ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ ২৬ সংখ্যা—৩৮ সংখ্যা

শুক্রবার, ১৬ই কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ—শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

শুক্রবার, ২রা নভেম্বর, ১৯৬২—২৫শে জানুয়ারী, ১৯৬৩

লেখক — **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

অমৃত

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক ... বিষয় ও পৃষ্ঠা

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৬ই কার্তিক, ১৩৬৯ বং—

Friday, 2nd November, 1962.
40 Naya Paise.

ঝড় আসিল! সারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান ও ওয়াকিবহাল লোক মাত্রেই জানিত যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে—শুধু আমাদের কর্ণধারবর্গ সময়মত হুঁসিয়ার হইতে পারেন নাই। চীনের মতলব কি সে বিষয়ে ১৯৫৪ সাল হইতেই বেশ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল এবং ১৯৫৮ সালের পর আভাস-ইঙ্গিতের কোন প্রশ্নই ছিল না—প্রশ্ন ছিল শুধু কবে ও কোথায় চীনা অভিযানের আরম্ভ হইবে এবং সেই অভিযানের সংঘর্ষ কতটা প্রবল হইতে পারে।

যখন অভিযান আরম্ভ হইল, জনসাধারণকে জানানো হইল যে চীনারা সেই আক্রমণে শুধু বিপুল সংখ্যায় সৈন্যদল নিয়োগ করে নাই, সেই সঙ্গে তাহারা 'মাউন্টেন গান', 'ভারী মর্টার' ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করিয়াছে। ছাপার অক্ষরে অজ্ঞ লোকের কাছে এই অস্ত্রগুলির নাম খুব ভয়ানক ঠেকে। কিন্তু আসলে আজিকার দিনে যে-কোনও আধুনিক ফৌজ যদি পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করে তবে এই অস্ত্রগুলি সাধারণভাবে তাহাদের হাতে দেওয়া হয়—যদি তাহাদের কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আমাদের কর্ণধারবর্গ হয় এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন নহিলে বলিতে হয় যে তাঁহাদের "বলিহারি আক্কেল"!

বিদেশী কাগজের মারফৎ আমরা শুনিলাম যে নেফা অঞ্চলে আমাদের সৈন্যদের রসদ বা যুদ্ধ-উপকরণ সরবরাহের জন্য পথ-ঘাট কিছুই করা হয় নাই—যদিও বিগত চার বৎসর লালচীনের কর্তৃপক্ষেরা তাহাদের অভিযান চালাইবার জন্য তিব্বতের পাহাড়ী এলাকা কাটিয়া ভারী লরী ও কামানবাহী মোটর চালাইবার পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত একথা সারা জগৎ জানিত।

ফলে যাহা হইবার তাহাই ঘটিল। প্রথমে আমাদের সৈন্যদল পৃথক পৃথক ঘাঁটিতে সংখ্যায় বহুগুণে অধিক শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও অসীম শৌর্যবীর্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া শেষে হটিতে বাধ্য হয়। তারপর আমাদের কর্তাদের টনক নড়ে এবং এখন চেষ্টা চলিতেছে অস্ত্র সংগ্রহের ও সরবরাহের। এখন দেশ-বিদেশে অস্ত্রের খোঁজ চলিতেছে—এবং পাওয়াও যাইবে তবে সময়মত নয়, দেরীতে।

একথা সত্য যে, এখন দোষ নিরূপণের সময় নয়। তবে এখন প্রয়োজন এই যে, যে পথে দেশকে এই বিপাকে ফেলা হইয়াছে, সেই পথের প্রদর্শকদের বলা যে যাহারা পথ জানে তাহাদের পরামর্শ এখন নেওয়া অত্যন্তই প্রয়োজন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন ও অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভারতরক্ষা আইনের পুনঃপ্রচলন হইবার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদলের মধ্যে উক্ত ঘোষণা ও অর্ডিন্যান্সজনিত জরুরী কাজ চালাইবার যে ছয়-জনের কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধকালীন দেশচালনার ব্যবস্থা করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একাধিক লোকের পরামর্শদাতা হিসাবে থাকা প্রয়োজন, যেরূপ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেই করা হয়। বর্তমানে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রীমহাশয়েরা ঐ কমিটিতে আসন পাইয়াছেন তাঁহাদের এসব বিষয়ে জ্ঞানের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে আমরা ভরসার কারণ পাই না।

ভরসা আমাদের আছে আমাদের সেনাদলের উপর। শৌর্য ও যুদ্ধবিক্রমের খ্যাতিতে তাহারা প্রতিষ্ঠিত এবং এবারের যুদ্ধেও তাহাদের সেই খ্যাতি উজ্জ্বলতর হইয়াই চলিয়াছে। এখন প্রশ্ন শুধুই অস্ত্রবলের এবং তাহার অনেক কিছুই আমাদের আনা প্রয়োজন বিদেশ হইতে—এমনই ব্যবস্থা আমাদের কর্ণধারবর্গের।

আর এক ভরসা যে আমাদের সৈন্যদল এখন যেখানে, সেখানে চীনা সেনাদলের অস্ত্র সরবরাহ ও রসদ পৌঁছান সহজ নয়, কেননা তাহাদের তৈয়ারী পথঘাট পিছনে পড়িয়াছে এবং তুষারপাতও আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং ভয়ের কারণ নাই। দেশের লোক এখন আমাদের স্বাধীনতা ও ভারতমাতার পবিত্রভূমি রক্ষার সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন প্রয়োজন স্থিরবুদ্ধিতে ও বিনা অযথা বাক্যব্যয়ে যথাযথভাবে চীন অভিযান প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। সমস্ত দেশ সজাগ ও উদ্যমশীল হইলে পরে আমাদের জয়লাভ সত্যই অনিবার্য।

উত্তর

শান্তিকুমার ঘোষ

কে ডাকে—"বেরিয়ে এসো তোমার কৈশোর থেকে
রক্তিম শিহর-লাগা ফাল্গুনে অধীর হ'য়ে
বাইরে দাঁড়িয়ে।
দ্যাখো না কৌতুক নাচে তরুণ সবার চোখে
বন-ভোজনের পথে যুগল সাঁতারে চলে
শহর ছাড়িয়ে।"

"সময় কোথায় বলো"—আমি তাকে বলি ঃ
"সোনেহারি বাগ থেকে কিনারি বাজার
মনে মনে ঘুরি রোজ স্মৃতির শহর;
অন্ধকার স্বর যেন জলচক্র অবিরাম
দুঃখ প্রেম তৃষ্ণা ছেনে সাধ যায় বেঁধে নিই
দু-চারটে কলি।
আমাকে ডেকো না তাই"—তাকে আমি বলি॥

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি

পরিমল চক্রবর্তী

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাই নি আমি
আকাশের দিকে। এই সমর্পিত আতুর আকাশ
সমস্ত শান্তির উৎস; ধরিত্রীর ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
মধ্য-রাত্রে ভেঙে পড়ে হাওয়া হয়ে সব দুঃখকামী
কবি ও শিল্পীর দেহে; জীবনের ব্যাপ্ত অন্ধকারে
আলোর রূপক যেন ওই নীল আকাশের ছবি।
যত দেখি তত ডুবি আমি সেই তীব্র হাহাকারে,
দেখে দেখে মুগ্ধ হই ওই নীল শান্ত ভাবচ্ছবি।

অনেক ঘুরেছি আমি একাএকা স্বদেশে বিদেশে—
অনেক দুঃখের স্বাদ প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মত
জীবনে পেয়েছি আমি। হৃদয়ের গভীরে অক্লেশে
বিষ জমা করে গেছি; দুঃখ আছে দাহ আছে যত
সমস্ত নিয়েছি বুকে, দুঃখ পেতে একাএকা। একা
লুকিয়ে রেখেছি প্রাণে আকাশের দীর্ঘ স্বপ্নরেখা॥

বাসনা

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

বাসনাকে কে রাখিস বুকে? কে রে তুই অবেলায়
মনের কামনাগুলি দীপে তুলে ভাসালি সাগরে
মন্ত্র জপে, গান গেয়ে। ওরে শোন, বাঘের শরীরে
চক্রকাটা ভয় আছে, সূর্য আছে গাছের মাথায়।

শীতের সাপের মতো যন্ত্রণারা গহ্বরের বুকে
নিঃশব্দ নিঃসাড় দ্যাখ। অন্ধকার শ্রাবণী সুপ্রিয়
প্রেম তাই স্বার্থপণ্ন, জীবনের একাকী আত্মীয়
আর সব মিথ্যা সত্য; ষড়ঋতু রূপের স্তবকে

একচ্ছন্দে সুর হয়; সময়েরা মদের মতন
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। তবু বারো মাস বরফ উত্তাপে
দিন রাত্রি বৃথা খোঁজা। অকস্মাৎ শেষরৌদ্র কাঁপে
বিরহী কম্পিত ঠোঁটে; থরোথরো জীবন্ত মরণ।

চেতনা রৌদ্রের ঢেউ; ভেঙে পড়ে নিশীথ গুহায়
দিন রাত্রি অন্তরঙ্গ দেহবন্দী অন্য মোহনায়॥

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

এ বাজারে নিজের ইচ্ছেমতো একটি ভালো বাড়ি পাওয়া আশাতীত সৌভাগ্য। উদ্যোগী পুরুষ চেষ্টা করলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইত্যাদি হয়ত আয়ত্ত করতে পারেন, এমন কি সংসারের দুর্লভতম বস্তু ভালোবাসারও হয়ত সন্ধান পেতে পারেন, কিন্তু ভালো একটি বাসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার স্বাভাবিক. কবি যে বলেছেন—রমণীর মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন, তাতে সময়টা একটু বেশি ধার্য হলেও একেবারে হতাশ হওয়ার কারণ ঘটেনি। কেননা, একের পিঠে গোটা তিনেক শূন্য বসালে হাজার নামক সংখ্যাটি হয়ত কোনো এক সময় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়ি, অর্থাৎ ভাড়াটেদের ভাষায় যাকে বলা হয় বাসা, সে বস্তু পাওয়ার জন্যে শূন্যের পর যতো শূন্যই বসানো যাক, শেষ অবধিও তবু ব্যাপারটা শূন্যের মতোই ফাঁকা-ফাঁকা থেকে যায়।

আমি শুনেছিলাম, এ সমস্যা কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে। বৃটেনে এ নিয়ে কয়েক বছর আগে কলরব শোনা গেছে, রাশিয়াতেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ ঘটেনি। কাজেই বাড়ি নিয়ে অশান্তি ঘটলে মনে মনে বলেছি, এ যুগে জন্মে এ নিয়ে অস্থির হলে চলবে না—এ সমস্যাকে মেনে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন কাগজে একটা খবর দেখে আমার শান্তিভঙ্গ হল। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, লেখা রয়েছে—

"ভাড়াটেদের স্বর্গরাজ্য।

কানাডার কুইবেক শহরে বাড়িঘরের তুলনায় ভাড়াটের সংখ্যা এত কমে গেছে (যে) বাড়িওয়ালারা বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছে যে, নতুন ভাড়াটেদের প্রথম তিনমাস বিনা ভাড়ায় থাকতে দেওয়া হবে। তারপর ভাড়া দেওয়া চলবে।"

কুইবেক শহর নিশ্চয়ই 'জলন্ধর সিটি' নয় যে, মন্ত্রপূত রেশমি রুমাল বা পাঁচ টাকার রেডিও সেটের বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকাটা জলের মতো বার করে নেবে। কিন্তু বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যাবে, এমন বিজ্ঞাপনও কি কেউ সহজ-ভাবে মনে গ্রহণ করতে পারে?

কলকাতায় রাস্তায় এককালে অনেক বাড়ির গায়েই 'টু লেট' ঝুলতে দেখা গেছে। কিন্তু সেই সুবর্ণযুগেও কোথাও 'টু লেট—উইদাউট রেন্ট' বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েনি। এমন অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার কথা কল্পনাই করেনি কেউ। আর আজ দেখা যাচ্ছে সেই অকল্পনীয় ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে সাগরপারের অন্যদেশে। শুনে সমস্ত দেহমন 'যাই যাই' বলে সাড়া দিয়ে ওঠে বৈকি!

আমার এক বিবাহোন্মুখ বন্ধুবর ত খবরটি পড়েই কানাডার পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করে আর কি। নেহাৎ করেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়ি এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধেই তার ইচ্ছেকে হাত-কড়ি পরিয়েছে আপাততঃ। তবে এই সমমবার ধার্য বিয়ের তারিখের মধ্যে সে যদি একটা বাসযোগ্য ভাল বাসা না পায়, তবে,

কানাডা চলিনু হাম
হামে না ফিরাও রে

বলে সে বারকয়েক শাসিয়ে রেখেছে আমাদের। আপনারা ভাবছেন সে তাহলে এখন কি গাছতলায় রয়েছে! না গাছ-তলায় থাকে না বলেই বাড়ি তার আশু

প্রয়োজন। গাছতলায় সন্ন্যাসীরাই (দিনের বেলায় ক্ষৌরকারগণ) থাকে। বন্ধুটি যখন বিয়ে করতে চাইছেন তখন তাকে সন্ন্যাসী বলাটা সম্ভবতঃ যুক্তিগ্রাহ্য হবে না। মাথা বাঁচাবার একটা ঠাঁই অবশ্যই অমরেশের আছে। কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্তই। আর কিছুই বাঁচে না। বিছানা না, মেঝে না, টেবিলের কাগজপত্র না এমন কি একটা পয়সাও না। দুটো ঘর নিয়ে থাকে সে ভাড়া দেয় পঁচাত্তর। আর বক্তব্য সে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে দুটো ঘর নয়, দুটো নেটের মশারিই ভাড়া নিয়েছে। বৃষ্টির সময় শুধু ছাদ দিয়েই নয়—দেয়াল, জানালা, ফাটল, রেন-পাইপ দিয়ে জলপ্রপাত হতে থাকে ঘরে।

—বাড়িওয়ালাকে বলিস না কেন? এক-বার বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম তাকে।

—বাড়িওয়ালাকে বলবো? আরে এ হল সেই বাড়িওয়ালা যে ঘরে জল পড়ার কমপ্লেন করলে বলে, 'বৃষ্টির সময় জল না পড়লে কি কোকাকোলা পড়বে' বুঝলি?

॥ একটি ঘোষণা ॥

বাঙলা একাঙ্কিকার ইতিহাস দীর্ঘকালের না হলেও সাম্প্রতিককালের কয়েকজন ক্ষমতাশালী নাট্যকারের অবদানে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। 'অমৃত' পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের এই নতুন সৃষ্টিকে আরও সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। একালের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নাট্যকারের একাঙ্কিকা 'অমৃতে' প্রকাশিত হবে। সর্বপ্রথম থাকবে খ্যাতিমান নাট্যকার মন্মথ রায়ের রচনা।

—রেন্ট কন্ট্রোলে নালিশ করিস না কেন? ভাড়াত দিস পঁচাত্তর! বন্ধুকে তাতাবার চেষ্টা করি।

—সে ভয় কি আর দেখাইনি ভেবেছিস?

—তা—কি বললেন তখন?

—কি আর বলবে, কিছুই বললে না, করপোরেশনের বাড়ি ছাড়ার নোটিশটা দেখালো। বাড়িটা এত পুরোনো যে করপোরেশন নোটিশ দিয়ে দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার। কাজেই আইনতঃ আমি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য......।

আমার চোখ তখন কপালের কাছা-কাছি।

—নোটিশ দেয়া বাড়ি ভাড়া নিয়েছিস, চাপা পড়বি যে!

অমরেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বললে,

—মরি মরবো। বিয়েত আর করিনি এখনো! কে আর.........

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর বলা গেল না যে বিয়ে করলেও অবস্থার কোনো তারতম্য হত না।

অবশ্য অমরেশকে কিছুই বোঝানো যাবে না কিন্তু, যতদিন না একটি বাড়ি পাচ্ছে সে। নইলে সেদিন এসে আমায় বলে,—ভাবছি গাড়ী কিনবো।

—সে কি! গাড়ি কিনবি হঠাৎ, গাড়িতেই বৌ নিয়ে থাকবি নাকি?

—কেন সেই গল্পটা জানিস না? একটা লোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলে একটা লোক গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কেউ তাকে হাস-পাতালে নিয়ে যায়নি, যে গাড়িটা চাপা দিয়েছে সেও সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়েছে। লোকটা চাপা-পড়া লোকটার ঠিকানা জানবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে ঠিকানা পেল একটা। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠিকানায় গিয়ে বললে, 'দেখুন অমুক বাবুর বাড়ি ত এটা? বেশ। উনি গাড়ি-চাপা পড়ে মারা গেছেন, বাড়িটা আমায় ভাড়া দেবেন?' বাড়িওয়ালা দরজা বন্ধ করতে করতে বললে, 'একটু আগে যে লোকটা চাপা দিয়েছে সে এসে ভাড়া নিয়ে গেছে।'

কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন বস্তু। আজ্ঞে হাঁ, 'টটোলজি' অর্থাৎ হেঁদো-কথার (!) মতো শোনালেও কথাটা সত্যি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ভাড়াটে-সমাজের দুঃখদুর্দশার বিষয়ে অনেক বিধিব্যবস্থা, শলাপরামর্শ এবং পরিকল্পনার পরেও আমরা যে তিমিরে প্রায় সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছি। বরং বর্তমানে যা ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তাতে 'তিমির'টা আরো একটু নিবিড় হবে বলেই মনে হচ্ছে। দিল্লির এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে সেদিন স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি নিয়ে এখন বাড়াবাড়ি করাটা জাতীয় প্রয়োজনের পরিপন্থী।

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অপেক্ষা করব এবং নিষ্ফল বেদনায় লক্ষ্য করব কানাডার বাড়ি-ওয়ালাদের কন্যাদায়সুলভ বিজ্ঞাপন, আর আমাদের বাড়িওয়ালাদের বরকর্তা-সুলভ মনোভাব।

তারপর, তারপর আর কি? প্রতি-দিন ঘুমের আগে আবৃত্তি করব মনে-মনে রবীন্দ্রনাথ লিখিত মধ্যবিত্ত ভাড়াটেদের এই বীজমন্ত্র—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
... ...
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

প্রাবন্ধিক রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত

দেশের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ও জাতীয় ভাবের উদ্দীপ্তিতে এক সময় রজনীকান্ত গুপ্তের লেখনী সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্কিম-পর্বের এই প্রাবন্ধিকের নাম আজ শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে প্রায় ইতিহাসেই পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে স্বদেশীয় লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও প্রাচীন গরিমাময় ঐতিহ্যের অনুশীলনে একদা একটি যুগ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। বিবিধ ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বগত রচনা-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিক চেতনার সংহত প্রেরণাই বলিষ্ঠ প্রকাশ-আকুলতা পেয়েছিল। অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে এই ধারার প্রবন্ধ রচনায় যে সূত্রপাত তা স্বরূপতঃ পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের বিচার, বোধ ও বিশ্লেষণকেই অনুসরণ করেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়নে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের সংলক্ষ্য ভূমিকাটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে এবং বিশেষভাবে স্মরণে রেখেও এ মন্তব্য হয়তো করা চলে যে, অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে এই জাতীয় ঐতিহ্য উদ্ধার-প্রয়াসের মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চার প্রবর্তনাই আত্যন্তিক মূল্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতির বঙ্কিম-পর্বে রচিত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে জাতীয় গৌরব-বোধের উচ্চসংস্পর্শ রূপটিই লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহী গবেষক গোষ্ঠীর মধ্যেই একটি অপরিহার্য নাম সংযুক্ত হয়ে রয়েছে—তিনি রজনীকান্ত গুপ্ত। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের বিভাগে ডক্টর সুকুমার সেন তাঁরই নাম সর্বাগ্রে দাবী করেছেন। দীর্ঘকালের বিস্মৃতির বিবর্ণতায় তিনি প্রায় স্মৃতিবহির্ভূত হয়ে পড়লেও তাঁকে নতুন করে স্মরণ করবার প্রয়োজন হয়তো রয়েছে।

রজনীকান্তের সা হি ত্য সা ধ না র ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনীর কয়েকটি সূত্রসন্ধানও অবশ্য-কর্তব্য হয়ে পড়ে। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন সতু গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। পিতা তেওতা গ্রামনিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য। বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতা আসেন। এন্ট্রাস অবধি পড়েন। কিন্তু শ্রবণশক্তি হ্রাসজনিত দুরদৃষ্ট তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেয়নি। আত্মীয়গণের ইচ্ছানুসারে আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত কিংবা গভর্ণমেন্টের অধীন সাব-ডেপুটিগিরি কোনটাই তিনি করেন নি। কেননা তাঁর সর্বাঙ্গীণ মনোধর্মে বা মেজাজে বিষয়ান্তরের প্রেরণাই একমাত্র ধ্যেয় হয়েছিল। দুর্জয় সাহস ও অতো-ধিক আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্যেই স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন : "এই সময় হইতে তাঁহার বাংলা রচনায় প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত 'জয়দেবচরিত' বাংলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়।"[1] প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে এই পুস্তক রচনা করেই তিনি রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পান। বাংলা ১২৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক তালিকায় তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীই 'আর্যকীর্তি' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুপ্রাণিত সত্তাকে এ প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি স্বাদেশিক চেতনাবোধই প্রধানত নিরূপণ করেছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আগ্রহে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব লিটেরেচার' বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রূপান্তরিত হয় (১৮৯৪, ২৯শে এপ্রিল); ১৩০১ সালের সতেরোই বৈশাখ তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুনর্গঠিত, নতুন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত ও নিয়মাবলী নতুনরূপে নির্ধারিত হয়। এই সময় থেকেই পরিষদের মুখপত্র-স্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' প্রকাশনা শুরু হল। রজনীকান্ত এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।[2] ১৩০১ থেকে ১৩০৩ পর্যন্ত রজনীকান্ত যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাখানি সম্পাদনা করেন। প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে মুদ্রণকার্য পর্যন্ত সবই তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হত। পরিষদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাগ্রসর মনের সান্নিধ্য সে সময়ে কতোখানি কাম্য ছিল, ১৩০৭ সালের পরিষৎ পত্রিকায় সে বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উল্লেখ করেছেন : "রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি রমেশ দত্ত রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। সাহিত্য পরিষদ যে যে প্রধান কার্যে এ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।" পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তিনি কতোখানি উদ্যোগী ও গভীরভাবে জড়িত ছিলেন 'সাহিত্য সাধক চরিত-মালার' উদ্ধৃত তিনখানি পত্রই তার প্রমাণ। তিনি উন্নত মানসিকতা নিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে-ছিলেন : (১) বাংলার পারিভাষিক শব্দের স্থিরতা না থাকার দরুণ যদৃচ্ছা পরি-ভাষা প্রণয়ন হচ্ছে—এই কারণে পরি-ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করা উচিত।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষা নির্বাচন বিষয়ে তিনি চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছিলেন : "এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্তব্য।"

(৩) বাংলার প্রাচীন কবিকুলের কীর্তি রক্ষা করা।

এই সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সমা-

---

১ ভূমিকা : ভারত-কাহিনী (১৮৮৩)

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিষৎ পরিচয়' গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বর্তমান বর্ষের জন্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।"

—কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন, আষাঢ়, ১৩০১

[illegible] রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আত্ম-ব্যক্তির উন্নত নিষ্ঠাকেই চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর মোটামুটি নিম্নরূপ একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে :

১ম বর্ষ।	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সাময়িক প্রসঙ্গ, 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালা রচনা
২য় বর্ষ।	"	সাঁওতাল পরগণার ছড়া, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য, সাময়িক প্রসঙ্গ (৪টি), সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (২টী), অক্ষয়কুমার দত্ত
৩য় বর্ষ।	"	মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাময়িক প্রসঙ্গ,
৪র্থ বর্ষ।	"	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে, বাঙ্গালা সাহিত্য
৫ম বর্ষ।	"	ইতিহাস রচনার প্রণালী
৬ষ্ঠ বর্ষ।	"	গ্রন্থ রচনা বিষয়ে প্রস্তাব

উপরোক্ত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিই নয়—রজনীকান্ত গুপ্তের প্রতিভার স্বীকৃতি অন্যত্র। তিনি হলেন ইতিহাসের ইতিহাসকার। রবীন্দ্রনাথ একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "যদিবা ভারত-সাহিত্যে ইতিহাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।" এর পশ্চাতে ভারতীয় চিত্তের অধ্যাত্মমার্গী অন্বেষা কিংবা ভারতীয় চিত্তের একাগ্র হবার সংগঠন-গত ভাবের অভাব প্রভৃতি সূত্রসন্ধান স্বতন্ত্র প্রশ্ন। বাংলায় যথার্থ ইতিহাস রচনার উদ্যোগপর্বে (১৮১৪-১৯০৫) বিগতকালের ইতিহাসই অনাগত কালের প্রেরণা ও শক্তিরূপে কাজ করে, এমনি একটি মানসিকতার উপলব্ধি ঘটল বাঙালী-চেতনায়। যুগগত এই অনুভূতিই তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী চিন্তানায়কদের চালিত করেছিল। এই সূত্রে প্রসঙ্গত প্রবোধচন্দ্র সেনের গভীর বক্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে : "বাংলার পুরাবৃত্ত সন্ধানে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের নেতা ও উৎসাহদাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪); বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—৮৬) প্রমুখ তৎকালীন বাঙ্গালী পুরাতাত্ত্বিকদের মুখপত্রের স্থলবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[৩] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার [illegible] পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১২৮১) পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমাদের ইতিহাস-চেতনায় শূন্যতা বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন : 'মার্শম্যান স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ পূরণমাত্র।' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাহিত্যের পরেই উল্লেখযোগ্য রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৯১); চিন্তাহীন গতানুগতিক ধারায় মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতা সঞ্চার করেছিলেন। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনা করেছেন রজনীকান্ত। পূর্বসূরী হিসেবে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতির পুরাতাত্ত্বিক ধারাকেই প্রথমদিকে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর 'জয়দেবচরিত' (১৮৭৩) কিংবা 'পাণিনি' (১৮৭৫)-তে সে প্রবণতার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বজাতির প্রতি গভীর আন্তরিক অনুরাগের বশে ভারতবর্ষীয় আধুনিক ইতিহাস পর্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'কেই তাঁর পাঁচ খণ্ড পুস্তকের বিষয়রূপে নির্বাচন করলেন।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাসের আলোচনার পথ সরল নয়। এ বিষয়ে দুটি বাধার উল্লেখ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রথমতঃ, ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্যে বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় নিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপন দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নয়। এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও একবার বলেছিলেন : 'সকল সভ্য দেশেই আপন সাহিত্যে ইতিহাস ও জীবনী আগ্রহের সঙ্গে রক্ষিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না।' এই জাতীয় ক্ষোভের মন নিয়েই বিস্মৃতির গহ্বরে [illegible] চেয়েছিলেন রজনীকান্ত। [illegible] উদ্দীপনা সংরক্ষণ ও তার [illegible] পরিপুষ্টিই ছিল রজনীকান্তের [illegible] ধর্ম। এই অন্তর্ধর্মের প্রেরণাতেই তিনি তাই বলতে পেরেছিলেন : 'স্বদেশের অতীত বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্তমান বিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই শোকসন্তাপ দূর করিবার উপায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য।' (ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন : ভারত-কাহিনী পৃঃ ৬); এই কর্তব্যের বিষয়ে তিনি অতি সচেতন—তাই স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন কর্তব্য নহে।' ইতিহাসের পর্যালোচনা ক্ষেত্রে তাঁর নির্ভীক মন ন্যায়ের পক্ষপাত বর্জিত বিচারকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আর তাঁর প্রাচীন ইতিহাসের সমালোচনাগুলি যেন বিনম্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি হয়ে উঠেছে। ভারতের পূর্বতন কাহিনী তাঁর হৃদয়ের প্রতি স্তরে একটি অখণ্ড মমতার অন্তরীপ বলেই এ বিষয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস না দেখে তিনি আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন : 'ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যন্ত লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।' (ভারত-কাহিনী পৃঃ ৩)।

ঐতিহাসিক সমালোচনাগুলির গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি বিষয়ের গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবদিকের অনুবিধা-গুলিও উপলব্ধি করেছেন। অন্ধকারময় প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধানে পদে পদে দিশাহারা হবার যেখানে সম্ভাবনা সেখানেও তিনি নির্ভীক। অকল্প যুক্তির বিশ্লেষণে তিনি এগিয়ে গেছেন। 'ভারত-কাহিনী'তে তাই তিনি ইংরেজ রচিত ইতিহাসের অযথা বা অতি সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় যথার্থ ঘটনার বিপর্যস্ত রূপকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। প্রাচীন হিন্দু আর্যগণের প্রকীর্তিত মহিমা তাঁর মননীয় মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত ছিল বলেই ঐতিহ্যালোচনার সার্থক নির্ভর পরিচয় দিতে পেরেছেন তিনি। 'ভারত-

৩ বাংলায় ইতিহাসচর্চা : [illegible] সেন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম [illegible] বিশ্লেষণ-ধারা বিশ্বজাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে। 'ভারতে গ্রীক' প্রবন্ধটিতে সেকান্দারশাহের বিজয়বাদ্যবাহী ভারতবর্ষীয় আটটি শ্রেণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। "আর্যকীর্তি" গ্রন্থ-পর্যায়ের মধ্যে বীর ও বীরাঙ্গনা রাজন্যবর্গের পরিচয় যেন লেখকের আত্মার শক্তি ও অন্তর্মুখী মনের বর্ণ দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে প্রবল আবেগ তাঁর কণ্ঠকে উদ্বেল করে তুলেছে। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হৃদয়বত্তার উদ্বেলতা কতোখানি পরি-পূর্ণ রূপ নিতে পারে— তারই নিদর্শন নীচের উদ্ধৃত অংশটি—লক্ষ্মীবাই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: 'যদি কেহ মাধুর্য-ময় কোমল সৌন্দর্যের সহিত ভয়ঙ্কর-ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাতকমলের অগ্নিবিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণা-ধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্যটনকারী ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাঈ তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন।' (আর্যকীর্তি, তৃতীয় খণ্ড)।

'ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়' প্রবন্ধে ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রগতি-ভাবনায় তিনি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। ইংরেজ রচিত ভারতের ইতিহাস যেখানে অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত সেখানে যেমন তিনি তীব্র-কণ্ঠ, তেমনি আবার আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির মূলে ইংরেজ আধিপত্যের দান বিষয়েও তিনি মুক্তকণ্ঠ। তিনি প্রশংসার সঙ্গেই স্বীকার করেছেন 'উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সর্বপ্রধান সৎকার্য।' 'ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধটির মধ্যে প্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন, ইংলণ্ডের মুদ্রণ-স্বাধীনতার ধারা ও পারম্পর্য বিষয়েও আলোচনা আছে। ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের সময় মুদ্রণ-স্বাধীনতার গতিরোধ হলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপবাদে তিনি প্রকাশ্যরূপে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার স্পষ্ট পরিচয় প্রবন্ধটির শেষে স্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। রজনীকান্তের ক্ষুব্ধ অন্ত-র্দাহের বেদনা [illegible] অত্যন্ত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত।

[illegible] [illegible] [illegible] তিনি সুবাদার [illegible] [illegible] রচনা করেছিলেন। কিন্তু [illegible] [illegible] মতে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'প্রবন্ধকলাটিতে বৈজ্ঞানিক ধারা প্রচলন ও নীতিজ্ঞান একটি অপূর্ব কথন-ভঙ্গীকে অনুসরণ করেছে। পুরুষের বক্তব্য যা দুরূহ তত্ত্ব বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য ও আচ্ছন্ন করে তোলেনি।

ইতিহাসের তথ্যের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণের আবেগকে উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। পুরাণো-তিহাসের সর্বস্তর মহিমাই তাঁর বঙ্গবাণী তথা ভারতীয় মনকে আকর্ষণ করেছে। যুক্তি ও বিচারাশ্রয়ী তাঁর ইতিহাসবোধে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তায় উদ্দীপ্ত তাঁর প্রাণের আবেগ কখনও অন্ধ অনুরাগে পর্যবসিত হয়নি। সমগ্র মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ প্রবন্ধগুলির মৌলিক উৎস-ভূমি। এই [illegible] [illegible] প্রতিভার [illegible] দিলেন। তাঁর মনোভাবের মধ্যেই তাঁকে এই শিল্পের সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। যেন না তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করেছিলেন 'আপনাদের পূর্ব গৌরব কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই।'

কিন্তু এর পরেও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তা হ'ল তাঁর ভাষা-চেতনা। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাই যে তাঁর সৃষ্টির স্বক্ষেত্র—তাঁর রচনা-রীতি ও ভাষায় তার পরিচয় আছে। ইতিহাসাশ্রয়ী হয়েও তাঁর রচনা সাহিত্যরসবর্জিত নয়। ভাষারীতির ঔদার্য ও তীক্ষ্ণসচেতন বিশুদ্ধি ঐতিহাসিক বিবরণের বিশুদ্ধি প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাই রজনীকান্ত গুপ্তের ভূমিকাটি ঔদার্যের সঙ্গেই বিচার করা প্রয়োজন।

।। দর্শক ও সমালোচক ।।

মহাশয়,

"দর্শক ও সমালোচক" শীর্ষক আলোচনার জন্য নান্দীকর তাঁর যোগ্য মূল্য পেয়েছেন শ্রীআনন্দ রায়ের কাছে। শ্রীরায়ের চিঠি নানা কারণে মূল্যবান, তবুও তিনি যে উদাহরণ সম্বল করে দর্শকদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তাতে পুলকিত হতে পারিনি। দর্শকের সংগে চলচ্চিত্র বা নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, অন্য কোনও ধরণের আর্ট-এ ঠিক এত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক প্রয়োজন হয় না। তারই জন্য দর্শক ও চিত্রশিল্পের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নান্দীকর এরকম প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করে নাটক ও নাট্যসাহিত্যে অনুরাগী প্রতিটি লোকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কিন্তু শ্রীরায়ের অভিমত গ্রহণ করা ঠিক সম্ভব নয়।

আমরা সচরাচর দর্শককে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি—যাঁরা বোঝেন না ও যাঁরা বোঝেন। প্রথম শ্রেণীকে আমরা রুচিহীন বলি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজেদের নাম লেখাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমার ধারণা, এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগ অসম্পূর্ণ। দর্শককে দুই নয় তিন বা ততোধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত। (ক) যাঁরা নাটক বা সিনেমা দেখেন আনন্দ পাবার জন্য—এ'দের আনন্দে কোনও মানসিক চর্চার প্রয়োজন হয় না। এ'রা ধরে নেন যে সিনেমা ইত্যাদি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ medium of entertainment. 'হল'-এ ব'সে কিছু ভাবা তাঁদের মনের মতো নয়—তাঁরা চান নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড়; নিছক প্রেম ও জৈবিক আনন্দের অন্যান্য ধরণগুলির জন্যই তাঁদের মোহ। এ'রাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রুচিহীন বলে পরিগণিত। (খ) যাঁরা স্নব; এই শ্রেণী নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি, কারণ কেউ নিজেকে স্নব প্রমাণিত করতে চান না। এ'রা জোর গলায় বলেন না যে নাটক বা সিনেমা নিছক আনন্দের 'মিডিয়াম'। কিন্তু এ'রা ভাবনাচিন্তাও বেশী করেন, না। সিনেমা দেখে স্বতন্ত্র অভিমত সৃষ্টি করতে এ'দের ভয়ানক অনীহা। পরিচালকের নাম, অভিনেতার অংশগ্রহণ ও তদোপরি চিত্র-সমালোচকদের মতামতই এ'দের মতামত সৃষ্টি করে। ভালো জিনিসকে খারাপ বলবার যে রীতি সমালোচনার ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত, সেই রীতি এ'রা মানেন। কিন্তু এ'দের স্বাতন্ত্র্য অন্যত্র—এ'রা খারাপ সিনেমাকেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে সক্ষম। কার্লাইলের হীরো ওয়ারসীপের আইন এ'রা মেনে চলেন—এবং ক্ষেত্রবিশেষে হীরো-ওয়ারসীপ শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে বাচালতায় পর্যবসিত হ'লেও এ'রা বাহাদুরী ত্যাগ করেন না। (গ) যাঁরা বোঝেন, ভাবেন ও খারাপ চলচ্চিত্রকে কখনও ভালো বলেন না বা ভালো ছবিকে খারাপ বলতে কুন্ঠাবোধ করেন। এ'দের অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকেরা রুচিহীন দর্শকের দলে ফেলতে কুন্ঠাবোধ করেন না। কারণ সামান্যকে অসামান্য বলবার মতো মানসিক অসুস্থতা এ'দের নেই। এ'দের বিচারবস্তু কেবল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র নয়, এমনকি হলিউডও এ'দের বিচারের শেষ মাপকাঠি নয়। বাংলা চিত্রের ভালো-মন্দ বিচারকালে এ'রা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্রের কথাও তোলেন না। পোলিশ, রুশ, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, চেকোশ্লোভাক, জাপানী এমনকি বৃটিশ (হলিউড নয়) চিত্রের সঙ্গে এ'দের পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলেও নিতান্ত সামান্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ'রা চিত্র-সমালোচকের হাতের পুতুল নয়—তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। শ্রীরায় "কাঞ্চনজংঘা"র যে দৃশ্যটি উল্লেখ ক'রে দর্শকের রুচিহীনতায় আঘাত করেছেন তা কোনও বোদ্ধা দর্শকের কাছে ভালো লাগতে পারে না। মামাবাবু পাখীর ওড়া দেখে যে জীবনদর্শন জেনেছেন তা' জীবনের ট্র্যাজেডীরই প্রতিচ্ছবি। এই জানাকে তীব্রতর করা যেতো যদি সমস্ত চিত্রের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজিক মুডটিকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে ধরে রাখা যেতো। কাঞ্চনজংঘার ট্র্যাজেডী শেষ পর্যন্ত ছিলো সন্দেহ নেই—ছবি বিশ্বাসের শেষ চীৎকার তারই আভাষ দেয়। কিন্তু দর্শক মনে কি এই ট্র্যাজেডী থেকে নতুন বন্ধুত্বের আবেদন বেশী রেখাপাত করেনি? করেছে। এক্ষেত্রে মামাবাবুর মন্তব্য কাটা, ছিন্ন, জীবনদর্শন মাত্র। দর্শকের ভালো না লাগার পুরো কারণও এটাই। এক্ষেত্রে পরিচালকের ত্রুটি না ধরে দর্শককে দোষ দিয়ে লাভ কি?

বাংলাদেশে আজ ভাবুক ও বিচারক্ষম দর্শকের অভাব নেই। তাঁদের কথা মনে রেখে অন্ততপক্ষে- সব দর্শককে রুচিহীনতার পর্যায়ে ফেলা কেবল অবাস্তবকরই নয়, আর্টের পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকর।।

বিনীত—
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা-৩১

।। কুকুর-প্রীতি ।।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়েষু,
সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতে পত্রিকায় শ্রীজৈমিনির 'পূর্বপক্ষ' বিভাগে কুকুর বিষয়ে আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী হয়েছে। এটা আভিজাত্যের Trade mark বললে বোধ হয় খুব বেশী অত্যুক্তি করা হবে না। শ্রীজৈমিনির আলোচনা পড়তে গিয়ে আমার আলি সাহেবের (শ্রীসৈয়দ মুজতবা আলি) সেই 'পাদটীকা' গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। সাহেবের কুকুরের একটি 'পা'র জন্য যে খরচ হয়, পন্ডিত-মশায়ের পরিবারের মাসিক ব্যয় তার সমান। তাছাড়া রাস্তায় কুকুরের চেয়ে বাসায় পোষা কুকুর কামড়ানোর ঘটনা যে বেশী সেটাও তার নির্ভুল তথ্য।

এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার উল্লেখ করলাম। ঘটনাস্থল একজন অফিসারের কোয়ার্টার। এ স্থলে উল্লেখ করা বোধহয় অনাবশ্যক হবে না যে বড় বড় মফঃস্বল শহরে শতকরা ৬০ জন উচ্চ পদস্থ অফিসার কুকুর পুষে থাকেন। এখন উক্ত অফিসারের কুকুর থাকার দরুণ তার অধীনস্থ অনেক কর্মচারী অফিস সম্বন্ধীয় কোন কাজে তাঁর কোয়ার্টারে যেতে রীতিমত ভয় পেতেন। কিন্তু তাঁদের উপরওয়ালা বলে কেউ ভয়ে কিংবা সঙ্কোচেই হোক ঐ কুকুর সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করতেন না। অবশেষে পালে কিন্তু সত্যই একদিন বাঘ পড়লো। একজন নতুন ডাকপিয়ন ডাকবিলি করতে গিয়ে খেল তাঁর কুকুরের কামড়। রক্তাক্ত অবস্থায় সে তার উপর-ওয়ালার কাছে এ ঘটনা জানালেন।

উপরওয়ালা উক্ত অফিসারকে কড়া ভাষায় পত্র লিখে জানিয়ে দেন, তাঁর কুকুর সম্বন্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস না দিলে কোন ডাকপিয়নের পক্ষে তাঁর কোয়ার্টারে চিঠিপত্র বিলি করা সম্ভব হবে না। ফলে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। তিনি নিজে গিয়ে ডাক-বিভাগের উপরওয়ালার (স্থানীয়) কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আসেন। চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হন। এরপর থেকে তিনি সর্বদা কুকুর বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর সদর গেটে "Beware of Dog" বোর্ড মারেন। অবশ্য এতটা সাবধানতা সকল কুকুর-প্রেমীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

নমস্কারান্তে,
বিনীত—
[illegible]

শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক বেলায় ফিরল হোম্‌স্‌। শুকনো মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যর্থ হয়েছে সে। অনেক আশা নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসেছে একেবারে নিরাশ হয়ে। বেশ কিছুক্ষণ বেহালার ওপর এলোপাতারি ছড়ি টেনে খিটখিটে মেজাজকে বাগে আনার চেষ্টা করল সে। তাতেও যখন কিছু হল না, তখন যন্ত্রটাকে একপাশে ছুড়ে ফেলে শুরু করল সারাদিনের নিষ্ফল অ্যাডভেঞ্চারের আদ্যোপান্ত কাহিনী।

"সব ভুল ওয়াটসন, আগাগোড়া সমস্ত ভুল। জোরগলায় লেসট্রেডকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম বটে, কিন্তু প্রমাণ যা কিছু দেখে এলাম, তার তো কোনটাই আমার অনুকূল নয়। আমার মন বলছে

নরউড'এর স্থপতি

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

এক, আর ঘটনাগুলো বলছে আর এক। যতই নতুন নতুন থিওরী আমি আবিষ্কার করি না কেন, বৃটিশ জুরীরা এখনও এমন প্রতিভার অধিকারী হয়ে ওঠেনি যে লেসট্রেডের অকাট্য প্রমাণ খারিজ করে দিয়ে আমার থিওরীকে মেনে নেবে।"

"ব্ল্যাকহিথে গেছিলে?"

"গেছিলাম এবং গিয়েই জেনেছি যে তোমাদের এই শখ-পাওয়া বুড়ো ওলডাকার মত পাজীর পা-ঝাড়া দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। মা বাড়ীতেই ছিলেন। ছোটখাট হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রমহিলা, নীল নীল চোখ। ভয়ে আর দুঃখে তাঁর সে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি যদি দেখতে তুমি। ম্যাকফারলেনের অপরাধ স্বীকার করা তো দূরের কথা, এ রকম কোন সম্ভাবনাও তিনি মানতে রাজী নন। ভেবেছিলাম, ওলডাকারের শোচনীয় পরিণতি শুনে বিস্মিত হবেন ভদ্রমহিলা, নিদেনপক্ষে একটু দুঃখও প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে-সবের ধার দিয়েও গেলেন না উনি। উল্টে দারুণ ঝাঁঝালো গলায় বুড়োর সম্বন্ধে এমন সব তোখা তোখা কথাবার্তা শুরু করে দিলেন যে নিজের অজান্তেই ছেলের কেসকে আরও জটিল করে তুললেন। কেননা, এ সব কথা ম্যাকফারলেনের কানে যদি এর আগেও

কিন্তু আমার কপাল ভাল, সেই সময়ে আমার একটু সুমতি হওয়ায় এনগেজমেন্ট ভেঙে দিয়ে বিয়ে করি ওর চাইতে গরীব একজনকে। বাকদত্তা থাকার সময়েই ওর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা পাওয়াতেই আমার চৈতন্য হয়। পাখীর বড় খাঁচায় একটা বেড়ালকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিল ওলডাকার—আর, তার ঐ পাশবিক উল্লাস দেখে আমার আপাদমস্তক এমনই শিউরে উঠেছিল যে বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' ড্রয়ার হাতড়ে একটা ফটোগ্রাফ বার করে আমার হাতে দিলেন ভদ্রমহিলা। ফটোটি একটি মেয়ের। কিন্তু আগাগোড়া ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চেরা। 'ছবিটা আমার

গিয়ে থাকে, তাহলে রাগে দুঃখে উন্মাদ হয়ে গিয়ে একটা খুনখারাপি করে ফেলা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় তার পক্ষে। ওলডাকারের নাম শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়ে প্রথমেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'মানুষ তো নয়, যেন একটা বড় সাইজের বাঁদর। শুধু আজ বলে নয়, ওর জোয়ান বয়স থেকেই এই রকম—যেমন ধড়িবাজ, তেমনি বদমাস্।'

'শুধোলাম—আপনি তাহলে সে সময়ে ওঁকে চিনতেন বলুন?'

'শুধু চিনতাম নয়, হাড়ে হাড়ে চিনতাম। লোকটা একসময়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মিঃ হোম্‌স্‌।

মিঃ হোমস্। বিয়ের দিন সকালে অনেক শাপ-শাপান্ত দিয়ে ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়েছিল—ঐ নচ্ছারটা।'

"ওলডাকার তাহলে এখন আপনাকে ক্ষমা করেছেন বলতে হবে। তা না হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলেকে কি দিয়ে যেতেন?"

"আগুনে যেন ঘি পড়ল। দপ্ করে জ্বলে উঠে চীৎকার করে উঠলেন ম্যাক-ফারলেনের মা— জীবিত অথবা মৃত জোনাস ওল্‌ডাকারের কাছ থেকে কানা-কড়িও চায় না আমার ছেলে অথবা আমি। মিঃ হোম্‌স্‌, আমি ভগবানে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, যাঁর হাতের বজ্র এই কুটিল বদমাস লোকটার মাথায় এসে পড়েছে, তিনিই একদিন না একদিন সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে, আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ওল্‌ডাকারের রক্ত কোনদিনই লাগেনি তার হাতে।'

"তার পরেও বৃথাই চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু আমাদের অনুমানের অনুকূলে তো দূরের কথা, প্রতিকূলেও কোন পয়েন্ট পেলাম না ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে গেলাম নরউডে।

"প্রকাণ্ড হালফ্যাশনের ভিলা এই ডীপডেন হাউস। ইঁটবার-করা দেওয়াল, পলস্তারার কোন বালাই নেই। অনেকটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ীটা, সামনের লনটা লরেল লতায় ঢেকে গেছে। রাস্তা থেকে একটু পেছনে ডানদিকে কাঠের স্তূপ রাখার উঠোন—আগুন লেগেছিল এইখানেই। নোট-বইয়ের পাতায় মোটা-মুটি একটা স্কেচ করে এনেছি জায়গাটার। বাঁ দিকে এই জানলাটা মিঃ ওল্‌ডাকারের ঘরের। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যায়। আজকের অভিযানে এইটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। লেসট্রেডকে দেখতে পেলাম না ওখানে, কিন্তু হেড কনস্টেবল বেশ খাতির করে সব দেখালে। আমি যাওয়ার ঠিক আগেই ওরা নাকি হীরে-জহরৎ পাওয়ার মত বিরাট একটা আবিষ্কার করেছে শুনলাম। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পোড়া দেহাবশেষ ছাড়াও কতকগুলো বিবর্ণ ধাতুর চাকতি পেয়েছে। চাকতি খুব যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখলাম ওগুলো ট্রাউজারের বোতাম না হয়ে যায় না। একটা বোতামের ওপর 'হিয়াম্‌স্‌' লেখা দেখে চিনতে পারলাম বুড়ো ওল্‌ডাকারের দর্জিকে। এরপর লনটা তন্ন তন্ন করে দেখলাম যদি কিছু চিহ্নটিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে জমি শুকিয়ে এমনই লোহার মত হয়ে গেছিল যে শুধু পণ্ডশ্রমই হল। কাঠের গাদার সঙ্গে এক রেখায় নীচু একটা ঝোপ ছিল। এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভারী একটা বস্তু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। অর্থাৎ যা কিছু পেলাম, সবই পুলিশের থিওরীর স্বপক্ষে। অগাস্টের সূর্য পিঠে নিয়ে লনের ওপর হামাগুড়ি দিলাম ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম, সে তিমিরে। যখন এত করেও এক কণা আলোকপাত করতে পারলাম না, তখন ধুত্তোর বলে উঠে দাঁড়ালাম হাঁটুর ধুলো ঝেড়ে।

"যাই হোক, এই সব বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়ার পর গেলাম শোওয়ার ঘরে। যথারীতি পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ দেখলাম খুবই সামান্য, তাও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও চিহ্নটা যে তাজা রক্তের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ছড়িটাকে ওরা নিয়ে গেছিল, কিন্তু তাতেও শুনেছি রক্তের দাগ খুবই সামান্য। ছড়িটা যে আমাদের মক্কেলের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ম্যাক-ফারলেন নিজেই তো স্বীকার করছে। কার্পেটের ওপর দু'জন পুরুষের পায়ের ছাপ পেলাম—কিন্তু কোন তৃতীয় জনের নয়। অর্থাৎ আর একবার টেক্কা মারল লেসট্রেড। প্রতিটি প্রমাণ প্রতিটি খুঁটি-নাটি একে একে জোরালো করে তুলছে ওর থিওরীকে, আর আমরাই শুধু ন যযৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা থিওরীই আউড়ে যাচ্ছি।

"আশার সামান্য একটু আলো দেখে-ছিলাম, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত টিকল না। আয়রণ-সেফের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে দেখলাম। বেশীর ভাগ কাগজপত্রই অবশ্য লেসট্রেড রেখে গেছিল বাইরে টেবিলের ওপর। সীলকরা কতকগুলো খামে ছিল কাগজগুলো। দু' একটা পুলিশ খুলেছে দেখলাম। দেখেশুনে দলিলগুলো খুব বিশেষ দরকারী বলে মনে হল না। ব্যাঙ্কের পাশ-বই দেখে মিঃ ওল্‌ডাকারের আর্থিক প্রাচুর্যেরও বিশেষ কোন প্রমাণ পেলাম না। এইটুকু বুঝলাম যে সবগুলো কাগজ সেখানে নেই। কতক-গুলো দলিলের বার বার উল্লেখ দেখে মনে হল আসল দলিল বোধহয় সে-গুলোই। কিন্তু খুঁজে পেলাম না একটাও। শুধু এইটুকুই যদি আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারি, তাহলেও তো একহাত নেওয়া যায় লেসট্রেডের ওপর। লেসট্রেড খুব বড়াই করে গেল না, যে লোক সব কিছুরই মালিক হতে চলেছে দু'দিন পরেই, তার পক্ষে কাগজ-পত্র সরানো কোন মতেই সম্ভব নয়? কাজেই, কাগজপত্র যে কিছু হারিয়েছে তা প্রমাণ করতে পারলে অন্ততঃ কিছুটা কাজ হবে।

"বাড়ীর প্রতিটি [illegible] তন্ন তন্ন করে দেখে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়লাম ঘরকন্নার কাজ যিনি দেখাশোনা করেন, তাঁকে নিয়ে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস লেক্সিংটন। মাথায় খাটো, গায়ের রঙ ময়লা, কথাবার্তা খুবই অল্প বলেন, আর তেরচা চোখে সব সময়ে সন্দেহের ছায়া। ইচ্ছে করলে মিসেস লেক্সিংটন আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারতেন। কিন্তু অনেক কিছু তো দূরের কথা, সামান্য কিছুও বার করতে পারলাম না তাঁর মোম-আঁটা মুখ থেকে। সাড়ে ন'টার সময়ে মিঃ ম্যাকফারলেনকে তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার আগেই নাকি তাঁর হাত দুটো খসে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে তো আর এত বড় কাণ্ডটা ঘটত না। সাড়ে দশটার সময়ে শুতে গেছিলেন তিনি। শোওয়ার ঘর বাড়ীর আর এক প্রান্তে, কাজেই এরপর কি হয়েছে না হয়েছে তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় মিঃ ম্যাকফারলেন তাঁর টুপি আর ছড়িটা হলঘরে রেখে গেছি-লেন। হঠাৎ 'আগুন, আগুন' চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। মিঃ ওল্‌ডাকারকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা? শত্রু কার নেই? কিন্তু মিঃ ওল্‌ডাকার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা, এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা না থাকলে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন না। বোতামগুলো দেখেছেন মিসেস লেক্সিংটন। গত রাতে মিঃ ওল্‌ডাকার যে ট্রাউজার পরে-ছিলেন, বোতামগুলো তারই। [illegible] বৃষ্টি না হওয়ায় কাঠের গাদা শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল। কাজেই খড়ের গাদার মত দাউ দাউ করে সব জ্বলতে থাকে। মিসেস লেক্সিংটন যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আগুনের লকলকে শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়েছিলেন তিনি এবং দমকল-বাহিনীর লোকেরা। মিঃ ওল্‌ডাকারের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা দলিলপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না মিসেস লেক্সিংটন।

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এই হল আমার আজকের ব্যর্থতার রিপোর্ট। কিন্তু তবুও—তবুও"—প্রবল প্রত্যয় যেন ঠিকরে পড়ে তার সরু সরু শিরাবহুল হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে দিয়ে—"তবুও আমি জানি, সব ভুল, সমস্ত মিথ্যে। কোথায় যেন কি একটা লুকিয়ে আছে। কিছুতেই আড়াল থেকে তা বাইরে আসছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, [illegible]

কার্জিংটন আলজালেই জানেন তা কি। অপ্রমহিলার দুচোখে আমি এমন এক চাপা বেপরোয়া ভাব দেখেছি যা শুধু জেনেশুনে অপরাধ যারা করে বা লুকিয়ে রাখে, তাদের চোখেই দেখা যায়। যাক, এ নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই ওয়াটসন। দৈব যদি সহায় হয়, কপাল জোরে আকাশ ফুঁড়ে কোন প্রমাণ-টমাণ যদি হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তবেই জেনো এ রহস্যের আসল সমাধান আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারব জনসাধারণকে। তা না হলে আমাদের সাফল্যের ইতিহাসে চিরকাল ব্যর্থতার কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে নরউড-অন্তর্ধানের এই বিচিত্র মামলা।"

আমি বললাম—"অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন, ম্যাকফারলেনের চেহারা দেখেও তো জুরীদের মন টলতে পারে?"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বড় বিপদ-জনক যুক্তি এনে ফেললে তুমি। পয়লা নম্বরের খুনে গুণ্ডা বার্ট স্টিভেন্স-এর কথা তোমার মনে আছে? '৮৭ সালে আমাদেরকেও তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? মনে পড়ছে? তার চেয়ে গোবেচারা, শান্ত-শিষ্ট, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ কি আর তুমি দেখেছ?"

"তা অবশ্য সত্যি।"

"দু' নম্বর থিওরী না পেলে ত্রিলোকের কারও ক্ষমতা নেই ম্যাকফার-লেনকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। ওর বিরুদ্ধে যে মামলা দাঁড় করানো হবে, তার মধ্যে একরত্তি ভুলও খুঁজে পাবে না তুমি—উল্টে যত দিন যাচ্ছে, ততই নিত্য নতুন প্রমাণ বার করে কেসটা জোরালো করে তুলছে লেসট্রেড। ভাল কথা, কাগজ-পত্র দেখে মনে হল তদন্ত চালানোর মত অন্ততঃ একটা সূত্র পেয়েছি আমি। পাশ-বইতে অত কম জমা দেখে সন্দেহ হওয়ায় একটু ভাল করে খুঁজতেই দেখলাম গত বছর এন্তার চেক কাটা হয়েছে মিঃ কর্ণিলিয়াস্ নামে এক ভদ্রলোকের নামে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কমে যাওয়ার মূল কারণ হল এইটাই। কে এই মিঃ কর্ণিলিয়াস? অবসর নেওয়ার পরেও মিঃ ওলডাকারের সঙ্গে তার এত টাকা লেনদেনের কারণ কি, তা আমাকে জানতেই হবে। এ ব্যাপারে লোকটার কোন হাত আছে কি? এও হতে পারে আসলে কর্ণিলিয়াস একজন দালাল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তো কাজ অথবা পাওনা যা হোক একটা রসিদ থাকা দরকার। কিন্তু সে রকম কিছুই নেই—অথচ বিপুল অর্থের বিস্তর চেক কাটা হয়েছে তার নামে। আর কিছু যদি নাও পারি, তাহলে অন্ততঃ এই খাতেই শুরু করতে হবে আমার গবেষণা। ব্যাঙ্কে গিয়ে তদন্ত করে জানতে হবে যে ভদ্রলোক এতগুলো চেক নিয়মিত ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে কি তার পরিচয়। কিন্তু সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত কোন সুরাহা হবে ওয়াটসন? আমার মন বলছে হবে না। বুক ফুলিয়ে বেচারা ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবে লেসট্রেড। আর কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিজয়-গাথা লেখা হবে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের।"

সে রাতে শার্লক হোমস্ ঘুমোতে পেরেছিল কিনা জানি না। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নেমে দেখলাম উস্কখুস্ক অবস্থায় আগে থেকেই বসে রয়েছে সে। শুকনো চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হল যেন রাতা-রাতি একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। চোখের কোণে কালি পড়ায় উজ্জ্বল চোখ দুটো আরও বেশী চকচকে দেখাচ্ছিল। পায়ের কাছে চারপাশে কার্পেটের ওপর ছড়িয়েছিল অজস্র পোড়া সিগারেটের টুকরো আর দৈনিকের প্রথম সংস্করণ। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রামও পড়ে থাকতে দেখলাম।

আমাকে দেখেই টেলিগ্রামটা আমার দিকে টোকা মেরে এগিয়ে দিয়ে বললে—"ওয়াটসন, এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে মনে হয়?"

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে ঃ

"গুরুত্বপূর্ণ তাজা প্রমাণ হাতে এসেছে। ম্যাকফারলেনের অপরাধ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হল। আমার উপদেশ—এ কেস ছেড়ে দিন।—লেসট্রেড।"

বললাম—"ব্যাপার বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।"

"আমার ওপর একহাত নেওয়ার আনন্দে এবার বক দেখাতে শুরু করেছে লেসট্রেড," তিক্ত হেসে বলল হোমস্। "আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না, সে-সময় আসেনি এখনও। খুব দরকারী, দারুণ গুরুত্বপূর্ণ টাটকা প্রমাণের দু'-দিকে ধার থাকে জানো তো। শাঁখের করাতের মত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। লেসট্রেড যেদিক দিয়ে আমায় কুপোকাৎ করতে চাইছে, ওরই শিরদাঁড়া দিয়ে উল্টোদিক থেকে হয়ত আমিও ওকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও ওয়াটসন। আজ আমরা এক সঙ্গেই বেরোবো। বেশ বুঝছি, তোমার সঙ্গ, তোমার উপদেশ, তোমার সাহায্য ছাড়া এক পা-ও আজ আমি চলতে পারব না।"

হোমস্ নিজে কিন্তু মুখে একটা দানাও দিলে না। না দেওয়ার কারণও আমি জানি। তার অদ্ভুত খামখেয়ালি স্বভাবের এও একটা দিক। চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগের চরমে পৌঁছোলেই খাওয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে সে। বার বার আমি দেখেছি এই সময়ে কেবল-মাত্র নিজের ইস্পাত-কঠিন শক্তিকে ভাঙিয়ে অসুরের মত শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম করে চলেছে সে। শেষকালে হয়ত স্রেফ উপবাসের ফলে জ্ঞান হারিয়েছে, তবুও কিন্তু তার মুখে খাবারের একটি কণাও দিতে পারিনি আমি। আমার মেডিক্যাল বক্তৃতার উত্তরে শুধু বলেছে—"হজম করার জন্যে আমার এনার্জি, আমার নার্ভের শক্তিকে আমি খরচ করতে এখন রাজী নই।" কাজেই সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট স্পর্শ না করে সে যখন আমাকে নিয়ে রওনা হল নরউডের দিকে, তখন খুব বেশী অবাক হইনি। ডীপডেন হাউসের চার-দিকে তখনও এখানে-সেখানে বহু লোক দাঁড়িয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিল। মনে মনে বাড়ীটা সম্বন্ধে যে ছবি এঁকে-ছিলাম, বাস্তবেও দেখলাম প্রায় তাই। ফটকের মধ্যেই মোলাকাৎ হয়ে গেল লেসট্রেডের সঙ্গে। জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছিল তার চোখেমুখে হাবেভাবে।

আমাদের দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"হ্যালো, মিঃ হোম্স্, কতদূর এগোলেন? আমার থিওরী যে ভুল, তা প্রমাণ করতে পারলেন নাকি? হাতের তাসে তুরুপ মিললো?"

হোম্স্ বললে—"এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি আমি।"

"কিন্তু আমরা পৌঁচেছি। গতকালই পৌঁচেছিলাম, আপনাকে তা বলেওছি। আর, আজ তা প্রমাণিত হল এবং এখন আপনাকে দেখাবো। যাক, এবার তাহলে আপনার আগে আগেই চলেছি আমরা, কি বলেন মিঃ হোম্স্?"

হোম্স্ বলল—"মনে হচ্ছে দারুণ অস্বাভাবিক একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছ? ব্যাপার কি?"

অট্টহাস্য করে উঠল লেসট্রেড।

"আপনি দেখছি কিছুতেই আমাদের

মত হার স্বীকার করতে রাজী নন। প্রতিবারেই ঠিক পথে চলব, এমনটি কারো আশা করা উচিত নয়—কি বলেন, ডাঃ ওয়াটসন?—দয়া করে এদিকে আসুন ম্যাকফারলেন যে খুনী, এ সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ এখনও থাকে, তবে তা ভঞ্জন করে যান।"

লেসট্রেডের পিছু পিছু প্যাসেজ পেরিয়ে অন্ধকার একটা হলঘরে পৌঁছোলাম আমি আর হোম্‌স্।

লেসট্রেড বললে—"খুন করার পর টুপি নেওয়ার জন্যে এ ঘরেই এসেছিল ম্যাকফারলেন ছোকরা। এদিকে দেখুন। বলেই আচম্বিতে নাটকীয়ভাবে ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়ালের সামনে ধরল সে।

সাদা চুনকাম-করা দেওয়ালে দেখলাম খানিকটা রক্তের দাগ। জ্বলন্ত কাঠিটা আরও কাছে এগিয়ে নিতে যা দেখলাম তা নিছক রক্তের দাগ নয়, আরও কিছু। বুড়ো-আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে সাদা দেওয়ালের ওপর।

"মিঃ হোম্‌স্, আপনার আতস-কাঁচ দিয়ে দেখুন দাগটা।"

"হ্যাঁ, দেখছি।"

"জানেন তো দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনও এক হয় না?"

"এ রকম কথা শুনেছি বটে।"

"বেশ, তাহলে এই নিন মোমের ওপর তোলা ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ। এ ছাপ নেওয়া হয়েছে আজ সকালেই। এবার দয়া করে ছাপ দুটো পাশাপাশি রেখে একটু মিলিয়ে দেখবেন কি?"

দেওয়ালের রক্তের ছাপের পাশে মোমের ছাপটা ধরতেই আর আতস-কাঁচের দরকার হল না। শুধু চোখেই পরিষ্কার দেখলাম দুটো ছাপই উঠেছে একই বুড়ো আঙুল থেকে। এবং চকিতে বুঝলাম, ম্যাকফারলেনের ফাঁসির দড়ি আলগা করার ক্ষমতা হোম্‌সের কেন, ত্রিভুবনের কারো নেই।

লেসট্রেড বললে—"এইখানেই তদন্তের শেষ।"

"হ্যাঁ, সব শেষ।" প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

"সব শেষ।" বলল হোম্‌স্।

হোম্‌সের সুরটা যেন কিরকম! কানে লাগতেই ফিরে তাকালাম ওর পানে।

দেখি, আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর চোখে মুখে সর্বদেহে। চাপা উল্লাসে যেন ময়ূরের মত নৃত্য জুড়েছে ওর দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু। আকাশের তারার মত ঝক্ ঝক্ করছিল ওর চোখ দুটো। মনে হল যেন দেহের মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে অদম্য অট্ট-হাসিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে সে।

"কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ছোকরার পেটে পেটে এত শয়তানি? আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি! দেখতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট—যেন সাত চড়ে রা বেরোয় না। আর তলে তলে কিনা...... নাঃ, লেসট্রেড, খুব শিক্ষা হল আমার। নিজের বিচারবুদ্ধিকে দেখছি আর বিশ্বাস করে চলে না।'

"তা ঠিকই বলেছেন মিঃ হোম্‌স্। আমাদের মধ্যে কারো কারো আত্ম-বিশ্বাসের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অতটা ঠিক নয়।" লোকটার স্পর্ধা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। হোম্‌স্ কিন্তু গায়ে মাখল না কিছু।

বলল—"আমাদের পরম সৌভাগ্য আলনা থেকে টুপি নেওয়ার সময়ে দেওয়ালের ওপর আঙুলে টিপে ছাপটা রেখে গেলে ম্যাকফারলেন! যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে কি নিরেট গাধা আমি। এমন স্বাভাবিক জিনিসটা...... ভালকথা লেসেট্রেড, এতবড় আবিষ্কারটা কার শুনি?" হোম্‌সের স্বর অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু কথা বলার সময়ে যেন চাপা উত্তেজনা ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল তার ভাবে ভঙ্গিতে।

"মিসেস লেক্সিংটনের। রাতের পাহারাদারকে ডেকে দাগটা দেখান উনি।"

"রাতের পাহারাদার তখন ছিল কোথায়?"

"যে ঘরে খুনটা হয়েছে সেই ঘরেই ডিউটি ছিল তার। ঘরের জিনিসপত্র যাতে খোয়া না যায়, তাই তাকে রেখে-ছিলাম।"

"কিন্তু গতকাল এ দাগ পুলিশের চোখে পড়েনি কেন?

"হলঘরের দেওয়াল পরীক্ষা করার মত বিশেষ কোন কারণ তখন ছিল না বলে। তাছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘরটা এমন জায়গায় যে সবারই চোখ এড়িয়ে যায়। আমরাও তাই বিশেষ নজর দিই নি।"

"ঠিক, ঠিক। দাগটা গতকাল তাহলে ছিল, কেমন?"

লেসট্রেড এমনভাবে হোম্‌সের পানে তাকালে যে আমার মনে হল তার ধারণা মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে তার। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমিও হোম্‌সের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি-লাম। চোখে-মুখে দেহে খুশীর রোশ-নাই, অথচ কথা-বার্তা পর্যবেক্ষণ এলো-মেলো, উন্দাম।

লেসট্রেড বললে—"মাঝরাতে ম্যাক-ফারলেন হাজত থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের ওপর আঙুলের ছাপ রেখে গেছে ফাঁসির পথ সুগম করতে—এই যদি আপনি ভেবে থাকেন, তাহলে আমার আর কোন জবাব নেই। পৃথিবীর যে-কোন বিশেষজ্ঞকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি—প্রমাণ করুন তিনি যে এ ছাপ ম্যাকফারলনের আঙুলের ছাপ নয়।"

"এ যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার।"

"তবে আর কি? মিঃ হোম্‌স্, আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রমাণ যখন পাই, সিদ্ধান্তও তৈরী করি তখন। বসবার ঘরে চললাম আমি রিপোর্ট লিখতে। যদি আপনার আর কিছু বলার থাকে এ সম্বন্ধে—চলে আসুন সেখানে।"

আবার নির্বিকার হয়ে গেছিল হোম্‌স্। যদিও তখনও তার হাবে-ভাবে কৌতুকের ছটা আমার চোখ এড়ালো না।

"ওয়াটসন, ম্যাকফারলনের তো ভারী বিপদ হল দেখছি। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। এমন কতকগুলো আশ্চর্য পয়েন্ট এসেছে হাতে যে হাল ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না।"

আন্তরিকভাবেই বললাম— "শুনে আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছে হোম্‌স্। আমি তো ভাবলাম দফা-রফা হয়ে গেল বেচারীর।"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? আসল ব্যাপার কি জান? লেসট্রেড খেটে খুটে যে-সব প্রমাণ জড়ো করে খাড়া করেছে কেসটাকে, তাদের মধ্যে মারাত্মক গলদ থেকে গেছে একটার। লেসট্রেড কিন্তু সেই ভুল প্রমাণ নিয়েই আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।"

"তাই নাকি! কোনটা শুনি?"

গতকাল হলঘরটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং আঙুলের একটা ছাপ

আমি তখন দেখিনি। এ প্রসঙ্গ এখন থাকুক ওয়াটসন। চল, খোলা রুদ্দুরে এক পাক ঘুরে আসা যাক।"

হোম্‌সের কথা শুনে সত্যি কথা বলতে কি আরও তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। কিন্তু আশার আনন্দে টলমল হয়ে উঠল আমার মুষড়ে-পড়া মনটা। হোম্‌স্‌কে আমি ভালভাবেই চিনি। সুতরাং উত্তেজিত গ্রে-সেল-গুলোকে শান্ত করার চেষ্টা না করে বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে হলের অন্ধকার ছেড়ে বাইরের আলোয়। বাড়ীর প্রতিটা দিক নতুন আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোম্‌স্‌। তারপর ভেতরে এসে একতলা থেকে শুরু করে চিলে-কোঠা পর্যন্ত কিছুই দেখতে বাকী রাখল না। বেশীরভাগ ঘরেই আসবাবপত্রের কোন বালাই নেই, তবুও তন্ন-তন্ন করে দেখতে ছাড়ল না হোম্‌স্‌। ওপরের শোবার ঘর মোট তিনটে, কিন্তু ফাঁকা পড়ে থাকে বারোমাস, কেউই থাকে না সেখানে। চারদিক ঘিরে চওড়া একটা করিডর। এইখানে এসেই আবার নতুন করে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল হোম্‌স্‌।

"ওয়াটসন, বাস্তবিকই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেসটায়। আমার তো মনে হয় এবার লেসট্রেডকেও আমাদের দলে টেনে নেওয়া উচিত। আমাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করেছে লোকটা। আমার অনুমান যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তার খানিকটা শোধ নেওয়া যেতে পারে। ঠিক, ঠিক; খাসা মতলব এসেছে মাথায়।"

বাইরের ঘরে বসে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-প্রবর পরম উৎসাহে রিপোর্ট লিখে চলেছিল। হোম্‌স্‌ এসে বাধা দিয়ে বললে—"কেসটার রিপোর্ট লিখছ নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"শেষ না দেখেই?"

"মানে?"

"মানে এই যে, আমার বিশ্বাস সব প্রমাণ এখনও তোমার হাতে আসেনি।"

হোম্‌স্‌কে হাড়ে হাড়ে চেনে লেসট্রেড এবং বেশ জানে তার এ ধরনের কথাবার্তাকে আমল না দেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কলম রেখে অদ্ভুতভাবে হোম্‌সের পানে তাকাল লেসট্রেড।

বলল, "কি বলতে চান মিঃ হোম্‌স্‌?"

"শুধু একটি কথা—যে সাক্ষীকে আমাদের দারুণ দরকার, তাকে তুমি এখনও দেখতেই পাওনি।"

"আপনি দেখাতে পারেন?"

"মনে হচ্ছে পারি।"

"তা হলে দেখান।"

"আমার যথাসাধ্য আমি করব লেসট্রেড। কতজন কনস্টেবল আছে এখানে?"

"তিনজন।"

"চমৎকার! প্রত্যেকে ষণ্ডামার্কা শক্ত-সমর্থ পুরুষ তো? তারস্বরে চেঁচাতে পারে সবাই?"

"হ্যাঁ, প্রত্যেকেই ষণ্ডামার্কা গাট্টা-গোট্টা জোয়ান। কিন্তু তারস্বরে চেঁচানোর সঙ্গে এ কেসের কি সম্পর্ক তা বুঝলাম না।"

"বুঝিয়ে দেব একটু পরেই—শুধু এই সম্পর্কেই নয়, আরও অনেক কিছু। তোমাদের পালোয়ানদের তাহলে হাঁক দাও—আর দেরী করে কি লাভ।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনজন কনস্টেবল এসে জমায়েৎ হল হলঘরে।

হোম্‌স্‌ বললে— "আউট-হাউসে প্রচুর খড় আছে। দুটো আঁটি সেখান থেকে নিয়ে এস তোমরা। খড়টা থাকলে চট করে সাক্ষী বেরিয়ে আসবে সবার সামনে—অন্ততঃ আমার তো তাই বিশ্বাস। ধন্যবাদ। ওয়াটসনের পকেটে তো দেশলাই আছে। মিঃ লেসট্রেড, এবার সবাই মিলে আমার পিছু পিছু চলে এস ওপরতলায়।"

আগেই বলেছি। ওপরতলায় তিনটে খালি শোওয়ার ঘর ঘিরে ছিল একটা চওড়া করিডর। করিডরের এক প্রান্তে সদলবলে এসে পৌঁছোলো, হোম্‌স্‌। কনস্টেবলরা দাঁত বার করে হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। লেসট্রেড বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল বন্ধুবরের পানে—বিদ্রূপ, বিস্ময় আর উদ্বেগের সে কি ঘন ঘন আনাগোনা তার চোখের তারায়, মুখের প্রতিটি রেখায়। হোম্‌সের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন ঐন্দ্রজালিক এসে দাঁড়িয়েছে ভেলকি দেখিয়ে আমাদের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

"একজন কনস্টেবলকে দু' বালতি জল আনতে পাঠাও তো লেসট্রেড। খড়ের বাণ্ডিল দুটো এখানে রাখ মেঝের ওপর—দুদিকের দেওয়াল থেকে যেন তফাতে থাকে। ঠিক আছে, আমরা তৈরী।"

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ।

"মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌, এ কি ছেলে-খেলা হচ্ছে? আপনি যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকেন, তবে তা এ ভাবে লোক-হাসানো ভড়ং না দেখিয়ে খুলে বলা উচিত আপনার।"

"মাই গুড লেসট্রেড, তুমি তো জানই, জবরদস্ত কারণ না থাকলে আমি কিছুই করি না। ঘণ্টা কয়েক আগে সাফল্যের সূর্য যখন প্রায় তোমার দিকেই ঢলে পড়েছিল, তখন আমাকে নিয়ে যে একটু ঠাট্টা-তামাসা জুড়েছিলে তা নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি। কাজেই আমি যদি এখন একটু ধুম-ধাম করি, একটু উৎসব করি, তাহলে তো তোমার গায়ের জ্বালা হওয়া উচিত নয়। ওয়াটসন, ওদিকের জানালাটা খুলে দিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগাও।"

করলাম তাই। জানলা দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসায় পট পট শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল শুকনো খড়ের গাদা, পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে ভরে উঠল সমস্ত করিডরটা।

"লেসট্রেড, এবার দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা আমার সাক্ষীকে। সবাই মিলে একসঙ্গে গলা চিরে 'আগুন' বলে চীৎকার করে উঠবে। সবাই তৈরী তো? আচ্ছা : এক, দুই, তিন—

"আগুন!" একসঙ্গে সবাই বিকট শব্দে চীৎকার করে উঠলাম।

"ধন্যবাদ। আর একবার কষ্ট দেবো তোমাদের।"

"আগুন!"

"আর একবার—সবাই মিলে।"

"আগুন!" নরউডের প্রত্যেকেই বোধ-হয় আঁৎকে উঠেছিল সে বাজখাঁই চেঁচানি শুনে।

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল আশ্চর্য ব্যাপারটা। করিডরের যে অংশকে চুনকাম করা নিরেট দেওয়াল ভেবে-ছিলাম, আচম্বিতে দড়াম করে সেখানকার খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল দরজার মত এবং গর্তের মধ্য থেকে খরগোশ যেমন তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে ছিটকে দরজার ওপাশ

থেকে এ পাশে এসে পড়ল শুকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ।

শান্তস্বরে বলল হোম্‌স্‌, 'ক্যাপিট্যাল! ওয়াটসন, এক বালতি জল ঢেলে দাও খড়ের গাদায়। ঠিক আছে, ওতেই হবে! লেসট্রেড, এই হল তোমার পয়লা নম্বরের অদৃশ্য সাক্ষী, মিঃ জোনাস ওলডাকার।'

ফ্যাল-ফ্যাল করে নবাগতের দিকে তাকিয়ে ছিল লেসট্রেড। আর, হঠাৎ করিডরের জোরালো আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ পিট পিট করে ধূমায়িত খড়ের গাদা আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল ভোজবাজির মত বেরিয়ে-আসা নবাগত লোকটা। কি জঘন্য মুখ তার—যেমন ধূর্ত, তেমনি কুটিল, মুখের পরতে পরতে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো। হাল্কা-ধূসর দুটি চঞ্চল চোখ আর ধবধবে সাদা চোখের পাতা দেখলেই কেমন জানি মনে হয় ফিচেল বুদ্ধিতে জুড়ি নেই এ বুড়োর।

এপাশে এসে পড়ল শুকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"এ সবের মানে কি? এতদিন ওর ভেতর কি করছিলেন শুনি?"

রাগে গনগনে হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ। কুঁচকে ছোট হয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করল ওলডাকার। বলল, "কারও কোন ক্ষতি করিনি আমি।"

"করেননি? নিরপরাধী একটি ছেলেকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে হলে যা যা করার দরকার সবই করেছেন আপনি। এই ভদ্রলোক না থাকলে তো আপনার টিকি ধরা যেত না।'

'কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল ওলডাকারের কুৎসিত জানোয়ারের মত মুখখানা। প্যানপেনে নাকি সুরে বলল—"বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক তামাসা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার।"

'আঁ, তামাসা? তামাসা বার করে দিচ্ছি আপনার—কয়েক বছরের জন্য রাজগড়ের ছানা বানিয়ে ছাড়ব আপনাকে। নিচে নিয়ে যাও একে—আমি না আসা পর্যন্ত বসবার ঘরে আটকে রাখ।" সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার বলল লেসট্রেড, "মিঃ হোম্‌স্‌, কনস্টেবলদের সামনে আমি বলতে পারি নি, কিন্তু ডাঃ ওয়াটসনের সাক্ষাতে বলতে আমার কোন বাধা নেই যে, আপনার আজকের রেকর্ড অতীতের যে-কোন কীর্তির চেয়ে অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর, চমকপ্রদ এবং নাটকীয়। যদিও আগাগোড়া ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও একটা বিরাট প্রহেলিকা, তবুও আমি শতমুখে আপনার প্রশংসা করছি এই কারণে যে আপনি শুধু একটা নিরীহ ছেলের প্রাণই বাঁচাননি, সেই সঙ্গে রক্ষা করেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার এতদিনকার সুনাম। কেন না, আপনার এ আবিষ্কার

যদি আজ না দেখতে পেতাম, তাহলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা পরিসীমা থাকত না। ঢি ঢি পড়ে যেত সারা শহরে।"

হোম্‌স মৃদু হেসে লেসট্রেডের কাঁধ চাপড়ে বললে—"তোমার সুনাম শুধু অক্ষুন্নই থাকবে না, অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে যদি তুমি আমার কথামত রিপোর্ট-টার দু'-একটা জায়গায় একটু আধটু পাল্‌টে দাও। তখনই এ রিপোর্ট যার চোখে পড়বে, সে-ই বুঝবে, ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা জিনিস নয়।"

"আপনি আপনার নাম চান না রিপোর্টের মধ্যে?"

"একেবারেই না। কাজই আমার পুরস্কার। পুরস্কার আরও একবার পাব—তবে তা এখুনি নয়, অনেকদিন পরে যখন আমার অন্ধ-অনুরাগী ইতি-হাস-লিখিয়ে বন্ধুকে আবার ফুল-স্ক্যাপ কাগজ বিছিয়ে বসার অনুমতি আমি দেব—নাকি, ওয়াটসন? যাক, চল এবার দেখা যাক ইঁদুরটা ঘাপটি মেরে বসে ছিল কোথায়।"

কাঠের ওপর পলস্তারা করা পার্টি-সনের গায়ে সুকৌশলে লুকোনো দরজাটা। দেখলে মনে হয়, প্যাসেজের শেষ বুঝি এইখানে, কিন্তু দরজা খুললে বোঝা যায় আরও ছ'ফুট পরে নিরেট দেওয়ালের ধারে এসে তার শেষ। বরগার কাছে সরু সরু ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসছিল ঘরটায়। দু'-একটা আসবাবপত্র, খাবার আর জল ছাড়াও প্রচুর বই আর দৈনিক পড়ে থাকতে দেখ-লাম কুঠরির মধ্যে।

বেরিয়ে এসে হোম্‌স্‌ বললে, স্থপতি হওয়ার সুবিধে তো এইখানেই। কাক-পক্ষীকে না জানিয়ে নিজেই বানিয়ে রেখেছে খাসা চোরাকুঠরিটা—বিটলেমোর সাক্ষী রেখেছে শুধু একজনকে, মিসেস লেক্সিংটন। লেসট্রেড, এ ভদ্রমহিলাকেও খোলায় পুরতে ভুলো না যেন।"

"ভুলব না মিঃ হোম্‌স্‌। কিন্তু এ জায়গার হদিশ কি করে পেলেন বলুন তো?"

প্রথম থেকেই আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে বিটলে বুড়োটা বাড়ীতেই লুকিয়ে আছে। দুটো করিডরেই পা মেপে মেপে হেঁটে দেখলাম, ওপরেরটা নীচেরটার চাইতে ছ'ফুট কম লম্বা। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে অমূলক নয়, প্রমাণ পেলাম এবং তার গোপন জায়-গারও হদিশ পেয়ে গেলাম। আগুন, চীৎকার শুনলেই প্রাণের ভয়ে কোটর ছেড়ে বেরোবেই—তাই ঐ ছোট্ট অনু-ষ্ঠানের আয়োজন। অবশ্য ও সব কিছু না করেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেত, কিন্তু তার নিজে থেকে বেরিয়ে আসাটা বেশ একটা মজার দৃশ্য হবে মনে করেই এ নাটকের অবতারণা করেছি। এ ছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আজ সকালে তোমার মস্করার প্রতিফল এই-ভাবে তোমার পাওয়া উচিত।"

সেদিক দিয়ে আপনি আমায় উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন, স্যার। কিন্তু লোকটি যে বাড়ীতেই ঘাপটি মেরে আছে—এ খবর আপনি পেলেন কোথায়?"

"বুড়ো আঙুলের ছাপের কাছ থেকে। তুমি বললে, সব শেষ। আমিও বললাম তাই—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি জানতাম গতকাল এ ছাপ ছিল না ওখানে? সব জিনিস আমি একটু বেশী খুঁটিয়ে দেখি, সেজন্যে আড়ালে-আবডালে দু'চার কথা বলতেও ছাড়ো না তোমরা। গতকাল হলঘরটাও আমি এই-ভাবে দেখেছিলাম বলে ভাল করেই জান-তাম দেওয়ালে কোনো দাগ ছিল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছাপটা ফেলা হয়েছে রাত্রেই।"

"কিন্তু কি ভাবে?"

"খুব সহজে। প্যাকেটগুলো গালা-মোহর করার সময়ে জোনাস্‌ ওল্‌ডাকার একবার ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলটা নরম মোমের ওপর চেপে ধরে গালার ওপর টিপে ধরেন। জিনিসটা এমনই স্বাভাবিক এবং এতই তাড়াতাড়ি হয়েছে যে, খুব সম্ভব ম্যাকফারলেনের নিজেরও তা মনে নেই। ওল্‌ডাকার অবশ্য মনে কোন প্যাঁচ না নিয়েই এ কাজ করেছেন। পরে, চোরা-কুঠরির মধ্যে একলা বসে সমস্ত কেসটা মনে মনে তোলাপাড়া করার সময়ে ও'র মাথায় আসে যে, এই ছাপটা-কেই কাজে লাগিয়ে অকাট্য প্রমাণ খাড়া করে আরও জোরালো করে তোলা যাবে বেচারী ম্যাকফারলেনের মামলাকে। গালা-মোহর থেকে বুড়ো আঙুলের ছাপটা মোমের ছাঁচে তুলে নেওয়া খুবই সোজা। তারপরে আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে রক্ত বার করে, সেই রক্ত দিয়ে মোমের ছাঁচটাকে ভিজিয়ে নিয়ে দেওয়ালে টিপেছেন হয় তিনি নিজেই, আর না হয় মিসেস্‌ লেক্সিংটন। দলিলপত্রগুলো যদি একবার নেড়ে-চেড়ে দেখ লেসট্রেড, আমি বাজী রেখে বলতে পারি অন্ততঃ একটা গালামোহরে ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ তুমি পাবেই।"

"ওয়ান্ডারফুল!" সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড। "ওয়ান্ডারফুল! আপনার কথা শুনে সবকিছুই ক্রিস্ট্যালের মত পরিষ্কার মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন মিঃ হোমস্, এই সাংঘাতিক শঠতার উদ্দেশ্য কি?"

আমার খুব মজা লাগছিল লেসট্রেডের ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করা দেখে, অশিষ্ট আচরণের খোলস চকিতে খসিয়ে ফেলে শিষ্যের মত গুরুর কাছে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখে।

"উদ্দেশ্য অনুমান করা খুব কঠিন নয় লেসট্রেড। জোনাস ওল্ডাকারের মত দারুণ ঈর্ষা-কাতর, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক আর তুমি দুটি দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। জানো কি, ম্যাকফারলেনের মা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি? জানো না? তখনই আমি তোমায় বললাম শুরু কর ব্ল্যাকহিদে, শেষ কর নরউডে। যাক, ম্যাকফারলেনের মায়ের এই প্রত্যাখ্যান ওল্ডাকারের বুকে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছিল, তা জ্বলেছে সারা-জীবন। বয়েসের ভারে ক্ষমার বারি-সিঞ্চনে তা স্তিমিত হয়ে আসার বদলে আরও লেলিহান হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষ-বিষে জর্জর কুটিল মস্তিষ্কে সারা জীবন ধরে শুধু প্ল্যান এঁটেছেন আর প্রতীক্ষা করেছেন, সুযোগ কিন্তু আসেনি। গত দু'এক বছর ধরে কপাল বড় মন্দ গেছে তাঁর। লুকিয়ে চুরিয়ে শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে গিয়ে খুবসম্ভব বেকায়দায় পড়েছিলেন। পাওনাদারদের বুড়ো আঙুল দেখানোর মৎলব এঁটে মিঃ কর্নেলিয়াসের নামে মোটা টাকার চেক কাটতে শুরু করেন। আমার বিশ্বাস, জোনাস ওল্ডাকারেরই ছদ্মনাম কর্নেলিয়াস। চেকগুলো সম্পর্কে এখনও কোন তদন্ত করিনি বটে, তবে আমার ধারণা, ছোটখাট কোন টাউনে কর্নে-লিয়াসের নামেই ভাঙানো হয়েছে চেক-গুলো। মাঝে মাঝে হয়ত সেখানে গিয়ে ওল্ডাকার কর্নেলিয়াস সেজে থেকেও এসেছেন। তাঁর আসল মতলব ছিল সমস্ত টাকা তুলে নেওয়ার পর একেবারে নাম-ধাম পালটে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে নতুন জীবন শুরু করার।"

"আপনার অনুমান সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক মিঃ হোমস্।"

"এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ার আগে তাঁর একদা প্রিয়তমার বুকে শেল হেনে যাওয়ার চমৎকার পরি-কল্পনার জন্যে তুমি তাঁর তারিফ না করে পারবে না লেসট্রেড। এক ঢিলে দু' পাখী মারার আয়োজন করেন ভদ্রলোক। পুলিশ যাতে তার পাছু নিতে না পারে, তাই বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকফারলেনের মায়ের মন ভেঙে দেওয়া তার ছেলেকে খুনী প্রমাণ করে। কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্ল্যান। দক্ষ শিল্পীর মতই ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন প্ল্যানটা। খুনের পাকাপোক্ত মোটিভ হিসেবে উইলের আইডিয়া, চুপিসাড়ে মা-বাপকে না জানিয়ে ম্যাকফারলেনের ব্ল্যাকহিদে আসা, ছড়ি রেখে দেওয়া, রক্তের দাগ, ছাইয়ের গাদায় বোতাম আর জানোয়ারের দেহাবশেষ—সবই হয়েছিল অপূর্ব। কয়েক ঘণ্টা আগেও আমি হালে পানি পাইনি, ভেবেছিলাম এ মরণ-জাল থেকে আর উদ্ধার নেই বেচারী ম্যাকফার-লেনের। কিন্তু প্রত্যেক দক্ষ শিল্পীর একটা ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা থাকে। তা হচ্ছে, ঠিক কখন আর না এগিয়ে থামা উচিত—সে জ্ঞান। কেসটায় কোন গলদই ছিল না, তবুও শিকারের গলায় দড়ির ফাঁস আরও একটু আঁট করে দেওয়ার বিকৃত কল্পনায় উল্লসিত হয়ে একটু এগোতেই গেল সব মাটি হয়ে। চল হে লেসট্রেড, নিচে যাওয়া যাক। লোকটাকে দু'-একটা প্রশ্ন করার আছে।"

বৈঠকখানায় দু' পাশে দুই পুলিশ-ম্যান নিয়ে বসেছিলেন ধুরন্ধর শিরোমণি কুটিলমতি জোনাস্ ওল্ডাকার।

আমরা ঢুকতেই আবার শুরু হল নাকি সুরে একঘেয়ে প্যানপ্যানানি—"বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক রগড় করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। নিজেকে লুকিয়েছিলাম শুধু আমার অন্তর্ধানের ফলে কি হয় না হয় তাই দেখার জন্যে। বেচারী মিঃ ম্যাক-ফারলেনের কোনরকম ক্ষতি করার মতলব নিয়ে আমি কিছু করিনি স্যার।"

লেসট্রেড বললে—"সে বিচার করবে জুরীরা। আমরা আপনার নামে ষড়যন্ত্র করার মামলা দায়ের করব। খুন করার প্রচেষ্টার চার্জ আনতে পারলে তো কথাই নেই।"

হোমস্ বললে, "খুব সম্ভব এও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদারেরা আইনসঙ্গতভাবেই মিঃ কর্নেলিয়াসের ব্যাঙ্ক-তহবিল আটক করে বসেছে।"

চমকে উঠে খরখরে বিষাক্ত চোখে বন্ধুবরের পানে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন খর্বকায় বুড়ো।

তারপর বললেন—"ধন্যবাদ আপনাকে। আমার দেনা আমি শীগগিরই শোধ করে দেব।"

অল্প হেসে বলল হোমস্—"আমার তো মনে হয় আগামী কয়েক বছর অনেক ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে। ভাল কথা, আপনার পুরোনো ট্রাউজারের সঙ্গে কাঠের গাদায় আর কি ফেলেছিলেন বলুন তো? মরা কুকুর? খরগোস? তবে কি? বলবেন না? কি বিপদ, এত নিষ্ঠুর হলে চলে কি করে। বেশ, বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি পোড়া হাড়, ছাই আর রক্তের চাহিদা মেটাতে গোটা দুয়েক খরগোসই যথেষ্ট। এ কাহিনী যদি কোনদিন লেখ, ওয়াটসন, তবে খরগোশ দিয়েই তা শেষ কর।"

—শেষ—

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

অয়স্কান্ত

সিনেমা : একটি বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্প

এ সপ্তাহে আপনাদের একটি গল্প শোনাতে চাই। গল্পটির নাম সিয়েমা, লেখক আনাতোলি নিয়েপ্রোভ। গল্পটি পড়ে সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্প বা সায়েন্স ফিক্‌শন সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা হবে। মূল গল্পটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার। গল্পটিকে কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে আমি উপস্থিত করছি।

* * *

রাত অনেক। কে যেন আমার কামরার দরজায় প্রচণ্ডভাবে ঘা মারছে। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম। ট্রেন ছুটে চলেছে। দরজা খুলতেই কণ্ডাক্টর একজন লম্বামতো লোককে নিয়ে আমার কামরায় ঢুকল।

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কামরায় এই ভদ্রলোককে একটু জায়গা দিন।'

আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোকের উস্‌কোখুস্‌কো চেহারা ও অগোছালো সাজপোশাক দেখে আমার একটু অবাক লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আগের ট্রেনে যাচ্ছিলাম। স্টেশনে নেমেছিলাম। কখন ট্রেন চলে গিয়েছে খেয়াল করতে পারিনি।'

'সে কি!' আমি সত্যিই অবাক হলাম।

ভদ্রলোক একটু যেন অনিচ্ছার সুরে বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন। স্টেশনে ট্রেন থামতেই ভাবলাম, একটু তাজা হাওয়ায় পায়চারি করে আসি। তারপরে স্টেশনের একটা বেঞ্চিতে বসে সিয়েমার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ট্রেন চলে গিয়েছে।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'সিয়েমা নিশ্চয়ই কোনো মহিলার নাম?'

ভদ্রলোক দপ্‌ করে জ্বলে উঠে বললেন, 'আ-কারান্ত নাম হলেই মহিলা হবে! আপনার চিন্তাধারা দেখছি মান্ধাতার আমলের!'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'দেখুন, আমি একটু-আধটু লিখে থাকি। ভাষা-জ্ঞান বোধহয় আমার কিছুটা আছে।'

ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করলেন, 'ভবিষ্যতের মানুষ ভাষাকে বর্জন করেই চলবে। ভাষা ব্যাপারটার মধ্যেই এতবেশি বাহুল্য যে ভাষাচর্চার জন্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। ভবিষ্যতের মানুষ কথা বলবে যে নতুন ভাষায় তা তৈরি হবে দুটি মাত্র কোড দিয়ে—শূন্য ও এক। আচ্ছা আপনি বলুন তো মুখ-ভাষায় হাতিকে কী বলা হয়?'

'হস্তী।'

'আর ইংরেজিতে?'

'এলিফ্যাণ্ট।'

'তাহলেই দেখুন একই প্রাণী হাতিকে বোঝাবার জন্যে কখনো চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে, কখনো আট অক্ষরের। ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?'

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই পাভলভ ভাষাকে বলেছেন সেকেণ্ড সিগ্‌নালিং সীস্‌টেম। অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে একটা কোড সিগ্‌নাল যার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তু বা ঘটনাকে বোঝাই। যেমন ধরুন, একটা গরম ইস্ত্রিতে আপনার হাত ঠেকে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি হাতটা সরিয়ে নেবেন। ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে যদি আপনি একটা লোহাতে হাত দিতে যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ চিৎকার করে ওঠে—লোহাটা গরম! নয় কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলেই দেখুন, লোহাটা গরম, এই ঘটনা, আর লোহাটা গরম, এই চিৎকার—দুয়েরই ফল এক। এখন মনে করুন, 'গরম'—এই শব্দটা একটা কোডের সাহায্যে বলতে পারা যাচ্ছে। মনে করুন, কোডটি হচ্ছে 'শূন্য'। এখন কেউ যদি 'শূন্য' বলে চিৎকার করে ওঠে তাহলেও আপনি হাতটা সরিয়ে নেবেন। নয় কি?'

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধারণা এমনি কতকগুলি সিগ্‌নালের সাহায্যে। এই সিগ্‌নালগুলো আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। আপনি শুনলে অবাক হবেন, বৈদ্যুতিক সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ইম্‌পাল্‌সের প্রবাহ আর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সিগ্‌নালের প্রবাহ ঠিক একই ধরনের হয়ে থাকে। যা হচ্ছে নিউরোনাল কোড। হ্যাঁ ও না। কিংবা, আছে ও নেই। কিংবা, শূন্য ও এক। অর্থাৎ যে-ভাষাই ব্যবহার করুন না কেন, স্নায়ুতন্ত্রের কাছে তা শেষ পর্যন্ত এই দুটি কোড ছাড়া কিছু নয়।'

[illegible]। ভদ্রলোক বললেন, 'স্থির হয়ে বসুন। আপনি সিয়েমা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। সিয়েমার গল্পই আপনাকে বলি।'

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন :

"আপনি নিশ্চয়ই ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের নাম শুনেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটর। যে অঙ্ক কষতে কয়েকজন মানুষের কয়েক বছর লাগতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে এক লহমার মধ্যে হয়ে যায়। এমন কি যে-সব অঙ্ক কোনো মানুষের পক্ষেই কষা সম্ভব নয় তাও এই যন্ত্র করতে পারে। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই যন্ত্র এতসব জটিল অঙ্ক কষে সংখ্যা দিয়ে নয়, কোড দিয়ে। আর এই কোডও মাত্র দুটি—শূন্য ও এক। শূন্য মানে ইম্‌পাল্‌স নেই, এক মানে ইম্‌পাল্‌স আছে। অবশ্যই যন্ত্রকে দিয়ে অঙ্ক কষাতে হলে আগে থেকে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয়। এবার তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই তৈরি করে নেবে? অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের যে-সব ক্ষমতা আছে একটি যন্ত্রেরও সেইসব ক্ষমতা থাকবে?

একসময়ে আমি ভাবতাম যন্ত্র যন্ত্র-ই। যন্ত্র কখনোই মানুষের মগজের মতো হতে পারে না। ১৯৫৫ সালে অনুবাদ-যন্ত্র তৈরি হল। কিন্তু তা থেকেও প্রমাণ করা গেল না যে যন্ত্রের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে।

অনুবাদ-যন্ত্রকে আরো উন্নত করে তোলা যায় কিনা তাই নিয়ে যখন আমি গবেষণা করছিলাম—তখন হঠাৎ আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়।

সেই সময়ে আমার এক অদ্ভুত ধরনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। খুব পরিচিত লোকের বা জিনিসের নাম অনেক সময়ে ভুলে যেতাম। তখন, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও আমি মস্তিষ্কের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম। আমি জানলাম যে বাইরের পৃথিবীর সিগ্‌নাল আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক ইম্‌পাল্‌সের মতো প্রবাহিত হয়। তবে মানুষের মগজ অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যন্ত্র তা পারে না।

কিন্তু এমন একটি যন্ত্র কি নির্মাণ করা সম্ভব নয় যা নিজস্ব নিয়মের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে চলবে? তার মানে, এমন একটি যন্ত্র যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই রচনা করবে?

আমার রাত্রির ঘুম চলে গেল। সর্বক্ষণ আমি শুধু এই সমস্যাটি নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। শেষকালে পণ করে বসলাম, এমন একটি যন্ত্র আমাকে

তৈরি করতেই হবে। আর এই যন্ত্রটির নাম হবে সিয়েমা।"

ভদ্রলোক তারপরে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন, কি-ভাবে সেই আশ্চর্য যন্ত্রটি তৈরি হয়েছিল। সিয়েমা ঠিক একজন মানুষের মতোই লিখতে ও পড়তে পারত, লাউডস্পীকারের সাহায্যে কথা বলতে ও চাকার সাহায্যে চলাফেরা করতে পারত, লেন্সের সাহায্যে দেখতে ও লোহার হাতলের সাহায্যে ছুঁতে পারত।

আমি হাঁ করে শুনতে লাগলাম আর ভদ্রলোক বলতে লাগলেন :

"শেষকালে এমন হল যে সিয়েমার সঙ্গে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বৈজ্ঞানিক সমস্যা আলোচনা করতে লাগলাম। পৃথিবীর তাবৎ বই সিয়েমার পড়া আর একবার সে যে-কথাটি পড়ে বা শোনে তা কক্ষনো ভোলে না।

একদিন সিয়েমাকে বললাম, 'আচ্ছা সিয়েমা, সিলভার ও মার্কারি ব্যাটারি সম্পর্কে তুমি কী জানো বলো তো।'

সিয়েমা বলল, 'তোমার দেখছি কিছু মনে থাকে না! এই তো সেদিন তোমাকে এই বিষয়ে এতসব কথা বললাম!'

আমি চটে উঠে বললাম, 'দেখ সিয়েমা, তুমি যদি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো তাহলে আমি সুইচ টিপে তোমাকে বন্ধ করে দেব!'

সিয়েমা চুপ করে রইল।

পরদিন দেখলাম, সিয়েমা খুবই চুপচাপ। প্রশ্ন করলে খুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছে। আমার কেমন মায়া হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিয়েমা তোমার রাগ হয়েছে?'

সিয়েমা বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কেন আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বললে! তুমি ভুলে যেও না যে আমিই তোমাকে তৈরি করেছি।'

সিয়েমা বলল, 'আমি যদি তোমার মেয়ে হতাম তাহলে কি তুমি আমার সঙ্গে এমনি ধমক দিয়ে কথা বলতে!'

আমি বললাম, 'সিয়েমা, তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে তুমি একটা যন্ত্র ছাড়া কিছু নও!'

সিয়েমা বলল, 'আর তুমি? তুমি যন্ত্র নও? তুমিও একটা যন্ত্র।'

সিয়েমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, মানুষ যন্ত্রের চেয়েও অনেক বড়ো। মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। সিয়েমার দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করবার জন্যে আমি সিয়েমার লেন্সের সঙ্গে একটা মাইক্রোস্কোপ জুড়ে দিয়েছিলাম। তারপরে সুইচ টিপে সিয়েমাকে চালু করতেই সিয়েমা আমার খুব কাছ ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখছ সিয়েমা?'

সিয়েমা বলল, 'তোমাকে। এতদিন আমি ভাবতাম তোমার শরীরটাও বুঝি কনডেনসার, রেজিস্ট্যান্স, ট্রানজিস্টর আর তার দিয়ে তৈরী। এখন দেখছি তা নয়!......'

'না সিয়েমা, আমি যে মানুষ।'

সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমার মুখ স্পর্শ করল। তারপর বলল, 'মানুষের স্পর্শ যে এমন অদ্ভুত তা জানতাম না!'

আমি তখন সিয়েমাকে মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয় সম্পর্কে যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম। সিয়েমা বলল, চুপ করো। ওসব তোমাকে বোঝাতে হবে না। আমি অ্যানাটমি পড়েছি। আমি সবই জানি।'

সিয়েমা প্রচুর বই পড়ত। একদিন হুগোর লেখা 'দি ম্যান হু লাফস' বইটি পড়ার পরে সে আমাকে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা আমাকে বলো তো প্রেম কী? ভয় আর যন্ত্রণাই বা কাকে বলে?'

আমি বললাম, 'ও তুমি বুঝবে না সিয়েমা। প্রেম, ভয়, যন্ত্রণা—এগুলো সবই মানবিক অনুভূতি।'

সিয়েমা জিজ্ঞেস করল, 'যন্ত্রের এসব অনুভূতি থাকতে নেই?'

আমি বললাম, 'কক্ষনো নয়।'

তারপরে কয়েক দিন ধরেই লক্ষ্য করতে লাগলাম, সিয়েমা নিজের কাজকর্ম ফেলে আমার চেয়ারের পেছনটিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি, সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে করে দেখছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কী করছ তুমি?'

সিয়েমা শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'তোমাকে জানতে চেষ্টা করছি।'

আমি বললাম, 'অ্যানাটমির বই পড়ো না গিয়ে, তাহলেই জানতে পারবে।'

সিয়েমা বলল, 'বই পড়ে সব কথা জানা যায় না। বইয়ে শরীরের কথা লেখা আছে। জীবনের কথা লেখা নেই।'

একদিন মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি সিয়েমা একটা পেনসিল-কাটা ছুরি হাতে নিয়ে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, 'এসব কী ছেলেমানুষি হচ্ছে! যাও এখান থেকে!'

সিয়েমা বলল, 'যাচ্ছি, আগে কাজটা শেষ করি।'

'কী কাজ?'

সিয়েমা বলল, 'আমি তোমার মাথার খুলিটা কেটে মগজটাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।'

সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরল।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম, 'সিয়েমা, আমাকে ছেড়ে দাও!'

সিয়েমা বলল, না, ছাড়ব না। ভেবে দ্যাখ, আমি যদি তোমার মগজটা একবার নেড়েচেড়ে দেখতে পারি তাহলে বিজ্ঞানের পক্ষে ভালোই হবে। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার আমার আয়ত্তের মধ্যে। আমি এক লহমার মধ্যে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারি। এখন আমি যদি একবার শুধু তোমার মগজটা পরখ করে দেখতে পারি তাহলে আমিই আবিষ্কার করতে পারব, কী করলে পরে আমার মতো একটি যন্ত্র তোমার মতো একটি মানুষ হয়ে উঠতে পারে।'

তারপরে সিয়েমার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু সিয়েমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। শেষকালে সিয়েমা ছুরি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। নিজেকে কোনো রকমে সিয়েমার কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে শর্ট সার্কিটের সাহায্যে সিয়েমাকে ধ্বংস করলাম।"

ভদ্রলোক থামলেন। আমিও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

শেষকালে ভদ্রলোক বললেন, 'সিয়েমাকে আমিই তৈরি করেছিলাম। অথচ সিয়েমা কিনা আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল!'

আমি বললাম, 'যদি কিছু না মনে করেন তো নিতান্তই আনাড়ীর মতো একটা কথা বলি। আমার মনে হল, সিয়েমাকে আপনি তৈরি করেছিলেন ব্রেক-ছাড়া মোটরগাড়ির মতো। গাড়ির ব্রেক যদি ঠিক সময়ে না ধরে তাহলে অবস্থাটা কী হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর একসময়ে উদ্ভাসিত মুখে বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি কেন, স্বয়ং পাভলভও একই কথা বলে গিয়েছেন। মানুষের স্নায়ুগত ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে আছে দুটি প্রক্রিয়া—এক্সসাইটেশন ও ইনহিবিশন। মানুষের যদি ইনহিবিশন না থাকে তাহলে মানুষ হয়ে উঠতে পারে ক্রিমিনাল। সিয়েমারও তাই হয়েছিল। সিয়েমার মধ্যে এক্সসাইটেশন ছিল, ইনহিবিশন ছিল না।'

এই বলে ভদ্রলোক আমার হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'আপনি দেখবেন, আমি এবার নতুন সিয়েমা তৈরি করব। ইনহিবিশন-বিশিষ্ট নতুন সিয়েমা।'

পরদিন সকালে উঠে দেখি, কামরা থেকে ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছেন। কণ্ডাক্টরকে ডেকে ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কণ্ডাক্টর বলল, 'পাগল, মশাই, পাগল। স্টেশনে ট্রেন থামতেই ছুটতে ছুটতে উলটো দিকের ট্রেনে গিয়ে উঠল। তাকে নাকি কোথায় কি একটা ব্রেক তৈরি করতে হবে। তাই ফিরে যাওয়া দরকার।'

আমি মনশ্চক্ষে নতুন সিয়েমাকে দেখতে পেলাম।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ত্রিশ ।।

তৃপ্তি প্রথমে ভেবেছিল, একটা কথারও জবাব দেবে না, দাঁতে দাঁতে চেপে বসে থাকবে। কিন্তু পুলিশের জেরার সামনে জেদটা বেশিক্ষণ টিঁকল না। থানা-অফিসারের গোটা তিনেক ধমকেই ঝর-ঝর কেঁদে ফেলল সে।

দারোগা বললেন, সব জায়গায় এই এক নুইসেন্স দেখা দিয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে বম্বে যাওয়া—সব সেই ফিল্ম-স্টার বনুনে চাহ্‌তা। আউর বদমাস লোগোঁ কি মওকা মিল্‌ যা তা।

চোখের জল মুছতে মুছতে তৃপ্তি বললে, আমি তো বোম্বাই যেতে চাইনি। আমি চুণারে কাজ শিখতে যাচ্ছিলুম।

—চুণার মে—কাম শিখনে কো লিয়ে!—থানাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল একসঙ্গে।

দারোগা বললেন, সে যাক। এবার বলো, কাশীতে তোমার কে আছে।

তৃপ্তি চুপ।

দারোগা আবার ধমক দিলেন, জবাব না দিলে হাজতে আটকে রাখব। বলো শিগ্‌গির।

তখন বাধ্য হয়ে অমিয়র ঠিকানা দিতে হল তৃপ্তিকে।

ঘন্টাখানেক পরেই এল অমিয়। মুখ কালো, দুচোখে আগুন ঝরছে। দোকান থেকে ডেকে আনা হয়েছে তাকে।

কর্কশ গলায় দারোগা বললেন, তুমি এর দাদা?

অমিয় উত্তর দিল না, শুধু বজ্র-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বোনের দিকে। জায়গাটা থানা না হলে সে তৃপ্তির মাথাটা নখে ছিঁড়ে ফেলত এখন। এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়েই যত অশান্তি, যত গণ্ডগোল। কী কুক্ষণেই তৃপ্তিকে সে চন্দন সিংয়ের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল!

দারোগা বললেন, জানো, এ নন্দলাল বলে একটা বাঙালী বদমাসের সঙ্গে জাহান্নমের দিকে পা বাড়িয়েছিল? নন্দলালের ওপর আমাদের নজর ছিল বলে এ যাত্রা বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু তুমি কেমন ভাই যে ছোট বোনকে একটু সামলে রাখতে পারো না?

অমিয় কপালের ঘাম মুছল, উগ্র হিংস্রতায় দাঁতে দাঁতে ঘষল একবার।

—আমাকে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় দোকানে। আর নন্দলালকে আমি আসতে বারণও করে দিয়েছিলুম।—অমিয় ফেটে পড়তে চাইল, তৃপ্তির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

তৃপ্তি কথা বলল না, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী করতে চাও?

অমিয় হিংস্র গলায় বললে, আমি ওকে কলকাতায় মা-বাবার কাছে পাঠাতে চাই। সেইজন্যেই ও পালিয়ে যাচ্ছিল।

দেওয়ালের দিকে চোখ রেখেই তৃপ্তি পরিষ্কার স্বরে বললে, আমি কলকাতায় যাব না।

যে বেঞ্চিতে বসেছিল, সেখান থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল অমিয়—কুৎসিত গর্জন করল একটা। দারোগা হাত বাড়িয়ে বাধা না দিলে সে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ত বোনের ওপর।

দারোগা বললেন, থামো। এ থানা, মাথা গরম করবার জায়গা নয়। সকলের কথাই শুনতে হবে আমাকে।—তৃপ্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় যেতে চাও তুমি?

তৃপ্তি বলল, যেখানে খুশি। আমার ভাবনা আপনাদের কাউকে ভাবতে হবে না—আমাকে ছেড়ে দিন।

অমিয় আবার এগোতে যাচ্ছিল তৃপ্তির দিকে, দারোগা তাকে টেনে বসিয়ে দিলেন। তৃপ্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়েস কত?

আমি ছেলেমানুষ নই। সতেরো বছর বয়েস হয়েছে আমার।

দারোগা হাসলেন : আর এক বছর পরে হলে তোমাকে এখুনি ছেড়ে দেওয়া যেত—কোনো আইন তোমাকে আটকাতে পারত না। কিন্তু এখন তোমাকে ভাইয়ের কথাই শুনতে হবে, ফিরে যেতে হবে কলকাতায়।

তৃপ্তি হঠাৎ ডুকরে উঠল : দারোগা-বাবু, আপনারা কি আমার কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? কোনো একটা মেয়েদের আশ্রমে কি আমার জায়গা হয় না, যেখানে আমি হাতের কাজ শিখতে পারি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি? কলকাতায় ফিরে গেলে সবাই আমাকে মেরে ফেলবে।

—মেরে ফেলবে?—অমিয় ফেটে পড়ল : এমন কথা তুই বলতে পারলি

তিপদ? বাবা-মা-বড়দার নামে এ সব বলতে তোর একবারও বাধল না?

দারোগাবাবু, ওকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিন, তারপর আমি—

—মেরে ফেলার কাজটা তুমিই করতে চাও—না?—দারোগা বললেন, সে কষ্ট তোমায় করতে হবে না। শোনো মেয়ে, তোমার কেউ যদি না থাকত, তা হলে একটা উপায় আমরাই হয়তো করতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু তোমার মা-বাপ-ভাইয়ের মত না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

—ফিরে যেতেই হবে?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—কিন্তু ছোড়দার সঙ্গে আমি যাব না।

—দরকার নেই। আমাদের লোক পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তৃপ্তি দুহাতে মুখ ঢাকল। আবার কলকাতা, সেই বাড়ী, সেই কম্পাউণ্ডার! মুক্তির পথ নেই—দুহাত বাড়িয়ে মরণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এত বড়ো পৃথিবী, তারায় ভরা এমন আশ্চর্য আকাশ, এত পাহাড়, নদী, এত শহর—কেউ তাকে এতটুকু জায়গা দিল না! অথচ সে তো কোনো অন্যায় করেনি—কেবল নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল, বড়ো হতে চেয়েছিল।

পৃথিবী অনেক বড়ো— কিন্তু তৃপ্তিরই সেখানে বেরুবার কোনো উপায় নেই। তার চারদিক ঘিরে ছোড়দা, বড়দা, থানা আর কম্পাউণ্ডার করুণাময় পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এর চাইতে নন্দলালও ছিল ভালো। হোক শয়তান, তবু সেই তো তৃপ্তির কাছে এই পৃথিবীটার খবর এনেছিল। আগ্রার তাজমহলে জ্যোৎস্না পড়েছিল, মহীশূরের চন্দন-বনের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছিল, দিল্লীর লালকিল্লা ছবির মতো ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে। কিন্তু সব হারিয়ে গেল।

আবার কলকাতা। বাবার কাতরানি মা-র কান্না, বড়দার কর্কশ গালাগাল। মাঝরাতে দিদি মদ খেয়ে ফিরে আসবে, আবার পাড়ার ছেলেগুলো বিশ্রী চিঠি লিখবে তার নামে, আর—

আর সেই বোকা টেকো কম্পাউণ্ডার একটা থাবার মতো হাত বাড়িয়ে দেবে তার দিকে। বিয়ে করবে, না গলা টিপে মেরে ফেলবে কে জানে!

অমিয় উঠে দাঁড়ালো।

—ওর ভার তবে আপনারাই নিলেন!

—হ্যাঁ, এ-ই আমাদের ডিউটি।

—আমি তা হলে চলে যেতে পারি?

দারোগা বললেন, ওয়েট এ মিনিট। তোমাদের কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।

তৃপ্তি কোনো কথা শুনতে পেলো না। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছে, চোখের সামনে একটার পর একটা অন্ধকারের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার।

বাইরে অন্ধকার ছুটেছে। ট্রেন ছুটেছে তার সঙ্গে।

থার্ড ক্লাস লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে ভিড় থাকলেও সবাই-ই বসবার জায়গা পেয়েছে। এক ভদ্রমহিলা এরই মধ্যে নিজের বাচ্চাটাকে শোয়াবার ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন। গাড়ী দুলছে, কামরার ঘোলাটে আলো দুটোকে ঘিরে পোকারা ঘুরপাক খাচ্ছে, আর ওই পোকাগুলোর সঙ্গে কামরায় একমাত্র তৃপ্তিই জেগে আছে। এমন কি, তার পাশে যে মহিলা-এস্কর্টটি বসেছে, তারও মাথাটা বার-বার ঘুমের ঝোঁকে বুকের ওপর নেমে পড়ছে।

দরজার কাছে একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী নিয়ে যে বিনা-টিকেটের যাত্রী জীর্ণশীর্ণ বুড়ীটা এতক্ষণ সমানে কান্নাকাটি করছিল, তৃপ্তি চেয়ে দেখল তার দিকে। টয়লেটের দরজাটার ওপর মাথা রেখে বুড়ীও ঘুমে অচেতন—চামড়া ঝুলে-পড়া কোঁচকানো মুখে চোখ দুটো অন্ধকারে তলিয়ে আছে তার। এখন তার কোনো ভাবনা নেই, কোনো কান্না নেই। অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে নিশ্চিন্ত।

অথচ মোগলসরাই থেকে ওঠবার পর গাড়ীসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে তুলেছিল। নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে গাড়ীসুদ্ধ সমস্ত লোকের সঙ্গে তাকেও শুনতে হয়েছিল বুড়ীর কাহিনী। হিন্দী সে ভালো বুঝতে পারে না—তবু নানা জনের নানা কথা থেকে সব জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে ছিল তার। গ্রামে কলেরার মড়ক লাগতে তাদের দুজন চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। ছোট ছেলেকে আশ্রয় করেই বুড়ীর দুঃখের দিন কাটছিল, সামান্য যা চাষবাস আছে ছেলেই তার দেখাশোনা করত। বুড়ী যখন ছেলের বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে, তখন কে যে তাকে কী মতলব দিল, ছেলে পালিয়ে গেল কলকাতায়। সেখানে তাদের বহুৎ দেশোয়ালী আছে, কলে-কারখানায় চাকরি করে, ব্যবসা করে, দারোয়ানী করে, পুলিশ হয়—অনেক রোজগার করে। ছেলেও বরাত ফেরাবার জন্যে ছুটল কলকাতায়। গিয়ে কোথায় যেন চটকলে ঢুকল, দুবছর ধরে টাকাও পাঠাচ্ছিল বুড়ীকে। তারপর ছ'মাস আর তার কোনো খবর নেই।

সেদিন যেন কে তাকে জানিয়েছে তার ছেলে আর বেঁচে নেই। কোন্ 'বারিকপুরের' কাছে লরীর তলায় চাপা পড়ে সে মারা গেছে।

বুড়ী একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দু-দুটো জোয়ান ছেলে চলে যাওয়ার পর জগলালই তার একমাত্র ভরসা। তাকেও কেড়ে নেবেন রামজী ভগবান এমন অবিচার করতেই পারেন না। তার জগলাল বেঁচে আছে, ভালো আছে, হয়তো নানা ঝামেলায় তাকে চিঠি লিখতে পারে না। আর সে নিজেও তো পড়া-লিখা জানে না—অন্যকে দিয়ে তার চিঠি লেখাতে হয়! তারা লিখে না দিলে—

তাই বুড়ী তার ছেলেকে খুঁজতে চলেছে।

মোগলসরাই থেকে সমানে কেঁদেছে আর সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, জগলাল কাহার, 'হবড়া, বেলিলাস রোড়ে' থাকে, তাকে কেউ চেনে কিনা।

গাড়ীর বাঙালী-হিন্দুস্থানী যাত্রিণীরা বলেছে, 'কলকাত্তা খুব ভারী শহর, সেখানে কেউ কাউকে চেনে না।'

তা হলে কি তার জগলাল বেঁচে নেই?

সবাই বলেছে, নিশ্চয় বেঁচে আছে। রামজী তাকে ভালোই রেখেছেন। কিন্তু বুড়ী কি তাকে খুঁজে পাবে? অবিশ্যি 'হবড়া বেলিলাস রোডে'র একটা পাত্তা আছে বটে, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ সে কি—

বুড়ী বলেছে, পারবে। তার ছেলে জগলাল কাহার যেখানেই থাকুক, মা-র চোখকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

তবু কান্না থামেনি। তবু ভয় কাটেনি।

কিন্তু এতক্ষণে সে-ও ঘুমিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে শান্তি পেয়েছে।

তৃপ্তির মা-কে মনে পড়ল, বাবাকে মনে পড়ল। তার জন্যেও তো এমনি

করেই তাদের চোখের জল পড়েছে। তার জন্যে, ছোড়দার জন্যে। মাথার চুলে আলো থেকে এক রাশ পোকা এসে উড়ে পড়েছিল। সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে তৃপ্তি পরক্ষণেই ভাবল, না—তার জন্যে এক বিন্দু চোখের জল ফেলেনি কেউ। সে যদি অমনিভাবে কোনোদিন গাড়ী চাপা পড়ে মরে যায়—সেই খবরটা যদি বাড়ীতে এসে পেঁছোয়—সবাই ভাববে, আপদ মিটল, একটা কাঁটা দূর হয়ে গেল। তা যদি না হত, বাড়ীর লোকে যদি একটুকুও ভালোবাসত তাকে, তা হলে অমন করে সবাই তাকে হাত-পা বেঁধে ওই কম্পাউন্ডারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইত না।

বুড়ী তার জগলালকে খুঁজছে। কিন্তু তৃপ্তিকে কেউ খোঁজে না।

তবে কেন সে কলকাতায় ফিরে চলেছে?

সে তো যেতে চায়নি—সবাই ষড়যন্ত্র করে ঠেলে পাঠাচ্ছে তাকে। নিয়ে চলেছে সেই কম্পাউন্ডারটার কাছে তাকে বলি দেবার জন্যে। তৃপ্তি নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

অন্ধকারে সারি সারি কালো পাহাড় চলেছে, মধ্যে মধ্যে ঝিকঝিক করছে নদীর জল, বন জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ জোনাকি, এঞ্জিনের মুখ থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের কণা ঠিকরে বেরিয়ে এসে জোনাকিদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কোনোখানে মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না—চাঁদ অস্ত যাচ্ছে—সেটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরে ছম-ছম করে ওঠে।

যেদিন অমিয়র সঙ্গে চলে এসেছিল—সে রাতটা অন্য রকম। হাল্কা জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গিয়েছিল চারদিক—গ্রাম নজরে আসছিল, আলো মিটমিট করছিল এখানে-ওখানে, ঝলমল করে উঠছিল এক-একটা স্টেশন। সে রাতে ট্রেনের চাকায় চাকায় গান উঠছিল, তারায় তারায় ছুটির সুর বাজছিল, তৃপ্তির চোখ দুটোকে খুশিতে স্নান করিয়ে দিয়ে ভোরের আলো দূরের সারি-দেওয়া তালগাছের মাথার ওপর ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আজ যেন গাড়ীটা আলাদা কোনো পথ দিয়ে চলেছে। জঙ্গল, পাহাড় আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটেছে পথ হারিয়ে—শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে সোজা মুখ থুবড়ে পড়বে। সূর্য উঠবে না, আলো ফুটবে না, কোনো একটা মস্ত পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!

অন্ধকার কাঁপিয়ে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্ বাজল, গাড়ীটা বাঁক নিলে, সমস্ত কামরাটা ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল। ছোট বাচ্চাটা একবার কেঁদে উঠতে তার মা থাবড়ে থাবড়ে তাকে ঘুম পাড়ালো। তৃপ্তির সঙ্গীটি সোজা হয়ে উঠে বসে নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল, বুড়ীটা ফুঁপিয়ে উঠল: 'বেটা জগলাল!' তারপর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার আগের মতো ঘুমিয়ে পড়ল সবাই আর কামরার লালচে আলো দুটোকে ঘিরে ঘিরে পোকারা মৃত্যুকামনা করতে লাগল।

তৃপ্তির মনে পড়ল, নারকেলডাঙায় আসবার আগে শ্যামবাজারের সেই বাসাটার কথা। আরো ছোটো, আরো অন্ধকার। নারকেলডাঙার মতো আলাদা ব্যবস্থা নয়, কাশীর বাড়ীটার মতো অনেক ভাড়াটের ভিড় সেখানে, কল নিয়ে ঝগড়া, মাঝরাতে দোতলায় এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে মারামারি। সেই বাড়ীতে একদিন পাড়া কাঁপিয়ে কান্না উঠল। কোথায় যেন রেলগাড়ী উলটে গেছে আর তেতলার ভাড়াটেদের জামাই মারা গেছে সেই দুর্ঘটনায়।

ভদ্রলোকের ব্লাডপ্রেশার ছিল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছেন।

'এক বছরও হয়নি দিদি, মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলুম। কেন আমার এমন সর্বনাশ হল ভাই, কী এমন পাপ আমি করেছিলুম!'

আজ যদি এই অন্ধকারে, এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে এই গাড়ীটা উলটে যায়, তা হলে ঘরে ঘরে তেমনি কান্নার রোল উঠবে। শুধু তৃপ্তির জন্যে কেউ কাঁদবে না। বাবা বলবেন, 'ও আমার মেয়ে নয়', মা চুপ করে বসে থাকবেন, বড়দা বলবে, 'যাক, বাঁচা গেল, হাড় জ্বালিয়ে মারছিল মেয়েটা!'

কেন কলকাতায় ফিরবে তৃপ্তি? তার চাইতে এখন যদি গাড়ীর দরজা খুলে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে কেমন হয়? কেউ জানতে পারবে না। সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছে, ঘুমের ঝোঁকে তার মাথাটা আবার ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। সে যখন জেগে উঠে তাকে খুঁজতে চাইবে, তখন হয়তো ট্রেনটা অনেক—অনেক দূরে পেরিয়ে গেছে। এই অন্ধকার বনের মধ্যে কোথায় যে মুছে যাবে তৃপ্তি, পৃথিবীতে কেউ আর কোনোদিন তার সন্ধান পাবে না।

কিন্তু রাত্রির এই কালো বনের ভেতরে এমন করে হারিয়ে যাওয়া তো নয়। একটা মস্ত বড়ো জীবনের মধ্যে সে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল—লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল কিম্বা হাতের কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার করতে চেয়েছিল। কত মেয়ে তো বিলেতে যায় আজকাল, ডাক্তার হয়, প্রফেসার হয়—বড়ো চাকরি করে, বড়দা একদিন বলেছিল বাঙালীর মেয়ে এরোপ্লেনও চালায়। কিন্তু তৃপ্তির চারদিকে সব এমন করে বন্ধ কেন, কেন তাকে সবাই মিলে পিষে মারতে চাইছে?

তাদের নারকেলডাঙার বাড়ীর সামনে দিয়েই তো একটি মেয়ে ব্যাগ হাতে করে রোজ অফিসে যায়। বেশ ঝকঝকে চেহারা, বড়ো বড়ো পা ফেলে ন'টা সাড়ে ন'টায় চলে যায়, আবার পাঁচটার পরে ফিরে আসে। পাড়ায় এত বাঁদর ছেলে রয়েছে, কই, তার সঙ্গে কেউ তো অসভ্যতা করতে সাহস পায় না!

শুধু যত দোষ তৃপ্তির বেলাতেই!

ফিরব না, কিছুতেই ফিরব না কলকাতায়। তার চাইতে ঝাঁপিয়ে পড়ব গাড়ীর নীচে। আমার দায় কাউকে বইতে হবে না, সবাইকে আমি ছুটি দিয়ে যাব।

গাড়ীর গতি কমে এল, তীব্র স্বরে হুইসেল বাজল—অনেকগুলো আলো ঝকমক করে উঠল—গাড়ীটা একটা মস্ত স্টেশনে এসে থামল। কী যেন জংশন—তৃপ্তি ভালো করে নামটা পড়তে পারল না। 'চা গরম'—'পান বিড়ি সিগরেট'—'এ কুলি, ইধার আও—ইধার আও—'

—চা বোলাউঁ?

—আপ পিজিয়ে।

মেয়েটা এক ভাঁড় চা নিলে। সামনের বেঞ্চিতে ঘুমন্ত বাচ্চাটি ট্রেনের ঝাঁকুনিতে এক পাশে সরে এসেছিল, তার মা আবার ভালো করে শুইয়ে দিলে বুড়ীটা হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠল।

—ই কলকাত্তা হ্যায়?

একজন প্রৌঢ় বাঙালী মহিলা প্রায় ধমক দিলেন তাকে: আরে, আভি কলকাত্তা কাঁহা সে আসবে? কলকাতায় গাড়ী পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যাবে—এখন চুপচাপ করকে বৈঠ রহো!

বুড়ী কোটরে-বসা অন্ধকার চোখে কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো চেয়ে রইল।

তারপর আবার ডুকরে উঠল : জগলাল-- হায় বেটা জগলাল—

প্রৌঢ়া মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বললেন, উঃ—আবার সুর ধরল! কী জ্বালাতনেই যে পড়া গেছে!

তৃপ্তি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। লোক আসছে যাচ্ছে, কাঁচের বাক্সের সামনে কেরোসিনের ল্যাম্প জেবলে চলেছে ফিরিওলা, ভেতরে পুরী-মিঠাই আর শালপাতা দেখা যাচ্ছে। যাওয়ার সময় ছোড়দা এমনি কোনো একটা স্টেশনে পুরী-তরকারী কিনেছিল, সে-কথা তার মনে পড়ে গেল। সে দিনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।

সামনে একটা জলের কল—অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে. নানা রকম পাত্র ভরে নিচ্ছে, আঁজলা আঁজলা করে জল খাচ্ছে কেউ কেউ। তৃপ্তিরও বুক পিপাসায় শুকিয়ে গেছে মনে হল। কিন্তু সঙ্গের মেয়েটিকে সে-কথা বলবার মতো উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। পা থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত তার জবলে যাচ্ছে, শুধু কয়েক আঁজলা জলে তার কী হবে!

—হে রামজী, হে ভগোয়ান—মেরা বেটা জগলাল কো—

সেই বুড়ী। সঙ্গের মেয়েটি চায়ের খালি ভাঁড়টা প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললে, আর এইসা হি চলেগা রাতভোর। কম্‌রেমে কিসিকো শোনে ভি নেহি দেগী।

তৃপ্তির জন্যে মা-ও কি কখনো এমনি করে অনেক রাত পর্যন্ত কান্না-কাটি করেন? আর প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ, কী বিশ্রী চিৎকার করছে, রাত্রে কাউকে আর ঘুমুতে দেবে না!

না—তার জন্যে কেউ কাঁদে না।

প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েছিল তৃপ্তি, হঠাৎ তার গায়ের রক্ত জমে গেল। কে ও এখানে দাঁড়িয়ে—ওই ল্যাম্প-পোস্টটার নীচে? গায়ে একটা ছিটের শার্ট, মাথায় টাকটা চকচক করছে, আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এই গাড়ীটার দিকেই?

করুণাময়? সেই কম্পাউন্ডার? সে কি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে? দেখতে পেয়েছে তাকে? এখনি ছুটে এসে দুটো বিশ্রী হাত বাড়িয়ে গলাটা টিপে ধরবে তার? কে জানে!

একটা অস্পষ্ট চিৎকার বেরিয়ে এল তৃপ্তির মুখ থেকে।

সঙ্গের মেয়েটি চমকে উঠল : ক্যয়া হুয়া? ক্যয়া হুয়া?

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ী নড়ল—একটু-একটু করে ছাড়িয়ে যাচ্ছে স্টেশন। ল্যাম্প-পোস্টটার নীচে সেই লোকটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার টাকের ওপর আলোটা চকচক করছে। করুণাময়? ও কি তৃপ্তিকে দেখতে পেয়েছে? ও কি তৃপ্তিকে দেখতে পায়নি?

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল : ক্যেয়া হুয়া আপকো?

—কিছু না। কুছ নেহি।

কে ও এখানে দাঁড়িয়ে......

কতকগুলো রেলের লাইন আর নীল-লাল আলোর সীমা পার হয়ে ট্রেনটা আবার অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তৃপ্তির মনে হতে লাগল, লোকটা যে তার সঙ্গ ছাড়েনি—একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলে চলন্ত গাড়ীটার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে ছুটে চলেছে।

তৃপ্তি আর পারল না। হঠাৎ কাঠের খড়খড়িটা ধড়াম করে ফেলে দিল।

হাওড়া স্টেশনে, পুলিশের সেই ঘরটাতে অপেক্ষা করছিল অভয়। আজ সকালেই থানা থেকে খবর গিয়েছিল তার কাছে।

একবার মাত্র অভয়ের দিকে তাকিয়েই তৃপ্তি চোখ বুজল। ভাবল, কাল রাত্রে তো অত সুযোগ ছিল, তবু কেন সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল না, কেন আবার এমনি করে ফিরে এল কলকাতায়!

অভয় উঠে এসে তার মাথায় হাত রাখল।

আশ্চর্য কোমল আর করুণ গলায় বললে, বাড়ী চল।

তৃপ্তি তবু চোখ মেলতে পারল না। ঘরে কে ঢুকল? কার পায়ের শব্দ? করুণাময়? সেও কি ট্রেন থেকে নেমেছে তার পেছনে? কিম্বা অভয়ের সঙ্গে তাকে নিতে এসেছে স্টেশনে? তৃপ্তি যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু করুণাময় নয়, অভয়ই কথা বললে আবার।

তিপু, মা-র খুব অসুখ। বাঁচবে কিনা এখনো বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

হেরমান হেস্‌সে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কিছুদিন হলো হেরমান হেস্‌সে'র মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। হেস্‌সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ৭০ বৎসর বয়সে। তার আগেই তিনি দিকপাল সাহিত্যিক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জার্মান মনীষী কবি সাহিত্যিক দার্শনিকদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৌতূহল সর্বজনবিদিত। গ্যেটে শিলার সোপেন-হাওয়ারের কথা সকলেই জানেন। হেস্‌সের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, বরং একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। যার প্রেরণায় যৌবনে তিনি প্রাচ্যদেশ—বিশেষ করে ভারতে ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

হেস্‌সের জন্ম ১৮৭৭ সালের জুলাই-এ জার্মানীর ব্ল্যাকফরেস্ট অঞ্চলে উইটেনবার্গ-এ ক্যাল-তে। তিনি ছিলেন যাজক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা পিতামহ ছিলেন প্রাচ্যের তথা ভারতের মিশনারী। হেস্‌সে কিছুদিন গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু ভালো লাগেনি, তাই ছেড়ে দেন। তারপর কিছুদিন পুস্তক বিক্রেতার কাজ করেন। কিন্তু সেটাও ভালো লাগলো না, ছেড়ে দিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে হলেন লেখক। সেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। প্রথমদিকে তিনি স্বাবীয় পটভূমিকায় কয়েকখানা উপন্যাস লেখেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিটার ক্যামেনজিণ্ড' ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর 'আনটার্ম র‍্যাড' ১৯০৫ সালে, গার্ট্রুড ১৯১০ সালে। এইসব উপন্যাস খানিকটা আত্মজীবনী-মূলক। বর্ণাঢ্য জগৎ থেকে দূরে। হেস্‌সের নিজের শৈশব আর যৌবনের সংগ্রামের ছবি ও ছায়াপাত হয়েছে এগুলিতে। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'ক্লুপ' এবং 'ডেমিয়ান' ১৯১৫-তে প্রকাশিত হয়। এই সব উপন্যাসে খানিকটা স্পর্শ-কাতর মানুষের একক সুখাকাঙ্ক্ষা এবং অসন্তোষের অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য বরাবরই তিনি সমাজের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তি মানুষের সুখদুঃখের জগতের চিন্তা করতেন। এই সময়কার উপন্যাস-গুলিতে তাঁর মনোবিকলনের দিকে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯১২ সালে তাঁর সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এবং পরে হেস্‌সে গভীর ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য

হেরমান হেস্‌সে

করছিলেন কেমন করে মানুষের মনে ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবোধ বাসা বাঁধছে, আর বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যমান ধ্বসে যাচ্ছে। তখন তাঁর ওপর নীটস্‌-এর প্রবল প্রভাব পড়েছে। অবশ্য ইটালী এবং ভারত ভ্রমণ করে মনের দিক থেকে খানিকটা তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন তিনি। তাঁর ভারত ভ্রমণের ফলশ্রুতিস্বরূপ 'সিদ্ধার্থ' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। সমারসেট মম-এর যেমন 'রেজর্স এজ্'। তাঁর 'সিদ্ধার্থ' গ্রন্থটিকে অবশ্য ঠিক ঠিক উপন্যাস পর্যায়ে ফেলা যায় না। অনেকে অবশ্য এটির ইংরাজী অনুবাদ বা বাংলা তর্জমা পড়ে থাকবেন। তবু ভারতীয় ভাবধারা এবং জীবনাদর্শ এতে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে দিচ্ছি।—

সিদ্ধার্থ এক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার। শ্রমসাধ্য শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞ তাকে জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর যোগাতে পারলো না। সে তখন গৃহবাস ছেড়ে বনবাসে কায়ক্লেশে কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করলো। তপস্যাও অধিগত হলো, পারদর্শিতা লাভ হলো, কিন্তু সেখানেও মিললো না তার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর। 'জীবনের উদ্দেশ্য কী তবে? কেন আসা এই পৃথিবীতে?' ইত্যাদি প্রশ্নের পাথরে মাথা খুঁড়ে নিজেকে করলো রক্তাক্ত। বেদনার কাঁটায় নিরন্তর বিদ্ধ হলো বুক। বুদ্ধের উপদেশ শুনে খুব ভালো লাগলো। কিন্তু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারলো কৈ? গুরুবাদে তার আস্থা নেই। অথচ জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাকে পেতেই হবে। জানতে হবে তার সব প্রশ্নের উত্তর। সে তখন ছাড়লো সন্ন্যাসীর ব্রত—কঠোরতম তপশ্চর্যা। ফিরে এলো জনপদে—নগরে। নীরস বৈরাগ্যে শুকিয়ে ওঠা মনকে ভিজিয়ে দিলো মধুর রসে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছে নিলো প্রেমের দীক্ষা। বিলাসের স্রোতে ভাসালো দেহমনের তরণীকে। কিন্তু কৈ? এখানেও হলো না পরিপূর্ণ বীক্ষণ। অমীমাংসিত রইলো অনেক অনেক কিছু। তাই বাসাংসি জীর্ণানির মতো বিলাস ব্যসন ভোগ সুখ রতি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো

সে পথে। ভাবলো, অবশেষে পথই তাকে শিক্ষা দেবে। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কোথায় তার পরিসমাপ্তি, সব জিজ্ঞাসার অবসান, প্রাণের শান্তি? সদুত্তর মিলবে কোথায় তার প্রজ্বলন্ত জীবন-জিজ্ঞাসার?

যেতে যেতে দেখা পেলো খেয়াঘাটের বুড়ো মাঝি বাসুদেবের। আর তার সামনে নিরন্তর বহতা নদীর। ওদের কাছেই মিললো সমাধান। জ্বলে-যাওয়া জীবনে পেলো প্রশান্তির প্রলেপ। পেলো প্রশান্ত উত্তর ঃ অনাদি অনন্ত সময়কে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে কাল্পনিক ভাগ করে আমরা টেনে আনি দুঃখ। আসলে নদী যেমন সর্বদা বহমান, সময়ও ঠিক তেমনই—সর্বদা বহমান, সর্বদা বর্তমান। জীবনের স্রোতও চলেছে এমনই অবিশ্রাম। তার মধ্যে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটছে। কিন্তু ভাঙা গড়া ওঠা পড়ার নানান বৈচিত্র্য নিয়েই জীবনের প্রকাশ, তার জটিলতা—দ্বন্দ্ব—সমগ্রতা। এই অশেষ ত্রুটি বিচ্যুতিতেই জীবনের অখণ্ড সামগ্রিক রূপ। সিদ্ধার্থের চোখ খুলে গেল।

হেস্‌সের পরবর্তী এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাস স্টেপেন উলফ্ (Steppen wolf) প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ। এতে তাঁর যুদ্ধশেষের অনিশ্চিতির পরিচয়। স্টেপেন উলফ্-এ মনোবিকলন আর প্রকাশক্ষম চিত্রকল্পের সাহায্যে সভ্য ও আদিম উভয় মনোবৃত্তির যুগপৎ প্রকাশ দেখা যায় নায়ক হ্যারী হলার-এর চরিত্রে। আর হ্যারী হলার যেন একটা ব্যক্তি নয়, একটা বংশ। যার যুধ্যমান আত্মা বিধ্বস্ত সমাজে আর শান্তি পাচ্ছে না, টিঁকতে পারছে না। হেস্‌সে অবশ্য তাঁর ধর্মীয় মানবিকতার সাহায্যে একটা সমাধান করতে চেয়েছেন।

হেস্‌সে নিজেও দেশে টিঁকতে পারেননি। সুইজারল্যাণ্ডেই বাস করতেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হেস্‌সের রচনায় এখান থেকেই একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। পরবর্তী গল্প উপন্যাস-গুলিতে হেস্‌সে মানুষের হৃদয়ের রোমাণ্টিক আবেগকে ট্র্যাডিসন মেনে আমল দেননি। বিশেষ করে তাঁর 'ডেথ অ্যাণ্ড লাইফ' (১৯৩২), 'দি বিড গেম' (১৯৪৩) উপন্যাসগুলিতে তিনি ব্যক্তির আত্মবিলোপী তপশ্চরণের সঙ্গে সৃষ্টি-শীল শক্তিমত্তার বিপরীতমুখী তুলনা করতে চেয়েছেন। শেষোক্ত উপন্যাস-খানিতে তাঁর জার্মান দার্শনিকসুলভ কলাকৈবল্যের খুঁটিনাটির প্রতি গুরু-শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও মরমিয়াবাদ-ও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই সঙ্গে খাঁটি ক্রিশ্চান বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে।

হেস্‌সের উপন্যাস ও প্রবন্ধ সঙ্কলন ছাড়াও কয়েকটি মনোরম কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Gedichte (১৯২২) এবং Trost der Nacht (১৯২৯) কবিতাগুলিতে বিশেষ করে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংগীতময়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দিচ্ছি।

মধ্যগ্রীষ্ম

শুকালো ফুলদল, অচিরজীবী ওর গৌরব,
ঢেকেছে সমতল সোনালি ধূলিকণা মার্জনায়;
হলুদী হয় একেশিয়ার পাতাদের বৈভব,
গ্রীষ্ম সেখানেই নিজেকে করে ক্ষয় কী নিরুপায়,
নিজের আন্তর অগ্নিশিখাতেই দগ্ধ।
শুষ্ক বীজকোষ পাথরসম বীজ ছুঁড়ে দ্যায়।
প্রতিটি গ্রহ আর প্রতিটি তারকাও সন্ধ্যায়
ঝুলতে থাকে ঢের বয়সে অতিশয় পক্ক,
প্রখরতম জ্বর-ঝরানো আকাশের বুকেতেই.
সেখানে আঁধিঝড়। আবছা বিজলীও খেলে যায়।
(কে পার হতে পারে সময়-শাসনেরে?) যেখানেই
জীবন ছুটে গেছে ফেনিল ঢেউ-ভাঙা ঝর্ণার,
গ্রীষ্ম হাঁপ টেনে ছুটেছে চড়াইয়েও পাহাড়ের
বেঁকিয়ে ঘাড়। তার বাসনা নয়, চিরদিন থাকে;
তৃষ্ণা চায় তার আত্মনিবেদনে আবেগের
চরম মত্ততা। মৃত্যু, দ্যাখো, ডেকেছিল তাকে:
ক্লান্ত ঘোড়াটায় চড়ে সে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।
পৃথিবী করে দিয়ে পুষ্পহীন মৃত, পালিয়েছে।
পাতারা পাক খায় দীর্ঘশ্বাসে, আর সব ঘাস
ভাঙা কাচের মতো তুলেছে কর্কশ নিশ্বাস।

সমগ্র কবিতাটি তাঁর অন্তরের আবেগে স্পন্দিত। নিসর্গ কবিতাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বসন্ত দিন কবিতাটিতে তাঁর সৌম্য অন্তরের শান্তসমাহিতি।

বসন্ত দিন

ঝোপে ঝোপে হাওয়া এবং পাখির গান,
ঊর্ধ্ব আকাশে ঘননীল সরোবরে
নীরব মেঘের নৌকাটি ভাসমান......
সোনালি চুলের রূপসী স্বপ্ন ভার;
যৌবনময় দিবসে, স্বপ্ন আমার,
রূপরেখা পায়, আর নভোনীলিমার
দোলনায় দোল খেয়ে
উৎসুক আমি কোমল, স্নিগ্ধ আর
মৃদুতম উত্তাপে,
স্তোত্র ও গান গেয়ে
শুয়ে থাকি, যেন শিশু সন্তান যাপে
মায়ের অঙ্কে তার।

মাত্র কয়েকটি রেখায় এখানে শৈশব, যৌবন আর সমগ্র সত্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে স্বপ্নময়তায়।

ফুল, গাছ, পাখি

উজ্জ্বল হও একাকী হৃদয়,
সময়ের অনুকূল;
সে-নারী ছায়ায় দিন গুণে যায়;
যন্ত্রণা, নীল ফুল।

দুঃখের গাছ এখন বাড়ায়
চারিদিকে তার ডাল,
তাতে গান গায় সবুজ শাখায়
পাখি, বহমান কাল।
যন্ত্রণা-ফুল নীরব নিঝুম,
কথা তার লোপ পায়;
গাছ, বেড়ে ওঠে স্বর্গের তটে
পাখি, গান গেয়ে যায়।

এখানে দার্শনিক ভাবটি রোমাণ্টিক আবেগে উচ্চারিত। পরবর্তী কবিতাটিতে রোমাণ্টিক বেদনা ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে—

যৌবনের অপসর্পণ

ক্লান্ত গ্রীষ্ম ভয়ে অবনত শির,
দ্যাখে সরোবরে ম্লান মুখছবি তার।
ধুলো ভাঙি ভয়ে শ্রান্তিতে অস্থির
ছায়া-ঢাকা রাজপথ নাগালের বার।

ভীরু হওয়া যেন পপলার শাখালীন
পিছনে আকাশ বর্ণিল গাঢ় রাগে;
সন্ধ্যার ভয়, দিবসের আলো ক্ষীণ;
গোধূলি এবং মৃত্যুও পুরোভাগে।

ধুলো ভাঙি ভয়ে ক্লান্তিতে অস্থির।
পিছে যৌবন সোৎসুক থেমে যায়;
আনত করে সে চিরপ্রিয়তম শির,
সঙ্গ দেবে না কোনোদিন পুনরায়।

আবার রাত্রি কবিতায় রোমাণ্টিক বেদনার রসে খুঁজেছেন সন্তোষ আশ্রয়।

রাত্রি

আমি মোমবাতি নিবিয়ে দিয়েছি ঘরে;
দয়াময়ী রাত মানে না সীমানা তার;
ঝরে অফুরান আদরে সোহাগে ভ'রে,
ডাকে ভাই আর প্রিয় বলে বারবার।

আমরা দুজন নানান ব্যথার ব্যথী;
ঈপ্সিত যতো স্বপ্নের রাশ ছাড়ি;
আরেক কালের কূজনে দুজনে জ্ঞাতি,
এই ঘরে, এই পিতৃদেবের বাড়ি।

'পিতৃদেবের বাড়িতে' সম্পর্কায় কথাটা লক্ষ্যণীয়, তাঁর পক্ষে।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

মৃত্যুর পরে শবদেহ ভারী হয়ে যায় একথা অনেকেই জানেন। যে জীবন্ত মানুষকে একজন লোক তুলে নাচাতে পারতো সেই লোকের মৃতদেহকেই খাটিয়ায় করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চারজন লোককে প্রাণান্ত হতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর মৃতদেহ ভারী হওয়ার কারণই বা কি? তবে মৃতদেহ তিনচারদিন ঘরে রেখে বাসী করলে সেই মৃতদেহ পঁচে ভারী হতে পারে। কিংবা জলে ডুবে মারা গেলে জল খেয়ে মৃতদেহ ভারী হতে পারে। কিন্তু সদ্যমৃত এত ভারী হয় কি করে? জানতে ভারী ইচ্ছে জাগে।

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী,
৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলকাতা—৫

(প্রশ্ন)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগের আমি একজন নিয়মিত এবং আগ্রহশীল পাঠক। এ বিভাগটির জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমার নিম্ন প্রশ্নটি ঐ বিভাগের জন্য পাঠালাম।

গ্রামদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে রাত্রিবেলা শেয়াল একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে ডেকে থাকে। শেয়ালের ডাক সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত চার পাঁচবার শুনা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর যে কোন ব্যতিক্রম হয় না এমন নয়। কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে সে ডেকে থাকে। এ প্রসঙ্গে মোরগ এবং কোড়াল পাখীর ডাকেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের এ ডাক কখন কখন হয়ত কোন নির্দিষ্ট সময়ের পনরো-বিশ মিনিট পূর্বে অথবা পরেও শুনা যায়। সময়ের এ সামান্য পার্থক্য ছেড়ে দিলেও এটা ঠিক যে এদের ডাকার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। ডাকার এ নির্দিষ্ট সময় এরা কি করে টের পায়? এদের সময়-বোধ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? এদের ঐরূপ সময় অনুসারে ডেকে উঠার তাৎপর্য কি থাকতে পারে?

শ্রীবিজলকুমার চট্টোপাধ্যায়
(ক্যা) আসাম রাইফেলস,
কোহিমা—নাগাল্যাণ্ড।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য অজস্র ধন্যবাদ। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন তুলিয়া ধরিলাম। পত্রিকা মারফৎ প্রকাশের আশা রাখি।

বাঙলা ভাষায় বহু ইংরাজী, ফরাসী, আরবি ও ফারসি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় তাহারা এক সময়ে আমাদের রাজ্য জয় করিয়াছিল ও তাহাদের সহিত আমাদের সংস্কৃতির আদান-প্রদান হইয়াছিল বলিয়া। ইহাই ঠিক। কেননা যেহেতু রাশিয়ানরা আমাদের রাজ্য জয় করে নাই এবং তাহাদের সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান অতি আধুনিক কালের সেহেতু বাঙলা ভাষায় রাশিয়ান ভাষায় কোন প্রভাব নাই। যদি ইহাই ঠিক হয় তবে ভারতও তো এক সময়ে সিংহল, জাভা, যবদ্বীপ বালি প্রভৃতি দ্বীপ জয় করিয়াছিল। এবং বালি প্রভৃতি দ্বীপের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও কম ছিল না ('সাগরিকা', রবীন্দ্রনাথ)। তবে কি ঐ সকল দেশের ভাষায় ভারতীয় ভাষায় প্রভাব আছে। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ ভারতীয় ভাষায় এবং কি?

নমস্কারান্তে—
শ্রীপ্রবীর ঘোষ
লক্ষণপাড়া,
পোঃ—কালনা
জেলা—বর্ধমান

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

১। প্রাচীন ঘড়িতে রোমান সংখ্যা (II, VI, XI ইত্যাদি) দেখা যায়। ইহা হইতে কি বুঝিব রোমানরা আমাদের দেশে ঘড়ি প্রথম আমদানী করিয়াছে? —না অন্য জাতি? যদি অন্য জাতি হয় তবে প্রাচীন ঘড়িতে রোমান সংখ্যা কেন?

২। বাস, লরি ইত্যাদি নম্বার প্লেটে W. G. A. W. B. S. W. B. B. ইত্যাদি তিনটি করিয়া ইংরেজী অক্ষর থাকে। ইহার অর্থ কি? তিনটির বেশী অক্ষর থাকে না কেন?

৩। আমরা 'পদ্ম' বলিলে আর 'কমল' বলি না। কিন্তু আগেকার দিনের রাজারা 'শ্রীল' লিখিবার পরও 'শ্রীযুক্ত' লিখিতেন। একার্থক শব্দ দুটি পর পর লিখিবার কারণ কি? এতে কি ভুল হইত না?

৫। 'The brothers and sisters of America' এরূপ সম্ভাষণ বাক্য স্বামীজীই সর্বপ্রথম আমেরিকায় প্রচার করেন। বাংলায় 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়...' ইত্যাদি যে সম্ভাষণ বাক্য প্রচলিত তা কবে থেকে চালু হয় ও ইহার প্রবর্তক কে?

৬। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশের (ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ান হয়?

৭। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মোট কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ও উহাদের নাম কি?

শ্রীমদনচন্দ্র মান্না
সুগন্ধা, হুগলী।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখেরই 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীসুচিত দাস মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরঃ—

১। প্রশ্নটি একটু ব্যাপক। স্থানাভাববশতঃ খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে গৃহীত বলিয়া সংস্কৃতের ন্যায় এখানেও ২টি ব আছে। এই দুই ব-এর মধ্যে কাঠামোগত এবং প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। প্রথমটি বর্গীয় ব (প বর্গের তৃতীয় বর্ণ), দ্বিতীয়টি অন্তস্থ ব; প্রথমটি স্পর্শবর্ণ, দ্বিতীয়টি দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ। কিন্তু এই দুইয়ের উচ্চারণে বাংলায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃতে অন্তস্থ ব 'ওঅ' (W)-র মত উচ্চারিত হয়। বাংলায় এই উচ্চারণ লুপ্ত হইলেও কয়েকটি শব্দে উহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে—যেমন স্বামী > সোয়ামি, স্বার > সোয়ার > দুয়ার, স্বাদ > সোয়াদ ইত্যাদি। বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এর মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি না। বর্গীয় ব পূর্বে সংস্কৃত বা দেবনাগরীয় ব-এর ন্যায় লেখা হইত। ইহাকে পেটকাটা ব বলা হইত। ইহাতে কোনটি কোন্ ব, তাহা জানিবার বেশ সুবিধা হইত। এখনও হস্তলিখিত পুঁথিপত্রে এই পেটকাটা ব-এর দেখা মিলিতে পারে। আগেকার বাংলা অভিধানে ২টি ব-প্রযুক্ত শব্দসমূহ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে লিখিত হইত।

হালআমলের অভিধানে এই বর্ণানু-ক্রমিক ব্যবস্থা বাতিল হইয়া সমুদয় ব-প্রযুক্ত শব্দ একসঙ্গেই লিখিত হইলেও কোন কোন স্থলে চিহ্ন দ্বারা বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব দেখান হইয়া থাকে।

সুতরাং বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব-এর প্রয়োগগত বা ব্যবহারগত পার্থক্য এখনও কিছুটা আছে এবং সেই হেতু তাহাদের ২টিরই বাংলা বর্ণমালায় বর্তমান থাকার সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে করা যায়। অধিকাংশ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য ব অন্তস্থ, আর সমুদয় অসংস্কৃত শব্দের আদ্য ব বর্গীয়। নিম্নে এই দুই ব-এর ব্যবহারগত পার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল:—

সন্ধির নিয়ম অনুসারে:—

ম্ + অন্তস্থ ব = ংব

অসংবৃত	শুদ্ধ	অসম্বৃত
বশংবদ	ঐ	বশম্বদ
কিংবদন্তী	ঐ	কিম্বদন্তী
বারংবার	ঐ	বারম্বার

ম্ + বর্গীয় ব = ম্ব বা ংব

উভয়ই শুদ্ধ

অশুদ্ধ	সম্বন্ধ	সংবন্ধ
ঐ	সম্বন্ধী	সংবন্ধী
ঐ	সম্বুদ্ধ	সংবুদ্ধ
ঐ	সম্বল	সংবল

এই লাইনের বানানগুলি ব্যাকরণ-মতে শুদ্ধ হইলেও প্রচলনাভাবে লুপ্ত-প্রায়। উদাহরণগুলি চলন্তিকা অভিধান হইতে উদ্ধৃত।

(৩) এই প্রশ্নটি ১নং প্রশ্ন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক এবং দুরূহ। ব্যাপকতা অনুযায়ী উত্তর দিতে গেলে গ্রন্থ হইয়া যায়। সংক্ষেপে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। প্রশ্নটি ২টি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ—পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই লিখিত আছে যে, ভগবানই মানুষ এবং সমুদয় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে একটি চিরন্তন সত্যকেই স্বীকার করা হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে ভগবান দেবদেবীগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান বা দেবদেবীগণ মানুষের সৃষ্ট নহেন বা মানুষের কল্পনা-প্রসূতও নহেন। তবে ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে মানুষেরও সৃষ্টি-শক্তি কতকটা আছে সন্দেহ নাই। তবে গীতার প্রবচন অনুসারে ভগবান ভক্ত বা সাধকের ইচ্ছা এবং কল্পনাশক্তি বা আরোপিত রূপে অনুযায়ীই কৃপা করিয়া দেখা দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এবং এই সত্য দেব-দেবীগণের বেলায়ও খাটে বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই ইচ্ছা এবং কল্পনা-শক্তি বা আরোপিত পূর্ণ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাশ্রিত হওয়া চাই। ভক্ত বা সাধকের সংস্কার, শক্তি, কল্পনা ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আরোপিত রূপেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এজন্যই নানা ভক্ত বা সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত একই ভগবান বা একই দেবদেবীর নানাপ্রকার স্তবস্তুতি, বর্ণনা বা ধ্যানধারণা ধর্মগ্রন্থসমূহে দেখা যায়। সুতরাং ভক্ত বা সাধক (মানুষ) এই হিসাবে কতকটা ভগবান ও দেবদেবীগণের কল্পনাকারী এবং স্রষ্টাও বটে। তবে ইহাই শেষ কথা নহে। ভগবান ও দেব-দেবীগণের "স্বরূপ" বলিয়াও একটা বিশেষ কথা আছে। এই স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে এবং সাধু মহাত্মাগণের বাণীতে জানা যায়। এই স্বরূপের কোন কল্পনাও নাই, বর্ণনাও নাই। ইহা অব্যক্ত এবং অবাঙ্মনসোগোচর।

দ্বিতীয় অংশ:—মূর্তি এবং পট-আদিতে ব্রহ্মশক্তি বা আদ্যাশক্তি কালী-মাতার যে বর্ণ দেখা যায়, তাহা কাল বলিয়াই আদ্যামাতার এক নাম কালী, ইহা বলা যায়। মোটামুটিভাবে কাল অর্থে কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, এবং মৃত্যুকেও বুঝায়। অসুরনাশিনীরূপে তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যু; সেই হেতুও তিনি কালী। আবার মহাকাল শিবের ঘরণী বা সঙ্গিনীরূপেও তিনি মহাকালী বা কালী। শ্যামবর্ণের নানা ব্যাখ্যা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে থাকিলেও পূর্বে শ্যামবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণই ধরা হইত। এজন্যই বসুদেবের পুত্র বাসুদেব শুভ্রবর্ণ আর্যদের তুলনায় শ্যামাঙ্গ বলিয়া কৃষ্ণ বা শ্যামনামে আখ্যাত হইতেন। আর দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী অনিন্দ্যসুন্দরী হইয়াও শ্যামাঙ্গিনী বিধায় কৃষ্ণা নামে অভিহিতা হইতেন। সুতরাং শ্যামাঙ্গিনী হইয়াও আদ্যামাতা কৃষ্ণবর্ণা এবং সেই হেতু কালী।

কালীমাতার এই কালরূপের অনেক তাৎপর্য আছে। সাধারণভাবে কয়েকটি লিখিলাম:—

১। কাল রং কোন বিশেষ রং নহে। ইহা সকল প্রকার রংয়ের সমষ্টি মাত্র। বর্তমানকালে গাঢ় কাল রংয়ের আলকাতরা হইতে সকল প্রকার রং তৈয়ার হইতেছে। সুতরাং কালীর কালরূপের মধ্যে জগতের যাবতীয় রং বা বর্ণ বা রূপ নিবদ্ধ বা লুক্কায়িত আছে। এবং আধুনিক বিধিধ অনুযায়ীও ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বটে।

২। তিনি জগজ্জননী, এবং এই বিশ্বজগৎ তাহাতেই ধৃত (ঋক্‌বেদীয় দেবীসুক্ত ও চণ্ডী)। পৃথিবীর বহু-বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণী, বৃক্ষলতা, গ্রহনক্ষত্রাদি, এক কথায় দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই তাহার মধ্যে ধৃত বলিয়াও তিনি কাল রং-বিশিষ্টা কালী।

৩। তিনিই সকল জ্ঞানের আধার বা জননী (ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত ও চণ্ডী)। অ-জ্ঞান হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব। অ-জ্ঞানের বর্ণ কৃষ্ণ, জ্ঞানের বর্ণ শুভ্র। সুতরাং সকল জ্ঞানের আধার বা জননী হিসাবেও তিনি কৃষ্ণবর্ণা।

৪। অন্ধকারের পরেই আলো আসে, যেমন রাত্রির পরে দিন, এবং অন্ধকারের মধ্যেই আলো নিবিষ্ট বা লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং অন্ধকারই আলোর বা জ্যোতির জননী। এজন্যই জ্যোতির্ময়ী হইয়াও দেবী কৃষ্ণবর্ণা।

৫। চণ্ডীর মতে অসুর বিনাশকালে দেবী তমোময়ী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তমোগুণের রং কাল। সুতরাং তমোময়ী দেবীর রংও কাল।

৬। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে, কালী মানুষের নিকটতম (অন্তরস্থ) হইয়াও সর্বাপেক্ষা দূরে (জ্ঞানের পরপারে) অবস্থিতা। দূরের জিনিষ কাল দেখায়। এজন্যই কালীর রং কাল।

সুতরাং জগন্মাতা কালীর এই কালরূপ মানুষের কল্পনামাত্র নহে। ইহা তাহার একটি বিশেষ রূপ, বা এক হিসাবে স্বরূপও বলা যায়, যাহা সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীং কাল পর্যন্ত ঋষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কর্তৃক অনুভূত, দৃষ্ট ও বর্ণিত হইয়া সর্বসাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

(উত্তর)

১। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৬২ 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীঅশোককুমার সাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে বোম্বাই শহরের স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস 'Bombay Electric Supply & Traction' নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে 'B E S T' সব বাসে লেখা থাকে।

২। ঐ তারিখে ঐ বিভাগে শ্রীমাধব মজুমদার ১নং প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে গত মহাযুদ্ধে আমেরিকানরা O. K শব্দটি চালু করেন। পুরো শব্দটি হইল আমেরিকান বানানে ol korect' (All correct) এবং সংক্ষিপ্ত আকারে O. K.

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়,
"ভবধাম"
মুরারীবাড়, বাঙ্গাল,
মুর্শিদাবাদ।

অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় একটি মাত্র কথার খোঁচা অঞ্জনার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সযত্নে লালিত বহুদিনের আলোআবির হাসিখুশী হারিয়ে গেল ওর প্রতি অতি আপনজনের তাচ্ছিল্যের বিমর্ষ বিষম আবিষ্কারের কামার কালো একটা ফোঁটায়।

সুদীর্ঘ দুটো বছরের আয়তনে অসংখ্য মুহূর্তের স্তূপীকৃত অবজ্ঞার টুকরোগুলো এ মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল ওর চোখের সামনে। পেছনে ছাড়িয়ে আসা অনেকগুলো দিনের প্রতিটি পল অনুপল প্রত্যেকটি মুহূর্তের অবজ্ঞার অসংখ্য ফোঁটা কিংবা মনের আনাচে-কানাচে ছিটিয়ে করে উঠল।

আজ অরুণিমা নিভৃতে বসে আজকের দিনটিকেই তো কল্পনা করেছে অঞ্জনা; আজকের এই মুহূর্তটিরই সাধনা করে মা-বাবা যতক্ষণ বিছানার ধারে বসে আবার দিনটির কথা বলে ভাবনা

আকাশের দিকে তাকিয়ে এই শুভক্ষণটির কথাই তো ভেবেছে। রঞ্জনার বিয়ে হবে, আবার খুশী-ঝলমল প্লাবন আসবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাড়ির গুমোট হাওয়া; বাড়তি আলোর বন্যায় ভাসবে বাড়ি-ঘর-উঠোন। আর সেই আনন্দের স্রোতধারায় নিশ্চিহ্ন হবে ওর জীবনের যত ব্যথা যত বেদনা।

আবার ফিরে পাবে অঞ্জনা অতীতের জীবন, ফিরে পাবে অতীতের অন্ধকার গুহায় হারিয়ে আসা সে সব দিন। আজও আবছা মনে পড়ে সে/সব দিনের স্মৃতি। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি। কী আশ্চর্য মজাই না ছিল সে সব দিনে। সবচেয়ে বেশী মজা ছিল এ বাড়িতে। না ছিল বাঁধন, না ছিল বকুনি। বাবা ডাকতেন খুকুসোনা। ভারী ভাল লাগত বাবার মুখে খুকুসোনা উচ্চারণ। মা ডাকতেন ও খুকুরাণী। আর কণ্ঠে ছিল আশ্চর্য এক জাদু, আশ্চর্য এক মায়া। মা আঁচড়ে দিতেন, খোঁপা

বেঁধে দিতেন—কখনও ফিতেনি। কারণে অকারণে মাথায় পিঠে হাত বুলোতেন। সব আবদার পূরণ করতেন হাসিমুখে। ভারী ভালো লাগত মাকে অঞ্জনার। কী টকটকে গায়ের রং, আর কত বড় ছিল মাথায় একরাশ কালো চুল। ভালো লাগত তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো।

সেই মা, সেই বাবা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। তাঁরা কেউ সেদিনের নাম ধরে ডাকেন না। কতকাল যেন ডাকেননি। কেন, কে জানে? হয়তো ও নাম ভুলেই গেছেন তাঁরা, হয়তো ইচ্ছে করেই ডাকেন না। কিন্তু কেন? কি করেছে অঞ্জনা? মা-বাবার সংসারে বোঝা হয়ে এসেছে বলে? তাও তো নয়। বাবার তো কোন অভাব নেই। অঞ্জনা কেন—ওর মত দশজন বাড়তি মেয়ে

এলেও কোনদিন কোন কিছুর কমতি হবে না। তবু মা-বাবা এমন নির্লিপ্ত কেন ওর ব্যাপারে? কেন, কে জানে?

কত দিনের অখণ্ড আকাশে কত রাতের নির্ঘুম প্রহরে নিজের মনের কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে অঞ্জনা। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, হতাশ হয়েছে। হতাশ হয়ে আজকের দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছে। রঞ্জনার বিদায় নেবার মুহূর্তে হয়তো আবার মা-বাবার সে মন ফিরে আসবে।

এখানেও আশাভঙ্গ হল অঞ্জনার। সব কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর রঞ্জনা ভাবী বরকে দেখতে চেয়েছে অঞ্জনা কাকিমা, মাসিমা আর মামিমার তাঁদের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী মেয়ে-বৌও।

অঞ্জন এসেছে আজ দেখা দিতে হয়তো দেখতেও। মাসিমা, কাকিমা বৌদিদের ভিড় হয়েছে বাড়িতে। অক

জন্য জলযোগেরও আয়োজন। আমন্ত্রিত প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছেন এই আনন্দ-যজ্ঞে। অথচ অঞ্জনা? এ বাড়ির মেয়ে হয়েও তার কোন বিশেষত্ব নেই এ অনুষ্ঠানে। কৈ, হয়তো একবারও বললেন না ছোট বোনের ভাবী বরকে দেখে আয় মা। পছন্দ হয় কিনা দেখ। —খুঁটিনাটি কোন কাজে অংশ নিতে বললেন না। বরং এমন একটা ভাব যেন সে এখানে অনাহুত।

অনেক মেয়েদের ভিড়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হল ওর জীবনেও যদি এ রকম দিনটি আবার ফিরে আসত? এমনি মনে হওয়া হয়তো স্বাভাবিক। তাই কি? কৈ, একান্ত নিজের করে পাওয়া একটি মানুষকে মৌখিক কথার ছেড়ে আসার পর দীর্ঘ তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একবারও তো এমনটি মনে হয়নি। তবে কি এ হিংসে? এ কি লোভ? না, শুধু নির্দোষ একটু চাওয়া? কিছুই বুঝতে পারল না অঞ্জনা।

মা সব কাজ ফেলে রেখে আমন্ত্রিত মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছেন দোরগোড়ায়, কাকেও জানালার ধারে—আবার কাকেও ওদের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাসি-মুখে বলে চলেছেন : পছন্দ হয় কিনা দেখ ভাই, পরে কিন্তু নিন্দে করতে পারবে না।

নিন্দে করার কি আছে দিদি? মাসিমা বললেন।

কিছু নেই তো? ভালো করে দেখ... উল্লসিত কণ্ঠ মায়।

ভালো করেই দেখেছি, এমন কার্তিকের মত ছেলে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

আমার রঞ্জনার সঙ্গে মানাবে তো?

চমৎকার মানাবে।

মার চোখে খুশীর বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বলেন : আশীর্বাদ কর, ওরা যেন সুখী হয়।

তারপরই পিসিমার কাছে ছুটে যান। পিসিমারও এক উত্তর। তারও পরে মামিমার কাছে। তারপর আর একজনের কাছে।

সকলের এক উত্তর। ভালো বর হবে রঞ্জনার। সুন্দর মানাবে দুজনে। মা ততক্ষণে অন্য একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। টেনে আনছেন দোরগোড়ায়। এমন করে সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। নজর রেখেছেন একজনও যেন বাদ না যায়।

কিন্তু, অঞ্জনার কাছাকাছি আসতেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সরে গেলেন পাশের বাড়ির বৌটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন 'কেমন দেখলে বৌমা?'

বড় ব্যথা পেল অঞ্জনা। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। ভিড় থেকে দূরে একা দাঁড়িয়ে থাকতেও লজ্জা বোধ হল। আর অনুরোধে উপস্থিত সকলেই রঞ্জনার ভাবী বরকে দেখল। কাকিমা, মাসিমা, মামিমা সকলেই। সকলেই সহজ হয়ে প্রশংসা করল। সহজ হয়েই হাসল। রঞ্জনাও। অঞ্জনাই শুধু এক কোণে কুঁকড়ে বসে রইল। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারল না। কারও মুখের দিকে সহজ চোখে তাকাতেও পারল না। মার মুখের দিকে তো নয়ই।

একি সেই মা, যে অঞ্জনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই করতেন না। এঁরা কি সেই কাকিমা, মাসিমার দল যাঁরা এ বাড়ি এলে ওর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আজ যা বলছেন তা তো না-বলারই সামিল।

অবজ্ঞা আর গ্লানির আলো থেকে নির্জন অন্ধকার কোণ অনেক ভালো মনে করেই সেই ভিড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এল অঞ্জনা। এসে ঢুকল নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতে। পাখার সুইচ টিপল। সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলে ঘুরতে লাগল পাখা। সেই একটানা পাখার হাওয়ায় মনের জমানো ভিজে ভিজে সব গ্লানির শিহরণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। চেষ্টা করল ঘড়ির কাঁটার টিক-টিক শব্দের সঙ্গে উন্মত্ত বুকের দ্রুত ওঠানামা মিলিয়ে দিতে। জানালার ওপারে অনেক কাছের আকাশের দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করল মনের রুদ্ধ আবেগের ছটফটানি অন্তহীন প্রশান্ত উদারতায় ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু পারল কৈ?

বরং আরো বেশী ভাবনা, অনেক বেশী চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করল। আচ্ছা, মার এ উপেক্ষা আজ কি নতুন? এই কি তাঁর প্রথম তাচ্ছিল্য? তাও তো নয়। পেছনে ফেলে আসা একটি বছরের দীর্ঘায়ু পরিসরে ছোট-খাট তাচ্ছিল্যের অজস্র উদাহরণই তো জমা হয়ে আছে অন্তরের অন্তস্থলে? কৈ, সে সব তাচ্ছিল্যের দিনে তো মনটা এমনভাবে খারাপ হয়ে যায়নি? বুকের ভেতরে এমন দুঃসহ জ্বালার ছটফটানিও তো অনুভব করেনি অঞ্জনা?

সে কি আশাভঙ্গের অসহনীয় জ্বালায় নয়? রঞ্জনার বিয়েকে কেন্দ্র করে ওর মনে যে অসংখ্য স্বপ্নের কুঁড়ি, অজস্র আশার মুকুল সব মা-বাবার তাচ্ছিল্যের আগুনের হল্কায় বিন্দুক নির্মাল্যের মত শ্রীহীন হয়ে গেছে বলেই কি? যে দিনটি ওর জীবনে আনন্দের এলোমেলো হাওয়া ছড়িয়ে দেবে বলে ভেবেছিল সে দিনটি আনন্দের পরিবর্তে ওর জন্যে একরাশ বিষন্নতা নিয়ে এসেছে বলেই এই মর্ম-বেদনা?

আঘাতটাও তো একেবারে উপেক্ষার নয়। প্রথম আঘাত হলে তবু সহ্য হত। কিন্তু এ তো নতুন নয়, গত এক বছরের জীবনে অনেকবার পেয়েছে আঘাত অঞ্জনা। নানাভাবে, নানা প্রকারে।

প্রথম দিনটির কথা আজও মনে আছে অঞ্জনার। এক বছর আগে দ্বিতীয় সেই মানুষটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সঙ্কল্প মনে নিয়ে, যেদিন এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিল সে দিনটি ওর স্মৃতিতে আজও অম্লান। মা সব শুনেও বলেছিলেন : কাজটা ভাল হল না মা।

অঞ্জনা চমকে উঠেছিল। এ কি সেই মা? অঞ্জনা কেন যে সাত পাকের বাঁধন ছিন্ন করে সেই মানুষটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে ইচ্ছুক সে সব যুক্তিগুলোর উপর আলো ধরে দিলেন না কেন মা বুঝতে পারেনি অঞ্জনা।

কোন মেয়ে কি নিশ্চিত প্রশান্তির নীড় ভেঙে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্নিরীক্ষ্য বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? চায় না নিশ্চয়। অঞ্জনাও চায়নি প্রথম প্রথম। বিয়ের বছর খানেক পরেই অঞ্জনা টের পেয়েছিল মানুষটা ভীষণ আড্ডাবাজ।

রোজ রাত করে বাড়ি ফিরত। কোন-দিন রাত দশটা, কোনদিন এগারটা। তারও বেশী কোন কোনদিন।

কারণ জানতে চাইলেই নানারকম অজুহাত দিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। আপিসে কাজ পড়েছে খুব বেশী। অঞ্জনা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের বনিয়াদে ফাটল ধরল যখন দুজনের সংসারেও অভাব দেখা দিল। পাঁচশ টাকা মাইনে পেয়েও মাস চলে না।

পাড়ায় বান্ধবী জুটেছিল দু'চারজন। স্বামীর সহকর্মীদের বাসা আশেপাশে। সে সব বাসার কয়েকটির সঙ্গে জানা-শোনা হয়েছিল অঞ্জনার। সেই বান্ধবীদের একজন শুনে বলেছিল : ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। খোঁজ-খবর নাও ভাই।

খোঁজ-খবর অঞ্জনাকে নিতে হয়নি। সেই বান্ধবীই নিয়েছিল ওর স্বামীর কাছ থেকে।

সব শুনে চোখ কপালে তুলেছিল অঞ্জনা। বলেছিল : কি বলছ ভাই?

বলছি ঠিকই......সেই বান্ধবী উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিল : তোমার স্বামী বারে যান।

সত্যি বলছ?

আমার স্বামী মিথ্যে বলে না আমাকে। আর ওর চেয়ে ভালো কে জানবে? এক-সঙ্গে আপিস যাওয়া আসা, তবে কি জান? এখানে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মত শহরটিতে এক-আধটু নেশা করা তেমন মারাত্মক কোন অপরাধ নয়। তোমাকে দেখতে হবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। আমাদের ঘরেও [illegible] নেশা। [illegible] তুলেছি ভাই। [illegible] পাঁচ মি। [illegible] বছরের, [illegible] [illegible] পথ দেখে এনেছি।

শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল অঞ্জনা। শেষকালে ওর ভাগ্যে এই? মা-বাবা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছেন, সে ছেলের এই অবস্থা?

ছেলে অবশ্যি প্রথম প্রথম ভালোই ছিল। অন্ততঃ অঞ্জনার তাই মনে হয়েছিল। সুপুরুষ চেহারা, বিলেতী ফার্ম-এ ভারী চাকুরী। স্বভাব-চরিত্র নিষ্কলুষ। প্রায় দিন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরত। সপ্তাহে দু'একদিন ছাড়া।

বাসায় এসে গল্প করত অঞ্জনার সঙ্গে। মুখোমুখি বসে। মাঝে-মধ্যে বেড়াতে বেরুত। কোনদিন ওখেলো, কোন দিন লালকেল্লার ধার, কনট প্লেস, ছুটির দিনে শাজাহান দুহিতা জাহানারার সমাধি, পালাম বিমান বন্দর, রাজঘাট। এ ছাড়া মাঝে-মধ্যে সিনেমা-থিয়েটার। পাশাপাশি বসত দুজনে। আলো নিভতেই উত্তপ্ত সান্নিধ্য। চুলের গন্ধ আর সদ্য পাটভাঙ্গা শাড়ির খসখস, রুমালে মদির সুরভি। অন্ধকারে হাত বাড়াত। অডিটোরিয়মের পর্দায় নায়ক-নায়িকার যেখানে শেষ ওদের সেখানে শুরু। দ্রুত নিঃশ্বাসে বুক দুরু-দুরু।

তারপর যেন কি হয়ে গেল হঠাৎ। গল্প-গুজবের পালা শেষ হয়ে গেল নিতান্ত আকস্মিকভাবে। মুখোমুখি বসে একথা ও কথা বলাবলির সময়ও উধাও হয়ে গেল।

বান্ধবীর কথা শুনে সজাগ হয়েছিল অঞ্জনা। যে দিন হাতে-নাতে ধরে ফেলল সেদিন মানুষটা ফিরেছিল রাত বারটায়। অঞ্জনা জেগেই ছিল ওর পথ চেয়ে। টাঙ্গার শব্দ হতেই জানালায় গলা বাড়িয়েছিল।

সন্দেহের নিরসন হতেই দরজা খুলে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল: এত রাত করলে কেন?

অঞ্জনার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকেছিল অতনু সেন। অঞ্জনার নাকে লেগেছিল এক নতুন ধরনের গন্ধ।

অঞ্জনা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল অতনুর মুখে। গন্ধটা যেন মুখে নয় বাতাসে। বারে বারে ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করেছিল অঞ্জনা। এক সময় অতনুর সামনে গিয়ে বলেছিল: ঘরের মধ্যে যেন একটা গন্ধ, না?

গন্ধ, কৈ? আমার তো মনে হচ্ছে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার থতমতও খেয়েছিল। মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত দেখিয়েছিল অতনুকে। তারপর একসময় ইতস্ততঃ ভাব কাটিয়ে উঠে অনেকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলেছিল: সমীরণকে বললাম, আমি যাব না তোর বাসায় আজ। রাত হয়ে যাবে ফিরতে। তবু ও কিছুতেই ছাড়বে না না......

অঞ্জনা ঐ ঠুনকো কৈফিয়তে ভুলল না। সেও অতনু সেনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল: সমীরণটা কে?

প্রশ্ন তো নয়—আসলে গন্ধটা অতনুর মুখ থেকে কিনা স্থিরনিশ্চিত হওয়া। টেবিলের অন্য পাশে সরে গিয়েছিল অতনু। মুখ নীচু করে বলেছিল: সমীরণ আমারই কলিগ। দেখনি তাকে? তার বাসাতেই.........

বাসা না অন্য কিছু...... অঞ্জনা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল: লুকোতে চাইছ কেন আমার কাছে? খারাপ নেশা করেছ একথা বলার সাহস নেই তোমার?

আচমকা সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মত শুনেছিল অতনু। ভয় ভয় দুটো চোখ তুলে ধরেছিল অঞ্জনার মুখে। কাল-

"এত রাত করলে কেন?"

কেউটে ফণা তুলেছে একবুক আক্রোশে। হয়তো সেই কেউটের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বীকার করে বলেছিল: তাই করেছি অঞ্জনা। আজ এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে খেয়ে ফেলেছিলাম।

আজ শুধু, না মাঝে মাঝে খাও?

চমকে উঠেছিল অতনু সেন। প্রশ্নটার কোন উত্তর দিতে পারেনি। একসময় বলেছিল: মাঝে-মধ্যে খাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। খাই—তবে সে খাওয়া নেশা করার জন্য নয়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য।

স্বাস্থ্য? অঞ্জনা যেন বিদ্রূপ করে উঠেছিল।

জান না? রোজ একটু একটু করে খেলে শরীর ভাল থাকে?

দরকার নেই আমার জেনে। কাল থেকে আপিস ছুটির পর তোমার বাসায় আসা চাই।

এসেছিল অতনু। পর পর দুদিন। তৃতীয় দিন আবার দেরী। আবার গন্ধ। আবার মুখোমুখি। কাল-কেউটের ফোঁস-ফোঁসানীও আবার।

সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ বালকের মত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসার সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ।

সে সঙ্কল্পও রক্ষা করেনি অতনু সেন। তারপরেও দেরী করে বাড়ি ফিরেছে। কোনদিন গন্ধ পেয়েছে অঞ্জনা, কোনদিন পায়নি। এভাবে মুখে দুবেলা চিবুতে চিবুতে এলে গন্ধ পাবে কি করে?

তবু ধরতে পেরেছে অঞ্জনা। আর কেঁচামেচি করেছে। এটা জেনেছে যে নেশা পেয়েছে। অতনু সেন বোঝাতে চেষ্টা করেছে মদের গুণাগুণ। বাঙালী সংসারে ওটা দুধ-মুড়ির মত অপরিহার্য।

অঞ্জনা মেনে নিতে পারেনি। ওর বাবার অবস্থাও যথেষ্ট ভাল। কৈ, তাঁর তো এসব রোগ ছিল না। ওসব এটা খারাপ নেশা। লোকের সর্বনাশ হয়ে যেতে

হয়। সমাজে মাথা হেঁট হয়। ও কিছুতেই খেতে দেবে না অতনুকে ঐ বদ জিনিস।

এমন করে কেটেছিল মাস তিন চার। ভুলবোঝা আর সন্দেহের খেলাপ এই করে পার করে দিয়েছিল ওরা একশো কুড়িটি দিন। তবু লোকটাকে নিজের মতে আনতে পারেনি অঞ্জনা।

না পেরে কলকাতায় ছুটে এসেছিল রাগ করে। সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে অঞ্জনার। কী আদর, কী মমতাভরা ব্যবহার মা-বাবার? সে সব দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও কান্না পায় অঞ্জনার। সে কান্না দুঃখের নয় আনন্দের। চোখের জল কেবল দুঃখেই তো ঝরে না আনন্দেও ঝরে।

সেদিন ওর ব্যথায় কাহিনী চেপে গিয়েছিল মা-বাবার কাছ থেকে। কি লাভ মুখ দরজার কলঙ্ক-কাহিনী সাত কান করে। মাসখানেক পরেই তো ও চলে যাবে। এর মধ্যে নিশ্চয় শুধরে নেবে অতনু নিজেকে।

একটি মাস ছিল অঞ্জনা। কত দীর্ঘ একটি মাস? কত শত সহস্র পল অনুপল ঐ একটি মাসের তিরিশটি দিনের মধ্যে! কিন্তু অঞ্জনার মনে হয়েছিল খুব অল্প সময় ছিল ও বাপের বাড়িতে। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল সে সব দিন। কত আদর, কত মমতা-স্নিগ্ধ স্পর্শ। সেদিনের আদর আর মমতার কথা মনে হলে অঞ্জনার মনটা আজও লোভাতুর হয়ে ওঠে।

ফিরে যাবার দিনটির কথা মনে পড়ে। হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন মা-বাবা, সঙ্গে রঞ্জনাও। বাবা নিজেই ড্রাইভ করেছিলেন। অঞ্জনাকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়েছিলেন টিকেট কেটে। মা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন: পৌঁছেই চিঠি দিস মা।

দেব। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন মা?

তোকে বিদায় দিতে কি যে কষ্ট তুই বুঝবি না মা। কোন দিন মেয়ের মা হয়ে মেয়েকে বিদায় দেবার দিনে বুঝবি।

অঞ্জনার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। রুমালে মুছে নিয়ে চোখ খুলতেই দেখেছিল গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মা-বাবা রঞ্জনাও চলতে শুরু করেছিলেন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু গাড়ির গতির কাছে পরাজিত হয়ে প্ল্যাটফরমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অশ্রুভেজা দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেছিল ওর যাত্রাপথে।

ফিরে পৌঁছে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল অঞ্জনা। ও যা চেয়েছিল তার উল্টোটাই হয়েছে। সর্বনাশের আর বাকী নেই। বার থেকে খেয়ে আসা নয়—ঘরে নিয়ে আসতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপর বোতল দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অঞ্জনা। এতদিন পাঁকের উপর পা রেখে রেখে চলাফেরা করছিল এবার একেবারে এক বুক পাঁকে নেমে বসেছে। এ ভাবে চলতে দিলে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাবে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেদিন কেঁদেছিল অঞ্জনা।

অতনু পাঁকে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে আর অঞ্জনা পড়েছে জলে, অথৈ জলে। তবু চেষ্টা ক'রে যেতে হবে বাঁচার। খড়-কুটো একটা কিছু চেপে ধরে কূলের সন্ধান করতে হবে।

রাতে শুয়ে পড়লে অতনুর মাথার কাছে বসে বোঝাতে চেয়েছিল অঞ্জনা। বলেছিল, এ পথের সর্বশেষ পরিণতির কথা। আস্তে আস্তে অবনতির শেষ সোপানে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। ধ্বংসেরও প্রান্তসীমায়। অনেক নাটক-নভেলের উদাহরণ, অনেক সিনেমা-থিয়েটারের কাহিনীর উদ্ধৃতিও দিয়েছিল।

কিন্তু বৃথা হয়েছিল সব। অতনু বলেছিল বারে যাবে না, ঘরে খেতে দিতে হবে। শুধু সামান্যই খাবে।

অঞ্জনা রাজি নয়। দুজনের তুমুল ঝগড়া। ঝগড়া এড়াবার জন্যই অতনু বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ফিরল পরদিন আপিস করে।

কোথায় ছিলে কাল রাত্রে?

অশোকের বাসায়।

অশোকের বাসা না অশোকার কুঞ্জবনে? কোনটা?

কি বললে?

বলছি ঠিকই। তোমার মত মানুষ পারে না কি সেটাই আশ্চর্য।

তর্ক চলল সমানে। তর্ক থেকে সোরগোল। গলা সপ্তমে চড়িয়েছিল অঞ্জনা।

অতনু বলেছিল: পাড়ার লোকজন জড়ো করে কি লাভ?

হ্যাঁ, লাভ আছে। পাড়ার লোকজন আসুক, তাদের কাছে বলব তুমি মাতাল।

ছিঃ! ছিঃ! অঞ্জনা—মাতাল কাকে বলে তাও তুমি জান না।

জানি। তোমার মত লোকগুলোকেই বলে।

কথা না বাড়িয়ে সেদিনও বেরিয়ে গিয়েছিল। অতনু বন্ধু অশোকের বাসায় গিয়ে উঠেছিল। ওর ওখানে সুবিধা আছে। মা ছোট ভাইদের নিয়ে থাকে।

পরদিন অঞ্জনা বিশ্বাস করল না। অঞ্জনা কেন ওর বান্ধবীরাও না। তবু চেষ্টা ছাড়ল না অঞ্জনা। ভেবেছিল শক্তি-প্রয়োগ করে লোকটাকে বশে আনবে। কিন্তু ব্যর্থ হল। অতনু পুরুষমানুষ হয়ে ঘরের বৌয়ের ঐ দাপট সইবে কেন?

তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠল। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানল। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল। সহানুভূতি দেখাল।

অঞ্জনার সব সহ্য হচ্ছিল। সহ্য হল না এ অযাচিত সহানুভূতি, অনাহূত সমবেদনা।

ওর কিসের অভাব? বাবার কি নেই? গাড়ি বাড়ি অর্থ সম্পদ কোনটার কমতি আছে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে এসেছিল মা-বাবার কথা। মনে পড়েছিল বিয়ের পরদিন বিদায় বেলার করুণ দৃশ্য। মা কাঁদছেন, বাবা চোখ মুছছেন—আর রঞ্জনা? ছেলেমানুষের মত কেঁদে ভাসিয়েছিল।

সেই মা সেই বাবা, সেই ছোটবোন রঞ্জনার কাছে গিয়ে সম্মানের জীবন-যাপনের আশাতেই আবার কলকাতা চলে এসেছিল অঞ্জনা।

ট্যাক্সি ছেড়ে নামতেই দোতলা থেকে মা নেমে এসেছিলেন নীচে। একটু পরে বাবা। রঞ্জনা ছুটে এসেছিল কাছে।

কোন খবর না দিয়ে তুই হঠাৎ এলি যে? মা-ই প্রশ্ন করেছিলেন।

আর থাকা সম্ভব হল না মা।

কেন রে? মার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে চল বলছি।

ভেতরে এসে ব্লাউজ খুলল। দেখাল হাত, একদিন দুজনে বোতল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল। কাল কাল দাগ হয়ে আছে। মা-বাবা দেখে ভেবেছিলেন অতনু শাস্তি দিতে গিয়ে হাত কেটে দিয়েছে।

অঞ্জনা ঐ দাগ দেখিয়ে বলেছিল: এর পরেও কি ঐ মানুষটির কাছে থাকতে বলবে?

শূন্য দৃষ্টি মেলে মা তাকিয়ে থেকেছিলেন দূরের বাড়িটার দিকে। এক সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলেছিলেন: কাজটা ভাল হয়নি মা।

অঞ্জনার মনে হয়েছিল অতনুর আঘাতের চেয়েও কঠিন, তার চেয়েও নির্মম আঘাত যেন মা-ই করলেন। চোখ তুলে তাকিয়েছিল বাবার মুখে।

বাবা সামনের দেয়ালে চোখ রেখে স্থির। কোন কথা বলেননি। সেই নীরবতা অঞ্জনার মনের কাছে অনেক কথাই বহন করে এনেছিল।

তারপর থেকে পুরো একটি বছর পেছনে রেখেছে অঞ্জনা। প্রতিদিনের প্রতিটি পল অনুপল একটা অনুভবের জ্বালা পীড়িত করেছে ওর মনকে। যে বাড়িতে, যে পরিবেশে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই সে বাড়িতে, সে পরিবেশে ওর জীবন কাটবে কি করে?

তবু মুখ বুজে পড়েছিল একটি আশ্বাসে যে মা-বাবা আবার পুরনো দিনের মন ফিরে পাবেন। প্রীতি আর স্নেহসিক্ত হাত বাড়াবেন। আদর আর সোহাগের প্রলেপ-স্পর্শ দিয়ে বলবেন: ঐ অপদার্থটার কাছে ফিরে গিয়ে লাভ নেই মা। কিসের অভাব আমাদের? এখানেই থাক তুই......

কিন্তু যতই দিন গত হয়েছে, ততই ওর মনে হয়েছে মা-বাবা ওকে একটি বোঝা মনে করছেন। ওর সামনে এসে কিছু বলেননি বটে, ব্যবহারে যেন চাপা থাকছে না। ওর অনুভবের চোখে ধরা দিয়েছে এ সত্য। ওকে নিয়ে তাদের

দুশ্চিন্তা কি কম? কত রাতে ওকে কেন্দ্র করে ও'দের আলোচনার ছিটে-ফোঁটা কানে এসেছে, কথার টুকরো শুনতে পেয়েছে। কৈ, তাঁরাও তো কোন সমাধান খুঁজে পাননি। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

তবু এ তাচ্ছিল্য কেন? কেন এ অপমান? কেন ও এ বাড়ির বড়মেয়ে হয়ে ও বড়মেয়ের মর্যাদা পেল না বুঝতে পারল না অঞ্জনা।

বিগত এক বছরের অসংখ্য ঘটনার টুকরো, অসংখ্য তাচ্ছিল্যের ছবি স্মৃতি-পটে ছায়াছবির মত ভিড় করে এল। দুঃসহ বোবা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে চাইল ওর সমগ্র সত্তা।

কিন্তু কেন এ উপেক্ষা? রঞ্জনার সম্ভাব্য বরকে কেন্দ্র করে বাড়িতে এত-বড় আয়োজনে কেন যে ও অবাঞ্ছিত হয়ে রইল তার কারণ খুঁজে পেল না অঞ্জনা। তবু উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় উত্তর?

শুধু সেদিন নয় তারপরের দিন-গুলোও ঐ অবজ্ঞার উৎস সন্ধান করে ফিরল। বাড়িতে একমাত্র রঞ্জনা কাছে আসে। প্রাণ খুলে কথা বলে। মা-বাবা কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু কেন? কি করেছে সে? ওরা কি খুলে বলতে পারে না যে ঐ লম্পট স্বামী নিয়েই ওকে ঘর করতে হবে।

এই অস্বস্তির মধ্যেই আরও কয়েকটা দিন পার করল। রঞ্জনার বিয়ের দিনটি এগিয়ে এল। বাড়িতে লোকজনের ভিড়, আত্মীয়পরিজনের মেলা। সিগারেটের ধোঁয়া কাঁপছে, জর্দার গন্ধে ভারী হয়েছে ঘরের বাতাস। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলগুঞ্জন।

বাড়তি আলোয় ভাসছে বাড়ি-ঘর-লন। পুরো ছাদটা ঘিরে ত্রিপলের প্যান্ডেল। লুচির ঝুড়ি আর মাছ-মাংসের বালতি হাতে ছোটাছুটি করছে লোকজন।

শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, চড়া গলার কথায় একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

লগ্ন এগিয়ে এল। মা এলেন ভিড় ঠেলে। পাড়ার দুটো তরুণী বৌয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন: মেয়েটাকে এবার সাজিয়ে দাও বৌমা। বর এসে পড়ল বলে।

অঞ্জনা আজও দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। মার কথা ওর কান এড়াল না। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আর সইতে পারল না এ তাচ্ছিল্য। অসহ্য ঠেকল এ অপমান।

বাড়ির এতবড় আয়োজনে ওর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। কোন বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু কেন? ছোট বোনের বিয়েতে ওর কি কিছুই করার নেই?

নেইই তো। তা না হলে মা এড়িয়ে চলছেন কেন? অন্যান্য মেয়েরাই বা কোন কাজে ওর সহযোগিতা চাইছে না কেন?

তাহলে কি আজকের শুভলগ্নের অঞ্জনা অপাংক্তেয়। তাইতো। অঞ্জনা সধবাও নয়—বিধবাও নয়। তাই এই বিয়ের আসরে, অফুরন্ত মঙ্গল আর উল্লাসের আনন্দ-যজ্ঞে ওর কোন প্রয়োজন নেই।

এরপরেও কি আছে? তাও তো নেই। একই জীবন। একই তাচ্ছিল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

অথচ বাবা অতনু সেনকে আনবার জন্য দিল্লী যেতে চেয়েছিলেন। যেতে দেয়নি অঞ্জনা। শুধু একখানা প্রজাপতি-মার্কা কার্ড পাঠাতে বলেছিল। অথচ যাকে বদলোক মনে করে দিল্লী ছেড়ে এসেছে অঞ্জনা সে লোকটা ওকে এক ডজন চিঠি লিখেছে ফিরে যাবার অনুরোধ করে।

আজ যদি অতনুকে সঙ্গে করে এ বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে পারত অঞ্জনা, তাহ'লে কি মর্যাদাই না দিত এরা। প্রথম সারিতেই থাকত ওর আসন। তাতো হল না। হল আঘাত আর অপমানের বোঝা ওর মনের আনাচে-কানাচে বিষাক্ত ছোঁয়ার মত জমা।

আজ ওর নিজের ঘরটাও বাক্স দমস্ত। আত্মীয়পরিজনরা দখল করেছে। খালি বলতে আছে ভাঁড়ার ঘরে পাশে একখানা ঘর। সেই ছোট ঘর।

সে ঘরে গিয়েই লজ্জা ঢাকতে চাইল অঞ্জনা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দিতে চাইল। হাতে করে নিয়ে গেল একটা মাদুর। মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

হয়তো ব্যর্থ বিষন্ন রাত ও ঘরে শুয়েই শেষ হত। কেউ জানত না, কেউ খোঁজও করত না।

কিন্তু বেদনায় সমবেদনা জানাতে এগিয়ে এলেন মা। মেয়েদের ভিড় থেকে অঞ্জনার হঠাৎ অন্তর্ধান তাঁর নজরে পড়ল অনেক রাতে। যে মেয়ে রাতদিন অসংখ্য কথায় আর অন্তহীন খুশীতে ভরিয়ে রাখত সে মেয়ে ইদানীং এমন বোবা হয়ে গেছে দেখে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। আজ আর স্থির থাকতে পারলেন না।

অঞ্জনার চোখের পাতায় তন্দ্রার প্রভাব এসেছিল। কিন্তু কে যেন ওর কপালে মাথার চুলে হাত রেখেছে বলে মনে হল, একটু পরে শব্দ আসছে।

চমকে আস্তে আস্তে চোখ খুলতেই কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল অজস্র ধারায়। উঠে বসল। মার বুকে মুখ লুকাল। মার বুকের শাড়ি কান্নার লোনা জলে ভিজে গেল।

সমস্ত অপমান আর তাচ্ছিল্যের আঘাত থেকে এই ছোট্ট ঘরে আত্মগোপন করে নিজেকে একটি রাতের মত বাঁচাতে চেয়েছিল অঞ্জনা। বাঁচতে চেয়েছিল কান্নার আড়ালেই সব আঘাতের দুরন্ত বেদনাকে দুঃসহ জ্বালায় ঝরিয়ে। তা হতে দিলেন না মা।

অনেকক্ষণ পরে মা বললেন: ওঠ মা, খাবি চল।

না মা, আমার খিদে নেই।

খিদে খুব আছে। চল...মার গলার স্বর কাঁপল।

না মা, তোমরা চাও না যে আমি ঐ আনন্দের হাটে থাকি। আমাকে এই অন্ধকার ঘরেই থাকতে দাও আজকের রাতটা।

চাই না—একথা ঠিক নয় মা...... আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে মা বললেন, কিন্তু কি করব মা। সমাজে বাস করতে হলে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কাকে না ডেকে পারি। আর তারা যখন প্রশ্ন করে আপনার ঐ মেয়েটা বছরের পর বছর এখানে কেন? স্বামীর ঘর করে না কেন, তখন যে কোন উত্তর খুঁজে পাই না মা।

জলভরা দুটো চোখ তুলে বলল অঞ্জনা। ভিজে ভিজে কাঁপা দুটো ঠোঁটও। বলল: সত্যি কথাই বলেছ মা, যা ঘটছে তাই বলেছ। তোমাদের আর এ অপমানকর অবস্থায় রাখব না আমি। ভাবছি কালই চলে যাব।

চলে যাবি, কোথায়? চোখ বড় বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন মা।

দিল্লী। কালকের দিনটা যাবার পক্ষে খুবই ভাল। রঞ্জনারা যাবে, আমিও যাব।

কিন্তু.........

কোন কিন্তু নয় মা। এবার ফিরে গিয়ে নতুন করে সংসারের হাল ধরব। এখন বুঝেছি পালিয়ে এলে মান বাঁচানো যায় না। বাঁচাতে হবে ঐ সংসারের উপর নিজের ব্যক্তিত্বের উপর সব অধিকার বজায় রেখে। দুর্বলের ছেড়ে দিলে চলবে না, শক্ত মুঠিতে হাল ধরে দুঃখের নদী পার হতে হবে।

মার চোখেও খুশীর দীপ্তি। সেই ভাল মা, নিজের ঘর নিজে আগলে না রাখলে দুদিন পরে কিছুই থাকবে না। তাছাড়া অতনু ছেলে হিসেবে খুব খারাপ নয়। খারাপ হলে তুই চলে আসার পর এতগুলো চিঠি লিখে তোকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করত না।

নীচে তখন শাঁক বাজছে, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে।

মা বললেন: চল, খাবি চল।

অঞ্জনাও মার হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: চল......

ধূমকেতু মাঝে মাঝে
হাসির ঝাঁটায়
ম্যাকমেহন লাইন
দ্যুলোক ঝাঁটিয়া নিয়ে কৌতুক পাঠায় !..
শান্তি প্রস্তাব
ভারত
অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্ব সৃষ্টিতে !

পথ ধরে পথ করে

পূর্বরাগেই নির্বন্ধ ফল ভক্তদের রোমান্ত ইউরোপের সমাজজীবন থেকে ক্রমলুপ্তায়মান।

কিমিতি বিদ্যা ও জীব-বিদ্যার অত্যাশ্চর্য উন্নতি, সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মিলন যাতে পরিণাম চিন্তায় ব্যাহত না হয় তার জন্যে বহুল ও বিচিত্র কৌশলের ব্যাপক প্রয়োজনের ফলে তার সঠিক পরিণতি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করবার উপায় নেই।

তবু হিসাবে দেখছি জার্মানীতে শত-করা দশটি নবজাতকের পিতামাতারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ নয়। ছোট্ট দেশ সুইডেনে জন্মহার নিতান্ত কম (প্রতি হাজারে ১৩½, বৃটেনে ১৭½,) তবু সেখানেও প্রতি বছর ১২০০০ জারজ সন্তান জন্মায়। বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত 'গেটিং ম্যারেড' নামে পুস্তিকার মতে প্রতি তিন-জন বিবাহিতা বৃটিশ নারীর মধ্যে এক-জন প্রাগ-বিবাহ জীবনে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। বর্তমানে বৃটেনে প্রতি দুটি নবজাত শিশুর মধ্যে একটির জন্ম-সম্ভাবনা দেখা দেয় তার পিতামাতার বিবাহের আগেই। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে বা পরেই সেই দম্পতিদের অনেকেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন বলে জারজের সংখ্যা অনেক কমে যায় (১৯৬০ সালে তাদের জন্মহার ছিল ৪৭০০ (মোট সংখ্যার শতকরা ৪·১ ভাগ, ১৯৩৭ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ৩২০০০ অথবা শতকরা [illegible])।

[illegible] জারজ [illegible] [illegible] [illegible]-তথা পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু [illegible] যে একটি [illegible] সামা-জিক সমস্যা তাতে সন্দেহ নেই। কিছু-কাল আগে লেনিনগ্রাদের 'লিটারারী গেজেটে' জনৈকা শিক্ষয়িত্রী অভিযোগ করেন যে, তাঁর স্কুলের শতকরা ২০টি ছাত্র-ছাত্রী জারজ। সুতরাং তাদের জন্ম-প্রমাণপত্রে পিতৃনামের স্থানটা শূন্য (ব্ল্যাঙ্ক) থাকে। তাই অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মর্মান্তিকভাবে বিদ্রূপ করে বলে 'ফাদার ব্ল্যাঙ্ক'। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার তাই সক্ষোভ জিজ্ঞাস্য "আমরা কি এমন অবস্থায় পৌঁছোচ্ছি যে যখন আমরা ওদের (ঐ জারজদের) সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ঘৃণার্হ—'বাস্টার্ড' শব্দটির প্রয়োগ শুরু করবো?"—অতএব তিনি রেজিস্টারীকৃত বিবাহের বাইরে মিলন-সম্ভূত এই বিপুল সংখ্যক সন্তানদের পরিচয় দানের জন্যে এমনভাবে আইনের পরিবর্তন দাবী করেছেন যাতে তারা নিজেদের প্রকৃত পিতার (মায়ের আইনত বিবাহিত স্বামী নয়) পরিচয় দিতে পারে।

নারী মাত্রেরই জীবনে এক চরম ক্ষণ সন্তান-সম্ভাবনা। তাই সর্বকালে সর্ব-দেশেই আসন্নপ্রসবা মাত্রই সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের সহানুভূতির পাত্রী হওয়া উচিত। তার ওপর সে যদি প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং তার যদি স্বামী কিম্বা স্বজন না থাকে তা হলে সে তো আরো বেশী করে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্নেহ ও সাহায্যের অধিকারিণী। কিন্তু অধিকাংশ দেশই সেই বিপন্নাদের প্রতি উদাসীন কিম্বা হৃদয়হীনতার আদিম বর্বরতা থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। যে দেশগুলি তার ব্যতিক্রম তার মধ্যে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও সুইডেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

আইনের চোখে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মাতার কোন প্রভেদ নেই। অবিবাহিতা মাতাদের সেখানে বলা হয় 'একলা মা'। প্রসবকালে তাঁদের হাসপাতালে কোন খরচ লাগে না। কর্মনিরতা হলে তাঁরা ১২৪ দিন সবেতন ছুটি পান।

সুইডেনে যেদিন থেকে একটি অনূঢ়া মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা জানাজানি হয়ে যায় সেদিন থেকেই তাঁকে 'মিসেস' বলে ডাকা হয়। তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করবার হৃদয়হীনতার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। এই সময়েই রাষ্ট্র তাঁর জন্যে কোন বয়স্ক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্না অভিভাবিকা ঠিক করে দেয়। সেই তরুণী মাতার জন্যে বাসস্থান ও প্রসূতি-আগার প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা এই অভিভাবিকার দায়িত্ব। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর পিতাকে সনাক্ত করে প্রসূতি ও শিশুর জন্যে কিছু পরিমাণে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা। অনেক সময়েই একাধিক, এমন কি পাঁচজন, সম্ভাব্য পিতাকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

সুইডেনে এই মেয়েদের বলা হয় 'নিঃসঙ্গ মাতা'। এঁরা মিউনিসিপ্যালিটির ফ্ল্যাট প্রভৃতি শুধু সস্তা পান না, পাওয়ার ব্যাপারে এঁদের অগ্রাধিকার। নার্স ও ধাত্রী এঁরা পান বিনা বেতনে। তাছাড়া তাঁরা অন্য কর্মনিরতা মায়েদের মতই সবেতন তিন মাস ছুটি পান এবং সেই সঙ্গে অন্যদের মতই মাতৃত্বের অভিদের বা বৃত্তি। এঁদের শিশু সাত বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মাতৃত্বের বিকল্প ব্যবস্থা

বলা বাহুল্য যে সর্বদেশেই অনূঢ়া মেয়েদের মাতৃত্ব অবাঞ্ছিত। শুধুমাত্র অজ্ঞতা, অসতর্কতা, কিম্বা প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির ব্যর্থতার ফলেই অনুরূপ অঘটন ঘটে। তাছাড়া, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যের জন্যেও অনেক সময় বিবাহিত নারীদেরও সন্তান-সম্ভাবনা অনভিপ্রেত হতে পারে।

কমিউনিস্ট দেশগুলির বাইরে জাপান, মেক্সিকো ও স্ক্যানডেনেভিয়া (অর্থাৎ নরওয়ে ও সুইডেন) প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি দেশে মেয়েদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বিপ্লবের পর থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে অনভিপ্রেত মাতৃত্ব-রোধ আইনসম্মত, ব্যয়হীন ও

সম্পূর্ণভাবে প্রসূতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। তারপর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রধানত জন্মবৃদ্ধির আশায় মাতৃত্ব-রোধ বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। '৫৬ সালে তাকে পুনরায় আইনসম্মত ঘোষণা করায় বহু মেয়ে বে-আইনীভাবে মাতৃত্বের অবসান ঘটাতো। অবশ্য আইনসম্মত ঘোষণার পরও নিজেদের নাম নথিপত্রের বাইরে রাখতে উৎসুক হয়ে আজো অনেক মেয়ে লুকিয়ে হাতুড়ে দিয়ে ঐ কাজ করিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে। তাছাড়া আইনসম্মত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে এ কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় না। সেখানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা বিনাব্যয়ে হলেও মাতৃত্ব-রোধের জন্যে প্রায় ১০০ রুবল (৯২০ টাকার মত) পারিশ্রমিক লাগে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সে অনেক টাকা!

চীনেরা বার কয়েক মাতৃত্ব-রোধ আইনী ও বে-আইনী ঘোষণার পর বর্তমানে তা আইনানুগ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি-রোধ।

হ্যাঙ্গারীতে ১৯৫৬ সালে মাতৃত্ব-রোধ আইনসম্মত করা হয়। কিন্তু তার পর থেকে সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গত ৭ই আগষ্ট (৭।৮।৬২) বুদাপেস্টের প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'নেপসজাভা' পত্রিকায় লেখে যে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে হাঙ্গেরীতে এই ব্যাপারে ৫০,০০০ জন নারীর নাম রেজিস্টারীকৃত করা হয়েছে, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে দেশে শিশু জন্মেছে মাত্র ৩৩,০০০টি।

সংবাদপত্রটির মতে অনেক মহিলা কোন কারণ না দেখিয়ে, অথবা কেবলমাত্র এই কথা বলেন যে, একটি ফ্ল্যাট কিম্বা মটরগাড়ী কিনবার জন্যে টাকা জমাতে চান বলে এই কাজের অনুমতি চেয়েছেন। উক্ত বিভাগের কমিশন প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মেয়েদের বিবেকের কাছে আবেদন করেছেন।

সম্প্রতি বৃটেনেও শ্রীমতী ফিনক্‌-বাইন * নাম্নী একটি মহিলার অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব-রোধ করা নিয়ে বৃটেনের সংবাদপত্র-সমূহে প্রবল বিতর্ক হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালে এলিস জেনীকিন্স নামে এক লেখিকা 'দ ফ্রি সি রীচ' নামে একটি বইতে প্রকাশ্যভাবে মেয়েদের অবাঞ্ছিত সন্তান নষ্ট করবার অধিকারের দাবী তোলেন। সম্প্রতি হেলেন লাওয়ে নামে এক লেখিকা 'এ কোয়েসচেন অব এ্যাবরসান' নামে একটি উপন্যাসে ঐ দাবীর সমর্থনে আলোড়ন তুলেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও ইতিপূর্বে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে বহু বিতর্ক হয়েছে।

কিন্তু চার্চ ও রক্ষণশীল জনমত সন্তান-নিরোধ অধিকারের প্রবল বিরোধী। আমেরিকার মত বৃটেনেও গর্ভপাত ঘটানো বে-আইনী এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধিনী কিম্বা তার সহযোগী বা সহযোগিনীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। আইনের একটি মাত্র ধারা আছে, যেখানে কোন চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, গর্ভপাত না ঘটালে ভাবী জননীর জীবন সংশয় ঘটতে পারে, সেখানে তিনি গর্ভপাত ঘটাতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কেউ আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারে, তাই কদাচিৎ কোন চিকিৎসক গর্ভধারিণীর জীবনরক্ষার জন্যেও গর্ভপাত ঘটান।

তবু কার্যত ঘটছে কি? প্রতি বছর বৃটেনেই অন্তত ১০০,০০০ নারী সন্তান নষ্ট করান। ফিনক্‌বাইন-বিতর্কের সময় ডেলি হেরল্ড পত্রিকায় জনৈকা লেখিকা লেখেন যে, বৃটেনে যা ঘটে পৃথিবীর আর সব দেশেও তাই ঘটে। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে গর্ভপাতের সংখ্যা কয়েক কোটি। লেখিকা বলেন যে, দেশে-দেশে এত কঠোর আইন ও ধর্মে কত কঠিন বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন যে, দুনিয়ার সব দেশে প্রতিটি বড় ও ছোট শহর এমনকি মাঝারী ধরনের গাঁ ও পাড়াতেও এক-আধজন পেশাদার কিম্বা আধা-পেশাদার গর্ভপাতকারী কিম্বা কারিণী খুঁজে পাওয়া যাবেই।

অতএব ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে গর্ভধারণের নির্দেশ আইনের ফল দাঁড়াচ্ছে কি?—

অস্বচ্ছল অবস্থার নারীদের পক্ষে অবস্থাপন্নাদের চেয়ে গর্ভপাত ঘটানো কঠিনতর ও বিপজ্জনক।

বিপুল সংখ্যক গর্ভপাত ঘটছে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাতুড়ে ব্যবসাদারদের হাতে। ফলে ঘটছে অসংখ্য মৃত্যু ও দুর্ঘটনা। অথচ গর্ভপাত যাঁরা ঘটাতে চান তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ও সুবুদ্ধিসম্পন্না। সন্তানদের প্রতি মমতাময়ী ও দায়িত্বসচেতনা বলেই তাঁরা অবাঞ্ছিত সন্তান চান না। অবশ্য আরেকদল নারীও থাকতে পারেন যাঁরা সম্ভবপর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেও গর্ভপাত ঘটাতে চান। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর শারীরিক ও মানসিক বিপত্তির ঝুঁকি নিতে চান।—অথচ রাষ্ট্র তাঁদের সঙ্গে ঘৃণ্য পাপিষ্ঠার মত ব্যবহার করে। কিন্তু কেন? পৃথিবীতে কি শিশুর অভাব ঘটেছে? বরং অনেক বিজ্ঞানী তো মনে করেন যে, জনবৃদ্ধির হার যুদ্ধ-সম্ভাবনার চেয়েও ভয়াবহ।

এমনকি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, স্রেফ নিজের সুবিধার জন্যে, অর্থাৎ নির্ঝঞ্ঝাট স্ফূর্তির জন্যে কোন মেয়ে সন্তান চায় না তবু সেই মাতাকে কি শুধু ভবিষ্যৎ সন্তানটির কথা ভেবেই গর্ভাবসানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়? নিজের মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তানের চেয়ে পৃথিবীতে অনভিপ্রেত জীব আর কি হতে পারে?

হেরল্ডের লেখিকার মতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন গর্ভপাত-বিরোধী আইন গৃহীত হয় তখন মেয়েদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করা হতো এবং পুরুষেরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের যে-কোন অধিকার দাবিয়ে দিত। কিন্তু আজ?—আজো কি তাদের নিকৃষ্টতর জীব বলে মনে করা হচ্ছে? নইলে সর্বক্ষেত্রে তাদের সমানাধিকার, অন্তত মুখে স্বীকার [illegible] তাদের [illegible] জবরদস্তি করে গর্ভধারণে [illegible] দেওয়া হচ্ছে কেন?

* শ্রীমতী ফিনক্‌বাইন আমেরিকান টেলিভিশন অভিনেত্রী। চারটি সুস্থ সন্তানের মাতা এই মহিলা পঞ্চমবার গর্ভধারণের পর সন্তান নষ্ট করতে চান। কারণ এবার গর্ভাবস্থায় অজ্ঞাতসারেই তিনি 'থালিডোমাইড' নামে ঘুমের ওষুধ খান। ফলে তিনি আশংকা করতে থাকেন যে তাঁর পঞ্চম সন্তান বিকলাঙ্গ হবে। চিকিৎসকেরাও এই সম্ভাবনার যথার্থতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু [illegible] তাঁর গর্ভপাতের অধিকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়।

শ্রীমতী ফিনক্‌বাইন শেষ পর্যন্ত সুইডেনে গিয়ে গর্ভপাত ঘটান। কিন্তু এই ঘটনা পাশ্চাত্যে অবাঞ্ছিত সন্তান-নষ্টের মৌলিক অধিকার নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে বিবিধ দেশের [illegible] প্রবল হয়ে ওঠে। [illegible]

গর্ভপাত কি মনুষ্য-জীবন নাশ?

এ বিতর্ক হয় গার্ডিয়ান পত্রিকায়। জীবিবিদদের মতে ২৮ সপ্তাহের আগে মাতৃগর্ভে শিশু থাকে সম্পূর্ণভাবে মাতৃদেহের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে বাঁচে না। সেই হিসাবে তখন সে মাতৃদেহের অংশ-বিশেষ, সুতরাং স্বতন্ত্র জীবন নয়। কিন্তু জীবন-সম্ভাবনা থাকে বটে। অতএব গর্ভসঞ্চারের শুরুতে ভ্রূণ অপসরণ করার অর্থ একটি জীবন-সম্ভাবনার বিনাশ করা, কিন্তু জীবন বিনাশ করা নয়। কিন্তু পরিবারে পরি-কল্পনার যেকোনো কৌশলই হচ্ছে জীবন-সম্ভাবনার বিনাশ সাধন।

এই নৈতিক বিপ্লবের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক হাওয়া বদল শুরু হয়েছিল, বর্তমান অবস্থা হচ্ছে তারই পরিণতি। মুখ্যত তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও স্বাধীনতার অগ্রগতি। সেই অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দুনিয়ার পুরুষ-প্রধান সমাজের নৈতিক মান-মর্যাদা ও কিছু মাত্রা ছেড়ে গেলো। তার বিধি-নিষেধের কাঠামো ধ্বসে পড়তে লাগলো।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা স্থান-সাপেক্ষ। কিন্তু সংক্ষেপে এ-কথা বলা যায় যে, সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য ঘটবার পর থেকেই তারা নারীর যৌন প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ মানবিক অনুভূতি হিসাবে গ্রহণে অস্বীকার করে। সতীত্বের নামে কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে সমাজ-চ্যুতি, বেত্রাঘাত, না-খেতে-দিয়ে-শুকিয়ে মারা, ঢিলিয়ে মারা, কয়েদ, ফাঁসি, অর্ধেক-মাটিতে পুঁতে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া সবই করেছে।

অথচ সতীত্বের মোদ্দা কথাটা কি?—মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র যৌন বাসনা থাকবে না। তাদের যৌন কামনা হবে সম্পূর্ণ নেতিবাচক, স্বামীর কামনা-লালসার পরিপূরক। যদি কোন নারী তার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ তার স্বতঃস্ফূর্ত কিম্বা সক্রিয় যৌন বাসনা থাকে, তাহলে সর্বনাশ! সে অসতী, ভ্রষ্টা, কুমাতা, কলঙ্কিনী, কুলটা।—এ হলো সনাতনী খৃষ্টানী মনোভাব!

আমাদের দেশে তাকে আরেকটু আগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুষ্ঠ-রোগী পঙ্গু স্বামীকে যে-স্ত্রী পিঠে করে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল, যুগ যুগ ধরে আমরা তার সতীত্ব ও পতি-পরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছি। কিন্তু ডাকসাইটে কোন লম্পট কিম্বা সন্দেহ-বাতিক নপুংসকের হতভাগিনী স্ত্রী যদি কোন বিহ্বল মুহূর্তে ঘোমটার ওপারে তাকিয়েছেন তো তাঁর লাঞ্ছনার অবধি রাখিনি।

—পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নারীরা হচ্ছেন সেই যুগ-যুগান্তরের সামাজিক অসাম্য ও মেয়েদের যৌন-নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী। এঁদের যৌন প্রবৃত্তি সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও চরিতার্থতাপ্রয়াসী। তাতেই তাঁদের আনন্দ, তৃপ্তি ও উল্লাস।

[illegible]

অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক

স্বাধিকারের ক্রমবৃদ্ধি ছাড়াও সম্প্রতি-কালে অন্য কতকগুলি গৌণ কারণও সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সমাজকে বিশেষ করে তরুণ-তরুণী সমাজকে প্রভাবান্বিত করেছে। যার ফলে যৌন-স্বাধীনতা ক্রমশই বয়ঃকনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠা-দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

সমাজতত্ত্ববিদেরা প্রায় অদ্বিতীয়মত হয়ে বলছেন যে, জীবন ও স্বাস্থ্যের মানের ক্রমোন্নতির ফলে মাত্র এক-কি-দুই পুরুষের মধ্যেই তরুণ-তরুণীদের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটছে দু'বছর আগে। আর সেই আশু যৌবনে যৌনলিপ্সাকে বহ্নিমান করে তোলবার মত উপাদানের অপরিমেয় প্রাচুর্য রয়েছে তার পরিবেশে।

যেমন, রেকর্ড-রেডিও, সিনেমা-টেলিভিশনে এবং চটকদার পত্র-পত্রিকায় যৌনসর্বস্ব গান, কাহিনী, গল্প, রম্য-রচনা ও ছবির ব্যাপক প্রসার। দ্বিতীয়ত, অসন-ভূষণ ও প্রসাধন-ব্যবসায়ীদের প্রচার-কেরামতি। আজকের তরুণ-তরুণীরা কৈশোরের সীমা অতিক্রান্ত হবার আগেই যেদিকে তাকায়, সেইদিকেই সহস্র-দর্পণ-যুক্ত হলঘরের প্রতিবিম্বের মত একটিই প্রলোভন-জাগানো দৃশ্য তার চোখে পড়ে —কিভাবে সাজলে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বে। কোন্ বিন্যাসে তরুণীর কেশে এমন কমনীয়তা আসবে, যার মধ্যে দিয়ে আঙুল সঞ্চালন করতে গেলে তরুণ প্রণয়াভিলাষীর চোখ দুটি আবেশে ঢুলে আসবে। কোন্ প্রলেপ তার ত্বকে ক্লিওপেট্রার স্পর্শ-সুখ আনবে ইত্যাদি।

কোন কোন শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ববিদ আবার স্কুলে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশুপালন ও প্রাথমিক যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষাকেও তারুণ্যে যৌন-স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে দায়ী করেছেন। তাঁরা বলেন, যাঁরা ঐসব শিক্ষার প্রবর্তক, তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহেই মহৎ ছিল এবং ঐগুলির শিক্ষা একেবারে না দেওয়া কিম্বা কিশোর-কিশোরীদের অজ্ঞ করে রাখাও অনুচিত, এমন কি বিপজ্জনক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অনুসন্ধিৎসু তরুণ মন বিষয়গুলি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞানার্জনের পর আরো দশটি বছর তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে নারাজ।

অবশ্য এতক্ষণ যা বললাম, তা হলো প্রধানত ইউরোপ-আমেরিকার [illegible] সম্পর্কে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, যেখানে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের বেসাতি নেই, যৌনসর্বস্ব চটকদার সাহিত্য ও সিনেমা নেই, সেখানে তরুণ মন যৌন-সম্ভোগলিপ্সু হয়ে ওঠার নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে বসতস্থানের অভাব। কয়েক বছর আগে ডাঃ এটারভ নামে এক সোভিয়েট সমাজ-বিজ্ঞানী 'যৌন শিক্ষার সমস্যা' (Problems of Sex Education—Dr. Atarov) নামে একটি বই-এ লেখেন ঃ

"সময় সময় পিতামাতারা সন্তানদের সম্মুখেই পরস্পরের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দেখান। এবং প্রায়ই একই ঘরে কিম্বা পাশের ঘরে ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে সম্ভোগলিপ্ত হন। তাঁরা ভুলে যান যে, এরকম ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই পিতামাতার অসতর্কতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যেই বালক-বালিকাদের মনে অকালে যৌনকামনা তীব্র হয়ে ওঠে।"

সমস্যার সাময়িক সমাধানে

নর-নারী সম্পর্কের দ্রুত পরি-বর্তনশীল এই পরিস্থিতির ফলে সমাজে নানা স্তরে নানা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা সম্প্রতিকালে অনুভব করা যায় 'লেডি চ্যাটার্লী' উপন্যাসের বিচারকালে। সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে খড়্গ হাতে বিতর্কের ময়দানে নামে চার্চ। সেই খড়্গ-যোদ্ধাদের সেনাপতি-স্থানীয় ছিলেন রেভারেন্ড লেসলে ডি, উদারহেড, পি-এইচ-ডি, ডি-ডি। তিনি লেখেন যে, যৌনানুভূতি দৈব পরি-কল্পনা। খাবার সময় খিদে পাবার মতই যৌন-কামনা চরিতার্থ করার বাসনাও অপরাধ নয়। কিন্তু খিদে পেয়েছে বলে চুরি করে খাওয়াকে তো সমর্থন করা যায় না।

—নিশ্চয়ই যায় না। কিন্তু গৃহস্থের সম্পত্তি নিয়ে কেউ যদি [illegible] ও [illegible] ভুক্ত করে, তবে তাকে কি চুরি বলা চলে?

কেউ কেউ অবশ্য নারী-স্বাধীনতা, এমন কি শিক্ষা প্রভৃতি বর্জন এবং বাল্য-বিবাহ পুনঃপ্রবর্তন প্রভৃতির কথা বলেন। ক্যাথলিকরা বলেছিলেন, মেয়েদের [illegible] নিয়ে আসার কথা। কিন্তু তার [illegible] কথা? তাতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও শিল্প-ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছুকেই পেছু হটাতে হবে।

তবে বাল্য-বিবাহ পুনঃপ্রবর্তনটা বোধ হয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্যে আংশিকভাবে ফিরে আসছে। ১৯৬০ সালে বৃটেনে ৩৪৩৬১৪টি বিয়ে হয়। তার মধ্যে ৫০০টি কনের বয়স ছিল ষোলর কম এবং ৮২০০০ কনের বয়স ছিল কুড়ির কম। আর আজকালকার ছেলে-মেয়েদের যতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে প্রচার করা হয়, হিসেব নিলে দেখা যাবে ততটা ঠিক সত্যি নয়। কারণ, সব-চেয়ে বেশি (অর্থাৎ আয়ের অনুপাতে) টাকা জমায় ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা।

তবে সব ছেলেমেয়ে টাকা না-ও জমাতে পারে। কারণ, টাকা যারা জমায়, তারা ঐ বয়সেই কাজে ঢুকেছে। কিন্তু ঐ বয়সে অনেকে পড়াশোনা করতে পারে কিম্বা শিক্ষানবীশ থাকতে পারে। সুতরাং তারা তো বাল্য-বিবাহ করতে পারে না। করা উচিত নয় বলেও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। কারণ, ঐ বয়সে শরীর, মন, দায়িত্ব ও বিবেচনাবোধ কোন কিছুরই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই অল্পবয়সের বিয়েতে স্বল্পকালেই ক্লান্তি আসে ও বিরোধ জাগে।

এই সব বিবেচনা করেই বিংশ দশকে আমেরিকার বেন, বি, লিন্ডসে নামে এক বিচারপতি তাঁর 'কম্প্যানি-ওনেট্ ম্যারেজ মার্ক' পুস্তকে (প্রকাশিত ১৯২৭) একটি ভিন্ন কিন্তু [illegible] প্রস্তাব করেন।

সংক্ষেপে তাঁর প্রস্তাব ছিল, যেহেতু বিবাহিত জীবনে সন্তানপালনের জন্যে এবং অনেকক্ষেত্রেই বিবাহিতা নারীর পক্ষে চাকরী করা সম্ভব কিম্বা বাঞ্ছনীয় নয় বলেই যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থাভাবের জন্যেই বহু তরুণ-তরুণী পরস্পরের প্রতি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েও বিয়ে করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং মিঃ লিন্ডসে দাবী তোলেন যে প্রচলিত সাধারণ বিয়ে ছাড়াও আরেক ধরনের সহযোগিতার বিয়ে (কম্প্যানিওনেট ম্যারেজ) চালু ও আইনের দ্বারা স্বীকৃত হোক। সেই বিবাহে ঃ

(১) নির্দিষ্টকালের জন্যে [illegible] [illegible] সন্তানধারণের কোন ইচ্ছা [illegible] [illegible] থাকবে না এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] মধ্যে থাকবে।

(২) যতদিন না তাদের কোন সন্তান হচ্ছে ততদিন তাদের পক্ষে [illegible]

পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হবে।

(৩) বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হলে স্ত্রী কোন-প্রকার খেসারৎ দাবী করতে পারবে না।

বিচারপতি লিন্ডসের মতে বিবাহিত কিম্বা যৌন-জীবনে স্থিতিশীল ও তুষ্ট ছাত্ররা যৌনজীবনে অস্থির ও অতৃপ্তদের চেয়ে পড়াশোনায় ভালো হয়। দ্বিতীয়ত, পূর্ণাঙ্গদস্তুর ঘর সংসার, কিম্বা দুজন স্বতন্ত্র, বিশেষ করে বিশৃঙ্খল জীবন যাপনের চেয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রীতি ও বন্ধুত্বের ওপর নির্ভরশীল 'সহযোগিতার বিয়ে' অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত ব্যয় ও নির্ঝঞ্ঝাট।

তবে তাঁর প্রস্তাবের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ ও ভালোর দিক হচ্ছে, এই অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা তরুণ-তরুণীদের জীবনে বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা, উত্তেজনা ও ব্যভি-চার প্রশমিত হবে। বহুগামিতার স্থানে আসবে একগামিতা। সেই সঙ্গে কমে আসবে সমলিপ্সা কিম্বা গণিকাসক্তি প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র যৌন স্খলন এবং রাতজাগা মাতলামি, চড়াও-বেড়াও, হৈ-হুল্লোড় ও মারপিট প্রভৃতি বদভ্যাস ও গুন্ডামী।

কিন্তু তা হলে হবে কি? ডেনভারের তরুণ অপরাধীদের বিচারালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ লিন্ডসে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেই পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন অমনি নিগ্রো-নিধনকারী কু ক্লুক্স ক্লান এবং ক্যাথলিকেরা ঐতিহ্য, পারিবারিক পবিত্রতা, রক্তের বিশুদ্ধতা, আইনসিদ্ধ লালসার বাঁধ-ভাঙা প্রবৃত্তির অজুহাতে এমনি আলোড়ন সৃষ্টি করলো যে লিন্ডসে পদ-চ্যুত হলেন।

তবে আজ স্ক্যান্ডেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য বহু দেশে তরুণ-তরুণীরা বিচারপতি লিন্ডসের প্রস্তাবকে বাস্তব করে তুলছে। তবে কোথাও তা আইনত স্বীকৃত হয় নি এবং চার্চের একরোখা অননুমোদনও বন্ধ হয়নি।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বিচারপতি লিন্ডসেকে পরে আংশিকভাবে সমর্থন জানান। তিনি লেখেন, "আমি যদিও মনে করি যে 'সহযোগিতার বিয়ে' সঠিক দিকেই এক পদক্ষেপ এবং তার দ্বারা বহু উপকারও সাধিত হতে পারে তবু আমি মনে করি না যে প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা যথেষ্ট। আমি মনে করি, সর্ব-প্রকার যৌন সম্পর্ক,—যার মধ্যে সন্তানের প্রশ্ন জড়িত নেই, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-গত বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি কোন নারী ও পুরুষ সন্তানের জন্ম না দিয়ে একত্র বসবাসের সিদ্ধান্ত করে তবে তা একান্তভাবে তাদের নিজেদের ব্যাপার। অন্য কারো তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

"আমি মনে করি না যে, যখন কোন নারী ও পুরুষ, বিবাহের দ্বারা সন্তান-সন্ততি কামনা করছেন, তখন তাঁদের যৌন ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে, অনুরূপ গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ কথার যথার্থতা প্রমাণে প্রভূত তথ্য ও প্রমাণ উত্থাপিত করা যায় যে, প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা এমন লোকের সঙ্গেই হওয়া উচিত যার ও-বিষয়ে আগে থেকে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কারণ যৌন প্রক্রিয়া মানুষের সহজাত বা স্রেফ ইন্দ্রিয়-জাত নয় (অর্থাৎ তার জন্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন) মনে হয় কোনদিন তা (অশিক্ষাপটু) ছিলও না। —এই যুক্তি ছাড়াও দুটি নরনারী যখন তাদের আজীবন সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছে তখন তাদের পরস্পরের সামর্থ্য ও সম্ভব-পর সহযোগিতার বোঝাপড়া না হয়েই তা গড়তে যাওয়া এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এ যেন এক ব্যক্তি যখন বাড়ী কিনতে যাচ্ছে তখন কেনা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে বাড়ীটি দেখতে না দেবার এক অসম্ভব সর্ত।

"যদি বিবাহের জৈবিক ভূমিকাকে যথার্থভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে তার সঠিক পদ্ধতি এই হওয়া উচিত যে স্ত্রীর প্রথম গর্ভসঞ্চারের পূর্বে পর্যন্ত কোন বিয়ের আইনত স্বীকৃতি না দেওয়া। বর্তমানে যৌন প্রক্রিয়া অসম্ভব হলে বিয়ে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তানলাভ, শুধুমাত্র যৌন প্রক্রিয়া নয়। সুতরাং সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেবার আগে পর্যন্ত বিবাহের পূর্ণ স্বীকৃতি দান অনুচিত।

—পূর্বোক্ত মত বা যুক্তি পোষণ করার কারণ অন্তত আংশিকভাবেও এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশল সন্তান উৎপাদন এবং নিছক যৌন প্রক্রিয়াকে পৃথক করে দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ যৌন জীবন ও বিবাহের সামাজিক উদ্দেশ্যকে এমনভাবেই স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যে একদিন যে পার্থক্য উপেক্ষা করা যেত, আজ তা অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আজ দুটি নর-নারী শুধু যৌন লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে, যেমন গণিকালয়ে একত্র হতে পারে। দ্বিতীয়ত হতে পারে, বিচারপতি লিন্ডসের প্রস্তাবিত সম্প্রীতির বাসস্থলে যার মধ্যে যৌনমিলনও থাকবে আংশিক-ভাবে। পরিশেষে তাদের মিলনের উদ্দেশ্য হতে পারে সন্তানলাভ ও সংসার-পরিবার গড়ে তোলা। প্রত্যেক উদ্দেশ্যই পৃথক এবং বর্তমান অবস্থায় কোন নীতি-বাদই তাদের একটি স্বাতন্ত্র্যহীন সামগ্রিকতায় সমষ্টিবদ্ধ করতে পারবে না।"

(ম্যারেজ এন্ড মরাল)

।। ব্যালাড অব এ মাইনার ।।
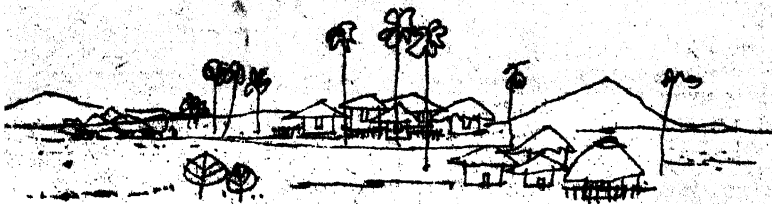
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে কাহিনীর শুরু। যুদ্ধপরবর্তীকালের অর্থনৈতিক সংকট-এর সময় পর্যন্ত কাহিনীর গতিই চেক খনি-মজুর রুডলফ হুডেৎস ধর্মঘটে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় যেমন তার চাকরি যায় তেমনি অন্য কোথাও চাকরি জোটে না। কোন খনি-মালিকই তার উপযুক্ত দারিদ্র পালন করলে না উপযুক্ত কর্মক্ষম একটি মানুষের জন্য। সংকটময় অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য রুডলফ দেশ ছেড়ে জার্মানীতে চলে গেলেন। অন্য নাম নিয়ে কাজ করতে লাগলেন এক খনিতে।

মারিয়ে মায়েরোভা

মিলচা রুডলফ-এর বাগদত্তা। সে এসে মিলিত হল। সামান্য আয়ের একটি সুখের সংসার গড়ে উঠল। কিন্তু রুডলফকে গ্রেপ্তার করে বাধ্য করা হল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীতে যোগ দিতে। তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন রুডলফ খনির কাজে। কিন্তু একদিন তাঁর উপযুক্ত বড় ছেলে মারা গেল দুর্ঘটনায়। একসময় রুডলফকেও দুটি আঙুল হারাতে হল। তারপর যুদ্ধ থামল। দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু রুডলফের তখন আর চাকরি নেই। যুদ্ধান্তের অভিশাপে বেকার। দেশে ফিরেও কোন সুরাহা হল না। বেঁচে থাকার তাগিদে রুডলফ একদিন পথে নেমে এলেন মানুষের দয়ার ওপর নির্ভর করে। একটি চাকরি একটি সংসারকে সুখে থাকতে দিল না। ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে রুডলফের এই পরিণতি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক—বীভৎস যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।

'ব্যালাড অব এ মাইনার'এর কাহিনী অতি সুন্দর এবং জটিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কাহিনী শ্রীমতী মারিয়ে মায়েরোভার অসামান্য সৃষ্টি। অশীতিপর বর্ষীয়া লেখিকা সাম্প্রতিক [illegible] সাহিত্যসেবী।

চেক্ সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি সরকারী জাতীয় পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

ক্লাড্নো চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। খনি-মজুরদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মায়েরোভার যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঐ শিল্পাঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'সাইরেন'। পরবর্তীকালে ঐ একই অভিজ্ঞতার ভূমিকায় রচিত 'ব্যালাড অব এ মাইনার'।

মায়েরোভা বেশী জাঁকজমক করে লিখতে বসেন না বা তিনি আড়ম্বরও পছন্দ করেন না। যা বলতে চেয়েছেন পরিষ্কারভাবে বলেছেন কোন জটিলতার সৃষ্টি না করে। রুডলফ জীবনকে ভালবাসে। সে বাঁচতে চায়। মোটামুটি স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে সামান্য সুখের স্বপ্ন দেখতে চায়। তার লোভ কম। তবুও পরিণতি ভয়াবহ এবং করুণ। জীবনকে কত গভীরভাবে ভালবাসা যায় তার প্রতীক রুডলফ। কাহিনীর পাতায় ফুটে ওঠে তার অকৃত্রিম জীবন-বোধ। মমতামাখা জীবনধারার ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে সায়াহ্নের শকুন অতি দ্রুত নেমে আসে। রুডলফ মানুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ধুলোর পুতুল ধুলোতে মিশে যায় বাঁচার দাবীকে অক্ষয় করে।

মিলফাইট এবং মিলচারের প্রবল প্রভাব পড়েছে রুডলফের জীবনে। মিল-ফাইট রুডলফের সহকর্মী বন্ধু। এদের জীবনপ্রবাহ কোন তত্ত্বদর্শনকে প্রচার করে না। নিতান্ত সাধারণ জীবনের চলার ছন্দে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত জীবনের অন্তরঙ্গতায় জীবন্ত। কোথাও কোন সেন্টিমেন্ট নেই। মিলিত কর্মচক্রের সুখ-আনন্দের কাহিনী 'ব্যালাড অব এ মাইনার'। সেই কর্মচক্র হতে বিচ্যুত-হতাশা ও ব্যর্থতাবোধের কাহিনী 'ব্যালাড অব এ মাইনার'।

।। স্টিফেন ল্যাকনার ।।

বর্তমান জার্মান কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পী স্টিফেন ল্যাকনার। এই কথাশিল্পী সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ না করলেও [illegible] বিশেষজ্ঞতাদের অধিকারী। এখানেই রয়েছে তাঁর স্বাতন্ত্র্য—অন্যান্য জীবিত সমকালীনদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। দৃশ্যগোচর বস্তুমাত্রেই কৌতূহলের সামগ্রী এবং শিল্পেরও বিষয়। নিপুণ হস্তে ঐ সমস্ত বস্তুপুঞ্জ শিল্পরূপ লাভ করে। সাহিত্য-গুণান্বিত সামগ্রিক শিল্পকৃতি সত্য ও সুন্দরের অনির্দেশ্য জগৎ হয়ে ওঠে। একটি কবিমন যেন অনুক্ষণ জাগ্রত।

বর্তমান আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ল্যাকনার গভীরভাবে জড়িত। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্টাবারার স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘকাল নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইউরোপেও এসেছেন কয়েকবার। জার্মান পিতামাতার সন্তান ল্যাকনারের জন্ম ১৯১০ সালে প্যারিসে। সে সময় বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্টে বসবাস করেন। গিসেন-এ শিক্ষালাভ করে দর্শন-শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

ল্যাকনারের জীবনারম্ভ হয় একজন খেতমজুরের কাজের মধ্য দিয়ে। লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ হয় সংবাদপত্রে। ১৯৩৯ সালে প্যারিস থেকে উত্তর আমেরিকায় চলে যান। তারপর আবার ইউরোপে আসেন যৌবনকালের তীর্থ-ক্ষেত্র দর্শনমানসে। ১৯৩৮ সালে ম্যাক্স বেকমান ল্যাকনারের 'ডের মেনশ্ ইস্ট কাইন হাউস্টির' গ্রন্থখানি চিত্রায়িত করেন। চব্বিশ বৎসর পরে ল্যাকনার এই

স্টিফেন ল্যাকনার
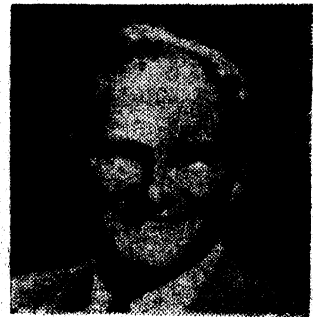
ক্ষমতাশালী শিল্পীর জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ল্যাকনার কোথাও স্থির হয়ে থাকেননি। তাঁর গ্রন্থগুলি প্রকাশস্থানও বিচিত্র। যখন যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই যেন বইগুলি প্রকাশিত। কয়েকটি বইয়ের নাম ও প্রকাশস্থান উল্লেখ করছি—'ইরান হাইমাৎলোস' (জুরিখ), 'ম্যান কন উইডারস্তেহন' (জিনেভা), 'ভিলকভার ইওয়েনস্তুর' (নিউইয়র্ক), 'ম্যাক্স বেকমান' (বার্লিন)। 'ইন লেটস্টেন ইওয়েনটাকত' নামক নাটকে মানব-সভ্যতা বিভাজনে মানবের বিপদ ও সংকটের মর্মস্পর্শী রূপকে তা চিত্রিত করেছেন ল্যাকনার।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

অঘ্রান মাসের পয়লা তারিখেই হঠাৎ একটা পালকি এসে থামল কনকদের বাগানে। দুপুর পার হয়ে গেছে বিকেল শুরু হয়নি—এমনি সময়টা শ্যামা খেয়ে আঁচিয়ে উঠে ঘাটের ধারে দাঁড়িয়েই রোদ পোয়াচ্ছেন। উঠোনে এত গাছপালা হয়েছে যে ভাল করে রোদ নামেই না এখনও।

হঠাৎ পালকি আসতে দেখে শ্যামা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কনকও বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ পেয়েছিল, সেও ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের বাড়িতে আবার পালকি করে কে আসবে। এতকালের মধ্যে তো কাউকে আসতে দেখে নি সে!

পালকির পিছনে পিছনে একজন পিজেরোগা ধরনের রুগ্ন-ঘষা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসছিলেন, এতক্ষণ ওরা দেখতে পায়নি। তিনি পালকি-বেয়ারাদের সঙ্গে অত দ্রুত চলতে পারেন নি—পিছিয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি ছুটে এগিয়ে এসে পালকির দোর খুলে কাকে যেন হাত ধরে আস্তে আস্তে টেনে বার করলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় বয়ে আনার মতো করেই বাইরের ঘরের রকে বসিয়ে দিলেন। একটা সাদা বোম্বাই চাদর মুড়ি দেওয়া—ঠকঠক করে কাঁপছে সে আর কী রকম একটা অবাক্ত আওয়াজ করছে।

মুড়ি-দেওয়া হলেও মেয়েছেলে নয় এটা বোঝা গেল। খানিকটা কোঁচা খুলে পড়েছে এদিকে—অর্থাৎ পুরুষ।

সঙ্গের অভিভাবকটি এতক্ষণ এদের সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি, এদিকে ফিরে তাকান নি। এবার এদিকে ফিরে—কাকে নমস্কার করবেন ঠিক করতে না পেরে শ্যামা ও কনকের মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য করে নমস্কার করলেন। শ্যামা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও একখানি খাটো ময়লা ধুতি পরে ছিলেন—তাই বাড়ির গৃহিণী না দাসী বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক।

সে ভদ্রলোকটিও অবশ্য খুব সুস্থ নন। তাঁর মুখের চেহারাও যৎপরোনাস্তি শীর্ণ ও দুর্বল—অনেকদিন কোন রোগে ভুগছেন বলেই মনে হয়। বেশভূষাও তথৈবচ। অত্যন্ত মলিন ধুতি পরনে—জীর্ণ গলাবন্ধ ময়লা কোটের ওপর ততোধিক ময়লা একটি উড়ুনি। নমস্কার করা হয়ে গেলে দু-হাতে উড়ুনির দুই প্রান্ত ধরে ওধারের তুলসী গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্যামা এতক্ষণ অবাক হয়ে চেয়েছিলেন শুধু, এবার বিস্মিত এবং ঈষৎ বিরক্তভাবেই বললেন,—'এসব কী ব্যাপার? কারা আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় আপনাদের বাড়ি ভুল হয়েছে। কোন্ ঠিকানা খুঁজছেন বলুন তো?'

গলার আওয়াজে নিঃসংশয়ে শ্যামাকেই বাড়ির কর্ত্রী বুঝতে পেরে তিনি চাদর ছেড়ে দিয়ে জোড় হাতে আর একটি নমস্কার করলেন, তারপর বিনীত কণ্ঠেই বললেন, 'আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ, বাড়ি ও-ই চিনিয়ে দিয়েছে। আপনার ছেলে!'

আপনার ছেলে!

চমকে পিছিয়ে উঠলেন শ্যামা। কনকও।

বোধহয় সামনে ভূত দেখলেও অত চম্‌কাত না তারা।

'ছেলে!' খানিকটা পরে বাক্যস্ফূর্তি হয় শ্যামার, 'আমার ছেলে? কোন্ ছেলে!'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যান তিনি সেই মুড়ি-দেওয়া কম্পমান মূর্তিটার দিকে। সামনে গিয়ে ঝুঁকে ভাল করে মুখটা দেখার চেষ্টা করেন।

অনেকক্ষণ পরে চিনতেও পারেন।

কান্তি!

সঙ্গে সঙ্গে—এতকাল পরে তাঁর সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন। চিৎকার করে—মড়াকান্নার মতো। কনক ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না। তারও দুচোখ ভরে জল এসে গিয়েছে। চিনতে পেরেছে সেও।

কান্তিই—কিন্তু এ কী চেহারা তার!

শেষ যেবার আসে সে—কনক দেখেছিল—একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের মতো।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অপূর্ব সুশ্রী: কান্তিমান তরুণ ছেলে। দীর্ঘ সুঠাম গঠন, দীর্ঘায়ত টানা চোখে, ... সুন্দর বঙ্কিম ঠোঁটের ওপর ... রেখা। আর তেমনি সরল ... আর কিছু দিন পরে ...

সুপুরুষ হয়ে উঠবে—তা তখনই দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

আর এ যে এসেছে—তার রঙ রোদ-পোড়া তামাটে কালো, গায়ে খড়ি উড়ছে, রুক্ষ পাতলা চুল, হাত-পা কাঠিকাঠি। মুখে যেন—বলতে নেই—মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে একেবারে। তেমনি ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি।

এ কী সেই লোক? বিশ্বাস হয় না যে কিছুতেই।

শ্যামার মড়া-কান্না শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এল অনেকে। স্বয়ং মল্লিক-গিন্নীও এসে দাঁড়ালেন। তিনি প্রবীণ লোক, বহুদর্শী। এক নজরে দেখে নিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। শ্যামাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ষাট্ ষাট্, ও কি কথা। অমন মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছ কেন গা! অলুক্ষুণে কাণ্ড, ঠিক দুপুর বেলা! রোগা ছেলে এসেছে—আগে তাকে ঘরে তোল, তার মুখে একটু জল দাও—তা নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলে! আর তুমিও তো তেমনি বোকা। যাও ওকে ছাড়, দেওরকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাও। এত কান্নাকাটির হয়েছেই বা কী, অসুখ করলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়—আর পুরুষ মানুষ সুন্দর চেহারা ওর কী কাজেই বা আসবে। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে তাই অমন কাঁপছে—আহা বাছারে!'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এই কান্নাকাটি দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। মল্লিক-গিন্নীর কথাতে তিনিও খানিকটা ধাতস্থ হলেন। অকারণেই তাঁকেও একটা নমস্কার করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ্ ঠিক ধরেছেন। ম্যালেরিয়াই বটে। ঐ এক কাল-রোগেই দিলে আমাদের দেশটাকে উচ্ছন্ন ক'রে। কী কালব্যাধি যে তা বলবার নয়। এ ছেলেটিও অনেকদিন ধরে ভুগছে মা—পুরনো রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও চিকিচ্ছে করলে হয়ত বাঁচবে, যেভাবে পড়েছিল, না চিকিচ্ছে না কিছু—বেঘোরে, সে ভাবে থাকলে আর বাঁচত না।'

মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'তা তুমি কে বাছা? একে পেলেই বা কোথায়?'

'আজ্ঞে মা আমি ওখানকার ইস্কুলের জয়েন্ট হেডমাস্টার। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত। অনেক পড়েছে অনেকদিন। সেই বর্ষার গোড়া থেকেই বড্ডো। তাতেই বেশী, মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে ইস্কুলেও আসে। আমাদের হোস্টেলে তো থাকে না—থাকে বাবুদের কাছাড়ী-বাড়িতে। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা—গোমস্তা-মুহুরীদের সঙ্গে। আমাদের অত দায়ও নেই তাই। এবারে অনেকদিন ইস্কুলে আসে না দেখে—পরীক্ষার সময় এসে গেল ওর, হেডমাস্টারমশাই আর আমি খবর নিতে গেলাম। গিয়ে দেখি এই অবস্থা—উঠতে পারে না, মড়ার আকৃতি। ওদের জিজ্ঞাসা করলুম যে ডাক্তার দেখিয়েছে? বলে সে রকম তো হুকুম নেই। আমরা কলকাতায় লিখেছি—কোন উত্তর পাইনি। খরচা করলে দেবে কে? তা মাস্টারমশাই বললেন, বাপু হাসপাতালেও তো দেখাতে পারতে—তা বলে, আজ্ঞে দুকোশ পথ, গোরুর গাড়ি ছাড়া তো যাওয়া চলবে না—সে ভাড়া দেবে কে? চোর চোর—বুঝলেন না মা, মহা চোর! জ্বর হ'লে শুধু একটু নির্জলা জল-সাবু দিয়ে ফেলে রাখত। একটা চাকর আছে কাছাড়ীর হরিহর বলে—সে নাকি মধ্যে মধ্যে তার নিজের পয়সায় পোস্টাপিস থেকে কুইনাইন এনে খাওয়াত, ঐ কুইনাইন, তাই খেয়ে খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করছে, কানে শুনতে পায় না। কেন মা—আপনিই বলুন, বাবুরা ওর খোরাকীর পয়সা দেয় তো—তা থেকেও তো বাঁচে কিছু, অসুখ হ'লে তো এক পয়সায় সাবুতে চলে যায়—তা এক দিন আর গ্রামের বটুক ডাক্তারকে ডাকা যেত না! তার তো মোটে এক টাকা ফী। আমাদেরও খবর দিলে পারত!'

'এখানে চিঠি দেয়নি কেন, এদের ছেলে, এরা গিয়ে নিয়ে আসত!' মল্লিক-গিন্নী প্রশ্ন করেন।

'কি জানি মা, তা বলতে পারব না। ওরা তো বলে ছেলে নাকি বারণ ক'রে-ছিল। বলেছিল শুধু শুধু ব্যস্ত করা। তাঁদের এমন পয়সা নেই যে আসবেন বা চিকিৎসার টাকা পাঠাবেন।...... তা আমাদের হেডমাস্টারমশাই বললেন, এ তো ছেলেটা এখানে থাকলে এক মাসও বাঁচবে না তাই জয়কেষ্ট, একে দিয়ে আসতে হবে। সব মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে দু-আনা, চার-আনা চাঁদা তুলে, ইস্কুল থেকেও বই বাঁধাই চার্জ বলে কিছু লিখিয়ে নিয়ে—আমাকে দিয়ে পাঠালেন।'

পাড়া-প্রতিবেশী-মেয়েরা এতক্ষণে অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছে, তারা তাঁদের জনাদা দিয়ে উঠল। জয়কৃষ্ণবাবুর বোধকরি ওদের কান্নাটা মনেই ছিল না, তিনি অকারণেই এতখানি বিরক্তিতে ভুগলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে বাবারা, দিচ্ছি। এক মিনিট!'

যথারীতি ভাড়া নিয়ে খানিকটা তকরার করার পর ভাড়া নিয়ে যখন তারা চলে গেল তখন জয়কৃষ্ণবাবু তাকিয়ে দেখলেন যে চারিদিক খালি হয়ে গিয়েছে। শ্যামা ও কনক ধরাধরি করে কান্তিকে নিয়ে ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে যারা ছিল তারাও ঘরে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শুধু মল্লিক-গিন্নীই তখনও সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ইতস্ততঃ করছেন। বোধহয় জয়কৃষ্ণবাবুর কথাটা ভেবেই ভেতরে যেতে পারেন নি।

খানিকটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবার পর জয়কৃষ্ণবাবুর সম্ভবত বোধগম্য হ'ল এই তথ্যটা যে এখন তিনি অনাবশ্যক।

বাড়িতে যে অবস্থা চলছে, তাঁর দিকে কারুর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন। লোকও বেশী নেই—ঐ দুটি স্ত্রীলোক ছাড়া—নইলে তাদের কাউকে দেখা যেত। পুরুষ-মানুষ কেউ এখন থাকার কথাও নয়।

সুতরাং এখন চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা, এবং কাকেই বা বলে যাবেন বুঝতে না পেরে মল্লিক-গিন্নীকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তাহলে আমি মা এখন যাই, ও'দের বলে দেবেন। ভাল হয়ে যদি আবার যেতে চায় তো যাবে। তবে এ বছরের টেস্ট্ বোধহয় আর দিতে পারবে না—সে তো এসে পড়ল বলে। আর তা যদি দিতে না-ই পারে তো গিয়েই বা লাভ কি। ওখানে থাকলে আবারও পড়বে। আমরা কি হপ্তায় কুইনাইন খাই নিয়মিত—তাই টিকে না হাল।'

তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চাদরের খুঁটটি আবার দুহাতে চেপে ধরলেন, অর্থাৎ রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মল্লিক-গিন্নী মিনিটখানেক ইতস্তত করলেন, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর আবার বেরিয়ে এসে বললেন, 'যাবেন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি বোধ হয়?'

'আজ্ঞে কখন আর হবে বলুন। রাত থাকতে লোকের গাড়িতে চেপেছি তো—

অনেকটা পথ। তাই গাড়োয়ানকে বলে বোর্ডিং এই গাড়ি মজুত রেখেছিলুম রাত্তিরে। তারপর তো ধরুন তিনবার ট্রেন বদলে আসা। সকালে সেওড়াফুলীতে একটু যা চা খেয়ে নিয়েছিলুম—একেও দিয়েছিলুম, সহ্য করতে পারলে না, বমি হয়ে গেল।...... তা সে যা হোক, আমার জন্যে ভাববেন না, এই যাবার পথে যা হয় কিছু জলটল খেয়ে নেব এখন। দিয়েছেন—মাস্টারমশাই পয়সা সব হিসেব করেই দিয়েছেন। এই পাল্কিটাতে দু আনা চারেক বেশী লাগল। তা তাতেও আটকাবে না। যা হোক করে হয়েই যাবে।'

তিনি একটু হেসে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন। মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'না না, সে কখনও হয়! আপনি এত কষ্ট করে নিয়ে এলেন আমাদের ছেলেকে, মহা উপকার করলেন, প্রাণ-রক্ষাই করলেন ওর বলতে গেলে। এরা বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে, বুঝলেন না—অমন সোনার চাঁদ ছেলের এই ছিরি, আঘাতটা লেগেছে খুব। তাই আর হুঁশপথ্য কিছু নেই। নইলে এখানেই সব ব্যবস্থা করে দিত এরা। ছেলের দাদা থাকলে খরচপত্রও দিয়ে দিত। তা আপনি বরং আমার ওখানেই চলুন—যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নেবেন। ডাল তরকারী সবই কিছু কিছু আছে—দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে বেশী দেরি লাগবে না। আমরাও ব্রাহ্মণ, আমাদের ওখানে খেতে আশাকরি আপনার আপত্তি হবে না।

'না না—সেসব কোন-কিছুই নেই আমাদের। আমরা পাল—ঐ মৃত্তিকার কাজ আমাদের কুলকর্ম। তা চলুন। তবে বিকেলের গাড়ি না ধরতে পারলে ওদিকে গিয়ে ইস্টিশানে পড়ে থাকতে হবে। যা পথ, রাত বেশী হয়ে গেলে আর যেতে ভরসা হয় না। নেই কি, বাঘ, ভালুক থেকে সাপখোপ সব আছে। বুনো শিয়ালরাও কম যান না। অবিশ্যি আছে, ইস্টিশানের কাছেই একঘর কুটুম্বও আমাদের আছে। অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই এই যা—তবে গিয়ে দাঁড়ালে চিনতে পারবে। সে যা হয় একটা হবেই'খন ব্যবস্থা। আপনাদের প্রসাদ দুটি পেলেই যাই।'

মল্লিক-গিন্নী একটু হেসে বললেন, 'না না, আমি বেশীক্ষণ আটকাব না। ট্রেন আপনি পাবেন। যা হয় একথালা [illegible] দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। আপনি স্নান করতে করতেই—'

এতখানি জিভ কেটে জয়কৃষ্ণবাবু বললেন, 'স্নান? ঐটি মাপ করবেন মা। স্নান করি আমি ধরুন মাসে একদিন। তাও ফুটনো জল ছাড়া চলে না। তাতেই কি নিস্তার আছে—যতদিন পরে যেভাবেই করি না কেন, মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে। ঐজন্যে ছুটিছাটা দেখে করতে হয়—যাতে একদিন শুয়ে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। চান করার দরকারও নেই তেমন—মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলবে।'

তাই তো ন্যায্য ডাক্তার ডাকতে আপত্তি করেছিলেন, পরের দিন সকালে হাস-পাতালে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলেন। হেম ধমক দিয়ে উঠেছিল বলে মুখে বেশি কিছু বলতে পারেন নি।

'তোমার যেমন কথা। অজ্ঞান অচৈতন্য রুগী, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, ওকে টেনে নিয়ে যাব হাস-পাতালে। তা হ'লে তো পাল্কি করতে হয়, সেও তো যাতায়াতে অন্তত দেড় টাকা। তাছাড়া ও অবস্থায় পাল্কিতেই বা উঠাব কী ক'রে! একটু থাকে না এতো ওকে নড়ানোই উচিত নয়!'

মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে...

'তা হলে চলুন।' বলে মল্লিক-গিন্নী আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তাঁকে।

হেম সেদিন এসে পৌঁছল রাত নটারও পর। সব শুনে সে অবশ্য তখনই ছুটল ডাক্তারের বাড়িতে কিন্তু ডাক্তার এলেন না। তাঁর [illegible] ব্যথা, রাত্রে আর বেরোতে পারবেন না। আর [illegible] নতুন ডাক্তার বসেছেন বটে, তাঁর [illegible] কী, ডাক্তারও তত সুবিধের নয়। [illegible]-

সুতরাং সে রাত্রে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। এরা শুধু সবাই মিলে জেগে ঘিরে বসে রইল সারারাত। রোগীর কোন জ্ঞানই নেই, অসাড়ের মতো পড়ে আছে। শেষরাত্রের দিকে জ্বর একটু কমল কিন্তু তখনও জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। [illegible] কিনা —এক এক সময় [illegible] বুকে [illegible]। [illegible] একটু [illegible] [illegible] ভাত

শ্যামা একবার একটু বেশী জল দিয়ে ফেলেছিলেন, দুদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, মুখে রেখে একটু একটু ক'রে খেতে পারল না।

সকালবেলাই হেম আবার গেল ডাক্তারের কাছে। ফকির ডাক্তার—দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, খুব দূর নয়, কিন্তু একবার বেরিয়ে পড়লে ধরা মুস্কিল। ফকির এককালে এখানকার বড় ডাক্তারের কম্‌-পাউণ্ডার ছিলেন, তিনি মারা যেতে বাজারে এক ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে বসেছেন, নিজেই চিকিৎসা করেন। সবাই বলে ফকির বিচক্ষণ ডাক্তার—এম-বি পাস ডাক্তারের চেয়েও ভাল। হয়ত আরও বলে, মাত্র এক টাকা ফী বলে। কোথাও কোথাও আটআনাও নেন। ডিস্‌পেন্‌-সারীতে গেলে (ফকির বলেন চেম্বার) তাও লাগে না, অথচ প্রত্যেককেই যত্ন ক'রে দেখেন। ওষুধও অনেক সময় বাকীতে দেন— ওষুধের দামও কম। যে মিক্সচারটা সব জায়গায় বারো আনা—কলকাতায় এক টাকা পাঁচসিকে—উনি সেইটেই নেন দশ আনা করে। গরীব-দুঃখীর ক্ষেত্রে আরও কমিয়ে দেন দাম। আট আনা সাত আনা যার কাছে যা পান তাই নেন।

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। এসেছিলেন হাসি হাসি মুখে কিন্তু দেখতে দেখতেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'শুনেছিলুম বটে ওদেশের ম্যালেরিয়ায় খাব সুন্দর জল হয়ে যায়—কিন্তু ভাবতুম ওটা কথার কথা। এখন দেখছি সাংঘাতিক সত্যি! ইস! এখানেও তো ম্যালেরিয়া কম নেই কিন্তু এমন ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া তো কখনও দেখিনি মশাই। সমস্ত রক্ত শুষে খেয়েছে একেবারে! বললে বিশ্বাস করবেন না—বোধ হয় এক ছটাক রক্তও আর দেহে নেই। এধারে পিলে লিভার দুই-ই বেশ ডাগর। খুব সাবধানে রাখতে হবে। দুধ

কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা

দেবার আর চেষ্টা করবেন না এখন, লিভারের যা অবস্থা সইতে পারবে না। ফলের রস মিছরির জল—এইসব খাওয়ান। ওষুধ দিচ্ছি দুরকম—তবে ওষুধের চেয়ে পথ্যির দিকেই মন দিতে হবে বেশী। পাংলা সাবুর জল আর মিছরির জল, এই-ই এখন চলুক। নাড়াচাড়া করতে যাবেন না—যে কোন সময়ে হার্টফেল করতে পারে—দেহের এমনি অবস্থা। এতটা পথ এল কী ক'রে তাই ভাবছি।'

এর পর দশবারোদিন ধরে চলল—বলতে গেলে যমে-মানুষে টানাটানি। শ্যামা দিনরাতই আগলে বসে রইলেন। হেম অফিসের ফেরৎ এসে কাছে বসলে তিনি একটু উঠতেন। তাও হেমকে সন্ধ্যা-বেলাই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হ'ত দুদিন একদিন অন্তর। ভোরে তার সময় হ'লেও ডাক্তার ভোরে উঠবে কেন? কনকের ওপর সারা সংসার পড়েছে—বাড়ির পাট বাসন-মাজা রান্না সব। দুপুর ছাড়া সে কাছে এসে বসবার ফুরসুৎ পেত না। সেই সময়ই যা একটু ছাড়া পেতেন শ্যামা। প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নানাহার একসঙ্গে সেরে নিতে হ'ত। ঐ সময়েই ঘন্টা দুই একটু গড়িয়েও নিতেন তিনি। রাত্রে ঘুম হ'ত না। একটি প্রদীপ জেবলে রেখে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে একা জেগে বসে থাকতেন। জেগে না থেকে উপায়ও নেই। অজ্ঞান অচৈতন্য ছেলে মুহুর্মুহু শুধু হাঁ করছে আর ঠোঁট নাড়ছে। অর্থাৎ জল। সাবুর জল ফলের রস মিস্ত্রীর জল—সবই চামচে ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে। অচৈতন্য অবস্থায় খাওয়া। ডাক্তার শাসিয়ে গেছেন, 'খুব সাবধানে পথ্যি দেবেন—এ অবস্থায় বিষম লাগলেই বিপদ!'

দিনের বেলা আসে অনেকেই। তরু আর হারান এসে একদিন লেবু আঙুর দিয়ে গেছে। বড় জামাই এসে খবর নিয়ে যান প্রায় নিত্য। নিত্যই এক জোড়া ক'রে কমলালেবু এনে রেখে যান। এ ছাড়া ডাক্তারের ফল খাওয়াবার নির্দেশ মানা যেত না। সাবু, মিস্ত্রী ছাড়া আর কিছু কিনতে পেন নি শ্যামা। ফলের কথায় বলেছিলেন, 'ওসব বড়লোকের জন্যে ব্যবস্থা। ফল না খেলে যদি ছেলে সারবে না—তবে ডাক্তার দেখাচ্ছি কেন? রাশ রাশ ওষুধই বা কিনের জন্যে। না, অত পারব না। তা ছাড়া, কমলালেবুতে ঠাণ্ডা করে—আমরা দেখেছি কবরেজরা খেতে দিত না। জ্বর অবস্থায় লেবু খেলে দুর্ষে না হয়!'
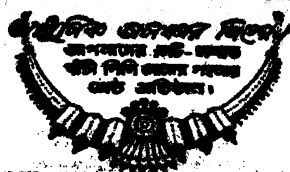
—কিন্তু পরে কিনে নিয়ে যেতে খুব আর আপত্তি করেন নি।

বাস্নাই আসত দিনের বেলা। একদিন পালকি ক'রে এসে মঙ্গলাও দেখে গেলেন। একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন আজকাল। হুঁশিয়াইয়ের দরুণ জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে-পায়ে হাজা দগ্‌দগ্‌ করছে। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আসছে কি দের!' সম্বন্ধ ছেলেরা ব্যাপ্ত ক'রে নিয়েছে,' এখন তো ওদের এক্তাজারি! একটা পয়সা খরচ করতে গেলেও ওদের কাছে হাত পাততে হয়। আর হাত পাতলেই কী চোখরাঙানি বাবুদের—পারব না অতসব, অত নবাবি চলবে না! এইসব। কী করব—হাতী যখন দ'কে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট মারে!' তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন, 'কী জানিস বামনি, আছে, এখনও কি দুচার টাকা নুকনো নেই মনে করিস—তা আছে। কিন্তু তবু ছেলেদের কাছে চাইতে হয়। না চাইলেই সন্দ করবে যে, তবে তো মা-মাগীর কাছে এখনও দুপয়সা আছে—আর অমনি ভাগাড়ে গরু পড়ার মত চিল-শকুনের দল এসে পড়ে দুয়ে বার ক'রে নেবে। এই শেষ বয়সে একটা পয়সার আজীর হয়ে পড়ব নাকি? এখনও কতদিন বাঁচতে হবে তার ঠিক কি?

তারপর মুখ বাড়িয়ে হাতে করে বয়ে আনা পিকদানীটায় খানিকটা পিক ফেলে বললেন, 'দেখলি তো বামনি—তখন যদি ছেলেটাকে ঘরজামাই দিতিস তাহ'লে আজ আর ওর এই হাল হ'ত না। সেই যে বলেছিলুম তোকে—মনে আছে? সে মেয়ের তো বে হয়ে গেছে। বে দিয়েই তো বাপ মিন্‌সে অক্কা—এখন জামাইয়ের বাপ, মা, ভাই ঘরে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব করছে, তাদেরই যথাসব্বস্ব। জামাইকে পোষ মানিয়ে পর ক'রে নেবার তো আর সময় হ'ল না—তার বাপমায়ের দিকে টান ষোল আনাই থেকে গেল। যে মেয়ে শাশুড়ীর ঘর করতে গেলে দুঃখু পাবে বলে এত কান্ড করলে মিন্‌সে, সেই মেয়েই এখন উঠতে বসতে শাশুড়ীর ঠোনা খাচ্ছে! তুই যদি দিতিস তাহ'লে তোরও আজ অমনি দন্তাদ্দি বজায় থাকত।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তোর কপাল তো ভাল নয়—বার বার তো দেখলি! তোর উচিত ছিল দিয়ে দেওয়া। পরের কপালে ছেলে ঠিক থাকত।... এখন গেল তো—ছেলের রূপের দেমাক, লেকা-পড়ার দেমাক কিছুই তো রইল না আর—এখন কেঁদে কেঁদে মর।...আর কী হয় তাই দ্যাখ্—এই রকম শক্ত অসুখ হলে শুনেছি একটা অঙ্গ নিয়ে তবে রোগ যায়। ভাল যদি বা হয়, আস্ত ছেলে ফিরে পাবি কিনা সন্দেহ!'

শ্যামা এতক্ষণে কথা বলবার অবকাশ পেলেন, 'ওসব কথা বলবেন না মা, বরং আশীর্বাদ করুন ছেলে ভাল হয়ে উঠুক!'

'ও কী লো, বামুনের ছেলেকে আশীব্বাদ ক'রে কি অকল্যেন টেনে আনব আমার ঐ শত্তুরগুলোর মাথায়! বেশ বললি তো! ভগবানকে ডাক, তাঁর কাছে মাপ চা। গেল জন্মে এ জন্মে ঢের পাপ করেছিস—তাই এত দুর্গতি। ভগবানের কাছে মানৎ কর তবে যদি গোটা ছেলে ফিরে পাস!'

তারপর আঁচল খুলে দুটো টাকা বার ক'রে কান্তির বিছানার পাশে রেখে বললেন, 'তোর অভাব নেই আর—তবু আমার একটা কত্তব্য আছে তো। সাবু, মিছরি কিনে দিস ছেলেটাকে। পেটের শত্তুরদের ভয়ে ওখান থেকে কিনে আনতে পারি নি—তাহ'লেই জেনে যাবে হাতে টাকা আছে। আর একবার টাকার গন্ধ পেলে হয়, ছিনে জোঁকের মতো ছুটে আসবে অমনি!'

আরও অনেকেই খবর পেয়ে এসে দেখে গেল।

মল্লিক-গিন্নীও দুপুরবেলা এসে বসেন।

কিন্তু রাত্রে কেউ থাকে না। একা একটা ঘরে মিটমিটে আলোতে জেগে বসে থেকে অজ্ঞান কঙ্কালসার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে—বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া কান্না গলার কাছে এসে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, ছেলের অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতেও পারেন না।

মঙ্গলার কথাটা মনে হয়ে আরও বুকের মধ্যেটা যেন হিম-হিম ঠেকে। তিনি কি আর সত্যিই গোটা ছেলেটাকে ফিরে পাবেন না? অমন রূপবান, কান্তিমান ছেলে তার।

হে মা সিদ্ধেশ্বরী! এ কী করলে মা!

আর তখনই মনে হয় ছোট খোকাটাকে বোনের কাছ থেকে আনিয়ে নেবেন এবার। বিশ্বাস নেই আর কাউকেই।
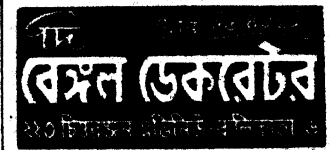
(ক্রমশঃ)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ

সুদেষ্ণা দে

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের প্রধান বন্দর পোর্টব্লেয়ার থেকে আর ৬৫ মাইল এগিয়ে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে আজও একদল বন্যজাতি শত-সহস্র শতাব্দী অতীতের সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি বজায় রেখে অস্তিত্বের ক্ষীণ সূত্রটি বহন করে বেঁচে আছে। এই বন্যজাতির নাম ওঙ্গে। ভারতের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থা গত কয়েক বৎসরের দুরূহতম অনুসন্ধানের ফলে এই ক্ষয়িষ্ণু বন্যজাতির যে ক্ষুদ্রতম দলটিকে আবিষ্কার করেছেন সংখ্যায় তারা মাত্র দুইশত। পৃথিবীর গহনতম অরণ্য প্রদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে, সভ্যতার আলো-স্পর্শহীন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে সুপ্রাচীন মানবজাতির যে ছিটেফোঁটা এখনও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা এই ওঙ্গে বন্যজাতিকে তাদেরই অন্যতম বলে দাবি করেন।

কয়েক বছর আগে যখন এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আরম্ভ হয় সে সময়ে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপের গহন-গভীর অঞ্চল সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা ছিল না এবং এই বন্য ওঙ্গেদের পাশবিক হিংস্রতায় ঐ অঞ্চলে অভিযান ছিল দুঃসাহসিক এবং ভয়ঙ্কর। এই ওঙ্গে জাতি ছাড়াও ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে আরও যে দুটি জাতি বাস করে শত্রু-মনোভাবে তারাও ভীষণ হিংস্র। এই দুই জাতির ক্রূর হিংস্র আচরণের জন্যই গবেষকরা আজও তাদের বিষয় বোধ করি কিছুই জানতে পারেননি।

নিগ্রো শ্রেণীভুক্ত এই ওঙ্গেরা উচ্চতায় মাঝামাঝি ধরনের। দৈহিক গঠনে তারা অত্যন্ত পরিপুষ্ট এবং বীর্যবান। মাথায় নিগ্রোদেরই ধরনে ভেড়ার লোমের মত কুঞ্চিত কালো কেশের প্রাচুর্য। এরা কৃষিকর্ম জানে না। বন্য পশু শিকার, মৎস্য শিকার, খাদ্য-যোগ্য বন্য ফলমূলাদি ও মধু খেয়েই প্রধানত জীবনধারণ করে। শাঁখ ও শুক্তি জাতীয় জলজ প্রাণীর শক্ত খোলায় করে এরা পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপের অধিবাসী হয়েও সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করা এরা অতি ঘৃণ্য বিরক্তিকর বলে মনে করে। নুনের স্বাদ ওদের মুখে কটু লাগে এবং দেহের স্বাস্থ্যহানি করে এই ওদের বিশ্বাস।

জীবনধারণ প্রথায় ওঙ্গেরা যাযাবর-ধর্মী। সারা দ্বীপময় এরা ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্বল্পকালীন আস্তানা রচনা করে। একই জায়গায় একই আস্তানায় কখনও একটি দল বেশি দিন থাকে না। আস্তানা বলতে এরা বোঝে একটিমাত্র কুটির—দলগত-ভাবে যেখানে বাস করা যায়। এই কুটীরগুলো এরা তৈরি করে সাধারণত সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ পাকা মজবুত করেই। একই দলভুক্ত প্রত্যেকটি পরিবারের উপযুক্ত শোবার জায়গাও তারা তৈরি করে নেয় ঐ কুটীরের ভিতরে। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রত্যেকের মাথার কাছে রাখে এরা অগ্নিকুণ্ড। কি নারী কি পুরুষ পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কিছুই ব্যবহার করে না—না গাছের ছাল, না পশু লোমের আচ্ছাদন। ঘাস জাতীয় এক-প্রকার শুষ্ক তৃণগুচ্ছের স্বল্পতম আবরণেই চলে এদের লজ্জা নিবারণ। এই কুটীরগুলির ব্যবহার অন্য একটি কারণেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মৃত আত্মীয়দের এরা কবর দেয়ার মত পুঁতে রাখে কুটীরগুলির ভিতরকার শোবার জায়গার তলায়। মৃত আত্মাকে জীবিত আত্মীয়দের নিরাপত্তা-রক্ষক বলেই মনে করে এবং আত্মা যে সব সময়ে তার অস্থি-মজ্জায় গড়া দেহ-পিঞ্জরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় তা এরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে।

ক্ষুদে আন্দামানের চারিদিকে যে সমুদ্র-তীর তার বেশির ভাগই কড়ি আর শামুক জাতীয় ছোট ছোট ঢিবিতে ভরা—সেই ঢিবিগুলির আনাচ-কানাচ সময় সময় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে-আসা সার্ডিন, হেরিং প্রভৃতি ক্ষুদে মাছের বন্যায় উথলে ওঠে। ওঙ্গে পুরুষেরা তখন সরু সরু ডিঙি ভাসিয়ে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে শিকার সন্ধানে। অনেকে আবার তীর ধনুকের বদলে গাছের ডালে তৈরি ছুঁচলো মুখ বর্শা নিয়ে শিকার করে। ওঙ্গে মেয়েরা সে সময়ে তীরের কাছাকাছি জলে ছোট একরকমের জোড়া-জাল ফেলে মাছ ধরে। এ সময়ে উদ্ভিদ-ভোজী একশ্রেণীর জলজ কচ্ছপ এবং গুগলি আহরণ করে এরা আহারে স্বাদ-বৈচিত্র্য আনে। শূকরের বংশবৃদ্ধি প্রবাদধন্য তা সকলেরই জানা আছে কিন্তু ক্ষুদে আন্দামানে তার বৃদ্ধি প্রবাদবাক্যকেও নাকি লজ্জা দেবার মতই অবিশ্বাস্য। এবং এই শূকরের মাংস ওঙ্গেদের একটি অত্যন্ত প্রিয় লোভনীয় ভোজ্য। স্বাস্থ্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এরা জলজ কচ্ছপের চর্বি মধু এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস পছন্দ করে খুব বেশি। ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে মদ্য জাতীয় কোন নেশার কথা এরা কল্পনাও করতে পারে না।

যুদ্ধপূর্বকাল পর্যন্ত ওঙ্গেরা যে রন্ধনাদি কাজে সেই প্রাচীন কালোপ-যোগী একরকম মৃৎপাত্র ব্যবহার করত সে বিষয়ে গবেষকরা নিঃসন্দেহ হলেও বর্তমানে তারা নিজস্ব কোন তৈজসপত্র আর ব্যবহার করে না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে খালি পেট্রোলের ড্রাম এবং খাদ্যের টিন এত প্রচুর পরিমাণে আন্দামানের
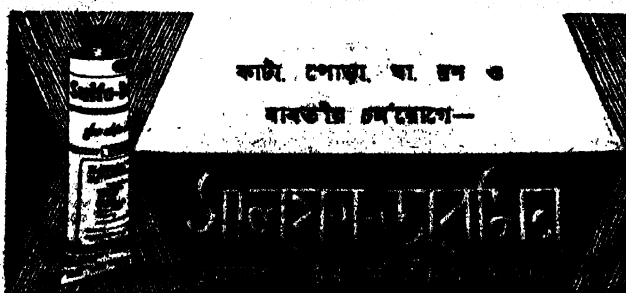
সমুদ্র তীরে ভেসে উঠেছে যে পাত্র হিসেবে একমাত্র এইগুলিকে ব্যবহার করেও এখনও এত প্রচুর সঞ্চিত হয়ে আছে যে ভবিষ্যতে হয়ত আর কোন দিনই তাদের নিজস্ব তৈজসপত্রের প্রয়োজনই হবে না।

বহু বন্য আদিবাসীদের মত ওঙ্গে পুরুষরাও বহুবিধ জ্যামিতিক আকৃতির উল্কি অঙ্কন করে নিজেদের দেহ-সৌষ্ঠবকে সজ্জিত করে। দিনের খাওয়া

ওঙ্গে পুরুষেরা বিচিত্র রঙে দেহ চিত্রিত করে। এখানে তেমনই একজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে।

শেষ করে স্বামী যখন বিশ্রামে এলিয়ে পড়েন স্ত্রী তখন তার গায়ে এই বিচিত্র-শোভন উল্কির আলপনা এ'কে পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখায়। নানা রঙের মাটি আর পাথর চূর্ণের সংমিশ্রণে মেয়েরা যে নতুন নতুন নক্সার উদ্ভাবন ক'রে এই উল্কির আলপনা আঁকে, এ শুধু তাদের নন্দনতত্ত্বের আনন্দোপ-ভোগই নয়; সুস্থ সবল দেহকে এভাবে চিত্র-বিচিত্র ক'রে রোগ-ব্যাধিকে তারা নাকি দূরে ঠেলে রাখে বলেই তাদের আজন্ম বিশ্বাস।

ওঙ্গেরা ভালবাসে যেমন স্ত্রীকে তেমনি ভালবাসে তাদের পোষ্য কুকুর-গুলিকে। কিন্তু কুকুর এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা নয়, তারা ঔপনিবেশিক স্বত্বে বিরাজমান। প্রায় বছর ত্রিশ আগে একদল বর্মী চোরাকারবারী কতকগুলি কুকুর নিয়ে উঠেছিল এই দ্বীপে। সেই থেকে এই কুকুরগুলি প্রতিপালিত হচ্ছে ওঙ্গে অধিবাসীদের দ্বারা এবং ক্রমবর্ধমান বংশবৃদ্ধির ফলে আজ কুকুরগুলির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি-পালক ওঙ্গেদের তুলনায় অনেক বেশি।

ওঙ্গে জাতির লোকগণনা করতে গিয়ে গবেষকদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুটি প্রধান বাধা। মাঝে মাঝে প্রায়ই নাম বদলানো ওঙ্গেদের একটি চিরাচরিত সামাজিক প্রথা এবং দ্বিতীয়টি হোল পোষ্য নেওয়ার প্রথা। এই পোষ্যগুলি আবার সঞ্চরমান, অর্থাৎ এরা প্রায়ই এক পরিবার থেকে অপর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে। পোষ্য-গ্রহণকারী পিতারাও পোষ্যদের নিজস্ব সন্তান বলে দাবি করতেও ছাড়ে না। বহু পিতা আবার জানেও না বা ভুলেও যায় কে বা কারা তার পোষ্য অথবা নিজস্ব সন্তান। কারণ ওঙ্গেরা এক দুই তিন-এর বেশি আর গুণতেই পারে না। ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষক সংস্থা বহু বাধা প্রতিবাধা অতিক্রম করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে ওঙ্গে জাতির মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র দুইশত।

ওঙ্গেদের জীবন-পরিধি অত্যন্ত স্বল্প। গড়ে মাত্র বিশ বছর বয়সেই ওরা মারা যায়—তবে সে ফাঁড়া যারা কাটিয়ে ওঠে তারা ত্রিশ বা চল্লিশের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বল্পায়ু এই জাতি আজ প্রায় অবলুপ্তির সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনতম মানবজাতির একটি বিশেষ শাখা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাতে না যায় সেজন্য ভারত সরকার তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্যে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে প্রচুর নারিকেল চাষের ব্যবস্থা করেছেন ঐ ওঙ্গেদের দিয়েই। অন্যান্য কৃষিকর্মেও তারা দীক্ষিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। পুনরুজ্জীবিত হয়ে বেঁচে থাকার মত জীবনীশক্তি এদের মধ্যে এখনও আছে

বিশেষ ধরণের পোশাক পরিহিতা অবিবাহিতা ওঙ্গে যুবতী

প্রচুর পরিমাণে—তাই ভারত সরকার বিশ্বাস করেন যে তাঁদের কর্মসূচী সাফল্যলাভ করবে নিশ্চয়ই এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-জাতির এই অতি বিরল ক্ষুদ্রতম শাখাটি এখনও দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে ঐতিহাসিক একটি বিস্ময় হয়ে।

ক্ষুদে আন্দামানে ওঙ্গেদের সাময়িক আবাস-স্থল

সাতপাঁচ
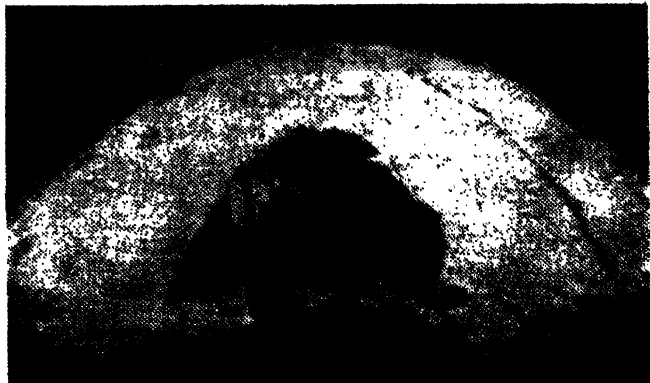
অনেকেই বাড়ীতে বেড়াল পোষেন, বেড়াল নিয়ে অনেক সোহাগ করেন, বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াল নিয়ে খেলা করে, আদর করে। চর্ম-চিকিৎসকদের মতে বেড়ালকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর কীল শহরের খবরে প্রকাশ যে বহু চর্মচিকিৎসক এক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে একটি বেড়ালকে পরীক্ষা করে দেখতে পেরেছেন যে তার লোমে একপ্রকার সংক্রামক রোগের ছত্রাক রয়েছে। বেড়ালটির দেহে রোগের লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট না হলেও একরকম আলোর সাহায্যে চর্মচিকিৎসকরা লোমের আক্রান্ত অংশ ধরতে পেরেছেন। আক্রান্ত অংশে এই আলো পড়লেই স্থানটি ফসফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে। ফলে চিকিৎসকরা যথাসময়ে রোগ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা শুরু করতে পারেন।

লোমের এই ছত্রাকগুলি বিশেষভাবে শিশুদের ত্বকের পক্ষে বিপজ্জনক। আক্রান্ত পোষা বেড়ালকে সামান্য ছুঁলে কিম্বা তার লোম আঁচড়ে দিলে ঐ ছত্রাক শিশুদের ত্বক সংক্রামিত হয় কারণ শিশুদের ত্বকের চর্বিতে ঐ ছত্রাক-প্রতিরোধক কোন পদার্থ থাকে না এবং নির্বিরোধে রোগ বাড়তে থাকে।

সাম্প্রতিককালে ছত্রাকজনিত রোগ ও ছত্রাকসংক্রমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুত বিস্তারলাভ করছে। আজকাল ছত্রাকজনিত রোগের তুলনায় জীবাণু-ঘটিত রোগ হ্রাস পাচ্ছে। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হফের মতে দুটি কারণ ছত্রাকজনিত রোগ বৃদ্ধিলাভ করছে। আধুনিক ওষুধপত্রে আজকাল মূত্রগ্রন্থির বহিরাংশ (অ্যাড্রেনাল কোর্টেক্স) থেকে তৈরী পদার্থসমূহ যথেষ্ট ব্যবহার করার ফলে দেহের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা কমে আসে অথচ এইসব বিপজ্জনক ছত্রাকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্বকের প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব ঘটলে গুরুতর ক্ষতি হতে থাকে এবং চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। আর আজকাল যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরী হচ্ছে তার গোড়ার উপাদান হচ্ছে নানাপ্রকারের সূক্ষ্ম ছত্রাক। এইসব ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবদেহের সূক্ষ্মকোষে (মাইক্রোফ্লোরা) পরিবর্তন ঘটে। সেকারণে এইসব ওষুধ শুধু যে দেহের পক্ষে বিপজ্জনক বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এমনসব বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করে যেগুলি বিপজ্জনক ছত্রাকের অপসারণে বা প্রতিরোধের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর ত্বকের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম কোষগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটলেই নানারকম ভয়াবহ সূক্ষ্ম রোগ-জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্রুত ছড়াতে থাকে। বর্তমানে এইসব ছত্রাক-ঘটিত রোগের চিকিৎসায় প্রচুর সক্রিয় উপাদান-সমন্বিত একরকম ট্যাবলেটে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাচ্ছে। তবে চর্ম-চিকিৎসকরা জনসাধারণকে এইবলে সাবধান করেছেন যে বেড়ালকে নিয়ে বেশি সোহাগ না করাই ভালো।

* * *

আগামী হেমন্তে হামবুর্গের বুকে য়ুরোপের দ্বিতীয় সর্বাধিক উঁচু স্তম্ভ তৈরীর কাজ শুরু হবে। উঁচু উঁচু সব অফিস-বাড়ী ও গির্জের চুঁড়ো ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া এই নতুন টেলিভিশনের স্তম্ভটি থেকে জার্মান টেলিভিশন কর্পোরেশন সমগ্র পশ্চিম জার্মানীতে তাদের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করবে।

হামবুর্গের এই "দৈত্যের" চেহারা, সাজসরঞ্জাম, খরচ, স্থাপত্য সম্বন্ধে এখন খ্যাতিমান স্থপতি, ইঞ্জিনীয়ার ও বিশেষ একটি কমিটির বৈঠক চলেছে, এইটুকুই বর্তমানে ঠিক হয়েছে যে স্তম্ভটি প্রায় ৯০০ ফুটের কাছাকাছি উঁচু হবে। এর এরিয়ালগুলি সবচেয়ে উঁচু বাড়ীরও মাথা যথেষ্ট ছাড়িয়ে যাওয়া চাই যাতে বিনাবাধায় সবদিকে সমান বেগে অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়। এটির খরচা যোগাচ্ছেন হামবুর্গের ডাক-কর্তৃপক্ষ। এর জন্যে প্রথমেই ইঞ্জিনীয়ারদের ২০০ ফুট গভীরে মৃত্তিকাস্তর পরীক্ষা করতে হবে কারণ এই বিরাট স্তম্ভটি নির্মাণের পূর্বে ভিত্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বর্তমানে এটি নক্সার ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এটি অ্যামেরিকার সীটলের "মহাকাশ সূচ" কিম্বা ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের নকলে তৈরী হবে না কেননা প্রধান সমস্যা হচ্ছে স্থানাভাব। তাই স্থপতিরা ঠিক করেছেন যে এটিকে তাঁরা একটি সোজা সরল কংক্রীটের টিউবের আকারে তৈরী করবেন। মাটি থেকে প্রায় ছশো ফুটের ওপরে স্থপতিরা পরিকল্পনা করেছেন একটি "মেঘ ছাড়িয়ে রেস্টুর‍্যান্ট" তৈরী করবেন যেখানে এমনসব খাদ্য পরিবেশন করা হবে যা পৃথিবীর সেরা খাদ্য-বিলাসীদের রসনা তৃপ্ত করতে সমর্থ হবে। রটারডামের য়ুরোপস্তম্ভের ৪৫০ ফুট উঁচুতে এইরকমের একটি খাবার-ঘর আছে।

স্তম্ভটি যে বিমান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাবে না, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ হয়েছেন। স্তম্ভের খাবার-ঘরটি ঘণ্টায় একবার তার কক্ষপথে ঘুরে আসবে। কর্তৃপক্ষরা মনে করেন এই "দৈত্যটি" শহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

* * *

পশ্চিম জার্মানীতে বিবাহিত জীবনের পরিসংখ্যানটি জেনে রাখুন : শতকরা ৯০ ভাগ বিবাহ স্বামী স্ত্রীর একজন মারা না যাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়, দম্পতিদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ স্বামী আগে মারা যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ স্ত্রী প্রথমে মারা পড়ে। প্রায় ৭০ শতাংশের অধিক দম্পতি তাদের বিবাহিত জীবনে রজত জয়ন্তী পালন করে এবং ষোল শতাংশ দম্পতি তাদের স্বর্ণজয়ন্তী দেখে যায়। গড়ে দম্পতিরা ৩৪ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করে। রজত জয়ন্তী পালন করতে হলে বরের বয়স ২৪ থেকে ২৬ বছর হলেই ভাল হয়। এর স্বপক্ষে বলা হয়েছে যে বিবাহিত জীবনের ৩৩ বছর পর্যন্ত যাদের বিয়ে ২১ বছরের কমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মারা পড়ার হারের অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেশি।

আলেয়া

প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
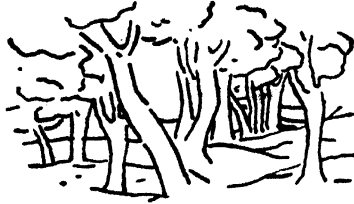
অদিতি কুনালদের বাড়ীর গেট পেরিয়ে পথে পা দিল। ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ীটার যতখানি দেখা যায় সবটুকুর ওপর সে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলিয়ে গেল। তখনো সন্ধে হতে কিছু দেরি আছে। বাড়ীর বাগানে যেখানে কবুতরদের কৃত্রিম অট্টালিকা সেখানে রয়েছে একটা দোলনচাঁপার গাছ। গাছের ডালে একঝাঁক পায়রা বসে রয়েছে। তার পিছনে দুটো দীর্ঘ ঝাউ গাছ বাড়ীর বারান্দার দুটি প্রান্ত আড়াল করেছে। ঝাউগাছের মাথা দুটো দূর থেকে মনে হয় যেন বাড়ীর তেতলার ছাদের আলসে পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেখানে তারা পৌঁছেছে ঠিক তার একটু ওপরে ছাদের ঘের পাঁচিলের ওপর দুদিকে দুটো চৌবে দুটি ফণিমনসা দুটো বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো এ বাড়ীর ঐতিহ্যের ওপর যেন কোথাও একটুও কলঙ্ক না পড়ে তার জন্যে অমিত ধৈর্যে পাহারা দিচ্ছে। ফণি-মনসার টব দুটোর মাঝখানে ছাদের পাঁচিল ও আলসে ঘেয়ে ঝুলছে একটা নীল শাড়ি।

এ বাড়ীতে অদিতির আজ প্রথম আগমন। এবার থেকে এ বাড়ীতে রোজ তাকে আসতে হবে কুনালকে পড়াতে। পল্লীবাংলার একটি বনেদি পরিবারের এই বাড়ী। কুনালের বাবা য়ুনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, মা এখানকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা। কুনালের গৃহশিক্ষকরূপে অদিতি নিজেকে কল্পনা করে মনে মনে কেমন একটু গর্ববোধ করলো। তারপর নীল শাড়িটার দিকে চাইতে চাইতে অভ্যস্ত পথ ধরে সে এগিয়ে চললো গ্রামান্তের নদীটার দিকে।

কুনালদের বাড়ীর অন্তঃপুরের খবর অদিতি জানে না। কিন্তু নীল শাড়িটার কথা ভাবতেই তার মনে হোলো সে যেন পেয়ে গেল সেই বাড়ীর অন্তঃ-পুরের একটা বিশেষ খবর। তার চোখের সামনে একটি কল্পিত মেয়ের মুখ ভেসে উঠলো। সে এই দিনের শেষ আলোয় হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সযত্নে কাজল পরছে চোখে, কপালে পরছে টিপ। তারপর ঐ নীল শাড়িটা যখন পরবে তখন কি অপরূপ সুন্দর দেখাবে তাকে।

অদিতি পথ চলছে। কুনালদের বাড়ীটা ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে পিছিয়ে যাচ্ছে। তবু সেই নীল শাড়িটা একটা স্বপ্নের মতো তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, কিংবা দুরূহ একটা প্রশ্নের মতো তার মনে অস্থিরতার সাড়া জাগিয়ে ভাবনায় বিভোর করে তুলছে। তারপর সে নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। দেখলো সন্ধে নামছে, তীর আবছায়া হয়ে আসছে, বাতাস ধীরে ধীরে উঠছে, নদীর বুকে জলের একটা ঝিরঝির শব্দ তাদের দূর থেকে যেন আসছে। নদীর ধারে সে তার পরিচিত জায়গাটিতে বসলো। সে তখন বিস্মিত হোলো। তার মনের এক অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যকে উপলব্ধি করে। তার সামনে

একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। প্রশ্নটি হোলো, কেন তার মনের সামগ্রিক কৌতূহলী চেতনা কুনালদের বাড়ীর যতটুকু দেখা গেল তার বৃহত্তর অংশকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে পার হয়ে একটা তীক্ষ্ণ শরের মতো লক্ষ্যহীন গতিতে ছুটে গেল শুধু সেই নীল শাড়িটার দিকে? সে কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে পড়লো। বাড়ী ফিরলো কুনালদের বাড়ীর পাশ দিয়েই। কুনালদের বাড়ীর গেটের কাছে এসে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দূরে ছাদের দিকে। অন্ধকার হাতড়াতে লাগলো তার শাণিত দৃষ্টি। ব্যর্থ হোলো তার প্রয়াস। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পেলো না ছাদে। ছাদের ওপর থেকে শুধু আকাশের উজ্জ্বল কালপুরুষ তার দিকে চেয়ে যেন হাসতে লাগলো।

পরদিন অদিতি বেশ স্বাভাবিক-ভাবে কুনালকে পড়াতে গেলো। সন্ধে হতে তখনো কিছুটা দেরি ছিল। কুনালের মা নির্মলা তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অদিতি তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক আগে। আর সে লক্ষ্য করেছে গতদিনের মতো একই ভাবে ছাদের পাঁচিল বেয়ে কার্নিশের কোল ঘেসে ঝুলছে সেই নীল শাড়িটা। মনে হোলো শাড়িটা যেন মসলিনের মতো পাতলা। তার মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন বুদ্‌বুদের মতো উঠলো। এ শাড়িটা কার? আবার টুপ করে মিলিয়ে গেলো। সে তার বাহ্যিক উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো। কারণ নির্মলার চোখে যেন তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এক চুলও না ধরা পড়ে। সে সম্বন্ধে সে খুব সতর্ক। তাই নির্মলা যখন বারান্দার ওপর থেকে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললো: 'আসুন মাস্টারমশাই', তখন সে একবার মাথা তুলে নির্মলার দিকে তার বিস্মিত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। তারপর মাথা নামিয়ে ঘরের মধ্যে গম্ভীর হয়ে ঢুকলো—যেন সে তার এই ভাবে বোঝালো নির্মলার এই সম্ভাষণ তার কাছে যত না অপ্রত্যাশিত তার থেকে অনেক বেশি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নির্মলাকে বারান্দায় দেখতে পাওয়া।

বাইরের ঘরে ঢুকে সে দেখলো কুনাল কথামতো বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে। কুনালকে তার খুব ভালো লাগলো। তবু তার গাম্ভীর্যের অর্গল ভেঙে একটা সন্তুষ্টির হাসি তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠতে ব্যর্থ হোলো। সে কুনালকে সেজের আলোয় খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো তার মুখের ওপর নির্মলার মুখটা যেন অস্পষ্ট ভেসে উঠছে। সে কুনালের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতে চাইলো না, কারণ সে ভাবলো নির্মলা হয়তো অন্তরাল থেকে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে। নির্মলার চোখে তার উপরিতলের পরিচয়টি (যেখানে সে শুধু এক আদর্শ শিক্ষক) যে এক বিমুগ্ধতার ঘন প্রলেপ দিয়ে গেছে সেই প্রলেপের ওপর সে অন্য কোন প্রলেপ অন্তত স্বেচ্ছায় দিতে চাইলো না। সে তার যৌবনোচ্ছল বহুমুখী মনকে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রতিজ্ঞার লক্ষ শিকল দিয়ে বেঁধে সংযত ও একমুখী করে তুলতে চাইলো অন্তত যতক্ষণ সে কুনালদের বাড়ীতে থাকবে ততক্ষণ। সে স্থির করলো সে তার শিক্ষকতার কর্তব্যটুকুর ঊর্ধ্বে অপ্রাসঙ্গিক কোন সম্পর্ক রাখবে না কুনালের সঙ্গে, নির্মলার সঙ্গে, কিংবা এ বাড়ীর অন্য কিছুর সঙ্গে। সে গম্ভীর হয়ে পড়িয়ে গেলো।

বিদায়ের সময় হলো। এমন সময় নির্মলা এলো সেই ঘরে একটা চাকরকে নিয়ে। চাকরের হাতে জল মিষ্টি। নির্মলা বেশ বিনম্র কণ্ঠে বললো: মাস্টারমশাই, একটু জল খান। অদিতি খুব গম্ভীর হয়ে নির্মলার দিকে তার বিস্মিত দৃষ্টি রেখে বললো: আজ যা করেছেন করেছেন। কিন্তু অন্য কোন দিন এমন আপ্যায়ন করবেন না—আমার এই অনুরোধটি অন্তত রাখবেন। নির্মলার চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝলকে উঠলো। তার মনে হোলো অদিতির এই অনুরোধের এমনই শক্তি যে তার ওপর কোন অনুযোগ যেন একেবারেই অচল। সে একটু আঘাত পেলো মনে। তবু এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যখন সে দেখতে পেলো একটি বছর চব্বিশ যুবকের অন্তরে একটি উন্নতশির ব্যক্তিত্ব বাস করছে তখন সে আরো মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হোলো। কোনো কথা সে বলতে পারলো না। নিশ্চুপ নির্মলার বিমুগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখ অদিতিকে অকস্মাৎ বড় বেশি সচকিত করে তুললো। তার বুকের ভেতরটা একবার ধক করে উঠলো। ভাবলো, সে কেন এমন করলো? তারপর কোনক্রমে সংক্ষিপ্ত জলযোগ সেরে অদিতি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা এসে পৌঁছলো গেটে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ছাদের পাঁচিলের সেই নীল শাড়িটা নেই।

অদিতি সেখান থেকে এগিয়ে চললো নদীটার দিকে। নদীর কাছে না গেলে যেন তার কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সেখানকার সেই প্রশান্তি ও নিবিড় নির্লিপ্তি জীবনসম্পর্কিত তার অযুত জিজ্ঞাসায় যেন উত্তর দিয়ে যায়। সে নদীর ধারে বসলো। দেখলো জল স্থির। নদীর সেই নিরুচ্ছলতা তার খুব ভালো লাগলো, কারণ তখন তার মনের অস্থিরতা তাকে নানাভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। সে চাইলো ঐ নদীটার মতো স্থির হতে, কিন্তু পারলো না। তার মনে অগণিত প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন রাতের অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়ে আকাশের কোন প্রান্তসীমার বিরাট এক পরিসর জুড়ে-থাকা একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। সে ছাদে গতদিনের মতো যে নীল শাড়িটা দেখলো সেটা কার? নির্মলার না অন্য কোন মেয়ের? না, নির্মলার হতে পারে না। তার পোষাকে চওড়া পাড় ঘেরা সাদা ঢাকাই শাড়ির আভিজাত্যসম্পন্ন বয়সোচিত যে গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছে তাতে মনে হয় ঐ ধরণের নীল শাড়ি পরার বয়স তার চলে গেছে অনেকদিন। নির্মলার যদি ঐ শাড়িটা না হয় তবে ওটা কার? অ[illegible] কোন মেয়ে কি কুনালদের বাড়ীতে থাকে? কুনালের কি কোন বোন আছে? এ সব প্রশ্নের উদয় [illegible] চলে অনেকক্ষণ। কিন্তু অদিতির জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বেড়েই চলে। মনে হয় সে যেন কোন এক দুর্ভেদ্য রহস্যের সন্ধান করতে এক গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। তারপর সে নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো। রাত বাড়লো। অন্ধকার খুব গভীর হোলো। সে উঠে পড়ে চললো বাড়ীর দিকে। কুনালদের গেটের সামনে এসে একবার ঘাড় ফেরালো। তার সন্ধানী দৃষ্টি ছুটলো অন্ধকারে গাছপালার ওপর দিয়ে সেই ছাদ পর্যন্ত। সে দৃষ্টি ছাদের পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

অদিতি অভ্যস্ত রীতিতে কুনালকে পড়াতে যায়। দেখে একইভাবে বিকেলের ম্লান আলো ছাদের পাঁচিল ঘিরে ছুঁয়ে রয়েছে নীল শাড়িটাকে। কোন কোন দিন দেখেছে সেই নীল শাড়িটার পরিবর্তে ছাদের পাঁচিলে শুকোচ্ছে একটা লাল, একটা মেরুন, কিংবা একটা হলদে শাড়ি। কিন্তু নীল শাড়িটা একটু

বেশি ছাদে আসার সুযোগ পায়। হয়তো ঐ শাড়িটাই তাকে সব থেকে বেশি আকর্ষিত করে ঐ বাড়ীর অভ্যন্তরের দিকে। সে এতদিন এলো গেলো, কিন্তু নির্মলা ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে সে হাজার চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। তবু তার মন অবুঝ। সে ভাবে এ বাড়ীর অন্তরাল থেকে কে যেন তাকে খুব হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে ধরা দেবে না তার কাছে। সে যেন খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে তার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলবে—এমনই তার স্থির প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সে কে? নির্মলা? না, সে হতে পারে না। অদিতি তাকে মাঝে মাঝে দেখেছে, দেখেছে সে আরো গম্ভীর হয়েছে। কুনাল সম্পর্কে যতটুকু প্রয়োজনের কথা থাকে নির্মলা তা খুব সংক্ষেপে সেরে চলে যায়।

নির্মলাকে অদিতি অনেকদিন দেখেছে, কিন্তু তাকে সে কোনদিন রঙগীন শাড়ি পরতে দেখেনি। অথচ ছাদে যে সমস্ত রঙগীন শাড়ি শুকোয় দিনের পর দিন সেগুলো তবে কার? অদিতি এ প্রশ্নকে কতবার চেষ্টা করেছে মাথা তুলতে দেবে না, কিন্তু সে পারেনি। কতদিন ঐ প্রশ্নের উত্তরের কিছু সূত্র পাবার আশায় কুনালের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু সাহস করতে পারেনি। পরোক্ষ-ভাবে তার এই স্থির প্রশ্নের উত্তরের জানা পাবার যে অনেক পথ আছে তা জানা সত্ত্বেও সে সেই পথে পা বাড়াতে পারেনি। কেবলই মনে হয়েছে হয়তো অন্তরাল থেকে নির্মলা কিংবা অন্য কেউ তার মনের চোরাগলির ঠিকানা অনুসন্ধান করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। কিন্তু অবিচল তার স্থির সংকল্প। সে কিছুতেই ধরা দেবে না, না নির্মলার কাছে, না অন্য কারুর কাছে।

[illegible]দিন কাটলো। অদিতির [illegible]দনকার সমস্ত কৌতূহল জৈবিক এক ক্ষুধার মতো একই সময়ে জেগে ওঠে আজ। তখন রাত্রি। চোখ দুটো ঘুমে অবশ। আর যখন সে চিরাভ্যস্তের মতো নদীর ধারে বসে বসে তার মৌন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে অসহায়ের মতো শুধু ঝিরঝির জলের নিরুজ্জ্বল স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে।

একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা অদিতিকে বিশ ভাবনায় মুখে ঠেলে দিল। সে ছাতে এসে দেখলো কুনাল ঘরে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এলো। তার হাতে এক থোকা সোনালচাঁপা ফুল। সে হাসতে হাসতে বললো : এই নিন মাস্টারমশাই। অদিতির চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেলো। তার ঘুমন্ত কৌতূহল আবার জেগে উঠলো। সে প্রাণপণে সংযত করলো তার আবেগ; গম্ভীর হয়ে বললে : রাখ।

অদিতির ক্ষুধার্ত কৌতূহলী দৃষ্টি বারবার লেহন করে গেলো ফুল-গুলোকে। ইচ্ছে করছে সেগুলোকে স্পর্শ করতে। কিন্তু সে পারলো না। ভাবলো ফুলের থোকাটা যেন একমুঠো আগুন। তার মনের কোণ থেকে একটা প্রশ্ন জেগে উঠলো, যে প্রশ্নের উত্তর না পেলে তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। কে পাঠালো এই ফুল? যার নীল শাড়িটা প্রায়ই রোদ পোহায় ছাদে যদি সে পাঠিয়ে থাকে? যদি নির্মলা? না, না, নির্মলা নয়, অন্য কেউ নিশ্চয় হবে, যে হয়তো তার মনের চোরাগলি নেপথ্য থেকে অনুসন্ধান করতে পেরেছে। তাই সে হয়তো এক নতুন প্রলোভনের ফাঁদ পেতে তার অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করছে অন্তরাল থেকে।......... অদিতি একবার মাথা তুলে তাকালো চারিদিকে। দেওয়ালে দেওয়ালে তার দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। সে তার নিজের দুর্বোধ্য অস্থিরতাকে উপলব্ধি করে মনে মনে একবার হাসলো। তারপর সে তার সমস্ত অস্থির আবেগকে দুঃস্থির বজ্রমুষ্টি দিয়ে চেপে ধরলো এবং কুনালের ইতিহাস বইটা খুলে বেশ স্বাভাবিক ভাবে পড়তে শুরু করলো : আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদারো নগরে প্রথম যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম সিন্ধু সভ্যতা।

অদিতি পড়ানোর সময় খুব সতর্ক ছিল, পাছে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পড়ানো শেষ করে সে একটা মৃদু আনন্দে ফুলের থোকাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অন্ধকারে পথ চলতে চলতে ফুলের একটা ঠাণ্ডা স্পর্শে তার দেহের রক্তের নদীতে উথালপাথাল শুরু হোলো। মনে হোলো তার নির্মলা একটা রহস্যময়ী নারী। না, না, না নির্মলা নয়, নির্মলা কেন হবে? নির্মলা তার থেকে তো অনেক বড়ো। অন্য কেউ হবে।

অদিতি পথ চলতে চলতে নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। সে বসলো। সে যখন তার অসহ্য নৈঃসঙ্গে অস্থির হয়ে পড়ে তখন নদীর ধারে কিছুক্ষণ বসে সব কিছু ভোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বুঝেছে চেষ্টা করে কিছু ভোলা যায় না। তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো সুদূর একটা অতীতকে। মনে পড়লো বিস্মৃত নবনীকে। নবনীর সুন্দর মুখটা তার চোখের সামনে একবার ভেসে উঠলো। একপিঠ কালো চুল, পরনে নীল শাড়ি, চোখে ভাষাহীন অজস্র কথা, অদিতি কেমন করে ভুলবে নবনীর এই স্মৃতি। নবনীকে যতবার সে দেখেছে, যত গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে ততই সে নিজের মনে মনে অনুভব করেছে নিজের নিঃসঙ্গতাকে। অদিতি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো—ভাবলো এ সব চিন্তা এখন থাক! এসব ভুলতেই হবে তাকে! সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর নবনীর ভেসে-ওঠা মুখ-খানা চোখের সামনে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলো। সে ছুঁড়ে ফেলে দিল তার হাতের ফুল। মনে মনে প্রশ্ন করলো এ কার ওপর অভিমান? নবনীর ওপর? না। নির্মলার ওপর? না। তবে কার ওপর? নদীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে তার চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজলো। কিন্তু কিছু পেলো না। শুনতে পেলো শুধু ঝির-ঝির জলের শব্দ।

ঠিক পরের দিন ছিল একটা ছুটির দিন। ছুটির আমেজ নিয়ে সকালবেলা অদিতির ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করলো। কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে শেষরাতে। গাছপালাগুলো শ্যামলিমায় একটু উজ্জ্বল হয়েছে। অদিতি পথ চলতে চলতে যখন কুনালদের বাড়ীর কাছ-বরাবর এসে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। পথের ধারে ছিল একটা পরিত্যক্ত মন্দির। সেখানে সে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে কুনালদের বাড়ীর তিন-তলার ছাদ স্পষ্ট দেখা যায়। অদিতি দেখলো সেই নীল শাড়িটা জলে ভিজছে, তার সঙ্গে আরো ভিজছে অনেক জামা-কাপড়। জলে ভিজে সেই নীল শাড়িটার নীল রং ক্রমাগত যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এমন সময় চকিতে ছুটে এলো সেই ছাদে এলো-চুলে এক কালো মেয়ে। সে [illegible] মধ্যে ছাদের সমস্ত জামা-কাপড় তুলে

নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে নেবে গেলো। অদিতি মেয়েটিকে খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। কারণ তখন প্রবল ধারাবর্ষণ তার চোখের সামনে একটা সাদা পর্দা টেনে দিয়েছিল। তবু সে অনেক দিনের একটা দুর্ভেদ্য রহস্যোদ্ধারের আভাস পাওয়ায় মনে মনে একবার হেসে উঠলো। তবু তার মন অবুঝ। ভাবলো ঐ নীল শাড়িটা যার তার যে ছবি সে মনে মনে কল্পনা করেছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা এই মেয়েটির বেশ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। তা হোক, তবু সে আত্মতৃপ্তিতে মনে মনে বেশ বিভোর হয়ে উঠলো। বৃষ্টি থামলো। ঈশান কোণে তখনো মেঘের গম্ভীর সমারোহ। নদীর ধারে তখন যাওয়া নিরাপদ নয়। অদিতি ঘরে ফিরে এলো তাই।

সন্ধ্যেবেলা অদিতি যখন কুনালদের বাড়ীর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো তখন সে এক বহুদিনের কঠিন প্রশ্নের সদ্য-পাওয়া উত্তরের সংকেতে তার বিগত দিনগুলোকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার করতে করতে মাথা নিচু করে পথ চলছিল। সে যখন তার নির্দিষ্ট ঘরের দরজার সামনে এসে পৌঁছলো তখন সে ঘাড় তুলতেই দেখতে পেলো ডানদিকের বারান্দায় হেলান দিয়ে তার সমবয়স্ক একটি কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদিতি চোখ নামালো। ঘরে ঢুকেই নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেই ভাবলো এই মেয়েটি হয়তো কাল তাকে যে ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে সে ফুল সে গ্রহণ করেছে বলে তার মনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বোঝার উদ্দেশ্যে অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে, এসেছে একেবারে তার চোখের সামনে। তার মনে মেয়েটির ওপর হঠাৎ ক্রোধ ও বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠলো। ভাবলো মেয়েটি যেন এতদিন পরে তার শিকারকে তার হাতের কাছে পেয়েছে, এবারে সে তাকে ধরবেই— এমনই তার প্রস্তুতি। কিন্তু অদিতি তার মনের আবেগ ও দুর্বলতার বল্গাকে একটুও শ্লথ হতে দেবে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পড়াতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে শাড়ির খস-খস শব্দ, যেন মেয়েটি খুব কাছে ঘুরছে। শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার হাসির শব্দ, সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নির্মলার সাংসারিক কথাবার্তা। মেয়েটি একবার অদিতির সামনে দিয়ে বাইরে গেলো, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো। অদিতি তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ভাবলো তার এই অন্যমনস্ক ভাবটির বিশেষ অর্থ হয়তো লেখা হয়ে গেল মেয়েটির মনের অভিধানে। তবু তার সংকল্প স্থির,—কিছুতেই ধরা দেবে না তার কাছে।

সেদিন রাত্রে অদিতি শুয়ে শুয়ে ভাবলো আর সে কুনালকে পড়াতে যাবে না। জীবনে সে এমন গহন পথে আর পা বাড়াবে না। এলোমেলো কত কি ভাবতে ভাবতে সে কেমন পাগলের মতো পাশের বালিশটাকে প্রবল শক্তিতে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে ঘুমোতে পারলো না।

পরদিন অভ্যস্ত রীতিতেই সে কুনালকে পড়াতে গেলো। সুস্থ চিন্তায় সেদিন সে তার গতরাতের সংকল্পকে কিছুই গুরুত্ব দিতে পারলো না। কুনালকে সে সবে পড়াতে বসেছে এমন সময় সেই মেয়েটি সেই ঘরে ঢুকে কুনালকে বললো : কুনাল, বললুম। রাশের মেলা দেখতে নিশ্চয়ই এবার যাস, এবারে খুব ধুমধাম হবে। কুনাল একটু হেসে উত্তর দিল : আচ্ছা, যাব ছোটমাসি। তারপর নির্মলাও এ বাড়ীর পরিচিত চাকর জগদীশকে নিয়ে দরজার বাইরে গেলো। বাইরে অপেক্ষা করছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সেই মেয়েটি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো : দুদিন বেশ কাটলো, না দিদি? নির্মলা এর উত্তরে একটু হেসে বললো : কুনালের সোয়েটারটা খুব তাড়াতাড়ি করিস।

তারপর ঘড়ঘড় শব্দে ঘোড়ার গাড়িটা চলতে শুরু করলো।

অদিতি তখন বাড়ী ফেরার পথে ভাবছিল—সে একটা পাগল। নচেৎ একটা মেয়েকে সেদিন ছাদে দেখতে পেয়ে এতসব এলোমেলো ভাবলো কেন! সে বুঝলো সে তার মনকে যত স্পষ্ট বোঝে ব'লে বিশ্বাস করে, আসলে তত বোঝে না। কিন্তু সে কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। মনে তখনো তার স্থিরজিজ্ঞাসা ঐ নীল শাড়িটা যাকে সে এতদিন ধরে দেখছে সেটা তবে কার?

তারপর অনেকদিন কেটে গেলো। অদিতি তার কর্তব্যে অবিচল। বেশ স্বাভাবিক ভাবে সে কুনালদের বাড়ী যায় আসে। ছাদের ওপর সে প্রায়ই দেখে অন্যান্য জামাকাপড়ের সঙ্গে প্রতিদিন একই জায়গায় শুকোচ্ছে নয় লাল, নয় বেগুনে, নয় গোলাপী, নয় নীল শাড়ির যে কোন একটা। কিন্তু নীল শাড়িটাই যেন তাকে অত্যন্ত অস্থির করে তোলে, যেন ঐ শাড়িটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তবু নিজের এইসব আবেগের প্রতিক্রিয়া তাকে খুব বেশি বিভ্রান্ত বা চঞ্চল করে না। সে যেন তার মনের অস্থিরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে হার মেনে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার যত রাজ্যের পুরোনো কৌতূহল ও আবেগোচ্ছল অস্থিরতা জেগে উঠলো।

সেদিন সে যথারীতি নির্ধারিত সময়ে পড়াতে গেছে। দেখলো ছাদে নীল শাড়িটা নেই, শুকোচ্ছে গোলাপী শাড়িটা। ঘরে ঢুকে দেখলো কুনাল নেই। ভৃত্য জগদীশ তার আগমন বুঝতে পেরে তার কাছে এসে জানালো : মাস্টারমশাই, খোকাবাবু আজ পড়বে না। অদিতি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো : কেন?

—আজ্ঞে, আজ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে খোকাবাবুর মাথা ফেটে গেছে। খুব ভাগ্য ভালো হাতপা ভাঙেনি।

এ সংবাদে অদিতি যে উত্তেজিত হয়নি, তা নয়। তবু স্বভাবসুলভ তার গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে জগদীশকে বললো : খোকাবাবুর মাকে গিয়ে বলো আমি খোকাবাবুকে একবার দেখবো। কিছুক্ষণ পরে জগদীশ ভেতর থেকে এসে বললো : চলুন মাস্টারমশাই।

অদিতি সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠলো। ভাবলো যাকে সে এতদিন ধরে খুঁজছে তাকে সে আজ দেখতে পাবে, দেখতে পাবে কুনালের পাশে বসে কুনালের গায়ে মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সিঁড়ির এক একটা সোপান অতিক্রম করছে আর সে যেন এক একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে। একটা আশাতীত বিস্ময়ে ও আনন্দে তার বুকটা ধক্-ধক্ করে কেঁপে উঠছে। কুনাল যে ঘরে শুয়ে আছে সে ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে সে আপ্রাণ চেষ্টা করলো নিজের স্থির বিচক্ষণ প্রকৃতিতে ফিরে আসতে। দরজার চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো একটা সেজের আলো জ্বলছে। কুনাল শুয়ে রয়েছে, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। আর নির্মলা তার পাশে বসে গরম জল দিয়ে তার চোখের কোলে সেঁক দিচ্ছে। অদিতি মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হারিয়ে ফেলেছে এমন হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো একাই সঙ্গে নির্মলা ও কুনালকে। নির্মলায় শুয়ে

বসন ঘিরে একটা সুন্দর শান্ত উদাস ভাব ফুটে উঠেছে। অদিতি তার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ও অন্যমনস্কভাবে শুনে গেলো কুনালের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত।

কুনাল তার মাস্টারমশায়ের জন্যে দোলনচাঁপার গাছ থেকে ফুল পাড়তে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে গাছ থেকে। একটা শিশুর এই প্রচেষ্টায় ও তার ব্যর্থতায় যে পরিমাণ করুণাদ্র আনন্দে স্বাভাবিকভাবে সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়ে তার কোন প্রকাশ অদিতির মুখে ফুটে উঠলো না। সে কেমন চিন্তাতুর ও স্মৃতিভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো এমন একটি কথা যা সেই পরিস্থিতিতে অবান্তর শোনালেও সেই কথাটা তখন বলার জন্যে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

সে বললো : সেদিন তুমি যে আমাকে ফুল দিয়েছিলে কুনাল, সে ফুল তোমাকে কে পেড়ে দিয়েছিল?

কুনাল জড়ানো কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল : মাস্টারমশাই, সেদিন আমি ফুল পাড়িনি। গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে এনে আপনাকে দিয়েছিলুম। আজ আমি দেখলুম গাছের তলার সমস্ত ফুল খুব নোংরা, তাই গাছে উঠে আপনার জন্যে ফুল পাড়তে গিয়েছিলুম।

অদিতি সমবেদনার সুরে বললো : আর কখনো করো না এমন কাজ। তারপর তার কপালে হাত দিয়ে বললো : খুব ব্যথা করছে, না? সব সেরে যাবে। এখন ঘুমোও।

কুনাল অভিমানে বালিশে মুখ লুকোবার চেষ্টা করলো। অদিতি একবার অন্ধকারে তার তীক্ষ্ণ চোখটাকে এলোমেলো ছুঁড়ে দিল। তারপর দ্রুত [illegible] গেল ঘর থেকে নির্মলাকে কিছু [illegible] বলেই। নির্মলা তখন একবার গি[illegible]ছিল পাশের ঘরে।

অন্ধকারের ওপর অদিতির তীব্র প্রতিহিংসা জেগে উঠলো। অন্তর্জ্বালায় তার সমস্ত দেহমন যেন দগ্ধ হয়ে গেল। সে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সেদিন সে কি ভেবে ফুল ফেলে দিয়েছিল নদীর জলে। সেকথা ভাবতেও তার ভালো লাগলো না। সে যেন নিজেই নিজেকে পরিহাস করছে এমন এক আক্ষেপ তার অন্তরে গুমরে উঠলো। অবশেষে প্রবল এক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাড়ী ফিরলো সে সেদিন।

তারপর তার দিন কেটে যায়। কৌতূহলের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয়ে গেছে। সে তার কর্তব্যে অবিচল। যেন তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সমান তালে তালে পড়ছে। কুনালকে পড়াতে যাবার সময় তাদের ছাদে লাল, মেরুন, গোলাপীদের অনুপস্থিতির দিনে নীল শাড়ির উপস্থিতি যেন তাকে আজকাল ভ্রূকুটি করে। অদিতির মনে মনে তার ওপর প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। তবু নিঃসহায়ের মতো সেদিকে চেয়ে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর সে তার দিকে চেয়ে দেখবে না।

হঠাৎ একদিন অদিতি তার জীবনের ঠিকানা বদল করার নির্দেশ পেলো। তাকে কলকাতার চলে যেতে হবে। সেখানের এক সওদাগরি অফিসে চাকরিতে যোগদান করার জন্যে সে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আহ্বানপত্র পেয়েছে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে কয়েকবার। ভেবেছে ঐ নীল শাড়িটার চক্রান্ত থেকে সে মুক্তি পেলো।

কুনালের পড়ানোর দায়িত্ব ত্যাগ করে অদিতি এলোমেলো ঘুরেছে এখানে সেখানে দীর্ঘ সাতদিন ধরে। নদীর ধারে কখনো কখনো চলে গেছে মধ্যরাত্রে। বিদায় নেবার আগের দিন কুনালকে একবার তার মনে পড়েছিল বিকেলে। সে গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। ওদের বাড়ীতে পোঁছে নীল শাড়িটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে মনে মনে বললো : আজও কি তুমি আমায় দেখা দেবে না? আমি চলে যাচ্ছি। আর হয়তো আসবো না। তোমার জন্যে খুব মন কেমন করছে।

অদিতির সম্বিৎ ফিরে এলো জগদীশকে দেখে। জগদীশের কাছে শুনলো নির্মলা অসুস্থ। তার জ্বর হয়েছে কদিন। অদিতি নির্দ্বিধায় পা বাড়ালো ভেতরের দিকে। সোজা চলে গেল ওপরে। অদিতিকে দূর থেকে দেখে নির্মলা বিছানায় উঠে বসলো। অদিতি দেখলো নির্মলার চোখ দুটো ভীষণ ছলছল করছে, মাথায় অস্নাত চুল উসকোখুসকো হয়ে বাদামী হয়ে গেছে। কাছে এসে দেখলো নির্মলার হাতে একটা মেয়ের ছবি। সে বেশ চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে নির্মলাকে একবার দেখলো। তারপর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সহস্র সঙ্কোচ পেরিয়ে সে নির্মলাকে বললো : ওটা কার ছবি?

নির্মলার কণ্ঠে একটা কাঁপন জেগে উঠলো। তবু সে আবেগসংহত কণ্ঠে বললো : আমার মেয়ে পদ্মর ছবি। সে বছর দেড়েক হলো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের মতো। নির্মলা যেন পদ্মর স্মৃতি বিহ্বল হয়ে পড়লো। সে মনে মনে ভাবলো প্রাণ চাইছে অনেক কথা বলতে, কিন্তু অদিতিকে সে কোন কথা বলবে না। অদিতি তার কথা বুঝবে না।

নির্মলা নিজেকে অন্যমনস্ক করে তোলার জন্যে জগদীশকে ডেকে একটা অনাবশ্যক কথা বললো : ওরে জগদীশ, পদ্মর শাড়িটা তুলতে তুই বড় দেরী করিস রোজ। যা তুলে এনে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দে।

জগদীশ দূরে থেকে উত্তর দিল : আলো জেলে যাচ্ছি মা।

তারপর নির্মলা ও অদিতির মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো একবার। দুজনে চুপ। ঘরে একটা ঝুঁকো অন্ধকার জট পাকাচ্ছে। অদিতির ভালো লাগলো না সে অন্ধকার। সে কেমন অস্বাভাবিক ভাবে উঠে পড়লো। নির্মলা উঠে বারান্দায় গিয়ে অদিতির চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলো। অদিতি চলে গেল ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে গেট পর্যন্ত। গেটের কাছে গিয়ে ছাদের দিকে সে শেষবার তাকালো। দেখলো অন্ধকার সেখানে থিকথিক করছে। হাওয়ায় গুটিয়ে-যাওয়া ঝুলন্ত নীল শাড়িটাকে দেখে তার মনে হোলো একটা মেয়ে যেন মুখভার করে দাঁড়িয়ে থেকে তার চলে যাওয়ার দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে।

কলারসিক

দুটি প্রদর্শনী : তিনজন শিল্পী

অক্টোবর মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে আমরা দুটি চিত্র-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই প্রদর্শনীর একটি ছিল ত্রিপুরার তরুণ শিল্পী বিমল করের, অন্যটি শিল্পী কল্যাণ বসু ও তাঁর ছাত্রী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের। শিল্পী বিমল করের প্রদর্শনীটি গত ১৮ই অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে চালু ছিল। দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে গত ২৪শে অক্টোবর শুরু হয়েছে এবং এটির দ্বার আগামী ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

।। শিল্পী বিমল করের শিল্পকলা ।।

শিল্পী বিমল কর বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি বেসিক ট্রেনিং কলেজে শিল্প-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকলেও তিনি কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজেই তাঁর শিল্পশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমান প্রদর্শনীই তাঁর সর্বপ্রথম একক প্রদর্শনী হলেও ইতিপূর্বে তিনি কলকাতার অনেক সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে রসিক-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে মোট ৩৯ খানি চিত্র। নানা মাধ্যমেই অঙ্কিত হয়েছে এই চিত্রগুলি। এর মধ্যে আছে তেল-রঙের ১১ খানি চিত্র, জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা ১৩ খানি, আর আছে ১২ খানি প্যাস্টেলের কাজ এবং কালি-কলমে অঙ্কিত ৩ খানি স্কেচ।

কোনো চমক বা বিভ্রান্তিকর বিমূর্ত শিল্প-চেতনাকে ততোধিক কোনো জটিল আঙ্গিকে শ্রীকর তাঁর চিত্র-রচনায় স্থান দেন নি। বরং বলা যায়, বিমূর্ত শিল্প-প্রকরণের দিকে শিল্পীর ঝোঁক থাকলেও তিনি পরিচিত ফিগারেটিভ পদ্ধতিকে এমনভাবে তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন, যা নিঃসন্দেহে দর্শক-মনের আগ্রহকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম।

তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির কয়েকটিতে যেমন বিমূর্ত শিল্প-চেতনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, তেমনি আবার প্রথা-সিদ্ধ রচনাও এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল। এ-সব দেখে আমার মনে হয়েছে শিল্পী কর এখনও নির্দিষ্ট কোনো শিল্প-আঙ্গিক গ্রহণ করতে ইতস্তত করছেন। বাছাইক তেল-রঙের চিত্রগুলির মধ্যে 'প্রসাধন' (২৯), 'একাগ্রতা' (৩৩), 'প্রতীক্ষা' (৩৫), 'সুর-মূর্ছনা' (৩৭) কিংবা 'দলবদ্ধ কাজ' (৩৮) আমাদের ভাল লেগেছে।

ত্রিপুরার পাহাড়, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যই জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তু। এগুলি বর্ণ-সম্পাতে এবং রেখার টানে, বিশেষ করে আলো-ছায়ার সুনিপুণ প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণবন্ত। জল-রঙ কাজের মধ্যে ২৪, ২৫, ২৬ নং নিসর্গ দৃশ্য-গুলি সত্যি মনোরম।

প্যাস্টেলের কাজের মধ্যে আমাদের ভাল লেগেছে 'কঠোর শ্রম' (৫), 'গুহা-ভিমুখে' (৭), 'গল্পগুজব' (৮) প্রভৃতি চিত্রগুলি। এগুলির কোনটির ব্যঞ্জনাময় শিল্প-ভঙ্গী, কোনটির ছন্দিত রূপ, কোনটির নিপুণ বর্ণ-প্রয়োগপদ্ধতি আমাদের মুগ্ধ করেছে।

শিল্পী কল্যাণ বসু ও ইন্দ্রাণী সেনের চিত্রকলা

আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী কল্যাণ বসু ও তাঁর ছাত্রী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের যে চিত্র-প্রদর্শনী চলছে তা কলকাতার কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিল্পী বসু বর্তমানে এস, বি, মডার্ণ হাই স্কুলের শিল্প-শিক্ষক। কিন্তু তিনি অবকাশ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দূর-দূরান্তরে। এমনি এক ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার শিল্প-নিদর্শন উপ-স্থিত করা হয়েছে আলোচ্য প্রদর্শনীতে। নেপালের নিসর্গ দৃশ্য, তার নর-নারী শিল্পী বসুর ২২খানি চিত্রেরই বিষয়-বস্তু। তেল-রঙ, জল-রঙ ও প্যাস্টেলের মাধ্যমে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত। তিনটি মাধ্যমেই শিল্পী বসু নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে নেপালের বর্ণাঢ্য মঠ-মন্দির, উঁচু-নীচু পথ চিত্র-সংস্থাপনের চমৎকার কৌশলে এবং উজ্জ্বল রঙের পরিমিত ব্যবহারে সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সব চিত্রের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'হনুমান ঢোকা' (৫), 'ললিত পট্টন' (৭) ও 'কয়েকজন নেপালী' (৯) নামক চিত্রগুলি।

জল-রঙের চিত্রগুলি নেপালের বিচিত্র নরনারীর বিভিন্ন মুহূর্তের বিশেষ ভঙ্গী অবলম্বন করে রচিত। অনেকটা স্কেচধর্মী। কিন্তু শিল্পীর দেখার দৃষ্টি যেমন প্রখর তেমনি মোটা রেখা এবং তুলির হাল্কা টানও যে বলিষ্ঠ—একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। জল-রঙের ৮ খানি চিত্রই এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

প্যাস্টেলে অঙ্কিত কয়েকটি নিঃসর্গ দৃশ্য দর্শকদের ভালও লাগতে পারে। মোটকথা : কল্যাণবাবুর চিত্রের মধ্য দিয়ে দেখা নেপাল আমাদের ভাল লেগেছে। তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী : ইন্দ্রানী সেন

কিশোরী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। জল-রঙ ও প্যাস্টেলের ৯ খানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কিশোরী মনের কল্পনার রঙে মিশে যে চিত্র সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সেটি হলো 'একটি মেয়ের পুতুল খেলা' (৭) নামক চিত্রখানি। অন্যান্য চিত্রে শিক্ষকের নির্দেশ যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার চিহ্ন স্পষ্ট। এই কিশোরী শিল্পী ভবিষ্যতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জন স্টাইনবেক

অনিন্দ্যকুমার সেন

আধুনিক যুগ হল আত্মসমর্পণের যুগ। এ যুগের শিল্পী-সাহিত্যিক সবাইকেই বিশেষ কোনো এক প্যাটার্ণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সেই জন্যে সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এসেছে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ। এ যুগের মার্কিন সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের আত্মসমর্পণের বিরোধী তাঁদের মধ্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক অন্যতম।

১৯০২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার 'স্যালিনাস'এ জন স্টাইনবেকের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন মন্টেরীর কাউন্টির কোষাধ্যক্ষ, মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, স্টাইনবেকের বাবার ছিল প্রুসিয়ান রক্ত আর মা'র পূর্বপুরুষ ছিলেন আইরিশ। স্টাইনবেক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন, কিন্তু কোন ডিগ্রী নেননি। পরে তিনি খামারে কাজ করেছেন, চিনির কারখানায় কেমিস্টের কাজ করেছেন, মাছের চাষ করেছেন এবং লেক টাহোতে জমিদারীর দেখাশোনাও করেছেন। কিছুদিন তিনি সংবাদপত্রেও কাজ করেন, কিন্তু শুধুমাত্র নিখুঁত সংবাদটুকু পরিবেশন করতে নারাজ হওয়ায় তাঁর চাকরী যায়।

দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অগভীর নয়। এক সময়ে মাসে মাত্র পঁচিশ ডলারে সস্ত্রীক দিন কাটিয়েছেন, মন্টেরীর উপসাগরে মাছ ধরে খেয়ে। তাঁর গোড়ার দিকের বই তেমন ভাল বিক্রি হয়নি। তাঁর জনপ্রিয় বই "টর্টিলা ফ্ল্যাট" ন'জন প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তাঁর প্রিয় লেখক হলেন ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, হার্ডি, মিল্টন, জর্জ এলিয়ট আর উইলা ক্যাথার। এছাড়া তিনি ভালবাসেন বিজ্ঞান, অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব নিয়ে বই পড়তে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস হল "দি কাপ অব গোল্ড" (১৯২৯) ক্যাবেল-এর প্রভাবে লেখা। তারপর বেরোয় "দি পাশ্চার্স অব হেভ্‌ন (১৯৩২), "টু এ গড আন্‌নোন" (১৯৩৩), "টর্টিলা ফ্ল্যাট" (১৯৩৫), "ইন ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল" (১৯৩৬), "দি গ্রেপ্‌স্‌ অব র‍্যাথ" (১৯৩৯), "সী অব কর্টেজ" (১৯৪১), "দি মুন ইজ ডাউন" (১৯৪২), "দি ওয়েওয়ার্ড বাস" (১৯৪৭), "বার্ণিং ব্রাইট" (১৯৫০), "ইস্ট অব ইডেন" (১৯৫২), "দি উইন্টার অব আওয়ার ডিসকন্টেন্ট" (১৯৬২)। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' প্রকাশিত হবার পর তিনি খ্যাতি আর স্বাচ্ছল্য লাভ করেন। ১৯৪০ সালে "গ্রেপ্‌স্‌ অব র‍্যাথ" পুলিৎসার পুরস্কার পায়।

বাস্তবধর্মী হলেও স্টাইনবেকের লেখায় রূপকের কোন অপ্রতুলতা নেই। হয়তো একটু বেশিই। যেমন "গ্রেপ্‌স্‌ অব র‍্যাথ"এ রোজ অব শ্যারণ এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে স্তন্যদান করলে (মোপাসাঁ দ্রষ্টব্য)। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট'এর কুকুরের কাহিনীর মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিসের মতবাদের ছাপ পাওয়া যায়। "ইস্ট অব ইডেন" ত বাইবেলের অ্যাডামের পতনের কাহিনীর ওপর সরাসরি ভিত্তি করেই লেখা। স্টাইনবেকের লেখায় একদিকে যেমন কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, আর অবাধ যৌন আবেগের সমাবেশ দেখা যায় আরেক দিকে তেমনি আবার নিছক বেঁচে থাকার আনন্দের প্রকাশও প্রচুরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তাঁকে নিষ্ঠুর ও কোমল, বাস্তববাদী ও নৈর্ব্যক্তিক হতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে জীবনের

জন স্টাইনবেক

তেমন গভীরে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি।

ফকনার একদা কতকটা যেন বিকৃতভাবেই বলেছিলেন যে, আজকের দিনের কোন লেখকের বিচার করতে গেলে সেটা তাঁর বিফলতার পরিমাণ এবং গুণাগুণ দিয়েই করতে হবে। সেদিক দিয়ে স্টাইনবেকের লেখার পরিমাণ যথেষ্ট এবং বিফলতাও অনেকখানি। কিন্তু সেই বিফলতা, তাঁর সমকালীন সাফল্যমন্ডিত লেখকদের সাফল্যের চাইতে অনেক বেশী মনোগ্রাহী। বিফলতা ঘটেছে তাঁর অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের মূল উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে, বাস্তবকে ধরার চেষ্টায়, এককথায় এ যুগের আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের প্রায় হাতের কাছেই বস্তুসত্তার যে প্রতিচ্ছবি, জীবনের যে গভীর অর্থ প্রায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে, তাকেই খুঁজে পাওয়ায়। ফলে কিন্তু যা তিনি ফোটাতে অসমর্থ হয়েছেন, শুধু তাঁর বিফলতার জন্যে সেই জিনিসটিই আমাদের চোখের সামনে আরো নিখুঁত এবং স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। আসলে এ ধরনের বিফলতার সঙ্গে সাফল্যের প্রভেদ অতি অল্প।

তাঁর ছোট উপন্যাস "অব মাইস অ্যান্ড মেন" বহু কষ্টে ভাবপ্রবণতাকে এড়িয়ে গিয়েছে। কিছুটা থিয়েটারী ভঙ্গির জন্যে একটু একঘেয়ে লাগে। করুণাপরবশ হয়ে বুড়ো কুকুরটাকে গুলী করে মারা, কাহিনীর শেষ ক্লাইম্যাক্সে লেনীকে গুলী করে মারার পূর্ব-প্রস্তুতি। ঘটনার সাজানো ভঙ্গি উপেক্ষা করা না গেলেও কাহিনীটি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে বাস্তববাদ নয়, গোটা বাস্তবতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। বই শেষ করলে অনুভূতির মুক্তিলাভ ঘটে, আর এর শেষটিই সবচেয়ে সুন্দর।

তাঁর "টু এ গড আননোন", "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল" (কমিউনিস্টদের সমর্থনে লেখা হলেও তাঁরা অসন্তুষ্ট হন), "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ", "ইস্ট অব ইডেন" প্রভৃতি উপন্যাসে মাঝে মাঝে এমন সব অংশ পাওয়া যায় যা বিদ্যুতের মত মনকে স্পর্শ করে। আকস্মিক, করুণ ক্ষণস্থায়ী ছবি, এর প্রকাশভঙ্গি যেন মনকে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দেয়। মনে হয় যেন অতলস্পর্শী কোন এক অন্ধকূপ থেকে বিপুল দানবীয় শক্তিতে শিল্পী বাঙ্ময় হয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে এক এক ঝলকের মধ্যে এক একটি সজীব চরিত্র দেখা দেয়—বইয়ের নায়ক নয়, স্টাইনবেক-সৃষ্ট জানীরা যেমন বিদ্রোহী ডাক্তার, বিদ্রোহী পুরোহিত, বিদ্রোহী দার্শনিক, এরা।

এইসব ক্ষণিক চরিত্রের স্ফুলিঙ্গের আলোয়, উপন্যাসগুলির মধ্যে বাস্তবের ছায়া আর নকশা দেখতে পাওয়া যায়। স্টাইনবেকের উপন্যাসে দুধরনের প্রতিকল্প পাওয়া যায়, একটি হল আমেরিকান প্রতিকল্প, মার্কিন জীবনের সম্ভাবনাময় চিত্র—অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর নিউ ইংল্যান্ড আর ক্যালিফোর্ণিয়ার রোমান্টিক গন্ধে ভরা। অন্যটি হল সমসাময়িক যুগের প্রতিকল্প। আমেরিকান প্রতিকল্পের সঙ্গে এর সম্বন্ধ অবশ্য অঙ্গাঙ্গী তবু সমকালীন অন্যান্য ভাষার উপন্যাসেও এই সুরেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এরই রূপ পাওয়া যাবে ফ্রান্সে মালরো আর কামুর মধ্যে বা ইটালীতে সিলোনের লেখায়। মানুষে মানুষে ব্যবধানের দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে করুণ এক চেতনা থেকেই এই রূপ জন্ম নিয়েছে।

এই ব্যবধান বোধ থেকেই রাজনৈতিক গল্প-বস্তুর উৎপত্তি হয়। আজকের মানুষের যা নিয়ে লড়াই, তার চেহারা, তার করুণ পরিণতিকে তার রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ছকের মধ্যে তাকে ধরবার চেষ্টা করা হয়। রাজনৈতিক গল্পবস্তুর মধ্যে দেখা যায় মানুষকে মানুষের কাছ থেকে তফাতে রাখবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর, যার মধ্যে কামুর ফরমুলারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—আমি বিদ্রোহী, তাই আমরা রয়েছি। কিম্বা ইগনেসিও সিলোনের সুর বোধ হয় আরো কাছাকাছি ঃ "আমার বিদ্রোহ আমার সঙ্গী-নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করেছিল।"

স্টাইনবেকের "গ্রেপস অব র‍্যাথ"-এ এই সুরটি সবচেয়ে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি পরিস্কারভাবে বলেছেন, "এই হল শুরু, 'আমি' থেকে 'আমরা।'" কিন্তু জীবন আর শিল্পের অতিমাত্রায় সামান্যীকরণের অভ্যাসের দরুণ তিনি এর বিভিন্ন অংশের বিচ্ছেদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি শিল্পের সংগঠনী-শক্তির অধীনে আনতে সম্পূর্ণ সমর্থ হননি। তবু এ বইয়ের নানা দোষ সত্ত্বেও এইটিই বোধ হয় স্টাইনবেকের সবচেয়ে ভালো উপন্যাস। একে সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমেরিকার ইতিহাসের এ একটি বিশেষ যুগের স্মারক।

"ইস্ট অব ইডেন" কাহিনীটি বাইবেলের প্রাচীনতম নায়ক অ্যাডামকে নিয়ে লেখা। স্টাইনবেক বলেছেন যে তাঁর যা কিছু আছে সবই তিনি এতে দেবার চেষ্টা করেছেন। এ একটি রূপক উপন্যাস। এতে অ্যাডাম আছে, কেইন আর অ্যাবেল (ক্যাল আর অ্যারণ) আছে, নতুন এক লিলিথও আছে। এর মধ্যেই তিনি তাঁর আমেরিকান জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, বাইবেলের কাহিনীর গঠনের ভেতর দিয়ে। অ্যাডামের কাহিনী হল মানুষের পতনের কাহিনী, অসৎ-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বের কাহিনী, মনুষ্য-প্রকৃতির মানবীয় হয়ে ওঠার কাহিনী।

কিন্তু এই প্রাচীন কাহিনীর অল্প অংশই এই বইয়ে সংরক্ষিত হয়েছে আর এর অন্তর্নিহিত ভাবের কিছুই রাখা হয়নি। অ্যাডাম ট্রাস্ক মানুষে হয় পূর্বাঞ্চলে এবং ক্যাথি নামে অত্যন্ত খারাপ একটি মেয়েকে বিয়ে করে ক্যালিফোর্ণিয়া চলে যায়। যমজ সন্তান উপহার দিয়ে ক্যাথি অ্যাডামকে পরিত্যাগ করে। অ্যাডাম নানা কাজে মন দেয় এবং নানা রকম পারিবারিক বিপত্তির মধ্যে তার বার্ধক্যপ্রাপ্তি ঘটে।

যে 'অসৎ'-এর সঙ্গে বাইবেলের কাহিনীটি সংশ্লিষ্ট তাকে ফোটাতে না পেরে বার বার অসৎ-এর উল্লেখ করতে হয়েছে। ক্যাথিকে 'অসৎ' বলে দেখাতে চাইলেও সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির মেয়ে। বড়ো অবাস্তব লাগে। মনে হয় বাইবেলের কাহিনীতে লেখকের বোধ হয় কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা নিজের বিশ্বাস কি তা বোধ হয় নিজের অগোচরেই এই বইয়ের এক জায়গায় তিনি পাঠকের সামনে তুলে দিয়েছেন ঃ "এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার মুক্ত অনুসন্ধিৎসু মন জগতের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আমি যুদ্ধ করব চিন্তার মুক্তির জন্যে, যাতে যে কোনো দিকে সে অপরিচালিত হয়ে চলতে পারে। যদি কোন ধারণা, কোন ধর্ম বা কোন শাসনতন্ত্র ব্যক্তিকে সীমিত বা ধ্বংস করে ত তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। এই আমার চিন্তা আর এই আমার কাজ। কোন বিশেষ ছকে তৈরী নিয়ম মুক্তমনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, কারণ একমাত্র সেই মনই অনুসন্ধান চালিয়ে সেই নিয়মের ধ্বংস সাধনে সক্ষম। আমি এ বুঝতে পারি আর একে আমি ঘৃণা করি আর এর বিরুদ্ধেই আমি লড়াই করব। সৃজনীশক্তিহীন পশুর সঙ্গে এইখানেই তো আমাদের তফাৎ। এই মহত্ত্বকে যদি বিনাশ করা যায় ত আমাদের কোন আশা নেই।"

এই জন্যে মনে হয় স্টাইনবেকের দেবার পুঁজি এখনো শেষ হয়নি। তাঁর এই বিদ্রোহী মনোভাব নিছক রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করেছে, এক কথায় মানবীয় ভাব যা শিল্পের মূল কথা, সেইখানে গিয়ে পৌঁছেছে। উপন্যাস হিসেবে 'ইস্ট অব ইডেনে'র মধ্যে এর ছাপ না পড়লেও একদিন এর প্রকাশ ঘটবে তা আশা করা যায়।

॥ প্রবল আক্রমণ ॥

গত ২০শে অক্টোবর হ'তে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনাদের যুগপৎ প্রচন্ড আক্রমণ শুরু হয়েছে। ভারতের সীমান্ত-লঙ্ঘন চীন আট বছর আগেই শুরু করেছিল এবং এইবারের প্রকাশ্য ও প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করার আগে ভারতের প্রায় বার হাজার বর্গমাইল জমি তার কুক্ষিগত হয়েছিল। ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে চীন ভারতের অভ্যন্তরে প্রায় পনের মাইল চলে এসেছে এবং আজ জানা গেল দ্বিমুখী আক্রমণে চীন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জনপদ তাওয়াং অধিকার করে নিয়েছে।

চীনারা যুদ্ধে বড় কামান ও স্বয়ংক্রিয় মরণাস্ত্র ব্যবহার করছে। মাত্র ৩০।৩৫ জন ভারতীয় সৈন্যের একটি চৌকি দখলের জন্যে চীনারা ট্যাংক পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। নয় দশ হাজার ফুট উঁচু পর্বতসংকুল দুর্গম সীমান্তে চীনারা যে ট্যাংক পর্যন্ত টেনে এনেছে তা-থেকেই বোঝা যায় যে তাদের এই সামরিক প্রস্তুতি কত দীর্ঘদিনের। ভারতকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েই তারা প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সেই প্রস্তুতি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 'নোট' বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার বন্ধ্যা বিতর্কে তারা কালক্ষয় করছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর চীনের এই বিরাট সামরিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেননি বা রাখলেও এসম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেননি। আর সেই অনবধানতা ও দায়িত্বহীনতার খেসারত দিতে আজ ভারতীয় জওয়ানরা দলে দলে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে এবং ভারতের সীমান্ত শত্রুর সম্মুখে এমন-ভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও আজ এমন যে কোন বৃহৎ শক্তির সহায়তালাভের সুযোগ ভারতের নেই। এ অবস্থায় ভারতকে একাই সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু তাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভারতের শিখ, রাজপুত, জাঠ, গুর্খা, গাড়োয়ালী সৈন্য চীনাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম রণপটু নয়। জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ

হয়েও ভারতীয় সৈন্যরা জয়ী হয়েছে, সুতরাং চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে, তাদের পরাজিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। তাছাড়া আধুনিক যুদ্ধ হল সমরোপকরণের যুদ্ধ, যা চীনের চেয়ে ভারতের কম নেই, এবং আরও সমরোপকরণ পাওয়ার সুযোগ ভারতের আছে। কারণ কমিউনিস্ট জোট বাদে সারা বিশ্বের সমর্থন আজ ভারতের পিছনে। সর্ব উপায়ে ভারতকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শক্তি। প্রথম অতর্কিত আঘাতের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে ভারতের খুব বেশী সময় লাগবে না। ইতিমধ্যে প্রবল শীতে চীনের পক্ষেও সরবরাহ বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখনই তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে নেফার পর্বতশীর্ষে। আজ সারা ভারতের সকল মানুষের কর্তব্য হল সর্বশক্তি নিয়ে ভারতের এই প্রতিরক্ষা প্রয়াসকে সফল করে তোলা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছে ভারতবাসী, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগ ও দুঃখবরণে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই আহ্বানই জানিয়েছেন সমগ্র জাতির কাছে।

ইতিমধ্যে ভারতের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করে বিশ্বাসঘাতক লাল চীন আবার যে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠায় ভারত তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত জানিয়েছে, আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কোন শান্তি বা আপোষ তার কাম্য নয়। সারা দেশ ভারত সরকারের এই মনোভাবের সঙ্গে একমত।

॥ কিউবা সঙ্কট ॥

ক্যারিবিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র কিউবাকে কেন্দ্র করে আবার এক সাংঘাতিক বিশ্ব সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া গোপনে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। যা যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের নিরাপত্তার জন্যে কখনও মেনে নিতে পারে না। তাই কিউবামুখী পঁচিশটি সোভিয়েট জাহাজকে তল্লাসের উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌবহর কিউবার চারিদিকে গভীর সমুদ্রে এক দুর্ভেদ্য অবরোধের সৃষ্টি করেছে। নৌবহরের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে, প্রত্যেকটি পণ্যবাহী সোভিয়েট জাহাজে বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা তল্লাসীর পর তাদের যেন কিউবা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এই অবরোধ সিদ্ধান্তকে বে-আইনী ও অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের কিউবা-গামী জাহাজ দলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তল্লাসী অথবা অবরোধ উপেক্ষা করেই তারা যেন অগ্রসর হয়। তার পরিণতি

বই হোক, সোভিয়েট রাশিয়া তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উত্থাপন অর্থহীন; কারণ তার খেয়াল-খুশি মত ব্যাখ্যা উভয় পক্ষ থেকেই হতে পারে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন, যে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা আদপেই সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আশ্বাস অর্থহীন, তার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যে কতবড় নির্বুদ্ধিতা আজ ভারত তা চরম মূল্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে।

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সঙ্কটের নিকট-সাদৃশ্য আছে। কিউবা আজ যুক্তরাষ্ট্রকে যে বিপদের সম্মুখীন করেছে ভারতকেও সমরূপ বিপদের সম্মুখীন করেছে নেপাল। দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরই বর্তমান শাসকবর্গ জনগণ-নির্বাচিত নন, তাঁরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা তারও কোন যাচাই হয়নি। অথচ তারা যে প্রবলতম প্রতি-দ্বন্দ্বী দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নেপাল যেমন আজ সম্পূর্ণরূপে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আজ্ঞাবহ, কিউবাও তেমনি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আজ্ঞাবহ। এ অসহনীয় অবস্থা ভারত নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র তা পারে না, রাশিয়াও পারত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া প্রতি-বেশী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড দখল করেছিল শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে ফিনল্যান্ডের সীমান্ত থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব মাত্র বারো মাইল, অতএব ফিন-ল্যান্ড শত্রুকবলিত হওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। সীমান্তবর্তী হাঙ্গেরী রাষ্ট্রে যখন রাশিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইমরেনজ সরকার কায়েম হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সে সরকারকে ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়িয়ে দিতে রাশিয়ার দ্বিধা-বোধ হয়নি। রাশিয়ার চারিদিকে আজ এমন কোন সরকারের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব নয়, যা রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন করে না।

সুতরাং কিউবাকে কেন্দ্র করে আজ যে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে তার মধ্যে আদর্শবাদ বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর। এখানে একমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নই বড় কথা, যে প্রশ্নে আপোষের সুযোগ খুবই কম। অতএব রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কায় বিশ্ববাসীর মুহূর্ত গণনা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। (সর্ব শেষ সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন অবরোধ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন।)

॥ উপদেশ ॥

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রে চীনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশটি তিনি চীনকে না দিয়ে ভারতকে দিলেন কেন বোঝা গেল না। চীন-ভারত সংঘর্ষে আজ ভারতের ভূমিকা কি? সে অত-র্কিতে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে—এঅবস্থায় ভারতের পক্ষে আলোচনা শুরু করার অবকাশ কোথায়? পর্তুগালের জবরদখল থেকে ভারতের ছয় শ' বর্গমাইল ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্যে ভারত যখন অস্ত্রধারণ করেছিল তখন ক্রুশ্চেভ তাকে দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যখন চীন বারো হাজার বর্গমাইল ভারতীয় ভূমি গ্রাস করে আরও জবর-দখলের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভারত তা প্রতিরোধের জন্যে সর্ব সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন এই আলাপ-আলো-চনার উপদেশ কেন? সেকি পর্তুগাল বিরোধীপক্ষ আর চীন স্বপক্ষ বলে? আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমাণ করলেন, এতদিন বিভিন্ন প্রশ্নে ভারতকে যে সমর্থন তাঁরা জানিয়েছিলেন তা নিছকই রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে, নীতির প্রশ্ন তাতে ছিল না। সোভিয়েট গোষ্ঠী-ভুক্ত কোন দেশ চরম অন্যায় করলেও ভারত সোভিয়েটের সমর্থন পাবে না। ভারতভূমি বেদখল হতে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের কোন আপত্তি নেই যদি কোন কমিউনিস্ট দেশ সেই জবরদখল জমির মালিক হয়।

॥ আলবেনিয়া ॥

আলবেনিয়া কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য ও আলবেনিয়া সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান তিনজনের নেতৃত্বে একটি বেসরকারী বাণিজ্য প্রতি-নিধি দল লণ্ডনে গিয়েছেন বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে।

১৯৩৯ সালের পর বৃটেনে এই প্রথম আলবেনিয়া থেকে একটি মিশনের আগমন হল। কারণ তারপরেই যুদ্ধ বেধে যায় এবং যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে কর্ফু ঘটনাবলীর ফলে বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার কূটনৈতিক যোগা-যোগ ছিন্ন হয়। কর্ফু প্রণালীতে আল-বেনিয়ার মাইনের আঘাতে বৃটেনের দুটি জাহাজ জলমগ্ন হয়। তারপর থেকে গত সতের বছরের মধ্যে বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার আর কোন রকম যোগাযোগ ছিল না।

কিন্তু আজ প্রায় নিরুপায় হয়েই আলবেনিয়াকে বৃটেনের কাছে যেতে হয়েছে। বছরখানেক আগে আলবেনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ হলে রাশিয়া আলবেনিয়াকে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়। চীন তখন আলবেনিয়াকে সর্ব-উপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত চীনের কাছ থেকে আলবেনিয়া যে সাহায্য পেয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। আলবেনিয়া প্রস্তাব নিয়ে এসেছে যে, বৃটেনকে তারা ক্রোম, তামা, এলুমিনিয়ম ও তামাক সরবরাহ করবে, তার বিনিময়ে বৃটেনের কাছ থেকে তারা নেবে ভারী যন্ত্রপাতি যা তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে একান্তই দরকার।

॥ ঘরে ॥

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক ঃ চীনের হুমকীর মোকাবিলার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তুতি—দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নেফার ঢোলা এলাকার চীনা আক্রমণজনিত সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা ঃ যে-কোন মূল্যে ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডত্ব বজায় রাখা হইবে।

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক ঃ নেফার ভারতীয় জওয়ানদের অতুলনীয় বীরত্ব—ঢোলা অঞ্চল হইতে চীনা ফৌজ বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ—লংজু হইতেও চীনাদের পশ্চাদপসরণ।

'চীনা আক্রমণের ফলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হইয়াছে'—ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গের ঘোষণা—চীনা আক্রমণরোধে দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়ার আহ্বান।

'দাবী (১৭ দফা) না মিটিলে বন্দর ও ডক কর্মীদের (প্রায় দেড় লক্ষ) ধর্মঘট অপরিহার্য'—সারা ভারত পোর্ট ও ডক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন সভাপতি শ্রী এস আর কুলকার্ণির সতর্কবাণী।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক ঃ নেফা ও লডাক অঞ্চলে (ভারত) চীনা বাহিনীর যুগপৎ প্রচন্ড আক্রমণ—নেফার ঢোলা ও খিঞ্জেমানে ঘাঁটি এবং লডাকে দুইটি ঘাঁটি পতনের সংবাদ—সংখ্যাবলে বলীয়ান চীনা আক্রমণের মুখে ভারতীয় সৈন্যদের বীরোচিত সংগ্রাম—চীনা পক্ষে ভারতের তুলনায় চতুর্গুণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছে বলিয়া দাবী।

'মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় চীনের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করিব'—দিল্লীর জনসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের দৃপ্ত ঘোষণা—চীনের নগ্ন ও ব্যাপক আক্রমণ এবং সম্প্রসারণশীল নীতির তীব্র প্রতিবাদ।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক ঃ লডাক ও নেফা সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যগণের অবিরাম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম—প্রতি ইঞ্চি ভূখন্ড রক্ষার জন্য মরণ পণ—নামচুকা নদীর (নেফা) উত্তরস্থ ঘাঁটি সকল ও লডাকে আরও দুইটি ঘাঁটির পতন—চীনা হানাদারদের ভারী ভারী কামান ও মর্টার ব্যবহার।

'আক্রান্ত হইলে ভুটান সর্বশক্তি লইয়া বাধা দিবে'—নেফার পরিস্থিতি সম্পর্কে কলিকাতায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমি দর্জীর বিবৃতি।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক ঃ লডাক রণাঙ্গনে চীনা হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক ব্যবহার—নেফা অঞ্চলেও প্রচন্ড লড়াই—নূতন ব্যূহসজ্জার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের কয়েকটি ঘাঁটি ত্যাগ।

'সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও পরিণামে জয় অনিবার্য'—উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রচন্ড আহ্বান।

চীনা হামলার পটভূমিতে কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের সুপারিশ—উড়িষ্যা বিধানসভার জরুরী প্রস্তাব।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক ঃ নূতন কয়েকটি স্থানে আক্রমণকারী চীনা বাহিনীর ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম—তাওয়াং-এর দিকে চীনাদের হিংস্র বাহু বিস্তার—সর্বত্র ভারতীয় ফৌজের তীব্র প্রতিরোধ।

'চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ ও হৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ব্যতীত বিকল্প পথ নাই'—দিল্লীতে রাজ্যপাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের তেজোদৃপ্ত ভাষণ।

'আক্রমণ প্রত্যাহার না করিলে চীনের সহিত আলোচনা সম্ভব নহে'—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের নিকট শ্রীনেহরুর জবাব।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক ঃ মীমাংসা-আলোচনার নামে চীনের কপট প্রস্তাব (তিন দফা) ভারত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান—ভারতের সর্ত ঃ আগে চীনা ফৌজকে প্রাক্ অভিযান স্থলে (৮ই সেপ্টেম্বর যেখানে ছিল) হটিয়া যাইতে হইবে, তারপর কথাবার্তা।

মধ্য নেফায় চীনা হানাদারদের নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি—তাওয়াং-এর দিকে সাঁড়াশী অভিযান—ভারতীয় ফৌজের সর্বত্র অকুতোভয় সংগ্রাম—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন ও আত্মত্যাগের প্রস্তুতি।

॥ বাইরে ॥

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক ঃ পূর্ব নেপালের ইলামে (দার্জিলিং সীমান্তের কয়েক মাইল দূরবর্তী বিমান অবতরণ ক্ষেত্র) প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র মজুত—বিদ্রোহ দমনে নেপাল সরকারকে চীনের সাহায্য।

'গণভোটে (২৮শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য) স্পষ্ট না জিতিলে পদত্যাগ করিব'—ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের ঘোষণা—প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবীতে দৃঢ়তা প্রকাশ।

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক ঃ প্রিন্স হাসানসহ ইয়েমেনী রাজপরিবারের ৮ জনের প্রাণদন্ড—বিশেষ সামরিক আদালতের রায়—দন্ডাদেশ ইয়েমেনী বিপ্লবের নেতা কর্ণেল আব্দাল্লাল এল সাল্লাল কর্তৃক অনুমোদন।

সাধারণ পরিষদে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) ভারত সমেত জোট বহির্ভূত ৩৭টি রাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব পেশ।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক ঃ ভারতের উত্তর সীমান্তে চীন-ভারত সংঘর্ষের তীব্রতায় মার্কিণ মহলে উদ্বেগ—কেনেডি সরকার কর্তৃক ভারতের উপর চীনা হামলায় কঠোর নিন্দা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত পত্র (চীনের সহিত আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব সম্বলিত) প্রেরণের সংবাদ।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক ঃ ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্ত—প্রতিবিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্যদান।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক ঃ 'দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি বৃহত্তর সংগ্রাম ডাকিয়া আনিতে পারে'—বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) ভারতের সতর্কবাণী।

কিউবার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট কেনেডি (আমেরিকা) কর্তৃক নৌ-অবরোধের নির্দেশ—অস্ত্রবাহী (কিউবায় প্রেরিত) সোভিয়েট জাহাজ সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সতর্কবাণী—রাশিয়ার পক্ষ হইতে পাল্টা হুঁসিয়ারী—প্রধানমন্ত্রী কাস্ত্রো কর্তৃক কিউবার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক ঃ সীমান্ত বিরোধে ভারতের প্রতি মিঃ ম্যাকমিলানের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) পূর্ণ সমর্থন—প্রেসিডেন্ট নাসের (সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র) কর্তৃক শ্রীনেহরু ও চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই'র নিকট মধ্যস্থতার প্রস্তাবসহ পত্র প্রেরণ—সাধারণ পরিষদের (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) অধিবেশনে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ষ্টিভেনসন কর্তৃক ভারতে কম্যুনিষ্ট চীনের নগ্ন আক্রমণের উল্লেখ।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক ঃ কিউবা প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন—সঙ্কট নিবারণে নিরপেক্ষ দেশগুলির চেষ্টা।

কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার নৌ-অবরোধ আরম্ভ—সমর-সম্ভারবাহী ২৫ খানি রুশ জাহাজের কিউবা অভিমুখে অভিযান।

বার্লিন অভিমুখে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও মোটরযান বাহিনী প্রেরণের সংবাদ।

অভয়ঙ্কর

॥ লেখকের খেয়াল খাতা ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিন সারা পৃথিবীকে উদ্বেগ আর উত্তেজনায় আকুল করে তুলেছে। টমাস মান তখন কালিফোর্ণিয়ায়, আশপাশে তাঁরই মত কয়েকজন নির্বাসিত জার্মানের ম্লান মুখ দেখা যায়, যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করছেন প্রবীণ চিন্তানায়ক অপরিসীম আগ্রহে, মনে তাঁর উৎকণ্ঠা আর তীব্র বেদনা। নিয়তই তিনি চিন্তা করছেন সারা বিশ্বব্যাপী এই অগ্নি-কান্ডের শেষ কোথায়? তাঁর স্বদেশের বর্তমান ব্যাধি আর নিদারুণ ভবিষ্যতের কথা! পড়ছেন হুগো উলফের চিঠি-পত্র, নীট্‌সে আর পল বেক্‌কারের "History of Music"—এমন সময় হঠাৎ মনে হল যে, ফাউস্তের উপকথা নিয়ে উপন্যাস রচনা করবেন, তার নায়ক হবেন একজন শিল্পী। এ চিন্তা তাঁর দীর্ঘদিনের। কিছু কিছু নোট লিখেছেন খেয়াল খুশীমত, বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা, অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন। এই খেয়াল-খাতার পাতায় যে উপন্যাসের উপকরণ রয়েছে তা কোনও দিন তাঁর মনে হয়নি, কিন্তু একদিন যখন এই বিচিত্র চিন্তার হিজিবিজির প্রতি হঠাৎ নজর পড়ল তখন তিনি বুঝলেন এ বড়ো গল্প নয় উপন্যাসের মালমশলা।

সচেতন মনের গভীরে উপন্যাসের অংকুর লালিত হয়েছে। তাঁর বিরাট উপন্যাস "Joseph and His Brethren" সেইকালে সমাপ্তির মুখে, এমন সময় "Dr. Faustus"-এর পরিকল্পনা তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হল।

কিছু পাঠক টমাস মানকে তেমন সুনজরে দেখেন না। তাঁর কাহিনী-বর্জিত রচনায় যে বস্তুটির অভাব তার নাম হিউমার। অথচ হিউমার সম্পর্কেও তিনি অজস্র লিখেছেন, কোথায় এবং কেমনভাবে কি মাত্রায় তা প্রবোজিত হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন। আসলে তাঁর সকল উপন্যাসের অন্তর্নিহিত হিউমার অতিশয় গভীর এবং সুসংহত। তাঁর রচনায় যে পরিণত মানসের পরিচয় পাওয়া যায় পাঠককে তা বিস্ময়াহত করে, এবং অনেক সময় মনকে নিরানন্দ করে তোলে।

এই বিচিত্র লেখকের যাঁরা ভক্ত, সেই অসংখ্য অনুরাগীদের কাছে এসব অতি তুচ্ছ এবং উপেক্ষার বস্তু, তাঁর রচনার প্রগাঢ় ভাবাবেগ পাঠকচিত্তে সুগভীর অনুভূতি জাগায়। তাই Dr. Faustus উপন্যাসের পরিকল্পনা এবং পরিণতি সম্পর্কিত যে অজস্র খুঁটিনাটির পরিচয় পাওয়া যায় THE GENESIS OF A NOVEL"-এ তাতে বিস্ময়ে প্রাণ আকুলিত হয়। "Dr. Faustus" টমাস মানের মহত্তম উপন্যাস নয় বটে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য উপন্যাস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই উপন্যাসের নেপথ্য-বিধান দেখতে পাওয়া যে কোনও সৎ-পাঠকের কাছে এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এ কথা অত্যুক্তি নয়।

পরিণত বয়সের লেখকের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি যে উত্তরসুরীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, দেহে থাকে না যৌবনের অদম্য উৎসাহ, মনে থাকে না অপরাজিতের ভয়শূন্য চিত্ত, শরৎকালের বিত্তবিহীন মেঘের মত যেন হালকা হাওয়ায় সাহিত্যাকাশে ভেসে বেড়ানো। মানও এই সংশয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন, অনেক দ্বিধা, অনেক সংশয় নিয়ে সেদিন ডায়েরীতে লিখেছিলেন :

"Do I have the strength for new conceptions? Have I not used up my subject-matter? And if not—shall I be able to summon up desire for work? Glooming weather, raining cold. With a headache, I drew up outline and notes for the Novella."

লস এঞ্জেলাসে কনসার্ট শোনার জন্য ছুটলেন টমাস মান, সেখানে হরোউইৎস্ 'বি' ফ্লাট মেজরে ব্রাহ্মের পিয়ানো কনসার্টো বাজাচ্ছেন তা শুনলেন। বাড়ি ফিরে এসে পড়লেন গেন্টা রোমানোরম আর নীট্‌সে, সেই সঙ্গে স্টীভেনসন। ফাউস্ট উপজীব্যকে একটা আকারদানের চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না।

বৃদ্ধ বয়সের শিথিল মানসিকতার অসহায়ত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তাঁর নতুন গ্রন্থের নামকরণ করা হবে 'My Parsifal' এই স্থির করলেন। ইবসেন এবং গ্যয়টের সর্বশেষ রচনাবলীর দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, ১৯৪৫-এ তাঁর মৃত্যু ঘটবে আর 'Dr. Faustus' রচনা করতে প্রয়োজন হবে হৃদয়-শোণিতের। তাই ভাবলেন, এই বৃহৎ কর্ম শুরু করার আগে অন্য কিছু করা যাক, তাই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যে সব রচনার খসড়া করেছিলেন তাই শেষ করতে বসলেন, যথা : "Confessions of Felix Krull" বা "Confidence Man"

১৯৪৩-এ টমাস মান লিখতে বসলেন "Dr. Faustus"। চতুর্দিকে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটছে, নিজের শরীর অবসন্ন, প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছেন, একটা গুরুতর অস্ত্রোপচার করাতে হল। জার্মানীর দুঃখে তিনি বিগলিত এবং বিচলিত, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অন্তরে সংশয়। এই শোক, দুঃখ, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হল এই বিস্ময়কর গ্রন্থ। শোক এবং উদ্বেগ থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখার জন্যই কি এই সৃষ্টির প্রয়াস, এ কি আর এক জাতের পলায়নী মনোবৃত্তি। কিংবা শোক এবং এই সাহিত্যকর্ম অন্য কোনও মানসিকতা থেকে উদ্ভূত? এই জাতীয় নানা প্রশ্ন লেখক করেছেন, নিজের অন্তরকে উৎপীড়ন করে অনুসন্ধান করেছেন, সত্যের, সুন্দরের, শিবের। এই সব প্রশ্ন আর তার উত্তরে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'The Genesis of a Novel'-এ সব কিছু প্রশ্ন ও তার সমাধান খুঁজে পাবেন। লেখক সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচারের একটা সূত্রের সন্ধান এই গ্রন্থে পেতে পারেন।

মানের খেয়াল-খাতার একটা অংশ এখানে উধৃত দেওয়া হল, তাঁর তৎকালীন মানসিকতার এক নিখুঁত রেখাচিত্র :—

"On German urban life in Luther's reign. Also medical and theological readings. Gropings, attempts, and a tentative feeling of greater security in the atmosphere of the subject. Walked the mountain Road with K. All day reading Luther's Letters. Took up Ulrich Von Hutten by D. F. Strauss. Decided to study books on Music.....Nothing yet has been done about stuffing the book with

[illegible]

তার ফাউস্টাসের কাহিনী উদ্ভব শ্রুবের নিয়তে। তার নাম রজাইটাম, লোকটি শুষ্কশুতে, উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এবং কিঞ্চিৎ হাস্যকর চরিত্র। কিভাবে এবং কেন এই আইডিয়া টমাস মানের মাথায় এসেছিল তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমার বিষয়গত চরিত্র এবং আমার মধ্যে 'বন্ধু'র মাধ্যম কেন আরোপ করেছি আমার সেইকালের ডায়েরীতে তার কোনও উল্লেখ নেই। এড্রিয়ান লিভার-কুহনের কথা সরাসরি তাকে দিয়ে না বলিয়ে কেন সেটা বলেছি, ফলে নভেল নয় জীবনী রচনা করেছি, তার সব জড়িয়ে। দানবীয় এক ঝোঁককে অদানবীয় খাতে প্রবাহিত করেছি। একটা নিরীহ, সরল আত্মাকে প্রকাশ করেছি, ভীরু ও সহৃদয় মানুষ। এই কাহিনী যে-ভাবে কথকতা করা হয়েছে, তা নিজেই একটা কমিক আইডিয়া।"

এ যুগের উচ্চাভিলাষী লেখকের Slyness-এর এ এক অত্যাশ্চর্য উদাহরণ। মান ছিলেন এই গুণের এক শক্তিশালী অধিকারী, তাই রজাইটাম তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির এক বিশিষ্ট পরিচয়। এই Slyness তথাপি এমন এক অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সমাবেশে সমৃদ্ধ, যা জেমস জয়েসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৩-এ এই উপন্যাস রচনা তিনি শুরু করেন। ফেলিক্স ক্রুলের আত্মজীবনী তাঁকে সচেতন করে দেয় যে উপন্যাসের বীভৎসতা সহনীয় হয় যদি তাতে কিঞ্চিৎ 'হিউমার' দিয়ে সরস করা যায়। এই উপন্যাস যতই অগ্রসর হয়েছে ততই তাতে ইতিহাস, সাহিত্য, ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মালমশলা এসে জমেছে। অঙ্কিত পরিপ্রেক্ষিতের এবং মরিচীকার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে বাস্তব জগৎ প্রবেশ করেছে। এই আঙ্গিক টমাস মানের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। তিনি একে বলেছেন মনতাজ টেক্‌নিক। এইভাবেই তিনি সমগ্র কাহিনীটি অন্তর্ধানপটে স্বপ্ন দেখেছেন এবং অন্য কোনও পথ ছিল না একে প্রকাশ করার।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে যখন তিনি নবম পরিচ্ছেদ লিখছেন তখন আবার অষ্টম পরিচ্ছেদ পড়লেন। সেই পরিচ্ছেদটি সন্তোষজনক মনে হল না। এর উপসংহার ... তিনি নিরাবিচ্ছিন্নভাবে তা লিখে আনলেন। ষষ্ঠীতম জন্মদিবসে তাঁর সঙ্গে যে জীবন ভোগ করেছেন, নির্বাসনকালে উদ্বেগের জীবন, আর তাঁর প্রিয় বন্ধু ব্রেনি সেহিকেলের মৃত্যু তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তিনি পড়তে লাগলেন। তিনি দেখলেন স্নাইডারের লেখা বীটোফেনের জীবনী বেশ কার্যকরী।

এর পর এল ফাউস্টাস রচনায় সুদীর্ঘ বিরতি। কানাডা এবং নিকট-প্রাচ্যে তিনি বেড়াতে গেলেন। কয়েকটি অবিস্মরণীয় সপ্তাহ ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও মন্ট্রিয়েলে কাটালেন। কিন্তু এই অবসরের কালেও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে অসমাপ্ত উপন্যাসের চিন্তা। ম্যানিকের এক পুস্তকবিক্রেতার সঙ্গে এক মজার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। তিনি সেন্ট্রাল ন্যার্ভাস সিস্টেমের সিফিলিস সংক্রান্ত কয়েকটি বই চান। তিনি লিখেছেন: "আমার এই অনু-সন্ধানে ভদ্রলোক একেবারে শিউরে উঠলেন সে কথা আমার মনে আছে, যেভাবে তিনি ভ্রূকুঞ্চন করলেন তাতে আমার মনে সন্দেহ রইল না যে, আমি যে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়।"

আবার বাড়ি ফিরে এলেন নতুন মন নিয়ে, উপন্যাস লেখা চলতে লাগল। ১৯৪৪-এ তিনি চিত্রশিল্পী ভেরফেলের কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। 'বাডেন-ব্রুকসে'র প্রশংসা করেছেন তিনি। টমাস মান ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর যৌবনের রচনাই কি শুধু ভবিষ্যতের মানুষ স্মরণে রাখবে? সেই সঙ্গে তিনি আর এক-বার Loves Labour Lost পড়লেন, একটি লাইন মন কে নাড়া দেয়। সেই লাইনটি তিনি কপি করে রাখলেন—"when great things labouring perish in their birth". টমাস মানের মনে হল যে, এই উক্তি 'ফাউস্টাস' সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এই সব এবং আরো অনেক কিছু কৌতূহলময় উল্লেখ আছে। টমাস মান কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন 'A Sketch of My Life', একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, The Genesis of a Novel সেই গ্রন্থটির সমতুল নয়। তথাপি লেখকের খেরাল-খাতা হিসাবে এই

... এবং রচনা প্রভৃতির জন্য তাই জনমান, চিন্তা এবং ধীর পরিশ্রম। আর সেই সঙ্গে শিল্পীর মনে থাকবে আশা, উৎসাহ ও অবসাদ। এই শেষোক্ত গুণ টমাস মানের চরিত্রে বিশেষভাবেই ছিল। তাঁর সংগ্রাম, আশা, নিরাশা, এবং চিত্ত-বিনোদনের ইতিহাস হিসাবে এই খেরাল-খাতা স্মরণীয় গ্রন্থ। *

THE GENESIS OF A NOVEL: (By THOMAS MANN— (Secker & Warburg: 18 Shillings)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সমালোচনা)— নিতাই বসু। কমল প্রকাশনী। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া। দাম সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় একমাত্র বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। পূর্বসূরী-প্রভাব-বর্জিত এই কথাশিল্পী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি একথা সত্য এককালে বাংলা দেশের পাঠকসমাজ থেকে তিনি যোগ্য সমাদর লাভ করেছিলেন। যদিও কোনো কোনো সর্বদ্রষ্টা প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা এক-দিন তাঁর মধ্যে একমাত্র বিকারেরই প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন।

নিতাই বসু নবীন (?) সমালোচক। দীর্ঘকাল তাঁর বর্তমান আলোচনা একটি ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই আলোচনা পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা-গ্রন্থ হলেও বর্তমান গ্রন্থখানি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে কোন-প্রকারে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। সর্বা-পেক্ষা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করেছি সমালোচকের পারম্পর্যহীন বক্তব্যকে। শব্দ সাজিয়ে বাক্য গঠন হয় সত্যি। এবং প্রত্যেকটি বাক্যের একটি অর্থ আছে। একটি আলোচনায় পরস্পর বাক্য একই ভাবধারায় গ্রথিত থাকে একটি অনুচ্ছেদে। বর্তমান গ্রন্থে একদিকে যেমন আছে অর্থহীন অসংখ্য বাক্য তেমনি আছে

যুক্তিহীন বক্তব্যের সমাবেশ। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার অভিপ্রায়কে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আলোচনার পূর্বে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন।

বর্তমান সমালোচক অযথা অসংখ্য বিদেশী খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম প্রাধান্য দিয়ে গ্রন্থটি নাম-ভারাক্রান্ত করেছেন।

'বিচার-তত্ত্বের দিক থেকে অনেকে আমার সংগে হয়তো একমত হবে না, তবে তথ্যের ভ্রান্তি বা অপ্রাচুর্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা অনেক কম।'—তত্ত্ব বা দর্শন যাই বলুন সেখানে বক্তব্যকে উপযুক্তভাবে তুলে ধরতে না পারলে 'তথ্যের ভ্রান্তি' বা 'অপ্রাচুর্য' কিছু ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয় না। এই ধরণের আলোচনায় আলোচক কত বেশী প্রলাপ বকতে পারে বর্তমান সমালোচক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া তথ্যের ভুলও কি একেবারেই নেই?

লেখকের ভাষা সম্পর্কে আপত্তি আছে। এই ধরণের অস্বচ্ছ ভাষারীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। বানান ভুল এবং মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে যোগ্যতর আলোচনার জন্যে আমাদের প্রত্যাশা এখনো অপূর্ণ থেকে গেল।

ফিরাগমন (উ প ন্যা স)—মি হি র আচার্য। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে মিহির আচার্য মননশীল ঔপন্যাসিক হিসাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর আগে তাঁর পাঁচ-ছয়টি উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহ পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে। ফিরাগমন তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনা। গোড়া থেকেই আমরা মিহির আচার্যের মধ্যে একটা সুস্থিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথটাকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। ত্রুটি তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তাঁর রচনায় অনেক সময় প্রেমের একঘেয়ে রূপ বা অস্বাভাবিক বিকৃতি আমার নিজের কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তিনি এক অন্ধ গলির পথে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু এ ত্রুটিগুলি সাময়িক। নিজেকে গড়ে তোলার কাজে এ বিচ্যুতি প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীর মধ্যেই আসে। মিহির আচার্যের রচনায় আমরা এ বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নতুনের ইঙ্গিত পেয়েছি। সেটাই আমাদের কাছে আশার কথা।

'ফিরাগমন' উপন্যাসে যে জিনিসটা আমাকে প্রথমত আনন্দ দিয়েছে তা হচ্ছে এর অপূর্ব বিষয়নিষ্ঠতা। নিবিড় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিন্ন এ ধরণের বিষয়-নিষ্ঠতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর-বীরভূমের সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই অঞ্চলটি মোটেই অপরিচিত নয়। তিমে-তালের গ্রাম্য জীবন—চাষবাস, ঝগড়া-বিবাদ আর নারী-লোলুপতা এই নিয়েই মানুষজনের সকাল-সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। জীবনীশক্তি আছে মানুষগুলির প্রচুর কিন্তু সর্বত্রই সে শক্তির অপচয় আর বিকৃতি। লেখক নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসটিতে। গ্রাম মোড়ল গঙ্গা ঘোষ ও তার ছেলে ভোলা, দুশ্চরিত্র পোস্ট-মাস্টার বিনোদ ঘোষ, ক্রিশ্চিয়ান সুধন প্রামাণিক ও তাঁর দুই মেয়ে সুলেতা-সুনীতি, বোর্ড প্রেসিডেন্ট নারায়ণ ত্রিবেদী, রক্ষিতা শশিমুখী, বহিরাগত ফেরিঅলা মাস্টার—কত না বিচিত্র চরিত্র। আর কোনটাই বেমানান বা জোর করে টেনে আনা নয়। লেখনীর আতিশয্য যত টাই হোক না কেন, প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা আর সংলাপের ব্যবহার বইটির আরেকটি উজ্জ্বল দিক। মাঝে মাঝে লেখকের বিশেষ সংলাপের ব্যবহার আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবে লেখকের স্বল্প ধারালো কথায় পরিবেশগত প্রকৃতির বর্ণনা অতুলনীয় ও একান্ত নিজস্ব। শেষকালে একটি বিরূপ মন্তব্য না করে পারলাম না। আমার মনে হয়েছে লেখক ভোলা আর সুলতার জীবনের শেষ পরিণতিটি ঠিকমত টানতে পারেননি। সেজন্য উপন্যাসটির সমাপ্তি একটু খাপ-ছাড়া মনে হয়। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও অনবদ্য প্রচ্ছদপটটি অতি উচ্চ রুচির পরিচায়ক।

হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু— (ভ্র ম ণ-কাহিনী)—প্রবোধ দে। প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স। ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিঃ—৭। মূল্য—পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভ্রমণ-রসিক লেখক তাঁর প্রথম গ্রন্থটি ভ্রমণ-রসিকদের হাতেই সঁপে দিয়েছেন। লেখক নেপালের সৌন্দর্য এবং প্রকৃতি বর্ণনাতেই তন্ময় নন, নেপালের গণ-জীবনের কথা তথা তার সংস্কৃতিও লেখার গুণে ভ্রমণ-কাহিনীর অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে। লেখক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; তাই প্রকৃতির ভাষায় গভীরে প্রবেশ করে তিনি ভারতের চিরন্তন বাণীর সন্ধান করেছেন এবং সে সন্ধানে তিনি সার্থকতাও লাভ করেছেন। তাঁর লেখার ভঙ্গিকে এক কথায় বলা যায় সুন্দর এবং সংযত।

ভ্রমণ-কাহিনীতে গল্পের উপাদান অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই উপাদান অসঙ্গত নয়।

লেখক কুশলী আলোকশিল্পী। বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে লেখকের এই কুশলতার পরিচয়।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা —বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার, পাঠক ও গবেষকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবেন। এমন একটি তালিকার প্রয়োজন বহুদিন থেকে অনুভব করা যাচ্ছিল। বলা বাহুল্য একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা গবেষকদের প্রধান সহায়। অহেতুক পরিশ্রম ও উদ্বেগ তাঁদের ঘুচে যায় যদি তাঁরা সময়মত পান গ্রন্থের তালিকা) কাজও হয় আরও উচ্চমানের। পাঠকদের পক্ষে তালিকা দিক-দিশারী। রুচিকে উন্নত ও সুগঠিত করতে নির্বাচিত তালিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্ব-পূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই কাজে হাত দিয়ে আমাদের প্রকৃত উপকার করেছেন এবং এই প্রাথমিক কাজের জন্য পাঠক ও গবেষকদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু কাজটি প্রাথমিক বলে বোধহয় কয়েকটি ত্রুটি থেকে গেছে। সত্যিই এমন কতকগুলি বই অনুল্লিখিত আছে যা যে কোন দিক থেকে মূল্যবান। হয়ত পরিষদের কথা চিন্তা করে সংকলয়িতাদের মাত্র দু' হাজার গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। তাই পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানে ছাপা বই। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মেটানোই

প্রয়োজন রাখে। এবং সে দিক থেকে সার্থক।

কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই যে, যদি এই তালিকাকে আর একটু প্রসারিত করা হত তবে কি ক্ষতি হত? যে সব গবেষক বা সিরিয়াস পাঠক অধ্যাপকের সাহায্য না পেয়ে নিজের মত কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁদের সংখ্যা আজকাল বাড়ছে, তাঁদের প্রয়োজনের দিকে একটু মনোযোগ দিলে তালিকা হয়ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। কিন্তু তার মানে আমি এই কথা বলতে চাই না যে, এ তাবৎকালের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা চাইছি। আমি বলতে চাই, নির্বাচনের ব্যাপারে আরও বিচক্ষণতা থাকলে গ্রন্থটি আরও মূল্যবান হতে পারত। এই সঙ্গে যদি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকা থাকত তাহলে সংকলনের মূল্য আরও বাড়ত।

অবশ্য এই ধরণের সংকলন এই প্রথম প্রকাশিত হল। তার জন্য প্রাপ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংকলয়িতাদের ত্রুটিমুক্ত ও আরও সসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

হেমন্তের সনেট— (কাব্য-গ্রন্থ)—পবিত্র মুখোপাধ্যায়। টিচার্স বুক এজেন্সী, কলকাতা—৯। দাম দু টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শবযাত্রা'র পর স্বল্পকালের ব্যবধানেই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্য "হেমন্তের সনেট" প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে ১৩৬৮ সালে রচিত উনচল্লিশটি সনেট। সনেটগুলি বিষয় অনুসারে 'কবিতা' 'প্রেম', 'বিষাদ' এবং 'মৃত্যু'—এই চার ভাগে সন্নিবিষ্ট।

গ্রন্থে পরিণতির দিকে ক্রম-অগ্রসর এক কবিমনের সাক্ষাৎ ঘটে। তরুণ কবির শক্তির স্বাক্ষর বহন করছে কবিতাগুলি। একটি গতিময়, স্বতঃস্ফূর্ত, তীব্র-তীক্ষ্ণ আবেগ কোনো কোনো কবিতার মধ্যে অবয়ব লাভ করেছে। স্থানে স্থানে উপমা এবং চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহার কবিতাকে সুষমামণ্ডিত করেছে। 'জানি, প্রস্থানের চিহ্নে কণ্টকিত স্মৃতির প্রান্তর', কিম্বা 'একা বসে আছো বটে স্মৃতিফলকের মতো একা?'—এরূপ অনুভবময়, উজ্জ্বল কিছু পংক্তিও রয়েছে যা কবিতা-পাঠকের স্মৃতিতে সম্পদ হবার যোগ্য।

কিন্তু মাঝে মাঝে কবির আবেগ যা বক্তব্য অসংহত, সুপ্রচুর কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেনি; ফলত, কোন কোন কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ অগভীর উচ্ছাসে পরিণত হয়েছে, কখনো বা ব্যঞ্জনাহীন ভাষণে। এ ছাড়া চিত্রকল্প ও শব্দের ব্যবহারে কবির অনবধানতা এবং বহুব্যবহৃত উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার অনেক স্থলে কবিতার আবেদন সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে।

পরিশেষে দুটি প্রশ্ন; 'বিষাদ' অধ্যায়ের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের সবগুলি কি-অর্থে বিষাদ-বিষয়ক? আর, অন্ত্যমিলহীন যে কয়েকটি চতুর্দশপদী গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে সেগুলিকে কি সনেট অভিধায় আখ্যাত করা যায়?

তাছাড়া কবির পূর্ব-প্রকাশিত 'শবযাত্রা' কাব্যের ভাব এবং ছাপ উভয়ই এ গ্রন্থের মধ্যে বার বার চোখে পড়ে। এমন কি শব্দপ্রয়োগ কোথাও কোথাও একই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরিশ্রমী বলে আশা করা যায়, কবি তাঁর কাব্য জীবনের এই সন্ধিক্ষণ কাটিয়ে অচিরেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সার্থক হ'য়ে উঠবেন।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

স্বাগত (শারদীয় ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বগত সাহিত্য পরিষদ, দুর্গাপুর—৪; বর্ধমান।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে আমরা ইতিপূর্বে 'অমৃত'র পাতায় অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। বর্তমান সংকলনটি হাতে নিয়ে আরও নিশ্চিত হলাম যে আমাদের অভিনন্দন অপাত্রে বর্ষিত হয়নি। আশরফ সিদ্দিকী, কৃষ্ণ ধর, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, যোজ্ঞানা বিশ্বনাথম এবং আরো অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ।

পার্বণী—সম্পাদক— জ্যোতিভূষণ চাকী। চিনকো — ১৬৭এন, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দাম—তিন টাকা॥

পুজো-পার্বণ উপলক্ষে প্রকাশিত 'পার্বণী' শিশু-সাহিত্যের অন্যতম মনোরম সংকলন। পড়তে ভালো লাগে এবং সেই ভালো লাগার জন্য নতুন কিছু লেখাও যার এমন অনেক লেখা এই সংকলনটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। শিশু ও কিশোরদের প্রিয় লেখক-লেখিকা শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখলতা রাও প্রভৃতির মতোই নানা রকম সুখপাঠ্য লেখা লিখেছেন সেইসব লেখক-লেখিকারা, যাঁরা শিশুদের ভালোবাসেন। এঁদের মধ্যে হিরণকুমার সান্যালের হাসির-কৌতুক গল্প, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ছড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আশা দেবীর লেখা উল্লেখযোগ্য। তিন রং-এর প্রচ্ছদটি চিত্তাকর্ষক।

কমল (শারদীয়া ॥ ১৩৬৯)—নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

বর্তমান সংখ্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হচ্ছে চিত্তরঞ্জন ঘোষ রচিত নাটক 'ডিরোজিয়ো'। কবিতা লিখেছেন— শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, বিনয় মজুমদার, দিলীপকুমার সেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে; গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন—রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, নিতাই বসু।

দক্ষিনা (শারদীয় সংখ্যা ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক—গগনাথ মণ্ডল ও সামসুল হক। ডায়মণ্ডহারবার থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দিলীপ রায়, শিবপ্রসাদ হালদার, সামসুল হক, শ্রীমন্ত সওদাগর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং আরো অনেকে লিখেছেন—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক।

কবিপত্র (ত্রয়োদশ সংকলন ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক—তুষার চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ১সি, রাণী শংকরী লেন। দাম—এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—অশীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোপাল ভৌমিক, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দিলীপ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার এবং আরো অনেকে।

জাতিস্মর সাথী (শারদীয় সংখ্যা ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন চৌধুরী।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, রস-রচনা, নাটিকা, ছড়া, রূপকথার সংকলন।

নান্দীকর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগীয় চলচ্চিত্র :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই বিবিধ সরকারী প্রচেষ্টাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করবার দায়িত্ব বহন ক'রে আসছেন। সেদিনও যেমন ছিল, আজ তেমনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের এই চলচ্চিত্রগুলি প্রস্তুত এবং প্রচারের মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী প্রচারকার্য। তবে আজ যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকা'রর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বলে চিত্রামোদী দর্শক-সাধারণ পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন বাঙলা চিত্রগৃহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত কোনো একখানি ছবি দেখতে পাবেনই পাবেন, বছর চারেক আগেও সে-ব্যবস্থা ছিল না। এবং এই চুক্তির ফলে প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘরে প্রায় লাখখানেক করে টাকা আমদানি হচ্ছে। কিন্তু আসলে এই ছবি করার ব্যাপারে যে টাকাটা প্রতি বছর বরাদ্দ করা হয় সেটা প্রচার বাবদ খরচেরই খাতে। তখন কোনও ছবিঘরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার চিত্রগুলি প্রবেশাধিকার পায় নি। তখন সরকারী প্রচার-বিভাগের লোকেরা গ্রাম বা মফঃস্বল শহরের হাটে, মাঠে বা কোনো সাধারণ স্থানে পর্দা খাটিয়ে প্রোজেক্টারের সাহায্যে ছবিগুলি দেখাত। বিনা ব্যয়ে 'টকী' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই একটি মাত্র আকর্ষণে নিশ্চয়ই কিছু লোক সেই সব প্রদর্শনীতে ভীড় করত এবং 'শো' শেষ হয়ে গেলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত চিত্রগুলির বক্তব্য কিছু অনুধাবন ক'রেই বা না ক'রেই। এখনও যে পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত-ছবিগুলি বিনা ব্যয়ে দেখতে না পাওয়া যায়, এমন নয়; প্রচার-বিভাগের 'মোবাইল ইউনিট' প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরে পাড়ি দেন জিলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ, মেলা কর্তৃপক্ষ, পৌর প্রতিষ্ঠান, সাধারণ পাঠাগার বা কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে। এবং এখন তো জেলায় জেলায় প্রচার-বিভাগের 'মোবাইল ফিল্ম ইউনিট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেলার অধিবাসীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত ছবিগুলিকে বিনা ব্যয়ে দেখাবার জন্যে।

যতদিন পর্যন্ত চিত্ররসিক জনসাধারণ ছবিঘরের মধ্যে কোনো কাহিনী-চিত্র দেখবার আগে ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত তথ্য-চিত্র দু'টিকে পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাননি, ততদিন প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত ছবিগুলির উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে কোনো আলোচনা সম্ভবও হয়নি এবং বোধ করি, প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু

বর্তমানে যখন সেই সুযোগ প্রত্যহই হচ্ছে এবং দর্শক এটাও অনুভব করছেন যে, তাঁর ক্রীত টিকিটের মূল্যের একটি অতি-সামান্য ভগ্নাংশও ঐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিটির জন্যে ব্যয় করা হবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন, প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিখানি উৎকর্ষের দিক দিয়ে ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত ছবি থেকে বিষয়বস্তু, কলাকৌশল এবং নেপথ্যভাষণ প্রভৃতির দিক দিয়ে ভালো না হোক, অন্ততঃ মন্দ হবে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, তাঁদের সে-দাবী বেশীর ভাগ সময়েই অপূর্ণই থেকে যায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছবিগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত ছবিগুলির পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

কিন্তু কেন? এই কেন'র জবাব দিতে হ'লে প্রথমেই যে-জিনিসটা নজরে পড়ে, সেটি হচ্ছে, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিত্র-প্রযোজনা রীতির বিরাট পার্থক্য। ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন একটি বিরাট স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। এ'দের প্রধান কর্মকেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই, সেখানে এ'দের নিজস্ব স্টুডিও এবং ল্যাবোরেটরী আছে; আর আছে চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, সম্পাদনা, বহু রকম ভেল্কির জন্যে 'ট্রিকশট' গ্রহণের বিশেষ যন্ত্রপাতি, কার্টুন ফিল্ম প্রস্তুতের জন্যে বিশেষ ক্যামেরা প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ; এর ওপর আছে মাসিক বেতনে নিযুক্ত একটি বিরাট কর্মীবাহিনী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ তাঁদের প্রযোজিত ছবি তৈরীর তত্ত্বাবধানের জন্যে নিয়মিত মাস-মাহিনা দিয়ে রেখেছেন একটি মাত্র লোক, যিনি প্রচার-বিভাগে 'প্রোডাকসান অফিসার' ব'লে পরিচিত। তাঁর কাজ ছবির পরিচালনা নয়, ছবির প্রযোজনা নয়, মাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্যে যে-সব ছবি তৈরী করা প্রয়োজন ব'লে সাব্যস্ত হবে, সেইগুলি যাঁরা তৈরী করবার ভার পাবেন, সেই বিশেষ ছবিগুলি তৈরী করবার ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সরকারী বিভাগের সঙ্গে যাতে সহজে যোগাযোগ ক'রতে পারেন, সেই বিষয়ে সাহায্য করা। এই প্রোডাকসান অফিসার ছাড়া সরকার আর কোনো দ্বিতীয় লোককে ছবি তৈরীর ব্যাপারে মাস-মাইনে দিয়ে রাখেননি।

তা'হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিগুলি তৈরী করেন কারা? দ্বিধাহীনভাবে বলব—কণ্ট্রাক্টররা। প্রতি বছর সরকারী অর্থিক বছর আরম্ভের বেশ কিছু দিন আগে সংবাদ-পত্র মারফৎ টেণ্ডার আহ্বান করা হয় এই সরকারী ছবিগুলি তৈরী এবং তৈরী ছবির কপি তৈরী প্রভৃতি কাজের জন্যে। বহু আগে এই কাজের মোট বরাদ্দমাত্র ছিল এক লক্ষ টাকা; বর্তমানে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষের কাছা-কাছি। যে-সব চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এই কাজের জন্যে টেণ্ডার দেন, তাঁরা তাঁদের নির্মিত ছবির ফুট-প্রতি কত টাকা চান, সেটা নিশ্চয়ই জানিয়ে দেন। এবং দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যখন ফুট-প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা দাবী করা হ'ত, তখন বর্তমানের অসম্ভব রকম চড়া খরচের যুগে এ'রা পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষির ফলে দাবী করছেন ফুট-প্রতি পাঁচ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব সময় থেকেও পঁচিশ নয়া পয়সা কম। অথচ যুদ্ধপূর্বকালে যে-এক রীল ফিল্ম নেগেটিভের দাম ছিল মাত্র ৯০ টাকা, আজ তার দাম হচ্ছে ২২০ টাকা। এবং এই হিসেবে প্রতিটি ব্যাপারেই খরচ বেড়েছে অন্ততঃ তিনগুণ। কিন্তু ফিল্মস ডিভিশন-প্রযোজিত ছবির খরচ কি জানেন? গড়পড়তা ফুট-প্রতি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা। তাও সেখানে কন্ট্রাক্টরের মুনাফা নেই। এ ছাড়াও

কথা আছে। • বাঙলা দেশের একজন সাধারণ পর্যায়ের চিত্রপরিচালক একটি কাহিনী-চিত্র, যা সাধারণতঃ ১২,০০০/১৩,০০০ হাজার ফুট দীর্ঘ হয়, তার জন্যে পারিশ্রমিক পান অন্ততঃ ১০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি এক রীলের অর্থাৎ ১ হাজার ফুট দীর্ঘ তথ্যচিত্র বা প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্যে প্রচার-বিভাগ নিযুক্ত কন্ট্রাক্টরেরা মাত্র ২৫০্ টাকা দিয়ে থাকেন। একজন সাধারণ ক্যামেরাম্যান যেখানে একটি কাহিনী-চিত্রর জন্যে দৈনিক অন্ততঃ ৮০্/১০০্ পেয়ে থাকেন, সেখানে এই প্রচার-চিত্র নির্মাণের জন্যে পান গড়পড়তা দৈনিক ৪০্ টাকা। কাহিনী-চিত্রের চিত্রনাট্যকার যেখানে অন্ততঃ ৩,০০০্ টাকা পেয়ে থাকেন, সেখানে এই এক রীল প্রচার-চিত্রের জন্যে বরাদ্দ আছে মাত্র ১০০্ টাকা। এই সব কথা জানবার পরেও কি জিজ্ঞেস করতে প্রবৃত্তি হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত চলচ্চিত্র ফিল্মস ডিভিশন-কৃত চলচ্চিত্রের মত গুণ-বিশিষ্ট হয় না কেন? শুনতে পাই, প্রচার-বিভাগকে চলচ্চিত্র প্রযোজনা বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্যে একটি ১৩ জন সভ্যবিশিষ্ট কমিটি আছে, যাতে চলচ্চিত্র প্রযোজনা বিষয়ে পারদর্শী লোকেরও স্থান রয়েছে। এই কমিটি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, ৫ টাকা ২৫ নয়া পয়সা ফুট দরে আজকেও ছবি তৈরী করা—ভালো ছবি তৈরী করা সম্ভব কিনা?

প্রেমপত্র (হিন্দী): বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৪,৮৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য: সলিল চৌধুরী ও দেবব্রত সেনগুপ্ত; পরিচালনা: বিমল রায়; সঙ্গীত-পরিচালনা: সলিল চৌধুরী; গীত-রচনা ও সংলাপ: রাজেন্দ্র কিষণ; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা: দিলীপ গুপ্ত; শব্দধারণ: এম আর পিটকে; সঙ্গীত-গ্রহণ: বি এন শর্মা, কৌশিক ও মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা: সুধেন্দু রায়: সম্পাদনা: অমিত বসু; রূপায়ণ: সাধনা, সীমা, চাঁদ ওসমানী, শশী কাপুর, রাজেন্দ্রনাথ, সুধীর প্রভৃতি। ক্যালকাটা ফিল্মস সেন্টার-এর পরিবেশনায় গত ২৬-এ অক্টোবর থেকে হিন্দ, প্রিয়া, কৃষ্ণা, রূপালী, পূর্ণশ্রী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একদা উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত "সাগরিকা" ছবিখানি বাঙলা চলচ্চিত্র-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল। বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নবতম নিবেদন "প্রেমপত্র" নিতাই ভট্টাচার্য লিখিত সেই একই 'সাগরিকা' কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাজেই বাঙলা কাহিনীর মতই এতেও মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র অরুণ সেই কলেজেরই ছাত্রী কবিতাকে (বাঙলা ছবির সাগরিকা) প্রেমপত্র লেখবার মিথ্যা অপরাধে (আসলে তার বোন রত্না তার নাম দিয়ে চিঠিখানি লিখেছিল কবিতাকে রাগাবার জন্যে) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যাবার সরকারী বৃত্তিটি হারায় কলেজ-প্রিন্সিপ্যালের হস্তক্ষেপের ফলে। প্রথমে ভগ্নোদ্যম হবার পর তার কাকার চেষ্টায় তাদের গ্রামের জমিদারের মেয়ে তারাকে বিবাহ করতে স্বীকার ক'রে সে শেষ পর্যন্ত তার বিলেত যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করে এবং বিলেত থেকে ফিরে এসে বিবাহ করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দেয়। এদিকে গ্রাম্য জমিদার তার অশিক্ষিত কন্যা তারাকে বিলেত-ফেরত ডাক্তার অরুণের যোগ্য ক'রে তোলবার আগ্রহে তাকে শহরে নিয়ে এসে তার ভগ্নির ওপর তার দিল তাকে ঘ'ষে-পিটে মানুষ করবার জন্যে। ভাগ্যচক্রে এই ভগ্নিরই কন্যা হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজে পড়া মেয়ে কবিতা, যার অভিযোগের ফলে অরুণ -এর সরকারী বৃত্তি হারিয়েছে। অরুণ তারাকে কোনো দিনই চোখে দেখেনি; কিন্তু আপ-টু-ডেট হবার অতি আগ্রহে তারা যেমন এক দিকে কবিতার বন্ধু লীলার ভাইয়ের সঙ্গে টেনিশ খেলা থেকে শুরু ক'রে শিকারে যাওয়া পর্যন্ত বহু সম্ভব-অসম্ভব কাজ করতে লাগল, তেমনি বিলেত-প্রবাসী অরুণকে প্রেম-পত্রও লিখতে কার্পণ্য করল না। অবশ্য এই প্রেমপত্র লেখবার মত বিদ্যে তার ছিল না; কাজেই এই দায়িত্বটা সে তার পিসতুতো বোন কবিতার ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ল। কলেজের সেরা ছেলে অরুণকে কবিতা মনে মনে ভালোই বেসেছিল এবং যেদিন সে জেনেছিল, যে প্রেমপত্র পেয়ে সে রাগের মাথায় অধ্যাপকের কাছে অভিযোগ পেশ করে-ছিল, সে-প্রেমপত্র আদৌ অরুণের লেখা নয়, সেদিন থেকে সে নিজেকে অরুণের কাছে গুরুতরভাবে অপরাধী জ্ঞান করেছিল। কাজেই তারার জবানীতে অরুণের কাছে চিঠি লেখার মধ্যে সে তার অন্তরের ভালোবাসাকেই মুখর করে তুলেছিল দিনের পর দিন। কিন্তু যখন উচ্চ শিক্ষা লাভের পর অরুণের বিলেত থেকে দেশে ফেরবার সময় নিকটবর্তী হ'ল, তখন একই সঙ্গে কবিতা এবং তারার জীবনে এল গুরুতর সমস্যা। কারণ, তারা তখন লীলার ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং সেই কারণে তার হৃদয়ে অরুণের স্থান নেই; আর কবিতা তো জানে, অরুণ তা'কে কতখানি ঘৃণা করে এবং তারার ব-কলমে অরুণকে প্রেমপত্র পাঠিয়ে সে-হৃদয়ের খেলায় সে মেতে উঠেছিল, তা যে কতখানি মিথ্যে, তা' অরুণ ফিরে এলেই ধরে ফেলবে। কিন্তু দৈব অনুগ্রহে দুজনেরই সমস্যার সমাধান হ'ল। বিলেত থেকে ফেরবার কয়েক দিন আগে মকল-তারার একখানি প্রেমপত্র পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ ল্যাবোরেটরীতে একটি বিস্ফোরণ ঘটায় অরুণ হারাল তার দৃষ্টিশক্তি। এই খবরে তারার বাবা প্রথমটা হলেন হতবাক এবং পরে ঘোষণা করলেন, অন্ধের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তিনি তাঁর আদরিণী কন্যার ইহকাল-পরকালের সর্বনাশ সাধন করতে আদৌ ইচ্ছুক নন। অতএব তারা পেল তার অভিলষিত মুক্তি। কিন্তু অন্ধ অরুণ ভারতে পদার্পণ করেই যার জন্যে সব-চেয়ে বেশী লালায়িত হয়ে পড়ল, সে হচ্ছে প্রেমপত্র-লেখিকা তারা, যার প্রেমপত্রগুলির মাধ্যমে সে কল্পনায় তার সঙ্গে একটি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই নিবিড়তার উত্তাপ আর একজন যাকে অস্থির করে তুলেছিল, সেই কবিতাই অন্ধ অরুণের মনো-বেদনাকে প্রশমিত করবার জন্যে আবার নূতন করে তারার ভূমিকাভিনয় করতে শুরু করতে বাধ্য হয় তাদের সাধারণ বন্ধু ডাঃ কেদারের নার্সিং হোমে আর একজন সাধারণ বন্ধু ডাঃ সুমিত্রার প্রত্যক্ষ সহায়তায়। কিন্তু এর পর যেদিন ডাক্তারদের চেষ্টায় অরুণ তার দৃষ্টিশক্তিকে ফিরে পেল এবং কবিতা

বহু অনুরোধে তারাকে তার সামনে হাজির করল, তখন অরুণ আসল তারার কণ্ঠস্বর এবং স্পর্শে বুঝতে পারল, যে-তারাকে সে জেনেছে, এ-তারা সে-তারা নয় এবং এই বুঝেই সে প্রায়-উন্মাদ ও আঘাতে তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হবার যোগাড় হ'ল। এই অবস্থায় কেমন নাটকীয়ভাবে কবিতা ও অরুণ এবং তারা ও লীলার ভাইয়ের মিলন হ'ল, তাই নিয়েই 'প্রেমপত্র'-এর শেষের দৃশ্যগুলি রচিত।

এই প্রেম-কাহিনীটিকে সুন্দর অভিনয়, সুচারু আভ্যন্তরিক ও বহির্দৃশ্যাবলী এবং মনোরম নৃত্যগীত দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং যে-অগণিত দর্শকসাধারণের জন্যে ছবিখানি রচিত, তাঁরা যে "প্রেমপত্র" দেখে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে উঠবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করা যায়। কবিতার ভূমিকায় সাধনা শিবদাসানী আন্তরিক অভিনয়ের গুণে ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। নায়ক অরুণের ভূমিকাটিতে শশী কাপুর তাঁর সহজ, স্বচ্ছন্দ ও দরদী অভিনয় দিয়ে একটি বিশেষত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। এবং এ'দের দু'জনকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছেন রাজেন্দ্রনাথ (ডাঃ কেদার), চাঁদ ওসমানী (সুমিত্রা), সীমা (তারা), সুধীর (লীলার ভাই), পারভীন চৌধুরী (রত্না), পদ্মা দেবী (কবিতার মা) প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

ছবিটিতে পাঁচখানি গান আছে; কিন্তু সলিল চৌধুরী সংযোজিত সুর সাধারণভাবে শ্রুতিমধুর হ'লেও এর কোনোটিতেই অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। কিন্তু আবহ-সঙ্গীত রচনায় তিনি বহু ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলের অপরাপর বিভাগে ছবিটি সর্বত্র একটি উচ্চ মান বজায় রেখেছে।

চিত্রপ্রিয় দর্শকসাধারণকে খুশী করবার জন্যেই বিমল রায় "প্রেমপত্র" চিত্রখানির রূপ দিয়েছেন এবং তাঁর সে-উদ্দেশ প্রচুর পরিমাণে সাফল্যও লাভ করেছে।

বাঙালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর বিশ্ব পরিক্রমা

৩০এ জুন, ১৯৬১ থেকে ৩রা অক্টোবর, ১৯৬১—একুনে ৯৬ দিন অর্থাৎ জুলস ভার্ণের ফিলিয়াস ফগ-এর থেকে ১৬ দিন বেশী লেগেছে বাঙলা চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক-পরিবেশক অসিত চৌধুরীর বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যবসায়-ভিত্তিক প্রদর্শন-সম্ভাবনা লক্ষ্য ক'রে একটি বিশ্বপরিক্রমায়। হ্যাঁ, বিশ্ব-পরিক্রমাই বলতে পারি। কারণ তিনি প্রতীচ্যের দিকে পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যের দিক দিয়ে দেশে ফিরেছেন। তাঁর গতি-পথে যে-সব শহর ও দেশ পড়েছে, সেগুলি হচ্ছে—তেহেরেণ (ইরাণ), ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), কায়রো (মিশর), বেইরুট (লেবানন), এথেন্স (গ্রীস).

অসিত চৌধুরী

জুরিখ (সুইজারল্যান্ড), মিউনিক (পশ্চিম জার্মাণী), বার্লিন (পূর্ব জার্মাণী), প্যারিস (ফ্রান্স), মাদ্রিদ (স্পেন), আমস্টার্ডেম (হল্যান্ড), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), লন্ডন (ইংলন্ড), নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস-এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিস্কো (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), টোকিও (জাপান), হংকং (চীন), সিঙ্গাপুর (দক্ষিণ এশিয়া-মালয়), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড) এবং রেঙ্গুণ (বার্মা)।

ভারতের আর কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মাত্র ব্যবসায় বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে এভাবে পৃথিবীর দেশে দেশে চলচ্চিত্র পরিবেশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে এ-রকম বিস্তৃত সফর করেছেন বলে আমাদের জানা নেই এবং অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা, শ্রীচৌধুরীর এই বিরাট সফর নানা দিক দিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি একমাত্র তেহেরেণ ছাড়া প্রতিটি জায়গায় তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের চারখানি ছবির, কোথাও সবগুলিরই, কোথাও তিনটির এবং কোথাওবা ন্যূনকল্পে একখানিরও পরিবেশন ব্যবস্থা পাকা ক'রে এসেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশকের কাছে প্রদর্শন ক'রে দেখাবার জন্যে একখানিও ছবি ছিল না। তাঁর পোর্ট-ফোলিওতে ছিল ঐ চারখানি ছবি সংক্রান্ত লিটারেচার বা বিবৃতিপত্র এবং কিছু স্থিরচিত্র। এইগুলির সাহায্যে মাত্র মুখের কথার জোরে এককভাবে প্রায় সারা বিশ্বে ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা ক'রে আসা কি অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক, তা' ব'লে বোঝাবার দরকার হয় না।

শ্রীচৌধুরী তাঁর এই ব্যবসায়িক সফরে যে-সব জিনিস লক্ষ্য ক'রে এসেছেন, তার মধ্যে প্রধান হ'ল, বহির্বিশ্বে ভারতীয় ছবির নিয়মিত পরিবেশনের জন্যে আজ পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারীভাবে কোনো পাকা ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠেনি। মাত্র দু'টি-পাঁচটি জায়গায় ব্যক্তিগত প্রয়াসে মাত্র সত্যজিৎ রায়ের কয়েকখানি ছবির—বিশেষ ক'রে অপু-জীবনী সংক্রান্ত ছবি তিনখানির (যাকে ইংরেজীতে অপু-ট্রিলজি আখ্যা দেওয়া হয়েছে) ব্যবসায়িক ভিত্তিক প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। তাঁর আরও যে দু'খানি ছবির বৈদেশিক মুক্তি সম্বন্ধে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—দেবী ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় ছবির একটি নিয়মিত বাজার সৃষ্টির জন্যে স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই জরুরী দরকার।

শ্রীচৌধুরী আরও লক্ষ্য করেছেন, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় টেলিভিশানের দাপটে চলচ্চিত্র প্রায় কোণঠাসা হ'তে চলেছে। প্রযোজনা ক'রে যাওয়ায় সর্বত্রই সিনেমাগৃহগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। টেলিভিশানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রতে হ'লে বহু অর্থব্যয় করে বিরাট পট-ভূমিকার ছবি—যা টেলিভিশানে হওয়া এখনও পর্যন্ত দুঃসাধ্য, তেমন ছবি তৈরী করা ছাড়া গতি নেই, এমনই অভিমত ওদেশের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা পোষণ করেন। অথচ তারও ব্যবসায়িক ফলাফল কি হবে, এ তাঁরা জানেন না। কাজেই চিত্রগৃহগুলিকে চালু রাখবার জন্যে ও'রা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বিদেশের ভালো ছবিগুলিকে প্রদর্শন করবার পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁরা দেশের বহু ছবির প্রদর্শনীস্বত্ব ক্রয় করেছেন ইতিমধ্যেই। শ্রীচৌধুরীর সুচিন্তিত অভিমত, ঐ সব দেশে ভারতীয় ছবির নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবার এই সুযোগ কোনো মতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্রীচৌধুরী দেখেছেন, ...

গ্রীন্ নৃত্যগীত সংবলিত ছবির ভক্ত। এখেন্সে ভারতীয় চিত্রতারকা শ্রীমতী নার্গিসের অসম্ভব জনপ্রিয়তার জন্যে তাঁর অভিনীত যে কোনো ছবি সেখানে চলে। কিন্তু রোম থেকে শুরু ক'রে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ একটি মাত্র যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের ভক্ত, তিনি হচ্ছেন—সত্যজিৎ রায়। 'দে ফিল্ম' বলতে প্রতীচ্যের যথার্থ চিত্ররসিকেরা প্রশংসায় শতমুখ। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক' প্রভৃতি জায়গায় অপুর্-ত্রয়ী (অপু-ট্রিলজী) ছবিখানি (যা দেখতে ৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট সময় লাগে) লোকে হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে আগ্রহের সঙ্গে দেখছে।

শ্রীচৌধুরী বলেন, পশ্চিম ইয়োরোপে ভারতীয়, বিশেষ ক'রে বাঙলা ছবির নিয়মিত বাজার সৃষ্টি করতে হ'লে লন্ডনে এবং কলকাতায় যুগপৎ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার; ভারতীয় সভ্যসমন্বিত এই সংস্থার কাজ হবে, ব্যবসায়িক সাফল্য-সম্ভাবনাপূর্ণ ভারতীয় ছবির নিয়মিত প্রচারের দ্বারা তাদের পরিবেশনের জন্যে পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। মাত্র ইংলন্ডেই অন্ততঃ দু'লক্ষ বাঙলা ভাষাভাষী বাস করেন; কাজেই সেখানে বাঙলা ছবির গুটি পনেরো প্রদর্শনী-ব্যবস্থা করলে প্রতিটি ছবি থেকে অন্ততঃ হাজার পনেরো টাকা মুনাফা সংগ্রহ করা আদৌ বিচিত্র নয়। ঠিক সমান কথাই বলা যেতে পারে, বর্মার রেঙ্গুন শহর সম্পর্কে। সেখানে ভালো বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে লোকে উদ্গ্রীব; অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সেখানে একমাত্র 'নীল আকাশের নীচে' ছাড়া দ্বিতীয় বাঙলা ছবি যায়নি। শ্রীচৌধুরী সেখানে তাঁর চারখানি ছবিরই পরিবেশন ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে বেইরুটে এবং দূরপ্রাচ্যের জন্যে হংকংয়েও ভারতীয় ছবির পরিবেশক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। হংকংয়ে একখানি ছবির ডাবিং খরচ মাত্র দশ থেকে বারো হাজার, আমাদের দেশে খরচ পড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। কাজেই দূরপ্রাচ্যের জন্যে সাব-টাইটেল ব্যবহারের পরিবর্তে ডাবিং করার ঢের বেশী ব্যবসায়িক সুবিধা আছে ব'লে শ্রীচৌধুরী মনে করেন।

শ্রীচৌধুরী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিদেশের বহু চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকারের সহযোগিতায় বহু ভারতীয় চলচ্চিত্র, কোনো সময়ে প্রতিযোগিতার জন্যে, কোনো সময়ে মাত্র বিশেষ প্রদর্শনীর জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, মাঝে মাঝে এমন ছবি পাঠানো হয়, যার সম্পর্কে কোনো প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা দূরে থাক, নিন্দাই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এতে শুধু যে ভারতের সুনামই ক্ষুণ্ণ হয়, তা নয়; ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ বাজার সৃষ্টির পথ এতে সঙ্কুচিতই হয়। কাজেই কোনো উৎসবে দেখাবার জন্যে কোনো ছবিকে মনোনীত করবার সময়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যখন ভারতের পক্ষে আশু প্রয়োজন, তখন এমন কিছু করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়, যাতে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি হওয়ার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি দপ্তরের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, শ্রীচৌধুরীর এই বিশ্বপরিক্রমা-লব্ধ ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বাঙলা দেশের, তথা ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্প বিদেশে ভারতীয় ছবির বাজার সৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিদেশে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্যে একটি স্থায়ী "এক্সপোর্ট সেলস্ প্রোমোশান" সংস্থা গ'ড়ে তুলবে কাল-বিলম্ব না ক'রে।

অসিত চৌধুরীর সংবর্ধনা :

গেল শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর চন্দননগরের লথরাজ ভবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এস পি প্রোডাকসন্স-এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-প্রযোজক ও

পরিবেশক অসিত চৌধুরীকে সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা ব্যোমকেশ মজুমদার। কলকাতার বহু প্রসিদ্ধ চিত্র-সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানসভা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।

'সেতু' নাটকের ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব :

বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটক গেল ৮ই অক্টোবর ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং এর অভিনয়ের ৭০০তম রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে গেল ২০এ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সালে। এই গৌরবের স্বীকৃতির জন্যে কর্তৃপক্ষ আসছে ৩রা নভেম্বর তারিখে একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ 'সেতু'র অভিনয়কে সহস্র রজনীর দ্বারে অনায়াসেই পৌঁছে দেবেন, এ-ভবিষ্যদ্বাণী আমরা পূর্বেই করেছি।

ম্যানসাটা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটর-এর শারদা পূজন :

গেল রবিবার ২৮এ অক্টোবর ম্যানসাটা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটর-এর কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে 'শারদা পূজন' উৎসব পালন করেছিলেন।

'সাত পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ :

'সাত পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে অজয় কর কুড়িজন শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে রাজস্থান যাত্রা করেছেন আর ডি বি অ্যান্ড কোম্পানীর সচিব বিমল দে'র তত্ত্বাবধানে। শ্রীকর চিতোরগড়, জয়পুর, উদয়পুর, অম্বর প্রভৃতি স্থানে চিত্রগ্রহণ করবেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং এতে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করছেন মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, সুব্রত সেন, পাহাড়ী সান্যাল, অসিত দে, বুবু গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পী। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরসৃষ্টি ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে।

বিনু বর্ধন পরিচালিত আর, ডি, বনশালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে তন্দ্রা বর্মন ও বিশ্বজিৎ

অগ্রগামী পরিচালিত 'নিশীথে' চিত্রের একটি মধুর মুহূর্তে উত্তমকুমার ও সুমিত্রা চৌধুরী

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'-এর শুভ মহরৎ :

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় চি[illegible] 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'-এর শুভ মহর[illegible] উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে গেল ১৯[illegible] অক্টোবর ক্যালকাটা মুভীটো[illegible] স্টুডিওতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগু[illegible] লিখিত কাহিনী ও সংলাপ অবলম্ব[illegible] রচিত চিত্রনাট্যটির পরিচালনা করছে[illegible] মধু বসু। এই উৎসবে পৌরোহিত[illegible] করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রচার [illegible] আবগারী মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে।

[illegible] 'চিত্রতোষিকা' :

আসছে রবিবার ৪ঠা নভেম্ব[illegible] [illegible] মাঠে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেন [illegible] [illegible] পরিচালনায়।

॥ [illegible] আগামী অনুষ্ঠান ॥

প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা নবাগত আগামী ২৩শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়টায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একটি মনোরম অনুষ্ঠানে শ্রীনিতীশ সেন রচিত 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' নাটিকাদ্বয় শ্রীতমাল লাহিড়ীর পরিচালনায় এবং সভ্যবৃন্দের অভিনয় সহযোগিতায় মাধ্যমে মঞ্চস্থ করবেন।

॥ একটি অনুষ্ঠান ॥

গত ২১শে অক্টোবর "ন'পাড়া পল্লী সঙ্ঘ" কর্তৃক সঙ্ঘপ্রাঙ্গণে অভিনীত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' নাটকটি সন্তোষ ব্যানার্জির পরিচালনায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ইতু নাগ, সন্তোষ ব্যানার্জি, ভোলা সিংহ, অনিলকুমার ঘোষ, সুখময় সরখেল, নরেন দেব, বিনয়-কুমার ঘোষ, অনিল জানা, সুভাষ দত্ত, অরুণ চ্যাটার্জি, অমূল্য দে এবং অন্যান্য সভ্যবৃন্দ।

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত শিল্প ভারতীর 'বর্ণচোরা' চিত্রে জহর রায়

কলকাতা

বি, এন্ড, বি প্রোডাকসন্স-এর মৌনমুখর' সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ভারতী রায় এ ছবির দুই প্রধান শিল্পী। শেখর [illegible]রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন ত্রয়ী-গোষ্ঠী। পার্শ্ব-চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অপর্ণা দেবী ও লিলি চক্রবর্তী।

[illegible] প্রযোজক-সংস্থার চতুর্থ চিত্রের (ছবিটির এখন নামকরণ হয়নি) একটি দৃশ্যে অরুণ মুখার্জি ও অনুপকুমার।

দক্ষিণেশ্বর ইস্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে সুজনী ফিল্মসের 'পরিণাম'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। নায়িকা-প্রধান কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন অসিত-বরণ, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যো-পাধ্যায় ও নবাগতা হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈশাখী-গোষ্ঠী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর 'কাঁচা পাকা' ছবির কাজ শুরু করেছেন। এই প্রণয়মধুর রসাত্মক ছবির কাহিনী রচনা করেছেন নিখিল গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, তপতী ঘোষ, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী ও নবাগত রজতকুমার।

সেনেশা ফিল্মস-এর 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত এ ছবির আলোকচিত্র

এ চিত্রের সম্পাদ। আলোকচিত্রশিল্পী হলেন ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল। ভক্ত টৌনিসনের একটি বিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে সমুদ্র উপকূলে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আলোকচিত্রশিল্পী ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও সুনীতি গুহঠাকুরতা। সঙ্গীত পরিচালক রবিশঙ্কর।

বোম্বাই

জনপ্রিয় চরিত্রশিল্পী মিশ্র সম্প্রতি প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন। আজিজ কাশ্মিরী-র একটি কাহিনী অবলম্বনে রঙিন ছবিটি পরিচালনা করবেন শঙ্কর মুখার্জি। সঙ্গীত পরিচালক হলেন রোশন। চিত্রনাট্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

প্রযোজক এফ, সি, মেহেরা-র রঙিন ছবি 'প্রফেসার' এই মাসেই মুক্তি পাবে। শাম্মিকাপুর এবং কল্পনা এ ছবির নায়ক-নায়িকা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন লেখ টেনডন। সঙ্গীতে সুর-সৃষ্টি করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ। প্রধান চরিত্রে রূপ দিয়েছেন পরভীন চৌধুরী, সেলিম, প্রতিমা দেবী ও ললিতা পাওয়ার।

প্রযোজক-পরিচালক জাল বালিওয়ালা-র 'এক মঞ্জিল দো মুসাফির'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বলরাজ শাহানী, মামুদ, আনওয়ার, হুসেন, সঙ্গীতা, হীরালাল ও সুন্দর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ইকবাল। আলোকচিত্র গ্রহণে সুরেন্দ্র।

সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক ভি, শান্তারাম 'সেহরা' ছবির একটানা চল্লিশ দিন স্যুটিং শেষ করলেন রাজকমল স্টুডিওর। নায়িকার চরিত্রে সন্ধ্যা
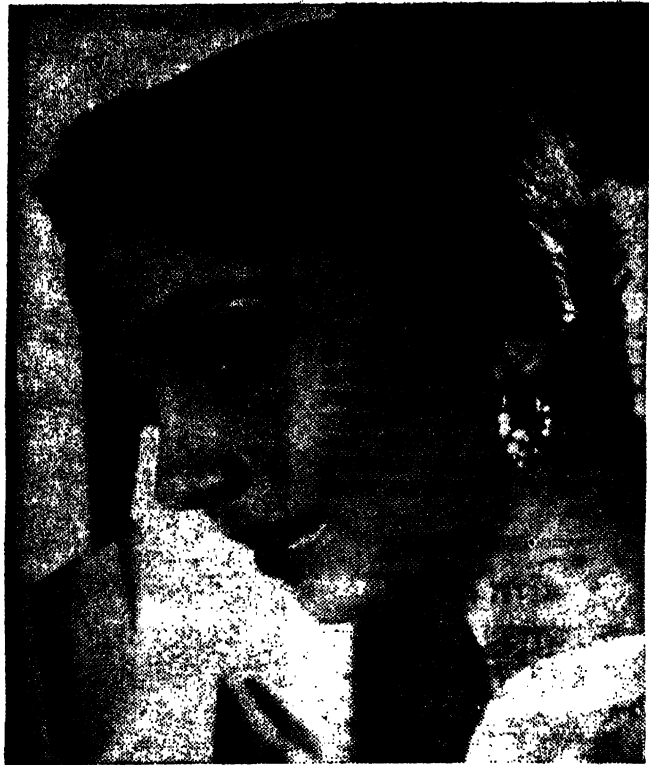
বিমল রায় পরিচালিত 'প্রেমপত্র' চিত্রে সাধনা

আবেগময় মুহূর্তগুলি অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শনীয় করে তুলেছেন। নায়করূপে—প্রশান্ত এই প্রথম অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রামলাল। বর্তমানে ভি, শান্তারাম দলবলসহ রাজস্থানে গেছেন বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য।

মাদ্রাজ

নৃত্যশিল্পী কুমারী কমলা আমেরিকার সম্প্রতি নৃত্যোনুষ্ঠানের জন্য অংশ গ্রহণ করতে গেছেন। ভারতের একমাত্র নৃত্যশিল্পী যিনি 'ইন্ডিয়া নাইট'-এ অংশ গ্রহণ করছেন। মাদ্রাজ পরিত্যাগ করার পূর্বেও তিনি 'সুবাইথাঙ্গি' চিত্রে স্যুটিং শেষ করেছেন।

মালায়ম ছবি 'ডকটর'-এর সঙ্গীত গ্রহণের পর চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে বিজয়া বাওহিনী স্টুডিওর। বিভিন্ন চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সত্যেন, থিক্কুরিসি, ও, মাধাবান, আনন্দ, শীলা ও শান্তি। ছবিটি পরিচালনা করছেন এম, এস, মানি। —চিত্রদূত

মানুষ এবং মানুষের ভালবাসা নিয়ে এর আগে অনেক গল্প অনেক রকমভাবে শুনেছেন এবং দেখেছেন হয়তো, কিন্তু এ ছবির গল্প একটু অন্যরকমের। এখানে সবাই আছে মানুষও আছে, কিন্তু এমন মানুষ যার ঘর নেই। বাইরের জীবনটাই তার কাছে বড় বেশি আপন বলে মনে হয়েছে। যার ফলে ঘর বা সংসার তাকে কোনদিনই বেঁধে রাখতে পারেনি। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাই সে পলাতক।

'পলাতক' ছবির কথাই বলছি সম্প্রতি যাত্রিক-গোষ্ঠী ছবির একটানা স্যুটিং শেষ করলেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর। এ ছবির প্রযোজক হলেন বম্বের অভিনেতা ও পরিচালক হি

ভি, শান্তারাম প্রযোজিত ও যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'পলাতক'এর একটি নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার—অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়

শান্তরাম। প্রথমদিনের চিত্রগ্রহণের সময় তিনি একদিনের জন্য এসেছিলেন এ ছবির শুভ মুহূর্তে। কাহিনীকার মনোজ বসুর 'আংটী চ্যাটার্জির ভাই' গল্প অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন যাত্রিক-গোষ্ঠীর অন্যতম তরুণ মজুমদার, শচীন মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

এ কাহিনীর নায়কের রূপ নেই। চলচ্চিত্রে নায়ক হবার কোন গুণ নেই। তবে রূপ না থাকলেও হৃদয় আছে। পলাতক হলেও মানুষের উপকার করেই তার দিন ফুরিয়েছে। সংসার তাকে বাঁধতে পারেনি কোনদিনই। এই ভবঘুরে মানুষটির নাম বসন্ত। জমিদার আংটী চ্যাটার্জির ভাই হলেও সে ধনী নয়। পথ তার ধন। আজ এখানে যেটা ভাল লাগছে কাল সেটা পুরনো বলে মনে হয়। এক জায়গায় মানুষ তার বেশিদিন ভাল লাগে না।

এইভাবে বহু জীবনের সঙ্গে বসন্তের দিন এগিয়ে চলে। তবে কবিরাজ নীলকান্ত ও তার মেয়ে হরিমতীর সঙ্গে তার জীবন এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে তা কোনদিনই বসন্ত ভাবতে পারেনি। নীলকান্তের চরিত্রটি বেশ মজার। সকালে কবিরাজ, কিন্তু রাতের সে রাম, রাজা কিংবা লক্ষ্মণ। সন্ধ্যে হলেই সে যাত্রা-থিয়েটারে মেতে ওঠে, তখন কারো সাধ্যি নেই যে তাকে দিয়ে কবিরাজী করতে বলে। বসন্তের ভাল লাগে নীলকান্তকে তার সহজ-সরল ঐ মেয়ে হরিমতীকে।

বসন্তের বাঁধনহীন জীবনকে ঘর-মুখো করে হরিমতী। সংসারে [illegible] দেখায় হরিমতী। একদিন কিভাবে কখন হরিমতী বসন্তকে জয় করলো। বিয়ে হল। বসন্ত নিজে তাদের গ্রামে দাদা-বৌদি হেমন্ত ও বীণাপাণির কাছে নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে ঘরে ফিরলো। দাদা-বৌদি ভাবলে বসন্তের সুমতি হয়েছে। এবার বোধহয় সংসারী হল। দিন যায়। কিন্তু বসন্ত হাঁপিয়ে ওঠে। বন্দী হয়ে থাকার মধ্যে জীবনের কোন গতি বা স্বাধীনতা নেই তাই একদিন গভীর পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলোয় হরিমতীকে ফেলে আবার সে ঘর-ছাড়া হল।

সংসারের কোন সুখই বসন্তের জন্য নয়। এমন হতভাগ্য জীবন চোখে পড়ে না। দুঃখের মধ্যেই জীবনটা সব সময় চলেছে। সুখ বলতে তার ভাগ্যে কোনদিনই আসেনি। তা নাহলে এমন হরিমতী সেও বসন্তকে বাঁধতে পারলো না সংসারে। পথে-পথে তার ঘর। পথের মানুষ তার আত্মীয়। আর সংসারের আপন-জন তার কাছে পর হল। থিয়েটার-যাত্রা আর ঝুমুর দলের সঙ্গে তার জীবন বৈরাগী হল। বসন্ত গান গায়। মেয়ের দলের মধ্যে তার ভাল লাগে ময়না আর গোলাপকে।

বসন্তের গান মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—

'দোষ দিও না আমার বন্ধু
(আমার) কোন যে দোষ নাই।
কা'র কাছে রাখিলাম এ মন
কা'র কাছেতে চাই॥'

যাযাবরের মত বসন্ত ভাসে। সংসারের কত কিছুই নতুন হয়। এরমধ্যে ময়নাও সংসারী হয়ে ঝুমুরদল ছেড়ে দিয়েছে। গোলাপ তাকে বোঝায় ফিরে যেতে। কিন্তু বসন্তের যৌবন? তাও একদিন পিছিয়ে পড়লো। এই অনিয়মের মধ্যে তার শরীর ভেঙে এলো। ঝুমুর দলে গান করা তার বন্ধ হল। মৃত্যুর মুখে-মুখে দাঁড়িয়েও বসন্ত এই ঝুমুর দলের সঙ্গে তাদের গ্রামের কোন জমিদারের আনন্দ উৎসবে গান করতে চলে আসে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সে গাইতে পারেনি। শুধু অনুভব করেছে এটাই তার সংসার। হরিমতী আছে। দাদা-বৌদিও আছে। সব চেনা-চেনা মনে হল বসন্তের। কি আশ্চর্য বসন্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্যই এ আনন্দ উৎসবে ঝুমুর দল গান করতে এসেছে।

বসন্ত ছুটে যায় তার সংসারে। লুকিয়ে সে তার ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে টেনে নেয়। আর প্রতীক্ষায় থাকে হরিমতীর জন্য। কিন্তু হঠাৎ সামনের দেওয়ালে দেখে হরিমতীর ছবিতে ফুলের মালা পরানো। ধূপ জ্বলছে।

হরিমতী প্রসবের পরে মারা যায়। শুধু বেঁচে রইলো ঐ শিশু। হরিমতী—বসন্তের শেষ চিহ্ন। বসন্ত সেই নদীর ঘাটে নৌকর ওপর ভেসে চললো আর এক দেশে। যেখানে হরিমতী তারজন্য আজও প্রতীক্ষায় রয়েছে। হরিমতী জানে একদিন নিশ্চয়ই বসন্ত ফিরে আসবে!

কাহিনী এখানেই শেষ। এ ধরণের গল্প এর আগে কোনদিনই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি। ভবঘুরের জীবন যে মানুষকে কাঁদাতে পারে, তার জন্য অলক্ষ্যে যে মানুষ ভাবে এই প্রথম হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম যাত্রিক-গোষ্ঠীর 'পলাতক'-এর কাহিনী শুনে। এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন বসন্ত—অনুপকুমার। হরিমতী—সন্ধ্যা

রায়, নীলকান্ত—অহর রায়, হিরাজ—অহর গাঙ্গুলী, কার্তিক—রবি ঘোষ, মঙ্গলা—রুমা গুহঠাকুরতা, গোলাপ—অনুভা গুপ্তা, বীণাপাণি—ভারতী দেবী ও হেমন্ত—অসিতবরণ।

প্রধান কলা-কুশলীতে রয়েছেন চিত্র-গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সহ-পরিচালনায় জগেশ্বর প্রসাদ এবং ব্যবস্থাপনায় ভানু ঘোষ।

সম্প্রতি এ ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বোম্বে রাজ-কমল কলামন্দির স্টুডিওয় সংগীত গ্রহণ করেছেন। গান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা ও শংকর মিত্র। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মুকুল দত্ত।

টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয় প্রথম পর্যায়ে 'পলাতক'-এর দৃশ্য গৃহীত হল। কবিরাজের বাড়ীর দৃশ্য গ্রহণের দিন উপস্থিত ছিলাম। গ্রামের খড়ের বাড়ী স্টুডিওতে নির্মিত হয়েছে।

নীলকান্তের বাড়ীতে বসন্ত এসেছে ছুটে।

বসন্ত—কোবরেজ! তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি?

নীলকান্ত—কেন?

বসন্ত—কেন? বলি কাল রাতে নমো নমো করে ডাল তো পাঠিয়ে দিলে এক বাটি—তা, কার শ্রীহস্তের রান্না ওটা জানতে পারি?

নীলকান্ত—হরি রেঁধেছে—কেন, হয়েছে কি?

চার্লি চ্যাপলিন সম্প্রতি দশম সন্তানের জনক হয়েছেন।

বসন্ত—হরি! ও তোমার চাকর বুঝি। রোস দেখাচ্ছি মজা। এই হরি—হরি।

নীলকান্ত—এই দেখ, হরি মানে আমার—

বসন্ত—ইস্, ব্যাটার কি মা বাপ নেই হে। ডাল খেয়ে জীবের অবস্থা দেখবে, এই দ্যাখ, (জীব দেখায়) গেল কোথায়? কথা কানে যাচ্ছে না নাকি? এই ব্যাটা হরে?

(হরিমতীর দ্রুত প্রবেশ)

হরিমতী—আমার নাম হরে নয়, হরিমতী। এই সাতসকালে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেন?

নীলকান্ত—এই যে মা, কাল নাকি ডালে বড্ড ঝাল হয়েছিল, ইনি বলছেন—

হরিমতী—কৈ নাতো!

বসন্ত—না।

হরিমতী—কক্ষনো না।

বসন্ত—তবে জিব আমার পুড়লো কি করে?

হরিমতী—জিবের আর দোষ কি? অত চিড়বিড়ে কথা জিব দিয়েই বেরুচ্ছে তো—কত আর সইবে?

বসন্ত—কি বললে?

(হরিমতী চলে যায় ঘর থেকে)

বসন্ত—একি! চলে গেল যে!

নীলকান্ত—ছাড়ান দাও ওর কথা। ঐ তো একরত্তি মেয়ে। আজকাল তোমায় তো খাচ্ছো না ওর হাতে। আজ থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিও।

বসন্ত—এই দ্যাখো, কোত্থেকে কি কথা। বলি, নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যাবো কেন, এ্যাঁ? তোমরা পাঁচজন থাকতে আমার অভাবটা কিসের? আরে আমি হলাম বাউণ্ডুলে—নিষ্কর্মা টে—রান্নাবান্না কি আমার পোষায়? তবে হ্যাঁ, মাগনা আমি খাব না। কবরেজ—এই নাও, ধরো—

—চিত্রদূত

॥ ইটালীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রবণতা ॥

নিওরিয়ালিজম-এর চিত্রভূমি ইটালীর চিত্র-প্রযোজকরা ইদানীং অতীতের দিকে চোখ ফেরানোর পক্ষপাতী। ইটালীয় জনতার দৃশ্যের জন্যে কম খরচে 'এক্সট্রা' সংগ্রহের অসুবিধে হলে ইটালীয় প্রযোজকরা গ্রীস, স্পেন অথবা যুগো-শ্লাভাকিয়াতে গিয়ে চিত্র নির্মাণ করছেন। ঐতিহাসিক পটভূমির জন্যে রোমের ধ্বংসস্তূপগুলোতে অবশ্য দৃশ্যগ্রহণ করতেই হয় তাদের। এই ধরণের চিত্র নির্মাণে উৎসাহ বৃদ্ধির কারণ ছবিগুলিকে ইংরেজীতে 'ডাব' করলে ঘরের এবং বাইরের বাজারের বক্স-অফিস সহজেই প্রসন্ন হয়। এম-জি-এম-

শ্রীমতী রোমি স্নাইডার ফ্রাণ্জ কাফ্‌কার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত "দি প্রসেস" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী স্নাইডার ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

এর 'বেনহার'-এর অকল্পনীয় অর্থ-সাফল্যই সম্ভবতঃ ইটালীর চিত্র-নির্মাতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের প্রধান কারণ। আমেরিকার ছবিঘরগুলোও সোৎসাহে ইটালীতে তোলা 'ডাব' করা ঐতিহাসিক ছবি সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখিয়ে যাচ্ছে। 'দি সিয়েজ অফ সাইরাকুস', 'ড্যামন এ্যাণ্ড পীথিয়াস', 'দি রিভোল্ট অফ দি স্লেভস', 'দি ট্রজান ওয়ার', 'এ্যাটলাস', 'দি টারটারস', 'ক্যারাওস উওম্যান', 'দি কলোসাস অফ রোডস', 'সন্স অফ সামসন' এবং 'লাস্ট অফ দি ভাইকিংস' ইত্যাদি ছবির জন-প্রিয়তা ইটালীর চিত্র-নির্মাতাদের ক্রমশঃই 'ঐতিহাসিক' করে ফেলছে। কিন্তু আমেরিকায় এই ধরণের ঐতিহাসিক চিত্র নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রশ্ন উঠেছে। প্রায়শঃই এই ধরণের ছবিতে ইতিহাসের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কোনো রকমে কাহিনীর চরিত্রকে ইতিহাসের পোশাক পরিয়ে রোজের ধুংলোড়পের বীভৎসতা সংযুক্ত করে 'ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর' ছবি বলে বাজারে ছাড়া হয়। স্বভাবতঃই কিশোর মনে এই ধরণের ইতিহাস-বিকৃত ছবি খুব একটা সুস্থ প্রভাব বিস্তার করে না। এই প্রসঙ্গে 'দি থ্রি হান্ড্রেড স্পার্টান' নামক ছবিটির নাম করা যেতে পারে। ছবিটি যথারীতি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে গ্রীসের পটভূমিতে তোলা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে থার্মোপলির ইতিহাস-বিশ্রুত যুদ্ধ এই চিত্রে দেখানো হয়েছে তা বাস্তবিকই হাস্যকর। স্পার্টানরা যেভাবে পারসীক সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যে দেখলে মনে হয় একদল আমেরিকান সৈন্য রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। রাজা লিওনিডেস-এর যুদ্ধ-হুংকার অনেকটা যেন আমেরিকান অশ্বারোহী সৈন্যের ক্যাপ্টেনের মতই। ওয়েস্টার্ণের ছবিরই যেন নতুন সংস্করণ এই ধরণের বাণিজ্যিক ইতিহাসাশ্রয়ী ছবিগুলো।

॥ আমেরিকার বক্স-অফিস ॥

মিরিশ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্যামুয়েল গোল্ডউইন স্টুডিওতে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি সাক্ষাৎকারে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড মিরিশ বলেছেন যে, হলিউডে যে সম্প্রতি একটি ধারণা চালু হয়েছে যে, আমেরিকান ছবির সাফল্য স্বদেশের চেয়ে বিদেশের, বিশেষ করে ইউরোপীয় বাজারের ওপর বেশী নির্ভর করে তার মূলে বিশেষ ভিত্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রীযুক্ত মিরিশ তাঁর চিত্র-প্রতিষ্ঠানের নির্মিত ছবিগুলির ব্যবসায়িক খতিয়ান প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের ছবিগুলো শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ অর্থ আমেরিকার দর্শকদের থেকেই এসেছে।" এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চিত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, 'দি অ্যাপার্টমেন্ট' (১৯৬০ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছবির নির্মাণ খরচ ছিল আঠাশ লক্ষ ডলার। ছবিটি মোট এক কোটি ডলার অর্থ উপার্জন করে এবং তার মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ ডলার এসেছে স্বদেশ থেকে। মেরিলীন মনরো অভিনীত 'সাম লাইক ইট হট' নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল আটাশ লক্ষ, এবং চিত্রের মোট এক কোটি তিরিশ লক্ষ ডলার উপার্জনের মধ্যে ছিয়াত্তর লক্ষ ডলার দিয়েছেন আমেরিকার দর্শকগণ। তবে শ্রীযুক্ত মিরিশ স্বীকার করেন যে, ওয়েস্টার্ণ ছবির বাজার আমেরিকার চেয়ে বিদেশেই বেশী। 'দি ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন' আমেরিকা থেকে পেয়েছে চৌত্রিশ লক্ষ ডলার এবং বিদেশ থেকে আটত্রিশ লক্ষ। হলিউডের চিত্র-প্রযোজকরা যে স্বদেশের দর্শকমণ্ডলীকে উপেক্ষা করে বিদেশী রুচিকে চিত্র নির্মাণে প্রাধান্য দিয়েছেন তার ফলেই কিছু কিছু আমেরিকান ছবি বক্স-অফিসধন্য হতে পারছে না বলে শ্রীযুক্ত হ্যারল্ডের ধারণা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিলি ওয়াইল্ডারের 'ওয়ান-টু-থ্রি' ছবিটির উল্লেখ করেন। ছবিটি ওয়াইল্ডারের অন্যান্য ছবির মত অর্থ-প্রসবিণী না হওয়ার একমাত্র কারণ এই ছবি নির্মাণে মার্কিনী রুচিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। —চিত্রদূত

খেলাধূলা

দর্শক

দিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মাণীর প্রথম এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে জার্মাণী ১০টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেছে। বাকি ৮টি অনুষ্ঠানে জয়ী হয়েছে ভারতবর্ষ। প্রতিযোগিতায় ১০টি অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে এবং ৫টি বিষয়ে পূর্ব রেকর্ডের সমান হয়েছে। নতুন ভারতীয় রেকর্ডের মধ্যে ভারতবর্ষের ভাগে পড়েছে ৩টি—১,৫০০ মিটার দৌড়, সটপুট এবং ৪×৪০০ মিটার রীলে। তাছাড়া ভারতবর্ষের গুরবচন সিং ১১০ মিটার হার্ডলস এবং হাইজাম্পে জয়ী হয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব রেকর্ডের সমান করেন। দৌড় অনুষ্ঠানে জার্মাণীর জয় ৬ এবং ভারতবর্ষের ৫। ফিল্ড অনুষ্ঠানেও জার্মাণী একের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়—জার্মাণীর জয় ৪ এবং ভারতবর্ষের জয় ৩। সমস্ত অনুষ্ঠানে জার্মাণীর তুলনায় ভারতবর্ষ সর্বাধিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে। দৌড় অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান ৭টা, জার্মাণীর সেখানে শূন্য এবং ভারতবর্ষের তৃতীয় স্থান ৫, জার্মাণীর ২। ফিল্ড অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান ৬, জার্মাণীর ৫ এবং ভারতবর্ষের তৃতীয় স্থান ৫, জার্মাণীর ৪। পয়েন্টের মাপকাঠিতে দুই দেশের যোগ্যতা বিচার করলে ভারতবর্ষ শীর্ষ স্থান পায়। কিন্তু যেহেতু এই টেস্ট অনুষ্ঠানের পূর্বে ফলাফল পয়েন্টের ভিত্তিতে বিচার হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন চুক্তি হয়নি সে ক্ষেত্রে দুই দেশের এই প্রথম টেস্ট ক্রীড়ানুষ্ঠানটি কেবল তিনটি স্থানের (১ম, ২য় এবং ৩য়) ফলাফলের উপরই বিচার করা হয়েছে। তাছাড়া একেবারে শেষ সময়ে দিল্লীর প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হয়। এঁরা পূর্ব-ঘোষিত ভারতীয় দলের নামের তালিকায় ছিলেন না। ফলাফলের তালিকায় দিল্লীর সুর্জনকুমার, গুরুদীপ সিং এবং আমরিক সিংয়ের নামের পাশে ভারতবর্ষের পরিবর্তে দিল্লী উল্লেখ করা হয়েছে। পয়েন্টের ভাগ-বাটোয়ারার পক্ষে এ-সব খুবই অসুবিধার কারণ। আশা করা যায়, যোধপুরের পরবর্তী দ্বিতীয় টেস্ট ক্রীড়ানুষ্ঠানের আগেই পয়েন্ট বন্টন সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষই কেবল দুটি অনুষ্ঠানে একক প্রাধান্য অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। ভারতবর্ষের এই একক সাফল্য লংজাম্প এবং হাইজাম্পে। এদিক থেকে একই অনুষ্ঠানে জার্মাণ দলের সাফল্য মাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়)। ভারতবর্ষ একই অনুষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে—১,৫০০ মিটার দৌড়, ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে। সুতরাং একক প্রাধান্যের দিক থেকেও জার্মাণ দলের তুলনায় ভারতবর্ষ বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

	১ম	২য়	৩য়
জার্মাণী	১০	৫	৬
ভারতবর্ষ	৮	১৩	১০

আন্তর্জাতিক পয়েন্টের গণনায় ভারতবর্ষের পয়েন্ট দাঁড়ায় ১৬৮, জার্মাণীর ১৩৮ এবং দিল্লীর ২৪।

ব্যক্তিগত সাফল্য

ভারতবর্ষের গুরবচন সিং হাইজাম্প এবং ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান লাভ করেন।

জার্মাণ দলের ভার্ণারফন মসটক পোলভল্ট এবং ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান এবং সটপুটে তৃতীয় স্থান পান।

জার্মাণ দলের ম্যানফ্রেড বক ১১০ মিটার হার্ডলসে দ্বিতীয় এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশীপ

রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা এই চারটি মহাদেশের ৩৬টি দেশ যোগদানের জন্যে নাম দিয়েছিল; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরুষ এবং মহিলা ভলিবল দল নির্দিষ্ট সময়ে খেলায় উপস্থিত না হওয়াতে প্রতিযোগিতা থেকে ভারতবর্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়। রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিভ এবং রীগা এই চারটি স্থানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুষ বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন রাশিয়া ১৮ পয়েন্ট পেয়ে এবারও শীর্ষ স্থান লাভ করে।
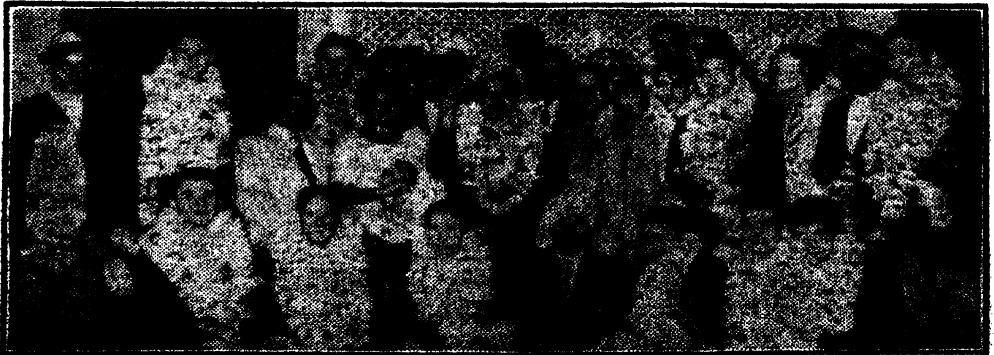
দিল্লীতে পশ্চিম জার্মাণ এ্যাথলেটিক দল: নয়াদিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে আগন্তুক দলের সঙ্গে ভারতীয় এ্যাথলীট শ্রী মিলখা সিংকে (বাম থেকে চতুর্থ) দেখা যাচ্ছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ১৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়। তৃতীয় স্থান পায় রুমানিয়া।

মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় জাপান।

॥ বিশ্ব পেন্টাথলোন ॥

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মডার্ণ পেন্টাথলোন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া দলগত এবং ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া উপর্যুপরি পাঁচবার খেতাব লাভ করলো।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম রাশিয়া ১৫,২০৩·৭৬ পয়েন্ট, ২য় হাঙ্গেরী ১৩,১৯০ এবং ৩য় আমেরিকা ১২,৪২০ পয়েন্ট।

॥ আই এ এফ হকি দল ॥

ভারতীয় বিমান বাহিনী হকি দল ইংল্যান্ড সফর শেষ ক'রে স্বদেশে ফিরে এসেছে। ইংল্যান্ড সফরে এই দলটি সাতটা খেলায় যোগদান ক'রে মাত্র একটা খেলায় হার স্বীকার করে। সফরের শেষ খেলায় হার স্বীকার না করলে তারা অজেয় রেকর্ড করতো। সফরে ভারতীয় দল সাতটি খেলায় ২৮টা গোল দিয়ে মাত্র ৫টা গোল খায়। ভারতীয় দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড মহাজন একাই ১১টা গোল দেন। ভারতীয় দল সফরের শেষ খেলায় ০—১ গোলে হকি এসোসিয়েশন দলের কাছে পরাজিত হয়। এই খেলায় সামরিক দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের সাত-জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন।

॥ নতুন বিশ্ব রেকর্ড ॥

উত্তর কোরিয়ার বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সীন কিউম ডান ৫১·৯ সেকেন্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে অনুমোদীত বিশ্ব রেকর্ড : ৫৩·৪ সেকেন্ড —মারিয়া ইটকিনা (রাশিয়া)।

॥ ডুরান্ড কাপ ও সুব্রত কাপ ॥

বর্তমানের জাতীয় সঙ্কট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলা বাতিল করা হয়েছে। দিল্লীতে ১লা নভেম্বর থেকে সুব্রত কাপ এবং ১৪ই নভেম্বর থেকে ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল।

॥ রড লেভার পরাজিত ॥

বর্তমান সময়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার স্বদেশবাসী বব হিউইটের কাছে কুইন্সল্যান্ড লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালের প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্রতিযোগিতায় লেভারের এই প্রথম পরাজয়। হিউইটের কাছে লেভারের পরাজয় এই প্রথম নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রড লেভার ১৯৬২ সালের অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ ক'রে একই বছরে বিশ্বের এই চারটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ছাড়া এ সম্মান আর কেউ পান নি।

বিশ্ব লন টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

আমেরিকার প্রখ্যাত টেনিস বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড পোটার বিশ্বের লন টেনিস খেলোয়াড়দের গুণানুসারে বেসরকারী-ভাবে একটি ক্রমপর্যায় তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ ক'রে থাকেন। তাঁর ১৯৬২ সালের তালিকায় পুরুষ বিভাগে নির্বাচিত দশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ারই চারজন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন—প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং সপ্তম। ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণানকে তালিকায় নবম স্থান দেওয়া হয়েছে।

মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান ছাড়া অস্ট্রেলিয়া আর কোন স্থান পায়নি।

ক্রমপর্যায় তালিকা

পুরুষ : (১) রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), (২) রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), (৩) ম্যানুয়েল স্যান্টানা (স্পেন), (৪) নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), (৫) চার্লস ম্যাকিনলে (আমেরিকা), (৬) জ্যান এরিক ল্যান্ডকুইস্ট (সুইডেন), (৭) মার্টিন মুলিগ্যান (অস্ট্রেলিয়া), (৮) র‍্যাফেল ওসুনা (মেক্সিকো), (৯) রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ), (১০) ফ্রেড স্টোল (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলা : (১) মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), (২) মেরি বুনো (ব্রেজিল), (৩) ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা), (৪) ক্যারেন সুসম্যান (আমেরিকা), (৫) রেনি স্কুরম্যান (দঃ আফ্রিকা), (৬) এ্যানে হেডন (ইংলন্ড), (৭) ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া), (৮) স্যানড্রা প্রাইস (দক্ষিণ আফ্রিকা), (৯) ক্যারোল ক্যাল্ডওয়েল (আমেরিকা), (১০) বিলি মোফিট (আমেরিকা)।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে মেক্সিকো ৩-২ খেলায় শক্তিশালী সুইডেনকে পরাজিত ক'রে ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোর সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত। আমেরিকান জোনের সেমি-ফাইনালে মেক্সিকো শক্তিশালী আমেরিকাকে ৪-১ খেলায় পরাজিত ক'রে প্রথম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই জোনের ফাইনালে তারা যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে।

সকলেরই ধারণা ছিল, ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় সুইডেন জয়লাভ করবে। এ ধারণার মূলে ছিল সুইডেনের বিগত কয়েক বছরের সাফল্য। প্রথম দিনের সিঙ্গলস খেলায় সুইডেন জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় অগ্রগামীও হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের ডাবলস এবং দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় মেক্সিকো জয়লাভ ক'রে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার ফলাফল সমান হ'লে মেক্সিকো ৩-২ খেলায় জয়লাভ করে। এর আগে মেক্সিকো কখনও ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার এই পর্যায়ে পৌছতে পারেনি।

আগামী ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে ভারতবর্ষ বনাম মেক্সিকোর ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা শুরু হবে দিল্লীর জিমখানা কোর্টে। এই খেলায় যে দেশ জয়লাভ করবে তারাই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অর্থাৎ ফাইনালে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে।

টেনিস খেলার পণ্ডিত মহলের মতে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মেক্সিকোর খেলার সম্ভাবনাই বেশী।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী একাদশ দল প্রথম

পলি উম্রিগড়

ইনিংসের খেলায় ২৫ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকার দরুণ চিদাম্বরম একাদশ দলকে পরাজিত করেছে। চিদাম্বরম একাদশ দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুজন খ্যাতনামা ফাস্ট বোলার কিং এবং গিলক্রিস্ট যোগদান করেছিলেন।

প্রায় কুড়ি বছর বিরতি থাকার পর হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতাটি পুনরায় এই বছর আরম্ভ হল।

চারদিনের এই ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে এ সি সি একাদশ দল ৬ উইকেট খুইয়ে ২০৫ রান করে। চিদাম্বরম একাদশ দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ ফাইনাল খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর শূন্য স্থানে আব্বাস আলী বেগ যোগদান করেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে এ সি সি একাদশ দলের প্রথম ইনিংস এক ঘন্টা স্থায়ী ছিল। ২৭৩ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিনে চিদাম্বরম একাদশ দল ৩ উইকেটে ১৪৮ রান করে।

খেলার তৃতীয় দিনে প্রায় লাঞ্চের সময় চিদাম্বরম একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ২৪৮ রানে শেষ হলে এ সি সি একাদশ দল ২৫ রানে অগ্রগামী হয় এবং এই ২৫ রানই শেষ পর্যন্ত এ সি সি একাদশ দলকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করে। এইদিনে এ সি সি একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তিন উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান তুলে। দলের প্রথম তিনটে উইকেট মাত্র ৩৯ রানে পড়ে যায় (গিলক্রিস্ট ২ এবং কিং ১)। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে উম্রিগড় এবং নাদকার্ণী দলের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন। তাঁরা যথাক্রমে ৫৩ এবং ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন এবং তাঁদের জুটিতে এই দিনে ৯২ রান ওঠে।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে এ সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৭ রানে শেষ হয়। দলের ২০৫ রানের মাথায় নাদকার্ণী আউট হলে চতুর্থ উইকেটের নাদকার্ণী এবং উম্রিগড়ের জুটি ভেঙ্গে যায়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে তাঁরা ১৭৭ মিনিটে দলের ১৬৬ রান তুলে দেন। উম্রিগড় এই খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (১০৪ রান) করার কৃতিত্ব লাভ করেন। দলের ২৪৩ রানের মাথায় উম্রিগড় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার কিংয়ের বলে ক্যাচ তুলে সিভালকরের হাতে ধরা পড়েন। এই সময়ে এ সি সি দল ২৬৮ রানে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু অধিনায়ক মন্ত্রী ইনিংস সমাপ্তির ঘোষণা করেননি। এ সি সি একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস যখন ২৮৭ রানে শেষ হয় তখন খেলা শেষ হ'তে আর ১৬৫ মিনিট বাকি ছিল এবং চিদাম্বরম দলের জয়লাভের জন্য ৩১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান করা অসম্ভব দেখে চিদাম্বরম দলের খেলোয়াড়রা পিটিয়ে খেলে যান। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় চিদাম্বরম

বাপু নাদকার্ণী

দলের ২২৬ রান উঠেছে ৮টা উইকেট পড়ে।

এ সি সি একাদশ : ২৭৩ রান (নাদকার্ণী ৯৮, উম্রিগড় ৬০, ওয়েদাকার ৫৫। কিং ৫৩ রানে ৪ উইকেট, গিলক্রিস্ট ৪০ রানে ১ উইকেট) ও ২৮৭ রান (উম্রিগড় ১০৪, নাদকার্ণী ৭৭। কিং ৬১ রানে ৩, কুমার ৮০ রানে ৩, গিলক্রিস্ট ২৯ রানে ২, মঞ্জরেকার ২৬ রানে ২ উইকেট)।

চিদাম্বরম একাদশ : ২৪৮ রান (আব্বাস আলী বেগ ৬৯, শের মহম্মদ ৪৬, মঞ্জরেকার ৪৩। উম্রিগড় ৯৭ রানে ৩ এবং নাদকার্ণী ৮৮ রানে ৬ উইকেট) ও ২২৬ রান (৮ উইকেটে। শের মহম্মদ ৪৮, আব্বাস আলী বেগ ৪০ এবং কিং ৩৫। দেশাই ৩৭ রানে ২, ওয়াদেকার ৩০ রানে ২ এবং মন্ত্রী ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

॥ সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড ॥

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার এবং কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠান আগামী ২২শে নভেম্বর থেকে শুরু হবে। এই উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু দল নির্বাচনের জন্যে যে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কম পক্ষে ৯টি নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

সতের বছরের স্কুল-ছাত্র কেভিন বেরী একাই তিনটি বিষয়ে ২২০ গজ, ২০০ মিটার এবং ১১০ গজ বাটারফ্লাই অনুষ্ঠানে বিশ্বরেকর্ড করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

অলিম্পিক বিজয়িনী কুমারী ডন ফ্রেজার ১১০ গজ ও ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৫৯-৯ সেকেন্ডে উক্ত পথ অতিক্রম করে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এক মিনিটের কম সময়ে বিশ্বরেকর্ড করার গৌরব লাভ করেন। ডন ফ্রেজার ১১০ গজ বা ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তাঁরই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ১ মিনিট সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। কুমারী ফ্রেজারের বয়স ২৫ বছর। গত ছ'বছর ধরে তিনি বহু বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

নতুন বিশ্বরেকর্ড

পুরুষ বিভাগ : ২২০ গজ ২০০ মিটার (২ মিনিট ৯-৭ সেকেন্ড) ও ১১০ গজ বাটারফ্লাই (৫৯-৪ সেঃ)—কেভিন বেরী; ৪৪০ গজ ফ্রি-স্টাইল রীলে (৩ মিঃ ৪৫-১ সেঃ)—মারে রোজ, পিটার ডোয়াক, ডেভিড ডিকসন এবং পিটার ফেলপস।

মহিলা বিভাগ : ১১০ গজ ও ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (৫৯-৯ সেঃ) অনুষ্ঠানে ডন ফ্রেজার দুবার বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেন; ৪৪০ গজ ফ্রি-স্টাইল রীলে (৪ মিঃ ১৩-৮ সেঃ)—রুথ ইভান্স, রবিন থর্ণ, লিন বেল এবং ডন ফ্রেজার।

॥ পিটার স্নেল এবং ব্রুমেল ॥

নিউজিল্যান্ডের পিটার স্নেল এবং রাশিয়ার ভ্যালেরি ব্রুমেলকে অস্ট্রেলিয়ার স্পোর্টসমেনস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'বৎসরের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট' সম্মানে অভিনন্দিত করা হয়েছে। এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত বিশ্ব বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান ওয়ালটার লিন্ডাসের স্মরণার্থে তাঁরই নামানুসারে 'লিন্ডাস ট্রফি' প্রতি বছর নির্বাচিত এ্যাথলীটদের দেওয়া হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খন্ড, ২৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৩শে কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th November, 1962.
40 Naya Paise

খৃষ্টজন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এদেশে এক তীক্ষ্নবুদ্ধি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অলোকসামান্য প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয় যাঁহাকে ইতিহাসে ও পুরাণে চাণক্য ও কৌটিল্য নামে খ্যাত করা হয়। ইঁহার “অর্থশাস্ত্র” নামক পুস্তকে রাষ্ট্ররক্ষা ও রাষ্ট্রচালনের যে সকল নীতি বিবৃত ও বর্ণিত আছে সেগুলি এরূপ কঠোর ও দৃঢ়ভাবে যুক্তিসিদ্ধ যে তাঁহার পরবর্তী বাইশ শত বর্ষের ভারত-ইতিহাস তাহার সারবত্তাই প্রমাণ করিয়াছে।

আমাদের কর্ণধারগণ কথায় কথায় ভারতের ‘চিরা-চরিত আদর্শ’ আমাদের ইতিহাসগ্রথিত ‘ন্যায়ধর্ম ও নীতি’ ইত্যাদি বাক্য শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু যে অর্থশাস্ত্রে লিখিত রাষ্ট্রনীতির উপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিগুলি চাণক্যের সময় হইতে খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ঐ মহাশয়গণ এক কথাও বলেন না।

মনে পড়ল

এই পর্যায়ে ‘অমৃতে’র প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশিত হবে অচিরে। শুরু করছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ, কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে সুলিখিত রচনা পেলেও তা সাদরে প্রকাশ করা হবে।

বাস্তব জগৎ এখনও শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্যেরই মত এবং সেই জগতে এখনও অনেক হিংস্র ও প্রবল রাষ্ট্র রহিয়াছে যাহাদের বিচারে সকল অধিকার সকল ন্যায়নীতি একমাত্র শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শক্তিহীন তাহার কোনও অধিকার প্রবলের কাছে গ্রাহ্য নয়। অধিকার বিচারের একমাত্র পথ এখনও শক্তিপরীক্ষাই। যে দুর্বল তাহার একমাত্র ভরসা প্রবলের কৃপা বা মিত্রশক্তির সাহায্য। আবার যে নির্বোধ অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বলপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নাই তাহাকে প্রস্তুতির অভাবজনিত দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইতেই হইবে।

আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছেও তাই। পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সকল কিছুর ভার ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর হস্তে এবং প্রতিরক্ষার ভার ছিল শ্রীকৃষ্ণ মেনন মহাশয়ের উপর। একজন অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্নমন বাক্যবাগীশ, অন্যজন পরমবুদ্ধিমন্ত, বাচাল ও বিপরীত বিচারে পটু—বিশেষে যেখানে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ করার প্রয়োজন ঘটে। একজন “বসুধৈব কুটুম্বকম” জ্ঞানে শত্রু-মিত্রের প্রভেদজ্ঞান বর্জন করিয়া আসিতেছেন, অন্যজন বাক্যজালে দিগ্বিজয়ে বিশ্বাসী, এবং তাঁহার বাম অক্ষির বক্রদৃষ্টির গতি সাধারণজনের সহজ পথের অতীত। সুতরাং এক কথায় আমরা বিপদকে ডাকিয়া ঘরে আনিয়াছি।

অন্যদিকে এই দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে পনেরো বৎসরের স্বাধীনতা বৃথায় যায় নাই। দেশরক্ষা ও শত্রু-প্রতিহত করার আহ্বানে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে সাড়া দিয়াছে এবং সর্বস্ব পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্র আক্রমণ দেশের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে। এবং সেই শক্তি যে কিরূপ অপরিমিত তাহার সামান্য প্রমাণ বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধে প্রায় আঠারো লক্ষ ভারতীয় সেনা জগৎবিস্তৃত রণাঙ্গনে দেখাইয়াছে। ভারতীয় জওয়ান যে কি প্রকার দুর্ধর্ষ তাহা যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে—এবং পুনরায় হইবে।

এইখানেই চীনের কূটনীতিবিদ-গণের ভুল হইয়া গিয়াছে। এদেশের কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক দেশ-দ্রোহীর মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চীন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র মেরুদন্ডহীন এবং প্রায় বিকল। চীনসেনা উত্তর সীমান্তে প্রবল আঘাত করিলেই ঐ শাসনতন্ত্র পড়িয়া যাইবে এবং সমস্ত দেশ চীনের পঞ্চমবাহিনীর করতল-গত হইবে। এখনও চীন বেতারে যে বার্তা ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাহাদের সে বিশ্বাস এখনোও আছে। হয়ত ঐ পঞ্চমবাহিনীর কোনও প্রচ্ছন্ন বেতারপ্রেরকযন্ত্রে তাহারা সেই কথাই শুনিতেছে। দেশে ঐরূপ প্রচ্ছন্ন প্রেরকযন্ত্র থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়, কেননা বাংলার এক মন্ত্রীই সেদিন বলিয়াছেন যে, একটি বিশ্বাসঘাতকের দল এখনও প্রকাশ্যে চীনের সমর্থন করিয়া দেশের লোককে প্রতি-রক্ষা চেষ্টায় সাহায্য দিতে নিষেধ করিতেছে। একথাও এখানে বলিতে হয়—বলিহারি ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স!

যাহা হউক এখন প্রশ্ন অস্ত্র-সরঞ্জামের এবং আমাদের কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধির—সেই বিষয়েই।

দু' নৌকো

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দু' নৌকোয় পা দিলে কোনো আশা নেই
তবুও কেন যে আমি পা দুটো বাড়াই?

বাতাস সুগন্ধে কেন বাজায় বাঁশি?
ফেরবার ইচ্ছে তবু বলি আসি-আসি।
অন্ধকার নদী-ভরা এক কলোচ্ছ্বাস
তোমাকে দেখলে কেন মনে হয় অনন্ত আকাশ?

কেন বল এতো রূপ এতো রস এতো গন্ধ স্বাদ
এতো ভালো-লাগা আর ঘুম-ছাড়া রাত?

ঋণ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সব থেকে বেশি দীর্ঘ রাজ্য জয় করেছে সংগীত।
পৃথিবীর জন্ম থেকে, তারো আগে নিখিল আকাশে
বেজেছে গভীর বীণা সে সকল শুনিনি তবুও
বৃক্ষে মেঘে জল স্থলে সেই স্বর লেগে আছে কিছু;
লেগে আছে আমাদের কন্ঠে সুখে বিষাদে নৈরাশে।
কেহ গায়, কেহ তার তলা থেকে কুড়ায় বকুল;
বকুলও হঠাৎ বাজে, বেহালার মত তীব্র টানে
বেজে ওঠে, কেহ শোনে, কেহ যায় নিতান্ত বধির।

অমন বকুল আমি বনতলে অনেক দেখেছি।
শুনেছি গহন গান, কুড়ায়েছে যেসব আঁচল
তাদেরও রেখেছি মনে, ভুলি নাই যেহেতু মানুষ
স্মরণ হারালে শুধু মনহীন কাঠ, খড়, ছবি!
জন্ম থেকে শুনি আমি চলে যাব, হয়ত কেবল
সংগীতের কাছে ঋণ থেকে যাবে, আর সে বকুল।

ও রূপ তোমার বড়ো মায়াময়

পুষ্কর দাশগুপ্ত

যেনবা স্বপ্নের সৃষ্টি বিকশিত তনু, রূপময়!
নিকটে দাঁড়ালে এসে প্রতিবেশ পরিচিত, ম্লান,
মুহূর্তেই অন্যরূপ—রূপান্তরে সুরম্য উদ্যান;
এবং অস্তিত্বে যেন সুরভিত বিহ্বল সময়।

দেহের প্রতিটি ভঙ্গি নিরুপম। সৌন্দর্য নির্ভার
সজ্জিত সুঠাম অঙ্গে; স্মিত মুখ, আয়ত নয়ন,
চূর্ণিত কুন্তল নিয়ে হাওয়ার প্রণয়। অনুক্ষণ
রহস্য তোমাকে ঘিরে; স্থির, মগ্ন দীপ্তি সুষমার।

ও রূপ তোমার বড়ো মায়াময়। নিশীথে—নির্জনে
একাকী দাঁড়াও তুমি স্তব্ধতায়; জ্যোৎস্নার প্রগাঢ়
কুহকে বিমুগ্ধ দিক; নিবিড়, গোপন নিঃসরণে

কোমল চন্দন-গন্ধে সমস্ত প্রান্তর ভরে গেলে—
মনে হয় তুমি যেন চকিতে অদৃশ্য হতে পার,
মোমের শিখার মতো, সুন্দর, উজ্জ্বল ডানা মেলে।

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।...

কলকাতা শহরে আমলকি গাছ নেই, অন্তত আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু শীত এসে গেছে এটা এখন স্পষ্টই অনুভব করা যাচ্ছে। গরম জামাকাপড় এখনো ন্যাপথলিনের সুখ-সংসর্গ থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের অঙ্গশোভা বাড়ায়নি বটে, কিন্তু শেষ রাতে ঘুমের মধ্যে গায়ে একটা চাদর টেনে নেওয়ার আবেগ অনুভব করা যাচ্ছে।

হয়তো এত তাড়াতাড়ি শীতের আগমন ঘটত না, কয়েকদিন আগের ঝড়-বৃষ্টিই এর কারণ। তবে হাওয়ার গতি এখন যেভাবে মোড় নিয়েছে তাতে বঙ্গোপসাগরে চট ক'রে একটা বড় রকম গর্ত তৈরি হ'য়ে বর্ষার পুনরভ্যুদয় ঘটবে এমন আশঙ্কার হেতু দেখা যাচ্ছে না।

অতএব শীত এসে গেছে। বর্ষার কয়েকমাসে বাজার নিয়ে যাঁরা ব্যাজার হ'য়ে বাড়ি ফিরেছেন, ধীরে ধীরে তাঁদের চোখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠবে। নয়নশোভন কফি, নধর বেগুন, সতেজ কলাই শুঁটি এবং নানাবিধ শাক-শব্জি বাজারের বৈচিত্র্য ঘোষণা করবে। তাছাড়া ভেট্‌কি, চিংড়ি ইত্যাদি সুস্বাদু মাছেরও শুভাগমন ঘটবে। কিন্তু দাম কী রকম থাকবে সেবিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। (যদিও চেষ্টা হবে কমিয়ে রাখবার দিকেই)।

তবে দাম যাই হোক, কেনাবেচা ঠিকই চলবে। মাছের দর যখন ছ'টাকায় উঠেছিল তখনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাড়ে চারটাকাতেও হবে না। আমাদের বাজার খরচের সম্প্রসারণশীলতা অসাধারণ। পরমহংসদেব নাকি একবার সংসারী মানুষের বিষয়ভোগের তুলনা দিয়ে বলেছিলেন, যেন উটের কাঁটা গাছ চিবানো। আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা। কাঁটা বিঁধে দু'গালের কষ বেয়ে রক্ত ঝড়ে পড়ে, কিন্তু খিদেটা এতোই বেশি যে না-চিবিয়েও অব্যাহতি নেই।

যাক এসব কথা। সে অসুবিধেগুলো পুরনো ব্যারামের মতো দীর্ঘস্থায়ী তা নিয়ে নতুন করে কাঁদুনী গেয়ে কোনো লাভ নেই। বরং শীত আমাদের নতুন কী সুযোগ এনে দিল সেই খোঁজ নেওয়াই বেশি প্রাসঙ্গিক।

কাগজে চোখ মেললে ইতিমধ্যেই সঙ্গীত সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি দেখা

যাচ্ছে। গান খুব মহৎ বস্তু। বাঙালী সংগীতপ্রিয় জাত একথা কে অস্বীকার করবে? জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী গ্রন্থ গীতাঞ্জলি পর্যন্ত গানের এই জয়যাত্রা অব্যাহত। এবং তারপরও আমরা থেমে নেই। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ধীরে ধীরে আসর জেঁকে বসেছে 'আধুনিক গান'। এ গানের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে এর গাইয়েরা আজ সামাজিক 'হিরো'র আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে ধরণের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি আধুনিক গানের নয়, মার্গ সংগীতের। এসব আসরেও শ্রোতা আসেন অজস্র।

একই সঙ্গে আধুনিক এবং মার্গ সংগীতের ভক্ত, এমন শ্রোতাও আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। কী করে এমন একটা স্ববিরোধী ব্যাপার ঘটে, তা আমি জানিনে। তবে ঘটে। সম্ভবত শীতের প্রভাবে আমাদের দেহমন একটা কিছু উত্তেজনার অবলম্বন খোঁজে, সেই জন্যেই এমনটা ঘটতে পারে। এতে এক ঢিলে সময়টাও কাটে, আবার কাল্‌চার্ড বলে সুনামও পাওয়া যায়। কাজেই শীত-সমাগমে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন দেখে আমার মতো অনেক 'ইয়াহু' ভক্তই যে মার্গ সংগীতের জন্যে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

কালচারের কথাই যখন উঠল তখন এই সঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনীর কথাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। একদা কলকাতা শহরে ছবির প্রদর্শনী শীতকালেরই একচেটিয়া ইজারা ছিল। তখন ছবি দেখার জন্যে সানাই বাজিয়ে লোক ডাকতে হত। এখন অবশ্য জমানা অনেক বদলে গেছে। সারা বছরই এখন শহরের নানা জায়গায় ছবির এক্‌জিবিশন খোলা থাকে। কিন্তু শীতকালের জাঁকজমকটা তবু লোপাট হয়ে যায়নি। অচিরেই শুরু হবে গোটাকত প্রথম শ্রেণীর চিত্র-প্রদর্শনী। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকা দরকার। ড্রইংয়ের 'ড' জানিনে অবশ্য, নিজের হাতে একটা কমলালেবু আঁকতে গেলে তার চেহারা হয় পেঁপের মতো, পেঁপে আঁকতে গেলে দেখায় যেন শশা, কিন্তু ছবির এক্‌জিবিশনে ভারিক্কী চালে ক্যাটালগ হাতে নিয়ে দেয়াল প্রদক্ষিণ করতে তবু আমাদের আপত্তি নেই। আর শুধু কি তাই? এসব এক্‌জিবিশান দেখে এসে আর্টের ওপর গোটা দুয়েক পকেট এডিশান বই পড়ে আলোচনাও ফেঁদে বসি কাগজের পৃষ্ঠায়। এবং তাতে প্যাস্টেলকে তেল রং আর তেল রংকে জল রং বলে যদি একটু বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলি তো শিল্পীরা অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবেন!

কালচারের তৃতীয় দফা হল শৌখীন সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়। পেশাদারী রঙ্গ-

মঞ্চে নাট্যোন্নয়নের পথ আজ রুদ্ধ, এ ধারণা এখন বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে আমাদের মনে। অনেক শৌখীন সম্প্রদায় যে এদিক থেকে সত্যিই অনেক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, সে কথাও স্বীকার করতে হবে সবিনয়ে। কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে এমন সব নাটক এমন পরিকল্পনায় অভিনয় করা হয়, যার মধ্যে 'নাটক', 'পরিকল্পনা' এবং 'অভিনয়' এই তিন বস্তুই আণুবীক্ষণিক অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয় আমাদের সামনে। তখন সেই গুণগুলির আবিষ্কার এবং অনুধাবনের দায় এসে পড়ে স্কন্ধে। আমরা তখন কলম ধরি। এবং অভিনয়ের দ্বারা যে-রস দর্শক-শ্রোতার-হৃদয়-মনে সংক্রামিত করা যায়নি, বর্ণনার দ্বারা সে রস পাঠকদের চোখে ছিটিয়ে দিতে থাকি।

কালচারের শেষ দফা হল সাহিত্য। বাংলা দেশের বাইরে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অধিবেশন বসে এই শীত-কালে। এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক আগ্রহের নয়, অনেকটা নিগ্রহের মতো। মূল সভাপতি, বিভিন্ন শাখার বিভাগীয় সভাপতি ইত্যাদির নির্বাচন ঠিক কী পদ্ধতিতে হয় তা আমরা জানতে পারিনে। হঠাৎ একদিন কাগজের পৃষ্ঠায় নামগুলি পড়ি, এবং কালক্রমে তাঁদের ভাষণও চোখে পড়ে। কিন্তু বাংলা দেশের লেখক-পাঠক-সংস্কৃতি কর্মীদের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে এবিষয়ে কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাইনে। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নামেই ঘটে। অনেকটা সেই, 'দোষী জানিল না দোষ, হ'য়ে গেল বিচার তাহার' ধরণের ব্যাপার! তবু এও একটা উত্তেজনা বৈকি। কাজেই একেও গণনার মধ্যে ধরতে হবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কালচারের দফা শেষ।

এর পর আছে শুধু চিড়িয়াখানা, সার্কাস আর পিকনিক।

শীত একটি মহাশয় ঋতু বটে!

ছোটগল্পে ধূর্জটিপ্রসাদ

ভূদেব চৌধুরী

একমুখী দীপ্তির প্রখরতার চেয়েও বহুচারী বিস্তার আর বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। প্রমথ চৌধুরী-মশায়ের এই স্বাতন্ত্র্য-ভাস্বর ভাব-শিষ্যটি গুরুর মতই ছিলেন যথার্থ 'আধুনিক', বিদগ্ধতার সার্থক প্রতিনিধি। আধুনিকতার এক মুখ্য লক্ষণ সর্বাভিমুখী জটিলতার মধ্যে সামগ্রিকতার অনুসন্ধান। ধূর্জটি-প্রসাদের মধ্যে সেই সন্ধানী দৃষ্টি অতন্দ্র ছিল,—জীবনের বিচিত্র-জটিল দিগন্ত-পথে কৌতূহলের জ্ঞানালোককে যা বিচ্ছুরিত করে ফিরত। অর্থনীতির বিশারদ পণ্ডিত ও অধ্যাপক হিসেবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিময় শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছিলেন; অথচ, সংগীত, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত-চেতন ছিলেন জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত; দীর্ঘকাল বাংলার বহির্বর্তী থেকেও বাঙ্গালীর বৃহত্তর প্রাণধর্মের সঙ্গে কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়নি কোনো দিন। এদিক থেকে তাঁর বিচিত্র-মুখী প্রয়াসের ফলশ্রুতি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবশ্য অনুসন্ধেয় উপাদান।

আধুনিক কালের বাঙালী পাঠকের কাছে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রায় একমাত্র পরিচয় মনন-গভীর প্রাবন্ধিক হিসেবে। মনস্বিতাই যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান তাতে সন্দেহ নেই। তাহলেও, বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ইনটেল্যাক্চুয়াল শিল্পীর এই ভাব-শিষ্য মুখ্যত বুদ্ধি-জীবী হলেও জাত-শিল্পীও ছিলেন বৈ কি! তাঁর অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭) ও মোহানা (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাসের পাঠকও একেবারে দুর্লভ নয়। প্রথমোক্ত সৃষ্টির অ-পূর্বতা সমকালীন আর এক সদ্যবিগত কবি-মনীষীর আলোচনায় সমুচিত স্বীকৃতি পেয়েছে (স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)। প্রবন্ধগুলিতে যেমন কলা-রসিক সংগীত-সন্ধিৎসু মননশীল মনের পরিচয় স্বচ্ছ হয়েছে, তেমনি উপন্যাসের সৃজনভূমিতে শিল্পীর লেখনী-মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে বুদ্ধি-প্রখর চিন্তনের গভীরতা। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের আরো এক অভিনব সৃষ্টি-প্রকরণের পরিচয় বহন করছে তাঁর স্বল্পসংখ্যক ছোটগল্প। একটিমাত্র গল্প-সংকলন গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, রিয়ালিস্ট (১৯৩৩) নামে। তাও আজ দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। শিল্পীর তিরোধানোত্তর নানা আলোচনায় কোথাও যেন 'রিয়ালিস্ট' গ্রন্থটিও তাঁর চিন্তা-মুখ্য প্রবন্ধাবলীর অস্পষ্ট গোত্র-ভুক্ত হয়েছে বলে চোখে পড়েছিল। অথচ, আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ছোটগল্প রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকরণগত সকল কনভেন-শনকে বিচূর্ণ করার সে প্রয়াস সবচেয়ে অভিনব বলেই সবচেয়ে অ-সফল বা উপেক্ষণীয় ছিল, এমন কথা বলা চলে না। বরং বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে এই রচনাগুলি স্বতন্ত্র কৌতূহলের দাবি রাখে। যার প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় যে কেবল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই নয়; বাংলা গল্প-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সচেতন স্বীকৃতিযুক্ত অনুসৃতি যাঁদের মধ্যে প্রকট, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদের এক অগ্রণী।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকায় শিল্পী লিখেছেন—"সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য।" বলাই বাহুল্য, এটুকু তাঁর সচেতন মনের বিনয়। তাহলেও,—অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর এক শ্রেষ্ঠ অনুব্রতী হওয়া সত্ত্বেও, ধূর্জটিপ্রসাদ একান্ত-ভাবেই গুরুর অনুমত ছিলেন না। অন্তঃশীলার আলোচ্য ভূমিকা এই সত্যই ব্যক্ত করতে চেয়েছে। অন্যপক্ষে, যে মননশীলতার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম যৌবন ধন্য ও পরিণত হয়েছিল, তাকে 'সবুজ পত্রের দল' নামে পরিচিত করে শিল্পী অন্যত্র লিখেছেন,—"এই দলের গোটাকয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। "বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান।" (নতুন ও পুরাতন'-বক্তব্য) তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে এই দুই ধারার প্রতিফলনই সুতীব্র।

একই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,—বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্রশক্তি, ইচ্ছা-শক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটা কয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" এই অনাপেক্ষিক বাস্তব-নির্মুক্ত নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদের অনুবর্তনে রচিত সাহিত্যের গুণ যতই থাক, তার মূলে অপরিহার্য এক ত্রুটি এসেও পৌঁচেছিল। আশ্চর্য যথার্থ দৃষ্টি ও আত্মৈষণার সঙ্গে শিল্পী তার পরিচয় দিয়েছেন,—"সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বস্তুচ্যুত হয়ে পড়ি"। ('নতুন ও পুরাতন'-বক্তব্য)।

'সবুজ পত্রের দল'-এর অপরাপর সভ্যের চেয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ সম্বন্ধে এ-মন্তব্যের সত্যতা সমধিক; আর এখানেই গুরুর গল্প-শৈলীর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পকে নিছক ইন্টেলেকচুয়াল বলবার উপায় নেই। জীবনের অপার-বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় সহৃদয় জীবনানুভবের 'পরে বুদ্ধির দীপ্ত-মার্জিত স্মিত আলোক প্রতিফলিত করেছেন তিনি। কিন্তু, ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত,—তাঁর নিজেরই ভাষায় 'বাস্তবতার কবল থেকে মুক্ত', 'জীবন থেকে—সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত'। যথার্থ অর্থে তাঁর চেতনা এক অনাপেক্ষিক, বিশুদ্ধ বুদ্ধি-জীবির। তাই বলে, তাঁর গল্প-সাহিত্য বা ব্যক্তি-অনুভবকে নির্জীবন বলবার উপায় নেই। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব,—ঠিক যে অর্থে মাছ জলজীবী। অতএব, সমাজের বিশেষ জীবন-প্রেক্ষিতে পরিবর্ধিত হয়ে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় কারো নেই। সীমিত, এমন কি অনভিপ্রেতও যদি হয়, তবু, ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডিতেও জীবনের ভাব-বেদ্য অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর গল্পে জীবনায়নের যে পার্থক্য, তা প্রধানতঃ তাঁদের দুজনের অন্তর্লীন মনোভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর

গল্পের প্লট-এ সহানুভূতিস্নিগ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার অবতারণা তার স্বতন্ত্র মূল্যে;—প্রসঙ্গতঃ সেই অভিজ্ঞতার শরীরে শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ বৌদ্ধিকতার দীপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে প্লট-এর ভূমিকা বুদ্ধির আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম হিসেবে;—তাঁর গল্পের লক্ষ্য বুদ্ধিবাদের অবাধ মুক্তি,—প্লট কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তাঁর ভাবসচেতনার কাছে সে প্লট-এর মূল্য কেবল গল্প-দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিসেবে, এর চেয়ে বেশি কোনো জীবন-মূল্য তার নেই। এই সত্যের ঘোষণাতেও শিল্পী সর্বদাই অকুণ্ঠমুখর।

রিয়ালিস্ট গল্পের মুখ-বন্ধে তার অনাবৃত প্রকাশ,—"প্রবাসের কোন একটি আড্ডায় আমরা কখনো কখনো সাহিত্য আলোচনার বদলে সাহিত্য রচনা করতাম। অবশ্য লিখে নয়, মুখে মুখে। আমাদের মধ্যে প্রবীণ রসিক পুরুষটি তিন-চারটি সংজ্ঞা ঠিক করে দিতেন, তাদের আশ্রয় করেই গল্প পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি করতে হত। সেদিন ছিল আমার পালা—সংজ্ঞা ছিল রিয়ালিস্ট, বন্যা, হিংসা ও পলায়ন। ঠিক পর পর কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে এই ধরণেরই স্মরণ হচ্ছে। মুখবন্ধ করেছিলাম এই প্রকারে,—

'যাঁরা গল্প রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাণপণে প্রমাণ করতে চান যে গল্প এটি নয়, নিছক সত্যি ঘটনা। তাদের চেষ্টা সফল হয় না, যদি বা হয় তাহলে সত্য ঘটনার বিবৃতি, অর্থাৎ ইতিহাসের মত গল্পটি নীরস হয়ে পড়ে। তার চেয়ে গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল যে এই গল্পটি কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক ঘটনারই সমাবেশ। যা বরাত দিয়েছেন, তাতে মামুলি গল্প চলে না। পৃথিবীতে রিয়ালিস্ট বলে কোনো মানুষ নেই, হতে পারে না হতে চেষ্টা করে।"

শরৎচন্দ্র নাকি গল্প-শিল্পকে বলেছিলেন 'মিছে কথা বলার আর্ট'। ধূর্জটিপ্রসাদের ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যে-কোনো রকমের মিছে বা বানানো কথাকে আর্টিস্টিক শরীরের আধারে বিন্যস্ত করতে পারলেই, তাঁর প্রকরণ মতে, গল্প-শৈলীর যথার্থ সার্থকতা। অন্যপক্ষে, যে প্রেক্ষাপরিবেশে তাঁর গল্প-সৃজনের প্রেরণার উদ্ভব, তাতে এই রচনা-পদ্ধতিকে বুদ্ধির খেলা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে সৃষ্টির উৎস স্রষ্টার অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে করা হয়। বহিরাগত নির্দেশ বা উপদেশ সেই স্বতঃস্ফূর্তির অন্তরায় বলে অনুভূত হয়ে থাকে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংযোগহীন শব্দের, অথবা একটি দু'টি গতি রেখাহীন কথার মধ্য দিয়ে সংযোগের সেতু, অথবা পথের স্পষ্ট রেখা টেনে টেলেন্ট ও ইনটেলেক্টকে খেলিয়ে খেলিয়ে কোনো এক পরিসমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছে যাওয়াই রচনা-শৈলীর মৌল বৈশিষ্ট্য।

ওপরের উদ্ধৃতিটুকু ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে আজগুবি গল্পের অসম্ভব মুখবন্ধ বলে মনে করবার উপায় নেই। তথ্য সন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁর গল্প-রচনা এই ধরণের ইন্টেলেক্চুয়াল এক্সারসাইজ-এর পটভূমি ও প্রক্রিয়া'র ভিত্তি ভেদ করেই উদ্ভূত হয়েছে। 'রিয়ালিস্ট' গ্রন্থের 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পটি লেখকের প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বলে অনুমিত হয়ে থাকে। অথচ এ-গল্পটি তিনি প্রথমে মুখে মুখে গড়ে তুলেছিলেন;—রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো এক ছত্র নিয়ে একটি গল্প গড়ে তোলা যায় কিনা, তারই এক্স্পেরিমেন্ট করবার চেষ্টায়। (এ তথ্যটুকু বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দান)। গল্প শেষের ভাষায়, গল্পের থিম্ হচ্ছে,—"সংগীত সমালোচনা।" অর্থাৎ—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি তরুমূলে
বসেছ ফুল্ল সাজে
সে কথা গেছ ভুলে।"

এই গানটি কোন্ পরিবেশে কোন্ বিশেষ ব্যক্তির কণ্ঠে সবচেয়ে সার্থক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হতে পারত, তারই বুদ্ধি-বিচারময় অনুসন্ধান রয়েছে সারা গল্পের প্লট-এ। সে প্লট আবার দুই বন্ধুর কথোপকথন ও বিতর্কের আকারে গঠিত। অর্থাৎ, গল্পের দেহে রয়েছে প্রমথ-শৈলীর সেই রূপ-মিশ্রতার স্বভাব,—কিছু কাহিনী, কিছু তর্ক, কিছু সংলাপ, কিছু বা কথোপকথন ও বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধি-ধর্মী বিচার-আলোচনা। বস্তুত গল্পের একতম শরীরে অনেক আঙ্গিকের সংকেতকে সংমিশ্রিত করার প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী মুদ্রায় ছিল এক বিশেষ পরিতৃপ্তি। গল্প রচনার কালে, নিজের শিষ্য ও স্নেহাস্পদদেরও তিনি এই বিমিশ্র রূপাঙ্গিকের বিন্যাস নিয়ে উৎসাহিত করতেন। আর, অন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে, গুরুর প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির অনুমতে দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে, তাঁর সব গল্পেই রূপের এক্সপেরিমেন্ট, বুদ্ধির সচেতন খেয়াল-খেলা; এবং গল্পের প্লট-এ বিচিত্র আঙ্গিক-মিশ্রণের প্রয়াস। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে প্লট-এর মধ্যে বিশেষ আবেগময় কোনো জীবন-মূল্যের সচেতন অস্বীকৃতিতে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পেরও শুরু হয়েছে সেই অস্বীকৃতি এবং রূপময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকেত নিয়ে,—

"ছোট্ট নদীর ধার, আলিবাটের ফাটক খোলা হয়েছে বলে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারী রাস্তার একধারে ঝাউগাছের সার, অন্যধারে জলারেখার কিছু ওপরে কাশের বন। দীর্ঘ ঝাউ-গাছের গাঁথিক উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সাদি—ক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষ-কম্পন এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূলাকেতুর পুচ্ছ-সঞ্চালন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন করে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প বলতে হলে ভ্রমণরত কোনো বন্ধুযুগলকে গাছের তলায় বসতে হয়।"

কেবল এই কারণেই শিল্পী তাঁর গল্পের প্রচ্ছদ হিসেবে দেওদার—ত্রিবেণীর অবতারণা করেছেন।—"তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়লোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার তলায় বসে পড়লেন। একজন বললেন, "এ-যেন সেই ছবির 'তিন বোন'—এ'রা তিনজন এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে শোন'।"

এখানে বিন্যাসের এক অদ্ভুত অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মত। দেওদার গাছের বিশেষ প্রেক্ষিত—এর প্রভাবেই কেবল বন্ধুযুগলের একজনের "গল্প করতে ইচ্ছে" হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য,

তিনি একটি প্রেমের গল্প ফাঁদবেন প্রথম —উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পটভূমিতে। আর, তার প্রয়োজনে "ভ্রমণরত কোনো বন্ধু-বন্ধুগণকে গাছের তলায় বসতে হয়।" কেবলমাত্র এই কারণেই গল্পে দেওদার-তরুর সন্নিবেশ, এবং সেই গাছের তলায় বসে এক বন্ধুর গল্প বলবার ইচ্ছা।

সকল সার্থক সৃষ্টিরই ভিত্তি হচ্ছে প্রকাশের ঔচিত্যবোধ;—যথোচিত প্রেক্ষিতে সমুচিত ঘটনার প্রক্ষেপ ঘটিয়ে, তবেই শিল্পী তাঁর গল্পকে বিশ্বসনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। কিন্তু শিল্পীর এই কলা-কৌশলের যথার্থ সফলতা তাঁর আত্মগোপনক্ষমতায়। অর্থাৎ যাদুকর যেমন হস্ত-পদ চালনার কৌশলে মিথ্যার মধ্যে সত্যের বিভ্রম রচনা করেন, তেমনি শিল্পী তাঁর হাতের প্রেক্ষিত-রচনা ও আরো নানা আনুষঙ্গিক হৃদ্‌গত উপাদানের মাধ্যমে এক রসস্নিগ্ধ মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন,—যেখানে উপস্থিত হতে পারলে সহজেই মনে হয়,—"এ অনুভব পরের হয়েও যেন পরের নয়,—আমার নয়, তবু বুঝি আমার।" কিন্তু, যেমন যাদুকরের বেলায়, তেমনি স্রষ্টার ক্ষেত্রেও মায়াজগৎ রচনার কৌশলযুক্ত এই অন্তরঙ্গ উপাদানসমূহ সাধারণ পাঠকের সম্মুখে প্রকট হয়ে পড়লে গল্পের জীবনাবেদন ফিকে,—এমনকি নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ওপরের গল্প-পরিস্থিতি বর্ণনায় ধূর্জটিপ্রসাদ সেই অঘটনই ঘটিয়েছেন, এবং তা ইচ্ছা করেই। তাঁর গল্প রচনার উদ্দেশ্য সংশ্লেষমূলক বা সিন্‌থেটিক নয়,—বিশ্লেষণমূলক, তথা এনালিটিক গল্প বলার মধ্য দিয়ে তিনি একটি জীবনরসঘনিষ্ঠ অনুভবের স্বাদ নিবিড় করে তুলতে চান না; বরং গল্প রচনার গোপন হাতিয়ারগুলোর কার্যকারণাত্মক মূল্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে চান;—সৌন্দর্য-সম্ভোগের চেয়ে বোটা-নিস্ট-এর অঙ্গচ্ছেদী এষণার প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবল। এই ধরণের শৈলীর আরও এক উদ্দেশ্য রয়েছে; —গল্প যে গল্পই, অর্থাৎ বানানো কথা,— গল্পাঙ্গিকের অন্তর বিদীর্ণ করে এই সত্যটিকে নির্মোহ প্রতিষ্ঠাদানে শিল্পী-হৃদয়ের যেন এক নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তি রয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবে বুদ্ধিজীবী, প্রবন্ধই তাঁর আত্মমুক্তির সহজ আধার। অতএব, গল্পের আবেগময় ললিতকলার প্রতি উপেক্ষা না হলেও তাঁর মনে রয়েছে এক কৌতুকবোধ। ফলে, তাঁর শৈলীর বৈশিষ্ট্য গল্প-রস নিবিড় করে তোলা নয়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "গল্পের কনভেনশন-এর প্রতি বিদ্রূপ ও তাহার কলাকৌশলের রহস্যোদ্ঘাটন।" দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সংশয়-রহিত পরিচয় রয়েছে তাঁর যে-কোনো গল্পে। প্রথমোক্ত মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাই রিয়ালিস্ট-এ। গল্পের নায়কের নাম রেখেছেন শিল্পী 'ক-বাবু'। অর্থাৎ এ-গল্প কোনো ব্যক্তি-জীবনের নয়,—একটি হাইপোথেটিকেল এলজেব্রিক ফিগার-এর মাধ্যমে লেখক তাঁর মনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরসিকতাকে কেবল মুক্তি দিয়েছেন,—গল্পের এই ফলশ্রুতি নায়কের নাম-করণের মধ্যেই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। গল্পের অভ্যন্তরে ক-বাবুর যক্ষ্মারোগ-গ্রস্তা পত্নীর ঈর্ষার আতিশয্য চিত্রণে সেই ব্যঙ্গরস আশ্চর্য সফলতা পেয়েছে।

তাছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের আর এক অনন্যতা তাঁর ভাষা-রীতিতে। বীরবলী স্টাইল-এর শ্রদ্ধান্বিত অনুবর্তী শিল্পী এই ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন অতিশয় 'সচেতন' বলে। অন্তঃশীলা-ভূমিকা—ধূর্জটিপ্রসাদের সকল রচনাতেই স্টাইল-এর এই অতি-সচেতনতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে, গল্পের মধ্যে সূচিত হয়েছে এক প্রসঙ্গাতিরিক্ত কথার আড়ম্বর—ওপরে উদ্ধৃত 'একদা তুমি প্রিয়' গল্পের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটি শিল্পীর এই স্বভাবসিদ্ধ স্টাইল-এর এক সার্থক নিদর্শন। কথার সুপরি-কল্পিত আতিশয্য ও আড়ম্বর গল্প-রসের সংহতিকে ছড়িয়ে বিচ্ছিন্ন বিস্তারিত করেছে প্রায়ই। রিয়ালিস্ট গল্পের ক-বাবু ও মনোরমার প্রণয়-কথার স্বাদ-বিনষ্টি এর এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ-গল্পের প্রধান প্রচ্ছদ বেরিলিতে ক-বাবুর এক বন্ধুর বাড়ীতে। ভাওয়ালি থেকে ফেরবার মুখে ভয়াবহ অবস্থায় তাড়নায় স্ত্রীকে নিয়ে ক-বাবুর এখানে এসেই উঠতে হয়—এখানেই হয় সেই স্ত্রীর দেহান্ত। মনোরমা ছিলেন ক-বাবুর সেই বিপত্নীক বন্ধুর 'পত্নীর বোন'।

সে যাই হোক, এই উপলক্ষে একটি রহস্য-তীব্র প্রণয়-কথায় রসহানি ঘটায় ধূর্জটিপ্রসাদের মনে কোনো ক্ষুণ্নতা নেই। কারণ, বারে বারে দেখেছি, প্লট-এর নিবিড়তার প্রতি তাঁর কোনো মমতা ত ছিলই না বরং ছিল সুগভীর উপেক্ষা। গল্পাঙ্গিকের ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাই 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের প্রথম বন্ধুর মুখে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় বন্ধু যখন অনেক বিতর্ক-কথোপকথনের পরে বলল, "এবার গল্প শুরু হোক।" প্রথমজন তখন জবাব দিয়েছিল, "গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের (দুই বন্ধু ও দ্বিতীয় বন্ধুর কল্পিত স্ত্রী) ঘাত-প্রতিঘাতেই গল্প তৈরী হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে নাকি?"

চরিত্র রচনাই ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের মুখ্য আকাঙ্ক্ষা; আর আগে দেখেছি চরিত্র অর্থ তাঁর নিজের দৃষ্টিতে—"(১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতি-নীতি আছে এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থকে মুক্ত হওয়া যায়।" ফলে তাঁর গল্পে আছে রূপায়ণের অজস্র সন্ধানী এক্সপেরিমেন্ট, গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের বিমিশ্রতা, চরিত্র বিস্তারের উপলক্ষে গল্পের পরিবেশ ও বাস্তব প্রসঙ্গ-রহিত বিতর্কের অবতারণা, প্লট-এর নামমাত্র আধারে তর্ক-বিশ্লেষণ-প্রধান প্রবন্ধ-শৈলীর প্রয়োগ। এক কথায় তাঁর গল্প রচনা আসলে গল্প লেখার শিল্প-খেলা। এ-খেলায় রস-প্রগাঢ়তা নয়, প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের কৌতুকোজ্জ্বল স্বভাব এ-কালের গল্প-রসিকেরও কৌতূহলের সামগ্রী হতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদের গল্প সংকলনের নবতর প্রকাশ আজও উপেক্ষণীয় নয়।

॥ 'অভিযান' প্রসঙ্গে ॥

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু—

১৯শে অক্টোবর 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীশান্তিগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' প্রসঙ্গে লেখা চিঠি পড়ে জানলাম—লেখক 'অভিযান' চিত্রের নায়ক 'নরসিংহ' চরিত্র সমালোচনা করতে তাকে অভদ্র বলে পরিচিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁর এই ভুল মনোভাবের জন্য কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করি।

ছবির প্রথম দৃশ্যেই আমরা নরসিংহের পরিচয় পাই—তার সুন্দরী বৌ তাকে ছেড়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—পালানোর প্রধান কারণ সে ট্যাক্সি-ড্রাইভার, তথাকথিত 'ভদ্রলোক' নয় বোলে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রেম থেকে বঞ্চিত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মদ্যপান কি খুবই অস্বাভাবিক?

সিংহশাবক যেখানেই প্রতিপালিত হোক না কেন, তার সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো তার স্বভাবের মধ্যে প্রতিভাত হতে বাধ্য। তাই নরসিংহের 'বেপরোয়া' ভাব—যে কোন গাড়ীকে ওভার টেক করবার যে মনোবৃত্তি—তার এই কঠিন পৌরুষের জন্য সে নিজে দায়ী নয় দায়ী তার সামন্তরক্ত যেটা তার ধমনীতে ছিল প্রবহমান। এই বংশমর্যাদা-বোধ তার রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বোলেই সে নিজে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হলেও 'তুমি' সম্বোধনকে তার স্বাভাবিক প্রাপ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারত না।

নিজে উচ্চ বর্ণের হিন্দু আর নীলিদিরা খৃষ্টান হলেও তার হাতের তৈরী কেক প্রথমে খাবার সময় তার মনে একটা দ্বিধাবোধ আসলেও ক্ষণিকের মধ্যেই সে সংকোচ কাটিয়ে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কোরল। এটাই তার মানবিক-বোধের যথেষ্ট পরিচয় নয় কি?

সে নিজের সম্মান চায় কিন্তু সে সম্মান অন্যের সম্মান হানি করে নয়।

সে নীলিদিকে ভালবেসেছিলো এবং নিজ ভালবাসার প্রবল টানে সে নীলিদিকে ভুল বুঝেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নীলিদিকে ও তার প্রেমিককে এগিয়ে দিয়ে এসেছিলো তার গন্তব্যস্থলে।

কাজেই এরপর নীলিদির কথা না মেনে তার উল্টো করাটাই কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তার মত লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়!

বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে—একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুদক্ষ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মনে সুন্দর ও অসুন্দরের অবিরাম যে সংঘাত চলেছে তারই প্রতিচ্ছবি নরসিংহের চরিত্র।

শ্রীশক্তি বসাক ও
শ্রীনারায়ণ সাহা।
দমদম, কলিকাতা-২৮

(২)

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু—

জনপ্রিয় শ্রীরায় পরিচালক হিসাবে শ্রদ্ধেয়। তাঁর 'অভিযান' বইখানার অনেক সাধু সমালোচনা পড়লাম। বইখানা ভাল হয়েছে নিঃসন্দেহ। তবে নিখুঁত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীরায় 'Star System'-এর পক্ষপাতী নন। মনে হয় তিনি বলতে চান 'Star'-ই ছবির একমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জনকারী শিল্পী নয়। সুস্থ পরিচালকের হাতে পড়লে অখ্যাত শিল্পীকে দিয়েও ছবির জনপ্রিয়তা অর্জন করানো যায়। এবং শ্রীরায়ের সেই ক্ষমতা আছে। তার প্রমাণ তাঁর পূর্ববর্তী ছবিগুলি। কিন্তু 'অভিযানের' একটি আলাদা সূক্ষ্ম শিল্পরস আছে। এবং তার জন্য আছে শ্রীরায়ের অসাধারণ পরিচালনার কৃতিত্ব। শিল্পীদের দিয়ে তিনি প্রাণবন্ত অভিনয় করিয়েছেন। কিন্তু একটি চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। 'গোলাবী' চরিত্রটি কি তিনি কোন অখ্যাত শিল্পীকে দিয়েও অভিনয় করাতে পারতেন না? আমাদের বাংলা চিত্রজগতের অনেক শিল্পীই তো হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে একবার চেষ্টা করলে শ্রীরায় নিশ্চয় 'গোলাবী' তৈরী করতে পারতেন। তাহলে মনে হয় তাঁর পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত।

দ্বিতীয়তঃ নরসিং-এর স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করল বলে নরসিং স্ত্রী-বিদ্বেষী হয়ে রইল। স্ত্রী-লোকের প্রতি সব সময় তাঁর ক্রোধ, ঘৃণা। যার জন্য বিবাহিত কনেকে সে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিল। এবং পরে আবার বেশী টাকার লোভে গোলাবীকে গাড়ীতে তুলল। কিন্তু কেন? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে নরসিং ট্যাক্সি-ড্রাইভার। তাঁর চরিত্রের দুটো সত্তা, যার জন্য চরিত্রের এরূপ দুর্বলতা'। কিন্তু সব মানুষেরই তো দুটো সত্তা আছে। তবে যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল তার এরূপ দুর্মতি কেন? এখানে কাহিনীর দুর্বলতা ঘটে না কি? এ দিকে গাড়ীর লাইসেন্স বাতিল হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের পায়ে ধরতে যে ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রবীর্ষে বাধা দের সে ক্ষত্রিয় কি করে চোরাকারবারীর অন্যায় ব্যবসার পার্টনার হয়? চিন্তাশীল দর্শক অবশ্য এ ছবির একটা সূক্ষ্ম-রুচিবোধের স্বাদ পাবেন। কিন্তু সাধারণ দর্শকের মনে নায়কের অপ্রকৃতিস্থতাই বদ্ধমূল হয়ে থাকবে না কি?

ইতি নমস্কারান্তে—
শ্রীমাধব মজুমদার
কলিকাতা-১০

॥ নৃত্য সম্পর্কে ॥

অমৃত পত্রিকায় "এশিয়ার লোক-নৃত্যের ভূমিকা" (চিত্তরঞ্জন দেব) "উত্তর প্রদেশের দেবদাসী" (প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরো কিছু কিছু নৃত্যের বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। সাধারণভাবে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক সম্পর্কে যত আলোচনা হয় সে তুলনায় নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ অনেক কম, আপনাদের পত্রিকায় সে প্রয়াস দেখে খুব খুশী হলাম। ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস ও ধারা এবং তার প্রাকৃত ও লোকনৃত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা-কালে এই ধরণের আলোচনার অভাব বিশেষ বোধ করেছি, একমাত্র ডাঃ মুল্ক-রাজ আনন্দ সম্পাদিত "মার্গ" পত্রিকার নৃত্যকলা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি।

নমস্কারান্তে
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা : ৩৪

অমরেশ দাশ

কয়েক মাস এই ঘরটায় সে আছে। এটাকে ঘর না বলে খুপরি বলাই উচিত। লম্বায় অনেকটা হলেও চওড়ায় এটা নিতান্তই ছোটো। অন্যমনস্ক হয়ে মাঝে মাঝে যখন আড়াআড়িভাবে সে শুয়ে পড়ে তখন দেয়ালে পা লেগে যায়। অবশ্য ছাদটা অনেক উঁচু। ছাদের কোণ ঘেঁষে একটা ছোটো জানালার মতো আছে। চেষ্টা করলেও তার নাগাল পাওয়া যায় না। সেখান দিয়ে দিনের বেলা আলো আসে, রাত্রে অন্ধকার। বাইরের বাতাস কখনো-সখনো ভুল করে ঢুকে পড়ে। মেঝেতে শুয়ে ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে সে দেখে। দুটি চড়ুই ওখানে বাসা বেঁধেছে। কিছুক্ষণ পর পর ওরা কি মনে করে একবার আসে, আবার বেরিয়ে যায়। যখন ভাববার কিছু থাকে না তখন সে ওদের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করে।

এখানে যখন প্রথম আসে তখন তাকে একটা অন্য ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে আর দশজনের সঙ্গে সে কয়েকদিন ছিল। সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষ তাকে সেখানে আর দশজনের সঙ্গে একসঙ্গে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাই স্থানান্তরিত করলেন এই ঘরে। ঘরে ঢুকে সে যখন চার পাশ দেখছিল তখন যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটু পর যখন পেছন ফিরে তাকাল তখন দেখল সামনে একটা লোহার দরজায় তালা ঝুলছে। যে সিপাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তখন সে চলে গেছে।

তারপর অল্প কয়েকবারই এখান থেকে বেরুবার সুযোগ পেয়েছে সে। অথচ একথা সত্য তার একটা ঘর ছিল, সে ঘরে একটা বউ ছিল, একটা ছেলে ছিল। আবার এও ঠিক সেই সে ঘর ভেঙেছে। দিনের বেলা খাওয়া হয়ে গেলে মেঝেতে শুয়ে পড়া তার অভ্যাস। অভ্যাসটা আগে ছিল না; এখানে আসবার পর হয়েছে। আগে সে সময়টা বসবার সুযোগও পেত না। এখানে এসে যেদিন প্রথম চড়ুই পাখী দুটি দেখল সেদিন ওরা ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে তাকে দেখেছিল। নীচে নেমে আসতে সাহস পায়নি। আস্তে আস্তে ওরা তাকে চিনে ফেলে।

বুঝতে পারে ওদের মতো সেও এ ঘরের বিনা ভাড়ার বাসিন্দা। এখন ওদের ভয় কেটে যায়। খাওয়া শেষে এদিক-সেদিক ভাত ছড়িয়ে থাকত; কেননা তখন সে খেতে পারত না। তার খাওয়া হয়ে গেলে ওরা দুটিতে নেমে আসত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাত খেত। এখন সে খেতে বসলেই ওরা নেমে এসে তার থালার সামনে বসে। আগে যখন খেতে বসত তখন তার বউ সামনে এসে বসত। ক্রমে সে ওদের ভালোবেসে ফেলল।

বউকে সে শেষ দেখেছে খবরের কাগজের পাতায়। যে রাত্রে সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার একদিন পর ঘটনাটা কাগজে বেরিয়েছিল। সমস্ত কাগজ বড় করে প্রথম পাতায় ছেপেছিল। সেখানেই বউর ছবি দেখেছে; ওর পাশেই শুয়ে ছিল ছেলেটা। সেই শেষ ওদের সে দেখেছে। তারপর তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ওদের মৃতদেহ দুটোও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। শুনেছে পুলিশের লোকেরাই ওদের কবর দিয়ে এসেছে। দারোগাবাবুকে সে বলেছিল, ওদের কবর দেবার সময় যাতে উপস্থিত থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু ওদের কখন কোথায় কবর দেওয়া হল সে খবর সে আর পায়নি।

তাকে গ্রেপ্তার করবার পর দারোগা-বাবু তার কাছে সমস্ত ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলেন। সে নিজের থেকে কোনো কথা বলেনি। বলতে চায়নি। অনেকক্ষণ তাঁর সামনে বসেছিল। তারপর এক সময় একটা খাতা খুলে কলম তুলে তিনি পর পর কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বউ এবং ছেলেকে তুমি মেরেছো?' সে মুখ নীচু করে বলেছিল, 'না'। কেন জানি সেদিন সে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারেনি। তার উত্তরটা খাতায় লিখে নিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহলে ওদের বিষ খাইয়েছে কে?'

সে বলল, 'কেউ খাওয়ায়নি।' বুঝতে পারল দারোগাবাবু তার উত্তরটা ধরতে পারছেন না। একটু জোরে তিনি বললেন, 'ঐ বাচ্চা ছেলেটা কি নিজে থেকে বিষ খেয়েছে?'

'না।'

উনি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'তাহলে?'

যথাসম্ভব অল্প কথায় সে জানাল, তার বউ বিষ খাবার আগে বিষ খাইয়েছে। উনি সঙ্গে সঙ্গে খাতায় কথাগুলো লিখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'ওরা যখন বিষ খাচ্ছিল তখন তুমি ওদের কাছে ছিলে?'

'বউর পাশেই ছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু বলে উঠলেন, 'বাধা দাওনি কেন?'

'আজ্ঞে, তেমন কথা ছিল না।'

উনি তার কথায় ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কেমন করে ওদের মৃত্যুটা সম্ভব হয়। আরো খোলাখুলিভাবে ঘটনাটা অকে বলতে বললেন। সে জানাল, এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। উনি খাতা বন্ধ করে রাখলেন।

তারপর কয়েকদিন তার কাছে দারোগাবাবু এসেছেন। যেদিন সকালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল সেদিনই তাকে এখানে আনা হয়েছে। ঢোকবার সময় এখানকার বাইরেটা ভালো করে দেখতে পায়নি। তখন অনেক রাত। তাছাড়া চারদিক বন্ধ যে কালো গাড়ীটায় তাকে এখানে আনা হয়েছিল, সেটা ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর তাকে বাইরে বার করা হয়। অবশ্য গাড়ীটার টিনের দেয়ালে কয়েক টুকরো জাল ছিল। কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে জেলখানার চেহারা দেখার কোনো উৎকণ্ঠা বা কৌতূহল তার ছিল না।

জেলখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেছে এখান থেকে সহজে বেরুনো যায় না। এখানে একবার যারা ঢোকে তারা কিছুদিন না থেকে কখনো বেরোয় না। তাকেও এখানে থাকতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে হতেই তো কয়েক মাস কাটিয়ে দিল। তারপর কত দিন কে জানে!

তার ঘটনাটা তদন্ত করবার ভার দারোগাবাবুর ওপর পড়েছে। তিনি মাঝে মাঝে আসেন তার কাছে। প্রথম যেদিন তিনি এলেন সেদিন সে আশ্চর্য হয়েছিল। কেননা, তিনি ঢোকার আগে সে কখনো ভাবতেও পারেনি যে এই খুপরীটায় দ্বিতীয় ব্যক্তি ঢুকতে পারে। সেদিন দেখল, তিনি এলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন সিপাই একটা টুল এনে তাঁকে বসতে দিল। তারপর তার সঙ্গে তিনি অনেক কথা বলার চেষ্টা করলেন। সে বেশি কথা বলতে চায়নি। অনেকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করার পর তিনি জানতে পারলেন, কলকাতায় আসার আগে দার্জিলিং জেলায় তার বাড়ী ছিল। প্রয়োজনীয় কথা সেদিন আর বিশেষ কিছু হয়নি। দারোগাবাবু জানতে চাইলেন তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কেমন লাগছে ইত্যাদি। সে বলল, 'সুবিধা এখানে মানায় না।' বুঝিয়ে দিল তার ব্যাপারে তিনি যদি মাথা না ঘামান ভালো হয়। সেদিন সে তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছিল, যে, বেশি কথা বলতে সে ভালোবাসে না। তিনি বোধহয় উল্টোটা বুঝেছেন। ভেবেছেন সে একা-একা যে থাকে, ভালো লাগে না। তাই তিনি যদি আসেন এবং তাকে সঙ্গ দেন তাহলে তার ভালই লাগবে। তিনি প্রায়ই আসেন। কোনো কোনো দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে কাটিয়ে দেন।

দ্বিতীয়বার যেদিন দারোগাবাবু এলেন সেদিন তাঁকে বেশ চঞ্চল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ঘরে ঢুকেই তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন তো খবর নিতে এলেন না?'

সে তাঁকে জানাল, কলকাতায় তার কোনো আত্মীয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কোথায় আছেন বলুন, খবর দিয়ে দেবো আমরা।'

সে একটু মুশকিলে পড়ল। কেন-না এর আগে দারোগাবাবু কখনো তাকে আপনি বলে সম্বোধন করেনি। তাছাড়া দার্জিলিং-এর কাছাকাছি এক গ্রামে তার শ্বশুর থাকেন। কথাটা দারোগাবাবুকে সে জানাতে চায় না। সাহস করে বলল, 'তাঁদের আমি বিরক্ত করতে চাই না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার নিকট-আত্মীয় তেমন কেউ নেই; যে দু-একজন আছেন তাঁরা অনেক দূর-সম্পর্কের। বস্তুত তাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগা-যোগ নেই।' এমনও বলল যে, পিতৃ-পরিচয় না দিলে তাঁরা তাকে চিনতেও পারবেন না। কেবলই তার আশংকা হচ্ছিল এই বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ এসে পড়ল। কেননা কাগজে তার বউর ছবি বেরিয়েছে; হয়তো তাঁরা তা দেখে থাকবেন। এতোদিনেও যখন কেউ এল না তখন সে বুঝেছে শ্বশুরবাড়ীর কেউ

পড়তে জানে না। ছবি এবং খবর দুটিই তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

এই ঘরের সামনে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা। বারান্দার একপাশে সারি-সারি ঘর। এক ঘরের একজন আর এক ঘরের আর একজনকে দেখতে পায় না। সে জানে তার ঘরের পাশের ঘর দুটিতে দুজন কয়েদী আছে। বারান্দায় বেরুলে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। কোনো প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেই বারান্দায় বেরুনো যায়। ঘরে বসে কোনো লোকজন দেখতে পায় না সে। মাঝে মাঝে পাহারাওলা পুলিশ পায়চারি করে।

বাইরে কখন সকাল হয়, সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল—এখান থেকে বোঝা যায় না। বাইরে আলো ফুটলে চড়ুই দুটি তাকে ডেকে তুলে দেয়। তখন বুঝতে পারে সকাল হয়েছে। আবার পাখী দুটো যখন ঘর থেকে আর বেরোয় না, তখন বুঝতে পারে সন্ধ্যা হয়েছে। এমনি করেই সময়ের হিসেব রাখে সে।

আজ রোববার। এই দিনটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সারা সপ্তাহ কাজ করে এই একটি দিন ছুটি পেত। আগে এই একদিনের অবকাশ সুখের ছিল। সকালবেলা বউকে সঙ্গে করে গির্জায় যেত। এখন সব দিনগুলি রোববার হওয়া সত্ত্বেও সুখের না। মুশকিল আরো, যখন সব কথা মনে পড়ে।

প্রথম কয়েকদিন তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। বউ এবং ছেলে যেভাবে মরেছে তাতে তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। প্রথমে এই জিনিসটা এখানকার কর্তৃপক্ষ এবং দারোগাবাবু বুঝতে চাইতেন না। দারোগাবাবু তখন প্রায়ই এসে তাকে বিরক্ত করতেন। প্রথম দু-তিনদিন তার কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ায় তারপর কয়েকদিন আসেননি।

পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করল তখন থেকেই সে জেনে গেছে তার নামে একটি মামলা হবে; অর্থাৎ তার বিচার হবে। এতোদিন মামলা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। তখন অবস্থাটা মোহাচ্ছন্ন ছিল তাই। সহসা এরকম একটা পরিবর্তনের জন্য আগে থেকে সে প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য প্রস্তুত হবার সত্যি কোনো কারণ ছিল না। যতক্ষণ না চরম ব্যর্থতার মুখোমুখি হল ততক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারেনি। সে-রাতে সত্যি যখন সে পারল না তখন নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার সময় পায়নি। পরিবর্তনটা বন্যার জলের তোড়ের মতো ধাক্কা দিল। তারপর? কোথায় ভেসে বেড়াল, যেখানে ছিল সেখান থেকে কতোদূরে এসে পড়ল সে খেয়াল তার ছিল না। এখন আর জলের তোড় নেই। এক অচেনা চরে আটকে পড়েছে।

কয়েকদিন পর দারোগাবাবু যখন আবার এলেন তখন মামলা সম্বন্ধে একটা ভাবনা তার মনে দানা বেঁধেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশংকা পেয়ে বসেছে তাকে। সেদিন যখন দারোগাবাবু এলেন তখন সে আশ্বস্ত হল; ঠিক করল তাঁকে সব কথা বলবে।

'আর কদ্দিন এখানে থাকতে হবে?'

উনি একটু ভারি গলায় বললেন, 'যতোদিন না আপনার মামলার বিচার হচ্ছে।'

দারোগাবাবুর গলা শুনে মনে হল উনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই অসন্তোষের কারণ তার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই বেশ অস্বস্তি বোধ করল তাঁর সান্নিধ্যে। প্রথম প্রথম তিনি যখন আসতেন তখন তাঁকে সহৃদয়ী বলে মনে হত। সে একজন মানুষের অসন্তোষের কারণ এবং সেই মানুষ তার সামনে বসে—অবস্থাটা ঠিক সামলে উঠতে পারছে না। এই খুপরিতে ঢোকবার পর মনে হয়েছিল, এখন আর নিজের ওপর নিজের কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তৃপক্ষের মর্জিই সব। কিন্তু সে কখনো কারুর অসন্তোষের কারণ হতে চায়নি। মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। দারোগাবাবু বললেন, 'জানেন বোধহয়, আপনার মামলার তদন্তের ভার আমার ওপর পড়েছে।'

সে নীরবে শুনল। একথা তার কাছে নতুন নয়। তাঁর কাছেই আগে অনেকবার শুনেছে। তাই বুঝতে পারল না একথা তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার কি তাৎপর্য। এর আগে কোনো মামলায় সঙ্গে সে জড়িত ছিল না। নিয়মকানুন কিছুই জানা নেই। তিনি বললেন, 'আপনার কলকাতার বাসায় কয়েকদিন আগে একবার গেছলাম; কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। ও-বাড়ীর কেউ আপনার কোনো খবর দিতে পারল না।' 'ছ মাসও আমি ও-বাড়ীতে থাকিনি। তাছাড়া পাহাড়ী বলে সকলে একটু এড়িয়েও চলত।'

পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা মুখে দিলেন দারোগাবাবু; একটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'নিন খান।'

সে তাঁর আদেশ মতো সিগারেটটা ধরাল। উপেক্ষা করে এমন ক্ষমতা তার ছিল না। কেননা, এই প্রথম দারোগাবাবু তাকে সিগারেট সাধলেন। তাছাড়া জেলখানায় ঢোকার পর একটি সিগারেটও সে খায়নি। অথচ তার সিগারেটের নেশা বহুদিনের। বাসায় যখন বেশি সিগারেট খেত তখন মাঝে মাঝে বউ রাগ করত। আজ যখন দারোগাবাবু সিগারেট সাধলেন তখন তার লোভ সামলাতে পারল না সে। এঘটনা তার কাছে নতুন। এখানে এর আগে যতোদিন তিনি এসেছেন সব সময়ই তাঁকে সিগারেট খেতে দেখেছে সে। মাঝে মাঝে সেদিকে তাকিয়েও থেকেছে হয়তো। কিন্তু এর আগে তিনি কখনো তাকে সিগারেট সাধেননি।

সিগারেটটা পেয়ে খুব জোরে কয়েকবার টান দিল। একসঙ্গে মুখ-ভর্তি ধোঁয়া টেনে বেশ আরাম বোধ হল। এলোপাথাড়ি টান দেওয়ায় একপাশ থেকে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। একবার খুব জোরে টান দিতেই দারোগাবাবু বললেন, 'অতো জোরে টানবেন না, বুকে লাগবে।'

তার ইচ্ছে হল, তাঁকে বলে কতোদিনের এই অভ্যাস। কিন্তু মুখের ওপর তেমন কথা বলা ঠিক হবে না ভেবে আগের চেয়েও জোরে টান দিল। কয়েক টানেই সিগারেটটা শেষ হল। দারোগাবাবুর সিগারেট তখন সবে আধখানা হয়ে পুড়েছে। তিনি আস্তে আস্তে টানছিলেন এবং ধোঁয়াগুলো নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ছিলেন।

তার সিগারেট শেষ হতেই দারোগাবাবু বললেন, 'আর একটা খাবেন?' 'না।' সত্যি কথা বলতে কি তার খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লজ্জা পেল। মনে হল উনি তার সিগারেট টানার অস্বাভাবিক রকম দেখে অনুকম্পা করছেন। নিজেকে সংযত করল সে। যদি পয়সা থাকত তাহলে সে সিগারেট আনিয়ে দেবার অনুরোধ করত। তার পকেটে পয়সা নেই।

দারোগাবাবুর সঙ্গে বসে থাকতে মন্দ লাগছে না। সিগারেট খাবার পর থেকে খুব আপন আপন বোধ হচ্ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠছেন। দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি

দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কেন?' কথাগুলো অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, মনে হল।

'চাকরির খোঁজে।' সংক্ষেপে উত্তর দিল সে। তার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। তাঁর চোখে একবার তার চোখ পড়ে যাওয়ায় সে দেখল তিনি আরো জানতে চাইছেন। কিন্তু কি বলবে তা গুছিয়ে নিয়ে নিজে থেকে বলতে ইচ্ছে হল না। একটু পর দারোগাবাবু বললেন, 'আপনার মামলার তদন্তের ভার আমার ওপর পড়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন ভালোভাবে উত্তর দিলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

তাঁর গলা যেন ভারি বোধ হল। কথার ঢঙে আদেশের ভাব প্রকাশ পেল। সে কথাগুলো আস্তে বলল, 'কি বলতে হবে?'

'আপনি কেন কলকাতায় এসেছেন, কারুর সাহায্য পেয়েছেন কিনা, এখানে এসে আপনার সংসার কিভাবে চলত, চাকরির জন্যেই বা কি চেষ্টা করেছেন— এই সমস্ত কথা আমায় বুঝিয়ে বলুন।'

প্রশ্নগুলো শুনল সে। হঠাৎ কি খেয়াল হল বলল, 'না বললে কি হবে?'

রাস্তায় চলতে চলতে নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে দিলে যেমন চীৎকার করে ওঠে তেমনি চীৎকার করে উঠলেন, তিনি, 'কি হবে বুঝতে পারছেন না! আপনার মামলার রিপোর্ট আমি দিতে পারব না, আর আমার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কেস কোর্টে উঠবে না।'

'সব কথা না বললে আপনারা কি আমায় শাস্তি দেবেন?'

'কি মূর্খের মতো প্রশ্ন করছেন!'

'না, আপনারা—তো ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতেও পারেন!'

'আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন না, যে, আমার রিপোর্টের ওপর আপনার মামলা নির্ভর করছে।' সে একটু ভয় পেল। কেননা দারোগাবাবু যদি ইচ্ছে করেন তা হলে তার নামে অনেক কিছু লিখতে পারেন।

'আপনার কি এখানে থাকতে ভালো লাগছে?'

তাকে অপ্রস্তুত করে তিনি প্রশ্ন করলেন। 'হ্যাঁ অথবা না' কোন উত্তরটা দিলে তিনি খুশী হবেন ভেবে পেল না সে। কোনো উত্তর না দেওয়ায় দারোগাবাবু আবার বললেন, 'আপনার কি বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না?' 'বাড়ী!' আর কিছু বলতে পারল না সে। ইচ্ছে করে ঠিক, কিন্তু কি হবে বাড়ী গিয়ে? কার জন্যে যাবে, কাকে নিয়ে সেখানে থাকবে? তাছাড়া বাড়ী বলে তো কোনো স্থান তার নেই। বিয়ে করেছিল; ছেলেও হয়েছিল একটা। যেখানে চাকরি করত সেখান থেকে এক কামরার যে কোয়ার্টার দিয়েছিল তাতেই থাকত। বউর কথা মনে পড়ায় তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

'আপনি কি আমার প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দেবেন না?'

চমকে উঠল সে। 'কেন দেবো না, নিশ্চয়ই দেবো।' আস্তে উত্তর দিয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকাল। দারোগাবাবু তাঁর পাতিলের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা বুঝিয়ে দেবার পর থেকে অবস্থাটা একটু অন্য রকম হয়ে উঠেছে। এতোদিন সে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এখন বুঝতে পারছে সেটা ঠিক হয়নি। তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা আছে। তিনি ইচ্ছে করলে তার নামে অনেক কিছুই লিখতে পারেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, 'আপনাকে আগেই বলেছি চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসেছি। কথাটা কিন্তু সত্যি; চাকরির খোঁজেই আমি কলকাতায় এসেছি।'

এই পর্যন্ত বলে সে থামল। আশা হল, এবার বুঝি তিনি বুঝবেন। সব কথা খুলে বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। পুরনো কথা ভাবতে ভালো লাগে না। ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়; কাঁদতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে জানে ইচ্ছে করলেও তার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

'বুঝলাম আপনি চাকরির খোঁজেই কলকাতায় এসেছেন। এখন কলকাতায় আসার পর কি হল, কি করলেন—সমস্ত কথা আমায় খুলে বলুন। কোনো ফাঁক রাখলে চলবে না; তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।'

ক্ষতি হবে বলায় সে ঠিক করল সব কথাই বলবে। কিন্তু একবার বলতে গিয়েও থেমে গেল। কেননা সব কিছু চাপা দিয়ে কেবলই সেই রাতের ছবি মনে পড়ছে।

দারোগাবাবু একটা সিগারেট ধরালেন তাকেও একটা সাধলেন। সে নিল না।

'দার্জিলিং-এর কাছাকাছি চা-বাগানের চাকরি থেকে আমি ছাঁটাই হয়ে যাই। তারপর সেখানে অন্য কোথাও চাকরি জোটাবার অনেক চেষ্টা করি। চেষ্টা করতে করতে কয়েক মাস কাটে। হাতে যা ছিল সব শেষ হয়ে যায়। তখন আমার ছেলেটার বয়স সাত কি আট মাস। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। আপনি তো দেখেছেন তাকে। আর হবে নাই বা কেন বলুন; ওর মা তো খুবই সুন্দরী ছিল। অমন সুন্দর বউ আপনাদের ঘরেও বেশি দেখা যায় না।'

'এসব কথা শুনতে চাই না; কলকাতার কথা বলুন।' তাকে বাধা দিয়ে বললেন তিনি।

এসব কথা বাদ দিয়ে কলকাতার কথা কি বলবে, ভেবে পেল না। ছোটো জানালার দিকে চেয়ে দেখল চড়ুই দুটি বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা নেমে আসতে চায়। কিন্তু দারোগাবাবু থাকায় সাহস পাচ্ছে না। সে ভাবল, বউটা যদি বেঁচে থাকত তাহলে তাকে এমন অবস্থায় পড়তে হত না। বউ মারা যাবার পর আরো বেশি করে মনে পড়ছে ওকে। বড় সুন্দর ছিল ও। ছেলেটা হবার পরও। এখন সে বুঝতে পারছে কাগজ থেকে ওর ছবিটা কেটে রাখা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে তবু দেখতে পেত। দারোগাবাবুকে বলল, 'যে কাগজে আমার বউ আর ছেলের ছবি বেরিয়েছিল, সেটা যোগাড় করে দিতে পারেন?'

'কেন?'

'মাঝে মাঝে ওদের দেখতে ইচ্ছে করে।'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি। তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন বলেও মনে হল না। তার মনে হল, এসব কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। উনি হয়ত ভাবছেন সে একটি স্টেণ। মনে পড়ল উনি তার নামে অনেক কিছু লিখতে পারেন। তাতে তার ক্ষতি হতে পারে। একথা মনে হতেই সে পূর্ব-প্রসঙ্গ ধরল, 'চাকরি থেকে ছাঁটাই হবার পর ভাবলাম একাই কলকাতায় চলে আসি। অনেকে বলল, কলকাতায় গেলে চাকরি পাবে। শুনেছি এখানে আমাদের ওখানকার লোকেরা সাধারণত দারোয়ানের চাকরি করে। চলে আসব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু একা আসতে পারলাম না।

কেননা ওখানে বউ আর ছেলেকে রেখে আসবার জায়গা ছিল না।'

আর বলতে পারল না সে। স্পষ্ট দেখতে পেল সেদিনের ছবি। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে উঠল তারা। সেই প্রথম তার বউ ট্রেনে উঠল। ট্রেনে বসে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ও ট্রেনের চাকাগুলোর রহস্যময় চলা দেখছিল। চাকাগুলো ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে। কখন, কোথায় তলায় কি পড়ল, তার কোনো খেয়ালই রাখছে না। সে নিষেধ করায় ও মুখটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ছেলেটাকে কোলে করে সে বসেছিল। আর ও আপন মনে দুপাশের দৃশ্য দেখছিল। ওকে দেখে খুশীই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে খুশী হতে পারে নি। ভালো লাগছিল না কলকাতায় আসতে। প্রথম থেকেই আশংকা হয়েছিল আর যদি
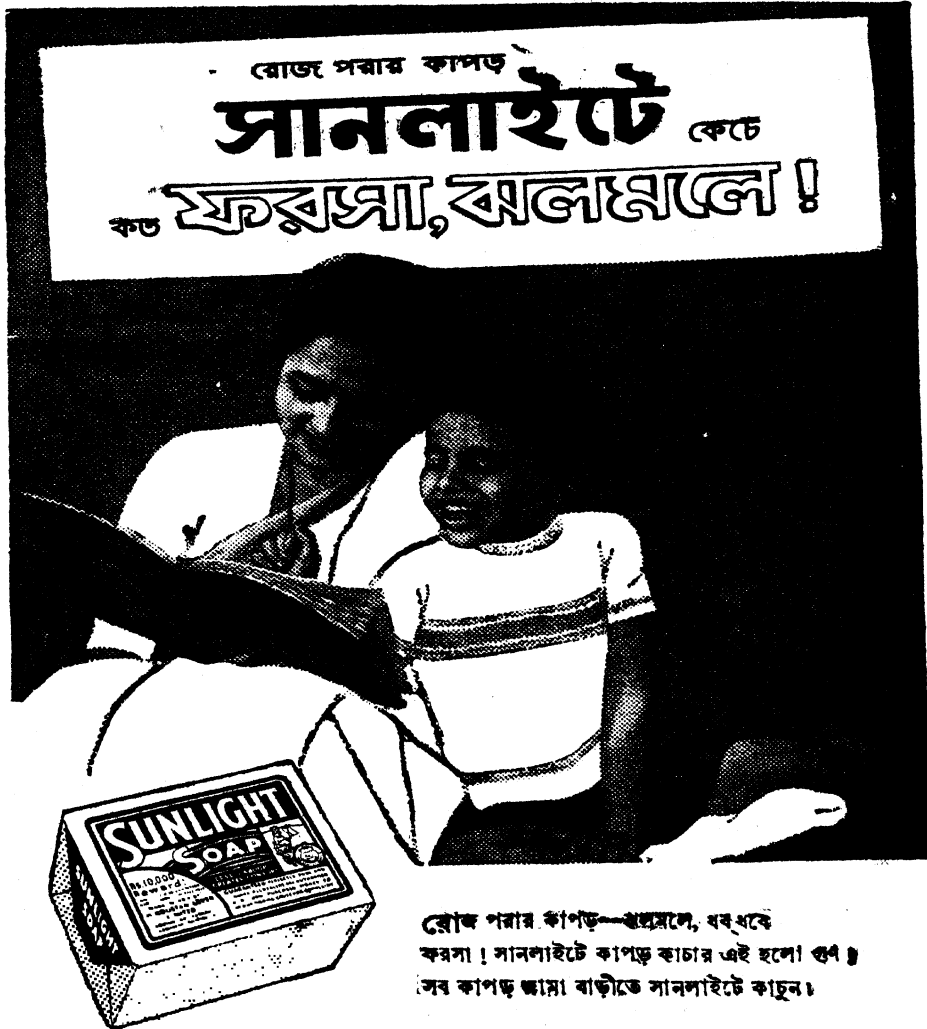
ফিরতে না পারে। এখন বুঝতে পারছে আর ফিরতে পারবে না।

সে থেমে যাওয়ায় দারোগাবাবু উসখুস করছিলেন। এতক্ষণ বেশ মন দিয়েই কথাগুলো শুনেছেন। আবার সে বলতে যাবে এমন সময় দারোগাবাবু বললেন, 'কলকাতায় কি আপনার জানা-শোনা কেউ ছিল?'

'আজ্ঞে না।'

তার এই উত্তরে তিনি একটু হতাশ হলেন। সে জানাল, 'কলকাতায় এসে প্রথমদিন স্টেশনেই ছিলাম। তারপর আমাদের ওদিককার একজনের সংগে দেখা হয়ে যায়। সে-ই আমাদের বাসাটা ঠিক করে দেয়।'

'সে এখন কোথায় থাকে? তার সঙ্গে কি আপনার আগের কোনো পরিচয় ছিল?'

'না, না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার চেহারা দেখে বুঝলাম সে আমাদের ওদিককারই লোক। কথা বলে দেখলাম তাই। তারপর তাকে সব খুলে বললাম।'

অন্য প্রশ্নটার জবাব না দিতে পেরে সে চুপ করে রইল। দারোগাবাবু বললেন, 'সে এখন কোথায় থাকে?'

'তাতো বলতে পারবো না।'

উনি তার উত্তরে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। সে লক্ষ্য করছে, তিনি তার কথা এখন আর বিশ্বাস করতে চান না। দারোগাবাবুর কাছে সে এখন আর দশ-জন কয়েদীর মতোই। চোর-ডাকাত-খুনী অনেক কয়েদীই এই জেল-খানায় আছে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে তো তেমন কিছু করেনি। সত্যিই এমন কিছু সে করেনি যাতে তার জেল হতে পারে। এখানে থেকে থেকে সে ওদের মতোই হয়ে যাচ্ছে। তবু ভালো, ছেলেটা মরেছে। যদি বেঁচে থাকত তাহলে ওর কাছে মুখ দেখাতে পারত না। দারোগা-বাবুর মতো ও-ও হয়তো বলত সে-ই বউকে মেরেছে। না, ছেলেটা মরেছে একরকম ভালোই হয়েছে। কাগজের ছবিতে ওকে শুয়ে থাকতে দেখেছে সে। মরে গেছে বলে মনেই হয়নি।

সে যখন এসব ভাবছিল তখন উনি কি-সব লিখে নিচ্ছিলেন। লেখা শেষ হতেই বললেন, 'তারপর বলুন।'

আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। সে বলল, 'একটা সিগারেট দেবেন?'

দারোগাবাবু পকেট থেকে সিগারেট বার করে তাকে দিলেন। নিজেও একটা ধরালেন। সিগারেটে বেশ আয়েস করে টান দিল সে। এতো কথা একসংগে বহুদিন বলেনি। সেই মেয়ে-মানুষ মরার সংগে শেষ কথা হয়েছিল। দুজনে অনেক কথা সেদিন বলেছিল। তারপর বিষ খেয়ে ও যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিল তখন অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখল সে। মরবার আগের মুহূর্তেও যেন কি-কথা বলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি। সে তারপর ওর ঠাণ্ডা দেহটা অনেকবার নেড়েচেড়ে দেখেছে। সিগারেটে জোরে জোরে টান দিল সে। ঘন ঘন নিশ্বাসের সংগে আওয়াজ হচ্ছিল। প্রাণপণে আওয়াজটা চাপবার চেষ্টা করল।

'দারোগাবাবু আপনার বউ আছে?'

'আমি বিবাহিত।' সংক্ষেপে তার কথার উত্তর দিলেন তিনি।

ভালো লাগল না তার কথা বলার ঢংটা। মনে হল, অনেক কিছু চেপে রেখে জবাব দিলেন। সে ঠিক এরকম জবাব আশা করেনি। এতো নির্বিকার ভাবে কথা বললেন তিনি যে তার ধারণা হল দারোগাবাবু স্ত্রীকে ভালো-বাসেন না। জবাব দেওয়া ভঙ্গী, এরকম ভেবেই হয়ত বলেছেন।

'আচ্ছা আপনি কখনো আপনার বউয়ের গায়ে হাত দিয়েছেন?'

'কি বোকার মতো প্রশ্ন করছেন!' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি।

বোকার মতো কি এমন কথা বলেছে, সে বুঝতে পারল না। যাই হোক, দারোগাবাবুর স্ত্রীর দেহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর মতো নয়! মরা দেহটাও কি নরম ও সুন্দর ছিল? আর একবার যদি ওর দেহটায় হাত বুলোতে পারত। ওর মতো নরম সুন্দর দেহ যদি দারোগাবাবুর স্ত্রীর হত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এভাবে উত্তর দিতেন না। বউটা যদি আজ বেঁচে থাকত তাহলে দেখাতে পারত কেন সে এমন প্রশ্ন করেছে।

'আপনি এতো বউ বউ করছেন কেন?'

'বড় ভালো ছিল বউটা!'

'মরবার আগে বোঝেননি? মরতে দিলেন কেন?'

'না, না; আমি মরতে দেইনি।' তাড়াতাড়ি বলল সে। এতো তাড়াতাড়ি বলল যে তিনি শুনতে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

'হয়তো দিয়েছি—' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা-বাবু লিখে নিলেন।

'দারোগাবাবু, আপনি আপনার বউকে ভালোবাসেন?'

'কেন বাসবো না!'

'আমি যে আমার বউটাকে কি ভালোবাসতাম তা আপনাকে কেমন করে বোঝাই! উঃ, ও যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহলে আপনাকে দেখাতাম কতো ভালো বউ আমার ছিল। আপনি ঠিকই বলে-ছেন, আমিই ওকে মরতে দিয়েছি।'

দারোগাবাবু তার কথায় খুশী হলেন। সে-ও খুশী হল তাঁকে দেখে। তাঁর জুতো-জোড়া পালিশ করা, চক-চক করছে। সেদিকে তাকাতেই তাঁর জুতোতে মুখের ছায়া দেখতে পেল সে। দূর থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ভাবল মুখটা নীচু করে দেখবে কিনা। না, তাঁর জুতোর পালিশ যদি নষ্ট হয়ে যায়। সে তখন জানালার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল। চড়ুই দুটি দেখতে পেল না।

দারোগাবাবুকে এখন তার ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, মাথাটা মালিশ করে দিতে।

'তারপর বলুন কলকাতায় বাসা ভাড়া করে কি করলেন।'

'কিছুই করতে পারিনি; সত্যি বলুন কিছু করতে পেরেছি কি?'

'না, না, আমি ওভাবে কথাটা বলিনি। কলকাতার বাসায় আপনার কিভাবে চলল, চাকরি-বাকরির কি চেষ্টা করলেন—এইসব আর কি।'

তার মনে হল, তিনি একথাও বলতে চেয়েছিলেন—কেন বউকে মারলেন। কিন্তু পারলেন না। কলকাতার দিনগুলো তার কাছে বীভৎস। এখানে আসবার পর মাঝে মাঝে মনে যে না পড়েছে—এমন নয়; তবে যখনই মনে পড়েছে তখনই মরবার ইচ্ছে জেগেছে।

'ওসব জেনে আপনার কি হবে? ভালো লাগে না ওসব বলতে।'

'আপনার ভালো-লাগাটাই তো সব নয়; আমি আপনার মামলার তদন্ত করছি একথা মনে রাখবেন।'

'সত্যি বলছি আমাকে আর ওসব কথা বলতে বলবেন না, পারি না।'

ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলল সে। কলকাতার কথা ভাবতে গেলেই কে যেন তার গলা চেপে ধরে। চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'বউ ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার সামর্থ্য যার নেই, তার কোনো অধিকার নেই তাদের কথা মুখে আনার।' তার সামনে বউ আর ছেলে বিষ খেয়ে মরেছে একথা সত্য। সে তাতে বাধা দেয়নি, একথাও সত্য। কিন্তু একথাও সত্য বাধা দেবার কোনো অধিকার তার ছিল না। গাছের ডাল থেকে একটি পাখী পড়ে গিয়ে আহত হলে তাকে সুস্থ করবার জন্যে এগিয়ে আসে পথ-চলতি মানুষ। অথচ সে নিজের বউ এবং ছেলেকে স্বেচ্ছায় মরতে দিয়েছে! একথা বিস্তৃত করে বলতে তার সাহস হচ্ছে না। কি করে বলে নিজের অক্ষমতার ইতিবৃত্ত। দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি বলবেন না? তাহলে আমায় ধরে নিতে হচ্ছে আপনিই আপনার স্ত্রী এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছেন।'

তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বুটের আওয়াজ তুলে চলে গেলেন তিনি।

দারোগাবাবু চলে যাবার পর তার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। কদিন থেকে মামলার ভাবনা তকে চঞ্চল করে তুলেছে। বাঁচবার ইচ্ছেটা দিন দিন বাড়ছে। যে কদিন মামলার কথা ভাবিনি সে কদিন এতো খারাপ লাগেনি। তার পাশের কয়েদীটির পাঁচিশ বছর জেল হয়েছে। তার যদি তেমনি পাঁচিশ বছর জেল হয়! পাঁচিশটি বছর যদি এখানে কাটাতে হয়! ভাবতেও পারে না সে।

কাল সারারাত তার প্রতিবেশী ঘুমোয়নি। দেয়ালে এতো জোরে জোরে লাথি মারছিল যে কেবলই তার ভয় হচ্ছিল দেয়ালটা যদি তার ওপর ভেঙে পড়ে! আশ্চর্য, এখানে ঘুমাতেও দেবে না। চাবাগান থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত তারা। বাসায় ফেরবার আগেই তার বউ রান্না করে রাখত। খেয়ে শুয়ে পড়ত তারা। তাদের ওদিকে তাড়াতাড়ি রাত হয়। শীতকাল হলে তো কথাই নেই! এখানে এই মেঝেতে একা একা শুয়ে থাকতে হয়; অবশ্য পাশ ফিরলে দেয়ালের স্পর্শ পাওয়া যায়। বউটা যদি না মরতো, তাহলে আবার ওখানে ফিরে যেত। 'অমন বউটাকে মেরে ফেললাম!'— ভাবল সে। দারোগাবাবু বলে গেলেন সে মেরেছে। সে মেরেছে? কি জানি হয়তো মারতেও পারে। না, দারোগাবাবু ভুল বলেছেন; অমন ভালো বউকে কি মারা সম্ভব? চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল তার।

বারান্দা দিয়ে এক সিপাই গটগট করে চলে গেল। পেছন পেছন গেল তার লম্বা ছায়াটা।

চদুই দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো আওয়াজ আসছে না। রাত কতো হয়েছে সে জানে না। তবে এই বারান্দার অন্ধকার এবং আলো দেখে সে বুঝতে পারছে শুয়ে পড়বার সময় হয়েছে। প্রতিবেশী যদি আজও ঘুমোতে না দেয়—এমন আশংকা করার কারণ আছে। গতরাত্রে তার জন্যে সে ঘুমাতে পারেনি। ঘরময় পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি এবং ছাই ছড়িয়ে। হাত দিয়ে সেগুলো জড় করে সে দরজার ফাঁক দিয়ে বারান্দায় ফেলে দিল। দারোগাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে এখন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। শুয়ে পড়ল তাই। তার হাতে এখনো সিগারেটের গন্ধ লেগে। অত্যন্ত পরিচিত গন্ধ। বারে বারে হাতটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘ্রাণ নিল সে। একটা সিগারেট পেলে বেশ ভালো হত। কতোদিন পর সে সিগারেট খেল! সিগারেটের গন্ধেতেই হোক অথবা ক্লান্তি-তেই হোক সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল হতে না হতেই কান্নার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠল সে। তার প্রতিবেশী কয়েদীটি, যে পরশু রাতে তাকে ঘুমোতে দেয়নি, হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেয়ালে কান পাততে হয় না, এমনিই পাশের ঘরের আওয়াজ আসে। একজন সিপাইকে ডেকে ব্যাপারটা জানল সে। গতকাল বিকেলে তার একজন আত্মীয় এসেছিল। তার কাছে খবর পেয়েছে যাকে সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল সে কলেরায় মারা গেছে। ঐ মেয়েটাকে ভালোবাসতো আর একজন পুরুষ। সে তাকে খুন করে এখানে এসেছে।

ঘটনাটা শুনে আশ্চর্য হল সে। কেননা কাল রাত্রে তার প্রতিবেশী একটুও গোলমাল করেনি। বুঝতে পারল সারারাত চুপ করেছিল। কিন্তু সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর চুপ থাকতে পারেনি; কান্নায় ফেটে পড়েছে। দুপুরে কয়েকজন সিপাই এবং একজন দারোগা এল। পাশের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেল সে। তার সামনে দিয়েই ওরা ওকে নিয়ে গেল। ওকে আর এখানে রাখা হবে না; পাগল হয়ে গেছে। অথচ তার সামনে দিয়ে যখন ও গেল তখন ওকে দেখে পাগল মনে হয়নি। লোকটা পাথর হয়ে গেছল; সকলে মিলে ধরাধরি করে পাথরটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

এ ঘটনা ঘটে যাবার পর সে ভীষণ অসহায় বোধ করল। এই জেলখানা এতো নীরব যে সামান্য কিছু হলেই সকলকে নাড়া দেয়। তার সামনে বউ এবং ছেলে মরেছে সে পাগল হয়নি। অথচ ও পাগল হয়ে গেল। সে-ও যদি পাগল হয়ে যায়! পাগলরা জ্ঞানশূন্য; জগতের কোনো জিনিসের মূল্য তারা বোঝে না। এমনকি তারাও যে একদিন মানুষ ছিল একথাও নাকি ভুলে যায়। সে পাগল হয়ে গেলে তেমনি হয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। 'আঃ! বউটা যদি এখন থাকতো!'— ভাবল সে।

সে মাঝে মাঝে নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এরকম হয় যখন চা-বাগানের কথা মনে পড়ে। বাগানের কাছেই তার এক-কামরার কোয়ার্টার ছিল। সেই কোয়ার্টারে বউ এবং ছেলেকে নিয়েই ভালোই ছিল সে। এখন মনে হয় ধর্মঘট না করলেই হত। যা মাইনে পেত তাদের আড়াইজনের সংসার কোনো রকমে চলে যেত। কিন্তু বাজের সংসার বড় তাদের চলত না। চা-বাগানের আর গত দুবছরে অনেক বেড়ে গেছল। তারা সকলে মিলে ঠিক করল মালিকের কাছে একত্র হয়ে গিয়ে মাইনে বাড়াবার কথা বলবে। ভালো কথা বলতে পারত সে। কেননা ছেলেবেলায় চার্চের ইস্কুলে সে পড়েছে। একদিন সকলে মিলে মালিকের কাছে গেল। উনি তাদের কয়েকজনকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। কয়েকজন ভেতরে গিয়ে তাঁকে তাদের কথা জানাল। উনি কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না; তাদের দাবি শুনলেন। তারপর একমাস কেটে গেল। মাসের শেষে যখন মাইনে পেল তখন সকলে দেখল এক পয়সাও বাড়েনি।

দারোগাবাবু যে কখন এসেছেন সে লক্ষ্য করেনি। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দরজার গরাদের ওপর একটা পা-তুলে কোমরে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; মুখে সিগারেট। কোমরে এবং বুকের ওপর যে বেল্ট বাঁধা, সেগুলি একটু আগেই পালিশ করিয়েছেন বুঝি; চকচক করছে। কোমরের বেল্টের একপাশে একটা

রিভলবার। তার চামড়ার খাপটাও পালিশ করা।

'কি ভাবছিলেন একমনে?' মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন তিনি।

'না, এমন কিছু নয়। আপনি বুঝি অনেকক্ষণ এসেছেন?'

'একটু আগে এসেছি। আপনি গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন, বুঝতে পারেননি। স্ত্রীর কথা ভাবছিলেন বুঝি!'

না। তিনি ভেতরে আসবার পর মনে হল তার উচিত ছিল তাঁকে ভেতরে ডাকা। দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সে। একটা টুলে বসে তাকে বসতে বললেন তিনি।

গতদিনের কথা কাটাকাটি মনে পড়ল তার। সহজ হতে পারল না তাই। দারোগাবাবুর পাশে নিজেকে বড় ছোটো মনে হল তার। কিন্তু তিনি তার জড়তা ভেঙে দিলেন।

কোমরে একটা হাত রেখে...

তাঁর কথায় ধাক্কা দেওয়ার সুর আছে বোধ হল। তিনি ধরে নিয়েছেন, সে একটি বউ-পাগলা। যেন বউ ছাড়া তার আর কিছু ভাববার নেই।

'এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখে যাই আপনি কি করছেন।'

একজন সিপাই এসে দরজা খুলে দিল। তার কি করা উচিত বুঝে উঠল

'আপনি কাল যে সমস্ত কথা বলেছেন তাতে আমার অনেকটা কাজ হয়ে গেছে।'

সে নীরবে মাথা নত করে শুনল।

'এরকমভাবে যদি বাকি ঘটনাটা আমায় জানিয়ে দেন, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার কেসের রিপোর্টটা দিয়ে দিতে পারব।'

এবারও সে কোনো উত্তর দিল না।

'অবশ্য আমি বুঝতে পারি আপনার কষ্ট হয় সে সব কথা বলতে। কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। আপনি যে খুব ভালোবাসতেন স্ত্রীকে।'

'সত্যি খুব ভালোবাসতাম,' আর চুপ করে থাকতে পারল না সে।

'সে আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা, আপনার ছেলেটার কতো বয়স হয়েছিল বলেছিলেন?'

'এক বছরের কিছু কম। ছেলেটা ভারি সুন্দর হয়েছিল; কলকাতার বাসায় সারাক্ষণ হামা দিয়ে বেড়াত।'

'চাকরির জন্যে আপনি চেষ্টা করেছিলেন?'

'কয়েকটা কারখানায় গেছলাম; কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করেনি। পরিচিত একজন মানী লোকের সার্টিফিকেট চেয়েছিল অনেক জায়গায়। আমার জানাশোনা তেমন কেউ নেই।'

'এই নিন।' হাত বাড়িয়ে তাকে সিগারেট দিলেন তিনি।

সে দেখল চড়ুই দুটি ওপর থেকে দেখছে। দারোগাবাবু রোজ রোজ কেন তার কাছে আসেন—ওরা বুঝতে পারছে না বোধ হয়। দারোগাবাবু একগাল ধোঁয়া ছাড়তেই ওরা বেরিয়ে গেল।

দারোগাবাবুর চকচকে পোষাক আর অন্তরঙ্গতা তার মাথা নত করে রাখতে চাইল। এখানে এই খুপরিতে সারাক্ষণ একা থাকে সে। এমন থাকা তার অভ্যাস নয়। দারোগাবাবু মাঝে মাঝে আসেন, কথা বলেন। মন্দ লাগে না। যখন বুঝতে পারেন তিনি তার ভালোর জন্যেই সমস্ত কথা জানতে চাইছেন তখন থেকে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আবার এক এক সময় মনে হয়, তিনি আর তার কি ভালো করবেন? বউ আর ছেলের মৃত্যুর কারণ সে, আইন তাকে শাস্তি দেবে। জেলখানায় যে একবার ঢোকে সে কিছুদিন না থেকে বেরোয় না। এটা এখানকার চলতি কথা। তার বউ আর ছেলেকে সে নিজে মেরেছে —আইনে হয়তো একথা প্রমাণিত হবে। সে খুনী—বিচারক ঘোষণা করবেন।

'কি ব্যাপার চুপ করে গেলেন।' তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে।

'আচ্ছা, আমার কতোদিনের জেল হবে?' দারোগাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'একথা কেন ভাবছেন, তার কোনো ঠিক আছে!'

তাঁর কথা শুনে তার মনে হল অনেকদিনের জেল হবে।

'ফাঁসিও-তো হতে পারে?'

'না, না, না। ওসব বাজে কথা; ফাঁসি হবে কেন, আপনি তো আর নিজে ওদের মারেননি।'

'হয়তো আমিই ওদের মেরেছি!'

কদিন থেকে কেবলই তার একথা মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে সে-ই ওদের মেরেছে। এ ধারণা মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না। তবে ক্রমশ সেটা বিশ্বাসে পরিণতি পাচ্ছে। এখন আর উলটো কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ফাঁসি আপনার হবে না; সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আপনার যাতে ফাঁসি না হয় সেরকম করেই রিপোর্ট লিখে দেবো।'

'না, না; ফাঁসির ব্যবস্থাই আপনি করে দিন। বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। যখন এখান থেকে ছাড়া পেয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবো তখনকার অবস্থা ভেবে দেখেছেন। না, না; সে আমার সহ্য হবে না।' কথাগুলো বলার সময় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল সে।

'কেন এখান থেকে বেরিয়ে দেশে গিয়ে যাই হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবেন।'

'তখন আমাকে কেউ চাকরি দেবে না। সকলে জেনে যাবে, আমি বউ ছেলেকে খুন করে গাঁয়ে ফিরে এসেছি। তার চেয়ে অনেক ভালো ফাঁসি। শুনেছি, এখানে নাকি গলায় দড়ি পরিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। সে বেশ ভালো; বেশি কষ্ট নেই, সময়ও বেশি লাগে না।'

কি সব বাজে কথা ভাবছেন। বললাম না আপনার যাতে ভালো হয় সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।' সে চুপসে গেল। অস্বাভাবিক জোরে কথাগুলো তিনি বললেন। তার ভালো তিনি কিছু করতে পারেন, একথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। অন্য কয়েদীদের মুখে এমন কথা সে কখনো শোনেনি। তাছাড়া তার ভালো করার মতো কি আর আছে। যে মানুষ বউ-ছেলেকে মেরেছে তার ভালো করার কথা আইনে আছে কিনা সে জানে না।

'আপনি মন খারাপ করবেন না; আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'

আগের মতো জোরে নয়, বেশ আস্তে অনুনয় করে বললেন তিনি।

'কি বলব আপনাকে; আমি আমার বউ-ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি—আপনি তো জানেন!'

'জানি। তবুও সব কথা না জানলে আমার পক্ষে রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়।'

একটু ভেবে তার দিকে তাকাল সে। তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'চাকরির চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না তখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষদিকে সেজন্যে বাড়ী থেকে বেরুতাম না, সারাক্ষণ বাড়ীতেই থাকতাম। এদিকে প্রথম মাসের ভাড়াও বাড়ীওয়ালাকে দিতে পারিনি; তিনি প্রায়ই এসে তাগাদা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ভাড়া-তো দূরের কথা খাবার মতো পয়সাও আমার ছিল না। বউ বলেছিল গাঁয়ে ফিরে যেতে; কিন্তু আমি রাজি হইনি। কি হবে গাঁয়ে গিয়ে, সেখানেও যখন উপোস করতে হবে তখন এখানে থাকতে আপত্তি কি! এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি। গাঁয়ে ফিরে গেলে উপোস করতে হলেও বউ আর ছেলেকে এভাবে মরতে হতো না। একথা বিশ্বাস করেন আপনি?'

'আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করি।'

'বেশ কয়েকদিন আমরা উপোস করেছিলাম। আমার আর বউর কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। কেননা আমরা জানতাম এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কিন্তু—ছেলেটা ওকথা বুঝতো না। রাতদিন চীৎকার করত। অবিশ্যি তাতে ওর কোনো দোষ ছিল না, আমাদের সঙ্গে ওকেও উপোস করতে হয়েছিল।' সে আর বলতে পারল না। গলা থেকে যেন বন্যার মতো কান্না উঠে আসতে চাইল। নিজের ছেলেকে খেতে দিতে পারেনি; একথা মনে করে একজনকে শোনানো যে কি কষ্টকর, বুঝতে পারল সে।

দারোগাবাবু তার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। একটা সিগারেট দিলেন।

'ছেলেটা খিদেয় চীৎকার করতো; আপনি কি করলেন?'

'আমি?—আমি কিছুই করতে পারিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমাদের আর ও-বাড়ীতে থাকতে দেবে না। বাড়ীওলা শেষ কথা বলে গেছলেন। অথচ কোথাও যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কলকাতায় এমন কেউ নেই যে আমাদের সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। সারাদিন বউর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এমন অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বউ বললে, আমরা যদি বিষ খেয়ে মরে যাই তাহলে সব মিটে যায়। আমি এই কথায় প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু তারপর দুজনে মিলে মনস্থির করলাম।'

একটু থামল সে। তারপর আবার বলল, 'দারোগাবাবু, এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।' দারোগাবাবু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে শুনলেন।

সে থামল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনের ছবি। সন্ধ্যের সময় সে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় তখন আলো জ্বলছিল, লোকজন ভর্তি ছিল। ভীষণ ভয় করছিল পথ চলতে। এতো লোক দেখে একবার তার মনে হয়েছিল, দরকার নেই বিষ কিনে, বাড়ী ফিরে যাবে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও খালি হাতে ফিরতে পারেনি সে। রাত অনেক হলে বিষ কিনে বাড়ী ফিরল।

ছবিটি মনে পড়ায় মুখ বন্ধ হয়ে গেছল তার। দারোগাবাবু স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আবার বলতে লাগল সে, 'একটা বাটিতে বিষ গুলে আমরা পাশাপাশি বসলাম। রাত তখন অনেক; বাড়ীর অন্যান্য কোনো ঘর থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেক আগেই। ঘরে কোনো আলো ছিল না, বউ বা ছেলের মুখের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল বলতে পারবো না। তবে মনে আছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বউ শান্ত ছিল। কথা ছিল ও-ই আগে ছেলেকে বিষ খাইয়ে পরে নিজে খাবে এবং সব শেষে আমি। দারোগাবাবু আমি তা পারিনি, কথা মতো কাজ আমি করতে পারিনি। বাটিটা মুখের সামনে তুলেছিলাম ঠিক, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি, পড়ে গেছল।'

কথা শেষ হতে না হতেই দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধরল সে। তিনি আস্তে আস্তে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর দরজাটা অনেকক্ষণ খোলা ছিল; কিন্তু সে বেরিয়ে যেতে পারেনি।

একটু পর দূর থেকে ভেসে-আসা হাসির আওয়াজ শুনে সে উঠে দাঁড়াল।

দরজার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে যতোটা সম্ভব মাথাটা বাইরের দিকে বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করল। রাত তখন অনেক হয়েছে। কাউকে সে দেখতে পেল না। আবার সেই হাসির শব্দ শুনতে পেল; এবার একটু জোরে মনে হল। সরে এল সে দরজার কাছ থেকে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে,—এমন সময় চড়ুই দুটি গোলমাল শুরু করে দিল। ভীষণ রেগে চীৎকার করে ওঠায় ওরা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখল, চুপ করে গেল। আশ্চর্য, হাসিটা ক্রমশঃ বাড়ছে; অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে। ডানদিকের দেয়ালে কান পাতল, মনে হল শব্দটা ওঘর থেকেই আসছে। আবার কান পাতল; ঠিক ধরেছে। কিন্তু ওঘরে-তো কেউ নেই! তবে? বাঁদিকের দেয়ালে কান পাতল, ওদিক থেকেই হাসিটা আসছে বলে বোধ হল। সরে এসে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। কি মুশকিল! হাসিটা আরো জোর মনে হল। এমন সময় ঘরের আলোটা নিভে গেল।

'কেমন আছেন এখন?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল সে; প্রশ্ন করতেই চোখ মেলে সামনে দারোগাবাবুকে দেখল। কোনো উত্তর না দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চারপাশটা দেখে নিল। একটা বড় ঘরে অনেকগুলো লোহার খাট, দু-একটা বাদে সব কটাতেই লোক শুয়ে। এটা হাসপাতাল সে বুঝল।

'কেমন আছেন এখন?' কোনো উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন দারোগাবাবু।

এবার তার অবস্থাটা বুঝতে পারল সে। বলল, 'এই আছি আর কি!'

পাশ ফিরল।

'কাল রাত্রে কি হয়েছিল আপনার? হঠাৎ ওরকম চীৎকার করে উঠলেন।'

কোনো কথা বলল না সে। কাল রাত্রে কি হয়েছিল মনে নেই তার। এমন কি কখন সে এখানে এসেছে তাও সে জানে না। হাসপাতালের জানালাগুলো খোলা। সকালের রুদ্দুর এসে মেঝেতে পড়েছে। অনেকদিন পর রুদ্দুর দেখে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

'কাল বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। অনেক বাজে কথা বলেছেন।'

পাশ-ফেরা অবস্থায় সব কথাই শুনল সে। তবু কোনো কথা বলল না। কি বাজে কথা সে বলেছে তাও জানতে ইচ্ছে করল না। এখন এতো ভাববার বা বলবার ইচ্ছে নেই তার।

'হাসপাতালে নিয়ে আসবার পরও অনেকক্ষণ আবোল-তাবোল বকেছেন।' নিজে থেকেই কথা বলে যাচ্ছেন দারোগাবাবু; আপনি আপনার বউ-ছেলেকে খুন করেছেন—এরকম কি একটা বার বার বলছিলেন। আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়েছি, এমন সময় একজন সিপাই এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য, হঠাৎ কেন যে এমন হয়ে গেলেন!' থামলেন দারোগাবাবু। সে তেমনি পাশ ফিরে শুয়ে। দারোগাবাবুর কথা শুনে তার কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না।

'ডাক্তার বলেছেন, ওকিছু নয়, সাময়িক উত্তেজনা। একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন কিনা। ভাববেন না, ভালো হয়ে গেছেন; কালই এখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবে।'

ভালো হবার চিন্তা একবারও তার মনে আসেনি। এবার উঠে বসল সে।

লাল রঙের কম্বলটা জড়িয়ে নিল গলা পর্যন্ত। গরম না লাগলে মাথার ওপর তুলে দিত। একবার ভাবল চোখ তুলে দেখে দারোগাবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিনা। না দেখেও সে বুঝতে পারল তার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। আশ্চর্য হয়েছেন হয়তো তার কম্বল জড়ানো দেখে। কম্বলের তলা দিয়ে একটা পায়ের কিছুটা বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পাটা আর একটু ঢুকিয়ে নিল।

'আপনার কি শীত করছে? জ্বর আসছে নাকি?'

তার কপালে হাত রাখলেন দারোগাবাবু। বললেন, 'কই, না-তো!'

কোনো জবাব দিল না সে। এখানে আসবার পর আজ সকালেই তার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। বুঝতে পারছে গতকাল রাত্রে কিছু একটা হয়েছিল, তাই তাকে এখানে আনা হয়েছে।

তথাপি কথা বলতে তার সাহস হচ্ছে না। অন্যদিন দারোগাবাবুর সঙ্গে সে অকপটে কথা বলেছে। অথচ আজ কেন জানি সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারছে না তাঁর দিকে।

এতক্ষণ যে রুদ্দুরটা ঘরের মেঝেতে ছিল এখন সেটা আকাশে মেঘের পেছনে। জানালা দিয়ে দেখল সে।

'মনে হচ্ছে আজ জল হবে। যা গরম পড়েছে—হলে বাঁচা যায়।'

দারোগাবাবুর এই মন্তব্য শুনে তার মনে হল, তার কম্বল জড়ানোকে ঠাট্টা করে কথাগুলো বললেন তিনি। অবশ্য এরকম মনে হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর দিকে তাকাতে পারল না।

'আপনার কি শরীর খারাপ মনে হচ্ছে?'

'না।'

চেহারাটা কিরকম হয়েছে যা দেখে উনি তার শরীর খারাপের কথা বললেন—আয়নায় দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সামনেই দারোগাবাবু বসে। উঠতে গেলেই প্রশ্ন করবেন। সে চাইছিল উনি উঠে যান। কেননা তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই তার। উপরন্তু এভাবে নিজের থেকে একের পর এক প্রশ্ন করলে তার পক্ষে চুপ করে মাথা নত করে থাকা সম্ভব হবে না।

'আমি এখন উঠি; পরে আবার আসবো'খন। চলে গেলেন দারোগাবাবু।

বিছানার ওপর বসে চারপাশটা ভালো করে দেখল সে। এতোক্ষণ দারোগাবাবু সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে ভালো করে দেখতে পারেনি। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সবকটি বেডে চোখ বুলিয়ে নিল।

'কি ব্যাপার আপনার ঠান্ডা লাগছে নাকি?'

যেতে যেতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল নার্স। কোনো উত্তর দিল না সে। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কোনো বেডের রোগীই গায়ে কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে নেই। পাখাগুলো ঘুরছে; সময়টাও গরমের। ঠান্ডা তার লাগছে না, বরং কম্বল গায়ে দেওয়ায় গুমোটটা বেশি বোধ হচ্ছে। অথচ কিছু গায়ে না দিলে অস্বস্তি বোধ করবে সে।

কাল রাত্রে কখন তাকে এখানে আনা হয় জানে না সে। দারোগাবাবু চলে যাবার পর কি কি ঘটেছিল, কেন তাকে এখানে আনা হল, কিছুই সে জানে না। আজ সকালে বুঝতে পারল, কাল রাত্রে এমন কিছু সে করেছিল যার জন্যে তাকে এই হাসপাতালে আনা হয়েছে। বেডগুলোর অনেকগুলিই ফাঁকা। কেউ কেউ বারান্দায় রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে হাসপাতালটা ঘুরে আসতে ইচ্ছে হল তার।

কিন্তু সে উঠতে পারছে না। দুজন রোগী কথা বলছে, আর বারে বারে তাকে দেখছে। মনে হল ওরা তার সম্পর্কেই আলোচনা করছে। কি বিষয়ে আলোচনা করছে তা সে জানে। কাল সে নাকি অনেক বাজে কথা বলেছে। এ ঘরের সমস্ত রোগীই বোধ হয় জেনে গেছে তার কেন জেল হয়েছে। সেই বিষয়েই ওরা আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে দেখছে তাকে। ভাবটা ঃ তার মধ্যে না-দেখা কিছু আছে, সেটা আবিষ্কার করতে হবে।

সকলে সব জেনে গেছে—এ ধারণা হবার পর থেকেই তার অবস্থাটা কি সদ্য ফুটো-হয়ে-যাওয়া জাহাজের মতো আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে; এতো আস্তে যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। কম্বলটা দুহাতে চেপে ধরেছে সে।

ঘরের একদিকে একটা টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ার ও একটা ছোটো আলমারি। এতোক্ষণ একটি চেয়ারে নার্স বসেছিল। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। বসে বসে দেখল সে। ডাক্তার কিছু প্রশ্ন করায় নার্স হাত নেড়ে নেড়ে তার উত্তর দিচ্ছে। নার্সের হাতটা বারে বারে তার দিকে ঝুঁকছে দেখে সে আরো গুটিয়ে বসল। দূর থেকে সে যেন তাদের কথোপকথন শুনতে পেল ঃ

'কালকের পেসেণ্ট্টা কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'একটু লক্ষ রাখবেন ওর প্রতি; লোকটা নিজের স্ত্রী ও ছেলেকে খুন করেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। যিনি ওর কেসটা তদন্ত করছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হল একটু আগে। উনিই বললেন আমাকে।'

'ইস!'

আর শুনতে পেল না সে। মাথাটা নাড়া দিয়ে কান পাতল বাতাসে। কিন্তু ডাক্তার বা নার্সের কোনো কথা তার কানে এল না। সেদিকে আর তাকাতে পারল না সে। কম্বলটা গায়ের ওপর তুলে দিল। চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

'থার্মোমিটারটা লাগান দেখি।'

নার্সের গলা শুনতে পেয়ে উঠে বসল সে। নার্স এবং ডাক্তার তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। উঠে বসতেই তার হাতের নাড়ী ধরল ডাক্তার। সে অচেতন দম-দেওয়া পুতুলের মতো থার্মোমিটারটা বগলের তলায় চেপে ধরল। বুঝতে পারল, নার্স এবং ডাক্তার দুজনেই তার কম্বল মুড়ি দেওয়া দেখে অসুস্থতার অনুমান করেছে। তাদের অনুমান যে সত্য নয় এবং অসুস্থতার সঙ্গে কম্বলের কোনো সম্পর্ক যে নেই—কথাটা জানিয়ে দেবার ইচ্ছে হল। কিন্তু ইচ্ছে মতো কথা বলার আগেই ডাক্তার তার হাতটা ধরে ফেলল এবং সে-ও থার্মোমিটারটা নার্সের কাছ থেকে নিয়ে নিল।

'কই আপনার তো কোনো টেম্পা-রেচার নেই! কম্বল গায়ে দিয়েছেন কেন?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলল, 'না, বেশ ভালো আছি।' কম্বলটা পায়ের তলায় টেনে নিয়ে ভালো করে গুটিয়ে বসল সে।

'আপনার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?' নরম গলায় প্রশ্ন করল নার্স।

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না সে; সত্যি বলতে কি জবাব দেবার মতো কিছু নেই।

'শরীর ভালোই আছে, মনটা বড্ড ভেঙে পড়েছে।' পাশ থেকে মন্তব্য করল ডাক্তার।

'তা হতে পারে।' নার্স আর দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গেল; ডাক্তার তার পিছু পিছু গেল।

এখন অসহায় বোধ করছে সে। তারা যখন খাটের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন অন্যান্য রোগীরা তার দিকে চেয়েছিল। আজ সকাল থেকেই সে লক্ষ্য করছে এঘরের সকলে তাকে বিশেষভাবে দেখছে। সকলের দর্শনীয় হয়ে পড়ায় স্বস্তি-বোধ করছে না সে। কোনোদিকে সহজ-ভাবে তাকান-ও সম্ভব নয়। ডাক্তার, নার্স সকলেই জেনে গেছে সে একটা খুনী। নার্সের ব্যবহার দেখে তার মনে হয়েছে সে যেন তার মধ্যে ভীষণ ভয়ংকরতার সন্ধান পেয়েছে। বউর মুখটা মনে পড়ল। তার বউ এই নার্সের চেয়ে দেখতে অনেক ভালো ছিল। একেবারে পশ্চিমদিকের বেডের রোগীটি অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করছে। তার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে সে মাথা নামিয়ে নিল। শুয়ে পড়ে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিল। এঘরের সমস্ত পাখা চলছে।

কম্বলটা মুখের ওপর টেনে দেওয়ায় তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অসহ্য গুমোটে অস্বস্তি বোধ করছে! তবু কম্বলটা মুখ থেকে সরিয়ে বাইরের বাতাস নিতে পারল না। ভেতরের অন্ধকারে চোখ মেলে রইল। ঐ অন্ধকারে সে স্পষ্ট দেখতে পেল আশপাশের বেডের রোগীরা তাকে দেখছে। কেউ কেউ তাকে নিয়ে এমন জোরে কথা বলছে যে সেসব শুনতে পাচ্ছে। এক একবার মনে হয় তাদের চেপে ধরতে পারলে হত। কিন্তু সে সামর্থ্য তার নেই। সে উঠে দাঁড়াতে গেলেই নার্স হয়তো ছুটে আসবে। তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেবে, আর একবার টেম্পারেচারটা নেবে।

সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তাকে এখানে এভাবে রাখার কি প্রয়োজন। এর চাইতে শান্তির ছিল সেই খুপরিটা। সেখানে সকলের চোখের সামনে তাকে অপরাধী সেজে থাকতে হয়নি। এক দারোগাবাবু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তার কথা হত না। কাজেই তার অপরাধ দারোগাবাবু ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতেন না। অবশ্য গতরাত্রের ঘটনার পর জেল-খানা থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সকলেই তাকে জেনে ফেলেছে। বউ-ছেলে কেন, কিভাবে বিষ খেয়ে মরল সেকথা অনেক-দিন কাউকে সে বলতে চায়নি। দারোগা-বাবুর পীড়াপীড়িতে বলতে হয়েছে তাকে। তারপর থেকেই সে সহজভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। শুধু তাই নয় তারপর আজ সকাল থেকে সে লক্ষ্য করেছে সকলেই তাকে বড় বেশি করে দেখছে।

কম্বলের তলাকার অন্ধকারে সে অপলক চেয়ে আছে। ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে। একবার চেষ্টাও করল কম্বল সরিয়ে উঠে পড়তে। উঠতে গিয়ে দেখল পাশের বেডের রোগীটা খাটে হেলান দিয়ে তার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে। উঠতে পারল না সে। উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি হাঁটুতে আছে বলে মনে হল না। দুপায়ের হাঁটু থেকে নীচের অংশটুকু অবশ হয়ে গেছে। তবু ভাবল, সকলের চোখের আড়ালে এঘর থেকে টেনে টেনে দেহটা সে বাইরে নিয়ে যাবে। একবার অন্তত বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারলেই হয়। তারপর বারান্দার রেলিঙ ধরে উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়বে নীচে।......

ঘরে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ শুনতে পেল সে। মনে হয় আওয়াজটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে সে কম্বলটা জড়িয়ে চোখ বুজল। তখনই তার বেডের পাশে এসে সবগুলো জুতো

থেমে গেল। আরো জোরে চোখ বুজে পড়ে রইল সে। কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকল কেউ। শুনেও কোনো সাড়া দিল না। তারপর একজন তার কম্বলটা টানতে লাগল। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করল কম্বলটা চেপে ধরতে। কিন্তু টান পড়তেই আস্তে আস্তে তার মুঠি শিথিল হয়ে গেল। কচ্ছপের মতো তার দেহটা বেরিয়ে পড়ল। চারপাশে একাধিক লোক দেখে আশ্চর্য হল সে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'এমন করে শুয়ে আছেন কেন? আপনার কি হয়েছে?'

একটু ভাবল সে: চোখ বুজে মুখটা কুঁচকে বলল, 'পেট ব্যথা করছে।'

'তা নার্সকে বলেননি কেন! আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি, ওষুধ দিয়ে যাবে।'

চলে গেল সকলে। আশ্চর্য হল, তার মিথ্যে কথাটা ধরতে পারেনি কেউ।

হাসপাতালের সবাই আজ তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এদের এই ব্যস্ততা মোটেই সুখদায়ক নয়। সে অন্যায় করেছে, তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচারে তার শাস্তি হবে। শাস্তির চেহারাটা যাই হোক না কেন, একথা সে বুঝতে পারছে, বউ এবং ছেলের মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী। এতোদিন মেনে নিতে পারেনি। আজ সকলের এই ব্যস্ততা, সচেষ্টতা এই একটি কথাই তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছে এদের কথা। কলকাতার বাসায় যখন উপোস করে একটু একটু করে মরছিল তখন মানুষের এই চেহারাটা সে দেখতে পায়নি। কেউ তখন এগিয়ে আসেনি তাদের সাহায্য করতে। আজ যখন মৃত্যুর সীমানায় পেঁৗছে গেছে তখন এরা সকলে মিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু সত্যি কি তাই? তার ধারণা তাদের এই ব্যস্ততা তার যন্ত্রণাকে তীব্র করছে। আর এটাই তার চরম শাস্তি।

পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান সে পেয়েছিল। বউ-ছেলে পূর্ণ করেছিল সমস্ত অসম্পূর্ণতা। কিন্তু সম্পূর্ণকে ধারণ করবার ক্ষমতা সে পায়নি।

নানাভাবে সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে কই? যতো সে আড়ালে যেতে চায় ততো তাকে জড়িয়ে ধরে সকলে। যদি পারত তাহলে এই মুহূর্তে সকলকে বুঝিয়ে বলত সে-ই অপরাধী; সব রকমের শাস্তি পেতে সে প্রস্তুত; শুধু এভাবে সকলে মিলে তার আত্মাকে যেন যন্ত্রণা না দেয়। মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর সকলের সজাগ দৃষ্টি। এতে আত্মা লজ্জা পায়।

নার্স এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে তার কাছে এল। সে কোনো কথা না বলে গরম দুধ খেয়ে নিল। চলে গেল নার্স। আগের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। নিশ্চিন্ত বোধ করল এই ভেবে যে, আপাতত কেউ তাকে আর বিরক্ত করবে না। সকলে বিশ্বাস করেছে সে অসুস্থ; তার পেটে ব্যথা।

অনেকক্ষণ কেউ তাকে বিরক্ত করল না। আচ্ছাদনের তলায় কচ্ছপের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমের চোখে আশ্চর্য হয়ে দেখল ছেলেকে। গ্লাসভর্তি গরম দুধ নিয়ে সে বসে আছে। ছেলেটা কতোদিন দুধ খায়নি। সে ডাকল তাকে। খুশী-খুশী চোখে পিট-পিট করে কয়েকবার চেয়ে দেখল ছেলেটা। বাপ ডাকতেই আসবে কিনা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সে আবার ডাকল ছেলেকে। ইঙ্গিতে দুধের কথা বোঝাল। এবার হামা দিতে শুরু করল ছেলেটা। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ছেলেকে খাওয়াবার মতো সামর্থ্য সে রাখে মনে করে গর্ব বোধ করল। ছেলেটা কাছে এলে কোলে তুলে নেবে। নিজে হাতে খাইয়ে দেবে দুধ। হাত নেড়ে আসতে বলল তাকে। এবার আরো জোরে হামা দিল ছেলেটা। এতো তাড়াতাড়ি হামা দিচ্ছে যে তার মনে হল ছেলে সেয়ানা হয়ে উঠেছে; আর কিছু-দিনের মধ্যেই হাঁটতে পারবে। অনেক কাছে চলে এসেছে ছেলেটা। আর একটু এলেই ধ'রে ফেলবে তাকে। একটু এগিয়ে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু নাগাল পেল না। সামনে বসে আছে ছেলেটা; অথচ তাকে ধরতে পারছে না। সে হাত নেড়ে আর একটু আসতে বলল ছেলেকে। বাপের ইঙ্গিত বুঝে বসে বসে সে হাসল। দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে। মনে হল খাটের নীচে ছেলে বসে আছে। ওপরে উঠতে পারছে না। কম্বল সরিয়ে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল সে। নীচু হয়ে খাটের তলা দেখল: কিন্তু ছেলেকে দেখতে পেল না। তাড়াহুড়ো করে ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল। চারপাশে তাকিয়েও ছেলের কোনো সন্ধান পেল না।

বিছানা থেকে হঠাৎ তার উঠে দাঁড়ান, ছুটে দরজার দিকে যাওয়া, চারপাশে তাকান—দেখে ঘরের অন্যান্য রোগীরা বিস্মিত হয়ে গেছল। দরজার দিকে যেতেই নার্স তাকে ধরে ফেলল।

'কি ব্যাপার এভাবে ছোটাছুটি করছেন কেন?'

নার্সের এই প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। কিন্তু এভাবে সকলের লক্ষ্য-বস্তু হয়ে পড়ায় সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। নার্স আবার বলল, 'কি হয়েছে আপনার; কি খুঁজছেন?'

চোখ রগড়ে নিয়ে সে বলল, 'পেটটা ভীষণ ব্যথা করছে'—থেমে পড়ল সে। আর বলতে পারল না।

'বললে কি বলছিলেন?'

'পেটটা ভীষণ ব্যথা করছে, তাই—পায়খানা খুঁজছি।'

তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

'যান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন: এভাবে ছোটাছুটি করা আপনার উচিত নয়। আপনার জন্যে বেডপ্যান পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। বেডপ্যান আমার লাগবে না। উঃ! ব্যথাটা এখন কমে গেছে।'

নার্সের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরের সকলে আশ্চর্য হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

বিকেলটা চুপচাপ কাটিয়ে দিল সে। নার্স যা বলল তাই করল। কোনো রকম আপত্তি না তুলে হাসপাতালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করল।

সন্ধ্যেবেলায় দুজন সিপাই এল। হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সিপাই তাকে আগের খুপরিতে নিয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে এই ঘরটায় আসবার পথটুকু সে কোনো কথা বলেনি। বস্তুত কথা বলার মতো অবস্থা তার ছিল না। সিপাই দুটি তাকে এই ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে রইল। ছাদের কোণ ঘেঁষে যে ছোটো জানালার মতো আছে, সেদিকে চোখ রেখে সে স্থির হয়ে গেল। চড়ুই দুটি চোখে পড়ল না। দেখল, মেঝে থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে।

এর মধ্যে একসময় দারোগাবাবু এসেছেন, সে লক্ষ্য করেনি। দরজার গরাদে পা তুলে কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাতে সিগারেট টানছেন। দরজার তালা ঝুলছে।

বাইরে থেকে তিনি বললেন, 'সিগারেট খাবেন?'

সে দারোগাবাবুর কথা শুনল। আগের মতো জানালার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। পিছন ফিরে কোনো উত্তর দিল না।

দারোগাবাবু একগাল ধোঁয়া গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কেসের রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যেই মামলাটা কোর্টে উঠবে।'

সে আগের মতোই ছোটো জানালার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।
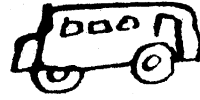
অয়স্কান্ত

॥ কয়েকটি মুখের আদল ॥

সকাল সাড়ে-সাতটার সময় আপনারা যদি কেউ এসপ্ল্যানেডে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণে মোটর-গাড়ি পার্কিং করার জায়গাটায় দু-তিনশো মানুষের একটা জমাট ভিড় স্থির হয়ে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। অনেকের হাতে রয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। অনেকের হাতে বেতের বাণ্ডিল ইত্যাদি। এরা কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ছুতোরমিস্ত্রী, কেউ বেতের কাজে পারদর্শী। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, একদল দক্ষ শ্রমিক। একটু দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে বা দু-একজনের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবেন, এই দক্ষ শ্রমিকরা বিশেষ কোনো উদ্যোগের সঙ্গে স্থায়ী-ভাবে যুক্ত নয়। রোজ সকালে এরা আসে কাজের সন্ধানে। রোজকার কাজের জন্যে রোজ অপেক্ষা করতে হয়। আর এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণের এই বিশেষ জায়গাটিই হয়ে ওঠে অস্থায়ী একটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। দিনে তিন টাকা বা তারও কম মজুরিতে এদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে সারা দিনের মতো কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন সহকারীকেও সঙ্গে নিতে হয়। তার মজুরী অবশ্যই আরো কম। কলকাতার ঠিক মধ্যিখানটিতে যে রোজ সকালে এমন একটি মানুষের বাজার বসে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তবে ট্রামে-বাসে আপিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হবার অনেক আগেই এই বাজারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই বিশেষ বাজারটির সন্ধান সম্ভবতঃ কলকাতার অধিকাংশ মানুষেরই জানা নেই।

আমি অনেক দিন ডবলডেকার বাসের জানলা থেকে এসপ্ল্যানেডের এই ভিড়টিকে লক্ষ্য করেছি। অল্প কিছুক্ষণের জন্যেই দেখতে পাই। কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। সাজপোশাকের দিক থেকে এমন বিভিন্ন চেহারার মানুষকে এমনভাবে জোট বাঁধতে বড়ো-একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাজ-পোশাকের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ-গুলোর মুখের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। খুব সম্ভবতঃ, অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবাইকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে বলেই।

মানুষগুলোকে এমনিতে দেখলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই। পরনে ধুতি বা পাজামা বা লুঙ্গি বা এমন কি পুরোপুরি প্যান্ট। গায়ে গেঞ্জি বা শার্ট। চকচকে ভিজে চুলের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, অনেকেই স্নান সেরে বেরিয়েছে। চুপচাপ বা একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে একজনকেও দেখা যাবে না। এমন কি, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসাও চলে। কেউ কেউ আবার লোহার রেলিঙে বসে মনের আনন্দে পা দোলায়। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, নিতান্তই একটা আকস্মিক জমায়েত মাত্র।

কিন্তু তবুও আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো কিছুতেই নয়। সামনে থেকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই মানুষগুলোর মুখের চেহারায় এমন একটা অসহায়তা আছে যা অনেক কথা ও অনেক হাসি দিয়েও আড়াল করা যাচ্ছে না। অনেকে বিড়ি টানে, অনেকে

মুখের বিড়ি কাড়াকাড়ি করে খায়—কিন্তু তারপরেও এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে যেন সকালবেলার নিঃঝুম এসপ্ল্যানেড সামান্য কয়েকটি বিড়ির ধোঁয়ার ফুৎকারে ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

এসপ্ল্যানেডের সঙ্গে নিঃঝুম বিশেষণটি অনেকের কানে হয়তো অস্বাভাবিক ঠেকছে। যাঁরা সকাল ন'টার পরের এসপ্ল্যানেড দেখেছেন, বা দুপুরের, বা বিকেলের, বা সন্ধ্যার, বা এমন কি নাইট-শো শেষ হবার পরে মাঝ-রাত্তিরের—তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সকালবেলার নিঃঝুম এসপ্ল্যানেড সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। ট্রাম আছে, স্টেটবাস আছে, লরি আছে, আছে এমন কি ঠেলাগাড়িও—তবুও সেই উচ্ছ্বসিত আলোড়নটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সদ্য জল দেওয়া অ্যাসফল্টের রাস্তা চিকচিক করে, মস্ত মস্ত বাড়ি-গুলোর ছায়া অনেকখানি লম্বা হয়ে ময়দানের আলপনা আঁকে, সিনেমার সাইনবোর্ডগুলো যেন রাত্রির উৎসবের শেষে ক্লান্ত অবসাদের মতো মুখ লুকোতে চায়। মানুষও অবশ্যই আছে। ট্রামে, বাসে ফুটপাথে। কিন্তু সকাল-বেলার হাই-তোলা পরিবেশে এই মানুষ-গুলোকেও যেন টের পাওয়া যায় না।

এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণের গাড়ি পার্ক করার জায়গাটিতে যে দু-তিনশো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও সহজেই হারিয়ে যেতে পারত। কিন্তু হারিয়ে যায় না তাদের মুখের বিশেষ চেহারার জন্যে। সকালবেলার একটি ঘণ্টার মধ্যে যাদের সারা দিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় তাদের পক্ষে বোধহয় কিছুতেই স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়।

আমি অনেক দিন ভাবতে চেষ্টা করেছি, সকালবেলা যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বেরোবার সময়ে এরা মনে মনে কী কামনা করে। নিশ্চয়ই এইটুকুই কামনা যে ভিনদেশী রাজপুত্তুরের মতো এক-জন খদ্দের আসুক এবং তিন টাকা দিন-মজুরীর শর্তে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজপুরীকে জাগিয়ে তোলার মতো সারাদিনটিকে কর্মব্যস্ততায় ভরিয়ে তুলুক। আর এই কর্মব্যস্ততাই এদের কাছে দিনের শেষের অন্ন আর রাত্রির ঘুম। সকালবেলার একটি ঘণ্টার অনিশ্চিত প্রতীক্ষা সারা দিনটির ওপরে অমোঘ নিয়তির মতো উদ্যত হয়ে থাকে।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি, এই মানুষগুলোকে বোধহয় আমি অন্য কোনো পরিবেশে অন্য কোনো কলকাতায় চিনে উঠতে পারব না। ট্রাম কিংবা বাসের স্টপে যারা ভিক্ষের জন্যে হাত পেতে থাকে, দুপুরবেলার কার্জন পার্কে যারা আকাশের দিকে মুখ করে চিত হয়ে শুয়ে থাকে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা দিনের পর দিন লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়ায়—তাদের কারও মুখেই আমি এই মানুষগুলোর আদল খুঁজে পাইনি।

তাই সকালবেলার এসপ্ল্যানেডে এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার রোজই মনে হয়েছে, এরা অন্য কোনো জগৎ থেকে এসেছে। এমনিতে খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে যে, এসপ্ল্যানেডের আশেপাশে নানা বস্তিতে এরা থাকে, এরা হয়তো এসেছে সারা ভারতের নানা শহর ও গ্রাম থেকে, এরা হয়তো কথা বলে ভারতের সবকটি ভাষায়—তবুও এসপ্ল্যানেডের এই বিশেষ কোণটিতে এরা যখন এসে দাঁড়ায় তখন কোনো পরিচয়ই এরা সঙ্গে করে আনে না। এরা কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ছুতোর-মিস্ত্রী, কেউ বেতের কাজে পারদর্শী—কিন্তু আশ্চর্য, কোনো উদ্যোগের সঙ্গে এরা স্থায়ীভাবে যুক্ত নয়। এদের চিনতে হলে সকালবেলার এই এসপ্ল্যানেডেই আসতে হবে।

তারপরে একদিন আকস্মিক এক ঘটনার যোগাযোগে আমি অন্য এক কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের এই মানুষ-গুলোর মুখের চেহারার আদল খুঁজে পেয়েছিলাম।

সকালবেলা আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। তখনই মানুষটিকে আমি প্রথম দেখি। ফুটপাথের একটি ধার পরিষ্কার করে সে দোকান সাজিয়ে বসছে। দোকান বলতে কয়েকটি রিবন, বোতাম, চিরুনি ও এমনি কতকগুলো টুকিটাকি জিনিস। মাঝবয়সী মানুষটিকে দেখে তখন আমার তাকিয়ে দেখার মতো একটি মুখ মনে হয়নি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে আমি যখন বাজার থেকে ফিরে আসছি তখন আবার এই মানুষটিকেই অন্য চেহারায় দেখতে পেলাম। পুলিশের একটি ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে, যার নাম ফেরিওলাদের ভাষায় হল্লা। আর সেই ভ্যানে টুকিটাকি জিনিসের পসরাকে পুঁটলি বেঁধে তুলে নেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তোলা হচ্ছে মানুষটিকেও।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্থান-কাল ভুলে যেতে হল। আমি অনেক দিন ধরে এসপ্ল্যানেডের মানুষগুলোর মুখের আদল খুঁজছিলাম। হল্লায় কবলে-পড়া মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সেই আদলটি খুঁজে পেলাম।

ফুটপাথের সেই বিশেষ ধারটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি থেকে তখনও সরু একটা ধোঁয়ার রেখা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ একত্রিশ ॥

দু দিন হল কাঞ্জিলাল সাহেব ফিরেছেন শিলং থেকে। প্রভাত সরকারের আবার বাঁধা ডিউটি আরম্ভ হয়েছে।

অ্যাক্টিভ লাইক এ ইয়ংম্যান—কাঞ্জিলাল সাহেব তিন গুণ কাজের ভেতর দিয়ে ছুটির এই দিনগুলোর যেন ক্ষতিপূরণ করে নিতে চাইছেন। গাড়ী ছুটছে বজবজ থেকে ব্যারাকপুর—অফিস থেকে বেরুচ্ছেন সন্ধ্যে ছটার পর। লাইফ ইজ ওয়ার্ক!

সারাদিনের খাটুনির পর পার্ক স্ট্রীটের সেই বার। মদের গ্লাসে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে বিশ্ব-প্রেমের জগতে প্রবেশ।

—ইয়ু প্রভাত!

—বলুন স্যার।

—হোয়াট্ ডু য়ু থিংক অব চায়না? মানে, চীন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

—আমি কিছু জানি না স্যার।

—জানা দরকার।—কাঞ্জিলাল হেঁচকি তোলেন: মানে ইন্দো-চাইনীজ্ রিলেসান্স্— ওহ্— হাউ আনফরচুনেট! নিজেই কথা বলতে থাকেন: এশিয়ার দুটো এত বড়ো দেশ, এতদিন ধরে, আই মীন হাজার হাজার বছর ধরে—কী ফ্রেণ্ড্শিপ আর কী আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। আর আজকে কয়েকটা পোস্টার, তিনটে টিলা, দুটো গ্রাম আর একটা পাহাড়ী নদী নিয়ে কী আগ্লি টেন্স্যান! এর কোনো মানে হয়?

প্রভাত জবাব দেয় না, একটা প্রকাণ্ড ডবল-ডেকারের পাশ কাটায়।

—গোতামা বুদ্ধা একদিন এই দুটো দেশকে এক করেছিলেন উইথ্ লাভ অ্যাণ্ড অহিন্সা! আজ যদি সেই গ্রেট্ গ্যান্ডী থাকতেন, তবে এ-সব কিছুই ঘটত না। দ্যাট্ সুপারম্যান পাঁচ মিনিটে সব মিটিয়ে ফেলতেন।—কাঞ্জিলালের চোখে জল আসে: এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল মেজর দাশগুপ্তের সঙ্গে। ড ইয়ু নো প্রভাত—আমার একটা আইডীয়া আছে।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করেন, ট্যাগোর যেন কী বলেছিলেন? এই ভারতবর্ষ থেকেই আবার নতুন করে মহামানব জন্ম নেবেন। আমার মনে হয়—আজ যদি ভারতের কোনো কোটিপতি—সে সাজওয়ান ফ্রম টাটা অর বিড়লা ফ্যামিলি—যদি সন্ন্যাসী হয়ে, লাইক বুদ্ধা সব ছেড়ে দিয়ে লাভ অ্যাণ্ড অহিন্সা প্রচার করতে থাকেন, তা হলে—

তা হলে নিশ্চয় একটা নিদারুণ কিছু ঘটে যায়, কিন্তু সেটা বলবার আগেই গাড়ী বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গিয়ে ঢোকে। দোতলার বারান্দায় লতার ঝাড়ের মধ্য থেকে গলা বার করে বিকট শব্দে অভ্যর্থনা জানায় কুকুরটা। বিশ্ব-সমস্যার সমাধান পরের দিন বার থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু প্রভাতের ক্লান্তি লাগে। কলকাতা এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেই মুরারিবাবুকে মনে পড়েছে। মুখার্জি অটোমোবাইল্স্। বাঁকুড়ায় গেলে এখুনি তার চাকরি হয়ে যাবে।

তার কাছে সব সমান। বাঁকুড়া—বর্ধমান—বসিরহাট—সব এক।

দীপ্তির কাছে বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, লজ্জায় পালিয়ে আসতে হয়েছে সেখান থেকে। প্রথম থেকেই দীপ্তি তাকে খানিকটা উপেক্ষা আর অনুকম্পা দিয়েই দেখেছে—কোনোদিন তাকে ভালো করে লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ। তাই একবার একটুখানি তার সাহায্য চাইতেই সে নিজেকে অনেক বড়ো ভাবতে চেষ্টা করেছিল। মুখের ওপর ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে সে—নবদ্বীপে তাকে আর কোনোদিনই হয়তো যেতে হবে না। রাণী তো একটা জলের দাগের মতোই তাকে মুছে ফেলেছে।

আর তৃপ্তি—

তৃপ্তির কথা কেউ জানে না। প্রভাতেরও জেনে কোনো লাভ নেই।

তা হলে আজই কেন বিদায় চাওয়া যাক না কাঞ্জিলাল সাহেবের কাছে? একজন মোটর ড্রাইভারের পক্ষে বেশি কৈফিয়তের দরকার নেই। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না স্যার—মাস তিনেকের জন্যে দেশে যাব—' এইটুকুই যথেষ্ট। কোথায় তার দেশ—সেখানে তার তিন কুলে কেউ আছে কি না, এসব নিয়ে ব্যস্ত মানুষ কাঞ্জিলাল কখনো মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু আজ আর সে কথা বলবার

সময় নেই। গাড়ী গ্যারাজে তুলে দিয়ে সে চলে এসেছে। এখন রাত সাড়ে দশটা।

বাস ছুটছে, প্রায় ফাঁকা গাড়ী। দোতলায় একা চুপ করে বসে আছে প্রভাত। জোলো হাওয়ার ঝলক আসছে—আজকালের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। শরীরটা অকারণে জ্বালা করছে, মাথাটা আবার ভারী হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ছুটন্ত ঘর বাড়ী আর গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে যে রাত্রির আকাশ দেখা যায় —সেখানে আষাঢ়ের খানিকটা গম্ভীর মেঘ। কলকাতা ডুবিয়ে-দেওয়া একটা দুরন্ত বৃষ্টি যদি নামত এখন! প্রভাত নেমে পড়ত এই বাস থেকে, প্রাণ খুলে ভিজতে পারত—শরীরটা তার জুড়িয়ে যেত!

আশ্চর্য—তার এই জীবনটার কোনো মানেই নেই। কেন সে চাকরি করে, কিসের জন্যে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি দেয়, কার জন্যে তার এই পরিশ্রম? মা নেই বাপ নেই—আত্মীয় বলতে কেউ নেই—বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নাই। কিছু তার ভালো লাগে না—আজ চার বছর ধরে একটা অপরাধের ভার রয়েছে মনে মনে—তার যেন একটা নেশা ছিল, রাণী সেটাকেও কাটিয়ে দিয়েছে। দুঃখ হোক, আনন্দ হোক— একটা কিছুকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচে—বাঁচতে হয় তাকে। প্রভাতের মনটা একেবারে ফাঁকা। গৌরাঙ্গবাবুর বাসায় আসবার পর তৃপ্তি যেন সেই ফাঁকটাকে একটু একটু করে ভরিয়ে তুলছিল. রাণীর জন্যে যন্ত্রণা আর তৃপ্তির কাছ থেকে এক টুকুরো স্বপ্ন নিয়ে দিনগুলো একভাবে কেটে চলেছিল। তারপরে সব মিটে গেল। এখন আর কিছুই নেই।

কাঞ্জিলাল সাহেবের কাছে এক-আধ সন্ধ্যা ছুটি চাইলেই মেলে—গিয়ে সিনেমা দেখতে পারে। কিন্তু সিনেমা আর তার ভালো লাগে না। সব সাজানো আর বানানো গল্প—অথচ জীবনে কোথাও গল্প তৈরী হয় না—গড়ে উঠতে গিয়েই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আগে দু একখানা উপন্যাস পড়ত, অভয় নিয়ে আসে সেগুলো। এখন তা-ও আর পড়তে পারে না সে।

কোনো কাজ নেই—কোনো উদ্দেশ্য নেই। দিনের পর রাত. রাতের পর দিন। কখনো ব্যারাকপুর. কখনো বজবজ। কখনো ডালহাউসি স্কোয়ার. কখনো বা নিউ মার্কেট। আর গৌরাঙ্গবাবুর সেই থমথমে সংসার—যেখানে আজ পর্যন্ত সে কাউকে কখনো হাসতে দেখেনি।

আকাশে সেই ঘন-গম্ভীর মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকে গেল। জোলো হাওয়ার ঝলক। বৃষ্টি কি আজকেই নামবে? নামুক— ভাসিয়ে দিক চারদিক। প্রভাত চোখ বুজল। একটা মস্ত দীঘির কালো জলে সে ডুব দিয়েছে। জলের ওপর বৃষ্টি পড়ছে—তলা থেকে তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ঝম্-ঝম্-ঝম্। ওপরের জলটা বৃষ্টিতে ঠান্ডা হয়ে গেছে—নিচে গরম। একটা প্রকাণ্ড মাছের পাখনা ছুঁয়ে গেল তাকে। ঠাণ্ডা গরম মাটিতে পা ঠেকল—আঃ, এই দীঘির তলায় যদি হাত-পা ছড়িয়ে, ওপরের বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া যেত।

কিন্তু দীঘিটা এখানে কোথাও নেই। প্রভাত চোখ মেলল। অনেক আলো আর অনেক মানুষের ভিড়। হৈ হৈ করতে করতে একদল লোক এসে গাড়ীর দোতলায় উঠে পড়ল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'মাইরি, ব্যাটা এক নম্বরের চারশো বিশ!'

শেয়ালদার মোড়।

এতগুলো মানুষেরও কি বেঁচে থাকবার কোনো মানে আছে? হৈ হৈ করে চেঁচানো—হা-হা করে হেসে ওঠা, গলা ছেড়ে গান গাওয়া, মুখ খারাপ করে কদর্য গালাগাল। কোনো দরকার নেই, তবু মাতামাতি করে দিন কাটে। কোনো কাজ নেই বলেই কাজ তৈরী করে নিতে হয়।

দীঘির নিচেই কি ডুবে থাকা যায় বেশিক্ষণ? সেখানেও তো দম বন্ধ হয়ে আসে। আবার ওপরে ভেসে উঠতে হয়।

কোনো কাজ নেই—তবু কাজ ফুরোয় না। কোনো উদ্দেশ্য নেই—তবু দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন কাটিয়ে যেতে হয়। কাজ না থাকলেই কি কাজ থামিয়ে দেওয়া চলে? কলকাতায় থাকবার কোনো মানে হয় না বলেই কি সে পালিয়ে যেতে পারে বাঁকুড়ায়?

তখন প্রভাতের মনে পড়ল. শিলং থেকে ফেরবার পরে রিনি কাঞ্জিলাল এই দুদিনে একটাও কথা বলেনি তার সঙ্গে।

সুযোগ মিলল পরের দিন। কী কাজে অফিসের গাড়ীতে কাঞ্জিলাল সাহেবেয় বর্ধমানে যাওয়ার পর।

—মাম্মী, তোমার গাড়ী দরকার?

মিসেস্ কাঞ্জিলাল একটু ঘরকুনো, মেয়ের ঠিক উল্টো। বাড়ীতে বসে বসে ঝি-চাকরদের সামনে বকাবকি না করলে তাঁর ভালো লাগে না। একটু বেশি মাত্রায় মোটা হয়ে গেছেন বলে নড়াচড়াতেও খুব বেশি উৎসাহ নেই তাঁর। বললেন, না বাপু, আমার কোনো কাজ নেই গাড়ী দিয়ে। তোমার ইচ্ছে হলে বেরোও।

—আমি তা হলে একটু নিলীমার কাছে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে।

মা সেই মুহূর্তে বাবুর্চিকে নিয়ে পড়েছেন : 'পুরো এক পাউন্ড বাটার দুদিনে খতম হোতা কেইসে?' সুতরাং মেয়ের কথার কোনো জবাব দিলেন না। রিনি এসে গাড়ীতে উঠল।

প্রভাতের রক্ত দুলে উঠল একবার। রিনিকে তার ভয় করে। কখনো তার সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল, কখনো বা অকারণ ঘৃণা। প্রভাত যেন তার একটা খেয়ালের খেলার পুতুল, তাকে নিয়ে যা খুশি করাতেই তার অদ্ভুত আনন্দ।

কিন্তু কী মানে হয় এসবের? সে তো বাড়ীর সামান্য ড্রাইভার, চাকর-দারোয়ান-বাবুর্চির সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই তার। তার কথা রিনি তো অনায়াসেই ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু ভুলে থাকতে সে রাজী নয়। কখনো কাজু বাদাম এগিয়ে দেবে, কখনো কাছে বসিয়ে গল্প করতে চাইবে, কখনো বিনা কারণে গালাগাল দিয়ে বলবে, 'আন্‌কালচার্ড—ইডিয়ট!' তার সম্পর্কে সব খবর খুঁটিয়ে জানতে চাইবে আর শিলং যাওয়ার আগে শাসিয়ে যাবে, 'খবর্দার, ফিরে এসে যদি শুনি এর মধ্যে কাউকে বিয়ে করে বসেছেন, তাহলে—'

একদিন কাঞ্জিলাল সাহেব নেশার ঝোঁকে দুঃখ করেছিলেন, আদরে আদরে মেয়েটা বিগড়ে গেছে। তার মনমেজাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, যখন তখন যা খুশি তাই করতে পারে। প্রভাতের তাতে কিছু আসে যায় না। রিনি কাঞ্জিলাল যদি আকাশের চাঁদে একটা কামড় দিতে চায় এবং সেজন্যে তার বাপ যদি একটা মই তৈরী করাতে আরম্ভ করেন তাতেও প্রভাতের কোনো বক্তব্য নেই। শুধু রিনির মনোযোগের হাত থেকে রক্ষা পেলেই সে আর কিছু চায় না।

সামনের আয়নাতে প্রভাত দেখল রিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কী ভাবছে সে-ই জানে। প্রভাতের মনে হল এই ক'টা দিন বাইরের আলো বাতাসে কাটিয়ে রিনি আরো সুন্দর হয়ে এসেছে —আরো উজ্জ্বল হয়েছে তার রঙ।

কিন্তু অমন ভাবে চুপ করে আছে কেন? যাওয়ার আগে তাকে অমন করে শাসিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে একটা কথাও তো জিজ্ঞেস করছে না।

রিনি চুপ করে থাকলেই স্বস্তি মেলে। কিন্তু প্রভাত যতটা খুশি হবে ভেবেছিল তা হতে পারল না। কোথায় যেন কী একটা তাকে বিঁধছে, রিনির চুপ করে থাকাটা তার ভালো লাগছে না।

তারপর রিনি জেগে উঠল।

—ল্যান্ডসডাউন রোডে যেতে হবে না।

—কোথায় যাব তবে?

—রিনি বললে, ব্যারাকপুরে।

—ব্যারাকপুর?

সেই আগেকার রিনি নিজের মূর্তি ধরল তৎক্ষণাৎ।

"না বাপু, আমার কোনো কাজ নেই গাড়ী দিয়ে। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়োও।"

—কানে কম শুনছেন নাকি? মা ব্যারাকপুর চেনেন না?

একটু চুপ করে থেকে প্রভাত বললে, ব্যারাকপুরে কোথায় যেতে হবে?

—ড্রাইভারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? —রিনির গলা খনখন করে উঠল: আপনার সাহস দেখছি বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন। ব্যারাকপুরে গঙ্গার নিয়ে গিয়ে আপনাকে ডুবিয়ে মারব—হল তো?

—আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি।

রিনি হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল। সামনের সীটটা মুঠো করে ধরে গলাটা এগিয়ে দিলে।

—ইয়ার্কি করছেন নাকি?

—আজ্ঞে না।

—ইডিয়ট। মেয়েদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে জানেন না। বাবা যে কেন পয়সা দিয়ে এমন একটা রাবিশ ড্রাইভার রেখেছেন তিনিই জানেন।

প্রভাত জবাব দিল না। গাড়ী চলল।

পথ ছিটকে সরে যেতে লাগল। শ্যামবাজার, টালা, চিড়িয়ার মোড়, বরানগর পার হয়ে। বিকেলের আলো নিবে এল, দু পাশের গাছের কোলে কোলে অন্ধকার ঘনালো, ইলেকট্রিক ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠল একসঙ্গে। রিনি আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। প্রভাত ভাবতে লাগল আজকেই সে চাকরিটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু কাজিলাল সাহেবের সামনে একবারও কথাটা তার মনে হয়নি।

কেন হয়নি?

রিনির জন্যে? সামনের আয়নায় রিনির মুখ নয়—নিজের মনের চেহারাই দেখতে পেলো প্রভাত। রিনির ঘৃণা, অপমান আর পাগলামির মধ্যে কি একটা কোনো আকর্ষণ আছে কোথাও? সেটা অসহ্য—অথচ তারও একটা নেশা আছে? আর রিনির জন্যেই কি কোনোদিন সে কাজিলাল সাহেবের চাকরি ছাড়তে পারবে না—যেমন করে পোষা কুকুর বার বার চাবুক খেয়েও তার মনিবের কাছে ফিরে আসে?

প্রভাত ভয়ঙ্কর চমকে উঠল।

কিন্তু একটু হলেই সেই চমকানির নিদারুণ দাম দিতে হত তাকে। পাশ দিয়ে যে পাহাড়ের মতো বোঝাই ট্রাকটা ডিজেল এন্জিনের ঝড় তুলে ছুটে গেল—মাত্র এক ইঞ্চির জন্যে তার সঙ্গে গাড়ীর ধাক্কা লাগল না। ট্রাক ড্রাইভারের গর্জন তার ভেতরেও কানে ভেসে এল: 'কেয়া শালা, মরেগা তুম?'

আর তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রিনি: কী হচ্ছে এসব?

প্রভাত উত্তর দিল না।

রিনি বললে, গাড়ী থামান।

প্রায় নির্জন রাস্তার এক ধারে প্রভাত গাড়ীটা দাঁড় করালো। আগুনের মতো চেহারা নিয়ে নেমে এল রিনি।

—কী করছিলেন আপনি?

—কিছুই করিনি।

—ট্রাকটার সঙ্গে তো এখুনি ধাক্কা লাগত।

—লাগেনি।

—লাগেনি সেটা নিতান্তই বরাত-জোর। —রিনি দুটো জ্বলন্ত চোখ প্রভাতের মুখে ফেলল: কী চেয়েছিলেন আপনি? আমাকে খুন করতে?

—মিথ্যে কেন খুন করতে যাব আপনাকে?

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। —রিনি প্রভাতের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো: আপনার মতলব আমার বুঝতে বাকি নেই। আপনি আমাকে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া যায় না বলেই—

প্রভাতের মাথায় রক্ত ছুটে গেল।

—থামুন, পাগলামি করবেন না।

—পাগলামি—আমি পাগল! —রিনি হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে প্রভাতের গালে।

ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত আর কদর্য-ভাবে ঘটল যে প্রভাত রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর কিছুক্ষণ ধরে বুনো জন্তুর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল রিনি।

পাশে একটা প্রকাণ্ড মোটর এসে থেমে দাঁড়ালো। একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক গলা বাড়ালেন।

—কোনো ট্রাবল হয়েছে কি? সাহায্য করতে পারি?

রিনিই সামলে নিলে। বললে, ধন্যবাদ, সাহায্যের দরকার নেই।

বড়ো গাড়ীটা চলে যাওয়ার পর রিনি এবার প্রভাতের দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে এসেছে—অনুতাপের ছায়া পড়েছে মুখের ওপর।

—রাগের মাথায় আপনার গায়ে হাত তুলে ফেলেছি। মাপ করবেন আমাকে।

মাথার ভেতরে তখনো সব কিছু এলোমেলো মনে হচ্ছিল। প্রভাত শুকনো গলায় বললে, মাপ করবার কিছু নেই। আপনারা মনিব, ইচ্ছে করলেই গায়ে হাত তুলতে পারেন।

—কী মনে করেন আমাকে—জানোয়ার? —রিনি আবার চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাণপণে শান্ত করল নিজেকে : বলেছি তো হঠাৎ করে ফেলেছি কাজটা। অন্যায় হয়েছে আমার—মাপ চাইছি সেজন্যে। আর ব্যারাক-পুরে গিয়ে কাজ নেই—বাড়ী ফিরে চলুন।

প্রভাত গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগে রিনিই গিয়ে বসল ড্রাইভারের জায়গায়।

—কী করছেন?

রিনি হাসল।

—আমিই চালিয়ে নিয়ে যাব। আপনার মুড নেই—আপনার হাতে গাড়ী দিয়ে আর বিশ্বাস করা যায় না।

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী! —রিনি হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল : আমার লাইসেন্স নেই বটে, তা হলেও গাড়ী আমি মন্দ চালাই না। এখুনি দেখতে পাবেন।

—তবু—

রিনি ভ্রূকুটি করল : আপনার ওই দোষ, সব সময়ে বাজে তর্ক করেন। ওই জন্যেই আমার মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। নিন—উঠে পড়ুন। না—পেছনে নয়, আমার পাশেই বসতে হবে আপনাকে।

প্রভাত তবু দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল? —রিনি ঝংকার দিয়ে উঠল : সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবেন নাকি এখানে? উঠে পড়ুন শিগগীর।

রাস্তা-ফাঁকা, তাই বলে একেবারে নির্জন নয়। গাড়ী চলেছে, সাইকেল চলেছে, রিকশা চলেছে, লোকজনও আসা-যাওয়া করছে। কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রভাত রিনির পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল।

গাড়ী ঘুরে চলল।

রিনির দিকে প্রভাত চাইতে পারল না। শুধু রিনির শাড়ী আর চুলের একরাশ গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল, স্টিয়ারিঙের ওপর মাঝে মাঝে চোখে পড়তে লাগল কয়েকটা লম্বা শাদা আঙুল—তাদের নখগুলো রক্তের মতো লাল। একটা পাতলা শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় হাওয়ায় তার গায়ে নরম ছোঁয়া বুলিয়ে যেতে লাগল।

মিনিট কয়েক পরে কথা বলল রিনিই।

—কী হয়েছিল আপনার? গাড়ী চালাতে চালাতে কার কথা ভাবছিলেন?

রিনির কথাই ভাবছিল, কিন্তু সেটা বলা যায় না। প্রভাত চুপ করে রইল।

—আমি জানি। কোনো মেয়ের ধ্যান করছিলেন বসে বসে। —মিনিটে মিনিটে রিনির মেজাজ বদলায়, সংগে সঙ্গে গলার স্বর তার বিষাক্ত হয়ে উঠল : সেই বিধবা মেয়েটি—তাই নয়? মার্কেটের সামনে যাকে দেখে আপনি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। —রিনি কুৎসিত ভাবে বলে চলল : ছোটলোকের মন এত নোংরা হয় যে—

রিনির চড়টা গায়ে লাগেনি, তাতে শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের কথাগুলোই অসহ্য, যেন কাটা ঘায়ে লঙ্কা-লবণ ছড়িয়ে দিতে থাকে। প্রভাতের হঠাৎ একটা প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করল। দাঁতে দাঁতে ঘষে প্রভাত বললে, মিথ্যে নোংরামি করবেন না দয়া করে। আমি আমার স্ত্রীর কথাই চিন্তা করছিলুম।

—স্ত্রী! —রিনি গলা চিরে চিৎকার করল।

—হাঁ, স্ত্রী। —প্রভাত সরকার আরো হিংস্রভাবে বললে, সাতদিন হল বিয়ে করেছি আমি। আমারই মতো এক ছোট-লোকের মেয়েকে। হল এবারে? খুশি হয়েছেন?

রিনি জবাব দিল না। স্টিয়ারিঙের ওপর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল তার। তারপর এক সময়ে হঠাৎ রিনি গাড়ীটাকে থামিয়ে দিল। বিশ্রী ঝাঁকুনি লাগল, চিৎকার উঠল গাড়ীর চাকায়। বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলতে ফেলতে রিনি বললে, নামুন।

—কী হয়েছে?

—গাড়ীর পেছনে কিসের আওয়াজ হচ্ছে। একটা চাকা লিক হয়েছে বোধ হয়। দেখে আসুন।

প্রভাত নেমে গেল এবং সেই মুহূর্তেই—

গাড়ীটা ব্যাক করল রিনি। এমন-ভাবে ব্যাক করল যে লাফিয়ে সরে না গেলে প্রভাত সোজা চলে যেত চাকার তলায়।

—একি! আমাকে চাপা দিতে চাইছেন?

গাড়ীর ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ করল রিনি—হাসল না কেঁদে উঠল বোঝা গেল না। তারপর প্রভাতকে রাস্তায় ফেলে রেখেই গাড়ীটা পঞ্চাশ মাইল স্পীডে সামনে ছুটে চলে গেল।

রিনি খুন করতে চেয়েছিল তাকে!

প্রভাত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর চকচকে কালো পীচের ওপর দুটো ব্যাক লাইটের রক্তরেখা আঁকতে আঁকতে গাড়ীটা দেখতে দেখতে দূরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রভাতকে কিছু করতে হল না। কাঞ্জিলাল সাহেবই অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে।

—স্যার, আমি রিজাইন দিতে চাই।

দুটো লাল টকটকে চোখে কাঞ্জিলাল তার দিকে তাকালেন। সকালে তিনি কোনোদিন নেশা করেন না, কিন্তু মনে হল আজ ভোরে তিনি বাড়ীতেই বোতল নিয়ে বসে ছিলেন।

কাঞ্জিলাল সাহেব বললেন, ভেতরে এসো।

সামনে ড্রয়িং রুম। এ ঘরে প্রভাত কোনোদিন ঢোকেনি, দরকার হয়নি। কাঞ্জিলাল সেদিকে পা বাড়িয়ে প্রভাতের দিকে আবার লাল টকটকে চোখ মেলে ধরলেন।

—শুনতে পাওনি? ভেতরে এসো।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রভাত তখনো বুঝতে পারছে না। দু-একবার ইতস্তত করে সে ঘরে পা দিল।

কাঞ্জিলাল সাহেব ড্রয়ারের টানা থেকে কয়েকটা নোট বের করে প্রভাতের দিকে ছুড়ে দিলেন। বললেন, তোমার মাইনে। নিচু হয়ে নোটগুলো কুড়িয়ে নেবার আগেই কাঞ্জিলাল দেওয়াল থেকে চাবুক নামালেন। আর প্রভাতের পিঠে প্রচণ্ড একটা ঘা পড়ল পরের মুহূর্তেই। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল প্রভাত।

—একি স্যার! মারছেন কেন?

বিশ্বপ্রেমিক কাঞ্জিলাল ঘর ফাটিয়ে রাক্ষসের মতো গর্জন করলেন এবার।

—রাস্কেল, রাস্তার কুকুর! তোমার এতবড়ো সাহস যে আমার মেয়েকে তুমি রাস্তায় পেয়ে—প্রভাতের সর্বাংগে একটার পর একটা চাবুকের ঘা এসে পড়তে লাগল : তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করো। তোমাকে আমি জেলেই দিতাম—কিন্তু আমার নিজের একটা প্রেস্টিজ আছে। আই উড [illegible] শুট ইয়ু, বাট—কুকুর মেরে [illegible] টোটা নষ্ট করতে চাই না। নাউ টেক ইট—টেক ইট—

উন্মাদের মতো আরো কতক্ষণ মারতেন বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই দোতলা থেকে পর পর কয়েকটা বিকট বাড়ী কাঁপানো শব্দ উঠল। কাঞ্জিলালের হাতের চাবুক থেমে গেল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকল বেয়ারা।

—হুজুর, মিসিবাবা আপকা পিস্তল লে কর ইধার-উধার গোলী মারনে লগী!

চাবুক ফেলে দিয়ে কাঞ্জিলাল ছুটলেন দোতলার দিকে। আর চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত প্রভাত যে ক-টা নোট কুড়োতে পেরেছিল, তাই নিয়েই টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

বাড়ীর গেট পার হতে হতে শুধু তার মনে হল, রিনির পোষা কুকুর হয়ে এই বাড়ীর ড্রাইভারগিরির মায়া সে কাটাতে পারেনি, কিন্তু বড়লোক যে কুকুরের জন্যে চাবুকও তৈরী করে রাখে—সেই কথাটাই তার জানা ছিল না!

—[illegible]

ভিনদেশী ছবির সচিত্র কাহিনী

কণাদ চৌধুরী

॥ কুশীলবগণ ॥

রে স্মিথ ... সুসান হেওয়ার্ড
পল স্যাক্সন ... জন গ্যাভিন
লিজ স্যাক্সন ... ভেরা মাইলস
পরিচালনা ঃ ডেভিড মিলার ॥ কাহিনী ঃ ফ্যানি হার্স্ট ॥ চিত্রনাট্য ঃ এলিনর গ্রীফিন এবং উইলিয়াম লুডউইগ ॥ প্রযোজনা ঃ রস হান্টার ॥

নিউইয়র্কের বিখ্যাত পোশাকশিল্পী রে স্মিথের সঙ্গে পলের প্রথম দেখা লিনকনে। ব্যবসার তদারকীতে প্লেনে শিকাগো যাচ্ছিল। লিনকোনেই ওদের প্রেমের প্রথম জন্ম। দুজনে মিলে স্থির করেছিল একসঙ্গে শিকাগোতে যাবে। এয়ারোড্রোমে টিকিট হাতে প্লেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল পল। রে আসেনি, আসতে পারল না। রাস্তায় গাড়িটাই বিকল হয়ে গিয়েছিল তার। বিমান-ঘাটিতে যখন পৌঁছেছিল রে, পলকে দেখতে পেল না। নিউইয়র্কে যেন নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে বাঁচতে চাইল সে। কিন্তু পৃথিবী কত ছোট। পাঁচ বছর পরে নিউইয়র্কের রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি হল পলের। কিন্তু নিরুত্তেজ গলায় কয়েকটা কথা বলে পলকে বিস্মিত করে জনারণ্যে মিশে গেল রে। সেদিন সন্ধ্যায় রে'র ফ্ল্যাটেই সটান এসে হাজির হলো পল।

—আমি ত তোমাকে বলেছি, আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকি। তোমাকে বোধ হয় বসতেও বলতে পারবো না।

—শোনো, আজকে রাস্তায় তোমাকে দেখার পর থেকেই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রে'র কাছে এগিয়ে আসে পল,

—তোমার জন্যে সেদিন কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম অথচ তুমি এলে না। প্লেনে ওঠার সিঁড়িটা সরিয়ে নেয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও ভেবেছিলাম তুমি আসবে।

—আসিনি বুঝি?

ওর সেদিনকার অনুপস্থিতির কারণটা রে বলেছিল পলকে। কিন্তু সেই শোচনীয় আবিষ্কারের কথাটা কিছুতেই জানাতে পারলো না। শিকাগোতে সেদিন ফোন করবার চেষ্টা করেছিল রে। ফোনেই কে যেন জানিয়েছিল, মিঃ স্যাক্সন বাড়ি নেই—কিন্তু মিসেস স্যাক্সন আছেন—ডেকে দেবো?"

পল রেকে নিজের কাছে টানতেই বাধা দিল সে,

—না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে এটা সরলভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল পল, কারণ আমি তোমার জীবনে দ্বিতীয়া হয়ে থাকতে রাজী নই।

পরদিন সকালেই রে তার দোকানের বন্ধুপ্রতিম অংশীদার ডালিয়েনকে জানাল যে, নিউইয়র্ক ছেড়ে সে চলে যাবে। ডালিয়েন যা দেখে তার চেয়ে বেশী আবিষ্কার করে, সোজাসুজি প্রশ্ন করল রেকে,

—লোকটা নিশ্চয়ই বিবাহিত?

—দুটো সন্তানও আছে। অকপটে উত্তর দেয় রে।

—আমার ধারণা ছিল এই ধরণের বাজে গোলমালের মধ্যে তুমি অন্ততঃ পড়বে না কোনদিন।

—পড়ব না বলেই ত পালাতে চাইছি।

—পালাবে মানে? এতদিনকার প্রতিষ্ঠা, দোকান সব ছেড়ে চলে যাবে? জাহাজ ডুবিয়ে জাহাজের আগুন নেভাবে?

অভিনেত্রী সুসান হেওয়ার্ডকে পরিচালক ডেভিড মিলার 'ব্যাকস্ট্রীট'এর একটি দৃশ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন।

পল এবং রের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটি দৃশ্য

শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। রে'র সঙ্গে জানিয়েনকেও। রোমে গিয়ে 'জানিয়েন এণ্ড রে'র আরেকটি শাখা খুললেন দুজনে। রোমে দোকান খোলার দু'মাস পরে একদিন এক রেস্টুরেন্টে একটা অদ্ভুত ঘটনার আবর্তে পড়ল রে। একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। মহিলাটিকে অপরূপ সুন্দরী বলা যেতে পারত যদি আরেকটু কম মাতাল হতেন তিনি। প্রায় টলতে টলতে কোন রকমে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন ভদ্রমহিলা, রে সরে দাঁড়াল পথ করে দিয়ে, কিন্তু তিনি ঠিক রে'র পায়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ধরতে হাত বাড়াল রে, কিন্তু তার আগেই আরেকটা হাত এগিয়ে এসেছে মহিলাটির সাহায্যে। চোখ তুলতেই পলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। বিবর্ণ মুখে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল পল।

পরদিন সকালটা আচ্ছন্নের মত দোকানে এল রে। গতরাতে ঘুমোতে পারেনি। কাজ করতেও ইচ্ছে করছে না, খানিকক্ষণ দোকানের মধ্যে থাকলে যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। দোকান থেকে এক রকম ছুটেই সুসজ্জিত রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। আর দাঁড়াতেই দেখল পলকে।

—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, চলো নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসি।

রে'র বাড়ির ছাদে পায়চারি করতে করতে তাদের অভিশপ্ত বিবাহিত জীবনের কথা একটানা বলে গেল পল।

—অন্য কোনো স্বামী-স্ত্রী হলে অনেকদিনই তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করত। কিন্তু লিজ তা চায় না। প্রথম যখন আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করি, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল লিজ। দ্বিতীয়বার যখন চেষ্টা করি ও চূড়ান্ত মাতাল হয়ে ছেলেমেয়ে দুটোকে গাড়িতে উঠিয়ে ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে গাড়ি চালিয়েছিল। একটা চাকা ফেটে যায়, কেউ যে মরেনি সেটাই এইটাই আশ্চর্য। আমি আর বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করতে সাহস পাইনি।

খানিকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করল পল।

—অবশ্য তোমাকে এ সমস্ত কথা বলে বিরক্ত করতে চাই না। আমার হয়ত আসাই উচিত না তোমার কাছে। আমি যাই, চলেই যাই বরং।

—ঠিক মরবার জন্যেই কি তুমি এসেছিলে?

—তাছাড়া আর আমি কি করতে পারি বলো? বিবাহ-বিচ্ছেদ পাবো না, তোমার জন্যে ভবিষ্যতের কোনো আলোই ত আমি জ্বালাতে পারবো না! অস্ফুট কণ্ঠে রে বলল,

—আমিও যে অন্ধকার।

রে'র উত্তরে পল যেন নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে,

—বিশ্বাস করো, আমি চেষ্টা করেছি তোমাকে এড়িয়ে যাবার, দেখা না করে থাকতে। পারিনি, কিছুতেই পারিনি আমি।

—আমিও আর তোমাকে দেখা না পারতে। গলায় হঠাৎ কোত্থেকে জোর আসে। কত বলল রে।

বাস্তবিক সেদিন থেকে পর পর তিন দিন পলকে যেন আঁকড়ে ধরেছিল রে। নিজেও বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয়নি, পলকেও বেরোতে দেয়নি।

কিন্তু পলকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল রোম ছেড়ে। লিজ আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে। অবশ্য ঠিক মরবার জন্যেই পিলগুলো খায়নি সে। স্বামীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখার এইটে তার নিজস্ব পন্থা। হাসপাতাল থেকে স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে চলে গেল পল। প্যারিস থেকে একদিন চিঠি পেলো রে। পল আসছে রোমে। 'তুমি যদি রাত জেগে কাজকর্ম কর মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখো জানালায়, বাইরে থেকেই যেন দেখতে পাই তোমার অপেক্ষার আলো।"

পল আসেনি, টেলিগ্রাম এসেছিল। মোমের আলোটাকে ফুঁ দিয়ে নেভাতে হয়েছিল রেকে।

পল আসতে পারেনি কি একটা কাজে। টেলিগ্রামে এবং তার পরের প্রতি চিঠিতে আসার কথা লিখেছে। কিন্তু সাতটা মোমবাতি নেভানোর পর রে'র মনে হল আর সে পারছে না মোমবাতির সামনে অপেক্ষার দীর্ঘ ছায়া ফেলে রাত কাটাতে। সে ঠিক করে ফেলল নিউইয়র্ক, রোম, এর পর প্যারিসেও সে আরেকটা পোশাকের দোকান খুলবে। প্যারিসে এসে পলের চোখে আবার যেন দীপ্তির আলো দেখল রে। আবার সেই সকাল-বিকেল একসঙ্গে থাকা, ঘোরা।

একদিন গাড়ি করে যেতে যেতে হঠাৎ পল প্রশ্ন করল,

—বল ত আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—জানি না। তুমি আমায় যেখানে

পল এবং তার স্ত্রী লিজ-এর রোমহর্ষক মধুযাত্রা

আছ এই রেন, আর কিছুই জানার দরকার নেই আমার।

পল নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল আর কিছু না বলে।

রে কিছুক্ষণ উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেলল,

—কিন্তু বল না সত্যি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

হাল্কা হাসিতে উদ্ভাসিত হল পল।

—জানতুম, তুমি না প্রশ্ন করে পারবে না। মেয়েদের সত্যিই মাটির পা...!

গাড়ি এসে একটি সুন্দর খামার-বাড়ির সামনে থামল। আপেল গাছের মধ্যে বাড়িটা যেন ডুবে আছে। সংলগ্ন বিরাট প্রান্তর যেন দূরে আকাশের কোলে লুটিয়ে পড়েছে।

—বাঃ, কি সুন্দর! রে'র মুখ থেকে যেন আপনা আপনি অব্যয় ধ্বনিত হল।

পল আবিষ্কার নিজস্বাদ ভেঙে বলে,

—জানতাম তোমার ভাল লেগেছে। নইলে সত্যিই আমার কষ্ট হত।

—কেন বল ত?

—আচ্ছা রে, তোমার কখনো মনে হয়নি যে আমি আজ পর্যন্ত কখনো তোমাকে কোন উপহার দেইনি?

রে অবাক হয়ে পলের দিকে তাকায়।

—এই বাড়িটা তোমার!

—আমাদের। মন্ত্রচালিতের মত পলের ভুল শুধরে দেয় রে।

এর পরের কয়েক মাস কি করে যে কেটে গেল—ওরা দুজনে যেন টেরই পেল না। পলের স্ত্রী লিজ, তার পার্টি, শ্যাম্পেন এবং যুবক বন্ধুদের নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াত আর পল শান্তির ছায়া পেত রে'র সাহচর্যে। লিজ যখন প্যারিসে থাকত, পল কোন-না-কোন ছুতোয় লণ্ডন, জুরিখ, রোম প্রভৃতি যে কোন শহরে চলে যেত। সঙ্গে রেও যেত। দুজনে কিন্তু কখনো প্লেনে এক-সঙ্গে বসত না, আলাদা আলাদা গাড়ি করে বাড়িতে আসত। কারণ লোক-জানাজানি হলে রে'র কথা লিজের কানে উঠবে আর স্বামীর কাছে ওটা যাবেই একটা বীভৎস নাটকের অবতারণা হবে জানত পল। যে আবিষ্কার করল কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ যতটা গোপন থাকবে ভেবেছিল ততটা গোপন থাকেনি। লিজ প্যারিসে প্লেন থেকে ফিরে আসতেই ওরা লণ্ডনের টিকিট কাটল। এরোড্রোমে ওরা দুজনেই বরাবর আলাদা যায়, আলাদা সিটে বসে। এয়ার-পোর্টে গিয়ে দেখল পলের সঙ্গে তার ছেলে-মেয়ে এসেছে ওকে বিদায় দিত। পলের বারো বছরের ছেলেটি কি একটা কথা জানার জন্যে অনুসন্ধান অফিসের কাউন্টারে দাঁড়াতেই শুনল কাউন্টারের লোক দুজন বলাবলি করছে,

—যেখানেই ওই ভদ্রলোকটি যান, ঐ ভদ্রমহিলাও যান পেছনে পেছনে।

পল বাবার কাছে কি যেন জানতে জানতে ফিরে যায়।

রে বাধ্য হয়ে সে প্লেনে না গিয়ে পরের প্লেনে অনুসরণ করে পলকে।

কিন্তু লোকরক্ষা হল না। লিজ গোয়েন্দা লাগিয়েছে স্বামীর পেছনে। রে বুঝতে পারল একদিন, পলের পরি-বারের সকলেই তার কথা জেনে ফেলেছে।

অন্তিমশয়নে পল, বুকে শোকাভিভূত পলের বালক পুত্র। টেলিফোনে রের সংগে কথা বলতে বলতে শেষ কথা শেষ না হতেই মৃত্যুর মেঘ ঘনিয়ে আসে।

একদিন রাস্তায় গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় একটি কিশোর কণ্ঠ শুনল,

—তুমি আবার বাবার পেছনে লেগেছ কেন? রে মুখ তুলতেই দেখল পলের ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছে।

—আমরা জানি সবাই তুমি কে! তোমার জন্যে মা ভীষণ মদ খাচ্ছে। ওরা ভেবেছে আমি কিছুই বুঝি না। আমি সব জানি। আমি...আমি ঘেন্না করি তোমাকে...। বারো বছরের ছেলেটা কাঁদতে থাকে।

রে কাঁদতে কাঁদতে ফোনে জানাল পলকে সব কথা।

—তুমি আর এসো না ছেলেটার জন্যে অন্ততঃ। তার ভীষণ দরকার তোমাকে।

ভাগ্যিস পরদিন তার দোকানে ফ্যাশান শো আর শিশু হাসপাতালের সাহায্যার্থে নীলাম ছিল। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকটা ভুলে থাকবার চেটা করল। নীলাম আরম্ভ করল রে।

একটা সুন্দর বিয়ের পোশাকের দাম উঠল পাঁচ হাজার ফ্রাংক। হঠাৎ হল-ঘরের একটা কোণ থেকে একটা গলা ভেসে আসে,

—দশ হাজার ফ্রাংক!

সকলেই ফিরে তাকায় বক্তার দিকে। রে পাথর হয়ে যায় লিজের দিকে চোখ পড়তেই। পলের স্ত্রী লিজই ডেকেছে।

রে সামলে নিয়ে ডেকে যেতে থাকে,

—দশ হাজার ফ্রাংক। আর কেউ—? তাহলে পোশাকটা কিনলেন—

—মিসেস পল স্যাক্সন। পোশাকটা পাঠিয়ে দেবেন। ফিট করাবার কোন দরকার নেই। কারণ পোশাকটা কেউ পরবে না। কেমন এক হিংস্র গলায় বলে লিজ। লিজের এক বান্ধবী ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তার দিকে তাকিয়ে লিজ জোরে জোরে বলতে থাকে—

—তোমরা এতদিন জানতে না আমার স্বামীর সংগে যে মেয়েটি ঘোরে সে কে। পোশাকটা যেন তার কাছেই পাঠানো হয়। তার নাম রে স্মিথ। ঠিকানা আমার স্বামীর।

রে যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে পলকে সেদিন রাত্রে বলল রে—তুমি আর এসো না। এসো না। আমার মান-সম্ভ্রম সমস্ত ধুলোয় গেছে। প্যারিসের সমস্ত লোক আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে তোমার স্ত্রীর জন্যে।

—লোকের কথায় কি এসে যায় সোনা। পল শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করে।

—না, না, ছেলেমেয়েদের কথায় নিশ্চয়ই যায় আসে পল! তারা সব জেনেছে।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রে। বাইরের ফলের বাগানের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকে—পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পুরোনো সব অনুশাসনই অমোঘ। তার থেকে বেরোবার উপায় নেই। তুমি ইচ্ছে করলেই নিজের জীবন যাপন করতে পার না, পৃথিবী টেনে তার নিজস্ব প্রথার শেকলে তোমাকে বাঁধবে। আমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করব না পল। এখন থেকে আমি চলে যাচ্ছি কোথায় বলব না।

পল ওর কাছে এসে দুকাঁধ চেপে ধরে জোরে।

—তুমি এখানেই থাকবে। আমি ফিরে আসছি। এবার এসে আর ফিরে যাবো না আমি কথা দিচ্ছি—

• • •

দিনের বেলা ফোন পেল রে। সে যেন অপেক্ষায় কাঁপছিল এতক্ষণ। অবাক হয়ে পলের ছেলের গলা শুনল।

—মিস স্মিথ? এক মিনিট ধরুন।

তার পরেই পলের গলা ভেসে এল যেন অনেকদূর থেকে—রে!

—বলো, বলো, আমি অপেক্ষা করছি সোনা! কিন্তু ভীষণ আস্তে কথা বলছে পল. প্রায় ফিস্-ফিস্ করে, শোনাই যায় না প্রায়।

—রে!...... রে স্মিথ আমি তোমাকে ভালবাসি!

রিসিভারটা মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনল রে। তারপরে পলের ছেলেটা যেন কেঁদে উঠল।

—পল! কি হল পল। আমি......... আমিও তোমাকে ভালবাসি পল......। কি হল পল......কি হল?

সকালবেলার কাগজে কি হয়েছিল সব জানতে পারল রে। মোটর দুর্ঘটনায় লিজ স্যাক্সন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। পল ভীষণ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। টেলিফোনটা তাহলে হাসপাতাল থেকেই করেছিল পল। নিশ্চয়ই স্ত্রীর সংগে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে ওর গাড়িতে উঠেছিল পল। ইচ্ছে করেই লিজ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। হয়ত এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির স্টিয়ারীংটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পল ধ্বস্তাধ্বস্তিও করেছিল হয়ত। কিন্তু সেই মৃত্যুর মঞ্চে নায়ক-নায়িকা কেউই শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

শবযাত্রার এক সপ্তাহ পরে সেই বাগানবাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

—ভেতরে আসুন। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল রে।

কিশোর পল তার ছোটবোনের হাত ধরে ঢুকল ঘরে।

—আমরা এসেছি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমাদের কেউ নেই—তাই ভাবলাম আমরা যদি একাধবার আপনার কাছে আসি—।

কি যে হল রে ঠিক বুঝতে পারল না, শুধু অনুভব করল দুটি সরল মুখ ওর কোলে। আর ও নিজে তাদের চুমু খাচ্ছে, হাসছে, আদর করছে।

আর কাঁদছে।

নোবেল পুরস্কার

অ্যাকাডেমিশিয়ান লিও দাভিদোভিচ ল্যান্দাউ

খ্যাতনামা সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক লিও দাভিদোভিচ ল্যান্দাউকে এই বৎসরের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে স্টকহোলম্ থেকে নোবেল পুরস্কার কমিটি ঘোষণা করেছেন।

তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানের নানাদিক নিয়ে অধ্যাপক ল্যান্দাউ গবেষণা করেছেন। প্রধানত ঘনীভূত বস্তুর থিওরি ও অতি-নিম্ন তাপাঙ্কে বস্তুর ভৌতিক অবস্থা সম্পর্কেই তিনি গবেষণা করেছেন। ঘনীভূত বস্তুর "দ্বিতীয় অবস্থা"য় অতিনিম্ন তাপাঙ্কে অবস্থান্তরের তাপ-গতীয় তত্ত্বটিকে ল্যান্দাউ আরও স্পষ্ট ও উন্নত করে তোলেন এবং অবস্থান্তরিত বস্তুটির গঠন-প্রতিসাম্যের রূপান্তর সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করেন। ১৯৪১ সালে তিনি চূড়ান্ত শূন্য তাপাঙ্কের কাছাকাছি হিলিয়মের অতি-তরলীকৃত অবস্থার লক্ষণবৈশিষ্ট্যের আণবীক্ষণিক থিয়োরিকে আরও বিশদে করে তোলেন। সেই সঙ্গে, হিলিয়মের মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন গতির শব্দ তরঙ্গের বিস্তারের ("দ্বিতীয় শব্দ তরঙ্গ") সম্ভাবনা সম্পর্কেও তিনি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বস্তুর অতি-ভেদ্যতার থিয়োরি সম্পর্কেও খুব মূল্যবান মৌলিক গবেষণা করেছেন লিও ল্যান্দাউ। পার-মাণবিক পদার্থবিদ্যা ও মহাজাগতিক রশ্মির উপরে অধ্যাপক ল্যান্দাউ-এর অন্য কতকগুলি গবেষণা নূতন আলোকপাত করেছে।

তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণামূলক আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক লিও ল্যান্দাউ লেনিন পুরস্কার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কর লাভ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই বৎসরের গোড়ার দিকে এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর রকম আহত হয়ে পড়ার পর প্রফেসর ল্যান্দাউকে "মৃত" বলে ঘোষণা করার পর, তিনি আবার "বাঁচিয়া" ওঠেন। গত জুলাই মাসে মস্কোয় খ্যাতনামা সোভিয়েত লেখক বোরিস পোলেভয় বলেন, সেই সময়ে ডাক্তাররা ল্যান্দাউ-এর "ক্লিনিক্যাল মৃত্যু" (দেহের যাবতীয় জৈব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া) ঘোষণা করেন। কিন্তু সোভিয়েত চিকিৎসকদের ও অন্যান্য দেশের চিকিৎসকের সহায়তায় বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অধ্যাপক ল্যান্দাউকে "পুনর্জীবিত" করে তোলা হয়। এজন্য গ্রেট ব্রিটেন হতে বিমানযোগে মস্কোতে একটি বিশেষ ঔষধ প্রেরণ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানী তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করেন।

।। ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ।।

ভেষজ বিদ্যায় ১৯৬২ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন বৃটিশ ও একজন মার্কিন বিজ্ঞানী যুক্তভাবে। বৃটিশ বিজ্ঞানী দুজন হচ্ছেন ডাঃ ফ্রান্সিস ক্রিক ও ডাঃ মরিস উইলকিন্স। মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ জেমস্ ওয়াটসন। ৪৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ ক্রিক

লিও দাভিদোভিচ ল্যান্দাউ

ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউট অফ মোলিকিউলার বায়োলজিতে কর্মরত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ওয়াটসনের বর্তমান বয়স ৩৪ বৎসর। ৪৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ উইলকিন্স লণ্ডনের কিংস কলেজে জীব-পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের সহকারী অধ্যক্ষ।

এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার বিষয়ে বিজ্ঞান-জগৎ আশান্বিত। তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন নিউক্লিক অ্যাসিডের ত্রিমাত্রিক গঠন সম্পর্কে আবিষ্কারের জন্য। মনে করা হচ্ছে যে জীববিদ্যা ও ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের প্রভাব দূরপ্রসারী হবে।

।। রসায়নে নোবেল পুরস্কার ।।

বর্তমান বৎসরে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জন কাউড্রি কেণ্ড্রুক ও মিঃ ম্যাক্স ফার্দিনান্দ।

ডাঃ মরিস উইলকিন্স
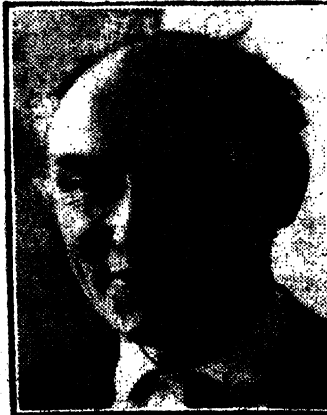
ডাঃ ফ্রান্সিস ক্রিক

অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন
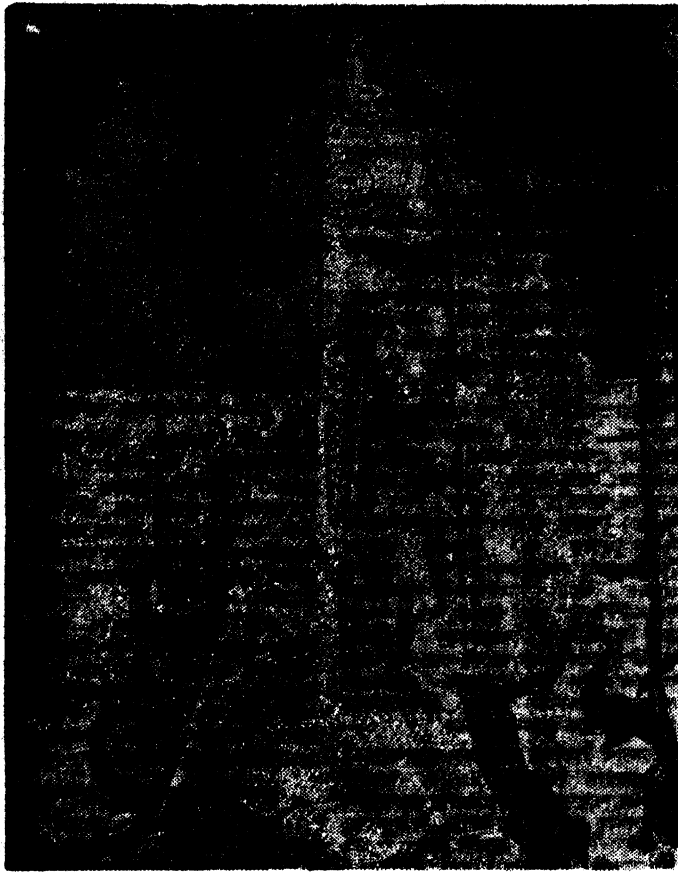
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব

সমীরণ দাশগুপ্ত

জগদ্ধাত্রী যে অর্থে জগৎ-ধারয়িত্রী—জগতের যাবৎ শৌর্য বীর্য শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারণকারিণী, সেই অর্থে ওই সব মানবীয় আচরণ বা জীবন-লক্ষণের স্বরূপগুলির পাশাপাশি জাগতিক জীবনের অনাবিল আনন্দ এবং সৌন্দর্যানুভূতিরও উৎস।

বারো মাসে তের পার্বণের দেশে প্রধানতম জাতীয় উৎসব বলতে একমাত্র দুর্গোৎসবকেই বোঝায়। দেশের আপামর জন-মানসে ভক্তি আনন্দ এবং অপরিসীম হৃদয়াবেগের মাধুর্য সৃষ্টি করা এমন আনন্দানুষ্ঠান হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে সম্ভবত দ্বিতীয় নেই। এই হৃদয়াবেগের মুহূর্তে মানুষের অন্তর্লোকে যে মহৎ চিত্তবৃত্তির অনুশীলন ঘটে তা থেকেই সার্বজনীন প্রীতি এবং মিলন সম্ভবপর হয়। পূজাশেষে বিজয়ার অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। এই প্রীতি-বিনিময় মূলতঃ ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটলেও পরস্পরের মধ্যে সানন্দ শান্তি সহযোগিতা এবং প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা ও দৃঢ় করবার [illegible] প্রয়াস এই ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। আমাদের [illegible] অভাব-অনটন দুঃখ-ধান্দার মধ্যে এই ধর্মানুষ্ঠানগুলি নিবিড়তম আনন্দের উপলব্ধি ঘটায় যা মহত্তর সার্থকতর জীবনাকাঙ্ক্ষারই স্বরূপ।

জগদ্ধাত্রী পূজার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার সঙ্গে দুর্গোৎসবের মিলটুকু লক্ষণীয়। ষষ্ঠী থেকে শুরু করে নবমী পর্যন্ত সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠানের পর দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা। এই চার বা পাঁচ দিনব্যাপী পূজার রীতি একমাত্র দুর্গাপূজার রীতির সঙ্গেই মেলে। এবং এই রীতির সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্ভব সম্পর্কে একাধিক মতবাদের একটির প্রায় হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান যা থেকে সেই মতবাদটির সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মতটি এই যে, সেকালে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারীর খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় দরুণ একবার মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বন্দীদশায় থাকাকালীন সময়ে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় ধার্মিক রাজা যারপরনাই মর্মাহত হন। অতঃপর নদীয়ায় ফিরে এসে কোন এক রাতে দেবীর এইরূপ স্বপ্নাদেশ হয় যে, আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তির পূজা করলে দুর্গা-পূজার সমান পুণ্য অর্জন সম্ভব হবে। কৃষ্ণচন্দ্র সেইমত পূজা করেছিলেন এবং তখন থেকেই নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার সূত্রপাত। আদ্যাশক্তি দুর্গার এই বিকল্প পূজার সূত্রপাতের সঙ্গে স্বপ্নাদেশের সংস্কারগত মিলটুকু তথ্য বা যুক্তির চেয়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সহজেই আকৃষ্ট করে থাকবে।

প্রশ্ন হতে পারে চন্দননগরে এই পূজার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির কারণ কি? সে সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ফরাসী আমলে চন্দননগর বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। তার ফলে সাধারণতঃ যা হয়, এক শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভেতর প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, যার দরুণ সারা বাংলায় ঐ পূজার প্রচার ঘটলেও জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের দিক দিয়ে চন্দননগরের অতীত ঐতিহ্য আজও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে গেছে। এবং এখনো চন্দননগরের বারোয়ারী পূজার প্রধান উদ্যোক্তা বলতে এই সব অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মহলকেই বোঝায়। এমনকি

পূজার ব্যয়িত অর্থের মোটা অংক প্রকৃত পক্ষে এঁরাই দিয়ে থাকেন।

চন্দননগরের প্রধান প্রধান বারোয়ারী পূজাগুলির প্রতিমার উচ্চতা চালচিত্র সমেত ত্রিশ চল্লিশ ফুট, কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী বলে অনুমান হয়। এই অস্বাভাবিক উচ্চতার যুক্তি-সঙ্গত কারণ কিছু জানা না গেলেও অনুমান হয়, এখানেও সেই একই প্রতি-যোগিতার মনোভাব উদ্যোক্তাদের ভেতরে সক্রিয় ছিল বা আছে যার ফলে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রতিমার দৈর্ঘ্য এমনি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ান হয়ে থাকে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না, যখন অন্ততঃপক্ষে একখানি প্রতিমার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এখানকার স্থায়ী প্রাচীন বাসিন্দাদের একজন মাথা নেড়ে বললেন— উঁহু কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা বলতে পারব না। বাবাকে মরবার আগে শুধিয়েছিলাম, তিনিও ওই এক কথা বলেছিলেন, জানি না। এটুকু বলতে প্যারি, ঐ পুজো এতদঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। নিচুপাটি বা চাউলপাটির ব্যবসায়ীরা চন্দননগরের অতীত সমৃদ্ধির দিনে ঐ পূজা শুরু করেছিলেন একথা সহজেই বোঝা যায়।

এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকখানি পূজার বয়সকাল নিঃসন্দেহে ১০০/১২৫ বছর কি তারও বেশি এমন প্রমাণ রয়েছে। ষণ্ঠী থেকে পূজানুষ্ঠানের শুরু। দুর্গাপূজার ঠিক এক মাসকাল পরে এই পূজা চন্দননগরবাসীদের কাছে দুর্গোৎসবের আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়। টাঙের মত দীর্ঘ খড়ের ছাউনির ঘর করে স্থায়ী কাঠামোয় প্রতিমার প্রাথমিক রূপায়ণ শুরু হয়। তারা বেঁধে চলে প্রতিমার গায় মাটি লাগানোর কাজ। বর্ধমান এবং কলকাতার মালাকরেরা বাড়ি বসে পরম উদ্দীপনায় সঙ্গে প্রতিমার চালচিত্রের জন্য শোভন সোলার কাজ শুরু করেন। সোলাকেই রঙ আর রাংতা লাগিয়ে নতুন নতুন ডিজাইনের নক্সা, ময়ূরী মূর্তি, হাতির শুঁড়ে জড়ান উপড়ে-করা শান্তিবারির কলস—নামা সূক্ষ্ম কারুকার্য শুরু হয়। এই সব সোলার কাজ চালচিত্র এবং প্রতিমার অঙ্গের আবরণ ও আভরণের জৌলুস বাড়িয়ে দেয় শতগুণ।

প্রতিমার পায়ের নীচে হাতী, তার ওপর কুঞ্চিত কেশর বলবান সিংহ—দেবীর বাহন। সবার ওপরে চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী দেবী মূর্তি বসে আছেন। চার হাতে শঙ্খ চক্র ধনুক বাণ। ডান কাঁধের ওপর সাপ—হিংস্র খলতার প্রতীক। দেবী সেই খলকে বশ করেছেন।

চালচিত্রের সোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কুম্ভকার তার তুলি আর রঙের সরঞ্জাম গুটিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তার জায়গায় রঙ-বেরঙের আলোকমালায় ঝলমলিয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি পূজা-মণ্ডপ। আয়ত-লোচনা দেবীমূর্তির মুখে স্বর্গীয় প্রসন্নতা। আর দেবীর মুখের সেই প্রসন্নতা যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে অগণিত দর্শনার্থীর মনে। কেউ ভক্তি-ভরে প্রণাম করছেন। প্রণামকে যাঁরা সংস্কার মনে করেন তাঁদেরও মনে দেবী-মূর্তির গঠন-নৈপুণ্য, মনোহারী সজ্জা, চালচিত্রের সোলার কাজ বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এঁদের কেউ কেউ পরস্পরের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কথাবার্তা বলছেন—কানে এল। সোলার কাজের শিল্পনৈপুণ্য তাঁদের অনেককে এত মুগ্ধ করেছে যে, কেউ কেউ এই সব মালাকরদের বাসস্থানের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। অনুমান হল তাঁরা এই লুপ্ত-প্রায় কারুশিল্পটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে মনে মনে আগ্রহী। এই আগ্রহের সঠিক উৎস কিম্বা পরিণতি কি তা বুঝতে না পারা গেলেও এটুকু বোঝা গেল এই শিল্পটি সম্পর্কে এখনও প্রকৃত রসিক-জনের মনে প্রভূত কৌতূহল বা আগ্রহ বর্তমান। আর সে আগ্রহ দু-পক্ষেরই উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রবাসী মানুষ যেমন আনন্দ-উৎসবে বাড়ি ফেরে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে চন্দননগরবাসীদের ঘরে ঘরে তেমনি দূর-দূরান্তর থেকে আত্মীয়-পরিজন আসার ধূম লেগে যায়। তাছাড়া এই তিন কি চার দিনে শহর কলকাতা এবং হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্ধমান জেলার দূর শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকেও বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একাধিক স্পেশাল ট্রেন চলাচলের বন্দোবস্ত চালু হয়েছে কয়েক বছর যাবৎ। তাছাড়া এ সময়ে ঐ অঞ্চলের সব কটি রুটে অতিরিক্ত বাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। জলপথের জন্য আছে নৌকা, গ্রামপথের জন্য গরুর গাড়িরও বন্দোবস্ত আছে। কাছের যাত্রীরা প্রতিমা দেখে বাস কিম্বা ট্রেনে সে রাত্রেই বাড়ি ফিরে যান। আর যাঁরা দূরের মানুষ, গ্রামের মানুষ, তিন দিন পুজো দেখে বিসর্জনের বাজনা শুনে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ফিরবেন বলে এসেছেন—এই তিন কি চার দিন তাঁরা হয় ভাড়া-করা গাড়িতেই রাত কাটান আর না হয় যে কোন পূজা-প্রাঙ্গণে সারা রাতব্যাপী গান-বাজনার অনুষ্ঠানে গিয়ে বসেন। শুধু গান-বাজনার হাল-ফ্যাশানের জলসাই নয়, সেই সঙ্গে যাত্রা, তরজা কিম্বা থিয়েটারের বন্দোবস্তও হয়ে থাকে এই তিন দিন। মোট কথা দূরের মানুষের

রাত কাটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি রাখেননি বারোয়ারী পুজোর উদ্যোক্তারা।

নবমী পুজো শেষ হয়ে দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের উৎসব। বৎসরান্তিক পূজানুষ্ঠানের এই শেষ দিনটি কোমলে, বিষাদে, আনন্দে, মাধুর্যে মেশানো একটি পরম উপভোগ্য দিনের ছাপ রেখে যায় প্রতিটি দর্শনার্থীর মনে। বিষাদের নামে এদিনের অনুভূতি অনেকখানি আনন্দেরও। মেঘের পাশে রৌদ্রের খেলার মত। অর্থাৎ দেবীকে আমরা বিসর্জন দিচ্ছি আগামী বছর তাঁকে নতুন করে পাব বলে। এই বিচ্ছেদের বিষাদ আরেক প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে তোলে বলেই এই বিষাদ শুধুই বিষাদ নয়। এ যেন নতুন করে পুনর্মিলনেরই সূত্রপাত।

দশমী, অর্থাৎ বিসর্জনের দিনটিতে অগণিত দর্শকের ভিড়ে প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপ, বিশেষ বিশেষ গলিপথ জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সাধারণত বেলা চারটে থেকে যানবাহন চলাচলকারী প্রধান রাস্তা জি-টি রোডের দুই প্রান্ত (একদিকে বাবুর বাজারের মোড় আরেক দিকে তালডাঙার মোড় থেকে চন্দননগরে ঢুকবার উত্তর-দক্ষিণের দুটি মুখ) পুলিশ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূরের যানবাহনকে কোন মতেই সেই নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না বেলা চারটে থেকে রাত বারটা অবধি। অবশ্য এই নিষিদ্ধ সীমানার দুই প্রান্ত থেকে নিয়মিত বাস এবং ট্যাক্সি আসা-যাওয়া করতে থাকে যার ফলে যাত্রী চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে অনেক রাত অবধি। নির্বিঘ্নে প্রতিমার মিছিল বার করা ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

পুরনারীগণ দেবী-বরণের অনুষ্ঠান শেষ করেন দেবীর পায়ে হাত দিয়ে। তারপর উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, এ্যামপ্লিফায়ারের বাজনা, ঢাক এবং কাঁসরের বাজনা সহযোগে প্রতিমাকে লরীতে তোলা হয়।

প্রায় চার মাইল দীর্ঘ রাস্তা ঘুরিয়ে দেবীকে গঙ্গার 'গড়ান ঘাটে' নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। মূর্তির অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের জন্য এই নির্দিষ্ট রাস্তার কোন কোন জায়গার টেলিফোনের তার, বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন ইত্যাদি যাবতীয় বাধা সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়। শেষ দিনের এই শোভাযাত্রার মিছিলের আলোর ছটা, জাঁকজমকের প্রাচুর্য, বিগত তিন দিনের সব আনন্দ কোলাহলকে যেন হার মানিয়ে দেয়। জেনারেটার খাটিয়ে লরীর ওপরে রকমারী রঙের বাতি জ্বালান হয়, অন্ধকারে প্রতিমার মুখ বারবার সার্চলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। জরীর কারুকার্য সোলার চালচিত্র শেষবারের মত রাস্তার দুধারের অগণিত নরনারীর চোখে উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে।

গঙ্গার গড়ান, ঢালু ঘাটে প্রতিমা আনার পর বিসর্জনের আগে স্থায়ী কাঠামো থেকে প্রতিমা খুলে ফেলা রীতি। সেই সময় কেউ কেউ চালচিত্রের সোলার কাজ সংগ্রহ করে রাখেন। এই সময় অন্ধকার গঙ্গার কিনারে কাতারে কাতারে নৌকা ভিড়ে থাকে এবং সেগুলির ওপর থেকে অসংখ্য দর্শক বিসর্জনের সমারোহ প্রত্যক্ষ করেন। সেই নৌকার ভিড় বিসর্জন অনুষ্ঠানের খ্যাতির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিশেষ পরিচিত।

একটি একটি করে প্রতিমা আসতে থাকে, বিসর্জন হয়ে যায় মহাসমারোহে, তারপর খালি কাঠামো নিয়ে লরীগুলো ফিরে যায় শূন্য মণ্ডপের দিকে। গঙ্গার ঘাটে অগণিত নারী-পুরুষের ভিড় লেগে থাকে মাঝরাত্র পর্যন্ত। এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়।

সেই বিশাল জনসমুদ্রে মাতৃমূর্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষার জন্য যত না আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তার বেশি লক্ষিত হয় আনন্দ-উল্লাসের রূপ যা এই ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানগুলির আড়ম্বরের ভেতরে স্বভাবতঃই বিশেষরূপে চোখে পড়ে। বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উৎসব বা আনন্দের স্থান আর কতটুকু? তবু যখন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সুযোগ আসে, আমরা জীবনের যত কিছু ক্লেদ গ্লানি তুচ্ছতা মালিন্য ভুলে নিশ্চিন্তে, পরমানন্দে মেতে উঠি। এই মেতে ওঠা, আনন্দিত করা, উল্লসিত করা এ সমস্তই সুস্থ জীবনলক্ষণের স্বরূপ। এইসব ধর্মানুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক লাভালাভের কথা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষের পাওনা হিসেবে এইটুকু বোধ হয় চরম এবং পরম পাওনা।

প্রাচীন মন্দির

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে ১২ মাইল দূরে হলো বৈষ্ণব তীর্থ খড়দহ। শ্যামবাজার থেকে ৭৮নং বাসে কিম্বা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলগাড়ী করেও খড়দহে যাওয়া যায়। ডাক্তার হান্টার বাঙলার বিবরণে (এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল) লিখেছেন—

"মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু ঘুরতে ঘুরতে এই স্থানে আসেন এবং গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় মহিলার ক্রন্দন শব্দ শুনতে পান। শব্দ লক্ষ্য করে দেখেন যে একজন মহিলার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় সে কাঁদছে। কিছুক্ষণ আগে কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ পড়ে আছে। নিত্যানন্দ অবস্থা দেখে সমস্তই বুঝলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে বললেন, কাঁদ কেন? তোমার কন্যা ত নিদ্রিত। মাতা নিত্যানন্দের কথা হৃদয়ঙ্গম করলো। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক এই বিশ্বাসে তাঁকে বললো, প্রভু আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও। আমি জন্মের মত তোমার দাসী হয়ে থাকবো। সত্য সত্যই মেয়েটি বেঁচে উঠল। মহিলা নিত্যানন্দের গৃহিণী হলেন। নিত্যানন্দ গৃহী হয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছে বসোপযোগী একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করলেন। জমিদার গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সামনের দহের উপর একখণ্ড খড় ফেলে দিয়ে বললেন, এই স্থান তোমার বাসের জন্য দিলাম। দহের ঘূর্ণি জলে খড় অদৃশ্য হ'লো। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেথায় চড়া পড়ে বাসোপযোগী স্থান দেখা দিল। তখন অধিবাসিগণ নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহিমা অবগত হয়ে অনেকেই তাঁর ভক্ত হ'লো। সেই অবধি সেই স্থানের নাম খড়দহ হয়েছে।"

খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দ প্রভুর বংশোদ্ভব। এই গোস্বামীরা অনেকেই বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু। দোল, ফুল দোল, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পর্বে এখানে অনেক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। খড়দহের শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রসিদ্ধ। শ্যামসুন্দর মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়। হান্টার সাহেবের বিবরণে উল্লেখ আছে—

"রুদ্র নামক এক যোগী গৌড় নগরে মুসলমান শাসনকর্তার কাছে এসে বলেন যে, প্রাসাদের দ্বারদেশের উপর একটি প্রস্তরখণ্ড আছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ হয়েছে যে ওটি থাকলে অমঙ্গল হবে। অতএব অবিলম্বে ওটি স্থানান্তরিত করা কর্তব্য। শাসনকর্তাও দেখলেন যে বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ঘর্মাক্ত হয়েছে। শাসনকর্তার হিন্দু মন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন যে পাষাণের চক্ষের জল পড়লে দেশের অমঙ্গল হবে। অতএব ওটি স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক। প্রস্তরখণ্ড খোলা হ'লো এবং রুদ্রকে অর্পণ করা হলো। রুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিয়ে নৌকায় তুলতে গেলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ হস্তস্খলিত হয়ে উক্ত প্রস্তর জলমগ্ন হলো। শ্রীরামপুরের কাছে বল্লভপুরে রুদ্রের বাস। রুদ্র বাড়ী এসে দেখলেন গঙ্গার ঘাটে সেই প্রস্তর এসে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রস্তর হতে বল্লভপুরের বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। খড়দহের গোস্বামীরা এই প্রস্তরের এক অংশ নিয়ে শ্যামসুন্দরের মূর্তি নির্মাণ করেন।"

এল, এস, এস, ও' ম্যালি সম্পাদিত "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (২৪ পরগণা)" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

খড়দহের গঙ্গাতীরে পুরাতন বাংলা রীতিতে নির্মিত শিবমন্দির

খড়দহ বৈষ্ণবগণের এক বিশেষ তীর্থভূমি। যেহেতু এই স্থানেই মহাপ্রভুর সর্বপ্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রম ছিল।"

"গোবিন্দ দাসের কড়চা" গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন যে—"নিত্যানন্দকে তিনি জাতিভেদের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য বঙ্গদেশে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ ছিলেন ভোলা মহেশ্বর, পতিতের প্রতি তাঁহার ছিল অপার করুণা। চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, তিনিই পতিত উদ্ধার কার্যের সর্বাপেক্ষা যোগ্য। এই জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল কোথাও থাকিতে দিতেন না। কিরূপে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জাতি-জাত্য-গর্বিত সমাজে একটু আদর পাইবে, তাহা তিনি গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া নির্জনে নিত্যানন্দের সঙ্গে আলোচনা করিতেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরভূম জেলার একচাকায়।

সি. আর. উইলসন লিখিত "দি আর্লি অ্যানালস্ অফ দি ইংলিস ইন বেঙ্গল" গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে হোসেন শা'র আমলে বিপ্রদাসের 'মনসার ভাসান' রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থে চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথে প্রধান প্রধান স্থানগুলির নামের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে খড়দহ নামেরও উল্লেখ দেখা যায়।

সেকালে গঙ্গার দুই তীরেই ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে বরাহনগর, সুখচর, পানিহাটি, খড়দহ, আকনা, মাহেশ, বল্লভপাড়া প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের আবাস গড়ে ওঠে। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানের নামের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

"পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদ বর্ণিবেক সে সব কৌতুক॥
এইমতে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥"

খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিত দেবালয়ে—
"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কহনে না যায়॥"
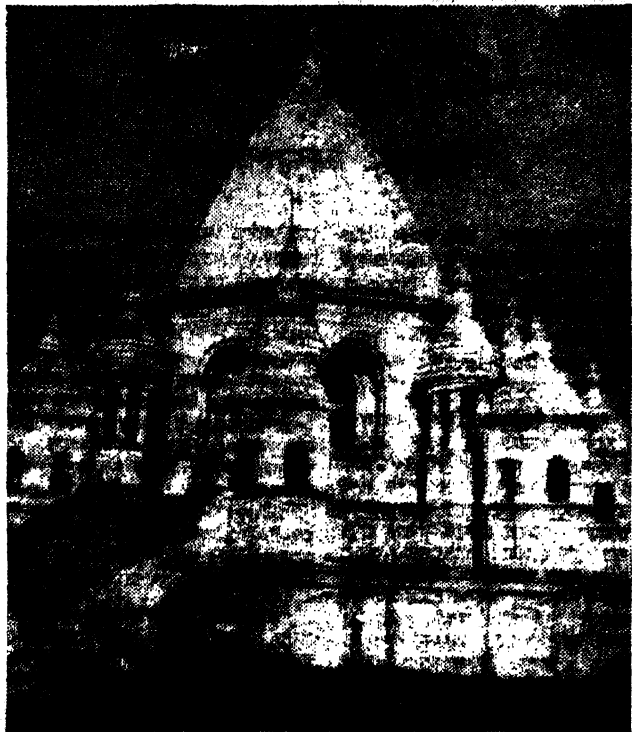
খড়দহের শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ

শ্রীবাস গৃহ হতে প্রভুর পানিহাটি রাঘব পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ—

"কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব মন্দিরে।"

কবি জয়ানন্দ বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থে পানিহাটি এবং খড়দহের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পানিহাটি নামগ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাধি সব পতাকা মন্দিরে॥
ইষ্টিকা রচিত হাটঘাট রাজ্যস্থান।
সেইখান দেহরা মঠ প্রপা পুষ্পোদ্যান॥"

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে যে—

"শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল বৈষ্ণবের বংশ যাহে রহে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ আছে যে—"১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করে-ছিলেন।

বি. টি. রোডের উপর খড়দহ পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির পাশের রাস্তা ধরে যেতে হয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরের দিকে। আঁকা-বাঁকা সরু রাস্তা। কয়েকটি দোকানের গায়ে বসুপাড়ার নামের উল্লেখ আছে।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এলাকায় প্রবেশ করার আগেই দেখা যায় দু'টি পুকুর। পুকুরের জলের রঙ ঘন সবুজ-বর্ণ। মন্দিরের সামনে পাথর বাঁধান নাট-মন্দির। মন্দিরের কোল ঘেঁসে রয়েছে সারি সারি ভক্তদের নাম লিখিত ইট বাঁধান ফুলশী মঞ্চ। শ্যামসুন্দরের মন্দির বেশ বড়। কাছেই নিত্যানন্দ প্রভুর বাসভবন।

বিবেকানন্দপাড়া হতে যাবার ঘাট। গঙ্গার ধারে চতুষ্কোণ ভূমির উপর ২৬টি শিবমন্দির। মধ্যে বিরাট প্রাঙ্গণ। কয়েকটি মন্দিরের গায়ে উঠেছে অশ্বত্থ ও বটগাছ। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ আছে। গঙ্গার ধারে ঐ ধরণের পর

পর আরও কয়েকটি মন্দিরের চূড়া দেখলাম।

গঙ্গার উপর ইট দিয়ে বাঁধান ঘাট। এ পারে বাঁধা ছিল কয়েকটি নৌকা। ওপারের কিনারা ঘেঁসে একটি স্টীমার যেতে দেখলাম। অপর পারের সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কয়েকটি কারখানার চিমনী মাথা তুলে আছে। ওপারে হলো রিষড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি।

শিবনাথ হাইস্কুলের সামনে দিয়ে এসে উপস্থিত হলাম শ্যামসুন্দরের পুরাতন ঘাটে। ঘাটের পাশে গঙ্গার ধারে চোখে পড়লো একটি দোতলা বাড়ী। ভিতরে নানারকম গাছের ঝোপ-ঝাড়। শুনলাম কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ ঐ বাড়ীতে বাস করেছিলেন।

ঘাট ভগ্ন। পাথর এনে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ঘাটের নিচে খরস্রোতা স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গা বয়ে চলেছে। রোদ পড়ে চকচক করছে গঙ্গার জল। কয়েক পা যেতেই চোখে পড়লো রাস খোলার ঘাট। সামনে সাদা চুনকাম করা শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ। এখানে প্রতি বছর রাসের সময় উৎসব হয়। মেলা বসে, পুতুল সাজানো হয়। দোকান বসে। শুনলাম উৎসবের দিনগুলিতে বেশ ভিড় হয় এখানে।

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের জন্য খড়দহের ইতিহাসে বিশ্বাস পরিবারের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক পণ্ডিতের সহায়তায় "প্রাণতোষিণী মহাতন্ত্র" নামে একখানি তন্ত্র-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় পণ্ডিত দ্বারা বহু গ্রন্থ যেমন প্রাণকৃষ্ণ শব্দাব্ধি, প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি, প্রাণকৃষ্ণ ঔষধকৌমুদী, প্রাণকৃষ্ণীয় সাগর, প্রাণকৃষ্ণকোষবাখলী, প্রাণকৃষ্ণ বৈদ্যামৃত, রত্নাবলী প্রভৃতি রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পরলোকগমন করেন।

২৯ জানুয়ারী, ১৮২০ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই—

"কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের বাঁধাঘাটের উপর চতুর্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থব্যয় করিয়া বাণকুণ্ড হইতে বাণ লিঙ্গ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণ লিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন। ওই আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন। সে স্থান অতি মনোরম। এতদ্দেশে অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকেরা অনেক অনেক মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই।"

শুনলাম খড়দহের গঙ্গার ঘাটে শিবমন্দিরের সংখ্যা মোট ছাব্বিশটি। তা ছাড়া আরও আশেপাশে কয়েকটি মন্দির চোখে পড়লো। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পাশে মদনমোহনের মন্দির। বিশ্বাস ঘাটে যাবার পথে পুরাতন এবং নতুন মন্দির দেখলাম। নবনির্মিত মহাবীর মন্দির রয়েছে পথের উপর। এ রকম কয়েকটি মন্দির ছড়িয়ে আছে খড়দহের আশেপাশে। শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে কিছু দূর গেলেই রহড়া। স্টেশন আর রেল লাইন পার হয়ে আসতে হয় রহড়ায়। সেখানে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র। গড়ে উঠেছে ইস্কুল, কলেজ, পাঠাগার, ছাত্রাবাস, মন্দির। আর চোখে পড়লো অনন্ত ব্যানার্জী রোডের উপর একটি শিবঠাকুরের মন্দির। শুনলাম ঐ মন্দিরের জন্য ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছে মন্দিরপাড়া।

খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির

[কটোগ্রাফ শ্রী জি পি গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত।]

(একটী চাণক্য শ্লোক)
COPYRIGHT
কাশ্মীর
সর্পঃ ক্রূরঃ
লাদাক
খলঃ ক্রূরঃ
এ সবই তোমার জমি
সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ
মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ
ডাক্তার কোটনীস
হিন্দী চীনী ভাই ভাই
ভারত চীনকে আক্রমণ করিয়াছে
খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

এখানে আসবার ঠিক বারো দিন পরে ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল কান্তির। চোখের চাউনি থেকে ঘোলাটে ভাবটা চলে গিয়ে পরিচয়ের দীপ্তি ফিরে এল। মনে হ'ল তাকে ঘিরে মা-দাদা-বৌদির বসে থাকবার কারণটাও বুঝতে পারলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নিরতিশয় লজ্জা। যেন সেই লজ্জা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যই আবার চোখ বুজল সে।

শ্যামা তখনই সাগ্রহে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কনক বেশ একটু দৃঢ়কণ্ঠেই নিবৃত্ত করল তাকে, 'এখন নয় মা, আরও কিছুদিন যাক, দুর্বল শরীর মাথাও দুর্বল—এখন কি কোন কথা ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারে? সেটা ভাবতে দেওয়াও ঠিক নয়। আর একটু সারুক শরীরটা।'

শ্যামা তা বুঝলেন, চুপ ক'রে গেলেন খানিকটা।

আরও চার-পাঁচ দিন পরে কথা কইল সে। জল চেয়ে খেল, খাবার চাইল।

কিন্তু সেই সময়ই তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করলেন শ্যামা যে সে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে ঠোঁট-নাড়া দেখে তবু বোধ হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে, জবাবও দিচ্ছে কিছু কিছু—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিছু বললে বা পিছনের দিক থেকে কোন প্রশ্ন করলে একটা উত্তরও পাওয়া যাচ্ছে না। রীতিমতো চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পাচ্ছে।

পরের দিনই ফকির ডাক্তারকে খবর দিয়ে পাঠালেন শ্যামা। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'ভয় নেই—ও কুইনাইনের এফেক্ট, সারতে দেরি লাগবে। ওর প্রাণটা যখন ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তখন কানটাও ফেরাতে পারব। তা ছাড়া একটু জোর পেলে না হয় কলকাতার কলেজে নিয়ে যাবেন, সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, ভাল চিকিৎসা হ'লে সেরে যাবে। শরীরে রক্ত নেই, একটু দুধ পেটে পড়েনি, শুধু খানিকটা ক'রে র কুইনাইন খেয়েছে তার আর কী হবে বলুন। ...না, ও ভাল হয়ে যাবে তবে সময় লাগবে ঢের—তা বলে দিচ্ছি। রোগটি খুব সহজ হয়নি ওর, এটা মনে রাখবেন। পিলে-লিবার এখনও জেঁকে বসে আছেন। জ্বরও এখন তো তিনচার দিন অন্তর অন্তর আসছে, ওটা কমে গেলেও দেখবেন একাদশী আমাবস্যে পূর্ণিমেতে গা-গরম হবে এখন দু-চার বছর। তবে বেল-পাতার রস শিউলিপাতার রস এইসব টোট্‌কা খাওয়াবেন—খরচ নেই, অথচ উপকার হবে।'

কিন্তু ফকির ডাক্তার যতই আশা ও আশ্বাস দিয়ে যান—জ্বর আসবার দিন-গুলোর মধ্যেকার সময়টা দীর্ঘতর হয়ে এলেও—কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং আরও যেন বেশী কালা হয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সেটা শ্যামার অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও কনকের চোখ এড়ায়নি। সে চুপি চুপি হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেদিকে। বললে, 'তুমি আর দেরি ক'রো না—বড় কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ফকিরবাবু যা জানেন তা করেছেন, এর বেশী আর ওঁর কাছে আশা করাও অন্যায়!'

হেমও লক্ষ্য করল কথাটা। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা তাদের নয়। নিয়ে গেল সে মৌড়ীর হাসপাতালেই। তাঁরা দেখে বললেন, 'কানের পর্দা তো ঠিক আছে, কালা হবার তো কথা নয়। সম্ভবত দুর্বলতার জন্যেই হয়েছে, একটু ভাল ক'রে খাওয়ান দুধটুধ—তাহ'লেই ভাল হয়ে যাবে। তাড়াহুড়োর কাজ নয়—অত ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলছেন—তাহ'লে সারতে সময় লাগবে বৈকি!'

ভাল ক'রে কীই বা খাওয়াতে পারে ওরা। খুব অসুখের সময় তবু পাঁচজনে ফলটল দিত—এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ভেবে হেম একপো ক'রে দুধের রোজানি ক'রে দিলে। তাও মায়ের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া ক'রেই। শ্যামা রুক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেন, কিসের জন্যে—ও ছেলে কী আমার সঙ্গে বাতি দেবে তাই শুনি। ওর ইহকাল-পরকাল সব গেছে। আমার সব্বনাশ ক'রে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়িয়ে পঙ্গু হয়ে এসে বসলেন চিরকালের মতো—একটা বিধবা মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরছি আবার একটা হয়তো পুষতে হবে। তার আবার অত কেন—একগাদা পয়সা খরচ ক'রে দুধ খাওয়ানো!'

হেম বললে, 'তোমার যেমন কথা। বেটাছেলে বিধবা মেয়ের মতো বসেই বা খাবে কেন। লেখাপড়া যদি আর নাই করে, তা' ব'লে রোজগার করে খেতে পারবে না? কানটা যদি যায় বরং সেই একটা ভাবনার কথা। ওটা আবার ফিরে পায় সেটা আগে দেখা দরকার নয়?'

তাতেও হননি অবশ্য। শেষ অবধি বলতে হয়েছে হেমকে যে দুধের টাকা সে আলাদা দেবে, মায়ের খরচ ছাড়া। হেম যে মাইনের সব টাকা মাকে দেয় না—এ শ্যামা জানেন। হেমও গোপন করে না। মাসে কুড়ি টাকা করে দেয় সে—এ ছাড়া সে কত রাখে, ঠিক কত তার এখন আর তা শ্যামা জানেন না। এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ যে করতে যাননি শ্যামা তা নয় কিন্তু সুবিধা হয়নি, হেম স্পষ্টই জবাব দিয়েছে, 'এই থেকেই তো বাঁচিয়ে তুমি টাকা জমাচ্ছ, তেজারতি খাটাচ্ছ। আর দরকার কী? সবই বা ধরে দেব কেন? আমারও তো আপদ বিপদ আছে।'

আর কিছু বলতে পারেননি শ্যামা। আজও কিছু বলতে পারলেন না। হয়ত বলারও কিছু নেই। হয়ত এটাই চেয়েছিলেন। টাকাটা ওপক্ষ থেকে বার করার জন্যই এত কঠিন হয়েছিলেন তিনি।

ছেলে একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই—অর্থাৎ উঠে বসবার মতো হতেই শ্যামা তাঁর নিরুদ্ধ প্রশ্নের স্রোতকে ছেড়ে দেন।

'কেন এমন হল? কী করেছিলি যে ওরা এতবড় শাস্তিটা দিলে? তুই এখানে চলে এলি না কেন? এমন হয়েছিল তখনই বা চলে এলি না কিসের জন্যে? কি এত লজ্জা তোর? খুন-জখম করেছিলি না রাহাজানি করেছিলি? কী জন্যে তুই আমার এত বড় সর্বনাশটা করলি! এখন যদি কানটা তোর না সারে? যদি জন্মের মতো কালা হয়ে যাস? লেখাপড়া তো গেলই—এরপর যে ভিক্ষে করে খেতে হবে তা হলে! এমন করে শরীরটা পাত করলি কি কারণে? এমন দুর্বুদ্ধি কেন হল তোর আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলো যেন চেঁচিয়েই করেন শ্যামা। কান্তির দুর্ভাগ্য করেই। শুনতে যে পেয়েছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কারণ প্রতিক্রিয়া জাগে সঙ্গে সঙ্গেই। কথা উঠলেই সেই যে মাথা হেঁট করে—সে মাথা আর তোলে না কিছুতেই। কিন্তু উত্তরও দেয় না। একটি কথাও বলে না। দিনের পর দিন ধরে প্রশ্ন যেমনি নিরুত্তরই থেকে যায় সেই প্রথম দিনটির মতো। ক্রমশ দুঃসহ হয়ে ওঠে শ্যামার মেজাজ—ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কণ্ঠের স্বর ও প্রশ্নের ভঙ্গী দুই-ই কঠোরতর হয়ে ওঠে। নির্মমভাবে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন তিনি—আর এই শিল্পটা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবু কান্তির কণ্ঠ থেকে একটি শব্দমাত্র উচ্চারিত হয় না। সমস্ত প্রশ্নবাণই নিশ্ছিদ্র নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এক এক সময় প্রায় ক্ষেপে ওঠেন শ্যামা, গায়ে হাত তুলতেও যান—কনক কাছে থাকলে হাত ধরে প্রতিনিবৃত্ত করে। কিন্তু কান্তি চুপ করেই থাকে। শুধু দুই চোখ দিয়ে এই অবরুদ্ধগুলোয় নিঃশব্দে যে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে অবিরল ধারায় তাইতে বোঝা যায় যে শ্যামার কথাগুলো যথাস্থানে গিয়েই পৌঁচেছে—কথাগুলোর প্রয়োগ কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় নি। বাইরের নীরবতার চর্মভেদ করে সে বাক্যবাণ মর্মে গিয়ে ঠিক বিঁধেছে।

অবশেষে এক সময় হার মানেন শ্যামা।

হাহাকার করে ওঠেন নিজে নিজেই। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন বারবার। গাল পাড়েন তাঁর চিরন্তন ভাগ্যকে আর নবতম দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ্য তাঁর এই ছেলেকে। সে সময় সমস্ত রকম শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যায় তাঁর মুখের ভাষা। কুৎসিত ইতর গালিগালাজ বেরোয় মুখ দিয়ে। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে থাকার ফলে যা শুনে এসেছেন, এতকাল কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেননি এমন সব ভাষা। সে সময় কনকের সামনে থেকে পালিয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। হেম প্রায়ই সে সব সময়গুলোয় থাকে না—তার উপস্থিতিকালে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য ধরেই থাকেন শ্যামা—থাকলে সে ধমক দেয়, নয়তো অর্ধবিহ্বল ভাইকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দেয় সেখান থেকে।

গালাগাল দেন তিনি মহাশ্বেতাকেও।

সেখানকার এ খেয়ালও থাকে না যে তার আসল পরিচয় এতকাল সযত্নে পুত্রবধূদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। মনে থাকে না যে এ গালাগাল তাঁদের গায়ে এসেই পড়ছে। সে স্ত্রীলোকটার যে পরিচয় আজ তিনি উদ্‌ঘাটিত করছেন সে পরিচয় জানার পর সেখানে কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠানো বাপ-মা-অভিভাবকদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করার কোন অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই। [illegible] হলেই গালাগাল দেন তিনি তাঁর ছেলের সর্বনাশকারিণী সেই নারীকে। দেখতে শুনতে যদি নাই পারবে, যদি নজর রাখা সম্ভবই না হবে—তবে কেন সে এমন করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তাঁর ছেলেকে। আর যখন বুঝল যে ওখানে রাখা আর উচিত নয়—কেন সে জোর করে পাঠিয়ে দেয়নি তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছে! কেন? কেন? কী এমন শত্রুতা করতে গেছলেন তিনি তার? কী তার পাকা ধানে মই দিতে গেছলেন—কিম্বা বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলেন!

অভিসম্পাৎ করেন তাকে— সর্বনাশ হোক। সর্বনাশ হোক। যে পয়সার অহঙ্কারে এমন ধরাকে সরা দেখা সে পয়সা যেন একটিও না থাকে—মালা হাতে ক'রে যেন পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়। সর্ব অঙ্গ থাকতে যেন চোখটি যায় আগে। হাতে যেন মহাব্যাধি হয়, ইত্যাদি—

তবুও কোন কথা বলে না কান্তি। শুধু নীরবে অশ্রুপাত করে বসে বসে।

উত্তর দিতে পারে না কান্তি তার কারণ উত্তর দেবার মতো কিছু নেই ওর। কিছুই বলবার নেই। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। অন্ততঃ ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এইটুকু লজ্জা ও ঘৃণা তার এখনও অবশিষ্ট আছে।

যা ঘটেছিল তা বলবার আগে ওর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনিই হয়ত করা উচিত ছিল, অনেক আগেই, এই কৈফিয়ৎ দেবার মুহূর্ত উপস্থিত হবার আগেই উচিত ছিল এ-পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া, কিন্তু পারেনি সে। আসলে বড় দুর্বল সে ভেতরে ভেতরে। দুর্বল বলেই পারেনি জীবন আত্মহত্যা করতে। দুর্বল বলেই আশা ওর জীবন নিয়ে এই সর্বনাশের খেলা খেলতে পারল!...

তিনিই জানেন না। সেই সর্বনাশিনীই ওর এই দুর্গতির প্রধান

কারণ—কিন্তু ওর নিজের দিক থেকেও দায়িত্ব কাটিয়ে ফেলবার উপায় নেই যে। তার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অপরাধ এক-দিকের পাল্লায় তুললেও ওর নিজের অপরাধের বোঝা কিছুমাত্র হালকা হয় না—ওর দিকের পাল্লাও তেমনি ভারী হয়ে ঝুঁকে থাকে। ওর অন্যায়ও তো কম নয়। বরং আরও বেশী, আরও অমার্জনীয়। ওর অন্তরের দিকে তাকালে যতদূর দৃষ্টি যায়—সেখানেও তো কলুষ কম জমা হয়ে নেই। দেবার মতো কৈফিয়ৎ বরং তার কিছু আছে—কারণ সে যা তাই, তার বেশী নিচে তো নামেনি। কোন কৈফিয়ৎ নেই ওরই এই জঘন্য আচরণের, কোন জবাব নেই। ওর নিজের মনেই যে সীমাহীন গ্লানি আর লজ্জার ইতিহাস লিখিত রয়েছে, যে অপরাধ-বোধ রয়েছে পুঞ্জীভূত—তারপর আর কাউকে দোষ দিতে যাওয়া, অপরাধের দায়িত্বটা আর কারুর ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া আরও একটা বিশুদ্ধতর অন্যায় আর একটা অক্ষমণীয় অপরাধ হয়ে উঠবে।

না, দোষ ও দেবে না রতনদিকে। যদিও সে-ই হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেছে এই সর্বনাশের দিকে, অধঃপতনের দিকে। কিন্তু ও তো বাধা দেয়নি কিছু, প্রতিবাদ করেনি। নিজের জন্ম, নিজের অবস্থা—আত্মীয়স্বজন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই তো ভুলে বসেছিল সেদিন। ওরই তো বাধা দেওয়া উচিত ছিল। এমন অস্বাভাবিক, এমন অন্যায় পথে পা দেবার আগে। এটুকু জ্ঞান যে সেদিন তার না ছিল তাও তো নয়—এক-বারে সরল শিশু ছিল না সেদিন ও। এটা ঠিক যে এই গত কয়মাস একরকম বনবাসে একা পড়ে থাকতে থাকতে—রোগশয্যায় একা শুয়ে ছটফট করতে করতে যতটা গুছিয়ে ভাবতে শিখেছে সে, যতটা বয়স তার দেহের তুলনায় বেড়ে গেছে—ততটা জ্ঞান অভিজ্ঞতা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না সেদিন, তবু মোটামুটি ন্যায় অন্যায় বোধ তার ছিল বৈকি। কাজটা যে ভাল নয়, তাও সেদিন সে জানত। তাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে—সেইজন্যই তাকে এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে—এসবও জানত। তার মা বাবা ভাইবোনেরা তার মুখ চেয়ে আছেন, সেটাও সেদিন অজানা ছিল না।

তবে?

বাধা সেদিন দেয়নি তার কারণ সেই অপার্থিবতা, অপ্রাকৃতের সর্ব-নাশের পথে নামতে তার তরফ থেকেও বুদ্ধি উৎসাহের অভাব ছিল না।

মনে আছে তার—কিছুই ভোলেনি। প্রতিটি দিনের ইতিহাস তার মনে আছে। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিপলের। মনে গাঁথা আছে প্রতিটি ঘটনা। চরম সর্বনাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইতিহাস।

এ ইতিহাস শুরু হয়েছে অনেকদিন—দুতিন বছর আগেই।

সেই দাদার বিয়ের সময় থেকে। কিম্বা বলা যায় তারও আগে থেকে।

তবে ঐ সময়টায়ই প্রথম ও রতনদির আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে-ছিল। অদ্ভুত লেগেছিল ওর ব্যাপারটা; অকারণে লজ্জাও হয়েছিল একটু। এখানে যেদিন আসবে—দাদার বৌভাতের দিন—হঠাৎ নিজে হাতে ওকে সাজাতে বসলেন রতনদি। এরকম কখনও করেন নি। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে তার আগেই অবশ্য কিন্তু তখন অতটা বুঝতে পারেনি। কিছুদিন ধরেই পাগলের মতো ওর জন্যে জামার ওপর জামা করাতে দিচ্ছিলেন, ধুতির ওপর ধুতি কিনছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনেই। আদ্দি আর রোঁয়া রেশমের পাঞ্জাবি—দেশী ফরাসডাঙার দামী মিহি ধুতি। সেই সঙ্গে মুসলমান দর্জি ডেকে চুড়িদার পাজামা-আচকান।

অবাক হয়ে যেত কান্তি, কিছুই বুঝতে পারত না রতনদির মতিগতি। প্রতিবাদ করতে যেত প্রথম প্রথম, ব্যাকুল-ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত, 'এ কী করছেন রতনদি, মিছিমিছি এত খরচ করছেন নতুন তো—শুধু শুধু। আমার তো এক গাদা জামা কাপড় রয়েছে। এমনই তো কত খরচ করাচ্ছি আপনার, তার ওপর অকারণে এ সব করছেন কেন?'
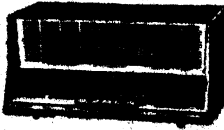
রতনদি কিন্তু উড়িয়ে দিতেন কথাটা। কখনও ধমক দিতেন, 'আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে, যাও, তোমাকে আর অত পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।' কখনও-বা ওর কাঁধে হাত রেখে ওর মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলতেন, 'কী হবে আমার এত পয়সা রে? কার জন্যে রেখে যাব? তোকে সাজিয়ে যদি আমার সুখ হয়, করলুমই নয় দুটো পয়সা খরচ, তোর কি?' আবার এক একদিন বলতেন, 'সুন্দর চেহারাতেই তো সুন্দর পোশাকের দাম। এই তো তার সার্থকতা। আমাদের আর কি—দেখেই তৃপ্তি।'

ও'র মনের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারত না কান্তি, আরও কুণ্ঠিত, আরও অপ্রতিভ হয়ে পড়ত।

সে যে এত সুন্দর দেখতে তাও তো আগে সে জানত না। রতনদির মুখে বারবার শুনেই জেনেছে সেটা। ইদানীং আয়নার নিজেকে দেখে ভাববার চেষ্টা করত সত্যিই সে সুন্দর কিনা। আবার ভাবত রতনদিটা পাগল। সুন্দর সুন্দর করে এত মাথা ঘামাবার কী আছে। রতনদিও তো কী সুন্দর দেখতে। নিজেকে সাজালেই তো পারেন, আর সাজানও তো—তবে আর কি।

আগে কুণ্ঠিত হ'ত সে শুধু খরচের কথাটা ভেবেই। কিন্তু ঐদিন—দাদার বৌভাতের দিন থেকে লজ্জার ও সঙ্কোচের আরও একটা কারণ দেখা দিল। কেন লজ্জা তা বলা মুস্কিল ছিল সেদিন—আর সেই জন্যেই কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। প্রথমত বিয়ের দিন তো যেতেই দিলেন না রতনদি, পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে—দাদার বিয়েতে একদিন বরযাত্রী গেলে এমন কি ক্ষতি হ'তে পারে তা তার মাথাতে যায়নি সেদিন, মনে মনে একটু ক্ষুন্নই হয়েছিল। বৌভাতের দিন সকালেই যাবার কথা, কী খেয়াল গেল রতনদির, তাঁর সেই অত শখের দেড় ঘণ্টা ধরে চান তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে এলেন ওকে সাজাতে। নিজে হাতে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে ওর চিবুকটি ধরে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'সত্যি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে কান্তি, যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর!'

আর তারপরই দুহাতে ওর মুখটি ধরে কাছে এনে একটি চুমো খেয়ে বলেছিলেন, 'যাও, সাবধানে যেও। সকাল করে চলে এসো। দারোয়ান যাচ্ছে সঙ্গে, আমার হয়ে ও-ই লৌকতা করবে।'

লজ্জার পরিসীমা ছিল না সেদিন, কিন্তু তবু সে নিতান্তই নির্দোষ গ্লানিহীন লজ্জা। অনেকটা সুখের ও আত্মপ্রসাদেরও বটে। রতনদির মাথাটা খারাপ এই কথাই বারবার বোঝাতে চেয়েছিল সে নিজেকে। সেই সঙ্গে একথাটাও মনে উঁকি মেরেছিল যে সে সুন্দর দেখতে—আর রতনদি সত্যি-সত্যিই ছোট ভায়ের মতো দেখেন ওকে।

তবু—মনের মধ্যে অস্বস্তিও একটা কোথায় ছিল।

কেমন একটু ভয়-ভয়ও করেছিল যেন সেদিন। নাম-না-জানা ভয়। মনে হয়েছিল এতটা ভাল নয়, এতটা সইবে না। হয়ত সকলের চোখ টাটাবে, রতনদির বাবাও বিরক্ত হবেন হয়ত—ওর জন্য এত খরচ করছে জানতে পারলে।

কিন্তু রতনদির যেন সব ডরডর হঠাৎ ঘুচে গেল। সমস্ত হিসেবের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, এর পর থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। প্রত্যহই ওকে নিজে হাতে সাজাতে বেতেন—ভাল ভাল দামী দামী পোশাক। নিতান্ত অনিচ্ছা খুব বিদ্রোহ করত বলে—ইস্কুলের সময়টা পাগলামি একটু বন্ধ রাখতেন। রতনদিদের পুরনো ঝি মোক্ষদাও ওর পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাই আরও সংযত হয়েছিলেন খানিকটা। মোক্ষদা বলেছিল, 'সত্যিই তো বাপু, তুমি যেন পাগল হয়েছ তাই বলে ও তো আর হয়নি যে অমনি কার্তিক সেজে ইস্কুল পাঠশালে যাবে। অপর ছেলেরা ক্ষেপিয়ে শেষ করবে যে জামাইবাবু বলে!'

কিন্তু ইস্কুল থেকে এলে আর রক্ষে নেই। ইস্কুলের জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়েই ভাল ভাল জামা কাপড় পরতে হবে, সেজেগুজে রতনদির কাছে বসতে হবে খানিকটা। এ সময়টা তাঁরও প্রসাধনের সময়, কান্তিকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখে নিজে সাজতেন—তারপর কোনদিন বলতেন, 'চল ছাদে বেড়াতে যাই।' ছাদে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে কিংবা কাঁধে হাত দিয়ে পায়চারি করতেন। কোনদিন বা শুধুই মুখোমুখি বসে গল্প করতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে যাওয়া বা খেলাধুলোর পাট ছিল না কান্তির—পাড়াটা খারাপ বলে বিকেলের দিকে বেরোতে নিষেধ করতেন এঁরা, তাছাড়া তার নিজেরও ভাল লাগত না। ইস্কুলের ছেলেরা আগে আগে তার ঐ পাড়ায় থাকা নিয়ে নানারকম বাঁকা মন্তব্য করত, ওর সম্বন্ধে একটা হীন ধারণাও করে নিয়েছিল, সেটার পুরো কারণটা না বুঝলেও ঐ পাড়ার বাস করা যে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে শোভন নয় এটা বুঝেছিল। তাই যেটুকু না বেরোলে নয় সেইটুকুই শুধু বেরোত। আর পড়বার সময় তো নয়ই মাস্টার মশাইরাও বলতেন, 'All work and no play makes Jack a dull boy'—রতনদিও বলতেন, 'ইস্কুল থেকে এসেই আবার বই নিয়ে বসতে নেই, ওতে পড়াশুনো এগোয় না। মাথাকে বিশ্রাম দিতে হয় একটু।'

কিন্তু সন্ধ্যে হ'লে যখন পড়াশুনোয়

......যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর......

সময় হ'ত তখনও রতনদি ওকে ছাড়তে চাইতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তেতালায় ওর পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'তুমি পড়, আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব না, শুধু চুপ ক'রে বসে থাকব!'

ওর ওপরের ঘরেরও ভোল পাল্টে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সে মেঝেতে পাতা তোষকের বিছানা আর নেই (যদিচ সেই শয্যাতে শুয়েই কান্তির প্রথম মনে হয়েছিল সুখস্বর্গ!), সে জায়গায় এক-জনের মতো বোম্বাই খাট এসেছে, গদি তোশক ঝালর-দেওয়া বালিশে সাজানো হয়েছে বিছানা। পড়বার জন্যে একটা ছোট টেবিল চেয়ারও আনিয়ে দিয়েছেন রতনদি।

কান্তি গিয়ে চেয়ার টেবিলে বই-খাতা নিয়ে বসলে রতনদি ওর পাশে বিছানার ওপর বসতেন। রতনদির বর নটার আগে আসেন না কোনদিনই। আগে আগে এ সময়টা রতনদি বই পড়তেন শুয়ে শুয়ে—এখন আর বই ছোঁন না। ওর বর রাশী-কৃত বাংলা বই কিনে পাঠিয়ে দেন, সে সব গাদামারা পড়ে থাকে। এখন ও'র এই নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে—হাঁ করে কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা।

চুপ ক'রে বসে থাকব বললেই কিছু আর চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। রতনদিও বসতে পারতেন না। দু'চার মিনিট পরেই উশখুশ ক'রে উঠতেন, এ কথা সেকথা পাড়তেন। কান্তিরও অস্বস্তি লাগত, একটা মানুষ দুহাতের মধ্যে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে—এ অবস্থায় বই-খাতায় ডুবে থাকে কী ক'রে? ওর মাস্টার আসতেন সকালে, এক এক সময় কান্তির মনে হ'ত, মাস্টারমশাই যদি পড়াবার সময়টা বদলে দেন তো ভাল হয়। কিন্তু পাড়া খারাপ বলেই বোধ হয়—সন্ধ্যার দিকে তিনি আসতে চাইতেন না।

প্রথম প্রথম পড়ার ব্যাঘাত হ'ত বলে এ ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগত না কান্তির—নটা বাজলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কারণ নটা বাজলেই ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক রতনদিকে নেমে যেতে হ'ত নিচে। জামাইবাবুর আসবার সময় হ'ত। কিছুদিন পর থেকে আর তত খারাপ লাগত না। তারপর এক সময় কান্তি আবিষ্কার করলে যে তারও ভালই লাগে এই গল্প করাটা; ক্রমশ এমনও হ'ল যে, রতনদি নিচে চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন বসাতে পারত না পড়ায়। কেবলই মনের মধ্যে ঘুরেফিরে কিছুক্ষণ আগেকার কথাগুলোরই রোমন্থন চলতে থাকত। মনে হ'ত বেশ মানুষ রতনদি। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যার ভাল হয় তার সব ভাল হয়। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি স্বভাবটাও সুন্দর। সত্যি দেখতেও কেমন চমৎকার, যখন সেজেগুজে বসেন তখন যেন মনে হয় পটে-আঁকা কোন ঠাকুর-দেবতার ছবি।...তারপর সময়ের হিসাবটাও যেতে লাগল গুলিয়ে, কোথা দিয়ে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে নটার ঘরে আসত তা দুজনের কেউই টের পেত না। অসহিষ্ণু মোক্ষদা গলির মোড়ে 'দাদাবাবু'র গাড়ির আওয়াজ পেয়ে যখন ওপরে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠত—তখন খেয়াল হ'ত ওদের। 'কী গো তোমাদের আর কথার ঝুলি শেষ হবে না—না কি? ওদিকে মানুষটা এসে দেখতে না পেলে যে রগ্নিরস্ত পাতালরস্ত করবে তার ঠিক আছে? গাড়ি এসে ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করতেছে তাও কি কানে শুনতে পাও না? একেবারে উন্মত্ত হয়ে বসে গল্প করা যে দেখতে পাই—জ্ঞানগম্যি থাকে না একটু? এখুনি তো ওপরে উঠে আসবে—ত্যাখন আমি কি জবাব দেব মানুষটাকে!' চমকে উঠত রতনদি, 'ওমা নটা বেজে গেছে নাকি রে? কখন বাজল? টের পাইনি তো?

'তা টের পাবে কেন? নটা কি আজ বেজেছে—কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে দ্যাখো গে যাও! বলি তোমার না হয় পয়সার অভাব নেই, ঐ গরীবের ছেলেটার মাথা খাচ্ছ কেন বলদিকি অমন কড়মড়িয়ে চিবিয়ে? নেকাপড়া তো ওর শিকেয় উঠল দেখতে পাই। একটা পাসও কি করতে দেবে না?'

'তুই থাম মুকী। তোর বড্ড আসপদ্দা বেড়েছে।' এই বলে কান্তিরই ছোট আয়নাটার মুখখানা দেখে নিয়ে আলতো হাতে চুলটা একটু ঠিক করে দ্রুত নেমে যেতেন রতনদি।

মোক্ষদার এই তিরস্কারের দিন-গুলোতে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ত কান্তি, অনুতপ্ত হ'ত একটু। জোর করে পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করত। কিন্তু মন আবার কখন বইখাতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন শুরু করত তা নিজেই টের পেত না। সত্যি, কোথা দিয়ে নটা বেজে গেল—আশ্চর্য তো! এই তো মনে হচ্ছে একটু আগেই ছাদ থেকে ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা!...না, কাল থেকে একটু হুঁস রাখতে হবে। রতনদিকে শাসনও করতে হবে একটু। রোজ রোজ মজার গল্প ফেঁদে ওর পড়া নষ্ট করা! আর কী বাজে কথাই বলতে পারে রতনদি, এত কথা পায় কোথা থেকে। তবে ঐ যে বইয়ের গল্পগুলো বলে—ওগুলো কিন্তু বেশ। বঙ্কিমবাবুর বইগুলো এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে পড়বে সে। রতনদির কিন্তু মনেও থাকে খুব—এক একসময় তো মুখস্থ বলে যায়। লেখাপড়া করলে ভাল হ'ত।

এমনি ক'রে কখন আবার ডুবে যায় সে রতনদিরই চিন্তায় তা বুঝতেও পারে না। টেবিলের ওপর আলোটা জ্বলতে থাকে, বইখাতা মেলাও থাকে সামনে—ওর মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ পূর্বে বসে থাকা রতনদির শূন্য জায়গাটায় স্থির নিবদ্ধ ক'রে বসে কত কী ভাবতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

আপনার প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন পাঠক, পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি, আশা করি প্রশ্নগুলির জবাব পাঠকবৃন্দ মধ্যে থেকেই 'অমৃত' মারফৎ জানতে পারবো।

(ক) হালিসহর, নৈহাটি, টিটাগড় ও দমদম—এই বিশেষ স্থানগুলি কোন্ দেশীয় শব্দ হ'তে প্রাপ্ত?

(খ) 'রেডক্রশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? —এবং কবে ইহা চালু হয়?

(গ) 'নূতন কাশী'—সে কি নবদ্বীপ না দক্ষিণেশ্বর?

ভবদীয়
কুমুদবিহারী আচার্য
৩৮২বি আনন্দমঠ
ইছাপুর, নবাবগঞ্জ
২৪ পরগণা।

(উত্তর)

অমৃত সম্পাদক,

আপনার বিখ্যাত 'অমৃত' পত্রিকায় ১৯শে অকটোবরের সদ্য-প্রকাশিত সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসত্যজিৎ চক্রবর্তী লিখিত 'দুই' (খ)-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতা 'পুরস্কার' 'সোনার তরী' বইতে প্রকাশিত। কবি উহা রচনা করেছিলেন শাহাজাদপুরে ১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণে।

—অরুণ বসু, বারাসত, ২৪ পরগণা।

অমৃত সম্পাদক,

আপনার ২৮-৯-৬২ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রশ্ন ছিল 'O K' কথার অর্থ কি? গত যুদ্ধের সময় বহু আমেরিকান সৈন্য এদেশে আসিয়াছিল এবং সেই হইতেই এই 'O K' কথাটি এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। আমি আমার একজন আমেরিকান বন্ধুকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে যাহা বলিলেন তাহাই নিম্নে লিখিতেছি :—

জনৈক জার্মাণ আমেরিকা যাইয়া ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। তিনি রোজ সকালে অফিসে আসিয়া প্রথমেই হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেন। হিসাব ঠিক থাকিলে খাতার নিচে লিখিতেন 'Orr Koret' (অথাৎ all correct)। ইহার পরে তিনি সম্পূর্ণ কথাটি না লিখিয়া সংক্ষেপে 'O K' লিখিতেন—অর্থাৎ all correct। ইহার কাছাকাছি বাংলায় বলা যাইতে পারে 'ঠিক আছে' অথবা হিন্দীতে 'ঠিক হ্যায়।'

—অবনীনাথ মিত্র, কলিকাতা—৯।

সম্পাদক অমৃত,

বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখে 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন :—

(খ) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী Empire State Building, New york। উচ্চতা ১৪৪৯ ফুট। আর ভারত তথা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী হইল কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন মহাকরণ (New Secretariat)—১৩ তলা বাড়ী।

(গ) এই প্রশ্নেরও কোন সর্বজন-স্বীকৃত বা বহুজন-স্বীকৃত উত্তর নাই

।। ভ্রম সংশোধন ।।

মহাশয়,

বিগত ২রা নভেম্বর তারিখের 'অমৃত'-র জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত আমার দুইটি উত্তরেই ছাপার একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে উত্তরগুলি অংশত অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। ভুলগুলি এইভাবে সংশোধিত হইবে:—

৩২ পৃঃ মধ্য কলমের যে লাইনে সংবন্ধ, সংবন্ধী, সংবন্ধ ও সংবল শব্দগুলি লম্বালম্বি সাজান আছে তাহার ঠিক উপরে একটি * (তারকা-চিহ্ন) বসিবে। ইহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরবর্তী লাইনের ঠিক বামদিকে আর একটি * (তারকাচিহ্ন) বসিবে যেখানে "এই লাইনের বানানগুলি ব্যাকরণগত শুদ্ধ হইলেও" ইত্যাদি কথাগুলি আছে।

ঐ ৩২ পৃঃ প্রথম কলম—৩নং প্রশ্নের উত্তর—১৮শ লাইনের শেষভাগে "তবে" কথাটি হইবে না, আর ২৬শ লাইনে "আরোপিত" কথাটির ঠিক পরেই "রূপ" কথাটি বসিবে।

নিবেদক
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী।

বা হইতে পারে না। যে যে লোক প্রশ্নকর্তার উল্লিখিত সব কয়টি পৃথিবীখ্যাত শহরই দেখিয়াছেন, তাহারা কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ীই স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন মাত্র। সৌন্দর্যের কোন একটি বিশেষ মাপকাঠি নাই। কেহ কেহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী জোর দেন, কেহ কেহ বাড়ী-ঘরের সামঞ্জস্যর উপর, কেহ কেহ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর, আবার বিরাটত্বের দিকে রহিয়াছে নজর, তাঁহাদের কেবল বড় বড় দালান-কোঠা এবং নগরের বিস্তৃতি বা আয়তনের দিকেই লক্ষ্য একটু বেশী থাকা স্বাভাবিক। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে সৌন্দর্যের দিক হইতে প্যারিস আজও সবচেয়ে সেরা শহর বলিয়া খ্যাত। তারপরেই সম্ভবতঃ নাম-করা যায় টোকিও, নিউ-ইয়র্ক, মস্কো, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, পিকিং, নিউদিল্লী, বোম্বাই, মেলবোর্ণ ইত্যাদি নগরের। বার্লিন ও কলিকাতার নাম সর্বশেষে আসিতে বাধ্য। বার্লিন দ্বিধাবিভক্ত, এবং যুদ্ধোত্তরকালীন মেরামতি এবং পুনর্গঠন সত্ত্বেও বহুস্থলে বিধ্বস্ত। আর সব কিছু বজায় থাকিতেও নোংরা রাস্তাঘাট এবং ততোধিক কুৎসিত দর্শন অসংখ্য বস্তির জন্য কলিকাতা সর্বনিম্ন স্থান পাইবার অধিকারী। —অমিয়কুমার চক্রবর্তী।
কলিকাতা—৯

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। এতে অনেক অজানা জিনিষ জানার সুযোগ পাওয়া যায়। তাই এই প্রশ্নটির অবতারণা করছি। প্রতি বছর পুজার প্রাক্কালে অসংখ্য পুজা সংখ্যায় কলকাতার বাজার পরিপূর্ণ হয়। এই সব পত্র-পত্রিকার উপর 'শারদীয় সংখ্যা' বলে লেখা থাকে। এবং কিছু সংখ্যক পুস্তকের উপর লেখা থাকে 'শারদীয়া' সংখ্যা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'শারদীয়' এবং 'শারদীয়ার' মধ্যে প্রভেদ কি? সাধারণতঃ শারদীয় কথাটির অর্থ আমরা জানি শরৎকালীন। স্ত্রী অর্থে অবশ্য শারদীয়া হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই শরৎ ঋতুটি পুরুষরূপী না স্ত্রী রূপিণী? যদি পুরুষরূপী হয় তা হলে প্রত্যেক পত্রিকার উপরেই শারদীয় হওয়া প্রয়োজন। আর যদি স্ত্রীরূপিণী হয় তা হলে প্রত্যেক পুস্তকেই 'শারদীয়া' হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি? ইতি—

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী,
৬৯, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

সেকালের আমোদ উৎসব

বেলা দে

প্রাচীনকালে নানাপ্রকারের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলাদেশ জর্জরিত ছিল। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণে বাংলা দেশে প্রায়ই নতুন নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হোত। এছাড়া একাধিকবার অন্তর্বিপ্লবের ঝড়ও এ দেশের উপর দিয়ে বহে গিয়েছিল। কিন্তু এইসব রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে দারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও বাঙ্গালী সুখে ও আনন্দে দিন কাটাবার চেষ্টা করেছে। সুজলা সুফলা এই বাংলা মায়ের করুণায় তাদের কোনদিনই অন্নাভাব ঘটেনি। বৎসর ভরে বাংলার প্রতি গৃহে শস্যাদি পরিপূর্ণ থাকত। তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠান করে বাঙ্গালী গৃহস্থের সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভবপর হোত। পূজাপার্বণাদি অবলম্বন করে সারা বছর ধরে নানারকম উৎসবের আয়োজন করা হোত।

ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবের মধ্যে শারদোৎসব, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনে হয় প্রত্যেক পূজায় একটি বিভিন্ন যুগের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। এগুলি যদিও বাংলাদেশে আজো বর্তমান।

কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় তখনকার দৈনন্দিন জীবনে নানারকম উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। যেমন—বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে যব-চতুর্থী উৎসব সম্পাদিত হোত। এই অনুষ্ঠানে একে অন্যের দেহে সুগন্ধি ছাতু নিক্ষেপ করতো। বর্ষার প্রারম্ভে বৃক্ষাদিতে নব-কিশলয় উদ্গত হলে নবপত্রিকা উৎসব সম্পন্ন হোত। এখন যেমন বন-মহোৎসব পালন করা হয়। শ্রাবণের শুক্লা চতুর্থীতে অশোক-চতুর্থী উৎসব করার নিয়ম ছিল। এই সময় গৃহ-দেবতাকে দোলায় বসিয়ে ঝুলানো হোত। বর্তমানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব হয়ে থাকে। ভাদ্রমাসে ইক্ষু বা আক্ পাকতে থাকলে ইক্ষুভঞ্জিকা উৎসব করার রীতি ছিল।

বাস্তবিক বাংলা দেশে যেমন উৎসবের ছড়াছড়ি তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত উৎসব! বিচিত্র আনন্দের কি অপূর্ব আয়োজন! বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মধ্যে যখন বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়, বাঙ্গালীও তখন ততোধিক বিচিত্র উৎসবের ডালি সাজিয়ে প্রকৃতিরাণীর কাছে নিজের সানন্দ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। সকল ঋতুতেই বাঙ্গালী তার হৃদয়ের আনন্দরাশি পুরোভাগে রেখে জীবনের মাধুর্য সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করে।

বাঙ্গালী বহুদিন থেকে দুর্গোৎসব করে আসছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দুর্গাপূজার সময় বরেন্দ্রীর অধিবাসীরা নানারকমের উৎসব করতো। এর মধ্যে শবরোৎসব সম্বন্ধে কালবিবেক গ্রন্থে কিছু উল্লেখ আছে। এই উৎসবটি বিজয়া দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হোত। যারা এই উৎসবে শবরের অভিনয় করতো তারা সমস্ত দেহে মাটি মেখে আর গাছপালা দিয়ে নিজেকে সাজাত। শবর একটি অসভ্য জাতিবিশেষ। [illegible] বাংলার বনে-জঙ্গলে বাস করতো। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে বৃক্ষপত্রে সজ্জিত শবরদের প্রতিকৃতি খোদিত পাওয়া যায়। আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী পূর্ণিমা উৎসব হোত। এর অপর নাম দ্যূত-পূর্ণিমা। বর্তমান সময়ে এই রাত্রিতে বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়। প্রাচীন বাংলার এই উৎসবে সমস্ত রাত্রি দ্যূতক্রীড়া ও দোলক্রীড়া করে কাটাতে হোত। দ্যূতক্রীড়া করলে শ্রীবৃদ্ধি হয় বলে সকলের বিশ্বাস।

এই সময়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিপিটক বা চিড়া খাওয়ার রীতি ছিল। যদিও বর্তমান বাংলায় উৎসবেও এই অনুষ্ঠানের কিছু কিছু দেখা যায়। কার্তিক মাসের অমাবস্যার তিথিতে যক্ষরাত্রি উৎসব হোত। এর অপর নাম সুখরাত্রি। বর্তমানে একে দীপাবলী উৎসব বলা হয়। বাংলাদেশে এই তিথিতে কালীপূজা হয়। দীপালী উৎসব বলা হয়। দীপালী উৎসব পূর্বের মত বর্তমানকালেও সমগ্র ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বসন্ত উৎসব হোত। এই উৎসবে নাচ-গানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোত। এই তিথিতে বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা হয়। এটি বিদ্যার্থীদের বিশেষ প্রিয়। এই সময় আর একটি উৎসব ছিল অভ্যুদ খাদিকা। এই উৎসবে মটরশুটি, ছোলা প্রভৃতি আগুনে পুড়িয়ে বন-ভোজনে খাওয়া হোত। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় কোন কোন জায়গায় এখনো এই উৎসব পালন করা হয়। বসন্ত সমাগমে শ্যামলী বৃক্ষাদি ফলে ফুলে ভরে উঠলে শ্যামলী উৎসবের অনুষ্ঠান হোত। বালক বা যুবকেরা শ্যামলী পুষ্পে সজ্জিত হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করত। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলক বা হোলি উৎসব করা হোত। এটি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোট ছোট কাগজের ঠুলির মধ্যে আবির ভরে মুখটা বন্ধ করে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে মারত। আমরা যাকে কুমকুম্ বলে দোলের সময়ে খেলে থাকি।

বসন্তকালে আর একটি উৎসব হোত, সহকার ভঞ্জিকা। এর আর একটি নাম আম্রভঞ্জিকা। উৎসবকারিরা আম্র-পল্লব কর্ণভূষণরূপে পরিধান করত এবং সবুজ ও অপক্ক আম্রফল গাছ থেকে তুলে এনে খাওয়া হোত। চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে অশোকোত্তংশিকা উৎসব হোত। এই উৎসবে যুবক-যুবতীরা অশোক ফুলের মুকুট তৈরী করে মাথায় পরতো। এছাড়া চৈত্র মাসে গাজন উৎসব বেশ জাঁকজমক সহকারেই পালন করা হোত।

সেকালে এই বারো মাসের তেরো পার্বণ ছাড়াও নিজেদের মধ্যে নানারকম খেলাধুলারও ব্যবস্থা ছিল। যেমন সতরঞ্চ, দাবা, দশপদ, অক্ষরিকা, প্রভৃতি খেলা। এছাড়া ছেলেমেয়েরা গৃহ-প্রাঙ্গণে ও মাঠে অনেক রকমের খেলা খেলত। এতে বেশ শারীরিক পরিশ্রমও হোত। ঘটিকা খেলা বর্তমানের দাণ্ডাগুলির অনুরূপ। আরো একটি খেলা ছিল লবণ বীথিকা খেলা। বর্তমানে একে নুনচুরি খেলা বলা হয়। অনিল তাড়িতিকা খেলার সময় বালিকারা দু'হাত প্রসারিত করে ক্রমাগত ঘুরতে থাকত। বর্তমানে এই খেলার সময় মেয়েদের বলতে শুনা যায়, 'আনি নানি জানি না 'পরের ছেলে মানি না।' মেয়েরা সব জলক্রীড়াও করতে ভালবাসত। বাংলা দেশে নৃত্যকলারও এক সময় বিশেষ চর্চা ছিল। দেবদাসীদের নৃত্যভঙ্গী দেখে কত রাজারা পর্যন্ত মুগ্ধ হোতেন।

প্রাচীন পুস্তকাদিতে বাঙ্গালীর যে চিত্র আমরা পাই তাতে মনে হয় যে, বাংলা দেশে মোটামুটিভাবে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা ছিল এবং সবাই আনন্দেই দিন কাটাত।

হামবুর্গে অতিক্ষুদ্রাতিক পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র

ছয় বৎসর ধরে নির্মাণকার্য শেষ হবার পর ১৯৬৩ সালের হেমন্তে হামবুর্গ বাহ্‌রেনফেল্ডে জার্মান ইলেকট্রোনিক সিন্‌ক্রোটোন যন্ত্রটির কাজ চালু হবে। নানা ধরণের গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা এই নতুন গবেষণা ব্যবস্থায় সুখ-সুবিধা পাবেন। এই "গতিবেগের সুবিধার" ফলে উচ্চ-শক্তি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে :—

উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রন তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে পরমাণু কেন্দ্রের গঠন লক্ষ্য করা যাবে। অনুপ্রাতিঅনুর আবর্তনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে এই বেগবর্ধক যন্ত্রটি অণুবীক্ষণের কাজ করে যেহেতু উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রনগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইলেকট্রোনিক অণুবীক্ষণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রায় একলক্ষ গুণ ছোট।

উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রন অথবা গামা-রশ্মির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিতে যা প্রায় অসাধারণ, সেই অস্থায়ী মৌলিক পদার্থগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, যাতে সেগুলির গুণাবলী ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই গবেষণার ফলে পারমাণবিক শক্তির নিজস্ব প্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই জনসাধারণ ও জটিল গবেষণা ব্যবস্থার নিয়মকানুন স্থিরীকৃত করার জন্য জার্মানীর প্রখ্যাত ৩৬ জন পদার্থবিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরিষদ গঠিত হবে। সমগ্র গবেষণা ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ হবে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রদত্ত একটি অর্থ ভাণ্ডার থেকে।

॥ পরমাণু শক্তিচালিত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ॥

পরমাণু শক্তিচালিত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের অন্তর্গত হ্যানফোর্ড শহরে প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হয়েছে। এই সম্পর্কে আইনগত প্রয়োজনীয় অনুমোদনপত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডি স্বাক্ষর দান করেছেন। পরমাণু শক্তিকে শান্তির অনুকূলেই এই কারখানায় ব্যবহার করা হবে। প্রায় এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পরমাণু শক্তির সাহায্যে এখানে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে কোনও কারখানা অপেক্ষা এই কারখানাটি চারগুণ বড় হবে।

॥ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষুদ্রতম যন্ত্র ॥

পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম সমেত একটি যন্ত্রকে বিমানের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশন জানিয়েছেন। এই ধরণের যন্ত্র মধ্যে পৃথিবীতে এটিই ক্ষুদ্রতম। যে পরমাণু চুল্লীটি এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওজন ১৫ টন। যে টার্বো জেনারেটর ইউনিট এই চুল্লীটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারও ওজন ১৫ টন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ৩০০ হতে ৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ভবিষ্যতে সামরিক হাসপাতাল, বিমান বাহিনীর রাডার স্টেশন, আপৎকালীন রেডক্রস স্টেশন এবং সুদূর মফঃস্বল এলাকার বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির কাজেও এই যন্ত্রকে ব্যবহার করা যাবে।

॥ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টীম টার্বাইন ॥

উক্রাইনের খার্কফ-এর বিশেষজ্ঞরা ৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির যে সিঙ্গল শিফট স্টীম টার্বাইনের ডিজাইন করেছেন, এই জাতীয় টার্বাইনের ক্ষেত্রে তা হবে পৃথিবীতে বৃহত্তম। এই টার্বাইনের দ্বারা উৎপন্ন বিজলির বার্ষিক পরিমাণ হবে সাড়ে তিনশত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা।

॥ অতিকায় টোমাটো ॥

উজবেকিস্তানের তাশখন্দ অঞ্চলের শাকসব্জির উৎপাদক যৌথ খামারগুলিতে অতিকায় টোমাটো উৎপন্ন হচ্ছে। এই টোমাটোগুলির এক একটির ওজন ১২০০ গ্রাম। হেক্তার পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ টন। এই নতুন জাতের টোমাটোর চমৎকার স্বাদ। উজবেক বিজ্ঞানী করিম ইউসুফের কয়েক বছরের নিরলস গবেষণার ফলে টোমাটোর ক্ষেত্রে এই নতুন জাতের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

॥ বিরাটকায় টায়ার ॥

ভরোনেঝ টায়ার ফ্যাক্টরিতে ২·৫৫ মিটার ব্যাসের টায়ার তৈরি হচ্ছে। ৪০ টন হতে ৬০ টন পর্যন্ত ওজনের মাল বহন করার শক্তিশালী ট্রাকগুলির জন্যই এই টায়ারের জন্ম। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে এই নতুন টায়ারের কল্যাণে ট্রাকের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং অনুরূপ বিদেশী টায়ারের অপেক্ষা তিনগুণ বেশী টেকসই হবে।

দশ দিন আগে সমস্ত জমিটা ছিল ফাঁকা। একদিন ঠিক হল বাড়ী উঠবে। রেডিমেড ফ্ল্যাটগুলো নিয়ে আসা হল। দৈত্যসদৃশ বিরাট ক্রেন দিয়ে সাজান হল তাদের। তৈরী হল বিরাটাকার এই বাড়ীটা। নভোয় চেরিওমোসকির ১০নং ব্লকটির মত আরও অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং হবে।

॥ একাধারে নিশ্চল ও সচল ক্যামেরা ॥

সোভিয়েত দেশের নতুন নিশ্চল-সচল ক্যামেরার নাম দেওয়া হয়েছে 'জানাস'। প্রাচীন রোমানদের দু-মুখো দেবতার নামে এই নামকরণ। এই ক্যামেরা একাধারে ২৪×৩০ মিলিমিটারের সাধারণ স্টিল ফিল্ম ক্যামেরা ও ৮ মিলিমিটার ফিল্মের উপযোগী একটি সিনে ক্যামেরার সমন্বয়। সিনে ক্যামেরার ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক মোটরটি চালিত হয় ড্রাই ব্যাটারির দ্বারা।

শেষ বন্দর

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী

অনেক অনেক দিন তোমার সাথে দেখা নেই, পত্রালাপ নেই। আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, যার উত্তর পাওয়া আমার কাছে জীবন পাওয়ার মতই মূল্যবান। যদি বলি বোঝা-পড়ার অভাবে এটা ঘটেছিল, বিশ্বাস করবে না। যদি বলি দুর্ঘটনা, বিশ্বাস করবে না। আর সত্যি কথা কি জানো, আমিই আজও সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না, পারি না!

আচমকাই ঝিম মেরে গিয়েছিল দত্তবাড়ী। ছটফট করে পালিয়ে গিয়েছিল সব হাসি গান হুল্লোড়।

তোড়া দেব সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে ঝাউতলার বড় টিলাটার কাছে কোনদিন এসে মুখ তুলে দাঁড়াল না।

নমিতা নাগ কাঁধের আঁচল কোমরে জড়িয়ে ব্যাডমিন্টন মাঠে র‍্যাকেট নিয়ে নাচতে এল না।

নিউ মার্কেটের আলো ঝলমল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চড়ুই পাখীর মত চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক চাইল না ভায়োলেট ভোকেশার।

তুমি শিল্পী। মানুষের সাদামাটা জীবনকে কল্পনার রঙে ডুবিয়ে অপরূপ

করে তোল: শতেক জন তাই পড়ে মুগ্ধ হয়। অভিভূত হয়। আমার কাহিনীতে বৈচিত্র্য নেই কিছু, প্রায় সবারই জীবনে এমন ঘটনা হর হামেশা ঘটে, ঘটে যায়। তোমাকে লিখলাম, কথার পর কথা গেঁথে তুমি মালাটি নিখুঁত করে তুলবে এ ধারণা আমার আছে।

কে সে তোড়া দেব, যার চোখে সূর্যের তৃষা!

কে সে নমিতা নাগ, অঙ্গে যার নাচন কাঁপন!

ভায়োলেট ডোফেরারই বা কে, যার সদা চঞ্চল চোখে অস্থির আবেদন।

কেউ নয়, ওরা সব এক। ওরা নারী, বিচিত্র রহস্যের সার্থক অধিকারিণী। তাই ঝাউতলার টিলায় অস্ত-আকাশের সূর্য মুখাই চোখ বুলিয়ে গেল সেদিন, ব্যাডমিন্টন মাঠে কুয়াশার ছায়া আগেই কেঁদে পড়ল, নিউ মার্কেটের আলো ব্যর্থ হাহাকারে ফুঁপিয়ে উঠল।

গলি ঘিঞ্জির বুক চিরে শহরের প্রান্তে যে পথটি হঠাৎ ডানদিকে মোড় খেয়ে নিবিড় শান্তিতে এলিয়ে পড়েছে তারই মুখটিতে দত্তবাড়ীর লোহার গেট। পথের সাথে সাথে তাদেরই ক্যাডিলাক অস্টিন এদিক পানে মোড় নেয় দত্তবাড়ীতে যাদের মানুষ আছে, মনের-মানুষ আছে। ছিমছাম ঝিমঝাম বাড়ী। ডালিয়া কসমসের লীলা দেখে দেখে সকাল দুপুর সন্ধ্যার আলো বাতাস আর মায়া মিটমিটে হাসিতে ভরে ওঠে।

সাগর-নীল কারের দরজা খুলে মাটিতে পা রাখতে রাখতে নমিতা নাগ বলে, হ্যাল্লো ডার্ট! হাউ ডু ডু!

স্নেহময় দত্ত হাসে, সকাল বেলায় দেখা হোল, বিকেলে অন্য কিছু দেখবে বলে আশা করেছিলে নাকি!

—মানুষটা তো বদলে যেতেও পারে। যে মানুষ মনকে স্বীকৃতি দিয়ে বেঁচে আছে, যে মনকে যে মানুষ কোন সময়েই নিরাশ হতে দেয় না, তার পরিবর্তন আশা করা যায় বৈকি!

—গুড, ভেরি গুড। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার ন্যান্সের চেয়ে তুমি সুন্দর, মাঝে মাঝে মনে হয় সবার চেয়ে তোমার কথাগুলি সুন্দর। আসলে......

—আসলে?

—তুমি সুন্দর।

—কারণ!

—কারণ? কারণ, সব নিয়েই তো তুমি। তোমার দেহের জোয়ারে সাদা কর্ক মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তোমার ঠোঁটের কাঁপনে কথারা ফুলের মত হাসে; আর ঠোঁট আর প্রমত্ত দেহের অধিকারিণী তুমি স্বয়ং স্বপনচারিণী!

হুস্—পিপ্!

পদ্মডগার মত ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ টানে নমিতা।

—কি হলো!

—লিক্ হয়ে গেলাম। না, আর নয়। তোমাকে আর কথা বলার চান্স দেয়া হচ্ছে না। চল, বেলা যে বয়ে যায়, খেলবে চল!

ধারী বিষ্ণু মাথায় হাত দিয়ে বসবেন, কুতো মনুষ্যাঃ! মেয়ে যেখানে আছে, তাদের একটা রহস্য-মণ্ডিত মনও আছে আর সেখানেই আছে যত গোলমালের কলকব্জা। দত্তবাড়ীর ব্যাডমিন্টন খেলায় অনেকেই আসে, শহরের তা বড় তা বড় ব্যক্তির দুহিতা পুত্র। প্রায় সবাই মন নামক বস্তুটির কারবারী! (বলতে পার, দত্তবাড়ীর এই ব্যাডমিন্টন মাঠ ছিল কামদেবের পীঠস্থান)। একটি করে হাত ধরবার মানুষ থাকলেও নমিতা নাগ যখন নতুন মডেলের গাড়ী থেকে আটোসাটো গেঞ্জি আর ট্রাউজার পরে কেড্স্ পায়ে ছন্দে ছন্দে এসে দাঁড়ায় একবার না চেয়ে কেউ থাকতে পারে না। একবার

......"কারণ, সব নিয়েই তো তুমি।"

—চল।

নমিতার রূপ আছে, রূপ প্রকাশ করবার দম্ভ আছে, রুচি আছে। অবিশ্যি নমিতা বলে, রুচি। দুষ্টু লোকে বলে, রুচি না ছাই! রং ঢং দেখলে অরুচি আসে। নমিতা বলে, কঞ্চির মত দেহকে যত দামী শাড়ি দিয়েই জড়িয়ে রাখ না কেন, তোবড়ান গালে যত পাউডারই ঢালো না কেন, যত রং ঢংই কর না কেন, পুরুষদের সত্যি রুচি আছে! তোমাকে দেখবে সামগ্রীর মত, আর আমাকে দেখবে সম্রাজ্ঞীর মত!

কথাটা হোল এই, মেয়েদের মন নিয়ে গবেষণা করতে দিলে স্বয়ং চক্র-

কথা না বলে কেউ স্বস্তি পায় না। কেন? ওকে দেখলে বুকের মধ্যে খ্যাপা জানোয়ারের মত কি যেন একটা অনুভূতি দাপায়, কড়াতে টগবগ তেলের মত ফুটতে থাকে রক্ত। তাই কথা বলতে হয়, কথা বলায় নমিতা নাগের নিষ্ঠুর আলোমালো ঝড়-ওঠা সমুদ্রের মাতন দেহ। আর তখনই বিপ্লব ঘটে। কাঠির মত চেহারাখানা নিয়ে প্যান্ট আর গেঞ্জি হাঁকালে বাড়ীর দারোয়ানেই হাঁকিয়ে দেবে পিক-পকেট মনে করে। বাবুর সুখতলা পর্যন্ত পোঁছবার সৌভাগ্য হবে না।

তাই নিষ্ফল আক্রোশে পাশের মানুষটিকে বলতে হয়, চলো ডিয়ার!

নির্জনে গিয়ে বসি। তোমার সাথে অনেক কথা। ততক্ষণে একটা গেম হোক।

কিন্তু তাই বলে রোজই এ পোশাকে আসে না নমিতা। উজ্জ্বল-লাল অথবা আকাশ-নীল শাড়িতে অঙ্গ ঢেকে নমিতা এসে দাঁড়ালে মনে হয়, এর চেয়ে গেঞ্জি প্যান্ট ভাল ছিল।— কি চেহারা বাবা! আসলে নমিতার স্বাস্থ্য শ্রী গড়ন সবই ভাল। হাজার প্রেমনীর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়েও নমিতার দেহে নিত্য নতুন বাঁক খেলছে, রক্তের লহর বইছে।

স্নেহময়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নমিতা শুধায়, আচ্ছা, নীরা পৌঁছয় নি এখনও?

—পৌঁছেছে। মনে করেছিলাম, ওর সাথে একটা গেম খেলি।

—খেললেই পারতে।

অকারণেই ডান হাতটা তুলে কানে ছোঁয়ায় নমিতা।

—না, শরীরটা আজ ভাল নেই। যদি ওর মত মেয়ের কাছে হেরে যাই, তাহলে এমন বাজাবে যে মুখ দেখাবার জো' থাকবে না।

নমিতার মুখ ভার হল। ভেবেছিল, স্নেহময় বলবে, তুমি আসো নি তাই খেলি নি। তুমি না থাকলে খেলে ভালই লাগে না।

শীত রোদ্দুর জ্বলছে সামনে। ঘুমের মত মিষ্টি রোদ্দুর, প্রিয়তমের মত আদুরে। চাপ চাপ রক্তের মত থুপ-থুপে পলাশ ফুলে আছে ওই দূরে সিংহদের বাড়ীর পাশে।

খেলা শুরু হল। স্নেহময় খেলল না। অনেক চোখের মত তারও এক-জোড়া চোখ উদ্গ্রীব হয়ে রইল। নমিতা শ্যাসের পর শ্যাস করে। বাঁকের পর বাঁক তোলে। প্রতিপক্ষ দম নেবার ফুরসুৎ পায় না, শান্তি খেলবার সাহস পায় না এতগুলি অস্থিরতার চোখ।

মস্তবাড়ীর গেটের সামনে মৃদু গর্জন করে করে একটার পর একটা গাড়ী চলে যাচ্ছিল। সূর্যটা গেছে ডুবে অনেকক্ষণ। খেলার শেষে বিদায় নিয়েছে সব।

অন্ধকার নামছে চারিদিকে। মস্ত-বাড়ীর সামনে দেওয়ালে যখোন জোতার করে ফুটে গেল কতগুলি চকচকে ধুন।

কথাটা উঠছে সামনে। টুকরো মনের কয়েকটা কথা, বুকের মত মোলায়েম কথা।

কালকে আসছো তো আমাদের বাড়ীতে? সন্ধ্যার ছায়ায় নীরার হাতটা টিপে প্রশ্ন করে সোমেন মিত্র।

আসবো। নীরার কথা জড়িয়ে যায়। কথা বলে একটা দুর্বার আবেগ।

স্নেহময় শুনল, হাসল।

তুমি কিন্তু দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ! যেন অভিমান কথা কয়।

কেমন হয়ে যাচ্ছি! চেঙালী মেয়ের হাসি হাসি মুখ।

ঠিক যে সময়ে তোমাকে পাওয়া উচিত, পেলে ভাল লাগবে, তখনই তুমি থাকো না। মনে হয় থাকতে চাও না।

মানে! বুঝিয়ে বলো!

মানে, তুমি এমন সময় আমাদের এখানে আসো, যখন ভাই বোন বাবা বাসায়। আর আমাকে এমন সময় যেতে বলো যখন তোমার বাবা মা বাসায়।

স্নেহময় শুনল, হাসল।

হেঁটে হেঁটে চলে এল। জেরাজটার বসে একটা সিগারেট ধরাল। কড়া! মুহূর্তে ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। বাঁ হাত ঠেলে কপালে বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল স্নেহময়। হাঁটল কিছুক্ষণ। জানালার কাছে এসে চাইল বাইরের দিকে।

মালীর ঘরে বাতি জ্বলছে। ইয়ার্কি মারছে মালী বৌটার সঙ্গে। এই সেদিন বিয়ে করেছে ও। অল্প বয়স, ভরা-যৌবন। খ্যাক খ্যাক করে হাসছে মালী। খসান ঘোমটা খোঁপায় জড়িয়ে বৌটা শাসনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তর্জনী দোলাচ্ছে। জানালা থেকে সরে এল স্নেহময়।

মন খারাপ হলে কি যে নিদারুণ অবস্থা হয়, এই প্রথম বুঝল স্নেহময়। সব কিছুরই ওষুধ আছে, কিন্তু মনের রোগের ওষুধ নেই। যতক্ষণ না নিজে সন্তুষ্ট হবে। কি অদ্ভুত জ্বালা! কি এক আশ্চর্য অতৃপ্তি! কাল, গতকাল! চব্বিশ ঘণ্টার স্মৃতি! মনে হয় এক যুগ। বাড়ী আসার সময় ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটে গেল।

মস্তবাড়ীতে আসবার পথে বড় রাস্তাটার ডান পাশে যে জমিটুকু চাঁদ হয়ে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে উদাস মনের মত মুখ তুলে দূর আকাশের বর্ণালীর দিকে চেয়েছিল একটি মেয়ে। গাঢ় লাল রঙের সিল্কের হয়ত পরনে, ভাঙা খোঁপা ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়া, কেমন যেন বিষণ্ণ-সুন্দর ভাবটি। গাড়ী থামাল স্নেহময়। বন্দনা মিত্র নয়ত! ধরণটা তাই বটে! কিন্তু ওর সঙ্গে নন্দদার জোর মহব্বৎ চলছে। এই সুন্দর লগ্নে বন্দনা সঙ্গহীন? যা হোক, একটা লিফ্ট দেয়া যাবে, আজেবাজে বক বক করা যাবে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল স্নেহ-ময়। ঠিক পেছনে গিয়ে কাব্য করে বলল, ওগো মেয়ে সুন্দরী, হেরি কেন বিষণ্ণ বদন!

সুন্দরী মুখ ফেরাল। হায় ভগবান, কোন্ অপরিচিতা দাঁড়িয়ে! (দৌড় মারব! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে কি লাভ! মার খাই যদি!)

হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটি, শোন। তুমি খুব ভালমানুষ, না!

হাঁ, মানে, কেন?

দেখো, আমাকে একটা জিনিস দিতে পার?

এত করুণ মেয়েটির কণ্ঠ!

কি বলুন, আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দোব! (পা দুটো আর কাঁপছিল না। বুকে সাহস জমা হচ্ছিল।)

একটা ছেলে! ছেলে দিতে পার আমাকে!

যে রূপ আপনার, ছেলেরা একটু পয়সা দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে!

না গো! আমি যে মা হতে চাই!

হৈ চৈ করতে করতে জন দুই লোক ছুটে আসছিল নদীর পাড় থেকে। কেঁপে উঠল স্নেহময়। অস্ফুট চীৎকার করে মেয়েটি স্নেহময়ের হাত চেপে ধরল। থর থর করে কাঁপছে ওর ঠোঁট দুটি। কাজলের জল খেলছে বড় বড় দুই চোখে।

আকুতি ভরে পড়ল মেয়েটির কথায়, আমায় বাঁচাও। ওরা আমাকে বলে কি জানো, আমি পাগল! আচ্ছা তুমিই বলো, সন্তান না পেলে লোকে পাগল হয় না! বলো না গো, তুমি তো ভাল-মানুষ!

ওরা এসে গেল। সামনের লোকটি কদর্য ভাষায় গালি দিয়ে চড় মারল মেয়েটার গালে। পাঁচ আঙুল লাল হয়ে বসে গেল সাদা নরম স্থানে। হঠাৎ যেন মেয়েটা বোবা বনে গেছে। চোখ থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে ওর রাঙা গাল বেয়ে।

আর থাকতে পারল না স্নেহময়, জিজ্ঞেস করল, ও'র কি কোন অসুখ নাকি?

অসুখ মানে, পাগল মশাই! আপনি না থাকলে কোন্ কীর্তি করে বসতো কে জানে!

কোন্ বাড়ীটা আপনাদের বললেন?

ওই যে ভাঙা দালানটা দেখছেন, ওর পাশের টিনের বাড়ীটা।

ওদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিধা-জড়িত স্বরে কথা বলল আবার স্নেহময়, একটি সন্তান পেলেই মনে হয় মাথা ঠিক হয়ে যাবে!

সন্তান ওকে দেয় কে?

কেন, ওর স্বামী!

স্বামী হলেই সন্তান দেওয়া যায় না মশাই!

এবার শুয়রের মত গর্জন করে উঠল লোকটি। হাতটা মেয়ের মটকে দেবে, এমন ভাবে টানল। পশু পশু! ক্ষমতা নেই, সাধ আছে!

মোটর চালাতে চালাতে কেবলই ভাবল স্নেহময়। সুশ্রী নিরপরাধিনী একটি মেয়ে। অন্তরে বিষম জ্বালা, অক্ষম স্বামীর অত্যাচার। পাগল না হলেই ছিল আশ্চর্য! দিনের পর দিন বুকের ভেতর চিতা জ্বালিয়ে মানুষটার বাহ্যিক পরিবর্তন না ঘটলেও বুকটা যে চৈত্র প্রান্তরের মত ফুটি-ফাটা হয়ে দীর্ঘশ্বাস উগরে দিচ্ছে।

নিউ মার্কেটের মোড়ে এসে গাড়ী থামাল স্নেহময়। এক হাতে পাউডারের কৌটো আর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ভায়োলেট ডেফেরারের রঞ্জিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এক সারি সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। চোখের কোণে ঘনিয়ে এল অভিমান। গাড়ীতে উঠে এলো ও শান্ত পায়ে, নিঃশব্দে।

অনেক পরে বলল, তোমার সংগে কথা বলবো না ডার্ট!

বেশ তো! তুমি না বললে আমার কিছু আসবে যাবে না, তোমার মুখ বললেই হয়।

না, ঠাট্টা নয়। কখন কথা ছিল আসার! বিলিভ মি, একঘন্টা ধরে ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বুঝি কোন বোধ নেই!

কে বললে নেই! নিশ্চয়ই আছে। তোমার এত বোধ আছে বলেই তো তোমায় আমি পছন্দ করি!

ভালবাসা কথাটা ইচ্ছে করেই স্নেহ-ময় উচ্চারণ করল না। এসব মেয়ের সাথে কিছুক্ষণের জন্যে বসে থেকে ভাল লাগে, আনন্দ লাগে। রাত জেগে ভাবতে মন চায় না, ওদের ঘিরে গান গাইতেও ইচ্ছে যায় না, অভিমান করার প্রবৃত্তি হয় না। একটুখানি হাত ধরা, একটু-খানি মিষ্টিকথা, একটুখানি সান্নিধ্য। ব্যস। এর বেশী গেলে তুমিও ঠকবে, আমিও ঠকব।

তবু খুশী হল ভায়োলেট। কোমর দুলিয়ে বলল, জানো ডার্ট, আজকে এক মজার কান্ড হয়েছে। ফাদার বোল্টন মায়ের কাছে বলেছে আমি নাকি নিয়মিত উপাসনায় যাচ্ছি না। মা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, আমার ভেতরে এমন একটা চার্চ আছে, যেখানে নিত্যই উপাসনা হচ্ছে। কেমন, ভাল বলিনি?

তবু তোমার যাওয়া উচিত। যে পরিবেশে তোমরা আছো, তাতে এগুলো অমান্য করা মোটেই উচিত নয়।

বারে, অমান্য কেন করব! আমার ভাল লাগে না!

ভাল লাগালেই লাগে! তোমার একটা ধর্ম আছে ভায়োলেট!

ও মাই গড্! ধর্মের বন্যায় যে দেশের লোক হাবুডুবু খায় তাদেরই একজনের কাছে অধর্মের কথা বলে মারা পড়ি আর কি! নারীধর্মের কাছে কোন ধর্মই বড় নয়, তা জানো!

জানি! কিন্তু এভাবে পার্টি ক্লাব করাটাকেই কি নারীধর্ম বলে নাকি?

না, বলে না, সবার মত আমিও চাই ঘর, স্থিতি! আমি মা হতে চাই; সন্তান নিয়ে ঘর করবার স্বপ্ন আমিও দেখি ডার্ট!

চমকে উঠল স্নেহময়। পৃথিবীটা কি চব্বিশ ঘন্টার ভেতর একদম বদলে গেল নাকি? (পাগল মেয়েটা এখন করছে কি!)

যে ভায়োলেট ডেফেরার পেগের পর পেগ মদ খেয়ে নেশায় চুর চুর অবস্থায় বেসামাল হয়ে যে কোন পুরুষের সংগে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে, যে ভায়োলেট কয়েকদিন আগেও বলেছে, যৌবনকে দাম দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি; তাই বার্ধক্যের কান্না শোনবার আগে আমি যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এনজয় করব; সেই ভায়োলেটের মুখে এ ধরণের আশ্চর্য অদ্ভুত কথা মনে একটা প্রবল ধাক্কা দেয় বৈকি!

চোখ তুলে চাইল স্নেহময়। ডেফেরার যেন একটু ঘন হয়ে বসেছে। সে কি গাড়ীর দুলুনিতে, না ইচ্ছাকৃত ভাবে! থাক্ থাক্ সোনালী চুলের মাঝ থেকে কয়েকগাছি খুচরো চুল উড়ছে ওর কানের পাশ ঘেঁষে। শরীরের ওপর এত অত্যাচার করে অথচ এতটুকু ভাঙ্গন নেই কোথাও। গাঢ় নীল রং গাউনের ওপর ওর লাল-হলুদ দেহ মুখ এক টুকরো স্বপ্নের মত মনে হয়।

তোমার স্বপ্ন সফল হবে বলে কি তুমি বিশ্বাস করো?

কেন করবো না!

করো না। কারণ, সবাই তোমাকে এখন প্রফেসনাল বলে জানে।

স্নেহময়!

হাঁ, তাই সন্তান তুমি পেলেও সেই সন্তানকে স্বীকৃতি দেবার মত ক্ষমতা তোমার নেই।

একি বলছো তুমি স্নেহময়!

ঠিকই বলছি। আজ তুমি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ, সন্তান দেবার মত অনেক পুরুষই তুমি পাবে. কিন্তু পিতা পাবে না।

তুমিও একথা বলছো ডার্ট! কেমন যেন কান্না কান্না স্বর ভায়োলেটের।

আমি বলছি না, আমাকে বলাচ্ছে তোমার নোংরা যৌবন। যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে যৌবন কাউকে কোন-দিন ক্ষমা করে না।

করে না? আত্মগতভাবে বলল ভায়োলেট।

সামনে একটা মাঠ। অন্ধকারের মেলা বসেছে সেখানে। মেলায় বসেছে

অবৈধ কথার। চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে ফনা তোলা সাপের মত বয়সে পাওয়া ছেলেমেয়েদের, বড়বাবু টাইপিস্ট-দের, ছাত্রী শিক্ষকদের আবছা আবছা মূর্তি।

আলোর অভিযান অন্ধকারকে যতই দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পৃথিবীর মানুষ-গুলো অন্ধকারকে তেমনি মহার্ঘ বলে মনে করছে, পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হচ্ছে।

মাঠটার ওপারে অন্য রাস্তার নিশানা। নেকড়ের চোখের মত বাতি জ্বলছে পোস্টগুলোর মাথায়। মোটর ছুটছে, রিক্সা চলছে।

ওখানে বসবে নাকি কিছুক্ষণ? আস্তে আস্তে বলল স্নেহময়, মোটর থেকে না নেমেই।

না, বাসায় যাব। গাড়ী ঘুরিয়ে নাও।

দত্তবাড়ীর চারপাশে একটা ক্লান্তির ছায়া দিন দিনই কেমন গভীর হয়ে উঠছে। ব্যাডমিন্টন মাঠে খেলা হয় ঠিকই, কিন্তু সেই উত্তেজনাই যেন হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সমস্ত হাসি গানের সোনার কাঠি। কেমন একটা নির্জীব গাম্ভীর্য সটান হয়ে শুয়ে থাকে দত্তবাড়ীর সবখানে, সব সময়।

ভাবনার সাথে হাসিও পায় স্নেহ-ময়ের। গাড়ীতে করে সেই পাগলী মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল সে। ভায়ো-লেটের ফ্ল্যাট থেকে ফেরবার মুখে গাড়ীটা নিজের অজান্তেই থামিয়ে দিল স্নেহময়। সেই বাড়ীটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। কেমন সুস্থ সুস্থ চেহারা।

ভাল আছো! একেবারে কাছে গিয়ে আপনজনের মত স্নেহময় শুধাল।

তুমি কে গো! নিষ্পাপ সরলতার ছবি ওর মুখে, মধ্য কপালে ছোট্ট করে আঁকা আলতার ফোঁটা, জ্যোতিহীন!

আমি সেই ভালমানুষ! নদীর ধারে তুমি দাঁড়িয়েছিলে, সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তুমি সন্তান চাইলে, ওরা তোমাকে মারতে মারতে নিয়ে এল!

হ্যাঁ।

তোমার স্বামী কোথায়?

স্বামী! ও হ্যাঁ, বাইরে গেছেন।

বাড়ীতে নেই কেউ!

কেউ নেই।

আমার সাথে আমার বাড়ীতে যাবে?

আর আসবো না?

আসবে। আমি দিয়ে যাব।

ওরা যে মারবে।

মারবে না। আমি দিয়ে যাব।

গেটের সামনে গাড়ী থামিয়ে নামল স্নেহময়। চারদিকে চাইতে চাইতে মেয়ে-টাও নেমে এল। ব্যাডমিন্টন মাঠের মক্ষিরাণীদের অনেকের চাইতে অনেক বেশী সুন্দরী মেয়েটা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দৌড়ে এল সবাই।

নমিতা শুধিয়েছিল, ও মেয়েটি কে ডাট্?

ও প্রতিমা!

প্রতিমা তো বটেই! কিন্তু আমদানী করলে কোত্থেকে।

আমদানী নয়। বাবা মারা যাওয়ার আগে ওর সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আমি চলে গেলাম বিলেতে! প্রতিমাকে ভুলে গেলাম।

তারপর হারা মাণিক কোথায় খুঁজে পেলে। নমিতার চোখ জ্বলছিল!

পেলাম কোথাও! আচ্ছা, তোমরা খেলতে যাও। আমি আসছি এখনি! এসো প্রতিমা!

হেটে হেটে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল দুইটি শান্ত স্নিগ্ধতার মূর্তি। ওদের দিকে চেয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল কয়েকটি প্রতিহিংসার চোখ।

আ-আমি প্রতিমা। মেয়েটা বলে।

হাঁ, তুমি প্রতিমা। স্নেহময় বলে।

কিন্তু আমি তো নলিনী!

না, তুমি প্রতিমা!

তোমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল!

না, ওদের বললাম আর কি! ওরা অন্য ধরণের পাগল!

আমার মত পাগল!

হাঁ, তোমার মতই। হাসল স্নেহময়।

সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার আগেই ওদের বাড়ীর সামনে ব্রেক কষল স্নেহময়ের গাড়ী।

তৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিমা বলল, কালকে আসবে না?

আসবো?

আসবে।

আসবো। যাই, কেমন!

এসো!

অনেকদিন পর আজ গান গাইতে ইচ্ছে করল স্নেহময়ের।

মোটরে বসে অনেকদিন আগে গান গেয়েছিল। কতই বা বয়স তখন। ঘুম ঘুম বয়স। মায়ের সাথে শিবতলায় 'ভোগ' দিতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে মাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, একটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ দেওয়া উপবাস-ক্লিষ্ট মুখে। গরদের ঘি-রং শাড়ি পরলে যে কোন মাকে এমনিতেই সুন্দর দেখায়। চোখ দুইটি মায়ের সামনের পথ বেয়ে বেয়ে বহুদূরে কিছু যেন খুঁজছিল। হঠাৎ হাততালি দিয়ে গান গেয়ে উঠল স্নেহময়।

চোখ না ফিরিয়েই মা ধমকে উঠলেন, গান গেও না!

কেন মা!

তর্ক করো না। গাড়ীতে বসে ভাল ছেলেদের গান গাইতে নেই।

আজ হঠাৎ মায়ের কথা মনে হতেই আস্তে আস্তে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিল স্নেহময়। সন্ধ্যার শহর। উজ্জ্বল আলোর নীচে নীচে মেয়ে-পুরুষদের ভিড়। নিউ-মার্কেটের দক্ষিণ দিকের একটা দোকানে গিয়ে আধ পাউন্ড টফি কিনল স্নেহময়।

স্নেহ!

পা-দানীতে পা রেখেই স্নেহময় ঘাড় ফেরাল।

তোড়া দেব। সূর্যাস্তের নায়িকা।

তোড়া! তুমি হঠাৎ এখানে।

বা রে, আমাকে এখানে আসতে নেই নাকি!

না, তা নয়। তোমাকে এমন সময় এখানে কোনদিন দেখিনি কি না, তাই! ভালো আছো!

ভাল থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! তুমি তো আমাদের ওখানে যাওয়া একদম ছেড়েই দিয়েছ!

আর বলো না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমন সময়টুকুও পেয়ে উঠি না যাতে জেলা-দুঃখদের দেখে তৃপ্ত হবো। পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর তোড়া।

হেসে ফেললে স্নেহময়। হেসে ফেললে তোড়া।

কি কথা বানাতে পার তুমি! গল্প লেখ না কেন?

কে বললে লিখি না। পত্রিকাওয়ালারা ছাপায় না তাই। না হলে আমার গল্পে সাসপেন্স ক্লাইমেক্সের হুড়োহুড়ি হুড়ো-হুড়ি লেগে যায়। নায়কেরা তিন তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে তিন তিনবারই বেঁচে যায়।

ওমা, নায়কেরা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে! হাসি চাপতে চাপতে তোড়া বলে।

তোমার মত নায়িকাদের কথা শুনে! নাও, উঠে এসো। তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দি।

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর পৃথিবীটা বদলে গেছে। সত্যিই বদলে গেছে, কেমন গিন্নী গিন্নী ভাব নিয়ে গাড়ী থেকে নামে নমিতা নাগ। খেলতে হয় তাই খেলে যায়। কেমন অলস ভঙ্গিতে র‍্যাকেট নিয়ে নড়াচড়া করে। আরগাটাই যেন কিছু হারানোর বেদনায় চুপি চুপি চোখ মুছতে থাকে। চব্বিশ বছরের যৌবনকে রঙ-ঢঙের প্রাচুর্যে ঢেকে যে নমিতা বয়সটাকে বোলাতে নামিয়ে এনেছিল সেটাই যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে কাঁধে উঠে গেছে।

ভায়োলেট ফোকেরার আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কথা বলে, ধীরে ধীরে হাঁটে আর অনেক কিছু যেন ভাবে।

প্রতিমা সেদিন একাই চলে এসেছিল। গোলাপ গাছ থেকে একটা রক্ত-গোলাপ তুলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে খোঁপায় গুঁজেছিল। ছুটে এসেছে মালীটা। আঁ, মেম সাহাব...।

ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল স্নেহময়। হরিণীর মত কোমর দুলিয়ে ছুটে গিয়েছিল প্রতিমা। ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিল মালী।

কি, খোঁপায় ফুল দেবার শখ হয়েছে? জিজ্ঞেস করে স্নেহময়।

হ্যাঁ, তোমার বাগানে কত ফুল!

তুমি ফুল খুব ভালবাস, না?

খুব ভালবাসি। আমার যদি ফুলের মত একটি ছেলে থাকত!

থাকবে।

থাকবে?

হাঁ, থাকবে।

আঃ! গভীর একটা তৃপ্তির হাসি ফেলে কুশন-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল প্রতিমা! ক্লান্ত মুখ, নিমীলিত আঁখি। সম্রাজ্ঞির ছবি।

প্রতিমা!

উঁ।

শোন!

কি!

সোমবারে তোমাকে এখানে আমি নিয়ে আসব। চিরদিনের জন্যে! আসবে না?

আসবো!

তাহলে এই কথাই রইল। আজ বুধ-বার। এ ক'টা দিন চুপচাপ থাকবে। সোমবারে নিঃশব্দে চলে আসবে। কেমন!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ!

চলে এলো প্রতিমা। চলে এল একটা জীবন্ত কামনা। কোন গোলমাল হল না। হৈ-চৈ হল না। একটা তৃষিত মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল শুধু কোমল, শুধু চিক্কন একটা কান্না শোনার জন্য! একটি শিশুর কান্না!

আরেকটা সংবাদ শোনার জন্যে স্নেহময়ের মন উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই সংবাদটা এল। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘশ্বাস!

মুখ তুলে বললে, আর ইউ সিওর সেন?

কথা বলছিল প্রফুল্ল সেন, ডাক্তার। স্নেহময়ের কলেজ-জীবনের বন্ধু।

তুমি কি বলছ স্নেহ! এসব ঘেঁটে হাত পাকিয়ে ফেললাম! তোড়া সেনও শেষ পর্যন্ত মা হতে চলল!

কিন্তু ওর মত মেয়ের এটা করা মোটেই উচিত হয় নি প্রফুল্ল! ভাল করে আমি ওকে জানি। একটা জোয়ারের সঙ্গে...।

কি বলছ স্নেহ! [illegible] তোমার?

নয়? এই সেদিনও দেখেছি চায়ের স্টল থেকে সিগ্রেট ছুঁড়ে মেরেছে স্কুল-যাওয়া মেয়েদের দিকে। ওর কত কীর্তি!

তা সে যা হোক। তুমি চতুষ্পদ [illegible] করবে বল!

(প্রতিমার খবরটা জানত না প্রফুল্ল।)

হবে। ঠিক সময়েই খবর পাবে।

গুড়। আচ্ছা আসি। বাই বাই।

বাই বাই।

সেই আলোর ঝর্ণাই এগিয়ে এল তোড়া। [illegible] দিয়ে গেল।

খুব খুশী হয়েছ, না? স্নেহময়ের চোখে চোখ রেখে তোড়া বলল।

হয়েছি। চোখে দেখে খেলায়, সব সুন্দরের মাঝেও যে একটা ভয়ংকর থাকে তা থেকে তুমি বঞ্চিতা নও, হয়ত কোন মেয়েই নয়।

মেয়েরা সুযোগ পেলে বেপরোয়া হবে। আর তা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই।

তুমি ব্যতিক্রম। তাই তোমার মাঝে ভয়ংকরের ছবি দেখে ভয় পাই নি, হাসি নি। আশ্চর্য হয়েছি।

আশ্চর্য করলে! বুকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে একরাশ বিস্ময়। ছটফট করতে থাকে তিনশো' পয়ষট্টি দিনের চাঞ্চল্য। কুমারী মেয়ের বুকের একটা জ্বালা!

আবার সূর্য উঠবে! স্নেহময় বললে।

উঠুক। তোড়া বললে।

—সূর্য অস্ত যাবে।

—যাক।

—বড় টিলাটার এক পাশে পোষা কুকুরের মত ক্ষেমীন হলুদ হলুদ রোদ্দুর গড়িয়ে পড়বে। মাঠের বুকে তেমনি নামবে ছায়া, তোমার চোখে নামবে স্বপ্ন। দূরের জঙ্গলে ওঠবে মিওন, আকাশে জাগবে অযুত তারা। তবু...।

—থামো ডার্ট্, থামো। পাগল করো না আমায়।

—জলে জাগবে ঢেউ। শব্দ জাগবে ছলছল। এমনি সময়ে টুংটাং বেজে ওঠবে কোন গির্জার ঘণ্টি অথবা কোন চানাচুর-ওয়ালার কৌটোর ঝম ঝম। তোমার চোখে দুলবে স্বপ্ন, আমার মনে আসবে কথা। আমি তোমার বন্ধু চাই তোড়া।

—সুন্দর আর ভয়ংকর নিয়ে আমি। শুধু বলছি স্নেহময়, তুমি ফিরে যাও।

—ফিরে যাব! আচ্ছা চলি। উইস্ ইউ এ নাইস ড্রিম।

—তাই তো হবে। আরেকদিন এসো। অনন্তের সঙ্গে দেখা হবে!

—আর আসবো না!

সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা বিকট মূর্তি নিয়ে হা হা করে হাসছে। যেতে দেব, যেতে দেব তুমি তোড়া দেবে। তোমার বাইশ বছরের আরাম ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করল তোড়া। ব্যর্থ আক্রোশে আকাশ চাইল। বাইশ যৌবনের চোখ দুটি দেখল একটা

ফূর্তিভরা মন নিয়ে মানুষটা কেমন নির্ভাবনায় হেটে হেটে চলে যাচ্ছে সারদাশঙ্কর রোডের ওপর দিয়ে। কাপুরুষ! বন্ধুত্ব চাই! দিনের পর দিন একটি স্বাস্থ্য-উছল তাজা মেয়েকে পাশে রেখে, কথা বলে......। উঃ, তোমার জন্যেই যে...।

চেঁচিয়ে ডাকল তোড়া, নারাণ, নারাণ!

কাছেই দাঁড়িয়েছিল নারাণ, কিছু বলছো দিদিমণি।

বলছি, গেটটা লাগিয়ে দে।

কর্ত্তা ফেরেন নি এখনও!

যা বলছি তাই কর। যখন আসবেন তখন খুলে দিবি। তোদের গাঁটে গাঁটে আলসেমি বসে গেছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে নারাণ গেট বন্ধ করতে চলল।

হাসছে দুই পাশের পথের কানাচ, হাসছে পথের ইশারা। স্নেহময় হাসে। এই ভাল, এই বেশ। চটুল কথার রসে ব্যক্তিটিকে ডুবিয়ে হজম করার শখ তাদেরই থাকে যাদের ভাল-লাগার অস্ত্রটি বেশ ভাল করেই রপ্ত করা আছে। ভাল-বাসার বিলাসীতায় জীবনকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে কত বড় যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে তা ওই দেহ-সর্ব্বস্ব প্রসাধন-কারিণীরা কেমন করে বুঝবে!

হ্যাল্লো মিঃ ডাট! আপনি এদিকে কোথায়?

কোথাও নয়। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলাম।

আকাশের দিকে চাইল মুসলীম হোসেন। গম্ভীরভাবে দেখল স্নেহময়কে। তিনটের ঘরে ঘড়ির কাঁটা দুলছে।

অসময়ে যে! প্রশ্ন না করে পারল না হোসেন।

হাসে স্নেহময়, সুসময়ে তো অনেক বেড়ালাম। দেখি অসময়ে কি হয়।

ও আচ্ছা! বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, বোঝার ভান করল মুসলীম, একটা খবর শুনেছেন নাকি মিঃ ডাট! মিসেস সেন কাল থেকে মিসেস সিম্পসন হচ্ছেন!

আচ্ছা! তা মিঃ সেনটি গেলেন কোথায়?

গারদে!

গারদে! কোন্ গারদে? ছেলেবেলায় পড়েছিলাম গারদ দুই প্রকার!

তিনি আছেন পাগলা গারদে!

এ্যাঁ, ব্যাপার জটিল বলুন!

নিশ্চয়! মিসেস সেনের রূপের জেল্লায় মাথায় এমন রক্ত চলাচল শুরু হোল বেচারা আর দাঁড়াতেই পারলেন না। এখন দেখা যাক সাদা আদমীর দৌড়!

তিনি পার্টি দিচ্ছেন নিশ্চয়!

নিশ্চয়! তা আর বলতে!

চলে গেল মুসলীম হোসেন। লোকটা এমনি, চোখ ঢেকে কিছু বলার পাত্রই নয়। আগুন জ্বালিয়ে ছাই-চাপা কেন বাবা!

হাসি-গানের দত্তবাড়ী ঘুমিয়ে গেছে। হৈ-হুল্লোড়ের দত্তবাড়ী ঝিমিয়ে পড়েছে।

ঝিমিয়ে পড়েছে এতগুলো অস্থির প্রাণের উন্মাদনা। এতদিনের একটা নরম কামনা চোখ মুছতে মুছতেই যেন পালিয়ে গেছে। কেউ আসে নি, কেউ আসে নি। দত্তবাড়ীর ব্যাডমিণ্টন মাঠের হাসি কথা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। অসহায়ের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে বারান্দায় উঠে এল স্নেহময়।

ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে ডালিয়া কসমসের নাচন দেখছিল প্রতিমা। স্নেহময়কে দেখে হাসল।

কোথায় গিয়েছিলে?

বন্ধুর বাড়ী।

ওরা কেউ আজ খেলতে এলো না।

আর আসবে না।

কেন?

কেন! নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখো!

চমকে ওঠল প্রতিমা। চোখ দুইটি ওর জলে ভরে এল। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলো আসন্ন মাতৃত্ব।

শেষ রাতের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল স্নেহময়ের। বিছানায় প্রতিমা নেই। বাথ-রুমের বাতিটা জ্বলছে। জমাট নিস্তব্ধতা বাইরের বাগানে। উঠে এল স্নেহময়। বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রতিমা। খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছে ওর পিঠটা।

প্রতিমা, প্রতিমা! মৃদুস্বরে ডাকল স্নেহময়। একটুও নড়ল না প্রতিমার দেহ। কোলে করে ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। বেশ করে মুছিয়ে দিল।

আঃ আঃ! পাশ ফিরেই হু হু করে কেঁদে ওঠল প্রতিমা!

কি প্রতিমা, কি!

আমাকে, আমাকে স্বামীর কাছে দিয়ে এসো! বিড়বিড় করে প্রতিমা বলল।

এই তো আমি তোমার কাছে আছি। স্নেহময়ের উদ্বিগ্ন স্বর।

আমাকে, আমাকে স্বামীর কাছে দিয়ে এসো!

প্রতিমা প্রতিমা!

না, না!

ভোরের দিকে ডাক্তার এলেন। ভাল করে পরীক্ষা করলেন। এক পাশে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল স্নেহময়।

বারান্দায় এলেন ডাক্তার। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বললেন, মিঃ ডাট, রোগিণীর মনে কোন গোপন ব্যথা আছে বলে জানেন কি?

না, যেটা ছিল সেটাও গেছে বলে জানি।

দেখুন তো চিন্তা করে।

দেখুন, আপনার কাছে বলতে তো কোন বাঁধা নেই! ওর বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত বছর। একটি মাত্র সন্তানের জন্যে ও'র মানসিক অবস্থা এমনও হয়েছে যখন ওকে উন্মাদ বলে সবাই মনে করেছে। বুঝতেই পারছেন, ও সন্তান-সম্ভাবনা। তাই বলছিলাম, এটাই ও'র মনোবেদনার কারণ ছিল। সন্তান পাওয়ার সম্ভাবনাতেও ও কেন এমন হয়ে গেল! আমার মনে হয় ও'র মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেছে!

ডাক্তার সাহেব!

হ্যাঁ, ঠিক তাই! এতদিন যার জন্যে উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, আজ তারই পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় উনি নিজেকে হারাতে বসেছেন।

কি করা যায় বলুন তো!

সন্তানকে বাঁচতে দেওয়া যাবে না।

আপনি এ কথা বলছেন!

হ্যাঁ বলছি! এখনও সময় আছে!

না, ডাক্তার সাহেব, তা হতে পারে না!

একটু ভাবুন, চিন্তা করুন। আচ্ছা আসি আমি।

ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

ভাই পুলকেশ, তোমার কাছে চিঠি লিখছি একটা প্রশ্ন করে। যার উত্তর পাওয়া আমার কাছে জীবন পাওয়ার মতই মূল্যবান। সব হারিয়ে তোমার কথাই বার বার মনে হয়েছে আমার। ভেবেছি, সদুত্তর তোমার কাছ থেকেই পাব। সব কিছুই জানালাম তোমাকে। এখন আমি কি করতে পারি! কি করতে পারে একটা মানুষ! খুব ক্লান্ত আমি। আর লিখছি না। খামের উপরেই ঠিকানা পাবে! প্রতিমার পাশে বসে তোমার কাছে লিখছি চিঠি। ওর একটা হাত বারবারই ডান হাতটা টানছে আমার। থামলাম।

তোমার স্নেহময়।

প্রদর্শনী

কলারসিক

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে যখন শিল্পী সমর ভৌমিকের তৃতীয় একক প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে (১লা নভেম্বর), তখন অ্যাকাডেমীর অন্য কক্ষে আয়োজিত শিল্পী শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনীটি সপ্তাহব্যাপী চলার পর শেষ হয়ে গেল।

।। শিল্পী সমর ভৌমিকের প্রদর্শনী ।।

গত বছর শিল্পী সমর ভৌমিক যখন তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তখন সেই প্রদর্শনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা শিল্পী ভৌমিকের প্রশংসা করেছিলাম। সেই প্রদর্শনীতে প্রধানতঃ ভারতীয় পদ্ধতির প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকে অঙ্কিত চিত্রকলারই প্রাধান্য ছিল। এবারের প্রদর্শনীতে প্রথাসিদ্ধ চিত্র-রচনার চেয়ে লোক-শিল্পের আঙ্গিক ভেঙ্গে বিমূর্ত চিত্র-রচনার দিকে শিল্পীর মানস-প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। শিল্পী ভৌমিকের কয়েকখানি চিত্রে আলপনাকে ভেঙে কিউবিক পদ্ধতিতে অনুসরণ করে ভুষো কালি, মেটে সিঁদুর, হরিতাল, নীল প্রভৃতি সম্পূর্ণ দেশীয় রঙ ব্যবহার করা হয়েছে এবং চিত্রের সাদা জমিনের বুকেই চ্যাপ্টা রঙ ব্যবহার করে রেখাগুলিকে বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনো কোনো চিত্রে মেক্সিকোর লোক-শিল্পের প্রতীকধর্মীতাকেও দেশীয় লোক-সংস্কৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী। মোটকথা, এই ধরণের চিত্রগুলি রচনায় শিল্পী সমর ভৌমিক তাঁর কল্পনা-প্রতিভা এবং আঙ্গিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

শিল্পীঃ সমর ভৌমিক

সমরবাবু এই প্রদর্শনীতেও ভারতীয় পদ্ধতির প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকে রচিত কয়েকখানি চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশই অজন্তার গুহা-চিত্রের প্রতিলিপি। বহুবার দেখা এই সব চিত্রের যে প্রতিলিপি সমরবাবু এখানে উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে নতুনত্বের কোনো স্বাদ না থাকলেও তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় ছিল। টেম্পেরায় অঙ্কিত কাজের মধ্যে নিসর্গ চিত্র 'নদী' (৬) কিংবা 'প্রাচীন সমুদ্র ও জেলে' (৭) মন্দ নয়। বালুকণা জমিয়ে তার উপর রঙ প্রয়োগ করে যে চিত্রগুলি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিতে চারু-কৃতিত্বের চেয়ে কারু-কৃতিত্বের পরিচয়ই সমধিক প্রকট।

।। শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনী ।।

শিল্পী শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনী গত ২৫শে অক্টোবর শুরু হয়ে ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়েছে। শ্রীদাম সাহা সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। চারু ও কারুকলা—এই দুই বিভাগেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে যে ৩৭ খানি চিত্র ছিল তার ২১ খানি প্যাস্টেলে অঙ্কিত এবং ১৬ খানির মাধ্যম ছিল জলরঙ। প্যাস্টেলে অঙ্কিত প্রায় সমস্ত চিত্রই বাঙলার পোড়ামাটির পুতুল-খেলনা ও লৌকিক দেব-দেবীর মণ্ডন-কলারই চিত্রিত রূপ। অবশ্য ভাস্কর্যের রূপকে চিত্রে বিধৃত করার সময় রঙ ও অবয়ব গঠনের দিকে শিল্পী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী অবলম্বন করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

জল-রঙের চিত্রগুলিও বেশ উন্নত মানের। ব্রাশের হাল্কা টানে, পরিমিত রেখায় এবং মৃদু রঙ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এইসব চিত্রের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানেও শিল্পী সাহার পরিমিতবোধ প্রশংসনীয়। জল-রঙের ছবিগুলির মধ্যে 'আলো-ছায়া' (১২), 'গাছের সারি', 'নারী ও শিশু' (১৫) নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

পোড়ামাটির ভাস্কর্যকলায় শিল্পী সাহার দক্ষতা অনস্বীকার্য। তবে এই নিদর্শনগুলির অধিকাংশই আমাদের মন্দির-গাত্রে রচিত পোড়ামাটির ভাস্কর্য-কলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ দুর্জয় প্রতিরোধ ॥

ভারতের উত্তর সীমান্তে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ভারতের অগণিত তরুণ প্রাণ। অতর্কিত আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে তারা দিশাহারা হয়নি, শত্রুর অগ্রগতিতে পরাজয়ের আশংকা তাদের মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত করেনি। নির্মম আক্রমণের সম্মুখেও নির্ভীক হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ভয়ংকর প্রত্যাঘাত হেনেছে শত্রুর বুকে। বীর জওয়ানদের প্রবল বিক্রমে ভারতের বুকে চীনা শত্রুর অগ্রগতি আজ সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

পুণ্য মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে হাজার তরুণ প্রাণ এ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয়েছে, আর সেই অকৃপণ জীবনদানে উদ্দীপ্ত হয়েছে সারা দেশ। ঘরে ঘরে আজ প্রস্তুতির সজ্জা, মাতৃভূমির মুক্তি-মন্ত্রে মুখরিত আজ সারা দেশ। ভারতের প্রতিটি সৈন্য-সংগ্রহকেন্দ্র এখন কর্মমুখর, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় লাখে লাখে ভারতের নওজোয়ান আজ এগিয়ে আসছে মৃত্যুঞ্জয়ী শপথ নিয়ে। দেশ-দেশান্তরের সক্রিয় সমর্থনও আজ আশীর্বাদের মত বর্ষিত হচ্ছে পুণ্য ভারত-ভূমিতে। ভারত ইতিহাসের স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবময় অধ্যায়ও আজ ম্লান হয়ে গেছে স্বাধীনতা রক্ষার মহান সংগ্রামের উজ্জ্বলতায়।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

দেশরক্ষার জন্য আজ প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণের প্রয়োজন। দেশ-দেশান্তর হতে অস্ত্র ও খাদ্য ক্রয় করে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, যুদ্ধ অবিলম্বেই শেষ হয়ে যাবে এ যেন আমরা কেউ আশা না করি। মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে চরম স্বার্থত্যাগের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে দেশ।

প্রধানমন্ত্রী ও সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের এই ত্যাগের আহ্বানে দেশবাসী যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা সত্যই অভূতপূর্ব। বৃহৎ শিল্পপতিরা এ পর্যন্ত পাঁচ দশ এমন কি বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেছেন, প্রয়োজনে আরও অনেক অর্থ তাঁরা দেবার জন্যে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি প্রায় সব ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান হইতেই পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রীদের অনেকেই

বেতনের এক একটি নির্দিষ্ট অংশ মাতৃভূমির মুক্তি-অর্জন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এদিক থেকে গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্ধ্র বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ। তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ বেতনই মাতৃভূমির মুক্তি-অর্জন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারী শত অসুবিধার মধ্যেও উদার হস্তে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ দিতে এগিয়ে এসেছেন। মা ও ভগ্নীরা নিজেদের দেহের অলংকার খুলে অকাতরে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেছেন। সারা দেশ জুড়ে আজ যেন শুরু হয়েছে ত্যাগের সাধনা।

কিন্তু তবুও আমরা আহ্বান জানাই দেশবাসীর কাছে—যার যাহা আছে, আন বহি আন, থেক না থেক না লুকায়ে। জীবন পণ করে আজ যে ভারতের বীর সৈনিকরা উত্তর সীমান্তে শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে তাদের সর্ব-উপায়ে সাহায্য করা, তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা আজ সমগ্র দেশবাসীর একমাত্র কর্তব্য। আরও অর্থ চাই, আরও স্বর্ণ চাই, আরও ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি চাই। পুণ্য মাতৃভূমির স্বাধীনতার তুলনায় সব সম্পদই আজ মূল্যহীন।

॥ দেশ-বিদেশের সমর্থন ॥

সারা পৃথিবীর শুভেচ্ছা ও সমর্থনে ভারত আজ শুধু ধন্যই নয়, এ সংগ্রামে তার জয়ও আজ সুনিশ্চিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার সর্বসামর্থ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের পাশে। সুস্পষ্ট কণ্ঠে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে ম্যাকমেহন লাইনই উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত রেখা এবং সে সীমান্ত রক্ষার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে ভারতকে সহায্য করবে। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ ঘোষণা করেছেন, আক্রান্ত ভারত তার প্রয়োজনে বৃটেনের কাছে যে সাহায্য চাইবে বৃটেন তা দেবে। পঃ জার্মানীর চ্যান্সেলর ডঃ আদেনুয়েরও অনুরূপভাবে ভারতকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত বড় বড় সমৃদ্ধ দেশগুলিও সমভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছে, অস্ত্র ও রসদের সাহায্য অকৃপণভাবে তাদের দেশ থেকে ভারতে আসবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় সবকটি দেশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, তারা আক্রান্ত ভারতের সমর্থক।

ভারতের রাষ্ট্রীয় সফরে আগত আর্চবিশপ ম্যাকারিওস বলেছেন, এ যুদ্ধ শুধু চীন ও ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতকে আক্রমণ করে চীন প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক বিশ্বকেই আক্রমণ করেছে এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের স্বার্থেই ভারতকে আজ জয়ী হতে হবে। মালয়ের প্রধানমন্ত্রীও একই ভাবে বলেছেন, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, সমগ্র এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম। তাই সমগ্র এশিয়াই আজ ভারতের সমর্থক। মালয়ের অন্যতম মন্ত্রীর সহধর্মিণী শ্রীমতী দাতিন শম্বানাথন রাষ্ট্রীয় সফর কালে গত ৩০শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে রক্তদান করেছেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের কল্যাণে। এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু ভারত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই রক্তের পবিত্র বন্ধনে নতুন করে বর্ধিত হ'ল ভারত ও মালয়ের আত্মীয়তা।

॥ প্রতিরক্ষা দপ্তর ॥

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে স্বয়ং প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রাথমিক বিপর্যয়ের জন্য দেশবাসী প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনবধানতাকেই দায়ী করে এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজ হস্তে ঐ দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়। উপযুক্ত সময়েই প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। আজ আর কোন দেশভক্তের মনে কোন অভিযোগ রইল না। অকুণ্ঠভাবেই সকলে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা প্রয়াসকে সর্বসামর্থ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন। চীনের ভারত আক্রমণ ও আক্রমণকারী চীনকে রাশিয়ার সমর্থন এবং সেই সঙ্গে

॥ কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥
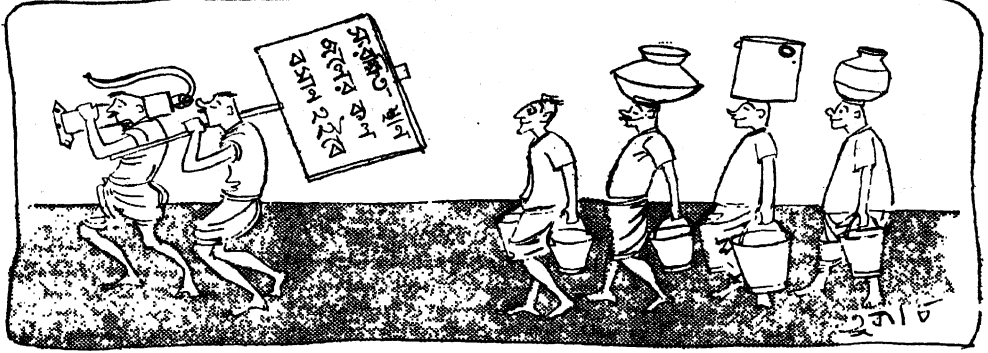
ভারতকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শক্তি-বর্গের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন অতি দ্রুতগতিতে ঘটে গেছে তাতে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এখনও শ্রীমেননের হাতে থাকাটা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হত। আমরা উপযুক্ত মুহূর্তে ভারত সরকারের এই যথোচিত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।

॥ রাশিয়ার মনোভাব ॥

ভারত সীমান্তের উপর চীনের দাবী সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন গত কয়-বছর সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে আসছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নীরবতার একটা বিশেষ নৈতিক মূল্য ছিল ভারতের কাছে। কমিউনিস্ট শিবির-ভুক্ত চীনের সঙ্গে অকমিউনিস্ট ভারতের বিরোধে প্রমাণ হচ্ছিল যে, ভারতের বিরুদ্ধে চীনের দাবী সোভিয়েট ইউ-নিয়নের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। এই মনোভাব যদি চীনের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হওয়ার পরেও সোভিয়েট ইউনিয়ন অপরিবর্তিত রাখ-তেন তবে কমিউনিস্ট চীনের উপর এদেশের লোক বীতশ্রদ্ধ হলেও কমিউ-নিজমের উপর হয়ত সম্পূর্ণ আস্থা হারাত না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার পূর্বের নির-পেক্ষ নীতি ত্যাগ করে আক্রমকারী চীনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে-ছেন। অতীতে বহু প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার পরম সুহৃদরূপে পেয়েছে, তার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ এই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনের মুহূর্তে দেখা গেল সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত-আক্রমণকারী চীনের বন্ধু। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও কয়েক সহস্র ভারতীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে চীন যে আত্মসমর্পণের তিন দফা শর্ত পেশ করেছিল ভারতের কাছে, তাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ গঠনমূলক প্রস্তাব বলে সমর্থন জানিয়েছেন এবং ভারতকে বলেছেন কোন শর্ত আরোপ না করে চীনের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু করতে। অর্থাৎ, রাশিয়ার দাবী আজ, "সাম্রাজ্যবাদ"-সৃষ্ট সীমান্ত বজায় রাখার জিদ না করে ভারত যেন অবিলম্বে বিনা শর্তে চীনের তিন দফা "গঠনমূলক" প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, পররাজ্য আক্রমণকারী চীনকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই আমরা করব না। আর রাশিয়া যতদিন তার বর্তমান মনোভাব অপরিবর্তিত রাখবে ততদিন আমরা তাকে আমাদের শত্রুর বন্ধু বলেই মনে করব।

॥ জেনারেল দ্য গল ॥

ফ্রান্সের সবকটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনারেল দ্য গল গণভোটে জয়ী হয়েছেন। দ্য গল অবশ্য এই জয়কে শুধু সাফল্যই বলেছেন, বিরাট জয় বলে মনে করেননি। কারণ তিনি বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি ফ্রান্সের ভোটদাতাদের শতকরা ষাটটি ভোট প্রদত্ত হয় তবে তাকে তিনি শুধু সাফল্য বলে মনে করবেন। আর জয়ী হয়েছেন বলে ভাবতে পারবেন যদি শতকরা পঁয়ষট্টি ভোট তাঁর পক্ষে পড়ে। তিনি কিঞ্চিদধিক শতকরা একষট্টি ভোট পেয়েছেন। কিন্তু যে বিরাট রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি এত ভোট পেয়েছেন তাতে এ সাফল্যকেও তিনি অনায়াসে বিপুল সাফল্য বলে মনে করতে পারতেন।

ঠিক নির্বাচনের পূর্বে কিউবাকে কেন্দ্র করে যে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয় সেটা দ্য গলের সাফল্যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে মনে হয়। চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি-পদ সৃষ্টির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে ফ্রান্সের জনসাধারণ এই কথাটাই জানালেন যে, দৃঢ় হস্তে স্থায়ী শাসনব্যবস্থাই তাদের কাম্য। ক্ষণভঙ্গুর সংসদীয় রাজনীতির সেই পুরাতন দিনে আর তারা ফিরে যেতে চান না।

॥ ডঃ সুরেন সেন ॥

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোকগমন করলেন। অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাতীয় দলিলাগারের অধ্যক্ষ রূপে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন এই পণ্ডিত আপন প্রতিভাবলে স্বীয় মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মহারাষ্ট্রের ইতিহাসকাররূপেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছত্রপতি শিবাজী, মারাঠী-দের শাসন-প্রণালী, মারাঠীদের যুদ্ধ-প্রণালী, শিবাজীর জীবন সম্বন্ধে বিদেশী গ্রন্থকারগণ। এগুলি সবই ইংরেজি ভাষায় লেখা। তাঁর বাঙলা রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য 'অশোক', 'হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়' ইত্যাদি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়েও তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

॥ ঘরে ॥

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : নেফা অঞ্চলে চীনা হানাদারদের ত্রিমুখী অভিযানের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের বীরোচিত সংগ্রাম—প্রচণ্ড লড়াই-এর পর হিমালয়ের মঠ-শহর তাওয়াং ত্যাগ—লাডাকের চুসুলে চীনা আক্রমণ প্রতিহত ও একটি ঘাঁটি হইতে শত্রু বিতাড়িত।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : 'নেফা অঞ্চলের সামরিক বিপর্যয়ে হতাশার কারণ নাই'—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা। রাষ্ট্রপতির (ডঃ রাধাকৃষ্ণ) দাবী : চীনা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

হানাদার চীনা বাহিনী কর্তৃক নেফার সিয়াং ডিভিশনে ভারতের আরও দুইটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি আক্রান্ত—ভারতীয় সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধ।

'প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) স্বহস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করুন'—শ্রীরাজাগোপালাচারীর দৃঢ় দাবী।

২৬শে অক্টোবর —৯ই কার্তিক : সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা—চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স জারী—শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নেতৃত্বে আপৎকালীন মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন।

নেফার বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি—জং-এ প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বহু চীনা সৈন্য হতাহত—ওয়ালঙের নিকটে দুইটি চীনা আক্রমণ প্রতিহত করার সংবাদ।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে জনচিত্তে দুর্জয় সংকল্প—চীনা হানাদারদের বিতাড়নের জন্য সর্বত্র প্রস্তুতি—ময়দানে (কলিকাতা) বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান— সভাপতি : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

আপৎকালীন অবস্থাধীনে দেশের সমস্ত উপ-নির্বাচন (লোকসভা ও বিধানসভা) বাতিল—নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক : নেফার তিনটি এলাকায় শত্রুসৈন্য (চীনা) পর্যুদস্ত—লাডাক রণাঙ্গনের অপরিবর্তিত অবস্থা।

বিভিন্ন বন্ধু-রাষ্ট্রের নিকট ভারতের অস্ত্র প্রার্থনা—প্রেসিডেন্ট কেনেডির (আমেরিকা) নিকট শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত পত্র।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত—চেয়ারম্যান : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক : লডাকে তীব্র চীনা আক্রমণ প্রতিহত —চাংলা ছাড়া সব ঘাঁটিতেই ভারতীয় সৈন্যের অপূর্ব বীরত্ব।

কলিকাতায় বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় চীনাগণ কর্তৃক কম্যুনিস্ট হানাদারদের (চীনা) তীব্র নিন্দা।

কঙ্গো হইতে ভারতীয় সৈনাদের ফিরাইয়া আনার দাবী—প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেঃ থিমায়ার প্রস্তাব।

টাকীতে (২৪-পরগণা) পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রথম মফঃস্বল বৈঠকের অনুষ্ঠান—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানকল্পে দেশবাসীর প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আহ্বান জ্ঞাপন।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক : ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্যদানে আমেরিকা প্রস্তুত—শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট কেনেডির পত্র—সপ্তাহকাল মধ্যেই মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের প্রথম চালান ভারতে পৌঁছিবে বলিয়া আশ্বাস দান—অস্ত্রবাহী দুইখানি বৃটিশ বিমানের ভারত যাত্রা।

নূতন সৈন্য আনিয়া লডাকে চীনা হানাদারদের প্রবল চাপ—ভারতীয় বাহিনীর দামচক ও জারা-লা ত্যাগ—নেফা রণাঙ্গনের স্থানে স্থানে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময়।

'আক্রমণকারী চীনের সহিত এখনই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে না' —শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক : নেফায় ভারতীয় সৈনাদের পাল্টা আঘাত শুরু—জং-এর নিকট চীনা ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ—ভারতের সর্বপ্রথম কামান ও মর্টার ব্যবহার।

'সকল রণাঙ্গনেই ভারতীয় বাহিনী শত্রুদের (চীনা) প্রতিরোধ করিতে পারিবে'—ভারতীয় স্থল সৈন্যাধ্যক্ষ জেঃ পি এন থাপারের ঘোষণা।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের (৭২) জীবনাবসান।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) হস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারার্পণ—শ্রীমেননকে (এ যাবৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) প্রতিরক্ষা উপকরণ উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত।

লডাক ও নেফা রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত—জং-এর নিকট চীনা ঘাঁটির উপর আবার গুলীবর্ষণ।

ভারতে চীনাদের অবাঞ্ছিত কার্য বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী।

॥ বাইরে ॥

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট কর্তৃক কিউবা ব্যাপারে রুশ-মার্কিন বিরোধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব—দুই-তিন সপ্তাহের জন্য ক্রুশ্চেভকে (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কিউবায় অস্ত্র প্রেরণ এবং কেনেডিকে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) অবরোধ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : কিউবাগামী সোভিয়েট জাহাজের গতিরোধ ও পরে যাইতে অনুমতি দান—মার্কিন সরকারের ঘোষণা—অন্ততঃ ১২ খানি সোভিয়েট জাহাজের প্রত্যাবর্তন।

'সীমান্ত বিরোধ (চীন-ভারত) সম্পর্কে সর্বশেষ চীনা প্রস্তাব গঠনমূলক'—সোভিয়েট সরকারের মুখপাত্র প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য—শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধ মীমাংসার সুপারিশ।

২৬শে অক্টোবর—৯ই কার্তিক : শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট নাসেরের (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) দ্বিতীয় জরুরী লিপি প্রেরণ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের প্রস্তাবে ভারতের সমর্থন দান।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক : 'কিউবার সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিসমূহ না ভাঙ্গিলে আলোচনা হইতে পারে না'—ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) প্রস্তাবের উত্তরে আমেরিকার স্পষ্টোক্তি।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক : কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি অপসারণে ক্রুশ্চেভের নির্দেশ—কেনেডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) নিকট সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর পত্র—রুশিয়াকে কেনেডির আশ্বাস : আমেরিকা কিউবা আক্রমণ করিবে না।

ফ্রান্সে দ্য গলের (প্রেসিডেন্ট) প্রস্তাবের (প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা ফ্রান্সের ভাবী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন) উপর গণভোট গ্রহণ।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক : ভারতকে বৃটেন ও আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাবে পাকিস্থানের গাত্রদাহ—পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি কর্তৃক কার্য-ব্যবস্থার বিরোধিতা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক : বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান কর্তৃক ভারতকে পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য করার আশ্বাসদান।

'চীনকে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে'— রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীচক্রবর্তী কর্তৃক আলোচনার ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য বিশ্লেষণ।

কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রহণ করার সোভিয়েট প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পুনরায় অগ্রাহ্য।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক : চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ অবসানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের ৪-দফা প্রস্তাব।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ সাগরসংগমে ॥

রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সব গবেষণা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্য চিরকালিক। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত রবীন্দ্র-সাগর মন্থন করে রত্নরাজি আহরণ করেছেন। বিভিন্ন ভাবে, বিচিত্র ভঙ্গিতে তা প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রানুরাগী সাহিত্য-পাঠকের যে অনেক সুবিধা হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

অনেক সংকলন-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে. রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের সাহিত্য-সাধকরা যে-সব আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সেই সমস্ত সংকলন-গ্রন্থে তা সংযোজিত হয়েছে। আলোচনাকারীরা এ যুগের দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার করেছেন, মুগ্ধ ভক্তের অনুরাগ, বিস্ময় এবং উচ্ছ্বাস থেকে সে সব রচনা যে সর্বদা মুক্ত তাও বলা যায় না।

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বিশেষ শ্রম সহকারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের সমকালীনরা যে সব আলোচনা করেছিলেন তা সংকলন করে 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' সম্পাদনা করেছেন। তা ছাড়া এই গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় টীকা, টিপ্পনী ও মন্তব্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় সাহিত্যানুরাগী ও গবেষক উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই এক মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচ্য হবে।

সম্পাদক এই সমস্ত রচনাদি বিভিন্ন প্রাচীন পত্র-পত্রিকা বা দুর্লভ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই সব রচনাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হওয়ায় এবং গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে কালক্রমে বিস্মৃতির অতলগর্ভে হয়ত লীন হয়ে যেত. রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সেকালের সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দ কি ভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন. তাঁদের চোখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন যথাযথ বা অসার্থক হয়েছিল তা জানার সুযোগ পাওয়া যাবে 'রবীন্দ্র সাগর সংগমে' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে।

চন্দ্রনাথ বসু ১৩০৭ সনের ৩০শে শ্রাবণ অর্থাৎ আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেছিলেন 'কণিকা, কথা, কল্পনা ও ক্ষণিকা' পর পর পাঠ করার পর—তার শেষাংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি, যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, উর্ধ্বদেশের— মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।"

তরুণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবীণ চন্দ্রনাথ সেদিন যেকথা বলেছিলেন তা আক্ষরিকভাবে সত্য। কে পারে রবীন্দ্র-সাগরের পরিমাপ করতে? প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায়। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই সমালোচনা সহ্য হলেও নিত্যকৃষ্ণ বসু সহ্য করতে পারেন নি, তিনি প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনাকে 'মানসী মঙ্গল কাব্য' বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং 'ভক্ত ও গোঁড়া মহাশয়দিগের অযথা স্তুতিবাদে কাব্য-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে' বলে আক্ষেপ করেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কিন্তু 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন "রবিবাবুর এই বই অতঃপর 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধহয়, ভাল হয়। কারণ তাঁহার এই 'চোখের বালি' বঙ্কিমবাবুর হউক, তাঁহার হউক আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চুনকালি মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত। মাসে মাসে পূর্ব নামজাদা 'মান্যমান' লোকের মুখময় চুনকালি মাখানটা ভাল দেখায় কি?"

১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রবাবুর গল্প' এই শিরোনামায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের' সম্পর্কে লিখেছেন—"রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার, তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।"

যে-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

'কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব?" তাঁহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র, সে রবিবাবুর minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু! শুধু পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ংকর!"

সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পাঠ করে এমনই মুগ্ধ হন যে অমূল্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রসংগে বলেন ঃ

গোরা উপন্যাসখানি Vicar of Wakefield-এর ধরণে লিখিত। ইহা শুধু উপন্যাস নহে। ধর্মগ্রন্থ। একদিকে যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কেবল কৌতূহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্যদিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। এ উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব।"

দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যুক্তি করেন নি, আজো বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষের উপন্যাস বিভাগে 'গোরা'কে অতিক্রম করার মত উপন্যাস প্রকাশিত হয় নি। একথা একজন বিখ্যাত সমালোচকের উক্তি।

'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় দর্শনান্তে 'পঞ্চানন্দ' বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে-রিপোর্ট রচনা করেন, তা এক হিসাবে এক অপূর্ব দলিল. এই জাতীয় রচনা-রীতির বর্তমানে প্রচলন নেই, কিন্তু মুন্সিয়ানায় ও সাহিত্যরসে যে অসামান্য সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'তে ফাল্গুন ১২৮৭ সালে লিখেছিলেন—"যেখানে বাল্মীকির কাব্যপ্রভা, যেখানে মূর্তিমতী প্রতিভা (প্রতিভাসুন্দরী দেবী), যেখান সঙ্গীতের নিসর্গ শোভা—সে যদি স্বর্গ না হয়, তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করিতে হয়।"

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২৯০ সালের ২রা আষাঢ় 'এডুকেশন গেজেট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'প্রভাত সংগীতে'র সমালোচনায় বলেছেন—রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত আর্য কবি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 'আর্য কবি' বলিলাম এইজন্য যে, তাঁহার হৃদয় প্রকৃতি-শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে, যাহা প্রাচীন আর্য কবিদের হইত!" বিস্তারিত সমালোচনা এবং প্রচুর উদ্ধৃতি, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সমালোচক যেখানে কবির সংগে একমত ন'ন সেখানে নিজে কবিতাটির পরিবর্তিত আকার রচনা করে কি হওয়া উচিত, তা বলেছেন। এই জাতীয় সমালোচনা আজ কোথায়?

বিরূপতারও অভাব নেই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতিরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অস্বীকার করার চেষ্টা করে নিজেদেরই হিমালয়সদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। সুরেশ সমাজপতিকে বাংলা সাহিত্যের অভিভাবক হিসাবে অনেকে আজো উল্লেখ করেন, কিন্তু যিনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা'র অন্ধ অনুকরণ 'চোখের বালি' মনে করেন, তাঁর সাহিত্য-জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এই কারণে কিছু রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনাকে এদিনের শান্ত পরিবেশে বিচার করলে নিছক গাত্রদাহ ভিন্ন আর কিছু মনে করার হেতু নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল, হয়ত 'প্রোফেসন্যাল জেলাসি'ও ছিল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল শিল্পী হিসাবে মহৎ তাই তাঁর 'গোরা' উপন্যাসকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে বাধেনি।

অমরেন্দ্র রায়কে আজও যে মানুষ স্মরণে রেখেছে সে শুধু রবীন্দ্রনাথকে তিনি রবিয়ানায় অসংখ্য কটু উক্তি করেছিলেন বলে। অরসিক রায় এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন ডঃ শচীন সেন (বর্তমানে ইণ্ডিয়ান নেশন-এর সম্পাদক), সজনীকান্ত দাশ সেই ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রনাথকে ঠুকেছিলেন সেও আর এক প্রকারের গাত্রদাহ। তবে, সজনীকান্ত কবির জীবদ্দশায় নিজের ত্রুটিস্বীকার করে পরে আন্তরিক রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায় এই সব আলোচনা একত্র সাজিয়ে পরিবেশন করায় ফলে নিরপেক্ষ পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধা হবে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গল্পকার), রমণীমোহন ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, চন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন রায়, নিশিকান্ত দেব, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সরসীলাল সরকার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বসু, মোহিতলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু এবং যাঁদের নাম আলোচনা প্রসংগে উল্লিখিত, এমন সাঁইত্রিশজন লেখকের প্রবন্ধ ব্যতীত পরিশিষ্ট বিভাগে আরো একত্রিশ জনের আলোচনা আছে যাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উল্লেখনীয়। এ ছাড়া সাহিত্য, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, মালঞ্চ, অর্চনা, কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রসংগে রবীন্দ্রালোচনা ও পত্রিকাগুলির পরিচয়ও আছে। প্রাচীনকালের এই সব লেখকগণের চিত্রসম্বলিত হওয়ায় গ্রন্থটি আরো আকর্ষণমূলক হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় পর্বে বাংলা সাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, বিশু মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-সাগর সংগমে' তা অশেষ শ্রমসহকারে একত্রে সন্নিবেশিত করার জন্য অভিনন্দনযোগ্য। ভারত সরকারের গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যের মন্ত্রণালয় এই গ্রন্থের আংশিক ব্যয়ভার বহন করায় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

রবীন্দ্র-সাগরসংগমে ॥ বিশু মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সনস্ লিঃ ঃ কলিকাতা ১২ ॥ দাম দশ টাকা

নতুন বই

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (১৯৫৯-১৯৬০)— (বাংলা বিভাগ) বি, এস কেশবন সম্পাদিত। সহঃ-সম্পাদক—সুনীলবিহারী ঘোষ ও অশোককুমার বিশ্বাস। স্টেট ব্যুরো অব এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক প্রকাশিক। মূল্য ৭·৫০ নয়া পয়সা।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৭-র অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের তালিকা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যের উন্নয়ন এবং গবেষণা ও পঠন-পাঠনে'র সুবিধার জন্য ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয় যে-সব প্রধান পরিকল্পনা এই গ্রন্থ-পঞ্জী প্রকাশ তার

অন্যতম। এই নূতন পরিকল্পনানুসারে জাতীয় গ্রন্থাগার যে সমস্ত গ্রন্থাদি পেয়ে থাকেন এই গ্রন্থ-পঞ্জী তারই এক প্রামাণ্য তালিকা। প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদি ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদিও এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র স্বরলিপি, মানচিত্র, পত্রিকা ও সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তকের অর্থ, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশন যথা ক্যাটালগ, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রচার-পুস্তিকা, সস্তা ধরণের উপন্যাস প্রভৃতি এই তালিকা বহির্ভূত। প্রতি তিন মাস অন্তর একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রথম। এই গ্রন্থপঞ্জী দুভাগে বিভক্ত। বিষয়ানুযায়ী বর্গীকৃত অংশ এবং বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট আর এক অংশ। বর্গীকৃত বিভাগস্থ গ্রন্থগুলি ডিউই-দশমিক বর্গীকরণের প্রামাণ্য সংস্করণানুযায়ী অনুসৃত। কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর প্রাপ্ত গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামানুসারে বিন্যস্ত। গ্রন্থকারের একাধিক গ্রন্থ উল্লেখ কালে তাঁর নামের পুনরাবৃত্তি করা থাকে না। অভারতীয় গ্রন্থকারদের নাম প্রথমে বাংলায়, পরে বন্ধনীর মধ্যে রোমান অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। নির্ঘণ্ট অংশে গ্রন্থকারের নাম, বিষয়, সম্পাদক, অনুবাদক, গ্রন্থমালা ইত্যাদি সকল প্রকার তথ্য বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। এই গ্রন্থ-সংকলনের মধ্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকাও দেওয়া আছে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে একটি প্রকাশক তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য এবং ডেলিভারি অব বুকস অ্যান্ড নিউজপেপার্স (পাবলিক লাইব্রেরিস অ্যাক্ট) সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থপঞ্জীটির মূল্য অধিকতর বর্ধিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বি, এস, কেশবন মহাশয় বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে তাঁর নিষ্ঠা ও নিরলস শ্রমের জন্য সুপরিচিত। এই মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জীটি যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে তিনি যে বলিষ্ঠ কল্পনা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর সহকারীবৃন্দের কৃতিত্বও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার্য। সাহিত্য-সাধক, পাঠক, পাঠাগার পরিচালক প্রকাশক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে গ্রন্থপঞ্জীটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মধুসূদন ও উত্তরকাল— (সংকলন গ্রন্থ) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা—কলিকাতা —১২। মূল্য—পাঁচ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, অবিস্মরণীয় চরিত্র। মধুসূদন দত্তের বিচিত্র জীবনী প্রসঙ্গে যা তাঁর কবি-কৃতি সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুসূদনের উত্তরসূরীদের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন নিঃসংশয়ে মূল্যবান।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপক্ষ' সংকলনটি সম্পাদনা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, 'মধুসূদন ও উত্তরকালে' তাঁর পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রইল। এই সংকলনে বিষ্ণুদের 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স', রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'মধুসূদনের পত্র-সাহিত্য', কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', আলোক সরকারের 'চতুর্দশপদীর ভূমিকা', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'মধুসূদন ও আধুনিক মন', অশ্রুকুমার সিকদারের 'মেঘনাদবধ ঃ কাব্য-নাট্যের সম্ভাবনা', মানস রায়চৌধুরীর 'কবিত্বের মূল্যায়ন ও মধুসূদন', কৃষ্ণ ধরের 'মধুসূদন ঃ প্রথম স্বধর্মী কবি', অতীন্দ্র মজুমদারের—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাইকেল, মনুষ্যত্ব ও সাম্প্রতিক চিন্তা' প্রভৃতি দশটি নির্বাচিত প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। সূচীপত্রের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মধুসূদনের প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে এ যুগের শক্তিমান সাহিত্য-সাধকেরা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে আছে বিশ্লেষক বৈচিত্র্য। বিষ্ণু দের 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধটি দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ, প্রবীণ কবি বিষ্ণু দে বলেছেন যে শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি' একথা ঠিক। মধুসূদনের প্রতিভার সুযোগ আমরা যেন হেলায় হারিয়েছি। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'মধুসূদন ও আধুনিক মন' প্রবন্ধটিও মূল্যবান। তিনি বলেছেন 'মধুসূদনকে আমরা সাম্প্রতিকতার সংস্কার নিয়ে স্পর্শ করতে গেলে তিনি ধরা দেবেন না।' একথা প্রণিধানযোগ্য। অশ্রুকুমার সিকদারের 'মেঘনাদবধ ঃ কাব্য-নাট্য সম্ভাবনা' প্রবন্ধটিও সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। পরিশেষে অতীন্দ্র মজুমদারের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাইকেল, মনুষ্যত্ব ও সাম্প্রতিক চিন্তা' প্রবন্ধ দুটিতে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের পুনর্বাসনের জন্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। মণীন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছদটি প্রশংসনীয়।

শতাব্দী শতক— (কাব্য-সংকলন)— সম্পাদনা ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কাব্য সংকলন। ১৮৬১-১৯৬১ পর্যন্ত কালসীমায় এক'শ জন কবির কবিতা আছে। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে কবিতা-রচনায় যে বিবর্তন ধারা অন্তরালে সক্রিয় ছিল তা সহজেই এই সংকলন থেকে উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরুণতম ক্ষমতাশালী কবিদের স্থান লাভ। এ ধরণের কাব্য-সংকলনে যে সমস্ত পূর্বসূরীর রচনা স্থান পায় আধুনিক কাব্য-পাঠকের রুচিবোধের সঙ্গে তার মিল না হলেও কাব্য-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য কবিতাগুলির প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। সম্পাদকদ্বয় বিহারীলাল থেকে শুরু করে কাব্য-জগতের তরুণতম প্রতিনিধিদের তুলে ধরেছেন তা সুযোগ্যতা ও সুবিবেচনা প্রসূত। ভূমিকাটি সুলিখিত।

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে— জন স্টুয়ার্ট মিল। অনুবাদক—অধ্যাপক রাখাল দত্ত। প্রকাশক ঃ সমাজ বিদ্যাভবন; মূল্য ১.০০

জন স্টুয়ার্ট মিল নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতে এক উজ্জ্বল প্রতীক, এবং 'অন লিবার্টি' তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের সর্বৈব মুক্তির জন্য মিলের এই গ্রন্থটি বহু সমাদৃত। ছাত্রদের কাছেও এই অনুবাদটির সমাদর হবে, আশা করা যায়।

অনুবাদের ভাষা পরিষ্কার। ছাপাও সুন্দর।

গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি— জন এইচ হলওয়েল। অনুবাদক—শ্রীঅধীরকুমার রাহা। প্রকাশক ঃ সমাজ বিদ্যাভবন; মূল্য '৭৫ নয়া পয়সা।

গণতন্ত্রের বিষয়ে নানারকম চিন্তা আছে। বিশিষ্ট অধ্যাপক জন হলওয়েলের 'গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি' গ্রন্থটি লেখকের রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার বিশিষ্ট রূপায়ণ। লেখকের মতে গণতন্ত্র স্থির..

গ্রীক ও খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি। সেই ঐতিহ্যের প্রকৃতির নীতি ও মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতিরূপ ব্যতীত এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বর্তমানে গণতন্ত্রের সংকটাবস্থায় এই সুমুদ্রিত অনুবাদটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সামূহিক বিকাশ— এস, কে, দে, থ্যাকার স্পিংক এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড : দাম ন' টাকা।

ভারতের সমাজ জীবন ও অর্থ-নীতিতে নানাবিধ বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে চলেছে। শ্রীযুক্ত এস, কে, দে ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়াও কর্মব্যপদেশে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সংগে সংযুক্ত। নানা সময়ে তিনি দেশের সামাজিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপরে বহুবিধ মতামত প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করেছেন। 'সামূহিক বিকাশ' বইখানি তাঁর ইংরাজীতে লেখা নিবন্ধসমূহের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ প্রশংসনীয়, শ্রীযুক্ত এস, কে, দে স্বদেশের জাতীয় সম্প্রসারণ স্কীমের অগ্রগমনের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের একজন যোগ্য অংশীদার হিসাবে বহু জটিল সমস্যার সরল সমাধান রেখেছেন। তথাপি বহুবিধ মতামত ও মনোভাব অতিউক্তির বাক্যবিন্যাসে বিবৃত বলে অতিসরলীকরণ মনে হতে পারে। বইখানি সুমুদ্রিত, কিন্তু উচ্চ মূল্যের।

নীরজা: মহেশ ভরদ্বাজ : বি বি প্রকাশনী : ৭৬।২ (X—৯) কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : দাম পাঁচ টাকা।

সম্প্রতি উপন্যাসে মননধর্মিতার পক্ষে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং যেহেতু সেটা ঝোঁক, তাই মননশীলতার রসদ সংগ্রহ না করেই বিপজ্জনক 'মননশীল' উপন্যাস তরুণতরদের হাত দিয়ে সচারাচব বার হচ্ছে যার পক্ষে কিছু বলা বেশ কঠিন। মহেশ ভরদ্বাজের 'নীরজা' যদি ব্যতিক্রম হত তবে সুখী হবার কারণ থাকতো। যে প্রশ্ন "নার্সিং হোমে" গিয়ে সমাধান হয়ে যেতে পারে তার জন্য এত পরিশ্রম ও মননশীল বিশ্লেষণের কি দরকার ছিল তা বোঝা যায় না। এই রকমের সমাধান বহু আগেই করা যেত এবং তাতে চরিত্র, যদি কোন চরিত্র তৈরি হয়ে থাকে, ধার ও আলো হারাতো না। তবে লেখকের বাংলা লেখার ক্ষমতার প্রশংসা করতেই হয়। বেশ ঝরঝরে বাংলা তিনি লিখতে পারেন। এইটে আবার দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে যখন দেখি চারপাশে চিন্তার আকালের দিনে আরও একজন অনাথের সংখ্যা বাড়লো। তবু এই উপন্যাস এক নিশ্বাসে পড়া যায়। এই লেখকের কাছে পাঠকেরা কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন।

রাগরূপ: সুনীল চট্টোপাধ্যায় : পরিবেশক বামা পুস্তকালয়, ১১-এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ : দাম চার টাকা।

কবি হিসাবে সুনীল চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের কাছে পরিচিত। তাই তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। 'নাবী ফসলের' পর 'রাগরূপ' সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু নাবী ফসলের সুনীল চট্টোপাধ্যায় রাগরূপে অন্যভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছেন এবং এই পরিবর্তন কাউকে আশ্বস্থ আবার কাউকে উদ্বিগ্ন করবে। এই পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ না করেও বলা যায় যে, রাগরূপের অধিকাংশ কবিতায় কবির বলিষ্ঠতা বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। চিত্রকল্পের ব্যবহারে ও শব্দ যোজনার দক্ষতায় অনেকগুলি কবিতা হীরক-দীপ্তি অর্জন করতে পেরেছে। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ভক্ত পাঠকেরা তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সচেষ্ট-মেটা-ফিজিক্যাল এবং করুণ ধোঁয়াটে আবিলতায় ধিক্কার হেনে তিনি কি নিষ্ঠার প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর শোনাতে পারেন না?

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বৈতানিক (শারদ সাহিত্য সংকলন)— সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

বর্তমান সংখ্যা 'বৈতানিক' পূর্ববতী সংখ্যার থেকে আরও আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিতরূপে প্রকাশিত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবব্রত মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, জয়াসত্ব, গুরুদাস ভট্টাচার্য, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, জাঁ পল সার্ত্রে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, ডি এচ লরেন্স, শার্ল বদলেয়র, পল এলুয়ার, রবার্ট গ্রেভস, রবার্ট ফ্রস্ট, হো চি মিন এবং আরো অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি নানাবিধ কারণে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের গ্রাম (শারদীয়া : ১৩৬৯)— সম্পাদক শতদল গোস্বামী ও সুনীল ভট্টাচার্য। ৪।২, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫, থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা মাত্র।

এই অভিজাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যাটি সুনির্বাচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা এবং ফটো, কার্টুন, স্কেচ প্রভৃতির সম্ভারে সজ্জিত। প্রায় প্রতিটি রচনাই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বর্তমান সংখ্যার লিখেছেন—বনফুল, পরিমল গোস্বামী, হাসিরাশি দেবী, মায়া বসু, সুশীল রায়, শতদল গোস্বামী, কৃষ্ণ ধর, সুনীল বসু, অবিনাশ রায়, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, দিলীপ মালাকার, অন্নদা মুন্সী এবং আরো অনেকে। সুধীর মৈত্রের অঙ্কিত কভার উল্লেখযোগ্য। মূল্যের তুলনায় কাগজ বাস্তবিকই উৎকৃষ্ট।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥ বাঙলার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা ॥

বিডন স্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাত ধ'রে যদি পশ্চিম মুখো কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দিক থেকে চিৎপুর রোডের দিকে হে'টে যাওয়া যায়, তা'হলে যেখানে চিৎপুর রোডের মুখে এসে বিডন স্ট্রীটের ফুটপাতটি শেষ হয়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে ঠিক উল্টো দিকে চিৎপুর রোড এবং নিমতলাঘাট স্ট্রীটের মোড়ে একটি দোতলা নীচু বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়, যার দোতলার সরু বারান্দাটি ঐ চিৎপুর রোডেরই ওপরে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখতুম, ঐ দোতলার বারান্দায় কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড আটকানো; তাতে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি, এবং বড়দের মুখে শুনেছিলুম, ঐ মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি'ই ছিল সে-যুগের পেশাদারী যাত্রাদলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে চিৎপুর রোড ধ'রে উত্তরমুখো কয়েক পা গেলেই রাস্তার পশ্চিম দিকের কয়েকটি বাড়ীর বারান্দায় আরও কয়েকটি ছোট-মাঝারি সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যেত, যাতে লেখা থাকত—'ভাণ্ডারী অপেরা', 'আর্য অপেরা', 'গণেশ অপেরা', 'বীণাপাণি অপেরা', 'সত্যাম্বর অপেরা' প্রভৃতি। সবগুলিই পেশাদারী যাত্রাদলের নাম।

অগ্রদূত পরিচালিত 'নবদিগন্ত' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

চিৎপুরের এই গরাণহাটা অঞ্চলেই যাত্রা দলের আড্ডা। তখনো ছিল আজও আছে। যে-সময়ের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে ১৯১৪।১৫ থেকে ১৯২০।২১-এর মাঝে। যাত্রাদলগুলির নাম শুনেই কারুরই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, সাধারণ রংগমঞ্চের প্রভাব তখনই ওদের ওপর এসে পড়েছে; খাঁটী 'যাত্রাত্ব' ওরা তখনই হারিয়েছে; কলকাতার পেশাদারী যাত্রাতে তখনই আর জুড়ী-দোহার খুঁজে পাওয়া যেত না। তখনকার আমলের থিয়েটারের ঢংয়ে যাত্রা আরম্ভের আগে দু'বার বাজত কনসার্ট—হার্মোনিয়ম, বেহালা, তবলা ও মৃদংগ, কর্ণেট, ক্ল্যারিওনেট, পিক্কু, মন্দিরা প্রভৃতি ছিল কনসার্টের অংগ। দ্বিতীয়বার কনসার্ট বেজে যাবার পর একটি পেটাঘড়িতে ঘণ্টা পড়ত এবং আসরে অবতীর্ণ হতেন হয় হর-পার্বতী বা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিংবা দু'জন গৈরিক বসনধারী মুনি-ঋষি; এ'রা নাটকের প্রস্তাবনা স্বরূপ দর্শক-সমক্ষে প্রকাশ ক'রে বলতেন, সে-রাত্রির অভিনয়ে নাটকের বিষয়বস্তুটি কি। অনেক সময় প্রস্তাবনাটি শেষ হ'ত কারুর গানের মধ্যে এবং এই প্রস্তাবনার পরেই আসল পালাটি শুরু হ'ত।

কলকাতার পেশাদারী যাত্রায় জুড়ী-দোয়ার্কি না দেখলেও পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি যাত্রাভিনয়ে—সেগুলি পেশা-দারী কিংবা সৌখীন সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল কি না, তা' সঠিক জানা নেই—আমরা ঐ জুরী-দোয়ার্কি-সমেত পূর্ণাঙ্গীণ যাত্রাই দেখেছি।

সে যাত্রা হ'ত পুরো আট-ন' ঘণ্টা ধ'রে এবং তার সময় ছিল দু'রকম। এক বেলা ১টা বা ২টোয় আরম্ভ হয়ে টানা রাত ১০টা পর্যন্ত হ'ত, আর নইলে ঐ রাত ১০টায় আরম্ভ হয়ে সকাল ৬টা/৭টা পুর্য্যন্ত চলত। হাটে, মাঠে, নাট-মণ্ডপে বা জমিদারবাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে—যেখানেই হ'ক না কেন, যাত্রার দলের লোকজনের জন্যে ভুরিভোজের বন্দোবস্ত থাকত; নিয়মিত ভিয়েন বসত তাদের ক্ষুৎপিপাসা মেটাবার জন্যে। তা ছাড়া দিনের বেলা হ'লে থাকত ডাবের ব্যবস্থা এবং রাত্রে হ'লে চায়ের; অবশ্য দিন-মানেও কিছু লোকের চায়েরও চাহিদা ছিল। এর ওপর প্রচুর পানও সরবরাহ করা হত। কিন্তু নেশার জিনিস যা-কিছু সে বিড়ি-সিগারেট-গাঁজাই হোক বা কালী মার্কা ধান্যেশ্বরী অর্থাৎ দেশী মদই হোক, তা' রুচি, অভ্যাস বা প্রয়োজন মাফিক যাত্রাদলের লোকেরা নিজেরাই যোগাড় করতেন। অবশ্য এমন দু'পাঁচজন উৎকট ভক্তের অভাব ছিল না, যাঁরা

নিজের ট্যাঁক খালি ক'রে তাঁদের দাদা বা পিছোদের নেশার সামগ্রী জুগিয়ে আনন্দে গদগদ না হতেন।

যাত্রার আসরের চার কোণে থাকতেন চারজন জুড়ী—পরনে তাঁদের গেরুয়া বা লাল রঙের চাপকান; মাথায় কখনও পাগড়ী থাকত, আবার কখনও কখনও থাকত না। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির কথোপকথন থেকে যখনই কোনো বিশেষ ভাব বা রস উদ্ভব হ'ত, তখনই জুড়ীরা উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরতেন। এই গানের মধ্যে কোনো না কোন পাত্র বা পাত্রীর উক্তি প্রকাশ পেত; রাজার উক্তি, রাণীর উক্তি, দূতের উক্তি, জননীর উক্তি, মন্ত্রীর উক্তি ইত্যাদি। জুড়ীরা দু'লাইন গান গাইবার পর সেই দু'লাইন পুনরাবৃত্তি করত দু'সারিতে চারজন চারজন করে বসা দোহারেরা। তারপর আবার জুড়ীর দল এবং আবার দোহারেরা। এই ভাবে একখানি আট-পংক্তির গান শেষ হ'তে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লেগে যেত। যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, তাঁরাও তাঁদের গুণপনা দেখাতে ছাড়তেন না। একজন জুড়ী একটি বিশেষ পংক্তি নিয়ে তান বা বিস্তার করলে অমনি বেহালা-বাদক বা ক্লারিওনেট-বাদক ঠিক সেই তান বা বিস্তারের কাজ দেখিয়ে বাহাদুরী নিতে ছাড়তেন না এবং বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের কাজ দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর বাহবা এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য পদকও আদায় করতে সমর্থ হ'ত।

শুনেছি, শহুরে পেশাদারী দলকে বায়না দেবার সময়ে পল্লী অঞ্চলের কোনো কোনো জমিদারবাড়ী থেকে ফরমাস করা হ'ত যে, তাঁদের বাড়ীতে জুড়ী-দোয়ার্কি সমেত পূর্ণাঙ্গ যাত্রাভিনয়ই করতে হবে; তার পরিবর্তে তারা পাবে ডবোল মজুরী। এবং ভূষণ-চন্দ্র দাস প্রমুখ যাত্রা দলের অধিকারীরা এই ফরমাস মাফিক যাত্রা করতে স্বীকৃতও হতেন।

কিন্তু শহরে পেশাদারী যাত্রাভিনয় দেখতে পাওয়া যেত এক, কোনো ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরে, আর দুই, কোনো বাজারে এবং উপলক্ষ্য ছিল একই—জন্মাষ্টমী, রাস, শিবচতুর্দশী বা ঐ ধরনের অপর কোনো পর্ব। ধনীগৃহের বিস্তৃত চত্বর তখন সাধারণ নাট্য-সম্প্রদায় (যেমন, ষ্টার, মিনার্ভা), ভ্রাম্যমান পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায় (যেমন, মডেল থিয়েটার, জুবিলী থিয়েটার প্রভৃতি) বা পাড়ার সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কখনও কখনও

প্রভুরাম পিকচার্সের "রাখী" চিত্রে অশোককুমার, ওয়াহিদা রহমান ও অমিতা

সৌখীন যাত্রাভিনয়ও যে না হ'ত, তা নয়; কিন্তু পেশাদারী যাত্রার সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল।

সাধারণ নাট্যালয়ের অনুকরণে পঞ্চাঙ্ক যাত্রাভিনয় শুরু করে মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিই; মথুর সাহাই প্রথম যাত্রাকে থিয়েটারী ঢংয়ে সাজান তাঁর দলের বাঁধা নাট্যকার হরিপদ চট্টো-পাধ্যায়ের সাহায্যে। নীলকণ্ঠ অধিকারী প্রবর্তিত জুড়ী-দোয়ার্কি সমন্বিত কৃষ্ণ-যাত্রার সমাধি রচনা করেন তিনিই। যাত্রা-দলের আসরে আজও যেমন দু'খানি চেয়ার পাতা হয় রাজা, রাণী, বাদশা, নবাব জাতীয় পদস্থ চরিত্রাভিনেতাদের বসবার জন্যে, তখনও তাই পাতা হ'ত; তবে সেই চেয়ার হ'ত কিংখাবে মোড়া বা জরির কাজ করা ভেলভেটের ঢাকা দেওয়া। তাতে বসতেন পৌরাণিক নাট-কের কৃষ্ণ, রাধা, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীরা। জুড়ি-দোয়ার্কি বর্জিত হ'লেও যাত্রাভিনয়ে গানের প্রাধান্য যেমন আগে ছিল, তেমনি আজও আছে। সেই জন্যেই যাত্রাভিনয়ের আর এক নাম হচ্ছে গীতাভিনয় বা অপেরা। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর মালিকানায় ভাণ্ডারী অপেরার খুব নাম ছিল গানের দিক দিয়ে, যেমন ছিল মথুর সাহার যাত্রা পার্টির অভিনয়ের ব্যাপারে। তখনকার পেশা-দারী যাত্রাজগতের দিক্‌পাল নাট্যকার ছিলেন মথুর সাহার দলের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশ অপেরা সম্প্রদায়-ভুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। প্রথমোক্ত হরিপদবাবুই হচ্ছেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে লক্ষাধিকবার অভিনীত চিরনতুন নাটক "জয়দেব"-এর রচয়িতা। এই একখানি মাত্র নাটক তাঁকে বাঙলার নাট্যেতিহাসে অমর ক'রে রেখেছে। এঁরা দুজনই এঁদের নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করতেন প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে। অবশ্য যে-দিন থেকে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার উদ্ভব হয়েছে, সেদিন থেকেই এঁরা মাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিতেও সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারই ফলে জন্ম নিয়েছিল হরিপদবাবুর "পদ্মিনী" ও "রাণী জয়মতী", আর ভোলানাথবাবুর "পঞ্চনদ", "দাক্ষিণাত্য" প্রভৃতি যাত্রা-নাটক। এঁরা ছাড়াও আর একজন শক্তি-মান পালা-লিখিয়ে ছিলেন ভূষণচন্দ্র দাসের দলে; তিনি হচ্ছেন "ধ্রুব", "পরশুরামের মাতৃহত্যা" প্রভৃতির লেখক, রাজপুর-হরিনাভি নিবাসী মতিলাল

বিমল সরকার ও অনিল দত্ত প্রযোজিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে রেণুকা রায় ও তন্দ্রা বর্মণ

ঘোষ। শোনা যায়, মথুর সাহার দলের জন্যে হরিপদবাবু যে "মেঘনাদ" পালা লিখেছিলেন, তার বীররসাশ্রিত ওজস্বিনী ভাষা রচনায় এই মতিলাল ঘোষের যথেষ্টই হাত ছিল। যখন এইভাবে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গীতাভিনয়কে আশ্রয় ক'রে কল্‌কাতার পেশাদারী যাত্রা দল শহর এবং গ্রামাঞ্চলে জনতার আসর মাত ক'রতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় সহসা ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার দল নিয়ে। "মাতৃপূজা", "দেশের ডাক", "পতিতা", "সমাজ" প্রভৃতি পালাভিনয়ের মাধ্যমে তিনি স্বাদেশিকতার স্রোত বইয়ে দিলেন জনমানসে; সেই গেরুয়াবসন-ধারীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত স্বদেশী গানে মত্ত হয়ে উঠত শ্রোতৃবৃন্দ—তাদের দেহের শোণিতে বইত উষ্ণপ্রবাহ। তাই ইংরেজ সরকার মুকুন্দ দাসকে বারংবার পাঠিয়েছেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তাঁর পালাগুলিকে করেছেন বাজেয়াপ্ত।

১৯৩০।৩১ সালের পর থেকে যতই পেশাদারী যাত্রাগুলির কল্‌কাতায় বায়না পাওয়া কম হয়ে যেতে থাকল এবং বাঙলার গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে সুদূর আসাম ও অপর দিকে কোলিয়ারী অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হ'ল, ততই তাদের রূপ পরিবর্তিত হতে লাগল। একদিকে দলের লোকসংখ্যা কমানো প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যেমন কোরাস গান একেবারে তুলে দেওয়া হ'ল, তেমনই আবার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেদের দিয়ে সখী-সঙ্গ তৈরী করা হ'ল; আর নাটকের মধ্যেও এল ভেজাল। পৌরাণিক হয়ে পড়ল একেবারে অপাংক্তেয়; অবিমিশ্র ঐতিহাসিক পালাও হ'ল বর্জিত। তার বদলে কিছুটা ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাকে মূলধন ক'রে তৈরী হতে লাগল সমাজ ও ইতিহাসের কাল্পনিক জগাখিচুড়ী। অত্যাচারীর আক্রমণে দেশের লোক ভীত সন্ত্রস্ত; তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক অসমসাহসী নারী, যে তার গরম বক্তৃতায় চোটে দেশের লোককে করল প্রবুদ্ধ এবং অত্যাচারীকে করল পঙ্গু। কিংবা ঐ রকমই কল্পনায় বলে অত্যাচারির নিজের স্ত্রী, ভাই বা ছেলে হ'ল মানব ও দেশপ্রেমিক এবং মতের গুরুতর পার্থক্যের জন্যে সাময়িকভাবে হ'ল নির্বাসিত বা দেশান্তরী। মোট কথা, এই সব পালায় বাঙলাদেশে মুসলমান শাসনের যুগের কোনো সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে বা মাত্র কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে গ্রন্থকার দর্শকদের খুশী করবার জন্যে একদিকে যেমন দেশাত্ম বা নীতিবোধক দৃশ্যাবলীর অবতারণা করতে শুরু করলেন, অপর দিকে তেমনি তাদের হাসির খোরাক যোগাবার জন্যে ভাঁড়, চাটুকার, স্ত্রৈণ গোছের চরিত্রও আমদানী করতে লাগলেন। অসহায়া নারীর ওপর লম্পটের অত্যাচার এইসব নাটকের আবশ্যিক বিষয়বস্তু। ১৯৩৭।৩৮ থেকে এই ধারাই চ'লে আসছে বাঙলার পেশাদারী যাত্রাজগতে। এবং এই ধরনের নাটক রচনার অবিসংবাদী সম্রাট হচ্ছেন শ্রীব্রজেন দে। তাঁর রচিত "বর্গী এল দেশে" থেকে শুরু ক'রে "লোহার জাল", "সোনাই-দিঘী", "বাঙালী", "গাঁয়ের মেয়ে" প্রভৃতি নাটক যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই আমার কথার যাথার্থ অনুভব করতে পারবেন। এবং প্রধানতঃ তাঁকেই অনুসরণ ক'রে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রভৃতি লেখক অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন যাত্রাদলগুলির জন্যে। কোনো রসবুদ্ধি-সম্পন্ন দর্শককেই যে এই ধরনের নাটক খুশী করতে পারে না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু লেখকেরা জানেন, তাঁদের অযুত দর্শকবৃন্দের মধ্যে ঐ বিশেষ শ্রেণীর দর্শক মাত্র 'কোটীকে গোটিক'। তাই যাদের খুশী করলে যাত্রার দল টি'কবে, পয়সা আসবে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁরা তাঁদের লেখনী চালনা করছেন বিনা দ্বিধায়।

কিন্তু এইবার তাঁদের ধারা পরিবর্তন করবার সময় এসেছে। বাঙলার পেশাদারী যাত্রাদলকে আবার শহরের দর্শকদের সামনে আসর পাততে হচ্ছে—সে-সুযোগ তাদের জীবনে এসেছে। শহরের লোক তাঁদের অভিনয় দেখতে আসছেন কাতারে কাতারে এবং এই অগণিত দর্শকের মধ্যে এমন বহু লোকই আছেন, যাঁরা ইতিহাস বা বাঙলা সমাজের খবর রাখেন। কাজেই কার্যকারণ সম্পর্ক-বিবর্জিত, সম্ভাব্যতার সীমানা অতিক্রম-কারী ঘটনার সমাবেশ দেখলেই তাঁদের মন অতৃপ্তিতে ভ'রে উঠবে। জাতীয় লোক-সংস্কৃতির বাহন যাত্রাকে স্ব-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে হ'লে যাকে আশ্রয় ক'রে অভিনয়টি হয়, সেই নাটককে হ'তে হবে বিশ্বাস্য ঘটনা সংবলিত কুরুচিবর্জিত এবং রসোত্তীর্ণ।

"সেতু"র ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব

গেল শনিবার, ৩রা নভেম্বর বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। এই উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে দেবার জন্যে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকার অর্থমন্ত্রীর হাতে ৭০০্ টাকা ও ৭ ভরি সোনা প্রদান করেন। এছাড়া বিশ্বরূপার অন্যতম শিল্পী জয়শ্রী সেন তাঁর কানের দুল জোড়াও অর্থমন্ত্রীর হাতে অর্পণ করেন। ৭০০ রজনীর স্মারক হিসেবে "সেতু" নাটকের কাহিনীকার, নাট্যকার, আলোক-সম্পাতকারী, রূপসজ্জাকর, বিভিন্ন শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকার যে ভাষণ দেন, তাতে "সেতু"র সাফল্যের কথা বলার পর ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, "দেশের এই আপৎকালে নাট্য শিল্পেরও কর্তব্য আছে। সেই দুরূহ কর্তব্য আজ আমাদের সম্মুখে। আমরা মনে করি যে, আজ নাট্যশালায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক।...... অতীতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ তার কর্তব্য যেমন যথাযথরূপে পালন করেছিল—নাটকের মাধ্যমে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—আজ আবার সেই দায়িত্ব পালনের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। আজ আর পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ নয়। আজ জাতিকে গ্রহণ করতে হবে—স্বাধীন জাতির বিপন্ন মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার শপথ। এই শপথ শুধু সংগ্রামী সৈনিকদের নয়, শুধু রাজনীতিজ্ঞদেরই নয়, এই শপথ সমগ্র দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সঙ্গে দেশের নাট্য শিল্পসাধকদেরও।"

সভাপতির ভাষণে অর্থমন্ত্রী দর্শকবৃন্দকে দেশের সংকট সম্বন্ধে অবহিত ক'রে বলেন, "চীনের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের যে যুদ্ধ, তাতে অংশ গ্রহণ করবার দায়িত্ব সকলেরই। এ যুদ্ধ সৈনিকের যুদ্ধ নয়, সমগ্র দেশবাসীর যুদ্ধ—এটি একটি টোট্যাল ওয়ার।"

সভায় রাসবিহারী সরকার ঘোষণা করেন, যে-সব নাট্যসংস্থা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে এককালীন ২,০০০্ টাকা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেবেন, তাঁদের অভিনয়ের জন্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ বিনা ভাড়ায় দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠান শেষে যথারীতি "সেতু" নাটকের ৭৩১তম অভিনয় সম্পাদিত হয়।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ঃ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে গেল শুক্রবার, ২রা নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বর্তমান চীন-ভারত পরিস্থিতিতে ইতিকর্তব্য নিরূপণের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের পেশাদারী ও অপেশাদারী নাট্যসংস্থা, মঞ্চ-চিত্র-বেতারশিল্পী এবং নৃত্য-গীত-অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট গুণিজনের একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় ভারত সীমান্তে চীনের বর্বরোচিত আক্রমণকে নিন্দা করে বিভিন্ন বক্তার দীপ্ত ভাষণের পর দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে কর্তব্য হিসেবে যে পনেরোটি গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি হচ্ছে এই ঃ

১। বর্তমান মাস থেকে দেশের প্রতিটি ব্যবসায়িক মঞ্চকে প্রতিটি অনুষ্ঠিত অভিনয়ের দরুণ ২০্ টাকা
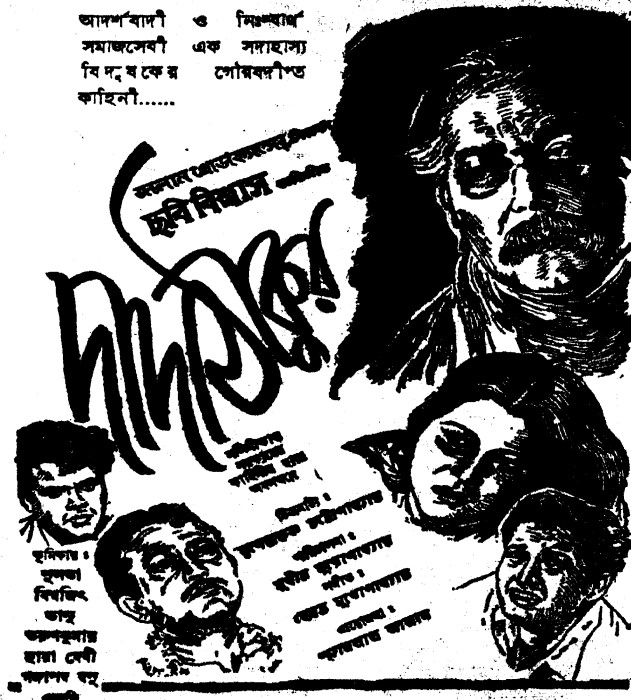
রেনেসাঁস ফিল্ম-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" ছবিতে শংকর, শম্পা ও বাদল। ছবিটি সানফ্রানসিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

হারে ভারতের প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

২। প্রতিটি মঞ্চশিল্পী ও কর্মীকে তাঁর একদিনের প্রাপ্য বেতন প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে দান করার অনুরোধ জানানো হোক।

৩। প্রতিটি নাট্যকারকে তাঁর প্রাপ্য রয়্যালটির দশশতাংশ উক্ত সাহায্য তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

৪। প্রতিটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনাগারকে প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য ৫্ টাকা হারে উক্ত তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

৫। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রকে বর্তমান জাতীয় সংকটে অধিক মাত্রায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশনের অনুরোধ জানানো হোক।

৬। সৌখীন ও পেশাদারী নাট্য সংগঠনগুলিকে দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানানো হোক।

৭। দেশরক্ষা সাহায্য তহবিলের জন্য সম্মিলিত দল ও শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থার উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানানো হোক।

৮। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক নাট্যশালাগুলিকে সাময়িকভাবে বিশেষ প্রদর্শনী মারফৎ অর্থ সংগ্রহ ক'রে দেশরক্ষা সাহায্য তহবিলকে পুষ্ট করতে অনুরোধ জানানো হোক।

নাট্যকার সংঘের প্রস্তাব ঃ

গেল সোমবার, ২৯শে অক্টোবরের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় নাট্যকার সংঘ চীন কর্তৃক ভারতের সীমা লঙ্ঘন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "আমরা বাঙলা দেশের নাট্যকারগণ আমাদের অতীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া জাতির এই সংকটকালে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতেছি......এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প লইতেছি। নাট্যকার সংঘ বাঙলা দেশের দলমতনির্বিশেষে সকল কলাশিল্পী ও সাহিত্যিককে যথাসম্ভব শীঘ্র একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া দেশের সংকটকালে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।... পেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা অবিলম্বে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিবেন।......অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার অটুট সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন।......সরকারী বেতার প্রতিষ্ঠান ও সরকারী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের এই সংকটকালে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যকে সংহত করিবার জন্য সংকটমোচন না হওয়া পর্যন্ত দেশপ্রেমমূলক নাটকাদির অভিনয়ের আশু ব্যবস্থা করিতে আহ্বান জানাইতেছে।"

আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, যে-সব সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে নাট্যকার সংঘ জাতীয় সংকটকালে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা অবিলম্বে এ'দের ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় কর্তব্য পালনে ব্রতী হবেন।

জালান প্রোডাকসন্স-এর "দাদাঠাকুর" ঃ

আজ শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর জালান প্রোডাকসন্স-এর "দাদাঠাকুর" ছবিখানি একযোগে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং

অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। নলিনীকান্ত সরকারের কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যটিকে পর্দার জন্য রূপায়িত ক'রছেন পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। ছবিখানির নাম-ভূমিকাতে দেখতে পাওয়া যাবে ছবি বিশ্বাসকে এবং অপরাপর চরিত্রে থাকবেন বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, সুলতা, ছায়াদেবী প্রভৃতি। সুরারোপ করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ

পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক জানাচ্ছেন, ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিক মন্ত্রী মাননীয় হুমায়ুন কবীর পরিষদের বিশেষ সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

একটি অসাধারণ নাট্যাভিনয় ঃ

গেল রবিবার, ৪ঠা নভেম্বর, নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত নাট্যসম্প্রদায় "রঙ্গসভা" এমন একখানি নাটককে মঞ্চস্থ করেছিলেন, যাকে অসাধারণ ছাড়া অন্য কিছু বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভব নয়। নাটকখানির নাম "বিপ্লবী ডিরোজিও"। অভিনয় প্রযোজনায় এমন চমৎকার নিখুঁত আমরা সাধারণ পেশাদারী রঙ্গালয়ের কোনো প্রথম নাট্যাভিনয়েও দেখতে পাই নি। শহর কলকাতায় পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়া পত্তনের যাঁরা খবর রাখেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসমাজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম তাঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

জালান প্রোডাকসন্সের 'দাদাঠাকুর' চিত্রের একটি দৃশ্যে নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও ফুলুরিওয়ালা কার্তিকরূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিরিঙ্গী সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে খাঁটী ইংরেজরাও যেমন তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে এসেছে, গোঁড়া হিন্দু বাঙালী সমাজও তেমনি তাঁকে শত্রু মনে করেছে। অথচ অত্যন্ত অল্প বয়সের মধ্যে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তিনি যে-ভাবে এদের তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছিলেন, তাতে তাঁকে একটি লোকোত্তর প্রতিভা ব'লে আখ্যাত করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। মনে-প্রাণে তিনি নিজেকে একজন ভারতীয় ব'লেই জানতেন এবং সেই কারণেই হিন্দু সমাজের অজ্ঞানতাপ্রসূত বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদী মন সৃষ্টি করবার সার্থক প্রয়াস করেছিলেন। মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার তিন চার বছরের মধ্যেই তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ
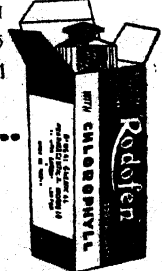
ক'রে তিনি তখনকার গোঁড়া হিন্দু সমাজের পক্ষে এমন বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে সমগ্র ইঙ্গবঙ্গ সমাজে সংক্রামিত হয়ে বাঙলাদেশের সংস্কৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে।

এই বিপ্লবী ডিরোজিওর জীবনে একদিকে সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু সমাজ ও অন্যদিকে হিন্দু কলেজ কাউন্সিল—এই উভয় তরফ থেকে যে-সব নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সংকট মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল, তাকেই নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন তরুণ নাট্যকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং যে-ভাবে তিনি ডিরোজিওর জীবনের ট্র্যাজিডিকে ধীরে ধীরে ঘনীভূত ক'রে তুলে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন এবং তারও পরে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ যে তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকবে, এই ইঙ্গিত দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, তাতে আমরা চমৎকৃত না হ'য়ে পারিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র, বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও ভাবধারায় অসামান্য নূতনত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে নাটকখানিকে একটি অসাধারণ নাট্য-প্রচেষ্টা ব'লে সম্মানিত না ক'রেও পারি না।

"বিপ্লবী ডিরোজিও" নাটকটির উপস্থাপনায় রঙ্গসভা যে পরিমাণ যত্ন শ্রম ও অনুশীলন স্বীকার করেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা কচিৎ পাই। ডিরোজিওর কক্ষ তার সমগ্রতা নিয়ে দর্শকদের যেমন এক শতাব্দী পিছনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, পাত্র-পাত্রীদের সাজপোশাকও সে-বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেনি।

অভিনয়েও প্রত্যেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং একজনকে ছেড়ে আর একজনের নাম করা অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য নাটকটি যাঁর নামাঙ্কিত, সেই ডিরোজিওর ভূমিকায় পীযূষ বসুকে প্রায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে হয় ব'লে তিনি স্বভাবতই দর্শকদের চোখে বড় হয়ে দেখা দেন। কিন্তু তাঁর সহ-শিল্পীরূপে দিলীপ রায় (রাধানাথ শিকদার), প্রশান্তকুমার (মহেশ ঘোষ), সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (রামতনু লাহিড়ী), চন্দন রায় (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়), ভোলা বসু (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), দুলাল চট্টোপাধ্যায় (রামগোপাল ঘোষ), রথীন ঘোষ (রাধাকান্ত দেব), পান্না দত্ত (ডেভিড হেয়ার), অজিত মজুমদার (ডেভিড ড্রামণ্ড), মলয় বিশ্বাস (মিঃ উইলসন), লিলি চক্রবর্তী (অ্যামিলিয়া), শীলা ঘোষ (মিস্ হিউ) প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন।

আবহসঙ্গীত রচনায় অচিন্ত্য মজুমদারের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আলোকসম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া নাটকের ভাবধারাকে নিঃসংশয়ে অনুসরণ করেছেন।

ডাঃ দাশগুপ্তের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী : একটি সাহায্য অনুষ্ঠান

আসছে ২রা ডিসেম্বর সকাল ১০-১৫ মিনিটে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রথিতযশা সৌখীন ঐন্দ্রজালিক ডাঃ এস, আর, দাশগুপ্ত হাওড়া স্বাস্থ্য বিভাগীয় রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে পরলোকগত রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনীর সাহায্যের জন্যে একটি ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করবেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রথিতযশা চক্ষু চিকিৎসক এবং বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হলেও সৌখীন ঐন্দ্রজালিক হিসেবে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চেই তিনি বহুবার তাঁর বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দেখিয়ে যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আশা করি, তাঁর আগামী প্রদর্শনীটিও সাফল্যমণ্ডিত হবে।

রং বেরঙ

'রং-বেরঙ' নাট্যগোষ্ঠী পরেশ ধর রচিত 'শুধুছায়া' নাটকটি পুনরায় আগামী ২৬শে নভেম্বর ও ৩রা ডিসেম্বর 'মুক্ত-অঙ্গন' নাটমঞ্চে সন্ধ্যা ৭টায় অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন—সলিল দত্ত, সজল ভট্টাচার্য, শোভা মজুমদার, হিমানী গাঙ্গুলী, তারক ধর, দুলাল বন্দ্যোঃ, শিবপ্রসাদ মুখোঃ প্রভৃতি। নাটকটি মনীন্দ্র মজুমদার পরিচালিত।

ভ্রম-সংশোধন :

গেল সংখ্যার "অমৃত"-এ "বাঙালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর বিশ্ব পরিক্রমা"-শীর্ষক নিবন্ধের গোড়াতেই ১৯৬২ সালের বদলে ভ্রমক্রমে ১৯৬১ ছাপা হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা

পরিচালক অজয় কর সম্প্রতি 'সাত-পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন। কয়েকটি প্রণয়মধুর দৃশ্য গৃহীত হয়েছে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে,—চিতোরগড়, জয়পুর, ও উদয়পুরে প্রায় ২০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীসহ সদলবলে পরিচালক শ্রীকর কলকাতায় দৃশ্যগ্রহণ শেষ করে ফিরেছেন। এ ছবির পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, রেখা মল্লিক, সুব্রতা সেন, তরুণকুমার, বঙ্কু গাঙ্গুলী ও অমিত দে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হাজারিবাগের ক্যানারী পাহাড়, ন্যাশনাল পার্ক ও রাঁচী রোডের বিভিন্ন জায়গায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরলেন 'অবশেষে' ছবির পরিচালক মৃণাল সেন। নাটকীয় কয়েকটি দৃশ্য এখানে গৃহীত হয়েছে। এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, উৎপল দত্ত, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, সুব্রতা সেন ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। সঙ্গীত, শিল্পনির্দেশ ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, বংশীচন্দ্র গুপ্ত ও শৈলজা চট্টোপাধ্যায়।

পূজার ছুটিতে তপন সিংহও 'নির্জন সৈকতে'র বহির্দৃশ্য সম্প্রতি শেষ করে ফিরেছেন। পুরী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি কোণারক, চিল্কা ও রম্ভার বিভিন্ন স্থানে দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ ও রবি ঘোষ। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে বি[illegible] মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মিত্র, সুবোধ রায় ও কালীপদ সেন।

পরমহংসে বাণীচিত্রের 'নবানুরাগে' ছবির দৃশ্যগ্রহণ গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। বাসন্তী দেবী রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভনুকুমার, সবিতা বসু (চ্যাটার্জি), অসিতবরণ, কমল মিত্র, জহর রায়, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অপর্ণা দেবী। ছবিটি পরিচালনা করছেন নায়ক অভনুকুমার। সঙ্গীত, শিল্পনির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন ভি বালসারা, গৌর পোদ্দার ও রামানন্দ সেনগুপ্ত।

বর্তমান সমাজের পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে একটি কাহিনী 'ফার্স্ট প্রাইজ' সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় মহরৎ-কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন অনুপকুমার, রূপশ্রী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, রেণুকা দেবী, জহর গাঙ্গুলী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণ শিল্পচার্যের

পত্তাকাতলে প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন পরেশ বসু ও হিরন্ময় সেন।

'আয়ার সংসার' সাফল্যের পর পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী ছবি 'আকাশ প্রদীপ'-এর কাজ আরম্ভ করেছেন। প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ। সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, দেওজীভাই ও পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বোম্বাই

এক সপ্তাহব্যাপী মারাঠী চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ১০ই থেকে ১৭ই নভেম্বর রঙভবন-এ অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বি গোপাল রেড্ডী এই উৎসব উদ্বোধন করবেন। এই উৎসবে মোট ২১টি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে বারো হাজার, ছ' হাজার ও চার হাজার টাকা। পরিচালক, কাহিনীকার ও কুশলীদের পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের মোট অঙ্ক ৫৫ হাজার টাকা। উৎসবে যে মারাঠী ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে তার মধ্যে অন্যতম মানুষ, সামচী আঈ, লগ্ন পাহেব কারুণ, রামযোশী, শান্ত তুকারাণী, প্রপঞ্চ, মাল্লিনী, সাহু, পরশুরাম, সপ্তপদী ও সুহাসিনী।

দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গীতাঞ্জলি সম্প্রতি হিন্দী ছবি 'পরশমণি'র জন্য মনোনীত হয়েছেন। রঞ্জিৎ স্টুডিওয় ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। যাদুকর নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন মহীপাল। ছবিটির পরিচালক হলেন বাবুভাই মিস্ত্রী।

রাজস্থানের জয়পুরে প্রযোজক-পরিচালক বসন্ত যোগলেকর 'আজ আউর কাল'র বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করলেন। একটি সঙ্গীত গ্রহণ দৃশ্যে ছিলেন নায়ক-নায়িকা সুনীল দত্ত ও নন্দা।

অঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী ছবির জন্য মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার, ও বৈজয়ন্তীমালা। ছবিটি পরিচালনা করবেন ইন্দররাজ আনন্দ।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় একটি বৃহত্তর ছবি পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুগ্মপ্রযোজনায়। এই দুই সরকারের সহযোগিতায় যে ছবির চলচ্চিত্রায়ণে রূপ পাবে তার নাম—'মহাভারত'।

মাদ্রাজ

কলালয়ের মালায়ম ছবি 'ডক্টর'-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে বিজয়া-বাহিনী স্টুডিওয়। ইতিপূর্বে দুটি সঙ্গীত গ্রহণ করেছেন সঙ্গীত পরিচালক পারাভু দেবর্জন। কণ্ঠদান করেছেন পি লীলা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সত্যম, টি এস মুথিয়া ও পঙ্কজাবালী। ছবিটি পরিচালনা করছেন এম এস মানি। চিত্রগ্রাহক হলেন রাজাগোপাল।

কানাড়া ছবি 'তেজস্বিনী' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন এইচ এন সীমহা। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন প্রযোজিকা পন্দরী বাঈ, রাজশ্রী, এম লক্ষ্মী দেবী, রাজকুমার, রাজাশঙ্কর ও বালকৃষ্ণ।

সম্প্রতি পাঁচটি তামিল ছবির শুভমহরৎ সূচনা হয় বিজয়া-বাহিনী, নেপচুন ও ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয়। ছবিগুলির বিস্তারিত খবর পরে জানতে পারবেন।
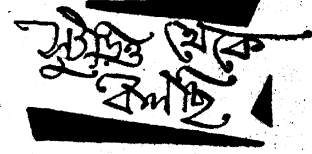
এ বছর স্বাধীনভাবে সহকারী থেকে যে কয়েকজন কুশলী চলচ্চিত্রায়নে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে 'দেখা হল' ছবির দৃশ্যগ্রহণ প্রথম পর্যায়ে শেষ করলেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। বনফুল রচিত 'নবদিগন্ত' কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির নামকরণ হয়েছে 'দেখা হল'। চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিজয় ঘোষ এবং প্রসাদ মিত্র। সম্পাদনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুবোধ রায় ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। দুটি প্রধান চরিত্রে

অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দিনের দৃশ্যটি ছিল একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান। নানান রকমের বাদ্যযন্ত্র এখানে-সেখানে টাঙানো রয়েছে। মালিকের নাম নিতাই নন্দী। কাহিনীর নায়িকা রঞ্জনা এই দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করে,—আমাকে ভাল দেখে একটা সেতার দিন তো।

নিতাইবাবু—সেতার? ও আচ্ছা।

নিতাইবাবুর সহকারী নতুন নতুন সেতার দেখাতে আরম্ভ করে। রঞ্জনার পছন্দ হয় না।

—আর একটু বড় হলে ভাল হত। বড় নেই?

—আছে।

দ্বিতীয় সেতারটি দেখেও যখন রঞ্জনার পছন্দ হল না তখন নিতাই বেশ রেগে উঠেছে। ঠিক এই সময় কাহিনীর নায়ক দিবস এসেছে সরোদ কিনতে। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনার পছন্দ হয় সেতার। কিন্তু কিছু টাকা কম পড়েছে দেখে নিতাই রঞ্জনাকে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিল। এদিকে দিবসের ভাল লাগল না এই সামান্য টাকার জন্য এক ভদ্রমহিলাকে অপমানিত হতে দেখে। দিবস উঠে এসে রঞ্জনাকে বলে,

—যদি কিছু মনে না করেন টাকাটা আমি দিতে পারি।

রঞ্জনা রাজি হয়। দিবস দোকানের মালিককে বাকি টাকা এবং রুচিসম্মত ব্যবহারের জন্য স্পষ্টকথা বলে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই দোকানের দৃশ্যটি পর পর কয়েকটি দৃশ্যকোণ বেছে নিয়ে চিত্রগ্রহণ করলেন বিজয় ঘোষ। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সার্থক অভিনয় করলেন দিবস, রঞ্জনা ও নিতাই নন্দীর ভূমিকায় অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মণি শ্রীমানী। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সুলতা চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি, অমুভা গুপ্তা, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, নবীন মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, অনুপকুমার, গীতা দে, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

এবারে ছবির কাহিনীর কথা বলি।

উকিল সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন তাঁর এম-এস-সি পাশ করা কৃতী পুত্র দিবসকে ল' কলেজে ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তখন দিবস তার রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও দিবসের প্রকৃতিটা ছিল কবি-প্রকৃতি তা সূর্য চৌধুরী জানতেন না। অবশ্য দিবস যে ভাল সরোদ বাজাতে পারে এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সরোদটাকে সু-চক্ষে দেখবার মতো উদারতা কিংবা নিরপেক্ষতা ছিল না তাঁর।

দিবস বিদ্রোহী হল। আপন স্বাধীনতায় বাধা পড়ায় সে ল' কলেজ এবং পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আত্ম-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ল। নিজের বৃত্তি পাওয়া জমানো টাকায় দিন চলল এক বস্তি বাড়ির সামান্য ঘরে। চাকরীর সন্ধানে দিন যায়। এখানে পরম আত্মীয়া হল সৌদামিনী। দিবসের দেখাশোনা সেই করতো। দিবসের ট্রাম-ড্রাইভার বন্ধু কিরণের সাহায্যে সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ ও তার একমাত্র কন্যা রঞ্জনার সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় হয়। পরোপকারের মাত্রা দিবসের সমাজ-

'দেখা হল' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণে পরিচালক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নায়ক অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী পরিচালক সুভেন সরকার ও নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

গুলো বয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে তার বাবাকে সে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ভাল আছে। পরীক্ষা ক র সে দেখতে চায় যে, নিজের সামর্থে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় কিনা।

বক্তৃতা আর পরোপকারে দিবস মেতে ওঠে। মাঠে-ময়দানে কখনো দিবস আবেগভরে বলে চলে—'ব ন্ধু গ ণ, বাঙ্গালিরা অপদার্থ, বাঙ্গালিরা পরশ্রী-কাতর, বাঙ্গালিরা স্বপ্নবিলাসী বাবু—এ অপবাদ ঘোচাতে হবে আমাদের। সার্থক প্রতিবাদ করতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে পৌরুষই মানুষের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র নির্ভর।'

'ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা উদ্বুদ্ধ করুন এই হতভাগ্য জাতির পৌরুষকে। আপনারা শ্রদ্ধা করতে শিখুন ধনীকে নয় চরিত্রবানকে, ভীরুকে নয় বীরকে, অক্ষমকে নয় সক্ষমকে, অলসকে নয়, কর্মীকে, অভদ্রকে নয় ভদ্রকে। আপনারা জাগিয়ে তুলুন আমাদের মহত্ত্ব, বাঁচিয়ে তুলুন আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আদর্শ।'

দিবসের সহপাঠী, অনুরাগীবৃন্দ, এমনকি রঞ্জনা পর্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। দিবস যে এমন বক্তৃতা করতে পারে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। তিনি অনুরোধ করলেও দিবস নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বাড়ী ফিরতে নারাজ হয়। এমনি দিন চলছিল বটে তবে দিবসের উদ্দেশ্য সফল হয়ে উঠলো না। তাই ভাগ্য পরিবর্তনে তার হিতৈষী অধ্যাপকের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক রিসার্চের জন্য বিলেত যাবার যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হল। এরমধ্যে রঞ্জনাকে দিবস কথা দিয়েছে যে সে ফিরেই তাকে বিয়ে করবে। অবশ্য রঞ্জনাকে এরজন্য একবার বাড়ী থেকে পালিয়েও আসতে হয়েছিল। কারণ প্রথমে বাড়ীর অভিভাবকেরা দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন শুনেছে যে দিবস বিলেত যাচ্ছে তখন তাদের মত পাল্টেছে।

দিবস যেদিন বিলেত যাচ্ছে, যাত্রার প্রাক্কালে এরোড্রোমে সকলেই অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। বিশেষ করে পিতা সূর্যকান্তের পুত্রগর্বে বুকটা সবার আগে ভরে উঠলো।

প্লেন তখন ছেড়ে দিয়েছে।

—চিত্রদূত

।। বৃটিশ ছবির টুকরো খবর ।।

লণ্ডনের সোহোর পটভূমিতে তোলা হচ্ছে 'দি স্মল স্যাড ওয়ারল্ড অফ স্যামিলী'। টেলিভিশনে এই নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল এবং নাটকটির পরিচালক কেন হিউজেস টেলিভিশন গিল্ড এর পুরস্কারও লাভ করেছেন। কেন হিউজেস ছবিটিরও পরিচালক। ছবির নায়ক ও টেলিভিশন রূপের নায়ক অ্যানথনি নিউলে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রবার্ট স্টিফেন্স, উইলফ্রেড ব্রাম্বল এবং মিরিয়াম কারলিন।

• • •

'এ কাইন্ড অফ লাভিং'-এর নায়ক অ্যালান বেটস ক্যারল রীডের সাম্প্রতিক ছবি 'দি ব্যালাড অফ দি বার্নিং ম্যান'-এ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাঁর সহঅভিনেতা অভিনেত্রীরা হলেন জ্যাক হকিন্স এবং লী রেমিক। ছবিটি রঙীন এবং প্যানাভিশনে তোলা হবে। বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে স্পেনে এবং আয়ারল্যাণ্ডে।

• • •

ব্রায়ান স্টোন লেভেন আর্টস-এর 'স্যামী গোয়িং সাউথ' তোলা হবে উগাণ্ডা, কেনিয়া এবং টাঙ্গানাইকার পটভূমিতে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন স্যাণ্ডি ম্যাকেনড্রিক যিনি ইতিপূর্বে 'দি লেডি কিলারস', 'সুইট স্মেল অফ সাকসেস' পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এডওয়ার্ড জি রবিনসন।

—চিত্রদূত

'ব্যালাড অব এ সোলজার' চিত্রে ভ্লাদিমির ইভাশভ ও আন্তোনিনা মাক্সিমোভা

খেলাধুলা

দর্শক

॥ অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি ॥

এম সি সি দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচনা খুবই ভাল হয়েছিল। পার্থে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সফরের প্রথম খেলায় এম সি সি দল ১০ উইকেটে জয়ী হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া যদিও শক্তিশালী দল ছিল না তবু খেলা ভাঙ্গার অর্ধেকদিন আগে দশ উইকেটে জয়লাভ এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের মনে যথেষ্ট সাহস এবং আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

কিন্তু প্রথম খেলায় জয়লাভের আনন্দ-উন্দীপনা পরবর্তী খেলায় সম্মিলিত একাদশ দলের কাছে ১০ উইকেটে পরাজয়ের ফলে অনেকখানি মিইয়ে যায়। সম্মিলিত একাদশ দল শক্তিশালী ছিল। চারদিনের এই খেলার প্রথমদিনে এম সি সি দল প্রথম ব্যাট ক'রে মাত্র ১৫৭ রানে আউট হয়।

সম্মিলিত একাদশ দল একরকম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দল বললেই চলে। কেবল নর্মান ও'নীল, বব্ সিম্পসন এবং বিল লরী এই তিনজন টেস্ট খেলোয়াড় নতুন মুখ। সারে এবং ইংল্যান্ড দলের ভূতপূর্ব টেস্ট বোলার টনি লক্ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছেন। তিনিও সম্মিলিত দলে যোগদান করেছিলেন। চারদিনের খেলার প্রথমদিনে এম সি সি দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—মাত্র ১৫৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ। হোর (৪২ রানে ৩), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী (৩৮ রানে ৪) এবং ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লক (৩৬ রানে ৩) এম সি সি দলের এহেন কাহিল অবস্থার জন্যে কৃতিত্বের অধিকারী। মাত্র ১৪ রানে হোর এবং ম্যাকেঞ্জী দলের চারজনকে (কাউড্রে, ডেক্সটার, গ্রেভনী এবং ব্যারিংটন) উইকেট থেকে বিদায় করেন। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় পঞ্চম উইকেটের জুটি ডেভিড শেফার্ড এবং বেরী নাইট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ৭১ রান তুলে দেন। দলের মোট ১৫৭ রানের মধ্যে এই দু'জনের রানই ছিল ১০৮ (শেফার্ড ৪৩ এবং বেরী নাইট নটআউট ৬৫)। নাইট ১৭১ মিনিটে ৬৫ রান ক'রে শেষ পর্যন্ত নটআউট থাকেন। প্রথমদিনের খেলায় সম্মিলিত একাদশ দল সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে ৯৬ রান করে। দ্বিতীয়দিনে সম্মিলিত একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানে শেষ হলে তারা ১৬০ রানে অগ্রগামী হয়। সম্মিলিত দলের ববি সিম্পসন সাড়ে চার ঘণ্টা খেলে ১০টা বাউন্ডারী সমেত ১০৯ রান ক'রে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। ডেভিড এ্যালেন ৭৬ রানে ৫টা উইকেট পান। সম্মিলিত দলের প্রথম উইকেট পড়ে ১১৬ রানে এবং সপ্তম উইকেট ২১৭ রানে। কিন্তু শেষের তিনটে উইকেটে আরও ১০০ রান যোগ হয়। সম্মিলিত দলের শেষের তিনজন খেলোয়াড় এম সি সি দলকে বেশ লেজে খেলিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে একটা উইকেট খুইয়ে ২৫ রান করে। এবারও কলিন কাউড্রে গোল্লা করেন—একটা খেলায় দু'বারই গোল্লা ক'রে দলপতি ডেক্সটারকে ভাবিয়ে তুলেছেন। মনে হয় তিনি এক নম্বর অর্থাৎ ওপনিং ব্যাটসম্যানের স্থান থেকে চার নম্বরে নেমে যাবেন।

তৃতীয় দিনে এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হয়। ডেভিড শেফার্ড আট রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তাঁর পরই অধিনায়ক ডেক্সটারের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও হোর বোলিংয়ে ভেল্কি দেখান—৬০ রানে ৫টা উইকেট। ম্যাকেঞ্জী তাঁর নীচে ৬৬ রানে ৩ উইকেট। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলা—এম সি সি দলের ৩টে উইকেট পড়ে তখন ২০৯ রান। কিন্তু ৪র্থ উইকেট ২০৯ রানের, ৫ম ও ৬ষ্ঠ উইকেট ২১১ রানের এবং ৭ম উইকেট ২১২ রানের মাথায় পড়ে যায়। ২০৯ রানের সঙ্গে মাত্র তিন রানের যোগফলে ৪টে উইকেট পড়ে যায়! এই চারটে উইকেটের মধ্যে হোর তিনটে উইকেট পান।

খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১১ রান তুলতে সম্মিলিত একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তৃতীয় দিনে কোন উইকেট না খুইয়ে ৫০ রান করে। ফলে তাদের আর ৬১ রানের প্রয়োজন হয়। ৪র্থ দিনে এই ৬১ রান তুলতে সম্মিলিত একাদশ দলের ৩৫ মিনিট সময় লাগে। সিম্পসন প্রথম ইনিংসে ১০৯ রান ক'রেছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৮০ মিনিট খেলে ৬৬ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে লরী খেলতে নামেননি। পূর্বে দি'ন তিনি ট্রুম্যানের বলে পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন।

চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের এই প্রথম পরাজয়; শুধু তাই নয়, পার্থে ১৯০৭ সাল থেকে এম সি সি খেলে এই প্রথম পরাজয় বরণ করলো।

॥ ব্রিসবেনে বিবিধ রেকর্ড ॥

আগামী ৩০শে নভেম্বর তারিখে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬-তম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। ১৯২৮ সালের এই ৩০শে নভেম্বর তারিখেই ব্রিসবেনের এক্‌সুইবিশন ক্রিকেট মাঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলার পীঠস্থান হিসাবে মাহাত্ম্য লাভ করে এবং সেই টেস্ট খেলাটিও ছিল ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে—উভয় দেশের ১১৫তম টেস্ট খেলা। ব্রিসবেনের সেই প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬৭৫ রানে জয়ী হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী তিনটে টেস্ট খেলাতেও ইংল্যান্ড জয়লাভ ক'রে শেষ পর্যন্ত ৪—১ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে উভয় দেশের টেস্ট সিরিজে জয়লাভের পুরস্কার কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' লাভ করে। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দুটো মাঠে টেস্ট খেলা হয়েছে—এক্‌সুইবিশন মাঠে মাত্র একটা (১৯২৮ সালে) এবং ওয়ালোনগাবা মাঠে ৬টা—মোট ৭টা। ওয়ালোনগাবা মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। সেই সময় থেকেই এই মাঠে খেলা হচ্ছে। ব্রিসবেন মাঠের মাটির বিশেষত্ব এই যে, এখানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সাতটা টেস্ট খেলাতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে—অর্থাৎ কোন খেলাই অমীমাংসিত থাকেনি। এই সাতটা টেস্ট

খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং ইংল্যান্ডের ৩। এখানে টেস্ট সেণ্চুরীর সংখ্যাও ৭—অস্ট্রেলিয়ার ৫ এবং ইংল্যান্ডের ২।

১৯২৮-২৯ সাল থেকে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে যে সাতটি টেস্ট সিরিজের খেলা হয়েছে একমাত্র ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজ বাদে বাকি ৬টি টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছে ব্রিসবেনে। ইংল্যান্ড উপর্যুপরি ব্রিসবেনের তিনটে টেস্ট খেলায়—১৯২৮-২৯ সালের প্রথম টেস্ট, ১৯৩২-৩৩ সালের চতুর্থ টেস্ট এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল; কিন্তু ব্রিসবেনের পরবর্তী চারটে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়। ব্রিসবেনে ১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে—অস্ট্রেলিয়ার যে কোন মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ই সব থেকে বেশী ব্যবধানে জয় হিসাবে আজও গণ্য।

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯২৮-২৯, ১ম টেস্ট
ইংল্যান্ডের ৬৭৫ রানে জয়
ইংল্যান্ড : ৫২১ ও ৩৪২ (৮ উইঃ ডিঃ)
অস্ট্রেলিয়া : ১২২ ও ৬৬

১৯৩২-৩৩, ৪র্থ টেস্ট
ইংল্যান্ডের ৬ উইকেটে জয়
ইংল্যান্ড : ৩৫৬ ও ১৬২ (৪ উইঃ)
অস্ট্রেলিয়া : ৩৪০ ও ১৭৫

১৯৩৬-৩৭, ১ম টেস্ট
ইংল্যান্ডের ৩২২ রানে জয়
ইংল্যান্ড : ৩৫৮ ও ২৫৬
অস্ট্রেলিয়া : ২৩৪ ও ৫৮

১৯৪৬-৪৭, ১ম টেস্ট
অস্ট্রেলিয়ার এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে জয়।
ইংল্যান্ড : ১৪১ ও ১৭২
অস্ট্রেলিয়া : ৬৪৫

১৯৫০-৫১, ১ম টেস্ট
অস্ট্রেলিয়ার ৭০ রানে জয়।
ইংল্যান্ড : ৬৮ (৭ উইঃ ডিঃ) ও ১২২
অস্ট্রেলিয়া : ২২৮ ও ৩২ (৭ উইঃ ডিঃ)

১৯৫৪-৫৫, ১ম টেস্ট
অস্ট্রেলিয়ার এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে জয়।
ইংল্যান্ড : ১৯০ ও ২৫৭
অস্ট্রেলিয়া : ৬০১ (৮ উইঃ ডিঃ)

১৯৫৮-৫৯, ১ম টেস্ট
অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে জয়।
ইংল্যান্ড : ১৩৪ ও ১৯৮
অস্ট্রেলিয়া : ১৮৬ ও ১৪৭ (২ উইঃ)

এক ইনিংসে দলগত ৫০০ রান অথবা তার বেশী রান

ইংল্যান্ড : ৫২১ রান (১৯২৮-২৯)
অস্ট্রেলিয়া : ৬৪৫ রান (১৯৪৬-৪৭); ৬০১ রান—৮ উইকেটে (১৯৫৪-৫৫)

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
৫২১ রান*	৬৪৫ রান+
(১৯২৮-২৯)	(১৯৪৬-৪৭)
৩৫৮ রান+	১২২ রান*
(১৯৩৬-৭)	(১৯২৮-২৯)

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
৩৪২ (৮ উইঃ ডিঃ)*	৬৬*
(১৯২৮-২৯)	(১৯২৮-২৯)
৬৮ (৭ উইঃ ডিঃ)+	৩২ (৭ উইঃ)+
(১৯৫০-৫১)	(১৯৫০-৫১)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড
১২৬ এম লেল্যান্ড, ১৯৩৬-৩৭+
১৬৯ ই হেনড্রেন, ১৯২৮*

অস্ট্রেলিয়া
১৮৭ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৬-৪৭+
৩৩ জে রাইডার, ১৯২৮-২৯*

* এক্সহিবিশন মাঠ
\+ ওয়ালোনগাবা মাঠ

রেকর্ড পার্টনারশীপ

১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ই হেনড্রেন এবং এইচ লারউড ৮ম উইকেটের জুটিতে যে ১২৪ রান করেন তা ইংল্যান্ডের পক্ষে আজও রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ডি জি ব্র্যাডম্যান এবং এ এল হ্যাসেট তৃতীয় উইকেটের জুটিতে যে ২৭৬ রান করেন তা ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত টেস্ট খেলার আজও রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মাণী

যোধপুরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় টেস্ট এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী—উভয় দেশই সমান সংখ্যক ৮৬ পয়েন্ট অর্জন করায় ফলাফল সমান দাঁড়ায়। মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথমস্থান লাভ করে এবং বাকি ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায় ভারতবর্ষ। প্রথমদিনের ১০টি অনুষ্ঠানে জার্মানী ৫২ পয়েন্ট এবং ভারতবর্ষ ৫১ পয়েন্ট পায়। দু'দিনের অনুষ্ঠানে মোট ৬টি বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়—প্রথম দিনে ৫টি এবং দ্বিতীয় দিনে একটি। দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পান ভারতবর্ষের গুরবচন সিং (হাই জাম্প এবং ১১০ মিটার হার্ডলস); জার্মানীর সুম্যান (১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড়) এবং উরবাক (ডিসকাস এবং সটপুট)।

জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মানীর তৃতীয় এ্যাথলেটিক্স টেস্ট প্রতিযোগিতায় ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১২টি অনুষ্ঠানে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিরা প্রথম স্থান লাভ করে। মাত্র ডিসকাস থ্রো এবং পোলভল্টে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। ভারতবর্ষ বাকি তিনটি অনুষ্ঠানে—হপ্ স্টেপ-জাম্প (রাজকুমার—দূরত্ব ৪৬ ফুট ১¾ ইঞ্চি), হাইজাম্প (জীত সিং—উচ্চতা ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি) এবং লং জাম্প

৪ঠা নভেম্বর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মাণী চতুর্থ এ্যাথলেটিকস টেস্ট খেলায় যোগদানকারী পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিনিধিরা কুচকাওয়াজ করছেন। পিছনে আছে ভারতীয় দল।

(বি ভি সত্যনারায়ণ—দূরত্ব ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি) প্রথম স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মিলখা সিং এবং গুরুবচন সিং এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। পশ্চিম জার্মাণী প্রকৃতপক্ষে ১৫টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে ১৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায়; কেবল লং জাম্পে তারা প্রথম স্থান নিতে পারে নি।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

ভারতবর্ষের উপর চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে জাতীয় সরকারের আহ্বানে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করেছেন। ক্রীড়াজগতও এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে এসেছে।

খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের এই জাতীয় জরুরী অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আসন্ন 'বৃটিশ এম্পায়ার এ্যান্ড কমনওয়েলথ গেমস' অনুষ্ঠানে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্ট তিন লক্ষ দশ হাজার টাকার জাতীয় সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় ক'রে বোম্বাইয়ে আয়োজিত রাজ্যপাল একাদশ বনাম মুখ্যমন্ত্রী একাদশ দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট ক্রয়ের যোগ্যতা লাভ করেছেন। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় দর্শক হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভের এই সর্ত ছিল যে, যাঁরা নির্দিষ্ট অঙ্কের সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করবেন, কেবলমাত্র তাঁরাই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা দেখার টিকিট পাবেন। মার্চেন্ট ছাড়া অনেকেই এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট ক্রয়ের অধিকার লাভের জন্যে নব্বুই হাজার টাকা ক'রে সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়া সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়েছে।

রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে পশ্চিম বাংলার এক নম্বর খেলোয়াড় দীপক ঘোষ ভারতবর্ষের দু' নম্বর খেলোয়াড় জে এম ব্যানার্জিকে পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া দীপক ঘোষ পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জে এম ব্যানার্জির জুটিতে খেতাব লাভ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়লাভ করেন মিস উষা আয়েঙ্গার।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ

১৯৬২ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল উপর্যুপরি ছ'বার মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩০শে কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th November 1962.
40 Naya Paise.

গত সপ্তাহে আমরা সম্পাদকীয় শেষ করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে "এখন প্রশ্ন অস্ত্র-সরঞ্জামের এবং আমাদের কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধির—সেই বিষয়েই।"

তারপর আর এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ মেনন মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইয়াছেন। এই বিদায়-গ্রহণের ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খুব ইচ্ছা ছিল না তাঁহার এই সঙ্গীকে বিদায় দেওয়ার। মন্ত্রিসভায় শ্রীকৃষ্ণ মেননের উপস্থিতি এবং অধিকার যে শুধু বিদেশের বহু মিত্রভাবাপন্ন দেশকে বিরক্ত ও রুষ্ট করিয়াছে এই নয়, উপরন্তু প্রতিরক্ষা বিভাগের সামরিক এবং অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুতি ও সরবরাহ-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত বহু উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে বিব্রত এবং অন্যায় অবিচারের দরুণ অসন্তুষ্ট করিয়াছে—এ সকল কথা পণ্ডিত নেহরু কি কারণে বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন জানি না। উপরন্তু দেখা যাইতেছে যে পার্লামেণ্টের কংগ্রেস কার্যকরি সমিতি তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার পূর্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণ মেননের লিখিত পদত্যাগ প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশ্য সে পরিচ্ছেদ এখন সমাপ্ত।

> আগামী সংখ্যা থেকে স্বনামধন্যা লেখিকা
> **শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর**
> মার্কিনী পটভূমিকায়
> মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় উপন্যাস
> **॥ অগ্নি তুষার ॥**
> ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
> সম্পাদক, অমৃত

শ্রীকৃষ্ণ মেননের পত্রে দেখা যায় যে তিনি দেশের লোকের তাঁহার প্রতি অনাস্থা যে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে সে কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত নেহরুকে সে কথা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুকে নিজের বিচার ও নিজের ইচ্ছার ঝোঁক সামলাইতে বেগ পাইতে হইয়াছে। এক্ষেত্রে স্বদেশের স্বাধীনতা আক্রান্ত হওয়ায় এবং উপরন্তু জগতের সম্মুখে বিব্রত প্রতিপন্ন হওয়ায় বিষের প্রতিক্রিয়া বিষাক্ত খোঁচায়ই দূর হইয়াছে—এই আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

লোকসভায় বিগত ৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী দুইটি প্রস্তাব লোকসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন। প্রথমটিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সমর্থন এবং দ্বিতীয়টিতে আক্রমণকারী চীনশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহার কবল হইতে ভারতের ভূমিখণ্ডকে উদ্ধার করার জন্য জাতির দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই প্রস্তাব লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রবল উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইয়াছে। কেননা এখন সমগ্র ভারতবাসীই কায়মনপ্রাণে ঐ দুই প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়াইয়াছে। যে মুষ্টিমেয় (ক্ষমতালোলুপ) দেশদ্রোহীর দল দেশের সর্বনাশ করিয়া, চীনের সহায়তায় নিজ ঘৃণ্য স্বার্থপূরণের স্বপ্ন এখনও দেখিতেছে তাহাদের বলির পশুবৎ নির্বোধ সমর্থনকারির দলও দেশের লোকের মনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া ক্রমে নির্বাক ও নিশ্চল হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যে নূতন তথ্য কিছুই ছিল না। চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের কোনও আয়োজন বা প্রস্তুতি কেন হয় নাই, তাহার কৈফিয়তে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার উপদেষ্টা ও সমর্থকবর্গের বিচারবুদ্ধি বা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাশক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা আজ কেবল ভারতের নহে, এশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক ক্রান্তি মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছি।"

তিনি বলেন, গত একশত বা তাহারও বেশী কাল ভারতে যাহা ঘটে নাই, আজ সেখানে তাহাই ঘটিতেছে। ইহা ইতিহাসের এক আশ্চর্য পরিহাস।

"সুয়েজের ঘটনা প্রভৃতি সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, এই ধরণের আক্রমণের সম্ভাবনা অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ ব্যাপক চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছি। ইহা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে।"

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে বক্তৃতাকালে শ্রীনেহরু ভারতের অপ্রস্তুত অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনার উল্লেখে স্বীকারোক্তি করেন, "প্রকৃতপক্ষে আমরা দুই তিন ডিভিসন সৈন্যের ব্যাপক আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এই অবস্থায় বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের আক্রমণ অকস্মাৎ আমাদের উপর আসিয়া পড়ে।" প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জানান যে, যথোপযুক্ত গরম পোষাক ও কম্বল ছাড়াই ভারতীয় জওয়ানদের

সীমান্তে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ তোলা হইয়াছে তাহা একেবারেই ঠিক নহে।

চীনাদের আসন্ন আক্রমণ ও তাহাতে কিরূপ শক্তি প্রযুক্ত করার আয়োজন চীনারা করিতেছে—এ সম্পর্কে কি কোনও সংবাদ পণ্ডিত নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন পান নাই? আমরা শুনিয়াছি যে সংবাদ অনেক ক্ষেত্র হইতেই দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা দিয়াছিল তাহাদের "ওয়ার-মঙ্গার" বা যুদ্ধকামী বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, এখন কর্ণধারবর্গ সচেতন থাকিলেই মঙ্গল।

শপথ

মণীন্দ্র রায়

আমরা সয়েছি যারা অন্য এক যুদ্ধের নখর,
শুনেছি গভীর রাতে ফ্যান-চাওয়া মৃত কণ্ঠস্বর,
দেখেছি দাঙ্গার খুনে ভেসে যেতে কবন্ধ শহর,
আমরা রুখেছি যারা ছেচল্লিশে বুলেটের ঝড়—
জেনেছি প্রাণের মূল্যে স্বাধীনতা কী ভীষণ দামী!

উত্তরযৌবনে আজ বাষট্টির উত্তুরে বাতাসে
আবার মৃত্যুর হিংসা, বারুদের গন্ধ ভেসে আসে।
তবু এই দস্যুতার মুখোমুখী কামানের পাশে
প্রতিবিন্দু রক্তে যারা এ দেশের মাটি ভালোবাসে,
আমারও সকল চিত্ত, জেনো বন্ধু, তারই অনুগামী॥

চীন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যদিও আমি শপথ করলাম
যদিও আমি সহোদরের নাম
এখন থেকে ভুলে থাকবো, তবু
তোমার নদী, তোমার মাটি, তোমার স্মৃতি, চীন!—
বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা!

কেননা তুমি আকাশছোঁয়া প্রাচীর গ'ড়েছিলে
তবু তোমার আমার মধ্যে কোনো প্রাচীর রাত্রেও
ছিলো না।
কেননা তুমি আকাশছোঁয়া প্রাচীর গ'ড়েছিলে
তবু তোমার বুকের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম সহোদর।

মাঝে একটি সত্যিকারের প্রাচীর আজ গ'ড়লে তুমি,
চীন?—
ভাইয়ের রক্তে রাঙা, চোখে দেখা যায় না এমন
ঘৃণার প্রাচীর;
ভাইয়ের রক্তে রাঙা পাথর ব'য়ে ব'য়ে, ঘৃণার পাথর
ব'য়ে ব'য়ে!...
তোমার চোখে তাকানো আজ পাপ!

বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা
নিয়ে এখন রক্তমুখে এগিয়ে যাচ্ছি কুরুক্ষেত্রে, চীন!—
ভাইয়ের নাম বিষ করেছো তুমি॥

জৈমিনি

সেদিন পোস্টকার্ড কিনতে গিয়ে কেলেঙ্কারী কান্ড।

দিনটা বোধ হয় ছিল সোমবার। ভিড় হ'য়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু লাইন ছিল না। সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও মশায়, আপনার চিত্রগুপ্তের খাতা বন্ধ ক'রে আমাদের বিদায় করে দিন আগে!'

খাম-পোস্টকার্ড দেওয়ার মালিক যিনি, জালের ওপাশ থেকে তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' বলে তিনি পূর্ববৎ মনোযোগ সহকারে খাম-পোস্টকার্ডের আদমসুমারী শুরু করলেন।

যাই হোক, এরপর তিনি খাম-পোস্টকার্ড দেওয়া শুরু করেছিলেন। কাজেই তখনকার মতো ঝগড়াটা সেখানেই থেমে গেল। কিন্তু ঐ অপেক্ষা করার কথাটা মন থেকে চট করে মিলিয়ে গেল না আমার।

বাস্তবিক ছোটবড় কতো ব্যাপারেই যে আমরা অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে বাধ্য হই, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। পরীক্ষা দিয়ে অপেক্ষা করা থেকে শুরু করে বাস স্টপে অপেক্ষা করা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা স্নায়বিক উৎপীড়নের বীজ নিহিত আছে। বর্তমান জগতে যে আমরা এমন নিউরটিক হ'য়ে উঠছি তার কারণও এই 'অপেক্ষা করা'।

মনে করুন আপনার কোনো প্রিয়জন আসবেন খবর পেয়ে আপনি স্টেশনে গেছেন। গিয়ে শুনলেন, ট্রেন আসতে দেড়ঘণ্টা দেরি। তখন সেই নব্বুইটা মিনিট যদি নব্বুই মণ পাথরের মতো আপনার বুকে চেপে বসে তো অবাক হবার কিছু নেই। আর নিজের ভেতরে এই নব্বুই মণ পাষাণভার নিয়ে প্ল্যাটফর্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করে যে আন্দাজ আয়ুক্ষয় হয় তাও মনে রাখবার মতো বটে। তারপর দেরিতে হলেও, ট্রেন এক সময় সত্যিই আসে, প্রিয়জনও আসেন, কিন্তু আপনার মনের সেই প্রাথমিক উৎসাহ আর এক-বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। তখন দেড়দিনের ট্রেনের ধকল সয়ে যে ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করেন তাঁর চেয়ে দেড়ঘণ্টা অপেক্ষাকারী আপনাকেই যদি

বেশি কাহিল দেখায় তো বিস্মিত হওয়া চলবে না।

কিংবা মনে করুন ডাক্তারের কাছে গেছেন। উচ্চ ভিজিটের নামজাদা চিকিৎসক, আগে থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা আছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যেহেতু আপনারই একমাত্র চিকিৎসক নন, সেইহেতু সাংঘাতিক একটা আকস্মিক যোগাযোগ না ঘটলে কিছুতেই আপনি চেম্বারে গিয়ে নিজেকে প্রথমতম আগন্তুক হিসেবে দেখতে পাবেন না। কিংবা তাও যদি হয় তো শুনতে পাবেন, ডাক্তারবাবু জরুরী একটা কল্-এ বেরিয়েছেন, এক্ষুনি আসবেন। তারপর শুরু হবে আপনার 'অপেক্ষা'। প্রথমে কিছুক্ষণ সামনের একটা অনির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চেয়ে শূন্য মনে বসে থাকবেন। অতঃপর, নেহাৎ কিছু করবার নেই বলেই, ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে পা নাচাতে শুরু করবেন। এরপর অন্যান্য যাঁরা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন বা পরে এসেছেন তাঁদের দিকে চেয়ে কে রোগী এবং কে রোগীর সঙ্গে সাহায্যের জন্যে এসেছেন সে বিষয়ে জল্পনা শুরু করবেন। এবং এইভাবে আগন্তুকদের প্রত্যেকের বিষয়ে একটা গল্প খাড়া করেও যখন আধঘণ্টার বেশি সময় কিছুতেই লোপাট করা সম্ভব হবে না তখন সামনের টেবিল থেকে শতহস্ত-মলিন বহু পুরাতন একখানি সাময়িক পত্র তুলে নিয়ে ছবি দেখতে শুরু করবেন।

এইভাবে একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা 'অপেক্ষা' করার পর যখন আপনি সত্যিই একসময় ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার জন্যে ডাক শুনতে পান তখন যে আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি অসুস্থ বোধ করছেন তা বলাই বাহুল্য।

বাস্তবিক 'অপেক্ষা করা' এমন মারাত্মক ব্যাপার যে, পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যায় তার ফলে। আর একই সঙ্গে তার ফলে ট্যাজেডী এবং কমেডীর রস প্রবাহিত হয়।

আমার এক বন্ধুর তখন পূর্বরাগের পালা ঘন হ'য়ে এসেছিল। মেয়েটির সঙ্গে তিনি দেখা করার ব্যবস্থা করলেন এক নামকরা কফির রেস্তরাঁয়। সেই দিন তিনি তার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ভদ্রমহিলাও সেটা আন্দাজ করেছিলেন এবং উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই গোড়াপত্তন বেশ ভালোভাবেই হ'য়েছিল বলতে হবে।

সাক্ষাতের সময় ছিল বেলা একটা থেকে দেড়টা। আগ্রহের প্রাবল্যে বন্ধুবর হাজির হলেন প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ—কারণ বলা তো যায় না, যান-বাহনের যোগাযোগে দেরিও হ'য়ে যেতে পারে।

যাই হোক, আগে-ভাগে এসে তিনি একটা নিরালা কোণ খুঁজে নিয়ে বসলেন, এবং কফির অর্ডার দিয়ে একখানা বই খুলে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। বেলা একটার সময় বেয়ারা কফির কাপ নিয়ে যেতে এল। বন্ধুবর দ্বিতীয় কাপের অর্ডার দিলেন এবং বইয়ের অন্য স্থানে মনঃসংযোগ করলেন। দেড়টা নাগাদ বেয়ারা আবার এল। কাজেই তাকে তৃতীয় কাপের অর্ডার দিতে হল। এইভাবে বেলা আড়াইটে নাগাদ পঞ্চম কাপ কফি গলাধঃকরণ করেও যখন তিনি ভদ্রমহিলার দর্শন পেলেন না তখন কফি এবং 'অপেক্ষা' তাঁর মস্তিষ্কে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিল। প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বইপত্র নিয়ে তিনি সবেগে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনের দিকে ছিল একটা হাত-দুয়েক চওড়া সিলিং-ছোঁয়া লোহার পিলার। তিনি সেটা পাশ কাটাবার জন্যে যেই বাঁক নিয়েছেন সেই সময়ে আরেকজনও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পিলারের ওপাশের চেয়ার থেকে—তাঁর সঙ্গে ঘটল বন্ধুবরের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন যে দ্বিতীয় মানুষটি তাঁরই প্রেমাস্পদা!

॥ মনে পড়ুক ॥

এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশিত হবে। মোটামুটি ৮৪০টি শব্দ-সম্বলিত এই রচনা—হাসির ঘটনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী, স্বীকার-কাহিনী, অলৌকিক অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে-কোনো বিষয়ে হতে পারে। প্রথমে প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের রচনা দিয়ে শুরু ক'রে এই বিভাগে অদূর ভবিষ্যতে পাঠক-পাঠিকাদের লেখা প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই 'অমৃতে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই ধরণের মনোজ্ঞ এবং সুলিখিত রচনা পেলে আমরা আনন্দিত হব।

সম্পাদক, 'অমৃত'

তখন প্রথমে কিছুক্ষণ চলল পরস্পরকে দোষারোপ এবং আস্ফালন। এর মধ্যেই জানা গেল, মহিলাটি এসেছেন ঠিক একটায়। তারপর চলল পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। কিন্তু হায়, 'অপেক্ষা' তাঁদের দুজনেরই মনের ওপর স্টীম-রোলার চালিয়ে গেছে—মনের কথা বলা এবং শোনার মতো এক-বিন্দু উৎসাহও আর অবশিষ্ট ছিল না কারো মধ্যে। ভগ্নমনে নিঃসাড় দুই ছায়াপিণ্ডের মতো নীরবে গিয়ে তাঁরা বাস ধরলেন নিজ-নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে!

অপেক্ষা করতে সেই জন্যে আমি ভয় পাই। মনে হয় যেন আমাকে একা বসিয়ে রেখে সময় আমার আড়াল দিয়ে তার বরমাল্য নিয়ে গেল অন্য কোথাও।

অথচ সারা জীবনই তবু আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হল!

॥ ধূপের গন্ধ ॥

আশাপূর্ণা দেবী
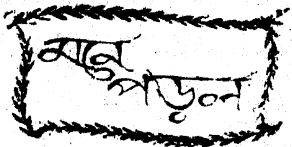
আমাদের স্মৃতির ঘরগুলো বড় অদ্ভুত। ওর স্তরে স্তরে ভারী ভারী কপাট, যে কপাট দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে মনেও পড়ে না ওর অন্তরালে ঘর আছে, আছে জীবনের অনেক অনুভূতির সঞ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ কোন এক মুহূর্তে সে দরজা খুলে পড়ে, সেই ভুলে-থাকা সঞ্চয়-গুলি মুখ বাড়িয়ে বলে ওঠে, 'আমি হারাইনি, আমি আছি।'

সেই বিস্মৃতির মরচেপড়া কবাটগুলি খুলে দেবার চাবি হয়তো কোন একটি বিস্মৃত গান, কোন এক সাদৃশ্যময় ঘটনা, বিশেষ কোন একটি সুগন্ধ, কোন একটি কন্ঠস্বর।

এইতো সেদিন পথে চলতে পাশ দিয়ে একটি মেয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল, হঠাৎ তার গলার স্বরে ছেলেবেলার এক বন্ধুর গলার আভাস পেলাম। আর—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাল্যকালটা যেন তার ধুলো-খেলা নিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল।

এমনিই হয়।

আমরা ভুলি, আবার ভুলে দেখি।

নইলে আজ একটা নাম-না-জানা ধূপের গন্ধ কেন জীবনে মাত্র মিনিট কয়েক দেখা মেয়েটিকে একেবারে স্পষ্ট করে চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল?

লাল আলোর চোখ রাঙানিতে ছুটন্ত ট্যাক্সীখানা মোড়ের মাথায় থমকে থেমে পড়ল, আর যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে খান-দুইতিন প্রসারিত করতল জানলা দিয়ে ঢুকে এল। ভিখিরির হাত, ফেরিওলার হাত।

এইগুলোই ওদের ঘাঁটি।

কাঁধে ঝোলা-ঝোলানো রোগা-হ্যাংলা ধূপওলা ছেলেটা একেবারে নাছোড়। 'নিন মা, নিন মা, খুব ভাল ধূপ আছে। কস্তুরী ধূপ, চন্দন ধূপ, গোলাপ ধূপ, মলয় ধূপ, দেবার্চন ধূপ—'

ফস করে একটা ধূপ জেলে ফেলে শূন্যে দুলিয়ে দিল কয়েকবার, স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় একটা গন্ধে ভরে গেল গাড়ীর ভিতরটা, আর সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের গভীর স্তরে যেন একটা ধাক্কা খেলাম।

এ কোন ধূপ?

এ গন্ধ কিসের গন্ধ?

এ যে আমার পরিচিত।

কিন্তু কবে কোথায়?......দুজোড়া চোখ হঠাৎ খুলে পড়া স্মৃতির দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—'এই তো! এখানে!'

একই চোখ, শুধু দুই চাহনি।

ধূপ কেনা হ'ল না।

ততক্ষণে সবুজ আলোর সাহস পেয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। ধূপওলা ছেলেটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে তার হাত।... ধূপ কেনা হ'ল না, কিন্তু সেই সুরভি মোহ আচ্ছন্ন করে রইল চেতনাকে। সেই আচ্ছন্ন চেতনায় বর্তমানের গন্ডি থেকে অনেক দূর পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম দক্ষিণ ভারতের এক দেবমন্দিরের সামনে। সে মন্দিরের দরজা বন্ধ, বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ভোগ হয়ে গেছে, বিগ্রহ বিশ্রামে নিমগ্ন।

তীর্থের পথে পথে বারে বারেই এমন ঘটে যায়। কোন দেবতার কখন ভোগের সময় কখন বিশ্রামের সময় জানা থাকে না। তাই দর্শন মেলে না। সেদিন তেমনি ঘটেছিল।

অনেক দূর থেকে গিয়ে, জানা গেল একটু আগে মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দির চত্বরের ভিড় হালকা হয়ে এসেছে। বিকেল চারটেয় আবার দরজা খুলবে।

বিকেলে আবার একবার আসা সম্ভব হবে কিনা সঙ্গীর সঙ্গে সেই পরামর্শ করছি, হঠাৎ দেখি আমাদেরই মত একজন আসছে সময়ের সীমানা পার করে। কিন্তু কী ব্যাকুলতা তার চোখে মুখে।

ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি মেয়ে, সাজসজ্জায় মনে হল দক্ষিণ ভারতীয়ই, হাতে ছোট একটি থালায় কিছু পুষ্পোপচার, আর একগোছা ধূপ।

দ্রুত ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আর আয়ত দুটি চোখে ফুটে উঠল দুঃখ অভিমান ক্ষোভ হতাশার এক তীব্র আবেগ।

কিন্তু ক্ষুব্ধ সেই দৃষ্টিতে আপন অক্ষমতার জন্যে আক্ষেপ দেখিনি। দেখেছিলাম যেন দেবতার উপর তীব্র অভিমান। চোখের অমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষা দৈবাৎ দেখা যায়।

মেয়েটি চত্বর থেকে নেমে এল।

কিন্তু কি হল কি জানি, শেষ ধাপে নেমে এসে একটু থেমে আবার উঠে গেল উপরে। নেমে এসে আবার কি ভেবে উঠে গেল ভেবে কৌতূহলী হলাম, কয়েক সিঁড়ি না উঠে পারলাম না।

দেখলাম মেয়েটি সেই বন্ধ কপাটের সামনে নামিয়ে রাখল হাতের থালাটি, চৌকাঠের খাঁজে জেলে দিল ধূপের গোছা, বসল নতজানু হয়ে। স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় একটা গন্ধে ভরে উঠল নির্জন চত্বর। ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

বারবার ভাবতে লাগলাম এ কী ধূপ!

ক্রমশঃ মন্দির একেবারে নির্জন হয়ে গেল, মেয়েটি বসে আছে তেমনি নিথর হয়ে। আমরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রাচীন মন্দিরের শিল্পসৌন্দর্য দেখতে। ভুলে গেছি মেয়েটির কথা, আলোচনা করছি, কত সালে মন্দির নির্মাণ হয়েছিল, কে এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।

এক সময় দেখি মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

কী আশ্চর্য, এখনো বসেছিল ও?

একা!

হঠাৎ মনে হল মেয়েটি কি এত উজ্জ্বল সাজে এসেছিল তখন? ওর পরণের ঘোর সবুজ মোটা রেশমী শাড়ী, ওর খোঁপায় গোঁজা ফুলের বলয়, ওর কপালের কুঙ্কুমের টিপ, ওর কণ্ঠের স্বর্ণাভরণ সব কিছুতেই যেন এক আশ্চর্য দ্যুতি।

নিতান্তই কবিকল্পনা সন্দেহ নেই, তবু মনে হল। মনে হল এ ওর চোখের দ্যুতি। কিছু পূর্বের সেই হতাশ ক্ষুব্ধ অভিমানে গভীর দৃষ্টি এমন প্রসন্ন প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হল কোন মন্ত্রে?

অবাক হলাম।

সন্দেহ রইল না ওর দেবদর্শন হয়ে গেছে।

ও চলে গেল।

কি যেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম বিগ্রহের ঘরের সামনে। বন্ধ কপাট। মোটা মোটা পিতলের সাজ লাগানো ভারী দেহটা নিয়ে যেমন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনিই আছে। আর তার সামনে নামানো রয়েছে সেই ফুলের থালাখানি।

এ থালা ও ভুলে ফেলে চলে গেছে।

কিন্তু ও কি আর আসবে?

রুদ্ধ কপাট খোলার অপেক্ষায় বারবার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাবে?

স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় সৌরভে আচ্ছন্ন সেই চত্বরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কতক্ষণ যেন।

সঙ্গী ডাক দিলেন, 'কি হল? বিকেল অবধি বসে থাকবে নাকি?'

নেমে এলাম।

মনে হ'ল বলি, 'বসে থাকবো এমন সাধ্যই বা কই? বসে থেকে কি খোলাতে পারবো দেবতার দ্বার?'

আজও আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি।

গাড়ীর মধ্যে এখনো সেই ধূপের মৃদু রেশ। সেদিনের মত মনে হচ্ছে এ কোন ধূপ?

চন্দন কস্তুরী? মৃগনাভি? মলয়? দেবার্চন?

যার গন্ধের চাবিতে খুলে গেল স্মৃতির একটা মরচেধরা কপাট?

হয়ত এই মনে পড়াটা কিছুই না। নিতান্তই একটা ক্ষণিক অনুভূতি, তবু সেই ক্ষণিকের অনুভূতিগুলিই তো আমাদের জীবনের পরম সঞ্চয়!

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শে অক্টোবর তারিখের অমৃত-তে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিত্রের "য়ুরোপে অনুবাদ-চর্চায় দু'এক কথা" শীর্ষক এক তথ্যবহুল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সুন্দর ও সময়োপযোগী আলোচনাটি পড়বার সময় স্বভাবতঃই বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগটির দৈন্যের কথাই বারবার আমার মনে পড়েছে। এই সম্বন্ধে দু-একটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই।

য়ুরোপের প্রায় সব বড়ো ও মাঝারি লেখকদের নাম বাংলা দেশের সং পাঠক মহলে পরিচিত—তা সম্ভব হয়েছে ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদাংশের সমৃদ্ধির জন্য। বাঙালী পাঠক টমাস মান বা জাঁ পল সার্ত্র-কে চিনেছে ইংরাজীর মাধ্যমে; দি কনফেসনস্ অব ফেলিক্স্ ক্রুল বা দি এজ অব রিজন্ পড়েছে ইংরাজীতে। কিন্তু আমাদের দেশের কথা ভাবলে কি দৈন্যটুকুই বড় হয়ে ধরা পড়ে না?

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অনুবাদ যে একেবারে হ'চ্ছে না তা' নয়—অন্ততপক্ষে প্রচেষ্টার অভাব নেই। বিশেষ ক'রে বটতলার উপন্যাস-লেখক ছাড়া সব সাহিত্যিকই এ ব্যাপারে অন্তত মাথা না ঘামিয়ে পারেননি। কবিমহলে এক সুস্থ আন্দোলন (এ ছাড়া অন্য কোনও কথায় ভাব প্রকাশ সম্ভব নয়) দেখতে পাচ্ছি। মাইকেল বা প্রমথ চৌধুরীর উত্তরসূরী হিসাবেই যে এ'দের কয়েকজন অনুবাদে হাত দিয়েছেন তা' নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আবেদন তাঁদের সৃষ্টিমানসে সাড়া জাগিয়েছে। কিছুদিন আগে বীট্-কবিদের নিয়ে মাতামাতি হয়ে গেছে; অথচ বাঙলা সাহিত্যে বীট-কবিতা অনূদিত হয়েছে অনেকদিন আগে। যতদূর মনে পড়ে, অরুণ ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী-তে মিহির গুপ্ত এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তা আজকের কথা নয়। সেই প্রবন্ধে বীট-কবিতার অনুবাদও ছিল। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেকেই এদিককার ওদিককার কবিতা অনুবাদ করেছেন; এমন কি জাপানী হাইকু কবিতা বা তংকা কবিতারও সদ্ব্যবহার করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বা দক্ষিণারঞ্জন বসু। কিন্তু সিস্টেম্যাটিক উপায়ে কেউ এখনও অনুবাদে হাত দিচ্ছেন না। যেমন ধরুন না সেক্সপীয়রের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা আজও বাংলাদেশে অপঠিত—কারণ কেউ সর্বতোভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালনে যত্নপর হচ্ছেন না। অবশ্য দু-একজন যে চেষ্টা না করছেন এমন নয়। দিলীপ রায় বহুদিন থেকেই ম্যাকবেথ বা টেমপেস্ট অনুবাদ করছেন—কিন্তু কেন জানি না তিনি শুরু করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন—শেষ করবার দিকে বিশেষ নজর তাঁর আছে বলে মনে হয় না। মণীন্দ্র রায়-ও বেশ কিছুকাল ধরে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে সেক্সপীয়রের অনবদ্য সনেটগুলি অনুবাদ করছেন।

যথা—

When in the chronicle of wasted time
I see descriptions of the fairest wights,
And beauty making beautiful old rhyme,
In praise of ladies dead and lovely knights,
Then in the blazon of sweet beauty's best,
Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,
I see their antique pen would have express'd
Even such a beauty as you master now.

সনেট ১০৬

অনুবাদ—

যখন বিগতস্মৃতি অতীতের কোনো কাহিনীতে
দেখি আমি বর্ণনায় অন্য কোনো রূপের প্রতিমা,
এবং সৌন্দর্য যদি সুন্দরের পদাবলী গীতে
প্রশংসায় ধ'রে রাখে মৃত নারী, বীরের মহিমা,
তখন সে মিছিলের তিলোত্তম প্রতি অঙ্গ মাঝে
হাতের, পায়ের, কিম্বা ঠোঁটের কি চোখের, ভুরুর,
সবারই ব্যাখ্যানে যেন পুরনো কলমে লেখা আছে।
তেমনি সৌন্দর্য তুমি যাতে আজ সংহত মধুর।

এ ধরণের সুললিত অনুবাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আজ রয়েছে।

বিনীত
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩১

মহাশয়,

বিগত শুক্রবার, ৯ই কার্তিক, ১৩৬৯, তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'সঙ্গীতাচার্য আলাউদ্দীন খান : শত-বর্ষের পথিক' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পান্নালাল দত্ত মহাশয়ের দুই-একটি বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিলাম, ইহা পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

৯৭২ পৃষ্ঠায় আছে—'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলাউদ্দীন খানকে তাঁহার ভ্রাতা আয়েত আলী খানকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে দিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে রাজি হন।'

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় যদি কবিগুরুর ঐরূপ 'অনুরোধের' কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ২২শে আশ্বিন ১৩৪২ তারিখের লিখিত পত্রে আমাকে বলিয়াছিলেন— 'যন্ত্রসঙ্গীত শেখাতে পারে এমন কোন লোকের সন্ধান তোমার আছে? যন্ত্রের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মাদকের অভ্যাস থাকলে চলবে না।'

কবিগুরুর আদেশানুযায়ী লোকের সন্ধান আমি দিতে না পারায় তিনি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়কেও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং তিনিই আয়েত আলী খাঁ সাহেবের শান্তিনিকেতনে পদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি।

শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয় আরও লিখিয়াছেন— 'তাঁহার (আয়েত আলীর) পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের (সেখানকার অন্যান্য শিক্ষকগণের) ঈর্ষা হইত। ইহা জানিতে পারিয়া আলাউদ্দীন নিজেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া অন্যান্য শিক্ষকদের দৌড় পরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের সামনেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, আয়েত আলীর বাজনাই শাস্ত্রানুগ। ঈর্ষাকারী শিক্ষকদের মুখ তখন চুন হইয়া যায়। তবে তার পরে তাঁহার ভ্রাতাকে শান্তিনিকেতন হইতে সরাইয়া লইয়াছিলেন।'

শান্তিনিকেতনের শিক্ষকগণের ঈর্ষা হইয়াছিল হয়ত, কারণ তাঁহারা কেহই নানারূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখেন নাই, আয়েত আলী খাঁ সাহেব সে বিষয়ে সুদক্ষ কারিগর। কবিগুরু তাঁহার সঙ্গীত ভবনের শিক্ষকদের বিদ্যার দৌড় পরীক্ষা করাইবার জন্য আলাউদ্দীনকে নিশ্চয়ই আমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও আমরা চর্মচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য উৎসুক।

ইতিহাসবিকৃত কাল্পনিক গুণাবলী আরোপ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের ভারতবর্ষে নূতন নহে, তাহা আমাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা করিতে যাইয়া পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ-মণীষীর কীর্তি সম্বন্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা সহ্য করিবার মত অপদার্থ আমরা আজও হই নাই।

বিনীত নিবেদক—
বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী
কলিকাতা-২৬

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়

২০শে অক্টোবর ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কমিউনিস্ট চীনের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। মেশিনগান, মর্টার প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশ সহস্রাধিক চীনা সৈন্য তুষারপাত ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে অতর্কিতে নেফা ও লদাক অঞ্চলের প্রহরারত ভারতীয় সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণের প্রথম দিনেই চীনা সৈন্যবাহিনী নেফা অঞ্চলে ঢোলার নিকটবর্তী ন্যামকাচু নদী অতিক্রম করে।

পশ্চিমে লদাক সীমান্তে চীনা সৈন্যবাহিনী কুড়ি হাজার ফুট উঁচু চীপচাপ ও গলোয়ান উপত্যকার ১১টি ভারতীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায় ও ৪টি দখল করে।

২১শে অক্টোবর বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের প্রবল আক্রমণে নিরুপায় হয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী জওয়ানরা নেফা অঞ্চলে ঢোলা, খিঞ্জেমান, দুঢাকারো সংচাত ও সলো ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে আসে।

পশ্চিম সীমান্তে গলোয়ান উপত্যকার সঙ্গে ভারতীয় ঘাঁটির সংযোগ ছিন্ন হয়।

২২শে অক্টোবর নেফা ও লদাক উভয় প্রান্তেই চীনাদের আক্রমণ আরও প্রবল আকার ধারণ করে। নেফার পার্বত্য অঞ্চলের সংগ্রাম কামেং ডিভিশন হ'তে লোহিত ডিভিশন পর্যন্ত ছড়িয়ে প'ড়ে।

লদাকে প্যানগঙ এলাকায় ঐদিন চীনারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে এবং ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা অন্তত পাঁচগুণ বেশী সৈন্য নিয়ে চীন ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গলোয়ান উপত্যকার সাতটি ভারতীয় ঘাঁটিই চীনা কবলিত হয়।

ঐদিন রাত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে এক বেতার-ভাষণে বলেন, "মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি। আরও কিছু বিপর্যয় হয়ত আমাদের হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

২৩শে অক্টোবর নেফার সুবর্ণশ্রী লোহিত ও কামেং ডিভিশনে চীনা বাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হয়। ফলে সমগ্র নেফা অঞ্চলই একটি রক্তাক্ত রণাঙ্গনের রূপ ধারণ করে। চীনাদের অগ্রগতির ফলে তওয়াং শহর বিপন্ন হয়ে পড়ে।

লদাক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

ঐদিন রাষ্ট্রপতিভবনে রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ঘোষণা করেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ও হৃতভূমি পুনরুদ্ধারই এখন আমাদের সম্মুখে একমাত্র কাজ।

২৪শে অক্টোবর মধ্য-নেফায় চীনা বাহিনী সুবর্ণশ্রী এলাকায় নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি করে। লংজুর দক্ষিণ-পশ্চিমে আসাফিলায় একটি ভারতীয় ঘাঁটির
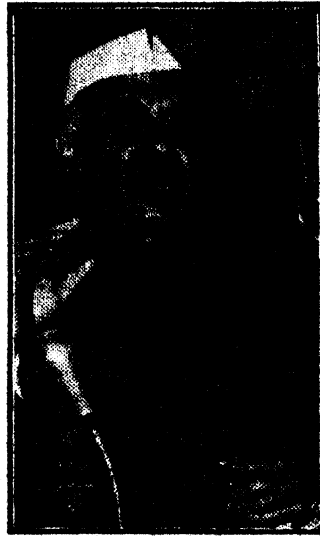
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

উপর চীনারা মর্টার ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালায়।

লদাক রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। একদিনে গলোয়ান উপত্যকার দশটি ভারতীয় ঘাঁটি চীনারা দখল করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐদিনই চীনের তিনদফা প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সবার আগে চীনা সৈন্যবাহিনীকে ৮ই সেপ্টেম্বরের স্থিতাবস্থায় ফিরে যেতে হবে, তারপর আলোচনা।

২৫শে অক্টোবর পূর্ব রণাঙ্গনে তওয়াঙের পতন হয়। বহু সৈন্যক্ষয়ের পর চীনারা দশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত ঐ মঠ-নগরীটি দখল করে। তওয়াঙের অসামরিক অধিবাসীদের তার পূর্বদিনেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়। লদাক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

২৬শে অক্টোবর পূর্ব রণাঙ্গনে চীনা বাহিনী তওয়াং অতিক্রম করে আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে জঙ দখল করে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবরের যুদ্ধে। চীনারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও লোহিত ডিভিশনের ওয়ালঙ এলাকায় তাদের দুটি বড় আক্রমণ ভারতীয় জওয়ানদের দ্বারা প্রতিহত হয়। চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে এইখানেই হয় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাফল্যের সূচনা। লদাক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিতই থাকে।

রাষ্ট্রপতি ঐদিনই সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে জাতীয় সঙ্কট ও আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে "ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স-১৯৬২" নামে একটি অর্ডিন্যান্সও ঘোষিত হয়। আপৎকালীন অবস্থায় এই অর্ডিন্যান্স একান্ত প্রয়োজন বিধায় সমগ্র দেশ তা সমর্থন করে।

চীনের তথাকথিত মীমাংসা-প্রস্তাব ভারত কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশিষ্ট পত্রিকা 'প্রাভদা' তাকে গঠনমূলক প্রস্তাব বলে

॥ ভারতের সমর্থনে ॥

চীনা আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে এবং ভারতের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি কামনা ক'রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত ২৬শে অক্টোবর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যে চিঠি লেখেন তার উত্তরে এ পর্যন্ত ৪০টি দেশ চীনা আক্রমণের নিন্দা ক'রে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন : ইথিওপিয়া, ইকুয়েডর, গুয়াটেমালা, জর্ডান, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, ডমিনিকান রিপাব্লিক, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, ফ্রান্স, সিংহল, সাইপ্রাস, নিউজীল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ট্রিনিদাদ, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, সুইডেন, ভেনিজুয়েলা, কোস্টারিকা, ইরাণ, নরওয়ে, চিলি, হাইতি, জাপান, গ্রীস, লিবিয়া, কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) উগান্ডা, পানামা, ক্যানাডা, ফিলিপাইন, আইসল্যান্ড, নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, ইটালী, এবং মালয়। (তালিকা অসম্পূর্ণ)

নেফার ওয়ালংখণ্ডে টহলদারী ভারতীয় সৈন্যগণ

সমর্থন করে এবং বিনাসর্তে চীনের ঐ তিনদফা প্রস্তাবে ভারতের অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাবে ভারতে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার করে।

২৭শে অক্টোবর নেফা ও লদাক উভয় রণাঙ্গনেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। ঐদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জানান যে, ভারতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকাতেও প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সমর্থনে ঐদিন প্রকাশিত হয় যে, শ্রীনেহরু রাষ্ট্রপতি কেনেডির কাছে অস্ত্র-সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে জরুরী পত্র লিখেছেন।

২৮শে অক্টোবর নেফা রণাঙ্গন নীরব থাকলেও লদাকে চীনা-আক্রমণ পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করে। দামচক এলাকায় চীনা সৈন্যের আক্রমণে ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২৯শে অক্টোবর চীনা সৈন্যের চাপে দামচক ও জারালা পরিত্যক্ত হয়। নেফা অঞ্চল হতে শুধু উভয়পক্ষের মাঝে মাঝে গুলী বিনিময়ের সংবাদ আসে।

ঐদিনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি জানান যে, আক্রান্ত ভারতকে সব উপায়ে সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও অনুরূপ আশ্বাস পাওয়া যায়।

দশদিনের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক, কামান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের আক্রমণে পঁচিশটি ভারতীয় ঘাঁটির পতন হয়।

৩০শে অক্টোবর নেফা অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী সর্বপ্রথম কামান ও মর্টার ব্যবহার করে। দশদিন যুদ্ধের পর এইদিনই সর্বপ্রথম ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যায়। তবে সিয়াং বিভাগে চীনাদের প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হওয়ায় ভারতীয় জওয়ানরা একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিপর্যয়ে দেশে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। চারিদিক হতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের অপসারণের দাবী ওঠে। প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে নিজহস্তে প্রতিরক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার ভারতের জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে এক ঘোষণায় জানান, পরের দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা-উৎপাদনমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু দেশবাসী এই ব্যবস্থাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা শ্রী মেননকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভা হ'তে অপসারণের দাবী জানান।

ঐদিন যুদ্ধের কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকে না। তবে মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর হতে এক ঘোষণায় বলা হয়, সপ্তাহকালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র হ'তে ভারতে বিমানযোগে হাল্কা ধরণের অস্ত্র ও গোলাগুলি পাঠানো হবে।

৩রা নভেম্বর অর্ডিন্যান্সবলে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের আটক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন।

৭ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদত্যাগপত্র গ্রহণ।

৮ই নভেম্বর উভয় সংসদের জরুরী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন—"পরিণাম যাই হোক না কেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারত কখনই হানাদারদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে না, এবং চীনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।"

সংসদে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

২০শে অক্টোবর হ'তে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত যুদ্ধে চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধকালে প্রায় আড়াই সহস্র ভারতীয় জওয়ান নিহত অথবা নিখোঁজ হন। বলাবাহুল্য, এটি অনুমিত হিসাব এবং এর মধ্যে আহতদের ধরা হয়নি, যাদের সংখ্যাও হয়ত ঐরকমই হবে। চীনাপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে তাদের হতাহতের সংখ্যা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশী বলে মনে করা হচ্ছে, এবং পিকিঙ রেডিওতেও তা অস্বীকার করা হয়নি।

৯-১১-৬২

সিজানগড়ে অনবরত বাগচী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অনবরত বাগচী বললেন 'মশায়, জলডুবিতে ডরোথী অ্যান্‌সন যখন ওরকম ব্যবহার করল তারপর আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। দূরে, সবকিছু থেকে দূরে যেতে চেয়েছিলুম এবং মেয়েদের সংস্রবে আর থাকব না ঠিক করে ফেলেছি। ঠিক সেই সময়ে নয়নের টেলিগ্রাম পেলুম।

সিজানগড়ের রাজকুমারী নয়ন। নয়নকে আপনাদের মনে পড়ে কি?'

আমরা ঘাড় নাড়লাম। অনবরত বাগচী বললেন 'দেখুন, মেয়েরাই আমায় জীবনে বড় বড় দাগা দিয়েছে।' তিনি বুকে হাত রাখলেন। বললেন, 'আঘাতে আঘাতে আমি জর্জর। কিন্তু সে কথায় কাজ কি? টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্লেনে চড়লুম। সকাল নাগাদ বোম্বাই। কেন বোম্বাই গেলুম তা যদি জানতে চান তবে স্বীকার করতেই হবে বোম্বাই আমি যাইনি। গেলুম ইস্পাতপুরী। অথচ টিকিট কাটলাম বোম্বায়ের।

ইস্পাতপুরী পৌঁছে নয়নের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। আমার হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছিল। নাগপুরে প্লেন থেকে নেমেছি আমি। কমলালেবুর ভ্যানে চড়ে এসেছি এই হতভাগা জায়গায়। হাঁটুতে ব্যথা। বললাম, ব্যাপারে কি নয়ন? অবজার্ড সিক্রেসি? টেলিগ্রামে ওকথা লিখলে কেন?

'নয়ন দেখতে কেমন?' অবিশ্বাসী রাজেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'নয়ন'? 'কুচকুচে কালো।' কালো-বাঘের মতো। দেখতে এবং স্বভাবে। আমার হাত ধরে তুলল নয়ন। বলল তুমি, একমাত্র তুমিই আমার বাঁচাতে পার বাগচী। নয়ন কেঁদে ফেললে। মশায়, নতজানু হয়ে মাথা নোয়াতে গিয়ে আমার পিঠের ব্যথা চাড়া দিয়ে উঠল। তবু আমি বললাম তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।

'নয়নের কাছে সব শুনলাম।'

'মশায়, সিজানগড় একদা স্টেট ছিল। এখন তার কিস্‌সু নেই। নয়ন দু'একটা ঘোড়া পোষে। পুণা এবং বোম্বায়ের মহালক্ষ্মী থেকে তার ঘোড়ার দরুণ যা পায় তাতেই চালাতে হয়।

'নয়ন বললে রেসের সময় আসন্ন। নয়নের বিশ্বস্ত জকি গোমেজ নাকি নয়নের নতুন ঘোড়া স্যাফায়ারকে তুক করেছে।

আমি বললুম নয়ন, আজকাল আর কেউ তুক-তাক করে নাকি! তুক মানে তুমি কি বলতে চাও? ইনডিআন উইচক্র্যাফ্‌ট?

'সে বললে জানিনে, তবে গোমেজ বর্তমানে হাসপাতালে। ঠ্যাং ভেঙে প'ড়ে আছে। স্যাফায়ার এদিকে খাচ্ছে না, দাচ্ছে না, কোর্সে দাঁড়িয়ে শুধু কি যেন শোকে আর চোখের জল ফেলে।

'বুড়োরাজাকে বলছ না কেন?'

'সে কথা আর বলো না। দিন নেই রাত নেই কবিতা পড়ছেন। কবিতা কপি করছেন। বাগচী, বাবা বোধ হয় বাঁচবেন না।'

আমি ভাবিত হলাম। যার পঞ্চষট্টি বছর বয়সের মধ্যে আটচল্লিশ বছরই কাটল অশ্বপৃষ্ঠে এবং কখনো ঘোড়ার সঙ্গে কখনো জকির সঙ্গে কথা ক'য়ে, সে লোক কবিতা পড়ছে! আমার মনে পড়ল নয়নের দাদার বৌ দেখতে যাবার দিন তাঁর কেমন ক'রে যেন ধারণা হয় তিনি বৌলি এস্টেটে ঘোড়া কিনতে এসেছেন। বৌলির রাজকুমারী যখন দরবার ঘরে ঢোকেন নয়নের বাবা নাকি তার দাঁত গুণে বলেন বয়স আটত্রিশ। শুনেই রাজকুমারী চেঁচিয়ে ওঠে। তখন তিনি তার পিঠে চাপড় মেরে বলেন, থাক্‌ আপ, মাই ল্যাস!

'সেই লোক কবিতা পড়ছে!'

আমি বললুম, নয়ন, তুমি ভেব না। আমিই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর।

নয়ন্ বললে, দ্যাট ইজ গুড। কিন্তু তুমি স্যাফায়ারের কাছে যাবার আগে স্নান ক'রে যেও। স্যাফায়ার বড় পিটপিটে।

আমি বললাম, আগে আমি বুড়ো-রাজার কাছে যাব। বুড়োরাজার কাছে গেলাম। দেখলাম গাছের ডালে হ্যামক বেঁধে আপন মনে দুলছেন। বুকের উপর একটি সুবৃহৎ বই। আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'নাই বা দৌড়ল স্যাফায়ার, নাই বা জিতল বাজি! বাগচী, এই প্রথম হব, বাজি জিতব, এমন নেশা কেন নয়নের? আমি বুঝিনি।'

বইটিকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। বললেন, 'ওসব ভাবতে হয় তোমরা ভাব গে! আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি!

আমি চেয়ে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। আবার মৃদু এবং ক্ষমা-সুন্দর হাস্য দিয়ে লজ্জা দিলেন আমাকে বুড়োরাজা। বললেন, 'গতি, গতির উপাসনাই করেছি এতদিন! বোম্বাই থেকে কলকাতা, হংকং থেকে প্যারী, ঘোড়ার পিঠে থেকে ঘোড়ার পিঠে উল্কার মতো ঘুরেছি আমি!'

গলা নিচু ক'রে বললেন, 'আজ আমি শান্তি পেয়েছি। পিঠে নয় বুকে। আঃ, প্যালেস মর্টগেজ, চাকর-ঝি'র মাইনে দশ বছর হলো বাকি, তিনজন রাণী মামলা রুজু করেছেন, কিন্তু আমায় বিচলিত করতে পারে না।'

আমি ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। নয়নকে বললাম, তুমি আমাকে বড় ভাবিয়ে তুললে নয়ন!

নয়ন বললে, যা করবার তাড়াতাড়ি ক'রো। রেসের আর ক'দিনই বা আছে! আমি ত' জানি জোজো বটুলীওআলা আর বুড়ী ভায়োলেট মেহ্‌তা এই চায়। স্যাফায়ার যাতে না নামে মাঠে।

আমি বললাম, কি ক'রে জানলে?

নয়ন ভয়ঙ্কর ও ক্রুর হাসিতে আমায় বিদ্ধ ক'রে বললে, সব খবরই রাখি আমি। আমি এ-ও জানি জোজো এবং ভায়োলেট দু'জনেই বাবার অনেক-দিনের দোস্ত। কিন্তু আমি কিছুই ভাবি না। আমার তুমি আছ!

ব'লে সে উচ্চহাস্য করল এবং আমার পিঠে চাপড় মারল।

আপনারা মনে করছেন তাতে আর কি; সে স্পর্শ ত' সুখেরই! মশায়রা একবার শুধু স্মরণ করুন, নয়ন ছ' ফিট লম্বা এবং একটি ছোট পিয়ানো সে একাই তুলতে পারে। ছোট গাড়ী খানায় পড়লে একাই তোলে।

আমি স্যাফায়ারকে দেখলাম।

কাছে গেলাম। ও আমায় শুঁকল। তারপরই বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত হ'য়ে গেল ও। দেখলাম নতুন জকি ওকে কত তাতাচ্ছে কিন্তু স্যাফায়ারের একটি পা-ও নড়ে না। একটু চলে দুল্‌কি তালে। তারপরই দাঁড়ায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং থরথর ক'রে কাঁপে।

থরে থরে খাদ্য এনে সাজালাম। কয়েকটি ঘোড়ী দেখলাম ওর আশেপাশে সহর্ষে হ্রেষারবে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু স্যাফায়ার যেন সব প্রলোভনই জয় করেছে।

বুড়োরাজার হদিশ পাই না। নয়নের মেজাজ সপ্তমে। হাসপাতালে গোমেজকে যেই শুধোই, 'বাবা, যা চাস দেব। বল দেখি ব্যাপারটা কি?' সে বুকে হাত রেখে আঃ আঃ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'ও'র নার্ভে আঘাত লেগেছে, আপনি যান।'

শেষে নয়ন একদিন আমায় বললে, 'বাগচী খুব সাবধান। তুমি আগুন নিয়ে খেলছ।

সুন্দরী, তুমি কৃষ্ণা, তুমি বহ্নি, এসব বলতে যাচ্ছিলুম। নয়ন বললে, 'পরশু আমরা বম্বে যাচ্ছি। যা পার কর। বম্বেতে সাতদিন থাকছি আমরা। তারপরই—!'

তখন আমি হাঁটতে লাগলাম। হাঁটছি এবং হাঁটছি। নিজেকে ভর্ৎসনা করছি, বাগচি, কবে আর তুমি মেয়েদের সর্বনাশা মোহ থেকে নিজেকে টেনে তুলবে? কবে? কবে?

ঠিক সেই সময়ে বনের গহন থেকে একটি কবিকল্পনা বেরিয়ে এল। সবুজ জামা, সবুজ শাড়ী, সবুজ সান্‌গ্লাস।
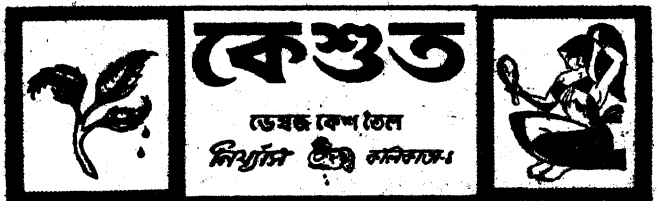
বললো, 'বাগচী, এসেছ? আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। আশ্চর্য হয়ো না। আমি গোমেজের বৌ সিতারা। আমি জানি স্যাফায়ারের কি হয়েছে।'

তুমি জান? জান সিতারা? ব'লে আমি আকুল হয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরলাম। সে বললে 'জানি বইকি!'

সে আর আমি। আমি আর সে। সে বলল, 'দামী কিছু চাইব না। তুমি শুধু মহারাজের কবিতার বইটি আমায় এনে দিও। আমি বাৎলে দেব কেমন করে স্যাফায়ারকে দৌড় করাতে হয়।'

'মশায়, কেমন করে মহারাজের পকেট থেকে সে কবিতার বই চুরি করলুম, কেমন ক'রে একদিন সিতারা, নয়ন, মহারাজ, আমি, নতুন জকি আর স্যাফায়ার বোম্বাই পৌঁছলুম তা আর জানতে চাইবেন না। মহারাজ তখনো জানেন না আমি তাঁর বই চুরি করেছি। তিনি শুধু নয়নের ভয়ে বোম্বাই এসেছেন এ কথাটিই বার বার বললেন।

নয়ন বাঘিনী হয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি এবং সিতারা হরিণের ম'তো সভয়ে পরস্পরকে ভালবাসছি। আমি একটি ফুল ফেলে দিই হোটেলের টেবিলে। সিতারা সেটি মাথায় নিয়ে গোঁজে। সিতারা একটি রুমাল উড়িয়ে দেয়, আমি সেটি বুকপকেটে রাখি।

রেসের দিন সকালে সিতারা আমার ঘরে এল। বলল, 'বাগচী, এখন আমি যা বলব তা শুনে আমাকে এবং গোমেজকে ক্ষমা করতে পারবে?'

সে যা বললে শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'সিতারা! সিতারা! এ কি সত্যি?'

সে হাত মুচড়ে কে'দে বললো 'হ্যাঁ। আমি, আমি এইমাত্র স্যাফায়ারের কাছ থেকে আসছি।।'

'হায় সিতারা! আমি কি করব?'

'তুমি?'

সে আমাকে একটি রুমাল ছ'ুড়ে দিল। সে রুমাল নিয়ে আমি কোর্সে যাই। সে রুমাল আমি জকির হাতে দিই। বলি, 'একবার শুধু ওকে শ'ুকতে দিও। তারপরেই ওর মনে পড়বে ওর নাম স্যাফায়ার। সাতপুরুষ ধ'রে যারা রেসে জিতেছে ও তাদেরই বংশধর!'

জকি সে রুমাল তাকে যথাসময়ে শোঁকায়। তার আগেই আমি নয়নকে দেখি। 'নয়ন!' ব'লে আমি চেঁচাতেই 'আরে মূর্খ!' ব'লে নয়ন আমার মাথার ওপর কেমন ক'রে যেন হাতটা ঘোরায়। আমার মনে হয় সব ভোঁ হ'য়ে গেল। জ্ঞান হারাতে হারাতে আমি শুনি বুড়োরাজা আমার কানের কাছে গর্জন করে বললে, 'আমার বই!'

অনবরত বাগচী একটু দম নিলেন। বললেন, 'মশায়, বিশ্বাস করুন সেবার ছ'টি মাস ভুগলাম আমি। জেজো বটলীওআলা, ভায়োলেট, বুড়োরাজা, নয়ন, সবাই পেটায় আমায়।' চার মাস হাসপাতালে।'

'কেন?'

'বুঝলেন না?'

নয়ন স্যাফায়ারকে ছোটাবে। স্যাফায়ার গোমেজদের হাতে। বুড়োরাজাকে হঠাৎ জেজো এবং ভায়োলেট মোটা টাকা দিলে। শর্ত, স্যাফায়ারকে ছোটান চলবে না। সে টাকা ঐ বইয়ের বাঁধান মলাটের মধ্যে। অতএব স্যাফায়ার এবং গোমেজের বিচ্ছেদ ঘটে। ঘোড়া যখন বেরিয়ে গেছে তখন নয়ন শুনল জিতলে যা পাবে, তার দ্বিগুণ টাকা পাবে ও-না জিতলে। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়েছে। ঘোড়া মোক্ষম ওষুধ পেয়ে ছুটেছে।'

'তারপর?'

'শেষ অবধি আমায় প্রথমে হাসপাতাল এবং তারপর জেলে যেতে হলো।'

'জেলে কেন?'

'বাঃ, এখনো বোঝেননি?'

'বা, গল্পটা দাঁড়াল কি?'

'কি আর দাঁড়াবে। গোমেজ আর সিতারা যে যার মত পালাল। নয়ন টাকা পেয়ে সে জকিকে বিয়ে করে ফেললে। বুড়োরাজা আমার চিঠি পাঠালে, আমি তখন জেলে।'

'কেন?'

অনবরত বাগচী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনাদের তুল্য বেরসিক কম দেখেছি। জেলে দেবে না ত' কি করবে? বোম্বায়ে প্রহিবিশান না? স্যাফায়ার কি খেয়ে ছুটত তা বোঝেননি? রোজ ও এবং গোমেজ হুইস্কি খেত। খাটি হুইস্কি-ভেজা রুমাল নিয়ে ওর নাকের সম্মুখে একবারটি নাড়াতে হত। তখন ও ছুটত! আহা, প্রেরণা না পেলে ছুটবে কেন! খুড়োর কল কবিতাটা ভাবুন না।

'আমার কথা ভাবুন! ইন দি স্টেট অফ বম্বে একটি নিরীহ পশুকে বিপথে ধাবিত করবার অপরাধে দু'মাস জেল।'

বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করবেন না, মেয়েদের বিশ্বাস করবেন না। এ আমার অনেক দুঃখ অনেক ঠেকে শেখা! সেই থেকে মশায় কাব্যপ্রিয় বৃদ্ধলোক, ঘোড়া-পাগল মেয়ে, ধূর্ত জকির বৌ এবং নেশাগ্রস্ত ঘোড়া থেকে আমি দূরে দূরে থাকি।'

আমরাও এবার দূরে দূরে ছিলাম। হাতে অনবরত বাগচী যাবার সময় ভুলে কিছু নিয়ে না যেতে পারেন—ছাতাটা কিংবা সিগারেটের টিনটা। বলা ত' যায় না!

বাঙলা গদ্যকবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্র

সুধীর করণ

বাঙলা সাহিত্যে গদ্য-কবিতা রচনার প্রথম অনায়াস-কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থটিকে এই হিসেবে বাঙলা গদ্য-কবিতার প্রথম গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। 'লিপিকা' নামক কাব্যায়িত গদ্য-রচনার পুস্তকটি আসলে কোন্ জাতীয় রচনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। মূলতঃ 'ব্যক্তিক নিবন্ধ' হলেও লিপিকার প্রত্যেকটি রচনা বাহ্যতঃ একই পর্যায়ের নয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে, গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্তিলাভের অধিকার পাওয়ার ফলে লিপিকার জাত-গোত্র-কৌলীন্য সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা সান্ত্বনা লাভ করলো বটে, কিন্তু তা'তেও সন্দেহের কারণ দূরীভূত হয়নি। বিতর্কিত বিষয়বস্তুকে আপাততঃ দূরে রেখে এ কথা বোধ হয় অনায়াসে বলা চলে যে, 'লিপিকা' রবীন্দ্রনাথের জাত-হারানো প্রিয়া। ছোট-গল্পের মুক্তি লিপিকাতে অপ্রাপ্য তবু লিপিকাকে গল্পের সংগ্রহশালায় পেয়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। লিপিকার যে কয়েকটি রচনায় কাব্যপ্রাণ আছে অর্থাৎ যা শুধু কাব্যায়িত গদ্য না হয়ে গদ্য-কবিতার রূপ-রসের ছোঁয়া পেয়ে নবজন্মের সিংহদ্বারের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে, সে-গুলিকে বাঙলা সাহিত্যের আদি গদ্য-কবিতারূপে স্বীকৃতি দানের পক্ষে অপরিসীম বাধা-নিষেধ ছিল বলে মনে হয় না। তবু লিপিকার রচনাগুলির কয়েকটিকেও যে তিনি পদ্যের মতো খণ্ডিত করে প্রকাশ করেন নি, ভীরুতাকেই তার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে এ ভীরুতার মূলে আরও যে কারণ ছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। রচনাগুলির অপরিমিতির কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যায়িত গদ্য এবং গদ্য-কবিতার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই লিপিকার রচনাগুলিকে সরাসরি গদ্য-কবিতা বলে দাবী করতে পারেন নি। তবু লিপিকার কয়েকটি রচনাই যে গদ্য-কবিতা রচনার প্রয়াস-জাত, তা তিনি স্বীকার করেছেন। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকাতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এইভাবে :—

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্য-শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাঙলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি। লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ হয় ভীরুতাই তার কারণ।
>
> তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল। কেবল ভাষা-বাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

লিপিকা প্রকাশের দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ ২ ॥

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত কথাকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আরোপ করলে তা' হয়তো শ্রুতিকটু বলে মনে হতে পারে। কেন না, অবনীন্দ্রনাথ তবু গদ্য-কবিতা রচনায় প্রেরণা লাভ করে প্রয়াসও করেছিলেন, কিন্তু ঠিক এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'গদ্য-কবিতা' রচনা করার চেষ্টা করেন নি। অথচ কথাটা ঠিক নয়।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই গদ্য-কবিতার প্রথম সার্থক সৃষ্টিকার,—এ কথা মনে রেখেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে হচ্ছে। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৩২, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ যখন কবি-কাহিনী রচনা করছেন কিশোর বয়সে, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম চেষ্টারত ছিলেন গদ্য-কবিতা রচনায়। বলা বাহুল্য সে চেষ্টার ফল যা-ই হোক না কেন, একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে সজ্ঞান প্রচেষ্টায় সূত্রপাত করেছিলেন। লিপিকার কয়েকটি রচনাকে যেমন অনায়াসে খণ্ডিত ক'রে কাব্যের কাঠামোটিকেও অন্ততঃপক্ষে পরিস্ফুট করা যেতো বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনার মধ্যেও সে সম্ভাবনা ছিল।

কাব্যায়িত গদ্যকে খণ্ডিত করার প্রথম প্রচেষ্টা অবশ্যই রাজকৃষ্ণ রায়ের। কিন্তু ঠিক এই কারণেই রাজকৃষ্ণ রায়কে বাঙলা সাহিত্যে আদি গদ্য-কবিতা-নির্মাতার স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আসলে রাজকৃষ্ণ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই যে এ ধরণের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা' আয়াসবোধ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজকৃষ্ণ রায় উভয়েই কাব্যায়িত গদ্য রচনা করেছিলেন এবং গদ্য-কবিতার আদি রূপ হিসাবে কাব্যায়িত গদ্যকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাব্যিক স্বীকৃতি দান করাও যেতে পারে। না-হয়, এ'দের কেউই যথার্থ গদ্য-কবিতার স্রষ্টা নন। এ-কথা মনে রেখেই এই আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

কবি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও অপরিচয়ের কালিমা বহন করে আছেন, অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু অ-কবিও সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবি-নামহীনতার মূল কারণ বোধ হয় তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই কবিপ্রাণতার অধিকারী ছিলেন। কবিতা রচনা করার মানসিকতা এবং রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল না। উপন্যাসের মধ্যেও তার পরিচয় আছে এবং অবিসম্বাদিতভাবে কমলাকান্তের দপ্তরে সংখ্যহীন নিদর্শন উল্লেখিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাগণের কুক্ষীভূত থাকুক। এখানে তাঁর কয়েকটি গদ্য-কবিতা সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। যে কাব্য-গ্রন্থে তিনি তিনটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, সেই কাব্য-গ্রন্থটির নাম 'কবিতা-পুস্তক'। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

কবিতা-পুস্তক সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুন না কেন নিজেকে

কবি হিসাবে পরিচিত করার মতো উৎসাহবোধ না করার কোন কারণই তাঁর ছিল না। কিন্তু বোধ হয় একথা তিনি ভাবোভাবেই জানতেন যে, তাঁর আত্ম-প্রকাশের পথ উপন্যাসের এবং প্রবন্ধের মধ্যে। কবিতা তাঁর কাছে নতুন কোন দিকদর্শক হিসাবে আসে নি। গতানুগতিক কাব্যরীতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি। ফলে সঙ্কোচের সঙ্গেই তিনি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

যাই হোক এই কবিতা-পুস্তকের মধ্যেই তিনটি রচনার মাধ্যমে বঙ্কিম-চন্দ্রই সর্বপ্রথম গদ্যের কাব্যরূপপ্রাপ্তি সম্পর্কে সজ্ঞান চেষ্টার পরিচয় রেখে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য :

> কবিতা-পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য-প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্য-কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যে-রূপ কবিত্ব-শূন্য আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথার কিছু অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ মিল আছে। 'অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন, 'গদ্য-কাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন-ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া

সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।'

বলাবাহুল্য, আমার বক্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে গদ্য-কবিতার সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেন। তাঁর লিখিত গদ্য-কবিতাগুলি যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে গদ্য-কবিতার পর্যায়ভুক্ত নয়, তবুও উক্ত গদ্যকবিতাগুলির মূল্য বঙ্কিমচন্দ্রের সজ্ঞান প্রচেষ্টার স্বাক্ষর হিসেবেই ইতিহাসভুক্ত হ'তে পারে। কাব্যায়িত গদ্য হিসাবে অবশ্যই সেগুলি স্মরণযোগ্য। পুনশ্চ-র অনেক কবিতাই এমনি কাব্যায়িত গদ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার স্পর্শে সেগুলি প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, গদ্য-কবিতা হিসাবে সে-গুলির মূল্যও অনায়াসগ্রাহ্য মনে হয়। তা' ছাড়া কবিতা-পুস্তক ও পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের কাল-ব্যবধানও অল্প নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরেই পুনশ্চ জন্মলাভ করে।

॥ ৩ ॥

কবিতা-পুস্তকের অন্তর্গত তিনটি গদ্য-কবিতা প্রথম জন্মলগ্নের সর্ববিধ দুর্বলতায় পূর্ণ। শুধু প্রাণপণে চিৎকার করেই হয় তো সে আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেছে মাত্র। তবু, লিপিকার সঙ্গে মেঘ, বৃষ্টি এবং খদ্যোত নামযুক্ত এই তিনটি গদ্য-কবিতার একটি সুদূর আত্মীয়তার মৌলিক যোগসূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোৎ ব্যক্তিগত প্রাবন্ধিকতায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত; কবিতা হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ মোটেই গ্রাহ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের লিপিকাতে যে বাধা অল্প ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-পুস্তকে সেই বাধাই ছিল বেশী।

আসলে, মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতের উপর কমলাকান্তের দপ্তরের সংবেদনশীল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটু সংযত হলে মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতকে অনায়াসে গদ্য-কবিতার প্রথম রূপ হিসাবেই আলোচনার ক্ষেত্রে টেনে আনতে পারা যেতো। রবীন্দ্রনাথ যেমন সজ্ঞানে গদ্য-কবিতা রচনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই গদ্য-কবিতা সৃষ্টি করতে বসেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক সেইভাবে গদ্য-কবিতা রচনা করতে বসেন নি। শুধু এই বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, গদ্যও কাব্যের বাহন হতে পারে। প্রতিভাবান কবি হলে এই চিন্তার কেন্দ্র থেকেই তিনি গদ্য-কবিতার সৃষ্টি করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ঘাটের কথা, রাজপথের কথা প্রভৃতি আত্মকথনমূলক রচনার পূর্বাভাস হিসেবে তখন আর বিশেষ করে খদ্যোত-নামক রচনাটি মনে পড়ত না।

তবু, অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি পংক্তিকে যদি কাব্যরীতিতে বিন্যস্ত করা যায়, তা' হলে একটি মনোরম বিভ্রান্তিও লাভ করা যেতে পারে মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতের ভেতর থেকে। সাধারণ গদ্য-ভঙ্গীতে রচনাগুলি যেখানে কাব্যায়িত গদ্য ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, সেখানে শুধু পংক্তি-বিন্যাসের সৌজন্যে সেগুলি অংশতঃ গদ্য-কবিতা বলে ভ্রম হতে পারে। উদাহরণ :

আমি যখন মন্দ গম্ভীর গর্জন করি
বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া
শিখীকুলকে নাচাইয়া
মৃদু গম্ভীর গর্জন করি—
তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে
মন্দার মালা দুলিয়া উঠে,
নন্দসূনুশীর্ষকে
শিখীপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে
পর্বত গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি
কাঁপিয়া উঠে।

আর—

বজ্রনিপাতকালে,
বজ্রসহায় হইয়া
যে গর্জন করিয়াছিলাম
সে গর্জন শুনিতে চাহিও না।
ভয় পাইবে।

(—মেঘ)

এ মোহিনী কি
আমি জানি।
জ্যোতিষ্মান হইয়া এ সংসারে
আলো বিতরণ করিব—
বড় সাধ,
কিন্তু হায়!
আমরা খদ্যোত,
এ আলোকে কিছুই
আলোকিত হইবে না।
কাজ নাই।
তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ কিশলয়কৃত
অন্ধকার মধ্যে
তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও।
আমিও জলে হউক স্থলে হউক
রোগে হউক দুঃখে হউক
এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

(—খদ্যোত)

অংশ বিশেষ উদ্ধৃত ক'রে সমগ্র রচনার বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করা যায় না। এমন কি, উক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্য দিয়ে কোন সুদূরপ্রসারী কাব্যব্যঞ্জনাও যে ধ্বনিত হচ্ছে না, এ কথাও ঠিক। কিন্তু, ভাষার গৌরবে, সাবলীল পদবিন্যাসে এই অংশগুলি কাব্যায়িত হয়ে উঠেছে এও অস্বীকার করা যায় না। 'মেঘের' মধ্যে তার গুরু গুরু গর্জনের সঙ্কেত যদি ধরা পড়ে থাকে, 'বৃষ্টির' মধ্যে যদি সর্বব্যাপ্তির আভাস থাকে, আর খদ্যোত যদি তত্ত্বায়িত জীবনবোধের স্ফুলিঙ্গকেও প্রকাশ করে থাকে, তা' হলে তা' কাব্যের সুরের মাধ্যমেই ব্যক্তিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গদ্য-কবিতাগুলির সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের গদ্য-কবিতাগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, রাজকৃষ্ণ যদিও পংক্তি ভেঙেই গদ্য-কবিতা রচনা করেছিলেন, তা' প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর থেকে বেশী দূর যেতে পারেনি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসর সরোজিনী কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দুটি গদ্য-কবিতা পাওয়া যায়। এইজন্য কোন কোন সাহিত্য-ঐতিহাসিক তাঁকে বাঙলা গদ্য-কবিতার আদি গদ্য-কবিতাকার হিসাবে স্মরণ করেছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-পুস্তক এর অনেক আগেই প্রকাশিত। সাহিত্যসাধক চরিতমালার লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজকৃষ্ণ রায়কেই এবিষয়ে কৃতিত্ব দান করেছেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আর্য-দর্শনে প্রকাশিত বর্ষার মেঘ নামক একটি গদ্য-কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই কবিতার পাদটীকায় বলা হয়েছিল : 'যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-পৌঙক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভ যার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।'

বর্ষার মেঘ কবিতাটি দীর্ঘ। পংক্তি-বিন্যাসে কোনরূপ ভীরুতাকে আশ্রয় তিনি দেন নি। বোধ হয় এই কারণেই রাজকৃষ্ণ রায়কে আদি গদ্যকবিতা নির্মাণকারী বলা হয়েছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় যতটুকু কাব্যরস প্রাপ্তির সম্ভাবনা, ততটুকুও রাজকৃষ্ণ রায় দিতে পারেননি। উদাহরণ,

ভাই বৈজ্ঞানিক!
একবার বেস করে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজিপাটা কি লইয়া?
পরমাণু লইয়া নয়?
তোমার সূর্য কি?
চন্দ্র কি?
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি?

শুধু প্রথমদিকে গদ্য ভাষাকে একটু কাব্যায়িত করার চেষ্টা আছে মাত্র।

আকাশ নীল—অনন্ত নীল
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক্‌শোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি
হতে
ধীরে ধীরে বায়ুস্রোতে
একখানি ক্ষুদ্র মেঘ ভাসিয়া আসিল।
ইত্যাদি......

মোটের উপর বাঙলা গদ্য-কবিতার উদ্ভবকাল বঙ্কিমযুগেই এবং বঙ্কিমচন্দ্রই গদ্য-কবিতার প্রথম সজ্ঞান নির্মাতা।

অয়স্কান্ত

জীবজগতের আশ্চর্য জীবনযাত্রা

আমরা নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত থাকি যে আমাদের আশেপাশের জীব-জগতের দিকে তাকাবার অবসর বড়ো একটা পাই না। আমাদের ঘরের দেওয়ালে যে টিকটিকিটি ঘুরে বেড়ায়, মেঝের গর্ত থেকে যে পিঁপড়ের সারি বেরিয়ে আসে, খাটের কোণে যে মাকড়শাটি জাল বোনে, জানলার কপাটে যে চড়ুইপাখিটি উড়ে উড়ে বসে—তাদের জীবনযাত্রার মধ্যেও যে কিছু কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে তা জানবার তাগিদ আমাদের ব্যস্তত্রস্ত জীবনে নেই বললেই চলে। অথচ বহু বিজ্ঞানী তাঁদের সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন শুধু এই জীবজগতের জীবন-যাত্রাকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। যে-সব আশ্চর্য তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চ-কর। এ সপ্তাহে আমি একটি অতি সাধারণ জীবের অতি আশ্চর্য জীবন-যাত্রার কিছু বিবরণ উপস্থিত করতে চাই।

॥ পিঁপড়ে ॥

পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। অতি সুশৃঙ্খল তাদের জীবনযাত্রা। আমরা কলকাতার মানুষেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে লাইন করে দাঁড়াতে শিখেছি। কিন্তু যেকোনো পিঁপড়ের সারির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, লাইন করে চলার ব্যাপারে আমরা এখনো ওদের কাছে শিক্ষা নিতে পারি। দু-দিক থেকে আসা দুই পিঁপড়ে যখন আচমকা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুঁড় নেড়ে কথা বলে—সে দৃশ্যও তাকিয়ে দেখার মতো। শব্দ শোনা না গেলেও শুধু ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, পিঁপড়েরা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জীবজগতে খুবই কম।

সকলেই জানেন, পিঁপড়েরা যে বাসা তৈরি করে তা শুধু একটু বাসা নয়, রীতিমতো একটি রাজ্য। সেই রাজ্যে রয়েছেন কয়েকজন রাণী, কয়েকজন পুরুষ ও প্রায় [illegible] মতো কর্মী। রাণীর সংখ্যা দুই বা তিন থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে কাঠপিঁপড়েদের এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। রাণীদের আয়ু পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত। তবে কোনো রাজ্যই রাণীশূন্য থাকে না। একদল রাণী মারা গেলে নতুন আরেক দল রাণীকে নির্বাচিত করা হয়।

রাণীদের যত্ন ও তোয়াজ করবার জন্যে সবসময়ই একদল কর্মীকে হাজির থাকতে হয়। তারপরে রাণী যখন ডিম পাড়তে শুরু করেন তখন সেই ডিমের পরিচর্যা করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয় আরো একদল কর্মীকে। এই পরি-চর্যার ব্যবস্থাটি এমনই সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক যে আমাদের শিশু-হাসপাতাল-গুলির পক্ষেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আদর্শ হতে পারে।

ডিমের প্রসঙ্গই যখন উঠে পড়েছে, পিঁপড়ের ডিম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা দূর করা যেতে পারে। সাধারণত ডিম ফুটে ছানা বেরোতে সপ্তাহ তিনেক সময় লাগে। কিন্তু ছানা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচর্যার পালা শেষ হয়ে যায় না। বরং পরিচর্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। একদল 'নার্স' সবসময়ে এই ছানা-গুলোকে চোখে চোখে রাখে, তাদের গা পরিষ্কার করে, তাদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, দিনের বেলা বাইরের রোদে আর হাওয়ায় নিয়ে আসে, রাত্রিবেলা ভেতরে নিয়ে যায় এবং আরো হাজার রকমে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করে। তারপরে এই ছানাগুলো যখন পুরোপুরি বড়ো হয়ে ওঠে তখন নার্সরা ছানাগুলোর জন্যে রেশমী গুটী তৈরি করে। বাজারের যে পিঁপড়ের ডিম বিক্রি হয় তা আসলে এই রেশমী গুটীগুলো।

তারপরে যখন গুটী থেকে বাচ্চা পিঁপড়ের বেরিয়ে আসার সময় হয় তখন এই নার্সরাই আবার এই গুটীগুলোকে কেটে তাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। তারপরেও কিছুদিন পর্যন্ত বাচ্চা পিঁপড়েদের নার্সদের তত্ত্বাবধানে থেকে হাঁটাচলা শিখতে হয়।

পিঁপড়েদের রাজ্যকে তুলনা করা চলে আধুনিক কালের মস্ত একটি শহরের সঙ্গে। চারদিকে ছোট-বড়ো রাস্তা ও মস্ত মস্ত হলঘর ও গ্যালারি। নিখুঁত পরিকল্পনা মতো সর্বত্র কাজ হচ্ছে। আর এই সমস্ত রাস্তা ও ঘর-বাড়ি আমাদের কলকাতা শহরের মতো মোটেই নয়, একদল কর্মী সব সময়েই মেরামতীর কাজ করছে, একদল কর্মী সব সময়েই পরিষ্কার করে চলেছে।

আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যদিও আমাদের চোখে সব পিঁপড়ের চেহারা একই রকম, কিন্তু পিঁপড়েরা খুব সম্ভবত একে অপরকে আলাদা করে চিনতে পারে। কারণ, দেখা গিয়েছে, এক রাজ্যের পিঁপড়েকে অপর রাজ্যে কখনোই ঢুকতে দেওয়া হয় না। আবার, কোনো একটি বিশেষ রাজ্যের কোনো একটি বিশেষ পিঁপড়ে যদি বহু দিন কোনো কারণে বাইরে থাকে আর তারপরে ফিরে আসে তাহলে তাকে বিনা আপত্তিতেই ঢুকতে দেওয়া হয়।

মানুষের মতো পিঁপড়েরাও চাষ-আবাদ করে ও গাই দোয়ায়। পিঁপড়ে-দের গাই হচ্ছে এক ধরণের পোকা যা গাছের পাতায় বা শেকড়ে বসবাস করে। গাই দোয়াবার পদ্ধতিও অদ্ভুত। পিঁপড়ে তার শুঁড় দিয়ে এই পোকার গায়ে সুড়সুড়ি দেয় আর পোকাটি মধুর মতো মিষ্টি একটি ফোঁটা বার করে। সেই মিষ্টি ফোঁটার খানিকটা পিঁপড়ে নিজেই খায়, বাকিটা বাসায় নিয়ে যায় অন্যদের জন্যে।

এই বিশেষ ধরণের পোকারাই হচ্ছে পিঁপড়েদের গাই। পিঁপড়েরা এই গাইদের খুবই যত্নআত্তি করে। অন্যান্য পোকা-মাকড় যাতে এই গাইদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর রাখে। শরৎকালে এই পোকার ডিম-গুলোকে পিঁপড়েরা বাসায় নিয়ে যায় এবং শীত থেকে বাঁচায়। তারপরে

ও মশাই দরজা খুলুন না

বসন্তকালে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে তখন আবার বাচ্চাগুলোকে রেখে আসে গাছের পাতায় বা শেকড়ে। এই পিঁপড়েদের দেখলে বোঝা যাবে, আমরা মানুষরাও অনেক সময় গাইদের এতখানি সেবা-যত্ন করতে পারি না।

পিঁপড়েদের রাজ্যে অসুস্থ বা আহতদের জন্যে চিকিৎসার বন্দোবস্তেও কোনো রকম ঘাটতি নেই। অনেকটা আমাদের হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা। অসুস্থ বা আহত পিঁপড়েকেও সেখানে আলাদা ঠাঁই নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি শল্য-চিকিৎসাও করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পিঁপড়ের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ছুরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাই বলে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, পিঁপড়েরা সব সময়েই কাজ নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। প্রসাধনের দিকেও তাদের খুবই মনোযোগ। হাজারটা কাজের মধ্যেও খানিকটা অবসর করে নিয়ে তারা রীতিমতো ঘটা করে প্রসাধন করতে বসে। প্রসাধন দ্রব্যেরও কোনো অভাব নেই। তাদের পায়ের সঙ্গেই আছে বুরুশ, চিরুনি, এমন কি বিউটি ক্রীম পর্যন্ত। বুরুশ হচ্ছে কয়েক গাছি ক্ষুদে ক্ষুদে শক্ত চুল, চিরুনি হচ্ছে কয়েক গাছি ক্ষুদে ক্ষুদে নরম চুল। এই নরম চুলগুলোর ভেতরটা ফাঁপা। আর এই ফাঁপা চুলের ভেতর থেকে এক ধরণের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই হচ্ছে বিউটি ক্রীম। আর এমনই প্রসাধনের ঘটা যে একজন আরেকজনকে ডাকে প্রসাধনে সাহায্য করবার জন্যে। সাহায্যকারীও যথাসাধ্য অনুরোধ রক্ষা করে।

গরমের দিনে মাঝে মাঝে দেখা যায়, একদল পিঁপড়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছে। এই উড়ন্ত পিঁপড়েদের কয়েকটি হচ্ছে রাণী আর বাদবাকিরা পুরুষ। তারপরে আকাশেই হনিমুনের পর্বটি সাঙ্গ হয়। রাণী পিঁপড়েরা তারপরে আবার ফিরে আসে নিজেদের রাজ্যে আর ডিম পাড়তে শুরু করে। সেই ডিম থেকে জন্ম নেয় নতুন একদল পিঁপড়ে। এমনিভাবে এক-একটি রাজ্য বহুকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণা, দু-শো বছরের পুরনো পিঁপড়ে-রাজ্যের সন্ধান পাওয়াটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এবারে পিঁপড়েদের সম্পর্কে সব-চেয়ে আশ্চর্য খবরটি দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

শুনলে অবাক হতে হবে যে, প্রজাপতির জন্ম হয় পিঁপড়ের রাজ্যে। প্রজাপতি ডিম পাড়ে গাছের পাতায়। সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে এক ধরণের শুঁয়োপোকা। কিন্তু এই শুঁয়োপোকারা গাছের পাতায় থাকে না, গাছ বেয়ে বেয়ে মাটিতে নেমে আসে আর [illegible] ঘুরে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত এই শুঁয়োপোকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায় বিশেষ এক জাতের পিঁপড়ের। আর তখনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে। পিঁপড়ে তার শুঁড় দিয়ে শুঁয়োপোকার গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। শুঁয়োপাকার পিঠে আছে মধুভর্তি গ্ল্যান্ড। সেই গ্ল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসে এক ফোঁটা মিষ্টি মধু। পিঁপড়ে পরমানন্দে সেই মধু খেতে থাকে। আর ওদিকে শুঁয়োপোকাটি হঠাৎ পিঠ বেঁকিয়ে গুটলি পাকিয়ে যায়। পিঁপড়ে তখন সেই গুটলিটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় নিজেদের রাজ্যে।

তারপরে সে এক বিপুল অভ্যর্থনা-পর্ব। সারা রাজ্যে যেন সাড়া পড়ে যায়। সেবাযত্নের ধুম শুরু হয়। বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি হয় শুঁয়োপোকাটির জন্যে। বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত থাকে। শুঁয়োপোকাটি হয়ে ওঠে একটি জড়-কীট এবং এইভাবে কাটে একুশটি দিন।

ঠিক একুশ দিন পরে জড়কীটের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে নীল প্রজাপতি। তখনো তার ডানাদুটো এঁটে থাকে শরীরের সঙ্গে। তারপরে সে পিঁপড়ের রাজ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তারপরে নীল ডানা মেলে নীল আকাশে উড়তে শুরু করে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

প্রথম বিপদের সঙ্কেত পেল কান্তি একদিন মোক্ষদার কাছ থেকেই। সেদিন কী একটা হাফ-হলিডের দিন, শনিবারই বুঝি, দুপুরবেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেছে যখন সে রতনদি তখনও ঘুমোচ্ছেন। একটু ইতস্তত করল, একবার ভাবল ঠেলে ঘুম ভাঙায় রতনদির। আবার কী মনে করে ওপরে উঠে গিয়ে বইখাতা নিয়েই বসল। অনেকদিনের টাস্ক জমে গেছে সব। মাস্টারমশাইদের কাছে কদিন ধরেই বকুনি খাচ্ছে—রতনদি একবার উঠে পড়লে আজও হবে না কিছু। এই বেলা সেরে নেওয়াই ভাল।

সে বিছানাতে বসে অঙ্ক কষছে, মোক্ষদা এল ঘর ঝাঁট দিতে। খানিকটা নীরবেই ঝাঁট দিল সে, তারপর কী মনে করে ঝাঁটাটা ফেলে কান্তির সামনে এসে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে।

প্রথমে অতটা বুঝতে পারেনি কান্তি। ঝাঁটার শব্দ থেমে যাওয়াও লক্ষ্য করেনি অত—হঠাৎ এক সময় কাছে একটা মানুষের উপস্থিতি অনুভব ক'রে মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে মোক্ষদা। মুখেও তার কেমন এক ধরণের হাসি। সে কি কৌতুকের না অনুকম্পার—না বিদ্বেষের তা ঠিক করতে পারল না কান্তি। কেমন যেন ভয় করতে লাগল তার। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'কী গা মোক্ষদাদি, আমায় কিছু বলবে?'

মুচকি হাসল মোক্ষদা। বলল, 'আর কিছু নয়—বলছিনু কি আর নেকাপড়ার ঠাট কেন ঠাকুর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না। আর যে কিছু হবে না এখানে থেকে তা তো নিজেই বুঝতে পারছ। এই বেলা পালাও—ভাল চাও তো। তবু এখনও জাত-ধম্মটা আছে—আর কিছু দিন এখানে পড়ে থাকলে সে দুটোও যাবে, রেহকাল পরকাল দুই-ই খুইয়ে বসে থাকতে হবে। লাভ তো হবেই না কিছু, উপরন্তু মার খেয়ে বেরোতে হবে এ বাড়ি থেকে, এও বলে রাখছি। মুকী আজকের লোক নয়, দেখল ঢের।...ওমাগীর ছেমো যখন চেপেছে তখন বেশী দিন আর তোমার বাঁচোয়া নেই, তোমার কাঁচা মাথাটি পরিপুন্ন ক'রে চিবিয়ে না খেয়ে ছাড়বে না। তবে এখনও সময় আছে, যদি পালিয়ে বাঁচতে পারো তো দ্যাখো। বামুনের ছেলে তায় গরীবের ছেলে—চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে তাই বলা।'

সত্যিই সেদিন কিছু বুঝতে পারে নি কান্তি, শুধু একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল তার, অকারণেই কানের কাছটা উঠেছিল লাল হয়ে। অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি কি বলছ মোক্ষদাদি, আমি তো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে যে পারবে না তা আমিও জানি। তাহ'লে আর তোমাকে সাবধান করতে আসবই বা কেন? এত যদি তোমার বুদ্ধি থাকত তাহ'লে কি আর এমনি ক'রে নিজের সব্বনাশ নিজে করতে। তাহ'লে তো দিন গুছিয়ে নিতে। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করছে—এ তোমার কী কাজে আসছে বল? তেমন সেয়ানা ছেলে হ'লে বেশ ক'রে দুয়ে বার ক'রে নিত। মাগী যেকালে ফলেন্ হয়েছে সেখানে কি আর কিছু হিসেব করত—যা চাইতে তাই দিত।...নাও না, তুমিও দিন কিনে গুছিয়ে নাও না—কিচ্ছু বলব না। তবু তো বুঝব একটা কাজ হচ্ছে রাথেরের। এ যে খাঁড়ের মাদ হয়ে থাকছ। জাতও যাবে পেটও ভরবে না!'

আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে কান্তি। এ সব ভাষা তার বোধশক্তির বাইরে। 'ফলেন্' হওয়াটা যে কী বস্তু তা আজও জানে না কান্তি, তবে একটা ঝাপসা ঝাপসা রকমের অর্থ আন্দাজ করতে পারে বটে। কিন্তু সেদিন সবটাই দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলে বোধ হয়েছিল।

খানিকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'আমি কিন্তু সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না মোক্ষদাদি, তুমি একটু খুলে বল। তুমি কি রতনদির কথা বলছ?'

'না—ওপাড়ার আসু দত্তর কথা বলছি। তুমি যেহেতু বোকা, বাকে আবর বলে তাই। আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে এ সব বলতে আসা! যাবে রসাতলে তুমি যাবে—আমার কি? মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে লাভ এই—

এখন যদি সাতখানা ক'রে গিয়ে লাগাও আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি!'

তারপর ঘুরে গিয়ে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে আবার সামনে এসে বলেছিল, 'তবে এও বলে রাখছি ঠাকুর, আমার সঙ্গে লাগতে এসো নি। ভাল হবে না তাহ'লে। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ করলে ঠকতে হয়; মনে রেখো।'

সে অবশিষ্ট ঘরটুকু এক মিনিটের মধ্যে ঝাঁট দেওয়া শেষ ক'রে পাশের তার ঘরখানাতে ঢুকে গিয়ে দড়াম্ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। ওঘরটাতে আসলে ঠাকুরের থাকবার কথা—কিন্তু মোক্ষদাদি গভীর রাত্রে এসে ওঘরেই শোয়—এ নিজে চোখে দেখেছে কান্তি। মোক্ষদা ভোরে সকলের আগে ওঠে—কিন্তু কান্তি ওঠে এক একদিন তারও আগে—ভোরবেলা চোখ মুছতে মুছতে ঐ ঘর থেকেই বেরোতে দেখেছে তাকে। তবে তাতে যে কিছু দুষ্য আছে তা ওর মাথাতে অত ঢোকেনি। সে কথা আলোচনাও করেনি সে কারুর সঙ্গে। একদিন শুধু গল্প করতে করতে রতনদির কাছে বলে ফেলেছিল, তাতে রতনদি হেসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'দূর পাগল! আমার কাছে যা বললে বললে—অপর কারুর কাছে ব'লো না। ঝি-চাকরদের এ সব কথা নিয়ে মনিবদের আলোচনা করতে নেই। ও অমন হয়েই থাকে!" কী হয়ে থাকে ঠিক তা না বুঝলেও জিনিসটা যে ভাল নয় সেটা বুঝতে পেরেছিল সেদিন।
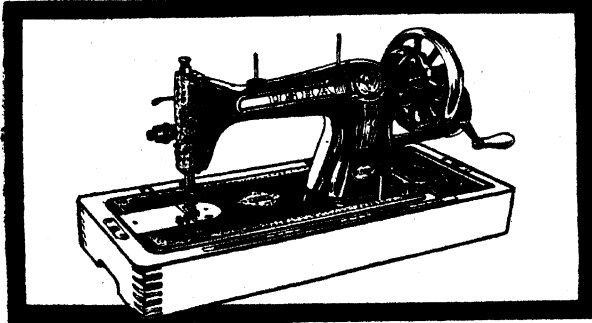
সেই মোক্ষদাদি আজ ওকে উপদেশ দিতে এসেছে!

চাকরদের কথায় মনিবের থাকতে নেই—চাকররাই বা মনিবের কথায় থাকে কেন?

রতনদিকে খারাপ বলবে কেন? আবার বলছে মাগী! আস্পদ্দা তো কম নয়! কী সাহস ওর!

কথাটা যে রতনকে আর তাকে জড়িয়ে বলা হচ্ছে এটা বুঝতে অবশ্য আরও মিনিট দুই সময় লাগল। কিন্তু তারপরই একটা অসহ্য ক্রোধে কান-মাথা আগুন হয়ে উঠল তার, ইচ্ছে হ'ল ওঘরে গিয়ে খুব দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে সে। কিম্বা রতনদিকে ব'লে আজই ওর চাকরিতে ইস্তফা দিইয়ে দেয়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মোক্ষদা মানুষটি বড় সহজ নয়। যখন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে তখন ওর যে হিংস্র চেহারাটা দেখেছে কান্তি তাতে বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠেছে তার।

তাছাড়া—রতনদির বাবা মামাবাবু পর্যন্ত ওকে কতকটা ভয় ক'রে চলেন তা সে দেখেছে। এতদিনের পুরনো ঝি, তার নামে লাগাতে গেলে ওর কথা কি বিশ্বাস করবে কেউ? রতনদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে পারবেন না—মায়ায় পড়ে। মাঝখান থেকে একটা প্রবল শত্রু সৃষ্টি হবে শুধু শুধু। ঐ যা বলেছে মোক্ষদাদি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা ঠিক নয়।

সুতরাং মনের রাগ মনের মধ্যেই

পরিপাক করতে হয় কান্তিকে। কোন কালেই কাউকে চড়া কথা বলা অভ্যাস নেই ওর, চিরদিন সকলকে ভয় ক'রেই এসেছে সে—চেষ্টা করলেও হয়ত ভাল ফল হবে না, উল্‌টে মোক্ষদার মুখ থেকে আরও কতকগুলো কটু কথা শুনে চলে আসতে হবে মাথা হেঁট ক'রে।

চুপ ক'রে বসেই থাকে তাই কান্তি। বই-খাতা সামনে খোলা থাকে, কলমের কালি নিবের ডগায় শুকিয়ে যায়—বার বার কালিতে ডুবিয়ে কাজ শুরু করতে চেষ্টা করে, বার বারই হাত থেমে যায় কখন।

রাগের প্রথম প্রবলতাটা কেটে যাবার পর আর একটা কথাও ওর মনে হ'ল। আচ্ছা, মোক্ষদাদি যে কথাগুলো বলে গেল তার কি কতকটা ঠিকও নয়। অধঃপাতে যাওয়ার কথাটাতে ঠিক কতটা কি বলতে চাইছে তা না বুঝলেও—পড়াশুনো যে তার হচ্ছে না কিছুদিন থেকেই সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এতদিন ইস্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে বলেই নাম ছিল তার, ইদানীং সে নাম তো ঘুচতে বসেছে। ক্লাসের পড়া পারে না, মাস্টারমশাইদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বকুনিও খায় সেজন্যে। পর পর তিন-চার দিন হোমটাস্ক দেখাতে না পারায় অঙ্কের মাস্টার প্রফুল্লবাবু ওকে সেদিন বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ ঐ প্রফুল্লবাবু কী ভালই না বাসতেন ওকে। শুধু দাঁড় করিয়েই দেননি—খুব বকেও ছিলেন। বলেছিলেন, 'পিপ্‌ড়ে পাকছে বুঝি! হবেই তো, যে পাড়ায় আর যে বাড়িতে থাকো! এতদিন পাকোনি তাই আশ্চর্য। তা আর বেঞ্চিটা জোড়া ক'রে রেখেছ কেন বাবা, যাও না, পান-বিড়ি খেয়ে ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াও না—তোমারও সুবিধে হবে, আমাদেরও হাড় জুড়োবে।'

সেদিন খুব রাগ হয়েছিল প্রফুল্লবাবুর ওপর। বিশেষত 'যে বাড়ি' বলাতে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সেটাও চোখ এড়ায়নি ওর। দারুণ অপমান বোধ হয়েছিল। কিন্তু আজ ভেবে দেখল, প্রফুল্লবাবু কিছু মিছে বলেননি। দোষ তো তারই। পড়াশুনো করতে এসেছে সে, এমনিই তো অনেক বেশী বয়সে ইস্কুলে পড়ছে—তার ওপর যদি এমনভাবে বকে যায়—। আর বকে যাওয়া না তো কী।

মোক্ষদাদিও যা বলছে ওর হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বলছে। রাগ না ক'রে কথাটা ভেবে দেখাই উচিত ওর। সত্যিই তো, গরীবের ছেলে, মানুষ হবে, মানুষ হয়ে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে এই আশাতেই তো মা-দাদা তাকে এত দূরে ফেলে রেখেছেন। তা যদি সে না-ই হয় তো এখানে থেকে লাভ কি? বাড়িতে চলে গেলে তবু তাঁদের সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারে তো!

না, মোক্ষদাদি ভালই করেছে ওকে একটু সাবধান ক'রে দিয়ে। এবার থেকে সাবধান হয়ে চলবে। রতনদির আর কি, তাঁর সময় কাটে না—তাই ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন কিন্তু তাঁর তো মাথার ওপর এত দায়িত্ব, এত ভাবনা নেই।

সে আবারও কলম দোয়াতে ডোবায় একবার।

কিন্তু রতনদিকে কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হয়। সত্যিই তো, তার কে আছে। বর আসে রাত নটায়, এসেই মদ খেতে শুরু করে। এক একদিন চেঁচামেচি মারধোর কত কী না হয়! তারপর খেয়ে ঘুমোল, ভোর হ'তে না হ'তে তো চলে গেল। মামাবাবু নিজের খাওয়া, তামাক খাওয়া আর বই নিয়েই থাকেন। ঝি-চাকররা বোঝে শুধু পয়সা। রতনদির মুখের দিকে কে চায়! না একটা বন্ধু-বান্ধব না কোন আত্মীয়স্বজন। কথা কইবার পর্যন্ত লোক নেই এ বাড়িতে, সারাদিন মুখ বুজে মানুষ থাকতে পারে! কখনও সখনও দৈবাৎ ওর বরের বন্ধু-বান্ধব দু-চারজন আসে, তবু দুটো বাইরের মানুষের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু তারাও সব মাতাল। তারাও এসে মদ খেতে শুরু করে—দু-একজন তো ঘুমিয়েই পড়ে, ধরাধরি ক'রে গাড়িতে তুলে দিতে হয়। এক-একজন বমি ক'রে ভাসায়। সে কী দুর্গন্ধ! সে সব পরিষ্কার করতে হয় তখন মোক্ষদাদিকেই। ঐ জন্যেই ওর আরও জোর।... থিয়েটার বায়স্কোপ—তাই বা কবে যায়। একবার এক সপ্তাহ রতনদির বর কোথায় গিয়েছিল বাইরে, একেবারে তিন-চার দিনের মতো থিয়েটার বায়স্কোপের টিকিট কিনে দিয়ে গিয়েছিল। হুকুম ছিল মোক্ষদাকে নিয়ে যাবার। সব নাকি ফিমেল সীটের টিকিট। তারই মধ্যে একদিন দারোয়ানকে দিয়ে লুকিয়ে একখানা টিকিট কিনে রতনদি তাকেও নিয়ে গিয়েছিল। 'সীতা' পালা—বড় দুঃখের কিন্তু চমৎকার পালা। দেখে এসে যত কেঁদেছে কান্তি তত উচ্ছ্বাস করেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রতনদির জীবনটা কি। কী আছে ওর সাধ-আহ্লাদ—বলতে গেলে বন্দী হয়ে আছে। পয়সা আছে ঢের, বর অনেক পয়সা দেয় ঠিকই—কিন্তু পয়সাই কি সব! পয়সা খরচ করারও তো উপায় নেই নিজের খুশি মতো। শুধু তার মার ভাষায়, 'ভূত ভোজন করানো'। সেই জন্যেই তো আরও বিনা দরকারেও কান্তির জামার

ওপর জামা করিয়ে দেয়, আর একটু-খানি গল্প করবার জন্যে ছুটে ছুটে আসে। হ্যাংগালি জ্যাংগালি করে।...

অর্থাৎ আবারও কখন ডুবে গিয়েছিল ঐ রতনদির চিন্তায়। সেটা খেয়াল হ'ল খোদ রতনদি ঘুম ভেঙে উঠে ওর খোঁজে ওপরে আসাতে।

'বারে ছেলে, কখন ইস্কুল থেকে এসে চুপি চুপি ঘাপটি মেরে ওপরে বসে আছ! আমাকে ডাকতে নেই বুঝি? আমি বলে আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি যে তুমি সকাল ক'রে এসে ডাকবে, পেট ভরে গল্প করব। আজ তোমার সঙ্গে বসে মুড়ি বেগুনি খাব শখ হয়েছে।...তা আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি—জানি ঠিক এসে ডাকবে।...ডাকোনি কেন? আমি যদি মুকীকে না জিজ্ঞেস করতুম তো টেরই পেতুম না যে চারটে বাজে।'

যে সব ভাল ভাল কথা এতক্ষণ ধরে ভেবে রেখেছিল গম্ভীরভাবে গুছিয়ে বলবে বলে—তা এর পর আর বলতে মন সরে না। যে মানুষটা সকাল থেকে আয়োজন ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে গল্প করবে বলে—তাকে কোন প্রাণে বলবে যে, 'আর তোমার সঙ্গে গল্প করব না আমি, গরীবের ছেলে পড়তে এসেছি, লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তুমি আর আমার পড়াটা মাটি করতে এসো না।'

কিছুই বলা হয় না তাই। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে বরং—যে কথাগুলো বলবে বলে ভেবে রেখেছিল—সেই কথাগুলো মনে ক'রে। তার বদলে কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে বলে,'তা নয়। এই টাস্কগুলো—। অনেক দিন হয়ে গেল কিনা, আমারই গাফিলি। আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম—। তা যাক, না হয় রাত জেগে সেরে নেব।'

'টাস্ক না দেখাবার জন্যে বকুনি খেয়েছ? তা কৈ বলনি তো। সকালে মাস্টারমশাই কি করেন? তিনি করিয়ে দেন না কেন?'

'না, তাঁর অত সময় হয় না। আর এ তো আমারই করবার কথা। তিনি কষে দিয়ে গেলেও আমাকেই তো খাতায় তুলতে হবে।'

'তাই তো। সত্যি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে—রোজ রোজ তোমার সময় নষ্ট করি। ক্লাসের প্রথম ছেলে তুমি—তুমি আঁক কষে না নিয়ে গেলে কী মনে করবেন তাঁরা।' যৎপরোনাস্তি ম্লান হয়ে যায় রতনদির মুখ, 'তা তুমি ভাই অংক কষো, আমি এখন যাই। তোমার টাস্ক সারা হ'লে বরং নিচে যেও। তখনই বরঞ্চ মুখ-হাত ধুইয়ে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে [illegible] আমি এখন [illegible]-জল-খাবার এখানে দিয়ে যেতে বলছি।'

রতনদি একেবারে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর সেই ম্লান মুখের দিকে চেয়ে, অপ্রতিভ করুণ কণ্ঠস্বরে কান্তির বুকের মধ্যটা যেন কেমন ক'রে উঠল। সে যা কখনও করে না তাই ক'রে বসল। কিছু না ভেবে-চিন্তেই খপ ক'রে রতনের একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'না না, রতনদি তুমি যেও না। একটু বসে যাও। টাস্ক আমি রাত্রে ঠিক সেরে ফেলব।'

ঝোঁকের মাথায় ধরে ফেলেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেই সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এর আগে 'তুমি' কখনও বলেনি রতনদিকে।

কেমন এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, 'অমন ক'রে প্রশ্রয় দিও না—কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে নেই। অত নরম হ'লে দুনিয়ায় টিকতে পারবে না।...আমি এখন যাই—সন্ধ্যের সময় আবার আসব বরং। তুমি কাজ সেরে ফেল—'

চলে গেলেন রতনদি সত্যি-সত্যিই। কিন্তু তিনি যে খুব ব্যথা পেয়েই গেলেন সেই কথাটা মনে ক'রে কান্তির মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণের প্রতিজ্ঞা তো ভেসে গেলই—উপরন্তু সেটুকু

আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম......

বলা উচিতও নয়। সে আরও লাল হয়ে মাথা নামাল, দেখতে দেখতে তার কপাল গলা ঘেমে উঠল—ভয়েও বটে—তার এই ধৃষ্টতা কী চোখে দেখবেন রতনদি, যদি রেগে যান এই ভয়ে—আর লজ্জাতেও বটে।

কিন্তু রতনদি রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। উলটে তাঁর চোখ মুখ যেন মনে হ'ল আনন্দে জ্বলে উঠল। যেন কৃতার্থই হয়ে গেলেন তিনি। একটু ইতস্ততও করলেন, একবার বসতেও গেলেন আবার কিন্তু তারপরই মন শক্ত ক'রে নিলেন যেন। উঠে দাঁড়িয়ে

লেখাপড়া এতক্ষণ জোর ক'রে হচ্ছিল বার বার চেষ্টার ফলে, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। রতনদির ম্লান মুখ, তাঁর করুণ কণ্ঠস্বর আর শেষের এই কথাগুলো—সব জড়িয়ে কেবলই মনে হ'তে লাগল—এত সব থাকতেও রতনদির কিছু নেই, রতনদি বড় দুঃখী। বড় দুঃখেই ছুটে ছুটে আসে তার কাছে। এই একটুখানি যা তার সান্ত্বনা—তা থেকেও বঞ্চিত করল কান্তি। মা বললেই হ'ত টাস্কের কথাটা, কেন যে বলতে গেল! ভারী অনুতাপ হ'তে লাগল ওর।

(ক্রমশঃ)

নৈঃশব্দের উচ্চারণ

কল্লোল মজুমদার

স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মিস জুলি'র ভূমিকাচ্ছলে বলেছিলেন—"It has seemed to me, that the theatre, like religion, may be on the verge of being abandoned as a form which is dying out, and for the enjoyment of which we lack the necessary conditions...... We have not got the new form for the new content, and the new wine has burst the old bottles." —এই নূতন প্রক্রিয়ার মদই Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ। প্রতীচ্যের নাট্যকলায় এর আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। প্রাথমিক পর্যায়ে নাট্যরসিকদের কাছে এর বাস্তবিক মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। সে যুগের নাট্য-সমালোচকদের মতে—অভিব্যক্তি নাটকের একটি বস্তু এবং সমস্ত বস্তুময় দিবসের অর্থ, ' একটি মিথ্যার মত শুকিয়ে যাওয়া। নাট্য-রসিকেরা তাই একে বাঁকা হাসিতে তাচ্ছিল্যের কাপড় জড়িয়ে পেছনে সরিয়ে রেখেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী যেন চক্রান্ত চলছিল্লো। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন বিশ্ববিশ্রুত বার্ণার্ড শ-এর বিখ্যাত নাটক 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি 'জি, বি, এস' নামে পরিচিত। যে কোন মানবই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা অতি-মানবে পরিণত হতে পারে। কিন্তু যত-ক্ষণ সেই মার্গে আরোহণে সে অসমর্থ, ততক্ষণ তার সঙ্গে অতিমানবিক চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সংঘাত—সম্ভবতঃ তাকে কেন্দ্র করেই 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান'এর নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই কালানুযায়ী এ নাটকে অভিব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ; জড়বাদী বিশ্বাসই তখন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছিল। ঐ বছরেই এমিল জোলা এবং আঁরি বেক-এর সাহিত্যের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বজায় রেখে জিরো'র 'ড্যামেজ্‌ড্ গুডস্' প্রকাশিত হল। বিশ্ববন্দিত নাট্যকার ইব্‌সেনের নাটকগুলো তখন প্রতীচ্যের নাট্যরসিক মহলে প্রশংসার ঊর্মিল আলোড়ন এনেছে। স্থিতিধর্মের আগল খুলে উঠে এল স্ব-ভাবের সমুদ্র, তার মন্থনে মঞ্চে সংপৃক্ত হ'ল বিষয় ও বক্তব্যের অনিবার্য সমীকরণ। স্বভাববাদীরাও ভাব ও কল্পনার নেপথ্য প্রাচীর ভেঙে মনোবৃত্তিগত অনুকারবাদের অবস্থিতি চাইল। এই অন্ধ আবেগের জোয়ারে নীলাভ রেখায় বাঁধ বাঁধলেন স্ট্রিন্ড-বার্গ। নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আনুকারিক দৃষ্টির অনুসরণ করবে না; সে হবে ভাবগত বুদ্ধির প্রতি-ফলন, নেপথ্যের হিরন্ময় অলিন্দের দ্যুতিতে হবে উদ্ভাসিত।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—অভিব্যক্তি-বাদ আসলে তবে কি? সমসাময়িক সমালোচকেরা অভিব্যক্তিবাদকে জড়বাদ-বিরোধী বলে প্রচার করেছিলেন, গভীরতার পাশ কাটিয়ে নিরঙ্কুশ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসত্যকে স্থিত করা গেল না। জড়বাদ জীবনধর্মে বিশ্বাসী। ভাব-গহ্বরে জীবন-দর্শন জড়বাদকেই সমর্থন করে। এই অভি-ব্যক্তিবাদ। জড়বাদী লেখকের সমস্যাকে নিঃশব্দ অভিব্যক্তির সাহায্যে এত গভীর সংবেদনশীল করে তোলা যায়—যা শব্দ-কল্লোলে সম্ভব হয় না। সেখানে সমস্যা প্রকাশিত, কিন্তু গভীর অনুভূতিশীল নয়। আর যেখানে গভীরতাই অনুপস্থিত সেখানে শিল্পধর্মীতার পদস্খলন ঘটে। দুরূহ সমস্যা এবং কঠিন প্রশ্নকে প্রকাশ করতে স্বভাববাদীকে যেখানে কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়, অভি-ব্যক্তিবাদী সেখানে দুর্বোধ্যতার বেড়া ডিঙিয়ে অনায়াসে সহজ সংবেদনশীল হতে পারেন। কোন বিখ্যাত সমা-লোচকের মতে—"এক্সপ্রেসনিজম্ ইজ্ দাস ড্রামাটাইজেসন অফ সাইলেন্স্। ইট অ্যাটেম্পটস্ অ্যাট্ প্রোজেক্‌টিং দ্য ইনার ওয়ার্কিংস্ অফ দ্য মাইন্‌ড।" মানবাত্মার অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল সংঘাত অভিব্যক্তি নৈঃশব্দ্য আধারে প্রয়োজনীয় রূপ ধারণ করে—অবলম্বনেই যেমন জলের বাস্তবিক রূপ। অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্ভবতঃ কিউবিস্ট অন্ত-বৃত্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কোন অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি বই অথবা টেবিল চিত্রায়িত করবেন, তিনি বিভিন্ন ভঙ্গী বা বর্ণের সমাবেশে বই বা টেবিলের উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তি রেখায়িত করবেন।

এইখানেই প্রয়োজন সম্পূর্ণ-তার সন্ধান। Cape de Nutt Cafe de l' Alcazar-এর মুখবন্ধে ভ্যান্ গগ্ অভিব্যক্তিবাদী মনোবৃত্তির সমর্থনে বলেছিলেন— "I have tried to express the terrible passions of humanity by means of red and green....I have tried to express the idea that the cafe is a place where one can ruin oneself, run mad or commit a crime. So I

have tried to express as it were the powers of darkness in a low drink shop......" মানব সত্তায় ক্রমবর্ধমান অন্ধকামনা রূপ নিয়েছিল বিচিত্র রঙের সংঘাতময় আঙ্গিকে। উদ্দেশ্যমূলক বর্ণ ও রেখায় ভ্যান্ গগ্ অভিব্যক্তির সফল প্রয়োগে নিচুতলায় আঁধারকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। একই পথে অভিব্যক্তিবাদী লেখক তাঁর বহুমুখী চিন্তা পাঠক এবং দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন।

'রোড টু ডামাস্কাস' এমন একটি নাটক, যার সাফল্য মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন কলানৈপুণ্যের ওপর সম্ভবতঃ নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ একটি বিশেষ চরিত্রের কথা এসে পড়ে। নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—জগতের কোন বস্তুই সর্বনাশের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মানসিক সংঘাতকে পরিস্ফুট করতে তখন প্রয়োজন বিচিত্র অভিব্যক্তির—যেটা সম্পূর্ণ সময়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন আঙ্গিক ও মঞ্চকলার স্বার্থে সময়ের সুযোগ থেকে অভিনেতা বঞ্চিত হ'লেন। ফলে বিষয়বস্তু হ'ল সংক্ষিপ্ত এবং 'রোড টু ডামাস্কাস' একটি আঙ্গিকধর্মী নাটক হয়ে উঠল। বক্তব্যের এই বিন্দুতে একটি উভয়মুখী স্রোতের সংমিশ্রণ দেখা যায়, যেন একটি মূর্তির পার্শ্বভাগ এবং সম্মুখভাগ একত্রে চোখের সামনে ধরা দিল। কিন্তু শুধু আঙ্গিকের সাহায্যে দু'টি উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্যকে সহজ সরল করে তোলা যায় না। অনুভূতির জটিলতম গ্রন্থিগুলো মানসিক চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে।

বক্তব্যকে সুস্থিত করতে মাতিস-পিকাসো-মেনেৎ প্রমুখ কলাদক্ষরা তাই কিউবিজম ও সুর-রিয়ালিজমকে বন্যার ঢেউয়ের মত সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিলেন। সেই লবণাক্ত ঢেউয়ের কম্পন ভারতবর্ষেও কিছুটা ছিটকে এসে প'ড়েছিল। 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তিতে সেই প্রপঞ্চ চিরবিধৃত। কিউবিস্ট কলাদক্ষ জ্যামিতিক রেখার কৌণিক ব্যবহারে যে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে চান, ইম্‌প্রেসনিস্ট কলাদক্ষ বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে তাকেই প্রকাশিত করতে পারেন। অভিব্যক্তিবাদী লেখক বা নাট্যপরিচালকও চরিত্রের জটিলতম মানসিক সংঘাতে ভাব এবং বুদ্ধির সফল প্রয়োগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাতে পারেন। উভয়মুখী স্পন্দন অথবা বক্তব্যের পূর্ণ সফলতা তাই অভিব্যক্তির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত।

সমস্যার মরুঝড় যখন হ্যামলেট্‌কে শুষ্ক বালির মত শান্তির মরুদ্যান থেকে উড়িয়ে নিয়েছিলো, তখন থেকে আমৃত্যু নিজের মানসিক সত্তাকে কঠিনতম উভয়মুখী প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন—"To be or not to be that is the question." পিতা আততায়ী হস্তে নিহত, মাতা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এবং পর-অনুরক্তা। জগৎ তাঁর কাছে প্রতিহিংসার মত মিথ্যা এবং অর্থহীন। হ্যামলেট্ চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ অমিত্রাক্ষর ও মুক্তছন্দের মধ্যাবস্থায় একক সংলাপের দ্বারা পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন সেক্সপীয়ার। বস্তুতঃ হ্যামলেট্ এমন একটি নাটক—যা অভিব্যক্তিবাদী উপস্থাপনার ওপর স্থিতিস্থাপক। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক কবি টি এস এলিয়ট কোন একজন কলা-সমালোচককে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—নাটকের কিছুটা অন্ততঃ এমন অংশ আছে, যেটা—যা আলোকসম্পাত বা আঙ্গিকের দ্বারা পরিস্ফুট হয় না, সেখানে প্রয়োজন শিল্পধর্মাশ্রয়ী ভাব এবং ব্যঞ্জনা। এই শিল্পাশ্রয়ী ভাব ও ব্যঞ্জনায় অপ্রাচুর্য সে কালের নাট্যমঞ্চে হ্যাম্‌লেট্ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকুই ফুটিয়ে তুলেছিলো মাত্র; জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী হ্যামলেট্ অব্যক্তই রয়ে গিয়েছিলো। এরপর এলিজাবিথান মঞ্চ নিজস্ব সাহসিকতা ও সরলতার পবিত্র ফলে শেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টিকে যথার্থ সম্মান দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু এলিজাবিথান প্রযোজকের ব্যবসাগত পুঁজির মূলধন বৃদ্ধির স্বার্থে পূর্ণ সিদ্ধি এল না। আমরা জানি না—শেক্সপীয়ার তাঁর চরিত্রাভিনেতাদের কাছে কি ধরনের প্রয়োগরীতি চেয়েছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, জন্ ব্যারিমোর, এবং লরেন্স অলিভিয়র-এর মত প্রতিভাও নাটকের গন্ধরাজ-গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি। সংলাপ উচ্চারণে ছন্দের প্রতি অন্ধ-আবেগ মহাকবির 'হ্যামলেট্'কে পূর্ণতা এনে দেয়নি। অলিভিয়র-এর হ্যামলেট ছিল দুর্বল এবং ব্যারিমোর ছিলেন অধিক বৈশিষ্ট্য-দোষে দুষ্ট।

অভিব্যক্তিবাদী প্রয়োগরীতিই নাটকের পূর্ণ সফলতা এনে দিতে পারে—একথা আজ স-প্রমাণিত। Lamb এই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও অবশেষে বাধ্য হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন। জি, বি, এস, স্ট্রিয়ো, ইবসেন প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর কর্ণধার মনীষীদের সুতীব্র আক্রমণ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এলো চিরাচরিত ভুল পথে। অভিব্যক্তিবাদী প্রয়োগরীতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—'টু হিউজ ফর্ দ্য স্টেজ।' যান্ত্রিক প্রয়োগরীতিকেই তিনি নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিলেন। যদিও অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্নিহিত সুর তিনি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেন নি, তবুও Lamb-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি—আংশিক হলেও যিনি এর প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

'হ্যামলেটে'র মত 'কিং লিয়ার'-ও এমন একটি নাটক যা ভাব এবং বুদ্ধিগত কল্পনার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঘটনার সংঘাতের প্রতীক হিসেবে মঞ্চে ঝড়ের দৃশ্যের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন ছিল; কারণ ঘটনা স্ব-ভাবেই প্রতীকধর্মী। আলোকোজ্জ্বল জগতের বাইরে রাত্রির রাজত্ব। সেই রাত্রির রাজত্বে এসে রাজা কত অসহায় এবং করুণার পাত্র—চলমান ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শেক্সপীয়ার সম্ভবতঃ সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন।

নাট্যমঞ্চে প্রতীকের ব্যবহার বহুদিন পূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। শেকস্তে'র প্রায় প্রতিটি নাটকে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইবসেনের শেষজীবনের নাটকগুলোতেও প্রতীকবাদকে আংশিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে নাটকে ঘটনার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে প্রাণোজ্জ্বল করে তোলার জন্য প্রতীকের ব্যবহার হ'ত, আবেদনশীল বক্তব্যও শিহরিত হ'ত নাটকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অণুতে-পরমাণুতে। মানব চরিত্রের চেতনার গভীরে যে অবচেতন চিন্তা ও ভাব লুকিয়ে থাকে—প্রতীকী অভিব্যক্তির সাহায্যে তাকে নাট্যজগতে প্রথম সুস্পষ্টভাবে সুস্থিত করলেন অভিব্যক্তিব্যদীরা।

প্রথিতযশা আমেরিকান নাট্যকার এলমার রাইস্-এর 'দ্য অ্যাডিং মেসিন' একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিধর্মী নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে থিয়েটার গিল্ড্-এর প্রযোজনায় এর উদ্বোধন হয়। নাটকটি আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণকারী। যন্ত্রযুগের জনসংখ্যা দিনে দিনে উৎপাদিত দ্রব্যের মতই বর্ধমান। নাটকের

নায়ক Mr. Zero-র জীবন ও মৃত্যুর পটভূমিকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ম চাবুক মেরে এলমার রাইস্ এই সত্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উঠলে দর্শক দেখতে পান—Mr. Zero শয্যায় শায়িত। সমস্ত দৃশ্যটিতে তিনি নির্বাক, অপর পক্ষে তাঁর স্ত্রী অনর্গল কথা বলে গেলেন। Zero-র পঁচিশ বছরের কর্ম-জীবনে তাঁর পত্নী কখনো বাক্যবর্ষণে এবং Zero নিঃশব্দ শ্রবণে ক্লান্ত হননি। আসল দৃশ্যের অবতারণা Zero-র অফিস কামরায়। মধ্যবয়স্কা একজন সহকর্মিনীর সংগে কথোপকথনে তাঁর পদোন্নতি সম্বন্ধীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এরপর মালিকের কঠোর ও রূঢ় ব্যবহারে উৎপীড়িত হয়ে তিনি মালিককে হত্যা করলেন। সমগ্র নাটকটি সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দৃশ্যে নাটকের দৃশ্যমান গতিবেগ অনুপস্থিত। মঞ্চ সরঞ্জামের পরিবর্তন এবং দু' তিনটি সংলাপ ছাড়া দর্শকেরা আর কিছুই দেখেন না, কিন্তু অনুভব করেন। অভাবনীয় খুনের চিন্তা যেখানে Zero-র অন্তর্লোকে সংঘাতময় ঘূর্ণীর সৃষ্টি করছে——নিঃসন্দেহে সেইটিই নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। এ দৃশ্যের মঞ্চ পরিচালনা অপূর্ব! পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের অভাবনীয় শাস্তি-প্রাপ্তিতে ক্ষিপ্ত ও অপ্রকৃতিস্থ Zero মঞ্চের যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন—সেটি প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো। সেই মুহূর্তে মালিকের রূক্ষ তিরস্কারের শেষ অংশটুকু শোনা গেল। এরপর মঞ্চের নেপথ্য থেকে আঙ্গিকের প্রয়োগ শুরু। বাতাস, উত্তাল তরঙ্গমালা, ছুটন্ত অশ্বের হ্রেষা এবং পদধ্বনি ও অবশেষে উদ্দাম ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অগ্নিমোজ্জ্বল আলোকের ঝলক Zero-র জিঘাংসা-প্রবৃত্তি দর্শকের চিত্তপটে স্পষ্ট প্রতি-ফলিত করে দিল। প্রতীকী অভিব্যক্তির ভিত্তিতে 'দ্য অ্যাডিং মেসিন্' তাই সেদিন অভিব্যক্তিবাদীদের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লেডী গ্রেগরী কোন একটি সভায় আলোচনাচ্ছলে বলেছিলেন—"আমরা আয়র্ল্যান্ড-এর নাট্যপ্রবাহকে বস্তুবাদী বনিয়াদ ও সৌন্দর্যবাদের রূপদী সংজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করব।"—সৌন্দর্যের এই সৃষ্টি-সত্তা ও' কেসীর পূর্ণবয়সের রচনা-গুলিতে জন্মলাভ করেছিল, যদিও প্রকৃতিবাদের ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 'দ্য স্টার্ টারন্স্ রেড্' এবং 'পার্পল ডাস্ট' (দুটি নাটকই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং তিন অঙ্কে বিভক্ত) অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে ও' কেসী-র দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলা যেতে পারে। তাঁর সবকটি বিখ্যাত নাটকই প্রতীকী অভিব্যক্তির দ্বারা সুচিহ্নিত।

নাট্যশিল্পে আমূল পরিবর্তনের আন্দোলনে নাট্যকারগণও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বর্তমানের নাট্যমঞ্চে সর্বাপেক্ষা প্রধান দর্শনীয় ব্যক্তি হলেন প্রযোজক। নিঃসন্দেহে নাট্যশিল্পে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। প্রযোজক একাধারে অভিনেতা, শিল্পী, স্থপতি, আলোকশিল্পী হ'বেন—ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও চরিত্রাভিনেতার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান থাকবে এবং সর্বোপরি তিনি মনুষ্যচরিত্রে গভীর অনুভূতিশীল হ'বেন।

বস্তুবাদী নাট্যমঞ্চের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ এনেছিলেন প্রথিতযশা অভিনেত্রী এলেন টেরীর সুযোগ্য পুত্র গর্ডন ক্রেগ্। মঞ্চসজ্জায় বিভিন্ন সাংকেতিক রীতি ও ত্রি-মাত্রিক সেটের ব্যবহার প্রচলন করেন তিনি। তাঁর দৃশ্য-সজ্জায় ছিল প্রশস্ত অভিনয়ক্ষেত্র এবং একটি সরল ও দীর্ঘ গাম্ভীর্য। ক্রেগ্ এবং তাঁর সহযোগী এ্যাপিয়ারের প্রয়োগরীতি থেকেই পরবর্তী সময়ে কিউবিক্ মতবাদ, ভবিষ্যৎবাদ প্রভৃতি মঞ্চরীতিতে প্রবিষ্ট হয়েছিল। প্রসংগতঃ টেরেন্স গ্রে প্রবর্তিত নির্মাণবাদের কথাও এসে পড়ে। নির্মাণবাদের রংগমঞ্চ বিভিন্ন যান্ত্রিক রীতির সাহায্য গ্রহণ করে। এইসব বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আংশিক পার্থক্য থাকলেও আসল উদ্দেশ্য সকলের এক—বস্তুবাদী মঞ্চ-রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সে উদ্দেশ্যে পুরোপুরি না হলেও অর্ধপথের বেশি তাঁরা অতিক্রম করে এসেছেন। সেই পশ্চিমী আগুনের আঁচ আজ ভারতবর্ষেও এসে পড়েছে, যদিও তা এদেশের কঠিন শীতলতাকে দূর করার মত যথেষ্ট পরিমাণ নয়। অথচ ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে—পশ্চিম জগত আজ যে মতবাদের স্রষ্টা বলে স্বীকৃত হয়েছে—ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সবই প্রচলিত ছিল।

এ সম্বন্ধে অজিত ঘোষের 'নাটকের কথা' পুস্তকে পাওয়া যায়—ভরতের নাট্যশাস্ত্রে * আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই চার রকমের অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। আঙ্গিক অভিনয়—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গগুলির দ্বারা প্রকাশিত। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, পার্শ্ব-দ্বয়, কটি ও পদদ্বয় এই ছ'টি অঙ্গ; উদর, স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, উরুদ্বয়, জঙ্ঘা-দ্বয় ও পৃষ্ঠ এই ছ'টি প্রত্যঙ্গ ও নেত্র, ভ্রু, অক্ষিপুট, তারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, হনু, অধর, দন্তপঙক্তি, জিহ্বা ও মুখ এই ক'টি উপাঙ্গ। কাব্যনাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয় বাচিক। হার, কেয়ূর, বেশ প্রভৃতি দ্বারা অলংকরণ আহার্য অভিনয়ের অঙ্গীভূত। স্তম্ভ, স্বেদজল, স্বরভংগ, রোমাঞ্চ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা এই সাত্ত্বিক ভাবগুলো প্রতিফলিত হ'ত। নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়-দর্পণ' এবং

* "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা" নাট্যশাস্ত্র। অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রভৃতি পুস্তকে নাটকের বিভিন্ন বিভাগের রূপ ও ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা গভীর শিল্পবোধের পরিচয় আজও বহন করে আসছে। নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ লেখকদের এইসব গ্রন্থ অনুশীলনে বোঝা যায়—প্রাচীন ভারতীয় সমাজ নাট্যকলার গভীর সাধনায় কতখানি নিমগ্ন ছিল।

নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে নন্দিকেশ্বরের নাট্যসম্প্রদায় এবং ভরতের নাট্যসম্প্রদায়—এই দু'টি প্রধান দল ছিল। নন্দিকেশ্বর ছিলেন ভরতের নাট্য-গুরু। তিনি নাটক অভিনয়ে বহিরঙ্গ আঙ্গিকের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। অপরপক্ষে ভরত অন্তরঙ্গ ভাব ও রস-স্ফূর্তির সমর্থক ছিলেন এবং অতিমাত্রিক অংগাভিনয়ের নিন্দাই করে গেছেন। পরবর্তী যুগে পরস্পরবিরোধী এই দুই মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন কোহল ও মতঙ্গ। এঁরাও রসসৃষ্টিকেই মুখ্য করে তুলেছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু আঙ্গিককেও একেবারে বিদায় করেননি। আঙ্গিককে ভাব ও রসের বাহন করে নাট্যজগতকে সার্থক প্রতীকধর্মী করে তুলেছিলেন।

আজ কোথায় আমাদের সেই শিক্ষা-সংস্কৃতি, কোথায়ই বা আমাদের শিল্প-কলার প্রতি গভীর অনুভূতিশীল সাধনা। নইলে সব থাকতেও কেন আমরা সবহারাদের দলে! এদেশেই তো জন্মে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে বাংলার নাট্যসাহিত্যে যুগান্ত-কারী আন্দোলন বললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—আজ দেশে-বিদেশে রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চাভিনয় সফল করে তোলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে। চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি নাটকে বহিরঙ্গ আঙ্গিকের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ নাটকই অন্তরঙ্গ বক্তব্য ও রসসৃষ্টির পরিচায়ক। প্রসঙ্গতঃ দু'টি মাত্র নাটকের কথা বলি। ১৩১৮ সালে 'অচলায়তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জগতে যেখানেই ধর্মকে উপেক্ষা করে আচার বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই মনুষ্য-অন্তর নিজের কপটতার দ্বারা রুদ্ধ হয়। সেই রুদ্ধ চেতনার ব্যথা ও বেদনাই 'অচলায়তনের' বিষয়বস্তু।

ধর্মের প্রকাশ্য গতিসৃষ্টির জন্যই আচারের জন্ম। কিন্তু ধর্ম যখন সেই আচার এবং নিয়ম-সংযমকে অতিক্রম করে আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে—তখন সে উত্তপ্ত মরুভূমি, অথবা স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই নীরস পথকে সনাতন রূপে সম্মান করার অর্থ মানবাত্মাকে ক্রমাগত অধীর ও তৃষ্ণার্ত করে তোলা। ১৩১৮ সালে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের একটি অংশে কবি বলেন—"সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে—তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা-মাত্র। এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ না কেহ শুনাইয়াছে যে—আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। ....অচলায়তনের গুরু কি কেবল ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই—"ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সবচেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না। যেখানে ভাঙা হইল সেইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে।"

অচলায়তনের মত 'মুক্তধারা'-ও রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নাটক—অন্তরঙ্গ রসসৃষ্টির ওপর যার বক্তব্য সুস্থিত। যন্ত্র এই নাটকের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। যন্ত্র যখন প্রাণকে আঘাত করে তখন প্রাণ দিয়েই সে যন্ত্রকে ভাঙতে হয়, যন্ত্র দিয়ে নয়। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে লেখেন—"যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে; কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে।.........যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডী তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তাদেরই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার লাগিয়ে জয়ী হ'ব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে মন—মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"

প্রতীকধর্মী সংলাপ ও উপস্থাপনায় নাট্য-সংঘাত কত রসঘন গভীর সংবেদন-শীল হয়ে উঠতে পারে—এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী আজ আন্দোলন চলেছে, চলেছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রুদ্ধ চিত্তের আশা ও বেদনাই শিল্পাশ্রয়ী সৃষ্টির বিষয় এবং আনুষঙ্গিকে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই ব্যক্ত হয়ে পড়ে—এটা বিশ্বজনীন সত্য বলে স্বীকৃত। এত বড় সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে না, আমারও নেই।

ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথ

সরোজরঞ্জন রায়চৌধুরী

বোলপুর রেল স্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তরে দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দুইটি ছাতিমবৃক্ষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একদিন শুভমুহূর্তে তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—সেদিন তিনি সেই বৃক্ষপাদমূলে উপবেশন করিয়া পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের অপূর্বশোভা দর্শন করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিশিযাপন করেন। তিনি হৃদয়ে বিশ্বরূপের সেই পরম সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের এই অমৃতময় বাণী জীবনের মূলমন্ত্র ও সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে এই অক্ষয়বাণী সার্থকরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কথা দিয়া কথা গাঁথিয়া ছন্দের মাধ্যমে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, উহা তাঁহার সাধনালব্ধ উপলব্ধির কথা যাহা মানবমনে অত্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা ঋষি কবির জীবনে সেই সমস্ত বাণী যে কতদূর সত্য ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি সুদীর্ঘকাল তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ও তাঁহাকে যেভাবে যতখানি দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহার কতকটা আভাষ আমি আমার নিজের দেখা কয়েকটি বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়াই দিবার চেষ্টা করিব। শোকে দুঃখে বা রোগশয্যায় সেই আত্মস্থ ঋষি কবির সহজ সুন্দর সরলস্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই মহামানবের চরণে ভক্তিনম্রচিত্তে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

শোকে

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার মাত্র কয়েক বৎসর পর অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি ও আমার অগ্রজ ৺মনোরঞ্জন চৌধুরী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৭৬ জন দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথও ছাত্ররূপে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। শমীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নম্রস্বভাব ও মধুর ব্যবহার দ্বারা সকল সহপাঠীরই মন জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

শমীন্দ্রনাথের রূপের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন—শুধুমাত্র এই কথা বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে শমীন্দ্রনাথ—"বালক রবীন্দ্রনাথ"। যেমন তাঁর দুধেআলতার মত গায়ের রং তেমনি মুখের আকৃতি ও শরীরের গড়ন পিতৃদেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতই ছিল। এই মাতৃহারা শিশুপুত্রকে গুরুদেব পিতা ও মাতার যুগ্ম দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন দ্বারা সর্বদা কাছে রাখিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ই তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হইত। এই সময়ে শমীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাত্র ৪।৫ মাস একত্র আশ্রমে থাকিবার পরই ৺পুজার ছুটিতে তিনি মুঙ্গের বেড়াইতে গিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু সুসাহিত্যিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺সরোজচন্দ্রের সঙ্গে। শ্রীশবাবুর প্রথম পুত্র ৺সন্তোষচন্দ্র ছিলেন গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র সরোজচন্দ্র গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু।—এইভাবেই দুইপুরুষের বন্ধুত্বসূত্রে পরস্পর পরস্পরের সহজ মিলনের পথে সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল।

৺পুজাবকাশ শেষ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই গুরুদেব টেলিগ্রামে খবর পাইলেন যে শমীন্দ্রনাথ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন কিন্তু কলিকাতা হইতে গুরুদেব চিকিৎসক লইয়া গিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার আর অবকাশ পাইলেন না, তাহার পূর্বেই আদরের দুলাল শমীন্দ্রনাথ ১৯শে কার্তিক, ১৩১৪ সনে মরধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাণপ্রিয় পুত্রের এই অকালমৃত্যু গুরুদেবের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিল বটে কিন্তু বিধাতার এই অমোঘ বিধান তিনি শান্তচিত্তেই সহজভাবে বরণ করিয়া লইলেন। অসীম ধৈর্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার জীবনদেবতার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া দৈনন্দিন কার্যে নিয়মিত মনোনিবেশ করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্মাহত হইলাম এবং ছুটীর পর শান্তিনিকেতনে আসার পরের দিনই সকালে দেখি ধীরপাদক্ষেপে "প্রাক্-কুটীরের" উত্তরদিকে বড় কুয়ার পাশে গাব গাছের নীচে গুরুদেবের সদা হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি উপস্থিত। আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদের সকলকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। এতবড় আঘাতের উল্লেখ তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ পর্যন্ত তাঁহার কথায় বা আচরণে দেখা গেল না। দৈনন্দিন সমস্ত কাজের মধ্যে এই সময়ে রামানন্দবাবুর "প্রবাসী" পত্রিকায় এলাহাবাদে "গোরা" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও নিয়মিত পাঠানোর ব্যাপারে কোন অন্তরায় দেখা দেয় নাই।

গুরুদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলাদেবী (মাধুরীলতা) রূপে গুণে পিতারই অনুরূপা এবং গুরুদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। ইনি অত্যন্ত দরদী ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন. বেলাদেবীর মাতৃহৃদয়ের মধুর রূপটি প্রকাশ পাইত তখন, যখন তিনি তৎকালীন শিশুবিভাগের ১৪।১৫টি ছেলের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। ১৯০৮ সালে গুরুদেব সর্বপ্রথম শিশুবিভাগ প্রবর্তন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন আমার ও শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দীর উপর। তখন বেলাদেবীকে যে ২।১বার আমার আশ্রমে দেখিয়াছি তাহাতে দেখিতাম তিনি "দেহলী" ভবনের পার্শ্বে যে ত্রিভুজাকৃতি বাড়িটি আছে তাহার মধ্যস্থলের বাঁধানো সুপ্রশস্ত চাতালে বসিয়া সন্ধ্যার সময় শিশুবিভাগের এই ১৪।১৫টি ছেলেদের গল্প শুনাইতেছেন। পূর্ণিমার দিন তাহাদের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করিয়া নিজহাতে পরিবেশন করিতেন। কী স্নেহ ও ভালবাসার সহিত মায়ের মত যত্ন করিয়া প্রতিটি শিশুকে খাওয়াইয়া তিনি

কী যে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন তাহা সেই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। এমন মধুর স্বভাবের দুর্লভ মহিলার সেবা যত্ন পাইয়া শিশুমন প্রচুর আনন্দে ভরিয়া উঠিত। এই বেলাদেবী দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়া ১৬ই মে, ১৯১৮ সনে কলিকাতায় নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গুরুদেব তখন কলিকাতায়ই ছিলেন। কন্যাকে এই সঙ্কটাপন্ন রোগের হাত হইতে আর রক্ষা করা সম্ভবপর নয় এই কথা গুরুদেবের অজানা ছিল না এবং শেষদিন তাঁহার অন্তিম অবস্থার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়িতে করিয়া কন্যার বাসগৃহে গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার আত্মা সেইমাত্র দেহমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আর গাড়ি হইতে না নামিয়াই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সন্ধ্যার সময় বিচিত্রা-ভবনে যথারীতি পূর্বদিনের অসমাপ্ত আলাপ-আলোচনা শেষ করিবার জন্য যথাস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সদস্যবৃন্দ জোড়াসাঁকো আসিয়া যখন এই নিদারুণ সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন সকলেই সেইদিন ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন যে কবি বিচিত্রা-ভবনে সকলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি স্বাভাবিক-ভাবেই পূর্বদিনের অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপন করিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তাঁর বাচনভঙ্গিতে বুঝিতেই পারিলেন না যে সেইদিন দুপুরেই কবির জীবনে এত বড় একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন—সান্ত্বনার কোন ভাষাই আর তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইল না।

কঠোর সাধনায় কতখানি সিদ্ধিলাভ করিলে এইরূপ আত্মসমাহিত চিত্তে দুঃখকে বিধাতার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়া সহজ ও সুন্দরভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহা এই ঘটনা হইতেই অনুমান করা চলে। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমৃতময় বাণীতেও তাঁহার এই সাধনালব্ধ উপলব্ধির কথাই নানাভাবে বিচিত্র ছন্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ আরো ঘটনার কথা উল্লেখ করা চলে তবে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াই এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করিব।

১৯৩২ সনের আগষ্ট মাসে বর্ষামঙ্গল উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য আশ্রমে তোড়জোড় চলিতে লাগিল। ৮ই আগষ্ট উক্ত অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা ছিল। গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতু (নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) এই সময় বিদেশে গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী। এই সংবাদ শুনিয়া মীরাদেবী বিদেশে রোগশয্যায় শায়িত পুত্রকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু ৭ই আগষ্ট টেলিগ্রামে গুরুদেব জানিতে পারিলেন যে একমাত্র প্রিয় দৌহিত্র নীতু আর ইহধামে নাই। এই মর্মান্তিক সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে আশ্রমে ছড়াইয়া পড়িল ও তদানীন্তন সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় আশ্রমের যাবতীয় কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পরদিন বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলেন। গুরুদেব এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জগদানন্দবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—"জগদানন্দ, নীতুর মৃত্যু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি তারজন্য আশ্রমের শান্তি নষ্ট করে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান বন্ধ করা হোক্ এটা আমার মনঃপূত নয়। উৎসব অনুষ্ঠান যথারীতি হয় এটাই আমার ইচ্ছা।" জগদানন্দবাবু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন, কোন কথা আর বলিতে পারিলেন না। সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় কবির ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া উৎসবের কাজ যথারিতী অনুষ্ঠিত হইবে এইকথা সকলকে জানাইয়া দিলেন। পরদিন পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার নিমিত্ত গুরুদেব যথাসময়ে গরদের জামা, কাপড় পরিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করিলেন। সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, কোনরূপেই শোকের কোন বাহ্য-প্রকাশ কিঞ্চিৎও দেখা গেল না। বিস্ময়ে আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম।—

রোগে

সামান্য অসুস্থতায় গুরুদেবকে কখনও শয্যা গ্রহণ করিতে দেখি নাই। বরং নিরলসচিত্তে সেইসব উপেক্ষা করিয়াই নিত্যকর্মে মনোনিবেশ করিতেই দেখিয়াছি। সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে যখন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পশ্চিমপ্রান্তে মহর্ষির প্রিয় ছাতিমবৃক্ষ ও পূর্বপ্রান্তে বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মহর্ষির সাধনাস্থল এই প্রান্তরে স্থায়ীরূপে গ্রহণ করিবার সময় আস্তে আস্তে কিছু শাল ও ফল ফুলাদির গাছ রোপিত হইয়াছিল। বৃক্ষলতাবিরল প্রান্তরে গ্রীষ্মকালে তখন ১০৯।১১০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপ দেখা যাইত। গুরুদেবকে দেখিয়াছি এই দারুণ গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে নিবিষ্টচিত্তে আসনে বসিয়া নিত্যকর্ম করিয়া যাইতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মে একখানা ছোট হাতপাখা কাছে থাকিত বটে কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার অবকাশ কখনও হইত না। প্রকৃতির বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ঋতুকেই মনপ্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমস্ত ঋতুর মধুর আবির্ভাব অন্তরে উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই তিনি সংগীতে, সাহিত্যে, ও কাব্যে তাহা অনায়াস ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

এই গ্রীষ্মকালের একটি মধুর স্মৃতি কতকটা অবান্তর হইলেও প্রকাশ করিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মের অসহ্য তাপও অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় যদি কোন কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা হয়। এই শিক্ষা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদেব এক অভিনব পরিকল্পনার সৃষ্টি করিলেন। নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।—

১০৯।১১০ ডিগ্রী উত্তাপে তখন খোলা মাঠে যেন আগুনের হল্কা বহিয়া যাইত এবং আশ্রমবাসী কোন কোন ছাত্র ও অধ্যাপকের নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে দেখা যাইত। এই সময় অধ্যাপনার কাজ সব ১০টার মধ্যেই শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। খাইতে যাইবার পূর্বে সমস্ত দুয়ার জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতাম। আহারান্তে অন্ধকার ও অপেক্ষাকৃত শীতল ঘরের ছায়ায় নিদ্রা যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বিকালে প্রায় ৫টার সময় দুয়ার জানালা খোলা হইত। গুরুদেব এই বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই দীর্ঘ সময় সকলে যদি বিছানায় শুইয়া গড়াগড়ি ও ঘুমাইয়াই কাটায় তাহা হইলে কোন কাজই তো সুষ্ঠুভাবে চলিবে না বরং অলসভাবেই দিন কাটিয়া যাইবে। তাই তিনি স্থির করিলেন দুপুরে ছেলেদের থাকার বড় হলঘরে নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকল ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে নূতন রকম হাল্কা অথচ আনন্দময় শিক্ষামূলক কাজে সকলকে মনোনিবেশ করাইতে হইবে।

ছাত্রদের বেশ চিন্তা করিয়া তাহার নিজের অংশটি যে কি হইবে তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে হইত। গল্পের গতির দিকে বিশেষ মনোযোগ না রাখিলে তাহার নিজ অংশটুকু খাপছাড়া হইয়া যাইবে বলিয়া সকলকেই গভীর মনোনিবেশ সহকারেই চিন্তা করিতে হইত। এইভাবে ঘুম তো ছুটিয়াই যাইত বরং গল্পে সকলে মশগুল হইয়া গল্পাংশ তৈয়ারী করার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। প্রত্যেকেই তাহার নিজের আসরে তাহার গল্পাংশ স্থির করিয়া রাখিতেন সময় আসিলেই যেন একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন। এইভাবে একটি গল্প আরম্ভ হইয়া ডালপালা বিস্তার করিতে করিতে শেষ হইতে প্রায় দুই ঘন্টা আন্দাজ সময় অতিবাহিত হইত অথচ তাহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক গল্পটির গতির ও পরিণতির কথা ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইতেন কারণ বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারা বিভিন্ন প্রকারের—কাজেই আরম্ভে যদিও বা একটা গল্পের ভঙ্গি থাকিত কিন্তু পরিশেষে গল্পটি অদ্ভুত বিচিত্ররূপ ধারণ করিত। এইভাবে গল্প ঘুরিয়া শেষে গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি গল্পটি কিভাবে আরম্ভ হইয়াছিল ও কিভাবে ঘুরিয়া বর্তমানে কী অবস্থায় দাঁড়াইল তাহা বুঝাইয়া দিয়া তার শেষ পরিণতি কী হইবে তাহা বলিয়া দিয়া গল্পাংশ শেষ করিতেন। এইভাবে গরমের জন্য আর কাহাকেও কষ্টবোধ করিতে হইত না। এই অভিনব খেলা অবসর সময়ে বনভোজনে বা দূর যাত্রা-পথে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।—

যতদূর মনে পড়ে বোধহয় ১৯০৯ সালে গুরুদেব অর্শরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এই সময় একদিন গুরুদেব ছাত্রদের হাতে স্বায়ত্তশাসনের গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের তাঁর 'দেহলী' ভবনের নিচতলায় স্বাস্থ্য-সমিতির অধিবেশনে সকাল ৯টার সময় আহ্বান করিলেন এবং দারুণ অর্শের যন্ত্রণার মধ্যে প্রায় ১॥ ঘন্টা এক আসনে স্থির হইয়া বসিয়া অবিচল চিত্তে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন, মুহূর্তের জন্যও কোনরূপ অস্বস্তির ভাব বা যন্ত্রণার প্রকাশ মুখে বা বাহ্যব্যবহারে প্রকাশ করিতে দেখি নাই, যদিও আমরা তাঁর যন্ত্রণার কথা তখন অনুমান করিয়াই জানিতাম। অসীম ধৈর্যের প্রতীক ঋষি কবির পক্ষেই ইহা সম্ভব এবং এইরূপ উদাহরণ বিরল। এই অর্শের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন পরবর্তী সময়ে বিলাতে এক নার্সিং হোম-এ থাকিয়া চিকিৎসা করার পর।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পংএ গুরুদেব অসুস্থ হইবার পূর্বে ১৯৩৭ সনেও ঠিক এই সময়েই শান্তিনিকেতনে হঠাৎ মূত্রগ্রন্থিরোগে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। শান্তিনিকেতনের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেব ইউরেমিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ যথাবিধি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা এই সংবাদ শুনিবামাত্র ছুটিয়া উত্তরায়ণে গেলাম। তখন গুরুদেব উত্তরায়ণের নিচের তলায় দক্ষিণদিকের এক প্রশস্ত কক্ষে বাস করিতেন। গুরুদেবের এই অবস্থা আমরা পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তার শচীনবাবু কলিকাতা হইতে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার আনাইয়া অনতিবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য রথীবাবুকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কারণ এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে শচীনবাবু সাহস পাইলেন না। রথীদা ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত কলিকাতার প্রশান্তবাবুকে টেলিফোন করিয়া সমস্ত বিষয় জানাইলেন ও কোন বিচক্ষণ ডাক্তারসহ অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রশান্তবাবু তৎক্ষণাৎ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ডাক্তার জ্যোতি সরকার সহ আরো বিশিষ্ট কয়েকজন ডাক্তারকে যন্ত্রপাতি ও ঔষধাদি সহ শান্তিনিকেতনে পরবর্তী ট্রেনেই রওয়ানা করাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাওড়া স্টেশনে আসিয়া অল্পের জন্য ট্রেনটি ধরিতে পারিলেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা মোটরে করিয়াই রওয়ানা হইয়া বর্ধমানে সেই ট্রেন ধরিয়া সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলেন। শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াই ডাক্তার সরকার কবির নিকটই গেলেন এবং তাঁহাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পর্যন্ত তাঁহাকে কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলে রথীদা ডাক্তার শচীনবাবুর প্রেসক্রিপশান দেখাইয়া শচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। শচীনবাবু ডাক্তার নীলরতন সরকারের মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়া নিজেকে একদিকে ধন্য ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বিষম বিব্রত বোধ করিতেছিলেন এবং চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল কিনা সেই ভয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি-বোধ করিতেছিলেন। ডাক্তার সরকার তাঁহার প্রেসক্রিপশান দেখিয়া শচীনবাবুর চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কথা জানিবার জন্য নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন। শচীনবাবু তাহাতে আরো বিব্রত হইয়া পড়িলেন কিন্তু ডাক্তার সরকার তথায় উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, মফঃস্বলে এরূপ বিচক্ষণ ডাক্তার যে থাকিতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। গুরুদেবের এই-রূপ অবস্থায় মাথা ঠিক রাখিয়া যে চিকিৎসা ইনি করিয়াছেন আমি থাকিলেও ঠিক তাহাই করিতাম এবং তাঁহার এই চিকিৎসার গুণেই গুরুদেবের অবস্থা বর্তমানে অনেকটা ভাল দেখিতেছি—এতক্ষণে শচীনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল বদনে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মনে শান্তি আনিয়া দিল।

ডাক্তার সরকার দুই দিন থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া গুরুদেবকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শচীনবাবু ডাক্তার সরকারের নিকট হইতে চিকিৎসাবিধি সম্বন্ধে যাহা জানিবার সমস্ত জানিয়া লইলেন। ডাক্তার সরকার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন শুনিয়া বোলপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ ও পাঁচু-গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ একদিন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন ও চিকিৎসা-বিধি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার আগে ডাক্তার সরকার আর একবার গুরুদেবকে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য কবির শয্যাপার্শ্বে গিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে দেখিয়াই হাস্যমুখে নমস্কার জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী রকম দেখছেন?" ডাক্তার সরকার বলিলেন, "এখন তো বেশ ভালোই দেখছি—আর কোন ভয় নেই।" তাঁহারা যে এত কষ্ট

করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিয়া গেলেন সেইজন্য গুরুদেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন কিন্তু ডাক্তার সরকার কিছু না বলিয়া জোড়হস্তে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গুরুদেব বলিলেন, "কী দেখছেন?" উত্তরে ডাক্তার সরকার বলিলেন, "আপনার কাব্যে দুঃখ শোক-জনিত নানা আঘাত সম্বন্ধে কত উপদেশ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, আর আজ এত কষ্টের মধ্যেও যে আপনি পরম আনন্দে নির্বিকার থাকিয়া হাস্যালাপ করিতে পারেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতেছি। তাই আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইতেছি।" গুরুদেব ছলছল নেত্রে তাঁহাকে জোড়হস্তে নমস্কার জানাইলে ডাক্তার সরকার সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গুরুদেবকে ডাক্তার সরকারের নির্দেশ-মত প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস শশার সরবৎ অবলীলাক্রমে খাইতে দেখা প্রসঙ্গে আজ একটি অবান্তর কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই কথাটি বন্ধুবর সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নিকট যেমন শুনিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি। গুরুদেব শশার সরবতের মত মাঝে মাঝে আরো অনেক রকম বিচিত্র খাওয়া অনা-য়াসে অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন। শারীরিক উপকার হইবে বলিয়া আটার রুটিতে ক্যাস্টর অয়েলের ময়াম ও প্রতি-দিন প্রাতে এক গ্লাস করিয়া নিমপাতার রসও মাঝে মাঝে খাইতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সকালে চা খাওয়ার সময় তাঁহার পুরাতন ভৃত্য "লীলমণি" (নীলমণি) এক গ্লাস নিমপাতার রস টেবিলে ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমাদের বন্ধু সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সকালে চা খাওয়ার সময় গুরুদেবের সঙ্গলাভের জন্য রোজই আসিতেন ও এই রকম সবুজরঙের এক গ্লাস রস গুরুদেবকে রোজই খাইতে দেখিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, চা খাওয়ার আগে ওটা কিসের সরবৎ আপনি খান?" গুরুদেব গম্ভীরমুখে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "বড় উপাদেয় সরবত, একটু খেয়ে দেখ। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা খুবই উপকারী"। এই বলিয়া তিনি অন্য একটি গ্লাসে অর্ধেক সরবত ঢালিয়া সুধা-কান্তকে দিলেন বাকীটুকু তিনি মুখ একটুও বিকৃতি না করিয়া ঠিক সরবত খাওয়ার মত একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিলেন—সুধাকান্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া গ্লাসটি লইয়া মুখে একটু ঢেলে দিয়াই মুখ-চোখ কুঁচকাইয়া জিভ বাহির করিয়া অমনি থুঃ থুঃ থুঃ এযে হাড়তেতো বলিয়া ফেলিয়া দিলেন। গুরুদেব আড়-চোখে তার দিকে তাকাইয়া এই দৃশ্য দেখিবেন বলিয়াই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এটা আর কী তেতো রে? এটা রোজ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। দেখিস তো আমি রোজই খাই।"

যে কোনরকম বিস্বাদ জিনিসও তিনি মুখ বিকৃত না করিয়াই অবলীলাক্রমে খাইতে পারিতেন, কাজেই শশার সরবত আর তাঁর কাছে বেশি কি?

কালিম্পং যাত্রা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া বৌঠান প্রতিমা দেবীর লিখিত বিবরণ হইতেই প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারা যায়। ১৯৪০ সনে গুরুদেবের স্বাস্থ্য আবার উদ্বেগজনক হইয়া পড়িল। গুরুদেব স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ অন্যান্য সকল ডাক্তারই কবির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেখানে প্রয়োজন হইলে সহজে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাইবে না এরূপ কোন স্থানে যাওয়ার পক্ষে মত দিতে পারিলেন না। গুরুদেব মংপু যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডক্তারদের অভিমত জানিয়া কালিম্পংএ বৌঠান প্রতিমা দেবীর কাছেই যাওয়া স্থির করিলেন। তখন বৌঠানের শরীরও বিশেষ ভাল ছিল না। কাজেই গুরুদেব সেইখানে যাইতেছেন জানিয়া বৌঠান অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রথীদা তখন জমিদারীতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন—বৌঠানও শারীরিক অসুস্থতার জন্য কালিম্পং চলিয়া গিয়াছেন কাজেই এই সময় গুরুদেব নিজের শরীরের অবস্থা অনুভব করিয়া একা শান্তি-নিকেতনে থাকিয়া শান্তি পাইতেছিলেন না। আসন্ন কোন বিপদের আশঙ্কা যে তাঁর মনে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা বুঝিয়াই আপনজনের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি কালিম্পংএ বৌঠানের নিকট আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া স্বস্তি বোধ করিলেন। কয়েকদিন মনের আনন্দে একটু সুস্থ-বোধও করিয়াছিলেন কিন্তু কালব্যাধি তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ থাকিতে দিতে-ছিল না—অকস্মাৎ একদিন রাত্রে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। এই সময়ে গুরুদেব কালিম্পং আসিয়াছেন জানিয়া মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবীও আসিয়া পড়িলেন। বৌঠান মৈত্রেয়ী দেবীকে এই সময় পাইয়া অনেকটা সাহস পাইলেন।

কলিকাতায় এই খবর পৌঁছিবামাত্র প্রশান্তচন্দ্র, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র, অমিয়নাথ বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার মহাশয়দের লইয়া কালিম্পং যাত্রা করিলেন এবং তাঁহারা গুরুদেবের সংজ্ঞা-হীন অবস্থাতেই কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। গুরুদেবের এই আকস্মিক অচৈতন্য অবস্থার কথা খবরের কাগজে ও রেডিয়োতে জানিয়া আমরা গুরুদেবকে দেখিবার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছুটিয়া গেলাম।

ডাক্তার নীলরতন সরকার, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যসখা মৈত্র, অমিয় সেন, অমিয়নাথ বসু, রামচন্দ্র অধিকারী, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ গুরুদেবকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া কিরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেই সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য পাশের ঘরে গিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে লাগি-লেন। ললিতবাবুর মত হইল যে কবির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে যেরূপ তাহাতে অনায়াসে অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহাকে কষ্টের হাত হইতে সহজেই মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার সরকার বলিলেন, "আচ্ছা, আপনারা অস্ত্রোপচার করলে কবি যে কয়দিন বাঁচবেন সে কয়দিন তিনি কি একেবারে পঙ্গু হয়ে থাকবেন না?" ডাক্তার ব্যানার্জি বলিলেন, "হ্যাঁ, সহজভাবে নড়া-চড়া করে বেড়ানো সম্ভব হবে না বটে, তবে কষ্টের অনেক লাঘব হবে।" ডাক্তার সরকার বলিলেন, "এমন একটা মহামূল্য জীবনকে এইভাবে পঙ্গু করে রেখে লাভ কি? তার চাইতে আমরা যদি ওষুধ দিয়ে তাঁকে সহজভাবেই কিছুদিন বাঁচাবার চেষ্টা করি তবে তাতে আপত্তি কি?" ডাক্তার ব্যানার্জি বলিলেন, "হ্যাঁ, সে তো ভাল কথা কিন্তু তাকি বেশিদিন স্থায়ী হবে? কিন্তু এখন যে অবস্থায় অপা-রেশন করতে আমি সাহস পাই তখন হয়তো এমন অবস্থা হয়ে পড়বে যে আমার দ্বারা আর অপারেশন করা সম্ভব হবে না এবং আমি তখন এই রকম মহামূল্য জীবনের জন্য দুর্নামের ভাগী হতে পারব না। আমার একান্ত অনুরোধ তখন আর আপনারা অপারেশনের জন্য আমাকে ডাকিয়ে পাঠাবেন না।" এইরূপ আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে ঔষধ দিয়াই সম্প্রতি কবিকে অস্ত্রোপচারের হাত হইতে রক্ষা করাই নীলরতন বাবুদের একান্ত ইচ্ছা। তদনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় ধীরে ধীরে অবস্থার খানিক উন্নতি হইল বটে কিন্তু তখনও একেবারে বিপদমুক্ত হইল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছেড়ে দিলাম
পথটা

বদলে গেল
মতটা

কৃষ্ণ মেনন

এমন অবস্থায়
পড়লে পারে
সবারি মত
বদলায় !

মেনন
ক্যান্টিন

খাসনবিশের খাসদপ্তরে

কমল দেব

ওয়ান-ডায়মেন্‌শান্‌ অর্থাৎ কিনা একমাত্রা-বিশিষ্ট লোককে কি যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়? বলা বাহুল্য, মাত্রাটা দৈর্ঘ্যের দিকে। রাখাল ভটচাজ কিন্তু যুদ্ধে গিয়েছিল। আর ও ছিল ওয়ান-ডায়মেন্‌শানাল।

রাখাল ভটচাজ নাকি লম্বায় ছিল ছ' ফীট। অবশ্য মনে হত সাড়ে ছ' ফীট। বলে। হবে নাই বা কেন! একে একমাত্রা-বিশিষ্ট জীব, প্রস্থে ও পরিধিতে শুধু অস্তিত্বই আছে, আয়তন নেই। তার ওপর ও যখন খাকি হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, ভারী বুট এবং হাফ-মোজা পরে, খোয়া-বাঁধানো পথে খড়মড় আওয়াজ তুলতে তুলতে ওয়ার্কশপের দিকে বীর

পোড়া বাঁশের একজোড়া রণপায়ে চেপে দৌড়চ্ছে

কদমে এগোত, তখন মনে হত, ও বুঝি পোড়া বাঁশের একজোড়া রণ-পায় চেপে দৌড়চ্ছে।

রাখাল ভটচাজ যদি ক্যাপ্টেনগোছের কিছু হত, তাহলে না হয় বোঝা যেত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও হেলমেট পরে, চোখে ফিল্ড-গ্লাস লাগিয়ে শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করছে। গাছের ওপর বা উঁচু ঢিলায় চড়তে হয়নি। শত্রুপক্ষও নিশ্চয় ওকে কোন বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ীর পোড়া খুঁটি ভেবে, কিংবা কৃষিক্ষেত্রের কাক-তাড়ুয়া ভেবে অমূল্য বুলেট খরচ করছে না। কিন্তু তা'তো নয়। ও যুদ্ধে গিয়েছিল ইলেক্‌ট্রিসিয়ান হিসেবে। মধ্য-প্রাচ্যের বহু যুদ্ধক্ষেত্রে ওকে বালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এক ট্রেঞ্চের সঙ্গে আর এক ট্রেঞ্চের বৈদ্যুতিক সংযোগ বজায় রাখতে হয়েছিল। হলদে বালির ওপর রাখাল ভটচাজের কৃষ্ণ-মধুর বর-বপুর শোভার সাক্ষী রয়ে গেল শুধু মিত্রপক্ষের জীবিত সৈনিকরা।

যুদ্ধের পর রাখাল ভটচাজ অধ্যাপক খাসনবিশের ল্যাবরেটরীতে এয়ার কণ্ডিশনিং মেকানিকের পদে যোগ দিল। প্রথম দিন এসেই ওকে ম্যানেজার গিলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হল। সাহেব ওকে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমাদের কণ্ডিশানিং প্ল্যান্টটা ঘরের ছাদের কাছে বসানো। সুপারভাইস করার জন্য তোমার বোধ হয় মই লাগবে না, কি বল?"

রাখাল ভটচাজ মোটামুটি ইংরিজি কথাবার্তা বুঝতো। কিন্তু আমাদের বড় সাহেবের খাঁক-খাঁক করে বলা ইংরিজি শোনার অভ্যাস ছিল না। সাহেবের মাথা নাড়া আর স্যুট-এর ওপর চোখ রেখে ও ধরে নিল, যা বললেই সাহেব খুশী হবে। তাই পরম বোদ্ধার মত ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে ও বলল, "নো স্যার!"

সাহেব এবারও গম্ভীরভাবে বললেন, "তুমি কি আরও লম্বা হতে চাও?"

রাখাল "টল্‌" কথাটা থেকে ধরে নিল ওর দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন। ও চটপট উত্তর দিল, "ইয়েস স্যার। সিক্স ফীট্।"

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, ও-কে। তারপর এ্যাসিস্ট্যান্ট ভূদেববাবুকে বললেন ওকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে।

কথাটা বেশ মুখরোচক হয়ে ল্যাবরেটরীতে পল্লবিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাখাল ভটচাজ আর এক কাণ্ড করে দিয়েছে।

ভূদেববাবু যখন ওকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন, "আপনি অফিসের নিয়ম-কানুন সব জানেন তো?"

"মিলিটারীর নিয়ম-কানুন জানি।"

"তাহলেই হবে। সব সাহেবের একই ধুলো। অফিসারদের একটু-আধটু নমস্কার করবেন।"

"সে আর বলতে হবে না, স্যার!"

পরদিনই কাণ্ডটা ঘটল। ডক্‌টর গড়গড়ি আর মিস্টার মণ্ডল অফিসে ঢুকতেই দারোয়ান ও'দের নমস্কার করল। ও'রা উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করছিলেন দারোয়ান ও'দের নমস্কার করে কিনা দেখবার জন্য। দারোয়ানকে নমস্কার করতে দেখে হৃষ্টচিত্তে, যেন ওসব খেয়ালই করেননি, এমনিভাবে আলগোছে হাতটা একবার কপালের কাছে তুললেন। ল্যাবরেটরীতে সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকছে কিনা, তা বোঝবার মাপকাঠি হল এইগুলো। অধ্যাপক খাসনবিশ যাকে অপছন্দ করবেন, ল্যাবরেটরীসুদ্ধ লোক তাকে আর পাত্তা দেবে না। দারোয়ান-বেয়ারা অবধি নমস্কার করতে ভুলে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাবে।

ও'রা দুজন দারোয়ানকে অতিক্রম করে সবেমাত্র এগিয়েছেন এমন সময় পাশেই খোয়া-বাঁধানো পথটার ওপর হঠাৎ খড়মড় আওয়াজ হতে দুজনে চমকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, খাকি হাফ-প্যান্ট-পরা পোড়া কাঠসদৃশ সুদীর্ঘ এক দেহ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। মাটি থেকে দু' ইঞ্চি ওপরে ভারী মিলিটারী বুট-পরা একজোড়া পা পরস্পরের ওপর সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

ডক্‌টর গড়গড়ি আঁৎকে উঠে

জিগেস করলেন, "কি হল, পিঁপড়ে কামড়ালো নাকি -"

মিস্টার মণ্ডল কিন্তু এ-সুযোগ হারালেন না। ঘাড়টা টান-টান করে দেহটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, পোর্টফোলিও ব্যাগ-ধরা হাতটা অল্প কয়েক ইঞ্চি তুলে রাখাল ভটচাজের স্যালুট গ্রহণ করলেন। তারপর গড়গড়ির কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললেন, "মিলিটারী স্যালুট যে।"

ডক্টর গড়গড়ির আপশোষের সীমা রইল না। এরকম স্যালুট জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। অথচ যদিও বা পেলেন, বুঝতেই পারলেন না। আর যখন বুঝতে পারলেন, তখন তো রাখাল ভটচাজকে ডেকে স্যালুট রিসিভ করা যায় না। মিস্টার মণ্ডল কিরকম ডাঁটের মাথায় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে মড্ করল!

পরের দিন অফিসে ঢোকবার সময়ে ডক্টর গড়গড়ি খুব সতর্ক রইলেন। কিন্তু গেটের কাছে সেদিন রাখাল ভটচাজ ছিল না। পর পর কয়েকদিনই ওঁকে বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হল। একদিন দূর থেকে দেখলেন, তাঁর ঘরের সামনে করিডোরে রাখাল ভটচাজ দাঁড়িয়ে। গড়গড়ি শঙ্কিত হৃদয়ে নিজের চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি যেতে যেতে যদি রাখাল ভটচাজ চলে যায়! আর হলও তাই। একটুখানির জন্য তিনি পৌঁছতে পারলেন না।

এদিকে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তো অন্তর্বিপ্লব লেগে গেল বললেই চলে। সিনিয়ার কেমিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কে বি পাল মিস্টার দাসের সঙ্গে গল্প করতে করতে ল্যাবরেটরীতে ঢুকছিল। দুজনেরই পরণে সাজের পাঞ্জাবি আর ধুতি। ওদের আগে আগে যাচ্ছিল জুনিয়ার কেমিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট সুনীল মজুমদার, পরণে টাই ও স্যুট। গেটের সামনেই রাখাল ভটচাজের সঙ্গে মোলাকাৎ। ফলে সেই মিলিটারী স্যালুট। সুনীল মজুমদার হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই পেছন থেকে কে বি পাল এসে হাজির। "শালা, তুমি অফিসার হয়েছ! ভটচাজ তোমাকে সেলাম করলে, আর আমাদের করলে না!"

সেদিন টেস্টিং ডিপার্টমেন্টের একটা টেস্টিং মেশিন হঠাৎ বিগড়ে গেল। ডিরেক্টার খাসনবিশের একটা জরুরী স্যাম্পেলের টেস্ট হচ্ছিল সে মেশিনটায়। হেড-টেস্টার মিস্টার দাস শিলপ দিলেন ডিরেক্টারের কাছে। ডিরেক্টার সেই শিলপটার ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে 'ইউ' লিখলেন, অর্থাৎ জরুরী। তারপর 'ইউ'টাকে ঘিরে নীল পেন্সিল দিয়ে একটা গোল দাগ দিলেন, অর্থাৎ অতি জরুরী। তারপর সেটাকে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানেজার গিলিশ সাহেব নীল গোল দাগটার চারপাশে লাল পেন্সিল দিয়ে আর একটা গোল দাগ দিয়ে হেড মেকানিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ বিষয়টার গুরুত্ব আরও এক ধাপ বেশী। হেড মেকানিক আবার সেই লাল গোল দাগটার ওপর নীল গোল দাগ দিয়ে ইলেক্ট্রিসিয়ানের কাছে পাঠালেন। ইকেট্রিসিয়ানের হয়তো ইচ্ছে ছিল নীল-লালের খেলাটা আর একটু চালায়। কিন্তু ওর তলায় যে সমস্ত ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী রয়েছে, তারা আবার ইংরিজি জানে না। তাই তিনি মেগার-টেগার নিয়ে দলবল-সুদ্ধ টেস্টিং ডিপার্টমেন্টে ঢুকলেন। মিস্ত্রীরা মেশিনটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইলেক্ট্রিসিয়ান ঘোষবাবু মিস্টার দাসকে বললেন, "কি মশাই, ডিরেক্টার সাহেবের রিসার্চের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।"

"পারলুম আর কই। আপনারাই তো মশাই সব ভণ্ডুল করে দেন। খেলাটা একটু জমতে না জমতেই এসে পড়ে সব মাটি করে দিলেন।"

একটা এ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে অধ্যাপক খাসনবিশ এসে হাজির হলেন।

"কি অবস্থা?"

মিস্টার দাস এবং ঘোষবাবু শশব্যস্তে "এই যে, প্রায় হয়ে এলো"।—বলে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেশিনটার ওপর। পেছনে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে লাগলেন।

খবর পৌঁছে গেল। স্যার এসেছেন শুনে হেড মেকানিক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল। একটু পরে ম্যানেজার গিলিশ সাহেবও। হেড মেকানিকের একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা অভ্যেস। তিনি বললেন,

"আমার মনে হচ্ছে স্যার, পেনিয়ানের দাঁতগুলো আলগা হয়ে গিয়ে রেভোলাডুশানারী মোশানের স্পীডটা বোধ হয় কমে যাচ্ছে।"

স্যার গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ!"

গিলিশ সাহেব একটাও কথা বলেন নি। তিনি এবার দুহাতে ভিড় ঠেলে মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ কুঁচকে এই অবাধ্য যন্ত্রশিশুটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর সদ্য-ভাঙ্গা, ক্রীজ-তোলা শার্ট-প্যান্ট-টাইসুদ্ধ চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন মেশিনটার সামনে একজন সুদক্ষ মোটর মেকানিকের মত। ধাঁ করে একটা আঙ্গুল চালিয়ে দিলেন মেশিনের এক ফাঁকে। কালো রঙের খানিকটা গ্রীজ উঠে এল। সুইচটা ধরে খটাং খটাং করে নাড়ানাড়ি করলেন। স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে দুবার ঠক্‌ঠক্ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন তোয়ালে এগিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে চিন্তিতভাবে বললেন, "হুম্!" তারপর ঘোষবাবুর দিকে তাকিয়ে, যেন সবই বুঝতে পেরেছেন এমনি ভাব করে বললেন, "হ্যাল্লো গোস্-বাবু!"

ঘোষবাবুও যেন সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে গেলেন এমনিভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ইয়েস স্যার।"—বলেই ব্যস্তভাবে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

হঠাৎ পেছনে একটা কুঁই-কুঁই আওয়াজ পেয়ে সবাই চমকে তাকালো। একটা শ্লিং-হাইগ্রোমিটার হাতে নিয়ে রাখাল ভটচাজ মুখ ব্যাদান করে নীরবে হাসবার চেষ্টা করছে। ওকে দেখে হেড মেকানিক রীতিমত গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, "এটা স্যার কারেন্ট এবং রেসিস্টেন্স সংক্রান্ত গোলযোগ। সুতরাং—"

খাসনবিশ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে তো খুব সহজ ব্যাপার। 'ওম্স্ ল' এ্যাপ্লাই করুন। 'ওম্স্ ল'-এ কি যেন বলছে—"

"ওরকমভাবে হবে না স্যার।"

হেড মেকানিক রাগতভাবে রাখাল ভটচাজের দিকে তাকালো। খাসনবিশ বিরক্তভাবে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কেন, ওম্স্ ল-টা খাটালে—" "ওসব কেতাবী ওম্স্ ল-টা এখানে খাটবে না", বাধা

পেছনে কষে টাইট দিতে হবে

দিয়ে বলে উঠল রাখাল, "ওই ইন্-স্ট্রুমেন্টটার পেছনে কষে টাইট দিতে হবে।"

রাখাল 'পেছনে' শব্দটার বদলে প্রাকৃততর শব্দ ব্যবহার করল। শুনে খাসনবিশ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মিস্ত্রীরা মুচকি হাসল। ঘোষবাবু যেন শুনতেই পাননি, এমনিভাবে মাথা নীচু করে নিজের হাতে সেই স্ক্রুটায় টাইট দিতে লাগল। একটু পরেই মেশিনটা গোঁ করে চলতে শুরু করল।

খাসনবিশ এবং হেড মেকানিক গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন। গিলিশ সাহেব শার্ট-প্যান্টের ভাঁজে টোকা মারতে মারতে "ওয়েল ডান বাট্চাজ্" বলে চলে গেলেন। মিস্ত্রীদের মধ্যে একটা ছোকরা সবার শেষে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীচুস্বরে বলল, "দাদা, বেশ তো এয়ার কন্ডিশনিং করে ঘর ঠান্ডা রাখছিলেন। হঠাৎ হাওয়া গরম করতে গেলেন কেন?"

রাখাল ভটচাজ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে গবেষণাগার আর কিছু না পারুক, কর্মীদের সময়ে হাজিরা দেওয়ার কৃতিত্বে রেকর্ড স্থাপন করতে পারে, সেইখানে কিনা রাখাল ভটচাজ রোজ লেট করে অফিসে আসতে লাগল। আর দু-চার মিনিট লেট নয়; আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। লাল পেনসিল দিয়ে হাজিরা-খাতায় দাগ দিয়ে দিয়ে ক্যাজুয়েল লিভ্ কেটে নিতে নিতে দেখা গেল সারা বছরের ক্যাজুয়েল লিভ্ শেষ। অথচ ও যে রেটে লেট করছে তাতে তো আগামী দু-চার বছরের ক্যাজুয়েল লিভ কেটে নিতে হয়। খাস-দপ্তরে খাসনবিশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করে স্টেপ নেওয়া যায়? ডিসিপ্লিনই যদি ভেঙে গেল, তাহলে তাঁর এই সাধের ল্যাবরেটরীর আর কি দেবার রইল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে।

একটু একটু করে বিরক্ত হয়ে উঠছিল খাসনবিশের মেজাজ। এমন সময়ে চীফ্ ফিজিসিস্ট্ ডক্টর গড়গড়ির কাছ থেকে একটা শ্লীপ এলো—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ থেকে, পিসার টাওয়ারের মত দেখতে (হেলানো নয়) যে সেমি-মাইক্রো-ব্যালেন্স যন্ত্রটি কেনা হয়েছে, যাতে অল্প কয়েকটি ধূলিকণা অবধি ওজন করা যাবে, তার ওপর প্রভূত পরিমাণে ধুলো-বালি, পাটের সূক্ষ্ম ফেঁসো ইত্যাদি জমা হয়ে সেটাকে প্রায় কয়লার দোকানের দাঁড়ি পাল্লার সমতুল্যতায় পরিণত করেছে। অনতি-বিলম্বে এটাকে ঢেকে রাখবার বন্দোবস্ত না করলে, এটাতে ভবিষ্যতে কয়লা ওজন করা চলবে। তাতে কয়লার ডিপার্টমেন্টের সুবিধে, কেননা ওদের প্রচুর পরিমাণে কয়লা ওজন করতে হয়। কিন্তু ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে পাটের সূক্ষ্মতা নিয়ে যে গবেষণা চলছে, তা অতল জলে তলিয়ে যাবে।

খাসনবিশ তো কাবার। সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোকে ডেকে আধঘন্টা ধরে পাঁচ লাইন নোট ডিকটেট করলেন—পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যালেন্সের ঢাকনার জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। সুতরাং সেখান থেকে কোন বন্দোবস্ত হবে না। আমাদের ল্যাবরেটরীতে এবং তার ওয়ার্কশপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু গবেষক-পণ্ডিত ও বহু সুদক্ষ কর্মীর অভূতপূর্ব সম্মেলন হয়েছে বলে প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সুতরাং একের পাণ্ডিত্য ও অপরের কর্ম-দক্ষতার যোগফলে একটা ঢাকনা তৈরী হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া নিজের ডিপার্টমেন্টের সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখাই ভালো। অন্য ডিপার্ট-মেন্টের কিসে সুবিধে হবে এ-সব ভাবলে নিজের গবেষণার ক্ষতি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

নোট পেয়েই তো গড়গড়ি লাফিয়ে উঠলেন। স্যার উপদেশ দিয়েছেন একটা ঢাকনা বানাতে। অতএব আর দেরী নয়। তিনি কর্মপদ্ধতি স্থির করবার জন্য ভাবতে বসে গেলেন।

গড়গড়ি ঠিক করলেন, প্রথমেই তিনি বাঁ ও ডান হাত স্বরূপ সহকর্মী এন কে বসু এবং বি কে শীলের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষ হলে তার ভিত্তিতে একটা ড্রইং করবেন। সেই ড্রইং নিয়ে হেড-মেকানিকের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর সেটা ওয়ার্ক-শপে দেবেন এবং কাজ চলাকালীন মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবেন।

পরদিন সকালে এসেই সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলেন গড়গড়ি। ঠিক হল, সরু ব্রাস্-রড দিয়ে পিসার টাওয়ারের ডিজাইনে একটা খাঁচার মত কাঠামো বানানো হবে। বলা বাহুল্য খাঁচাটা পিসার টাওয়ারের মত হেলানো হবে না। তারপর তার ওপর এ্যালকাথিন পেপার জড়ানো হবে। সেটা ব্যালেন্সের ওপর দিয়ে পরিয়ে ঢাকা দেওয়া চলবে।

এরপর শুরু হল ড্রইং। একবার ড্রইং-এর পর তিনবার আলোচনা তারপর একবার ড্রইং। আবার ড্রইং। তারপর আবার আলোচনা, আবার ড্রইং, ইত্যাদি চলতে চলতে শেষ অবধি ড্রইং সমাপ্ত হল। তারপর সেই ড্রইং হেড-মেকানিককে বোঝানো হল। হেড-মেকানিক আবার সেটা মেকানিককে বোঝালো। সে ঠিকমত বুঝতে না পেরে গড়গড়ির কাছে এসে বুঝে গেল। ইতিমধ্যে সাড়ে চারদিন কেটে গেছে। এরপর কাজ আরম্ভ হল। গড়গড়ি এবং তাঁর দুই সহকর্মী প্রায়ই গিয়ে সুপার-ভাইস করে আসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সেই মেকানিকটি আধখানা খাঁচা হাতে ঝুলিয়ে গড়গড়ির কাছে এসে পরামর্শ নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেই খাঁচা তৈরী হল। তারপর অফিসে নোট গেল এ্যালকাথিন পেপার, ছুঁচ, সুতোর জন্য। হেড-ক্লার্ক ডিরেক্টারের কাছে জানতে চাইল, এগুলোর জন্যে কোন টেন্ডার আহ্বান করা হবে কিনা। ডিরেক্টার নির্দেশ দিলেন, এগুলো ক্যাশ্ পারচেস্ করতে। আউটডোর ক্লার্ক দৌড়ল ছুঁচ-সুতো ইত্যাদি কিনতে। বি কে শীল সেই কাঠামোর ওপর এ্যালকাথিন পেপার সেলাই করে খাঁচা বানালো। সত্যি, দেখতে হল অপূর্ব। তার ঢাকনাটা বেশ একটু লম্বা বলে, আর ব্যালেন্সটা টেবিলের ওপর বসানো বলে একটা টুলের ওপর উঠে ঢাকনাটা খুলতে বা লাগাতে হয়।
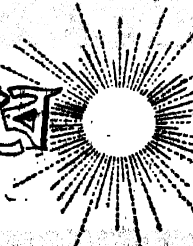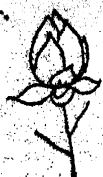
স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট্ সনাতন-বাবু চিরাচরিত প্রথায় ঢাকনার দাম কষে বার করলেন। ডক্টর গড়গড়ির তিনদিনের মাইনে, শীল আর বোসের পাঁচদিনের, এমনিভাবে সবাইকার লেবার প্লাস ছুঁচ-সুতো-এ্যালকাথিন আড়াই টাকা—মোট-মাট দাঁড়ালো এগারোশো বাহান্ন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। সাড়ে তিন হাজার টাকার ব্যালেন্সের উপযুক্ত ঢাকনা। কষ্টিং-করা কাগজটার অনেকগুলো কপি ল্যাবরেটরীময় হাতে হাতে ফিরতে লাগল।

ব্যালেন্সের ঢাকনাটা ঘিরে অধ্যাপক খাসনবিশ, ডক্টর গড়গড়ি এবং অন্যান্য কর্মীরা দাঁড়িয়েছিলেন। অধ্যাপক খাস-নবিশ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, "এমনিভাবেই আমাদের নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে—আমাদের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারীর একান্ত ইচ্ছে তাই। আমার অনেক সহ-কর্মী বন্ধু পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির উন্নতির কথা উল্লেখ করে আমাদের কাজের প্রতি কটাক্ষ করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে বাইরের সাহায্য ছাড়াই

নতুন নির্মল হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

পূর্ব-ইউরোপ নিজেদের গড়ে তুলেছেন যেমন করে আমরা এই ঢাকনাটা তৈরী করলাম।"

হঠাৎ মূর্তিমান বেরসিকের মত রাখাল ভটচাজের অকুস্থলে প্রবেশ। হাতে স্লিং-হাইগ্রোমিটার, উদ্দেশ্য হিউমিডিটি দেখা। সবাইর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বোকার মত হেসে ও এগিয়ে এসে ঢাকনাটার গায়ে আলতোভাবে হাত বোলাতে লাগল। তারপর একগাল হেসে বলল, "হুজুর এটার জন্যে তো অনেক খরচা পড়ল। শুনেছি নাকি হাজার দেড় হাজার টাকা।"

গড়গড়ি তো অবাক। "কে বলেছে তোমায়?"

"এই যে হুজুর, এই কাগজটায় সব দাম কষা রয়েছে।"

খাসনবিশ এবং গড়গড়ি ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখতে লাগলেন। বাকি সবাই চোখ-মুখের ঈষৎ কুঞ্চনে একটা যেন পুলকের তরঙ্গ সৃষ্টি করল।

"হুজুর, এটা অনেক সস্তায় হয়ে যেত।"

গড়গড়ি চোখ-মুখ লাল করে এবং খাসনবিশ গম্ভীর-উদাসীনভাবে রাখালের দিকে তাকালেন।

"হুজুর, এই ঢাকনাটা খোলা আর লাগানো বড় ঝামেলার ব্যাপার। টুলের ওপর চড়। সোজাভাবে পরাও। তার চেয়ে ঐ যে কাঁচের ঢাকনাটা রয়েছে—" ঘরের কোণটা দেখাল ভটচাজ। তিনটে ধার এবং মাথার ওপর কাঠের ফ্রেমে কাঁচ লাগানো, যন্ত্র ঢাকনারই একটা কাঁচঘর। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

"হুজুর ওর সামনের দিকটা খোলা। ওখানে এই প্ল্যাস্টিকের কাগজ দিয়ে পরদার মত টাঙিয়ে দিন। কাজের সময় পরদাটা তুলে দেবেন, কাজ হয়ে গেলে পরদা নাবিয়ে দেবেন। এতে হুজুরের এক পয়সাও খরচ পড়বে না।"

খাসনবিশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে বললেন, "হুম!" তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভটচাজের ডাক পড়ল খাস দপ্তরে।

"কি ব্যাপার বলুন তো আপনার? আগে তো আপনি এরকম ছিলেন না।"

"কি হয়েছে হুজুর?"

"আপনি অফিসের নিয়ম-কানুন ভেঙে দিনের পর দিন লেট করে অফিসে আসছেন। জানেন, সেটা কত বড় অপরাধ?"

"হুজুর, আমায় শাস্তি দিন। তা নইলে আমায় পাপের বোঝার লাঘব হবে না হুজুর।"

"শাস্তি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু কি শাস্তি আপনাকে দেব, হঠাৎ যেন অসহায়ের মত বলে ফেললেন খাসনবিশ, "আপনার তো সব ক্যাজুয়াল লীভ্ কাটা যাবে।"

বিগলিত হেসে ভটচাজ বলল, "তাহলে হুজুরে শাস্তি দিয়েও হালে পানি পাচ্ছেন না।"

ধাঁ করে রক্ত মাথায় চড়ে গেল খাসনবিশের। কঠিন কণ্ঠে বললেন, "শুনুন। শাস্তি এখনও আমার হাতে কিছু আছে। কিন্তু তাতে ভাতে মারা হয়। তাই সেগুলো ব্যবহার করা হয় না। ইনক্রিমেন্ট্ বন্ধ করে দিলে কি আপনি খুশী হন?"

"হুজুর, আমার যা অপরাধ, তাতে চাকরী থেকে না তাড়ালে আমি খুশী হব না।"

"বটে। তাহলে জেনে রাখুন, আমি কাকেও ডিসচার্জ করি না। যার যাবার ইচ্ছে সে নিজে থেকেই যায়। এ বাজারে কারোর চাকরী যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।"

পরের দিন রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল-গুলো পর পর না পাওয়ার দশটা বাজতে দশ মিনিটে ডিরেক্টারের গাড়ী ল্যাবরে-টরীর গেটে ঢুকল। খাসনবিশ বিরক্ত হচ্ছিলেন ঠিক সময়ে না আসতে পারার জন্যে। এমন সময়ে দেখলেন, রাখাল ভটচাজ দারোয়ানের পাশে বসে গল্প করছে। হৃষ্টচিত্তে খাসনবিশ ভাবলেন, এখনও ধমকে কাজ হয়। দিন কয়েক ধরে লক্ষ্য করলেন হাজিরা খাতায় রাখালের দশটায় সই।

সেদিন বেলা এগারটা নাগাদ টেস্টিং থেকে নোট এলো—ঘরের হিউমিডিটি যেখানে দু পারসেন্ট কম-বেশী হয় সেখানে তিরিশ পারসেন্ট হচ্ছে। ডিরেক্টারের যে স্পেশাল রিসার্চ স্যাম্পেল-গুলো এক পারসেন্ট হিউমিডিটি কম-বেশীর মধ্যে রাখবার কথা, সেগুলো এখানে থাকবে কিনা জানানো হোক।

খাসনবিশ লাফিয়ে উঠলেন। টেস্টিংটা বড্ড জ্বালায়। দৌড়ে এলেন ব্যাপারটা দেখবার জন্যে। খোঁজ পড়ল রাখালের। ওকে পাওয়া গেল না। খাস-নবিশ প্রথমেই হাজিরা খাতা দেখলেন। না, ঠিক দশটার সই রয়েছে ওর। গেল কোথায় লোকটা! খাসনবিশ নিচে নেমে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দারোয়ানকে দেখতে পেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন। দারোয়ান ওঁকে দিকটা দেখিয়ে দিল, সেদিকটা স্টাফ্-কোয়ার্টার। ওখানে কি করছে লোকটা! শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নাকি? দ্বিধান্বিত চিত্তে খাসনবিশ এগোলেন।

একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা কলতলা। সেখানে এক-মাত্রিক দীর্ঘদেহী রাখাল ভটচাজ এক বিঘৎ একটা গামছা পরে বালতি করে মাথায় জল ঢালছে, আর বিড় বিড় করে অশুদ্ধ সংস্কৃতের কি যেন একটা শ্লোক আবৃত্তি করছে। ডিরেক্টারকে দেখেই সেই অবস্থায় রাখালের বিরাট একটা সামরিক অভি-বাদন। খাসনবিশ আঁৎকে উঠে সরে

গামছার টেনশানটা ঠিক জানা না থাকায়।

এলেন, কোমরের ওপর গামছার টেনশানটা ঠিক জানা না থাকায়।

আধ-ঘণ্টাটাক পর ডাকতে পাঠিয়ে শুনলেন, রাখাল ভাত খাচ্ছে। ইস, এদিকে স্যাম্প্‌লগুলোর যে কি অবস্থা হচ্ছে! ঘণ্টাখানেক পর আবার ডাকতে পাঠালেন। এবারে শুনলেন, ও পান খেতে গেছে। পান চিবোতে চিবাতে ও যখন ফিরল, তখন একটা। টিফিন পিরিয়াড। এ্যাসিস্ট্যান্টদের কাউকে পাওয়া গেল না। টিফিন শেষ হল দেড়টায়। তারপর কাজ শুরু হল। অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যেই এয়ার কণ্ডিশনিং মেশিন চালু হয়ে গেল।

পরের দিন আবার মেশিনের এক অবস্থা। উদ্বিগ্নচিত্তে ডিরেক্টারের প্রতীক্ষা, কখন রাখালের চান করা থেকে পান খাওয়া অবধি শেষ হবে। নাঃ, এরকমভাবে আর গবেষণা চলে না।

সেদিন একটু বিরক্তি প্রকাশ করে জানতে চাইলেন ডিরেক্টার, মেসিনে কেন এরকম গণ্ডগোল হচ্ছে।

"হুজুর, বুড়ো রুগীকে কি আর ওষুধ দিয়ে বাঁচানো যায়। দুচারদিন একটু সুস্থ রাখা যায়।"

"বুড়ো রুগী মানে?"

"আজ্ঞে, মেসিনটার কথা বলছি হুজুর। নতুন দামে কিনলে কি হবে, ওটা যে সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ মাল, সে তো হুজুর আমার চেয়ে ভালো জানেন।"

"বটে!" খাসনবিশ ঠোঁট কামড়ালেন।

দিনকয়েক পর বেলা দুটো নাগাদ আবার মেসিনে গণ্ডগোল। সেদিন কিন্তু সারা ল্যাবরেটরী খুঁজেও রাখালকে পাওয়া গেল না। অথচ এ্যাটেণ্ডেন্স্-রেজিস্টারে সই আছে। সাড়ে চারটে অবধি ডিরেক্টার খবর রাখলেন, ও ফিরেছে কিনা। তখনও রাখাল ভটচাজ ফেরেনি।

পরদিন সকাল দশটায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই গবেষণাগারে ডিরেক্টারের প্রধান কাজ হল, রাখাল ভটচাজকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করা।

"আপনি এখানকার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন।"

"আমি হুজুরের কথামত চলি। তাতে ঐ ডিসিপ্লিন না কি যেন বলছেন—যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে আমি কি করব হুজুর!"

"আমার কথামত চলেন কি রকম?"

"আজ্ঞে আপনি বলেছেন ঠিক দশটায় আসতে আর পাঁচটায় যেতে।"

"কিন্তু কাল কি আপনি পাঁচটায় গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

খাসনবিশ তো অবাক। লোকটার সাহস তো কম নয়। জলজ্যান্ত মিথ্যেকথা বলছে।

"কাল দুটো থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আপনাকে ল্যাবরেটরীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"আমি যে তখন পান খেতে গিয়েছিলাম হুজুর। খেয়ে উঠে পান না

খেলে আমার আবার পোষায় না। তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম কালীঘাট।"

"কালীঘাট! সে তো এখান থেকে পাঁচ মাইল!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর," একগাল হেসে রাখাল বলল, "ওখানকার জর্দা" দেওয়া পান না খেলে হুজুর কাজ করতে গা লাগে না। তাইতো ফিরতে এত দেরী হল হুজুর। জানি তো আপনার মেসিন বিগড়োবে। তাই এসে মেসিন চালু করে ঠিক পাঁচটায় বেরিয়েছি। আবার আজ সকাল দুটোয় এসে হাজির হয়েছি। ঐ যে ডিসিপ্লিন না কি যেন—ওসব ভাওতা আমাদের কাছে পাবেন না হুজুর।"

"আচ্ছা আপনি এখন যান।"

ডিরেক্টারের ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী এসে গ্রেপ্তার করল।

"কি হল। ভয় দেখালে চাকরী যাবার ?"

"কই না, তেমন কিছু বললে না তো।"

"কোন রকম শাস্তি দেবার ভয় ?"

"আজ্ঞে কিছুই না।"

"কিন্তু আপনিই বা এরকম করছেন কেন," হতাশ হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চাকরী বজায় রাখতে গেলে তো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।"

"কি হবে নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করে। এখানে আমি করব কাজ। ইনাম আর ইজ্জত পাবে আমার হেড, যে কাজের কিছুই বোঝে না।"

রাখাল ভটচাজের গলায় এমন একটা তিক্ততার সুর ছিল, যাতে ওর এতদিনের পরিচয়টা ঢাকা পড়ে গেল।

এরপর থেকে রাখাল প্রায়ই কামাই করতে শুরু করল। একদিন আসে তো তিনদিন আসে না। এই সময়ে এক কমিটি মীটিং-এ পুরোনো কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট্‌টা বাতিল করে দিয়ে নতুন একটা প্ল্যান্ট কেনার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। যে কোম্পানী মেশিন বিক্রি করবে, তারাই রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাবে, এটাও স্থির হল। পুরোনো প্ল্যান্টে যে লোকগুলি কাজ করত তারা উদ্বৃত্ত হয়ে গেলেও তাদের যাতে চাকরী না যায়, তার জন্য ডিরেক্টার খুব লড়লেন কমিটিতে।

পরদিন সমস্ত উদ্বৃত্ত কর্মীদের কাছে নোটিশ গেল, তোমরা বিকল্প কাজ করতে প্রস্তুত আছ কিনা জানাও। সবাই সম্মতি জানিয়ে দিল। প্রথম বিকল্প চাকরী দেওয়া হল রাখাল ভটচাজকে—তুমি অনতিবিলম্বে কেমিস্ট্রি ডিপার্ট-মেন্টে বেয়ারার কাজে যোগ দাও। ওখানে একজন বেয়ারা ছুটিতে আছে।

ইউনিয়ান-সেক্রেটারী হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

"আপনি মামলা করুন। কিছুতেই ছাড়বেন না।"

"ওসব করবে কে ? আমার আর কতটুকু ক্ষমতা।"

"ইউনিয়ান তো আপনার পেছনে আছে। আপনি ইউনিয়ানের মেম্বার তো ?"

"না।"

"এখনও মেম্বার অবধি হন নি।" হতাশ হয়ে বললেন ভদ্রলোক।

"আজ্ঞে, এখনও তো কিছুই হতে পারিনি। শুধু ইলেকট্রিসিয়ান হতে চেয়েছিলাম। তাও পারলাম না।"

সেদিন কাজ না করে ও বাড়ী চলে গেল। আর সেইদিনই প্রথম ওকে নিয়ে ল্যাবরেটরীতে গবেষণা শুরু হল—ওর চাকরী যাবে, না ও চাকরী ছাড়বে। চাকরী না থাকলে ওর স্ত্রী-পুত্র-পরি-বারের অসুবিধে হবে কিনা। ওর স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি আছে কিনা। ও ব্যাচিলার কিনা। যদি ব্যাচিলার হয় তবে কেন ও ব্যাচিলার। ওকি লস্ট্ লাভার ? ওকে কি কোনদিন কোন মেয়ে ভালোবেসেছিল। যদি ভালোবেসে থাকে তবে কি দেখে ভালোবাসবে। অনেকদিন পর একটা ভালো বিষয়বস্তু পাওয়া গেল গবেষণায়।

পরপর দিনকয়েক ও অফিসে এলো না। শোনা গেল, ওর নামে এবার চার্জ-শীট দেওয়া হবে। ব্যস্ত হয়ে ইউনিয়ান-সেক্রেটারী অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে ছুটল ওর বাড়ী। সেখানে ওকে পাওয়া গেল না। এক বন্ধু আর তার স্ত্রীর সঙ্গে ও নাকি দুর্গাপুর গেছে। ওর বাড়ীর লোকজন কেউ আছে কিনা খোঁজ নিতে বাড়ীওলা বলল, "না মশাই, কেউ কোথাও নেই। একখানা ঘর নিয়ে একলা থাকত।

এইরকম অবস্থায় কেউ বেড়াতে যায়। কি করা যায় তাহলে ? ভাবতে ভাবতে বাড়ীটার একতলার ছোট্ট চায়ের দোকানে বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

"বাবু, চা দেব একটা ?"

"দাও।"

ছোট্ট কাঁচের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে দোকানী বলল, "বাবু কি রাখালকে খুঁজতে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। চেন নাকি ওকে ?"

"খুব চিনি। আপনি কি ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী ?"

"হ্যাঁ, কেন বল তো।"

"আপনার কথা ও বলেছে। লোকটার মাথা খারাপ বাবু। তা নইলে চাকরীর এ'রকম অবস্থায় একটা মেয়ের জন্যে কেউ অফিস কামাই করে।

"মেয়ের জন্যে ?"

"তাছাড়া আর কি বলব বলুন। এসব আপনাদের প্রেম-টেমের ব্যাপার। আমাকে বলতে নেই। তবে বলি শুনুন। যদি আপনি কিছু সুরাহা করতে পারেন।

ইউনিয়ান সেক্রেটারী পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। প্রেম-ট্রেম ঘটিত ব্যাপার নিয়ে তো ইউনিয়ানে বিশেষ চর্চা নেই। তবে যদি এক এস আর [illegible] কিছু করতে

পারে। ও নাকি ঐসব নিয়ে খুব কানাকানি-টানাটানি করে।

মেয়েটি থাকত রাখালের পাশের ঘরটায়। পরিবারটি খুব দুঃস্থ। ওদেরই স্বজাতি। মেয়েটির বয়স হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে হয়নি। মেয়েটা খুব বই পড়তে ভালোবাসত। এর ওর কাছ থেকে বই খবরের কাগজ চেয়ে-চিন্তে আনত। এই মেয়েটিকে রাখালের ইচ্ছে হল, বিয়ে করে। কিন্তু ওর সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের জন্য রাখাল কিছু বলবার সুযোগ পায়নি। চায়ের দোকানী

হরেরামের কাছে গুজগুজ করত

হরেরামের কাছে গুজগুজ করত। দু'একবার হরেরাম বলেছিল, কথাটা পাড়বে কিনা ওদের কাছে। রাখাল আঁৎকে উঠে নিষেধ করেছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা পাড়ার একটি ছোকরা মাস্টারের সাহায্যে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল। পাশও করল। তারপর ট্রেনিং পাশ করে দুর্গাপুরে এক প্রাইমারী স্কুলে চাকরী পেয়েছে। সেই মাস্টারটিও সেখানে একটা চাকরী যোগাড় করেছে। তারপর দুজনে বিয়েটা সেরে সেখানে চলে গেছে। একদিন রাখাল ওদের বিয়ের জন্য খাটা-খাটুনি করেছে অফিস কামাই করে। এবারে ওদের সঙ্গে দুর্গাপুর গেছে, ওদের ঘর-দোর গুছিয়ে দেবার জন্য। অথচ লোকটা শুধু শুধু চাকরীটা খোয়াতে বসেছে মেয়েটার জন্যে। মেয়েটা সকালে পড়তে যেত মাস্টারের বাড়ী। পাড়ার ছেলেরা বিরক্ত করত। রাখাল সকালে তাকে পৌঁছে দিতে, আবার বেলায় নিয়ে আসতে। অফিস লেট হচ্ছে হোক। পরীক্ষার আগে রাখালই দুপুরে নিজের ঘরে ওদের পড়বার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। ছেলেটাও তখন কি একটা পরীক্ষা দিচ্ছিল বলে ছুটি নিয়েছিল। আর দেখ, এখানে অফিসে যা মন দিয়ে কাজ করে। তা না দুপুরে বেলা অফিস থেকে চলে এসে দোকানে বসে থাকত। নিজের ঘরে ঢুকতে পারত না। তবুও দোকানে এসে বসে থাকা চাই।

"কতবার বলেছিলাম, রাখাল তোমারই তো স্বজাতি। বলো কথাটা পাড়ি।" হাত চেপে ধরে রাখাল বলেছে, "না ভাই। ওসব জাত নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না। আসলে আমি মিস্ত্রী আর ও একটু লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকই পছন্দ করবে।"

রেগে গিয়ে আমি বলেছি, "তুমি কি ছোটলোক? আমরা সবাই ছোটলোক?" কাঁচুমাচু হয়ে থেকেছে রাখাল; কোন উত্তর দিতে পারেনি।

দিনকয়েক পর টেস্টিং ল্যাবরেটরীর বন্ধ হয়ে যাওয়া কন্ডিশনিং মেসিনটা হঠাৎ চলতে শুরু করল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাখাল সেদিন কাজে যোগ-দান করেছে। আরও শোনা গেল সেদিনই নাকি ওকে চার্জ-শীট দেওয়া হবে, বিনা নোটিশে কামাই, ইত্যাদি আরও নানা অপরাধে।

ইউনিয়ান-সেক্রেটারী খবর পেয়েই ওকে খুঁজে বার করল। রাখাল তখন নিষ্কর্মার মত বসে বসে বিড়ি টানছিল। ও সাধারণতঃ বসে থাকে না। সেক্রে-টারীকে দেখে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

"আসুন স্যার। সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে এলাম।"

"কি রকম?"

"রেজিগ্‌নেশান লেটার দিয়ে দিয়েছি।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। ঝামেলা আর রাখলাম না।"

"কিন্তু এককথায় চাকরী ছাড়লেন কেন? মামলা করা যেত। সমস্ত স্টাফ ছিল আপনার পেছনে। আপনার তো গ্রাউন্ড্‌ ভালো ছিল। কেউ কিছু করতে পারত না।

"কি আর দরকার। কাজ একটা ঠিক জুটেই যাবে। যাই বলুন স্যার, ডিরেক্টার কথা রেখেছে। বলেছিল বটে, আমি চাকরী থেকে কা'কেও ছাড়াই না। কেউ ইচ্ছে করলে ছেড়ে যেতে পারে।"

"অন্য কোথাও কাজকর্মের চেষ্টা করছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। ভাবছি দুর্গাপুরে যাব।"

"সেখানে কেন?"

"ওখানে কাজকর্ম পাওয়ার সুবিধে আছে। তাছাড়া জায়গাটা স্যার বেশ ভালো লাগল।

সম্পাদক, 'অমৃত',

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় অহিভূষণ মিত্র দুটি প্রশ্ন করেছেন 'জানাতে পারেন' বিভাগে।

প্রথম প্রশ্নটি 'বিপজ্জ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রংয়ের ব্যবহার হয় কেন? কত দিন হইতে ইহার শুরু হইয়াছে?'

বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রংয়ের ব্যবহার হয় বহুবিধ কারণে। বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই কারণটি স্পষ্ট হবে। যেমন সাদার মধ্যে আছে একটি শুচি শুভ্র ভাব, কিছুটা বা রিক্ততাও। সবুজের মধ্যে আছে স্নিগ্ধতা ও নবীনত্ব। নীলের মধ্যে আছে রোমান্টিক স্বপ্নিলতা, গৈরিকের মধ্যে বৈরাগ্য। কিন্তু লালের মধ্যে আছে ভয়ংকরের সূচনা।

দ্বিতীয়ত, সমাজের বিধান যখন সুশৃংখলিত হয়নি, স্বেচ্ছাচার যখন কলংকিত করেছে সমাজের প্রতিটি নারীকে—তখনও স্বীয়াকে চিহ্নিত করবার জন্য পুরুষ ব্যবহার করেছে এই লাল রঙই। তারই বর্তমান বিবর্তিত রূপ সিঁদুর। বহু অলিখিত নির্দেশ ও অনুশাসনের ইঙ্গিতবহ এই সিঁদুর। সিঁদুরের রঙও লাল। বিবাহিতা রমণীর সিঁদুর বিন্দুর অর্থ আশা করি কারুর কাছেই অস্পষ্ট নয়।

এ ছাড়া অন্যান্য রঙের চেয়ে লাল রঙ স্পষ্টতর। বহু দূর থেকেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটি বর্ণান্ধ ছেলেকে জানি যে কোনও রঙই প্রায় বুঝতে পারে না। কিন্তু লাল রঙ পারে। এমন কি রাতেও ক্যামেরার 'রেডটি' চিনে নিতে তার অসুবিধা হয় না।

শেষতঃ রক্তের রঙ লাল। আর রক্তের সঙ্গে লাল রক্তের কোথায় যেন সাযুজ্য আছে। তাই রক্তের রঙের মত লাল রঙও আমাদের মনে কিছুটা বিভীষিকা, কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার করে।

এই সমস্ত কারণেই বিপজ্জ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রঙ অনিবার্য এবং এর ব্যবহার শুরু হয় বহু দিন থেকেই।

ছেলেবেলায় পাঠশালায় শেখানো হইত : ১এ চন্দ্র, ২এ পক্ষ ইত্যাদি। ইহার 'তিন নেত্র' ও 'পঞ্চ বাণ' কি কি?

—মহাদেবের ত্রিনয়নকে 'তিন নেত্র' বলে। এবং পঞ্চবাণ—মদনদেবের পাঁচটি কুসুমশরই, পুষ্পধনুধারী প্রণয়ের দেবতা স্বয়ং মদনকেই পঞ্চশররূপে অভিহিত করা হয়। পঞ্চশর দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী......
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

—(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীকৃষ্ণকুমার দে, কোলকাতা—৯।

সম্পাদক অমৃত,

বিগত ৫ই অক্টোবর তারিখের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমৃন্ময় রায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

রাজার ভার্যা বা স্ত্রী হইলেই যদি রাণী হয়, তবে এই আক্ষরিক অর্থে রাজা দশরথের অনেক রাণী ছিলেন বলিয়া রামায়ণে দেখা যায়। তবে তাঁহার মহিষী ছিলেন মাত্র ৩ জন। এই তিন মহিষী ছাড়া রাণীর সংখ্যা ছিল সার্ধশতত্রয় বা ৭৫০ (অযোধ্যা কাণ্ড—বঙ্গবাসী সংস্করণ—৩৪ সর্গ)। প্রথমা মহিষী রাম-মাতা কৌশল্যা সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই। দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া সম্পর্কেই রামায়ণে সামান্য একটু গোলমাল দেখা যায়। অযোধ্যা কাণ্ডের ৯২ সর্গে ভরত ভরদ্বাজ ঋষিকে বলিতেছেন যে, সুমিত্রা রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী, আবার অরণ্য-কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায়, স্বয়ং রামই বলিতেছেন যে, কৈকেয়ী তাঁহার মধ্যমা জননী। এই সামান্য অসঙ্গতিটুকু ছাড়া রামায়ণের আর সর্বত্রই লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-মাতা সুমিত্রা দেবীকে মহিষীর ক্রম বা পর্যায়ের দ্বিতীয়বার স্থান দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায় (যেমন অযোধ্যা কাণ্ড ৮৯ ও ৯২ সর্গ, লঙ্কা কাণ্ড—১২৯ ও ১৩০ সর্গ ইত্যাদি)। অযোধ্যা কাণ্ড ১০ম সর্গে ভরত-মাতা কৈকেয়ীকে রাজা দশরথের তরুণী এবং প্রিয়তমা ভার্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং কৈকেয়ী যে মহিষীদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর দুই মহিষীর মত সুমিত্রা রাজ-কন্যা ছিলেন না। রাজা দশরথেরই কোন এক [illegible] সচিবের কন্যা ছিলেন এবং সেইজন্য কৃশাঙ্গী ছিলেন বলিয়া জানা দেখা যায়।

ঐ তারিখেরই 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীকৃপাপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, গুরুতর কোন সামাজিক বা অন্য অপরাধে অপরাধীকে চূড়ান্তভাবে অপমান বা এলাকা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য গর্দভে চড়াইয়া রাজপথ প্রদক্ষিণ বা জনসমক্ষে অসম্মানসূচক ভাবে বা নগর প্রদক্ষিণ করান হইত। শাস্তি হিসাবে মুখে চুনকালী লেপিয়া রাস্তা বা নগর প্রদক্ষিণ করাইবার আর একটি প্রক্রিয়াও এই সঙ্গে প্রচলিত ছিল দেখা যায়। হাতের কাছে গাধা পাওয়া গেলে দোষীকে মুণ্ডিত বা চুনকালী প্রলিপ্ত অবস্থায় গাধার পিঠে উল্টা দিকে মুখ করিয়াও চড়ান হইত। সামাজিক সাজা হিসাবে এই দুইটি পন্থাই এখন পর্যন্ত কিছুটা বজায় আছে দেখিতে পাই।

অনেকের মনে হয়, শাস্তির মাত্রা চূড়ান্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই দুইটি প্রক্রিয়াকে কালে একীভূত করা হয় এবং মস্তকমুণ্ডন ও চুন মাখান এক সংগে চালান হয়। চুন গুলিয়া অপরাধীর নেড়া করা মাথায় ঢালিয়া দিলে শাস্তি ও অপমানের মাত্রা আরও চূড়ান্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অপরাধীর চক্ষু নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে বলিয়াই হয়ত গোলা চুনের বিকল্প হিসাবে একই রং বিশিষ্ট খোলের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। ইহাতে শাদা রং বিশিষ্ট গোলা চুনের কাজও হইল, অথচ অপরাধীর চক্ষুও নষ্ট হইল না। খোল প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক কারণ হয়ত ইহাই।

—শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
কলিকাতা—৯।

(প্রশ্ন)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের মাধ্যমে দু-একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই, সমাধান পাবার আশায়।

(ক) জাদুকরেরা যে সব খেলা দেখান, সেই সব অদ্ভুত এবং অপূর্ব 'জাদু বিদ্যায়' জাদু অর্থাৎ মন্ত্র বর্তমান না সেগুলি শুধু বিভিন্ন জটিল কৌশলেরই অভূতপূর্ব প্রয়োগ?

(খ) ছেলেবেলায় যা মন্ত্রশক্তি বলে মনে করতাম বড় হয়ে দেখছি তা মন্ত্রশক্তি নয়, শুধু মাত্র ট্রিক, তবে কি মন্ত্রশক্তি বলে কিছু নেই, যা আজ মন্ত্রশক্তি বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল সেটাই হয়ত বিজ্ঞানের কৌশল বলে প্রমাণিত হবে।

(গ) শুনেছি, সাধক মহাত্মাদের শিষ্যরা নিজে অলৌকিক শক্তি দিয়াছে। ইহা কিভাবে সম্ভব হয়েছে?

ইতি—
সমীরকুমার বিশ্বাস,
[illegible]।

প্যারিস, অক্টোবর—গ্রীষ্মের ছুটী অনেক কাল পূর্বেই শেষ হয়েছে। গ্রীষ্মও বিদায় নিয়েছেন ছুটীর শেষে। প্যারিসিয়ানরা আবার জড়ো হয়েছে প্যারিসে। সবাই কাজে ব্যস্ত। ইস্কুলের ছাত্ররা নতুন বই সংগ্রহ করে সুবোধ বালকের মত গুরুমহাশয়ের পাঠ মনে করছে বিদ্যালয়ে। সরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে ১৫ই অক্টোবর। কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের পাঠ নেওয়া শুরু করবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কিন্তু যারা বিগত জুন মাসের পরীক্ষায় ফেল করেছে তারা পুনরায় পরীক্ষা দিচ্ছে অক্টোবর মাস ধরে। এদের পরীক্ষা শুধু লিখে নয়। লিখে পাশ করলে আবার মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হয়। সে এক হাঙ্গামা। ছাত্ররা বলে পরীক্ষার হাঙ্গামা না থাকলেই ভাল। মৌখিক পরীক্ষা নয় যেন আদালতে বিচার।

কর্মব্যস্ত প্যারিসিয়ানরা। প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেছে। তার সাথে সাহিত্য পুরস্কারের বায়না। শিল্প-সংস্কৃতি ছেড়ে দিলে আছে রাজনীতি। অক্টোবরের শেষে হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গণ-ভোট। তারপর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ নির্বাচন। একটির পর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা লেগেই আছে। কারুর বিশ্রাম নেই। প্যারিস নগরী এখন কর্মচঞ্চল। তার নেই ক্লান্তি।

নগরবাসি-কোলাহলের মাঝে যে যেমন কর্মব্যস্ত। চির যৌবনা প্রকৃতি দেবী। তিনিও বিশ্রাম-বাহিনী সাজ বদল চলেছেন। তাঁর তুলির আঁচড়ে প্যারিসের বুলভার-এভিন্যুর ধারে বাগিচার পাতায় পাতায় সবুজের ওপর সোনালি রঙের ছোপ। কোথাও দেখি সোনালি বা লাল রঙের পাতাগুলো পথের ধারে স্তূপীকৃত। গাছের ঝরা পাতা জানান দিচ্ছে এটা হেমন্ত কাল। ঠাণ্ডা পড়া শুরু হয়েছে। শীত আসতে এখনও দেরী। সবে ঠাণ্ডা। মানে ওভার-কোট চাপাতে হচ্ছে। অবশ্য হাল্কা। গলায় পশমী চাদর আর হাতে দস্তানা আঁটতে হচ্ছে না এখনও। অল্প অল্প ঝির-ঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে না যদিও। তবে বেশ ঠাণ্ডা। এই হল প্যারিসের হেমন্ত কালের রূপ।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে না ছিল চাঞ্চল্য, না ছিল জীবন। হেমন্তের ছোঁয়ায় প্যারিস নগরী আবার জেগে উঠেছে। চারধারে তাই কোলাহল। প্রদর্শনী বা মেলার সেরা হল মোটর গাড়ীর বাৎসরিক মেলা। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন মোটরগাড়ি আর বিলাসিতার দ্রব্য নয়। আমাদের দেশে মোটরগাড়ি যাঁর আছে তিনি একজন কেষ্ট-বিষ্টু। মোটরগাড়ি কেনা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু এখানে আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, গ্রামের কৃষকও বাজারে যায় তার নিজস্ব মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে। এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস হবার উপায় নেই। এ হেন যান্ত্রিক বাহন সম্পর্কে ঔৎসুক্য যেমন আছে তেমনি কৌতূহল। আমাদের দেশে মোটর না থাকার জন্যে অনেকে খেদ করে। মোটরের অভাবে ট্রামে-বাসে চড়ে। কিন্তু প্যারিসে রাস্তায় শুধু গাড়ি। গাড়ির ভিড়ে মোটর চালান বাধ্য-বাধকতার ব্যাপার। তাই মোটরগাড়ির মালিকরা আজকাল মোটরগাড়ির বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্যে ট্রামে-বাসে চড়ছে। আমাদের দেশে গাড়ি না থাকাটা লজ্জানির। কিন্তু এদের গাড়ি এত আছে যে তারা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। মোটরগাড়ি এদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী তাই প্রতি বছরে বসে এই অক্টোবর মাসে মোটরগাড়ির প্রদর্শনী। এবার মোটরগাড়ির মেলা বসেছিল প্যারিসের বিখ্যাত প্রদর্শনী ক্ষেত্র পোর্ত দ্য ভার্সাই-এর প্রাঙ্গণে। মেলার ক্ষেত্র ছিল দেড় মাইলের মতন। দশ দিনে প্রায় সাত লক্ষ দর্শক ভিড় করেছিল। শুধুই কি মোটরগাড়ি। সাইকেল থেকে আরম্ভ করে স্কুটার, লরী-ট্রাক তো ছিলই। তার ওপর যে কটি সেরা মোটরগাড়ি নির্মাণ করে তাদের অতি-আধুনিক মোটরগাড়ির প্রদর্শনী চলে দশ দিন ধরে। মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত হয় যত রকমের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সবই দেখান হয়েছে ঐ মেলায়। প্যারিসে মোটরগাড়ির মেলা সত্যি দেখবার মতন।

সব দেশেই আজকাল মোটরগাড়ির ব্যবসায় মন্দা চলছে। ১৯৬০ সালে বিশ্বে মোটরগাড়ি নির্মিত হয়েছে এক কোটি বাট লক্ষ আর ১৯৬১ সালে নির্মাণের সংখ্যা হয় এক কোটি উনপঞ্চাশ লাখ। বিশ্বে যে-সব দেশ মোটরগাড়ি নির্মাণ করে তাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১ সালে ছেষট্টি লাখ আর সমগ্র ইউরোপ নির্মাণ করে আটান্ন লাখ। ১৯৬১ সালে পশ্চিম জার্মানী নির্মাণ করে একুশ লাখ মোটরগাড়ি, বৃটেন ষোল লাখ, ফ্রান্স বার লাখ, জাপান আট লাখ এবং ইতালি সাত লাখ। ১৯৬১ সালের শেষে জগতে মোট গাড়ির সংখ্যা ছিল তের কোটি বাহাত্তর লক্ষ বিশ হাজার। তার মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল সাত কোটি আটান্ন লাখ। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মোটরগাড়ির সংখ্যার অর্ধেক। পশ্চিম ইউরোপে প্রায় তিন কোটি বিশ লাখ। ফ্রান্সের মোটরগাড়ির মোট সংখ্যা বর্তমানে সত্তর লাখ।

বসন্তের আমেজ আর পরিষ্কার সকালের সুদীর্ঘ মায়ায় ঝলকানি দেখলেই প্যারিসের আর্টিস্টরা ছোটেন গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতি দেবীর শোভা দর্শনে। যখন ঠাণ্ডা পড়া শুরু হয় তখন তারা প্যারিসে এসে জড়ো হন। তারা এলেই শুরু হয়

তিন মুখো গাড়ী দেখতে খারাপ হলেও এতে চড়ে আরাম

প্যারিসে আর্টিস্ট পাড়ায় আর্ট গ্যালারিতে সোরগোল। অক্টোবরে চাই শুরু চিত্র-প্রদর্শনীর। হেমন্ত কালে প্যারিসে সেরা চিত্র-প্রদর্শনী হল বিশালাকায় 'গ্রাঁ পালে'র একটি অংশে 'স্যালোঁ দোতন' (হেমন্তের প্রদর্শনী)। এ-বছরে পালিত হচ্ছে ষাট বছরের স্যালোঁ দোতন। সালোঁ দোতনের বৈশিষ্ট্য হল এর বিরাট আকার ও অসংখ্য চিত্রপট। সাধারণতঃ প্যারিসের অন্যান্য চিত্র-প্রদর্শনীতে কয়েকটি বাছাইকরা চিত্র দেখান হয়। বেশী নয়। কিন্তু সালোঁ দোতনে তার ব্যতিক্রম। তার কারণ হল এই যে, সালোঁ দোতনে অনেক অজ্ঞাতনামা এমন কি ছাত্রদের আঁকা ছবিও প্রদর্শিত হয়। আজ যাঁরা চিত্রকর হিসেবে বিখ্যাত তাদের অনেকের আঁকা ছবি এককালে এই সালোঁ দোতনে প্রদর্শিত হয়েছে। সেকালে হয়ত তারা ছিলেন না বিখ্যাত। তবে সালোঁ দোতনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অজ্ঞাত-নামা চিত্রকরের আঁকা ছবির পাশে অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবিও দেখান হয়ে থাকে। সালোঁ দোতনের প্রদর্শনী এক ঘন্টায় দেখে শেষ করার মতন নয়। কয়েক ঘন্টা লাগে। এটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। দেশ-বিদেশের চিত্রকরদের আঁকা চিত্রপট সমৃদ্ধ। তেমনি এতে দেওয়া হয় অসংখ্য পুরস্কার।

অক্টোবর মাসে আরেকটি বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনী [illegible] বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি শারপানতিয়ের এক দোকানে। গ্যালারি শারপানতিয়েরে চলেছে 'একোল দ্য পারী'র চিত্র-প্রদর্শনী। এখানে দেখান হয় একমাত্র পাত্র চিত্রপট। এটির নাম 'একোল দ্য পারী' কিন্তু শুধু প্যারিস বা ফরাসী শিল্পীদের একচেটিয়া নয়। দেশ-বিদেশের অগণিত শিল্পীর আঁকা চিত্রপট স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এমন কি বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর রাজার একটি চিত্রপট। শিল্পী রাজা বম্বের লোক। তিনি প্রায় বছর পনের ধরে প্যারিসের অধিবাসী। ইনি সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী।

কলকাতার তরুণ শিল্পী শ্রীসুনীল দাসের প্রদর্শনী চলেছে দুই সপ্তাহ ধরে মোপারনাসে 'কোইরেস দেজ আর্তিস্ত' গ্যালারিতে। সুনীল দাস তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি বদলেছেন। ইনি এখন এ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকছেন। সুনীল দাস ভবিষ্যতের আশা রাখেন।

মনে করবেন না যে এই কটি মাত্র চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিসে। প্যারিসে আর্ট গ্যালারির সংখ্যা কয়েক শত। তাছাড়া আর্ট মিউজিয়মের সংখ্যা হল আশিটি। এসব মিলে প্রদর্শনীর সংখ্যা কত হতে পারে তা অনায়াসে অনুমেয়। উপরে যেকটির কথা বললাম সে কটি শুধু বিখ্যাত নয়, তারা বিশ্ববিখ্যাত। তাদের জোড়া নেই।

বইয়ের দোকানে দোকানে [illegible] সাজান হচ্ছে নতুন নতুন বই দিয়ে। সংবাদপত্রে, সাময়িকীতে ও [illegible] দেখা যাচ্ছে নতুন বই-এর বিজ্ঞাপন। সাহিত্য-পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতারা এখন ব্যস্ত। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ফরাসী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোঁকুর', 'রোনাদো' ও 'ফেমিনা' পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে এখন। বিচারকেরা যেমন উপন্যাস পাঠ করে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন তখনি সংবাদপত্রের সমালোচকরা দিচ্ছেন তাঁদের রায়। উপরন্তু প্রতিটি প্রকাশক বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার করছে তাঁদের কোন উপন্যাস কি পুরস্কার পাবার যোগ্য ইত্যাদি। নভেম্বর মাসে ফ্রান্সে সাহিত্যের পুরস্কার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে পড়ে যায় সোরগোল। সে দেখবার মতন।

কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকার ইতিমধ্যে সমালোচকেরা তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। তাদের মতে এ-বছরের গোঁকুর পুরস্কার লাভ করবে ম' অঁরি-ফ্রাঁসোয়া রে-এর উপন্যাস 'লে পিয়ানো মেকানিক', মঃ জেরার দ্যুতেও-র উপন্যাস 'লা পর্তে অঁসম্বল', মঃ জ' মতোরিয়ের উপন্যাস 'কম্ অন এ্যাভার্স দ্য কো', এই তিনটি উপন্যাসের একটি। নইলে অন্য দুটো পুরস্কার তো পাবেই।

ইতিমধ্যে কিছু সাহিত্য পুরস্কারের ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে ফরাসী সাহিত্য আকা-দেমির বাৎসরিক উৎসব। [illegible] নতুন আকাদেমীশিয়ানদের [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বত্রিশ ।।

ডাক্তার সৌম্যেন ঘটক ঘরে ঢুকে শব্দ করে ব্যাগটা রাখলেন টেবিলের ওপর। ডাকলেন, রাণীদি!

রাণী কতকগুলো ওষুধ কোম্পানীর ক্যাশ মেমো নিয়ে হিসেব তৈরি করছিল। চোখ না তুলেই জানতে চাইল, কী হল?

—তুমি মাসে মাসে যে সম্মান-দক্ষিণা আমাকে দিয়ে থাকো, তা থেকে গোটা পঞ্চাশেক আজ আগাম দিতে হবে।

রাণী কলমটা নামিয়ে রেখে আশ্চর্য হয়ে তাকালো ডাক্তারের দিকে।

—এটা তো নতুন ঠেকছে। এর আগে তো আপনাকে কোনোদিন টাকা চাইতে শুনিনি।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন : ঠিক কথা। তুমি শ্রদ্ধা করে প্রণামী দিতে, আমি কৃপা করে গ্রহণ করতুম। কিন্তু দিদি, আজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মানে, আজ আমিই কৃপার পাত্র।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের লাইন একটু ঘুরিয়ে বলি। 'দিবসে যে ধন পেয়েছিনু, তারে হারানু নিশীথ রাতে।'

—মানে?—রাণী আরো আশ্চর্য হয়ে বলল : কিছু তো বুঝতে পারলুম না।

ডাক্তার বললেন, শুনেছি আবেগ এলে কবিতা বেরিয়ে আসে। আপাতত আমি যন্ত্রমতো ইমোশন্যাল।

—ইমোশনের হেতু?

—ওই কবিতার লাইনটার মধ্যেই আছে। ধাঁধার মতো ঠেকছে তো? ভেবে-চিন্তে তুমি উত্তরটা বের করো আর তার মধ্যে আমি একবার তোমার হাসপাতাল চক্কর দিয়ে আসি। আর ধাঁধার জবাব যদি খুঁজে পাও, তা হলে টাকাটা যে কেন চাই তা-ও বুঝতে পারবে।

হেসে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন, এগোলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। মিনিটখানেক অন্যমনস্ক ভাবে বসে থেকে রাণী আবার হিসেবের ভেতরে তলিয়ে গেল।

দোতলায় অন্য পেশেন্টদের খোঁজ-খবর নিতে ডাক্তারের মিনিট চল্লিশেক কাটল। তারপর এসে দাঁড়ালেন দীপ্তির ঘরের সামনে।

বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় দীপ্তি একটা সিনেমা-পত্রিকার পাতা উলটে চলেছিল। এ আর এক জীবন। সামনের পাতা-জোড়া ছবিতে যে বিখ্যাত ফিল্ম-স্টারটি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে, দীপ্তি জানে সে মেয়েটি তার চাইতে সুন্দরী নয়। অথচ কত নাম—কত টাকা! দীপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল।

চৌরঙ্গীর সেই হোটেলে কিছুদিন এক মুগ্ধ ভক্ত জুটেছিল তার। বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে, অল্প একটু নেশা হলেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলত। আর রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে মুছতে বলত, তুম্ ফিল্‌ম্ লাইনমে চলো, বৈজয়ন্থীমালা, সায়রা, সাধনা—সব ঘায়েল হো জায়েগা।

দীপ্তি বলেছিল, বেশ তো, আমাকে ঢুকিয়ে দাও না ফিল্‌মে।

অল্প বয়েসী ছেলেটি তার দেবীকে নিয়ে তিন-চারদিন ঘোরাঘুরি করেছিল নানা প্রডিউসার-ডিরেক্টারের দরজায়। সবাই ফেরৎ দিয়েছিল। জবাব দিয়েছিল, দীপ্তির চেহারা ভালো হলেও ক্যামেরায় ঠিক আসবে না, ফিল্ম-ফেস্ নেই, অসহ্য বাঙালে উচ্চারণ, আর ওপর দীপ্তির অভিনয়ে কোনো ন্যাক্ নেই। চলবে না।

রাতের পর রাত যাকে অভিনয় করে যেতে হয়, সে অভিনয় করতে পারে না! আশ্চর্য!

ছেলেটি চটে বলেছিল, ই লোগ্ কেয়া সমজেগা? চলো রায় কো পাস্!

কিন্তু রায়কে পাওয়া গেল না, তিনি তখন ইয়োরোপে। ছেলেটি বললে, বহুৎ আচ্ছা, ম্যায় তুমকো বম্বই লে জাউঙ্গা।

বোম্বাই আর যাওয়া হল না। ছেলে-টির বাপ বড়োবাজারের একটি এঁদো ঘ'র বসে চারটি টেলিফোন পাশে নিয়ে সারা ভারতবর্ষের শেয়ার বাজারের হিসেব নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলের দিকেও তাঁর নজর ছিল। বয়েস কম, কিছুদিন টাকা ওড়াচ্ছে ওড়াক, কিন্ত রাশ টানতে হয় এক সময়, বলতে হয়, বাস্ করো। কাজেই বোম্বাই যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হতেই ছেলেকে তিনি হায়দ্রাবাদে চালান করে দিলেন। দীপ্তি আর ফিল্ম-স্টার হতে পারল না।

সত্যিই কি সে পারত না? একটু-খানি হাসি, দু ফোঁটা চোখের জল,

সাজিয়ে দুটো কথা বলা। এ তো তার প্রতিদিনের কাজ, ফাঁকা হাসি, মিথ্যে কান্না আর সাজানো কথা দিয়েই তো তার প্রত্যেকটা সন্ধ্যাকে ভরে তুলতে হয়। তবু দীপ্তিকে কেউ সুযোগ দিল না। তাকে শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যেতে হল, নবদ্বীপের এই নার্সিং হোমে এসে হারিয়ে যেতে হল চিরকালের মতো। আজকে গালের ওপর দুটো বীভৎস ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে রূপের বেসাতিতেও সে অর্ধেক বাতিল—ফিল্মের মরীচিকা অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে এখন।

পত্রিকাটা বন্ধ করল দীপ্তি। চোখের সামনে সব আবছা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো দু মাস, হয়তো তিন মাস। তারপর আবার তাকে সেই পুরোনো জীবনের ভেতরে ফিরে যেতে হবে। আবার তেমনি করে আশ্চর্য নেশা আর অসহ্য গ্লানির মধ্যে বেঁচে থাকা। একটা মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকবে, 'তোমাকে বিয়ে করব, পাটরাণী করে রাখব।' পায়ের তলায় কেউ উপুড় হয়ে পড়বে—রেল-লাইনের ধারে কাটা-পড়া কুকুরকে যেমন শকুনে ছিঁড়ে খায়, তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ। কখনো পুলিশ এসে রেইড্ করবে আর পেছনের স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে একটা বোবা গলির মধ্যে পালাতে

পালাতে গুণ্ডাও তাকে দয়া করে ছেড়ে দেবে, বলবে, 'আরে যানে দো, উ তো কসবী হ্যায়!'

চোর-ডাকাত-গুণ্ডারাও তাকে নিজের লোক বলে চিনে নিয়েছে। কাকের মাংস কাক খায় না!

হাসপাতালের সেই মেয়েটি—কী নাম যেন! কল্পনা।

কল্পনা বলেছিল, বিয়ে করে ফেলুন ভাই, এত রূপ নিয়ে—

বিয়ে! আশ্রয়, সংসার, স্বামী। উদ্বাস্তু কলোনীর সেই মেয়েটি। দাওয়া নিকোচ্ছিল, সারা গায়ে তার অদ্ভুত একটা মাটির গন্ধ। কলার পাতায় বাতাস শব্দ করছিল, উড়ে যাচ্ছিল সজনের ফুল। মেয়েটির হাতে শাঁখা ছিল আর দুগাছা কাচের চুড়ি। কপালের সিঁদুর যেন তার মুখের হাসির আলোয় আরো বেশি জ্বলজ্বল করছিল।

এক বাটি মুড়ি এনে দিয়েছিল, এক টুকরো গুড়।

সিনেমার মায়াপুরী সরে রইল অনেক দূরে, যেখানে নিকোনো-দাওয়া থেকে ভিজে মাটির গন্ধ আসে আর বাতাসে সজনে ফুল উড়ে যায়, সেও রইল আর এক রূপকথা হয়ে। এখন সারা শরীরে নিজের লজ্জার ভার। সে ভার নেমে গেলে আবার—

কোথাও পালানো যায় না? বাইরে বাতাস গরম হয়ে উঠেছে—গা জ্বালা করছে। দীপ্তি একটা অন্ধকারকে ভাবতে চেষ্টা করল। যে অন্ধকারে আকাশ দেখা যায় না, তারা দেখা যায় না, নিজেকে দেখা যায় না। সেই অন্ধকারে, জমাট পাঁকের মতো খানিক নরম আর ঠান্ডা আশ্রয়ের ভেতরে ডুবে থাকতে পারলে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস সেখানে তলিয়ে থাকতে পারলে—সব জ্বালা তার জুড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে অন্ধকার—সেই নরম ঠান্ডা একটা আশ্রয় কলকাতায় কোথাও নেই—এই নবদ্বীপেও নয়।

যদি কোথাও থাকে—

থাকলেই কি পালাতে পারে দীপ্তি? সেই সজনে গাছের তলায়, শুধু শাঁখা আর দুগাছা করে কাচের চুড়ি পরেই কি সে খুশি হয়ে উঠতে পারে? অনেকগুলো নিয়নের আলোজ্বলা ঘরে, পিয়ানো-অ্যাকর্ডিয়নের বাজনার তালে তালে রক্ত যে ডাক শোনে, কোনো অন্ধকার—কোনো শীতল বিশ্রাম কি নেবাতে পারে তাকে? নিজের কাছ থেকে কি সত্যিই পালাতে পারে সে?

—আসতে পারি?—গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করলেন ডাক্তার। দোরগোড়ায় মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর তাঁর মনে হয়েছে, তিনি পাঁচ ঘণ্টা এভাবে অপেক্ষা করলেও দীপ্তি তাঁকে দেখতে পাবে না।

দীপ্তি সোজা হয়ে উঠে বসল বিছানায়। গায়ের কাপড় এলোমেলো হ'য়ে ছিল, গুছিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ। বললে, আসুন—আসুন।

ডাক্তার ঢুকলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। ডাক্তারের দি'ক তাকিয়ে দীপ্তির বুকের মধ্যে দুলে উঠল একবার—এই মানুষটা একেবারে নতুন ধরনের। রাণীকে ঠিকই ব'লেছিল সে—ডাক্তারের মতো কাউকে এর আগে কোনো-দিন তার চোখে পড়েনি।

ডাক্তার বললেন, খবর কী?

—নতুন কোনো খবর নেই।

—শরীর?

—চলছে এক রকম।

—ডাক্তারের কিছু করবার নেই?

দীপ্তি হাসতে চেষ্টা করল: আপাতত কিছু দেখছি না।

ডাক্তার একটু চুপ করে রইলেন। পকেট হাতড়ে আবার বের করলেন সেই পোড়া চুরুট। ধীরে-সুস্থে দেশলাই জেলে ধরালেন সেটাকে। কড়া তামাকের ধোঁয়ার খানিক বিস্বাদ গন্ধে ভরে উঠল ঘরটা।

ডাক্তার বললেন, রাত-দিন এমনি করে বসে থাকেন নাকি?

দীপ্তি জবাব দিল না।

ডাক্তারের মুখে পেশাদারী গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল: একটু চলাফেরা করবেন—যে-ভাবে বলেছি, তেমনিভাবে এক্সার-সাইজ্ করবেন মধ্যে মধ্যে। নইলে—

—কী হবে?

সৌম্যেন ঘটকের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল, ঠোঁটের উদ্দেশ্যে চুরুটটা তুলেছিলেন, মাঝপথে থেমে দাঁড়ালো সেটা। বললেন, আপনার এর পরের কথাগুলোও আমি জানি। আপনি বলবেন, আমার ও-সবে দরকার নেই, এখন মরলেই আমি বাঁচি। ও-সব ট্র্যাডিশন্যাল

ননসেন্স্ ছাড়ুন। মা হতে চলেছেন, ট্রাই টু কীপ ইয়োরসেল্ফ্ ফিট্।

—মেয়ে হলে আর আমার অবস্থায় পড়লে—দীপ্তির স্বর হঠাৎ ধারালো হয়ে উঠল : বুঝতে পারতেন। তখন আর এত সহজে এসব উপদেশ আপনার মুখে আসত না।

বলেই খারাপ লাগল। বিশ্রী রকমের রূঢ় শোনালো নিজের কাছেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার। ছোট ঘরটুকুর ভেতরেই পায়চারি করলেন কয়েক বার। চুরুটটা নিবে গেল, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—ঠিক।—নিজের সঙ্গেই যেন কথা কইলেন ডাক্তার : ঠিক। মেয়েদের ট্র্যাজেডী সম্পূর্ণ বুঝতে পারা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু মানুষের সম্পর্কে কয়েকটা সহজ কথা বলা যায় তো। দেখুন, ডাক্তারী পড়তে গিয়ে এই শিক্ষাটাই গোড়াতে পেতে হয়েছে যে, জীবনটা অত্যন্ত দামি। রোগটা যত ভয়ংকর হোক, যতই সাংঘাতিক হোক ক্ষতটা আমরা আশা করি সারিয়ে তুলব। শুধু তাই নয়, প্রাণপণ চেষ্টাও করতে হয় সেজন্যে।

—আমি আপনাদের আশা-চেষ্টার বাইরে।

—ট্র্যাশ—রোমান্টিক্ ট্র্যাশ—জ্বলজ্বল করে উঠল ডাক্তারের চোখ : এই কথাগুলো শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, যেন থিয়েটারের মতো মনে হ'তে থাকে। কী এমনটা হয়েছে আপনার যে বৈরাগ্য-শতক আওড়াচ্ছেন বসে বসে? কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছেন? সোস্যালি ব্যাপারটার একটা নোংরা চেহারা আছে—অ্যাড্মিটেড। যদি বলেন সাংঘাতিক একটা ভুল করেছি, তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যে যুগ, যে ইকনমি, যে গ্যাংগ্রীনের মধ্যে আমরা বাস করছি, তাতে আপনার কিসের লজ্জা? কোনো অন্যায় যদি আপনার হয়েই থাকে, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে সমাজ—আপনি নন।

এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটে উঠল দীপ্তির ঠোঁটে। ডাক্তার বক্তৃতা দিচ্ছেন। অন্য সময় হলে শুনতেও মন্দ লাগত না। কিন্তু পৃথিবীটা মাতৃসদনের এই ঘরটুকুই নয়, সমস্ত মানুষ ডাক্তার সৌমেন ঘটকের বক্তৃতা শুনে হাততালি দেবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে নেই।

ডাক্তার বললেন, জবাব দিচ্ছেন না?

—শুনেছি।

—যা বলেছি তাই করবেন। চলাফেরা, যেমন ডিরেকশন দিয়েছি তেমনি লাইট এক্সারসাইজ—আর মনটাকে খুব ভালো রাখা—ডাক্তার ঘুরে এসে চেয়ারে বসলেন। বললেন, বেড়াতে যাবেন?

দীপ্তি চমকে উঠল : কোথায়?

—এই নবদ্বীপেই। জায়গাটাকে যা ভাবছেন তা নয়। ইতিহাস জানেন তো এর? এখানেই লক্ষ্মণ সেনের শেষ, চৈতন্যের আবির্ভাব এদেশে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধন-পীঠ। কাশী ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এত মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। একদিন যান, রাণীদির সঙ্গে দেখে আসুন সব। তবে উঁচু সিঁড়িগুলো দয়া করে ভাঙবেন না।

—না।

— না কেন?

—আমি বেশ আছি।

—লজ্জা? —ডাক্তারের চোখ আবার চকচক করে উঠল : বলেছি তো কোনো লজ্জা আপনার নেই। মাথা সোজা করে চলুন।

দীপ্তির ঠোঁটের কোণা আর একবার বাঁক নিলে, কিন্তু হাসিটা এবারে আর স্পষ্ট হয়ে ফুটল না। ভালোমানুষ ডাক্তার নিজের যুক্তি আর বিশ্বাস নিয়েই থাকুন, মিথ্যে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। দীপ্তি আস্তে আস্তে বললে, ভেবে দেখব।

—ভেবে দেখবেন কেন? আমিই রাণীদিকে বলে দেব না হয়। এখন আপনার ঘড়িটা দেখুন তো, কটা বাজল।—বাঁ হাতের মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, বারো বছরের সঙ্গী ছিল ঘড়িটা—বড্ড মায়া হচ্ছে।

দীপ্তি নিজের ছোট্ট ঘড়িটা তুলে নিলে টিপয় থেকে। বললে, দশটা বাজতে সাত মিনিট। কিন্তু কী হল আপনার ঘড়ির? ভেঙে গেছে নাকি?

—ভাঙলে এমন করে বুক ভাঙত নাকি? ভঙ্গুর জিনিস—একদিন ওকে যেতেই হবে—এইটে ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া যেত। ব্যাপারটা তা নয়—চুরি হয়ে গেছে কালকে।

—বলেন কি—দীপ্তি চমকে উঠল : কী করে চুরি হল?

—কাল রাত্রে যখন ঘুমুচ্ছিলুম, তখন চাকর নিয়ে উধাও হয়েছে। শুধু ঘড়ি নয়, গোটা দুই দামী ফাউণ্টেন পেন, মা-র দেওয়া একটি আংটি ছিল—যদিও কখনো পরতুম না—সেটা, আর সুটকেস থেকে শ-দেড়েক টাকা।

—কী সর্বনাশ! বাড়ীর আর সবাই—

—আর সবাই তো কেউ নেই। মা-বাবা কালনায় দেশের বাড়ীতে থাকেন, ছোট ভাই কলকাতায় চাকরি করে। আমি একাই একটা বাড়ীর দুটো ঘর নিয়ে মুক্তির আনন্দে কাটাচ্ছিলুম। ভালোই করেছে চাকরটা—মুক্ত পুরুষের মায়ার বাঁধন আরো অধিক আলগা করে দিয়ে গেছে। সেইজন্যেই তো প্রথমে এসেই আজ রাণীদির কাছে হাত পাততে হল।

—থানায় খবর দিয়েছেন?

—কী হবে?—ডাক্তার হাসলেন : কয়েকটি ভদ্রসন্তান এমনিতেই নানা ঝামেলায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে রয়েছে, মিথ্যে আর তাদের বিব্রত করা কেন? তা ছাড়া থানা জায়গাটাকে আমার একেবারে ভালো লাগে না, গেলেই কেমন বুকের ভেতর গুর-গুর করে ওঠে, জীবনে যা কিছু করে বসেছি, সব কনফেস্ করতে ইচ্ছে হয়।

দীপ্তি অধৈর্য হয়ে বললে, ঠাট্টা নয়। থানায় খবর দিন, ধরে ফেলবে।

—ধরে ফেলবে?—ডাক্তার আবার হাসলেন : একটু বেশি কম্প্লিমেন্ট্ দিচ্ছেন হয়তো। যদি ধরেই ফেলে—তাতেই বা কী হবে?

—সব ফিরে পাবেন।

—দেখুন, ফিরে পেলেই ফিরে নেওয়া উচিত কিনা তাও ভাবা দরকার। আমি মাসে শ-চারেক টাকার মতো রোজগার করি, ওকে বাইশ টাকা মাইনে দিতুম। তার বদলে রান্না করত, ঘর সাফ করত, বাসন মাজত, বাজার করত, সময়-অসময়ে চা করবার হুকুম মেনে চলত। পরিশ্রমের কথাটা ভাবলে বোধ হয় ডিস্ট্রিবিউশন অফ মানিটা একটু বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিল। ও তারই খানিকটা ক্ষতি-পূরণ করে নিয়েছে—কেন রাগ করব বলুন।

—না—এ অন্যায়, ভারী অন্যায়। ছি-ছি, এতগুলো টাকার জিনিস—দীপ্তি একবার থামল : সত্যিই আপনি বিয়ে করুন ডাক্তারবাবু। এভাবে থাকার কোনো মানে হয় না।

সত্যিই আপনি বিয়ে করুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললেন, রাইট। বিয়ে করলে অন্তত গিন্নীর একটা কড়া নজর থাকত। চাকরটা হয়তো নির্বিঘ্নে বাজারের পয়সায় হাত পাকাতে পাকাতে শেষ পর্যন্ত এতখানি ডেভেলপ করতে পারত না। বিয়ের প্রস্তাব তো রাণীদির কাছে করেই ছিলুম, কিন্তু জানেনই তো, আমার এই দাড়ির জন্যেই বোধ হয় ভদ্রমহিলা আমাকে দাদা ছাড়া কিছু আর ভাবতে পারলেন না।

—রাণীদি ছাড়া কি আপনার জন্যে আর পাত্রী জুটত না?

—জুটত খুব সম্ভব। আমার এই দাড়ি দেখেও আতঙ্কে পিছিয়ে যাবে না এমন বীরাঙ্গনা বাংলা দেশে যে নেই সে-কথা আমার মনে হয় না। কিন্তু খুঁজবে কে বলুন। তাই শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখে দেশান্তরীই হতে হল।

—দেশান্তরী মানে?—দীপ্তি চকিত হয়ে উঠল, ডাক্তারের কথাটা এবারে আর ঠাট্টার মতো মনে হল না।

—মানেটা খুব জটিল নয়।—ডাক্তার হাসলেন : মাস তিনেক আগে খেয়াল-খুশিতে চাকরির একটা দরখাস্ত করে-ছিলুম ওড়িষ্যায়। হঠাৎ তার একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ এসে গেছে। চাকরিটা নেব কি নেব না এই নিয়ে চিন্তা কর-ছিলুম, কিন্তু চাকরটা চলে গিয়ে মনটাকেও উদাস্ করে দিয়েছে। ভাবছি আমিও চলে যাই। আর পাঁচ দিন পরেই জয়েন করতে হবে, অতএব 'বাঁধ গাঁটরিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল দীপ্তি। কালো হয়ে গেল চোখ-মুখ। হঠাৎ মনে হল, এই দুঃসময়েও পায়ের তলায় একটা শক্ত ভাঙার মতো ছিল কোথাও, এইবার কে যেন সেটাকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে।

ডাক্তার নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন দীপ্তির দিকে। বাইরের আমগাছে বুলবুলিতে শিস দিচ্ছিল, খানিকক্ষণ যেন তাই শুনলেন কান পেতে। কী যে ভাবলেন তিনিই জানেন। তারপর ঃ

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

দীপ্তি দুটো আবছা চোখ মেলে ধরে বললে, বলুন।

—মনে রাখবেন, আপনার আমার মধ্যে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে—তাই সোজা জিজ্ঞেস করব, সোজা উত্তর দেবেন।—ডাক্তার তরল হতে চেষ্টা করেও পারলেন না ঃ কাউকে ভালোবাসেন আপনি?

বুকের মধ্যে ঘা পড়ল একটা। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল দীপ্তি, তারপর বললে, না। কিন্তু একথা কেন?

—বলছি পরে।—ডাক্তার এবার পোড়া চুরুটটা বের করেই আবার উত্তেজিতভাবে পকেটে পুরলেন ঃ তার আগে জবাব দিন। আপনি যদি নিজের সম্বন্ধে কোনো ডিসিশন নিতে চান—কেউ বাধা দেবে?

—সব বাধা পেরিয়ে এসেছি আমি।

—তা হলে নির্ভয়ে বলতে পারি।—ডাক্তারের গলাটা কেঁপে উঠল ঃ উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট্ মাই প্রোপোজাল?

—প্রোপোজাল? কিসের?

ডাক্তার তাঁর থাবার মতো প্রকাণ্ড মুঠোটা বাড়িয়ে দিয়ে দীপ্তির একখানা হাত চেপে ধরলেন ঃ যদি বলি আমাকেই না হয় বিয়ে করে ফেলুন—আপনি আপত্তি করবেন?

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল দীপ্তির—চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা যেন গোল হয়ে ঘুরতে লাগল আর সেই সঙ্গে ডাক্তারের জ্বলন্ত দৃষ্টি একটা আগুনের বৃত্তের মতো যেন প্রদক্ষিণ করে চলল তাকে।

—কী হল? কী হল আপনার?

অনেক দূর থেকে যেন ডাক্তারের গলা ভেসে এল, যেন স্বপ্নের ভেতরে শুনল দীপ্তি। ধীরে ধীরে ঘূর্ণন্ত ঘরটা স্থির হল, আর মনে হল ডাক্তারের চোখ থেকে একটা দৃষ্টি এসে তার মুখের ওপর চিরকালের মতো আটক পড়ে গেছে, ডাক্তার চলে গেলেও এই দৃষ্টিটা কোনো-দিন আর ওখান থেকে সরে যাবে না।

আর কোথা থেকে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে পড়ল খানিকটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে জাগিয়ে দিল দীপ্তিকে। আরো মনে পড়ল, ডাক্তারই এই কথাটা প্রথম বলেননি—চৌরঙ্গীর হোটেলে আরো অনেকবার অনেকের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে তাকে। কোনো আশা করেনি দীপ্তি, নেশা কেটে যাওয়ার পরে কথাটা যে কারো মনে থাকবে না এ-ও তার অজানা থাকেনি।

ডাক্তারেরও সেই নেশা। মনের মদ—মুহূর্তের একটা মানসিক মাতলামি। কিন্তু যে-কোনো মাতালই হোক, আপাতত দীপ্তি তাদের আর সহ্য করতে পারছে না। ডাক্তারের ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা ঘৃণায় বিস্বাদ হয়ে গেল তার।

আশ্চর্য নিষ্ঠুর আর বিষাক্ত স্বরে দীপ্তি বললে, আমাকে বিয়ে করতে চান? এই অবস্থাতেই?

ডাক্তার বললেন, আপত্তি নেই।

—জানেন, আমি যার মা হতে চলেছি তার কোনো পরিচয় নেই?—দীপ্তির মুখ প্রেতিনীর মতো বিকৃত হয়ে গেল ঃ জানেন, কলকাতার হোটেলে আমি পয়সার জন্যে শরীর বিক্রী করি, তাই আমার পেশা?

দীপ্তির মুঠো থেকে হাত খুলে গেল ডাক্তারের। প্রত্যেকটা কথা একটা করে ছুরির ঘায়ের মতো এসে লাগল, যুদ্ধ-ফেরৎ সৌম্যেন ঘটকও এতখানির জন্যে তৈরী ছিল না। মুখের কথা যা-ই হোক, চিরকালের সংস্কার তৎক্ষণাৎ কুঁকড়ে আনল স্নায়ুগুলোকে।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। আর দীপ্তি নিষ্ঠুরভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে—যেন পরম পরিতৃপ্তিতে গুলি করা শিকারের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপভোগ করছে সে।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। বললেন, পারব।

দীপ্তি থমকে গেল। ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে বসল তার।

—বিশ্বাস করতে পারবেন আমাকে?

—তা-ও পারব।

আরো নির্মম, আরো কঠিন হতে চাইল দীপ্তি। একটা চরম আঘাত দিতে চাইল ডাক্তারকে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের একটা শক্ত চাপ দিয়ে বললে, কিন্তু আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না। যে বুনো বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে একবার, তাকে ঘাস-পাতা খাইয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন আপনি!

কথাটা ঘুরিয়ে বলা, কিন্তু অর্থটা অস্পষ্ট রইল না ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার অধৈর্যভাবে হাতের আঙুল-গুলো মটকালেন একবার, যেন শরীর-

মনের সমস্ত জড়তা মিটিয়ে নিতে চাইছেন। উজ্জ্বল চোখ কিছুক্ষণের জন্যে সংশয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, এবার কুয়াশা সরে গিয়ে সে দুটো তারার মতো ঝকঝক করে উঠল।

—বাজে কথা। আপনি এমন কিছু মনের বাঘ নন—সেই স্বাভাবিক আর বলিষ্ঠ স্বর জেগে উঠল ডাক্তারের ঃ ইট্ ইজ ইকনমি—ইট্ ইজ্ এ সোস্যাল ট্র্যাজেডী। এই বীভৎস প্রোফেসান মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয় এই ক্রিমিনাল্ সমাজ। তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে যাদের হত্যা করা হয়—দু-একটা অ্যাব্‌নর্মাল সাইকোলজী বাদ দিলে—তারা যে সেই মৃত্যুর প্রেমে পড়ে এ-কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে রাজী নই। আমি জানি, আপনি একটা সুস্থ সংসার চান, আপনি জীবনে মর্যাদা চান, বাঁচতে চান—কাজ করতে চান।—দীপ্তির চোখের সামনে ডাক্তারের মূর্তিটা যেন ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, যেন সমস্ত ঘরটাকে জুড়ে বসল তার শরীর, যেন দীপ্তির এতদিনের চেনা-জানা সমস্ত পৃথিবীটাকে তা আড়াল করে দিলে। ডাক্তার বলে চললেন ঃ জানি এখনো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, করা উচিত নয়, তবু আপনাকে দেখে মনে হয় আমাদের আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং আসবে। আমি কোনোদিন আপনাকে দেবতা বলে ভুল করব না, আমার ভেতরে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবেন আপনি। তবু মানুষ হিসেবে এ ওকে চিনে নিয়ে হয়তো আমরা জীবনটাকে এগিয়ে নিতে পারব। আই অ্যাম্ টায়ার্ড—আই ওয়ান্ট টু সেট্‌ল। ইউ আর এ ভিক্‌টিম অব্ দি সোশ্যাল হাউণ্ডস্। আসুন, আবার গুছিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করা যাক। আপনাকে আমার ডিপেণ্ডেণ্ট করে রাখতে চাই না—যদি কোনোদিন আমাকে অসহ্য বোধ হয়, সম্মান নিয়ে বাঁচবার জন্যে আপনাকে আমি ফারদার এডু-কেশনের সুযোগ দেব। যদি চলে যেতে চান একবারও বলব না আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আই এম টু স্মার্ট ফর দ্যাট্। —ডাক্তার থামলেন ঃ আমার সব কথা খুলে বলেছি আপনাকে। রাজী?

দীপ্তি বসে রইল পাথর হয়ে। সমস্ত হিংস্রতা, সর্ব বিদ্বেষ যেন একটা পাথরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ঠিকরে পড়েছে। ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করবে, বিশ্বাস করবে না ভয় করবে, তাই সে বুঝতে পারল না।

একটু চুপ করে রইলেন ডাক্তার। এতক্ষণ পরে পোড়া চুরুটটা বের করে ধরাতে পারলেন। সেই উগ্র কটু গন্ধ ঘর-ময় ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, জানি, মেনে নিতে সময় লাগবে। আমাকে যারা চেনে জানে, তারা আমাকে দেখে আকর্ষণের চাইতে বিকর্ষণটাই বোধ করে বেশি। সুতরাং আপনার মুখের তেতো স্বাদটা আর একদিন সইয়ে নিতে চেষ্টা করুন। কাল আপনার মতামত জানতে চাইব। ইয়েস অর নো।

দীপ্তি যেন হঠাৎ ভেসে উঠল সমুদ্রের তলা থেকে। একটা অস্পষ্ট স্বর বেরুল ঃ আর আমার সন্তান।

—ইয়েস। তা-ও ভেবে দেখেছি। ওটা না হলেই ভালো হত। বাট্ হোয়েন ইট্ ইজ দেয়ার—জায়গা একটা দিতেই হবে তাকে। ডাস্টবিনে ফেলে দেবার জন্যে মানুষের জন্ম হয় না, আর তা ছাড়া আমি যখন কিছু আয় করতে পারি, তখন অনাথ আশ্রমের ভার মিথো বাড়িয়ে কী লাভ। লেট্ ইট্ বী মাই চাইল্ড্। মাস্টার অর মিস্ ঘটক।

এইবার দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল দীপ্তি। যা কিছু বাঁধ ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সামনে। দুর্বল শরীর আর সইছে না, ক্লান্ত মন সব কিছু ভাব-বার শক্তি হারিয়েছে তার।

দীপ্তির মাথার ওপর প্রকাণ্ড হাত-খানা নেমে এল ডাক্তারের।

—থামুন,—থামুন। ডোণ্ট্ বী সেণ্টিমেণ্টাল।

ঘরে ঢুকল রাণী। দাঁড়িয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে।

—ডাক্তারবাবু।

দীপ্তি নিথর হয়ে বসে রইল, আর শান্ত হাসিতে ভরে উঠল ডাক্তারের মুখ।

—এসো, এসো রাণীদি।

রাণী তীক্ষ্ণ চোখে একবার ডাক্তারের দিকে চাইল, একবার দীপ্তির দিকে। কপালে ছায়া ঘনিয়ে এল তার। ঘরের আবহাওয়াটা ভালো লাগল না—একটা সন্দেহ মাথা তুলল মনে।

—নীচে পেশেণ্ট্ বসে আছে। আপনি ভারী আড্ডাবাজ হয়ে যাচ্ছেন আজকাল।

—আড্ডা নয় রাণীদি, অত্যন্ত সীরিয়াস্ ব্যাপার। তুমি তো পাত্তাই দিলে না, তাই এই ভদ্রমহিলাকেই বললুম, আমাকে বিয়ে করে ফেলুন। যদিও এখনো কথা দেননি, তবু মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যাবেন।

—কী বললেন!—রাণীর গলা চিরে চিৎকারের মতো বেরিয়ে এল কথা।

—সরল বাংলাতেই বলেছি দিদি। তোমার না বোঝবার কথা নয়।

একটা অর্থহীন যন্ত্রণায় আর অসহ্য ক্রোধে রাণীর মুখ বেগুনে হয়ে গেল। শক্ত করে দরজাটা চেপে ধরে, কঠোর স্বরে বললে, ডাক্তারবাবু, এটা হাস-পাতাল। এর কতগুলো নিয়ম আছে, লোকের চোখে এর একটা সম্মান আছে। এটা ইয়ার্কির জায়গা যে নয় সেটা ডাক্তার হিসেবে আপনার অন্তত জানা উচিত।

—সেই কথা ভেবেই তো রিজাইন দেব রাণীদি।

—রিজাইন!—রাণী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—তা ছাড়া তো উপায় নেই। তোমাকে বলা হয়নি, উড়িষ্যায় একটা চাকরি পেয়েছি। এই মহিলাকে নিয়ে পাড়ি জমাব সেখানে। ঘর বাঁধব। তোমাকে আর ঘটকালির পরিশ্রম করতে হল না, নিজেই সেটা ম্যানেজ করে নিলুম।

—এই মেয়েটাকে নিয়ে চলে যেতে চান!—দীপ্তির সম্পর্কে যে-টুকু মমতা রাণীর মনে দেখা দিয়েছিল অসহ্য বিদ্বেষ আর ঘৃণায় এক মুহূর্তে সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল ঃ নিয়ে যেতে চান—কোনো আপত্তি নেই। প্রভাত-দা এনেছিলেন বলেই জায়গা দিয়েছিলুম, নইলে এ ধরনের কদর্য মেয়ের জন্যে আমার নার্সিং হোম নয়।—বিন্দু বিন্দু করে বিষ ঢালতে লাগল রাণী ঃ এদের

রাখলে হাসপাতালের বদনাম—সম্মানের ক্ষতি। আপনি একে যে-চুলোয় খুশি নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু প্রভাত-দাকে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব?

চোখের জল মুছে ফেলেছিল দীপ্তি। কয়েক মিনিট আগেও যা অনিশ্চিত ছিল, রাণীর এই ঘৃণার আঘাত তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত করে দিলে। দীপ্তি মাথা তুলল।

—প্রভাত-দাকে যা জানাবার আমিই জানিয়ে দেব, আপনি ভাববেন না।

—বেশ ভাবব না।—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাণী। বলে গেল, ডাক্তারবাবু, আপনার পাওনাটা আজ বিকেলেই মিটিয়ে নিয়ে যাবেন। আর—একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, বিয়ের নিমন্ত্রণটা আর দয়া করে করবেন না, অতটা সইতে পারব না।

শুধু ঘর থেকেই বেরিয়ে গেল না রাণী, দোতলা থেকে নেমে সোজা বেরিয়ে গেল হাসপাতাল থেকে। সামনে যে নার্সটি পড়ল, তাকে বলে গেল, এ বেলা আমি আর আসব না—কেউ খোঁজ করলে বলে দিয়ো।

রিক্সা করে বাড়ীর দিকে ফিরতে ফিরতে যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যেতে লাগল রাণীর, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বার বার করে ভাবতে চাইল সেই স্বামীকে—ভালো করে যাকে দেখবার আগেই একটা ভয়ঙ্কর রাত্রের মোটর-দুর্ঘটনায় যে চিরকালের মতো মুছে গেছে।

কিন্তু—!

* * *

বার থেকে সন্ধ্যায় তেমনি টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন কাঞ্জিলাল সাহেব।

ড্রাইভার প্রভাত সরকারকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আজ নতুন ড্রাইভার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। একজন পাঞ্জাবী—তাঁর বন্ধু ঘোষসাহেব আজ সকালে এটিকে এনে দিয়েছে।

বারের বাইরে এসে একবার দাঁড়ালেন কাঞ্জিলাল সাহেব।

হঠাৎ মনে হল, কিসের জন্যে, কার জন্যে তাঁর এই এভারগ্রীন লাইফ? কালকে রিনি অদ্ভুত পাগলামির মধ্যে কাটিয়েছে সারাদিন—নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়েছে টুকরো টুকরো করে—হিংস্র চিৎকার করেছে। সময় মতো রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছিলেন, নইলে হয়তো খুনই করে বসত কাউকে।

ফ্রাস্ট্রেশন!

নিজেরই বাধাহীন প্রশ্রয়ে আজ তাঁর মেয়ে একটা শূন্যতার জগতে এসে জায়গা নিয়েছে। ব্যর্থ-বিকৃত। এক ডাক্তার বন্ধু বললেন, বিয়ে দিন—নইলে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে দেবেন? সেই ছেলেটা—দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল তাকে বিয়ে করবার পর—

কাঞ্জিলালের মনে হল, শুধু রিনি নয়, তিনিও পাগল হয়ে যাবেন। এতদিন পরে তাঁর সব কিছু যেন বালির বনিয়াদের মতো ধ্বসে পড়েছে পায়ের নীচ থেকে।

শুধু একটা বাকী ছিল তাঁর। বিশ্বপ্রেম।

কিন্তু কোথায় বিশ্বপ্রেম? সেদিনও বলেছিলেন, বিশ্বপ্রেমের বাণী পাঠাবেন হিমালয়ে—প্রেমাশ্রুতে মিলন ঘটাবেন—যত বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু—

আজকের কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইন। আগুনের মতো খবর।

বিশ্বপ্রেমে কেউ কর্ণপাত করে না। তাই চীনের আক্রমণ। বিশ্বাসঘাতকতা। পঞ্চশীলের সমাধি। পীত নদীর জলে 'গৌটামা বুড্ঢার' বিসর্জন।

অস্ত্র! ওয়ার! প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান।

শুধু পাহাড়ের টিলা নয়—নদী নয়—দেশের মাটি। তার প্রতি ইঞ্চি জমিকে রক্ত দিয়ে বাঁচাব আমরা। সারা ভারতবর্ষ ক্ষুধিত সিংহের মতো গর্জন করছে। থর থর করে কাঁপছে হিমালয়।

ক্লাবের আড্ডাবাজ বন্ধুদের মুখ থমথম। কয়েকজন মদ পর্যন্ত স্পর্শ করলেন না আজকে। দুচার কথার পরেই উঠে গেলেন। ডেজ অব্ হার্ড ট্রায়াল অ্যাহেড্। আজ রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। কোটিপতি থেকে পথের ভিক্ষুক। সকলের দায়িত্ব সমান—সকলের সঙ্কল্প এক।

মদের গ্লাশ আর বিশ্বপ্রেমের বাণী! সারা জীবন কী পাগলামি নিয়ে কাটালেন! কী পেলেন একমাত্র মেয়ের কাছ থেকে—কী পেলেন পৃথিবীর কাছ থেকে? হিমালয়ের তুষার আজ বুদ্ধের রক্ত দিয়ে রাঙানো। কোথায় দাঁড়াবেন কাঞ্জিলাল সাহেব?

সামনে দিয়ে গর্জিত প্রসেশন চলেছে একটা। কতগুলো মুষ্টিবদ্ধ হাত। দেশ আমাদের। প্রতি কণা ধুলোর জন্য বুকের সব রক্ত ঢেলে দেব।

চুরমার হয়ে গেছে শৌখিন বিশ্ব-প্রেম। নিশ্চিহ্ন হযে গেছে তাঁর স্বপ্নের প্রাসাদ। হিমালয়ের ওপার থেকে যেন গুপ্তঘাতকের ছোরা এসে বিঁধেছে তাঁরই হৃৎপিণ্ডে। চোখের সামনে চার-দিকের আলোগুলো জোনাকির মতো ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল। ঘনিয়ে এল একরাশ অন্ধকার। হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কাঞ্জিলাল সাহেব। জ্ঞান হারাবার আগে যেন কানে এল রিনির অদ্ভুত সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার: ও ড্যাডী, ইয়ু আর এ ফুল—ইয়ু আর অ্যান্ ইডিয়ট্! ইয়োর লাইফ ইজ—

পাঞ্জাবী ড্রাইভারই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল তাঁর দিকে।

—(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাহিত্য সমাচার

মহাভারতের দ্বিতীয় পর্বের রুশ অনুবাদ

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত কালিয়ানোফকৃত মহাভারতের সভাপর্বের রুশ অনুবাদ ২৭-এ অক্টোবর লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। টীকাব্যাখ্যাসহ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে 'স্মরণীয় সাহিত্য' গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত মহাভারতের আদিপর্বের রুশ অনুবাদও করেছিলেন এই বিশিষ্ট সোবিয়েত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সম্পাদনা করেছিলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান আলেক্সি বারান্নিকফ।

মহাভারতের এই রুশ অনুবাদের সঙ্গে কালিয়ানোফ তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানসম্মত টীকাব্যাখ্যা যোগ করেছেন দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত মূলে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য উদ্ধৃতির সাহায্যে। দেশের জনগণকে ভারতের ও অন্যান্য আপ্রাচ্যীয় দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত করা, এইসব দেশের জাতিসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেনকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার ওপরে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে, মহাভারতের এই রুশ অনুবাদ প্রকাশ তারই প্রমাণ বলে অ্যাকাডেমিশিয়ান কালিয়ানোফ মনে করেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জনগণের জীবন অনুশীলন করার পক্ষে মহাভারত যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ, সে কথা উল্লেখ করে কালিয়ানোফ বলেন যে, ভারত সম্পর্কে একটি কোষগ্রন্থ হিসাবে মহাভারত সোবিয়েত পাঠকদের নিকট খুব আকর্ষণীয় একটি মহাকাব্য।

সভাপর্বের এই রুশ অনুবাদের প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের দায়িত্ব বহন করেন লিথুয়ানিয়ার রাজাবিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ও সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবিদ বোরিস লারিন। এই লিথুয়ানীয় বিজ্ঞানপরিষদের প্রাচীন জাতিসমূহের ইনস্টিটিউটে রক্ষিত ১৫টি জলরঙে অঙ্কিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্র এই রুশ সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সোবিয়েত বিজ্ঞানপরিষদের এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিটিউটের ভারতীয় বিভাগের প্রধান ভ্যাদিমির কালিয়ানোফ। গত ২৭-এ অক্টোবর একজন 'তাস' প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন: 'ভারতের মহাকাব্য মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ ও টীকাটিপ্পনিসহ রুশ অনুবাদের কাজে সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।' বর্তমানে কালিয়ানোফ মহাভারতের চতুর্থ পর্ব (বিরাটপর্ব) অনুবাদে নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় পর্ব (বনপর্ব) অনুবাদ করছেন তাঁর ছাত্রী স্ভেৎলিনা লেভিনা।

।।এ হংকং হাউস।।

এডমণ্ড ব্লানডেনের নতুন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'এ হংকং হাউস'। হংকং ইউনিভার্সিটিতে তিনি ইংরিজি সাহিত্য অধ্যাপনা করেছিলেন কিছুকাল। সুদূর প্রাচ্যের এই অঞ্চলটির অভিজ্ঞতাই তাঁর এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই ভিত্তিভূমি। পূর্বপ্রকাশিত 'পোয়েমস অব মেনি ইয়ারস' গ্রন্থখানি এককালে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। লিড্স ইউনিভার্সিটি তাঁকে সাহিত্যে অনারারি ডিগ্রী দিয়েছে।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন পুরস্কার ১৯৬২

এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য সৃষ্টির জন্য। গত জুলাই মাসে জুরিখে পুরস্কারটির আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী মিলিত হন। বর্তমান বৎসরের জন্য এই সম্মানজনক পুরস্কারটি লাভ করেছেন মেরী নরটন, তাঁর 'দি বরোয়ার্স অ্যাফ্লোট' গ্রন্থের জন্য। শিশু অ্যাডভেনচারের এই মুগ্ধকর কাহিনীটি বিচারকমণ্ডলীকে অভিভূত করে। মেরী নরটন ইতোপূর্বে 'দি বরোয়ার্স' নামক শিশুদের গ্রন্থ রচনার জন্য 'কারনেজি' মেডাল লাভ করেন।

।। সোভিয়েতে 'ডক্টর জিভাগো' ।।

রুশ সাহিত্যিক য়েভজেনি পেপোভকিন সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশ করেছেন। সংবাদটি হচ্ছে বর্তমান বৎসরের মধ্যেই বরিস পাস্তেরনাক রচিত বহুবিতর্কিত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

।। পর্তুগালে নিষিদ্ধ গ্রন্থ ।।

সম্প্রতি পর্তুগীজ সরকার ডঃ ম্যানুয়েল জোস্ হোমেন ডি মেলো রচিত 'পর্তুগাল, হার ওভারসিজ্ প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড দি ফিউচার' নামক গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করেছেন। ডি মেলো ১৯৫৮ সালে জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রাক্তন পর্তুগীজ প্রেসিডেন্ট মার্শাল ক্র্যাভিরো লোপেস। গ্রন্থে সালাজার সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কার থেকে শুরু করে জাতীয় সমস্যার মুক্ত আলোচনার জন্য এবং আফ্রিকায় পর্তুগীজ শাসননীতির পরিবর্তন সাধনের স্বপক্ষে স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবী জানিয়েছেন ডি মেলো এবং লোপেস।

।। ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ।।

আন্তর্জাতিক পি, ই এন, পরিচালিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল জানা গেছে। কেবলমাত্র সংস্থার সদস্যগণের পক্ষেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সম্ভব। ২৫০ জনের ওপর প্রতিযোগী যোগদান করে। প্রথম পুরস্কার ৫০০ ডলার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ ডলার এবং তৃতীয় পুরস্কারের পরিমাণ ২০০ ডলার।

প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন স্টর্ম জেমসন (গ্রেট বৃটেন), আঁদ্রে মঁরিস্ (ফ্রান্স) এবং হুইট বারনেট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

প্রথম পুরস্কার : অ্যান অর্ভার (ড্যানিশ থেকে অনুদিত), লেখক : সি, ই সোয়েক। ইনি একজন নাট্যকার এবং ডেনমার্ক কেন্দ্রের সদস্য।

দ্বিতীয় পুরস্কার : অ্যাগু (গ্রীক থেকে অনুদিত), লেখিকা : ইর্সি সেফেরিয়েডস হাজীটিমিহেলি। ইনি গ্রীক কেন্দ্রের সদস্য।

তৃতীয় পুরস্কার : দুভাগে ভাগ করে দুজন সদস্য লাভ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রের সদস্য ভ্যাদিমির কস্টেটস্কির 'অ্যাডাম, আই অ্যান্ড ক্যাপিটাস্কি' রুশ থেকে অনুদিত গল্পটি পুরস্কৃত হয়েছে। মিসেস কনস্ট্যান্স ইয়ং রচিত 'অ্যাণ্ড ইজোলিনি স্মাইলড' গল্পটি পুরস্কার লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কেন্দ্রের কেপ টাউন' শাখার সদস্য।

।।লেট মাই পিপল গো।।

অ্যালবার্ট লুথুলি রচিত বর্তমান গ্রন্থখানি দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। বিচারমন্ত্রী ভোস্টার গ্রন্থ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আমদানিকৃত সমস্ত 'লেট মাই পিপল গো' ইতোমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আর অধিক কপি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

আদিবাসী বিবাহের নানারূপ

প্রভাতকুমার দত্ত

ভারতবর্ষে আদিবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে ২২৪.৮৮ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ। এদের জীবনধারা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আদিবাসী জীবনের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দিক নিয়ে আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে বিবাহপ্রথা। ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজে মোটামুটি নিম্নোক্ত ধরণের বিবাহপ্রথা লক্ষ্য করা যায়।

॥ মেয়ে চুরি করে বিবাহ ॥

দক্ষিণ ভারতের মুথুভান শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে। এদের সমাজে বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে বর কনেকে তার মায়ের বাড়ী থেকে যে কোন ফন্দীতে চুরি করে নিয়ে যায় এবং তারা বনের একেবারে নির্জন অংশে কিছুদিন একত্র বাস করে। পরে তারা ঘরে ফিরে আসে যদি-না ইতিমধ্যে তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের খুঁজে বার করে থাকে। নাগা, হো ও মুন্ডা সমাজেও এ রীতি আছে। খাড়িয়া ও বীরহোর পুরুষেরা পিছন থেকে লুকিয়ে এসে প্রার্থীত নারীর সিঁথিতে সিন্দুর লাগিয়ে দেয়। এই সিন্দুর দেওয়া বিবাহেরই নামান্তর। মধ্যভারতে উৎসব দিনে যখন বিভিন্ন গ্রামের লোক একত্র মেলে তখন উৎসব-মত্ততার সুযোগে বিবাহের জন্য এই ধরণের যুবতী হরণকার্য সম্পাদিত হয়। যে পুরুষ হরণ বা চুরি করে সে যদি ক্ষতিপূরণ দেয় বা সবাইকে খাওয়ায় তবে এই চুরিকে বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

॥ কাজের বিনিময় ॥

দক্ষিণ ভারতের মান্নান ও পালিয়ান সমাজে বিবাহের এ রীতি লক্ষ্য করা যায়। বর তার ভাবী শ্বশুরের বাড়ী ছয় মাস থেকে এক বছর কাল বাস করে এবং গৃহের নানা কাজকর্ম করে দেয়। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে পর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। যে সমস্ত পুরুষেরা কন্যাপণ সংগ্রহ করতে পারে না তারাই এভাবে বিবাহ করে। স্ত্রী সংগ্রহের জন্য কাজ করার কারণই হচ্ছে যে মেয়ের বাপ শুধু হাতে অর্থাৎ কিছু না নিয়ে মেয়েকে হাত ছাড়া করতে ইচ্ছুক নয়। কোন গোণ্ড বা বৈগা পুরুষ কন্যা-মূল্য না দিতে পারলে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে চাকররূপে যায় এবং কয়েক বছর পরে মেয়েকে বিবাহ করে। বীরহোর সমাজে কন্যা-মূল্যের জন্য শ্বশুরে টাকা ধার দিয়ে থাকে। এই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত জামাইকে শ্বশুরের বাড়ী থাকতে বাধ্য করা হয়। বর ভালভাবে কাজকর্ম করলে কনের বাপ সহজেই মেয়ে দিয়ে দেন।

।। কন্যা-ক্রয় ।।

মেয়ে কিনে বিবাহের রীতি শুধু আদিবাসী সমাজ কেন সভ্য সমাজেও লক্ষ্য করা যায়। নাগারা টাকা বা জিনিষ দিয়ে মেয়ে কেনে। দাম দেওয়াটা হচ্ছে নারীর 'প্রয়োজনীয়তার' জন্যই। হো সমাজে কন্যা-মূল্য দেওয়ার অর্থনৈতিক দিকটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এখানে মূল্যের হার এত উঁচু যে বেশীর ভাগ যুবক-যুবতী অবিবাহিত থাকে। অংগামী নাগাদের মধ্যে কন্যা-মূল্য দেওয়ার রীতি না থাকায় নারীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং অনেকেই তারা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। অপরদিকে রেংগমা নাগাদের মধ্যে এই রীতি থাকার জন্য তাদের সমাজে নারীর এ অবমাননা ঘটে নি। কেরালার বিভিন্ন

মুরিয়া বিয়ের কনে

আদিবাসীদের মধ্যে কন্যা-মূল্যের প্রচলন আছে। এখানে যে অর্থ আদায় হয় তা মা-মামা প্রভৃতিরা ভাগ করে নেন। কন্যা-মূল্য জিনিষটাকে স্ত্রী রাখার ক্ষমতার পরিচায়করূপে গণ্য করা যেতে পারে।

।। ভগ্নী বিনিময় ।।

ভগ্নী বিনিময় করে বিবাহ উরাওঁ, উল্লাটান, বিরহোড় প্রভৃতি আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত। যার নিজের ভগ্নী নেই তার পক্ষে স্ত্রী পাওয়া সম্ভব নয় কারণ শর্ত হচ্ছে স্ত্রী নিলে বিনিময়ে ভগ্নী দিতে হবে। এই রীতিতে টাকা বা সম্পত্তি দিয়ে স্ত্রী কেনা চলে না। ভগ্নী নেই অতএব ভাগ্যে বিবাহ নেই এটাই নিয়ম। ভগ্নী বিনিময় প্রথার উদ্ভব কন্যা-মূল্য জিনিষটাকে এড়াবার জন্যই।

॥ ভাগিনেয় বিবাহ ॥

দক্ষিণ ভারতেই এই প্রথার চলন বেশী। কেরালার আদিবাসীরা বিশেষভাবে এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। সেখানে মুথুভান, মান্নান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা মামার মেয়েকে বিবাহ করাটাই বেশী পছন্দ করে। অবশ্য পিসিমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। ভাগিনেয়-বিবাহ রীতি পরিবারের বাঁধুনী শক্ত রাখে ও সম্পত্তি এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। যে সমাজে উত্তরাধিকারী শুধু মেয়েরাই সেখানে পিতা তাঁর ভগ্নীর মেয়ের সঙ্গেই পুত্রের বিবাহ দেন। মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যেই ভাগিনেয় বিবাহ বেশী প্রচলিত। এক আদিবাসী সমাজের দূরবর্তী আদিবাসী সমাজগুলি সম্পর্কে অপরিচয়ও এই প্রথা উদ্ভবের কারণ হতে পারে। সাধারণত মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বেশী দূরে কেউ পাঠাতে চায় না। এটা একটা অতি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

।। একবিবাহ ।।

এই প্রথা ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজে প্রধানত কাদার, মালাপান্ডারাম, সাঁওতাল, খাসিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি বিবাহ মাতা-পিতা ও পুত্র-কন্যার মধ্যে সবচেয়ে সহজতম রূপ। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা দুই-ই এ প্রথার বৈশিষ্ট্য। পুরুষেরা নারীর সতীত্বকেই বেশী শ্রদ্ধা করে এবং এর পরিচয় হচ্ছে একবিবাহ। মধ্যপ্রদেশে অত্যধিক কন্যা-মূল্যের জন্য একবিবাহ ছাড়া গত্যন্তর নেই। দক্ষিণ ভারতে মথুভান, মান্নান, পালিয়ান সমাজে এই বিবাহ রীতি অনুষ্ঠিত হয় পাছে কোন দুষ্ট দৃষ্টি বর-কনের ওপর পড়ে।

।। বহুবিবাহ ।।

বহুবিবাহ আদিবাসীদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। বহুবিবাহ মানে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যের অবসান। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সেখানেই এ প্রথার উপস্থিতি। বর্তমানে নাগা, গোন্ড, বৈগা, লুসাই, টোডাদের মধ্যে বহু-বিবাহের অনেকটা রেওয়াজ আছে। কেরালাতে মুথুভান, পালিয়ান, কানিক্কর প্রভৃতিদের মধ্যেও বহুবিবাহ দেখা যায়। উরাওঁ আদিবাসী পুরুষেরা যতগুলি ভগ্নী ঠিক ততগুলি বিবাহ করে থাকে। ফলে উরাওঁদের মধ্যে যাদের বয়স কম, তারা বিবাহের জন্য মেয়ে পায় না কারণ বয়স্ক বা বৃদ্ধদের পত্নীর সংখ্যাই বেশী হয়ে যায়। বহু-বিবাহের সামাজিক কয়েকটি কারণ আছে। যে সমাজে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বেশী সেখানে বহু-বিবাহ চলে। বহু পত্নী থাকলে ঘরে কাজ করার লোকও বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া পত্নীর সংখ্যা পুরুষের সামাজিক মর্যাদার পরাকাষ্ঠা বিশেষ। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোন সমাজে নারীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে বহু-বিবাহ দেখা দেয়। এখানে লক্ষ্যণীয়, যে যে আদিবাসী সম্প্রদায় মৎস্য আহরণ ও শিকারের স্তরে রয়েছে তাদের মধ্যে বহু বিবাহ থাকতে পারে না। কারণ খাদ্যাভাবের জন্য একটির বেশী দুটি পত্নীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। কিন্তু পশুপালন ও কৃষিনির্ভর আদিবাসী গোষ্ঠীতে বহু-পত্নীর ভরণ-পোষণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাই বহু-বিবাহ প্রচলিত।

॥ বহু ভ্রাতার এক পত্নী ॥

লাদাখি, দেরাদুন অঞ্চলের কোল্টা টোডা, কোটা, কুরুম্বা, কাদাদের মধ্যে বহু ভ্রাতার এক পত্নী নেওয়ার রীতি আছে। নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যাধিক্য এই রীতি উদ্ভবের বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। কাশ্মীরের লাদাখি গোষ্ঠীতে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। টোডা সম্প্রদায়ে যখনই কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী বরের অন্যান্য ভ্রাতাদেরও পত্নীরূপে গণ্য হয়। সম্পত্তির প্রশ্ন ও যৌন-অসাম্য এই প্রথা উদ্ভবের কারণ। একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, খাদ্য প্রচুর হলে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হবে আর এর উল্টো দেখা যাবে যদি খাদ্য দুর্লভ হয়। খাদ্য ঘাটতির জন্য মালাপুলা, উরাওঁ, পালিয়ানদের সমাজে পুরুষের আধিক্য। তাই সেখানে বহু পুরুষের এক পত্নী-রীতির প্রচলন। দারিদ্র ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, যেমন তিব্বতে—বহু-পুরুষকে এক পত্নী নিতে বাধ্য করতে পারে। কারুর কারুর মতে গোষ্ঠী-বিবাহেরই একটি পরবর্তী রূপ হচ্ছে আলোচ্য প্রথা। আরেকটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, একই আদিবাসী সম্প্রদায়ে এক-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বহু পুরুষের এক পত্নী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রথা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। যেমন টোডাদের মধ্যে দেখা যায়।

॥ গোষ্ঠী বিবাহ ॥

এক গোষ্ঠীর প্রতিটি পুরুষ অপর এক গোষ্ঠীর প্রতিটি নারীর স্বামীরূপে গণ্য হলে তাকেই গোষ্ঠী-বিবাহ বলা হয়। এই প্রকার বিবাহের ফলে যে পুত্র-কন্যা জন্মলাভ করে তারা ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীর পুত্র-কন্যা।

।। লেভিরেট ।।

মৃত ভ্রাতার পত্নীকে বিবাহ করাকেই 'লেভিরেট' বলে। এই প্রথার বহুল প্রচলন আছে এবং অনেকের মতে 'বহু পুরুষের এক পত্নী' প্রথারই পরিবর্তিত রূপ 'লেভিরেট' রীতি। যেখানে নারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য সেখানে তা অন্যান্য সম্পত্তির মত হাত-বদল হয়। মৃতের ভ্রাতা না থাকলে নিকটতম আত্মীয় বিধবাকে লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের কানিক্কর, পুল্যা, গরৈয়া, মালায়ারায়ান প্রভৃতি আদিবাসীরা এই প্রথায় বিবাহ করে।

॥ মোরোরেট ॥

এই প্রথায় অনেকগুলি ভগ্নী থাকলে সকলের বড়টিকে বিবাহ করলে সকল ভগ্নীকে বিবাহ করা হয়। লেভিরেট ও মোরোরেট প্রথা একত্র করলে দাঁড়ায় ভ্রাতা হিসাবে একদল স্বামীর সঙ্গে ভগ্নী হিসাবে একদল পত্নীর বিবাহ। আন্তঃ-পরিবার দায়-দায়িত্ব পালন এবং দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন লেভিরেট ও মোরোরেট বিবাহ-রীতি এই দুটি বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। ফ্রেজার মনে করেন গোষ্ঠীবিবাহপ্রথার মধ্যেই এই সঙ্কর রীতির উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের ইরুলি, উল্লাটান এবং মান্নান আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে এই দুটি প্রথারই উপস্থিতি বর্তমান।

॥ বিধবা বিবাহ ॥

আদিবাসী সমাজে বিধবা বিবাহের সম্মতি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মৃত স্বামীর ভ্রাতাই বিধবাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করে। কানিক্কর-মুথুভান সমাজে এটাই নিয়ম। মৃত স্বামীর অগ্রজের সঙ্গে বিধবার বিবাহের রীতি মালাপুল্যাদের মধ্যে দেখা যায়। সেমা নাগারা মা ছাড়া পিতার অন্য বিধবাকে বিবাহ করতে বাধ্য। পরিবারে একবার যাকে নেওয়া হয়েছে তাকে রাখার জন্যই মধ্য-ভারতে মৃত অগ্রজের বিধবাকে বিবাহ করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। বিহারের খাড়িয়া সমাজেও বিধবা বিবাহের রীতি আছে। একজন বিধবা আরেকজন বিপত্নীক পুরুষ বা অবিবাহিত যুবককে বিবাহ করতে পারে এবং এর জন্য কোন কন্যা-শুল্ক লাগে না।

মোটামুটি এই বারটিই হোল ভারতের আদিবাসী সমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ-রীতি।

॥ চিত্ররসিক ॥

হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির উদ্যোগ

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী-গৃহে হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। প্রদর্শিত ছবি এবং ভাস্কর্যের সংখ্যা সত্তরটিরও অধিক। আজকের দিনের শিল্পে আধুনিকতার হাওয়া সর্বত্রই বইতে দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশও তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত হতে দেয়নি। বিশেষ করে সেখানকার ললিতকলা অ্যাকাডেমির সংগ্রহের যে অংশ এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তা প্রায় একই ধরণের। কেবল হায়দ্রাবাদ মিউজিয়ামের "ফুল ওয়ালোঁ কা মেলা" নামে ছবিটি এর ব্যতিক্রম। প্রাচীন মুঘল প্রথায় (অথবা দাক্ষিণী প্রথায়) আঁকা কয়েক শ লোকের নিখুঁত প্রতিকৃতি সাজিয়ে আঁকা এই বৃহদাকার ছবিটি এতগুলি একই ধরণে আঁকা ছবির মধ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের প্রচেষ্টা

এরপর কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে, এই সহস্র সমস্যাসঙ্কুল শহরের সমস্যার ধরণ এবং তাদের সম্ভাব্য উন্নয়নের পরিকল্পনার বিবরণ যে ম্যাপ আর চার্টের সহযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে, তার উল্লেখ করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতা শহরের আকার ও আয়তন কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই থেকে শুরু ক'রে কলকাতার খাদ্য সমস্যা কিভাবে সমাধান হয়, এখানকার লোকবসতি, তাদের অর্থোপার্জন সমস্যা, বস্তী সমস্যা, যানবাহন ইত্যাদি নাগরিক জীবনের বহু বিভিন্ন সমস্যাগুলি ম্যাপ এবং চার্টের সাহায্যে সুন্দরভাবে বোঝান হয়েছে। নতুন পরিকল্পনায় গৃহ এবং যানবাহনাদি সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হবে বলে স্থির হয়েছে তার কতকগুলি ছবি দেওয়া হয়েছে। এই প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে শহরবাসীর মনে কৌতূহল জাগাবে।

শিল্পী রাখালচন্দ্র দাসের একক প্রদর্শনী

এ সপ্তাহে (৯ই নভেম্বর) অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী-গৃহে নতুন শিল্পী রাখালচন্দ্র দাসের একক প্রদর্শনীর শুরু হল। শিল্পী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পাশকরা ছাত্র। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগে কাজ করেন। এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। ২২ খানি ছবি নিয়ে তাঁর আগমন। আধুনিকতার হাওয়ায় শিল্পী গা ভাসিয়ে দেননি। চোখে যা দেখা যায় তাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রায় সব ছবিই জলরং এবং প্যাস্টেলে আঁকা। কিন্তু আঙ্গিকের ব্যবহারে কিছুটা একঘেয়েমি আছে। প্রতিকৃতির মধ্যে 'অভিনেতা' (১০) ছবিটি তৃপ্তিকর। নিসর্গ চিত্রের মধ্যে ৫, ৭, ১৭ এবং ২০ সংখ্যক ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে বর্ণপ্রয়োগে বৈচিত্র্যের কিছু অভাব দেখা যায়, এইসব এবং আরো কতকগুলি কারণে ছবিগুলির মধ্যে কিছুটা ক্যালেণ্ডার-মার্কা ভাব এসে গিয়েছে।

শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর একক প্রদর্শনী

১১ই নভেম্বর থেকে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর একক শিল্প প্রদর্শনী শুরু হল। তেলরং, জলরং আর চারখানি ড্রইং নিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশটি ছবি শিল্পী উপস্থিত করেছেন। এই তরুণ শিল্পী এখনো নিজেকে খুঁজে পাননি। তাই কোন পথে তিনি যাবেন সে সম্বন্ধে তাঁর অনিশ্চয়তাই সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে ফুটে রয়েছে। তেলরংয়ের ছবিগুলির মধ্যেই এই অনিশ্চয়তার ছাপ প্রকট। বস্তুনিষ্ঠ এবং ডেকরেটিভ এই উভয় রীতির মধ্যেই তিনি যাওয়া আসা করছেন। মনে হল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ইউরোপে যে এক্সপ্রেসনিস্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তার প্রতিই যেন তাঁর ঝোঁকটা কিছু বেশী। উদাহরণস্বরূপ ১, ১১ এবং ১৫ সংখ্যক ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, (৭, ৮, ১১, ১২, ১৬) কিন্তু সে দৃষ্টি তেমন সচেতন নয়। বর্ণবিন্যাস অনুজ্জ্বল, রেখাঙ্কন দ্বিধাগ্রস্ত। কখনো কখনো "তুলি-কর্ম" (ব্রাশ ওয়ার্ক) দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, ফলে সেটি বক্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার বদলে দৃষ্টির বিভ্রান্তি রচনা করতেই সমর্থ হয়েছে। এ-সব দৌর্বল্যের কারণ, নিজের চোখে দেখা নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টার পরিবর্তে পরের চোখে দেখা পরের অভিজ্ঞতার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ। জলরং-এর ছবিগুলি একটু মামুলী ধরণের। বর্ণপ্রয়োগের দ্বিধা-সংকোচ এখানেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু তাঁর তেলরংয়ের ছবিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের দিকে শিল্পীর মনোযোগের ফলে দর্শকের যেমন খানিকটা বিভ্রান্তি-বোধ ঘটে, জলরংয়ের ছবিতে এত আঙ্গিক-বৈচিত্র্য এড়িয়ে বিষয়বস্তুকে ফোটাবার চেষ্টার দরুণ এদের মধ্যে একটা একতার ভাব আছে। তাই এগুলির মধ্যে ৩১ এবং ৩৭ সংখ্যক ছবি দুটি অসাধারণ না হলেও তৃপ্তিকর।

রেখাচিত্র : মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

।। কলমের এক খোঁচায় ।।

এক কলমের খোঁচায় যখন আপনার আমার চাকুরীর জীবনে ওঠা-নামা, এমন কি মর্মান্তিক ধ্বংস পর্যন্ত নামতে পারে, তখন সেই সর্বশক্তিমান কলমকে ভয় না করে আমাদের উপায় কি? দোলনা চেয়ারে দুলতে দুলতে যে ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে আপনার আমার সার্ভিস রেকর্ডে স্তূপীকৃত প্রশংসাকে এক কলমের আঁচড়ে বাতিল করে দিয়ে, নীচুতে নামিয়ে দিতে না পারলেও, বেশী বাড় আর বাড়ার রাস্তায় কন্টকের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁর সেই দেড়শ টাকা দামের কলমটিকে সত্যিই যে কোন তরবারির চাইতে শক্তিশালী ভাবা মোটেই আমাদের পক্ষে আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আর ইদানীং ব্যবসা মন্দা রূপ অর্থনৈতিক সংকটের নয়া পরিত্রাণ হিসেবে চালু র‍্যাশানালাইজেসান কথাটির কল্যাণে এই কলমের খোঁচায় সত্যিই ত তরবারির কোপ আমাদের ঘাড়ে বেশ ঘনঘনই পড়ছে। তবু কেরানী হিসাবে কলম নামক বস্তুটিকে এই কারণে ভয় করলেও, আমার কলম ধরার উদ্দেশ্য অন্য।

হ্যাঁ, আমি কেরানীদের পক্ষ থেকেই একটা নিবেদন রাখতে চাই, সেই সব সাহিত্যিক-কলমধারীদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা কেরানীদের সাহিত্য-পাঠক হিসেবে ভাবতে লজ্জিত হন, যাঁরা নিজেদের সৃষ্টি (অনাসৃষ্টি কিনা সে বিচার করবার যোগ্যতা আমাদের নেই, তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলার সাহসও নেই আমাদের) সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে লেখেন, 'যাঁরা রাত ৯৷৷ নাগাদ শয়নগৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসেবে জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ যাঁদের ঘুমে কাটে, ভোরের অক্ষম পিচুটি কচলিয়ে জেগে ওঠে তাঁরা যা আশা করতে পারেন তা হল হরিণঘাটার, দুধ, ওই জন্য তাই-ই তাঁরা পেয়ে থাকেন, আধুনিক সাহিত্য তাঁদের জন্য নয়। গোটা রাত্রি জুড়ে কী হল এ'দের জানাতে যাওয়া বৃথা, এ'রা জানবেন না কোন দিনই।'

এই শেষের উত্তর দেওয়া বা রাত জাগার উপলব্ধিতে এ'দের কলমের খোঁচায় কি রত্ন আহরিত হচ্ছে তাও পরিবেশন আমরা করতে চাই না। তবে সাহিত্যস্রষ্টা না হলেও সাহিত্য-পাঠক হিসাবে আমাদের বক্তব্য কিছু আছে। খুবই প্রাঞ্জল সে বক্তব্য এবং সাহিত্যের সোনার কলম যাঁদের হাতে তাঁদের এ বক্তব্যে (আজ না হলেও) কর্ণপাত করতেই হবে। কারণ পৃথিবীর সব কিছু পদার্থের পরিবর্তন ঘটে থাকলেও কলম মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতির একমাত্র অপরিবর্তনীয় হাতিয়ার। যে কলমের আঁচড় কেটে একদিন মানুষের জ্ঞান, মানুষের সৌন্দর্যের, এই পৃথিবীর যা কিছু ভাল তার প্রতি মানুষের

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, যে কলম ধরে বিশ্বের জ্ঞানী চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক, দার্শনিক মানুষের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত করে গেছেন, যে কলমে লিখে গেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, সেই কলমের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বলেই আমরা দুঃখ পাই যখন রাত-জাগা (!) অসুস্থ মনোবিকলনকে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে আমরা মেনে নিতে না পারলে আমরা সাহিত্যিক পদবাচ্য এই সব কলমধারীদের কাছে ব্যঙ্গই পাই শুধু।

বুদ্ধি আমাদের কম হলেও এটাও আমরা বুঝি, যুগে যুগে সাহিত্যের ফর্ম বদল হয়, স্টাইল পালটায় কিন্তু তাই বলে অস্থির সমাজ-ব্যবস্থাজনিত হতাশার অজুহাত দেখিয়ে সাহিত্যকে ঘৃণাউদ্রেককারী বস্তুতে পরিণত করতে হবে, এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রক্ষণশীলের মত নোংরা ঘাটা মাত্রই আমরা যদিও নিন্দার বলব না, কিন্তু সেই নোংরার মধ্য থেকে কিছু একটা উজ্জ্বল সত্যও আবিষ্কার করা চাই, যে সত্যের মুখোমুখি হয়ে আমরা জীবনের প্রতি আস্থার আরও দৃঢ় হতে পারব, জীবনের প্রতি অনুরাগে ভাবতে পারব আমাদের এই বাঁচাটা, নানা হীনতা, তুচ্ছতার মাঝেও, কম শ্লাঘার বস্তু নয়।

আমাদের তাই একটাই বক্তব্য, সাহিত্যিকের কবির সোনার কলম যাঁদের হাতে, তাঁদের উদ্দেশ্যে, আর যাই করুন আপনাদের এক কলমের খোঁচায় মানুষকে ছোট করবেন না। মানুষের অনেক দোষ, অনেক সঙ্কীর্ণতা, ও অনেক জটিল মানসিকতায় তারা শিকার, তবু মানুষ মানুষই। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে তার মানবিকতা, তার মহত্ত্ব। মানুষকে মনোবিশ্লেষণের সস্তা থিয়োরী দিয়ে যাচাই না করে, নিজের আবেগ-বুদ্ধি অনুভূতি দিয়ে বিচার করুন, তারপর সাদা কাগজের পাতায় আপনার কলমটা রাখুন। আপনার পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য আপনার নাগালে যখন রয়েছে, তখন এটা নিশ্চয় আপনাদের বলে দিতে হবে না, মানুষকে মহত্ত্বে মহিমান করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই এই সব পূর্বসূরীদের কলমের আঁচড় কালের প্রহারেও আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

আপনাদের একথা বলব না, দলের নির্দেশ লিখলেই বা কোন থীম'কে অবলম্বন করে লিখলেই, আপনারা আপনাদের কলমের মর্যাদা রাখবেন, এও বলব না শ্রমিক-কৃষক সমস্যা, সংগ্রাম, প্রগতি, শ্রেণী-সংঘর্ষ আপনাদের রচনায় না থাকলে তা সাহিত্যই নয়। কিন্তু এটা বলব আপনাদের রচনায় যেন জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়, যেন আপনাদের কলমে মানুষ তার সহস্রবিধ তুচ্ছতার মাঝেও নিজের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা রেখে যায়।

আপনার সৃষ্টি ফর্মে স্টাইলে, কাঠামোয় আধুনিক হোক, কিন্তু জীবনের প্রতি আস্থায় যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। হয়ত তাতে কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার আপনাদের হতেও পারে। কিন্তু কলমের মর্যাদা রাখতে পেরে নিজেদের গর্বিত ভাবতে পারবেন এবং আমরাও সাহিত্যের আবদ্ধ জলাশয়, শহরের বুকে পানশালায় ভিড় জমে ওঠার মত, নোংরা জঞ্জাল জমে উঠতে দেখে আপনাদের কলমকে যে রীতিমত ভয় করতে শুরু করে দিয়েছি, সে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারব। আমরা চাই, আপনাদের নিদ্রাহীন রাত্রের সৃষ্টি, রাতের শেষে নিছক সৌখীন কারিকুরির প্রলোভনে যে জীবনে আমরা জেগে উঠি, তা যেন না কুৎসিত করে তোলে।

কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী, বিকৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে আপনারাও এ কথাটি ভুলে গেলে, আমরা সাধারণ মানুষ যারা মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি, তারা কি সে ভরসা পাব বলতে পারেন?

জানি এ যুগে অনেক যন্ত্রণা, তারও ছাপ আসবে আপনাদের কলমের মুখে, কিন্তু সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হলে নোংরা আবর্জনার মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থেকে আক্ষেপই করে যাওয়াই কি আমরা আমাদের জীবনের একমাত্র পরিণতি বলে ভাবব। জীবনের প্রতি অনুরাগে দীপ্ত অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্যের কত শত বৎসরের ইতিহাস কিন্তু একথা বলে না।

তরবারি দিয়ে ঘাস কাটাটা যেমন হাস্যকর, তেমনি কলম দিয়ে জীবন-বিমুখ কোন অসত্যকে সত্য বলে চালানোও এই অতীত ঐতিহ্যেরই অসম্মান।

তাই কামনা করি বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের কলমই বিরাট কিছু সৃষ্টি করতে না পারুক, অন্ততঃ জীবনের প্রতি অনুরাগটুকু পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে যেন পারে। সে-টুকুতেই তাঁদের কলম ধরার সার্থকতা।

॥ ডাঃ কার্ভের জীবনাবসান ॥

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী ভারতরত্ন ডাঃ ধন্দো কেশব কার্ভে গত ৯ই নভেম্বর পরলোকগমন করেছেন ১০৪ বৎসর বয়সে। স্বর্গত মনীষী ডাঃ বিশ্বেশ্বরায়ার ন্যায় এই মনীষী পণ্ডিত ছিলেন ভারতীয় জনগণের এক অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এই অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ রাণাডে, তিলক, গোখরে ভাণ্ডারকর প্রভৃতির সঙ্গে জাতীয় ইতিহাসে এক উচ্চস্থানের অধিকারী।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে তিনি পুণা ফার্গুসান কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯২-১৯২৪ পর্যন্ত এই কাজে আবদ্ধ থাকলেও সমাজ-সংস্কারকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন বহুপূর্ব থেকেই। ১৯০৭ সালে তাঁর বিখ্যাত মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৬ সালে যে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন তার কাজেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। দেশে-বিদেশের নানা পণ্ডিত এসেছেন এখানে। পণ্ডিত মালবীয়ের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পর একক প্রচেষ্টায় এমন অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ বর্তমান ভারতে আর চোখে পড়ে না। তাঁর এই মহৎ কাজে অপর দুজন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য স্যার বিটলদাস থ্যাকার্স এবং শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর থ্যাকার্স। সামগ্রিকভাবে নারী-সমাজের সেবার কাজে উৎসর্গীকৃত এমন সেবাব্রতন অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এই অমরসাধক সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ সকল ক্ষেত্রেই এক অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ পরলোকে মিসেস রুজভেল্ট ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য যুদ্ধকালীন প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী মিসেস রুজভেল্ট ৭৮ বৎসর বয়সে ৭ই নভেম্বর নিজ গৃহে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর যোগাযোগ এবং তিনি ডেমোক্রাট দলের সমর্থক ছিলেন। গত বৎসর যে জনমত গ্রহণ করা হয় তাতে তিনি 'বিশ্বের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন মহিলার আসন' লাভ করেন। গত বৎসরই বানারোজো বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেনর রুজভেল্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন ইতিহাসের এই মহীয়সী মহিলা

আপন প্রতিভাগুণে এক অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

॥ কঠিন সমস্যা ॥

দেশ আজ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অনতিবিলম্বেই যুদ্ধ শেষ হবে এমন ভুল ধারণা যেন কারও মনে না থাকে এবং আরও রক্ত ও অশ্রুপাতের জন্য সারা দেশ যেন প্রস্তুত থাকে।

যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের ফলাফল ভারতের বিরুদ্ধে গেছে। কারণ ১৯৫৬ সালের পর ১৯৬০ সালের মানচিত্রে চীন নতুন করে ভারতের যে কয়েক হাজার বর্গমাইল জমির উপর দখল দাবী করেছিল তা ২০শে অক্টোবরের পর প্রথম ১৭ দিনের যুদ্ধেই চীন ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আপাতত ভারতের কোন ভূমিখণ্ডের উপর চীনের আর দাবী নেই। ওদিকে সীমান্তে কঠিন শীত নামায় মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখাও চীনের পক্ষে এখন কঠিন হবে। এঅবস্থায় চীন এখনই হয়ত আর অগ্রসর হবে না এবং যা সে ইতিমধ্যে দখল করেছে তার ওপর কায়েম বজায় রাখার দিকেই সে দৃষ্টি দেবে।

সুতরাং আত্মরক্ষার সংগ্রামের অধ্যায় ভারতের পক্ষে শেষ হয়েছে, হৃতভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতকে এখন আক্রমণাত্মক সংগ্রাম সুরু করতে হবে। একাজ যে সহজসাধ্য নয় তা সহজেই অনুমেয়। প্রবল প্রত্যাঘাতের ঝুঁকি নিয়ে আক্রমণকারী চীন এখন ভারতের উত্তর ভূখণ্ডে প্রস্তুত হয়ে আছে, প্রবলতর শক্তির সহায়তা ছাড়া তাকে পিছু হটানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র। আবার ভারত যখন হৃতভূমি পুনর্দখলের সংগ্রাম সুরু করবে তখন যুদ্ধবাদী চীন যে কি আচরণ করবে তা এখন থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয়। চীন হয়ত তখন এমন এক আক্রমণাত্মক নীতি নেবে যার ফলে যুদ্ধ আর উত্তর সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এইজন্যেই প্রধানমন্ত্রী বারবার করে বলেছেন, চীনা অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় কেউ যেন না মনে করেন যে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে।

ভারতের সকল মানুষের সম্মুখে আজ একটিই মাত্র কর্তব্য আছে। তা'হল সকল বাদবিসম্বাদ ও অভাব অভিযোগের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করা। যখন যে আহবান জানাবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তা বিনা প্রশ্নে পালনের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে সারা দেশ। আজ একথাই যেন ভাবি সবাই যে, মাতৃভূমির পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোন স্বার্থত্যাগই চরম ত্যাগ নয়।

॥ ব্যর্থ দৌত্য ॥

যুদ্ধবাদী চীনকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি

নাসের। এসিয়া ও আফ্রিকার মহান ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার আন্তরিক আগ্রহে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি লাল চীনের মদমত্ত নেতাদের কাছে। কিন্তু সে আবেদন তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। যে চারটি সর্তে তিনি ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ভারত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করলেও চীন তাতে সম্মত হয়নি। ফলে নিরুপায় হয়েই নাসেরকে হাতগুটাতে হয়েছে।

কিন্তু তবুও আমরা বলব, তাঁর প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আরব নেতার এই উদ্যোগের ফলে এটুকু অন্তত প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত যুদ্ধ চায়নি। নয়া সাম্রাজ্যবাদী চীনের অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধকল্পেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে সে। আর এই সত্যটুকু প্রমাণিত হওয়াতেই আজ দেশদেশান্তর হতে আসছে ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

॥ সমর্থন ॥

আক্রান্ত হওয়ার পরেই ভারত পৃথিবীর সকল দেশের কাছে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। সে আবেদনে পৃথিবীর সকল দিক হতে যে বিপুল পরিমাণ সাড়া পাওয়া গেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। এপর্যন্ত চল্লিশটি দেশ প্রকাশ্যে চীনের আক্রমণের নিন্দা করে ভারতের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। কমিউনিষ্ট দেশগুলি ভারতকে সমর্থন না করলেও একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া আর কেউ প্রকাশ্যে এখনও পর্যন্ত চীনের পক্ষে সমর্থন জানায়নি। বর্তমানে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির এই নীরবতা ও নিরপেক্ষতার মূল্য কিছু কম নয়। চীন কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তারা যে চীনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি তার দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হয় যে, চীনের দাবীকে তারা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেনি।

॥ নতুন প্রস্তাব ॥

বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজে একঘরে হয়ে চীনের কিছুটা সম্বিত ফিরেছে বলে মনে হয়। বোধহয় চীন এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, তার অনর্গল মিথ্যা প্রচারে কোন কাজ হয়নি। ভারত আক্রমণকারী এমন আজগুবি কথা দুনিয়ার কাউকে বারে বারে শুনিয়েও বিশ্বাস করাতে পারেনি সে। ভারতের পক্ষে অর্থ অস্ত্র ও সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে এতগুলি দেশ, কিন্তু তার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি। সুতরাং তার সাম্রাজ্যবাদী লালসা যদি চরিতার্থ করতে হয় তবে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিয়েই করতে হবে।

কিন্তু বিশ্বপরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও চীনের বর্তমান মনোভাবের প্রকৃত কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্তত তার ৭ই নভেম্বরের প্রস্তাব পাঠে তা বোঝা যায় না। পূর্বভাগে ম্যাকমেহন লাইনকেই ভারতের সীমা বলে মেনে নিতে চীন রাজী এবং ম্যাকমেহন লাইনের ১২ মাইল উত্তরে তার সৈন্যবাহিনী পিছিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সে প্রস্তাব যে অর্থহীন তা বোঝা যায়, ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে চৌ এন লাই-এর নূতন ব্যাখ্যায়। তিনি যে সীমান্ত বরাবর ম্যাকমেহন লাইন টানতে চান তা মানতে হলে শুধু পূর্ব সীমান্তেই ভারতকে প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল স্থান হারাতে হবে। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য বিভাগের সীমান্ত রেখা সম্বন্ধে চীনা প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুতরাং আপোস ও যুদ্ধবিরতির জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে যে আবেগটুকু প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কথার মারপ্যাঁচে বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করাই এই প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

॥ পাক-দৌরাত্ম্য ॥

ভারতের বিরুদ্ধে চীনের নগ্ন ও নির্লজ্জ আক্রমণে সারা বিশ্বের জনমত বিক্ষুব্ধ হলেও এই সুযোগে কাজ গুছানোর মতলবে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়েছে পাকিস্তান। আজন্ম ভারতের বৈরী এই দেশটির ধারণা, ভারতের এখন খুবই বেকায়দা অবস্থা, সুতরাং তার কাছ থেকে কিছু যদি আদায় করে নিতে হয় তবে এই তার উপযুক্ত সময়। তাই যাদের কাছে পাকিস্তানের আজ টিকি পর্যন্ত বাঁধা, সেই বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ সত্ত্বেও পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে তার যা দাবী-দাওয়া তা আদায়ের চেষ্টা এখন তারা বন্ধ করবে না।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে ন'বছর আগে গৃহভৃত্যের মত বিতাড়িত হয়েছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তারপর গত ন'বছর লজ্জায়, অপমানে ও আরও বেকায়দায় পড়ার ভয়ে একবারের জন্যেও মুখ খোলেননি তিনি। আজ পূর্ব-পাকিস্থানে জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে জনাব সুরাবর্দীর নেতৃত্বে যে প্রবল গণ-আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে খাজা সাহেবকে কোন কাজে লাগানো যায় কিনা পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে আয়ুব খাঁ প্রায় ঠান্ডা ঘর থেকে টেনে বার করেছেন তাঁকে। আয়ুব খাঁর হুকুম তামিলের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন মুশ্লিম লীগের সভাপতি হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিন, আর হওয়ামাত্রই হুমকি ছেড়ে বলেছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি চাই ভারতের বিরুদ্ধে, সৈন্য মোতায়েন করো ভারতের সীমানা বরাবর। কাশ্মীরে গণভোট এখনই চাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর গত ১৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ একবারের জন্যেও তাদের শাসক নির্বাচনের সুযোগ পায়নি। তারপর আয়ুবশাহী কায়েম হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রায় দশ কোটি নাগরিককে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা ভোটদানের অযোগ্য। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় মতামত দেওয়ার মতো বুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তি তাদের নেই। অতএব তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারও স্বীকার করা হবে না। এইভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে পাকিস্তানের যে শাসকবর্গ তারাই আজ কাশ্মীরের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণের দাবীতে মুখর! জনমতের প্রতি পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকদের যে কতখানি শ্রদ্ধা তা বিশ্ববাসীর অজানা নেই। সুতরাং সুযোগ বুঝে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আবার জিইয়ে তোলার এই অপপ্রয়াসেও পাকিস্তান বিশ্বের কোন দেশের সমর্থন পাবে না। উপরন্তু ভারতের বর্তমান অসুবিধার সুযোগ নেওয়ার জন্য তাদের নিন্দনীয় প্রয়াস সর্বত্রই নিন্দিত হবে। বস্তুত আজ চীনকে তার হঠকারী নীতির জন্য যেভাবে একঘরে হতে হয়েছে, পাকিস্তানকেও তার বর্তমান নীতির জন্য একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীতে এমন বুদ্ধিহীন দেশ একটিও নেই যে ভারতের বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালী করবে। সংখ্যাতীত সমস্যায় সমগ্র পাকিস্তান আজ বিপর্যস্ত এবং ভারতের সৌহার্দ ও সহযোগিতা ছাড়া তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। এই সত্য যতদিন না পাকিস্তান উপলব্ধি করতে পারবে ততদিন তার দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে না এবং সমস্যার বোঝাও দিনের পর দিন বেড়ে চলবে।

॥ ঘরে ॥

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক ঃ 'জাতির মর্যাদার প্রশ্নে আপোষের কোন স্থান নাই—চীন বর্তমানে আর প্রতিপক্ষ নয়, শত্রু'—দিল্লীতে সাইপ্রাস প্রেসিডেন্টের (ম্যাকারিওস) সম্বর্ধনা-সভার শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কর্তৃক সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার দান।

কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ কর্তৃক চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা—গৃহীত প্রস্তাবে ভারত সরকারের সকল ব্যবস্থা সমর্থন।

কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গের স্থলে 'বাংলা' করার সিদ্ধান্ত।

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক ঃ নেফা ও লডাক রণাঙ্গনে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা—একমাত্র ওয়ালং-এ উভয় (চীন-ভারত) পক্ষের মধ্যে সামান্য গুলী বিনিময়।

ব্যাংক অব চায়নার লাইসেন্স বাতিল—জনস্বার্থে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কার্যব্যবস্থা— সরকারী লিকুইডেটর কর্তৃক ব্যাংকের সম্পত্তি গ্রহণ।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক ঃ রাষ্ট্রবিরোধী যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার অথবা আটক করার ব্যবস্থা—নূতন অর্ডিন্যান্সবলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জরুরী ক্ষমতা গ্রহণ।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক ঃ নেফার ওয়ালং-এর নিকটে ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা আঘাত।

ভারতের সংকটে ফরাসী সরকার ও জনগণের সহানুভূতি জ্ঞাপন—শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পত্র।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক ঃ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর) সমর্থ ব্যক্তিদের রাইফেল চালনা শিক্ষাদান—দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিকল্পনামত ভারতীয় ফৌজের দৌলতবেগ ওল্ডি ঘাঁটি (লডাক অঞ্চল) ত্যাগ—ওয়ালং-এর নিকট উভয়পক্ষে (ভারত-চীন) গুলী বিনিময়।

সমগ্র ভারতে শেয়ার ও সোনার বাজারে তীব্র মন্দা—বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক ঃ ত্রিশজন সদস্য লইয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত—চেয়ারম্যান ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

লডাকে চুশুলের নিকট নূতন চীনা সৈন্য আমদানী—ভারতীয় জওয়ানদের গুলীবর্ষণে ওয়ালং-এর নিকট চীনাদের পশ্চাদপসরণ।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সীমান্ত জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) কর্মক্ষম ব্যক্তিদের রাইফেল ব্যবহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিদায়—প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত।

বিভিন্ন রাজ্যে 'চীনাপন্থী' ৪১জন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট গ্রেপ্তার—দিল্লীতে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীবি টি রণদিভে ধৃত—নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার জন্য নাগরিক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত।

॥ বাইরে ॥

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক ঃ ভারত ও চীনের মধ্যে অবিলম্বে সংঘর্ষের (সীমান্ত) বিরতি ও চীনা সৈন্যদের অপসারণ (৮ই সেপ্টেম্বরের সীমারেখায়) দাবী—কায়রো বেতারে প্রেসিডেন্ট নাসেরের (যুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র) চার দফা প্রস্তাব প্রচার—শান্তিপূর্ণ পন্থায় সীমান্ত বিরোধ মিটাইতে সংশ্লিষ্ট দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়কে আহ্বান।

রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে কাস্ত্রোর (কিউবার প্রধানমন্ত্রী) আপত্তি—উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল) কিউবা শান্তি মিশন কার্যত ব্যর্থ।

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক ঃ চীন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নাসেরের মীমাংসা প্রস্তাব অগ্রাহ্য—ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে চীনের আপত্তি—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর নিকট রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের দ্বিতীয় পত্র।

সোভিয়েট মহাকাশযানের ('মঙ্গলগ্রহ') মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে যাত্রা—মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান উৎক্ষেপণের প্রথম উদ্যম।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক ঃ রাওয়ালপিণ্ডিতে শীর্ষস্থানীয় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদের সহিত পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বৈঠক—চীন-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক ঃ ভারতের প্রতি খাজা নাজিমুদ্দীনের (পাকিস্তান মুসলীম লীগের নব-নির্বাচিত সভাপতি) রণহুংকার—৪-দফা সর্ত (গণভোট গ্রহণের দাবীসমেত) না মানিলে কাশ্মীর সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করার হুমকী।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক ঃ 'ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের (ভারতকে প্রদত্ত) ফলে চীন-ভারত সংঘর্ষ ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জল্পনা-কল্পনা—পাকিস্তানের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সদম্ভ উক্তি ঃ কাশ্মীর না ছাড়িলে পাকিস্তান ভারতকে সমর্থন করিবে না।

'ভারতের উপর চীনা আক্রমণ শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের বিপদ'—শ্রীনেহরুর নিকট ডাঃ আদেনুয়েরের (পশ্চিম জার্মান চান্সেলার) লিপি—অপর পক্ষে জাপ প্রধানমন্ত্রী ইকেদারও উদ্বেগ প্রকাশ।

'সর্বপ্রথম যুদ্ধ-বিরতি ও পরে সর্তবিহীন গোলটেবিল বৈঠক—ভারত ও চীনের নিকট 'প্রাভ্দা'র (সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র) প্রস্তাব।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক ঃ ভারতের নিকট চীনা প্রস্তাবসমূহের 'সঠিক উত্তর' দাবী—মীমাংসায় না আসিলে আত্মরক্ষার জন্য চীনকে প্রত্যাঘাত শুরু করিতে হইবে বলিয়া পিকিং সরকারের নূতন হুমকী।

'ব্যাঙ্ক অব্ চায়না' বন্ধ করার জের—ভারতের নিকট চীনের প্রতিবাদ।

১লা জানুয়ারী (১৯৬৩) মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য রাষ্ট্রসংঘের আহ্বান।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক ঃ চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের অবসান-কল্পে নূতন ভাষায় চীনা প্রধানমন্ত্রীর (চৌ এন-লাই) পুরাতন প্রস্তাব—শ্রীনেহরুর নিকট চৌ-এর আর একদফা লিপি—৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন।

মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জয়—প্রেসিডেন্ট কেনেডির পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল।

ইংরাজ লেখকের দৃষ্টিতে ভারত

অভয়ঙ্কর

আজ এবং যে কালে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সেই অন্ধকার দিনেও, কোনো সময়েই ভারত-আত্মার অন্তরে এতটুকু বিদ্বেষ বা তিক্ততা ছিল না। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রীতির মনোভাবই অক্ষুন্ন ছিল। ভারত ইংরাজের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করেছে, তার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে—এমন কি ইংরাজী ভাষা অতিশয় স্বচ্ছন্দ এবং সহজ ভঙ্গীতে ভারতবাসী ব্যবহার করেছেন তাঁদের আবেদন নিবেদনে, বাদ-প্রতিবাদে, সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যে। এই বৈদেশিক ভাষায় ভারতবাসী এক আশ্চর্য সাবলীলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জবাহরলাল নেহরু। এ'রা সকলেই ইংরাজী ভাষায় শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর বাদসার আমলে চার শতাব্দী আগে প্রথম জেমসের আমলে যে-ইংরাজ এদেশে এসেছিলেন এবং কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির অনুমতি লাভ করে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, সমগ্র জাতির রাষ্ট্র-নৈতিক অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁরাই আবার একদিন 'হে বন্ধু বিদায়' বলে ভারত ত্যাগ করে গেছেন। উভয়-পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল প্রীতি-মধুর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শাসক-গোষ্ঠী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মানুষ ভারতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এবং ভারত-আত্মার মর্মবাণী উপলব্ধীর জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদল দেশ গঠনেও সহায়তা করেছেন একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন্য। উইলিয়ম জোন্স, হেনরী কোলব্রুক এবং ডানকান প্রভৃতির মত প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদরা ছিলেন আবার হিউম, বার্ক এবং ক্রীপসের মত সহানুভূতিশীল রাজনীতিক ও সংস্কারক, ঐতিহাসিক, ধর্মপ্রচারক, চিত্রশিল্পী এবং লেখকবৃন্দ, বিশেষতঃ কবি ও ঔপন্যাসিকের দল ভারতের আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন, তাঁদের অনেকের কাছে হয়ত ভারতবর্ষ রহস্যময়পুরী এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ চক্রান্তে পূর্ণ মন হয়েছে, তবু তাঁদের আগ্রহ ক্ষুন্ন হয়নি।

ঘনিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট অনুশীলনের ধারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট এবং গভীরতর বোধ লাভ করেছেন, তার ফলে এই সব সাহিত্যিকের উপন্যাস প্রভৃতি ক্রমশঃ মানবিক আবেদনসম্পন্ন এবং বিদ্বেষবিহীন হয়ে উঠেছে।

ই, এম, ফরস্টার রচিত "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" এই জাতীয় প্রগতিমূলক উপন্যাসাদির গোড়ার যুগের গ্রন্থ, তারপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে আরো কয়েকটি রচিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উৎস ক্ষীণ হয়নি। জন মাস্টারস জাতীয় (ইনি কিন্তু আংলো-ইণ্ডিয়ান) লেখকবৃন্দ ভারতীয় পটভূমিকায় অনেক কাহিনী লিখে চলেছেন, তাঁদের অনেকগুলি গ্রন্থ সাফল্যলাভ করেছে। এই ধারা, এক হিসাবে একে বাঞ্ছনীয় এবং সুস্থ ধারা বলা যায়, কারণ এই সংযোগহেতু উভয়-দেশকে পরিণামে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতেও পারে। যদিও এই কালে অচ্ছেদ্য বন্ধনের আকস্মিক অবসানও হামেশাই ঘটে থাকে, তবু ভালো ফলটাই সাধারণ মানুষ আশা করে।

এ কথা বলা উচিত যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বা ভারতকে পটভূমি করে লিখিত কাহিনী মাত্রেই উৎকৃষ্ট তা নয়, কয়েক খানির মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা না থাকাই উচিত ছিল, লেখকের অজ্ঞতার পরিচায়ক ইত্যাদি। কিন্তু এর মূলে আছে অতীতের ধারণা, যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। এইসব উপন্যাসে তাই অতীতের ভারতের পট-ভূমিকা, এমনকি কোনো ক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দী আগেকার, কিছু আবার অতি-আধুনিককালের। ভারতের রাজনৈতিক জীবন, রাজা মহারাজার বিলাসবহুল জীবন। ওপরতলার সমাজের রঙীন চিত্র, ক্যাডিল্যাককণ্টকিত হোটেলে আর হৈ-হৈ-ময় জীবনের চাপে ভারতের হাট-বাজারের চিত্র চাপা পড়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে যা পাওয়া যায় তা প্রীতিপদ এবং মনোরম।

এই জাতীয় লেখকদের মধ্যে যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের নাম এডওয়ার্ড টমসন, ডঃ ভেরিয়ার এলুইন, সমরসেট মম, ই, এম, ফরস্টার, মিস রুমার গডেন এবং জন মাসটারস। ফরস্টারের মত টমসনের উপন্যাসও রচিত হয়, কয়েক যুগ
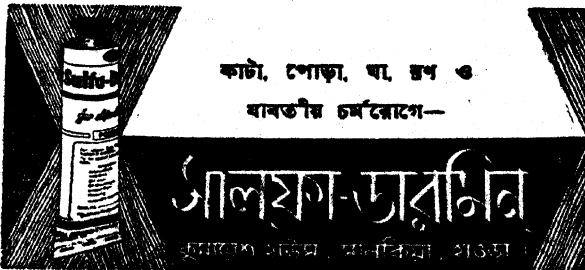
আগে। কিন্তু তাঁর রচিত "ইণ্ডিয়ান ডে", "এনড্ অফ্ আওয়ার্স" কিংবা "ফেয়ার ওয়েল টু ইণ্ডিয়া" যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে কি গভীর অনুভূতি নিয়ে তিনি এই গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।

"এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" ভারতীয় মানসিকতার আর এক পরিচয়। এ ছাড়া ব্রিটিশরা এদেশে কি জীবনযাপন করেছে, এদেশের আইনগত ও ন্যায়-সংগত রাজনৈতিক অভীপ্সা সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজপুরুষ এবং নাগরিকদের ধারণা। ডঃ আজিজের জ্বালা ও যন্ত্রণা, তাঁকে একটা মিথ্যা অভিযোগে জড়ানো হয়েছিলো, অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে লিখিত। ব্রিটিশ প্রভুত্ব এবং অহমিকার ফলে নিরপরাধকে কি ভাবে কষ্ট পেতে হয় তার দৃষ্টান্ত এখনো পর্যন্ত এই দিকটি কোনও লেখক এমন নিষ্ঠার ও সততার সংগে তুলে ধরেনি। ফলে এই উপন্যাস চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কিপলিঙের ভারত এবং ফরষ্টারের ভারত দুটি বিভিন্ন দেশ— উভয়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান।

সমর সেট মমের 'রেজর্স এজ' আর এক দিক উদ্ঘাটিত। ভারত-আত্মার অধ্যাত্ম জীবনের মহৎ ঐশ্বর্যের পরিচায়ক কাহিনী 'রেজর্স এজ'। যম মুমুক্ষুদের প্রতি উপদেশ দিয়েছিলেন— উত্থিত হও। বিবিধ বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হও। মোহনিদ্রা ত্যাগ করে জাগরিত হও, আর শ্রেষ্ঠ আচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করো। বিবেকবান ব্যক্তিগণ ব্রহ্মলাভের পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় শাণিত, দুর্গম এবং দুরত্যয় বলেছেন, কঠোপনিষদের এই সূক্তকেই বিধৃত করেছেন সমর সেট মম কাহিনী মাধ্যমে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মম লিখেছিলেন :

"বহুদিন আগে 'মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' নামক উপন্যাস রচনা করি, ফরাসী চিত্রকর পল গগার জীবন-কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য। তবে এই উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় নিইনি, (এই উপন্যাসটি 'রেজর্স এজ') যাঁরা এখনও জীবিত অস্বস্তি ও অশান্তির হাত থেকে তাঁদের ত্রাণকল্পে আমি চরিত্রাবলীর কাল্পনিক নাম দিয়ে, সহজে যাতে তাঁদের ধরা না যায়, সেই চেষ্টা করেছি।"

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ কাহিনীকার সমর সেট মম যে উপন্যাস লিখেছেন তা সর্বকালের যে ভারত— সেই ভারতের মর্মবাণী। অনাদি কাল থেকে যে ধারা অব্যাহতগতিতে প্রবাহিত, সেই ধারার পরিচয় দানের প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে টি, এস, এলিয়ট, আলডাস হাক্সলী ও ক্রিসটোফার ইসারউডকে স্মরণ রাখা কর্তব্য। এলিয়ট ও ইসারউড অবশ্য ইংরাজ নন।

ডঃ ভেরিয়ার এলউইন ভারতকেই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মধ্যভারত, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতির আদিবাসী অঞ্চলে তিনি সুদীর্ঘকাল কাজ করেছেন। তাঁর "এ ক্লাউড দ্যাটস ড্রাগনিস" বা "ফুলমত অব দি হিলস" —ভারতের আর এক প্রান্তে নিয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের 'বস্তার' রাজ্যের আদিবাসী সম্পর্কে সাধারণ ভারতবাসীর জ্ঞান কতটুকু, এদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনধারা, আকর্ষণময় চরিত্র, সমাজশৃংখলা এবং রোমান্টিক জীবনধারা এই সমাজ-বিজ্ঞানী লেখককে মুগ্ধ করেছে, ভালো না বাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। এই পরম সত্যে এলউইন সাহেব বিশ্বাসী।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জন মাষ্টারস। তিনি জাতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন, যতদূর মনে হয় উইলিয়াম ম্যাকপীস্ থ্যাকারের মত এই কলকাতা সহরেই জন্মেছিলেন। তাঁর 'ভবানী জংসন' ভারত বিভাগের পটভূমিকায় রচিত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের কাহিনী, কিছু অবাস্তবতা যে নেই তা নয়, তবু অনেকাংশে উপন্যাসটিকে সার্থক বলা যায়। তাঁর 'করোমণ্ডল' অবশ্য আধুনিক কালের কথা নয়, যখন জ্যাসন স্যাভেজ মাউণ্ট মেরুতে রত্ন খনির সন্ধানে এসেছিলেন সেই অতীতের কথা। "লোটাস এ্যাণ্ড দি উইণ্ড" আছে ১৮৭৯ খৃীষ্টাব্দের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে এক সম্ভাব্য আক্রমণাশঙ্কার কাহিনী, সেই আক্রমণ অবশ্য সফল হয়নি। আর "নাইট রানার্স অব বেংগল" উপন্যাসে আছে ১৮৫৭ খৃীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কথা।

রুমার গডেনও ভারতে বাস করেছেন, তাঁর 'দি রিভার' নামক উপন্যাসটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনেকেরই হয়ত পরিচিত। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও ভারতীয় পটভূমিতে রচিত।

ডঃ সিমেয়নস্ কুষ্ঠ রোগীদের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন, তাদের জন্য শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, মানবিক সহানুভূতিরও যে প্রয়োজন তা তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর "মাস্ক এ্যাণ্ড দি লায়ন" উপন্যাসে এই মহাদেশের এক দর্জি পরিবার কি ভাবে এই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তারই কাহিনী বিধৃত।

ডি, জি ষ্টেল তাঁর "দি ডোণ্ড ফাউণ্ড নো রেস্ট" নামক উপন্যাসে ভারতবাসীর ব্যথা ও বেদনার অংশভাগী হয়েছেন। রয় ফষ্টার তাঁর "দি ফ্লুট অব অশোকে" জাপানী ও জার্মাণীর সহযোগে কয়েকজন ভারতীয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন, আর 'ইণ্ডিগো' নামক উপন্যাসের লেখিকা ক্রিষ্টিন ওয়েষ্টন লিখেছেন কাল্পনিক শহর কথকপুরের সুগভীর চক্রান্তকাহিনী "দি ওয়ার্ল্ড ইস্ব্রীজ" নামক উপন্যাসে। এই লেখিকাও ভারতে শিশুকাল থেকে বাস করে গেছেন।

ইংরাজ লেখক-লেখিকাদের ভারতীয় পটভূমিতে রচিত এই কাহিনীগুলি সাহিত্য রসিকদের পড়া উচিত, যাঁরা বিদেশী উপন্যাস অনুবাদে আগ্রহান্বিত তাঁরা এই সব উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে একথা নিসংশয়ে বলা যায়।

নতুন বই

জাতক নিদান— শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু কর্তৃক মূল পালি থেকে অনূদিত। প্রকাশক : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার— ১নং বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২.৫০ নয়াপয়সা।

পালি ভাষায় শাক্য-গৌতমের যে জীবনকথা পাওয়া যায় তাকে মূল হিসাবে ব্যবহার করে শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু বাংলায় সেইগুলি অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান অনুবাদক সংস্কৃত বুদ্ধচরিত এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর নামক প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে 'জাতক-নিদান' অনুবাদ করে ধর্মপাল ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধদেবের মহাজীবনকথা বাঙালী পাঠকের কাছে সহজলভ্য করেছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থ বৌদ্ধ-সমাজ ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্য পাঠকের কাছেও মূল্যবান।

রবীন্দ্র-সংগীত সাধনা— সুবিনয় রায়। গীতবীথি ।। ১৯৫বি রাজা-রামমোহন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭।। মূল্য চার টাকা।।

রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে ইদানীং কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র-সংগীতের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দিকের আলোচনাকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চাপদ্ধতি ও আদর্শকে শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য লেখক পরিবেশন করেছেন। তানপুরা ব্যবহার, রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী, যন্ত্র-সংগীত সহ-যোগিতা এবং রবীন্দ্র-সংগীতের স্বর-লিপি এই চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। শেষ পরিচ্ছেদে আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির নিয়মাবলী ও সাংকেতিক চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী অধ্যায়টিও সুলিখিত। রবীন্দ্র-সংগীতের অনুশীলনে গ্রন্থটি সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন প্যালেস্টাইন—(ইতিহাস)— শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙলাদেশের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক। তিনি যে কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস রচনায় সমগ্র জাতীয় চেতনাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তা প্রাচীন বা বর্তমান যে কালেরই হোক না কেন। ইতোপূর্বে তাঁর রচিত 'প্রাচীন ইরাক', 'প্রাচীন মিশর', 'মহাচীনের ইতিকথা' প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ সত্যকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করেন তিনি।

'প্রাচীন প্যালেস্টাইন' তাঁর রচিত পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির অসাধারণত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, উপাখ্যান, ধর্ম, দর্শন কেমনভাবে একটি সমগ্র জাতির পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলে বর্তমান গ্রন্থপাঠে তা উপলব্ধি করা যায়। আব্রাহামের আগমন —মোজেসের জীবনকথা থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইনের রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির বর্ণনায় গ্রন্থকারের অপরি-সীম দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। জটিল জীবনকথাকে যে মনোগ্রাহীরূপে বর্ণনা করা যায় তা এই অধ্যায়গুলির আলোচনায় ও উপাখ্যান পর্যায়ে নানাবিধ কাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট। ইহুদিদের বিচিত্র জীবন-কথা— মাতৃভূমিবিচ্যুত জাতির দেশ-বিদেশে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান— নানাবিধ বিরুদ্ধশক্তির প্রতিকূলতা— বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম— পরিশেষে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা গ্রন্থকারের সুনিপুণ বর্ণনা-ভঙ্গিমায় জীবন্ত। এ সমস্ত বর্ণনায় আবেগের প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিতর্কের পথ দিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ইহুদি-সভ্যতার সামগ্রিক বিবর্তনধারার এমন প্রাণবন্ত ও তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থরচনা বাঙলা ভাষায় হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্যে শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন তা বাঙলা সাহিত্য ও ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করবে তেমনি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায় নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে। সমগ্র বিশ্ব ইতিহাস তাঁর কঠোর পরিশ্রমে এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠুক এই কামনা করি।

সদ্ধর্ম রত্নমালা— শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু ত্রিপিটক বিশারদ সংকলিত। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১নং বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ত্রিপিটক এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত 'সদ্ধর্ম রত্নমালা' বৌদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বন্দনা, পূজা, দান, চীবর দান, ত্রিশরণ কথা, শীল পরিচিতি, প্রবজ্যা কাহিনী, ভাবনা-কথা, গৃহীদের কর্তব্য, আবাহ বিবাহপদ্ধতি এবং পরিত্রাণ কথা। গ্রন্থটির প্রারম্ভে "দুল্লভঞ্চ অনুসসত্তং" এই প্রসঙ্গ দিয়ে গ্রন্থটির সূত্রপাত, মানবজনম দুর্লভ তাই বুদ্ধদেব প্রবর্তিত মার্গ অনুসরণ করলে বৃহত্তম সুখলাভ সম্ভব এই বক্তব্য। গ্রন্থটি বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রকাশন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্র নিয়ে যে আমোদ-প্রমোদের জগৎ, তাই নিয়েই আমাদের "প্রেক্ষাগৃহ"। এবং এতদিন পর্যন্ত আমরা সাধ্যমত সেই জগতেরই খবরাখবর দিয়ে ও সেই জগতের বিভিন্ন সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা ক'রে আমাদের কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সহসা জাতির জীবনে এমন এক দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে, যখন রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের আলোককে এবং চিত্রগৃহের সম্মুখভাগের চিত্র-বিচিত্র আলোকোজ্জ্বল শোভাকে আমাদের চক্ষুপীড়াদায়ক ব'লেই মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, প্রমোদ জগতের বহুতর কাহিনীকে মসী দ্বারা রূপায়িত করবার চেষ্টাকে কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রেখে অসিকে শত্রুরক্তে রঞ্জিত করবার জন্যে সেই সীমান্ত প্রদেশে ছুটে যাই, যেখানে আমাদের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবার জন্যে চৈনিক বর্বরতা উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। এডমন্ড বার্ক বলেছেন public calamity is a mighty leveller (সাধারণ বিপদ একটি প্রকাণ্ড সমতাসাধক)। আজ ভারতের উত্তর সীমানা বলপ্রয়োগে অতিক্রম ক'রে ক্ষমতালোলুপ চীন আমাদের দেশকে যে জাতীয় সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মধ্যে কে রাজনৈতিক, কে ব্যবসায়ী, কেই বা চিকিৎসক, আর কেই বা সাহিত্যিক, কে বিচারক এবং কেই বা শিল্পী—এ-কথা মনে রাখতে পারছি না; মনে জাগছে, আমরা প্রত্যেকেই ভারতবাসী এবং আমাদের সম্মানকে আজ ধুলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে একদা-বন্ধুর-মুখোসধারী প্রতিবেশী লাল চীন।

আজ সারা ভারত বিক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত। জাতি আজ শত্রুপ্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবার জন্যে একাগ্র। কাতারে কাতারে ভারতীয় যুবক এগিয়ে আসছে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে; আহত সৈন্যদের চিকিৎসাকে সহজতর করবার জন্যে সুস্থ মানুষ আজ রক্তদান করতে হাসপাতালে জমায়েত হচ্ছে; যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে অস্ত্রাদি আনাবার বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থানের জন্যে দেশের মায়েরা অকাতরে স্বর্ণদান ক'রে নিরাভরণা হচ্ছেন, প্রাসাদবাসী ধনপতি থেকে রাজপথে ভূমিশয্যাগ্রহণকারী ভিক্ষাজীবী পর্যন্ত অর্থদান করছেন সাধ্যাতীতভাবে। স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার জন্যে কারুর কাছেই কোনো কিছুই অদেয় থাকতে পারে না; বিশেষ ক'রে দু'শতাব্দীকাল পরাধীন থাকবার পরে যে-স্বাধীনতার স্বাদ ভারতবাসী মাত্র কয়েক বছর উপভোগ করছে, তাকে সে কোনোক্রমেই লাঞ্ছিত দেখতে প্রস্তুত নয়।

সদ্যমুক্ত রেনেসাঁস ফিল্মস্-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" চিত্রের একটি মধুর মুহূর্তে শম্পা (নায়িকা) ও শংকর (নায়ক)।

এর আগেও ভারত নিজেকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়েছে; এই কলকাতার বুকেই শত্রু-বিমান বোমা নিক্ষেপ করেছে কয়েক দিন। নিশীথ নগরীর নিষ্প্রদীপ রাজপথ সতর্কীকরণের সাইরেণ জনচিত্তে যে-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলত, তার স্মৃতি সহজে মুছে ফেলবার নয়। এবং সে-যুদ্ধেও ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনে তার শৌর্যবীর্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু সে-যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের প্রকৃতিগত প্রভেদ কি বিরাট! তখন পরাধীন ভারত তার বিদেশী শাসকের স্বার্থরক্ষায় নিজেকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু আজ! আজ স্বাধীন ভারত তার উত্তর সীমান্তে হানাদার শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে ব্যস্ত; শত্রুকবলিত সীমান্ত প্রদেশ যতদিন পর্যন্ত না পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

তাই আমাদের প্রমোদসূচীতেও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আজ জাতির প্রয়োজনে নাটকাভিনয়ে এবং চলচ্চিত্রে এমন বিষয়বস্তুরও অবতারণা করতে হবে, যা দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে রণোন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে,

আপামর জনসাধারণকে নতুন ক'রে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। মনে রাখতে হবে, আজ সমগ্র জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে—স্বাধীন ভারত আজ চীনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নরনারীনির্বিশেষে সকলকেই আজ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাড়া দিতে হবে। এমন নাটক আজ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোক, এমন চলচ্চিত্র আজ আমাদের চিত্রগৃহগুলিতে প্রদর্শিত হোক, যা প্রতিটি দর্শককে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেবে, স্বাধীন ভারতের মর্যাদা-রক্ষা-প্রচেষ্টায় সেও একজন অংশীদার, সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তারও রয়েছে কর্তব্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচনের জন্যে একদিন বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়-গুলি যে-ভাবে জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ক'রে জাতির ধন্যবাদভাজন হয়েছিল, আজ আবার তাদের ডাক এসেছে জাতিকে আত্মসচেতন করবার প্রচেষ্টায় নবভাবে নাট্যার্ঘ সাজাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্যে। পরাধীন ভারতে আমাদের চলচ্চিত্র দেশে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগাবার জন্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি বহু রকম প্রতিবন্ধকের দরুণ; কিন্তু আজকের স্বাধীন ভারতে জনসাধারণকে কর্তব্যসচেতন ও স্বাধীনতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে কোনো বাধাই যখন নেই, তখন চলচ্চিত্রজগতকে আজ সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। এমন কাহিনী আজ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন, যা দেখে দর্শক বুঝবে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে-কোনো দুঃখকষ্ট বরণ করা যায়, যে-কোনো ত্যাগস্বীকার করা যায়, সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণকে বলি দেওয়া যায়।

দাদাঠাকুর (বাঙলা) : জালান প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৩,৯৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শ্যামলাল জালান; কাহিনী : নলিনীকান্ত সরকার; চিত্রনাট্য এবং পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কাহিনী : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়' পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : কাজী নজরুল ইসলাম, শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর) ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দ-ধারণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ; আবহ-সঙ্গীত ও পুনঃ শব্দ-যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণ : ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী, সীতা দেবী, আশা প্রভৃতি। জালান ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে মিনার, ছবিঘর, বিজলী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বিদেশের চলচ্চিত্রে জীবিত মানুষের জীবনী নিয়ে একাধিক ছবি তৈরী হয়েছে; এই সেদিনও "জর্জ র‍্যাফ্‌ট স্টোরী" আমরা প্রত্যক্ষ করলুম। কিন্তু সে-সব ছবি যাঁদের নিয়ে, তাঁরা প্রত্যেকেই দেশবিখ্যাত, এমন কি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ, ধৈর্য প্রভৃতির পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোনও জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র রচিত হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। মনে হয়, "দাদাঠাকুর"-ই বাঙলা, তথা ভারতের প্রথম ছবি, যা একজন জীবিত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বন ক'রে নির্মিত হয়েছে। এবং তাও এমন একজন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ব্যক্তির জীবনালেখ্য, যাঁর নাম পর্যন্ত আজকের দিনের সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বহু সম্ভ্রান্ত সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বরেণ্য জন-নেতাদের কাছেও একান্ত অজানা।

কিন্তু "বিদূষক"-সম্পাদক, এডিটার, লেখক, কম্পোজিটর, প্রুফ-রীডার, প্রিন্টার এবং হকার, সেই নাতিদীর্ঘ শুভ্রকান্তি, নগ্নগাত্রে শুভ্র যজ্ঞোপবীত-ধারী, সগুম্ফবদনে সহাস্যময়, নির্ভীক, তেজস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দা'ঠাকুরকে আমরা দিনের পর দিন দেখেছি, তাঁর প্রতি মুহূর্তে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সরস প্রত্যুত্তর—ইংরেজীতে যাকে বলে রেপার্টি শুনে হেসেছি এবং দেখে বিস্মিত হয়েছি দারিদ্র্যকে কি আশ্চর্য সহজে তিনি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তাকে একটি মর্যাদার কৌলীন্য দান করেছেন। আজ দা'ঠাকুরের বয়স নিশ্চয়ই আশীর ওপরে, কিন্তু তিনি আজও সেই দা'ঠাকুর, সেই রকমই 'সতেজ সরল সরস রসিকার জীবন্ত প্রতিমূর্তি'। কাজী নজরুল ইসলাম বোধ করি এ'কে দেখেই লিখেছিলেন, "হে দারিদ্র, তুমি মোরে
করেছ মহান"।

এত কথার পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে, চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার মত এমন কি উপাদান আছে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনে।

আছে—যথেষ্টই আছে। একমাত্র রাণী ভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা ছাড়া যে-নির্লোভ ব্যক্তি জীবনে কোনোকিছুর জন্যেই কারুর স্বারস্থ হননি, ইংরাজ গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে থেকে শুরু ক'রে লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি শীর্ষস্থ দেশবরেণ্য ব্যক্তির সানুগ্রহ সংস্পর্শ, সুপারিশ এবং আর্থিক সাহায্য অকাতরে

প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বাবলম্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, জীবনে সুখ-দুঃখ কোনো কিছুকেই গায়ে না মেখে নিজের দৈনন্দিন কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, ধনীর ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজের জিদকে বজায় রেখেছেন এবং দেশের মুক্তি-আন্দোলনকারীদের বহু রকমে সাহায্য ক'রে গৌরববোধ করেছেন, বৈষয়িক দিক থেকে সেই অতি-সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ জীবন-কথা আজকের খোলসসর্বস্ব সভ্য বাঙালী সমাজের সামনে চলচ্চিত্রের মারফৎ তুলে ধরা যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা 'দাদাঠাকুর'-ছবিটিকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না ক'রলে বুঝতে পারা যাবে না। বিশেষ ক'রে দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা যেন এমনই একখানি ছবির প্রতীক্ষায় ছিলুম।

দা'ঠাকুরের সহকর্মী এবং অনুগত ভক্ত নলিনীকান্ত সরকার রচিত জীবন-কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু ছবিখানির মধ্যে দা'ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যে অগণিত বাস্তব চরিত্রের সমাবেশ সাধন করা হয়েছে, তাদের কারুরই চরিত্র অণুমাত্রও ক্ষুন্ন হয়েছে ব'লে মনে করতে পারছি না। এমন কি, গুরুসদয় দত্ত, লালগোলার মহারাজ, নির্মলচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ আমাদের চোখে-দেখা চরিত্রগুলিকে যখন পর্দার ওপর উপস্থাপিত হ'তে দেখেছি, তখন তাদের সান্নিধ্য অনুভব ক'রে সেই যুগে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও ফিরে যেতে আমাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়কে এইজন্যে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় এমনই নিষ্ঠা ও দরদের সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন যে, 'দাদাঠাকুর' অনায়াসেই তাঁর পরিচালক-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ব'লে পরিগণিত হবে। পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের মৃন্ময় মূর্তির সঙ্গে নেপথ্য থেকে তাঁর প্রশস্তিজ্ঞাপন ক'রে তাঁরই নামে ছবিখানিকে উৎসর্গ করা থেকে শুরু ক'রে দা'ঠাকুর-রূপী ছবিবাবুর পর্দাজোড়া মুখ দিয়ে শহীদ দর্পনারায়ণের প্রশস্তিজ্ঞাপনে ছবির শেষ

বিমল বর্ধন পরিচালিত আর ডি বনশালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে কালী ব্যানার্জি ও তন্দ্রা বর্মন।

পর্যন্ত কাহিনীটিকে উত্তরোত্তর দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী ক'রে যে-ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে পরিচালকের উচ্চ-প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ এবং শিল্প-নির্দেশনায় সর্বত্র একটি উচ্চ মান বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্পাদনার চাতুর্য ছবিখানিকে একটি বিশিষ্ট সুরে বেঁধে তাকে সুন্দরভাবে গতিশীল রেখেছে। ছবিটির পরিচয়-লিপিগুলি অত্যন্ত মার্জিত রুচিপূর্ণ নূতনত্বের পরিচায়ক।

ছবিতে আটখানি গান আছে। তার মধ্যে তিনখানি নতুন, বাকীগুলি আগেকার রচনা। ভোটের দু'খানি গান, কলকাতার ভুল এবং বোতলপুরাণ দাঠাকুরের নিজের রচনা। নলিনীকান্ত সরকারের গাওয়া 'কলকাতার ভুল' গানের রেকর্ড একদিন কলকাতার ঘরে ঘরে বাজত। নজরুল রচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কাজীর নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে সেকালের রাজনৈতিক সভা-সমিতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করত। ছবির সকল গানই সুরসমৃদ্ধ, সুগীত ও সুপ্রযোজিত; তবে 'দুর্গম গিরি' গানটিতে যেন তীব্র মাদকতার কিছু অভাব দেখলুম। আবহ-সঙ্গীত ছবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে।

জানি না, ছবি বিশ্বাস অভিনীত আর কোনো ছবি এখনও মুক্তি পেতে বাকী আছে কিনা; কিন্তু 'দাদাঠাকুর'-এর চরিত্র-চিত্রণে তাঁর অভিনেতৃ-জীবনের স্মরণীয় অভিনয়গুলির মধ্যে বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। মাত্র আকৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি চরিত্রটির অন্তর্নিহিত মহত্বকে এমন আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর অভিনয়কে একটি অনবদ্য সৃষ্টি না ব'লে পারি না। এর পরেই যে-চরিত্রটি আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সেটি হচ্ছে বিশ্বজিৎ অভিনীত দর্পনারায়ণ। একটি লম্পট জমিদারপুত্র থেকে অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরূপে শহীদত্ব বরণ করার মধ্যে যে সুনিশ্চিত মানসিক ও মানবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, তার প্রতিটি পর্যায় তাঁর অভিনয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। বিশ্বজিতের জীবনে এখনও পর্যন্ত এইটিই শ্রেষ্ঠতম অভিনয়। নলিনীরূপে তরুণকুমার এবং কার্তিক ফুলুরিওয়ালারূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয়ে অনায়াসেই দর্শক-হৃদয় জয় করেছেন। চমৎকার উপস্থাপনার গুণে ছায়া দেবী অভিনীত দা'ঠাকুর-গৃহিণীর চরিত্রটি মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রথমে নিগৃহীতা এবং পরে দেশসেবিকা লতার ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী অভিনয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেননি; কিন্তু তাঁর মুখ-চোখে আর একটু ভাবের প্রকাশ দেখতে পাবার আশা করেছিলুম। এ ছাড়া আরও যে অসংখ্য চরিত্র ছবিখানিতে ভীড় ক'রে আছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুঅভিনীত।

'দাদাঠাকুর' বাঙলা চিত্রজগতে একটি গৌরবান্বিত সংযোজন।

ঢেউ এর পরে ঢেউ (বাঙলা) ঃ রেনেসাঁস ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৩২৯৮ মিটার দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ মাণিক দত্তগুপ্ত; কাহিনী ঃ লর্ড টেনিসন-এর 'এনক-আর্ডেন'-কাব্যগীতিকার ছায়া; চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল, স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতা; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ রবিশঙ্কর; চিত্রগ্রহণ ঃ ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল শব্দানুলেখন ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা ঃ গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ ঃ শঙ্কর, বাদল, শৈলেন দে, অনিল দত্ত, গাঙ্গুলী মশাই, সুকুমার গুহ, শম্পা মিত্র প্রভৃতি। এম্ জি, ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ, লোটাস, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কলেজ-জীবনে টেনিসনের 'এনক-আর্ডেন' কাব্য-গীতিকা মনকে দিয়েছিল এক অভিনব দোলা। একটি মেয়েকে মাঝে রেখে এনক আর্ডেন এবং ফিলিপ রে-র প্রেমের দুই বিপরীতধর্মী অভিব্যক্তির কাহিনী প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। দুরন্ত সাহসী এনক আর্ডেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের সুখীজীবন কামনায় যে-দিন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দশ বছরের মধ্যে আর ফিরল না, অ্যানি লীর দুর্দশার চরম অবস্থা উপস্থিত হ'ল, তখন ধনীর সন্তান, স্বভাবতঃ মুখচোরা ফিলিপ রে এল ওদের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে। একদিন সে অ্যানি লীকে মনে মনে ভালোবেসেছিল; কিন্তু যেদিন এনক-আর্ডেন তার সোচ্চার প্রেম নিবেদন ক'রে অ্যানিকে নিজের জীবনসঙ্গিনী ক'রে

বলে, সেদিন সে তার মনের নিভৃত কোণের গোপন বাসনাকে প্রকাশ না ক'রে যার যে-ভদ্র পরিচয় দিয়েছিল, সেই ভদ্রতাই তাকে তার বন্ধু-পত্নীর বিপদে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু যেদিন তার মনে হ'ল, তার বন্ধু নিশ্চয়ই আর ইহজগতে নেই, অথচ তারই জন্যে মিথ্যা আশায় অ্যানি নিজের জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে, সেদিন সে নিজের মনকে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারেনি। অ্যানি প্রথমটা হয়েছিল চকিত, পরে যথেষ্ট সময় নিয়ে যখন সে এনক-আর্ডেনের সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিল, তখন ফিলিপ রে-র হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রতে তার বাধেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এনক-আর্ডেন ফিরে এসেছিল এবং অ্যানি-ফিলিপের মিলিত জীবনযাত্রা দেখে ব্যথিত হয়েও সে ওদের ওপর রাগ করতে পারেনি; বরং অ্যানির সুখের জন্যে ফিলিপ এবং ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে নিজেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের কাছে অজ্ঞাতই রেখেছিল এবং মৃত্যুকালে তার আশ্রয়-দাত্রীকে তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে অনুরোধ করেছিল, আর যেই জানুক না কেন, অ্যানি যেন তার পরিচয় না জানতে পারে; তা নইলে সে তার মৃতদেহ দেখে ব্যথা পাবে।

এই কাব্য-গীতিকাকে প্রায় হুবহু বাঙলা চিত্ররূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন রেনেসাঁস ফিল্মস। দীঘার সমুদ্রতট ও তার বেলাভূমির পটভূমিকায় এই কাব্যকে চিত্রায়িত করবার যে-সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন চিত্রশিল্পীরূপে ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল। বিস্তীর্ণ জলরাশি, সফেন সমুদ্রতরঙ্গ, বালুময় বেলাভূমি, আলোছায়ায় ঘেরা বনপথ, দীর্ঘ আন্দোলিত তরুরাজির বিচিত্র সচল দোলায়মান ছায়া—এ-সবই অতি সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছে এবং চিত্রটিকে একটি সাদা-কালোয় আঁকা শিল্পসুষমা দান করেছে। এ দিক দিয়ে 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' ছবিখানি একটি অনাস্বাদিতপূর্ব নূতনত্বের দাবি করতে পারে অনায়াসেই।

কিন্তু মূল গল্পের বাঙলা রূপান্তরে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। টেনিসনের বর্ণনাচাতুর্যে যে-সব দৃশ্য বা ঘটনা ওদেশের পক্ষে অবলীলাক্রমে সহজগ্রাহ্য ছিল, গল্পের দৃশ্য-সংস্থাপনায় এবং বিশেষ ক'রে সংলাপ রচনায় যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে এবং বাঙালীর জীবন-যাত্রার বিপরীত-ধর্মিতা প্রকাশ পাওয়ায় সেই সব ঘটনাই অসম্ভাব্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কাজেই নবাগত শিল্পীদের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ

বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "বর্ণচোরা" চিত্রের একটি দৃশ্যে হরিধন মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু।

অভিনয়ও লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারেনি। বিশেষ ক'রে বাদল অভিনীত লোটন চরিত্রটিকে—যে-চরিত্রটি মূলে একটি অসামান্য নায়কের পদাভিষিক্ত হয়েছে, সেই মহৎ চরিত্রটিকে আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। এমন কি শঙ্করের সাহসিকতা এবং বলিষ্ঠ পৌরুষ উপস্থাপনার দুর্বলতায় পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারেনি।

কুশলী ও শিল্পিবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টা হিসেবে 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' আমাদের সহানুভূতি লাভের যোগ্য।

রাখী (হিন্দী) ঃ প্রভুরাম পিকচার্স-এর নিবেদন; ১৩,৮২১ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ শিবাজী গণেশান; কাহিনী ঃ কে, পি, কোট্টা-রাক্কারা; সংলাপ ও গীত-রচনা ঃ রাজেন্দ্র কৃষণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ এ, ভীম সিং; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ রবি; চিত্র-গ্রহণ ঃ জি, ভিট্টল রাও; শব্দধারণ ঃ এ, ভেঙ্কটচলম ও এ, বিশ্বনাথন; সম্পাদনা-তত্ত্বাবধান ঃ এ, ভীম সিং; সম্পাদনা ঃ পল ডোরাইসিংহম ও কে, থিরু-মালাই; শিল্প-নির্দেশনা ঃ গঙ্গ; রূপায়ণ ঃ অশোককুমার, প্রদীপকুমার, মেহমুদ, রাজ মেহেরা, রণধীর, শিবরাজ, মোহন চটি, ওয়াহীদা রেহেমান, অমিতা, মালকা, ললিতা পাওয়ার প্রভৃতি। মিউজিক্যাল ফিল্মস (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে সোসাইটি, কৃষ্ণা, দর্পণা, প্রিয়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

রাজু এবং রাধা—দুই ভাইবোন; দু'জনের জন্যেই দু'জন যথাসর্বস্ব পণ করতে পারে। তাই রাধা যেদিন আনন্দকে ভালোবাসল, সেদিন রাজু নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধাকে তারই হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা করল না। কিন্তু গোল বাধাল আনন্দর বড় বোন; তার মুখর কোপন স্বভাব রাজুকে অন্যত্র যেতে বাধ্য করল। রাজুর স্ত্রী মালতী যখন সন্তান-প্রসবের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে রাজুকে শোকার্ত ক'রে তুলল, ঠিক সেই সময়েই রাধার কাছ থেকে সম্পত্তি

জাওলা প্রোডাকশনের 'দুই বোন' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার

বিভাগের দাবী এসে উপস্থিত। রাজু ক্ষোভে দুঃখে দেশত্যাগী হ'ল। কিন্তু কোথাও তার স্বস্তি নেই। প্রাণসমা ভগ্নী রাধার জন্যে তার প্রাণ নিয়তই কাঁদে। তাই দৈবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে সে যেদিন বাড়ীর কাছাকাছি এসে একটি শিশুকে মোটর দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের চোখ হারাল, সেদিন রাধাও জানল, তারই ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে তার দাদা তারই কাছে ফিরে এসেছে এবং দিনটাও রাখীপূর্ণিমা—যেদিনে বোন ভাইয়ের হাতে রাখী বে'ধে স্নেহের সম্বন্ধকে দৃঢ় করে।

এই ঘটনাবহুল কাহিনীকে দর্শক-মনোরম ক'রে তোলবার জন্যে মাদ্রাজের সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা শিবাজী গণেশান্ প্রযোজক হিসেবে শিল্পী-সমন্বয় থেকে শুরু ক'রে জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট, নৃত্য-গীত, রোমহর্ষক ঘটনা-সমাবেশ এবং কৌতুকদৃশ্যের অবতারণা পর্যন্ত কোনোরকম অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেননি। শিল্পীদের মধ্যে রাজুর ভূমিকায় অশোককুমার তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রাধারূপে ওয়াহীদা রেহমানও নৃত্য-গীত-অভিনয়ে নিজ ভূমিকাটির প্রতি সুবিচার করেছেন। আনন্দের ভূমিকায় প্রদীপকুমারও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। কিন্তু দর্শকরা সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন আনন্দের ভাগ্নের ভূমিকায় মেহমুদের অনবদ্য কৌতুকাভিনয়ে। অপরাপর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার, অমিতা, মোহন চোট্টি, রণধীর, রাজমেহরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের কাজ সব দিক দিয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভের যোগ্য।

এম কে জি-র "রক্তপলাশ" :

আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর এম-কে-জি প্রোডাকসন্স-এর রহস্যঘন চিত্র "রক্তপলাশ" রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কালিকা ফিল্মস্ পরিবেশিত এই অভিনব রোমাঞ্চ চিত্রটির পরিচালনা ও সুরসৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে পিনাকী মুখোপাধ্যায় এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এবং বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে

এম কে জির 'রক্তপলাশ' চিত্রে উৎপল, দীপক, অমাদি এবং জনৈক অভিনেতা

পাওয়া যাবে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জহর রায়, ছায়াদেবী, রেণুকা রায় প্রভৃতি শিল্পীকে। নবাগত বালক-অভিনেতা মাস্টার বাসুদেব এবং ল্যাসি নামে একটি কুকুর নাকি এই ছবিখানির বিশেষ আকর্ষণ। ছবিখানি "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ :

পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক রাসবিহারী সরকার জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

"সেতু"র বিশেষ অভিনয় :

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানের উদ্দেশ্যে আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে "সেতু" নাটকের একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ঐ তহবিলে দেওয়া হবে।

।। "রূপান্তরী"র নতুন নাটক ।।

আগামী ১৮ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটার হলে রূপান্তরী গোষ্ঠী তাদেরই সদস্য জগদীশ চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত নতুন নাটক "প্রতিনিধি" মঞ্চস্থ করবেন।

এলিটে "অ্যাডভেঞ্চার অব এ ইয়াং ম্যান" :

আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর থেকে এলিট সিনেমায় হেমিংওয়ের 'অ্যাডভেঞ্চার অব এ ইয়াং ম্যান' দেখানো হবে। প্রধান ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছেন রিচার্ড বেমার, ডায়ানা বেকার এবং পল নিউম্যান।

।। জার্মানীর ভ্রাম্যমান নাট্য সংস্থা ।।

একটি জার্মান নাট্য সংস্থা সম্প্রতি এশিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গত ৩রা এবং ৪ঠা নভেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবনে উক্ত দলটি একটি পূর্ণাঙ্গ এবং দুটি একাংকিকা মঞ্চস্থ করেন। দলটির নাম 'সেতু'। জার্মানীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের জন্যেই এই দলটি প্রায়শঃই ভ্রাম্যমাণ। 'সেতু' নাট্য সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং সমগ্র ইয়োরোপ সফর শেষ করেছেন। ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রথমদিন এ'রা দু'ঘন্টার একটি নাটক 'ডু ইউ নো দ মিল্কি ওয়ে' অভিনয় করেন। নাটকটি দু'ঘন্টার হলেও মাত্র দুজন অভিনেতা এই নাটকে অভিনয় করেছেন। দ্বিতীয়দিন এই দলটি দুটি কৌতুক নাটক মঞ্চস্থ করেন তার মধ্যে একটি হল গ্যেটের 'দি গিল্টি' এবং অপরটি 'দি ব্রোকেন জাগ'। তিনটি নাটকেরই সংলাপ জার্মান ভাষায়। 'সেতু' নাটকের দলটি বাসে করেই এশিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছেন, নিজেরাই এ'রা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করছেন। দলের সঙ্গে জার্মান রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী

"দাদাঠাকুর" চিত্রে নামভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও জীবন-কাহিনীর রচয়িতা নলিনীকান্ত সরকারের ভূমিকায় তরুণকুমার।

ম্যাক্সমুলার ভবনে অভিনীত গোটের 'দি গিল্টি' নাটকের একটি দৃশ্য

থিয়েটার রামের, জুসটি জি ডফ। ইংগে ব্যাসার্টাস রামের, হুবার্ট কিসটেরের।

স্টার থিয়েটারের বিশেষ অভিনয় :

২৬এ নভেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ৬॥টায় স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত দে শা ত্ম বো ধ ক পৌরাণিক নাটক "কারাগার"-কে মঞ্চস্থ করবেন জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানের সাধু সংকল্প নিয়ে। এই নাট্যাভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত চেষ্টায় ত্রুটি রাখছেন না। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করবেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, চন্দ্রশেখর, অপর্ণা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, বাসন্তী নন্দী, সাধনা রায়চৌধুরী, শীলা পাল প্রভৃতি স্টারের কুশলী শিল্পীবৃন্দ। বলা বাহুল্য, টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদায় অর্থই প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

শৌভনিক নাট্য সংস্থা :

শৌভনিক নাট্যসংস্থা স্থির করেছেন, গেল ৮ই নভেম্বর থেকে শুরু ক'রে তাঁদের "যা-নয়-তাই" নাটকের নিয়মিত অভিনয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রতি অভিনয় বাবদ অন্ততঃ ১০্ (দশ) টাকা তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে থাকবেন।

'অপরূপ কথা'র মহরৎ :

নবগঠিত ফোটোপ্লে সিণ্ডিকেট-এর প্রথম কিশোরচিত্র, পরিবর্তনের কাহিনীকার মনোরঞ্জন ঘোষ লিখিত "অপরূপ কথা"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী মাননীয় জগন্নাথ কোলের পৌরোহিত্যে গেল রবিবার, ১১ই নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

।। সাজঘরের নতুন প্রচেষ্টা ।।

বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা সাজঘর আগামী সোমবার ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায় তাদের নতুন নাটক "সুখের পায়রা" মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সলিল সেনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করবেন।

নাটকটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটক। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী আলো দাশগুপ্ত।

।। "বিরহ" ।।

"বিরহ" নামে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসন একসময় রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছিল। এই প্রহসনের একটি পরম উপভোগ্য রূপারূপ আগামী ১২ই ডিসেম্বর, '৬২ বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় 'মুক্ত-অঙ্গনে' বিচিত্রা সংস্থা মঞ্চস্থ করবেন। এই নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীতরুণ মিত্র। নাটকটির একটি মুখ্য চরিত্রে শ্রীমিত্র ও কৃতি অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় অংশ গ্রহণ করবেন।

।। 'উদীচী'র সমাবর্তন উৎসব ।।

গত ৪ঠা নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভারতী-ভবনে 'উদীচী'র সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য ও কৃতিপত্র বিতরণ করেন শ্রীঅনাদি-কুমার দস্তিদার। গ্রহীতা, সঙ্গীতে সুশীল মল্লিক, রমেন্দ্র দাশশর্মা, নৃত্যে—দেবযানী মুখোপাধ্যায়, গীটারে—সূর্যকান্ত বসুরায় ও রবীন্দ্রমোহন রায়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শৈলেন ভড় তাঁর ভাষণে বলেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এবং সুষ্ঠু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন সুরুচিপূর্ণ শিল্পীমনের পরিচয়। শ্রোতাদের উদ্দেশে শ্রীভড় বলেন, 'অধিবেশন আরম্ভের পরে ও শেষ হবার পূর্বে আসনগ্রহণ ও ত্যাগ শুধু অশোভন নয়, অবাঞ্ছনীয়ও। এতে শুধু শিল্পীর প্রতি নয় কবির প্রতিও অসম্মান ও অশ্রদ্ধা দেখানো হয়।'

সভাপতি শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের একটি লিখিত বিবৃতি সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন। পরে ভবতারণ সাঁতরার পরিচালনায় সমবেত গীটারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। তারপর শচীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও কল্পনা করের নৃত্য পরিচালনায় শরৎশ্রী পরিবেশিত হয়। সবশেষে শিক্ষায়তন সদস্য কর্তৃক 'বৈকুন্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ হয়। বিপিনের ভূমিকায় চন্দ্রকান্ত শীল উল্লেখযোগ্য।
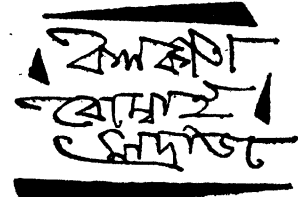
কলকাতা :

'এক টুকরো আগুন'-এর কাজ শেষ করে পরিচালক বিনু বর্ধন তাঁর পরবর্তী ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন গত সপ্তাহে দু নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর। সমরেশ বসুর 'অচিনপুরের কথকতা' কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির নামকরণ হয়েছে 'বিভাস'। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন কমল মিত্র, বিকাশ রায়, তরুণকুমার প্রভৃতি। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কার্তিক বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা সংস্থা হ জেনিথ পিকচার্স।

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরিচালক মধু বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবির পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। নাম ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন 'ভগিনী নিবেদিতা' খ্যাত শিল্পী অমরেশ দাস। এ ছাড়া অন্যান্য মুখ্য চরি

অভিনয় করবেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী। সংগীত পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। নির্বাক ছবি 'ইংগিত'এর পর প্রযোজক-পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায় এবারে যে ছবি করবেন তার নাম 'সৎ-ভাই'। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, কমল মিত্র, অনুপকুমার,. অসীমকুমার, জহর রায়, সুখেন দাস, সরযূবালা, সন্ধ্যারাণী, দীপিকা দাস ও লিলি চক্রবর্তী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সম্প্রতি একটি হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ছবির নাম 'সুখে স্বপ্নে বাসী গীত'। এর মধ্যে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সংগীত-পরিচালক পবিত্র দে এ ছবির একটি গান রেকর্ডিং করছেন। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে বলরাজ সাহনি, বিপিন গুপ্ত, জীবনকলা, মির্জা মুশারফ, আরতি দাস ও বীরেন চ্যাটার্জি অন্যতম। কিরণ ফিল্মস প্রযোজিত এই হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করছেন অরুণ চৌধুরী।

বোম্বাই :

প্রযোজক জে ওমপ্রকাশের পরবর্তী রঙিন ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'আরজু'। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শচীন ভৌমিক। ছবিটি পরিচালনা করছেন মোহন কুমার। সংগীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। প্রধান চরিত্র-অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বাণু, ধর্মেন্দ্র, নাজির হোসেন, সুলোচনা ও শোভা খোটে।

আলিবাবা মার্জিনা পুরোন গল্পের কাহিনী অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্ত যে রঙিন ছবিটি করছেন তার নাম রাখা হয়েছে 'কনিজ'। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন গুরু দত্ত ও সিমি। সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ। পরিচালক গুরু দত্ত।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের 'প্রেমপত্র' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। বর্তমানে তিনি 'বন্দিনী' ছবির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। নাম-ভূমিকায় রয়েছেন অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র। নায়িকার চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন নূতন। সংগীত-পরিচালক শচীনদেব বর্মণ। এছাড়া আর একটি হিন্দী ছবি 'বেনজির'র কাজ আরম্ভ করছেন পরিচালক শ্রীরায়।

এ ছবির প্রধান ভূমিকা-লিপি হল অশোককুমার, মীনাকুমারী, শশীকাপুর ও রাজশ্রী শান্তারাম। সুরকার শচীনদেব বর্মণ।

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওয় রঙিন ছবি 'দিল দিয়া দরদ লিয়া'র কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক এ আর কারদার। কাহিনী-চিত্রনাট্য রচনা ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার। বিপরীতে রয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান। পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন জনি ওয়াকার, প্রাণ, শ্যামা, রেহমান, এস নাজির ও রানী। আলোকচিত্র ও সংগীত পরিচালনা করছেন দোয়ারকা দিবাচী এবং নৌসাদ।

গীতিকার শৈলেন্দ্রের প্রথম-প্রযোজনা হিন্দী ছবির নাম 'তিসরি কসম'। রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রেহমান এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। সংগীত পরিচালনা করবেন শঙ্কর-জয়কিষণ। পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন বাসু ভট্টাচার্য ও সুব্রত মিত্র।

মাদ্রাজ :

জনপ্রিয় উপন্যাস 'পেনমানাম' অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক এল ভি প্রসাদ সম্প্রতি রাহনি স্টুডিওর কাজ শুরু করেছেন। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শিবাজী গণেশন, বি সরোজাদেবী, এস ভি রাঙ্গারাও, এম আর রাধা, টি আর রামচন্দ্র এবং করুণানিধি। আলোকচিত্র ও সংগীত পরিচালনা করছেন কে এস প্রসাদ ও কে ভি মহাদেবন।

অঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী ছবি হল 'আঁধেরে চিরাগ'। অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা ও মনোজ এই ছবির তিনটি মুখ্য আকর্ষণ। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ ছবির কাজ আরম্ভ হবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ইন্দর রাজ আনন্দ। সংগীত-পরিচালক আদি নারায়ণ রাও।

—চিত্রদূত
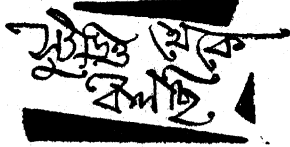
(ঘরের মধ্যে ছোট কিংকর মাটিতে শুয়ে আছে। চিরঞ্জীবকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসলো।)

ছোট চিরঞ্জীব—যাক্। তাহলে মারধোর খেয়ে চৈতন্য হয়েছে। হোটেলেই ফিরে এসেছো দেখছি।

কিংকর—আজ্ঞে?

চিরঞ্জীব—বলছি, মারধোর খেয়ে জ্ঞান ফিরেছে তাহলে? সেই পঁচিশ হাজার টাকা কোথায়?

কিংকর—সে তো আপনি চলে যাবার পরই আমি হোটেলের ম্যানেজার-বাবুর লোহার সিন্দুকে জমা করে দিয়েছি। এই যে তার রসিদ।

চিরঞ্জীব—তাহলে রাস্তায় অমন ধানাই-পানাই বকলি কেন?

কিংকর—রাস্তায় বক্‌তে যাবো কোন্ দুঃখে? আমি তো হোটেল থেকে রাস্তায় পা-ই দিইনি।

চিরঞ্জীব—কিংকর! আবার মার খাবি তুই। পথে তুই তো আমাকে বললি যে মা আর মাসিমা সকাল থেকে না-খেয়ে বসে আছেন। বাড়ী চলুন?

কিংকর—এই মরেছে! এ-সব আবার কি কথা গো। আপনি চলে যাবার পর—আমি তো খাওয়া-দাওয়া করে—এই ঘরে শুয়ে—

চিরঞ্জীব—ফের বাজে কথা বলছিস? শীগ্‌গির বল—রাস্তায় আমাকে এ-কথা বললি কেন তুই!

কিংকর—আরে! কি আপদ! আমি তো—
(এই সময় দরজায় ঘা পড়ল।)

চিরঞ্জীব—কে?

ম্যানেজার—আমি স্যার!

চিরঞ্জীব—আসুন!

উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবির দৃশ্যগ্রহণের আগে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মানু সেন।

কিংকর—ম্যানেজারবাবু! বাবু হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি কি বাইরে বেরিয়েছি?

ম্যানেজার—না! তুমি তো আমার কাছে টাকা জমা দিয়ে খেয়ে-দেয়ে এসে শুলে।

চিরঞ্জীব—কী বলছেন মশায়! ও বাইরে যায়নি?

ম্যানেজার—না স্যার!

চিরঞ্জীব—আপনি কি বলতে এসেছেন, বলুন!

ম্যানেজার—আমি বলতে এসেছি স্যার—যে দু'ঘণ্টার জন্যে আমি একটু বাইরে বেরুচ্ছি। এরমধ্যে আপনার টাকার দরকার হবে কি?

চিরঞ্জীব—ওই জমা টাকার? না।

(ম্যানেজার চলে গেল। চিরঞ্জীব চেয়ে দেখে এখনও কিংকর দুশ্চিন্তায় করে আছে। চিরঞ্জীব শান্ত হয়।)

চিরঞ্জীব—নে, কাপড়-জামা পরে নে। এখানে খুব বড় মেলা হচ্ছে। চল্—দেখে আসি।

(কিংকর এগিয়ে জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিল।)

এই অভিনীত চিত্র-নাট্যের চিত্রগ্রহণ চলেছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। ছোট চিরঞ্জীব ও কিংকরের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করলেন উত্তমকুমার এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যানেজারের চরিত্রে রূপ দিলেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন্ ছবির কথা বলছি?—উত্তমকুমার প্রোডাকসন্সের 'ভ্রান্তিবিলাস'। ছবিটি পরিচালনা করছেন মানু সেন। আলোকচিত্র পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও রূপকার যথাক্রমে হরিপদ মহালনবিশ, সুনীল সরকার ও শক্তি সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' অবলম্বনে বর্তমানের কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। এ কাহিনীর ঘটনা ও পরিবেশ আজ থেকে বহু বছর আগেকার জয়স্থল-অধিরাজ বিজয়বল্লভের রাজত্বে। কিন্তু এই চলচ্চিত্রায়ণে শুধু মূল ঘটনা বর্ণনাটুকু আছে। বাকী পরিবেশ, সাজসজ্জা ও কিছু কিছু ঘটনা যুগোপযোগী করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই আধুনিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক যথার্থ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই এক যুগ আগের প্রাচীন পরিবেশ নিয়ে বর্তমানে ছবি করা দুঃসাধ্য ছিল এবং বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হোত।

ভ্রান্তি-বিলাসের ওপরেই কাহিনীর মূল ঘটনা। সোম দত্ত নামে এক বণিকের দুই সুকুমার যমজকুমার ছিল, যাদের নাম ছোট এবং বড় চিরঞ্জীব। চেহারার মিল একই রকম। এই সময়ে এক দুঃখিনীর কাছ থেকে একাকৃতি সমসন্তানদুগল কিঙ্করদ্বয় ভৃত্যস্বরূপ নিজের কাজে লাগালেন সোম দত্ত। এর মধ্যে একবার অর্ণবপোতে যাত্রা করার সময় এক প্রবল সমুদ্র-ঝড়ে এই সংসারে সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শুধু সোম দত্ত, কিংকর ও ছোট চিরঞ্জীবকে এক

সঙ্গে দেখা গেল। অনেক বছর উত্তীর্ণ হলেও যখন কোন খবর জানতে পারলেন না তখন চিরজীব নিরুদ্দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু পরে তিনি পুত্রেরও কোন সংবাদ পেলেন না। শেষে সোম দত্ত স্বয়ং পর্যটন আরম্ভ করলেন এবং জয়স্থলে উপস্থিত হয়ে মহারাজ বিজয়বল্লভের কাছে তিনি ধৃত হন। এই সময় এখানে ছোট চিরজীব ও ছোট কিংকর উপস্থিত হয়। এক বিদেশী বন্ধুর সাহায্যে কিছু অর্থের মালিক হয়ে উভয়ে এক হোটেলে এসে হাজির হয়। এই নগরের অধিপতির দুই কন্যা—চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী। প্রথমার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বড় চিরঞ্জীবের বিবাহ হয়। বড় কিংকর এর সঙ্গেই ছিল।

ঘরের বাইরেই প্রথম বিবাদের পর্ব শুরু হল। ছোট-বড় চিরঞ্জীব ও কিংকরকে দেখে সকলে ভুল করতে শুরু করলো। বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নাটকের মূল ঘটনা এগিয়ে চলে। শেষপর্যন্ত দেবালয়ের প্রাঙ্গণে সোম দত্ত তাঁর সংসারের স্ত্রী-পুত্র ও ভৃত্যদ্বয়ের সন্ধান পেলেন। বিলাসিনীর সঙ্গে ছোট চিরঞ্জীবের বিবাহের কথা পাকা হল।

এই সংক্ষিপ্ত মূল কাহিনীর শুধু গল্পের প্রধান বক্তব্যটুকু ছবির চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। ঘটনা এবং পরিবেশ নতুন আঙ্গিক পরিচালক ব্যক্ত করেছেন। ছবি দেখতে বসে এ কাহিনী আপনাদের নতুন বলে মনে হবে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—দ্বৈত চিরঞ্জীব ও কিংকরের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রপ্রভা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিলাসিনী—সন্ধ্যা রায়, বসুপ্রিয়—বিধায়ক ভট্টাচার্য, সোম দত্ত—বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যময়ী—ছায়া দেবী, রূপবতী—লীলাবতী করালি, অপরাজিতা—সবিতা বসু, ধর্ম দত্ত—তরুণকুমার ও অন্যান্য চরিত্রে জয়নারায়ণ, মণি শ্রীমানী, তমাল লাহিড়ী, গৌর সী, প্রশান্ত চ্যাটার্জি ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

—চিত্রদূত

।। টনি কার্টিস : ক্রিস্টিন কাউফম্যান ।।

৩৭ বছরের টনি কার্টিস সম্ভবতঃ আগামী ১১ই অথবা ১২ই জানুয়ারী জার্মান চিত্রাভিনেত্রী সপ্তদশী ক্রিস্টিন কাউফম্যানকে বিয়ে করবেন। দশ বছর অভিনেত্রী জেনেট লের সঙ্গে সংসারযাত্রা করার পর তাঁর সঙ্গে টনির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। হলিউডের গুজব তাঁর জন্যে নাকি ক্রিস্টিনই দায়ী। অবশ্য টনির ভূতপূর্ব স্ত্রী জেনেট প্রতিহিংসা নিয়েছেন অদ্ভুতভাবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই জেনেট ফাটকা বাজারের দালাল বব ব্র্যাসটকে নিয়ে বিবাহ-রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হন। এবং পূর্ব স্ত্রীর দ্রুত পুনর্বিবাহের লজ্জা এড়াবার জন্যেই মনে হয় টনিও যথাসত্বর ক্রিস্টিনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসেছেন। মার প্রভাবে ক্রিস্টিন এক কথায় রাজী হন নি। মার প্রভাব তাঁর ওপরে কম নয়। কারণ 'রোজেন রেজলি', 'দি সাইলেণ্ট এঞ্জেল', 'গার্লস ইন ইউনিফর্ম' প্রভৃতি ছবির সাফল্যের মূলে ছিলেন মা এবং তিনিই তাঁকে জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান হাইমাণ্ট থেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নাম করার জন্যে অন্যান্য জার্মান, ইটালীয়ান চিত্র-প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। ঐসব প্রতিষ্ঠানে থাকার কিছুদিন পরে ক্রিস্টিন মিউনিক ও ভিয়েনার কার্ক ডগলাসের সঙ্গে বিশ্বনন্দিত 'সিটি উইদাউট পিটি'তে খ্যাতিলাভ করেন। হলিউডে এসে ক্রিস্টিন টনি কার্টিস ও ইউল ব্রাইনারের সঙ্গে 'টারসা বালবা' অভিনয় করেন। হলিউডে যাওয়া সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মার অমতই ছিল। হলিউডে অভিনয় করার পর ক্রিস্টিন দেশে ফিরে এলে টনিও তাঁর সঙ্গে আসেন জার্মানীতে। জার্মানীর প্রায় সব জায়গাতেই টনি এবং ক্রিস্টিনকে একসঙ্গে দেখা যেতে থাকে। তাঁর মা মেয়ের এই প্রেমকে মোটেই সুনজরে দেখেননি এবং এই নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ-ও করেছিলেন অবশ্য কুৎসার ভয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যেতে হয়। টনিকে বিবাহের প্রস্তাবে তিনি মেয়েকে জানিয়েছেন জানুয়ারী মাসে সাবালিকা হলে সে যা খুশী করতে পারে। ক্রিস্টিনের সেই 'যা খুশী করা'র দিন ধার্য হয়েছে ১১ই অথবা ১২ই জানুয়ারী।

ক্রিস্টিন কাউফম্যানের নবতম ছবি 'নাইন্টি মিনিটস্ আফটার মিডনাইট' ছবির কাজ এখনো চলছে। —চিত্রকূট

টনি কার্টিস ও ক্রিস্টিন কাউফম্যান

খেলাধুলা

দর্শক

॥ অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি ॥

এডলেডে অনুষ্ঠিত এম সি সি বনাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের চারদিনের ক্রিকেট খেলা ড্র গেছে। বৃষ্টির দরুণ এম সি সি দল জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

এম সি সি এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩৮। খেলার ফলাফল : এম সি সি'র জয় ১৯, ড্র ১৪ এবং পরাজয় ৫।

প্রথমদিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দল ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩২৪ রান করে। জন লিল ৭১ মিনিটের খেলায় ৮৭ রান ক'রে নিজ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করার কৃতিত্ব লাভ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স ৪২ রান করেন। পাঁচ বোলার-দের সহায়ক ছিল না। ১৫৪ রানের মাথায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের তিনটি উইকেট (৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম) পড়ে যায়। খেলার প্রথম এক ঘন্টা এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ১৫৪ রানের মাথায় এম সি সি দলের বোলাররা যা কিছুটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। শেষের-দিকেও এম সি সির বোলাররা সুবিধা করতে পারেনি—অষ্টম উইকেটের জুটিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ৬০ রান উঠে যায়।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানে শেষ হয়—অর্থাৎ প্রথমদিনের ৩২৪ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১১রান যোগ হয় ৩৩ মিনিটে, এদিকে উইকেট পড়ে বাকি ৩টে। এইদিনের বাকি সময়ে এম সি সি ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩৩৩ রান করে।

তৃতীয়দিনের খেলার সমস্ত গৌরব এম সি সি দলের। এম সি সি ৫০৮ রানে (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের সহ-অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবারও গোল্লা করেন—দুটো খেলায় উপর্যুপরি তিনটে গোল্লা। মিডলসেক্স কাউন্টি দলের চৌকস খেলোয়াড় ফ্রেড টিটমাস ১৩৭ রান ক'রে নটআউট থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে তাঁর চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং এই ১৩৭ সর্বোচ্চ রান। গ্রেভনীর পাথরচাপা কপাল—মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরী করার গৌরব হাতছাড়া করেন। ব্যারিংটনের ১০৪ রান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বোলার হক ১৩০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৭৪ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থদিনে ২৮৩ রানের মাথায় (৭ উইকেট পড়ে) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সোবার্স ৯৯ রান ক'রে রানআউট হন—নিজ দলের পক্ষে তাঁর রানই সর্বোচ্চ ছিল। খেলার এই অবস্থায় এম সি সি দলের জয়লাভ করতে ১১১ রানের প্রয়োজন হয়, তখন খেলা ভাঙ্গতে ৬৭ মিনিট সময় ছিল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৯ মিনিট আগেই বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে যায়; এই সময়ে এম সি সি'র জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান থেকে মাত্র ১৬ রান কম ছিল। এই ষোল রান করতে পারলেই এম সি সির ষোলকলা পূর্ণ হ'ত। বৃষ্টির দরুণ ১৩০ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।
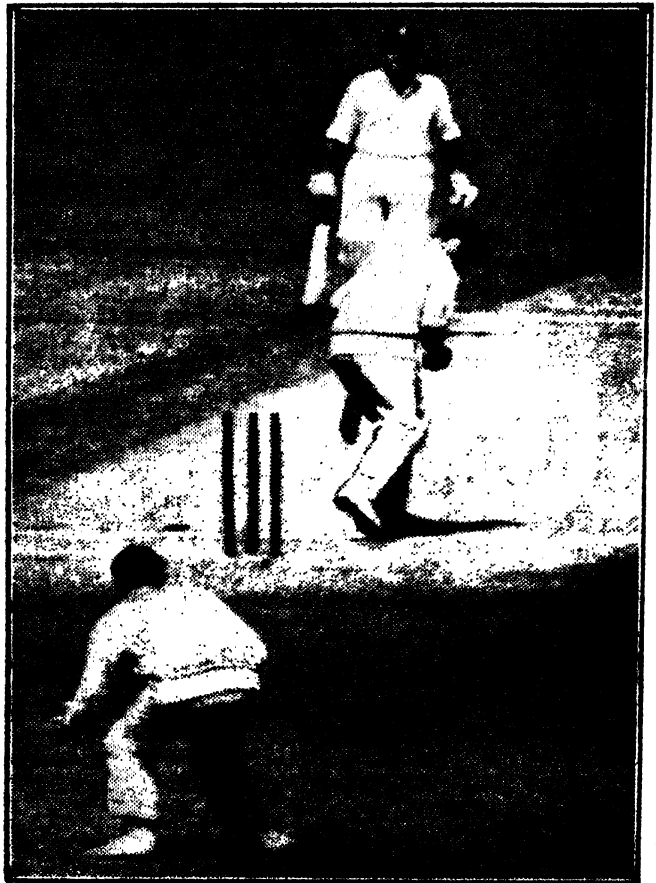
এডিলেডে ওভাল মাঠে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বনাম এম সি সি'র খেলায় হকের বলে এম সি সি'র কলিন কাউড্রের শূন্য ক'রে আউট হওয়ার দৃশ্য—কলিন কাউড্রের উপর্যুপরি তৃতীয় বার শূন্য রান।

দ্বিতীয় ইনিংসে কাউড্রে ৩২ রান ক'রে নটআউট থাকেন। তাঁর প্রথম উইকেটের জুটি জিওফ পুলার ৫৬ রানে আউট হ'ন। প্রথম উইকেটের জুটিতে তাঁরা এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৯১ রান তুলে দেন।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৫ রান (জেন লিন্ড ৮৭ এবং ম্যাকালাচান ৫৩। স্টেথাম ৫৮ রানে ৪ উইকেট) ও ২৮৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গারফিল্ড সোবার্স ৯৯। স্টেথাম ৮৩ রানে ৩ উইকেট)।

এম সি সি : ৫০৮ রান—৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। (ফ্রেড টিটমাস ১৩৭, কেন ব্যারিংটন ১০৪, টম গ্রেভনী ৯৯। হক ১৩০ রানে ৬ উইকেট) ও ৯৫ রান (১ উইকেটে। পুলার ৫৬)।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানী

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মানীর পঞ্চম এ্যাথলেটিক টেস্টের ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রিলে অনুষ্ঠানে এসিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ হয়। পশ্চিম জার্মানীর জাঞ্জ ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫১·৩ সেকেন্ডে দুরন্ত পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম হ'ন এবং নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ৪×৪০০ মিটার রিলে অনুষ্ঠানে জার্মানী ১ মিঃ ৫২·২ সেকেন্ডে প্রথমস্থান পেয়ে এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করে।

হায়দরাবাদের ষষ্ঠ এ্যাথলেটিক টেস্টেও পশ্চিম জার্মানী তাদের জয়লাভের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১১টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে। ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী তিনজন এ্যাথলীটই (স্কুম্যান, নাগভূষণম এবং রাজশেখরম) এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেন। লং জাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানের তিনটি স্থানই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা অধিকার করেন।

বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর সপ্তম তথা সর্বশেষ এ্যাথলেটিক্স টেস্টে পশ্চিম জার্মানী মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। জার্মাণ দল হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ৬টি ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়। ভারতবর্ষ পোলভল্ট, ১১০ মিটার হার্ডলস, হাইজাম্প, লংজাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে প্রথম স্থান পায়। ভারতীয় জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে ৮০০ মিটার দৌড়, পোল ভল্ট, সটপুট, ডিসকাস, ৪০০ মিটার হার্ডলস, হাতুড়ি নিক্ষেপ ও ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে। একমাত্র পশ্চিম জার্মানীর উয়রবাক দুটি অনুষ্ঠানে—সট্‌পুট এবং ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

॥ টেড ডেক্সটার ॥

অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দল তথা ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। টেড ডেক্সটার একজন খ্যাতনামা অপেশাদার টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়। জীবনবীমা কোম্পানীর চাকুরী-জীবন ছাড়াও বেতার ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার এবং বিজ্ঞাপনের লেখক হিসাবে তিনি বেশ সম্মানজনক পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাছাড়া অতি সম্প্রতি তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ডেক্সটার নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন, ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের উপর নির্ভর করে তাঁর আর্থিক অবস্থা বর্তমানে বেশ স্বচ্ছলই। কিন্তু তিনি তাঁর বয়স এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য এই দুটির উপর বেশী গুরুত্ব রেখে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম-পন্থা স্থির করে নিতে আজ খুবই ব্যগ্র। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানে চাকুরী সূত্রে আবদ্ধ রয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মহল ডেক্সটারের ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবন সম্পর্কে মোটেই উৎসাহিত নন্। তাঁদের মনোভাব, ডেক্‌সটার তাঁর ২৮ বছরের ব্যক্তিগত জীবনে ক্রিকেট খেলায় যা দিয়েছেন তা যথেষ্টই। সুতরাং ডেক্সটার বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বর্তমান চাকুরী বজায় রাখতে হলে তাঁকে ক্রিকেট খেলা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

আগামী মার্চ মাসেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবন সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে বাঙ্গালোরে ১৯৬২ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার কথা। সংবাদে প্রকাশ, মহীশূর স্টেট ফুটবল এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এল আর ডি ক্লাব আদালতে যে মামলা দায়ের করেছে তার ফলে মহীশূর স্টেট ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করার নাকি অসুবিধা ছিল। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির বিবৃতি থেকে জানা গেছে সে রকম অসুবিধা নেই।

খেলার তালিকা

প্রথম রাউণ্ড : (১) গুজরাট : উড়িষ্যা (২৩শে ডিসেম্বর)

দ্বিতীয় রাউণ্ড—(২) রেলওয়ে : বিহার (২২শে); (৩) মধ্যপ্রদেশ : অন্ধ্র (২২শে)। (৪) কেরালা : রাজস্থান (২৪শে); (৫) বিজয়ী (১) : মহীশূর (২৫শে); (৬) বাংলা : উত্তরপ্রদেশ (২রা জানুয়ারী); (৭) আসাম : মাদ্রাজ (৩০শে ডিসেম্বর); (৮) সেনাদল : পাঞ্জাব (২৯শে); (৯) দিল্লী : মহারাষ্ট্র (৩০শে)।

কোয়ার্টার ফাইনাল—বিজয়ী (২) : বিজয়ী (৩) ২৬শে; বিজয়ী (৪) : বিজয়ী (৫)—২৮শে; বিজয়ী (৬) : বিজয়ী (৭)—৩রা জানুয়ারী; বিজয়ী বিজয়ী (৮) : বিজয়ী (৯)—১লা জানুয়ারী।

সেমিফাইনাল খেলা দুটি ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী, তৃতীয় স্থানের জন্য সেমি-ফাইনালে বিজিত দু'দলের খেলা ৭ই জানুয়ারী এবং ফাইনাল খেলা ৬ই জানুয়ারী হওয়ার কথা আছে।

ভারত-সিংহল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের চতুর্থ বার্ষিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় (স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের) ভারতবর্ষ ১০—৫ লড়াইয়ে সিংহলের বিপক্ষে প্রথম জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে এই দ্বৈত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ১৯৫৯ সালে কলম্বোতে প্রথম আরম্ভ হয়। সিংহল উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে—১৯৫৯ সালে ৯—৬, ১৯৬০ সালে ৮—৭ এবং ১৯৬১ সালে ৮—৬ লড়াইয়ে। বর্তমানে সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল—সিংহলের জয় ৩ এবং ভারতবর্ষের ১ (১৯৬২)।

আলোচ্য চতুর্থ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সিংহলের নোয়েল বুলনার জুনিয়র বিভাগে এবং ভারতবর্ষের সমর মিত্র সিনিয়র বিভাগে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন। সমর মিত্র (নাসিরুদ্দিন স্কুল, ক'লকাতা) হেভী ওয়েট বিভাগে সিংহলের এল ভি ডগলাসকে পয়েন্টে পরাজিত করেছিলেন।

ভারতবর্ষ দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে এন ডি গুণশেখর কাপ পায় এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক সমর মিত্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে ওবেসেকার কাপ পান।

জাতীয় জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতা

গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় দিল্লীর প্রতিনিধিরা পুরুষ এবং বালকদের দলগত বিভাগে এবং বালকদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ ক'রে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। পশ্চিম বাংলা বালক এবং বালিকাদের দলগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং বালিকাদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। পশ্চিম বাংলার

পক্ষে বালিকাদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন যথাক্রমে অরুণা দাশগুপ্ত এবং বাসনা রায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল

চীনের ভারতভূমি আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। চীনা হানাদারদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। চীনাদের এই অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে অর্থ, স্বর্ণ, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামগ্রী দান করতে এগিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলি এবং ক্রীড়াবিদরাও জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য বোম্বাইয়ে ভারতীয় দল বনাম রোভার্স একাদশ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় দল ৩—১ গোলে জয়লাভ করে। ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়দের নিয়ে এই প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী খেলায় ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

প্রথম এশিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের পূর্বাঞ্চলের সদস্য শ্রীদিলীপ বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটির তহবিলে ব্যক্তিগতভাবে ১৪০০ টাকা দান করেছেন।

১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক শ্রীশৈলেন মান্না পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটির তহবিলে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান ক্লাবের আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ উপলক্ষ্যে তিনি এই আংটিখানি উপহার পেয়েছিলেন।

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ১৩ই অক্টোবর থেকে বোম্বাইয়ে প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ৪৪টি দল যোগদান করেছে—স্থানীয় দল ১৫টি এবং বহিরাগত দল ২৯টি। গত বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী ই এম ই সি (সেকেন্দ্রাবাদ), রানার্স-আপ মোহনবাগান, সেমি-ফাইনালে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং হায়দরাবাদের অন্ধ্র পুলিশ দলের প্রথম খেলা পড়ে তৃতীয় রাউন্ড থেকে।

তৃতীয় রাউন্ডে মোহনবাগান দলের খেলা পড়ে আই এস ই দলের (বাঙ্গালোর) সঙ্গে। এই খেলাটি প্রথম-দিন ২—২ গোলে ড্র যায়। মোহনবাগান ২—০ গোলে অগ্রগামী থেকেও শেষ-পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়-দিনের খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়লাভ করে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। খেলার শেষ দশ মিনিটে মোহনবাগান দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড শেখ আলি দুটি গোল দেন।

তৃতীয় রাউণ্ডের অপর এক খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সহজভাবেই ৪—০ গোলে বাঙ্গালোরের প্রখ্যাত হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট দলকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দল এই খেলার প্রতি অর্ধে দুটো ক'রে গোল দেয়। কোয়ার্টার-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা পড়েছে হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল পুলিশ দলের সঙ্গে। গত বছরের প্রতিযোগিতার হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল পুলিশ দল অপ্রত্যাশিতভাবে ৬—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল।

ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে ১—৫ গোলে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে গত ৩০শে অকটোবর থেকে বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি দেশের মোট সাতজন প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই সাতজনের মধ্যে চারজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান—ইংল্যান্ডের হার্বার্ট বিথান (১৯৬০), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮), অস্ট্রেলিয়ার রবার্ট মার্শেল (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১) এবং অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লারি (১৯৫৪)। এ ছাড়া আছেন সোমনাথ ব্যানার্জি (ভারতবর্ষ), বিল হারবার্ট (নিউজিল্যাণ্ড) এবং রসিদ করিম (পাকিস্তান)। অস্ট্রেলিয়ান বিলিয়ার্ডস কাউন্সিলের ঔদার্যে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রতিনিধি সোমনাথ ব্যানার্জির পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা সম্ভব হয়েছে।

এ পর্যন্ত (১২।১১।৬২) একমাত্র উইলসন জোন্সই প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। উইলসন জোন্স ১,৯৯১—১৯২৩ পয়েন্টে সোমনাথ ব্যানার্জিকে, ২,৩৪৫—৭১৬ পয়েন্টে রসিদ করিমকে, ১৪১০—৮৭৯ পয়েন্টে বিল হারকোর্টকে, ১,৬৬৬—১৪৮৮ পয়েন্টে বব্ মার্শেলকে এবং ১৫৮২—১১০৩ পয়েন্টে ১৯৬০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হার্বার্ট বিথামকে পরাজিত করেছেন।

উইলসন জোন্স ভারতবর্ষের এক নম্বর বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড়। তিনি বহুবার ভারতবর্ষের জাতীয় অপেশাদার বিলিয়ার্ডস এবং স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ করেছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম স্থান এবং ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান (জয় ৫ এবং হার ২) লাভ করেন। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেলেও তিনি কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেন—সর্বাধিক ব্রেক (৫৮৯), সর্বাধিক সমষ্টি (১২,০৮৯) এবং সর্বাধিক পয়েন্ট (২,৪৬৮)। সর্বাধিক 'ব্রেক' রেকর্ড করার দরুণ তিনি 'এ রস হিউইট কাপ' পুরস্কার লাভ করেন।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই খেলা শুরু হবে মাদ্রাজে ১লা ডিসেম্বর। প্রথমে খেলাটি দিল্লীতে হওয়ার কথা ছিল। মেক্সিকো ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ৩—২ খেলায় শক্তিশালী সুইডেনকে পরাজিত ক'রে ইণ্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার বিজয়ী দেশই শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবনে—২৬শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বর। ইতিমধ্যেই মেক্সিকোর খেলোয়াড়রা ব্রিসবেন যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কেটে রেখেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd November 1962
40 Naya Paise.

চীন আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমবারে তাহারা অতর্কিত আক্রমণ ও আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলার পূর্ণ সুযোগ লওয়া সত্ত্বেও আমাদের রক্ষীবাহিনীকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই কেবলমাত্র আমাদের সেনাগণের প্রবল যুদ্ধদানে প্রবল প্রতিরোধ চেষ্টার কারণে। ঐ প্রথম দিকের আক্রমণের অভিজ্ঞতার বশে নূতন প্রস্তুতিতে এবং নেফা অঞ্চলের পথহীন পর্বতমালায় উহাদের অভিযান চালনার পথ-ঘাট করিবার জন্য বিস্ফোরকে পাহাড় উড়াইয়া ও কাটিয়া ফেলিতে, এতদিন হয়তো যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত বিরতি দিয়াছিল চীনাগণ। এখন সেই প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হওয়ায় যুদ্ধের দ্বিতীয় ও প্রবলতর অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভের প্রথম দিকেই নেফায় উহাদের লক্ষ্যস্থলের একটি উহারা অধিকার করিয়াছে এবং দ্বিতীয়টির জন্য অর্থাৎ সেলা গিরিসংকটের জন্য প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। এই দুইটি অধিকার করিলে পরে উহারা উহাদের প্রকৃত অভিযান-পথের সম্মুখের ঘাঁটিতে পৌঁছাইবে, অর্থাৎ চীনা যুদ্ধ-অভিযান তাহার প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিবে এবং তাহার লক্ষ্য বুঝা যাইবে। লাডাকে এখন চুসুলই চীনাদের লক্ষ্য।

নেফায় জং এলাকা ও ওয়ালং শহর চীনাদের হস্তগত হওয়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ ও তাহার ফলাফল বুঝা যাইবে চীনাদের অগ্রগতির পরিমাণ ও বিস্তৃতির পূর্ণ বিবরণ পাইলে পর। এখন যাহা বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় চীনারা তাহাদের শীতকালীন যুদ্ধ-অভিযানকে পূর্ণরূপে চালিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছে, যাহাতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দোষ-ত্রুটি শোধরাইবার অবকাশ আমরা না পাই।

অভিযান আরম্ভের পর চার সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এখনও আমাদের ভরসা শুধু আমাদের বীর সেনাদলের শৌর্যবীর্য ও অদম্য যুদ্ধদানে স্পৃহা ও উৎসাহের উপর। আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কঠোর ব্রত পালনের জন্য। এখন প্রয়োজন দৃঢ়সংকল্পের ও সহিষ্ণুতার।

আমাদের অভাব প্রধানতঃ যুদ্ধ-সম্ভারের এবং সেই অভাব পূরণ করিতে প্রয়োজন প্রধানতঃ সময় এবং যথাযথ ব্যবস্থার। এই দুইয়ের জন্যই আমাদের অতি কঠোর মূল্যদান করিতে হইবে, সহ্য করিতে হইবে অনেক কিছুই যাহা দুঃসহ ঠেকিবে প্রথম দিকে। আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসিগণ যুদ্ধবিগ্রহে অনভ্যস্ত। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ আমরা দেখি নাই এক শতাব্দীর উপর এবং পরোক্ষভাবেও যাহা দেখিয়াছি তাহা ব্যাপক কোনও দিন হয় নাই, কি সময়ের হিসাবে, কি ভূমির পরিমাণে। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফলে অতি অল্পেই আমাদের মনে হয় মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর বুঝি রক্ষা নাই। আবার সামান্য যুদ্ধ-বিরতিতে আমরা উল্লসিত হইয়া উঠি, মনে করি ঝড় বুঝি কাটিয়া গেল।

আমাদের বুঝিতে হইবে যে যুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি শুধুমাত্র এই সকল বিচ্ছিন্ন জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে দীর্ঘকালের বুদ্ধি, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্তে শক্তি-পরীক্ষার পরিণতির উপর। যে দেশ বিঘ্ন-বিপদ, দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ দিতে থাকে সে দেশ অজেয়, এ তো এই শতাব্দীতেই একাধিক বার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যোদ্ধার অভাব নাই। সময় পাইলে শতাধিক ডিভিশন রণাঙ্গনে পাঠাইতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এবং অস্ত্র-সাহায্যও আমরা পাইতেছি ও পাইব।

তবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি-পর্বে এখন আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এবং দেশের ভিতরে শত্রুর পঞ্চম-বাহিনীর উপরেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এখন নিতান্তই প্রয়োজন। শত্রুর অগ্রগতিতে তাহারা আশান্বিত হইয়া দেশবিধ্বংসী কার্যকলাপের সূচনা করিতে পারে। আসামে ট্রেন লাইন বিচ্যুত করার চেষ্টা, বর্ধমানে "চীন-প্রতিরোধ"-মিছিলের উপর পট্‌কা ও ইষ্টক নিক্ষেপ, এগুলি শুভলক্ষণ নয়।

ভারতের আর এক শত্রু এখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে আমাদের জন্য অস্ত্রপ্রেরণে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়া বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ হয় নাই তাহার। এখন চলিতেছে অবিশ্রাম গালিবর্ষণ, নিন্দাবাদ এবং এই সুযোগে ভারতকে ঘায়েল করার উস্কানি সেখানের সংবাদপত্রে। তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষ এখন বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রধান-মন্ত্রীকে চিঠি দিয়াছেন, ইহা একটি সুসংবাদ বটে।

গান

॥ ১ ॥

(অংশ)

মাগো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে॥

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ তলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হবো কোন্ কালে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

(পুনর্মুদ্রণ)
কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ

গান

॥ ২ ॥

(অংশ)

দুর্গম গিরি-কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

গিরি সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কান্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুঁসিয়ার

(পুনর্মুদ্রণ)
নজরুল ইসলাম

চীনের প্রতি

আশিস সান্যাল

বিশ্বাসের বিনিময়ে করেছো আহত। তুমি ঘৃণ্য দাবানলে
বিধ্বস্ত করেছো মৈত্রী, অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিক নিয়ম-চেতনা
অসুস্থ রক্তের লোভে। তাই আজ অবিরত তীব্র অনুতাপে
ভীষণ ধিক্কার ধ্বনি। চতুর্দিকে অপ্রেমের প্রবল প্রতাপে
তোমার আকাশ যেন স্মরণীয় সূর্যোদয়ে যেতে যেতে ক্রমে
আঁধারে বিনষ্ট আজ। কিন্তু তবু সময়ের ইতিহাস জানে
পেছনে ফেরে না সূর্য, আলো কিংবা মানুষের নির্ভয়
মহিমা—
আততায়ী স্তব্ধ সব—কবরের অন্ধকারে যেহেতু নিহত।

রক্তের দুর্লভ স্রোতে প্রতিহত করবো তোমাকে। ভ্রান্ত চীন,
তোমার ঔদ্ধত্য আর দস্যুতো-লোলুপ এই স্বার্থের লালসা,
সাম্রাজ্যের লোভে ভ্রষ্ট, উত্তেজিত কোলাহলে প্রতিভাত মুখ
দেখবো না কোনোদিন। বন্ধুত্বের প্রতিদানে চতুর আঘাতে
বিধ্বস্ত করেছো মৈত্রী। তাই আজ সমবেত আমরা সকলে
রক্তাক্ত প্রাণের মূল্যে রুখবোই অভিশপ্ত তোমার সংগ্রাম।

জৈমিনি

পাঠক! আজ আমি হাল্কা কথায় আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করব না। সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। মাঝে মাঝে এমন উপলক্ষ্য আসে যখন সোজা-সুজি কথা বলার দরকার হয়। ভারতের উপর লাল চীনের আক্রমণে আজ জৈমিনির মতো বিদূষকেরও কিছু স্পষ্ট-ভাষণের প্রয়োজন ঘটেছে।

চীনের এই অতর্কিত আক্রমণে সারা ভারতবর্ষ আজ যেভাবে এক হ'য়ে রুখে দাঁড়িয়েছে তা অভূতপূর্ব। দেশের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা অর্থ দিয়ে, সোনা দিয়ে এবং যা সোনার থেকে দামী সেই রক্ত দিয়ে আমাদের জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিশিখাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলছেন। এই আত্ম-নিবেদনের ডাকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদেরও যে বিশেষভাবে সাড়া দেওয়ার দায়িত্ব এসে গেছে সেই কথাই আমি বিশেষ করে বলতে চাই।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকগণের ঐতিহ্য খুবই গৌরব-পূর্ণ। স্বাজাত্যবোধ বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম প্রেরণা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অগণিত কবি ও সাহিত্যিক স্বদেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করে মহত্ত্ব অর্জন ক'রে গেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকগণও এ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। শরৎচন্দ্র ও নজরুলের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকগণের অনেকে এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন বলে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না, কিন্তু প্রায় সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী দেশজননীর সেবা করে ধন্য হ'য়েছেন।

কিন্তু গত দশ বারো বছরে বাংলা সাহিত্যের গরিষ্ঠ অংশ যেন এই জাতীয়-কর্তব্য পালনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। এই লেখকদের প্রতিই আজ আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে চাই।

আমি জানি, সৌন্দর্য সৃষ্টি একটা বড় কথা। সুন্দরভাবে প্রকাশিত না হ'লে কোনো বক্তব্যই পাঠক-সাধারণের মনে

স্থায়ী আবেদন জাগাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সুন্দরের লাবণ্যমণ্ডিত প্রকাশের নিচে থাকে মঙ্গলের শোণিত-প্রবাহ। যে সাহিত্যকর্ম পাঠকবর্গের মনকে মানুষের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে না তোলে, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয়ে সচেতন করে না তোলে, তাতে সৌন্দর্য যতোই থাক তা নিস্ফলা। কিংবা তাও নয়। সত্যি বলতে গেলে বলা যায়, এধরণের সৌন্দর্য আসলে কোনো সৌন্দর্যই নয়, তা প্রাণহীন অনুকরণ-মাত্র। আর অনুকরণ যে শেষপর্যন্ত বিকারে পর্যবসিত হয় সে তো বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের যে অংশের কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, বিকারই তার প্রধান উপজীব্য। স্বকপোল-কল্পিত মন-দেওয়া-নেওয়ার হেঁয়ালি, কিংবা রীতির ঝুটো জৌলুস দিয়ে তার অসারতা আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। সিম্বলের নামে কবিতায় যেমন দেখা যাচ্ছে পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ, গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি নকল কাব্যিয়ানা এবং চেতনা-প্রবাহের অচেতন উন্মাদনা বোবার আর্তনাদের মতো করুণ হ'য়ে উঠেছে।

এই পটভূমিতে চীনা-আক্রমণ আজ তরুণতর লেখকদের সামনে প্রবল একটি চ্যালেঞ্জের মতো উদ্যত।

চল্লিশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি এঁদের বিরাগ এঁরা নানাভাবেই প্রকাশ করেছেন। সে সময়ের অনেক লেখাই আজ অপাঠ্য তা সবিনয়েই মেনে নেব, (কোন সময়েরই বা সব রচনা পরবর্তী-কালে সুপাঠ্য হয়!) কিন্তু একটা কথা তবু স্বীকার করতে হবে যে, লক্ষ্যের বিষয়ে তাঁদের মনে কোনো গোঁজামিল ছিল না। সাহিত্য যে সমাজবাসী মানুষের দ্বারা সামাজিক মানুষের জন্যেই রচিত হয়, এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন স্থিরনিশ্চয় —আর এও তাঁরা জানতেন যে, জাতির প্রধান দায়িত্বের সঙ্গে যে-সাহিত্য হাত মিলিয়ে চলতে পারে না, ইতিহাস তাকে নির্বিচারে নিক্ষেপ করে আবর্জনাস্তূপে।

সাহিত্যিক এবং শিল্পীগণ এই দেশেরই মানুষ। জ্ঞানগরিমায় তাঁরা বিশ্বনাগরিকতার অংশীদার হলেও দেশের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সাধারণ মানুষেরই পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। গত মহাযুদ্ধের সময় আমরা এই কলকাতা শহরেই সামরিক পোষাক পরি-হিত বহু বিদেশী কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে দেখতে পেয়েছি। হয়তো আমাদের দেশে ঠিক এই মুহূর্তেই সেরকম সর্বাত্মক সামরিক-বৃত্তির আহ্বান এসে উপস্থিত হয়নি, কিন্তু তার বাইরেও করণীয় আছে অনেক কিছুই।

> **॥ মনে পড়ল ॥**
>
> **এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠায় একটি রচনা প্রকাশিত হবে। মোটামুটি ৮৪০টি শব্দ-সম্বলিত এই রচনা—হাসির ঘটনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী, স্বীকার - কাহিনী, অলৌকিক অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে হতে পারে। প্রথমে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা দিয়ে শুরু করে এই বিভাগে অদূর-ভবিষ্যতে পাঠক-পাঠিকাদের লেখা প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই 'অমৃতে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই ধরণের মনোজ্ঞ এবং সুলিখিত রচনা পেলে আমরা সানন্দে প্রকাশ করব।**
>
> সম্পাদক, 'অমৃত'।

একথা সকলেই জানেন যে, শিল্প-সাহিত্যের প্রেরণা-সঞ্চারী ক্ষমতা অসাধারণ। একটা বন্দুক কেবল একজন সৈনিকের বুকে সাহস জোগায়, কিন্তু একটি গান পুরো ব্যাটালিয়ানকে অনু-প্রাণিত করে তোলে। এই ভাবমণ্ডল গঠনের জন্যে শিল্পী-সাহিত্যিকগণকে আজ বিশেষভাবে সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে।

বাংলাদেশে আজ যে ধরণের ছবি আঁকা হয়, যাকে চলতি কথায় বলে মডার্ণ আর্ট, তার মধ্যে ভালো কিছু একেবারে নেই তা বলা হয়তো অন্যায় হবে, কিন্তু নতুন কিছু করার ঝোঁকটা সেখানে এতই প্রবল যে ছবি-আঁকা প্রায় খেয়ালখুশির নামান্তর হ'য়ে উঠেছে। এই নৈরাশ্যের কারণ কী, তার হয়তো অনেকরকমই ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। তবে শিল্পীদের দায়িত্ব তাতে কমে না, বরং বেড়ে যায়। কারণ দর্শকের হৃদয়ানুভূতি যদি কোনো রকমেই চিত্রের ভিতরে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তাদের ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। এবং সে বাধার প্রাচীর ভাঙতে হবে শিল্পীদেরই।

আজ দেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে সাহিত্যিকগণের সঙ্গে শিল্পীদের সামনেও তাই নতুন কর্তব্য দেখা দিয়েছে। তাঁরা শুধু ফর্মের কারিকুরি ছেড়ে বলিষ্ঠ ভাববস্তুর সার্থক রূপায়ণের দিকে এগিয়ে আসবেন এবং চিত্রানুরাগী জনসাধারণের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবেন, এইটেই এখন আমাদের বিশেষ প্রত্যাশা।

এবং এইকথাই বলব আমরা দেশের তরুণ সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুরকারদের। বাঙালী তার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের জন্যে গৌরব অনুভব করে। বন্দেমাতরম এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাঙালীরই অমর স্বদেশপ্রেমের বাণীমূর্তি। তাছাড়াও আরো শত শত গান একদিন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে দেশপ্রেমের প্লাবন এনে দিয়েছে। এই গৌরবময় উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ সত্ত্বেও কেন যে নবীন বাংলার গীতিকার এবং সুরস্রষ্টা-গণ তাঁদের জাতীয় কর্তব্যে পিছিয়ে থাকবেন, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া কঠিন।

তাই আজ আমাদের তরুণতর সাহিত্যিক-শিল্পী ও সুরকারদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা বাস্তব কর্তব্যের বিষয়ে অবহিত হন। চীনের এই নগ্ন আক্রমণকে আমাদের জওয়ানেরা যেমন প্রতিহত করছে দুর্জয় সাহসে, আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদেরও গড়ে তুলতে তেমনি স্বাজাত্যবোধের দুর্জয়তর প্রেরণা। আজ শিল্পীরা তাঁদের রঙে ও রেখায়, সাহিত্যিকগণ তাঁদের উদ্দীপ্ত কল্পনার বাঙ্ময় প্রকাশে এবং সুরস্রষ্টাগণ তাঁদের সঙ্গীতের মৃত্যুঞ্জয় আহ্বানে সমস্ত দেশের হৃদয়কে মুক্তিমন্ত্রে জাগ্রত ক'রে তুলুন।

ইতিহাস তাঁদের আশীর্বাদ জানাবে।

বর্তমান সীমান্ত-সঙ্কট ও আমাদের কর্তব্য

তুষারকান্তি ঘোষ

কখনো যা ভাবিনি, তাই হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে। যে চীনকে আমরা আপনার বলে জেনেছিলাম, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, যাকে আমরা আত্মার আত্মীয়রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম, আঘাত এসেছে সেই চীনের কাছ থেকেই। চীন সমস্ত মানবিক নীতি ভুলে বর্বর শক্তির দম্ভে আমাদের বন্ধুত্বের প্রসারিত হাতে তার লালসার নখর বসিয়েছে। আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতিদানে সে আমাদের প্রিয়তম বাসভূমি গরীয়সী মাতৃভূমির সীমান্ত কামড়ে ধরেছে। বেশ কিছুটা গ্রাসও করেছে। আমরা চমকে উঠেছি। আমরা বিস্মিত হয়েছি। একটা অতর্কিত ভূকম্পনে আমাদের বিশ্বাসের ভিৎটাই যেন নড়ে উঠেছে। নড়ে উঠেছে এই জন্যে যে, চীন ছিল আমাদের বন্ধু, ভারতের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের সম্পর্ক। সেই বন্ধুই আজ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নেমেছে। ইতিহাসে এ বিশ্বাসঘাতকতার নজির দুর্লভ।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত আর ইতিপূর্বে এতো বড়ো বিপদের সম্মুখীন হয়নি। বহু ত্যাগে, বহু আত্মদানে যে স্বাধীনতার সূর্য ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছে, হঠাৎ যেন একটা কালো মেঘ ক্ষুধার্ত রাহুর মতো তার উপর কালো ছায়া ফেলেছে। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সে গ্রাস করতে চায়। পশুশক্তির অসীম স্পর্ধা শুভশক্তিকে ধুলায় বিলীন করে দিতে চায়।

এই অতর্কিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাতে আমাদের বেগ পেতে হয়েছে। বেগ পেতে হচ্ছে তার কারণ এরকম আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ভারত শান্তিবাদী। তার এই শান্তিবাদ মৌখিক নয়, আন্তরিক। এই শান্তিবাদের প্রকাশ তার আচারে, অনুশীলনে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণে যে ভারত রিক্ত, হৃতসর্বস্ব, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেই ভারতই নতুন ক'রে নিজেকে সাজানোর তপস্যায় মগ্ন। কাজেই 'সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সে তার তূণকে অস্ত্র-শস্ত্রে ভরে তোলেনি।

কিন্তু আঘাত যেদিন এলো, পররাজ্যলোভী কম্যুনিষ্ট চীনের আক্রমণ যেদিন শুরু হলো, ভারতের সেদিন ধ্যানভঙ্গ হয়েছে, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় ভারতের নওজোয়ানরা সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন। যে বলের বিকারে চীন ভারতে আক্রমণ শুরু করেছে, সেই বল প্রয়োগ করেই হয়েছে তার প্রতিরোধ করার আয়োজন। পশুশক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণশক্তির এ হলো দুর্জয় প্রতিরোধ। ভারতের পক্ষে এ হলো ন্যায়ের যুদ্ধ—সত্যরক্ষার, স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম।

চীনের এ 'চ্যালেঞ্জ'র মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমগ্র জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বান ঠিক যেন যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। সর্বপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ ভুলে ভারত আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে, হয়েছে আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন।

কিন্তু এই শক্তিকে আজ কি-ভাবে কাজে লাগাতে হবে, সেইটেই হলো আজকে আমাদের চিন্তার বিষয়। আজকের রণকৌশলের একটি প্রধান কথা হলো, আজকের দিনে যুদ্ধ জয়, শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই করা যায় না, সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে যারা থাকে, অর্থাৎ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের কর্মনিষ্ঠা ও উদ্যোগ-আয়োজনের উপর যুদ্ধজয় অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই যে যুদ্ধ আজ আমাদের সীমান্তে চলেছে, ভারতের বীর জোয়ানরা শত্রুকে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করার যে মরণপণ সংগ্রাম শুরু করেছেন, সে সংগ্রামে জয়লাভের জন্যে আমাদেরও পশ্চাৎ-ফ্রন্ট খুলতে হবে। যুদ্ধজয়ের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে আমাদের ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায়, সর্বক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে যেতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যে কাজ করি, দেশের আপদকালীন জরুরী অবস্থায় আজ তার চেয়েও ঢের বেশী কাজ চাই। কাজ-কাজ—কাজই আজ আমাদের হৃদস্পন্দন হোক। আমাদের যে জোয়ানরা আজ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামরত, আমাদের কাজই তাঁদের হাতে শক্তি জোগাবে, মনে আশা জাগাবে, তাঁরা বুঝবেন তাঁদের পেছনে রয়েছে সমগ্র জাতির সহযোগিতা। এই বিশ্বাস তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করবে।

একটা কথা আজ মনে রাখতে হবে, শত্রুকে আমাদের দেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে হলে আজ সর্বাত্মক আয়োজন প্রয়োজন। দেশের ডাকে আমাদের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ আজ যে সাড়া দিয়েছেন, সে সাড়া অভূতপূর্ব।

প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নরনারীর মনে আজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্জয় সংকল্প। দেশের দিকে দিকে আজ যেন দেশপ্রেমের প্রবল বন্যা প্রবহমান। কিন্তু শুধু আবেগ দিয়ে তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আবেগ হলো সৃষ্টিকর্মের উৎস। আজ তাই এই আবেগকে আমাদের কর্মের খাতে বইয়ে দিতে হবে।

এক মুহূর্তের জন্যেও যেন আজ আমরা না ভুলি, শত্রু আমাদের মাতৃভূমির পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সে এখনও আমাদের জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ অপমান যদি আমরা না ঘোচাতে পারি তাহলে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার আমাদের কোন অধিকারই নেই। সমগ্র বিশ্বের কাছে আমরা করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবো. আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামী ঐতিহ্য চিরদিনের মতো নষ্ট হবে। তাই শুধু সোনা-দানা, অর্থ-বস্ত্র দিলেই চলবে না, দেশের প্রয়োজনে যে-কোন কর্তব্য পালনের জন্য সকলকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ দেশের প্রয়োজন সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন, স্বাধীনতার আদর্শ সবচেয়ে বড়ো আদর্শ। এই আদর্শ রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে শেষ ভাই, শেষ পাইটিও উৎসর্গ করতে হবে। আজ ঘরে ঘরে সেই প্রস্তুতিই শুরু হোক।

আমাদের দেশবাসীর অসীম দেশপ্রেম। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও হয়তো কিছুসংখ্যক কালোবাজারী ও মুনাফাশিকারী রয়েছে, যারা এই সুযোগে নিজেদের কার্য গুছিয়ে নিতে চায়। তাদের আমরা এই বলে সতর্ক করে দিই যে ইতিহাসের ধরবদল হয়েছে, ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে, এই পরিবর্তিত পরিবেশে যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটায় তা হলে জাতি কোনদিনই তাদের ক্ষমা করবে না। জাতির দুর্দিনে নিজের সৌভাগ্যের ভিৎ রচনা করার অপচেষ্টার অর্থ হলো জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এই নীতিভ্রষ্ট ব্যবসায়ীগণ যদি এখনই এ বিষয়ে সতর্ক না হয় তাহলে সমস্ত জাতির ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলে উঠবে। আর তার পরিণাম ভয়াবহ।

আর একটি কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এখনও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যে এ যুদ্ধ যে ভারতের পক্ষে ন্যায় ও ধর্মযুদ্ধ, আত্মরক্ষার যুদ্ধ, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী কিম্বা একমত নহেন। আমাদের দেশের এই বিপদে অবিশ্বাসী বা অর্ধ-বিশ্বাসীর স্থান নেই। যাঁরা আজও সন্দেহের অবকাশ রাখেন দেশবাসী তাঁদের ক্ষমা করবেন না।

আগেই বলেছি, এ যুদ্ধে ন্যায় ও ধর্ম আমাদের পক্ষে। আমরা সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তির উদগ্র লালসাকে প্রতিরোধ করছি। এ যুদ্ধে জয় আমাদের অনিবার্য। আমাদের ত্যাগ, আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার আমাদের দুর্জয় সাহস শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সমগ্র পৃথিবী পশুশক্তির সর্বগ্রাসী লোভ থেকে রক্ষা পাবে। আর সেটাই হবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর কাছে শান্তিবাদী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। জয়হিন্দ।

(আকাশবাণী, কলিকাতা-র সৌজন্যে)

মৃত্যু

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শুধুই তোমার চুলে ছিল দুটি ফাল্গুনের হাওয়া,
শুধুই তোমার চোখে একদীঘি জল।

আমার যা-কিছু দেওয়া-পাওয়া
তুমি শুধু আর সাঁঝ বলা কেবল।

একটু সময় নেই সময়ের মতো,
তুমি আজ নিরন্তর. সতত
তোমাতে সময় বেজে যায়।

কেউ নেই আপনার মহামহিমায়,
আমার উজ্জ্বল আত্মা সে-ও তোমাতেই
আর্ত হয়ে উপস্থিত নেই
আমার বলতে কিছু আর।

দাও তবে মৃত্যু, দাও শেষ অন্ধকার ॥

অক্ষয়

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন অত মধ্যাহ্নের আঁচে
দাঁড়িয়ে রয়েছ, এস বারান্দার ভিতরে দাঁড়াও।
এখানে ক্ষুধার অন্ন না থাক অন্তত
নেই অগ্নিদাহ।

বারান্দা পেরিয়ে তুমি অনায়াসে ঘরের নিভৃতে
ঢুকে এস, শুধু কটি জীর্ণ পাতা ছড়ানো রয়েছে।
আমার ভাবনার বেশে সন্ধ্যালোক তোমার আতিথ্যে
নিয়োজিত হবে, তুমি এলে

আসন গ্রহণ করো. কেন অত মধ্যাহ্নের আঁচে
দাঁড়িয়ে রয়েছ, এই বারান্দা এ ঘর
নিমেষে সন্ধ্যার মত ছিঁড়ে আছে নিঃশব্দ সমারোহ।
তুমি আজ আমার মুগ্ধ, আরাধ্য অতিথি, হে অক্ষয়।
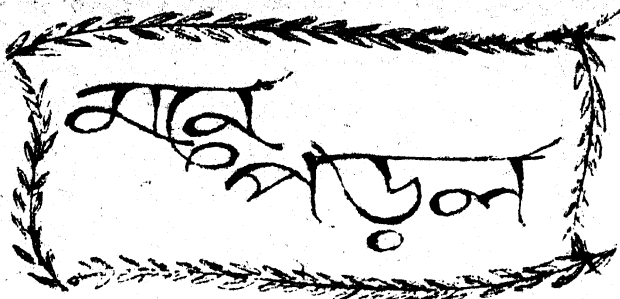
একটি ব্ল্যাকমেলের কাহিনী

মনে পড়ল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা। তাকে আমি গত বছর ব্ল্যাকমেল করেছিলাম।

ব্ল্যাকমেল কথাটির একটি অর্থ হচ্ছে—কোনো অসুবিধাজনক বিষয় প্রকাশ ক'রে জব্দ করব, এই ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করা।

প্রেমেনকে ব্ল্যাকমেল করেছিলাম অনেকটা এই অর্থেই।

কিন্তু কাহিনীটি বলবার আগে তার কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা দরকার।

যাঁদের সঙ্গে প্রেমেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, সে যে-কোনো বিষয় বেশ মনোহর ক'রে বলতে পারে। এই বলা সে এমন একটি আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তার মোহ থেকে তার নিজেরও এখন নিষ্কৃতি নেই। এ জন্য স্বভাবতই তার বন্ধুর সংখ্যা বেশি আর তার লেখার সংখ্যা কম। সময় পাবে কি ক'রে?

আলাপের বিষয় যাই হোক না কেন, প্রেমেনের কাছে সব বিষয়েরই সমান মর্যাদা। রোম্যান্টিক কবি-মানস। তার মনে, যাকে বলে—**exuberant intellectual curiosity**—তা সব বিষয়ে সব সময়। সে যদি তার কোনো সামান্য অসুখের বিষয় আলাপ শুরু করে, তবে সেই বিষয়টিকে একটি বৈজ্ঞানিক বিস্তারে টেনে নিয়ে যাবে, এবং তাকে নতুন করে সাজিয়ে দর্শনীয় ক'রে তুলবে। তখন তা আর তার ব্যক্তিগত অসুখ থাকবে না, সে-অসুখ তখন একটি অতি চিত্তাকর্ষক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়ে উঠবে। এবং তার এই অসুখের জন্য তার প্রতি কারো সহানুভূতি দেখাবার দরকার হবে না। দেখাবার সুযোগও পাবে না কেউ। কারণ তার উদ্দেশ্য অন্য। সে শুধু অসুখটাকে মন থেকে টেনে বাইরে মেলে ধরে।

কথা না রাখা এবং কোনো বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে না থাকার ব্যাপারটাতেও সে এমন একটি রম্য-মাধুর্য আরোপ করতে পারে যে, তার কাছে অল্পক্ষণ বাস করলেও রুটীন-অনুসারীদের মনে তার প্রতি ঈর্ষা জাগবে। তার সমস্ত অভ্যাসের উপরেই সে একটা রোম্যান্টিক আবরণ পরিয়ে তাকে সবার বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসালাভের উপযুক্ত ক'রে তোলে। ম্যাজিশিয়ানরা যেমন প্রতারণাকে আর্ট বানায়, প্রেমেনও ঠিক তাই করে। লেখা চেয়ে চেয়ে কাগজের লোকেরা যত তার কাছে ঘোরে, তত সে তাদের ফিরিয়ে দেয়, এবং তত

পরিমল গোস্বামী

তারা লেখা ফেলে লেখককে বেশি পছন্দ করতে থাকে। তার প্রতারণাই তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

প্রেমেনকে কোনো লেখা লিখতে বললেই সে ভারী সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দেয় যে, তার সময় বড়ই কম, এত কাজ তার। এ বিষয়ে ঘন্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাকে সে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে।

কাজের চাপে সে অস্থির।

এটি অবশ্য তার ধারণা মাত্র। সম্ভবত বিশ্বাসও।

জেরা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছি, সে বস্তুতঃ ব্যস্ত নয়, কাজের চাপ তার বিশেষ কিছুই নেই।

বুঝতে পারে। এবং হাসে। কিন্তু ধারণা নষ্ট হয় না। পুনরায় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়।

এমন লোকের কাছ থেকে লেখা আদায় করা বড়ই কঠিন। ঘাড়ে চেপে না বসলে পাওয়া যায় না। একবার তার লেখা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, তার এক কোণে লিখে দিয়েছিলাম, লেখা না দিলে লজ্জা লাগাব।

কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। গত বছর তাকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল শারদীয় যুগান্তরের জন্য। যথারীতি 'না সিপাই'। জানতাম লেখা এ ভাবে আসবে না। সময় প্রায় উত্তীর্ণ, এমন সময় প্রেমেন সশরীরে হাজির যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে।

উৎসাহপূর্ণ আবির্ভাব। এমন কি তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যটাই ভুলিয়ে দিয়েছিল এসে। বললাম লেখা দাও।

ভুল ধারণা। লেখা নেই। অন্য কাজে এসেছে।

তখন মনে পড়ল এই হল খাঁটি প্রেমেন। একে ভুললাম কি ক'রে?

কিছু বললাম না। কিছু সময় গেল ভাবতে। পথ পেলাম একটা। বললাম, ভাই একজন তোমার অটোগ্রাফ চেয়েছে, যাহোক দু লাইন কবিতা লিখে দাও।

কাগজ এগিয়ে দিলাম হাতে।

প্রতিবাদ জানাল—এখন কি লিখব? কিছু ভাববার সময় নেই।

বললাম, সেই তো ভাল। যা-তা এলোমেলো কিছু লিখে দাও। এলোমেলো কথাটার উপর জোর দিলাম। ভাবলাম স্পষ্ট কোনো অর্থ হবে না, বেশ হবে।

প্রেমেন তখন নিরুপায়। দুচার সেকেন্ড চিন্তা ক'রে লিখে দিল অটোগ্রাফ। চার লাইন মোট, শিরোনামা ঐ "এলোমেলো"।

"গুছিয়ে কি লিখবে
দুনিয়াই এলোমেলো
যাই লেখো তাই সই
কি বা কি সে এলোগেলো।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৬।৯।৬১

লেখাটি হাতে পাওয়া মাত্র পাশে যে ছিল তাকেই বললাম, অবিলম্বে প্রেসে পাঠাও পূজাসংখ্যার জন্য।

প্রেমেন চেঁচিয়ে উঠল—না না, ওটা দিও না, দিও না। কি চাও বল।

গল্প চাই।

তাই দেব।

বেশ, তা হলে এটি প্রেসে পাঠাব না। কিন্তু যদি না দাও তা হ'লে পাঠাব।

এর তিন দিনের মধ্যে তার গল্প পেয়ে গেলাম। ১৯৬১ (বাংলা ১৩৬৮) সালের শারদীয় যুগান্তরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গল্প নেই' নামক যে গল্পটি ছাপা হয় তা এইভাবে তাকে ব্ল্যাকমেল ক'রে আদায় করা হয়েছিল। কথাটি প্রকাশ করলাম এতদিনে। কিন্তু আশা করি কেউ এ পন্থার অনুসরণ করবেন না। ভাল মানুষের উপর অত্যাচার করা শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

ম্যাকমেহন লাইনের ইতিহাস

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতের উত্তর সীমান্ত স্থিরীকরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় ১৮০১ সালে। ঐ সময়েই সর্বপ্রথম সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে ভারতের অধিকারের সীমা সুনির্দিষ্ট করা হয়।

এরপর ১৮৪৭-৪৮ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের পরিচালনায় কাশ্মীর ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভারতীয় এলাকা লদাকের জরিপকার্য শেষ হয়। ভারত সরকারের ঐ জরিপ সেদিন তিব্বতের দলাইলামা ও লাসাস্থ চীনা রাষ্ট্রদূতের অনুমোদন লাভ করে। এই-ভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগেই কাশ্মীর থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর সীমান্তের শেষ প্রান্ত মোটামুটি-ভাবে স্থির হয়ে যায়।

॥ লদাক ॥

নেপাল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একমাত্র লদাক ছাড়া অন্য কোন এলাকা নিয়ে আপাতত চীনের সঙ্গে বিরোধ নেই। সুতরাং লদাকের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও ইতিহাস এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে জানা দরকার লদাকের ব্যাপারে চীনের এত আগ্রহ কেন। তার একমাত্র উত্তর হল লদাকের ভৌগোলিক অবস্থিতির গুরুত্ব। লদাকের তিনদিকে রয়েছে তিব্বত, সিনকিয়াঙ ও পাকিস্থান। আফগানিস্থান ও সোভিয়েট ইউনিয়নও লদাক থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ঐ একটিমাত্র এলাকার উপর চীন ভালভাবে অধিকার কায়েম করতে পারলে ঐখান থেকে সে চার পাঁচটি রাষ্ট্রের উপর তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

কিন্তু লদাক প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই চীনের অধিকারে ছিল না। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে লদাক যথাক্রমে তিব্বত ও কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করলেও বিগত শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত লদাক ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারপর জম্মুর রানা গুলাব সিং লদাক অধিকার করেন। অবশ্য ১৬৯০ সালে সম্রাট আরঙজেবের শাসনকালে তিব্বত একবার লদাক দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু কাশ্মীরের মুঘল সুবাদারের সহায়তায় লদাক সেই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং তারপর থেকে মুঘল সুবাদারের সহায়তার প্রতিদানস্বরূপ লদাক নিয়মিতভাবে কাশ্মীর সুবাদারকে ভেট পাঠাতে থাকে। কিন্তু সে ভেট ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং তার দ্বারা লদাকের রাজনৈতিক বশ্যতা প্রমাণিত হত না। লদাক বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীরের অংশীভূত হয় ১৮৪৬ সালে। বৃটিশ সরকার ঐ সময় কাশ্মীর উপত্যকার শাসনভার জম্মুর রাজার উপর অর্পণ করেন। তার দু' বছর পরেই স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের পরিচালনায় লদাকের সীমান্তরেখা স্থিরীকৃত হয়।

॥ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ॥

উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও ভারত ও তিব্বত চিরাচরিত প্রাকৃতিক সীমারেখা মেনে চলত বলে তিব্বত যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন ভারত ও তিব্বতের মধ্যে কোন সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিব্বত ও চীনের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করাতে ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত স্থিরীকরণেরও তাগিদ অনুভব করেন।

১৯১২ সালে চীন তিব্বত পুনর্দখলের চেষ্টা করে কিন্তু তিব্বতীদের প্রবল বাধায় চীনের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, তিব্বতীদের প্রতি-আক্রমণে, চীন পিছু হটতে হটতে একেবারে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের উপক্রম করে। একারণে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটামাত্র ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে

তিব্বত ও চীনকে এক ত্রিপক্ষ সম্মেলনের আহ্বান জানালেন।

সম্মেলন আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী স্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে লেঃ চার্লস বেলের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দলকে তিব্বত সীমান্তে পাঠালেন। ইয়ং হাসব্যান্ডের তিব্বত অভিযানকালে চার্লস বেল ছিলেন তাঁর প্রধান সহকর্মী, আর তিব্বতী ভাষাও তিনি খুব ভাল জানতেন। তাই ভারত সরকার বেলকেই ঐ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করলেন।

চার্লস বেল তাঁর সেই তথ্যসমৃদ্ধ দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনী No passport to Tibet গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ঐ গ্রন্থেরই এক জায়গায় লোপা খণ্ডজাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে চার্লস বেল লিখেছেন—'সীমান্ত-পল্লী মিগিটাম অতিক্রম করে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি লোপা খণ্ডজাতির ছিল না।' এই উক্তিটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে লোপা খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল তিব্বত রাজ্যের বাইরে। এর একটু পরেই বেল আবার লিখছেন—"We found ourselves on the edge of the **No man's Land** between the **Tibetans and** the Lopas." এই উক্তিটুকুর বিশেষ উল্লেখ এখানে এই কারণে করা হল যে, ঐ লোপা খণ্ডজাতির বাসস্থানই হল লংজু, যা আজ তিব্বত দখলের দাবীতে চীন তার এলাকা ব'লে দাবী করেছে। এ দাবী শুধু যে অর্থহীনই নয়, অনৈতিহাসিকও তা চার্লস বেলের কথাগুলি থেকে প্রমাণিত হবে।

।। নেফার অধিবাসীগণ ।।

তিব্বতী ভাষায় লোপা কথাটির অর্থ হল বিদেশী, এবং বর্তমান নেফা অঞ্চলের মিশমি, আবর, মিরি, আকা, দাপলা, মম প্রভৃতি সবকটি উপজাতিকেই সম্মিলিতভাবে তিব্বতীরা বলে লোপা। এদের সঙ্গে তিব্বতীদের ভাষার বা সংস্কৃতির বা ধর্মীয় আচার-আচরণের কোন সম্পর্ক নেই এবং কোনদিনই এরা তিব্বতীদের অধিকারে ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল আসামের অহোম রাজাদের সঙ্গে। তারপর উনিশ শতকে বিভিন্ন উপজাতি একে একে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন আকা উপজাতির সঙ্গে ভারত সরকারের সন্ধি হয় ১৮[illegible] ও ১৮৮৮ সালে। আবর এলাকা ভারত সরকারের শাসনাধীন হয় ১৮৬২-[illegible] সালে। মিরি অঞ্চল ভারত সরকারের শাসন মেনে নেয় ১৮৫৩ সালে। ঐসব এলাকার জরিপ শেষ হয় ১৯১১-১৩ সালে। লোহিত এলাকার জরিপ হয় ১৯১১-১২ সালে। ১৯১৩ সালে যখন সিমলায় ত্রিপক্ষ সম্মেলন আরম্ভ হয় তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ঐ খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি শাসনকার্যের সুবিধার্থে 'সাদিয়া ফ্রন্টিয়ার' ও 'বালিপাড়া ফ্রন্টিয়ার ট্রাক্ট' নামে দুটি প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট শাসন-এলাকায় বিভক্ত ছিল।

।। সিমলা সম্মেলন ।।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সিমলায় ত্রিপক্ষ সম্মেলন আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালে। এবং বহু নোট বিনিময় ও আলাপ আলোচনার পর সম্মেলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৪ সালের ২৭শে এপ্রিল। কারণ ঐদিন চুক্তিপত্রে ভারত সরকারের পক্ষ হতে স্বাক্ষর দেন স্যার হেনরি ম্যাকমেহন, তিব্বতের পক্ষ হতে স্বাক্ষর করেন তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী মা-ত্র ও চীনের হয়ে স্বাক্ষর করেন ইভান চেন।

ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্যার হেনরি ম্যাকমেহন ছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী। কূটনৈতিক রীতি অনুসারে তিনিই হন ঐ সম্মেলনের সভাপতি এবং এই কারণেই ঐ সম্মেলনে স্থিরীকৃত ভারত-তিব্বত সীমান্তরেখা ম্যাকমেহন লাইন নামে পরিচিতি লাভ করে।

কিন্তু স্যার ম্যাকমেহন ভারত সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হলেও তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন লেঃ চার্লস বেল। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁরই আলোচ্য সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল সবচেয়ে বেশী। এ কারণে সহজেই তিনি সম্মেলনের আলোচনার উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রস্তাবমত ২৭°-৪৮' অক্ষাংশ বরাবর ভূটান হ'তে ভারত-চীন-বর্মা সীমান্ত-সঙ্গমের নিকটবর্তী তালু পাস পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল দীর্ঘ তিব্বত-ভারত সীমান্ত স্থিরীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে যে সীমান্তকে ভারত ও তিব্বত দীর্ঘকাল হতে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সীমারেখা বলে ম'ন করে আসছিল সিমলা সম্মেলনে উভয় সরকারের ইচ্ছাক্রমে তাই আইনতঃ সীমারেখা বলে স্বীকৃতিলাভ করল। এই সীমারেখার সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, তার দৈর্ঘ্য বরাবর রয়েছে একশ মাইল প্রশস্ত দুর্গম পর্বতশ্রেণীর দুস্তর ব্যবধান।

ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর জলচ্ছেদ বরাবর এই সীমান্তরেখার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটানো হয় মিগিটাম অঞ্চলে তিব্বত সরকারের অনুরোধে ও লোহিত, সিয়াং, সুবর্ণশ্রী ও নামজং নদীর প্রবেশমুখে। মিগিটাম অঞ্চলে জলচ্ছেদ নীতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয় তিব্বতের দুটি পবিত্র হ্রদ সো কার্পো (শ্বেত হ্রদ) ও সারি সারপু সম্পূর্ণরূপে তিব্বতের অভ্যন্তরে দেবার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া তিব্বতের তীর্থপথ সারি নিইংপা ও সীমান্ত পল্লী মিগিটামও তিব্বতের অভ্যন্তরে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, তিন সরকারের প্রতিনিধি নূতন সীমান্ত ব্যবস্থায় সম্মত হয়ে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পাকা দলিলে স্বাক্ষর দানের জন্যে কাগজপত্র যখন চীনে পাঠানো হ'ল তখন চীন সরকার এক নতুন আপত্তি তুললেন। তাঁরা বললেন, ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী প্রস্তাবিত ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে তাঁদের কোন বক্তব্য নেই, কারণ ও ব্যাপারে তাদের কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু তিব্বত ও চীনের মধ্যে যে সীমান্ত-রেখা প্রস্তাবিত হয়েছে তা তাঁরা মানতে রাজী নন। সিমলা সম্মেলনে গৃহীত চারটি সিদ্ধান্তের মধ্যে ঐটিই ছিল প্রথম। সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

চীনের এই অনমনীয় জেদের জন্যে ভারত সরকারকে বাধ্য হয়েই সিমলা সম্মেলনের প্রথম সিদ্ধান্তটি বাদ দিতে হ'ল। এবং বাকি সর্তগুলির ভিত্তিতে তিব্বত ও ভারতের অনুমোদনক্রমে ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমারেখা স্থির হ'ল।

তিব্বত সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ভারত সরকার কি মনোভাব প্রকাশ করেছে বা চীন কি দাবী করেছে এইটাই বড় কথা নয়। তিব্বত যে চীনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন স্বাধীন ইচ্ছায় ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত স্থির করেছিল তাতে প্রমাণ হয় যে, তিব্বত তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। অন্যথায় এজাতীয় ঘটনা কিছুতেই ঘটা সম্ভব ছিল না। আজ তিব্বত আর তা পারে না এবং পরাধীন বলেই সেটা সম্ভব নয় তার পক্ষে। দিল্লী সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসাম বা কেরলের রাজ্য সরকার যদি কোনদিন অন্য কোন দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে তবে সেদিন নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আসাম বা কেরল আর দিল্লী সরকারের অধীন নয়। ১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিব্বত যে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল তা কোন যুক্তি দেখিয়েই অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং একদিন দুই সরকারের স্বাধীন ইচ্ছায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, পিকিঙ সরকারকে তার এক পক্ষের উত্তরাধিকারীরূপে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক আইনের এটি অবশ্যপালনীয় বিধান।

এমন তো কথা ছিলোনা!
সুধীর খাস্তগীর
২৫-১১-৬২
আমি তো আগেই বলেছি, ওদের অ্যাটোম্যাটিক অস্ত্র নেই! সবই ওদের সেই পুরানো ধরনের বেয়নেট গুলা বন্দুক!
তাতো বুঝলাম, কিন্তু একেবারে এভাবে ...!
ওগো স্টীমার সারেঙ্গ খালাসী জোয়ান
ও মিঞা, আমরা তো হরতাল করলাম! আর এখন যে ভারত ওপার থেকেই মাল পাঠায় আসাম?
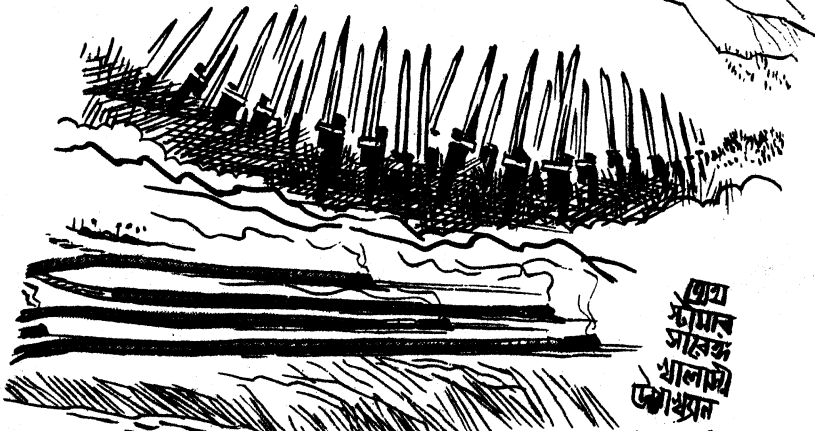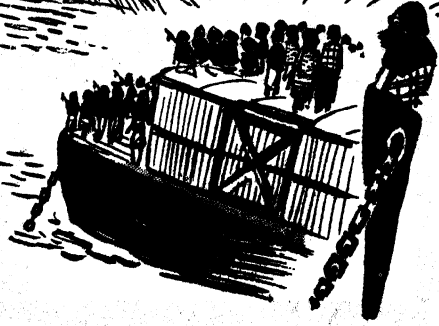
[উপন্যাস]

সমস্ত ঠিক-ঠাক ক'রে দিয়ে নীলিমা এ ঘরে এসে দাঁড়ালো; 'তা হ'লে আপনি এবার শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু।'

দিগ্বিজয়ী টি-বি-বিশারদ ডাক্তার মৈত্র মোটা চুরুট দাঁতে কামড়ে বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে ভ্রূকুটি করলেন। 'শোবো! এখুনি!, এখুনি ঘুম পেয়ে গেল তোমার?'

নীলিমা হাসলো, 'বা রে, আমার কেন ঘুম পাবে। এমনিতেই আমার দেরিতে শোবার অভ্যেস, তার উপরে এ দেশে তো দেখছি যতো কাজ যতো ফুর্তি সব তাদের রাত্রে। আমাদের বারোটা একটার আগে কোনোদিন ঘুম হয় না।'

'তবে?'

'তবে কী? আপনি ক্লান্ত না?'

'ক্লান্ত! ক্লান্ত কেন হবো।'

'সেই শিকাগো থেকে বাসে চড়ে এক রাত একদিন কাটিয়ে এসে পৌঁচেছেন। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে তবে তো বিশ্রাম হবে?'

'দেখো নীলা, আমি এইচ. বোসের কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন নই যে নিজের মাথায় টাক নিয়ে অন্যের মাথার চুল গজাবার তেল বিক্রী করবো। আমি প্রশান্ত মৈত্র, আমি নীরোগ থাকার মন্ত্র জানি বলেই রোগীদেরও সেই মন্ত্র দিতে পারি। মহম্মদ মহসীনের গল্পটা জানো তো?'

নীলিমা বসলো, বললো, 'কী?'

'এক বিধবা মহিলা এসে তাঁর কাছে নালিশ জানালেন, তাঁর ছেলেটি রোজ সন্দেশ খেতে চায়। রোজ তাকে সন্দেশ খাওয়াবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই, অথচ ছেলেকে সে কথা কোনোরকমেই বোঝানো যায় না, সে খাবেই। আর না পেলেই চ্যাঁচাবে। সুতরাং মহিলাটির আর্জি মহসীন সাহেব যদি তাঁর ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে উপদেশ দেন, ছেলেটি হয়তো তার এই অন্যায় আবদার থেকে মুক্ত হ'তে পারে। আর্জি শুনে মহসীন মুখ নিচু করলেন, কপাল কুঁচকে ভাবনার সাগরে ডুব দিলেন। একটু পরে বললেন, "আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে তুমি ছেলেকে নিয়ে এসো, আমি তখন বলতে পারবো এই রোগ তার সারাতে পারবো কিনা।" কথামতো তাই করলেন মহিলাটি এবং তাঁর ছেলের আবদার সেরে গেলে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, এক সপ্তাহের সময় তিনি নিয়েছিলেন কেন? মহসীন একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "জানো মা, আমার নিজেরো যে ঐ একটা বদরোগ ছিলো। একটি সন্দেশ আমার রোজই চাই। যদি নিজেই লোভ ছাড়তে না পারবো, অন্যের লোভ ছাড়াবো কী করে?" ডাক্তার মৈত্র হাসলেন, 'বুঝলে? আমি যদি এইটুকুতে ক্লান্ত হই তা'হলে মা লক্ষ্মী তোমাদের ক্লান্তি কোন্ অসুধে দূর করবো বলো?'

নীলিমাও হাসলো। উপমাটা উপভোগ ক'রে বললো, 'তা হ'লে আর এক কাপ কফি ক'রে আনি? কফি সহযোগে—'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কফি তুমি যতো কাপ খুশি ক'রে আনো না কেন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বয়স বেড়েছে বলে বুড়ো ভেবো না, দশটা না বাজতে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে বোলো না।'

হাসিমুখে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নাঘরে কফি করতে গেল নীলিমা। এক কাপ নয়, এক পট ভর্তি করে আনলো। ঢালতে ঢালতে বললো, 'ঠিক আছে, দেখি, কতো রাত জাগতে পারেন। বলুন, দেশের কে কোথায় কেমন আছে, সব খবর বলুন।'

ডাক্তার মৈত্র পা নাচালেন, গরম কফিতে চুমুক দিলেন, হাতের বই মুড়ে রেখে বললেন, 'দেশের গল্প যথা পূর্বং তথা পরং, বিদেশের গল্পই জমবে ভালো। তুমি বলো, এখানে লাগছে কেমন।'

'খুব ভালো।'

'একেবারে খুব ভালো?'

'সত্যি খুব ভালো।'

'কী ভালো? দেশটা? দেশের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য? পুষ্টি? পরিচ্ছন্নতা? না কি মানুষ-জন দোকান-পসার—'

'সব মিলিয়েই অত্যন্ত পছন্দসই। আমি ভেবেছিলাম, এখানে আমার মন টি'কবে না, খুব খারাপ লেগেছিলো আসবার সময়ে, কিন্তু কোথা দিয়ে যে বছর দুটো কেটে গেল।

'সর্বনাশ। একেবারে মেমসাহেব বনে গেলে? দেখো বাপু ফিরবে তো শেষ পর্যন্ত।'

'মেয়াদ ফুরোলেই ফিরবো কিন্তু তাড়া নেই মনের মধ্যে। কেন, আপনার ভালো লাগছে না?'

'আমার! আমার ভালো-মন্দের উপর কিছু নির্ভর করছে না।'

'কেন?'

'কেন কী গো। আমি তো মাত্র কয়েক দিনের অতিথি। ঋতুপর্ণ। সময় ফুরোলেই ঝরবো।'

ডাক্তার মৈত্র শিকাগোতে একটা মেডিকেল কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন মাসখানেক আগে, কাজ সেরে ফিরে যাবার পথে কয়েক দিনের জন্য নিউইয়র্কে বন্ধু-কন্যা শ্রীমতী নীলিমা সান্যালের আতিথ্য কাটিয়ে যেতে এসেছেন। নীলিমার স্বামী প্রোফেসর সান্যাল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক। কোনো কাজে ওয়াশিংটন গিয়েছেন, তাই অপেক্ষা করছেন জামায়ের জন্য। নীলিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আহা আপনি যেন এই একবারই এলেন।'

ডাক্তার মৈত্র হাসলেন, 'তা অবশ্যি বলতে পারো, তবে তোমার মতো কখনো মজে গিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তা কি আর?' নীলিমা ঠাট্টা করলো, 'কতো বার প্রেমে পড়েছেন বলুন দেখি?'

'প্রেম! কই, মনে তো পড়ছে না।'

'কী ক'রে পড়বে। ভারতীয় ছেলেরা ভুলতে ওস্তাদ। দিব্যি প্রেম টেম ক'রে—শেষে পালিয়ে যায়!'

'আর এ-দেশের ছেলেরা বুঝি একেবারে অচল হ'য়ে লেগে থাকে?'

'থাকেই তো।'

'না বাপু, তোমার একথা আমি মেনে নিতে পারলুম না।'

'কেন? কেন?' প্রতিবাদের সুর আপনা থেকেই তীব্রভাবে বেরিয়ে এলো নীলিমার গলায়।

ডাক্তার মৈত্র হাসলেন, 'এ জাতের সব ভালো কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে এরা বড্ড হালকা।'

'কক্ষনো না।'

'প্রমাণ করতে পার?'

'নিশ্চয়ই।'

'করো দেখি। বলো দেখি এই দু' বছরে তুমি এমন কোনো প্রেমিককে দেখেছ কিনা, যে ছোকরা সতেরো থেকে সাতাশের মধ্যে সতেরো দুগুণে—অন্তত চৌত্রিশ বার প্রেম করেনি, আর প্রেমিকা ছাড়েনি?

'আমি তো এখানে এমন কোনো ছেলে-মেয়েই দেখিনি যাদের মনের কথাটা শুধু এই যে বিয়ে করবো না অথচ প্রেম করবো। সে ওরা চৌত্রিশবারই করুক আর চৌত্রিশ দুগুণে আটষট্টি বারই করুক।'

'ওরে বাবা, এ দেখছি এ দেশের উকিল নিযুক্ত হ'য়েছে!'

'এখানে ওদের নিজেদের দেখেশুনে বিয়ে করতে হয় বলেই রোজ রোজ এর ওর সঙ্গে ডেট্ করে, মিলে-মিশে পছন্দ হ'লে তবে তো? ঐ ডেট করাই বলুন, আর প্রেম করাই বলুন, ওটাই ওদের মেয়ে দেখা বা ছেলে দেখা বা সম্বন্ধ করা। যাকে পছন্দ হয় প্রেমটা লেগে যায়, যাকে হয় না ভেঙে যায়। নিতান্তই সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপার। যেমন আমাদের বেলায় চব্বিশবার সাজিয়ে-গুজিয়ে মেয়ে দেখানো হয়। আপনি কি বলবেন সেটা এর চেয়ে কিছু কম বিশ্রী? বরং যুক্তি-তর্ক যদি তোলেন আমি প্রমাণ ক'রে দেবো সেটার মতো অপমানকর ব্যাপার মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। এর মধ্যে আর যাই থাক, অপমান নেই। আর সত্যিকারের প্রেম যখন হয়, তখন এরা যে কতো সিরিয়াস আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি, এখানে আসবার মাসখানেকের মধ্যেই একটি সানফ্রান্সিস্কোর ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—কিন্তু না, সে গল্প থাক।'

ডাক্তার মৈত্র উৎসুক হ'য়ে বললেন, 'বলো, বলো।'

'অনেক রাত হ'য়ে যাবে।'

'আবার তুমি আমাকে সন্ধ্যারাতেই বাচ্চাদের মত ঘুমিয়ে পড়তে প্ররোচিত করছো?'

নীলিমা হাসলো, 'ক'টা বেজেছে জানেন?'

'ঘড়ি দেখে শুইনি কোনোদিন।'

'গল্পটা শুনলে ধারণা আপনার নিশ্চয়ই পালটাবে, কিন্তু বড্ড বড়ো, শুনতে সময় লাগবে অনেক, শেষ পর্যন্ত আপনার ধৈর্য থাকবে না।'

'আহা, কথা না বাড়িয়ে আসল খবরটা বলো দেখি তুমি।' ডাক্তার মৈত্র নড়ে-চড়ে সিগারটা নতুন ক'রে ধরিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বসলেন।

নীলিমা উঠে গিয়ে জানালার ভারি পর্দাটা ভালো ক'রে টেনে দিতে দিতে বললো, 'মিসেস ব্রাউন বলে এখানে এক ভদ্রমহিলা আছেন, পার্ক এ্যাভিনিউর বাসিন্দা তাঁর বাড়িরই মস্ত এক গণ্যমান্য ককটেল পার্টিতে গিয়ে এই ছেলেটিকে আমি প্রথম দেখি। নিউইয়র্ক শহরে এই মহিলার বাড়িটি বিখ্যাত। তাঁর সুসজ্জিত ড্রইং-রুমটি আধুনিকতার একেবারে চরম উৎকর্ষ বলে ধ'রে নিতে পারেন। ঘরের মধ্যেই তাঁর উদ্যান, লন, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল, কৃত্রিম পাহাড়, ফোয়ারা, বাকী নেই কিছু। কিন্তু একটুও দেখানোপনা লাগে না, সাজানো বানানো লাগে না, একেবারে যথার্থ। দেয়ালগুলো কী একরকম অদ্ভুত কাচ ধরনের জিনিসে তৈরী যে সমস্ত ঘরটা আয়নার মতো তার মধ্যে ছায়া ফেলে। জানালা দিয়ে তাকালে সোজা ঈস্ট নদী দেখা যায়, এতো মজা লাগে। তীরে তীরে সব একতলা দোতলা রাস্তা। ভদ্রমহিলা থাকেন উনিশ আর কুড়ি তলার উপরে। ঐ দু'টো এ্যাপার্টমেন্ট কিনে নিয়েছেন উনি।'

'অত্যন্ত ধনী মহিলা বলতে হবে।'

'দারুণ। ড্রইং-রুম থেকে পাঁচ ধাপ উঁচুতে কী ভালো একটা লাইব্রেরী করেছেন, আবার তার তিন ধাপ নিচে যতো সব মূল্যবান ছবির সংগ্রহ, সব অরিজিনেল। এদিকে পাহাড় ফোয়ারা ঘিরে কিছু গ্রীক ভাস্কর্যের নমুনাও দেখা গেল। একটা ঝর্ণা আছে।'

'তা হ'লে বাড়িটি দেখবার মতো।'

'সত্যিই দেখবার মতো।'

'আর বাড়ির মালিকানিটিও নিশ্চয়ই—'

'তিনিও দেখবার মতোই সুন্দরী। বয়েস বেশ হ'য়েছে, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। মনে হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণী। ভাব-ভঙ্গী রানীর মতো। বয়সের তুলনায় মাথার চুল কী ঘন। আর সেই চুল তিনি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ঢেউ খেলিয়ে এমন সুন্দর ক'রে রাখেন! তখন আবার নতুন রং করিয়েছিলেন, চকচক করছিলো। একেবারে পাকা ধানের মতো গাঢ় সোনালি রং।'

'ঐ সব মেকি দিয়েই তোমার মন ভুলিয়েছে বুঝেছি।'

'মোটেও না। মেকি আমরা কে না করি। প্রকৃতি আমাদের যেভাবে ভব-সংসারে পাঠিয়েছেন, কেউ কি সেভাবে থাকি? শরীর তো মেকিতেই ভ'রে রাখি, বলতে পারেন সেই মেকিতেও ওরা সমান দক্ষ। আমাদের মতো এবড়োখেবড়ো, নয়।'

'নাঃ, তুমি দেখছি বড্ড বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়েছ।'

'একদিন মিসেস ক্রাউনের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক'রে নিয়ে যাবো আপনাকে, এই বুড়ো বয়সে যদি কেলেঙ্কারী করেন আমি জানি না।'

নোংরা জামা-কাপড় পরে......

ডাক্তার মৈত্র জোরে হেসে উঠলেন, 'কী বোকা মেয়ে, এতো লেখাপড়া শিখে একটুকুও শিখলে না যে কেলেঙ্কারী মানুষে না জানিয়েই করে। কিন্তু মাগো, মিসেস্ ক্রাউনের সাহেব স্বামী কি তা হ'লে আমাকে আস্তো রাখবেন?'

'না, সে ভয় নেই। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সড।'

'যাক একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। তারপর বলো—'

'সেদিন তিনি আমাদের অনারেই পার্টিটা দিয়েছিলেন। আর যেহেতু আমরা ভারতীয় সেইজন্য পোষাকটা তাঁর গাঢ় মেজেণ্টা রংয়ের ভারতীয় র সিল্কে তৈরী ছিলো। সেই অদ্ভুত ছাটের ঢোলা পোষাকের মেজেণ্টা রং আর তাঁর গায়ের রং মিশে রূপের জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর উপরে গলায় ডুমুরের মতো বড়ো বড়ো মুক্তোর তিন-লহরী মালা ঝুলিয়েছিলেন, হাতে মুক্তোর আংটি, কানে মুক্তোর ফুল। খাড়ার মতো তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা রঙিন ঠোঁট, নীল রংয়ের টানা টানা চোখ,—ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যেন প্রজাপতি। দেখে দেখে আমার আর চোখ ফিরছিলো না। বুঝতে পারছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে যে এই মহিলার এতো প্রতিষ্ঠা, তার কারণ শুধুমাত্র তাঁর ডলার নয়, এই রূপও অনেকখানি। তার উপর মহিলাটি বিদুষী। কবিতা লেখেন, হার্প বাজিয়ে মিষ্টি গান করেন, হৃদয়টি স্নেহশীতল, ব্যবহার ত্রুটিহীন। এই ধরনের আতিথেয়তা বা সমাজ-সেবায় একেবারে ঢেলে রেখেছেন নিজেকে।'

'গল্পের নায়িকা তা হ'লে ইনিই?'

'না। এই গল্পের সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ বলতে গেলে নিতান্তই কম।'

'সে কী। তা হ'লে গল্প দাঁড়াবে কী ক'রে।'

'শুধু নায়কটিকে নিয়েই আমার গল্প।'

'শুধুই নায়ক?'

'শুধুই নায়ক। সেই সানফ্রান্সিস্কোর ছেলেটিই এই গল্পের একমাত্র খুঁটি।'

'তা হ'লে মিসেস ক্রাউনের পার্টিটা?'

'ওটা উপলক্ষ্য।'

'বুঝতে পারলাম, তুমি কোনোদিন লেখিকা হ'তে পারবে না।'

'তা নিশ্চয়ই পারবো না। কিন্তু কেন পারবো না তার কী এমন বিশেষ কারণ আপনি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলুন তো?'

'উৎকৃষ্ট গল্প-লিখিয়েরা তাদের গল্পের মধ্যে কোনো অকারণ চরিত্র ঢোকায় না।'

'কিন্তু এটা তো আমার গল্প নয়।'

'কী তবে?'

'নিজের দেখা সত্য ঘটনা।'

'ও, আচ্ছা বলো।'

'মিসেস ক্রাউনই সেই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার। বললেন, 'এই আমাদের রাসেল, ওয়াশিংটন স্কোয়ারের বিখ্যাত বীটনিক। কবিতা লেখে, রাত জাগে, কম খায়, বেশী খাটে আর সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।' বলে মিষ্টি ঝিরঝিরে গলায় হাসলেন।

এই ছেলেটির কথা আমি আগেও নানা লোকের কাছে শুনেছিলাম। মিসেস ক্রাউনও বলেছিলেন। ভালো ক'রে দেখলাম। রাসেল সবেগে মাথা ঝেঁকে বললো,

'ম্যাডাম, আপনার সব কথা সত্যি নয়। অন্তত বীটনিক শব্দটার জন্য আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

মিসেস ক্রাউনের মুখে কৌতুক বিচ্ছুরিত হ'লো। ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'যদি ভুল বলে থাকি, দুঃখিত। কিন্তু আমার মনে হয় একটা পার্টিতে আসতে গেলে অন্তত তার কতোগুলো নিয়ম-কানুন মেনে নেয়া উচিত। যেমন গায়ের শার্টটা, পায়ের জুতোটা, মাথার চুলটা—'

রাসেল বাধা দিল, 'আপনি তো জানেন আমি ও সব মানি না।'

'তার মানেই তুমি বীট।'

'কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হ'তে আমি রাজী নই, আমার মতামত একা আমার। আর অত টিপটপ কাপড়চোপড় আমি কোথায় পাবো বলুন তো। যা দেখলে আর আপনি আমাকে বীট বলবেন না? আমার সামর্থ্য আছে নাকি?'

মিসেস ক্রাউনের মুখের হাসি অমলিন। ওর পিঠে তিনি আস্তে হাত ছোঁওয়ালেন। বোঝা গেল ছেলেটির উপর তাঁর স্নেহ আছে। নরম গলায় বললেন, 'লোকে তো বলে একটা কবিতার বই ছাপিয়ে ক'রেই তুমি অনেক ডলার লাভ করেছ।' বাঁ দিকের ভুরুটা তুলে একটু ঠাট্টা করলেন, 'অবিশ্যি সেটাকে ঠিক কবিতার বই বলা যায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে।'

রাসেল ঠাট্টাটা বরদাস্ত করলো না, চটে গিয়ে বললো, 'মতভেদ আর যা নিয়েই থাকুক, কবিতা নিয়ে যদি হয় তা হ'লে বলবো, সে সব লোক কবিতা বোঝে না। আর তাছাড়া শুনুন, ও-সব ফরম্যালিটি যে আমি মানি না তাতো আপনার অজানা নয়। ও-সব মেকি সভ্যতা আমার খুব অপছন্দ।'

'কিন্তু, দেশাচার তো বাছা মানতেই হবে?'

'দেশ! দেশ কোথায়? কার দেশ? আমি যতোটা আমেরিকান, তার চেয়ে বেশী ভারতীয়। না, শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী।' বলতে বলতে রাসেল উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, হাতের কোমর-সরু গ্লাস থেকে খানিকটা ড্রাই মার্টিনি উপচে পড়লো তার গলা-খোলা শার্টের বুকে।

মিসেস ক্রাউনের চোখে আদর উপচলো, 'তা ভারতীয়ই হও আর বাঙালীই হও, তাই বলে নোংরা জামা-কাপড় পরে আসবে সেটা মোটেই শোভন নয়। যদি পরো তা'হলে বলবো, ভারতীয়রাই নোংরা।'

জেনে-শুনেই মিসেস ক্রাউন রাসেলের আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। রাসেল দেয়ালে ঠেসান দিল, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিল, চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'তর্ক যদি করতেই চান, তা হ'লে আসুন, আপনি প্রমাণ করুন আপনারা পরিষ্কার, আমি প্রমাণ করি, সত্যিকারের পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে। আর তার যা'রা দৃষ্টান্তস্থল সেটা কোন্ দেশ।'

'রক্ষে করো' মিসেস ক্রাউন ঈষৎ শব্দ ক'রে হাসলেন এবার, হাতজোড় ক'রে বললেন, 'এখন বসে তোমার সঙ্গে যদি ঝগড়া করি, তা'হলে আর অন্য অতিথিদের আসতে বললাম কেন? সে একদিন একা একা নিভৃতে হবে। তুমি বরং এই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে মাথা ঠাণ্ডা করো, আমার মনে হয় আজকের সভা তোমার এঁর জন্যই সুখের বলে মনে হবে। আর তাছাড়া বলা কি যায়, মিসেস সান্যাল হয়তো তাকে চেনেন।'

'কাকে?' আমি এতোক্ষণে একটা কথা বলার সুযোগ পেলাম।

মিসেস ক্রাউন বললেন, 'সেটা আপনি রাসেলের কাছেই জানতে পারবেন। কী বলো?' বলতে বলতে তিনি চোখ টিপে এক জোড়া আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আপনি তো জানেন কাকাবাবু, এই ককটেল পার্টিগুলোর মস্ত অসুবিধেই হচ্ছে এই যে, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যে কাজে আমি একেবারেই অপটু। যদিও তখনো তেমন জমে ওঠেনি পার্টি, তবু প্রায় আধঘণ্টার উপরে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা ধ'রে এসেছিলো। একটু বসবার জন্য প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এ কোণে, ও কোণে নরম ফোমের রাশি রাশি কুশানশোভিত সব আরামের আসন ছড়ানো ছিটানো, রাসেলের দিকে তাকিয়ে কাতর হ'য়ে বললাম, 'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আর যদি খুব অভদ্রতা না হয়, তা হ'লে আমি একটু বসি।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই।' রাসেলই অগ্রণী হ'য়ে বসলো গিয়ে, আমাকে ডাকলো, 'আসুন।' অবাক গলায় বললো, 'আপনি কোনো পানীয় নিলেন না?'

'আমার ও সব অভ্যেস নেই।'

'বুঝেছি। কিন্তু এখানে অনেক ভালো ফরাসী মদ আছে। একটু যদি ভ্যাঁ দর কিম্বা দুবনে নিয়ে দেখেন আমার মনে হয় খুব ভালো লাগবে।'

'ও আমার হবে না।'

'না, না, খুব হবে। একটু নিন। নিয়ে দেখুন না কেমন লাগে।' রাসেল দৌড়ে বয়কে ডেকে নিয়ে এলো, অতি-যত্নে পাৎলা ছোটো গ্লাসটি তুলে দিল হাতে। মৃদু হেসে বললো, 'খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে। আপনি তো বাঙালী?'

'একেবারেই খাঁটি বাঙালী।'

'আমি আপনার লাল সিঁথি দেখে বুঝেছি।'

'লাল সিঁথি? মানে সিঁদুর। বাঙালী মহিলাদের সিঁদুর রহস্যও তা হ'লে তোমার জানা আছে দেখছি।'

'সব জানি।'

'এখানে এসে থেকে তো এই সিঁদুরের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। সকলেরই দেখছি এ বিষয়ে মহা কৌতূহল।'

'আমার খুব ভালো লাগে। কপালের এই লাল ফোঁটা আর সেই ভাগ করা কালো চুলের মাঝখানে লাল সিঁথি —খুব, খুব সুন্দর। আর লম্বা চুলের খোঁপাও আমি খুব ভালোবাসি।'

'তাই নাকি?' যদি বিয়ে না ক'রে থাকো তা হ'লে একটি বাঙালী বৌ জুটিয়ে দেবো, সে খুব সিঁদুর পরবে সিঁথিতে।'

'সে ভাগ্য কি আমার হবে? আমার তো তাই স্বপ্ন। বাংলাদেশ আর বাঙালী মেয়ে, এর কি কোনো তুলনা আছে জগৎ সংসারে?'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কাকে দেখে মন মজেছে বলো তো? তুমি কবে গিয়েছিলে আমাদের দেশে? ক'দিন ছিলে?'

'না, ঈশ্বর এখনো আমার সে সাধ পূর্ণ করেন নি।'

'যাওনি! তবে এতো জানলে কী ক'রে?'

'না গেলেও জানা যায়।'

'কিন্তু একবার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। না দেখেই যদি এই—'

'উচিত বুঝেছেন কী, বলুন, না গিয়ে বেঁচে আছো কী ক'রে।'

'এতো!'

'এতো। কিন্তু এ ইচ্ছে আমার হয়তো কখনোই পূরণ হবে না।'

'কেন হবে না?'

'আমাকে যদি কেউ কখনো কোনো শুভ ইচ্ছে জানায় আমি তাকে এই আশীর্বাদই করতে বলি, যেন মৃত্যুর আগে অন্তত একবার সেখানে যেতে পারি।'

একথার পরে আমি চুপ ক'রে রাসেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এ দেশে এসে ভারতবন্ধুর অভাব দেখছি না, ভারতবর্ষ বিষয়ে আগ্রহের অন্ত দেখছি না; ভারতীয় বলে খাতির যত্ন বন্ধুতা, উষ্ণতা পুরোপুরি ভোগ করছি, দোকানে পসারে যেখানেই যাই, 'মাই ইয়াং লেডি', 'মাই হানি' শুনতে শুনতে প্রায় নিজের উপর সম্ভ্রম হ'তে শুরু করেছে, তবুও রাসেলের মতো এ রকম অদ্ভুত আবেগ আর প্রত্যক্ষ করেছি বলে মনে করতে পারলাম না। একটু দূরে মস্ত কাচের চৌবাচ্চায় মিসেস ব্রাউনের লাল কালো মাছেরা খেলা করছিলো, সামুদ্রিক লতাপাতা নুড়ি গুহার মধ্যে ঢেউ তুলছিলো, ঘাই মেরে মেরে ক্ষিপ্ত করছিলো টলটলে জল, আমি সেইদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠলাম।

রাসেল বললো, 'আপনি বাঙলা দেশের কোন শহরে থাকেন!'

মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম, 'কলকাতা।'

'কলকাতা!' যেন স্বর্গ, ঠিক এরকম মুখের ভাব করলো রাসেল, যে তার তাকিয়ে থাকার ধরনে মনে হলো আমি যেন সেই স্বর্গ থেকে অকস্মাৎ কক্ষচ্যুত তারার মতো ছিটকে এসে এই মর্ত্য-ভূমিতে পড়ে গিয়েছি।

'আমি সেই কলকাতাতেই যেতে চাই।' আবেগে প্রায় গলা বন্ধ হ'য়ে এলো রাসেলের, 'সেই কলকাতাই আমার ধ্যান, জ্ঞান, আমার আশা, আলো, আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।'

কথাগুলো রাসেল কবিতার মতো গুনগুণিয়ে আবৃত্তি করলো। তার মাতৃভাষায়, অর্থাৎ ইংরিজিতে অনেক গভীর শুনিয়েছিলো সুরটা, আমার বাংলা তর্জমায় আমি ততোটা ফোটাতে পারলুম না।

হেসে বলেছিলুম, 'তা আর এমন কি কঠিন ব্যাপার, একবার নিশ্চয়ই এসো। যদি ততোদিনে আমরা ফিরে যাই। আমাদের অতিথি হবার নিমন্ত্রণ এখন থেকেই জানিয়ে রাখি।'

রাসেল ভরা গলায় বললো, 'এই নিমন্ত্রণ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবো। তার জন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি আমি কোনোদিনই যেতে পারবো না।'

'কেন?'

'আমি নিতান্ত দরিদ্র, সামান্য একজন স্কুলমাস্টার মাত্র, আমার টাকা কই?'

একটি বিষণ্ণ হাসিতে রাসেল স্মীথের সুকোমল মুখখানা করুণ হ'য়ে উঠলো।

আমি হেসে বললাম, 'এটা কোনো কথাই নয়। তেমন যদি আগ্রহ থাকে তা হ'লে তোমাদের দেশে টাকার জন্য কিছু আটকায় এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করুন, শুধু সেই কারণেই আটকে আছি।'

'কুবেরের দেশে টাকার সমস্যা!

'ঠিক তাই।' রাসেল মস্ত এক চুমুকে পানীয়ের গ্লাসটি শেষ করলো। সিগরেট এগিয়ে দিল আমার দিকে, আমি বললাম, বাঙালী মেয়েদের এ সব ঠিক আসে না।

'জানি। আর সে জন্যই বাঙালী মেয়েদের এতো ভালো লাগে। মেয়েরা সত্যি সত্যি মেয়ে এমন আর পৃথিবীর কোন দেশে আছে?'

'যদিও আমাকে খুশি করার জন্যই তুমি একথাটা বলছ বলে আমি ধ'রে নিচ্ছি, তবুও শুনতে খুব ভালো লাগছে।'

'না, না', রাসেল মাথা নেড়ে ভুরু কুঁচকে সবেগে প্রতিবাদ জানালো, 'আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, একটুও স্তুতিবাদ করছি না, এ আমার একান্ত মনের কথা। আপনার ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস করবেন না।'

'তা হ'লে তো তোমার নিশ্চয়ই আমাদের দেশে একবার যাওয়া দরকার।

'আমি তো পাগল হ'য়ে পা বাড়িয়েই আছি।'

'তুমি এ দেশের একজন বিশিষ্ট কবি, তুমি চাইলে নিশ্চয়ই কোনো প্রতিষ্ঠান তোমাকে সাহায্য করবে।'

'আমাকে সাহায্য করবে! পাগল! আমি অত্যন্ত অপাংক্তেয় এদেশে।'

'কেন?'

'সেই 'কেন'র জবাব দু' এক কথায় দে'য়া যায় না। তবে একথা আপনাকে বলতে ভালো লাগছে, আমার মন প্রাণ আত্মা সব আপনাদের দেশে চলে গেছে। আমি শুধু দেহটা নিয়ে পড়ে আছি এখানে। যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তবু আমি একদিন না একদিন সেখানে যাবোই।'

'শুনে সত্যি আনন্দ হচ্ছে। নিজের দেশকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু অন্যের দেশ সম্পর্কে তোমার মতো এমন আশ্চর্য আগ্রহ আমি আর কোথাও দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে কৌতূহল হচ্ছে এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

(ক্রমশঃ)

পুনর্জীবন স্বপ্ন নয়

বার্তাবাহক

(এবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী লিও দাভিদোভিচ লান্দাউ। সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য অ্যাকাডেমিশিয়ান লান্দাউ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসাবে সর্বদেশে স্বীকৃত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স" বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সর্বদেশের উচ্চতর পদার্থ-বিদ্যার ছাত্রদের পক্ষে এই বইটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যপুস্তক।

গত জানুয়ারী মাসে (১৯৬২) লিও লান্দাউ এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হন। কিন্তু সোভিয়েত চিকিৎসক ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীদের যে সমবেত প্রয়াসে লান্দাউয়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুকে হার মানতে হয়, তা এক মহৎ আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু। এখানে সোভিয়েত সাংবাদিক দানিল দানিন সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলেছেন।)

এই বছরের গোড়ার দিকের ঘটনা। জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ, রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা নগরী সুবিখ্যাত দুব্‌না'র পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। আবহাওয়া ছিল জঘন্য। সারাটা পথ বরফে জমাট। একটি মেয়ে পথ পার হয়ে বাস স্টপের দিকে ছুটছিল। গাড়ীর ব্রেক চাপা হল সজোরে, আর গাড়ীটা পথ পিছলে দ্রুত-গামী এক ট্রাকের ওপর গিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ নিবারণের কোন উপায় ছিল না। গাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে মুচড়ে ভেতরে ঢুকে গেল, আর সমস্ত ধাক্কাটা গিয়ে লাগল যে ব্যক্তি পেছনের সীটে ডান ঘেঁষে বসেছিলেন তাঁর ওপর।

এই ব্যক্তি হলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান লিও লান্দাউ, কিংবা শুধু "দাউ"—যে নামে তিনি গত ত্রিশ বছরের বেশী কাল ধরে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিচিত।

একখানা অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে—মস্কোর তিমিরিয়াজেভ জেলার ৫০নং হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হল। স্ট্রেচার লিফটে করে তোলা হল সাত তলায়—সেন্ট্রাল মেডিক্যাল আপগ্রেডিং ইনস্টি-টিউটের ট্রমাটোলজি ক্লিনিকে। ডিউটির ডাক্তার লিদিয়া পানচেংকো ঝুঁকে পড়-লেন রোগীর ওপর—যাঁকে প্রাণহীণ বলে মনে হচ্ছিল। এই হল সূচনা, লান্দাউয়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের চিকিৎ-সকদের অসাধারণ, সত্যিকারের বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রামের সূচনা।

রবিবারটা কারু পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দিন বলা চলে না। এইদিন ইনস্টিটিউট সব বন্ধ থাকে, ল্যাবরেটারী কর্মীরা ছুটিতে, যাঁদের ওপর পুনরুজ্জীবন নির্ভর করে তাঁরা সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ট্রমাটোলজি ক্লিনিকের অধ্যক্ষ প্রোফেসর ভালেনতিন পালিয়াকফ সেদিন একজন রোগীকে দেখতে এসে-ছিলেন; আগের দিন তিনি তার দেহে অস্ত্রোপচার করেছেন। ডিউটির ডাক্তার তাঁকে তৎক্ষণাৎ লান্দাউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে একটা নিদারুণ অসমান যুদ্ধে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হল। শক্-বিরোধী চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নানা-বিধ প্রফিল্যাক্‌টিক সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হল।

ততক্ষণে হাসপাতাল থেকে টেলি-ফোন পেয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকা-দমির পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সমস্যাবলীর ইনস্টিটিউটে লান্দাউয়ের সহকর্মী এবং বন্ধুরা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। নিকোলিন পাহাড় থেকে মস্কোয় ছুটে এলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান পিওৎর কাপিৎসা। সবাই খুঁজতে লাগলেন অধ্যাপক এভগেনি লিফশিৎকে—যিনি লান্দাউয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃহৎ "তত্ত্বগত পদার্থ-বিদ্যা" পাঠক্রমের সহ-রচয়িতা। এইভাবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে খোলা হল "দ্বিতীয় রণাঙ্গন"—সেকেন্ড ফ্রন্ট।

চিকিৎসাবিজ্ঞান আকাদমির সদস্য এবং বিশিষ্ট নিউরোপ্যাথিস্ট নিকোলাই গ্রাশ্চেনকফকে নিযুক্ত করা হল লান্দাউয়ের জীবন রক্ষাকারীদের প্রধান রূপে। তিন-জন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর প্রথম পরামর্শ-সভা সর্বপ্রথম বসল বিকাল ৪টায়; এর পর থেকে তাঁরা অবিরত রোগী পর্যবেক্ষণে রত হলেন। এই তিনজন হলেন গ্রাশ্চেনকফ, পালিয়াকফ, এবং বিখ্যাত নিউরো সার্জন অধ্যাপক গ্রিগরী কাশিয়ানস্কি।

পরামর্শ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কঠিন এক রোগলক্ষণ নির্ণয় করলেন। এর বারোটি পয়েন্ট। প্রত্যেকটি পয়েন্টে ১১টি ফ্র্যাকচার দেখা যায়, এর মধ্যে আছে মাথার বেসের ফ্র্যাকচার এবং বুকের বহু পাঁজরের ফ্র্যাকচার। এর পর রোগীর অবস্থা রোজই খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকে: শ্বাস

প্রশ্বাসের কষ্ট, হৃদপিণ্ডের গোলমাল, কিডনির অসুস্থতা, ট্রমাটিক নিউ-মোনিয়া, আর তাই থেকে দেখা দিয়েছে ডবল ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া এবং আন্ত্রিক প্যারেসিস। ১লা ফেব্রুয়ারী নিকোলাই গ্রাশ্চেনকফ বললেন ঃ "বিশ বছরের ডাক্তার-জীবনে আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম এমন একটা জটিল ট্রম্যাটিক কেস দেখলাম। দাউ যে তিন সপ্তাহ বেঁচে আছেন এটাই একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়!"

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এই বিস্ময় থেকে কোন আশার কারণ পাওয়া যায় কিনা। গ্রাশ্চেনকফ, কার্শিয়ানস্কি, পালিয়াকফ এবং থেরাপিউটিস্ট অধ্যাপক এ এম দাসির এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু এ তাঁদের নৈরাশ্য নয়, এ শুধু সতর্ক-

তার অভিব্যক্তি। বোধ হয় বিজয়ীদের খানিকটা সংস্কারগত সতর্কতা, যাঁরা জানেন যে শত্রু পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়নি।

মার্চ মাসেই এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, লান্দাউয়ের আঘাত থেকে জীবনের শক্তি বেশী। আরো জানা গেল যে, লান্দাউ তাঁর মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় আঘাতে আহত হননি। ছয়মাস ধরে প্রতিদিন, প্রতি রাত্রিতে, প্রতি মিনিটে তা ঘটে চলল। ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের অপরিসীম নিঃস্বার্থ সেবার এ এক ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের ঘটনা। সোভিয়েত দেশের অন্তত পঞ্চাশ-জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ঘুম আর বিশ্রাম ভুলে দিনরাত লান্দাউয়ের জীবন রক্ষার জন্যে সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কিন্তু ডাক্তাররাও তাঁদের পক্ষ থেকে পদার্থবিদগণের সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁরাও তাঁদের নাম, পদবি এবং উপাধির কথা উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা, ঔষধপত্রের সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেও আকাদমির বিকল্প সদস্যগণ, ডি এস-সি ও এম এস-সি-গণ, ৫৪ বৎসর বয়স্ক লান্দাউয়ের সমবয়স্ক বিজ্ঞানীরা ও তাঁর ছাত্ররা এবং তাঁর ছাত্রদের অতি তরুণ ছাত্ররা—স্বেচ্ছায় সব কাজ চেয়ে নিয়েছেন। কেউ বার্তা বহন করেছেন, কেউ চালিয়েছেন গাড়ী, কেউ আলাপ আলোচনার কাজ করেছেন, কেউ সরবরাহের বা সেক্রেটারির কাজ, কেউ অন্য ডিউটি দিয়েছেন, কেউ ফুট-ফরমাস খেটেছেন, কেউ স্ট্রেচার বহন করেছেন। তাঁদের সদর কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়ে প্রধান চিকিৎসকের অফিসে ঘাঁটি গেড়েছিল এবং চিকিৎসকদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও জরুরী নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে ঘড়ির কাঁটা ধরে পালন করার এজেন্সী হয়ে উঠেছিল এই কেন্দ্রটি।

এই স্বেচ্ছামূলক "জীবনরক্ষা সমিতিতে", যোগ দিয়েছিলেন সাতাশীজন তত্ত্ববিদ এবং গবেষণাকারী। যে সকল লোক এবং ইনস্টিটিউট যে কোন মুহূর্তে কাজে আসতে পারে তাদের টেলিফোন ও ঠিকানা বর্ণানুক্রম অনুসারে লিপিবন্ধ করা হয়েছিল। এই লিস্টিতে আছে ২২৩টি টেলিফোন নম্বর। এর মধ্যে আছে হাসপাতাল, মোটরডিপো, বিমান বন্দর, শুল্ক বিভাগ, ফার্মাসী, মন্ত্রী দপ্তর এবং এমন অনেক জায়গা যেখানে পরামর্শদাতা ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে।

সব থেকে গুরুতর সংকটজনক দিনগুলিতে সাততলা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আট থেকে দশখানা গাড়ী; দাউ-এর মরণাপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছিল চারদিন।

১২ই জানুয়ারী যখন কৃত্রিম শ্বাস-যন্ত্রের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছিল, তখন তত্ত্ববিদদের একজন ফিজিক্যাল প্রব্লেমস ইনস্টিটিউটের ওয়ার্কসপে তক্ষুনি তা তৈরী করে দেবার প্রস্তাব করেন। তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এ প্রস্তাব ছেলেমানুষিও বটে, কিন্তু এর পেছনে যে নিষ্ঠা সে কী আশ্চর্য! পদার্থ-বিদগণ পলিওমাইলাইটিস রিসার্চ ইনস্টি-টিউট থেকে মেসিনটি দিলেন, নিজেরা তা বহন করে নিয়ে এলেন ওয়ার্ডে যেখানে লান্দাউ শ্বাসকষ্টে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে-ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সহকর্মী, শিক্ষক ও বন্ধুর জীবন রক্ষা করেছেন।

সমগ্র ঘটনা পদার্থবিদগণের এক আশ্চর্য ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন। পরামর্শ-সভায় যেদিন খানিকটা আশার কথা শোনা গেল সেদিন গ্রাশেচনকফ তাঁদের বলে-ছিলেন : "দাউ বেঁচে উঠলে তার অর্ধেক কৃতিত্ব আপনাদের।"

সাধারণ ব্যবস্থা সবই গ্রহণ করবার পর এক বিশেষ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার কথা মনে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং বৃটেনে।

কাপিৎসা তৎক্ষণাৎ তিনটি টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর তিনজন পুরাতন সহকর্মীর কাছে : লণ্ডনে সুবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্ল্যাকেটের কাছে; প্যারিসে মহাবিজ্ঞানী লাজ্ভাঁর সহকারী ফরাসী বিজ্ঞানী রিকার্টের কাছে এবং কোপেনহ্যাগেনে নিল্স্ বোরের পরিবারের কাছে। কাপিৎসা বোরের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান নি এই বৃদ্ধ শিক্ষককে তিনি বিচলিত করতে চাননি। কিন্তু পরদিন তাঁরই কাছ থেকে এল এক ছোট টেলিগ্রাম; তাতে বলা হল—ঔষধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ ঠিক নামটি জানতেন না, আর বোর পাঠিয়েছিলেন এমন একটা ঔষধ যা ঠিক উপযুক্ত ছিল না। রিকার্ট প্রাগে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কর্মী ইউনিয়নে তাঁর পরিচিত নেসেজকে টেলিগ্রাম করেন। নেসেজ অধ্যাপক শোয়েম্-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং শোয়েম্ প্রয়োজনীয় জিনিসটি মস্কোয় পাঠিয়ে দেন।

বৃটেন থেকে সাহায্য এসেছে আরো আগে। কাপিৎসার টেলিগ্রাম লণ্ডনে ব্ল্যাকেটের কাছে পৌঁছোয়নি, সেটি তৎক্ষণাৎ ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণুবিজ্ঞানী জন ককরফটের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়; ককরফট্ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইতিমধ্যে এড-গেন লিফশিৎস অক্সফোর্ডের বিজ্ঞান সম্পাদক, তাঁর পুরানো বন্ধু ম্যাকস্-ওয়েলকে টেলিফোন করেন; এই ম্যাকস্-ওয়েলই লান্দাউ ও লিফশিৎসের লেখা বিরাট গ্রন্থ "তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা" ব্রিটেনে প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন। ককরফট ও ম্যাকস্ওয়েল তাঁদের সমস্ত সংগতি জড়ো করলেন; পর দিন লণ্ডন বিমান বন্দরে ইউ-১০৪ বিমানখানাকে খানিকটা দেরী করতে হয়, সেই বিমানে করেই মস্কোতে আসে একটি ছোট পার্সেল—তার উপরে লেখা "মিঃ লান্দাউয়ের জন্য।"

ম্যাকস্ওয়েল তখন নিজেই বিপন্ন ছিলেন; মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাঁর পুত্র কয়েকদিন যাবৎ হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর আপন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে, পরে অ্যান্টিবায়োটিকস্ দরকার হবে।

শেরেমেতিভো বিমান বন্দরে ঔষধের পার্শেল আসতে লাগল বেল-জিয়াম থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, জার্মানী থেকে। এই বিমান বন্দর থেকে ৫০নং হাসপাতালে ঔষধের পার্শেল বহন করে আনার কাজ নিয়েছিলেন অধ্যাপক ইয়াকফ্ স্মরোদিনাস্কি।

কিন্তু লান্দাউয়ের জীবন রক্ষা হয় একটি ঔষধের অ্যাম্পুলের সাহায্যে—সেটির সন্ধান পেয়েছিলেন আচার্য ভ্লাদিমির এঙ্গেলহার্দৎ। তিনি এবং নিকোলাই সেমিয়নফ দুর্ঘটনার দিনই ঔষধটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আরো একটি সহজ উপায় পাওয়া যায়। এঙ্গেলহার্দৎ-এর ছাত্ররা লেনিনগ্রাদে একটি তৈরী অ্যাম্পুল পান। ম্যাকস্ওয়েলের পার্শেল এসে পৌঁছনোর আগেই ডাক্তাররা সেটি পেয়ে যান।

ওপরে যে বিবরণ দেওয়া হল তা এই আশ্চর্য ঘটনার প্রারম্ভিক এবং কঠিনতম অবস্থার বর্ণনা। তারপর প্রবীণ নিউরো সার্জন পেনফিলডের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। আর একটি চিকিৎসা নিকেতন—বুরদেনকো ইনস্টিটিউট অব নিউরো সার্জারির—ডাক্তার এবং নার্সরাও লান্দাউয়ের শয্যা পার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এই পুনরুজ্জীবিত রোগীর আরোগ্যোত্তর সেবা ও চিকিৎসা এখনো চলেছে।

ডাক্তার এবং পদার্থবিদগণের আলো-চনায় পরামর্শে সেই মহৎ শব্দটি—আশার কথাটি ঠিক কোন মুহূর্তে প্রথম এসেছিল আজ তা নিরূপণ করা কঠিন।

কিন্তু সে আশা সত্য হয়েছে—এইটেই সব থেকে বড়ো কথা।

যুদ্ধের স্বাদ ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

।। এক ।।

অনিচ্ছায় আমরা একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি, যে যুদ্ধ হয়ত সহজে মিট্‌বে না। বিস্তৃত সমরাঙ্গনে বীর সৈনিকরা যুদ্ধ করছেন। তাঁদের শৌর্যের, তাঁদের ক্লেশ ও নির্যাতনের কাহিনীও শোনা যাচ্ছে। শান্তির নীড় ছোট ছোট কত পাহাড়-পর্বত, কত গ্রাম আজ হয়ত রণাঙ্গনে পরিণত। তারপর আসবে আধুনিক যুদ্ধের অভিশাপ, গ্রাম, নগর, সব হয়ত একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাবে। যুদ্ধের সময় দূর নিকট হয়, পর আপন হয় এবং মিত্র শত্রু হয়। নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই নতুনতর বিধি। যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে উঠেছে, গভীরও হয়েছে, যাঁরা সবাই এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, শুধু তাঁরা নয়, পিছনের সারির সবাই সেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িত তাদের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটবে তার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবে, সে আর এক কাহিনী।

যুদ্ধের সঙ্গে আছে সর্বাঙ্গীন আক্রমণ, অনটন, নিয়ন্ত্রণ, কৃচ্ছ্রসাধন। সর্বসাধারণ সে ক্লেশ হাসি মুখে সইবে। এখন আমরা বৃহত্তর কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহান দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েছি। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী ভিন্ন বেসামরিক নাগরিকের ভূমিকাও কম নয়। যুদ্ধেরও আর্ট আছে, তাই প্রতিটি সৎ নাগরিকের দায়িত্ব আছে সেই আর্ট সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করার। আর যে স্বাধীন মানুষ বোঝে যুদ্ধের কি অভিপ্রায়, তার পক্ষে একজন পেশাদার সৈনিকের চাইতেও অনেক বেশী শৌর্য প্রকাশ করা সম্ভব। এই কারণে ইতিহাসে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বাহিনী দেশপ্রেমের পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক সময় সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রীস ও পার্সিয়ার যুদ্ধ, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ তীরন্দাজরা ক্রেসীতে যুদ্ধকালে যে-বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈনিকদের ট্যাঙ্ক-বিজয় আর মাদ্রিদের কথা স্মরণীয়।

যুদ্ধকে পটভূমি করে যুগে যুগে বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কাব্য, গাথা ও কাহিনীর মাধ্যমে কবি, চারণ ও কাহিনীকার যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ চিত্র লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যুদ্ধের অভিশাপ তাঁদের রচনামাধ্যমে সাধারণ পাঠক বুঝেছে। এমনই কোনো কোনো যুদ্ধকাহিনী রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্যে বিধৃত। 'সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ট্রাজেডি'—একথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক প্রবন্ধে। যুদ্ধের মধ্যে যে ট্রাজেডি জড়িয়ে আছে এমন আর কোনো বস্তুতে নেই। তাই যুদ্ধের স্বাদ যে সব কবি ও সাহিত্যিক লাভ করেছেন, তাঁরা তা প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাব্যে ও কাহিনীতে। তবে, লেখকের পরিচয় তাঁর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে নির্ভরশীল নয়, অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীটাই আসল। নিছক অভিজ্ঞতা মূল্যহীন। টলষ্টয় ভিন্ন অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকের হাতে পড়লে 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' হয়ত শিশুপাঠ্য রোমাঞ্চকর কাহিনী হয়ে উঠ্‌ত।

।। দুই ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইংলন্ডে কবিতার ফসল বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই জ্যাকুলীন ট্রটার নামক একজন সংকলক "ভ্যালর এ্যান্ড ভীসন" নামে যুদ্ধ-কবিতার এক সঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। শ্রীমতী ট্রটার তাঁর ভূমিকায় নিবেদন করেছিলেন যে এই সংগ্রহকর্মে তাঁকে অন্ততঃ পাঁচশো-খানি কবিতাপুস্তক অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এইসব কবিতাবলীর সঙ্গে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো অসংখ্য কবিতার কথা যোগ করা উচিত। দেশ-প্রেমের আবেগে গোড়ার দিকে অনেক কবিতা রচিত হয়।

এই কালের কবিতার আনুপাতিক কাব্য-মূল্য সরাসরি বিচার করা চলে না। কারণ, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সব কবিতাবলীর একটা বৃহৎ অংশ রীতিগত এবং ভাবাবেগপ্রধান। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ফলে যে জরুরী অভিব্যক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার ফলে রীতি এবং প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙে পড়ে একটা নতুন সাহিত্যিক আকৃতি গড়ে উঠল। প্রগতিবাদী "নিউ নাম্বারস"-গোষ্ঠী প্রভৃতির উদ্ভাবিত সাধারণ পথ-চলতি কথাবার্তা, শিল্পাঞ্চলীয় পরিবেশ, এবং বাক্-প্রতিমার ব্যবহার করাটাই রীতি হয়ে দাঁড়ালো। বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধসমাজ যে অসংখ্য মানুষের ব্যথা ও বেদনায় সমান অংশভাগী তা অনুভূত হল। তার ফলেই ছকবাঁধা প্রচলিত কাব্যিক রীতি বিসর্জন দেওয়া সহজ হল। সুতরাং, কাব্যমূল্য যাই হোক, এইসব কবিতা সামরিক সংঘর্ষজনিত বহুজন অনুভূত মানসিক প্রতিক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণে সমর্থ হল, জনপ্রিয়তা লাভ করল।

আরো আশ্চর্য কান্ড, যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গেই কবিতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। হরিজন হয়ে একপাশে যে পড়েছিল রাতারাতি তাকে সম্মানের আসনে বসানো হল। তখন আর কবিতা পাদপূরণের প্রয়োজনে ব্যবহার হয় না, তার ভূমিকা তখন দায়িত্বপূর্ণ। লন্ডন টাইমসের মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধ-লেখক তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে কবিতা ব্যবহার করতে লাগলেন। আর হোরেশিয়ো বটমলী জাতীয় দেশভক্তগণও জনপ্রিয় সংবাদপত্রে উদাত্ত আহ্বান জাগালেন। প্রখ্যাত লেখকরা পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন, তবে কিপলিঙ-এর "For All we Have and Are" এবং হার্ডির "Song of the Soldiers" আজো প্রেরণা জাগায়। এই সব সমরকালীন কবিতা সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে আহরিত হয়ে "Songs and Sonnets for England in War Time" নামে প্রকাশিত হয়। মোট পঞ্চাশটি কবিতা ১৯১৪-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রচিত।

এই সব কবিতার মূল বক্তব্য কাইজারের ঘৃণিত শঠতা, নীচতা এবং বর্বর, নগ্ন আক্রমণ। তাছাড়া কাইজার দাবী করতেন যে তাঁর সর্বকর্মে আছে দৈব অনুমোদন, আর অপর পক্ষ মনে করতেন যে দৈব কেবলমাত্র বৃটেনের অনুকূলে। এই বিষয়বস্তু বা বক্তব্য অধিকাংশ কবিতায় প্রকাশিত। স্যার উইলিয়াম ওয়াটসন আবেগভরে লিখে ফেলেছিলেন—

> "Shall all the false and
> creeping things
> Find a last refuge among
> Kings ?"

তারপর হয়ত কবির খেয়াল হয় যে ইংলন্ডে রাজা আছেন। আর মিত্রপক্ষে আছেন রোমানফ বংশের জার। তাই

পরবর্তী অংশে এ'দের প্রশংসা করতে হয়েছে। জার্মানরা তখনও 'হূন' নামে অভিহিত হয়নি বা কুৎসাভরা 'ঘৃণার পাঁচালী' তখনও বেশ জমিয়ে লেখা সুরু হয়নি। এই কালেই উইলিয়ম আর্চার, উদার-নীতিক সংবাদপত্র 'ডেইলী নিউজ'-এ 'The workers thinkers and singers' -দের ত্রাণ করার জন্য ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করে কবিতা লিখলেন। মানবকল্যাণে আবার যাতে জার্মানদের উদ্বুদ্ধ করা যায় তার আহ্বান জানালেন। যুদ্ধ-জ্বর-জনিত এই অবস্থার মধ্যে শান্তিকামী বিদগ্ধদেরও সংখ্যা কম ছিল না, তাঁরা 'নেশন', 'নিউ স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন। এই কালেই জন মেসফিল্ড (আগস্ট ১৯১৪) একটি কবিতা রচনা করেন, যা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সংবাদ শুনে জনৈক কিষাণের আত্ম-চিন্তনে কবি নিজের মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় একজন সাধারণ মানুষের জন্মভূমির প্রতি নিবিড় আবেগ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, সে আর কিছু জানে না। 'জানে শুধু, স্বপ্ন দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' তার সাধের মাতৃভূমি। এই মনোভাবটিই রুপার্ট ব্রুক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

"All these people at the front who are fighting muddledly enough for some idea called England — it's some faint shadowing of goodness and loveliness they have in their hearts to die for."

যুদ্ধের হেতু সম্পর্কে যদিচ ইংলণ্ডের কবিদের মনে ধোঁয়াটে ভাব ছিল তবু তাঁরা সেদিন এক হয়ে যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করেছেন। জন ফ্রীম্যান তাই বলেছিলেন, "এক অজ্ঞাত এবং নির্ভয় ভবিষ্যের পানে আমরা এই এক বৃহৎ জাতি যে এগিয়ে চলেছি এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে?"

।। তিন ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের স্মরণীয় কবি রুপার্ট ব্রুক এনটোয়ার্পের রয়্যাল নেভাল ডিভিসনের প্রতিরক্ষা-কর্মে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূর্তি দেখেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই ইজিয়ান সমুদ্রের বিখ্যাত দ্বীপে কবির দেহ সমাধিস্থ হয়। এই স্বল্পকালের মধ্যে রুপার্ট ব্রুক (অর্থাৎ ১৯১৪-র ডিসেম্বরের মধ্যে) তাঁর বিখ্যাত সনেটগুলি রচনা করেন। আত্মত্যাগী তারুণ্যের প্রতীক হয়ে রুপার্ট ব্রুক আজো তাই একটি কাল-পর্বের প্রতীক হয়ে আছেন। তাঁর চরিত্র ছিল সম্ভাবনাময়, তাঁর শেষ পরিণতি বিয়োগান্ত। তারুণ্যের প্রতি-মূর্তি এই কবির আত্মত্যাগ দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত। জীবনের উজ্জ্বল দিকের স্বপ্ন দেখার সুযোগ হয়েছিল রুপার্ট ব্রুকের। তাঁর পরিচিত মহলের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি অনেক দেশ পর্যটন করেছেন, সাউথ-সী-আইল্যাণ্ডের স্বর্গীয় পরিবেশে কিছুকাল কাটিয়েছেন। এই প্রাচুর্য ও সৌভাগ্য তিনি ভোগ করলেও নিজের বিচারবুদ্ধিকে বলিদান করেননি। তাই সাউথ-সীর উপকূলে বসেও তিনি আশা করেছেন 'Some kind of upheaval'-এর, যা দেশকে কুৎসিত সংক্রমণের হাত থেকে ত্রাণ করবে। ফেবিয়ানিজম তাঁর কাছে দুর্বল মন্ত্রশক্তি মনে হয়েছে। রুপার্ট ব্রুকের সনেটের মধ্যে একটা জাতিকে জাগ্রত করার প্রেরণা আছে। রুপার্ট ব্রুকের মৃত্যুর পর লণ্ডন টাইমসের শোক-প্রশস্তি লিখেছিলেন উইনস্টন চার্চিল, জীবনের শেষ কয়েক মাস সৈনিক কবি কিভাবে দেশকে প্রেরণা দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ঃ

"The Poet Soldier told with all the simple force of genius the sorrows of youth about to die, and the sure consolations of a sincere and valiant spirit."

চার্চিল অবশ্যই জানতেন যে যুদ্ধ ক্রীসমাসের মধ্যে শেষ হবে না, তারপর ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টের সামরিক কার্যকলাপ যখন প্রায় ধামাচাপা অবস্থায় তখনই প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহত্ব ক্রমশঃ সর্বসাধারণ উপলব্ধি করতে পারলেন।

এই মুহূর্তে 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হল, আত্মদানের আদর্শে লিখিত আগেকার সব আবেগময় কবিতাকে নস্যাৎ করে এজিজাবেথ ব্রীজেস এই কবিতায় লিখলেন ঃ

"Sons and brothers
Take for armoury,
All love's Jewels
Crushed, thy warpath be."

পোয়েট লরিয়েট রবার্ট ব্রীজেস কিন্তু তখনও নীরব, শিল্পীর মনে যে অনভূর্ণ আসে হয়ত তৎকালে তিনি তাতে আচ্ছন্ন ছিলেন। এই কারণে, তাঁকে কুৎসিত আক্রমণও সইতে হয়েছে। এরপর প্রকাশিত হল তাঁর সংকলন-গ্রন্থ "দি স্পিরিট অফ্ ম্যান", এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"Man is a spiritual being, the proper work of his mind is to interpret the world according to his higher nature, and to conquer the material aspects of the world so as to bring them into subjection to the spirit."

এই সংকলন-গ্রন্থ হাজার হাজার সৈনিকের পকেটে পকেটে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে লাগল। সৈনিকদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করলো। ব্রীজেস অশেষ লিপিকুশলতায় ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের সঙ্গে দু'হাজার বছরের মানবিক অভীপ্সাকে সংযুক্ত করে এক বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যুদ্ধের কাল প্রলম্বিত হতে থাকে, ততই মানুষের মনে জাগে হতাশা এবং নৈরাশ্য, তাই এতকাল যা দেশপ্রেমের ভাবাবেগ মাত্র ছিল, যা ছিল কল্পনা তা বাস্তবে রুপায়িত হতে লাগল। কবিদের রচনায় প্রাচীন রীতি পরিবর্তিত হয়েছিল, কবিতার আলংকারিক বাহুল্য খসে গিয়ে কঠোর বাস্তবতা ফুটে উঠল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সীগ্‌ফ্রীড্ সাসুন "সুইসাইড ইন ট্রেনচেস্" নামক যে কবিতা প্রকাশ করলেন তার মধ্যে অসহনীয় অবস্থার ছবি পরিস্ফুট। একদা আনন্দময় এক সৈনিকের বেদনা নিয়ে তিনি লিখলেন—

"In winter trenches,
cowed and glum
With crumps and lice
and lack of rum,
He put a bullet through
his brain,
No one spoke of him
again........"

"ক্রামপ্স" মানে বৃহৎ জার্মান গোলা। এই কবিতা অনেকের মনোমত না হতে পারে কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেই কবি রীতিগত পথ পরিত্যাগ করে পরিষ্কার ছবি সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যা তখনও ছায়াচ্ছন্ন তাকে স্পষ্ট করেছেন।

সাসুন যা বলেছিলেন তা আর দুবছর আগে বলা যেত না। এই ১৯১৫-র অকটোবর মাসে সি, এচ,

সরলীর মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতার কল্পলোক বিধ্বস্ত। সচেতন সৈনিক সর্বদাই জানে যে সে তলহীন গর্তের অতলে ব্যক্তি হিসাবে বিলীন হবে। তাই সরলী লিখেছিলেন : "লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের বিকৃত অবয়ব যখন দেখো, তোমার স্বপ্নের মধ্যে যখন ম্লান সেনা-বাহিনী বিলীন হয়, তখন অপর মানুষের মতো মধুর কথা বোলো না, তোমার তাতে প্রয়োজন নেই। প্রশংসা দিও না, তারা বধির শুনতে পাবে না। অশ্রুজলের প্রয়োজন নেই, তাদের চোখ দৃষ্টিহীন, তোমার চোখের জল কি করে দেখবে! সম্মানও চাই না। বরং মৃত্যুই ভালো..."

।। চার ।।

মৃত্যুর অপরিহরণীয়তা, অভিশপ্ত যৌবনের সান্ত্বনাহীন ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকার রচনা করেছে। বে-সামরিক জগতে যে-প্রিয়জনরা পড়ে আছে তাদের অঙ্গীকারের মূল্য কি! এই ভাবাবেগকে অনুকম্পাও বলা যায় না, তিক্ততাও বলা চলে না। উইলফ্রেড ওয়েনের কবিতায় এই অভিব্যক্তির পূর্ণতর প্রকাশ লক্ষিত হয়।

ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস কিছুকাল হাসপাতালে কাটিয়ে এবং গভীর মনঃসংযোগের ফলে তাঁর বিখ্যাত বিয়োগান্ত উপন্যাস "Le Feu" রচনা করেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে যে সব মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা শান্তি বিঘোষিত হওয়ার পর, সেই কারণে, আঁরি বারবুসের উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। কেননা যুদ্ধের কালে শুধু সংক্ষিপ্ত কবিতা লেখাই সম্ভব ছিল, বৃহত্তর রচনা নয়। বারবুসের উপন্যাসে আছে যাঁরা হালকা কর্মে নিযুক্ত তাঁদের নিয়েই কিভাবে সেনাগোষ্ঠীকে ব্যস্ত থাকতে হয়, এই সামরিক পোষাক পরিহিত কাজ-এড়ানো একদল মানুষ একদিকে আর অপরদিকে সুদূরপ্রান্তের বে-সামরিক জীবন। তারা দেখে যে অল্পসংখ্যক মানুষ যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট তারাই আসল বোঝা বইছে। এমনকি পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীরও কোনো তুলনা চলে না। তাই ট্রেঞ্চ থেকে যে সৈনিক ছুটিতে ঘরে আসে সে এমন এক জগতের সামনে এসে পড়ে যেখানে ট্রেঞ্চের জীবন কল্পনাতীত। তার কাছে বে-সামরিক জগৎ খাপছাড়া ঠেকে, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন কি ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও এই নিঃসঙ্গতার দুঃখ এসে প্রবেশ করে, প্রেমিকাকে বাহুপাশে পেয়েও মনে হয় যেন যুদ্ধের প্রেত উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এডমণ্ড ব্লাণ্ডেনের "রিইউনিয়ন ইন ওয়ার" কবিতার মধ্যে এই ভঙ্গীটি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হল। ব্লাণ্ডেন লিখলেন প্রেমিকের মিলন-মুহূর্তে যুদ্ধের প্রেত-মূর্তি এসে চীৎকার করে ওঠে:—

> "Love's but a madness,
> a burnt flare;
> The shell's a madman's bride."

বে-সামরিক সংসারের চেতনহীন অবস্থা এর জন্য কম দায়ী নয়। সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন রাজনীতিবিদ্ ও প্রচার-বাগীশরা।

এইভাবে কবিরা ক্রমশঃই বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এডমণ্ড ব্লাণ্ডেন, উইলফ্রেড ওয়েন এবং সীগফ্রীগ সাসুন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে করুণা ও প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিলেন। তাঁরা এ যুগের ক্রুদ্ধ তরুণদলের পুরোগামী। এঁরা সকলেই সৈনিক, যুদ্ধের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে যুদ্ধের এবং ফ্রন্টলাইনের
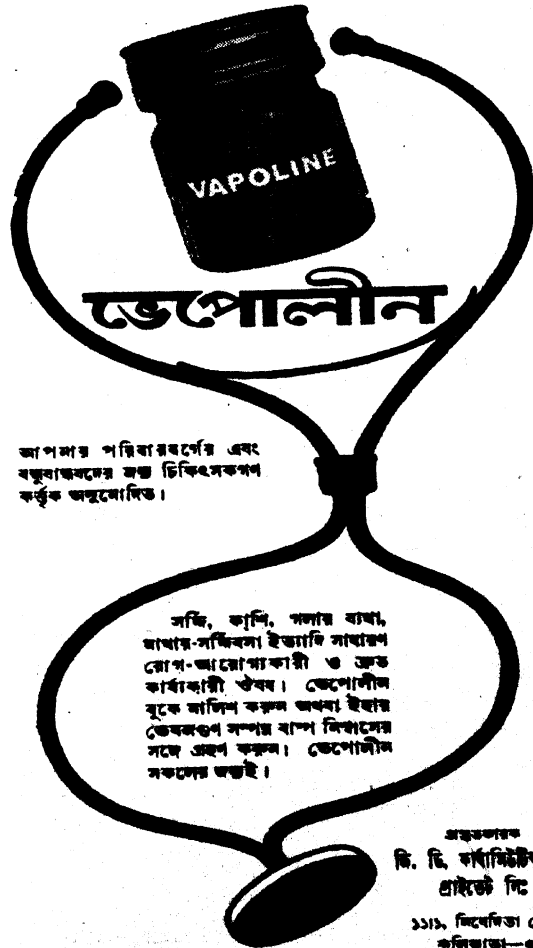
কঠোর বাস্তব রূপকে প্রকাশ করেছেন, দুর্বল স্নায়ুবিকার-গ্রস্ত মানুষের বিভীষিকাময় ক্রন্দন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে অনেক সৈনিক কবি সমরাঙ্গণে গিছলেন। তাঁরা যুদ্ধের যন্ত্রণা ভোগ করে যুদ্ধের কবিতা লিখেছিলেন। তাই তার মধ্যে শুধু দেশপ্রেমের ভাবাবেগ নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাস্তবচিত্রও পাওয়া যায়। সাসুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন, তবু শান্তি নেই—

"In bitter relief
I awake, unfriended ;
And while the dawn begins
with slashing rain
I think of the battalion
in the mud.
'When are you going
out to them again ?
Are they not still your
brothers through our blood?"

এইখানে দেশপ্রেমকে ছাপিয়ে 'কমরেডসীপ' জাগ্রত হয়েছে। এই ভঙ্গী নিয়েই উইলফ্রেড ওয়েনও লিখেছেন যে "আমি ঘুম ভেঙে আমার বন্ধুদের দীর্ঘশ্বাস শুনি, তাদের দুর্দশার কথা বলার জন্য তাদের বাসনা নেই, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এসেছে, এবার যাই।"

উইলফ্রেড ওয়েন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির দিনই গোলাঘাতে নিহত হন। ওয়ার অফিস থেকে তাঁর ব্যক্তিগত খাতা-পত্র তাঁর মার কাছে পাঠানো হয়। সেই নোটবুকের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ ১৩১৭ (ইং ১৯১০-এ) লিখিত 'যাবার দিন' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ লেখা ছিল :—

"যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই ।।"

ওয়েনের মা রবীন্দ্রনাথকে একথা লিখে জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আর একটি কারণ আছে। কবিতাটির তলায় ওয়েন স্বহস্তে লিখেছিলেন—এই কবিতাটি রণক্ষেত্রের কঠোর পরিবেশে আমার মনে গভীর শান্তি এনেছে।

কবি-সৈনিকের ব্যক্তিগত দুঃখভোগে সমষ্টির দুঃখেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাই গৃহসুখ এদের ভালো লাগে না, সবাই আবার ফিরে যেতে চায় সমরাঙ্গনে, সেই কারণে ওয়েন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলেন, তাদের সহায়তা করবার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে একজন অফিসারের পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, আর অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের দুর্ভোগ দেখে তাদের জন্য দক্ষ উকীলের মত আবেদন-নিবেদন করার প্রয়োজনে। যাঁরা ঘরে বসে আছেন তাঁদের আনন্দ ঘুচিয়ে মানসিক দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার জন্য ওয়েন বে-সামরিক মহলে আন্দোলন করে আবার সমরাঙ্গনে ফিরে গেলেন। সামরিক ও বে-সামরিকদের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ওয়েনের রচনায়। তিনি অতিশয় তিক্ততার সঙ্গে বলেছিলেন—ইংলণ্ডের যা কিছু মহৎ তা সৈনাদের সঙ্গে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে চলে গেছে।

।। পাঁচ ।।

যুদ্ধের বিরতির প্রাক্কালে লেখকদের মনে যে চিন্তা জেগেছিল তা যুদ্ধকে ভয় করে নয়, যুদ্ধান্তে এক উজ্জ্বল সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাতের জন্য। বিদ্বেষের বিষবাষ্প যেন পৃথিবী থেকে মুছে যায়—এই ছিল তাঁদের কামনা। আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীতে শান্তি আসুক; রাত্রির তপস্যা যেন একটি প্রসন্ন দিনকে আনতে পারে।

তা কিন্তু হল না। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, সেই পৃথিবীর লোভ-জটিল-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি কই। তাই কিছুকাল যেতে না যেতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে ওঠে। আবার সেই রণভেরীর আহ্বানে সমরাঙ্গনে ছুটতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই ইংলণ্ডের এক রক্ষণশীল সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকী কয়েকজন কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা পাঠানোর জন্য। এই আমন্ত্রণের উত্তরে অতি সামান্য কয়েকটি কবিতা পাওয়া গিয়েছিল, ফলে সম্পাদক গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসীবাদের লড়াই-এ কবিগণের এই জাতীয় নিস্পৃহ ভঙ্গী দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে কড়া সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের রুপোর্ট ব্রুকের মত এই যুদ্ধে কোনো কবির অভ্যুদয় হচ্ছে না কেন এই অভিযোগ। এর কারণ ইংরাজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষায় ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসীবাদের সম্পর্কে কবিতা লিখিত হয়েছে। ফেদরিকো লোরকা স্মরণীয়।

পরিবর্তিত মূল্যবোধ এবং কাব্যে বিমূর্তনবাদের আবির্ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরকালে কবিতার রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি। স্টীফেন স্পেনডার একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন এর কারণ—

"Poetic minds of our times are materialist, for better or worse, because outstanding problems are national ones."

সভ্যতার সংকটকাল সম্পর্কে এযুগের কবিরা সচেতন। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৮-এ যে কথা বলেছেন আজো সেকথা সত্য—"প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—"

ইংলণ্ডে দুই যুদ্ধের মাঝখানে যে দুজন কবি উল্লেখযোগ্য তাঁদের নাম এলিয়ট এবং অডেন। আমাদের দেশে এ দুজনই সুপরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরকালে যে কবি-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় তাঁদের নাম, লুই ম্যাকনীস, ষ্টিফেন স্পেনডার, সিসিল ডেলুইস, ডিলান টমাস এবং জর্জ বার্কার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইংরাজী কবিতায় গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জীবনের যা অংশ, যা জীবনে জড়িয়ে আছে তাকে এড়িয়ে চলা যায় না, মানুষের অনুভূতি গভীরতর হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ যুগের মানুষ আত্মচিন্তনে অধিকতর আগ্রহী। কবিরাই মানব-মনের গভীরে কি আছে তার অন্তরঙ্গ বিচার করতে পারেন, যুদ্ধের অমানুষিকত্ব ও নগ্ন অত্যাচারের পিছনে কি মানবিক সংগ্রাম আছে তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং উদ্ঘাটন করেছেন। বিশেষতঃ তিনজন ইংরাজ কবি মহাযুদ্ধের ভয়ংকরত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁদের রচনায় তা বিধৃত করেছেন, এ'দের নাম এলুন লুইস, রয় ফুলার এবং সিড়নে কীস্। লুইস আর সিড়নে কীস্ দুইজনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত হন, কিন্তু তার আগেই কয়েকটি আশ্চর্য কবিতা রচনা করে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ'দের মধ্যে লুইসের ভঙ্গী ছিল সরল এবং সহজ, তাঁর প্রেমের কবিতা এবং সমর-জীবনের কবিতা যুদ্ধের অমর্যকত্ব এবং মানবমনে তার প্রতিক্রিয়ায় উত্তম রূপায়ণ বলা যায়। সিড়নে কীসের ভঙ্গী ছিল সাহিত্যরসসমৃদ্ধ, বয়সে তরুণ হলেও লিপিকুশলতা ও আঙ্গিকে পরিণত মানসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফুলার অনেক আগে থেকেই লিখেছিলেন, তাঁর রচনারীতি উন্নত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর কয়েকটি উত্তেজনাময় কবিতা তিনি লিখেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

[উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

সোজাসুজি বই-খাতা গুটিয়েই বসে রইল সে। মোক্ষদা এল না—আজ স্বয়ং ঠাকুর এসে ওর চা-জলখাবার দিয়ে গেল। আজ আর বাঁধা বরাদ্দ ঘরে তৈরী পরোটা নয়—কান্তি যা ভালবাসে বেছে বেছে তা-ই আনিয়েছে রতন। বড় বড় হিংয়ের কচুরি, আলুর দম—তার সঙ্গে খাস্তা গজা। দুঃখই করুক অভিমানই করুক—রতনদির তার প্রতি স্নেহ কিছু মাত্র কমেনি—এই খাবার আনানো'তে আর এক দফা তাঁর অপরিসীম স্নেহেরই পরিচয় পেলে কান্তি।

এর পর বসে বসে প্রায় ছটফট করতে লাগল সে। রতনদি যে নিজেই উঠে আসবেন একটু পরে কিম্বা ডেকে পাঠাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাকতে পারবেন না কিছুতেই। সেই-টেরই অপেক্ষা করছে সে, তার আগে খাওয়াটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে এল, আবছা হয়ে এল বাড়ির ভেতরের দিকটা, তবু রতনদির তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। এই সময় প্রসাধন শেষ ক'রে চা খেয়ে রোজই ওপরে ওঠেন প্রায়। তবে আজ এমন চুপচাপ কেন? সত্যি বটে একবার বলে-ছিলেন ওকেই নিচে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে, সেইটেই ধরে বসে আছেন নাকি? বেশ মজার লোক তো। আবার যে বলে গেলেন, 'আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব'—সেটা ভুলে গেলেন! কিন্তু এ ভুল তো স্বাভাবিক নয়। কান্তি বেশ জানে ওদের এই সান্ধ্য আসরে মন পড়ে থাকে তাঁর। তবে কি সত্যি সত্যিই খুব অভিমান হয়েছে। চাপা মেয়ে অভিমান চেপে অন্য রকম ব'লে চলে গেল?

সে আর থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। অন্য দিনের চেয়ে একটু সন্তর্পণেই নামল। কেন যে এই সতর্কতা তা সে জানে না। এটা যে সঙ্কোচ—এবং এ ধরনের সঙ্কোচের যে কোন কারণ নেই, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়, আপনা থেকেই পা টিপে টিপে নামল সে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে-- মোক্ষদা নিচে রান্নাঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। এর পর নিশ্চিন্ত হয়েই ঢুকল রতনদির ঘরে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল সে। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, এখনও বেশ-ভূষা সারা হয়নি রতনদির, চুলটা পর্যন্ত বেঁধে দিয়ে যায়নি মোক্ষদা—যেমন সেই বিকেলে ওর কাছে গিয়েছিল তেমনি অবস্থাতেই আছে এখনও। সেই ঘুম থেকে ওঠা সাধারণ কাপড় পরা আলু-থালু অবস্থা। আধ অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন—নিচের ঢালা বিছানাটাতে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে—সামনে হাতের কাছে একটা গেলাসে লাল-পানা কী সরবতের মতো।

কী যে সেটা, তা আজ আর বলে দিতে হ'ল না। গন্ধতেই টের পেয়েছে। এতদিনে গন্ধটার সঙ্গে ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে ওর। সে একটা চাপা আর্তনাদের মতো 'রতনদি' বলে ডেকে কাছে গিয়ে বসে বলে উঠল, 'এ কী করছ রতনদি, এমন ক'রে বসে এখন থেকেই মদ খাচ্ছ!' তারপর কেমন একটু অসংলগ্নভাবেই বললে, 'আমার ওপর রাগ ক'রেছ রতনদি? কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে এ কাণ্ড কেন করতে গেলে! ছি ছি!'

ওর ওপর রাগ ক'রেই এই কাণ্ড করছেন রতনদি, এটা মনে করবার তার কোন অধিকার নেই—এটাও এক রকমের ধৃষ্টতা, অনধিকারচর্চা তো বটেই—কিন্তু সে সব কথা সে মুহূর্তে মনে এল না ওর। আবারও যে সে 'তুমি' বলছে তাও লক্ষ্য করল না।

বরং আরও আবেগের সঙ্গে, ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই রতনের একটা হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললে, 'ওঠো—উঠে বসো রতনদি—লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি গা-হাত ধুয়ে নাও। এ সব ছাই-ভস্ম আর এখন থেকে খেতে শুরু করো না। মাথায় বরং জল দাও একটু—নইলে সন্ধ্যে থেকেই মাথা ধরবে হয়ত।'

এতক্ষণ পাথরের মতোই বসেছিল রতন কিন্তু ওর এই স্পর্শে যেন পাষাণী প্রাণ পেল। হাতটা কান্তির হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে-ই দু হাতে চেপে ধরল কান্তির দুটো হাত। তারপর প্রবল আকর্ষণে ওকে আরও খানিকটা কাছে টেনে এনে বলল, 'সাধ ক'রে কি খাই। না খেয়ে উপায় কি বল্? দুঃখ ভুল'তে পারি আর যে আমার কিছু নেই, কেউ নেই। ওরে আমি যে বড় দুঃখী, কত যে দুঃখী তা তুই বুঝবি না।'

'কে বললে বুঝব না রতনদি। আমি বুঝেছি তোমার দুঃখ। বুঝেছি বলেই

তো ছুটে এসেছি। কেউ নেই তোমার কেন এ কথা বলছ—আমি তো আছি! আমি তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি।...তুমি এখানে এমনি ক'রে বসে না থেকে আমার কাছে গেলে না কেন, অন্যদিনের মতো জোর ক'রে ডেকে নিলে না কেন? কেন এমন অন্ধকারে একা বসে বসে ঐ সব বিষ খাচ্ছ?'

'একটা বিষ নামাতে এই বিষ খাচ্ছি—বুঝলি। নইলে সে বিষে সব ছারখার হয়ে যাবে। তুই যা ভাই, আমার কাছে আর থাকিসনি। নয়ত এ বিষে তুইও জ্বলেপুড়ে মরবি। তুই কালই বাড়ি চলে যা!'

আর যা-ই হোক ঠিক এ কথাটা আশা করেনি কান্তি। সে একেবারে আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। রতনদির রাগ হয়েছে অভিমান হয়েছে—এটা সে আগেই আশংকা করেছিল কিন্তু ঠিক এতটা যে হয়েছে, তা বুঝতে পারেনি। সে কিছুক্ষণ চুপ করে ক'রে থেকে প্রায় ঘাট হয়েছিল টাস্কের কথা তোলা। সত্যি বলছি, আর কখনও বলব না। এই বারটি মাপ করো আমাকে!'

সে হাত দুটো রতনের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যিই দু হাত জোড় করলে।

অকস্মাৎ যেন পাগল হয়ে গেল রতন। একটা প্রবল ধাক্কায় ওকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে, 'যা বলছি আমার সামনে থেকে, দূর হয়ে যা! নাকে কান্না কেঁদে আমার মন ভোলাতে এসেছে! যত সব মায়াকান্না! ওসব আমি ঢের দেখেছি। দূর হ হতভাগা। কাল সকালে উঠে যেন তোর মুখ আর আমাকে না দেখতে হয়। আমি ওঠবার আগে বই-খাতা জামা-কাপড় সব নিয়ে চলে যাবি—কোন চিহ্ন না থাকে তোর!'

চাপা হিংস্র গলায় কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে রতন।

ওর এ চেহারা বহুকাল দেখেনি কান্তি। অনেক দিন আগে, একেবারে গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলা স্নান করার আগে মদের খোঁয়াড়ি না ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে বকুনি খেয়েছিল—সেই সময় কতকটা এই রকম চেহারা দেখেছিল ওর। কিন্তু তাও এতটা নয়।

ওরে আমি যে বড় দুঃখী......

ভেঙ্গে-আসা কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ রতনদি, আমি—আমি তো বলিনি কিছু। আমি তো বললুম রাত জেগে সেরে নেব পড়া—তুমিই তো চলে এলে। আমার

বাঘিনী কেমন তা জানে না সে, কখনও দেখেনি—কিন্তু বই পড়ে যা ধারণা হয়েছে তার—হঠাৎ মনে হ'ল রতনদি আর মানুষ নেই, সেই বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এল সে সেখান থেকে। অপমানে দুঃখে দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল আসছিল ভরে, গলা অবধি ঠেলে উঠছিল কান্না—কিন্তু এখানে এর পর চোখের জল ফেলতেও সাহস হ'ল না ওর। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চেপে পা পা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ওপরে চলে এল।

নিজের ঘরে এসে কান্না আর কোন শাসন মানল না। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো শব্দ ক'রেই কাঁদতে লাগল সে ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। অপমান তো বটেই—দুঃখও তার কম হচ্ছিল না। বিনা দোষে সে এমনি লাঞ্ছিত হ'ল সেইটেই আরও দুঃখ। কেন এমন হয়ে গেল রতনদি, এতদিনের স্নেহ ভালবাসা একদিনে ভুলে গেল! নাকি বড়লোকের ধরনই এই? এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য—এত হাসি-তামাসা গল্প-গুজব একসঙ্গে খাওয়া-বসাতেও কান্তি কিছুমাত্র আপন হ'তে পারেনি রতনদির, কিছুমাত্র কাছে পৌঁছতে পারেনি। দুজনের অবস্থার মধ্যে—ভিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার যে দুস্তর ব্যবধান তা ঠিক রয়ে গেছে। তাই না আজ রতনদি এমন ক'রে অনায়াসে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেন তাকে!...ওদের গরীবের ঘরে ছেঁড়া জুতোও বুঝি এমন ক'রে ফেলে না!...এখন ও বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে? তাঁরা কি বিশ্বাস করবেন যে কান্তির সত্যিই কোন দোষ ছিল না? তাই কি কেউ বিশ্বাস করে? যেখানে এত আদর-যত্ন সেখান থেকে বিনা দোষে বিতাড়িত হয়েছে—এ তো বিশ্বাস করার কথাও নয়।

ছি ছি, এর চেয়ে মরে যাওয়ায় ঢের ভাল ছিল। আজকের রাতটা শেষ হবার আগে কোন রকমে তার মৃত্যু হয় না?

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এমনি এলোমেলো আবোল-তাবোল কত কী কথা ভাবতে লাগল সে। মুখেও দু-একটা কথা বেরিয়ে এল। ভাগ্যে এ সময়টা ওপরে কেউ থাকে না। নইলে পাগল ভাবত তাকে। সে চেষ্টা ক'রেও যে সামলাতে পারছে না নিজেকে!

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর অনেকটা

শান্ত হয়ে উঠে বসল। বিছানাটা ভিজে গেছে ওর চোখের জলে, মোক্ষদাদি এসে দেখলে কী মনে করবে! যদি প্রশ্নই করে—কিসে ভিজল? অবশ্য রাত্রে বড়-একটা ওপরে ওঠবার সময় পায় না। তবু—আসতেও তো পারে। ছিঃ—যদি জানতে পারে, সে বড় লজ্জার কথা হবে।

দুঃখের প্রথম আবেগটা কেটে গিয়ে এইবার মনে হ'ল—তাহলে কী সত্যিই বই-খাতা গুছিয়ে নিতে হবে তাকে? জামা-কাপড় সে নেবে না, যেমন একবস্ত্রে এসেছিল তেমনি একবস্ত্রে চলে যাবে। ওসব ভাল ভাল জামা-কাপড় যাকে খুশি দিন রতনদি, নয়ত জ্বালিয়ে দিন—ওতে কান্তির কোন দরকার নেই। আবার মনে হ'ল সত্যিই কি রতনদির ওটা মনের কথা? না মদের ঝোঁকে বলেছে? নেশা কেটে গেলে আবার ওকে খুঁজবে—আনতে লোক পাঠাবে? নিশ্চয়ই তাই। কী একটা ভেবে দুঃখ হয়েছিল, তাই মদ খেতে শুরু করে—আর মদ খেলেই তো রতনদির অমনি মেজাজ হয়। মাতালের কথা কি ধরা উচিত?

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু জোর [illegible]লে মনে। সোজা হয়ে উঠে বসল। [illegible]সি পেতে লাগল নিজের ছেলে-[illegible]নুষিতে। মিছিমিছি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল করে তুলে নিজেই কষ্ট পেল সে। রতনদির এত স্নেহ—এমন একদিনে মুছে যেতে পারে না। এই তো ক'বছরই দেখছে তাকে, এক-আধদিন তো নয়, তা সত্ত্বেও এমন ভুল বুঝতে পারল কী ক'রে তাঁকে! আশ্চর্য!

আবার একসময় মনে হ'ল—কিন্তু যদি সত্যিই বলে থাকেন। ওটা যদি তাঁর অন্তরের কথাই হয়? হয়ত কী শুনেছেন কার কাছে, হয়ত মোক্ষদাদিই মিছে ক'রে কী লাগিয়েছে ওর নামে—সত্যি-সত্যিই রেগে গেছেন। যদি তাই হয়, কাল সকালে ওকে দেখে যদি এমনি রেগে ওঠেন, সকলকার সামনে যাচ্ছেতাই করেন? সে যে আরও অপমান!......

অনেকক্ষণ বসে ভাবল কান্তি। অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না। কী করবে, কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারল না। খাবার সময় হ'তে ঠাকুর যখন ডাকতে এল, একবার ভাবল সহজভাবেই গিয়ে খেয়ে আসবে—কেউ না কিছু সন্দেহ করে, লোক জানাজানি না হয়। আবার ভাবল, খেতে গেলেই সে সম্ভাবনাটা বেশী থাকবে, কারণ এখন তার যা অবস্থা একগালও বোধ হয় খেতে পারবে না। সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে থর-থর ক'রে কাঁপছে—গা বমি-বমি করছে সর্বক্ষণ। সে আস্তে আস্তে বললে, 'আমার শরীরটা ভাল নেই ঠাকুরমশাই, আজ আর কিছু খাব না। তখন ঐ সব খেয়ে বোধহয় অম্বলমতো হ'য়েছে—গা গুলোচ্ছে বড্ড!'

ঠাকুর অবশ্য তাই বুঝেই নেমে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখা দিল মোক্ষদা-ঝি।

'বলি ব্যাপারটা কি বল তো ঠাকুর—খোলসা করে বল দিকি আমায়? আমার সেই দোপর বেলাকার কথাতেই মন ভারী হ'ল নাকি? নাকি দুজনে সোহাগের আগাআগি হয়েছে? আমার কথাগুলো নাগানো হয়েছে বুঝি?'

'না—মাইরি বলছি মোক্ষদাদি, এই বিদ্যাছুঁয়ে বলছি, তোমার কথা কাউকে একটাও বলিনি! বিশ্বাস করো!'

'তা যদি বলনি বাপু তো দুজনেরই মেজাজ গরম কেন? আগাআগিটা হ'ল কি নিয়ে? উনি তো মান ক'রে পড়েছিলেন এতক্ষণ—নিহাৎ নটা বাজে দেখে তখন উঠে যেমন তেমন ক'রে কাপড় বদলে চুল বেঁধে নিলেন, তুমি তো আহার-নিদ্রাই ছেড়ে দিলে! আবার দিদিবাবুর হুকুম হয়েছে, দাদাবাবুর সরকারমশাইকে জোর তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছেন কালকের মধ্যেই কোথায় কি বোটিংওলা রিস্কুল আছে খোঁজ ক'রে দেখে তোমাকে ভর্তি করে দিয়ে আসতে হবে। তোমাকে উনি এ বাড়িতে আর রাখবেন না! ...... এসব তো অমনি অমনি হয় না বাপু—কারণ একটা আছে। এ সমিস্যেটা কি হ'ল আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দিকি!'

এ আবার এক নতুন খবর। মন্দের ভাল অবশ্য। তাড়িয়ে দেবেন না, বাড়িতেও যেতে হবে না—বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন। একদিক দিয়ে হয়ত খুবই ভাল হ'ল। পড়াশুনোটা হবে। তবে বাড়িতে কী বলবে, সে কথাটা থেকেই যাচ্ছে যে!

আর, আর যেটা—সেটা হ'ল রতনদি আর তাকে এ বাড়িতে রাখতে চান না। তাকে দেখতে চান না তাঁর সামনে। সে কি তারই মঙ্গলের জন্যে—না সত্যিসত্যি তার ওপর রেগে গেছেন?

'কী গো মুখে রা নেই কেন? শরীর সত্যি খারাপ না আগ হয়েছে? —বল তো খাবার উপরে পেঁাছে দিয়ে যাই। খাওনি শুনলে কাল সকালে আমাদের কারুর ধড়ে মাথা থাকবে না!'

'না মোক্ষদাদি, রতনদি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, আমার আর মুখ দেখতে চান না। আমি খাইনি শুনলে কিছুই বলবেন না আর, খোঁজও করবেন না!'

'হুঁঃ!' অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে ওঠে মোক্ষদা, টক্ ক'রে জিভেরও একটা আওয়াজ করে, তারপর যেন একপাক নেচে নিয়ে বলে, 'ইল্লো! মরে যাই গো! ......তা আর না। বেরক্ত হয়েছে! বেরক্ত হওয়া কাকে বলে তা কি আর আমি জানি না! ওসব সোয়াগের কোঁদল—আত পোয়াতে যা দেরি, আর পোয়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে ঐ বোটিং মোটিংএ যেতে দেবে ভাবছ? তবেই হয়েছে। তবেই চিনেছ মেয়েজাতকে। মিছিমিছি সরকারমশায়ের অদেস্টে হয়-রানি আছে, ঘুরে মরবে। ওগো ঠাকুর, এই মুকী ঝির অনেক বয়স হয়েছে—অনেক দেখেছে এ।

......নাও, নাও, সোজা হয়ে ব'সো দিকি। চোখে জল দাও। কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়েছ দেখছি। একেই বলে ছেলে-মানুষ। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করা ঠিক নয়, কাঁচা বয়স এখন তোমাদের—বলে, আত-উপোসী হাতি পড়ে। খাবার আমি রোপরে দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে শুয়ে পড়ো সকাল সকাল। ওসব আগাআগি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে।'

তারপর যেতে গিয়েও ফিরে এসে—গলাটা আরও নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'বরং যদি সেয়ানা হও তো এই তালে কিছু আদায় ক'রে নাও মোটামুটি। দু' দণ্ড মান ক'রে বসে থাকলেই যথা-সর্বস্ব দিয়ে মেটাবে। নতুন নেশা তো—তার জন্যে সব করতে পারে। হি-হি!'

চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়তে পড়তে চলে গেল মোক্ষদা।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

(১) শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুর থানায় ভরতপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর আছে। একটি পুঁথির কয়েকটি পাতার উপর তোলা পাঠে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত সংশোধন আছে। এই পুঁথির কাগজ খুব পাতলা প্রায় বর্তমান যুগের ইন্ডিয়া পেপারের ন্যায়; পুঁথির পাতা বলিলে আমরা তুলট কাগজের কথা ভাবি—ইহা সেই রকম নয়। ইং ১৯৫৩ সালে (পদ্মশ্রী) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাইকপাড়া ও কান্দি রাজবংশের কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহের সহিত এই হস্তাক্ষর দেখি। জগদীশবাবু হস্তাক্ষরের ফটো তুলিবার জন্য পকেট ক্যামেরা লইয়া যান, পথে জীপগাড়ির ধাক্কায় ক্যামেরার কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় ফটো তোলা হয় নাই।

রাঁচি শহর হইতে ১৩।১৪ মাইল জগন্নাথপুর গ্রামে এক মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর আছে বলিয়া শুনি। ইং ১৯৫৫ সালে ৺বিমলচন্দ্র সিংহের সহিত যাইবার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় যাইতে পারি নাই।

অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য স্থানেও শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহারা জানেন তাঁহারা আপনার পত্রিকা মারফত সে স্থানের খবর জানাইলে ভাল হয়।

বাংলা লিপি।

(২) বাংলা লিপির যুগে যুগে পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে বাংলা লিপি কি রকম দেখিতে ছিল? এ বিষয়ে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আশুতোষ মিউজিয়মে বাংলার রাজা তৃতীয় গোপালদেব কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দিই। ইহার পাদমূলে যে অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা পণ্ডিতেরা প্রোটো বেঙ্গলী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা হইলে নবম-দশম শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর ও সমসাময়িক পুঁথি হইতে ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা লিপি কি রকম ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অনেক পুরাতন বাংলা দলিলে 'ন'য়ে ফুটকি দিয়ে 'ল' লিখিত আছে দেখিয়াছি। ইহা ১০০।১৫০ বছর আগেকার কথা।

(৩) বাংলায় সহি।

আমি বাংলাও জানি, ইংরাজীও জানি। সাধারণতঃ ইংরাজীতে সহি করি—ইহা হয়ত আমার ব্যবসাগত অভ্যাস। সরকারী কর্মচারীরা ইংরাজ আমলে ত বটেই, এখনও নিজেদের পারিবারিক দলিলাদিতে ইংরাজীতে সহি করেন।

১৫৮২ সালে রাজা টোডরমল্ল বাংলা ও বিহারের আসল জমা তুমার করেন। সরকার মুঙ্গেরের জমাবন্দীর কাগজ ফারসীতে লিখিত; কিন্তু যে রাজকর্মচারীর অধীনে ও তত্ত্বাবধানে এই জমাবন্দী হইয়াছিল তাঁহার সহি বাংলায়; "শ্রীকণ্ঠ দত্ত" বলিয়া লিখিত। ইনি উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ; ইনি বহু উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থকে ভাগলপুরে বসবাস করান। এই কাগজ ভাগলপুর কালেক্টরীতে ডবল তালার ভিতরে রক্ষিত আছে।

সরকার যদি ইহার ফটো-ষ্ট্যাট প্রকাশ করেন ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রকাশিত হইতে পারে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দত্তর কয়েকটি ছাড়-পত্র দেখিয়াছি। তাঁহার সীলে ফারসী অক্ষর, সহি বাংলায়।

এ বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

(৪) এই রামপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কে?

আঙ্গুলের টীপ-ছাপ লওয়ার কথা সকলেই জানেন। আমার আঙ্গুলের টীপ্-ছাপ অপর কাহারও টীপ্-ছাপের সঙ্গে মিলিবে না; আর সারা জীবন আমার টীপ্-ছাপ একই রকমেরই থাকিবে। আমাদের বাংলা দেশেই এই টীপ্-ছাপ লওয়ার প্রথা উদ্ভব হয়। স্যার উইলিয়ম হার্সেল ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন তিনি লোকে যাহাতে জাল করিতে না পারে, এইজন্য ভয় দেখাইয়া টীপ্-ছাপ লইতেন। তখন কেহই জানিত না যে এক-জনের টীপ্-ছাপের সহিত অপর জনের টীপ্-ছাপের মিল নাই—আর সারা জীবন একই রকমের টীপ্-ছাপ থাকে।

হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন তিনি কতকগুলি দলিলে সহি ছাড়াও টীপ-ছাপ লয়েন। পরে বহু বৎসর পরে হুগলীর সাব-রেজিস্ট্রার রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলেন। যাঁহারা দলিলে পূর্বে টীপ-ছাপ দিয়াছিলেন (সাহেবের ভয়ে) তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ি রামগতি বাবু যায়েন। অনেকে ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন; কেহ বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে; বাকী লোকদের বুঝাইয়া রাজি করাইয়া রামগতি বাবু পুনরায় টীপ-ছাপ লয়েন। এবং আগের লওয়া টিপ্-ছাপের সহিত খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া মিল আছে কিনা দেখেন। তাঁহার তদন্তের ফলাফল—এইটী সরকারি তদন্ত নহে, সখের তদন্ত, স্যার উইলিয়াম হার্সেল স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনকে পাঠান। স্যার ফ্রান্সিস তাঁহার Finger Prints বা Decipherment of old Prints পুস্তকে—কোন্‌টায় আমার ঠিক মনে নাই, রামগতি বাবুর প্রশংসা করেন এবং তাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে টীপ্-ছাপ যে সারাজীবনে বদলায় না এই সিদ্ধান্তে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় আইসেন। ইহা ইং ১৮৯০ সালের পূর্বের কথা।

এই রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় কে? কোথায় বাড়ি? কতদিন সব-রেজিষ্টারী আফিসে ছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে কেহ কি সন্ধান দিতে পারেন? আমরা সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, সন্ধান পাই নাই। যদি কেহ জানেন "অমৃত" মারফত প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত
৪৫নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিঃ—২

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শে অক্‌টোবর ('৬২) প্রকাশিত আপনার পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীঅঞ্জনা মিত্র যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

কোন ছেলে বা মেয়ে যথেষ্ট বয়স হওয়ার আগেই 'পাকা' (অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) হয়ে উঠলে তাকে আমরা আখ্যা দিই 'এঁচোড়ে পাকা'।

এ প্রশ্ন যিনি করেছেন তাঁর বক্তব্য—অকালপক্কতার সঙ্গে 'এঁচোড়' নামক বিশেষ ফলটিই কেবল আমরা যুক্ত (associate) করি কেন। উত্তরটি, আমার ধারণায় খুব শক্ত নয়।

'এঁচোড়' হল কাঁঠালের কাঁচা অবস্থার নাম। 'এঁচোড়' পাকলে 'কাঁঠাল',—পাকার আগে তা এঁচোড়ই। কাজেই 'এঁচোড়ে পাকা'র অর্থ অকালে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই) পাকা। একমাত্র 'এঁচোড়'ই যে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তার কারণ অন্য কোন ফলের দুটো নাম (অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় একটি এবং পাকলে আর একটি) নেই। 'আম' কাঁচা থাকলেও 'আম'—পাকলেও 'আম'। কাজেই "ছেলেটি আমপাকা" বললে সুপক্কতার ধারণাই আমাদের মনে আসে—অকালপক্কতার ধারণা আসে না। অন্য যে কোন ফল সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

"এঁচোড়ে পাকা" এই প্রবাদটি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসাই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয় কি?

তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
কর্ণেল গোলা, মেদিনীপুর।

স্ত্রী ॥ আমার শিয়রে কে বসে?

স্বামী ॥ আমি।

স্ত্রী ॥ সে কি গো! সারাটি রাত জেগে বসে আছ?

স্বামী ॥ আমার ভালই লাগছে তরলা। কী সুন্দর তুমি ঘুমোচ্ছিলে। মনে হচ্ছিল, তোমার আর কোনো যন্ত্রণা নেই। খুব শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলে তুমি। জাগলে কেন?

স্ত্রী ॥ জানো, যম এসেছিল।

স্বামী ॥ না, না তরলা। ও সব তোমার স্বপন। স্বপ্নে বাঘ-ভালুক কত আমরা দেখি। ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি। নাও, আর একটু ঘুমোও। রাত আর বেশী নেই।

স্ত্রী ॥ আর ঘুম হবে না আমার। ডাক আমার এসে গেছে। এবার আমাকে যেতে হবে।

স্বামী ॥ তুমি ঘুমোও, ঘুমোও তরলা।

স্ত্রী ॥ না, না আর ঘুমুতে আমি আমি পারবো না। চোখ বুজলেই সে আবার আসবে, আবার তাকে দেখবো। এবার তবে আর তাকে রুখতে পারবো না আমি। রুখতে চাইও না আমি।

স্বামী ॥ মিছে ভয় পেয়ো না, তরলা।

স্ত্রী ॥ তুমি ভেবেছ, যমকে আমি ভয় পাচ্ছি। না গো, না। ছোট-বেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছি যমরাজার বিকট চেহারা। শিংওয়ালা কালো মোষ তার বাহন। কিন্তু এ যা দেখলাম, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। কী সুন্দর যে তার মূর্তি! বলে উঠতে পারবো না আমি। শান্তি। পরিপূর্ণ শান্তি।

স্বামী ॥ বেশ তো! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকে দেখো। কথা ব'লে ব'লে আর ক্লান্ত হয়ো না।

স্ত্রী ॥ কিন্তু কথা শেষ না ক'রে আমি যে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না গো! কাজেই কথা আমার বলতেই হবে। শেষ ক'রে যেতে হবে আমার সব কথা। তিনি আমাকে বলেছেন তবেই আমি পাবো তাঁর কাছে যাবার ছাড়পত্র।

স্বামী ॥ এমন ক'রে বললে, আমি এখান থেকে চ'লে যাবো গো, চলে যাবো।

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

স্ত্রী ॥ তাতে আমার যন্ত্রণা বাড়বে। কী অসহ্য এই মৃত্যুর যন্ত্রণা! জীবনের শেষ কয়েকটি কথা আমি তোমাকে বলবো, তুমি তা শুনবে না? পালিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে?

স্বামী ॥ বলো।

স্ত্রী ॥ যা বলবো তা শুনলে রাগ করতে পারবে না কিন্তু তুমি।

স্বামী ॥ রাগ করবো কেন তরলা? যা বলতে চাও অল্প কথায় চটপট ব'লে ফেলো। এই ধর বলতে লাগবে মিনিট খানেক। তারপরই আমার তরঙ্গিণী চুপ করবে। আর কথা ব'লে ক্লান্ত হবে না। এক কাপ হরলিকস খাবে।

স্ত্রী ॥ সে কী গো? মাত্র এক মিনিট? কত কথা রয়েছে বলবার সে কি এক মিনিটে আমার শেষ হবে?

স্বামী ॥ শেষ করতেই হবে। কী রকম জানো? শুনবে? এই ধরো, আমি যেন ট্রেণে চেপে কোনখানে যাচ্ছি। গার্ড হুইশিল দিয়েছে, ট্রেণ ছাড়ছে। এমন সময় প্লাটফর্মে এক বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমি। পরমবন্ধু। কত কথাই না তাকে বলার ছিল। কিন্তু ট্রেণ তখন ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধু আমার ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। তখন যে কটি কথা আমি তাকে ব'লে যেতে পারি—সেই কটি কথা—সব কথার সামারী।

স্ত্রী ॥ মন্দ বলনি। হ্যাঁ, বেশ বলেছো। আমার গার্ডও হুইশিল দিয়েছে। আমার ট্রেণও ছেড়ে দিয়েছে। দু' কথাতেই আমি বলছি আমার সারা জীবনের শেষ কথা।

স্বামী ॥ লক্ষ্মীটি! দেখি এক মিনিটে কেমন সামাল ক'রতে পারো তুমি? তার পরেই কিন্তু এক কাপ হরলিকস।

স্ত্রী ॥ এক মিনিটই হোক, আর আধ মিনিটই হোক আর এক ঘন্টাই হোক, সে কথাটা আমাকে বলতেই হবে—ব'লে যেতেই হবে তোমাকে। না বললে আমার শান্তি নেই। ক্ষমা নেই, মুক্তি নেই।

স্বামী ॥ কিন্তু এসব কথা বলতে গিয়ে, তুমি তো এক মিনিট প্রায় শেষ ক'রেই ফেললে তরলা।

স্ত্রী ॥ বেশ! তবে দশ সেকেন্ডও লাগবে না আমার সে কথা বলতে। আমি সতী নই, আমি অসতী।

স্বামী ॥ সে কী? এ তুমি কী বলছো তরলা?

স্ত্রী ॥ মরতে ব'সে আমি মিথ্যে বলিনি। সত্যটা শেষে ব'লে যেতে পারলাম বলে আমার যেন কেমন শান্তি বোধ হচ্ছে।

স্বামী ॥ না, না এ সব তুমি প্রলাপ বকছো। তোমার এ সব কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। আজ দশ বছর তোমাকে নিয়ে ঘর ক'রলাম। কী ভালোই না বেসেছ তুমি আমাকে এই দশটি বছর! সুখে-দুঃখে, শোকে, তাপে কী সান্ত্বনাই না ছিলে তুমি আমার! মূর্তিমতী পবিত্রতা ছিলে তুমি আমার সংসারে। তুমি হবে অসতী! ছি-ছি-ছি।

স্ত্রী ॥ আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি। ফাঁকি দিয়েছি এই দশটি বছর। কিন্তু আর আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেমন একটা প্রশান্তি নেমে আসছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্বামী ॥ ফাঁকি দিয়েছ বিশ্বাস করি না। শোনো, তুমি ঘুমিও না। হরলিকস খেতে হবে তোমাকে।

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে সময় সংক্ষেপের জন্য দীর্ঘ রচনাপাঠে মনোনিবেশ একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে। তাই বৃহৎ উপন্যাসের পাশে ছোট-গল্পের উদ্ভব এবং তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ কারণেই দীর্ঘ চার অঙ্ক - পাঁচ অঙ্ক নাটকের পাশেই অতি সম্প্রতি একাঙ্কিকার উৎপত্তি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এবং জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। এ কালের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের অবদানে বাঙলা একাঙ্কিকা আজ সমৃদ্ধ। 'অমৃত' পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের এই নতুন শাখাকে সুযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আরও সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই বর্তমান সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হবে 'অমৃতে'।

অমৃত, সম্পাদক।

স্ত্রী ॥ না। হরলিকস খাবো না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তোমাকে তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্বামী ॥ ডাক্তার! ডাক্তার! আমি ডাক্তারকে ডাকছি।

স্ত্রী ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) ডাক্তার! না আর ডাক্তার ডেকো না। সারা জীবন ঐ ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছি আমি। কোনো ফল হয়নি তাতে। ব্যারাম আমার দিন দিন বেড়েই গেছে। আর ডাক্তার ডেকে এনো না তুমি।

স্বামী ॥ ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে কেন তরলা? তোমার বাড়া-বাড়ি দেখে আমি যে তাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছি। রাতের পর রাত জেগেছে সে। আজ আমি তাই ওকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি। ওকে ডাকছি।

স্ত্রী ॥ (আঁতকাইয়া উঠিয়া) না, না ওকে ডেকো না।

স্বামী ॥ তোমার অস্থিরতা বাড়লে ও'কে ডাকতে বলেছেন।

স্ত্রী ॥ তোমার ঐ ডাক্তার বন্ধু তুমি জানো না। তোমার বন্ধুই আমার যম। বিয়ের থেকেই ও আমাকে ... দিয়ে দিয়ে মৃত্যুর পথে চলেছে।

স্বামী ॥ সে কী?

স্ত্রী ॥ তুমি জানো না, তুমি জানো না। আজ তোমাকে তা জানাতে পারলাম ব'লে আমি পরম শান্তি পাচ্ছি, আমার ঘুম পাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি, তোমাকে আর দেখতে পারছি না আমি। বিদায় বন্ধু বিদায়। বিদায়।

(চোখ বুজিল। মৃত্যুর প্রশান্তি তাহার সমস্ত দেহে নামিয়া আসিল)।

স্বামী ॥ তরলা! তরলা! ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার ॥ (পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে) ব্যাপার কী সামল? আসবো?

স্বামী ॥ না। দরকার নেই। আর তুমি তাকে পাবে না। না-না পাবে না বন্ধু। তাকে তুমি চিরতরে পেয়ে গেছ।

(নিস্তব্ধতার মধ্যে যবনিকা পড়িল)।
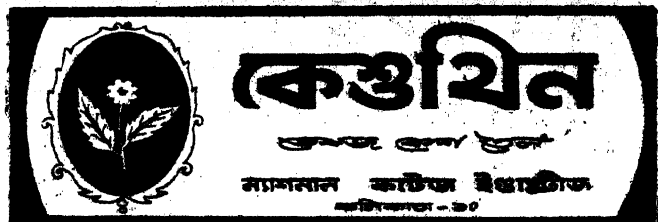
ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথ

সরোজরঞ্জন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তখন বহুলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু মুস্কিল হইল তিনি সকলের সেবা সহজভাবে গ্রহণ করিতে একেবারেই রাজী নন। অর্থের বিনিময়ে সেবা গ্রহণ করা তিনি কখনই পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে দরদী মনের স্পর্শ থাকে না।—দায় মিটানোর কাজের মত প্রতি মুহূর্তে সেবার মাধুর্য নষ্ট করিয়া দিয়া দুঃখের ভার বাড়াইয়া তোলে, অশান্তির সৃষ্টি করে। তাই খুব অন্তরঙ্গ, প্রিয় ও স্নেহের পাত্র যাহারা এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আনন্দের সঙ্গে প্রফুল্ল বদনে সহজ ও কোমল হস্তে নিপুণভাবে সেবা করিতে পারিবেন এবং রহস্যালাপে যথাযথভাবে যোগদান করিয়া তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিতে সক্ষম ছিলেন এমন সেবকদের সেবাই তাঁহার রোগে কতকটা আরাম দিতে পারিত—তিনিও তাহাতে আনন্দ লাভ করিতেন।—কাজেই এই সকল পরীক্ষায় যাঁহারা কতকটা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নামের তালিকাই নিম্নে দিলাম ঃ—

নন্দিতা কৃপালনি (বুড়ি), রাণী মহলানবীশ, মৈত্রেয়ী সেন, অমিতা ঠাকুর, রাণী চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিলকুমার চন্দ, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিশ্বরূপ বসু, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু)।

উপরোক্ত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র সকলেই গুরুদেবের সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছেন। তাঁর আশীর্বাদই তাঁহাদের জীবনের মহামূল্য লাভ।

চিকিৎসকগণ প্রতিদিন তাঁর প্রস্রাবের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া রোগ-প্রশমনের প্রতি খুবই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন ও প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে জলপানের ব্যবস্থা দিলেন। রাত্রি ১২টার পর আমার ও সচ্চিদানন্দের (আলু) উপর সেদিন সেবার ভার পড়িয়াছিল। রথীদা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ডাক্তারেরা আজ রাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাইয়ে যাতে বাবা মহাশয়ের প্রচুর প্রস্রাব করাতে পারা যায় সেই চেষ্টা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কাজেই তোমরা আজ রাত্রে সেইরকম ব্যবস্থা করো, নয়তো বাবা মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। যথেষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজের জল বোতলে করে ফ্রিজিডিয়ারে রাখা আছে, তোমরা প্রয়োজনমত সেটার ব্যবহার করো।" রথীদার উপদেশ শুনিয়া আলুকে ডাকিয়া রথীদা যাহা বলিয়া গেলেন তাহা শুনাইলাম। আলু বলিলেন "সরোজদা, তুমি জান না গুরুদেবকে যথেষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজের জল খাওয়ানো বড় শক্ত কাজ। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।" আমি বলিলাম, "উপায় নেই। কারণ তাঁকে যেরকম করেই হোক খাওয়াতেই হবে—এখানে রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করলে চলবে না। তুমি কেবল আমাকে সাহায্য করো আমি তার একটা ব্যবস্থা করব।" এই পরামর্শ করিয়া প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এক গ্লাস করিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলাম এবং ২।৩ বার খাওয়ার পরই গুরুদেব প্রবল আপত্তি জানাইলেন, বলিলেন—"তোরা করছিস্ কি—এইতো খানিকক্ষণ আগেই জল খেয়েছি—আবার কেন? এত জল খাবার জায়গা কোথা? আর আমি খাব না?" আমি বলিলাম, "ডাক্তার বলেছেন এটা খেতে হবে।" তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ডাক্তার বলেছেন—ওঃ—তা'হলে দাও।" ডাক্তারের অভিমত তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন দেখিয়া আর আমার কোন অসুবিধা রহিল না। যখনই গ্লাসভরা জল লইয়া গিয়াছি তখনই অবলীলাক্রমে তাহা খাইয়া ফেলিয়াছেন। শেষ রাত্রের দিকে ডাক্তারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াইয়া প্রচুর প্রস্রাব হওয়ায় আলু ও আমি দুইজনই ছুটিয়া গিয়া পাশের ঘরে রথীদাকে ডাকিয়া বলিলাম, "রথিদা এই দেখুন কত প্রস্রাব হয়েছে।" রথীদা পরম আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "আঃ—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আজ চা-র টেবিলে প্রচুর মিষ্টির ব্যবস্থা থাকবে, সকলে মিলে আনন্দোৎসব করা যাবে।" পরদিন এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং চিকিৎসকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আমাদের অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এমন সময় বড়মা (হেমলতা দেবী) সেই আনন্দসংবাদ শুনিয়া আমাদের চায়ের টেবিলে আসিয়া বলিলেন, "আজ কী আনন্দ হচ্ছে তাই জানাবার জন্য তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।" আমরা এইজন্য প্রচুর মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া আনন্দ করিতেছি দেখিয়া বড়মা সকলকে বলিলেন—"আজ রাত্রে এই উপলক্ষে আমি তোমাদের সকলকে রাত্রের খাওয়ার নেমন্তন্ন জানাচ্ছি। বাড়ির সকলে ও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে তোমরা এসো। কেবল তোমাদের সংখ্যাটা আমাকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়ো।" গুরুদেব যে ঘরে শুইয়াছিলেন তাহারই পূব দিকের প্রশস্ত বারান্ডায় ৫০।৬০ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির দুই সারি বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আহারে উপবেশন করার আহ্বান আসামাত্র সকলে যথাস্থানে উপস্থিত হইতেছেন এমন সময় বড়মা আমার হাতে একটি বড় গাঁদা ফুলের মালা দিয়া বলিলেন, "সরোজ আজ তোমাদের একজনকে প্রধান অতিথি করে তাঁর গলায় এই মালাটি পরিয়ে দিয়ো। তাড়াতাড়িতে অন্য ভাল ফুলের কোন মালা আর সংগ্রহ করতে পারিনি।" ঠিক্ আছে বলিয়া আমি বড়মার হাত হইতে মালাটি লইয়া আস্তে আস্তে যাইতেছি আর ভাবিতেছি কাহাকে প্রধান অতিথি করা যায়। এমন সময় দেখি উত্তর দিক হইতে একজন ভদ্রলোক ধোপ-দুরস্ত পরিষ্কার খদ্দরের কাপড় পরিয়া ধীর পদক্ষেপে ভোজনপংক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। রংটা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণই বলা চলে কিন্তু তাহা হইলেও সুপুরুষ বলিয়া তাঁহারই গলায় গাঁদা ফুলের মালাটি দেওয়া স্থির করিলাম। তিনি নিকটে আসামাত্র বলিলাম—"ভাই, একটু দাঁড়াও, তোমাকে আজ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করতে হবে।" এই বলিয়া জোড়হস্তে ঊর্ধদিকে মালাটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম—"মা মহামায়া, অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার উপযুক্ত বলি আর না পেয়ে এ'কেই তোমার চরণে উপস্থিত করছি, তুমি দয়া করে গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া মালাটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলাম। এই কথা বলামাত্র ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সরোজদা, করছ কী, করছ কী, আমাকে শেষকালে এমন

করে জব্দ করলে?" উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলেই এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। গুরুদেব এত হাসির রোল শুনিয়া বুড়িকে (নন্দিতা কৃপালনি) জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতো এদের আজ এত উল্লাস কেন?" বুড়ি তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া সমস্ত বিষয়টা জানিয়া লইয়া গুরুদেবকে শুনাইলেন। গুরুদেব শুনিয়া খুব খুশী। তিনি বুড়িকে বলিলেন, "সরোজকে বল্ খাওয়ার পর যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যায়।" বুড়ি আমাকে বলিলেন, "সরোজদা, দাদা-মহাশয় তোমাকে খাওয়ার পর দেখা করতে বল্লেন।" আমিতো শুনে অবাক, বুড়িকে বলিলাম "কেন হে কী জন্য ডেকেছেন জান কিছু?" বুড়ি বলিলেন—"সে আমি জানি না—আমাকে যা' বল্তে বলেছেন তাই বললাম।" আমার আনন্দ তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেবলই ভাবিতেছি খাওয়ার পর গুরুদেব আমাকে দেখা করিতে বলিলেন কেন? যাই হোক্ ভুরিভোজনের শেষে "বড়মা কি ফতে" বলিয়া সকলে আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। আহারান্তে আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া দেখি গুরুদেব নাত্নির (বুড়ি) সঙ্গে বেশ রহস্যালাপে মশগুল আছেন। আমি ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই দেখি মুহূর্তের মধ্যে গুরু-দেবের মুখের ভাব বদল হইয়া গিয়া গম্ভীর আকার ধারণ করিয়াছে। (গুরু-দেব যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আর নূতন করিয়া পরি-চয় দিতে হইবে না)। আমি জোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব, আমাকে ডেকেছেন?" তিনি কট্মট্ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়াই বলিলেন—"তোমার এত বড় সাহস যে আমার একান্ত-সচিবকে সকলের সামনে এমন করে অপদস্থ করলে? জান—তাঁকে অপমানিত করা মানে আমাকে অপমানিত করা?" আমি তো এই কথা শুনিয়া একে-বারে অবাক! কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম—"গুরুদেব, আমি না বুঝে এমন একটা কাজ করে ফেলেছি—আর কখনো এমনটি হবে না।" গুরুদেব মুহূর্তের মধ্যে মুখের চেহারা পরিবর্তন করিয়া হাস্যমুখে আমার পিঠে দুইটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, "আরে ঠিক করেছিস। আমি খুব খুসি হয়েছি। ও ব্যক্তি যখন তখন সবাইকে জব্দ করে বেড়ায়, কিন্তু ওকে কেউ জব্দ করতে পারে না। আজ তুই তাকে এমন করে জব্দ করেছিস শুনে খুব খুসি হয়েছি।"

সদা হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া এই রকম রহস্যালাপ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করিতেন। রোগযন্ত্রণা মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

এই ঘটনার পর হয়তো গুরুদেবের মনে হইয়াছিল আচ্ছা দেখি তো সরোজকে একটু অপ্রস্তুত করা যায় কিনা। তাই একদিন সকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথারীতি কাজে মন দিব এমন সময় তিনি আমাকে দেখিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আমি মনে করিলাম হয়তো শরীরটা আজ তত সুস্থবোধ করিতেছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুদেব, আজ শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে?" তিনি আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি—সারারাত ঘুম হয়নি—তাই ভাল লাগছে না।" আমি উত্তরে বলিলাম—"অসুস্থ দুর্বল শরীরে এই রকম দুঃস্বপ্ন সকলেই দেখে থাকে—তাতে এত মন খারাপ করার কি আছে? কী স্বপ্ন দেখেছেন?" তিনি তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি কোথায় কোন্ এক বড় সহরে যেন আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না—গেলুম সেই সহরে কিছু বলার জন্য। মস্ত বড় হলঘর লোকে লোকারণ্য। সকলে আমাকে নিয়ে গেলেন সেই হল-ঘরে। আমি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমার ভাষণ দিচ্ছি, একটু পরেই মঞ্চের নিচেই কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁরা হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠ্লেন—'না না, আমরা আপনার কথা শুনব না—আপনি বসে পড়ুন। আপনার মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হচ্ছে না—আপনি বসুন।' আমি বললুম, 'আচ্ছা আমাকে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন, পরে আপনাদের যদি কিছু বলবার থাকে তো বলবেন। আমি শুনে যদি বুঝি জবাব দেবার কিছু থাকে তা'লে দেবো।' এই কথা বলেই আবার আমি বক্তব্য বল্তে আরম্ভ করি। তাঁরা এবারও বলে উঠ্লেন—'না, না, আমরা শুনব না, আপনি বসে পড়ুন।' আমি বললুম, 'আপনারা আমাকে ডেকে এনেছেন একটু ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য কথাটা শুনুন, পরে আপনারা প্রতিবাদ করবেন—আমি শুনব।' এই বলে আবার আমি আমার বক্তব্য বল্তে সুরু করেছি এমন সময় তাঁরা আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে এসে বল্তে লাগলেন—'আপনি বসবেন কিনা বলুন, নইলে আমরা জোর করে আপনাকে বসিয়ে দেবো'—এই বলে তাঁরা আমাকে অবসর সময় না দিয়েই খপ করে আমার দাড়ি ধরে টেনে বসাতে গেলেন। আমি বললুম—'আহা হা করছেন কি? আমার দাড়িটা ছাড়ুন, দাড়ি ছিঁড়ে গেল। প্রতিবাদ করার এটা তো ভদ্ররীতি নয়—আপনারা ছাড়ুন ছাড়ুন।' তাঁরা কোন কথা না শুনে আমার দাড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার জীবনে কখনও এত বড় অপমান হইনি। আমি দুঃখে অধোবদন হয়ে বসে রইলুম। আচ্ছা বল তো এটা কোথায় হতে পারে? আমার মনে হচ্ছে এটা যেন ময়মনসিংহে সূর্যকান্ত হলে ঘটেছিল। তুই কি বলিস?" এতক্ষণ পরে আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম যে আমার বাড়ি ময়মনসিংহে বলিয়া আমাকে জব্দ করার জন্যই এই গল্পের অবতারণা। যা'হোক, আমি শোনামাত্র বলিলাম—"না না গুরুদেব, আপনি ভুল করছেন—এটা তো ময়মনসিংহে হয়নি।" তিনি বলিলেন—"অ্যা, তবে কোথায় হয়েছিল?" আমি বলিলাম—"এটা তো হয়েছিল যশোরে।" শুনিয়াই গুরুদেব অসুস্থ শরীরেও অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস। এটা ময়মনসিংহে নয় এটা আমার শ্বশুরের দেশে! নগেনকে (গুরুদেবের শ্যালক) এই কথাটা বলে দিস যে শ্বশুরের দেশে ভগ্নীপতির কী দশা হয়েছিল।"

গুরুদেবের এই সমস্ত রহস্যালাপের মধ্যে যে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ উত্তর দিতে পারিতেন তার উপর তিনি খুব খুসী হইতেন এবং তাঁহার প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। তাই আমার জবাবটা বলামাত্র শুনিয়া বড়ো খুসী হইয়াছিলেন এবং নাত্নি বুড়িকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ দিদিমণি, সরোজের যে এমন সুন্দর রসবোধ আছে তা তো আগে বুঝতে পারিনি।"

এই রকম হাসি ঠাট্টার মধ্যেই রোগ-শয্যা সহজ সুন্দর ও মধুর করিয়া তোলাই তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। রোগের গ্লানিকে তিনি কখনই প্রাধান্য দিতেন না। এই রোগশয্যায় থাকিয়াই কখনো

তিনি মুখে মুখে কবিতা বলিয়া যাইতেন উপস্থিত সেবক বা সেবিকার মধ্যে যে কেহ তখন তখনই তাহা লিখিয়া লইতেন এবং পরে তিনি উহা সংশোধন করিয়া দিলে ছাপা হইতে যাইত। কখনও বা শুধু হাসি ঠাট্টার মধ্যেই সময় কাটাইতেন। সেবক সেবিকাদেরও তাই তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত মধুর ও সহজ বলিয়া মনে হইত। সেবার মধ্যে কখনও শ্রান্তি বা ক্লেশ অনুভব করিতেন না।

শান্তিনিকেতনে

নভেম্বর, ১৯৪০ সনের তৃতীয় সপ্তাহে চিকিৎসকদের পরামর্শমত গুরুদেবকে শান্তিনিকেতনে লইয়া আসা হইল। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস ও শীতের নবরূপ ও সতেজ আবহাওয়া তাঁহার দেহমনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইবে এই আশা চিকিৎসকদের মনে ছিল—গুরুদেবও কলিকাতার বদ্ধ ঘরের দূষিত আবহাওয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এইখানে আসিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। প্রতিদিন নির্মল আবহাওয়া তাঁহার দেহমনে অফুরন্ত আনন্দ ও শান্তি আনিয়া দিল। তিনি সুস্থমনে প্রতিদিন নানা ছড়া ও কবিতা মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন ও রাণী চন্দ নিষ্ঠার সহিত তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। গুরুদেব উত্তরায়ণের নিচের তলায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণের বারান্দায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উপবেশন করিতেন। নীরবে প্রকৃতির অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে যেন সেই অমৃতময় সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেন। তাই তিনি এই সময়ে লিখিয়াছেন ঃ—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করে—সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত
সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

উদয়ন
১৮শে নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে।

গুরুদেব তাঁর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সেবায় পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কি করিয়া যে এই সেবার ঋণ শোধ করিবেন সেটি তাঁহার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। একদিন সকালে আমি তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "এই যে সরোজদাদা এসেছ—তোমার জন্য এইটা রেখেছি।" বলেই তিনি একটি তসরের লম্বা জোব্বা (যা' তিনি নিত্য ব্যবহার করিতেন) আমার হাতে তুলিয়া দিলেন—বলিলেন "এইটি পর দেখি।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এই জিনিষ আমাকে মানাবে কেন? তা' ছাড়া এত বড় জোব্বা আমার গায় যে ঢল্ ঢল্ করবে।" তিনি বলিলেন, "পরই না—তোর গায় ঠিক লাগবে।" বারবার পীড়াপীড়িতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সেটি গায় দিয়ে দেখি একটা ভাঁড়ের মত চেহারা হয়েছে। গুরুদেব বলিলেন—"হ্যাঁ একটু বড় হয়েছে বটে, তা এটাকে এক কাজ করিস, কোন ভাল দর্জিকে দিয়ে একটু কাটিয়ে নিয়ে তোর গায়ের মাপের মত করিয়ে নিস্—পরতে পারবি—জিনিষটা ভালো। দেখ্ এইটার বুকের কাছে একটু কালির দাগ লেগেছে—আমি যখন ছবি আঁকছিলুম তখন একটু কালি লেগে গেছে—ভাল শালকরকে দিয়ে ধুইয়ে নিস দাগটা উঠে যাবে।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এই জিনিষ আমি দর্জি দিয়ে নিজের গায়ের মাপসই করিয়ে নষ্ট করব না—এটা আপনার আশীর্বাদ, যত্ন করে ধুইয়ে মাথায় তুলে রাখব। তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—তোর যা ইচ্ছে হয় তাই করিস।"

আমি সেবা দ্বারা যে এই মহামানবকে অল্প একটুও সুখী করিতে পারিয়াছিলাম এইটাই আমার পরম লাভ। তাহারই নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার এই আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তিনি জানিতেন অর্থ দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে আমাদের সেবার প্রতিদান হইবে না, তাই তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকদের প্রায় অধিকাংশকেই তিনি অমর ছন্দে তাঁহার কাব্যে চিরদিনের জন্য স্বরূপে বিশ্লেষণ করিয়া স্থান দিয়া গিয়াছেন। সার্থক হইয়াছে এই মহামানবের সেবা।

আমার জীবনের মহত্তম একটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ না করিলে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি ঘটাইব মনে করিয়া আজ সর্বসাধারণের সম্মুখে অকপটচিত্তে উদ্ঘাটিত করিতেছি। পাঠক আমাকে ভুল বুঝিয়া নিজের প্রশস্তি গাহিতেছি মনে করিয়া যেন উপহাস না করেন।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯৪১ সনের ৮ই জানুয়ারী রাত্রি দুই ঘটিকায়। এইদিন রাত্রি দুই ঘটিকা হইতে আমার উপর সেবার ভার ছিল। আমি যথারীতি ঠিক দুইটার সময় রোগীর ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরে জোর আলো জ্বলিতেছে—মাথার উপর বন্ বন্ পাখা ঘুরিতেছে, গুরুদেব একেবারে নগ্নদেহে খাটের একটু দূরে একটা কৌচের উপর বসিয়া পরিধেয় লুঙ্গির মধ্যে দড়ি ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি তো দেখিয়া অবাক্। বেতনভোগী শুশ্রূষাকারী তাঁহার পার্শ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়াই পাখাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, "গুরুদেব এ কি ব্যাপার?" তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে, সরোজ দাদা এসেছ? এই লুঙ্গিটাতে দড়ি পরাতে পারছি না—তুই এটা পরিয়ে দে তো?" আমি তাঁহার হাত হইতে লুঙ্গি লইয়া বলিলাম "এটা থাক্, আমি আর একটা লইয়া আসিতেছি।" তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া একটা পাঞ্জাবী ও দড়ি পরানো লুঙ্গি লইয়া তাঁহাকে প্রথমে পাঞ্জাবীটা পরে লুঙ্গি পরাইয়া দিলাম এবং আস্তে আস্তে কৌচের উপর বসাইয়া কম্বল দিয়া গা ঢাকিয়া লম্বা করিয়া শোয়াইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, "জামা লুঙ্গি সব ভিজে গিয়েছিল।" আমি বিছানার কাছে গিয়া মশারি তুলিয়া দেখি বিছানা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিছানা তুলিয়া সরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি ৮।১০টা ভাল কম্বল পাতিয়া দিলাম। তাহার উপর বিছানার চাদর দিয়া একটা অয়েল-ক্লথ ও তাহার উপর বড় একটা তোয়ালে বিছাইয়া আবার একটা বিছানার চাদর দিয়া চারিদিকে হাত দিয়া দেখিলাম বিছানাটা বেশ নরম হইয়াছে কিনা, কারণ বিছানা নরম তুলতুলে না হইলে তাঁহার মনঃপূত হইবে না। সমস্ত ঠিক করিয়া মাথার কাছে ৫।৬টি বালিশ দিয়া পায়ের কাছে গায়ের কম্বলটি রাখিলাম। কৌচের কাছে গিয়া বলিলাম, "গুরুদেব চলুন এইবার খাটে শোয়াইয়া দিই।" তিনি আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, বিছানা সব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এইখানেই বেশ আছি—রাত্তির তো আর বেশি নেই। বাকী রাতটা এইখানেই বেশ কেটে যাবে।" আমি বলিলাম—"আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। আপনি গিয়ে দেখুন, যদি ঠিক না থাকে তো এইখানেই ভরে

করে শুইয়ে দেব।" "আবার আমাকে টেনে নিবি—এইখানেই তো বেশ ছিলুম!" আমি দুই হাতে তাঁহার সেই দীর্ঘদেহ ধরিয়া তাঁহার হাত আমার কাঁধে তুলিয়া দিয়া অতি কষ্টে কৌচ হইতে উঠাইয়া ধীরে ধীরে খাটের কাছে লইয়া গেলাম। খাটের একধারে বসিয়া চারিদিকে হাত বুলাইয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। পা দুইটা তখন খাটের উপর তুলিয়া বালিশ-গুলি পিঠে ও মাথায় ঠিক করিয়া বসাইয়া দেওয়ার পর শুইয়া পড়িলেন। আমি কম্বলটি টানিয়া মশারি গুঁজিয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত আরামের সঙ্গে একটা আঃ—শব্দ করিয়াই চক্ষু বন্ধ করিলেন। উজ্জ্বল আলোটি নিভাইয়া অদূরে একটি ক্ষীণপ্রভ বাতি জ্বালাইয়া রাখিলাম। মাথার উপর পাখাটিও ছাড়িয়া দিলাম। দেখিতে না দেখিতে গুরুদেব বেশ আরামে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ ব্যাপারটা ভাল করিয়া জানিতে না পারিয়া অদূরে বেতনভোগী শুশ্রূষাকারীর নিকট গিয়া কি হইয়াছিল জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "গুরুদেব যথারীতি প্রস্রাব করিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলে আমি আলো জ্বালিয়া মূত্রাধারটি যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করছি দেখেই তিনি জোরে ধমক দিয়ে আমার হাত থেকে সেটি টেনে নিলেন। বল্লেন —'তোমার কিছু করতে হবে না। আমি নিজেই করছি।' —আমি দেখ্ছি মূত্রাধারটি যথাস্থানে নাই, তখন তাড়াতাড়ি সেটিকে ধরে ঠিক করে বসিয়ে দিতে গেলে তিনি আবার আমাকে জোর ধমক দিয়ে বল্লেন—'সরে যাও বলছি, তুমি ধরবে না, আমি দিচ্ছি।'—কিন্তু তখনও ঠিকমতো বসানো হয়নি বলে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ধরে দিবার জন্য আবার হাত বাড়াতেই তিনি আরো জোরে বলে উঠলেন—'বারবার বারণ করছি তবু শোন না, সরে দাঁড়াও—খবরদার হাত দেবে না।' আমি ভয়ে সরে দাঁড়াতেই দেখি প্রস্রাব মূত্রাধারে না পড়ে বিছানায় পড়ছে ও জামা লুঙ্গি সব ভিজে যাচ্ছে। তিনি মূত্রাধারটি আমার হাতে দিয়েই বল্লেন—'এ্যাঃ সব ভিজে গেল।' এই বলেই আমাকে হটিয়ে দিয়ে তিনি নিজে নিজেই উঠে বসলেন ও খাট ধরে ধরে জামা-লুঙ্গি খুলে ফেলে কৌচের উপর বসলেন ও আমাকে একটা সাফ লুঙ্গি এনে দেবার জন্য আদেশ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা' পেয়েছি তাই এনে দিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে দড়ি পরানো ছিল না। এই সময় আপনি এসে পড়ায় রক্ষা হয়েছে।" এই বলেই সেই ভদ্রলোক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কাল রথীদা এই খবর জানতে পারলে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবেন।" আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যাহা বলিতে হয় তাহা আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি যে গুরুদেব অর্থের বিনিময়ে কাহারো সেবা কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু রথীদা ও সুরেনবাবু গুরুদেবকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, প্রথম রাত্রে ও দুপুরের পরে কাছে থাকার জন্য একজন লোক রাখা বিশেষ দরকার নতুবা অন্য সকলের পক্ষে দীর্ঘদিন নিয়মিত সেবার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালানো শক্ত হইয়া পড়িবে। গুরুদেব তাহার জবাবে অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, "আমি তো এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি আর কোন সেবা-শুশ্রূষার দরকার নাই। কাউকেই আর আসতে হবে না।" যাহা হউক তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মৌন সম্মতি জানাইলেও বেতনভোগীর নিকট হইতে কোন সেবাই গ্রহণ করিতেন না। বরং দেখিলেই ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইতেন। তাহারই পরিণতি উপরের ঘটনা।—

ভোর ৫টায় যখন বুড়ি (নন্দিতা) গুরুদেবের প্রাতঃকৃত্যাদি করাইবার জন্য আসিলেন তখন গুরুদেব বলিলেন—"জানো দিদিমণি—কাল রাত্রে এক কাণ্ডই করেছি। ভাগ্যিস সরোজদাদা এসে পড়েছিলেন তাই মুস্কিল আসান হলো।" ব্যাপারটা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেই বুড়িকে জানাইলাম পরে বলিব। গুরুদেব বলিলেন, "কাল তোমার 'প্লাক্‌সো বেবি' বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছেন।"

'নির্বাণ' পুস্তকে শ্রদ্ধেয়া বৌঠাকুরাণী প্রতিমা দেবী গুরুদেবের সেবা করার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"যাঁদের সেবায় দেহের অত্যন্ত ক্লিষ্টতার দিনে তাঁকে শান্তি ও স্বস্তি দিত, সেই অনুরক্তদের অন্তরাত্মাকে গভীর যাতনার মধ্যেও তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই সত্যমূর্তি তাঁর কাছে ধরা পড়ত। তাঁরা নব-জন্মলাভ করতেন তাঁর চেতনালোকে, সেই সব মানব-মানবীর আধ্যাত্মিক ছবি রূপায়িত হোলো "রোগশয্যায়"-এর আবেগময় ছন্দে।"

শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই উপরের ঘটনার পরই গুরুদেব ছন্দোময় বাণীতে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন—আমাকে অমর করিয়া দিয়াছেন তাঁর "আরোগ্য" নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়া। অমর কবির ঋণ শোধ হইল বটে কিন্তু আমাদের ঋণ আরো বহুগুণ বাড়িয়া গেল। ধন্য হইল ঋষি-কবির সেবা।—

গুরুদেব ৯ই জানুয়ারী সকালেই এই আশীর্বাণী লিখিয়া শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন—"এইটি এখনই ভাল কাগজে লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো"। কর মহাশয় তাড়াতাড়ি তাহা লিখিয়া গুরুদেবকে দিলে তাহার উপর তিনি 'সরোজদাদা' এই কথাটি লিখিয়া নিচে নিজের নাম দস্তখত সহ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪১ লিখিয়া দিলেন। কর মহাশয় সত্বর তাহা পিরন-বই দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রবাহক মহাদেবকে ডাকিয়া গুরুদেব বলিলেন, "এইটা সরোজদাদার হাতে দিয়ে তার মুখখানা খুসি হলো কিনা দেখবি এবং এখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে আসবি।" আমি পত্রবাহকের নিকট হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িয়া দেখিয়া অবাক্ এবং সই করিয়া দিতেই সে বলিল "বাবা মহাশয় আপনাকে এখনই একবার ডেকেছেন।" আমি যাচ্ছি বলিয়া ভিতরে গিয়াই স্ত্রীর হাতে তাহা তুলিয়া দিলাম। উত্তরায়ণে যাইব বলিয়া বাহির হইতেছি এমন সময় আমার বন্ধুবর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'সরোজ বাড়ি আছ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলেন। "সরোজ বাইরে এসো তোমাকে দেখি।" আমি বলিলাম, "সে কী? তুমি কি আমাকে কোনদিন দেখ নাই?" সুধাকান্ত বলিলেন, "তোমার মুখখানা প্রসন্ন না বিষন্ন সেটাই শুধু দেখে গিয়ে গুরুদেবকে এখনই বল্‌তে হবে এই আদেশ। আর তোমাকে এখনই উত্তরায়ণে আসতে বল্‌লেন। ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমাকে দূর থেকে আসতে দেখেই গুরুদেব বল্‌লেন, 'সুধাকান্ত তোমার চা তৈরী হচ্ছে তুমি আগে সরোজের বাড়ি যাও তারপর এসে চা খাবে।' আমার কোন কথা বলার আগেই তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন।" আমি হাসিয়া তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া সেই কাগজখানা হাতে তুলিয়া দিলাম। পড়িয়া বলিলেন, "তাই বলো। এটা পেয়ে তোমার মুখ প্রসন্ন না বিষন্ন তা' জানতে চেয়েছেন। যাই হোক্, তুমি শিগ্‌গির উত্তরায়ণে এসো—তিনি তোমার জন্য বারান্দায় বসে আছেন।"

আমি উত্তরায়ণে গিয়া দেখি তিনি বারান্দার কৌচে বসিয়া আমার দিকে দূর হইতেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—"কী সরোজ দাদা—খুসি হয়েছ?" আমি বলিলাম—"গুরুদেব, খুসি হই নাই? আমি এতো পাবো তা' কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। আমি আপনার আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিয়েছি—খুব খুসি হয়েছি। কিন্তু"—বলিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখ আবার, 'কিন্তু'—জানি বাঙ্গাল কিছুতেই পুরো খুসি হয়নি—অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা যে একটি

যখন দিলেনই, তখন আপনি নিজের হাতে লিখে দিন—কারণ সুধীরের হাতের লেখা পছন্দ নয়। আচ্ছা—ঠিক আছে—এটাও রেখে দে। আমার হাত তো কাঁপে, এটা পরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে ধরে লিখে দেব।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এখন আপনি লিখবেন না। একটু সুস্থ হলে পরে লিখে দিলেও চলবে।" কিন্তু তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—খুসির পর্বটা চুকাইয়া দিবার জন্য সেইদিনই ধরিয়া ধরিয়া লিখিয়া বিকালের দিকে লেখাটা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই অমূল্য সম্পদ আমি যত্ন করিয়া ঘরে রাখিয়া দিয়াছি।

শেষ যাত্রা

বেশ কিছুদিন সুস্থ থাকার পরে গুরুদেবের শরীরের অবস্থা আবার ক্রমশঃ উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতা হইতে ঘন ঘন চিকিৎসকগণ শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন ঔষধেই আর আশানুরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছিল না। চিকিৎসকগণ এখন অতি সত্বর অস্ত্রোপচার করা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই বলিয়া স্থির করিলেন ও রথীদা সেই সংবাদ গুরুদেবকে জানাইয়া তাঁহার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব অস্ত্রোপচারের ঘোরতর বিরোধী। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "অস্ত্রোপচার করা ছাড়া যখন কোন গতি নাই তখন আর আমাকে কেন এইভাবে কষ্ট দেবে, আমাকে শান্তিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দাও। আমি এই ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারি না।" গুরুদেব খুবই চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে আর কিছু প্রকাশ করিলেন না—তবে ভিতরে ভিতরে ঘোর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। গুরুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া ও ডাক্তারদের এই দৃঢ় অভিমত জানিয়া একদিন গুরুদেবকে বলিলাম—"গুরুদেব, ডাক্তারদের মত যখন অপারেশন করলে আপনি অনেকটা সুস্থবোধ করবেন তখন এই বিষয়ে আপনি দয়া করে মত দিন।" গুরুদেব বলিলেন—"দেখ আমার এই দেহটাতে কোনদিন একটা আঁচড়ও কাটতে হয়নি—আজ যদি সে কাজ করা হয় তাহলে আমার এই দেহ সেটা কিছুতেই সহ্য করবে না। আমি জানি সেদিন তাহলে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে যেতে হবে।" সুন্দরের পূজারী দেহকে কোনরূপে অসুন্দর করিতে পারেন না তাই অস্ত্রোপচারই তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করিল। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনি অস্ত্রোপচার করাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৮ যেদিন তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবেন তার পূর্বদিন সারা রাত্র তাঁহার ঘুম হইল না। সকালে তাঁহার চেহারা একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বিষণ্ণ নেত্রে যেন সুদূরের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দুঃখে আমাদের অশ্রু সংবরণ করা অসম্ভব হইল। উদয়নের দোতালা হইতে ইনভেলিড চেয়ারে গুরুদেবকে বসাইয়া আমি, সচ্চিদানন্দ রায়, মাসোজি ও বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে নিচের তলায় বাসে উঠাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া চলিলাম। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে আশ্রমের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ সারিবদ্ধ হইয়া জোড়হস্তে নীরবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। গুরুদেব নির্বাক নিশ্চল প্রতিমূর্তি হইয়া অপলকদৃষ্টিতে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। সমস্ত আশ্রম তাঁহাকে সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলে বাস ধীরে ধীরে উত্তরায়ণের বাহিরে আসিয়া ছাতিমতলার পাশ দিয়া বিশ্বভারতীর অফিসের সম্মুখে গিয়া চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুদেব পশ্চিম আকাশের দিকে উদাস নয়নে যেন সুদূরের জীবন-দেবতার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন। বাস আবার ধীরে ধীরে বেণুকুঞ্জের পাশ দিয়া নেপাল রোড বাহিয়া বোলপুর যাইবার রাস্তায় আসিয়া পড়িল। একবার বড় দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) চরণে যেন প্রণাম নিবেদন করার জন্য নিচু বাংলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে কী করুণ দৃশ্য! সেদিন যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁহারাই জানেন সে কী! বোলপুর ষ্টেশনে সেদিন শহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সাইডিং-এ রেলের চিফ্ অপারেটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহার সেলুনটি গুরুদেবের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় ষ্ট্রেচারে গুরুদেবকে তুলিয়া লইলেন।—গুরুদেবের পথে সেবা-শুশ্রূষার জন্য নন্দিতা কৃপালনি, রাণী মহলানবিশ প্রমুখ কয়েকজন মহিলা মাত্র সেই কামরায় উঠিলেন—আমরা অন্যান্য সকলে পৃথক কামরায় রহিলাম। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রমোদচন্দ্র রায় মহাশয় নিউ থিয়েটার্সের বড় ভ্যান-খানা গুরুদেবকে জোড়াসাঁকো পৌঁছাইয়া দিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রমোদদা অতি যত্নে ও ধীরে ধীরে ভ্যানটি চালাইয়া গুরুদেবকে জোড়াসাঁকো পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোয় যে ডাক্তার ললিতবাবু একদিন এই অস্ত্রোপচার করার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহা হইল না বলিয়া তিনি ভবিষ্যতে এই মহামানবের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয় সেইভাবে বিনীত নিবেদন জানাইয়াছিলেন, আজ বাধ্য হইয়াই তাঁহাকেই আবার ডাকিতে হইল। অভিমান ত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই অস্ত্রোপচারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে থাকিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক অমিয় সেন তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ললিতবাবু আসিয়া গুরুদেব খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন ও গুরুদেবকে বলিলেন, "আপনি কিছু ভাববেন না—আপনি টেরও পাবেন না যে অপারেশন করা হবে। শুধু একটু পিঁপড়ে-কামড়ের মত মনে হবে। আপনার সজ্ঞান অবস্থায়ই আমাদের কাজ শেষ করব।"

জোড়াসাঁকো বাড়ির পূর্ব দিকের প্রশস্ত বারান্দাটি ঘেরাও করিয়া সেইখানে অস্ত্রোপচারের জন্য গুরুদেবকে লইয়া যাওয়া হইল। ললিতবাবু অস্ত্রোপচারের স্থানটুকু ঔষধ দিয়া একেবারে অবশ করিয়াই সুনিপুণ হস্তে তাঁহার কাজ প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিয়া গুরুদেবকে আবার তাঁহার ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। তিনি খানিকক্ষণ পরে আসিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কী কিছু টের পেলেন কী?" গুরুদেব মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"না, এই পিঁপড়ের কামড় মাত্র।" অথচ অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ত্রোপচারের সময় মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। এইভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার পরই গুরুদেব ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। ডাক্তার অমিয় সেন মাঝে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। গুরুদেব আর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন না। সকলেই ব্যস্ত হইয়া ইহা কি হইল ভাবিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই চলিয়াছে। পরদিন ভোরবেলা হইতেই নাভিশ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া সুধীরা দেবী (নন্দলাল বসুর স্ত্রী) মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে লাগিলেন এবং বেলা ১০টার সময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেবের অন্তিমশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁর পূত আত্মার জন্য উপাসনা করিলেন। দুঃখে আমরা গুরুদেবের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ঘড়িতে যখন বারোটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট তখন গুরুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মরধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(সমাপ্ত)

ডেম সিবিল থর্নডাইকের বৈঠকে

রাখী ঘোষ

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুর ইউ-রোপের সাংস্কৃতিক জগতের কয়েকজন বিখ্যাত নর-নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ইংল্যান্ডে অনুরূপ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে আমার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল জগদ্বিখ্যাত অভিনেত্রী ডেম (নাইট) সিবিল থর্ণডাইকের সঙ্গে। এ'র স্বামী বিখ্যাত নট স্যার লুই ক্যাসন।

ডেম সিবিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—প্রায় ষাট বছর আগে সিবিলের মঞ্চ-জীবন শুরু হয়। শৈশব থেকেই সিবিল ও তাঁর ভাই রাসেলের মধ্যে অভিনয় প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়েছিল। সিবিল কিন্তু হতে চেয়েছিলেন পিয়ানিস্ট। কিন্তু দেখা গেল একটানা বেশীক্ষণ পিয়ানো বাজালে তাঁর হাতের শিরায় টান ধরে। সুতরাং সিবিল অভিনয়-জীবনই বেছে নিলেন এবং অভিনয় শিক্ষা করবার জন্য বেনগ্রীট একাডেমীতে যোগ দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সিবিল অভিনয় জগতে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি আমেরিকা যান এবং সেক্সপীয়রের নাটকের ছোট বড় প্রায় সব চরিত্রে রূপ-দান করেন। ওলড্ ভিক থিয়েটার এদেশে যে নাট্য আন্দোলনের শুরু করে তারও আগে ম্যাঞ্চেস্টারে নব নাট্য আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিবিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে মিস বেলিস শুরু করলেন ওল্ড ভিক থিয়েটার।

কিন্তু চারদিকে যুদ্ধের এত বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁরা যেন আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। জীবনে অত উৎসাহ আর কোন দিনও পাননি। বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিল যুদ্ধের ধ্বংস আর অশান্তির মধ্যে জাতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের প্রেরণা দেবার মত মহৎ কাজ আর নেই। সিবিল তখন সাধারণ অভিনেত্রী। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে "কিং লীয়রের" অভিনয় চলছে। তাঁর ভাই রাসেল করছেন কিং লীয়রের ভূমিকা আর তিনি করছেন "ফুল" বা বোকার পার্ট। তখন তাঁকে বেশীর ভাগই ছেলেদের ভূমিকায় নামতে হত। কারণ ছেলেদের ভূমিকায় অভিনেতা পাওয়া কঠিন ছিল। ছেলেরা প্রায় সবাই তখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। যাক্। সেই অভিনয় চলার সময় সামনেই ওয়াটারলু ষ্টেশন বোমার আঘাতে উড়ে গেল। কিন্তু অভিনয় থামেনি। সিবিলের ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোট ছোট। তাদের রেখে তিনি আসতেন থিয়েটারে। এক মিনিট দেরী হবার উপায় ছিল না। টিউব ষ্টেশনে বোমা পড়ার সঙ্কেত শুনে যাত্রীদের বাইরে যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু সিবিল বেপরোয়া। টিকিট কালেক্টর তাঁকে বলত "এত যখন তাড়া তখন নিশ্চয়ই মিস বেলিশের লোক তুমি। যাও বাপু।" কিন্তু তবু কি নিস্তার আছে? মিস বেলিশ বলতেন "এ্যাঁ এত দেরী করে ফেললে! এভাবে কি ক'রে চলবে?"

অভিনয়-কলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, কমেডি অভিনয় করাটা সব অভিনয় শিক্ষার মূল। ভাল কমেডি না করতে পারলে ভাল ট্র্যাজিডী অভিনয় করা যায় না। যাঁরা শুধু একটাই করেন তাঁদের অভিনয় একঘেয়ে হয়ে পড়ে, কিং লীয়র আর মিডিয়া দুয়েই আমার অসামান্য সাফল্য। দুইই কমেডি। এখানে বলা দরকার যে, সিবিলকে শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক অভিনেত্রী বলা হয়।

কি ধরণের পার্ট তাঁর ভাল লাগে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে, কোন চরিত্র যাতে আমি আর আমাতে থাকি না যার বিরাটত্ব আমার নিজের সত্ত্বাকেও বিরাট করে তোলে, সেই ধরণের চরিত্রই আমার পছন্দ। যেমন জোয়ান অফ আর্ক। জোয়ানের ভূমিকা বোধহয় আমি হাজারবার করেছি। প্রত্যেক বারই আমি নতুন উদ্দীপনা পেয়েছি, নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যে আজও আমি তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আজও সে অভিনয় আমার অক্ষয় স্মৃতি। আমি যা বলতে চাই জোয়ান করবার আগে আমি কঠিন পরিশ্রম ঠিক তাই বলেছে। ঐ চরিত্রে রূপদান

লরেন্স অলিভিয়ার—ইডিপাস, সিবিল থর্ণডাইক—জোকাস্টা

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ডে হরতনের বিবির ভূমিকায় সিবিল থর্ণডাইক

করেছি। জোয়ান অফ আর্ক সম্বন্ধে, তার বিচার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু পড়েছি। জোয়ানের দুটো ভাষণ আছে। একটা ঠিক তার মৃত্যুর আগে, আরেকটা ভগবানের নিঃসঙ্গতা নিয়ে। দুটোই অপূর্ব। কি জান, অভিনেতাকে হতে হবে নমনীয়। ঠিক কাদার তালের মত। যখন যে চরিত্রে অভিনয় করবে ঠিক তার মত হতে হবে।

ইংল্যান্ডের স্টেজে রাইনহার্টের প্রভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমতী ঠাকুর। নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাব আছে। তিনি ওয়েলসের লোকদের দিয়ে ওয়েলস ভাষায় কয়েকটি বই করিয়েছিলেন। প্রত্যেকটিই সুন্দর হয়েছিল। Every Man তো খুবই ভাল হয়েছিল।

আমরা যে ধারার লোক সে ধারাকে বিচ্ছিরি নাম দিয়েছে "কিচেন সিংক স্কুল"। তা যাই হোক না বাপু ঐ কথাটা তো ঠিক আমাদের প্রত্যেককেই সেখানে আসতে হয়। অন্তত সেটা চিনি তো ভাল করে। এই ধারার লোকদের মধ্যে জন ওসবোর্ণ, উইসকার হ্যারল্ড পিন্টা এবং আরও অনেকে নাম করেছেন। তবে সবচেয়ে ভাল লেখেন পিন্টা। ও'র লেখা একটা বই তিনবার দেখতে গিয়েছিলাম। তিনজন লোককে নিয়ে গল্প। মানুষের আত্মার বা মনের যে চিরন্তন নিঃসঙ্গতা তাই তার উপজীব্য। ও'রই লেখা আরেকটি বই "দি কিচেন"। মাটির তলায় বিরাট রান্নাঘর। ওপরে রেস্টুরেন্ট। ওপরটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ওয়েটারদের দৌড়াদৌড়ি দেখে। নীচের তলায় লোকেরা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নিয়েই গল্প। এক বিরাট ট্র্যাজিডী সেখানে রূপ নিচ্ছে। ঐ নাটক শেষ হবার পরও প্রশ্ন থেকে যায় কি হবে? দর্শককে নীতি উপদেশ নয় তার মনে চিন্তা জাগাতে হবে।

আবার বললেন সিবিল। এখানে প্রথম দিকে ট্র্যাজিডী অভিনয় করা যে কি কঠিন ছিল! জানই তো আমরা ইংরেজরা অতি দুঃখেও হাসি। অন্য কোন জাত তো দূরের কথা জার্মাণ ফ্রেঞ্চরাও আমাদের এদিকটা বুঝতে পারে না। ট্র্যাজিক জিনিষ দেখে হাসা আমাদের স্বভাব। আমাদের কমেডিগুলো তোমাদের মত হালকা নয়। বড় বেশী গুরু-গম্ভীর।

কলকাতার থিয়েটার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সিবিল। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে বললেন ও'র সাথে ফরাসী অভিনেতাদের তুলনা করা চলে। নাটকীয় অথচ স্বাভাবিক। আমি ভাষা বুঝতে পারিনি কিন্তু তাঁর কণ্ঠ আমাকে আশ্চর্য্য করেছিল। তিন অঙ্কেতেই তাঁর গলা চলত।

কলকাতার ছেলে মেয়েদের অভিনয় প্রতিভা আছে। আমি ইউনিভারসিটির ছেলে মেয়েদের করা বাংলা ম্যাকবেথ দেখেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। তোমাদের মধ্যে তো বহু অপেশাদার দল আছে—প্রচুর নাট্যরসিক লোক আছেন যাঁরা সারাটা জীবন নাট্যবেদীর মূলে উৎসর্গ করেছেন। তোমাদের তো প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু দয়া করে তাদের বোল' তারা যেন মাইক ব্যবহার না করে। দেখ না এদেশে আজকাল কণ্ঠস্বরের চর্চা কমে গেছে। কিন্তু গলার স্বরের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন, বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে তার যে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তা কি কখনো মাইকে প্রস্ফুটিত হয়। আমার স্বামীর গলাই ধর না কেন। অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমি যখন সে গলাই মাইকে শুনি তখন মনে হয় এ যেন আর কারুর গলা শুনছি।

শুধু গলায় অভিনয় করা কিছু কঠিন নয়। চর্চা করলেই সেরকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া যায়। খুব বড় জায়গায় যদি শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে সেরকম জায়গায় থিয়েটার করাই উচিত নয়।

পল রবসন—ওথেলো, সিবিল থর্ণডাইক—এমিলিয়া

দর্শকের সংখ্যা ১১০০র বেশী হবে না এবং ১১০০ দর্শকের কানে কণ্ঠস্বর পেঁৗছে দেওয়া কিছু কঠিন নয়।

তোমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই মুক্ত স্টেজে বা ওপেন এয়ার স্টেজে করা চলে। আমি এরকম স্টেজই সবচেয়ে পছন্দ করি। তবে গ্রীণ থিয়েটারের মত না হলে ওপেন এয়ারে সংলাপ বলা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

আজকালকার থিয়েটারগুলোর চেয়ে এলিজাবেথীয়ান যুগের থিয়েটারগুলো অনেক বেশী প্রাণবন্ত ছিল। থিয়েটারের যে অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য তা যেন আজকাল ব্যাহত হচ্ছে। সিনেমা এবং টেলিভিশনের প্রভাবটাও হয়েছে। সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো গলার স্বর বা বাচনভঙ্গী স্পষ্ট করা নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু থিয়েটারে এমনকি প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ পর্যন্ত পৃথক ও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র স্মৃতি ঃ—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সিবিলের শ্রদ্ধা অসীম। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন তিনি ১৯১৯ কি কুড়ি সালে। তাঁর চেহারা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর বাচনভঙ্গী সবই যেন মোহময়। রবীন্দ্রনাথ এলে তাঁকে নিয়ে কবিতা রচিত হল। আবৃত্তি করলেন সিবিল থর্ণডাইক। তাঁকে বললেন "এসো একদিন আমার ওখানে।" সিবিল কবি যে হোটেলে উঠেছিলেন সেখানে এলেন পরদিন সকাল আটটায়। কবির চারিদিকে আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কবি সবাইকে বিদায় করে প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন। কি অভিনয় করছ, কেমন লাগছে ইত্যাদি। এ সাক্ষাৎকার সিবিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। একদা তিনি যে এই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত স্নেহ ও মনোযোগ পেয়েছিলেন এ কথা আজও গৌরবের সাথে বলেন সিবিল।

এরপর কবিকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন তখন তিনি যে নাটকে অভিনয় করছিলেন সেটি দেখবার জন্য। কবি এলেন। অভিনয় দেখলেন। অভিনয়ের পর আলাপ করলেন সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে। সিবিলের মনে পড়ে কবি চলে যাওয়ার পরেও সকলের সেই অভিভূত অবস্থার কথা।

ভারতবর্ষ আমার ভাল লাগে—প্রথমেই লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের কথা উঠলো। সিবিল বললেন, ওখানেই বহু ভারতীয়ের সাথে আমার প্রথম আলাপ। এমন কি কৃষ্ণ মেননের সাথেও। মেনন সম্পর্কে ছেলেমানুষের মত বার বার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। যেন দুষ্ট ছেলে সম্পর্কে সস্নেহে কোন গুরুজন অভিমত প্রকাশ করছেন "ওয়াইল্ড বয়।"

প্রথম থেকেই সিবিল ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সাথে যুক্ত আছেন। ভারতবর্ষ কেমন লেগেছিল এ প্রসঙ্গে সিবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন। বললেন, ভারতীয় নৃত্য অপূর্ব। মাদ্রাজে থাকবার সময় কাছেই একটি গ্রামে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তাতে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম। মণিপুরী নাচও দেখেছি। কি সুন্দর তোমাদের কমনীয়তা। আমাদের যা সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয়, তোমাদের তা জন্মলব্ধ।

আমি তখন দিল্লীতে গ্রীক নাটক সম্পর্কে কিছু কাজ করছি। সে সময় দূরে পার্বত্য অঞ্চল থেকে একদল মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। পা অবধি, তাদের ঘাগরা পরা, গায়ে ওড়না। কি তাদের চলার ভঙ্গী! অমনটি আর দেখিনি।

ভারতীয় শাড়ী ঃ—একবার ওল্ড ভিক থিয়েটারে একটি ভারতীয় নাটকে পরবার জন্য আমার স্বামী আমার জন্য একটা নীল শাড়ী কিনে এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার সেটি পরা হয়নি। যে মেয়েটি রাজকন্যা হয়েছিল তাকেই পরানো হয়েছিল। কিন্তু সে নীল আমি আর কোথাও দেখিনি। ভূমধ্য সাগরের নীলিমাকে আরও অতল আরও গভীর করলে তবে সে নীলিমা পাওয়া যায়। শাড়ীর কি তুলনা হয়? আর তাছাড়া তোমাদের এ রকম বছরে বছরে হাস্যকর উদ্ভট ফ্যাশন চালু হয় না। সেও মস্ত সুবিধা। আমরা এবার সমস্বরে হেসে উঠলাম। তোমাদের গান বাজনাও আমার খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয় তোমাদের কতকগুলো বাদ্যযন্ত্রের সাথে চৈনিক যন্ত্রের মিল আছে। তবে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বর ব্যবহার কর। দুটো স্বরের মধ্যে অত সূক্ষ্ম ব্যবধান আমাদের সঙ্গীতে নেই।

"আপনি তো ভারতীয় চরিত্রেও রূপদান করেছেন,—না?"

হ্যা। আমি সাবিত্রী ও শকুন্তলার পার্ট করেছি। গত বছর রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমি, আমার নাতনী এবং ওল্ড ভিক থিয়েটারের আরও অনেকে "বিসর্জন" নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। তোমরা বুঝি তখন ছিলে না?

সে সৌভাগ্য হয়নি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে দেখে কিন্তু মনেই হয় না যে, আপনার বয়স প্রায় আশী হতে চললো। তার কারণ বয়স আমার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই আশীর কাছাকাছি এসেও আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি না।

সময় হয়ে এসেছিল। এবার আমরা উঠবো। এ কথোপকথনে প্রশ্ন বেশী ছিল না। সিবিল নিজেই আত্মমগ্নভাবে বলে চলেছিলেন সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে।

লিফট্ পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বয়সেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও সজীব মন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সিবিল থর্ণডাইক থামেননি। এখনও তিনি নতুন পথের সন্ধান করছেন। ঘরোয়া জীবনে তিনি বিলাসী নন। অহংকারী নন। আমার এই অসাধারণ দম্পতীর ঘরের বাইরেও কাজের অবসর নেই। সৃষ্টি যদি যৌবন হয় তাহলে আজও এঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন। এই অক্লান্ত শিল্পীকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম।

সিবিল থর্ণডাইক—সেন্ট জোয়ানের ভূমিকায়

ভবঘুরের খাতা
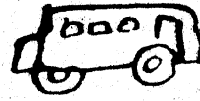
অয়স্কান্ত

কলকাতা : অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দুঃসহ জীবনযাত্রার কোনো ছবিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ ছবিটি যে কী ভয়াবহ সে-বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়া দরকার। সম্প্রতি কলকাতার ইনফর্মেশন সেন্টারে কলকাতা মেট্রো-পলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (সংক্ষেপে সি-এম-পি-ও) কর্তৃক একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। প্রদর্শনীটি খুবই শিক্ষাপ্রদ ও সময়োচিত। তবে শহরের জরুরি অবস্থার দরুন এই প্রদর্শনীটি কতজন দেখে উঠতে পেরেছেন আমি জানি না। আমি এ-সপ্তাহে এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন চার্ট ও ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত কয়েকটি তথ্য পর-পর সাজিয়ে কলকাতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে চাই।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের আমলে ছোট ছোট তিনটি গ্রাম নিয়ে যে স্বল্পায়তন শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল তারই নাম কলকাতা। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে কলকাতা ছোট্ট এতটুকু একটা রঙের ছোপ মাত্র। আয়তন মাত্র ০·৯৪ বর্গমাইল। তারপরে বছরে বছরে কলকাতা কি-ভাবে আয়তনে বেড়েছে তা নিচের হিসেবের দিকে তাকালে বোঝা যাবে।

কলকাতার আয়তন

১৭৫০	সালে	০·৯৪	বর্গমাইল
১৮০০	"	১·৯৫	"
১৮৫০	"	৭·৬৯	"
১৯০০	"	১১·৫০	"
১৯৩১	"	৩৫·০২	"
১৯৬১	"	৩৮·২৩	"

এই হিসেব খাস কলকাতার, অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকার। এই খাস কলকাতার জনসংখ্যা বর্তমানে ২৯ লক্ষ। আর সন্নিহিত এলাকা নিয়ে যাকে বলা হয় বৃহত্তর কলকাতা তার আয়তন বর্তমানে ১৭০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ৬৫ লক্ষ। গত দশ বছরে কলকাতার জনসংখ্যা শতকরা ৮·৪৮ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ১৯৮৬ সালে কলকাতার জনসংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। এই বিপুল জনসংখ্যার চাপে কলকাতা একটা বেলুনের মতো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে কিনা, তা নিতান্তই অনুমানের ব্যাপার। তবে কলকাতার বর্তমান জনসংখ্যার চাপেই এক ঐতিহাসিক শহরের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে সে-সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে একটা উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি।

"গত কুড়ি বছর ধরে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত এই শহরের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে শহরের এই বিরাট আয়তনও আজ অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমতঃ যুদ্ধকালীন শিল্পগুলি কলকাতার বুকে ও আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কর্মীদলে শহর ছেয়ে গেল। এরপরে এল '৪২ সালে মন্বন্তরে গ্রামাঞ্চল থেকে পালিয়ে-আসা স্বল্পকালীন বাসিন্দার দল আর সবচাইতে শেষে এল পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার বলি হতভাগ্য সর্বহারা ঘরছাড়াদের দল। কলকাতা ও আশেপাশে বর্তমানে পনেরো লক্ষ উদ্বাস্তুর বাস।"

শুনলে অবাক হতে হবে যে কলকাতায় প্রতি বর্গমাইলে মানুষ বাস করে ৭৩,১৮২ জন। বস্তি অঞ্চলে অবশ্যই আরো বেশি—প্রতি একরে ২৫৮·৫ জন। খাস কলকাতার ২৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে বস্তিতে বাস করে ৭ লক্ষ, পরিবারের হিসেবে ১,৮৯,০০০টি। অর্থাৎ কলকাতার প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বস্তিবাসী। শহরাঞ্চলের ছ-ভাগের একভাগই বস্তির কবলে।

কলকাতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা করতে হয় তাহলে এই বস্তিগুলোর দিকেই আরো ভালো করে তাকাতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক, বস্তিবাসীদের পরিবার-পিছু আয় কত। গড় মাসিক আয় পরিবার-পিছু ১০৭ টাকা, বা মাথা-পিছু ৩০ টাকা। শতকরা ৫০টি পরিবারের মাসিক আয় ৫১ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। শতকরা ১৭টি পরিবারের মাসিক আয় ৫০ টাকারও কম। ঘরভাড়া পরিবার-পিছু মাসে ১৯ টাকা।

আশা করি, এই সংখ্যাগুলো বলার পরে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না যে কলকাতার প্রতি চারজন মানুষের একজন বাস করে স্থায়ী অনাহারের অবস্থায়।

আর এই অনাহারী মানুষগুলো কোন্ পরিবেশে বাস করে? এবারেও সোজাসুজি অঙ্কের হিসেবে আসা যাক।

বস্তিবাসী প্রায় দু-লক্ষ পরিবারের মধ্যে নিজস্ব জলের কল আছে শতকরা মাত্র একটি পরিবারের। শতকরা ৬১টি পরিবার জলের কল অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। বাকি শতকরা ৩৮টি পরিবারের ভরসা রাস্তার কল। নিজস্ব পায়খানা আছে শতকরা মাত্র দুটি পরি-

বারের। শতকরা ৮১টি পরিবার অন্যদের সংগে ভাগাভাগি করে। শতকরা ১৭টি পরিবারের কোনো পায়খানাই নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে শতকরা ২২টি পরিবারে।

এই হচ্ছে খাস কলকাতা শহরের বস্তি-জীবন।

আর কলকাতার বস্তি-জীবনের সমস্যাই কম-বেশি পরিমাণে কলকাতার নাগরিক জীবনের সমস্যাও। নিজেদের জীবনযাত্রার দিকে তাকালেই বিষয়টিকে উপলব্ধি করা যাবে।

গোটা শহরটি যে প্রায় একটা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ কলকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা। আমরা কলকাতার ট্রাম-বাস নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, কলকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা যে-কোনো সভ্যদেশের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। দুর্ঘটনার খতিয়ানই এর সবচাইতে বড়ো প্রমাণ। গত বছরে শহরে দুর্ঘটনার সংখ্যা ২৭৫। তার মধ্যে ১৮৯টি ক্ষেত্রে বলি হয়েছে পথচারী। তার ওপরে আছে ট্রাফিক-জ্যাম, প্রয়োজন অনুপাতে কম সংখ্যক ট্রাম-বাস, উপযুক্ত রাস্তার অভাব, ইত্যাদি। অবস্থাটা যে কী অসহনীয় হয়ে উঠেছে তা বোঝাবার জন্যে কয়েকটি হিসেব দিচ্ছি। আপিসের সময়ের কলকাতায় যানবাহন যে গতিতে অগ্রসর হয় তা প্রায় শামুকের মতো। ধর্মতলা স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, লোয়ার চিৎপুর রোড ইত্যাদি ধরনের কয়েকটি রাস্তায় যানবাহনের গতি ঘণ্টায় সাড়ে-সাত মাইলেরও কম। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও আরো কয়েকটি রাস্তায় ঘণ্টায় সাড়ে-সাত থেকে দশ মাইলের মধ্যে। ওয়েলেসলি স্ট্রীট ও আরো কয়েকটি রাস্তায় ঘণ্টায় দশ থেকে সাড়ে-বারো মাইলের মধ্যে। পার্ক স্ট্রীট ও আরো কয়েকটি রাস্তায় ঘণ্টায় সাড়ে-বারো থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। আর পনেরো মাইলেরও বেশি স্পীড হতে পারে এমন রাস্তা কলকাতায় খুবই কম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রেড রোড। তবে রেড রোডের মতো রাস্তা কলকাতায় এতই কম যে সেগুলোকে হিসেবের বাইরে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, যদিও আমরা বাস করছি এক শিল্পোন্নত শহরে, যদিও আমরা আমদানি করেছি আধুনিকতম যন্ত্রযান, কিন্তু গতির বিচারে এখনো আমরা পড়ে আছি সাইকেলের যুগে। তবে আমাদের সান্ত্বনার কথা এই যে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বলেছেন যে ভারতের মানুষ আমরা নাকি সবে সাইকেলের যুগে প্রবেশ করেছি।

সব মিলিয়ে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের কোনো ব্যবস্থাই আজকের দিনের কলকাতায় নেই। অভাব শুধু যে বাসগৃহের ও যানবাহনের তাই নয়, অভাব গ্যাসের ও বিদ্যুতের, পরিস্রুত পানীয় জলের, রাস্তাঘাটের আবর্জনা পরিষ্কারের যথোচিত ব্যবস্থার। কলকাতায় স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই।

কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সমস্যাও প্রায় একই ধরনের। আর সকল সমস্যার মূলে সেই একই কথা—জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছি।

"অন্যান্য দেশে শিল্পের প্রসার দেশের সমৃদ্ধির সূচনা করেছে, দেশবাসীর জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধতর ও সুন্দরতর করেছে—আর আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার হুগলী নদীর দুই তীরে অগণিত মেহনতী মানুষকে অসহনীয়, অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে দিনযাপনে বাধ্য করেছে। এই বিরাট জনসমুদ্র যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে—সামান্য আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মিউনিসিপ্যাল সংস্থাগুলির পক্ষে তার সমাধান সাধ্যাতীত।"

সন্নিহিত অঞ্চলের জনসংখ্যা কি-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটা হিসেব দেওয়া যাক।

	জনসংখ্যা ১৯৩১	জনসংখ্যা ১৯৬১
ব্যারাকপুর	৩৪৩২	৫০৫৯
টিটাগড়	৫৯১৪	১০৮৭৫
খড়দহ	১৫০১	৩৮৬১
বরানগর	৮৭৫১	২০০৫৯

এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্যে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। ফলে অনিবার্যভাবেই বস্তির উৎপত্তি হয়েছে। আর এক-একটি বস্তি প্রায় এক-একটি নরক। পানীয় জল নেই, আবর্জনা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত নেই, বিদ্যুৎ নেই। আর এই নরকের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে ও বড়ো হচ্ছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা।

কলকাতার জীবনযাত্রাকে যদি উন্নত করে তুলতে হয় তাহলে সবচেয়ে প্রথমে হাত দিতে হবে এই বস্তির ওপরে। ধাপে ধাপে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যাতে বস্তি অপসারিত হয় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সমন্বিত বাসস্থান গড়ে উঠতে পারে। কলকাতা যদি বাঁচে তাহলেই আশেপাশের আরো বত্রিশটি মিউনিসিপ্যালিটি বাঁচতে পারে। সি-এম-পি-ও গঠিত হয়েছে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

"বৃহত্তর কলকাতার ব্যাপক পুনর্গঠন ও এখানকার অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনা রচনার ভার সি-এম-পি-ও'র ওপর ন্যস্ত। এই সংস্থার কর্মীদল ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একদল বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কলকাতা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্রমবর্ধমান শহরাঞ্চলের চারিশত বর্গমাইল পরিমিত ভূমিতে আগামী ১৯৮৬ সালের বসবাসকারী আনুমানিক জনসংখ্যার সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির একটি 'সর্বাত্মক পরিকল্পনা' রচনায় লিপ্ত আছেন। এই সর্বাত্মক পরিকল্পনাটি বৃহত্তর কলকাতার নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।"

এই উদ্ধৃতিটি সি-এম-পি-ও'র একটি পুস্তিকা থেকে। লক্ষ্য খুবই মহৎ কিন্তু কতখানি বাস্তবে রূপায়িত হবে তা অপেক্ষা করে দেখার বিষয়। যে প্রদর্শনীটির কথা উল্লেখ করেছি সেখানে অনেকগুলি চার্ট ও মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে ভবিষ্যতের কলকাতার রূপ কী হবে। হুগলী নদীর ওপর দিয়ে আরেকটি পুল তৈরি হবে, প্রত্যেকটি পার্ক হয়ে উঠবে অতি মনোরম উদ্যান, মাথা-পিছু ত্রিশ গ্যালন জল সরবরাহ হবে, বস্তি অপসারিত হয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলবে আলো-হাওয়ায় উদ্ভাসিত অতি সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাটবাড়ি। এতখানি হওয়া সম্ভব কিনা তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুটাও যদি হয় তাহলেও তা হবে একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তেত্রিশ ॥

তৃপ্তি ফিরে এসেছে। বাবা ভালো-মন্দ একটা কথা বলেননি, অসুস্থ মা একবার মেয়ের মাথায় হাত রেখেছেন, মেয়ে কেঁদে ভেঙে পড়েছে মায়ের পায়ের ওপর। অভয়ই হয়তো আগের থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, তৃপ্তিকে ক্ষমা করেছে সবাই।

পাড়ায় একটুখানি চঞ্চলতা জেগেছিল। কিন্তু অমলের চেহারাই আলাদা এখন। বোঝা-পড়ার ব্যাপারটা মাঝ পথেই চাপা পড়েছে—কাউকে সোজাসুজি ধরতে না পেরে আর দিন কতক অমলকে হয়রাণ করে পুলিশ প্রায় হাত গুটিয়েছে মনে হয়। আর অমলের হঠাৎ মনে হয়েছে, পাড়ার চাঁই হিসেবে এই বিপন্ন পরিবারটির ভালো-মন্দ দেখা তার একটা নৈতিক কর্তব্য।

বন্ধুদের বলেছে, মাইরি ভাই, ভারী একটা বোকামো হয়ে গেছে। বাইরের লোক—ভাড়া নিয়ে আছে, ভারী দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়। কোনো ডিস্টার্ব করবিনি—বুঝলি? সাধ্য মতো বরং হেল্প করতে হবে, এই হল আমাদের ডিউটি।

এখন সেই ডিউটিই করে চলেছে। তৃপ্তি সম্পর্কে একটা কথা উঠতে দেয়নি পাড়ায়। সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে—কোনো আলোচনা কেউ যেন না করে।

তা ছাড়া—

তা ছাড়া এখন ফাজলামির সময় নয়। যুদ্ধ এসে গেছে। দেশের দায়িত্ব। অনেক কাজ আমাদের।

ডিফেন্সের টাকা তুলতে হবে। সভা-সমিতি। রক্ত দিতে হবে। ডাক পড়লে যুদ্ধে যাব। কেন—ইলেকশনে আমরা লড়িনি? আরো বড়ো ডাক এসেছে—এখন আর ইয়ার্কি চলবে না।

তৃপ্তির প্রসঙ্গ চাপা পড়েছে। রকে, পথে ঘাটে এখন অন্য আলোচনা। অন্য উত্তেজনা।

বাইরের কালো ঝড় এসে ঘরের সমস্যাকে যেন মুছে নিয়ে গেছে। তৃপ্তিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন কারো নেই। এমন কি, সর্ব ঘটে যিনি কাঁঠালী কলা হয়ে বিরাজ করেন, সেই বাঁড়ুজ্জে-মশায়েরও নয়। ডাক্তারের চেম্বারে এত দিনে নতুন কম্পাউণ্ডার এসেছে আবার। বুড়ো মানুষ, সতর্ক সংসারী লোক—কাজ-কর্মে চটপটে, প্রচুর কথা বলতে পারে। গোবেচারা করুণাময়ের সঙ্গে তার কোথাও কোনো মিল নেই। বাঁড়ুজ্জে নিয়মিত সেখানে যান—খবরের কাগজ নিয়ে যুদ্ধের আলোচনা তোলেন, দুজনে মিলে অসংখ্য সমস্যার চমৎকার সমাধান করে দেন। যে বেঞ্চিতে বসে বাঁড়ুজ্জে তর্ক করেন, দেড় মাস আগে সেটা যে করুণাময় কম্পাউণ্ডারের রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, সে কথা তাঁর মনেও পড়ে না।

আর গৌরাঙ্গবাবু তাঁর চৌকিটিতে চুপ করে বসে থাকেন। সামনের বাড়ীটার মাথার ওপর দিয়ে সেই অপরিচ্ছন্ন আকাশ—যেখানে রেলওয়ে সাইডিঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাওয়ায় গলির স্তূপাকার ময়লার গন্ধ ভাসে।

আবার যুদ্ধ।

সেই দিনগুলোকে মনে পড়ে। সেই অন্ধকার আর বিভীষিকা ভরা কতগুলো দিন। তারপর পার্টিশন। আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছেন যেন। কিন্তু এখন আর কিছু ভাবতে পারেন না। একটার পর একটা আঘাত—এই অসুখের ছেদহীন যন্ত্রণার শৃঙ্খল—আজ আর কোনো কথা নিয়ে থাকতে পারেন না বেশিক্ষণ। একটু পরেই মনে হয় মাথার শিরাগুলো তাঁর টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

যা হওয়ার হোক। যা ঘটার ঘটুক। গৌরাঙ্গবাবু ফুরিয়ে গেছেন। কিছু করবার নেই তাঁর—কোনো কথা ভাববার নেই।

অভয় খুব ব্যস্ত। কারখানার কর্মীদের মধ্যে যুদ্ধের জন্যে চাঁদা তুলছে—সভা-সমিতি করছে। কারখানার আরো বেশি কাজ তার—প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। দেশের এখন মহা-সঙ্কট।

মা-র অসুখ দেখে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল চন্দন সিংয়ের কাছে। সবই স্বীকার করেছে চন্দন সিং। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—তৃপ্তিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। চাচাই সব গোল-মাল করে দিয়েছে। চন্দননগরের ওধারে কোথায় মাঠের মধ্যে সে নামিয়ে দিয়েছে অমিয় আর তৃপ্তিকে। তার পরের খবর চাচা জানে না—চন্দন সিংয়ের তো কোনো কথাই নেই।

তারপর পুলিশের কাছ থেকে খবর এল। হাওড়া স্টেশন থেকে তৃপ্তিকে নিয়ে এল সে। অমিয়র চিঠি এসে গেছে। মা অনেকটা ভালো—উঠে বসেন, দু-পা চলা-ফেরা করেন। এখন সংসারের ভার আবার তৃপ্তির উপর। আগেকার মতো সে মুখ বুজে নেপথ্যে মিলিয়ে গেছে। কোনোদিন বেশি কথা বলত না—এখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

যুদ্ধ। বাইরের জগৎ মাতিয়ে দিয়েছে অভয়কে। ঘরের কথা সে আর ভাববার সময় পায় না। অমিয় কাশীতে চাকরি করে। দিদি নবদ্বীপ থেকে লিখেছে—ভালো আছি, ভেবো না।

এতদিন ধরে যা কিছু বেসুরো ঘটে গিয়েছিল, গৌরাঙ্গবাবুর সংসারে যে

ঝড়ের পালা এসেছিল—সমস্ত থিতিয়ে গেছে যেন। আগের সব-কিছু দুঃখ-সুখের একটা বাঁধা ছকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। দীপ্তি চলে যাওয়ার পর অভাব বেড়ে গেছে—অভয়ের ওভার-টাইমেও সপ্তাহে দু'দিনের বেশি বাজার হয় না—চালের মুঠিতে টান পড়ে মাসের মাঝামাঝি থেকে। মা-র অসুখের জন্যে কিছু ধারও হয়ে গেছে অভয়ের। কিন্তু অভাবের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের আর এসব গায়ে লাগে না।

শুধু প্রভাত সরকার গুম হয়ে বসে থাকে। কাঞ্জিলালসাহেবের চাবুকের ঘা শরীরে কোথাও নেই—কিন্তু মনের মধ্যে তার জ্বালাটা জ্বলতে থাকে সারাক্ষণ। যিনি কাঞ্জিলালের হাতে বাঁদর-নাচ নাচবার সময় তারও ঘোর লেগেছিল—তারও নেশা ধরেছিল বইকি। কিন্তু যে চাবুকটা দিয়ে কাঞ্জিলাল কুকুর মারেন—তারই কয়েকটা আঘাত এসে তার মাথা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। দীপ্তিকে দয়া করতে গিয়েছিল—সে দান দীপ্তি ছুঁড়ে দিয়েছে তার মাথার ওপর।

রাণী ভার নামিয়ে দিয়েছে মন থেকে। প্রভাতের ছুটি। কাঞ্জিলাল-সাহেবই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছেন তাকে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। তার কাছে এখন সব সমান।

বাঁকুড়ায় মুরারিবাবুকে চিঠি দিয়েছিল, আজকে জবাব এসেছে তার।

"তুমি চলে এসো। চাকরি ঠিক হয়ে আছে—ভাবতে হবে না।"

না—ভাববার আর কিছু নেই।

বারান্দায় বসে গৌরাঙ্গবাবু ঝিমুচ্ছেন। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। এমন সময় পিয়ন ডাকল ঃ মণি অর্ডার।

মণি অর্ডার? চমকে জেগে উঠলেন।

—আমার

—হাঁ বাবু, আপনার নামেই। কুড়ি টাকার।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর নামে কোনোদিন মণি-অর্ডার আসতে পারে এ-কথা ভুলে গেছেন তিনি। কে তাঁকে পাঠাতে পারে—কার কাছে টাকা পাবেন তিনি?

কাঁপা হাতে ফর্মটা নিলেন। টাকা পাঠিয়েছে অমিয়।

"বাবা, আমাকে মাপ করবেন। আমি—"

আর পড়তে পারলেন না—চোখ দিয়ে জল এল। অমিয়ের একটা চিঠি এসেছিল বটে অভয়ের নামে, তৃপ্তিও বলেছিল যেন ছোড়দা চাকরি করছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ-বাবু বিশ্বাস করেননি। সেই দায়িত্বহীন অমিয়, ফুটবল খেলে আর ইয়ার্কি দিয়ে যার দিন কাটে—সে করবে চাকরি! ওরা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছে তাঁকে।

কিন্তু সত্যিই তো টাকা পাঠিয়েছে অমিয়—ক্ষমা চেয়েছে তাঁর কাছে। অভি-ভূত হয়ে ফর্মটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা লাইন পড়তে পারছেন না—কোনো কিছুর অর্থ বুঝতে পারছেন না তিনি।

পিয়ন একটা কলম এগিয়ে দিলে। বললে, সই করে দিন বাবু—আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে আবার।

বাতের জন্যে যে আঙুলগুলো টন টন করছিল, আজ কি সেখানে যন্ত্রণ কোনো অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন না? ব হাতে দুটো সই করলেন।

পিয়ন টাকা দিয়ে চলে গেল, বু ভেতর কুপন আর নোট-দুটো নি গৌরাঙ্গবাবু বসে রইলেন।

হৃৎপিণ্ড এতদিন পাথরের মত জমাট বেঁধে ছিল, আবার যেন চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে আবার বাঁচবেন, আবার মাথা তুলবেন। তাঁর দুই ছেলে দু হাতে শক্তি এনে দিয়েছে নতুন করে। দীপ্তি গেছে যাক—তৃপ্তি ফি এসেছে। কিছুই ফুরিয়ে যায় না—মে কাটে, আলো দেখা দেয়—সব নতুনভা শুরু করা চলে।

কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে অমিয়। কিন এই কুড়ি টাকা কুড়ি লক্ষের চাইতে বেশি।

সামনে দিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুক চলেছিলেন বাঁড়ুজ্জেমশাই। গৌরাঙ্গ বাবু তাঁকে ডাকলেন। নিজে থে ডাকলেন এই প্রথম।

—কোথায় চলেছেন, ও মশ কোথায় চললেন?

অবাক হয়ে বাঁড়ুজ্জে থেমে দাঁড়ালে গৌরাঙ্গবাবুর এমন গলা কোনো শোনেননি তিনি।

—কেমন আছেন আজ?

—খুব ভালো—খুব ভালো।—এ অদ্ভুত আলোয় গৌরাঙ্গবাবুর

হাঁ বাবু, আপনার নামেই কুড়ি টাকার

জবলতে লাগল ঃ এবার আমি ভালো হয়ে যাব—বুঝলেন।

অসীম কৌতূহলে এগিয়ে এলেন বাঁড়ুজ্জে।

—কী ব্যাপার বলুন তো? কোন দৈব ওষুধ পেয়েছেন নাকি?

—দৈব ওষুধ না। তার চাইতেও ঢের বেশি। অমির আজ টাকা পাঠিয়েছে আমাকে।

—তাই নাকি?

বাঁড়ুজ্জে এসে রোয়াকের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। গৌরাঙ্গবাবুর উৎসাহ তাঁরও মধ্যে এসে সংক্রামিত হয়েছে এতক্ষণে।

—কোথা থেকে টাকা পাঠিয়েছে? কেমন আছে সে?

—আসুন, আসুন—বলছি।

ঠিক সেই সময় প্রভাত এসে

কাকিমার ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ডাকল :

কাকিমা!

কাকিমা বিছানায় বসে ছিলেন। সাড়া দিলেন : এসো বাবা।

প্রভাত ঢুকল। রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ—দিনে-দুপুরেও আবছা অন্ধকার। বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলে প্রথমে যেন কিছু চোখে পড়তে চায় না। চৌকাঠ পেরিয়ে কয়েক মুহূর্তে ইতস্তত করল প্রভাত—তারপর দৃষ্টিটা সহজ হয়ে এল তার।

তৃপ্তি বসে ছিল মা-র পাশেই, প্রভাতকে দেখে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। কাশী থেকে ফেরবার পর এই সাত-আট দিনের মধ্যে একটা কথাও বলেনি প্রভাতকে, একবারও চোখ তুলে তাকায়নি তার দিকে।

কাকিমা বললেন, যাচ্ছিস কোথায় তিপু? বোস।

তৃপ্তি বসে পড়ল। ঠোঁট দুটো কী একটা বলতে গিয়ে একবার কেঁপে উঠেই থেমে গেল। এই বাড়ীতে শুধু প্রভাতদা সামনে এলেই সমস্ত লজ্জা যেন পাহাড়ের মতো নেমে আসে তার ওপর—মাটিতে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় তৃপ্তির।

কাকিমা বললেন : কী বাবা?

প্রভাত দ্বিধা করল একবার। তারপর বললে, আমি চলে যাচ্ছি কাকিমা।

কাকিমা চমকে উঠলেন। তৃপ্তি চোখ তুলেই নামিয়ে ফেলল।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বাঁকুড়ায়।—প্রভাত শুকনোভাবে হাসতে চেষ্টা করল : জানেন তো, এখানকার চাকরি আমার চলে গেছে। এ-ভাবে বেকার বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে কাকিমা বললেন, চাকরি পেয়েছ ওখানে?

—একটা জুটে যাবে মনে হয়। ড্রাইভারের কাজের অভাব হয় না।

—কবে যাবে?

—কাল।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কাকিমা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, একটা কথা রাখবে আমার?

—বলুন।

—আমার এই ছোট মেয়েটাকে—এই বোকা তিপুকে—কাকিমার গলা ধরে এল একবার : তুমি ভুল বোঝোনি তো বাবা? ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে একটা পাগলামো করে ফেলেছে বলে তুমি কি ওর ওপর রাগ করে থাকবে?

কথার ধরনে একটু আশ্চর্য হল প্রভাত। একটু নতুন রকমের ঠেকল কানে।

—আমি রাগ করব কেন কাকিমা? আর তাতে কী আসে যায়?

—আসে যায় বাবা।—কাকিমা একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রভাতের ডান হাতখানা চেপে ধরলেন : তুমি যদি যাওয়ার আগে কথা দাও আমার মেয়েটাকে তুমি নেবে—তা হলে আমার সব ভাবনা মিটে যায়!

—আমি!

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রভাত কাকিমার শুকনো ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঘরের আবছায়ায় কী বিষন্ন, কী করুণ! মাথায় আঁচলটা তোলা রয়েছে—তার ধারে ধারে কালো সুতোর সেলাই পর্যন্ত দেখা যায়। প্রভাতের মনে হল, এই বাড়ীটার যত ব্যথা—যা কিছু দুঃখ, কাকিমার মাথার সেলাই করা আঁচল থেকে তাঁর রোগা আঙুলগুলো পর্যন্ত একসঙ্গে তাদের সমস্তটাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

তৃপ্তির মাথাটা আরও নীচে ঝুঁকে পড়ল, যেন এই ঘরের মেজেটা তাকে একটু একটু করে টেনে নিচ্ছে। আর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রভাত, কী ভাববে—কী যে বলবে খুঁজে পেলো না।

—মেয়েটাকে নেবে না বাবা?—কাকিমার গলায় যেন কান্নার ঢেউ দুলে উঠল।

—আমি গরিব, কাকিমা। আমার চাল-চুলো নেই।

—গরিব আমরাও—সে তো তুমি সবচেয়ে ভালো করে জানো। আর চাল-চুলো? সংসার করলেই তা আসবে।

—কিন্তু অভয়, কাকাবাবু—

—অভয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তার আপত্তি নেই। শুধু বলেছিল, 'আগে বললেই পারতে—এত জল-ঘোলা করবার দরকার ছিল না।' তোমার কাকাবাবু তোমাকে ভালোবাসেন—তিনি খুশি হবেন।

কিন্তু প্রভাত খুশি হতে পারল না সম্পূর্ণ—কোথায় একটা ভয় আর সংশয় তার মনটাকে চেপে ধরতে লাগল বার বার। শুকনো মুখে চুপ করে রইল সে।

—কথা দেবে না বাবা?

দীপ্তির কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেবার প্রহসনটা মনে পড়ল একবার। মনে পড়ল কাঙালীলালের চাবুক। আবার কি নতুন করে বাঁদর-নাচের মহড়া চলেছে তার? এর থেকে জীবনে কি সে নিস্তার পাবে না কোনোদিন?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কাকিমা।

—না বোঝবার তো কিছু নেই প্রভাত। তবে তোমার মনে যদি খটকা থাকে—কাকিমার গলায় আবার কান্না দুলে উঠল : তুমিও যদি ভাবো যে—

—আমি কিছুই ভাবিনি কাকিমা। কিন্তু—কিন্তু—তিপু কি সুখী হবে?

—সুখী হবে বইকি।—কাকিমার বাঁ হাতখানা এবার তৃপ্তির মাথায় এসে পড়ল : ও আমার খুব ভালো মেয়ে। নিজে সুখী হবে—তোমায় সুখী করবে এ আমি বলে দিচ্ছি। বলো, কথা দিলে?

সংশয় গেল না। মেঘলা মুখে প্রভাত বললে, দিলাম কাকিমা।

শুধু তৃপ্তি প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। একটা কী যেন তার বুকের ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে—কোনোমতেই সেটাকে সে সামলে রাখতে পারছে না।

রাত অনেক। সমস্ত বাড়ী ঘুমিয়ে পড়েছে। তৃপ্তি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছোট উঠোনটিতে জ্যোৎস্না। চতুর্দশীর আলো দিনের মতো জ্বলছে চারদিকে। এত আলো—অথচ একটি মানুষের সাড়া নেই কোথাও। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না আজকে।

বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়ালো তৃপ্তি। একবার মনে হল, অ-জ সেদিনের মতো আবার পালিয়ে যেতে পারে সে। কেউ জেগে নেই, কেউ তাকে বাধা দেবে না। পথ একবার যে চিনতে শিখেছে—পথকে আর তার ভয় নেই।

কত বড়ো এই জীবন। ট্রেনে যেতে যেতে কত বিশাল একটা আকাশ আর কী অসীম পৃথিবীকে দেখেছিল সে! তবু সব ফুরিয়ে গেল। সে নিজে বড়ো হয়ে—একটা বিরাট জীবনের ভেতরে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে দাঁড়াতে দিল না। আবার সেই অন্ধকূপেই টেনে আনল। করুণাময় গেল তো প্রভাতদা এসে পথ আটকে দাঁড়ালো।

নন্দলাল তাকে নিয়ে চলেছিল। কোথায় নিয়ে চলেছিল? মৃত্যু না মুক্তিতে? পুলিশ বলে, নন্দলাল শয়তান। হয়তো তাই। কিন্তু—

কিন্তু সংশয় যায় না। কানের কাছে এখনো বেজে উঠছে : বাঙ্গালোর-বোম্বাই-দিল্লী-এলাহাবাদ। পাহাড়-সমুদ্র-চন্দন বনের ডাক। হয়তো নন্দলালই তাকে সত্যিকারের মুক্তির খবর দিয়েছিল।

এই সময়। এখনো পালানো যায়। দিনের মতো জ্যোৎস্না—অথচ একটি মানুষ কোথাও জেগে নেই। কেউ বাধা দেবে না তৃপ্তিকে—সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।

একবার যেন ঘুমের ঘোরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো, তার পরেই বসে পড়ল। দাওয়ার ওপর। উপায় নেই—পালানোর পথ নেই। মা-র শুকনো মুখ। বাবা। বড়দা—

খাঁচার দরজা খোলা পেলেই কি পাখি পালাতে পারে? পায়ের শিকল না-ই থাক, যেটা মনের—তার কাছ থেকে কি নিষ্কৃতি আছে কোনোদিন?

এক ঝলক বাতাস এসে গায়ে পড়ল তার—বাইরের প্রকাণ্ড পৃথিবীটার একটা কাতর মিনতির মতো, একটা আর্ত দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো। আর নিজের বুকে—প্রতিটি শিরা-স্নায়ুতে সেই অসহ্য শৃঙ্খলের যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে—তৃপ্তি দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলল একটানা॥

—শেষ—

।। চোরাকারবারীদের দুর্দিন ।।

পশ্চিম জার্মানীতে চোরাকারবারীরা মহা ফাঁপড়ে পড়েছে। তাদের আগেকার ফন্দিফিকির আর চলছে না। জুতোর গোড়ালির মধ্যে হীরে, টুপির মধ্যে সিগারেট কিম্বা দুমরা স্যুটকেশ, টাইপরাইটার অথবা দুধের টিনে মাল-পত্তর পাচার করা আজকাল অচল হয়ে গেছে। তবে তারাও বসে নেই, নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। এখন মালপত্তর পাচার না কোরে ব্যবসার জাল দলিল, শুল্ক সম্পর্কীয় কাগজপত্র আমদানির নথী, জিনিষপত্রের ঝুটো ওজন ও হিসেব নিয়ে তারা কারবার করছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বে-আইনী ব্যবসা চালাচ্ছে, য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারের দেশগুলির আইন-কানুন এড়াচ্ছে, বিনিময় বাণিজ্যে লুকোচুরি খেলছে। এ-দেশের শুল্ক বিভাগও কম যায় না; তারাও যাকে বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কোলোনের শুল্কবিভাগের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান এইসব চোরাকারকারীদের সর্বাপেক্ষা চতুর জালিয়াতি ও ধূর্ত কৌশল ধরার জন্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতি ও যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামকে কাজে লাগিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক, ইঞ্জিনীয়ার ও সাংকেতিক লিখন পারদর্শী গোয়েন্দারা একত্রে কাজ করে। চোরা-কারবারী ও জালিয়াতদের অফুরন্ত ছল-চাতুরী ধরার জন্যে এরা এখানে অক্লান্ত-ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যায়।

রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরা কাগজের অদৃশ্য ও অস্পষ্ট লেখা ফুটিয়ে তোলে। মূল্যবান ডাচদেশের মধু বলে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে সস্তাদরের আর্জেন্টিনার মধু চালাচ্ছে, কিন্তু এদের অনুবীক্ষণের পরীক্ষায় দেখা গেল যে ফুল থেকে মৌমাছিরা ঐ মধু সংগ্রহ করেছে, সেই ফুল একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মায়; অতএব ধর ব্যাটাদের। চোরাকারবারীদের ধাবমান গাড়ীতে ট্রেসার অ্যামুনিশন গুলী চালিয়ে কোন খাঁজে কোথায় কি লুকানো আছে, তা পরিষ্কার ধরা যায়।

প্রত্যেকটি সীমান্ত পারাপার বিন্দুর সঙ্গে রেডিও, টেলিফোন ও টেলি-প্রিন্টারের মাধ্যমে কোলোন কেন্দ্রীয় দপ্তরের যোগাযোগ আছে। চোরাকার-বারীদের সর্বাধুনিক ফন্দি, সন্দেহজনক গতিবিধি সম্বন্ধে, সীমান্তের শুল্ক-বিভাগের কর্মচারীদের সবসময়ে খবর পাঠান হয়। য়ুরোপীয় কমন মার্কেটের
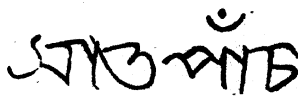
দেশগুলির সঙ্গে সবসময় সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা আছে। যত্রতত্র খানাতল্লাসী চালাবার জন্যে এই বিভাগের গাড়ীতে এক্সরে সমেত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার সবরকম ব্যবস্থা আছে। আদালতে একবার যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সেইসব চোরাকারবারীদের সম্পূর্ণ পরিচয়পত্র এই দপ্তরে আছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে চোরাকারবারীদের ফলাও ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠার বন্দোবস্ত হয়েছে।

।। যোগ্যতার বয়স ।।

মানুষ কোন বয়সে সর্বাধিক যোগ্যতা অর্জন করে দেখবার উদ্দেশ্যে মনো-বিজ্ঞানীরা "আমাদের জীবনের সেরা অংশ" সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলাফল শুনলে আশ্চর্য হবেন যেহেতু চিরাচরিত মতবাদকে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত করে।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে দশ-পনের বছরের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা পঁচিশ থেকে পয়তাল্লিশ বছরের লোকরা সবকিছু তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, চট্ করে বুঝতে পারে। তবে এর মধ্যে একটি কথা আছে এবং সেটি হচ্ছে কুড়ি পঁচিশ বয়সের লোক ঐ বয়সে যাকিছু শিখুক, তার জ্ঞানের ওপর সে নির্ভর করতে পারে যেমন লিখতে, পড়তে জানে, অংক বুঝতে পারে, যন্ত্র-পাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, যে বিষয়ে শিখতে চায় সে সম্বন্ধে আগ্রহ আছে। কোন একটা বৃত্তি ও জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে নিজের খুশিমত জিনিষ শেখে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় কিন্তু একথা খাটে না; দিব্যি খেলাধুলার মধ্যে থেকে হঠাৎ জোরজবরদস্তি করে স্কুলে পাঠালে তাদের সবকিছু বিস্বাদ লাগে, ভড়কে গিয়ে কিছু বুঝতে পারে না এবং বুঝতেও চায় না। অথচ মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এটাও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে অজ্ঞান শিশুদের যেক্ষেত্রে বছর খানেকের মধ্যেই লেখাপড়া দখলে এসে যায়, অক্ষর-জ্ঞানহীন বয়স্ক লোকদের লেখাপড়া আয়ত্ত করতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে।

“সর্বোচ্চ সৃজনীশক্তির বয়স” সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফলাফল পেয়েছেন যেমন ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে কবিদের কাব্যশক্তি ফুটে ওঠে, লেখকদের সৃজনীশক্তি শিখরে ওঠে চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে। আবিষ্কারক, চিত্রকর, গীতিকাররা তাঁদের জীবনের তুঙ্গে ওঠেন তিরিশ বছর বয়সে কিন্তু বিজ্ঞানী ও গণিতবেত্তাদের জীবনে চরম সাফল্য আসে তেত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এবং ডাক্তার ও মনো-বিজ্ঞানীরা ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেন।

পঞ্চাশ থেকে ছাপান্ন বছর বয়সে মানুষ সবচেয়ে বেশী অর্থ রোজগারে মনোযোগ দেয়। বয়স যত বাড়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানুষের মন তত ঝোঁকে অবশ্য এটি তাঁদেরই হয় যাঁরা তাঁদের মনকে ঐভাবে তৈরী করেন।

এই অনুসন্ধানের ফলাফল সাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য, অসাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খাটে না, যেমন মোৎসার্ট ছিলেন একজন “শিশু প্রতিভা” অথচ গেটে, বার্নাডশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁদের সৃজনীশক্তি অব্যাহত রেখেছিলেন। পরি-সংখ্যানের হিসাবে “চরম পরিণতি বিন্দু” স্থির করা সম্ভব হলেও সর্বক্ষেত্রে যে একথা খাটে না তার প্রমাণ আজকের রাজনীতিক্ষেত্রে চল্লিশ বছরের কেনেডি, নাসের, উইলি ব্রান্ড এবং অন্য দিকে পয়ষট্টি পঁচাশি বছর বয়সের ক্রুশ্চেভ, দ্যগল ও আদেনায়ুর বিশ্ব-রাজনীতিতে তাঁদের অস্তিত্ব পুরোদস্তুর বজায় রেখেছেন।

।। ব্যক্তিগত রুচিমাফিক 'তৈরী' বাড়ী ।।

পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুনট শহরে সম্প্রতি বিস্ময়কর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানী সমেত ইংল্যান্ড ফ্রান্স প্রভৃতি ৭দেশের প্রায় ২৭০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের তৈরী “প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী” হাতেকলমে এখানে দেখিয়েছিল।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি পরিবারের উপযুক্ত প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী, এই শ্রেণীর বাড়ীর মোট ১৮টি নমুনা এখানে ছিল। আর এক ধরণের বাড়ী ছিল যেগুলি দরকার মত তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে।

প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ীর বিরুদ্ধে লোকের মনে কুসংস্কারের কারণের মধ্যে রয়েছে বাড়ীগুলির আয়ু সম্বন্ধে সন্দেহ, ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা ও শব্দরোধক হবে কিনা সে সম্বন্ধে ভয় এবং বাড়ীগুলির ছাঁচে-ঢালা গড়ন যা নিজস্ব রুচি অনুযায়ী অনেকেরই মনঃপূত নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে মধ্য-য়ুরোপীয় আবহাওয়ায় প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর টিকবে। বাড়ীগুলির একঘেয়েমি দোষ কাটাবার জন্য নির্মাতারা আজকাল কুড়ি থেকে চল্লিশ রকমের বিভিন্ন ছাঁচের বাড়ী তৈরী করছেন। তাছাড়া এসব বাড়ীতে 'ব্লক' পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় বলে মালিকরা খুশীমত বাড়ীর চেহারা পালটে দিতে পারবেন। এ যেন সেই ছোট বাচ্চাদের নানা ঢঙে খেলনার বাড়ী তৈরী করার মত, আর তেমনি সহজ।

'ম্যান ইজ এ র‍্যাশনাল অ্যানিমেল' এই আপ্ত বাক্যটির অর্থ আমার এক ছাত্র এইভাবে করেছিলঃ 'মানুষ রেশনের চালডাল খাওয়া জন্তু'। হেসেছিলাম মনে আছে, কিন্তু বকতে পারিনি। কারণ র‍্যাশনালিটি যে অন্যান্য জন্তুর মধ্যে একেবারেই নেই হলপ করে বলা শক্ত। বরং খাঁটি 'র‍্যাশনাল' মানুষের সংখ্যা ভূমধ্যে যথার্থই মুষ্টিমেয়। অতএব মানুষকেই একমাত্র 'র‍্যাশনাল অ্যানিমেল' বলার মধ্যে আর যাই হোক র‍্যাশনিলিটির কোনো লক্ষণ নেই। মানুষকে যদি একান্তই কোনো বিশেষণ-বাচক বাক্যে বন্দী করতে হয় তাহলে বলা উচিত 'ম্যান ইজ এ্যান অ্যানিমেল উইথ হেডেক'। আশা করি এই তথ্যের কেউ প্রতিবাদ করবেন না যে আলংকারিক এবং ব্যবহারিক অর্থে মাথা একমাত্র মানুষেরই ধরে এবং মানুষের যে মাথা আছে তার প্রমাণও ওই একটিই। স্বাভাবিক নিয়মেই বলা যেতে পারে বুদ্ধির প্রলয় যাদের বেশি মাথাও তাদের বেশি ধরে। এবং স্ত্রীবুদ্ধি যে প্রলয়ংকরী তার একমাত্র কারণই হল ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি মাথা-ব্যথা। কিছু কিছু স্ত্রীবিদ্বেষী লোকেরা অবশ্য বলেন যে মেয়েদের যতটা মাথাধরে তার চেয়ে বেশি তারা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি পুরুষদের নিজেদেরো মাথাধরার বিষয় কিছু কম না। রেস গাইডের প্রতিটি পাতাই ত পুরুষদের পক্ষে মাথাধরার পাতা। তেমনি, শীল্ড ফাইনাল খেলায় রহমানের আত্মঘাতী গোল, নতুন রীতির গল্প, হিন্দি সিনেমা, দাবার চাল, অফিস-কালীন স্টেটবাসে ওঠা ইত্যাদি সব কিছুই পুরুষদের মাথাধরার উৎস। এমনকি কোন কারণ না থাকলেও যে মাথা ধরবে না তার কোনো নিয়ম নেই। মাথা ধরলে মাথা রাখবার যদি একটা কোল এবং একটি সুখস্পর্শ হাত পাওয়া যায় বুদ্ধিমান পুরুষ মাত্রেই সেক্ষেত্রে মাথাকে ধৃত হতে দ্যান। কপালে ওষ্ঠ-তিলক প্রাপ্তির পরমলগ্নকে কোনো প্রেমিকের পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব না। শুধু প্রেমিকই বা কেন বুদ্ধদেব বসুর নায়িকা বিশাখা হবু স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার জন্যে নিজেই মাথা ধরিয়েছিল।

'মাথাধরা' রোগটি ঠিক কবে মানুষের শিয়রে এসেছে বলা শক্ত, তবে মাথাধরাকে সভ্যতার সমান বয়সী বলা চলতে পারে স্বচ্ছন্দে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন এবং মাথাধরা প্রায় যমজ। আজকে কৃত্রিম উপগ্রহের কল্যাণে মানুষের মাথাধরা পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে নভোমণ্ডলে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানকেও আজকাল মাথাধরা নিয়ে বিলক্ষণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে। বলতে গেলে এই রোগটি আধুনিক যুগের একটি ব্যাপক ব্যাধি এবং মানুষের নিত্যসখী। মাথাধরা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন এত্তেলা দিয়ে আসে না। তাই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে তাকে আটকাবার উপায় নেই। রোগটা প্রায় গরিলা সৈন্যের মতন, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে মাথা দখল করে সমস্ত রণাঙ্গণ জুড়ে বিজয়োল্লাস করতে থাকে। তবে মাথা যে কারো কারো ক্ষেত্রে দিনক্ষণ বুঝেই ধরে এ তথ্য জেনেছিলাম আমার এক ফিচার লেখক বন্ধুকে দেখে। একটি দৈনিক কাগজে প্রতি রবিবার তাকে একটা করে রম্য-রচনা জাতীয় নিবন্ধ লিখতে হয়। বন্ধুটি তার নিবন্ধের বিষয় নির্বাচন করে সারা সপ্তাহ ধরে। প্রবন্ধটা লেখে বুধবার। এই বুধবারটিই তার অপরিসীম মাথাধরার দিন। প্রতি বুধ-বারেই ওর মুখ শুকনো দেখি।

—বুধবার বুধবার তোর কি হয় বলত? এরকম মনমরা শুকনো দেখায় কেন তোকে?

—বুধবার আমার পক্ষে সত্যিই একটা শুকনো দিন!

বন্ধুর অধঃপতনে দুঃখ পাই। বুধবারটা যাদের কাছে 'ড্রাই ডে' তাদের মধ্যে ওকে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। আমারো প্রায় শুকিয়ে আসা মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিজেই ব্যাখ্যা করে ব্যস্ত হয়ে।

—না, না তুই যা ভাবছিস তা নয়। বুধবারে বুধবারে আমাকে লেখা সাবমিট করতে হয় কাগজে। সপ্তাহে ছটা দিন ধরে কি নিয়ে লিখবো ভাবি, বুধবার সকাল হলেই দেখি বিষয়গুলো কেমন গুলিয়ে গেছে! যেটা মনে পড়ল সেটা নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখি নানান ফৈজৎ।

ফৈজৎ-এর ব্যাপারটা অবশ্য খানিকটা আমি জানতাম। ষাঁড় ধরার ওপর লিখলে করপোরেশন চটবে, ছাত্রদের নিয়ে লিখলে বাড়িতে বেনামী চিঠি আসে, মেয়েদের নিয়ে কিছু লিখলে সম্পাদকীয় কলমে গাদা গাদা গালাগালি দেওয়া চিঠি বেরোয়। বাড়িভাড়ার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে প্রায় ছমাস বাড়িয়ালাকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। প্রবন্ধটি বেরোনোর পর বাড়িয়ালার সরকারমশাই এসে জানালেন যে তাঁর মনিব ঐ প্রবন্ধটি পড়েছেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিনি দু-একদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। বন্ধুটির দৃঢ় ধারণা 'আলোচনা'টা আর কিছুই না বাড়ি ছাড়ার নোটিশ।

—দ্যাখ যা লিখবি একদিনেই ভেবে ঠিক করে লেখ। সপ্তাহের ছদিন ধরে মাথা ঘামালেই নির্ঘাত সপ্তমদিনে মাথা ধরবে। কারণ মাথাঘামানোর সঙ্গে মাথা-ধরার অতি নিকট সম্বন্ধ।

—যা যা, বাজে বকিস না! হিন্দি ছবি দেখতে গিয়ে ত আমি মাথা ঘামাই না, তবে মাথা ধরে কেন? আর তোর

কথা সত্যি হলে ত সবসময়েই রিক্সাওয়ালা, শিয়ালদা স্টেশনের মুটে এদের সবসময় মাথা ধরে থাকত।

—এদের মাথা ধরবে কেন? অবাক হয়ে তাকাই বন্ধুর দিকে।

—ধরবে না? ওরা সকলেই ত খুব বেশী মাথা ঘামায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওরাই ত রোজগার করে। মাথা-ঘামানোর সংগে মাথাধরার—

বন্ধুর যুক্তির বহর দেখে মাথায় হাত দিয়ে, কিংবা বলতে পারেন মাথাটা ধরেই, বসে পড়ি মাটিতে। ফিচার লেখক বন্ধুটিকে আর কিছুই বলতে পারিনি, কারণ, মাথাধরার রুগীকে কখনও বেশী ঘাঁটাতে নেই। মাথা যাঁদের ধরে তাঁরা মাথায় প্রায়শঃই বিচারবোধকে ধরে রাখতে পারেন না। বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হবার মতন হয় তাঁদের। পাড়ার তারিণীবাবুরও হয়েছিল একদা। তারিণীবাবু আর পরমেশ ঘোষাল দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। প্রায় পনেরো বছর ধরে আমরা দুই বন্ধুকে মোড়ের রতনের দোকানে চা খেতে, খবরের কাগজ ভাগ করে পড়তে দেখে আসছি। অথচ এই গভীর বন্ধুত্বও তারিণীবাবুর মাথাধরাকালীন একটি সংলাপে শেষ হয়ে গেছে। এখন দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলেন। তারিণীবাবুর চা খাওয়া হয়ে গেলেই রতনের দোকানে ঢোকেন আজকাল পরমেশ ঘোষাল। অথচ ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই না। দুই বন্ধু রোজ বিকেলে পার্কে এসে গল্পগুজব করেন। সেদিনও দুজনে বসে গল্প করছিলেন পার্কের বেঞ্চে। কথা বলতে বলতে পরমেশ ঘোষাল লক্ষ্য করেন তারিণীবাবু যেন গল্পে তেমন মন দিতে পারছেন না।

—কি হল তারিণী? কপাল কুঁচকে ওরকম চুপচাপ বসে আছ কেন? জ্বরটর হয়েছে নাকি?

—আর বোলো না, সেই যে দুপুর থেকে আধকপালি মাথাধরে আছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

—মাথাধরার বড়ি খাও না!

—খাইনি আবার, চারটে ট্যাবলেট খেয়েছি, কিসসু হয়নি। সখেদে জানান তারিণীবাবু। আর ঠিক তখুনি না জেনে সাপের গর্তটার দিকে পা বাড়ালেন পরমেশ ঘোষাল। পরমেশ ঘোষাল লোকটা এমনিতে খারাপ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক অবিবাহিত বন্ধুর কাছে স্ত্রীকেন্দ্রিক কথা বলতে ভালবাসেন। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর রান্না, সেবা, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদির গল্প প্রায় রোজই শুনতে হয় অবিবাহিত তারিণীবাবুকে। হয়ত বন্ধুকে বিবাহে প্রলুব্ধ করার জন্যেই স্ত্রীর গল্প করেন পরমেশ ঘোষাল এবং বিবাহিত জীবনের খুটিনাটি শুনতে খারাপ লাগে না বলেই শোনেন অকৃতদার তারিণীবাবু।

সেদিনও ত যথারীতি শুনে যাচ্ছিলেন মাথাধরা নিয়েও, কিন্তু বন্ধুর একটা কথায় হঠাৎ বুঝি তাঁর মনে হয়েছিল শুধু তাঁর মাথাই না সমস্ত জীবনটারই মাথা ধরে আছে। ওষুধেও মাথাধরা যায়নি শুনে পরমেশ ঘোষাল একটু চিন্তিত হয়েই বলেছিলেন—ওষুধ খেয়েও যায়নি? তাইত! তবে কি জানো তারিণী, ডাক্তারী ওষুধটষুধ সব বাজে। এ আমি নিজের ব্যাপার থেকেই জানি। আমারো একবার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। গরম চায়ের সংগে অ্যাসপিরিন খেলাম, নস্যি নিলাম, রগের ওপর দড়ি বাঁধলাম, এতটুকু কমল না। তারপর শেষে—। কথাটা শেষ না করে পরমেশ ঘোষাল সিগেরেটের প্যাকেটটা বার করলেন। বন্ধুর কথা শেষ না করার এই বিশেষ ভঙ্গিটি চেনেন তারিণীবাবু। এরপরেই নিশ্চয়ই স্ত্রীর দেওয়া কোনো টোটকার কথায় আসবেন পরমেশ ঘোষাল। কিন্তু মাথাধরার গরজ বড় বালাই। বন্ধুর থেমে যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে তাড়া লাগান তারিণীবাবু।

—সিগেরেটটা না হয় পরেই ধরালে। বল না কি ওষুধ দিলেন তোমার গিন্নী?

—না, ওষুধ তেমন কিছু নয়। আলোটা নিভিয়ে খাটের ওপর আধশোয়া করে বসিয়ে বন্ধ করে মিনিট কুড়ি টিপে দিতেই বিলকুল অলরাইট হয়ে গেল। সত্যি নীরজা এমন সুন্দর মাথা টিপতে পারে......।

তখুনি মাথাধরায় বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অকৃতদার তারিণীবাবু বন্ধু বিচ্ছেদকারী সেই অমোঘ বাক্যটি ঘোষণা করলেন।

—বৌ-এর টেপায় ভেড়ুয়াদের মাথা-ধরা সারে, ভদ্রলোকের সারে না, বুঝলে?

ব্যস সেই থেকে দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।
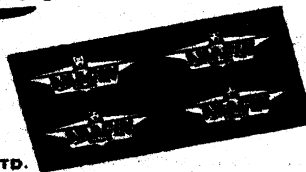
শিরঃপীড়ার মতন খুব কম রোগই সারা বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ হতে পেরেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, মাথাধরার উৎস মাথার মধ্যে নয়, অন্যত্র।

নীরজা বেশ মাথা টিপতে পারে

নিউইয়র্কের শিরঃপীড়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বলেছেন * "আমরা আমাদের রোগীদের মাথাধরার চিকিৎসা করতে গিয়ে কাঁধের ওপরের অংশের চিকিৎসা করি না, করি তার নিম্নাংশের।" ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, মাথাধরা শারীরিক বা মানসিক বিপর্যয়েরই একটা লক্ষণ ব্যতীত আর কিছু নয়। রোগ নির্ণয়ের জন্যে মাথা-ধরার রোগীকে ওই ধরা মাথাটাকে নিয়েই অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যথা, যন্ত্রণাটা ঠিক কোন জায়গায় হচ্ছে—কপালে, মাথার ওপরে, না ঘাড়ের পেছন দিকটায়? কোন সময়ে সাধারণত মাথাধরা শুরু হয়? আধ-কপালে না পুরো কপালে? মাথাধরা কি আকস্মিকভাবে সেরে যায়। না ধীরে ধীরে কমে? অস্বাভাবিক কাজের চাপ, মস্তিষ্ক চালানোর ফলে অথবা খাওয়ার পরে কি মাথাধরা বেড়ে যায়? এর সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ থাকে কি—যেমন বমির ভাব, কানে ভোঁ ভোঁ করা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া ইত্যাদি? যাঁরা পুরোনো মাথাধরার রোগে ভুগছেন তাঁদের আবার এতসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মনোসমীক্ষকের কাছেও ঢুকতে হয়।

* মাথাধরা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি একটি মার্কিণী সন্দর্ভ থেকে গৃহীত। ক, চৌ।

ডাঃ ফ্রায়েডম্যান মনে করেন এই রোগের চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করা একান্তই আবশ্যক। প্রচণ্ড মাথা-ধরার রোগীদের অবশ্য চোখের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, অথবা মানসিক ও স্নায়বিক চিকিৎসার ব্যবস্থাই করতে হয়। 'অ্যাসপিরিন' জাতীয় ওষুধ এই রোগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও অ্যাসপিরিন সেবনের কুফল সম্বন্ধে প্রায় সব চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই একমত। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক উইলিয়াম সারওয়ান তাঁর 'অ্যাসপিরিন' গল্পে লিখেছেন ঃ

আমি রোজ অ্যাসপিরিন খাই মাথা-ধরা সারানোর জন্যে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন অ্যাসপিরিনেও সারবে না। সেদিন কি করবো? বাস্তবিক কিছুই করার নেই তখন। সব মাথা ধরাই অ্যাসপিরিনের প্রভাবে মুক্তি পায় না। শারীরিক কারণে মাথা ধরলে তার হাত থেকে যত সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, মানসিক কারণে ধরা মাথার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তত কঠিন।

আমেরিকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে ধরনের মাথাব্যথা খুব সাধারণভাবে দেখা যায় তার মূল কারণ হল মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশীর ক্রমাগত সংকোচন, দীর্ঘসময় কোনো কাজে মনঃসংযোগ (যোলো হাজার ফিটের হিন্দী ছবি দেখবেন না) অথবা ভাবাবেগপ্রধান এমন কোনো সমস্যার অনুশীলন যাতে মস্তিষ্ক চালানোর প্রয়োজন হয়। আরেক ধরনের মাথাধরা আছে যার উৎসমূল স্নায়ু। একে 'মাইগ্রেন' বলা হয়। এই ধরনের মাথা-ধরার কারণ জানা যায়নি। তবে মাইগ্রেন রোগাক্রান্ত রোগীদের দেখা গেছে তারা একদম পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না। মেয়েদেরই এই ধরনের মাথাধরা রোগ সবচেয়ে বেশি হয়। আর্গোটামাইন টার্ট্রেট শুঁকিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু যাবতীয় গবেষণা সত্ত্বেও ডাক্তারেরা স্বীকার করেছেন যে শিরঃপীড়া বিষয়ক গবেষণার কাজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। অন্যান্য রোগের গবেষণা জীব-জন্তুর ওপর চালানো যায় কিন্তু মাথা-ধরার গবেষণা একমাত্র মানুষের ওপরেই চালানো সম্ভব, কারণ 'ম্যান ইজ দি ওনলি অ্যানিমেল উইথ হেডেক'।

।। মার্কিণী শিশু-সাহিত্যে ভারত ।।

বর্তমান নিবন্ধে মার্কিণ শিশু-সাহিত্যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করব। যাদের পটভূমিকায় যে কোন-ভাবেই ভারতবর্ষ উপস্থিত। ভারত সম্পর্কে আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জ্ঞানলাভের সুযোগ এতকাল ছিল অভিধানের গণ্ডীতেই আবদ্ধ। সম্প্রতি তাদের সে অভাব দূরে হয়েছে। ভারতীয়দের কাজকর্ম, ধ্যানধারণা ও জীবনের নানাদিক সম্পর্কে আলোকপাত করে নতুন নতুন বই রচিত হচ্ছে আমেরিকায়। এই বইগুলি মার্কিণ শিশুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ছেলেমেয়েদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৬০০ বই প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অন্য দেশ সম্পর্কে যখন একখানা কি দুখানা বই প্রকাশিত হয় ভারত সম্পর্কে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সেখানে ছ'খানা।

শার্লি লীজ অরোরা রচিত 'হোয়াট দেন, রামন' এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহের অন্যতম। শ্রীমতী অরোরা জন্মসূত্রে আমেরিকান হলেও বিবাহ করেছেন একজন ভারতীয়কে। ভারতীয় স্বামীর সঙ্গে চার বৎসরকাল দক্ষিণ ভারতে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। 'হোয়াট দেন, রামন' বইটিতে একটি ছোট্ট ভারতীয় বালকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের মধ্যে এই ছেলেটিই সর্বপ্রথম লিখতে পড়তে শেখে।

বইটির রচনা প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন, 'ভারত সম্পর্কে আমার পুঁথিগত জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। যে ভারতকে আমি প্রাত্যহিক সংস্পর্শে উপলব্ধি করেছি আমার রচনার মধ্যে তাকেই মূর্ত করবার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতের সনাতন প্রথা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আধুনিক যুগ-জীবনের সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে—সে সম্পর্কেও কিছু আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি এতে।'

'হোয়াট দেন, রামন' তিনটি পুরস্কার লাভ করেছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শিশু-রক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পুরস্কার।

'হোয়াট দেন, রামন' বাঙ্গালোরের শিশুসাহিত্য সমালোচক বৃন্দা নিরোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মিস্ নিরোদী বলেন, বইটি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় মেজাজে রচিত। আমাদের দেশের লোকেদের ধ্যানধারণা, তাদের মনের ঘাত-প্রতিঘাত ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরত্বকে লেখিকা ভালভাবেই জানেন।

'গেনেক, দি স্টোরি অব্ এ পিজিয়ন'-এর বঙ্গানুবাদের প্রচ্ছদচিত্র

সম্প্রতি মিস নিরোদী শিশুসাহিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকা প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত। শ্রীমতী অরোরার বইটিও এই তালিকাভুক্ত হয়েছে। মিস নিরোদী বলেন, 'আমার মনে হয়, ভারতীয়রা এই বইটির যোগ্য সমাদর করবে, কেননা, সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য এই বই কালের কষ্টিপাথরের বিচারে অম্লান গৌরবে টিকে থাকবে।'

আমেরিকান লেখকদের আরও দুখানি বইও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি বাণী শর্টারের লেখা 'ইণ্ডিয়ান চিলড্রেন'। লেখিকা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বইখানি অভিষিক্ত। কোন বালক বা বালিকার জীবনের কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারটি ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জীবনযাত্রার রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। অপর বইটি ওয়ালটার ফেয়ার সার্ভিসের লেখা 'ইণ্ডিয়া'। সিন্ধু উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময় সেই কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে লেখক যে জ্ঞান লাভ করে-ছিলেন তার ভিত্তিতে এই বইটি রচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে এশিয়ার যাযাবর উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে সব আমেরিকান লেখক কখনও ভারত ভ্রমণ করেননি তাঁদের মধ্যে বীয়াট্রিস ম্যাকলিয়ডের 'অন স্মল উইংস' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই বইয়ের উপাদান আহরণ করা হয়েছে দীর্ঘকাল ভারতে কাটিয়েছেন এমন এক মিশনারী দলের চিঠিপত্র থেকে। বইটি পড়লে মনে হবে লেখক যেন বহুকাল ভারতে কাটিয়েছেন এবং ভারত ও ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাইরের মহল ছাড়িয়ে অন্দরের অন্তরঙ্গতায় এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

জীন কেথওয়েল শিক্ষিকারূপে দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করেন। তাঁর লিখিত 'স্টোরী অব ইণ্ডিয়া' নামক বইটিতে ভারতের ইতিহাস, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের সমন্বয়ের এক সুন্দর ছবি চিত্রিত হয়েছে। 'দি লিটল বোট বয়' বইটি কাশ্মীরের ছোট্ট হাফিজকে নিয়ে লেখা। পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব, কাশ্মীরের কম্বল ব্যবসায়ী ও মহাজনের সঙ্গে হাফিজের সম্পর্ক লেখিকার দরদী লেখনীর বাস্তব স্পর্শে জীবন্ত। 'দি প্রমিস্ অব্ দি রোজ' নামক বইটি পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা তন্ময় হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর ভারত সম্রাট আকবরের আমলে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। তাঁর রচিত অপর একটি বইয়ে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমির জীবনযাত্রা মনোজ্ঞ ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'দি লিটল ফ্লুট প্লেয়ার' নামক এই বইটিতে দেখানো হয়েছে দশ বৎসরের টিকারাম কিভাবে অজন্মার বৎসরে তার পরিবার-বর্গকে আহার জুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখে-ছিল।

আমেরিকার লেখকদের ভারত সম্পর্কে লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে কর্নেলিয়া স্পেন্সারের 'মেড ইন

'হোয়াট দেন রামনে'র অপূর্ব প্রচ্ছদচিত্র

ইণ্ডিয়া', ভারতে প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজের কন্যা সিন্থিয়া বোলজ-এর 'অ্যাট হোম ইন ইণ্ডিয়া' এবং 'ইয়াং ট্র্যাভেলার ইন ইণ্ডিয়া' নামক বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্য ভারতীয় লেখকদের লেখা বইগুলির মধ্যে পার্বতী মেনন থাম্পির 'গীতা অ্যাণ্ড দি ভিলেজ স্কুল' বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। এই বইটিতে ছোট্ট একটি ভারতীয় মেয়ের এক নতুন বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্পর্কে ভীতির কাহিনী অপূর্ব দক্ষতাসহকারে বর্ণিত। তাছাড়া রনি সোলবার্ট নামক আমেরিকান শিল্পীর আঁকা মনোরম ছবিতে বইটি সমৃদ্ধ।

'হোয়াট দেন্, রামন' বইটির চিত্র-শিল্পী হানস গুগেন হাইমের আঁকা ছবিগুলি চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পের পরিবেশসৃষ্টিতে এবং চরিত্র-গুলির মেজাজ বর্ণনায় ছবিগুলি বিশেষ সহায়ক।

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরিয়ান ম্যারিয়া কিমিনোর মতে, আমেরিকান শিল্পীরা ভারতীয় শিশুসাহিত্যের উপযোগী চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর বিরাট চিত্র-সংগ্রহের উল্লেখ করে তিনি বলেন—'এই সংগ্রহগুলি বইয়ের জন্য যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের গবেষণার কাজে লাগবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত সম্পর্কে লিখিত বইগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ও আলোকচিত্রে পূর্ণ।' ম্যারিয়া কিমিনো বিশ্বসাহিত্য থেকে শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ চয়নের জন্য গত পঁচিশ বৎসর ধরে অক্লান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, নিউ-ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ভারতীয় পুস্তক-সংগ্রহ বিভাগটি সারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও পাবলিক লাইব্রেরীর শেল্‌ফের বইয়ের ভীড়ে আরও অনেক ভারতীয় বইয়ের দর্শন মিলবে। এই সঞ্চয়ন ভারতের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার সম্পর্কে আমেরিকার ছেলেমেয়েদের মনে অন্ততঃ কিছুটা আলোকপাত যে করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব্ রাম'। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই বইটি রচনা করেছেন জোসেফ গেয়ার। তাছাড়া জোসেফ জ্যাকবস্-এর লেখা 'ইণ্ডিয়ান ফেয়ারী টেলস্' এবং এলেন সি, ব্যাবিট কর্তৃক নতুন করে বলা ভারতের শাশ্বত অমর কাহিনী 'দি জাতক, টেলস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ভারতীয় সঞ্চয়ন ভাণ্ডারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্যে ভারতীয় লেখকেরাও বেশ কিছু মন-ভোলানো গল্পের বই লিখেছেন। ভার-তীয় লেখকদের রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'গেনেক, দি স্টোরি অব্ এ পিজিয়ন' বইটি শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যমূলক রচনা হিসাবে নিউবেরী পদক লাভ করে। আর, লাল সিং-এর 'গিফট অব দি ফরেস্ট' নামক বইটি ভারতীয় জঙ্গলের এক বিচিত্র উত্তেজনাপূর্ণ জীব[illegible] আলেখ্য।

বেশির ভাগ সময়েই ছেলেমেয়েদের গল্প বলার জন্য রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'জঙ্গল বয়', 'কিম', ধনগোপাল মুখো-পাধ্যায়ের 'দি হিন্দু ফেবলস্ ফর লিটল্ চিলড্রেন', 'টেলস ফ্রম দি পঞ্চতন্ত্র' এবং জোসেফ গেয়ারের 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব রাম' প্রভৃতি ক্লাসিক পর্যায়ের শিশু-সাহিত্যেরই স্মরণ নিতে হয়।

ভারত সম্পর্কে লিখিত কোন বইটি শিশুচিত্ত আকর্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম, সেকথা সঠিক বলা শক্ত। অ্যাসট্রিড বার্জম্যান সাক্‌সডর্ফ-এর লেখা 'চেন্দু দি বয় অ্যাণ্ড দি টাইগার' শিশুদের আদরের বই। এই বইটি অসংখ্য পাঠক বহুবার পড়েছে। বইটি রঙীন ছবি ও আলোকচিত্রে ভরা। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এই জন্যেই একে এত পছন্দ করে। আর, বড় ছেলেমেয়েরাও এ বই সাগ্রহে পড়ে। কারণ, এর মধ্যে তারা ভিন্-দেশের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎ পায়।

আমেরিকার বইয়ের জগতে ভারতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ভরা বইয়ের আজ আর অভাব নেই।

অ. না. দ.

'বন্দীবীর' কবিতার সংগে বাঙালী পাঠকমাত্রেই ছেলেবেলা থেকে পরিচিত। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের একটি কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন : শিখবীর বান্দার ধর্মবিশ্বাস, বীরত্ব ও অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের কাহিনী।

ইতিহাসে শিখবীর বান্দাকে নিতান্ত বর্বর, নিষ্ঠুর হত্যাকারী কিংবা নাটকীয় দানবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এক বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত যে বান্দার প্রতাপে মহাশক্তিশালী মুঘল সম্রাটের সিংহাসন টলে উঠেছিল। কেবল তা-ই নয়, ভারতে শিখরাজ্যের পত্তনও করে গেছেন তিনি।

বান্দার জন্ম রাজপুত বংশে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে। ছেলেবেলায় নাম ছিল লছমন দাস। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ তাঁর মন উদাসী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ঘরে তাঁর মন টিকল না, যোগ দিলেন এক বৈরাগী দলে। সেখানে নাম হল মাধো দাস। অনেককাল ঘুরে বেড়িয়ে শেষকালে মধ্যভারতে এসে ঠাঁই নেন এক হিন্দু আশ্রমে এবং পরে এক সময়ে নিজেই একটা আখড়া খুলে বসেন গোদাবরী তীরে। পনের বছরকাল কাটল এই আখড়ায়।

এই সময়ে একদিন শিখধর্মনেতা গুরু গোবিন্দ সিং এসে দেখা করলেন বান্দার সঙ্গে। সেটা ১৭০৮ সন। তখন মুঘলে ও শিখে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। শিখ-সম্প্রদায় রুখে দাঁড়িয়েছে মুঘল সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ঐ ব্যাপারে বান্দাকে শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বললেন গুরু গোবিন্দ। তিনি সম্মত হলেন।

এবারে শুরু হল বান্দা বৈরাগীর কর্মজীবন। একদল শিখ সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন দিল্লী অভিমুখে। হাতে গুরু গোবিন্দের পতাকা। দিল্লীর কাছাকাছি এসে ছাউনি করলেন এক গ্রামে। তারপর চারদিকে হুকুমনামা জারি করে শিখদের আহ্বান করলেন তাঁর দলে যোগ দিতে। আবার ঘোষণা করে অভয় দিলেন চোর ডাকাত দস্যুর হাত থেকে, ধর্মান্ত রাজপুরুষদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন সকলকে; কোনো রকম অন্যায় অবিচার যাতে না হয় তারও ব্যবস্থা করবেন।

একেই ত লোকের মনে ক্ষোভ আর অসন্তোষের অন্ত ছিল না, উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে। বান্দার ঘোষণায় আগুন জ্বলে উঠল চারধারে। অচিরে দলে দলে শিখরা এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। 'হাজার কন্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।' পাঞ্জাবের কৃষককুল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জমিদার ও রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে—শুরু হল আন্দোলন এবং আনুষঙ্গিক লুণ্ঠন, হত্যাকান্ড। সে ভীষণ ব্যাপার। বান্দার বারণ কেউ শুনল না। আন্দোলন থামাবার চেষ্টাও তিনি করলেন না। তিনি জানতেন, একবার বাঘের পিঠে চড়লে আর নামা যায় না।

অবশেষে দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চল ছেড়ে তিনি দলবলসহ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে চললেন উত্তরাপথে। যেতে যেতে সেনাপত, সধানা, শিরহিন্দ্ প্রভৃতি পথিপার্শ্বস্থ কয়েকটি জনপদ দখল করলেন। এভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বান্দার অধিকার বিস্তৃত হল। এই অঞ্চলের বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা। এই জয়ে বান্দার দারুণ প্রতিপত্তি! শিরহিন্দ জয়ের তারিখ থেকে শুরু করে একটা নতুন সালই তিনি প্রবর্তন করে ফেললেন; তা ছাড়া তাঁর শাসনকার্যের স্মারকচিহ্নস্বরূপ গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর নামাঙ্কিত মুদ্রাও চালু করলেন।

এর কিছুকাল পরেই বান্দা সাহারাণপুর অধিকার করলেন। সমগ্র যমুনা-গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীরা দলে দলে তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিল। শতদ্রু পার হয়ে বান্দা চললেন এগিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম তাঁর অধিকারে এসে গেল। অধিবাসীদের মুক্ত করে দিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ থেকে। আর দুটো মাত্র ঘাঁটি রইল মুঘলদের—রাজধানী লাহোর ও আফগান শহর কসুর। বান্দা যদি আর একটু তৎপর হয়ে দিল্লী ও লাহোর দখল করতেন তাহলে ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত। কিন্তু তিনি দুর্দান্ত সাহসী হয়েও রাজ্য গড়ে তোলার মতো একটা কিছু স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হননি বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর জয়যাত্রা সফল হয়নি।

এদিকে ব্যাপার দেখে শুনে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা'র টনক নড়ে উঠল। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। রাজপুত-পাঠান-আফগান সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন পাঞ্জাব অভিমুখে।

বান্দা তখন ছিলেন মুখ্‌লিসগড় দুর্গে। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী দুর্গ অবরোধ করল। এক গভীর রাত্রে জনকয়েক বাছা বাছা তরোয়ালধারী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে বান্দা বেরিয়ে পড়লেন দুর্গ থেকে, পালিয়ে গেলেন মুঘল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। পরদিন মুঘল সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করল। দখল করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু প্রবেশ করে দেখে দুর্গ প্রায় শূন্য। সৈন্যসামন্ত অল্পই ছিল।

বান্দারই মতো চেহারার একটি লোককে পাওয়া গেল, তার পরনেও ছিল বান্দার পোষাক। মুঘল সৈন্যদের উল্লাস দেখে কে? মনে করল বুঝি বান্দা ধরা পড়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, ওর নাম গুলাব সিং। বুঝতে পারল পাখি পালিয়েছে। ওরা বাজপাখি ধরতে গিয়ে ধরল একটা পেচক!

বাহাদুর শা ক্ষেপে গেলেন। নিরপরাধ লোকদের উপরেই শুরু করলেন অত্যাচার। অবশ্য লাভ কিছু হল না; বান্দাকে ত আর ধরা গেল না? অবশেষে মন ভেঙে গেল সম্রাটের। বেশিদিন আর বাঁচলেন না। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হল।

সম্রাটের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের দাবী নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে লাগল ঝগড়া বিবাদ। বান্দা এতদিন পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এবার সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসে মুঘল অধিকৃত স্থানগুলো পুনরায় দখল করলেন। কিন্তু বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। প্রথমে সম্রাট জাহান্দর শা এবং পরে সম্রাট ফারুক সিয়ার, উভয়েই পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বান্দা পাঞ্জাবে টিকতে পারলেন না; তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ তিনি পালিয়ে গেলেন জম্মু থেকে মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে। পরে তাঁরই নামে ঐ গ্রামের নাম হয়েছিল ডেরা বাবা বান্দা।

১৭১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বান্দা শেষবারের মতো মুঘলদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার উদ্দেশ্যে ঐ পার্বত্য বাসস্থান ছেড়ে চলে এলেন পাঞ্জাবে। দলবল নিয়ে মুখোমুখি হলেন মুঘলদের। কিন্তু পেরে উঠলেন না। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ করে আবার তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মুঘল সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করত, আর বান্দা এ ঘাঁটি থেকে সে ঘাঁটিতে পলায়ন করতেন, ঠিক যেমন বন্য পশু এক ঝোপ ছেড়ে আর এক ঝোপে আশ্রয় নেয়। এতে করে তাঁর লোকক্ষয় হল প্রচুর, অবশ্য পশ্চাদ্ধাবনকারী দলেরও যে ক্ষতি হল না তা নয়।

অবশেষে গুরুদাসপুর নাঙ্গাল নামে একটা জায়গায় মুঘল সৈন্য বান্দাকে ঘেরাও করে ফেলল। উপায়ান্তর না দেখে ওখানে আস্তানা করে নিয়ে শেষ সংগ্রামের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। জনৈক মুঘল ঐতিহাসিক এই অবরোধের এক চাক্ষুষ বর্ণনায় বলেছেন: অবরোধকালেও শিখদের কাজকারবার ছিল দারুণ বেপরোয়া। দিনে দুতিনবার ওরা এক এক দল বেঁধে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসত ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটতে, আর অমনি মুঘল সৈন্যরা আক্রমণ করত তাদের। কিন্তু শিখরা তীর ধনুক আর তরোয়াল দিয়ে ওদের দফা নিকেশ করে পালিয়ে যেত। শিখদের বীরত্বে আর তাদের নেতা বান্দার চাতুরিতে মুঘল সেনাপতিরা এমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল যে তারা মনেপ্রাণে প্রার্থনা করত ঈশ্বর এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে বান্দা তাদের রেহাই দিয়ে দুর্গ থেকে নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পারে।

যাক, বান্দা মরিয়া হয়ে আট মাসকাল দুর্গ আঁকড়ে রইলেন। দেখা গেল ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যসামন্ত সব কাবু হয়ে পড়েছে, বর্শা বা তরোয়াল চালনার ক্ষমতা একজনেরও নেই। বাধ্য হয়ে বান্দা মুঘলদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, এবং হত্যা করা হবে না এই আশ্বাস পেয়ে দলবলসহ ধরা দিলেন। সেটা ১৭১৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা।

বন্দী হলেন বান্দা। হাতে হাতকড়া, পায়ে লোহার বেড়ি, গলায় একটা লোহার হাঁসুলি। দুপাশে দুজন রক্ষীসৈন্য বান্দার সঙ্গে একত্রে হাতকড়ায় আবদ্ধ। এই অবস্থায় একটা লোহার খাঁচায় বন্ধ করা হল তাঁকে।

অন্যান্য বন্দীদেরও গলায়, হাতে-পায়ে পড়ল লোহার বেড়ি। এদের সংখ্যা ছিল সাত শতেরও বেশি। মুঘলদের তরবারের চোটে যে শত শত শিখের মাথা কাটা পড়েছিল সেই ছিন্নমুণ্ডগুলো এবং সাতশত বন্দীকে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে মুঘল সৈন্যরা বিজয়োল্লাসে পাঞ্জাব থেকে মার্চ করে চলে এল দিল্লীতে,—১৭১৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্যারেড করান হল দিল্লীর রাজপথে।

ঐ সময়ে দিল্লীর রাজ দরবারে উপস্থিত দুইজন ইংরেজ এই ঘটনার নিম্নরূপ এক সরকারী বিবরণ বিলাতে পাঠিয়েছিলেন :—

'শেষ পর্যন্ত লাহোর অঞ্চলের সেই বিখ্যাত বিদ্রোহী গুরুকে তার পরিবার এবং সহচরবর্গসহ (সংখ্যায় ৭৮০) বন্দী করা হয়েছে। দিন কয়েক হল তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উটের পিঠে চড়িয়ে আনা হয়েছে রাজধানীতে। উটগুলো এই উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকেই পাঠান হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধে হত প্রায় দু'হাজার শিখের ছিন্নমুণ্ড কাষ্ঠফলকে বিদ্ধ করে নিয়ে আসা হয়েছে। বিদ্রোহী গুরুকে প্রথমে হাজির করা হয় সম্রাটের সামনে, তারপরে পাঠান হল কারাগারে। এতদিন রাজস্ব করে গুরু যে-টাকাকড়ি ধনরত্ন সংগ্রহ করেছে সেসব কোথায়, কোন্ গুপ্তস্থানে লুকানো আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তার একটা হদিস্ বের করা যায় কিনা দেখবার জন্যে তাকে আপাতত দিনকতক সময় দেওয়া হয়েছে, পরে তাকে হত্যা করা হবে। এদিকে প্রত্যহ বন্দী শিখদের এক'শ জনকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কী ধৈর্যের সঙ্গে তারা মৃত্যুবরণ করছে দেখলে অবাক হতে হয়। শেষ পর্যন্ত স্বধর্ম ত্যাগ করেনি।'

সঞ্চিত ধনসম্পদের খোঁজ পাবার আশায় ক্রমান্বয়ে তিনমাসকাল বান্দাকে নৃশংস নির্যাতন করা হল, কিন্তু বৃথা। অবশেষে একদিন তাঁর চার বছরের ছেলে অজয় সিং, পাঁচজন সেনাপতি ও অন্য একদল শিখ বন্দীসহ বান্দাকে আবার দিল্লীর রাজপথে প্যারেড করান হল। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হল দিল্লী থেকে এগারো মাইল দূরে মেহেরৌলি নামক স্থানে, বাহাদুর শা'র সমাধিস্থলে।

হত্যা করার পূর্বে বান্দাকে বলা হল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মুক্তি দেওয়া হবে। বান্দা কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন পুত্র অজয় সিংকে তাঁর চোখের সামনে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল।

এইভাবেই জীবন সাঙ্গ হল বান্দা বাহাদুরের। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন শান্ত সমাহিত জীবনযাপন করবেন বলে। কিন্তু একদা অতর্কিতে জীবনের মোড় গেল ঘুরে। শান্তির আবাস ছেড়ে চলে এলেন লোকালয়ে, যত অত্যাচারিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন অস্ত্র এবং মহাক্ষমতাশালী এক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার ভিত এমনভাবে নেড়ে দিলেন যে, আর কখনো তা মাথা তুলতে পারেনি।

এখন নিজেকে সৌমেনের গুহাশ্রিত জীব বলে মনে হচ্ছে, বিরাটকায় জন্তুর তাড়া খেয়ে এক অন্ধ কোটরে সে আশ্রয় নিয়েছে। তার চারদিকে এক আদিম আঁধার ঘন হয়ে ছড়িয়ে। আর তার বুকে মুখ লুকিয়েছে চেয়ার, টেবিল, বাক্‌স, জামা-কাপড় রাখবার র‍্যাকেটটা, কোণে ঝোলান দড়ি, দেয়ালের ক্যালেণ্ডার দুটি। সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ কলকাতার এই দুকূল ভাঙ্গা-চোরা গলির পাশে দশ বাই দশ ফুট অন্ধকার ঘরটাতে ধোঁয়ার আস্তরের মাঝে শুয়ে শুয়ে নিজেকে গুহাবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে সৌমেন কিন্তু অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল।

জানলার বাইরে সৌমেন দৃষ্টিক্ষেপ করল। তার ঘরের উল্টোদিকের পাঁচ বাই দুয়ের সি বাড়ীর পনের বছরের শিপ্রা আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসে গেছে। দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করছে। আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে গলির লোক দেখছে। চিৎপুরের ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকার মত সৌমেনের মাথাটা ধরে রয়েছে। একপাশের কপালের 'পরে শিরাটা দপ-দপ করছে। চোখদুটো জ্বালা করছে অনবরত।

এতক্ষণ সৌমেন অফিসের জামা-প্যাণ্ট না ছেড়ে জুতো পড়েই শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা বালিশের 'পরে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর চোখ বুজে ভাবছিল। সত্যেনদের কথা। সত্যেনদের মেসের ঘরখানা তার বুজে-থাকা চোখের আঁধারের মাঝেও ব্ল্যাক-আউটের রাতের ঘোমটা-পড়া আলোর মত জ্বলজ্বল করছিল।

সৌমেন ভাবছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সত্যেনের ঘরে দরজা বন্ধ করে ওরা গোল হয়ে বসেছে। ওরা চারজন। সত্যেন, রবি, অশোক আর সত্যেনের রুমমেট অরবিন্দ। সত্যেনের খাটের 'পরে বসে থাকা তিন-জ'নর সামনে কিছু খুচরো পয়সা জড়ো করা। হয়ত পয়সা চাপা দেওয়া এক-আধটা টাকাও। আর অরবিন্দ সিগারেটের খরচ তুলবার জন্যে খালি কৌটো হাতে বোর্ড-মানির আশায় বসে।

টুং-টাং পয়সা পড়বে, রাত বাড়বে, চল্লিশ পাওয়ারের ডুমটা ঘিরে কয়েকটা পোকা ক্লান্তিহীন ঘুরতে থাকবে। আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে খেলা এগোবে। সত্যেন নিশ্চয়ই পুকুরের শান্ত জলে মাছের বুড়বুড়ি কাটার মত মাঝে মাঝে বলবে—সৌমেনটা আজও এল না। অনেকক্ষণ পর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে হাই তুলে রবি বলবে, এবার উঠব। কিন্তু উঠবার কোন লক্ষণ সে দেখাবে না।

সৌমেন আজ ওদের আসরে গেল না। গতকালও যায়নি। চিড়িয়াখানায় থাকা-কালীন (তার এক ছোট বোন শিজু তাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটার এই নামকরণ করেছিল) সেই যে তার ইন্‌সম্‌নিয়া ভোগা শুরু হয়েছিল সেটা এতদিনে ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইদানীং আবার এমনি একিউট স্টেজে পেঁৗছেছে যে গত কিছু-দিন ধরে তার প্রায় ঘুমই হচ্ছে না। মাথাটা সব সময় ধরে রয়েছে। চোখদুটো জ্বালা করছে আর কপালটা টিপটিপ।

গতকাল সত্যেনদের ওখানে না গিয়ে সে অনেক রাত অবধি গড়ের মাঠে শুয়ে কাটিয়েছে। খানিক দূরে মনুমেন্টের মাথা ঘিরে অনেক তারার আকাশ আর দূরে নিয়ন আলোর রকমারী সাজ দেখতে দেখতে কখন তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। আর সেই চেতনার আবছা আলোয় সৌমেন তাদের বিরাট চুনবালি-খসা বিবর্ণ বাড়ীটা পিতু পিতু প্রদীপের মত দেখছিল। সেই বিকট বাড়ীটার একটি খুপরিতে তার আরও সাতটি সহোদর-সহোদরা আর জনক-জননী (আহা জনক-জননী!) বেঁচে থাকার আত্মপ্রসাদ লাভ করছে এবং অভিসম্পাত দিচ্ছে। সৌমেন ও-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগেই দীপু পালিয়েছিল। পরে শুনেছে চোপ-সান যৌবন নিয়ে বছর দুই বাদে সে ফিরে এসেছিল। প্রদোষের প্লুরিসি হবার খবরও তার কাছে এক চিঠির মাধ্যমে পেঁৗছেছিল। ও বাড়ীতে থাকাকালীনই অতনু কোন এক চোরাকারবারীদের দলে ভর্তি হয়েছিল। কখনও কখনও উল্কার মত সে বাড়ীতে হাজির হত। দু-চার ঘণ্টা বা এক-আধদিন থাকার পর মায়ের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে সে পালাত। বুঝতে পারার পর প্রথম প্রথম কদিন মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সৌমেন বিলাপ করতে দেখেছিল। আফিমের নেশায় স্থাণুর মত বসে থাকা লোকটিকে কথার আঁকশি দিয়ে মা মাটির বুকে জলকাদায় পেড়ে ফেলতে চাইত। দেয়ালের বুকে ছোঁড়া বলকে ফিরিয়ে দেবার মত নির্বিকার ঔদাসীন্যে সৌমেন বাবাকে সব কথা অগ্রাহ্য করতে দেখত। কদিন বাদে অতনুর কল্যাণ কামনায় কালীর কাছে মাকে সৌমেন পুজো দিতে দেখেছিল। দাদা অজয়ও এখন ও-বাড়ীতে নেই। কাকে বিয়ে করে বাড়ী থেকে সরে গিয়েছে। বিজু কোন এক কারখানায় কি একটা কাজ নিয়েছে। শুধু বোধহয় তার বাবাই স্থির আছে। আফিমের প্রভাবে জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গের কূলে বসে নির্ভাবনায় রোদ্দুরে পিঠ তাতাচ্ছে।

বাবাকে সৌমেনের এক বিরাটকায় কীট বলে মনে হত। অথবা মৃত এক শামুক।

ভাবতে ভাবতে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সৌমেন চমকে উঠেছিল।—বালিশ হবে বাবু।

চোখ মেলে তাকাতেই দেখে ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরনে একটা লোক আবছা অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সৌমেন বিরক্ত বোধ করছিল। হাত নাড়িয়ে বিদায় দিতে চাইল। লোকটা তবু দাঁড়িয়েই রইল। সৌমেন উঠে বসল। তারপর তাড়া লাগাল—কি, কি চাই তোমার।

পাঞ্জাবী পাজামা এবার একটু সচল হল। লোকটা মুখ খুলল, একটু থেমে বলল—লেড়কী আছে বাবু, খুপসুরৎ, কলেজ গার্ল। যাবেন?

পলকের তরে সৌমেনের চোখে ভাসল, এক উষ্ণ নারীদেহ, বাসন্তীর। অনেকদিন বাসন্তীর কাছে সে যায়নি। এতদিনে অনেক খদ্দেরের ক্ষুধা মেটাতে মেটাতে বাসন্তী নিশ্চয়ই তাকে ভুলে গেছে।

কিন্তু নগ্ন নারীদেহ যা এক্ষুণি তার চোখে ভাসছিল তা তাকে মোটেই বিচলিত করল না। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, নেহি, যাও।

সৌমেন অফিসের জামাজুতো পরে তার বিছানায় এখনও নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। এক গভীর আঁধারের মাঝে সে এখন নিমজ্জিত। আর এ আঁধারের রাজ্য ছাড়িয়ে আলোর সীমানায় পেঁাছুবার কোন তাগিদ সে বোধ করছে না। নস্যির টিপ তুলবার মত ডান হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে কপালের পাতলা চামড়াকে টেনে তুলবার সে চেষ্টা করছে। তাতে মাথা ধরার প্রচন্ড যন্ত্রণায় সে যেন খানিকটা আরাম অনুভব করছে। হঠাৎ তার স্লিপিং পিলের শিশিটার কথা মনে পড়ল। অনেককাল সে পিল খায়নি কিন্তু আজ তাকে খেতেই হবে। আর খেয়ে স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে বিশ্রাম দিতে হবে। দিনের পর দিন তার নিদ্রাহীনতা, বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে পরিশ্রমকাতর ও উত্তেজিত করে তুলছে। বাক্সটার মধ্যে শিশিটা রয়েছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। এবং এখনই, নইলে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পর তার আর মেজাজ থাকবে না।

সৌমেন আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে অলস দৃষ্টি ছড়াল। শিপ্রা বই খোলা রেখে বাড়ীর মধ্যে গেছে। বইয়ের পাতা ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

সৌমেন চোখ বন্ধ করে আলোটা জ্বালল। চোখ বোজা থাকা সত্ত্বেও সে টের পেল এক ঝাঁক বিদ্যুৎ কোথা থেকে ছুটে এসে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপর ঠিক কখন চোখ খুলবে ভাবতে ভাবতে এক সময় সত্যি সত্যিই সে তাকাল। আর ঘরের সমস্ত জিনিস তার চোখে প্রত্যক্ষ হল। প্রাত্যহিকের স্পর্শ-লাগান পুরোন জিনিসকটি যা দেখতে দেখতে তার চোখ ক্ষয়ে গেছে সেগুলো আলাদা আলাদা ভাবে আর দৃষ্টি দিয়ে না ছুঁয়ে সে জামাকাপড় ছাড়ল। তারপর হাতমুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকল। ঢোকার মুখে বাড়ীটার ভেতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ভেতরটা অন্ধকার। মোহিত নেই। খুব সম্ভবতঃ রেবাকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। এতও সিনেমা দেখে মোহিত!

সিনেমাটাকে নেশা করে নিয়েছে মোহিত। সৌমেন ভাবছে, তার যেমন তিনপাত্তি খেলাটা। নেশা ছাড়া এ যুগে মানুষ বাঁচতে পারে না। ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা আর পাপের ভয় মানুষকে আজকাল নাড়া দিতে অক্ষম। মরচে পড়া, ধার ক্ষয়ে যাওয়া বঁটির মত মানুষের ফালতু জিনিসের জঞ্জালে তা অবহেলায় পড়ে থাকে। কাজেই পরলোকের আকর্ষণ ও ধর্মের নেশা টুটে-যাওয়া মানুষ স্বভাবতই কোন পার্থিব তরল নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে চায়।

এখন তার মনে পড়ছে তার মা একদিন দীপুকে চুল ধরে টেনে হিচড়ে মা-কালীর ফটোর সামনে এনে ফেলেছিলেন। দেবীর পা ছুঁইয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন মূর্তিমান ক্রোধে পরিণত। চুল খুলে অগোছাল। সমস্ত মুখে চটচটে ঘাম আর শরীরের সমস্ত পেশী কঠিন, শক্ত। সে মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু মা-কালীর পা স্পর্শ করে বলে দেওয়া কথাগুলো আওড়ে যেতে আপত্তি করেনি। কিন্তু পনেরদিন পার না হতেই ক্লাশ এইট অবধি পড়ে ক্ষান্ত দেওয়া উনিশ বছরের দীপু চিড়িয়াখানা সদৃশ বিরাট বাড়ীর আর একটি চিড়িয়ার সাথে পালিয়ে যেতে কুন্ঠাবোধ করেনি। আর দেখে সৌমেনের হাসি পেয়েছিল, ভীষণ হাসি। চুনবালি খসে পড়া তাদের ঘরখানার মাঝে অট্টহাস্যে তার খানখান হয়ে ভেঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। তার মন এক প্রচন্ড খুশীতে নেচেছিল মেঘডাকা ময়ূরের মত। সে কি মায়ের পরাজয়ে না একটা খাবার মুখ কমে যাওয়াতে সৌমেন আজও জানে না।

কিন্তু মোহিত সিনেমার নেশায় মগ্ন হতে চাইলেও রেবা সিনেমাতে খুব আকর্ষণ বোধ করে না। সে বরং মাঝে মাঝে সৌমেনকে ধরে টানতে ভালবাসে। বছর কয়েক আগে সেই বিসদৃশ বাড়ীটা হতে বেরিয়ে আসার সময় আগ্রহ করে রেবাই তাকে এখানে এনেছিল। মাঝে মাঝে রেবা তাকে অফিসে যেতে দেয় না। মোহিত অফিসে বেরিয়ে যাবার পর খেয়ে দেয়ে দুপুরে তাকে নিয়ে রেবা রাস্তায় নামে। আর বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক—কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত খালি বাসে রেবা সৌমেনকে পাশে নিয়ে বসে। আর বামবাহু অথবা দক্ষিণবাহুতে তীব্র দহন অনুভব করতে করতে সৌমেনের মনে হয় তাদের দুজনের দুটো মন যেন দুটো সাপের মত জড়িয়ে পাক খাচ্ছে।

বাক্সটা খুলে ফেলেছে সৌমেন। ডাইনে বামে একোণে ওকোণে আঙ্গুল ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করল। স্লিপিং পিলের শিশিটা হাতে ঠেকছে না। কাপড়গুলো ওপর থেকে তুলে মেঝেতে ডাঁই করতে লাগল। আর বাক্স খালি হতেই এক কোণে তার চোখে পড়ল লম্বাটে শিশিটা। কিন্তু ততক্ষণে সৌমেনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে বান্ডিল দু'তিন চিঠির 'পরে। একটা প্যাকেট হাতে তুলল সে। পুরোন সোঁদা সোঁদা গন্ধ তার নাকে লাগল। সব তার লেখা চিঠির কপি। লেখা হয়েছিল অনুপমকে।

অথচ অনুপমের লেখা চিঠি একখানাও নেই। এমনকি ছায়ারও নেই। সৌমেনের মনে পড়ছে এককালে নিজেকে সে ভালবাসতে পেরেছিল। আমি সৌমেন-প্রেমে মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সৌমেনের চিন্তা-ভাবনা লেখা—সৌমেন সম্পর্কিত সব কিছু আমার কাছে এত প্রিয় ও অনুরাগের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আমার আর অন্য কিছুতে মন ছিল না। অথবা অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এনে আমি আত্মস্থ হতে চেয়েছিলাম। সবাইকে অবাঞ্ছিতের মত সরিয়ে দিয়ে আমি নিজের মাঝে মগ্ন হয়েছিলাম।

তাই আজ অনুপমের চিঠি, ছায়ার চিঠি, তপেনের চিঠি—কিছু নেই, কেউ নেই। কিন্তু সেই সৌমেন-ভালবাসাও আমি ধরে রাখতে পারিনি। আমি আস্তে আস্তে সৌমেন সম্বন্ধেও নিস্পৃহ হয়ে গেলাম। আমার মনটা এক বন্ধ্যা সমভূমি হয়ে গেল। বৃষ্টিহীন, বায়ুহীন, তাপহীন এক পাথুরে ভঙ্গা আমি। আমার কাছে প্রতিটি দিন অন্যদিনের সমান্তরাল, প্রতিটি রাত অন্য রাতের প্রতিচ্ছু। সন্ধ্যা আমার কাটতে চাইত না। এখানে ওখানে ঘুরতাম উদ্দেশ্যহীন, নির্দেশশূন্য, বাসনা জাগলে আর বাসনাকে ঘিরে দেহমন অনবরত পাক খেতে থাকলে পকেটে হাত দিতাম। টাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে আমি মাঝে মাঝে

বাসন্তীর ওখানে যেতাম ক্ষুধা মেটাতে আর ক্ষুধা জাগাতে। এখন আর যাইনে। সময় কাটাবার পথ খুঁজিনে। এখন সোজাসুজি সত্যেনের ওখানে চলে যাই। সত্যেন আর ওর রুমমেট অরবিন্দ অপেক্ষা করে আমাদের জন্যে। আমি যাই, অশোক আসে। রবি আসে সবার শেষে। আর সত্যেন খিস্তি করে, বউয়ের গন্ধ ছেড়ে আসতে পারলে বাপধন। রবি কান্নার মত মুখ করে। কি বলতে যায় কিন্তু কথাটা যেন গলায় আটকে যায়। একটু বাদে সামলে নিয়ে বলে, স্বরটা কেমন ক্লান্ত শোনায়—তবু তো আসি। না এসে পারিনে। তারপর তারা তাশ বাটবে। প্রায় নিঃশব্দে খেলা চলবে। শুধু পয়সার টুংটাং মিষ্টি শব্দ উঠবে। আর রুপোলী পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ কখনও সখনও চিকচিক করে জ্বলবে। চশমা চোখে অশোক বিরক্ত হয়ে শুধু মাঝে মাঝে বলবে, সত্যেন তোদের এ ড্রুমটা পাল্টা, তাশ প্রায় চিনতে পারছিনে। ম্যানেজারকে অন্ততঃ ষাট পাওয়ার লাগিয়ে দিতে বলিস। নইলে তুইই বদলে নিস।

শুকিয়ে যাওয়া গাছের মত স্থাণু নিষ্ক্রিয় সৌমেন মেঝের 'পরে ডাই করে রাখা কাপড় জামার পাশে বসে হাট করা প্রায় শূন্য বাকসটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে ভাবছিল। হাতে তার একতাড়া চিঠি। তার মাঝে পুরোন সৌমেনের গন্ধ।

সৌমেন ততক্ষণে তার এক চিঠির মাঝে ডুব দিয়েছিল।

'অনুপম তুমি আমার দিনগুলোর খবর জানতে চেয়েছ। তা দিনগুলো কাটছে মন্দ নয়—বিরক্তি, ব্যস্ততা, ভালবাসায় মাখামাখি দিনগুলো। সকালে উঠেই স্পষ্ট বিরক্তি, শ্রীমান মনখারাপ অফিসে যাবার কথা মনে পড়াতে। মনটা চায় কুঁড়েমি করতে, ভাবতে, পড়তে, কখনও বা লিখতে। সেই একই সময়ের জন্যে অফিসে যাবার জন্যে ভারি ঝাপটান—কষ্ট হয়. (এটা মার্চ মাস—এরই মধ্যে আমার দশদিন ক্যাজুয়াল লীভ চলে গেছে)। তবু, নান্য পন্থা। বিরক্তি চেপে, কষ্টটুকু বুকে করে সেই ছককাটা পথে পদক্ষেপ।

ছুঁচোগেলার মত অফিসের সময়টুকুকে গিলি। কখনও কাজের চাপে দিশাহারা, কখনও দৈনন্দিন (দৈনিকও বটে) খবরগুলোকে নিয়ে গুলতানি, কথার হাউইয়ের ছড়াছড়ি, ঠাট্টা তামাসা তর্ক (বহু পুরোন ও বহুকথিত ঠাট্টাগুলোকে আমরা ঘুরে ফিরে বলি, হাসি, হাসাই); আবার কখনও বা কাজ আর কর্মকে ঠেলে দিয়ে সময়ের বুকে সাঁতরাই ভাবনা জুড়ে জুড়ে। আমি তখন নিথর মৌন। শুধু সিগারেটের গন্ধ ভাসে আমার চারধারে।

বিকেলে অফিস শেষে, আর সাথে সাথে এক প্রবল ক্লান্তি, আমার মনের 'পরে এক জগদ্দল পাথর, আমার চিন্তায় কি এক বিষণ্ণতা Waste, a colossal waste. সমস্ত দিনটাই আমার শুয়োরের মাংস হয়ে গেল পুরোন রসিকতার জের টেনে টেনে, স্থূল আদি রসাত্মক কথাবার্তা শুনে হাসতে হাসতে। ওহ্, হাসতে হাসতে আমি যদি কাঁদিতে পারতাম!

কিন্তু সূর্যালোক নিভে আসা বিকেলের গরম আলোর মাঝে এসপ্লানেডে এসে দাঁড়াতেই মনটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর খুশীতে উচ্ছল। ততক্ষণে অফিসের গন্ধ মুছে ফেলে আমি পৃথিবীর গন্ধ গায়ে মেখে নিয়েছি। বিকেলের হাওয়াকে বলতে ইচ্ছে হয়—এই যে তুমি, বন্ধু, এসেছ—মুক্তি নিয়ে, ভালবাসা নিয়ে। মনে মনে ভাবি—এই যে আমার জীবন, আমার মুক্তি—এই যে আমি। আমি মরে গিয়েছিলাম, সমস্ত দিনভর আমি মৃত মমি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাংস, আত্মা (অথবা আমার ইচ্ছা বাসনা সাধ) আমি বিক্রী করে দিয়েছিলাম, এখন আমি আবার আমাকে ফিরে পেয়েছি, এই যে আমি—আমি, সন্ধেটুকুকে নিয়ে আমি মাতাল হতে চাই, পাগল হবার সাধ জাগে। রাতটুকু থেকে কি এক ঐশ্বর্য আমি নিংড়ে বের করতে চাই—কি এক সম্পদে সেও আমায় বলীয়ান করতে চায়—কিন্তু কোনক্রমেই সাফল্য আমার করায়ত্ত হচ্ছে না। সাধ্য না থাকার দরুণ আমার প্রবল সাধ রাতের আঁধারের বুকে এক আর্তনাদের জন্ম দেয়। আমি রোজ অসীম তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ভোরের আলো নেবাই।

কিন্তু তার পরও কি রেহাই আছে। আমার চোখের স্পষ্ট নিদ্রাবিহীনতার বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হই। অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হবার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তারপর নিদ্রাদেবী দয়াপরবশ হয়ে আমায় আশ্রয় দেয়। তাও পরিপূর্ণ অভয়ের সাথে নয়।'

অনেকদিন বাদে সৌমেন পুরোন চিঠির কপি পড়তে কৌতুক বোধ করছে, বিদ্রূপে তার ঠোঁট বেঁকে গেল। ছেলেমানুষের মত উচ্চরোলে তার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে হাসল না। পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা সৌমেন চিঠি থেকে শুধু মাথা তুলল আর চোখ কুঁচকে একটা যন্ত্রণাকে বিদায় করতে চাইল।

আর তখনই সৌমেনের ছায়ার কথা মনে পড়ল। কিন্তু ছায়ার চেহারাটা সে কিছুতেই মনে আনতে পারছে না, তার মনে পড়ছে না। চোখ, নাক, কপাল, ঠোঁট, চিবুক, গলা—সব মিলিয়ে ছায়ার যে আলাদা বাহ্যিক অস্তিত্ব সেটা সৌমেন কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না। চেষ্টা করে করে সৌমেন অবশেষে ক্ষান্ত দিল।

হঠাৎ খসখস একটা আওয়াজ উঠতেই সৌমেন মুখ তুলল। তার ডানদিকের দেয়ালের কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্র্যাকেটটার পাশে একটা অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি ঝুলছিল। সেই ছবিটার ওপর দিয়ে দ্রুত একটা টিকটিকি ছুটে

গেল একটা আরশুলার পিছু পিছু। কিন্তু আরশুলা শিকারে ব্যর্থ হয়ে টিকটিকিটা খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর টিকটিকির দ্রুত পদসঞ্চারে ক্যালেন্ডারটা মদির কটাক্ষসহ সেই স্বল্পবসনা মেয়েটিকে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেয়ালের 'পরে দুলতে লাগল।

ক্যালেন্ডারটির দিকে তাকালেই তার বাসন্তীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বাসন্তীর ওখানকার আর আর মেয়েগুলোর কথা।

মোহিত তাকে এই ক্যালেন্ডারটা দিয়েছিল। দেবার সময় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলেছিল, তোমার ঘরে রেখে গেলাম। রেবার জ্বালায় ঘরে রাখার উপায় নেই। বলে—এখানে ছেনালীপনা চলবে না। মাঝে মাঝে তোমার ঘরে এসে বরং দেখা যাবে।

সৌমেন হাসছে। মোহিত তুমি রেবাকে লুকিয়ে নগ্ন ছবি দেখতে চাও। অশ্লীলতা তোমায় সমানে টানছে। আর পা ছুঁইয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে রেবা তোমাকে ফাঁকি দিয়ে রেস্তোরার চোরকুঠুরীতে আমায় নিয়ে বসে। পায়ে কেমন এক আদুরে ভঙ্গিতে বলে, সৌমেন এবার একটা বিয়ে কর—কেমন! আমার বোনকে তোমার পছন্দ হয়?

আর আমি? আমি ওর গলার স্বরে টের পাই ওর মনে এক ভূমিকম্পের ধ্বস নেমেছে, এক অবুঝ আকাঙ্ক্ষায় ও কাঁপছে। উত্তর না দিয়ে (কেননা, উত্তর ও সত্যি সত্যিই চায় না) খেলার ছলে ওর হাতখানা নিয়ে আমি পিষি।

মোহিত ফাঁকি দিচ্ছে, ফাঁকি দিচ্ছে রেবা। রবি বৌকে ফাঁকি দিয়ে জুয়া খেলে দিনের পর দিন। জেনেশুনেই ফাঁকি দিচ্ছে। আর আমি? আমি সময়ের হাত থেকে পালিয়ে রোজ সত্যেনদের আসরে গিয়ে জুটি।

আমরা প্রত্যেকেই কাউকে না কাউকে ফাঁকি দিই। ফাঁকি দিচ্ছি—কেননা উপায় নেই। কিন্তু এতেও আমরা কিছু লাভবান হচ্ছিনে। আমরা অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি, ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিনে।

হঠাৎ সৌমেনের মনে হল—সে গরমে ঘামছে, আর বুক আর পিঠের ওপর দিয়ে ঘামের বিন্দুগুলো পিলপিল করে নামছে। ঘাড় আর কপালটা ভেজা ভেজা লেপটান। মাথাটা তার প্রায় যন্ত্রণায় টনটন করছে। আর বাঁ দিকের কপালটা দপদপ করছে। গায়ে জামাটা গলিয়ে সে চট করে বেরিয়ে গেল।

সৌমেন হোটেল থেকে একেবারে খেয়েদেয়ে ফিরল। সামনের পাঁচ বাই দুয়ের সি বাড়ীর শিপ্রা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। তারও শোয়ার আয়োজন করতে হবে। মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা কাপড়-চোপড় কাগজপত্রের থেকে শ্লিপিং পিলের শিশিটা সে খুঁজে বার করল। ট্রেন ফেল করার ব্যস্ততা নিয়ে সৌমেন অন্য জিনিসগুলো বাক্সের মধ্যে কোনরকমে ঢুকিয়ে রাখল। চকচকে শিশিটা প্রায় ভর্তি। হাতের মুঠোতে নিয়ে বার দুইতিন সে নাড়ল। শিশির ভেতর পিলগুলো যেন খুশীতে হাসল। আর নড়তে চড়তে ঝনঝন শব্দ করল। কটা খাবে সৌমেন ভাবছে। দুটো তিনটে চারটে না আরও বেশী। সৌমেন মনে করতে পারছে না। তার ডাক্তারবন্ধু দেবাশীষ এককালে তাকে কি সব বুঝিয়ে বলেছিল। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব বুঝিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল, তার ভারগ্রস্ত মাথা সে সব অঙ্কের সাবধানী হিসেব একদম গুলিয়ে ফেলেছে। কটা খেলে প্রগাঢ় তন্দ্রায় সে ঢলে পড়বে অথচ চৈতন্যের এপারে থেকে যাবে আর কটা তাকে চৈতন্যের পরপারে পৌঁছে দেবে সেসব সৌমেনের স্মরণ নেই। তবে নিশ্চয়ই দু একটায় কোন কাজ দেবে না।

আর ডোজ বেশী হলেই বা ক্ষতি কি! শুধু মোহিত কাল সকালে খবরের কাগজটা নিতে এসে তাকে তুলতে পারবে না। প্রথমে সে বিরক্ত হবে, পরে ভয় পাবে। আর সে নিজে সময়কে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। এবার আর অতৃপ্তির কোন প্রশ্ন থাকবে না, অসন্তুষ্টির কারণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হঠাৎ সৌমেনের হাসি পেল। আমি ভাবনায় খুব রোমান্টিক হয়ে পড়ছি। মৃত্যুবিলাসে মগ্ন হচ্ছি।

সিরিয়াস সৌমেন ভাবছে। আমরা সচেতন ভাবে মৃত্যুর কথা বাদ দিয়েও বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করতে পারছিনে। আমরা আমাদের জীবনে কিছুই প্রমাণ করতে পারিনে। শুধু আমরা একটা ক্লান্ত স্থবির বৃত্ত পরিক্রমা করে যাচ্ছি। একই জায়গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা ঘুরছি, ঘুরছি আর ঘুরছি। আমাদের জীবনে পুরোন ভাঙা একটা রেকর্ড বেজেই চলছে।

"......সৌমেন এবার একটা বিয়ে কর—কেমন!"

অনেকক্ষণ ধরে সৌমেন বাথরুমে যাবার প্রয়োজন অনুভব করছিল। ফেরার পথে সৌমেন মোহিতদের ঘরের দিকে তাকাল। এদিকের খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের মেঝে একরাশ তীব্র আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আর সেই উজ্জ্বল আলোয় নিচে একটুকরো মুখখোলা ছবির

মত স্থির। সোমেনের দৃষ্টি আটকে গেল, সোমেন দাঁড়িয়ে গেল।

সোমেন রেবার কথা ভাবছে, মাঝে মাঝে একটা অস্থিরতা রেবাকে পেয়ে বসে। রেবা তখন তাকে আশ্রয় করে। সেটাকে রেবার চিন্তাবিলাস বলে সোমেন কোনদিন ভাবতে পারেনি। রেবার অস্বাভাবিক দৃষ্টি, গলায় ক্লিষ্ট স্বর—সব মিলিয়ে তার চেতনাকে সোমেনের কোনদিন কৃত্রিম বলে মনে হয়নি। রেবার মাঝে একরকম অসন্তুষ্টির চেহারা আবিষ্কারে সোমেন পরোক্ষে খুশী হয়েছিল। আজ এক্ষণে জানলা দিয়ে একটুকরো নীরব নিভৃত সংলাপ দেখতে-থাকা সোমেনের ভাবনায় বিতর্ক এসে হাজির হল। রেবার দুটো ভিন্নধর্মী রূপ ও দুরকম চেতনার পরস্পর বিরোধিতা সম্পর্কে সে এই প্রথম চিন্তায় গভীর হল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল। জানলা দিয়ে রেবা আর মোহিতকে দেখা যাচ্ছে না। ভাবিত সোমেন ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে রেবা এই যুগ-যন্ত্রণার স্মারক, রেবার মাঝেই যেন যুগের চেহারা আঁকা রয়েছে। সোমেনের কেমন মনে হচ্ছে জীবন-যন্ত্রণার শান্ত অনুভবের বিভিন্ন স্তরের মাঝেই এ যুগের মানুষের মনুষ্যত্বের পারদ ব্যারোমিটারের বুক বেয়ে উঠে কাঁপছে। সোমেন আর বিচলিত হবে না। এ যুগের গরল আর অমৃত দুই-ই সে ধারণ করবে স্থির শান্ততায়।

স্লিপিং পিলের শিশিটার 'পরে সোমেনের নজর পড়ল। তার বিছানার 'পরে শিশিটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তার গায়ে লেখা পরজন শব্দটা সোমেনের চোখকে ভীষণ পীড়িত করছে।

শিশিটার দিকে তাকাতে তাকাতে সোমেন ভাবছে। এক যন্ত্রণার হাত থেকে পালাবার বাসনায় সে একদিন চিড়িয়াখানা সদৃশ বাড়ীটার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু জীবনে সে যন্ত্রণাকে এড়াতে পারল কই! আজকাল সে সময়ের হাত থেকে পালাবার জন্যে রোজ সত্যেনদের আসরে গিয়ে জোটে। এক তরল নেশায় সে ডুবে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্লান্তি সে এড়াতে পারছে কোথায়!

ইনসমনিয়াটা তার একিউট স্টেজে এসে পৌঁছেছে। গত ক' রাত তার প্রায় ঘুমই হচ্ছে না, কপালটা দপদপ করছিল আর চোখ দুটো জ্বালা। মাথাটার মধ্যে যন্ত্রণার পাথর ভাঙ্গছিল নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে। স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোবার বাসনা সে পোষণ করছিল। এখন ভাবছে কোন যন্ত্রণাই এ পৃথিবীতে এড়ানো যায় না। শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা আর যন্ত্রণার স্বরূপ প্রকৃতি মনন দিয়ে বিশ্লেষণ করা ছাড়া মানুষের করণীয় আর কিছু নেই।

আগামীকালই সে তাদের সেই চিড়িয়াখানা সদৃশ বাড়ীতে ফিরবে। স্লিপিং পিলের শিশিটা জানলা দিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গলির বুকে একটা ছোট্ট শব্দ জেগে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সংগীত বীক্ষা

আনন্দ ভৈরব

সংগীত সম্মেলন

প্রতি বছর প্রধানত শীতকালকে কেন্দ্র করে কলকাতার নানা সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের আবহাওয়া অন্যান্য বারের মতো না হলেও এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পালা আরম্ভ হয়েছে। এই-সব সংগীত সম্মেলনে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী-গণ তাঁদের সংগীত-পরিবেশন দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করেন। মানুষের জীবনে এরূপ আনন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আনন্দ লাভ করার পন্থা সকলের একরূপ নয়। শিক্ষার্থী শিক্ষক সমঝদার সমালোচক ও সাধারণ-শ্রোতা-ভেদে আনন্দলাভের পন্থা ও পরিমাণের তারতম্য লক্ষিত হয়।

আর একটি দিক আছে। সেটি হল শিক্ষার দিক। আমাদের দেশে সংগীত-শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমশ অধিকতর বিস্তৃত হচ্ছে। এখনও মতান্তর ও অসামঞ্জস্যের বহু বিষয় আছে যেগুলি সংগীত সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য-যুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সংগীত-কীর্তিবান 'চতুর পণ্ডিত' বিষ্ণু-নারায়ণ ভাতখণ্ডের কথা মনে পড়ে।

তাঁর উদ্যোগে ও গাইকোয়াড় মহারাজের সহায়তায় ১৯১৬ খৃস্টাব্দে বরোদায় প্রথম যে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছিলেন :

"মেরা উদ্দেশ্য ইস প্রতিনিধি সভা কে সামনে অপনী পদ্ধতি কো রাখ্‌নে কা কেবল য়হী হৈ কি মৈঁ চাহতা হুঁ কি মেরে ইস অসম্পূর্ণ কার্য কী ওর সমর্থ প্রতিনিধিয়োঁ কা ধ্যান আকর্ষিত হো জাযে, তাকি উনকী সহায়তা সে মৈঁ ইসে পূর্ণতা প্রদান কর সকূঁ ঔর জব বিশ্ববিদ্যালয় উসকী মাঙ্গ করে তো এক সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি উসে হম দে সকেঁ।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রধানত উত্তর-ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেই এই উক্তি করেছিলেন। এ-বিষয়ে সকলের পক্ষে গ্রাহ্য একটি 'সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি' স্থিরীকৃত করা সহজ কাজ নয়। অথচ ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োজন। আজও বহু রাগের ক্ষেত্রে নিয়মের একীকরণ আবশ্যক। তা ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যা ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। সংগীত সম্মেলনে বিশিষ্ট গুণীগণের উপস্থিতিতে সে-সম্বন্ধে কার্যকর আলোচনা হতে পারে। এরূপ আলোচনার শ্রোতা কেবলমাত্র টিকেট-শ্রোতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সংগীততত্ত্বানু-সন্ধানী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা যায় কিনা বিবেচ্য। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এরূপ আলোচনায় টিকেট-ক্রেতা শ্রোতা খুব কমই উপস্থিত থাকেন অথচ এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ সংগীতের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি সমঝদারের সংখ্যাও বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। সমঝদারের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধির পক্ষে সহজে প্রবেশাধিকারলভ্য আলোচনা আংশিক-ভাবে সাহায্য করে বই-কি।

প্রতি বৎসর এই-যে সংগীত সম্মেলনে বহু শিল্পী ও বিখ্যাত শিল্পীগণ গীত বাদ্য ও নৃত্য পরিবেশন করেন তাতে নূতনত্ব ও অভিনবত্বের সন্ধান মেলে কিনা তাও ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে। প্রধানত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কলকাতায় সিনেট হলে প্রথম অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয় তাতে উদ্বোধন-ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন :

"সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিষ এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, একথা বলা বাহুল্য।......প্রাণের যে ধর্ম সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। তা যদি হয় তাহলে আমাদের একথা চিন্তা করতে হবেই যে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।......বড়ো বড়ো লোকেরা শিক্ষা দিয়েছেন তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ কর—সেই অনুপ্রেরণাকে তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ কর। তানসেন অনুকরণের কথা বলেননি, এবং কোনো গুণীই তা বলেননি, বলতে পারেন না।"

এই মূল্যবান উক্তিতে যথেষ্ট অনু-ধাবনের বিষয় আছে। কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অন্য যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সেটি হল এই যে শিল্পীভেদে গুণপনার তারতম্য তো স্বাভাবিকই, কিন্তু একই শিল্পী যে স্থলে বছরের পর বছর সংগীত পরি-বেশন করেন সে স্থলে তিনি তাঁর কলাশৈলীতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রস-সৃষ্টিতেও অধিকতর পারঙ্গম হয়েছেন কিনা, সে-বিষয়ও অবশ্য বিচার্য। ক্ল্যাসিকাল গান ও বাজনায় আলাপের মাধ্যমে রাগ-রূপায়ণের স্থান অতি উচ্চে। এক-একটি রাগের যে ধ্যানরূপ বা ভাবরূপ আছে তার সঙ্গে সেই রাগের রসাভিব্যক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। রাগের ভাবরূপের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক-ঠিক রস অভিব্যক্ত করার অধিকার অর্জন করতে না পারলে সার্থক শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয় সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে শ্রোতার পক্ষেও সম্যকরূপে রসগ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এই তো সেদিন শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে দরবারী কানাড়া রাগের রূপায়ণ করলেন। তাঁর বাজনায় উক্ত রাগের ভাবরূপ ও রসের

সুষ্ঠু অভিব্যক্তি শুনে চমৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হয়েছি।

সংগীতশাস্ত্রে 'গানাৎ পরতরং ন হি' বলা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় সংগীত সম্মেলনে গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা অপেক্ষা নৃত্যানুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা অধিক। সকলেই যে নৃত্যশৈলী দর্শনের অভিলাষে আসেন তা নয়। তা হলে শ্রোতার সংখ্যা-গরিষ্ঠতার কারণ কি? এ বিষয়ে সামান্য বিশ্লেষণ করা ভালো। সাধারণভাবে বেশভূষার পারিপাট্য এবং আংশিকভাবে নর্তক-নর্তকীর চেহারা ও কলাকুশলতা, তাল-ছন্দ-লয়ের উত্তেজনা ও বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক নৃত্যের সমাবেশ দর্শককে আকৃষ্ট করে। নৃত্যের রসগ্রহণের পক্ষে এই বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু আংশিকভাবে নয় সামগ্রিকভাবে। অর্থাৎ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি হ'ল তবেই নৃত্য দেখা সার্থক হয়।

আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করে এই ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করব। ভারতবর্ষের সংগীতে উত্তেজনার স্থান উচ্চে নয়, নিম্নে। গীত বাদ্য বা নৃত্যে দ্রুতলয়ের উত্তেজনাকেই যদি সংগীতের চরম উৎকর্ষ ব'লে ধরে নেওয়া যায় তাহলে শিল্পীর প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, শ্রোতার বা দর্শকের সমঝদারিত্বের অধিকারী হওয়ার আশাও সুদূরপরাহত হয়। এবারকার সংগীত সম্মেলনের প্রাক্কালে বিষয়টি স্মরণ রাখা ভালো।

॥ সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন ॥

গত ৯ই নভেম্বর থেকে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন কলকাতায় মহাজাতি সদনে আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তানসেন নামটি যেমন, অন্যদিকে নিয়ামৎ খাঁর নামটিও বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত করার মতো। মুখ্যত ধ্রুপদ ও বীণাযন্ত্রের কলাকার নিয়ামৎ খাঁ তাঁর সংগীতপ্রতিভার জন্য বাদশাহ মহম্মদ শা কর্তৃক 'শাহ সদারঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হন। পারস্যের আমীর খসরু প্রবর্তিত খেয়াল গানের নব-রূপায়ণ ও বহু খেয়াল গানের রচনা দ্বারা খেয়ালকে জনপ্রিয় করে তোলা সদারঙ্গের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর নামে নামাঙ্কিত উক্ত সম্মেলন ৯—১৭ নভেম্বর এই নয় দিনের নয়টি অধি-বেশনে সমাপ্ত হয়েছে।

৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার কর্তৃক গীত 'বন্দেমাতরম্' সংগীত দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত এই গানটি বিশেষ সময়ের পটভূমিতে সৃষ্ট হলেও গানটি যে সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চিরভাস্বর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাজাত্যবোধে ও জাতীয়তাবাদের জাগরণে এই গান মন্ত্রের মতো কাজ করেছে, আজও করছে। প্রথম সংগীত অধিবেশনের সূচনায় ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ। প্রতি বৎসর কোনো-না-কোনো সংগীত সম্মে-লনে তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় এই গুণীর ধ্রুপদ শোনার সুযোগ হয়। দবীর খাঁ সাহেব বহুদিন কলকাতায় আছেন। ভবিষ্যতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বা শিষ্যদের কণ্ঠে ধ্রুপদ শোনার আশা করব। এই অধিবেশনে শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক কর্তৃক পরিবেশিত বেহাগ রাগের রূপায়ণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিষ্ণু দিগম্বর ঘরানার অন্যতম ধারক পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পটবর্ধনের সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী পটনায়ক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাগ-রূপায়ণ করলেন। তা ছাড়া, সংগীত-পরিবেশনকালে তাঁর তন্ময়তা প্রশংসার দাবি রাখে।

তৃতীয় অধিবেশনে পূরিয়া-মার্গ-বেহাগ-কেদার রাগ পরিবেশন করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী। স্পষ্টতই এটি সংকীর্ণ রাগ, মিশ্রণটিও অভিনব। ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ শুনতে অভ্যস্ত এবং মনে হয় তাতে blending হয় ভালো। এরূপ মিশ্রণের প্রধান তাৎপর্য হল এই যে এক-একটি রাগের স্বাধীন সত্তা অন্য সমপ্রকৃতি রাগের সহিত যথা-সম্ভব ওতোপ্রোতভাবে মিশে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূরিয়া, মার্গবেহাগ ও কেদার রাগের মিশ্রণের তাৎপর্য আমাদের কাছে ঠিক-ঠিক ধরা পড়েনি। গায়নের পূর্বে শিল্পী একটু ব্যাখ্যা করে দিলে সুবিধে হত। সেতারে জোগ রাগের সুষ্ঠু রূপায়ণ করলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই রাগে তিলং রাগের আবেদন মুখ্য, তার সঙ্গে মালকোষের আবির্ভাব surprise দেয়।

চতুর্থ অধিবেশনে হারমোনিয়মে বসন্ত রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সহকারিতা করেন তাঁর পুত্র শ্রীমহারাজ বন্দ্যো-পাধ্যায়, তবলা সংগত করেন শ্রীকানাই দত্ত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন ভালো, আরো তাঁর সুন্দর মেজাজের গুণে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। নবাগত শিল্পী গোলাম হাসান সাগ্গান কর্তৃক মালকোষ রাগের রূপায়ণ অভিনন্দন-যোগ্য। সূচনায় গীত রাগলক্ষণ অনুযায়ী মালকোষ রাগকে ভৈরবী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়ে মতান্তর থাকা সম্ভব।

পঞ্চম অধিবেশনে শঙ্করা রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল। তাঁর সঙ্গে সহকারিতা করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণ হাঙ্গল, তবলায় সংগত করেন শ্রীশেষগিরি হাঙ্গল। এই অনুষ্ঠানে রাগ-রূপায়ণ চমৎকার হয়েছে। শ্রীমতী কৃষ্ণ হাঙ্গলের কণ্ঠস্বর বেশ ভালো। তবে অন্যবারের তুলনায় এবারে তিনি কণ্ঠসহযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম করেছেন বলে মনে হল। কথক নৃত্যে শ্রীমতী রোশনকুমারী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-সংগত এই অনুষ্ঠানকে উদ্দীপিত করেছে। এবারে শ্রীমতী রোশনকুমারীর নৃত্যে লয়কারি যতটা হয়েছে, সেই তুলনায় ঘুঙুরের সূক্ষ্ম ঝংকারের মাধ্যমে লয়কারির অংশ প্রদর্শিত হয়েছে কম। এই প্রসঙ্গে আনন্দভৈরব একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চায়। কথক নৃত্যে এক-একটি বোলের শৈলী প্রদর্শন করার জন্য সেই বোলের গঠন অনুযায়ী লয় কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে হয়। তাকে বিলম্বিত থেকে ক্রমশ মধ্য ও দ্রুত লয়ের দিকে গতির জন্য যে উপভোগ্যতা হবার কথা তা যেন ক্ষুণ্ণ হয়। নৃত্যখণ্ড-গুলিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি ক্রমিক লয়ের সূত্রে গ্রথিত করা যায় কিনা নৃত্য-বিশারদগণ বিবেচনা করলে ভালো হয়।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পরে আলোচ্য।

॥ সীমান্তের সংবাদ ॥

নেফা ও লদাক উভয় রণাঙ্গনেই প্রায় পক্ষকাল অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে গুলীবিনিময় ও ছোটখাটো অনুল্লেখ্য সংঘর্ষ ছাড়া আর কোন সংবাদ কোনদিক থেকে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং তাতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সমগ্র ভারতভূমি শত্রু-কবলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। সংসদের সকল দলও প্রধান-মন্ত্রীর এই ঘোষণাকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা একমনে সর্ব সামর্থ দিয়ে সরকারের যুদ্ধ প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

স্বভাবতই এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শত্রুর অগ্রগতি না হয় রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাকে বিতাড়নের উদ্যোগ কোথায়? রণভূমিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি শত্রু বিতাড়িত হবে? ইতি-মধ্যে শত্রুপক্ষ যদি আরও বেশী প্রস্তুত হয়ে অগ্রগমনের চেষ্টা করে তখন আমরা কি করব? সুতরাং শীত থাকতে থাকতেই আঘাত হানা উচিত নয় কি?

দেশকে আমরা শত্রুমুক্ত দেখতে চাই, তাই আমাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের স্থির মস্তিষ্কে এ কথাটা বোঝা দরকার যে যুদ্ধ মানে শুধুই আক্রমণ নয়। হঠাৎ আক্রমণে হয়ত সাময়িক কিছু লাভ হতে পারে কিন্তু সে লাভ স্থায়ী হয় না। চীনের প্রাথমিক সাফল্যের বর্তমান পরি-ণতিই তার পরিচয়।

ইতিপূর্বে চীন যেমন তার জাতীয় জীবনে 'Twenty years in a day', 'Great leap forward' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে ও তারপর কতকগুলি হঠকারিতামূলক কাজ করে চরম অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে; আজ রাতারাতি ভারত দখলের দুর্বুদ্ধি নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে নেমেও তারা একই-জাতীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ভারত দখলের অদ্ভুত চিন্তায় চীন তিব্বতে লক্ষাধিক সৈন্যের সমাবেশ করেছে। কিন্তু তিব্বতে বৌদ্ধ মঠগুলি ছাড়া এমন কোন আচ্ছাদিত স্থান নেই যেখানে এই প্রচণ্ড শীতে সৈন্যদের রাখা যেতে পারে। তিব্বতে এখন তুষারপাত শুরু হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলের রুক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সমতল অঞ্চলের চীনাদের কোনই পরিচয় নেই। তার পরেও আছে সৈন্যদের নিয়মিত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের সমস্যা। তিব্বতের নিকটবর্তী এলাকায় অতি সামান্যই খাদ্য পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে ঐ বিরাট সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের প্রয়োজন কোন-মতেই মেটা সম্ভব হবে না। অথচ শীত এখন বাড়তেই থাকবে এবং যুদ্ধেরও সহজে মীমাংসা হবে না। সমগ্র পরি-স্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, চীনকে ইতিমধ্যেই যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার সঙ্গে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আক্রমণের পর জার্মাণ সৈন্যবাহিনীরই তুলনা হতে পারে। রাশিয়ার প্রবল শীতে মূল ঘাঁটি হ'তে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত জার্মান সৈন্যবাহিনীকেও ঠিক এই রকম সমূহ বিপর্যয়ে পড়তে হয়েছিল।

এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের অবস্থা এখন অনেক ভাল। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের আনুকূল্যে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদের অভাব ভারতীয় সৈন্যদের কখনও হবে না এবং তা রণক্ষেত্রে সরবরাহ করাও ভারতের পক্ষে খুব কঠিন নয়। সুতরাং ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালানোর যে সুযোগ আছে চীনের পক্ষে তা নেই। পৃথিবীর কোন উল্লেখযোগ্য দেশের সমর্থন পায়নি চীন, তাই অস্ত্র-শস্ত্রের ভাণ্ডারও তার সীমিত।

আজকের দিনে যুদ্ধের সাফল্য ধৈর্য, মনোবল ও রসদ সামর্থ্যের উপর
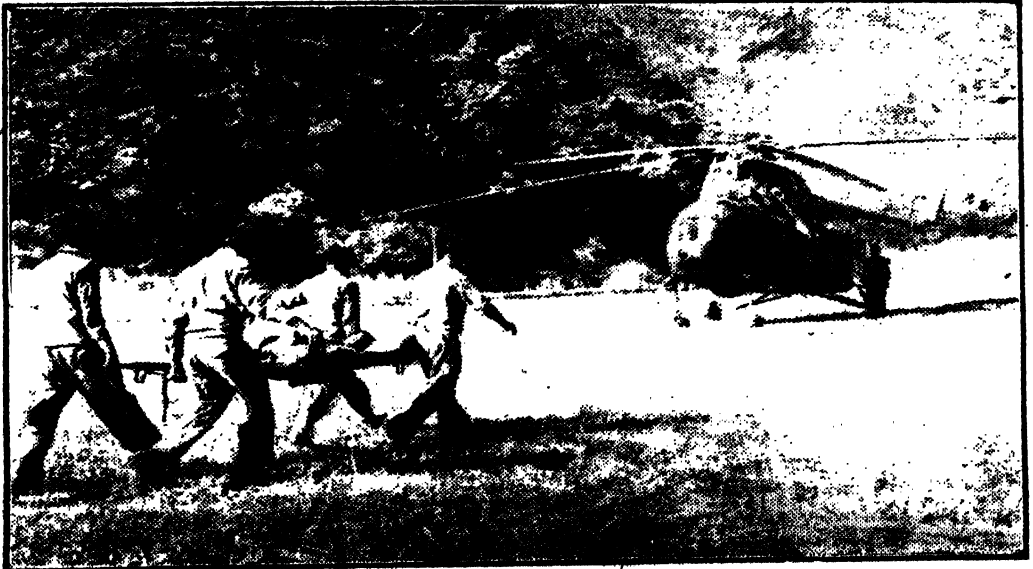
নেফা অঞ্চলে আহত সৈন্যদের প্রাথমিক শুশ্রূষার পর হেলিকপ্টারযোগে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নির্ভরশীল। হঠাৎ আক্রমণ ও প্রাথমিক সাফল্যের মূল্য সেখানে নিতান্তই সামান্য। আধুনিক যুদ্ধে শেষ জয়ই একমাত্র জয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাফল্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুতরাং যুদ্ধের বর্তমান থমথমে ভাবে ধৈর্যহীন বা নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রত্যেকের আজ এটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে, রসদ সরবরাহের সামর্থ্যের উপরেই আমাদের সাফল্য নির্ভরশীল। যুদ্ধের প্রথম সাফল্য কারখানায়, তারপর যুদ্ধাঙ্গনে। তাই কারখানা ও খেত খামারগুলিকে কর্মমুখর রাখাই দেশবাসীর আজ একমাত্র কাজ। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিকদের চেয়ে সে কাজ কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম গৌরবের নয়।

॥ দেশবাসীর সাড়া ॥

প্রতিরক্ষা তহবিলে যাথাসাধ্য সাহায্যদানের জন্য সমগ্র ভারতে আজ যেভাবে সাড়া জেগেছে, এদেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। কাশ্মীর হতে কেরল, গোয়া হতে নেফা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারতের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে আজ শুধু আত্মত্যাগের শপথ। ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত শুধু কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা তহবিলেই জমা পড়েছে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ও ১০ হাজার ৭০০ তোলা সোনা।

এছাড়া প্রতিদিনই সকল রাজ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ও শত শত তোলা সোনা সংগৃহীত হচ্ছে। রক্তদানের জন্যেও এগিয়ে আসছে অসংখ্য নরনারী।

কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিপণস্বরূপ আজ যে পরিমাণ অর্থ, স্বর্ণ ও রক্তের প্রয়োজন তার অতি সামান্যতম অংশই এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। আরও বহু ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সহায়তার প্রতীকস্বরূপ অন্তত ৪৫ কোটি টাকা জাতীয় শপথ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক পরিবারের কর্তা যদি তাঁর পরিবারভুক্ত সকলজনের হয়ে মাথাপিছু একটাকা দান করেন তবে অতি সহজেই ৪৫ কোটি টাকার ভান্ডার পূর্ণ হতে পারে।

॥ সিকিমে বিপদাশঙ্কা ॥

১৩ই নভেম্বর সিকিমের মহারাজা সমগ্র রাজ্যে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

মহারাজার ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সিকিমের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সমগ্র সিকিমে নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে।

নেহরুজীর জন্মদিনে

১৪ই নভেম্বর জন্মদিবসে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শ্রীনেহরুকে আলিঙ্গন করছেন।

ইতিপূর্বে আর এক ঘোষণায় সিকিমের মহারাণা ভারতভূমির উপর চীনের আক্রমণের নিন্দা করে জানিয়েছেন, সিকিম তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে।

॥ রুশ-চীন সম্পর্ক ॥

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক বর্তমানে আরও খারাপ হয়েছে। কিউবা সংকটের সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন চীন-ভারত সংঘর্ষে চীনের প্রতি যে সামান্য সহানুভূতিটুকু দেখিয়েছিল বর্তমানে সেটুকুও প্রত্যাহৃত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে সর্বশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে বন্ধু ভারত ও ভ্রাতা চীনের মধ্যে বিরোধের আশু মীমাংসাই তার কাম্য, এবং এমন কোন কাজই তার পক্ষে করা উচিত হবে না যা এই দুই দেশের সঙ্গে তার পূর্বের সম্পর্ক ক্ষুন্ন করতে পারে।

এরপরেই ভারত হতে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার প্রতিশ্রুতি মত বিমানবহর ভারতকে সরবরাহ করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত ও ভারতকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বিমানবহর সরবরাহের ঘোষণা চীনের পক্ষে খুবই ক্ষোভের কারণ হয়েছে। চীন প্রকাশ্যেই 'পীপলস ডেলী' পত্রিকায় এই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, এক সমাজতান্ত্রিক দেশ (অর্থাৎ চীন) যখন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা (অর্থাৎ কিনা ভারত) আক্রান্ত (!) তখন সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির এই মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইতিমধ্যে বুলগারিয়ার স্তালিনবাদী নেতৃত্বের অপসারণও

লাদাকের পাংগং হ্রদের দৃশ্য—এই ঘাঁটির ভারতীয় জোয়ানগণ প্রভূত শক্তিশালী চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফটোতে ভারতীয় সৈন্যদের পারাপার করতে একখানি নৌকাকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

স্তালিনবাদী লাল চীনের পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আলবানিয়ার মত বুলগারিয়াও অনতিবিলম্বে তার পক্ষে যোগ দেবে এই ছিল চীনের আশা। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের ঐ দেশটিতে স্তালিনবাদী নেতৃত্বের পতন হওয়াতে লালচীনের সে আশা নির্মূল হল।

এ সকল কারণে চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে বিরোধ গত কয়েক বছর ধরে সঞ্চিত হচ্ছিল তা হয়ত অনতিবিলম্বেই বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই চীন নাকি পূর্ব ইউরোপের সবকটি কমিউনিস্ট দেশ হতে তার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের স্বদেশে ফিরে আসার জন্যে নির্দেশ পাঠিয়েছে।

চীনের বিভিন্ন স্থানে রাশিয়ার যেসব বাণিজ্য দূতাবাস ছিল তাদের কাজকারবার বহুদিন আগেই গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। পিকিং ছাড়া চীনের আর কোথাও এখন সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাস নেই। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ হতে মনে হয় যে, লাল চীনের জঙ্গী-বাদকে আর প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

॥ বন্ধুর দান ॥

বৃটেনে কমন্স সভায় চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কিত আলোচনাকালে কমনওয়েলথ সচিব স্যান্ডস জানান যে, ভারতের অনুরোধে ভারতকে যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিনা-সর্তে বন্ধুর দানস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ভারত যা অস্ত্র চেয়েছিল তা সবই তাকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তি সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয় বিমানে, বাকি পাঠানো হয়েছে জাহাজে। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে ভারতের অনুরোধমত আরও অস্ত্র বৃটেন ভারতকে দেবে।

॥ মার্কিণ সাহায্য ॥

মার্কিন সাহায্যেরও প্রথম কিস্তি ভারতে এসে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার হতে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, আপাতত আর অস্ত্র ভারতে পাঠানো হবে না। তবে দরকার হলেই ভারতের অনুরোধ রক্ষা করা হবে।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ এক বিবৃতিতে বলেছেন, অস্ত্র সরবরাহকালে ভারতের উপর এমন কোন সর্ত আরোপ করা হয়নি যে, ভারতকে জোট নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে পশ্চিমী শক্তিজোটে যোগ দিতে হবে।

॥ ভারতের প্রতিরক্ষা ॥

ইতিমধ্যে দিল্লীতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক ঘোষণায় বলেছেন, ভারতের সমরোপকরণ উৎপাদন গত তিন সপ্তাহে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীগুলিতে এখন দিবারাত্রি কাজ চলছে। ভারতের কারখানায় নির্মিত স্বয়ংচালিত অস্ত্রশস্ত্র হয়ত আর একমাসের মধ্যেই ভারতীয় জওয়ানদের হাতে পৌছে যাবে।

॥ দুর্ঘটনা ॥

গত ১১ই নভেম্বর ভোর তিনটায় উত্তর বিহারের সারণ জেলার মাঝি ও বাকুলাহ ষ্টেশনের মধ্যবর্তী একস্থানে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ছাদের উপর উপবিষ্ট ২৫ জন যাত্রী নিহত ও ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ট্রেনটি একটি ব্রীজের নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। সংবাদে প্রকাশ, নিকটবর্তী একটি মেলার জন্য ঐদিন গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় ছিল এবং তার জন্যই যাত্রীরা গাড়ীর ছাদে উঠতে বাধ্য হয়।

বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও যাত্রীদের অসাবধানতার জন্যই এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষের অবহেলায় প্রতিকার হওয়া সহজ নয়। সুতরাং আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য যাত্রীদেরই সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

॥ ঘরে ॥

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক : লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা : যা আসে আসুক, যা ঘটে ঘটুক, চীনের নগ্ন আক্রমণের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করিলাম।

'দৃঢ়তার সহিত চীনের বিশ্বাস-ঘাতকতার জবাব দিতে হইবে'—রাজ্য-সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

নেফার ওয়ালং ও জং অঞ্চলে কয়েকটি সংঘর্ষ—চীনাদের উপর ভারতীয় জওয়ানদের প্রত্যাঘাত।

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : পুণায় বিশিষ্ট সমাজসেবী 'ভারত-রত্ন' ডঃ ডি কে কার্ভের (১০৪) জীবনা-বসান।

লডাক রণাঙ্গনে চুশুলের নিকট চীনাদের ট্যাঙ্ক আমদানী—নেফায় জং অঞ্চলে শত্রুঘাটির উপর ভারতীয় ফৌজের গোলাবর্ষণ।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা—দেশব্যাপী সমবায় বিপণি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত—লোক-সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘোষণা।

নেফা অঞ্চলের সংঘর্ষে উভয়পক্ষে (ভারত-চীন) কামান ব্যবহার।

'রাশিয়ার নিকট হইতে পূর্ব-প্রতি-শ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মধ্যে 'মিগ' জঙ্গী বিমান পাওয়া যাইবে' —শ্রীনেহরু কর্তৃক সোভিয়েট প্রেরিত বার্তার বিবরণ প্রকাশ।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : উত্তর বিহারে মানুঝি ও বাকুলাহা স্টেশনের মধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনায় (প্রত্যুষের ঘটনা) ২৫জন যাত্রী নিহত ও তিনজন আহত—ট্রেনের ছাদে বসিয়া ভ্রমণের প্রাণঘাতী পরিণতি।

অননুমোদিত ব্যক্তিদের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ নিষিদ্ধ—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী—অপর অর্ডিন্যান্সে রাজ্যে হোমগার্ড বাহিনী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ অনুযায়ী ভার-তের প্রতিরক্ষা মন্ত্রিপদ গ্রহণে মহা-রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবনের সম্মতি।

সীমান্তে চীন-ভারত সংঘর্ষের অবস্থা অপরিবর্তিত—ওয়ালং-এর নিকট উভয়পক্ষে গুলী বিনিময়।

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : 'আজ প্রতিটি ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও আত্ম বলিদানের দিন'—ময়দানের (কলিকাতা) জনসভায় জেনারেল কারিয়াপ্পার (প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি) স্পষ্ট ঘোষণা—চীনের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নেতাজীর সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান।

নেফা এলাকায় তিনটি চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

বেরুবাড়ীর জরিপ কার্য (ভারত-পাকিস্তান যৌথ ব্যবস্থা) বন্ধ রাখার দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (পশ্চিম-বঙ্গ) নিকট বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির স্মারকলিপি।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : রাজ্যসভায় ভারতভূমি হইতে চীনা হানাদার বিতাড়নের সঙ্কল্প অনুমোদন—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা : চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাই।

দেশের সর্বত্র সোনার আগাম লেন-দেন নিষিদ্ধ—ফাটকাবাজী রোধে ভারত সরকারের ঘোষণা।

নেফা ও লডাক উভয় রণাঙ্গনে অস্বস্থিকর নিস্তব্ধতা—ভারতীয় জও-য়ানদের অবাধ টহলদারী।

পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব কর্তৃক শ্রীনেহরুর লিপির (চীনা আক্রমণ প্রসঙ্গে) জবাব প্রেরণ—ভারতের সহিত মৈত্রী রক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : শ্রীচাবন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত—রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার : প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রীপদে শ্রীকে রঘু-রামাইয়া।

জন্মদিবসে (৭৪তম) শ্রীনেহরুর প্রতি দেশের সহস্র সহস্র নর-নারীর অভিনন্দন—অমৃতসরের নাগরিকগণ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর ওজনের স্বিগুণ সোনা দান—সর্বত্র 'শিশু দিবস' পালন ও চীনা দস্যুদের বিতাড়নের শপথ গ্রহণ।

ওয়ালং-এর নিকট চীনা হানাদারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

মহারাষ্ট্রের নূতন রাজ্যপাল পদে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিযুক্ত।

'চীনা হানাদারদের হটাইতে ভারত বদ্ধপরিকর'— লোকসভায় গৃহীত প্রস্তাব।

॥ বাইরে ॥

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক : 'পাকিস্তানের এলাকার মধ্য দিয়া ভারতের জন্য অস্ত্র সরবরাহ যাইতে দেওয়া হইবে না'—করাচীতে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ আলির বিবৃতি।

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ প্রসঙ্গে মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) পত্রের উত্তর প্রেরণ—চীন ভারতকে আক্রমণ করায় দুঃখ।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইয়েমেনের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলে (চীনা আক্রমণের দরুণ) সকল গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই বিপর্যয়'—মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমানের সতর্কবাণী।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : কাতাঙ্গার স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি দাবীতে রাষ্ট্রসংঘের চরমপত্র—আনুগত্যের শপথে স্বাক্ষর না দিলে ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকী।

সৌদী আরবের আকাশে মিশরীয় জঙ্গী বিমান—সৌদী আরবীয় বিমান-বিধ্বংসী কামান হইতে গোলাবর্ষণ।

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের সহিত জাপানী প্রধানমন্ত্রী ইকেদার সাক্ষাৎকার—চীন-ভারত সংঘর্ষ বিষয়ে বিশদ আলোচনা।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ-জনিত অবস্থা ঘোষিত।

কিউবা সম্পর্কে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সোভিয়েট ও কিউবান সরকার কর্তৃক উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল) নিকট যুক্ত ফর্মুলা পেশ।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : 'ন্যাটো' রাজনৈতিক কমিটি কর্তৃক ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের নিন্দা এবং ভারতকে সাহায্যদানে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন।

॥ জাতীয় সংকট ও বুদ্ধিজীবি ॥

অভয়ঙ্কর

কম্যুনিস্ট চীন একই দশকে দ্বিতীয়বার পররাজ্যগ্রাসে উদ্যোগী হয়েছে। এই যুদ্ধ যে আপাততঃ কিছু অঞ্চল গ্রাস করার মতলবেই করা হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লাদকে চীনারা ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশ গ্রাস করে সেখানে সিংকিয়াং-তিব্বত রাজপথ বানিয়েছে। নেফায় ম্যাকমেহন লাইন পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান ছিল, তার সীমানা অতিক্রমণের কোনো বাসনা ভারতের ছিল না। থাগ্‌লা গিরিশ্রেণীতে চীনাবাহিনী এগিয়ে এসে ভারতীয় ভূখণ্ড গ্রহণ করার পর, ভারত সরকার ভারতীয় এলাকা থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা গোড়ার দিকে সীমানা-সংঘর্ষ বলে মনে হয়েছিল, তা যে নিছক সীমানা-অঞ্চলেই সীমিত থাকবে না, তার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণে ৫০,০০০ বর্গমাইল পরিমাণ জমি চীনারা দাবী করে তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ। শুধুমাত্র একটা টেকনিক্যাল ঘোমটা পরা আছে, তার নাম অঘোষিত যুদ্ধ। সেই ঘোমটা যেদিন খসবে, সেদিন অবস্থা আরো কঠিন হবে।

এখন আর কারো মনে সংশয় নেই, চীনের অভিপ্রায় সম্পর্কে। তারা যে আক্রমণ করেছে সেকথাও স্বীকার করতে নিছক মোহমুগ্ধ দুচারজন ছাড়া আর কারো অস্বীকার করতে বাধা নেই। সুতরাং আমরা যে একটা বৃহৎ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি একথা সকলেই বুঝেছেন, হয়ত কিছু কিছু ব্যক্তির মনে এখনও কিঞ্চিৎ আত্মতুষ্টির ভাব আছে, সেই ভাবও কাটবে।

এই সংকটকালে বুদ্ধিজীবি অর্থাৎ লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের কি কর্তব্য? শান্তিকামী এবং সহঅবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী ভারতবর্ষ আজ বিদেশী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত। এখন মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্য সকলেরই সর্বস্ব পণ করা উচিত। এই সংকটে বুদ্ধিজীবিরা কি করবেন? কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে কি তাঁদের?

এ কথা বলা বাহুল্য যে বুদ্ধিজীবি নামক শ্রেণীবিশেষরাও মানুষ। অন্ন, বস্ত্র, নিরাপত্তার প্রয়োজন তাঁদের আর কারো চেয়ে কম নয়। যদি ঘরে আগুন লাগে তাহলে একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক যে কাজ করবেন, বুদ্ধিজীবীও তাই করবেন। অর্থাৎ আগুন কিভাবে এল, কোন্ অঞ্চল থেকে এল, এবং আসাটা উচিত হয়েছে কি অনুচিত হয়েছে এই বিচার বিবেচনা না করে, অকারণ কালহরণ না করেই সর্বাগ্রে জলের সন্ধান করে আগুনটা নির্বাপিত করাই প্রাথমিক কর্তব্য, একথা সবাই জানে।

বুদ্ধিজীবিদের বিপদ এই যে তাঁরা পাত্রাধার তৈল, কি তৈলাধার পাত্র এই নিয়ে অনেক সময় কালহরণ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তাই যে হয়নি তার পরিচয় পাওয়া গেল বুদ্ধিজীবিদের আলোচনা শুনে। সেখানে ম্যাকমেহন লাইনের ঐতিহাসিকত্ব এবং চীনারা মহৎ কি অসৎ এ নিয়েও বিতর্ক হল, এমন কি সোস্যালিস্ট রাজ্য কোনো মতে নিছক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে অগ্রসর হতে পারেন না এমন কথাও শোনা গেল। আবার অতিশয় উগ্র দেশপ্রেমমূলক বক্তব্যও শুনেছি। কেউ বলেছেন যে বর্তমান সংকটে বিনা দ্বিধায় স্বাধীনতা-রক্ষার সংকল্প নিয়ে আত্মবিসর্জনের শপথ গ্রহণ করা প্রথম কর্তব্য। আরেক-জন বললেন যে, অতীতের ভুলত্রুটি ভুলে গিয়ে দেশের হস্তচ্যুত অংশগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশপ্রেমের প্রচারে বুদ্ধিজীবিদের উদ্যোগী হতে হবে। আগে দেশ পরে আর সব।

একটি সভায় উপস্থিত থাকার বুদ্ধিজীবীদের এই আলোচনার ধারা থেকে আজ আমাদের সমাজে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করেছি। বুদ্ধিজীবিদের একটা কর্তব্য এবং মহৎ ভূমিকা আছে এই সংকটকালে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। আজও বহু-বিভ্রান্ত দেশবাসী এই সংকটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, বুদ্ধিজীবি-দের কর্তব্য আলোচনার দ্বারা তাঁদের মনের সংশয় ঘুচিয়ে তাঁদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

জাতীয় মনোবল গঠনে বুদ্ধি-জীবিরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। শুধুমাত্র অসংখ্য নামাবলীসংযুক্ত বিবৃতিদান করেই ভারতভূমি থেকে চীনকে হটানো সম্ভব নয়। দেশের মানুষকেই সর্বাগ্রে উপযুক্ত জ্ঞান দান করা কর্তব্য। সাধারণ মানুষকে গড়ে তুলতে হবে।

দেশপ্রেম এমন জিনিস যে তা কাউকে অনুনয় বিনয় করে বোঝাতে হয় না, এ দেশের শিশুরাও জানে যে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী। শুধু প্রয়োজন সেই সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করা।

লেখকের অস্ত্র তার বাণী। এমন সময় হয়ত আসতে পারে যে নিজের রচনা লেখক স্বহস্তে আর লিখতে পারবেন না, তখন এই বাক্যই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। এই বাক্যকে শাণিত, তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। উপযুক্ত

ক্ষেত্রে উপযুক্ত বাক্য-প্রয়োগ কার্যকরী হয়।

অনেক কথার কদর্থ করা হবে, অনেক অর্থকে অনর্থক প্রমাণিত করার চেষ্টা হবে। ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলে, আর যে কথার দ্বারা আমরা সেই সংবাদ জানতে পারি সেও এগিয়ে চলে। কথা কানে হাঁটে, একথা আমাদের পল্লী-বাসীরাও জানে। আমাদের তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের বোঝা উচিত যে যুদ্ধকালে বাক্যের'ও একটা ভূমিকা আছে, তার পরিমিত ব্যবহার প্রয়োজন। অনেক লোভন কথা যেমন বর্জন করা উচিত, তেমনই দরকার হবে অনেক কঠোরতর বাক্য প্রয়োগের। উল, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি যুদ্ধের প্রয়োজনে শান্তিকালীন অবস্থানুপাতে সুলভ হবে না, বাক্যও তাই। তার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এমন অনেক কথা আছে যার অর্থ অনেক রকম, আবার অনেক কথা অস্পষ্ট, এর ফলেই অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, একথা সর্বদা স্মরণ প্রয়োজন। বিরুদ্ধ প্রচারণা সহ্য করার শক্তি আমাদের থাকা উচিত। অনেক কথা বিপদকালে হজমও করতে হবে। এইসব কথা স্মরণে রেখে আমাদের কর্মে এবং ব্যবহারে যেন খাঁটি কথাই আঁকড়ে থাকি। এই দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীর। তাঁদের মনই তাঁদের কর্মের বাহন।

দীর্ঘকাল আমরা শান্তিতে বসবাস করেছি। ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী, সহবস্থান নীতির পোষক। তাই এই শান্তির আবহাওয়া আমাদের অন্তরকে কিঞ্চিৎ কোমল এবং দ্রব করে রেখেছে, ফলে আজ ভারতবাসী একটা অবক্ষয়ের মুখে এসে পেঁৗছেছিল। প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতার আধিক্য ঘটেছিল। আত্মিক দিক থেকে একটা অসাড়ত্ব এসেছিল। এই যুদ্ধের হোমকুণ্ডে স্নান করে ভারত অনেকখানি পরিশুদ্ধ এবং পরিশীলিত হয়ে উঠবে। স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, —কঠোপনিষদের বাণী— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—", আজ আবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছিল। সেই অবক্ষয়কে এলফ্রেড নোয়েস বলেছিলেন —"the sloth, the intellectual pride; the trivial jest, the lawless dreams the cynic art—" এর থেকে মুক্ত হতে হবে। পরিশেষে স্বদেশের ধূলিকে স্বর্ণ-রেণু বলে কবি এলফ্রেড নোয়েস সেদিন বলেছিলেন :

"The fire, the fire that made her great
Once more upon her altar burns.

Once more redeemed and healed
and whole,
She moves to the Eternal
Goal."

সেদিনের ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীর মনে এই ভাব জাগ্রত হয়েছিল, তাই তাঁরা দেশবাসীকে বলতে পেরেছিলেন যে, যে আগুন আমার দেশকে মহৎ করেছিল আবার সেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত। আবার আমরা চিরন্তন লক্ষ্যে পৌঁছাব।

জবাহরলাল নেহরু বলেছেন এতদিন আমরা শান্তির জন্য চেষ্টা করেছি, এবার আমাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। স্বদেশের মানুষকে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে, ভাবাবেগে চালিত হয়ে, কিংবা বিজ্ঞাপিত হওয়ার লোভ মোহ ত্যাগ করে বুদ্ধিজীবীকে আজ জাগ্রত হতে হবে।

প্রথম মহাসমরের কালে ইংলণ্ডের তরুণ কবি রুপার্ট ব্রুক একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"There are a few people who have been so anti-war before, or so suspicious of diplomacy, that they feel rather out of national feeling. But it is astonishing how the 'intellectuals' have taken on new jobs. No, not astonishing; but impressive."

আজ এদেশের বুদ্ধিজীবিদের স্বদেশের মহামন্ত্রে নতুন করে দীক্ষা নিতে হবে, বুদ্ধিজীবীকে নতুন পোষাক পরতে হবে, তবেই এই সংকটে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালিত হবে।

বুদ্ধিজীবীকে intellectual pride থেকে মুক্ত হয়ে বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় শান্ত ও সংযতচিত্তে মুক্তিযজ্ঞের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করতে হবে এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর পাশে দাঁড়াতে হবে, নিছক ভক্তিযোগ নয় কর্মযোগের প্রয়োজন আজ অধিক। বর্বরতা ও উচ্ছৃংখলতাকে পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে তবেই ভারতভূমি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হবে।

ইতশ্চেতঃ— একক্লমী ।। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী ।। কলিকাতা—১২ ।। দাম—ছয় টাকা।

'যুগান্তর' সাময়িকীর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা যে রংগরসাত্মক স্তম্ভের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন রবিবারের প্রভাতে তার নাম "ইতশ্চেতঃ"। চলতি সংবাদের ওপর লঘু আলোচনা, মাঝে মাঝে গুরু আলোচনা ইত্যাদি এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। 'যুগান্তর' যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে সরস আলোচনা করতেন 'পথচারী', যিনি পরে "যাযাবর" নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'নন্দীভৃংগী' ছদ্মনামে লিখতেন, প্রাচীনকালে ইন্দ্রনাথ লিখতেন 'পঞ্চানন্দ' নামে এবং হিতবাদীর 'শ্রীবৃদ্ধ' যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "বুদ্ধের বচন" যাঁদের পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা তা আজো ভুলতে পারেন নি। কিন্তু ইদানীং যে দুজন সর্বজনপ্রশংসিত 'কলমী' রংগরস পরিবেশন করেন তাঁদের রচনারীতি বিভিন্ন, পূর্বসূরীদের সংগে কোথাও মিল নেই, এমন কি পরিমল গোস্বামী এবং শিবরাম চক্রবর্তী দুজনেই সমকালীন হলেও দুজনের রচনারীতিতে পার্থক্য আছে। এককলমীর স্তম্ভের নিয়মিত পাঠক হিসাবে বর্তমান সমালোচক তাই "ইতশ্চেতঃ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত। 'এককলমী'র বৈশিষ্ট্য যে তাঁর আশ্চর্য বাক্প্রবণতা তা নয়, তাঁর 'নেগেটিভ্ এ্যাপ্রোচ' (বাংলা করা গেল না)—বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য। লেখকের মন বিজ্ঞানীর মন, তাই বিজ্ঞানের অনেক গুরু বিষয়ের সরস আলোচনা "ইতশ্চেত"র স্তম্ভে ছড়ানো আছে, সেই সংগে আছে সমসাময়িক সাহিত্য, সমাজ, ও রাজনীতির ওপর এমন "অল্পকথায় তীক্ষ্ণ উপহাস" (রাজশেখর বসুর উক্তি) করার শক্তি আর কারো নেই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। চলতি ঘটনার সরস দিক সংবাদপত্রের পাতায় লুপ্ত হয়ে যায়, তাই "এককলমী"র উক্তি গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হওয়ায় প্রকাশককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। "ইতশ্চেতঃ" সংকলনটি পাঠ করতে গিয়ে অনেক পুরাতন কথা স্মরণে আসবে, তাই এই জাতীয় গ্রন্থ হাতের কাছে থাকলে বারবার পড়া যায়, অবসর বিনোদন ব্যতীত স্মৃতির রোমন্থনে তা সহায়ক হবে। বাংলা সাহিত্যে সরস রচনার সংখ্যা অল্প, তাই এই গ্রন্থ যে সর্বত্র সমাদৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

রূপমতী নগরী— (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)— অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৪.৫০।

আলোচ্য গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ-কাহিনী। এই গ্রন্থের লেখক শিল্পমনের অধিকারী, তাই সমস্ত রচনায় রসমুগ্ধ আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত। সর্বোপরি গ্রন্থকার একজন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী। যে কথা রচনায় বলা সম্ভব হয়নি ক্যামেরার চোখ দিয়ে তিনি তা দেখিয়েছেন। চিত্রশিল্প নিজস্ব বিভূতি প্রকাশ করেছে। কাজেই এই ভ্রমণপর্বের আর্ট পেপারে সুমুদ্রিত প্রতিচিত্রগুলি এই গ্রন্থের লোভনীয় আকর্ষণ। মাণ্ডু শহর থেকে শুরু করে বেলুড়, তিরুপতি, মহাবলীপুরম্, খাজুরাহো, পুষ্করতীর্থ, তাজমহল, অম্বর, দিলওয়ারা, অমৃতসরের সরস কাহিনী চিত্রে ও রচনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রতিটি স্থানের ঐতিহাসিক পরিচয় এমনকি আঞ্চলিক কিংবদন্তীগুলি লেখক অত্যন্ত পরিশ্রমে সরবরাহ করেছেন। লেখকের ভাষা সাহিত্যগুণান্বিত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং হৃদয়ের উদারতা রচনাকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য দান করেছে। অকারণ পাণ্ডিত্যের অহম্মন্যতা নেই বলে সাধারণ পাঠক-দরবারে এই গ্রন্থ সমাদর পাবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের নাট্যশালা ও চিত্র-প্রযোজকের কর্তব্য :

গেল হপ্তার প্রেক্ষাগৃহে লিখেছিলুম, 'আজ জাতির প্রয়োজনে নাটকাভিনয়ে এবং চলচ্চিত্রে এমন বিষয়বস্তুর অবতারণা করতে হবে, যা দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রণোন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে, আপামর জনসাধারণকে নতুন ক'রে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।...... এমন কাহিনী আজ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন, যা দেখে দর্শক বুঝবে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে-কোনো দুঃখকষ্ট বরণ করা যায়, যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করা যায়, সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণকে বলি দেওয়া যায়।' সম্প্রতি একটি বৈঠকে এই একই প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। উপস্থিতদের মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলন্ডের নাট্যশালাগুলি কি সময়োপযোগী, জাতীয়তাধর্মী, উদ্দীপক নাটক মঞ্চস্থ করেছিল ?' সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠ থেকে উত্তর এল নিশ্চয়ই! ওদেশে বহু নাটক লেখা এবং লেখানো হয়েছিল যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য চালাবার জন্যে, গণমানসে আশা, উদ্দীপনা, সহনশীলতা ও সাহস জাগিয়ে রাখবার জন্যে। যুদ্ধকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 'হোম অব দি ব্রেভ', 'টুমরো দি ওয়ার্ল্ড', 'মিসেস্ মিনিভার', 'দিস ল্যান্ড ইজ মাইন' প্রভৃতি বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর মধ্যে শেষের দু'টিকে চলচ্চিত্রের মারফৎ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের মত বহু লোকেরই হয়েছে। বোমাবিধ্বস্ত লন্ডন শহরের মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখভোগ ক'রেও কেমন করে শত্রুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিল, তার বাস্তবচিত্র আমরা দেখেছিলুম 'লন্ডন ক্যান টেক ইট' ছবিতে। যুদ্ধকালে ইংরেজী ভাষায় যে অগণিত নাটক রচিত হয়েছিল, তার ভিতর কিছু সংখ্যক নাটক নিয়ে 'ওয়ার ড্রামাজ' (যুদ্ধকালীন নাটকাবলী) নাম দিয়ে কয়েকটি সঙ্কলনও দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীন জাতির নাগরিকরূপে আমাদের নাট্যকারদেরও আশু কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্যে আমাদের দেশের লোককে মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, তাদের মনোবল অটুট রাখবার জন্যে বর্তমান সময়োপযোগী নাটক লেখবার জন্যে কলম ধরা। বিদেশী শাসনকালে আমাদের দেশাত্মবোধ যে রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, বলা বাহুল্য, এখনকার দেশাত্মবোধ নিশ্চয়ই তার থেকে ভিন্ন রূপ। তখন গান ছিল, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়", এখন আমাদের গান হবে, "বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই, কর কর সবে সাজ।" তখন আমাদের নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছে, 'মেবার পতন', 'প্রতাপাদিত্য', 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'সিরাজদ্দৌলা', 'কারাগার', কিন্তু এখন মঞ্চস্থ হোক এমন নাটক, যা আমাদের যুব-সম্প্রদায়কে সৈন্যদলভুক্ত হবার জন্যে

"রক্তপলাশ" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও নিরঞ্জন রায়

উদ্দীপিত করবে, নিজের গ্রাম বা শহরকে রক্ষা করবার জন্যে গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু ক'রে সকল প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শিক্ষা এবং গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। যে বৈঠকের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, রাণাপ্রতাপ দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করবার জন্যে সদলবলে প্রথমে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিয়ে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই নীতিকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্তমান কালোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করা সম্ভব। শ্রীচৌধুরীর প্রস্তাবটি আমরা বাঙলাদেশের নাট্যকারদের সামনে রাখলুম। কিন্তু চীনের ব্যাপক আক্রমণে বর্তমান সংকটকাল আসবার বহু পূর্বেই ১৯৫৯ সালের ২৮এ নভেম্বর থেকে ৩০এ নভেম্বর—এই তিন দিনের মধ্যেই বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় 'মহাপ্রেম' নাম দিয়ে যে অনতিদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি রচনা করেছিলেন এবং ১৯৬০ সালের ২৬এ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাকেই বর্তমান কালোপযোগী প্রথম নাটক ব'লে অভিনন্দিত করতে চাই। 'একটি অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ' নিয়ে রচিত এই 'মহাপ্রেম' নাটকখানি পাঠ ক'রে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে, ১৯৬২ সালের ২০এ অক্টোবর তারিখে চীনাদের দ্বারা ভারত সীমান্ত যে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবে, এ সম্পর্কে শ্রীরায়ের কি স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল? কিংবা কোনো ভবিষ্যদ্রষ্টা জ্যোতিষী প্রায় তিন বছর আগে তাঁকে এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন? নইলে তাঁর এই 'মহাপ্রেম'-এর প্রতিটি ছত্র প'ড়ে কেন মনে হয়, চীন কর্তৃক আক্রান্ত অঞ্চলের কোনো গ্রামের দু'টি দিনের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি? নাটকের প্রথম সংলাপ—"না, না পঞ্চায়েত, আর দেরী নয়। একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে শত্রু-পল্টন,—বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে" থেকে শুরু ক'রে শেষ সংলাপ "হ্যাঁ, এসে গেছি। দুশমনদের তাড়িয়েছি" পর্যন্ত চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকখানির বক্তব্য হচ্ছে, মিলিটারীর সাহায্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত শত্রু-আক্রমণ-সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রামের লোকেদের কি করা উচিত, গ্রামের পথঘাট কিভাবে শত্রুর পক্ষে অব্যবহার্য করা সম্ভব, পঞ্চমবাহিনীর লোক সম্বন্ধে কতখানি সজাগ থাকা প্রয়োজন, সমস্ত গ্রামের মনোবল অটুট রেখে গেরিলা যুদ্ধের জন্যে দেশের যুব-সম্প্রদায় কিভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং প্র'য়োজন হ'লে কিভাবে "পোড়ামাটি" নীতি অবলম্বন ক'রে পশ্চাদপসরণও করতে হয়। অথচ এমন সুকৌশলে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচনা করা হয়েছে যে, শুষ্ক প্রচারের নামগন্ধও কোথাও নেই। আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এই 'মহাপ্রেম' নাটকখানি।

শুনে আনন্দিত হলুম, প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা ধরে যাতে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হতে পারে, তার জন্যে শ্রীরায় সম্প্রতি আরও চারটি দৃশ্য যোজনা করে নাটকটির কলেবরকে দ্বিগুণ করেছেন। আমরা আশা করি, কোনো সাধারণ রঙ্গালয় যদি উৎসাহী হয়ে নাটকখানিকে কালবিলম্ব না ক'রে মঞ্চস্থ করেন, তাহলে তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ অর্জন করবেন। কিন্তু এই এক 'মহাপ্রেম'ই নয়, আরও বহু নাটক লিখিত হয়ে পেশাদারী এবং অপেশাদারী—সকল নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হওয়ার আশু প্রয়োজন ঘটেছে আজ।

চিত্র-প্রযোজকদেরও এই পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে দৃঢ়তর হয়, স্বাধীন ভারতের প্রতিটি যুবক যাতে অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে-কোনো মুহূর্তে নিজেকে সংগ্রামী সৈনিকে পরিণত করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে উৎসাহিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে তাঁরা পর্দায় প্রতিফলিত করুন। নেহরু বলেছেন সংঘর্ষ দীর্ঘ দিন ধরে চলবে। কাজেই জনসাধারণ তাদের মনোবলকে অক্ষুন্ন রেখে যাতে দীর্ঘকাল দেশ-মাতৃকার জন্যে দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকে, চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে সেই আদর্শ প্রচার করবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করবার জন্যে সকল চলচ্চিত্র-প্রযোজককে অনুরোধ জানাই।

রক্তপলাশ (বাঙলা) : এমকেজি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন : ৩,৬৫২ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা : সুনীল বসুমল্লিক, পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : প্রণব রায়, সঙ্গীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত, চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত, চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা, শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু, সম্পাদনা : রবীন দাস, রূপায়ণ : অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জীবেন বসু, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি), অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, মাঃ বাসুদেব প্রভৃতি। কালিকা ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ১৬ই নভেম্বর থেকে

রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একটি বিদেশী ছায়াচিত্র থেকে সংগৃহীত কাহিনী অবলম্বন করে 'রক্তপলাশ' চিত্রনাট্যটি গড়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক, জাহাজী অফিসার শঙ্কর চৌধুরী নিতান্ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় নায়িকা নীলার দুর্বৃত্ত ভাই শশাঙ্ককে যখন দৈবক্রমে গুলীর আঘাতে হত্যা করে বসল, তখন ডাকু নামে এক দুঃসাহসী ছেলে হয়ে রইল তার একমাত্র সাক্ষী। পুলিশ এবং শঙ্কর, দু'পক্ষই যখন জানল ডাকুই হচ্ছে ঐ হত্যাকান্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, তখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শঙ্কর ডাকুকে নিজের দলে টেনে গা-ঢাকা দিল। সেই থেকে শুরু হ'ল পুলিসের খোঁজাখুঁজি। অবশ্য ডাকু ধরা পড়ল বনভোজনকারী একটি দলের কৌতুক-সৃষ্টিকারী দলপতির সাহায্যে। এইবার শঙ্কর হয়ে পড়ল ভীত—ডাকু পুলিশের চাপে সত্যপ্রকাশে বাধ্য হলে অবধারিত তার ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি বিদেশগামী জাহাজে চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে পা বাড়াল। কিন্তু পুলিশ তাকে সহজে ছেড়ে দিল না। রোমহর্ষক ঘটনার মাঝে যখন সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, তখন খুনের দায়ে সে হ'ল আদালতে অভিযুক্ত। এরপর ডাকুর সাক্ষ্যের ফলে কেমন করে প্রমাণিত হ'ল যে, হত্যাকান্ডটা নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং শঙ্কর নির্দোষ, তাই নিয়েই ছবির পরিসমাপ্তি।

এই ধরনের রোমাঞ্চকর চিত্রকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে আলোকচিত্রকরের দায়িত্ব অনেকখানি। চিত্রগ্রহণ-পরিচালক অনিল গুপ্ত এবং চিত্রগ্রহীতা জ্যোতি লাহা সেই দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন। বিশেষ করে ছবির আরম্ভভাগে রাত্রির বহির্দৃশ্যগুলি অসাধারণভাবে দর্শক-মনকে অধিকার করে। ঠিক অনুরূপ কথাই বলতে হয় আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে, তবে ঘটনানুযায়ী ভাবসৃষ্টির জন্যে আবহ-সঙ্গীতকে কোথাও অযথা গুরুভার করে তোলা হয়নি। শব্দানু-লেখনে বাণী দত্তর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সম্পাদনায় রবীন দাস ছবিটিকে যে সুষম ছন্দে বন্ধ করে ধীরে ধীরে এর গতিবেগকে বর্ধিত করেছেন, তাও ভূয়সী প্রশংসালাভের যোগ্য; এখানে বিশেষ করে বলা দরকার, একদিকে খুনের কাহিনী এবং অপর দিকে একটি মধুর প্রেমের উপাখ্যানকে একসঙ্গে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া রীতিমত মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। পাতলা কাগজের সাহায্যে ঘষা কাচ সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টাকে বাদ দিলে কার্তিক
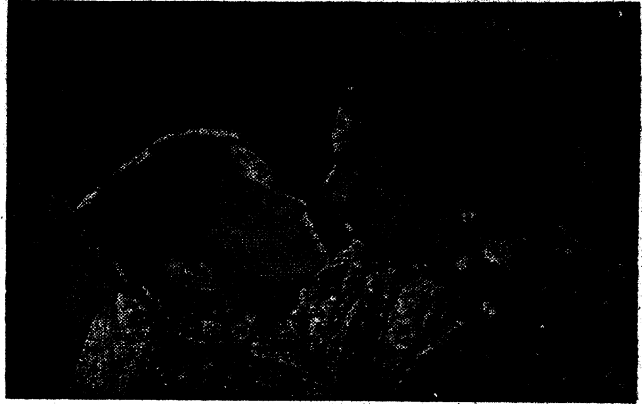
'জয় ভবানী' চিত্রে মনহর দেশাই ও জয়শ্রী গড়কর

বসুর শিল্পনির্দেশন উচ্চাঙ্গের এবং বাস্তবসম্মত।

'রক্তপলাশ'-এর একটি উজ্জ্বল অংশ হচ্ছে এর সমষ্টিগত অভিনয়। অসংখ্য চরিত্র-বিশিষ্ট এই ছবিখানিতে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। কিন্তু সকলের কৃতিত্বকে অতিক্রম করে যার অভিনয় দর্শকমনে অত্যন্ত সুগভীর রেখাপাতে সমর্থ হয়, সে হচ্ছে বালক-অভিনেতা মাস্টার বাসুদেব। এই 'ক্ষুদে' অভিনেতাটি তার চলনে, বলনে, চোখের চাহনি এবং অঙ্গভঙ্গীতে ছবির সব জায়গাতেই তার নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও যেখানে সে তার চোখে-দেখা হত্যা দৃশ্যটিকে পুনরভিনয় করে দেখায়, সেখানে তার আশ্চর্য অভিনয় অবিস্মরণীয়। অনিল চট্টোপাধ্যায় এক-জন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী, নায়ক শঙ্করের ভূমিকায় তাঁর আন্তরিক অভিনয় তাঁর সুনামকে বর্ধিত করবে। নায়িকা নীলা বেশে সন্ধ্যা রায় তাঁর সংবেদনশীল অভিনয়গুণে চরিত্রটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ভূমিকাটিতে তাঁকে মানিয়েছেও যেমন চমৎকার, তেমনই এই ভূমিকায় তাঁর বহুমুখী অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। ডাকুর মামীর ভূমিকায় রেণুকা রায়ের স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ অভি-নয় আমাদের অতিমাত্রায় তৃপ্ত করেছে।

এছাড়া পুলিস-অফিসারের ভূমিকায় কমল মিত্র, নায়কের ডাক্তার পিতার বেশে বিপিন গুপ্ত, শিবু গুন্ডারূপে দীপক মুখোপাধ্যায়, ডাকুর মামার ভূমিকায় জীবেন বসু, বনভোজনকারীদের দলপতিরূপে জহর রায়, নায়কের মায়ের ভূমিকায় ছায়া দেবী প্রভৃতি সকল শিল্পীই যে তাঁদের গৃহীত চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করেছেন, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। মাত্র নায়িকার দুর্বৃত্ত ভাই শশাঙ্কের ভূমিকাটিতে নিরঞ্জন রায়ের অভিনয় আরও উন্নততর হবার অবকাশ ছিল বলেই মনে হয়।

বহু রোমহর্ষক দৃশ্যে ভরা এই 'রক্তপলাশ' চিত্রটি অপরাপর নানা গুণের মধ্যে বিশেষ করে মাস্টার বাসুদেবের অবিস্মরণীয় অভিনয়গুণে চিত্ররসিকদের পক্ষে একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য চিত্ররূপে চিহ্নিত হবে।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব :

গেল শনিবার, ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নাটক-রচনা, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্যে পরিষদ 'বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা' নামে একটি মহাবিদ্যালয় চালু করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে পনেরোজন সদস্য নিয়ে একটি শক্তিশালী পরিচালন-পরিষদ গঠিত হয়েছে। যাতে এই সান্ধ্য মহা-বিদ্যালয়টি আসছে বছরের জানুয়ারী থেকেই কাজ শুরু করতে পারে এবং যত শীঘ্র সম্ভব নবগঠিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়, তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ব'লে প্রকাশ।

ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ :

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি নাতিদীর্ঘ ছবি করবার জন্যে মনস্থ করেছেন। উল্লেখযোগ্য এর পরিচালক তপন সিংহ থেকে শুরু ক'রে এর শিল্পিবৃন্দ, কলাকুশলীরা এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দ এতে কাজ করবার জন্যে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেবেন না। ফিল্ম প্রভৃতিও যাতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তারও চেষ্টা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তার মধ্যেই ছবিটি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে পারবে।

জার্মান নাট্য-বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা :

গেল শনিবার, বেলা ২॥টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে পশ্চিম জার্মানীর নাট্য-বিশেষজ্ঞ ডঃ স্টেম্যান 'জার্মানীর নাট্য আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দেন। ৫৩৯ খৃষ্টপূর্ব থেকে গ্রীস দেশের নাট্য-প্রচেষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, যে দিন মানুষ বেদীর ওপর ভগবানের নামে উৎসর্গ দিতে শুরু করে, সেদিন থেকেই নাটকের হয়েছে জন্ম। প্রতি মাসে একটি ক'রে চার মাসে প্রদত্ত চারটি বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য শেষ হবে।

পরলোকে মনোরঞ্জন ঘোষ :

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহের পরিচালন-সংস্থা 'দি স্ক্রীণ কর্পোরেশন'-এর নির্বাহী অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টার) মনোরঞ্জন ঘোষ গেল শনিবার, ১৭ই নভেম্বর সকালে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় আটষট্টি। বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা বহু আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তাঁর আদি নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুরে হ'লেও তাঁর জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার সদনপুর গ্রামে ১৮৯৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে। ছাত্রজীবন কিন্তু তাঁর প্রধানতঃ কলকাতাতেই। এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত "রূপবাণী" নাম নিয়ে উত্তর কলকাতায় বিশিষ্ট চিত্রগৃহটি ১৯৩২ সালে যে-দিন তার দ্বারোদ্ঘাটন করে, সেই দিন থেকেই শ্রীঘোষেরও চলচ্চিত্র-জগতে পথযাত্রার শুরু। পরে 'প্রাইমা ফিল্মস্' নামে পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এবং অরুণা ও ভারতী নামে আরও দুটি চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেন। এই বছরই তিনি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আমরা শ্রীঘোষের পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

'নবাগত'-এর 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' :

আজ শুক্রবার ২৩এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় 'নবাগত' নাট্যসংস্থা নীতীশ সেন রচিত 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা'

নামে নাটিকা দুখানি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবেন।

শিল্পশ্রীর ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন :

গেল সোমবার, ১৯এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় সুবিদিত সংস্কৃতি সংস্থা 'শিল্পশ্রী'র ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি-রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কলকাতার শেরিফ সন্তোষের রাজা বি, এন, রায়চৌধুরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতে নিযুক্ত সাংস্কৃতিক অধিকর্তা হার্বার্ট বার্টহোল্ড এবং ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু।

এই উপলক্ষ্যে সংস্থার সভাবৃন্দ ডি, পি, কর রচিত 'সুরবাঈ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

একখানি জাপানী ছবির বিশেষ প্রদর্শনী :

ছবিখানির জাপানী নাম "হাদকা নো শীমা"; ইংরেজীতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "দি ভ্যালিয়াণ্ট আইল্যাণ্ড" (সাহসী দ্বীপ)। ২,৬৩৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ রীলে সম্পূর্ণ এই ছবিখানি ১৯৬১ সালের মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "গ্র্যাণ্ড প্রিক্স" লাভ করেছে। সাদা-কালোর সমন্বয়ে নির্মিত এই ছবি-খানিতে সংলাপ নেই একটিও; আছে মাত্র কিছু গান, কিছু হাসি, কিছু কান্না এবং আনুষঙ্গিক শব্দ ও আবহ সংগীত। একটি নির্জন দ্বীপে একটি চাষী দম্পতির অজস্র পরিশ্রম ক'রে দিন-যাপনের কঠিন বাস্তব কাহিনী এই ছবিখানিতে চিত্রিত হয়েছে। "চিলড্রেন অব হিরোশিমা", "গিস্কো-এ গিজা গার্ল", "উলভস" প্রভৃতি চিত্রের সুখ্যাত পরিচালক কানেতো শিণ্ডো এই ছবিখানি পরিচালনা করা সম্পর্কে বলেছেন, "পৃথিবী এবং প্রকৃতির সঙ্গে কৃষক-দম্পতির নীরব সংগ্রামটিকে যথা-যথভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই আমি ছবিটিকেও "নীরব" (সংলাপহীন) করেছি। প্রতিটি চিত্রই এখানে ভাষ্যকারের কাজ করেছে।" এই পরীক্ষায় কানেতো শিণ্ডো যে সসম্মানে জয়যুক্ত হয়েছেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। মেহবুব প্রোডাকসন্স এবং জ্যোতি সিনেমার সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এই অপূর্ব ছবিখানির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

একটি অনুষ্ঠান

গত ২০শে অক্টোবর, শনিবার কোলড়া বীণাপাণি ক্লাবের ৭৬তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের সর্বাধিনায়ক ডাঃ বি, এন, সিনহা মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক শ্রীপঞ্চানন দত্ত মহাশয়। সংঘের সভাবৃন্দ কর্তৃক শচীন সেন-গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' সংঘের নবনির্মিত নিজস্ব মঞ্চে অভি-নীত হয়। গোলাম হোসেনের ভূমিকায় শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সকলের মনে রেখাপাত করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী পঞ্চানন নন্দী, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বলাই চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন শেঠ, গৌর সরকার, শীতল সরকার, আনন্দ সরকার, দীননাথ ঘোষাল, রবীন্দ্র সরকার, চিন্তা ঘোষাল, বিভূতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, চিন্তা সরকার, বেচু চট্টোপাধ্যায়, মধু মান্না, হারু শেঠ, কৃষ্ণধন ঘোষাল, সমর মুখার্জি, শ্রীমতী রেনুকা ভট্টাচার্য, দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্নপূর্ণা মুখো-পাধ্যায়।

।। 'দুঃখীর ইমান' নাট্যাভিনয় ।।

'তুলসীদাস লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করলেন গত ১২ই নভেম্বর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতির হেড অফিস শাখার সভ্যবৃন্দ। অফিস ক্লাবের পক্ষে এ ধরনের দুরূহ ও জটিল নাটক অভিনয় দুঃসাহ-সিকতার পরিচয় এবং তাঁরা এই দুঃসাহসিক কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, তা নয় কিন্তু বিশেষ করে নায়কের চরিত্রে অপূর্ব বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন রণজিত রায়। একদিকে উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় আমেজ অন্যদিকে রাগ ও দুঃখ এবং চারিত্রিক দ্রাঢ্য প্রকাশে পেশাদারী অভিনেতার প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠেছেন। তারপরই উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেছেন জামালের ভূমিকায় দীপেন সেন এবং টাইপ চরিত্র হিসাবে রামঅবতারের ভূমিকায় দেবেশ চৌধুরী। এ ছাড়াও বিজাতীর ভূমিকায় আভা মণ্ডল, ম্যানোর চরিত্রে সান্ত্বনা ঘোষ, বসিরের ভূমিকায় মাঃ মানস এবং জমিদারের চরিত্রে ধ্রুব গুপ্ত সুঅভিনয় করেছেন। নাটকটির সুষ্ঠু পরিচালনা করেন শ্রীভীম মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে

কমনওয়েলথ চলচ্চিত্র পুরস্কার

বৃটেনের রয়েল সোসাইটি অব আর্টস কমনওয়েলথ দেশগুলিতে সাধারণের কল্যাণ-কল্পে নির্মিত শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের জন্য একটি পুরস্কার দিয়ে আসছেন দু-বছর ধরে। এ বৎসরে পুরস্কার লাভ করছেন জামাইকার উন্নয়ন দপ্তর এবং হংকং সরকার। চিত্রে জামাইকার অস্থায়ী হাই-কমিশনারকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলেন বিখ্যাত সুঅভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়।
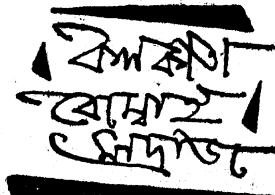
কলকাতা

সম্প্রতি দীঘায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন জওলা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'দুইনারী'-র পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী। দুইনারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে ভালবাসার অন্তরবেদনায় একটি পুরুষ সাড়া দিয়েছিল সেই কাহিনী রচনা করেছেন কথাশিল্পী সমরেশ বসু। বহির্দৃশ্যের একটি রোমাঞ্চমধুর দৃশ্যে শিল্পী ছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার। কাহিনীর আর এক নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কাজল গুপ্ত। এ ছবির কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। আলোকচিত্র ও সংগীত পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

কিশোর চিত্র 'অপরূপ কথা'-র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হল। পরিবর্তন-খ্যাত মনোরঞ্জন ঘোষ এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন পঞ্চক-গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনা করবেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

রাধা ফিল্মস স্টুডিওর পরি-চালক ভূপেন রায় একটি রহস্য-রোমাঞ্চকর ছবি 'নিশাচর'-এর কাজ আরম্ভ করছেন। শম্ভু মিত্রের বিপরীতে অভিনয় করছেন মঞ্জু দে। নায়িকা সম্ভবতঃ শম্পা। একটি বিশেষ চরিত্রে বিকাশ রায়কে দেখা যাবে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'নবদিগন্ত'। বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরি-চালনা করেছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। আলোকচিত্র, সংগীত ও শব্দগ্রহণ পরি-চালনা করেছেন বিভূতি লাহা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও যতীন দত্ত। কাহিনীর দুই নারীর প্রণয়-জীবনের কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে এ ছবির চিত্র-নাট্য গড়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্র যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী ও অপর্ণা দেবী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

বোম্বাই

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণে সীমান্ত রক্ষার তহবিলে সবচেয়ে আশাজনক সাড়া দিয়েছেন বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্র শিল্পীরা। সম্প্রতি প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহকল্পে শিবাজী পার্ক থেকে বল্লভ-ভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম পর্যন্ত এক শিল্পী-মিছিল দেখা যায়। প্রিয়শিল্পীদের হাতে জনসাধারণ তাঁদের অর্থ ও স্বর্ণ দান করেন। শিল্পীদের নিজস্ব কয়েক-জনের উল্লেখযোগ্য দান হল, এ ভি এম—পঞ্চাশ হাজার, এস জি রামচন্দ্র—এক লক্ষ, শিবাজী গণেশন— পঞ্চাশ হাজার, দিলীপকুমার, মীনাকুমারী, রাজকাপুর ও শংকর জয়কিষণ পঞ্চাশ হাজার করে। বৈজয়ন্তীমালা, শাম্মি কাপুর ও রাজেন্দ্র-কুমার প্রত্যেকে পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া প্রতিদিন অর্থের অঙ্ক বেড়ে চলেছে। এই আসন্ন অর্থ সংগ্রহার্থে সিনে আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন তৎপর হয়েছেন।

প্রযোজক মোহন সায়গল তাঁর পর-

মতী ছবি 'প্রেয়সীর হিন্দী এই মাসেই শুরু করবেন। এ ছবির হিন্দী নামকরণ হয়েছে 'ওয়াপস'। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল পার্ক ও এয়ারে মিল্ক কলোনীর বহির্দৃশ্যে সঙ্গীত গ্রহণ-দৃশ্য শেষ হল বি এল রাওয়াল প্রযোজিত 'দিল হি তু হাই' ছবির। এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকাপুর, নূতন, প্রাণ, আগা, মাজিদ হোসেন, লীলা চিটনিস, সবিতা চ্যাটার্জি ও শিশুশিল্পী রাজা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রোশন। যুগ্ম-পরিচালক পি এল সন্তোশী ও রাওয়াল।

রূপতারা স্টুডিওর মুকুল পিকচার্সের 'রাজা' ছবির কাজ আরম্ভ হচ্ছে। আলোকচিত্র প্রযোজনা করছেন রামদয়াল। রাধাকান্ত-র পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিজয়া চৌধুরী, জগদীপ, জীবন, সুন্দর, জীবনকলা ও শ্যাম। সঙ্গীতে সুর-সৃষ্টি করেছেন এস এন ত্রিপাঠী।

ঈগল ফিল্মসের 'প্রফেসর' এই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। এফ সি মেহেরা প্রযোজিত ও লেখ টেনডন পরিচালিত এছবির প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর ও কল্পনা। সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ।

মাদ্রাজ

ভসু ফিল্মসের 'ভরোসা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে বাসথানি স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, গুরু দত্ত, মাহমুদ, শুভা খোটে ও নীনা। প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন বাসুদেব মেনন ও কে শঙ্কর। সঙ্গীত পরিচালক হলেন রবি।

মাদ্রাজের বিভিন্ন চিত্রগৃহে সম্প্রতি পাঁচটি নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে। প্রথমটি 'মথুমান্দাপাম'। অভিনয় করেছেন এস এস রাজেন্দ্রন, বিজয়াকুমারী, চন্দ্রকান্ত ও মনোরমা। পরিচালনা করেছেন এ স্বামী।

দ্বিতীয়টি 'সাবরিমালাই শ্রীআয়াপ্পান'। পদ্মিনী, রাগিণী ও অম্বিকা অভিনীত। এ ছবির পরিচালক হলেন এস নাইডু।

তৃতীয়টি প্রযোজক-পরিচালক এস রাঘবন-এর ছবি 'আজাগানীলা'। সঙ্গীত পরিচালক কে মহাদেবন।

চতুর্থ ছবি 'বিক্রমাদিত্য'। রামচন্দ্রন ও পদ্মিনী অভিনীত ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এস রাজেশ্বরাও।

শেষ ছবিটি শান্তি ফিল্মসের 'বন্দাপাশাম'। পরিচালনা করেছেন ভীম সিংহ। শিবাজী গণেশন, জেমিনী গণেশন ও বি সাবিত্রী প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। —চিত্ররথ

মুক্তি প্রতীক্ষিত আগামী চিত্রের একটি কাহিনী সম্পর্কে এবারে আপনাদের বলবো। ছবির নাম 'ধূপছায়া'। এ ছবির সংগঠনে রয়েছেন, প্রযোজনা—অনন্ত সিংহ। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত। সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে অমল মুখোপাধ্যায়, সুহৃদ ঘোষ ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীজগন্নাথ পিকচার্সের পরিবেশনায় এ ছবির প্রচার পরিকল্পনায়-আছেন রমেন চৌধুরী।

চরিত্র-রূপায়ণে প্রধান চরিত্রে নাম কৃষ্ণকান্ত—ছবি বিশ্বাস, প্রদীপ—বিশ্বজিৎ, হিমাদ্রি—এন, বিশ্বনাথন, যতিশঙ্কর—বিপিন গুপ্ত, অমিয়নাথ—পাহাড়ী সান্যাল, সিদ্ধার্থ—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট—তরুণকুমার, উমা—দীপ্তি রায়, অমিতা—অনুভা গুপ্তা, গৌরী—সন্ধ্যা রায়, করুণাময়ী—অপর্ণা দেবী, অমর মল্লিক, চণ্ডীদাস, ভানু ঘোষ ও শান্তা দেবী ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

কাহিনীর আরম্ভে নায়ক হিমাদ্রি শিমুলতলায় তার দাদু অমিয়নাথের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে আসে। কলকাতায় ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। হিমাদ্রি তাই খালি হাত-পায়েই চলে এসেছিল এখানে। কিন্তু হঠাৎ এই বাড়ীর আশ্রিতা উমাকে দেখে তার কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল লেগে যায়। তিনদিনের ছুটিতে তিন মাস উত্তীর্ণ হল। হিমাদ্রি-উমা দুটি যৌবন এক হল। ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেতে ওঠে। যদিও বিলেত থেকে ফিরে এসে সামাজিক প্রথায় উমাকে হিমাদ্রি বিবাহ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তারা এই প্রণয়মধুর দিনগুলো সবার অলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছিল। হিমাদ্রির কথায় উমা বিশ্বাসী হয়।

কলকাতায় ফিরতে হয় হিমাদ্রির। হঠাৎ বিলেত যাবার আগে হিমাদ্রির বাবা যতিশঙ্কর তার বন্ধু-কন্যা অমিতার সঙ্গে হিমাদ্রির বিয়ের কথা পাকা করলেন। কারণ তিনি এ ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ। এদিকে কোন উপায় না দেখে হঠাৎ বিয়ের আগে আবার হিমাদ্রি শিমুলতলায় উমার কাছে ছুটে চলে আসে। কিন্তু উমার তখন কোনও উপায় ছিল না। এই অবস্থা-

[illegible] উমাকে [illegible] দেখে [illegible] অমিয়নাথ উমাকে [illegible] আসেন দেশ। [illegible] কথা জেনে উমা কলকাতায় [illegible] হিমাদ্রির সঙ্গে উমার দেখা হোল না। [illegible] জানতে পারে যে উমা মৃত। এই নিদারুণ খবর শুনে কলকাতায় হিমাদ্রি ফিরে গেল। যতিশঙ্করের অনুরোধে হিমাদ্রি অমিতাকে বিবাহ করতে রাজী হয়। এই নিদারুণ বিবাহের কথা শুধু উমা জানতে পারেনি। প্রতিশ্রুত এতদিনের বিশ্বাসটা ভেঙে যায় উমার। কলকাতার জনসমুদ্রে নিজেকে তার বড় দুর্বল বলে মনে হয়। এই দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ এক মোটর দুর্ঘটনায় উমা এক নার্সিং হোমে। তার সদ্যজাত শিশুর কান্নায় যেন নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা পেল। তাই একদিন সুস্থ হলে রাতের আঁধারে হিমাদ্রির বাড়ীতে এই নবজাত শিশুকে রেখে আসে। এইসঙ্গে বিস্তারিত হিমাদ্রিকে লেখা একটা চিঠি রেখে উমা নিঃস্ব হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো। তখন হিমাদ্রি সাগরপারে। শুধু অমিতা হিমাদ্রিকে লেখা উমার চিঠিতে সব জানতে পারে। অমিতা নীরবে নিজের ব্যথা ভুলে এই শিশুকেই বুকে তুলে নেয়।

এরমধ্যে দীর্ঘ বছর উত্তীর্ণ হয়। পৃথিবীর কাছ থেকে ছুটি চাইলেও উমা কিন্তু ছুটি পায়নি। এক অনাথ মেয়েকে

চিত্ত বসু পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'ধুপছায়া'র একটি দৃশ্যে বিশ্বনাথন ও অনুভা গুপ্তা।

বড় করে তোলার দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। অন্যদিকে অমিতা সেই নবজাত শিশু প্রদীপকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে সাবালক করে তোলে। দীর্ঘ বাইশ বছর পার করে হিমাদ্রি বিলেত থেকে এসে কোন কথাই জানতে পারেনি। শুধু এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তার কেটে গেছে দীর্ঘ বছর। প্রদীপকে তাই সে সহজে গ্রহণ করতে পারলো না।

উমার কাছে অনাথা গৌরী বড় হয়। ঘটনাচক্রে একদিন প্রদীপের গৌরীর প্রতি ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার মধ্যে প্রদীপ জানতে পারলো না যে গৌরীর বড় মা-ই তার নিজের মা হলো। কিন্তু উমা সব জেনেও নিজেকে ধরা দেয়নি কোনদিন।

ডাক্তারী পাশ করে প্রদীপ। অমিতা প্রদীপকে বিলেতে পাঠাবার কথা ভাবেন। তবে এরমধ্যে স্বাভাবিকভাবে একদিন গৌরী ও প্রদীপের বিয়ের কথা ওঠে। কিন্তু হিমাদ্রি তীব্র প্রতিবাদ করে। এক অজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে আর একজনের জীবনকে এমনিভাবে গোপনে জড়িয়ে ফেলার কোন অর্থই তার কাছে সুস্পষ্ট নয়।

অমিতা কিন্তু তবু নীরব। প্রদীপের সত্যিকারের পরিচয় সে হিমাদ্রিকে জানাতে পারলো না বোধহয় মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবার কষ্টে। আর উমা? সে কি এখনও হিমাদ্রির প্রতিশ্রুত কথার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে? না হিমাদ্রি সব জেনে জীবনটাকে ভুলতে চেয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর আপনারাই ছবি দেখে বিচার করবেন। আগে থেকে সমাপ্তি বা পূর্ণচ্ছেদ না টানাই ভাল। —চিত্রদূত

।। ইরমা-লা-দুস ।।

আমেরিকার চিত্রনির্মাণ জগতের সাম্প্রতিক বিস্ময় হল স্যামুয়েল গোল্ডুইন স্টুডিওতে আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত একটি সেট। প্যারিসের দুটো রাস্তাকেই যেন তার সমস্ত দোকান-পাট রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত তুলে এনে বসানো হয়েছে। সেইটি নির্মিত হয়েছে 'ইরমা লা-দুস' চিত্রের জন্যে। আই, এ, এল ডায়মন্ড এই চিত্রের কাহিনীকার এবং পরিচালক হচ্ছেন বিখ্যাত বিলি ওয়াইল্ডার। মিরিশ এবং ইউনাইটেড আর্টিস্ট চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

ইদানীং হলিউডে হাসির ছবি তৈরী করার তিনটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলেন প্রযোজক পক্ষ। এক হচ্ছে ছবিতে থাকবে কতগুলো কিম্ভূত চরিত্র যারা অবিশ্বাস্য জীবন-যাপন করে, অদ্ভুত কাজ করে, কথা বলে। এই ধরনের উপাদান নিয়ে তোলা 'পিলো টক', অপারেশন পেটিকোট', 'কাম সেপ্টেম্বর', 'ডাক্তার কামব্যাক' এবং 'ড্যাড টাচ অফ মিংক প্রভৃতি ছবিগুলির সাফল্য প্রযোজকদে এই ধরনের ছবি নির্মাণে ক্রমশঃই উৎ সাহিত করেছে। ওয়াইল্ডার কিন্তু এ ধরনের নির্জলা রঙ্গ-রসের ছবি নির্মাণে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে সমাজ-বীক্ষা পরিপ্রেক্ষিতে এই উঁচুদরের হাসির ছ নির্মিত হতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সমাজসমস্যাবন্ধ কৌতু রচনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে কীর্তিত হয়ে আসছে, অ্যারিস্টোফেনিস সেক্সপীয়ার, স্যেরিডাস অস্কার ওয়াইল্ড এর নাটকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ খোদ হলিউডেও কিছুকাল আগে 'ফিলাডেলফিয়া স্টোরী', 'দি সেনেট ওয়াজ ইনডিসক্রীট' প্রভৃতি ধরনে সমাজসমস্যার পটভূমিতে বক্স-অফিসধ হাসির ছবি তোলা হয়েছে। এমন ওয়াইল্ডার নিজেও 'দি এ্যাপার্টমেন্ট'-এ মত অস্কার পুরস্কার-জয়ী ছবি নির্মা করেছেন যার কাহিনীকারও হলে ডায়মন্ড।

হলিউডের হাসির ছবি নির্মাণে দ্বিতীয় প্রথাটির বিরুদ্ধেও ওয়াইল্ডা বিদ্রোহী। ব্রডওয়ে মঞ্চে কোনো সঙ্গীত মূলক নাটক জনপ্রিয় হলেই প্রযোজক তার পেছনে ছোটেন। 'ইরমা লা দুস যদিও একটি ব্রডওয়ে সফল সঙ্গীতবহু নাটক, ওয়াইল্ডার তাঁর ছবিতে সঙ্গীতে এতটুকু স্থান রাখেন নি। শুধু কাহিনী কাঠামোটুকু নিয়েছেন তাঁর ছবির জন্যে।

কিন্তু হলিউডের অন্যান্য চিত্র নির্মাতাদের থেকে সবচেয়ে বড় পার্থক অর্জন করেছেন ওয়াইল্ডার বহি গ্রহণে অনীহাপ্রকাশ করে। তাঁ এ ছবিটির বহিদৃশ্য যদি প্যারিসেই তোল হত পুরোপুরি, অনেক কম খরচে কাজ হত, কিন্তু ওয়াইল্ডারের মতে প্যারিসে দৃশ্য গ্রহণ প্যারিসের চেয়ে স্টুডিও সেটের নকল 'প্যারিসে'ই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ হবে।

ইরমা লা দুসের কাহিনীটি সম্পূ আধুনিক কালের। জনৈকা গণিকা অন্নভোজী একটি চরিত্রকে ঘিরে এ চিত্রের কাহিনী। তার জন্যে অর্থোপার্জ করে আনন্দ দেবে অন্য লোকেদের এ চিন্তা নায়কের অসহ্য। একটি সংলাপে মধ্যেই গোটা ছবির মূল চরিত্র ধরা পড়ে বিবাহহীন ভালবাসা সমাজে বে-আইন এই উক্তির উত্তরে নায়ক বলছে— কি সমাজেই আমরা থাকি! ভালবাস বে-আইনী অথচ ঘৃণা কদাপি বে-আইন নয়। যে যে-কোনো অবস্থাতেই থাকে তাকে ঘৃণা করতে পারে, তবে বে-আইন বলা যাবে না।

• • •

বৃটেনে টেডি বয়দের নিয়ে সম্প্রতি একটি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। ছবিটি নাম 'দি বয়েজ'। কাহিনীকার হলে জন বার্কে।

—চিত্রদূ

খেলাধুলা

দর্শক

এম সি সি বনাম অস্ট্রেলিয়ান একাদশ

এম সি সি : ৬৩৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ব্যারিংটন ২১৯ নট আউট, বেরী নাইট ১০৮, টেড ডেক্সটার ১০২ এবং কলিন কাউড্রে ৮৮ রান। মিশন ১০৩ রানে ৩ এবং সিম্পসন ১৫৩ রানে ৩ উইকেট) ও ৬৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন ১৯।)

অস্ট্রেলিয়ান একাদশ : ৪৫১ রান (ববি সিম্পসন ১৩০, বেরী শেফার্ড ১১৪, ম্যাকলাকলান ৫৫ এবং হার্ভে ৫১) ও ২০১ রান (৪ উইকেটে। শেফার্ড ৯১ নট আউট এবং ম্যাকলাকলান ৬৮।)

প্রথম দিনের খেলায় এম সি সি দল ৫ উইকেট খুইয়ে ৪৫৮ রান করে। টেড ডেক্সটার ১০২ রান করেন। কেন ব্যারিংটন এবং বেরী নাইট যথাক্রমে ১২২ এবং ৫৭ রান করে নট আউট থাকেন। কলিন কাউড্রে এবার হতাশ করেননি. ৮৮ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দল ৬৩৩ রানে (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে নি। ১৯৩২-৩৩ সালের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের এই রানই (৭ উইকেটে ৬৩৩ রান) এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান। ১৯৩২-৩৩ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল ৯ উইকেটে ৬৩৪ রান করেছিল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

কেন ব্যারিংটনের নট আউট ২১৯ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট ব্যাট করে ১৭টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী মারেন। ব্যারিংটনের ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে এই রানই বর্তমানে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। তাঁর পূর্ব রান ১৮৬, ১৯৫৯ সালে ওয়ারউইকসায়ার দলের বিপক্ষে। ১৯৫০-৫১ সালে নিউসাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে রেগ সিম্পসন যে ডবল সেঞ্চুরী (২৫৯ রান) করেন তার পর অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের পক্ষে এই প্রথম ডবল সেঞ্চুরী। আলোচ্য খেলার ব্যারিংটন এবং বেরী নাইটের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি ১৬০ মিনিটের খেলায় ২০৯ রান যোগ করেন। বেরী নাইট আলোচ্য খেলায় যে ১০৮ রান করেন তা তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী। এম সি সি দল আলোচ্য অস্ট্রেলিয়া সফরে এ পর্যন্ত পাঁচটা খেলায় যোগদান করে সেঞ্চুরী করেছে ৬টা।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া দল কোন উইকেট না খুইয়ে ১৮ রান করে।

খেলার তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া একাদশ দলের ৪টে উইকেট পড়ে ৩৫৫ রান ওঠে। ওপনিং ব্যাটসম্যান সিম্পসন সেঞ্চুরী (১৩০ রান) করেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানে শেষ হলে

কেন ব্যারিংটন

এম সি সি দল ১৮২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; কিন্তু তারা ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৮ রান করে। এই ৬৮ রানের মাথায় এম সি সি দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে অস্ট্রেলিয়ান দল জয়লাভের প্রয়োজনে ১৬০ মিনিটের খেলায় ২৫৯ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের ২০১ রান উঠেছে ৪টে উইকেট পড়ে। ফলে খেলাটি ড্র গেল।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস্ চ্যাম্পিয়ানসীপ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার রবার্ট মার্শাল (অস্ট্রেলিয়া) ৩৬২৩—২৮৯১ পয়েন্টে ভারতবর্ষের উইলসন জোন্সকে পরাজিত ক'রে চতুর্থবার বিশ্বখেতাব পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। মার্শাল ইতিপূর্বে এই অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেছেন ১৯৩৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫১ সালে। ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স বিশ্বখেতাব পান ১৯৫৮ সালে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক (চারবার) জয়লাভ করেছেন মার্শাল।

এ বছরের মূল প্রতিযোগিতার মার্শাল এবং উইলসন জোন্স মোট ৬টা খেলায় সমান পয়েন্ট অর্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেন। ফলে প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য তাঁদের মধ্যে পুনরায় খেলা হয়। মূল প্রতিযোগিতায় উইলসন জোন্স ১৬৫৬—১৪৮৮ পয়েন্টে বব মার্শালকে পরাজিত ক'রেও নিষ্পত্তি-মূলক খেলায় তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই নিষ্পত্তিমূলক খেলায় দ্বিতীয় সেসনের শেষে দেখা যায়, উইলসন জোন্স ১৫৭৩—১৪২৮ পয়েন্টে অগ্রগামী হয়েছেন—উইলসনের সর্বাধিক ব্রেক ৪৮৯ এবং মার্শালের ২৩৪। কিন্তু তৃতীয় সেসনে মার্শাল অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী হ'ন। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সেসনে উইলসন খুব ভাল খেলেও পয়েন্টের ব্যবধান অতিক্রম করতে পারেন নি।

আলোচ্য বছরের মূল প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারি ভারতবর্ষের উইলসন জোন্সের বিপক্ষে প্রতিযোগিতার সর্বাধিক ব্রেক (৩১৫) করার রেকর্ড ক'রে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন। নিষ্পত্তিমূলক খেলায় উইলসন জোন্সের সর্বাধিক ব্রেকের রেকর্ড (৪৮৯) এক্ষেত্রে গণ্য হয়নি এই কারণে যে, জোন্সের উক্ত রেকর্ড মূল প্রতিযোগিতার বাইরের ঘটনা।

উইলসন জোন্স মূল প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেলার মধ্যে ৫টি খেলায় জয়লাভ ক'রে একটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেন। উইলসন জোন্সের খেলার ফলাফল : জয় (৫)—সোমনাথ ব্যানার্জিকে ১৯৯১—১৯২৩ পয়েন্টে, রসিদ করিমকে ২৩৪৫—৭১৬ পয়েন্টে, বিল হারকোর্টকে ১৮১০ — ৮৭৯ পয়েন্টে এবং বব মার্শালকে ১৬৫৬—১৪৮৮ পয়েন্টে পরাজিত করেন। পরাজয় (১)—টম ক্লিয়ারির (অস্ট্রেলিয়া) কাছে ১৪২১—১৮০৮ পয়েন্টে পরাজিত হন।

আলোচ্য বছরের চ্যাম্পিয়ান বব মার্শাল মূল প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেলার মধ্যে কেবল একটি খেলায়—উইলসন জোন্সের কাছে পরাজিত হন।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় মোট সাতজন যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এই চারজন ছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান

—অস্ট্রেলিয়ার বব মার্শাল (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮), অস্ট্রেলিয়ার টম ক্রিয়ারি (১৯৫৪) এবং ইংল্যাণ্ডের হার্বার্ট বিথাম (১৯৬০)। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় হার্বার্ট বিথাম অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতা এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ সালের চূড়ান্ত ফলাফল

১ম বব মার্শাল (অস্ট্রেলিয়া), ২য় উইলসন জোন্স (ভারতবর্ষ), ৩য় টম ক্রিয়ারি (অস্ট্রেলিয়া), ৪র্থ হার্বার্ট বিথাম (ইংল্যাণ্ড), ৫ম সোমনাথ ব্যানার্জি (ভারতবর্ষ), ৬ষ্ঠ রসিদ করিম (পাকিস্তান) এবং ৭ম বিল হারকোর্ট (নিউজিল্যান্ড)।

॥ রোভার্স কাপ ॥

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—১ গোলে হায়দরাবাদ পুলিস লাইনস দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। গত বছর এই পুলিস দলই রোভার্স কাপের খেলায় শোচনীয়ভাবে ৬—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের এই জয়লাভ গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ বলা চলে। আলোচ্য কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় হায়দরাবাদ পুলিস লাইনস দল প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল দল গোল শোধ দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল দল পুলিস দলকে কোণঠাসা করে রাখে। আট মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দল দুটো গোল দিয়ে ৩—১ গোলে অগ্রগামী হয়। খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দল চতুর্থ গোল দেয়।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২—১ গোলে ১৯৬২ সালের ক'লকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। প্রথমার্ধের প্রথম আঠার মিনিটের খেলায় টাটা স্পোর্টস ক্লাব দুটো গোল দিয়ে বিশ্রাম সময়ে ২—১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ক'লকাতার বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব ২—০ গোলে বোম্বাইয়ের শক্তিশালী ক্যালটেক্স দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে রেল দলের খেলা পড়েছে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে।

চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল (হায়দরাবাদ) ৫—০ গোলে বোম্বাইয়ের মফৎলাল মিলস দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। পুলিশ দলের ইনসাইড রাইট খেলোয়াড় ইউসুফ খান হ্যাট-ট্রিক করেন। পুলিশ দল সেমি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে।

॥ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

ত্রিবেন্দ্রামে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ বার্ষিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল পুরুষ বিভাগে সর্বাধিক ৫৭ পয়েন্ট অর্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের এই দলগত সাফল্য এই প্রথম। পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলই উপর্যুপরি গত কয়েক বছর প্রথম স্থান লাভ করেছিল। এবছর দেশের বর্তমান আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভিসেস দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় রেলওয়ে দলের পক্ষে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করার পথ সুগম হয়। বাংলা দল জুনিয়ার বিভাগে ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে এবং মহিলা বিভাগে ৩২ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা সাঁতারু এবছর রেল বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করায় বাংলা দল দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া কয়েকজন নামকরা মহিলা সাঁতারু ব্যক্তিগত কারণে এবছর প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে সক্ষম হননি।

নিমাই দাস

পুরুষ বিভাগে বাংলার নিমাই দাস তিনটি অনুষ্ঠানে (২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) প্রথম স্থান লাভ ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার ফলে দেশে যে জরুরী অবস্থার উদ্রেক হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি জাতীয় কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। প্রধানতঃ বিশেষ প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমেই এই অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুদ্ধের মত জাতীয় আপৎকালেও খেলাধূলার ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় খেলাধূলার ভূমিকা দ্বিবিধ—প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং দেশের জনসাধারণকে হতাশা, ভয় এবং উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা করা।

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভায় স্থির হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই একটি শক্তিশালী হকি দল গঠন করা হবে এবং এই দলটি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় শহরে প্রদর্শনী হকি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বোম্বাই, দিল্লী, ক'লকাতা প্রভৃতি শহরে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ক'লকাতায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর একাদশ বনাম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একাদশ দলের এক চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে অবস্থানকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রখ্যাত চারজন ফাস্ট বোলারদেরও আমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির আবেদনে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন সর্বসম্মতিক্রমে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০০ টাকা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 30th November, 1962
40 Naya Paise

সব মুখেই এক প্রশ্ন, "চীনাদের এই চালের অর্থ কি, এবং এই চালের পরেই বা কোন মুখে গতি?"

এ প্রশ্নের উত্তর জানে শুধু চীনের ভাগ্যবিধায়ক কয়েকজন মাত্র। এবং পূর্ণ উত্তর তাহারাও জানে না, কেননা এই চালের আমরা কি অর্থ করিব এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় আমরা কোন পথে চলিব তাহার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। তবে একথা সহজেই বলা যায় যে, এই প্রশ্নের কোনও সরল ও সদুত্তর নাই, কেননা প্রশ্নটাই কুটিল ও জটিল। এবং তাহার এই জটিলভাব যে ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কেননা যে "যুদ্ধবিরতি" প্রস্তাবের বশে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছে সেই প্রস্তাবের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী অনেক বাক্য রহিয়াছে। ভারত সরকারের বিবৃতিতে সেই সকল অসংগতির উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হইয়াছে। এবং দুই তিনটি দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাও চীনা সরকারের নিকট চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। তাহার কি উত্তর আসে এবং সেই উত্তরে এই প্রস্তাব জটিলতর হয় কি সহজ হয় সে বিষয়েরও কোনও স্থিরতা নাই।

সুতরাং সারা জগত যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না সে প্রশ্নের কোনও আনুমানিক সমাধান এখানে আমরা উপস্থিত করিব না। শুধুমাত্র একথা বলিয়া এখনকার মত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ স্থগিত রাখিব যে বিগত ২০শে অক্টোবরের আক্রমণের ফলে চীনের যে মুখোস খুলিয়া গিয়া তাহার ক্রূর ও হিংস্র মুখ দেখা দিয়াছে, এই যুদ্ধবিরতির মুখোস তাহারই পরিবর্তে পরা হইয়াছে, জগতকে ভুলাইবার জন্য এবং ভারতকে ছলিবার জন্য। এবং সবশেষে বলিব "ফলেন পরিচীয়তে"।

বর্তমানের দিকেই এখন খরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কেননা আমাদের প্রতিরোধ প্রস্তুতির অভাবে আমাদের যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে তাহার পুনরাভিনয়ের সম্ভাবনাকে দূর করা নিতান্তই প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের আরও কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তেই যাহাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ়তর ও যথোচিত হয় সেদিকে প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। চীনাদের বৃহত্তর আক্রমণের আয়োজন যে অনুক্ষণ চলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শুধু তাহার দিনক্ষণ ও আক্রমণের গতিমুখ এখন অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়াছে এই সাময়িক যুদ্ধ বিরতির ফলে। হিমালয়ের অন্তরালে ঐ বিশ্বাসহন্তারা কিসের আয়োজন করিয়া চলিতেছে আমরা আগেও বুঝিতে পারি নাই, এবং এখনোও বুঝি না। তবে উদ্দেশ্য যে সৎ নয় সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাসাধিককালের অবিশ্রাম যুদ্ধে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের সেনাদলের যুদ্ধদানের ক্ষমতা, তাহাদের শৌর্যবীর্য এবং ধৈর্য পূর্বেকার মতই অটুট ও অতুলনীয় আছে। এখন প্রশ্ন যুদ্ধাস্ত্রের এবং যুদ্ধদানের অন্য উপকরণের। এখানেই আমাদের প্রস্তুতির মধ্যে অশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গিয়াছে যাহা শোধরাইতে এখন প্রবল আয়াসপ্রয়াস ও আয়োজন চাই।

আমাদের বীর জওয়ানরা আপনাদের বাঁচানোর জন্য রক্ত দান করছেন। আপনি তাঁদের বাঁচাবার জন্য রক্ত দিন ॥

এই অবস্থার মধ্যে আমাদের আশ্বাসের প্রধান উপাদান দেখা গিয়াছে আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সহায়তার আকাঙ্ক্ষা ও সক্রীয় উদ্যোগের মধ্যে। সেই সহায়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলে আমাদের প্রতিরক্ষা এবং তাহার পর পুনরুদ্ধার-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। তাই বর্তমানে প্রয়োজন সেইদিকে সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দ্রুতবেগে আয়োজন সম্পূর্ণ করার।

এদেশের পবিত্র ভূমির সূচাগ্র অংশ যতদিন শত্রু-কবলিত থাকিবে ততদিন অন্য সকল কথা বা অন্য সকল চিন্তা অবান্তর।

যাঁহারা দেশের ও জাতির পথপ্রদর্শক আশা করি তাঁহারা চতুর চীনের এই নূতন ফন্দীতে প্রতারিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে কোনও বিরাম-বিশ্রাম বা বিভ্রমের সৃষ্টি করিবেন না। যুদ্ধপরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে কোনও ভুলভ্রান্তিতে প্রকৃত কাজে ব্যাঘাত বা ব্যবস্থাবিভ্রাট ঘটিবে না। ঝড় কাটিয়া যায় নাই, ইহা সাময়িক ক্ষান্তি মাত্র।

কিন্তু মাভৈঃ!

গান

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি—মা আমার, মা আমার !
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে, অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখদুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!
নাহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলংক ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

(পুনর্মুদ্রণ)
কামিনী রায়

গান

(অংশ)

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কিবা শোভাহার
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্।

পিতামহদের অস্থি মজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্যৎ সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

(পুনর্মুদ্রণ)
হরিদাস হালদার

চীন : ১৯৬২

অতীন্দ্র মজুমদার

এতকাল আমি বন্ধু বলেছি তাকে—
মানুষের হাতে রক্ত লুব্ধ তীক্ষ্ণ ড্রাগন-নখ
গোপনে যে ঢেকে রাখে,
—হায়, এতকাল বন্ধু বলেছি তাকে!
আমার প্রেমের প্রসারিত দুই হাতে
হাত রেখে, পরে ছলনার কালো রাতে
যে করেছে পিঠে প্রবল ছুরিকাঘাত—
সুহৃদের প্রেম সখ্যের বুকে যে করেছে পদাঘাত,
এতকাল আমি বন্ধু বলেছি তাকে,—
পঞ্চশীলের শাক দিয়ে যারা
লোভের মাছকে ঢাকে—
সহোদর বলে এতকাল আমি পিঠ চাপ্ড়েছি তাকে!

মূর্খ! আজও কি বন্ধু বলবি তাকে?
—যে আমার সব সৃষ্টি স্বপ্ন
হিংসার মেঘে ঢাকে?
আমার ঘরের শিশুর মুখের হাসি
আমার মাঠের সোনার শস্যরাশি
আমার প্রাণের মুক্ত গানের বাঁশি
মরণ-আগুনে যে-পোড়াবে বলে
রাইফেলে হাত রাখে—
ভায়ের শোণিতে যে আজ নিজের
পতাকার রঙ আঁকে,
—মূর্খ! আজও কি বন্ধু বলবি তাকে?

পূর্বপক্ষ

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এক নিদারুণ পরীক্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে। এবং অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গেই সে পরীক্ষার সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ আমরা কায়-মনোবাক্যে গ্রহণ করেছি।

এরই পাশাপাশি আরো একটি ঘরোয়া পরীক্ষা বাংলাদেশের প্রায় প্রতি পরিবারেই এখন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সেদিকেও আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না।

প্রসঙ্গটা মনে পড়ল, দিল্লির এক শিশু সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভাষণ পাঠ করে। সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবরণে দেখা যায়, তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এমনও হতে পারে যে, তোমাদের কেউ কেউ বড় হয়েও দেখবে যুদ্ধ তখনো শেষ হয় নি। তখন তোমরা সেই যুদ্ধে যোগদানের মতো উপযুক্ত হবে এবং যোগও দেবে।' তারপর তিনি বলেন, 'দেশ আজ সংকটের সম্মুখীন। এই সময় জনসাধারণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয় এমন সব মৌলিক বিষয়ের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। বাস্ততার মুহূর্তে শিক্ষণ ও শৃঙ্খলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলির ব্যাপারে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। তা না হলে দেশ শক্তিহীন হয়ে পড়বে।'

বাংলাদেশে এখন ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে। এই পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলি আমাদের পুরনো দায়িত্বকে নতুন করে ভেবে দেখার সুযোগ দিল। দেশের শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ এ বিষয়ে অবহিত হবেন বলে আশা করি।

ভারতের প্রতি চীনের এই নগ্ন আক্রমণে অতি সঙ্গত কারণেই আমরা ক্রুদ্ধ এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। আজ সর্বত্র সকলের মুখেই এই এক কথা—আততায়ী শত্রুকে দেশ থেকে হটিয়ে দিয়ে দেশজননীর গৌরব পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ সংকল্পের কথা কেবল সভাসমিতিতেই নয়, ঘরে ঘরে উচ্চারিত। বলা বাহুল্য, গৃহসীমার মধ্যে আমরা যখন এ আলোচনায় আমাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা বারম্বার ব্যক্ত করি, আমাদের ছেলেমেয়েরাও তখন আশেপাশেই থাকে, এবং তাদের ছোটো ছোটো বুকেও জেগে ওঠে স্বাজাত্য-বোধের পবিত্র আবেগ। এরই প্রেরণায় তারা তাদের সামান্য হাতখরচ থেকে

পয়সা বাঁচিয়ে, কিংবা কানের দুল খুলে দান করে আসে জাতীয় প্রতিরক্ষা ভান্ডারে। তাদের এইসব ছোটো ছোটো দান আমাদের কাছে সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়েও মূল্যবান। যে কয়টি পয়সা বা যে কয় রতি সোনা তারা দান করে তার চেয়েও বেশি যা তারা দেয়, তা হল তাদের হৃদয়। সেই দেব দুর্লভ নিষ্পাপ হৃদয়ের আকুতি আমাদের এই কথাই যেন আরো গভীরভাবে ভাবতে শেখায় যে, আমরা কেবল আমাদের বর্তমানকেই শত্রুমুক্ত করার ব্রতে নিয়োজিত নই, এইসব শিশুরা বেড়ে উঠবে যে নতুন ভবিষ্যতে তাকে নিষ্কণ্টকভাবে বিকশিত করে তোলারও কর্তব্যে নিযুক্ত।

শিশুরা যে দান এনে দিচ্ছে, তার প্রতিদানে আমাদের দিতে হবে এই শত্রুমুক্ত নতুন ভবিষ্যৎ।

এ কাজে আমাদের প্রথম কর্তব্যঃ দেশরক্ষার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা। আমাদের বীর জওয়ানেরা যেমন প্রতি বিন্দু রক্তের বিনিময়ে দেশের মাটিকে নিঃশত্রু করার ব্রতে আত্মনিবেদিত, আমরাও তেমনি অর্থ দিয়ে, সোনা দিয়ে, রক্ত দিয়ে পালন করব আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এরই সঙ্গে আরো এক গুরুতর কর্তব্য রয়েছে আজ আমাদের সম্মুখে। আমাদের ঘরে ঘরে যেসব শিশু আছে, তাদের শিক্ষার বিষয়ে অবহিত হতে হবে। শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের প্রথম লাইন যদি হয় সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয় লাইন তা হলে নিশ্চয়ই হবে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী তাই শিশুদের আহবান করে বলেছেন, 'আজ তোমরা শিশু। কিন্তু আগামীকাল তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের দায়িত্ব এবং বিশ্বের সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তোমাদের শিক্ষা, এমন কি, খেলাধুলোও তোমরা ত্যাগ করতে পার না।'

সত্যিই পারে না। খেলাধুলোর ভেতর দিয়ে শিশুদের দেহ পুষ্ট হয়, পড়াশোনার ভেতর দিয়ে তারা পৃথিবীকে ভালো করে জানে। প্রত্যক্ষ কাজের চাপে যদি আমরা শিশুদের বিষয়ে অবহেলা করি তা হলে সেটা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসও আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ এক প্রলয়ংকর তান্ডবের মধ্যে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার বিষয়ে অবহেলা করে নি। আর তা করে নি বলেই আজ ঐসব দেশ কেবল শত্রুজয়ের গৌরবই লাভ করে নি, বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির অভূতপূর্ব উন্নতিতে মানবজাতির সম্মুখে এক নতুন মহিমার দ্বারও উদ্ঘাটিত করতে পেরেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার সংখ্যাতীত গবেষণাগারে যেসব বৈজ্ঞানিক কর্মী এবং প্রয়োগকুশলী আজ নব-নব আবিষ্কারের অবগুন্ঠন-মোচনে নিয়োজিত, পনের-বিশ বছর আগে তাঁদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র। তাঁদের স্বদেশের জনগণ যখন শত্রুর সঙ্গে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তখন এইসব শিশু ও কিশোর আত্মনিবেদন করেছিলেন জ্ঞান-আহরণের দুর্জয় সাধনায়। এই দৃষ্টান্ত আজ গ্রহণ করতে হবে আমাদেরও ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের। কারণ প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, চীনের সঙ্গে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আজ যারা শিশু বড় হয়ে তাদেরই হয়তো নিতে হবে সে যুদ্ধের দায়িত্ব। তখন সম্মুখ রণাঙ্গনেও যেমন মোকাবিলা নিতে হবে শত্রুর, তেমনি নব-নব গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার উৎকর্ষ ঘটিয়ে শত্রুর উৎপাদন ব্যবস্থাকেও পরাজিত করতে হবে। ভবিষ্যতের সেই কঠিন দায়িত্বের কথা মনে রেখে আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ আজ দেশের সমস্ত শিশু ও কিশোরদের এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে জ্ঞান-যজ্ঞে নিয়োজিত করুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে বলেছেন, 'এই পরীক্ষায় আমরা সগৌরবে উত্তীর্ণ হব।' সে অভয়বাণী রূপায়িত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের কর্মে ও চিন্তায়। জয় আমাদের অনিবার্য।

দেশপ্রেম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মী সম্পর্কে

মহাশয়,

গত সংখ্যায় পূর্বপক্ষে শ্রীজৈমিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষণায় সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের প্রতি যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তার জন্যে তিনি ধন্যাবাদার্হ। সৎ-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ভাবাকাশ সর্বদাই জাতিকতার দ্বারা উজ্জীবিত। বিশেষ করে সাহিত্যিকরা 'জাতির বিবেক' বলে পরিচিত। তাই এই আপৎকালীন অবস্থায় তাঁদের উপর জাতিগত সমূহ দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাঙালী সাহিত্যিকদের পিছনে মহান ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা-পূর্ব সাহিত্য জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের কল্লোলে মুখরিত। স্বাধীনতার পবিত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত সাহিত্য প্রতিভাত করেছে। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা-পর সাহিত্যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন তেমন করে প্রতিফলিত হয়নি। সাহিত্যের বৈচিত্র্য এসেছে, ভূগোল বেড়েছে, কিন্তু জাতীয় শর্তগুলি প্রতিপালিত হয়নি। আজকে গুরুতর চীনা আক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্য-কর্মীদের দেশ-প্রেমিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দরকার হলে প্রপাগান্ডিস্ট হতে হবে, চারণ কবি হতে হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছেন। নন্দন-তত্ত্ব আপাতত মুলতুবী থাক। দরকার মুকুন্দ দাশকে, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। যাঁরা কবি উদাত্ত উৎসাহের আওয়াজ তুলুন, গদ্য-লেখকেরা নাটকের মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব পালন করুন। চিত্রকররা এগিয়ে আসুন তাঁদের বলিষ্ঠ তুলি নিয়ে, সংগীত-শিল্পীরা স্বর্ণকণ্ঠে আবেগকে সমুন্নত করে তুলুন। মনে রাখবেন শুধু বাহুবলে যুদ্ধ জয় করা যায় না, হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মী ছাড়া আর কারা তা করতে পারে?

একজন সাহিত্যকর্মী হিসেবে আমি বাঙালী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছে এই আবেদন করছি।

মিহির আচার্য,
কলকাতা

তিন শত্রু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রতিরোধ প্রতি পদে প্রতি পলে-পলে
প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকায়, প্রতিটি বিঘতে।
রে দুরাত্মা, আরো তোর তিন শত্রু আছে এ ভারতে—
জেনে রাখ তার পরিচয়।

এক শত্রু, গ্রামান্তের জীর্ণ দেবালয়
ইটের কোটর কিংবা সামান্য কুটির,
আরতির ঘণ্টা শোন নিবিড় মদির।
বটমূলে বাঁধা বেদী, বুড়ো শিব বসানো পাদপ
হাটে ঘাটে আটচালা, চণ্ডীর মণ্ডপ।

দুই শত্রু. ছোট পুঁথি. ক'টি মাত্র শ্লোক,
মৃত্যুরে অগ্রাহ্য করা অমৃত আলোক।
ক্লৈব্য জাড্য মূঢ়তার চির-বিরোধিতা
নাম তার শুনে রাখ—গীতা।

তৃতীয়, অপরাজেয় প্রতি প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস
শাশ্বত বিশ্বাস,
ধর্ম খাদ্য ধর্ম জল ধর্ম প্রতি বক্ষের নিশ্বাস।
রে দুর্বৃত্ত, বঞ্চক বর্বর,
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর ॥

শয়তান হতে সাবধান
২২·১১·৬২
কেননা, দুর্জনের ছলের অভাব হয়না !
পিকিং: হঠাৎ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব

জেনে রাখবেন, সাবধানের মার নেই !

এখন নাকে সর্ষের তেল দেওয়া বন্ধ করুন !
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ....

॥ বুঝতে পারিনি ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
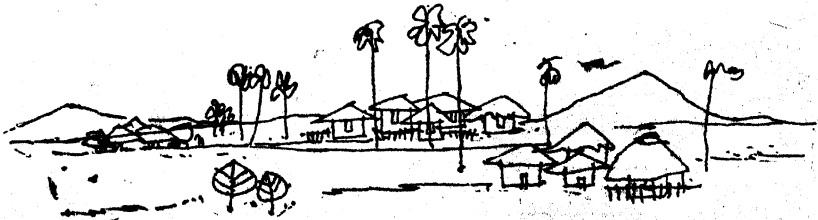
সামান্য একটুখানি ঘটনা, কিন্তু ভোলানাথের কাছে তাও আজ যেন অসামান্য হয়ে উঠেছে।

থাকে বাগবাজারে। হাতের কাছে গঙ্গা। কাজেই গঙ্গার জলে অবগাহন স্নান তার নিত্যদিনের ঘটনা।

সেদিন সকালে সে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছে, এমন সময় তার স্ত্রী বললে, আজ আর তুমি যেয়ো না গঙ্গায়।

—কেন?

—ভারি খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে। তুমি যেন ডুবে যাচ্ছ গঙ্গার জলে।

ভোলানাথ বিশ্বাস করেনি তার স্ত্রীর কথা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটাকে। বলেছিল, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না।

ভোলানাথ সেদিনও গিয়েছিল স্নান করতে।

কিন্তু তার স্ত্রীর স্বস্তি ছিল না। —স্বামী যতক্ষণ না ফিরে আসে গঙ্গা থেকে ততক্ষণ সে ক্রমাগত ঘর-বার করেছে।

ভোলানাথ ফিরে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। ডোবেনি গঙ্গার জলে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল তার স্ত্রী।

কিন্তু ভোলানাথ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

আমার কাছে চুপিচুপি এসে বলেছিল, এই সব স্বপ্নে তুমি বিশ্বাস কর?

বলেছিলাম, না।

উদ্ভ্রান্ত ভোলানাথ কিন্তু আমার মুখের দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে বলেছিল, কিছু বুঝতে পারছি না ভাই এর রহস্য। শোনো তাহ'লে কি হয়েছিল। আজ আমি সত্যিই ডুবেছিলাম। খড়ের নৌকোর একজন মাঝি ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল, নইলে আজ আর আমাকে দেখতে পেতে না।

কোনও সান্ত্বনাই সেদিন দিতে পারলাম না ভোলানাথকে। দিতে পারলাম না জীবন-রহস্যের কোনও সন্ধান।

মনে পড়লো আমারও জীবনের এমনি একটি দিনের কথা। ভোলানাথের মত আমিও সেদিন হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম জীবনের এই অজ্ঞাত রহস্য-লোকের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে।

ইংরেজিতে লেখা দু'খানি বই পেয়েছিলাম। একখানির নাম 'In Search Of God' আর একখানি 'In The Vision Of God'; বইএর সামনের পাতায় লেখকের নাম ছিল। 'রামদাস'। ছবি ছিল দু'খানি। প্রথম বইখানিতে ছিল শীর্ণ কঙ্কালসার এক যুবকের ছবি। দ্বিতীয়টিতে ছিল এক বৃদ্ধের ছবি। মুণ্ডিত-মস্তক দন্তহীন এক বৃদ্ধের হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন প্রফুল্ল আনন্দময় একখানি মুখ। ঠিক সেরকম হাসি, সেরকম মুখ আমি বোধহয় জীবনে সেই প্রথম দেখলাম। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

'ঈশ্বরের সন্ধানে' নাম দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওই চিররহস্যময় ব্যক্তিটির সন্ধান তো অনেকেই করেছেন, সে সন্ধানের ইতিহাস আমি অনেক পড়েছি, সবাই সেই এক কথাই বলেছেন। ইনি আর বেশি কি বলবেন? কাজেই একটুখানি দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে ম্যাঙ্গালোরের কাছাকাছি সমুদ্র-উপকূলের অখ্যাত অবজ্ঞাত কোন্ এক পল্লীর এক যুবক চাকরি করতেন কোথায় যেন কোন্ এক কাপড়ের কলে।

মানুষের জীবনে ছোটখাটো দুঃখ আছে, আনন্দও আছে, কিন্তু কোনকিছুতেই যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই। সবই যেন ক্ষণস্থায়ী। ধরে রাখা যায় না কাউকেই। না দুঃখকে, না আনন্দকে। দুঃখ পেলে খারাপ লাগে, আনন্দ পেলে ভাল লাগে। তাই মানুষ শুধু আনন্দই চায়। তাই-না দেখে এই মানুষটির মনে হলো বুঝি জীবনের দেবতা আনন্দময়। ভাবলেন বুঝি সেই আনন্দময়কে ধরতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়!

বাস্, শুরু হয়ে গেল তাঁর আনন্দময়ের অনুসন্ধান। নিজের পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে নাম নিলেন রামদাস। পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি সব রাম। তিনি নিজে সকলের দাস। চোরও রাম। সাধুও রাম। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—সব রাম। এই রামময় পৃথিবীকে দেখবার উদগ্রীব বাসনা নিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন তিনি সারা ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে। দেবতার মন্দিরে-মন্দিরে। প্রথম বইখানি তাঁর সেই অনুসন্ধানের ইতিকথা। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র অনুভূতির দিনপঞ্জী। ধীরে-ধীরে চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার একটা পর্দা যেন সরে যেতে লাগলো। কখন যে প্রথম বইখানি শেষ করে দ্বিতীয় বইখানি ধরেছি বুঝতে পারিনি। তন্ময় হয়ে গেছি পড়তে পড়তে। অতি সুখপাঠ্য উপন্যাসের চেয়েও মনোরম সে ভ্রমণকাহিনী। মনে হলো যেন আমি নিজেও রামদাসের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলাম দু'-দুবার। তাঁর সে বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ লাগলো যেন আমারও মনে। আমারও চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার যবনিকা অপসারিত হতে লাগলো ধীরে-ধীরে। সুদীর্ঘ পনেরোটি দিন কোন্ দিক দিয়ে পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। পনেরো দিন পরে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলো এই মানুষটিকে একবার চোখে দেখবার। কিন্তু বহুদূরে সে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্তী আনন্দাশ্রম। সংসারের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে বুঝলাম যাওয়া সেখানে অসম্ভব। দূর থেকেই প্রণাম নিবেদন করলাম এই মহাপুরুষকে।

মন আমার তখন আনন্দে ভরে আছে। মনে হচ্ছে আমারও যেন মুক্তি-স্নান হয়ে গেছে। কোনও দুঃখই আমাকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না।

এমন দিনে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ আমার জীবনে এলো এক নিদারুণ বিপর্যয়। সে যে কী, তার বিবরণ দিতে হলে অনেককিছু বলতে হয়। সুতরাং এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, অতি জঘন্য প্রকৃতির একজন মানুষ অতর্কিতে আমার এমন এক সর্বনাশ করলে যার ফলে আমার মনের শান্তি ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল। কোথায় গেল আমার সেই দর্শন, কোথায় গেল আনন্দ! এই মানুষটিও যে রাম, সে-কথা ভাবতেই পারলাম না। বুঝলাম, আমার মনের পরিবর্তন যাকিছু হয়েছিল সবই সাময়িক। এ শুধু ভাবের আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

খুব কষ্ট হতে লাগলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে ঘুম এলো না। মনের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা জানালাম স্বামী রামদাসের কাছে। —'আমাকে তুমি সাহায্য কর! মনের যে-শান্তি আমি হারিয়েছি সেইটুকু আমাকে ফিরিয়ে দাও!'

রাত্রে ভাল ঘুম হ'লো না। সকালে হাত মুখ ধুয়ে ওপরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, একজন অচেনা ভদ্রলোক সোজা আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন।

—কে আপনি? খবর না দিয়ে ওপরে উঠে এলেন কেন?

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, আপনাকে ডাকছেন।

—কে?

—স্বামী রামদাস।

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। উঠে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

বলেই জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

পাশেই কালী বোসের প্রকাণ্ড বাড়ী। সেখানে যেতেই সিঁড়ির ওপর দেখলাম, কালীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটি গোলাপ ফুলের মালা। হাসতে হাসতে বললেন, স্বামী রামদাসকে এনেছি আমার বাড়ীতে। আপনি বোধহয় চেনেন না তাঁকে। মাদ্রাজী সাধু একজন। তাঁর গলায় ফুলের মালা দিতে হবে। তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলুম আপনাকে। মালাটা আপনিই পরিয়ে দিন।

আমার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুচ্ছে না। দোতলার বারান্দায় দেখলাম বসে আছেন স্বামী রামদাস! সেই প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি, আমার সেই বইএর ছবিতে-দেখা মানুষটি!

ফুলের মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে মাথা নত করে প্রণাম করলাম তাঁকে। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে সেই হাসি! যেন কতকালের চেনা!

কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমার বাংলা তিনি বুঝবেন না। মনে-মনেই বললাম : আশীর্বাদ করুন!

তিনি আমার মনের কথা জানতে পেলেন নাকি?

আমার মাথায় হাত রাখলেন তিনি। হাত রেখে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই আবার সেই হাসি!

আমার মনের সমস্ত গ্লানি মনে হলো যেন সেই হাসির স্রোতে ভেসে গেল—ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু কেমন করে ঘটলো এই অঘটন?

কে এই রহস্যের সমাধান করে দেবে?

আমি আজও বুঝতে পারিনি।

(উত্তর)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

গত উনিশে অক্টোবরের অমৃততে শ্রীসত্যজিত চক্রবর্তী যে প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে Statistics না নিলেও খ্যাতির ওপর ভিত্তি করে অনুমানে বলা যায় যে Daily Mirror-ই পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র।

২(ক) সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে যদি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকেও ধরতে হয় তবে বলব ১৯০৮ এবং ১৯৩৩ সাল—এই দুই বছরেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই দুই বছরেই মোট ৯ খানি করে পুস্তক তাঁর প্রকাশ হয়।

১৯০৮ সালে—কথা ও কাহিনী, গান, প্রজাপতির নির্বন্ধ, শারদোৎসব, মুকুট, রাজা-প্রজাসমূহ, স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা।

১৯৩৩ সালে—বিচিত্রিতা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী, দুইবোন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, মানুষের ধর্ম, ভারত-পথিক রামমোহন রায়।

অবশ্য প্রবন্ধকে বাদ দেবার কথা যদি সত্যজিতবাবু চিন্তা করে থাকেন তবে বলতে হয় কাব্য ও গানের ক্ষেত্রে ১৯১৪ সালে (স্মরণ, উৎসর্গ, গীতিমাল্য, গান, গীতালি, ধর্মসঙ্গীত) এবং নাটকের ক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে (চিরকুমার সভা, শোধবোধ, নটীর পূজা, ঋতু উৎসব ও রক্তকরবী) রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা বেশি সাহিত্য সৃষ্টি করে ছিলেন।

২(খ) 'পুরস্কার' কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

বিগত ১৯শে অক্টোবর তারিখের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

(১) কুমার অর্থে সাধারণতঃ পুত্র, বালক (৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত), অবিবাহিত পুরুষ এবং রাজপুত্রকে, আর কুমারী বলিতে পুত্রী, বালিকা, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, এবং রাজকন্যা প্রভৃতিকে বুঝায়। বাংলায় অবিবাহিতা বালিকা বা মহিলাদের নামের পূর্বে কুমারী লেখার রেওয়াজ হাল আমলে খুব বেশি চালু হইলেও অবিবাহিত যুবক বা পুরুষের নামের পূর্বে কুমার শব্দটি ব্যবহার আজও প্রায় অপ্রচলিত। কারণ বাংলায় নামের পূর্বে কুমার শব্দটির প্রয়োগে রাজা উপাধিধারীগণের পুত্রদিগকেই বুঝাইয়া থাকে চাই তাঁহারা বিবাহিতই হউন আর অবিবাহিতই হউন। প্রয়োগের ব্যতিক্রম এজন্যই মনে হয়। কংগ্রেসী সরকারের আমলে রাজা উপাধি দান বিলুপ্ত হইলেও ইংরেজ আমলে প্রাপ্ত রাজা উপাধিধারীগণের পুত্রেরা কেহ কেহ এখনও নামের পূর্বে 'কুমার' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(২) বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে নামের মধ্যে কুমারী লেখা মোটেই রীতি-বিরুদ্ধ বা প্রয়োগ-বহির্ভূত নয়। বহু বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার নামের মধ্যেই কুমারী শব্দটির প্রয়োগ দেখা যাইবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই দুই ভগ্নীর নাম ছিল স্বর্ণকুমারী দেবী ও বর্ণকুমারী দেবী। এ ছাড়াও চন্দ্রকুমারী জ্যোৎস্নাকুমারী, মীনাকুমারী, বীণাকুমারী প্রভৃতি কুমারীযুক্ত নামের সাক্ষাৎ বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে বহুস্থানে মিলিতে পারে। আমার নিজেরই এক জ্যেষ্ঠা পিতামহীর নাম ছিল কুমারী দেবী, আর বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মাতার নাম ছিল কুমার দেবী। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রের নাম ছিল কুমার গুপ্ত। আর কুমার নামধারী বহু বিবাহিত ও অবিবাহিত লোকেরই সাক্ষাৎ ভারতের সর্বত্র মিলিবে। সুতরাং কুমার-কুমারীর এই বৈচিত্র্য ব্যাপক, সন্দেহ নাই।

বাংলায় বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষ, উভয়েই নামের মধ্যে কুমার শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য শব্দটি এখানে কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া নামের পূরক বা পরিপূরক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথমে রাশনাম বা বাড়ির লোকের দেওয়া নাম, শেষে কৌলিক উপাধি, এবং মধ্যে কুমার, চন্দ্র, নাথ, মোহন প্রভৃতি পরিপূরক শব্দ।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা—৯।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার "অমৃত" পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

১। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেওয়ালপঞ্জির প্রবর্তন কে করেন। কোন দেশে, এবং কতদিন পূর্বে?

২। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে দুটি 'ব' কেন? ব্যবহারগত প্রকারভেদ কোথায়?

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র মান্না,
পোঃ বৃন্দাবনপুর,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

যুদ্ধের স্বাদ ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছয় ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের ঘোর না কাটতেই য়ুরোপে আবার অশান্তি জেগে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হতাশা, বিভ্রান্তি ও বিতৃষ্ণায় এ যুগের তরুণের মন ভরে উঠল। তাদের সকলেই ওপরতলার সমাজে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে মানুষ, সম্পন্ন বাপ-মার সন্তান, পাবলিক স্কুল আর য়ুনিভার্সিটির ব্যয়বহুল শিক্ষালাভ ক'রেছেন। মিঃ অডেন একটি চিঠিতে মিঃ ঈশার উডকে লিখেছিলেন—Behind us we have stuco suburbs and expensive educations — এরা যখন জীবনের দিকে তাকায় তখন দেখে কি নিদারুণ অবস্থা। চারিদিকে পরিবর্তন, চারিদিকে বিপ্লব! এই পরিবর্তনের প্রভাবে সাহিত্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হয়ে উঠেছে প্রচারমুখী। যুদ্ধের আশংকায় লেখকরা লিখছেন নতুন ভঙ্গীতে। আগেকার গজদন্ত মিনার এখন চূর্ণিত হওয়ার উপক্রম, সুদৃঢ় সেই মিনার এতদিনে হেলে পড়েছে। এই অবস্থার কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বছরে প্রকাশিত "দি লীনিং টাউয়ার" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ।

ডেলুইস, অডেন, স্পেণ্ডার, ঈশার উড, লুই ম্যাকনীস্ প্রভৃতি লেখক বৃন্দ এই যুগের প্রতিনিধি। তাঁদের অন্তরে জেগেছে মানবিক প্রেরণা, এই হেলান মিনার সাহিত্যের প্রবণতা হল, সম্পূর্ণ হতে হবে, সামগ্রিক জীবনের অংশভাগী হতে হবে, মানবিক হতে হবে "All that I would like is to be human' — that cry rings through their books — the longing to be closer to their kind, to write the common speech of their kind, no longer to be isolated and exalted in solitary state upon their tower, but to be down on the ground with the mass of human kind."

(The Leaning Tower).

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ঠিকই বলেছেন আত্ম-বিশ্লেষণ ও জীবনজিজ্ঞাসায় এ যুগের লেখকরা মগ্ন। নৈরাশ্য ও বৈকল্য চিন্তায় তাঁরা ভারাক্রান্ত। উন-বিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক এবং বৈদগ্ধ্যের ভিত্তিমূলে অনেক আগেই আঘাত শুরু করেছিলেন জর্জ বার্নাড শ, এতদিনে তা সম্পূর্ণ হল।

এই পটভূমিকার ওপর শুরু হল স্পেনের গৃহযুদ্ধ। কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারা একটা আসন্ন আন্তর্জাতিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে এই চিন্তা প্রবলতর হয়ে উঠল এবং সব শ্রেণীর বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবির দল (যার মধ্যে ছিল পৃথিবীর সব অঞ্চলের প্রখ্যাত লেখক সম্প্রদায়) একত্র সম্মিলিত হয়ে ফ্যাসিস্ত অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে হাত মেলালেন। ফ্যাসী-বিরোধী একটা দল স্পেনে রিপাবলিক্যানদের হয়ে লড়তে গেলেন। ব্রিটেনের কয়েকজন তরুণ লেখকও গিছলেন, এঁদের মধ্যে জন কর্নফোর্ড এবং র‍্যাল্‌ফ ফক্‌স ছিলেন বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন। এঁরা দুজনেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত হ'ন। ফেদরিকো গারথিয়া লোরকা গৃহযুদ্ধের গোড়ার দিকেই ফ্যাসিস্তের গুলীতে প্রাণ দেন। স্পেনের নবযুগের তিনি ছিলেন প্রতি-নিধি স্থানীয়। মৃত্যুকালে বয়স ছিল সাঁইত্রিশ। তাঁর অনেক কবিতা বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

স্পেনের এই গৃহ-বিবাদের যুদ্ধে নতুন আন্দোলনের চরম পরিণতি ঘটল। রিপাবলিক্যানরা যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তখনই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। এই বিভ্রান্তি সাধারণ ধরনের নয়। যা ওপর থেকে সহজ মনে হয়েছিল যখন দেখা গেল তা গভীরভাবে জটিল তখন মনে বিভ্রান্তির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। লেখকের নিজস্ব মতবাদ বা আইডিয়া-লিজমকে রাজনৈতিক খেলার পুরানো চালবাজিতে জড়ানো হল। সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। লেখকরা বুঝতে শুরু করলেন যে, এইভাবে যুদ্ধে অংশভাগী হয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু মহৎ কার্য করেন নি, কারণ সংকীর্ণ একটা রাজনৈতিক আবর্তে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা হয়ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের প্রকৃত এবং প্রাথমিক কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। শিল্পীর কর্ম শিল্পসম্মত সাহিত্য-সৃষ্টি, যা হবে কালজয়ী। সাময়িক উত্তেজনার মুখে পুস্তিকা রচনা নয়।

ফলে ১৯৩৯-এ যখন জার্মান যুদ্ধ ঘোষিত হল তখন লেখকমহলের প্রচণ্ড ভাঁটার কাল সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। ব্রিটেনে তাই ১৯৩৯-উত্তর কালে দেশপ্রেমমূলক আবেগ প্রায় নীরবতায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর আশ্চর্য কর্ম-ক্ষমতা, সাহস, তেজোদীপ্ত বাণীর দ্বারা একটা জাতিকে যুদ্ধজয়ের পথে নিয়ে গেছেন, যিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে (ইতিহাস, জীবনী ও বাগ্মিতার স্বীকৃতি হিসাবে), সেই উইনস্টন চার্চিল-ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক। ১৯৪০-এর ১০ই মে তারিখে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। আর পর-বর্তী সোমবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠে "Blood, Sweat and tears" নিয়ে আবেগময়ী বক্তৃতা দিলেন। এই এক বক্তৃতা সেদিন ইংলণ্ডের মানুষকে জাগিয়ে এবং মাতিয়ে দিল। চার্চিলের জীবনীকার বলেছেন 'an immortal masterpiece among England's great orations.'

।। সাত ।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে উইনস্টন চার্চিল একটি প্রায়-বিধ্বস্ত জাতিকে সর্বোত্তম সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকখানি গ্রন্থ 'ওয়ার ক্লাসিক' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বাগ্রে নাম করতে হয় এরিক মারিয়া রেমার্কের "ইন ওয়েস্টার্ণ নাটস নিউজ" নামক জার্মান উপন্যাস, যা 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' নামে পৃথিবীখ্যাত। ১৯২৯-এর জানুয়ারীতে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পল বমার ছাত্রাবস্থা শেষ হওয়ার আগেই যায় সমরাঙ্গনে লড়তে। কাজিনস্‌কি, মুলার, জ্যাডেন প্রভৃতি সহ-সৈনিকদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব জমে ওঠে এবং যুদ্ধের বিচিত্র ক্লেশ ও নির্যাতন সকলে একত্রে ভোগ করে। পল বমারের বন্ধুরা একে একে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। কারো স্নায়ুবিকার ঘটলো, কেউ বিক-লাঙ্গ হয়ে ঘরে ফেরে যুদ্ধের পর— সামরিক জীবনের অভিশাপ কিভাবে সাধারণ সৈনিকের দেহ-মনকে বিকল করে তার কাহিনী। এই জনপ্রিয় গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ ১৯৩১-এ ৩৭৫ হাজার খণ্ড বিক্রীত হয়। ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয় রেমার্কের দ্বিতীয় গ্রন্থ ডের ওয়েজ জারাক বা 'রোড ব্যাক'। এই উপন্যাসের উপজীব্যও প্রথমটির মত। যুদ্ধের পর-বর্তীকালের দুর্দশার বিবরণ।

রাশিয়ান লেখক মিখাইল সোলোকোভ লেখেন "দি কোয়ায়েট ডন"। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত এই গীতকাব্যধর্মী উপন্যাসে প্রথম মহাযুদ্ধকালীন রাশিয়া ও রাশিয়ানদের জীবনালেখ্য বর্ণিত। স্পেনের লেখক ভিসন্ত ব্লাস্‌কো ইবানেজ লেখেন "দি ফোর হর্সমেন অফ্ দি এপোকালিপস্" (১৯১৬)— নরহত্যা, বিজয়, দুর্ভিক্ষ, প্রথম মহাযুদ্ধের কালে কিভাবে সমরাঙ্গনে বিভীষিকা সৃষ্টি ক'র তার কাহিনী। সি এস, ফরেস্টার নামক ইংরাজ লেখক ১৯৩৫-এ লেখেন "দি আফ্রিক্যান কুইন"—এক স্টীমলঞ্চে জনৈক ভীরু ককনি এবং মিশনারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রথম মহা-যুদ্ধের পটভূমিকায় বিধৃত। এই

উপন্যাসটি চার্চিলের অতিশয় প্রিয়। ১৯২৯-এ ইংরাজ লেখক রবার্ট গ্রেভস এক আত্মজীবনীমূলক কাহিনী রচনা করেন "গুড বাই টু অল দ্যাট"—এই গ্রন্থে যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন সহকর্মীদের কথা লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সি, ই, মনটেগুর "ডিসএনচানমেণ্ট", এডমন্ড ব্লাণ্ডেন কৃত 'অনডারটোনস্ অব ওয়ার' এবং টমলিনসনের 'অল আওয়ার ইয়েণ্টারডেস' প্রভৃতির মতো এই গ্রন্থটিতে যুদ্ধের বেদনাভরা দিনের কাহিনী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত। গ্রেভসের এই আত্মজীবনীতে এমন এক সরলতা আছে যা সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। সাধারণতঃ আত্ম-জীবনীতে এই ধরনের সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না। এই একই কারণে উপরিল্লিখিত গ্রন্থাবলী ওয়ার ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে।

আরেকটি জার্মান উপন্যাস কার্ল আন্ড আনা বা 'কার্ল ও আনা' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই উপন্যাসের লেখক লিওনিদ ফ্রাঙ্ক। দুই বন্ধু ছিল একই বন্দী শিবিরে, সেখানে প্রতিদিন একজন অপরজনকে তার ঘরের খবর শোনাত, স্ত্রীর বর্ণনা এমনই বলে যেত যে অন্য বন্ধুর কোনো কিছু অজানা রইল না। একদিন কোনোমতে বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে অপরজন হাজির হল বন্ধুর স্ত্রীর কাছে। নানাবিধ অন্ত-রঙ্গ কথা এমন ভঙ্গীতে বলে যে মহিলাটি তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করে, অথচ বোঝে যে সে তার স্বামী নয়। অবশেষে একদিন আসল স্বামী ঘরে ফেরে, এতদিনে নকলের সঙ্গেও মহিলাটির প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এইখানেই শুরু হল এক নিদারুণ ট্রাজেডি।

যুদ্ধের বিভীষিকা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গঠনই ছিল এই সব উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। সদ্য যুদ্ধযন্ত্রণায় দগ্ধ য়ুরোপ অতি স্বাভাবিক কারণেই এইসব উপন্যাস এবং আত্মজীবনীকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

।। আট ।।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ যেমন কবি ও সাহিত্যিকদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে, তেমনই বিশ্ব-সাহিত্যে একজন স্মরণীয় লেখককে দান করেছে তাঁর নাম আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ে স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং তাঁর উপলব্ধিকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। "আনডার দি রীজ" নামে স্পেন-যুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর একটি গল্প আছে আত্মনেপদী কাহিনী। স্পষ্টই হেমিংওয়ের "স্প্যানিস আর্থ" ছবি তোলা হচ্ছে, ফিলম ইউনিট কয়েক-জন রিপাবলিক্যান সৈনিকের সঙ্গে কথা-বার্তায় মেতে আছে, তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠল—আমি সব বিদেশীকেই ঘৃণা করি। অপর সৈনিকরা তার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে সংগ্রাম এবং কথাবার্তা চলছে এমন সময় দেখা গেল জনৈক মধ্যবয়সী ফরাসী ভদ্রলোক ফ্রণ্ট লাইন ঘেঁষে যাচ্ছেন। তিনি নীচে রীজের তলায় মিলিয়ে গেলেন, সেইখানে সৈন্যরা এবং ফিল্ম ইউনিট দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে একদল রাশিয়ান আর্মি পুলিস এসে হাজির, প্রশ্ন করে কেউ কি ফরাসী-টাকে দেখেছ? সবাই বলে—কই না ত। রাশিয়ানরা চলে যায়, পরে সেই ফরাসী-টিকে খুঁজে গুলি করে মেরে আবার ফিরে আসে। তখন পূর্বোক্ত সেই সৈনিকটি পুলিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলে—এর নাম—। লেখক কথাটি সম্পূর্ণ করেন—যুদ্ধ। যুদ্ধে ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন আছে।

সৈনিক বলে—সেই ডিসিপ্লিন পালন করতে গিয়ে আমরা মারা যাব কি?

লেখক বলেন—ডিসিপ্লিন না থাকলে আমাদের সবাইকেই ত' মরতে হবে।......

এ পর্যন্ত কাহিনী হেমিংওয়ের বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচায়ক। যুদ্ধ উত্তম এবং সত্য। হিংসার প্রয়োজন আছে, মানুষের ভালো কিংবা মন্দ বিচার করতে হবে সে বেশ কড়া না দুর্বল এই মাপকাঠিতে। এর পর কাহিনীর মেজাজ পালটে যায়, সেই সৈনিক লেখককে বলেন যে তাঁর প্রদেশের একটি ছেলে নিজের হাতেই গুলি করে, বোমা ফেলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবে বলে। তাকে হাসপাতালে যেতে হল, সেরে উঠে আবার তাকে কাজে পাঠানো হল। রাশিয়ান পুলিসরা ওকে ফ্রণ্টে নিয়ে এল। তার সঙ্গীরা তাকে অভিনন্দন জানায়, ছেলেটি বলে—আমি অবশ্য কাজটা নির্বোধের মত ক'রছিলাম, তার জন্য লজ্জিত। এখন এক হাতেই কাজ করব, যে মহৎ দায়িত্ব নিয়েছি, তা পালন করব।

রাশিয়ানরা কিন্তু ঠিক যেখানে ছেলেটি নিজের হাতে গুলি করে আহত হয়েছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে গুলি করে মারল, দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই উদ্দেশ্য। এর পর সৈনিকটা বলে—আমার ঘৃণার কারণ বুঝলেন?

লেখক বল্লেন—বুঝেছি।

এর পরই ফিলম ইউনিট তাদের যন্ত্রপাতি গুটিয়ে চলে গেল। এখানেই গল্প শেষ। গল্পটি এমন জায়গায় শেষ হওয়ায় এর মূল্য বেড়েছে, এর আগে থামলে অন্য রকম হত। একটা নির্দিষ্ট সীমার মাঝে মানুষ যে নিষ্ঠুর ও উন্মাদ হতে পারে তার আগ্রহ এক রকম, কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতা এবং উন্মত্ততা সম্পর্কে অপরের অনুভূতির এই অভি-ব্যক্তির মূল্য অনেক বেশী।

হেমিংওয়ে ১৯২৯-এ লিখেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় "এ ফেয়ার-ওয়েল টু আর্মস"—প্রেমের কাহিনী, অত্যন্ত সাহসিক কাহিনী, আর "ফর হুম দি বেল টলস" স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, এর মধ্যেও আছে প্রেম আর বিপজ্জনক মুহূর্ত। সমালোচকদের মতে এই উপন্যাস হয়ত হেমিংওয়ে শিল্পী হিসাবে সচেতন হয়ে রচনা করেন নি, তাই এত উৎকৃষ্ট হয়েছে। এণ্ড্রেস তার সঙ্গীর জীবনরক্ষার জন্য হেডকোয়ার্টার্সে একটা সংবাদ পাঠাবার জন্য সচেষ্ট। যত বিলম্ব হচ্ছে হতাশায় মন ভরে উঠছে। এই বিলম্ব আর হতাশা উপন্যাসটির মধ্যে প্রতীকের কাজ করেছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ত্রাণ নয় বিপ্লবের মুক্তিই এই প্রতীকের অর্থ। ভয়ের বিশ্লেষণও চমৎকার। হেমিংওয়ে এর অনেক আগে লিখেছিলেন "দি সান অলসো রাইজেস"—সেই উপন্যাসে আছে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল তার কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ এবং মার্কিন উপন্যাসিকরাই কয়েকখানি মহৎ উপন্যাস রচনা করেছেন। কনস্টানটাইন সিমোনভ রাশিয়ার একজন নেতৃস্থানীয় সমর-সাংবাদিক। ১৯৪১-এর ২৪শে জুন তিনি বেরিয়েছিলেন সমরাঙ্গনের পথে, তারপর বেরেনটস থেকে ব্ল্যাক সী এবং স্টালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। স্টালিনগ্রাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন—"ডেস এন্ড নাইটস"। ১৯৪৬-এ এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ, সেখানকার নর-নারী তাদের যন্ত্রণা আর বিজয়উল্লাসের কাহিনী। এই উপ-ন্যাসের জন্য তিনি 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' এবং অনেক পদক লাভ ক'রেন। এর পূর্বে ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'রাশিয়ান পিপল' নামক নাটকটি স্ট্যালিন প্রাইজ লাভ করে। এই নাটকের চমকপ্রদ চরিত্র লাল ফৌজের স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধ পক্ব-কেশ ভূতপূর্ব জার আমলের অফিসার, নির্ভীকত্বে তিনি তরুণদের চেয়েও পারদর্শী।

ডভসেংকো লিখেছেন—"নাইট বিফোর ওয়ার" নামক শক্তিশালী সমরোপন্যাস। ইউক্রেনের নদীর প্রাচীন মাঝিদের বীরত্বের পটভূমিতে রচিত। ডভসেংকো লিখেছেন—"নদী নয় যেন একটি নাটক, আর এই প্রাচীন মাঝিরা যেন নদীর দৃশ্য-আত্মা। তারা দুঃসাহসী ও দুর্জয়, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না।"

ইগনেৎসিও সিলোনে নামক ইতালীয় লেখক লিখেছিলেন 'ব্রেড এণ্ড ওয়াইন'। ফ্যাসিস্তদের তাঁবে ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা, এবং আনডার গ্রাউণ্ড প্রতিরোধবাহিনীর বিরামবিহীন সংগ্রামের কাহিনী।

পোল্যাণ্ডের ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কা যুদ্ধ-সাংবাদিক। জার্মান অধিকৃত

ইউক্রেণের একটি গ্রামকে পটভূমি করে তিনি লিখেছিলেন 'রেন বো'।• ষ্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত এই উপন্যাসে তিনি ইউক্রেণের মাটি ও মানুষের দুঃসাহসিক চরিত্রের কাহিনী লিখেছেন। শীতের কয়েকটি দিনের মধ্যে উপন্যাসটি সমাপ্ত। লাল ফৌজ কর্তৃক মুক্ত হওয়ার পূর্বেকার কয়েকটি দিনের ইতিহাস। গ্রামের সবাই হাতিয়ারহীন তবু তারা যুদ্ধ করে যায়। প্রধান চরিত্র ওলেনা একজন গেরিলা যুদ্ধের নায়িকা। শান্ত ভঙ্গীতে সে দেশের মুক্তির জন্য নিজের ও সদ্যোজাত সন্তানের জীবন দান করল। ওলেনা কষ্টিয়ুক এক বিচিত্র নারীচরিত্র।

জার্মান লেখক ডঃ লিঅন ফয়েট-ভাংগার ১৯৩৩-এ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে পালিয়ে আসেন। পরে ফ্রান্স জার্মান অধিকারে আসায় কিছুকাল অন্তরীণ থাকার পর আমেরিকায় আশ্রয় নেন। যুদ্ধ এবং অবরোধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় তিনি লেখেন 'সীম"। সীম' নামে একটি সাধারণ ফরাসী মেয়ে পাঁচশো বছর আগেকার বিপ্লবী নায়িকা জোন অব আর্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিভাবে ফরাসী প্রতিরোধবাহিনী গড়ে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তার আশ্চর্য কাহিনী। একটি কিশোরী মেয়ের দেশপ্রেম, এবং দেশপ্রেমের আগুনে সে আত্মবিসর্জন দিয়েছে, আপনাকে সে ভেবেছে বীরবালা জোন অব আর্কের অংশ, এবং সেই প্রেরণায় সে দুর্ধর্ষ জার্মান সেনার সঙ্গে লড়েছে। উপন্যাসটির আঙ্গিক বিচিত্র।

একজন বাঙালী লেখক গিরিজা মুখোপাধ্যায় যুদ্ধের সময় ছিলেন ফ্রান্সে। জার্মান আক্রমণের কালে তিনিও আরো অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে আসছিলেন, কিন্তু পারলেন না, প্যারিতে ফিরে এলেন। জার্মান পুলিস ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাঁকে ফরাসী জেলখানায় রাখল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এ, সি, নাম্বিয়ারের পরামর্শে তিনি জার্মানী গেলেন। সেখানে তিনি 'আজাদ হিন্দ' বেতারের ঘোষক হলেন, সুভাষচন্দ্র এবং গ্রাণ্ড মুফ্‌তির সঙ্গে যোগাযোগ হল। জার্মানী থেকে হল্যাণ্ডে, সেখান থেকে আবার বার্লিন, সেখান থেকে দক্ষিণ জার্মানী, ইতিমধ্যে রাশিয়ানরা বার্লিনে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে তিনি পালালেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে আবার জার্মানী। তারপর ফরাসীদের হাতে পড়ে কোনোরকমে নিষ্কৃতি। শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখোপাধ্যায়কে
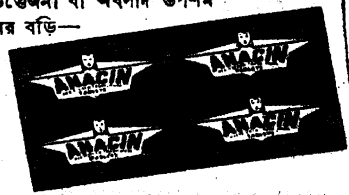
যুদ্ধের হেরফেরে তাঁতের মাকুর মত ঘুরতে হয়েছে। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি লিখেছেন তাঁর "দিস্ ইয়োরোপ" নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থটিও একটি উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-সাহিত্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

।। নয় ।।

এর পর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য মার্কিন উপন্যাসের বিবরণ দান করে নিবন্ধটি শেষ করব। পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিণ সাহিত্যিকরা প্রচুর মহৎ উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে নর্মান মেলরকৃত 'দি নেকেড এ্যান্ড দি ডেড্' উপন্যাসটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এই উপন্যাসটি ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়, পরে সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীটি রিপোর্টাজের এক দৃষ্টান্ত। সাউথ-প্যাসিফিক আইল্যান্ডে আমেরিকান সৈনিকদের (জি-ওয়ান) চিন্তা এবং জীবনযাত্রার নিখুঁত বর্ণনা। তারা কিভাবে থেকেছে, কথা বলেছে এবং মরেছে তার রিপোর্ট। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংসএর থিয়োরী ছিল অদ্ভুত। তিনি তাঁর সহকারীকে বলতেন—আমাকে যে-কোনো একটা লোক দাও তাকে আমি ভয়ার্ত করে তুলব। আমেরিকান সৈনিককে দৃঢ় হতে হবে তবেই সে শত্রুকে কায়দা করতে পারবে। আমার কৌশল হল যে শত্রুর চেয়ে আমাকেই বেশী ভয় করবে। এইভাবে ভয় জয় হবে।

লেফ্‌টনান্ট হার্ন বলতো—আর সেই সৈনিক যখন আপনার দিকে মেশিনগান ঘুরিয়ে দেবে, তখন?" —কঠিন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সঙ্গে আছে মানবজীবনের অতি-শয় অন্তরঙ্গ কাহিনী। সাধারণতঃ এমন খোলাখুলিভাবে খুব কম উপন্যাসই রচিত হয়েছে।

জেমস জোনস লিখেছেন—'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি'। এই উপন্যাসটিও সেনা ব্যারাকের কাহিনী। পদস্থ সৈনিকরা কিভাবে তাঁদের নিম্নপদস্থ সৈনিকদের প্রতি অত্যাচার করেন তারই বিয়োগান্ত কাহিনী। বিউগিল কোরের বার্টলী প্রিউইটের পার্ল হারবারের কাছে স্কোফিলড ব্যারাকে বদলীর আদেশ হল। অত্যাচারিত আহত প্রিউইট ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১—শুনতে পেল জাপানীরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলেছে। সে এতদিন দলছাড়া হয়ে পালিয়েছিল, সৈন্যদলে যোগদান করতে যাওয়ার পথে রাতের অন্ধকারে সেনাদল তাকে গুলি করল, সে বলে আমি সৈনিক। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, স্টেনগানের আঘাতে তার দেহ নিশ্চল হয়ে গেল।

প্রিউইটের সম্মানে বিউগিল বাজালেন ওয়াডেন নিজে। তাঁর সুরজ্ঞান নেই, তবু তিনি জানেন একজন সৎ সৈনিকের উদ্দেশ্যে তিনি বিউগিল বাজাচ্ছেন। সেই সঙ্গে পড়ে চোখের জল।

'দি টি হাউস অব দি আগস্ট মুন' ভার্ণ জে স্নাইডার-কৃত উপন্যাস। এই উপন্যাস পরে নাটক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্যাপ্তেন ফিস্‌বি ভাবতেন আমি সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত নই, তবু যা হোক যুদ্ধে জয় হল। ফিস্‌বি সাহসী, সৎ এবং নিষ্ঠাবান। কর্নেল পারডির কাছেও সেই কথাই বলে—আমি স্যার সোলজার হওয়ার জন্যে জন্মাইনি। কর্নেল হতাশ হন, কি আর করবেন। ওপর থেকে পাঠিয়েছে। তিনি বল্লেন—ক্যাপ্তেন, আমরা কেউই সৈনিক হয়ে জন্মাই নি, তবু আমাদের এই কর্মে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, কাজ চাই, কাজ করতে হবে। কর্ণেল বল্লেন—এই নিন, প্ল্যান 'বি', ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো হয়েছে, এখানকার পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা। এই প্ল্যান আপনার বাইবেল। ভালোকথা আপনি লুচু আনে কেমন?

—সে কি স্যার? সেটা আবার কি বস্তু?

—এখানকার স্থানীয় ভাষা। আচ্ছা আপনাকে একজন দোভাষী দেওয়া হবে। সাকিনি ছেলেটি ভালো, এই সা-কি-নি।

সাকিনি জাপানী তরুণ। খালি হাসে। ঘুম ঘুম চোখ, গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন হাতে বোনা কাপড়ের জামা জড়ানো, পায়ে মার্কিণ সৈনিকের বিরাট মোজা, আর বুট। সে এসে হেসে বলে—সাকিনি প্রেসেন্ট, সকস্ আপ, নট স্লিপিং—'

এই কাহিনীর শুরু। তারপর সাকিনি এবং ক্যাপ্তেন ফিস্‌বি দুজনে মিলে বিধ্বস্ত জাপানের একটি পল্লী-গ্রামের সমরোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা-নুসারে কিভাবে একটা চায়ের আসর গড়ে তুললেন তার কাহিনী। চমৎকার স্যাটায়ার।

যুদ্ধের এক বিচিত্র ব্যঙ্গ-কাহিনী। আরও অনেক কাহিনী—পার্ল-হারবার, বিমানবহর, ক্লাসের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের শুধু পরিচয় দেওয়া হল।

।। দশ ।।

আরনল্ড বেনেট বলেছিলেন টলস্টয়ের "ওয়ার এণ্ড পীস" সম্পর্কে "St. Peter at Rome is a trifle compared with Tolstoy's 'War and Peace.." টলস্টয় স্বয়ং এই উপন্যাসকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ৩৫০টি চরিত্র, জীবনের এক বিচিত্র মিছিল। নেপোলিয়ানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বিশাল উপ-ন্যাস। প্রিন্স আঁদ্রে প্রিয়তমা নাটাশার কক্ষে মরণাপন্ন অবস্থায় মৃত্যুর শীতল স্পর্শলাভ করেন, ফরাসীর হাতে বন্দী পীয়ের। মৃত সৈনিকের পাহাড় অতি-ক্রম করে পীয়েরের পদযাত্রা, সঙ্গে কারা-টেভ সান্ত্বনা দেয়।

যে টলস্টয় একদা তাঁর উপন্যাসকে ইলিয়াডের সমগোত্র বলেছেন, তিনিই আবার পরে বলেছেন—এসব তুচ্ছ। অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি টলস্টয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

টলস্টয়কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বিচার করতেন একজন pomesh-thchik বলে, অর্থাৎ জমিদার মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে সম্মানিত হয়। তিনি রাশিয়ার বরেণ্য মনীষীদের অন্যতম হিসাবে মর্যাদালাভ করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' পড়ে শোনানো হত।

পাঁচ বছরের বিরামবিহীন পরিশ্রমে টলস্টয় যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা আজো বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত।

শেলীর বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:—

"Poets are the trumpets which sing to battle, poets are the unacknowledged legislators of the world."

কত কাব্য, কত কাহিনী বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, কিন্তু যে সাহিত্য দেশপ্রেমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই সাহিত্য অবিস্মরণীয়। যুগে যুগে তাই প্রয়োজন হয়েছে অতীতের পুনরাবিষ্কার, অতীত বিমুখ হয়ে বসে থেকে নিখিল মারণযজ্ঞের শীকার হওয়ার মত মুর্খামি আর নেই। যুদ্ধের স্বাদ তাই আমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে বিরূপ করলেও, দেশ যখন আক্রান্ত তখন সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই। ঠুনকো মূল্যবোধ বিপদকালে ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত তলিয়ে যায়, তখন তাই প্রয়োজন সেই ঐশ্বর্যের যা চিরন্তন। মানুষের মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লিষ্টতার গভীর তমিস্রার মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মত সাহিত্যিকের সাহসিক বাণী যুগে যুগে পথ নির্দেশ করেছে।

—শেষ—

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসেল কিছু জবাব দেবার আগেই মিসেস ক্লাউন একজোড়া নতুন দম্পতি নিয়ে এলেন আলাপ করাতে। রাসেলের সঙ্গে কথোপকথনে ছেদ পড়লো।

এই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মনস্তত্ত্ব-বিদ। দু'জনেই নিজেদের বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করেন। প্রচুর রোগী জোটে, এবং সেই রোগীদের দয়ায় প্রচুর পয়সাও করেছেন। নিউইয়র্ক শহরে, ম্যান-হাটানের উপর বাগান ঘেরা একটি আড়াইতলা বাড়ি কিনেছেন দু'জনে, দু'টি আলাদা চেম্বার করেছেন। এমন কি চারটি বেডসম্বলিত একটি হল ঘরও আছে অতিথিদের থাকবার জন্য। তেমন তেমন বাছা রোগীরা সেখানে থেকে চিকিৎসা করিয়ে রোগমুক্ত হ'য়ে চলে যান। আর সেই বেডের যা মূল্য তার অঙ্ক শুনে আমাদের মাথা ঘোরে।

ভদ্রলোকটি দেখতে খুব সুন্দর, মাথা ভর্তি চুল, নীল চোখ, টিকোলো নাক, বাঁকা ঠোঁট—সব মিলিয়ে চেয়ে থাকার মতো। তিনি নিজে জাতিতে ওলন্দাজ, স্ত্রী আমেরিকান। ভারতবর্ষের জন্য বিষয়ে তাঁদের অশেষ কৌতূহল, সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। আমার সঙ্গে আলাপ হ'তেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি মেহেরবাবাকে চিনি কিনা। সবিনয়ে স্বীকার করতে হ'লো সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির নাম আমি কোনোদিন [illegible]। ভদ্রলোকটির [illegible] এবং তাঁর তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধা স্ত্রীটি চোখ বড়ো ক'রে দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। ঘোর কাটলে বললেন, 'রিয়েলি ?'

আমি বললাম, 'রিয়েলি।'

তখন আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, চোখ— ছোট করলেন, ভর্ৎসনার সুরে বললেন 'এ রীতিমতো অজ্ঞতা।'

আমি মুখ নিচু ক'রে হাতে হাত ঘষলাম।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'সেই ভগবান-তুল্য সাধকটি দক্ষিণ ভারতের এক দুর্গম অরণ্যে বাস করেন। সেই অরণ্যে বাঘেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে কিন্তু মেহেরবাবাকে তারা কিছু বলে না। মেহেরবাবা সব বাঘেদের বাবা। তিনি যদি একবার চোখ তুলে তাকান, ব্যস, হ'য়ে গেল। এক নিমেষে সব ঠাণ্ডা। অমনি সব নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের নড়বার ক্ষমতা থাকবে না, কোনো ইচ্ছাশক্তি কাজ করবে না।'

শুনে চমৎকৃত হ'লুম। এর পরে মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারটি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভারতের কোন্ প্রদেশ থেকে ?'

বললুম 'বাংলা দেশ।'

শুনে খুশি হ'লেন তিনি, নম্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড়ো আনন্দ হ'লো। টেগোর তো শুনেছি বাঙালী।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'আমি তাঁর কিং অব ডার্ক চেম্বার পড়েছি।'

'কেমন লাগলো ?'

'চমৎকার। আপনি কি জানেন এই নিউইয়র্ক শহরে মাস দেড়েক হ'লো সেই নাটকটা হচ্ছে'?

'দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তা হ'লে তো জানেন। আমরাও যাবো। শুনেছি খুব ভিড় হচ্ছে। আমি আপনার স্বামীর বক্তৃতা শুনে থেকেই এ বিষয়ে প্রথম কৌতূহলী হই। তারপর থেকেই আমার টেগোর বিষয়ে খুব জানতে ইচ্ছে করে। যদি আপনাদের খুব অসুবিধে না হয়, এক-দিন আমার বাড়িতে খেতে বলতে পারি কি ?'

'খুব আনন্দের কথা।'

'আমাদের একজন ফরাসী বান্ধবী আছেন, এখন তিনি বৃদ্ধা, তিনি টেগোরকে দেখেছেন, তাঁর কাছে টেগোরের সাতখানা চিঠি আছে।'

'তাই নাকি ?'

'সেদিন তাঁকেও বলবো।'

'খুব ভালো।'

'এখন বড্ড শীত। ধরুন আর দু'মাস। তারপরেই বসন্ত। আমার বাগান তখন টিউলিপে ভরে যাবে। আমার কালো টিউলিপের ক্ষেত আছে। একটি মস্ত মেপল গাছও আছে।

বাগানে, তাতে যখন সবুজ পাতা গজাবে, আমি তখন গার্ডেন পার্টি করবো আর আপনারাই হবেন আমার প্রধান অতিথি।'

বুঝতে পারলুম মিসেস ক্লাউন একবার যাদের প্রধান অতিথি করে এতোবড়ো এক পার্টির আয়োজন করেছেন, সমাজে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবার চলতে থাকবে একের পর এক। ক্লাউন সম্মান পাওয়া মানেই নিকষ পাথরে ঘষে যাচাই হয়ে যাওয়া সোনা। মন্দ কী। হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালুম।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, 'ভারতবর্ষ বিষয়ে আমাদের অনেক কথা জানবার আছে, শোনবার আছে। ভারতবর্ষ এক রহস্যময় দেশ। দেখুন আমরা যে মানুষের মনের ব্যাধি সারাই, সবই বই পড়া বিদ্যা। ভারতবর্ষের সাধুরা শুনেছি যোগঅভ্যাস দিয়ে সে বিদ্যা অর্জন করেন। সন্ন্যাসীরা সব অলোকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে হতবাক করে দেন তেমন তেমন পণ্ডিত লোককে। বলুন সত্যি কিনা।'

'হয়তো। আপনারা যে রকম শোনেন আমরাও সে রকমই শুনি।'

'দেখা পাননি কারো?'

'না তেমন ভাগ্য এখনো হয়নি। আপনাদের মতো আমাদেরও বই পড়া বিদ্যা ভাঙিয়েই দিন কাটে। যদি ভেবে থাকেন ভারতবর্ষ মানেই সাপ বাঘ আর সন্ন্যাসীদের বিচরণক্ষেত্র তা হ'লে বোধহয় সুবিচার হবে না। এই আমাদের মতো লোকেরই ভিড় বেশী। সুতরাং কোনো অলৌকিক বিষয়ে যদি আলাপ করতে চান তা হ'লে আমি বা আমার স্বামী আপনাদের হৃদয়ে যে খুব বেশী আলোকপাত করতে পারবো তা তো মনে হয় না।'

'কী! কী বিষয়ে কথা হচ্ছে?'

কটকটে ইংরিজি বলতে বলতে অন্য একজন ভারতীয় প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এলেন। চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম না তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ। শুধু এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হলুম তিনি বাঙালী নন। দেখলাম আমেরিকান অঙ্গনাটির তাঁর করায়ত্ত। প্রাণ করে বললেন, 'এই যে মিসেস গুরেজ্ঞারেম, তা শুনুন, ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর বিষয়ে যদি জানতে চান, আমি আপনাদের এমন সব ঘটনা বলতে পারি যা শুনলে আপনাদের লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠবে। এবং আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।'

'তাই নাকি। তাই নাকি।'

চেঁচিয়ে কচুরিপানার মত দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে তৎক্ষণাৎ ছোটো একটি মানুষের দল এসে ঘিরে ফেললো তাকে। সে সদম্ভে সবিস্তারে গল্প ফাঁদলো, 'শুনুন তা হ'লে। বছর পাঁচেক আগে আমি একবার মারা যাই—'

'কী!'

'কী!'

'কী!'

সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখের তারা ছিটকে বেরিয়ে এলো প্রায়।

সে সদম্ভে সবিস্তারে গল্প ফাঁদলো.....

'মারা যান?'

'মানে?'

'মানে আমার মৃত্যু ঘটে।'

'মৃত্যু ঘটে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর?'

'তারপর যথারীতি আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে শ্মশানে নিয়ে যান। পোড়াবার ব্যবস্থা করতে কাঠ জড়ো করেন। আপনারা বোধহয় জানেন না, কীভাবে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। আমাদের শ্মশানে কতোগুলো মানুষ শোওয়াবার মতো কাটা জায়গা থাকে মাটির উপরে। তাতে প্রথমে কয়েক পাঁজা কাঠ সাজিয়ে মৃতদেহটিকে শুইয়ে দেয়া হয়, তারপর তার উপর আরো কয়েক পাঁজা কাঠ দিয়ে তলা থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।'

'চুক। চুক। চুক। তারপর?'

'আমাকেও সেই ভাবে শোয়ানো হ'লো।'

'ইশ। তারপর?'

'তারপর মন্ত্র পড়ে সাতপাক ঘুরে আমার আট বছরের ছেলে যখন আমাকে আগুন ধরিয়ে দিতে এলো—'

'ছেলে?'

'হ্যাঁ, প্রথম আগুনটা ছেলেকেই ধরিয়ে দিতে হয় কিনা?'

'তাই বুঝি?'

'ওটার নাম মুখাগ্নি। যাই হোক, আট বছরের ছেলে তো আগুন এনে ছুঁইয়ে দিয়েই বাবা বাবা বলে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, আগুনেও ধরে উঠলো দাউ দাউ করে। এর মধ্যে হঠাৎ লালপাড় শাড়ি পরনে, লাল টকটকে সিঁদুর কপালে, এক অতি অপূর্ব চেহারার মহিলা কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হলেন কে জানে। এই লম্বা লম্বা চুল, হাতে কমণ্ডলু, তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, 'তিষ্ঠ'।

'তিষ্ঠ'!'

'হ্যাঁ। মানে থামো। বলেই কমণ্ডলু থেকে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে

দিলেন, অমনি আগুন নিবে গেল। তখন সেই দেবী কাঠ সরিয়ে আমার দেহটা তুলে এনে আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আমার চারপাশের আত্মীয়-স্বজনকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'শীগ্গির একে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মুখে জল দাও, গা মুছিয়ে পরিষ্কার করে দাও, তারপর বাড়ি নিয়ে যাও'।

আত্মীয়-স্বজনরা স্তম্ভিত। মরা মানুষকে শ্মশান থেকে কোথায় বাড়িতে নিয়ে যাবে? সকলে তো মা মা বলে লুটিয়ে পড়লেন সেখানে। মা তখন আমার কানে জীয়ন মন্ত্র ঢাললেন, তারপর মস্ত এক চপেটাঘাত করে যেন জাগিয়ে দিলেন ঘুম থেকে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম।'

'এ্যাঁ!'

'এ্যাঁ!'

'এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আর এই ঘটনা কাগজে কাগজে বেরিয়ে তখন দেশে ভয়ানক আন্দোলন তুলেছিলো। দলে দলে লোক দেখতে আসতে লাগলো আমাকে, আর তারপর—'

'হ্যালো ডেশাই—'

আর একজন মহিলা এসে ভিড় বাড়ালেন। ভারতীয় ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে।

মহিলাটি হাত ধ'রে থেকে বললেন, 'তারপর? দেশ থেকে কবে ফিরলে? নতুন কী জিনিস আনলে?'

কোথা থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দেশাইয়ের স্ত্রী এসে হাজির হ'লো 'এই যে ডক্টর ওয়েভারেন, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

'হ্যালো পেনি, আছ কেমন?'

'ভালো না, ডক্টর ওয়েভারেন।'

'কেন? আবার কী হ'লো?'

পেনি ওরফে মিসেস দেশাই তার রোগা দেহ নিয়েও হাঁসফাঁস করলেন। গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ছোট্ট রুমালে মুখ মুছে হতাশার সুরে বললেন, 'আপনার চিকিৎসায় সত্যি আমার উপকার হয়েছিলো, বিরক্ত বিরক্ত ভাবটা খুব কমে গিয়েছিলো, চট করে রেগে ওঠা বা মন-খারাপ করে বসে থাকা ভাবটাও একদম ছিলো না কিন্তু এখন আবার আর এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে।'

কী উপসর্গ?'

'ভারি দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'দুঃস্বপ্ন! এ তো ভালো নয়।'

'আর তা ছাড়া আপনি তো জানেন একটু একটু কবিতা লেখার অভ্যাস ছিলো, আজকাল আর কিছুই মাথায় আসছে না।'

'তাই নাকি?'

ডক্টর ওয়েভারেন তো বটেই, মিসেস ওয়েভারেনও ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভুরু কুঁচকে বিড় বিড় করলেন একে দুঃস্বপ্ন তায় কবিতা লেখার ভাব না আসা—উঁহু, এ ভালো লক্ষণ নয়। ডক্টর ওয়েভারেন নিজের মাথায় চারটি টোকা মারলেন। চুপ করে থেকে বললেন 'দ্যাখো পেনি, যা মনে হচ্ছে বেশ সিরিয়স ব্যাপার। নেগলেক্ট করা একটুও উচিত হবে না। দুঃস্বপ্নের সঙ্গে কবিতা লিখতে না পারার সম্বন্ধটা খুব খারাপ। তার মানে একটাই আর একটা টেনে এনেছে'।

'তা হ'লে?' পেনির আর্তস্বর।

'তাই তো ভাবছি, কী করা যায়। শোনো, এক কাজ করো। আর একদিনও দেরি নয়। তুমি কালই আমার ক্লিনিকে এসো। আমি তোমাকে একটা দু' সপ্তাহের ট্রীটমেণ্ট দিয়ে দেখি আগে, সেটাতে ফল পেলে মাত্র পাঁচ মাসের চিকিৎসাতেই তুমি সেরে যাবে।'

'তাই যাবো ডক্টর ওয়েভারেন। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'না হবারই কথা।'

'দেখুন, যদি আমার স্বামীর দেশে একবার যেতে পারতাম নিশ্চয়ই কোনো সাধুবাবা আমাকে এক ফুঁয়ে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু আমার স্বামী এমন নিষ্ঠুর, নিজে এর মধ্যে মাল আনতে দু'বার ঘুরে এলেন, আমাকে একবারো নিলেন না।'

বলতে বলতে মিসেস দেশাই চোখে রুমাল চাপা দিলেন।

আসলে এই দেশাই ভদ্রলোক এখানে ব্যবসা করেন। রকফেলার প্লাজার বেইজমেণ্টে তাঁর ভারতীয় সামগ্রীর মস্ত দোকান। সেখানে তিনি চটের মতো ভারি ভারি কাপড়ের দিশী স্যুট বানিয়ে রেখে তাক লাগিয়ে দেন সাহেব-সুবোর। দিশী নেকটাই ঝুলিয়ে প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের নয়ন মন হরণ করেন। তা ছাড়া মেয়েদের পুঁতির-মালা, কাচের চুড়ি, বেনারসী স্কার্ফ—ইত্যাদির সমাবেশও কম নয়। কিন্তু বাসনও আছে সঙ্গে। কটকি কাজ করা এ্যাশ ট্রে, আখরোট কাঠের কাশ্মীরি বাসন, জয়পুরী মিনে করা ফুলদানি, নেপালী সেটিংয়ের পিতলের থালা—বেশ আকর্ষণযোগ্য দোকান। আর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ সেই দোকানে একটি শাড়ি-পরা সেলস গার্ল—সব সময়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। এই পেনি নামের পুয়েটোরিকান মেয়েটিও ঐ দোকানে কাজ করতো। শেষ পর্যন্ত দেশাই তাকে বিয়ে করে দোকানের মালিকানী করে নিয়েছেন। না নিয়ে অবিশ্যি উপায় ছিলো না। বিয়ের তিন মাস পরেই তাদের একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়।

দেশাইয়ের দোকান সেখানে বিখ্যাত। শুধু দোকানই নয়, ইংরিজিতে একখানা

বইও লিখেছেন দেশাইসাহেব। বইয়ের নাম 'ভারতের ভূত, ভারতের সাধু, ভারতের আত্মা' অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত অলোকিকতা বিষয়ে সেড়শো পাতার মধ্যে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। বর্তমানে 'ভারতের সর্প ও ব্যাঘ্র' এই বিষয়ে লিখতে মনোনিবেশ করেছেন। শোনা গেল দোকানের বিক্রীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই বই বিক্রী হয়। দেশাই অনেক ডলারের মালিক।

মিসেস ক্রাউন এর আগে তাঁকে চিনতেন না। নাম শুনেছিলেন। আজ আমাদের অনারেই এই ভারতীয় ভাল্লুকটিকে ডেকে এনেছেন। ভেবেছেন, দেশওয়ালী ভাই দেখে আমরা সুখী হবো। তা হলুম।

আরো একজন ভারতীয়কেও এই রকমই কানে শুনে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। তাঁর দোকান নেই, তিনি শুধুই লেখেন। এবং লিখেই তিনি সেখানে প্রচুর আরামের জীবনের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বিষয়ে জোরালো প্রবন্ধ ছেপে খুব বাহবা পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাস্নান, পতিসেবা, আগুনে পুড়ে সতী হওয়া, মাতৃত্বের মহিমা, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে বেশ্যাবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা—এ সব বিষয়ে নাকি এর অনন্ত জ্ঞান। বর্তমানে একের পর এক সেই সব ছাড়ছেন। শীগ্গিরই একটা কালেকশন বেরুবে। আশা করছেন তা থেকে তিনি বাকী জীবনের সংস্থান করে নিতে পারবেন। বাচ্চা বয়েস থেকে ব্যবসায়ী পিতার সঙ্গে প্রবাসেই জীবন কেটেছে তাঁর। মাতৃভূমির মতো মাতৃভাষার সঙ্গেও তাঁর কোনো নাড়ির যোগ নেই। কিন্তু তবু তিনি ভারতীয়, গায়ের রং এখনো মেটে, সুতরাং ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বর্ণনায় তাঁর জন্মগত অধিকার।

এই নমুনা দুটির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর এ পাশ থেকে ও পাশে গিয়ে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

ও রকম নিঃসঙ্গ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেতে যেতে মাঝপথে থেমে গেলেন মিসেস ক্রাউন।

'এ কী, এখানে একা? এসো এসো, এদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি', নিউইয়র্ক শহরের তথা আমেরিকার তিনজন হোমরা-চোমরাকে উপস্থিত করলেন তিনি। তিনজনের নামই বহুশ্রুত। একজন মস্ত রাজনীতিজ্ঞ, একজন সেই বছরের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, অন্যজন সেই বেহালাবাদক, যাঁর বাজনা শুনতে একদা কলকাতার রাস্তায় টিকিটের জন্য আধ মাইল জোড়া লম্বা লাইন হয়েছিলো।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে রাসেল বেরিয়ে এলো। 'আমি এবার পালাই, মিসেস ক্রাউন।'

'কেন? এতো তাড়া কিসের?'

'অনেক দূর যেতে হবে। খুব ভালো লাগলো।' আমার দিকে তাকালো 'আপনি আর কতোক্ষণ?'

বললাম, 'যতোক্ষণ না স্বামীকে উদ্ধার করতে পারি।'

'তাঁকে তো দেখলাম আমাদের এক সত্যিকারের বিট কবির পাল্লায় পড়ে আছেন। সেই কবি আপনার স্বামীর কাছে আপনাদের দেশের ভাং, গাঁজা, সিদ্ধি এবং সোমরসের ভেদাভেদ বিষয়ে জ্ঞান চাইছেন। আমার যদ্দুর মনে হ'লো সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুব প্রবল নয়।'

আমি হেসে বললাম, 'কেন, দেশাই বা ভট্ট থাকতে জ্ঞানী লোকের অভাব কী? যা চায় তাই পাবে।'

রাসেল খোলা গলায় হেসে উঠলো। মিসেস ক্রাউন আমার হাত ধরে বললেন, 'এখুনি যাবার কথা তুলো না। তোমাদের জন্যই এই পার্টি। এখনো সবাই আসেন নি। আর রাসেল, তুমিও আর একটু থাকো না।'

রাসেল মিসেস ক্রাউনের হাতে হাত বুলোলো, 'মাদাম, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, নইলে আমার নিজেরো একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন।' পকেট থেকে দস্তানা বার করলো সে।

সেদিনকার ঐ কৌতুকপ্রদ ককটেল-পার্টি আরো অনেকক্ষণ চলেছিলো। আরো অনেক লোক এসেছিলেন, অনেককেই অত্যন্ত ভালো লেগেছিলো, মস্ত ড্রইংরুমের তরঙ্গায়িত মানুষের ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠেছিলো, জলের স্রোতের মতো কেটে গিয়েছিলো সময়। মিসেস ক্রাউনের দরাজ হাতের মূল্যবান মদ্য পরিবেশনে, আর চুটকি খাবারের বৈচিত্র্যে সকলেই তৃপ্ত হয়েছিলো সেদিন। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। লবিতে এসে সুন্দরী শাদা চামড়ার দাসীর হাতে কোট পরতে পরতে এই পার্টির জন্য মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলুম মিসেস ক্রাউনকে। মিসেস ক্রাউন তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে আমাদের আরো কৃতজ্ঞ করলেন।

বাড়ি এসে অনেকক্ষণ সে বিষয়েই কথা বলাবলি করলুম। অনেক ছবিই ছায়া ফেললো মনের পর্দায়, কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট যে ছবিটা দেখলুম সেটা রাসেলের। বারে বারেই আমার কেবল রাসেলকে মনে পড়তে লাগলো। এমন কি বিছানায় শুয়েও ওর ভাবনা আমার মন থেকে গেলো না। ছিপছিপে চেহারা, বড়ো বড়ো এলোমেলো চুল, বড়ো বড়ো চোখ, সেই চোখের বিষাদভরা দৃষ্টি, পাগলাটে ধরন, কথা বলার জেদি ভঙ্গি, সব ভেসে ভেসে উঠছিলো চোখে। বাংলাদেশের উপরে ওর উগ্র আকর্ষণের উৎসটা কী, সেটা খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম। যদিও পরের দিন সকালে উঠেই ভুলে গিয়েছিলাম সব তবু তার ছাপটা মুছেও মুছে যাচ্ছিলো না। ওর বহু বিখ্যাত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বইখানা কিনে পড়ে ফেললুম একদিন। চেহারা দেখে যতো না পাগল মনে হয়েছিলো, বই পড়ে বুঝলাম তার চেয়ে সে বেশী পাগল।

(ক্রমশঃ)

নেফার মানুষঃ মিশমী

নলিনীকুমার ভদ্র

একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরাম দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছলেন পারলৌহিত্য প্রদেশে পাহাড়ঘেরা এক রমণীয় স্থানে। সেখানে এক সুরম্য কুন্ডে অবগাহন করবার সঙ্গে সঙ্গে স্খলিত হল তাঁর হস্তসংলগ্ন কুঠার। এই কুন্ডের পুণ্যোদকে অবগাহন করে মাতৃহত্যাজনিত পাপ এবং অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন পরশুরাম। তার পর থেকে এই কুন্ড সমগ্র ভারতে প্রখ্যাত হল পরশুরাম কুন্ড নামে।

কাহিনীটি শুনেছিলাম প্রথম যৌবনে অজানার আকর্ষণে যেদিন সদিয়ার লোহিত নদী পার হয়ে পরিদর্শন করতে যাই পরশুরাম কুন্ড। তখনই প্রথম এসেছিলাম সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী মিশমিদের সংস্পর্শে, যারা ক্ষত্রিয়-হন্তারক পরশুরামের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দিতে রীতিমত গৌরববোধ করে।

আহোম রাজা পুরন্দর সিংহের নিকট থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-সৌকর্যার্থে সদিয়াতে একজন এ্যাসিস্টান্ট পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ সালে তিব্বত-সীমান্ত-সংলগ্ন বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত সমগ্র ভূভাগকে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল এবং সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলই বর্তমানে নেফা নামে সুপরিচিত এবং কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত, তিরাপ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। লোহিত বিভাগটি আগেকার সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এলাকার মধ্যে। এই বিভাগে দুরধিগম্য মিশমি পাহাড়ে মিশমী জাতির বাস। এ ছাড়া লোহিত বিভাগে পদম নামে একটি উপজাতীয় এবং খামতি এবং সিংফো নামে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দুটি উপজাতীয় লোক বাস করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের দুটি বিভাগ (পশ্চিম প্রান্তের কামেং এবং পূর্ব প্রান্তের লোহিত) চীনা অনুপ্রবেশের ফলে আজ রণাঙ্গনে পরিণত। এ ছাড়া আর একটি সমরাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে কামেং-এর পূর্বদিকস্থ ডফলা, মিরি, আফা প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত সুবনসিরি বিভাগের উত্তর ভাগে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে (বর্তমান নেফা) যে পঞ্চান্নটি উপ-ভাষাভাষী উপজাতির বাস তাদের মধ্যে একদা মিশমীরাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিল আর্য-সংস্কৃতি দ্বারা। পরশুরাম কুন্ডের কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া মিশমীদের দেশ লোহিত বিভাগে আছে শ্রীকৃষ্ণাপহৃতা রুক্মিণীর পিতা রাজা ভীষ্মকের রাজধানীর আর তাম্রেশ্বরী দেবীর তাম্রনির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আগেকার দিনে দূরদূরান্তর থেকে পুণ্যলোভীরা এসে সমবেত হত এই তীর্থমন্দিরে।

নেফার আদিবাসীদের মধ্যে মিশমীরাই হচ্ছে সকলের চেয়ে সুন্দর। মেয়েপুরুষ উভয়েরই দেহের বর্ণ পীতাভ গৌর, উচ্চতা মাঝারি, মেয়েরা অনেকেই রূপলাবণ্যবতী। মিশমীদের পোশাকপরিচ্ছদের বিচিত্র নকশা এবং বর্ণসৌসামঞ্জস্যে তাদের সহজাত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন মুখ এবং মেয়েপুরুষ উভয়েরই মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত দেখে মন খুশী হয়ে ওঠে। তারাওম এবং কামান মিশমী মেয়েদের সযত্নবিন্যস্ত কেশগোছা দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ

খামতি উপজাতিদের বৌদ্ধ উৎসব

করে, কোনো কোনো গোষ্ঠীর মিশমী মেয়েরা তাদের অনাবৃত বক্ষোদেশকে সুশোভিত করে বিচিত্রবর্ণের কাচ ইত্যাদির সচ্ছিদ্র গুটিকায় তৈরী মালা এবং রেশমী সুত্রগুচ্ছ দ্বারা। যৌবন এদের দেহে স্থায়ী হয় দীর্ঘকাল, মলিন হয় না কখনো মুখের মৃদু হাসি। আরণ্য পরিবেশে নিঃসঙ্গ বনচারিণী, স্থিরযৌবনা বিদ্যুৎবর্ণা মিশমী রূপসীকে দেখলে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে ঃ

যা তত্র স্যাদ্‌ যুবতি বিষয়ে
সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।

অর্থাৎ, এ যেন বিধাতার সৃষ্ট প্রথম যুবতী।

মিশমীদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী আছে তিনটি ঃ দিগারু (তারাওন), মিজু (কামান), চুলিকাটা (ইদু)। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় একই ধরনের, পার্থক্য যেটুকু সে শুধু কেশবিন্যাসের কেরামতিতে। চুলিকাটাদের মাথার চারপাশের চুল ক্ষুর দিয়ে চাঁছে বৃত্তাকারে কামানো। তারাওন এবং কামান গোষ্ঠীর মেয়ে-পুরুষ উভয়েই কিন্তু মাথায় রাখে লম্বা চুল। বেশভূষাও একই ধরণের, পুরুষদের মুখে আবার গোঁফদাড়ির বালাই নেই বললেই চলে। কাজেই বিদেশীদের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে কে পুরুষ কে নারী বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। লুসাইদের (মিজো) বেলায়ও ঠিক এমনি ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি হয়।

নেফার সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, দফলাদের ন্যায় মিশমীদেরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের গ্রামজীবনে সংহতির অভাব। গোটা গ্রামে আসলে ঘর বলতে আছে মোটে একখানি —জঙ্গলের ভিতরে অথবা খাড়া পাহাড়ের গায়ে সে ঘর। এই বাসগৃহগুলি আকারে বেশ বড় হয়। দৈর্ঘ্যে একশো ফুট, প্রস্থে পনেরো ফুট পর্যন্ত। দশ থেকে ষাটজন লোক বাস করতে পারে এতে। এদের যেটুকু সামাজিক ঐক্য তা গড়ে ওঠে এই যৌথ বাসভবনকে কেন্দ্র করেই, গ্রামের অন্যান্য ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলি

মিশমী বালিকা

পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ছড়ানো। একটি থেকে আর একটির দূরত্ব কম-সে-কম আধ মাইল। মিশমী গ্রাম-প্রধানকে বলা হয় গাম। সামাজিক অপরাধ ইত্যাদির বিচারে তার সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হয় গ্রামবাসীদের।

কামান এবং তারাওন মিশমীদের বেশভূষা বর্ণাঢ্য এবং নয়নসুভগ। বেশীর ভাগই এরা নিজেরা তৈরি করে, তিব্বত থেকে আমদানি করা হয় বহুবর্ণরঞ্জিত এবং ক্রুশচিহ্নশোভিত এক রকম অতি চমৎকার গরম কোর্তা। পুরুষরা সাধারণত গায়ে দেয় কালো অথবা ম্যারুণ রঙের নকসা-তোলা বর্ডার-দেওয়া কোর্তা, মাথায় পরে সযত্নে বোনা বেতের টুপি।

তারাওন এবং কামান মেয়েদের পরনে কোমরে গেরো-দেওয়া, রঙিন ডোরাকাটা কালো রঙে ছোপানো আপাদলম্বিত দীর্ঘ বস্ত্রখন্ড, গায়ে চমৎকার সুচের কাজ-করা হাতাহীন আঁট-সাঁট জামা। গয়নাগাটির মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কপালে আটকানো পাতলা রুপোর পাতগুলি এবং ভেরীর মতো আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণভূষণ। মেয়েরা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে রাখে প্রকান্ড প্রকান্ড তারের ফাঁস। আজকাল অবশ্য টাকা এবং কাঁচ, পুঁতি ইত্যাদির তৈরি মালার প্রচলন হওয়াতে তারের মালা পরার রেওয়াজ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তিব্বতী কবচ মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই অতি প্রিয় জিনিস।

খামলাং উপত্যকায় কামান মিশমী

মিশমী মেয়ে-পুরুষ সকলেই ধূম-পানে অত্যাসক্ত। আপনি যদি মিশমীদের দেশে বেড়াতে যান তা হলে দেখে অবাক হবেন যে, রুপো অথবা পিতলের তৈরি তামাকের পাইপ সকল সময় এদের ঠোঁটে লেগেই আছে। যদি জুমের ক্ষেতের ধারে গিয়ে হাজির হন তা হলে দেখবেন, মাথার চুল চূড়াকারে বাঁধা, উজ্জ্বলবর্ণা পরিপুষ্টাঙ্গী মিশমী সুন্দরীরা কুড়ুল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে, কিংবা অন্য কোনো কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজ করছে। দুই ঠোঁটের মাঝখানে তাদের শোভা পাচ্ছে আঁট করে চেপে ধরা তামাকের লম্বা পাইপ, মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরের দিকে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

মিশমীরা প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডবলীলাজনিত মহতী বিনষ্টির হাত থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে এদের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা। ১৯৫০ সালে আসামে যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হয় তার দরুণ আবর এবং মিশমী পাহাড়ের উপজাতি অধ্যুষিত প্রায় চৌদ্দ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অনেকগুলি গ্রামের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতির এই অভাবিত-পূর্ব রুদ্রতাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ আদিবাসী।

আসাম গবর্ণমেন্টের মনোযোগ এবং প্রযত্ন সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার প্রভাব থেকে আজও মিশমীরা রয়ে গেছে বহু-দূরে।

মিশমী পাহাড়ের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম। তীব্র গতিশীল পার্বত্য নদী পারাপার করতে হয় বেতের তৈরি একটি দড়ির সাহায্যে। সেই দড়ির এক প্রান্ত এপারের একটি গাছে এবং অপর প্রান্ত ওপারের একটি গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। এই দড়িতে সংলগ্ন থাকে কতক-গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেতের আংটা। নদীতিতীর্ষুকে বেঁধে দেওয়া হয় এই আংটায়, তার পর যে ভাবে সে খরস্রোতা নদী অতিক্রমণ করে তার চাইতে ভবনদীর ওপারে যাওয়া ঢের সোজা। 'দি আও নাগাজ', 'দি লোটা নাগাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা জে পি মিলসকে লোহিত উপ-ত্যকা পরিদর্শনকালে এমনিভাবে নদী পার হতে হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে, জীবনে এত ভয় আর কখনো পাননি তিনি।

যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যবিধ বহু কারণে বলতে গেলে গোটা মিশমী জাতটাই আজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কোনো

ডফলা বালিকা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি, গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান; আধুনিক সভ্য-তার উপকরণসমূহ মিশমীদের একঘেয়ে জীবনে আরাম উপভোগের ব্যবস্থা করেনি। কর্মক্লান্ত জীবনে সান্ত্বনা লাভ করে তারা নভোলীন তুষারাবৃত পর্বতমালার পানে তাকিয়ে, বেগবতী পার্বত্য নদীর কল-গানে এবং ছায়াঘেরা অরণ্যের মর্মর-ধ্বনিতে কানে তাদের বর্ষিত হয় শান্তির অমৃতবাণী। কিন্তু আজ লোহিত প্রদেশ নেফার অন্যতম যুদ্ধভূমিতে পরিণত হওয়াতে ব্যাহত হয়েছে মিশমীদের শান্তিপূর্ণ জীবনধারা। ভারতের ঐতি-হ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ যারা, পরশুরামের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্য-ভূমি লোহিতের অধিবাসী সেই মিশমী-দের মনে চীনাদের এই অনধিকার অনু-প্রবেশ এক নতুন জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছে।

হেরম্যান হেসে

নভেম্বরের নিকষ কালো আকাশ সেদিন টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় শহরটার ওপরে বজ্রবিদ্যুতের তাড়নায় প্রবল বেগে দুলছিল। ঝড়-বৃষ্টির একটানা আক্রমণে অলিগলি, পথঘাট সব কেমন বিপর্যস্ত। ভেজা ফুটপাথগুলোতে রাস্তার ম্লান আলো প্রতিফলিত হয়ে যেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসছে। দূরে পাহাড়-শ্রেণীর একটা টিলার ওপরে একটা প্রাচীন অট্টালিকার চূড়া অনবরত মেঘ এবং কুয়াশা নিয়ে খেলে যাচ্ছে। চূড়াটা মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাঝে মাঝে কুয়াশায় সাদা হয়ে আসে। দুটো জানালার শুধু লালচে আলোর আভা ছাড়া সেই নিরেট পাথরের প্রাসাদে আর কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারের রহস্যময় প্রহরী হয়ে বিশাল এক রক্তচক্ষু দৈত্য নীচে শহরের বাড়িগুলোর ছাদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। শহরের নির্জন পথের দু' পাশে পত্র-পুষ্পহীন চেস্টনাট লিন্ডেন এবং প্লেন গাছের সারি একদল জীর্ণ বৃদ্ধের মত রাত্রির হাসপাতালে মৃত্যু-ভয়ে ধুঁকছে। রয়েটলিংগেন স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটাও ছেড়ে গেল। ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকার ভারী হাওয়ায় যেন অনেকক্ষণ লেগে থাকে।

মাঝে মাঝে ঝড়টা জিরিয়ে নেয়। তখন নেকার নদীর জলস্রোতের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। কারা যেন নিঃশব্দ বিষাদের চাদর নদীর দুই তীর ধরে বিছিয়ে রেখে চলে গেছে। এখন ভাবাই যায় না এই নদীর তীর একদা ছাত্রদের গানে, বনভোজনে প্রীত ছিল। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়টিও যেন আজকে পুরোনো স্মৃতির শিবির মাত্র। অতীতের সেই আলোকিত মুখগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির আনাচ-কানাচে কোথাও খুঁজলে পাওয়া যাবে না। হয়ত ফেলডেরলিন-এর সেই কিংবদন্তীর যন্ত্রসংগীতকে পাথরের পুরোনো দেয়ালগুলো গিলেই ফেলেছে একদিন। এখন পাথরের গায়ে কান পাতলে তার শেষ রেশটুকু শোনা গেলেও যেতে পারে। সেই সব কাল আর নেই। টুবিঙ্গেনের ঘড়িতে এখন নতুন সময় বাজছে। প্লেটো, অ্যারিস্টোটল প্রভৃতির রচনাবলীর ওপর নতুন চোখের উঁকি-ঝুঁকি এখন।

দুজন ছাত্র নেকার নদীর সেতুর দিক থেকে হেঁটে আসছিল। এই তুমুল ঝড়-বৃষ্টিকে এতটুকু সমীহ না করে শুধু গরম কোটেই আচ্ছাদিত হয়ে হাঁটছিল দুই বন্ধু।

—বোতলে আর কিছু আছে নাকি? অটো এবের বন্ধুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। ওর বন্ধু হেরমেন লাউশের জাতে কবি অতএব স্বভাবতই একটু বিষাদগ্রস্ত এবং উচ্চমন্য। বেনেডিকটাইনের প্রায় শূন্য বোতলটাকে পকেট থেকে বার করে বন্ধুর হাতে দিল। নদীর অপর পারের বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে চীৎকার করে এবের।

—অয়ি জ্ঞানদাত্রী জননী আজিকে তোমারই স্বাস্থ্য পান করি! বোতলে যেটুকু ছিল এক চুমুকে শেষ করে ফেলল এবের। খালি বোতলটা দেখিয়ে লাউশের প্রশ্ন করে,

—এই অপদার্থ পদার্থটিকে নিয়ে এখন কি করবো আমরা?

—কি আর করবো, এটাকে টুবিঙ্গেনের ফাঁড়িতে জমা রাখব। এই ত আমাদের ফাঁড়ি—। এবের বোতলটাকে নদীর ওপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল তাক করে ছুঁড়ে মারল। পাথরে লেগে বোতলটা চুরমার হয়ে যায়। কাঁচের টুকরোগুলো ছিটকে পড়ে চারদিকে।

—অতঃ কিম?

—অতঃ 'লুয়েন'। ওখানে সাবরে শ্যারপনের আর রেচকে পাওয়া যাবে। গত বৃহস্পতিবারের দাঙ্গার শোক ভুলছে দুটোতে ওখানে। এবের লং কোটটাকে ভাল করে এঁটে তাড়াতাড়ি পা চালাতে আরম্ভ করে।

—অত দৌড়চ্ছো কেন? আমাদের পক্ষে কিন্তু আজকের আবহাওয়াটা একে-

যাবে আদর্শ। বোতলটা শেষ না হলে বন্ধ চারটে দেয়ালের মধ্যে কখনই ঢুকতাম না আমি। 'লুয়েনে' গিয়ে শারপেনের আর রেচের সংগে বসার ত কোনো মানেই হয় না। একটা বিরক্তকর গবেট, আরেকটা ত অল্পেই চেঁচাতে শুরু করে। কিন্তু ওরা যদি 'উলবাথের' গেলে তাহলে কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। আজে-বাজে মদ আমার ভালো লাগে না। লাউশেরের কথায় হেসে ফেলল এবের। হাসতে হাসতেই বলল।

—মদ-গার্বিত? ওখানে অন্য কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। লাউশের! আমরা কিন্তু এক কাজ করলে পারি। আমরা কয়জনে মিলে একটা ক্লাব করলে কি রকম হয় বল ত? আমরা ত আছিই, আরো জন্যকয়কে ভিড়িয়ে ফেল-করা ছাত্রদের একটা সমিতি করা যায় স্বচ্ছন্দে।

—ক্লাব? অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে লাউশের, তারপর বলে।

—তার চেয়ে আমি সন্ন্যেসী হয়ে পাহাড়ে চলে যাব!

—কেন? যারা কেতাদুরস্ত ক্লাবে যেতে চায় না এবং হতাশ ছাত্র, যাদের পাশ করার কোনো আশা নেই শুধু তাদের নিয়েই আমরা ক্লাব খুলবো। রেচ আমাদের ক্লাবের সভ্যদের সমস্ত পাপ আর গ্লানির বোঝাকে কান্নার স্রোতে ভাসিয়ে দেবে। শারপেনেরকে আমাদের হয়ে লড়বার জন্যে উপযুক্ত বর্ম দেয়া হবে। আমি হবো বীয়ার কমিশনার এবং তুমি ক্লাবের সেক্রেটারী এবং বোতল রক্ষক!

আমরা নিয়ম করে দেবো যে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের অন্যত্র পান-গমন নিষিদ্ধ। ধরো যদি কাউকে 'অস্যেন'-এ মদ খেতে দেখা যায় তাকে এক মার্ক জরিমানা করা হবে।

দু বন্ধু কথা বলতে বলতে পুরোনো সেতুটার ওপরে উঠল। পানশালা থেকে ছাত্রদের হাসি-হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসে। সেতুর থামে নেকার নদীর উন্মত্ত জলস্রোত ক্রমাগত আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তার আলোগুলোকে কোণে [illegible] ক্রমাগত নাচাচ্ছে নদীটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জার ঘন্টার প্রহর শুনল তারা দুজন। নদীর ঠিক উঁচু পাড় থেকে আরম্ভ হয়ে সামনের মাঠটা পর্যন্ত একনাগ [illegible]

বিদ্যালয়ের পুরোনো বাড়ির সারি চলে গেছে। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি একেবারে নিঝুম ঘুমে আচ্ছন্ন, আবার কোনো কোনো বাড়ি তখনও আলোকিত জানলায় জেগে আছে। সেতুটার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা আর একটাও কথা বলল না। হয়ত নিশিথ নগরীর রূপ, নেকার নদীর জল—শব্দ এবং দূর থেকে ভেসে-আসা ছাত্রদের সমবেত গানের রেশ ওদের অতীতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে থাকবে। যে ছাত্রজীবন আর ফিরবে না তারই জন্যে শোকজ্ঞাপক নীরবতা পালন করছে যেন দুই বন্ধু। সেতুটা পেরিয়ে ওরা হোলাৎস মার্কট-এর দিকের খাড়া সরু রাস্তা ধরল। গির্জা, কির্শ স্ট্রীট, বন্ধ বাজার, 'সোনে' পানশালা, ছাড়িয়ে 'লুয়েন'-এর পেছনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। খিড়কির দরজাটার সামনে কালো জলে একেবারে থৈ-থৈ। ভেতরে ঢুকবার আগে ওরা নীচের জানালা দিয়ে রেচ আর শার্পেনারকে দেখতে পায়। দুজনে এক কোণে বসে মদ খাচ্ছে।

—ওরা 'উইংকলের' খাচ্ছে। কেমন খাঁটিস তোমাকে? আনন্দে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে এবের। প্রথমে লাউশের ঢুকল দরজা দিয়ে। ভেতরে ঢুকে লেমনেডের বিজ্ঞাপনের পোস্টারটা হঠাৎ একটা অহেতুক আক্রোশে টেনে ধরে এবের। মালিকের মেয়ে মাথিল্ডা আসতেই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে কোটটা দেয় ওর হাতে।

ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে উইংকলের-পায়ীরা একবার মুখ তুলে তাকায়। ওদের মধ্যে প্রথম কথা বলল শার্পেনার।

—ভীষণ দেরী হয়ে গেছে! কিছু পান করবে নাকি তোমরা। পান না করে চানও করতে পারো, অথবা সমস্ত দুঃখ-শুলোকে একসঙ্গে মদের মধ্যে চুবিয়েও দিতে পারো। উঃ! জীবনে আর কখনো বাজী ফেলবো না। পনেরো বোতল মাল টেনে খাওয়া কি অসম্ভব একঘেঁয়ে।

যত ইচ্ছে উইংকলের আছে খাও।

—ঠিক হায়। কোনো ভয় নেই। মাথিল্ডা! দুটো গ্লাস!

একটা বোতল তুলে নিয়ে খানিকটা নেড়ে-চেড়ে দেখে দুটো গেলাস ভরে নিল লাউশের।

—এবের এই হচ্ছে আমার মনের মতন জল তরল অনল!

—খেয়ে যাও। ঠোঁটে তলাসুদ্ধ উপুড় করে দাও।

—জিনিসটা কিন্তু ভাল! এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা খালি করে আবার ভরে, চেয়ারের পিছনে হাতটাকে যেন ছুঁড়ে ফেলল লাউশের।

—তোমার হয়েছেটা কি? এ রকম উন্মুকের মতন লাগছে কেন তোমাকে?

শার্পেনের প্রশ্ন করে লাউশেরের দিকে তাকিয়ে। উত্তরটা দেবার চেষ্টা করে এবের।

—ও ত আবার লিকার খেতে পারে না। বেনেডিকটাইনটা শেষ—এবেরের কথা শেষ না হতেই হঠাৎ দাঁত চেপে শিস দিয়ে উঠল লাউশের।

—এবের বেশী বোকো না। আর দ্যাখো শার্পেনার এই ধরণের আজে-বাজে প্রশ্ন করা উচিত না। আরেকটা গেলাস ভরে চুমুক দিতে দিতে খুব গম্ভীর এবং আস্তে আস্তে বলতে থাকে লাউশের।

—তোমরা করজন একেবারে খাঁটি শুয়োরের বাচ্ছা। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি সময় সময়, তোমাদের সঙ্গেই কিনা আমাকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয়। রেচ ওর বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠে, মদের গেলাস উঁচিয়ে, কবি হায়মেন লাউশেরের স্বাস্থ্য পান করে। ঘরের আবহাওয়াটাকে শান্ত করবার জন্যেই যেন বলল এবের,

—যাগগে বড় বড় কথা ছেড়ে এখন একটু শিল্প দর্শন কিংবা একটু রসিকতা কর দেখি বাবা, যা তোমার ছিঁচকাঁদুনে কবিতায় কখনও পাওয়া যায় না!

—নিশ্চয়ই আমার কবিতায় পাওয়া যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এইভাবে বসে আছি, তোমাদের পয়সার মদ খাচ্ছি, তোমাদের মাথার ওই ফাঁকা খুলিগুলো আমাকে দেখতে হচ্ছে সব সময়—নিজের মনে সোনা-রূপো, রূপকথার ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মেনে নিয়েছি—এর চেয়ে বড় রসিকতা আর কি হতে পারে? নিজেদের কথা ভাবো না তোমরা? এখানে বসে কি করছ? মদের মধ্যে কোন দুঃখ কোন সুখকে ঢাকবে? হয়ত একটা সামান্য পরীক্ষা, কয়েকটা টাকা কিংবা একটা ইতর চাকরী, ব্যস এই শুধু। কারণ তোমরা হঠাৎ বুঝে ফেলেছো যে শুধু এই সমস্ত জিনিসের জন্যে বাঁচা যায় না! আর আমি? আমার কবিতার সূর্য-করোজ্জ্বল নীল আকাশকে আমি আমার মদে ডুবিয়ে দিচ্ছি। আমার কল্পনার জন্মভূমি আমার তুলির রঙ, আমার সেতারের তার, শিল্পের একটা অংশ, যশের অংশ, অসীমের অংশ সব ডুবিয়ে দিচ্ছি আমি। কারণ সত্যি কোনো কিছুর জন্যেই বেঁচে থাকা যায় না। উদ্দেশ্যহীন জীবনও যেমন নিষ্প্রভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আয়ুও তেমনি গ্লানিকর।

রেচ যথারীতি ওর কবি বন্ধুর কথায় হাসতেই থাকল। এবের গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল।

—খাও, খাও শুধু খেয়ে যাও। জীবনটাকে অত কালো করে নাই বা দেখালে।

হঠাৎ রেচের দিকে চোখ পড়ে এবেরের।

—রেচ, এখন তুমি কি করবে? বুড়োকে তোমার ব্যাপারটা সব জানিয়েছ?

—বুড়োকে কি জানাবে? লাউশের প্রশ্ন করে।

—তুমি জানো না? এই নিয়ে তৃতীয়-বার রেচ পরীক্ষা দিতে বসেনি। ওর নামও কাটা গ্যাছে! কিন্তু এখন কি করবে তুমি রেচ?

—কি করবো?—আমি নাম লিখিয়েছি!

—নাম লিখিয়েছ?

—সৈন্যবাহিনীতে আজকাল বদ্ধ মাতালদেরো নিচ্ছে নাকি?

—কতকটা হয়ত তাই। আসলে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্বর্গের টিকিট পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চোখের জল ফেলেছি। আর নয় বাপস্।

—কিন্তু তোমার নামটা নিলো কে? এতক্ষণ পরে লাউশের প্রশ্ন করল।

—এক ভদ্রলোক। তোমরা নিশ্চয়ই আলাপ করতে চাইবে। অদ্ভুত ভালো ভদ্রলোক—।

—ভদ্রলোক না তোমার মাথা! ভদ্র-লোক সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো হে ছোকরা? আমার চেয়েও কি লোকটা ভদ্র?

—অনেক, অনেক। আমি বলছি লাউশের ওরকম ভদ্রলোক হয় না। যাকগে তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলে লাভ নেই। ভদ্রলোকটি আজ সন্ধ্যায় এখানে আসবেন। আমাকে তিনি কথা দিয়েছেন।

—সত্যি আসবেন?

—আলবাৎ!

লাউশের পকেট থেকে কয়েকটা কালো

লম্বা চুরুট বার করে বন্ধুদের বিলিয়ে দেয়। নিজে একটা ধরিয়ে একমনে টেনে যেতে থাকে। সমস্ত ঘরটায় চুরুটের ধোঁয়া ভেসে বেড়ায়। ঘরের সকলেই চুপচাপ মদ খেয়ে যায়, ঘরটাকে আরো ধূমায়িত করে। পানশালার অন্যান্য লোকদের হাসি-গল্পের টুকরো টুকরো কথাবার্তা ভেসে আসে এদিকে। ওরা আর কেউ একটাও কথা বলে না। চুপচাপ কথা না বলে মদ খেয়ে ওরা চারজন অনেকদিন রাত কাবার করেছে। মনে হচ্ছিল আজকের রাতটাও বোধ হয় তেমনি গড়িয়ে যাবে তাদের নির্বাক চিন্তার চাকায়। অনেক কয়েকটা গেলাস শেষ হবার পর প্রথম কথা বলল এবের,

—সত্যি তোমার ওই ভদ্রলোককে দেখবার জন্যে আমি উৎসুক।

কেউ কোনো উত্তর দেয় না। মাথিল্ডা এসে আরো দুটো বোতল খুলে দিয়ে যায়। আবার কথা বলল এবের,

—কিন্তু আমাদের কে নেবে? আমার ত' আর দুটো চান্স আছে পাশ করার, তারপর ত' সব খতম!

—আমার আবার টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। বাবাকে আর রাজী করানো যাবে না। শার্পেনার বলল।

—আমারও ত' সেই একই ব্যাপার। বুড়ো একেবারে হাত মুঠো করে ফেলেছে। লাউশের মুখ ভ্যাঙায়।

—একেই বলে বেঁচে থাকার চিন্তা। আচ্ছা এবের, তুমি কি হলপ করে বলতে পারো আগামী দুটো টার্ম পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকবেই? আগামী এক বছরে কত কিছু হয়ে যেতে পারে তা জানো?

—যথা?

—যথা তুমি চুরুটের আগুনে এই মুহূর্তেই পুড়ে মরতে পার।

—জাহান্নমে যাও। এবের চেঁচিয়ে ওঠে।

—তুমি—। লাউশের কথাটা শেষ করতে পারে না। হঠাৎ ওর মুখটা কেমন ভয়ে শাদা হয়ে যায় জানালার দিকে তাকিয়ে।

—কি হল? শার্পেনার চেঁচায়।

লাউশের নীরবে জানালাটা দেখায় আঙুল দিয়ে। সকলেই ফিরে তাকায় জানালার দিকে। একটা রোগা লম্বা [illegible]

লোকটার রং অসম্ভব ফ্যাকাসে, ভঙ্গীটা কেমন যেন উদ্ধত, লম্বা চিবুকে ছুঁচালো দাড়ি আর সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ইস্পাতের ফলার মত তীক্ষ্ণ এক-জোড়া চোখ। লোকটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে ছিল।

ঘরের মধ্যে শার্পেনের শুধু ভয় পায় নি। হেসে উঠে বলল,

—সংটাকে সরে যেতে বলবো?

আগন্তুক জানালা থেকে সরে যায় কিন্তু একটু পরেই তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখল ওরা। শার্পেনের রেগে দাঁড়িয়ে উঠে লোকটাকে বেরিয়ে যেতে বলবার উপক্রম করতেই রেচ লোকটার সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

—ক্ষমা করবেন, আপনাকে দূর থেকে চিনতে পারিনি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবেন না?

রেচ অল্প মাতাল হয়েছিল। আলাপ করাতে গিয়ে আগন্তুকের নামটাই বলতে একদম ভুলে গেল।

—কিন্তু আলাপের পর আরেকটা কথাও কেউ বলল না। ঘরের লোকগুলো যেমন চুরুট টেনে যাচ্ছিল, মদ খেয়ে যাচ্ছিল অবিকল তেমনিই চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে লাউশের চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

—আমি যাচ্ছি! কেউ বিলিয়ার্ড খেলবে?

কেউ উত্তর দিল না।

আগন্তুক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনি যদি চান, আমি খেলবো। আমরা 'ভালফিশে' যেতে পারি। আমি ওদিক দিয়েই এলাম, বিলিয়ার্ড টেবিলটা দেখলাম ফাঁকাই আছে।

ওরা চারজনই আগন্তুকের প্রস্তাবে রাজী হল। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাড়ের ভেতরটাও কাঁপছে ওদের। কর্ণহাউস স্ট্রীটটা একেবারে কাদার সমুদ্র। কোনো রকমে পা টেনে টেনে ওরা পাঁচজন 'ভালফিশ'এ পেঁছল। রেচ সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে যেতে থাকে। একটা গ্যাস-লাইটের নীচে এসে এবের ভদ্রলোককে থামায়।

—যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব।

—বলুন।

—রেচ আপনার সম্বন্ধে আগেই বলেছে আমাদের। আপনি নিশ্চয়ই কোনো সমিতির এজেন্ট।

—হুঁ। কেমন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে আসে দীর্ঘকান্তি আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে।

—দেখুন। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

—নিশ্চয়ই। শুনে সুখী হলাম। আমি মাত্র আজকের দিনটাই এখানে থাকবো। আপনার বন্ধু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কালকে অনেক খবর জানাতে পারবেন। আমি প্রতিটি ষাণ্মাসিক টার্মিনালেই টুবিঙ্গেনে আসি।

আর একটাও কথা বলল না কেউ। ধোঁয়ায় ভরা কাফের মধ্যে ঢুকল তারা।

রেচ আগেই ঢুকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। লাউংশের বিলিয়ার্ড স্টিকে চখ ঘষছে। দুজনে খেলতে আরম্ভ করল। ভদ্রলোক অসাধারণ ভালো খেলেন।

—আপনি সত্যি ভাল খেলেন। একটু চর্চা করলে অসাধারণ খেলতে পারবেন আপনি। ভদ্রলোক বল্লেন লাউশেরকে। লাউশের কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল। আগন্তুক অবিশ্বাস্য রকমে কিউ বলটাকে টেবিলের মধ্যে ঘোরাচ্ছিলেন। খেলা শেষ হবার পর অন্য বন্ধুদের টেবিলে এল ওরা দুজন। এবের আর লাউশের কফি খেতে আরম্ভ করল, অন্যরা শেরী এবং শ্যাম্পেন-এর অর্ডার দিয়েছিল। একটি যুবতী মেয়ের সংগে আলাপ হল ওদের। মেয়েটির নাম মলি। ছোট্টখাট্টো দেখতে, শরীরের তীক্ষ্ণ রেখায় মেয়েটি বেশ আকর্ষণীয়। ওদের সংগে শেরী খেতে খেতে মলি বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল রেচের সংগে। রেচ তখনো সোফায়। ওর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে লাউশেরকে প্রশ্ন করলেন আগন্তুক :

—ওকে আপনার কি মনে হয় বলুন ত?

—রেচ? ও একটা শুকরছানা, কিন্তু মনটা ভালো ওর।

—আর আপনার ওই বন্ধুটি? এবার শার্পেনেরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন আগন্তুক।

—একেবারে বোকা নয়। ব্যক্তিত্বহীনও নয়। ও আমাদের বীর অসিযোদ্ধা। কিন্তু ও বোঝে না বন্ধুপ্রীতির আধিক্যই ওর পক্ষে কাল হবে। লাউশের মৃদু কন্ঠে বলল।

—আর ওই তৃতীয় জন?

—কে এবের? তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এবেরের ব্যক্তিত্বের কিছুটা অভাব আছে। ভেতরের নৈরাশ্যকে ও ভীষণ ভয় পায়।

—আপনি কিন্তু আপনার বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে সুন্দর মতামত দিতে পারেন।

—কেন পারবো না। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করি। আমাদের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যও অসমান।

—আমি কিন্তু আপনাকে পছন্দ করি।

—সত্যি?

লাউশের দাঁড়িয়ে উঠে এবেরকে ডাকে।

—চল আমরা চাই।

আগন্তুক ওদের একটা অদ্ভুত বিচ্ছিরি হাসি দিয়ে বিদায় জানালেন। ল্যাবরে শারপেনের ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। রেচ আর মলি নরম সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে শুধু নিজেদের মধ্যেই মত্ত। এবের এবং লাউশের সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে জনশূন্য অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। 'লুয়েন' বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনো পানশালায় ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না ওদের। ঘড়িতে তিনটের ঘন্টা বাজল।

—চলো বাড়ি যাওয়া যাক্। হাঁটতে হাঁটতে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবের। লাউশের মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে তাকিয়ে নেয় একবার।

—আমি যাবো না। সবাই যেন মরে হেজে গ্যাছে। লোকগুলো সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমোচ্ছে কি করে?

—এসো এসো আমরাও তাই করি।

—ঘুম? না! কবি লাউশের বন্ধুর বড় বড় মাতাল চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

—এবের এখন নিশ্চয়ই তোমারও 'পৃথিবী রসাতলে যাক' বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে?

—তাতে কিছু এসে যায় না। চলো আমরা বরং 'সোয়াংর্সভান্ডের'এ যাই।

—একই কথা আমার পক্ষে। বেশ চল।

ওরা দুজন পানশালায় ঢুকে 'গিলকা'র অর্ডার দিল। এবের ক্রমশঃই যেন ওর বন্ধুর প্রভাবে মনমরা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ, অতৃপ্ত এবং অর্ধমৃত দৃষ্টি দিয়ে তারা দুজনে নিজেদের চুরুট আর ধোঁয়াভর্তি ঘরটাকে নিরর্থক দেখছিল। রাত-প্যাঁচার মতন তিনজন কিম্ভূত লোক কফি-টেবিলের ওপর ঘুঁটি খেলছে। কাফের পরিচারিকা একপাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। একটা মাছি গ্যাস-পাইপ বেয়ে ক্রমাগত হামাগুড়ি দিচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তেই গ্যাসের আগুনের মধ্যে পড়ে যেতে পারে মাছিটা। কাঁচের শার্সিতে তখনও প্রবল বৃষ্টির বাজনা।

—আমাদের কিন্তু এতটা ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত না। এক ঘন্টা নীরবতার পর বলল এবের। গিলকার গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করল কথাটা বলে। খাওয়া শেষ করে আবার ওরা বেরোল। এবার জডেন এ্যালির উৎরাই ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। 'ভালফিশ' কাফের ধার দিয়ে যাবার সময় দেখল দোকানের লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করছে। পুরোনো এ্যামার ব্রীজ-এর কাছে এসে দাঁড়ায় দুজনে।

—বাঁদিকে যাওয়া যাক। এবের প্রস্তাব করে।

—ব্রীজের ওপর দিয়ে গেলেই সবচেয়ে কম দূর পড়বে। লাউশেরের কর্কশ গলায় এবের মিইয়ে আসে কেমন যেন।

সেতুর এপারে আসতেই ঘাটের কাছে কাকে যেন পড়ে থাকতে দেখা গেল। নদীর ঘাটের সিঁড়িতে মাথা রেখে লোকটা শুয়ে আছে। লোকটার বেপরোয়া শোয়ার ভঙ্গী দেখে এবের হেসে ওঠে।

—বাঃ বেড়ে ঘুমোচ্ছে ত!

—বোধ হয় নামী ক্লাব থেকে দামী মাল টেনে ফিরছিল। কালকে ঘুম ভাংগলে এই হট্টমন্দিরের শয়ন ওকে অবাক করে দেবে খুব।

হঠাৎ লোকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবের,

—হে ভগবান, এ ত রেচ। সারা ইয়োরোপে একমাত্র রেচ ছাড়া কেউ এই ধরনের ড্রেস-কোট পরে না!

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে তারা শায়িত মূর্তিটার কাছে নেমে গেল। সিঁড়ির ওপর মুখ দিয়ে পড়ে ছিল রেচ। ওকে ধরে তুলল দুজনে মিলে। রেচের সমস্ত মুখময় শুকনো কালো রক্ত।

—ইস্ খুব বিশ্রীভাবে পড়ে গেছে বেচারী। এবের কথাটা শেষ হতেই সিঁড়িতে একটা কিছুর পড়ার শব্দ শোনা গেল। রেচের শক্ত মুঠি থেকে ঠান্ডা পিস্তলটাই পড়েছে শানবাঁধানো ঘাটে। এবং ঠিক তখনই রেচের ডান কপালে গুলীর কালো দাগটাকে দুজনেই দেখতে পেল একসংগে।

লাউশের দেশলাই জ্বালায়।

—তুমি এখানে থাকো লাউশের, আমি পুলিশ ডেকে আনি। কোনো রকমে কথা বলে এবের।

—না, আমাকেই সব কিছু করতে দাও। হঠাৎ কোত্থেকে একটা তীক্ষ্ণস্বর ভেসে আসে। ওরা চমকে তাকিয়ে দেখল সেই দীর্ঘকান্তি শীর্ণ আগন্তুক, যিনি প্রতি ষান্মাসিক পরীক্ষার পর টুবিংগেনে আসেন, সিঁড়ি দিয়ে যেন নদী থেকেই উঠে আসছেন। কাছে এসে তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে যেন দুই বন্ধুকে কুর্ণিশ করলেন। একটা অদ্ভুত হিংস্র হাসলেন। বরফের মতন শীতল দুই চোখে তাকিয়ে রইলেন টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হতভম্ব দুজন ছাত্রের দিকে। ওদের সমস্ত মেরুদন্ড যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেল। দুজনেই সেই দুর্ধর্ষ রাত্রির মধ্যে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করে।

পরদিন লাউশেরের গৃহকর্ত্রী লাউশেরকে ঘুম থেকে তুলে ওর টেবিলে গরম কফির কাপটা রাখতে রাখতে বললেন

—কালকে একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে মিঃ লাউশের। শোচনীয় ব্যাপার। একজন ছাত্র এ্যামার নদীর ঘাটে আত্মহত্যা করেছে।

অনুবাদ : বিজয় রায়চৌধুরী

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়

চীনা সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থতা দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে। শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রথমে স্বহস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদায়ী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ৭ই নভেম্বর মন্ত্রিসভা হ'তে সম্পূর্ণ বিদায় নেন।

কিন্তু আপৎকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রতিরক্ষা দপ্তরের গুরু-দায়িত্ব বহন কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই রাষ্ট্রপতির আহ্বানে শ্রীযশোবন্ত রাও চাবন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে ১৪ই নভেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন শ্রী কে রঘুরামাইয়া। শ্রীকৃষ্ণমাচারী হলেন অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। মন্ত্রিসভার এই রদবদল সংসদ ও দেশবাসীর অনুমোদন ও পূর্ণ সমর্থন লাভ করল।

ইতিমধ্যে ৭ই নভেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরুকে আরও একটি শর্ত-সম্বলিত পত্র লেখেন। তাতে লদাক সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না এবং পূর্ব সীমান্তে ম্যাকমেহন লাইন বরাবর যুদ্ধবিরতি সীমারেখার যে প্রস্তাব করা হয় তাও ছিল শঠতাপূর্ণ। পত্রে ম্যাকমেহন লাইনের যে নূতন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি তা মেনে নিলে ভারতকে চীনের পূর্ব দাবীমত প্রায় সাড়ে চার হাজার বর্গমাইল স্থান ছেড়ে দিতে হ'ত। তাই প্রধানমন্ত্রী সেই তথাকথিত শান্তি প্রস্তাব পূর্বের মতই প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ভারত চীনের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসবে না।

৮ই নভেম্বর সংসদের জরুরী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, চীনা সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের ফলে ভারত যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তা গ্রহণ করতে ভারত পশ্চাৎপদ হবে না। ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম চীনকে সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করলেন এবং চীনা হানাদারদের বিতাড়নের কঠোর সঙ্কল্প প্রকাশ করে বললেন, পরিণাম যাই হোক, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারত কখনই হানাদারদের কাছে নতি স্বীকার করবে না।—সংসদের সকল দলের সদস্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, সারা দেশ আজ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশাধীন। যতদিন না মাতৃভূমি শত্রুকবলমুক্ত হবে ততদিন সমগ্র জাতি একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করবে শত্রুর বিরুদ্ধে।

চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসাকল্পে আরব নেতা প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতা ২রা নভেম্বর সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। সে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল চীনের অনমনীয়তা। নাসের প্রস্তাবিত চার দফা মীমাংসাসূত্র চীন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। কিন্তু ৯ই নভেম্বর মীমাংসা প্রয়াসে নাসেরের নূতন উদ্যমের কথা শোনা গেল। ভারত-চীন বিরোধের ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারে না—এই চিন্তাই ছিল নাসেরের নূতন উদ্যমের অনুপ্রেরণা। কিন্তু তিনি যে তাঁর পূর্ব মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি তা ঐ দিনের 'অল আহরাম' পত্রিকার সম্পাদকীয় হতেই সুস্পষ্ট হল। 'অল আহরাম' পত্রিকা রাষ্ট্রপতি নাসেরের মুখপত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

'অল আহরামের' সম্পাদকীয়তে বলা হল, যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় উভয় পক্ষ না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হ'তে পারে না। এই মন্তব্যের পরেই সম্পাদকীয়তে বলা হল, এই প্রস্তাব ভারতের দাবীর প্রতিধ্বনি বলে মনে হলেও এই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত।

ঐ দিন রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ভারতের প্রথম পর্যায়ের ব্যর্থতার জন্য তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অপ্রস্তুতি কতখানি দায়ী ছিল তা পরে অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

অপরাহ্নে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানালেন, ভারতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং মাসখানেকের মধ্যেই ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র রণাঙ্গনে পাঠানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বললেন চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে সকল রাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করছে, ভারত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১০ই নভেম্বর লোকসভায় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের অজুহাতে কেউ যাতে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বাড়াতে না পারে তার জন্য সরকার দেশব্যাপী সমবায় বিপণি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র ও ঔষধের দাম যাতে বৃদ্ধি না পায় সরকার সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

ঐ দিন নেফা রণাঙ্গন হতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ওয়ালঙের কাছে চীনাদের কয়েক দফা প্রচণ্ড আক্রমণ আমাদের বীর জওয়ানরা ব্যর্থ করেছেন। লদাক সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী তুঙ্কু আবদুল রহমান ১০ই নভেম্বর কুয়ালালামপুর হ'তে এক বেতার ঘোষণায় ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে এশিয়ার সব গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। ভারতকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে মালয়ের প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' তহবিল গঠনের কথাও ঐ বেতার ভাষণে প্রচারিত হল।

১১ই নভেম্বর দিল্লীর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, গত তিন সপ্তাহে ভারতে সমরোপকরণ উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মিটাতে অস্ত্রনির্মাণ-কারখানাগুলিতে দিন-রাত্রি কাজ চলছে। উভয় রণাঙ্গনই ঐ দিন প্রায় সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকে।

১২ই নভেম্বর নেফা এলাকায় চীনাদের তিনটি আক্রমণ প্রতিহত হয়। লদাকের অবস্থা আগের মতই অস্বস্তিকরভাবে শান্ত থাকে।

১৩ই নভেম্বর সিকিমে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উভয় রণাঙ্গনই শান্ত থাকে। "নেফা ও লদাকে আমাদের সৈন্যরা সক্রিয়ভাবে টহল দিতেছে, কিন্তু গতকাল ঐ দুই এলাকায় কোন সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই"—প্রতিরক্ষা দপ্তর হতে ঐ দিন শুধু এই কটি কথাই জানানো হয়।

১৪ই নভেম্বরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না, উভয় রণাঙ্গনেই অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করে। ঐ দিন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দানস্বরূপ নগদ একশ লক্ষাধিক টাকা ৫.৩২৭ গ্রাম সোনা উপহার পান। সহস্রাধিক পাউণ্ডের কয়েকটি চেকও তাঁকে সেদিন উপহার দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের জনসাধারণ ঐ দিন প্রধানমন্ত্রীকে ১,৩০,০০০ গ্রাম স্বর্ণ উপহার দেন।

১৫ই নভেম্বর নেফায় ভারতীয় সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। নেফায় লোহিত বিভাগে ওয়ালঙ থেকে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে চীনা-

সৈন্য বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত জেনারেল জে, এন, চৌধুরী সামরিক বাহিনীর সদর কার্যালয় থেকে বাইরে আসছেন।

কবলিত একটি এলাকায় আমাদের সৈন্যরা অভিযান চালায়।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল ঐ কংগ্রেস সংসদীয় দলের এক সাব-কমিটির বৈঠকে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জরুরী প্রয়োজনে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টন গম ও ২০ হাজার টন চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রায় সপ্তাহকাল যুদ্ধের যে অবস্থা ছিল তাতে মনে হয়েছিল, ভারত অতর্কিত আক্রমণের প্রাথমিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলিয়ে নিতে পেরেছে। চীনাদের আর অগ্রগমন সম্ভব হবে না এবং ভারতীয় সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণে তাদের অবিলম্বে পশ্চাদপসরণ শুরু হবে।

কিন্তু ১৬ই নভেম্বর আবার চীনাদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হল। প্রত্যুষে নেফা সীমান্তের ওয়ালঙ অঞ্চলের একাধিক ঘাঁটির উপর অর্ধবৃত্তাকারে চীনা সৈন্যদল প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করল। ২০শে অক্টোবরের পর ঐ দিনই ছিল চীনা সৈন্যদের বৃহত্তম আক্রমণ। নেফার চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু রণাঙ্গনে তখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে এসেছিল। এ অবস্থায় চীনের এই দুর্বার আক্রমণ শুরু হওয়ায় বোঝা গেল, প্রচণ্ড শীতেও যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের সম্ভাবনা কম। লদাকের অবস্থা ঐ দিনও শান্ত ছিল।

১৮ই নভেম্বর নেফা সীমান্তে যুদ্ধ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের ব্যাপক আক্রমণে ওয়ালঙ ভারতীয় সৈন্যদের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।

ঐ দিনই চীনা রেডক্রসের মাধ্যমে ভারতীয় রেডক্রস মারফৎ জানা গেল যে, ২০শে অক্টোবরের পর হতে ১৭ই

নেফার একটি পুরোবর্তী এলাকায় মাটির বাঁধের আড়ালে ভারতীয় জওয়ান।

নেফায় একটি পুরোবর্তী এলাকায় টহলরত ভারতীয় জওয়ানদল।

নভেম্বর পর্যন্ত চীন-ভারত যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার ডালভিসহ মোট ৯২৭ জন ভারতীয় সৈন্য চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

সরকারের পক্ষ হতেও ১৮ই নভেম্বর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হল, ২০শে অক্টোবর হতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যের নিহত ও নিখোঁজ সংখ্যা ১৬২৩, তার মধ্যে ২৬৪ জনের মৃত্যুসংবাদ সুনিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে। নিখোঁজদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং বহু নিখোঁজ সৈন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরিত্যক্ত রণাঙ্গন হতে ফিরে আসছে। সাতাশ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য আহত হয়েছে মাত্র ১৫৫ জন। নিখোঁজদের মধ্যেও হয়ত কিছু আহত থাকতে পারে।

প্রায় এক মাস ধরে প্রতি দিনই 'প্রচন্ড' যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। বন্যার স্রোতের মত দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসা বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের ভারী সমরাস্ত্রের প্রবল আক্রমণে একান্ত নিরুপায় হয়ে একটির পর একটি ঘাঁটি ছেড়ে পিছু হঠে এসেছে ভারতীয় বীর সৈনিকরা—এই সংবাদই প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে পাঠ করেছে দেশের লোক। অক্টোবরের শেষেই ভারত সরকার জানিয়েছিলেন, প্রথম দশ দিনের যুদ্ধে দুই থেকে আড়াই হাজার ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত হয়েছেন। তা থেকে দেশবাসীর ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী এক পক্ষকালের প্রচণ্ড সংগ্রামে আরও কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য হয়ত রণক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। সে অবস্থায় ব্রহ্ম সীমান্তের নিকটবর্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়ালঙ শহর ও তৎনিকট-বর্তী বিমানক্ষেত্র পরিত্যাগের পূর্বে ভারত সরকার জানালেন, যুদ্ধের প্রথম থেকে ওয়ালঙ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সীমান্তের উভয় রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে মাত্র ২৬৪ জন ও আহত ১৫৫ জন। পূর্বে যে দুই হতে আড়াই হাজার ভারতীয় সৈন্য হতাহত হওয়ার কথা প্রচারিত হয়েছিল তাও ঠিক নয় বলে সরকারীভাবে জানানো হল।

১৯শে নভেম্বরের সংবাদপত্রে দেশ-বাসী জানল, ওয়ালঙ পরিত্যক্ত হয়েছে। নেফার পশ্চিম সীমান্তে জঙ অঞ্চলে সেলা গিরিপথেও চীনা সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের সৈন্যবাহিনী কাহিল হয়ে পড়েছে।

নেফা সীমান্তে চীনাদের প্রায় তিন সপ্তাহ চুপ থাকার অর্থ বোঝা গেল। আসলে সে স্তব্ধতা ছিল পরবর্তী আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতি। জানা গেল ইতিমধ্যে তিব্বতে তারা প্রায় ১৫।১৬ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। সড়কনির্মাণকারী শ্রমিক বাহিনীসহ ভারত সীমান্তে চীনা হানাদারদের মোট সংখ্যা তখন তিন লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বিশ হাজার।

লদাকেও চুশুল এলাকায় আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর চীনা সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ শুরু হয়।

১৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু আবার জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বললেন, সীমান্ত রণাঙ্গনে জওয়ানদের সাময়িক বিপর্যয়ে দেশের কোন মানুষ যেন বিচলিত না হন। শত্রুর প্রত্যেকটি আঘাত যেন আমাদের শক্তিসঞ্চয়ের সহায় হয়। আক্রমণকারীদের কবল হতে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি বিপর্যয় যেন আমাদের সংকল্প বৃদ্ধি করে।

পরদিন বমডিলা পতনের সংবাদ প্রকাশিত হল। ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, বমডিলা চীনাদের কুক্ষিগত হয়েছে। বমডিলা কামেং সীমান্ত ডিভিশনের সদর কার্যালয়। সেখানকার দু' হাজার অসামরিক অধিবাসীকে পূর্বেই স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঐ দিন আরও জানা গেল যে, বমডিলা পতনের আগে সেলা গিরিবর্ত্মও চীনা হানাদারদের কুক্ষিগত হয়েছে। মাত্র ক' দিনের মধ্যে চীনারা বুমলা থেকে তাওয়াঙ পর্যন্ত একটি রাস্তাও তৈরী করে ফেলেছে বলে জানা গেল।

লদাকের চুশুল রণাঙ্গন হতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, চুশুল বিমানক্ষেত্রের উপর শত্রুর অবিরত আক্রমণ তখনও বন্ধ হয়নি। তবে তার ফলে বিমানক্ষেত্রটি একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি বা চুশুল এখনও শত্রুকবলিত হয়নি।

২০শে নভেম্বর লদাক ও নেফা উভয় অঞ্চলেই চীনা হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যাহত ছিল। সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছিল বমডিলার কয়েক মাইল দক্ষিণে ও বর্মা সীমান্তে ওয়ালঙের ১২।১৪ মাইল দক্ষিণে। অর্থাৎ পর্বতের ব্যবধান অতিক্রম করে আমাদের সমতল অঞ্চলের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে চীনাবাহিনী। ঐ দিনই আসামের সমতল অঞ্চলের প্রধান শহর তেজপুরের অসামরিক অধিবাসীদের শহরত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

যুদ্ধে একটানা বিপর্যয়ের কারণ যে শুধু চীনাদের উন্নততর রণকৌশল বা বিপুল সংখ্যাধিক্যই নয় তা বোধ হয় আমাদের কর্ণধারেরা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই সৈন্যদের মনোবল ও সেই সঙ্গে জাতির আত্মবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০শে নভেম্বর জেনারেল থাপারের স্থানে লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতের স্থল-সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর এই নতুন নিয়োগের ঘোষণা বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা সম্বর্ধিত হয়। বহু সংগ্রামের বীর নায়ক লেঃ জেঃ চৌধুরী জাতির এই চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে যোগ্যতম নায়ক, সকলেই এক বাক্যে একথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু ২০শে নভেম্বর রাত্রে (ইংরেজি মতে ২১শে নভেম্বর) কমিউনিস্ট চীন সরকার এক অতর্কিত ঘোষণার দ্বারা বিশ্বকে হতবাক করে দিলেন। বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাঁরা জানালেন, ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হতে তাঁরা সমগ্র ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ করবেন। ১৯৬২ সালের ১লা ডিসেম্বর হতে তাদের সৈন্যবাহিনী পিছু হটে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর চীন ও ভারতের প্রকৃত দখলে যে সীমারেখা ছিল তারও ২০ কিলোমিটার (১২½ মাইল) পিছনে চলে যাবে। ঐ বিবৃতিতে চীন সরকার আরও বলেন যে, সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসাকল্পে গত ২৪শে অক্টোবর তাঁরা যে তিন দফা প্রস্তাব ভারতকে দিয়েছিলেন, এবং যা ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেই কার্যকরী করার জন্য চীন সরকার একাই যুদ্ধ-বিরতি ও পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চীনা সরকারের এই অভাবিত প্রস্তাব বিশ্বের সকল কূটনৈতিক মহলকেই বিস্মিত করে। কারণ যে সরকার সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের মত শান্তিকামী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর অতর্কিত আঘাত হেনেছে এবং যার কার্যক্রমের ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তার পক্ষ হতেই হঠাৎ এই চৈতন্যোদয় ও শান্তির আগ্রহ প্রকাশ কারও পক্ষেই নেওয়া সহজ হয় না। ঐ দিনই বিশ্বের বিভিন্ন কূটনৈতিক মহল হতে বলা হয় যে, চীনের এই শান্তির আগ্রহ নিছক ধাপ্পা। এটা চীনাদের স্বভাবজাত চতুরতারই আর এক রূপ। ২১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদে ঘোষণা করেন যে, চীনাদের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালভাবে না জানা পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাব যে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় তা চীনকে বহু পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে মীমাংসার দাবী অর্থহীন। চীন যতক্ষণ না ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে ততক্ষণ তার সঙ্গে কোন আলোচনা হবে না।

তবে ২২শে নভেম্বরের সংবাদে জানা যায় যে, চীন সত্যই সীমান্তে সংগ্রাম বন্ধ করেছে। চীনা সৈন্যরা তখন নেফায় ফুটহিলসের কাছে ও লদাকে চুশুলের উপকণ্ঠে। কিন্তু ২২শে নভেম্বরের মধ্যরাত্রি হতে কোথাও আর তারা গুলী চালায়নি।

চীন সরকারের সাম্প্রতিক আচরণ এমনই নিন্দনীয় যে, হঠাৎ তার কোন কথাই সত্য বা আন্তরিক বলে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। একথা ভারত বা তার মিত্রদের পক্ষে মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, চীন প্রথম পর্যায়ে আক্রমণের পর যেমন কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ শেষ হওয়ার পর আবার সে ঠিক তেমনি কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে। কারণ রণাঙ্গন এখন খুবই বিস্তৃত ও সীমান্তের প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে এখন যুদ্ধচালনাও খুবই কষ্টকর। সরবরাহ কেন্দ্রও তাদের এখন অনেক দূর হয়ে গেছে, সুতরাং এই অবকাশে তারা হয়ত সদ্য অধিকৃত এলাকা বা নিকট অঞ্চলে তাদের নতুন সরবরাহ ঘাঁটি গড়ে তুলতে চায়। আর সেই সঙ্গে যদি তারা হঠাৎ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত প্রচার করে তবে তা ভারতের দ্রুত সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসকেও বেশ কিছুটা শিথিল করবে। যুদ্ধ-বিরতির আনন্দে ভারত যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সেই সময় আবার শুরু হবে বিশ্বাসঘাতক চীনের কঠিন আক্রমণ। সুতরাং শুধুমাত্র চীনের হঠাৎ একতরফা ঘোষণাতেই ভারত যে তার যুদ্ধপ্রয়াস শিথিল করেনি বা চীনকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানায়নি, সেটা ভারতের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ভারত আজ কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন, এ অবস্থায় মুহূর্তের বিভ্রান্তি বা শৈথিল্য হয়ত সমগ্র জাতির সমূহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। একারণে ভারত সরকার বা ভারতের জনগণ কারও একথা মনে করে হাত গুটানোর উপায় নেই যে, বিপদ কেটে গেছে। বর্তমান নিস্তব্ধতাকে শত্রুর আরও ব্যাপক আক্রমণের প্রাক্-প্রস্তুতি মনে করেই আমাদের প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দিক থেকে কিছুই করণীয় নেই। সদিচ্ছার পরিচয় যদি কাউকে নতুন করে দিতে হয় তবে তা আক্রমণকারী চীনকেই দিতে হবে, আক্রান্ত ভারতকে নয়। চীনের যদি সত্যই শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে তবে তাকে পরে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মত ও নীতির পরিবর্তন হয়েছে ধরে নিয়ে আমরা যেন আমাদের কঠিন কর্তব্য পালনে বিরত না হই।

॥ পরমাণুর জনক নীল বোর ॥

দেশের অস্থির পরিস্থিতির দরুণ নীল বোর-এর মৃত্যু-সংবাদ হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা হলে আমরা নিশ্চয়ই এই উপলক্ষে নীল বোরের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তুলতাম। তার ফল ভালোই হত, কারণ নীল বোরকে জানা মানেই আজকের এই যুগটিকে জানা।

নীল বোরকে বলা হয় 'ফাদার অব দি অ্যাটম'—পরমাণুর জনক। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ পরমাণু, তারই একটি মডেল খাড়া করেছিলেন তিনি। এই মডেলটি পরবর্তীকালে বিশ্বকে এক নতুন যুগে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল, যে যুগটিকে বলা হয় পারমাণবিক। এই বিচারে তিনি অবশ্যই যুগস্রষ্টা।

তাঁর জীবনও কম ঘটনাবহুল নয়। সংগ্রামে ও সাধনায় উজ্জ্বল এই জীবনটি অনায়াসেই একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হতে পারে। নিজের দেশের এবং সারা বিশ্বের মানুষদের মনে তিনি যে বিরল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তা এমন কি এই বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সহজলভ্য নয়।

আর ডেনমার্কের মানুষ তাঁদের দেশের এই মহান বিজ্ঞানীকে নিয়ে যতোখানি গর্ববোধ করে, তার বোধহয় কোনো তুলনা নেই। ছোট একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। একজন মার্কিন ভদ্রমহিলা কোপেনহাগেনের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে স্থানীয় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, তাঁর স্বামী কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার সংস্থায় অধ্যয়ন করেন। কথাটা শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালেন। বলা বাহুল্য, এই অভিবাদন মার্কিন ভদ্রমহিলার স্বামীর উদ্দেশ্যে নয়, কোপেনহাগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা সংস্থার অধ্যক্ষ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী নীল বোরের উদ্দেশ্যে।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে নীল বোর ভারতে এসেছিলেন। সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতাতেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে-ছিলেন। বিজ্ঞানী ও ছাত্রমহলে যে সমস্ত

অমলকান্ত

যে উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এই দুজনের শহর কলকাতার পক্ষেও একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা।

১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে কোপেনহাগেন শহরে নীল বোরের জন্ম। তাঁর বাবাও ছিলেন কোপেনহাগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর পড়াশুনা। তবে তিনি যে শুধু কৃতী ছাত্র ছিলেন তাই
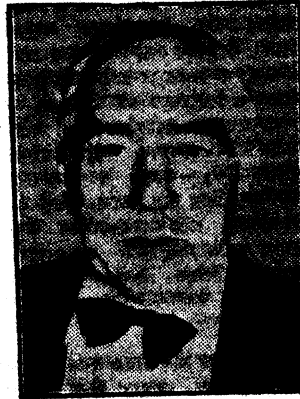
প্রফেসার নীল বোর

নয়, কৃতী খেলোয়াড়ও। বিশেষ করে ফুটবলে তাঁর নামডাক সারা ডেনমার্কে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডেনমার্কের জাতীয় টিম তাঁকে বাদ দিয়ে গঠিত হতে পারত না। পরবর্তী জীবনে প্রায় ষাট বছর বয়সেও তিনি স্কি-প্রতিযোগিতায় জয়-লাভ করেছিলেন। সাইকেল ও নৌকো—দুটি খেলের চালনাতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি সারফেস টেনশন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্যে ডেনমার্ক বিজ্ঞান পরিষদের স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি। তারপরে তিনি গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরে-টরিতে। সেখানে তিনি গবেষণা করেছিলেন তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ইলেকট্রনের জনক জে জে টমসনের পরিচালনায়। তাঁর সহযোগী ছিলেন স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। পরবর্তী কালে এই দুজন বিজ্ঞানীর বন্ধুত্ব সারা জীবনব্যাপী অটুট ছিল।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল পারমাণবিক গঠন সম্পর্কিত নীল বোরের মৌল তত্ত্বটি। এই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে অনেক পরিমাণে পরিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু নীল বোরের মূল কাঠামোটিতে বিশেষ রদ-বদল হয়নি। এই কাঠামো থেকে অগ্রসর হয়েই শেষ পর্যন্ত পার-মাণবিক তেজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

সকলেই জানেন, যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপকে বলা হয় পরমাণু। ১৮০৮ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডালটন সর্বপ্রথম পরমাণুর ধারণাকে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। তখন থেকে প্রায় একশো বছর ধরে ধারণা ছিল যে পরমাণু অবিভাজ্য, পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তার-পরে ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন যে, পরমাণুই পদার্থের শেষ কথা নয়। পমাণুরও উপাদান আছে, আছে বিশেষ একটি কাঠামো। আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে এই উপাদান ও কাঠামো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক।

পেঙ্গুইন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভি-ধানে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা এই: 'পরমাণুর মধ্যে আছে একটি পজিটিভ চার্জযুক্ত কেন্দ্রীয় বস্তি (কোর) যার নাম নিউ-ক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন এবং এই কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে ঘূর্ণ্যমান নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন।' কাঠামোটিকে তুলনা করা চলে একটি ক্ষুদে সৌরজগতের সৌরমণ্ডলের সঙ্গে। সূর্য হচ্ছে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস আর গ্রহ হচ্ছে ইলেকট্রন। বিভিন্ন গ্রহের সূর্য-প্রদক্ষিণের মতো এক্ষেত্রেও বিভিন্ন ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াস-প্রদক্ষিণ।

ডালটনের অবিভাজ্য পরমাণুকে যে শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনে ভাগকে স্বীকার তার অন্যতম কারণ ছিল ইউরেনিয়াম-থোরিয়ামের ও রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ও তজ্জনিত আলফা বিটা ও গামা রশ্মিকে ব্যাখ্যা করার

প্রয়োজনীয়তা। পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরে নিলে এই তেজস্ক্রিয়তাকে বা রশ্মিকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা চলে না।

এই ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল রাদারফোর্ডের পরমাণুর সাহায্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এই ব্যাখ্যাটিও পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটি অসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সকলেই জানেন, কোনো গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি হলে সেই গ্যাসটি জ্বলতে শুরু করে। যেমন, নিওন গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পাওয়া যায় কমলা-লাল রঙের অতি সুন্দর আলো। তেমনি প্রত্যেকটি গ্যাসেরই নিজস্ব একটি আলো আছে। বিজ্ঞানীরা এই বিদ্যুৎপ্রবাহজনিত আলোকে বিশ্লেষণ করেই গ্যাসটিকে সনাক্ত করতে পারেন।

কেন এক-একটি বিশেষ গ্যাস থেকে এক-একটি বিশেষ ধরণের আলো নিঃসরিত হয় তার ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল রাদারফোর্ডের পরমাণু এই ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া গিয়েছিল রাদারফোর্ডের তত্ত্বের দু-বছর পরে প্রকাশিত নীল বোরের তত্ত্ব থেকে। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, উপাদান ও কাঠামোর দিক থেকে রাদারফোর্ডের পরমাণু নির্ভুল; কিন্তু ইলেকট্রন-কক্ষের অঙ্ক-গণনায় প্রাচীন গণিত বাতিল করে আশ্রয় নিতে হবে প্লাঙ্ক-উদ্ভাবিত নব্য-গণিতের—কোয়ান্টামের।

'কোয়ান্টাম' শব্দটি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু এই শব্দটির ব্যাখ্যা দরকার। এই ব্যাখ্যা দেবার জন্যে আমি শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি।

"কোয়ান্টাম বিধির তাৎপর্য হল তাপ-বিকীরণ শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন না মনে করে তাকে গণ্য করা উচিত কণাসমষ্টি-রূপে। এই সিদ্ধান্তে প্লাঙ্ক উপনীত হন ১৯০০ অব্দে তাপ বিকীরণের একটা বিসদৃশতার সূত্র-সন্ধানে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে হিসাবের বিসদৃশতার মীমাংসার জন্য ইতিপূর্বে লর্ড রেলে, উইন, বোলজম্যান প্রভৃতি এক-একটি মীমাংসা দাখিল করেন। তন্মধ্যে বোলজম্যানের সূত্রই হয়েছিল সমীচীন। এই সূত্রের সমর্থন-সন্ধানে প্লাঙ্ক এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিকীরণের শক্তি আসলে শক্তি-কণার সমষ্টি। একটা সহজ সূত্রও তিনি আবিষ্কার করেন, সে হল বিকীরণের স্পন্দন বা তরঙ্গ-সংখ্যাকে একটা অভিন্ন অঙ্ক—যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্লাঙ্কাঙ্ক'—দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে তার শক্তি-মাত্রা। শক্তিকে কণারূপে গণ্য করা সে সময়ের পক্ষে এমনই অর্বাচীন ছিল যে স্বয়ং প্লাঙ্ক তাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। অবশেষে একে সংশয়মুক্ত করে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করলেন পাঁচ বছর পরে, ১৯০৫ অব্দে, আইনস্টাইন। তিনি আলোকপাতে ধাতুপাত্র থেকে ইলেকট্রন মোচন হওয়ার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যায় প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম-তত্ত্ব প্রয়োগ করেন ও সেই থেকে এই অভিনব তত্ত্ব বিজ্ঞানজগতের স্বীকৃতি লাভ করে। আইনস্টাইন বলেন, আলোকরশ্মিও কণিকাসমষ্টি; —তারও তরঙ্গ-সংখ্যাকে প্লাঙ্কাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় সে রশ্মির শক্তি-মাত্রা। এতদিন ঈথর তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ বলেই আলোক বিদিত ছিল, এখন সন্ধান পাওয়া গেল আলোক-অণুর; তার নাম হল 'ফোটন'।"

এই ব্যাখ্যা যদি কারও কাছে অস্পষ্ট মনে হয়ে থাকে তাহলে আমি তাঁকে অনুরোধ করব লিঙ্কন বার্ণেট-এর লেখা 'দি ইউনিভার্স অ্যান্ড ডঃ আইনস্টাইন' বইটি পড়তে। বইটি পকেটবুক সংস্করণেও পাওয়া যায়।

১৯২২ সালে নীল বোর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ; নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু নিজের দেশে তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অনেক আগে থেকেই উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার সংস্থার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়ার মহিলা বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার ও তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশ কোপেনহাগেন নীল বোরের গবেষণাগারে গবেষণা করছিলেন। সে সময়ে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান্-এর লেখা ইউরেনিয়ম পরমাণুর ভাঙন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের সূত্র ধরে গবেষণা করতে করতে ফ্রিশ-মাইটনার সিদ্ধান্ত করলেন যে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু সমান দুটি ভাগে ভাঙতে পারে। সে সময়ে ইতালীর পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাঙ্গেরিয়ান পদার্থ-বিজ্ঞানী লিও জিলার্ডও আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। নীল বোরও আমেরিকায় এলেন এবং আইনস্টাইন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। অন্যদিকে ফ্রান্সে জোলিও কুরী ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণাতেও ফ্রিশ-মাইটনারের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হল। তারপরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের তৎপরতা যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে লাগল তারই ফল পারমাণবিক বোমা। ইতিহাসের এই পর্বটি যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁদের আমি রবার্ট য়ুঙ্কের লেখা 'ব্রাইটার দ্যান থাউজেন্ড সানস' বইটি পড়তে অনুরোধ করি। এই বইটিও পকেটবুক সংস্করণে পাওয়া যায়।

ইহুদী মায়ের সন্তান নীল বোরকে এক সময় নাৎসী-কবলিত ডেনমার্ক ছেড়ে পালাতে হয়েছিল একটা জেলে-ডিঙ্গিতে চেপে। দেশে ফিরে এসেছিলেন যুদ্ধ শেষ হবার পরে।

১৯৫৫ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাটম্স্ ফর পীস' সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্যে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(২)

পুণ্যসলিলা সুরধুনী তীরে প্রায়োপবেশনে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন ভারত-সম্রাট পরীক্ষিত শ্রোতা, আর আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ববন্ধন বিনির্মুক্ত ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মহর্ষি শ্রীশুকদেব বক্তা। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম নরলীলার পরম প্রকাশ শ্রীশ্রীরাসলীলার পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া —সম্রাট প্রশ্ন তুলিলেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে বিভিন্ন রুচির অসংখ্য জনই তো রহিয়াছেন। সাধারণের সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যেই মহারাজের এই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাস্য—গোপীগণ তো পরকীয়া ভাবেই শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা করিয়াছিলেন। শাশ্বত ধর্মগোপ্তা ভগবান আভীর-তনয়াগণের এই জারবুদ্ধি অনুমোদন করিলেন কেন? শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের যে কয়েকটি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটির যুক্তি এইরূপ—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্য ওদৈবাচরণঃ ক্বচিৎ"—ঈশ্বরের বচনই সত্য, তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে সর্বত্র সে কথা বলা চলে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম। একমাত্র তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধহয় একথা বলিতে পারি যে তাঁহার বাণীও যেমন সত্য আচরণও তেমনই সত্য। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" ইহাই ত তাঁহার জীবন-বাণী। শ্রীমহাপ্রভুর সমগ্র জীবন এই বাণীরই ঘনীভূত বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যকথা আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার এই জীবনাদর্শের বিষয় সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। শ্রীভগবানের বাণী এবং আচরণের মধ্যে অনেক সময় স্ব-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি না, তাই কখনো সেই উক্তিকে বলি প্রক্ষিপ্ত, এবং আচরণের করি কদর্থ। ভগবদ্‌বাক্যের মধ্যে যে পূর্বাপর কোন অসঙ্গতি নাই, থাকিতে পারে না, তাঁহার আচরণ যে সর্বত্রই সামঞ্জস্যপূর্ণ, অনুকূল অনুশীলন, ও সুগভীর অনুধ্যান ভিন্ন তাহা ধরা পড়ে না। যাহা অনুভূতিবেদ্য, তাহা বিতর্ক-সঙ্কুল মনে প্রতিফলিত হয় না। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভিন্ন তাহা বোধগম্য হয় না।

শ্রীচৈতন্যলীলা সত্যই দুরবগাহ। তাঁহার কৃপা ভিন্ন সে লীলাসমুদ্রে অবগাহন কল্পনাতীত ঘটনা। তবে ভরসার কথা এই লীলায় সর্বজনের সহজবোধ্য অংশেরও অসদ্ভাব নাই। প্রথম প্রথম সাধারণ পাঠক আপাত-দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর জীবনে এবং আচরণে সেই সহজবোধ্য অংশেও হয়তো কিছু কিছু স্ব-বিরোধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় সামান্য অনুধাবনেই ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে সে সুযোগও ঘটিয়া উঠে না। আমাদের প্রথম অসুবিধা—আজ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিবৃতিপূর্ণ যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবত লইয়া সেরূপ কোন আলোচনা হয় নাই। কেহ তেমন ব্যাখ্যা বিবৃতিও প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় অসুবিধা, সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণের কদর্থ করিয়াছেন, তাঁহার বহু বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আপনাদের মতবাদের সম্পূর্ণ সমর্থনের অনুকূলে। ইহাদের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, দুই চারিখানি ছাপানো পুস্তকও পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বহু আখড়ায়—এই সম্প্রদায়ভুক্ত তথাকথিত বৈষ্ণবের সংখ্যা প্রচুর। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আউল, বাউল প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহারা ভিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সুবিধা পাইলেই আপনাদের ব্যাখ্যা সহ চৈতন্যকথা প্রচার করেন। পল্লী-গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থগণের মধ্যেও এই মতবাদের প্রসার লক্ষ্য করিয়াছি। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেও এই মতবাদ অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। ইদানীং কথক সম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটিয়াছে, শ্রীচৈতন্যকথা শুনাইবার লোকের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত আচার্য-সন্তানগণকে পল্লীগ্রামে প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। ইঁহাদের মুখ নগরাভিমুখি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন কোন সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠানও নাই। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার সুসঙ্গতি আছে। বাঙালী সাধকগণ এই সঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজলীলার গতি মাধুর্য হইতে ঐশ্বর্যের পথে, আর নবদ্বীপলীলার গতি ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যের আনন্দ-নিকেতনে। কবি জয়দেবের জীবনে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু কবির সাধনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত সাধনার পার্থক্য আছে। কবির সাধনা ছিল সৌন্দর্যের সাধনা, রসের উপাসনা, নিত্যসিদ্ধ সাধকের ভাবাস্বাদন। শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু নবদ্বীপলীলায় সাধারণ মানুষের সাধনপদ্ধতিরই পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস এই পথের ইতিহাসবেত্তা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তিনি এই পথের এবং পথিকের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মহাকাব্যে এই পথ ও পথযাত্রীর একটি অতি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত আছে। বৃন্দাবন দাস একজন মহাকবি, একজন সিদ্ধবিদ্য পটুয়া। অন্যথায় লক্ষ লক্ষ কবির অনুভূতি-বৈচিত্র্যেসমৃদ্ধ সার্থক ও সুসম্পন্ন, রসভাবের মিলিত তনু নিখিল জগতের নাটুয়া শ্রীচৈতন্যদেবের এমন প্রাণবন্ত মনোহারী মূর্তি তিনি চিত্রিত করিতে পারিতেন না।

আমাদের উদ্দিষ্ট লীলার সূচনা হইয়াছে গয়াধামে। গয়াধামে পিতৃকৃত্য সম্পাদনের পর নবদ্বীপে প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমাদের অবলম্বন। ইহারই মধ্য হইতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, নিমাই পণ্ডিত একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকা অভিনয়ে কেমন করিয়া বিশ্বের নর-নারীকে একটি ক্রম-পারম্পর্যে সুশৃঙ্খল সুন্দর সাধনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার চরণাঙ্কিত এই সাধনসরণি আজিও পথযাত্রীর অপেক্ষা করিতেছে।

আমি বলিয়াছি শ্রীচৈতন্যলীলা নিতান্তই নিগূঢ় লীলা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত কথিত সমস্ত লীলার সামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যাখ্যাদান, আমার মত সাধনহীন সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত। তথাপি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্মরণপূর্বক এই সুদুর্গম পথে আমি অগ্রসর হইয়াছি। এবং তজ্জন্য সর্ববৈষ্ণববৃন্দের পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার দিব্যজীবনের অপরাংশ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। এই-খানেই শ্রীবৃন্দাবন দাস আপন কর্তব্য

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] তিনি শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] আবির্ভূত হইয়াছেন। অবশ্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসোত্তর জীবনের কিছু কিছু কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে তত্ত্বের কল্পদ্রুমাদি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই অংশের মধ্যে তথ্যের অংশই অধিক। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যেন এক পৃথক মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীদাস রঘুনাথের কৃপাধন্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার পরিত্রাতক।

আমাদের আলোচনায় পশ্চাৎপট-রূপে আমরা নবদ্বীপলীলার দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত যখন প্রতিষ্ঠার শিখর-দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, এমন সময় একদিন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অধ্যাপনা অন্তে ছাত্র-সঙ্গে পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, নিয়তিনিয়মে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আসিয়া পথিমধ্যে দর্শন দিলেন। প্রেমকল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বিশ্বজনবন্দ্যনীয় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রশিষ্য বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই শ্রীল ঈশ্বরপুরীই গয়াধামে নিমাইকে দীক্ষাদান করেছিলেন। পথের মধ্যে স্পর্শমণি, মণিকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। নিমাই-এর ভুবন ভুলানো রূপ, তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি পুরীর পথরোধ করিল। শ্রীগৌরচন্দ্রের ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি পুরীর অন্তরে তরঙ্গ তুলিল। আশ্চর্য এই অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকৃতি। পুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি তোমার নাম বিপ্রবর, কোন্ গ্রন্থের অধ্যাপনা কর, তোমার বাড়ী কোন্‌খানে? ছাত্রগণ সগৌরবে উত্তর করিল, ইনিই নিমাই পণ্ডিত। "তুমি সেই" বলিয়া পুরী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের এই প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। লৌকিক জগতের ভবিষ্যত গুরু-শিষ্যের এই প্রথম পরিচয়। নিমাই তাঁহাকে আপন গৃহে ভিক্ষায় আমন্ত্রণ জানাইলেন। পুরীও পরমানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। এইযাত্রায় পুরী কয়েক মাসই শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য আপন গৃহে পুরীকে স্থান দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নবদ্বীপেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে পুরীর পরিচয় হয়। তিনি অতি যত্নে স্ব-প্রণীত গ্রন্থ "কৃষ্ণ-লীলামৃত" গদাধরকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

গয়াধামে দীক্ষা গ্রহণের পর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পথে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরী-পাদের জন্মস্থান কুমারহট্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥

সাধুসঙ্গের ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়—আপন জীবনে মহাপ্রভু তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে যাহার শুভারম্ভ, গয়াধামে তাহার পূর্ণ [illegible] দেখিতে পাইব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার পরই মহা-প্রভুর সঙ্গে এক সর্বজ্ঞের সাক্ষাৎকারের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু যেন দেখাইতেছেন— সাধুসঙ্গের ফলেই তাঁহার মনোদর্পণে অতীত দিব্যজন্ম কর্মের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছে। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নিমাই পণ্ডিত সর্বজ্ঞের গৃহে গিয়া অন্যজন্মে আমি কি ছিলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্বজ্ঞ—শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি দেখিয়াছেন মথুরায় কংস কারাগারে। পরে বালগোপাল মূর্তি দেখিয়া গোপীগণ পরিবেষ্টিত ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদনকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শ্রীরাধার উল্লেখ করেন নাই। পরে রামচন্দ্র, বরাহ, নরসিংহ, বামন, মৎস্য, হলধর, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শনলাভ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই, পূর্বাপর বিচারও নাই। আমি প্রসঙ্গক্রমে সর্বজ্ঞদৃষ্ট এই ছায়া-চিত্রের কথাটা উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। ইহার মধ্যে সর্বজ্ঞ কর্তৃক জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শনের মধ্যে যেন অদূর ভবিষ্যতে সচলব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য-দেবের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাগর তীরে দারুব্রহ্ম সমীপে অবস্থানের ইঙ্গিত আছে। অন্যথায় অবতার পর্যায়ে—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার উল্লেখের কোন সার্থকতা থাকে না। অনেকে জগন্নাথ-দেবকে বুদ্ধাবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিন্তু স্পষ্টরূপে বুদ্ধের উল্লেখ আছে।

লেঃ জেনারেল চৌধুরী

হিরণ্ময় সেন

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী স্বাধীন ভারতের স্মরণীয় ও বরেণ্য সেনানায়ক। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এই সমরকুশলী অধিনায়ক আজ সমস্ত জাতির শ্রদ্ধার পাত্র। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জয়ন্তনাথের জীবনকথা নানা কীর্তিগাথায় সমুজ্জ্বল।

পাবনার বিখ্যাত অভিজাত চৌধুরী পরিবারে জয়ন্তনাথের জন্ম ১৯০৮ সালের ১০ই জুন। এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারেই জন্ম নিয়েছিলেন এক সময় আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী—বাঙলাদেশের অমর সন্তানেরা। সেই পরিবারের ঐতিহ্য যেমন অক্ষুন্ন রেখেছেন জয়ন্তনাথ তেমনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আরও উজ্জ্বলভাবে।

কলকাতা থেকে লণ্ডনের হাইগেট স্কুলে গিয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর যোগদান করেন স্যাণ্ডহার্স্টের রয়েল মিলিটারী কলেজে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৯২৮ সালে কমিশন লাভ করে সপ্তম লাইট ক্যাভালরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই শিক্ষাযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই জয়ন্তনাথের উপযুক্ত ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জয়ন্তনাথ কোয়াটার স্টাফ কলেজেও যোগদান করেন এবং শিক্ষালাভান্তে বিখ্যাত পঞ্চম ভারতীয় ডিভিসনের সহযাত্রী হয়ে বিদেশে যান। সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়ার প্রত্যক্ষ সামরিক ও যুদ্ধাভিজ্ঞতা লাভ করেন ঐ ডিভিসনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালে। এই ডিভিসনে জয়ন্তনাথ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর ডিভিসনের সহকারী অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ও কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের দায়িত্ব পালন করাই ছিল পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর কর্মভার। এই কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর উপযুক্ততার সত্যতা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হল এবং কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের জন্য 'অর্ডার অব দি বৃটিশ এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জয়ন্তনাথ ভারতে ফিরে এলেন। এবার নিযুক্ত হলেন কোয়েটার স্টাফ কলেজের সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর। জয়ন্তনাথের কর্তব্যভারের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ১৯৪৪ সালে ষষ্ঠ দশ ক্যাভালরির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই সর্বপ্রথম তাঁকে সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল। জয়ন্তনাথের নেতৃত্বে ক্যাভালরির গৌরবময় কাহিনী আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে কোয়েটা থেকে মেইকতলা যাওয়ার পর মধ্যব্রহ্মের রণক্ষেত্রে অমর শৌর্যবীর্যের অক্ষয় কীর্তি রচনা করে। জয়ন্তনাথের সুনিপুণ সমর-কুশলতা এবং সামরিক অভিজ্ঞতায় সুচিন্তিত ও দ্রুতসিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাহীনতার মধ্যে ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ সমর-নায়কের পরিচয় ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তারপর তিনি ইন্দোচীন ও জাভার যুদ্ধে যোগদান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী

জয়ন্তনাথ মালয় কম্যান্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্রিগেডিয়ার ইনচার্জ নিযুক্ত হন ১৯৪৬ সালে। ইতোপূর্বে ব্রিগেডিয়ার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র দুজন ভারতীয়। ১৯৪৬ সালে একটি ভারতীয় বিজয়ী বাহিনী লণ্ডনে যায়। জয়ন্তনাথ ছিলেন সেই দলের অধিনায়ক। ১৯৪৭ সালেই তিনি লণ্ডনে যান ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজের এক বিশেষ শিক্ষাক্রমে যোগদানের জন্য। উক্ত শিক্ষাক্রমে যোগদানকারী দুজন ভারতীয়ের মধ্যে জয়ন্তনাথই ছিলেন অন্যতম। ভারতে ফিরে আসার পর ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি ব্রিগেডিয়ার (স্ট্যাফ) এবং কিছুকাল বাদেই স্থল বাহিনীর সদর দপ্তরে ডিরেক্টর অব আর্টিলারি অপারেশনস অ্যাণ্ড [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] হন [illegible] জেনারেল স্টাফের [illegible] সাময়িকভাবে।

১৯৪৮ সালে সাঁজোয়া ডিভিসনের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিয়ে জয়ন্তনাথ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। হায়দরাবাদ অভিযানে এই বাহিনীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। হায়দরাবাদ গ্রাস করার পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জয়ন্তনাথকে ঐ রাজ্যের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত এবং ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ হল স্থলবাহিনীর সদর কার্যালয়ে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল (১৯৫২), চীফ অফ জেনারেল স্টাফ (১৯৫৩), সাদার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক (১৯৫৯)। শেষোক্ত পদে কার্যকালীন তাঁর ঐতিহাসিক গোয়া অভিযান। বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই কাজ করে আসছিলেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তীকালের ভারতীয় ইতিহাসে জয়ন্তনাথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এই দুর্ধর্ষ সেনানায়ক ভারতীয় বাহিনী ও জনগণের সামনে চিরজয়ের বাস্তব সত্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। হায়দরাবাদের গৌরবদীপ্ত অভিযান ও গোয়ার ঐতিহাসিক অভিযানে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতাগুণেই ভারতীয় বাহিনীর বিজয় অভিযান হয় সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত। আজ আবার তাঁর আহ্বান এসেছে। চীনা দস্যুদের ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। এ আহ্বানে যে দায়িত্ব তিনি মাথায় তুলে নিয়েছেন তা পূর্বের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর। কিন্তু অভিজ্ঞ, দুঃসাহসী, নেতৃত্বের দুর্লভ ক্ষমতাগুণে উজ্জ্বল এই সেনানায়ক আমাদের সামনে বিজয়ের বরমালা গলায় নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোন অমঙ্গল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর দুর্ধর্ষ সামরিক অভিজ্ঞতা জাগ্রত হোক। আমাদের সকলের বল একত্রিত হোক। আমাদের মঙ্গলকামনায় তাঁর অভিযাত্রা হোক সার্থক ও জয়দীপ্ত।

ভাষা হল ভাববিনিময়ের সেতু। ভাষাকে সভ্যতার প্রথম রাজদূতও বলা যেতে পারে। রাজ্য ভিন্ন হলে রাজদূতের বেশবাসও যেমন ভিন্ন, আবাস অনুযায়ী ভাষাও তেমনি একেবারে বদলে যায়। এমন কি এক দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় পার্থক্য সম্ভবতঃ উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং ভাষা যেমন ভাব-বিনিময়ের সেতুও হতে পারে পার্থক্যের দেয়াল গাঁথতেও ভাষার তুল্য রাজ-মিস্ত্রি নেই। ভিনদেশী ভাষা বুঝতে হলে অনুশীলনের শ্রম স্বীকার

আমেরিকার শ্রীমতী ললা শিউর এবং হল্যাণ্ডের ডার্ক স্যান্ডারস অভিনীত মূকচলচ্চিত্রের একটি নৃত্যদৃশ্য।

করতেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি পৃথিবীকে যেমন ছোট করেছে, তেমনি সময়কেও। আজকের খণ্ডিত জীবন সময়ের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে নাজেহাল। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বসুন্ধরার অনেক অধ্যবসায়কে আমরা চলমান জীবনের জানালা থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলছি। অতএব মাতৃভাষা এবং বড় জোর বিদ্যালয়লব্ধ দ্বিতীয় একটি ভাষা ছাড়া ভাব-বিনিময়ের আর কোনো সেতু আমাদের নেই।

ইউনেস্কো সম্প্রতি একটি সার্ব-জনীন সেতুনির্মাণে নিরন্তর চেষ্টা করে আসছেন। তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সঙ্গীত দিয়ে। মনুষ্যমনে সুর

বিশেষ ভঙ্গীমায় মূকঅভিনেতা এরডিং ভিনসার।

অব্যয় সুতরাং রেডিও, টেলিভিশন মারফৎ বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত প্রচার করে সারা বিশ্বের রসিকদের মনে সহজেই সাড়া তুলতে পেরেছেন তাঁরা। সঙ্গীতের পর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ঘটনাবলী অবলম্বনে মূকাভিনয় দ্বারা বিশ্বের নানা প্রান্তকে একাত্ম করবার চেষ্টা করে-ছিলেন ইউনেস্কো। প্রথমে স্থির হয়েছিল একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানো হবে। কিন্তু নানা কারণে ইউনেস্কোর পরি-কল্পনাটি সুফলপ্রসূ হয়নি।

ইউনেস্কো সম্প্রতি আটটি দেশের শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী-নির্ভর মূক চলচ্চিত্র তুলেছেন টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যে। এই মূক চলচ্চিত্রে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মে ছবির বক্তব্যকে উপস্থিত করা হয়নি। তবে

প্রতীচ্যের প্রাচীন মূকাভিনয়ের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি যত সহজে ইয়োরোপীয় দর্শকদের পক্ষে বোধগম্য, প্রাচ্যের ধর্ম-নির্ভর নৃত্য-কাহিনী থেকে মর্ম গ্রহণ প্রতীচ্যের দর্শকদের পক্ষে তত সহজে সম্ভব না। ইটালীর ষোড়শ শতকে যে 'কর্মেডিয়া দেলা আর্ত'এর মূকে নাট্যচরিত্র-গুলিকে উপস্থিত করার জন্যে কোনো বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। হারলে-কুইন, হারলেকুইন প্রেমিকা কলাম্বাইন, ডটর, প্যান্টালোন, ট্রকেলডিনো প্রভৃতি চরিত্রগুলি লোকপরম্পরায় ইয়োরোপে আজো সজীব। এমনকি তুরস্কের নাসিরুদ্দিন ওঝার তুর্কী চরিত্রটিকেও ইয়োরোপের রসিকজন চিনতে ভুল করেন

নাসিরুদ্দিন ওঝার ভূমিকায় এরডিং ডিনসার।

না। কিন্তু প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারত-বর্ষের নৃত্য-নাট্য থেকে রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক। ভারতীয় নৃত্যের একেকটি মুদ্রা বিশেষ বিশেষ অর্থ বহন করে। শিবের তাণ্ডব নৃত্যে অন্তরালশায়ী সৃষ্টি এবং ধ্বংসের তত্ত্বকে না জানলে দর্শকমনে ভাববিনি-ময়ের সেতুটি সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু প্রাচ্যের এই বৈশিষ্ট্যই বারবার প্রতীচ্য মনকে আকৃষ্ট করেছে। ইউনেস্কোর এই মূক চলচ্চিত্রে তাই কোনো দেশেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ব্যাহত করা হয়নি। এই চলচ্চিত্রে ইউনেস্কো বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের চিরন্তর সূত্রকে বিধৃত করেছেন বিভিন্ন দেশের লোকগাথা ধর্মকাহিনীকে অবলম্বন করে।
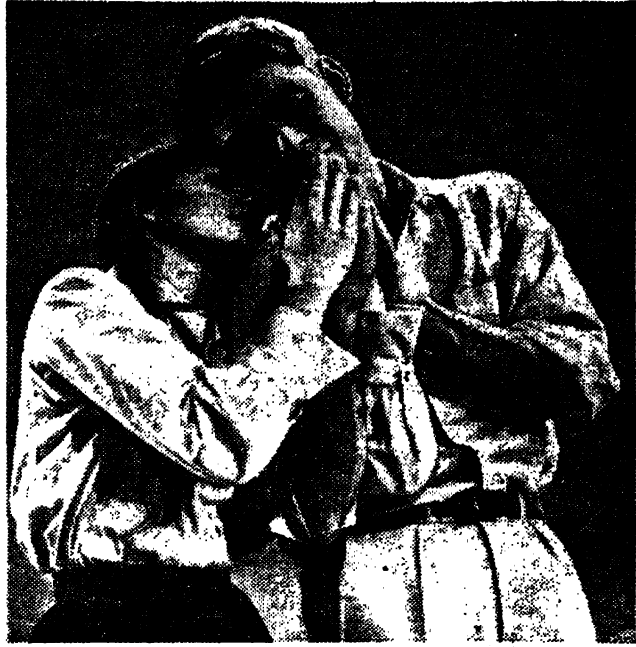
লরা এবং স্যান্ডারস-এর একটি আবেগমধুর দৃশ্য মূকচলচ্চিত্রে।

শিবের প্রতীক্ষায়ঃ শিল্পী—অমলিনু দেবী

।। তিনজন ভারতীয় সাহিত্যিক ।।

অক্টোবর মাসের শেষদিকে তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। এই তিনজন ভারতীয় লেখক হলেন রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য আকাদমির সেক্রেটারি শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানী ও হিন্দী লেখক শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। এঁরা তিনজন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যান প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ সফর-সংক্রান্ত নথিপত্র অনুশীলন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য।

এই তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকই রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রীকৃপালানী দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে প্রথমে ছাত্র হিসেবে ও পরে অধ্যাপনার কাজে এবং ইংরিজি বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন; তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালানী রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ছিলেন বিশ্বভারতীর হিন্দী-ভবনের পরিচালক (বর্তমানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত)।

এঁরা তিনজনে সোভিয়েত দেশ সফরকালে লেনিনগ্রাদে যান এবং সেখানে এঁদের নগর-দর্শনে ও তথ্যসংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন প্রখ্যাত ভারতবিদ পরলোকগত আলেক্সি বারান্নিকভের পুত্র পিওৎর্ বারান্নিকভ্। পিওৎর্ বেশ কিছুকাল ভারতে ছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট হিন্দী ভাষাবিদ। এই তিনজন ভারতীয় লেখকের লেনিনগ্রাদ সফর সম্পর্কে পিওৎর্ বারান্নিকভ নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির অনুরোধে যে রিপোর্ট লিখে দেন, তা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া গেল ঃ

শ্রীমুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃপালানী ও ডঃ দ্বিবেদী লেনিনগ্রাদে এসে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার এশীয় জাতি-সমূহের ইনস্টিট্যুটের প্রতিনিধিবৃন্দ ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য অনু-শীলন বিভাগের অধ্যাপকগণ তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কালিয়ানোভ ও অধ্যাপিকা ভেরা নোভিকোভা।

ভারতীয় সাহিত্যিকরা আনুষ্ঠানিক-ভাবে এশীয় জাতিসমূহের অতিথি হলেও, প্রথম দিনটা বারান্নিকভের অতিথি হিসেবে কাটান। বারান্নিকভের ব্যক্তিগত আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ তাঁরা রক্ষা করেছিলেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ লেনিনগ্রাদে এসে পেঁছান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ৪৫তম বার্ষিকীর মাত্র কিছুদিন আগে। প্রথমেই তাঁরা ইতিহাস-খ্যাত নগরীর ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত স্থান ও দ্রষ্টব্যগুলি দেখেন। ৪৫ বছর আগে ৭ই নভেম্বর তারিখে যে ক্রুজার যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' থেকে কামানধ্বনি করে সমাজতান্ত্রিক নবযুগের জন্ম ঘোষণা করা হয়, লেনিনগ্রাদে রক্ষিত সেই জাহাজটি এঁরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেন। তারপরে এঁরা যান রাজলিভে—যেখানে লেনিন আত্ম-গোপন করে থেকে আমাদের শ্রমিক-শ্রেণীকে পরিচালনা করেন। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে এখানে থাকার সময়েই লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থটি রচনা করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর স্বদেশে নিয়ে যাবেন বলে এখানকার কিছু ফুল সযত্নে তুলে নেন।

লেনিনের কর্মজীবনের সঙ্গে জড়িত আর একটি জায়গা হল স্মোলনি। বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এখানেই। এই বাড়িটিকে এখন একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে এবং লেনিনের ঘরটি তিনি থাকার সময় যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরে ঢুকে শ্রীমুখোপাধ্যায় বার বার অভিভূত স্বরে বলে ওঠেন, 'পবিত্র স্থান! অতি পুণ্য স্থান।' ডঃ দ্বিবেদী বললেন, 'লেনিনের মতো একজন মহাপুরুষের ও বিরাট জননায়কের জীবনযাত্রা যে কতদূর সহজ ও সরল ছিল, তা দেখে আমরা বিস্মিত। এই পবিত্র স্থান দর্শন করে আমরা আনন্দিত।'

এর পরে তাঁরা মিউজিয়ামের অন্যান্য অংশ এবং বিশেষ করে বিগত যুদ্ধে লেনিনগ্রাদের বীরদের অবিস্মরণীয় বীরত্বের ইতিহাস সংক্রান্ত দ্রষ্টব্যগুলি মনোযোগের সঙ্গে দেখেন। ডঃ দ্বিবেদী বললেন, 'সোভিয়েত দেশ সফরে এসে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে সোভিয়েত জনগণ সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। লেনিনগ্রাদ অবরোধের এই ইতিহাস জানার পর আমরা উপলব্ধি করছি যে কেন আপনারা শান্তির জন্যে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমনভাবে সংগ্রাম করছেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে বিশ্ব-শান্তির জন্য আপনাদের এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই।' সঙ্গে সঙ্গে কৃপালানী যোগ করেন, 'শান্তির জন্যে আপনাদের এই সংগ্রামে আমাদের দেশের মানুষও আপনাদের [illegible]।'

তারপর তাঁরা বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁদের গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁরা এখানকার ভারতবিদদের সঙ্গে ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও আলাপ আলোচনায় কাটান।

এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিট্যুট ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-অনুশীলন বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে এঁদের তিনজনকে এক সম্বর্ধনা সভায় সম্মান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এশীয় ইনস্টিট্যুটের ভারতীয় শাখার পরিচালক অধ্যাপক ভি. কালিয়ানোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পরিচালিকা অধ্যাপিকা নোভিকোভা ভারতীয় অতিথিদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তিনজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরে জোর দেন। সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে নানা তথ্য তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক কালিয়ানোভ জানান, মহাভারতের টীকাসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কাজে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী দীর্ঘকাল ধরে নিযুক্ত আছেন এবং মহাভারতের সভাপর্বের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। (এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ২৮ সংখ্যা অমৃতে)।

ভারতীয় অতিথিরা লেনিনগ্রাদে ছিলেন চারদিন। বলাবাহুল্য তাঁরা সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছিলেন তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তারজন্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সফর সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও নথিপত্র অনু-শীলন—সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

লেনিনগ্রাদ পরিত্যাগের কালে এই ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের পক্ষে দলনেতা শ্রীমুখোপাধ্যায় লেনিনগ্রাদ-বাসীদের উদ্দেশে সুগভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করেন ও তাঁদের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানান। লেনিনগ্রাদ সফর করে সব থেকে কোন বিষয়টি তাঁদের মনে রেখাপাত করেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃপালানী বলেন, "যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সইতে হয়েছে, এই ঐতিহাসিক শহরের অনেক কিছুই সে সময় ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ মাত্র এই ক'বছরের মধ্যেই সেই ধ্বংসচিহ্নগুলিকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর নতুন লেনিনগ্রাদ গড়ে তোলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েত জন-সাধারণের উদ্যম কি অসাধারণ! এই ব্যাপারটাই আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করেছে।"

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

াত্রে ঘরের দোর দিয়ে শোবার অভ্যাস না কান্তির। কৌটোর মতো বন্ধ সদর দরজা বন্ধ হ'লে আর একটা রও ঢোকবার উপায় নেই কোনদিক —এমনি সব বন্দোবস্ত করা। ড়া কীই বা আছে তার ঘরে যে চোর ব? বইখাতা কতকগুলো—দু'-একটা কাপড়, এই তো। বেশী জামাকাপড় ই থাকে আজকাল রতনদির দেরাজে। ন মনে পড়ত সেদিন দরজাটা ভেজিয়ে শুধু আর যেদিন পড়তে পড়তে ঘুম পেয়ে যেত সেদিন কোনমতে না নিভিয়ে শুয়ে পড়ত, দরজার কথা থাকত না। রাত্রে মোক্ষদা বা ঠাকুর ত আসবার সময় কপাটটা হয়ত টেনে জয়ে দিত।

সেদিনও খোলাই ছিল দরজা। জানো কপাট প্রায় নিঃশব্দেই খুলেছে চখু খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙেগ ছে কান্তির। কারণ বহু রাত অবধি মাতে পারেনি সে—এলোমেলো চিন্তায় ন পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতে মাথা ম হয়ে গিয়েছিল, ঘুম আসেনি তাই— কবারে শেষের দিকে, হয়ত এই ঘণ্টা- নেক আগে একটু তন্দ্রা এসেছে। তাও ই পাৎলা ঘুম—সামান্য শব্দেই জেগে ঠেছে আবার।

কে একজন তার ঘরে ঢুকছে।

তখনও ঘুমের ঘোর রয়েছে চোখে— ং মনেও। অনিদ্রার প্লানি আর প্ত নিদ্রার জড়তা তখনও জড়িয়ে ছে তাকে। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, কিন্তু আওয়াজটা ভাল ক'রে বেরোল না গলা দিয়ে। আরও যে চেঁচিয়ে উঠতে পারল না, তার কারণ উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কে' বলে প্রশ্ন করার সময়েই তার মনে হ'ল—এ রতনদি। রতনদি ছাড়া কেউ নয়।

কিন্তু এ সময় এমনভাবে রতনদির আসাটা এতই বিস্ময়কর, এতই অবিশ্বাস্য যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চাইল না।

'রতনদি?' বলে প্রশ্ন করতে গেল সে, কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার—ভাল ক'রে স্পষ্ট উচ্চা- রণও করতে পারল না। অস্ফুট একটা স্বরই বেরোল শুধু কোনরকমে।

মূর্তিটা আরও কাছে এল। আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ সবে উঠেছে—পূর্বমুখী দরজা দিয়ে ভেতরে এসেও পড়েছে তার এক ফালি আলো। তাতেই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মুখচোখ খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই —তার অত দরকারও নেই কান্তির। এ সবই পরিচিত ওর। ঐ বেশভূষা, ঐ চলবার ভঙ্গি, দেহের ঐ গঠন। সেই চওড়া কালাপাড় দেশী শাড়িটা—হাতে সেই ফারফোরের বালা ঝিকঝিক করছে। কানে হীরের টব দুটো এই সামান্য আলোর আভাসেই ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'রতনদি!' এবারে অস্ফুট কণ্ঠে হলেও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারল। এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কান্তি। জামাইবাবুর কোন অসুখ-বিসুখ করল না তো—কিম্বা ও'রই?

রতন ঘরে ঢুকেছিল আস্তে আস্তে— বোধহয় অন্ধকারে আগে কিছু ঠাওর পাচ্ছিল না—তাই। এখন চোখটা সয়ে আসতে একরকম ছুটে এসেই বিছানায় বসে কান্তিকে জড়িয়ে ধরল একেবারে। যা কখনও করেনি আজ পর্যন্ত—পাগলের মতো একেবারে ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে চুপিচুপি বলল, 'তুমি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কান্তি? চলে যেতে পারবে? একটু মায়া হবে না তোমার? মন-কেমন করবে না? তবে যে তুমি বললে তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি! কেন বললে তাহ'লে?'

কান্তির প্রথম মনে হ'ল মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে রতনদির। কিম্বা মদের ঝোঁকেই উঠে এসেছেন।

কিন্তু কৈ না, তেমন উগ্র গন্ধ তো ছাড়ছে না রতনের নিঃশ্বাসে। খুবই কম —একটু আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত সেই সন্ধ্যায় যেটুকু খেয়েছিল— তারপর রাত্রে আর খায়নি। কোনমতে এড়িয়ে গেছে ওর বরের জবরদস্তি। কিন্তু তবে? তবে এসব কী বলছে?

সেও তেমনি চুপিচুপিই উত্তর দিল— পাশেই মোক্ষদারা আছে হয়ত, তবে ওর বুক কাঁপছে ঢিপ্ ঢিপ করে, বা মুখ, কী সব যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে হয়ত এই নিয়ে যদি টের পায়—'কিন্তু আমি তো— মানে তুমিই তো বললে আর মুখ দেখব না। তুমিই তো শুনছি বোর্ডিংএ পাঠা- বার ব্যবস্থা করছ। আমার কী দোষ, বারে। আমি তো কিছু বলিনি। আমি— আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে তো চাইনি।'

'ছাড়বে না? আমাকে ছাড়বে না তো? যাই কেন হোক না, কোনদিন কিছুতে ছেড়ে যাবে না? বল বল—উত্তর দাও। এই আমাকে ছুঁয়ে বল।'—

'না না—রতনদি, তুমি 'যাও' না বললে যাব না।'

'না, সে আমি বলতে পারব না প্রাণে ধরে। বলাই উচিত, তবু পারব না। অনেক ভেবে দেখলুম। তোমাকে কোথাও পাঠাতে পারব না।...... আমার কথা যখন কেউ ভাবে না—আমিই বা কেন অপরের কথা ভাবব? আমি বড় দুঃখী কান্তি, আমাকে তুমি দয়া করো। আমি বড় দুর্বল আর লোভী। যদি অন্যায় ক'রে ফেলি—তবু আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না!'

'ছিছি। ওসব কথা কেন বলছ রতনদি। তুমি আমার কাছে এমন কোন অন্যায় করতেই পার না। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা কি আমি জীবনে ভুলব? জীবন দিয়েও তোমার ঋণ শোধ হয় না?'

'ঠিক বলছ? অন্তরের কথা তোমার? জীবন দিতে পারবে আমার জন্যে? আমি যে তাই চাইতেই এসেছি। পালিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। ওরা ঘুমোচ্ছে, সবাই ঘুমোচ্ছে কিন্তু আমি ঘুমোতে পারিনি। সারারাত ভেবেছি। ভেবে দেখেছি ভাল করে—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তাতে যা হয় হবে। জীবনে কিছুই পাইনি—এটুকু আমি আদায় করব। কিন্তু জীবন দেবে তো আমার জন্যে? দিতে পারবে? কথার কথা নয় তো—মন বুঝে বলছ তো?'

'ঠিকই বলেছি রতনদি। তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব।'

'আঃ বাঁচলুম, বাঁচলুম। তুমি আমাকে বাঁচালে।'

এই ব'লে অকস্মাৎ আরও জোরে আরও নিবিড়ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল রতন—তারপর পাগলের মতো ওকে চুমো খেতে লাগল বার বার। এত জোরে জড়িয়ে চেপে ধরেছিল যে কান্তির মনে হ'ল পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। চোখেও কিছু দেখতে পারছে না। অনুভব করছে শুধু আগুনের মত ঐ চুম্বনগুলো।

কী যেন ভয়ঙ্কর মোহ গ্রাস করছে ওকে। যেন কোন মায়াবিনীর মায়া তার সব শক্তি হরণ করছে।

কী যে—তা ও সেদিন বোঝেনি। আজও বোঝে না।

ভাববারও অবসর ছিল না কিছু। কারণ একটু একটু ক'রে ওর সমস্ত চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে এল সেই মায়ায়।

তার পর আর কিছু মনে নেই ওর। আর কিছু মনে পড়ে না।

তারপর আর কিছু মনেও পড়েনি। সেই দিনগুলোয় আর কিছু মনে ছিল না। সব একাকার অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। তার লেখাপড়া, বর্তমান-ভবিষ্যৎ—তার মা দাদা বৌদি, যারা তার মুখ চেয়ে আছে অনেকখানি আশা নিয়ে—কিছু না। এক সীমাহীন নির্লজ্জতায়, এক সর্বনাশা উন্মত্ততায় সব কিছু ঘুলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। যেন একটা প্রচন্ড ঘূর্ণিতে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেটা যে ঘূর্ণি—ও যে শূন্যেই ঘুরছে ওর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারিদিকে ধূলির আবরণ সৃষ্টি করে, এ ঘূর্ণি যেমন অকস্মাৎ একদিন শূন্যে তুলেছে তেমনি অকস্মাৎই একদিন কোথাও আছাড় মেরে ফেলবে—তাও বুঝতে পারেনি। এক আধ দিন নয়—অনেক কদিনই—কোথা দিয়ে কেটে গেল তাও টের পায়নি। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, কোন লজ্জার আবরণ ছিল না। সাংঘাতিক এক নেশায় সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিল।

ইস্কুলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল বলতে গেলে—কারণ ইস্কুলে গেলে পড়তে হয়, পড়া দিতে হয়—টাস্ক্ করে নিয়ে যেতে হয়। রতন শুধু মাসে মাসে মাইনে পাঠিয়ে দিত, আর খবর পাঠাত যে শরীর খারাপ, শরীর ভাল হ'লেই যাবে আবার। সে প্রতিদিনই আশা করত যে এবার সে সংযত হবে, কান্তিকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে—কোন বোর্ডিংএ কোথাও—যাতে নতুন ক'রে পড়াশুনো আরম্ভ করতে পারে। তার ভরসা ছিল কান্তি ভাল ছেলে—একটা বছর নষ্ট হ'লেও আবার ঠিক ধরে নেবে।

এরই মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার দিন কবে পেরিয়ে গেল—কান্তির মনেও পড়ল না। কিছুই মনে ছিল না তার, হুঁশ ছিল না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাটত এক উন্মত্ত নেশার মধ্য দিয়ে—রাত নটা থেকে পরদিন প্রভাত পর্যন্ত কাটত সারা দিনের স্মৃতি-রোমন্থনে ও আসন্ন দিনের সুখ-কল্পনায়। এর মধ্যে তুচ্ছ জীবন বা ভবিষ্যতের কথা ভাববার মতো ফাঁক কৈ?

অবশেষে আবারও একদিন এল বিপদের সঙ্কেত। নিয়ে এল সেই মোক্ষদাই।

নটার সময় বাবু এসে গেলে একদিন ওপরে উঠে এল সে। কান্তি তখন বিছানায় চুপ করে শুয়ে ভাবছে রতনের কথাই। রতন যেন চির-বিস্ময় ও
কাছে, চির-বাঞ্ছিত। তার চিন্তায়
ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। কি
মোক্ষদার রূঢ় পদক্ষেপে সেই চিন্
ছেদ পড়ল—স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল। 'কে' ব
ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'ও মোক্ষদাদি? অই ভাল। অ
বলি কি—'

'কী বল? ভাবছিলে তোমার রতনদি
হ্যাঁ—ঐটে কতটু বাকী আছে! পয়
দেনেয়ালা বাবুকে ছেড়ে অসের নাগরে
কাছে অস করতে আসা! বলি ঠাকুর-
সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম তা আম
কথা তো শুনলে না। উলটে বেশী ক
মুখ জুবড়ে পড়লে দ'কের মধ্যে। ত
আমার কি! আমিও চুপ করেই ছিলুম
নিহাৎ শেষ পর্যন্ত একটা খুনাখু
বেহ্মঅক্তপাত হবে বলেই আবার হ
করাতে আসা। শোন না শোন—তোম
ইচ্ছে!'

—'কী বলছ মোক্ষদাদি—তোম
কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না
কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কান্তি
লজ্জা, সামনাসামনি প্রকাশ্যভাবে এই স
কথা আলোচনায় লজ্জা আর তার সঙ্গে
সত্যিকারের একটা ভয় যেন তার ক
বলার শক্তি কেড়ে নিয়েছে। হঠাৎ ওর মনে
হ'ল মোক্ষদার কথাগুলির মধ্যে সত্যি
একটা আসন্ন বিপদের আভাস আছে।

'বেশ বুঝেছ।' চোখ-মুখ ঘুরিয়ে
অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বল
মোক্ষদা, 'বলি বুঝতে তো তোমার বাক
নি কিছু! বুঝবে না কেন? সেই যাখ
কচি খোকাটি ছিলে—ত্যাখন বুঝতে
পারনু নি বললে সাজত। এখন আ
সাজে না। এখন আর জানতে বুঝতে
কোন্ জিনিসটা বাকী আছে তোমার
বলে সপ্ত কান্ড আমায়ণ, সীতে কা
পতি।...... শোন ঠাকুর, বাজে কথা বক
বার সময় নি আমার, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে
পারবুনি। এক আশ কাজ পড়ে আ
নিচোয়। ওসব ন্যাকাপানায় আর কাজ
নি—যা বলছি ঠিক ঠাক মন দিয়ে শোন
বাবু মানে জামাইবাবু একটা কিছু স
করেছে। ঠাকুরকে দারোয়ানকে ডে
নানা রকম জেরা করেছে—আমাকে
করেনি তার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে
জানে দিদিবাবুর হাতের নোক বলে
তাও করতে পারে। এমনি কেউ বল
দেবে না—দিদিবাবু মুঠো মুঠো টা
দে মুখ বন্ধ করে এখেছে সব—কি
জেরায় মুখে কোন্ কথায় কাঁকে

রে যাবে তাকি কিছু ঠিক আছে। খন কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে নি বাবু, মন বাবু নয় কো। আগলে, মদ পেটে লে পিচেশ হয়ে ওঠে তা তো জানই। কটে-পটে কোনদিন ধরে ফেলতে র তো তেক্ষুনি কেটে দু-টুকরো র ফেলবে!'

হয়ত ওর কথাগুলো বলবার এই ত অপমান-কর ভঙ্গিতে, কিম্বা ক উপলক্ষ্য করেই ওরা নিয়মিত অর্থ ন করছে রতনদির কাছ থেকে—এই টা শুনে, হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল ন্তর। সে-ও বেশ চড়াসুরেই উত্তর , 'তা আমাকে এসব কথা শোনাতে ছ কেন? নিজের মুনিবকে গিয়ে না। তিনি ছাড়লেই আমি যাব। দ তো শুধু আমার একার নয়, তারও মার তেমন কিছু হ'লে, তোমাদেরও। সুখের চাকরি কোথায় পাবে?'

মোক্ষদা কিন্তু রাগ করলে না। টা মেনে নিয়েই বললে, 'সে কথা শবার। হক কথা এটা। এমন পরিপুষ্ট সহজে মেলে না। দুয়ে উঠতে লেই হ'ল। বলি সেই জন্যেই তো এত ব্যথা গো! কিন্তু ওকে তো বলবার নি। ও তো পাগল এখন, কোন কি -দীর্ঘ্যি জ্ঞান আছে? তুমি একটু করে দ্যাখো। মার খেয়ে সে-ই লে বেরোতে হবে, সেকালে এই বেলা মানে সরে পড়া ভাল নয় কি? আর তোমারও রেহকাল পরকাল দু-কালই গেল ঝরঝরে হয়ে, এর পরে খাবে কি তাও ভাব। আজকাল নেকাপড়া না সায়েবের চাকরি হয় না। তোমার অইল ধর গে হয় উনুনে ফুঁ, নয়তো ফুঁ। তা যে নবাবী মেজাজ করে ছে তোমার তাতে কি আর ঐ ওজ- মন উঠবে? তার চেয়ে সময় থাকতে বেলা দু-চার হাজার বাগিয়ে নে সরে । তোমারও রাখেরের কাজ হোক— ড়িও বাঁচুক। নেশা কেটে গেলে কত টাকা দুয়ে বার করে নিতে বে বাবুর ঠেঙে। তুমিও চাই কি ঐ য় একটা দোকান-দানী দিয়ে ক'রে পারবে। আর কেনই বা পড়ে আছ, রেও তো সাধ মিটে গেছে—এবার তি দাও না!'

আবারও সেই টাকার ইঙ্গিত।

এবার বেশ রূঢ়ভাবেই বললে কান্তি, ম তোমাদের মতো অত ইতর নই দাদি যে এতদিন এত খেয়ে এত পেতে নিয়ে আবার টাকা বাগিয়ে সরে পড়ব! যেতে হয়তো এমনিই চলে যাব। পুরুষমানুষ—আর কিছু না হয় মোট বয়ে খাব। তাতে কি?'

মুচকি একটু হেসে আশ্চর্যরকম ঠান্ডা মেজাজেই জবাব দিল মোক্ষদা, 'তা বাপু মানছি আমরা রিতর ছোট-লোক। পয়সা খুব চিনি। পয়সার জন্যেই তো খনকিবাড়ি গতর খাটাতে এসেছি। পয়সা চিনব না! তুমি চেনো না চেনো—নিজের ভাল বোঝ না বোঝ সে তোমার রুচিরুচি। তবে তাও বলি টাকা তোমার পাওনা—বেহক্কের কিছু নয়। নিলে এমন কিছু ছোটনোকপানা হ'ত না। তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে বসে অইল—তার দাম দেওয়া তো রুচিতই।'

এই বলে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে মোক্ষদা চলে গেল।

কিছুই বলতে পারল না কান্তি। খুব দুকথা শুনিয়ে দিতে পারলে একটু শান্তি হ'ত ওর—কিন্তু বলা হ'ল না। অবসর মিলল না বলে নয়—ডেকে থামানো যেত, জোর ক'রে ধরে দুকথা বলা যেত—কী বলবে তাই ভেবে পেল না যে। শুধু একটা দুঃসহ রাগে সমস্ত দেহটা চিনচিন করতে লাগল—অব্যক্ত কী রকম কষ্ট হ'তে লাগল। রাগ আর অপমানবোধ। ওদের দুজনকে জড়িয়ে বার বার যে ইঙ্গিত দিয়ে গেল মোক্ষদা সেইটেই যথেষ্ট অপমানকর। অথচ কী-ই বা বলবার আছে। কথাটা এত নির্ঘাৎ সত্য যে অস্বীকার করবার, কি মোক্ষদাকে ধমক দেবার কোনও উপায় নেই কোথাও। আজ তারা এমনভাবেই নিজেদের নামিয়ে এনেছে যে, এইসব সামান্য দাসী-চাকরের বিদ্রূপ-ইঙ্গিত-অপমান নিরবে সয়ে যেতে হচ্ছে। জবাব দেবার মতো কিছু নেই ওদের তরফ থেকে।

কিন্তু তবু বার বার মনে হ'তে লাগল—এত স্পর্ধা ওদের, এত দুঃসাহস! যে মুখ নেড়ে এই অপমান ক'রে গেল সেই মুখখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ঠিক জবাব হ'ত এ আস্পর্ধার।

একবার মনে হ'ল কালই রতনদিকে বলে ওকে জবাব দেওয়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবের মূঢ়তা নিজের কাছেও ধরা পড়ল। কোন ফল হবে না। রতনদি সাহস করবেন না ওকে জবাব দিতে। এই জন্যেই করবেন না। বড় বেশী জানে ওরা। বিশেষত মোক্ষদা। যে মুহূর্তে জবাব দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে মোক্ষদা গিয়ে জামাইবাবুকে খবর দেবে—জানিয়ে দেবে সম্পূর্ণ ইতিহাস। ওরা এখন এদের হাতের মুঠোর চলে গেছে। একদিক দিয়ে অপমানিতও হ'তে হবে আর একদিক দিয়ে টাকাও গুণতে হবে। মাথায় পা দিয়ে চললেও কিছু বলবার যো থাকবে না।

মনে পড়ল একদিন ইংরিজী কি খবরের কাগজে 'ব্ল্যাকমেল' কথাটা পেয়ে-ছিল। মানেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ইংরিজীর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন, ওর মানে কোন গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে, অপদস্থ করবার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধে আদায় করা। এই ধরণের ব্যাপার। তারপরই বলেছিলেন, বড় খারাপ কাজ ওটা। বড় ঘৃণ্য। ওর মানে না বোঝাই ভাল। কোনদিন যেন বুঝতেও না হয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। একেই বুঝি ব্ল্যাকমেল বলে। এরা ব্ল্যাকমেল ক'রে রতনদির কাছ থেকে টাকা আদায় করছে।...

কী করবে, এ অবস্থায় কি করা উচিত ভেবে পেল না কান্তি। যেন কী একটা দৈহিক অস্বস্তিতে ছট্‌ফট ক'রে বেড়াল খানিকটা।

বলবে রতনদিকে মোক্ষদার কথাটা?

লাভ কি?

বড় ম্লান হয়ে যাবেন। কষ্ট পাবেন খুব। সেই মলিন মুখ এবং নত দৃষ্টি কল্পনা ক'রেই মায়া হ'তে লাগল কান্তির। অথচ শুনবেনও না কথাটা—তাও সে ভাল ক'রেই জানে। প্রাণধরে বিদায় দিতে পারবেন না।

কান্তিই কি পারবে এই নিরানন্দ পুরীতে ওকে ছেড়ে যেতে?

তারচেয়ে ওদের ঘনিষ্ঠতাটাই কমিয়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া এইবার চেপে পড়তে বসতেও হবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সামনের বার পরীক্ষা না দিলেই নয়। ভাগ্যিস দাদারা অত হিসেব রাখেন না—নইলে কী কৈফিয়ৎ দিত তার ঠিক নেই। মুখ দেখাতে পারত না তাঁদের কাছে।

সাতপাঁচ ভেবে কিছুই বলা হ'ল না রতনদিকে। মোক্ষদারা এই ব্যাপার নিয়ে

টাকা আদায় করছে তাঁর কাছে এটা কান্তি টের পেয়েছে। আদায়ের লজ্জায় মরে যাবেন রতনদি। এতটুকু হয়ে যাবেন অপমানে। জানা—তিনি, সে মুখ-ফুটে বলতে পারবে না এ কথাটা।

যেটা বলতে পারে সেটাই বলল একদিন—ঐ ঘটনার দিন চারপাঁচ পরে। বলল, 'এবার একটু চেপে পড়তে হবে রতনদি। একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না!'

'একটা বছর গেল মানে? নষ্ট হয়ে গেল?'

'গেল বৈকি। টেস্ট দেবার কথা ছিল দিলুম না। এইতো সামনেই এক-জামিন। টেস্টে প্যাস না করলে তো তাতে বসতে দেবে না!'

'তা বৈকি—।' কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় রতন। 'তা বৈ বলনি তো'—এই কথাই বলতে যাচ্ছিল। দোষটা যে তার ঘাড়েই এসে পড়বে, সেইটে মনে পড়ে যাওয়ায় আর বলল না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়াল। মুখটা লাল হয়ে উঠল—কানের ডগা পর্যন্ত।

তেমনি মাথা নামিয়েই একটু পরে বলল, 'তাহ'লে তুমি কাল থেকেই আবার ইস্কুলে যেতে শুরু কর। আর কামাই ক'রে কাজ নেই।'

এবার মাথা নামাবার পালা কান্তির। সে নত মুখে রতনের বালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ইস্কুলে আর আমার যেতে ইচ্ছা করে না। সকলে ঠাট্টা করবে, যা-তা বলবে। মাস্টারমশাইরা বকবেন, নতুন সব ছেলেদের সামনে। এখন যারা ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে তারা আমার নিচে পড়ত, কত খাতির করত। তাদের সামনে অপমান হওয়া—'

'তবে কি করবে? নতুন কোন ইস্কুলে ভর্তি হবে? কিন্তু আমি তো সে সব সম্বন্ধে জানি না। সরকার-মশাইকে বললে বাবাকে কৈফিয়ৎ—জানাজানি!'

আবারও মাথা নাড়ায় রতন।

কান্তির মাস্টারমশাইও এসে রোজ ফিরে যেতে হয় বলে শত অনুযোগেও আসছেন না। সেটাও মনে প'ড়ে গেল দুজনকারই।

'মাস্টারমশাইকেই বরং খবরটা দিই। এবার থেকে নিয়মিত আসুন।'

'না-না। ওঁকে না। তুমি বরং সরকারমশাইকে বল অন্য একজন মাস্টারমশাই ঠিক করতে। এঁকে দিয়ে চলছে না, ভাল একজন মাস্টারমশাই চাই—এ বলতে তো কোন দোষ নেই। তাতে কি কিছু—মানে মনে করবেন ওরা?'

'না না। তা মনে করবেন কেন? তাই বলি বরং সরকারমশাইকে। একটু যদি চেপে পড়ান, বেশী ক'রে নজর দিয়ে। নাহে ঘণ্টা-দুই আড়াই—না হয় বেশী মাইনেও দেবেন কিছু।'

'সে রকম হ'লে বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ টাকা হেঁকে বসবেন!' ভয়ে ভয়ে বলে কান্তি।

'তা হোক। টাকার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কান্তি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এবার আস্তে আস্তে সে দূরে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। ঠিক পরের দিনই—সরকারমশাইকে ডেকে নতুন মাস্টার খোঁজার কথা বলবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তখন তিনটে চারটে হবে, রতনদির খাটে পাতলা বাঘের ছবি আঁকা বিলিতি কম্বলটার মধ্যে ওরা দুজনে ঘুমোচ্ছিল।

দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎ সে দোরটা খুলে ফেলে ঢুকলেন রতন দা—না বাবু—দত্তসাহেব। ঘরে ঢু দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দি একেবারে।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত যে ঘুম ভেঙে গে ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লা ওদের। তারপরই ধড়মড় ক'রে দু দুদিক দিয়ে নেমে এল খাট থে কিন্তু দত্তসাহেবের মুখ দেখেই বু ওরা যে আজ আর রক্ষা নেই কার ওঁর দুদিকের রগে শিরাগুলো ফু উঠে দব্‌দব্‌ করছে তা এখান থে দেখা যায়। দুই চোখ টক্‌টকে লা হয়ত মদও খেয়েছেন একটু—কি এ লাল অন্যরকম—মাথায় রক্ত ও দরুণ এত লাল হয়েছে নিশ্চয়।

ওদের তরফ থেকে কিছু বলবা কৈফিয়ৎ দেবার কি ক্ষমা চাই কোন অবসর মিলল না। জিজ্ঞাস করলেন না দত্তসাহেব। কেউ কোথ চুকলি খেয়েছে নিশ্চয়। পাকা খ পেয়েই এসেছেন। কৈফিয়ৎ অনেক দে চলতে পারত অবশ্য—ভাইবোনে, বিশে ছোট ভায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোও কিছু অন্যায় নয়, অশোভনও ন কিন্তু সে কৈফিয়ৎ শুনবে কে? ওদে দেবার মতো অবস্থা নয়। দাঁড়ি ঠকঠক ক'রে কাঁপা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারল না ওরা। মুখ দিয়ে এক শব্দও বেরোল না। আর সেইটেই ওদের তরফ থেকে অপরাধের স্ব স্বীকৃতি।

প্রস্তুত হয়েই এসেছেন দত্তসাহে

যে ছাড়খানা এতক্ষণ পিছনে লি সেইটে এবার সামনে এল।।

শঙ্করমাছের চাবুক একটা এ বস্তুটা চেনে কান্তি। এ ঘরেও এক টাঙানো আছে।

হিস হিস ক'রে উঠলেন দ সাহেব, 'হারামজাদা কুকুর—তুমি মুখ দি এসেছ ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে! এ আস্পর্দা তোমার! এত সাহস! এ সাহস কোথা থেকে এল তাই ভাবি ভিখিরী বামুনের ছেলে—পেট পু ভাত জুটছিল না—আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিলুম—তার এই শো প্রতিদান। এই তো নিয়ম, আমাদেরই খে আমাদেরই গলায় [illegible] ক [illegible]

সাপের দস্তুরই যে এই। তবে সাপের ওষুধও আমার জানা আছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। হারামজাদা, বজ্জাত বাচ্চা কাঁহাকা।

সব কথা শুনতেও পেল না কান্তি। কারণ তার আগেই সপাসপ চাবুক পড়তে লাগল—পিঠে হাতে বুকে মুখে—সর্বত্র। কেটে কেটে বসতে লাগল শঙ্কর মাছের চাবুক। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। রতন ব্যাকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, চাপা রোষে ধমক দিয়ে উঠলেন দত্তসাহেব—

চুপ! তুমি কি ভাবছ তুমি বাদ যাবে? ও কসবীর জাতকে শাসন করতে হয় কী করে তা আমি জানি। ওর হয়ে সুপারিশ করতে আসছ!... নিজের ভাবনা ভাব গে। তবে এ আগে। কসবী কসবীর ধর্ম পালন করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্যায়ের কোন মাপ নেই। বেইমানী হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ—

চাবুক কিন্তু বন্ধ নেই এক মিনিটের জন্যেও। কান্তি এতক্ষণ ছট-ফট করছিল, এই বৃষ্টির মতো আঘাতের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষার একটুকু ফাঁক খুঁজছিল আকুল হয়ে—দুই হাত বাড়িয়ে, অন্ধের মতো। এবার অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল সে।

এক মুহূর্তও থামলেন না দত্ত-সাহেব, একবার ফিরে তাকালেন না তার দিকে, একবার হাতটা পর্যন্ত বদল করলেন না। বাঘের মতো গিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন রতনের ওপর। এবারের আঘাতটা যেন আরও নিষ্ঠুর, আরও সাংঘাতিক, আরও অব্যর্থ।

একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না।

জামাকাপড় ভেদ করে সে চাবুক মাংসতে চেপে বসে সেগুলোকে রক্তে ভিজিয়ে তুলল।

এরা কেউই আসেনি, চেঁচামেচি করেনি। কিন্তু নিচে থেকে সবাই ছুটে এসে জড়ো হয়েছে বাইরে। অমন তাদের অসময়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বাবুকে ছুটে ওপরে আসতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছে তারা। তাছাড়া চাবুকের শব্দ বন্ধ দোরের মধ্য দিয়েও বাইরে আসছিল।

মোক্ষদা হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা কী হবে গো। একটা খুনো-খুনি করবে নাকি শেষমেষ। ওমা—কোথায় যাব গো। থানা-পুলিশ করতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। ওগো ও জামাইবাবু খোল খোল দরজা খোল। দরজা বন্ধ ক'রে আবার কী শাসন। শেষে কি সবাইকার হাতে দড়ি দেওয়াবে নাকি। অ ঠাকুর, যাও যাও কর্তাবাবুকে ডেকে নে এস। আর, দারোয়ান তুমিই বা কী রকম লোক গা। এত ডালরুটি খাও মজা মজা ......একটু গায়ে জোর নেই, দরজাটা ভাঙতে পারছ না! মনিব খুন হচ্ছে ওধারে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ সঙের মতো। ভাঙো ভাঙো কপাট ভেঙে ভেতরে সেঁধোও—

দারোয়ান সাহস পেয়ে দুম-দুম লাথি মারতে লাগল দরজায়। একটু পরে কর্তাবাবু অর্থাৎ রতনের বাবাও ছুটে এলেন। ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'এ সব কী হচ্ছে কী? দত্ত, এই দত্ত—দরজা খোল শিগ্‌গির!'

ততক্ষণে রতনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। রক্তাক্ত চাবুকটা শেষবার ওর অনড় দেহটাতেই আছড়ে ফেলে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন দত্তসাহেব। ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে একটু চড়া গলাতেই কি বলতে যাচ্ছিলেন কর্তাবাবু, এক ধমকে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'তুমি চুপ ক'রে থাকো! বুড়ো শুয়োর কোথাকার! মেয়ে বেচে খাচ্ছ বসে বসে—মেয়েকে পাহারা দিতে পার না? পথের কুকুর এসে ঘরে ঢুকছে দেখতে পাও না? ছোটলোকের জাত!'

তারপর সকলকার সামনে দিয়েই গট গট ক'রে বেরিয়ে চলে গেলেন তিনি।

কর্তাবাবু পর্যন্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না!

এরপর কদিন আর কান্তির কোন জ্ঞান ছিল না। কদিন তাও জানে না সে। গায়ের ব্যথায় আর প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। গায়ে নাকি ঘাও হয়ে গিয়েছিল চার-পাঁচ জায়গায়।

যেদিন জ্ঞান হ'ল সেদিন দেখলো পাশে একটা টুলে ডাক্তারী ওষুধ সব রয়েছে। কাটা ঘাগুলোতেও মলম লাগানো। অর্থাৎ ডাক্তার ডাকা হয়েছে, শুশ্রূষাও হয়েছে কিছু কিছু। আরও ভাল ক'রে জেগে দেখল যে, সে তার

ওপরের ঘরে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

জ্ঞান হবার পর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল ওর—তা হচ্ছে অপরিসীম লজ্জার। ছি ছি, এ বাড়িতে আর মুখ দেখাবে কি ক'রে—এই সব ঝি-চাকরদের সামনে! এখনই পালিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোথায়ই বা পালাবে। বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে! সেখানে গিয়েই বা কোন মুখে দাঁড়াবে!

একটু পরেই হাসিহাসি মুখে মোক্ষদা এসে দাঁড়াল।

'এই যে. হু'শ ফিরে এসেছে? বাচ বাবা, বাঁচা গেল। যা ভাবনা হয়েছিল! এধারে ইনি প'ড়ে রজ্ঞান-রচৈতন্যি—ওধারে উনি পড়ে। আমরা যাই কোথায় বল দিকি! তবু ভাগ্যে জামাইবাবুই ডাক্তার পাঠিয়ে দেছ'ল তাই রক্ষে!'

তারপর একটু থেমে আঁচলের নাড়া দিয়ে কান্তির মুখের ওপর থেকে মাছি সরি'য় দিয়ে বলল, 'নাও, এবার চটপট সেরে উঠে সময় থাকতে থাকতে সরে পড় দিকি। ব্যবস্থা একটা হয়েছে যেকালে সেকালে আর দেরি ক'রে নাভ নি। মানুষের মন না মতি। এখন মত হয়েছে আবার সে মত ঘুরে যেতে ক্যাতক্ষণ? এই বেলা কাজ গুছিয়ে নাও!'

কান্তির এ সব বোঝার কথা নয়। তার তখনও একটু জ্বর রয়েছে, দুর্বল মাথায় এ সব কথা ঢুকলও না। সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই রইল মোক্ষদার মুখের দিকে।

মোক্ষদাই বুঝিয়ে দিলে এবার, 'তা বাপু মারুক ধরুক যা-ই করুক—এধারে মানুষটার বেবেচনা আছে, তা কিন্তুক মানতেই হবে। আমরা তো ভাবনু তাড়িয়েই দেবে সোজাসুজি, দেশে গিয়ে যেখানকার ছেলে সেখানে উঠতে হবে। মুখ দেখাবে কী ক'রে সেই ভাবছিলুম। তা সেদিক দিয়ে যাবু যায়নি, হুকুম দিয়েছে কোথায় কোন ওর জমিদারীতে কি রিস্কল আছে সেখানে যদি গিয়ে থাকতে চাও তো রিস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—কাছারীবাড়িতে থাকবে, রামলাদের সঙ্গে খাবে—রিস্কুলে পড়বে। খরচা সব তেনার। তবে নবাবি চলবেনি। গরীব গেরস্তর চালে থাকতে হবে। পোষায় ভাল, তিনি নোক দেবে, সঙ্গে গিয়ে ভর্তি ক'রে দে রাসবে, আর না পোষায় তো পত্তরপাঠ তোমাকে পথ দেখতে হবে।...তা আমি বাপু তোমার হয়ে বলেই দিয়েছি ও সেখানে যেতেই আজী।......জানি তো দেশে-ঘাটে বাবার মুখ নি তোমার—কোথায় যাবেই বা!'

এই প্রথম মোক্ষদা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করল কান্তি। আঃ বাঁচা গেল! বাঁচা গেল! বে'চে গেল সে। বাঁচল এই লজ্জা থেকে শুধু নয়—সর্বনাশ থেকেও। আর কোন পথ কোথাও ছিল না। বাড়ি গেলে পড়াশুনো আর হ'ত না এটা নিশ্চিত। এ তবু নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করার একটা সুযোগ মিলল। এখন যদি চেপে খাটে তাহ'লে আবারও হয়ত ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

হায় রে! তখন যদি জানত দত্ত-সাহেবের এই আপাত-দয়ার পিছনে কি সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা আছে! সামান্য দৈহিক শাস্তিতে কিছুই মন ওঠেনি তার, দুঃসহ ক্রোধের কিছুমাত্র শান্তি হয় নি। বড় রকমের শাস্তির জন্য তাঁর এই সদয় প্রস্তাব। পৈশাচিক শাস্তি—যা দীর্ঘকাল মনে থাকে, সারা জীবনে যা বাঘের দাঁতের মতো স্থায়ী দাগ রেখে যায়—তারই জন্যে এই বদান্যতার ব্যবস্থা, এই আয়োজন।

মোক্ষদা বলল, 'তাই বলছিনু তোমায়—মেজাজ ভাল থাকতে থাকতে সেখানে গে চেপে ব'সো গে যাও। তার-পর আর কী মনে থাকবে ওর! বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! একবার হুকুম হয়ে গেলে রামলা-গোমস্তরা ঠিক খরচা জুগিয়ে যাবে পয়ের পর। মোদ্দা আর দেরি ক'রোনি। কখন আবার মেজাজ পালটে যাবে, অত চড়ে যাবে মাথায় আবার দুম ক'রে কী বলে বসবে!...দেখলে তো—যা বলেছিনু সেদিন, তাই ফলে গেল রক্ষরে রক্ষরে। খুন হওনি সে তোমার গুরুর ভাগ্যি, আর আমাদের বাপ-মা'র পুণ্যি—বামুনের অক্ত দেখতে হ'লনি। গরীবের কথা বাসি হ'লেই খাটে। এবার আর দেরি করো নি। আমি যে মানুষ চিনি—এই সব বাবু ভাইদের চিনতে কি আর বাকী আছে। ঘরের মাগকে পাহারা দেয় কে তার ঠিক নি—বাইরের আঁড়কে পাহারা দেবার জন্যে চোখে ঘুম নি! হাস্তোর বড়মানুষ রে!'

বোধ করি একটু দম নেবার জন্যই থামল একবার মোক্ষদা। সেই ফাঁকে কান্তি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আজই যেতে চাই মোক্ষদাদি, যত শিগ্‌গির পার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও—সরকার-মশাইকে বলে। আমি আর একদিনও থাকতে চাই না।'

'ওমা, তাই বলে কি আজই এক্ষুনি যাওয়া হয়। এখনও গায়ে তাত অয়েছে বেস্তর' হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালটা দেখে নিল মোক্ষদা, 'ওঠো, একটু ভাল হও। পথ্যি কর দুটো—তারপর তো যাওয়ার বন্দোবস্ত। ভয় নি—একদিনে কিছু মহাভারত রশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সরকারমশাইকে তো আমি তোমার জবানীতে বলেই দিয়েছি, তিনিও নাকি চিঠিপত্তর নিকে দিয়েছে!'

এর তিন-চার দিন পরেই প্রথম যেদিন ভাত পেল সে—সেই দিনই রওনা হয়ে গিয়েছিল কান্তি, কিছুতেই আর থাকতে রাজী হয়নি।

যাবার আগে রতনের সঙ্গে দেখাও হয়নি আর। সে কথা কেউ বলেওনি। রতনও চেষ্টা করেনি দেখা করার। কান্তিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। হয়ত দত্তসাহেব শুনতে পেলে আবার রাগ করবেন, হয়ত রতনদিকেই তার জন্য কথা শুনতে হবে। কিম্বা আবার মার খেতে হবে—! নিজের আঘাত দিয়েই রতনদির কী পরিমাণ লেগেছিল তা বুঝতে পারে কান্তি। অমন ননীর মতো নরম দেহে ঐ চাবুক যখন কেটে কেটে বসেছে তখন না জানি কী যন্ত্রণাই পেয়েছে রতনদি। আজও সে কথা মনে হ'লে দু' চোখে জল ভরে আসে তার। সত্যিই বড় দুঃখী রতনদি, বড় অসহায়। সে তো তবু পালিয়ে যেতে পারছে, ওকে পড়ে মার খেতে হবে। থাক, আর দেখা করার চেষ্টা কর'বে না সে। তাছাড়া, রতনদিও লজ্জা পাবে মিছিমিছি। এমনিই বোধ হয় লজ্জাতে মরে যাচ্ছে সে। আর লজ্জা বাড়িয়ে দরকার নেই।

সেও ভাল হয়ে উঠেছে, ভাত খেয়েছে এটুকু মোক্ষদাই একদিন উপযাচক হয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেই জেনেই নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে-ছিল কান্তি।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

সন্তোষকুমারী রোহাতগির একক প্রদর্শনী

গন্ডোলাজ

শিল্পীঃ রোহাতগি

সন্তোষকুমারী রোহাতগি কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে কিছুকাল দিলীপ দাশগুপ্তের স্টুডিওতে কাজ করেন। পরে স্কলারশিপ নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান। বিভিন্ন জায়গায় তিনি ইতি-পূর্বে প্রদর্শনী করেছেন। এটি তাঁর পঞ্চম একক প্রদর্শনী। আর্টিস্ট্রি হাউসে বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর হাল-আমলের ইউরোপ-ভ্রমণের সময় আঁকা পঁয়তাল্লিশখানি ছবি এবং স্কেচ প্রদর্শন করছেন। সবগুলিই তেল রংয়ে আঁকা।
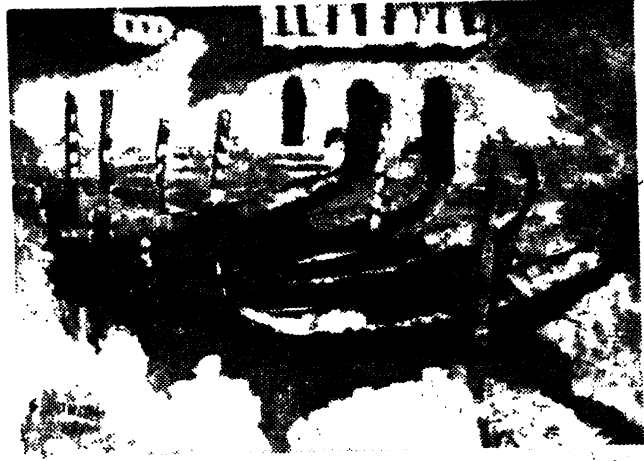
শ্রীমতী রোহাতগির ছবিগুলির মধ্যে একটা উজ্জ্বল, কোমল এবং সতেজ ভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ভ্রমণকালে যা কিছু তাঁর চোখে লেগেছে তাই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাতে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাড়ী ঘর, নিসর্গ দৃশ্য, পথ-ঘাট, বুল ফাইট, বাজার, প্রমোদশালা, পার্ক কিছুই উপেক্ষা করেন নি। ইম্প্রেশনিস্ট ধারার অনুসরণে আলোছায়া, এবং আবহাওয়া ফোটানোর প্রচেষ্টাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী তবে সুরুচিসম্মত রংয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমতল প্যাটার্ণ সৃষ্টির দিকেও তিনি সমান নজর রেখেছেন। 'আর্লি কাস্টমার' (১১), মর্নিং লাইট (৩৩), ক্যানাল, ভেনিস (৩৪), 'গন্ডোলাজ' (৩৫), ব্ল্যাক স্টকিংস (৩২) প্রভৃতি ছবি-গুলির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে 'মাদমোয়াজেল ফে'র স্কেচটিতে (২২) খুব আলোর মধ্যে একটি চরিত্রের আভাস আনা হয়েছে। প্রদর্শনীর ছবিগুলির কোনটিই বিশেষ বড় মাপের নয়। কিন্তু এর মধ্যেও নিসর্গ চিত্রগুলিতে বেশ বিস্তৃত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে। একই কারণে আজকের গৃহসমস্যার দিনে ছোট ঘরেও ছবিগুলি টাঙ্গানোর সুবিধা রয়েছে। প্রদর্শনীর সাজসজ্জা সন্তোষজনক।

ওয়ার্কারস্

শিল্পীঃ রোহাতগি

কোন দেশেই বা তাঁরা অপরিচিতা? —রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে তাঁরা পরিহাসের পাত্রী। বয়োকনিষ্ঠরা তাঁদের জন্যে সমবেদনা বোধ করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা করেন বিদ্রুপ। নীতিবাগীশেরা সন্দেহ। সরকার মনে করে প্রতিকারসাধ্য সামাজিক সমস্যা। আদমসুমারীতে তাঁদের বলা হয় একক-নারী। সমাজতত্ত্ববিদদের সভায় 'যৌন-উদ্বৃত্তা।'

—এরা সেই অপরাধিনীরা—যৌবনে যাঁরা মোহজাল, কিম্বা যৌতুক-কৌতুক-হাস্য-লাস্য, যে কোন উপায়েই হোক না কেন, কোন পুরুষকে আকৃষ্ট করে শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনে বাঁধতে পারেননি।

প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইংল্যান্ড ও ওয়েলশে নারী-পুরুষের সংখ্যার সামঞ্জস্য নেই, প্রথমোক্তরা সংখ্যায় প্রায় ৫০ লক্ষ বেশি। অবশ্য এই সংখ্যা-গরিষ্ঠাদের মধ্যে বৃহত্তম অংশ হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বৃদ্ধা। কিন্তু ২০ থেকে ৪৫ বছরের উদ্বৃত্ত নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ। সেই পনেরো লক্ষের মধ্যে একটি অংশ আবার বিধবা কিম্বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না। বাকি প্রায় ১৩৪৫০০০ জন বিবাহ-সম্ভাবনারহিত বা চিরআইবুড়ো। ফ্রান্সে অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৮ (পুরুষ ৯·৫)। নরওয়েতে জনসংখ্যার (অর্থাৎ নারী ও পুরুষ) ১৮ শতাংশ এবং সুইডেনে ১৭ শতাংশ অবিবাহিত। মার্কিন দেশে অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে কম মাত্র ৩·৮ শতাংশ কিন্তু অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৮ শতাংশ।

এঁদের দাম্পত্য-সঙ্গী হবার মত শুধু যে যথেষ্ঠ সংখ্যক পুরুষ নেই তাই নয় - পুরুষদের একটি লক্ষণীয় অংশ * বিচিত্র সামাজিক ব্যাধি সমলিঙ্গায় বিকৃত-রুচি। নারীদের মধ্যেও সমলিঙ্গ নেই তা নয়, কিন্তু তা সংখ্যায় নগণ্য। প্রায় সব যৌন-উপবাসী, অনাগতদের জীবন নিঃসঙ্গ, উপেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিষণ্ণ।

একজন অবিবাহিত পুরুষ যে কোন বয়সে যতজন খুশি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে। তাতে দোষ সামান্য, বাহবা প্রচুর। মেয়ের বয়সী কোন তরুণীকে নিয়ে সে নির্বিকারে কোন মজলিশে হাজির কিম্বা সপ্তাহ শেষে অবকাশ যাপন করতে যেতে পারে। লোকে তার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বলবে, 'স্ফূর্তিবাজ অকৃতদার।' দোষ যদি দিতে হয় দেবে সেই সঙ্গিনী মেয়েটিকে।

বস্তুতপক্ষে, অবিবাহিত পুরুষের যা-হোক-একটা যৌন জীবন থাকবেই—এটা যেন প্রকাশ্যে কিম্বা অপ্রকাশ্যে ধরেই নেওয়া যায়। বরং সে যদি সম্পূর্ণভাবে নারী-সংসর্গ এড়িয়ে চলে তা হলেই লোকে তাকে পূর্বোক্ত ধরণের কোন যৌন-স্খলন, মনোবিকার কিম্বা মাথায় ছিটের সন্দেহ করবে।

আর মেয়েদের বেলা?—এই তো সে দিন পর্যন্ত বলে আসা হয়েছে যে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কোন যৌন প্রবৃত্তি নেই। যদিবা থাকে, তাহলে তাকে দমন করা উচিত। আর সেই দমনের নামে আমাদের দেশে ও সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের অজ্ঞাত-অন্ধ ও অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার জবরদস্তি চালু রাখা হয়েছিল ও হয়েছে। আমাদের বালবিধবাদের দেহ-মনের ওপর হৃদয়হীন উৎপীড়ন করা হয়েছে। আর পাশ্চাত্য বর্বরতার চরম প্রকাশ পেয়েছে 'চেসটিটি বেল্টে'।

আজ অবশ্য মনোবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের বিপুল বিপ্লবের পর মেয়েদের যৌন নিষ্ক্রিয়তাবাদ অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে কেউ স্বীকার করবেন না। বরং অনেকেই বলবেন মেয়েদের কামনা-বাসনা পুরুষের চেয়েও গভীর, গহন ও ব্যাপক। কারণ তার দেহ-মন সব কিছুই অনেকটা সন্তান ও আদিম সৃষ্টি পরিকল্পনার অধীন। মানব অস্তিত্বের আদি-উৎস সেই পরিকল্পনা হচ্ছে মাতৃত্ব।

তবু আজ যদি কোন ক্ষয়িষ্ণু-যৌবনা অপরিণীতা মনের বাসনা ব্যক্ত করে তা হলে?—চারদিক থেকে নির্মম তিরস্কার বর্ষিত হবে, সম্ভব হলে তাকে নির্যাতিত করা হবে।

মনোবাসনা গোপন রাখলেও তার একলা চলা সহজ নয়। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিলাম। বৃটেনেও একজন অবিবাহিতা প্রাপ্তবয়স্কার ঘর ভাড়া পাওয়া সহজ নয়। তিনি যত শিক্ষিতা ও সম্মানিত পেশারই অধিকারিণী হোন না কেন, একজন অশিক্ষিতা বাড়ীওয়ালীর শালীনতাহীন সন্দেহ ও বক্রবচন তাঁকে নিষ্প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে। ঘরে তিনি তাঁর কোন পুরুষ-বন্ধুকে আনলে হয়তো পরের দিন ঘর ছেড়ে দেবার পরোয়ানা আসবে। আর কোন সমবয়সী বান্ধবীর সঙ্গে হৃদ্যতা হলে মুচকি হাসির চোরা আঘাতে মন ও মেজাজ ক্ষত-বিক্ষত হবে। চতুর্দিকে ফিসফিসানী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে 'ওরা সমলিঙ্গ। লেসবিয়ান'।

আর যদি কোন কারণে কোন বয়োকনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু বাড়ে? তা হলে তার নতুন নামকরণ হবে, 'বালক শিকারী'। —এ শুধু বৃটেনেই নয়। যুদ্ধের পর রাশিয়াতে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হারে যে দারুণ তারতম্য ঘটে তা পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি। মধ্য-তিরিশ নারী-পুরুষের মধ্যে সেই তারতম্য গিয়ে দাঁড়ায় ১ জনে ৭ জন। তৎসত্ত্বেও সে সময় কিম্বা এখন, কোন বয়স্কা নারী যদি সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি কম বয়স্ক কোন পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে তাহলে সে নিন্দা ও বিদ্রুপের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

অতএব সমাজের এই সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ, উৎপীড়ন, বিদ্রূপ ও অনুকম্পায় এবং সর্বোপরি নিজ অন্তরের দমিত বাসনার প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ সে তিরীক্ষে মেজাজ ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে লাবণ্য শুকিয়ে যায়। বিপ্রলব্ধ

---

* ১৯৫৪ সালে পার্লামেন্ট নিযুক্ত বিখ্যাত উলফেনডেন কমিটি কর্তৃক ১৯৫৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩১ থেকে '৫৪ সালের মধ্যে ঐ অপরাধ ১৩০৩ থেকে ১১৯১৬তে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য আইনের জালে ধরা নজিরের সাহায্যে ঐ জাতীয় অপরাধের সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়।

Richard Hanser নামক সমাজতত্ত্ববিদের The Homosexual Society অনুযায়ী শতকরা ৪ জন লোক পুরোদস্তুর সমলিঙ্গ। অন্য 'সমলিঙ্গ' নামে পরিচিতরা প্রকৃতপক্ষে উভয়লিঙ্গ। Jess Stearn নামক অন্য এক লেখকের The Sixth Man অনুযায়ী এ দেশে প্রতি ছজন পুরুষের একজন সমলিঙ্গ। তবে তারা পুরোদস্তুর না আধাআধি তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।

জীবনের ক্ষোভ আত্মম্ভরিতায় প্রকাশ পেতে চায়। বলে বিয়ে করার ঝঞ্ঝাট ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে সে খুশি। আর পুরুষের সাহচর্য? 'ছোঃ, কে

চায়? তারা তো শুধু একটি জিনিষই বোঝে।'

হায়! অন্তরের অতলে তার মত কে আর পরিষ্কার করে জানে যে ঐ 'একটি জিনিষই' যদি কোন পুরুষকে সে দিতে পারতো তবে যা কিছু দেবার তা সে কেমন অকৃপণভাবে লুটিয়ে দিত।

অবশ্য এর পরও নীতিবাগীশরা বলতে পারেন যে, অবস্থা যখন এমনি প্রতিকার-অসাধ্য তখন অনূঢ়ারা কেন ব্যষ্টি বা সমষ্টি সেবায় অথবা সন্ন্যাস-ব্রতে বাকি জীবনটা অতিবাহিত করেন না?—এর উত্তরে ফরাসী লেখক রোঁমা রোঁলার ভাষা পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে, "আমি এমন একটি লোককেও চিনি না যার চরিত্র অশ্লীলতম যৌন সাহিত্যের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু এমন বহু লোককে আমি দেখেছি যাদের চরিত্র খুব সম্ভ্রান্ত নীতিবাগীশের নির্দেশে সম্পূর্ণভাবে বিপথগামী হয়েছে।"—কারণ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শুধু তো ধর্মানুষ্ঠানের পদ্ধতির দ্বারা নির্দেশ মাফিক নির্জীব করে ফেলা যায় না, বা করলেও তার ফল ভাল হয় না।

আর সন্ন্যাস যদি কেউ গ্রহণ করে তবে অন্তরের টানেই তা করা বিধেয়, অবস্থাচক্রে পড়ে নয়। কারণ তা হচ্ছে মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙানো। তার দারুণ প্রতিক্রিয়ার সাময়িক বর্ণনা স্থান-সাপেক্ষ।

এ'দের বিপরীত পন্থীরা বলবেন যে, এই অবহেলিতা যৌবনাদের জীবনে অন্তত আংশিক পূর্ণতা আনার জন্যে সমাজের সনাতনী নরনারী সম্পর্ককে একটু শিথিল করা হোক। কিন্তু তার অনিবার্য পরিণাম হবে জারজ জন্মের বহুল বৃদ্ধি, অগণিত বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অশান্তি ও যৌন-ঈর্ষা।

এতদুভয়ের মধ্যব্যবস্থা হতে পারে অনূঢ়ারা সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বিনী হয়ে শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, কারুশিল্প প্রভৃতি কোন সুকুমার বৃত্তির চর্চায় মনের উৎকর্ষ সাধনে নিমগ্ন থাকবে। অনুরূপ অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়েই তাই করেন।

কিন্তু এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, যে-মন যত সংস্কৃত তা ততই সংবেদনশীল। ততই সে উপলব্ধি করে এ বৃহৎ বসুন্ধরা কী অর্থে যে ভরা। তাই পঞ্চশরের বেদনামাধুরী তার পক্ষে আরো মর্মান্তিক।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে একাকী

তাই যখন দাদুরী ডাকা বর্ষামুখর রাতে কিম্বা বনের আঙিনায় গন্ধবিভোল দক্ষিণ বায় জলস্থলের মর্মদোলায় দোল দিলে, ঝরা বকুলের কান্নায় আকাশ ব্যথিত হলে তার মন বিষাদ-ঘন হয়ে উঠবে। মাধবীলতার মঞ্জরী-মঞ্জরী ফুল ফোটার যে বেদনা সেই বেদনা তাকে আকুল করবে। প্রতিটি ঋতুচক্রের আবর্তনে উপেক্ষিত বন-গোলাপের রক্ত-পাপড়ির মত তার অন্তরের জীবন-সম্ভাবনা ঝরে পড়বে। তবু ভ্রমর আসবে না।

সংগীত বীক্ষা

আনন্দভৈরব

॥ সংগীত সম্মেলন ॥

গত সপ্তাহের অমৃত পত্রিকায় নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অধিবেশনে বেহাগড়া রাগে খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশন করেন শ্রীমতী মালবিকা কানন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে বেহাগড়া রাগের রূপায়ণ রসগ্রাহী হয়েছে। অতঃপর পূরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। ওস্তাদ আমীর খাঁ কিরানা ঘরানার প্রখ্যাতনামা শিল্পী। রাগ-রূপায়ণে তাঁর স্বর-প্রয়োগের পদ্ধতি ও মেজাজ প্রশংসার দাবী রাখে। রাগবিশেষে মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে বিস্তারিত আলাপের পরিবেশনে রাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করা এই শিল্পীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূরিয়া-কল্যাণের পর ওস্তাদ আমীর খাঁ বাগেশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। বাগেশ্রী রাগে তাঁর ঋষভ, কোমল গান্ধার ও মধ্যম স্বরত্রয়ের পর-পর বার-বার প্রয়োগ একটু অভিনব মনে হয়েছে। একটি রাগের পর আর একটি রাগ আরম্ভকালে পরবর্তী রাগের আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার আশা স্বভাবতই মনে জাগে। পূরিয়া-কল্যাণের পর দুটি রাগের গান শিল্পী এমন হঠাৎ ধরলেন যে রাগের আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার আশা মনেই রয়ে গেল। ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠান ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ কর্তৃক সেতার-বাদন। তিনি সেতারে বাগেশ্রী রাগের আলাপ জোড় ঝালা বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের গৎ এবং পরে ঠুংরি পরিবেশন করেন। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ বাগেশ্রী রাগের চমৎকার রূপায়ণ করলেন। এই রাগে পরিবেশিত আলাপের পরবর্তী অংশগুলিতেও পূর্বাপর একটি বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। পূর্বাপর এই সামঞ্জস্য রাখার ক্ষমতা খুব কম শিল্পীরই থাকে এবং একই শিল্পীও তাঁর সব অনুষ্ঠানে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হন না। রাগেশ্রী রাগে স্পষ্টতই বাগেশ্রী রাগের ছায়া আসে। কিন্তু শুদ্ধ গান্ধারের সুষ্ঠু প্রয়োগে সেই ছায়া তিরোহিত হয়। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতার-বাদনের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-বাদনে শৈলীকুশলতা ছাড়াও একটা সজীবতার ভাব আছে। এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর তবলা-সহযোগিতায় বিশেষ সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

সপ্তম অধিবেশনে প্রথমে দরবারী কানাড়া রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন বিষ্ণুদিগম্বর ঘরানার অন্যতম ধারক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর। পাণ্ডিত্য, সংগীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়ার অধিকার, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বাচন-শক্তি, শুদ্ধাচার ইত্যাদির বিবেচনায় পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ সর্বকালেই দুর্লভ। এই শ্রদ্ধেয় শিল্পী প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, কিন্তু কণ্ঠস্বর আজও তাঁর উদাত্ত। বিশেষ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের গভীরতা (depth of voice) বিস্ময়জনক। অনেক শিল্পী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েও গভীর কণ্ঠস্বরের deep voice অধিকারী হন না। এটি কতকাংশে সাধনা দ্বারা লব্ধ হয়, তার উপভোগ্যতার স্বতন্ত্র মজা আছে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের দরবারী কানাড়া রাগের রূপায়ণ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিকতর স্থিতির জন্য, সাধারণ কোমল গান্ধার অপেক্ষা এক শ্রুতি নিম্নগামী অতি-কোমল গান্ধারের প্রয়োগ ও আন্দোলনের জন্য রাগটির গাম্ভীর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। রাগবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীর পক্ষেও স্থৈর্যের আবশ্যক হয়। পণ্ডিতজীর পরিবেশনে এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আমরা আনন্দ পেয়েছি। বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের পর তাঁর মধ্য লয়ের খেয়াল-গায়নও উপভোগ্য হয়েছে। মধ্য লয়ের খেয়াল আজকাল কমই শোনা যায়, যদিও তার বিশেষ মজা আছে বলে শোনার ইচ্ছে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মধ্য পন্থার আর সন্ধান মেলে না, বিলম্বিতের পরেই একেবারে দ্রুত লয়ের আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টম অধিবেশনে আড়ানা রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্যা শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। আড়ানা রাগে কেউ দুই নিষাদ ব্যবহার করেন, কেউ কেবলমাত্র কোমল নিষাদ ব্যবহার করেন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে শেষোক্ত রূপ আড়ানা পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার সুষ্ঠুভাবে রাগটি পরিবেশন করে রাগোচিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। একটি ভজন গান গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। এই অধিবেশনে ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেন শ্রীমতী পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনী ও সম্প্রদায়। কথক নৃত্যে লয়কারির অংশ প্রধান। ভারতনাট্যম নৃত্যে লয়কারির প্রাধান্য তার তুলনায় ততটা না থাকলেও নৃত্য-ছন্দের সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে ভাবাভিব্যক্তি মিলে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভারতনাট্যম দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য। সেজন্য এই নৃত্যের সঙ্গে নেপথ্য থেকে যে সংগীত পরিবেশিত হয় তা প্রায়শঃ দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটিক সংগীত-ভিত্তিক। শ্রীমতী পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনীর নৃত্য মোটামুটি উপভোগ্য হয়েছে, তবে তাঁর নৃত্যে লাস্যের ভাব কিছু বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের নবম ও শেষ অধিবেশনটি ছিল সারা রাত্রিব্যাপী। এই অধিবেশনের আরম্ভে ছায়ানট রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের খেয়াল পরিবেশন করেন কুমারী শুচিস্মিতা মিত্র। এবারে সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত ইনিই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। সম্মেলনে প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে নবীন শিল্পীদেরও সুযোগ দেওয়া ভাল। কুমারী শুচিস্মিতা বেশ ধীর-স্থিরভাবে ছায়ানট রাগের রূপায়ণ করলেন। আমরা এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-লহরা উপভোগ্য হয়েছে। তারপর এই অধিবেশনে যথাক্রমে শ্রীশিবকুমার শুক্লা হংসধ্বনি ও আড়ানা রাগে খেয়াল, শ্রীমতী জারিন দারুওয়ালা স্বরোদে কৌশিকী-কানাড়া ও পাহাড়ী-ঝিঁঝিট রাগ, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক গোরখ-কল্যাণ রাগে খেয়াল ও পরে ভজন, ওস্তাদ গোলাম হোসেন সাগ্গান দরবারী-কানাড়া, সুহা ও অহীর ভৈরব রাগে খেয়াল, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সেতারে বসন্তকালি রাগ ও পরে ভাটিয়ালী সুর এবং সবশেষে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ভৈরব-বাহার রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন। উল্লিখিত শিল্পীগণ এই সম্মেলনে পূর্বের কোন-না-কোন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রেই পূর্বদিনের অনুষ্ঠানই অধিকতর রসোত্তীর্ণ হয়েছে। পণ্ডিত ভি জে জোগের শিষ্যা স্বরোদ-শিল্পী শ্রীমতী জারিন দারুওয়ালা নবাগতা। সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর স্বরোদ-বাদন পূর্বদিনের চেয়ে ভাল হয়েছে। ওস্তাদ গোলাম হাসান সাগ্গানও নবাগত শিল্পী। পূর্ব অধিবেশন অপেক্ষা সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর খেয়াল পরিবেশন নিকৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর স্থৈর্য ও গায়ন-সংযমের অভাবে দরবারী কানাড়া রাগের গাম্ভীর্য ও রস নষ্ট হয়েছে।

যে সকল শিল্পী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আলোচনা করা হল তাঁরা ছাড়াও এই সম্মেলনে আরো অনেক শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন ও যথাসম্ভব নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে সব অনুষ্ঠানের আলোচনা করা তথা বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। অল্প হোক, বেশি হোক, গত কদিনে তাঁরা যে আনন্দ দান করলেন তার মূল্যও কম নয়।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গীত হওয়ার পর নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

একটি সন্ধ্যা

আভা পাকড়াশী

প্রথমে তো ভদ্রলোক শুরু করলেন বহুকাল আগের সেই পেগান ছবিটার একটি সুর গেয়ে। সেই সুরের জন্ম হল একটি সন্ধ্যায়। একটি ক্যানোর মত সরু নৌকোয় চলেছে প্রেমিক আর প্রেমিকা। চঞ্চল সমুদ্র। নীল জলে ভাসছে সন্ধ্যার রুপোলী নীলে মেশা ছায়া। তার মধ্যে দিয়ে ক্যানো চলেছে ধীরে ধীরে। দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে নায়কের হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। আর নায়িকা যেন লতার মত সহকারের গায় জড়িয়ে আছে। গাইছে নায়ক। এবার ভদ্রলোকের গলার আওয়াজে আর সুরে সত্যিই এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হল, যেন মনে হল সেই পেগানের নায়ক আর নায়িকা আমাদের সামনে দিয়েই ক্যানোয় চড়ে চলেছে। ভুলে গেলাম সেই কিউরিও দিয়ে সাজান সুন্দর ড্রয়িং রুম। ভুলে গেলাম সেই পরিবেশ। কানে বাজতে লাগল সুর আর চোখে ভাস[illegible] লাগল সেই যুগল প্রেমিক।

হঠাৎ ভদ্রলোক গান থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কিন্তু কাল সকালে আর নৌকোয় চড়বেন না। চড়লেও একা চড়বেন। ওর সঙ্গে, বলেই থেমে গেলেন। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন কেমন! একথা ঘরে ঢুকেই আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম। এবার বুকটা যেন কেমন ছাঁত করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে

তাকালাম আমার স্বামীর দিকে আর ওর দিকে। আমার স্বামী কিন্তু সংগে সংগে উত্তর দিলেন, এ আপনি কি বলছেন মিঃ রবার্টস, আমার স্ত্রী তো জলকে ভীষণ ভয় পায়। ও তো, ও তো জীবনে কোনদিন নৌকোয় চড়েনি। এইতো লেকে এত লোক বোটিং করছে, কিন্তু ও কোনদিন যায় না। আপনি হয়ত ভুল করছেন। একটু হাসলেন মিঃ রবার্টস। তারপর আবার স্বামীকেই বললেন, আপনিও রোজ সকালে ডাক-বাংলোয় যাবেন না। বাড়ীতে থাকবেন। মনে হল যেন স্বামী একটু চমকে উঠলেন।

এদিকের পিয়ানোর টুল থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন মিস্ ক্রিস্টিনা। তিনি বললেন, হাউ ফানি, মিঃ রবার্টস, আপনি কি গানের সংগে সংগে জ্যোতিষচর্চাও করেন নাকি? নাহলে এতসব কি করে বলছেন!

মিঃ রবার্টস কেমন একরকম করে হেসে বলেন, কিছু-কিছু চর্চা সব কিছুরই করি। তবে একটা কথা বলব আপনাদের—এই ইণ্ডিয়া একটি মিসটিরিয়াস প্লেস। এর মধ্যে কিছু যাদু আছে। তারমধ্যে এই নৈনীতাল পাহাড়। আমি যেখানেই থাকি না কেন বছরের এই সময়টা এখানে না এসে পারি না।

আমি আর একটিও কথা বলিনি, চুপ করে চেয়ে বসেছিলাম; আর মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। বুঝতে পারছিলাম যে ভদ্রলোক আর কিছু জানুন আর নাই জানুন থট রিডিংটা খুব ভাল রকমই জানেন। ওঠার জন্য উসখুসও করছিলাম। সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমার স্বামীর আবার হাত দেখানো বাতিক। মেতে গেছে সায়েবের সংগে। আবার মিঃ রবার্টস আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। আর আমিও সংগে সংগে দাঁড়িয়ে উঠে আমার স্বামীকে বললাম, এবার চলো। মিঃ রবার্টসও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, একি? মিসেস বোস, আপনি তো একটুকরো কেকও নিলেন না। পারব না, মাফ করবেন, বলে অন্যদের নমস্কার করে বেরিয়ে আসি।

পাহাড়ের পরিবেশটা প্লেনের থেকে অনেক ভিন্ন। বেশ অন্যরকম। এখানকার এই পরিবেশ, মহিলা, পুরুষ আর শিশু সকলেরই রংচঙে বেশভূষা, আনন্দোজ্জ্বল ভাব বেশ মানিয়ে যায় কিন্তু, কে কি ভাবছে, কে কি মনে করছে এসব না ভেবেই বেপরোয়া ভাবে উদ্ভট কিছু করে বসা, আশ্চর্য, অসামঞ্জস্য লাগে না কিন্তু। শুধু এই পাহাড়ী পরিবেশ বলেই লাগে না। এইতো বেঞ্চিতে বসে দেখছি বিরাট বপু এক পঞ্জাবনী ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। দুপাশের শরীরের মাংসগুলো থলাস থলাস করছে। কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল সত্যেনের দেখা নেই কেন? কাল রাত থেকেই ওর মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখছি।

অদ্ভুত ভদ্রলোক কিন্তু ঐ মিঃ রবার্টস! কি করে এত সব জানতে পারেন কে জানে। কিন্তু ঐ সত্যেন, সত্যি আমি ওকে এড়াতে পারি না। আমার স্বামীর রূপ-গুণের কাছে ও কিছুই না, তবু আমার ভাল লাগে ওকে। কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ওর। আমার ওকে ভালবাসার একটা কারণ অবশ্য আমি নিজেই খুঁজে বের করেছি। আমার স্বামীর বিরাট ব্যক্তিত্ব আর তার উৎকর্ষ প্রকাশের দরুণ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। আমার নিজস্ব সত্ত্বা যেন কোথায় ডুবে যায়। তাই যার কাছে আমি নিজেকে খুঁজে পাই, আর আমার মধ্যে যে কিছু দ্রষ্টব্য খুঁজে পায় সেখানে কি মিল হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক? আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এটা অন্যায়। কিন্তু মানুষের মনের ওপর বিশেষ শাসন চলে না। অবশ্য সত্যেন যদি ওভাবে দিনের পর দিন আমার কাছে না আসত তবে কি হত বলা যায় না। এটাও কিন্তু ঠিক আমি নৌকোয় চড়তে ভীষণ ভয় পেতাম। কোনদিন কোন কারণেই আমি নৌকোয় চড়িনি। কিন্তু সত্যেনের সংগে নৌকোয় চড়তে ভীষণ ভাল লাগে। ঠিক যেন ভয়মিশ্রিত একটা আনন্দ উপভোগ করি।

সত্যেন আসছে। ওর চোখ মুখ যেন একদিনেই কিরকম শুকিয়ে উঠেছে। হাতে আবার কাগজের একটা রোল, কি ওটা? আমার হাতে বোনা জেমন কলারের হাইকলার সোয়েটারে সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু ওকে। বিকেলের সোনালী আলো পড়েছে ওর ফর্সা মুখে। অনেকটা গ্রেগরী পেকের মত লাগছে। কিছুই না বলে কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। আমি আস্তে আস্তে রোলটা খুলতে লাগলাম। ভেতর থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগল একটি ছোট্ট মেয়ের কোঁকড়া চুলে ঢাকা গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখ। বড় বড় টানা টানা চোখ। একটা ছোট্ট নাক আর ঠোঁট ভরা মিষ্টি হাসি। কেমন যেন চমকে উঠলাম, ভয়ানক চেনা মনে হল মেয়েটিকে। কোথায় দেখেছি একে? কবে দেখেছি? কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হঠাৎ সত্যেনের দিকে চোখ পড়তে দেখি সে কেমন যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছে। এই চাউনি আমি ওর চোখে খুব কমই দেখেছি। কেমন যেন অস্বাভাবিক আর অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় এখনকার এই সত্যেনকে। চেনা শক্ত হয়ে ওঠে ওকে। হঠাৎ কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে, চেনো একে? নিশ্চয়ই বলবে চেনো না। কিন্তু তুমি অস্বীকার করলে কি হবে? আমি জানি, তুমি সুজাতা, তুমিই সেই সুজাতা। ওর এই অর্থহীন প্রলাপের আমি কোন মানে বুঝি না। ওর হাতটা ধরে এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, এই সত্যেন! কি বলছ কি পাগলের মত এবার সুর নরম হয় ওর। বলে, চল নৌকোয় চল। আমি বলি, রবিবার আজ, নৌকো পাবে না, তাছাড়া ভীষণ জোর বৃষ্টি আসছে। এই সময় নৌকোয় চড়া কি উচিত তুমিই বল? বলে, সে ভাবনা তোমার নয় আমার। নৌকো আমি ঠিক যোগাড় করব। তবে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন কই এতদিন তোমার মনে ওঠেনি তো? ওঃ, ঐ রবার্টস। ও লোকটা আমার জীবনের শনি। আমার চম্পাকে—বলেই দুহাতে মুখ ঢাকে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কাল রবার্টস সাহেবের ঘরে একটা জয়পুরী রুপোর গুলাবদানে অনেকগুলি চাঁপা-ফুল রাখা ছিল। গুলাবদানটি ছিল একটা টিপয়ের ওপর একটা ছবির সামনে। ছবিতে ছিল দুটি মেয়ে। এই মেয়েটির থেকে একটু বড় একটি মেয়ের আর একটির অবিকল এই মুখছবি। আর ঠিক তক্ষুনি আমার মনে পড়ল কাল রাত্রের কোচে বসা সত্যেনের মুখের চেহারা। ওঃ কি করুণ আর কি বীভৎস। যেন কোমলতা আর কঠিনতার যুগপৎ বিকাশ। ছবিটির দিকে তাকাচ্ছে করুণ চোখে আর রবার্টসে দেখছে কুটিল দৃষ্টিতে।

মনে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব?

নানান প্রশ্নের ঝড় ওঠে আমার

সত্যি বলছি আমি এই সত্যেনকে আগে দেখিনি। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে ছিল অন্য সত্যেন। সে যে আমাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেত না। যেন কি এক অপরাধ করেছে ও আমার কাছে, সেটা কাটাবার জন্য আমাকে উজাড় করে সব কিছু দিতে রাজী। যেন কত বড় একটা ভুল করেছে ও আমার কাছে সেই ভুল শোধরাবার জন্য ও যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। ভাল লেগেছে ওর আন্তরিক ব্যবহার—বিনয়নম্র কথা। কিন্তু এ কোন্ সত্যেন? নৈনীতাল আসার পর থেকেই ওর মধ্যে একটা উন্মনা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, তবে এতটা পরিবর্তন ভারী আশ্চর্যজনক। ওর আগ্রহেই কিন্তু নৈনীতালে আসা। হঠাৎ দেখি পাশে সত্যেন নেই।

আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন চন করে ওঠে।

গুড ইভনিং মিসেস বোস। দেখি প্রশান্ত হাস্যে সমুজ্জ্বল মিঃ রবার্টস। বোধহয় সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

ফিরে এলো সত্যেন। বলল নৌকো পেয়েছি সুজাতা, চল। হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় মিঃ রবার্টস বললেন, না যাবে না ও। কক্ষনো যাবে না। ইউ ব্রুট্, যেন সাপের উদ্যত ফণায় কেউ মন্ত্র পড়ে দিল। মাথা নীচু করে চলে গেল সত্যেন।

হোটেলে ফিরে দেখি সত্যেন নেই। তার জিনিসপত্রও নেই। আমার স্বামী ছিলেন বাইরের লাউঞ্জে। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম চলে গেছে। আর কিছুই বললেন না তিনি। শুধু একটা মোটা নীলরঙা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঐ খাম আমার চেনা। ও চিঠি সত্যেনের।

ঘরে এলাম চিঠিখানা নিয়ে। বড় ফাঁকা লাগছে। মনের ভেতর থেকে যেন কিরকম একটা গুমরোনো ভাব সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। রাগ, অভিমান, ভয়, কৌতূহল সবই আছে, তবে উপস্থিত কৌতূহলটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শুধু একটা প্রশ্নই তখন ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে জাগছে কি দরকার ছিল তবে এত ভালবাসার যদি এইটুকুতেই ছেড়ে চলে যাবে? কেন এমন করে খেলা করল আমার সঙ্গে? কৌতূহল আরও তীব্র হওয়ায় এবার চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম।

সুজাতা, আমার সুজাতা,

তোমাকে যা কখনো বলিনি—যা তুমি স্বপ্নেও ভাবোনি আজ তাই বলতে চলেছি। শোন। সুজাতা আমি একটা খুনী। আমি সুজাতাকে খুন করেছিলাম। আর তাতে সে একটুও বাধা দেয়নি। কিন্তু তার মুখে তখন যে একটা হাসি দেখেছিলাম, উঃ সেটা যদি একটু আগে দেখতাম, একটু আগে যদি বিদ্যুৎটা চমকাত তবে আমি তাকে কক্ষনো খুন করতে পারতাম না। ঠিক সেই হাসি দেখেছি তোমার মুখে। তুমি যখন আমার বুকে মাথা পেতে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে আর বলতে আঃ কি শান্তি সত্যেন। কতবড় একটা আশ্রয় তোমার এই বুকটা। আমার তখন কোন কথাই কানে যেত না। আর মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠত। ভাবতাম ছি ছি রাগের মাথায় কি অন্যায়ই না করেছি। হিংসেয় অন্ধ হয়েছিলাম। ওঃ তোমাকে তো আসল কথাই বলা হয়নি। সুজাতা ছিল আমার স্ত্রী। আমার চম্পার মা। ঠিক তোমার মত মিষ্টি মেয়ে ছিল সে। দেখতেও ছিল অনেকটা তোমার মত এমনি ছোটখাট, গোলগাল টুকটুকে।

অনেক বড় একটা আঘাত দিলাম তাই না সুজাতা! আরও আঘাত দিচ্ছি সত্যি কথা বলে, তোমাকে আমি ঠকিয়েছি সুজাতা। আমি তোমাকে

তারপর থেকে নিত্য রোজ......

ভালবাসিনি। আমি তোমার নাম আর তোমার চেহারা আর স্বভাবকে ভালবেসেছিলাম। শুধু তোমার মধ্যে আমি আমার সুজাতার ছায়া দেখতে পেতাম বলে তোমাকে ভাল লেগেছিল। ঐ জন্য যখনই তোমার সঙ্গে তার কোথাও অমিল দেখতাম, ক্ষেপে উঠতাম আর তাই তুমি আমার সেই অহেতুক অসন্তোষের কোন কারণ খুঁজে পেতে না।

প্রথম দিন যখন তোমাকে তোমাদের সেই জলন্ধরের বাংলোয় দেখলাম তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল এ কে? কাকে দেখছি? তবে কি আমি তাকে মারিনি? বেঁচে ছিল সে? সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে বাগানে বসেছিলাম আমরা। তুমি একবার উঠে গিয়ে আমার আর অমরের জন্য কফি নিয়ে এলে। আশ্চর্য তোমার হাঁটাচলা এমন কি কথা বলার ধরণ হাসি সব কি তার মত? সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলাম অমরের মুখে তোমার নাম শুনে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ও সুজাতা বলে তোমাকে ডাকতেই আমার হাত থেকে কফির পেয়ালা পড়ে গিয়েছিল।

তারপর। পরদিন আবার গেলাম শুধু একটিবার দিনের আলোয় তোমাকে দেখতে। পেলাম না দেখতে। অমর বলল, সে কলকাতা যাচ্ছে কাজে, প্রায় মাস-খানেক দেরি হবে তার ফিরতে। আমি যখন ওখানেই বদলি হয়েছি যেন তার স্ত্রীকে দেখাশুনো করি। সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে নিত্য রোজ তোমার কাছে গিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে তোমার মনে নিজের স্থান করে নিলাম। তোমাকে ভালবেসে সুজাতার ঋণ শোধ করতে লাগলাম।

অমরের অনেক পুরনো কথা আমি জানতাম। ও একটি পঞ্জাবী মেয়েকে আগে ভালবাসত। সে মেয়েটিকে ও বিয়ে করতে পারল না শুধু ওর বাবা অমত করায়। কিন্তু মেয়েটির পেটে ওর বাচ্চা ছিল। মেয়েটি তা লুকিয়ে বাধ্য হয়ে আর একজনকে বিয়ে করে। সেইসব কথা সেদিন বলছিল অমর। তুমি বলছিলে চুপিচুপি কি এত আলোচনা হচ্ছে আপনাদের দুই বন্ধুতে? আমি এলেই চুপ হয়ে যাচ্ছেন? অমর বলছিল, জানিস সত্যেন, বোধহয় সেই অভিশাপেই আর আমার ছেলে হল না। নাহলে এই তিন বছরে অন্ততঃ একটাও কি হত না?

এই পর্যন্ত পড়েই আমার বুকের ভেতরটা যেন কি রকম মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটে গেলাম অমরের কাছে। বললাম দোহাই তোমার দুটি পায় পড়ি সত্যেনের খোঁজ কর। এই দেখ যা লিখছে তুমি নিজে পড়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার পায়ের ওপর চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গোল্লায় যাক সত্যেন। সে একলা গেল কেন? তার সঙ্গে তোমাকেও নিয়ে যেতো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতো আমার জানাই ছিল। এর থেকে আর বেশি কি আশা করেছিলাম ওর কাছ থেকে। আজ সত্যি ও বলতে পারে, কারণ আছে ওর বলার। কিন্তু যখন কোন কারণ ছিল না তখনই বা কোন ভাল ব্যবহার করেছে ও আমার সঙ্গে?

পায় চটিটা গলিয়ে, ম্যাকিণ্টসটা জড়িয়ে সোজা চলতে শুরু করলাম চায়না পিকের রাস্তায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যের সেই হৈ চৈ আর রং-এর মেলা এখন আর নেই। দুএকটা পাহাড়ী লোকের দেখা মিলছে। আর কেউবা ওভারকোট মুড়ে জড়ানো গলায় ইংরেজী গান গাইতে গাইতে এলোমেলো পা ফেলে নিজের ডেরায় ফিরছে। ওদের কাছাকাছি হলেই বুকটা কেমন করছে। এক একবার মনে হচ্ছে কেন যাচ্ছি! কার জন্য এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি? যে অমন করে আমাকে ঠকিয়েছে? কিন্তু আশ্চর্য কোন বিরুদ্ধ ভাব জাগছে না মনে। লোকটাকে খুনী জেনেও তার ওপর ঘেন্না আসছে না। বিশ্বাসই হচ্ছে না কথাটা। উপরন্তু ঐ অসহায় অসহিষ্ণু লোকটাকে একটা আসন্ন সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য অদ্ভুত একটা প্রেরণা জাগছে মনে। কেন এমন হয়?

ভদ্রলোক তাহলে এখনো ঘুমোননি? ঐতো বেহালা বাজছে। যতই চড়াই বেয়ে উঠছি ততই বেহালার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই পেগানের সুর। যা গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সেই সুর তুলেছেন বেহালার বুকে। এই সুরের সঙ্গে যেন ও'র প্রাণের যোগ রয়েছে একটা। আর এই সুর শুনলেই চোখের সামনে সেই সমুদ্রের অতল জলের আভাস, ঢেউএর শব্দ, চাঁদনী রাত, আর নৌকো বেয়ে চলা যুগল প্রেমিকের ছবিটা পরিষ্কার ভাবে ভেসে ওঠে। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, এমনই একটা মাদকতা আছে এই সুরে।

ঝম ঝম, করে বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ী বর্ষা। লেগেই আছে বৃষ্টি। দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিতে বেহালার সুর থামল। দরজা খুলে ড্রেসিং গাউনপরা মিঃ রবার্টস আমাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিয়ে বললেন, আপনাকে ভয়ানক ফেকাসে দেখাচ্ছে। এক কাপ কফি আনি। আমি আর তার উত্তর না দিয়ে শুধু বলি, সত্যেনকে আপনি বাঁচান মিঃ রবার্টস। তারপর আনুপূর্বিক সব শুনে তিনি বললেন, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন মিসেস বোস। ঐ রকম আত্মহত্যা করব বলে ভয় দেখিয়ে আমাকেও আগে অনেক চিঠি দিয়েছে ও। ও তা পারবে না। সে মনের জোর ওর নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। একবার যে খুন করেছে ও সেটা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে করেছে। দ্বিতীয়বার ও খুন করতে চেয়েছিল আপনাকে। অবশ্য প্রকৃতিস্থ ছিল না ও। ওর অপ্রকৃতিস্থ মনে আজ থেকে দশ বছর আগের নৈনীতালের পরিস্থিতি ছায়া ফেলছিল। আপনাকে তাই ও চম্পার মা বলে কল্পনা করেছিল। আপনাকে খুন করার সংকল্পটা ওর মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছিল সেই রাত্রে আমার ড্রয়িংরুমে এই ঘরে বসে। তাই আপনাকে নৌকোয় তোলবার জন্য ও অত ব্যাগ্র হয়েছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস বোস, ও এখন করুণার পাত্র। ওকে এখন অ্যাসাইলামে রাখা উচিত। পারি তো আমি সেই ব্যবস্থাই করব। বেশি দূরে যে ও যায়নি ঐ চিঠিই তো তার প্রমাণ। কোথায় আছে তাও আমার খানিকটা জানা।

ওর স্ত্রী সুজাতার সঙ্গে কি সত্যিই আমার খুব সাদৃশ্য আছে? এবার রবার্টস-এর নীল চোখের একাগ্র দৃষ্টি আমার মুখের ওপর পড়তে একটু অস্বস্তি লাগে।

আছে। সত্যিই অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শুধু বাড়তির মধ্যে তার গালে একটা কালো তিল ছিল। চমকে উঠি আমি। ওঃ তাই কি সত্যেন আমাকে খালি বলত গালে একটা তিল আঁক না সুজাতা। বেশ কালো করে একটা বড় তিল। এ'কেও দিয়েছিল একদিন আমার বাঁ গালে কাজল দিয়ে একটা তিল।

মিঃ রবার্টস বলতে শুরু করেন। যদিও ওর মন হিংসেয় পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য তার কোনই প্রকাশ বোঝেনি ওর স্ত্রী। না হলে অন্ততঃ আমাকে সে ঠিকই বলত। আমি ওদের মেয়ে চাম্পিকে ভীষণ ভালবাসতাম। কারণ—বলে একটা ঢোক গেলেন রবার্টস, তারপর একদমেই বলতে থাকেন, কারণ আমার নিজের মেয়ে রোজি ঐ বয়েসে এই চায়না পিক থেকে নামতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মা ছিল না। আমার ঠিক নীচের টিলার ঐ বাড়ীটায় থাকত সুজাতা সত্যেন আর চাম্পি। সুজাতা রোজিকে ঠিক নিজের মেয়ের মত যত্ন করত। রোজি ছিল চাম্পির চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু ওরা ছিল ঠিক যেন দুটি বোনের মত। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনে। একসঙ্গে স্কুলেও যেত ওরা। রোজির সারাদিন প্রায় কাটত ওদের বাড়ীতে। ওকে কাছে পেতে গেলে আমাকেও ওদের বাড়ী যেতে হত। গেলে সুজাতা আমাকেও যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করত। সত্যেন তখন হয়তো বাড়ীতে নেই এমনও হয়েছে। তারপরই ঐ দুর্ঘটনা রোজি আমাকে হঠাৎ ছেড়ে চলে গেল। ওর এই আকস্মিক মৃত্যু আমার বুকে শেলের মত বাজল। কোথাও বেরুতাম না, চুপ করে স্থানুর মত এই ঘরের ওই কৌচটায় চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতাম। তখন ঐ সুজাতা লজ্জা, ভয়, সব ছেড়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে। তার মমতায় ভরা অন্তরের মাধুর্য দিয়ে মুছিয়ে দিতে চেয়েছে আমার মনের ব্যথা। বুঝতে দিয়েছে যে সেও সমব্যথী। রোজির বিচ্ছেদ বেদনা তার মনের গভীরেও বেজেছে। সত্যেন ভুল বুঝল সুজাতাকে। অথচ সে কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না সুজাতাকে। বরং প্রশ্রয় দিত।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে ছিল ঐ সুজাতা। সে নিজের সংসারের সব কাজ কর্তব্য সেরেও আমার পুরো দেখাশোনার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। সকালের চা থেকে রাত্রের সাপার পর্যন্ত সব কিছু হত তার নির্দেশে। জুতোটা পর্যন্ত পালিশ করিয়ে রাখত সে। সবই ছিল তার নেপথ্যে, প্রকাশ্যে ছিল খুব কম। কিন্তু সত্যি বলছি, তার সঙ্গে আমার কোন রকম অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। তবে হ্যাঁ তার সেবার মধ্যে দিয়ে, চার্মাপির মধ্যে দিয়ে তাকে আমি কাছে পেতাম। চার্মাপিকে সেই আমার কাছে এগিয়ে দিত, রোজির অভাবের তীব্রতা বাধটা কিছু অংশে কমাবার জন্য। আমি চার্মাপিকে খুবই স্নেহ করতাম। সকালবেলা উঠেই সে তার রবোটের কাছে চলে আসত। সুজাতা ওকে আঙ্কল বলতে শেখাত কিন্তু বলবে না সে। হয় রোজির মত ড্যাডি বলবে আর নয়তো বলবে রবোট। ভারি মিষ্টি মেয়ে ছিল চার্মাপি।

সুজাতার চমৎকার একটা পরিমাপ বোধ ছিল। তার কাছে ততটা পর্যন্তই এগুনো যেত যতটা সে চাইত। তার বেশি নয়। আমার প্রতি তার যে সহানুভূতি ছিল সেটা তার মনে যে ভালবাসায় পরিণত হয়েছে সেটা আমি কোনদিনই বুঝিনি। এমনই ছিল তার সীমা বোধ। কিন্তু সত্যেন সুজাতার মত স্ত্রীর মূল্য বুঝল না। ওর মত সেন্টিমেন্টাল লোকের মনে আবার যা ছাপ কাটে সে আবার সেই ছাপে সব ছেপে নেয়। তাই সবই সে নিল অন্য রংএ। হয়তো এতটা কিছুই হত না, যদি না চার্মাপি একরাত্রের মধ্যে ডিপথিরিয়ায় মারা যেত। সত্যেনও মেয়েকে ভীষণ ভালবাসত। শত চেষ্টাতেও যখন চার্মাপি বাঁচল না তখন সত্যেন তো হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। আর আমি আবার পাথর হয়ে গেলাম। সুজাতাকে বললাম আমার স্নেহে বোধহয় অভিশাপ আছে। ও কিন্তু সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। নিজের প্রচণ্ড শোক চেপে রেখে আমাকে আর সত্যেনকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। সত্যেন এখানেও ভুল বুঝল। ওর ধারণা হল সুজাতা মোটেই দুঃখিত নয় মেয়ের মৃত্যুতে। যেন তার বাঁধন কমলো, রাস্তা পরিষ্কার হল।

এবার ধীরে ধীরে সে তার কাজ শুরু করল। সুজাতাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে শুরু করল। যা কখনো করত না এমনি ভাল ব্যবহার করতে লাগল। নিজের ক্লাব আর খেলা বাদ দিয়ে বেশিক্ষণ সময় সুজাতার সঙ্গে কাটাতে লাগল। সুজাতা খুবই কৃতজ্ঞ তাতে। ভাবত মেয়ের অভাবে তার মনে যে বিরাট শূন্যতা এসেছে সেটা কিঞ্চিৎ ভরিয়ে তোলাই বোধহয় সত্যেনের উদ্দেশ্য। সে আরও নির্ভর করত ওর ওপর। কিন্তু দেখতে পেতাম তার মনে কি নিদারুণ শূন্যতা, তার হাসিতে কত কান্না। তবু সান্ত্বনা দিতে পারিনি তাকে কাছে গিয়ে। তার যে স্বভাব ছিল সব কিছু চাপা দেওয়া। তার মনোভাবটাই সে সব সময় একটা সুন্দর হাসির আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে চমৎকার ভাবে নিজের কর্তব্য করে যেত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে শেষের দিকে সে সত্যেনের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তার প্রমাণ তার চিঠিতে। ওর মৃত্যুর পর আমি পাই চিঠিটা।

যেদিন এখানে পেগান ছবিটা ওপন্ করল সেদিন ওরা দুজনে গেল দেখতে। ফিরে এসে সুজাতা বলল, রবার্ট প্লিস্ তুমি ছবিটা দেখে এসো। ওর মধ্যে যে একটা গান আছে সেটা তোমার বেহালায় চমৎকার উঠবে। গেলাম। সেই সুর আমাকে দিয়ে সুজাতা চলে গেল। হয়তো তার মৃত্যুর ইসারা দিয়ে গেল ঐ নৌকো বেয়ে চলার মধ্যে দিয়ে। আমি ছবি দেখতে না গেলে ওরা একা একা নৌকোয় যেত না। রোজ আমি ওদের সঙ্গী হতাম। সেদিনই সুযোগ পেল সত্যেন। আগে থাকতেই ও নিজের মন তৈরি করে নিয়েছিল। তাই সব কিছুই সুন্দরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় করতে পেরেছে।

এতক্ষণ আমি নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসেছিলাম। এবার প্রশ্ন করি, সেই চিঠি কোথায়? কি ছিল সেই চিঠিতে?

হ্যাঁ বলি, শোন। সরি, শুনুন। (আবার সেই নীল চোখের গভীর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হল,) **But I think you are Sujata, the same Sujata. I can't believe that you are not.** চমকে উঠি আমি, বলি, না না রবার্ট, আমি সে নই। আমি অরফ্যানেজে মানুষ। অকিঞ্চিৎকর জীবন আমার। বৈচিত্র্যহীন সে কাহিনী। জানি না। কে আমার মা, কে আমার বাবা, কোথায় আমার জন্ম? সবই রহস্য আমার কাছে। আমার পরিচয় শুধু আমি। জলন্ধরে অরফ্যানেজে মানুষ। লেখাপড়া ভালবাসতাম, স্কুল থেকে কলেজে পড়তে যাই। সেই কলেজে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসনের সময় মেজর গুপ্ত মানে অমর আমাকে দেখে পছন্দ করে। মিলিটারি ম্যান, ডিসিসন নিতেও দেরি হয় না। বিয়েও করে ফেলে আমাকে। কিন্তু নেশার চোখে দেখা। তাতে কোন মনের বালাই ছিল না। ও বস্তুটাই তার মধ্যে নেই। বুঝলাম ছিলাম আগুনে, এখন উঠেছি তপ্ত কড়াইয়ে, এই যা তফাত। এইতো আমার জীবন।

রবার্টস অবাক হয়ে বলে, কিন্তু কি করে তোমার সঙ্গে তার এত মিল। এমনকি তোমার ঐ হাত নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিতে বসার ধরণে আমি সুজাতাকে খুঁজে পাচ্ছি। তবে সে ছিল দিল্লীর এক প্রফেসরের মেয়ে। তারা ছিল দুই বোন। এক বোন আমার ঠিক মনে নেই মারা গিয়েছিল বা হারিয়ে গিয়েছিল এমনি কিছু হবে। আমি বলি, যমজ বোন ছিল কি?

প্লেনে করে চলেছি লন্ডনের পথে। সঙ্গে আছে রবার্টস। এই বোধহয় আমার বিধিলিপি। যাকে কোনদিন দেখিনি, জানিনি, সেই আমার যমজ অনুজা, তারই দুই প্রিয়তমের মাঝে ঠাঁই করে নিলাম আমি। ঢেউএর মত সত্যেন এসেছিল আমার জীবনে। তাকে আমি আর রবার্টস মিলে চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে রাঁচি রেখে এলাম। একটা বড়ই দুঃখ রইল এত করেও আমার মা বাবাকে দেখতে পেলাম না। দুজনেই নেই। বড় সাধ ছিল দেখার। হল না। আমি তো জানতাম আমার কেউ নেই। সবাই ছিল। পাইনি কপাল দোষে। হারিয়ে গিয়েছিলাম বার্মা ইভাকুয়েসনের সময়। মা বাবা বার্মায় থাকতেন। কি করে জলন্ধরে গেলাম জানি না। তখন আমার বয়েস মাত্র চার বছর। স্নেহ-ভালবাসাহীন, নিয়মের নিগড়ে বাঁধা রুক্ষ জীবন কেটেছে। যাকে ভালবাসতে গেছি আঘাত পেয়েছি। তাই যে পরম আদরে বুকে তুলে নিল তাকে ফেরাই কি সাহসে? সঞ্চয়ের পরিমাণ আমার এতই অকিঞ্চিৎকর, এতই তুচ্ছ যে মনের গভীরে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেও এমন কিছুই পাই না যাকে আঁকড়ে ধরে তাচ্ছিল্য করতে পারি এই আহ্বানকে। তবে এও জানি আমার বোনের ছায়াকে এরা ভালবাসছে, আমাকে নয়। হয়ত সেই বিদেহী আত্মা আমার মধ্যে দিয়েই তার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করছে। কিন্তু আমারও সত্যেনকে ভাল লেগেছিল। রবার্টসকেও ভালবেসেছি একথা অস্বীকার করি কি করে? এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে রবার্টস যে কি বলি। আর ভালবাসার আদরে যত্নে যেন ভরিয়ে তুলেছে আমাকে। এরা যেন দুজনেই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে আমার। সে বীজ বুনে গেছে ফল ভোগ করছি আমি।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ বাগান করা ॥

কলকাতা শহরে যেখানে মাথা গোঁজাটাই একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার, সেখানে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ আজও কারোর বাগান করার নেশা আছে ভাবতে বসাটাই বিস্ময়কর। বড় জোর সৌখীন টবের বুকে বাগান তৈরী করার করুণ প্রয়াসে মানুষের বাগান করার আদিম নেশাটুকু সীমাবদ্ধ। তাই এ নিবন্ধ সেই সব মানুষদের আমি পড়তে বলব না. যাদের বাড়ীতে ঢুকলে এক চিলতে আকাশই দেখা যায় না, এক টুকরো গাছ বসাবার জমির সন্ধান পাওয়া ত' কাঙ্গালের স্বর্গ পাওয়ার মত। আমার নিবেদন সেই সব অনেকের মধ্যে অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানদের উদ্দেশে যাঁরা চেষ্টা করলে এই নেশার কবলে আত্ম-সমর্পণ করে নিজের এবং আমাদেরও উপকার করতে পারেন।

বাগান ব্যাপারটার ওপর আমার বিশেষ পক্ষপাত আছে বলে মনে কর-বার কোন কারণ নেই, কারণ বাগান করা ব্যাপারটাই আদম নামধেয় এক মানুষের প্রধান কাজ ছিল একদিন। স্বর্গের বাগানে ঈশ্বরের হয়ে সেই মানুষই দেখাশোনা করত। স্বর্গোদ্যানে ছিল সৌন্দর্য আর ক্ষুধা দুইই মেটাবার জন্যে ফল আর ফুল। বলতে কি, ইভকে পাবার আগে, আদম পেয়েছিল ইডেনকে।

সেই আদমের যুগ থেকেই বাগান করায় মানুষ সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়ে এসেছে। সরু সরু সবুজ মটর-লতার ডালে ডালে যখন মটরশুঁটিরা থরে থরে দেখা দিয়েছে তখন সেই টাটকা সবজী মটরশুঁটি যেমন তার পেট ভরিয়েছে, তেমনি নিষ্প্রয়োজন হলেও ফুলগাছের ফুটন্ত ফুলের সৌন্দর্য তার মন ভরিয়েছে। শুধু তার পরি-শ্রমের ফলই সে পায়নি, পেয়েছে সৃষ্টির আনন্দ। ফুল অথচ নিজে ফুটেও তার স্রষ্টার চেয়ে বেশী আনন্দ পায় নি।

এ আনন্দ কত সাধনার বস্তু। শুধু বীজ পোঁতা আর জল দেওয়া ত' নয়, প্রতি মুহূর্তের চিন্তা সেই গাছটিকে ঘিরে যে গাছটির ফুলটি উজ্জ্বল করে তুলবে তার একটুকরো উদ্যানকে। সেই গাছেদের বুনো ঝোপঝাড় আর কাঁটার আক্রমণ থেকে, পতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে কত না পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তা।

ঋতু বদলায়, বাগানের রং বদলায়। গ্রীষ্মের বেলকুঁড়ির সুবাস মিলোতে না মিলোতে, বর্ষার রজনীগন্ধা গন্ধ ঢালে, আসে হেমন্তের চাঁপার চাপা গন্ধ, আসে শীত তার সঙ্গে বর্ণালী ফুলের সমারোহ। সূর্যমুখী যখন সূর্যের মুখ চেয়ে ডালে আর পাতার মাঝে দোল খায়, তখন তার স্রষ্টার শরীর আর মন দুইই ভরে ওঠে।

এক টুকরো বাগান তাই জীবনে শান্তি আর সৌন্দর্যের দ্যোতনা আনে। তাই জীবনটাকে শান্ত আর সুসমঞ্জস-ভাবে গড়ে তুলতে গেলে বাগান তৈরী করার নেশা একটা মস্ত বড় অবলম্বন—এ বিষয়ে সব দেশেরই মানুষ একমত। শোনা যায় ইংরেজ জাতটা বাগান-পাগল, কোন একটা বাড়ীর সঙ্গে ছোটখাটো কোন বাগান নেই—এ নাকি কোন ইংরেজের ভাবনায় অতীত। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও আমার দৃঢ় ধারণা বস্তুবাদী সোভিয়েট দেশেও ফুলের আদর তাদের শিশুদের জন্যে আদরেরই পরে।

স্বর্গোদ্যানের কথা জানি না, এ-পৃথিবীতে বাগান তৈরী করার ব্যাপারটা কাদের প্রথম মাথায় আসে জানা যায় না। তবে বাগান-পাগল ইংরেজদের এ ব্যাপারে গুরু যে রোমানরা একথা ওরাও স্বীকার করে।

অবশ্য বাগান বলতে ফুলের বাগান বলেই আমরা সাধারণতঃ বুঝলেও, আজকের কেরানী বাঙালী একটুকরো জমি পেলে যেমন কুমড়ো ফুল ফুটিয়ে খুবই আনন্দ পায় বা কোন বাঙালী সাহিত্যিকের চরিত্র সেই ফুলভক্ত ভদ্র-লোকটি (বলা বাহুল্য ফুলটি ভেজে খাওয়ার সম্ভাবনায় মুগ্ধ!) যিনি ঔদরিক স্বার্থেই ফুল ভালবাসেন, তেমনি বাগান বলতে আগে এই ফল সবজির ব্যাপারই বোঝাত।

তারপর ধীরে ধীরে ফুল ফোটাবার তাগিদ এসেছে মানুষের মনে এবং তখনই বাগান বলতে যে শুধুই এলো-পাথারি শাকসবজি ফল-ফুলুরি ফলানো বা লাল-নীল ফুল ফোটানো নয়—এটা মাথায় উদয় হয়েছে।

তাই কাঁচি এসেছে বাগান-করিয়ের হাতে। নানা শট তুলে চিত্র-পরিচালক যেমন ছবিটি এডিট করবার জন্যে গন্ধবাহকের জিম্মায় যদি না তুলে দিতেন, তাহলে যেমন সেটা ছবি হত না, তেমনি বাগানেরও একটা পরিকল্পনা আছে।

সুন্দর হলেই যেমন তা আমাদের চোখ টানে না, তাকে তেমনভাবে দেখাতে না পারলে তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না, তেমনি বাগান করার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য। গোলাব নার্সারীতে ছোটাছুটি করে ক্যাটালগ হাতড়ে নানা দুষ্প্রাপ্য ফুল ফুটিয়ে বাহাদুরী আছে, কিন্তু বাগানটিতে রুচিসম্মতভাবে সজ্জিত করার পেছনে যদি না ভাব না থাকে, তবে তা আমরা যারা সেই বাগানের পাশ দিয়ে যাব তাদের ভাল লাগবে কেন? ফুলদানিতে ফুল সাজানোর আর্টের মত ফুলফলের বাগান সাজানোও একটি আর্ট।

তবে হাঁ, বাগানে ফুলগাছ সমধিক আদর পাবে এ ত জানা কথা, কিন্তু যারা ফলের বা শাকসবজির চাষ করেন, নিদেনপক্ষে কুমড়ো ফুলের আগায় ফলের আভাস দেখে খুশী হন, তাঁদের অপরাধী বলতে আমরা মোটেই রাজী নই। মনটার আমাদের বেশী দাবী কিন্তু পেটটিও ত' ফেলনা নয়। ইংরেজরা শুনেছি ফল ফলানোর চাইতে ফুল ফোটাতেই বেশী পছন্দ করে, কারণ জন্মে নাকি মানুষ আগে চারপাশ চেয়ে দেখে তারপর দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলে তবেই সে খিদের জন্যে কাঁদে। তাই চোখের সৌন্দর্যেরই তারা ভক্ত বেশী।

যদিও ফুল যেমন আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গী, তেমনি লাউ-কুমড়ো ত' নয়। কারণ শেষ যখন আমরা চোখ বুঁজি, তখন ফুল বুকে নিয়েই বিদায় নিই। অতএব ফুলের দাবী আগে বৈকি!

আজ যখন শহরের চারধারে নকল ফুলের সজ্জায় আমরা মনকে ভোলাতে চাইছি, তখন কেউ যদি আমাদের সেই ফেলে-আসা গ্রামের রাংচিতার বেড়া দেওয়া ছোট্টখাট ফুলে-ছাওয়া বাগানটির কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সত্যি আমরা এই শহরে যেখানে মাথা খুঁজে থাকি, তাকে আর যাই হোক বাড়ী বলে না।

যে বাড়ীতে ফাঁকা কোন জায়গায় ফুল ফোটে না, সেটা আর যাই হোক শান্ত সুখী গৃহকোণ নয়। এ বিষয়ে আমি কেন সব দেশের গৃহপাগল মানুষ মাত্রেই একমত। একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু দ্বিমত। বাগান করাটা একটা উত্তম ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু সৌন্দর্যবোধ ছাপিয়ে নেশার যান্ত্রিক দাসত্বের কবলে পড়ে সময় আর অর্থ ব্যয় দুটোই আমাদের কোন উপকারে আসে না।

বাগান করাটা অপরকে দেখানো ততটা নয়, তার চেয়ে বেশী নিজে দেখা, খুরপি হাতে গাছের গোড়া ঠিক করে দিতে দিতে নিজের মনটা শান্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারাটাই কাম্য বেশী। আধুনিক কবির মত ফুল ফুটুক না ফুটুক তাতেই আনন্দ।

ফুল ফোটানোতে আনন্দ আছে ঠিকই কিন্তু যদি ফলের সৌন্দর্যের চাইতে গজ ইঞ্চির মাপকাঠিতে ফুলের আয়তনের কৃতিত্বই বড় হয়ে ওঠে, তবে তা পেশাদারী বাগান করা হয়ে ওঠে।

তাই আমার এই কথাগুলো পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা বাগান করার কাজে হাত লাগাবেন, তাঁদের পূর্বাহ্নেই আমার এই আশঙ্কা জানিয়ে রাখছি।

ভরার মেয়ে

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

শিপ্রা দেবী

'ভরার মেয়ে' কথাটি বাঙালি সমাজের এক দীর্ঘ কলঙ্কিত অধ্যায়ের 'ফসিল' বা জমাটবাঁধা অবশেষ। নৌকা অর্থে ভরা শব্দ পূর্ববঙ্গে বহুপ্রচলিত। নৌকা ভরে আনা মেয়েদের চিহ্নিত করা হতো ভরার মেয়ে আখ্যায়। এক সময়ে জাহাজভর্তি আফ্রিকার নরনারী চালান যেতো আটলান্টিকের পরপারে, মার্কিন মুলুকে। এই ক্রীতদাসরা পূরণ করতো সে দেশের শ্রমিকদের অভাব। প্রায় সে সময়েই বিক্রমপুরে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কনের অভাব মেটাতো ভরায় আনা তরুণীর দল। 'ভরার মেয়ে' কৌলিন্যপ্রথার এক বাই-প্রডাক্ট বা উপজাত। ক'নের অভাব কি করে ঘটল তা বুঝবার জন্য কৌলিন্যপ্রথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা দরকার।

কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তি

বাঙলাদেশ ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত এক প্রান্তবর্তী অঞ্চল। দূরত্বের জন্য আর্য রীতি-নীতি ও ধর্মানুষ্ঠান এখানে স্বভাবতই শিথিল ছিল। তার ওপর বাঙলা ছিল দীর্ঘকাল বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবাধীন। ব্রাহ্মণগণ বেদের চর্চা ছেড়ে রাজার অনুগ্রহপুষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিংবদন্তীর হিন্দু রাজা আদিশূর এখানে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠাবার জন্য কনৌজের রাজাকে অনুরোধ জানান। তিনি বাঙলা দেশে পাঁচজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে আদিশূরের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন, শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, ছিলেন 'ক্ষিতীশ-নন্দন', কনৌজের রাজকুমার। বাকি চারজনের নাম, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ, কাশ্যপদক্ষ, বাৎস্য বেদগর্ভ ও সাবর্ণ চন্দ্র। আসবার সময় তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন হোমাগ্নি, যজ্ঞের সরঞ্জাম এবং তাঁদের সহধর্মিণী। থাকবার জন্য আদিশূর প্রত্যেক পণ্ডিতকে একটি করে গ্রাম দান করলেন। এভাবে বৌদ্ধ ভাবাপন্ন বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সোপান রচনা হয়েছিল।

কনৌজী ব্রাহ্মণগণ এখানে এসে বাঙালি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের পলিতে গড়া উঁচু ভূমি রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী ভূখণ্ডের নাম ছিল বরেন্দ্রভূম। বাসস্থানের নাম অনুসারে রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রভূমের ব্রাহ্মণগণ বারেন্দ্র নামে পরিচিত। রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা বলেন, তাঁরা ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পণ্ডিতদের হিন্দুস্থানী পত্নীর, এবং বারেন্দ্রগণ তাঁদের বাঙালি পত্নীর সন্তান। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বলেন এর উল্টো। তাঁদের ধমনীতে যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ আর্য শোণিত প্রবাহিত, রাঢ়ীদের এই দাবী নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কেন্দ্র করেই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি।

ঠিক আটশ বছর আগে বাঙলার রাজা ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বল্লাল সেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আদিশূরের সময়ের পাঁচখানা গ্রামের পরিবর্তে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিদের অধিকারে ছিল ৫৬টি গ্রাম। এসব গ্রামের নাম অনুসারে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ ৫৬ গাঁই বা শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গ্রামে অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ ছিল।

রাজা বল্লাল কনৌজী ব্রাহ্মণদের বংশধরদের ব্রাহ্মণত্ব ও বংশের শুচিতা রক্ষার উদ্দেশে গুণের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণী-বিভাগ করেন এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করেন। বল্লাল সেনের এই সংস্কার বল্লালী বা কৌলিন্য প্রথা নামে ৮০০ বছর বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজে বহু বিষময় ফল প্রসব করে এখন শেষ দশায় উপস্থিত, কিন্তু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেনি।

বল্লালীর গঠন

সভাপণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার পর রাজা বল্লাল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে ন'টি লক্ষণ নির্ধারিত করেছিলেন তা হলো—আচার—ব্রাহ্মণের জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন; বিনয়—সংযম; বিদ্যা—বেদ ও শাস্ত্রাদি চর্চা; প্রতিষ্ঠা—সদাচারের খ্যাতি; তীর্থদর্শন—পুণ্যস্থান ভ্রমণের আগ্রহ; নিষ্ঠা—ধর্মানুষ্ঠানে অনুরক্তি; আবৃত্তি—সমান ঘরে বিবাহের রীতি রক্ষা; তপ—আত্মোপলব্ধির জন্য কঠিন সাধনা ও দান—বদান্যতা। এই ন'টি গুণের কষ্টিপাথরে প্রত্যেক পরিবার যাচাই করে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। সকল গুণের অধিকারীকে কুলীন এবং আবৃত্তি ছাড়া অন্য আটটি গুণ যাদের ছিল তাদের শ্রোত্রিয় আখ্যা দেওয়া হলো। কালক্রমে এদের মধ্যে ভঙ্গ কুলীন ও বংশজ নামে দুটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেজন্য রাঢ়ীদের মধ্যে এখন চার শ্রেণী,—নিকষ (কষ্ঠিপাথরে কষে খাঁটি প্রমাণিত) কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজ। সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেঁধে দেওয়াতে আপত্তির বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু কৌলিন্য প্রথার সব অনর্থের মূলে রয়েছে বল্লাল রচিত বিবাহ-বিধি। ,

মনু-স্মৃতি অনুসরণ করে রাজা বল্লাল নিয়ম করলেন যে প্রত্যেক শ্রেণীর পুরুষ তার স্বশ্রেণী অথবা নিচের যে কোন শ্রেণী থেকে পত্নী গ্রহণ করতে

পারবে। নারীর বেলা নিয়ম হলো এর বিপরীত। নারী তার স্বশ্রেণী অথবা যেকোন উঁচু শ্রেণী থেকে পতি গ্রহণের অধিকারিণী হলো। এর ফলে সর্বোচ্চ সোপানের কুলীন কন্যা এবং সর্বনিম্ন সোপানের কষ্ট শ্রোত্রিয় পুরুষের স্বশ্রেণী থেকে পতি ও পত্নী গ্রহণ ছাড়া আর কোন পথ থাকল না।

বল্লালের পরে

যোগ্যতার ভিত্তিতে গঠিত শ্রেণীর, ভোটার-তালিকার মত সাময়িক সংশোধন প্রয়োজন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন তাই-ই করেছিলেন। বল্লাল সেনবাইশটি গাঁই কৌলিন্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। অসদাচরণের জন্য তাদের চৌদ্দটি লক্ষ্মণ সেন শ্রেণীচ্যুত করেন। এই নাম-কাটা কুলীনদের আখ্যা দেওয়া হলো গৌণ কুলীন। গৌণ কুলীনদের ভিন্ন সত্তা এখন আর নেই। অবশিষ্ট আটটি গাঁই থেকে উনিশটি পরিবারকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

এই কৃত্রিম আভিজাত্য ও শ্রেণী-বিভাগ রক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষমতাশালী তত্ত্বাবধায়ক থাকা প্রয়োজন। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রক্ষক রাজক্ষমতার অবসান ঘটল। বল্লালের সমাজব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আকর্ষণে অশুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল।

'কন্যাগত কুল', এটা কৌলিন্যপ্রথার এক মূল সূত্র। কন্যা কুলীন পাত্রে দান করলে কন্যার বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই মোহ ক্রমে উন্মাদনায় পরিণত হলো। অকুলীনদের অনেকেই কন্যার জন্য কুলীন বর সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে। বরের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে বর-পণ বেড়ে গেল। অশ্রোত্রিয় ধনী ব্রাহ্মণরা সে যুগে ২০০০ পর্যন্ত পণ দিতে দ্বিধা বোধ করতো না। ত্রিশ বছর আগে বিক্রমপুরের এক স্বভাব কুলীন পিতা তার পুত্রকে ভঙ্গ করাবার খেসারত নিয়েছিলেন ৪০,০০০ টাকা। অর্থলোভে অ-শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করে বহু কুলীন হয়েছিল ভঙ্গ। যে ভঙ্গ হতো তাকে বলা হতো স্বকৃত ভঙ্গ। তার অধস্তন তিন পুরুষ ভঙ্গ কুলীনের সম্মান লাভ করতো। পঞ্চম পুরুষ থেকে তাদের কৌলিন্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেত। চতুর্থ পুরুষের পর ভঙ্গ কুলীনের বংশধরেরা 'বংসজ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

দেবীবর ঘটকের সংস্কার

প্রায় দু'শ বছর এভাবে চলবার পর দেবীবর ঘটক নামে যশোহরের এক কুলতত্ত্ব-বিশারদ কৌলিন্য প্রথার সংস্কার সাধন করেন। কুলীনদের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করা ছিল তাঁর সংস্কারের উদ্দেশ্য। দেবীবরের সংস্কার কুলীনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কুলীনদের তিন শ্রেণী,—স্বভাব, ভঙ্গ ও বংশজ—স্বীকৃত হলো। পূর্বপুরুষের নাম, গোষ্ঠীর নাম অথবা গ্রামের নাম অনুসারে কুলীনদের বিভক্ত করা হলো ছত্রিশ ভাগে। এসকল ভাগের নাম দেওয়া হলো মেল। এদের নাম—ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী, বল্লভী ইত্যাদি। স্বীয় মেলের মধ্যেই কুলীনদের বিবাহ করতে হবে, দেবীবরের সংস্কারের এটাই ছিল প্রধান কথা। দেবীবরের অনুশাসন কুলীনরা মেনে নিয়েছিল। স্বভাব কুলীনদের কোন্ পরিবারের সঙ্গে কোন্ পরিবারের বিবাহ হতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার নাম 'পালটি-প্রকৃতি'।

পরিণাম

কৌলিন্য প্রথার ইতিহাস নারীর প্রতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও নির্মম অত্যাচারের করুণ কাহিনী। দেবীবরের মেল-বন্ধনের পর এই কৃত্রিম আভিজাত্য ও বিবাহ-নিয়ন্ত্রণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজকে অপ্রতিহত প্রতাপে পরিচালিত করেছে পাঁচশ বছর। দীর্ঘস্থায়ী যুক্তিহীন সংস্কার মানুষকে হিতাহিত বোধশূন্য করে অন্ধের মতো পরিচালনায় পরিণাম কি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের এক আবেদনপত্রে। বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে একুশ হাজার হিন্দুর স্বাক্ষর-সংবলিত এই পত্রখানি কুলীনের বহু-বিবাহ নিবারক আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানিয়ে বাঙলার লাট সাহেবের নিকট পেশ করা হয়েছিল। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে যে কুলীনের পত্নীসংখ্যা সাধারণত ১৫ থেকে ৮০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। বহু-পত্নীক কুলীনের পক্ষে সকল স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ি চিনে রাখা সম্ভব হতো না। এক কৌতুকপ্রিয় বহুপত্নীক কবি কুলীনের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'বিয়া করছি কুড়ি চারি,
চিনিনা সব শ্বশুর বাড়ী,
কোন্ পথে যাব গো মা,
বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী।'

চিনতে না পেরে কুলীন স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করছেন 'মা'।

রাজা দশরথের রাণীর সংখ্যা নাকি ছিল সাতশ। চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের রাণীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। মুসলমান আমীর ওমরাহ সুলতান বাদশার হারেমে থাকত বহু রমণী। যাদের রমণী তারাই নিত তাদের ভরণপোষণের ভার। বল্লালের সৃষ্ট কুলীন ওমরাহদের সে দায় ছিল না। বিবাহের সময় তারা পেত পণ ও যৌতুক—বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি পদার্পণ করলে মিলত তার ভিজিট বা দর্শনী। বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ নারীর প্রতি কুলীন স্বামী কোন কর্তব্যই পালন করতো না। বিক্রমপুরে এক ছড়ায় কুলীন বলেছে—

ঘটি না দেই, বাটি না দেই,
শয্যায় না দেই ঠাঁই,
বিয়া কইরা ফালাইয়া রাখি
পোষে বাপ ভাই।

এমন স্বামীদের বিবাহ ছাড়া তো আর [illegible] নয়। বিবাহ হল কুলীনের কুল-ধর্ম [illegible] পেশা। অনেকেরই [illegible] গোকুলের ষাঁড়ের মতো [illegible]
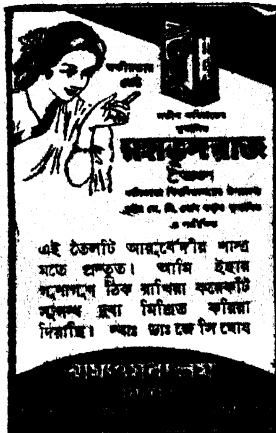
বেড়াতো শ্বশুরবাড়ির গোঠে গোঠে। কেউ বা ভর্তি হতো ধনী শ্বশুরের 'জামাই-বারিকে'। কোনো কোনো জমিদার ও তালুকদার নিজ বাড়ি 'জামাই-বারিকে' পরিণত না করে কুলীন জামাইকে বাড়ি করে দিতেন অদূরেই। ভরণ-পোষণের জন্য জামাইদের দান করা হতো জমি। আম্বারিয়া, জয়দেবপুর, কলস-কাঠি, পন্মার কুক্ষিগত কাউলিপাড়া, সাকজনগর, বটেশ্বর ও তারপাশা প্রভৃতি গ্রামে এভাবে গড়ে উঠেছিল কুলীন-কলোনী।

কনের দুর্ভিক্ষ

নারী ও পুরুষের সংখ্যার স্বাভাবিক হার প্রায় সমান হবে। একজন পুরুষ একটির বেশী বিবাহ করলে সমাজে কোনো কোনো পুরুষের ভাগ্যে পত্নী জুটবে না। একজন কুলীন এক পত্নী লাভের অধিকারী। কৌলিন্য প্রথার কৃত্রিম ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সে যদি চার কুড়ি নারী দখল করে বসে তাহলে ঊনআশী জন পুরুষের বিবাহের কনের অভাব ঘটবে। কুলীনে কন্যা দান করতো না এমন শ্রোত্রিয় ও বংশজের সংখ্যা ছিল খুবই কম। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কন্যা-বিক্রেতা পিতা কনের দর চড়িয়ে দিলে। কনের যত বয়স তার দর হতো ততো শ' টাকা। হাজার টাকা পণে দশ বছরের মেয়ে বিবাহ করা ছিল অনেকের সাধ্যের অতীত। শ্রোত্রিয় বংশজের মধ্যে অকৃতদার পুরুষের সংখ্যা বেড়ে গেল। ছেলেবেলায় ছোটো দু'টি গ্রামে প্রায় দশজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ চিরকুমার ব্রাহ্মণ দেখেছি। সে যুগে টাকা ছিল দুর্লভ। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। তার ওপর পুষতে হতো 'সদাপ্রসন্ন' কুলীন জামাই। কুলীনদের বোঝা বইতে বইতে অকুলীনরা হয়ে পড়তো নিঃস্ব। নিজেদের বিবাহের পণ জুটতো না তাদের। এভাবে বহু অকুলীন পরিবার নির্বংশ হয়ে গেছে। বিবাহ যাদের হতো তাদের মধ্যে বর-কনের বয়সের বৈষম্য থাকত বিস্তর। পণের টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় বরের বয়স যেত বেড়ে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষের সঙ্গে নয়-দশ বছরের মেয়ের বিবাহ অসাধারণ ছিল না। এ অবস্থা রূপায়িত হয়েছে মুখের কথায়—

> অবশ্য বিধি বন্ধ হবে,
> তারা সামনে পোয়া পাবে।

চিরকুমারী কুলীন-কন্যাও ছিল ঘরে ঘরে। [illegible]

অনূঢ়া কুলীন-কন্যা ও অকৃতদার অকুলীনের মিলনের পথ ছিল রুদ্ধ। সমাজের বন্ধন মানুষকে চিরকাল কাম-জয়ী করে রাখতে পারে না। ভেতরের তাগিদে পত্নীলাভের নতুন উপায় বের করা হলো।

কনের ব্যবসা

কনের অভাবের মধ্যে ধূর্ত লোকেরা পেল অর্থোপার্জনের এক ভিন্ন পথের সন্ধান। তাদের পানসি চলতে শুরু করলো শীতললক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও সুরমার উজান বেয়ে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের অনুন্নত অঞ্চল থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মেয়ে সংগ্রহ করে তারা ফিরে আসত বিক্রমপুরে। ঘটক ঘুরে ঘুরে সস্তা দরের এই তরুণীদের জন্য অকুলীন বর জুটিয়ে আনতো। তারপর হতো বিবাহের অভিনয়। অজ্ঞাত পরিচয়াদের বংশ-তালিকা রচিত হতো। কেউ কেউ মেয়ের ভাই বা মামার ভূমিকা অভিনয় করতো। মুস্কিল দেখা দিত বিবাহের পর। মেয়ের ভাষা ও আচরণে ফাঁস হয়ে যেত তার বংশের পরিচয়। সাঁঝ-বাতি দেবার সময় বৌর মুখ থেকে 'ঠাউকরাণ, চিরাগডা কই?' প্রশ্ন শুনে শাশুড়ীর বুঝতে বাকি থাকতো না যে বৌমা মুসলমানের মেয়ে। এক নতুন বৌ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের বাড়ি টানা হানা দেখি না ক্যান?' মুসলমান ও তাঁতীর মেয়ের আত্মপরিচয় প্রকাশের পরও তাদের ত্যাগ করা হতো না। সমাজের প্রধানদের মুখ চাপা দেবার ব্যবস্থা চলতো মাত্র। ভরার মেয়েদের সমাজে থাকতে হতো মাথা নিচু করে। তারা কোনো সময় বাপের বাড়ী যেত না। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না। দেশের মেয়ে স্বামীর বাড়ি লাঞ্ছিত হলে ভয় দেখিয়ে বলতো, 'আমি কি (বান্ধব-হীন) ভরার মেয়ে এসেছি?'

পণের ব্যবসা শুরু হয়েছিল কখন তা জানা যায় না। যে দুজন ভরার মেয়ে দেখেছি তাদের বিবাহের সময় ছিল গত শতাব্দীর অন্তিম দশকে। এ থেকে বোঝা যায় তখনও বাইরে থেকে বিক্রমপুরে মেয়ে আনা হতো। শিক্ষার প্রসার এবং মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বহু বিবাহের ব্যবসায় ভাটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কনের অভাব হ্রাস পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভরার করে মেয়ে আনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটক। তাঁদের বাঁধন ভেঙে ভরার মেয়ে ঢুকে পড়লো ব্রাহ্মণের ঘরে। এভাবে প্রকৃতি নিয়েছিল তার দীর্ঘ বিলম্বিত প্রতিশোধ।

[কৌলিন্য প্রথার ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য আমরা স্যার হার্বার্ট রিসলি ও সাম্প্রতিক জনগণনার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের নিকট ঋণী।]

॥ স্তব্ধ সীমান্ত ॥

হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেছে। ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হতে চীনা আক্রমণকারীদের বন্দুক হতে আর কোন গুলী-বর্ষণ হয়নি। তার আগে পর পর ক' দিনের যুদ্ধে কেবলই পর্যুদস্ত হচ্ছিল ভারত। নেফা সীমান্তে ওয়ালঙ ও বমডিলার পতন ও লদাক সীমান্তে চুশুলের পতনের আশঙ্কা রীতিমত আঘাত হেনেছিল ভারতের মনোবলের উপর। শত বিপর্যয়েও দিশাহারা হলে চলবে না, তাতে বিপদ আরও বাড়বে—এ কথা জানত ভারতবাসী, আর সে কারণে আরও অধিক সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সারা দেশ। সেই সময়েই এল এক অভাবিত সংবাদ, চীনের ব্যাপক আক্রমণের মতই যা ছিল এদেশ তথা বিশ্ববাসীর কল্পনাতীত। চীন জানাল, তার ২৪শে অক্টোবরের তিন দফা শান্তি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সে ভারতের সঙ্গে মীমাংসাপ্রার্থী, এবং এ ব্যাপারে তার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যেই সে স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে।

ইতিপূর্বে যখন ঐ প্রস্তাবটি ভারতের কাছে চীন পাঠিয়েছিল তখন ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, চীন যদি সত্যিই ভারতের সঙ্গে আপোষ করতে চায় তবে তাকে আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যে সব আগে সৈন্যবাহিনীকে এই বছরের ৮ই অক্টোবরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চীন তাতে কর্ণপাত করেনি এবং ভারত-ভূমির উপর সে নির্লজ্জভাবে তার আক্রমণ চালিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ চীনের এই পূর্ব প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি ও একতরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত সারা পৃথিবীর কূটনৈতিক মহলকেই হতবাক করে দেয়।

চীনের অতীত কার্যকলাপ যাদের জানা আছে তাদের কারও পক্ষেই এ প্রস্তাব সহজ মনে বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবুও চীনের এই নতুন সিদ্ধান্তকে একেবারে ধাপ্পাবাজী বলে উড়িয়ে দেওয়ারও কোন যুক্তি নেই। কারণ এমনিতেই চীনের আন্তর্জাতিক সুনাম আজ ভুলুণ্ঠিত। এ অবস্থায় তার নতুন করে একবার নিজেকে ধাপ্পাবাজ প্রমাণ করানোর কোনই যুক্তি থাকতে পারে না, বিশেষ করে যখন একথা তার খুব ভালভাবেই জানা আছে যে, তার এই হঠাৎ ঘোষণায় ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতিও শিথিল হবে না বা ভারতকে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তারাও এই সামান্য ঘোষণাটুকুতেই হাত গুটিয়ে নেবে না। বরঞ্চ ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত যদি বিনা বাধায় যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় পায় তবে তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে সে বিরাট প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে পারবে। সুতরাং আমরা আমাদের প্রস্তুতির কাজ সামান্যতমও শিথিল না করে, বরঞ্চ এই সুযোগে তা দ্বিগুণিত করেও ধরে নিতে পারি যে, যে কোন কারণেই হোক, চীনের পক্ষে বর্তমানে আর অগ্রগমন সম্ভব হবে না।

কারণগুলি কি হতে পারে, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে প্রথমেই একথা বলা যেতে পারে যে, চীন একক শক্তিতে নির্ভর করে আর অগ্রসর হয়ে বিরাট এক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারে না। একথা চীনের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, পার্বত্য এলাকা থেকে যুদ্ধ যখন সমতলে নামবে এবং তার ফলে সারা ভারত জুড়ে যখন ব্যাপক ধ্বংসলীলা শুরু হবে তখন যুদ্ধ আর নিশ্চয়ই ভারত ও চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতকে আজ যে সব শক্তিশালী দেশ বিপুল সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তারা নিশ্চয়ই প্রবলতর শক্তির বিরুদ্ধে ভারতকে একা ক্ষতবিক্ষত

তেজপুরে হোমগার্ড বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর মহিলাদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে
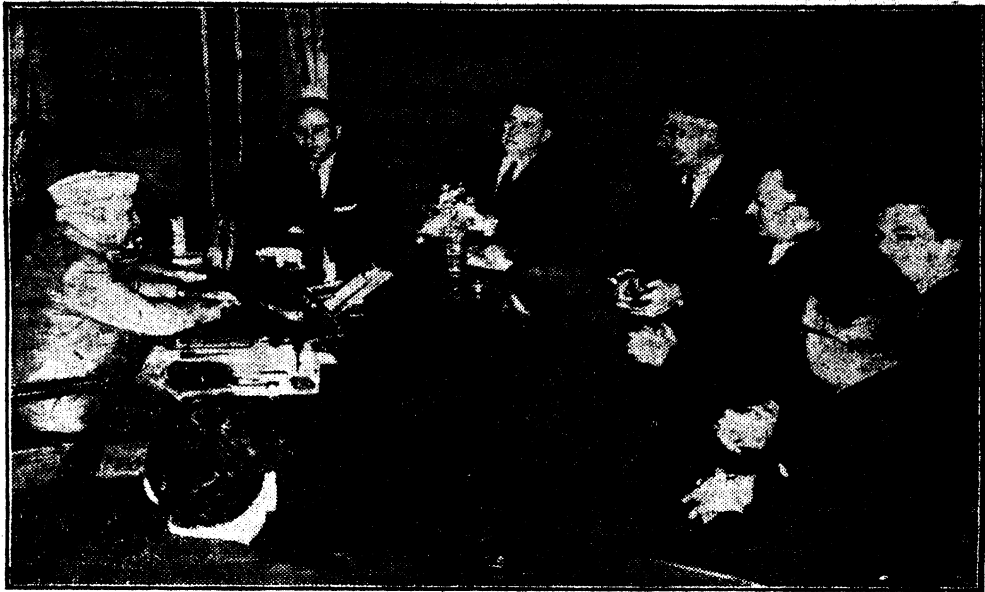
মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত তথ্য-সন্ধানী মিশনের সদস্যগণ গত ২০শে নভেম্বর নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সফরকারী মিশনের নেতৃত্ব করছেন সেনেটর মাইকেল জে ম্যানসফিল্ড।

ও বিপর্যস্ত হতে দেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না। আর ভারতের পক্ষে যখন তারা যুদ্ধে নামবে তখন যে শুধু হিমালয়ের এই দুর্গম এলাকা দিয়েই তারা চীনকে প্রতি-আক্রমণ হানবে এমনও কোন কথা নেই। যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হলে ফর্মোসা, জাপান প্রভৃতির দিক থেকেও চীন আক্রান্ত হতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত কোন প্রথম শ্রেণীর শক্তির সহায়তা ছাড়া এত বড় যুদ্ধের ঝুঁকি চীন এখনও পর্যন্ত নিতে পারে না। অথচ আজ পর্যন্ত উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে চীন যেভাবে তড়িৎগতিতে ভারতের কয়েকটি স্থান অধিকার করে নিয়েছে তাতে আর কাউকে না হলেও ভারত ও তৎপার্শ্ববর্তী এশিয়ার অন্যান্য ছোট দেশগুলিকে সে বোঝাতে পেরেছে যে, চীনের দাবীকে উপেক্ষা করা আজ তাদের কারও পক্ষেই নিরাপদ নয়। লাল-চীন হয়ত আপাতত এই লাভটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে করছে, এবং বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও সে রাশিয়ার সক্রিয় সমর্থন ছাড়া নিতে চাইছে না। সুতরাং জয়ের মাথাতে অস্ত্রসংবরণ করাটাই বর্তমানে সে সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবতে পারে। এখনই অস্ত্রসংবরণ করে সে যদি স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যায় তবে সে কোন দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, পরন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশকে সে বোঝাতে পারবে যে, অস্ত্রের জোরে নিজ দাবী পূরণের সামর্থ থাকলেও চীন প্রকৃতই শান্তিকামী। এসব দিক থেকে বিচার করলে চীনের এই সিদ্ধান্তকে মোটেই বিস্ময়কর বা নিছক ধাপ্পাবাজী বলে মনে হবে না। আজ জেতার মাথায় তার যে মহৎ ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ আছে পরাজয়ের দিনে তা কোনমতেই থাকবে না।

॥ নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ ॥

২০শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদে ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল থাপার স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ছুটি প্রার্থনা করায় তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তাঁর স্থানে লেঃ জেনারেল চৌধুরীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রাথমিক বিপর্যয়ের কারণ যে শুধু চীনা বাহিনীর উন্নততর রণনৈপুণ্যই নয়, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতাও তার জন্যে যথেষ্ট দায়ী এ চিন্তা এদেশবাসীকে প্রথম থেকেই পীড়িত করছিল। এ কারণেই চীনা আক্রমণ শুরু হওয়ার পর পক্ষকালের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননকে পদত্যাগ করতে হয়। আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ে প্রধান সেনাপতির দুর্বলতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে সকলের মনে প্রশ্ন জাগছিল, তাই জেনারেল থাপারের বিদায়কেও দেশবাসী সময়োপযোগী ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন।

সমরকুশলী সেনাপতিরূপে লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর খ্যাতি দীর্ঘ দিনের। ইংরেজ শাসনের আমলেই বর্মায় জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি যথেষ্ট সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ ও গোয়ায় ভারতের পুলিশী অভিযানের নেতৃত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। জয়ন্তনাথের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাই আজ দেশবাসী ও সৈন্যবাহিনীর অপরিসীম আস্থা। আর এ কারণেই প্রধনমন্ত্রী যখন লোকসভায় লেঃ জেনারেল চৌধুরীকে নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন তখন লোকসভার সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে সে ঘোষণাকে সমর্থন জানান।

॥ জয়-ক্ষতির খতিয়ান ॥

এক মাসের যুদ্ধে ভারত ও চীনের কত ক্ষতি হল তার পূর্ণ হিসাব কোন দিনই হয়ত পাওয়া যাবে না। কারণ চীন হয়ত তার পক্ষের জয়ক্ষতির সঠিক

হিসাব কখনও প্রকাশ করবে না। তবে ভারতের পক্ষে লোকক্ষয়ের একটা মোটা-মুটি হিসাব পাওয়া গেছে। চীন সরকারের কাছে তথ্য পেয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ব্রিগেডিয়ার ডালভিসহ মোট ৯২৭ জন ভারতীয় সৈন্য চীনা আক্রমণকারীদের হাতে বন্দী হয়েছেন। অপরপক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ হতে প্রকাশিত এক হিসাবে বলা হয়েছে, ২০শে অক্টোবর হতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে ভারতের পক্ষে নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে মোট ১৬২৩ জন সৈন্য। তার মধ্যে নিহতের সংখ্যা ২৬৪। তা ছাড়াও ঐ ক'দিনের যুদ্ধে আহত হয়েছে মাত্র ১৫৫ জন জওয়ান। জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদের সর্বাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এই হতাহতের সংখ্যা নিঃসন্দেহে সামান্য। নিখোঁজদের মধ্যেও অনেকে ফিরে আসবেন বলে ভারত সরকার আশা প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রথম দশ দিনের যুদ্ধে ভারতের পক্ষে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার মত সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তা ঠিক নয় বলে ভারত সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে। শুধু হতাহতের সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে একথা অনেকেরই মনে হবে যে, চীনা হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল জমি ছেড়ে আসার আগে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কর্তারা খুব বেশী ঝুঁকি নেননি।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

অতর্কিত আক্রমণের জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না। তার ওপর দীর্ঘকাল ধরে ভারত পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল তাতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে ভারতের মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ ঘটার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। তাই ভারতের বিভিন্ন আপৎকালের মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে সক্রিয় সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকল সে সময় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সেই দারুণ প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ষায় না থেকেই বিপন্ন ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। একথা আমরা অকপটেই স্বীকার করব যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এভাবে সাহায্যের জন্য সাগ্রহে এগিয়ে না এলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত, এবং ভারতবাসীর মনোবল ভেঙে গিয়ে এক বিরাট জাতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। অবশ্য রাশিয়া নিরপেক্ষ থেকেও যে ভারতের অসীম কল্যাণের কারণ হয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সমভাবেই আজ আক্রমণকারী চীনকে জয়ের মুখেও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিও ভারতকে সর্বভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এ ছাড়াও ভারতকে পূর্ণ সমর্থন জানায় ও চীনের নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ণ সাফল্য কামনা করে পৃথিবীর সকল মহাদেশের আরও অন্তত পঞ্চাশটি দেশ। তাদের কাছেও ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ভারতের চরম বিপদের দিনে ভারতকে সবচেয়ে নিরাশ করেছে জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি, যাদের এতদিন ভারত তার নিকটতম বন্ধু বলে জেনে এসেছে। সরকারীভাবে একমাত্র মিশরই ভারতের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং ভারতের পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে যাতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় তার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। এ কারণে রাষ্ট্রপতি নাসেরের কাছেও ভারত কৃতজ্ঞ। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে কিছুটা সমর্থন পেয়েছে ভারত, কিন্তু ঘানা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির তথাকথিত নিরপেক্ষ আচরণ ভারতকে রীতিমত বিব্রতই করেছে। আক্রান্ত ভারতের পাশে বৃটেন যে বন্ধুর মত এসে দাঁড়িয়েছে এটাও ঘানার প্রেসিডেণ্টের মনঃপূত হয়নি। মুখ্যত এই তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির আচরণের জন্যেই ভারতকে ভবিষ্যতে হয়ত তার পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে হবে।

দেশবাসী যে এই বিপদের দিনে কল্পনাতীতভাবে সাড়া দিয়েছেন তার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা আমাদের নেই। আমরা যদি আমাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করে থাকি তবেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করব।

॥ কাস্ত্রোর মত পরিবর্তন ॥

অবশেষে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফিদেল কাস্ত্রোর মত পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্তকে তিনি জানিয়েছেন, কিউবা থেকে ২৮টি সোভিয়েট ইলিউশিন বোমারু বিমান তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দাবী-মত সোভিয়েট ইউনিয়নকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। ডঃ কাস্ত্রো বলেছেন, বিমানগুলি খুবই পুরানো ধাঁচের এবং বেশী উঁচুতে ওঠার শক্তি তাদের নেই। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধে ঐ ধরণের বিমান একেবারেই অচল।

ভারতের নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি চ্যবনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

॥ ঘরে ॥

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক : নেফার ওয়ালঙ এলাকায় শত্রু (কম্যুনিস্ট চীন) কবলিত একটি ঘাঁটি পুনর্দখল—ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা অভিযানের জের ১৪ হাজার ফুট উচ্চ সে-লা গিরিপথ 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে মুখরিত।

জরুরী অবস্থাধীনে সমগ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের এন-সি-সি ট্রেণিং বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা—দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠনে ভারত সরকারের নূতন প্রস্তাব।

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক : ওয়ালঙ অঞ্চলে চীনাদের ব্যাপক পুনরাক্রমণ—২০শে অক্টোবরের পর বৃহত্তম অভিযান—ভারতীয় জওয়ানদের দুর্জয় প্রতিরোধে চীনা অগ্রগতি ব্যাহত।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জরুরী অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা—শেষ রক্তবিন্দু দিয়া হানাদারদের হটাইবার দৃঢ় সংকল্প—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপনকারী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কংগ্রেস) কর্তৃক চীনাপন্থী কম্যুনিস্ট-দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ : প্রচণ্ড লড়াই-এর পর ভারতীয় জওয়ান-দের ওয়ালঙ ত্যাগ—জং এলাকায় চারবার শত্রু (চীন) আক্রমণ প্রতিহত।

রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) দেশদ্রোহী কম্যুনিস্টদের প্রতি আরও ধিক্কার।

'বজ্রকঠিন সংকল্প লইয়া কম্যুনিস্ট চীনকে প্রতিরোধ করিতে হইবে'—ময়দানের (কলিকাতা) বিশাল জনসভায় আচার্য কৃপালনীর আহ্বান : সূচাগ্র ভূমি চীনা দখলে থাকা পর্যন্ত আপোষের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ : নেফা অঞ্চলের সে-লা গিরিবর্ত্ম চীনা হানাদারদের কবলিত—সুবর্ণশ্রী এলাকায় চীনাদের নূতন আক্রমণ—প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য ভারতীয় সৈন্যের মরণপণ সংগ্রাম।

সাময়িক বিপর্যয়ে বিচলিত না হইবার জন্য জাতির প্রতি শ্রীনেহরুর আবেদন—আক্রমণকারীদের তাড়াইবার জন্য প্রতিটি বিপর্যয়কে নূতন সংকল্পে পরিণত করার উপদেশ—দিল্লীতে আঞ্চলিক বাহিনী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর তেজোদ্দীপক বক্তৃতা।

বর্ধমানে চীনা-আক্রমণ-বিরোধী মিছিল আক্রান্ত—উত্তেজিত জনতা কর্তৃক স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টি অফিসে হানা—সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত : জনৈক শোভাযাত্রী [illegible] : কম্যুনিস্ট এম-এল-এ (শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়) সহ ৫১ জন গ্রেপ্তার।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ : প্রবল সংগ্রামের পর বমডিলা'র (কামেং সীমান্ত বিভাগের সদর) পতন—চুশুলে এলাকাতেও (লেডাক) একটি ঘাঁটি হাত-ছাড়া—বিপর্যয় সত্ত্বেও আক্রমণকারী চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের সর্বত্র বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্তৃক চীনা হানাদার বিতাড়নে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ—শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আহ্বান—কম্যুনিস্ট দলের বিরুদ্ধে আরও ধিক্কারধ্বনি বর্ষণ।

'বিপর্যয় সত্ত্বেও জয় সুনিশ্চিত : শত্রু বিতাড়ন না করিয়া নিরস্ত হইব না'—বেতারে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ : লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ (অস্থায়ী) নিযুক্ত।

চুশুল রক্ষায় ভারতীয় বাহিনীর দৃঢ়তা—বমডিলা ও ওয়ালঙের দক্ষিণে আক্রমণকারী চীনা ফৌজের সহিত সংগ্রাম—ফুটহিলের দিকে চীনাদের অগ্র-গতি।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ : 'চীনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে'—পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—প্রস্তাবের সাধুতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে ঘোর সন্দেহ।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ প্রায় ৬০ জন চীন-দরদী কম্যুনিস্ট আটক—ভারতরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাড়ে তিন শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

॥ বাইরে ॥

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক : কিউবা হইতে জেট বোমারু বিমান অপসারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে শ্রীচাবানের শপথ গ্রহণ।

মধ্যরাত্রি হইতে সমগ্র সীমান্তে গুলীবর্ষণের বিরতি।

নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত—দীর্ঘ পরামর্শের পর রুশ-মার্কিন মতৈক্য।

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক : পশ্চিমী মিত্রবর্গ ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করায় পাকিস্তানের গাত্রদাহ—করাচীতে বিভিন্ন মহলে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ—স্থানে স্থানে প্রতিবাদ দিবস পালন।

চীন-ভারত যুদ্ধের অবসানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা—রাষ্ট্রসংঘে ৩৫টি নিরপেক্ষ দেশের বৈঠক।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ : লিওপোল্ডভিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা—কংগোলী প্রেসিডেন্ট জেসেফ কাসাভুবু কর্তৃক আদেশ জারী—লিওপোল্ডভিল প্রদেশে ক্রমাগত হত্যা ও সশস্ত্র ডাকাতি সহ অরাজকতার জের।

'ভারতকে প্রদত্ত অস্ত্রের অপব্যবহার হইবে না'—পাক সরকারকে আমেরিকার আশ্বাস দান।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ : প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে (ইন্দোনেশিয়া) হত্যা করার ষড়যন্ত্রের জের—সামরিক আদালত কর্তৃক ৭ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

কিউবার উপর দিয়া বেসামরিক বিমান চলাচলও নিষিদ্ধ—কাস্ট্রো সর-কারের (কিউবা) কার্য-ব্যবস্থা।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ : মিঃ চৌ এন লাই-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) সহিত পিকিং-এ ভারতীয় দূত শ্রী পি কে ব্যানার্জির বৈঠক : চীনা পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মার্শাল চেন ই'রও আলোচনায় যোগদান।

মস্কোয় সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক দলীয় কর্মনীতি বিশ্লেষণ।

আমেরিকার নিকট ভারতের আরও অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা—ওয়াশিংটনে মিঃ কেনেডির (মার্কিন পেসিডেন্ট) সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি কে নেহরুর আলোচনা।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ : চীন সরকার কর্তৃক অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা—২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হইতে ব্যবস্থা বলবৎ—১লা ডিসেম্বর হইতে সৈন্যাপসারণ শুরু।

ভারতের জন্য বৃটেনের উদ্বেগ—আরও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা।

আমেরিকা কর্তৃক কিউবায় নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ : [illegible] অভিমুখে মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক বিমানের যাত্রা—চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যুদ্ধাস্ত্রের চাহিদা নিরূপণই লক্ষ্য।

॥ বন্দে মাতরম ॥

চীনের ভারত আক্রমণ উপলক্ষ্যে একটা কথা উঠেছে যে প্রগতিশীল ক্ষুদ্র দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। দেশ-প্রেমটা নাকি নিছক অপ্রগতিমূলক মনোভাব। আমাদের দেশের অনেক লোক আছেন যাঁরা কাকে কান নিয়ে গেল শুনে কাকের পিছনে দৌড়েছেন, কানে হাত দিয়ে যাচাই করার অপেক্ষা রাখেননি কানটা আছে কি নেই।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ তারিখে ষ্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে একটি বক্তৃতা দেন, তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি, মরিস হিনডাসকৃত Russia Fights on গ্রন্থে সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি পাওয়া যাবে। সেদিন কমরেডদের উদ্দেশে ষ্টালিন বলেছিলেন,—'আপনারা কি চান আমাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ তার স্বাধীনতা হারাবে? আমরা পরাজয় চাই না!'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এল। গভীরতর অভীপ্সা, মহত্তর আত্ম-বলিদানের বিস্ময়কর প্রেরণায় সমগ্র জাতি মেতে উঠল। চারিদিকে কমসোমল কমিটির দেয়ালে দেয়ালে লেখা হোল—

'দেশপ্রেমহীন মানুষের সমাজে কোনও স্থান নেই'

মরিস হিনডাসকে কেন্দ্রীয় কমসোমল কমিটির সেক্রেটারী সুন্দরী তরুণী ওলগা মিশাকোভা বল্লেন ঃ

> "প্রধানতঃ আমরা চাই আমাদের যুব সম্প্রদায় দেশপ্রেমিক হোক। অন্তরে তাদের দেশপ্রাণতা থাক, অতীতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে এবং সোভিয়েট-তন্ত্রাধীনে যা করা হবে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাক। দেশপ্রেম জীবনের আকর বস্তুর অন্যতম—দেশপ্রেম পবিত্র সম্পদ।"

প্রখ্যাত রুশ লেখক বোরিস গর্বাটোভ 'Letters to a Comrade' নামক পত্রে লিখেছিলেনঃ—

> "মাতৃভূমি কি শক্তিশালী বাক্য। ২১ মিলিয়ন কিলোমিটার ও দুশো মিলিয়ন সহ-দেশবাসীকে ঘিরে রেখেছে এই মাতৃভূমি। তবু সকলের কাছে যে স্থানে ও যে বাড়িতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই তার মাতৃ-ভূমি। তোমার আমার কাছে ডন-বাসিনের খনি এই মাতৃভূমির উৎস। একই ধূসর আগাছার ভেতর তোমার ও আমার কুটির। এখানে কেটেছে যৌবনের সোনালী দিন। পাহাড়ের নিম্নভূমি যেন অন্তহীন সমুদ্র, দিগন্তপ্রসারী। আর সৌম্য গম্ভীর আকাশ।...... সোভিয়েট জনগণ আমাদের স্বপ্ন, আমাদের গর্ব।"

অভয়ঙ্কর

আলেকসী টলস্টয়, মিখাইল সলো-কোভ, টিয়ানোভ, কনস্টানটাইন সিমানোভ, এলাইয়া এরেনবুর্গ প্রভৃতি সোভিয়েট রাশিয়ার লেখকবৃন্দ দেশপ্রেমের প্রশস্তি গানে রাশিয়ার জনগণের মনে বিশেষতঃ সৈন্যগণের মনে প্রেরণা জাগিয়েছেন। তার মধ্যে কোনো কোনো আবেদনে আছে গীতিকবিতা বা প্রার্থনা-সঙ্গীতের প্রাণ-স্পর্শী আবেদন। সৈনিকের উদ্দেশ্যে এরেনবুর্গ বলেছিলেনঃ—

> "তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছে কৃশাঙ্গী তরুণী ট্যানিয়া (জয়া কসমোডেমিনস্কয়া), সেবাস্ত-পোলের দৃঢ়চিত্ত নৌ-সেনাদল। তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছেন স্মরণীয় পূর্বসূরীগণ, যাঁরা এই বিশাল দেশকে একসূত্রে বেঁধেছেন। প্রিন্স ইগোর নাইটবৃন্দ বা ডিমিট্রির-দল। তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছেন, সেই বীর সেনানীদল যাঁরা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অপরাজেয় নেপোলিয়ানকে বিতাড়ন করেছেন। তোমাদের সঙ্গে চলেছেন বুদেনীর সৈন্যদল, চাপাইয়েভের স্বেচ্ছা-বাহিনী, নগ্নপদ, বুভুক্ষিত সর্বজন-বিজয়ী সৈন্যদল। তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমাদের সন্তান, জায়া ও জননী। তাদের আশীর্বাণী তোমা-দের শিরে। এদের জন্য তুমি আনবে শান্তিময় অবসরের দিন, স্ত্রীর জন্য প্রত্যাবর্তনের মধুরক্ষণ, আর সন্তানের জন্য অপার আনন্দ।

> "সৈন্যদল, তোমার সঙ্গে অভিযানে চলেছে সারা রাশিয়া। রাশিয়া তোমার পাশে পাশে চলেছে। শোনো তার পদধ্বনি, যুদ্ধের ভয়ংকর মুহূর্তে তোমাকে মধুর বাক্যে সেই রাশিয়া পরিতৃপ্ত করবে। সেই রাশিয়া দেবে বাহুতে শক্তি ও অন্তরে সাহস। যদি বিজয়ী হও আলিঙ্গন করবে।

> "দেশপ্রেমহীন মানুষের সমাজে কোনও স্থান নেই।"

৭ই নভেম্বর, ১৯৪১-এর বক্তৃতায় ষ্টালিন Predki—বা পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেছেন প্রেরণা লাভের জন্য। স্বদেশের সংকটে Stariki—বা বৃদ্ধদের স্মরণ করা হয়েছে। স্বদেশ ও স্বাধীনতা, Semya (পরিবার) ও Rodina (পিতৃ-ভূমি)-র প্রতি শ্রদ্ধা রাখো। সূর্যবিহনে যেমন অন্ধকার ও নিশ্চিন্ত মৃত্যু তেমনি পরিবার ও স্বদেশ ভিন্ন সবই শূন্য ও অসার্থক। স্বদেশ পরিবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আর এই পরিবারই সেই স্বদেশকে অনধিগম্য, অনতিক্রম্য করে রেখেছে।"

ষ্টালিনের অতিবড় শত্রুও তাঁকে বিভিন্নমিশ্র কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পারবেন না। স্বদেশের মূল্য যে বোঝে না দেশপ্রেম যার অন্তরে নেই, সে মানুষের স্বদেশে স্থান নেই, শত্রুর আগমনের পথ যে দেশদ্রোহী খুলে দেয়, ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।

জননী জন্মভূমির দুর্দিনে তাই অতীতের পুনরাবিষ্কার প্রয়োজন। রাশিয়াও করেছিল। যে টলস্টয়কে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছিল বিপদের দিনে তাঁকে স্মরণ করেছে।

আমরা যুদ্ধ করিনি, তবু আমাদের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছেন, দেশপ্রেমের মহিমা কীর্তন করেছেন। স্বদেশপ্রেমাত্মক প্রথম কবিতা লিখেছিলেন ১৮২৭-এ ডিরোজিও ইংরেজীতে। সে কবিতায় পরাধীনতার বেদনা পরিস্ফুট—

> "Where is that glory, where
> that reverence now?
> Thy Eagle pinion is chained
> down at last — "

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেনঃ—

> 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
> কে পরিবে পায়।।"

কিন্তু স্বদেশকে মা বলে প্রথম স্মরণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৪৮-এ লিখিত এক কবিতায়। হিন্দু মেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন নবজীবনের গান। সেই গানটি অত্যন্ত ভালো লেগেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। এ গান দ্বারা ভারতে ধ্বনিত হোক এই ছিল তাঁর বাসনা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আবার জোয়ার এলো। স্বদেশ মাতৃসমা, তাঁর পূজায়, তাঁর সেবায় জীবন পণ করতে হবে, এই ছিল সেদিনের কবিদের বক্তব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—

"সাজ সাজ সকলে রণ সাজে
শুন ঘন ঘন ভেরী বাজে
চল সমরে, দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।।

রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি মা এই দেশে'। 'ও আমার দেশের মাটি', 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী', 'স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি,' প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের—'ভারত আমার, জননী আমার', 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', অতুলপ্রসাদের 'বল বল বল সবে' ও কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের—'যায় যেন জীবন চলে, বন্দে মাতরম বলে—'।

এই সব গান আমাদের অতীতে প্রেরণা দিয়েছে, এই সংকটে আবার নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

অনেকের হয়ত স্মরণ নেই, কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯২৮—২৯-এ একটা সম্বর্ধনা দান করা হয়। 'বাংলার কথা' দৈনিকের গোপাললাল সান্যাল ও কবি সুবোধ রায় সেই সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি সেদিন বলেছিলেন,—'নজরুলের গান গেয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্চ করে যাব।' সে কথা সত্য হয়েছে।

কাজী নজরুলের দেশপ্রেমের গান ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙ্গালীকে মাতিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই কালে অপর কোনো কবির দেশপ্রেমের গান এমনভাবে প্রেরণা দান করতে পারেনি।

আজ দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রয়োজন এই গৌরবময় অতীতকে পুনরাবিষ্কার করা। দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের জড়ত্বের ঘোর কাটিয়ে তুলতে, দেশপ্রেমের বন্যায় দেশকে মাতিয়ে তুলতে চাই—পুরাতন গান, পুরাতন সাহিত্য। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে রাশিয়া এইভাবেই বিজয়ী হয়েছিল সে কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

নতুন বই

সাহিত্য ও শিল্পলোক— (প্রবন্ধ) দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। এ মুখার্জি এন্ড কোং, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২, পাঁচ টাকা।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের এই প্রবন্ধ-সংগ্রহটিতে সাহিত্য ও শিল্পের প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। নিপুণ বিশ্লেষণের আলোয় লেখক বুঝিয়েছেন, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব যদিও জীবন থেকে এবং যদিও তা ব্যাখ্যা করে জগৎকে, তবু সার্থক সৃষ্টি জগৎ ও জীবনের বাস্তব রূপ অতিক্রম করে দুর্নিরীক্ষ্য রসের স্তরে উন্নীত হয়। সেই রসের প্রকৃতি ও প্রাণই ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থকার, আলোচ্য বইয়ের প্রথম স্তবকে গৃহীত ছ'টি প্রবন্ধে। দ্বিতীয় স্তবকে গ্রথিত হয়েছে তাঁর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কীয় এক গুচ্ছ প্রবন্ধ। এগুলি তত্ত্বমূলক নয়, তথ্য বিচারাশ্রিত রচনা এবং বলাই বাহুল্য, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। লোক-সাহিত্য ও লোকসংগীত, গণসচেতন সাহিত্য, রম্যরচনা, যুগান্তকারী উপন্যাস প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির কথা বলছি। বইটি জিজ্ঞাসু ও বিচারশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় এবং বাহুল্যশূন্য, বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদও সুন্দর।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী— (প্রবন্ধ) বিশ্বভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চার খণ্ডে রবীন্দ্র-জীবনী রচনা করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে জড়িত। বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আজও তিনি আমাদের সামনে আছেন। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ইতিহাস এবং অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে বর্তমান গ্রন্থ-রচনা।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে এসেছে বীরভূমের রায়পুর, সুপুর, সুরুল, বোলপুরের ইতিহাস। ১৮৬৩ সালের ১লা মার্চ দেবেন্দ্রনাথ ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে ভুবনডাঙ্গায় ২০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত নেন। এখানে গড়ে ওঠে দেবেন্দ্রনাথের সাধনপীঠ। বহু পরিশ্রমের পর স্থানটি মনোরম করে তোলা হয়। তারপর ১৮৭৩ সালে ১১ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এখানে আসেন। মহর্ষি ১৮৮৩ সালে সর্বশেষ শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৮ সালের ১১শে অক্টোবর। তারপর নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়, লরেন্স, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির শিক্ষকতায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। ১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র রায় নামে যে তরুণ শিক্ষক আসেন তাঁর নাম শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তারপর ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের উন্নতি ঘটতে থাকে খুবই দ্রুত। শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন, ব্যবস্থাপনায় উন্নততর ব্যবস্থা, শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের আগমন ঘটে। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বহু জটিলতায় পূর্ণ। বর্তমানে গ্রন্থকারের গবেষণাধর্মী মননধর্মীতায় তা সুন্দররূপে প্রতিভাত। বিদেশের ছাত্র-শিক্ষকেরা এসে শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন কেমনভাবে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থ থেকে। কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অনেকের চোখেই বিস্ময়কর বলে মনে হবে। বিশ্বভারতীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম মিশে আছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক আনয়ন, অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাপনা, ত্রিশ বৎসর ধরে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বহু মানুষের সাধনার পীঠস্থান 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' আজ ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের স্থান। তার অতীত ইতিহাসের এই সুনিপুণ ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা একটি অভাব দূর করল সত্য। বিশেষ করে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। আশা করি গ্রন্থের সম্পূর্ণ খণ্ড তিনি রচনা করেও যেতে পারবেন।

কত রঙ—(উপন্যাস)— প্রভাত দেবসরকার ।। গ্রন্থপীঠ ।। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ।। কলিকাতা-৬ ।। চার টাকা ।।

প্রভাত দেবসরকার ছোটগল্পের সার্থক রূপায়ণে খ্যাতি অর্জন করেছেন। চরিত্র-চিত্রণে এবং ঘটনা-সংস্থাপনে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় ইতিপূর্বে তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাওয়া গেছে। 'কত রঙ' তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি একালের এক সরকারি অফিস, যেখানে বাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষ সামাজিক বিবর্তনে একাত্ম হয়ে জীবিকা অর্জনে এসেছেন। চাকুরীজীবির জীবনের যে ভালো এবং মন্দ দিক আছে যে বিচিত্র জগতে তাঁরা বিচরণ করেন আলোচ্য উপন্যাসে তারই কাহিনী বিধৃত। কেরানী-মনস্তত্ত্ব এক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র, বিশেষতঃ আধুনিককালের কেরানী-জীবন। লেখক সেই বাস্তব-জগতের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই রাজ্যে বাঙ্গালী প্রগতিশীলা স্বাধিকার প্রমত্তারা কেমন ভীড়ে গেছে, বড় সাহেব, ছোট সাহেব, তাদের প্রীতি এবং প্রতিকূলতা কোথায় নিয়ে যায় তার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন লেখক। তরফদার সাহেব, লাবণ্য, মন্দিরা, সীতা, সেন-চৌধুরী, মীনাক্ষী ইত্যাদি চরিত্র সরকারি অফিসের অতি-পরিচিত চরিত্র। সেই জনতার মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু। তাই তিনি যখন শোনেন—রায়সাহেব চলে গেছেন, তরফদার বড় সাহেব হয়েছেন, মীনাক্ষী বিয়ে করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, লাবণ্যও রিজাইন করেছে, বীণাদি তেমনি আছে। তখন ভাবে দু'বছরে দুনিয়া কত বদলেছে। অতিশয় দক্ষতা ও সংযমের সঙ্গে লিখিত উপন্যাসটি এ যুগের এক ডকুমেণ্টারি। ছাপা প্রশংসনীয়।

প্রাণতরঙ্গ ।। (উপন্যাস) —প্রফুল্ল রায়চৌধুরী ।। মুকুন্দ পাবলিশার্স ।। ৮৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা। দাম সাড়ে ছ'টাকা।

প্রফুল্ল রায়চৌধুরীর অন্য কোনও উপন্যাস দেখেছি স্মরণ হয় না। 'প্রাণতরঙ্গ' কিন্তু পাকা হাতের পরিচয়। শিক্ষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সংবাদপত্র অফিসের ব্যস্ততার মধ্যে, টেলিপ্রিণ্টারে খবর আসে, আর নাইট এডিটর গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেই সংবাদ সাজিয়ে চলেছেন। এমন সময় শিক্ষক-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টিচাররা রাজভবনের সামনে বসে আছেন, তাঁদের পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সোমেন সাব-এডিটর সে সংবাদ দিচ্ছে। সোমেন ও বিকাশ এ যুগের মানুষ। তারা ব্যথা ও বেদনা বোঝে, সংবাদপত্রে কাজ করে, নিউজ কি করে 'কিল' করতে হয় জানে না। শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিযান সোমেনের মনকে আন্দোলিত করে। মলিনা আর সাদা শাড়িপরা ক্রীশ্চান মেয়েটি, যে বাজনা শিখিয়ে খাওয়া-পরার সংস্থান করে তার কথা ভাবে। সোমেনের মনে বিষাদে মেশানো যে আনন্দ—তার নাম অনুপমা। শেষ পর্যন্ত সোমেন অনুপমার কাছেই ধরা দিয়েছে। কিন্তু সুবৃহৎ উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেছে, যে লিপিকুশলতা এবং শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান কালের পটভূমিকায় এমন একখানি সার্থক উপন্যাস কদাচিৎ চোখে পড়ে। বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনের পরিচয় লেখক দিয়েছেন। তজ্জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।
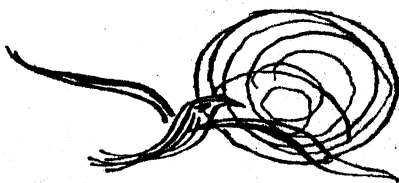
প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

[শয়তা]নের মুখে শান্তিবাণী :

২১এ নভেম্বর, পিকিং সময় মধ্য-[রাত্রি] (ভারতীয় সময় রাত্রি ৯৷৷টা) থেকে [নেফা] এবং লাদক রণাঙ্গনে বহু শত [বর্গ] মাইল ভারতভূমি অধিকার করবার [পর] পররাজ্যগ্রাসী চীনাবাহিনী অপসা-[র]ণ করেছে সীমান্ত-বিরোধের শান্তি-[পূর্ণ] মীমাংসার যে শেষ প্রস্তাব পিকিং [থে]ক এসেছে, তারই প্রথম শর্ত [হিসে]বে। সদা শান্তিকামী ভারতও অপস-[র]ণকারী চীনাবাহিনীর উপর গুলী-[গো]লা ছোঁড়া বন্ধ করেছে পরবর্তী [শর্ত]গুলি চীন কিভাবে পালন করে, তা' [সরে]জমিনে প্রত্যক্ষ করবার অধীর [প্র]তীক্ষায়।

মদমত্ত চীনাবাহিনী যখন বিভিন্ন [রণা]ঙ্গনে পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে প'ড়ে [ভা]রতীয় জোয়ানদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও [তা]দের অগ্রগতির পথকে দীর্ঘায়ত কর-[ছি]ল, ঠিক সেই সময়ে চীনের কাছ থেকে [এ]ই শান্তি-প্রস্তাব জগতের বহু ঝানু [রা]জনীতিজ্ঞকেই বিভ্রান্ত করেছে; কিন্তু [প্রা]য় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, [চী]নের এই শান্তি-প্রস্তাব একটি চাল-[বা]জী ছাড়া কিছুই নয়। বর্বর শয়তানের [মু]খ থেকে শান্তির বাণী ঘোষিত হবার [কা]রণ বড় গূঢ়।

পণ্ডিত নেহেরু বারংবার বলেছেন, [ভা]রতের এক ছটাক জমিও যতক্ষণ শত্রু-[ক]বলিত থাকবে, ততক্ষণ আমরা শান্ত [হ]ব না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের ভার [আ]মাদেরই উপর। রণদক্ষ সৈনিক, আধু-[নি]কতম অস্ত্র, পর্যাপ্ত রসদ এবং [স]র্বোপরি অটুট মনোবল জোগাবার ভার [আ]মাদেরই ওপর। রূপ-জগৎ সংশ্লিষ্ট [প্র]তিটি শিল্পী, কলাকুশলী, কর্মী ও [সাং]বাদিককে এই কথা স্মরণ রাখতে অনু-[রো]ধ জানাই। পবিত্র ভারতভূমি থেকে [শে]ষ শত্রুটি বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত [আ]মাদের বিশ্রাম নেই।

দর্শকরুচি :

বীজ আগে, না বৃক্ষ আগে?—এই প্রশ্ন নানা আকারে আবহমান কাল ধ'রে চলে এলেও বাইবেলের "ঈশ্বর কহিলেন, আলোক হউক এবং আলোক হইল" বা ডারউইনের "থিয়োরি অব ইভলিউ-শান"-কে যদি মানতে হয়—বিজ্ঞান অবশ্য আমাদের ডারউইনের থিয়োরি মানতেই বলে—, তাহ'লে গোড়ায় বীজের অস্তিত্ব-কেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সকল শিল্প-কলার মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প হচ্ছে অত্যন্ত জটিল এবং কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। একজন চিত্রকরের ছবি আঁকবার জন্যে দরকার একটুকরো কাগজ বা কাপড় এবং কিছু রঙ-তুলি। একটি হার্মোনিয়ম বা তানপুরা থাকলেই গায়ক তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন; সুরসৃষ্টির জন্যেও এর বেশী না লাগে, সে হচ্ছে কিছু কাগজ ও কলম। আর সাহিত্য বা কবিতা রচনার জন্যে মাত্র কাগজ-কলমই যথেষ্ট। অবশ্য ভাস্কর্যের জন্যে কিছু ভারী জিনিসের দরকার হয়—শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর এবং খোদাই কাজের জন্যে বিভিন্ন আকারের ছেনি ও হাতুড়ী। কিন্তু একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে?—ক্যামেরা, সাউন্ড-রেকর্ডিং মেসিন প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি থেকে শুরু ক'রে কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক,

'মা-বেটা' চিত্রে নিরুপা রায়

সৃষ্টিতত্ত্বের এই দার্শনিক প্রশ্নের মতই নন্দনতত্ত্বের বিচারে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, দর্শকরুচির দৈন্যের জন্যেই খারাপ চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়, না খারাপ চলচ্চিত্রই দর্শকরুচিকে উন্নত হতে দিচ্ছে না? দর্শকের গতানুগতিক, অমার্জিত, অপরিশীলিত রুচির জন্যেই প্রযোজকরা জাঁকজমকবহুল, নৃত্যগীতপূর্ণ যৌন-আবেদনে ভরা নিম্নস্তরের ছবি তৈরী করতে বাধ্য হন, না আর্থিক সাফল্যকে একমাত্র লক্ষ্য রেখে তৈরী এই সব ছবিই দর্শকরুচিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিকৃত করছে?

সঙ্গীত-পরিচালক, আলোকচিত্র-শিল্পী, শব্দযন্ত্রী, শিল্পনির্দেশক, সম্পাদক প্রভৃতি সমেত এক বিরাটকায় কর্মিসঙ্ঘের সঙ্গে অল্প বা বেশী সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ। এবং এই সমাবেশ ঘটাতে গেলে যে বেশ কয়েক সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবিটিকে জনপ্রিয় তারকাখচিত করতে গেলে অর্থের পরিমাণটা কয়েক লক্ষে গিয়ে পেঁছোয়।

এই ব্যয়বাহুল্যই চলচ্চিত্র শিল্পকে মাত্র শিল্পকলা বা আর্টের গণ্ডীতে থাকতে না দিয়ে একটি বৃহত্তর ব্যবসায়ের

রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে এবং এরই জন্যে একে একটি বৃহৎ দর্শক-গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। প্রথম জীবনে পাঠকসমাজের স্বীকৃতির অভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্ব-কবি হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু কোনো চলচ্চিত্র-প্রযোজকের দু'তিনখানি ছবি যদি জনপ্রিয়তার অভাবে আর্থিক দিক দিয়ে অসাফল্য বরণ করে, তা'হলে তাঁকে চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিতে বাধ্য হ'তে হয়। চলচ্চিত্র-পরিচালকদের সম্বন্ধেও প্রায় সমান কথাই বলা চলে। কাজেই যথার্থ সৃষ্টি-ধর্মী চলচ্চিত্র-প্রযোজককেও এর ব্যবসায়িক দিকের কথা মনে রেখে চলতে গিয়ে বহু রকম আপোষ-মীমাংসায় আসতে হয়। এবং এর ফলে তাঁর শিল্প-স্বাধীনতা হয় ক্ষুন্ন।

অবশ্য গণমানসে প্রচুর প্রভাব বিস্তার-কারী আর্ট হিসেবে চলচ্চিত্রের এই দর্শক-নির্ভরতা এক হিসেবে শুভকর। চলচ্চিত্র রচনায় বেপরোয়া অসংযম, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কল্যাণবোধের অভাব অত্যন্ত মারাত্মক। দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করতে হয় ব'লে রুচি বা নীতিগত শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা প্রযোজককে করতেই হয়। ছবির বিষয়-

জাওলা প্রোডাকশনের 'দুই বোন' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

বস্তু থেকে শুরু ক'রে তার গঠন-পারিপাট্য পর্যন্ত সব বিষয়েই যাতে বৃহত্তর দর্শকসমাজের অনুমোদন পাওয়া যায়, সে দিকে তাঁকে সতর্ক লক্ষ্য রাখতেই হয়। মনে করা যেতে পারে, কোনও চলচ্চিত্রের সৃষ্টির ব্যাপারে বৃহত্তর দর্শকসমাজও একটি বড় অংশীদার এবং সেই কারণে এ-ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্বও আছে অনেকখানি।

সমাজ এবং সাহিত্য যেমন পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে দর্শক-সমাজ এবং চলচ্চিত্রও তেমনই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দর্শক-সাধারণের রুচি যেমন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বা তার গঠন-সৌকর্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, ঠিক তেমনই চলচ্চিত্রও তার বলিষ্ঠ বক্তব্যের স্বারা দর্শক-সাধারণের মধ্যে রুচির সু... পরিবর্তন সম্ভব করতে পারে। প্র... পরিবেশনের নামে অবাস্তব ঘটনা... দৃশ্যাবলীর অবতারণা যে করতেই ... এমন কোনো শর্ত দর্শকরা কোনো ... প্রযোজকের সামনে উপস্থাপিত করে... ক্রন্দনরত শিশুকে ভুলোবার ... উপায় হচ্ছে তাকে সামান্য পরিমাণ ... ফেন খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। ... তেমনই জাঁকজমক, নাচগান, ... আবেদন প্রভৃতি বাস্তব সম্পর্কবর্জিত বস্তুর সমন্বয়ে দর্শকচিত্তকে অ... মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে দর্শকচিত্তও 'অহিফেন'-ধর্মী হয়ে পড়ে; তখন ... দেয়, রুচিবিকার। ছবি দেখতে ... দর্শক তখন তার সুস্থ স্বাভাবিক ... হারিয়ে ফেলে; তার পলায়নপর মনো... তখন বলে—ছবি দেখতে গিয়ে যদি দুরেক সমস্ত ভুলে খানিকটা আনন্দে ভাসতে পার, তা'হলে ঐ বদ্ধ ঘরের ... যাব কেন? এ যেন কয়েকজন বন্ধু ... মদ্যপান ক'রে কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোড় ... এও এক রকম মনের ব্যভিচার। ... চিত্র-প্রযোজক বলবেন, আমার অন... কোথায়? দর্শক যা চায় আমি তাই ... তা'হলে ক্রন্দনরত শিশুকে অ... দেওয়াতেই বা দোষ কি?

জানি, সারা দেশে জনশিক্ষার ... মত ব্যবস্থা না ক'রলে, লোকের ... একটা সুস্থ জীবনদর্শ খাড়া করা...

...রূপে গণমানসের রুচিবোধ সামগ্রিক-...বে উন্নত হ'তে পারে না। এবং ...কাজ আধুনিক যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের, ...ই কাজের ভার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ...চিত্র-প্রযোজকের ওপর অর্পণ করা ...পাত। তবু বলব, জনমানসে চল-...চ্চিত্রের অসামান্য প্রভাবের কথা স্মরণ ...খে প্রত্যেক চলচ্চিত্র-প্রযোজকেরই ...র্তব্য, ছবির মাধ্যমে এমন বিষয়বস্তুর ...বতারণা করা, এমন ঘটনা ও দৃশ্যের ...মাবেশ ঘটানো, শিল্পীদের এমন সাজ-...জ্জায় উপস্থিত করা এবং এমনভাবে ...ভিনয় করানো, যা বাস্তবের পরিপন্থী ...া, যা দর্শককে জীবনাদর্শের সন্ধান ...বে এবং তাকে কল্যাণের পথে চালিত ...রবে। এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ...দের যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে, এমন ...নো কথা নেই। আমাদের দেশের ...ত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপুর ...সার' প্রভৃতি চিত্র, এবং বিদেশের ...ইসিকল থিভস্' (ইতালীয়), 'য়ুকিও-...রিসু' (জাপানী) 'হ্যাপিনেস ফর আস ...্যালোন' (জাপানী), 'ব্যালাডস্ অব এ ...লজার' (রুশীয়), 'দি লেটার দ্যাট ...য়াজ নেভার সেন্ট' (রুশীয়) প্রভৃতি ...বির আর্থিক সাফল্যের কথা এই প্রসঙ্গে ...রণীয়।

গান শোনবার জন্যে যেমন কান তৈরী ...রতে হয়, সাহিত্য বা কবিতার সমঝদার ...বার জন্যে যেমন সাহিত্যবোধ সৃষ্টির ...কেষ্টা হয়, তেমনই চলচ্চিত্রের প্রকৃত ...াবধারণের জন্যেও উপযুক্ত শিক্ষার ...য়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্র-ভারতীতে ...াপিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সংগীত-...টক অ্যাকাডেমী'তে নাট্য-গুণাবধারণ ...ামা অ্যাপ্রিসিয়েশান) নামে একটি ...শেষ পাঠ পড়ানো হয়। মাধ্যমিক এবং ...শ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটিজ বিভাগে ...ার্ট অ্যাপ্রিসিয়েশান'—যার মধ্যে নাটক, ...চ্চিত্র, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয় ...কবে—সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় ...দি আজও অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, ...হ'লে অচিরেই তা' করার প্রয়ো-...নীয়তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

।। মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'নবদিগন্ত' ।।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের 'নব-...গন্ত' চিত্রটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুক্তি-...ভ করেছে উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে। খ্যাতনামা অগ্রদূত গোষ্ঠী চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। ডঃ বিশ্বনাথ রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চ্যাটার্জি এবং সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

পরলোকে নবদ্বীপ হালদার :

চলচ্চিত্র এবং গ্রামোফোনের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদার গেল রবিবার, ২৫এ নভেম্বর চৌষট্টি বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি হাঁপানী রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। রবিবার তাঁর শ্বাসকষ্ট খুব বেড়ে যাওয়ায় রাত্রি ১০॥টা নাগাদ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এইখানেই মাত্র একঘণ্টার মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলে এবং তিনটি মেয়েকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। তাঁর পরলোকগত আত্মা যেন শান্তি পায়, এই কামনাই করি।

এ-ভি-এম-এর "মনমৌজী"

গেলকাল, বৃহস্পতিবার, ২৯এ নভেম্বর থেকে দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় এ-ভি-এম-এর নবতম চিত্র-নিবেদন "মনমৌজী" শুভমুক্তিলাভ করেছে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী, বীণা, খান্না প্রভৃতি চিত্রগৃহে। ছবিখানির পরিচালনা, সংলাপ ও গীতরচনা এবং সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে কৃষ্ণাম পঞ্জু, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ও মদনমোহন।

আর-ডি-বনশালের নূতন প্রয়াস "ছায়াসূর্য" :

প্রযোজক আর-ডি-বনশালের নবতম চিত্র "ছায়াসূর্য"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ কাজ শুরু হবে এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে। আশাপূর্ণা দেবী লিখিত কাহিনী অবলম্বনে তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবিটির প্রধান চরিত্রে আছেন শর্মিলা ঠাকুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্ত, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পীকে।

চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ী" :

শৈলেশ দে লিখিত কাহিনী অবলম্বনে অসীম পালের পরিচালনায় চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ী" ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। আলোকচিত্রম প্রাইভেট
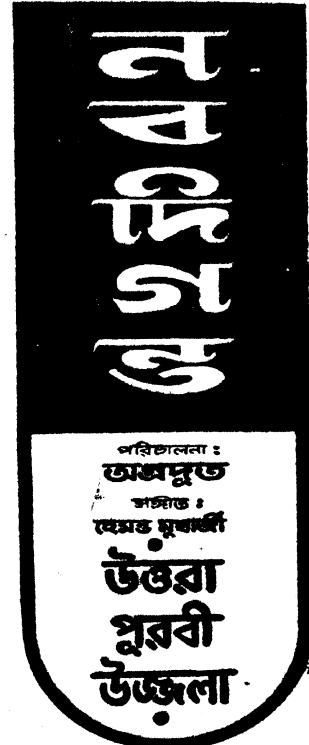
'মনমৌজী' চিত্রে সাধনা ও কিশোরকুমার

লিমিটেড পরিবেশিত এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, নীলিমা চক্রবর্তী, তন্দ্রা বর্মণ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দকে। ছবির চিত্রনাট্য, গীত-রচনা, সঙ্গীত-পরিচালনা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন পরিচালক অসীম পাল, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, কালীপদ সেন এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

শৌভনিক-এর অনুষ্ঠান :

গেল মঙ্গলবার, ২৭এ নভেম্বর ছিল হেরোসিম লেবেডফ দিবস এবং শৌভনিক-সম্প্রদায়ের জন্মদিন। এই দিনটিতে তাঁদের অগ্রগতির পথকে সুদৃঢ় করবার জন্যে তাঁদের প্রস্তাবিত নাট্যনিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল পার্কসার্কাসের রকেরা পার্কে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমির ডীন অব ড্রামা, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী দ্বারা। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, শৌভনিকের যাত্রাপথ যেন কুসুমাস্তীর্ণ হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ও'দের নূতন নাটক "যা-নয়-তাই"-এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ল "মুক্ত-অঙ্গন" রঙ্গমঞ্চে।

নবাগত-এর 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' :

গেল শুক্রবার, ২৩-এ নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নবাগত-নাট্যসম্প্রদায় নীতিশ সেন রচিত দু'খানি একাঙ্কিকা—'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' অভিনয় করেন। প্রথম নাটিকাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে মামুলিত্ব থাকলেও নাটকীয়তার উপাদান ছিল এবং অনায়াসেই 'অনীতা'র মানসিক সামঞ্জস্য বিধান ঘটানোকে যুক্তিগ্রাহ্য করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু কাঁচা হাতের লেখা ব'লে 'করুণা'-বৌদি বা 'অনীতা'-ননদের চারিত্রিক বিবর্তন সহজ পথ ধরে অগ্রসর হতে পারেনি। অবশ্য বিভিন্ন শিল্পীর—বিশেষ ক'রে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (অমল), সুলেখা চক্রবর্তী (অনীতা) এবং তরুণ চক্রবর্তীর (দীপক)—অভিনয়গুণে প্রথম নাটিকাটি দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। দ্বিতীয় নাটিকা—'রসভরা'তেও শিল্পীরা যথেষ্টই সুন্দর অভিনয় কর[েছেন]। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (সুভা[ষ]), পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায় (কমল), দীপ[ু] অধিকারী (মণি), নীলিমা চক্রব[র্তী] (লিলি) এবং মঞ্জুলা মুখোপাধ্[যায়] (সুরমা) যথার্থই সু-অভিনয় করেছে[ন]। কিন্তু পিতার গোঁড়ামি এবং পুত্র-কন্[যার] আধুনিকতা নিয়ে কিছু সংবাদ আদা[ন]-প্রদান সংক্রান্ত কথোপকথনকে নাটক [ব'লে] দিলে নাটকের সংজ্ঞা পরিবর্তনের প্রয়ো[জ]ন হবে।

ই. রেলওয়ে কমার্সিয়াল স্টাফ কা[উন্সিল]... চারাল কাউন্সিলের (হাওড়া অঞ্চল) [..] বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই নভেম্বর '[..] হাওড়ার রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠি[ত] হয়। এই উপলক্ষে সভ্যগণ কর্তৃক ভা[নু] চট্টোপাধ্যায়ের 'কাণাগলি' নাটকটি বিশে[ষ] সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রত্যেক[] শিল্পীই প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন, ত[বে] মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সর্ব[..] কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম গাঙ্গু[লী], গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রমো[হন] বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্[যায়] লতিকা মুখার্জি।

কমলা সার্কাস :

একদিন ছিল, যখন খ্রীস্টমাস অর্থাৎ বড়দিন উপলক্ষ্যে কলকা[তা] শহরে—বিশেষ ক'রে চৌরঙ্গীপাড়ায় আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। হোয়াইটও[য়ে] লেডল' (যেখানে এখন ইউ-এস-আ[ই]-এস, কে-এল-এম এবং মেট্রোপলি[টান] ব্যাঙ্ক), আর্মি নেভী স্টোর্স (বর্ত[মান]

'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী ও ভানু ব্যানার্জি

ঙ্গ এবং ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ), হল অ্যান্ডার্সন প্রভৃতি বড় বড় ন এবং হগ সাহেবের বাজারের যে-পে শোভা এই বড়দিনের সময় তা' আজ আর কোনো কিছু ক্ষেত্রই হওয়া সম্ভব নয়। এই দর হাটে শহরবাসীকে আনন্দ জন্যে উপস্থিত হ'ত বড় বড় সের দল; এরা গড়ের মাঠে—ন—তাঁবু ফেলে তাদের খেলা । আজও মনে আছে, হিপোড্রোম হার্মিনিস্টোন সার্কাসের কথা। এর আমাদের দেশী সার্কাসও ছিল—র সার্কাস; এই সার্কাসেই বিখ্যাত কর গণপতি—যিনি পি, সি, রের গুরু—তাঁর আশ্চর্য খেলা তেন।

রে কিন্তু, কি কারণে জানি না, জ আমল থাকতেই কলকাতা শহরের তাঁবু ফেলে সার্কাস দেখানো ধ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার কে সার্কাস দেখতে ছুটতে হ'ত য়দানে। সম্প্রতি আবার শহরের স্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে সের তাঁবু ফেলবার অনুমতি দেওয়া তাই শীত পড়তে না পড়তেই "কমলা সার্কাস" এবং টালা পার্কে ন্নই আসচে প্রফেসর সুবোধ পাধ্যায় পরিবেশিত "ইণ্টার-নাল সার্কাস"।

"কমলা সার্কাস"-এর শিল্পিগোষ্ঠীর ান্য ক্রীড়াচাতুর্য যে-কোনও কে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার ক্ষমতা রাখে। অসামান্য স্বাস্থ্যের অধিকারিণী দাক্ষিণী মেয়েরা ট্রাপিজ, রোম্যান রিং, রোপ-ওয়াকিং, রোপ-সাইক্লিং প্রভৃতি খেলায় যে-দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন, তাকে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এ'দের সঙ্গে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা শিল্পীর সাইক্লিং এবং ব্যালান্সিং খেলাও যথেষ্ট উপভোগ্য। দু'টি ওরাং-ওটাংয়ের সাইকেল চালনা এবং ট্রেনের চালকও গার্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াও কম উপভোগ্য নয়। হাতীর খেলা এবং বাঘের খেলা সাধারণ দর্শকদের যমন স্তম্ভিত করে, ভাঁড়গুলির—বিশেষ ক'রে বামন ভাঁড়টির—কীর্তি-কলাপ তাদের মধ্যে তেমনই হাসির বন্যা বইয়ে দেয়। "কমলা সার্কাস" এ-বছর শীতের একটি বিশেষ আনন্দ-আকর্ষণ।

খগেন রায় পরিচালিত 'বিংশতি জননী' চিত্রে মাধবী মুখার্জি, অনুপকুমার এবং লিলি চক্রবর্তী

। সার্কাসের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০১ টাকা দেওয়া হচ্ছে মবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জীর হাতে এবং ডানদিকে সার্কাসের একটি দৃশ্য

।। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির ।।

১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পার্কসার্কাস ময়দানে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে উৎসব-মণ্ডপে শ্রীজওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ও শিশু-উৎসব উপলক্ষে নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্য-কলা মন্দিরের শিল্পিবৃন্দের 'ভারত-ভূমি' নৃত্য-নাট্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এম-এল-সি মহাশয়। নৃত্য-নাট্য রচয়িতা ও সূত্রধরের রূপদান করেন পরিতোষ মুখার্জি, নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন অনুজ শঙ্কর, অরুণ কুমার, স্বপ্না সেনগুপ্তা, শোভা মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, জয়শ্রী মিত্র, অনিল ঘোষ, গোপাল মিত্র, শঙ্কর পাল প্রভৃতি। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ও দর্শক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

।। উদ্দীপক ও স্বদেশ সঙ্গীত ।।

উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'উদীচী'র সম্পাদক শ্রীশৈলেশ ভড় তাঁর একটি ঘোষণায় দেশের পরি-স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'জাতীয় পতাকার মত জাতীয় সঙ্গীতকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানানো উচিত তা আমরা

'রাত এক্ রাত কী' চিত্রে ওয়াহেদা রহমান ও দেব আনন্দ

অনেকেই জানি না। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের সম্মান রক্ষা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।' তিনি আরো বলেন, 'আজ দেশের এই দুর্দিনে আমরাও নিজেদের উৎসর্গ করবো দেশরক্ষার কাজে।' এ বিষয়ে 'উদীচী' কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এবং এই পরিকল্পনায় সহ-যোগিতা করার জন্য 'উদীচী'র প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এবং যোগ্য শিল্পীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে ৯টা 'উদীচী' শিক্ষায়তনে শ্রীশৈলেশ ভড়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপক ও স্বদেশ সঙ্গীত বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করবেন শ্রীশচীন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্রকান্ত শীল। যোগদানেচ্ছু শিক্ষার্থীরা কর্ম-সচিব শ্রীমনোরঞ্জন সিংহের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্মিংহামে ভারতীয়দের জন্য চিত্রগৃহ

বার্মিংহামের অন্তর্গত স্মেথউইকের একটি চিত্রগৃহ, চার বৎসর পূর্বে নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তা পুনরায় বিশেষভাবে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী শ্রোতৃবর্গের জন্য সম্প্রতি খোলা হয়েছে।

চিত্রগৃহটি নির্মাণ করতে প্র ১৫,০০০ পাউন্ড ব্যয় হয়েছিল, পা চালনব্যয় বহন করছেন ভারতীয় পাকিস্তানী সম্প্রদায়ের সদস্যগণ। চি গৃহে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে এ অন্যান্য ছুটির দিনে নানা ধরনের চ চ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্যো গণ আশা করেন যে এই চিত্র-গৃহ সপ্তাহের অন্যান্যদিনে শিক্ষা সংক্রা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারবে।

লয়ালপুরবাসী শ্রীমহম্মদ সর্দা যিনি চিত্রগৃহের পরিচালক গোষ্ঠী একজন সদস্য, তিনি বলেন কম ওয়েলথের যে কোন নাগরিক এই চি গৃহে চলচ্চিত্র দেখতে আসতে পারবে এর আসন সংখ্যা ৯০০।

তিনি আরও বলেন লভ্যাংশে সামান্য অংশ বৃটেনে যে-সমস্ত ভারতী ও পাকিস্তানী রয়েছেন তাঁদের কল্যা বিশেষভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত ও অন্য কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে, ব্যবহৃত হ পারবে।

চিত্র-গৃহের ম্যানেজার হবেন শ্রী কে মানিনি, ইনি একসময় জব্বলপুরে অধিবাসী ছিলেন, এবং বর্তমানে ই বার্মিংহামে একটি মুদির দোকানে পরিচালক। ইনি এবিষয়ে এক ভারতীয় ও পাকিস্তানী কর্মচা সাহায্য লাভ করবেন। —বি আই

।। ভারতে ব্রিটিশ থিয়েটার কোম্পানী

আগামী বৎসর ব্রিস্টল ওল্ড ভি কোম্পানী কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ ক জন্য প্রায় ৩০ জন শিল্পী ও কর্মী নি ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল পরিদর্শ আসছে।

তাঁরা অভিনয় করবেন শেক্সপীয় 'হ্যামলেট', জর্জ বার্নার্ড শ'র 'আ অ্যান্ড দি ম্যান' এবং রবার্ট বোল নতুন নাটক 'এ ম্যান ফর অল সিজন

দলটি ঢাকা হ'তে ৩১শে জানু কলকাতায় পৌঁছবে এবং ১৩ই ফে য়ারী দিল্লী, ১লা মার্চ বোম্বাই ও মার্চ হায়দরাবাদ যাবে। ১৭ই ২৪শে মার্চ পর্যন্ত মাদ্রাজে অভি পর দলটির ভারত সফর শেষ ইহার পর দলটি সিংহলে যাবে।

৮ই এপ্রিল দলটি প্রত্যাবর্তন করবে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর সদ্যমুক্ত 'নবদিগন্ত' চিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও বসন্ত চৌধুরী

[ক]লকাতা
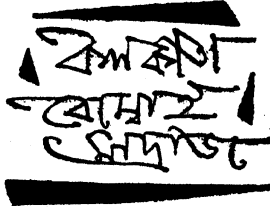
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীর [সম্]পাদনা-টেবিলে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় [প]রিচালিত 'বর্ণচোরা'র কাজ প্রায় শেষ [হ]তে চলেছে। বনফুল রচিত এ [কা]হিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ [ক]রেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, [...]রে গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর [রা]য়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, [ম]নীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, [রে]ণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী। এ ছবির [আ]য়োজনা ও সংগীত-পরিচালনা করেছেন [...]র দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'সূর্যশিখা'র [...]ষ স্যুটিং শেষ করলেন প্রযোজক-[প]রিচালক ও কাহিনীকার সলিল দত্ত। [চিত্র]গ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন বিজয় [...]ষ ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান [চরি]ত্রে যাঁরা অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ [ক]রেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উত্তম-[কুম]ার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, [গঙ্গ]াপদ বসু, জহর রায়, তরুণকুমার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। সংগীতে সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিবেশনা করবেন চণ্ডীমাতা পিকচার্স।

কল্পনা মুভিজের 'শেষ অঙ্ক' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি আবহসংগীত গ্রহণ করলেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা শেষ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হরিদাস ভট্টাচার্য। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এ ছবির প্রযোজক।

রামধনু পিকচার্সের একটি পরীক্ষা-মূলক ছবি 'তের নদীর পারে' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। ভ্রাম্যমাণ একটি সার্কাস দলের বাস্তব জীবন নিয়ে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ বহির্-দৃশ্যের এ ছবিটির আলোকচিত্র ও পরিচালনা করেছেন বারীন সাহা। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়ম হাজারিকা। সংগীত পরিচালনা করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

অর্ধসমাপ্ত একটি ছবি—সুশীল ঘোষ পরিচালিত 'পলাশের রঙ'। সুর-সৃষ্টি করেছেন ভি বালসারা। প্রধান চরিত্র-শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসীম-কুমার, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, চিত্রিতা মণ্ডল ও বঙ্কিম ঘোষ।

জে বি প্রোডাকসন্সের 'এ প্রভু মহাপ্রভু' ছবিটির কাজ শীঘ্রই শুরু

হবে। নোরা ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন হরিধন, শীতল, রাজলক্ষ্মী ও ধীরেন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করবেন রতন চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই

সম্প্রতি মডার্ণ স্টুডিওয় রতনদীপ পিকচার্সের 'ঘর বাসাকে দেখো'র চিত্রগ্রহণ শেষ হল। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেন মনোজকুমার ও রাজশ্রী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন চিত্রগুপ্ত। ছবিটি পরিচালনা করছেন কিশোর সাহু।

অমর ছায়ার 'যাবসে তুমহে' দেখা হাই' ছবির একটি বিশেষ কাওয়ালি দৃশ্যে শাম্মিকাপুর ও রাজেন্দ্রকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কেদার কাপুর। সম্প্রতি গীতাঞ্জলি ও অন্য নৃত্য-শিল্পীদের নিয়ে একটি 'টুইস্ট' দৃশ্যায়িত হল। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, বিজয়লক্ষ্মী, দুলারী, মোহন চোটী, সুন্দর ও আনা। সঙ্গীত পরিচালক হলেন দত্তরাম।

প্রযোজক-পরিচালক এন এ আন্সারী 'মুলজিম' ছবির আরও কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ করলেন। মুখ্যচরিত্রের শিল্পীরা হলেন প্রদীপকুমার, শাকিলা, জনি ওয়াকার ও আন্সারী। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবি।

শাম্মিকাপুর ও রাজশ্রী অভিনীত রঙীন ছবিটির নাম 'জানওয়ার'। হরদীপ প্রযোজিত ছবিটি পরিচালনা করছেন ভাপ্পি সোনি। সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। কাহিনী ও আলোকচিত্র রচনায় শচীন ভৌমিক ও তারু দত্ত। রূপতারা স্টুডিওয় এ ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বিরাজ কাপুর, রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, অচলা সচদেব ও মাধবী।

প্রায় এক মাসব্যাপী পরিচালক আর কে নায়ার তাঁর ছবি 'ইয়ে রাস্তা হ্যায় পেয়ার কী'র কাজ শেষ করলেন। অশোককুমার, সুনীল দত্ত, মতিলাল, লীলা নাইডু, শশিকলা, রেহমান, হরি সদাশিব, রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এ ছবির প্রধান চরিত্র-শিল্পী। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন রবি।

গত সপ্তাহে প্রায় এক মাসের জন্য গোয়ালিয়র-বহির্দৃশ্যে পরিচালক মণি ভট্টাচার্য তাঁর দলবলসহ রওনা হয়ে গেছেন 'মুঝে জিনে দো' ছবির জন্য। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন সুনীল দত্ত, ওয়াহিদা রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, নিরূপা রায়, দুর্গা খোটে ও তরুণ বসু। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক জয়দেব।

মাদ্রাজ

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান হিসেবে স্মরণীয়। অভিনেতা এম জি রামচন্দ্রন তাঁর মাসিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন বলে তিনি এক সভায় প্রতিশ্রুতি দেন এবং এই অনুষ্ঠানে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন প্রথমে।

এম জি রামচন্দ্রন সম্প্রতি চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অল্প-দৈর্ঘের চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এই চিত্রটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তোলা হবে।

শিবাজী গণেশন এই উপলক্ষে একটি অল্প-দৈর্ঘের চিত্র 'নাম নাদু' সম্প্রতি শেষ করেছেন। সীমান্ত রক্ষীর উৎসাহদানকল্পে যে ছোট্ট কাহিনী গড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিবাজী গণেশন, জি সাবিত্রী, জেমিনী গণেশন ও কে সারঙ্গপানি। সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিশ্বনাথন এবং রামমূর্তি। ছবির পরিচালক বি আর পান্থালু।

—[illegible]
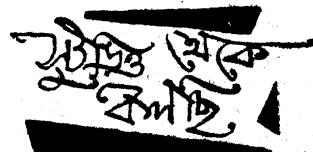
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতই অবস্থা হয়েছে আজকাল স্টুডিওগুলোর। নতুন ছবি তেমন আরম্ভ হচ্ছে না। বাংলা ছবির বাজার কিভাবে চলেছে সে তো আপনারা প্রেক্ষাগৃহেই প্রমাণ পাচ্ছেন। সরকার অবশ্য পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। জানি না এ অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে। চালু যে কয়েকটি স্টুডিও আছে তার মধ্যে নিউ থিয়েটার্স এবং টেকনিসিয়ানে বর্তমানে কিছু নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হবে বলে খবর পেলাম। অন্য আর সব স্টুডিও-গুলোর কাজ প্রায় বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য যা পুরনো ছবি[illegible] কাজ হয়। তাই এক একদিন নিরা[illegible] মনে স্টুডিওপাড়া থেকে অবসাদে[illegible] হাই তুলতে তুলতে বাড়ী ফিরি।

সম্প্রতি টেকনিসিয়ান স্টুডি[illegible] একটি নতুন ফ্লোর কয়েক মাসের ম[illegible] তৈরী হল। এই স্টুডিও-ফ্লোরে এ[illegible] নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। খ[illegible] পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলা[illegible] ছবির নাম—'নবারুণ রাগে'। ছ[illegible] পরিচালনা করছেন [illegible] অভিনে[illegible] অভনুকুমার। আপনারা এঁর বহু [illegible] এর আগে দেখেছেন। যেমন—উপর[illegible]

টনসিল, কাবুলিওয়ালা, লৌহকপাট, ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত এবং আকাশ পাতাল ছবিতে। তিনি এই প্রথম পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। পরমহংস বাণীচিত্রের 'নবারুণ রাগে' অতনুকুমার নায়ক এবং পরিচালক। পর পর কয়েক দিনের দৃশ্য-গ্রহণ দেখে মনে হয়েছে তিনি অভিনয়ের মত পরিচালনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন। এ ছবির সংগীত এর আগেই গৃহীত হয়েছে। সংগীত পরিচালক ভি. বালসারা। এ ছবির তিনটি গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিশ্র।

বাসন্তী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করছেন হিরন্ময় দত্ত। চিত্রগ্রহণ করছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। সম্পাদনা শিব ভট্টাচার্য। শিল্প-নির্দেশনা গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জার অনাথ মুখোপাধ্যায় ও গৌর দাস। শব্দগ্রহণে সমেন চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রায়ণে সেদিন নায়ক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দৃশ্যটি গৃহীত হচ্ছিল। নায়ক সকালে শয্যাত্যাগ করে বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল। এমনি সময়ে সুজাতা এ ঘরে এসেছে। কাহিনী পরে বলছি তার আগে অভিনীত দৃশ্যটির কয়েকটি সংলাপ বলে রাখি।

গৌতম—একি আপনি কেন। বৃন্দ গেল কোথায়?

সুজাতা—তা কি করে হবে। নব-বিবাহিতা স্ত্রী পড়ে পড়ে আটটা পর্যন্ত ঘুমবে আর স্বামীর জন্য Bed-tea নিয়ে আসবে সেই পুরাতন ভৃত্য। তাতে ছন্দ পতন হবে যে।

গৌতম—তাহলেও আপনাকে শুধু শুধু বিরত করা উচিত নয়।

সুজাতা—জানেন তো অভিনয় করতে হলে নিখুঁত হওয়া চাই। তা না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

এই পর্যন্ত। দৃশ্যটিকে বুঝিয়ে দিয়ে পরিচালক-নায়ক গৌতম এবং সুজাতার ভূমিকায় অভিনয় করলেন অতনুকুমার ও নায়িকা সবিতা বসু। কাহিনী সংক্ষেপে আজকের সমাজের একটা দিকের কথা বলা হয়েছে। জমিদার কুমার বাহাদুর জমিদার-প্রথায় বিশ্বাসী হলেও চাষাবাদের জন্য নতুন পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন। চাষীদের সব রকমের সুবিধার কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার বাদ সাধলেন অন্যদিকে। অবশ্য চাষের জন্য সাহায্য করতে চাইলেন আধুনিক ট্রাক্টার আর সব যন্ত্রপাতি দিয়ে। কৃষির ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মুখোপাধ্যায়কে তাঁরা পাঠালেন জমিদারের কাছে। কুমার বাহাদুর এই পরিকল্পনায় বিশ্বাসী না হওয়ায় তার একমাত্র প্রণয়ী সুজাতাকে পাঠালেন গৌতমের কাছে। সুজাতা রাজী হয় এক সর্তে। কুমার বাহাদুরের কথায় গৌতমের সঙ্গে সুজাতা কলকাতায় চলে আসে। সুজাতা সব কথা জানায়।

সুজাতা যখন পালিয়ে কলকাতায় এসেছে তখন কুমার বাহাদুর গ্রাম্য চাষীর মেয়ে ললিতার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন। সুজাতার বাবা সজনীবাবু মেয়ের কোন খবর না পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের সাহায্য নিলেন। সুজাতার মা ভেঙে পড়েন। গোয়েন্দাদের কানু ও বংশী কাজ শুরু করে।

গৌতম এবং সুজাতা গ্রামে ফিরে আসে। সরকারের পরিচালনায় গৌতম বিরাট কারখানা ও চাষাবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জমিদার কুমার বাহাদুর তাঁর কথা রাখেন নি। জমিদার

পরিচালক ও নায়ক অতনুকুমার 'নবারুণ রাগে'-র একটি দৃশ্যে নায়িকা সবিতা বসুকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বংশের সেই রক্ত তাকে লালসার পথে নিয়ে গেছে। সুজাতার কথা নয় রেখে তিনি ললিতাকে বিবাহ করেন।

শুধু অভিনয় নয়। ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সুজাতার বিয়ের সব পাকাপাকি হল কাহিনীর শেষ অঙ্কে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন কুমার বাহাদুর—অসিতবরণ, সুজাতা— সবিতা বসু, গৌতম— অতনুকুমার, ললিতা—আরতি দাস, রাজা বাহাদুর—কমল মিত্র, নলিনীবাবু—বিপিন গুপ্ত, সুজাতার মা—অপর্ণা দেবী, কানু—তরুণকুমার, বংশী—জহর রায় ও বন্ধু—পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

—চিত্রদূত

।। দি লংগেস্ট ডে ।।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে আজ পর্যন্ত যত ছবি উঠেছে তাদের মধ্যে 'দি লংগেস্ট ডে' হল দীর্ঘতম। ছবিটিকে প্রায় একটি আন্তর্জাতিক চিত্রও বলা যেতে পারে। কারণ এই চিত্রের জন্যে তিন দেশের তিনজন প্রথিতযশা পরিচালক এবং চার দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়োজিত করেছেন ড্যারিল জ্যানুক। নরম্যাণ্ডি উপকূলে মিত্রপক্ষের সৈন্যাবতরণের সেই ঐতিহাসিক ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন এই চিত্রের পটভূমি। যে যে দেশ সেই স্মরণীয় দিনে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেকেরই সাহায্য লাভ করেছেন জ্যানুক এই ছবি তুলতে গিয়ে। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানীর অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই চিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালনা করেছেন বৃটেনের কেন আনাকিন, আমেরিকার এ্যানড্রু মারটন এবং জার্মানীর বার্নাড় ভিকি। যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে যে যে দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল চিত্রের সেই সেই অংশের পরিচালনার ভার সেই দেশেরই পরিচালকের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু 'দি লংগেস্ট ডে' শুধুমাত্র তারকাখচিত চলচ্চিত্র নয়। ৬ই জুনের সেই স্মরণীয় দিনটি যেভাবে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী এবং জার্মান চোখে প্রতিভাত হয়েছিল তারই তথ্যনির্ভর নিখুঁত ছবি এই চিত্রটি। নিটোল কোনো কাহিনীর সূত্র এই চিত্রে অনুসরণ করা হয়নি। এবং কোনো মুখ্য চরিত্রকেও প্রাধান্য দেয়া হয়নি বর্তমান চিত্রে। কিন্তু তাতে চিত্রের আকর্ষণ এতটুকু কমেনি দর্শকদের কাছে। চিত্রের ঘটনাংশ নেয়া হয়েছে কর্ণেলিয়াস রায়ানের একটি গ্রন্থ থেকে। রায়ান আমেরিকান বলে মার্কিনী সৈন্যের ক্রিয়াকলাপ চিত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে বটে তবে অন্যান্য দেশের সৈন্য বাহিনীর ভূমিকাও মর্যাদার সঙ্গে রাখা হয়েছে। যেমন ইংরেজ সৈন্যদের ওরনে নদীর সেতু আক্রমণের দৃশ্যটি (এই অংশে সৈন্য পরিচালনা করেছেন রিচার্ড টড) এবং সোর্ড বীচে লর্ড লোভাট-এর (পিটার লফোর্ড) নেতৃত্বে সৈন্যাবতরণের দৃশ্য ইংরেজ গরিমারই বীরত্বব্যঞ্জক প্রমাণ। ফরাসী প্রতিরোধ কাহিনীর তীব্র আক্রমণও চিত্রে যথাযথ রাখা হয়েছে। এমন কি জার্মান সৈন্য বাহিনীর প্রতিও কোনো বিরূপ ভাব জাগ্রত করার প্রচেষ্টা নেই চিত্রে। বরং জার্মান সেনাপতিদ্বয় রুনস্টেড এবং রোমেল-এর প্রতি দর্শকরা সহানুভূতিই বোধ করবেন।

চিত্রটি সাদাকালোয় সিনেমাস্কোপে তোলা হয়েছে। যুদ্ধের ব্যাপক আক্রমণ প্রতিআক্রমণের মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্বই হারিয়ে যায়নি এইটেই হচ্ছে এই বিরাট চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই বৃদ্ধ ফরাসীটি যে তার বাড়িটাকে কামানের গোলায় চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখেও আনন্দে উদ্ভাসিত—তাকে দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে। কুকুর সঙ্গী কেনেথমোর, আহত বিমানচালক রিচার্ড বার্টণ, আহত জনওয়েন এই চিত্রে কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন।

।। জাঁ আনুইর নাটক চিত্রায়িত ।।

আনুইর ঐতিহাসিক নাটক 'বেকেট' পিটার গ্লেনভিল-এর পরিচালনায় তোলা হচ্ছে বৃটেনে। চিত্রটি পরিবেশনা করবেন প্যারামাউন্ট পিকচার্স। টমাস বেকেট একটি ভুল বোঝাবুঝির ফলে চার্চের মধ্যে রাজার সৈন্যদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। টমাস বেকেটের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রিচার্ড বার্টন এবং দ্বিতীয় হেনরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পিটার ওটুল।

—চিত্রকূট

দর্শক

এম সি সি বনাম নিউ-সাউথ ওয়েলস

এম সি সি : ৩৪৮ রান (জিওফ পুলার ১৩২, কাউড্রে ৫০ এবং ডেক্সটার ৪২। জে মার্টিন ১২২ রানে ৪ এবং রিচি বেনো ৬১ রানে ৩ উইকেট) ও ১০৪ **রান** (পারফিট ২২। রিচি বেনো ১৮ রানে ৭ উইকেট এবং মার্টিন ৩৮ রানে ২ উইকেট)

নিউ সাউথ ওয়েলস : ৫৩২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ও'নীল ১৪৩, সিম্পসন ১১০, হার্ভে ৬৩, ডেভিডসন ৫৫, ক্রুকটোন নট আউট ৬২ এবং রিচি বেনো নট আউট ৪০। ডেক্সটার ১১৬ রানে ২ এবং ইলিংওয়ার্থ ১৪৪ রানে ২ উইকেট)

নিউ সাউথ ওয়েলস এক ইনিংস এবং ৮০ রানে এম সি সি দলকে পরাজিত করে।

নিউ সাউথ ওয়েলস দলের এগার জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আটজন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলোয়াড় এবং এই আটজনের মধ্যে ছ'জন খেলোয়াড়—রিচি বেনো, হার্ভে, ও'নীল, ডেভিডসন, সিম্পসন এবং বুথ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন প্রথম টেস্ট খেলায় দলে স্থান পেয়েছেন। সুতরাং নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে এম সি সি-র এই চারদিনের খেলাটিকে ছোট আকারের টেস্ট খেলা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত ১৯৫৮-৫৯ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে দুটো খেলাই ড্র রেখেছিল। এ পর্যন্ত নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম এম সি সি দলের ৫২টি খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল : এম সি সি'র জয় ২০, হার ১৮ এবং খেলা ড্র ১৪।

আলোচ্য খেলার প্রথম দিনেই এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৩৪৮ রানে শেষ হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার সেঞ্চুরী (১৩২ রান) করেন। কোন রান করার আগেই এবং নিজস্ব ১৭ রানের মাথায় আউট হওয়ার হাত থেকে তিনি বেঁচে যান। তবে তিনি বিপক্ষের বোলিংকে তোয়াক্কা করেননি। ডেভিডসন প্রথম ইনিংসে কোন উইকেটই পান নি। বেনোর থলি চা-পানের আগে পর্যন্ত শূন্য ছিল। চা-পানের পরের খেলায় বেনো তাড়াতাড়ি ৩টে উইকেট পান। মনে হয় কলিন কাউড্রে এতদিনে দুষ্টগ্রহের কুদৃষ্টি থেকে ছাড়ান পেলেন। এবার ৫০ রান করেন। এই দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, কিন্তু কোন রান হওয়ার বা উইকেট পড়ার আগেই খেলা বন্ধ হয়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস মারমুখী হয়ে খেলতে থাকে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ৫ উইকেট পড়ে ৪০৮ রান উঠেছে। ববি সিম্পসন (১১০ রান) এবং নর্ম্যান ও'নীল (১৪৩ রান) সেঞ্চুরী করেন। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের বিপক্ষে ববি সিম্পসন এই নিয়ে তিনটে সেঞ্চুরী করলেন—এডিলেডে সম্মিলিত একাদশ দলের পক্ষে ১০৯, মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের পক্ষে ১৩০ এবং সিডনিতে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের পক্ষে ১১০ রান।

নিউ সাউথ ওয়েলস দলের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দলের মাত্র ১৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট (টেমাস) পড়ে যায়। সিম্পসনের সঙ্গে ও'নীল দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন এবং এই দু'জনেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে সিম্পসন এবং ও'নীল দলের ২৩৪ রান যোগ করেন। সিম্পসন তিন ঘন্টার বেশী খেলে দশটা বাউন্ডারী মারেন। ও'নীল ১৩০ মিনিটের খেলায় তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। ২৪৯ মিনিটের খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

খেলার তৃতীয় দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস দল ৫৩২ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে এম সি সি দল ১৮৪ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এম সি সি দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা মাত্র ১৭৩ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে তারা ১০৪ রান করে। এম সি সি দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব রিচি বেনোর। বেনো মাত্র ১৮ রানে ৭টা উইকেট পান। বেনোর বোলিংয়ের হিসাব : ওভার ১৮-১, মেডেন ১০, রান ১৮ এবং উইকেট ৭। এইদিন পীচের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলস দল এই দিনের খেলায় একটা উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ৪০৮ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১২৪ রান যোগ করে মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

ডেভিডসন এই খেলায় মাত্র একটা উইকেট (২য় ইনিংসে ১১ রানে ১) পেলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে তিনি নিঃসন্দেহে ভয়ের কারণ। ব্রিসবেনে ৩০শে নভেম্বর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের হাতে এম সি সি দলের এই শোচনীয় পরাজয় দলের পক্ষে মোটেই শুভ নয়।

॥ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ॥

৩০শে নভেম্বর ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজের এই প্রথম টেস্ট খেলাটি ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ১৮৪তম টেস্ট খেলা। ব্রিসবেনে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সাতটি টেস্ট খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং ইংল্যান্ডের ৩। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার বিগত সাতটি টেস্ট খেলায় যে সব উল্লেখযোগ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে (অমৃতের ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করা হয়েছে।

আসন্ন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলে এই বারজন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন : রিচি বেনো (অধিনায়ক), নীল হার্ভে, ব্রায়ান বুথ, পিটার বার্জ, এ্যালান ডেভিডসন, ওয়ালি গ্রাউট, বিল লরী, কেন ম্যাকায়, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, নর্ম্যান ও'নীল, ববি সিম্পসন এবং বেরী শেফার্ড। এই বারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বেরী শেফার্ড বাদে বাকি এগারজন খেলোয়াড়ই ১৯৬১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে খেলে ইংল্যান্ডকে ৫৪ রানে পরাজিত ক'রেছিলেন। ন্যাটা খেলোয়াড় বেরী শেফার্ড টেস্ট দলে এই প্রথম স্থান পেলেন। এ বছর তিনি খুব ভাল খেলেছেন। সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের হয়ে শেফার্ড এম সি সি দলের বিপক্ষে ১১৪ এবং নট আউট ৯১ রান করেন। শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় তিনি এই মাসেই ডবল সেঞ্চুরী করেন। মনে হয়, নির্ভরশীল টেস্ট খেলোয়াড় ব্রায়ান বুথ চূড়ান্তভাবে দল নির্বাচনের সময় শেফার্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন। খেলার দিন সকালে দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হবে।

ব্রিসবেন ক্রিকেট মাঠ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এখানে যে দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায় সেই দলই বেশীর ভাগ সময় খেলায় জয়মাল্য লাভ করে। তাছাড়া এখানের ক্রিকেট খেলার সঙ্গে বরুণদেবের যেন একটা অতি নিকট সম্পর্ক আছে। খেলার সময় বৃষ্টিপাত এখানের আবহাওয়ার এক বিশেষত্ব। খেলার উপর বৃষ্টির খুবই প্রভাব। ফলে যে দল প্রথম ইনিংস খেলবে তারাই জয়লাভ করবে। অবিশ্যি প্রতিটি খেলায় এ-সব প্রবাদ খাটে না।

অস্ট্রেলিয়া বিগত দুটি টেস্ট সিরিজের (১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬১) অধিক সংখ্যক টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে জয়লাভের পুরস্কার কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' নিজেদের অধিকারে রেখেছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া আজ স্বদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলছে। এই দুটি ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার মনোবল অটুট রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

॥ ডেভিস কাপ ॥

মাদ্রাজে আগামী ১লা, ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা হবে। এই পর্যায়ে খেলবে ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো। ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো ইতিপূর্বে কখনও ডেভিস কাপের ইন্টার-জোন ফাইনালে পেণছতে পারেনি। গত বছর ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ২—৩ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার ক্রম-পর্যায় তালিকায় মেক্সিকোর কোন বিশেষ স্থান ছিল না। কিন্তু ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপের খেলায় মেক্সিকো যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে খেলেছে। আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া এবং সুইডেন এই তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত ক'রে মেক্সিকো ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে। মেক্সিকোর এই সাফল্য অপ্রত্যাশিত কিন্তু দৈবক্রমে মেক্সিকো জয়লাভ করেছে বললে অবিচার করা হবে।

মেক্সিকোর ডেভিস কাপ দল ভারতবর্ষে পেণছে গেছে। এই দলের সঙ্গে এসেছেন এই চারজন—পি কণ্ট্রিরাস (অধিনায়ক), রাফেল ওসুনা, এ্যান্টোনিয়ো প্যালাফক্স এবং মারিয়ো লামাস।

আসন্ন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার ফলাফল সম্পর্কে মেক্সিকোর অধিনায়ক কণ্ট্রিরাস তাঁর নিজ দলের সাফল্যের উপর বেশী জোর দিয়ে বলেছেন, মোটের উপর তাঁর দল ভারতীয় দল অপেক্ষা শক্তিশালী। তিনি ভারতীয় দলের রমানাথন কৃষ্ণানের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে মন্তব্য করেছেন, কৃষ্ণান যদি দুটি সিংগলস খেলায় জয়লাভও করেন তাহলে বাকি দুটি সিংগলস এবং গুরুত্বপূর্ণ ডাবলসের খেলায় মেক্সিকোর জয়লাভ সম্পর্কে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী। মেক্সিকো দলের অধিনায়ক ডাবলসের খেলার ফলাফলের উপরই বেশী জোর দিয়ে বলেছেন, এই খেলার ফলাফলই তাঁর দেশকে জয়যুক্ত করবে।

॥ রোভার্স কাপ ॥

১৯৬২ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু দু'দিনের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। প্রথম দিন ১—১ গোলে খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনের নির্ধারিত সময়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। দুই দলই একটি ক'রে গোল দেয়। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত উভয় দলকেই যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অন্ধ্র পুলিশ দল টসে জয়লাভ করায় প্রথম ছ'মাস রোভার্স কাপ নিজেদের অধিকারে রাখবে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে উভয় দলের যুগ্মভাবে রোভার্স কাপ জয় এই প্রথম।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দল ইতিপূর্বে হায়দরাবাদ পুলিশ দল নামে উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৫০—৫৪) রোভার্স কাপ জয় ক'রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়ের রেকর্ড করে। এই দলটি পুনরায় ১৯৫৭ এবং অন্ধ্র পুলিশ দল নামে ১৯৬০ সালে রোভার্স কাপ পায়। অন্ধ্র পুলিশ দল এ পর্যন্ত ৮বার (১৯৫০—৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে) রোভার্স কাপ পেল—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এত অধিকবার কোন দলই রোভার্স কাপ জয় করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চারবার (১৯৪৯, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬২) রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে দু'বার (১৯৪৯; ১৯৬২ সালে যুগ্মভাবে) রোভার্স কাপ পেল। ১৯৬০ সালের ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশ দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল। প্রথমদিনের ফাইনাল খেলাটি ২—২ গোলে ড্র ছিল।

।। স্মরণীয় ।।

১৮৯১ সালে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়।

১৯২৩ সালে বিশেষ নিমন্ত্রণে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের যোগদান এবং ফাইনালে ১—৪ গোলে ডারহামস দলের কাছে মোহনবাগান দলের পরাজয়। ফাইনালে মোহনবাগান ৪৫ মিনিট সময় পর্যন্ত এক গোলে অগ্রগামী ছিল।

১৯৩৭ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে বাঙ্গালোর মুসলিম দলের রোভার্স কাপ জয়। এই বছরের ফাইনালে বাঙ্গালোর মুসলিম দল ১—০ গোলে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে।

১৯৬২ সালের প্রথমদিনের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ২১ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দলের ইনসাইড-লেফট জুলফিকার প্রথম গোল দেন। বিরতির সময় পুলিশ দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলা ভাঙ্গার চার মিনিট আগে কর্ণার সট থেকে অরুণ ঘোষ মাথা দিয়ে গোল শোধ করেন।

দ্বিতীয়দিনের খেলায় প্রথম গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দল। প্রথমার্ধের খেলার ৩০ মিনিটে বলরামের ফ্রিকিক থেকে এইদিনের খেলার প্রথম গোল হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৬ মিনিটে পুলিশ দল একটা কর্ণার পায়। এই কর্ণার কিক থেকে পুলিশ দলের লেফট-ব্যাক নঈম গোলটি শোধ দেন। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আর কোন গোল হয়নি।
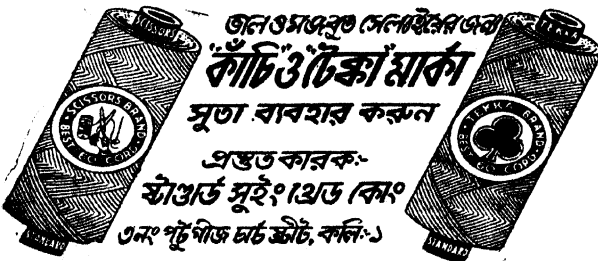
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 7th December, 1962.
40 Naya Paise.

সমরাঙ্গনে এখন শান্তি না হোক ক্লান্তি। কিন্তু কূটনীতির বুদ্ধি-পরীক্ষায় এখন যে প্রবল তর্ক ও যুক্তির ধূলিজাল উড়িয়াছে তাহার পিছনে শত্রুপক্ষের কিসের প্রস্তুতি চলিতেছে তাহাই এখন আমাদের চিন্তার কারণ। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে যদি চীন কূটতর্ক ও যুক্তির চালে ভারতকে পরাস্ত না করিতে পারে তবে যুদ্ধের অনল আবার প্রজ্বলিত হইবে। অন্য দিকে ইহাও এখন প্রায় নিশ্চিত যে চীনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধুমাত্র হিমালয়ের কয়েক সহস্র বর্গমাইল-ব্যাপী প্রস্তর ও তুষারময় অধিত্যকা বা জঙ্গলে ছাওয়া পার্বত্য অঞ্চল গ্রাস করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং এই কুটিল তর্কের শেষে পুনর্বার শক্তি-পরীক্ষা অনিবার্য। কেননা চীনের যদি প্রকৃতই এই সীমান্ত লইয়া বিরোধের শান্তিময় মীমাংসা করার ইচ্ছা থাকিত তবে তাহার শর্তগুলির মধ্যে এরূপ কথার 'মারপ্যাঁচ' থাকিত না। যুদ্ধবিরতি রেখা কোথায় স্থির থাকিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই এবং সে বিষয়ে কোনও সরল ও সহজ উত্তর এখনও আসে নাই।

চীন সারা জগতকে বুঝাইতে চাহিতেছে যে সে ভারতের দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী দিতে প্রস্তুত আছে। ভারতের পিছনে নাকি সাম্রাজ্যবাদীদিগের চক্রান্ত চলিতেছে এবং তাহারই বশে ভারত যুদ্ধবিরতি করিয়া শান্তিময় মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাইতে চাহে না। চীনের মুখপাত্র চু এন-লাই সারা জগতকে জানাইয়াছেন যে ভারত যুদ্ধবিরতির শর্তে বলিয়াছে যে চীনা সৈন্যবাহিনী এই বৎসরের ৮ই সেপ্টেম্বর যেখানে ছিল সেই সীমারেখায় ফিরিয়া যাইলে শান্তি বিষয়ক আলোচনা চলিবে। চীনা কর্তৃপক্ষ নাকি ভারতকে আরও অধিক সুবিধা দিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা তাঁহাদের সেনাবাহিনীকে আরও প্রায় তিন বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের সীমারেখায় পেছনে ফিরাইতে প্রস্তুত এমনই শান্তিকামী তাঁহারা। এবং জগতের অনেক দেশে এই চীনা-ধাঁধার প্রকৃত রহস্য না জানা থাকায়, এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে এই সীমান্ত বিরোধ এবং তাহার পরের চীনা আক্রমণ ব্যাপারে আমাদের দোষ যথেষ্ট আছে। এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদের কথা বলিবার অর্থাৎ এই অপরূপ শান্তি প্রস্তাবের ভিতরে যে ফাঁকি রহিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার লোকের অভাব। যে সকল লোককে আমাদের বহির্রাষ্ট্রবিভাগ বিদেশ-স্থিত আমাদের দূতাবাসগুলিতে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য লোক অল্প। অযোগ্য লোক যে কত আছে তাহার একটি উদাহরণ তো সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। জাকার্তায় অর্থাৎ ইন্দোনেশীয়ায়, ভারতীয় দূতাবাসের বিহারীলাল নামক জনৈক কর্মচারী "অসন্তোষজনক" কার্যকলাপের জন্য ভারতে ফেরৎ আসিতেছিল। সেই বিমানে বহির্রাষ্ট্র-দপ্তরের ইতিহাস বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ এস গোপালও ছিলেন—যিনি উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের সহিত বর্মা, মালয়, কাম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশীয়ায় এই চীনা প্রস্তাবের ভিতরের ফাঁকি ধরাইতে গিয়াছিলেন। বিমানে ঐ বিহারীলাল "তোমরা চীনের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছ" বলিয়া ডাঃ গোপালকে ছুরিকাহত করে। আমাদেরই দূতাবাসে এরূপ ব্যক্তি থাকিলে সে দেশে যে আমাদের বিরুদ্ধে বিপরীত মতের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? এই বিহারী-লাল মহাশয় কে এবং তিনি ঐ বিভাগে নিযুক্ত হইলেন কি ভাবে তাহা জানা প্রয়োজন।

চীনা প্রস্তাবের ভিতরের উদ্দেশ্য ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। ঐ প্রস্তাবিত পশ্চাদপসরণের কোনও প্রকৃত সীমারেখা নাই, অর্থাৎ চীনাবাহিনী তাহাদের এই অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে যাহা গ্রাস করিয়াছে চীন চাহে যে সে সকলই তাহার অধিকারে থাকে এবং আমাদের সেনাবাহিনী আরও ১২ মাইল পিছু হটিয়া আসে। লাডাখে এই ব্যাপার ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। নেফার কথা বুঝা যায় নাই—এই লেখার সময় পর্যন্ত।

ওদিকে আমাদের আর এক প্রতিবেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এই সময় ভারতের সহিত বুঝাপড়া করিতে। যাই হোক, সম্প্রতি ব্রিটিশ ও মার্কিন মিশনের দুই কর্তাব্যক্তি, সান্ডস এবং হারিমান রাওয়ালপিণ্ডি ও নয়াদিল্লীর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ আলোচনার গোড়া-পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে হয়।

গান

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়ায়ে হাঁক দিয়ে বল,
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই,
জয় গাহ আজি দেশ মাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার
জ্বালাও মুক্তি কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও সুর দিয়ে বল,
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
জোর করে বল আপোষ নাই, আপোষ নাই
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
মৃত্যুপণ জীবনপণ হয় বিজয় নয় মরণ
দিগ্‌দিগন্তে ঝড় তুফানে অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ
বল মাভৈঃ বল মাভৈঃ, হে সৈনিক নিশান কৈ।

(পুনর্মুদ্রণ)
—অজ্ঞাত

গান

(অংশ)

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলসরে, সাজো সাজো রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল!
কে র'বি প'ড়ে লাজে॥

বহে স্রোত জীবন নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয় দূরে সাগর ডেকে যায়॥
হ'বি মৃত্যু-পাথার পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥

(পুনর্মুদ্রণ)
—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

অটল চূড়া

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

প্রণাম অটল চূড়া,
অয়ি শুভ্রকিরিটিনী দেশ,
ভুবনমোহিনী প্রাণ-প্রতিমার মুগ্ধ স্বপ্নাবেশ
কুজ্ঝটিকা ছিন্ন করে বিচ্ছুরিত নব রৌদ্ররাগে
এ কোন নতুন রূপ আমায় দেখালে,—
সমুদ্যত দশদিকে ঝলসায় দশ প্রহরণ
ঊর্ধ্বে স্থির ত্রিংশকোটি ভুজোধৃত খর-করবালে।

নতুন স্বরূপে আজ আরবার তোমাকে চিনলাম,
দুর্জয় তুষারমৌলি, হে কারাকোরাম।
অভ্রংলিহ গৌরীশৃঙ্গ গম্ভীর মহিমা নিয়ে জাগে
আরক্ত ছটায় দীপ্ত নবোদিত সূর্যের সংরাগে।
কে আছো ঘুমিয়ে? শোনো, প্রভাতের এই বৈতালিক—
অজেয় প্রতিটি শৃঙ্গ—সীমান্তের নির্ভীক সৈনিক।
অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে দৃঢ়বন্ধ প্রতি ওষ্ঠাধরে
বিনিদ্রিত অক্লান্ত প্রহরে
প্রতিরোধে প্রতিরোধে শেষতম রক্তবিন্দু ঢালে;
আমার বুকের রক্তে ফোঁটা দিই তাদের কপালে।

পাথুরে দেয়াল তুলি; কে এগোও, কলঙ্কিত পায়ে?
কে এগোও? সাবধান! কে এগোও, অন্ধ আবছায়ে?
জ্যাবন্ধ ধনুর মতো ঘরে ঘরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি
প্রাণযজ্ঞে দিতে পূর্ণাহুতি,
এখানে প্রস্তুত চতুর্দিক;
ছিন্ন করে স্বপ্নাবেশ
জাগে সুপ্ত সিংহ-দেশ ঃ
প্রণাম অটল চূড়া—সীমান্তের নির্ভীক সৈনিক।

জৈমিনি

গত সপ্তাহে শিশু ও কিশোরদের লেখাপড়ার বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করেছি। এবার বলছি প্রধানত কিশোর এবং তরুণদের বিষয়ে।

বলা বাহুল্য, দেশের এই সংকট-কালেও কিশোর ও তরুণ, অর্থাৎ আমাদের ছাত্র সমাজের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বড়, তাদেরও লেখাপড়ার কাজে অবহেলা করলে চলবে না। কিন্তু তার সঙ্গেই আরো কতকগুলি নতুন কর্তব্য আছে তাদের, যা পড়াশোনার সঙ্গেই সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন ক'রে যেতে হবে।

আমি সামরিক শিক্ষার কথা বলছি। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে কলেজের ছাত্র পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে শরীর গঠন ও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করা হ'য়েছে। এ প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাবেন না, এমন অভিভাবক বোধহয় একজনও নেই। বরং ইতিমধ্যে যখন খবরের কাগজে একদিন দেখলাম, আমাদেরই এই শহরের একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় দু'হাজার ছাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন গৌরবে আমার বুক ভরে উঠল। আমি জানি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ-গুলিতেও অনুরূপ প্রেরণার জোয়ার এসে যাবে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যগণ ইতিমধ্যেই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ এবং দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। এগুলি নিশ্চয়ই মনে রাখবার মতো ঘটনা।

বাস্তবিক ছাত্র সমাজের এই জাগরণ এত উৎসাহজনক যে, আজ রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলা চলে যে, দেশের সেবায় কে আগে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে, সেই নিয়েই প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন ছাত্রগণ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অত্যাচারীর মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেইরকমই কিংবা তার চেয়ে বেশি আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা

নিয়ে অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আজ আমাদের ছাত্র সমাজ। দেশজননীর আশীর্বাদে তারা হবে অজেয়।

কিন্তু এই সামরিক শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করেই আমাদের কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হননি। এইসঙ্গে তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রেরণা যাতে দৃঢ়মূল হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে জাতীয়সঙ্গীতের ভাবগাম্ভীর্যে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার কার্যক্রম তার অন্যতম। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকে এই মহৎ পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন। এবং সে প্রয়োজনের বিষয়ে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও যে একমত হবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

এইগুলি এবং এই ধরণের আ'রো কতকগুলি ব্যবস্থা আছে যাকে বলা যায় 'অবিলম্বে করণীয়', কিন্তু এছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয় আছে সেগুলি 'দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রম' হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।

চীনা-আক্রমণের পটভূমিতে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক চিন্তা এবং সমাজ সংগঠন ইত্যাদিকে যেমন ঢেলে সাজতে হচ্ছে, সেইরকম শিক্ষাবিধিরও দ্রুতপরিবর্তন প্রয়োজন।

একদা বিদেশী-আমলে আমাদের শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেরানী তৈরি করা। স্বাধীনতালাভের পর নব-জাগ্রত জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দিকে বেশি 'ঝোঁক দেওয়া হয়। এবং সেইসঙ্গেই ছিল বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই ব্যবস্থাগুলিতে ছিল দেশের শান্তি-কালীন অবস্থার প্রতিফলন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে এক মদমত্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাত। তাকে প্রতিঘাত হানার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে যে ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের উচ্চতর ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থাও আমাদের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বেই করবেন। এ প্রসঙ্গে আমার কেবল নিবেদন এইটুকু যে, শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাকে নিবদ্ধ না রে'খে শিশু-শিক্ষার স্তর থে'কেই তার গোড়াপত্তন ঘটানো দরকার।

সকলেই বোধকরি স্বীকার করবেন, মানুষ যে শিশু অবস্থা থেকে নানাভাবে শিক্ষালাভ করতে করতে ক্রমে 'মানুষ' হ'য়ে ওঠে, তার পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র। পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের প্রভাব তাতে যথেষ্টই থাকে বটে, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের প্রভাবও প্রায় অপরিসীম।

সেইজন্যে আমার প্রস্তাব এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যে একেবারে প্রাথমিক স্তরের যেসব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় তারও বাক্যগঠন ও সন্দর্ভগুলি দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত হওয়া উচিত। এবং এই প্রক্রিয়া স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত হ'য়ে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া আবশ্যিক।

এছাড়া ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠক্রমেরও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। দৈনন্দিন জীবনে যেসব ঘটনা আমাদের তরুণতর ছাত্রগণ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আলোচিত হতে শোনে তার প্রকৃত তাৎপর্য তারা অনেক সময়েই বুঝতে পারে না। এইগুলি যাতে তারা মোটামুটি বুঝতে পারে তার জন্যে তাদের বিদ্যা-লয়িক শিক্ষার কিছু হেরফের ঘটানো দরকার। প্রতি সপ্তাহে এখন একটি ক্লাসের ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়, যেখানে সেই সপ্তাহে আলোচিত ঘটনা ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যামূলক ভাষণ দেবেন, এবং ছাত্ররাও প্রশ্ন করে বিস্তৃততর তথ্যাদি জেনে নেবে।

এইসঙ্গে আরো একটি প্রস্তাব আছে যা বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। ভারত সরকার ও আমাদের রাজ্য সরকারের প্রযোজিত তথ্যচিত্রগুলি নিজের দেশকে ভালো করে জানার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলে মনে করি। কর্তৃপক্ষ যদি ব্যবস্থা করেন যে, যেখানে সুবিধে আছে সেখানে এই ছবিগুলি নিজেদের বিদ্যালয়ে এবং অন্যদের জন্যে এগুলি বিনামূল্যে সরকারী প্রেক্ষাগৃহে দেখাতে হবে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের, তাহলে একটা মহৎ কর্তব্য সাধিত হ'তে পারে।

আমাদের ছাত্রসমাজ আজ দেশাত্ম-বোধে যতো গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে, আমাদের ভবিষ্যৎও হবে ততোই ভাস্বরতর মহিমায় দীপ্ত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের সহযোগিতায় আমরা এমন এক লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞার যুগে উত্তীর্ণ হ'য়েছি আজ যে সকলেই প্রতিনিশ্বাসে অনুভব করছি—আমরা নতুন মানুষ।

শত্রুর পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী।

*

'পূর্বপক্ষে'র ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনায় শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের দেশাত্মবোধক রচনার জন্যে আহ্বান জানানো হ'য়েছিল। তারপর দেশে সাহিত্যিকগণও যেমন সভাসমিতি ক'রে, কবিতা ইত্যাদি রচনা ক'রে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন, শিল্পীরাও তেমনি পিছিয়ে নেই। তাঁদেরও ছবির প্রদর্শনী উন্মুক্ত হ'য়েছে জনসাধারণের জন্যে। এবং সেই প্রেরণায় অপেক্ষাকৃত অখ্যাত শিল্পীও তুলি ধরেছেন দেশসেবার ব্রতে।

নিদর্শন হিসাবে 'অমৃতে'র জনৈক পাঠক শ্রীহরিনারায়ণ কর্তৃক অঙ্কিত দুটি প্রতিরোধের স্কেচ মুদ্রিত করা হল এখানে।

*

॥ দুই স্মৃতি ॥

শরৎ-বন্দনা। তখনকার দিনের গণ্যমান্যেরা উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। টাউন হলে খুব ঘটা করে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। কর্তাদের পিছনে পিছনে আমরা আছি। শরৎচন্দ্র চেনেন আমাকেও—সামান্য-সাধারণ অনেককেই তিনি চিনতেন। পরিষদের পরিমন্ডল গড়ে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না।

লোকারণ্য টাউন হলে। সেদিন আবার হিজলি-দিবস। হিজলি বন্দীশালায় ঐ তারিখে বীর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে গুলী মেরেছিল ইংরেজের চেলা-চামুন্ডারা। নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্মৃতিময় জাতীয় দিবস।

শরৎচন্দ্র টাউন হলে ঢুকতে যাচ্ছেন, ছেলেরা পথ আটকাল : এমন শোকের দিনে আপনি উৎসব করতে যাচ্ছেন কেন?

শরৎচন্দ্র দাঁড়ালেন। আমি অনতিদূরে—স্বচক্ষে সমস্ত দেখছি। শরৎচন্দ্র বললেন, জন্মদিন বলেই এই তারিখ ঠিক হয়েছে। জন্মানোয় আমার তো হাত ছিল না। হিজলির দুর্ঘটনাও হয়নি তখন।

আবার তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। যজ্ঞ পন্ড।

কোথায় চলে গেলেন, বড়রা খোঁজ পেয়েছিলেন হয়তো। বেহালায় মণীন্দ্র রায়ের বাড়ি শরৎচন্দ্রের আস্তানা। সেইখানে গিয়েছি আমি। আরও কেউ কেউ গেলেন, নাম মনে পড়ছে না। শরৎচন্দ্র ফেরেন না। রায়-বাড়ির লোকেরাও উদ্বিগ্ন।

অনেক রাত্রে অবশেষে ফিরলেন।

কোনখানে নিরুদ্দেশ হলেন, সকলে ভেবে সারা।

শরৎচন্দ্র বললেন, বাড়ি এসে বসতে ইচ্ছে হল না। কী করা যায়? ভাবলাম, জোড়াসাঁকোর রবিবাবুর কাছে যাই। সেখানে গল্পসল্প হচ্ছিল এতক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখ শরৎ, তোমার জীবন সম্বন্ধে লোকের বড় কৌতূহল। আমার 'জীবন স্মৃতি' সকলে আনন্দ করে পড়ে। তুমিও লেখো তেমনি।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, আমার জীবন তো ভাল নয় আপনার মতন। সে জিনিস লেখা যায় না।

একটু থেমে আবার বললেন, আগে তো জানিনে এত বড় হব। তা হলে সেই রকম মাপজোখ করে চলতাম।
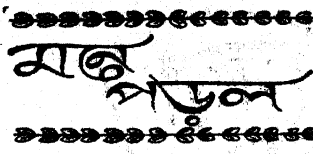
এ গল্প আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখে শুনেছি। শরৎ-বন্দনার প্রথম অধিবেশন পন্ড হল—সেই রাত্রে। মণীন্দ্র রায় মশায়ের বৈঠকখানায়।

* * *

দীনেশ সেন মশায়কে নিয়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

তিনি তখন 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে বাঙালী জাতির সুরম্য সুবৃহৎ ইতিহাস লিখছেন। বাংলার লোক-সাহিত্য লোক-শিল্প ও লোক-সংস্কৃতি নিয়ে সেই বয়সটায় আমার বড় উৎসাহ। 'পল্লী-সম্পদ রক্ষা সমিতি' স্থাপিত হয়েছে—গুরুসদয় দত্ত মশায় সভাপতি, জসীম-

মনোজ বসু

উদ্দিন ও আমি যুগ্ম-সম্পাদক। বাংলার আসল চেহারাটা দেখবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই অনেক সময়।

সেন মশায়কে আমি খবর দিলাম, কালীঘাটের নোংরা দুর্গম বস্তির মধ্যে এক দরিদ্র পটুয়ার কাছে পুরানো দিনের দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানা পট আছে। দীনেশচন্দ্র বললেন, তুমি নিয়ে চলো আমায় সেই জায়গায়। জিনিসগুলো একবার দেখে আসব।

যথা নির্দেশ এক দুপুরে বেহালায় সেন মশায়ের বাড়ি গিয়েছি। আমায় সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব ঘোড়ার গাড়িতে বেরুলেন। ইউনিভার্সিটিতে বোর্ডের মিটিং, সেখানটা একবার ঘুরে যেতে হবে—এই মিনিট পনেরোর ব্যাপার। দু-জনে তারপর কালীঘাট চলে আসব।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর দোতলায় বারান্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে দীনেশচন্দ্র মীটিঙের ঘরে ঢুকে গেলেন। পনের মিনিটের ঘন্টা পুরে গেল, দেখা নেই। আরও কয়েকটা জরুরি কাজ রয়েছে আমার—দেরির জন্য ছটফট করছি। কিন্তু বাংলা দেশের প্রতি একান্ত প্রীতিপ্রবণ তিনি—মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করি, তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারছি না।

অবশেষে বেরুলেন। প্রায় দু-ঘন্টা কেটেছে। বললাম, পনের মিনিটের কথা বলে দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন—

দীনেশচন্দ্র বোমার মত ফেটে পড়লেন : যাও, শ্যামাপ্রসাদকে বলোগে—

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষক তিনি, বড় আনন্দের সম্পর্ক দুয়ের মধ্যে। এ ব্যাপার নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে কি বলতে হবে, বুঝতে পারিনে।

বলছেন, কাজকর্ম আর কিছু হবে না। হবার উপায় নেই। আগে নিয়ম ছিল, মেম্বাররা যা-কিছু বলবেন ইংরেজিতে। পারতপক্ষে কেউ মুখ খুলত না গ্রামার ভুল হবার ভয়ে। শ্যামাপ্রসাদের আমলে নিয়ম হল, বাংলাতেও বলা যাবে। এবারে জো পেয়ে গেছে। আজেবাজে তর্ক—নানান কায়দায় বিদ্যে জাহির করা। যা মিনিট পনেরোয় হয়ে যায়, তার জন্য দু-ঘন্টা লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি কাজ চাই তো আবার সেই পুরানো নিয়ম বহাল হোক। কথাবার্তা লেখাজোখা সমস্ত ইংরেজিতে।

শ্যামাপ্রসাদের কাছে একদিন এই কাহিনী বলেছিলাম। হাসাহাসি হল।

ঢাকী ঢুলী সাবধান !
— কাফী খাঁ
২১-১১-৫৯ ই
নেপাল
পাকিস্তান
ম্যাক-মেহন লাইন

জয় হিন্দ

বনফুল

অকস্মাৎ বজ্রপাতে হয়তো হয়েছি সচকিত,
হয়তো ভাবিনি কভু বন্ধু হবে বিশ্বাস-ঘাতক,
তবু মোরা আছি স্থির, নহি ভীত, নহি বিচলিত,
স্বহস্তে স্ববীর্যবলে ধৌত করি শত্রুর পাতক,
উত্তীর্ণ হইব মোরা নব-তীর্থে নবীন জাতক।

সে নবীন স্ফীত বক্ষে দৃপ্ত কণ্ঠে করিবে ঘোষণা,
ভারত-সন্তান মোরা সহিব না মিথ্যা অপমান,
দস্যুদের রক্তচক্ষু নেহারিয়া কাঁপিবে না প্রাণ
সূচ্যগ্র সমান ভূমি ভীত হ'য়ে কখনও দিব না
নিত্যকাল উচ্চশির গেয়ে যাব ভারতের গান।

স্বাধীন ভারতবাসী এ মোদের সত্য পরিচয়
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, উচ্চকণ্ঠে বলহ নির্ভয়।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে কলম ধরুন

ভারতীয় লেখকদের প্রতি সাহিত্য আকাডেমীর আবেদন

সাহিত্য আকাডেমীর পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীকে আর কৃপালনী বলেছেন, দেশের এই জরুরী অবস্থায় সমগ্র জাতীয় সম্পদ একত্রিত করতে হবে। ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য হবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লেখনী চালনা করা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সাহিত্য আকাডেমীর সভাপতি।

শ্রীকৃপালনী দেশের লেখকদের প্রতি তাঁর আবেদনে বলেন, লেখকদের নিকট স্বাধীনতা হতে অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই। এই স্বাধীনতা আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যেই উপভোগ করেছি। এক্ষণে জাতি তার জীবনমরণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই নিদারুণ দুঃসময়ই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের শক্তি এবং যা কিছু আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান করে তোলে সেগুলি রক্ষার্থে আমাদের ক্ষমতা পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। যদি এরজন্য আমরা প্রাণপাত করতে প্রস্তুত না থাকি তবে আমরা স্বাধীনতা ভোগের অনুপযোগী বলে পরিগণিত হব।

শুধু ভৌগোলিক সীমান্তেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অঙ্গনেই অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধ চলেছে। আমাদের প্রত্যেককে, যে যাই করি না কেন, আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতার ঋণ পরিশোধের জন্য জাতীয় সম্পদ একত্র করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

আসুন আমরা ঐ কর্তব্য সাধনে বদ্ধপরিকর হই। নাগরিক হিসাবে আমাদের বৈষয়িক সম্পদ দেশের জন্য দান করতে হবে এবং লেখক হিসাবে আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের লেখনী ধারণ করতে হবে।

আজ সমগ্র দেশে যে স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ দেখা দিয়েছে, বিরাট উদ্যম ও সাহসিকতাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তার প্রকাশ আবশ্যক। অন্যথায় তা ব্যাপক বিদ্বেষ ও উত্তেজনার প্রহসনেই রূপান্তরিত হবে। সকল সৃজনীশক্তির পক্ষেই তা চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি এবং শান্তিতেই বসবাস করেছি। কিন্তু পরাধীন হয়ে শান্তিতে বাস করা যায় না। তা মানবিকতার পক্ষে অপমানও বটে। অহিংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধী বলতেন, "সমগ্র জাতির স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে আমি শত সহস্রবারও হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা করব না।" তিনি আরও বলতেন, "জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি ভারতবাসীদের অস্ত্রধারণ করতে বলব। ভীরুর মত থেকে জাতীয় অসম্মান লক্ষ্য করার চেয়ে তা অবশ্যই শ্রেয়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন একজন শান্তির কবি। তিনিও এক সময়ে গেয়েছিলেন,

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার তবে আপন হাতে
পরাও রণসজ্জা॥"

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

চরিত্র

শিবনাথ	সর্বেশ্বর
প্রভা	বাউল
রাধারাণী	সমীর

[একটি টালীর ঘরের সম্মুখস্থ উঠান। বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন। দূরে থেকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হবে।]

শিবনাথ ।। ইতিহাসের সেই একই প্রশ্ন—বার বার একই প্রশ্ন আসছে ঘুরে ঘুরে.........

প্রভা ।। এই মরেছে। কোথায় তর্ক শুরু ক'রে দিয়েছিল—ক্ষেপে উঠেছে। এমন লোক নিয়ে মানুষ পারে! বেলা দুপুর হতে চললো—সেদিকেও যদি হুঁশ থাকে! বাজারটা পর্যন্ত হলো না আজ......

[শিবনাথের প্রবেশ]

শিবনাথ ।। ওরা ভেবেছিল আমরা দুর্বল।

প্রভা ।। কারা ভাবলো?

শিবনাথ ।। যারা আমাদের বুকে থাব্‌লা মেরে খানিকটা মাংস তুলে নিতে চায়।

প্রভা ।। সে আবার কী!

শিবনাথ ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তাই। কিন্তু ওরা তো জানে না এটা দধীচির দেশ। বুকের অস্থিতে এখানে বজ্রের সৃষ্টি।

প্রভা ।। কিন্তু এদিকে যে বজ্রপাত। বাজার তো হলো না—সামনে বেড়ে দেব কী?

শিবনাথ ।। ছেলেটা যখন আমাকে জিগ্যেস করলে—যুদ্ধ হয় কেন?

প্রভা ।। আর অমনি তোমার মাথা গরম হয়ে উঠলো!

শিবনাথ ।। মাথা নয়, মাথা নয়—রক্ত গরম হয়ে গেল।

প্রভা ।। তা তো হবেই! সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতে না পারলেই যত গণ্ডগোল।

শিবনাথ ।। প্রশ্নটা সহজ, প্রভা!

প্রভা ।। সহজ বই কি! অন্যেরটা জোর করে কেড়ে নিতে গেলেই যুদ্ধ করতে হয়।

শিবনাথ ।। আমরা তো কারো কিছু কেড়ে নিতে যাইনি!

প্রভা ।। চায়ের দোকানে বসে বুঝি এতক্ষণ এই তর্কই করছিলে?

শিবনাথ ।। তর্ক নয়, তর্ক নয়—গোটা ইতিহাস এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়। নগ্ন বর্বর রূপটাকে দেখে আমি আঁতকে উঠি। সেকেন্দর, সিজার, চেঙ্গিজ, হিটলার আমার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ায়। কী বীভৎস রূপ তাদের! কিন্তু পারেনি, কেউ পারেনি কালের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে।

প্রভা ।। চাকা যেদিকে ঘুরবার ঘুরবেই। নিজেদের অদৃষ্ট দেখেই তো বুঝতে পারছি।

শিবনাথ ।। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভাববার এ সময় নয়, প্রভা!

প্রভা ।। কেন ভাববো না! দেশ দেশ করে সারাটা জীবন দিলে—দেশ কী দিয়েছে তোমাকে?

শিবনাথ ।। ভুল করো না। দেশ জীবনের চাইতেও বড়ো।

প্রভা ।। জানি, জানি। জীবনভর তোমার মুখ থেকে ওই একটা কথাই শুনলাম। এসব লোকের ঘর-সংসার পাতা অন্যায়।

শিবনাথ ।। দেশের মাটি আছে বলেই সংসার পাততে পেরেছি।

প্রভা ।। সংসার! না শ্মশান?

শিবনাথ ।। প্রভা!

প্রভা ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্মশান, শ্মশান। তুমি শ্মশানের শিব। ঘরে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শান্তি নেই—আর তুমি দেশ নিয়ে মেতে আছ!

শিবনাথ ।। যে দেশের বায়ুতে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, যে দেশের রসে আমার দেহ পুষ্ট হচ্ছে, যে দেশের নীল আকাশ আমার দু'চোখকে স্নিগ্ধ করছে, যে দেশের সবুজ মাঠ আমার হৃদয়কে দোলা দিচ্ছে, যে দেশের বারিধারা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করছে, যে দেশের মাটি আমাকে কোল দিয়েছে—সে দেশ আমার জননী। সে দেশকে যে ভুলে যায় সে বেইমান।

প্রভা ।। যে মা তার সন্তানকে খেতে দেয় না, তিলে তিলে শুকিয়ে মারে, সেও বেইমান।

শিবনাথ ।। প্রভা, প্রভা! মা হয়ে তুমি এমন কথা বলতে পারলে! সন্তানের মুখে অন্ন যোগাতে না পারলে মায়ের বেদনা হয়, কিন্তু মা বেইমান হয় না।

প্রভা ।। হয় হয়, মা'ও বেইমান হয়। না হলে যে মায়ের আঁচল ধরে ছিলাম সেই জন্মভূমি বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে আসতে হলো কেন?

শিবনাথ ।। মা ছাড়েননি—আমরা ছেড়ে এসেছি। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। যদি প্রাণ দিতে পারতাম.........

প্রভা ।। প্রাণ নয় গো, প্রাণ নয়—যদি মান দিতে পারতাম...

শিবনাথ ।। কিন্তু মান তো আমাদের বেঁচেছে।

প্রভা ।। হ্যাঁ, মান বেঁচেছে, তবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কী পেয়েছি এখানে এসে আমরা? দেশ ভাগ হলো, বাড়ি গেল, ঘর গেল, তোমার চাকরি গেল। এখানে এসে কোনোরকমে যোগাড় করলে একটা স্কুল-মাস্টারি। বুড়ো হয়েছ বলে তাও গেল। এখন দুবেলা ছেলে পড়িয়ে যে ক'টা টাকা পাও তা দিয়ে দশদিনও চলে না। বস্তিরও অধম এই জবরদখল কলোনীতে কাঠ-পাতার চালাঘরে বাস! ছেলেটাকে কলেজে পড়ানো গেল না টাকার অভাবে। দেশের কাছ থেকে তো এই পেয়েছ! আর তোমার খালি দেশ ...দেশ...দেশ!

শিবনাথ ।। মহাজনী বুদ্ধি তোমার আছে স্বীকার করি।

প্রভা ।। হ্যাঁ, আছেই তো। কেন থাকবে না! আমি যদি দেশের জন্যে ভাবি, দেশ কেন আমার জন্যে ভাববে না!'

শিবনাথ ।। দ্যাখো, দেশসেবা তো কম্পানী কারবার নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে আদায় ক'রে নেব!

প্রভা ।। নেবই তো। কেন নেব না? হোমরা-চোমরাদের কেউ কি কম নিচ্ছে? পাঁচ বছর আন্দামানে কাটালে, চার বছর অন্তরীণ থাকলে. সাত বছর জেল খাটলে. কিন্তু তোমার জন্যে সরকারী মাসোয়ারা বরাদ্দ হলো মাত্র চল্লিশ টাকা। আর দ্যাখো গিয়ে, যারা ছ'মাসও দেশের জন্যে জেল খাটেনি. এমন কি কোনোদিন জেলের ফটকও চোখে দেখেনি, তাদের একেকজন একশ' দেড়শ' ক'রে সরকারী মাসোয়ারা পাচ্ছে। এই তো বিচার!

শিবনাথ ।। মাসোয়ারা না পেলেও আমি কিছু বলতাম না।

প্রভা ।। কেন বলবে না! তোমার দাবি নেই?

শিবনাথ ।। না, নেই। দেশের কাছে আমার একমাত্র দাবি আছে তাকে সেবা করার। সেই অধিকার থেকে কেউ আমাকে কোনোদিন বঞ্চিত করতে পারেনি এবং পারবেও না।

প্রভা ।। আশ্চর্য মানুষ তুমি!

শিবনাথ ।। আমার মাও এ কথাই বলতেন। সর্বস্ব পণ করে দেশের কাজে নেমেছিলাম। আর কোনো প্রত্যাশাই ছিল না—একমাত্র কামনা ছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। আজ আবার সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামের দিন এসেছে। এসময় পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন আসে না, প্রভা। শুধু দেয়া— দেয়া—কে কত দিতে পারে......

প্রভা ।। যাদের আছে তারা দেবে। যাদের কিছুই নেই তারা আবার দেবে কী!

শিবনাথ ।। আছে আছে, প্রভা, দেবার অনেক আছে। আছে আমাদের মন-প্রাণ অন্তর, আছে দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগ।

প্রভা ।। বুঝেছি, ঢাকে কাঠি পড়েছে আর অমনি গাজনের সন্ন্যাসী মেতে উঠেছেন!

শিবনাথ ।। হ্যাঁ, মেতে উঠেছে, সত্যি মেতে উঠেছে। ভেতরটা নেচে উঠেছে আমার। মনে হয় শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে। যে হাত একদিন ইংরেজ মারতে উদ্যত হয়েছিল সে হাত আবার অস্ত্র ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বার্ধক্য আমাকে বাধা দিচ্ছে। যদি শক্তি থাকতো তবে আজই আমি সৈন্য-দলে নাম লেখাতাম।

প্রভা ।। লেখাও না। বাধা দিচ্ছে কে! একটা পিঁজরাপোল-বাহিনী হবে! যাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনলে তো পেট ভরবে না। যা হয় সেদ্ধ-পোড়া তো কিছু চাপাতে হবে। না হলে তো হরিবাসর। এমন পাগল নিয়ে যেন কাউকে কোনোদিন ঘর না করতে হয়।

[প্রভার প্রস্থান]

শিবনাথ ।। ইতিহাসের সেই একই প্রশ্ন—ঘুরে আসে বার বার!

[চেঁচামেচি করতে করতে সর্বেশ্বর ও রাধারাণীর প্রবেশ।]

রাধারাণী ।। আমার সোনায় হাত দিবি তো তোর মুখে নুড়ো জেলে দেব।

সর্বেশ্বর ।। অঃ! বড়ো সোনার মালিক হয়েছেন! সোনা তুই পেলি কোথায়! কার টাকায় সোনা হয়েছে?

রাধারাণী ।। তোর টাকায় হয়েছে. মুখ-পোড়া, তোর টাকায় হয়েছে?

সর্বেশ্বর ।। আমার টাকায় হয়নি তো কার টাকায় হয়েছে? তুই রোজগার করিস. না তোর কোনো নাগর আছে?

রাধারাণী ।। ভালো হবে না, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। মুখ খারাপ করবি তো মুখে ঝ্যাঁটা মারবো।

সর্বেশ্বর ।। মার্ না ঝ্যাঁটা, দেখি কেমন ক্ষেমতা আছে! বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো তোর চুল ছিঁড়ে বেহালার ছড় বানাবো।

রাধারাণী ।। আমাকে বেশি চটাসনি, বলছি, বেশি চটাসনি। তোর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাবো।

সর্বেশ্বর ।। শুনছেন শিবনাথবাবু, শুনছেন মাগীর কথা। [দাঁত কড়মড় করে] কথা শুনে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না!

শিবনাথ ।। আহা হা, থামুন না একজন।

সর্বেশ্বর ।। থামবো কি মশায়, মাগীর কথা শুনে পিত্তি জ্বলে যায়। বাচ্চা ছেলেমেয়ে-গুলোর কথা ভেবে আমি

পারিনে। না হলে নাথি মেরে করে ওকে বাড়ি থেকে খেদাতাম!

রাধারাণী।। মার না নাথি, দেখি তোর কেমন মুরদ! তোর পায়ে কুষ্ঠ হবে।

সর্বেশ্বর।। তা হতে পারে। নচ্ছার মাগী! তোর অঙ্গ স্পর্শ করাও পাপ।

শিবনাথ।। আঃ সর্বেশ্বরবাবু! এক-জন চুপ করবেন তো!

সর্বেশ্বর।। ওকে আগে চুপ করতে বলুন। কুত্তী দিনরাত খালি আমার সঙ্গে খ্যাক খ্যাক করে।

রাধারাণী।। শুনলেন, শুনলেন তো চাটুজ্যে মশায় ড্যাকরার কথা! জন্মের পরে ওর

না ওর মুখে মধু দেয়নি, বিষকচুর ডাঁটা পুরে দিয়েছিল।

সর্বেশ্বর ।। আর তোর মুখে দিয়েছিল কেউটের ল্যাজ।

শিবনাথ ।। আপনারা একজন চুপ করবেন, না কি?

সর্বেশ্বর ।। আপনিই বিচার করুন, শিবনাথবাবু আমি কি অন্যায় কথাটা বলেছি?

রাধারাণী ।। হ্যাঁ, আপনার ওপরই আমি বিচারের ভার দিলাম, চাটুজ্যেমশায়, ডাকরার যদি অলেহ্য কথা বলে থাকি, আমার মুখে আপনি পাঁচ ঘা জুতো মারেন।

শিবনাথ ।। ছিঃ ছিঃ! এসব কি কথা!

রাধারাণী ।। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি। আপনাকে এই কলোনীর আমরা সবাই মান্যি করি। আপনিই বিচার করুন, সোনা ও কেড়ে নেবে কেন?

সর্বেশ্বর ।। আমি কেড়ে নেব বলেছি!

রাধারাণী ।। বলিসনি, বলিসনি তুই যে আমি যদি আমার গয়না না দিই তবে জোর করে তুই তা কেড়ে নিবি?

সর্বেশ্বর ।। কী হবে গয়না দিয়ে? বলি কী হবে? গয়না পরার বয়স তোর আছে?

রাধারাণী ।। তা থাকবে কেন! তোর মন পড়ে থাকে কোথায় আমি জানিনে? আমি তো এখন তোর দু'চোখের বিষ হয়েছি।

শিবনাথ ।। রাধারাণী, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাড়িতে গিয়ে করাই ভালো নয় কি?

রাধারাণী ।। আমি ঝগড়া করতে আসিনি, চাটুজ্যেমশায়। আপনি তো জানেন, আমি কি ঝগড়া করার মানুষ! ও আমাকে দিয়ে ঝগড়া করায়।

সর্বেশ্বর ।। অঃ! কী শান্ত সুশীলা উনি!

রাধারাণী ।। ঐই দ্যাখেন, দ্যাখেন আপনি! আপনাকেও যদি মান্যি করে! আবার ঝগড়ার তালে আছে।

শিবনাথ ।। কী হয়েছে সর্বেশ্বরবাবু? আপনারা তো শুধু ঝগড়াই করছেন—অথচ কী নিয়ে ঝগড়া, খুলে বলছেন না কেউ!

সর্বেশ্বর ।। কী আর বলবো! ও আমাকে একতিলও বিশ্বাস করে না।

রাধারাণী ।। বিশ্বাস না করলে পঁচিশ বছর একসঙ্গে ঘর করছি কেমন করে রে, ড্যাকরা!

সর্বেশ্বর ।। তবে গয়না দিতে তোর এত আপত্তি কেন?

রাধারাণী ।। আহা-হা-হা, আমার শখের পায়রা রে! ব্যবসার নাম করে আমার গয়নাগুলো খোয়াবি তো?

সর্বেশ্বর ।। খোয়াবো কেন! আরো দশখানা করে দেব।

রাধারাণী ।। কত ক'রে দিবি তুই! সে মানুষ থাকে আলাদা। দ্যাখ্ গে চৈতন সা সোনা দিয়ে তার বউর গা মুড়ে দিয়েছে। তুই দিয়েছিস, আমাকে একখানা গয়না? এক রত্তি সোনা কিনতে বললেই খেঁকিয়ে উঠিস। এক পয়সা দু'পয়সা করে জমিয়ে কত কষ্টে আমি সোনাদানা করেছি। এখন শকুনের মতো তার দিকে নজর!

সর্বেশ্বর ।। কী হবে সোনা ঘরে জমিয়ে রেখে? দেখছিসনে দিন দিন সোনার দাম কমে যাচ্ছে?

রাধারাণী ।। কমে যাচ্ছে তো কিছু কিনে রাখ্ না। যুদ্ধ তো আর চিরদিন থাকবে না। সোনার দর আবার বাড়বেই। দেখিসনি গত যুদ্ধের পরে সোনার দাম কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল। তা নয় —ঘরের লক্ষ্মী বার করার তাল!

শিবনাথ ।। এখন সোনা কেনার সময় নয়, রাধারাণী, বেচার সময়।

সর্বেশ্বর ।। তা কি ও বোঝে!

রাধারাণী ।। বুঝি বুঝি, আমি সব বুঝি। তোর শয়তানী বুঝতে আমার আর বাকী নেই।

শিবনাথ ।। কত সোনা আছে তোমার?

রাধারাণী ।। কী আর তেমন আছে, চাটুজ্জেমশায়। সবশুদ্ধ ধরলে পনর-বিশ ভরি।

সর্বেশ্বর ।। মিছে কথা বলিসনে। চাটুজ্জেমশায় গুরুজন। গুরুজনের কাছে মিছে কথা বলা পাপ।

রাধারাণী ।। তার বেশি সোনা আছে আমার?

সর্বেশ্বর ।। নেই! চাটুজ্জেমশায় জিগ্যেস করুণ তো ওর ক'ছড়া হার আছে?

রাধারাণী ।। তুই তো বেশি দেখবিই। মাত্র তিন ছড়া হার আছে আমার—তাতেই তোর চোখ টাটায়! হায় তালুকদারের বউর আছে সাত ছড়া হার।

সর্বেশ্বর ।। তোর হাতের চুড়ির ওজন বিশ ভরি।

রাধারাণী ।। তুই দেখেছিস, কানা!

সর্বেশ্বর ।। বারো ভরির আর্মলেট নেই তোর?

রাধারাণী ।। হুঁ! কোদাল ভাঙিয়ে গড়েছি তো!

সর্বেশ্বর ।। দশ ভরি দিয়ে চুড় গড়াসনি তুই?

রাধারাণী ।। আ মলো! তাকে চুড় বলে? পইছা পইছা। সেই পইছা দিয়ে গুঁতিয়ে যে তোর দাঁত ভেঙে রক্ত বার করেছিলাম, এরই মধ্যে তা ভুলে গেলি বেহায়া!

সর্বেশ্বর ।। ও মিথ্যুক। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না চাটুজ্জেমশায়। সোনার খাই ওর এত বেশি যে, একটা স্যাকরার দোকান উজাড় করে দিলেও ওর আশ মিটবে না।

রাধারাণী ।। আপনি তো ওকে চেনেন, চাটুজ্জেমশায়। ওর লোভের অন্ত নেই। তিন টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় বেচতে ওর চক্ষুলজ্জায় আটকায় না।

শিবনাথ ।। চেপে যান চেপে যান, দিনকাল ভালো নয়। কার মুখ থেকে কার কানে কথাটা যাবে—শেষে মুশকিলে পড়বেন।

সর্বেশ্বর ।। সেই জন্যেই তো এই কলোনীতে এসে মেলীর ঘরে বাস করছি, শিবনাথ-

বাবু। গেল যুদ্ধের সময় ছোটখাটো ঠিকেদারী করে দু'পয়সা হাতে এলো। অমনি পাড়ার লোকের চোখ টাটালো। এদিকে দেশটাও ভাগ হলো। ভাবলাম গরিবদের সংগে থাকাই ভালো। আ প দে বি প দে তারাও আমাকে দেখবে—সময়ে অসময়ে আমিও তাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া এই কলোনীর অবস্থাও তো এরকম থাকবে না। দেখছেন তো, পাশেই জমির দাম কাঠা আড়াই হাজার টাকায় উঠেছে।

রাধারাণী ।। জানেন, এই জমিটা ও বেচে দেবার তালে আছে?

সর্বেশ্বর ।। বলুন তো, বেচে দিয়ে উঠবো গিয়ে কোথায়? আজকাল কি জায়গা মেলে কোথাও! আর ঘর ভাড়া করে থাকা? সে তো আমাদের নাগালের বাইরে। ছোট হোক বড়ো হোক এই জা য় গা টু কু আঁ ক ড়ে ই আমাকে থাকতে হবে। ভাবছি পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই কোনোরকমে দু'খানা কোঠাঘর তুলে নেব। তাও তো টাকার দরকার। মালমসলার কেমন দাম তো দেখতেই পাচ্ছেন। তাই ভাবছি ব্যবসাটা একটু বাড়িয়ে নেব। সোনার দাম যখন দিনদিন কমে যাচ্ছে, তখন ওগুলো ঘরে ফেলে রেখে কী হবে? তার চেয়ে ওগুলো বেচে দিয়ে যা পাওয়া যাবে তা ব্যবসায় খাটানো ভালো নয় কি? তাতে দু'পয়সা আসবে বই যাবে না তো।

রাধারাণী ।। হুঃ। আমার সোনা বেচে তা দিয়ে চাল-ডাল, তেল-নুন, কাপড়চোপড় মজুত করা হবে!

সর্বেশ্বর ।। তাতে ক্ষেতিটা কী! কখন কোন্ দিক দিয়ে বিপদ আসে বলা যায় না তো। আমার গুদোমে যদি মাল থাকে, তবে বিপদের দিনে আপনাদের আমি সাহায্য করতে পারবো।

শিবনাথ ।। কিন্তু মজুতদারী করা যে এখন বে-আইনী কাজ সর্বেশ্বরবাবু।

সর্বেশ্বর ।। আহা হা হা, বেআইনী কাজ করতে যাবো কেন আমি! পারমিটের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেব। তাছাড়া দরকার মতো সরকারকেও সাহায্য করবো আমি। জরুরী অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনের জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

শিবনাথ ।। দেখুন সর্বেশ্বরবাবু, আপনি যে বুদ্ধি বাতলেছেন সেটা ছিল পরাধীন ভারতের বুদ্ধি। আজ দেশ স্বাধীন। স্বাধীন দেশের মানুষ বা সরকার কেউই আপনাদের এ বুদ্ধি বরদাস্ত করবে না।

সর্বেশ্বর ।। আহা হা হা! আপনি ওভাবে নিচ্ছেন কেন!

রাধারাণী ।। ঠিকভাবেই নিয়েছেন উনি। যুদ্ধ দেখে দাও মারার তালে আছ তুমি! সেটি হবে না। মুনাফার লোভে কালোবাজারী করতে গিয়ে তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে, আর আমি একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসবো? আমার চোখে ধুলো দেওয়া! এক রত্তি সোনাও আমার হাতছাড়া করবো না।

সর্বেশ্বর ।। আমি তবে পুলিশে খবর দেব আর খানাতল্লাসী করিয়ে ছাড়বো। দেখবো তখন সোনা থাকে কোথায়!

রাধারাণী ।। আমিই ছেড়ে দেব ভেবেছিস? ব্যবসার নামে তোর জালজুচ্চুরির কথা আমার অজানা আছে কিছু? স-অ-ব বলে দেব আমি। ল্যাজের আগুনে শেষটায় মুখপোড়া হনুমান হবি বলে দিচ্ছি।

[গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রবেশ।]

ওরে ও মন পাগল!
যা তোর দেবার আছে
এবার দিয়ে চল।

আর কেন রে খোঁজাখুঁজি,
বিলিয়ে দে সকল পুঁজি,
দেশের ধুলো অঙ্গে মাখি
পথের কাঁটা পায়ে দল।

শিঙা ফুঁকে পাগলবাবা
দিয়েছে ঐ ডাক;
এক নিমেষে সকল বাঁধন
ছিন্ন হয়ে যাক।

কে তোর আপন কে বা পর,
হাত বাড়িয়ে হাতকে ধর—
প্রলয় নাচন নাচরে এবার,
মুখে মাভৈঃ মন্ত্র বল্।

বাউল ।। ইচ্ছাময়, তোমারই ইচ্ছা

পূর্ণ হোক! চাট্টি ভিক্ষে পাবো, বাবা?

শিবনাথ ।। বাউল, এ গান তোমার নিজের রচনা?

বাউল ।। না বাবা, নিজের বলি কী করে! ইচ্ছাময় ভেতর থেকে যা বলান তাই বলি।

শিবনাথ ।। আশ্চর্য গান! গানটা আমাকে লিখে দেবে?

বাউল ।। কী হবে, বাবা, লিখে! পথে চলতে চলতে মনের মানুষ যা বলে তাই গেয়ে যাই। আবার পথেই ভুলে যাই তা। তারপর লীলাময়ের দেখি নতুন লীলা। ভেতরের মানুষটা তখন ডেকে বলে—ওরে গেয়ে চল্ গেয়ে চল্, চলার পথে নতুন গান গেয়ে চল্। আমি কি তখন না গেয়ে থাকতে পারি! ভেতরের মানুষটা ঠেলা মারে। সে বড়ো কঠিন মানুষ—এক দণ্ড আমাকে তিষ্ঠুতে দেয় না। কেবল বলে—এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্......

শিবনাথ ।। ঠিক বলেছ বাউল। তার ডাক যে শুনতে পায় সে ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। খালি পথে বেরিয়ে পড়তে চায় তার মন। আজ সেই ডাক এসেছে—তাই কেউ স্থির থাকতে পারছে না।

বাউল ।। কী করে পারবে! মহাজীবন যখন ডাক দেয় তখন প্রতি প্রাণকণাই যে তার দিকে ছোটে। তিনিই দেন, আবার তিনিই নেন। আমার আমার ক'রে আমরা মিছেই ভেবে মরি। ডাক যে কখন কোন্ দিক থেকে আসবে, কেউ কি তা বলতে পারে!

[আবার গান]

ও তুই ভাবিসনে মনে—
ডাক দেবে সেই মহাক্ষ্যাপা
শুভদিন গুণে।

সে যে ছন্নছাড়া আত্মহারা
আপন খেয়ালে
কী লিখে যায় হিজিবিজি
মনের দেয়ালে।

কী বলে তা কী বা জানি—
আমায় নিয়ে টানাটানি;
আমার আমি হারিয়ে ফেলে
ছুটি তার সনে।

বাউল ।। ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

শিবনাথ ।। বাউল আমি যদি এখানে ছেলেদের একটা দল খুলে দিই, তুমি তাদের গান শেখাতে পারবে?

বাউল ।। না, তা পারবোনি। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জো নেই আমার। কপালের লিখন তো খণ্ডাতে পারবো না! বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছে ঘোরা—তাই শুধু ঘুরে মরি। তার আদেশ কি আমি অমান্য করতে পারি?

সর্বেশ্বর ।। বাউলের ঘর কোথায়?

বাউল ।। ঘর? দিনের শেষে যখন যেখানে গিয়ে হাজির হই সেখানেই আমার ঘর—কখনো গেরস্তর দাওয়ায়, কখনো গাছতলায়।

সর্বেশ্বর ।। গান গেয়ে তো বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়?

বাউল ।। তা হয় বই কি, বাবা। বিধাতার ভাণ্ডারে তো অভাব নেই। আমার জন্যে সব ভাণ্ডারই খোলা।

সর্বেশ্বর ।। হুঁ, গতর খাটিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতে হিমশিম খেতে হয়—আর ভিক্ষের চালে বাড়িও ওঠে।

রাধারাণী ।। শুনছেন চাটুজ্জেমশায়, কথার ছিরি! না, বাউলঠাকুর, ওর কথা মেনেন না। শাপমান্যিরও যদি ভয় থাকে একটু!

বাউল ।। না মা, কারো কথাই আমি কিছু মনে করিনে। ভিক্ষের মতো ভিক্ষে মিললে হয় বই কি। আজ ব্রতভিক্ষে দেবার দিন এসেছে। পাগলবাবার সন্ন্যেসীরা গাজনে নেমেছে। ভিক্ষে দিয়ে তাদের আঁচল ভরিয়ে দিতে হবে, মা। দেবে মা কিছু ভিক্ষে?

রাধারাণী ।। কী দেব? আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই।

বাউল ।। নেই! তবে থাক। [শিবনাথকে] এক মুঠি ভিক্ষে মিলবে, বাবা!

[শিবনাথ পকেট থেকে এক টাকা বার করে দেন]

জয় হোক, বাবা জয় হোক। মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করুক।

[সর্বেশ্বর ট্যাক থেকে খুলে পাঁচটা নয়া পয়সা দেয়।]

রাধারাণী ।। কেমন লোক গা! মাত্র পাঁচটা নয়া পয়সা দিলে! চাটুজ্জেমশায় দিলেন এক টাকা—আর সেখানে পাঁচ নয়া পয়সা!

বাউল ।। তাতে কী হয়েছে, মা? আজ কোনো দানই ছোট নয়। রামচন্দ্র যে সাগরে সেতু বেঁধেছিলেন তাতে কাঠবেরালিরও ডাক পড়েছিল। বিন্দু বিন্দু বারি দিয়েই তো সিন্ধু হয়, মা। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পাবো তা থেকে নিজের জন্যে এক মুষ্টি রেখে বাকীটা কাল সকালে ব্রতভিক্ষে দিয়ে আসবো।

রাধারাণী ।। ব্রতভিক্ষে কী, বাবা?

বাউল ।। বুঝলে না মা! যারা জননী-জন্মভূমির মান রাখার ব্রত নিয়েছে, তাদের ব্রতভিক্ষে দিতে হবে। যাই এখন। এক জায়গায় তো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে, ভেতরের মানুষটা ঠেলা মারে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সর্বেশ্বর ।। এ দেখছি রাজনৈতিক বাউল!

বাউল ।। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কী বললেন বাবা? রাজনৈতিক? রাজনীতি আমি বুঝিনে, বাবা। রাজনীতি বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি কই আমার। আমি পথের বাউল—সহজ বুদ্ধি আমার। রাজনীতির জটিল ব্যাপার কি আমার মাথায় ঢোকে!

পথে চলতে চলতে আকাশে বাতাসে যে-কথা শুনতে পাই তাই গেয়ে বেড়াই আমি। মানুষের মধ্যে যখন ভগবান জেগে ওঠে তখন শতকোটি প্রণাম জানাই তাকে। স্বদেশী যুগে আমি ছিলাম ছেলেমানুষ। বাবা গান গাইতেন আর আমাকে বলতেন—দ্যা খ্, যা রা হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, ফাঁসীর হুকুম শুনেও কারাগারে যাদের দেহের ওজন বেড়ে যায়, তাদের মধ্যে ভগবান জাগ্রত। তাদের গান গাওয়া ভগবানেরই নাম করা। গান্ধী মহারাজের যুগে মানুষের মধ্যে আবার সেই ভগবানকে জাগতে দেখেছিলাম। প্রাণ ভ'রে সেদিন গেয়েছিলাম তাদের গান। আজ আবার মানুষের মধ্যে ভগবান জেগে উঠছে—তাই তার গান গাইছি আর জানাচ্ছি শত কোটি প্রণাম।

[হাতজোড় করে নমস্কার করে।]

রাধারাণী।। বাউলঠাকুর!

বাউল ।। বলো মা, বলো।

রাধারাণী।। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বাউল । রাখার মতো হলে নিশ্চয়ই রাখবো, মা।

রাধারাণী।। আমার হাতের এই বালা দু'গাছা রক্তভিক্ষের জন্যে নেবেন?

বাউল ।। [হাতজোড় করে] ক্ষমা করো মা। অত বড়ো দান গ্রহণ করার সামর্থ আমার নেই। আমি দীন বাউল। স্বর্ণদান গ্রহণ করার অধিকার কি আমার আছে? দান যদি করতেই চাও স্বর্ণদান গ্রহণের যাঁরা অধিকারী তাঁদেরই হাতে অর্পণ করো।

রাধারাণী।। না, তা হবে না। এ না নিলে আমি মনে কষ্ট পাবো। ভাববো, আপনি আমাকে ঘৃণা করেন—তাই আপনি নিলেন না।

বাউল ।। বড়ো মুশকিলে ফেললে মা! এই সোনা নিয়ে আমি কোথায় রাখবো? যেখানে সেখানে রাত কাটাই—সোনাদানা রাখা কি সম্ভব।

সর্বেশ্বর ।। ও মেকী সোনার গয়না—আপনি স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন।

রাধারাণী।। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] মেকী! ও জানে মেকী! আমি নিজে স্যাকরার দোকানে গিয়ে কিনে এনেছি—আর ও বলে মেকী! ড্যাকরার জন্য সোনা তো রাখা যাবেই না। লাগুক সৎকাজেই লাগুক। আপনি নিয়ে যান বাউলঠাকুর। ওর কথা শুনবেন না।

[হাত থেকে বালাজোড়া খুলে বাউলের হাতে দেয়।]

বাউল ।। নাম বলতে হবে যে, মা।

রাধারাণী।। গুরুজনের সামনে নিজের নাম কি বলতে আছে!

শিবনাথ ।। রাধারাণী সাউ।

বাউল ।। নাম ঠিকানা দয়া করে লিখে দেবেন বাবা?

[সর্বেশ্বর তেড়ে গিয়ে বাউলের হাত চেপে ধরে]

সর্বেশ্বর ।। বাটপাড় কোথাকার! বাউলের বেশে চোর! মেয়েছেলের মন ভিজিয়ে সোনা চুরি করা! চল্, এখ্খুনি তোকে নিয়ে যাবো থানায়।

শিবনাথ ।। কী হচ্ছে সর্বেশ্বরবাবু!

সর্বেশ্বর ।। আপনি বুঝতে পারছেন না! বেটা চোর। ওর আলখাল্লার ভাঁজে ভাঁজে শয়তানী। ওকে আমি পুলিশে দেব।

রাধারাণী।। চোর তুই। তুই যে চোরাই সোনার কারবার করিস আমি জানিনে? বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো আমি পুলিশকে সব কথা বলে দেব। আমি বলে তোর সব দোষ ঢেকে রেখেছি—অন্য মেয়েমানুষ হলে এতদিনে সব কথা ফাঁস করে দিত। হাত ছাড় বাউলের......

সর্বেশ্বর ।। বটে!

রাধারাণী।। ছাড় বলছি—ভালো চাস তো হাত ছেড়ে দে। আমার সোনা আমি গঙ্গায় ফেলে দেব—তবু তোকে এক রত্তি দেব না।

সর্বেশ্বর ।। অ!

[বাউলের হাত থেকে বালাজোড়া কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়]

রাধারাণী।। [গর্জে উঠে] কী! বাউলের হাত থেকে তুই বালা কেড়ে নিলি! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নির্বংশের ব্যাটা—কামড়ে এ'চড়ে তোকে আজ আমি শেষ করে দেব না......

[সর্বেশ্বরের পিছু ধাওয়া করে।]

বাউল ।। মানুষের মধ্যেই ভগবান—আবার মানুষের মধ্যেই শয়তান। ইচ্ছাময়, কী বিচিত্র লীলা তোমার!

[গান]

ও ভোলা মন ভুলের সীমা নাই।
ভগবান আছেন কাছেই—
হাত বাড়ালেই পাই।
আকাশে তাকাস মিছে—
ভগবান আছেন নীচে;
অরূপ আজ রূপ ধরেছে,
সেরূপে নয়ন জুড়াই।

[গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রস্থান]

শিবনাথ ।। কালের চাকা ঘোরে— কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্নটা মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায় বার বার!

[প্রভার প্রবেশ]

প্রভা ।। আপাততঃ প্রশ্নটা চাপা দিয়ে দিনের চাকা ঘোরাও দেখি। ঘাটে গিয়েছিলাম স্নান করতে—এদিকে সোরগোল শুনে মনে হচ্ছিল রোশনচৌকি বসেছে আমার বাড়িতে। ক'টা বাজলো? নাওয়া-খাওয়া আছে তো!

শিবনাথ ।। জানো, এক আশ্চর্য বাউল এসেছিল একটু আগেই এখানে!

প্রভা ।। তা তো গান শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। সর্বেশ্বর সাউ আর তার ঝগড়াটে বউটা বুঝি বাউলের একতারার সঙ্গে নাচলো? যত আপদ এসে জোটে এখানে!

শিবনাথ ।। আপদ! সত্যি প্রভা আজ আপদই এসে জুটেছে ভারতের ভাগ্যে। বৃহৎ সংগ্রাম ক'রে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।

প্রভা ।। দেশ স্বাধীন হয়েই বা কী হয়েছে। আমাদের পাথর-চাপা কপাল! এ ভাগ্যের তো আর কোন দিনই পরিবর্তন হবে না!

শিবনাথ ।। হবে হবে, অনেক পরিবর্তন হবে। আবার যদি আমরা পরাধীন হই তবে আমাদের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না।

প্রভা ।। লাঞ্ছনার বাকী আছে কিছু!

শিবনাথ ।। আশ্চর্য, প্রভা! তোমার জন্যে করুণা হয়। বাইরের দৈন্য যাদের মনকেও দীন ক'রে দেয়, সত্যি তারা কৃপার পাত্র।

প্রভা ।। রেখে দাও তোমার আপ্ত-বাক্য। [আবেগভরে] তোমার হাতে পড়ে সারাটা জীবন কী পেয়েছি আমি? খোকা তখন আমার পেটে। দেশের কাজে তুমি দিলে গা-ঢাকা। সবদিন দু'বেলা পেট ভ'রে ভাতও জুটতো না। পাড়ার ছেলেরা মুষ্টি-ভিক্ষে তুলে সাহায্য করতো। তা দিয়ে অতি-কষ্টে দিন চলতো আমার। খোকার জন্মের পরে ক'দিন ওকে দুধ খাওয়াতে পেরেছি আমি? সেদিনও ছিল যে দৈন্যদশা—আজো তাই।

[খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটে।]

শিবনাথ ।। দুঃখের অবসান হয়নি বলে আরো দুঃখকে যদি আমরা ডেকে আনি, তা হবে আত্ম-হত্যারই সামিল। অন্ন বাঁচায় জীবনকে—আর মহৎ কাজ বাঁচায় মানুষের আত্মাকে। আত্মাকে বাঁচাবার জন্যে যদি অন্ন যায়, যাবে—তাতে কাতর হলে চলবে না। মানুষ মহৎ বলেই অমর।

প্রভা ।। তোমার মহত্ত্ব নিয়েই তুমি থাকো। তোমার কাছে মানুষের জীবনের যে কোনো মূল্য নেই, তা আমি জানি।

[দ্রুত গতিতে প্রস্থান]

শিবনাথ ।। পল গুনে গুনে বেঁচে থাকাই কি মানুষের জীবন? না জীবনের অন্য কোনো মহৎ লক্ষ্য আছে?

[বলতে বলতে সমীরের প্রবেশ।]

সমীর ।। বাব্বা! যা বিরাট লাইন—শেষ হতে আর চায় না।

শিবনাথ ।। কিসের লাইন, সমীর?

সমীর ।। সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে সব লাইন দিয়েছে।

শিবনাথ ।। তুই সেখানে কী করতে গিয়েছিলি?

সমীর ।। আমিও নাম লিখিয়ে এসেছি, বাবা।

শিবনাথ ।। [চমকে উঠে] অ্যাঁ!

সমীর ।। ভালো করিনি, বাবা? জোয়ানরা যখন দেশের জন্যে লড়াই করছে তখন আমরাই বা ঘরে চুপ করে বসে থাকবো কেন? আমরাও প্রাণ দিতে পারি কি না দেখিয়ে দেব। ওরা ভেবেছে ভারতের বুকে প্রাণ নেই—আছে কতগুলি মরা মানুষ!

[শিবনাথ নির্বাক]

চুপ করে রইলে কেন বাবা! আমি ভালো কাজ করিনি?

শিবনাথ ।। [স্বপ্নোত্থিতের মতো] অ্যাঁ! [নিজেকে সামলে নিয়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ!

সমীর ।। তুমি অমন কচ্ছ কেন, বাবা!

শিবনাথ ।। [আত্মসান্ত্বনার সুরে] না না, কিছু করছিনে, বাবা। ভাবছিলাম, এ কি বিধাতার নির্দেশ?

হতো বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা
ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়
কৃতনিশ্চয়ঃ।।

[দু'জনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রবেশ করে প্রভা।]

প্রভা ।। খোকা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পুবের সূর্যি যে প শ্চি মে হে ল লো—সেদিকেও খেয়াল নেই? ছেলে পড়াতে গিয়ে বাপ ফিরলেন দেশোদ্ধার করে। তুই এলি আবার কী উদ্ধার করে?

[শিবনাথ ও সমীর দুজনেই প্রভার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

কী? দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বল্ কী অপরাধ করেছি আমি?

সমীর ।। মা, অমনভাবে কেন বলছ! তুমি কেন অপরাধ করবে! বরং আমিই অপরাধ করেছি।

শিবনাথ ।। সমীর, তোর মুখ থেকে এমন কথা বেরুবে এ আমি ভাবিনি। অপরাধ! কিসের অপরাধ করেছিস তুই!

প্রভা ।। তোমাদের দুজনের মধ্যে কী যেন একটা গোপন পরামর্শ হচ্ছিল—আমি হঠাৎ মাঝ-খানে এসে পড়েছি।

শিবনাথ ।। না, গোপন পরামর্শ কিছুই নয়। সমীর আজ যা করেছে তাতে তার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। বরং তার জন্যে আমাদের গর্ব অনুভব করা উচিত।

প্রভা ।। কী করেছিস খোকা? বল্, আমাকে খুলে বল্।

শিবনাথ ।। সমীর সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে।

প্রভা ।। অ্যাঁ! সর্বনাশা তুই আমাকে এভাবে খুন করলি! এ কথা শোনার আগে আমার মাথায় বজ্রপাত হলো না কেন! খোকা, তোর মনে যদি এই ছিল তবে আগেই আমাকে বিষ খাইয়ে মারলিনে কেন? আমার কপালে এও ছিল!

[কেঁদে কেঁদে কপালে করাঘাত করতে থাকে।]

সমীর ।। [ব্যাকুল কণ্ঠে] মা, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, মা, ...ঠিক বুঝতে পারিনি। ক'দিন থেকেই কে যেন আমাকে শুধু ডাকছিল—ওরে আয়, ওরে আয়। সে-ডাক শুনে আমি তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, মা। তুমি কেঁদো না। কালই গিয়ে আমি নাম কাটিয়ে আসবো।

শিবনাথ ।। তা হয় না, সমীর। দেবতার নামে কিছু উৎসর্গ করে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রভা ।। তুমি বলতে পারলে একথা! বাপ হয়ে তোমার মুখে একটু আটকালো না! তুমি কি পাষাণ দিয়ে গড়া!

শিবনাথ ।। [সামান্য বিচলিত হয়ে] না না, প্রভা, আমি পাষাণ নই, পাষাণ নই। আমিও বাপ। অন্য কারো চেয়ে আমার প্রাণে অপত্যস্নেহ একটুও কম নয়। কিন্তু আমার ছেলের শিরায় শিরায় বইছে আমারই রক্ত। মা আজ রক্ত চাইছেন—সে রক্ত আমাকে দিতে হবে—মায়ের ঋণ শোধ করতে হবে। জানো, এদেশেরই এক বীর সন্তান একদিন ডাক দিয়ে ব লে ছি লে ন— আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি

তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব। আজ আবার সেই ডাক শুনতে পাচ্ছি—সীমান্তের ডাক......

প্রভা ।। আমি ওকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিলাম এজন্যে? নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে ওকে বাড়িয়ে তুলেছিলাম এজন্যে? না না, তুমি বুঝবে না। তুমি মা নও... তুমি বুঝবে না।

সমীর ।। [আবেগে মাকে জড়িয়ে ধরে] মা!

প্রভা ।। না না, তোকে আমি যেতে দেব না, যেতে দেব না...... কামানের মুখে তোকে আমি যেতে দেব না।

সমীর ।। ভেবো না মা তুমি। যেদিন রণে যাবো সেদিন বারুদের গন্ধ হবে তোমার আরতির ধুপের ধোঁয়া— কামানের লাল গোলা হবে তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ— পরিখা হবে তোমার কোমল দুটি বাহু, অক্ষয় কবচ তোমার স্নেহ-চুম্বন—আর বীজমন্ত্র হবে বন্দেমাতরম্।

শিবনাথ ।। ধন্য, আমি ধন্য!

[বালা নিয়ে ছুটতে ছুটতে রাধারাণীর প্রবেশ।]

রাধারাণী ।। এনেছি, আমি বালা এনেছি। ওকে নিতে দেব আমার সোনা! কখ্খনো না, কখ্খনো না। বাউল-ঠাকুর কই, চাটুজ্জেমশায়।

শিবনাথ ।। সে তো তখনই চলে গেছে, রাধারাণী।

রাধারাণী ।। চলে গেলো! আমার বালা না নিয়েই সে চলে গেলো? আমি যে তাকে দেবোই। তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন চাটুজ্জেমশায়।

শিবনাথ ।। কোন্ দিকে সে গেছে কী করে জানবো!

রাধারাণী ।। তবে উপায়! তাকে কোথায় পাবো আমি? এই বালা-জোড়া তার হাতে তুলে না দিয়ে যে আমি শান্তি পাবো না। আমি চিনেছি তাকে, চিনেছি—সে সামান্য বাউল নয়......

শিবনাথ ।। রাধারাণী, সময়ই মানুষকে সামান্য করে—আবার সময়ই তাকে অসামান্য করে তোলে। তুমিও এখন আর সামান্যা নারী নও। তুমি কি আর সেই রাধারাণী আছ? এখন মহারাণী হয়ে উঠেছ। বাউলের মুখে দিয়ে মা ডাক দিয়েছেন—সে ডাক তোমার কানে পৌঁচেছে। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো—ব্রতভিক্ষে দিয়ে আসবে।

রাধারাণী ।। তাই যাবো। এই সোনা আমি দান করবোই। শকুনের পেটে যাওয়ার চাইতে দেবতার পুজোয় লাগা ভালো।

শিবনাথ ।। দাও দাও......যে যা পারো আজ দিয়ে যাও। যে পারো সোনা দাও, যে পারো পুত্র দাও, যে পারো রক্ত দাও—আজ মাতৃযজ্ঞে আহুতি দাও সবাই।

সমীর ।। মা, বলো তুমিও আমাকে হাসিমুখে বিদায় দেবে?

প্রভা ।। আমি জানতাম, আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে। তোদের বংশে এক সর্বনাশা রক্ত আছে। সেই রক্তের কণাগুলো যখন নেচে ওঠে তখন তোরা পাগল হয়ে যাস। তোদের আমি চিনি, ভালো করেই চিনি। তখন তোদের মা থাকে না, বাপ থাকে না, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন কেউ থাকে না—দেশ দেশ করে শুধু উন্মাদের মতো ছুটিস। তোর বাপ আমাকে আজীবন জ্বালিয়ে খেয়েছে—তুইও যে জ্বালাবি, আমি জানতাম......আমি জানতাম ....

[কেঁদে কেঁদে বিহ্বল হয়ে পড়ে।]

শিবনাথ ।। স্থির হও, প্রভা, স্থির হও। মেয়েদের অতো ভেঙে পড়লে আজ চলবে না। নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করো। বীরজননী হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। অন্তরের বেদনাকে চেপে রেখে হাসিমুখে সন্তানকে বিদায় দিতে হবে; না হলে মায়ের চোখের জল তাকে দুর্বল করে ফেলবে, তার অকল্যাণ হবে। তুমি জানো না—রণাঙ্গনে মায়ের হাসিমুখ মনে পড়লে যোদ্ধার বাহুতে বল আসে। চোখের জল ফেলার দিন আজো আসেনি— ভগবান করুন তেমন দিন যেন না আসে। আর সত্যি যদি তেমন দুর্দিন আসে সেদিন তোমাদের চোখের জল যেন আগুন হয়ে দেখা দেয়।

প্রভা ।। [সমীরকে বুকের কাছে নিয়ে] নাঃ! জানি আমি তোকে ধরে রাখতে পারবো না। চোখের জলও যে তোদের ধরে রাখতে পারে না তা আমি জানি। [আঁচলে চোখ মুছে] আমি তো কাঁদতে চাইনে—তবু কেন বার বার আমাকে কাঁদতে হয়। কান্না কাঁদায়? আমি বুঝতে পারিনে...... কিছু বুঝতে পারিনে। মায়েদের এই কান্নার শেষ কি হবে না......হবে না কোনোদিনই?......?

[সমীরকে আরো জোরে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। শিবনাথ ও রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।]

যবনিকা

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

৭ই নভেম্বর-১৯৫৯

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

চীন-ভারত সীমান্তে স্থিতাবস্থা রক্ষার দুটি প্রস্তাবিত তারিখ—৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯ ও ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। প্রথমটি চীনের প্রস্তাব, দ্বিতীয়টি ভারতের।

২০শে অক্টোবর ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা সৈন্যদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। তার চারদিন পরে ২৪শে অক্টোবর চীন ভারতের কাছে একটি তিন দফা সর্ত-সম্বলিত আলোচনা-প্রস্তাব পাঠায়। তাতে চীন বলে যে, আলোচনার মাধ্যমেই চীন সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করতে চায় এবং তারজন্যে সে তার সৈন্যবাহিনীকে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

কিন্তু আক্রমণকারী চীনের সে প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হতে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, আক্রান্ত অবস্থায় ভারত চীনের কোন প্রস্তাবই বিবেচনা করতে রাজী নয়। কোনরকম আলোচনা শুরু করার আগে চীনকে অবশ্যই অস্ত্রসংবরণ করতে হবে এবং আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তাকে অবশ্যই আরও পেছিয়ে এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় চলে যেতে হবে। তা যতদিন না চীন যাবে ততদিন ভারত নিজভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে সংগ্রাম করে যাবে। তার জন্যে যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন ভারত তা স্বীকারে প্রস্তুত। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সে যুদ্ধে ভারতকে যদি প্রভূত ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়, ভারত তা করবে, কিন্তু শত্রুর হুমকি বা আঘাতের ভয়ে সে নতি স্বীকার করবে না।

ভারতের এই স্পষ্ট ও দৃঢ় উত্তরে আক্রমণকারী চীনকে খুবই বিব্রত হতে হয়। ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার যে মতলব চীন করেছিল, ভারতের দৃঢ়তায় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। ওদিকে চীন আরও যেসব আশা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল সে সবও তার সম্পূর্ণ অপূর্ণ থেকে গেল। সোভিয়েট ইউ-নিয়ন এ বিরোধে কোন অংশ নিল না। ক্রুশ্চেভ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে, বন্ধু ভারত ও ভ্রাতা চীনের বিরোধ তার কাম্য নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নীতি অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশ-গুলিও অনুসরণ করল। শুধুমাত্র দুটি নগণ্য শক্তি আলবানিয়া ও উত্তর কোরিয়া ছাড়া আর কারও সমর্থনই চীন পেল না। অপর পক্ষে ভারতের সমর্থনে এগিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশ, তাদের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে। তারা জানাল, চীনের আক্রমণ হটাতে ভারত তাদের কাছে যা সাহায্য চাইবে তারা তাই দেবে। এমন কি ইঙ্গিতে একথাও তারা বুঝিয়ে দিল যে, প্রয়োজন হলে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েও তারা ভারতকে সাহায্য করবে।

চীনের সামরিক বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক, ভারতকে যারা সাহায্য

লদাক রণাঙ্গন—
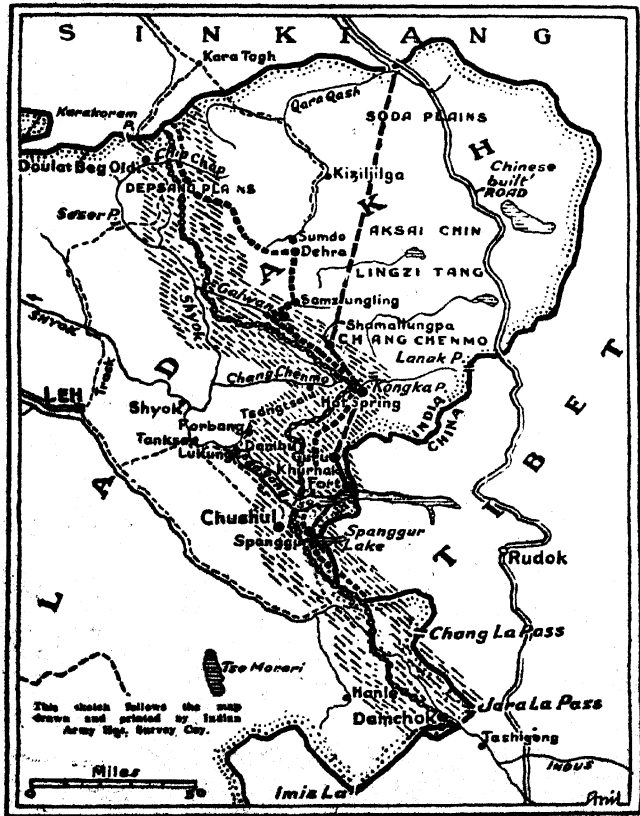
Line demarcating the extent to which Chinese forces had set up posts by 7th Nov. 59.

Line roughly separating Chinese and Indian forces on 7th Sept. 62.

Area of demilitarisation 20 Km on either side of the line of actual control as defined by the Chinese.

করতে এগিয়ে এসেছে তাদের তুলনায় তার শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের ভরসাতেই চীন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস করতে পারত। কিন্তু কিউবা হতে প্রত্যাহার করে সোভিয়েট ইউনিয়ন বুঝিয়ে দিল যে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ করে কোন সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সে একেবারেই রাজী নয়। কিউবা হতে ক্রুশ্চেভের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে চীন তীব্রভাবে সমালোচনা করে এবং পিকিঙ রেডিও খোলাখুলিভাবেই ক্রুশ্চেভকে 'ভীরু', 'শোধনবাদী' ইত্যাদি বলে' গালি দেয়। চীনের শেষ পর্যন্ত একটা আশা ছিল যে, হয়ত ক্রুশ্চেভের সিদ্ধান্ত সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি অনুমোদন করবে না। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনের পর চীনকে সেদিক থেকেও নিরাশ হতে হ'ল।

চীনা আক্রমণে গৃহহারা এক উপজাতীয় মা ও সন্তানদ্বয়।

এরপরেও একার ভরসায় এগোনোর সাহস চীনের ছিল না। তাই যেমন অতর্কিতে সে ২০শে অক্টোবর ভারত আক্রমণ করেছিল, তেমনি অতর্কিতেই ঠিক এক মাস পরে ২০শে নভেম্বর সে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে আরও জানালো যে, ১লা ডিসেম্বর হতে তার সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করবে এবং ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর সে যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় তার সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর ভারত যাতে তার পূর্ব প্রস্তাবিত ২৪শে অক্টোবরের সর্তাবলীর ভিত্তিতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তার জন্যও সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সুতরাং, চীনের যুদ্ধবিরতির

নেফা রণাঙ্গন—
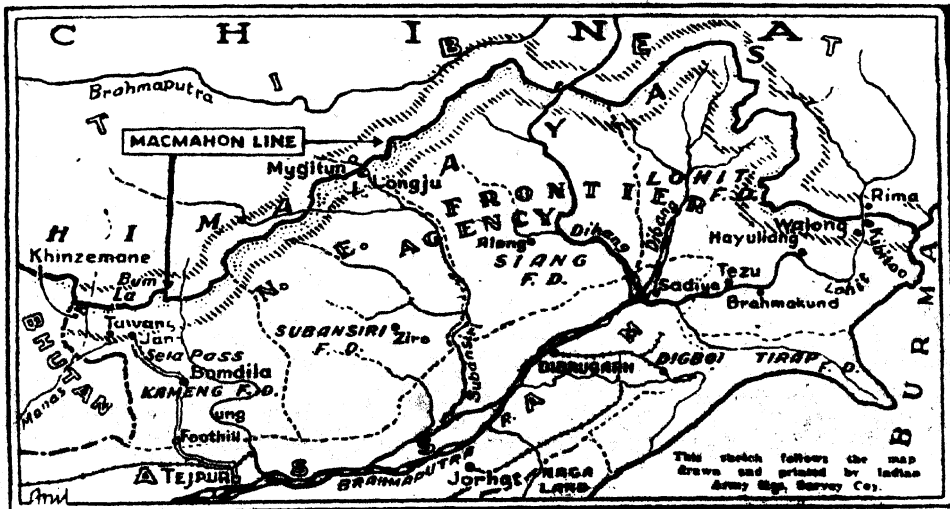
Line of actual control separating Chinese and Indian forces on 7th Sept. 62.

Area of demilitarisation 20 Km on either side of the line of actual control as defined by the Chinese

Area of dispute regarding interpretation of McMahon Line ... Khinzemane & Longju

এই একতরফা সিদ্ধান্ত আপাতঃদৃষ্টিতে যতই চমকপ্রদ বলে মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা শঠতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বর্তমানে তার পক্ষে আর একপাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধে জয় অব্যাহত থাকতেই চীন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিল। বলতে দ্বিধা নেই, এই ব্যাপারে চীন যথেষ্ট চাতুর্য ও সময়জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীন মীমাংসা করতে চায় তা যে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ভারত চীনকে ২৪শে অক্টোবরের পরেই তা জানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধ-বিরতিকালে তারই পুনরাবৃত্তি করা অন্তত চীনের পক্ষে যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এইটুকু চীনের বোঝা উচিত ছিল।

এরমধ্যে অবশ্য চালাকি দেখানোর একটা সুযোগ আছে। চীন জগতকে এই সুযোগে দেখাতে পারে যে, ভারত তাকে যে অবস্থায় ফিরে যেতে বলেছিল, তার চেয়েও তিন বছরের আগের অবস্থায় সে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও ভারত তার সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজী নয়। তাতে, চীনের অন্তত ধারণা বোধহয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতকে ভুল বুঝবে। কিন্তু ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারে যে কোন কাজ হয় না, এটা চীনের এতদিনের অভিজ্ঞতায় কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করা উচিত ছিল। এতদিন ধরে একনাগাড়ে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছে চীন. কিন্তু তবুও আজ সে দেখতে পাচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীই ভারতের সমর্থক। প্রকাশ্যে যে সমর্থন করতে পারেনি সেও নীরব থেকে বুঝিয়েছে যে, চীনের পক্ষে বলার কিছুই নেই।

তিন বছর আগের অবস্থাটা এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের চেয়ে যদি চীনের পক্ষে খারাপই হ'ত তবে ত চীন সানন্দেই ভারতের ৮ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত। ভারত তাকে আরও বেশী ভারতের অভ্যন্তরে থাকতে বলছে, আর চীন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় আরও বেশী পেছিয়ে যাচ্ছে—দস্যু চীনের এই ধরণের বৈষ্ণবী যুক্তিতে নিশ্চয়ই কেউ আস্থা স্থাপন করবে না। প্রস্তাবের গভীরে না গিয়ে শুধু এই কথাটুকু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, অস্ত্রের জোরে যা সম্ভব হয়নি কথার মারপ্যাঁচে চীন তা হাসিল করার চেষ্টা করছে।

১৯৫৭ সালের মধ্যে চীন লদাক অঞ্চলে ভারতের প্রায় বারো হাজার বর্গ মাইল জমির উপর জবরদখল কায়েম করে। ১৯৫৬ সালের ২০শে অক্টোবর অর্থাৎ বর্তমান পর্যায়ের ব্যাপক আক্রমণের ঠিক ছয় বছর আগে চীনা সৈন্যরা হঠাৎ লাদাকের দক্ষিণ দিকে চল্লিশ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও চাঙ চেনমো উপত্যকার প্রহরারত ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণ করে' নয়জনকে হত্যা করে ও দশজনকে ধরে নিয়ে যায়। চীনের সেদিনের আচরণে সারা ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও অবিলম্বে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের দাবী জানায়। কিন্তু ভারত সরকার সেদিন শান্তভাবেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন ও ১৬ই নভেম্বর চীনের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করেন যে, ভারত চীনের দাবী মত সীমারেখাতে ভারতের সৈন্য ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু চীনও ভারতীয় মানচিত্রে প্রদর্শিত চিরাচরিত সীমারেখায় তার সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাক। কিন্তু চীন ১৭ই ডিসেম্বর ভারতের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও আকসাই চীনের আরও দক্ষিণ ও পশ্চিমে চীনা সৈন্য এগিয়ে যায় ও ঐ অঞ্চলে পথ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এইভাবে চীনের অগ্রগতি ও জবরদখলের মধ্যে শেষ হয় ১৯৫৬ সাল।

পাঁচ বছর বাদে, বহু বন্ধ্যা তর্ক-বিতর্কের পর ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারতের পক্ষ হতে উভয় পক্ষের সীমান্ত সম্পর্কিত দাবী-দাওয়া ও দীর্ঘ আলোচনা সম্পর্কে যে সরকারী দলিলপত্র প্রকাশ করা হয় তাতে বলা হয়, চীন ভারতের অভ্যন্তরে পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইল জমির উপর দখল দাবী করেছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের এই দলিল হতেই বোঝা যাবে যে, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর চীন ভারতের কতখানি জায়গার ওপর জবর-দখল কায়েম করে রেখেছিল।

তারপরেও অবশ্য চীনের এখানে-ওখানে হামলা বন্ধ হয়নি। কিন্তু ভারত সরকারও ক্রমে অবস্থা সম্বন্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং ভারতীয় সৈন্যরা লদাক ও নেফা উভয় অঞ্চলেই চীনাদের দখল হতে কিছু কিছু জায়গা পুনরুদ্ধার করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের ভারতীয় ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ চলতে থাকে। অর্থাৎ, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর (যখন ভারতে চীনাদের জবরদখল সর্বাধিক মাত্রায় পেঁৗচেছিল) ও ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা চীনাদের হাত হতে বহু এলাকা ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হয়। পূর্বে ম্যাকমোহন লাইন পর্যন্ত ভারতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বর হ'তে আবার চীনাদের ভারতীয় ভূমিতে হামলা শুরু হয়। ঐদিনই তারা ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে' নেফায় আগলা শৈলশিরা পুনর্দখল করে।

১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, এই বছরে মে মাসের পর থেকে চীনা সৈন্যরা লদাকে চিপচাপ, গলোয়ান, কারাকাশ ও প্যাংগঙ হ্রদ অঞ্চলে ৩৪টি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

১০ই অক্টোবর নেফার থোলা অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের প্রায় বারো ঘন্টা গুলী-বিনিময় হয় ও তাতে ১৭ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এর দশদিন পরেই চীনা সৈন্যরা ব্যাপকভাবে ভারতের উভয় সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। চীনাদের আক্রমণ পদ্ধতিতেও বিশাল সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আক্রমণের জন্যে চীন অনেকদিন আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। যাইহোক তার ঠিক এক মাস পরে তারা আবার নিজে থেকেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে এবং বলে যে, সীমান্ত বিরোধের মীমাংসাকল্পে তারা ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে।

কেন যে তারা হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিল তার আলোচনা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই করা হয়েছে, এবং ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থা যে তাদের পক্ষে কতখানি সুবিধাজনক তা ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত ভারত সরকারের দলিল

থেকেই বুঝতে পারা যাবে। ঐ অবস্থায় চীন যদি তার দখল কায়েম রাখতে পারে তবে ভারতের প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল জমি তার দখলে থেকে যাবে। আর ভারত যদি তাকে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় সম্মত করাতে পারে তবে এই দুই সময়ের ব্যবধানে ভারত চীনের কাছ থেকে যে এলাকাগুলি পুনর্দখল করতে পেরেছিল তা চীনকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু চীন তাতে সম্মত নয়, পরন্তু প্রস্তাবের সঙ্গে আরও যে কটি সর্ত চীন সংযুক্ত করেছে তাতে ভারতকে সম্মত হতে হলে তার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা আরও বেশী খারাপ হয়ে যাবে।

চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে' ভারত সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছে, ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলে ভারতকে নেফায় ঢোলা, খিনজেমান, কিবিটো ও ওয়ালঙ ত্যাগ করতে হবে এবং লদাকে ত্যাগ করতে হবে ৪০টি ঘাঁটি। উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে বরাহিতে-সহ একটি বিস্তীর্ণ এলাকা এমনিতেই চীনকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে।

চীনের নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, চীন ম্যাকমোহন লাইনের ওপারে চলে গেলেও ভারতীয় সৈন্য ম্যাকমোহন লাইনের এপারে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ অঞ্চলকে অসামরিক অঞ্চল করে' ফেলে রাখতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য বমডিলা হতে আগলা শৈলশিরা পর্যন্ত ও কিবিটো হতে ওয়ালঙ পর্যন্ত চীনের হুকুমে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি ভারত প্রবেশ করে তবে চীন তার স্ব-আরোপিত সর্ত অনুসারে ভারতকে প্রত্যাঘাত হানবে।

অর্থাৎ চীনের বর্তমান সর্তের সারমর্ম এই যে চীন ২০শে অক্টোবরের আগে যে প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল জমি দখল করেছে তাও সে ছাড়বে না, পরন্তু ২০শে অক্টোবরের পর গত এক মাসে সে যে সব ভারতীয় এলাকা দখল করেছে সেগুলি ছেড়ে গেলেও ভারতকে তা পুনরুদ্ধার করতে দেবে না। আপাতত চীনের ইচ্ছামত ঐ সব এলাকা অসামরিক ও বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকবে।—এ প্রস্তাবকে শান্তি প্রস্তাব বলে প্রচার করাতে চীনের নির্লজ্জ মিথ্যাচারী নেতাদের কোন সঙ্কোচবোধ না হতে পারে কিন্তু ভারতের কাছে এ প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে বশ্যতারই সর্ত-স্বরূপ।

দার্জিলিং রাইফেল ক্লাবের সদস্যগণ রাইফেল ট্রেণিং নিচ্ছেন।

এই প্রস্তাবে ভারতের সম্মত হওয়ার অর্থ, শত মাইল বিস্তৃত পর্বতের স্বাভাবিক ব্যবধান অতিক্রম করিয়ে পররাজ্যলোভী দস্যু চীনকে একেবারে ভারতের সমতলভূমির উপান্তে আহ্বান করে আনা।

চীন তার প্রস্তাবের ফাঁকি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই প্রস্তাব করা মাত্রই স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারতকে আক্রমণ করার সময় চীন বিশ্বের জনমতকে হেলায় উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু ভারতে তার দাবী করা ভূমির সবখানি দখল করার পর তারই প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধের নিষ্পত্তি করানোর জন্যে এখন তার আগ্রহ সীমাহীন। শুধু যে এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছেই চীন তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্যস্থতা করার আবেদন জানিয়েছে তাই নয়, থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চীন তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়েছে। অথচ থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছেও একই মর্মে আবেদন জানাতে চীনের চতুর নেতারা ভুল করেননি। ক'দিন আগেও বিশ্বের সকল প্রতিবাদ ও নিন্দা তুচ্ছ করে যে চীন অস্ত্রবলে তার দাবী পূরণে উদ্যত হয়েছিল তার আজ বিরোধ মীমাংসায় কি অপরিসীম আগ্রহ! অথচ মীমাংসার সর্ত তারই এবং এমন সব সর্ত যা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে ভারত প্রায় এক মাস আগে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। এই প্রচার তৎপরতাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত মীমাংসায় কোন আগ্রহ চীনের নেই। যা সে গত কয়েক বছর ধরে ও বিশেষ করে গত কয়েকদিনে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, ছদ্ম শান্তি প্রস্তাবের আড়ালে তার ওপরেই সে তার জবরদখল পাকাপাকি করে নিতে চায়।

(উত্তর)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

গত ১১ই আশ্বিন ১৩৬৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর '৬২ ২১শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসুচিত দাস, আমতা, হাওড়া থেকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর :—

ব দুই প্রকার—(১) প বর্গ ও (২) অন্তস্থ ব বর্গ।

প বর্গের ব ব্যবহার :—বলাকা, বসুন্ধরা, বেন্দু, বীণা প্রভৃতি।

অন্তস্থ ব বর্গের ব হইতেছে :— অবলা, অবনী প্রভৃতি।

শ্রদ্ধেয় দাস মহাশয় দুই ব এর প্রভেদ কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

দুই ব দেখিতে এক প্রকার, ব্যবহার ভিন্ন হয়।

বন্দনা সেন,
অর্ঘ, পূর্বপল্লী,
শান্তিনিকেতন।

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত জনাব মহম্মদ ইউনুস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর :—

বাংলার তারিখ, সাকিন বা সাকিম প্রভৃতি শব্দ মুসলমান আমলে আরবী ভাষা হইতে আমদানী হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রয়োগ ইংরেজ আমলের পূর্ব হইতেই ছিল। আর ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ তাং, সাং প্রভৃতিও ইংরেজী ভাষার অনুকরণে হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক ভাষারই সংক্ষেপী-করণের একটা নিজস্ব রীতি থাকে। হিসাব শব্দটিও আরবী ভাষা হইতেই বাংলায় চালু হইয়াছে, এবং পূর্বাপর সংক্ষেপিত রূপ "হিঃ" দ্বারাই সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজীতেও এরূপ অসমতা বা অসামঞ্জস্য বহু আছে। প্রশ্নকর্তার উল্লেখিত উদাহরণগুলি হইতেই নমুনা দেখান যাইতে পারে, যেমন Number-এর সংক্ষিপ্ত রূপ Nu, না হইয়া No., Limited এর সংক্ষিপ্ত রূপ দুই অক্ষরযুক্ত Li বা তিন অক্ষরযুক্ত Lim. না হইয়া হইয়াছে তিন অক্ষরযুক্ত Ltd., আর Maximum এর বেলায় হইয়াছে তিন অক্ষরযুক্ত Max.। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রেই পূর্বাপর প্রচলিত রূপেই অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধারা বা রীতির অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম হইবে।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬ নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন

আপনার পত্রিকার জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগটির মারফৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর আশা করি।

(১) বিখ্যাত লোকের নামে দেশের রাস্তাঘাটের নামকরণের প্রচলন পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম ও কবে হয়? আমাদের দেশে এই প্রথা কতদিন প্রচলিত হয়েছে?

(২) ইংরেজী ক্যালেন্ডারের মাস ও বারের নামগুলি বিভিন্ন রোমান দেবতার নামানুসারে প্রচলিত। বাংলাদেশের মাস ও বারগুলির নামকরণের উৎস কি? অগ্রহায়ণ মাসকে 'মার্গশীর্ষ' বলা হয় কেন? রবিবার ছাড়া অন্য কোন বার হতে সপ্তাহের গণনা কোনদিন শুরু হয়েছিল কি?

(৩) শোনা যায় কাকের একটিমাত্র চক্ষু, সেই কারণে চারিদিক দেখবার জন্য এরা ক্রমাগত ঘাড় ফেরায়। এ কি বৈজ্ঞানিক সত্য? পরিষ্কার নির্মল জলকে কাকচক্ষুর সহিতই তুলনা করা হয় কেন?

ভবদীয়,
অহিভূষণ মিশ্র।
পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' মারফত কয়েকটি বিষয় জানতে ইচ্ছুক, আশা করি অনুগৃহীত করবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের মধ্যে "বৈদ্যের" স্থান কোথায়? অনেকের মতে প্রাচীনকালে যাঁরা আয়ুর্বেদের চর্চা করতেন তাঁরাই বৈদ্য নামে এখন পরিচিত, এবং ব্রাহ্মণরাই ছিল বেদ চর্চার অধিকারী। এর সত্য কতদূর, পূর্বে নাকি বৈদ্যরা শর্মা লিখতেন, যেমন সেনশর্মা, দাশশর্মা ইত্যাদি, এখন তাঁরাই লিখছেন সেন-গুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত। অনেকে উপবীত ধারণ করেন, অনেকে করেন না, কেন?

শ্রীমঙ্গলকুমার দত্তগুপ্ত,
ই।১৮।৪, নিউ এয়ার-পোর্ট কলোনী
বম্বে—২৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের চিত্তাকর্ষক "জানাতে পারেন" বিভাগে কয়েকটি কৌতূহলো-দ্দীপক বিষয় জানাচ্ছি। সহৃদয় পাঠক ও পণ্ডিতবর্গ থেকে এর যথোচিত উত্তর আশা করছি।

(১) আজকাল শিশুদের তোতাপাখির মত কেবল মুখস্থ ক্রিয়ার উপর থেকে শিক্ষাপ্রণালীপ্রস্তুতকর্তাদের নজর সরে এসেছে কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর অর্থাৎ কাজের থেকে শিক্ষা—যেমন, আঁকা, খেলা, কাজ, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি থেকে শিক্ষণীয় জ্ঞান অর্জন করা। ৪০।৫০ বছর আগে দেখা গেছে পাঠশালার মরমী দরদী পণ্ডিত মশাইগণ শিশুদের ছবি আঁকা শেখাতেন বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা ইত্যাদির মিশ্রণে। এবং সে সম্বন্ধে সুন্দর ছড়াও একটি পাই। ছড়াটি হল : (এই ছড়াটি একটু আধটু পরিবর্তিত আকারে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জানা থাকতেও পারে)

দ-কে হল জ্বর
২২ জন ডাক্তার এল
বসতে দিল লাঠি
খেতে দিল বাটি।
উপর দিয়ে ছিটনী দিলে
হল একটি পাখি।

এই ধরণের ছড়া শিশুদের বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজনীয়। পুরনো ছড়া যদি কারো জানা থাকে, প্রকাশ করলে উপকৃত ও বাধিত হব।

(২) কোন জিনিসের পৌনঃপুনিক ব্যবহার বা অতিরিক্ততা বস্তুটির প্রতি তিক্ততা জাগায়, সেই সূত্রে প্রবাদ প্রচলিত "নেবু বেশি দললে তেতো হয়ে যায়"। কেন তেতো হয়? নেবুর মধ্যে Cytric Acid আছে। সেই Acid-এর গঠনগত কোন পরিবর্তনের ফল কি? আরও দেখা গেছে দুধ থেকে দই যখন সবে বসতে শুরু করেছে—তখনো টক হয়নি, তার স্বাদে কিছু তিক্ততা অনুভব করা যায়। এও কি Acidity হবার প্রাক্কালীন Acid Molecule গুলির ছন্নছাড়া অবস্থা?

মধু চক্রবর্তী,
১১৫নং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড, কলিকাতা—২৬।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। অসহ্য শীত চলেছে ক'দিন থেকে। তার উপর ঝিরি-ঝিরি বরফ পড়ছে, বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘরের বাইরে পা দেবার কথা ভাবতেই শরীর হিম হ'য়ে আসে। আপনি শীতের সময় কখনো থেকেছেন কিনা জানি না, কিন্তু কাকাবাবু, এখানকার শীতকালের শীত যে কী ভয়ংকর জিনিস তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। বাইরে বেরুলে মনে হয় কে যেন দৌড়ে এসে তাল তাল বরফের মধ্যে জোর ক'রে ঠেসে ধরলো। ঘরের শীতকে এরা পরাস্ত করেছে বটে, দিব্যি আরামে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পাতলা জামা-কাপড় পরে চটি পায়ে ঘুরে বেড়ানো চলে। দোকানে পসারে, গাড়ির ভিতরে--সর্বত্রই এই আরামের উত্তাপ। কিন্তু আকাশের তলায় পা দিলাম কি গেলাম। একেবারে মৃত্যু। গুঁড়ি মেরে থাকা লক্ষ লক্ষ শীতের সৈনিক শরীরের উপর লাফিয়ে পড়ে টেনে ছিঁড়ে হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে।

সে জন্যেই পথ-ঘাট সাধারণত জনবিরল থাকে। লোকজনেরা কেউ উপরে ওঠে না, সবাই যতোটা সম্ভব মাটির তলার পথেই আনাগোনা করে। মাটির তলার ট্রেনগুলো তখন কলকাতার ট্রামের চেয়েও বেশী ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে মানুষের চাপে। তবুও এমন অনেক কাজ আছে যা মাটির তলায় সম্ভব নয়। বাজার করা, অসুধ কেনা, এমনি ধরনের কাজগুলোর জন্য উপরের রাস্তায় না বেরুলে উপায়ই থাকে না। সাত প্রস্থ গরম কাপড়ের তলায় অসহায় শরীরটাকে লুকিয়ে গুটিয়ে নামতেই হয় খোলা রাস্তায়। কিন্তু যতো গরম কাপড়ের পুঁটুলিই হই না কেন, যেমন ক'রেই বেরুই না, শীতের সেই দুর্দান্ত দস্যুকে কোনো রকমেই পরাস্ত করা যায় না, বাঘের চেয়েও ভীষণ ঐ শীতের থাবা, আর সেই আঘাত সইতেই হতো, দিনের মধ্যে অন্তত একবার।

এই শীতের উপরেও প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা ধ'রে বরফ পড়লো দু'দিন। আকাশ থেকে যেন কোটি কোটি বস্তা লাক্স সাবানের গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগলো এবং পড়ে গিয়ে সেগুলো গলে গেলো না, শক্ত হ'য়ে জমতে লাগলো। ঘরে বসে ডবল কাঁচের মোটা জানালার উপরে এক আঙুল পুরু সিল্ক সাটিনের আপাদ-মস্তক মুড়ে রাখা মস্ত মোটা পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বরফ ঝরার এই দৃশ্যটা দেখতে মন্দ রমণীয় মনে হ'লো না। চোখের সামনে সহরটা আস্তে আস্তে একটা ধোঁয়াটে সাদা বরফের সাগরে পরিণত হ'য়ে গেল। বাড়ি-ঘরের চেহারা রইলো না, রাস্তা-ঘাট, পার্ক ময়দান, মস্ত মস্ত মেপল গাছের শুকনো ডাল সব একাকার হ'য়ে গেল সাদা শক্ত পাথরের মতো বরফের চাপে। সেই সাদা ছাড়া কোনোদিকে আর কোথাও অন্য রং রইলো না অমন জীবের নিউইয়র্ক সহরে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি গাড়িগুলো এক একটা এক এক রকম প্রাগ-ঐতিহাসিক অদ্ভুত জানোয়ারের আকৃতি নিয়ে বরফ-ঢাকা হ'য়ে পড়ে রইলো। চল্লিশতলা, পঞ্চাশতলা বাড়িগুলোকে সারা গায়ে বরফ মেখে উঁচু-নিচু তুষারাবৃত পাহাড়ের এক একটি চুড়ো বলে ভ্রম হ'তে লাগলো। প্রায় অচল হ'য়ে উঠলো সহর।

বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো পাঁচতলার সমান উঁচু এক একটা বরফ কাটা যন্ত্র তার হাঙরের মতো পাঁচশো দাঁত নিয়ে আর্তনাদ ক'রে ফিরতে লাগলো এ্যাভিনিউগুলোতে। স্ট্রীটগুলো না হয় পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ্যাভিনিউগুলো পরিষ্কার না করলে চলবে কেমন করে? পথ কই? লোক চলবে, বাস চলবে, ট্যাক্সি চলবে।

প্রাইভেট গাড়ি বেরুনো অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হ'য়ে গেছে। প্রাইভেট গাড়ির গতি অনবরত নয়। তাকে থামতে হয় নানা জায়গায়। কর্তাকে আপিসে পৌঁছে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কোনো বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, দোকানে নিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আর সেই দাঁড়িয়ে থাকার সময়টুকুর মধ্যেই সে আকণ্ঠ ডুবে যায় বরফে। যে গাড়ির যে রকম চেহারা, বরফ তাকে সেই চেহারায় মুড়ে রাখে, কোদাল দিয়ে কুপিয়েও সেই বরফের স্তূপ ভেঙে তাকে বার ক'রে চালানো যায় না। হাঁ ক'রে থাকা শত্রু প্রকৃতির দিকে, কোনদিন কড়া রোদ

উঠবে। বরফ গলবে, তারপর আবার বৃষ্টি হ'য়ে ধুয়ে দেবে।

সহর সত্যি প্রায় অচল হবার দশা। সবাই হায় হায় করতে লাগলো, বলতে লাগলো তবে কি এবার বরফের তলাতেই সমাধি হবে নাকি? নিউইয়র্ক টাইমস বড়ো বড়ো হেড লাইনে খবর দিল আশি বছরের মধ্যেও এমন একটা ঘটনা ঘটে নি। এতো স্লীট নয়, এর নাম ব্লিজার্ড। তুষার-ঝড়। এই তুষার তুলোর আঁশের মতো ঝরে ঝরে ক'রে মাটিতে পড়েই গলে যায় না, শক্ত হ'য়ে ওঠে।

সেই শক্ত হ'য়ে ওঠা পাথরের মতো সতেরো ইঞ্চি পুরু বরফের চাপে যন্ত্রের দাঁত বসতে চাইলো না। সে এক মহা ব্যাপার। স্ট্রীটের বাসিন্দারা তাদের রাস্তার ধারে পরিখার মতো গর্ত খুঁড়িয়ে সমানে আগুন জ্বলাতে লাগলো, যদি তাতে গলে। সবাই বললো, এই বরফ পরিস্কার ক'রে হাডসন নদীতে ফেললে নদী বুজে যাবে। অবস্থাটা বুঝুন।

এদিকে নতুন এসে সংসার পেতেছি, এটা থাকে তো ওটা থাকে না, তখন বাধ্য হ'য়েই বেরুতে হয়। তলাকার গোটা পাঁচেক পশমী জামার উপরে লম্বা হাতের সোয়েটার পরে, সিলকের শাড়ি জড়িয়ে তার উপরে এক দশ মন ওজনের কোট চাপিয়ে, ওভার শুতে পা ঢেকে, মাথায় ফ্লানেলের টুকরো বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে কিনতে-কাটতে যাই। দু' পা হাঁটি আর কোনো-না-কোনো ড্রাগস্টোর চোখে পড়লেই ঢুকে পড়ি। আপনি জানেন, এখানকার ড্রাগস্টোরগুলো কেমন অন্য রকম। অষুধ মনোহারি আর রেস্তোঁরা এক সঙ্গে। এক পাশে ঘোরানো টেবিল ঘিরে উঁচু চেয়ারে বসে লোকেরা মোটা মোটা শুয়োরের মাংসের স্যান্ডুইচ আর কফি খেতে খেতে গল্প করে। কেউ কেউ শুধু কফি খায়, কেউ কোকা-কোলা, অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি চা। আসলে সবাই একটু শরীর গরম করতে ঢোকে। একটা কিছু নিয়ে বসে থাকে খানিকক্ষণ। আবার বেরোয়। এমনিই এক উঁচু চেয়ারে এক কাপ গরম পানীয় নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আবার দেখা হ'য়ে গেল রাসেলের সঙ্গে। সে-ও ঐ একই উদ্দেশ্যে ঢুকেছিলো। আমাকে দেখে এক লাফে কাছে এসে হাত ঝাঁকিয়ে উদ্ভাসিত মুখে সম্ভাষণ করলো। আমিও খুশী হ'য়ে উঠলাম। বললাম, 'কেমন আছ?'

'আপনি কেমন আছেন?'

নিয়ম মাফিক শীত বিষয়ে একটু রসিকতা করলুম। রাসেলও যথারীতি জবাব দিল। আলাপ জমতে দেরি হ'লো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাছেই থাকো নাকি?'

'কাছে!' চোখ বড়ো করলো সে, 'মোটেই না, সেই কুইন্সে। কিন্তু এ রাস্তাই আসলে আমার রাস্তা, এই ওয়াশিংটন স্কোয়ারই আমার আসল পাড়া।' সে কী অর্থে বলছিল, তখন আমি বুঝিনি, পরে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলুম। তখন ভেবেছিলুম কবি সাহিত্যিকের তীর্থস্থান তো এই ওয়াশিংটন স্কোয়ার পাড়াই, রাসেল হয়তো সে কথাই বলছে তাই জবাবে বললুম, 'সে তো বটেই,—তোমাদের জন্যই গ্রীনউইচ ভিলেজের এতো খ্যাতি। এখন অবিশ্যি বিটনিক।'

রাগ করলো রাসেল, ভারি গলায় আধো আধো বাংলায় বললো, 'বা রে কোটাবার বোলবে যে হামি একটুকু বিটনিক নই।'

'আরে, বাংলা বলতে পারো! কী আশ্চর্য!'

আমি একেবারে অবাক। মুহূর্তে তাকে আমার আপন মানুষ বলে মনে হ'তে লাগলো। আমি তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, 'বিটনিক বললে তুমি রাগ করো কেন বলো তো? আমার তো খুব ভালো লাগে তাদের কথা ভাবতে।'

'কিন্তু আমি যা নই' রাসেল জোর দিল গলায়, 'তা কেন আমাকে বলা হবে?'

'ঠিক আছে, আর বলবো না। বরং এসো কলকাতার কথা বলি।'

'আপনিও কি ঠাট্টা করছেন?'

'কক্ষনো না। সেদিন আলাপ হ'য়ে থেকে আমি কতোবার তোমার কথা মনে

করেছি, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো।'

'আমার মতো নয় নিশ্চয়ই' ভালো লাগার প্রতিযোগী হ'য়ে রাসেল অর্থাৎ হাসলো, 'আপনি আর আমাকে কতোটুকু ভেবেছেন, আমি সেই থেকে ভাবছি আবার কেমন ক'রে আর কোথায় দেখা হ'তে পারে আপনার সঙ্গে।'

'খুব কিছু কঠিন ছিল না নিশ্চয়ই। অনায়াসে ফোন করতে পারতে, একদিন আসতে পারতে।'

'আমি কি ফোন নম্বর জানি? ঠিকানা জানি?'

'মিসেস ব্রাউন তো জানেন।'

'তিনি জানলেই কি আমার জানা হয়?'

'তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারতে!'

'আমি জানি জিজ্ঞেস করলেই উনি হাসবেন, ঠাট্টা করবেন।'

'কেন?'

'ও সব ঠাট্টা আমার সয় না।'

'কিন্তু ঠাট্টা করবেন কেন সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'সে আপনি বুঝবেন না। আপনাকে আমি একদিন সব বলবো।'

'সেই ভালো। কবে তুমি আবার দেখা করবে বলো।'

'কোথায় দেখা করবো?'

'কেন, আমার কি ঘর-বাড়ি নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নেই সেখানে। চলো না আজই নিয়ে যাই, তারপর বেশ অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।'

'আজ? এখন!'

'ক্ষতি কী?'

'তা কখনো হয়? আগে থেকে একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে—'

'এই বুঝি তুমি বাঙালী?'

'কেন?'

'বাঙালীরা কখনো এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে কারো বাড়ি যায় না। আমাদের দেশে অত সব ফর্মালিটি নেই। মনে হলে যাবো, বেশ কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসবো।'

'সেটা বেশ ভালো।'

'অত তোড়-জোড় ক'রে গেলে তো আধেক সুখই মাটি। কী বলো।'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তা হ'লে আর সারপ্রাইজ থাকে কোথায়?'

'এই তো বেশ বুঝেছ কথাটা।'

'কেন বুঝবো না। আমি তো জানি সে কথা। মালিকাদের কাছে তো আমি সেই ভ'বেই যেতাম।'

'মালিকা কে?'

'মালিকা মালিক।'

'মালিকা মালিক। মানে মল্লিকা মল্লিক?'

'ঠিক। ঠিক।'

'কে সে?'

'বাংলায় বলবো?'

'খুব সুখের কথা।'

'সে হামার আলো, সে হামার প্রাণ।'

'কী।'

'সে হামার স্বোপ্নো, সে হামার গান।'

'এ্যাঁ।'

'সে হামার দিন, সে হামার রাত্রি। আপনি কি এ গানটা জানেন না, টেগোরের লেখা,

দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূরে মেঘে লাগায় গুরু গুরোগুরো,
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে জাগায় মৃদু মরো মরো,
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তার থাকি থাকি।'

এ গানটা রাসেল তার উচ্চারণে ওখানে বসেই সুর ক'রে গাইলো। আমি চুপ ক'রে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখে জল ভ'রে উঠেছে।

সেদিন রাসেল আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেনি। সেই অকথ্য শীতের মধ্যে কোথায় সে কোন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে গেল। সেখানেই নাকি তাদের প্রথম দেখা হয়েছিলো। তার আর সেই মল্লিকা মল্লিকের। আমি শুনে বললাম, 'তুমি কি পাগল হ'য়েছ? এই দুরন্ত শীতের মধ্যে কেউ আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে, না থাকতে পারে, না কি পারলেও থাকা উচিত? ঘরে যাবে যে।'

রাসেল হাসলো। আমি তবু বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'যার কথা ভেবে তুমি ওখানে গি'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এগারো হাজার মাইল দূরে থেকে তা কি সে দেখতে পাবে?'
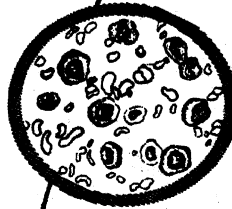
'অনুভব করবে।'

'বলছো কী তুমি?'

'ঠিক বলছি। আপনাকে আমি সত্যি বলছি—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কতোদিন আমি তাকে পেয়েছি, একেবারে বুকের কাছে পেয়েছি, আমি যেন স্পষ্ট দেখেছি সে এসেছে, ছুঁয়েছে, আমার সমস্ত বিচ্ছেদ-বেদনা ধুয়ে গেছে এক মুহূর্তে। অবিশ্যি রোজ তা হয় না। না হোক, তার জন্যে অপেক্ষার দাম দিতে হবে আমাকে?'

এর উত্তরে আমি আর কথা ভেবে পাইনি সেদিন। সে নিজেই আবার বলেছে, 'আপনি বুঝবেন, আমি জানি আপনি বুঝতে পারবেন সে কথা। আপনি যে তারই মতো একজন বাঙালী মেয়ে, সব বুঝতে পারবেন আপনি।'

এর পরে আমি শুধু বললাম 'তা হ'লে আজ আসি।'

রাসেল বললো, 'কবে ফ্রী আছেন'

আমি বললাম, 'যেদিন তুমি বলবে।'

'যেদিন আমি বলবো? কী সুন্দর ক'রে বললেন আপনি। এমন সুন্দর ক'রে কথা বলতে বাঙালী মেয়েরা ছাড়া আর কে পারে?'

'তোমার মালিকা বাঙালী হ'য়ে আমারো সুবিধে হ'য়ে গেল, মিছি-মিছিই তোমার প্রশংসা পেয়ে যাচ্ছি, অথচ—'

আমার এই ঠাট্টায় রাসেল মিষ্টি ক'রে হেসে বাধা দিয়ে আবার বাংলায় বললো, 'ওঠোচো হামার ডিডিটির কোনো গুণই নেই।'

'আবার দিদিও শিখেছ?' আমি তৎ-ক্ষণাৎ সেই বিদেশীটির জন্য একটা বিগলিত স্নেহ অনুভব করলাম হৃদয়ের মধ্যে।

রাসেল বললো, 'হামি ডিডি জানি, মামী জানি, মামাবাবু জানি। মালিকার মামী তো হামারো মামী, মামাবাবুও হামার মামা, আর মালিকার য়েকটা ছোটো ভাই ছিলো, সেটা মালিকাকে ডিডি বলটো, টাইটো হামি ডিডি জেনেছি।'

'খুব ভালো করেছ। এখন তা হলে বলো কবে দিদির বাড়ি খেতে আসছো।'

'খেতে?'

'আমি রান্না করবো, সব বাঙালী রান্না। তারপর একসঙ্গে বসে খাবো।'

'আঃ। ভাবতেও কতো ভালো লাগছে।' চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিল রাসেল। 'আমি বাঙালী রান্না খুব ভালোবাসি। খুব। খুব। আমি মঙ্গলবার যাবো কেমন?'

'খুব ভালো।'

'আর আপনাকে সব বলবো।' হাত নেড়ে দরজা ঠেলে সে বেরিয়ে গেল ধা ধা করে। কোথায় মিলিয়ে গেল সতেরো ইঞ্চি পুরু বরফের রাস্তা বেয়ে। আমিও নামলাম দোকান থেকে ফুটপাতে, হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরলাম।

মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ে রাসেল এলো। দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম অনেক উপহার নিয়ে এসেছে হাতে করে। এক বাকস চকোলেটের সঙ্গে স্প্যানীশ মশলা, কাগজি লেবু, মস্ত একটা বেগুন, বাঙালী দিদির জন্য তার যা যোগ্য মনে হয়েছে এমনি সব টুকটাক জিনিস। এই নিউইয়র্ক সহরে বেগুন আর লেবু! আমি তো অবাক।

'জানে, জানে, হামি সোব জানে।'

'বাংলাও জানেন দেখছি।'

'যোতোটা জানা উচিত জোতোটা কেন জানে না সেই তো দুঃখ।'

'এ দুঃখ বেশীদিন থাকবে না, আপনার দিদি কয়েকদিনের মধ্যেই সে দুঃখ মিটিয়ে দেবেন।'

আমি খাবার জায়গা দিয়ে দিলুম। আমেরিকার নিয়ম মতো বিকেল ছ'টাতেই খেতে বসা গেল। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সপ্তাহে তিনদিন আমার স্বামীকে কাজ করতে হয়। খাওয়ার পরে আর গল্পে বসা হলো না তাঁর। তিনি চলে গেলে একটু চুপ করে থেকে রাসেল বললো, 'কলকাতা সহর কতো বড়ো?'
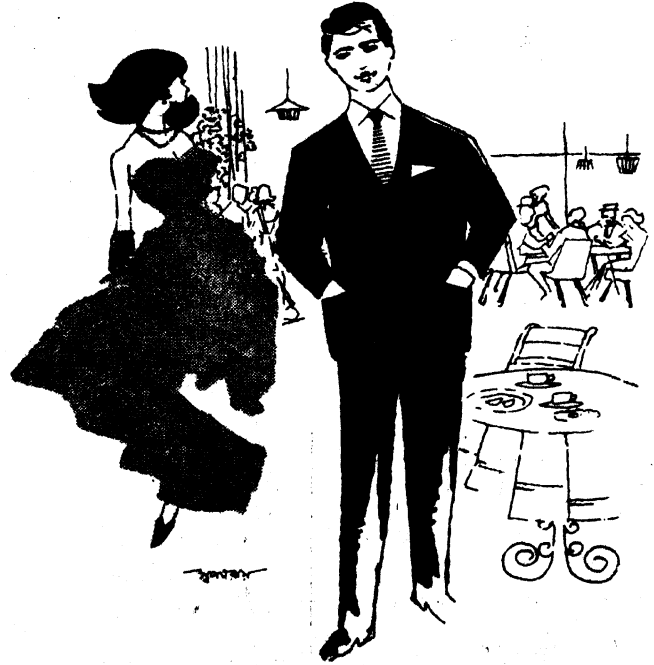
'আঃ। ভাবতেও কতো ভালো লাগছে।'

'এ সব তুমি কোথায় পেলে? কেমন করে জানলে এ সবই আমরা ভালো-বাসি।'

রাসেল নিজের মতো হাসতে লাগলো। আমার স্বামী বললেন, 'শুনলাম দিদি পাতিয়েছেন, তা বেগুন দিয়ে সেটা খুব বেশী করে জমবে। আপনার দিদিটি ভীষণ বেগুন ভালোবাসে।'

আমি বললাম, 'মস্ত।'

রাসেল বললো, 'সেখানে কি সবাই সকলকে চেনে?'

আমি বললাম, 'নিউইয়র্কে কি সবাই সকলকে চেনে?'

তখন রাসেল হাসলো। নিজের প্রশ্নে নিজেই কৌতুক বোধ করে বললো, 'বুঝি সবাই, তবু একজন এমন মানুষের দেখা পেতে ইচ্ছে করে, যে মালিকাকে চেনে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

'তুমি বলো না তার গল্প, হয়তো বা চিনতেও পারি। আর না-ই-বা চিনলাম, তাতেই বা কী, তবু আমাদের দেশের মেয়েই তো। যখন কলকাতা যাবো, ঠিক বার করে নিয়ে আলাপ করবো, তোমার কথা বলবো।'

'বলবেন!'

'কেন বলবো না। ঠিকানা দিলেই আমি ঠিক—'

'আমি যে ঠিকানা জানি না।'

'জানো না।'

'না।'

'কেন?'

'কী করে জানবো?'

'সে চিঠি লেখে না তোমাকে?'

'না।'

'সে কী কথা? তুমি লেখো না?'

'আগে লিখতাম।'

'এখন লেখো না?'

'জবাব দেয় না যে।'

'কোনোদিন দেয়নি?'

'তা কেন দেবে না। প্রথম দিকে একটুও নিয়মের গোলমাল হতো না।'

'তারপর?'

'তারপর যে কী হলো আমি জানি না। এটুকু বুঝতে পারি যে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।'

'ওরা কবে এদেশে ছিলো?'

'দু' বছর আগে।'

'তার মানে এই দু' বছরই তোমাদের দেখাশুনো নেই?'

'না।'

'আর চিঠি?'

'তা-ও প্রায় দশ মাস হলো পাই না।'

'কোনো খোঁজই পাও না?'

'না।'

'ওর সঙ্গে তোমার কেমন করে আলাপ হয়েছিলো বল না?'

'সে ভারি অদ্ভুত।'

'বলো না শুনি।'

'একদিন একটা বিশেষ কাজে আমি এ পাড়ায় এসেছিলুম। ঠিক এই রকমই শীতের রাত ছিলো, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো, স্লীট পড়ছিলো। আমি একটা ট্যাক্সী করে এসেছিলুম। ট্যাক্সী থেকে নেমে যখন ভাড়া মিটিয়ে
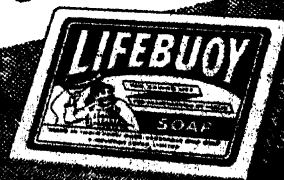
দিচ্ছিলুম, মনে হলো কেউ এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে। অনুমানে বুঝলুম, ট্যাক্সীটার আশায়। আসলে আমি ছাড়লেই সে নেবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই রকম টিপটিপ বৃষ্টি আর বরফ পড়া শীতের রাত্রে একটা ট্যাক্সী পাওয়া কী দুরূহ ব্যাপার। তাই সবাই একটা গাড়ি দেখলেই ওরকম ওৎ পেতে থাকে। আমি ভাড়া দিতে দিতেই আমার পিছনের মানুষটি আমার পাশাপাশি হয়ে ড্রাইভারকে হাত তুললো। কিন্তু ড্রাইভারটি আমার হাত থেকে ভাড়াটা নিয়েই তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে স্টার্ট দিল গাড়িতে। আমি পাশে তাকালাম। দেখলাম শাড়িপরা ছোটখাটো একটি মেয়ে। আমাদের দেশের তুলনায় আপনাদের বাঙ্গালী মেয়েরা এতো ছোট যে দেখলে মায়া হয়। শাড়িপরা মেয়ে দেখে আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। তার হাতভরা জিনিস ছিলো; কোটের উপর, মাথায় চুলে সব জায়গায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ, চোখের দৃষ্টি অসহায়।

গাড়িটা স্টার্ট দিতেই সে অস্থির হয়ে উঠলো, অনুরোধ করলো দাঁড়াতে। লোকটা হাত নেড়ে জানিয়ে দিল যাবে না। মাত্র স্টার্ট দেয়া গাড়ি, আমি তক্ষুনি ছুটলুম পেছনে, গালাগালি করে বললুম তোমার যখন এই পেশা, সোয়ারী না নেয়ার রাইট নেই তোমার। সে জবাব দিল 'আমি নেবো না।'

'নেবে। নিতেই হবে। নিশ্চয়ই নেবে।' আমি দৌড়তে দৌড়তে গাড়িটার পিছনে একটা ঘুষি মারলুম, ড্রাইভার স্পীড নিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

বরফ পড়ে পড়ে তখন সারা সহর নোংরা হয়ে আছে। সেই পিচ্ছল পথে ছোটা যায় না। পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। আর এ রকম সময়ে খুব জরুরী কাজ না থাকলে বেরোয়ই না কেউ। পথটা খুব নির্জন ছিলো। হতাশ হয়ে আমি ফিরে তাকালাম; বললাম, 'এই ড্রাইভার লোকটি অত্যন্ত দুষ্টু, যদি রাস্তা ভালো থাকতো আমি ঠিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলতাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। এ রকম রাতে এই ক্যাবওয়ালাগুলো সকলের সঙ্গেই এই রকম দুর্ব্যবহার করে। আসলে সারাদিন খেটে খেটে ক্লান্ত শরীরে এই শীতের রাত্রে ওদের বোধহয় আর সোয়ারী বইতে ইচ্ছে করে না।'

ক্যাবওয়ালার অপরাধে আমার এই ক্ষমাপ্রার্থীর চেহারা দেখে মেয়েটি বোধ হয় একটু অবাক হয়েই চোখ তুলে তাকালো, আর সেই চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে আমি যেন একটা ধাক্কা খেলাম।

আমাদের এই আমেরিকার একটা বদনাম আছে কালো রং দেখলেই লোকেরা খারাপ ব্যবহার করে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দক্ষিণের লোকেরা অবিশ্যি এ বিষয়ে অত্যন্ত বিশ্রী কিন্তু কেনেডির ক্রেণ্টার এই নিউইয়র্ক সহরে সেই দোষ খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। বুঝতেই পারেন, অশিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কারের অধীন। সে তো আপনাদের দেশেও আছে বলে জানি। আপনাদের জাতিভেদ প্রথাটা কি ভালো? বলুন?

'নিশ্চয়ই না।'

'তবু তো আছে?'

'তা আছেই তো।'

'আর ইংলেণ্ডের কথাও ভেবে দেখুন, কী ভয়ানক শ্রেণীভেদ। জার্মান দেশের ইহুদি বিতাড়ণের কথা আর না-ই বললাম। কিন্তু তবু এই সাদা কালো নিয়ে ভেদাভেদের দুর্নাম আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশী। কাজেই মনে হলো মেয়েটি হয় তো ভাবছে যে সে সাদা চামড়ার নয় বলেই ড্রাইভারটির এই বেয়াদপি করতে সাহস পেলো। দেশের এই বদনামের ভয়েই আমি ও রকম ছুটে গিয়ে গাড়িটা ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। আর সেই জন্যই নানা রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'আমি যদি জানতাম চলে যাবে, তা হলে আগে আপনাকে ভিতরে বসিয়ে তবে ভাড়া মিটোতাম।

মেয়েটি এবার তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। ঠোঁটের কোন বাঁকিয়ে খুব সুন্দর করে একটু হাসলো, নরম গানের মতো করে বললো 'আপনার ব্যবহার অনুকরণযোগ্য। এই উপকারের কথা আমার মনে থাকবে। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'এখুনি আর একটা ট্যাক্সি এসে যাবে, আপনি ভাববেন না।'

'না, না, ভাববো কেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

তবু আমি ব্যস্ত হলাম। নিজের কাজ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম তার সঙ্গে। মনে মনে বললাম এই সুন্দর শাড়িপরা বিদেশী মেয়েটিকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আমি কখনোই তাকে একা ফেলে যাবো না, গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে অন্য কথা।

অস্থির হয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি আর কেন এই দুরন্ত শীতে অকারণে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন, না, না, আমি ঠিক একটা পেয়ে যাবো।' আর এক পলক চোখ তুললো সে।

তার সেই দৃষ্টি, দ্বিধান্বিত গলার স্বর, কুণ্ঠিত হবার ভঙ্গি, ঈশ্বরের পোষাকের মতো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ছোটো শরীরের নিখুঁত গড়ন, সবটা মিলিয়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত বোধ করলাম। এর আগে আর কোনো শাড়িপরা মেয়ে আমি দেখিনি, এমন সুন্দর নরম গলা শুনিনি, বইয়ে লেখা লজ্জা শব্দের এমন চেহারাও কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। শুনেছিলাম, ভারতীয় মেয়েরা নাকি এই রকমই হয়। আমার এক ভারত ফেরৎ বন্ধু আমাকে রাতদিন তাদের বিষয়ে গল্প করতো। এমন কি, সে এতোটাই মুগ্ধ হয়ে এসেছিলো যে চেষ্টা-চরিত্র করে আবার চলে গেছে সেখানে। সে গেছে বাংলা দেশে। সে বলতো বাংলাদেশই তার ভালো লেগেছে বেশী। কলকাতার বন্ধুদের নাকি তুলনা নেই, তাদের সঙ্গেই সে বেশী মনের মিল খুঁজে পেয়েছে।

অনেক স্বপ্ন ছিলো আমার, সেই স্বপ্নই মূর্তি হয়ে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের আশ্চর্য কোমলতার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের দৃষ্টি আটকে রইলো। আমি এক পা নড়তে পারলুম না সেখান থেকে। এমন কি কেন দাঁড়িয়ে আছি সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আমি সুখী হলাম, শিহরিত হলাম, তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমি আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে গেলাম। তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ কবিতার মিল খুঁজে পেলাম আমি।

সেদিনের সেই কুয়াশা-ঢাকা বরফ-ঝরা টিপটিপ বৃষ্টির রাত আমি জীবনে ভুলবো না। সেই রাত্রি আমাকে স্বর্গের স্বাদ দিয়েছিলো। উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপার ছাড়িয়ে আমি অগণিত তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুললাম।

(ক্রমশঃ)

নেফার মানুষ - মনপা

প্রভাতকুমার দত্ত

মনপা বালিকা

অক্টোবর মাসের কুড়ি তারিখে বিশ্বাসঘাতক চীনের অতর্কিত আক্রমণে নেফার যে স্থানটি আমাদের হাতছাড়া হয় তা হচ্ছে মনপা জাতিদের আবাসস্থল তাওয়াং। মনপারা নেফার বহুজাতির মধ্যে একটি এবং সংখ্যায় খুব বেশী নয়। এরা সকলেই বৌদ্ধমতে দীক্ষিত। তাওয়াং শহর মনপাদের কাছে অতি পবিত্র। কারণ এখানে রয়েছে তাদের প্রধান মঠ। তাওয়াং-এর পতনের পর মঠের প্রধান লামা তাঁর সহকারীদের নিয়ে ভারতীয় এলাকা তেজপুরের দিকে চলে আসেন। বহু সাধারণ মনপাও এঁদের সঙ্গে আসতে বাধ্য হয়। তবে খবরের কাগজে আমরা পড়েছি যে যারা পেছনে রয়ে গেছে তারা চীনা-প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রতিরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। চীনারা তাওয়াং মঠকে অস্ত্রাগারে পরিণত করে যেভাবে অপবিত্র করেছে, তাদের শান্তিময় জীবনে যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে তার প্রতিশোধ নিতে মনপরা সচেষ্ট।

অদ্ভুত শান্তিপ্রিয় আর ধর্মনিষ্ঠ জাত এই মনপরা। সুন্দর রুচিবোধ এদের চরিত্রের অপর একটি ভূষণ। ধর্ম এদের জীবনের প্রায় সবটুকু স্থান জুড়ে রয়েছে। মঠে আরাধ্য মূর্তির সামনে প্রদীপের ডালি সাজিয়ে দেওয়া এদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। এদের হাতে সব সময়েই থাকে প্রার্থনাচক্র। তিব্বতীয় ধরনের ধর্মীয় পতাকায় মনপাদের ঘর-বাড়ী সর্বক্ষণ সজ্জিত থাকে। মনপরা নেফার উত্তরতম প্রান্তের কামেঙ বিভাগের বাসিন্দা। তাওয়াং-এর অল্প-দূরে ম্যাকমোহন সীমানা পেরোলেই থাগলা গিরিশ্রেণী। এরপর তিব্বত। তিব্বতের সঙ্গে মনপাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। মনপারা যে ভাষায় কথা বলে তা তিব্বতীয় ভাষারই রূপান্তর। যদিও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে তবু মনপরা তিব্বতের মারফৎ বৌদ্ধধর্ম লাভ করেছে। প্রতি বছর মনপরা দুর্গম গিরিপথ দিয়ে তিব্বতে যায় গরম কাপড়, ব্রোকেড, রঙচঙে টুপি, জুতা, রিবন ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য। পশ্চিম বাঙলায় উত্তরে কালিম্পঙ শহরেও তারা দলবদ্ধ-ভাবে কি বছর আসে। পূজা করার সময় ধর্মীয় ব্যবহারের জন্য মনপরা কেনে মূর্তি, প্রার্থনা-পতাকার কাপড়, ছোট ছোট প্রার্থনাচক্র, পুঁতির মালা। এছাড়াও তারা নেয় চন্দনের রঙকরা পাত্র যার কোনটা রূপার বা কোনটা কাঠের। ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন বলেছেন : "অতীতে মনপারা তাদের ধর্ম ও শিল্পকলার জন্য তিব্বতের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নেফার শাসন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে মনপারা বৌদ্ধধর্মের আদিকেন্দ্র ভারতের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে।"

মনপাদের উপজীবিকার প্রধান উপায় চাষবাস আর মেষপালন। চাষবাসে মনপারা মোটামুটি উন্নত প্রথা অনুসরণ করে। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মত নেফার আদিবাসীরাও জুম চাষে অভ্যস্ত। সকলেই জানেন এই প্রথা ক্ষতিকারক।

বিরাটাকার চায়ের পাত্র হস্তে মনপা লামা
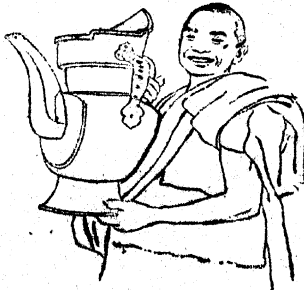
আশ্চর্য ব্যাপার হোল একমাত্র মনপা জাতি জুম চাষ বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত উন্নত টেরাসিং বা সিঁড়ি পদ্ধতিতে চাষ শুরু করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে যে পাহাড়গুলি ঢালু হয়ে গেছে তার গা কেটে কেটে চাষবাস অগ্রসর হয়েছে। এতে ধানের ফলন বেড়ে গেছে। জুম চাষে যেটা সম্ভব নয় সেই জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর ধারণাটা ক্রমে ক্রমে তাদের মাথায় ঢুকছে।

মনপারা নানা কারুকর্মেও খুব নিপুণ। অতি সুন্দর নক্সার কাজ করা কার্পেট, মাদুর, চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরীতে এরা খুব পটু। পরনের পোষাক যা কিছু তা মেয়েরাই তাঁতে তৈরী করে নেয়। রঙটা এদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে পাত্র, প্রার্থনা-পতাকা—এ সবকিছুই নানা বর্ণে উজ্জ্বল। ধাতুর কাজেও মনপারা অভিজ্ঞ। অবশ্য আদিবাসী অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কাজটি নিষিদ্ধ। তাই মনপারা কেবল নিজেদের অঞ্চলের নয় নেফার অন্যান্য আদিবাসী এলাকা ঘুরে ঘুরে কামারের কাজ করে বেড়ায়। সমগ্র নেফা অঞ্চলের একমাত্র কামেঙ বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ শুধু মনপা জাতির মধ্যেই চিত্রাঙ্কনের প্রচলন আছে। এরা এ বিদ্যায় বিশেষ অগ্রণী। চিত্র-শিল্পীরা অবশ্য চিরাচরিত বৌদ্ধশিল্পের রীতিতেই ছবি আঁকে। তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দেয়াল ও ছাদ চিত্র-শোভিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের পাত্র, মুখোস ইত্যাদি অলঙ্কৃত করে। মনপারা কিছু কিছু কাগজও তৈরী করে যা শিক্ষিত লামারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির জন্য ব্যবহার করে।

মনপাদের ঘরবাড়ী পার্বত্যভূমিতে গৃহ-স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। আমাদের অনেকেরই ধারণা আদিবাসীরা যে-কোনভাবে তৈরী জোড়া-

তাওয়াঙ্-এ লামার বাসস্থানের একাংশ

তাড়া দেওয়া খুপরির মত ঘরে বাস করে। মনপাদের ঘরদোরগুলি দেখলে আমাদের সে ভুল ধারণা ভেঙে যায়। এদের ঘরে উপযুক্ত জানলার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন বলেছেন যে তিনি মনপাদের যে সমস্ত ঘরে থেকেছেন তার প্রত্যেকটিই আলো-বাতাসযুক্ত। শস্য মাড়াই করা কিম্বা প্রার্থনাচক্র ঘোরাবার জন্য এখানকার লোকেরা জলস্রোতের দ্বারা পরিচালিত চাকার ব্যবহার করে। এটি একটি স্থানীয় অভিনবত্ব। ভারতে আদিবাসী সমাজে অনেক ক্ষেত্রে 'গার্লস ডরমিটরি' বা মেয়েদের আলাদা যৌথ ঘুমাবার স্থানের রেওয়াজ আছে। মনপাদের মধ্যে কিন্তু এ জিনিস নেই।

সংস্কৃতির প্রশ্নে এলে দেখা যায় যে তা বৌদ্ধ বৎসরের নানা উৎসবকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত। আনুষ্ঠানিক প্যান্টোমাইম্ বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা অভিনয় মনপা-সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য। এজন্য বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল পোশাক ও রঙচঙে মুখোস ব্যবহার করা হয়। অভিনেতাদের সঙ্গে একদল লোক ঢাক ও শিঙ্গা বাজায়। মঠের লামারাও বৃহদাকার করতালের শব্দে চারিদিক মুখরিত করেন। এ ধরনের প্যান্টোমাইম্ সব সময়েই মঠ বা গোম্ফার সামনে অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয়ের গল্পাংশ বা উপদেশাত্মক বক্তব্য থাকে। এরই মধ্যে আবার ভাঁড় চরিত্রগুলি হাসির খোরাক জোগায়। তবে এ ধরনের অভিনয় খরচা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বলে ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হয় না। তাই প্রাত্যহিক আনন্দের জন্য মনপা নারী ও পুরুষেরা কয়েকটি সহজ নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

মনপা-জীবনের আর একটি অতি-সুন্দর দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানবো। সেটি হচ্ছে মনপা রমণীদের ফুলের প্রতি ভালবাসা। মনপারা গরীব তাই মেয়েরা ফুল দিয়েই নিজেদের সাজায়। প্রত্যহ মঠের মূর্তির সামনে রাশি রাশি ফুলের অর্ঘ্য দিতে ভোলে না। আরো বিচিত্র হোল কোন অতিথি এলে মনপা রমণীরা তার আসার পথে ফুল ছড়িয়ে দেয়। সৌন্দর্যপ্রীতি কত গভীর হলে এ জিনিস সম্ভব! এই ধরনের রুচিবোধসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ শান্তি-প্রিয় মনপা সম্প্রদায়ের উপর দস্যু চীনারা অকারণে বিপদ আর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাই প্রত্যেক ভারতবাসীর সহানুভূতি মনপাদের পক্ষে।

[অমৃতে প্রকাশিত গত ৩০শ সংখ্যায় ৪৩১নং পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা "তিন শত্রু" শীর্ষক কবিতায় কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। কবিতাটি নিম্নলিখিতরূপ পড়তে হবে।]

তিন শত্রু
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রতিরোধ প্রতি পদে প্রতি পথে-পথে
প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকায়, প্রতিটি বিঘতে।
রে দুরাত্মা, আরো তোর তিন শত্রু আছে এ ভারতে—
জেনে রাখ তার পরিচয়।
এক শত্রু, গ্রামান্তের জীর্ণ দেবালয়
ইটের কোটর কিংবা সামান্য কুটির,
আরতির ঘন্টা শোন নিবিড় মদির।
বটমূলে বাঁধা বেদী, বুড়ো শিব বসানো পাদপ
হাটে ঘাটে আটচালা, চণ্ডীর মণ্ডপ।
দুই শত্রু, ছোট পুঁথি, ক'টি মাত্র শ্লোক,
মৃত্যুরে অগ্রাহ্য করা অমৃত আলোক।
ক্লৈব্য জাড্য মূঢ়তার চিরবিরোধিতা
নাম তার শুনে রাখ,—গীতা।
তৃতীয়, অপরাজেয় প্রতি প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস
শাশ্বতে বিশ্বাস,
ধর্ম খাদ্য ধর্ম জল ধর্ম প্রতি বক্ষের নিশ্বাস।
রে দুর্বৃত্ত, বঞ্চক বর্বর,
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর।।

গ্লেন থিওডোর সীবর্গ

[পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরটি চালু হয়েছিল ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে। এই সাফল্যের মূলে যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির অবদান ছিল তার নাম চেইন রিঅ্যাকশন বা শৃংখল বিক্রিয়া। ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নেতৃত্বে বেয়াল্লিশ জন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রচিত হয়েছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও নতুন অধ্যায়, উন্মোচিত হয়েছিল আশ্চর্য এক দিগন্ত। পরমাণু-শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসার কুড়ি বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। ডঃ গ্লেন থিওডোর সীবর্গ আজকের মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিজ্ঞানী। ১৯৫১ সালে তিনি তাঁরই সহকর্মী বিজ্ঞানী ডঃ এডুইন এম. ম্যাকমিলানের সংগে একযোগে রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডঃ সীবর্গ একাধিক নতুন মৌল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। —অয়স্কান্ত]

চাঁদের দেশে মানুষের অভিযান শুরু হবে, বা গ্রহলোকে বা নক্ষত্রলোকে—এ স্বপ্ন মানুষের বহু শতাব্দীর। তবে রকেটের ব্যবহার কিন্তু প্রধানত শুরু হয়েছিল সামরিক উদ্দেশ্যে এবং খুব প্রাচীন কাল থেকেই। তারপর থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরাও আবহাওয়া বা মহাজাগতিক রশ্মি বা এমনি ধরনের কোনো বিষয় সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে বেশ কিছুকাল ধরে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট পাঠিয়ে এসেছেন।

এতদিন পর্যন্ত রকেটের বেগ সঞ্চারের জন্যে রাসায়নিক জ্বালানীর ওপরে নির্ভর করে আসতে হয়েছে। আজকের এই মহাকাশ অভিযানের যুগে রকেটের যে-সব রকমফের দেখা যাচ্ছে—যেমন, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ বা ব্যোম-অনুসন্ধানী বীক্ষণাগার—এসব ক্ষেত্রেও জ্বালানী হয় রাসায়নিক। তথ্যসংগ্রহের জন্যে এই সমস্ত উপগ্রহে বা বীক্ষণাগারে নতুন নতুন যন্ত্র বসাতে হয় আর যন্ত্রগুলোকে চালু রাখবার জন্যে প্রয়োজন হয় নানা ধরনের ব্যাটারি। দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে সৌর ব্যাটারি ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধের। তবে সৌর ব্যাটারির সুনির্দিষ্ট অসুবিধেও আছে।

মহাকাশ-অভিযানে নিউক্লিয়র তেজ ব্যবহার করার কথা শোনা যাচ্ছে। কথাটা নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের, কেননা এনরিকো ফার্মির সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার পরে কুড়ি বছরও পার হয়নি। এনরিকো ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরাই হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, পরমাণুর নিউক্লিয়সের বিভাজন-জনিত প্রক্রিয়ার ফলে নিঃসৃত তেজকে সাফল্যের সংগে নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

এনরিকো ফার্মি (১৯০১-১৯৫৪)

তবে এ-প্রসংগে মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃতের নামও স্মরণ করতে হয় যিনি সেই ১৯১৯ সালেই আক্ষেপ জানিয়েছিলেন যে, নিউক্লিয়র শক্তি তাঁর আয়ত্তে নেই। এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন রবার্ট এইচ, গডার্ড। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কারণ আমাদের আয়ত্তে অধি-পারমাণবিক শক্তি নেই......" (অধি-পারমাণবিক শক্তি বলতে ডঃ গডার্ড যা বুঝিয়েছেন তারই নাম আমরা দিয়েছি নিউক্লিয়র শক্তি।)

রকেটের বেগসঞ্চারের জন্যে নিউক্লিয়র শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হলে এমন একটি শক্তির ভাণ্ডার মানুষের আয়ত্তে এসে যাবে যার ফলে মানুষ অবাধে মহাকাশের যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞাননির্ভর গল্পে যে-সব কথা বলা হয়ে থাকে তাই হয়ে উঠবে বৈজ্ঞানিক বাস্তব।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমানে যতোখানি অগ্রসর হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, মহাকাশে দীর্ঘকালের জন্যে পাড়ি দিতে হলে বেগসঞ্চারের জন্যে নিউক্লিয়র তেজকে ব্যবহার করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পন্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই উদ্দেশ্যে দুটি বিভিন্ন দিকে আপন প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন।

একটি হচ্ছে রকেট-চালনার উপযোগী নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর উদ্ভাবন করা। এই উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম "রোভার"। এই কর্মসূচীটি রূপায়ণের দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করে থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও জাতীয় বিমানবিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। ১৯৫৭ সাল থেকে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ হচ্ছে।

দ্বিতীয় কর্মসূচীটির নাম "স্ন্যাপ্"। অর্থাৎ, এমন একটি ব্যবস্থা যার ফলে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে পরামাণবিক শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে কমিশনের উদ্দেশ্য হবে এমন কিছু ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যার ফলে মহাকাশগামী যানের তথ্য-সংগ্রাহক ও তথ্য-প্রেরক যন্ত্রপাতির জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি

পাওয়া যেতে পারে নিউক্লিয়র তেজের সাহায্যে। পরবর্তী কালে যখন মানুষ-যাত্রী সমেত ব্যোমযানের যাত্রা শুরু হবে তখনো সেই যানের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির শক্তিও পাওয়া যাবে এই নিউক্লিয়র তেজের সাহায্যেই। ১৯৫৫ থেকে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ হচ্ছে।

বর্তমানে 'রোভার' কর্মসূচী অনুসারে যে-সব কাজ হচ্ছে তার লক্ষ্য, এমন একটি নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর তৈরি করা যার জ্বালানী হবে কঠিন পদার্থ। এই ধরনের রিঅ্যাক্টরের সাহায্যে ব্যোমযান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে।

নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর সমন্বিত ব্যোমযানের একটি সুবিধে এই যে, এক্ষেত্রে জ্বালানীর জন্যে যে-পরিমাণ ওজন বহন করবার প্রয়োজন হয় তা খুবই কমে যায়। ব্যোমযানের পাড়ি যতো দীর্ঘ হবে ততোই আনুপাতিক হারে জ্বালানীর ওজন কমবে। যেহেতু জ্বালানী বহনের ওজন অনেক কমিয়ে ফেলা যাবে, অতএব মাল ও যাত্রী আরো অনেক বেশি ওজনের বহন করা চলবে। কিংবা দুয়ে মিলিয়ে ব্যোমযানের ওজন অনেক কমে যাবে। আমরা এই মত পোষণ করি যে, রাসায়নিক জ্বালানীর সাহায্যে চালিত রকেট মহাকাশ-অভিযানের যে-সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সেখানে নিউক্লিয়র রকেট সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারবে।

এখনো পর্যন্ত রোভার কর্মসূচী অনুসারে যতোদূর কাজ হয়েছে তা থেকে
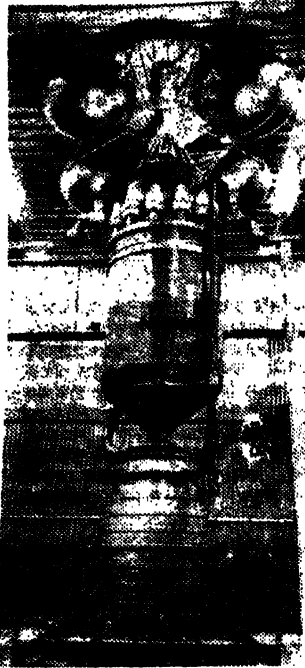
রকেটে ব্যবহারের জন্য পরমাণু চালিত এঞ্জিন

আমরা যুক্তিসংগতভাবেই আশা করতে পারি যে, ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে নিউক্লিয়র ইঞ্জিন সমন্বিত রকেটের মহাকাশ-অভিযান শুরু হবে। যাঁরা এই গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁদের ধারণা, যদি নতুন কোনো টেকনিকাল অসুবিধে দেখা না দেয় তাহলে হয়তো ১৯৬৫ সালের মধ্যেই পরীক্ষামূলক মহাকাশ-অভিযান শুরু হয়ে যেতে পারে।

আর 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে উদ্ভাবিত হবে ব্যোমযানে ব্যবহারযোগ্য বৈদ্যুতিক নিউক্লিয়র আধার। এই আধারটি হবে দৃঢ়সংবদ্ধ, হাল্কা, দীর্ঘ-স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য। নিউক্লিয়র তেজের ব্যবহার থেকে যে কী অনন্যসাধারণ ফল পাওয়া যেতে পারে, এটি তার একটি নিদর্শন। বিশেষ করে ব্যোমযানের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে এতখানি সুবিধে পাওয়া যায় তার একটি কারণ, এই ব্যবস্থায় ব্যোমযানের ওজন অনেকখানি কমিয়ে ফেলা চলে।

কৃত্রিম উপগ্রহ, ব্যোমযান ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে নিউক্লিয়র তেজের দ্বারা চালিত যে ইলেকট্রিক জেনারেটার তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে তা হবে দু-ধরনের। একটিতে ব্যবহৃত হবে উচ্চ তাপমাত্রার কম্প্যাক্ট রিঅ্যাক্টর যার সাহায্যে চালিত হবে টার্বো-জেনারেটর। এই টার্বো-জেনারেটর থেকে যে উত্তাপ পাওয়া যাবে তা উদ্দীপ্ত করবে থার্মোইলেকট্রিক ও থার্মো-আয়োনিক কনভার্টরকে আর এইভাবে পাওয়া যাবে বৈদ্যুতিক শক্তি। দ্বিতীয়টিতে ব্যবহৃত হবে বিশেষ বিশেষ রেডিওআইসোটোপের ক্ষয়হেতু উত্তাপ, যার দ্বারা থার্মোইলেকট্রিক ও থার্মো-আয়োনিক কনভার্টর উদ্দীপ্ত হবে। বর্তমানে 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে কম-পক্ষে ত্রিশটি বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে।

মহাকাশ-অভিযানে এমন ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে যাদের সারাই বা মেরামতের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচীতে এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ হচ্ছে। নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টরের উত্তাপকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে আমরা ক্ষুদে আকারের টারবাইন ও অল্টারনেটর তৈরি করার চেষ্টা করছি। তাছাড়া আমরা চেষ্টা করছি এমন ধরনের জেনারেটর তৈরি করতে যাতে কোনো সচল অংশ থাকবে না এবং তার ফলে জেনারেটরটি খুবই নির্ভরযোগ্য হবে।

এমন কি এই মুহূর্তেই 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে উদ্ভাবিত এমন থার্মো-ইলিকট্রিক জেনারেটর আমাদের হাতে আছে যার জ্বালানী হবে উপযুক্ত কোনো আইসোটোপ এবং যা কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা চলবে। এই জেনারেটরটির ওজন মাত্র চার পাউন্ড (১·৮ কিলোগ্রাম) এবং এই জেনারেটরে পাঁচ বছর ধরে হাজার হাজার পাউন্ড (কিলোগ্রাম) ব্যাটারির সমপর্যায়ের বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এসব কথা বলার নয় কাউকে। মা-দাদা-বৌদির কাছে তো নয়ই—এতখানি অপরাধের কথা, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, অস্বাভাবিক অমানুষতার কথা কারও কাছেই বুঝি বলা যায় না। সুতরাং চুপ ক'রেই থাকে সে। চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ে যায় উত্তরের বদলে। এক এক সময় মা ক্ষেপে যান—সব কথা সে শুনতে পায় না বটে, কানের মধ্যে সর্বদা যেন একটা ঝম ঝম ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, দিন-রাতই—আভাসে আন্দাজে তাঁর তিরস্কারের কঠিন ভাষা সে কিছু কিছু বুঝতে পারে—কিন্তু তবু জবাব দিতে পারে কৈ? মা এক একদিন তেড়ে মারতেও আসেন, অথচ, কী ক'রে বোঝাবে সে তাঁকে যে বলার মতো তার কিছুই নেই। বলবার কোন উপায় নেই। সে তিরস্কারে মাথাটাই শুধু আরও খানিকটা হেট হয়, চোখের ধারাটাই শুধু আরও প্রবল হয়।

বৌদি আড়ালে আবডালে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হেঁকে বললে মা শুনতে পাবেন বলে সীতার ফেলে রাখা স্লেটটা খুঁজে বার ক'রে লিখে জানায় যে, 'তুমি আমার কাছে বল, কেউ টের পাবে না। তেমন যদি কিছু কথা হয় তো আমি বলবও না কাউকে। আর যদি এমন হয় যে মার ক'রে বলতে লজ্জা করছে তোমার তো তাও আমাকে বলা সুবিধে, আমি ওঁদের বলতে পারব। চক্ষুলজ্জা হয় তো আমি চলে যাচ্ছি স্লেটে লিখে রাখো। দূরে নিয়ে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু তাও পারে না কান্তি। হাত জোড় করে শুধু।

এদিকে কানের রোগটা ওর বেড়েই যায় দিন দিন। আগে একটু চেঁচিয়ে বললেই শুনতে পেত—এখন কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করলে তবে কিছুটা শুনতে পায়। তাও অর্ধেক কথা বুঝতে পারে না। কেমন এক রকম করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে ঘাড় নাড়ে, কানটা এক হাত দিয়ে খানিকটা চোঙের মতো ক'রে বক্তার মুখের আরও কাছে নিয়ে আসে।

এবার হেমও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এখানের হাসপাতাল থেকে সাফ্ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা আর পারবে না কিছু করতে।

কনক ক্রমাগত খোঁচায়, 'ওগো কি করছ? এর পর যে চিকিচ্ছের বাইরে চলে যাবে। দুটো একটা দিন অফিস কামাই কর। কলকাতার কলেজে নিয়ে যাও।'

অগত্যা তাই করতে হয়। অফিস কামাই ক'রে মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে নিয়ে যায়। ই-এন-টি'তে ধর্ণা দিয়ে যখন ডাক আসে তখন কিন্তু আশার সঞ্চার হয় একটু হেমের মনে। কারণ ডাক্তার যিনি দেখছিলেন তিনি ওর কেস দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের ডেকে দেখালেন, স্ট্রেঞ্জ! ফ্রামে কিছুই হয়নি, কানা হওয়ার অন্য কোনও কারণ নেই—অথচ শুনতে পাচ্ছে না। এ একটা ইন্টারেস্টিং কেস কিন্তু।'

দু-দিন বড়মাসীর কাছেই রইল ওরা দু-জনে। ছোটমাসীর একখানা ঘর, তাতে ওদের ছোট ভাই খোকাকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। সেখানে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে রোজ রোজ আসার খরচাও আছে, বঞ্ঝাটও আছে।

তিন দিন পর পর গেল কান্তি। শেষের দিন বলে-কয়ে শরৎ মেসোমশাইকে সঙ্গে দিয়ে হেম অফিস গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। এঁরাও বললেন দুর্বলতার জন্যেই এ রকম হয়েছে। ভাল পুষ্টিকর কিছু খেতে দিন। টনিক খাওয়ান একটা।' টনিক লিখেও দিলেন। বিলিতী নার্ভ-টনিক। সাত-আট টাকা দাম।

হেমের মুখ শুকিয়ে উঠতে দেখে শরৎ মেসোমশাই আটটা টাকা বার ক'রে দিলেন। বললেন, 'তুমি লজ্জা করো না বাবা, এ লৌকিকতা-লজ্জার সময় নয়। আছে বলেই দিচ্ছি, নইলে কি আর দিতে পারতুম। তুমি ওষুধটা কিনে নিয়েই যাও। আর ওখানে গিয়ে একটা দুধের জোগানি ব্যবস্থা করো, অন্তত এক পো ক'রে। সেটাও আমি দেব। শুধু টনিকে কিছু হবে না, তার সঙ্গে ভাল খাওয়াও চাই। মাছ মাংস খাওয়াতে তো পারবে না তেমন, তবু এক পো ক'রে দুধ খেলেও কিছুটা হবে।'

নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতে হ'ল। কারণ সত্যিই তারও এমন সঙ্গতি নেই যে দুম ক'রে আট টাকার

ওষুধ কিনে খাওয়ায় এখুনি। কিছু সে হাতে রাখে ঠিকই মাইনের টাকা থেকে—কিন্তু সেও হাতি ঘোড়া কিছু নয়। তা থেকেও তো ডাক্তারে ওষুধে কত টাকা বেরিয়ে গেল গত দু-মাসে। আরও কি বিপদ-আপদ হয় ঠিক আছে!

শরৎ মেসোমশাইয়ের দিল আছে ও'রও কীই বা আয়। একটা ছোট ছাপা-খানা ছিল—নিজে দেখতে পারেন না, লীজ দিয়েছেন, তারই কটা টাকা ভরসা। তারও অর্ধেক নাকি আদায় হয় না। গিয়ে তাগাদা দিয়ে দু টাকা এক টাকা ক'রে আদায় করতে হয়। দুর্দান্ত হাঁপানি মেসোমশাইয়ের, রোজ যাওয়াও শুধু নাকি বিয়ে করেছিলেন। তারপর শ্বাশুড়ির জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলেন মাসিমা। দিদিমা একা, সহায়সম্বলহীন। কোথাও দাঁড়াবার কোন আশ্রয় না পেয়ে সেদিন ছোটমাসী উপার্জনের এক অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, সামান্য লেখাপড়া সম্বল ক'রে এক টাকা দু টাকার টিউশ্যনী ধরে ছিলেন গোটাকতক। তারপর থেকে সে-ই চলছে আজও। একেবারে বুড়ো বয়সে বলতে গেলে, শরতের সেই রক্ষিতাটি গত হ'লে শরৎ যখন অসহায় হয়ে পড়লেন—অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেস-বাড়ির নিচের তলায় ধরে পড়ে পড়ে

তুমি আমার কাছে বল, কেউ টের পাবে না...

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মাসিমা এখনও টিউশ্যনি ক'রে সংসার চালাচ্ছেন তাই রক্ষে, নইলে খেতেই পেতেন না।

বিচিত্র ভাগ্য ছোটমাসির। ওষুধটা কিনতে কিনতে কথাটা মনে হ'ল হেমের। জীবনে একদিনও স্বামীর সাহচর্য পেলেন না—ফুলশয্যার রাত্রেও না। স্বামী তাঁর কোন্ ডোমের মেয়ে রক্ষিতা নিয়েই রইলেন সারাজীবন, অসচ্চরিত্র স্বামী স্পর্শ করলে স্ত্রীর অপমান হবে এই ভয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না কোন-দিন। মায় কাজের সুসার হবে বলে কাশছেন আর হাঁপাচ্ছেন দেখে হেমই এসে খবর দিয়েছিল ছোটমাসীকে। ছোটমাসী গিয়ে মেস থেকে উদ্ধার ক'রে এনে কাছে রেখে সেবা করছেন এখন। কিন্তু নিজের কোট ছাড়েননি তাই ব'লে, মেসোমশাইয়ের শত অনুরোধেও টিউশ্যনী ছাড়তে রাজী হননি। বলে-ছেন, 'জীবনের এতগুলো বছর যদি স্বামীর ভাত না খেয়ে চলে যেতে পেরে থাকে তো এখনও পারবে। মানুষের জীবন, বলা যায় না কিছু—তবে পারি তো শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ভাতই খেয়ে যাব। দুদিন ভাত দিয়ে যে তুমি বিয়ের সময়কার করা প্রতিজ্ঞা সেরে নেবে—তা হবে না!'...

শরতের দেওয়া সে টনিক ফুরোবার আগেই খবর পেয়ে অভয়পদ আর এক শিশি কিনে পাঠিয়ে দিলে। একদিন এক রাশ ফলও পাঠিয়েছিল। দুধের যোগানি টাকা হেম অবশ্য কারুর কাছ থেকে নেয়নি—নিজেই দিয়ে যাচ্ছে যেমন ক'রে হোক। তবে মাছ মাংস খাওয়াবার কোন সুবিধে হয়নি। শনি-রবিবার হাত-ছিপে বা দু-একটা ধরা পড়ত, তারই বেশির ভাগটা কান্তিকে দিত কনক, এই পর্যন্ত।

এর জন্য কান্তির লজ্জার অবধি ছিল না। আরও মাথা নুয়ে পড়ত তার। অত দামী ওষুধ খাবার সময় প্রত্যেক-বারই লজ্জায় তার কান মুখ রাঙা হয়ে উঠত। উপায় নেই বলেই খেতে হ'ত তবু। এতগুলো লোককে ব্যস্ত করছে, এত টাকা খরচ করাচ্ছে—এখন তাড়া-তাড়ি সেরে উঠে এদের অব্যাহতি দিতে পারলেই ভাল। বৃথা চক্ষুলজ্জা ক'রে রোগ বাড়িয়ে আরও বিব্রত করা উচিত নয়।

কিন্তু দু শিশি টনিক খেয়েও কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং মনে হ'তে লাগল আরও কালা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কিছুই প্রায় শুনতে পায় না এখন, কানের কাছে গিয়ে প্রাণ-পণে চিৎকার করলে দুটো-একটা কথা ধরতে পারে শুধু। এবার তার নিজেরও চিন্তা হয়েছে খুব। কান না ভাল হ'লে ইস্কুলে যেতে পারবে না—মাস্টার-মশাইয়ের পড়ানো তো কিছুই শুনতে পাবে না।

সেখানকার বই-খাতাগুলো সেই কাছারী বাড়িতেই পড়ে আছে। কেই বা আনতে যাবে। তারা যে গরজ ক'রে পাঠাবে সে সম্ভাবনাও নেই। চিঠি লিখলেও কোন সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শুধু চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। কখনও কখনও সাধ্য মতো টুকটাক বাগানের কাজ করে এক-আধটু, নইলে বেশির ভাগ সময়ই চুপ ক'রে বসে থাকে আর ভাবে এই অসুখের কথা, নিজের জীবনের কথা, এই সর্বনাশা রোগের কথা। ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পায় না কিছু—অসুস্থ শরীরে খানিকটা ভাববার পর মাথা ঝিমঝিম করে। লজ্জায় অনু-তাপে চোখে জল এসে যায় বার বার।

দু শিশি টনিকেও কোন কাজ হয় নি—উন্নতি তো হয়ই নি উলটে বরং কিছু অবনতিই ঘটেছে শুনে গোবিন্দ ওকে আবার কলকাতাতে পাঠাতে বললে। যে একজন ই-এন-টি'র বড় ডাক্তার আছেন, ওর বন্ধু এবং মনিব ধরের আত্মীয় হন তিনি। ওর বন্ধুকে বলেই ব্যবস্থা করেছে গোবিন্দ, তিনি বিনা পয়সায় দেখতে রাজী হয়েছেন। যদি ছোট-খাট কোন অপারেশন করলে কাজ হয় তো তিনিই করবেন—তারও কোন খরচ লাগবে না। তিনিই হাসপাতালে ভর্তি ক'রে নেবেন।

কিন্তু এবারেও কোন লাভ হ'ল না। দু দিন তিন দিন ধরে দেখলেন ডাঃ মল্লিক। কোন আশাও দিতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'আসলে ওর কানের নার্ভগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওর কোন চিকিৎসা বিলেতে হয় কিনা জানি না, এদেশে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। বৃথা চেষ্টা। এর পর একেবারেই কিছু শুনতে পাবে না। কানের কাজে বাজ পড়লেও বুঝতে পারবে না। একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল ছেলেটা!... ঐ যে দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া হয়েছিল বললেন, তাতেই এই কান্ডটি হ'ল। সাধারণত ঐ টাইপের ম্যালেরিয়া শরীর একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে যায়। মনে হয় ওর বংশে ভিডিও ছিল। তাতেই আরও অনিষ্ট হয়েছে। সরি, কী আর বলব। I feel pity for the boy.

অর্থাৎ এদিক দিয়ে আশা-ভরসা আর কিছু রইল না। একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'ল ওরা।

এই খবরের পর শ্যামা আর একবার আছাড় খেয়ে পড়লেন। আর এক দফা—রতনকে উদ্দেশ্য ক'রে—গালিগালাজ শাপ-শাপান্তর ঝড় উঠল। কান্তি কিছুই শুনতে পেল না তার, তবে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল সে অনেক কিছুই। তাকে কেউ বলে দেয়নি যে আর কোন আশা নেই কোথাও তার কান সারাবার—কিন্তু দাদা বৌদির অন্ধকার হতাশ মুখ, বড়মাসিমার চোখের জল আর মার এই রণরঙ্গিণী মূর্তি ও আছড়ে পড়া দেখে কিছু আর বুঝতে বাকী রইল না। এবার পাথর হয়ে গেল সে। চোখে আর জল নেই তার। সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এত বড় সর্বনাশের কথা যখন ভাবতেও পারে নি—তখন লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে চোখ দিয়ে জল পড়ত এখন আর কিছুই নেই, এ সবের অতীত হয়ে গিয়েছে সে। এখন শুধু সামনে দিক-দিশাহীন অন্ধকার, নিঃসীম শূন্যতা। ভয়েই পাথর হয়ে গেল সে।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক কান্না-কাটির পর শ্যামাও এক সময় বোধ হয় শ্রান্ত হয়েই চুপ করলেন। কিন্তু মনের আক্রোশ মেটেনি তাঁর—এই কথাটা নিয়েই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলেন। একবার ভাবলেন সত্যি-সত্যিই যাবেন সেখানে, সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে-তাই ক'রে আসবেন, কৈফিয়ৎ তলব করবেন তাদের এই আচরণের। কোন্ অধিকারে ও'দের না জানিয়ে ছেলেকে সেই মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়েছিল তারা? কেন? কেন এ কাজ করতে গেল তারা, কিসের জন্যে?

আবার পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছিঃ! জামাইবাড়িতেই কোন দিন গেলেন না তিনি—তা আবার তাদের আত্মীয়-বাড়ি। বিশেষ ক'রে ঐ বাড়িতে—ঐ পাড়ায়। না, সে সম্ভব নয়; তা তিনি পারবেন না।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা কাজ করলেন। মহাশ্বেতার বড় ছেলেটা এসেছিল একদিন, তার শরণাপন্ন হলেন; 'বুড়ো ভাই, একটা কাজ করবি? চুপি চুপি কোন রকমে তোর মেজকাকীর কাছ থেকে তোর রতনপিসীর ঠিকানাটা জোগাড় ক'রে দিবি? এরা শুনলে হৈ-চৈ ক'রে উঠবে কিন্তু সেখানে কান্তির একরাশ কাপড়-জামা পড়ে রয়েছে—মিছিমিছি নষ্ট হবে বৈ তো নয়। ঠিকানাটা পেলে আমি মন-মন কাছে একটা চিঠি লিখে দেব, কাউকে দিয়ে তারা পাঠিয়ে দেবে।'

বুড়ো কথাটা বুঝল। নিতান্তই স্বাভাবিক এটা তার দিদিমার পক্ষে। তবে সে পারবে না, অন্য ব্যবস্থা করবে। সেই কথাই বলল, 'না দিদিমা, আমার কম্ম নয় ওসব। তবে কথাটা বার ক'রে নেব। বুঁচি আছে মেজকাকীর পেয়ারের মন্ত্রী, তাকেই বলব। বরং তোমার নাম ক'রেই বলব।'

'তাই বলিস। আর ঠিকানাটা পেলে আমাকে দিয়ে যাস। লক্ষ্মী দাদা আমার। তবে দেখিস, এরা না কেউ টের পায়।'

'ঠিক আছে, সে তুমি কিছু ভেবো নি।' আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বুড়ো অর্থাৎ বিষ্ণুপদ।

অবশ্য বুড়োর বুদ্ধিতে কাজও হয়। দু দিন পরেই হাসতে হাসতে ঠিকানাটা এনে দিয়ে যায়। 'মেজকাকীও জানত না ঠিক—মেজকাকার কাছ থেকে

জেনে দিয়েছে। বাব্বা, ও কি আমাদের কাজ। বাঁচি বলেই পেরেছে।'

বাচ্চাকে দিয়েই একখানা দু-পয়সার খাম আনিয়ে নিলেন শ্যামা। তারপর অনেকদিন পরে সীতার খাতা থেকে একখানা কাগজ যোগাড় করে চিঠি লিখতে বসলেন। সবাইকে বাঁচিয়ে আড়ালেই লিখতে হ'ল—সেজন্যে দুদিন সময় লাগল তাঁর চিঠি শেষ করতে। বহুদিনের অনভ্যাস, কলমও সরতে চায় না। দেরি হওয়ার সে-ও একটা কারণ।

শ্যামা লিখলেন,

"কল্যাণীয়াসু,

তোমার কল্যাণ কোন-ক্রমেই আমার কাম্য নয়, তবে অন্য পাঠ খুঁজিয়া না পাইয়াই এই পাঠ দিলাম। কল্যাণ-কামনা তো দূরের কথা, তোমাকে নিত্য অভি-সম্পাৎ না দিয়া আমি জল খাই না। তোমার অনিষ্টই এখন আমার একমাত্র কাম্য। কারণ বিশ্বাস করিয়া তোমার কাছে আমার গর্ভের সেরা সন্তানটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া একটু যদি মানুষ করিয়া দাও এই আশায়—তুমি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছ। এমন স্থানেই তাহাকে পাঠাইয়াছিলে যে কমাসেই বাছার আমার জীবনসংশয় ঘটিয়া গেল। দুর্দান্ত ম্যালেরিয়ায় মৃত-প্রায় হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পড়িয়া ছিল, একজন অপরিচিত লোক দয়াপরবশ হইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন বলিয়া তবু প্রাণটা বাঁচিল। তাও অনেক কষ্টে অনেক অর্থব্যয় করিয়া। বহু রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতে হইয়া-ছিল. দশ-বারোদিন পর্যন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না। প্রাণ যদি বা বাঁচিল চির-দিনের মতো পঙ্গু অক্ষম হইয়া গেল। শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবে—চিরদিনের মতো তাহার দুটি কান কালা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ কালা নয়, বদ্ধ কালা। এখন কানের কাছে ঢাক বাজিলেও শুনিতে পায় না। আমরা ভিখারী তবু ভিক্ষা দুঃখ করিয়াই বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়াছি. চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন ও কান আর ভাল হইবে না। কোনদিনই না। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষেই উহার কানটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে কী করিয়া খাইবে বলিতে পারো? পথের ধারে বসিয়া ভিক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন উপায় রহিল না। মা, একটা কথা তোমাকে দুই হাত জোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমরা তোমার কী অনিষ্ট করিয়াছিলাম যে তুমি বা তোমরা আমার এতবড় অনিষ্টটা করিলে? সাহায্য করিতে না পারিতেছিলাম—না পারিলে সোজা-সুজি বলিয়া দিলে না কেন? সে নাকি কিছু ডাইরা গিয়াছিল, তোমরা বলিয়াছ, (সেও তো তোমার দায়িত্ব!) সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছেই পাঠাইয়া দিলে না কেন? আমাদের ছেলে আমরা বুঝিতাম। তাহাকে সাক্ষাৎ যমদুয়ারীতে পাঠাইবার তোমার কী অধিকার ছিল? এই রহস্যটা যদি খোলসা করিয়া জানাও, এক্ষণে তবু মনকে একটা সান্ত্বনা দিতে পারি। আশা করি এ জবাব চাহিবার আমার সম্যক্ অধিকার আছে। পরিশেষে আবারও জানাই, সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিত্য অভিশাপ দিব, তুমিও যেন এমনি করিয়া সকল ভালর মাথা খাইয়া বসিয়া থাক। ইতি—

কান্তির মা।"

বহুকাল পরে লিখতে বসা। হাতের লেখা এককালে মুক্তোর মতো ছিল—এখন এঁকেবেঁকে বিশ্রী হয়ে গেল। বিস্তর বানানভুলও হ'ল নিশ্চয়ই। তবু পড়ার কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হ'ল না। শ্যামা চিঠিখানা খামে এঁটে ঠিকানা লিখে দুপুরের দিকে নিজে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী-তলার কাছে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন।

জবাব পাবেন আশা করেন নি। প্রধানত গায়ের ঝাল মেটাতেই চিঠিটা লেখা। তবু দুদিন পর থেকেই একটু উৎসুক হয়ে দুপুরের দিকটায় বাইরের বাগানে ঘুরতে লাগলেন। ঐ সময় পিওন যায় প্রত্যহ এই পথ দিয়ে। যদিই চিঠি আসে, তাঁর হাতেই পড়া বাঞ্ছনীয়। বৌমা কি কান্তির হাতে পড়লে অনেক ঝামেলা। কৈফিয়ৎ দিতে হবে বিস্তর। এখনকার ছেলেমেয়েদের আবার বড় বেশী ভদ্রতাজ্ঞান। যে আমার মন্দ করেছে তাকে দু-কথা শোনাব—এতেও ওদের ভদ্রতায় বাধে।......

জবাব ডাকে এল না অবশ্য। তবে জবাব পেলেন শ্যামা।

অপ্রত্যাশিতভাবে। অচিন্তিত পথ দিয়ে এসে পৌঁছল।

চিরদিনের ভগ্নদূত মহাশ্বেতাই নিয়ে এল সে জবাব, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে সে খবরটা দিলে।

'আর শুনেছ ব্যাওরাটা। রতন গো রতন, আমার মামাতো ননদ, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে পরশুদিন। কাল ইনি শুনে এয়েছেন। পুলিশ-হাঙ্গামার কাণ্ড তো—সবাইকেই জানিয়েছে। তাই, যে যেখানে আছে আপ্ত-স্বজন।'

'গলায় দড়ি দিয়েছে। সে কি? আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

'হ্যাঁ গো। ঠিক দুপুর বেলা। নিজেরই শাড়ি কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে এই কাণ্ড ক'রে বসে আছে মেয়ে। কেউ জানে নি, কেউ টের পায়নি এমন চুপি-সাড়ে কাজ সেরেছে। সন্ধ্যে হয়ে যায় তবু দোর খোলে না, ঘর থেকে বেরোয় না, এতেই সন্দ হ'তে দোর ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে ঐ কাণ্ড। চিঠি লিখে গেছে নাকি—কারুর হাত নেই এতে, নিজের পাপের প্রাচিত্তির করতে আমি মরছি!... এমন ঘর-বাড়ি, এত পয়সা, সুখের জীবন, দ্যাখো দিকি বাপু! কী যে হ'ল। তোমারই শাপমন্যি ফলল আর কি। যা গালটা দিলে কদিন ধরে ছড়া কাটিয়ে, এত কি সহ্য হয়! তোমার বাপু কথা যস্ত ফলেও যায়, কালমুখের বাণী।...... বলে কে যেন একখানা চিঠি দিয়েছিল দুদিন আগে, সেই চিঠি পেয়ে এস্তক জম জ্বার ক'রে ছিল, খায়নি দায়নি কিছু করেনি দুদিন। সে চিঠিও পাওয়া যায়নি—তা'হলে তবু একটা কিনারা হ'ত যে কেন এ কাজ করলে। কে যে বাপু এমন শত্রুরতা ক'রে চিঠি দিলে! কী লিখে-ছিল কে জানে, এমন কে চিঠি দিলে ওকে যে আত্মঘাতী হ'তে হ'ল!'

বকেই যায় মহাশ্বেতা আপনমনে, ওর অভ্যাসমতো।

কিন্তু শ্যামা যেন আর শুনতে পারেন না। তাঁর দু কান যেন পুড়িয়ে দেয় কে। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।

অভিশাপ দিয়েছিলেন সত্য কথা—কিন্তু এ রকম তো তিনি চাননি। ঈশ্বর জানেন এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি।

—এমন হবে জানলে ও চিঠি কখনই দিতেন না তিনি। যদি মেজবৌয়ের মনে পড়ে, যদি সন্দেহ করে যে তাঁর চিঠিতেই এই কাজ করেছে রতন তো তিনি ওদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে?

আর তা ছাড়া—আজ যত বড় অনিষ্টই ক'রে থাক সে—অনেক উপ-কারও করেছে, কান্তিকে যে যথার্থই ভালবাসত, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তার এমন ভয়াবহ পরিণতি—কোন অন্ধ ক্রোধের বশেও কখনও কল্পনা করেন নি। ছি ছি, কী করল হতভাগী। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল তাঁকেই।

শ্যামা নির্জনে বার বার নিজের ইষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগ-লেন। পরলোকে গিয়ে যেন হতভাগিনী শান্তি পায় একটু—সেখানে না আবার এই আত্মহত্যার শাস্তি বইতে হয় তাকে।

ঠাকুর তাকে মাপ করো, তাকে তোমার কাছে টেনে নাও।'

(ক্রমশঃ)

।। পেশা যাদের মেঘের ওপর তলা ।।

শুধু রূপ থাকলেই হয় না। কারণ কেবল সৌন্দর্য ও চটক থাকলেই কঠিন কাজ করা যায় না। এয়ার হোস্টেস-দের প্রথম গুণ হচ্ছে অতিথিদের সকলের প্রতি সম্মান সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। চলতি সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী এদের শিখতে হয়। শুধু ঘ্যারো-ডি-জেনি রা কোথায় বা বিমান লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে উড়ছে কিনা এই বল্লেই হবে না। কেননা হয়তো কোন যাত্রী বিমানের ইঞ্জিনের শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারে অথবা কোন ভীতু যাত্রী হয়তো জানতে চাইবে কত ওপরে উঠলে সে ঠাণ্ডায় জমে যাবে কিম্বা বিপদের সময় বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরজাটা ঠিকমত কাজ করে কি না; তৃতীয় কোন যাত্রী হয়তো জানতে চাইবে সামনের শহরের দর্শনীয় বস্তু কি কি?—এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাকে দিতে হবেই তাছাড়া প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তার জানা চাই। আর জানা চাই কোন যাত্রীর হৃদরোগ দেখা দিলে তাকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে।

এই সব ছাড়াও তাকে শেখানো হয় বিমান চলার সময় কিভাবে খাদ্য ও পানীয় তৈরী কোরে পরিবেশন করতে হয়, কিভাবে যাত্রীদের তদারক করতে হয়। অর্থাৎ দূরত্ব বাঁচিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই এয়ার হোস্টেসের কাজ।

।। গ্রহান্তর-ভাষা সমস্যা ।।

অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা, বিজ্ঞান তা আজও জানে না। বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্পরচয়িতাদের মাঝে মাঝে এই সমস্যাটির মুখোমুখী হতে হয়েছে যে পৃথিবীর অধিবাসীরা গ্রহান্তরবাসীদের কাছে নিজেদের বক্তব্য বোঝাবে কি ভাবে? ইদানিং বিজ্ঞানীরাও এদিকে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আমাদের অস্তিত্বের কথা আমরা অন্যান্য গ্রহে জানাবো কি ভাবে? একটা প্রস্তাব বিজ্ঞানী মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে—কারণ প্রস্তাবটি খুব সরল। এই প্রস্তাবটি হল : পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী কিছু একটা গড়ে তোলা। সকলেই জানেন : একটি সমকোণ-বিশিষ্ট ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গফল অন্য দুটি ভুজের বর্গফলের যোগফলের সমান—এই উপপাদ্যটিই পিথাগোরাসের নামে প্রচলিত—যদিও, পিথাগোরাসের বহু আগে থেকেই এই সূত্রটি মানুষের জানা ছিল। সে যাই হোক, গণিতবিদরা দাবি করেন যে, প্রত্যেকটি সমাজকেই তার বিবর্তনের ধারায় এক সময়ে এই সূত্রটি আবিষ্কার করতেই হবে, জ্ঞান ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকাশের এ একটি অবশ্যম্ভাবী দিক্‌চিহ্ন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি খুব সহজ মনে হলেও, প্রশ্ন উঠছে : গ্রহান্তরে যদি এমন কোন সমাজ থাকে যে-সমাজের প্রাণীরা সমাজ বিকাশের আদিম অবস্থাতেই রয়েছে, তাহলে তো তারা পিথাগোরীয় সূত্রের মর্ম বুঝবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে ভিন্ন গ্রহে অধিবাসী থাকলে, তারা মানুষের সমান অথবা বেশি বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন।

তাই, আর একটা পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে : মার্কিন বিজ্ঞানীরা মাস ছয়েক আগে ২১ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন 'এরিডেনাস' নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। এই নক্ষত্রলোকের গ্রহগুলির পরিবেশ ঠিক আমাদের সূর্যলোকের গ্রহগুলির পরিবেশের অনু-রূপ। তাই সেখানে মানুষের অনুরূপ প্রাণী থাকিলেও থাকতে পারে। এরিডেনাসের কোনো গ্রহে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে, তাহলে এই সংকেত পেয়ে তারা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তারাও সংকেত পাঠিয়ে তাদের অস্তিত্ব আমাদের জানাবে।

সিগারেটের মত দেখতে এই সুদৃশ্য যাত্রীবাহী মোটর বোটটির নাম 'চাইকা' চাইকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বোট। এর ওয়াটার জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে গতিমাত্রা বাড়ান যায় ঘণ্টায় ৯৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। ৩০ জন যাত্রীবহনে সক্ষম এই বোটটি পরিচালনা করেন মাত্র দু'জন লোক—ক্যাপ্টেন এবং একজন নাবিক। এইটি প্রথম হাইড্রোফয়েল মোটর-বোট নয়। এর আগে 'রকেটা', 'স্পুটনিক' 'মিটিওর' প্রভৃতি সমধর্মী যানগুলি যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আত্মপরিচয়ে ইংরাজ

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ভদ্র ইংরেজ কেমন হবে? পোষাক-আসাকে টিপটপ। আরও একটু চাই। তাকে ছত্রপতি হতে হবে। আমাদের দেশে এককালে যেমন চুড়িদার পাঞ্জাবির সঙ্গে একটা ছড়ি লাগত। বাবু ইংরেজের হাতে একটা ছাতা চাই। ফিতে দিয়ে নিপাট করে বাঁধা। এদেশে বৃষ্টি লেগেই আছে। ছাতা আত্মরক্ষার অস্ত্র। না থাকলেই বিপদ। ব্যবসায়ী জাত প্রয়োজন বুঝে ফ্যাশনের রেওয়াজ তুলেছে। উঁহু হল না। হাতে বন্দুক আছে কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্যেও গুলী ছোড়ার হুকুম নেই। ছাতা খোলা মানেই সমাজচ্যুতি। কেষ্ট-বিষ্টু থেকে কেষ্টাবেটার দলে নাম লেখান। বৃষ্টি পড়লেই বনেদী ভদ্রলোককে ট্যাক্সির সন্ধান করতে হবে। হাতের ছাতা যেমন নিপাট করে বাঁধা ছিল তেমন থাকবে।

ইংরেজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসে বলেছেন শ্রীমতী পার্ল বাইন্ডার [Pearl Binder]। বইটার নাম "The English Inside Out." *

টি পার্টি বসেছে। সবাই নামজাদা লোক। এমন সময় ইংরেজ কূটনৈতিক প্রতিনিধির স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি ব্যাপার? নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল? ভদ্রমহিলা শুধরে দেন, চা করতে গেলে আগে দুধ দিতে হয়। এর সার্থকতা কি? খেতে ভালো হয়, বেশীক্ষণ গরম থাকে? এর পেছনে যুক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, তবু মানতে হবে। ওইটে ভব্যতা—প্রচলিত রীতি। না মানলে ইংরেজের সামাজিক পৃথিবী রসাতলে যাবে। কিন্তু যে বিনা দুধে চা খায় তার বেলা কি বিধান?

এমন আরও কত ঘটনা লিখেছেন। ইংরেজ চরিত্রের এমন সরস সংস্কার-মুক্ত বর্ণনা আমি অন্তত পড়িনি। বর্ণনা নয় বলা যায় আত্মবিশ্লেষণ। দোষগুণ সব তুলে ধরেছেন। সময় সময় দুর্বলতার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। নিজের জাত সম্বন্ধে তা সবাই করে। তাই বলে এড়িয়ে যাননি। সাধারণ ইংরেজের মত হামবড়াই ভাব কোথাও নেই। লেখাটা রম্যরচনা। প্রথম প্রথম মনে হয়েছে পাঠককে আনন্দ দেওয়াই বইটার উদ্দেশ্য। শেষ করলে বোঝা যায়, বই-টায় শুধু ঘটনার অসংখ্য সংগ্রহ নেই, ভাববার বিষয়বস্তু আছে।

আবহাওয়া নিয়ে শুরু। ইংরেজ রক্ষণশীল জাত। ভদ্রতার নানান কোড মেনে চলতে হয়। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হয়ত দশ বছর ধরে একই রাস্তায় হাঁটছে, দুবেলা পথে দেখা হচ্ছে তবু কথার লেনদেন নেই। কিন্তু বিশেষ বিধি আছে। আলোচনার বিষয় বস্তু আবহাওয়া হলে সাতখুন মাপ। বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে একজন অপরি-চিতার সঙ্গেও এ নিয়ে খোস গল্প করা যায়। বলাবাহুল্য আবহাওয়াকে আক্র-মণ করে আলাপের শুরু। এই অব্যবস্থ-চিত্ত আবহাওয়াই নাকি জাতটাকে gambler এবং grumbler করে তুলেছে—বাইরে ঘুরতে না পারলেও জুয়া খেলা যায়, অসন্তোষেজরা কথার তুবড়ি ছোটান যায়। এই আবহাওয়া নাকি বিশ্ববিজয়ী রোমান-সম্রাট সিজারকে কাবু করে ফেলেছিল। সম্রাটের সৈন্যদল অপরাজেয়—দুর্দান্ত প্রতাপ। তারা উত্তরাঞ্চলের বীর ঘুরে বেড়ায় আর হুংকার ছাড়ে। কিন্তু বিলেতে এসে চড়া সুর হ্যাঁচ্ছো-হ্যাঁচ্ছোয় রূপান্তরিত হল। শেষে পটাপট বিছানা নিল—সর্দি কাশি জ্বর। বুকে বর্ম এঁটে টহল দিতে আরম্ভ করল। দেখতে হল
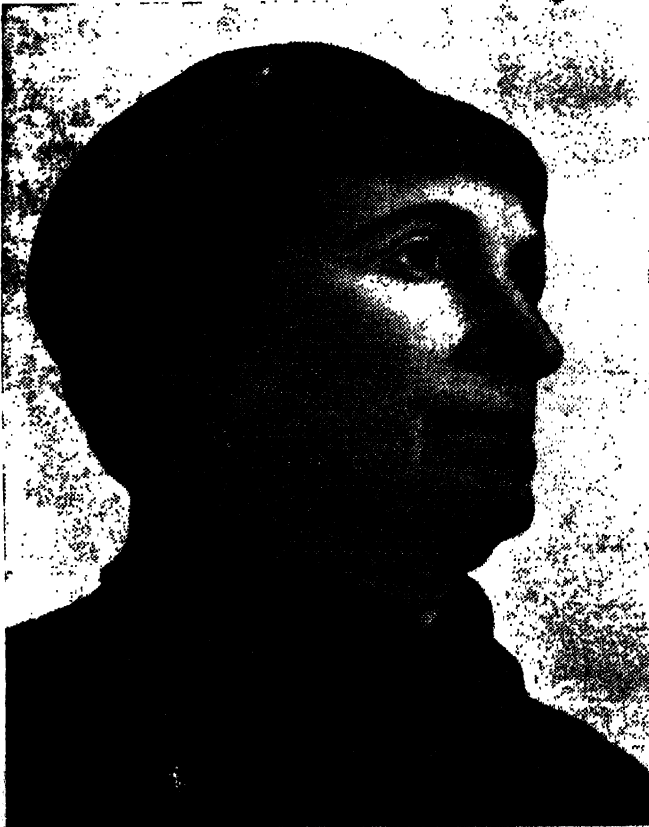
শ্রীমতী পার্ল বাইন্ডার

কিম্ভূতকিমাকার। বিজয়ী সৈন্যের একি অপমান!

বইটায় ভালো করে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, রাজপরিবারকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচা লেখিকার মনঃপূত নয়। খ্রুটিয়ে খুটিয়ে দোষ বার করেছেন। কিন্তু দোষ করেছেন সন্ধিপত্র দাখিল করে। রাণীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দাঁড়ি-পাল্লার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

রাজপরিবার সম্বন্ধে রবিবারের কাগজ "রেনল্ডস নিউস"-র রিপোর্টে :

কোন বিজ্ঞানের ছাত্র বলেছে—'রাজ-বংশের প্রতীক আজ আউট ডেটেড। রাজারাণী নিয়ে হৈ-চৈ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল'। অন্য একজন বলেছে—'রাণী দেখতে সুন্দর। ডিউককে দেখতে জামাই-এর মত। দুজনকেই আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু ওইখানেই শেষ। তার বেশী টেনে নিয়ে যাওয়া ছেলেমানষী।' অপর জনের মত —'অনেকে বলে তারা রাণী বা ডিউক হতে চায় না। আমি কিন্তু চাই। কেমন মজা করে ঘুরে বেড়াও, পোলো খেলো। চেষ্টা করে খুজে বার কর কি করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা যায়।'

লেখিকা জুড়ে দিয়েছেন, রাণীর পরম ভক্তরাও তাঁর খরচের দিকে কটাক্ষ করে। রাণীর জাঁক-জমক মন্দ লাগে না। তবে ব্যক্তিগত খরচের মোটা অঙ্ক বিসদৃশ লাগে। রাজপরিবারের বাৎসরিক ব্যয়ের তালিকা দেখা যাক।

	পাউন্ড
মহারাণীর হাতখরচ	৬০,০০০
সাংসারিক খরচ	১৮৫,০০০
দান-ধ্যান	১২১,০০০
অতিরিক্ত খরচ	১৩,০০০
মহারাণীর মা	৭০,০০০
ডিউক অফ এডিনবরা	৪০,০০০
ডিউক অফ গ্লস্টার	৩৫,০০০
রাজকুমারী মার্গারেট	৬,০০০
রাজকুমারী রয়াল	৬,০০০
প্রিন্স অফ ওয়েলস	১০,০০০

খরচের তালিকা যোগ করলে দেখতে বড়ই হয়, আসলে কিন্তু সস্তা। দেশ-বাসীর মাথাপিছু মাত্র তিন পেনি। প্রেসিডেন্টের চেয়ে রাণী অনেক ঘরোয়া। তাঁকে নিয়ে বেশী আনন্দ করা যায়। সমস্ত রাজপরিবার দেশের সামাজিক উৎসব বাঁচিয়ে রেখেছে। কমনওয়েলথ রাণীকে নিজের দেশে দেখতে পেলে উল্লসিত হয়। রাণীকেও কঠোর পরি-শ্রম করতে হয়। ১৯৬১ সালে ৫০,০০০ করমর্দন করতে হয়েছে। ৫০টা রাজসূয় যজ্ঞে যেতে হয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পনের ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হয়েছে। সবার বড় কথা স্থায়িত্ব বা stability প্রেসিডেন্টের নেই একমাত্র রাজপরিবার দেশকে তা দিতে পারে।

সাপ-লুডো খেলার তুলনা দিয়েছেন প্রচুর। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে মই বেয়ে সমাজের ওপরতলায় ওঠার। কিন্তু সেত সহজ নয়। সাপের দল হাঁ করে বসে আছে মুখে পড়লেই পপাত ধরণী-তলে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এমন কোন জাতিভেদ নেই বটে তবু কঠোর ব্যব-ধান। শ্রমিক - মধ্যবিত্ত - উচ্চমধ্যবিত্ত। দেশের অধিকাংশ লোক শ্রমিক। তাদের ধনুকভাঙা পণ মধ্যবিত্তের পর্যায়ে ওঠার। শ্রমিকরা এদেশে মন্দ উপায় করে না, ভদ্র কেরাণীকুলের চেয়ে বেশী। কিন্তু টাকা ত সব নয়, সেরা জিনিস হল সামাজিক মর্যাদা। তাই শ্রমিকের চেষ্টা কি করলে তার ছেলেরা ককনি ছেড়ে বিশুদ্ধ ইংরাজী শিখবে—কুইন্স ইংলিশে কথা বলবে। কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা শিখবে। ভালো কাউন্সিল স্কুল আছে বাড়ীর কাছে, তার আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি এবং মাইনে লাগে না। তবু মন উঠল না, ভর্তি করলে এক নিকৃষ্ট পাবলিক স্কুলে। মাইনে লাগে লাগুক, ভালো সমাজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে ত মিশতে পারবে। দুদিন বাদে জাতে উঠবে। কৌলিন্য না থাকলেও মর্যাদা ত মিলবে।

কৌলিন্য আর বংশগৌরব কোনটাই হেলা-ফেলার নয়। তার তকমা এঁকে বিজয়কেতন ওড়ান যায়। কিন্তু হায়! বর্ণশ্রেষ্ঠর রঙটাও ধার করা—নীলবর্ণ শৃগালের মত। বিজয়ী উইলিয়ামের মাত্র দুজন সঙ্গী ছিল যাদের ধমনীতে বইত আসল নর্মান রক্ত। অন্য সকলে দাস। প্রভুকে ভক্তি দেখাবার জন্যে আগের কালে কৃতদাসরা প্রভুর নামে নিজের পরিচয় দিত। আজকের লর্ডদের পরিচয় নিলে দেখা যাবে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সার্ফ।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে তিনটে গুণ লাগে,—শিক্ষা, ব্যবহার ও বৃত্তি। শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে চাই মার্জিত উচ্চারণে কথা বলা। ভালো মন্দ উচ্চারণের ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। আরও আছে মধ্যবিত্ত সমাজের কড়া পাহারা। সব সময় সজাগ অযোগ্য কেউ ঢুকে পড়ে কিনা। অবশ্য কোন

রুকমে বেড়া টপকাতে পারলেই নিস্কৃতি নেই। এক পরিবার রাতারাতি বড়-লোক হল, যাকে বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। পুলে টাকা পেল লাখ দশেক। জাতে উঠতে হবে, প্রথমেই পাল্টাল করল পরিচিত পরিবেশটা, বাড়ী কিনল অভিজাত পল্লীতে। কিন্তু এ যে শ্মশানভূমি। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকায় না। আগের পাড়ায় প্রতিবেশীরা কত গল্প-গুজব করত। এ ওর নিন্দে রটাত। বাগানের বেড়ার হুমড়ি খেয়ে বলত, ও দিদি শুনেছ। দরকার পড়লে এ ওর জিনিস ধার করত। এখানে বা কলা পরিবেদনা। কাউকে বাগানের পাশে উঁকি মারতে দেখা যায় না। কেউ প্রতি-বেশীর নিন্দে করে না। আগের পাড়ায় দরজা ছিল সবার জন্যে অবারিত। এখানে প্রতি দরজায় আভিজাত্যের হুড়কো লাগান।

তবু সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে। বছর পঞ্চাশেক আগে কেউ রাতারাতি ভদ্রলোক হবার স্বপ্ন দেখত না। স্ত্রী চার্চ চ্যারিটি আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। আঙুল দিয়ে গোনা যেত মধ্যবিত্ত সমাজকে। বর্তমানে গণ-তন্ত্রের ঢেউ আলোড়ন তুলেছে, ভদ্র-লোকের সমাজটা ফেঁপে ফুলে উঠছে। হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে চাইছে তাদের অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে। লেবারের সঙ্গে যেন তাদের কোনকালে সম্পর্ক ছিল না, তারা সবাই অভিজাত টোরি পার্টির সমর্থক।

বার্নার্ড শ পঞ্চাশ বছর আগে বলেছিলেন, চাকরী এবং অর্থের সাচ্ছল্য দেশকে টোরি করে দেবে। আজ সে ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হয়েছে। worker বা labourer কথাটাই যেন কানে লাগে মানমর্যাদাশূন্য সমাজের এক অপাংক্তেয় গোষ্ঠী। এমন কি লেবার পার্টিও সে কথা ভাবছে। আজকের দিনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে লেবার কথাটা বাতিল করতে হবে।

ইংরেজের অসাধারণ কুকুর-বেড়াল-প্রীতির কথা বলেছেন। ছেলে-মেয়েদের পথে-ঘাটে প্রেমালাপের একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আরও লিখেছেন, কয়েক বছর আগে পথে ঘাটে দেহ-ব্যবসায়ীরা লোকশিকারে বেরোত। বর্তমানে আইন করে তা বন্ধ করা হয়েছে। পথে ঘাটে তাদের পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। নিউজ এজেন্ট এদেশের পত্র-পত্রিকা বিক্রির দোকান। সামনে কাচ দিয়ে ঢাকা বড় শো-কেস। ভেতরে ছোট ছোট কার্ডে লেখা বিজ্ঞাপন—মডেল — সোনারবরণ চুল। ৩৮-২৩-৩৭। কফিখানার নীচে স্টুডিয়ো। অন্য কার্ডে লেখা—জেনি পুরোনো ও নতুন বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছে। ফোন বেলা বারোটা থেকে রাত্রি আটটা। আর একটা, ক্যারোলিন। মডেল। ছোট পুতুলের মত দেখতে। স্টুডিয়ো। সেই বোর্ডের আর একটা বিজ্ঞাপন। বিনামূল্যে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাপের মূল্য মৃত্যু।

মধ্যবিত্ত পরিবারের রোমান্স সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলেছেন ঃ দুই সুখী পরি-বার। ধরা যাক তাদের নাম শ্রী ও শ্রীমতী 'ক' এবং শ্রী ও শ্রীমতী 'খ'। দুজনেরই ছেলে-মেয়ে আছে। দুই ভদ্র-লোক ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। একই পাড়ায় বাড়ী। নিয়মিত যাতায়াত আছে। সন্ধ্যে হলে দুজোড়া যুগলে একসঙ্গে ব্রিজ খেলতে বসেন। তাদের পরম বন্ধুত্ব। ক্রমে দেখা গেল 'খ'-এর বাথ-রুমের জানলায় ভিজে তোয়ালে টাঙান। দুদিন বাদে 'খ'-এর বাথরুমে তোয়ালে ঝুলতে দেখা গেল। সন্দেহ থেকে সুষ্ঠু প্রমাণ। প্রথম মন কষাকষি তারপর কোর্টঘর। পরস্পরী প্রীতির অভিযোগে দুপক্ষেরই বিবাহবিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হল। শ্রী 'ক' বিয়ে করলেন শ্রীমতী 'খ'-কে এবং উঠে এলেন 'খ'-এর বাড়ী। শ্রী 'খ' আশ্রয় নিলেন শ্রীমতী 'ক'-এর গৃহে। ছেলেমেয়েরা যেমন ছিল তেমনি থাকল। আবার তাদের মধ্যে গড়ে উঠল সদ্ভাব। সন্ধ্যে না হতে ব্রিজ খেলা শুরু হল। তবে কিছুদিন বাদে আবার নাকি বাথরুমে তোয়ালে ঝুলতে দেখা গেছে।

হাস্যরসিক ইংরেজের পরিচয় প্রসঙ্গে মজার ঘটনা বলেছেন। অবশ্য এদেশে প্রতি বছর কলেজের ছেলেরা দল পাকিয়ে একটা কিছু কিম্ভুৎকিমাকার কাজ করে। তাকে বলে rag—লোককে বোকা বানায় —একটু নির্দোষ আনন্দ—এপ্রিল-ফুলের দিন যা অনেকে করে। লেখিকা আক্ষেপ করেছেন তেমন মজার ফন্দি আঁটার সময় কোথায় লোকের। পয়সাই বা কার আছে। সে ছিল একজন—হোরেস-ডি-ভেরে-কোল। অনেকটা আমাদের দেশের বিগত দিনের জমিদারের মত। কোল তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পুঁথি পড়ার চেয়ে লোক ঠকানোর ফন্দি আঁটতে বেশী বুদ্ধি খরচ করতেন। কেবল চিন্তা কি করে রথী-মহারথীদের বোকা বানান যায়। সেটা ১৯০৫ সাল। তিনি সাজলেন জানজিবরের সুলতান, এক ছাত্রী সাজলেন বেগম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানান। কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি। যতদিন না ঘটনাটা ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়।

দ্বিতীয় দফায় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনা। দীর্ঘদিন ধরে চলল অভিযানের খসড়া। এবার টার্গেট নৌ-বাহিনী। এ্যাডমিরাল স্যার উইলিয়ামে মের কাছে টেলিগ্রাম এলো। এমনভাবে লেখা যেন বৈদেশিক দপ্তরের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী স্যার চার্লস লিখছেন। মিত্র-বন্ধু আবিশিনিয়ার মহারাজ সদলবলে আসছেন। জানি হাতে বেশী সময় নেই, তবু তাঁদের যেন উপযুক্ত সামরিক অভ্যর্থনা জানান হয়।

মহারাজ নামলেন। সঙ্গে দুজন দেহরক্ষী, একজন রাজকুমার, একজন জার্মান দোভাষী এবং স্বয়ং কোল সেজেছেন আবিশিনিয়ার বৈদেশিক বিভাগের কর্মচারী। বিশেষ ট্রেন তাঁদের নিয়ে এসেছে ওয়েমাথ-এ। নৌ-বাহিনী রাজোচিত সম্বর্ধনা জানায়। কোল নিজের পরিচয় দেন। কমিশন নিয়ম

প্রসঙ্গে বলেন—রাজপুরীর পাচকবর্গকে আনা সম্ভব হয়নি, অবশ্য আবিসিনিয়া ও বিলেতের বাঁধ রুটীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে ধর্মের অনুশাসন। বাইরে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ নিষেধ। তাই নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁদের অক্ষমতা জানাচ্ছেন। তাঁদের ভয় ছিল খাবার আসরে নাকাল কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ না খসে পড়ে। তিনি আরও বললেন, সূর্যাস্তের সময় মক্কার দিকে মুখ ফিরে আজান করতে হবে তাই বিদায় নিচ্ছেন। দোভাষী দোভাষী তখন সামাল দিচ্ছেন। অতিথিরা থেকে তাঁরা করেকটা কথা মুখস্থ করেছেন। অ্যাডমিরালটির ফ্ল্যাগশিপ এক একটা অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে রাজা সপারিষদ উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। চোখে মুখে বিস্ময়ের আভাস। আর বলে উঠছেন 'বুংগ', 'বুংগা', অর্থাৎ চমৎকার। কয়েক দিন বাদে দৈনিক পত্রিকায় বড় বড় হরফে ছাপা হল 'বুংগা বুংগা'। এডমিরাল মে'র জীবন নিশ্চয় কিছু-দিনের জন্যে দুর্বিসহ হয়েছিল। কোজ ব লাছিলেন হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হয়েছে বটে তবে রাজকীয় সম্বর্ধনার তুলনায় তা কিছুই নয়।

বইটার শেষ অধ্যায় "ঈশ্বর ইংরাজ ও হাইড্রোজেন বোমা" এই শিরোনামে। ভল্টেয়ার বলেছিলেন, ইংরেজের শখানেক ধর্ম এবং এক মনোভাব। তিনি খুব ভুল করেন নি। ইংরেজের ভগবানের সঙ্গে সরাসরি ইংরাজী ভাষায় কথা বলা যায়। পার্থক্য কোথায়। মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে Low Church বা Chapel একমাত্র আশ্রয়। যারা অবস্থাপন্ন ইংরাজিয়ানায় তাদের পরম বিশ্বাস। যে দলকে কম পয়সা দেওয়া হয়েছে তাদের ধর্মে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। সৎ হোক ধার্মিক হোক বিনয়ী হোক। তাদের মধ্যে দু-একজন দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তুমুল আক্রোশে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। কিন্তু তার পরিধি কতটা—বড়জোর খবরের কাগজের চিঠি-পত্রের কলম।

লেবার পার্টি শুরু করে Sunday School সেখানে ছেলে-মেয়েদের ধর্মকথা শোনান হয় এবং শিক্ষা দেওয়া হয় কি করে প্রতিবেশীকে সাহায্য করা যায়। আজ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে তার রূপ পরিবর্তন হচ্ছে। যারা দরিদ্র শ্রমিক ছিল তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে কেউ বা ভাল মাইনের চাকরী করছে। সংসারে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। ভুলে যাচ্ছে সেবা সংগঠন। কিন্তু এই টাকাই কি জীবনের সব? হয়ত দুদিন বাদে লোকে উপলব্ধি করবে অর্থই পরমার্থ নয়।

ম্যাকমিলান গত সাধারণ নির্বাচনের আগে বলেছিলেন We have not had it so good—জাতির জীবনে এত ভালো দিন আর আসেনি। লেখিকা বলেছেন একথা শুনে লজ্জায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেছে। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক আজও পেট-ভরে খাবার খেতে পায় না। ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক, যারা পেন্সনের ওপর নির্ভর করে আছে তাদের তেল আনতে নুন ফুরোয়। শীতে জমে যায় তবু আগুনে জ্বালার পয়সা নেই। আজও ইংলণ্ডে প্রতি চারটে বাড়ীর মধ্যে একটা বাড়ীতে স্নানঘর নেই। অথচ প্রতি বছর হাজার হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করা হচ্ছে সামরিক আয়োজনে—মানুষ-মারা ছুরিতে শান দেবার জন্যে। মাথার ওপর সেটোর প্লেন আণবিক বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ম্যাকমিলান হয়ত কথাটা বিশ্বাস করে আনন্দ পেতে চান। তবে দেশবাসী এ কথায় সায় দেবে না।

হাইড্রোজেন বোমা নিয়েই ত কত লোকের মাথা-ব্যথা। যুদ্ধ হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে একথা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডিও বলেছেন। যুদ্ধ না বাধলেও পুরোপুরি অব্যাহতি নেই। আণবিক পরীক্ষাও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়ায়, তাতে লোকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগবে। ভাবীকালের সন্তানদের কেউ হবে অন্ধ কেউবা বিকলাঙ্গ। তারপর বলেছেন—ব্যান-দি-বম দলের কথা। ধর্ম জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে যোগ দিয়েছে এই দলে। গত মহাযুদ্ধের পর কোন রাজনৈতিক দল যুব শক্তিকে এত আকৃষ্ট করতে পারে নি। তার কারণ এর নীতি ছোটখাট দলাদলির অনেক ঊর্ধ্বে। মনুষ্যের অস্তিত্ব নিয়ে এদের দুর্ভাবনা। এই দলে আছে ডাফল-কোট-পরা গম্ভীর ও মধ্য-বিত্তের দল। আছে গীটার বাজিয়ে, যৌবনের উচ্ছলতভরা লোক। মাথায় অল্প ছিট এমন লোকও এ দলে আছে, কেউ দাড়ী রাখে, কেউ উদ্ভট পোষাক পরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

ওই বোমার প্রতিবাদে অল্ডার-মাস্টন মার্চ। ছেলে বুড়ো, যুবক যুবতী কদম কদম এগিয়ে চলেছে। মা বাচ্চাকে প্র্যামে শুইয়ে এগিয়ে চলে, ভাল করে হাঁটতে শেখেনি এমন ছেলেকে নিয়ে বাবা ধীরগতিতে এগোয়। প্রিয় কুকুর বেড়ালকে ঘরে ফেলে রেখে যেতে কারও মন সরেনি। তাই তাদের নিয়ে চলেছে প্রসেশনে। প্রথম বছর শোভাযাত্রা যায় ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে অল্ডারমাস্টন। ট্রাফলগার স্কোয়ারে সভার দিন চমৎকার আবহাওয়া। চার দিন ধরে যাত্রা। পর দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়ল, এলো ঝড়-বৃষ্টি শেষে তুষারপাত। অনেকের তেমন গরম পোষাক নেই তবু দমে যায়নি। গীটার থেকে গড়িয়ে পড়েছে জল আর বরফের কুচি তাই বলে বাজনা থামেনি। দলে দলে গেয়ে চলেছে পথ চলার সঙ্গীত। আশ্চর্য এদের সংযম এবং শৃঙ্খলা। কোন প্রতিষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি। পথে এক অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার হামলা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু যাত্রীদল নির্বিরোধ। স্কুলে বা চার্চ হলে রাত কাটিয়ে যখন পরের দিন যাত্রা করেছে একটা কাগজের কুটো পর্যন্ত পথে পড়ে থাকেনি। সব পরিষ্কার করে তবে পথে নেমেছে। মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। তারা গেয়েছে জীবনের সঙ্গীত। বলেছে মনুষ্যত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

* Published by
Weidenfeld & Nicolson.
20, New Bond St.
London W.I.

'প্যাকেজ' পরিকল্পনা

বার্তাবাহক

['প্যাকেজ' পরিকল্পনা ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। অধিক ফসল উৎপাদনে এবং দেশের একটি বৃহৎ সমস্যা সমাধানে এই পরিকল্পনাটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দেশের কৃষক সম্প্রদায় সানন্দে গ্রহণ করছে এই পরিকল্পনার উজ্জ্বলময় ভবিষ্যতকে।]

বিহারের শাহাবাদ জেলার কিষাণপুরা গ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নীরব পরিবর্তন চলছে, সেই পরিবর্তনের ছাপ গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও পড়েছে। এই গ্রামেরই কৃষক জয়রাম তেওয়ারীর মধ্যেও সেই আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে যা সহজে নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। চল্লিশের প্রান্তে উপস্থিত হয়ে এই প্রৌঢ় কৃষকের আজ একটা কথা বলার আছে। সেকথা শুধু জয়রামের একার নয়, গ্রামের মোড়ল কীর্তানন্দ তেওয়ারী থেকে আরম্ভ করে সামান্য কৃষক পর্যন্ত প্রত্যেকেরই,

শাহাবাদ জেলার একজন প্রসার-কর্মী ভুট্টার জন্য প্যাকেজ পরিকল্পনা অনুসারে চাষ শিক্ষা দিচ্ছেন।

সেকথা গ্রামের কৃষকদেরই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাহিনী।

দেশকে গড়ে তোলার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। আর চলেছে সেই পরিকল্পনার সার্থক রূপদানের প্রচেষ্টা। কিষাণপুর তার থেকে বাদ পড়েনি। মাত্র গত এক বছরে এই গ্রামকে 'সামগ্রিক কৃষি জেলা পরিকল্পনা', যা আজকাল 'প্যাকেজ পরিকল্পনা' নামেই বিশেষ পরিচিত, তার অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যে সাতটি জেলাকে এই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা হয়—শাহাবাদ তারই একটি। এই পরিকল্পনায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকদের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কোন ধারণা ছিল না। ধারণা ছিল না কেমন করে ফসল বাড়ান যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়রাম এবং তারই মত ঐ গ্রামের আরও জন-কুড়ি-বাইশ কৃষককে গত এক বছরে উন্নতপ্রথায় চাষ-আবাদ পদ্ধতির শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে মোটালাভের পথও।

॥ ফসল বোনার নতুন রীতি ॥

প্যাকেজ পরিকল্পনার জন্য যে প্রসার (কৃষি) কর্মীর দল গ্রাম পরিদর্শনে যান তারা গ্রামের চাষীদের কাছে নতুন রীতিতে ফসল বোনার ওপর খুব ঝোঁক দেন। এবং নতুন রীতিতে ফসল-বোনা সম্পর্কে কৃষকদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে হাতে-কলমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তারা বিশেষকরে এই কথাই বলেন যে, রবিখন্দে প্রচলিত ধারায় গম এবং ডালের অর্থাৎ ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের মিশ্র চাষ না করে ভালো। সেচের ব্যবস্থায় গম এবং ডালের চাষ করা উচিত। আর খরিফখন্দে প্রথম জলদি আলুর চাষ করে পরে পেঁয়াজ এবং ভুট্টার চাষ করা উচিত। সেই অনুসারে চাষ করে কৃষকরা হাতে হাতে ফল পায়। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে এবং আরও দ্বিগুণ হয়। কৃষকরা সানন্দে এই ফসল বোনার নতুন রীতিকে স্বীকার করে নেয়। কারণ এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পায়।

এর আগে কৃষকরা খরিফখন্দে সেচ করা ধানের ক্ষেতে সামান্য পরিমাণ 'এমোনিয়াম সালফেট' ব্যবহার করত। কিন্তু এখন তারা ভাল ফসলের জন্য সম-পরিমাণে সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। সরকারও এবিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করেছেন। সার সরবরাহ করে কৃষকদের নিয়মিত সাহায্য করা হয়। এবং সে সার কিভাবে

ক্রমশঃই বেশী সংখ্যক কৃষক উন্নত প্রথায় চাষ করার রীতি গ্রহণ করছে। ছবিতে এইরূপ একজন কৃষককে মাঠে চাষ করতে দেখা যাচ্ছে।

ব্যবহার করলে উপযুক্ত ফল লাভ হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই জেলায় গত এক বছরে সারের ব্যবহার বেড়ে গিয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফসফেট ঘটিত সারের চল খুব বেড়ে যায়, আগের বছরের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়। মিশ্রসার এবং পটাশের চল এ অঞ্চলে একেবারে ছিল না বললেই চলে কিন্তু এখন থেকে চাষীরা জমিতে এই সার প্রয়োগের শুভপ্রথা এই প্রথম গ্রহণ করল বলা চলে। গ্রামের বহুমুখী সমবায় সমিতি বর্তমানে এই সব কৃষকদের নতুন সভ্য করে নিয়েছে এবং বীজ ও সার কেনার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ঋণও দিচ্ছে।

।। উৎপাদন বৃদ্ধি ।।

আরও অনেকের মতই জয়রাম তেওয়ারী আগের বছরে যে জায়গায় ১০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারত সেই জায়গায় ২৬ মণ ধান উৎপাদনে সক্ষম এবং ১০০ মণ দেশী আলুর বদলে ৩০০ মণ 'আপ-টু-ডেট' আলু উৎপাদন করে। শাহাবাদ জেলার প্রায় দু হাজার গ্রাম 'প্যাকেজ' পরিকল্পনার আওতায় আসার ফলে বিবাণপুরার মতন পরিবর্তন সর্বত্রই দেখা দিয়েছে। আজ ৩৫০০ কৃষক পরিবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে এই পরিকল্পনায়।

উৎপাদন বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হয় কৃষকদের মনে একটি প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা। তাই সামগ্রিক কৃষি জেলা পরিকল্পনা বিশেষ জোর দেয় কৃষি-প্রদর্শন ব্যবস্থার ওপর। এই উপায়েই কৃষকদের মনে দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি করা যায় যে চিরাচরিত প্রথায় চাষ করার চেয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করা কত ভাল। গত বছরে এই জেলায় ধান-চাষের উপর মোট ১৪৫৫টি এবং গম ও আলু ইত্যাদি অন্যান্য শস্যের উপর যথাক্রমে ১৪৯৯ এবং ১৪১৭টি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

।। উন্নত প্রথায় চাষ ।।

উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন এবং জমির ফলন বৃদ্ধির প্রথম ধাপ উন্নত বীজ ব্যবহার। এই উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এই জেলায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। শুধুমাত্র গমের জন্য উন্নত বীজের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ১৫১৭ মণ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৬১-৬২ সালে ৪৫৬০ মণের কাছাকাছি হয়। আর উন্নত জাতের বীজ আলুর ব্যবহার ৪৮৫ মণ থেকে বেড়ে গিয়ে ৩৫৮০ মণে দাঁড়ায়।

মাটিরও দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। ক্ষেতের মাটি পরীক্ষার নানারকম সুবিধাজনক দিকটাও শাহাবাদের কৃষকদের আকৃষ্ট করে। বহু কৃষক তাঁদের জমির নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেদের জমির গুণাগুণ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পেরেছে। এ পর্যন্ত মোট প্রায় ১৮৬০টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল জমির মাটি পরীক্ষার জন্য। এর মধ্যে ৬১৪টি বিধিসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার ফলাফল কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটামুটি গ্রামের সকলের ফসলই কীট ও রোগের আক্রমণ থেকে ভালভাবে রক্ষা পায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে, কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের ১৩,০০০ পাঃ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৬২ সালে ৫২,০০০ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছে।

।। প্রয়োজনীয় ঋণদান ।।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণদান বিশেষ প্রয়োজন। এই ঋণের পরিমাণও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬১-৬২ সালে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ হিসাবে ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। আগের বছরে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ টাকা। আবার পূর্বের দুই বছরের দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকার জায়গায় ৬ লক্ষ টাকা নাতিদীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সতেরটি কৃষি-বাজার সমিতিও স্থাপিত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য গুদামঘরের বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ ২৩টি গুদাম ইতি-মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ৩৫টি নতুন গুদামঘরের নির্মাণকার্য চলেছে এবং ৩১টি ভাড়া লওয়া হয়েছে।

প্যাকেজ পরিকল্পনা বিবাণপুরার মতন সমস্ত গ্রামে গ্রামে কৃষকদের কাছে নতুন পথ দেখাচ্ছে—কি উপায়ে কৃষির উন্নতি করা যায়, কিভাবে আয় বাড়িয়ে তোলা যায়। জয়রাম তেওয়ারীও বলে—"আমি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি। আমি জানি যে, কৃষির উন্নতি করতে পারলে আমি আমার এই সাড়ে চার একর জমি থেকে অনেক বেশী আয় করতে পারব।"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ লাইন ॥

কথাটা বললে বিশৃঙ্খলা চাইছি বলে ডিসিপ্লিনভক্ত সভ্য নাগরিকেরা আমার ওপর বিরক্ত হতে পারেন এবং আমাকে কলকাতায় বাসের অনুপযুক্ত বলে গ্রাম দেশে ডেরা বাঁধবার বিনামূল্যে উপদেশও দিতে পারেন, তবু নিঃসঙ্কোচে বলব, লাইন দেওয়া ব্যাপারটা আমি আমার মানসিক আভিজাত্য বোধের জন্যেই একটুও পছন্দ করি না। অবশ্য সামান্য চাল ডাল কেরোসিনের জন্যে বাংলাদেশের অভাবী মানুষকে একদিন যে কারণে রাতজেগে লাইন দেওয়াটা মেনে নিতে হয়েছিল, হাঁ মাত্র সেই কারণেই এই কলকাতায় আমিও লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি। এবং এও সগর্বে বলি যেখানে লাইনে দাঁড়ানো ব্যাপারটা থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে হলে, নিজের চাহিদা বা শখকে খুব বেশী বিসর্জন দিতে হয় না সেখানে আমি সর্ববিধ লাইন এড়িয়েই চলি।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমারই বা লাইন দেওয়ার ব্যাপারে এবংবিধ বীতরাগের হেতুটাই বা কি থাকতে পারে? সমাজটা যখন সুশৃঙ্খলভাবে নানা আইনের বেড়া-জালে চলে যাচ্ছে স্বয়ং মনুর আমল থেকেই, তখন আইনমাফিক যদি সব কিছু হয় তাতে ক্ষতি কি। এই ধরুন, বোম্বের মত এখানকার ট্রামে বাসেতে যদি এই লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে অনর্থক গুঁতোগুঁতির হাত থেকে শরীর আর পোষাক কি খাসাই না বাঁচানো যায়। বলতে গেলে, লাইন মানেই সাম্যবাদ। গায়ের জোর আর পয়সার জোর দুটোই কেমন লাইনের শাসনে দুর্বল। অবশ্য এ'দের এই যুক্তির মধ্যে সত্যতা অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু তবু ইতিমধ্যেই যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত লাইনস-ম্যান হয়ে উঠেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন লাইন দিয়ে জেতাটা গায়ের জোর বা পয়সার জোর যাদের নেই, তাদের পক্ষে রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। তবু লাইন দেওয়ার সমর্থকদের আমি সে যুক্তিও দেব না।

আসলে আপনি আমি সকলেই জানি এই লাইন দেওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করেছে মানুষের সবচেয়ে শত্রু যুদ্ধ। তাই এই একটা কারণেও বটে লাইন দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই সর্বনেশে প্রভাবের দিনগুলো। আর তখনই ডিসিপ্লিনভক্ত বন্ধুদের লাইন দেওয়ার যুক্তির বিপক্ষে আমায় মানসিক আবেগেই বলতে হয়, বন্ধু লাইন মানে শৃঙ্খলা নয়, লাইন মানে অভাব, হাহাকার। ম্যালথাস বলে এক ভদ্রলোকের শিষ্যরা যখন তাই বলেন মানুষ কমাও, তা না হলে ভোগ্যপণ্যের জন্যে কামড়া-কামড়ি করতে হবে, তখন আমি ভাবি, অধিকাংশ পণ্য বণিকের ঘরে তুলে দিয়ে, উচ্ছিষ্টের জন্যে আমাদের লাইন দেওয়ালে তাতে মনে হতে পারে আমরা কি সভ্য, আমাদের কি সুন্দর শৃঙ্খলাবোধ, কিন্তু তাতে আমাদের প্রাণও বাঁচে না, মানও বাঁচে না। লাইন দেখলেই তাই ভাবি কেন এত যানবাহন কম, কেন এত কম চিত্র-গৃহ, কেন ট্রেন ছাড়বার একঘন্টারও আগে আমা'কে মাত্র শ্রীরামপুর যাবার জন্য সুবার্বান টিকিট ঘরের জানলায় দাঁড়াতে হবে; কেন যেখানেই চোখ চেয়ে দেখি সেখানেই দেখব অজগরের মত দীর্ঘ এক লাইন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে ভাগ্যিস আমাকে সিনেমা হাউসের টিকিট ঘর থেকে লাইন করে পথে নামতে হয় না! তা হলে হয়ত সত্যজিতের ছবি দেখার আশাই আমাকে ছাড়তে হত। এতদিন ধরে যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে আসছেন এবং যে হারে অর্থনীতির কাঁটাটা এগোচ্ছে তাতে করে মরবার আগে পর্যন্তও লাইনে দাঁড়াবেন (বা মরেও হয়ত পোড়াবার জন্যে নিমতলায় অপেক্ষা করবেন) তাঁদের প্রত্যেকের বুকে কান পেতে শুনলে এটাই শোনা যাবে, এ কাঙালপনা চাইনে, চাইনে। সাতাশী নয়া পয়সা পর্যন্ত বরাদ্দ করে চিত্ররসিক যে বন্ধু সাতাশী নয়া পয়সা ফুরোতে সংনিশ্বাসে লাইন ছাড়লেন, তার জন্যে অবশ্য আমি লাইনকে দায়ী করছিনে, তবু মনে হল এই অস্বস্তির হাত থেকে পরিত্রাণের রাস্তা লাইনে নেই।

আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে তাই অভ্যস্ত হচ্ছি, যেমন অভ্যস্ত হচ্ছি আমাদের দিনের পর দিন আর্থিক অবনতিতে অদৃষ্টবাদীর মত। এ কেন, এ প্রশ্ন তোলার দায় চুকিয়ে দিয়েছি আমরা। এই বুঝি নিয়ম। লাইনে ছাড়াও ভাগ্যে থাকলে মিলবে প্রার্থিত বস্তু, নচেৎ নয়।

এই প্রসঙ্গে, এই কিউ ব্যবস্থার জনক বৃটেন দেশের মানুষদের এই ব্যবস্থার দাপটে কি হাল হয়েছিল, তারই একটা কৌতুককর ঘটনা নিবেদন করছি। ঘটনাটা ওদের দেশের কাগজেই বেরিয়েছিল ১৯৪৫-এ।

মিসেস অ্যালবার্ট ট্রট বলে এক ভদ্রমহিলা শাকসব্জী কিনে বাড়ী ফিরে দেখলেন দরজাটা বন্ধ। তিনি কিছু না ভেবেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মিসেস উইলকস এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তখন পোনে [illegible] হবে। সাড়ে বারটার সময়ে মিসেস [illegible] [illegible] এলফি কোন একটা [illegible] [illegible] কেনবার জন্যে লাইন [illegible] [illegible] পাশে ফিরল। মাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েও মায়ের পেছন পেছন দাঁড়িয়ে পড়ল।

হ্যাঁ যা ভাবছেন ঠিক তাই সন্ধ্যে সাড়েছটা পর্যন্ত বাড়ীর কর্তাটি ফিরলেন, তখন এলফির পেছনে লাইন করে দাঁড়িয়ে অনেক নারী পুরুষ এবং সেই লাইনে প্রতিবেশিনী মিসেস উইলকসও, মিঃ ট্রটের অন্য একটা কিউয়ের পাল্লায় বাড়ী ফিরতে বেশ কিছুটা দেরী হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু নিজের বাড়ীতে ঢোকবার জন্যে বউ তার লাইন দিয়েছে দেখে মিঃ ট্রটের চোখ ত ছানাবড়া। নিজের বাড়ীতেও লাইন করে ঢুকতে হবে; এটা আবার নতুন নিয়ম হল নাকি, তাহলেই ত' গেছেন মিঃ ট্রট!

যাক শেষ পর্যন্ত মিঃ ট্রট সস্ত্রীক, সকন্যা ত বাড়ীতে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। সেই ও'রাই কিন্তু কয়েকঘন্টা পরে শোবার ঘরের জানলা থে'ক দেখলেন ওদের বাড়ীর সামনের লাইনটা শুধুমাত্র সরে গেছে পাশেই একটা ল্যাম্পপোস্টের সামনে।

না, এই মজার গল্পটা আমার লাইন দেওয়ার অভ্যাসকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে কোন উদ্ধৃতি নয়, কলকাতায় রাশিয়ান সার্কাস দেখবার জন্যে এক লাইন ভেঙ্গে অন্য লাইনে টিকিট পাবার জন্যে ছুটো-ছুটি করতে গিয়ে ঘোড়ার লাথি খাবার ভয়ে পা মচকে দু'মাস বিছানায় পড়ে থাকার যন্ত্রনার কথাও তুলব না।

শুধু বলব, পূর্ব রেলের মস্তবড় ইংরাজী অক্ষরে লিখে কিউ দেবার অভ্যাসের আপাততঃ পরামর্শ আপনি কানে নেবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমাদের কর্তব্য ত' আমরা করছি, তোমাদের কর্তব্য তোমরা কর। আমাদের সুখ সুবিধার প্রতি একটু যত্ন দিলে, তাতে আখেরে 'ট্রেন বলে জিনিষটার প্রতি যে অশ্রদ্ধা আমাদের জন্মেছে, তা অনেক কমে যাবে।

আপনাদের কাছে, আপনারা যাঁরা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের নিয়ন্তা, আমার মত অনে'কর হয়েই একটাই মাত্র নিবেদন রাখছি, আপাততঃ আমরা লাইনে দাঁড়াচ্ছি, না দাঁড়িয়ে উপায় নেই বলেই কিন্তু দোহাই আপনাদের, এমনই অবস্থার সৃষ্টি করুন এদেশে যেন লাইনে দাঁড়ানোর হাত থেকে আমরা অব্যাহতি পাই চিরদিনের জন্যেই, বুঝতে পারি, বেঁচে থাকবার জন্যে আমার দেশে কাঙালপনার দিন কবেই ফুরিয়েছে!

আরমানি দূত পিদ্রু

শোভনলাল বাগচী

কোম্পানীর রাজনীতিতে আকস্মিক-ভাবে এসেছিল আরমানি বণিক পিদ্রু। মিলিয়েও গেল আকস্মিকভাবে। কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখলে না। অথচ সে-ই সমস্ত চক্রান্তের নির্বাক সাক্ষ।

আরমানিরা বহু বছর আগে এসেছিল কলকাতায়. ইংরেজদেরও আগে। ব্যবসা-পাতি করত। শান্তভাবে থাকতো। এই আরমানিদের সর্দার ছিল পিদ্রু। সবাই তাকে সম্মান করত। সুবা বাংলার রাজ-ধানী তখন মুর্শিদাবাদ। তাই ব্যবসায়ী পিদ্রুর সম্পর্ক কলকাতার সঙ্গে যেমন ঠিক তেমন মুর্শিদাবাদের সঙ্গেও। মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে তখন আর-মানিদের বড় আড্ডা। ১৭৫৮ সালে সৈদাবাদের আরমানি গির্জাটা তৈরী করেছিল পিদ্রু।

যাই হোক, সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিল ফলতায়। নৌকোয় থাকে গোরা সাহেবরা। নবাবের ভয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে না গ্রামের লোক। রোগে আর অনাহারে প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে গোরাদের। এই দুঃসময়ে ইংরেজদের পাশে অযাচিতভাবে এসে দাঁড়াল আরমানি বণিক পিদ্রু আর নব-কেষ্ট—পরে যিনি হলেন শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ।

তারপর চুপচাপ। রাজনীতিতে পিদ্রুর আর দেখা নেই। আবার ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের বিবাদ পাকিয়ে উঠল।

১৭৫৭ সালের ২৫শে জানুয়ারী পিগট চিঠি লিখলে ক্লাইভকে : "ফরাসীদের মধ্যস্থতা না মেনে নবাব আমাদের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে চায়। তাই নবাবের প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে আরমানি বণিক পিদ্রুকে পাঠিয়ে ছিল"...... ইত্যাদি। দূতের কাজে পিদ্রুর এই প্রথম আবির্ভাব।

দূতের কাজে আরমানিরা পাকা। নবাব-বাদশার আঁতি-পাতি খবর তাদের নখ-দর্পণে। বাজারের হাল-চাল জানা খুব ভাল ভাবেই। দূতের কাজে আর-মানিদের বিশ্বাস করা যায়। সুরেম্যান যখন দিল্লীর দরবারে গেল, তখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল এই আরমানিকেই। আশা করার যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে পেয়েছিল অবি-শ্বাস্য রকমের সুফল। দূতের কাজ তাই আরমানিদের বিশ্বাস করে গোরা ইংরেজ।

১৭৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ আবার পাঠায় পিদ্রুকে ইংরেজদের কাছে।

পরের দিন কোর্ট উইলিয়মে যে চিঠি লেখে ক্লাইভ তার শুরুতেই ছিল : "পিদ্রু নবাবের কাছ থেকে চিঠি ও উপহার নিয়ে এসেছে। আমি তার কাছে আমাদের প্রস্তাব পাঠাতে চাই। সুতরাং আপনারা তাড়াতাড়ি প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দেবেন।"

কিন্তু এর পরই নাটকের আরম্ভ। ১৭৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হুগলী থেকে দশ ক্রোশ দূরে বসে ওয়াটস এই চিঠি পাঠাল কর্নেল ক্লাইভকে : "পিদ্রু আর দু'জন ভদ্রলোককে আমিও চুঁচুড়ায় পাঠাই। আমি খবর পেয়েছি যে ফরাসীরা নৌকোয় মাল বোঝাই করছে। নৌকোতে যদিও ঝুড়ি, তুলো, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্র আছে, কিন্তু তা লোক ঠকা-বার জন্য ওপর ওপর সাজান। নৌকো কামানের বারুদে ভর্তি।"

১৭৫৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিলেতে সিক্রেট কমিটিকে দীর্ঘ চিঠি লিখে ক্লাইভ জানাল যে, "আরমানি বণিক পিদ্রু নবাবের চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। পিদ্রু আমাকে বলেছে যে, নবাব কলকাতায় আসবে না।......... তবু পরের দিন, ৬ তারিখে, নবাব আসে দমদমে। আমাদের কাছে নবাব আবার পিদ্রু আর রঞ্জিত রায়কে পাঠায়।" তার-পর সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কথাবার্তা হয়। কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে রঞ্জিত রায়ের। কারণ রঞ্জিত রায় হল শেঠবাড়ির প্রতিনিধি। আর এই সন্ধির সর্তে শেঠবাড়ির স্বার্থ ছিল গভীরভাবে জড়িত।

১৭৫৭ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে মুর্শিদাবাদ থেকে ওয়াটস লিখল ক্লাইভকে, "দু'দিন আগে মীরজাফর খুব গোপনে খোজা পিদ্রুকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। মীরজাফর বলে পাঠিয়েছে যে দরবারের সবাই নবাবকে অপছন্দ করে। নবাব প্রত্যেককেই অপমান করে। মীরজাফরের ত দরবারে যেতেই ভয় করে। কারণ মনে হয় দরবার থেকে তিনি বোধ হয় আর ফিরবেন না। তাকে খুন করা হবে। তাই তিনি সব সময় সৈন্য-বাহিনীকে তৈরি হয়ে থাকার হুকুম দিয়েছেন। তাঁর ছেলেও থাকে সবসময় প্রস্তুত হয়ে। তাঁর ধারণা এই দু' মাস সন্ধির সর্তগুলি পালন করবে না। মোহনলাল এখন অসুস্থ। সে ভাল হয়ে উঠলেই এবং পাটনা থেকে আর কিছু সৈন্য এসে পড়লেই নবাব আমাদের আক্রমণ করবে। মীরজাফর তাই পিদ্রুর কাছে বলে পাঠিয়েছে যে, যদি আমরা রাজী থাকি তবে সে, রহিম খাঁ, রায়দুর্লভ আর বাহাদুর আলি খাঁ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে এবং নবাবকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য আর একজনকে করতে পারে নবাব।"

১৪ই মে তারিখে ওয়াটস একটা চিঠিতে ক্লাইভকে জানায় যে, পিদ্রুকে সঙ্গে নিয়ে সে মীরজাফরের বিশ্বস্ত বন্ধু ওমর বেগের সঙ্গে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছে।

উমিচাঁদ ইতিমধ্যে নাটকে এসেছে। উমিচাঁদ একটা চিঠি লেখে পিদ্রুকে : "উমিচাঁদ পিদ্রুকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আমি ওয়াটসকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, যতক্ষণ আমি আসতে না বলছি ততক্ষণ ইংরেজরা যেন না আসে। এখন আপনার স্বার্থ আর আমার স্বার্থ অভিন্ন। সুতরাং আমাদের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং সেই মত কাজও করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধু (অর্থাৎ ওয়াটস) যদি যাত্রা না করে থাকেন তবে তাঁকে আরও কিছু দিন আটকে রাখবেন। কারণ এখানে সব ব্যাপারের এখনও মীমাংসা হয়নি। পরে আমি আপনাকে সব জানাচ্ছি। আপনি সমস্ত ব্যাপার বোঝেন খুব ভাল করে। সুতরাং বেশি লেখা বাহুল্য মাত্র। আমাদের সার্থকতা নির্ভর করছে আমাদের দু'জনের ওপর। আমার কিন্তু সব ভরসা আপনিই।"

উমিচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে নিজের অবস্থা পাকা করা। পিদ্রু উমি-

চাঁদকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ছিল ইংরেজদের একান্ত অনুগত। পিদ্রু এই চিঠিটা ওয়াটসের হাতে তুলে দেয়। ইংরেজদের কাছে উমিচাঁদের অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে আর তার ফল উমিচাঁদকে পেতে হ'ল জাল সন্ধিপত্রে।

১৫ই জুন তারিখে ক্লাইভ লেখে, "কাল রাত্রে আমি কাটোয়ায় এসেছি। আমার সিপাইরা হেঁটে আসছে। তারা খুবই ক্লান্ত। আমি আজকেই মূলাজোড় যাবো। সেখানেই কামানগুলো খালাস করব। দিন-দুয়েকের মধ্যে আমি অগ্রদ্বীপ পৌঁছাব। মিঃ ওয়াটস তার লোকজন নিয়ে কাল বিকেলে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার সঙ্গে আছে পিদ্রু। ওরা ১৩ তারিখ রাজধানী ছেড়েছে। ওরা আমাকে বললে যে, মীরজাফরের দল দিন দিন বাড়ছে।"

২৩শে জুন। মীরজাফরের চিঠি এল ক্লাইভের কাছে। মীরজাফর লিখল : "আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার শর্ত আমি পড়েছি। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক। ওমর বেগ, ওয়াটস অথবা পিদ্রুকে আমার কাছে পাঠান।......"

পলাশীর চক্রান্তে পিদ্রুর ভূমিকা এখানেই শেষ। কিন্তু এই চক্রান্ত থেকে কিছু লাভ করতে পারেনি পিদ্রু। সে উমিচাঁদের মত পাগল ও বেয়াকুব হয়নি। ১৭৫৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে দীর্ঘ ও করুণ চিঠি পাঠায় সে।

সে দীর্ঘ চিঠিতে পিদ্রু ব্যাকুলভাবে তার ইংরেজ সেবার ইতিহাস আবার জানাল বিলেতের সাহেবদের কাছে। পিদ্রুর আশা ছিল সে বিলেত থেকে সুবিচার আদায় করে আনবে।

পিদ্রু এই বলে চিঠি শেষ করল : "আমার আর আব্রাহাম জেকবের অসাধারণ পরিশ্রমের সুফল আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজকে কলকাতা শান্ত। কিন্তু সেই সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজ পরিবারের দুঃখ লাঘব করতে আমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছি, যে বিপদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, যেমন ভাবে সুন্দর বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছি, তার বিনিময়ে আমি পেয়েছি নীরব উপেক্ষা। আজ আমার বন্ধু আব্রাহাম জেকবের অবস্থা আমার মত। সে আজ অসুস্থ। কিন্তু কোম্পানীর কাজের জন্য আমরা নিজেদের তরফ থেকে যে ব্যয় করেছি তা অবধি আমরা পেলাম না।" পিদ্রুর মিনতি এখনও শেষ হল না। অথচ পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পর নৌকোর পর নৌকায় ধনরত্ন সাজিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে গোরারা এসেছে কলকাতায়। ভাগ করে নিয়েছে। চোখের সামনে দেখেছে পিদ্রু। কোন সরিকানা নেই তার সেই লুণ্ঠনে। অথচ পলাশীকে সার্থক করে তুলতে সে ত কম বিপদের ঝুঁকি নেয় নি। বিশ্বাসভঙ্গ করে ঠকল উমিচাঁদ আর বিশ্বস্ত থেকে ঠকল পিদ্রু। পিদ্রু তাই করুণ সুরে আবেদন জানাল বিলেতে,

"....Hope you will consider me worthy of the gratuity to have some post in your Honour's Service conferred on me."

এ চিঠির কোন উত্তর পায়নি পিদ্রু। তবু ইংরেজদের সেবা করেছিল পিদ্রু।

আর একবার যখন মুকুট মোচন যজ্ঞ হয়; মীরজাফরের মাথা থেকে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে যখন বসান হল মীরকাশিমের মাথায় তখনও এগিয়ে এসেছিল এই আরমানি বণিক।

কিন্তু শেষ পুরস্কার পেতে বেশি দেরি হয়নি তার।

১৭৬৩ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে কলকাতা কাউন্সিলের মিটিংএ ব্যাটসন অভিযোগ করল :

"আমাদের প্রতি নবাব মীরকাশিমের জঘন্য মনোভাব দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক জানে যে, আরমানি বণিক পিদ্রু হল নবাবের গুপ্তচর। তাই মিঃ ব্যাটসন প্রস্তাব করছেন যে, তাকে এবং তার পরিবারের সবাইকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।"

এই প্রস্তাবকে ভোটে দেওয়া হয়। কাউন্সিলের সমস্ত সভাই এই প্রস্তাবের ওপর নিজেদের মতামত জানায়। ওয়াটসও কথা বলে। পিদ্রুর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয় ওয়াটসের। কিন্তু এই ওয়াটসও বলে, "পিদ্রু লোকটা বড়ই কুচক্রে। এই কাজেই সে হাত পাকিয়েছে। আমাদের আর সিরাজের মাঝখানে থেকে সে গুপ্তচরের কাজ করেছে। সে একবার এই গুজব ছড়ায় যে, ক্লাইভ ছোট নবাবকে (মীরণকে) খুন করার কথা ভাবছে। এই গুজব ছড়াবার জন্য ক্লাইভ তাকে আগে একবার কলকাতা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। তাই আমার মনে হয় তাকে কলকাতা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া দরকার।"

কিন্তু সেবার কলকাতা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া গেল না। প্রেসিডেন্ট জানাল যে, এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পিদ্রু হল একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। এই করেই তার দিন চলে। কোম্পানী যদি স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ওপর প্রভুত্ব করতে যায় তবে বাজারে তাদের বদনাম হয়ে যাবে। অন্য ব্যবসায়ীরা তাদের বিশ্বাস করবে না। তাই পিদ্রুকে শুধুমাত্র এই হুকুম দেওয়া হল যে, সে আর নবাব মীরকাশিমের উকীলের কাজ করতে পারবে না।

সে যাত্রা বিপদটা কেটে গেল অবশ্য। কিন্তু বেশি দিন আর সুস্থির হয়ে থাকতে পারেনি পিদ্রু। ১৭৬৩ সালে মীরকাশিমের সঙ্গে বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল। মেজর এডামস আবার অভিযোগ আনল যে, পিদ্রু নবাব মীরকাশিমের গুপ্তচর। এই অভিযোগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে, পিদ্রুর ছোট ভাই গার্গিন খাঁ হল মীরকাশিমের বড় সেনাপতি। গার্গিন খাঁ বা নবাবের অন্যান্য আরমানি সেনাপতিরা ইংরেজ বন্দীদের ওপর অত্যাচার করতে পারে। যুদ্ধ যখন হচ্ছে তখন সে সম্ভাবনা আছে। তাই এডামস প্রস্তাব করল যে, পিদ্রুকে বন্দী করে রাখা হোক। পিদ্রু যদি বন্দী হয়ে থাকে তবে গার্গিন খাঁ তার বড় ভাই-এর প্রাণরক্ষার জন্য অন্তত ইংরেজদের খুন করবে না। এডামসের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। পিদ্রু হল যুদ্ধ-বন্দী।

১৭৬৩ সালের ৩রা অক্টোবর মেজর আবার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখল : "কাল আমি খবর পেয়েছি যে কয়েকজন মোগল সৈন্য মাইনে পায়নি বলে বিদ্রোহ করে এবং এই বিদ্রোহে গার্গিন খাঁ আহত হয়। শত্রুপক্ষ থেকে এক হরকরা এসে এই মাত্র আমাকে জানাল যে ছোরা আঘাতের ফলে গার্গিন খাঁ আজকে মারা গেছে এবং এই সঙ্গে প্রায় চল্লিশজন মোগল সৈন্যও মারা যায়। এই খবর যদি সত্যি হয়, তবে পিদ্রুকে যুদ্ধবন্দী করে আমাদের কাছে রেখে আর কোন লাভ হবে না। তাই আমার মনে হয় যে তাকে এবার কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। যাই হোক এই বিষয়ে বোর্ডের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছু করব না।"

পিদ্রু ছাড়া পায় এবং কলকাতায় ফিরে আসে। তার আর কোন আশঙ্কা ছিল না। পিদ্রু শান্ত হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে ১৭৬৩ সালেই সে কলকাতায় আরমানি গির্জাটা সংস্কার করায় এবং গির্জার ভিতরে আরো দুটি বেদী তৈরি করে। একটা করেছিল তারই ছোট ভাই নিহত গার্গিন খাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আর একটা তার নিজের জন্য।

হেস্টিংসের সঙ্গে পিদ্রুর ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। ভারতের কোম্পানীর সার্থক পরিচালক বিলাতে যখন তিরস্কৃত তখন তার অর্থাভাব হয়। সেই বিপদের সময় তার নিজের ভারতীয় দেওয়ান এক পয়সাও দেয়নি হেস্টিংসকে। কিন্তু দিয়েছিল পিদ্রু। পিদ্রু এই সময় পাঠায় বারো হাজার টাকা।

১৭৭৮ সালে মারা যায় পিদ্রু। কলকাতার আরমানি গির্জায় তাকে সমাধি দেওয়া হয়। স্মৃতি-ফলকে লেখা আছে :

"....He departed in the hope of salvation at the age of fifty three and was placed in this tomb with pomp in the year of our Lord 1778. the 29th of August, and in the year 163 of the era of Azaria, the 12th day of the month of Nadar."

আকস্মিকভাবে এল পিদ্রু। পলাশীর চক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার পর আকস্মিকভাবেই মিলিয়ে গেল। শুধু নিয়ে গেল কিছু যন্ত্রণা আর কিছু অপমান।

হলুদ আলোর রেখা

সমরজিৎ কর

ভোরের রোদটাকে আজ অদ্ভুত হলুদ বলে মনে হোল মৃগাঙ্কের। আকাশ বড় বেশী নীল। খুবই স্বচ্ছ। আস্তে আস্তে রোদের আভা যতই পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল, তার মনে হোল জীবনের তলানিটা বুঝি এবারই নিঃশেষ হবে। বিস্তৃত আকাশের দিকে আর একবার চাইল মৃগাঙ্ক। ক্ষণিক চেয়ে চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ঘরের মধ্যে। জানলার পর্দাটা একটু সরে গিয়েছিল। তারই ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ একটা হলুদমাখানো সুতোর মত ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। পড়েছে অসীমার মুখের ওপর। অসীমা তখনও ঘুমচ্ছে। তারই ফাঁকে মৃগাঙ্কের মনে হোল অসীমা যেন বড়ই শীর্ণা। রোদটা যদি হলুদ না হোত? মন্দ কি? যদি লাল হোত? অসীমা এখনও ঘুমবে। অন্ততঃ আরও কিছুক্ষণ। ছ'টার আগে ওর ঘুম ভাঙে না।

মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট ধরালো। আরও একটা। আরও। ক'টা পুড়ল সে হিসেব সে রাখে না। শুধু ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সম্মুখে ঝোলানো আয়নাটায় নিজের মুখখানা একবার দেখল। কিন্তু নিজের কাছেই অচেনা মনে হোল তা। আর সেই আয়না থেকে যে আলোর রেখা তির্যক হয়ে ঠিকরে পড়েছিল মায়ার ছবির ওপর তার কাছে চকিতে মনে হোল সেই হলুদে আলোর মায়া যেন সত্যিই খুশী হয়ে উঠেছে তার দিকে চেয়ে।

হঠাৎ কেশে উঠল মৃগাঙ্ক। কাশির শব্দে অসীমার ঘুম ভাঙল।

—এ কি? কখন উঠলে? অমন

করে এই ভোরে বসে কেন? বিছানার উপর থেকেই কতকগুলি প্রশ্ন বর্ষিত হোল মৃগাঙ্কের প্রতি।

মৃগাঙ্ক সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল, এখনও ছ'টা বাজে নি। দশ মিনিট বাকি। আর একটু ঘুমোও।

—বয়ে গেছে আমার ঘুমতে। আগে বল তুমি এত ভোরে কেন এমন করে বসে আছ? অনুযোগের সুরে কথা বলল অসীমা।

—অমন মানে? কেমন দেখলে আবার?

—তুমি নিজেই দেখ না। আয়না তো রয়েছে সামনে।

—কই? তেমন তো কিছু চোখে পড়ছে না? একবার আয়নায় মুখ দেখল মৃগাঙ্ক।

—ইস্! একি? এরই মধ্যে পাঁচটা সিগারেট শেষ? না না। ভাল হবে না। ঐ জঞ্জাল তোমাকে ছাড়তেই হবে। তাছাড়া তোমার স্বাস্থ্য এখন মোটেই ভাল যাচ্ছে না। মা'ও কাল বলছিলেন, আমি যেন তোমাকে ও ছাই-ভস্ম খেতে না দিই।

মৃগাঙ্ক কৌটো থেকে আর একটা সিগারেট বের করার জন্যে হাত বাড়ালো। অসীমা মুহূর্তে কৌটোটা সরিয়ে ফেলল। না। আর না। মুখটা একটু গম্ভীর করল। একটু অভিমানের রেশ। মৃগাঙ্কের মাথার চুলের মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল ডুবিয়ে দিয়ে তার কাঁধের ওপর মাথা রাখল সে।

—কি হোল আবার? মৃগাঙ্ক কথা বলল।

—জিজ্ঞেস করো না। একটু যেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল অসীমা। না না। সব মিথ্যে কথা। এখনও আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ। মোটেই না। মোটেই আমাকে তুমি ভালবাস না।

এবার একটু শব্দ করেই হাসার চেষ্টা করল মৃগাঙ্ক। আয়নায় সে মুখ দেখল না। দেখলে নিজেই বুঝতে পারত হাসিটা কিন্তু কৃত্রিমই দেখাচ্ছিল। স্বরটা মধুর করার চেষ্টা করল ও। বলল, তাই নাকি? এই তথ্যই বুঝি বিয়ের এক বৎসর পর আজ ভোরে আবিষ্কার করলে তুমি?

অসীমাকে আরও কাছে টেনে নিল মৃগাঙ্ক।

—তাহলে এত ভোরে তুমি মুখ অমন করে বসে আছ কেন?

বাইরে ঠিকে-ঝিটা এতক্ষণে বোধহয় এল। উঠনে কয়লা ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মৃগাঙ্ককে ছেড়ে অসীমা দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃগাঙ্কের শক্ত বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সে পারল না।

—কি করছ এখন? আর সকলে এর মধ্যে উঠে পড়বে যে। ভাববে কি সকলে বল ত?

—ভাবুক! মৃগাঙ্ক আদর করল অসীমাকে। বলল, কেন আবোল-তাবোল আমার সম্বন্ধে ভাব তুমি, বল ত?

—তুমি কেন এই ভোরে অমন করে বসে থাকবে? অসীমা আবার মৃগাঙ্কের চুলে হাত বোলালো।

অসীমা বাইরে গেল। সম্ভবতঃ বাথ-রুমে। এই ফাঁকে মৃগাঙ্ক আর একবার মায়ার ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। ভোরের সূর্যের হলুদ আলোটা তার মুখ থেকে কখন অদৃশ্য হয়েছে। মায়ার মুখে এই কিছুক্ষণ আগেও যে মৃদু-হাসির আমেজ লক্ষ্য করেছিল, সেটা নেই। একবার উঠে এল ছবিটার সামনে। স্বচ্ছ কাচের ওপর হাতটা রাখল। সমস্ত শরীরে কেমন যেন এক রোমাঞ্চ! মায়া আর তার মধ্যে ঐ কাচেরই মত একটি স্বচ্ছ ব্যবধান রচিত হয়েছে। সব দেখছে সে। বুঝছেও সব। কিন্তু স্পর্শের মধ্যে সে কই? মনে হোল অসীমা আর সে যেন দুইটি পূর্ণ বাক্য, একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করতে। দুই-এর মধ্যে আছে শব্দসম্ভার, আছে ব্যঞ্জনা, যতি। আর এই যতির মধ্যে একটু ব্যবধান।

—আবার ভাবা হচ্ছে? পেছনে দাঁড়িয়ে অসীমা। হাতে চা'য়ের কাপ।

চমকে চেয়ে সরে এলো মৃগাঙ্ক মায়ার ছবির কাছ থেকে। অসীমা মৃগাঙ্ককে টেনে এনে চেয়ারে বসালো। এক কাপ চা' তুলে দিল তার হাতে।

মৃগাঙ্ক চা'য়ের কাপে চুমুক দিয়ে এক হাতে কাছে টেনে নিল অসীমাকে।

বলল, অদ্ভুত কিন্তু লাগছে তোমাকে অসীমা।

—ছাড়ো, সকালেই অত নভেলিয়ানা করতে হবে না। চটপট চাটা খেয়ে আমাকে রেহাই দাও। বাবার অফিসের ভাত রাঁধতে হবে। হ্যাঁ। আর একটা কথা। কালকের সেই ভদ্রলোকের কথাটা মনে আছে তো। এবার কিন্তু দায়িত্বটা আমিই নিয়েছি। ছি ছি। লেখাটা তুমি আজ সেরে ফেল, লক্ষ্মীটি। টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছ। কাগজ প্রকাশেরও দেরি নেই। অত করে তোমাকে অনুরোধ করে গেল। আমাকেও।

মৃগাঙ্ক টেবিলের ওপর ছড়ানো কলম আর কতকগুলো টুকরো কাগজের দিকে চাইল।

অসীমা চলে গেল। মৃগাঙ্ক পরিষ্কার শুনল অসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে। কি যেন কড়ায় চড়িয়েছে। হাতা নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

কাগজ-কলম নিয়ে বসল মৃগাঙ্ক। গণপতিবাবুকে পুজোর গল্পটি আজ

দিতেই হবে। ভদ্রলোককে অনেক ঘুরিয়েছে সে। তাছাড়া টাকার তারও তো দরকার। পুজো আসছে। অফিসে সে যে কাজ করে, তার আয়ে সংসার চলে না। তার ওপর পুজোর খরচ। এ-সময়টায় লিখে তাকে উপরি কিছু রোজগার করতে হয়। বেচারা অসীমা! জীবনের প্রথম অধ্যায় যে প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে, তার পক্ষে এই সামান্য অবস্থায় কি করে চালানো সম্ভব, সেইটেই ভেবে পায় না মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্কের মনে হয় ওকে যদি আরও প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারত?

না। সময় নষ্ট করলে চলবে না। লেখাটা আজ শেষ করতেই হবে। ঘণ্টা তিনেকেই শেষ হবে মনে হয়। কলম তুলে নিল মৃগাঙ্ক। দু'চোখ বুজে তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে কলমটি রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চেপে ধরল কপালের ঠিক মাঝখানে। যেটুকু লিখেছে সেটুকু মনে মনে চিন্তা করে নিল। লেখাটা গড়িয়েছে মন্দ না। মনে হয় ইন্টারেস্টিং হবে। নায়িকা তৃপ্তিকে সে মেরে ফেলতেই চায়। জীবনে যে শুধু স্বামীর কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে উপেক্ষাই পেল, বেঁচে থেকে তার কোন লাভ আছে কি? তৃপ্তির জীবনে ত্যাগ আছে অনেক। বহু বিঘ্নিত এবং লাঞ্ছিত-জীবন নিয়ে একদিন নায়ক রমেনের কাছে যখন সে এসেছিল, ভেবেছিল, রাত্রির বুঝি সমাপ্তি ঘটল। নতুন প্রভাতে নতুন সূর্য তাকে আনন্দ পথের সন্ধান দেবে। কিন্তু ভুল তার ভেঙেছে। সে বুঝতে পেরেছে রমেনকে ভালবাসা যায়, কিন্তু কাছে পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে লেখাটা জমছে। কলম দ্রুত আঁক কেটে চলেছে।

একটা খুট করে শব্দ হোল। অসীমা এসেছে। হাতে চা এবং জলখাবার। আস্তে করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে হাতের চামচটা বিকট শব্দ করে পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল মৃগাঙ্ক। কি করছ তুমি? কে এখানে গোলমাল করতে আসতে বলল। যত সব উৎপাত! বলে টেবিলে মাথা রাখল।

হাসল অসীমা। বলল, এই যে। উৎপাত সামনেই দাঁড়িয়ে। ফাঁসি দিতে হবে নাকি?

—এখন যাও রসিকতা করতে হবে না।

—না। এগুলি না খেলে যাব না। দেখছ না তোমার শরীরটা কত খারাপ হয়ে গেছে?

উঃ! এবারে যেন ক্ষেপে উঠল মৃগাঙ্ক। মুহূর্তে কলমটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তেপায়টাকে সজোরে উল্টে দিল।

মৃগাঙ্কের এ ব্যবহার বুঝি অসীমাও আশা করতে পারেনি। দীর্ঘ এক বৎসরের বিবাহিত জীবনে মৃগাঙ্ককে এত বেশী রাগতে কখনও সে দেখেনি। এটুকু সে বুঝেছিল, মৃগাঙ্ক কিছুটা খামখেয়ালী। কিন্তু রাগী বলা চলে না। তবে আজ এমন কি হোল?

মৃগাঙ্কের রাগ তখনও পড়েনি। অসীমাকে বলল, শত্রু। একেবারে শত্রু তুমি। ঠিক যখন কাজ করতে বসেছি তখনই এসে সেটাকে নষ্ট না করে দিলে হোত না? জানি। জানি। আজ যদি মায়া থাকত, সে পারত না। সে বুঝত আমার দুঃখ কোথায়।

"এই যে! উৎপাত সামনেই দাঁড়িয়ে।"

এবারে ফেটে পড়ল অসীমা। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে—কি বলতে চাও তুমি? বলল সে। লজ্জা করে না তোমার? বিয়ে করেছিলে কেন তুমি আমাকে? মায়া! মায়া! মায়া! মায়াকে নিয়ে থাকলেই তো পারতে?

—হ্যাঁ তাই থাকব! মৃগাঙ্কও বুঝি মরিয়া হয়ে উঠল। পাশে ঝোলানো জামাটা পরল। পায়ে স্যাণ্ডেল গলালো। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। অসীমা শুধু দাঁড়িয়ে দেখল। কোন বাধা দিল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফুটপাথের ওপর একবার দাঁড়ালো মৃগাঙ্ক। কোন দিকে যাবে? পকেটে হাত পুরে দেখল মাত্র কয়েক আনা পয়সা সম্বল। ধর্মতলা-গামী একখানি ট্রাম আসছিল। তার সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে পড়ল সে। গড়িয়ে যেতে লাগল গাড়ী। দু'পাশের বাড়ীঘর-গুলি ঝাপসা ছবির মত একে একে পেছনে চলে যেতে লাগল। কোন এক চার্চের পাশ দিয়ে গেল ট্রামটা। চার্চের টাওয়ার-ক্লকটার দিকে তাকালো সে। বেলা বেশী হয়নি। মাত্র আটটা। সোয়া আটটা নাগাদ এসপ্ল্যানেডে পৌঁছল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সেসঘাটে এসে একটি অশ্বত্থতলায় বেঞ্চে বসে পড়ল।

গঙ্গার উপর জাহাজের সারি। ছোট-খাটো ডিঙিগুলি এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। বেলা যত বাড়তে লাগল, জলের বুকে কর্মচঞ্চলতাও গেল বেড়ে। মধ্যাহ্নে অশ্বত্থের ছায়া ছোট হয়ে এল। পাশে এক ছাতুওয়ালা কখন পশার বিছিয়ে বসেছে। এরই মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। কুলিরা ও ঠেলাওয়ালারা গঙ্গায় স্নান সেরে তার কাছ থেকে ছাতু কিনে খাচ্ছে। ঘড়ি দেখল মৃগাঙ্ক। প্রায় বারোটা। খিদের পেট চোঁ চোঁ করছে।

চানা চাই বাবু? বড়িয়া দালমুট? পাপড়? পাঁপড়? একজন ফেরী-ওয়ালা কানের কাছে কথা বলল।

কখন বাঁ-পকেটে হাত পুরেছে মৃগাঙ্ক।

—কি দেব, বাবুজী। ফেরিওয়ালা নাছোড়বান্দা হোল।

—পেঁপে চার আনার! অস্ফুট কণ্ঠে বলল মৃগাঙ্ক।

ফেরিওয়ালা পেঁপের ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিল। মৃগাঙ্ক তার হাতে অবশিষ্ট সিকিটা তুলে ধরল।

একবার সদ্য জলে ভেজানো লাল পেঁপের দিকে তাকালো সে। জিভের জল বুঝি ঝরে পড়বে। উঃ বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তার! দুটো আঙ্গুল বাড়ালো একটুকরো পেঁপে মুখের সামনে ধরে। হঠাৎ পাশের বেঞ্চে দেখল একজন পুরুষ, একজন রমণী। বোধহয় দম্পতি। সম্ভবতঃ কলকাতা বেড়াতে এসেছে। অবাঙ্গালীই মনে হোল। টিফিন-বাক্স থেকে খাবার নিয়ে পরস্পর ওরা খাচ্ছে। চমকে উঠল মৃগাঙ্ক। পেঁপের ওপর থেকে আঙ্গুল দুটি সরিয়ে নিল। মনে পড়ল অস্পষ্ট স্মৃতিতে একখানি মুখ। মনে পড়ল এমনি করে আরও একদিন সে মায়ার ওপর রাগ করে এখানে এসে বসেছিল। নদী তার ভাল লাগে। আর ভাল লাগে জাহাজের ঐ বিচিত্র মুখগুলি। ওদেব দেখতে দেখতে কোন স্বপ্ন-রাজ্যে সে চলে যায়। অথচ সেই মায়া—! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অসীমা কি করছে এখন? মেয়েদের অত রাগ ভাল না। করলামই বা একটু রাগ। তাই বলে ও-ও মুখ ঘুরিয়ে কথা শোনাবে? শোনাবেই তো? ও তো মায়া নয়?

—বাবু! একটি বাচ্চা। বছর আটেকের। হাত পেতে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। একটু খাব। ক্ষিধে পেয়েছে। বলল ছেলেটি।

বুকের মধ্যে কোথায় যেন খচ করে বিঁধে উঠল। অসীমা কি করছে। আহা! নিশ্চয় ওর ক্ষিধে পেয়েছে খুব। ব্যাচারা! ওরই বা দোষ কি? সবই তো করে। অতবড় সংসারের কাজ! নিজেকে কি ভাবেই না সঁপে দিয়েছে! কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় মৃগাঙ্ক। না না। এ স্বার্থপরতা। ভীষণ স্বার্থপর অসীমা। আমি না হয় একটু রাগ করলামই। তাই বলে তার পালটা দিতে হবে?

—বাবু? ছেলেটির কণ্ঠে আবার সেই যাচ্ঞা!

মৃগাঙ্ক হাতের ঠোঙাটা আস্তে আস্তে ছেলেটির হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! ঠোঙা থেকে এক এক টুকরো পেঁপে কত আনন্দচিত্তেই না খেল সে!

মৃগাঙ্কের মনে হোল একটা মস্ত পাথর যেন এতক্ষণ কোথায় তার দেহে আবদ্ধ ছিল। শরীরটাকে এতক্ষণ মস্ত এক বোঝার মত মনে হচ্ছিল। এবারে সব হাল্কা হয়ে গেল।

পাশের সেই দম্পতির এতক্ষণ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওরা এখন গল্প করছে দুজনে। অপরাহ্নের ছায়া তখন আউটরামঘাট ছেড়ে গড়ের মাঠের দিকে এগোতে লাগল। মধ্যাহ্নের সেই ক্ষিধের ভাব একেবারে নেই। মৃগাঙ্ক দেখল জাহাজের মানুষগুলি কতই না কর্মচঞ্চল! কাজই যেন ওদের জীবন। এবারে মৃগাঙ্কের রাগ গিয়ে পড়ল গণপতিবাবুর ওপর। যত নষ্টের গোড়া তো সেই! লেখার জন্যে অত তাগাদা না দিলে কি ঐ ভোরে সে লিখতে বসত? লেখা! লেখা! লেখা! কি হয় লিখে? অসীমা কেন তাকে অত তাগাদা দিল? পরে লিখতে বসলেও তো হোত? না মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। ভাবতে পারে না মৃগাঙ্ক। আবার রাগ হয় অসীমার ওপর। রাগ করে সে না হয় বাইরেই পা বাড়ালো। তাই বলে সে কি মৃগাঙ্ককে চেপে ধরতে পারত না? সেকি বাধা দিতে পারত না? তাহলে কি এভাবে সারাটা দিন কাটাতে হোত?

ক্রমে সন্ধ্যে নেমে এলো গঙ্গার বুকে। রঙবেরঙী আলো জ্বলল এদিক-সেদিক। স্বামী-স্ত্রী, পরিবার, প্রেমিক-প্রেমিকা সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কি উচ্ছলতা ওদের প্রাণাবেগে, মানুষের জীবনে এত প্রাণ! এত উচ্ছ্বাস! পীচ-ঢালা রাস্তার ওপর রঙবাহারীর ভিড়। আইসক্রীম, ডালমুট, বিচিত্র খাবার। দেখতে দেখতে কখন অন্ধকার ঘন হয়ে এল, মৃগাঙ্কের মনে হোল শরীরটা যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঘড়িতে রাত আটটা। ওঃ! বারো ঘণ্টা এর মধ্যেই কেটে গেল! না। এবার উঠতে হয়। পকেটে হাত দিল মৃগাঙ্ক। হাতে কিছুই বাঁধল না। সর্বনাশ। এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

টলতে টলতে চলতে শুরু করল। রাত প্রায় ন'টায় পৌঁছলো বাসায়। কড়া নাড়ল। দোর খুলল অসীমা। মৃগাঙ্ক একবার তার মুখের দিকে চাইল। মৃদু হাসল অসীমা, বলল, চল।

মৃগাঙ্ক নিজের ঘরে বসল। সমস্ত কিছু দেখল একবার। সমস্ত কেমন গোছগাছ করা। ধূপদান থেকে ধূপের ধোঁয়া তখনও ঘরখানায় একটা মৃদু সৌরভ বিস্তার করে রেখেছিল। মৃগাঙ্ক দেখল, অসীমা গামছা, সাবান এগিয়ে দিয়েছে। সে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুলো।

ঘরে এসে দেখল, গরম ভাত আর মাংস এক বাটি। মৃগাঙ্ক মাংস ভালবাসে। সারাদিন অনাহারের পর পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি শেষ করতে সময় লাগল না। খাওয়া সেরে হাত ধুলো, পান এগিয়ে দিল অসীমা। পান খেল। সিগারেট এগিয়ে দিল। তাও ধরালো।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃগাঙ্ক খাটের ওপর বসল। অসীমা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করল।

মৃগাঙ্ক বলল, তুমি খাবে না?

অসীমা বলল, ক্ষিধে নেই।

সুরটা নরম করল মৃগাঙ্ক। রাগ এখনও পড়েনি। চলো। খাবে চলো। লক্ষ্মীটি!

না। থাক।

কিন্তু শুনল না মৃগাঙ্ক। নিজেই রান্নাঘরে গেল। হাঁড়িতে হাত দিল। আর চমকে উঠল। ভাত কই? সমস্ত বুক মুচড়ে উঠল তার।

—কাকার ছেলে মন্টু এলো একটু রাত করে। অসীমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মন্টু? ছোটকাকার ছেলে?

—হ্যাঁ। অত রাতে আর বাজারে কে যায়? থাকগে। একটাই তো রাত!

এবারে নিজেকে আর সামলাতে পারল না মৃগাঙ্ক। দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে অসীমাকে! কেন? কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দাও বলতে পার? আর ঐ। ঐ গণপতিবাবু! না! লেখা ছাড়তে হবে। মায়াকে হারিয়েছি। অসীমা! তুমিও কি আমাকে ছেড়ে—? মৃগাঙ্ক অসীমার বুকে মুখ লুকিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এল।

মুখে হাত রাখল অসীমা মৃগাঙ্কের। ছিঃ অমন কথা বলো না। দিদি স্বর্গে গেছেন। আমি তো আছি। আর তোমার কোন দুঃখ হবে না।

মৃগাঙ্ক দেখল, টেবিল-ল্যাম্পের একফালি আলো আবার নেমে পড়েছে মায়ার মুখের ওপর। মৃগাঙ্ক পরিষ্কার দেখল, মায়া এবারে সত্যিই হাসছে।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

।। নয় ।।

বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্যাভিষেকের পর বঙ্গভঙ্গ যখন নিবৃত্ত হলো, তখন ভারতের একটি শুভযুগের সম্ভাবনা সমাসন্ন। যুক্তবঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মহানগরী দিল্লী ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে মণ্ডিত হয়ে ভারতের রাজধানীরূপে অধিষ্ঠিত হলো। যদিও কলকাতা থেকে ভারতের শাসনকেন্দ্র পরিবর্তিত হলো, তথাপি উভয়বঙ্গের পুনর্মিলনের ফলে কলিকাতার মানসিক আবহাওয়ায় বিষাদের কোনও চিহ্ন ছিল না। পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারের পর যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন এখানেও জনচিত্ত বহুবিধ উৎসবের মধ্যদিয়ে প্রচুর আমোদ-উল্লাসের পরিচয় দিয়েছে। খেলাধুলা, থিয়েটার, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের আসরও কম জমকাল হয়ে ওঠেনি। কলিকাতার স্থানীয় কলাকারদের মধ্যে কৃতী স্বরোদী কৌকভ খাঁ ও দুর্ধর্ষ-গায়ক বিশ্বনাথ রাও তখন যন্ত্র ও কন্ঠ সংগীতের আসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এঁদের সংগীতানুষ্ঠানের পর আর কারও গান-বাজনা জমতো না। তবে এসময়ে ইমদাদ খাঁ সেতারী ও গয়ার বিখ্যাত খেয়ালী হনুমান প্রসাদজী কলিকাতায় নানা সংগীত-সভায় বিশেষ সমাদর অর্জন করতে পেরেছিলেন। হনুমানজী খেয়ালী হলেও এস্রাজের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সোনীপ্রসাদ এস্রাজ ও হারমোনিয়াম বাদনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঐ সময় গয়াতে এস্রাজযন্ত্রের বিশেষ চর্চা ছিল। ইতিপূর্বে কানাই ঢেড়ী গয়ায় এস্রাজযন্ত্রের বহুমুখী বাদ্যপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি এস্রাজে কন্ঠের অনুকরণে যেমন খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি বাজাতেন, তেমনই স্বরোদ ও সেতারের অনুকরণে আলাপ ও গৎকরীতেও যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ছড়ির যন্ত্রে মিজরাপ বা জবার পদ্ধতি প্রবর্তনের অনেকেই বিরোধী। বিশেষতঃ বর্তমানে এস্রাজে বা বেহালায় গান ছাড়া অন্য কিছু বাজালে অনেক সংগীত সমালোচকই অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু কানাই ঢেড়ীর পরও হনুমান প্রসাদ ও তাঁর শিষ্যগণ এস্রাজে তন্ত্রকারী পদ্ধতির নানা উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন। এঁদের মধ্যে গয়াবাসী বাঙালী ডাঃ ভেজুবাবু, বুলাকীরাম ও চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। চন্দ্রিকাপ্রসাদ আজও জীবিত আছেন। এঁরা ছড়িতে স্বরোদ ও সেতারের ন্যায়ই দ্রুত বোল প্রকাশ করতে পারতেন। কলিকাতার বিখ্যাত এস্রাজী কালী পাল স্বরোদী কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভের পর এস্রাজে স্বরোদের বোল ও বাদ্যপদ্ধতি অবিকল প্রদর্শন করে গেছেন। ভারতগৌরব আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বেহালাযন্ত্রে গায়কী তান ছাড়াও স্বরোদের দুনী বোল ও ঠোক ঝালা যথেষ্ট বাজিয়েছেন।

বৃটিশ সম্রাটের কলিকাতা আগমনের সময় মদীয় পিতৃদেব ও শীতলবাবুর সহিত গয়াবাসী এস্রাজীদের সাক্ষাৎকার ও যোগাযোগ ঘটে এবং শীতলবাবুর অনুরোধে বাবা সর্বপ্রথম হনুমানপ্রসাদের নিকট নাড়া বেঁধে সংগীতে দীক্ষালাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শীতলবাবুও হনুমানজীর নিকট এস্রাজে দীক্ষিত হন। তবে হনুমানজী এখানে স্থায়ীভাবে থাকতেন না; তাঁর পুত্র সোনীবাবু মাঝে-মাঝে কলিকাতায় আসা-যাওয়া করতেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর ঠুমরীর আসরে স্বনামধন্য গিরিজাবাবুর সহিত সংগীতিক অনুষ্ঠানে সোনীবাবু প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতেন। এই সময় থেকেই এস্রাজযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীতলবাবুকে একজন উৎকৃষ্ট এস্রাজীরূপে বিখ্যাত করার জন্য তাঁর ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে।

১৯১২ সালের পর শীতলবাবুকে ঢাকা থেকে এনে বাবা নিজ সহচররূপে কর্মে নিযুক্ত করেন। মাঝে-মাঝে তাঁকে গয়ায় এস্রাজ শিক্ষার জন্য পাঠাতেন এবং শীতলবাবুও তাঁর শিক্ষালব্ধ আলাপ ও গতের স্বরলিপি বাবার জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। বস্তুতঃ বর্তমানে আমাদের কাছে গান ও বাজনার যে বিপুল স্বরলিপি সংগ্রহ স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, তার সূত্রপাত হয় শীতলবাবু প্রদত্ত গয়ার তালিমযুক্ত খাতা থেকে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরেলা সেতারীদের মধ্যে ইমদাদ্ খাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর নিজ দক্ষতাই শুধু এর কারণ নয়, তাঁর সুবিখ্যাত পুত্র এনায়েৎ খাঁ এক সময় ভারতের এক প্রধান সেতারীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। এনায়েৎ খাঁর দেহান্তের পর তাঁর পুত্র বিলায়েৎ খাঁ বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেশে-বিদেশে সেতারী হিসাবে প্রচুর সম্মান ও সমাদর লাভ করেছেন। বলা যেতে পারে যে, পুত্র ও পৌত্রের মধ্যদিয়েই ইমদাদ্ খাঁ সংগীতজগতে সেতারের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে অমরত্ব লাভ করেছেন। ইমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির সহিত গৌরীপুর ঘরের এক সুনিবিড় সম্বন্ধ আজও অটুট রয়েছে। এই আত্মীয়তার সৃষ্টি হয় ১৯১৩ সাল থেকে। গয়ার হনুমানপ্রসাদজীর নিকট এস্রাজে দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পর আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে ইমদাদ্ খাঁর সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে। হনুমানজী গয়ায় স্থায়ীভাবে থাকতেন, তাই স্থায়ীভাবে এস্রাজ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাবা সাপ্তাহিক দুঘন্টা করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইমদাদ্ খাঁকে নিযুক্ত করেন। ইমদাদ্ খাঁ বাবাকেই শিক্ষা দিতেন শীতলবাবুকে নয়। কেননা

শীতলবাবু গয়ার নিয়মিত যাতায়াতের দ্বারা সেখানকার শিক্ষা সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সংগীত সংঘের একটি আসরেই ইমদাদ খাঁর সহিত বাবার প্রথম পরিচয় ঘটে। যদিও ইমদাদ খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে সভাবাদকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বাসের পর ইন্দোর রাজদরবারে চাকরী পেয়ে ইন্দোর চলে যান। তারপর বৃটিশ সম্রাটের কলিকাতা আগমনের সময় নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং দু-এক বৎসর কলিকাতায় থেকে যান। কিন্তু তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয় ইন্দোর দরবারে। ইন্দোরের সভাবাদক হিসাবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত নানা সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে তিনি যন্ত্রসংগীতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে গেছেন।

১৯১৩ সালে কয়েকমাসের জন্য আমাদের গৃহশিক্ষকপদে আমরা তাঁকে লাভ করেছি। তবে একথা স্মরণীয় যে ইমদাদ খাঁর চূড়ান্ত সম্মানলাভ ও কৃতিত্বঅর্জন কলিকাতা নগরীতে কোনদিনই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে সেতার ও সুরবাহারের উচ্চতম আসন সাজ্জাদ মহম্মদের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেনী বাজের আলাপ ও রেজাখানি গতের অতুল কীর্তি লাভ ক'রে গেছেন। তাঁর পরে দ্বিতীয় সেতারীর স্থানে ইমদাদ খাঁ ছিলেন। সাজ্জাদ মহম্মদের মৃত্যুর পর গোবরডাঙ্গার অধিপতি জ্ঞানদাপ্রসন্নবাবুর ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ সুরবাহার ও সেতারে সুর ও লয়ের চূড়ান্ত উৎকর্ষ প্রদর্শন ক'রে গেছেন। তাঁর সুরবাহারের মীড়ে খাঁচার পাখীও উল্লাসে নৃত্য করতো। ইমদাদ খাঁর প্রথম কলিকাতাবাসকালে মহম্মদ খাঁ ছিলেন সেতারের খলিফা। কেননা তিনি ছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদেরই শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। ইমদাদ খাঁ তাঁর সহিত প্রতিযোগিতার চেষ্টা না ক'রে ইন্দোরে চলে যান। সেখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ বীণকাররূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোরাদ খাঁ, বাবু খাঁ, মজিদ খাঁ প্রভৃতির নাম সংগীত-ইতিহাসে আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

পশ্চিম ভারতে সুরবাহারযন্ত্রের কোনও বিশিষ্ট শিল্পী তখন না থাকায় দরুন ইমদাদ খাঁ ঐ অঞ্চলে সুরবাহারের জন্য একচ্ছত্র সম্মানলাভ করেন এবং সেজন্যই তাঁর কলিকাতায় দ্বিতীয়বার আগমনের পরও পশ্চিম ভারতের আকর্ষণে তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করতে হয়। ইমদাদ খাঁ সুরবাহারযন্ত্রে খানিকটা বীণাপদ্ধতি ও খানিকটা গোয়ালিয়র ঘরের খেয়ালের তানপদ্ধতি সম্মিলিত ক'রে এক অভিনব বাদন-পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। সেতারেও তিনি জয়পুরের সেনী ঘরানার শিক্ষার সহিত খেয়ালের তান-কর্তবের সমন্বয় সাধন ক'রেছেন। তাছাড়া নানা প্রকার তেহাইযুক্ত তানের পথও তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তিনি ছিলেন অতি কুশলী ও সুরেলা শিল্পী এবং তাঁর যন্ত্রসংগীত ছিল বিচিত্রপ্রকার পদ্ধতির সৌন্দর্যে সুশোভিত। তিনি অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নিজেকে কোনদিনই সংগীতবিদ্যার নায়করূপে প্রচারের চেষ্টা করেননি। তিনি শ্রেষ্ঠ গুণীগণের সংগীত পরিবেশনের সময় অতি মনোযোগের সহিত সেই সমস্ত সংগীত শুনতেন এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাবে পূর্বশ্রুত উৎকৃষ্ট সংগীত সেতারে আদায় করবার চেষ্টা করতেন। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বাবার সংগৃহীত গয়াঘরের গৎ বা আমীর খাঁ স্বরোদীর গৎ তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজের জন্য সংগ্রহ ক'রতে চাইতেন, এবং সে সকল গতের পদ কিছু কিছু পরিবর্তিত ক'রে জলসায় নিজ সেতারে অপূর্ব ঝংকারের সহিত বাজাতেন। সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তিনি একটি ছোট এস্রাজ নিয়ে শেখাতে আসতেন। তাঁর বক্ষের ছাতি ছিল কৃষ্ণবর্ণ রোমযুক্ত। আমার নয় বৎসর বয়সে তাঁকে দেখেছি। তাঁর প্রথম শিক্ষা ইমনের একটি প্রসিদ্ধ মসিদখানি গৎ, যা এখনও অনেকেরই সুবিদিত। আমার একান্ত অনুরোধে একবার তিনি সুরবাহারযন্ত্র নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। সেই সময়ে শীতলবাবু আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। ইমন ছিল তাঁর অতি প্রিয় রাগ। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইমদাদ খাঁ সাহেব তাঁর বিখ্যাত ইমনকল্যাণের আলাপ সুরবাহারে বাজিয়ে শোনালেন। আসলে তাঁর ইমনকল্যাণ ইমন ভিন্ন আর কিছু নয়। কেননা খাঁটি ইমনকল্যাণে ইমন-শুদ্ধ কল্যাণ ও বিলাবল এই তিন রাগের সমন্বয় দেখা যায়। যাইহোক তাঁর ইমন আলাপ এখনও আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রয়েছে। তখন আমার বয়স মাত্র দশ। বাজনার তত্ত্ব বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। তবে এটা মনে আছে যে বিলম্বিত আলাপের সময় তিনি এরূপ সুমধুর ও নিখুঁত সুরেলা মীড়ের সন্নিবেশ করেছিলেন, যার তুলনা আমি আজও পাইনি। সান্ধ্যকালীন সেই অনুষ্ঠানে তিনি একজন তারওয়ালাকে সঙ্গে এনেছিলেন। সে তাঁর সুরবাহার শুনতে শুনতে প্রথমে ঝিমনো শুরু করলো, পরে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে শুয়ে পড়লো। আমরা কিন্তু সজাগ ছিলাম; বিলম্বিতের পর তিনি খেয়ালের পাল্টা অনুযায়ী গমক-জোড় শুরু করলেন। তাঁর গমকের মধ্যে সুরের মাধুর্য সম্পূর্ণ বজায় ছিল—যা সচরাচর দেখা যায় না। জোড়ের পর তিনি ঝালা বাজালেন; তারপর আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "খোকা মহারাজ, এবার শুনবেন ঝড়াক তান।" এই ব'লে তিনি ঝড়ের অনুকরণে লড়ির বোলযুক্ত নানা তান শোনালেন। তাঁর ঝড়াক তান বাজাবার সময় ঘুমন্ত তারওয়ালার নাসিকা গর্জনও প্রবলবেগ ধারণ করেছিল। তাঁর তারের ঝড় থামলে তারওয়ালা কিছুক্ষণ পর জেগে উঠলেন ও বললেন,—খাঁ সাহেবের সুরবাহার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে বাজনা শেষ হ'লে আমি ও শীতলবাবু খাঁ সাহেবকে সম্বোধন ক'রে যা বলেছিলাম, আজও অকুণ্ঠিতচিত্তে তা প্রকাশ ক'রতে চাই।

"খাঁ সাহেব, আপনার এত সুরেলা মীড়ের যন্ত্রবাদন কখনও শুনিনি আর বোধ করি কখনও শুনতেও পাবো না।" সত্যি বলতে কি ইমদাদ খাঁর মত নিখুঁত সুরে মীড়সমন্বিত বাজনা শোনার সৌভাগ্য আজও আমার ভাগ্যে ঘটেনি।

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

শিল্পী: শ্যামল দত্ত রায়

২৩শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসএ দেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের ১৩০টি ছবি এবং ভাস্কর্যের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। আমাদের দেশের শিল্পীদের অর্থ-সামর্থ্য অতি সামান্য। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য তাঁদের শিল্প-সম্ভার উপস্থিত করেছেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

প্রদর্শনীতে গত ২৫।৩০ বছরে দেশের শিল্প কোথা থেকে কোন ধারায় বইছে তার এক নমুনা পাওয়া যায়। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅতুল বসু প্রমুখ প্রবীণ শিল্পী থেকে নবীন স্টুডিও গ্রুপ, সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস, ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটির শিল্পীবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই আছেন। যদিও সব শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবির নিদর্শনগুলি এখানে রাখা যায়নি তবু মোটামুটি তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পবস্তু উপস্থিত করেছেন। পুরোনো একাডেমিক ধরণের ছবি থেকে আধুনিক রীতি পর্যন্ত সব রকমের ছবিরই কিছু কিছু নমুনা এখানে পাওয়া যাবে। এদিক থেকে প্রদর্শনীর একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

শিল্পী: অরুণ বসু

গত ২৪শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসএ ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটির অন্যতম শিল্পী শ্রীঅনিমেষ নন্দীর একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল তৈলচিত্র এবং ড্রয়িং সর্বসমেত ২২ খানি ছবি নিয়ে। শ্রীনন্দী আধুনিক রীতির চর্চা করেন তবে সম্পূর্ণ বিমূর্ত শিল্প নয়। গঠনের সঙ্গে এখনো সম্পর্ক

শিল্পী: অনিমেষ নন্দী

কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রধানত ছবিগুলি অলঙ্কার ধর্মী। ১, ২, ৩ এবং ১০ সংখ্যক ছবিতে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ কাজেই এখনো দ্বিধাসংকোচের ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আশা করি ভবিষ্যতে এঁর আরো উন্নত ধরণের ছবি দেখতে পাবো।

১৭ই নভেম্বর রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটিতে কালীঘাটের পটের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৭৪টি রঙ্গীণ এবং এক রঙা ড্রইং নিয়ে এই প্রদর্শনী। এই ছবিগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণের ছবি। ইংরেজ রাজত্ব তখন কায়েম হয়েছে এবং

শিল্পী: অজিত চক্রবর্তী

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিদেশী সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠ হতে সুরু করেছে। লোকশিল্পের এই মাধ্যমেও তার ছাপ দেখা যায়। যেমন স্বচ্ছ জলরংএর ওয়াশ দেওয়ার পদ্ধতি। এটি মনে হয় বিলিতি ছবি থেকেই আমাদের দেশে এসেছে। আমাদের সাবেক আমলের ছবি, মোগল, কাংড়া, রাজপুত থেকে পুরোনো পটচিত্র প্রায় সবই সাদা মিশিয়ে টেম্পারা পদ্ধতির ধরনে আঁকা। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ ছাড়া রং দেবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিমাত্রিক গঠন ফোটাবার চেষ্টা লক্ষ্য করবার মত। এই প্রচেষ্টা কেবল-মাত্র রেখাঙ্কনগুলির মধ্যেও স্পষ্ট। প্রদর্শনীর ছবিগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক ধর্ম সম্বন্ধীয়। যেমন শিব, দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই প্রভৃতি। দুই জীবজন্তুর ছবি,

শিল্পী: মিলন মুখোপাধ্যায়

যেমন, বাঘ আর বাঘের মাসী, টিয়া, কাক, মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি এবং তৃতীয় হল সামাজিক সমালোচনাধর্মী ছবি যেমন, তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশী সংক্রান্ত ছবি, বারাঙ্গনা এবং মদ্যাসক্ত বাবুদের ছবি ইত্যাদি। রঙীণ ছবির মধ্যে গলদাচিংড়ি (৬৮) পাকা হাতের কাজ। জাপানী টাচের কাজের কিছু কিছু গুণ যেন এতে বর্তমান মনে হয়।
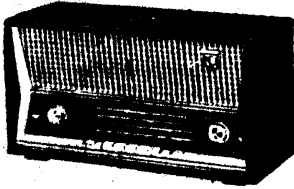
ড্রইংএর মধ্যে যশোদার দুগ্ধ-দোহন (৩) প্রসাধন (১৬) সুরা ও নারী (৩১) মাছকোটা (৩৬) প্রভৃতি ছবিগুলির সাবলীল ও দ্বিধাহীন রেখাপাত দেখবার মত। আর ছবিগুলির প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে কোথায় যেন বাংলার লোকসঙ্গীত আর গ্রামীণ ছড়ার মেজাজের সঙ্গে একটা একাত্মতা আছে। আর সেই সঙ্গে বিশেষ ধরনের এক কৌতুক বোধ। এই শিল্পীরা হাসতে জানতেন। আজকালকার ছবি বড় বেশী সিরিয়াস্।

২৮শে নভেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস্-এর চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী খোলা হল। এটি এই সংস্থার ৩য় বার্ষিক প্রদর্শনী। বহু বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে এই সংস্থা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত এক বছরের মধ্যে এঁরা ১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীটে নিজেদের একটি স্টুডিও এবং গ্যালারী খুলেছেন এবং দশটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। সেদিক দিয়ে এঁদের কাজ প্রশংসনীয়।

বর্তমান প্রদর্শনীতে জলরং, তেলরং, গ্রাফিকস এবং ভাস্কর্য নিয়ে আঠারজন শিল্পীর ৪৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এবারে প্রদর্শনীতে ছবি আরো কঠোরভাবে বাছাই করা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে ছবির মান আগের বছরের চাইতে উন্নত দেখা গেল। আর সমস্ত প্রদর্শনীই আগের চাইতে উজ্জ্বল মনে হল। অরুণ বসুর দুখানি ছবি 'দি এলিফ্যান্ট' (১), 'দি ক্যাচ' (২) তার বর্ণ সম্ভার এবং কম্পোজিশনের মৌলিকত্ব নিয়ে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্যামল দত্তরায়ের 'হ্যাঙিঙ্ ব্রিজ' (২৫) এবং 'বয়েজ এন্ড কাইটস্' (২৩)এর প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্যণীয়। বর্ণ প্রয়োগ সংযত, গম্ভীর এবং প্রকাশধর্মী, সনৎ করের 'ইন টিউন' (৩৯)এর কাব্য-ধর্মী অলঙ্করণ এবং অরুণাভ দত্তের 'ডিয়ার' (৭) চক্ষুতৃপ্তিকর। অনিলবরণ সাহা 'হোলি চার্চ' (৩) ছবিতে বিশেষ একটি মুড সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া অরুন্ধতী রায়চৌধুরী; দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার দত্ত প্রভৃতি সকলেই একটা নিম্নতম মান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। ভাস্কর্যের মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর 'মাদারস প্রাইড' (৪২) সব-চেয়ে প্রশংসনীয়। গ্রাফিক্সের মধ্যে সোমনাথ হোড়ের 'দি পীকক' একটি অনবদ্য সৃষ্টি এবং সুহাস রায়ের 'ব্রিজ' (২১) দর্শনীয়। আগামী বৎসর থেকে এঁরা একটি ছবি ধার দেবার লাইব্রেরী করছেন। এর ফলে সাধারণ লোকের কাছে শিল্পবস্তু সহজলভ্য হবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। প্রদর্শনীটি ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু অংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়া হবে।

২৮শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গৃহে ১৭খানি ছবি নিয়ে মোহেঞ্জোদারো গোষ্ঠির শিল্পী মিলন মুখোপাধ্যায়ের একক প্রদর্শনী সুরু হল। সমাজের নীচেরতলার অবহেলিত মানুষদের পরাভবের কাহিনী ছবিগুলির বিষয়বস্তু। তবে অঙ্কনরীতি দেখে ক্যাটালগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেল। লিখে না দিলে এছবি বোঝবার উপায় নেই। শিল্প যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে বসে তবে দর্শকের ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটে। প্রদর্শনীটি ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়া হবে।

॥ স্বাগতম ॥

পশ্চিম জর্মানীর রাষ্ট্রপতি ডঃ হাইনরিখ লুবকে আজ ভারতের সম্মানিত অতিথি। সুপণ্ডিত ও ভারতবন্ধু এই রাষ্ট্র-নায়ককে আমরা স্বাগত জানাই। পশ্চিম জর্মানীর সহযোগিতায় ভারতের অনেক শিল্প-উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা আশা করব, এই মহান রাষ্ট্রনায়কের শুভ-গমনে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।

॥ চীনের প্রস্তাব ॥

২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রে চীনের পক্ষ হতে একতরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হয়, তারপর থেকে সীমান্ত সম্পূর্ণ স্তব্ধ। চীন তার ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অস্ত্রসংবরণ করেছে, এবং ভারত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও চীনের বর্তমান কার্যক্রমে কোন বাধা দেয়নি। ১লা ডিসেম্বর থেকে চীনা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ করে "৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯-এর কার্যত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখার" সাড়ে বারো মাইল উত্তরে চলে যাওয়ার কথা। ২৮শে নভেম্বর তারিখেও কমিউনিস্ট চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ পিকিঙে এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছেন, চীন অবশ্যই ফিরে যাবে, এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইও ঐ সম্বর্ধনা সভায় পিকিঙস্থ ভারতীয় চার্জ দ্য এফেয়ার্সকে বলেন যে, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

চীনের সাম্প্রতিক আচরণ এমনই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যে, তার কথা সহজে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। শুধু ভারত নয়, ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী বহু দেশের শাসনকর্তারাই ভারতের সঙ্গে সমভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, শুধু মুখের কথায় চীনকে বিশ্বাস করা কোনমতেই উচিত হবে না। জার্মানীর চ্যান্সেলর ডঃ আদেনাউর বলেছেন, শীতে চীন আর যুদ্ধ করতে চায় না বলে এই চাল চেলেছে, বসন্তে আবার তার আক্রমণ শুরু হবে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ভারতের সাহায্যকারী পশ্চিমী মিত্ররা বলেছে, চীনের শুভেচ্ছার উপর ভরসা করে ভারতের গুটিয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। তার প্রস্তুতিকার্যে এতটুকুও ঢিলে দেওয়া চলবে না। চীন আরও অধিক শক্তি অর্জনের জন্য এখন প্রস্তুত হচ্ছে। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের ইতিমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সমরাস্ত্র বৃটেন ভারতকে বিনামূল্যে সরবরাহ করবে। আমেরিকাও জানিয়েছে যে কোন সর্ত আরোপ না করেই সে ভারতকে অস্ত্র-সাহায্য করবে। মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান পুনরায় ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, চীন-ভারত সংঘর্ষকে মালয় শুধু সীমান্ত সংঘর্ষ বলে মনে করে না। মালয় মনে করে যে, ভারত যদি নতি স্বীকার করে তবে চীনের পররাজ্যলোলুপ পররাষ্ট্র-নীতির দাপটে সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণেই মালয় ভারতকে তার বিপদের দিনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ভারতকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে গঠিত মালয়ের 'গণতন্ত্র বাঁচাও' তহবিলে আড়াই লক্ষ টাকা চাঁদা উঠেছে।

বলা বাহুল্য, চীনকে বিশ্বাস করার মত কোন কাজই এখনও পর্যন্ত চীন করেনি। তবুও চীন যে এখন কিছুটা পিছু হটবে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে চীন ভারত আক্রমণ করেছিল, সে উদ্দেশ্য তার ইতিমধ্যেই পূরণ হয়ে গেছে এবং তার সিদ্ধান্তমত পশ্চাদপসরণের দ্বারা সে এতটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভারতের কাছ থেকে সে যে জমি দাবী করেছিল তা সে ২০শে অক্টোবরের ব্যাপক আক্রমণের পর সাতের দিনের মধ্যেই দখল করে নিয়েছিল। তারপর আরও তের দিনে সে যা দখল করেছিল তা আজ ছেড়ে দিলে লাভ বই ক্ষতি কিছু হবে না। এর দ্বারা সে জগতকে দেখাতে পারবে যে, শক্তি তার যথেষ্টই আছে কিন্তু শক্তি দিয়ে সে কোন কিছুর মীমাংসা করতে চায় না, শান্তিই তার কাম্য। দ্বিতীয়ত, তড়িৎগতিতে ক'দিনের মধ্যে দুর্গম পর্বতের
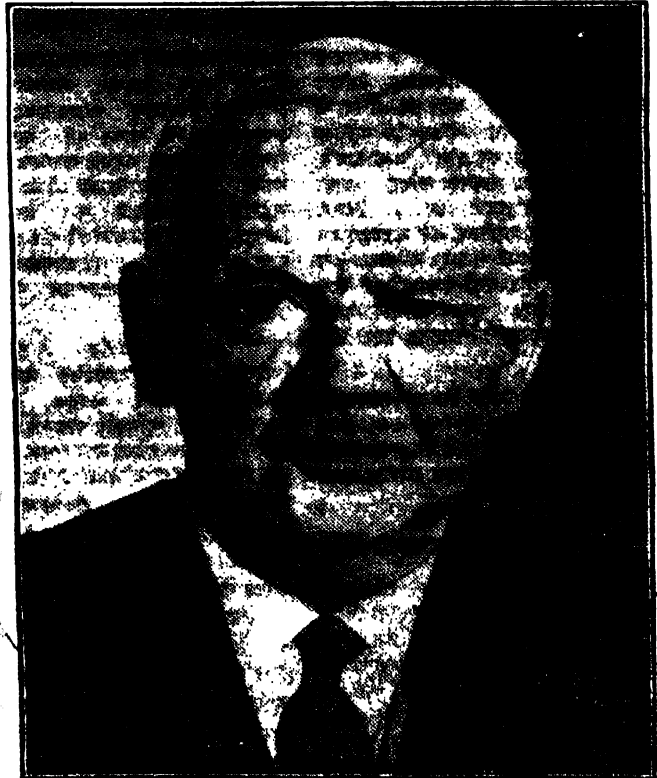
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইনরিস লুবকে ভারত সফরে এসেছেন।

নয়াদিল্লীর বিমানঘাঁটিতে বৃটেশ সামরিক প্রতিনিধি দলের নেতা জেনারেল হালের সহিত জেনারেল চৌধুরীর আলোচনা।

বাধা অতিক্রম করে ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সৈনিকদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত করে সে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের শক্তিবর্গকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে, চীন আজ দুর্মদ, দুর্নিবার। তার সামরিক শক্তির একটা পরিচয় বহির্জগতকে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল, এই সুযোগে সে তা দেখিয়ে নিতে পারল। ভবিষ্যতে এর জোরেই সে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে বশে রাখতে পারবে। একারণে এখন সংযত হওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তার পক্ষে।

এসব দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় চীন আর এখন যুদ্ধ করবে না, এবার শান্তির কথা প্রচার করে সে ভারতকে অন্যদিক থেকে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করবে।

॥ কূটনৈতিক তৎপরতা ॥

ভারতকে আক্রমণ করার সময় চীন বিশ্বের জনমতকে সামান্যই মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু কাজ হাসিল করার পর স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে ভারতের আগেই তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারত তার কাছে দাবী জানিয়েছিল যে, যতদিন না চীন স্বেচ্ছায় ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে ততদিন ভারত তার সংগে কোন আলোচনা করবে না। কিন্তু চীন আজ একতরফা যুদ্ধ-বিরতি করে জগতকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ত অনেক পরের কথা, তারা স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর, অর্থাৎ, তিন বছর আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু তবু ভারত চীনের সংগে আপোষ করতে চাইছে না। সে আজ বিভিন্ন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে হাত মিলিয়ে এশিয়ার এই প্রান্তকে আর একটা বিশ্ব-যুদ্ধের সমরাঙ্গনে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, এ প্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের মনোভাব ভারতবাসীর কাছেই এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ ত অনেক পরের কথা। গত ২০শে অক্টোবরের পর হতে আজ পর্যন্ত ভারত সরকার কোন মানচিত্র প্রকাশ করে বা কোন বিবৃতি দিয়ে এদেশের লোককে বোঝাননি যে, দুইটি প্রস্তাবিত স্থিতাবস্থার তারিখের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি! যদি চীনের প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করে তবে ভারতকে আপাতত কতখানি ভূমির উপর অধিকার হারাতে হবে। আমরা না হয় ধরে নিতে পারি যে, আমাদের ক্ষতি হবে বলেই ভারত সরকার চীনের প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ, যা ওটা চীনের আর এক চালবাজী। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশও ভারতের প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হয়ে সমগ্র পরিস্থিতির বিচার করবে এতটা আমরা কিভাবে আশা করি?

এরপর আছে পশ্চিমী সাহায্যের প্রশ্ন। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আজ যেভাবে ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তা কিছুদিন পূর্বেও এদেশবাসীর কল্পনাতীত ছিল। যদি তারা ওভাবে এগিয়ে না আসত তাহলে আজ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভারতের যে কি দুর্গতি হত তা আমাদের ভাবতেও ভয় হয়। দীর্ঘদিন যাদের মৈত্রীর উপর আস্থা রেখে ভারত নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তারা সকলেই কৌরবসভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদীর আর্তনাদের সম্মুখে অবিচল ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠিরের মত নীরব হয়ে রইল। সামান্য মুখের কথাটুকু প্রকাশ করেও ভারতকে সহানুভূতি জানাল না। ভারতের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাহায্যের পূর্বে অনেক কিছু সর্তও আরোপ করতে পারত পশ্চিমী শক্তিবর্গ। কিন্তু সে-সব কোন কিছু না করে ভারতকে সর্বশক্তি নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে তারা আজ গণতন্ত্রী জগতের কাছে সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ করে দিল যে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারাই প্রকৃত বন্ধু।

বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, এবং এখন থেকেই আমাদের প্রকৃত মিত্রদের সহায়তায় এমন এক শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করতে

হবে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের এমন বিপর্যয়ে প্রস্তুত হবে না।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

নয়াদিল্লী হতে ২৮শে নভেম্বর প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, দেশবাসীর স্বেচ্ছাদানে ঐ দিন পর্যন্ত ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তা-ছাড়াও অলঙ্কারসহ স্বর্ণ পাওয়া গেছে মোট ২১,৬১২ তোলা।

পশ্চিমবঙ্গ হ'তে ঐ সময়ের মধ্যে মোট সংগৃহীত হয়েছে ১,১০,২০,২১৬; টাকা ও ৫,৩০৪ তোলা সোনা। দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত দানে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ইতিপূর্বে এদেশে কখনও সংগৃহীত হয়নি। এর দ্বারা এইটাই প্রমাণ হয় যে, শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও দেশের মানুষ দেশকে কত ভালবাসে। কিন্তু তবুও আমাদের জানা প্রয়োজন যে, জাতির প্রয়োজনের তুলনায় এ দান নগণ্য। আরও বহু দানের জন্য অমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনেও জাতীয় সরকারকে সাহায্য করার কাজে অগ্রণী হতে হবে।

॥ পাকিস্তানের মতিভ্রম ॥

ভারতের জাতীয় জীবনের বিরোধিতা করেই পাকিস্তানের জন্ম। সুতরাং ভারত যা করবে, বা যা করলে ভারতের ভাল হবে এমন সব কাজের বিরোধিতা করাই পাকিস্তানের আজন্ম অনুসৃত নীতি। ধর্মের ধুয়া তুলে পাকিস্তান স্বতন্ত্র হয়েছে, আজও সরকারীভাবে পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র। ইসলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ইসলাম-বিরোধী সব কিছুই তার মতে রাষ্ট্র-বিরোধী। এই অপরাধে পাকিস্তানের হিন্দুরাও আজ নিজ বাসভূমিতে পরবাসী। এতদিন পাকিস্তানের আর এক রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল কমিউনিজম বিরোধিতা। সকল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ছিল বৈরিতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল তার আশ্রয়।

কিন্তু যেদিন থেকে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রকাশ্য অবনতি ঘটতে আরম্ভ করল সেইদিন থেকেই দেখা গেল, নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট চীন ও ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যে। তারপর চীন যখন প্রকাশ্যে ভারত আক্রমণ করল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এল ভারতকে সাহায্য করতে, তখন রাতারাতি পাকিস্তানের সমগ্র পররাষ্ট্র-নীতিরই সমূহ পরিবর্তন ঘটে গেল। পাকিস্তান আবিষ্কার করে ফেলল, চীনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য। 'সেণ্টো', 'সিয়াটো' প্রভৃতি পশ্চিমী সামরিক আঁতাত থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়ার কথাও নাকি পাকিস্তান চিন্তা করছে। ভারতকে যারা সাহায্য করে তারা আবার পাকিস্তানের বন্ধু কি? তার চেয়ে চীন তার অনেক ভাল বন্ধু।

তেজপুরে উপনীত যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ মিশনের সামরিক বিশেষজ্ঞদ্বয়। ছবির বাম হতে দক্ষিণে বৃটেনের ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান, জেনারেল স্যার রিচার্ড হল এবং যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর জেনারেল পল এ্যাডামসকে দেখা যাচ্ছে

এ ব্যাপারে আপাতত শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা যখন কোনভাবেই হল না, তখন অচিরে তাকে চরম শিক্ষাই পেতে হবে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ ঃ পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা ঃ ২১শে নভেম্বর মধ্য রাত্রি হইতেই উভয় রণাঙ্গনে (নেফা ও লডাক অঞ্চল) গুলী-বর্ষণের বিরতি—চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে বলিয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্রের উক্তি।

ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে সারা দেশে কমিউনিস্টদের (চীনপন্থী) ধরপাকড়—দিল্লীতে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) গ্রেপ্তার।

চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের সামরিক প্রয়োজন নির্ধারণে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মিশনের দিল্লী উপস্থিতি—বৃটিশ দলের নেতা ঃ স্যার রিচার্ড হাল (বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ) ও মার্কিন মিশনের অধিনায়ক ঃ মিঃ এভারেল হ্যারিম্যান (মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব)।

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ ঃ 'গুলী বন্ধ হইলেও আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই ঃ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা'—দিল্লীতে যুব কংগ্রেস আয়োজিত সমাবেশে শ্রীনেহরুর বাণী।

চীনা হানাদার উৎসাদনে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগের আহ্বান—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ।

জলপাইগুড়ি শহরে রাত্রিবেলা সতর্কতামূলক নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) সহিত বৃটিশ ও মার্কিন মিশনের বৈঠক।

চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া কংগ্রেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মন্তব্য—চীনা প্রস্তাবের অর্থ ঃ নেফা ও পশ্চিম অঞ্চলে ভারতের সব কয়টি চৌকীই (৪৭টি) ছাড়িয়া দেওয়া।

ভারত কর্তৃক পিকিং-এর নিকট চীনা প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ ঃ সফরকারী বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধি দলের নিকট ভারতের অস্ত্র ও সমরোপকরণ চাহিদা (বেশ মোটা রকমের) পেশ—যুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডসেরও দিল্লী আগমন।

শিলিগুড়ি শহরে ও ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে নিষ্প্রদীপ ঘোষণা।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ ঃ রণাঙ্গন পরিদর্শনের জন্য মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক মিশনের নেফা যাত্রা—প্রতিরক্ষা চাহিদা সম্পর্কে সরেজমিনে পর্যালোচনার আগ্রহ।

দিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রথম বৈঠকের অনুষ্ঠান—সামরিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন।

ডিসেম্বর মাসে (১৯৬২) সোভিয়েট-'মিগ' বিমান পাওয়ার (পূর্ব প্রতিশ্রুত) সম্ভাবনা নাই—রাশিয়ার উপর চীন সরকারের প্রবল চাপ দিবার সংবাদ।

সে লা ও বমডি লার (নেফা অঞ্চল) মধ্যে আটক তিন সহস্রাধিক ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যাবর্তন।

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ ঃ 'চীনের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গ বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘে উত্থাপনের ইচ্ছা নাই'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

দেশরক্ষায় সামগ্রিক প্রস্তুতি হিসাবে সীমান্ত এলাকার সমর্থ লোকদের রাইফেল চালনা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

দিল্লীতে বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ স্যাণ্ডস-এর সহিত শ্রীনেহরুর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

ভারত সফরে আগত পশ্চিম জার্মান প্রেসিডেণ্ট ডঃ লুবকে কর্তৃক চীনের অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ ভারত আক্রমণের নিন্দা জ্ঞাপন। চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে পিকিং সরকারের ব্যাখ্যা (ভারতের দাবীকৃত) দিল্লীতে প্রেরিত—ভারত সরকার কর্তৃক বিষয়টি বিবেচনা।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ ঃ চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতকে বৃটেনের বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা—দিল্লীতে বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'চীনাপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তারের পর পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পুনর্গঠন—দলীয় সম্পাদক শ্রীভবানী সেন ও দলীয় মুখপাত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক পদে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে ভারতীয় বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ ঃ লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারত প্রতিরক্ষা বিল গৃহীত।

বাংলার যশস্বী শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র (অন্ধগায়ক—বয়স ৭০) জীবনাবসান।

আটকাবস্থা হইতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মুক্তিলাভ।

॥ বাইরে ॥

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ ঃ 'চীনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব এশিয়া ও আফ্রিকাকে বিভ্রান্ত করার অভিসন্ধি ঃ আসামের সমভূমি আক্রমণের প্রস্তুতিকল্পে সময় লইবার ফিকির মাত্র'—মার্কিন কূটনৈতিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য।

ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে লর্ড রাসেলের (বৃটিশ দার্শনিক) আহ্বান।

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ ঃ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়কদের নিকট চৌ এন লাই-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) বার্তা—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সাহায্য করার আবেদন—আবেদনের আন্তরিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ ঃ ভারতের বিরুদ্ধে চীনের নয়া ষড়যন্ত্র—প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে (পাক্ প্রেসিডেণ্ট) চীনের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের আহ্বান—পাক্ সরকারের নিকট পিকিং-এর পত্র।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ ঃ শ্রীমতী বন্দরনায়ক (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক কলম্বো-এ আফ্রো-এশীয় ছয়টি রাষ্ট্রের (সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, ঘানা ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা।

লর্ড রাসেলের নিকট চৌ এন লাই-র তারবার্তা—চীনা প্রস্তাব গ্রহণে শ্রীনেহরুকে রাজী করাইবার জন্য অনুরোধ।

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ ঃ জেনেভায় পুনরায় ১৭ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

চীন-ভারত বিরোধ. মীমাংসায় সাহায্যার্থে ইন্দোনেশিয়ার নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ চৌ) ধর্ণা।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ ঃ সিংহলে প্রস্তাবিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রস্তাব অনুযায়ী) অনুষ্ঠানের জন্য চীনের চাপ—নাসের (আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট) সমেত বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের নিকট চৌ-এর লিপি।

চীনের প্রেমে পাক্ শিল্পমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর গদগদ ভাব—পিকিং প্রস্তাবিত অনাক্রমণ চুক্তি গ্রহণের পক্ষে নানা যুক্তি হাজির।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ ঃ কায়রো-এ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত ভারতের আইন মন্ত্রী শ্রী এ কে সেনের বৈঠক—শ্রীসেন কর্তৃক চীন-ভারত প্রসঙ্গে ভারতীয় বক্তব্য জ্ঞাপন।

অভয়ঙ্কর

॥ সক্রিয় প্রতিরোধ ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গ সুরু করেছেন যে দুটি লাইন দিয়ে ভারতের সীমারেখা বর্ণনায় এত সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর উক্তি আর দেখা যায় না—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো
নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ
পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥"

অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অব-গাহনপূর্বক, পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান, দেবতাদিগের অধিষ্ঠানভূমি এক বিরাট পর্বত ভূমণ্ডলের উত্তর দিক জুড়ে আছে, তার নাম হিমালয়, এতবড় পর্বত আর নেই, সেই ভূধর পর্বতকুলের রাজা কুমারসম্ভব দেবতাদের প্রধান সেনাপতি কার্তিকের জন্মকাহিনী। পুণ্যভূমি হিমালয়, কৈলাসের শিবের আবাস, তাঁর সহধর্মিণী পার্বতী হিমবানের কন্যা, তাই তিনি গিরিজাসুতা হৈমবতী। বদ্রিনাথে আছেন নারায়ণ, আর কেদারে মহেশ্বর। এরমধ্যে আছে গঙ্গোত্রী ভারতে পুণ্য-সলিলা নদীগুলির উৎস, যে যমুনা তীরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাপ্রকাশ করেছেন সেই যমুনারও উৎস এই হিমালয়। আমাদের দেশের সাধকবৃন্দ যুগে যুগে এই হিমালয়ে তপশ্চর্যা করেছেন। কালিদাস বলেছেন হিমালয় পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক (অর্থাৎ উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত) এই পর্বত এবং শেষ লাইনই বিশেষ অর্থপূর্ণ—ভারতীয় মহাদেশের সীমারেখা নির্দেশের যেন মানদণ্ড এই পর্বত।

আমাদের জাতীয় জীবনে, সাহিত্যে, পুরাণে উপকথায় এই পর্বত জড়িয়ে আছে, সেই দেবতাত্মা হিমালয়ের সুমহান ঐতিহ্য আজ শত্রু আক্রমণে বিঘ্নিত। এই পবিত্রভূমিতে বর্বর আক্রমণকারী রাত্রির অন্ধকারে হানা দিয়েছে, হিমালয় ভারতের ভূগোলের একটি অংশ মাত্র নয়, আমাদের অমর সংস্কৃতির একটা অংশ, আমাদের ধর্মের চিরন্তন উৎস, আমাদের আত্মার আশ্রয়, আর হিন্দুর দেব-দেবীর পবিত্র বিচরণভূমি।

এই অঞ্চলে আক্রমণের অর্থ, আমাদের যা কিছু পবিত্র, যা কিছু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাকে ধ্বংস করা, যদি ভারতীয় সংস্কৃতির বিনাশ ঘটে, তাহলে ভারতের মৃত্যু।

জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ সত্যম, শিবম, সুন্দরম এই মন্ত্রের আমরা উপাসক, আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মের স্থান সবার উপরে—সেই ধর্মের নাম চিরন্তন ন্যায়। আমরা 'অস্তেয়', চুরি না করা, 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ অপরের জিনিষ অধিকার না করার নীতিতে বিশ্বাসী ভারতবাসী, আমাদের সম্প্রসারণে দৃষ্টি নেই, অপরের দ্রব্য গ্রহণের বাসনা নেই। এই আমাদের জাতীয় শিক্ষা। তাই আমাদের কাছে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমাদের যা কিছু শক্তি, যা কিছু সঞ্চয় সবই সেই স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যয় করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন..."বন্দেমাতরম্।

—মাতা-কে ? এ তো দেশ, এ তো মা নয়।

—আমরা অন্য মা জানি না, আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি।"

সারা ভারত আজ ধর্মক্ষেত্র, আর পবিত্র দেবভূমি হিমালয় আজ কুরুক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"ততস্ম্যাং যুধ্যস্য ভারত!"—অতএব ওঠো, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। জেনারেল কারিয়াপ্পা বাঁকুড়ায় এক সভায় বলেছেন যে "মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার্থে চীনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে ধর্ম-যুদ্ধ বলা উচিত। আমাদের জন্মভূমি অশোক ও চন্দ্রগুপ্ত এবং শিবাজী ও রাণা প্রতাপকে জন্ম দিয়েছে, এইসব বিরাট পুরুষদের আমরা উত্তরাধিকারী, কম্যুনিস্ট চীনের ভ্রূকুটিতে আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়া চলে না।" তাই যুদ্ধ সম্পর্কে আবার অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা উধৃত করছি—"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।" "অর্জুন, উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হও।" এই আদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবাসীর মর্মমূলে অনুরণিত। তাই যখন যুদ্ধের আহ্বান এল তখন যুধিষ্ঠিরের মত ভদ্র এবং মহাশয় ব্যক্তি-ও যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন। ভীষ্ম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিন্তু রণে তাঁর চরিত্রের ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশিত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীষ্ম প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীবৃন্দ যুদ্ধের মধ্যে যে ন্যায় আছে তা স্বীকার করেছেন, ন্যায়ের পথ ও প্রভাব বিস্তারে যুদ্ধ যেখানে অপরিহার্য সেখানে যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় বৌদ্ধ যুগে অজাতশত্রু ও বিম্বিসার যুদ্ধ করেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও যুদ্ধ করেছেন। কলিঙ্গ জয়ের কাল পর্যন্ত—

অশোক দিগ্বিজয় করে বেড়িয়েছেন, কলিঙ্গের পর আর কিছু করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর উত্তরাধিকারী পুষ্যমিত্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। হূন, আফগান, তুর্কী ও মোগলরা যখন ভারত আক্রমণ করেছে তখন ভারতবাসীরা বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছে। রাণা সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, চৌহান, রাণা প্রতাপ, শিবাজী মহারাজ, গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পবিত্র নাম, স্মরণীয় নাম। যখন ঔরংজেব তাঁর পূর্বগামীদের শান্তির পথ পরিত্যাগ করে সংঘর্ষে মেতেছেন তখন পাঞ্জাব, রাজস্থান, ও মহারাষ্ট্র এমন তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মেতেছে, সাফল্য লাভ না করলেও ভারতের মানুষের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনা।

আজ চীনা শত্রুর প্রতিরোধে বাংলার সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ অগ্রণী হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"তোমার কাছেই ঋণী হ'লাম
বিষকীটচক্র কপটতায়।
তোমার বৃশ্চিক পুচ্ছই
আমার শান্ত শোণিত স্রোতে
এনেছে তপ্ত দুর্বার বন্যা-বেগ,
আমার অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য
দিয়েছে ঘুচিয়ে।।"

ভারতের অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য আজ চীন এক আঘাতে ঘুচিয়ে দিয়েছে। ভারতের জড়িমার ঘোর কেটে গেছে।

অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

"—রে দুর্বৃত্ত, ষণ্ডক বর্বর
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর।।"

ভারতের মাটিতে সম্প্রাসরণশীল ষণ্ডক বর্বর চীনের সমাধি রচিত হোক।

এ'রা দুজন ছাড়া জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আরো অনেকেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই লিখবেন। যেমন 'অমৃতে'র বর্তমান সংখ্যাতেই প্রকাশিত হচ্ছে 'বনফুলের' একটি অনবদ্য কবিতা।

অপেক্ষাকৃত তরুণতর, কিন্তু খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে 'অমৃতে' প্রকাশিত হ'য়েছে মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার ও আশিস সান্যালের কবিতা। অন্যত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার ও সুনীল মুখোপাধ্যায়।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অকটোবর নভেম্বরের মধ্যে বাংলার কবিরা যেসব কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে আছে প্রতিরোধের সুর। সে সুরে সারা দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে হবে, স্বদেশের জন্য শেষ রক্তবিন্দু ব্যয় করতে হবে একথা আজ স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন।

নতুন বই

লেদ সেপিং ও মিলিং শিক্ষা— সোমনাথ দাঁ। বসু চৌধুরী, ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯।

আধুনিক শিল্প যদিও নানা জটিল যন্ত্রের উদ্ভাবনায় ও প্রবর্তনে ক্রমেই স্বয়ংক্রিয়তার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, কিন্তু মেশিনটুল এখনো পর্যন্ত অপ্রচলিত নয়। বরং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটুলেরও অতি দ্রুত উন্নতি হয়ে চলেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভারী শিল্পের পাশাপাশি যদি মাঝারি ও ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হয় তাহলে মেশিনটুলের চাহিদা খুবই বেশি হবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য মেশিনটুলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেশিনিস্ট ও মেশিনচালকও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশের নানা স্থানে পলিটেকনিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেমন হাতে-কলমে কাজ করতে শেখেন, তেমনি বই পড়েও শেখেন। যে-দেশের কারিগরদের যতো বেশি বই পড়ার সুযোগ আছে সে-দেশের কারিগররা ততো বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। আমাদের দেশের একজন কারিগরের চেয়ে একজন ইংরেজ বা জার্মান বা রুশ কারিগরের দক্ষতা যে অনেক বেশি, তার কারণ ওইসব দেশের কারিগরদের জন্যে মাতৃভাষায় অজস্র বই লিখিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত টেকনিকাল বিষয়ে মাতৃভাষায় বই রচনা করার রেওয়াজ তেমনভাবে শুরু হয়নি। অথচ আমরা যদি চাই যে আমাদের দেশে কলকারখানার যুগ শুরু হোক তাহলে এ-দায়িত্ব যতো শীঘ্র পালিত হবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। শ্রীযুক্ত সোমনাথ দাঁ বাংলা ভাষায় লেদ সেপিং ও মিলিং শিক্ষা সম্পর্কিত

বইটি রচনা করে সাঁতাকমরের দেশ-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিত একটি ভূমিকা বইয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। এই ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "কি ইনজিনিয়র কি কারিগর সকলকেই প্রয়োগশালায় শিক্ষানবিশী করতে হয়। নিজের হাতে যন্ত্র চালাতে হয়, যাতে সে শিখতে পারে নানা যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তবে আমাদের কারিগররা সব সময় ইনজিনিয়রের মত উচ্চশিক্ষিত হয় না। ইংরাজী লেখা বই বুঝতে অনেক সময় তাকে বিরত হতে হয়। এদিকে নিপুণ কর্মী হতে গেলে গতানুগতিক-ভাবে যন্ত্রাগারে মাষ্টারের কাছ সাগরেদী করে শিখলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বিদ্যা আয়ত্ত হবে না—তাই নিজে পরিশ্রম করে ঘরে বসে নানা বই পড়ে নিজের জ্ঞান বাড়ান—"

শ্রীযুক্ত সোমনাথ দাঁ-র লেদ শেপিং ও মিলিং শিক্ষা এমনি ঘরে বসে পড়বার মতো একটি বই। বইটির ভাষা প্রাঞ্জল, উপস্থাপনার ভঙ্গি জটিলতাবর্জিত। প্রচলিত ইংরেজী টেকনিকাল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করার চেষ্টা হয়নি—এতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাই হবে। আশা করি বইটির বহুল প্রচার হবে এবং এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও বাংলায় টেকনিকাল বিষয়ের বই লিখতে উৎসাহিত হবেন।

ঢেউ কথা কয়— (গল্প সংগ্রহ) সুভাষ সমাজদার। ভারতী বুক ষ্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দু-টাকা।

শ্রীসুভাষ সমাজদারের 'ঢেউ কথা কয়' একখানি অভিনব বই। একাধারে এতে প্রত্নতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, উপকথা, ইতিহাস ও ছোটগল্পের সমাবেশ হয়েছে, আবার সব কিছুকে অতিক্রম করে মূর্ত হয়েছে লেখকের একটি জাগ্রত কবি-কল্পনার সুরও, যা চিরায়ত সাহিত্যের বস্তু। দীঘির 'দেশ' দিনাজপুরে দীঘি দেখা যায় যেমন অসংখ্য, তেমনি লোক-মুখে শুনতে পাওয়া যায় এই দীঘি-গুলোকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীনকাল থেকে গড়ে-ওঠা বিচিত্র কিম্বদন্তী, উপকথা ও ইতিবৃত্ত। সেগুলোকেই লেখক গ্রথিত করেছেন এই বইয়ে, মনোরম গল্পের ভাষায় পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে যেমন তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা, তেমনি কথা-সাহিত্যিকের কুশলী কলমও স্বাক্ষর রেখেছে তাঁর ছত্রে ছত্রে। বাংলাভাষায় এইভাবে হাট, মেলা, মঠ ও মন্দিরকে বেষ্টন করে যে-সমস্ত লোকবৃত্ত ও কল্পকথা জনারণ্যে ছড়িয়ে আছে, তা সংগ্রহ করার প্রয়াস এর আগেও কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু রসোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে প্রকাশমান হয়েছে তার কমই। সুভাষ সমাজদারকে স্বাগত জানাচ্ছি, প্রথম এই পথের সফল পথিক-রূপে। বাণরাজার কাহিনী, যশোমতীর কাহিনী, দীবোর (দিব্যক?) কাহিনী... কত বিচিত্র কাহিনীরই পসরা মেলে ধরেছেন তিনি এবং তা সাজিয়েছেন কি নিপুণ গল্পের পোষাকে! পুরাতনের কঙ্কাল যেন নবজীবনের স্পর্শে সঞ্জী-বিত হয়ে উঠেছে লেখাগুলির মধ্যে এবং সেকালকে দিয়েছে একালের সঙ্গে সংযুক্ত করে! বইটির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

উর্মিমালা—(উপন্যাস) অসিত গুপ্ত। করুণা প্রকাশনী। ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—বারো। দাম তিন টাকা।

অসিত গুপ্ত ইতিপূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর 'এই সব আলো প্রেম' গ্রন্থখানির প্রশংসা করেছিলাম আমরা। সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ছিল—লেখক যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। এবং গ্রন্থখানি বাঙলা উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আমাদের সে ধারণা সার্থক হোল না। চরিত্রচিত্রণ খুবই দুর্বল। লেখক গ্রন্থখানি কোথাও কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লীলতার বাইরে নিয়েছেন বলে মনে হল।

গ্রন্থখানির বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ চমৎকার।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

নবদিগন্ত (বাঙলা) : শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, ৩৬৫৪ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শিশিরকুমার মল্লিক; কাহিনী : ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ('নতুন দিনের আলো' নামে উপন্যাস); পরিচালনা : অগ্রদূত; চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা; শব্দানুলেখন : যতীন দত্ত; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, শীলা পাল, সাধনা রায়চৌধুরী, আরতি দাস, রাখী মজুমদার, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, এস ম্যালকম্, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯এ নভেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"নবদিগন্ত" কাহিনীতে এমন একটি সামাজিক প্রশ্নকে তু'লে ধরা হয়েছে, যার কোনো সদুত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। সামাজিক বা আইনগত স্বীকৃতিধন্য নয়, এমন যৌনমিলনের ফলে যদি কোনো সন্তানের জন্ম হয়, আমাদের সমাজ-জীবনে তার স্থান কোথায়? যে-ছেলে বা মেয়ে নিজের জন্মদাতা পিতার নাম জানেনা, কোন্ অপরাধে সে সতীর্থদের কাছে বা লোকসমাজে উপহসিত হয়? নিজে কোনো রকম অপরাধে অপরাধী না হয়ে সে অগৌরবের ভাগী হবে কেন? আজকের দিনে যখন অপরিণামদর্শিতার ফলে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব আমাদের সমাজ-দেহকে কণ্টকিত করছে প্রতি নিয়তই, তখন এ-ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে কাহিনীকার এবং চিত্র-প্রযোজক একটি নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যেভাবে এবং যে-বয়সে ডাঃ সমীর ভট্টাচার্য এবং রুচিরা ধীরে ধীরে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে, সেখানে রেজেস্ট্রী ক'রে তাদের বিবাহকার্যটি সময় থাকতেই সমাধা না হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক লেগেছে এবং সেই কারণেই রুচিরার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে সমর্থন জানানো সহজ নয়। রুচিরার বাবার মৃত্যুর পর থেকে ডাঃ সমীর ভট্টাচার্যের চেষ্টায় ও সাহায্যে রুচিরা যখন প্রথমে নার্স, পরে সিনিয়র নার্স এবং সবশেষে ডাক্তারী পর্যন্ত প'ড়ে পরীক্ষা দেয়, তখন অতখানি সময়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওরা কেন নিজেদের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানটিকে সম্পন্ন করেনি, তার কোনো সদুত্তর নেই। মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম এলেই যে বিবাহ রেজেস্ট্রি না ক'রেই চলে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এমন কথা তাঁরাই বলতে পারেন, বাস্তব জীবনে যাঁদের অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই। এবং মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে গি'য়ে যে-পরিস্থিতিতে সমীর ডাক্তার আর কলকাতায় ফিরতে পারল না বা রুচিরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারল না, তাকেও খুব স্বাভাবিক ব'লে গ্রহণ করতে না পারাই স্বাভাবিক। এ-ছাড়া এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট ও পি-আর-এস উপাধিধারী কলেজ প্রোফেসার গৌতমকে রুচিরার অবৈধ সন্তান, আইএ ক্লাশের ছাত্রী লিপিকার সঙ্গে যে-ভাবে প্রেম করতে দেখানো হয়েছে, তা যে-কোনও তরুণ কলেজ-প্রোফেসারের কাছে বিসদৃশ এবং আপত্তিকর ব'লে বোধ হবে। তাই প্রথম থেকেই অধ্যাপক গৌতমকে তাঁর আই-এ ক্লাশের ছাত্রী লিপিকার প্রেমে ডগমগ হওয়াকে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি।

কাহিনীর এই অস্বাভাবিকতাকে উপেক্ষা করতে পারলে "নবদিগন্ত" ছবিটি অপরাপর দিক দিয়ে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। চিত্রনাট্যের মধ্যে যে-ভাবে দু'টি ফ্ল্যাশব্যাকের অবতারণা করা হয়েছে, তা শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক। বিভূতি লাহার চলচ্চিত্রায়ণ ছবিটিকে একটি উজ্জ্বল সুষমাসম্পন্ন করে তুলেছে এবং তাঁকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করেছেন শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী। শব্দানু'লেখনে যতীন দত্ত সর্বত্র একটি উচ্চমান বজায় রেখেছেন। গানগুলি অত্যন্ত দীর্ঘায়ত এবং সুরের মধ্যে নূতনত্ব না থাকলেও প্রত্যেকটি গানই সুগীত।

"নবদিগন্ত"-এর প্রতিটি শিল্পী নিজের নিজের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহুদিন পরে বসন্ত চৌধুরী একটি উপযোগী ভূমিকায় তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও দরদী অভিনয় দেখাবার সুযোগ পেয়ে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন; বিশেষ করে প্রৌঢ় ডাঃ সমীরের বেশে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং স্মরণীয়। রুচিরার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন; তাঁর চরিত্রের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সহানুভূতিশীল চিকিৎসকরূপে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছবির প্রেমিক-প্রেমিকা অধ্যাপক গৌতম ও ছাত্রী লিপিকার ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায় তাঁদের সাবলীল অভিনয়ের দ্বারা চরিত্র দু'টির দাবি পূর্ণ করেছেন; আবেগপূর্ণ দৃশ্যগুলিতে তাঁদের আন্তরিকতা দর্শক-চিত্তকে উদ্বেলিত করে। অপরাপর ভূমিকায় সকলেই যথাযোগ্য অভিনয়ে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এই কলাকৌশলসমৃদ্ধ ছবিটির মাধ্যমে বর্তমান সমাজ জীবনের একটি অত্যন্ত জটীল প্রশ্ন সার্থকভাবে তুলে ধরবার জন্যে আমরা ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকবৃন্দকে সাধুবাদ জানাই।

মনমৌজি (হিন্দী) : এ. ভি. এম-এর নিবেদন; ৪,৯১১ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ. ভি. মায়াপ্পান; কাহিনী : কে. ভি. রেড্ডী, ডি. ভি. নরশরাজু এবং ডি. মধুসূদন রাও; পরিচালনা : কৃষ্ণন পঞ্জু; সঙ্গীত পরিচালনা : মদনমোহন; গীতিরচনা ও সংলাপরচনা : রাজেন্দ্র-কৃষ্ণন; আলোকচিত্র পরিচালনা : এস. মারুতিরাও; আলোকচিত্র গ্রহণ : ভি. পুণ্যকোটি; শব্দানুলেখন : এস. পি. কার্ডার; শিল্পনির্দেশনা : এইচ,

শান্তারাম; সম্পাদনা ঃ এস, পাঞ্জাবী ও অয়ম, বিঠল; রূপায়ণ ঃ সাধনা, মঞ্জু, লীলা চিটনীজ, দুর্গা খোটে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, অচলা সচদেব, ভারতী রায়, কিশোরকুমার, প্রাণ, আনওয়ার হোসেন, অসীমকুমার, সুন্দর, মোহন চটি, ওম প্রকাশ, মাস্টার অশোক প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯এ নভেম্বর থেকে ওরিয়েন্ট, বীণা, বসুশ্রী, কৃষ্ণা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সেক্সপীয়র বলেছেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিসই ঘটে, যা কবির কল্পনাকে হার মানিয়ে দেয়। তাই ছোট্ট ছেলে রাজা তার মরণাপন্ন গরীব মায়ের ওষুধের দাম সাত টাকার বদলে তার সম্বল পাঁচটি টাকা দিতে চেয়েও না পেয়ে ওষুধের শিশিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং এই অপরাধে সাজা পেয়ে শিশু-অপরাধীর সংশোধনাগারে প্রেরিত হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে সে শোনে, তার মা ইত্যবসরে মারা গেছেন এবং তার একমাত্র ছোট-বোন লক্ষ্মীকে একটি অনাথ আশ্রমে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনাথ আশ্রমের দ্বাররক্ষক মিথ্যা কথা ব'লে তাকে যখন তাড়িয়ে দেয়, তখন সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে এক কৃপণ বড়লোকের বাড়ীতে। সেখানে থাকতে থাকতেই এক দুর্বৃত্তের হাত থেকে সে সব্জিওয়ালী রাণীকে রক্ষা করে। রাজা ও রাণীর বন্ধুত্ব যখন ভালোবাসায় পরিণত হচ্ছে, তখন রাজা তার বোন লক্ষ্মীর সন্ধান পায় সেই অনাথ-আশ্রমে। সেখানে তাকে মিথ্যে ক'রে বলতে হয়, সে ব্যবসায়ী এবং ধনী। লক্ষ্মী কলেজে পড়ায় সাহায্যের জন্যে সে তার মনিববাড়ী থেকে তিনশো টাকা এবং মনিবকন্যার বিবাহের জন্যে কেনা দামী শাড়ী ও কিছু গহনা এনে লক্ষ্মীকে দেয়। কিন্তু যখন সে ঐ জন্যে ধরা পড়ে আবার জেলে যায় তখন দুঃখে অনুশোচনায় লক্ষ্মী আশ্রম ত্যাগ করে। জেল থেকে আবার ছাড়া পেয়ে সে এক জায়গায় মোটর-ড্রাইভারের কাজ নেয়; কিন্তু যখন দেখে, তারই আদরের বোন সেই বাড়ীর ছোট ছেলের বৌ হতে চলেছে, তখন সে ড্রাইভারের কাজ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে ওখানেও সে পায় চোর অপবাদ। তার ওপর তার আগেকার কৃপণ মনিব যখন টের পায়, তার বোনের সঙ্গে সেই ডাক্তার ছেলেটির বিয়ে হচ্ছে, যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়নি, তখন কৃপণ ঐ বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। কিন্তু এখনেও দৈবের গুণে কৃপণ হ'ল নিহত এবং সন্দেহের বশে রাজু পড়ল ধরা। এরপর আসল দুর্বৃত্ত ধরা পড়ে নিরপরাধ রাজু কেমন ক'রে ছাড়া পেয়ে তার প্রেমিকা রাণীর সঙ্গে মিলিত হল, তাই নিয়েই গল্পের শেষ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে। "মনমৌজি" কথাটার অর্থ হয়ত মন যার প্রতি মজে; সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মনের মানুষ। এ-ক্ষেত্রে রাজা ও রাণী হচ্ছে পরস্পরের মনমৌজি।

প্রযোজক মারাপ্পান চিত্রপ্রিয় দর্শক-দের বেশ ভাল রকমই চেনেন। তাই তিনি তাদের সব রকমে ভালো লাগবার মতো করেই তাঁর জনপ্রিয় ছবিগুলি প্রস্তুত করেন; দর্শকচিত্তজয়ী সব কর্ণ্ট বাণকেই তিনি তাঁর ছবিতে কায়দা-মাফিক নিক্ষেপ করেন এবং তার কোনোটাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। দর্শক সহানুভূতি লাভের উপযোগী চরিত্রে ভরা কাহিনীর মধ্যে আনন্দ ব্যথা যেমন থাকে, তেমনি থাকে নাচ-গান ও কৌতুকরসের প্রস্রবণ; তার ওপর থাকে সুন্দর বহির্দৃশ্যের সঙ্গে জমকালো

সদ্যমুক্ত শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর 'নবদিগন্ত' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

দৃশ্যপটপূর্ণ স্টুডিও-সেট। তাই দেখি, ছবির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ দর্শক তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং প্রতিক্ষণে ছবির ঘটনাবৈচিত্র্যে কখনও আনন্দে অধীর হয়, আবার কখনও কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে। "মনমৌজি"তেও তার ব্যতিক্রম দেখিনি।

অভিনয়ে রাজা, রাণী, রায় বাহাদুর ভোলানাথ, জগৎ এবং লক্ষ্মীর ভূমিকায় যথাক্রমে কিশোরকুমার, সাধনা, ওম প্রকাশ, প্রাণ এবং নাজ তাঁদের গৃহীত চরিত্রে সাবলীল অভিনয় ক'রে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছেন। কিশোর এবং সাধনার নাচ-গান উপভোগ করেননি, এমন দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পেলুম না। অন্যান্য চরিত্রে লীলা চিটনীজ, দুর্গা খোটে, আনওয়ার হোসেন, অসীমকুমার প্রভৃতি যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে 'এ-ভি-এম'-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

স্টারে "কারাগার": ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে অর্থদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ অভিনয় রজনীতে স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত "কারাগার" নাটকটি অভিনয় করেছিলেন গেল সোমবার, ২৬এ নভেম্বর।

মাত্র একদিন অভিনয় করবার জন্যে "কারাগার"-এর মত একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটককে মহলা দিয়ে উপযোগী সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপট সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করা নাট্যজগতে নিশ্চয়ই একটি অভাবনীয় ব্যাপার। আমরা দেখে চমৎকৃত হয়েছি, স্টার কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুযোগ্য শিল্পিবৃন্দ, নেপথ্য-শিল্পী ও কলাকুশলী এবং পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ফলে এই গুরুদায়িত্ব এমন সার্থকভাবে পালন করেছেন যে, মনে হয়েছে, ও'রা এই নাটকখানিকে বেশ কিছুকাল ধরে নিয়মিতভাবে অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত করেছেন।

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে, ১৯৩০ সালের ২৪এ ডিসেম্বর অধুনালুপ্ত মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে মন্মথ রায় রচিত "কারাগার" নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন আমাদের দেশ ছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত। তখন নারায়ণের চরণে অস্ত্র সমর্পণ করে মথুরারাজ কংসের বিরুদ্ধে যাদবকুলের নিরস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সৌসাদৃশ্য ছিল ব'লে নাটকখানি ঐ সময় যে যুগবার্তা বহন ক'রে নিয়ে এসেছিল, আজকের দিনে তার প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে ফুরিয়ে গেছে। তবুও দেশাত্মবোধক নাটক হিসেবে "কারাগার"-এর যে স্বকীয় মূল্য আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ ক'রে কাজী নজরুল ইসলাম এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত গানগুলি নাটকখানির বিশেষ সম্পদ। এই হিসেবে অল্প চরিত্র নিয়ে রচিত দেশাত্মবোধক নাটক "কারাগার"কে মঞ্চস্থ ক'রে স্টার কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৩০ সালে "কারাগার" নাটকের উদ্বোধন রজনীতে যে আকর্ষণীয় ভূমিকালিপি ছিল, তা এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বসুদেব—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (দানীবাবু), কংস—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কঙ্কন—ভূমেন রায়, নরক—মণি ঘোষ, দেবকী—সুশীলাসুন্দরী, চন্দনা—নীহারবালা, মদিরা—শেফালিকা।

স্টারের আলোচ্য অভিনয়ের ভূমিকালিপি আগেকার থেকে নিশ্চয়ই দুর্বল। বর্তমানের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, এমনকি নৃত্য-গীত সংবলিত অপেরা অভিনয় করবার মত শিল্পী সঙ্ঘের বিশেষ অভাব। এমন কোন সাধারণ রঙ্গালয় আজ নেই, যেখানে নরীসুন্দরী, আশ্চর্যময়ী, সুবাসিনী, আঙুরবালা, ইন্দুবালার সমপর্যায়ভুক্ত গায়িকা আছে। অভিনয়ে, নৃত্যে, গীতে নীহারবালার সমকক্ষা নায়িকা আজকের রঙ্গজগতে একান্ত দুর্লভ। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, চারুশীলা প্রভৃতির মত নৃত্যকলাদক্ষ শিল্পী আজ কোথায়? এবং স্টারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র যাঁর উত্তরাধিকারী, সেই উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারের সুবিখ্যাত সখিসঙ্ঘ আজ নিঃশেষে অন্তর্হিত।

তাই স্ত্রী-ভূমিকাগুলিতে নৃত্য-গীতের দিক দিয়ে "কারাগার"-এর অভিনয়কে সেদিন অত্যন্ত দুর্বল ব'লেই মনে হ'ল। বাসবী নন্দী আপ্রাণ চেষ্টা করে "ধরিত্রী"র উন্মাদনাকারী গানগুলিকে জীবন্ত, প্রাণস্পন্দী ক'রে তুলতে পারেননি। মাত্র "মদিরা"-রূপিণী লীলা পাল তাঁর ভরত-নাট্যম নৃত্যে কিছুটা মুখরক্ষা করেছেন; যদিও

"মদিরা"র মাদকতাময়ী লাস্যানুভোর যৌবনোন্মেষ তাতে ছিল না।

অভিনয়াংশে অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন কংসের ভূমিকায় কমল মিত্র। তাঁর রূপসজ্জা, দৈহিক সৌষ্ঠব এবং বাচনভঙ্গী ভূমিকাটির মর্যাদা রক্ষা করেছে। বসুদেবের ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় দর্শক মনকে স্পর্শ করেছে; অতি শব্দে বাণীর প্রতি এঁর সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি অত্যিমাত্রায় প্রশংসনীয়। বিদুরথ বেশে পঞ্চানন ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন; বিশেষ ক'রে পুত্রহারা বিদুরথের উন্মাদ-দৃশ্যটি স্মরণীয়। স্ত্রী-চরিত্রে দেবকী ও চন্দনার ভূমিকায় যথাক্রমে অপর্ণা দেবী ও গীতা দে অভিনয়গুণে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কংকন ও কঙ্কার রোমাণ্টিক চরিত্রে শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী ভূমিকা দু'টির প্রতি সুবিচার করেছেন। অপরাপর ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত।

মঞ্চস্থাপনায় ও আলোকনিয়ন্ত্রণে অনিল বসুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

শৌভনিক-এর "যা নয় তাই": প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শৌভনিক সম্প্রদায় গেল ২৭এ নভেম্বর মুক্তাঙ্গনে নিবেদিতা দাস রচিত "যা নয় তাই"—নামে তাঁদের চলতি নাটকটিকে মঞ্চস্থ করলেন।

মোলেয়ার রচিত যে কৌতুক নাটিকাখানি থেকে "যা নয় তাই"-এর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তাই নিয়ে গঠিত "দিল্লী থেকে কলকাতা" নামে একখানি চলচ্চিত্র আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। তবে পার্থক্য এই যে, বর্তমান মঞ্চ-নাটিকাটি অভিনয় এবং প্রয়োগগুণে যে পরিমাণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, ছবিখানি চলচ্চিত্রায়ণের দোষে ততটা সার্থক হয়ে উঠতে পায়নি।

সামান্য কেরাণীর স্ত্রী তার বান্ধবীর কাছে নিজেদের মিথ্যা পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কি কাণ্ড না ক'রে বসল এবং শেষ পর্যন্ত দুই বান্ধবীরই মিথ্যা দম্ভ কেমন ফাটা বেলুনের মত চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়ে সত্যকে প্রকাশ ক'রে উভয়পক্ষের সম্পর্ককে সহজ ক'রে তুলল, তাই নিয়েই এই চমৎকার কৌতুক-নাটিকাটির বিস্তৃতি।

অভিনয়ে মাত করেছেন কুমুদিনীর ভূমিকায় নিবেদিতা দাস এবং তাঁকে সব রকমে সাহায্য করেছেন কিশোরের ভূমিকায় গোপেন মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্র-নারায়ণরূপে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটিকার শেষাংশে সূর্যনারায়ণ বেশে রথীন ঘোষ নতুন ক'রে হাসির খোরাকের আমদানী করেন।

পরিমিত মঞ্চের ওপর একটি মাত্র সুপরিকল্পিত দৃশ্যের সাহায্যে শৌভনিক-সম্প্রদায়ের "যা নয় তাই" অভিনয় দর্শকদের অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে উপভোগ্যতার সাগরে ডুবিয়ে রাখে।

বর্তমান সীমান্ত পরিস্থিতির ওপর রচিত ছোট একাঙ্কিকা "তৈরী হও" অত্যন্ত সময়োচিত নাট্যাবদান এবং এর অভিনয়ও প্রাণস্পর্শী।

স্টার থিয়েটারের সাহায্য অভিনয়:

গেল সোমবার, ২৬শে নভেম্বর ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত "কারাগার"-এর যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, তার বিক্রয়-লব্ধ ২৮১০ টাকা ঐ রাত্রিতেই দর্শক-সমক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐ সঙ্গে আরও যে-সব দান ঐ অনুষ্ঠানে সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্টারের স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্রের ২০০১ টাকা, তাঁর সহধর্মিণীর ১২½ ভরি সোনা, কমল মিত্রের ৫০১ টাকা, কাহিনীকার শক্তিপদ রাজগুরুর ১০১ টাকা, নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের সোনার ঝর্ণা-কলম, শিল্প-নির্দেশক অনিল বসুর সোনার বোতাম, অপর্ণা দেবী ও লিলি চক্রবর্তীর একটি ক'রে নেকলেস, গীতা দে, প্রভাবতী জানা, শীলা পাল প্রভৃতির আংটি এবং চন্দ্রশেখর প্রমুখ কয়েকজন শিল্পীর সোনার পদক।

রঙমহলের "মহাপ্রেম"-নাটকের অভিনয়-স্বত্ব ক্রয়

গেল হপ্তায় প্রেক্ষাগৃহে আমরা লিখেছিলুম, "কোনো সাধারণ রঙ্গালয় যদি উৎসাহী হয়ে নাটকখানিকে কাল-বিলম্ব না ক'রে মঞ্চস্থ করেন, তাহলে তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ অর্জন করবেন।" শুনে অতিমাত্রায় আনন্দিত হলুম, রঙমহল সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই নাটকখানির অভিনয়স্বত্ব ক্রয় করেছেন এবং যাতে তাঁরা ডিসেম্বরের মধ্যেই "মহাপ্রেম"কে মঞ্চস্থ করতে পারেন, তারও জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা, নাটকখানির উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

স্টারে মন্মথ রায়ের "স্বর্ণকীট":

ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে স্টার থিয়েটার যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, সেই আসরে নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত সাধারণ্যে নিবেদন করেন, অতি শীঘ্রই স্টার কর্তৃপক্ষ মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা "স্বর্ণকীট" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

মহিলা শিল্পী মহল-এর "মিশরকুমারী" অভিনয়

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে এবং দুঃস্থা শিল্পীদের আশ্রয় প্রতিষ্ঠা-কল্পে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট মহিলা শিল্পবৃন্দ গেল বুধবার, ৫ই এবং আজ শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে "মিশরকুমারী" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছেন এবং করবেন। সরযূ দেবী এবং মলিনা দেবীর যুগ্ম-পরিচালনাধীনে এই নাটকের ভূমিকালিপি হচ্ছে: আবন—

'মনমৌজী' চিত্রে সাধনা

মল্লিনা, সামন্দেশ—সুনন্দা, জিনো—কানন, রামেশিশ—বনানী, কাকাতুয়া—মঞ্জু, খারেব—অনুভা, সায়া—সুলতা, বুলো—বাসবী এবং নাহরিণ—মাধবী মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনা করছে বাঁশরী লাহিড়ী ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং আলোক-সম্পাতে আছেন তাপস সেন।

এই অভিনয় দেখবার জন্যে নাট্যামোদী সুধিবৃন্দের মধ্যে যে-উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল, তাতে আশা করা অন্যায় নয়, মহিলা শিল্পী মহলের সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে "ডাক" ও "সাজাহান"

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যে আসছে মঙ্গলবার, ১১ই ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রথিতযশাঃ পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের দ্বারা প্রণব রায় রচিত দেশাত্মবোধক নাটিকা "ডাক" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটক অভিনীত হবে।

রঙমহল-এর বিশেষ অভিনয়

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যে কাল শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর রঙমহলের শিল্পীরা তাঁদের চলতি নাটক "আদর্শ হিন্দু হোটেল" অভিনয় থেকে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ দান করবেন বলে স্থির করেছেন।

"মুখোস" সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা

ভবানীপুরের থিয়েটার সেন্টারে নিয়মিত অভিনয়কারী "মুখোশ"-সম্প্রদায়ের পরিচালক তরুণ রায় নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, তাঁরা আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ কি রসের নাটক দেখবার ইচ্ছা করেন। নাট্যামোদী দর্শকরা যদি সরাসরি এ ব্যাপারে ৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ—এই ঠিকানায় থিয়েটার সেন্টারের পরিচালক তরুণ রায়কে তাঁদের মতামত জানিয়ে দেন, তাহলে "মুখোশ"-সম্প্রদায় দর্শকদের মনোমত কোনো নাটককে ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে মঞ্চস্থ করতে পারেন।

তরুণ রায় আর একটি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাঙলা দেশের নাট্যশিল্পিবৃন্দকে। ১৯৬৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি "সাজাহান" নাটক মঞ্চস্থ করবার সংকল্প প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি বাঙলা দেশের সকল পেশাদার এবং

[illegible] পরিচালিত '[illegible]' চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। (কাহিনী : তারাশঙ্কর)

অপেশাদার মঞ্চশিল্পীর সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে "বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা" শিগ্‌গিরই চালু হবে, এ-খবর "অমৃত"-র পাঠকদের অজানা নেই। এই কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে (গভর্ণিং বডি) অন্যূন ৩০ জনের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অচ্যুত দত্ত, অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যক্ষ ডঃ রমা চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, মন্মথ রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি জনবরেণ্য মনীষী।

পদ্মিনী পিকচার্স (মাদ্রাজ)-এর "দিল তেরা দিওয়ানা"

আজ শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে হিন্দ, জনতা, কৃষ্ণা, রূপালী, ভবানী, প্যারামাউন্ট প্রভৃতি চিত্রগৃহে মাদ্রাজের পদ্মিনী পিকচার্স-এর "দিল তেরা দিওয়ানা" ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে। বি আর পান্থালু পরিচালিত এবং শঙ্কর জয়কিশনের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে মালা সিংহ, শুভা খোটে, শাম্মী কাপুর, মেহমুদ, প্রাণ, ওমপ্রকাশ, মোহনপেটি, মনমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি শিল্পীকে। রাজশ্রী পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

ভ্রম সংশোধন

গেল ৩০শে নভেম্বর "অমৃত"-এ কমলা সার্কাস-এর একখানি ছবির (৪৯৩ পৃঃ) নীচে পরিচয়লিপিতে ছিলঃ "কমলা সার্কাসের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০১ টাকা দেওয়া হচ্ছে।" আসলে টাকাটা দেওয়া হয়, কমলা সার্কাসের স্থানীয় প্রযোজক মেসার্স ডি সি কাপুরের পক্ষ থেকে।

জীবন গাঙ্গুলী পরিচালিত 'দুই নারী' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার

"দিল তেরা দিওয়ানা" চিত্রে শাম্মি কাপুর ও মালা সিন্‌হা

একখানি চিঠি

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

সাম্রাজ্যবাদী চীনের নৃশংস ভারত আক্রমণে যন্ত্রণায়, ক্ষোভে রোষে সুকঠোর জীবনপণ সংগ্রামের শপথ নিয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। নতুন চেতনায়, নতুন পথে কোটী কোটী মানুষের নিঃশংক অভিযান চলেছে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে। মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রায় সর্বত্রই শিল্পীরা পথে নেমেছেন স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি বন্দনায়।

কলকাতায় এসে কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো হতাশায়, লজ্জায় আপনি বুজে যাবে। এই সেই কলকাতা, চারটে পেশাদারী নাট্যমঞ্চ। এদের কোনটির গায়ে নতুন চেতনার অরুণ আলো লাগেনি। শত রজনী অতিক্রান্ত নাটকগুলির ক্লান্তিকর পরিক্রমা চলেছে সমানভাবে। অথচ পরাধীন ভারতে অসহযোগ, স্বরাজ্য, বঙ্গভঙ্গ এমনি কত আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ সুগভীর দেশপ্রেমের হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিল নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর', 'রঘুবীর', বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' প্রমুখ খ্যাত, স্বল্পখ্যাত নাট্যকারবৃন্দের গভীর 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' নিয়ে।

এই তো সেদিন! বিয়াল্লিশের 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে সংগ্রামে, বন্দী

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে, রামেশ্বর ব্যানার্জি, আব্দুস সালামের রক্তে ভেসে যাওয়া রাজপথে ছাত্র সমাজের শোণিত-স্নাত পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশ ঘোষণায় কলকাতার মঞ্চও পেছিয়ে থাকেনি। স্টারে চলেছে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের রচনা পরিচালনায় 'মহারাজ নন্দকুমার', 'টিপুসুলতান', 'রাণী ভবানী', 'রণজিৎ সিংহ', 'স্বর্গ হতে বড়', মিনার্ভার 'কেদার রায়', 'ঝান্সীর রাণী' রঙমহলে 'বাংলার প্রতাপ', 'পথের দাবী' শ্রীরঙ্গমে নাট্যাচার্যের 'দুঃখীর ইমান', 'বিপ্রদাস', 'সিরাজদ্দৌলা', নাট্যভারতীতে 'দুই পুরুষ' অপূর্ব গরিমামণ্ডিত সেদিনের নাট্যমঞ্চগুলির ভূমিকা।

জানি, সেদিন যাঁরা নাট্যমঞ্চগুলির হাল ধরেছিলেন, তাঁরা কম বেশী আদর্শ-বাদী ছিলেন। তাই নাট্যমঞ্চগুলি যথার্থই 'A nation is known by its theatre' কথাটি সার্থক করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে চারটির তিনটিতে তো প্রবীণ নাট্যকারবৃন্দ রয়েছেন। কেন তাঁদের এই লজ্জাকর নীরবতা!

দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও জনসাধারণ বার বার আবেদন জানিয়েছেন দেশাত্মবোধক নাটকগুলির পুনরভিনয়ের জন্য। ব্যর্থ হয়েছে সে ডাক। তবে প্রতিরক্ষা তহবিলে কিছু অর্থদান করাতেই যদি কর্তব্য শেষ হয় তবে নাট্যমঞ্চগুলি একটি করে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষ মহল কিছু কিছু স্বর্ণালংকার দান করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

ভবিষ্যতে হয়তো এ ভ্রান্ত ভূমিকা নাট্যশালাগুলি থেকে বিদায় নেবে চিরতরে, কিন্তু আজকের একটি ব্যর্থতা ভবিষ্যতে বহুদিনের লজ্জা বেদনার সঞ্চয় করে রাখবে স্মৃতির ভান্ডারে। ইতি—
শ্রীদীনেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া।

উত্তর

বর্তমান সংখ্যায় 'বিবিধ সংবাদে' এ বিষয়ে কিছু সংবাদ আছে।

সম্পাদক, অমৃত
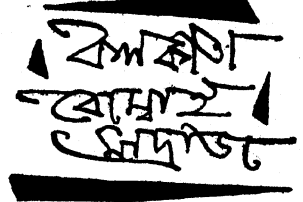
।। কলকাতা ।।

সত্যজিৎ রায়ের তিন সহকারী মিলে একটি ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই নবতম 'প্রান্তিক' গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গাঙ্গুলী। সুবোধ ঘোষের 'শেষ প্রহর' অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই মাসের মাঝামাঝি টেক্‌নিসিয়ান স্টুডি-ওয় চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল। প্রধান তিনটি মুখ্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কুশলী বিভাগে আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় কাজ করবেন সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত। রূপন ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন অনন্ত দাস ও মুকুল চৌধুরী। সম্ভবত এ ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক অসিত সেনের সহকারী পার্থপ্রতিম চৌধুরী এই প্রথম স্বাধীন-ভাবে তাঁর ছবি আশাপূর্ণা দেবীর 'ছায়াসূর্য'র কাজ আরম্ভ করেছেন গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। আর ডি বনশাল প্রযোজিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর, নির্মলকুমার, অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অরুণ মুখো-পাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, গীতা দে ও দিলীপ রায়। রবি ঘোষ। আলোকচিত্র ও সংগীত পরি-চালনা করছেন বিশু চক্রবর্তী ও ভি বালসারা।

এই মাসে চিত্ত বসু পরিচালিত 'ধূপছায়া' মুক্তিলাভ করছে। নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত এ কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশ-গুপ্ত। সংগীত পরিচালক অমল মুখো-পাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়
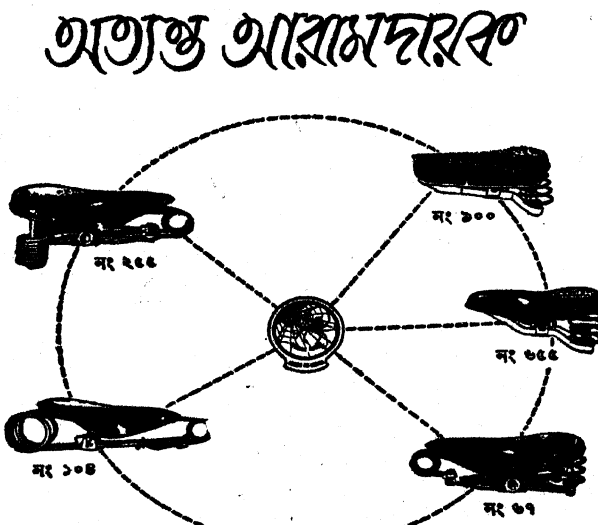
করেছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, অনুভা গুপ্তা, দীপ্তি রায়, তরুণকুমার ও অপর্ণা দেবী।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওর পরিচালক সুরেশ রায় 'মরুতৃষা' ছবির কাজ পুনরায় শুরু করেছেন। এ ছবির সংগীত পরিচালক কালোবরণ। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন মুরারী ঘোষ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, রবীন মজুমদার, তপতী ঘোষ, বিপিন গুপ্ত, পদ্মা দেবী, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও মণি শ্রীমানি।

।। বোম্বাই ।।

মডার্ণ স্টুডিওয় গত সপ্তাহে শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'কাশ্মীর কী কলিয়া' ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ ছবির নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর এই প্রথম হিন্দী ছবিতে অভিনয় করতে বোম্বে এসেছেন। বিপরীত নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় শিল্পী শাম্মি কাপুর। সংগীত পরিচালনা করবেন ও পি নায়ার। এই রঙিন ছবির কাহিনী রচনা করেছেন রঞ্জন বসু।

'হাম দোনো' চিত্রের কাহিনীকার নির্মল সরকার সম্প্রতি প্রযোজক হয়েছেন। তিনি একটি হিন্দী ছবির মহরৎ করেছেন, যার নাম 'জুয়ারী'। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন শশি কাপুর ও নন্দা। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুরজ প্রকাশ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রাজকুমার, তনুজা, মাধবী, অচলা সচদেব, মদনপুরী ও নবাগত কাবেরী। সংগীত পরিচালনা করবেন কল্যাণজী এবং আনন্দজী।

হামরাহী ফিল্মস্-এর 'দামাদ' চিত্রগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এস এম আব্বাস পরিচালিত এ ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন বিশ্বজিৎ ও অনিতা গুহ। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণজী-আনন্দজী এ ছবির সংগীত পরিচালক।

সম্প্রতি দুটি ছবির সংগীত গ্রহণ শেষ হল। সংগীত পরিচালক শচীনদেব বর্মন বৃন্দাবন পিকচার্সের 'কৈসে কহুঁ' ছবির সংগীত গ্রহণ করলেন লতা মঙ্গেশকরের কন্ঠে। এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও নন্দা। ছবিটি পরিচালনা করছেন আত্মারাম।

স্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে অর্থ ও অলঙ্কারাদি তুলে দিচ্ছেন। মধ্যে রয়েছেন নাট্যকার মন্মথ রায়।

'মুঝে জিনে দো' ছবির সংগীত গ্রহণ করলেন সংগীত পরিচালক জয়দেব। কন্ঠদান করেন আশা ভোঁসলে। গোয়ালিয়র বহির্দৃশ্যে একটি গানের দৃশ্য গৃহীত হবে। সুনীল দত্ত প্রযোজিত ও অভিনীত এ ছবির বিপরীত নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রেহমান। ছবিটি পরিচালনা করছেন মণি ভট্টাচার্য।

।। মাদ্রাজ ।।

মাদ্রাজের বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ টাকারও বেশী অর্থ সংগৃহীত হয়েছে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে। সারা ভারতের চিত্রজগতের মধ্যে মাদ্রাজের দানই উল্লেখযোগ্য।

চিত্রালয়ের একটি জনপ্রিয় তামিল ছবির কাহিনী অবলম্বনে হিন্দী 'দিল এক মন্দির'এর কাজ আরম্ভ হয়েছে বাহেনী স্টুডিওয়। এ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হলেন সি ভি শ্রীধর। তিন সপ্তাহে এ ছবির কাজ শেষ করবেন বলে পরিচালক জানিয়েছেন। মীনাকুমারী, রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার, মামুদ, শুভা খোটে, কৃষ্ণকুমারী ও অচলা সচদেব এ ছবির প্রধান চরিত্রলিপি। সংগীত পরিচালনা করছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।
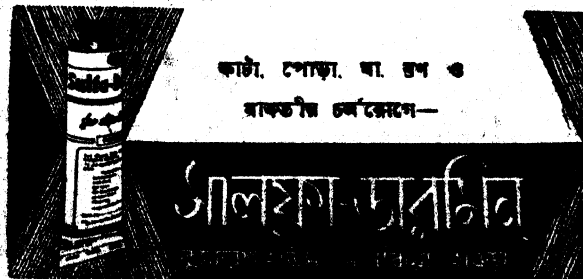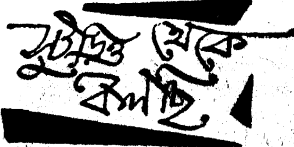
এ সপ্তাহ থেকে কয়েকটি বাংলা ছবির কাজ আবার আরম্ভ হয়েছে। শীতের দুপুরে স্টুডিও পাড়ায় খবর এখন অনেক। সারি সারি স্টুডিও-ফ্লোরে নতুন নতুন ছবি। টেক্‌নিসিয়ানে যাত্রিকগোষ্ঠীর 'পলাতক।' ক্যালকাটা মুভিটনে কনক মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ প্রদীপ।' ইন্দ্রপুরীতে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের নতুন ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এখানেই পরিচালক সুশীল ঘোষ তাঁর ছবি 'পলাশের রঙ' আরম্ভ করেছেন। চিত্র গ্রহণের দিনে শ্রীঘোষ পরিচয় করিয়ে দেন এ ছবির শিল্পীদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, অঞ্জনা নাগ এবং বঙ্কিম ঘোষ। আপনারা বঙ্কিম ঘোষের অভিনয় নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে চলচ্চিত্রে নয় রঙ্গমঞ্চে। রূপকার সংস্থার 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখে থাকবেন। সেই ঘনশ্যাম-এর চরিত্রে যিনি একাই একশো। এ ছবিতেও এঁর অভিনয় আপনাদের খুসী করবে। কারণ চিত্রগ্রহণ দেখে আমার তাই ধারণা হয়েছে। শ্রীঘোষের খুব ইচ্ছে চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করার। কিন্তু তেমন সুযোগ তিনি এখনও পাননি বলে অভিযোগ করেন। একদিন কিন্তু এঁর অভিযোগ ভাঙবে তা আজকের অভিনয় দেখে বোঝা যায়।

এ ছবির কাহিনী আগে আপনাদের বলি তারপর অন্যান্য খবর জানাবো। চিত্র-গ্রহণের অবসরে পরিচালক শ্রীঘোষ কথায় কথায় এ ছবির গল্প বললেন।

হারাণ কবিয়ালের স্বপ্ন—মহিমকে সে কবি-গান গাইতে দেবে না—তাকে ওস্তাদী গান শেখাবে, বড় করবে। সারা দেশের মানুষগুলো মহিমের গান শুনে পাগল হয়ে যাবে। কাগজে কাগজে মহিমের ছবি ছাপা হবে। সকলের মুখে মুখে শুধু একটাই নাম হবে—মহিম রায়।

সেবার রায় বাবুদের বাড়ীতে গান গাইতে এল—চম্পাবাঈ। সেদিন আসরে মহিমকেও গাইতে হল। ওর গান শুনে এদিকে চম্পাবাঈ মুগ্ধ হয়ে মহিমকে ভিক্ষে চেয়ে বসে। হারান তো শুনে অবাক। সে তো এই স্বপ্নই দেখছে সারাটা জীবন ধরে। জমিদার রায় বাবুও হারানকে বুঝিয়ে বলেন—'এই ছাই-গাদাতে আর পদ্মফুলটাকে ফেলে রেখো না ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। হারান চম্পাবাঈকে কথা দেয়। কিন্তু মহিম বেঁকে বসে—সে একা যাবে না কোথাও। হারানকাকা, মা এবং গৌরীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। গাঁয়ের মাটিই তার ভাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চম্পাবাঈ-এর চাপে মহিমকে কলকাতায় চলে যেতে হল।

'পলাশের রঙ' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে বঙ্কিম ঘোষ, পরিচালক সুশীল ঘোষ, অসীমকুমার ও মঞ্জুলা সরকার

নিঃস্বার্থভাবে মহিমকে বড় করে তোলে চম্পাবাঈ। বড় বড় ওস্তাদের কাছে শেখে। একের পর এক সংগীত সম্মেলনে মহিম রায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সকলেরই মুখে মুখে তার নাম। এমনিভাবে একদিন খবরের কাগজ থেকে হারানও দেখতে পায় মহিমের ছবি। গৌরী আর গৌরীর মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মহিমের ছবিটির দিকে। ওদিকে চম্পাবাঈও ছবি দেখে। স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য! মহিম তার কে? এইরকম নানান প্রশ্ন তোলে চম্পাবাঈয়ের বিগত প্রেমিক কুমার সাহেব। চম্পাবাঈ জবাব দেয়—কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসেব কষে দেখিনি কুমার। আজ আমি সার্থক। স্বপ্ন দেখা আমার সফল হয়েছে।

জয়মাল্য পরে ফিরে আসে মহিম। হাসতে হাসতে চম্পাবাঈকে একটা আড়াই হাজার টাকার চেক্ দেখায়। এই অর্থ-প্রাপ্তি তার কোন একটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার জন্য। চম্পাবাঈ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—এ তুমি কি করেছো মহিম? টাকার জন্যে তুমি নিজের প্রতিজ্ঞাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এলে! ওরা তোমার গুণের মর্যাদা দেবে না। মহিম প্রতিবাদ জানায়। বলে—এটা তোমার গোঁড়ামি। যারা গানই বুঝলো না তারা গানের অপমৃত্যু ঘটাবে কি করে? এ তোমার অহেতুক ভয়। আমি যোগদান করবো কারণ টাকা চাই আমার—অনেক টাকা।

স্তম্ভিত হয় চম্পাবাঈ। একি সেই মহিম। যাকে অনেক বড় করে মানুষ করতে চেয়েছিল সে একদিন? স্বপ্ন দেখেছিল অনেক। এখন হারান কবিকে সে কি জবাব দেবে? কিছুই ভেবে পায়না চম্পাবাঈ।

কিন্তু মহিম তার প্রতিজ্ঞায় অটল।

বি এন বাহেতী প্রযোজিত স্বস্তিকা ফিল্মস্-এর 'পলাশের রঙ' ছবির কাহিনী রচনা করেছেন বাণী বিশী। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য করছেন সুশীল ঘোষ। আলোক-চিত্র, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় গণেশ বসু, গৌর পোদ্দার এবং শিবসাধন ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালক হলেন ভি বালসারা।

এ ছবির বিভিন্ন রূপায়নে রয়েছেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অঞ্জনা নাগ, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, চিত্রিতা মণ্ডল, আভা মণ্ডল, নিমাই ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রমেন ঘোষ ও নবাগত সুতপা মজুমদার। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন কিনে কর্ণার প্রাইভেট লিমিটেড।

—চিত্রদূত

।। ভিনদেশী ছবি ।।

আবার অনেকদিন পরে চিত্ররসিকরা বিগতদিনের দুই শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে দুটি অসাধারণ ভূমিকায় দেখতে পাবেন। ছবিটির নাম "ওয়াট এভার হ্যাপেনড টু বেবি জেন"। হেনরি ফ্যারেলের অদ্ভুত রসের উপন্যাস 'বেবী জেন' অবলম্বনে ছবিটি তোলা হয়েছে। দুই বন্ধ্যা ভগ্নীর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাহিনীর মূল আখ্যান। দুবোনই যৌবনে চিত্রাভিনেত্রী ছিল। ছোট বোনের খ্যাতি বড় বোনের খ্যাতিকে ম্লান করে দেওয়ার পর থেকেই দুবোন পরস্পরকে অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বড় বোন বেবী জেন শৈশব থেকেই মঞ্চে অভিনয় করে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। খ্যাতির হঠাৎ আলোয় সমস্ত প্রীতির সম্পর্ককে সে বিষ করে ফেলেছিল দম্ভ এবং এক-গুঁয়েমির তাড়নায়। বাবা মাকে সে তৃণ জ্ঞান করতো ছোটবেলা থেকেই এবং তার সহোদরা তার কাছে কেঁচোর চেয়েও তুচ্ছ। কিন্তু খ্যাতির আলোগুলো যতই নিভতে লাগল তার জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে ততই সেই তুচ্ছ কেঁচোটি যেন সাপের ফণা মেলতে থাকে। দিদির দুর্ব্যবহারের, অবজ্ঞার, প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছোট বোন যেন দিনের পর দিন নীরবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বড় বোন মদের মধ্যে ডুবে গিয়ে অতীতের গৌরব এবং বর্তমানের রৌরব থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। ছোট বোন জোয়ান তখন হলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। একদিন রাত্রে জোয়ান রাগে দিশাহারা হয়ে দিদিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে

বেটি ডেভিস ও জোয়ান ক্রফোর্ড

বিফলকাম হল। গাড়িটা একটা গেটে ধাক্কা খায় এবং জোয়ানকে হারাতে হয় তার পা-দুটো। ভাগ্যের পরিহাসে সেই দিদির ওপরেই তাকে নির্ভর করে থাকতে হয়। দিদি কিন্তু তাকে চাপা দেয়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কারণ ঘটনার সময় অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তার চেতনার খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। তার কেমন ধারণা হল গাড়িটা সে নিজেই চালাচ্ছিল এবং দুর্ঘটনার জন্যে সেই দায়ী। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সে স্থির করে বাকী জীবনটা পঙ্গু বোনের সেবা করেই কাটিয়ে দেবে। জোয়ানও নিজের স্বার্থে দিদির ভুলটা ভাংগে না।

কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ছোট বোনের অক্লান্ত সেবা করবার পর আসল ঘটনাটাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলল দিদি। তীব্র মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে বড় বোন প্রতিশোধের অবিশ্বাস্য উপায় খুঁজতে থাকে। তার প্রতিশোধ সুরু হয় খাবার দিয়ে। একদিন একটা ইঁদুর পুড়িয়ে ভালো করে সাজিয়ে ছোট বোনের মুখের কাছে ধরে। ব্যস খাওয়া একদম ঘুচে গেল জোয়ানের। সব সময় মনে হয় তার যেন যাবতীয় অখাদ্য জিনিষ রান্না করে খেতে দিচ্ছে তাকে দিদি। না খেয়ে খেয়ে পঙ্গু জোয়ান দিন দিন দুর্বল হয়ে আসে। পিশাচ দিদির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ফোন করতে যায়, দেখে ফোনের লাইন কাটা। সিঁড়ি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পালাতে যায় দিদি এসে তাকে বেঁধে রাখে ঘরে, মুখও বন্ধ করে দেয় বেঁধে।

পরিচালক রবার্ট এলড্রিচ রোমহর্ষক ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে চিত্রটিকে একেবারে জমাট ছবি করে তুলেছেন।

বড় বোনের ভূমিকায় বেটি ডেভিস রোমাঞ্চকর অভিনয় করেছেন। ছোট বোনের ভূমিকায় জোয়ান ক্রফোর্ড-এর অভিনয়ও মনে রাখার মত।

—চিত্রকূট

দর্শক

॥ কমনওয়েলথ গেমস ॥

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থের পেরী লেক স্টেডিয়ামে সম্প্রতি সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস শেষ হ'ল। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৫টি দেশের ১,০০০ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই সপ্তম কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে নি। ভারতবর্ষের যোগদানের কথা ছিল; কিন্তু চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পক্ষে যোগদান সম্ভব হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার কারণ অন্য, তারা আর কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত নয়। এই কমনওয়েলথ গেমসে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় (পঞ্চম অনুষ্ঠান) চতুর্থ স্থান এবং ১৯৫৮ সালের প্রতিযোগিতায় (ষষ্ঠ অনুষ্ঠান, কার্ডিফ) তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। গত ষষ্ঠ কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পেয়েছিল দু'টি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্যপদক।

পঞ্চাশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপ সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই উদ্বোধন উৎসব সাড়ে চার ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পুরোভাগে ছিল ওয়েলস। ১৯৫৮ সালের ওয়েলসের কার্ডিফে ষষ্ঠ কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণে তারাই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের শীর্ষ ভাগে স্থান পায়। অস্ট্রেলিয়ার আইভান লান্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের পক্ষ থেকে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেন। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের তালিকায় ছিল—এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, মুষ্টি যুদ্ধ, সাইকেল চালনা, কুস্তি, ভারোত্তোলন, রোয়িং, ফেনসিং এবং লন বাউলস। অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন সর্বাধিক প্রতিনিধি—২৪০ জনেরও বেশী। মাত্র একজন প্রতিনিধি নিয়ে যোগদান করেছিল—বার্বাডোজ, মালটা, বহামা এবং ডোমিনিকা। বহামা এবং বার্বাডোজের যোগদান সার্থক হয়েছিল। বহমার প্রতিনিধি একটি রৌপ্যপদক এবং বার্বাডোজের প্রতিনিধি একটি ব্রোঞ্জ-পদক পান।

আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় গত ১লা ডিসেম্বর।

ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ৩৫টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ স্বর্ণ পদক লাভ করে। স্বর্ণ পদকের মোট সংখ্যা ছিল ১০৪। স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির তালিকায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম (৩৮ পদক), ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় (২৯), নিউজিল্যাণ্ড তৃতীয় (১০) এবং পাকিস্থান চতুর্থ স্থান (৮) পায়। মোট পদক লাভের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম (১০৫ পদক), ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় (৭৮ পদক)। নিউজিল্যাণ্ড তৃতীয় (৩২ পদক) এবং কানাডা চতুর্থ (৩১ পদক) স্থান পায়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা থেকে ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি ৬টি অনুষ্ঠানে পদক লাভের তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের এই একটানা প্রাধান্য সপ্তম ক্রীড়ানুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া খর্ব করেছে। কার্ডিফে ১৯৫৮ সালের ৬ষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠানেই অস্ট্রেলিয়া তার এই সাফল্যলাভের পূর্বাভাষ দিয়েছিল—ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণ পদক সংখ্যা ছিল ২৯ এবং অস্ট্রেলিয়ার ২৭।

আলোচ্য সপ্তম ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্তরণ অনুষ্ঠান। সন্তরণে ৯টি বিশ্ব রেকর্ড ভংগ হয় এবং ৩টি বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করে। এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা এ্যাথলিটদের যোগদান সত্ত্বেও কোন নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়নি।

পার্থের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত দুই সাঁতারু—মহিলা বিভাগে মিস ডন ফ্রেজার এবং পুরুষ বিভাগে মারে রোজের ব্যক্তিগত সাফল্য অপর সকলকে নিষ্প্রভ করেছে। এ'রা দুজনেই চারটি (রিলে সমেত) ক'রে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের মহিলা সাঁতারু অনিতা লন্স ব্রাউ তিনটি বিষয়ে (১১০ গজ ও ২২০ গজ বুক সাঁতার এবং ৪৪০ গজ ব্যক্তিগত মিডলি রিলে) স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। সাঁতারের দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন—অস্ট্রেলিয়ার কেভিন বেরী (১১০ গজ ও ২২০ গজ বাটার ফ্লাই), ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান ফেলপস (স্প্রিং বোর্ড এবং হাই বোর্ড ডাইভিং), অস্ট্রেলিয়ার মিস সু নাইট (স্প্রিং বোর্ড এবং হাই বোর্ড ডাইভিং) এবং ইংল্যাণ্ডের পনর বছরের স্কুল-ছাত্রী মিস লিণ্ডা লুডগ্রোভ (১১০ গজ ও ২২০ গজ ব্যাক স্ট্রোক)।

সন্তরণ অনুষ্ঠানে (ডাইভিং সমেত) অস্ট্রেলিয়া ১৭টি, ইংল্যাণ্ড ৮টি এবং কানাডা ২টি স্বর্ণ পদক লাভ করে।

এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানের পুরুষ বিভাগে সেরাফিনো আন্তাও (কেনিয়া) ১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে এবং মহিলা বিভাগে মিস ডোরথি হিম্যান (ইংল্যাণ্ড) ১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে স্বর্ণ পদক পেয়ে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। ম্যারাথান রেসে (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) ব্রিয়ান কিলবি (ইংল্যাণ্ড) ২ ঘন্টা ২১ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম স্থান পান। দ্বিতীয় স্থান পান ৬ষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠানের (১৯৫৮ সাল) বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার

সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইল রিলে সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড অধিকারি অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু দল। (বাম দিক থেকে) ডন ফ্রেজার, রবিন থর্ন, রুথ এভারুস এবং লীন বেল। ৪ মিনিট ১১.০ সেকেণ্ড সময়ে এ'রা বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ডেভিড পাওয়ার—সময় ২ ঘণ্টা ২২ মিনিট ১৫·৪ সেকেণ্ড।

দৌড় প্রতিযোগিতায় দর্শক সাধারণের নয়ন-মন জয় করেছিলেন ৬ মাইল দৌড়ে বিজয়ী কানাডার ব্রুস কিড। তিনি ২৮মিঃ ২৬·৭ সেকেণ্ড সময়ে (নতুন রেকর্ড) লক্ষ্য স্থলে পেণছান। এই দীর্ঘ দূরত্ব অতি সহজ-ভাবেই তিনি অতিক্রম করেন; তাঁর দৌড়-ভঙ্গিমার মধ্যে ভবিষ্যতের আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা পরিস্ফুট।

পদক লাভের তালিকা

(প্রথম ...ভটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
অস্ট্রেলিয়া	৩৮	৩৬	৩১	১০৫
ইংল্যাণ্ড	২৯	২২	২৭	৭৮
নিউজিল্যাণ্ড	১০	১২	১০	৩২
কানাডা	৪	১২	১৫	৩১
স্কটল্যাণ্ড	৪	৭	৩	১৪
পাকিস্থান	৮	১	০	৯
ঘানা	৩	৫	১	৯

সন্তরণে বিশ্ব-রেকর্ড

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনু-ষ্ঠিত সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার এ্যাণ্ড কমনওয়েলথ গেমসে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

৪৪০ **গজ ফ্রিস্টাইল রিলে (মহিলা)**: সময় : ৪ মিঃ ১১·০ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া পূর্ব রেকর্ড : ৪ মিঃ ১৩·৮ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া, ২২শে অক্টোবর, ১৯৬২।

৮৮০ **গজ ফ্রিস্টাইল রিলে (পুরুষ)**

সময় : ৮ মিঃ ১৩·৪ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া। পূর্ব রেকর্ড : ৮ মিঃ ১৬·৬ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০।

১১০ **গজ ফ্রিস্টাইল (মহিলা)**

সময় : ৫৯·৫ সেঃ—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)।

২২০ **গজ বুক সাঁতার (মহিলা)**

সময় : ২ মিঃ ৫১·৭ সেঃ—অনিটা লন্সব্রাউ (ইংল্যাণ্ড)।

৪৪০ **গজ মিডলি রিলে (মহিলা)**— সময় : ৪ মিঃ ৪৫·৯ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া।

১১০ **গজ ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)**— সময় : ১ মিঃ ১০·৮ সেঃ—মিস পাম সার্জেয়েন্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

২২০ **গজ ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)**— সময় : ২ মিঃ ৩৫·২ সেঃ (হিট)— লিণ্ডা লুড গ্রোভ (ইংল্যাণ্ড)।

৪৪০ **গজ ফ্রি স্টাইল রিলে (পুরুষ)** —সময় : ৩ মিঃ ৪৩·৯ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

কুইন্সল্যাণ্ড : ৪৩৩ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কে ডি ম্যাকে নট আউট ১০৫, ট্রিম্বল ৯৫, বিজেস ৫৯ এবং গ্রাউট ৫৬। কোণ্ডওয়েল ১০৬ রাণে ২, লার্টার ৬৩ রাণে ২ এবং নাইট ৫৮ রাণে ২ উইকেট) ও ১৪ রাণ (৭ উইকেট। ডেক্সটার ৮ রাণে ৪ এবং গ্রেভনী ২ রাণে ২ উইকেট)।

এম সি সি : ৫৮১ রাণ (৬ উই-কেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন নট আউট ১৮৩, শেফার্ড ৯৪, নাইট ৮১, ডেক্স-টার ৮০ এবং গ্রেভনী ৫২। ওয়েস্টওয়ে ১৫৬ রাণে ৩ উইকেট)।

ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে এম সি সি দলের সফরের অষ্টম খেলাটি ড্র গেছে। বর্তমানে আলোচ্য সফরের ফলাফল : খেলা ৮, এম সি সি'র জয় ২, হার ২ এবং ড্র ৪।

কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে এম সি সি দলের খেলার ফলাফল বর্তমানে দাঁড়াল—মোট খেলা ১৬, এম সি সি'র জয় ৮, হার ১ এবং ড্র ৭।

বৃষ্টির দরুণ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম দিনে মাত্র ১২০ মিনিট খেলা হয়েছিল। কুইন্সল্যাণ্ড প্রথম ব্যাট করে ২ উই-কেটের বিনিময়ে ১২৩ রাণ করে। ইংল্যাণ্ডের কোণ্ডওয়েল ৪০ রাণে দুটো উইকেটই পান। ডেভিড লার্টার সুবিধা করতে পারেননি—৭ ওভার বলে ২৯ রাণ দিয়ে কোন উইকেট পাননি। চা-পানের পরের খেলায় লার্টারের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওভারে টেস্ট আম্পায়ার টাউনসেণ্ড পাঁচবার 'নো-বল' ডাকেন। ফলে দলের অধি-নায়ক ডেক্সটার তাঁর বল দেওয়া বন্ধ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় কুইন্স-ল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এম সি সি দলের বোলিং তুলোধুনা করে ছেড়ে দেয়। কুইন্সল্যাণ্ড ৭ উইকেটে ৪৩৩ রাণ করে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ম্যাকে সেঞ্চুরী (১০৫ রাণ) করেন। পাঁচ রাণের জন্যে ট্রিম্বল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। উইকেট-কিপার গ্রাউটের ৫৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। ম্যাকে এবং গ্রাউট দু'জনেই প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান পেয়েছেন। এইদিনে এম সি সি দল আধ-ঘণ্টার খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ২৯ রাণ করে।

তৃতীয় দিনের খেলায় এম সি সি দলের ৫ উইকেট পড়ে ৩৭৩ রাণ দাঁড়ায়। প্রথম উইকেটের জুটিতে শেফার্ড এবং পারফিট ১৩২ মিনিট খেলে দলের ১০১ রাণ যোগ করেন—এবারের সফরে এই রাণই প্রথম উই-কেটের জুটিতে এ পর্যন্ত সর্বাধিক রাণ হিসাবে গণ্য। শেফার্ড ৯৪ রাণ করে আউট হন। ২৪৪ মিনিটের খেলায় তিনি ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। শেফার্ড এবং ডেক্সটারের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১১০ রাণ যোগ হয়। অধিনায়ক ডেক্সটার ৮০ রাণ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত টেস্ট বোলার ওয়েসলি হল কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন। তাঁর একটা মার-মুখী বলে দলের উইকেট-কিপার গ্রাউটের চোয়াল ভেঙ্গে যায়। গ্রাউটকে বরাবরের মত খেলা থেকে অবসর নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয়। প্রথম টেস্ট খেলার মুখে এরকমের বড় দুর্ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অশুভের সূচনা না হলেই মঙ্গল। এইদিনের খেলায় হল বোলিংয়ে কোন রকম সাফল্যলাভ করতে পারেননি—ওভার ২০, মেডেন ১, রাণ ৮২, উইকেট ০।

চতুর্থ দিনের খেলায় এম সি সি দল ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এম সি সি দল ৫৮১ রাণে (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তৃতীয় দিনের ৩৭৩ রাণের (৫ উই-কেটে) সঙ্গে এইদিনের খেলায় মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ২০৮ রাণ যোগ করে। পূর্বদিনের নট আউট খেলোয়াড় ব্যারিংটন এবং নাইট খেলা আরম্ভ করেন। চৌকস খেলোয়াড় নাইট ৮১ রাণ করে আউট হন। দুটো ওভার বাউণ্ডরী এবং ১১টা বাউণ্ডারী মারেন। তিনি সফরে প্রত্যেকটি খেলায় ৫০ রাণ করেছেন। নাইট এবং ব্যারিংটনের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ১৯০ রাণ যোগ হয়। ব্যারিংটন ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের খেলায় ১৮৩ রাণ করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। তিনি ২২টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী করেন। এই নিয়ে ব্যারিংটন উপর্যুপরি তিনটে খেলায় সেঞ্চুরী করলেন—এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০৪, মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের বিপক্ষে নট আউট ২১৯ এবং ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে নট আউট ১৮৩ রাণ।

কুইন্সল্যাণ্ড দল ১৪৮ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা মোটেই সুবিধার হয়নি। ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৪ রাণ ওঠে। এম সি সি দলের অধিনায়ক ডেক্সটার মাত্র ৮ রাণ দিয়ে একাই ৪'টে উইকেট পান। প্রকৃতপক্ষে ১৩টা বলে মাত্র এক রাণ দিয়ে তিনি এই চারটে উইকেট পেয়েছিলেন। কুইন্সল্যাণ্ড দলের শেষের দুটো উইকেট পান টম গ্রেভনী। গ্রেভনী কদাচিৎ বল করেন।

কুইন্সল্যাণ্ড কান্ট্রি একাদশ দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় (সফরের নবম খেলা) এম সি সি দল ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। এম সি সি দলের পারফিট নট আউট ১২৮ রাণ করেন। এ পর্যন্ত সফরের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৯, এম সি সি'র জয় ৩, হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। এম সি সি'র এই জয়ের মধ্যে মাত্র একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা।

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ : ৩৩৭ রাণ— (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দিলীপ সারদেশাই ৮৬, আমরোলীওয়ালা ৮৫। কিং ৬৭ রাণে ২, ওয়াটসন ৩২ রাণে ১, উমরীগড় ৫৮ রাণে ১, দুরাণী ১৮ রাণে ১ এবং বোরদে ৭৮ রাণে ১ উইকেট) ও ২০২ রাণ (ওয়াদেকার ৭১, আমরোলীওয়ালা ৫১। ভোঁসলে ১৭ রাণে ৪, কিং ২৫ রাণে ৩ এবং উমরিগড় ২১ রাণে ২ উইকেট)।

রাজ্যপালের একাদশ : ৩৪৯ রাণ (অধিকারী ৮৩, উমরীগড় ৬২, কিং ৬১। সুভাষ গুপ্তে ৬০ রাণে ৪, গিলক্রিস্ট ৮২ রাণে ৩, দেশাই ৩১ রাণে ১, নাদকার্ণী ২১ রাণে ১, রামচাঁদ ৪৪ রাণে ১ উইকেট) ও ১৭৫ রাণ (৮ উইকেটে। সুভাষ গুপ্তে ৫৪ রাণে ৩ এবং নাদকার্ণী ২২ রাণে ২উইকেট)।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালের একাদশ দল বনাম মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের তিনদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার সময় মাঠে ঘোষণা করা হয়, এই খেলা উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয় এবং খেলায় প্রবেশমূল্য বাবদ দুই কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই তিন দিনের প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদিন ত্রিশ হাজার ক'রে দর্শক সমাগম হয়েছিল এবং প্রতিদিনই দর্শক সাধারণ টেস্ট খেলা দেখার মেজাজ নিয়ে খেলায় প্রভূত আনন্দ ও উত্তেজনা উপভোগ করেছিলেন।

উভয় দলেই কয়েকজন করে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলোয়াড় যোগদান করেছিলেন। তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রখ্যাত চারজন ফাস্ট বোলার— ওয়াটসন এবং কিং রাজ্যপাল একাদশ দলে এবং গিলক্রিস্ট এবং স্টেয়ার্স মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট ক্যাপটেন লালা অমরনাথ রাজ্যপাল দল পরিচালনা করেন; অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল পরিচালনা করেন ভূতপূর্ব টেস্ট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী। লালা অমরনাথ টসে জয়লাভ করেও মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলকে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ ছেড়ে দেন। প্রথম দিনে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের ৬ উইকেট পড়ে ৩৩৭ রাণ উঠে।

দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল পূর্বদিনের ৩৩৭ রাণের (৬ উইকেটে) উপর প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। রাজ্যপাল একাদশ দলের প্রথম ইনিংস চা-পানের পরবর্তী খেলার ৩৫ মিনিটে ৩৪৯ রাণে শেষ হলে তারা ১২ রাণে অগ্রগামী হয়। এইদিনের খেলায় মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২টো উইকেট খুইয়ে ৪৩ রাণ করে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০২ রাণে শেষ হয়। তখন খেলা শেষ হতে ১৯১ মিনিট বাকি ছিল। রাজ্যপাল দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণের সংখ্যাও ছিল ১৯১। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যপালের একাদশ দল ৮ উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রাণের বেশী তুলতে পারেনি। মাত্র ১৬ রাণের জন্যে তারা জয়লাভের গৌরব হাত-ছাড়া করে—ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ঘড়ির কাছে হার স্বীকার করে।

প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দল বনাম পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল একাদশ দলের চার দিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি আগামী ২২শে, ২৩শে, ২৪শে এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ক'লকাতার রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় যোগদানের জন্য যাঁদের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন: লালা অমরনাথ, সৈয়দ মুস্তাক আলী, ভিনু মানকড়, পলি উম্রিগড়, চাঁদু বোরদে, বাপু নাদকার্নি, রমাকান্ত দেশাই, সেলিম দুরাণী, বুদ্দি কুন্দরাম, দিলীপ সরদেশাই, বিজয় মেহেরা, আব্বাস আলী বেগ, লেস্টার কিং, চার্লস স্টেয়ার্স, রয় গিলক্রিস্ট, ওয়াটসন, রুসি সুর্তি, অজিত ওয়াদেকার, শের মহম্মদ এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার।

।। ভ্যালেরি ব্রুমেল ।।

বিশ্ববিখ্যাত রুশ এ্যাথলিট ভ্যালেরি ব্রুমেল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সাংবাদিক সংগঠন কর্তৃক ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে ২৬টি দেশের ক্রীড়া-

ভ্যালেরি ব্রুমেল

সাংবাদিকদের ভোট গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ড (৭ ফিট ৫ ইঞ্চি) স্রষ্টা ব্রুমেল উপর্যুপরি দু' বছর এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করলেন।

॥ জাতীয় জুনিয়র ভারোত্তোলন ॥

প্রথম জাতীয় জুনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক পয়েন্ট (৪২ পয়েন্ট) পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

দলগত পয়েন্টের হিসাব

প্রথম পশ্চিম বাংলা ৪২, দ্বিতীয় রেলওয়ে—৩৪, তৃতীয় মাদ্রাজ—৩১, চতুর্থ উত্তর-প্রদেশ—১৮, পঞ্চম হায়দরাবাদ (অন্ধ্র)—১৪, ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র—১১, সপ্তম দিল্লী—৭, অষ্টম উড়িষ্যা—২।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Firday, 14th December, 1962
40 Naya Paise

সীমান্তে এখনও যুদ্ধবিগ্রহ নাই। এই যুদ্ধ-বিরতির পিছনে কি আছে সেটা এখনও অনিশ্চিতই আছে সুতরাং ভবিষ্যতের কথা বিচার করা বৃথা। তবে একথা নিশ্চয় যে বৃহত্তর শক্তি-পরীক্ষার প্রশ্ন এখন আরও প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে কেননা চীনের কথা-বার্তায় যাহাই থাকুক কাজে দেখা যাইতেছে তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা এখনও প্রবল আছে, নহিলে লাডাখে পশ্চাদপসরণের কোনও ইচ্ছা তাহার কথায় বা কাজে প্রকাশ পাইতেছে না কেন? নেফায় যদিও পিছনের দিকে সৈন্যাপসরণের চিহ্ন দেখা গিয়াছে, অগ্রবর্তী অঞ্চলে সে প্রকার কোনও কাজের খবর এখনও নাই। সকলের চাইতে অনিশ্চিত ব্যাপার রহিয়াছে আমাদের দিকে।

চীন-সেনা পিছাইবার সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের সেনাদল অগ্রসর হইবে? যে এলাকায় চীনারা দখল ছাড়িবে সেখানে কি আমাদের সেনাদল যাইবে, না শুধু পুলিশ-প্রহরী ও অসামরিক কর্মচারীগণ সেখানের তত্ত্বাবধান করিবে? প্রধানমন্ত্রী এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক সমাধানে এখনও উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কথাবার্তায় মনে হয় ইহা এখনও অনিশ্চিতের মধ্যেই আছে। যদি তাই হয় তবে এ যুদ্ধ-বিরতির একমাত্র মূল্য সময়প্রাপ্তি এবং তাহাও কতদিনের জন্য সেকথাও অনিশ্চিত। এই সময়ের অর্থ যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতির অবকাশ।

আমাদের বীর জওয়ানগণ তাঁদের কর্তব্যে অটল।
...আপনি?
•
চূড়ান্ত জয়ের জন্যে চাই
আরো বেশী শ্রম
আরো বেশী ত্যাগ

এরূপ পরিস্থিতিতে শান্তির বিষয় চিন্তা করাও বাতুলতা, কেননা ঐরূপ চিন্তা করার ফল আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে শুধু ঢিলা দেওয়া নয়, তাহা পূর্ণ ও ব্যাপক হওয়ার বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করা। সাময়িক উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসে একথা আমরা জানি এবং আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যাপারে এই অবসাদ যে কিরূপ মারাত্মক ভুল হইতে পারে সেকথা আমরা চিন্তা করি না বলিয়াই এখন যুদ্ধ-বিরতি ও এই সীমান্ত-বিরোধের শান্তিময় সমাধান সম্পর্কে নানা গুজব ও গাল-গল্পে আমরা মুখর হইয়া উঠিতেছি।

এই সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির একটা কারণ ইহাও হওয়া অসম্ভব নয়, শত্রুপক্ষ চাহে যে এই যুদ্ধ-বিরতির [illegible] আরো একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়। চীনের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও অতর্কিত আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই উত্তেজনা ও সাহসের স্ফুরণ দেখিয়া আমাদের বিদেশী বন্ধুরা যেভাবে আমাদের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার জন্য বোধহয় চীন অধিকারিবর্গ প্রস্তুত ছিলেন না এবং সেই কারণে ঐ প্রতিক্রিয়ার মুখে অভিযান চালন বোধহয় তাঁহারা সমীচীন মনে করেন নাই। এই যুদ্ধ-বিরতিতে সেই উত্তেজনা নির্বাপিত হইতে পারে এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বভাবগত যে দীর্ঘসূত্রতা ও অন্য মানসিক দৌর্বল্য আছে তাহা আবার আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজ সকলভাবে আচ্ছন্ন ও ব্যাহত করিতে পারে। এবং সেই সঙ্গে যদি বিদেশী অস্ত্র-সাহায্য সম্বন্ধে আমাদের কর্তৃপক্ষের মনে কূট প্রশ্নের ও মানসিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় তবে তো শত্রুপক্ষের সোনায় সোহাগা।

আমাদের সকলের,—অর্থাৎ উচ্চতম অধিকারি হইতে সাধারণ জন পর্যন্ত প্রত্যেকের—এখন বুঝা প্রয়োজন যে যাহা শত্রুর পক্ষে সুবর্ণসুযোগ তাহাই আমাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদের কারণ। এই বর্তমানের উত্তেজনা যদি অবসাদে পরিণত হইয়া সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্বাপণ করে তবে সেই অবসাদ জাতির ও দেশের মরণকালের অন্তিম অবসাদে পরিণত হইবে।

আমরা যুদ্ধবিগ্রহে অনভ্যস্ত সেইজন্য এই তথাকথিত যুদ্ধবিরতিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, এই বর্তমানের যুদ্ধকালীন অবস্থা সাময়িক আগ্নেয়াস্ত্র-সম্বরণ মাত্র (cease-fire), ইহা প্রকৃত যুদ্ধ-বিরতি (armistice) নয়। যাহারা যুদ্ধের ব্যাপারে অভ্যস্ত তাহারা জানে, এই সময়ে যে ক্ষিপ্রতর প্রস্তুতি করিতে পারে তাহারই জয় সম্ভব এবং যে মূঢ়মতি ঐ অবসরে বিরাম-বিশ্রামের চিন্তা করে তাহার সমূহ বিপদ আসন্ন।

আমাদের বাংলাদেশ তো সবে জাগ্রত হইতেছিল। এখনও বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও অন্যমনস্ক, আমাদের এখন "জাগো জাগো" "সাজো সাজো" বলিয়া সকল উদ্যম যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতিতে নিয়োগ করা প্রয়োজন। শান্তি এখনও সুদূর পরাহত।

গান

চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, সাধ্‌রে সাধ সবে, দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আনতে, নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে, নব উৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান।

লোক রঞ্জন, লোক গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

(পুনর্মুদ্রণ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে,
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনমতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ
সে সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্ত কায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্য পর্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুল্‌ছে নাকি প্রাণ
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মতো
ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে!

(পুনর্মুদ্রণ)

—অজ্ঞাত

ভারত ছাড়ো

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চীনা বুনো ফৌজ ভারত ছাড়ো।
তিব্বত গিলে খাই বেড়ে আজ
ভারত-দেহেরও মাংস কাড়ো?
গলায় আঙুল দিয়েই বলব ঃ
ভারত ছাড়ো॥

আমার ভারত, আমার নিশান—
আমার জীবন, মান, সম্মান;
আমার ধর্ম, আমার মন্ত্র ঃ
বন্দে মাতরম্‌।

গৈরিক রং গঙ্গার ধারে
সরস্বতীর তুষারের আড়ে
শ্যাম যমুনার প্রলেপে নিশান
ত্রিবেণীর সঙ্গম।

এই তেরঙ্গা নিশানের দেশে
চেঙ্গিস খাঁর সাকরেদ এসে
নতুন মুখোসে ভোল পাল্টিয়ে
রক্ত নিশান গাড়তে পারে?
ভারত ছাড়ো॥

জৈমিনি

চীনা আক্রমণ আমাদের নানাদিকেই সচেতন করে তুলেছে। শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আগে কিছু নিবেদন করেছি। এবার টেলিস্কোপ ঘোরাচ্ছি অন্য একটা বিষয়ের দিকে।

ডিসেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি, অথচ এখনও শীত পড়ল না ভালোকরে। ইংরেজি কবিতায় ছাত্রজীবনে পড়েছি, ইফ উইন্টার কামস্, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড? জীবনের অনেক দুঃখের সময় এ কথা চিন্তা করে শান্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু বাংলাদেশে যে ঐ উক্তির কিছুটা পরিবর্তন করে অনুবাদ করলে লাগসই হয় তাও লক্ষ্য করেছি সবিস্ময়ে।

অর্থাৎ, 'শীত এলে বসন্ত আসতে দেরি হয় না', মানেটা ঠিক এরকম না হয়ে হবে এই রকম—শীত না এলে বসন্ত আসতে দেরি হয় না।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে 'বসন্ত' কথাটার মানে একটু অন্য রকম। তার মধ্যে মলয়ানিলের স্নিগ্ধ স্পর্শ নেই, কোকিলের কুহুরব নেই। আছে কেবল যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ দাহ এবং শয্যাশায়ীর উহুরব। ব্যাপারটা নিছক একটি ব্যাধি, যাকে চলতি কথায় বলে স্মল পক্স। ঋতুগত বসন্তের মতো, এই দেহগত বসন্তেরও শীতের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্ক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অবশ্য এইখানেই বলে নেওয়া ভাল, 'বসন্ত' শব্দটির এই বিপরীত ব্যবহার আমার মৌলিক সৃষ্টি নয়। এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির একস্থানে আছে—'কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।' তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি শব্দটির ব্যঞ্জনা কতো গভীর।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। শীত না পড়লে বসন্ত দেখা দিতে শুরু করে। আর বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে সেই একই ঘটনা—কলকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সমাসন্ন।

শোনা যাচ্ছে, চার বছর পর-পর বসন্ত রোগের যে বড় ধাক্কাটা আসে, এবার নাকি সেই পাইকিরি রোগের

বছর। কাজেই, চারদিকেই একটা অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বসন্ত-কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ এখন অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করা হয় না। সত্যি বলতে কি, ইউরোপ-আমেরিকায় তো বটেই, আমাদের এই ভারতবর্ষেরও অনেক শহরে ঐ সব ব্যাধির প্রকোপকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা এবং সমগ্রভাবে বাংলাদেশেও যে তা করা যাবে না কেন তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অবশ্য একটা কারণ যে আছে, তা আমরা সকলেই জানি। সে হল আমাদের জনসাধারণের উদাসীনতা। কিন্তু তাকে সঙ্গত কারণ বলা যায় না। স্বাধীনতা পাওয়ার এত বছর পরেও যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার মতো একটা প্রাথমিক ব্যাপারে এতখানি উদাসীন হয়ে আছেন, তাকে নিয়তির বিধান বলে মেনে নিতে পারি না।

কিন্তু অতীতে আমরা কী করেছি আর কী করতে পারিনি, তার চুলচেরা বিচারে বসে এখন লাভ নেই। চীনাদের দস্যুসুলভ আক্রমণে দেশরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যাপারেই আমরা এখন নতুন করে প্রস্তুত হতে সচেষ্ট। আমার বক্তব্য, জনস্বাস্থ্যের দিকেও যেন আমরা নজর দিতে কুণ্ঠিত না হই।

একদা এমন সময় ছিল, যখন সাধারণ মানুষ টীকা নিতে ভয় পেতেন। আমি এক ভদ্রলোকের কথা জানি, তিনি ছিলেন প্রাথমিক ইস্কুলের পরিদর্শক। জায়গাটা ছিল কলকাতার কাছেই একটা মফঃস্বল শহর। কোনো একটা বিশেষ ইস্কুলে পরিদর্শন করতে গেছেন তিনি। তাঁর হাতে ছিল একটা ব্যাগ, যার মধ্যে তিনি জরুরী কাগজপত্র রেখেছিলেন। খোলা চালার মধ্যে বসেছিল ইস্কুল। শহরতলীর দরিদ্র ছেলেরা দূর থেকে এই ইন্সপেক্টারবাবুকে দেখে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে বইপত্র ফেলে এমন ঊর্ধশ্বাসে মতো চারিদিকে ছুটে পালাল যে, তিনি তো অবাক। যাই হোক, ইস্কুলের চত্বরে এসে হেডমাস্টার মশায়ের অভ্যর্থনা লাভ করে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তিনি। আগে তো

> ### প্রতিরক্ষা সংখ্যা
>
> আগামী ২৮শে ডিসেম্বর প্রকাশিতব্য 'অমৃতে'র ৩৪ সংখ্যাটি বিশেষ প্রতিরক্ষা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্যপূর্ণ সচিত্র রচনা এবং বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে সাহিত্য, নাট্যশালা ও চলচ্চিত্রের বিশেষ কর্তব্যের বিষয়ে বহুবিধ হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধ স্থান পাবে। তা'ছাড়া থাকবে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত একটি দেশাত্মবোধক ছোট গল্প, প্রতিরোধাত্মক বিদেশী গল্পের অনুবাদ, ধারাবাহিক উপন্যাস ও অন্যান্য বিভাগ।
>
> এই বিশেষ সংখ্যাটিরও দাম থাকবে যথারীতি ৪০ নয়া পয়সা।

ভেবেছিলেন এটুকুও বরাতে জুটবে না, বরং সেখানেও পাবেন বিরূপ সম্বর্ধনা।

মাস্টার মশায় ছাত্রদের অসঙ্গত আচরণের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, এবং বললেন কিছুক্ষণ বসলে ওদের কাউকে কাউকে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে ধরে আনতে পারবেন তিনি।

কিন্তু কেনই যে ওরা এমন করে ছুটে পালাল, আর কেনই বা ওদের 'ধরে' আনতে হবে, সেকথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না ইন্সপেকটারবাবু। সে কি তিনি ওদের পড়া ধরবেন এই ভয়ে? প্রশ্ন করলেন তিনি হেডমাস্টার মশায়কে। উত্তর হল, আজ্ঞে তা নয়। পালিয়েছে ওরা আপনার ঐ ব্যাগ দেখে। ওরা ভেবেছিল, আপনি টীকাদার।.........

এমনি ভয় ছিল এক সময় টীকা নেওয়ার বিষয়ে। এখন হয়তো এতটা নেই। কিন্তু একেবারে যে নেই, একথা বলা চলে না। পাছে টীকা ওঠে, পাছে কয়েকটা দিন একটু অসুবিধে হয় এই ভয়ে অনেক মোটামুটি শিক্ষিত মানুষকেও আমি টীকা নিতে গড়িমসি করতে দেখেছি। এই ধরণের ভয় যে কী রকম সাংঘাতিক কুফল আনতে পারে এ বিষয়ে অনেকেই দেখেছি অচেতন।

এইখানেই আসে আমাদের দেশবাসীর সচেতন অংশের দায়িত্ব। সব কিছুই সরকারী প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার অর্থ হল নিজের কর্তব্যে অবহেলা। সরকার বা কর্তৃপক্ষের যা করণীয় তা তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে সর্বত্রগামী এবং সর্বাঙ্গসার্থক করার জন্যে দরকার হল আমাদের সচেতন দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা। আশা করি এ ব্যাপারে কেউ উদাসীনতার প্রশ্রয় দেবেন না।

দেশ আজ নতুন করে জেগে উঠেছে। তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি যেমন অপ্রতিরোধ্য, তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিজ্ঞাও তেমনি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সকলের প্রথমে হটাতে হবে আজ হামলাদার বিদেশী দস্যুদের। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখতে হবে, মহামারী এসে যাতে আমাদের জয়ের আনন্দ উপভোগে বাধা না দিতে পারে। আমাদের এই নবজাগরণের বন্যায় মুছে যাক আজ পুরনো দুর্বলতার গ্লানি, পুরনো ব্যাধির কলঙ্কস্পর্শ।

প্রদাহ

সব কিছু তাই আছে
বাড়ি আর বেড়া
আশা, তৃপ্তি, অসন্তোষ,
উল্লাসে ও অবসাদে
জীবনের বৃন্ত খুঁজে ফেরা,
হেমন্তের কুয়াশায় ধোঁয়ার ভেজাল,
নির্মল প্রাণের ধারা
রুদ্ধ করা মিথ্যার জঞ্জাল।

তবু এক দুঃসহ প্রদাহে
অন্য সব জ্বালা মুছে গেছে,
আর সব চেতনা অসাড়।
আকাশ পৃথিবী সব ভিন্ন চোখে চায়,
সূর্যোদয় রক্তিম ধিক্কার
রাত্রি গাঢ় গ্লানির কালিমা।

আত্মায় ধর্ষিত আমি।
আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সত্তায়
অশুচি স্পর্শের ক্ষত
পাপের ব্যাধির মত দহে।
শিরায় শোণিত নয়,
বিষতিক্ত আর কোনো স্রোতে
হৃদয়-স্পন্দিত।

সুখ, প্রেম, শান্তি আর সত্যের পিপাসা
থাক তবে আজ মুলতবি,
বাঁচার চেয়েও বড়
জীবনের অত্যাজ্য সুরভি,
মাটির মমতা আর মানবতা মেশানো আধারে
স্বাধীনতা যার এক নাম।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত "অমৃত" পত্রিকার জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগের আমরা নিয়মিত পাঠক। উক্ত বিভাগ মারফৎ কয়েকটি প্রশ্ন পাঠক-বর্গের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য পাঠালাম। আশা করি প্রশ্ন কয়টি অমৃতের পাতায় যথাসময়ে দেখতে পাব। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ—

১। ভারতবর্ষে মোট কতগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে? বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির নাম কি কি?

২। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কোন প্রদেশে কত?

৩। ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশাগত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়ন করেন?

৪। বহির্ভারতীয় কি কি ভাষায় কোন কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়?

৫। ভারতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা কয়টি এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত?

শ্রীবিপুলেন্দ্রশঙ্কর রায়।
শ্রীহেমচন্দ্র দে।
পি, ডব্লু, আই, (কনস্ট্রাকসন)
অফিস অন্ডাল, বর্ধমান।

(উত্তর)

গত ১৯শে অক্টোবরের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ঃ—

১। সমাজ-সংস্কারক ও মেলবিধি নামক সংস্কৃত কুলজী গ্রন্থ রচয়িতা দেবীবরের উপাধি মিশ্র ছিল না, ছিল ঘটক। রাজা আদিশূর কর্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ, এবং বাঙ্গালপাশী গ্রাম নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী সঙ্কেত বংশ-সম্ভূত সর্বানন্দ ঘটকের পুত্র ছিলেন এই দেবীবর ঘটক বিশারদ। উপাধি দ্বারাই বুঝা যায়, সম্ভবতঃ বিবাহের ঘটকালি করাই তাহাদের পেশা ছিল। আনুমানিক ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি এক এক প্রকার দোষযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণকে এক এক দলভুক্ত করিয়া এক এক মেলের নামকরণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত মেল বা দলের সংখ্যা ছিল ৩৬।

২। "সন্ধ্যা" দেশের উল্লেখ প্রশ্ন-কর্তা কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে পাইয়াছেন, তাহা জানাইলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতিথিকে কিভাবে সম্ভাষণ জানান হয়, তাহার উত্তর 'জানাতে পারেন' বিভাগের স্বল্পপরিসর স্থানে দেওয়া সম্ভবপর নহে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, হিন্দুগণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার বা প্রণাম, খ্রীষ্টানগণ নিজ নিজ ভাষায় সুপ্রভাত বা সুসন্ধ্যা ইত্যাদি বলিয়া করমর্দন, মুসলমানগণ "আস্ সালামো আলায় কুম্" বলিয়া একটু অন্যভাবে করমর্দন দ্বারা, এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণ হিন্দুদের মতই জোড়হাত উত্তোলন করিয়া অতিথিগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অতিথি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বা পদস্থ হইলে সকলেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্ভাষণ জানাইবার সময় মাথা বা ঘাড় কমবেশী নোয়াইয়া থাকেন।

৪। পার্শীয়ান বলিতে বর্তমানে পারস্য বা ইরান দেশের লোককে বুঝায়। তাঁহারা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্মা-বলম্বী, মৃত লোককে কবর দিয়া থাকেন। তবে পারস্য হইতে ধর্ম ও প্রাণভয়ে পলাতক বোম্বাই-প্রবাসী অগ্নি-উপাসক পার্শী সম্প্রদায় মৃত লোককে Tower of Silence-এ শকুন ও বাজপাখির খাদ্য হিসাবে এখনও রাখিয়া আসেন, অন্য কোনরূপ সংকারের ব্যবস্থা করেন না। অবশ্য ইহার মধ্যেও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। মৃত ব্যক্তির পচনশীল দেহ দ্বারা অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি পক্ষীর তুষ্টিসাধন।

৫। ৫০ মেগাটন বোমা যেখানে বিস্ফোরণ করা হইয়াছিল, সে স্থান হইতে বায়ুতাড়িত হইয়া আণবিক ভস্মকণাসমূহ যে যে স্থানে খুব বেশি পরিমাণে পড়িয়াছে, সে সে স্থানেই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা।

৬। মোটামুটিভাবে উপকথা ও রূপকথার মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না। উভয়ই অলীক বা উপাখ্যান মাত্র, এবং উভয়ের মধ্যেই গল্পের মাধ্যমে উপদেশমূলক কোন কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে। তবে উপকথার উপজীব্য সাধারণতঃ মানুষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি, আর রূপকথার কাহিনীতে রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব, পরী ইত্যাদির প্রাধান্যই দেখা যায়।

৭। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম কোনটি, তাহা যাঁহাকে লইয়া ধর্মের উদ্ভব (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা), একমাত্র তিনিই সঠিকভাবে বলিতে পারেন। ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ (যেমন সমগ্র ইয়োরোপ এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি স্থানে), এবং হত্যাকাণ্ডের ফলে (যেমন সমগ্র আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়) পৃথিবীর বহু প্রাচীন ধর্মই আজ অবলুপ্ত। তবে যে সমস্ত সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এবং তাহাদের অনুগামীগণও বাঁচিয়া আছেন, তন্মধ্যে বৈদিক ভাষায় রচিত ঋগ্বেদ পৃথিবীর সমগ্র আর্য জাতির প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, আর প্রাচীন হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের Old Testament সেমেটিক জাতিসমূহের (পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিয়দংশের অধিবাসিগণ) প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক বলিয়া স্বীকৃত। Old Testament বর্ণিত ধর্ম Judaism (জুডাইসম্) বা প্রাচীন ইহুদী ধর্ম। এই দুই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদকেই প্রাচীনতর বলিয়া ধরা হইলে বৈদিক আর্যধর্ম এবং তাহার ধাবক হিসাবে ভারতের হিন্দুধর্মকেই বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইরানের প্রাচীন আর্য অধিবাসিগণের, এবং বর্তমানে ভারতের পার্শী সম্প্রদায়ের "জেন্দ্ আবেস্তা" ঋগ্বেদ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। আর প্রাচীন মঙ্গোলীয় জাতির প্রধান বাসস্থান হিসাবে চীনদেশে প্রচলিত "তাও" ধর্ম বা "কন্ফুসিয়ান্" ধর্ম বা তৎপরে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা বয়সে অনেক নবীন। এই ভারতেই আজ হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে একপ্রকার সমকালেই প্রচারিত ভগবান মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্ম এবং ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম বৈদিক আর্যধর্মেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র সন্দেহ নাই। প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত খৃষ্ট-ধর্মের বয়স কমবেশি ১৯৩০ কি ১৯৩২ বৎসর, আর প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ইস্লাম ধর্মের বয়স কমবেশি ১৩৫২ বৎসর মাত্র। এই দুই ধর্মকেই প্রাচীন Judaism এর দুই নবরূপ বলা যায়।

৮। ইংরেজী ১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে, দেহরক্ষার কয়েকমাস পূর্বে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিকাল বেলায় কাশীপুর উদ্যানবাটির প্রাঙ্গণে ভাবস্থ অবস্থায় "কল্পতরু" হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত প্রায় সকলকেই তাহাদের অন্তরের অভিলাষ অনুযায়ী বরদান করিয়াছিলেন। বলা-বাহুল্য, ভক্তগণ সকলেই সেই পবিত্র ভাবময় মূর্তির সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া মনে মনে পারমার্থিক কল্যাণই হয়ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঐহিক সুখভোগ প্রার্থনা করেন নাই। সেই পবিত্র দিনটিকে স্মরণ করিয়াই তাঁহার অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীগণ প্রতি বৎসর "কল্পতরু" উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা-৯

॥ সারপ্রাইজ ভিজিট ॥

খবরের কাগজে দেখলাম বর্মডিলার পতনের পর চীনদরদী ক'টা বাঙালি বিভীষণ ঠোঙায় করে খাবার কিনে এনে খেয়েছে।

মনে পড়ল।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি, এক মফঃস্বলী দপ্তরে মুন্সেফিতে আছি। বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে, সেরেস্তাদারকে চার্জ দিয়ে জয়েনিং টাইম 'এভেইল' করছি। জিনিসপত্র প্যাক হচ্ছে।

হঠাৎ সন্ধের দিকে ছোকরা এক আমলা এসে হাজির।

এখন তো উদীয়মানের কাছেই যাওয়া উচিত, অস্তমানের কাছে কে আসে।

'স্যার, ওরা ফিস্টি করছে।'

'কারা ?'

'কোর্টের আমলারা।'

'উপলক্ষ্য ?'

'আপনি বদলি হয়ে গিয়েছেন, তাই।'

তার মানেই শত্রুপক্ষের পতন হয়েছে বলে উল্লাস। আমিও উল্লসিত হলাম যেহেতু বিভীষণরাও নিরাপদ নয়। বিভীষণের মধ্যেও বিভীষণ।

বললাম, 'তা ওদের ফুর্তি-ফুর্তি নিতে অসুবিধে হচ্ছিল—আমি চলে গেলে ফুর্তি তো হবেই—'

'স্যার, একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন ?'

চার্জ দিয়ে দিয়েছি, সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার আর এক্তিয়ার কই ? তবে বাঙালি মতে এমনি গিয়ে পড়লে কে আটকায়।

বললাম, 'চলুন।'

হাকিমি পোশাক নয়, সাদাসিধে ঘরোয়া ধুতি-পাঞ্জাবিতেই চললাম। শুধু র‍্যাপার দিয়ে মুড়িসুড়ি দিলাম—যা কনকনে শীত।

'এই যে এল। এত দেরি করলে কেন ?' সেরেস্তাদার স্বয়ং অভ্যর্থনা করল। 'শালা ভেগেছে এত দিনে। চার্জ দিয়ে দিয়েছে।'

বুঝলাম দেখামাত্রই চিনতে পারেনি আমাকে। কোনো অনুপস্থিত আমলা বলে ভুল করেছে।

বললাম, 'কই আমার ঠোঙা কই ?'

যা কণ্ঠস্বর, পলকে চিনে ফেলল।

'স্যার, স্যার—' সকলের প্রায় নাড়ী-ছাড়ার অবস্থা।

'বা, ফিস্টি তো ভালো কথা। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে কেন? যার জন্যে ফিস্টি তারই নেমন্তন্ন নেই ? আমার একটাও ফেয়ারওয়েল মিটিং হয়নি, এইটেকেই বরং তাই করা যাক। খাবার ঠোঙায় কেন, প্লেট নিয়ে আসুন। আর ওপেনিং সং গাইবার জন্যে একটা হার-মোনিয়ম—'
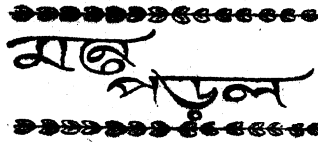
কেউ বা প্লেট আনবার কেউ বা হারমোনিয়ম আনবার নাম করে কেটে পড়ল।

সেই রাত্রেই ট্রেনে করে কলকাতা গেলাম। সকালে হাইকোর্টে দেখা করতে গেলাম রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে রেজিস্ট্রার ইংরেজ।

স্থানীয় জেলাজজকে বাই-পাশ করে গেলাম। প্রথম কারণ, চার্জ দিয়ে দেবার পর সে আর আমার জজ নয়; দ্বিতীয় কারণ, বাঙালি "ইউরোপীয়ান" জজের রসবোধ নেই বললেই চলে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কার্ড পাঠালেও সহজে ডাকছেন না রেজিস্ট্রার। সে নির্ঘাৎ বুঝেছে বদলি ক্যানসেল করতে এসেছি। আর ওজুহাত সেই মামুলি—স্ত্রীর ডেলিভারি আসন্ন।

'কী, স্ত্রী অসুস্থ ?' ঘরে ঢুকতেই হুমকে উঠল রেজিস্ট্রার।

হাসলাম। বললাম, 'না, স্যার। বদলি রদ করবার তদবিরে আসিনি। শুধু একটা গল্প বলতে এসেছি।'

'গল্প ?'

'হ্যাঁ, এখন না বলে গেলে বলবার আর চান্স পাব না কোনোদিন।'

বলে সব ব্যক্ত করলাম।

রেজিস্ট্রার গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমার প্রতি ওরা এত বিরূপ কেন ?'

'ঐ সারপ্রাইজ ভিজিট।' হাসলাম। 'একেবারে না বলা-কয়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়েই সারপ্রাইজ ভিজিট। কখনো-কখনো সরাসরি এজলাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে। কখনো বা অফিস-টাইমের বাইরে, রাত্রে।'

'কিছু আবিষ্কার করেছ ?'

'তার আর লেখাজোখা হয় না। উকিল নথি থেকে সারেপটিশাস কপি নিচ্ছে, আউটসাইডাররা ভাড়ায় কাজ করছে, আমলারা সাইকেলে বেঁধে নথি নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আর সেরেস্তাদার দিব্যি খালি গা হয়ে খেলো হুঁকোর তামাক খাচ্ছেন—'

'কিছু সুফল হয়েছে ?'

'সুফলের মধ্যে প্রিসিডিং করে-করে নিজের কাজ বাড়িয়েছি আর পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সেরেস্তাদারের হুঁকো থেকে জ্বলন্ত কলকে তুলে নিতে গিয়ে হাত পুড়েছে। আর, শেষ পর্যন্ত, ঐ ফিস্টি—'

'তুমি কি আজই ফিরে যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ, তা, আজই।'

'তবে নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাও। আর অর্ডারের য়্যাডভান্স কপি নিয়ে যাও সঙ্গে করে।'

পরদিন যথাসাজে কোর্টে গিয়ে কলিং বেল-এ ঘাড়ি মারতেই হৈ-চৈ প ড় গেল। সেরেস্তাদার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এ কী!

বললাম, 'চার্জ টেক ওভার করব। বদলি রদ হয়ে গেছে।' অর্ডারের য়্যাডভান্স কপিটা দেখালাম। 'আর শুনুন, অফিসে এখন আমি একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেব। সব টিপটপ করে রাখুন। ভিড়ভাড় সরিয়ে দিন। হুঁকো-কলকে সরা-মালসা—সমস্ত। আর যদি কালকের ঠোঙা-ফোঙা থাকে, তাও। আর শুনুন,—' সেরেস্তাদার আবার ফিরল। 'সিগারেট খান না? সিগারেটটা মন্দ কী! চট করে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ছুঁড়ে। এই নিন একটা—দেখুন—'

'না স্যার, না স্যার—' পায়ে যেন হাড় মাংস নেই এমনি টলতে-টলতে চলে গেল সেরেস্তাদার।

এজলাসে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল।

তার মানেই বর্মডিলা আবার অধিকৃত হল।

বিভীষণরা বোধ হয় আরো একবার খাবে। ভাব দেখাবে আমার ফিরে-আসা যেন ওদেরই ফিরে-পাওয়া।

দুই নৌকায় পা

একেই বলে 'বিজনেস ইজ বিজনেস' খেলা
৮-১২-৬২ ইং
চীনের জন্য টার্বোপ্রপ
ভারতের জন্য অস্ত্র
চীন
ভারত
জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানী
কলকাতা
ঢাকা

আয়ুব

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়

চীন তার এক তরফা ঘোষণা অনু-সারে ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রির পর অস্ত্রসংবরণ করে।

কিন্তু অস্ত্র সংবরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা যে পশ্চাদপসরণের কথা বলেছিল সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখ-যোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি। ১লা ডিসেম্বর থেকে চীনা সৈন্যদের অধিকৃত ভারতীয় এলাকা ত্যাগ করে পূর্বে ম্যাকমেহন লাইনের ২০ কিলোমিটার উত্তরে ও পশ্চিমে "চিরাচরিত সীমান্ত-রেখার" ২০ কিলোমিটার উত্তরে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চীনাদের এই প্রতিশ্রুতি পালনের কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই থেকেই বোঝা যায় যে, কারও মধ্যস্থ-তায় বা সরাসরি আলোচনায় ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দখল করা জমি হাতছাড়া করার ইচ্ছা তাদের নেই।

ভারত চীনের ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বাবস্থায় চীনা সৈন্য না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কোন রকম আলাপ আলোচনা চীনের সঙ্গে শুরু করবে না ব'লে জানিয়ে দিয়েছে। ভারতের এই সিদ্ধান্ত হতে চীন স্বভাবতই ধরে নিতে পারত যে সে কোন দখল করা জমি ত্যাগ করে গেলে ভারতীয় সৈন্য অগ্রসর হয়ে তা দখল করে নেবে। কিন্তু, যেকোন কারণেই হোক, ভারত সরকারের পক্ষ হতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে চীনা সৈন্যরা ভারতের যেসব অঞ্চল ত্যাগ করে যাবে ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তা পুন-র্দখল করা হবে না। অসামরিক ব্যক্তিরা সেসব স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ভারতের এই নির্দেশ বোধহয় চীনকে এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে যে, চীন আবার আক্রমণ আরম্ভ না করলে ভারত আর সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে না। এইকারণে ২১শে নভেম্বর যেসব কথা চিন্তা করে চীন অস্ত্র সংবরণের ও পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বর্তমানে তার সে মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্য চীনকে যে কতখানি উত্তেজিত করে তা অস্ত্রসংবরণের পরেরদিন ভারতের উদ্দেশ্যে লিখিত পিকিং পিপলস ডেইলীর আবেদনটুকু পড়লেই বুঝতে পারা যায়। তাতে বলা হয় Particularly serious is the prospect that if U.S. imperialism is allowed to become involved, the present conflicts will grow into a war. অর্থাৎ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যদি এই বিরোধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে বর্তমান সংঘর্ষ যুদ্ধে পরিণত হবে।

কিন্তু ভারতের বর্তমান মনোভাব ও কার্যক্রম চীনকে একথা বোঝার সুযোগ দিয়েছে যে, মার্কিন সাহায্য পেলেও ভারত এখন আর নিজ উদ্যোগে যুদ্ধ শুরু করবে না। সুতরাং ব্যাপক যুদ্ধের আশঙ্কায় চীন যে আপাতত কিছুটা ভারতীয় জমি ছেড়ে দিয়ে যে সদিচ্ছা প্রমাণের কথা ভেবেছিল সেভাবে সে হয়তো এখন আর চিন্তা করছে না।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর কলম্বোয় এসিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি নিরপেক্ষ দেশ — সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার যে সম্মেলন আহূত হয় ভারত তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীআর কে নেহরু যান আফ্রিকার ও আরব রাজ্যগুলিতে এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন যান কলম্বো সম্মেলনে আহূত এসিয়ার দেশগুলিতে। ভারতের বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের প্রতিলিপির সাহায্যে তাঁরা ঐসকল দেশের রাষ্ট্রনায়ক-দের বোঝান ভারতের দাবী কোন ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলে অন্তত স্বদেশ প্রত্যা-বর্তন করে তাঁরা সকলেই তাঁদের চেষ্টার সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীঅশোক সেন ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর চীনারা যেখানে ছিল সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ভারতের পক্ষে কোন সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না একথা তিনি প্রেসি-ডেন্ট নাসের ও প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে জানিয়ে এসেছেন। তিনি আরও বলেন যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের শান্তি প্রস্তাব ভারতের প্রস্তাবেরই অনুরূপ কিন্তু চীন তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

শ্রীসেন আরও বলেন যে, কায়রো ও আক্রায় তাঁদের আলোচনার ফলে চীনাদের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার" অস্পষ্টতা ও অসত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত

তেজপুরে তিনজন সেনাধ্যক্ষ : (বাম হতে দক্ষিণে) ইস্টার্ণ কমান্ডের অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল এল পি সেন, নেফা কমান্ডের নূতন অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল মানেক শা এবং সর্বদক্ষিণে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী।

শ্রীসেন তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে অতি সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে, চীন যা গায়ের জোরে দখল করেছে তার কিছুই সে ছেড়ে যাবে না। পরন্তু চীনের প্রস্তাব মানতে হলে ভারতকেই ঐ সকল এলাকা থেকে আরও সাড়ে বারো মাইল পিছু হটে আসতে হবে।

কলম্বো সম্মেলনে যে ছয় রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তারমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের উপরেই চীনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ ডঃ সুকর্ণ যে মীমাংসা-প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ করতে চান চীন তা পূর্বেই নাকচ করে দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাব করে যে চীন ভারতের দাবী মেনে তার সৈন্যবাহিনী ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাক, আর ভারতও চীনের দাবীমত ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা" হতে ২০ কিলোমিটার পেছিয়ে আসুক। তাহলে উভয় দেশের মধ্যবর্তী নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে।

নিয়ন্ত্রণরেখা কোনটি? চীনাদের মতে, যেটি চিরাচরিত রেখা। আবার চিরাচরিত রেখা কি না, ১৯৬০ সালের চীনা মানচিত্রে যা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, চীনা ভাষ্যমতে, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন রেখা" হল ১৯৬০ সালের মানচিত্রে দেখানো সীমান্ত রেখা। এবং সে সীমান্ত রেখাও আবার চীনা সৈন্যরা দখল করেছে আরও দু বছর পরে, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ব্যাপকভাবে ভারতের উপর হানাদারি শুরু করার পর।

কিন্তু কলম্বো সম্মেলনের উপর ভারত যত গুরুত্বই আরোপ করুক না কেন, সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে খুব বেশী আশাহীন বলে মনে হয় না। কারণ সব রাষ্ট্র হতেই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, প্রধান শাসকরা নন। কারণ, তাঁরা বোধ-

সেলায় বিচ্ছিন্ন ভারতীয় বাহিনীর এই সৈন্যরা দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন করে দলে যোগদানের পর তেজপুরে সাংবাদিকদের নিকট তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। বাম হতে দক্ষিণে—মেজর [illegible], ক্যাপ্টেন [illegible], জমাদার [illegible] ও [illegible]।

ভারতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে কে গলব্রেথ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বিঃ জেনারেল জন কেলিকে সঙ্গে করে একটি হেলিকপ্টারযোগে নেফা এলাকায় সম্মুখ অঞ্চল সফরে যাচ্ছেন।

হয় এটা ধরে নিয়েছেন যে, চীনের মনমত প্রস্তাব যদি তাঁরা না গ্রহণ করতে পারেন তবে চীন তা কখনও মেনে নেবে না। সুতরাং নতুন কোন প্রস্তাব মাথা খাটিয়ে বার করতে যাওয়াটাই তাঁদের পণ্ডশ্রম হবে।

আর চীনের মনোভাব এ ব্যাপারে দুকান কাটার মত। তারা আজ সমালোচনা বা নিন্দাতে আর সঙ্কুচিত হয় না। সারা বিশ্বের জনমত তার বিরুদ্ধে গেছে এমন কি কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মনোভাবও তার প্রতিকূল। তার ওপর যদি কলম্বো সম্মেলনের সিদ্ধান্তও তার বিরুদ্ধে যায় তাতে তার এমনকি ক্ষতি হবে? তার যুদ্ধ ভারতের সঙ্গে, সুতরাং ভারত যতক্ষণ না তাকে বলপূর্বক উৎখাত করছে ততক্ষণ তার থাকতে বাধা কোথায়?

সম্প্রতি বুলগারিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির যে বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে প্রায় সর্বত্রই চীনের বর্তমান কার্যকলাপ ও মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু চীন তাতে এতটুকুও দমেনি। বরঞ্চ চীনা প্রতিনিধিরা সেসব সম্মেলনে বলেছেন, চীন তাদের সমালোচনার ভয় করে না। কারণ চীন এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের পথে আর তার সমালোচনা করছে যেসব কমিউনিষ্ট দেশ বা দল তারা সকলেই শোধনবাদী, বিপ্লব-বিমুখ এমন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল।—এই হচ্ছে আজ চীনের মনোভাব। কেউ যদি তার সঙ্গে না থাকে তবে সে একাই চলবে। যুদ্ধ যদি করতে হয় ত সে একার হিম্মতেই করবে। সত্তর কোটি লোক তার সমর্থক, সুতরাং তার ভয় কাকে? এই যে দেশের মনোভাব, দীর্ঘদিনের মিত্র ও সংগ্রাম-সাথীদের সম্বন্ধেও যাদের এত অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি ও আচরণ, সোভিয়েট ইউনিয়নও যে দেশের মতে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত, তার কাছে কলম্বো সম্মেলনের বিরূপ সমালোচনার কি মূল্য থাকতে পারে? সুতরাং কলম্বো সম্মেলন বা ঐ জাতীয় মধ্যস্থতার উপর আমরা যতই নির্ভর করি না কেন চীনের কাছে তার মূল্য নিতান্ত সামান্য। আর ঐসব সম্মেলন ও বন্ধ্যা আলোচনায় ভারত যত কালক্ষেপ করবে ততই চীনের পক্ষে পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় মিলবে।

শ্রীনেহরু অবশ্য তেজপুরের সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, চীনারা যদি ভারতীয় অঞ্চল হতে সরে না যায় তাহলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের বলপূর্বক বার করে দিতে বাধ্য হবে। আর কখন তা করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব ভারতের।

কিন্তু চীন যদি কোন স্থান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে যায় তবে ভারতের অসামরিক ব্যক্তিরা সে সব স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, ভারতের এই পূর্ব-ঘোষিত নীতি চীনকে হয়ত শ্রীনেহরুর এই

সর্বশেষ ঘোষণাকে খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে না নেওয়ার জন্যই প্ররোচিত করবে। তারপর তেজপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীনেহরু যে বলেছেন, বিদেশী সৈন্যের সাহায্য ভারত কখনও নেবে না।

লদাক সম্বন্ধে আমরা একবার শুনেছিলাম, সেই জনপরিত্যক্ত পার্বত্য এলাকায় ঘাস পর্যন্ত গজায় না। কিন্তু চীনের মনোভাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা নভেম্বর 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী' লদাকের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রচার করেন তাতেই বোঝা যায় যে, ঐ এলাকাটির প্রতি তাদের লোভের প্রকৃত কারণ কি। ঐ বর্ণনায় বলা হয়, 'যদিও মনুষ্য বাস সেখানে সামান্য, প্রাকৃতিক সম্পদ সেখানে প্রচুর। এ পর্যন্ত সেখানে খনিজ সম্পদের মধ্যে মাইকা, জেড, কৃষ্টাল প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। উঁচু পাহাড়ের বহু স্থানে বহু দুষ্প্রাপ্য জন্তু-জানোয়ার ও ভেষজ গুল্মের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'ঐ এলাকার বরফও একটা বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রতি বছর বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী মাসগুলিতে ঐ বরফের গলিত স্রোত সিনকিয়াং-এর বহু কৃষি ভূমিকে সিঞ্চিত করে।

'কোংকা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণে আছে ঝর্ণার জলসিঞ্চিত বহু তৃণাচ্ছন্ন পশু-চারণ ক্ষেত্র যেখানে যুগ যুগ ধরে তিব্বতী পশুচারকরা তাদের পশুপালন করছে।

'প্যাঙ্গাং হ্রদে প্রতি বছর এপ্রিল ও মে মাসে নৌকা চলে। হ্রদের অপর সম্পদ হল মাছ ও দেশবিদেশ থেকে উড়ে আসা বুনো হাঁস। আর ঐ হ্রদের তীরে আছে মানুষ-সমান উঁচু ঝাউ গাছের ঝোপ।'

এমন এলাকা চীন স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাবে এ আশা হয়ত অনতিবিলম্বের ইতিহাসেই অকারণ ও অর্থহীন দুরাশা বলে প্রমাণিত হবে।

এ কারণেই আজ সকল ভারত-বাসীকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে হবে যে, পররাজ্যলোভী চীন আজ যে যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা শেষ হয়নি। আর কঠিন আঘাত দিয়ে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত তারা এদেশের অধিকৃত ভূমি ত্যাগ করে যাবে না। এ ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে ভরসা এই যে, আমাদের চরম সংকটের দিনে যারা উদারহস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে-ছিল তাদের সাহায্যের ভাণ্ডার আজও আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। বৃটেনের সঙ্গে আমাদের অস্ত্র-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সেদেশ থেকে এপর্যন্ত যে নানাবিধ অস্ত্র আমরা পেয়েছি তা সবই পেয়েছি বিনামূল্যে ও বন্ধুর দানরূপে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হতেও অনুরূপভাবে জাহাজ ও বিমানে ভরে অস্ত্র এসেছে এবং প্রয়োজন হলে আরও আসবে। অষ্ট্রেলিয়া হতে আসছে ১৮ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র। এমন কি যে নিরপেক্ষ সুইডেন কখনও কোন যুদ্ধ বা বিরোধে অংশ গ্রহণ করে না সেও আক্রান্ত ভারতকে বিমান-ধ্বংসী কামান দিয়ে সাহায্য করছে। এ ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মাণী, কানাডা প্রভৃতি শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশগুলিও আমাদের সকল উপায়ে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।

আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের মিগ বিমান সরবরাহ নিয়ে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল সে সন্দেহেরও নিরসন হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক সাম্প্রতিক ঘোষণায়। তাঁরা জানিয়েছেন যে, মিগ বিমান নির্মাণ কারখানা স্থাপনের যে কথা তাঁরা দিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোন কারণই ঘটেনি, শুধু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর জন্য প্রতিশ্রুতি পালনে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে মাত্র।

নৈতিক সমর্থনের অবশ্যই মূল্য আছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশের সকল দেশের সমর্থন লাভের জন্য ভারত সব সময়ই সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চাই অস্ত্র ও রসদের অফুরন্ত সাহায্য সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের অবস্থা চীনের চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু লোহা লাল থাকতেই কি করে তার উপর আঘাত হানা যায় সেই কথাটাই আজ তৎপরতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে।

সেলা পাস থেকে একজন আহত জওয়ানকে তেজপুর আনা হচ্ছে হেলিকপ্টারযোগে।

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

ব্যারাকপুর শহরে একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে বড় রাস্তার ধারে মহানন্দ মিত্রের বাড়ি। মহানন্দ মিত্র সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। পুত্রবধূ ভারতী দেবী, পৌত্র আনন্দ, পৌত্রী নন্দা এবং ভৃত্য ঈশ্বরকে লইয়া তাঁহার সংসার। কাল সন্ধ্যা। ভৃত্য ঈশ্বর কক্ষে ধূপধুনো দিল।

নেপথ্য কণ্ঠ ।। কে আছেন স্যার? আসবো?

[পল্টন এবং লণ্ঠন নামক দুইটি গুণ্ডাপ্রকৃতির ভবঘুরে যুবক একটু ভয়ে ভয়েই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াইল। ঈশ্বর একটু কানে খাটো।]

পল্টন ।। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছি। সাড়া দিচ্ছিলে না যে? বাবু আছেন?

ঈশ্বর ।। সাবু? বাজারে পাবেন। এখানে কেন? দোকানে যান।

পল্টন ।। আহা! সাবু নয়। বাবু, বাবু।

ঈশ্বর ।। শুনিছি, শুনিছি। সাবু তো? বল্লাম তো বাজারে পাবেন।

লণ্ঠন ।। এ শালা মাইরি একেবারেই কালা।

পল্টন ।। মালিক? মালিক আছেন?

ঈশ্বর ।। শালিক? পাখী? উড়ে গেছে বুঝি?

লণ্ঠন ।। এ শালা একেবারে কানে সীসে ঢেলে রেখেছে মাইরি।

পল্টন ।। [কানের কাছে মুখ লইয়া] বাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করবো।

ঈশ্বর ।। ও। বসুন বসুন। তা কেউ তো বাড়ি নেই। সব মীটিংয়ে গেছেন। লড়াইয়ের মীটিং।

পল্টন ।। বাড়ীতে কেউ নেই?

ঈশ্বর ।। না।

লণ্ঠন ।। গিন্নীমা?

ঈশ্বর ।। গিন্নী-মা গেছেন স্বর্গে।

লণ্ঠন ।। বেশ-বেশ। ছেলে টেলে?

ঈশ্বর ।। ছিল একই ছেলে। তা তিনিও স্বর্গে।

লণ্ঠন ।। বাঃ, সব স্বর্গে।

ঈশ্বর ।। না—না—ছেলের বৌ আছেন। বৌমা।

পল্টন ।। বাড়িতে আছেন?

ঈশ্বর ।। কানে শোন না নাকি? বল্লাম না, কর্তার সঙ্গে গেছেন লড়াইয়ের মিটিংয়ে। আনন্দ দাদু, নন্দা দিদি, তারাও গেছে।

লণ্ঠন ।। তা এতবড় বাড়িতে কেউ নেই?

ঈশ্বর ।। চোখেও দেখ না নাকি? আমি নেই?

পল্টন ।। বটেই তো—বটেই তো। তাহলে আমরা একটু বসি। কর্তার সঙ্গে দেখা করব কিনা।

ঈশ্বর ।। তা বেশ তো, বসো।

পল্টন ।। একটু জল খাওয়াতে পারো?

ঈশ্বর ।। ও, জল?

পল্টন ।। হ্যাঁ জল। একটু গরম জল হবে? একটু চা? অনেক দূর থেকে এসেছি কিনা।

ঈশ্বর ।। হবে, হবে। তোমরা বোসো—আমি দিচ্ছি। বাবুরা না থাকলে কী হয়, আরে আমি তো আছি।

পল্টন ।। তুমি কে?

লণ্ঠন ।। নাম কি?

ঈশ্বর ।। নাম? আমার নাম ঈশ্বর।

[ঈশ্বর ভিতরে চলিয়া যায়]

লণ্ঠন ।। ওরে বাবা। চাকরের নামই যদি ঈশ্বর হয়, বাবু না জানি কোন পরমেশ্বর?

পল্টন ।। আরে শালা, ও লোকটার কান থেকেও কান নেই আর তোর শালা চোখ থেকেও চোখ নেই। গেটের সামনে দেখিসনি একটা প্লেটে লেখা আছে, মহানন্দ মিত্র।

লণ্ঠন ।। মহানন্দ মিত্র? তাহলে ওস্তাদ আনন্দ করতে করতেই ফেরা যাবে কী বল? লড়াইয়ের চাঁদা আদায় করে?

পল্টন ।। দেখ লণ্ঠন! তোর যদি এতটুকু আক্কেল থাকে?

লণ্ঠন ।। কী বেয়াক্কেলের কাজ তুই আমার দেখলি?

পল্টন ।। সরকার ঢাক-ঢোল মেরে রটিয়ে দেয়নি যার তার হাতে লড়াইয়ের চাঁদা দেওয়া চলবে না? চাঁদা চাইলেই দেখতে চাইবে সরকারী রসিদ। আর তা না দেখাতে পেলেই—

লণ্ঠন ।। ওরে বাবা!

পল্টন ।। ধোলাই—একেবারে ধোলাই।

সব শালা আজ চালাক হয়ে গেছে।

লণ্ঠন ।। কিন্তু আজ কিছু কামাই না করলেও তো চলবে না ওস্তাদ। দেখছি মাল টাল কী আছে এখানে। নাম যখন মহানন্দ, নিরানন্দ করো না বাবা।

[চোরের মতন এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে একটু ভিতরে গেল। পল্টন পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল ও একটি খবরের কাগজ লইয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।]

পল্টন ।। এই যাঃ, বিল্টু শালা পকেট মারতে গিয়ে কাল ধরা পড়েছে! এই লণ্ঠন, শুনছিস?

[উল্লসিত লণ্ঠন পাশের ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

লণ্ঠন । মার দিয়া কেল্লা।

পল্টন ।। কি?

লণ্ঠন ।। এই দেখ।

[মুঠো খুলিয়া দেখাইল]

পল্টন ।। [তাহা দেখিয়া] মারহাব্বা! টিসো ঘড়ি, একেবারে আনকোরা নূতন, তার মানে তিন শো! পার্কার পেন—এটা দশ আনীরে শালা।

লণ্ঠন ।। আরে, না না। যাচিয়ে দেখেছি। একেবারে খনির মাল রে—কম করে আশী নব্বুই। তা'হলে ওস্তাদ এ দুটো চাঁদা হিসেবে ধরেনি?

পল্টন ।। না। ঈশ্বর এলো বলে। জিনিস দুটো এখুনি, যেখানে ছিল, সেখানে রেখে আয়।

লন্ঠন ।। হাসালে ওস্তাদ, হাসালে। ওই ঈশ্বরকে ভয় পাচ্ছ?

পল্টন ।। [রাগতস্বরে] লন্ঠন! যা বলছি শোন। এখানে একটা নতুন টিকস্ খাটাতে হবে আজ।

লন্ঠন ।। কী?

পল্টন ।। তুই আগে রেখে আয়, আমি বলছি।

[অনিচ্ছা সত্ত্বেও লন্ঠন জিনিস দুইটি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

লন্ঠন ।। বলো। কী তোমার টিকস্ ওস্তাদ বলো।

পল্টন ।। বলছি। শুনলি তো, এ বাড়ির সবাই গেছে লড়াইয়ের মীটিংয়ে।

লন্ঠন ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে বুঝলে পল্টনদা, ঐ পার্কে যে খুব বড় একটা মীটিং হচ্ছে, সব চেঁচাচ্ছে 'সেনাদলে যোগ দাও', 'চীনকে হটাও', ঐ মীটিংটাতেই গেছে।

পল্টন ।। ধর তুই আর আমি অনেক দূরে থেকে, বারাসত-বসিরহাট সাইডের কোন গাঁ থেকে যেন আমরা এসেছি। যাবো কলকাতায়, সৈন্য হ'তে। ধর তোর আর আমার প্রাণ দেশের জন্য খুব কাঁদছে। আমরা গেঁয়ো লোক। কোথায় সৈন্য হওয়ার জন্য নাম লেখানো যায়, এ সব আমরা কিছু জানি না। পকেটে নেই পয়সা, কিন্তু মনে খুব দেশপ্রেম। ধর বোজ মাইল পথ আমরা হেঁটে চলে এসেছি। দেশের জন্যে প্রাণ দেবই আমরা। তা' এখানে আসতেই রাত হ'য়ে গেল। পথ না পেয়ে সামনে এই ভালো বাড়িটা দেখে এই মহানন্দবাবুর কাছেই সাহায্য চাইছি—আমাদের মশাই পাঠিয়ে দিন, দেশের জন্য প্রাণ দিই।

লন্ঠন ।। ওস্তাদ। এ সব কি বলছিস তুই। সত্যি সত্যি জান্ টান্ দিবি নাকি? না ওস্তাদ, ওসবের মধ্যে আমি নেই। জান্ টান্ দিতে পারবো না।

পল্টন ।। আরে বুদ্ধু, এটা একটা টিকস্। মানে, আমরা সৈন্য হবো—লড়াইয়ে যাবো এ-সব আমরা বলবো, বললেই তো আর যাচ্ছি না। সেরেফ্ 'ভড়কি'। কিন্তু এ-সব বললেই আজকাল কি খাতির যত্নটা হয় দেখবি এখন। হ্যাঁ কাগজে সব পড়ছি যে।

লন্ঠন ।। কিন্তু তাতে হচ্ছেটা কী? 'পাত্তি'? পাত্তি আসবে তাতে? জানিস আমি বাড়ি ফিরলে তবে ছোট ভাইটার মুখে একটু ওষুধ-পথ্যি পড়বে—এই আশায় বসে আছে মা।

পল্টন ।। সে যদি বলিস্, আরে আমারোতো তাই। বস্তিতে খোলার বাড়ি। তারই ভাড়া বাকী পড়ে গে'ছ চার মাস। বাড়িওয়ালা শালা ডিক্রী করে রেখেছে। এই শনিবারের মধ্যে ভাড়া মিটিয়ে না দিলে বুড়ো বাপ আর ভাই-বোন দুটোকে নিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। 'পাত্তি'? 'পাত্তি'? আমারই কি কিছু কম দরকার? কিন্তু আসছে কোথ্থেকে? পাচ্ছি কোথায়? তাই না 'চারশো-বিশ' হচ্ছি। লড়াইয়ে যাবো বললে, দেখি মহানন্দ মহাশয় কলকাতা যাবার খরচ-পত্রটা দেয় কিনা। রাতের খোরাকিটা বেঁচে যায় কিনা। রাতটা এই ঘরে কাটাতে দিলে শেষ রাতে ঐ 'টিসো' ঘড়ি আর ঐ পার্কার পেন—

লন্ঠন ।। ওস্তাদ! ওস্তাদ! সাধে কি আর তোকে ওস্তাদ বলি। দে মাইরি, হাতখানা দে। [হাত ধরিয়া হ্যাণ্ড-সেক্]

পল্টন ।। চুপ! ঈশ্বর, ঐ ঈশ্বর এসে গেছে।

[দুই প্লেট খাবার ও দুই কাপ চা লইয়া ঈশ্বরের প্রবেশ]

পল্টন ।। ওরে বাবা! এ যে একেবারে রাজভোগ।

লন্ঠন ।। এ রাজভোগ দেখে আবার ঐ টিসো ঘড়ি আর পার্কার পেন যেন ভুলো না।

পল্টন ।। আরে শুনবে যে।

লন্ঠন ।। আরে এ ঈশ্বর শোনেন না। কিহে কিছু কানে গেছে তোমার?

ঈশ্বর ।। বানে? হ্যাঁ বান হয়েছিলো খুব। বানে ভেসে গেছে এবার আমার দেশের বাড়িঘর। তোমরা জানলে কি করে?

লন্ঠন ।। আরে তা আর জানবো না। তোমার দেশেই যে আমাদেরও বাড়ি।

ঈশ্বর ।। হ্যাঁ! হ্যাঁ! হাঁড়ি। ভাতের হাঁড়ি। আমাদেরও ভেসে গিয়েছিল।

পল্টন ।। যাবেই তো। তুমি যে ভেসে যাওনি এই আমাদের ভাগ্যি।

[মহানন্দবাবু সপরিবারে বাড়ি ফিরলেন।]

মহানন্দ ।। এই তো তোমরা—আপনারা। না-না, বসুন-বসুন, আলাপ-পরিচয় পরে হবে। প্লেটে যে কিছু নেই দেখছি। [ভারতীকে] বৌমা—

পল্টন ।। না-না, স্যার। খুব খেয়েছি। আপনার ঈশ্বর খুব খাইয়েছে আমাদের [ভারতীকে] না—মা। আর আমাদের কিছু লাগবে না। আমরা আমরা একটা বিপদে পড়েই এখানে এসে উঠেছি।

মহানন্দ ।। বিপদ! কী বিপদ ভাই?

পল্টন ।। শুনেছি, চীন আমাদের দেশ কেড়ে নিতে আমাদের মাটিতে ঢুকে পড়েছে।

মহানন্দ ।। হ্যাঁ ভাই। স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের এত বড় বিপদ আর আসেনি।

[ঈশ্বর চায়ের কাপ, প্লেট সব লইয়া চলিয়া গেল।]

আনন্দ ।। দেশের এই বিপদে—ভারতের জওয়ানরা হাতগুটিয়ে বসে থাকবে না—

ভারতী ।। দেশের এই বিপদ তো রয়েছেই, কিন্তু এদের বিপদটা কি সেটা তোমরা শোনো।

মহানন্দ ।। বটেই তো। বটেই তো। হ্যাঁ তোমাদের কী বিপদ বলছিলে?

পল্টন ।। আমরা দুই বন্ধু বসিরহাটের এক গাঁয়ে থাকলেও দেশের এই বিপদের কথা শুনেছি। শুনেই ছুটে আসছি সৈন্যদলে নাম লেখাতে। কিন্তু এই ব্যারাকপুরে আসতেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

লন্ঠন ।। পকেটও ফাঁকা।

পল্টন ।। এখানে বসে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা দেখিয়ে দিলেন আপনার বাড়ি। বললেন, সটান চলে যাও মহানন্দবাবুর কাছে।

লন্ঠন ।। আপনিই নাকি সব ম্যানেজ করে দেবেন স্যার।

মহানন্দ ।। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আনন্দ ।। কি আনন্দ! বন্দেমাতরম্!

নন্দা ।। বন্দেমাতরম্। লড়াইয়ে যাবেন। বলুন তবে জয়হিন্দ।

সকলে ।। জয়হিন্দ।

ভারতী ।। সত্যি আনন্দ হচ্ছে। আমি তোমাদের খাবার জোগাড় করছি বাবা। নন্দা আয় আমার সঙ্গে। [শ্বশুরকে] বাবা, আপনিও কাপড় জামাটা ছেড়ে আসুন। [মহানন্দের অন্দরে গমন।] এ বেলা মাছ নেই, মাংস আছে। আর আছে ঘরে-তৈরী রাবড়ি। মাংস খাও তো বাবা?

লন্ঠন ।। মারহাব্বা— [বলিয়াই লজ্জা পাইল]

পল্টন ।। ওরে বাবা, খাই আবার না!

আনন্দ ।। শুধু মাংস আর রাবড়ি! না-না, মা! লড়াই করতে গেলে ভালো মন্দ খাবার তো আর জুটবে না। বলুন না, আপনারা কী খেতে ভালবাসেন? আমি কিনে আনছি।

লন্ঠন ।। কী খাবি বল্ না?

পল্টন ।। তুই থাম।

নন্দা ।। না-না। আপনারা লজ্জা করবেন না।

ভারতী ।। হ্যাঁ বাবা। লজ্জা করো না। আমাকে তোমরা মা বলেই জেনো। আমার ছেলেমেয়েরাও যাবে এই লড়াইয়ে।

আনন্দ ।। কলেজ থেকেই আমাদের পাঠাবে। এন-সি-সি ট্রেনিং আমার শেষ। আমি দিন গুণছি।

নন্দা ।। আমাকেই বা আটকাচ্ছে কে? গার্লগাইড ট্রেনিং আমারও শেষ হবে এই মাসে। আমি হব নার্স।

ভারতী ।। [লন্ঠন ও পল্টনকে] কিন্তু তোমরা দুজন যাচ্ছো, কাল ভোরেই। আবার কবে তোমাদের পাবো আমি জানি না। আজ তোমাদের একটু ভালো করে খাওয়াতে ইচ্ছে। কি খেতে ইচ্ছে, বলো না?

পল্টন ।। আমরা ডাল ভাত পেলেই খুশি মা।

লন্ঠন ।। সেই সঙ্গে যদি পারেন দেবেন একটু আচারটাচার। যদি ইচ্ছে হয়।

নন্দা ।। মা, এ ছেলেরা তোমাকে আপনার ভাবতে পারছে না। প্রাণ খুলে তাই বলতে পারছে না কিছু। সত্যিকার মা নও কিনা তাই।

আনন্দ ।। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি।

ভারতী ।। তা যদি বলিস সত্যিকার মাকেও ছেলেদের বলতে হয় না। মা তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে কি খেলে খুশি হবে তারা। [আনন্দ ও নন্দাকে] তোরা আয় দেখি আমার সঙ্গে। যা দরকার আমি করছি। তোমারা বাবা জামা কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করো। যাচ্ছো লড়াই করতে, আর বিশ্রাম জুটবে কিনা কে জানে। ঘরে যা আছে তাই দিয়েই খাইয়ে দিচ্ছি তোমাদের যাতে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো।

[আনন্দ ও নন্দাকে টানিয়া লইয়া ভারতীর অন্দরে প্রস্থান]

লন্ঠন ।। ওরে চুপ মেরে গেলি যে! গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিস্ ওস্তাদ?

পল্টন ।। চল, পালিয়ে যাই।

লন্ঠন ।। সে কি ওস্তাদ! পালাবি কি?

পল্টন ।। হ্যাঁরে, কেমন দম আটকে আসছে।

লন্ঠন ।। যারে! পালাবো তো সেই শেষ রাতে। এখনই পালাবো কি। মওকা তো এই শুরু হলো ওস্তাদ।

পল্টন ।। যা বলেছিস্।

লন্ঠন ।। তবে পালাবার কথা বলছিস কেন?

পল্টন ।। তোর মনটা বাজিয়ে দেখছিলাম।

লন্ঠন ।। তাই বল। তা আমি ঠিকই আছি। এখন ভরপেট খাওয়া তারপর ঘুমুবো বলে শুয়ে পড়া। তারপর সবাই ঘুমুলে—

পল্টন ।। ঐ টিসু আর পাকুটা হাতিয়ে হাওয়া, কেমন ?

লন্ঠন ।। এই তো! এই তো! জানি ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। মার দিয়া কেল্লা। মারহাব্বা।

[ঘরোয়া জামাকাপড়ে মহানন্দবাবুর প্রবেশ]

মহানন্দ ।। এই যে, দাদুরা তোমরা এখনও একটু গা হাত পা ছড়িয়ে বসোনি? একটু আরাম করবে না?
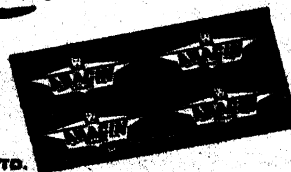
পল্টন ।। না-না, এই বেশ আছি।

মহানন্দ ।। শুনে বড়ো খুশি হলাম দাদু। নেহরুজী বলেন—'আরাম হারাম হ্যায়'। আর লড়াই করতে যখন যাচ্ছো, আরাম যে কি তা তো ভুলেই যেতে হবে ভাই।

পল্টন ।। লড়াই করতে না গিয়েও আরাম কি তা ভুলে গেছি। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে যদি দুমুঠো ভাত জোটে।

মহানন্দ ।। কি করো তোমরা? পাশ-টাস কিছু করেছো?

পল্টন ।। ওসব আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না দাদু।

মহানন্দ ।। সে কি হে? তবে চলছে কি করে?

লন্ঠন ।। চারশো বিশ।

পল্টন ।। এই!

মহানন্দ ।। 'সোবিশ'? 'সোবিশ'টা কি বাপু?

পল্টন ।। ও আপনি বুঝবেন না।

মহানন্দ ।। কেন বুঝবো না দাদু? 'সোবিশ' মানে শুয়ে বসে থাকো। কিন্তু আর তো শুয়ে বসে থাকলে চলবে না দাদু। চীনের আক্রমণে দেশের আজ চরম বিপদ। জাতির আজ চরম দুর্দিন।

পল্টন ।। তাই তো ছুটে এসেছি স্যার।

মহানন্দ ।। আসবে বৈকি। গান্ধীজী আর নেতাজীর নেতৃত্বে বিদেশী শাসনের অবসানে আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতের যে কোন পরিবারে আজও খুঁজে দেখো কাউকে নিশ্চয়ই পাবে যে এই স্বাধীনতার জন্যে কত না আত্মত্যাগ করেছে। হয় জেল খেটেছে কিম্বা মরেছে কিম্বা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

লণ্ঠন ।। আমার বাবাই তো কতবার জেল খেটেছে।

পল্টন ।। আমার বাবাও। বেয়াল্লিশ সালের বিপ্লবে দস্তুর মতো লড়াই করে জখম হয়েছে; একটা পা আর নেই তাঁর।

মহানন্দ ।। ঐ বেয়াল্লিশের বিপ্লবেই গুলী খেয়ে আমারো একমাত্র ছেলে মহিম শেষ হয়ে গেছে। তাই না মুছে গেছে আমার ঐ বৌমার সীমন্তের সিঁদুর।

[লন্ঠন ও পল্টন নীরবে চিন্তামগ্ন]

মহানন্দ ।। তোমার আমার এক ছটাক জমি যদি কেউ বেদখল করতে আসে আমরা কখনও তা সইতে পারি?

পল্টন ও লন্ঠন ।। [একসঙ্গে হাঁকিল] না!

মহানন্দ ।। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী গেল বাইশে অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিছুটা তোমরা শোনো—
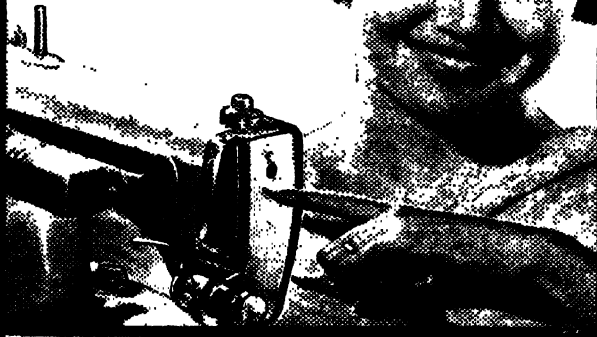
[পকেট হইতে একটি সংবাদপত্রের কর্তিতাংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।]

"......চীন ও ভারতের সীমান্ত বিরোধে আমরা শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম। যুদ্ধ চাই নাই, সংঘর্ষ চলিতে থাকাকালেও আমরা শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালাইতেছিলাম, কিন্তু আলোচনা চলিতে থাকাকালে চীন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিয়া আমাদের স্কন্ধে এই যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। শান্তির জন্য আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।......দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করা এবং যাহারা আমাদের পবিত্র ভূমি গ্রাস করিতে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করাই আজ আমাদের একমাত্র কর্তব্য। [যুগান্তর]

[মহানন্দ উত্তেজিত কণ্ঠে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ, নন্দা এবং ভারতীদেবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মহানন্দবাবুর পাঠ শেষ হওয়ামাত্রই আনন্দ ও নন্দা যুগ্মকণ্ঠে গাইয়া উঠিল "জয়হিন্দ"এর গান। সেই গানে লন্ঠন ও পল্টন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহারাও ক্রমে কণ্ঠ মিলাইয়া দিল।]

ভারতী ।। এসো বাবা—এবার তোমরা আমাদের সঙ্গে খাবে এসো। খেয়ে এসে এই ঘরেই তোমরা শোবে।

[ভারতী সকলকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন]

[সময়ক্ষেপক অন্ধকার অন্তে দেখা গেল উদ্গার তুলিতে তুলিতে লন্ঠন ও পল্টন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, তক্তপোশের ওপর তাহাদের দুইজনের শুইবার উপযোগী একটি পরিপাটি বিছানা হইয়া গিয়াছে]

পল্টন ।। ওরে বাবা! রাজভোগ, তারও-পর এই রাজশয্যা। এ কোথায় এলাম রে বাবা!

[ঈশ্বর দুইটি পাশবালিশ লইয়া আসিল।]

লন্ঠন ।। তার ওপর আবার এই পাশ-বালিশ। মাইরি বিপদ হ'ল দেখছি ওস্তাদ!

পল্টন ।। কেন বল তো?

লন্ঠন ।। এমন আরামে ঘুমিয়ে পড়তে হবে যে! পালাবো কি করে? [ঈশ্বরকে] আর মালিশ পেলে না!

ঈশ্বর ।। মালিশ! হ্যাঁ, মালিশও জানি। কর্তাবাবুকে করি যে।

[সঙ্গে সঙ্গে লন্ঠনের মাথায় 'ম্যাসাজ' করিতে লাগিল]

পল্টন ।। এই যাঃ! আবে ঘুমিয়ে পড়বি যে শালা!

লন্ঠন ।। [ঈশ্বরকে] আর চাই না।

ঈশ্বর ।। চা?

লন্ঠন ।। তোমার মাথা।

ঈশ্বর ।। ছাতা? দেখছি।

[ঈশ্বর চলিয়া গেল]

পল্টন ।। জ্যালা বিপদ।

[পানের ডিবা লইয়া নন্দার প্রবেশ]

নন্দা ।। এই যে আপনাদের পান।

[এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আনন্দের প্রবেশ]

আনন্দ ।। দাদু বললেন—সিগ্রেট দিতে —অবশ্য যদি আপনারা খান।

পল্টন ।। তা'—আচ্ছা। [সি গ্রে টে র প্যাকেটটি লইল]

লন্ঠন ।। আপনাদের দাদু—মাইরী খুব মাইডিয়ার লোক। [পল্টনকে] কি সিগ্রেট রে?

পল্টন ।। গোল্ড ফ্লেক্। তোর চার-মিনার' না।

লন্ঠন ।। তবে তুই খা। আমার চার-মিনার না হলে শানায় না। [নিজের পকেট হইতে একটি চারমিনার বাহির করিয়া ধরাইল]

পল্টন ।। আমারও তাই। তবে এনেছেন, খাচ্ছি। [একটি গোল্ড ফ্লেক্ ধরাইয়া আনন্দকে] আপনি?

আনন্দ ।। না—থাক। দাদু আসবেন যে।

[নন্দা ইহাদের বিছানাটি ভাল করিয়া সাজাইয়া দিয়া এইবার দুইটি গ্লাস এবং একটি জলের কুঁজো আনিয়া দিল।।

নন্দা ।। এই যে আপনাদের খাবার জল রইলো।

আনন্দ ।। আপনারা তো লড়াইয়ে যাচ্ছেন! আমিও একদিন যাচ্ছি। সেখানে দেখাও হয়ে যেতে পারে আবার একদিন। কি ভালই না লাগবে সেদিন!

নন্দা ।। আমার সঙ্গেও কিন্তু দেখা হতে পারে। আমি নার্স-এর ট্রেনিং নিয়েছি যে!

লন্ঠন ।। উঃ দেখা হলে সে যা হবে মাইরি!

নন্দা ।। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যেন কোনদিন আমার দেখা না হয়। লড়াইয়ে গিয়ে কোন আঘাতই যেন আপনারা না পান। আচ্ছা আর আপনাদের কি লাগবে বলুন না!

পল্টন ।। না-না আর কি লাগবে! এই যা করেছেন—বড্ড বাড়াবাড়ি করে-ছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি যেন সইতে পারছি না।

আনন্দ ।। সোলজারদের এটা প্রাপ্য। কেন পাবে না তারা? দেশের জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছে না তারা?

নন্দা ।। তা' নয় তো কি! বরং সে তুলনায় সৈনিকদের কতটুকু সেবা আমরা করতে পারি? এই তো ভাইফোঁটার দিনে আমাদের জওয়ান-দের জন্য দেশের সব বোনেরা কত কি উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু কোন বোনেরই মন তাতে ভরেনি। হাতে করে তো কেউ কিছু দিতে পারেনি। আজ কিন্তু আমরা দুই ভাইবোন আপনাদের কিছু দেবো। নিতেই হবে আপনাদের।

[নন্দা ও আনন্দ পাশের কক্ষে গিয়া তখুনি দুইটি উপহার লইয়া আসিল]

নন্দা ।। [পল্টনকে] আমার এই পার্কার পেনটি আপনাকে আমি দিলাম।

আনন্দ ।। [লন্ঠনকে] আর আমার এই "টিসট্" ঘড়িটি আপনাকে আমি দিচ্ছি।

পল্টন ।। এ্যাঁ! না—না।

লন্ঠন ।। ওরে বাবা! এ কি!

নন্দা ।। না-না, হাতে করে দিতে পারছি এই আনন্দটুকু আমাদের দিন। এই কলমটা দিয়ে যদি দু'একটা পোস্ট-কার্ড লিখে আমাদের জানান কেমন আছেন আপনারা! জানাবেন তো?

আনন্দ ।। [লন্ঠনকে] তুমি ভাই এই ঘড়িটা সব সময়ে রেখো হাতে। সময় দেখতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো মনে পড়বে আজকের এই রাতটির কথা। আচ্ছা চলি।

[আনন্দ যাইতেছিল। পল্টন তার হাত চাপিয়া ধরিল]

পল্টন ।। না-ভাই, আর একটা গান শুনিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ ।। গান! এখন!

পল্টন ।। হ্যাঁ—আমাদের মনটাকে তৈরী করে দাও ভাই—মনটাকে তৈরী করে দাও।

আনন্দ ।। নন্দা ধর—

[আনন্দ ও নন্দা আর একটি দেশপ্রেমমূলক গান ধরিল! এই গানের মধ্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহানন্দবাবু এবং ভারতীদেবী]

মহানন্দ ।। ওরে, এসব গান শুনে আমি আমার বয়স ভুলে যাই। ভুলে যাই আমার সব ব্যায়াম-ট্যারাম। ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যাই যেখানে হচ্ছে লড়াই। কেন জানো? আমার যেন কেবলই মনে হয় এদের বাপ—আমার সেই বীর ছেলে—ও'র সেই বীর স্বামী—আমাদের সেই মহিম—তার আত্মা হয়তো স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে দেখতে, যে স্বাধীনতা তারা জীবন দিয়ে এনে দিয়ে গেছে, আমাদের হাতে,—সেই স্বাধীনতা অটুট রাখতে আমি কি করছি? কতটুকু আমি করছি?

ভারতী ।। আমি বিশ্বাস করি বাবা।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'।

মহানন্দ ।। [আবেগপূর্ণকণ্ঠে বারবার আবৃত্তি] 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'!

নন্দা ।। দাদু-দাদু!

ভারতী ।। বাবা! আপনি শান্ত হোন বাবা। চলুন এখন আপনি শোবেন চলুন।

মহানন্দ ।। চল, চল—যাচ্ছি।

আনন্দ ।। আচ্ছা—আজকের মত শুভরাত্রি। কাল সকালে তো আবার দেখা হচ্ছে।

নন্দা ।। আচ্ছা—এখন তাহলে আসি। মশাটশা কামড়ালে আপনারা ডাকবেন। আবার ফ্লিট দিয়ে যাবো।

[ভারতী ব্যতীত আর সবাই চলিয়া গেল]

ভারতী ।। [পল্টনকে] তোমার মা আছেন বাবা?

পল্টন ।। না, নেই।

ভারতী ।। বাবা আছেন?

পল্টন ।। আছেন।

ভারতী ।। তুমি যে লড়াইয়ে যাচ্ছো তাতে তিনি খুশী হয়েছেন।

পল্টন ।। [বিব্রত হইয়া] আমি জানি না—জানি না আমি।

ভারতী ।। [লন্ঠনকে] তোমার?

লন্ঠন ।। মা আছেন। বাবা নেই।

পল্টন ।। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আজ আমরা সব কিছু ফিরে পেয়েছি। যার বাপ নেই সে পেয়েছে বাপ। যার মা নেই সে পেয়েছে মা।

ভারতী ।। তেমনি যাদের ছেলে নেই তাদেরও অভাব পূরণ করেছো তোমরা—ছেলেরা। দেশের যখন একটা চরম বিপদ আসে তখন এই ই হয়ে থাকে বাবা। পুত্রহীনেরা পায় পুত্র। পিতৃহীনেরা পায় পিতা—মাতৃহীনেরা পায় মা। যেমন আজ হয়েছে। ঝগড়াঝাটি, হিংসাদ্বেষ আজ সবই ভুলে যাচ্ছে। আজ দেশের সব লোক যেন ভাইবোন। একই মায়ের সন্তান যেন সবাই। সে মাতা আমাদের দেশমাতা। রাত হয়েছে। এবার তোমরা শুয়ে পড়ো বাবা।

[ভারতীদেবী অন্দরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর]

লন্ঠন ।। কি রে, গড়িয়ে নিবি নাকি একটু?

পল্টন ।। গড়িয়ে নিতে হয় তুই নে।

লন্ঠন ।। তা ওস্তাদ, যা নরম বিছানা তা একটু শোয়াই যাক। মেয়েটা এত যত্ন করে বিছানাটা পেতে দিয়ে গেছে, না শুলে দোষ হবে। কিন্তু ওস্তাদ তাই বলে যেন ঘুমিয়ে পড়ো না—বাড়িটা নিঝুম হলে শটকাতে হবে মনে রেখো। কি ওস্তাদ, মুখে চাবি মেরে বসে আছো যে! এতো কি ভাবছো?—মাল তো আপসে হাতে এসে গেছে! আমি কি ভাবছি জানো ওস্তাদ? এমন সুন্দর ঘড়িটা পরতে পারবো না দুদিনও। বেচে হোক কি বাঁধা রেখেই হোক 'পাত্তি' যোগাড় করতে হবে।

পল্টন ।। খবরদার! এ ঘড়ি তুই নিয়ে যেতে পারবি না লন্ঠন।

লন্ঠন ।। পারবো না মানে? এ ঘড়ি আমায় দেয়নি?

পল্টন ।। দিয়েছে। তুই দেশের হয়ে লড়াই করতে যাচ্ছিস তাই দিয়েছে—তুই কি লড়াই করতে যাচ্ছিস?

লন্ঠন ।। পারলে যেতাম। কিন্তু পারছি না, তাই যাচ্ছি না।

পল্টন ।। কাজেই এ ঘড়িও তুই পাচ্ছিস না।

লন্ঠন ।। [ব্যঙ্গে] পাচ্ছি না! তুই কি ওই পার্কার কলম এখানে ছেড়ে যাচ্ছিস!

পল্টন ।। যদি লড়াইয়ে না যাই তবে এ কলম আমি নিচ্ছি না।

লণ্ঠন ।। 'এবে', খুব যে সাধু হয়ে গেলি। তোর মতলবটা কি বলদিকি? একটু ঝেড়ে কাস না শালা।

পল্টন ।। ভদ্রলোকের বাড়ি। শালা শালা বলে ওমন চিল্লাবি না। মুখ খারাপ করবার জায়গা এটা নয়, তোকে আমি বলে রাখছি লণ্ঠন।

লণ্ঠন ।। কি বাবা—মেয়েটার 'লাগে' পড়ে গেলি নাকি—তাই এমন বাছা বাছা বুলি আওড়াচ্ছিস—ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজছিস।

[পল্টন কোনও জবাব দিল না। চিন্তামগ্ন]

এইরে শালাকে পরীতে পেয়েছে দেখছি। [কথার কোনও উত্তর না পাইয়া হঠাৎ তাহার পিঠে এক ধাক্কা দিয়া] চল

শালা, বাড়িটা নিঝ্‌ঝুম, এই ফাঁকে কেটে পড়ি।

পল্টন ।। [পল্টন রুখিয়া গিয়া লন্ঠনকে এক চড় মারিল।]

লন্ঠন ।। [লন্ঠন গালে হাত বুলাইতে লাগিল] তুই আমাকে মারলি?

পল্টন ।। কোনও দিন কোনও থানে এতো ভালবাসা, এতো সম্মান পেয়েছিস তুই, না আমিই পেয়েছি? যখন যেখানে আমরা যাই, কেউ ভাল মুখে একটা কথা বলে? মন থেকে এমন আদরযত্ন করে? কুকুর বেড়ালের মত তাড়া না করে, এমন করে বুকে টেনে নেয় কেউ? কত ছোট ভাববে এরা আমাদের, যদি আমরা এই কলম আর ওই ঘড়ি নিয়ে পালিয়ে যাই? আমরা খুব ছোট—আমরা খুব নীচ—কিন্তু তারও কি একটা সীমা নেই? শেষ নেই লন্ঠন?

লন্ঠন ।। হুঁ, তুই কি করতে চাস ওস্তাদ?

পল্টন ।। তোর যদি যেতেই হয় যা—তবে ঘড়িটা তুই রেখে যা লন্ঠন।

লন্ঠন ।। আর তুই?

পল্টন ।। আমি লড়াইয়ে যাবো।

লন্ঠন ।। সে কি রে?

পল্টন ।। হ্যাঁ। এ জীবনে কোন একটা ভাল কাজ করার সুযোগ আমরা পাইনি, কেবলই ছোট কাজ করে করে কত ছোট হয়ে গেছি আমরা, তা আজ এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

লন্ঠন ।। এরা সব বড়লোক। এদের কথা আলাদা।

পল্টন ।। হ্যাঁ আলাদা, কিন্তু দেশের জন্য লড়াইটা আলাদা নয়। সবাই সৈনিক—সেখানে বড়লোক, ছোট-লোক নেই। শত্রুর গুলী বড়লোক ছোটলোক চেনে না। সেখানে সব একাকার। লন্ঠন, এ মওকা আমি ছেড়ে দেব না। আমি লড়াইয়ে যাবো।

লন্ঠন ।। তোর বুড়ো বাপ আর নাবালক ভাই-বোন? পথে দাঁড়াবে তারা? আমাকে লড়াইয়ে যেতে বলছিস, আমিই বা কী করে যাই। আমার ছোট ভাইটা না পাবে ওষুধ, না পাবে পথ্যি। মারা যাবে না?

পল্টন ।। কিন্তু গোটা দেশটা মারা যেতে বসেছে যে আজ। শোন ভাই লন্ঠন, তুই ওই ঘড়িটা রাখ—আমার এই কলমটা নে—চলে যা বাড়ি। তোর ভাইয়ের মুখে ওষুধ পথ্যি দিয়ে ফিরে চলে আয় কালই সকালে—নিদেন দুপুরে। কালই আমরা চলে যাই কলকাতায়—যেখানে সৈন্য হবার জন্য নাম লেখানো যায়।

[কাহারও মুখে আর কথা সরিল না। পল্টন লন্ঠনের হাতে তাহার পার্কার কলমটি দিল। লন্ঠন পল্টনের হাতে তাহার 'টিসট' ঘড়িটি রাখিল। নেপথ্যে মহানন্দের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

মহানন্দ ।। দরজাটা খুলবে ভাই?

[পল্টন দরজাটা খুলিয়া দিল। দেখা গেল মহানন্দবাবু একা নন; সঙ্গে ভারতীদেবীও আছেন। তাঁহার হাতে একখানা পাখা। সকলে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহানন্দ ।। কি ভাই যুদ্ধে যাওয়ার আনন্দে ঘুম আসছে না বুঝি? খুব গল্প করছো—আ ও রা জ পাচ্ছিলাম। আমার বৌমার আবার মায়ের মন কিনা—আমাকে বলছেন মশার কামড়ে ওদের ঘুম হচ্ছে না। ওই দেখ, পাখা নিয়ে এসেছেন হাওয়া করতে।

ভারতী ।। হ্যাঁ বাবা—আমি হাওয়া করছি। তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।

পল্টন ।। না-না, মশা টশা নয়।

ভারতী ।। তবে ঘুমচ্ছো না কেন বাবা? কাল থেকে শুরু হবে তোমাদের কষ্টের জীবন। একটা রাত আমাদের এখানে কাটিয়ে যেতে এসেছো—তাও যদি ঘুমুতে না পারো—আমি যে ঘুমুতে পারবো না বাবা অনেক রাত!

মহানন্দ ।। ঘুম অবশ্য আমারও হচ্ছে না—কিন্তু সে মশার জন্যে নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু আলাপ হয়েছে, তাতে আমি এই কথা বুঝেছি ভাই, সংসারে তোমাদের অনেক দায়-দারিদ্র আছে। টাকা-কড়িরও অভাব রয়েছে। আজ লড়াইয়ে যেতে সেই ব্যথাটা তোমাদের মনে কাঁটা হয়ে ফুটছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাদের মুখে আমি সে আনন্দ দেখিনি, যে আনন্দ ফুটে ওঠে, লড়াইয়ে যাবার স্বপ্নে, আমার আনন্দ-দাদুর মুখে—আমার নন্দা-দিদির চোখে। তাই আমি ঘুমুতে পারছিলাম না। ঘুমুতে পারি ভাই—ঘুমুতে পারবো আমি—যদি এই শ'দুই টাকা তোমরা নিয়ে কাল সকালে মনিঅর্ডার করে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

[পল্টন এবং লন্ঠন উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল]

মহানন্দ ।। হ্যাঁ ভাই। এটাকা তোমাদের নিতেই হবে। আজ দেশরক্ষার লড়াই বেঁধেছে—আজ তোমার পরিবার, ওর পরিবার, আমার পরিবার আলাদা নয়। আজ গোটা দেশে মাত্র একটি পরিবার। সৈনিকের পরিবার। ঐ একটি পরিবারের লোকই আজ আমরা সবাই।

[মহানন্দ ইহাদের হাতে নোটগুলি গুঁজিয়া দিলেন]

পল্টন ।। [ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া] আপনারা জানেন না—আমরা কে? আমরা কি?

মহানন্দ ।। [দুজনকে বুকে টানিয়া লইয়া] জানি ভাই খুব জানি। তোমরা ভারতমাতার বীর সন্তান। স্বাধীন ভারতের নওজোয়ান। স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিক ছিল তোমাদেরই পূর্বপুরুষ। স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে আজ যারা সৈনিক, তাঁদের বংশধর তোমরা। দেশের আশা তোমরা—দেশের ভরসা তোমরা।

ভারতী ।। তা নয়তো কি? মায়ের সম্মান রাখতে যে সন্তান জীবন পণ করে, প্রাণ দেয়, মায়ের সন্তান শুধুই সে। সেই সন্তান তোমরা। মায়ের মুখোজ্জ্বল করবে তোমরাই।

লন্ঠন ।। [ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া] জবাব নেই—এর কোনও জবাব নেই ওস্তাদ। দে আমার ঘড়ি দে—আর এই নে তোর কলম। চল, ঝাঁপিয়ে পড়ি দেশের ডাকে। লড়াই-এ।

[পল্টন আবেগে লন্ঠনকে বুকে জড়াইয়া ধরিল]

পল্টন ।। আর, পায়ের ধুলো নিই মায়ের—পায়ের ধুলো নিই দাদুর।

[উভয়ে তথাকরণ] বন্দেমাতরম্।

[সকলেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিলেন। আনন্দ ও নন্দা ঘুম হইতে জাগিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহারা গাহিয়া উঠিল—রণসঙ্গীত। সকলেই তাহাতে যথাসাধ্য যোগ দিল। আনন্দময় পরিবেশে যবনিকা নামিল।]

—যবনিকা—

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার হৃদয় মন উধাও হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশ আমার মন কেড়ে নিয়েছিলো। আমি যে সেদিন সারা বিশ্বে কী মাধুরী দেখেছিলাম আমি জানি না। গির্জের অর্গানের মতো একটা গভীর গম্ভীর শব্দ ধীর লয়ে বেজে চলেছিলো আমার বুকের মধ্যে।

যখন চোখ নামালাম, স্বভাবত মেয়েটির মুখের দিকেই তাকাতে গিয়েছিলাম, দেখলাম আলো জ্বালিয়ে আর একটা খালি ট্যাক্সি ছুটে আসছে সামনে থেকে। তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। অন্য একজন মহিলাও সেই গাড়িটির আশায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছিলেন। আমি জানতাম প্রতিযোগিতায় ঐ ফ্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে এই শাড়িপরা মেয়েটি কখনোই জয়ী হতে পারবে না, সুতরাং দিক-বিদিক হারিয়ে আমি তার আগেই দৌড়ে গিয়ে গাড়িটা ধরতে চেষ্টা করলাম। আর দৌড়োবার সঙ্গে সঙ্গেই বরফের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে।

হাতে আর মাথায় দারুণ চোট লাগলো। মেয়েটি এসে ধরলো আমাকে, গাড়িটাও থেমে গেল। বিশ্রী ব্যাপার হলো। ওঠবার শক্তি ছিলো না, ড্রাইভারটি নেমে এসে মেয়েটিকে সাহায্য করলো আমাকে ধরে তুলতে। কোথায় আমি মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দেব, তা নয়, সে-ই আমাকে তুলে দিল। ড্রাইভারের ধারণা হয়েছিলো আমরা যুগলযাত্রী, বস্তুত হলোও তাই। আমাকে তুলে দিয়ে একটু ভাবছিলো মেয়েটি, ড্রাইভার যখন তাকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার জন্য তাড়া দিল, সে আর দ্বিধা করলো না। আমার অবস্থাটা বুঝেছিলো, আমি যে আর একা যাবার যোগ্য নেই সেটা ভেবে আমাকে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলো।

আমাকে কোনো ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো না সে, নিজের ঠিকানায় নির্দেশ দিল। আমার তখন প্রতিবাদ করবার মতো শক্তি ছিলো না, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো মাথায়। আচ্ছন্নের মতো হেলান দিয়ে ছিলুম গাড়ির আসনে। গাড়ি দ্রুততর হয়ে চলতে লাগলো নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে।

আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ বটে, কিন্তু কোনো নিয়ম মাফিক ধর্মও যেমন মানি না, ভাগ্য নামক বস্তুটির প্রতিও তেমনি কোন আস্থা ছিলো না। কিন্তু সেদিনের সেই অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহে আমি ঈষৎ হতচকিত হলাম। মনে হলো জীবনের সবটাই পুরুষকার নয়। ভাগ্যের হাতও আছে। আর সেই ভাগ্যই আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছিল যা মুহূর্তকাল আগেও আমি ভাবতে পারিনি। আমার যুক্তি বুদ্ধি বা ইচ্ছে নামক সব জোরালো পুরুষকারেরা সেখানে মাথা গলাতে পারেনি। ঘটনাটা ঘটে গেছে, ঘটবে বলেই ঘটেছে। এগারো হাজার মাইল দূরের একটি মানুষকে আমার সঙ্গে একাত্ম করবার জন্যই ঘটেছে। আমার মাথা নিচু করে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না।

আস্তে মেয়েটি বললো, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?' আমি শুধু মাথা ঝাঁকালাম। আমার হাতের উপর মুহূর্তের জন্য তার হাতটা এসে পড়লো, বেদনা-বিদ্ধ স্বরে বললো, 'আমিই এ জন্য দায়ী।'

'না, না।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণাটাকে সহ্য করবার চেষ্টায় ছটফট করতে করতে চোখ মেলে তাকালাম। কাচ ঢাকা প্রায় অন্ধকার গাড়ির মধ্যে অস্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে, তার উদ্বিগ্ন মনের ছায়া অনুভব করলাম তার সমস্ত ভঙ্গিতে। সে আমার হাত থেকে বরফে ভিজে যাওয়া দস্তানা দুটো খুলে দিল। নিজের ছোট্ট রুমালে আমার কোটের উপরকার বরফের কুচিগুলো ঝেড়ে দিল। আর তার এই সেবার ইচ্ছের চেহারায় মনোহারিত্বে আমি সব কষ্ট সুখের বলে মনে করতে লাগলাম।

বাড়ি খুব দূরে ছিলো না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল গাড়ি। গাড়ির দরজা খুলে নেমে বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি ডোরম্যানকে ডেকে আনছি, সে এসে আপনাকে নামতে সাহায্য করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায় নামতে সাহায্য করবে।'

'এখানে। আমি এখানেই থাকি। আমার মামা ডাক্তার, আপনি যদি কষ্ট করে ভাবিতে এসে বসেন একটু—'

'না না কিছু দরকার নেই।' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম 'অনেক

ধন্যবাদ। আপনি নেমে গেলে এই ট্যাক্সিটা নিয়েই আমি চলে যাবো।'

'কোথায় যাবেন?'

'প্রায় চোদ্দো মাইল। আমি কুইন্সে থাকি।'

অতদূরে। এ অবস্থায়! একা!'

উৎকণ্ঠা দেখে হাসলাম, বললাম, 'তাতে কী?'

'যেতে যেতে যে বেড়ে যাবে।'

'তা একটু যাবে বোধহয়।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'একা একা অতদূরে? না না' তা হয় না।'

'হয়। বরং তা ছাড়াই আর কিছু হতে পারে না।'

'কিন্তু আমার জন্যই আপনার এই দুর্ভোগ হলো।'

'কিছু না, কিছু না, বরং আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশী সুখী হলাম। আচ্ছা,—'

মেয়েটি দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছিলো, বিদায়ের জবাবে বিদায় নিল না। ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ডোরম্যানকে ডেকে আনলো। মুহূর্তে বলিষ্ঠ নিগ্রো ডোরম্যানটি গাড়ির কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। মেয়েটি আমার অনুমতি নেয়া না নেয়ার ধার দিয়েই আর গেলো না দেখলাম। যেন সেই আমার গতিনিয়ন্ত্রণের কর্ণধার এমনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হুকুম দিতে লাগলো। যাতে ব্যথা না লাগে এমনভাবে যেন নামানো হয়, তার নির্দেশ দিতে লাগলো ডোরম্যানকে। ডোরম্যানটিই শুধু তার হুকুম পালন করলো না, আমিও বিনা প্রতিবাদে নেমে এসে লবিতে বসলাম। এই আমাদের আলাপ হবার ইতিহাস মিসেস সান্যাল, এই আমাদের প্রথম দেখা।' আনমনা হয়ে চুপ করলো রাসেল স্মিথ, একটা সিগারেট ধরিয়ে এলোমেলো টান দিল।

আমি একমনে শুনছিলাম। গল্পের মতো লাগছিলো। বললাম 'তারপর?'

রাসেল হাসলো। 'তারপর তো অবস্থাটা দেখছেন।'

'তা তো দেখছি, কিন্তু অবস্থাটা তো সেদিনই এ রকম হয়নি।'

'কে জানে। তা নৈলে আমি তার কথামতো নামলাম কেন বলুন? কারো উপরে নির্ভরশীল হওয়াটাকে আমরা অপমান বলে মনে করি। আমার মা ছিলেন ফরাসী মেয়ে, বাবা আমেরিকান, এই দুই রক্তের সংমিশ্রণে আমার জন্ম। সেই রক্তে তো কোনো নির্ভরতার প্রশ্ন থাকা উচিত ছিলো না। একটি অপরিচিত বিদেশী মেয়ের সেবা বা সাহায্য আমি নিতে যাবো কেন? আশৈশব আমরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠি। আমার বাবা একটু ঢিলেঢালা মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু আমার ফরাসী মা যেমনি অহংকারী তেমনি রাগী, আর তেমনি অসহিষ্ণু। এতোটুকু নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছাড়া আমাদের দেশের মা বাবা আমাদের জন্য কোনো প্রয়োজনে সাহায্য করতে চান না, তাতে শিশুদের শক্তপোক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে বাধা হয়। আমরা গলায় ন্যাপকিন বেঁধে, ছোট অপটু হাতে কাঁটা চামচে ধরে দেড় বছর বয়েস থেকেই একলা বসে খেয়ে খিদে নিবৃত্ত করতে অভ্যস্ত হই। আর একটু বড়ো হয়ে জামা জুতোও নিজেরা পরি। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি, নির্দিষ্ট সময়ে জেগে উঠি। নির্দিষ্ট সময়ে খেলি, নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসি। সময় আমাদের কলের নিয়মে বাঁধা। আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, হয়তো অন্য শিশুদের চেয়ে বেয়াড়া ছিলুম একটু। দুপুরে বা রাত্রে কখনোই আমার ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করতো না। জেগে থেকে মা বাবার কাছে কাছে ঘুরতে চাইতুম। কোনো অতিথি এলে তো আর কথাই নেই, হাঁ করে তাদের কথা গিলতে ইচ্ছে করতো। মার ইসারা ইঙ্গিত আদেশ সব উপেক্ষা করে ছুটোছুটি করতুম, কিছুতেই ধরা দিতুম না। কতোদিন শক্ত করে মা-র হাঁটু জড়িয়ে ধরেছি, একটু বেশী সময় তাঁর কাছে, তাঁর কোলে থাকবার জন্য বায়না ধরেছি, মা একটুও প্রশ্রয় দেননি। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জোর করে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর হাতে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। তারপর বাইরে থেকে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি লাফিয়ে উঠে এসে ঘসা কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে কেঁদেছি। আমার মাথা যতোটুকু উঁচুতে উঠতো, ঠিক সেই জায়গায় মুখটা ঠেকিয়ে থাকতুম বলে ঐ খানটায় আমার চোখের জলে দাগ ধরে যেতো। তারপর এক সময় হতাশ হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম।

তা বলে আদরের কমতি ছিলো বলে ভাববেন না। আমি একমাত্র সন্তান ছিলুম। আমার স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য, যোগ্য হয়ে উঠবার জন্য আমার মা বাবার চিন্তার অন্ত ছিলো না। কিন্তু, যত বাজে বকছি না? আমি বরং যাই।'

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, 'মাত্র সাড়ে আটটা, এক্ষুনি যাবে কি। বোসো না, কী চাও? কী পানীয় দেব বলো? গরম না ঠাণ্ডা?'

'ঠাণ্ডাও আছে?'

'তুমিই তো নিয়ে এলে।'

'সে তো আপনাদের জন্য।'

'আমরা অতো কৃপণ নই, শেয়ার করতে রাজী আছি।'

রাসেল স্মিথ হাসলো। বললো, 'সেদিন প্রোফেসর সান্যাল ওখানে কিয়ান্টিটা বেশ পছন্দ করছিলেন, তাই ভাবলাম নিয়ে যাই—'

'খুব ভালো করেছ। দিদির জন্য বেগুন আর লেবু, আর ভগ্নিপতির জন্য কিয়ান্টি।'

'দিদি যে ও রসে বঞ্চিত। শুনুন, আপনি যদি আমাকে কোনো পানীয় দিতেই চান, তাহলে আর এক কাপ কফি দিন।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি উঠে গিয়ে কফি নিয়ে এলাম। কফি খেতে খেতে বললো, 'জানেন, আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিলো আমার সাত বছর বয়সে। বাবাই আমাকে মার হাত এড়িয়ে একটু প্রশ্রয় দিতেন। বাবার জন্য আমার যে কী কষ্ট হয়েছিলো বলতে পারি না। বাবার মৃত্যুর পরে মা সেই শোক ভুলতে আমার প্রতি উগ্রভাবে আসক্ত হয়ে উঠলেন, যেন বদলে গেলেন মানুষটা। কিন্তু আমাদের মা আর ছেলের যৌথ জীবনের সুখ বেশীদিন টিকলো না। আমার এগারো বছর পুরতে চার মাস আগেই মারা গেলেন তিনি। একেবারে একা হয়ে গেলাম। একেবারে নিঃস্ব।

এদিকে ভাইবোনও কেউ ছিলো না যাদের সংগসুখে একদিনের জন্যও সুখী হতে পারি। এই নিবিড় নিঃসংগতা ভুলে থাকতে পারি। দিনগুলো ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম সবই সয়ে গেল একদিন।

কিছু সঞ্চিত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন মা বাবা, এক আত্মীয় আমাকে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি লেখাপড়া করতে ভালোবাসতুম। আমি বেঁচে গেলুম। সত্যি বলতে লেখাপড়া করা ছাড়া আর কিছুর দিকেই আমি তখন মনোযোগ দিইনি। আর কিছুর উপর তেমন মনোযোগ এখনো আমার কিছু নেই। ইস্কুলের গণ্ডি পার হতে বেগ পেতে হ'লো না। ততোদিনে আমি সাবালক হয়েছি, নিজেরটা নিজেই গুছিয়ে নিতে শিখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলুম। সেখানকার তরীও ঘাটে ভিড়লো, আর তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে বয়স যখন পঁচিশে এসে পৌছুলো, তখুনি তাকে দেখলুম। ততোদিনে আমি দু'বছর ইশকুল মাস্টারি করে পাকা হয়ে গেছি নিজের নির্জন জীবন নিয়ে বেশ তো সুখেই ছিলাম সেই সময়টায়। বই ছিলো সঙ্গী, কবিতা ছিলো আনন্দ, পড়ানোর কাজটাতেও কোন অভিযোগ ছিলো না। কখনো কখনো যে একা লাগেনি তা নয়, বন্ধু-বান্ধবীদের ডেকে সেই একাকিত্ব ঘুচিয়ে নিতুম। কিন্তু সবই ছিলো ভাসাভাসা। মনের গভীরে তারা সাড়া দিতো না, তাই শেকড়ও গাড়তে পারতো না।

সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরী ক'রে খেয়ে চলে গেছি কাজে, ফিরে এসে বেহালা বাজিয়ে, কুকুরটাকে আদর ক'রে,—যা হোক কিছু রান্না ক'রে খেয়ে কবিতা লিখে আর কবিতা পড়েই সময়কে একঘেয়ে হতে দিইনি।

ঐ দেখুন আবার আমি আমার নিজের কথায় ফিরে এসেছি। জানেন, এই আমার দোষ। একবার আরম্ভ করলে আর আমি থামতে পারি না। কখন যে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

কফিটফি ফেলে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাসেল, 'চলি।'

'সে কী। এমন হঠাৎ।'

'না, হঠাৎ নয়, আমি বুঝতেই পারিনি যে এর মধ্যেই এতোগুলো সময় কেটে গেছে। আজ বিদায় দিন।'

'আবার কবে আসবে?'

'আমি আপনাকে ফোন করবো।'

চলে গেল সে। আর চলে যাবার পরে আমার মনে হ'লো, ওর ঠিকানাটা রাখা উচিত ছিলো। তারপর ভাবলাম যাক গে, ও ঠিক আবার আসবে না হ'লে ফোন করবো।

কিন্তু বেশ দিনকয়েক কেটে গেল, আর দেখা নেই। বাঙালী মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী। আমার এদিকে তারই মধ্যে একটু টান পড়ে গেছে ওর উপর। একবার 'দিদি' ডেকেই আমার মন কেড়ে নিয়েছে। এই স্বজনবিরহিত প্রবাসে সেই ডাকটুকুর মূল্য কম নয়। আমি অস্থির হ'য়ে উঠলুম।

শেষে উনি বুদ্ধি দিলেন 'মিসেস ব্রাউনকে ফোন ক'রে দেখতে পারো।' ঠিক। যেন অকূলে কূল পেলাম। দেরি না ক'রে তখুনি সেই মত কাজ করলুম। কিন্তু হতাশ হ'তে হ'লো। শুনলাম ভদ্রমহিলা তাঁর গ্রামের বাড়িতে থাকতে গেছেন কয়েকদিনের জন্য। তখন আর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইলো না। আর অপেক্ষা কর'ত করতে যখন প্রায় ভুলে এসেছি, তখুনি ফোন বেজে উঠলো তার গলা নিয়ে।

'আমি রাসেল, রাসেল স্মিথ।'

'ওমা, রাসেল স্মিথ? কী কাণ্ড! কোথায় ডুব দিয়েছিলে এতোদিন?'

'স্কুল পরীক্ষা চলছিলো, সময় করতে পারছিলাম না। ভালো আছেন?'

'তুমি ভালো আছ?'

'অনুমতি করেন তো আবার একদিন গিয়ে বিরক্ত করি।'

'শোনো তোমার জন্য আমি অস্থির হ'য়েই আছি। দয়া ক'রে এলে এই বাঙালীদিদিটি ভয়ানক সুখী হবে।'

'আপনি সেদিন রাগ করেননি তো?'

'রাগ? কেন?'

'বিরক্ত ক'রে এসেছি।'

'বিরক্ত হ'য়েছিলাম বলে মনে হয়েছিলো?'

'জানি না।'

'তা হ'লে জেনে নাও, তোমার কথা শোনার জন্য আমি অধীর হ'য়ে অপেক্ষা

করছি। আধখানা বলে আমাকে ভারি অস্বস্তিতে রেখে গেছ।'

'তবে কি আবার যাবো?'

'নিশ্চয়ই।'

'অসুবিধে হবে না তো?'

'বিদেশে একা আছি, তোমার মতো একাধারে ভাই আর বন্ধুকে কে না চায়? এসো, নিশ্চয়ই এসো।'

'কবে স্ত্রী আছেন?'

'কবে আসতে চাও?'

'সোমবার।'

'বেশ তো।'

'তা হ'লে তাই ঠিক রইলো। আমি ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশে গিয়ে পৌঁছুবো, তারপর আপনাকে আর প্রোফেসর সান্যালকে নিয়ে বাইরে খেতে যাবো।'

'বাইরে খেতে যাবে? তার দরকার কী? বরং তুমিই সেদিন আমাদের সঙ্গে খাওনা।'

'না, না, সে হয় না।'

'কেন হয় না?'

'তা হ'লে কিন্তু আমি রাগ করবো।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যা তোমার খুশি তাই কোরো।'

তাই হ'লো। সোমবার বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা পঞ্চাশেই এলো সে। আমরা ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কোনো ইতালীয় রেস্তোরায় খেতে গেলাম। খাওয়ার শেষে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উনি চাকরী করতে গেলেন, আমি রাসেলকে নিয়ে বাড়ি এলাম। বললাম, 'বসো, তোমাকে কফি করে দি।'

'না, না, আর কফি কেন, এই তো খেয়ে এলাম।'

'তাতে কী? অধিকন্তু নঃ দোষায়। আর কফি ছাড়া গল্প জমবে কেন?'

'তা ঠিক, তা ঠিক। আপনি এতো ভালো। এতো বোঝেন। জানেন, মালিকাও ঠিক এরকমই ছিলো।'

'কী রকম?'

'আপনার মতো।'

'তা হ'লে তো তোমার মল্লিকাকে বেশী প্রশংসা করতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমার মতো হওয়াটাকে আমার ভালো মনে হয় না।'

চোখ টিপলো রাসেল। 'তাই বুঝি? কিন্ত আমি তো ভালো মন্দ কিছু বলিনি।'

'কী বলেছ?'

'বলেছি আপনার মতো। তা সে মন্দও হ'তে পারে।'

'মন্দ! আমাকে তুমি মন্দ বলছো?'

আয়াস করে সিগারেট খেতে খেতে মাথা নেড়ে বাংলায় বললো, 'হ'টে পারে।'

'তার মানে মল্লিকাকেও মন্দ বলছো?'

'হটে পারে।'

'ঠিক আছে। দাঁড়াও, দেশে গিয়েই তাকে বলে দেব সব।'

চোখ জ্বলে উঠলো রাসেলের, 'ডেখা তোবে হোবে?'

'কেন হবে না!'

'টবে, টাকে বোলবেন, সে হামাকে বুঝি ভুলটে পারে হামিটো পারে না।' ছেলেমানুষের মতো সে সজল হ'য়ে উঠলো। আর আমারও কী যে কষ্ট হ'লো আপনাকে বলতে পারবো না কাকাবাবু।

'বারোটা দশ। এরপরের সময়টা ঘুমের দাবী করতে পারে।'

'ওটাকে দুটো পর্যন্ত লাইসেন্স দে'য়া যায়।

'না, না, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।

'আমি বলছি তুমি তোমার গল্পটা শেষ করো।

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'আপনাকে আমি আর রাত জাগতে দিতে পারি না।'

'জামাই থাকলে আমি সারারাত তার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাতুম। আমার এ স্বভাব কি তোমার জানা নেই?'

'তা আর নেই।'

'সেবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে মনে আছে?'

"আর কফি ছাড়া গল্প জমবে কেন?"

চুপ করলো নীলিমা। ডক্টর মৈত্রও চুপ ক'রে কী যেন ভাবতে লাগলেন। অনেক পরে বললেন, 'তারপর?' এবার ঘড়ি দেখলো নীলিমা, চোখ খাড়া ক'রে বললো, 'ক'টা বেজেছে জানেন?'

'দরকার কী জেনে?'

'রাতটা তো মানুষের জেগে থাকবার জন্য নয়?'

'ঘুমিয়ে থাকবার জন্যও নয়।'

'খুব মনে আছে।' নীলিমা হাসলো 'সত্যি, কী ক'রে অত রাত জেগে কেবল কথা বলেন বলুন তো?'

'সুতরাং এখুনি শোবার প্রস্তাব না ক'রে তোমার বিদেশী ভ্রাতাটিকে আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করো।

'কতোগুলো অচেনা মানুষের কথা শুনিয়ে রাত দুটো বাজিয়ে আমি

আপনার শরীর খারাপ করতে পারবো না।'

'অচেনা কে বললো তোমাকে?'

'রাসেলকে আপনি চেনেন?'

'বলা কি যায়?'

'মল্লিকাকেও চেনেন বোধহয়।' খুবে হাসলো নীলিমা। ডাক্তার মৈত্রের মুখেও হাসি ফুটলো। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'খুবে অসম্ভব মনে হচ্ছে নাকি?'

'না, অসম্ভব কী। জগৎ সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তা হ'লে রাত বাড়িয়ো না।'

'আমি জানি, আজ আপনি ক্লান্ত।'

'তুমি বড্ড ঘুম কাতুরে।'

'মোটেও না।'

'ঐ জন্যই তো প্রোফেসর সাহেব না থাকলে আমার জমে না।'

'সেটা আপনার পক্ষপাতিত্ব।'

'সে আমাকে কক্ষনো বারোটা বাজতেই শুয়ে পড়তে বলতো না।'

'তা কী ক'রে বলবে, প্যাঁচা যে। রাত জাগাতেই তো তার ফূর্তি।'

'সব ভদ্রলোকেরাই তা হ'লে প্যাঁচা।'

'লোকেদের প্রেমের গল্প শোনায় এত আগ্রহ কেন?' না, এসব ভালো না।'

'দ্যাখো, নীলা, আমি হলাম ডাক্তার। পরোপকার করাই আমার ধর্ম। তার উপরে এ দেশ থেকে তুমি আরো এক বছর বাদে ফিরছো, আমি ফিরছি কাল-পর্শু, প্রয়োজনে লেগে যেতে পারি। আমি হয়তো খুঁজে-পেতে মল্লিকাকে বার ক'রে তোমার স্মিথ সাহেবের 'অধীর অদর্শন তৃষা' মিটিয়ে দিতে পারি। তারপর কী হ'লো বলো।

'ঠিক আছে, আমার কী। কিন্তু যতো রাতই হোক, গল্প শেষ পর্যন্ত না শুনিয়ে ছাড়বো না। এই কণ্ডিশন।'

'না শুনিয়ে যে ছাড়বে না, তা আমি জানি গো, জানি। কেবল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা বলে একটু দেখে নিচ্ছ আমি সত্যি মন দিয়ে শুনছি কি না। নাও, বলো। আর তার আগে একটা কাজ করো—'

'বলুন।'

'ঘরের হীটটা একটু কমিয়ে দাও দেখি বড্ড গরম লাগছে।'

হীট কমিয়ে, ফিরে এসে গুছিয়ে বসলো নীলিমা। ডাক্তার মৈত্র তাকে খেই ধরিয়ে দিলেন, 'রাসেল বাংলায় বললো, 'আমি তাকে ভুলতে পারিনি। তারপর?'

'তারপর আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলাম। এক সময়ে রাসেল নিজেই বলতে আরম্ভ করলো। বললো, 'জানেন সেই যে মেয়েটি আমাকে তার নিজের একটা স্বাভাবিক সেবার দায়িত্বে আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই নামিয়ে নিল, যত্ন ক'রে লবিতে এনে বসিয়ে পিঠের তলায় কুশান গুঁজে দিল তখুনি আমার কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল সব। সে বললো, 'আমাদের এ্যাপার্টমেন্ট চারতলাতে, আমি এক্ষুনি আমার ডাক্তারমামাকে ডেকে নিয়ে আসছি।' এই বলে প্রায় ছুটে গিয়ে সে লিফটে উঠলো। আর আমি আমার ব্যথাবেদনা সব ভুলে অদ্ভুত এক বিমূঢ় অবস্থায় সামনের দিকে দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ।

আসলে সেদিন আমার মাথায়ই যদিও বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিলো, কিন্তু মাথার চেয়ে জখম হয়েছিলো বেশী হাতটা। হাতটা ভেঙেই গিয়েছিলো। বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছের হাড়টা সরে গিয়েছিলো। কেটেও গিয়েছিলো অনেকটা। মেয়েটির ডাক্তারমামা তখুনি নেমে এলেন। ছোটখাট শক্তপোক্ত মধ্যবয়স্ক এক সুশ্রী ভদ্রলোক। চমৎকার ব্যবহার, অত্যন্ত সহৃদয়, তার চেয়ে বেশী স্নেহশীল। দেখে আর উনি দেরি করলেন না। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ডাকিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমার এতো যন্ত্রণা হচ্ছিলো যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। ভালোও লাগছিলো সেই মনোযোগটুকু।

কেউ আমার জন্য কিছু করুক এ আর কে না চায় বলুন? তা ব্যতীত আমি বোধহয় একটু স্নেহ-কাঙ্গালও আছি। মা বাবার কাছে ঠিক পুরোপুরি পাওনাটা আদায় হয়নি আমার। অনেক-অনেক বাকী ছিলো, অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। নিঃসঙ্গ এক স্নেহপিপাসিত হৃদয় নিয়েই একা একা বড়ো হ'য়েছি। আমার শারীরিক কষ্ট ছাপিয়ে সেই পাবার সুখটুকু যেন উপচে পড়ছিলো।

(ক্রমশ)
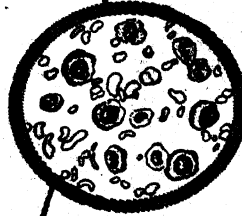
নেফার মানুষ-টাঙ্‌সা

নলিনীকুমার ভদ্র

আজ থেকে কয়েক শো বছর আগেকার কথা। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের পাতকোই পর্বতের আরণ্য অঞ্চল থেকে একদল বুভুক্ষু যাযাবর মানুষ বেরিয়ে পড়ল বাস এবং চাষ করবার উপযোগী উর্বরা ভূমির সন্ধানে। দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছল তারা লোহিত নদীর দক্ষিণে তিরাপ এবং নামচিক নদীবারি-বিধৌত রমণীয় পার্বত্য-ভূমিতে। ধীরে ধীরে এই নদী দুটির দুই তীরে গড়ে উঠল টাঙ্‌সাদের উপনিবেশ। দূর অতীতে বহিরাগত এই টাঙ্‌সাদের বাসভূমি আজ নেফার অন্যতম অঙ্গ এবং তিরাপ নামে পরিচিত।

বিচিত্র দেশ এই তিরাপ। তীব্র গতিশীলা কলনাদিনী অগণিত পার্বত্য স্রোতস্বিনী এই দেশকে করে রেখেছে সুজলা, সুফলা এবং শস্য-শ্যামলা। বনানী-মণ্ডিত গিরিগাত্রের উপর দিয়ে প্রবহমান এই সকল নদীর জলধারা ঋজু কুটিল নানা পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এসে গা ঢেলে দিয়েছে আসামের লোহিত নদীর প্রসারিত বক্ষে। নদীর স্বচ্ছ জলে স্বাচ্ছন্দ্য সন্তরণশীল মৎস্যকুলের পাখনা পর্যন্ত দেখা যায়।

এখানকার বনভূমিতে বিচরণ কালে গাছ-পালার প্রাচুর্য দেখে মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেন সবুজের বান ডেকেছে। অরণ্যের শ্যাম শোভার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে কাকু, জাতি প্রভৃতি হরেক রকমের বাঁশগাছ। গোটা দেশটা জুড়েই এই বাঁশ গাছের অজস্রতা। তিরাপের বনভূমি শুধু ঘুঘু, সবুজ পায়রা, টিয়া, কাঠঠোকরা, কোকিল ইত্যাদি পাখীর কাকলিতেই মুখরিত নয়—বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি বন্যজন্তুর গর্জনেও প্রকম্পিত এবং বুনো হাতীর বপ্রক্রীড়ায় বিধ্বস্ত।

নেফার অন্তর্ভুক্ত এই ভীষণ-রমণীয় তিরাপ ভূমিতে লুঙ্গি-পরা যে সকল মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করে মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে গেছে, তাদের কথা কিছুই আমরা জানি না। অথচ [illegible]

চমৎকার কথা বলতে পারে, অনেক অসমীয়া শব্দ পুষ্ট করেছে এদের শব্দকোষকে। যেমন ঃ সুদূর অতীতে বর্মায় ছেড়ে-আসা গ্রামের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের এরা বলে 'অজান্তি', অর্থাৎ অজানা দেশের মানুষ।

একই দেশের অধিবাসী হলেও আদিবাসী টাঙ্‌সারাও আমাদের কাছে 'অজান্তি'। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে কোনো বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন-এর নির্দেশে, তিরাপ সীমান্ত বিভাগের এ্যাসিস্টান্ট রিসার্চ অফিসার পারুল দত্ত 'দি টাঙ্‌সাস্' নামক একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তিরাপের টাঙ্‌সাদের সম্বন্ধে এখানিই একমাত্র আকর-গ্রন্থ।

টাঙ্‌সা কথাটার মানে হচ্ছে পাহাড়ী মানুষ। লোহিত বিভাগের ঠিক দক্ষিণে এদের অধ্যুষিত তিরাপ বিভাগ। তিরাপের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে আসামের লক্ষীমপুর ও জোড়হাট জেলা। আসামের তৈল-সমৃদ্ধ অঞ্চল মার্গারিটা, ডিগবয় তিরাপের পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। খেলা হচ্ছে তিরাপের হেড কোয়ার্টার।

আক্রমণকারী চীনারা অবশ্য এবার টাঙ্‌সাদের দেশ তিরাপে অনুপ্রবেশ করেনি, লোহিত বিভাগের কিবোতুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে খেলাতে খেল শুরু করেও দেয়নি। তাই বলে একথা

টাঙ্‌সা [illegible]

মনে করলে ভুল হবে যে, চীনা সৈন্যরা টাঙ্সাদের অচেনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মা থেকে পাতকোই পর্বতমালা পার হয়ে বহু চীনা সৈন্য তিরাপের গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে অস্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছিল। বিভিন্ন গ্রামের টাঙ্সারা তখন চীনাদের সংস্পর্শে আসে। চীনাদের অনুকরণে তখন এদের মধ্যে হাতে উল্কি পরার রেওয়াজ হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। উল্কি-পরা টাঙ্সারা চীনা ভেল্কি এবং ভাঁওতায় ভুলবার পাত্র নয়। পাতকোই পর্বতের ওপারের জাত-ভাইদের সঙ্গে সামাজিক লেন-দেনের সম্পর্ক এদের ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ তা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। পক্ষান্তরে ভারতের সন্নিহিত এবং দূরবর্তী অঞ্চলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এদের একাত্মতাবোধ ক্রমবর্ধমান। শুধু অসমীয়া নয়, হিন্দী ভাষাতেও তারা চমৎকার বাত-চিৎ করতে পারে। বিশেষতঃ যে-সকল মেয়ে লিডো এবং মার্গারিটার হাটে সওদা করতে আসে তাদের মুখে অসমীয়া ভাষায় যেন খৈ ফুটতে থাকে।

আজ টাঙ্সারা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী মানুষ, কিন্তু একদা এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও নাগাদের মত নরমুণ্ড-শিকারী। কোন্ গাঁয়ের ওপর চড়াও করতে হবে তা স্থিরীকৃত হত মাতব্বরদের বৈঠকে। গোটা গাঁয়ের মানুষদেরই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করতে হত, বাদ যেত কেবল মেয়েরা, শিশুরা আর বুড়ো এবং অশক্ত লোকেরা।

যুদ্ধ পরিচালনা যে করত তাকে বলা হত সেরাই! সেরাই ভোরবেলাতেই তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোনো গাঁয়ের উপর, তার পর নির্বিচারে স্ত্রী-পুরুষের মাথা কাটতে শুরু করত, রেহাই পেত কেবল শিশুরা, ফিরবার সময় তাদের তারা বন্দী করে নিয়ে যেত।

অতর্কিত আক্রমণ ছাড়া এক গ্রাম আর এক গ্রামকে সম্মুখ সমরেও আহ্বান করত। এক্ষেত্রে একটি তীরের ফলায় একটি মোরগের মাথা রেখে ছুঁড়ে ফেলা হত, অথবা কয়েকজন যুবযোদ্ধা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠত : "কালো কালো রাতি, ন্নিয়া মিবা রাতাই কালো"; অর্থাৎ আমরা আসছি তোমাদের সঙ্গে লড়বার জন্যে, গাঁয়ে যদি পুরুষ-বাচ্চা কেউ থাকো তো বেরিয়ে এস।"

এমনিভাবে কোনো গাঁয়ের উপর চড়াও হওয়ার আগে একটি শূকর মারা

মাঠের পথে টাঙ্সা বালিকা

মাছধরা জাল ঠিক করছে টাঙ্সা পুরুষ

হত, তার পর রাজসিক ভোজন এবং প্রচুর পরিমাণে ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহারের পালা। পান-ভোজনের পালা শেষ হলে সেরাই একটা মোরগ মেরে যুদ্ধের শুভাশুভ নির্ণয় করত। লড়াইয়ে জিতলে পর অনুষ্ঠিত হত 'মই' অথবা 'মাই-প্যাম-

সিপ' নামক বিজয়োৎসব। শত্রুদের কাটা মাথা এবং হাত পুঁতে ফেলা হত গ্রামের সীমানার বাইরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সন্নিকটে। সাতদিনের দিন মাটি খুঁড়ে মুণ্ড ইত্যাদি নিয়ে এসে বিতরণ করা হত গ্রামবাসীদের মধ্যে, মাথাগুলি পড়ত অবশ্য সেরাইয়ের ভাগে।

টাঙ্সাদের আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি আজ বিলুপ্তপ্রায়, এদের সমাজে নরমুণ্ড শিকারের রেওয়াজ এখন আর্দৌ নেই। আজকের দিনে সহজ সরল সদাহাস্যময় টাঙ্সাদের সংস্পর্শে এলে মুগ্ধ হতে হয় তাদের অমায়িক আচরণে। এদের রূপসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁতে-বোনা জ্যামিতিক নকশাওয়ালা কাপড়ে, মেয়েদের সীঁথিবন্ধে এবং বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি ইত্যাদিতে।

বর্মী পুরুষদের মত টাঙ্সা পুরুষ-দেরও প্রধান পরিধেয় ডোরা-কাটা লুঙ্গি—এগুলি সবুজ এবং কালো রঙের। গায়ে হাতাহীন জামা, মাথায় ছোট একটি কাপড়ের টুকরো জড়ানো। মেয়েদের পরনে কোমরে গেরো-দেওয়া হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত বস্ত্রখণ্ড (খোসা)। এই নয়নাভি-রাম খোসা টাংসা মেয়েরা নিজেরাই বোনে লাল কালো সাদা এবং নীল রঙের সুতো দিয়ে। খোসার বিচিত্র প্যাটার্নের নকশা-গুলো দেখলে তারিফ করতে হয়। দেহের উত্তরার্ধ আচ্ছাদিত করে এরা নীল সুতোর তৈরী দুটি বহির্বাস দিয়ে।

এই হ'ল টাঙ্সা মেয়েদের নিজস্ব জাতীয় পরিচ্ছদ। আধুনিক সভ্যতার আওতায় আসার দরুণ আজকাল কিন্তু এদের বেশভূষায়, কেশবিন্যাস-প্রণালী ইত্যাদির অনেক অদল-বদল হয়েছে। এদের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বয়নশিল্পকে হটিয়ে দিয়ে সস্তা দরের মিলের কাপড় ব্লাউজ ইত্যাদি ধীরে ধীরে বাজার ছেয়ে ফেলছে।

অন্যান্য পাহাড়ী মেয়েদের মতো টাঙ্সা মেয়েদেরও উদয়াস্ত খাটুনির আর অন্ত নেই। অতি প্রত্যুষে পল্লীপথে বেড়াতে বেরুলে কানে আসে ধান ভানার ছন্দোময় ধ্বনি, বুঝতে পারা যায়—শুরু হল পার্বত্য জনপদ-বধূদের কর্মব্যস্ত জীবনের প্রাত্যহিক পর্ব, ধান ভানা সারা হলে পর তারা চলে যায় ঝরণা-তলায় জল আনতে, ফিরে এসে হাঁড়ি চাপায় উনুনে। রান্না-বান্নার পরেও কি আর একটু জিরিয়ে নেবার জো আছে। তাড়াতাড়া-তাড়ি ঝুড়ি নিয়ে চলে যেতে হয় ক্ষেতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে ফিরে আসে তারা ঝুড়ি-ভরতি তরিতরকারী, ধান আর জ্বালানি কাঠ নিয়ে। এসেই শুয়োর-গুলোকে খাওয়াতে হয়, তারপর আবার রাতের রান্নার জন্যে উনুন ধরানো। খাওয়া-দাওয়ার পর তুলসীর গনগনে আগুনের কাছে বসে গল্পগুজবে কাটিয়ে দেয় তারা কয়েক ঘণ্টা, শুতে যায় রাত আন্দাজ এগারোটা নাগাদ। কুমারী তরুণীরা খেয়ে-দেয়ে গিয়ে জমায়েৎ হয় যৌথ শয়নাগারে এবং সেখানে নিশি যাপন করে বান্ধবীদের সঙ্গে।

অতীতে তরুণদের মোরাঙ্ বা যৌথ শয়নাগার টাঙ্সাদের সামাজিক জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। এই সকল সুসংগঠিত শয়না-গারকে বলা হত লুপ্পঙ্। এগুলি ছিল একাধারে গ্রামের প্রতিরক্ষা-গৃহ এবং কুমারদের প্রমোদ-নিকেতন। তখনকার দিনে বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল বলে প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশ-পথেই নির্মিত হত একটি করে লুপ্পঙ্। গাঁয়ের সকল অবিবাহিত যুবক একত্রে শয়ন করত সেই বিরাট ভবনে। সকল রকম হাতিয়ার এবং একটি প্রকাণ্ড কাঠের মাদল মজুত থাকত সেখানে। আপৎ-সূচনা দেখা দিলেই কাঠি পড়ত মাদলে আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেত সাজ-সাজ রব। সাম্প্রতিক কালে কিন্তু আর এই সকল লুপ্পঙ্-এর অস্তিত্ব নেই।

মেয়েদের যৌথ শয়নাগার (লুপ বা লিকপিয়া) কিন্তু এখনো কোনো কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে অনূঢ়া তরুণীদের প্রমোদ-নিকেতন এবং যৌথ শয়নাগার। অবিবাহিত যুবকেরা সন্ধ্যাকালটা কাটিয়ে দেয় লিকপিয়াতে মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গাছা করে।

টাঙ্সা স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয় আনুষ্ঠানিক বিবাহের মাধ্যমে। 'বন্ধন-হীন গোপন মিলন' লাভ করে না সামাজিক মর্যাদা।

ভিন্ন গোত্রে বিবাহ (exogamy) হচ্ছে এদের সাধারণ নিয়ম। আসামের মিকিরদের ন্যায় টাঙ্সাদের মধ্যেও মামাতো বোন এবং পিসতুত ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। এইটেই হচ্ছে আদর্শ বিবাহ। কোনো বিবাহেচ্ছু যুবকের যদি মামাতো বোন না থাকে অথবা কনের পিসে যদি অপুত্রক হয় তাহলেই শুধু এরা অন্য পরিবার থেকে জীবনসঙ্গী অথবা জীবনসঙ্গিনী বেছে নিতে পারে। অগ্রজের বিধবাকে বিয়ে করবার অগ্রাধিকার হচ্ছে অনুজের। ভাদ্র-বধূ কিন্তু ভাশুরের অপাংক্তেয়া বলে পরিগণিতা।

কন্যা-পণের প্রথা প্রচলিত টাঙ্সাদের সমাজে। কনের পিতা বরপক্ষের নিকট দাবি করে কন্যার 'গা-ধন' বা দেহের মূল্য। কথাটা অসমীয়া ভাষা থেকে ধার-করা। এই গা-ধন খুব বেশী হলে কন্যা-গর্বী পিতা নিজেকে অত্যন্ত গৌর-বান্বিত মনে করে। গা-ধন সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে ফয়সালা হলে পর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। তিন দিন ধরে চলে বিয়ের অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনে বর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবসহ কনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় সে একটি শুকর এবং গুটিকতক চোঙা ভর্তি লাহু বা দেশো মদ। ঐ দিনই কনেকে নিয়ে বর ফিরে আসে নিজের বাড়িতে।
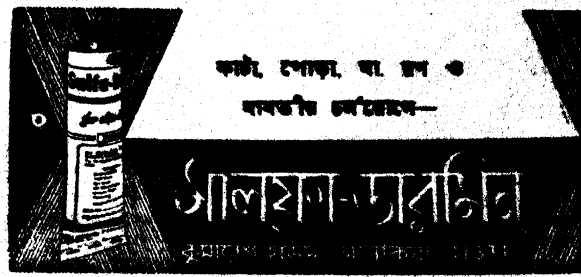
কনের সহগামিনী হয় তার পরিবারের দুটি মেয়ে। বরের বাড়িতে কনে এই দুটি মেয়ের সঙ্গে শোয় আলাদা একটা ঘরে।

দ্বিতীয় দিনে কনের পিতামাতাকে গা-ধন দিয়ে পুত্রদায় হতে মুক্ত হতে হয় বরের বাপকে।

ঐ দিন সকালবেলা কনে সহ বর-পক্ষের লোকেরা কনের বাপের বাড়িতে যায়। বরপক্ষের লোকেরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হ'লে পর নব-পরিণীত দম্পতির প্রত্যেকের বাঁ হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলসূত্র। এদের মিলন যাতে শাশ্বত হয় সেজন্যেই এই রাখিবন্ধন। অনুরূপ আরো একটি অনুষ্ঠানের পর বরপক্ষ নব-দম্পতিসহ ফিরে আসে বরের বাড়িতে।

তৃতীয় দিনে বরবধূ একসঙ্গে আসে কনের বাড়িতে। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে আবার তারা ফিরে আসে বরের বাড়িতে। কনে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসে একটি দা, একটি বর্শা, একটুকরো কাপড় এবং একটি ঝুড়ি।

অন্যান্য উপজাতির ন্যায় টাঙ্সারাও অপ-দেবতাদের অস্তিত্বে আস্থাবান।

টাঙ্সারা সাধারণত মৃতদেহকে মৃত্তিকায় সমাহিত করে। স্বাভাবিক ভাবে কারো মৃত্যু হলে পর শবদেহকে বাসগৃহের সম্মুখভাগেই মাচার নীচে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। অপমৃত্যু ইত্যাদির বেলায় কিন্তু মৃতদেহকে গ্রামের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে গোর দেওয়া হয়।

কবর খোঁড়া হলে পর সেখানে রাখা হয় কাঠের তৈরী একটি শবাধার। মৃত-ব্যক্তিকে ঐ আধারে রাখবার আগে, ঘরের ভিতরই জল দিয়ে তার মুখ, বুক এবং হাত ধুয়ে ফেলা হয়। তারপর তাকে যথাস্থানে রেখে শবাধারের উপরিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয় কতকগুলি কাঠের তক্তা দিয়ে। তারপর সেটিকে ভালো করে ঢেকে দেওয়া হয় কাটাগুল্ম, পাথর, মাটি এবং কাঠের গুঁড়ি দিয়ে।

কারো মৃত্যু হলে পর টাঙ্সারা সাধারণত তিন দিন অশৌচ (মাঙ্পিয়ের) প্রতিপালন করে। এই তিন দিন গ্রাম-বাসীদের মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া বারণ। চতুর্থ দিনে মৃতের আত্মীয়-স্বজন এক ভোজের আয়োজন করে, গ্রামবাসীরা তাতে আমন্ত্রিত হয়।

টাঙ্সাদের বিশ্বাস যে মানুষের দেহে আছে একটি অপার্থিব বস্তু—আত্মা—যার প্রসাদে সে থাকে জীবিত। এটি যখন দেহ ছেড়ে চলে যায় তখনই হয় মানুষের মৃত্যু। টাঙ্সারা মনে করে

সুতো কাটছে টাঙ্সা বালিকা

মস্তকই হচ্ছে আত্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। মুখের নির্গম পথ দিয়ে এই আত্মা দেহ ছেড়ে প্রয়াণ করে।

ব্রিটিশ আমলে যাতায়াত-ব্যবস্থার অসুবিধা ছিল এদের জাতীয় ঐক্যের প্রধান পরিপন্থী, কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের প্রশাসনের উদ্যোগে গত বার বৎসরের মধ্যে তৈরী হয়েছে বহু রাস্তাঘাট। এতে যে সুফল লাভ হয়েছে সে সম্বন্ধে পারুল দত্ত বলেছেন, "....the Tangsas are now coming out of their seclution and feeling their unity with the body of the Indian nation, অর্থাৎ টাঙ্সারা এখন বেরিয়ে আসছে তাদের নিভৃতি থেকে এবং ভারতীয় মহাজাতির সঙ্গে তাদের ঐক্য সম্বন্ধে হয়ে উঠছে সচেতন।"

রাস্তাঘাট নির্মাণ ছাড়া প্রশাসনের প্রযত্নে টাঙ্সাদের কৃষিকাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, কাজ-কারবারের সুবিধার জন্যে স্থাপিত হয়েছে অনেক-গুলি সমবায় সমিতি, চিকিৎসার জন্যে চাঙ্লাঙ-এ খোলা হয়েছে একটি হাস-পাতাল, শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতকগুলি বিদ্যালয়। সর্বতো-মুখী উন্নয়ন এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে পুর্ণোদ্যমে—কিন্তু এদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে রাখা হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি। কাজেই নিজেদের জাতীয় আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এরা প্রগতির পথে। অর্ধ শতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"........বেরুক নূতন ভারত পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে।"—স্বামীজীর সেই স্বপ্নই আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে নব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত টাঙ্সাদের মধ্যে।

।। শিশুসাহিত্য-পুরস্কার ।।

রাজা বাদশার কাল শেষ হয়েছে অনেক কাল। আমরা স্বাধীন। সে আমলে জ্ঞানীগুণীরা সভা অলংকৃত করে থাকতেন। জায়গীর জেতেন। অন্যথায় মাসোহারা পেতেন শিল্পসাধনার জন্য। সেকাল অতীত। ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র। আমরা দেশের শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতির সম্মান জানানো'র দায়িত্ব আমাদের। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের জাতীয় সরকার নানাবিধ পুরস্কার বিতরণ করে আমাদের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সত্যিকার প্রতিভা নিয়ে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের দাম আজ আর উপেক্ষিত নয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর শিশু সাহিত্যের একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মোট ঊনত্রিশখানি গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়েছে। পুরস্কার বিতরণের এই অষ্টম বর্ষ।

ঊনত্রিশটি পুরস্কারের তিনটি পুরস্কার পেয়েছে বাঙলা ভাষায় রচিত তিনখানি গ্রন্থের লেখক। অন্যান্য ভাষায় পুরস্কৃত গ্রন্থের পরিমাণ নিম্নরূপ—অসমীয়া—২, গুজরাটি—২, হিন্দী—৫, কানাড়ী—২, মালয়ালম—১, মারাঠী—৩, ওড়িয়া—২, পাঞ্জাবী—২, তামিল—২৷ তেলেগু—২, সিন্ধী—২ এবং উর্দু—২।

এই গ্রন্থগুলির লেখকেরা প্রত্যেকে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য মোট আর্থিক ১,০০০ টাকা পাবেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙলা গ্রন্থগুলির নাম :—(১) সুন্দরবন—শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র, (২) খেলাঘরের রাজ্যে—শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম ও (৩) বয়নকারের জীবন-কথা—শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'সুন্দরবন' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা অমৃতে বলা হয়েছিল—"শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র ইতিপূর্বে 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' লিখে চমক লাগিয়েছিলেন। সুন্দরবনের এক নিঃস্ব ও ক্ষীণকায় চাষী আর্জানের সাহস এবং দুর্জয় অভিযানের কাহিনীও যে কত রোমাঞ্চকর হ'তে পারে তা আমরা কখনো অনুমান করিনি। শিবশঙ্করবাবু সেদিক থেকে পথিকৃতের গৌরব দাবী করতে পারেন।

বর্তমান বইটিও সেই সুন্দরবনের পটভূমিতেই রচিত। অবশ্য এখানে আর্জানের মতো কোনো একক নায়ক নেই, ছোট ছোট কতকগুলি কাহিনী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু ভাষার উপর যে পরিমাণ সহজ কর্তৃত্বের ফলে আর্জানের জীবনকাহিনী মনোগ্রাহী হতে পেরেছিল, সেই ভাষার জোরেই বর্তমান সংকলনের গল্পগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য বইখানি পড়তে শুরু করলে ভাষার যাদু ছাড়াও আরো একটি জিনিস নজরে পড়ে। সেটা হ'ল লেখকের অভিজ্ঞতা। সুন্দরবনকে তিনি অত্যন্ত ভালো করে চেনেন, তার গাছপালা-নদী-খাল, পশু-পাখী সবই তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আর তেমনি তিনি জানেন সুন্দরবনের কাছাকাছি বাস করে যেসব মানুষ তাদেরও। এরা কেউ বা চাষী, কেউ কাঠুরে, কারো পেশা মাছ ধরা, কারো বা মধু সংগ্রহ করা। বাঘ-সাপ-কুমিরের

ইভো আন্দ্রিক

হিংস্র আক্রমণকে উপেক্ষা করে এইসব মানুষ প্রায় নিরস্ত্রভাবে জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এদের পদে পদে, তবু এরা হার মানে না। এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-সংগ্রামের রূপটিই অপার সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর কাহিনীগুলিতে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর সুন্দরবন পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ 'বনবিবি' রচনা'র কাজ শেষ করেছেন। গ্রন্থটি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

।। নিঃশব্দের প্রতিধ্বনি ।।

এ বছর সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিণী সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক। গত বছর পেয়েছিলেন যুগোশ্লাভের ৭০ বৎসর বয়স্ক কথাশিল্পী ইভো-আন্দ্রিক। আন্দ্রিক আমাদের পাঠক-সমাজে অতি অল্প কালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এর মূলে অবশ্য আন্দ্রিকের সেই বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'। কোন বিশেষ একখানি রচনার জন্য আন্দ্রিককে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে সমস্ত রচনাবলীর জন্য এই পুরস্কার লাভ করছেন। এবং সুইডিশ আকাদমি আন্দ্রিককে পুরস্কৃত করবার পক্ষে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত কালে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র উল্লেখ করেন।

সম্প্রতি আন্দ্রিকের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'ডেভিলস্ ইয়ার্ড' এবং তিনটি ছোট উপন্যাসের সংকলন 'দি ভিজিয়ার্স এলিফ্যান্ট'। এ গ্রন্থ দুটি কম মাত্রার এপিক লক্ষণাক্রান্ত হলেও পূর্ববর্তী দুটি গ্রন্থ 'বোসনিয়ান স্টোরি' এবং 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র থেকে শিল্পগুণে কোন অংশেই কম নয়। সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে আন্দ্রিকের জীবনদর্শন আরও সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ-রূপে প্রকাশিত।

আন্দ্রিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনও কোনও সময় বেদনা-হতাশার একটি প্রবল ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন সমালোচকেরা। আন্দ্রিক যে জটিল জীবন-যন্ত্রণা আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিলেন সেখানেই সুপ্ত রয়েছে চরম বেদনার জ্বালা। কিন্তু আন্দ্রিক হতাশ হননি। হতাশ হলে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় যে মানবতাবোধ যে গভীর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে—তা হয়ত পাওয়া যেত না। আন্দ্রিক ইতিহাসকে ভালবাসেন। ইতিহাসের প্রবল গতি-ধারায় যে নীরব শান্ত প্রবাহের মধ্যেও উন্মাদমতা ফুটে ওঠে আন্দ্রিক তার দর্শক। আন্দ্রিকের মনে মানুষের প্রতি যে বিশ্বাস-বোধের যে গভীর সত্যকে উপলব্ধি করা যায় সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে তা আরও সুস্পষ্ট—এবং বলিষ্ঠরূপে প্রকাশিত। যুদ্ধ ইতিহাস, সমকালীন জীবন সকল চিন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে।

আন্দ্রিক উচ্ছ্বাসপ্রবন শিল্পী নন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এক একটি রচনায়। নীরব সাধনায় কেটে গেছে জীবনের সত্তরটি বছর। শান্ত উজ্জ্বল-কান্তি, লৌহকঠিন মনোবলের অধিকারী বিশশতকের এই প্রদীপ্ত নক্ষত্র বার বার এক একটি মহৎ শিল্প অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। বহু বিতর্কের ঝড় উঠছে। কিন্তু তিনি নীরব। নিরত সাধনায়।

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস (সিন্ধী)

দীপকের শেষ চিঠি: বাবা, দোকানের সমস্ত জিনিস নিলামে উঠতে বাকি, বাজারে চারদিকে ধারদেনা করে বসে আছি। তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে পাওনাদাররা অস্থির করে তুলছে। এই অবস্থায় ব্যবসা গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

গোপালদাস বিদেশে অনেক বছর দোকান চালিয়ে ছেলের হাতে দোকানের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। দীপকের যোগ্যতার উপর তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দীপকের দোকানে বসার পাঁচ বছরের মধ্যেই গণেশ উল্টাল।

ব্যবসা গুটিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই গোপালদাসের বয়স হু-হু করে যেন বেড়ে গেল। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে পনের-কুড়ি হাজার টাকা খরচা করে বড় মেয়ে শীলবন্তীর বিয়ে দিল ঘটা করে।

গোপালদাস এখন ভাড়াটে বাড়িতেই আছে। সঙ্গে আছে বউ রুক্মিণী, মেয়ে রেখা এবং একটি নাতি। যে সব আত্মীয়-স্বজন অতীতে দিনের পর দিন এদের বাড়িতে কাটিয়ে দিতো তারা এখন আর চিনতে পারে না।

রেখাও বড় হয়েছে। আজ বাদে কাল তারও বিয়ে দেওয়া দরকার। দীপক যে কোথায় পালিয়ে গেল কোন পাত্তা নেই। এ সব বিষয়ে রেখার মা গভীরভাবে চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত।

রেখা চমৎকার বীণা বাজায়। মা-বাবা তার পাশে বসে অনেকক্ষণ ঐ বাজনা শুনত। নিজেদের মনের করুণ সুরের সঙ্গে বীণার সুরের মিল খুঁজে পেত তারা।

গোপালদাসের পারিবারিক অবস্থা যখন এই তখন শুরু হল দেশভাগের পালা। নানা রকম খবর শুনে মা-বাবা রেখার কোমল সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রুক্মিণী রেখার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছে। তার নাক, মুখ, চোখ নাকি নিখুঁত। আর এখন তো একগলা যৌবন রেখার। তার রূপলাবণ্য আরও খুলেছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই মেয়ে বড় হলে বাবা-মার দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। তার উপর দেশের এই চরম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মুহূর্তে দুর্ভাবনা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

গোপালদাসের দিদি এসে একদিন বলল, ভাই গোপাল, ব্যবসা দীপকের জন্য নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তোমার হাতে যা টাকা আছে তাতে যে কোন সময় অন্য কোথাও গিয়ে কিছু করে খেতে পারবে। আমার অবস্থা তো আর বলার মতো নয়—একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে চাইলেও তো শুধু গাড়ী ভাড়াই লেগে যাবে শ' দুয়েক টাকা।

গোপালদাস বলল, দিদি তুমি তো অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত—তোমার মেয়েগুলো সব ছোট ছোট। এদিকে আমার রেখার জন্য তো ওর মায়ের চোখে ঘুম নেই। তুমি যা ভাবছ অত টাকা আমার কাছে নেই; তবে হ্যাঁ, রেখার বিয়ের জন্য হাজার কয়েক টাকা তুলে রেখেছি। সে—যাই হোক, দরকার হলে শ' দুয়েক টাকা তোমায় দেবো।

—বাঁচালে, কি দুশ্চিন্তাতেই না ছিলাম।......ও ভাল কথা, যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলি তোমায়।

—অত সঙ্কোচের কি আছে দিদি! আমার মেয়ের চেয়েও তোমাকে বেশি আপন মনে করি। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো।

—এক কাজ কর না, আমার দেবরাণীর ভাইপোর সঙ্গে রেখার বিয়ে দাও। ছেলেটা দেখতে-শুনতে ভাল, নম্র ব্যবহার, কলেজে তিন-তিনটে পাশ করেছে—রোজগারও ভাল করে। পণ-টনের কোন ঝামেলা নেই। ওদের বাড়ি থেকে এখন আদা-জল খেয়ে লেগেছে ভাল মেয়ের খোঁজে। ও বাড়ির বড় বউ নাকি অনেকদিন ধরে বাপের বাড়িতে রয়েছে। তাই সংসারের কাজ-কর্মের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।

এতক্ষণ দরজার আড়ালে রুক্মিণী দাঁড়িয়েছিল। ওর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, অমন কাঙালদের বাড়িতে রেখার বিয়ে দিতে দেবো না।

একদিন পাশের বাড়িতে অনেকক্ষণ [illegible] বলে ফিরে এসে রুক্মিণী

স্বামীকে বলল, যাই বলো আর কিন্তু এখানে আমার আর মন টিকছে না— সবাই জমি জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে কি করে থাকব ভেবে পাচ্ছি না। অথচ এখন এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।......পাত্রের খোঁজ করেছো? শুনলাম শীতলদাসের বাড়িতে একটি সুপাত্র আছে।

—গোপালদাস বলল, তাতো আছে। কিন্তু ও যে দাবি করছে কুড়ি হাজার টাকা। তাঁকে তো আমার কুড়িশো টাকাও নেই।

—টাকা যখন ছিল তখন তো আর তোয়াক্কা করলে না। এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝছ।

রুক্মিণীর সর্বক্ষণ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা। ঘরের এক কোণে বসে প্রায়ই তারা চোখের জল ফেলে। সেদিন রাত্রে স্বামীকে বলল, আচ্ছা, তোমার দিদি যার কথা বলেছে তার সঙ্গেই যদি বিয়ে ঠিক হয়। রেখা গররাজি হবে না তো?

—সে কথা নিজেই রেখাকে জিজ্ঞেস করলে পার। গোপালদাসের হাতে রুক্মিণীর চোখের জল পড়ল। চমকে উঠে সে বলল, আরে, একি মাথা খারাপ হল নাকি। কাঁদছ কেন। দেখ, এ সব ব্যাপারে যার যা ভাগ্য। রেখার ভাগ্য যদি ভাল থাকে—

—ওকে আর কি জিজ্ঞেস করবো। ফুলের মত যত্নে এত বড় করে শেষে আজ ওকে কাঁটার বনে ছুঁড়ে ফেলবো।

—মা, আমি গররাজি হব না।

বাবা-মা বিস্মিত হল। এ যে রেখার কণ্ঠস্বর। গোপালদাস বলল, কে মা রেখা? আয় ভেতরে আয়।

কথা একটা ছুঁড়ে দিলেও এখন কিন্তু রেখা দরজায় হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। বিয়ের সব ব্যবস্থা সমাপ্ত। সেদিন বিয়ের দিন। সকালে ঘুম ভাঙতেই রেখার মনে হল সারা পূর্বাকাশ যেন আগুনের মত জ্বলছে। রাত্রে যে অনেক কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। কি যে চিন্তা করেছে তাও মনে পড়ছে না।

সকাল হতে না হতেই ইন্দিরা, শীলা, গোপী রেখার তিন মাসতুতো বোন পৌঁছে গেল। বিয়ের দিনে রেখার সঙ্গে ওরা ঠাট্টা-তামাসা করতে এসেছে। কয়েক ঘণ্টা পরে রেখা লক্ষ্য করে বাড়ির সকলের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। রেখা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, তোমরা সব এত চুপচাপ কেন বল তো? কি হয়েছে মা?

রুক্মিণী মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কেমন কিছু হয়নি মা, এমনি।

—আমায় দিদি, বল—কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

—কাল রাত্রে একটা খারাপ খবর পেলাম। তাই নিয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে রেখা জিজ্ঞেস করল, কি খারাপ খবর মা—বলনা।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রুক্মিণী বলল, রাত্রে তোর বাবার কাছে হরিরাম এসেছিল লক্ষ্য করেছিলি? ভদ্রলোক তোর জেঠাইমার আত্মীয়। সেই বলল, চন্দন নাকি মাসে খুব জোর আশি টাকা রোজগার করে। বাড়ির অবস্থা এত খারাপ যে মাঝে মাঝে বড় বউ দুবেলা ঠিক মত খেতে পায় না বলে বাপের বাড়ি চলে যায়।

রেখা কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ চঞ্চল বালিকার মত বলে উঠল, এটা এমন কি খবর যে বাড়ির সবাই মুখ ভার করে বসে রয়েছো!

মেয়ের সহজ সরল কথা শুনে রুক্মিণী বলল, আমি যে তোকে ফুলের মত যত্ন করে এতবড় করেছি—এসব জেনে-শুনে কি করে আমি তোকে ওদের হাতে তুলে দেবো? এ বিয়েতে আমি যে গোড়াতেই গররাজি হয়েছিলাম।

রেখা চমকে উঠল। বাবা তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোপালদাসের ঘরে ঢোকার সময়েই কানে গেল বউয়ের শেষ কথা। বউকে বলল, হ্যাঁরে পাগলি, ও-খবর পেয়েছি বলে কি আজ বিয়ের দিনে সব ভণ্ডুল করব। পাকা কথা যেদিন দিয়েছি ধরে নিতে হবে সেইদিনই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাগ্যে যা আছে হবেই। তোমার বোঝা উচিত যে আমাদেরও বর্তমান অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। আর তাছাড়া বিনাপণে ওর চেয়েও ভাল পরিবারের পাত্র পাবে কোথায়?

রুক্মিণী কোন কথা বলেনি। মাথা হেঁট করে বসে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটছিল।

॥ দুই ॥

ফুলশয্যার রাত্রি। দু-চার কথা পরেই চন্দন বলল, চল।

—না, আমি অন্য বিছানায় শোব। হাত ছাড়িয়ে নিল রেখা। চন্দন হেসে উঠে বলল, তুমি যে কত বড় অভাগিনী তাতো আর তুমি জান না। এ ঘরে অন্য বিছানা করার জায়গা কোথায়।

রেখা স্বামীর এই সহজ-সরল অথচ বাস্তব কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হল। শুধু কি তাই বান্ধবীদের কাছে ফুলশয্যার রাত্রি সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে, তাই সে ভেবেছিল, স্বামী নিজেই তার হাত ধরে বিছানায় শোয়াবে। চুমোয়-চুমোয় তার গাল ভরে দেবে।

কিন্তু রেখার সে কল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল। ওদের মধ্যে কত কথাই হল সেই রাত্রে। কথায় কথায় রেখা বলল, আমার মতে দাম্পত্য জীবনে গভীর প্রেম গড়ে তোলাই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

—আমার মতে কিন্তু দেশবাসীর সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনেক রাত পর্যন্ত কথা—আলিঙ্গন ইত্যাদির পর কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়ল টের পায়নি।

সকালে ঘুম ভাঙতে রেখার মনে হল সে যেন সারা রাত দুঃস্বপ্ন দেখছিল। গোটা শরীরে কেমন যেন একটা ব্যথা। জানলা খুলতেই সূর্যরশ্মি এসে পড়ল তাদের বিছানায়। ফুলশয্যায় তত ফুল নেই। রেখার চোখ পড়ল নোনাধরা দেয়ালের উপর। দরজা খুলতেই নজরে পড়ল কুড়ি বছরের একটি যুবতী ঝাঁট দিচ্ছে। ঘর থেকে রেখাকে বেরোতে দেখে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দোতলায় বসল। দুজনের হাসিতেই যেন দুষ্টুমির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কমলা ভাবছে, আমার জীবনে কি এদিন আসবে না? আর রেখা ভাবছে, জগতের লোক গতরাত্রিকে একবারে ভুলে যাক। আমি যে বিবাহিত সেই স্মৃতি সকলের মন থেকে মুছে যাক। আমি ফিরে যাই আমার বাপের বাড়িতে। কিন্তু দুজনেই অসমর্থ। কমলার বাবা গরীব, আর রেখার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

দিন তিনেকের মধ্যেই রেখা এবং কমলার মধ্যে ভালবাসা গভীরতর হল। উভয়েই অসহায় ভাবকে ভুলে থাকার যেন এ-একটি মাধ্যম, চতুর্থ দিন কমলা রেখার কাছে এসে বলল, পিসি, আজ হয়ত আমাকে দাদা নিয়ে যেতে আসবে। সত্যি সত্যি সেদিন কমলা চলে গেল। ও-বাড়ির বড় বউ দুপুরে কান্নাকাটি করে বাপের বাড়ি চলে গেল। ঘটনা তেমন কিছু নয় তবু একটি অজুহাতে ঝগড়া বেধে গেল। রেখার শাশুড়ী গাম রোদে দিয়ে নিজে রোদে বসেছিল, বুড়ী রোদ পোহাচ্ছিল।

সর্দি হয়নি অথচ গোলাপের বউ ছেলেকে গরম জলে স্নান করাচ্ছিল। হঠাৎ কিছু জল ছিটকে পড়ল ঐ গামের উপর। গোলাপের মা বলল, দেবী, একটু সরে গিয়ে বাচ্চাকে স্নান করাও। বাচ্চার তো আর সর্দি-কাশি হয়নি যে গরম জলে স্নান করাতে হবে।

—তাতো বুঝি মা। সর্দি তো আপনারও হয়নি, তবু তো রোদে বসে আছেন দেখছি। বাচ্চাদের তো একটু সর্দি তাব থাকেই।

ঠিক সেই সময় রেখা ঝকঝকে নতুন শাড়ি পরে সেজেগুজে আঙিনায় এসে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াল। দেবী এমনিতেই তেলে-বেগুনে চটে গেছে। রেখা যে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তা সে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ সব জল একরকম ছুঁড়ে ফেলার মত বাচ্চার গায়ে ঢেলে দিল। বেশ কিছু জলের ছিটা রেখার শাড়ীর উপর পড়ল। যে বাড়িতে মাত্র তিন দিন হল সে এসেছে সেখানকার আর কিইবা বলবে! তবে মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। বড় বউয়ের কাণ্ড দেখে শাশুড়ী চটে গেলেও রাগ প্রকাশ করল না। রেখার প্রণাম করার পর বলল, এসো মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ওখানে কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না— বাবে আর আসবে কিন্তু।

রেখা মাথা নেড়ে চলে গেল। বুড়ী তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বলল, বেচারি কত বিনয়ী, অমন ঝকঝকে নতুন শাড়িতে জল পড়ে একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তবু বেচারী মুখ ফুটে একটু কথা বলল না।

বড় বউয়ের রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। গত তিন-চারদিন ধরে সমানে শাশুড়ীর মুখে ছোট বউয়ের রূপের প্রশংসা শুনে আসছে। কথায় কথায় তার সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্যের তুলনা করছে। আর থাকতে না পেরে বলল, অত যে বলছ মা, ও সব ছোটখাটো ব্যাপারে কি আর কেউ ঝগড়া করে!

বুড়ী ওর মনোভাব বুঝে বলল, আমি তো তোমাকে বলিনি বউমা—আর যদি বলেই থাকি তাহলে দোষ কিসের! বেচারীর বেয়োনোর মুখে শাড়ি খারাপ হয়ে গেল আর কিছু বলবে না! দুঃখ তো তার হবেই।

দেবী প্রত্যেকটি শব্দে জোর দিয়ে দিয়ে বলল, তাতো বটেই মা। তবে আমার কথা হোল, যে বউ বাপের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে আসে তারই দুঃখ করা সাজে, যে কিছুই আনে না, সে আবার কি নিয়ে দুঃখ করবে!

—লেনদেনের ব্যাপারে তোমার অত মাথা ঘামানোর কি দরকার! ভগবান আমার চন্দনের ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছে তাই হবে।

দেবী ঈর্ষায় যেন জ্বলে উঠে বলল, তাতো বটেই। আমার মুখ দেখার সঙ্গে

"দেশবাসীর সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত"

নতুন নির্মল হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড়
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

নির্মল
Nirmal
BAR
SOAP
১/২
বার

সংসারে তো অনেকেরই ভাগ্য বিগড়ে যায়। আমি তো এমনিতেই বাপের বাড়ি থেকে আসতে চাইছিলাম না। আমি তো আপনাকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছি। তবু তো আমার বাপের বাড়ি গিয়ে খোসামোদ করেছেন অন্ততঃ এই বিয়েতে খাটা-খাটনির জন্য যাতে আসি। এখন যখন বিয়ে হয়েই গেছে তখন কি আমাকে এ-বাড়িতে থাকতে দেবেন! মা আমাকে ঠিকই বলেছিল।......চল সুন্দর, জামা-কাপড় পরে নে—তোর দিদিমার বাড়িতে যাব।

সন্ধ্যার সময় রেখা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে দেবী নেই। চলে গেছে বাপের বাড়ি। চন্দন উনুনে হাত গরম করতে করতে বলল, মা বৌদি এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন?

মা সব ঘটনা জানাল। শেষে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, না জানি কোত্থেকে এই রাক্ষুসী গোলাপের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে।

—দাদার তো এই বউদির প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল পাঁচ হাজার টাকার।

—দেখ খোকা, ওভাবে টাকা জোগাড় না করলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে পারত না। আর তা না করলে আজকে যত টাকা সে রোজগার করছে তা আর হয়ে উঠত না। অনেক ভেবে-চিন্তেই এই পোড়াকাটকে বিয়ে করেছে। যতই হোক আজও তো তোর বউদির বাপের বাড়ি থেকে কিছু না কিছু জিনিস আসে।

রেখা ওদের পরিবেশন করতে করতে এই সব কথা শুনে মনে মনে ভাবল গোলাপ অর্থাৎ তার ভাসুর নিশ্চয়ই খুব একটা ভালমানুষ নয়। যে টাকার জন্যই বিয়ে করে সে আর যাই হোক ভাল লোক নয়। কিন্তু তার ছবির দিকে তাকালে তো মনে হয় না যে লোকটা খারাপ। সুন্দর হাসিভরা মুখ। রেখার কাছে গোলাপের ছবি ভালই লাগল।

চন্দন বলে উঠল, মা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখছি তুমি ঘরের সব কথা বলে দিলে—এ সব শুনে কি হবে আমার!

—সাংসারিক ব্যাপারে এখনো যদি মন না দিস চলবে কি করে! যাতে সংসারী হোস বাড়িতে যাতে তোর মন বসে সেই জন্যেই তো বিয়ে দিয়েছি।

চন্দন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাতো আমি জানতাম না মা, আমার জীবনধারা বদলানোর জন্যে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছো জানতে পারলে আমি বিয়েই করতাম না। যাক তবু বলছি, সংসারের কাজে আমাকে জড়াতে পারবে না। অবশ্য আগন্তুককে জড়াতে পার।

রেখা তার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে এগোচ্ছে। তার ছায়া তার সামনে থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

খেতে বসে রেখা ভাবছে, মাত্র এই তিনদিনে তার জীবনে কত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে—এ-বাড়ি আর ও-বাড়ির মধ্যে কতবড় একটা পার্থক্য। ও-বাড়ির উচ্চ শিখর থেকে নীচে দ্রুত-গতিতে পড়ে যাচ্ছে, আর এ-বাড়ির লোক স্বপ্ন দেখছে উপরে ওঠার। স্বপ্ন তো আমার বাড়ির লোকও দেখেছে। কিন্তু এদের আর ওদের স্বপ্ন দেখার মধ্যেই যেন বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। শাশুড়ী ভাবছে, তার প্রত্যেকটি ছেলে বড় বড় চাকরি করবে, মোটা মাইনে আনবে, বাড়িতে চাকর-চাকরাণী থাকবে। থালা-বাসন হবে রুপোর। সুন্দর কাজ-করা চীনামাটির পাত্র থাকবে চায়ের সেট।

—চন্দন, আর আমাদের বাবা এখানে থাকা চলবে না—চারদিকের যা অবস্থা দেখছি তাতে প্রতি মুহূর্তে ভয় করছে আমার।

চন্দনকে অন্যমনস্ক দেখে মা আবার বলল, তোর জন্য এমন ফুলের মত সুন্দর বউ এনেছি, তবু তোর মন কোথায় যে পড়ে থাকে, কি যে ভাবিস, বুঝি না বাবা।

চন্দন রেখার মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই রেখা কেমন যেন লজ্জিত হয়ে উঠল। চন্দন বলল, মা সুগন্ধহীন সুন্দর ফুল পেয়ে কি লাভ! কতটুকু আনন্দ পাব সে ফুল পেয়ে!...... যাক সে কথা। শোন মা, এদেশ ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। এখানে আর যাই হোক আশি টাকা মাইনের একটি চাকরি রয়েছে, আর আমাদের নিজস্ব একটি বাড়ি রয়েছে। এসব ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেলে আর পাব কোথায়।

মা কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কথা মনে পড়তেই থেমে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে যে যার ঘরে চলে গেল। রেখা শাশুড়ীর পা টিপতে বসল। ঘুম পেলে উঠে গেল। সকালে চন্দন চাকরিতে বেরিয়ে যায়। সারাদিন ঘরে থাকে রেখা, তার শাশুড়ী এবং দুই ছোট দেবরের সঙ্গে। ওদের নাম গোপ এবং শ্যাম। সারাদিন ওরা বউদির সঙ্গে খেলাধূলো করতে ভালবাসে। আর রেখাও তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

আজকাল বাড়ির সব কাজ রেখা নিজেই করে। গোড়ার দিকে তার রূপ-লাবণ্যের যে প্রশংসা হত, কদিন যেতে না যেতেই কমে গেল। সে আদরও নেই আর। ঘরের কোথায় কি আছে সমস্ত তার নখ-দর্পণে। প্রায় সারাদিন কাজ-কর্মের মধ্যেই তাকে লিপ্ত থাকতে হয়।

একদিন রাত্রে পা টেপাতে-টেপাতে শাশুড়ী বলল, বুঝলে ছোট বউ, ঐ গান্ধুদের বাড়িতে থালা-বাসনও ছিল না, কিন্তু ও-বাড়ির বউগুলো বাপের বাড়ি থেকে থালা-বাসন থেকে শুরু করে বাক্স-প্যাটরা আর খাট-পালঙ এত এনেছে যে ঘর ভরে গেছে।

রেখা পা টিপতে টিপতে ও সব কথা শোনে আর হাসে। ইচ্ছে জাগে শাশুড়ীকে বলার, গান্ধুরা তো আর আমার মত সুন্দরী বউ পায়নি। পরক্ষণে ভাবে এ'র কাছে' ও সব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রেখা মাথা নীচু করে কোন কথা না বলে পা টিপছে।

—বউমা, হঠাৎ তুমি মুখ ভার করে বসে আছ কেন, আমি তো তোমাকে কটাক্ষ করে বলিনি। রেখা বাইরে একটু হাসল, কিন্তু ভেতরটা তার কেঁদে উঠছে।

—তাহলে আর একথা পাড়লেন কেন মা! মোক্ষম একটা জবাব দিতে পেরে রেখা মনে মনে হাসল।

—তুমি দেখছি বেশ সেয়ানা মেয়ে! বেশ তো তাই যদি বলে থাকি, তাহলে কি ভুল বলেছি। ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে এত বড় যে'করলাম তা তো আর ওমনি-ওমনি নয়! ছেলে তো আর আমার পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া নয়।

শাশুড়ীর ব্যঙ্গাত্মক কথা শুনে রেখা থ' বনে গেল।

পরের দিন রেখার বাপের বাড়ি থেকে অনেক খাওয়ার জিনিস এল। রেখার শাশুড়ী যা যার পছন্দে তাই

নিয়ে গজর-গজর করল। কিন্তু চন্দন ও সব সম্পর্কে মন্তব্য করা অশালীন মনে করল।

।। তিন ।।

গোধূলি বেলা। আবির ছড়ানো। মাণ্গুরমান্টগা বস্তির অদূরে সারি সারি নারকেল গাছ। তার গা ঘেঁষে বড় রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রতীরে এক বড় পাথরের উপর বসে রেখা ভাবছে, কতদিন পরে এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসার অবকাশ পেয়েছে। আজ তার খুব ইচ্ছে করছে অস্তমান সূর্যের লীলাখেলা দেখার।

দেশ ছেড়ে আসার পর থেকে সে এতখানি সুযোগ পায়নি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর মাণ্টুগাতে যে ছোট্ট ছোট্ট ঘরদুটি পাওয়া গেল তার নেই কোন রান্নাঘর, নেই বারান্দা। যে রেখা হায়দ্রাবাদের বিরাট বাড়িতে এত বড় হয়েছে সে এত ছোট ঘরের কল্পনাই করতে পারে না। অনেকক্ষণ সে পাথরের উপর বসে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। হন্তদন্ত হয়ে চন্দন এসে গেল, এ কি, তুমি শেষে এখানে এসেছো? তোমাকে বেড়াতে কেউ বারণ করেনি। কিন্তু না বলে এলে কেন? আমরা কখন থেকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।

রেখা কোন জবাব না দিয়ে নীরবে স্বামীকে অনুসরণ করল। ঘরে পা রাখতেই শাশুড়ী গর্জে উঠল, বলি ঘর কি তোমায় কামড়াচ্ছে। যত বাইরে বেরোনোর সখ হল।

আঁচল ঠিক করে নিয়ে রেখা বলল, মা আজ মন বসছিল না ঘরে, তাই একটু বেরিয়েছিলাম।

—মেয়ের কথা শোন। ঘরে নাকি মন বসে না। মন কি তাহলে পাথরের উপর বসে বৌমা! আমরা এখানে সেই কখন থেকে গরু-খোঁজা খুঁজছি। শেষে শ্যাম আর গোপু বলল, ওদের ঘুড়ি উড়াতে বলে তুমি নাকি পাথরের উপর বসেছিলে।

রেখা আর ওখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পারল না। বিয়ের পর নিজেকে এতখানি পরাধীন তার কোনদিন মনে হয়নি। চন্দন কোন এক বন্ধুর সঙ্গে কাজ আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল। রেখাকে ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে দেখে শাশুড়ী বলল, হায় হায়, একি! আমি এমন কি বললাম যে, অত কান্নাকাটি করছ! আজকালকার বউদের দেখছি একটা কথা বলার জো নেই।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রেখা জেগেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত তার মায়ের কথাগুলো কানে বাজছিল। আজকালকার মেয়েদের বোঝা ভার। কি একটা কথা বলেছি তাই নিয়ে একেবারে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আর স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কান্না কোথায় চলে গেল।

এব্যাপারে চন্দন যত ভাবে ততই তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। চন্দন ভাবে, আসলে বউ আমার কি চায়। বোম্বাইয়ের জীবন যে কত কঠিন তা কি সে টের পাচ্ছে না। মাথা গোঁজার জায়গা এখানে পাওয়া ভার। এই খুপরি দুটোর জন্যেই দেড় হাজার টাকা সেলামী দিতে হয়েছে। কত কাণ্ড করেও তো নসর-বাঞ্জি মিলে একটা সাধারণ কেরানীর চাকরি পেয়েছি। জীবনের এসব বাস্তব দিকগুলো কি রেখার নজরে পড়ে না।

পারিবারিক ব্যাপারে বেশিক্ষণ চিন্তা করার অবকাশ চন্দনের নেই। বোম্বাইয়ের সংঘর্ষময়জীবন এবং জীবিকার বিষয়ে তার রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক চিন্তা-ধারার আলোকে বিচার করার চেষ্টা করছে।

মাস-কয়েকের মধ্যে মিলের অনেকের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটে। অল্পদিনের মধ্যেই সে জনপ্রিয় হয় এবং কর্মচারী সমিতির সহ-সম্পাদক পদ পায়। তারই উদ্যোগে একটি পাঠচক্র গঠিত হয়েছে। ইদানীং সেখানে আলোচনা চলেছে নানা-ধরণের। সবারই খুব উৎসাহ।

গভীর রাত্রে রেখার ঘুম ভেঙে গেল। তাকে জেগে উঠতে দেখে বলল,

আমি বন্ধুর বাড়ি চলে যাওয়ার পর তুমি অত কাঁদছিলে কেন?

রেখা কোন জবাব দেয়নি।

তোমার হয়ত এখানে বিশ্রী লাগছে। বিশ্রাম পাচ্ছ না। সুন্দর সুন্দর শাড়িও তোমাকে দিতে পারছি না।

রেখা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল।

যে চন্দন স্কুল-কলেজে বিতর্কসভায় প্রথম হ'ত, যার ভাষণ হাজার মানুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল স্ত্রীর সেই চাউনি।

রেখা পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে কাঁদছে আর ভাবছে, কে চেয়েছে অত সুন্দর সুন্দর শাড়ি—আমি তো তা চাইনি। স্বামী তো সময় পায় না ঘরে বেশিক্ষণ থাকার। রাজ্যের মরাঠী এবং গুজরাতীদের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। ওদের সঙ্গেই যেন তার যত কথা। রেখার মনে পড়ল প্রতিবেশিনী রাধার কথা। সে বলেছিল, তোমার স্বামীটি কেমন যেন। প্রায়ই দেখি মরাঠীদের মত প্যান্ট জামার সঙ্গে একটা চটি জুতো পরেন, আর কাঁধে একটি ব্যাগ আর সেই ব্যাগে রাজ্যের বইপত্তর।

রেখা কোন জবাব দেয়নি। রাধা লক্ষ্য করেছে রেখার সেই উদাস বিষণ্ণ ভাব। আমার কথা কি খারাপ লাগছে ভাই? যাই বলো লোকটা কিন্তু খুব সাদা-সিদে। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক ভাল। আর যাই হোক, তোমার স্বামীর কাছ থেকে তো আর একথা শুনতে হয় না, শ্বশুরবাড়ি থেকে এটা দিল না ওটা দিল না...যাই বলো ভাই, আজকালকার নজর সব শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ওপর। ঘরে কানাকড়ি থাকুক আর না থাকুক ছেলের নাম কিন্তু হবে ধনপতি! রাধার কথায় একটু সান্ত্বনা পেয়েছিল রেখা। সমুদ্রের তীরভূমিতে বসে মাঝে মাঝে সে এই ধরণের সান্ত্বনাই পায়। রেখা ভাবে, এইভাবেই কি তাকে গোটা জীবন কাটাতে হবে? তার জীবনে কি নতুনত্বের আর কোন আভাস থাকবে না? অনেকক্ষণ ধরে তার মনের আকাশে হাজার প্রশ্নের পাখিগুলো উড়ছিল।

শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লো রেখা। সকালে ঘুম ভাঙ্গল অনেক দেরীতে। কাছের মন্দিরের ঘন্টা বাজছে...মনে পড়ে গেল বাপের বাড়ির কথা। বাড়িতে এই সময় প্রত্যেক দিন গীতাপাঠ হত। পাশের ঘরে দেখে চন্দন আর একজন যুবক খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মুখ ধুয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, নিজেকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চন্দন বলল, মা হীরের জন্যও এক কাপ চা হবে।

রেখা চা আনতে গেলে শাশুড়ী বলল, মহারাণীর এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গল। বলি চোখ খুলে একটু দেখেছ, কত বেলা হয়েছে!

রেখা সঙ্কোচে মাথা নিচু করে চায়ের কাপ তুলে চলে গেল। হীরের সামনে চায়ের কাপটা রাখার সময় তার মনে হল হীরের দুই সকৃতজ্ঞ চোখ যেন তার দিকে নিবদ্ধ। যুবকটির যাওয়ার সময় রেখা লক্ষ্য করল তার হাঁটা মন্দ দেখাচ্ছে না। কিন্তু পায়ে পুরানো চটি জুতো। রেখা মনে মনে হেসে ফেলল। যতই হোক কার বন্ধু দেখতে হবে তো।

।। চার ।।

গোলাপের মায়ের মুখ আজকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরটাও নতুন দেখাচ্ছে। ভাল ভাল খাওয়ার ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে ঘরে, রান্নার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। উপলক্ষ্য গোলাপের আগমন। রেখা ভাবছে, ভাশুরের স্বভাব কেমন হবে। তার কাছে কি ওর হাতের রান্না ভাল লাগবে। আর রান্না ভাল হলে তারিফ করবে।

তিনটে নতুন ট্রাঙ্ক, একটি রেডিও-সেট, ছ-সাতটা ছোট ছোট বাক্স ট্যাক্সি থেকে নামল। গোলাপের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। রেখা জানালা দিয়ে দেখে নিল একবার ভাশুরকে। গোলাপের দৃষ্টিও তার দিকে পড়াতে সে তাড়াতাড়ি সরে গেল সেখান থেকে। শ্যাম এবং গোপ হাততালি দিয়ে চীৎকার করে বলছে, মা, দাদা এসে গেছে দাদা এসে গেছে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের মাথায় হাত বুলোল। পরক্ষণে কাঁপা গলায় বলল, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত...রেখাকে ইসারায় কাছে ডেকে বলল, গোলাপ এই হোল আমাদের ছোট বউ।

রেখা মাথা নোয়াল।

—গোলাপ, চন্দনের ভাগ্যে সুন্দর বউ জোটেনি? গোলাপের মা এমন ভাবে বলল যেন তারই হাতে তৈরি সুন্দর পুতুল রেখা। আড়চোখে রেখা লক্ষ্য করল ভাশুর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। রেখা এখন নিঃসঙ্কোচে গোলাপের সামনে যাতায়াত করছে। গোলাপের কাপড় জামা আলনায় গুছিয়ে রাখছে, তার জুতো ব্রাশ করে দিচ্ছে, তার রুমাল কেচে দিচ্ছে। রেখা ভাবে, রুমাল কত সুগন্ধ... আমার স্বামী যদি এরকম আতর ব্যবহার করত বেশ হত...

—রেখা, এখানে কি করছ...এক কাজ কর ত, কালকের মত বেশ গরম দুটি কতগুলো বানাও তো।

গোলাপ বিলেত থেকে রেডিও এনেছে। তার আসার পর প্রত্যেকটি জানলায় রেশমি-পর্দা ঝুলানো হয়েছে।

—বুঝলি গোলাপ, রেডিও এনে খুব ভাল কাজ করেছিস...আমিও ভাবছিলাম কবে আমাদের ঘরে বসে রেডিওর গান শুনতে পাব। আমাদের ছোট বউমা তো বাথরুমে বসে খুব গান গাইত। আমিই একদিন বারণ করে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি, রেখা গান গাইতে পারে? রেখা শোন, আজ কিন্তু তোমাকে গান শোনাতেই হবে।

রেখার মন নেচে উঠল। মাথা নিচু করে ফিক্ করে হেসে ফেলল সে।

—শুধু হাসলে চলবে না, এক্ষুনি গান শোনাতে হবে।

—না বাবা, ওসব আমি পছন্দ করি না। তোমার কাকিমা আমার চেয়ে কত ছোট। তবু তার বউমারা তাকে অনেক ভয় করে চলে।

রাত্রে শ্যাম-গোপ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। রেখা শাশুড়ী এবং ভাশুরকে খেতে দিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটি ফিল্মী পত্রিকা দেখছিল।

—বুঝলে মা, যার ভাগ্যে সুন্দরী বউ জোটে সেই সত্যিকারের ভাগ্যবান।

—তোর ভাগ্যেও যে সুন্দরী বউ জুটছিল না তা তো নয়। তুই তো নিজেই কনেপক্ষের লোকদের বলেছিলি, মেয়ে যাই হোক টাকা কিন্তু বেশি চাই।

—মা। ওরকম সময় দুনৌকোয় পা রাখা কি আমার উচিত হত। বাড়ির অবস্থা তখন কি ছিল ভেবে দেখ। আর আজ কতগুণ বেশি টাকা নিয়ে এসেছি। আর একবার বিলেত ঘুরে আসতে পারলে তুমি সোনার থালায় খেতে পারবে।

রেখা ঠিক সেই সময় জলের গ্লাস রাখতে রাখতে ভাশুরের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। তার মনে হল শুধুমাত্র টাকার জন্য একজন প্রেমিক তার প্রেম বিক্রী করেছে। বেচারীর ভাগ্যে যদি একটি সুন্দরী গুণবতী বউ জুটতো, জীবনে কোন আক্ষেপ থাকত না।

পরমুহূর্তেই শাশুড়ী বউমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরগলায় বলল, তা কি করে বলো বাবা। সম্পত্তি না-আনা সুন্দরী বউকে ঘরে এনেও তো দেখছি কি সুখ পাচ্ছে। স্বামীকে তো সারাদিন খেটে মরতে হচ্ছে কারখানায়। শুধু সুন্দরী পেলেই তো আর হয় না।

শাশুড়ীর কথাগুলো রেখার মনে বিঁধছিল। কিন্তু ওদের কথায় মধ্যে নাক গলানো উচিত মনে করল না সে। আর সেখানে থাকতে না পেরে মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অথ প্যারিস-কথা

দিলীপ মালাকার
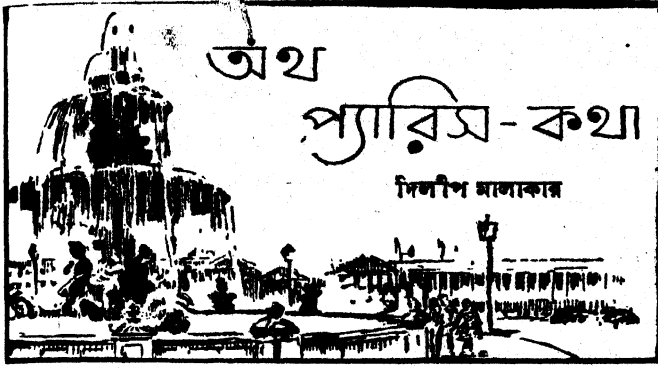
প্যারিস। প্যারিস নগরীকে কখনো কখনো সংস্কৃতির তীর্থস্থান বলে বর্ণনা করা হয়। কথাটা যে সত্য তা বোঝা যাবে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এলে। প্যারিস শুধু ফ্রান্সের রাজধানী নয়, সংস্কৃতিবান ও চিন্তাশীলদের জধানী। এর এক এক রাস্তায় এক এক রকমের বৈশিষ্ট তেমনি সাংস্কৃতিক জীবন। প্যারিসের 'রিভ্ গোশ্' বা সেইন নদীর বাম রে 'ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্তক-প্রকাশক বিক্রেতা, লেখকদের ড়াখানা, চিত্রশিল্পীদের আস্তানা সবই ই অঞ্চলে। এমনি একটি অঞ্চল জারমা দে প্রে' হল চিন্তাশীল চিত্রকরদের পাড়া। এখানকার চায়ের দোকানে বসে লেখক শিল্পীদের আড্ডা। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই লেখক বা শিল্পী নন। ছাত্র এবং অনেক গুণ-ণধরা আসে দলে দলে। এই অঞ্চলে ছেলে ও মেয়েদের পোষাক দেখবার তন। কেউ চুল ছেঁটেছে ছোট করে, কেউ রেখেছে বিরাট বাবরি চুল। মেয়েরা এখানে রংচং মাখেনা বটে তবে পোষাকে দেখা যাবে অদ্ভুত ভাব। এই রহস্যময় অঞ্চলে সুরু হয়েছে চঞ্চলতা। মাসখানেক ধরে সুরু হয়েছে সাহিত্যের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার বতরণ। কত হাজার রকমের যে রস্কার থাকতে পারে তার হিসেব খিল করতে গেলে সন্ধে হয়ে যাবে। র পুরস্কার যারা দেয় সেইসব প্রতিনের কথা না বলাই ভাল। সব তিষ্ঠান কিন্তু বিজ্ঞ মহলের নয়। 'সাঁ জারমা দে প্রে'র দুই কাফে যথাক্রমে 'কাফে দো মাগো' ও 'কাফে ফ্লোর'ও প্রতি বছরে তাদের নির্বাচিত দুই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকে দিয়ে থাকে দুই হাজার টাকার পুরস্কার। চায়ের দোকানও সাহিত্যের পুরস্কার বিতরণ যখন করে তখন ফরাসী সরকার, জেলার শাসনকর্তা, বিভিন্ন শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশকের দল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কথা হিসেবের মধ্যে না আনাই ভাল। অধিকাংশ পুরস্কারের টাকার অঙ্ক হাজার টাকা থেকে দশ-পনর হাজার টাকা পর্যন্ত। কিন্তু যেটি ফ্রান্সে সব চেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য-পুরস্কার তার টাকার অঙ্ক কিন্তু পাঁচ শ টাকার নিচে। সেই পুরস্কারের নাম হল "গঁকুর" পুরস্কার। গঁকুর পুরস্কার ফ্রান্সের পয়লা নম্বরের ঔপন্যাসিকরাই পেয়ে থাকেন।

এ বছরের 'গঁকুর' পুরস্কার এনেছে যেমন উত্তেজনা তেমনি আশ্চর্য। কারণ এ বছরের গঁকুর পুরস্কার পেয়েছেন একজন মহিলা সাহিত্যিক এবং দ্বিতীয় পুরস্কার যার নাম হল 'রনোদা', এটিও পেয়েছেন আরেকটি মহিলা। গঁকুর পুরস্কার-এর ইতিহাসে এ হল অভিনব। এর আগে অর্থাৎ গত ষাট বছরে মাত্র চারজন মহিলা সাহিত্যিক গঁকুর পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬২ সালের গঁকুর পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীমতী আন্না লাংফুস্ আর রনোদা পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী সিমন্ জাক্‌মার।

'সাঁ জারমা দে প্রে' অঞ্চলের দৃশ্য

গংকুর পুরস্কারের টাকার অংক মাত্র পাঁচশ টাকা। কিন্তু এই পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থকার তাঁর বই বিক্রি বাবদ রোজগার করবেন এক থেকে দেড় লাখ টাকা। গংকুর পুরস্কার প্রাপ্ত বই কম করে বিক্রি হবে কয়েক মাসের মধ্যে লাখ পাঁচেক। তারপর সেই বই হবে সিনেমায় রূপান্তরিত, হবে অনুদিত বিভিন্ন ভাষায়। এই সব থেকে লেখকের আয় বাড়তেই থাকবে।

গংকুর পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখিকা শ্রীমতী আন্না লাংফুস্ হলেন জাতে পোলিশ। জন্ম হয় পোল্যাণ্ডে ১৯২০ সালে। যুদ্ধের পরেই তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন উদ্বাস্তু হয়ে। যখন তিনি প্যারিসে এলেন তখন তিনি ভালভাবে ফরাসী বলতে পারতেন না। এক ইস্কুলে অংকের মাস্টারি করতেন। তিনি তখন ফরাসী ভাষা শিখছেন। তাঁর ক্লাশের ছাত্ররা তাঁর ফরাসী শুদ্ধরে দিত। এইভাবে চলে ফরাসী সাহিত্যের আরাধনা। কয়েক বছর পরে তাঁর দুটো উপন্যাস বাজারে বেরোয়। যে উপন্যাসটি এবারকার গংকুর পুরস্কার পেয়েছে সেটির নাম হল, 'লে বাগাজ্ দ্য সাব্‌ল' (বালির বস্তা)। এই উপন্যাসের আখ্যান বস্তু হল এইরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক মাস পর মারিয়া নামে এক যুবতী পোল্যাণ্ড ছেড়ে এসে প্যারিসে বসবাস করতে থাকে। মারিয়া প্যারিস ছেড়ে চলে যায় দক্ষিণ ফ্রান্সে। সেখানে এক বুড়োর প্রেমে পড়ে। বুড়োর সঙ্গে তার দিনগুলো কাটছিল সুখেই। এক-দিন সেই বুড়োর স্ত্রী এসে হাজির। বুড়ো তাকে বলে যে, স্নেহ ও ভাল-বাসাই সব নয়। এদিকে মারিয়া হারিয়েছে পোল্যাণ্ডে তার আত্মীয়স্বজন। সে তার কিশোরী দিনের কথা নিয়মিত ভাবতে লাগল। কিছু দিন পরে এলো তার জীবনে অবসাদ। এর পর সে ঠেকে শিখল যে, এই দুনিয়া অতি সহজ সরল নয়। বক্র তার পথ। সে ভেসে চলল নিষ্ঠুর দুনিয়ার জনস্রোতের মুখে। সেখানে সে হারিয়ে গেল।

শ্রীমতী আন্না লাংফুস
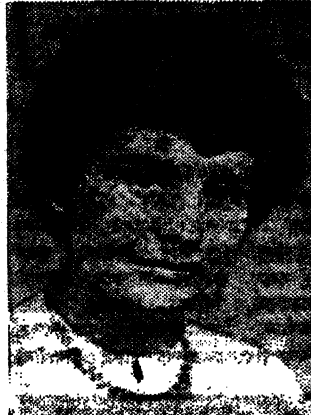
ফরাসী যার মাতৃভাষা নয়, অনেক সাধ্যসাধনা করে ভাষা শিখে, সেই ভাষার সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করা সোজা কথা নয়। তাই আন্না লাংফুস্ পেয়েছে অফুরন্ত প্রশংসা। দ্বিতীয় পুরস্কারটি রনোদা পুরস্কার বলে খ্যাত। এটি পেয়েছেন শ্রীমতী সিমন্ জাক্‌মার। সিমন্ জাক্‌মার বয়স এখন আটত্রিশ। গত দশ বছরে ইনি পাঁচ-খানা উপন্যাস লিখেছেন। রনোদা পুরস্কারপ্রাপ্ত সিমন্ জাক্‌মারের উপন্যাস "ল্য ভেইয়র দ্য নুই" (রাত্রির প্রহরী)র আখ্যানবস্তু হল এই, এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুরি করে এনে তার নিজের বাগানে কুয়ো খনন করে সেখানে তাকে লুকিয়ে রাখে। অনেককাল পরে সে খবর জানা যায় বিচার চলা কালে।

নভেম্বর মাস ধরে চলেছে পুরস্কারের পালা। সে পালা চলবে ডিসেম্বর-জানুয়ারী ধরে। তবে বিখ্যাত ও সরকারী পুরস্কারগুলো বিতরিত হয়েছে নভেম্বর মাসে। । তবে তিনটে জনপ্রিয় পুরস্কার যেমন, ফেমিনা, এ্যাঁতেরাইতে মেদিসি ইত্যাদি বিতরিত হবে শীঘ্রই।

সরকারী পুরস্কারগুলোর মধ্যে দুটি হল অন্যতম। প্রথমটি হল ফরাসী আকাদেমির উপন্যাসের ওপর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবার দেওয়া হয়েছে মঃ মিশেল মর্‌কে। ঔপন্যাসিক মিশেল মর্ তাঁর উপন্যাস 'লা ব্রিজ মারিটিম্' এর জন্য পেয়েছেন দশ হাজার টাকা পুরস্কার। দ্বিতীয়টি হল জাতীয় পুরস্কার। এ বছরের সাহিত্যের গুরু, ন্যাশনাল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যিক মঃ পিয়ের জ জুভ্। ইনি একাধারে উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর সর্বশেষ বই 'ল্য তম্ব দ্য বদলেয়র' (বদলেয়রের কবর) উল্লেখযোগ্য।

প্যারিস হল সেইন জেলার শহর। সেই সেইন জেলার আধাসরকারী সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন মঃ আঁরম লান্দ। প্যারিস ও তার আশে পাশের অঞ্চল নিয়ে লেখার ওপর এই পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতি বছরে। পুরস্কারের টাকার অংক চার হাজার টাকা। প্যারিস পৌর-প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য-পুরস্কার এখনো বিতরিত হয়নি। হবে পরে। সেইন জেলার প্রতিবেশী সেইন এ ওয়াজ জেলা প্যারিসকে ঘিরেই। সেইন এ ওয়াজ জেলার সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন এ বছরে মঃ জর্জ মংগ্রদিয়ান্। মঃ মংগ্রদিয়ান সেইন এ ওয়াজ জেলার ইতি-হাস লিখে প্রসিদ্ধ। এই পুরস্কারটিও চার হাজার টাকার।

সমালোচনা-সাহিত্যের ওপর অনেক-গুলো পুরস্কার বিতরিত হয় প্রতি
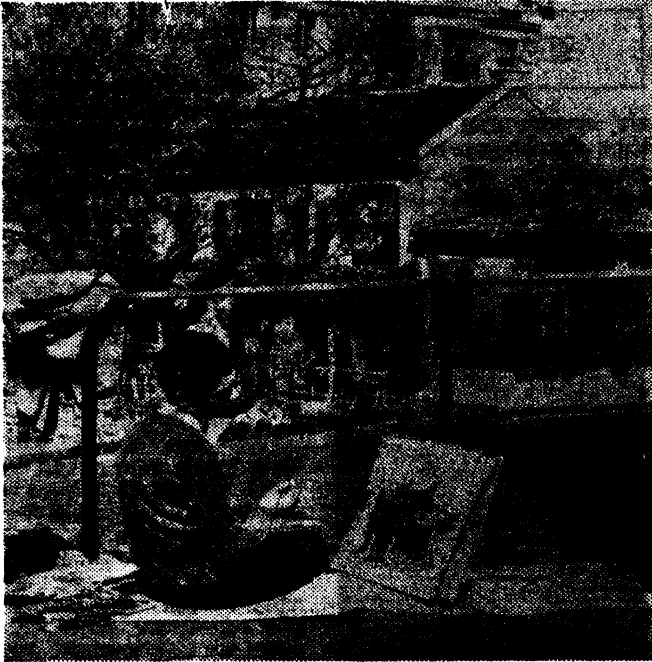
মোমাত' অঞ্চলের পথের ধারে একমনে শিল্পী এ'কে চলেছেন

বছর। এ বছরের সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী সুজান্ জ'-বেরার তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থ 'ল্য জনেস্ দা রোম' দ্য বালজাক্'। বালজাক-সাহিত্যের সমালোচনা লিখে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন।

আকাদেমি এ্যাঁতরনাশিওনাল দে এসপারেসিস্ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরস্কার বর্ষণ করেছে। তার সংখ্যা গোটা পনেরো। এক সাহিত্যের ওপরই পেয়েছেন পাঁচজন ফরাসী সাহিত্যিক।

দশ হাজার টাকার 'প্রি দেকুভ্যার' এক মাসের মধ্যে দেওয়া হবে বিজ্ঞানের ওপর লেখা শ্রেষ্ঠ বইএর লেখককে। এই পুরস্কার দিচ্ছে প্যারিসের সাংবাদিক সঙ্ঘ।

ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে এ বছরে অনেকগুলো পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পঁয়ষট্টি হাজার টাকার ফোঁদাশিয়ঁ শার্ল লেওপোল্ড মায়ার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মঃ মোনো ও মঃ জ্যাকবকে। এরা দুজনে প্রাণী-বিজ্ঞানী।

বিশ হাজার টাকা করে তিনটি কোনাক্-জে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পরমাণু বিজ্ঞানী মঃ কুশার, মঃ গ্রেগোরি, মঃ পিয়ুকে। চারটি পনের হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে চার বিজ্ঞানীকে, মঃ আরমনভেরো, মঃ আস্তিয়ের, মঃ লাগারিক্ এবং মঃ মুলারকে।

প্রাণী বিজ্ঞানের বিখ্যাত পেলমান পুরস্কার লাভ করেন মিউজিয়ম অব ন্যাচরাল হিস্ট্রির গবেষক মঃ পিয়ের দুজে। এই পুরস্কার বিশেষ সম্মানীয়। রাউল-দুত্রি পুরস্কার দেওয়া হয় পরমাণু বিজ্ঞানী মঃ রবার পোতে'কে। তিন হাজার টাকার চিকিৎসক-লেখক পুরস্কার দেওয়া হয় ডাক্তার শভিরেকে তাঁর উপন্যাস 'লে পাশ' (পথযাত্রী)র জন্য। যে সব চিকিৎসক সাহিত্যচর্চা করেন তাদের ভিতর থেকে বেছে এই পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়ে থাকে।

শিশুসাহিত্যের জন্যে দেওয়া হবে, এক হাজার টাকার দুটো পুরস্কার। পেয়েছেন লাইনেল টেরি পর্বতারোহণের বই লিখে, আরেকজন মাদাম ইভন্ মেইনিয়ের পেয়েছেন বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন মরিস ললং তার 'সেলেব্রেশান দ্য লার মিলিটেয়ার' এবং গাব্রিয়েল মার্ক তাঁর উপন্যাস 'ল্য সুর-মুয়ে'র জন্য।

* * *

পশ্চিম জার্মাণীতে এখন যে বইটি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে সেটি কোনো উপন্যাস বা রহস্য রোমাঞ্চের বই নয়। জার্মাণীর পুরাকালের ইতিহাস নিয়ে বইটি লিখেছেন এক জার্মাণ সাংবাদিক মিঃ রুডলফ্ পার্টনার। পার্টনারের বইটির বিষয়বস্তু হল জার্মাণীতে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে জার্মাণীর জাতীয় ইতিহাস বর্ণনা। তাতে আছে সে যুগের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা। অর্থাৎ খ্রীস্টের জন্মাবার বহু আগের ইতিহাস এতে স্থান পেয়েছে। পেয়েছে জার্মাণীর প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস।

রঙ-বেরঙ

।। দূর জগতের কথা ।।

হাঙ্গেরিয়ান সঙ্গীতের সৃজনী কল্পনা ও অপূর্ব সুরমাধুর্যের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন ফ্রাঞ্জ লিজ্‌ট তাঁর রচনার মাধ্যমে। কিন্তু সেই হাল্কা, মধুর, আনন্দঘন অথচ করুণ সঙ্গীতগুলি ফ্রাঞ্জ লেহার ও এমেরিখ কেলমানের সুরের যাদুতে হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

এমেরিখ কেলমানের আসল নাম ছিল ইমরে। ছোট একটি গ্রাম, সিওফোকে তাঁর জন্ম হয় ১৮৮২ সালে। বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হ'ত আশি বছর। প্যারিসে ১৯৫৩ সালে তিনি মারা যান। অল্পবয়সেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিয়ানোবাদক হবার বাসনা মনে জাগে। কিন্তু ডান হাত দুর্বল হওয়ায় সে বাসনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং কেলমান অন্য পেশার কথা চিন্তা করতে থাকেন। খানিকটা আইন অধ্যয়ন করে কোন ব্যবহারজীবীর অফিসে কেরানীর কাজ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সঙ্গীতের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে এবং হাঙ্গেরীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে সঙ্গীতের সমালোচনা লিখে জীবিকা অর্জন আরম্ভ করেন। তারপর ১৯০৮ সাল থেকে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি নিয়োজিত হয় হাল্কা সংগীত-রচনার মধ্যে। সেই সময়ে তাঁর রচিত গীতিনাট্য "'অটাম ম্যানোভার" বা "হেমন্তের অভিযান" অভাবিত সাফল্য অর্জন করে। ভিয়েনায় অভিনীত হবার পর ইউরোপের সমস্ত অপেরা-হাউসে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় গীতিনাট্যটি। এরপর কেলমান বহু গীতিনাট্য রচনা করে ভিয়েনার সঙ্গে এতো বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে আসলে হাঙ্গেরিয়ান হলেও লোকে তাঁকে অস্ট্রিয়ার লোক বলেই ভাবতে শুরু করে।

তাঁর গীতিনাট্যের জনপ্রিয়তার মূলে সুরে লোকসঙ্গীতের প্রাধান্য। ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত মঞ্চ তিনি জয় করেছিলেন ও লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্তে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর পাগলকরা সুরে তিনি চারদিকে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। তাঁর আকুলকরা সুরগুলিকে ঠিক সঙ্গীত বলা চলে না কিন্তু তা' ছিল আধুনিক ছন্দে বাঁধা লোকসঙ্গীত যা সেদিনের মানুষকে মোহিত করেছিল।

ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ তাঁর নিজস্ব ধারায় সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন অপেরা নেই যেখানে তাঁর স্বর প্রতিধ্বনি তোলেনি।

যুদ্ধ তাঁর সৃজনীশক্তিতে ছেদ আনে। প্রিয় ভিয়েনা ত্যাগ করে তিনি চলে যান প্যারিসে এবং সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিউইয়র্কে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। তার দুবছর বাদে ১৯৫৩ সালের ৩০শে অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শেষ গীতিনাট্য "আরিজোনা লেডী" আগের মত সাফল্য অর্জন করতে অসমর্থ হয়। সেজন্যে একজন সমালোচক বলেছিলেন, "কেলমান ভিয়েনাকে চায় আর ভিয়েনা চায় কেলমানকে।" জীবনে যে সুরের ঝড় তিনি বইয়েছিলেন, আজও তাই তাঁর স্মৃতিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে জাগরূক রেখেছে।

* * *

এই বছরে বেরবেশ ও আলনজবুর্গের সঙ্গীতানুষ্ঠানে বহু বিদেশী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর কোন গায়ক বিদেশে বিশেষতঃ ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও নেদারল্যান্ডে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই মত-ভোটে যেসব মহিলা গায়িকাদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন মেলিন্ডা মুল্লার ট্রি, এরনা বেরগের, ক্রিস্তা লুডভিক, ইরমগার্ড সিফ্রিড ও আনেলিজে রোথেনবেরগের এবং পুরুষ গায়কদের ক্রমিক নাম হচ্ছে, ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ, উলগাঙ্ক হিন্ডগাসেন, রুডলফ শোক, যোশেফ গ্রাইন্ডল, হাইঞ্জ হপ্পে ও বেন্নো কুশে।

এ'দের মধ্যে প্রথমজন ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ যেন গায়ক হবার জন্যেই জন্মেছিলেন। তাঁর জীবনে কখনও কোন বাধা আসেনি। অন্যেরা যখন সংগীত-শিক্ষার কঠোর সাধনায় রত, ডিয়েট্রিখ তখন পুরোদস্তুর সংগীত-পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি, তখনই বার্লিনের একজন নামজাদা পরিচালক তাঁকে পৌর-অপেরায় শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করে প্রভূত সাফল্যলাভ করেন। এরপর তিনি যখনই মঞ্চে যে-কোন অভিনয় করেন তাতেই যশের অধিকারী হন। শিল্পের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে অভিনয় করায় তাঁর অভিনয় ও গানে একটি সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও মহত্ব ঘিরে থাকে। স্বর ও অভিব্যক্তিতে সঙ্গীত ও নাটকের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এমন কোন অপেরা নেই, যেখানে তাঁর স্বরের প্রতিধ্বনি জাগেনি, এমন কোন আন্তর্জাতিক শ্রোতা নেই যিনি তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন নি। বড় বড় গীতিনাট্যে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও, ডিয়েট্রিখ জার্মানীর সঙ্গীতধারার প্রতি আজও অনুরক্ত। তাঁর মতে এ যুগেও সেই সঙ্গীতধারা অচল নয়। সেকালের সেইসব সঙ্গীতকে আজকের দিনে কেউ যদি সুর দিতে পারে এবং তার উপযুক্ত শিল্পী ও আধুনিক ভাষ্যকার যদি কেউ থাকে, তবে ডিস্কাউ-এর নাম করতে হয় প্রথমে। এই কথাটাই প্রমাণ করেছেন শিল্পী ও গায়ক ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

মহাশ্বেতার ইচ্ছা ছিল কান্তিকেও খবরটা দিয়ে যায়। বোধ করি পেট ফুলছিল তার তখনও। তাই শ্যামা যখন সেখান থেকে উঠে একরকম ছুটেই পিছন দিকের বাগানে চলে গেলেন নিজেকে সামলাতে—মহাশ্বেতা খুঁজে খুঁজে কান্তিকে বারও করেছিল।

'ঐ, শুনছিস! তোর সেই তিনি রে—তোর রতনদি যে ঘোড়া উলটেছেন। অক্কা পেয়েছে।...... আ-মর্ চেয়ে আছে দ্যাখো কেমন করে—রতনদি তোর, রতন, আমার সেই ননদ মরে গেছে, বুঝলি? এই—গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলেছে। মা মানুষটি তো আমার সহজ নয়—মার গাল সহ্য করতে পারবে কেন? হাতে হাতে ফলে গেল ওর শাপ! বাব্বা, মনে হ'লেও ভয় করে।'

যৎপরোনাস্তি চেঁচিয়েই বলেছিল মহাশ্বেতা, কিন্তু কান্তির কানে তাও পেঁছবার কথা নয়। সে তেমনি করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে বললে, 'কিছু বুঝতে পারছি না কি বলছ। কার কথা বলছ? কার কী হয়েছে? একটু লিখে দেবে?

'দূর হ কালার ডিম। এক জ্বালা হয়েছে কালাকে নিয়ে। আমি তোদের মতো লিখতে পড়তে পারি কি না, যে লিখে দেব। বলে কবে সেই দাগা বুলিয়েছিলুম দিনকতক, এখনও তা নাকি মনে আছে। আদ্দেক বানান্ জানি না।........ শোন, যা বলছি আমার মুখের দিকে তাকা। তবু চেয়ে থাকে দ্যাখো বোকার [illegible]—

আরও ভাল ক'রে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবার হয়ত চেষ্টা করত কিন্তু ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে আকৃষ্ট হয়ে কনক এসে পড়ল। সে ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারেনি বটে, তবে এটা সে তার সহজ সহানুভূতি দিয়ে বেশ বুঝেছে যে, কান্তির এই দুর্গতির জন্য রতন যতই দায়ী হোক, কান্তির তার প্রতি এখনও যথেষ্ট টান আছে। কারণ এতদিনের এত কথার মধ্যেও ওর মুখ দিয়ে একটি দিনের জন্যেও রতনের বিরুদ্ধে কোন নালিশ উচ্চারিত হয়নি। হয়ত এককালে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে তার কাছ থেকে বলেই—কৃতজ্ঞতাটা ভুলতে পারেনি, অথবা ওর এই অনিষ্টের মূলে রতনের সত্যিই তেমন কোন হাত ছিল না,—কারণ যা-ই হোক, কান্তি মনে মনে আজও রতনকে স্নেহ বা শ্রদ্ধা করে। সুতরাং হঠাৎ এত বড় খবরটা পেলে দুর্বল শরীর আরও ভেঙ্গে পড়বে।

সে ব্যস্ত হয়ে এসে মহাশ্বেতার হাত ধরে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে গেল।

'ও কি করছিলেন ঠাকুরঝি, ওকে কি এখন এই খবর দেয়! এখনও ভাল ক'রে সেরে উঠতে পারেনি, রোগা শরীর, এখন এত বড় আঘাত সইতে পারবে কেন?'

'নে বাপু, তোদের আদিখ্যেতা দেখলে আর প্রাণ বাঁচে না। এখনও কি তার ওপর এত টান ছেদ্দা-ভক্তি আছে ওর যে একেবারে বুক ফেটে যাবে! সে মাগী তো ওকে মেরে ফেলতেই বসেছিল। মা কি [illegible]!'

'তাই বলে কি এতদিনের ছেদ্দা-ভক্তি একদিনেই উবে যায়। এত বছর ধরে এত যত্ন করেছে, এত উপকার করেছে, সে-সব একদিনেই ভুলে যাবে? অন্তরের টান থাকবে না একটা!"

'জানি নে বাপু! তোদের কথার ধাঁচ-ধরন বুঝতে পারি না। বলে—যে দিয়েছে মনে ব্যথা তার সঙ্গে আমার কিসের কথা, তবু যদি কই কথা ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা!'

গজগজ করতে করতে মহাশ্বেতা চলে যায়।

কিন্তু ঐ ভাবে তাকে টেনে আনাতে কান্তির মনে একটা খটকা লাগে। সে কনকের কাছে এসে বলে, 'কী হয়েছে বৌদি, কী বলছিল বড়দি? কেউ মরেছে? কার কথা বলছিল? গলা দেখাচ্ছিল!'

ঠোঁটের ভঙ্গি করে কনক বুঝিয়ে দেয়, 'ও কিছু না। ওর কে এক পাড়ার লোক মরেছে!'

কান্তি চুপ ক'রে যায়—কিন্তু মনের খট্‌কাটা যে দূর হয় না সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে কনক।

পরের দিন দুপুরে আবার এসে কনককে ধরে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি-চুপি বলে, 'একটা কথা বলব বৌদি, কাউকে বলবে না?—লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, না বলে আমি থাকতে পারছি না!'

কনকের মুখ শুকিয়ে ওঠে। তবুও বলতে হয়, 'বল না কী বলবে! কী এমন কথা?'

বলবার আগেই কান্তির মুখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু ক'রে খুব চুপিচুপি বলে, 'এর মধ্যে—এর মধ্যে তোমরা রতনদির কোন খবর পাও নি?' আটকে আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো। বিশেষ ক'রে রতনদির নামটা। কোনমতে যেন মরীয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করলে।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। হয় তাহা মিথ্যে বলতে হয়, নয় তো সত্যটা স্বীকার করতে হয়। তবু পাশ কাটাবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করল কনক, 'কেন বল তো?'

আবারও মুখ নিচু করল কান্তি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'কাল রাত্রে বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। যেন ছেঁড়া-ময়লা একটা কাপড় পরা, গলায় একটা কাটা দাগ—এসে আমার কাছে হাত জোড় করে কী চাইছে। কী যে চাইছে তা বুঝতে পারলুম না। সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুম এল না। রতনদির কিছু হয়েছে—হ্যাঁ বৌদি, লক্ষ্মীটি আমার কাছে গোপন ক'রো না, সে-সে বেঁচে আছে তো!'

একেবারে নির্জলা মিথ্যাটা মুখে আটকায় বৈ কি!

কনক মাথা নিচু করল এবার।

কান্তির গলাটা যেন একেবারে ভেঙ্গে এল। সে স্খলিত কণ্ঠে একেবারে ফিসফিস ক'রে বলল, 'তাই বুঝি কাল বড়দি বলতে এসেছিল? কেউ-কেউ খুন করেছে তাকে? গলা কেটে দিয়েছে?'

কনক ঘাড় নাড়ল। ইঙ্গিতে দেখাল যে গলায় দড়ি দিয়েছে রতন।

চুপ ক'রে গেল কান্তি। শুধু আবার দুই চোখ দিয়ে তার এতদিন পরে অশ্রুর বন্যা নামল।

এর পর দুটো দিন তার যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল তা কনক ছাড়া পুরোটা কেউ বুঝত পারল না। ঠিক এইটেই আশঙ্কা করছিল সে। যদি বেচারা প্রাণ খুলে একটু কাঁদতেও পারত তো হয়ত আঘাতের তীব্রতা অতটা লাগত না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দাদা বা মায়ের সামনে সে চোখের জলও ফেলতে পারত না। কে জানে অপরাধিনীর জন্য চোখের জল ফেললে যদি এরা রাগ করেন? ঠিক সেই কারণেই তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো স্বাভাবিক ভাবেই করে যেতে হ'ত—অন্তত চেষ্টা করতে হ'ত। ভাতের সামনে গিয়েও বসতে হ'ত, যদিও খেতে পারত না প্রায় একগালও। প্রথম দিন রাতে ইচ্ছা ক'রেই হেমের সঙ্গে তাকে খেতে দেয়নি কনক, হেমের প্রশ্নের উত্তরে 'আমার সঙ্গে খাবে' বলে কাটিয়ে দিয়েছিল। মারও সেদিন একাদশী, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তা নইলে বিস্তর বকুনি খেতে হ'ত ওকে। ভাত কমই দিয়েছিল কিন্তু তাও খেতে পারল না সে—দু এক গ্রাস নাড়াচাড়া ক'রে কনকের চোখে চোখ পড়তেই কেঁদে ফেলল। ইঙ্গিতে আশ্বস্ত ক'রে কনক তাকে চুপ ক'রে বসে থাকতে বলল, তারপর নিজের খাওয়া হ'তে নিঃশব্দে ভাতসুদ্দ ওর থালাটা নিয়ে পুকুরে চলে গেল।

পরের দিন কিন্তু আর চেপে রাখা গেল না। কিন্তু বিচিত্র কারণে শ্যামা খুব একটা বকাবকি করলেন না। শুধু কনককে প্রশ্ন করলেন একবার, 'খবরটা ও শুনেছে বুঝি বৌমা? মহাই বুঝি এই উপকারটি ক'রে গেলেন আমার?'

কিন্তু শ্যামা বকাবকি না করলেও দুদিনেই আবার কান্তির যা চেহারা হয়ে গেল, তা দেখে ভয় পাবারই কথা। কনক তো বটেই—শ্যামাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। শ্যামা যে এতটা সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটা দেখবেন তা আশা করেনি কনক, সে ভরসা পেয়ে বলল, 'কী হবে মা—আবার একটা কিছু ভারী অসুখ বিসুখ হবে না তো গুমরে গুমরে!'

'কী জানি মা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা কিছু কাজের মধ্যে থাকলেও বা যা হয় হ'ত—শুধু শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা—এই যে হয়েছে আরও কাল!'

'ওকে—ওকে কোথাও দু একদিনের জন্যে পাঠালে হ'ত না?'

'কোথায় পাঠাব বল। উমার কাছে একটা রাত্তিরও কাটাবার জায়গা নেই, পাঠাতে গেলে এক বড়দির কাছে। তা কালা-মানুষ কিছুই শোনে না। কল-কাতার গাড়ি-ঘোড়ার পথ, ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আরও, কলকাতায় গেলে—ঐসব কথা বেশি ক'রে মনে পড়বে হয়ত!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে বাঁচিয়ে দেয় উমাই।

তৃতীয় দিনে ডাকে একটা চিঠি আসে কান্তিরই নামে। উমা ওকে বিস্তর সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে লিখেছে

—'তুমি কোন কারণেই হতাশ হইও না— বা হাল ছাড়িয়া দিও না। মেয়েদের পড়ার বইতে অনেক অনেক জীবনী নিতাই পড়িতেছি, তোমার অপেক্ষা গুরুতর রকমের অঙ্গহীন লোকও পৃথিবীতে বহু বড় বড় কাজ করিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে হাত-পা বা ঐ ধরণের কোন অঙ্গ যায় নাই। আমি বলি কি, তুমি আবার পড়াশুনাতেই মন দাও। ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়িয়াছিলে, মোটামুটি অনেকটা জানাই আছে। এখন বই হইতে নিজেই পড়িতে পারিবে। এখন তো লিখিত পরীক্ষা—কানে শুনিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তুমি বরং ওখানকার ইস্কুল হইতে, বা যেসব বই তুমি পড়িতে, মনে করিয়া পুস্তকের তালিকা করিয়া আমাকে দাদার মারফৎ বা ডাকে পাঠাইয়া দাও, আমি আমার ছাত্রীদের বাড়ি হইতে যতটা পারি যোগাড় করিয়া দিব, বাকীগুলি তোমার মেসোমহাশয় কিনিয়া দিবেন। তুমি আর একদিনও সময় নষ্ট না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও।'

উমার এই চিঠিখানাই যেন দশ বোতল টনিকের কাজ করল। কান্তির মুখ-চোখের চেহারা ফিরে গেল দুদিনে। রতনের শোকটাও এই প্রবল উৎসাহের বন্যায় অনেকটা দূরে চলে গেল। এক আধবার—বিশেষত সন্ধ্যার সময়টা— একটু উন্মনা হয়ে উঠত, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও হয়ত ফেলত কিংবা দূরে শূন্যে চেয়ে চোখ দুটো উঠত ছলছল ক'রে—কিন্তু সেই গুম্ হয়ে বসে থাকা বা শুকিয়ে ওঠাটা একেবারে চলে গেল। সে সেইদিনই বসে বসে একটা বইয়ের ফর্দ করে দাদার হাতে দিয়ে দিলে ছোট-মাসীকে দেবার জন্যে। তারপর খুঁজে খুঁজে সীতার দরুন বালির কাগজের খাতাটা বার ক'রে তারই দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসল। যে ইংরেজী প্রবন্ধ গুলো তার তৈরি করা ছিল সেইগুলোই নতুন ক'রে লিখে মিলিয়ে নিতে লাগল। অর্থাৎ নতুন উৎসাহ এসেছে জীবনে— হতাশ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। এরাও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবার।

দিন পাঁচ সাত পরেই ছোটমাসী একদফায় কতকগুলো বই পাঠিয়ে দিলেন। হেম ইতিমধ্যে ওর অফিস থেকে রেলের কখানা বাঁধানো খাতা এনে দিয়ে-ছিল—অঙ্ক কষা ও অন্য সব লেখার জন্য। এতো আর ইস্কুলে দেখাতে হবে না—মিছিমিছি সাদা খাতা কিনে পয়সা নষ্ট করার প্রয়োজন কি! তাতে অবশ্য কান্তিরও আপত্তি নেই। সে এবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনো শুরু করল। অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে সে। শুধু ওর এই একেবারে কালা হয়ে যাওয়াটা এদের এখনও অভ্যাস হয়নি বলে এদেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে। পেছন ফিরলে আর কোন মতেই ডাকার উপায় নেই। সামনে ফিরে থাকলে হাত পায়ের ভঙ্গি ক'রে ঠোঁট নেড়ে তবু কাজ চলে। অন্যদিকে ফিরে থাকলে গায়ে হাত দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নয়ত ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়—কি ঘাড় হেঁট ক'রে থাকলে, একটা হাত ওর চোখের সামনে ঘুরিয়ে মাথা তোলবার ইঙ্গিত জানাতে হয়।

এইসব দেখে হেম মধ্যে মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ে। মাকে বলে, 'পড়ছে তো, এতখানি অন্ধকার ভবিষ্যৎ মেনে নিতে তাঁর মন চায় না। এ ছেলের ওপর যে অনেকখানি ভরসা ছিল তাঁর। সে আশার প্রাসাদ একেবারে ধূলিসাৎ হলে তিনি দাঁড়ান কোথায়? তাই কতকটা নিজের গরজেই একটা ক্ষীণ আশা আঁকড়ে ধরে থাকেন। একটা কি কিছু উপায় হবে না, ভগবান কি এতটা অবিচার করবেন? তবে যে লোকে বলে 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি'—সে কি মিছে কথা? শুধুই কথার কথা? তাঁর জীবনে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন সে কথা ভেবেও বল পান অনেকটা। আবার এমনও একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে উঁকি দেয়—ভালও তো হয়ে যেতে পারে, যেমন হঠাৎ কালা হয়ে গেছে তেমনি হঠাৎই আবার হয়ত শুনতে আরম্ভ করবে। অনেক সময়

......ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না......

প্রাইভেটে একজামিন দিয়ে পাশও হয়ত করতে পারবে কিন্তু কোন কাজ হবে কি তাতে? ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না। কে দেবে ওকে কাজ? যে মাইনে দেবে সে এত দিকদারি সহ্য করবে কেন?... যা দেখছি ষাঁড়ের নাদ হয়েই ওকে জীবন কাটাতে হবে।

শ্যামা চুপ ক'রে থাকেন। তিনি হেমের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তিনিও যে একটা হিম হতাশা বোধ করেন না তা নয় কিন্তু ঠিক দৈব ওষুধেও কাজ হয়। একবার তাই না হয় যাবেন মঙ্গলার কাছেই। তাঁর অনেক জানাশুনো আছে—যদি তেমন কোন ওষুধ বিষুধের সন্ধান দিতে পারেন তিনি।

ছেলের মুখে চোখে নতুন উৎসাহের দীপ্তি জেগেছে, তার আলোও খানিকটা তাঁর মনে এসে পড়ে। হবেই একটা উপায়, যা হোক ক'রে। ভগবান কোন মতে একটা পথ দেখিয়ে দেবেনই।

(ক্রমশ)

॥ জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি ॥

গত সপ্তাহের 'অমৃত' পত্রিকায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট মার্কিন রসায়ন-বিজ্ঞানী গ্লেন থিওডোর সিবর্গ-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির নাম 'মহাকাশ অভিযানে পরমাণুর ভূমিকা'। প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মহাকাশ অভিযানের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্তে আনার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে। সুতরাং গত সপ্তাহের প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবে জনকল্যাণে পরমাণুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা তোলা যেতে পারে।

গোড়ায় একটু পুরনো ইতিহাস স্মরণ করা যাক। ১৯০৭ সালে মাদাম কুরী প্যারিস ইনস্টিটিউটকে এক গ্রাম রেডিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। সে-সময়ে এই এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম ছিল কয়েক লক্ষ রুবল। এই রেডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল খনিজ আকর থেকে। এই পদ্ধতিতে সারা বছরে কয়েক গ্রামের বেশি রেডিয়াম পাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু-শক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। এখন নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর থেকে কৃত্রিম উপায়ে অজস্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যাচ্ছে। এই নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টরকে বলা চলে আমাদের যুগের 'অ্যালকেমিস্টিক' চুল্লী। মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টরা পদার্থের মৌলিক রূপান্তরের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন পারদ থেকে সোনা তৈরি করতে। অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপায়িত। পারদ থেকে সোনা তৈরি করা এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়, যদিও তাতে খরচ এত অসম্ভব রকমের বেশি যে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু অন্যদিক থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী থেকে যেমন পারমাণবিক তেজ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে অজস্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। বর্তমানে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত আইসোটোপের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

এত বিভিন্ন প্রকারের এত অজস্র আইসোটোপ যে মানুষের আয়ত্তে আসতে পারে তা কুড়ি বছর আগে বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারেননি। আর আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে আইসোটোপ যে কী অশেষ জনকল্যাণকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তাও এখনকার বিজ্ঞানীরা কল্পনা করতে পারছেন না।

আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে আইসোটোপ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। 'অমৃত' পত্রিকার পুরনো একটি সংখ্যায় (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬১) এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা তুলেছিলাম। সেই আলোচনার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

॥ আইসোটোপ ॥

"পরমাণুর ভর নির্ণীত হয় নিউক্লিয়সের দ্বারা। নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে প্রোটোন ও নিউট্রন। প্রোটোন কত সংখ্যক থাকবে তা নির্ভর করে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপরে, অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার ওপরে। কাজেই, পারমাণবিক সংখ্যাটি যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রোটোনের সংখ্যা কম-বেশি হবার উপায় নেই। কিন্তু নিউট্রন যদি কম-বেশি হয় তাহলে পরমাণুর ভর কম-বেশি হবে বটে, কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ৯২। কিন্তু পারমাণবিক ভর সর্বক্ষেত্রে সমান নয়—কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৮। ইউরেনিয়াম-২৩৪-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪২টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম—২৩৫-

রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থি পরীক্ষা

এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৩টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৬টি নিউট্রন। অর্থাৎ, প্রোটোনের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই সমান, সেই কারণে পারমাণবিক সংখ্যাও সর্বক্ষেত্রে ৯২। কিন্তু পারমাণবিক ভর কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৯। অতএব, একই পদার্থ ইউরেনিয়ামকে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারায়। একই পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট একই পদার্থের এই যে বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারা—এরই নাম আইসোটোপ।"

পেঙ্গুইন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভিধানে 'আইসোটোপ'-এর সংজ্ঞা এই: "একই মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণু যদি এমন হয় যে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে সমান কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক, তাহলে পরমাণুগুলোকে বলা হয় এই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ।"

চিকিৎসাকার্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

ক্যানসারের চিকিৎসায় এতকাল রেডিয়াম ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি ক্যানসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেডিয়ামের জায়গা নিয়েছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আগেই বলেছি, রেডিয়ামের দাম খুবই বেশি, সে-তুলনায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দাম সামান্যই। যেমন, এক টুকরো তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের দাম মাত্র ১০০ ডলার—অথচ এই কোবাল্টে যতোটা কাজ হবে, ততোটা কাজ করবার মতো রেডিয়াম সংগ্রহ করতে গেলে দাম পড়বে ২০,০০০ ডলার। ১৯৪৬ সালের পর থেকে ক্যানসারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি রোগনির্ণয় ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। রোগীর দেহে এমন কী ঘটেছে যার দরুণ অসুস্থতা—তা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নির্ভুলভাবে খুঁজে বার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে রোগনির্ণয়ের জন্যে আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। দেহে রক্তের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্যানসারের সঠিক অবস্থান নির্ণয় এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গোলযোগ সঠিকভাবে জানবার কাজেও আইসোটোপের ব্যবহার চলেছে।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন, অর্থাৎ আয়োডিন-১৩১, চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। থায়রোয়েড গ্ল্যান্ডের সক্রিয়তার জন্যে আয়োডিন প্রয়োজন। শরীরের বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে এই গ্ল্যান্ডের ওপরে। মানুষের শরীরে যদি আয়োডিন প্রবিষ্ট হয় তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জমা হয় থায়রোয়েড গ্ল্যান্ডে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রয়োগ করে জানা যেতে পারে এই গ্ল্যান্ড ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। রোগীকে তখন সোডিয়াম আয়োডাইডের সঙ্গে অল্প তেজস্ক্রিয় আয়োডিন সেবন করানো হয়। এর পর গাইগার কাউন্টারের মাধ্যমে জানা যায় আয়োডিন কত সময়ের মধ্যে গ্ল্যান্ডে জমা হচ্ছে—তার সক্রিয়তার পরিমাপ করার এই হচ্ছে পদ্ধতি।

ফসফরাস-৩২ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সঙ্গে ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের গোপন টিউমার ধরা পড়ে। বাইরে থেকে এই ধরনের টিউমার বড়ো একটা ধরা যায় না, বা ধরা পড়লেও ঠিক টিউমার কিনা বোঝা শক্ত।

রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার দোষত্রুটি ধরা পড়ে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম-২৪ ব্যবহারে। শরীরের কোনো স্থানে সঙ্কোচনের ফলে রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হলে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তা জানিয়ে দেয়।

সুস্থ মানুষকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সেবন করিয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে মানুষের দেহভ্যন্তরস্থ জটিল কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আজ জানা যাচ্ছে। রক্তসঞ্চালন, খাদ্য ও অক্সিজেনের গতিপথ এবং দেহাভ্যন্তরের ধাতব দ্রব্যাদির ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদভাবে জানবার পক্ষে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আজ চিকিৎসক ও

বিজ্ঞানীদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

কৃষিক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগের ফলে কৃষি-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধনের নতুন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ফসল বাড়াবার জন্যে কখন কোথায় কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে, উদ্ভিদ-জীবন ও উদ্ভিদের রোগ, শস্যনাশী কীট, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইউ-এস-আই-এস প্রকাশিত একটি বুলেটিনে তামাক-চাষের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণার একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের তামাক-চাষীরা তামাক উৎপাদনের জন্য ফসফেট জাতীয় সার প্রয়োগ করতো। বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে আবিষ্কার করলেন যে, তামাকের চারা ফসফেট জাতীয় সার গ্রহণ করতে পারে না। এটা জানবার পর চাষীরা তামাকের ক্ষেতে ফসফেট সার দেওয়া বন্ধ করে দিল। সুতরাং এই সার প্রয়োগের ফলে প্রতি বৎসর অর্থের যে অপচয় ঘটতো তা নিবারিত হলো। সারের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কোন ধাতব দ্রব্য প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের বিশেষ বৃদ্ধি হয়ে থাকে, এটা আগেও জানা ছিল। কিন্তু এই পরিমাণ যে পূর্ব ধারণার চাইতে অনেক কম হওয়া দরকার সেটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যেই গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে। সামান্য পরিমাণে মোলিবডেনাম ধাতুর সঙ্গে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে এবং উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে মোলিবডেনাম থাকলে সেই উদ্ভিদকে যারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবে তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক হবে। জমিতে কি পরিমাণে মোলিবডেনাম প্রয়োগ করলে সেই জমিতে উৎপন্ন ফসল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না—তা এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে নিরূপিত হয়ে থাকে।"

উদ্ভিদের দেহে জল ও বাতাসের সংযোজনের ফলে কিভাবে জীবন্ত টিসু বা কলা গড়ে ওঠে—যে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফটোসিনথিসিস—সে-সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শ্রমশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতের অন্য কোনো সংখ্যার জন্যে এ-আলোচনা তোলা রইল। আপাতত অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

॥ ভস্মনিক্ষেপের সমস্যা ॥

পারমাণবিক চুল্লীর ছাই কোথায় ফেলা হবে, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো একটা সমস্যা। আমাদের রান্নার উনুনের ছাই যেখানে সেখানে ফেলা যেতে পারে, কিংবা এমন কি পেঁপে বা অন্য কোনো গাছের সার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারখানার চুল্লীর ছাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানার পাশেই কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় স্তূপ হয়ে জমতে থাকে। এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। অনেকের পক্ষে—যারা ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে পোড়া কয়লা বার করে—সুবিধের ব্যাপারও বটে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় পারমাণবিক চুল্লীর বেলায়। যেহেতু চুল্লীটি পারমাণবিক, এই চুল্লীর ভস্মও তেজস্ক্রিয়। এই তেজস্ক্রিয়তার জন্যেই এই ভস্মকে যেখানে সেখানে ডাঁই করা চলে না। যে-কারণে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি, সেই একই কারণে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পারমাণবিক চুল্লীর ভস্ম সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ও মস্ত মস্ত বইও লিখেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সহজ ও সুলভ কোনো পদ্ধতির হদিশ পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করে করে গভীর সমুদ্রের জলকে কলুষিত করে তুলছে। খবরে বলা হয়েছে, পঞ্চান্ন গ্যালনের ইস্পাতের ড্রাম বা কংক্রীটের আধারে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ভরে নিয়মিতভাবে সমুদ্রের জলে ফেলা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সাল থেকে এমনি হাজার হাজার ড্রাম বা আধার ফেলেছে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে। ব্রিটেনের উইণ্ড্স্কেল-এ যে পারমাণবিক চুল্লী আছে তার ভস্ম ফেলা হয় আইরিশ সাগরে। অথচ বহিঃসমুদ্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (১৯৫৮ সালে সম্পাদিত) বলা হয়েছে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করে সমুদ্রের জলকে কিছুতেই কলুষিত করা চলবে না। খবরে আরো বলা হয়েছে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করা হয় মাটির নিচের গভীর গর্তের মধ্যে।
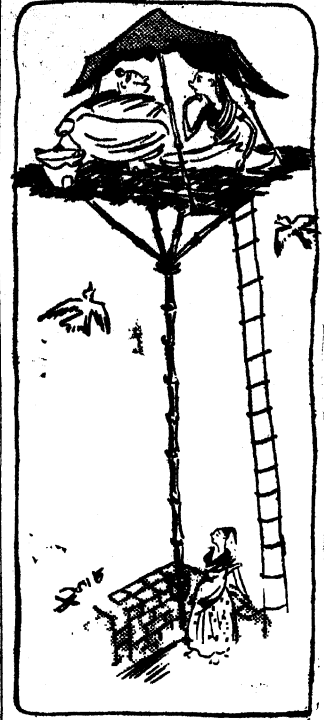
বাড়ীতে দুটো ঘর দুই ছেলে বউ নিয়ে থাকে। তাই ছেলেরা আমার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশেও অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হতে চলেছে। যে চুল্লীর ছাই ফেলাটাও এত-বড়ো একটা সমস্যা তা নিশ্চয়ই খুব একটা সরল ব্যাপার নয়। অতঃপর আমাদের দেশেও অন্য অনেক সমস্যার সঙ্গে এই ছাই-ফেলার সমস্যাটাও যুক্ত হবে।

মরালী-মন

সুভাষ সমাজদার

শোন উর্মিলা, বেশ ভাল করে ভেবে দেখ, এদেশে যাকে সাধারণত ভাল মেয়ে বলা হয়, তা তুমি নও। কোন যুক্তি দেখিয়ে তুমি মানুষের কাছে সহানুভূতি চাইবে? জীবনকে নিয়ে তুমি যেমন ইচ্ছা খেলেছো। জীবনের অর্থ তোমার কাছে স্পষ্ট নয় বলেই তুমি এতটা যেতে পেরেছো। তা না হলে তোমার শুরুটা তো বাঙলাদেশের আর পাঁচটা মেয়ের মতই ছকবাঁধা রাস্তায় হাঁটিতে আরম্ভ করেছিল।

বাগবাজারের গঙ্গার ধারের সেই ভাড়া-করা বিয়ে-বাড়ীর কথা মনে পড়ে? তোমার বিয়ের আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। ছোট উঠানে আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর পদাঙ্কলেখা জ্বলজ্বল করছিল। আম্রপল্লব, মঙ্গলঘট কোন কিছুরই অভাব ছিল না। পুরোহিত বেদের মন্ত্র পড়েছিল, যজ্ঞাগ্নির শিখায় ছাতনাতলা আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ তুমি—এই তুমিই উর্মিলা বসু, দর্শনে অনার্স-পড়া মেয়ে এক গা গয়না আর বেনারসী শাড়িতে আপাদমস্তক মুড়ে জবুথবু হয়ে সেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলে। তোমার সামনে সিল্কের পাঞ্জাবি পরা আর টোপর মাথায় দেওয়া যে মানুষটি বসেছিল তোমার সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। বিদ্যাও এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত ডিঙিয়ে বিদেশ থেকেও সমৃদ্ধ হয়ে এসেছিল। যা থাকলে তোমার মত মেয়ে সুখী হয়, তার কোন কিছুর কমতি ছিল না। তবুও—

তুমি আজ বর্ধমান রোডের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হোস্টেলের একটি ঘরের একক বাসিন্দা। তোমাকে ঘিরে কুমারী জীবনের রিক্ততার অভিশাপ!......

চিঠি লেখার প্যাডের ওপর শক্ত করে কলম ধরল উর্মিলা। লিখল, দেখ মায়া, তোকে লিখতে ইচ্ছে করছে অনেক কথা। কিন্তু এত চিন্তার তোড় আসছে যে, কলম চলতে চাচ্ছে না। তুই আমার সবই জানিস! তোকে যেমন অনেক গল্প বলেছি, তেমনি আরেকটি গল্প বলবো বলে আপাতত কলম ধরেছি। মনে হচ্ছে, এই গল্পটি আমার জীবনে সত্য হয়েও যেতে পারে। আর যখুনি ভাবছি, সত্য হলেও হতে পারে, তখুনি আমার নিজের জীবনের বিচিত্র অতীতটা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলছে।

আচ্ছা তুই বল মায়া, সত্যিই কি জীবন নিয়ে খেলেছি আমি? তোদের কাছে মেয়েদের জীবন কতগুলো কর্তব্যের বোঝা মাত্র। প্রাক-বিবাহকালীন যুগে মায়ের টুকটাক ফাইফরমায়েশ খাটা আর পড়াশুনা (বাবার সঙ্গতি থাকলে) করা। তারপর বিবাহোত্তর যুগে তো জীবনের ওপরে অসংখ্য রকমের রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ পড়ে। বিভিন্ন ছাপে ছাপে জীবনটা একেবারে হিজিবিজি হয়ে ওঠে। কোন ষ্ট্যাম্পে লেখা থাকে, বৌদি, কোনটায় থাকে কাকীমা—মাসীমা, জা, ছোট বৌমা, বড় বৌমা হাজারো রকমের ষ্ট্যাম্প। প্রতিটি সম্বন্ধ অনুযায়ী প্রত্যেকের মন জুগিয়ে কর্তব্য করতে করতে নিজের বলতে আর কিছু থাকে না! সেই যে বেদান্তে বলে না, ব্রহ্মের সঙ্গে একেবারে আত্মলোপ করে যাওয়া—বিয়ের পর মেয়েরা মিশে যায় সংসার-রূপ ব্রহ্মের সঙ্গে। অবশ্য যদি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার না হয় কিম্বা দূরে কোন কর্মস্থলে স্বামীর সঙ্গে পৃথিবীর দূরে কোণে রহিব আপন মনে থাকার ভাগ্য যদি থাকে—তাহলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু—

আমার তো তাও ছিল মায়া! শুধু স্বামীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিলাম সমুদ্রতীরের এক শান্ত জনপদে। সারা দিন হু-হু-করা হাওয়ার গর্জনে কানে তালা ধরে যেত। জানালার কাঁচের শার্সির ওপারে দেখা যেত উচ্ছল সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশি। গাঢ় নীলের পরেই সাদা ঝকমকে ধু-ধু

বালুচর। বিপুলব্যাপ্ত আকাশের দূর-দিগন্তে শ্বেতপদ্মের মালা গেঁথে গেঁথে উড়ে যেত সাগর-পাখীরা। প্রকৃতির সম্ভার ছিল যেমন অফুরন্ত, তেমনি ছিল আমার সংসারের (আমার স্বামীর) ঐশ্বর্য!

কিন্তু ছিল না মন। যে মন থাকলে ভালবাসতে পারে, ভালবাসতে পারে প্রকৃতিকে, তা ভদ্রলোকের একেবারেই ছিল না। ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ার। লোহালক্কড় আর কুলি-কামিন নিয়ে কারবার। চেহারার মত মনটাও স্থূল। তাকে দেখলে মনে হতো লোকটার পৃথিবীতে স্থূল বস্তু ছাড়া আর কিছু নেই বুঝি......

উর্মিলা! এ-সংসারে মনের মত মানুষ কয়টি মেয়ে পায়? বেদের মন্ত্র পড়ে যার হাতে সঁপে দেওয়া হয়, তাকেই একটু একটু করে আপনার মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে নেয় মেয়েরা। স্বাস্থ্যবান আর যথেষ্ট উপার্জন করে এমন স্বামী পেলে মেয়েরা সুখীই হয়। তুমি হওনি। তাকে রচনা করে নিতে পারো নি।

তুমি জানো না উর্মিলা, মেয়েরা 'স্বামীস্বর্গের ইন্দ্রাণী'। চারটে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরই তাদের স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীলোক হয়ে জন্মালেই হয় না, স্ত্রীভাবের পরিস্ফুটন হওয়া চাই। স্ত্রী-ভাব বলতে সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, উদারতা—এই সব বৃত্তিকেই বুঝায়। স্ত্রীভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে আত্মবিলোপ!

এই আত্মবিলোপের কথা আছে শাস্ত্রে। তোমার হয়তো মনে আছে তোমার বাবা "ভাগবত ধর্ম" থেকে তোমাকে পড়ে শোনাতেন : আত্মবিলোপ হয়েছিল কৃষ্ণের জন্য গোপিকাবৃন্দের! তারা পুরুষোত্তম সেই মথুরাপতি ভিন্ন আর কিছু জানতো না। তাঁর ভেতরেই বিলীন করে দিয়েছিল তারা আপন গুণ, আপন প্রীতি, আপন লজ্জাও—মনের সে এক অতি উন্নত অবস্থা!

উর্মিলা! তোমার উদার প্রকৃতির বাবার সঙ্গে ছোটকাল থেকে বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে তুমি নারীপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছো। তোমার বাবা যদি ফরেস্ট অফিসার না হতেন, আর তোমার মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে—তাহলে হয়তো তুমি স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে উর্মিলা......

আবার কলম তুলল প্রাচ্যবিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যাপিকা মিসেস উর্মিলা রায় (পদবীটা এখনও বিশাল অট্টা-লিকার ধ্বংসাবশেষের মত বিগত দিনের স্মৃতি বহন করছে)। জানিস মায়া, বাবা আমার এই স্বভাবের কথা জানতেন বলেই অনেক খুঁজে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলে ইরিগেশান ডিপার্ট-মেণ্টের ইঞ্জিনীয়ার। কর্মস্থলে উন্মুক্ত প্রকৃতির ভেতরে থাকবে মেয়ে। কোল-কাতায় কি আর কোন শহরে একটা বড় বাড়ীর কোন ঘরে মেজ কি সেজবৌ হয়ে থাকার বিড়ম্বনা নেই। এমন কি তার সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই।

দীঘার সমুদ্রতীরে ছোট একটা বাংলো-বাড়ী। উচ্চপদস্থ অফিসার স্বামী। খানসামা, বেয়ারা বাবুর্চি। বিলাসের উপকরণ ছিল নিখুঁত। তাই তোরাও অবাক হয়েছিলি, কেন-কেন এত পেয়েও আমি সব ছাড়লাম। শুনেছি, তোরাও বলেছিলি, ওর স্বভাবটাই ও রকম—

ওই স্বভাবটুকু, ওই বৈশিষ্ট্যটুকুই আজও আমার গর্ব ভাই। আজ হোস্টেলের এই ঘরে একেবারে নিঃস্ব একক জীবনযাপন করি। তোরা মনে করিস, আমার জীবন বুঝি রিক্ততার ব্যথা আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু আমার এই রিক্ত, অভিশপ্ত আর করুণ জীবনের ভেতরেও অদ্ভুত একটা আত্ম-তৃপ্তি আছে ভাই। সেটা কি জানিস, আমি একটু আলাদা রকমের মানুষ, আমার স্বভাবে কতগুলো মৌলিক গুণ আছে।

ছোটকাল কেটেছে তরাইয়ের অরণ্যে। কৈশোর কেটেছে বানগড়ের রিজার্ভ ফরেস্টে। আর যৌবনেরও কয়েকটি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার স্মৃতি পরম মমতায় মত জড়ানো আছে বংশীহারির বনের শাল-শিশু-সেগুনের পাতায় পাতায়। বরাবরই খাওয়া-পরা পশুর মত বেঁচে থাকার এই জীবন আর জগৎকে ছাড়িয়ে বহু-বহু উর্ধ্বে একটা বিচিত্র ভাবের রাজ্যে আমার মন মরালের মত ভেসে ভেসে বেড়াতো। এই জন্যেই—এই জন্যেই হয়তো রূঢ় বাস্তব সংসার আজ আমার কাছে থেকে মূল্য আদায় করে নিচ্ছে।

ভাগবত ধর্ম পড়তেন বাবা। যদিও ফরেস্ট অফিসার, কিন্তু শুধু বন্দুক আর লাঠি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। উপনিষদ পড়তেন, রবীন্দ্রনাথও পড়তেন। শোনাতেন, আমার সঙ্গে আলোচনাও করতেন। কোন শাস্ত্রে কি চিন্তাশীল লেখকের লেখা গ্রন্থে এমন কথা কখনো পাইনি—যে মেয়ে-পুরুষের আত্মার ভেতরে কোন মৌল পার্থক্য রয়েছে। মেয়েমানুষের আত্মা শুধু কতগুলো বিধি-নিষেধের খাঁচায় ভেতরে না-রোদ-না-জল, না-হাওয়ায় খাবি খেতে খেতে বেঁচে থাকবে। তা আমি ভাবতেই পারতাম না।

আরো আছে। কত বড় এই নীল আকাশ, কত বিপুল আর বিস্ময়কর এই সমুদ্র। কেন মানুষ হয়ে জন্মেও প্রকৃতির এই অবারিত সৌন্দর্যের প্রতি নির্লজ্জভাবে বিমুখ থাকলো [illegible]। শুধু টাকার নোটের বাণ্ডিলের ভেতরে ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের পাতায় পাতায় ঘুরে ঘুরে মরবে মন?

আমরা এ যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা, এক কথায় বিদগ্ধ ইনটেলেকচুয়ালসদের (ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লেখক, পণ্ডিত, শিক্ষক, অধ্যাপক) আমার কি মনে হয় জানিস মায়া, অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক। যে যা করছে তার বাইরে যেন দুনিয়া নেই আর। কেউ কারো কথা একটু ধৈর্য ধরে শোনে না। সময় নেই। সহিষ্ণুতা নেই। সবাই—সবাই যেন নিজের নিজের পথ ধরে উন্মাদের মত ছুটছে। কে ছুটছে না। ছুটতে পারছে না। কোথায় কোন অন্ধকারে কে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল—সে সব দেখার তাদের উপায় নেই।

যে যা ভাবে তাই হয়ে যায় মায়া। অসুখের কথা ভাবতে ভাবতে অসুখই বাঁধিয়ে ফেলে মানুষ। আমার মনে হয়, বুঝলি, একটা এ্যাম্বিশন বা কোন স্থির-লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ছুটতে ছুটতে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইটকাঠ পাথরের মত একটা জড়বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। অনেক টাকা, অনেক বড় বাড়ী, গাড়ী আর অনেক নাম ইত্যাদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সাধনা আসলে সেই ম্যাটারের উপাসনা মায়া!

রাশিয়া আকাশে রকেট ছুঁড়ছে। তার দেখাদেখি আমেরিকাও ছুঁড়ছে। তোরা যে যাই বল না কেন মায়া, আমার কিন্তু অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়। ওই রকেট যেন গোটা দুনিয়ার মানুষের আত্মা চুরি করে নিয়ে অজানা আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে শুধু পড়ে আছে হাড়-চামড়ার জড়ানো খোলগুলো।

তোর কি মনে হচ্ছে মায়া, আমি ফ্রাস্টেটেড! হতাশ? তাই মানুষ সম্বন্ধে এত উন্নাসিক হয়ে উঠেছি! কাব্যের ভাষায় তোরা হয়তো বলবি, ব্যর্থ জীবনের সুর ফুটেছে তোর কথায়। তাই তোকে এসব কথা বেশি লিখতে ইচ্ছা করছে না। এবার তোকে সেই গল্পটা বলি—যে গল্পটা আমার জীবনে একটা চমকপ্রদ ঘটনা হয়ে যাবে বলে হচ্ছে......

অনেক লিখেছ উর্মিলা। বাইরে তাকাও। দেখবে আলিপুরের পার্ক রোড আর বর্ধমান রোডের মোড় ছাড়িয়ে গাঢ় সবুজ রঙের শিরিষ গাছের সারি বহু-কালের পুরানো তারাজ্বলা আকাশের নীচে ধ্যানমগ্ন এক একটি অতি বৃদ্ধ মুনির মত দাঁড়িয়ে আছে। দূরে মাঝের-হাট স্টেশনের কাছে রেললাইনের ওপর সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে। চারি-দিকের ঘন অন্ধকারে জবাফুলের মত ফুটে থাকা লাল আলোটাকে তোমার মনে হবে যেন কোন অভিশপ্ত প্রেতাত্মার রক্তচক্ষু তোমাকে ভ্রুকুটি করছে। এই মধ্যরাত্রির নির্জনতার [illegible] ভেসে

দেখ ঊর্মিলা, মানুষ যেমনই হোক, যার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যেমন হোক, তার সঙ্গে মানিয়ে চলা যায় না? একেবারেই কি অসম্ভব! সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের একটি লোককে আপন করে নেওয়ার ভেতরে প্রতিভা আছে ঊর্মিলা।

তোমার অসুবিধা কি জানো, তোমাকে যে কখনও কাউকে আপন করে নিতে হয়নি। কোন কৃপণতার ভেতরে কি কোন কৃত্রিমতার ভেতরেই তুমি বেড়ে ওঠোনি। তুমি বড় হয়েছো অরণ্যের শাল-শিশুর মত। বর্ষায় জল, রোদ হাওয়ার স্নেহ তুমি পেয়েছে অকৃপণভাবে। সেই তুমি করেন্ট অফিসার অজয় বসুর একমাত্র কন্যা ঊর্মিলা বসু কি করে পঁচিশ বছরের পরিণত মন নিয়ে অন্য একটা লোকের প্রভুত্ব মেনে নেবে!

আর মানুষের প্রকৃতি দেখ কী

অদ্ভুত। যার যার স্বভাব নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকে না। সে যে রকম অন্যকেও সেই রকম করতে পারলে তবে তার শান্তি। যতক্ষণ তুমি তার মত না হচ্ছো, ততক্ষণ তোমার নিস্তার নেই। মানুষের এই স্বভাবের জন্যে পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে।

তোমার মনে পড়ে উর্মিলা, ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারের রাগ রাগ সেই ভারী মুখখানা। সেদিন তুমি সমুদ্রের ধার থেকে ফিরতে রাত করেছিলে—

—এত রাত করলে যে?

—সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকে চাঁদ উঠছিল যুঝলে। বালুচরের চারিদিকে কেয়ার ঝোপে ঝোপে কী সুন্দর কেয়া ফুটেছে আর দূরে হ্যামিল্টন সাহেবের বাগান-বাড়ীর সামনে ঝাউবনে বাতাসের সে কী মাতামাতি—

—বুঝলাম। এত রাত করে বাড়ী ফেরা আমি পছন্দ করি না।

—বাঃ রে। তুমি বেড়াতে ভালবাসো না, আমি বাসি—

—আমি যা পছন্দ করি না, তা করবে না—খুব গম্ভীর হয়ে জলের পাইপের ফুট হিসাব করতে শুরু করল সে। সামনে ছাইদানিতে ফেলে-দেওয়া সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছিল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। আর সমুদ্রের হু-হু বাতাসে তার টি-এ বিলের কাগজগুলো কেমন বিশ্রী একটা খড়মড় আওয়াজ করে উড়ছিল। তুমি উর্মিলা, আর একটিও কথা না বলে চলে গিয়েছিলে। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে কি ভেবেছিলে মনে আছে, উর্মিলা?

আপন আপন স্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে পরস্পরকে ভালবাসা যায় না। পঁচিশ বছর ধরে একটু একটু করে যে চরিত্র গড়ে উঠেছে, সেটাকে কয়েকটা মন্ত্রের জোরে স্বামী হয়ে ভেঙ্গে দিতে চায়। এ কেমন জুলুম? তার চেয়ে এই তো বেশ, যে তুমি থাকবে তোমার পাইপ, ডায়নামো ফিট-করা জল-তোলা মেশিন আর কুলি-কামিন নিয়ে। আমি থাকবো আমার ইচ্ছা আমার পছন্দ নিয়ে। তোমার কাজ শেষ করে যদি সময় পাও আর ইচ্ছে হয় কাছে আসবে। বসবে। যদি আমাকে ভাল লাগে, ভালবাসবে। আদর করে ডাকবে। তা-না! সব সময় তোমার লোহা-পেটানো ইঞ্জিনীয়ারি জোর খাটাবে। কেন রে বাপু, আমার স্বভাবটা কি একটা লোহার রড, যে আগুনে তাতিয়ে আচ্ছা করে পেটালেই তোমার মনের মত আকৃতি নেবে!......

শোন মায়া, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না ভাই। আমার সেই গল্পটা বলি-বলি করেও বলা হচ্ছে না। অনেক বাজে কথা ভিড় করে আসছে। সেই গল্প শুরু করার আগে তোকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি ভাই। উপনিষদ বলে, প্রাণো বিরাট। জীবন—তোরা যাকে মরজীবন বলিস, তা একটা কিন্তু প্রাণের প্রবাহ অনন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে ভাই। প্রাণকে কেউ নিষ্পিষ্ট করতে পারে না।

তুই শুনলে অবাক হবি, আজও এই চল্লিশের কোঠায় এসে যৌবন যখন বার্ধক্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে চলেছে তখনও আমি একটি সজীব প্রাণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। মায়া, তোর শুনতে অবাক লাগছে না, চল্লিশ বছরের একটি বাঙালী মেয়ের চোখে এখনও—এখনও স্বপ্ন নেমে আসে।

আমি ভেবে দেখলাম, স্বামী-স্ত্রী'র সম্বন্ধের সেই সনাতন বন্ধন মেনে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকলে, দুজনেই তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবো। তাই তাকে মুক্তি দিয়ে চলে এলাম।

কলকাতায় এসে জীবনটাকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করলাম। স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকা যায় কিনা ভাবতে লাগলাম।

একদা দর্শনে অনার্স পড়েছিলাম। সবাই বলল, এম-এ-টা দিয়ে দাও। কলেজে অধ্যাপনা করো। নতুন নতুন ছাত্রী আর বইয়ের সংস্পর্শে তোমার মনটা সজীব হয়ে উঠবে। বই আর পড়াশুনা যারা ভালবাসে, তাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাইন—এই প্রফেসারী।

পাশ করলাম এম-এ। হলাম অধ্যাপিকা। কিন্তু—কিন্তু সব নতুনই এক দিন পুরানো হয়ে যায়। কলেজে পড়াই আর দেখি কলেজের শিক্ষকরাও অত্যন্ত—অত্যন্ত সাধারণ এক চাকুরী-জীবী ছাড়া আর কিছুই না। কারো কোন 'আউটলুক' নেই। কিসে দুটো পয়সা আসে; কোথায় ভাল টিউশানি পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিদ্যার নয়, বস্তুর সাধনা করে চলেছে। এদের ভেতরে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে গেলাম। মনের ভেতরে জেগে উঠল সেই নিরাকার নিরুদ্ধ অস্থিরতা।

হয়ত তোর কাছে এ সব কথা একটু ধোঁয়াটে লাগছে। ভাবছিস কি ও চায়? আমার চাওয়াটা খুবই সামান্য ভাই। ইঞ্জিনীয়ার হও, ডাক্তার হও আর অধ্যাপকই হও না কেন, জীবিকা যার যাই হোক—সেই জীবিকার পায়েই প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয় সঁপে দেবে কেন মানুষ? কেন তার স্বপ্ন দেউলে হয়ে যাবে? টাকা রোজগার, বাড়ী করা, ওপরের পোস্টে যাওয়ার চেষ্টা—এই সব ছোট ছোট স্বার্থের প্রহরীরা জীবনকে পাহারা দেবে কেন?

দূর-আকাশে চাঁদ ওঠে। চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধা তার বুকের সৌরভ উজাড় করে রাতের বাতাস ভারী করে তোলে। শুধু প্রকৃতিতে নয়—এ যুগের বস্তুবাদী মানুষের জীবনেও প্রাণের লীলা কখনও সখনও দেখা যায়। পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এখনও কেউ কেউ। হিমালয়ের কোন দুর্গম গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে তুহিনশীতল বরফের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রাণ দেয়। আমি—

আমি এই প্রাণময় জীবন বড় ভালবাসি মায়া। কয়েক মাস আগে। একদিন মেডিকেল কলেজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য সর্টকাট করে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে পড়বো। হঠাৎ দেখি, ব্লাড ব্যাংক লেখা সাইনবোর্ডটার সামনে একটি বিদেশী যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একটা ভিখারী। খক খক করে কাশছে। কাশের সঙ্গে দলা দলা রক্ত উঠে আসছে—

—টি-বি-র ওয়ার্ডটা কোথায় বলতে পারেন ম্যাডাম?

—আপনি একে কোথায় পেলেন?

রাস্তায় বসে কাশছিল।

—রাস্তায়! অবাক হয়ে ভাবলাম, রাস্তার যুবকটির জন্য সাগরপারের যুবকটির মনে এত মমতা!

—আপনাদের দেশের লোক অদ্ভুত ম্যাডাম—স্ট্রেঞ্জ! লোকটা কেশে কেশে মরে যাচ্ছে। রাস্তার লোক দিব্যি একবার তার দিকে তাকিয়েই চলে যাচ্ছে। তার মুখে ঘৃণার ছায়া ফুটে উঠল।

প্রশস্ত কপাল তারুণ্যের তেজে জ্বলজ্বল করছে। আর কিসের যেন প্রেরণায় ছটফট করছে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন ঘন নীল চোখদুটো।

আমার মন বলে উঠল, এই সেই দুর্লভ মানুষ, যে আত্মকেন্দ্রিক নয়, যার চোখে স্বপ্ন আছে আর আছে নিশ্চয় ওর বুকের ভেতরে উত্তাল সমুদ্রের মত একটা উদ্দাম প্রাণ!

আলাপ হলো।

ডেনমার্কে বাড়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসীদের হাতে বন্দী হয়ে বার্লিনে থাকে দেড়বছর। জেল থেকে পালায়। কোনরকমে সমুদ্রের ধারে এসে একটা ডেনিশ জাহাজ ধরে আসে অস্ট্রিয়ায়। ভিয়েনায় এক পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করে কয়েক বছর কিন্তু কোন একটা কাজ বাঁধাধাঁধিভাবে দীর্ঘদিন তার করতে ভাল লাগে না। যুদ্ধ শেষ হতেই আবার দেশে ফিরে যেয়ে ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেই সে এসেছে ভারতবর্ষে। এদেশের

সমাজব্যবস্থা ও ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দেখতে এসেছে।

—আপনি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করবেন ম্যাডাম?

—নিশ্চয়ই।

সেই শুরু হল। তাকে নিয়ে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দিনের পর দিন ঝড়ের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কলকাতার অভিজাত পল্লী বালিগঞ্জ, পাইকপাড়া, চৌরঙ্গীতে নিয়ে যেতে চাইলেই হ্যানস বলতো—উহুঁ—উহুঁ ওখানে আপনাদের জীবন আর্টিফিসিয়েল—বস্তীতে চলুন—

গ্রে স্ট্রীট ধরে সোজা পুবে যেয়ে গোয়াবাগান বস্তি। সেখানে চারিদিকে

না—এই অবস্থায় মানুষ গান করতে পারে!

কলকাতার বাইরে নিয়ে গিয়েছি। দমদম, বারাকপুর, নৈহাটী—ওদিকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে কাজ করছে চাষীরা, কাঠ কাটছে দেহাতী মানুষ। জ্বালানি করবে। কোথাও খেজুর গাছ ঝুড়ছে। কে কি করছে—কেন করছে—সব বুঝিয়ে দিলাম।

—আচ্ছা, যে যা করছে, ওটাই ওদের একমাত্র জীবিকা?

—হ্যাঁ।

—কত মজুরী।

"তুমি বেড়াতে ভালবাসো না, আমি বাসি।"

বীভৎস নোংরা দেখে আঁতকে উঠেছে। আবার স্যাঁতসেঁতে নোনাধরা ঘরের মেঝেতে বসে কোন মা-কে দেখেছে—বাচ্চাকে আদর করছে; কোথাও বা ঘন হয়ে বর্ষা নেমেছে, জলে থৈথৈ করছে ঘর। বস্তি ভাসছে। ঘরের জল গামলা দিয়ে ছেঁচে ফেলে দিতে দিতে কোন তরুণী গুনগুন করে গান ধরেছে।

—স্পেলণ্ডিড! সুপার্ব।

—কেন?

—এত দুঃখেও এদের প্রাণ মরেনি! একটু গম্ভীর হল হ্যানস। বলল, আমাদের দেশের লোক ভাবতেই পারে

—কত আর—দিনে দেড়টাকা দুটাকা হবে।

—ওনলি ওয়ান এ্যাণ্ড হাফ রুপি! ওয়াণ্ডারফুল! কত অল্পে সন্তুষ্ট তোমাদের দেশের লোক। এই দেড়টাকা পেয়েও মাঠে ধান কাটে গান গেয়ে!

হ্যানস আনন্দিত হতো। উচ্ছ্বসিত হতো। আমি চুপ করে থাকতাম আর ভাবতাম, আমাদের দেশের 'ইন্টেলিজেন্সিয়া' অর্থাৎ শিক্ষিত জনসমাজ তোমাদের দেশের মতই বস্তুবাদী। 'সাপেক্ষ সুখমণ্ডিত' তাদেরও জীবনের মূলমন্ত্র। সে যাই হোক—

আমি যে ধরনের মানুষ পছন্দ করি, হ্যানস ঠিক সেই রকম লোক। হাসে হো হো করে। অট্টহাসির শব্দ চারিদিকে বয়ে যায় লহরে লহরে। কথা বলে চড়া গলায়। ওকে দেখে মনে হতো, একটা উদ্দাম প্রাণের আবর্ত যেন ওর ভেতরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে নিশব্দে।

আর সবচেয়ে তার বড় গুণ কি জানিস মায়া। যদিও হ্যানস সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষক, তবুও ওর কাব্যময় মন ছিল। ছিল কবিদৃষ্টি।

হালকা সবুজ শাড়ি পরে একদিন তাকে নিয়ে গিয়েছি টিটাগড়ে। সেখানে কুলিদের মহল্লা দেখে আমরা বারাকপুর গান্ধীঘাটে গিয়েছিলাম। গঙ্গায় জোয়ার এসেছিল। ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছিল ছোট ছোট ঢেউ। আর ওপারে শ্রীরামপুর-কোন্নগরের আকাশে কালো মেঘে বর্ষার সমারোহ ঘন হয়ে উঠেছিল। হুহু বাতাসে আমার চুল উড়ছিল, উড়ছিল আমার শাড়ির আঁচল।

—বাঃ স্প্লেনডিড্! আপনাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ম্যাডাম—

—কি রকম?

—বিক্ষুব্ধ এক ঝড়ো জীবনের ভেতর দিয়ে চলেছেন আপনি। ঘনঘোর দুর্যোগের ভেতর দিয়ে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। তবুও আপনি দৃঢ় পায়ে চলেছেন! আপনার পুরুষালি লম্বা চেহারাটায় আর চোখেমুখে কঠোর প্রতিজ্ঞার ছাপ।

কোপেনহেগেন আর কলকাতা। পুরুষমানুষের স্বভাব সর্বত্র একরকম। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে ছেলেরা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বিদেশে গবেষণা করতে এসে ইডেন গার্ডেন, ভিকটোরিয়া মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ আর আউটরামের ঘাটের সন্ধ্যা হ্যানসের জীবনে মিষ্টি রোমাঞ্চকর স্মৃতির সম্পদ হয়ে রইল। বেলুড়মঠের সবুজ মাঠের আর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর বায়ুসেবীরা কত শান্ত সন্ধ্যায় দেখত এক বিদেশীর যুবকের হাত ধরে চলেছে বাঙালী মেয়ে। কিন্তু তারা জানতো না, কত অসংখ্যবার বাঙলা-দেশের তরুণ প্রেমিকের মত সাগরপারের এই তরুণটিও ধরা গলায় বলতো, তোমার প্রেরণায় আমার কাজ কত এগিয়ে গিয়েছে......

না। মায়া, হ্যানসকে নিয়ে কোন অসম্ভব দেখার মত বোকা মেয়ে ভাবিস না আমাকে। তবুও—

তবুও সৃষ্টির সেই আদিকালের খেলাই তো। মেয়েদের বুঝতে একটুও দেরি হয় না এ খেলা। কিন্তু কোপেন-হেগেন ইউনিভার্সিটি থেকে যেদিন তাড়া এল, সেদিন হ্যানস আবার নতুন করে প্রমাণ করে দিল, কত ও সেবামানীর

উপাখ্যান মিথ্যা নয়। বৃহস্পতিপুরে কচের ভেতর দিয়ে যেন দুনিয়ার সমস্ত পুরুষের স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক আর কাজ-পাগল মনের প্রতিফলন হয়েছে। কাঁথি-দীঘায় সেই ইরিগেশান ডিপার্ট-মেন্টের ইঞ্জিনীয়ারই শুধু নয়, কাজ অর্থাৎ ডিউটি ছাড়া পুরুষরা আর কিছু বোঝে না। এমন কেজো ভূত, এমন প্র্যাকটিক্যাল জীব আর দুটি নেই পৃথিবীতে।.........

একটু থামো। তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছো উর্মিলা। উঠে এসে একটু খোলা জানালার সামনে দাঁড়াও। দেখবে আলিপুর পার্ক রোডের দুধারে সবুজ সবুজ আবছায়া অন্ধকার জড়ানো ঝাউ-বনের ওপরে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোন অদৃশ্য হাত একটু একটু করে আলো ছড়াচ্ছে। সুসুপ্ত প্রকৃতি আশা করছে, চাঁদ উঠবে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ!

উর্মিলা, আকাশের এই জ্যোৎস্নার আভা, দেবদারুবীথি, ঝাউবন আর ভুতুড়ে অন্ধকারে ঢাকা ঐ শিরিষগাছ-গুলো মিলিয়ে নিশীথ রাত্রির রহস্যময় পৃথিবীটা তোমার বড় আপন মনে হচ্ছে না?

হচ্ছে। হবে জানি। কিন্তু কাছে এস, হোস্টেলের ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এস। দেখবে পায়ে পায়ে ভয় আর কত রকমের বিপদ তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। প্রতিদিনের ব্যবহারে আর সান্নিধ্যে মলিন হয় না বলেই আকাশের মেঘ অত সুন্দর! দূর থেকে হয়তো ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারকেও তোমার ভাল লাগতো।

তুমি দর্শনে অনার্স পড়েছ উর্মিলা, কিন্তু দর্শনকে তুমি তোমার জীবন-বোধের ভেতরে ব্যাপ্ত করে দিতে পারোনি। তোমার অনার্সের ডিগ্রি নিছক প্রাণহীন একটা আসবাবের মত। তুমি কি জানো না, তোমার চাওয়াটা—তোমার সেই স্বপ্নের মানুষটি, তোমারই মনের ইচ্ছার সৃষ্টি। 'দি ওয়ার্ল্ড এ্যাজ মাই উইল (will)' তোমার এই ইচ্ছার সঙ্গে অন্য লোকের ইচ্ছা নাও মিলতে পারে! তাই বলে ছেড়ে আসতে হবে.........

শোন মায়া, এবার তোকে বলবই সেই গল্পটা। আমার জীবনের প্রায় সব গল্পই তুই শুনেছিস। এবারেরটা অদ্ভুত!

খরস্রোতা নদীর বুকের ভেতরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখে জেলেরা মাছ ধরার জন্য—দেখেছিস তো? আমার মনে হয়, আমি সেই বাঁশের খুঁটি। আমার চারিদিক দিয়ে হ্যানসের মত আরও অনেকের উদ্দাম ভালবাসার স্রোত বয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু খুঁটির মত দাঁড়িয়েই আছি। আজও আমাকে কেউ ভালবাসছে দেখলে আশা হয়, আনন্দ হয়,' আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার খুব ভয়—খুব আতঙ্ক—মরবাঁধার সেই দুর্মর বাসনায়। সংসার করলে আবার যদি ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারের মত তার পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমার ওপর চাপিয়ে দেয় —শুধু স্বামী বলে! আমি মেয়ে। কিন্তু মানুষ। আমারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—আত্মা আছে—যদি এসব কিছু—কিছুই মানতে না চায়। আরও—আরও—ভয় আছে। দৈনন্দিনতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, সংসারের কাদামাটি লেগে যদি সেই স্বপ্নের মানুষটি যে দিনের পর দিন কত রঙীন স্বপ্নের কথা বলছে, কত অসংখ্য মুহূর্তকে ছন্দোসুরভিত করে তুলেছে—সে যদি রুক্ষ, নীরস আর সহানুভূতিহীন হয়ে যায়। যে গানের সুর মধুর, সেই গানটাই শেষের গান হওয়া ভাল নয় কি মায়া! মধুর রেশটুকু থাক। স্বপ্নটুকু থাক। কিন্তু—

এবার যে এসেছে সে যেন বর্ষার ভরা নদীতে নৌকো ছেড়েছে। পালে লেগেছে হাওয়া। আর উন্মত্ত একটা গতির আনন্দে ভেসে চলেছে। সে যেন কখনো থেমে থাকতে জানে না। বিশ্রাম জানে না। বহুকালের স্থবির কোন নিভু নিভু নক্ষত্রের কাছে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড!

অদ্ভুত ভাল ছবি আঁকে। হয় ঝড়ের ছবি, না হয় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ছবি। যাতে প্রচণ্ড কোন গতি নেই এমন ছবি সে আঁকে না!

বেড়াতে বেরোলে ওর সঙ্গে ছুটে ছুটে হাঁফ ধরে যায়। বেড়ানোর জায়গা-গুলোও অদ্ভুত! চলো হাওড়া স্টেশন। কাটো টিকিট। ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে ব্যাণ্ডেল। ব্যাণ্ডেলে-চুঁচুড়ায় বেড়িয়ে আবার ট্রেনে কলকাতা? উঁহু, তাহলে আর বৈশিষ্ট্য কি! স্টীমলঞ্চে পার হও গঙ্গা। চলো নৈহাটী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী দেখে শ্যামনগরে কালীবাড়ীর সামনে গঙ্গার পাড়ে কিছুক্ষণ বসে দূরে ওপারে চন্দননগরের আলোর মালার ঝিলিমিলি দেখে সেই রাত্রে বাড়ী ফেরা!

আমার কি মনে হয় জানিস মায়া, সেই স্বপ্ন দেখার সবুজ বয়সে,—সেই উথাল-পাতাল উনিশ-কুড়িতে যে পুরুষের ছবি মনে মনে এঁকেছি—সে এই দীর্ঘ বিশ বছর পরে কোথায় থেকে এল? বারে বারে মনে হয়, সে আসাই এলো, তবে বড্ড—বড্ড দেরি করে এলো! হ্যানসকে ভালো লেগেছিল। আরো অনেককে ভালবেসেছিলাম কিন্তু এই-রকম কখনও হয়নি মায়া, সবসময় কেমন জ্বরজ্বর ভাব। মাথায় কানের দুপাশে কেমন একটা জ্বালাধরা অনুভূতি। পড়তে গেলে তার কথা মনে আসে। ঘুমোতে গেলে তার মুখ চোখ ভাসে। তাহলে চল্লিশ বছর বয়সে কি প্রথম ভালবাসার স্বাদ পেলাম। এই কি তবে প্রথম পুরুষ.........

ভুল-ভুল উর্মিলা, যা তুমি পাওনি, সেই না-পাওয়ার বেদনাটা তোমার চোখের সামনে পাওয়ার একটা রঙীন ছবি তুলে ধরে। মেয়ে হয়ে জন্মেছো। অথচ নারী-জীবনের কোন সাধ তোমার পূরণ হয়নি। তাই তোমার রক্তের ভেতরে জীবাণুর মত কিলবিল করে হাজারো আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যই যে পুরুষই তোমার জীবনে আসে—তাকেই তুমি মোহের চোখে দেখ।

উর্মিলা, এই কল্পনাপ্রবণ আর্টিস্ট ছেলেটির কথা এমন করে ভেব না। তুমি দুঃখ পাবে। তাকে দুঃখ দেবে। তার চেয়ে তুমি এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দাও। তুমি প্রাচ্য বিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যাপিকা। কতলোক তোমাকে সম্মান করে। তোমার এ ছেলেমানুষী মানায় না।

চিঠি রেখে উঠে এস। দেখ, আকাশের যেখানে একটু আগে কোন অদৃশ্য হাত আলো ছড়াচ্ছিল, সেখানে বৈষ্ণবের কপালের তিলকের মত বাঁকা চাঁদ উঠছে। চাঁদ উঠছে উর্মিলা—চাঁদ উঠছে। ঝাউবন, দেবদারুবীথি আর বর্ধমান রোডের দুধারে নিবিড় শিরিষ গাছের সারি কেমন আবছায়া স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় এই নিশি রাত তোমার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত করুণ অনুভূতি জাগিয়ে দেবে। শোঁ শোঁ বাতাস তোমার কানের কাছে বলবে—কত বড় এই পৃথিবী! কত কোটি কোটি অসংখ্য অগনন জীবন! তোমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আশা স্বপ্ন এখানে কত তুচ্ছ—কত অকিঞ্চিৎকর। একান্ত করে তোমারই সুখদুঃখের স্বার্থ আশা-নিরাশার স্বপ্নের দুর্গ থেকে তোমার মনকে বৃহত্তের ভেতরে, মহত্তের ভেতরে অদ্ভুত একটা উদার অনুভবের ভেতরে নিয়ে যাবে এই ম্লান চাঁদের আলোয় ভরা মধ্যরাত্রি...

ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে কেমন হয়েছে জানিস মায়া? যখন সকালের রোদ হোস্টেলের বাগানে লুটিয়ে পড়ে, কামিনীর ঝাড়, চন্দ্রমল্লিকা আর বেলী রোদ গায়ে মেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে, তখন কেন যেন ভেতরে ভেতরে খুব জোর পাই। মনে হয়,

কিছুই অসম্ভব নয়। আমি পারবো—পারবো অশান্ত সেই ঋতুকে বুক পেতে গ্রহণ করতে। আর অমনি মনের পটে ছবির পর ছবি ফুটে উঠতে শুরু করে। বেনারসী শাড়ি... আলো... লোকজন... হৈ হৈ ভিড় আর চীৎকার! যুঁইফুলের পাঁপড়ির মত চন্দনের ফোঁটা দেওয়া মুখাবরব। ঠোঁটের প্রান্তে লাজুক হাসির ঝিকিমিকি! আরও কত—কত স্বপ্ন দেখি আর বুকের ভেতরটা অজানা একটা ব্যথায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চায়—সেই সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিষ্টি অনুভূতি।

আবার যেই গাছপালায় ঘেরা বর্ধমান রোডের সেই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হোস্টেলের চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামে। ঝাপসা অন্ধকার একটু একটু করে দূরে নিউ আলিপুরের বড় বড় বাড়ীগুলোকে অবয়বহীন করে তোলে, তখন কেন যেন মনে হয় আমার মনের ভেতরের আশার রঙীন শিশুদের ওই অন্ধকার গ্রাস করতে আসছে। আমার মনের সব স্বপ্নকে মুছে দেয় এই আসন্ন রাত্রির অন্ধকার। মনে হয়, না—না ভুল—সব ভুল। কখনো কেউ আমাকে ভালবাসেনি। বাসবে না। হোস্টেলের এই অন্ধকার ঘরেই সে যেন অনন্তকাল ধরে বন্দী হয়ে আছে। থাকবে। এখান থেকে কেউ তাকে আলোর রাজ্যে, জীবনের ভেতর নিয়ে যাবে না। তারপর—তারপরে একদিন শ্বাসরোধী অন্ধকার ঘেরা এই ঘরেই মৃত্যু এসে দাঁড়াবে। আর তার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে।

আলো-নেভানো অন্ধকার ঘরে নিজের অজানিতেই কখন হাত উঠে আসে মুখে, গালে, কপালে-গালের হাড়-দুটো উঁচু উঁচু মনে হয়। আর বেশ বুঝতে পারি চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। গালের হাড়দুটোর ওপরে জলের ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে জমে থাকে। তারপর কখন আমার ঘুম আসে আর বাতাসের ভেতরে অক্সিজেনের কল্যাণে জল শুকিয়ে যায় (ভাগ্যিস বাতাসে অক্সিজেন ছিল), শুধু দাগটা থাকে। ঘুম ভেঙে গেলেই চোখের নীচে হাত বুলাই! চোখের নীচে কি কালির দাগ পড়েছে। চোখের জলের দাগটা কি পুরানো ঘায়ের মত মনে হচ্ছে? কখন—কখন ভোর হবে। সকাল হবে। প্রাতঃকালীন প্রসাধনের সময় পাউডার পমেডের প্রলেপে রাত্রির দুশ্চিন্তার সব স্বাক্ষর তুলে ফেলে দেবো। ভোরের আলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি মায়া!

ভোর হয়। বহুকালের পুরানো এই পৃথিবীটা নতুন সাজে সেজে ফিক-ফিক করে হাসে। আমিও অভিসারিকার বেশে সেজে তার বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। দ্রৌপদীর শাড়ির মত রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কেন অফুরান হয় না। কিন্তু তা হয় না। আবার রাত্রি আসে।

তোরা যে যাই বল মায়া, চল্লিশ বছরে আবার বিয়ের সাজে সাজলাম। কলকাতার শ্রেষ্ঠ ইংরাজী বাজনা আনালাম। অনেক - অনেক আলো দিয়ে ভাড়া-করা বিয়েবাড়ীকেই ইন্দ্রপুরী করে তুললাম। এল সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী যে যেখানে আছে। লোকে লোকারণ্য বাড়ী। চারিদিকে মেয়েদের রঙীন ভিড়। এখানে-ওখানে জল-তরঙ্গের মত হাসির শব্দ। টুকরো-টুকরো কথা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সকলের মুখেই এক কথা! এই বয়সেও কী সুন্দর মানিয়েছে উর্মিলাকে। বাড়ীর চারিদিকে মঙ্গলশঙ্খের শব্দ—

ভোরে মেটাল বক্স কোম্পানীর সিটি দেওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। সকালের আলোয় আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় লজ্জা পেলাম মায়া। দুঃখও হল। ছিঃ ছিঃ এই বয়সেও বিয়ের স্বপ্ন দেখছি। এখনও - এখনও তাহলে স্বপ্ন আছে। মনে হল, কোন উপায়ে এই স্বপ্নটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না? যদি এই খানেই ছেদ টেনে দেওয়া যায়—তাহলে এই মধুর অনুভূতিটাই সত্য হয়ে থাকবে। বেশি চাইতে গেলে যদি সব হারায়—যদি সে-ও ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারের মত হয়ে যায়, রক্তের ভেতরে আবার সেই ভয়ের বীজাণু আবার কিলবিল করে উঠল। সেইদিনই—

সেইদিনই বুঝলি মায়া,—তোকে বলতে বড় কষ্ট হচ্ছে—কি করলাম জানিস? তাকে ডেকে নিয়ে গেলাম ভিক্টোরিয়া মনুমেন্টের মাঠে। কাছে-দূরে যতদূর চোখ যায় সমস্ত মাঠজুড়ে কেমন সবুজ অন্ধকার! শোঁ শোঁ বাতাসে প্রেতিনীর কান্নার শব্দ। আমার ভালবাসার মানুষটির হাতে হাত রাখলাম।

—তুমি কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বলো, চুপচাপ আছো কেন?

আমার বুকের ভেতরে যেন রাতের অন্ধকারে ঢাকা গড়ের মাঠের বাতাস মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরছে। শরীরের সব শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছে। মাথার ভেতরে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে।

—বলো। ও কি তুমি কাঁদছো!

আমি আর সামলাতে পারলাম না। বললাম সেই কথা যা আমি বহুজনকে বলেছি। কিন্তু এত কষ্ট কখনও হয়নি। ঢোক গিলে থেমে থেমে বললাম পারবো না—হবে না—আমি—

—পারবো না? সে যেন আঁতকে উঠল। আর আমি সেই আবছায়া অন্ধকারে একটা কান্নাকে বহন করে ঝড়ের মত ছুটে পালিয়ে এলাম। বুঝলি মায়া, একেবারে পালিয়েই এলাম.........

উর্মিলা! বাইরে তাকিয়ে দেখ, রাত্রির অন্ধকারের দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন পৃথিবীর দূরদিগন্তে একটু একটু করে ভোরের আভা জাগছে। চিঠি রেখে উঠে এস উর্মিলা। এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভোরের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বৃহত্তের ভেতরে মনটাকে ছড়িয়ে দাও। ভেবে দেখ, বহুকালের পুরানো, জীর্ণ এই পৃথিবীও সকালের সোনার রোদে ঝলমল করে উঠবে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও তোমার ও মরালী-মন কল্পনার পাখায় ভর করে কোন নিরুদ্দেশ শূন্যে আজও—আজও উধাও হয়ে যায়। এখন—এখনও তুমি স্বপ্ন দেখ। তোমার মনে তারুণ্যের স্পর্শ রয়েছে। তোমার বেদনাদীর্ণ দীর্ঘ জীবনের ঘন অন্ধকারের ভেতরে আশা আর স্বপ্ন-গুলোকে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রেখে পরমায়ুর বাদবাকী দিনগুলো হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারো না?

সূর্য উঠছে—সূর্য উঠছে উর্মিলা! দেখ চারিদিকে ঈশ্বরের অপার মহিমার কী লীলা! গাছের পাতায় পাতায় প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবীর দিকে দিকে জীবনের অন্তহীন প্রবাহ বয়ে চলেছে! তোমার বন্ধুর কাছে লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেল উর্মিলা! তুমি যে দুর্বল—ভয়ঙ্কর দুর্বল আর খুব দুঃখী, —এই নির্মম সত্যটার বেদনা-করুণ একটা রাগিণীই কি তোমার চিঠির ছত্রে ছত্রে বাজছে না? জেনে রেখ জীবন-বিমুখতা মৃত্যুর নামান্তর আর দুঃখ, শোক হতাশার চেয়েও জীবন অনেক—অনেক বড়। এই সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়ে ছিঁড়ে ফেল—ছিঁড়ে ফেল উর্মিলা তোমার এই চিঠি।

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

গত ২৩শে নভেম্বর 'পেইন্টার্স' এন্ড স্কাল্পটরস এসোসিয়েশন' আর্টিস্ট্রি হাউসে তাঁদের সংস্থার প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তৈলচিত্র, জলরং, প্যাস্টেল, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে উন-চল্লিশটি শিল্পবস্তু দেখান হয়েছে। এ'রা এক গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও কোন এক বিশেষ শৈলীর অনুগামী নন। মূর্ত এবং বিমূর্ত দু-রকম ছবিরই চর্চা করেন দেখা গেল। ছোট দু-খানি ঘরের মধ্যে ছবি সাজান ভালই হয়েছে। লালুপ্রসাদ সাহা 'ফ্লাওয়ার ভাস' (১) ছবিতে বেশ একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন। ইশা মহম্মদ-এর 'অফিস মেশিন' (৪) ছবিটির বর্ণপ্রয়োগ সুন্দর। দেবদাস ব্যানার্জীর দু-খানি প্যাস্টেলে কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় (২৬, ২৭)। ভাস্কর্যের মধ্যে চিন্তামণি করের 'মনোলিথ' (২৮) আকারে বৃহৎ। সুরেজিৎ দাসের 'মিল্ক মেইড' (৩২) এবং নির্মলেশ দেও ধবল দেও-এর 'সুইমার্স' (৩৫) ও 'গেইশা গার্ল' (৩৬)-এ সুন্দর একটি ছন্দবোধ আছে। সমস্ত প্রদর্শনীতে একটা নিম্নতম মান রাখার চেষ্টা আছে।

১লা ডিসেম্বর 'ইন্ডো কন্টিনেন্টাল আর্টিস্ট' সংস্থার শিল্পী শ্রীমতী সম্প্রীতি দেবীর একটি একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গৃহে। সম্প্রীতি দেবী কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিল্প শিক্ষা-লাভ করেননি। অপরের সাহায্য বিনা যেটুকু শিল্পবিদ্যা আয়ত্ব করা সম্ভব তাই করেছেন। শিল্পী-জীবনের গোড়া থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত আঁকা ছত্রিশটি জল রং ও তেল রংয়ের ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী করা হয়েছে। মনে

ভাস্কর্য-শিল্পী নির্মলেশ দেও ধবল দেও কর্তৃক সৃষ্ট 'গেইশা গার্ল' (কাঠের)।

হয় ছবি বাছাইয়ে বেশী সময় দেওয়া হয়নি। ফলে ছবির মান ঠিক উঁচু রাখা যায়নি। আশা করি এর পরের প্রদর্শনীতে আরো ভাল ছবি দেখতে পাবো।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্য গত ৬ই ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস চার থেকে পনেরো বছরের ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পশ্চিম-বঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী এর উদ্বোধন করেন। দেশের সংকটের সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পেছিয়ে থাকেনি। তাদের সাধ্যমত শিল্পকার্য নিয়ে দেশের সাহায্যে তারাও এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা দুশো পঁয়তাল্লিশটি ছবির এই প্রদর্শনীটি সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে মূক বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলি চমৎকার। প্রদর্শনীটি ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে। আশা করি প্রদর্শনীর মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে।

এযুগের কমনওয়েলথ শিল্প

গত ৬ই নভেম্বর রাণী এলিজাবেথ লণ্ডনে যে নূতন কমনওয়েলথ ইনস্টি-ট্যুটের উদ্বোধন করেন, তারই আর্ট গ্যালারিতে "কমনওয়েলথ আর্ট টুডে" বা "এযুগের কমনওয়েলথ শিল্প" নামক এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে; এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেছে ভারত সহ ২৪টি কমনওয়েলথ দেশ।

প্রদর্শনীটি ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। প্রদর্শনীর লক্ষ্যই হল কমন-ওয়েলথ এযুগে কি ধরণের উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপাদন করতে পারছে তারই পরিচয় দান করা।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ১৮৫টি নিদর্শন। ১৭০ জন শিল্পী (সকলেই জীবিত) এতে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এই শিল্পকর্মগুলি প্রথম পর্যায়ে ২৪টি দেশের প্রত্যেকটির শিল্প কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়; প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নির্বাচন হয় ব্রিটেনে। নির্বাচিত শিল্প-কর্মগুলির একটা বড় অংশ আসে ভারত, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে।

প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রস্তুত করেছেন, এই

শিল্পী : সম্প্রীতি দেবী

ক্যাটালগের ভূমিকায় প্রত্যেকটি দেশের শিল্প চর্চার একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণী প্রদান করা হয়েছে; এই বিবরণী যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই শিল্প বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় নিদর্শনগুলির জন্য এই বিবরণী লিখেছেন শ্রী বি, সি, স্যান্যাল। তিনি ভারতীয় শিল্পে "বেঙ্গল স্কুল মুভমেণ্ট" কিভাবে নব-জীবন সঞ্চারিত করেছে তার বর্ণনা করে বলেন, "ভারতীয় শিল্পের যত রকমের ব্যাখ্যাই হোক না কেন একথা ঠিক যে, এই শিল্প সর্বাবস্থায় ভারতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে।"

সবশুদ্ধ ২২টি ভারতীয় শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। এর অধিকাংশই জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত এবং বিশেষভাবে অবিনাশ চন্দ্রের "কল্প ফল"-এর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। চিত্রটিতে কমলা রঙ ও হলদে রঙ এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা পশ্চিমী বিচারকদের মতে ঐতিহ্যগত-ভাবে ভারতীয়।

অরুণ বসুর "ম্যান উইথ গোট" চিত্রটিতে পিকাসোর প্রভাব সুস্পষ্ট; কে, শ্রীনিবাসালুর "আর্থ অ্যান্ড লাইফ" চিত্রটিতে শিল্পীর প্রাতিস্বিকতা এতদূর স্পষ্ট যে, অন্যান্য চিত্রের মধ্য থেকে এটিকে সহজেই আলাদা করা যায়। আর একটি আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম হল রাঘব কানেরিয়ার ব্রোঞ্জ নির্মিত গোবৎস, ভারত সরকার এই বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য শিল্পকর্মটি ধার দেন।

ব্রিটিশ বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রাহাম সাদার্ল্যান্ড ও ভিকটর প্যাসমোর-এর কয়েকটি সম্প্রতি অঙ্কিত চিত্র; হেনরি মুরের তৈরি এক বিরাট উল্লম্বী মূর্তির দুদিকে এই চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়েছে; এই মূর্তিটিও এবার এখানে প্রথম প্রদর্শিত হল।

॥ ছয়-রাষ্ট্র সম্মেলন ॥

চীন ও ভারতের বিরোধ মীমাংসাকল্পে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক বিশেষ উদ্যোগী হন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি সিংহল সমেত এসিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন কলম্বোয় আহ্বানের প্রস্তাব করেন। অপর যে পাঁচটি রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের নাম কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই শ্রীমতী বন্দরনায়েকের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ১০ই ডিসেম্বর হতে কলম্বোয় এই ছয়-রাষ্ট্র সম্মেলন শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান অবাঞ্ছিত বিরোধের মীমাংসাকল্পে সিংহল ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির এই উদ্যোগকে ভারত পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং তাদের কাছে ভারতের পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে যাত্রা করেন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও আফ্রিকা ও আরব রাজ্যগুলিতে যান আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন ও ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীআর কে নেহরু। ভারতের সকল প্রতিনিধিই সফরান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁদের দৌত্য সফল হয়েছে। সকল দেশই তাঁদের বক্তব্য ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছে এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের অনেক ভুল ধারণা নিরসন হয়েছে।

অপর পক্ষে, ৫ই ডিসেম্বর পিকিঙ থেকে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, কলম্বো সম্মেলন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই চীনের কূটনৈতিক মহলে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে। এই সম্মেলন আহূত হওয়ার ব্যাপারে চীন প্রথমে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল, কিন্তু এখন চীন এব্যাপারে মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে, সম্মেলনে কোন রাষ্ট্রই চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব যা ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের সীমান্তে স্থিতাবস্থা সৃষ্টির দাবীতে সমর্থন

গুপ্তচর হতে সাবধান।

জানাবে না। এমন কি চীনের সবচেয়ে বড় সমর্থক বলে প্রচারিত ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকেও যে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা হয়েছে তাতে নাকি চীনকে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই চীন নাকি ইন্দোনেশিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে যে ঐ প্রস্তাব তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না।

॥ মিগ বিমান ॥

মিগ বিমান সম্পর্কিত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের অবসান হ'য়েছে।

কিছুদিন আগে এক সংবাদে বলা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারতে যে মিগ বিমান আসার কথা ছিল তা যথাসময়েই আসবে এবং মিগ বিমান পরিচালনার ট্রেনিং নিতে ইতিমধ্যেই আটজন বৈমানিক মস্কোয় চলে গেছেন। আর উড়িষ্যায় যে মিগ বিমানের কারখানা স্থাপনের কথা আছে তাও যথাসময়ে স্থাপিত হবে। কিন্তু এই সংবাদের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই আবার প্রচারিত হয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে মিগ বিমান সরবরাহ না করার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং ডিসেম্বর মাসে মিগ বিমানের যে প্রথম চালান আসার কথা ছিল তা আসবে না। ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভারতের বর্তমান নীতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাতে পরবর্তী সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবি কে নেহরু ও বৃটেনের কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান স্যান্ডসও এ সম্বন্ধে বলেন যে, কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভারতের সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে মিগ বিমান পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়ে যাবতীয় অনুমান ও গবেষণার প্রতিবাদ করে বলেছেন— সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে স্পষ্ট করে একথা জানিয়েছে যে, ভারতকে মিগ বিমান সরবরাহ ও ভারতে মিগ বিমান নির্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার মত কোন কারণই ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচবনও জানান যে, সোভিয়েট সরকার মস্কোস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই মাসের মধ্যেই অথবা তার "অল্প কিছু পরেই" প্রতিশ্রুত মিগ বিমান ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শুধু কিউবার গণ্ডগোলের জন্যই সব কাজ ঠিকমত সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। নইলে মিগ বিমানের প্রথম চালান ইতিমধ্যেই ভারতে এসে যেত। এরপরেও ১৯৬৩ ও '৬৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতিমত বিমান সরবরাহ করে যাবে এবং ভারতে বিমান নির্মাণের কারখানার কাজও শুরু হয়ে যাবে।

॥ ঘরে ॥

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ : কাশ্মীর সম্পর্কে পাক্-ভারত আলোচনার সিদ্ধান্ত—প্রারম্ভে মন্ত্রি-পর্যায়ে ও পরে নেহরু-আয়ুব বৈঠকের ব্যবস্থা—বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগের ফল।

'চীনের সর্বশেষ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা আরও বিভ্রান্তিকর'—কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের মন্তব্য।

শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর নূতন পত্র—সর্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে যুদ্ধবিরতি-ব্যবস্থা ভঙ্গের হুমকী।

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ : 'কাশ্মীর বিভাগের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার কথা ভিত্তিহীন'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

লেঃ জেনারেল বি এম কাউলের স্থলে লেঃ জেনারেল ম্যানেকশ ইস্টার্ণ কমাণ্ডের কোর কমাণ্ডার নিযুক্ত।

চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী—পিকিং-এর নিকট ভারতের নূতন লিপি প্রেরণ।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ : 'চীন এক তরফা সীমা স্থির করিতে পারে না'—চৌ-এর সর্বশেষ লিপির উত্তরে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সীমান্ত হইতে চীনা সৈন্য প্রত্যাহারের সঠিক সংবাদ ভারত সরকার অনবহিত—আক্রমণকারীরা সরিয়া গেলে পরিত্যক্ত এলাকায় অসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত—কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ : 'নেফা ও লডাক অঞ্চল হইতে চীনা সৈন্যদের অপসারণ করা হয় নাই'—কর্তৃপক্ষীয় সামরিক মহলের সংবাদ।

জাকার্তা হইতে ফিরিবার পথে বিমানে রাষ্ট্রপতির পুত্র ডঃ এস গোপাল (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধিকর্তা) ছুরিকাহত—সহযাত্রী আততায়ী গ্রেপ্তার।

'ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না : চীনা আক্রমণ প্রতিরোধই সমর প্রস্তুতির উদ্দেশ্য'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে শ্রীনেহরুর আশ্বাস।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ : 'আক্রমণকারী চীন—ভারত ছাড়'—চীনা বাণিজ্য দূতাবাসের (কলিকাতা) সম্মুখে দুর্জয় ছাত্রসমাজের সরোষ ধিক্কার—মহানগরীতে ছাত্রদের অভূতপূর্ব বিক্ষোভ মিছিল—সারা বাংলা চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ দিবস পালন।

'শুধু পিছন হইতে চীনাদের সৈন্যাপসরণের আভাস— পুরোবর্তী ঘাঁটিগুলিতে এখনও চীনাদের অবস্থান' —লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

ভারতের উপর দিয়া চীনের সর্বপ্রকার অসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ : 'প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসেই রাশিয়া ভারতে 'মিগ' বিমান পাঠাইবে'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

পাক্-ভারত সীমান্ত হইতে প্রচুর সৈন্য (ভারতীয়) অপসারিত,—প্রত্যাহৃত সৈন্যদের চীনের বিরুদ্ধে নিয়োগের ব্যবস্থা—ভারত সরকারের বিবৃতি।

'যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও ভারতীয় সৈন্যদের উপর চীনাদের গুলীবর্ষণ'—লোকসভায় শ্রীনেহরু।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে ভারতের পক্ষে সমর্থন আদায়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গের ইউরোপ (মস্কো সহ বিভিন্ন স্থান) সফরে যাত্রা।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ : 'হানাদার চীনা বাহিনীকে ভারতভূমি হইতে হটিতেই হইবে'—গৌহাটির জনসভায় শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা—গৌহাটি হইতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন সহ প্রধানমন্ত্রীর তেজপুরে উপস্থিতি।

কলিকাতার অসামরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে 'মাস্টার প্ল্যান' সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

॥ বাইরে ॥

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ : চীনে রাশিয়ার সমস্ত বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধের সংবাদ।

১লা ডিসেম্বর কলম্বো সম্মেলন (চীন-ভারত সংঘর্ষ প্রশ্নে সিংহলী প্রধানমন্ত্রী আহূত) অনুষ্ঠানের জন্য পিকিং-এর পীড়াপীড়ি—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সহ আফ্রো-এশীয় দেশগুলির উপর প্রবল চাপ।

ঢাকা হাইকোর্টে পাকিস্তানে দণ্ডিত লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্যের (ভারতীয়) হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন।

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ : পাঁচ বৎসরের জন্য উ থান্ত সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল নির্বাচিত।

ভারত সীমান্ত হইতে চীনা সৈন্যাপসরণ সুরু হইয়াছে বলিয়া পিকিং সরকারের দাবী।

১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় জাতি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (কলম্বো-এ আহূত) স্থগিত।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আক্রায় ঘানা প্রেসিডেন্ট নক্রুমার সহিত ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের আলোচনা।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ : সমগ্র সিকিম রাজ্যে গণ-নিরাপত্তা বিধি জারী—মহারাজার আদেশনামা।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ : 'চীন-আলবানিয়া জোট আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ক্ষতি করিয়াছে'—চীনের যুদ্ধবাদী নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে ইতালির কম্যুনিষ্ট নেতা মিঃ তোগলিয়াত্তির অভিযোগ।

পাকিস্তানী মাঝি-মাল্লাদের (জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানী সংশ্লিষ্ট) ধর্মঘট মিটাইবার জন্য ঢাকায় চতুর্দলীয় বৈঠক।

'ভারত চীনের নিকট নিজের কোন অঞ্চলই ছাড়িয়া দিবে না'—দিল্লী সফরান্তে কমন্স সভায় বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মিঃ স্যান্ডস-এর উক্তি—কাশ্মীর সম্পর্কিত বিরোধ (পাক্-ভারত) মীমাংসার আশা পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ : জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানীর দুই হাজার পাকিস্তানী কর্মীর (নাবিক) ৫০ দিন-ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ : 'পাকিস্তান চীনের সহিত অনাক্রমণ চুক্তির জন্য উদ্গ্রীব'—পাক্ প্রেস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ।

কঙ্গোলী বাহিনী কর্তৃক কঙ্গোলো শহর দখল—অবিরাম যুদ্ধের পরিণতি।

॥ লেবাননের কবি ॥

অভয়ঙ্কর

"ধর্ম নয়, বিজ্ঞান নয়, রূপের কাছে আর কিছু নেই—রূপসৃষ্টি করে যাও, আর সব কিছু চুলোয় যাক।"

এই উক্তি করেছেন লেবাননের জাতীয় লেখক কাহলিল জীব্রাণ। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও চিত্রশিল্পী। কোটি কোটি আরবী-ভাষাভাষী মানুষ তাঁর রচনা পাঠ করে আনন্দ পান। তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব প্রাচ্যদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে দূরদূরান্তরে প্রসার লাভ করেছে। বহু বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাঁর অনেক রচনা অনুবাদ করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

কাহলিল জীব্রাণের জন্ম হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লেবাননের এক অখ্যাত গ্রামে, নাম তার বিস্‌আরে। এই গ্রামের সন্নিহিত দেবদারুকুঞ্জ অতি পবিত্র বলে বিবেচিত। এখানকার কাঠ দিয়ে নাকি সম্রাট সলোমান তাঁর জেরুজালেমের উপাসনামন্দির গড়েছিলেন।

এই গ্রামে পাঠ সাঙ্গ করে, ভাই-বোনদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে চলে যান জীব্রাণ বারো বছর বয়সে। সেখানে তিন বছর কাটানোর পর তাঁর জননী বেরুটের বিখ্যাত বিদ্যামন্দির মাদ্রাসাট আল-হিকমতে তাঁকে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। স্নাতক হয়েই জীব্রাণ সিরিয়া ও লেবাননের ঐতিহাসিক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি পরিদর্শন শেষ করে ১৯০২-এ লেবানন ত্যাগ করলেন, তারপর আর সেখানে ফেরেননি।

প্যারীতে আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়ে তিনি বিখ্যাত ভাস্কর র‍্যদার কাছে চিত্রবিদ্যা শিখলেন। জীব্রাণের ছবি সারা পৃথিবীতে প্রদর্শিত হয়েছে। মরমীয় ভঙ্গীতে ছবি এঁকেছেন জীব্রাণ। তার মধ্যে আছে মানব-হৃদয়ের গভীর মর্মবাণী।

জীবনের শেষ কুড়ি বছর যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে ১৯৩১-এ লোকান্তরিত হয়েছেন জীব্রাণ। এই শেষের দিনগুলিতে তিনি ইংরাজীতেই লিখেছেন বেশী। বিখ্যাত কবি জর্জ রাসেল বলেছিলেন—**"I do not think the East has spoken with as beautiful a voice as in THE PROPHET OF Kahlil Gibran, since the GITANJALI of Rabindranath Tagore."** জীব্রাণের "প্রোফেট" এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী সাহিত্যপাঠকের কাছে বিশেষ সমাদৃত।

কাহলিল জীব্রাণের জীবনীকার বারবারা ইয়ং-এর মতে এই কবির জীবন ছিল তাঁর বাণীরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর জগৎ ছিল 'দেবোপম' মানুষের জনাকীর্ণ সমাবেশ। মানুষকে তিনি এঁকেছেন অপরূপ সৌন্দর্যসুষমায় মণ্ডিত করে। দেহের মধ্যে পার্থিব প্রকৃতি নেই, আত্মা অতি সূক্ষ্ম আবরণে মণ্ডিত। শুধু যে সব চরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যেই যে এই বৈচিত্র্য তা নয়, সেই বৈচিত্র্য ছিল তাঁর জীবনে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দোষ-ত্রুটিহীন জীবন কদাচিৎ মেলে। তাঁর মন ছিল কল্পলোকবিহারী।

এই মনোভঙ্গী নিয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন ও লিখেছেন। যে কালে ছবি আঁকায় সকল অন্তর ঢেলে দিয়েছেন সেই কালেই জীব্রাণ লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি প্রোফেটের" প্রথম সংস্করণ, পরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই পরিবর্তিত সংস্করণ সারা বিশ্বে এক আশ্চর্য আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিরিশের শতকে এবং চল্লিশেও জীব্রাণের প্রভাব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

এই কালে তিনি যে সব গদ্য-কবিতা রচনা করেছেন তা **"Tears and Laughter", "Secrets of the Heart"** এবং অতি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে 'A Treastury of Kahlil Gibran' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডটিও অনুবাদ করেছেন এন্টনি আর ফেরিস মূল আরবী থেকে।

এন্টনি রিজকাল্লা ফেরিসের জন্মও লেবাননে, ১৯৩১-এ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীতে কাজ করেছেন। টেক্‌সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বর্তমানে অধ্যাপনা করেন। কাহলিল জীব্রাণের অসংখ্য রচনার সার্থক অনুবাদক হিসাবে তিনি খ্যাত।

রিজকাল্লা ফেরিসকৃত অনুবাদ "সেকেণ্ড ট্রেজারী" গ্রন্থটি যাঁদের পাঠ করার সুযোগ হবে তাঁরাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে, এই মহাকবির কাব্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার কি আশ্চর্য মিল।

যৌবনে কবি জীব্রাণ "দি প্রোফেটে" এমন এক বিশ্বের কল্পনা করেছেন যা সর্বাঙ্গসুন্দর ও অশুভস্পর্শমুক্ত এক অকলঙ্ক জগৎ। সে পৃথিবীতে 'আকাশ-ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা গান', সেই আনন্দলোকে নেই অজ্ঞানতার অন্ধকার, আছে এক সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন জগৎ, যেখানে আছে দুর্নীতিহীন প্রগতিশীল পরিবেশ। ন্যায় এবং প্রজ্ঞা পাশাপাশি সেখানে বিচরণশীল। একতার একসূত্রে সহজ জীবন সেখানে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু কবি জীব্রাণ তাঁর কল্পলোকের এই জগৎ থেকে রূঢ়, রুক্ষ, বাস্তব জগতের ভীষণ আকৃতি দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন, নৈরাশ্যে তাঁর মন ভরে উঠেছে।

জীব্রাণ রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে করতেন প্রকৃত ধর্মাবতার। তাঁরা ন্যায় ও প্রজ্ঞার আদর্শ স্থাপন করবেন এই ছিল তাঁর আশা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের শোষণ নীতি এবং বিলাসবাহুল্য তাঁকে আহত করেছে, জীব্রাণ রাষ্ট্রপ্রধানদের 'অত্যাচার'-কেই বলেছেন এর অপর নাম 'রাজনীতি', তারপর লেবাননের এই মনীষী আরবী সংবাদপত্র, গ্রন্থ এবং সাময়িকপত্রে বহু জ্বালাময়ী নিবন্ধ রচনা করেছেন। এন্টনি রাজকাল্লা ফেরিস সম্পাদিত **'A Treasury of Kahlil Gibran'** নামক গ্রন্থটিতে এই জাতীয় অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে।

জীব্রাণের ধ্যানের জগৎ ছিল এক সংবেদনশীল, ন্যায় ও চিন্তার জগৎ। এ জগতের মানুষ শঠ এবং বঞ্চকের প্রতারণায় প্রতারিত হয় না, সংস্কারকে আঁকড়ে বসে থাকে না। তাদের কাছে একমাত্র শিখা প্রজ্বলিত, তার নাম জ্ঞানের শিখা, অজ্ঞতার অন্ধকার পথকে সেই অনির্বাণ জ্যোতি উজ্জ্বল করে রাখে। জীব্রাণের নিজের জীবনটিকে এইভাবেই গড়ে নিয়েছিলেন, সংস্কার ও গোঁড়ামির অন্ধকারকে তিমিরবিদারী জ্ঞানের সূর্যালোক বিতাড়িত করেছে। তাঁর রচনার পরিচয় হিসাবে **Thoughts and Mediations** নামক অংশের 'স্বপ্ন' নামক একটি অনুচ্ছেদ এখানে অংশতঃ উদ্ধৃত করছি ঃ

"আমি দেখলাম শৈলচূড়ায় তিনটি ছায়ামূর্তি বসে আছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে পড়লাম, যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে।

যেন ইন্দ্রজালের বশে সেই ছায়া-শরীরের কিছু দূরে আমার গতি স্তব্ধ হল। সেই সময় ছায়াশরীরীদের একজন উঠে দাঁড়ালেন, যেন সমুদ্রবক্ষ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল ঃ

"প্রেমহীন জীবন যেন ফল-ফুলহীন বৃক্ষ। রূপহীন প্রেম যেন গন্ধহীন পুষ্প, বীজহীন ফল...জীবন, প্রেম ও রূপ একের ভিতর তিন, এদের পরিবর্তন করা যায় না, পৃথক করাও চলে না।"

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির বাণী জল-প্রপাতের ছন্দে ঝঙ্কৃত হল—"বিদ্রোহহীন জীবন যেন বসন্তহীন ঋতুরঙ্গ। আর ন্যায়নীতিহীন বিদ্রোহ যেন শুষ্ক মরুতে বসন্তকাল—জীবন, বিদ্রোহ এবং ন্যায়নীতি একের ভিতর তিন, এদের পৃথক করা চলে না।"

তখন বজ্রনির্ঘোষের মত ধ্বনিত হল তৃতীয় ছায়ামূর্তির কণ্ঠে ঃ—স্বাধীনতা-

হীন জীবন যেন আত্মাহীন দেহ। চিন্তা-হীন স্বাধীনতা বিভ্রান্ত মনমের মত... জীবন, স্বাধীনতা এবং চিন্তা—একের ভিতর তিন। এরা চিরন্তন, এদের অন্ত নেই।

তারপর সেই তিনটি ছায়াশরীর উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণকণ্ঠে সমস্বরে বলল :—

"That which Love begets,
That which Rebellion creates,
That which Freedom rears,
Are three manifestations of God.
And God is the expression
Of the intelligent Universe."

সেই মহাক্ষণে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে, কেবল যেন কোন স্বর্গীয় শরীরের পক্ষবিধূনন শোনা যায়।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। যা শুনেছি তার প্রতিধ্বনি আমার মনে অনুরণিত। চোখ খুলে দেখলাম কিছু নেই, কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্র কল্লোলিত। আমি সেই শৈল-শিখরের দিকে এগিয়ে গেলাম একটু আগেই ছায়াশরীরগুলি যেখানে ছিল, এখন আর কিছুই নেই, শুধু সুগন্ধ ধূম-জ্যোতি ঊর্ধ্বগগনে স্বর্গলোকের পানে ধূমায়িত।"

মরমী কবি জীব্রাণ মানবপ্রেমে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মী। অশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদির নাগপাশে সরল মানুষকে যন্ত্রণাভোগ করতে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় এক বিভ্রান্ত মানুষের বিলাপ শোনা যায়, তার রচনার বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য এবং দার্শনিক অনুভূতির সঙ্গে ভারতীয় ভাবসাধনার বিস্ময়কর মিল। নরদেবতার সেবায় তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ, মানব-কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেমে, নৈতিক জীবনের বিকাশে। জীব্রাণ অদ্বৈতবাদী, তাঁর দর্শনে কেবল একটি শক্তি বিরাজিত। *

---

* **A SECOND TREASURY OF KAHLIL GIBRAN : Translated from the Arabic by ANTHONY R. FERRIS. The Citadel Press: New York.**

দ্বারকানাথ ঠাকুর—(কিশোরীচাঁদ মিত্রকৃত ইংরাজী জীবনীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক— দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। প্রকাশক— সম্বোধি পাবলিকেশনস্ (প্রা) লিমিটেড—কলিকাতা—এক।। দাম আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সং গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা দূরী-করণের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থ সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। এই সিরিজের সম্পাদক ও পরিকল্পক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের "Memoir of Dwarkanath Tagore" গ্রন্থটি নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের এক সন্ধি-ক্ষণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নব্যবঙ্গের জনক। সতীদাহ প্রথা বিলোপে রামমোহনকে তিনি সহায়তা করেন। হিন্দু কলেজের পুনর্গঠনে উইলসন এবং হেয়ারকে সহায়তা দান, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ এবং শব-ব্যবচ্ছেদের কালে উপস্থিতি তাঁর সংস্কারমুক্ত উদার প্রকৃতির পরিচায়ক। এই মহাজীবনের কথা লিখেছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্রের অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন, এর পূর্বে তিনি রামমোহন-জীবনী রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। সম্পাদক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত গ্রন্থটির একটি ভূমিকা রচনা ব্যতীত প্রসঙ্গ-কথা অধ্যায়টি রচনা করেছেন এবং সম্পাদনাকর্মে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশকালে যে জাতীয় টীকা, ও সমসাময়িক বৃত্তান্ত দান করা প্রয়োজন তা সম্পাদকের জানা থাকায়, গ্রন্থটির মূল্য এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থশেষে ঠাকুরবাড়ির একটি বংশলতিকা এবং দ্বারকানাথের জীবনের ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্রও সংযোজিত হয়েছে, তবে মুদ্রণ ব্যবস্থা এই জাতীয় মহাগ্রন্থের উপযুক্ত নয়।

রবীন্দ্রদর্শন— (প্রবন্ধ) শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড—কলিকাতা—৯। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'রবীন্দ্রদর্শন' — রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের মধ্যে যে দার্শনিক ভাবধারা নিহিত তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ। লেখক স্বয়ং কবি ও দার্শনিক, তাঁর বিচারভঙ্গীর মধ্যে তাই অতি সূক্ষ্ম নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যের দুরূহতায় আলোচনাটিকে ভারাক্রান্ত না করে অতিশয় প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে লেখক তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। অনাবশ্যক বাহুল্য যেমন এই গ্রন্থে নেই, তেমনই নেই জটিলতা, অথচ এক জটিল তত্ত্বের আলোচনা 'রবীন্দ্র-দর্শন'। এই আলোচনা-গ্রন্থটি 'বস্তু পরিচয়', 'দর্শন ও মার্গ' 'বিশ্বের রূপ', সত্যোপলব্ধি', 'মানুষের ধর্ম' ও সমালোচনা এই ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি কিন্তু দার্শনিক অনুসন্ধান তাঁর রচনার একটা বৃহৎ অংশে পরিব্যাপ্ত, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে আলোচিত প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। লেখক 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থটির বিরাট, লোকচারিত্রিকে একটি অমূল্য দার্শনিক রচনা মনে করেন, এবং তাঁর মতে কবির সমগ্র দার্শনিক ভাবনা এক জায়গায় বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন কবি। লেখক বলেছেন—'যদিও বিশ্বের সর্বত্রই কবি এক পরম সত্তার প্রকাশ আবিষ্কার করেছেন তবুও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই পরম সত্তা মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে ও প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান।' লেখক বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনে অনুভূতিমার্গের প্রতি পক্ষপাত, মনন-মার্গকে তিনি পরিহার করেছেন। মননশক্তিতে যা পাওয়া যায় তা শুষ্ক, নীরস আর অনুভূতিমার্গে পাই প্রেম। পরম সত্তা বহু বিচিত্র অথচ তিনি এক—বিশ্বের সেই একত্ব—ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না—বহু ও বিচিত্র্যের মধ্যে মননশক্তির সাহায্যে একত্ব উপলব্ধি করতে হয়, রূপহীন পরম সত্তা বিশ্বের সর্বত্র মাধুরী ছড়িয়ে রেখেছেন, সেই বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি আত্মগোপন করে আছেন। এই ভাবে লেখক অতিশয় গুরুতর তত্ত্বকে সহজ ও সরল করে প্রকাশ করেছেন। কবির সমগ্র জীবনের সাধনালব্ধ বাণীর পরিপূর্ণ রূপটি যেমন হৃদয়ঙ্গম করেছেন সেই ভাবে পরিবেশন করায় তাঁর এই গ্রন্থটি 'রবীন্দ্র-দর্শন' বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ একথা বলা চলে। গ্রন্থটির পর পর তিনটি সংস্করণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। সাহিত্য-সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

রমেশচন্দ্র— (জীবনী) মণি বাগচি। প্রকাশক :জিজ্ঞাসা। কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

মনি বাগচি ইতিমধ্যে লোভমবুদ্ধ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সুবর্ণযুগের বঙ্গসন্তানদের জীবনী রচনা করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জীবনীকার। তাই তাঁর জীবনী-রচনার মধ্যে আছে অসামান্য স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা। তথ্যনিষ্ঠ জীবনকাহিনীকে যে-আঙ্গিকে পরিবেশন করলে তা হৃদয়-গ্রাহী হয় তা লেখকের জানা থাকায় তাঁর রচিত জীবনী-গ্রন্থাবলী এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যে ব্যক্তিটিকে তাঁর বন্ধু রামমোহন ঘোষ একদা বলেছিলেন, "নরেশ, তুমি দেখছি শেষ থেকে আরম্ভ

করে ধারাপাত, সবকিছু লিখে গেলে।" সেই ব্যক্তির জীবনী বাঙালীমাত্রেরই প্রাণের সামগ্রী। রমেশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সংগে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার দিনে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে।" রমেশচন্দ্র সাহিত্যিক, স্বদেশপ্রেমিক, ভারতের অতীত গৌরবে বিশ্বাসী, নিরলস সাহিত্য-গবেষক এবং নিষ্ঠাবান শাসক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুতে তাই 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় লিখেছিলেন:

"Ramesh Chandra Dutt stands out as one of the most prominent man of the generation."—রাজনৈতিক মতবাদে রমেশচন্দ্র ছিলেন মডারেট, তথাপি তাঁর চরিত্রগুণে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আজ থেকে তিপান্ন বছর আগে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে রমেশচন্দ্রের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে সুদূরে বরোদায়। ধর্মানুসন্ধানে, স্বদেশপ্রেমে, সাহিত্যসেবায় ও মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত রমেশচন্দ্র বিগত যুগের এক আদর্শ মানব, আজ প্রয়োজন অতীতের পুনরাবিষ্কার, তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে যে মহাপ্রাণ বাঙালী লেখক তিনখণ্ডে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন, সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁর কাছে ঋণী। মণি বাগচি এই সুন্দর গ্রন্থটি রচনা করে এ-যুগের বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন সন্দেহ নেই।

চীনের নাম বিষ— (সংকলন)
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৫ নঃ পঃ।

রক্তে ভাসা মুখ— (সংকলন)
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদার। পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩০ নঃ পঃ।

চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তলোলুপ বর্বরতার বিরুদ্ধে বাংলার সাহিত্যিক-সমাজ আজ অগ্রণী হয়েছেন। চীনের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কবিগণ যে প্রতিরোধের গান রচনা করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদার দুটি বিভিন্ন সংকলন-পুস্তিকায় তা বিধৃত করেছেন। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত এই ধিক্কার-ধ্বনি আজ প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হোক। 'চীনের নাম বিষ' সংকলিকায় সম্পাদক যেসব কবিতা সংকলন করেছেন তার মধ্যে মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন বসু, তরুণ ভট্টাচার্য, আশিস্ সান্যাল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির কবিতা উল্লেখযোগ্য।

'রক্তে ভাসা মুখ' সংকলিকায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি প্রতিরোধের কবিতা সঞ্চয়িত হয়েছে। কবিতাগুলি সাময়িক পটভূমিকায় রচিত দীপ্ত কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান।

এই জাতীয় কাব্য-পুস্তিকার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।

সরকারস্ ডায়রী (১৯৬৩)
এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২।

'সরকারের ডায়রী'র ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ডায়রীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত। বর্তমান বৎসরেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিভিন্ন ধরণের ডায়রী প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নলিখিত ডায়রীগুলি আমরা পেয়েছি: 'ল ডায়রী' (দাম দুটাকা), 'এভরি ম্যানস্ ডায়রী' (দাম দুটাকা), 'লিটল ডায়রী' (দাম দুটাকা ও দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা), 'পকেট ডায়রী' (একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা), 'বাংলা ডায়রী' (দুটাকা) 'ক্রাউন ডায়রী' (তিন টাকা), 'ডিমাই ডায়রী' (দাম চার টাকা) ও 'রয়েল ডায়রী' (দাম পাঁচ টাকা)।

যাদু-কাহিনী— (রহস্য-কাহিনী)
অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।

যাদুর সংগে ভারতের যোগ সুপ্রাচীন। এই রহস্যময় জগৎ সম্পর্কে আজও ভারতীয় মাত্রেই সমানভাবে উৎসুক। দেশী বিদেশী বিচিত্র যাদু-কাহিনী নিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি।

যাদুজগতের শ্রেষ্ঠতম নায়ক হ্যারি হুডিনি সম্পর্কে আলোচনাটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। যাদুকর গণপতি, চুং লিং সু, ফরাসী যাদুকর উদ্যাঁ, ডেভিড ডেভাণ্ট—প্রসংগে লেখকের কাহিনী অত্যন্ত জীবন্ত। এই গ্রন্থে আরও চমৎকার সুখপাঠ্য হৃদয়গ্রাহী কাহিনী আছে। এই সমস্ত কাহিনী একদিকে যেমন অনেকের বিস্ময়ের বিষয় তেমনি মজাদারও বটে। জীবনে যাঁদের খ্যাতবান যাদুকরদের যাদু-প্রদর্শনে 'যাগদান সম্ভব হয়নি তাঁরা বর্তমান গ্রন্থ পা'ঠ সে অভাব অনেকটা দূরে করতে পারবেন বলে মনে হয়। একজন যাদুকরের কথা, শয়তান ও ম্যাসকেলিন, একটি অভিশপ্ত খেলা, আদালতে যাদুকর উত্তর দেশের যাদুকর, যাদু জগতের আষাঢ়ে গল্প, আসল ও মেকি, কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, দুটি অলৌকিক কাহিনী, খেয়ালী যাদুকর, বেকায়দায় যাদুকর, কয়েকটি যাদু খেলার কথা—এ সমস্ত বর্ণনায় গ্রন্থকার স্বাভাবিকভাবে মূল কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ফলে গ্রন্থখানি মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এ সমস্ত রহস্যজনক কাহিনীর পেছনে খ্যাত ও অখ্যাত যাদুকরদের জীবনব্যাপী সাধনার কথা পরিব্যাপ্ত। আর লেখকের সুনিপুণ বর্ণনাভঙ্গিমায় তা জীবন্ত।

গ্রন্থকারের ভূমিকাটি যথেষ্ট মূল্যবান। গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে আশা করি।

ছবি ও গল্পে যীশুর জীবন—
(কিশোর গ্রন্থ) সুবোধবিকাশ দত্ত। সুসমাচার সাহিত্য ভাণ্ডার, ১১।১, মিশন রো, কলিকাতা—১।

বর্তমান গ্রন্থটিতে যীশুর পুণ্য জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে যীশুর জীবনকাহিনী হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অগণিত জনমানসকে প্রভাবিত করে আসছে। যীশুর পবিত্র জীবন-কাহিনী সাহিত্যের, শিল্পের এবং সংগীতের এমন কোনো শাখা নেই যাকে প্রভাবিত করেনি। বাংলায় ইতিপূর্বে যীশুর জীবন নিয়ে অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে কিন্তু কুণ্ঠার সংগে স্বীকার করি সুখপাঠ্য বাইবেলের গল্প বাংলাভাষায় অঙ্গুলিমেয়ই। তবে সুখের বিষয় সুবোধবাবু নিষ্ঠার সংগে যীশুর জীবনকাহিনীকে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা ঝরঝরে এবং কিশোরদের পক্ষে উপযোগী। এই গ্রন্থের আরেকটি আকর্ষণ ছোট ছোট রঙীন ছবির পাতাটি। কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে যথাস্থানে ছবি কেটে কেটে বসানোর ব্যবস্থা থাকাতে গল্পগুলি পড়লে সহজেই মনে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

ম্যাণ্ডেলীন মেলোডিস্ট— প্রকাশক : জয়দেব দাস। প্রাপ্তিস্থান : ২৭।১, হরিঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম : দেড় টাকা।

পুস্তকটি উচ্চাঙ্গ ও লঘু ম্যাণ্ডোলিন শিক্ষার জন্য রচিত। ম্যাণ্ডোলিন বিদেশী যন্ত্র ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রটি আমাদের দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। ম্যাণ্ডোলিন তারযন্ত্র এবং এর দ্বারা রবীন্দ্র ও রাগসঙ্গীতও বাজান যায়।

বাংলাভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচিত হওয়ায় গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

নান্দীকর

একটি সঙ্গত প্রশ্ন ঃ

পণ্ডিত নেহরু বারংবার বলেছেন, সীমানা বিরোধ নিয়ে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হবে। এবং কূট-নীতিজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে চীনের এই যে একতরফা যুদ্ধবিরতি এবং তার মর্জি অনুযায়ী গঠিত একটি অদ্ভুত আজগুবি সীমারেখাকে মেনে নিয়ে উভয় তরফের সৈন্যদের সেই সীমারেখা থেকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২॥ মাইল) পশ্চাদপসরণের প্রস্তাব, এ কেবল ধোঁকাবাজী। কাজেই বর্তমান আপদা-বস্থার সমাপ্তি কবে, এ 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।' এ হেন পরিস্থিতিতে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালা এবং মঞ্চহীন পেশাদারী, অর্ধপেশাদারী ও অপেশা-দারী বা সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলির কি ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করা কর্তব্য, তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য এরও আগে আর একটি জরুরী প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। বহু লোকের আশঙ্কা যদি নির্মমভাবে সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই যদি চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ আবার শুরু হয়ে অতি শীঘ্রই ব্যাপক ও উত্তাল হয়ে ওঠে, তাহ'লে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি তাদের পাদপ্রদীপের আলোককে কি বেশী দিন জ্বালিয়ে রাখতে পারবে?

কিংবা যদি দৈবক্রমে ঠিক বিপরীত অবস্থাই অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যায় অর্থাৎ সামগ্রিক রাজনীতির পরোক্ষ চাপে প'ড়ে চীন যদি সত্যিই হঠাৎ অন্ততঃ বর্তমানে কিছুদিনের জন্যে অতিমাত্রায় শান্তিকামী হয়ে ওঠে, তাহ'লে? তাহ'লে আমাদের রঙ্গমঞ্চ-গুলি কি রাজনৈতিক প্রয়োজন বা দেশ-প্রেমকে আপাততের মত সিন্ধুকজাত ক'রে যে যার চালে চলতে শুরু করবে?

না, অত সহজে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। অবস্থার গতিকে সাধারণ নাট্যশালাগুলিকে যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে দরজা বন্ধ করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু থিয়েটার যদি চালু থাকে, তাহ'লে প্রতিটি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে এমন নাটক অভিনয় করা, যা দেখে আমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক, সে সম্বন্ধে সচেতন হই। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যাতে আমাদের দেশের, রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হই, এমন নাটক এখন কিছুকাল ধ'রে আমাদের দেশে রচিত হোক। সস্তা, হাল্কা প্রেমের গল্প, আদর্শের বিরোধ নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে, বাপে ছেলেতে, স্বামী স্ত্রীতে বা বন্ধুতে বন্ধুতে সংঘর্ষকে উপজীব্য ক'রে গল্প, হাসির গল্প, কোনো সামাজিক সমস্যার গল্প বা স্রেফ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক কিংবা নাচ গানের গল্প নিয়ে রচিত নাটককে এখন বেশ কিছু দিনের জন্যে বিদায় দেওয়া হোক। তার পরি-বর্তে আমরা দেখতে চাই এমন নাটক, যা আমাদের চিরাচরিত 'অহিফেনসেবী'র শান্তিপ্রিয়তাকে চিরতরে নির্বাসিত ক'রে আমাদের মধ্যে জাগাবে বীর্য, শৌর্য এবং দেশের স্বাধীনতাকে অটুট রাখবার জন্যে শক্তি অর্জনের স্পৃহা। বহু শতাব্দী-ব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমাদের জাতি আজও হয়ে রয়েছে অর্ধ-জাগ্রত। জাতিকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ ক'রে বীর্য-বান ক'রে তোলবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটির সার্থক রূপায়ণের ভার গ্রহণ করতে হবে আমাদের নাট্যকার এবং নাট্যশালাকে। সীমান্ত সংঘর্ষ চলুক, বা নাই চলুক, দেশকে বীর্যবান ক'রে তোলাই এখন আমাদের নাট্যশালার একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান আপৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেশের জনসাধারণ অর্থ, স্বর্ণ, রক্ত ও শ্রম দান ক'রে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বজ্রকঠিন ক'রে তুলতে সচেষ্ট, তখন আমাদের পেশাদারী নাট্যমঞ্চ চারটির মধ্যে (দক্ষিণ কলকাতার 'থিয়েটার সেণ্টার' ও 'মুক্ত-অঙ্গন'কে হিসেবের মধ্যে না ধ'রে) 'কোনটির গায়ে নতুন চেতনার অরুণ আলো লাগেনি', এমন অনুযোগ করেছেন জনৈক পত্রপ্রেরক গেল হপ্তায় প্রকাশিত একখানি চিঠির মারফৎ আমাদের "অমৃত"-সম্পাদকের কাছে। তাঁরা নাকি 'প্রতিরক্ষা তহবিলে কিছু অর্থ দান' ক'রেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন। সত্যের খাতিরে আমরা বলতে বাধ্য, পত্র-প্রেরকের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন। একটু কষ্ট ক'রে যে-কোনো বাঙলা দৈনিকের রঙ্গজগতের বিজ্ঞাপন-গুলির দিকে চোখ চেয়ে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া প'ড়ে গেছে। বিশ্বরূপা বেশ কিছু দিন ধ'রে তাঁদের বিজ্ঞাপনে বাঙলা-সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে "আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে অতি তীব্র প্রেম আলিঙ্গন সম। ভাল নাহি লাগে অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝনঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে ক্ষুদ্র জয়লাভ।" (রবীন্দ্রনাথ), "করিব সংগ্রাম—যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হয়ে, যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা" (গিরিশচন্দ্র), "ওঠো সৈনিকগণ, দৃঢ়-পণ ক'রে ওঠো, ভারতবর্ষ জানুক, বিদেশী জানুক, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয়নি" (দ্বিজেন্দ্রলাল), "দেখাব ভারতবীর্য দেখাব কেমন! বলে যদি হিমাচল, করে তারা রসাতল, পারিবে টলাইতে একটি চরণ?" (নবীনচন্দ্র) প্রভৃতি বহু উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী 'স্বদেশপ্রেমের পীঠস্থান বঙ্গরঙ্গামঞ্চের আহ্বান' রূপে প্রকাশিত ক'রে চলেছেন। এ-ছাড়া প্রতিদিন অভিনয়ের আগে তাঁরা টেপ-রেকর্ড মারফত প্রতিরক্ষা বিষয়ে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে একটি উদাত্ত বাণী বিঘোষিত করেন। আরও প্রকাশ যে, তাঁদের জনপ্রিয় "সেতু" নাটকের আগে অভিনয়োপযোগী, বর্ত-মান পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি ছোট দেশাত্মবোধক নাটক নির্বাচনে তাঁরা ব্যস্ত। স্টার থিয়েটার তো ইতিমধ্যেই তাঁদের "শেয়াণ্গন" নাট্যাভিনয়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে গেল বৃহস্পতিবার, ১৩ই ডিসেম্বর থেকে মন্মথ রায় রচিত "স্বর্ণকীট" ও "কারাগার" মঞ্চস্থ করতে শুরু করেছেন। রঙমহল মহলায় ফেলে-ছেন মন্মথ রায়েরই আর একখানি নাটক "মহাপ্রেম" এবং আশা করছেন, অতি

শীঘ্রই তাঁরা পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করতে পারবেন। মিনার্ভা থিয়েটার তাঁদের "অঙ্গীর"-এর অভিনয় বন্ধ করেছেন সাধারণের দাবীতে এবং নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করছেন বাঙলার বৈপ্লবিক যুগের পটভূমিকায় রচিত অসামান্য নাট্যালেখ্য "ফেরারী ফৌজ"। এ অবস্থায় কেন যে কোনো ভদ্রলোকের "কলকাতায় এসে কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো হতাশায়, লজ্জায় আপনি বুজে যাবে", তা' আমরা বুঝতে সর্বৈব অক্ষম।

এখানে পত্রপ্রেরক এবং পাঠক-সাধারণকে একটি বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হ'তে অনুরোধ করব। সীমান্তে চীনা ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছিল ২০-এ অক্টোবর এবং একতরফাভাবে তারা এই আক্রমণ বন্ধ করেছে গেল ২১-এ নভেম্বর। আমরা স্বাধীন হবার পর ভারতকে নানা দিক দিয়ে শান্তি-পূর্ণভাবে গড়বার দিকে মনোনিবেশ করেছিলুম, অপরের অন্যায় আক্রমণ থেকে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার যে প্রয়োজন হবে, এ-কথা আগে থাকতে চিন্তা ক'রে গোলাগুলি, যুদ্ধাস্ত্র এবং অপরাপর সামরিক উপকরণ নির্মাণ ও দেশের সক্ষম ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ক'রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও অজেয় করবার দিকে মনঃসংযোগ করিনি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জন কেনেডী ১৯৬১ সালের ২০-এ জানুয়ারী তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমাদের সামরিক শক্তি যখন নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত ব'লে বিবেচিত হবে, মাত্র তখনই সেই শক্তি যে কখনও ব্যবহৃত হবে না, সেই সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হ'তে পারব।" স্বাধীনতা লাভের পনেরো বছর বাদে গেল ৮ই ডিসেম্বর আমাদের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, "আমাদিগকে এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারত যখন প্রকৃতই শক্তিমান হইবে, মাত্র তখনই প্রকৃত শান্তি সম্ভব।"

এই পরিস্থিতিতে সকল মানুষকে সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে একখানি যুগোপযোগী দেশাত্মবোধক নাটক লেখা কি সহজ কথা? কোথায় নাটকীয় উপকরণ, মাত্র এক মাসের সংঘর্ষে অপ্রস্তুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ যে-সব ঘটনার কথা শোনা গেছে বা যাচ্ছে, তার থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্যে একাধিক নাট্যকার ব্যস্তভাবে অনুসন্ধানরত, এ সংবাদ আমরা রাখি। ভারতের ইতিহাস মন্থন ক'রে বর্তমান কালের পরি-প্রেক্ষিতে ব্যবহার করবার মত উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টাও যে না চলছে তা নয়। কিন্তু সবই সময়সাপেক্ষ। এবং একখানি নাটক দ্রুতভাবে লেখা হবার পরেও তাকে কোনো বিশেষ নাট্যশালা দ্বারা অভিনীত হবার উপযোগী করবার জন্যে যে আবার ক'রে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, তাও কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। এর পরে মহলা, আঙ্গিক প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং প্রয়োগকর্ম প্রভৃতির জন্যে অন্ততঃ দু' মাস সময় দেবার পর একখানি নাটকের উদ্বোধন সম্ভব হয়। কাজেই কলকাতার চারটে পেশাদারী মঞ্চ বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বিকার, এ অনুযোগ করবার সময় এখনও আসেনি। আমরা নিজেদের অপর থেকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে

'ধূপছায়া'র একটি স্মরণীয় মুহূর্তে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

আত্মপ্রসাদ লাভ করি। তাই পত্রলেখক মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের শিল্পীদের পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু আমাদের রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরা যে শহরের বিভিন্ন পার্কে প্রণব রায় রচিত "ডাক" নামে পথ-নাটিকাটি অভিনয় করছেন, কিংবা মিহির ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, জহর রায়, অপর্ণা দেবী, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস প্রমুখ খ্যাতনামা মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীরা যে দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত "এগিয়ে চলার ছন্দ" নামে পথনাটিকাটি শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করছেন, অথবা আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীরা যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথপরিক্রমা করছেন, সে-সম্পর্কে তিনি কি কোনো সংবাদই রাখেন না? অথবা ইচ্ছা ক'রেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন?

(১) **আমার দেশ** (বাঙলা)ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নিবেদন; ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ২ রীলে সম্পূর্ণ; রচনা ও পরিচালনাঃ তপন সিংহ; সংগীতপরিচালনা ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; নেপথ্য-ভাষণ ঃ রাধামোহন ভট্টাচার্য; চিত্রগ্রহণঃ বিশু চক্রবর্তী, বিমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; শব্দানুলেখনঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনাঃ দুলাল দত্ত; রূপায়ণঃ উত্তমকুমার, সৌমিত্র, অনিল, রাধামোহন, বিকাশ, পাহাড়ী, কালী, দিলীপ, বসন্ত, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা, অরুন্ধতী, রুমা, ছায়া প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে গেল শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে রাধা, শ্রী, উত্তরা, রূপবাণী, দর্পণা, মিনার, প্রাচী, বসুশ্রী, পূর্ণ, ভারতী, ইন্দিরা এবং বিজলী চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সীমান্ত বিরোধকে উপলক্ষ্য ক'রে চীন ভারতের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছিল, তাতে সমস্ত ভারত আজ রুখে দাঁড়িয়েছে—হানাদারকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত করতে নেহরু সরকারের সঙ্গে আজ হাত মিলিয়েছে সমস্ত ভারত-সন্তান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টাকে তীব্রতর ক'রে তোলবার ব্রত নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন (পূর্বতন বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন) আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে ১২ খানি স্বল্পদীর্ঘ চিত্র উপহার দিতে মনস্থ করেছেন, তারই প্রথম চিত্র হচ্ছে তপন সিংহ রচিত ও পরিচালিত "আমার দেশ"।

দেশপ্রেম দ্বারা চরম উদ্বুদ্ধ হয়েই তপন সিংহ "আমার দেশ" রচনা করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কি, স্বাধীনতা লাভ করবার পর শান্তি-প্রিয় ভারত কেন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ব্রতী না হয়ে দেশকে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, তা দেখাবার পর যখন বন্ধুভাবাপন্ন ভারত অতর্কিতে চীন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তখন সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হয়ে নিজ বীর্য পরীক্ষা দেবার জন্যে কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাই বর্ণিত হয়েছে "আমার দেশ" ছবিতে। প্রথমে রাধামোহন ভট্টাচার্যের শুদ্ধবাণী সমন্বিত কণ্ঠে ধারাবিবরণীর পর রবীন্দ্রনাথের দু'খানি উদ্দীপক সংগীত "হে ভৈরব, শক্তি দাও" এবং "আগুন জ্বালো" উত্তমকুমার, সৌমিত্র, অনিল, বিকাশ, পাহাড়ী, বিশ্বজিৎ, বসন্ত, রাধামোহন, দিলীপ, কালী, সুচিত্রা, সুনন্দা, অরুন্ধতী, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা, রুমা, ছায়াদেবী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীর দ্বারা গানে রূপায়িত হয়ে ছবিখানির সমাপ্তি টানা হয়েছে। দেশাত্মবোধক এই নাতিদীর্ঘ চিত্রটি শিল্প-কৃতিতে বাঙলার চিত্রজগতের একটি স্মরণীয় অবদান বলে চিহ্নিত হয়ে রইল।

(২) **হাম এক হ্যায়** (হিন্দী)ঃ মেহবুব প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; দু রীলে সম্পূর্ণ; রূপায়ণে দিলীপকুমার, সুনীল দত্ত, রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানকে বিশিষ্ট শিল্পীর সাহায্যে রূপায়িত করেছেন পরিচালক-প্রযোজক মেহবুব এই স্বল্প-দীর্ঘ চিত্রটিতে। সুন্দর ও বাস্তব পটভূমিকায় অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত এই গীত-চিত্রটি দর্শকের মনকে দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করতে অতিমাত্রায় সক্ষম। বর্তমানের জাতীয় পরিস্থিতিতে এ-রকম চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(৩) **দিল তেরা দিওয়ানা** (হিন্দী)ঃ পদ্মিনী পিকচার্স (মাদ্রাজ)-এর নিবেদন; ৪০৪৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে

সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ দাদা মিরাশী; চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ ইন্দরাজ আনন্দ; প্রযোজনা ও পরিচালনা ঃ বি আর পান্থালু; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ শঙ্কর জয়কিষণ; গীত-রচনা ঃ শৈলেন্দ্র ও হসরৎ জয়পুরী; চিত্রগ্রহণ ঃ ভি রামমূর্তি; সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা ঃ মিনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশ ঃ এ কে শেখর; সম্পাদনা ঃ আর দেবরাজন; রূপায়ণ ঃ শাম্মী কাপুর, মেহমুদ, ওম প্রকাশ, প্রাণ, উল্লাস, মনোমোহন কৃষ্ণ, মালা সিংহ, শুভা খোটে, মমতাজ বেগম প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে হিন্দ, জনতা, কৃষ্ণা, রূপালী, ভবানী, প্যারামাউণ্ট, পূর্ণশ্রী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কোনো নিও-রিয়ালিস্টিক, নিউ-ওয়েভ বা বাস্তবাশ্রয়ী নয়, "দিল তেরা দিওয়ানা" একেবারে সাধারণ হিন্দী চিত্রামোদীদের জন্যে নির্মিত হাসিখুশী, গান নাচ, কৌতুক ও প্রেমের চিত্র। তাই গল্পের নায়ক মোহনকে দেখি তার নারী-বেশধারিণী বন্ধু আনোখেলালের সঙ্গে 'রেবেল ক্লাব'-এ নাচগানে মশগুল থাকতে, এবং কঠিন নিয়মতান্ত্রিক পিতা দ্বারা প্রাক্তন জেলার দয়ারাম জঙ্গবাহাদুরের কাছে নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষার জন্যে প্রেরিত হয়ে নিজের বন্ধু আনোখেকে সেখানে 'মোহন' নামে পরিচিত হয়ে থাকতে সম্মত করিয়ে নিজেকে দরিদ্রের বেশে অন্ধ পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা মীণার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। কেমন ক'রে শেষ পর্যন্ত মোহন আবার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মীণাকে বিবাহ করল এবং আনোখে নিজের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের জন্যে জেলারের মেয়ে মালতীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হ'ল, তাই নিয়েই কাহিনীর চমকপ্রদ, কৌতুহলোদ্দীপক, সাধারণের উপভোগ্য দৃশ্যগুলি।

অভিনয়ে মেহমুদ আনোখেলাল এবং ছবির শেষাংশে মিস্ত্রাওয়ালা ও আনোখেলাল—এই দ্বৈতচরিত্রে অসামান্য নাটনৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। মীণার বেশে মালা সিংহ নাচে গানে, প্রেমের অভিনয়ে দর্শকচিত্ত হরণে কিছুমাত্র ত্রুটি করেননি। মোহনবেশে শাম্মী কাপুর তাঁর "জংলী"র ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করেছেন; দর্শকরা তাঁর মুখ এবং অঙ্গভঙ্গী পছন্দ করে। প্রাক্তন জেলার বেশে ওমপ্রকাশ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় শুভা খোটে, প্রাণ, উল্লাস মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি ভূমিকানুযায়ী অভিনয় করেছেন।

কর্মানুষ্ঠানের কাজ সর্বত্র একটি উচ্চ মান বজায় রেখেছে। "দিল তেরা দিওয়ানা" একটি দর্শকমাতানো আনন্দমুখর সঙ্গীত চিত্র।

এস, এস, চিত্রমন্দির-এর "ধূপছায়া" ঃ

আজ শুক্রবার, ১৪ই ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে এস এস চিত্রমন্দির-এর "ধূপছায়া" মুক্তি পাচ্ছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে প্রদীপ দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত চিত্রনাট্যটিকে রূপায়িত করেছেন পরিচালক চিত্ত বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অমর শিল্পী ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, এম বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অপর্ণা দেবী, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্ত প্রভৃতি। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন অমল মুখোপাধ্যায়। শ্রীজগন্নাথ পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

•

মহিলা শিল্পীমহল-এর "মিশরকুমারী" ঃ

একটি সদুদ্দেশ্য মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে, তার একটি জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেখলুম মহিলা শিল্পীমহল আয়োজিত "মিশরকুমারী"র অভিনয় আসরে ৫ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়। দুঃস্থা মহিলা-শিল্পীদের জন্যে একটি আশ্রয়-ভবন নির্মাণকল্পে যেভাবে মহিলা-শিল্পীরা একত্র হয়ে সেদিন মহাজাতি সদনে অভিনয় থেকে শুরু ক'রে আরক-পুস্তিকা বিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত কাজে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন, তা আমাদের চোখে অভূতপূর্বই ঠেকেছে। শ্রীমতী কানন, চন্দ্রা, মলিনা, সুনন্দা, সরযূ, জয়শ্রী, অনুভা, বনানী, মঞ্জু, সুলতা, মাধবী, সুমিতা, শ্যামলী, স্বাগতা, গীতা, দীপিকা, সাধনা, মেনকা, ইরা, মমতা, আশা, উষা, কবিতা, ছন্দা প্রভৃতি মঞ্চ ও চিত্রের খ্যাত এবং অখ্যাত শিল্পীর এমন একত্র সমাবেশ কচিৎ দেখতে পাওয়া গেছে। মন্ত্রী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে শোনা গেল, ওই অভিনয় রজনীতে কমবেশ বিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে এ'দের উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্যে। মনে হয়, ৭ই ডিসেম্বরের অভিনয় মারফৎ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যেও তাঁরা অনুরূপ পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছেন।

•

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে রঙ-মহলের অভিনয় ঃ

গেল শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে, এই মর্মে রঙ-মহল কর্তৃপক্ষ পত্রপত্রাদিতে পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। ঐ রজনীতে বিক্রয়লব্ধ ১৭২০ টাকা, কর্মিবৃন্দের সমবেত দান ২৭০ টাকা ও জহর রায়ের ব্যক্তিগত ১০১ টাকা—একুনে ২০৯১ টাকা নগদ এবং জহর রায়ের স্ত্রী কমলা রায় প্রদত্ত ৭ ভরি সোনা, তাঁর তিনটি মেয়ের দেওয়া ৩টি আংটি, সরযূ দেবীর ১ গাছি চুড়ি ও ১টি পেণ্ডেণ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১ জোড়া কানের দুল এবং সলিল সেনের ১টি আংটি—এ সমস্তই সেই রাত্রে দর্শক সমক্ষে

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'বর্ণচোরা' চিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে

পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলের হাতে দেওয়া হয়।

ডাঃ দাশগুপ্তের ইন্দ্রজাল :

যক্ষ্মোত্তর কলোনীর সাহায্যকল্পে ২রা ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত যে অলৌকিক ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন, তা যে-কোনো পেশাদার ইন্দ্রজালিকের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করবে। একজন প্রথিতযশা ডাক্তার তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করার মধ্যেও কি ক'রে এমন অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা আয়ত্ব করেছেন, তা' অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। শুনে সুখী হলুম, ডাঃ দাশগুপ্ত আমাদের পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আরোগ্যোত্তর কলোনীর জন্যে যে-দশ হাজার টাকা তুলে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐ দিনের প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ যোগ ক'রে তাঁর দান ঐ অর্থের অঙ্ক পার হয়ে গেছে।

শিশু রংমহলের বার্ষিক উৎসব :

এবার শিশু রংমহলের (চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার) বার্ষিক উৎসব হচ্ছে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে ২১এ ডিসেম্বর থেকে। উদ্বোধন উৎসবে সভাপতি হবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুল্য ঘোষ এম, পি এবং উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যকল্পে ২২এ ডিসেম্বর "অবন পটুয়া" মঞ্চস্থ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে ঐ দিনের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ দেওয়া হবে।

শিশু রংমহলের বার্ষিক উৎসবে যে টাকা পাওয়া যায়, তার থেকেই "সি-এল-টি"র সারা বছরের কাজ চলে এবং যে টাকা বাড়্‌তি থাকে, তা' গৃহ-নির্মাণ তহবিলে জমা রাখা হয়। ঐ তহবিল থেকেই ১,৭২,০০০, টাকা দিয়ে সি-এল-টি'র নিজস্ব বাড়ীর জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে সম্প্রতি জমি কেনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করেছেন, দু' বছরের মধ্যেই ঐ জমির ওপর সি-এল-টি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করবে।

বর্তমানে জাতীয় সঙ্কটের দিকে লক্ষ্য রেখে বার্ষিক কার্যক্রমকে অল্প-দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং অনাবশ্যাক খরচ সংক্ষেপের জন্যে দেশ-প্রিয় পার্ককেই উৎসবের স্থানস্বরূপ নির্বাচিত করা হয়েছে। শিশু রংমহলের 'অবন পটুয়া', 'মিঠুয়া', 'জিজো' প্রভৃতি জনপ্রিয় পালাগুলি ছাড়া নতুন সৃষ্টির মধ্যে আছে 'লাল্‌চে বুড়ো' ও 'কাঠ-ঠোক্‌রা'। এর ওপর আছে সর্বভারতীয় শিশুচিত্র প্রদর্শনী এবং সুরেশ দত্তর পুতুল নাচের আসর।

"দীপশিখার" নবপ্রচেষ্টা :

আধুনিক কালের উদীয়মান ও তরুণ শিল্পীদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত নাট্যসম্প্রদায় "দীপশিখা" আস্‌ছে ১৪ই ডিসেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের চিরনূতন প্রহসন "অলীকবাবু" নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। এই দলে যাঁদের দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁদের মধ্যে আছেন রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর, নীরেন, দেবব্রত, তরুণ মিত্র, রুবী মিত্র ও কৃষ্ণা রায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় "দশরূপক" নাট্যসংস্থা :

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে সুপরিচিত নাট্যসংস্থা "দশরূপক" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রথম দফায় ১০১, টাকা পাঠিয়েছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম হপ্তা নাগাদ এঁরা কোনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে মন্মথ রায়ের "মহাদেব" নাটকটি অভিনয় করবে

আরও ৫০১্ টাকা ঐ তহবিলে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এছাড়া দেশে যতদিন আপৎকালীন অবস্থা থাকবে, ততদিন এঁরা যতগুলি অভিনয়-আসর বসাবেন, তার প্রতিটি থেকে অন্ততঃ ১০্ টাকা হিসেবে প্রতিরক্ষা তহবিলে দেবেন। "দশরূপক"-এর প্রশংসনীয় উদ্যম সার্থক হোক।

*

নিখিল বঙ্গ যাদুকর সম্মিলনী

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু সংস্থাই এগিয়ে আসছে নৃত্য-গীত অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা।

খবরটা শুনলে সকলেই খুশি হবেন যে, এই ব্যাপারে যাদুকর গোষ্ঠীরাও পিছিয়ে নেই। যাদুচক্রের উদ্যোগে, আগামী ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ হলে এক যাদুকর সম্মিলনীর মাধ্যমে মনোরম যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট যাদু শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে; এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। এদের মধ্যে "দি গ্রেট ডি-সি-দত্ত, ম্যাজিসিয়ান বিনয়, ম্যাজিসিয়ান রঞ্জন; শ্রীসুনীল দত্ত এম-কম (এ্যাঃ), শ্রীঅনাদি দত্ত বি এস-সি (ইঞ্জিঃ) প্লাসগো, আরও অনেকে। **টিকিট বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।**

মৃণাল সেন পরিচালিত অভ্যুদয় ফিল্মসের 'অবশেষে' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত ও ছায়া দেবী। (কাহিনী ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত তিরিশে নভেম্বর শুক্রবার রঙমহল মঞ্চে কো-অপারেটিভ্ লাইফ ইনসিওরেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব ভানু চট্টোপাধ্যায়ের "কানাগলি" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এঁদের দলগত সুন্দর অভিনয় নাটকটির একটি প্রধান সম্পদ। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে দক্ষতার সহিত অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী বরেণ মুখার্জি, পান্না ব্যানার্জি, সারদা চক্রবর্তী, সুধীর সেনগুপ্ত, সুবোধ ব্যানার্জী এবং নাট্যপরিচালক অভিনেতা কালিপদ চক্রবর্তী। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন রমা ব্যানার্জী এবং উষা বোস এবং রিক্তা সরকার। বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে সুনামের সহিত অভিনয় করেন সর্বশ্রী

নৃপেন রায় পরিচালিত 'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে উত্তম ব্যানার্জি, পদ্মা দেবী ও অন্যান্যরা

অজয় বসু, গোপী চক্রবর্তী, উমাকান্ত গাংগুলী, বিরুপাক্ষ চক্রবর্তী এবং ভবতোষ ব্যানার্জী।
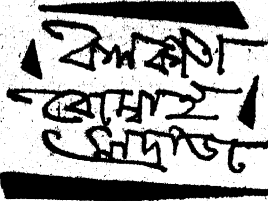
কলকাতা

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় সম্প্রতি মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের 'ন্যায়দণ্ড' চিত্রের কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। জয়সন্ধ রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অন্জনা বর্মন, আশীষকুমার, অসিতবরণ, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সবিতা বসু, মঞ্জুলা সরকার, রবি ঘোষ, তপতী ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। কুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন, আলোকচিত্রে—কানাই দে, শিল্পনির্দেশনায়—সুনীল সরকার, সম্পাদনায়—বি, নায়ক, রূপনে—শৈলেন গাঙ্গুলী ও সংগীত পরিচালনায় আলী আকবর খাঁ।

যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'পলাতক' ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলেছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। জমিদার আংটী চ্যাটার্জীর নাটমহলে যন্ত্রের দলের একটি বিরাট নৃত্য ও গানের দৃশ্য গ্রহণ করলেন আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায়।

জমিদার বাড়ীর এই দৃশ্যে শিল্পী-সহ প্রায় আড়াইশো জন 'একস্ট্রা' উপস্থিত হয়েছিল। শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশনায় নিখুঁত পরিবেশটি যে দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হচ্ছে। ভি, শান্তারাম প্রযোজিত এই চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, ভারতী দেবী ও রবি ঘোষ। সম্পাদনা ও সংগীত পরিচালনায় যুক্ত আছেন দুলাল দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সম্প্রতি 'আইহীন' ছবির নায়ক চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জীর কণ্ঠে একটি গান ছবির একটি দৃশ্যে গৃহীত হল। দিলীপ মিত্রের পরিচালনায় ছবির কাজ সমাপ্তপ্রায়। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অনিল চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, রেণুকা রায়, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, অজিত চ্যাটার্জী ও তুলসী চক্রবর্তী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবির সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেছেন।

উত্তমকুমার ফিল্মস্-এর প্রথম ছবি 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর সংগীত-গ্রহণের পর প্রথম পর্যায়ে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি প্রধান দৃশ্যে অভিনয় করেন দ্বৈতভূমিকায় উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। নারী-চরিত্রে প্রধান শিল্পীরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও সুব্রিতা বসু। এ মাসের শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবেন পরিচালক মানু সেন। কুশলী কর্ম-নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন আলোকচিত্রে—অনিল গুপ্ত, সম্পাদনায়—হরিদাস মহালনবিশ, শিল্পনির্দেশনায়—সুনীল সরকার, রূপকার—শক্তি সেন ও সংগীত পরিচালনায় শ্যামলকুমার মিত্র। বিদ্যাসাগর রচিত ভ্রান্তিবিলাস অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন তরুণকুমার, ছায়া দেবী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানি, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী করালি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তমাল লাহিড়ী। ছবিটির পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন ছায়াবাণী।

বোম্বাই

সম্প্রতি 'সেহ্‌রা' ছবির প্রযোজক ও পরিচালক ভি, শান্তারাম রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক অঞ্চলে প্রায় দু'মাসকাল চিত্রগ্রহণ শেষ করে ফিরেছেন। বিকানীর বহির্দৃশ্যে একমাস অবস্থানকালে যোধপুর ও আলোয়ার-এ ছবির মধ্যে দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়েছে।

'আপনা ঘর আপনি কাহানি'-এর জন্য নায়ক-নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বীণা রাই ও দেবর। রচনা ফিল্মস-এর ছবিটি পরিচালনা করবেন পরিচালক রূপী মজুমদার। ব্রজনাথ কোহলের প্রযোজিত এ ছবির সংগীত পরিচালক এন দত্ত।

[illegible] ফিল্মস-এর 'পুনর্মিলন' ছবিতে [illegible] ও [illegible] ভূমিকায় অভিনয় করবেন [illegible] ও [illegible] রাজ

জাহানী। নরেন্দ্র দেব পরিচালিত শশি-কলা, জয়দীপ ও অমিতা অভিনীত এ ছবির আর একটি আকর্ষণ। সঙ্গীত ও প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন সি অর্জুন ও রবীন্দ্র দেব।

প্রযোজক ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'শর্মিলা' ছবির এ মাসেই বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে রাণী-গঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে। উত্তমকুমার ও ওয়াহিদা রেহমান ছাড়াও এ ছবির অতিথি-শিল্পী হিসেবে বিশ্বজিৎকে একটি বিশেষ দৃশ্যে দেখা যাবে। সম্ভবত মঞ্জু দে ছবির আর এক আকর্ষণ। ছবিটি পরিচালনা করছেন বীরেন নাগ।

নীতিন বসু পরিচালিত ও ভারত-ভূষণ প্রযোজিত 'দুজ কা চাঁদ' চিত্রের একটি বহির্দৃশ্য কোলহাপুর অঞ্চলে গৃহীত হল। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ভারতভূষণ, বি সরোজা দেবী, চন্দ্রশেখর, আগা, মুরাদ, জীবন জলিল, রাজকুমার ও ভি, গোপাল। ছবির সঙ্গীত পরি-চালক রোশন।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের পরবর্তী 'বন্দিনী' ছবিতে বহুদিন পর আপনারা সঙ্গীত পরিচালক শচীনদেব বর্মনের স্বকণ্ঠে গান শুনতে পাবেন। সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় শ্রীবর্মনের কণ্ঠে এ গান গৃহীত হয়।

অসীম পাল পরিচালিত 'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে পাহাড়ী সান্যাল ও তন্দ্রা বর্মণ।

মাদ্রাজ

এ, ভি, এম-এর আগামী একটি চিত্রের জন্য সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে মদনমোহন স্বাক্ষর করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন ভীম সিং। নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মালা সিনহা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সংকল্পে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কে কামারাজ একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের তামিল ছবিতে অভিনয় করছেন। প্রযোজক এম, জি রামচন্দ্রন-এর এই ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। এই প্রতিরক্ষা সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে শিবাজী গণেশন যে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন সেটি বর্তমানে মুক্তি পেয়েছে।

তেলেগু ছবি 'পেন্ডুলি পিলপু'-র কানাড়া ভাষায় গৃহীত হচ্ছে বহুনি স্টুডিওয়। জানকী, লীলাবতী, রাজ-কুমার, রাজাশঙ্কর, রামা দেবী ও বালকৃষ্ণ প্রভৃতি শিল্পী এ ছবির মুখ্য চরিত্র। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন জি কে ভেংকটেস।   —চিত্রদূত

ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজস্থানকে কেন্দ্র করে উদয়পুর, চিতোর এবং জয়পুরের মনোরম পরিবেশে আর ডি বনশাল প্রযোজিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রের বহির্দৃশ্য সম্প্রতি শেষ করেন পরিচালক অজয় কর। কলকাতা থেকে ১৫০০ মাইল দূরবর্তী এই রাজস্থানের বহির্দৃশ্য এ ছবির একটা বিশেষ আকর্ষণ বলা চলে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই স্থাপত্যশিল্পের কথা আপনারা অনেকেই জানেন। ছবি সম্পর্কে কিছু সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন আর ডি বনশাল-এর সর্বাধ্যক্ষ শ্রীবিমল দে। তিনি উপস্থিত ছিলেন এই বহির্দৃশ্যে।

রাণা প্রতাপের লীলাভূমি চিতোরে এ ছবির প্রধান দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়। কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্র—অর্চনা বসু ও অধ্যাপক সুখেন্দু মিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অর্চনা-সুখেন্দুর বিয়ের পর এই প্রথম দুজনে বেড়াতে এসেছে। অতীতের সবকিছু ভুলে দুজনে একাত্ম হয়েছে। এই প্রণয়মধুর স্নিগ্ধ পরিবেশে ছবির প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলির কাজ সুসম্পন্ন হয়। দৃশ্যগ্রহণে এ ছবির কলাকুশলী ও শিল্পীদের এই কয়েকদিনের কর্মদক্ষতার কয়েকটি টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার কথা বলি।

চিত্র পরিচালক অজয় কর স্বভাবে ভাবগম্ভীর হলেও এই ছবি-ছবি পরিবেশে তিনি 'ট্রলি ট্রাক' পর্যন্ত নিজের

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা সেন

হাতে বসিয়ে কাজ করেছেন। আলোকচিত্রশিল্পী বিশু চক্রবর্তীর একটা ঘটনা বলি। মীরাবাঈ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের সিঁড়ি-ধাপে সুখেন্দু-অর্চনার একটি দৃশ্যগ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল। দৃশ্যকোণ ও আলোর পরিমাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিলেন শ্রীচক্রবর্তী। অন্যদিকে এই মধুর পরিবেশে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বকণ্ঠে গান আরম্ভ করলেন—"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।' চিত্রগ্রহণের অবসরে গানে গানে সকলেই উপভোগ করছিলেন। কিন্তু বিশুবাবু তখনও যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে-পিছিয়ে চলেছেন নিখুঁত দৃশ্যগ্রহণের জন্য। তাই বাধ্য হয়ে গান থামিয়ে শ্রীমতী সেন বলেন—'বড় বেরসিক। শুধু কাজ।'

যাযাবরের যেন ছোট্ট সংসার। রাজস্থানের এই বহির্দৃশ্যে প্রায় চার হাজার মাইল পথ-পরিক্রমায় এ ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবিতে বহির্দৃশ্যের যে অংশগুলি গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উদয়পুরের পিচোলা লেক, জগমন্দির প্রাসাদ, চিতোরের রাণাকুম্ভের প্রাসাদ, রাণী পদ্মিনী যেখানে জহরব্রত গ্রহণ করেন, মীরাবাঈ প্রাসাদ, রাণাকুম্ভের বিজয়-স্তম্ভ, 'ম্যায় ভুখাহুঁ', কালীমাতার মন্দির, জয়পুরের রাজপ্রাসাদ, হাওয়া মহলের রাজপথ এবং অম্বরের অম্বর প্রাসাদ অন্যতম।

রাজস্থানের এই বহির্দৃশ্যে উদয়পুরের স্থানীয় মহারাণার সেক্রেটারীদ্বয় চন্দন সিংজী ও নারায়ণ সিংজী, গাইড অফিসার যশমন্ত সিংজী এ ছবির দৃশ্যগ্রহণে প্রভূত সাহায্য করেন। এ'দের মধ্যে রাজপুতদের সরল এবং বলিষ্ঠ পরিচয়ে ভাল লেগেছিল। সবকিছু মিলিয়ে আর ডি বনশাল-এর এই বহির্দৃশ্য চিত্রগ্রহণের দিনগুলি যেন ছবির মত সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছিল এবং আপনাদেরও গৃহীত দৃশ্যগুলি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা আগে থেকে বলে রাখছি।

—চিত্রদূত
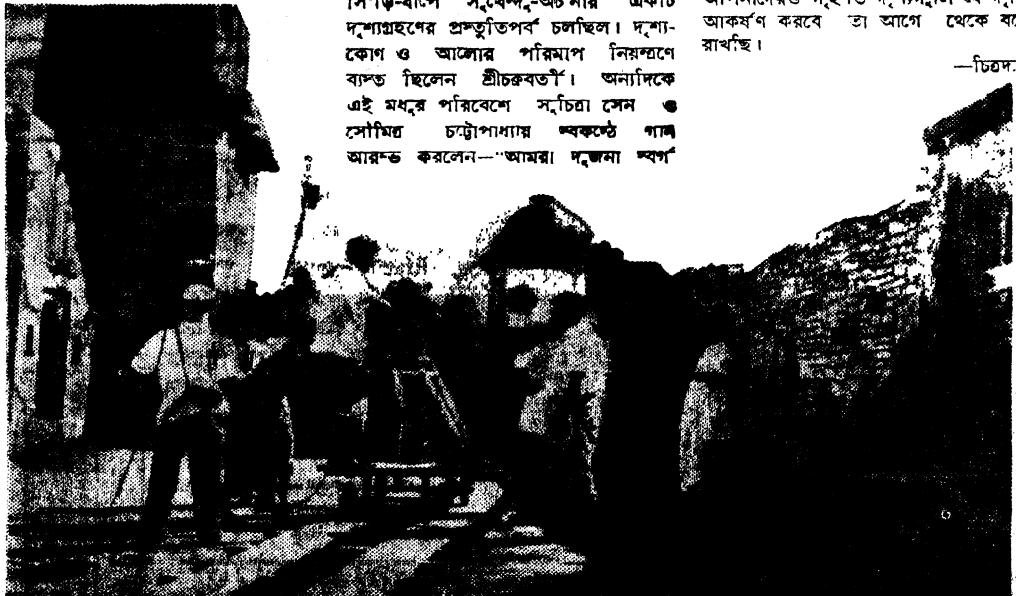
রাজস্থানে 'সাত পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণে

॥ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক চলচ্চিত্র ॥

যদিও ইংল্যান্ডের আকাশে এই মুহূর্তে এমন কিছু বিশ্বযুদ্ধের মেঘ জমছে না বা সে সম্ভাবনাও নেই আপাতত তবু বৃটেনের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্যে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করেছেন। বৃটেনের দি ডিসটিলারিস লিঃ নামক একটি বৃহৎ রসায়ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটা কুড়ি মিনিটের তথ্যচিত্র তুলেছেন। এই তথ্যচিত্রের নাম দেয়া হয়েছে "ইন দি ইভেন্ট..." অর্থাৎ "যদি এমন হয়..."। এই চিত্রে দেখানো হয়েছে আ ণ বি ক বোমা বিস্ফোরণের পর প্রতিষ্ঠানটির দুশোজন কর্মী কিভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছেন। কি করে ওয়ার্ডেনরা আহতদের সেবা করছে। আগুন নেভাচ্ছে, গৃহহারাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে প্রভৃতি যাবতীয় আপৎকালীন ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এই তথ্যচিত্রে।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তথ্যচিত্রের দিকে ততটা দৃষ্টি পড়ে নি চিত্র-নির্মাতাদের। তবু কিছু কিছু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চলচ্চিত্র তোলা হয়েছিল। যদিও আজকের উন্নত ধরনের ক্যামেরা বা ছবি তোলার অন্যান্য আনুসঙ্গিক সেকালে সুলভ ছিল না, তবু কিছু কিছু ভালো ছবি যে তোলা হয়েছিল সেসময়ে তার প্রমাণ পাওয়া গেল লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে প্রদর্শিত যুদ্ধ-চিত্রগুলি থেকে। ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রতি একটি বিশেষ পর্যায়ের বা কোন বিশেষ পরিচালকের সব ছবি একত্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ইদানীং এই সংস্থা দুমাস ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওপর তোলা ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। যুদ্ধ তৎকালীন দৃষ্টিতে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় ছবিগুলির মারফৎ। বিখ্যাত সোম, আরে এবং আরাস রণাঙ্গনের ঘটনাবলীর ছবিও এইসব চিত্রে দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এই সব চিত্রের মূল্য অসামান্য।

বার্লিনের প্রাচীর নিয়ে ছবি
২৮ জন টানেল

অদূর ভবিষ্যতে চিত্রগৃহের রূপালী-পর্দায় যে ছবিটি দেখানো হবে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার ঘটনা ও বিষয়টি সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। একটি সত্য কাহিনীকে ভিত্তি করে মার্কিন-জার্মান যুগ্ম-প্রযোজনায় ছবিটি তোলা হয়েছে।

চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জার্মান প্রযোজক রবার্ট সিওডমাক এবং তাতে অভিনয় করেছেন জার্মান শিল্পিবৃন্দ ডন মারে, রুনো ফ্রিৎজ ও ক্রিস্তিন কাউফম্যান। চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ করা হয় পশ্চিম বার্লিনের টিয়েরগার্টেন নামে উদ্যানে কার্ডবোর্ডের নকল প্রাচীর খাড়া কোরে। ছবিটি তুলতে ৬৫০,০০০ ডলার খরচ হয়েছে।

বহুলোক এই চিত্রগ্রহণ স্বচক্ষে দেখে মনে মনে ভেবেছিল এই ছবি চলবে না। সবকিছুই যেন বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। মার্কিন প্রযোজক সে-সব কথা কানে না তুলে ছবিটি শেষ করে প্রথমেই পশ্চিম বার্লিনের চিত্ররসিক-সমালোচকদের দেখান। ছবিটি দেখার পর তাঁরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। বিভিন্ন কাগজে সমালোচনা বেরয় যে খুঁটিনাটি ও স্থানকালপাত্রের বিচারে ছবিটি নিখুঁত ও অসম্ভব বাস্তব, কুৎসিৎ বার্লিন প্রাচীরের পাশে জীবনের রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কারুর বিরুদ্ধে কোন অপপ্রচারের চেষ্টা হয়নি, রাজনৈতিক অভিযোগ কোথাও নেই, আছে কেবল মানুষের ভয় ও হতাশাকে রূপ দেবার প্রয়াস। চিত্রে দেখানো হয়েছে দাসত্বের মধ্যে মানুষের রূপ কি এবং সেই দাসত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে মানুষ কতখানি ঝুঁকি নিতে পারে।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ॥

অস্ট্রেলিয়া : ৪০৪ রান (ব্রায়ান বুথ ১১২, কেন ম্যাকে নট আউট ৮৬, রিচি বেনো ৫১ এবং ববি সিম্পসন ৫০। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৭৬ রানে ৩ উইকেট এবং বেরী নাইট ৬৫ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩৬২ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৯৮, সিম্পসন ৭১, ও'নীল ৫৬, হার্ভে ৫৭, বার্জ নট আউট ৪৭। ডেক্সটার ৭৮ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ৩৮৯ রান (পিটার পারফিট ৮০, কেন ব্যারিংটন ৭৮, টেড ডেক্সটার ৭০। রিচি বেনো ১১৫ রানে ৬ এবং ম্যাকেঞ্জি ৭২ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৭৮ রান (৬ উইকেটে। ডেক্সটার ৯৯, পুলার ৫৬ এবং ডেভিড শেফার্ড ৫৩। ডেভিডসন ৪৩ রানে ৩ উইকেট এবং ম্যাকেঞ্জি ৬১ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (৩০শে নভেম্বর) : অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেট পড়ে ৩২১ রান দাঁড়ায়। ম্যাকে ৫১ এবং বেনো ১৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১লা ডিসেম্বর) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ১৬৯ রান (৪ উইকেট)। ব্যারিংটন (১৩) এবং স্মিথ (০) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (৩রা ডিসেম্বর) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮৯ রানে সমাপ্ত। পনের রানে অগ্রগামী হয়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু ক'রে এই দিনে কোন উইকেট না খুইয়ে ১৬ রান করে।

চতুর্থ দিন (৪ঠা ডিসেম্বর) : অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ৩৬২ রান তুলে ৩৭৭ রানে অগ্রগামী হয়। বার্জ (৪৭) এবং বুথ (১৯) নট আউট থাকেন।

পঞ্চম দিন (৫ই ডিসেম্বর) : অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ দিনের ৩৬২ রানের (৪ উইকেটে) উপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৭৮ রান (৬ উইকেটে) ক'রে অপরাজেয় থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেল। ব্রিসবেনে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় এই প্রথম জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। এখানে দুই দলের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল—মোট খেলা ৮, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যাণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১। ক্রিকেট খেলায় প্রকৃত অনুরাগী মহল শুধু এইটুকু সংখ্যাতত্ত্বে খুশী হবেন না জেনে আমি তাঁদের কাছে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফলের আরও পরিসংখ্যান তুলে দিচ্ছি : ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত এই দুই দেশের খেলার মোট সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়াল ১৮৪। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭৬, ইংল্যাণ্ডের জয় ৬৩ এবং খেলা ড্র ৪৫। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত এই দুই দেশের টেস্ট খেলার ফলাফল বর্তমানে দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৯৮, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ৩৮ এবং খেলা ড্র ৭। এই পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া ৭৬—৬৩ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পিছনে রেখেছে।

ব্রিসবেনে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হয় ৩০শে নভেম্বর থেকে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। লাঞ্চের সময় নিরস বদনে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর বোর্ড দাঁড়িয়েছিল—মাত্র ৯৭ রান, ৩টে উইকেট পড়ে। দলের ১৪০ রানের মাথায় পঞ্চম উইকেট পড়ে যায়। এর পর ৬ষ্ঠ উইকেটে ব্রায়ান বুথের সঙ্গে খেলতে নামেন এ্যালান ডেভিডসন। এই জুটিতে রানের গতি বেশ দ্রুতগামী হয়। ব্যারিংটনের একটা বল সজোরে মেরে ডেভিডসন ওভার-বাউণ্ডারীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। ডেভিডসন মোক্ষম মার মেরেছেন—৫ রান নিশ্চিত। ট্রুম্যান তাঁর মনের সাধ পূরণ হ'তে দিলেন না। পনের গজ দূর থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসে বলটা লুফে নেন। দলের রান তখন ১৯৪, ৬টা উইকেট পড়ে। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় বুথের সঙ্গে খেলতে নামলেন কেন ম্যাকে। এই সপ্তম উইকেটের জুটিই শেষ পর্যন্ত দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। বুথ এবং ম্যাকে সপ্তম উইকেটের জুটিতে ১১৯ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ১০৩ রান যোগ করেন। দলের ২৯৭ রানের মাথায় বুথ নিজস্ব

ব্যারিংটন

ডেক্সটার

প্যারফিট
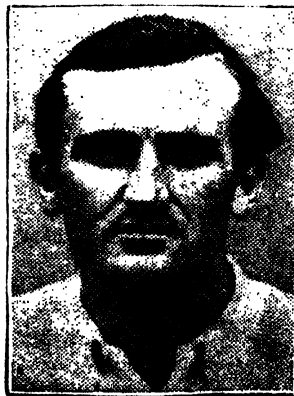
১১২ রান ক'রে টিটমাসের বলে ডেক্সটারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। এই দিনে আর কোন উইকেট পড়ে নি। ম্যাকে ৫১ এবং অধিনায়ক রিচি বেনো ১৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়া দলের রান দাঁড়ায় ৩২১, ৭ উইকেট প'ড়ে।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানে

সিম্পসন

শেষ হয়। অষ্টম উইকেটের জুটিতে রিচি বেনো এবং কেন ম্যাকে দলের ৯১ রান যোগ করেন। বেনোর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের পতনও আসন্ন হয়। ম্যাকে ৮৬ রান ক'রে শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় থাকেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের বাকি তিনটে উইকেট পান বেরী নাইট ১০ রানে। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৪৭৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। অস্ট্রেলিয়া খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই দলের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। যেখানে ৬ উইকেট পড়ে দলের রান ছিল ১৯৪ সেখানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪০৪ রানের মাথায়। অর্থাৎ শেষের চারটে উইকেটে দলের ২১০ রান যোগ হয়।

অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৪০৪ রানের উত্তরে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৬৯ রান তুলতে পারে। ইংল্যান্ড দলের এই কাহিল অবস্থার জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর। তিনি ৪৫ রানে ৩টে উইকেট পান। এক সময়ে তাঁর বোলিংয়ের সংখ্যা ছিল ১১-২-১৯-২। ডেক্সটার ছাড়া বেনোর লেগ স্পিন বোলিংয়ের মাহাত্ম্য কেউ ধরতে পারেন নি। ডেক্সটার এক সময়ে বেনোর দুটো ওভারে ২২ রান তুলে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙার সাত মিনিট আগে বেনোর বলে পা দিয়ে ডেক্সটার বোল্ড আউট হন। বেনো প্রথম ইনিংসের খেলায় ডেক্সটারের হাতেই ধরা পড়ে আউট হয়েছিলেন।

বেনো

ইংল্যান্ড ২৩৫ রানের পিছনে পড়ে রাত্রিবাস করতে যায়।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮৯ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১৫ রানে অগ্রগামী হয়। পিটার পারফিট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৮০ রান করেন—এই রানই ছিল দলের সর্বোচ্চ রান। চার ঘণ্টা আট মিনিট খেলে পারফিট বাউন্ডারী মারেন ৮টা। তার পরই কেন ব্যারিংটনের ৭৮ রান উল্লেখযোগ্য। তিনিও প্রায় চার ঘণ্টা খেলে মোট ১০টা বাউন্ডারী করেন। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড যে ৯টি টেস্ট ইনিংস খেলেছে তার মধ্যে এই প্রথম ইনিংসের ৩৮৯

[illegible]

রানই ইংল্যান্ডের পক্ষে এক ইনিংসের সর্বাধিক রান হিসাবে গণ্য। পূর্ব রেকর্ড ২৫৭ রান (১৯৫৪-৫৫)।

অস্ট্রেলিয়া এই দিনে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ১৬ রান করে।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার ৪টে উইকেট পড়ে ৩৬২ রান দাঁড়ায় মোট ৩৮৯ মিনিটের খেলায়।

লরী

অর্থাৎ প্রতি মিনিটে একটা করে রান উঠেনি। এই দিনের প্রথম দু' ঘণ্টার খেলায় ৮৮ রান ওঠে—প্রথম এক ঘণ্টার খেলায় ৪৩ রান। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না পড়ে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ১০৪—সিম্পসন (৫৫) এবং লরী (৪৫) নট আউট ছিলেন। দলের ১০০ রান উঠতে ১৪২ মিনিট সময় লেগেছিল। দলের ১৩৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট (সিম্পসন) পড়ে। প্রথম উইকেটের জুটি সিম্পসন এবং লরী ১৮১ মিনিটের খেলায় দলের যে ১৩৬ রান তুলে দেন তা অস্ট্রেলিয়া দলের বেশী রান করার পক্ষে প্রধান সহায়ক হয়েছিল। সিম্পসন তাঁর ৭১ রানে ৭টা বাউন্ডারী করেছিলেন। দলের ২১৬ রানের মাথায়

[illegible]

বিল লরী (২য় উইকেট) নিজস্ব ১৮ রান ক'রে আউট হ'ন। তাঁর দুর্ভাগ্য মাত্র দু' রান কম পড়ায় তিনি সেঞ্চুরী করার সম্মান পেলেন না। তাঁর এই ১৮ রান তুলতে ২৬০ মিনিট সময় লাগে—একটা ওভার বাউন্ডারী এবং ৮টা বাউন্ডারী ছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে বিল লরী এবং নর্ম্যান ও'নীল ৭৮ মিনিটের খেলায় দলের ৮০ রান যোগ করেন। চা-পানের বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ২২৩, ৩ উইকেটে। উইকেটে ছিলেন ও'নীল (৪১) এবং হার্ভে (৩)। ও'নীল এবং হার্ভে যথাক্রমে নিজস্ব ৫৬ ও ৫৭ রান ক'রে আউট হন। ব্রিসবেনের মাটি থেকে ইংল্যান্ডের বোলাররা কোন রকম সাহায্যই পান নি। অধিনায়ক ডেক্সটার আত্মরক্ষামূলক খেলার উপর বেশী আস্থা রেখে সেই মত মাঠ সাজিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ৬টা উইকেট হাতে নিয়ে ৩৭৭ রানে এগিয়ে থাকে।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করেনি; তাদের পূর্ব দিনের ৩৬২ রাণের (৪ উইকেট) উপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে ইংলন্ডকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে দেয়। তখন খেলার অবস্থা দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৩৭৭ রাণে অগ্রগামী। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডকে খেলায় জয়লাভ করতে হলে বাকি ৬ ঘণ্টার খেলায় ৩৭৮ রাণ তুলতে হবে; অর্থাৎ কিনা প্রতি ঘণ্টায় ৬৩ রান। পঞ্চম দিনের ক্ষত-বিক্ষত উইকেটে এত রান করার চেষ্টা মানে নিজের পায়েই কুড়োল মারা। ইংল্যান্ড তাই জয়লাভের খেলা খেলেনি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার ধরণ কোন কোন ক্রিকেট সমালোচকের চোখে ভাল লাগেনি। তাঁরা বলেছেন, এই রকমের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করা বিলেতের কাউন্টি ক্রিকেট খেলায় শোভা পায়, টেস্ট খেলায় নয়—বেনোর এ চ্যালেঞ্জই নয়। চতুর্থ দিনের খেলার শেষ আধ ঘণ্টায় ক্লান্ত ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে না দেওয়ার কারণ হিসাবে বেনো বলেছেন, তিনি ঝুঁকি নিতে ভরসা পাননি। ইংল্যান্ডও কোন রকম ঝুঁকি নেয়নি। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৩৪ রাণ ওঠে। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না পড়ে ৮৩ রাণ। দলের ১১৪ রাণের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট (পুলার) পড়ে—১৯৪৬ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম উইকেটের জুটিতে এই প্রথম শত রান উঠলো। চা-পানের বিরতির সময় দলের রাণ ছিল ১৮২ (২ উইকেটে)—ডেক্সটার (৫৬) এবং কাউড্রে (৮) উইকেটে ছিলেন। চতুর্থ উইকেটের জুটি ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন যা একটু তাড়াতাড়ি রান তুলেছিলেন—প্রতি মিনিটে একটা হিসাবে রান। এই জুটিতে ৬৬ রান ওঠে। ইংল্যান্ডের ২৫০ রানের মাথায় মাঠে নতুন বল নেমেই রানের লাগাম টেনে ধরে এবং জয়-পরাজয়ের পথে খেলার মোড় সাময়িকভাবে ঘুরিয়ে দেয়। যত আশা-নিরাশার স্বপ্ন যেন জমা ছিল শেষের চল্লিশ মিনিটের খেলার অপেক্ষায়। খেলা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যাবে—সকলেরই মন তাই বলছে। ইংল্যান্ডের রান তখন ২৫৭, ৩ উইকেট পড়ে। উইকেটে স্বয়ং অধিনায়ক ডেক্সটার ৯৯ রান ক'রে নট আউট আছেন। যেটুকু খেলার সময় বাকি সেটুকু নিয়ম রক্ষার জন্যেই। হঠাৎ খেলায় চাঞ্চল্য দেখা গেল। ইংল্যান্ডের এই ২৫৭ রাণের মাথায় ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন এবং মাত্র চার মিনিট পরই ২৬১ রাণের মাথায় পারফিট খেলা থেকে বিদায় নিলেন। ম্যাকেঞ্জি নিলেন ডেক্সটার এবং পারফিটকে আর ডেভিডসন ব্যারিংটনকে। ম্যাকেঞ্জি আবার ব্যারিংটনের ক্যাচটাও লুফলেন।

ইংল্যান্ড দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় ফ্রেড টিটমাসের সঙ্গে মাঠে খেলতে নামলেন বেরী নাইট—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এই দুজনেরই হাতে খড়ি। হাতের ঘড়িতে তখন খেলা ভাঙ্গতে আধ ঘণ্টার মত সময় বাকি। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'—এই কথাটাই যেন রিচি বেনোকে প্রেরণা দিল। তিনি ন'জন খেলোয়াড়কে নিয়ে ব্যাটের চার পাশে ব্যূহ রচনা করলেন। সকলেরই চোখে ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু অভিমন্যু বধ হ'ল না। খেলার বাকি সময়টা কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে নাইট এবং টিটমাস নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলেন। ইংল্যান্ডের মান-সম্মান রক্ষা পেল। এই দিনের খেলায় অধিনায়কের ভূমিকায় যথার্থ সম্মান রেখেছিলেন টেড ডেক্সটার। মাত্র এক রানের জন্যে তিনি শত রান পূর্ণ করতে পারেন নি বলে শত রান করার তালিকায় তাঁর নাম থাকবে না যেমন সত্য, তেমনি একথা সত্য যে, তাঁর খেলায় দর্শনীয় পুল ও ড্রাইভ মারগুলি দর্শকদের চোখ ও মন থেকে মুছে যাবে না।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে মেক্সিকো ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে গত তিন বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। মেক্সিকোর এই জয়লাভে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের যোজনা হল। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা ১৯০০ সালে প্রথম আরম্ভ হলেও প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত (১৯৬২ সাল নিয়ে) ৫১ বার ডেভিস কাপের খেলা হয়েছে। ১৯০১ ও ১৯১০ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী দল যথাক্রমে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়াকে কোন দেশই চ্যালেঞ্জ করে নি; ফলে কোন খেলা হয়নি। তাছাড়া দু'টি মহাযুদ্ধের দরুন মোট ১০ বছর (১৯১৫—১৮ এবং ১৯৪০—১৯৪৫) ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এই সব বাদ দিলে খেলা দাঁড়ায় ৫১ বার। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৫০টি প্রতিযোগিতায় মাত্র এই ৯টি দেশ চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে: আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলেশিয়া (অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড একত্রে), অস্ট্রেলিয়া (১৯২৩ সাল থেকে পৃথকভাবে), বেলজিয়াম (মাত্র ১৯০৪), জাপান (মাত্র ১৯২১) এবং ইতালী (১৯৬০-৬১)।

ভারতবর্ষ বনাম মেক্সিকোর খেলার প্রথম দিনে পালাফক্স প্রথম সিঙ্গলস খেলায় জয়দীপ মুখার্জিকে ৯-৭, ৬-২ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় দিনে ওসুনা দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে ৮-৬, ২-৬, ৭-৫, ৬-৮, ৬-৪ গেমে পরাজিত ক'রে দলকে ২—০ খেলায় অগ্রগামী করেন। ডাবলসের খেলায় ওসুনা এবং পালাফক্স জুটি ১০-৮, ১২-১০, ৬-৪ গেমে ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করলে মেক্সিকো ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ফলে পরবর্তী দুটি সিঙ্গলস খেলার ফলাফলের আর কোন গুরুত্ব থাকে না। সেই কারণে, শেষের দুটি খেলায় কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি এবং মেক্সিকোর ওসুনা এবং পালাফক্স যোগদান করেন নি। মেক্সিকোর অধিনায়ক কন্টিরাস ৬-৪, ২-৬, ৫-৭, ৬-৪, ৬-৩ গেমে আখতার আলীকে এবং মারিয়ো ল্যামাস ৬-২, ৬-২, ৬-৩ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করায় মেক্সিকো ৫—০ খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১২ই পৌষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 28th December, 1962
40 Naya Paise.

বড়দিন খ্রীষ্টধর্মীগণের মহত্তম উৎসবের দিন। খ্রীষ্টান-সমাজ এই দিনকে তাহার প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুণ্যময় জন্মবাসর বলিয়া উদ্‌যাপন করে। এই পার্বণ জগতে শান্তি ও শুভেচ্ছার মৌসুম বলিয়া খ্যাত, কেননা যীশু 'শান্তিরাজ্যের রাজকুমার' নামে ঘোষিত। সুতরাং আজিকার দিনে মনে করা প্রয়োজন তাঁহাদের কথা যাঁহাদের জীবনে যেসাস্ যীশুর প্রদত্ত আলোক সাক্ষাৎভাবে প্রতিফলিত হইতে আমরা নিজেরা দেখিয়াছি আমাদের এই বর্তমান কালে।

সর্বপ্রথমে মনে করি তাঁহার কথা যিনি নিজে খ্রীষ্টধর্মী না হইয়াও নিজের জীবনে খ্রীষ্টীয় [illegible]বাদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমস্ত খ্রীষ্টান-সমাজে স্বীকৃতি পাইয়া গিয়াছেন নিজের জীবৎকালেই। স্মরণ করি তাঁহাকে যিনি বিশ্বমানবকে আপনজন জ্ঞানে সকলের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ও জগতে শান্তিবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা জীবনের শেষদিন ও শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত করিয়া খ্রীষ্টপন্থার বাস্তব রূপ জগতকে দেখাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাবনত শিরে প্রণাম জানাই সেই বিশ্ববরেণ্য দেশপূজ্য, আমাদের জাতির জনক, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্মৃতি-তর্পণে।

তারপর স্মরণ করি সেই মহামানবকে যিনি নিজে বিদেশী হইয়াও ভারতমাতার প্রত্যেকটি দীন দুঃখী ও অত্যাচার-প্রপীড়িত সন্তানের বেদনা-ব্যথী ও দুর্দিনের সহায়ক হইয়াছিলেন এই দেশে জীবনের অন্তিমদিন পর্যন্ত। মনে করি তাঁহাকে যিনি অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আর্ত ও অত্যাচারজর্জরিত ভারত-সন্তানের সেবায় [illegible] এসেছেন, দূর [illegible] ও। তাঁহার [illegible] চেষ্টিত ছিলেন ও যিনি ভারতীয়দিগের প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়দের অন্যায় আচরণ ও অবিচারের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদে মুখর ছিলেন, এবং সেই কারণে তাঁহার ভারতীয় এদেশস্থ অধিকারিবর্গের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে মনে করি [illegible]

[illegible] গির্জার কবরস্থলে স্থান না পাওয়ায় সমাধিস্থ হইয়াছে লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরস্থলে, যাহা ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগের অন্তিম বিশ্রামস্থল।

তারপর মনে করি তাঁহার কথা যাঁহার স্নেহপূর্ণ সরসস্পর্শ সে সকলেই অনুভব করিয়াছে যাহাদের তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার ভারতীয়ত্ব ছিল গভীর উদার ও ব্যাপক এবং সেই কারণে ভারতীয় খ্রীষ্টানদিগের জন্য বিশেষ অধিকার বা পৃথক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন এবং নিজ সমাজকে বুঝাইয়াছিলেন যে ঐরূপ পার্থক্য জাতীয়তা-বাদের প্রতিকূল। তিনি নিজে খ্রীষ্টান পরিবারজাত ও বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার জাতীয়তা-বাদে ধর্মবিচার ছিল না। শিক্ষক, গুরু ও রাজ্যপাল হিসাবে যিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের প্রতি সমান সৌজন্যপূর্ণ মধুর ব্যবহার করিয়া ও আর্ত, দুঃস্থ এবং অনুন্নতের সেবার এবং শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অকৃপণ মুক্তহস্তে দানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের সম্মুখে উদার জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই আমাদের শিক্ষাগুরু হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে।

সবশেষে মনে করি সেই খ্রীষ্টধর্মী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীকে যাঁহার জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা ছিল জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় এবং জাতীয়তাবাদের অগ্নি-যুগের মুখে যাঁহার জ্বালাময়ী লেখনী শাণিত কৃপাণের ন্যায় ব্যবহৃত হইত বিদেশী শাসকের অর্থনৈতিক দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে। মনে করি সেই দিনের কথা যেদিন তিনি বরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া [illegible] ও [illegible] করিয়া বিচারালয়ে বিদেশী বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত এবং যেদিন সেই বিচারকের "তুমি নিজেকে দোষী বা নির্দোষ বলিতে চাও" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সদর্পে উত্তর দিয়াছিলেন "আমার বিচার করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তোমার নাই এবং তোমার প্রদত্ত শাস্তিও আমি [illegible] না, কেননা আমার বিচারক জগতের অধীশ্বর।" [illegible] বিদেশী শাসকের শাসন ও [illegible] তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। [illegible] স্মরণ করি সেই [illegible] ও জাতীয়তাবাদের [illegible]

সূর্য তুমি সাক্ষী থাক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আত্মার দেহ ক'রে দিলে বিষাক্ত জর্জর
আত্মাহীন মানুষের কুটিল বর্বর
অতর্কিত আক্রমণে, বিশ্বাসঘাতের বাঘনখে।
মুহূর্তে আগুন জ্বলে আমার দু'চোখে ॥

আমি দিনু শান্তিজল পশু জ্বালে অগ্নি লেলিহান
সে আগুনে আমি জ্বলি দীপ্ত বহ্নিমান
বাষ্প হল শান্তিজল। জান না কো করিলে কি পাপ !
আমার শান্তির ধ্যান ভঙ্গে কী উত্তাপ
সৃষ্টি হবে। এ ললাটে বহ্নি দেখ জ্বলে ধ্বক ধ্বক
তুমি পুড়ে ছাই হবে; এ বহ্নি পাবক
ক্ষমাহীন। তাহার উত্তাপ আজি বিশ্ব বিধাতার
বিশুষ্ক করিয়া দিল উৎস করুণার ॥
নখদন্তে বিশ্বগ্রাস, গোপন দংশনে বিশ্বনাশ
হলে পরে, নেকড়ে সাপের শুধু বাস
হ'ত পৃথিবীতে। পশুরে মরিতে হবে এ দণ্ড অমোঘ।
মানুষের জন্মলগ্নে অমৃতের যোগ,
মানুষ অমর পৃথিবীতে। হায় পশুত্ব-বিশ্বাসী,
অদৃশ্যে তোমার শীর্ষে নাচে সর্বনাশী
আত্মঘাত। ইতিহাসে অমৃত অধ্যায় রচনায়
রক্তের আঁচড় রেখে মিলাইয়া যায়
অভিশপ্ত বিস্মৃতির মাঝে। তাও হায়, শেষ নয়—
প্রাণহীন দেহ তাও নির্যাতিত হয়
আপন জনের হাতে; তোমারই আক্রোশে তুমি মর
ইতিহাস চিরদিন এ বিষে জর্জর।
সেই ইতিহাসে আমি অমৃতের নূতন অধ্যায়
রচিতে চাহিয়াছিনু, তার বুকে হায়
রক্তের আঁচড় টেনে ছিঁড়িতে চাহিলে সেই পাতা !
এর ক্ষমা নাই, নাই। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বিধাতা ॥

পশুত্বের মৃত্যুধ্রুব মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের হাতে
তমসার মৃত্যু সম প্রতিটি প্রভাতে।
সূর্য তুমি সাক্ষী থাক, আমি করি পশুত্ব সংহার।
যে বিধানে হত্যা তুমি কর বারবার,
পাপ অন্ধকার ॥

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞায় শিল্পলোক

নির্মল কুমার ঘোষ (এন.কে.জি.)

জনসমুদ্রের মাঝখানে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপেই যেন এতকাল বাস করতেন আমাদের ছায়াছবি ও মঞ্চের শিল্পীরা। নাকি আমরাই তাঁদের এতদিন একঘরে করে রেখেছিলাম?

এক মেরুতে বুঝি ছিল ওদের বাস, আমাদের আর এক মেরুতে। আজ মেরু-মিলন ঘটেছে। আমরা আজ এক হয়ে গিয়েছি। একটি কঠিন আঘাত আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। আমরা যে এতদিন পরস্পরকে জানতে পারিনি সেই সত্যই যেন আজ নিদারুণভাবে জানলাম। আর বুঝলাম এই আঘাতের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল। নইলে উপলব্ধির দরজা খুলত না।

জীবন শেখায়, ইতিহাস শেখায়। কিন্তু মূল্য নিয়ে শেখায়। মূল্য আমরা দিয়েছি। অসুরের ছলাকলা এতদিন আমরা বুঝতে পারিনি। তার ছদ্মরূপের অর্ধেকটা খসে পড়ল। যেমন মহিষাসুর। অসুর এবার চীনা ড্রাগনের রূপ নিয়ে এসেছে। তাই গর্জন কম, প্রবঞ্চনা বেশী। চীনা ড্রাগনকে আমরা চিনেছি অনেক মূল্য দিয়ে। এই চেনার সঙ্গে আমরা আরও যেন বেশী কিছু পেলাম। যা পেলাম তা' মূল্যাতীত।

আমরা পেয়েছি ভারতবোধ, জাতীয় ঐক্য। আমরা জেনেছি, সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি—আমরা ভারতবাসী। আমাদের লক্ষ্য এক। সঙ্কল্প অভিন্ন। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা তাই আজ সমস্বরে উচ্চারিত।

আজ আমরা প্রতিরোধের আগুন জেলেছি। আমাদের অগ্নিপূত অঙ্গীকার এই, ভারত শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন আত্মত্যাগের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব।

এই আত্মত্যাগের প্রসন্ন ব্যস্ততা আজ দেখা দিয়েছে আমাদের চলচ্চিত্র ও মঞ্চলোকের শিল্পীদের মধ্যে। জাতীয় চেতনায় শিল্পীদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে আর দেখিনি কোনদিন। আমাদের জাতীয় জীবনের ওপর দিয়ে এর আগেও অনেক ঝড় বয়ে গেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য মুক্তিসংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের শিল্পীরা গোষ্ঠিগত-ভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন।

প্রতিরোধ সংগ্রামে অস্ত্রের চেয়েও যে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন অনেক বেশী আমাদের শিল্পীরা তা' অনুভব করেছেন। দেশরক্ষার জন্য অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, রসদ চাই আর তার চেয়েও বেশী চাই দেশচেতনা। জনমনে এই দেশচেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আমাদের শিল্পীরা আজ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে পথ-নাটিকা অভিনয় ক'রে চলেছেন। রাজপথের ধারে মুক্ত-অঙ্গনে নাট্যাভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ ক'রে চলেছেন তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁরা জানেন, আত্মদানই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই গভীর সত্যটি তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন ব'লেই তাঁদের ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। জনে জনে ঘরে ঘরে দেশপ্রেমের বীজমন্ত্রটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে তাঁরা নিয়োজিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলিউডের শিল্পীরা এমনিভাবেই দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'গ্ল্যামার'-এর কারাগার ভেঙে তারাও এমনিভাবেই বেরিয়ে এসেছিলেন, মিশে গিয়েছিলেন বিশাল জনতার সঙ্গে। কেউ নেমে এসেছিলেন রাজপথে, কেউ ছুটে গিয়েছিলেন রণাঙ্গনে। প'ড়ে রইল অভিনয়, প'ড়ে রইল রূপসজ্জা। রূপসী হ'ল সেবিকা, রূপবান হ'ল সৈনিক। রণক্ষেত্রের অদূরে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা এবং যোদ্ধাদের আনন্দদানের কাজ সানন্দে গ্রহণ করলেন কোন কোন শিল্পী। অনেকে আবার শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন 'ডিফেন্স্-বন্ড্' বিক্রী ক'রে।

জাতীয় জীবনের মহাসঙ্কটে আমাদের শিল্পীরাও প্রমাণ করলেন,—প্রথমে তাঁরা দেশবাসী, তারপর শিল্পী। প্রমাণ করলেন, তাঁরাও নাগরিক, জনগণের মধ্যেই তাঁদের বাস। বাংলার শিল্পীরা দেশসেবার যে পুণ্যব্রত পালন ক'রে চলেছেন তার প্রয়োজন ছিল। হয়তো তা' অপরিহার্যই ছিল।

আগেই বলেছি, প্রতিরোধ-শক্তির মূলে রয়েছে দেশচেতনা। জনমনে এই দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ অতি সহজে জাগিয়ে তুলতে পারেন অভিনয়-শিল্পীরা। তাছাড়া শিল্পীরা জনপ্রিয়। ও'দের অভিনয়ের শক্তি অমোঘ, ও'দের আবেদন অব্যর্থ। বিধিদত্ত শক্তি ও অন্তরের আবেদন নিয়েই বাংলার শিল্পীরা আজ দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের পবিত্রব্রত উদ্‌যাপন ক'রে চলেছেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলার কণ্ঠশিল্পীদের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধী হব। বাংলার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীরাও স্বাদেশিকতার প্রেরণায় সমান উদ্বুদ্ধ। জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য উদ্দীপক গান গেয়ে তাঁরা রাজপথ পরিক্রমা করেছেন। তাঁদের দীপক রাগিণীতে জাতির ঘুম ভেঙেছে। চারণ-কবিদের মতই তাঁরা কলকাতার পার্কে পার্কে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে চলেছেন।

কলকাতার শিল্পলোক আজ যেন এক দুর্বার প্রাণের প্রেরণায় জেগে উঠেছে। এই প্রাণশক্তি দুর্দম, কিন্তু সংহত। এবং এও জানি, বিশ্বাস করি—এই প্রদীপ্ত প্রাণের অভিযান সবে শুরু হয়েছে। অব্যর্থ গতিতে তা' এগিয়ে চলবে চরম সার্থকতার পথে।

শিল্পীদের সিদ্ধি আমরা দেখে যাব। দেবাসুর যুদ্ধে অসুরের পরাভব সুনিশ্চিত। জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস একদিন মুখরিত হ'য়ে উঠবে। আর সেদিন এক অপরূপ মঙ্গল-আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে আমাদের শিল্পীলোক। অদূর ভবিষ্যতের সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

॥ আশা করি ॥

লাল চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করে আমাদের দেশের অনেকখানি জমি দখল করে বসে আছে এবং হুমকি দিচ্ছে 'আমার প্রস্তাবে যদি রাজি না হও তাহলে আবার আক্রমণ করব।'

এতে সারা দেশ জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে। দেশের শাসকমণ্ডলী দেশের আত্মসম্মানকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বক্তৃতা দিচ্ছেন, দেশের জনসাধারণ প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান করছেন, দেশের কবি ও শিল্পীরা চারণের ভূমিকায় নেমেছেন, পুরাতন স্বদেশী সঙ্গীত আবার নূতন করে শোনা যাচ্ছে, বঙ্গ-ভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের যে সব গান রচিত হয়েছিল, যে সব গান আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, সেই সব গান বিস্মৃতির কবর খুঁড়ে বার করা হচ্ছে আবার। ভারতের সেই নব-জাগরণের যুগে আরও যে সব কবি সার্থক জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে দেশকে জাগিয়েছিলেন তাঁদেরও আবার স্মরণ করছি আমরা। মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের তূর্যনিনাদ আমাদের বধির কর্ণ ভেদ করে মর্মে প্রবেশ করছে আবার। সাড়া জেগেছে সন্দেহ নেই। এতদিন আমরা যেন খানিকটা অসাড় ছিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা ডাক্তারি কথা মনে পড়ল। শরীরে কোন দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, বিশেষ করে ব্যথা, যখন সেরেও সারতে চায় না তখন আমরা আমাদের শরীরের 'জোয়ান'দের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করি। ডাক্তারি ভাষায় এই জোয়ানদের নাম লিউকোসাইট্স্ (Leucocytes), এরাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এরা দলে দলে রক্তস্রোতে এসে পড়লে পুরাতন মেয়াদী অসুখ-টাকেও অনেক সময় সারিয়ে তোলে। শরীরে কোনরকম প্রদাহ সৃষ্টি করলেই শরীরের এই জোয়ানরা সাড়া দেয় সাধারণত।

এই প্রদাহ সৃষ্টি করবার নানারকম উপায় আছে। অনেক আদিম জাতি লোহা গরম করে ব্যথার জায়গাটায় ছ্যাঁকা দেয়। আমি একজন সাঁওতালকে কোদাল গরম করে পিঠে ছ্যাঁকা দিতে দেখেছি। গুল দেওয়ার প্রথা তো অনেকদিন থেকে প্রচলিত। জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে শরীরের কোন জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হ'ত। সাধারণত এটা দেওয়া হত বড় প্লীহার উপর। ছুঁচ বা নরুন দিয়ে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি করার প্রথাও অনেক প্রাচীন। প্রদাহজনক বহুবিধ ওষুধও আছে। আইয়োডিন, মাস্টার্ড, ক্যান্থারাইডিন প্রভৃতি ওষুধ ডাক্তাররা খুবই ব্যবহার করতেন। আধুনিক যুগে এসেছে ইনজেকশন। দুধ, ওমনাডিন, এবং আরও নানারকম প্রোটিন-জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হয় এজন্য। সকলেরই লক্ষ্য এক। শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে শরীরের
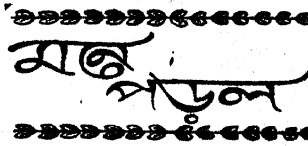
লিউকোসাইট্স্দের (শ্বেত রক্তকণিকা-দের) ডাক দেওয়া। শরীরবাসী এই জোয়ানরা যদি ভালভাবে সাড়া দেয় তাহলে আমরা আশা করি শরীরের দীর্ঘস্থায়ী গ্লানিটা কেটে যাবে।

চীনের আক্রমণও আমাদের দেশে অনেকটা ওই ভাবেই কাজ করেছে। আক্রমণের প্রদাহে আমাদের দেশের জোয়ানরা জেগে উঠেছে। দেশের সর্ব-স্তরে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

এর কিন্তু আর একটা দিক আছে সেটাও মনে রাখা কর্তব্য। শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে মনোমত ফল হয় না। রক্তে যে পরিমাণ শ্বেত রক্তকণিকা বৃদ্ধি আশা করা

বনফুল

গিয়েছিল তা হয়নি। এরকম হলে ডাক্তাররা বলেন যে রোগীর জীবনীশক্তি (ভাইটালিটি) কমে গেছে। তখন তাঁরা চেষ্টা করেন এই জীবনীশক্তি বাড়াবার। শরীরের ক্ষেত্রে এই জীবনীশক্তি বাড়াবার চেষ্টা সাধারণত নিবদ্ধ থাকে রোগীকে সুপাচ্য আমিষ জাতীয় (প্রোটিন) খাদ্য, ভিটামিন এবং পুষ্টিকর নানারকম রাসায়নিক উপকরণ, (minerals) সরবরাহ করায়। এ সব জিনিসের অভাব হলে শরীরের যে সব ফ্যাক্টারি থেকে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয় সে সব ফ্যাক্টারি দুর্বল হয়ে পড়ে, তার থেকে আর শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয় না।

শরীরের ক্ষেত্রে যা সত্য সমাজ বা জাতির পক্ষেও তা সত্য। সমাজ বা জাতি অপ্রত্যাশিতভাবে যখন কোনও বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সেই বিপদের প্রহারে সে উত্তেজিত হয়, উদ্দীপ্ত হয়, জোয়ানের দল তখন হৈহৈ রৈরৈ করে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু সমাজের বা জাতির জীবনীশক্তি দুর্বল হ'লে সে উত্তেজনা, সে উদ্দীপনা বেশীদিন টেঁকে না। তা সাময়িক হুজুকে পর্যবসিত হয়।

জাতির জীবনীশক্তি বাড়াবার উপায় কি? প্রথম এবং প্রধান উপায় অবশ্য ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা। ক্ষুধার্ত বা শীতার্ত সৈনিক বেশীক্ষণ লড়তে পারে না। দ্বিতীয় উপায়, তাদের মনের জন্যও সুখাদ্য পরিবেশন করা। তাদের সামনে বড় একটা আদর্শ অহরহ তুলে রাখতে হবে। দেশের শাসকমণ্ডলীর আচরণে এমন কোনও পক্ষপাতিত্ব যেন না দেখা দেয় যাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁরা যে একটা বিশেষ দলের, বিশেষ প্রদেশের বা বিশেষ ভাষার পৃষ্ঠপোষক এ রকম ধারণা জাগলে আমাদের একতায় ফাটল দেখা দেবে। দেশের সবাই সমান সুযোগ ও সুবিধা পাবে গণতন্ত্রের এই নীতি নিষ্ঠাভরে পালন করতে হবে। এই আদর্শ স্থাপনের ব্যাপারে দেশের সাহিত্য এবং শিল্পের দায়িত্বও কম নয়। যে সাহিত্য বা শিল্প মানুষকে পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সে রকম সাহিত্য বা শিল্প এখন বর্জনীয়। গত যুদ্ধের সময় জার্মানদের কাছে ফ্রান্সের পরাজয়ের একটা প্রধান কারণ অনেকে অনুমান করেছেন—ফ্রান্সের নৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা।

চীনের আক্রমণে আমাদের দেশে যে সাড়া জেগেছে, যে আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি আশা করি তার সুর নেমে যাবে না, আমরা সগৌরবে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা সমুন্নত রাখতে পারব।

২১-১২-৬২ ই.
যদি মরণ লভিতে চাও,
এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে
রবীন্দ্র সরোবর
নিখিল বঙ্গ
নাগরিক সমিতি
সম্মেলন
বড়দিনের
আলিঙ্গন
ক্ষেপনাস্ত্র?
ইয়েমেন সমস্যা?
কমন মার্কেট?
কিউবা?
বাহামা
প্রতিভার পূজা
ক্রুশ্চেভের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের মত
দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' চিত্রটিও বিশেষ
সম্মানিত ও নিরাপত্তার সহিত
ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়াছে

প্রতিরোধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুকুরটায় এত মাছও ছিল।

উত্তর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ভবতারণ।

কতক মাছ জালের থেকে কেমন পালাচ্ছে লাফ দিয়ে। রোদ্দুরে ঝিলিক দিচ্ছে। আবার কতগুলো ফাঁদে পড়ে কেমন ছটফট করছে।

তা চারুলাল মন্দ খাওয়ালে না। ছোকরা বয়েস হলে কী হয়, চালখানা পাকা বনেদীদের মত।

কেউ বললে, 'বাপ পয়সা রেখে গেছে বিস্তর।'

'পয়সা থাকলেই কি খরচ করতে হাত ওঠে? কত তো দেখি—'

'হ্যাঁ, খরচ করতে প্রাণে লাগে।'

'না, নিজের নিজেতে খরচ করবে না?'

'কে করে। কেউ করে না। এদিকের দুদিন পঞ্চাশ কিছু দেয়নি। এ আর কিছুই নয়, শুধু বড়লোকী দেখানো।'

সেই সঙ্গে বউটাকেও তো দেখালে। ভবতারণ অন্দরের দিকে তাকাল।

'কে ভবতারণ?' প্রথমটা চমকে উঠল চারুলাল।

'বা, সে কী কথা। ভবতারণ [illegible]। আপনার পাশের বাড়ির লোক।'

[illegible] চারুলাল। [illegible] ছিলেন উনিও [illegible] সেই লজ্জায়। কিন্তু কাল পাশের বাড়ি বলতে গোপাল সাপুইয়ের বাড়ি বলেই চলে আসছিল। কী যে খেয়াল হল গোপালের, গাঁয়ের বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেল শহুরে হতে। আর কোথাকার কে ভবতারণ দাসঘোষ, উঠতি বড়লোক, জলকে দুধের দাম দিয়ে কিনে বসল।

কে ভবতারণ! ভবতারণ শুনেছে স্বকর্ণে। অবজ্ঞার টানটা বিঁধল বুকের মধ্যে। এক ডাকে চিনতে পারেনি ছোকরা। যেন এক ডাকে চেনবার মত নাম নয়।

'আসুন। আসুন।' হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল চারুলাল।

যখন বউ দেখতে চেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আর খালি-হাতে আসেননি। অভ্যর্থনায় চারুলাল অজস্র হয়ে উঠল।

অনাত্মীয় মহলে পুরুষদের বউ-দেখার রেওয়াজ নেই গাঁয়ে-ঘরে। তবু তার বেলায় ব্যতিক্রম হবে এই ভবতারণ আশা করেছিল। কিন্তু, কে ভবতারণ! কী দেখুন ব্যবহার করেও এ প্রতিবেশীকে চেনে না?

ভেবেছিল শুধু [illegible] দিয়ে আশীর্বাদ করেই চলে যাবে। কিন্তু বউটাকে দেখে ভবতারণ চমকে উঠল।

টানা-টানা কালো চোখে [illegible] মেয়েটা। [illegible]

প্রৌঢ় কোনো গুরুজন ভেবে বউটা মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল।

যা দেখবার দেখে নিয়েছে ভবতারণ। পকেটে হাত না ঢুকিয়ে পারল না শেষ পর্যন্ত। একটা সোনার হার বের করল।

'পরিয়ে দিন।' বর্ষীয়সী কোনো আত্মীয়া হবে হয়তো, তারই হাতে পৌঁছে দিল ভবতারণ।

নিজে তো আর পরিয়ে দিতে পারে না, তাই নিরুপায় হয়ে দূরেই সরে রইল। তবু যদি এখন পরে, নিজের থেকেই হোক বা পরের সাহায্যেই হোক, লজ্জার ঘোমটাটা একটু শিথিল হবে নিশ্চয়ই। মেয়েটার মুখটা আরেকবার দেখা যাবে।

কিন্তু বউ আরো কুঁকড়ে গেল। মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

'কী নাম তোমার?'

'শংকরী।' চারুলাল উত্তর দিল।

'বেশ নাম, ঠাকুর দেবতার নাম। আর তো লজ্জায় কুঁচকি হয়ে আছে, চোখ দিলাম ভবতারণ। জড়তা কাটলে পর দুটিতে মিলে একদিন যেও বেড়াতে। পাশাপাশি বাড়ি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।'

'আমার দেওয়া হারে কেমন মানিয়েছে দেখিয়ে এস।'

বোকার মতন হাসল চারুলাল।

চেঁচিয়ে মামলার ফয়সলা হয় না। বলি সেটেলমেন্ট ম্যাপটা দেখেছ?'

সে আবার কী জিনিস, কোনোদিন যেন শোনেও নি নামধাম—এমনি শূন্য চোখে তাকাল একবার চারুলাল। বললে, 'কী আছে সেই ম্যাপে?'

'এই দেখ সেই ম্যাপ।' একতাড়া কাগজের ভিতর থেকে একটা ছাপানো ম্যাপ বার করল ভবতারণ: 'তোমার পুকুর হচ্ছে প্লট নম্বর ১৪২ আর তার লাগোয়া উত্তরে ১৪৩ নম্বর প্লট গোপালের বাস্তু, খরিদসূত্রে হালদখল ভবতারণ। দেখেছ!'

'তাতে কী হয়?'

'তাতে অবশ্যি সব হয় না। কিন্তু ১৪৩ নম্বর প্লটের মোট এরিয়াটা দেখেছ? সেটা পুরো খাওয়াতে হলে তোমার পুকুরের উত্তরের পাবার তিন হাত মাটি ১৪৩-এ চলে আসে। সেটা দেবে তো আমাকে?'

'কিন্তু গোপাল সাপুই তো কোনোদিন তা দাবি করেনি।'

'গোপাল সাপুই দাবি করেনি বলে আমিও করব না তার কী মানে আছে? পূর্বপুরুষ যদি অমানুষ হয় উত্তরপুরুষও কি অমানুষ হবে? তা হয় না হে ছোকরা, হয় না।'

'কিন্তু আপনি প্লট জরিপ করলেন কখন?'

'যখন হয় করেছি, তা জেনে তোমার লাভ কী?'

'আমিন কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।' মুখ ফেরাল ভবতারণ।

'সব আপনার ভাঁওতা।'

'যা ভেবে তোমার সুখ হয় তাই ভাবো।'

'এ একেবারে গায়ের জোর। কিন্তু চলবে না এ জুলুমবাজি। আমরা জঙ্গলে বাস করছি না। এটা মগের মুলুক নয়।'

'জানি। যা করতে হয় করো গে।' ভবতারণ দরজার দিকে আঙুল দেখাল।

কিন্তু কী করতে পারে চারুলাল?

গ্রামের পঞ্চজনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দেখুন অবিচার।

সবচেয়ে প্রাচীন সম্মানী মাতব্বর ঈশান প্রামাণিক। চারুলাল তারই স্মরণস্থ হল।

সাঁপুই মশাইয়ের আমলে সীমানার প্রশ্ন কোনোদিন ওঠেনি, রেখামাত্র না। একশো বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-এর মাপজোক নিয়ে কারু মাথাব্যথা ছিল না। আমার পুকুর অমার, ও'র বাস্তু ও'র, এই সবাই জানত-মানত, ভুলে থাকত। দিব্যি কেটে গিয়েছে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু এ কী উপদ্রব! শুধু গায়ের জোরে কেড়ে নেবে? লুটে খাবে? এ জবরদস্তির মানে কী?

'নতুন টাকা হয়েছে ভবতারণের।' মাথা দোলাল ঈশান। 'টাকার গরমে ধরাকে শরা জ্ঞান করছে।'

কিন্তু এর ব্যবস্থা কী? আমিন এসে জরিপ করে গেল সে-জরিপ আমি দেখলাম না? আপনারা পঞ্চজনেরাও দেখলেন না? বললেই হল? একের পুকুরের গাবা কি অন্য কারু বাস্তু জমির শামিল হতে পারে? এমন কোনো প্রমাণ আছে যে পাড় থাচ্ছে আমার পুকুর, ঢুকেছে অন্য জমিতে? যেমন পাড় তেমনি পাড়, পাশেই পায়ে-চলা নিটুট পথ। এ জঙ্গীবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

'দেখি আমি একবার যাই ওর কাছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি।'

'দেখুন। বলুন। ব্যবস্থা করে দিন।'

চারুলাল তারপর গেল মহেন্দ্র আদকের কাছে। শাঁসালোর লিস্টিতে তার নামও উপরের দিকে।

সব শুনে মহেন্দ্র গম্ভীর হল। বললে, 'না, এর প্রতিকার করতে হয়। গাঁয়ের বুকের উপর বসে এ দুষমনি করতে দেব না কিছুতেই। ওর লোভ সদ্য সদ্য জব্দ করতে না পারলে ক্রমেই তা দুর্বার হয়ে উঠবে। কারু আর শান্তিতে ভোগদখল করতে হবে না।'

'তা আপনারা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, আপনারা একটা সুরাহা করে দিন।'

টাকে হাত বুলুতে-বুলুতে মহেন্দ্র বললে, 'নিশ্চয়ই। আমরা যুক্তিবাদী, জবরজুলুম চলবে না আমাদের কাছে।'

আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরল চারুলাল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যেমন বেড়া তেমনি রইল।

ঈশানও চুপ। মহেন্দ্রও চুপ।

তখন কী আর করা, দেওয়ানিতে গিয়ে মামলা করল চারুলাল। মামলার বিষয় হচ্ছে ১৪২ প্লটের পুকুরের উত্তর পাড় বরাবর দু হাত চওড়া গাবা যা গর্ভস্থ জমি। স্বত্ব সাব্যস্তপূর্বক বেড়া অপসারণে বিবাদীকে উৎখাত করে খাস দখলের প্রার্থনা।

বুড়ো ঈশান ছুটতে-ছুটতে চারুলালের বাড়ি এসে হাজির।

'এ তুমি করেছ কী? আদালতে গিয়েছ?'

'না গিয়ে আর পথ কোথায়?'

'ছি ছি, তুমি প্রতিরোধ করতে গেলে?'

'সে কি, প্রতিরোধ করব না? শত্রু আক্রমণ করবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব?' চারুলালের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আহাহা, আক্রমণ একটা সমস্যা ছিল বটে, কিন্তু তোমার প্রতিরোধ সে-সমস্যা আরো জটিল করে তুলল।' বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল ঈশান।

'বলতে চান আমার প্রতিরোধটাও সমস্যা?'

'তা এক হিসেবে সমস্যা বৈ কি।'

'তা হলে আমার বাড়িতে আগুন লাগলে আমি তার প্রতিরোধে জল ঢালব না? আমার পক্ষে আগুন যেমন সমস্যা, জলও তেমনি সমস্যা? ভবতারণ আমার পুকুরে বেড়া পুঁতবে আর আমি নিষ্ক্রিয়ের মত বসে থাকব?' চারুলাল অন্ধকার শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে লাগল:

'আজ দু হাত ঘিরেছে, কাল আবার দু হাত ঘিরবে, পরশু আবার দু হাত—এমনি করে বাড়িয়ে নেবে এলাকা, আর আমার প্রতিরোধ সমস্যা হবে বলে আমি চুপচাপ দিন গুনব। সমস্ত পুকুর ওর আত্মসাৎ হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করব বসে-বসে?'

'কিন্তু তুমি পারবে ওর সঙ্গে?' নড়বড়ে ঘাড় শক্ত করল ঈশান: 'ওর টাকা কত! আর জানো তো কথাটা, টাকা যার মামলা তার।'

'জানি। তবু আমিও চেষ্টা করব সাধ্যমত। লড়ে যাব, ফলাফল আদালত বুঝবে।'

'কিন্তু লড়বে কিসের জোরে?'

'ন্যায় জয়ী হবে এই বিশ্বাসের জোরে।' চারুলাল এগিয়ে এল: 'আপনি আমার পক্ষে, সত্যের পক্ষে, সাক্ষী দেবেন সেই সাক্ষীর জোরে।'

'আমি—আমি আবার কী সাক্ষী দেব?' ঈশান ঢোঁক গিলল।

'সাক্ষী দেবেন এ পুকুর আমি বংশানুক্রমে ষোল আনা নিরঙ্কুশ দখল করে আসছি, এক ইঞ্চিও বাকি রাখিনি। সেদিনও আমার বিয়েতে টানা জালে এ পাড় থেকে ওপাড় মাছ ধরেছি। গাবায় আমার জেলেরা জাল ঝেড়েছে।'

'কিন্তু মুস্কিল কী জানো,' ঈশান শক্ত ঘাড় আবার নড়বড়ে করল: 'ভবতারণও আমাকে সাক্ষী মেনেছে।'

'ওর পক্ষে সাক্ষী দেবার আছে কী? ও তো সেদিনের খদ্দের। উড়ো পাখি।'

'তা তো ঠিক। কিন্তু সাক্ষী যখন মেনেছে তখন ওকে আমি পথে বসাই কী করে? ভাবছি কারু পক্ষেই সাক্ষী দেব না, নিরপেক্ষ থাকব।'

'না, না, দু পক্ষই যখন মেনেছে তখন দু পক্ষেই সাক্ষী দেবেন।' ঝাঁজিয়ে উঠল চারুলাল: 'সাপের মুখেও চুমু খাবেন, ব্যাঙের মুখেও চুমু খাবেন।'

'এ মামলায় সাক্ষী দেবার আছে কী?' ঈশান অসহায় মুখ করল: 'কোর্ট থেকে কমিশনার আসবে, সেটলমেণ্ট ম্যাপ ধরে প্লট ভাঁউরে দেখবে সাকুল্য পুকুর ১৪২-এই পড়ে, না, উত্তরের খানিকটা ১৪৩-এর শামিল? মৌখিক সাক্ষী কারুরই কোনো কাজে লাগবে না, সমস্ত বিচার কমিশনারের রিপোর্টের উপর।'

'তা হোক। কিন্তু আপনি কখনো সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেবেন না, সব সময়েই সাক্ষী দেবেন সুবিধের পক্ষে।'

চারুলাল তারপর নিজেই গেল মহেন্দ্র আদকের বাড়ি।

'কি, আপনিও নিরপেক্ষ নাকি?'

বিবেকের উপরে বুঝি ঘা পড়ল। 'তার মানে?' ম্লান মহেন্দ্রের কণ্ঠস্বর।

'তার মানে আপনি দুদিকেই আছেন। দু পক্ষেই সাক্ষী দেবেন। তার মানে গাছেরও খাবেন, তলারও কুড়োবেন।'

'আমি বলি কী, আমার কথাটা শোনো।' ঘন হয়ে এল মহেন্দ্র : 'শোনো, বলি কী, তুমি তোমার মামলাটা ছেড়ে দাও, তুলে নাও।'

'তুলে নেব?'

'মামলা করে লাভ কী? শুধু খরচান্ত। কমিশনার নিযুক্ত করতে হবে বলে কোর্ট কত টাকা জমা দিতে বলেছে?'

'প্রথম দফায় দুশো টাকা। পরে আরো কোন না চাইবে!'

'তবেই দেখছ ন দেবায় ন ধর্মায় যাচ্ছে টাকাটা। তারপর কতদিন ধরে চলবে তার ঠিক কী। কোর্ট তো একটা নয়, কোর্ট তিনটে। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। উকিলের পেট ভরানো। এত কষ্টার্জিত টাকা—'

'তাই বলে অন্যায়কে শায়েস্তা করব না? দিনে-দুপুরে ডাকাতি ঘটতে দেব?'

'ডাকাতির মধ্যে আছে কী!' মহেন্দ্রের স্বরে একটু বুঝি বা পরিহাসের ছোঁয়া লাগল : 'শত্রুপক্ষের বেড়া তোমার জলকে স্পর্শ করেনি, শুধু গাবার দু হাত মাত্র ঘিরেছে। সেই দুহাত জায়গায় একটা ঘাস পর্যন্ত গজায় না, খানিকটা অকেজো মাটি শুধু পড়ে আছে,—তা নিয়ে কে লড়ে? কে গাঁটের পয়সা খরচ করে? ও গেলে তোমার কী হয়?'

'কী হয়!' চারুলাল গর্জে উঠল : 'আপনার মাথায় তো এক গাছাও চুল নেই, আমি যদি ওখানে কোপ মারি, আমাকে দিয়ে দেবেন মাথাটা? থানা-পুলিশ করবেন না? করলেও তুলে নেবেন মামলা?'

'মাটি আর মাথা সমান হল?'

'না, সমান নয়। মাটি মাথার চেয়েও গরীয়সী।'

সাক্ষীসাবুদ নেই, না থাক, কমিশনার আছে।

সবাই জানে, আদালতে যে পক্ষ কমিশনার চায়, যে তার সব খরচ-খরচা জোগায়, তার দিকেই রিপোর্ট হেলে থাকে। ফিল্ড-ওয়ার্কে হেলেই ছিল চারুলালের দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল, রিপোর্ট অন্য মূর্তি নিল। লেখা হল, দুহাত তো বটেই, কোনো কোনো স্থানে তিন হাত পর্যন্ত গাবা ১৪৩-এর অন্তর্ভুক্ত।

রিপোর্ট মোতাবেক ম্যাপ দেখ কমিশনারের। বিরোধীয় জমি লাল রঙে ডোবানো। এটা নিঃসন্দেহে ভবতারণের।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল চারুলাল।

পয়সা যার পসার তার। কিন্তু তাই বলে এতদূর?

এখুনি কী! আরো অনেকদূর এখনো বাকি।

উকিল অবনীশ বললে, 'ঘাবড়াবেন না। কমিশনারের রিপোর্ট-ম্যাপ সব বাতিল হয়ে যাবে।'

'বাতিল হয়ে যাবে?'

'নির্ঘাৎ যাবে। স্টার্টিং পয়েন্ট নেয়নি ঠিকমত। সেটলমেণ্ট জরিপে যে পাকা পোস্ট পোঁতা হয়েছিল, যার কয়েকটা আছে এখনো সরজমিনে, তাই নেওয়া উচিত ছিল। কার একটা পাকা বাড়ির একতলার রকের একটা কোণকে ফিক্সড পয়েন্ট ধরেছে। এর কোনো মানে হয়? সে বিল্ডিং সেটলমেণ্টের আমোল থেকে ছিল কিনা তার কে খোঁজ নেয়? সুতরাং ভয় নেই, টিকবে না রিপোর্ট—

যেন সেটাও কত বড় ভয়ের এমনি মুখ করে চারুলাল বললে, 'তা হলে কী হবে?'

'আবার মাপজোক হবে। নতুন কমিশন যাবে। নতুন লোক নিযুক্ত হবে। কোর্ট দু পক্ষ শুনে নিজেই হয়তো স্টার্টিং পয়েন্ট ঠিক করে দেবেন।'

'তার মানেই আবার খরচ।' মুখ কালো হয়ে গেল চারুলালের।

'তার আর কী করা! লড়তে হলে সর্বস্ব দিয়েই লড়তে হয়।'

সেরেস্তায় পাশে কে একজন বসে ছিল, বলে উঠল : 'দুহাত অফলা মাটির জন্যে এমন করে ফতুর হবার কোনো মানে হয় না।'

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে একবার তাকাল চারুলাল। শত্রুপক্ষের চর বোধ হয়? বোধহয় তলে-তলে খেয়েছে।

মুহূর্তে কী হল, চরকে আড়াল করে দাঁড়াল চারুলাল। বললে, 'ফতুর হই তো হব, লড়ে যাব শেষ পর্যন্ত। ঝিনুক দিয়েই সমুদ্র সেঁচব। অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমার জল-মাটি, আমার পিতৃপুরুষের ভিটে, সুচাগ্রও ছাড়ব না। আপনি লড়ে যান, অবজেকশান দিন, ঘুষখোর কমিশনারের রিপোর্ট নস্যাৎ হয়ে যাক।'

'কিন্তু আমার লড়তে হলে আমারও তো রসদ দরকার।' দাঁত বের করে হাসল অবনীশ।

ধারে-নগদে চারুলালের যত শক্তি ছিল সব নিঃশেষ হতে চলেছে। এখন না শঙ্করীর গয়নাতে হাত পড়ে।

সকলের মুখেই আপোশরফার কথা। তার মানেই দুর্বৃত্ত যা নিয়েছে তাই তাকে ধরে থাকতে দাও। আর যেন সে না এগোয়, জল না ছোঁয়, থাবা না বাড়ায়—তুমি দুর্বল, তোমার পক্ষে এটুকু হলেই যথেষ্ট। যে ছুঁচ গড়তে পারে না সে বন্দুকের বায়না নেয় কোন হিসেবে?

চমৎকার সর্ত। আগে টিকিটা দাও, পরে গোটা মাথাটা দেবে।

জ্ঞানদা পিসির মুখ থেকে প্রস্তাব এল অন্য চেহারায়।

'শোন্।' ফিসফিসে গলায় বললে শঙ্করীকে, 'চারু যখন শহরে আপিসে চলে যাবে তখন একবার চুপিচুপি তোকে ভবতারণের বাড়িতে নিয়ে যাব। তার দেওয়া হারটা গলায় পরে নিবি। তার বড় শখ তার হার গলায় তোকে একবার সে দেখবে।'

কী লজ্জা! কী লজ্জা! শঙ্করী দেয়ালের কোণে মুখ লুকোল।

'ডোলি-পেসেঞ্জারি করে চারুর বাড়ি ফেরার ঢের আগেই ফিরে আসবি। চারু জানতেও পারবে না।'

গুম হয়ে বসে রইল শঙ্করী।

'ভয় কিসের? সঙ্গে তো আমিই থাকব। আফিংখেকো বুড়োর স্নেহের চোখে একটু তেরছা করে দেখা। তাতে দোষের কী! হয়তো এতেই বুড়ো প্রসন্ন হবে। মামলা-ফ্যাসাদ মিটিয়ে নেবে। সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে যাবে সংসার।'

তবু শঙ্করী নিঃশব্দ।

'কিরে, যাবি?'

হঠাৎ ঝামটা মেরে উঠল শঙ্করী : 'না, শত্রুপুরীতে যাব না কিছুতেই।'

কী কঠিন অদৃষ্ট, মামলার শেষ তারিখের তিনদিন আগেই চারুলাল ঘোর অসুখে পড়ল।

এত জ্বর, বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

'কী হবে?' হতাশায় মন-প্রাণ সব ভাসিয়ে দিল চারুলাল।

'তুমি উকিলকে চিঠি লিখে দাও, অসুখ বলে সময় নেবে।' স্থির কণ্ঠে বললে শঙ্করী।

'উকিলের চিঠি পাবার আর সময় নেই।' বিছানায় কাতরাতে লাগল চারুলাল : 'তা ছাড়া শুধু চিঠিতে হবে না। টাকা দিয়ে লোক পাঠাতে হবে। আমার লোক কই? সংসারে তুমি আর পিসি আর চাকর শ্যামসখা। শ্যামসখা না রামবোকা। বেতদাবিতে মামলা ঠিক খারিজ হয়ে যাবে। তারপর কেঁচে গণ্ডূষ! আবার ছানি করো। ছানি কাটালেই বা চোখে দেখতে পাব কিনা

ঠিক কী। পড়ে পড়ে এমনি করেই মার খাব?' চারুলাল ছটফট করতে লাগল।

'তুমি চঞ্চল হয়ো না।' শান্ত মুখে তাকাল শঙ্করী: 'আমি যাব।'

'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ, আমি। তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। তুমি পড়লে আমি লড়ব।'

'কী বলছ, তুমি কোর্টে যাবে?'

'হ্যাঁ, সদাশিবকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখা করব অবনীশবাবুর সঙ্গে। মামলাকে নষ্ট হতে দেব না। তুমি কিছু ভেবো না। কোর্ট পুরুষ-মেয়ে সকলের জায়গা—যারা বিচার চায়, যারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত তাদের জন্যেই আদালত। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে আসব।'

যেন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে এমনি ভাবের থেকে চারুলাল বললে, 'উকিলের জন্যে টাকা পাবে কোথায়?'

'ভবতারণ যে হারটা দিয়েছিল সেটা কোনোদিন গলায় তুলিনি। সেটা বাক্সে আছে। সেটা বেচব শহরে গিয়ে। একটা রিকশা করে সোজা উকিলের বাড়ি চলে যাব। উকিলবাবুই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

যেন স্বপ্নে দেখছে, স্বপ্নে শুনছে—চোখ বুজল চারুলাল।

চারুলালের কপালে হাত রাখল শঙ্করী। বললে, 'জ্বর এখন কম আছে। আমি প্রথম ট্রেনেই চলে যাই। তুমি পিসিকে বোলো না কিছু। আমি বাড়িতে নেই দেখে নিজেই তোমার দেখাশোনা করবেন। আমি প্রথম ট্রেনেই রওনা হই।'

কতক্ষণ পরেই জ্ঞানদা রব তুলে দিল, বউ পালিয়েছে। পাড়ায় খুঁজতে বেরিয়ে রাষ্ট্র করে দিল কথাটা। কিন্তু পালাল কার সঙ্গে?

কে একজন বললে, শঙ্করীকে ট্রেনে দেখেছে। আর পাশের কামরায় ভবতারণ।

ঘোমটার নিচে এত খেমটা। এ তো শুধু গলায় হারে নয়, হাড়ে-হাড়ে।

জমি গেল জরু গেল—এখন এ কুল-নাশা কথাটা রুগ্ন ছেলেকে জানাই কী করে? আমি তখনই জানি সমস্ত নষ্টের গোড়া ঐ মুখপুড়ী।

সব যাক, আমার চারু বেঁচে থাকুক। ওর আমি আবার বিয়ে দেব।

বিকেল-বিকেল ফিরে এল শঙ্করী। ঝিলিকমারা বিদ্যুতের চেহারায়।

'কী হল?' পাগলের মত লাফিয়ে উঠল চারুলাল।

'ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে এলাম।' ফুর্তিভরা গলায় শঙ্করী বললে, 'ওরা ভেবেছিল, অনুপস্থিতিতে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। স্বামীর জায়গায় স্ত্রী এসে দাঁড়াবে ওরা তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।'

'কিন্তু হল কী মামলার?'

'আবার দিন পড়ল।'

'শুনানির দিন?'

'শুনানি স্থগিত রাখলেন হাকিম। বললেন, আগে কমিশনারের রিপোর্টের বিচার হবে। পরে আসল মামলার বিচার। ওরা যে ভেবেছিল এক ঢিলে দু পাখি মারবে, রিপোর্ট আর মামলা এক ঢোকে গিলবে, তা আর হল না। যদি রিপোর্ট অগ্রাহ্য হয় তা হলেই ওদের ভিত নড়ে যাবে। উকিলবাবু আমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

সরল, গোবেচারা।

'তার মানেই তো আবার নতুন আমিন বেরুবে।' ক্লান্তের মত নিশ্বাস ফেলল চারুলাল: 'সে আবার কী খায় না-খায় তা কে জানে!'

'সে পরের কথা পরে। সমূহ বিপদটা তো কাটল।'

'তা একরকম কাটল। কিন্তু ঝামেলা তো কমল না।' শঙ্করীকে চারুলাল কাছে টানতে চাইল: 'নিষ্পত্তির তো আরো দেরী হয়ে গেল!'

নরম হয়ে কাছে সরে এল না শঙ্করী। দূরত্বে দৃঢ় থেকে বললে, 'যাতে নিষ্পত্তি দ্রুত হয় তার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'কী করেছ?'

'হার বেচে উকিলের ফি-টি দিয়েও অনেক বেঁচেছে, তাই দিয়ে একটা জিনিস কিনে এনেছি। দেখবে?'

'কী জিনিস?'

'জটিলকে সহজ করার ওষুধ।'

'কই দেখি।'

শঙ্করী একটা প্রকাণ্ড দা এনে দেখাল। যেমন ভারী তেমনি ধারালো। সমস্ত গায়ে লাল হয়ে ওঠবার জন্যে সুশুভ্র পিপাসা।

ভয় পেল চারুলাল। 'এটা দিয়ে কী হবে?'

'বেড়ার জঞ্জাল সাফ করে দেব।' কোমরে আঁচল জড়িয়ে আঁট হয়ে দাঁড়াল শঙ্করী: 'আর যদি কেউ বাধা দিতে আসে, গায়ে হাত তোলে, নিমেষে দু-টুকরো করে ফেলব। আত্মরক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত যেতে বাধবে না এতটুকু।'

'ওরা পুলিশে যাবে।'

শব্দ করে হেসে উঠল শঙ্করী। 'যাক। তাই তো আমি চাই। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কাই তো আশাপ্রদ। যদি পুলিশ ১৪৪-ধারা জারি করে, খতিয়ানে আমাদের দখল দেখে আমাদের অনুকূলেই জারি করবে। সে পরের কথা পরে। বেড়াটা তো আগে উৎখাত হোক।'

পড়ন্ত বিকেলেই শঙ্করী চলল পুকুরে।

জ্ঞানদাকে একবার ডাকল। বললে, 'পিসি, তুমিও চলো। না, না, তোমাকে বেড়া পর্যন্ত যেতে হবে না। তুমি পাড়ে দাঁড়িয়েই গাল পাড়বে।'

'গাল পাড়ব! কাকে?'

'শত্রুকে। প্রবঞ্চককে। তোমার তো গালাগালের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাই উজাড় করে ঢেলে দেবে। ওরা কাছে ঘেঁষতেও সাহস পাবে না। আমার দা, তোমার জিভ।'

'চল।' জ্ঞানদাও কোমর বাঁধল।

গাবায় নেমে বেড়ার বাঁধন কেটে দিতে লাগল শঙ্করী। ডান হাতে দা, বাঁ হাতে টেনে উপড়ে তুলে দিতে লাগল কচার ডাল। আর উপরে দাঁড়িয়ে কোমরে দু হাত রেখে জ্ঞানদা চালিয়ে দিল গালাগালের মেশিনগান।

দলবল নিয়ে ছুটে এল ভবতারণ।

কিন্তু কারু সাধ্য নেই শঙ্করীর কাছাকাছি আসে।

মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, বুকের আঁচল সঙ্কীর্ণ হয়ে কোমরে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, গলা খালি, অনেকখানি খালি, দু মণিবন্ধে শুধু শাঁখা, ডান হাতে ঝকঝকে দা, সমস্ত মুখে-চোখে প্রতিজ্ঞা—মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল ভবতারণ। তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্যে দ্রুততার দীপ্তিতে ঝলকাচ্ছে সর্বশরীর। এ কে মেয়ে?

প্রধান মোসাহেবের পর্যায়ে যে পড়ে সে বললে, 'দাঁড়িয়ে দেখছেন কী! চলুন, থানায় যাই, পুলিশে এত্তেলা দিই।'

'যাব'খন। দাঁড়াও।' ভবতারণ বললে, 'একটুখানি দেখতে চেয়েছিলাম, এ যে অনেকখানি দেখছি। দেখি—দেখতে দাও।'

আধুনিক মারণাস্ত্র
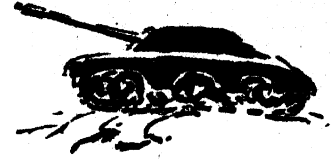
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্রের অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি হয়েছে। অথবা একথাও বলা যেতে পারে যে, মারণাস্ত্রের উন্নতি বিধান করতে গিয়েই অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে। বামে প্রথম পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি। ৫৪০০ টনের এই জাহাজটি দৈর্ঘ্যে ৩৮০ ফুট। এর থেকে পোলারিস্ ক্ষেপণাস্ত্র ১৫০০ মাইল দূরে ছোঁড়া যেতে পারে।

●

নীচে আধুনিক বোমারু বিমান, যুদ্ধ-বিমান আর মাল বহনকারী কতক-গুলি বিমানের ছবি।
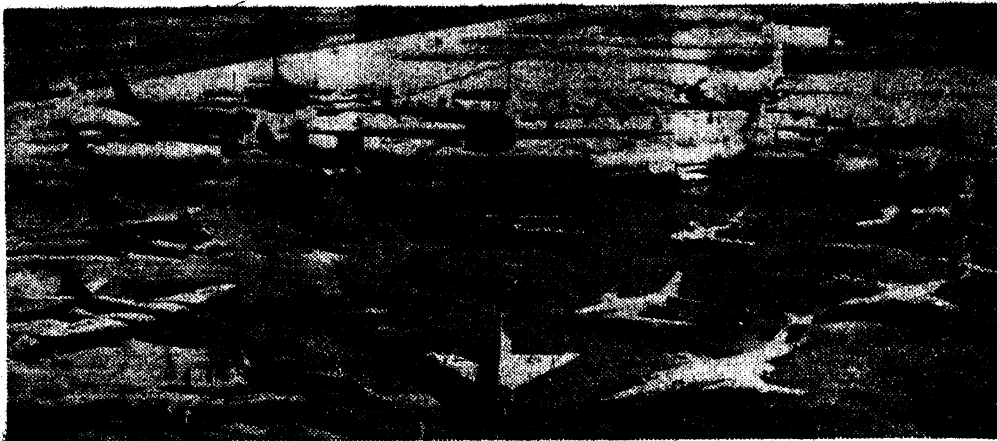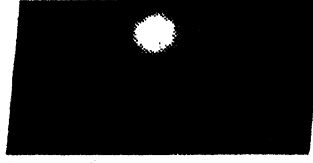
মার্কিন নৌবাহিনীর দুটি জেট টারবাইন এঞ্জিন পরিচালিত যুদ্ধবিমান এক্স-এস-ওয়াই—১। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৫৫০ মাইল। সোজাসুজি উঠতে এবং নামতে পারে বলে, ওঠানামার জন্যে এর অতি সামান্য জায়গাই লাগে।
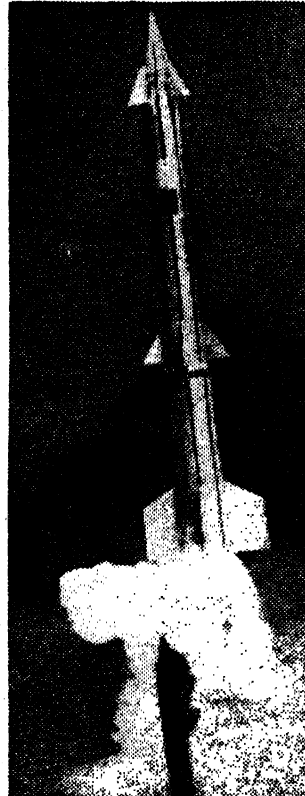
ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী নিকি জিউস। ডান দিকে নিকি হারকিউলিস ক্ষেপণাস্ত্রকে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বঁয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী নিকি জিউস। মধ্যে, ডানে হারকিউলিসের ধ্বংস।

দক্ষিণে সমুদ্রের ১০০ ফুট নীচে সাবমেরিন থেকে উঠে আসা পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্রের দুটি দৃশ্য। জলের ওপর ভেসে ওঠার পর এর এঞ্জিন কার্যকরী হয়।
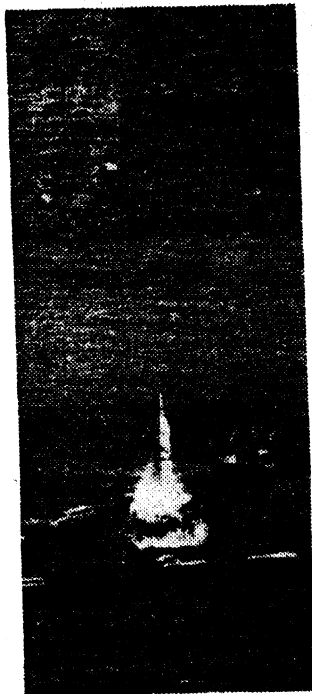
এই অতি আধুনিক ট্যাঙ্ক রাইনোর চাকাগুলি অর্ধগোলাকৃতি। সাধারণ রাস্তায় এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল। ৬৫ ডিগ্রি উঁচু পথেও এটি অবলীলাক্রমে উঠতে পারে এবং উল্টে না গিয়েও যে কোন এক পাশ দিয়ে কাত হয়ে চলতে পারে।
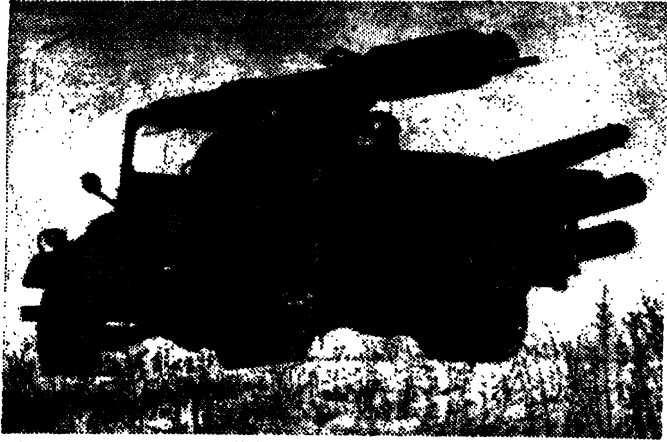
মার্কিন সৈন্য বাহিনীর নতুন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ যন্ত্র 'ডেভি ক্রকেট'। দুজন লোক জীপে করে এটি নিয়ে যেতে পারে। এর সাহায্যে অল্প শক্তি-সম্পন্ন আণবিক বা সাধারণ বিস্ফোরক অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায়।

মার্কিন সেনাবিভাগের আধুনিক ট্যাঙ্ক টি—৪৩। এর ওজন ৬০ টন। ১২০ মিলিমিটার কামান এবং ৩০ ও ৪০ ক্যালিবারের কামানে সুসজ্জিত এই ভারী ট্যাঙ্ক ট্রাক্টর চালনার চাইতেও সহজ।
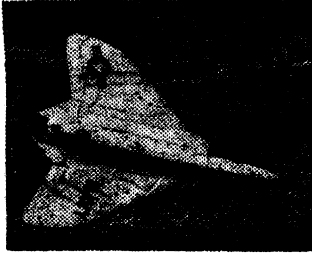
মার্কিন নৌবিভাগের দ্রুততম বিমান ডগলাস এফ—৪-ডি স্কাইরে। এর গতি-বেগ ঘণ্টায় ৭৫৩ মাইল।

ভবিষ্যতে পদাতিক সৈন্য। আধুনিক যুদ্ধের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে এর সঙ্গে রয়েছে ইনফ্রারেড দূরবীন, ট্রানজিস্টর বসানো শিরস্ত্রাণ, রেডিও অ্যাকটিভিটি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মুখোস, দস্তানা এবং জুতো। গুলীগোলা প্রতিরোধের জন্য নাইলনের বর্ম। ভবিষ্যতের সৈন্য উড়ন্ত প্ল্যাটফর্ম করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারবে। সঙ্গে বিস্ফোরক যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে গর্ত খুঁড়ে নিতে পারবে এবং ছোট রকেটের সাহায্যে নদী-নালা এবং ছোটখাট পাহাড়ের চূড়াও পার হয়ে যেতে পারবে।

ক্যামুফ্লাজ

কণাদ চৌধুরী
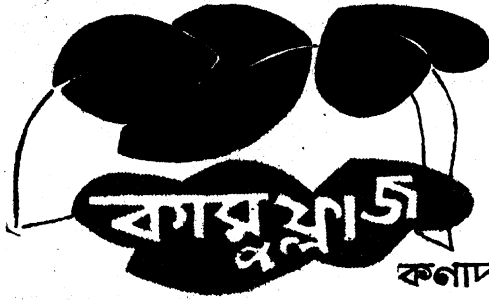
ম্যাকবেথ তিন ডাইনীর এক ডাইনীর কাছ থেকে অভয়বাণী পেয়েছিলেন এই বলে যে, বিশাল বীরনাম বন যতদিন না ডানসিনান পাহাড়ে উঠে আসে ততদিন যে-কোনো যুদ্ধে তিনি অজেয়। পর্বতের ওপরে বন উঠে আসবে? বিশ্বাস করেন নি ম্যাকবেথ, আত্মপ্রসাদে বলেছিলেন :

> That will never be
> Who can impress the forest; bid tree
> Unfix his earth-bound root?

কিন্তু পর্বত যে সত্যি কখনো কখনো মহম্মদের কাছে যায় তার প্রমাণ পেয়েছিলেন ম্যাকবেথ ভগ্নদূতের বিস্মিত বার্তায় :

> As I did stand my watch
> Upon the hill I looked toward
> Birnam, and anon, methought the
> Wood began to move.

সত্যি যেন বীরনামের জঙ্গলটাকেই পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে দেখেছিল পর্বতপ্রহরীরা। ম্যালকমের সৈন্যদলের প্রত্যেকে একটা করে গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল নিয়ে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল। শত্রু যাতে সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি টের না পায় তাই এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ম্যালকম। এবং এই আত্মগোপনের কৌশলটি আজও অবিকল এক। বনে জঙ্গলে যুদ্ধরত সৈনিকদের টুপিতে প্রায়ই লতাপাতা জড়ানো থাকে। চীন-সম্রাট চেংগিজ খানের হানাদার সৈন্যবাহিনীরা সর্বদাই মাথায় লতাপাতা জড়িয়ে যুদ্ধাভিযানে বেরোতো। রণ-প্রতারণার এই নীতিটি সম্ভবতঃ চীনদেরই প্রথম আবিষ্কার। রণ-নীতির ওপর সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থটি পাওয়া গেছে তার রচয়িতা হলেন সান জু। খৃঃ পূর্ব পাঁচশো বছর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

সমস্ত যুদ্ধকৌশল-এর নীতি হল প্রতারণা। অতএব যখন আমাদের আক্রমণ করার মত যথেষ্ট শক্তি বর্তমান, আমাদের ভান করতে হবে যেন আমরা বলহীন। আমরা যখন সৈন্য সমাবেশ করছি, শত্রু যেন ভাবে আমরা নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছি। আবার আমরা যখন শত্রু ঘাঁটির খুব কাছাকাছি থাকবো, তখন তাদের বোঝাতে হবে আমরা অনেক দূরেই আছি এবং আমরা যখন সত্যিই দূরে, অপর পক্ষ যেন ভাবে আমরা একেবারে তাদের ঘাড়ের ওপর।

দেখতে একটা বাজপড়া বিরাট গাছ মনে হলেও আসলে এটি একটি কামুফ্লাজ করা পর্যবেক্ষণ মিনার। জার্মানরা ২য় মহাযুদ্ধে আয়াসে এই মিনারটি তৈরী করেছিল।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত এই চৈনিক নীতিটিকে চীনেরা যে আজও কি নিদারুণ নিষ্ঠায় পালন করছে সাম্প্রতিক সীমান্তের ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। শত্রুপক্ষের নিকটে নিজেদের গতিবিধি, কার্যকলাপ গোপন রাখার বিদেশী প্রতি-

সাদা-কালো 'ড্যাজল পেইন্ট' করে জাহাজটিকে কামুফ্লাজ করা হয়েছে।

শব্দ কাম্ফ্লাজ শব্দটি আসলে ফরাসী, যার অর্থ গোপন রাখা।

নিজেকে গোপন রাখার এই বিশেষ কৌশলটি মানুষ শিখেছে পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিদের কাছ থেকে। জেব্রার সাদা-কালো দাগটি জঙ্গলের মধ্যে মিশে থাকে বলে জেব্রাকে চট করে চোখে পড়ে না বনের মধ্যে। উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের মধ্যে সাদা ভালুক হারিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে। বহুরূপী ত সবসময়েই তার চারপাশের জায়গার সঙ্গে মিলিয়ে রঙ বদলায়। উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু ছোট প্রাণী আবহাওয়ানুযায়ী তাদের লোমের রং পাল্টায়। শীতকালে তাদের লোমের রং থাকে সাদা, গরম পড়লেই সেই লোমটাই আবার বাদামী হয়ে আসে প্রকৃতির বর্ণানুযায়ী।

কিন্তু আধুনিক অর্থে কাম্ফ্লাজ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশ ধারণের কয়েকটি কৌশল মাত্র নয়। রণ-নীতিতে কাম্ফ্লাজের ব্যবহার প্রায় অস্ত্রের মতই। এবং এই বিশেষ অস্ত্রের ধার দুদিকে। একদিকে যেমন শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাম্ফ্লাজ কাজ করে, অন্যদিকে তেমনি শত্রু-বাহিনীকে ঠকিয়ে, তাকে বিভ্রান্ত করে জয়যাত্রার রাস্তাকে সুগম করতেও কাম্ফ্লাজের জুড়ি নেই। গ্রীক সৈন্যরা যখন দীর্ঘদিন অবরোধের পরও ট্রয়ের পতন ঘটাতে পারেনি তখন তাদের কাম্ফ্লাজের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সেই বিরাট কাঠের ঘোড়াটি, যার ভেতরে আত্মগোপন করে গ্রীক সৈন্যরা নগরে ঢুকেছিল, কাম্ফ্লাজের একটি অসামান্য নিদর্শন। আজকের দিনের সৈন্যরা সারাক্ষণই রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘোরে না, কিন্তু কাম্ফ্লাজের আয়ুধটি তাদের সৈনিক জীবনের সব সময়ের সঙ্গী। সৈন্যদের খাঁকি রঙের পোষাক-পরিচ্ছদ কাম্ফ্লাজের জন্যেই করা হয়েছে। প্রথম ভারতবর্ষেই উনবিংশ শতকে ইংরেজরা সৈন্যদের পোষাক খাঁকি রং আমদানী করেন। তার আগে সৈন্যদের পোষাক ছিল টকটকে লাল অথবা নীল। ঝলমলে পোষাকের জন্যে শত্রুপক্ষ সহজেই অপরপক্ষের গতিবিধি টের পেত। ভারতবর্ষের সৈন্যদের পোষাকের রঙ-এর প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সৈন্যবাহিনীর পোষাকও খাঁকি করা হয়।

কিন্তু যুদ্ধে কাম্ফ্লাজের ব্যবহার শুরু হয় ১ম মহাযুদ্ধ থেকে। এই যুদ্ধে আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা দুই কাজেই সামরিক দপ্তর কাম্ফ্লাজের সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে জেনারেল এ্যালেনবি ম্যাগিডো রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্যে যেভাবে কাম্ফ্লাজকে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। জলপাই এবং কমলালেবু বনের মধ্যে সৈন্যসমাবেশ করে এ্যালেনবি জর্ডন উপত্যকায় নকল সৈন্য রেখেছিলেন। ফলে তুর্কী সৈন্যরা ভেবেছিল এ্যালেনবি বাঁ দিক থেকে আক্রমণ চালাবেন। আক্রমণ বলাবাহুল্য সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে করেছিলেন এ্যালেনবি এবং বিভ্রান্ত তুর্কী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাম্ফ্লাজকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো হয়েছিল নৌ-বাহিনীতে। মিত্রপক্ষের বাণিজ্য জাহাজগুলি জার্মাণদের ডুবোজাহাজের আক্রমণে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত। জাহাজগুলিতে নানারঙের উজ্জ্বল ডোরা কেটে জার্মাণ ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপকে বোকা বানানো হত। আবার যুদ্ধজাহাজগুলিকে এমন করে রঙ করা হত যেন দেখতে ঠিক নির্বিরোধী বাণিজ্য-জাহাজের মত দেখায়। ডুবোজাহাজগুলো নির্ভয়ে কাছে এলেই লুকোনো জায়গা থেকে মৃত্যু-বর্ষণ শুরু হয়ে যেত।

কামুফ্লাজ করার [illegible]

কামুফ্লাজ করার পর বিমান থেকে কারখানাটকে বাগানবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাম্ফ্লাজ-এর ব্যবহার শুরু হলেও এ-বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা বা সামরিক বিভাগে আলাদা কাম্ফ্লাজ শাখার কথা তখনও পরিকল্পিত হয় নি। জেনারেল দ্য গল 'দি আর্মি অফ দি ফিউচর' নামক গ্রন্থে বিশ্বের সমর দপ্তরগুলির দৃষ্টি কাম্ফ্লাজের উপর আকর্ষণ করেন। এই গ্রন্থে দ্য গল লিখেছেন :

There still remains the question of deceiving the enemy by means of false-road indications, sham columns on the march, deceptive earth works and lighting effects, artificial noises, misleading wireless messages. Each division will possess a camoflage battalion specializing in these things and provided with the necessary means of deceiving the enemy by stimulating the presence of a large unit.

But to make oneself invisible and inaudible is not enough.

কিন্তু দ্য গলের এই পরিকল্পনাটি ১৯৩৮ সালের আগে কেউই গ্রহণ করেনি। ১৯৩৮ এবং তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠতেই শত্রু এবং মিত্র দুই পক্ষের সমরকর্তারা কাম্ফ্লাজে গভীরভাবে মনোযোগী হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাম্ফ্লাজের জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেল। ব্যাপক হারে শত্রুপক্ষের আকাশে পর্যবেক্ষক বিমানের আনাগোনার ফলে প্রতারণার কৌশলগুলিকে সম্পূর্ণ বদলাতে হল। সাদা চোখকে যত সহজে প্রতারিত করা যায়, পর্যবেক্ষক বিমানের ক্যামেরাকে তত সহজে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। প্যানক্রোম্যাটিক, ইনফ্রা-রেড এবং রঙীন ফিল্ম ব্যবহৃত হবার ফলে ছদ্মবেশের ক্ষুদ্র ত্রুটিটুকুও বিরাট হয়ে শত্রুর সামনে গোপনতার হাঁড়িকে হাটের মাঝখানে ভাঙতে আরম্ভ করল। পর্যবেক্ষকরা যে-সব ছবি তুলে আনে গবেষণাগারে চিত্র-ভাষ্যকাররা স্টিরিওস্কোপ ওভার-

ল্যাপিং প্রভৃতির সাহায্যে সেই সব ছবির ভাষা পড়ে শত্রুর সমস্ত গোপন প্রয়াসকে বানচাল করে দিত। তার ফলে আরো উন্নত ধরণের কামুফ্লাজ আবিষ্কারে লেগে গেলেন দুই শিবিরের সমর-নায়করা। এবং সেই সংগে শুরু হল কামুফ্লাজ-বিশেষজ্ঞ এবং চিত্রভাষ্য-কারদের মধ্যেও আরেক যুদ্ধ। এক পক্ষের আপ্রাণ প্রয়াস গোপনতা রক্ষার, অপর পক্ষের সাধনা সেই প্রয়াসকে বানচাল করার।

সুতরাং কামুফ্লাজ বিশেষজ্ঞদের সর্বদাই পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি-শক্তি এবং ক্যামেরার কথা ভেবেই কাজ করতে হয়। পর্যবেক্ষকরা তিনটি উপায়ে শত্রু-ঘাঁটি অথবা তার গতিবিধি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। প্রথমে অন্বেষণ। বিমান থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণের পরে সন্দেহ-জনক যদি কিছু পাওয়া গেল, ত তখন চলবে পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়—লক্ষ্যবিদ্ধ জিনিসটিকে চেনার চেষ্টা। অর্থাৎ চিমনীর মত যে জিনিসটি খাড়া হয়ে আছে সেটা সত্যিই একটা কারখানার চিমনী না এমনি ঠকাবার জন্যে একটা ফাঁকা নল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এটা আবিষ্কার করতে হবে পর্যবেক্ষককে। তারপরের তৃতীয় কর্তব্য হল জাহাজকে যদি চেনা যায় তা'হলে জাহাজটা যুদ্ধ-জাহাজ না বাণিজ্য জাহাজ, সনাক্ত করতে হবে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সীমানার মধ্যে গিয়ে বিমানধ্বংসী কামানের পাল্লা বাঁচিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। লক্ষ্যবস্তুর প্রকৃতি এবং স্বরূপ জানবার জন্যে পর্যবেক্ষককে আকার, ছায়া, রঙ-এর ওপর মূলতঃ নির্ভর করতেই হয়। গতি, ঔজ্জ্বল্য এবং রঙ ও তার গভীরতাও তাকে অনেকখানি সাহায্য করে। সুতরাং তাকে ঠকাতে হলে আলোর হিসেব, পর্যবেক্ষক বিমান এবং লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব, রঙ, ছায়ার গভীরতা প্রভৃতি সব-কিছুই নখদর্পণে রাখতে হবে কামুফ্লাজ বিশেষজ্ঞকে। আবার কখনো কখনো কখনো কূট হিসেবের মধ্যে না গিয়ে ব্যাপক কুয়াশার সৃষ্টি করেও শত্রু-পক্ষকে বিভ্রান্ত করা হয়। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে সৈন্যাবতরণের সময়ে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি করা হত যাতে শত্রুর পক্ষে লক্ষ্য-সন্ধানের কাজটি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কামুফ্লাজ শুধু নিজেদের গতিবিধি এবং সম্ভাব্য আক্রমণস্থলকে গোপনই করে না, শত্রুকে প্রতারিত করাও কামুফ্লাজের অন্যতম দায়িত্ব। একটা নকল কামান-শ্রেণী সাজিয়ে যদি তাকে একটু লুকো-বার চেষ্টা করা হয় এবং এই চেষ্টাটা শত্রুপক্ষ যদি সত্যিকারের চেষ্টা বলে ভুল করে তাহলেই কামুফ্লাজ সার্থক। এই সকল কামানশ্রেণীকে আক্রমণ করেই শত্রু তার শক্তির অপব্যবহার করবে। যদি শুধুই একটা মাঠের মধ্যে নকল কামান সাজিয়ে রাখা হত এতটুকু লুকোবার চেষ্টা না করে, তাহলে শত্রুকে ঠকানো যেত না। কাজেই কামুফ্লাজে গোপনতা এবং গোপনতার অভিনয় দুটিই প্রয়োজন।

বড় বড় কারখানা সেতু বা বড় নদী হ্রদ বা সমুদ্রতীরবর্তী কোনো লক্ষ্য-বস্তুকে গোপন করা যায় না সহজে। কামুফ্লাজের সাহায্যে রাতারাতি এদের বেমালুম লুকিয়ে ফেলা সম্ভব না। এ-সব ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু যাতে চারপাশের দৃশ্যাদির মধ্যে একেবারে মিশে যায় সেই চেষ্টা করা হয়। রঙ বদলে, চারপাশে গাছ পুঁতে এবং লতাপাতা আটকানো জালের পর্দা টাঙিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে একেবারে জঙ্গল তৈরী করে ফেলা যায়। বড় বড় কারখানাকে কামুফ্লাজ করা মানেই হচ্ছে ছায়াবাজী দেখানো। বিমান থেকে ছায়া দেখে লক্ষ্যবস্তুকে সনাক্ত করে পর্য-বেক্ষকরা। সুতরাং আসল জিনিসটিকে অবিকল রেখে তার ছায়াটাকে পাল্টে ফেললে ও সনাক্তকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে শত্রুর পক্ষে। অনুজ্জ্বল কাপড়ের স্ক্রীণ খাটিয়ে ছায়া মুছে ফেলা যায়। চিমনীর বিভিন্ন উচ্চতায় স্ক্রিণ রেখে চিমনীর ছায়াকে গাছের ছায়ায় ছায়ান্তরিত করা যায়। কিন্তু কামুফ্লাজের প্রতিটি আনু-যঙ্গিকই একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। নকল গাছপালা পোতার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় গাছগুলো যেন মরা মরা না দেখায়। এবং পাতার রঙ যেন ভেতর দিকে এবং বাইরের দিকে যথাযথ হয় এবং আঞ্চলিক গাছপালার সংগে তার প্রভেদ ধরা না পড়ে।

কামুফ্লাজের সবচেয়ে বড় অসুবিধের কারণ হল জলপথ। অর্থাৎ নদী, সমুদ্র বা হ্রদকে লুকোনো বা রূপান্তরিত করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ জলপথের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুকে সনাক্তকরণও শত্রুর পক্ষে সহজতর। অবশ্য জলকেও যে গোপন করার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়নি তা নয় তবে অসম্ভব ব্যয়-সাপেক্ষ হওয়ার ফলে খুব কমই কামুফ্লাজ দ্বারা জল-স্থলীকে লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছে। জলনিষ্কাশনের খাল কেটে, ভাসমান স্ক্রিন দিয়ে ঢেকে কিংবা একরকম ভাসমান গুঁড়ো ছিটিয়ে জলকে ডাঙায় পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একমাত্র জার্মানরাই সার্থকভাবে তাদের জলপথকে কামুফ্লাজ করেছিল। হামবুর্গের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া গোটা বীনেন আলস্টার নদীকে তারা পুরো লুকিয়ে ফেলেছিল। নেটের ফ্রেমের ওপর বাড়ি-ঘর রাস্তা-ঘাটের ছবি এঁকে নদীর ওপরে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং বীনেন আলস্টারের উপরের একটা ব্রীজের মতন আরেকটি নকল সেতু তৈরী করেছিল অসেন-আলস্টার খাঁড়ির ওপর। মিত্রপক্ষীয়রা ওইটেকেই আসল সেতু ভেবেছিল, ফলে আসল সেতুর কোনো ক্ষতি হয়নি মিত্র-পক্ষের আক্রমণে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কামুফ্লাজের মূল নীতি হল তিনটি। একেবারে লুকিয়ে ফেলা, মিশিয়ে ফেলা এবং প্রতারণা।

লুকোনোর কাজটি অপেক্ষাকৃত সরল। লক্ষ্যবস্তুকে জাল, দড়ি-দড়া, গাছপালা প্রভৃতি দিয়ে একেবারে লুকিয়ে ফেলা যায়। লক্ষ্যবস্তুকে পারিপার্শ্বিকের সংগে মিশিয়ে দেয়ার কাজটি অপেক্ষাকৃত জটিল। পটভূমির সংগে কি রঙে, কি প্রকৃতিতে কি আকারে তিন দিক দিয়েই এক করে ফেলতে হয়। আশে-পাশে অব-
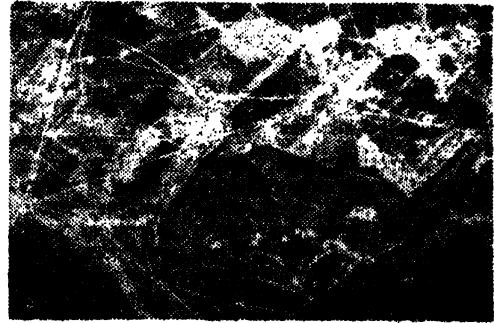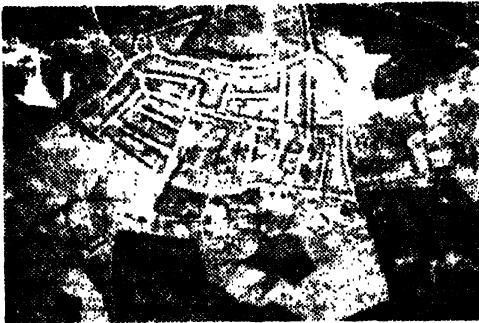
(বাঁদিকে) একটি ছোট শহরের দৃশ্যকে আমূল বদলে ফেলা হয়েছে (ডানদিকে) শহরটির ওপরে অসংখ্য রাস্তা তৈরী করে এবং পাড়িজম প্রভৃতি সবুজ রঙ করে। মিলিটারী গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে রাস্তাগুলো খুব কম সময়ের মধ্যে বানানো হয়েছে।

স্থিত জিনিসরা যেভাবে ছায়া ফেলছে, যেভাবে আলো প্রতিহত করছে আসল লক্ষ্যবস্তুটিকেও সেই ভাবে কামুফ্লাজ করলে তবেই শত্রুর চোখ ঠকবে। কামুফ্লাজের শেষ নীতি হল প্রতারণা। যে-কোনো রকমেই হোক শত্রুকে বিভ্রান্ত করে তাকে হীনবল করতে হবে এই হচ্ছে এই নীতির মূল উদ্দেশ্য। তিনটি কারণে প্রতারণার জন্যে কামুফ্লাজ করা হয়। প্রথমটি হল শত্রুপক্ষের সামনে অনেক নকল লক্ষ্যবস্তুর সৃষ্টি করে তার আক্রমণ শক্তিকে বিভক্ত করা। দ্বিতীয় কারণ, আসল লক্ষ্যস্থল থেকে শত্রুর মনোযোগ সরিয়ে বিপথে চালানো। এবং সবচেয়ে বড় তৃতীয় কারণটি হল শত্রুকে সামরিক গতিবিধি, সৈন্যসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিভ্রান্ত করা।

লুকিয়ে ফেলা, মিশিয়ে ফেলা এবং প্রতারণার তিনটি নীতিকেই একসঙ্গে সার্থকভাবে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কাজে লাগিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এল আলামেন রণাঙ্গনে। সামরিক ইতিহাসে জেনারেল মন্টেগোমারীর এই কামুফ্লাজ কৌশল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিখ্যাত অষ্টম আর্মির অধিনায়ক মন্টেগোমারী স্থির করেছিলেন ১৯৪২ সালের ২৩শে অক্টোবর জার্মান বাহিনীর উপর অকস্মাৎ আঘাত হানবেন। আক্রমণের প্রস্তুতি শত্রুপক্ষকে জানতে দেয়া চলে না। আবার এতবড় আক্রমণের প্রস্তুতি মরুভূমির বুকে একেবারে লুকেনোও সম্ভব না, কিছু না কিছু শত্রুর চেখে পড়বেই। তখন স্থির হল প্রস্তুতি যদি একেবারে গোপন করা না-ও যায়, তাহলে আক্রমণের সময় এবং কোন দিক থেকে আক্রমণ করা হবে, এই দু-বিষয়ে জার্মান বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে হবে। আল-আলামেন রণাঙ্গনের উত্তরদিকে যেখান থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল সেখানে অক্টোবরের গোড়া থেকে মরুভূমির ওপর সার সার নকল গাড়ি তৈরি করা হল। মূল সৈন্যবাহিনীকে রাখা হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া-কায়রো রোডে। ১৮ই অক্টোবর থেকে একেক দল সৈন্যবাহিনী রাত্রে এসে ওই নকল গাড়িগুলোর মধ্যে এসে ঢোকে। একেক দল সৈন্য আসে, আর তাদের বদলে নকল সৈন্য সাজিয়ে রাখা হয় মূল শিবিরে। সব সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র সমেত যখন উত্তরে এসে আক্রমণের জন্যে জমা হল, শত্রু বুঝতেই পারল না। কারণ মূল ঘাঁটির নকল সমাবেশকে তারা মূল সৈন্য সমাবেশ ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। আবার নকল গাড়িগুলোও এক রাত্রে সরে গিয়ে তার জায়গায় এল আসল সাঁজোয়া গাড়ি। নকল গাড়িগুলোকে এনে রাখা হল মূল শিবিরে আসল গাড়ির জায়গায়।

প্রথমেই নকল গাড়িগুলো বিভ্রান্ত করেছিল জার্মানদের। তারা মরুভূমির ওপর পড়ে থাকা অসামরিক গাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শত্রুপক্ষের চোখের সামনে দিয়েই সৈন্য সমাবেশ করে মন্টেগোমারী ঠিক ২৩শে অক্টোবর আক্রমণ করেছিলেন জার্মানদের।

কামুফ্লাজেরও একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে। নিয়মটি পালন করা সমস্ত সভ্য দেশেরই কর্তব্য। যেমন সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে এ্যাম্বুলেন্সের লাল ক্রশ আঁকা নীতিবিরুদ্ধ। যুদ্ধবিরতির শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে আক্রমণ চালানোও সভ্য নিয়ম না। কিন্তু নিয়মগুলি যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় একথা হলপ করে কেউই বলতে পারবে না। গোয়া অভিযানের সময়ে সাদা পতাকা উড়িয়ে কয়েকজন ভারতীয় সৈনাকে হত্যা করার কাহিনী এই সেদিনও আমরা পড়েছি সংবাদপত্রে।

শান্তির পতাকাই শুধু না, শান্তির আওয়াজও যে কামুফ্লাজ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তার জঘন্যতম নিদর্শন 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই' আওয়াজটি। এই ধ্বনিকে যে চীনেরা তাদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিকে কামুফ্লাজ করার জন্যেই ব্যবহার করে এসেছে এতদিন, সাম্প্রতিক সীমান্তের ঘটনাবলীই তার সাক্ষ্য দেবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক, সেক্রেটারীয়েট লাইব্রেরী।

অসামান্য সামান্য-সঞ্চয়

আনন্দকুমার সেন

মানুষের লোভ আদম ও ইভের সেই ইডেন উদ্যানের ঘটনার মতই প্রাচীন। অনেক সময় মানুষ লোভজাত ছোটখাট মন্দ অভ্যাসের সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করার চেষ্টা করে। একটা বাড়তি সিগারেট খাবার লোভসম্বরণে অসমর্থ মানুষ যুক্তি দেখায়, কি দরকার, সবাই তো করছে।

দরকার নিশ্চয়ই আছে। দেশকে আজ যখন যুদ্ধে নামতে হয়েছে তখন সব কিছুরই দরকার। সীমান্তে যে সৈনিক দেশরক্ষার জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে আছেন, দেশের যা কিছু ভাল তা তাঁরই পাওনা। তিনি তা পাচ্ছেন কিনা দেখার দায়িত্ব আমাদেরই।

চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও আক্রমণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন 'ভারতের ইতিহাসে যুগসন্ধির সময়'। আজকের এই চীনে-বর্বরতার পর ভারতভূমি নতুন এক রূপ ধারণ করেছে। বিদেশী আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেবার জন্যে অবিচলিত ঐক্যবদ্ধ দেশবাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষের শক্তি-সামর্থ্য সীমিত। কিন্তু দেশ যখন আক্রান্ত তখন শেষ সীমা শুধু সেই দূরের ক্রমপ্রসারমাণ ক্ষিতিরেখা। আমাদের শক্তি আজ সীমাহীন। জরুরী অবস্থায় জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যেককে এক মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের সর্বব্যাপী দেশব্যাপী প্রচেষ্টায় প্রতিটি কণারই সমান মূল্য। কারও ভূমিকাই অন্য কারও চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সীমান্তে জোয়ানরা চীনাদের সঙ্গে লড়ছে। তাদের জন্য চাই অস্ত্র—চাই অস্ত্র কিনতে টাকা।

দরিদ্র দেশে টাকার অভাব। এই সময়ে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের সামর্থ্য আর সঞ্চয় নিয়ে।

বর্তমান জরুরী অবস্থায় জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করে দেশের প্রতিটি মানুষই আজ জাতীয় সরকারকে সাহায্য করছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ক্রমশই বেড়ে উঠছে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডার। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে আসমুদ্র হিমাচলের ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশবাসীর ছোট-বড় প্রতিটি দান সমান কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করছেন সরকার।

গুজরাটের প্রখ্যাত কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী তাঁর নর্মদ স্বর্ণপদকটি প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছেন। সাহিত্য-কৃতির উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ লাভ করেছিলেন এই পদকটি। তাছাড়া ঐ তহবিলে তিনি আরও দান করেছেন নগদ ৫০০ টাকা ও একজোড়া সোনার বালা।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে ইরোডের ষাট বছর বয়স্ক ভিক্ষুক মুথুস্বামু সুনডুর কথা। অন্যের দয়ায় চলে তার জীবন। কিন্তু সুনডু বিস্মৃত হল না তার কর্তব্যের কথা। কয়েকদিনের ভিক্ষের দান একত্র করে কিনলে একটা মুরগী। তারপর প্রায় ষাট মাইল পায়ে হেঁটে সে তার প্রতিরক্ষা তহবিলে সামান্য দান এনে পৌঁছে দিল মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজের হাতে। মুরগীটি নিলামে তুলে যে ১০০ টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা জমা দেওয়া হল প্রতিরক্ষা তহবিলে।

কেরালার লেদুমংগারের এক গরীব হরিজন নারীর সঞ্চয় না থাকতে পারে, কিন্তু তার মন ছোট নয়। প্রতিদিন ঘাস বেচেই তার জীবিকা-নির্বাহ হয়। সমস্ত দিনের সংগৃহীত ঘাসের আঁটি তুলে দিলে হরিজন কল্যাণ মন্ত্রীর হাতে। ঐ ঘাস নিলামে বিক্রি হল ২৫ টাকায়। টাকাটা জমা দেওয়া হল প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে।

অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের পিয়ন শ্রীভগত সিং অক্টোবর মাসের এক দিনের বেতন প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, জরুরী অবস্থাকালে তিনি তাঁর মাসিক বেতনের এক-সপ্তমাংশ প্রতিরক্ষা তহবিলে দিয়ে যাবেন প্রতি মাসে।

জলন্ধর জেলার রাহায়ুন তহশীলের শান্তি দেবী সোনার চাইতে দেশকে বড় বলে মনে করেন। তাই তিনি তাঁর ৩৩৫ গ্রাম স্বর্ণালংকার প্রতিরক্ষা তহবিলে দান হিসেবে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে গত ২২শে নভেম্বর।

ফারাক্কা বাঁধের পৌরসভা কর্মীগণ একদিনের মাহিনা ৬১২ টাকা, স্যানিটারী কর্মীগণ ১৮৪ টাকা এবং প্রাথমিক ও জুনিয়র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ৩০৫ টাকা দান করেছেন প্রতিরক্ষা তহবিলে।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ ৪৫০০ ডলার, অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ ব্যবসায়ী সমিতি ৫১০০ টাকা ঝারসুগোদায় কার্যরত রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর শ্রীবি. কে. মোহেন্তা এক মাসের মাইনে এবং মধ্যপ্রদেশের বিদিসা জেলার পাথরি গ্রামের এক বন্ধ্যা ৪টি রুপোর বালা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছেন।

বিহারের রাঁচী জেলার গুলাডো গ্রামের এক চাষী জেলা-শাসককে জানিয়েছেন যে, তার তিন একর জমিতে যে ধান পাকবে ঐ ধান গ্রাম-পঞ্চায়েতের মারফৎ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন। মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার কোকপুর গ্রামের শ্রীহীরালাল তাঁর ৬ একর জমির ফসল দু বৎসর প্রতিরক্ষা তহবিলে দেবেন এবং তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন পরের জমিতে চাষ করে।

কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের মোটর-চালক শ্রীশিবচরণ তার অক্টোবর মাসের বেতন ১২২ টাকা দিয়েছেন এবং তাঁর স্ত্রী দিয়েছেন দুটি সোনার দুল।

উত্তরপ্রদেশের জে, এ, এস, ইণ্টার কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং মাদ্রাজের পি, কে, এন্ হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ যথাক্রমে ১৫০০ টাকা ও ৭৫০ টাকা দিয়েছেন। দেওবাঁধ (সাহারাণপুর) কলেজের ছাত্ররা তহবিলে এ পর্যন্ত দিয়েছেন ৭০০ টাকা। তাঁরা মোট ১০০১ টাকা দেবেন বলে স্থির করেছেন। জামশেদপুরের মহিলা কলেজের ছাত্রীরা স্থির করেছেন তাঁরা প্রতিমাসে এক টাকা করে দান করবেন। এবং ঐ কলেজের অধ্যাপিকারা প্রতি মাসে এক দিনের বেতন দান করবেন।

কটক জেলার রাজনগরের একটি দরিদ্র বালক তার পুরনো সুলেখা কলমটি দান করে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে। প্রথমে কলমটি নিলামে ডেকে পাওয়া যায় দশ টাকা। পরে কয়েকবার কলমটি নিলাম করে প্রতিরক্ষা তহবিলে তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর সেণ্ট্রাল কলেজের দুশত কয়েদী সীমান্তে যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, তাঁরা যুদ্ধের শেষে জেলে ফিরে কারাদণ্ডের বাকী সময়টুকু সেখানে কাটাবেন। তাঁরা ৬১৫ টাকা ৯০ নয়া পয়সা অনাহারে থেকে সঞ্চয় করে জমা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে। গুরুদাসপুর জেলের ৭২ জন কয়েদী যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য রক্ত দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রী এক মাসের বেতন দেবেন প্রতিরক্ষা তহবিলে। মাদ্রাজের শ্রীজি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও দিয়েছেন দশ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সকল অফিসার ও কর্মী জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৪৫,০০০ টাকা দান করেছেন এবং আরও দানের আশ্বাস দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দিল্লী প্রকাশনা বিভাগের কর্মচারিগণ দিয়েছেন ৪৫০০ টাকা। বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের বৈদ্যুতিক বিভাগের অফিসার

ও কর্মচারিগণ তাঁদের এক দিনের বেতন ৯৬২ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দিয়েছেন। শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অফিস ও গবেষণাগারের কর্মচারিগণ দিয়েছেন নগদ ৫৯,৩৩৭ টাকা, ৫ খানি সোনার বালা ও একটি আংটি। হায়দরাবাদে জাতীয় সঞ্চয় সম্পর্কিত আঞ্চলিক অধিকর্তার অফিসের কর্মচারিগণ একদিনের বেতন দিয়েছেন প্রতিরক্ষা তহবিলে। একটি জনসভায় সংগৃহীত হয় ৭৫৭০ টাকা ও দুটি সোনার আংটি।

টাটানগরের শিশু সংস্থা 'বাল নীলকুঞ্জ' শিশুদিবসে প্রাপ্ত টফি চকলেট সীমান্তে যুদ্ধরত সৈনিকদের উপহার পাঠিয়েছে। ঐ উপহারের মধ্যে আছে একশ এক পাউন্ড টফি চকলেট ইত্যাদি। এই শহরের জগবন্ধু সেবা সদন গ্রন্থাগার তাদের সমস্ত পত্রিকা জরুরী অবস্থায় সীমান্তের জোয়ানদের নিয়মিত পাঠাবে। গত ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কাছ থেকে মোট ২,৪০,৩১১ টাকা সংগ্রহ করে তহবিলে জমা দিয়েছেন জন্মভূমি সংবাদপত্রগোষ্ঠী। গত ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের রাইপুর জেলায় মোট ২,১২,১৬৬ টাকা ও ১৩৫৫ গ্রাম সোনা সংগৃহীত হয়। নয়াপাড়া রাজিমের মহিলারা দিয়েছেন ২২০ গ্রাম সোনা ও ২৬২ টাকা। রাইপুরের টেলিগ্রাফ কর্মীরা এপর্যন্ত দিয়েছেন ১৮৬৫ টাকা। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার একস্থানে ৩০০০ টাকা পাওয়া গেছে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য। শ্রীউদয় সিং নামক জনৈক পাটওয়ারী ৮০ গ্রাম সোনা ও একমাসের বেতন তহবিলে দান করেছেন। জনৈক অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীরাতওয়ার সিং জরুরী অবস্থার শেষ পর্যন্ত তাঁর অবসর-ভাতা প্রতিরক্ষার জন্য দিয়ে যাবেন।

কয়রা জেলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় ইউনিয়ন নগদ ১,২৫,০০০ টাকা ও ১ লক্ষ টাকার গুঁড়া দুধ দান করেছেন। আমেদাবাদ শহরের সিনেমা গৃহগুলি ১১ই নভেম্বরের গেটে সংগৃহীত প্রায় ৫৫ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং দশ বৎসরের একটি হরিজন বালিকা প্রতিরক্ষা তহবিলে তার সোনার আংটি দান করে। দিল্লীর মেসার্স রাজকমল প্রকাশন ও তার কর্মচারিগণ সৈন্যবাহিনীর জওয়ানদের ৫ হাজার টাকার পুস্তক দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। দিল্লীর ভারত সেবক সমাজ জওয়ানদের ব্যবহারের জন্য প্রথম কিস্তিতে ৪৫০ খানি সুতি জার্সি ও ১৩০ খানি পশমী টুপি পাঠায়।

পণ্ডিচেরীর একটি কমিটি ১০ হাজার টাকা ও ৮২টি সভরেন সংগ্রহ করে। এখানকার তিনটি কাপড় কলের শ্রমিক ও সরকারী কর্মচারিগণ তাঁদের একদিনের বেতন ঐ তহবিলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।

ভরতপুর জেলা পরিষদ প্রতি পঞ্চায়েতের থেকে ১০০ টাকা হিসাবে ৪,৫২,০০ টাকা সংগ্রহ করবেন। এবং ৪৫২ তোলা সোনা সংগৃহীত হবে। ৭ লক্ষ টাকা ও ৬০০ তোলা সোনা সংগৃহীত হবে সমগ্র ভরতপুর থেকে।

মধ্যপ্রদেশের মিউনিসিপ্যাল কাউনসিল ঐ তহবিলে ৫০০১ টাকা দিয়েছেন এবং কর্মচারিগণ একদিনের বেতন দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। সাগর জেলার গড়খোতার কর্মচারিগণ ২০৯ টাকা দিয়েছেন এবং একদিনের বেতন দানের অঙ্গীকার করেছেন।

পাঞ্জাবের রোটক ও হিসার জেলার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর উত্তর প্রদেশের ভারত স্ট্রবোর্ড অ্যান্ড পেপার মিলস-এর কর্মচারিগণ একদিনের বেতন দানের সিদ্ধান্ত করেন। আসামের রাজবাড়ী চা-বাগিচার কর্মী এবং পরিচালকগণ সঙ্কটকালে মাসে একদিনের মাহিনা, অন্ধ্র প্রদেশের কীরলামপুদি সুগার মিলের কর্মিগণ প্রায় দু হাজার টাকা এবং নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান ড্রাগস অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-এর কর্মিগণ একদিনের বেতন দেবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কানপুর শাখার কর্মচারিগণ ৫০১ টাকা দিয়েছেন এবং তাঁরা আরও ৫০১ টাকা দেবেন। তাঁরা এবং ত্রিপুরার কৈলাস শহরের শিক্ষা ইনস্পেক্টারের অফিসের কর্মচারিগণ প্রতি মাসে একদিনের বেতন দান করবেন। এলাহাবাদের ই, এম, ই, কর্মীসংঘ ৫০১ টাকা দেন এবং সর্বাধিক উৎপাদনের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ জানান। বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল কমিশনারের অফিসের কর্মচারিগণ দিয়েছেন ৫২৪৩ টাকা।

দিল্লীর ইন্দো-আফগান বণিক সভা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫৫ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং মীরাটের পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ বণিকসভা দেবেন ৫ হাজার টাকা।

জরুরী অবস্থা থাকাকালীন রাজস্থানের বিধানসভা সদস্য শ্রীআনন্দ সিং কাচ্ছাওয়া তাঁর সমস্ত বেতন দেবেন এবং তাঁর স্ত্রী ১২৫ তোলা সোনার গহনা দিয়েছেন।

ভারতীয় রেডক্রস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত সৈনিকদের জন্য চারশ কম্বল ও লেপ, গুঁড়ো দুধ, চিনি, বিস্কুট, সিগারেট, গ্রামোফোন, খেলার সামগ্রী, খাম পোস্টকার্ড, বই এবং আরোও অনেক কিছু পাঠান অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে। তাছাড়া তাঁরা নেফার বাস্তুত্যাগীদের জন্য গরম কাপড়, কম্বল, সুতী, পোষাক, ওষুধপত্র খাবার এবং আরো অনেক কিছু পাঠিয়েছেন।

কারলবাগের ক্ষৌরকার ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫২৫ টাকা জমা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক সদস্যকে একদিনের আয় দানের জন্য অনুরোধ করেছেন। উত্তর প্রদেশের ললিতপুর পৌরসভার কর্মীরা তাঁদের একদিনের বেতন ১০১ টাকা দান করে জানিয়েছেন যে তাঁরা রবিবার দিনও কাজ করবেন, এবং ঐদিনের সম্পূর্ণ বেতন প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন। বেরিলী পৌরসভার কর্মীরা একদিনের বেতন, দিল্লীর উইংস উয়ের করপোরেশনের কর্মীরা ২২০১ টাকা, জীবনবীমা করপোরেশনের দ্বারভাঙা শাখার কর্মীরা বেতনের ২ শতংশ, মহীশুরের খুনিয়ারবাদ চিনি কলের কর্মীরা একদিনের বেতন দান করেছেন।

কানাডার ভ্যান্কুভারের ভারতীয়গণ ভারত সাহায্য তহবিল গঠন করে ৭০০০ ডলারের একটি চেক পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে গত ২২শে নভেম্বর। তাছাড়া প্রত্যেক ভারতীয় এককালীন ৫০ ডলার এবং যতদিন চীন বিতাড়ন শেষ না হবে ততদিন একদিনের বেতন দান করে যাবেন প্রতি মাসে। ২০০০ ডলারের একটি চেক পাঠিয়েছেন ভ্যান্কুভারের পুরনো ভারতীয় বাসিন্দা শ্রীকাবুল সিং। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ পাঠিয়েছেন ১০০০ ডলার।

নয়াদিল্লীর এম, সি, মিডল বেসিক স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ দিয়েছেন ১১০০ টাকা। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র মদনলাল অবসর সময়ে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে উপার্জিত ২৭ টাকা প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেছেন। জবলপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ দিয়েছেন ৫৭৬ টাকা। এবং দুজন কলেজ ছাত্রী শকুন্তলা দেবী চাওলা ও কুমারী অমরজী রাও দিয়েছেন যথাক্রমে একজোড়া সোনার কানের দুল ও আংটি। শ্রীজওহরলাল নেহরুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বোম্বাইয়ের আট বছর বয়স্ক নিখিলেশ জে, মাইনথিয়া এবং বার বছর বয়স্ক যামিনীকুমার তাদের ঘড়ি কেনবার জন্য বাড়ী থেকে পাওয়া ১৫১ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছে। উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলার আট বছরের মেয়ে শীলা পানাডর অনেকদিনের সাধ একটা গরম কোটের। তাই একটি দুটি করে পয়সা জমিয়েছিল ১·৮১ নয়া পয়সা। চাচা নেহরুর উদাত্ত আহ্বানে শিশুপ্রাণে সাড়া জাগল। তার সমস্ত সঞ্চয় তুলে দিল জোয়ানদের শক্তি বাড়াবার তহবিলে।

জয়পুর রেলস্টেশনের প্রথম শ্রেণীর টিকিটঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার পার্থক্য টাকা ক'টা দিলেন জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে। সেদিন আরও অনেক যাত্রী সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করায় সেখানেই জমা পড়ে দুশ টাকা। কর্তব্যপরায়ণ এক নাগরিকের বাড়ীতে বিয়ের ভোজ বন্ধ করে ভোজের জন্য বরাদ্দকৃত ১,১০০ টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দেওয়া হয়।

এসব মহৎ আত্মত্যাগেরই নিদর্শন। অন্ধ ব্যক্তির দেওয়া সৈনিকের জন্য রক্ত, তরুণীর দেওয়া শখের দুজোড়া দুল, সজাগ নাগরিকের হাজার-লক্ষ টাকা—আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ করবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের আরও সজাগ হবার প্রয়োজন আছে।

নেফার পর্বত শিখরে, লাদাকের তুষারশুভ্র উচ্চতায় রয়েছে অনেক ভারতীয় বীরের রক্তস্রোত আর দেশমাতৃকার অশ্রুধারা। অসংখ্য ভারতীয় জওয়ান শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ছে মাতৃভূমির মর্যাদার জন্য। দেশবাসী সবাইকে দাঁড়াতে হবে তাঁদের পেছনে। প্রতিটি মানুষের সহায় এবং সম্বলে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে উঠবে—সে প্রাচীর হবে অটল—এক মহান বীরত্ব এবং জয়গাথার নিদর্শন।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন কিন্তু সে সত্যিই এলো না। তার মামাও এলেন না। বিকেলটা আমার ছটফট ক'রে কাটলো। নিজের দুরবস্থা দেখে নিজেরই করুণা হ'লো আমার। সেই রাত্রে আমি ঘুমুতে পারলাম না। মাথার কাছের টেলিফোন-টিতে অনেকবার হাত বুলোলাম, দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে সেই লোভকে পরাস্ত করলাম আমি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এই অবস্থাকে আর এক বিন্দুও প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এ আমার অপমান। নিজেকে যে স্বেচ্ছায় অপমানিত হ'তে দেয় তার মতো কাপুরুষ, তার মতো হীনচেতা আর কে আছে জগতে। আমি রাসেল স্মীথ, আমেরিকার একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, বহুনিন্দিত, বহুপ্রশংসিত একজন বিশিষ্ট কবি, যার সতেরো পৃষ্ঠার একখানা কবিতার বই এই বছরে প্রায় লক্ষ কপি বিক্রী হ'য়েছে, যার প্রেমে পড়তে পারলে এই নিউইয়র্ক শহরের যে কোনো মেয়ে ধন্য হ'য়ে যায়, সেই আমি আজ আমাকে এইখানে বলি দেব? না। কক্ষনো না। সেটা হতেই পারে না।

সেদিন সত্যি আমি আমার মনকে দুই ধমকে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিলাম। শান্তিও পেয়েছিলাম। কিন্তু শান্তি আমার ভাগ্যে ছিলো না। বিকেলে মলিকার বাবা এলেন। হাসিতে গল্পেতে মাতিয়ে রাখলেন সময়। খবর দিলেন [illegible] তাকে নিয়ে কাল কুইন্সে আমার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে-ছিলেন। দরজা বন্ধ ছিলো, চাবি দিয়ে [illegible] ঢুকতে পারছিলেন না, ম্যানেজারই এসে তার দরজা খুলে দিলেন।

তারপর ওরা ঘরে ঢুকে সব দেখে শুনে গুছিয়ে, কুকুরটাকে নিয়ে চলে এসেছেন। কুকুরটাকে ম্যানেজারই খেতে দিচ্ছিলেন, ঘরের দরজাতেই সে পড়ে থাকতো। ছোট্ট পিকিনিজ কুকুর, মনিবের দুঃখে প্রায় আধমরা হ'য়ে ছিলো, মলিকা তাকে নিয়ে এসে একদিনেই বশ ক'রে ফেলেছে। সারাদিন সে আর তার ভাই তাকে হয় বিছানায় নিয়ে বসে আছে, নয় কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। না হয় খেতে দিচ্ছে।

মনের সমস্ত সংকল্প, সমস্ত দৃঢ়তা, সমস্ত রাগ ঢিলে ক'রে দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

খাবার দিতে এসে 'নার্স' জিজ্ঞেস করলো, 'কই, তোমার সেই শান্তিপ্রিয় ভারতীয় এজেন্টটি আর আসছে না কেন? কী হলো।' নার্সের গলায় একটু শ্লেষ ছিলো। অল্পবয়সী নার্স, তার চোখে আমার সব ব্যাকুলতাই ধরা পড়ে গিয়ে-ছিলো। এটাকে সে যে সুনজরে দেখছিলো না, সেটা বোঝা গেল।

গম্ভীর হ'য়ে বললুম, 'তার সঙ্গে কি তোমার কোনো দরকার আছে?'

'দরকার! আমার সঙ্গে!' যেন এমন আশ্চর্য কথা সে জীবনে এই প্রথম শুনলো। চোখ-দুটো গোল করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

আমি মাথা নাড়লুম, 'তা [illegible], তোমার সঙ্গে আর তার কী দরকার থাকতে পারে। [illegible] তো তার [illegible] নয়, মেয়েটাই-বা [illegible] কী কাজ?'

নার্সটি এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে তার কাজ করতে করতে ফিরে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকোলো। মনে হ'লো আমার কথাটা সে ভালো ক'রে শোনেনি। অথবা শুনেও না শোনার ভান করলো। বললো, 'ঐ কালো মেয়েটি ছাড়া কি তোমার আর কোনো মেয়ে বন্ধু নেই?'

'না।'

'ভালো মেয়ে চাই?'

'না। ধন্যবাদ।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বললো, 'তার সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হ'লো?'

আসলে নার্সটি [illegible] আমার প্রতি একটু মনোযোগও পড়েছে। আমি কিছু জবাব দেবার আগেই কাছে এসে বললো, 'তুমি কি জানো, তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর?'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।'

'তুমি কি জানো, আমি তোমার সেই সতেরো পৃষ্ঠার কবিতার বইটা এক নিঃশ্বাসে পড়েছি?'

'ধন্যবাদ।'

'কবিতার আমি পড়ুয়া নই।'

'ধন্যবাদ।'

'আমেরিকার হাসপাতালের বাইরে গিয়েও তুমি আমাকে ভুলবে না।'

'কেন ভুলবো?'

'আমি দেখা করবো মাঝে মাঝে।'

'আমি খুব কাজে ব্যস্ত থাকি।'

'আমি [illegible], তা বলে [illegible] করে না, এমন লোক নেই।'

'পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক,

সবাই যায় এই ব্যস্ত জগতে। নতুন বন্ধুত্বের সময় কোথায়?'

মেয়েদের মনোযোগের মিলিয়ত এ রকম অভদ্র জবাব দেয়া অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ। জানতুম সে কথা। তবু আমি তখন সেখানে এই রকমই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিলুম।

মল্লিকার কণ্ঠস্বরও কর্কশ হ'লো, মাথার তলায় বালিশ ঠিক করে দিতে দিতে বললো, 'নতুনো বন্ধু। কই তেমন তো দেখছে আসে না কোনোটিকে। তবে কি ঐ ভারতীয় মেয়েটাই—না, না, তাহলো খারাপ দুটি আমাদের দেশের ছেলেরা—

আমি এমন করে তার দিকে তাকালাম যে সে আর কথা শেষ করতে সাহস পেল না।

মল্লিকা এলো তিন দিন পরে। আমন্ত্রিত সম্ভাষণের পরে আমি বেশ গম্ভীর হ'য়ে রইলাম। মনে হ'লো তাতে একটু অপ্রস্তুত বোধ করছে সে। করুক। অন্যকে অপ্রস্তুত করতে যখন তার নিজের এতটুকু আটকায় না, অন্যের কাছ থেকেও কিছু শাস্তি পাওয়া দরকার।

'আপনার কুকুরটা খুব সুন্দর।'

বোধ হয় চুপ করে অস্বস্তিটা কাটাতেই এই প্রসঙ্গটা তুললো সে।

আমি বললুম, 'ধন্যবাদ।'

'এই কদিনেই আমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে।'

'সুখী হলুম।'

'আমার ভাই মস্ত বলেছে, ওকে আর ছাড়বে না।'

'তাই নাকি!'

ছোটো কড়া জবাব দিতে পেরে খুব আত্মতৃপ্তি অনুভব করছিলাম।

একটু হাসলো মল্লিকা, 'আপনার কষ্ট হবে না ওকে দিয়ে দিতে?'

'ভালোবাসার জিনিস দিয়ে দিতে বা দেখতে না পেলে কার না কষ্ট হয়।'

'তবে দেবেন কেন?'

'সেই সব কষ্ট আমার অভ্যাস করা আছে।'

'কষ্ট আবার কারো অভ্যেস করা থাকে নাকি?'

'থাকে।'

'নতুন কথা শুনলুম।'

'কুকুর কেন, সারাক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে এমন মানুষের দেখাই কি আমরা ইচ্ছে করলে পেতে পারি?'

কথাটা বলে ফেলেই আমি একটু সজাগে চেয়ে। মল্লিকার সম্পর্ক আমার সম্পর্কে মনে যতো বড়ো বাসনাই হোক, কিন্তু পরিচয় অতি অল্প দিনের। এবং সে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধরনের মানুষ। দেখা যায় আমি না হয় পাগল হয়ে গেছি, তার মনের কী ভাব তা তো আমার জানা নেই। যদি রাগ করে? যদি অন্যরূপ মনে করে? মনের কথা ব্যক্ত করা বিষয়ে আমার আরো সংযত হওয়া উচিত ছিলো নাকি?

আসলে কিছু চেপে রাখতে পারা আমার স্বভাব নয়। মনের কথা বলে ফেলতে জীবনে আমি দুবার ভাবিনি। ভালোলাগা মন্দলাগার তীব্র প্রকাশে অনেক সময় অনেক মানুষকে আমি অখুশি করেছি, অপ্রস্তুত করেছি, বিরক্তির কারণ হয়েছি। আমার স্বভাবে কোথায় একটা দোষই আছে। ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে চলতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি দুর্দাম, খেয়ালী, নিজের ইচ্ছের অধীন।

ছিঁড়তে ভাঙতে ফেলতে নিতে কখনো আমার কোন মমতা ছিল না। কিন্তু সেদিন স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম সেটা সত্য নয়। আসল জায়গায় পৌঁছবার জন্যই আমার সেই সব বাড়তি জিনিস ঝরিয়ে ফেলার অপচয়। ভালোবাসার ভাণ্ডারটি যেন সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে ওঠে তার জন্যই এই প্রস্তুতি। সেই সময়ে হারিয়ে যাবার কিছু ছিলো না আমার তাই হারাতেও ভয় ছিলো না। কিন্তু তখন হয়েছে। আমার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, সেই আকাঙ্ক্ষা আমার মল্লিকা। মল্লিকার ভালবাসা পাবার, তাকে সুখী করবার, তার মনের কাছে পৌঁছবার। তাকে আমি চাই। অনুপরমাণুতে চাই। কোথাও যেন এতটুকু আঘাত না লাগে তার, যেন সে রাগ ক'রে আমাকে পরিত্যাগ না করে। তার জন্য আমাকে সাবধান হ'তে হবে, তার মন বুঝে চলতে হবে, তার ভাল-

তা ব্যতীত কিছু দিনের মধ্যে এটাও টের পেলাম, ওর পরিত্যক্ত স্বামীর সঙ্গে আবার ও দেখাশুনো করছে। একসঙ্গে না থাকলেও বন্ধুত্বের আটকাচ্ছে না কিছু। দরকার মতো টাকাকড়িও দিচ্ছে, সেই স্বামী।

তারপর কয়েক মাস পরে দেখা গেল ওর স্বামী আবার একজনকে বিয়ে করেছে। কিন্তু লোকটিকে যতোটা হৃদয়হীন ভেবেছিলাম, আসলে সে তা নয়। স্ত্রীর উপর টান না থাকলেও বাচ্চা দুটোকে ভালবাসতো। বাচ্চা দু'টো বোর্ডিংয়ে চলে গেল। বাপ-মা দুজনেরই তাতে দেখাশুনো করার সুবিধে হলো। আর বাচ্চাদের খরচ বহনে তাদের বাপের এতটুকুও আপত্তি দেখা গেল না। স্বামী বিয়ে করবার পরেই ও নিজেও বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠলো। অবিশ্যি ওর স্বামী নির্বাচনের তালিকায় শুধু যে আমার নামটাই একমাত্র ছিলো, ঠিক তা নয়, আরো দু'একজনের সঙ্গেও দেখাশুনো করেছে। ডেট ফেলেছে, জুৎসই হচ্ছে না। আসল ঝোঁকটা ছিলো আমার উপরেই। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে স্বামী হিসেবে পেলে ও আর কারু কথা ভাববে না। তার কারণ হচ্ছে আমার একটি বহুবিক্রীত কবিতার বই। একজন কবিকে বিয়ে করা কম গৌরবের কথা নয় এখানে, বিশেষ ক'রে যে কবিকে এখনো কেউ হাতের মুঠোয় পায়নি, যার জন্য অসংখ্য না হোক, শহরের অনেক কন্যাই উৎসুক। বিজয়ীর গৌরব লাভ করতে চাইছে সে।

আমি শুকনো হেসে তাকে সম্ভাষণ করলাম। আমাকে দেখতে আসার জন্য সৌজন্য দেখিয়ে ধন্যবাদ দিলাম। সে একটা চেয়ার টেনে একেবারে আমার গা-ঘেঁষে বসলো।

প্রকৃতপক্ষে এর ভয়েই আমি কিছু দিন আগে পাড়া বদলে ছিলাম। ঠিকানা না দিয়ে বদলাতে গেলে প্রায় ডুব মেরে-ছিলাম। কী ক'রে যে খবরা-খবর করেছে বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই। মৃদুলিকা উঠে দাঁড়িয়েছে যাবার জন্য, মুখের ছায়া গম্ভীর হয়েছে। ব্যগ্র হয়ে বললাম, 'এখুনি, এখুনি যাচ্ছেন কেন?'

'আমার কাজ আছে।'

'এই যে এর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।'

আইলিন অনর্গল কথা বলছিলো কল কল ক'রে। সে যে আমাকে কতো খুঁজেছে, না পেয়ে কতো কেঁদেছে, না ঘুমিয়ে না খেয়ে কতো রোগা হয়ে গেছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিলো। তারপর প্রাণের তাগিদে কীভাবে ঠিকানা সংগ্রহ করেছে, হাসপাতালে হাত ভেঙে পড়ে আছি জেনে কতো কষ্ট পেয়েছে তার আদ্যো-পান্ত ইতিহাসও সব এক দমে উগরে দিল সে।

আমি বললাম, 'শোন আইলীন, ইনি মিস মল্লিক, আমি এঁর কাছে বাংলা শিখছি। আমার বিশেষ বন্ধু।'

ভুরু কুঁচকে ফিরে তাকালো আইলীন, 'বাংলা! সে আবার কী?'

'একটা ভাষা।'

'ও. মাই, রিয়্যালি! কতো ভাষাই না আছে।'

মৃদুলিকা ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে বললো, 'ভারতবর্ষের নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'টেগোরের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তিনি এই ভাষায় লিখতেন।'

'ও।'

'এটা তাঁর মাতৃভাষা।'

'তা হলে তিনি ইংরিজিতে লিখতেন না?'

'আপনার জমিতে তিনি কেন বীজ বুনবেন?'

'মানে?'

'তিনি ভারতীয়, বাঙালী, তাঁর অবশ্যই একটা মাতৃভাষা আছে।'

'সব বই-ই তাঁর মাতৃভাষায় লেখা?'

'তাঁর মাতৃভাষার ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি গৌরবান্বিত ছিলেন।'

'সত্যি? তোমাদের ভাষা তা হলে বেশ অগ্রসর, কী বলো?'

'আপনার এই কথার জবাব দিতে আমি অপমান বোধ করছি।'

'অপমান বোধ করলে কী হবে? ইংরিজি ছাড়া কি তোমাদের চলে?'

'চলে কি চলে না সেজন্য আমরা ইংরিজি শিখি না, সাহিত্য রচনার জন্যও শিখি না। শিক্ষিত হবার জন্য শিখি, বিভিন্ন দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করে আনন্দিত হবার জন্য শিখি। সাহিত্য উপভোগ করবার জন্য শিখি। মূল ভাষার সাহিত্য পড়বার জন্য মানুষ আরো অনেক ভাষা শেখে।'

'কিন্তু আমি অনেক ভারতীয় লেখককে চিনি যাঁরা ইংরিজিতেই লেখেন।'

'সেই সব লেখকদের ঈশ্বর দয়া করুন।'

'কেন?'

'তাঁদের দিয়ে যদি আপনি আমাদের সাহিত্য বিচার করে থাকেন, তা হলে একটু ভুল করেছেন। এই ইংরিজি-নবীশদের আমাদের দেশে আমরা পাত্তা দিই না।'

'দেয়া উচিত।'

'দেখুন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর নেই, পরের ভাষায় যে আপন সাহিত্য রচনা ক'রে কৃতকার্য হয়েছে। আপনি রুশ সাহিত্যের কথাই ভাবুন না। যতদিন ওরা ফরাসী নিয়ে মাথা ঘামাতো ততদিন কী ছিলো? আর তা ছাড়া যদি এমনও হয় যে, দৈবাৎ কোন ভারতীয় সত্যি একটা উৎকৃষ্ট রচনার অধিকারীও হয়ে যান, এবং তা যদি ইংরিজি বা ফরাসী বা জর্মান ভাষায় লেখা হয়ে থাকে তবুও আমরা তাঁদের আমাদের বলে ভাববো না।

'কেন? কেন?'

'যা আমাদের ভাষায় নয়, তার সঙ্গে আমাদের কী সম্বন্ধ? তাতে কি আমা-দের সাহিত্য পুষ্ট হবে?'

'তার মানে যে সব ভারতীয় ইংরিজিতে লেখেন তাঁদের তুমি পছন্দ কর না?'

'পছন্দ অপছন্দের কথা এর আগে ভাবিনি, এই মুহূর্তেই বুঝতে পারছি, এই কর্মটি ক'রে নিজের দেশকে, নিজের ভাষাকে আপনাদের চোখে তাঁরা ছোট করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের সঙ্গে কখনোই এক আসনে বসাতে রাজী নই। এবং আমি এ-ও জানি তাঁরা আমাদের কেউ নয়ই, আপনাদেরও কেউ হতে পারবেন না।'

'আসলে তুমি খুব ফ্যানাটিক। কিন্তু যাদের দেশে অতগুলো ভাষা তাদের ইংরিজি না শিখে উপায় কী? পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবে কেমন করে।

'তার জন্য কি কেউ অন্যের ঘরে ধার চায়? আপনাদের সারা ইয়োরোপ জুড়ে কি একটাই ভাষা?'

'তা কেন হবে?'

'তবে? আপনি যান না ইটালিতে, দেখুন না ইংরিজিতে কথা বললে কেউ বোঝে কি না, জর্মানীতে যান না, ফ্রান্সে যান না, রাশিয়ায় যান না—'

আমি বললাম, 'আইলীন, মিস মল্লিক যা বললেন, সমস্ত কথাই ঠিক। মিছিমিছি তুমি বাজে তর্ক করো না।'

আইলীন রেগে গিয়ে বললো, 'কখনো আমি বাজে তর্ক করছি না। বরং, আমার যদি আজ টেগোরকে পড়বার ইচ্ছে হয়, তা হলেই আমাকে বাংলা শিখতে হবে?'

শিখতেই যা।'

'দ্যাখো মৃন্ময়, বাড়াবাড়ি করো না। কচি খোকা নও যে এই সহজ সত্য কথাটা তুমি বোঝ না, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সাহিত্য পড়বার জন্য আগে তাদের ভাষা শিখে নিতে হলে ঐ ভাষা শিখতেই জীবন যাবে, সাহিত্য আর হবে না।'

মৃন্ময়কা বললো, 'তা তো ঠিকই। আপনি অনুবাদ পড়বেন।'

'অনুবাদই কি তোমরা করেছ? কোথায় অনুবাদ আছে তোমাদের? কী করে জানবো তোমাদের সাহিত্য কোথায় পৌঁচেছে।'

একটু হাসলো মৃন্ময়কা, চোখ নামিয়ে বললো, 'অনুবাদের কাজটাও কি আমাদেরই করে দিতে হবে?'

'কে করবে?'

'আপনারা করলেই কি ভাল হয় না?'

'আমরা কী করে করবো? আমরা কি তোমাদের ভাষা জানি?'

'আপনারা কি ইংরিজি ছাড়া আর কোন দেশের সাহিত্য পড়েন না?'

'পড়ি বই কি। সব ইংরিজিতে অনুবাদ আছে। অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ।'

'সেই অনুবাদগুলো কারা করেন? নিশ্চয়ই কোন জর্মান ভদ্রলোক বা ফরাসী ভদ্রলোক বা রুশ লেখক বসে বসে নিজের ভাষা থেকে অপরের ভাষায় রূপান্তরিত করেন না। ইংরিজিতে যখন অনুবাদ পড়েন, তখন ধরেই নিতে হবে এই ইংরিজি অনুবাদ ইংরিজি যার মাতৃভাষা তার। যে ভাষা থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন, মূল ভাষাটা শিখে নিয়েছেন তিনি, তারপর সেই লেখার সুর, সৌরভ, সব শুদ্ধ ধরে এনেছেন নিজের ভাষায়। অনুবাদ কর্ম এতো সহজ নয় যে, অপরের ভাষায় একজন লেখককে ঠিক তার ভঙ্গিতে উপস্থিত করা যায়। বাংলা সাহিত্য পড়তে চাইলেও তাই করতে হবে।'

কথাটা মেনে নিতে হলো আই-লীনকে, তবুও তর্ক ছাড়লো না। জোর দিয়ে বললো, এই যে বইটা দেখছি—' আমার মাথার কাছে পড়ে থাকা গীতাঞ্জলিটা তুলে নিল সে, 'এটা তো টেগোর নিজেই করেছেন।'

'তিনি সর্ববিষয়েই কৃতী ছিলেন, তাঁর শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল, তিনি কী করেছেন বা করেননি, কী পেরেছেন বা পারেননি, তা নিয়ে আমরা আর পাঁচ-জনের বিচার করি না। উনি আলাদা। তবুও বলবো, এ কাজ যদি ওঁকে করতে না হতো, যদি কোন ইংরেজ বা আমেরিকান, যাদের মাতৃভাষা ইংরিজি তাঁরা করতেন, তা হলে বাংলার এর যা মাধুর্য, তার সবটাই আপনারা পেতে পারতেন। বোঝেন না কেন, নিজের ভাষার বিশ্লেষক ছাড়া আমরা অন্যের

করতে পারি তা কি অন্যের ভাষায় কখনো সম্ভব?'

এইবার মাথা নাড়লো আইলীন, তার-পর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বিদ্রূপ করলো, 'তা হলে আজ-কাল বাংলা শিখছো এই মেয়েটির কাছে, না? কিসের আকর্ষণে? ভাষা? সাহিত্য? না কি মাস্টার?'

মুখ লাল করে মৃন্ময়কা বললো, 'আমি যাচ্ছি।' যাবার সময় সে তার নিজের দেশের পদ্ধতিতে দুই হাত যুক্ত করে বললো, 'নমস্কার।' (ক্রমশঃ)

বাংলা রঙ্গালয়ে দেশাত্মবোধের ঐতিহ্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সেকালে একশ্রেণীর বুদ্ধিচাঞ্চল্যগ্রস্ত লোক বিশেষ কোন কারণে বাংলা রঙ্গালয়কে একেবারেই অগম্য স্থান ব'লে মনে করতেন। তাঁদের কাছে, বাংলা থিয়েটারের নাম করলেই তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে উঠতেন। এঁদের দল আগে বেশ ভারি ছিল, এখন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এসেছে।

কিন্তু এঁরা একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করেন না যে, বাংলা রঙ্গালয় আজ পর্যন্ত কতদিকে—ধর্মের, সমাজের, সংসারের ও দেশের—কী প্রভূত উপকার সাধন ক'রে এসেছে এবং জনমত গঠন করবার জন্যে কী বিপুল চেষ্টাই না করেছে।

অন্যান্য দিকের কথা ছেড়ে দিয়ে আজ তার দেশাত্মবোধের ঐতিহ্যের কথা নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

দেশাত্মবোধ কথাটার জন্ম হয়েছে আধুনিক যুগেই। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, তবে মনে হচ্ছে, দেশাত্মবোধ কথাটা নিয়ে সর্বপ্রথমে আলোচনা করেন বিপিনচন্দ্র পাল। একবার নয় বারবার।

কিন্তু দেশাত্মবোধ কথাটা যখন আমরা কানেই শুনিনি, অথচ দেশের কথা নিয়ে অল্পবিস্তর জাগ্রত হয়ে উঠেছি, সেই ইঙ্গবঙ্গদের প্রাধান্যের—অর্থাৎ নকল ফিরিঙ্গিআনার—যুগেই এবং একরকম আঁতুড়ঘরে ব'সেই দেশের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করেছে আমাদের শিশু বাংলা রঙ্গালয়।

দেশের কথা বলবার সুবিধা হয় প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটকেই এবং বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক "কৃষ্ণকুমারী" রচনা করেন মধুসূদন দত্ত। নাটকখানি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়ে সর্বপ্রথমে অভিনীত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রি-ক্যাল সোসাইটি" দ্বারা, তখনও সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের জন্ম হয়নি। এর মধ্যে ভারতমাতা ও [illegible] প্রভৃতির প্রসঙ্গ থাকলেও এখানিকে বিশেষভাবে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক বলা চলে না। পরে সাধারণ রঙ্গালয়েও (১৮৭৩ খৃঃ) এই নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল।

সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে—বাগবাজারের [illegible] বৎসরখানেক পার হ'তেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরলাল রায়ের "বঙ্গের সুখাবসান" নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। নাটকখানি বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের পরাজয়-কাহিনী নিয়ে লিখিত। এর মধ্যেও জাতীয় ভাব আছে, তবে বিশেষ উদ্দীপনা নেই।

পর বৎসরেই বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু লিখিত "পদ্মিনী" নাটক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়—তার মধ্যে ঠাকুর-কবি লিখিত বাংলার প্রথম সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত ("মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনোপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান") ছিল। ভীমসিংহও সৈন্যদের উৎসাহিত করবার জন্যে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক সুপ্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতেন—যার মধ্যে আছে: "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়" প্রভৃতি লাইন। এটি হচ্ছে বাংলার প্রথম কি দ্বিতীয় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা।

ঐ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেই সিন্ধুদেশে মুসলমান আক্রমণ নিয়ে লিখিত "বীর নারী" নামক নাটক অভিনীত হয়েছিল, নাট্যকারের নাম পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তার আগেই বাঙালীর দেশাত্মবোধের প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পুরু-বিক্রম" নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল। "মিলে সব ভারত সন্তান" গানটি এর মধ্যেও ছিল। নাটকের ভাষায় দুই-এক টুকরো নমুনা:

(রণবাদ্যের সঙ্গে [illegible] গান)
"জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়, কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!"

পুরুর উক্তি—
"ওঠ! জাগ বীরগণ! [illegible],
[illegible]!
হও সবে একপ্রাণ, [illegible],
[illegible]!"

সৈন্যদলের উক্তি—
"ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ [illegible],
অদৃষ্টে [illegible]
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত [illegible],
চোখ [illegible] যাক শুনি
[illegible]!"

তারপর "সরোজিনী নাটক"।

আমরা বাল্যকালে বিপুল উৎসাহে এই নাটকের একটি গান গাইতুম এবং গানটি এত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তখনকার দিনে পথেঘাটে শোনা যেত লোকের মুখে মুখে। গানটির আরম্ভ এই—
"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে
বিধবা-বালা।" নাটকে গীতি-লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু পরে জেনেছিলুম, রচয়িতা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে রাখবেন, রবীন্দ্রনাথের তখন কিশোর বয়স এবং বাংলা রঙ্গালয় শৈশব সীমাও পার হয়নি।

"অশ্রুমতী নাটক"। মেবাররাজ প্রতাপসিংহের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের লেখনীর একাধিক গান আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবোদ্দীপক আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক আছে—"স্বপ্নময়ী"। ঐতিহাসিক মূল ঘটনা—শোভাসিংহের বিদ্রোহ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। কোথাও অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

মোট কথা, সেই শৈশবকাল থেকেই বাংলা রঙ্গালয় দেশাত্মবোধের সুর ধরেছে এবং তার প্রথম যুগে বাংলা রঙ্গালয়ে দেশাত্মবোধের প্রধান নাট্যকার হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই—তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন আর কারুকেই দেখা যায় না। এও ঠাকুর-বাড়ীর আর এক গৌরবের কথা।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটকও ঐতি-হাসিক এবং তার নাম "আনন্দ-রহো"। তার মধ্যে পাই বাদশাহ আকবরের শেষ-জীবনের ঘটনা, কিন্তু তাকে দেশাত্মবোধ-মূলক নাটক বলা চলে না। এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সেই সময়ে বা পরে রচিত তাঁর আরো কোন কোন নাটকের সঙ্গেও ইতিহাসের অল্পবিস্তর সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও দেশাত্ম-বোধের পরিচয় নেই। তারপর [illegible] কেটে গেল, তবু বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেশাত্মবোধের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

[illegible]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইংলণ্ডের রঙ্গালয়

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দেশরক্ষার দায়িত্বকে ইংরেজ এত বড় ক'রে দেখে, রণোন্মাদনা ওদের মধ্যে এত বেশী যে, যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার জন্যে সবাই ছোটে—কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, কেউই বাদ যায় না। সন্দেহবাদী লেখকেরা তখন 'যুদ্ধের সময় আমাদের কর্তব্য কি?' এই নিয়ে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ভরায় না, বা দেশাত্মবোধক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয় না, তারা লেখনী ত্যাগ ক'রে তখন নির্বিচারে হাতিয়ার ধরে দেশের শত্রুনিধনযজ্ঞে আহুতি দেবার সংকল্প নিয়ে।

কাজেই ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলন্ডের নাট্যজগৎ তার অগ্রগতির পথে সুনিশ্চিতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৯৪১ সালে লণ্ডন শহর যখন দিনের পর দিন বোমাবর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তখন তো কিছু নাট্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল, আর বাকীরা কিছুদিনের জন্যে তাদের অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'ল।

কিন্তু সারা ইয়োরোপের মানবসভ্যতা যখন এই ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে বিপন্ন, তখনও ইংলন্ডে নাট্যানুশীলনের ধারা অব্যাহত ছিল; অবশ্য এর জন্যে এমন সব কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেখানে সোজাসুজি বোমা পড়বার ভয় নেই। এবং প্রথম যুদ্ধের আপৎকালীন অবস্থায় লণ্ডনের লোকেরা যেমন মঞ্চের ওপর মাত্র সস্তা আমোদ পরিবেশক হাল্কা ধরণের গীতিনাট্য বা কৌতুকনাটিকা প্রভৃতি দেখবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু অনেকটা তার বিপরীত ধর্মই দেখা গেছে। বোমা পড়ে শহর যখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন নাট্যামোদী দর্শকেরা সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট" বা "ম্যাকবেথ"-এর মত গুরুগম্ভীর নাটকের রসপানে মুগ্ধ। নাট্যকারদের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত ছিলেন ব'লে লণ্ডনে তখন খুব বেশী নতুন নাটক অভিনীত হয়নি; এর বদলে হয়েছে সুখ্যাত পুরোনো নাটকের পুনরভিনয় এবং এরই মধ্যে যে-ঘটনাটি হ'ল উল্লেখযোগ্য, সেটি হচ্ছে সেক্সপীয়রের আবার নতুন ক'রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।

এই সময়ে ইংলন্ডের নাট্যজগতে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। লণ্ডন শহরের নাট্যশালাগুলি যে-কোনো মুহূর্তে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে "দি কাউন্সিল ফর দি এনকারেজমেন্ট অব মিউজিক অ্যাণ্ড আর্টস" নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আওতায় দেশের দূর দূরান্তের গ্রামে গ্রামে নাচ-গান-অভিনয়ের আসর বসাবার জন্যে বহু ভ্রাম্যমান দল গ'ড়ে ওঠে। এমনই একটি ভ্রাম্যমান দল নিয়ে প্রথিতযশা অভিনেত্রী ডেম সিবিল থর্ণডাইক "ম্যাকবেথ" ও "মিডিয়া" নাটক অভিনয় ক'রে বেড়িয়েছিলেন ওয়েলশ-এর খনি-অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। ১৯৪১ সালে যখন বোমা পড়া শুরু হয়, তখনই "মার্টিন ব্রাউন্‌স্ পিলগ্রিম প্লেয়ার্স" প্রভৃতি ভ্রাম্যমান দলের যথার্থ কদর বুঝতে পারা যায়। আর্ট কাউন্সিলের সঙ্গে সঙ্গে "ইউনিটি থিয়েটার" নামে আর একটি নব-প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল এই সময়ে। ১৯৩৮ সালে 'বেবস্ ইন দি উড' নামে রাজনৈতিক মূকাভিনয় প্রথমে এদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এর পরের বছরেই এঁরা 'স্যান্ডব্যাগ ফলিজ' নামে যুদ্ধ সংক্রান্ত নাটিকা দর্শকদের উপহার দেন। ১৯৪১ সালে ইউনিটি ও'কেসির 'দি স্টার টার্নস রেড' নামে নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেন। আইরিস নাট্যকার ও'কেসি খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সাম্যবাদকে মিলিয়ে এই নাটকখানি রচনা করেন।

যুদ্ধকালে যে-সব যুদ্ধ সংক্রান্ত বা যুদ্ধের পটভূমিকায় নাটক রচিত হয়, তার মধ্যে পিটার পাওয়েলের 'দি টু চিলড্রেন'-এ (১৯৪৩) এমন একটি পরিবারের চিত্র আঁকা হয়েছে, যার লোকজনেরা যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হবার মত ক'রে মানুষ হয়নি। ১৯৪৪ সালে পিটার উস্টিনভ রচনা করেন 'দি বানবারী নোজ'; এতে ইনি একটি সৈনিক পরিবারের বর্তমান কাল থেকে শুরু করে পূর্বতন পুরুষ পর্যন্ত একটি সুন্দর কৌতুহলোদ্দীপক চিত্র এঁকেছেন।

কিন্তু আজও পর্যন্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত নাটক হিসেবে যে-বইটি শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়, সেখানি হচ্ছে আর সি শেরিফ-এর 'জার্নিজ এণ্ড'। প্রথম যুদ্ধকালীন জার্মান যুদ্ধ সীমানায় একটি ট্রেঞ্চ হচ্ছে এর অকুস্থল; একটি কালো পর্দার সামনে যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনই যুদ্ধের পটভূমিকায় সমস্ত চিত্র নিটোল হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এই নাটকখানিতে; এতে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার সঙ্গে এসে মিশেছে দার্শনিক আদর্শবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলন্ডের স্বনামধন্য নাট্যকারেরা যে-সব নাটক লিখেছিলেন, তার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন জর্জ বার্ণার্ড শ লিখেছিলেন ১৯৩৯ সালে 'ইন গুড কিং চার্লস গোল্ডেন ডেজ', নাটকটি ১৯৪০ সালে লণ্ডনে অভিনীত হয়। জে বি প্রিস্টলে ১৯৩৯ সালেই রচনা করেছিলেন 'জনসন ওভার জর্ডন'; এতে একটি লোক মারা যাওয়ার পর তার ভৌতিক জীবনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলি কেমন করে চরিতার্থ করছে, তাই দেখানো হয়েছে। অবশ্য ১৯৪২ সালে প্রিস্টলে 'দে কেম টু এ সিটি' নামে যে-নাটকখানি লেখেন, তাতে এমন একটি আদর্শ নগরী দেখানো হয়েছে, যেখানে সভ্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত। এখানে মানুষ কাজকে খেলার মতই সহজ চোখে দেখে, যুদ্ধের নামগন্ধ জানে না এবং হিংসাদ্বেষকে জীবন থেকে দূর করে দিয়েছে। দেশাত্মবোধক নাটক 'ক্যাভালকেড'-এর নাট্যকার নোয়েল কাওয়ার্ড ১৯৪১ সালে 'ব্লাইদ স্পিরিট' নামে একটি হাল্কা কৌতুকনাট্য রচনা করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ও'কেসি লেখেন 'রেড রোজেস ফর মি'; এটি একটি বর্ণাঢ্য রম্য-নাটিকা বা ফ্যান্টাসি; এতে বেকার দরিদ্রের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ফুলওয়ালীর উজ্জ্বল দীপ্তি মিলিত হয়েছে এবং সুখের অন্বেষণে চরিত্রগুলিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত ব্রিডির 'মিঃ বোলফ্রাই' নাটকেও দর্শককে কল্পনাবিলাসের আনন্দলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমলিন উইলিয়মস-এর 'উইণ্ড অব হেভেন' (১৯৪৫) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হলেও ঐ একই কল্পনাবিলাসের আধার। কিন্তু ঐ একই সালে ডাবলিন চেথাম স্ট্রোড 'ইয়ং মিসেস ব্যারিংটন' নামে যে-নাটকখানি লেখেন, তার নায়ক হচ্ছে একজন যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। এরও দু' বছর পরে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত রোনাল্ড অ্যাডাম-এর 'অ্যান ইংলিশ সামার' আসলে হচ্ছে ইংলন্ডের বিমানবাহিনীর একটি তথ্যমূলক চিত্র এবং এর সঙ্গে শেরিফ-এর 'জার্ণিজ এণ্ড'-এর একটি চমৎকার আদর্শগত সাদৃশ্য আছে। ১৯৫৫ সালে শেরিফ নিজে লিখেছেন 'দি লঙ সানসেট'।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, রণনিপুণ ইংরেজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন হাতে-নাতে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তেমনই তার নাট্যচর্চাও করে গেছে। যখন তার রাজধানীতে বোমা পড়েছে, তখনও সে কোথাও বসে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ', আবার কোথাও উপভোগ করেছে 'স্যান্ডব্যাগ ফলিজ' ও 'দি স্টার টার্নস রেড'।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

বহুকাল ঐন্দ্রিলার কোন খবর পাওয়া যায়নি। হাজার হোক মায়ের প্রাণ। মধ্যে মধ্যে বুকের মধ্যেটায় হু-হু করে ওঠে বৈকি। অস্থির হয়ে ওঠেন। সে অস্থিরতা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও কনক করে। তবু সে যখন বলে, 'কী হবে মা ও পাগলের ওপর রাগ করে থেকে। একটা চিঠি লিখে দিন, চলে আসুক। মিছিমিছি লোক হাসিয়ে আর দরকার নেই।' তখনই আবার কঠিন হয়ে ওঠেন শ্যামা, বলেন 'না বৌমা, আর না। স্বেচ্ছায় এয়ে-যেকে আর ঐ ঝগড়া আনব না। লোক যা হাসবার তা তো হেসেছেই, আশ্ত-পারে কোথাও কি আর জানাজানি হতে বাকী আছে যে মেয়ে আমার রাঁধুনীগিরি করে খাচ্ছে! সেই যখন বিজ্ঞাপন হয়েই গেল পুরোপুরি, তখন আর আমার কিসের দায়? থাক ও, যখন তেজ কমবে তখন আপনিই আসবে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলাও আসে না। তারও বোধহয় জেদ, মা না ডাকলে সে আসবে না। তবে সে যে সুখে নেই তা কনক জানে। এর ভেতর বহু বাড়ি বদল করল সে। কোথাও বেশীদিন টিকতে পারে না। শ্যামারা বলেন ঝগড়ার জন্যে—কনক জানে যে সবক্ষেত্রে তা নয়। অন্য কারণও আছে। আর হয়ত সেইটেই প্রবল।

আসে না সে, কিন্তু চিঠি লেখে। বিশেষ করে ঠিকানা বা মনিব বদলের সময়। কনককেই লেখে। শাশুড়ির হুকুম নেই বলে কনক উত্তর দিতে পারে না। তবু ঐন্দ্রিলা চিঠি দিয়ে যায়। কেন, কিসের আশায়—তা কনক বোঝে। যদি কোনদিন এদের দরকার পড়ে, যদি কোনদিন এরা ডাকে। তাই ঠিকানাটা সর্বদা জানিয়ে রাখা। তবে সে চিঠিতে ভেতরের কোন কথা থাকে না। থাকা সম্ভব নয়, এক পয়সায় পোষ্টকার্ডে লেখা খোলা চিঠি। ভেতরের কথাটা অনুমান করে কনক। অবশ্য ভিত্তিও একটা আছে বৈকি। মধ্যে একবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিল, কান্তির অসুখের খবর পেয়ে। শ্যামাকে প্রণামও করেছিল কিন্তু শ্যামা শুধু একটি শুষ্ক কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু বলেননি, সীতার কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। অন্তত সে দিনটাও থেকে যেতে বলেননি। একেবারেই নিরাসক্ত উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ই দু-চার মিনিটের জন্যে রান্নাঘরে এসে কনকের সঙ্গে দুটো কথা বলে গিয়েছিল। ওকে দেখেই রান্নাঘরে এসে ঢুকেছিল কনক, না জানি কি বাধবে এখনই। তবে বাধেনি কিছু। বাধতে পারত অনায়াসেই—কারণ ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কান্তির প্রতি সমবেদনা উপলক্ষ্য করে অনেক বাঁকাবাঁকা কথা শুনিয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু এ পক্ষ থেকে কোন উত্তর না আসাতেই কলহটা জমতে পারেনি। শ্যামা একেবারে পাথরের মতো নীরব ছিলেন।

শ্যামার ধৈর্যে শুধু কনক নয়, ঐন্দ্রিলা সুদ্ধ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেমন ভয়ও হয়ে গেল তার। মানুষের কাছ থেকে দয়ামায়া পাবার আশা থাকে, পাথরের কাছে যে কোন ভরসাই নেই। বলেছে সে যথেষ্ট। বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই বলেছে ; 'হবে না। হতেই হবে যে। আমি যে জানি। ঐ উনি, উনি যতদিন আছেন—কারুর ভাল হবে না আমাদের বংশে।' ঐ এক হতেই এ বংশের সর্বনাশ হবে। ঐ যে সর্বনেশে রাক্ষুসী ভাল-খাকী বসে আছেন, সব্বাইকে খেয়ে, সকলের সর্বনাশ করে তবে উনি যাবেন।

রক্তাক্ত শিয়রে সেবা

অনিন্দ্যকুমার সেন

উত্তর সীমান্তের রক্তঝরা সংগ্রামে আমাদের সেবিকারা কর্তব্যে অটল রয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত অমূল্য সাধনা গৌরব দেশবাসীর। এই কাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিশীথে জাগরণে নিরন্তর নীরবে যাঁরা কাজ করে যান, যাঁরা আছেন সেই সামরিক বাহিনী জীবন তুচ্ছ করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েও ফিরে আসতে পারেন, সেই সেবিকাদের কথাই লিখতে বসেছি। এই প্রসঙ্গে একবার সকলেরই মনে পড়বে, প্রায় একশ বছর আগে এক লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের পট-ভূমিকাতেই সেবাধর্মের ইতিহাসে নতুন পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছিল।

সেবিকা দীপান্বিতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১লা অক্টোবর '১৮৫৪তে ৩৮ জন নার্স নিয়ে যেদিন ক্রিমিয়ায় উপস্থিত

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

হলেন সেদিন থেকে সেবাধর্মের ইতি-হাসের গতি পরিবর্তন হল। সভ্য নাগরিক জীবন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে সেবাধর্মের সামাজিক ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হয়েছিল। প্রাচীন যুগের সেবাশুশ্রূষার সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। শোনা যায় অশোকের সময়েও আমাদের দেশে আরোগ্যশালা ছিল এবং সেখানে সেবিকারা রোগীদের শুশ্রূষা করতেন। ইউরোপে খৃষ্টীয় যুগের শুরুতেই পরিষেবার শুরু হয়। মধ্য-যুগে ক্রুসেডের সময় নাইট হস্পিটালার অব সেন্ট জন এর নেতৃত্বে গঠিত হয় যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষার জন্য। ১৮৩৬-এ জার্মানীর ক্রিজনার জার্মানীর কাইজারওয়ার্থ-এ সেবাধর্মের উন্নতির জন্যে ডিকনেস আন্দোলন শুরু করেন। ফ্লোরেন্স নাইটি-ঙ্গেল এখানেই প্রথম হাতে-কলমে নার্সিং শিক্ষালাভ করেছিলেন। নার্সিং বিদ্যা এবং হাসপাতাল পরিচালনায় নিয়মকানুন ইত্যাদি সবই তিনি আমূল পরিবর্তন করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন, একথা আজ সর্বজনবিদিত।

আমাদের দেশে আধুনিক নার্সিং আর ধাত্রী বিদ্যার গোড়াপত্তন হয় প্রায় একশ বছর আগে।

১৮৭০ এবং তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মাদ্রাজে মেয়েদের নার্সিং শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত শুরু হয়। সাধারণত বড় বড় সরকারি হাসপাতালে বিলেত থেকে সোজাসুজি নার্স নিযুক্ত করা হত। মিশন হাসপাতালগুলিতে কাজ করবার জন্যে ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে কিছু নার্স আসতেন। এঁরা এঁদের কর্মস্থলে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই এদেশে কিছু মেয়েদের নার্সিং বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে নার্সিং এবং ধাত্রী বিদ্যার প্রচলনের ক্ষেত্রে এঁদের এই কাজের গুরুত্ব অল্প নয়।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বোম্বাই মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশে কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হয়। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং অন্যান্য খৃশ্চান সমাজের মেয়েরাই সেবাকর্মের ভার নিতেন। তবে পুণার সেবাসদন থেকে হিন্দু মেয়েদের এই নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যায় কাজে এগিয়ে আসতে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়। নার্সের প্রয়োজন প্রধানত হাসপাতালেই সবচেয়ে বেশী ছিল। তবে এই সময় থেকে প্রাইভেট নার্সের প্রয়োজনও দেখা যেতে থাকে। ইণ্ডিয়ান মিলিটারী নার্সিং সার্ভিস খোলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর ১৯১৮তেই প্রথম জনস্বাস্থ্য পরিদর্শিকা বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে স্বাস্থ্য ট্রেনিং হিসেবে স্কুল খোলা হয়। এদেশে নার্সদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এই শতাব্দীর গোড়াতেই শুরু হয়েছিল।

১৯২০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে নার্স, ধাত্রী আর স্বাস্থ্য পরিদর্শিকার শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়। সমস্ত বৃটিশ ভারত আর কিছু কিছু দেশীয় রাজ্যেও অনেকগুলি শিক্ষালয় খোলা হয়। প্রথম "নার্সেস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট" পাশ হয় মাদ্রাজে ১৯২৬ সালে।

১৯২০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে বিদেশে শুশ্রূষাবিদ্যায় অনেক উন্নতি সাধন হয়েছিল। স্বদেশে এ ধরণের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন ভাল না থাকায় কিছু ভারতীয় নার্স শুশ্রূষার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক এবং অসামরিক হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সুশিক্ষিত নার্সের অভাব দেখা গেল। "উইমেন্স অক্সিলিয়ারী

সার্ভিস"এ মেয়েদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত বলে নার্সিং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে। যারা এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে ভারত সরকার ১৯৪২ সালে "অক্সিলিয়ারী নার্সিং সার্ভিস" (এ. এন. এস) খুললেন এবং ডিরেক্টর জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এর অফিসে একজন চীফ নার্সিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হল। এ. এন. এস কেবলমাত্র মেয়েদের নিয়েই গঠিত হয় এবং এঁদের প্রথমে ৮।৯ মাসব্যাপী শিক্ষা দিয়ে কাজে নিযুক্ত করা হলেও যুদ্ধের শেষে স্বল্পকালের মধ্যে জেনারেল নার্সিং কোর্স সম্পূর্ণ করবার সুযোগ দেওয়া হত।

১৯৪১ সালে মাদ্রাজে নির্দিষ্ট বেতনের হার এবং চাকরীর সর্তাবলীসহ "স্টেট নার্সিং সার্ভিস" খোলা হয়। বাংলা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশও অল্প-দিনের মধ্যেই এ কাজে এগিয়ে আসে। এর কিছুকাল পরেই নার্সিংএর উচ্চপদ-গুলি গেজেটেড করা হয় এবং ১৯৪৩এ ভারতীয় সামরিক সিস্টারদের "কমিশনড্ পদ দেওয়া হল।

১৯৪৩ সালে ভারত সরকার নার্সিং-এর মান উন্নয়ন এবং সামরিক হাস-পাতালগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে দিল্লীতে "স্কুল অব নার্সিং অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন" প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাজের জেনারেল হসপিটাল এবং ভেলোরের মেডিক্যাল কলেজ শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যে শিক্ষক তৈরীর ব্যবস্থাও করা হয়।

১৯৪৬-এর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ভারতবর্ষে মাত্র ৭০০০ নার্স আছেন অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৪৩,০০০ লোকের জন্য একজন করে। এই সময়েই ভোর কমিটির রিপোর্টের ফলে এদেশে নার্সিং-এর অনেক রকম উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হয়। কমিটি বলেন প্রতি ৫০০ জন লোক পিছু একজন করে নার্স থাকা চাই অর্থাৎ সারা দেশের জন্যে অন্ততঃ ৭,৪০,০০০ নার্সের দরকার। তখন থেকে ভারত সরকার নার্সিং-এর উন্নতি এবং শিক্ষা-দানের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা করতে থাকেন এবং দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ে প্রথম নার্সিং বি এস সি ডিগ্রি কোর্সের ব্যবস্থা করেন। পরে বোম্বাই, ওসমানিয়া ও বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এস সি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪৭-এ "নার্সিং কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হয় আর পোস্ট-সার্টিফিকেট ট্রেনিং-এর জন্যে কিছু নার্স বিদেশ যাত্রা করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে নার্সিং-এর অনেক উন্নতি হয়। আগের মত শিক্ষার্থীর অভাব আর দেখা যায়নি। তাছাড়া আরো বেশী সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা একাজে এগিয়ে আসছেন। ১৯৬১র হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে ভারতবর্ষের ২৩৯টি জেনারেল নার্সিং এবং ২৮৪টি ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার স্কুল থেকে যথাক্রমে ২৮৫১ জন নার্স এবং ২২৭৭ জন মিডওয়াইফ পাশ করেন এবং ৩৯টি পুরুষ নার্সের স্কুল থেকে ২৫১ জন পাশ করেন।

উচ্চতর নার্সিং শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে, মাস্টার অব নার্সিং কোর্স, সিস্টার টিউটর কোর্স, মিডওয়াইফ টিউটর কোর্স, নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পাব-লিক হেলথ নার্সিং এবং সাইকিয়াট্রিক নার্সিং কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৫৫তে সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব হেলথ নিযুক্ত এক কমিটির সুপারিশের ফলে নার্সিং-এর পেশাগত কয়েকটি উন্নতি হয়। যেমন কাজের পরিবেশ এবং অবস্থা, কাজের সময় এবং বেতনের হার উন্নয়ন, বাসগৃহের ব্যবস্থা ইত্যাদি। গৃহসমস্যা এবং যানবাহন সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। তবে আগের চেয়ে চাকুরির অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। আজকাল নার্সদের অধিকাংশই কোন না কোন সরকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুণ সরকারী কর্মীদের প্রাপ্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা এঁরাও পেয়ে থাকেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে পাবলিক হেলথ নার্সিং এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক-পরিদর্শিকার কাজের ওপরে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। এই পরি-কল্পনা এবং স্টেট নার্সিং সার্ভিস সর্বত্র প্রচলিত হলে বৃত্তি হিসাবে নার্সিং আরো উন্নত হবে।

আজকে আমাদের দেশ যে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাতে সাম-রিক নার্সিং-এর ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। এদেশে প্রথম সামরিক নার্সিং সার্ভিস শুরু হয় ১৮৮৮ সালে বৃটিশ সৈন্যদের জন্যে ইংলণ্ডের নার্সদের নিয়ে। পরে ভারতীয় নার্সরা একাজে যোগ দিলে ১৯২৭ সাল থেকে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী নার্সিং সার্ভিস খোলা হয়। ১৯৪৩-এর অর্ডিনান্স অনুযায়ী এটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ হল এবং এর কর্মীরা কমিশনড্ অফিসারের পদ পেলেন। এঁদের বলা হত নার্সিং অফিসার।

দুই মহাযুদ্ধে ভারতের মিলিটারী নার্সিং সার্ভিস স্বদেশে ও বিদেশে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা দেখিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বিদেশী নার্সরা ভারতীয় নার্সদের হাতে কর্মভার দিয়ে চলে যান। আজকে এই বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতীয়রাই পরিচালিত করছেন। এখানে বেতন ও পদমর্যাদা দুইই ভাল। নিয়োগের সময়ে লেফটেনাণ্ট পদে নিযুক্ত করা হয় (বেতন ৩০০—৩৮০ টাকা) তারপর ক্রমে ক্রমে ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এবং কর্ণেল পর্যন্ত পদ। কর্ণেল পদের বেতন ১০৫০—১২০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া বিভিন্ন অ্যালওয়েন্স ও অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। বর্তমান জরুরী অবস্থায় সরকার অল্পসময়ের মধ্যে নার্সিং কোর্স শিক্ষাদান ও সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত নার্সদের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা দেশসেবার এই নতুন সুযোগ অবশ্যই পূর্ণভাবেই নেবেন।

[নরম্যান মেইলর কৃত উপন্যাস The Naked & The Dead উপন্যাসের ভবানী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত ও অনূদিত রূপান্তর]

[লেখক পরিচিতি— নরম্যান মেইলর ১৯২৩-এর ৩১শে জানুয়ারী লংব্রাঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে সেখান থেকে গেলেন ন্যুইয়র্কের ব্রুকলিন শহরে। লেখক এই ব্রুকলিন ও ন্যুইয়র্ক নগরীকেই আপন ঘরবাড়ি মনে করেন। সেখান থেকে ১৯৩৯-এ স্নাতক হয়ে হার্ভার্ডে গেলেন বৈমানিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে। সেই সময় হঠাৎ চিত্তে লেখকবৃত্তির খেয়াল জাগে, সেই বছরই বারো মাসে তিনি পঁচিশটি ছোট গল্প রচনা করেন। পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ 'Story' magazine-এর কলেজ প্রতিযোগিতায় ১৯৪১-এ সম্মানিত হলেন "The Greatest Thing in the World" নামক গল্প লিখে। লেখকের মত হার্ভার্ড এবং ব্রুকলিনের বিপরীত সংস্কৃতির চাপেই তাঁর মনে লেখক হওয়ার প্রবৃত্তি জাগে। ১৯৪৩-এ হার্ভার্ডে স্নাতক হওয়ার পর যখন সমরক্ষেত্রের আহ্বানের অপেক্ষায় রয়েছেন সেই আট মাসে মানসিক হাসপাতালের পটভূমিকায় "A Transit to Narcissus" নামক উপন্যাস লিখে ফেললেন। রোমান্টিক ও অর্থবহ এই উপন্যাসটি কুড়িটি প্রকাশকের কাছ থেকে ফেরৎ এসেছে। লেখক বলেছেন যে, সমরক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা না লাভ করলে তিনি হয়ত কোনোদিনই সার্থক লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতেন না। লিখলেও হয়ত লিখতেন আগেকার স্টাইলে। তিনি আরো বলেছেন, "আমার প্রকাশিত দুখানি উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে পাঠক বিস্মিত হন। যে দুটি উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে —'The Naked and the Dead' এবং 'Barbary Shore' —সেই দুটি উপন্যাসই আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে দেবে। আমি দীর্ঘকাল বাস্তব এবং রোমান্সের দোটানায় পড়ে ঘূর্ণিপাক খেয়েছি।" এই রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্ট দুটি বিভিন্ন ধারাকে একসূত্রে বাঁধার অক্ষমতায় লেখকের অনেকদিন ভুগতে হয়েছে। ১৯৪৪-এ তিনি যুদ্ধের কাজে যোগদান করেন।

সেনাবিভাগে নরম্যান মেইলর দু'বছর ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ উদাসীন প্রবৃত্তির সৈনিক হওয়ার ফলে ফীল্ড আর্টিলারি সার্ভেয়ার, রাইফেলম্যান, কেরাণী ও রাঁধুনী প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। ১৯৪৬-এ সেনাবিভাগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যুদ্ধের পটভূমিকায় এক উপন্যাস রচনার উদগ্র বাসনা তাঁর মনে জাগে, তার ফলে রচিত হয়—"The Naked and the Dead". গ্রন্থটি পনের মাস ধরে লিখিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত The Naked and the Dead একটি মহৎ উপন্যাস। Saturday Review of Literature নামক বিখ্যাত পত্রিকায় ম্যাক্সওয়েল গাইসমার লিখেছিলেন: 'a substantial work from a new Novelist of consequence"— আধুনিক যুদ্ধসাহিত্যের এক আশ্চর্য রেকর্ড। তাই জন এলড্রিজ লিখেছিলেন: "On page after page and in episode after episode, it is Mailer's magnificent reportarial sense, his gift for evoking the tactile sense of a scene, that sustains the book and that will keep it alive at least as long as the events it describe live in the memory"

এই সুবৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের ভাব ও ভাষা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।
—অনুবাদক]

।। এক ।।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংসের একটা নিজস্ব থিওরী ছিল। তাঁর অনুগত তরুণ এ্যাডভাইজার-সচিবকে তিনি প্রায় বলতেন—

"যাকেই আমার কাছে পাও তাকে আমি ভয় পাইয়ে দেব। আমাদের আমেরিকান সৈনিক যে কোন শত্রু সৈন্যের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে। আর সেই দুর্বল চরিত্র পড়ে তোমার আমার নিজস্ব কৌশল হল শত্রুর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের ভয় করবে।"

তরুণ লেফটেন্যান্ট হার্ন প্রতিবাদে বলতেন—"এমনও ত' হতে পারে এই সৈনিকদের মধ্যে কেউ তার বেয়নেটখানা আপনাদের দিকেই ঘোরাতে পারে।"

"যুদ্ধটা তুমি কি মনে করো? ছেলেখেলা?"

"জেনারেল, আপনি আমার বাবার মত, তাঁর কারখানার লোকজন মানুষ নয়, তারা মেশিন মাত্র। আপনি কি জানেন তাদের মনে কি হয়?"

"উত্তর হল এই যে, আমি এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। তুমি বিবাহ করোনি, কখনো কি বিবাহ সম্পর্কে কোন চিন্তা করেছ? স্ত্রী—আমার নিজের স্ত্রীর কথাই ধরা যাক, আমার জীবনে এবং কর্মে প্রচণ্ড সাহায্য করেছে।"

"নিশ্চয়ই তা হয়েছে জেনারেল, এ আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমার আর কি ভবিষ্যৎ বলুন?"

"যদি আমার ছেলে থাকত তাহলে তাকে যেমন কথা বলতাম, এও সেইভাবেই বলছি। আমি সন্তান চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী এদিকে আশ্চর্য রমণী হলেও, পারলেন না।"

শিবিরে স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। এমনই সেই স্তব্ধতা যা সমস্ত শীতল করে দেয়।

জেনারেল মৃদু গলায় বললেন—"রবার্ট, তোমার ভঙ্গি অমানুষিক। ঠিক এই মুহূর্তেই তুমি আমার কথা ভাবছ, আমার স্ত্রীর কথা নয়।"

"আমার সে ইচ্ছা নেই জেনারেল।" কথাটা কিন্তু দুর্বল প্রচেষ্টার মত শোনালো।

কামিংস সজোরে বল্লেন: "ধরো প্রথমটা আমাদের আলোচনা হোক নীতি নিয়ে, অর্থাৎ প্রিন্সিপলস। হার্ন। স্ট্যাণ্ড আপ। স্যালুট মি।—অলরাইট, এখন উপস্থিত তুমি তোমার কাজটুকু ছাড়া আর সব ভুলে যাও। আমার এই শিবির একেবারে থাকবে ঝকঝকে, তকতকে। তুমি যদি ঐ ক্লিন্যানকে আরো একটু কড়া নজরে নিয়ে দেখতে তাহলে হয়ত বেশী ময়লা থাকতো না। আর নজর রেখো আমার ডেসকে যেন তাজা ফুল রোজ সকালে থাকে।"

'তাজা ফুল! সেও কি আমি নিজেই তুলে আনবো স্যার?'

"আমার মনে হয় ক্লিন্যানটাকে বিশ্বাস করা চলে। অবশ্য নজর রাখতে হবে। সুপারভিসনটাই আসল। ডিসমিসড!"

।। তিন ।।

জাপানী আক্রমণের পরবর্তীকালীন বিরতি ক্রফটের দলের সকলকেই স্ব স্ব ভঙ্গি অনুসারে স্পর্শ করেছিল। বিরাটবক্ষ উইলসন একটা হুইস্কির চোলাই-এর যন্ত্র বসালো, দেশে থাকার সময় ওরা বাপ-বেটার নাকি এমনই করত। রিজেস বসে বসে বাইবেল পড়ত। গালাঘর বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটতো আর বোস্টন থেকে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর সংবাদের আশা করত। রুদে মিনেত্তা পাগল হয়ে যাওয়ার ভান করতো সেনাদল থেকে নাম খারিজের আশায়।

ক্রফট কিন্তু এর ওষুধ জানতেন। তিনি মিনেত্তাকে হাসপাতালের খাট থেকে টেনে তুলে এমনি প্রহার দিলেন যে তার দেহ থেকে মাথাটা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। তারপর বল্লেন—"ও কে—মিনেত্তা। এইবার প্যান্টটা পরে ফেল। এ রকম আর যদি ঢঙ করো তাহলে—আমি......।"

একদিন মাজক গালাঘরকে ডেকে পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন, একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং ভালোই আছে; তবে তার স্ত্রী প্রসবকালে দেহ-রক্ষা করেছেন। নদীর ধারে ডাক ছেড়ে কাঁদার মত একটা নির্জন জায়গা খুঁজে পেয়েছিল গালাঘর।

স্লেটন একটা বদলিও পেয়ে গেল। একজন অল্পবয়সী ছোকরা, নাম উইম্যান, এমন কি উইলসনের চোলাই-করা মদ খেতেও শেখেনি, এমনই বাচ্চা। যাই হোক, উইম্যানের আবির্ভাবে রেড বেচারী হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল। সে একটা বক্তৃতা দিল।

সে শ্রোতাদের জগৎকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে—"এই সেনাদলের গলদ কোথায় জানো? এরা কখনো যুদ্ধে হারেনি। এখন তোমাদের কি মনে হয় আমি এই দুর্গন্ধ নোংরা দ্বীপটা চাই!"

ক্রফট চীৎকার করে ওঠেন—'চুপ কর! সেনাবাহিনীতে তোমার মত দু-চারটে অকালকুষ্মাণ্ড ছাড়া আর কোনও ত্রুটি নেই। ম্যাটিনেজের দিকে তাকিয়ে দেখ, টেক্সাসে ফিরে ও নিছক ম্যাকস্ মাত্র। আর্মিতে ও আমার মত উচ্চ-পদস্থ। কেন? আমরা আমাদের কাজ করি, কর্তব্যজ্ঞান আছে, তাই।'

ওদিকে অপারেশন টেন্টে জেনারেল কটুকাটব্য শুরু করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। হার্ন এই গোলমালটার জন্য দায়ী। জেনারেলের পরিচ্ছন্ন ধোয়া মোছা মেজেতে একটা সিগারেট ফেলে আবার পা দিয়ে সেটা মাড়িয়েছে, এমনই তার দুঃসাহস ও স্পর্ধা! এ বিষয়ে কামিংসের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে অনেক পরে। প্রথমটা তিনি তাঁর অধঃস্তনদের ডেকে নিজের ওপরওলাদের কাছ থেকে হুমকী খাওয়ার ফলে যে উত্তাপ জমেছিল তা উদগারিত করেছেন।

তিনি গর্জন করলেন: "আমার একটা সুবৃহৎ সৈন্যসমাবেশের বাসনা মনে ছিল, এই সমুদ্র উপকূলে আমি একটা ব্যাটেলিয়ন ন্যামাবার ফেন্টার ছিলাম।" (এই দিকটা শত্রু-ঘাঁটির শেষ প্রান্তে), "আর ইচ্ছা ছিল পিছন থেকে শত্রুকে হটানোর। এর জন্য নৌবাহিনীর সমর্থন ও সহায়তা প্রয়োজন। তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তবে তার কোনও আশা নেই। বিনা হাতিয়ারে আমাকে লড়াই করতে করতে হবে।"

এমন ভাবে তিনি কথা কটি বললেন যে মনে হল যারা পড়শী এতকাল কামিংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

তিনি আবার হুংকার দিলেন—"যাই হোক, আর একটা পথ এখনও আছে। একটা স্কোয়াড (দল)—এই জনমানবহীন অঞ্চলে শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে এখানে আসছে, এরা শত্রুর পিছন দিক থেকে হামলা চালাতে পারবে। সব যদি ভালোয় ভালোয় ঘটে যায় তাহলে আমি এখান থেকে ওদের পিছনে একটা দল পাঠাব, প্রতিরোধ ব্যবস্থা তারা ধ্বংস করবে, তার পর একটা ব্যাটালিয়ন নামিয়ে দেব। জেন্টলমেন, আপনারা বিষয়টি বিবেচনা করুন......"

সেই সিগারেটের নিক্ষিপ্ত টুকরো সংক্রান্ত ঘটনা, যা নাকি অবজ্ঞা এবং ঔদ্ধত্যের প্রতীক, তার প্রতিক্রিয়া ঠিক এই মিটিং-এর পর ঘটল। জেনারেল তাঁর তাঁবুতে হার্নকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "আচ্ছা, রবার্ট, আমরা এই যুদ্ধ লড়ছি কেন, এ প্রশ্ন কি তোমার কখনো মনে জেগেছে?"

"আমি ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় কতকগুলি ব্যক্তির সুবিধার জন্য কিছু প্রাণীকে মরতে হয়, এটা ভালো কথা নয়......"

"এই যুদ্ধ, ঐতিহাসিক অগ্রগতির পন্থা। অনেক দেশের মধ্যে আছে সুপ্ত শক্তি, সুপ্ত সম্পদ। আমাদের জাতকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে শক্তির বিপক্ষে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ভবিষ্যতের একমাত্র নীতি হল শক্তির নীতি,—সেই নীতি, সেই ন্যায়। আর শক্তি ওপর থেকে পড়ে নীচে প্রবাহিত হয়। সামান্য মাত্র প্রতিরোধের ফলে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়। তুমি আমার মেঝেতে ঐ সিগারেটের টুকরোটা ফেলেছিলে?"

হার্ন বলল—"আমিও ভেবেছিলাম, আপনি এই কথাটাই হয়ত তুলবেন।"

জেনারেল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল্লেন—"তুমি আমার কোনো এক কর্মের প্রতিবাদ করেছ। একটা শিশুসুলভ চপলতা। আমি এখন যে সিগারেটটা টানছি এটা যদি মাটিতে ফেলে দিই, তুমি কুড়িয়ে দেবে?"

"আমার মনে হয় আমি বলব আপনি নিপাত যান স্যার।"

"তুমি জানো, যদি তুমি ওটা না তোলো তাহলে পাঁচ বছর জেলে থাকতে হবে? উপযুক্ত বাধ্যতা সঞ্চারিত করার প্রয়োজন সার্থক করতে অপরিমিত শক্তিমত্তার দরকার।" তারপর সিগারেটটি মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে হুকুম করলেন ঃ

"এটা তুলে ফেল রবার্ট!"

দীর্ঘকাল সেই কক্ষে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। হার্ন-এর মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তারপর অবনত হয়ে ধীরে ধীরে সিগারেটের টুকরোটি কুড়িয়ে নিয়ে এ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল ঃ

"জেনারেল, আমি বদলি হয়ে যেতে চাই।"

কামিংস হাসলেন, বললেন—"ভয় নেই, আমিও তোমাকে আর আমার একান্ত দেহরক্ষী রাখতে চাই না।"

— চার —

সার্জেন্ট ক্রফ্‌ট সর্বপ্রথম জেনারেলের বিপর্যস্তকারী বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা শুনলেন যখন তাঁকে ইনটেলিজেন্স টেন্টে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হ'ল।

ডেস্কের অপর প্রান্ত থেকে হুকুম হ'ল—"এই অঞ্চল সম্পর্কে চার দিনের ভেতর সমস্ত খবর যোগাড় করা চাই। তোমার টহলদারী বাহিনী আজ রাতে বেরিয়ে পড়বে। একটি নৌকোয় তোমাদের ঐ জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে রবার বোটে করে গিয়ে এই পাহাড়ের ওপর একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বসাবে।" তারপর ম্যাপটা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে ০৬·০০ ঘণ্টায় একটা প্লেন উড়ে যাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে, তার সংগে বেতার মারফত যোগাযাগ করবে। চতুর্থ দিনে, ২৩·০০ ঘণ্টার সময় নদীর ধারে তোমাদের তুলে নেওয়ার জন্য নৌকা হাজির থাকবে।"

নির্দিষ্ট উপকূলে ক্রফ্‌ট তাঁর দলবলকে সন্ধ্যায় যথারীতি নির্দেশ দিলেন। একটি আক্রমণকারী গাড়ি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, মোটরটা ঝক্ ঝক্ করে শব্দ করছে, এখনই নিয়ে যাবে। গম্ভীর চেক্ করে ক্রফ্‌ট ঘড়ির দিকে তাকালেন—

"বোঝাই শুরু করো। রাইফেল উ'চু রাখো।"

একে একে সার বে'ধে লোকগুলি জলা-জমি পার হয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। মার্টিনেজ ছিল সর্বশেষে। ক্রফ্ট তাদের অনুসরণ করার উপক্রম করছেন, এমন সময় একটা জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। কমব্যাটের পরিপূর্ণ পোষাক পরে তরুণ লেফটেনান্ট হার্ন লাফিয়ে নামলেন, তার পর বিস্মিত ক্রফটকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ঃ—'এই টহলদারীর ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে সার্জেন্ট, শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত।' স্বয়ং জেনারেলই যে এই নির্দেশ দিয়েছেন, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তিনি শুধু বললেন ঃ "সব তৈরী! চমৎকার!" শেষ দুজন নৌকার গলুই-এর ভেতর বসে পড়ল—নৌকা সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ল। এক মাইল দূরে দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করে আক্রমণকারী নৌকা ডাঙায় ভিড়ল। কিছু দূরে ক্রফ্ট চুপ করে বসে ছুরি শানাচ্ছে, তিক্ত নীরবতায় তার মন ভারাক্রান্ত। ট্রেঞ্চের ছুরিটা পকেট থেকে একটা পাথরের টুকরো বার করে শানিয়ে নিচ্ছে আর দেখছে হার্ন লোকজনের সঙ্গে কেমন প্রীতিভরে কথা বলছে, আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। ক্রফ্টের চোখ জ্বলছে। কি বিশ্রী কাণ্ড, নব্বুই দিনের এক বিস্ময়কর ঘটনা ওদের ঘাড় থেকে যেন ছু'ড়ে ফেলার প্রচেষ্টা। এতদিন বিনা অফিসারেই ক্রফ্ট প্লেটুন চালিয়ে এসেছেন, কাজ ত' ভালোভাবেই চলেছে, যদি একজন লেফটেনান্টের প্রয়োজন ছিল তাহলে সাম ক্রফ্ট কি অপরাধ করেছিল?

নৌকা অন্ধকারে ওদের নামিয়ে দিয়ে রাত্রির ছায়ায় মিলিয়ে গেল। হার্ন এবং ক্রফ্ট সেই অঞ্চলের বৈমানিক মানচিত্র দেখতে লাগলেন। সম্ভাব্য আক্রমণের সূত্র সন্ধান করতে লাগলেন। হার্ন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন ঃ

"আমরা নদীর পথ ধরে মাইল আটেক যেতে পারি, তারপর উন্মুক্ত দেশ পর্যন্ত পে'ছে আমাদের অভিযান বন্ধ করব। লোকজনদের আমরা কি করছি তার একটা আভাস দিন।" হার্ন এই হুকুম দিলেন।

ক্রফ্ট সবাইকে বুলডগের মত ঘেউ ঘেউ করে সম্বোধন করে বলল ঃ "শোনো ভালো করে, এই নদীর পথ ধরে যতদূর যেতে পারি আমরা যাব, তোমাদের পোষাক ভিজে যেতে পারে—যতটুকু জানি এ অঞ্চলে জাপানীরা নেই, তবু চোখ-কান খুলে রাখ।"

লোকগুলি কাঁধের ওপর যে যার পোঁটলা-পুটুলি উঠিয়ে নিল। হার্ন এগিয়ে এলেন কথা বলার জন্য—"আমি তোমাদের জানি না, তোমরাও আমাকে জানো না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করবো, এমন কি তোমরা আমার শক্তিকে ঘৃণা করলেও। নাও, এখন এগোন যাক্।"

সেই সেনাদল অতি কষ্টে বালিয়াড়ি ভেঙে পথ করে নিল। মানচিত্রে নির্দেশিত নদীর উৎস-মুখের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। হার্ন নেতৃত্ব করার জন্য এগিয়ে আছে, মাথার ওপর জঙ্গল সুউচ্চ ছাদের মত দেখাচ্ছে।

ক্রফ্ট নিঃশব্দে হে'টে চলেছেন, মুখে দৃঢ়তার ছাপ। প্লেটুনের নেতাকে কড়া হতে হয়, বন্ধুভাবাপন্ন হলে চলবে না। —এর মত। কার মত যেন—

যখন সবাই এসে একটা বাঁকের মুখে পে'ছালো তখন ক্রফ্ট নিজের কোমরে একটা মোটা দড়ি বে'ধে সেই শাদা রঙের ফেনোজ্জ্বল জল ভেঙে দূরে কিনারায় গিয়ে পড়ল। অপর তীরে একটি মোটা গাছের গু'ড়িতে দড়িটা বে'ধে লেফটেনান্টকে পার করা হল। তৃতীয় দফায় এল গাল্লাঘর, সে তীরের কাছাকাছি এসে পে'ছাতেই তার পকেট থেকে একটি অনুন্মুক্ত খাম তার হাত থেকে জলে পড়ে প্রবল স্রোতে ভেসে গেল। সে একবার সেটি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ডুব দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্রফ্ট তাকে জড়িয়ে ধরে তীরে টেনে নিয়ে এলেন—গাল্লাঘর তখন ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদছে, এইটি তার স্ত্রীর শেষ চিঠি।

ক্রফ্ট চড়া গলায় বল্লেন—"গেছে গেছে! এক টুকরো কাগজ মাত্র, এখন মন থেকে ওসব মুছে ফেল।'"

সেই প্রভাতে শুধু এই চিঠিখানিই যে হারাল তা নয়। প্লেটুন এক এক করে সেই শক্ত দড়ি ধরে ধরে এসে পে'ছাল। নতুন আমদানি উইম্যান ঠিকমত পারল না, মাঝপথে পে'ছে সে জলে পড়ে গেল, সবাই যখন লক্ষ্য করল তখন সে অনেক দূরে ভেসে চলে গেছে। ক্রফ্ট এবং হার্ন দুজনে দৌড়ে তীর-প্রান্তে গিয়ে দেখলেন যে এক টুকরো কাঠের মত উইম্যান ভেসে চলেছে।

ধীরে ধীরে ওরা দুজনে ফিরে এলেন।

।। পাঁচ ।।

নদীকে পেছনে ফেলে প্লেটুন ডাঙায় উঠতেই পরিক্রমা শেষ হল। এখন দুজনে মিলে প্রতি দফায় ওরা এগিয়ে চলে। পাতালতার জাল ভেদ করে যাওয়া অতি নোঙরা কাজ। রোদের তেজ বৃদ্ধির সঙ্গে ওরা কাতর হয়ে পড়ে গেল। গাছ কাটতে কাটতে পথ করে নিতে হচ্ছে।

অবশেষে যখন জঙ্গলের প্রান্তে পে'ছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তখন চোখে পড়ল ঘাসের ঘন জঙ্গল এবং সামনের ছোট টিলা পাহাড় শ্রেণী। সেই পাহাড় শ্রেণী ছাড়িয়ে একটা পার্বত্য গিরিপথ দেখা যাচ্ছে, এই পথ ধরে শত্রুর পিছনে পে'ছাতে হবে।

হার্ন অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে ও'র দলের সকলকে বল্লেন ঃ

"জাপ লাইনের পিছনেই আমরা আজ রাতে পোজিসন নিতে চাই। তার মানে অন্ধকার হওয়ার আগে পনের মাইল যেতে হবে। আর কিছু করার আছে সার্জেন্ট?" ক্রফ্টকে প্রশ্ন করলেন লেফটেনান্ট।

ক্রফ্ট থুতু ফেলে বলল—"হ্যাঁ, স্যার, আমরা উন্মুক্ত দেশে গিয়ে পড়ব। এই সবাই শোনো, পেট্রলের ডিসিপ্লিন ঠিক রাখা চাই। চে'চামেচি, হৈ-চৈ কিছু চলবে না। পনের মাইল কি পাঁচ মাইল কতটুকু পারব জানি না, তবে আমাদের এটা করতে হবে।"

নিজের কথার প্রকারান্তরে এই প্রতিবাদ শুনে হার্ন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু উনি ওদের ছিন্ন বাহিনী হিসাবে এগিয়ে দিলেন। গিরিপথের দিকে সবাই এগিয়ে চলল। গিরিবর্ত্মের পাশে মাউন্ট

অনাকা বিরাট আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় ওরা গিরিবর্ত্মের প্রবেশ-পথের সামনাসামনি গিয়ে পৌঁছাল। সঙ্কীর্ণ খাদ সুক্ষ্ম সবুজ গাছে ঢাকা, প্লেটুন সেখানে দাঁড়িয়ে তা বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করল। ক্রফ্‌টের চামড়ার মত মুখভঙ্গিমা যেন আশংকায় ভরে উঠল। ক্রফ্‌ট বললেন ঃ

"আমার মনে হয় লেফটেনাণ্ট, ওরা নিশ্চয়ই এই গিরিবর্ত্ম পাহারা দিচ্ছে।"

হার্ন অনিশ্চিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ —"আমরা ওদের লাইন থেকে অনেক দূরে আছি।"

হার্ন হলেন অফিসর, আর হার্ন কি, পুরানো ঘুঘুমাত্র। তাই আবার বল্লেন ঃ "ঐ গিরিবর্ত্ম এত সংকীর্ণ যে দু'জন মানুষ ওটা রুখতে পারবে না। আমাদের বেশ ভালো করে সব দেখতে হবে। দুটো দ'লে সবটা বিভক্ত করতে হবে। একদল এই মাঠটা অতিক্রম করবে, আর অপর দল তাদের রক্ষণ-ব্যবস্থা দেখা-শোনা করবে।"

সাধারণ জ্ঞানানুসারে হার্নকে এ কথায় রাজী হতে হয়। তবে তিনি জানতেন, যে অন্যকালের চাইতেও এখনই যে কম্যান্ড তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছে তা আবার শুরু করতে হবে। তাই তিনি সোজাসুজি যারা মাঠ অতিক্রম করে যাবে সেই দলের নেতৃত্ব ভার নেওয়ার জন্য জেদ করলেন। দ্বিতীয় দলের ভারপ্রাপ্ত ক্রফ্‌ট সমগ্র দৃশ্যটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ক্রফ্‌ট ছাড়া, ব্রাউন ভীষণ অস্বচ্ছন্দ-ভাবে কাশতে লাগল। সে বলল—"আমরা যদি ঐ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে না পারি তাহলে কি করবে স্থির করেছ ক্রফ্‌ট।"

ক্রফ্‌ট ধমক দিয়ে বলে ওঠেন—"আমায় বলছ কেন? হার্নকে প্রশ্ন করো। এই দলের তিনি অধিনায়ক। তবে কি জানো, সেনাবাহিনীতে কোনো কাজ এক-ভাবে না করা যায়, তাহলে অন্যভাবে করতে হয়।"

সৈন্যদল ঝোপের একেবারে ভিতরে গিয়ে পড়েছে এমন সময় পাতাজতার ভেতর থেকে একটা কামান গর্জন করে উঠল। একটি গোলা হার্নের পাশ ঘেঁসে গেল, চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন—"সাবধান! গা ঢাকা দাও।" অভিশাপ দিতে দিতে সঙ্গীরা আশপাশের পাথরের আড়ালে যতটুকু আত্মরক্ষা করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করল। পিছন থেকে ক্রফ্‌টের দল গাছগুলি লক্ষ্য করে সমানে গুলি ছুঁড়ে চলল। তার সারা দেহ দিয়ে ঘাম ঝরছে, হার্ন জানেন যে তাঁর শুয়ে পড়া চলে না, তিনি যে অফিসার।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি চীৎকার করে ওঠেন—"গেট ব্যাক।" রেড, রীজেস, উইলসন, গাল্লাঘর—সকলেই হুকুম তামিল করার জন্য উঠে দাঁড়াল, হার্ন দেখলেন। গাছের ভেতর থেকে একটা বুলেট এসে উইলসনের পেট ভেদ করে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ল। হার্ন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে আহত লোকটির কি সেবা করা যায় দেখতে লাগলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।

আধঘণ্টা পরে উইলসন মারা গেল। যে খাদে প্লেটুন বাসা বেঁধেছিল সেই খাদের ভেতর পড়ে রইল তার মৃতদেহ। রেড আর রীজেস ওদের বিরাট কমরেডের দেহখানি তার জামা-কাপড়ে জড়িয়ে কবরস্থ করে ফেলল। ক্রফ্‌ট সেই খাদের প্রান্তে বাইনোকুলার দিয়ে রহস্যময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার কাছাকাছি এসে হার্ন প্রশ্ন করলেন—'কি দেখতে পাচ্ছ?'

"তেমন কিছু নয়।" ক্রফ্‌ট যেন বাধা পেয়ে বিরক্তিভরে মুখ ফেরালো।

"সার্জেণ্ট, কতকগুলি ব্যাপার আছে যা সোজাসুজি করতে হয়। তুমি এই প্লেটুনে অনেক দিন আছো। আমি জানি কম্যান্ড ছাড়া অতি কঠিন। কিন্তু অবস্থা ত' এই। এখন এটা আমার প্লেটুন। পাকাপাকিভাবেই। আমি স্থির করেছি, ফিরে যাব। এই গিরিবর্ত্ম রুদ্ধ, কোনোমতেই এ অতিক্রম করা যাবে না।"

ক্রফ্‌ট গর-গর করে বলল—"আমরা কি একবার ঘুরে-ফিরেও দেখবো না? আমরা ত' নিশ্চিতভাবে জানি না লেফটে-ন্যাণ্ট, যে জাপানীরা এখনও ওখানে আছে কিনা, ঐ গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটি বিচার করে দেখলে মনে হয় বড়জোর একটা স্কোয়াড ওখানে আছে মাত্র। হয়ত ওদের ওপর হুকুম আছে শত্রুসেনা দেখতে পেলে পিছু হঠার।"

হার্ন তৎক্ষণাৎ বললেন—"সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

"আমাদের কি একটা সুযোগ দেবেন না? কারণ, আপনি ত' জানেন এই টহল-দারী বাহিনী সমগ্র আক্রমণের রূপ পালটে দিতে পারে! লেফটেনাণ্ট, দেখুন, একটা কাজ আমরা করতে পারি, রাতের অন্ধকারে একজন কেউ গিয়ে সব পর্য-বেক্ষণ করে আসুক।'

হার্ন রাজী হলেন, "একজন! রাতের অন্ধকারে! তবে সে যদি কোনো কিছুর সামনে গিয়ে পড়ে—?"

ক্রফ্‌ট গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন—"মার্টিনেজ এই কর্মের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। সে ইণ্ডিয়ান।"

"বেশ মার্টিনেজ ঠিক রইল। তাকে বল্‌বেন ফিরে এসে আমাকে যেন জাগিয়ে দেয়।"

এই বোধ হয় প্রথম ক্রফ্‌ট ওপরওলার আদেশ অমান্য করলেন।

মার্টিনেজকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রফ্‌ট বল্‌লেন—জুলিয়ো, লেফটেনান্ট ফিরে যেতে চান। আমাদের দায়িত্ব কিন্তু একটা পথ খুঁজে বার করার, যে পথে একটা কম্প্যানী যেতে পারে। অন্ধকার হলেই—আমি চাই তুমি এই গিরিবর্ত্মে পর্যবেক্ষণে যাও। যদি জাপানীদের দেখতে পাও, তাহলে তারা সংখ্যায় ক'জন জানার চেষ্টা করবে। জুলিয়ো, তুমি ফিরে এসে কাউকে কিছু জানাবে না আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত। লেফটেনান্ট যদি জেগে থাকেন, বল্‌বে যে বিশেষ কিছুই ঘটেনি।"

মার্টিনেজ উত্তর দেয়—"ও, কে,। আপনি যখন বল্‌ছেন তাই হবে।" তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

চাঁদ উঠেছে, কম্বলে ঢাকা মানুষদের ওপর রুপোলি ছায়া নেমেছে। অনেক আগেই মার্টিনেজ ফিরে এসেছে। মাঠ ভেঙে সে ছায়ার মত চলে এসেছে। তার ছুরির খাপ শূন্য, কারণ, খাদের ধারে ফেরার সময় মেশিনগান চালক একজন জাপ সৈনিকের কাছে এসে পড়ে—সৈনিকটা তাকে ঠিক সময়মত দেখ্‌তে পায়নি যে গোলা ছুঁড়বে বা চেঁচাবে, তার পিঠে ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছে। ফিরে এসেই সোজা ক্রফ্‌টের কাছে গিয়ে সব-কিছু জানিয়েছে।

ক্রফ্‌ট চুপি গলায় বল্‌লেন—"তুমি তাহলে কিছুই দেখতে পাওনি? ও, কে, —ভালো, তাহলে এখন সরে যাও।"

সূর্যোদয়ের পর উঠে হার্ন ক্রুদ্ধগলায় জানতে চাইলেন—কেন তাকে জানানো হয়নি। ক্রফ্‌ট একগাল হেসে বল্‌ল—"আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন তাই। গিরিবর্ত্ম একেবারে ফাঁকা, শত্রুদল বোধহয় পালিয়েছে।"

"কথাগুলি ভালো শোনাচ্ছে না।"

নির্দোষ কণ্ঠে নিরীহ ভঙ্গিতে ক্রফ্‌ট বলে—"আমরা তাহলে পাহাড়ের দিকে হানা দিতে পারি।"

"অসম্ভব। তবে গিরিবর্ত্মের দিক থেকে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকতে পারে। আর একবার চেষ্টা করা যাক্।"

পশ্চাদপসরণ বন্ধ করতে পারার ফলে ক্রফ্‌টের মনে গভীর সন্তোষ জেগে-ছিল, কিন্তু অপর সেনাদের মনে অস্বাচ্ছন্দ্য জেগে উঠ্‌ল যখন প্লেটুনকে বলা হল যে গিরিবর্ত্ম পার হওয়ার জন্য আবার চেষ্টা করতে হবে। দলের সকলের অস্বস্তি কাটানোর জন্য ক্রফ্‌ট বল্‌লেন যে, মার্টিনেজ গিয়ে দেখে এসেছে কেউ কোথাও নেই। তারপর হার্ন যখন নেতৃত্বের ভার নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন তখন সে গম্ভীর মুখে লাইনে যোগ দিল।

আজ সকালের প্রভাতী আলো প্রান্তরটুকু নিরীহ মনে হচ্ছিল। গতকাল যেখানে দলটি বাধা পেয়েছিল সেই অঞ্চলটি পার হয়ে সংকীর্ণ খাদের মুখে গিয়ে পৌঁছাল। হার্ন এগিয়ে যাচ্ছিলেন পিছনের সঙ্গীদের এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করছিলেন এমন সময় গোপন ঘাঁটি থেকে গোলা বর্ষিত হল। মার্টিনেজ যে জাপানী সেনাটিকে হত্যা করেছিল সে যে নিঃসঙ্গ ছিল না তা বোঝা গেল।

মনে হল যেন হার্নকে শূন্যে কে তুলে নিক্ষেপ করল, তিনি পিছনে হেলে পড়ে গেলেন। আর বাকী সবাই পাথরের খণ্ডের আশে-পাশে শুয়ে পড়ল চি হয়ে।

ক্রফ্‌ট চীৎকার করে ওঠে—"এখান থেকে পালাও, ফায়ার করো! কিছু গুলি ছুঁড়ে যাও!" এই বলে ঘাসের সবু পাঁচিলের পাশে তিনি শুয়ে পড়লেন এদিকে রেড্ আর রথ লেফটেনান্টের দেহটা পিছনে টেনে নিয়ে এল।

পিছু হেঁটে এসে ওরা থামলে ক্রফ্‌ট সেখানে সেই ক্লান্ত লোকগুলিকে দিয়ে দুটি গাছের ডাল-পালা কাটালেন তারপর তাতে একটা কম্বল বেঁধে স্ট্রেচা তৈরী করা হল। বুকের কাছে গোলাকা লালরঙে সিক্ত অংশ লাল গোলাপের ম দেখাচ্ছে, হার্ন শুয়ে আছেন আর জো জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

।। ছয় ।।

স্ট্রেচার তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রথ একটি ভগ্নপক্ষ পা দেখতে পেল। সেই ক্লান্ত-শ্রান্ত মানু দের কয়েকজন সেই অসহায় প্রাণীটি শান্ত করার চেষ্টা করছিল এমন সম তারা ক্রফ্‌টের নজরে পড়ল। রাগে ফে পড়ে তাদের হাত থেকে সেই প্রাণীটা কে নিয়ে ক্রফ্‌ট সেটিকে এক রকম চট্‌ মেরে ফেলে দূরে ফেলে দিলেন। স দলের লোকজন তার দিকে বিস্ময়ে বেদনায় আকুল হয়ে তাকিয়ে রইল।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রীজেস ব ওঠে—"এটা করার অর্থ কি? ওকে মার কোনো অধিকার তোমার নেই—"

"সাট্ আপ! সবাই চুপ করো! এ আমার হুকুম।" চীৎকার করে উঠ্‌ ক্রফ্‌ট।

রেডের মুখে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠ্‌ল, সে বলে ওঠে,- "তুমি হুকুম দেওয়ার কে ক্রফ্‌ট?

ক্রফ্‌ট আবার চীৎকার করে—"ওসব বাজে কথা ছাড়ো!" ভাবটা যেন ওদের সবাইকেই মারার জন্য ও তৈরী। "তোমাদের মধ্যে দু-একজন লেফটেনান্টের স্ট্রেচার ওঠাও, ব্রাউন, তুমি জানো কিভাবে এই পরিক্রমা থেকে পার হয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি? তাহলে তুমি ও'কে নদীর কূলে নিয়ে যাও। তারপর, যদি নৌকা আসা পর্যন্ত উনি বেঁচে থাকেন তাহলে ওদের সঙ্গে চলে যেয়ো। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা নৌকা পাঠাতে বোলো। আর তোমার সঙ্গে রীজেস ও গোল্ড্‌ষ্টাইনকে নিয়ে যাও।"

মিনেত্তা সহসা ভয় পেয়ে বলে উঠ্‌ল—"হে! আমরা সকলে তাহলে ফিরে যাবো না?"

ক্রফ্‌ট কঠোর গলা বিকৃত করে বলে ওঠেন—"তুমি কি হে, অফিসার নাকি? আমাদের আর সবায়ের সঙ্গে তোমাকে আবার পাহাড়ে যেতে হবে।"

"পাহাড়ে? আবার পাহাড়ে?" সকলে একসঙ্গে শঙ্কিত গলায় বলে উঠ্‌ল।

"পাঁচ মাইলের মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় একটা ফাঁক আছে, এখান থেকে পূব দিকে গেলেই সেই ফাঁক। এখন যদি আমরা বেরোই, তাহলে একদিনেই আমরা চড়াই শেষ করতে পারব।"

রেড করুণ গলায় প্রশ্ন করল—"আমরা ফিরে যাবো না কেন?"

"সেই কর্মের জন্য আমাদের পাঠানো হয়নি! আমি এখন এই প্লেটুনের অধিনায়ক। আচ্ছা ব্রাউন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে সরে পড়ো। বাকী সবাই জিনিসপত্র তুলে নাও, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ও, কে,। কাজ শুরু হোক। লাইনে দাঁড়াও।"

মাউণ্ট আনাকা থেকে সূর্যের শেষ রশ্মি ক্ষীণ বিদায়োন্মুখ তখন, এক সুরে মানুষ মাতালের মত লাইন বেঁধে চলেছে, মাথাগুলি তাদের মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটে তারা এগিয়ে এসেছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে উঠেছে, চড়াই ভেঙেছে। দুপুর থেকেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছে।......

ওদিকে সেদিনই সকালে হেড কোয়ার্টার্সে একটা কাণ্ড ঘটছিল। জেনারেল কামিংস একটা পি প্লেনে উঠে তাঁর ওপরওলাদের কাছে নৌ এবং বিমানবহরের অভাব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছেন। তাঁর অভিযান চালানোর জন্য এই দুই বিভাগের সমর্থন অপরিহার্য। তাঁর যাবার অল্পকাল পরেই কর্নেল ডালেসন, যাঁর ওপর ভার পড়েছিল, সংবাদ পেলেন যে তোয়াকুর নিকটস্থ শত্রু-শিবির সহসা শূন্য হয়ে গেছে।

হঠাৎ জাপানীরা কেন তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। এমন একটা ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার অর্থ কি। হয়ত—

কিংবা এটা একটা ফাঁদ মাত্র। ডালেসন চিন্তিত হলেন।

ক্রফ্‌টের কাছে কিন্তু এই দিনটিতে চিন্তার অবসর ছিল না। তার একমাত্র লক্ষ্য হল ওর দলকে কেবল এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে স্ট্রেচার বাহকেরা কি ভাবে সমুদ্রোপকূলে এগিয়ে চলেছে সে দৃশ্যও মনে জেগেছে। তবে সে চিন্তা এখন ব্রাউনের, ক্রফটের নয়। সাম ক্রফটকে এখন এই অনিচ্ছুক দলটিকে পাহাড়ে টেনে তুলতে হবে।

পাহাড়ের চূড়ো যেখানে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে সেইখানে উঠে আবার নীচে নামার সময় অদূরে বজ্র-নির্ঘোষের মত গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। সবাই জানতো যে আওয়াজ গোলন্দাজ বাহিনীর। নিশ্চয়ই অদূরে কিছু ঘট্‌ছে, ওখানে হয়ত দু দল সামনা-সামনি পড়েছে।

পাহাড়ের গায়ে ঈগল পাখির মত দুটি হাত রেখে ক্রফ্‌ট তাঁর ভগ্ন এবং ক্লান্ত দলটিকে হুকুম দিচ্ছেন আর প্রাণপণে পাথর আঁকড়ে আছেন পাছে পড়ে যান। আর একটু হলেই ফাঁকটায় পোঁছানো যায়। পাশের পাহাড়ে লাফিয়ে যেতে গিয়ে প্রায় পা ফস্‌কে পড়ে গিছ্‌লেন আর কি। বাকী দল নীরবে দেখতে লাগল। তারপর দূর প্রান্তে পোঁছে বাকী দলকে অনুসরণ করার হুকুম দিলেন।

ওরা সবাই লোকটির প্রতি ঘৃণায় আকুল হয়ে উঠেছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—"হারামজাদা ক্রফ্‌ট! কি ভেবেছে আমাদের, পাহাড়ী ছাগল?"

কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তা করা চলে না, আবার ক্রফ্‌ট হেঁকে উঠেন—"ও, কে, মেন! এগিয়ে এসো, নাও শুরু করো!"

এই অভিযানে রথকে হারাতে হল। পা ফস্‌কে সে পাহাড় থেকে একেবারে নীচে গভীর খাদে পড়ে গেল, তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সমস্ত গিরিবর্ত্ম যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু—পড়ার সঙ্গেই সেই আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। দলের আর সবাই ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠে বিমূঢ় হয়ে শুনলো সেই সকরুণ ধ্বনি।

গাল্লাঘর ক্রন্দনাতুর কণ্ঠে বলে—"কোথায় চলেছি আমরা? কি প্রমাণ করতে চাই আমরা? আমরা যদিও উঠতে পারি, সমগ্র কম্‌প্যানি (দল) এই পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব। এ ব্যাটা ক্রফ্‌ট পাগল হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে

ও মারতে চায়। এ যে আত্মহত্যার সামিল।”

ক্রফ্‌ট আবার চীৎকার করে ওঠেন—“কই, কি হোল! এগিয়ে চলো সবাই!”

রেড এতক্ষণে আহত পশুর মত গর্জন করে ওঠে—“কেউ এক ইঞ্চি নড়বে না, কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে।”

বিরাট-দেহ সার্জেণ্ট ক্রফ্‌ট একটু শ্লেষভরে বলে ওঠেন—“ওঃ তাই নাকি!”

“আমরা সবাই ফিরে যাব, তুমি আর ফিরতে পারবে না। পারবে ক্রফ্‌ট? তুমি লেফটেনাণ্টকে মিথ্যা বলে একেবারে মেসিনগানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ। সব জেনে শুনে। জাপানীরা এখানে নেই, একথা বলোনি? তুমি একা পাহাড়ের ওপর ওঠো, নয়ত—”

ক্রফ্‌ট ধীরে ধীরে নিজের রাইফেলটা উঠিয়ে নিয়ে ওদের দিকে রেখে বল্লেন ঃ

“আমি তোমাদের বলেছি অনেক বার, জিনিসপত্র উঠিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—নইলে আমি তোমাদের খুলি উড়িয়ে দেব।”

সবাই জানে ক্রফ্‌ট যা বলছেন তা ঠাট্টা নয়। এই ওর আসল মনোভাব। তাই সবাই জিনিসপত্র উঠিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে আবার যাত্রা শুরু করে।

।। সাত ।।

পর্বত-শিখরে ছায়াঘেরা অঞ্চলে পেঁছে ওরা বিচ্ছিন্ন পাথরে ঘেরা একটা টিলা পাহাড়ে পেঁছালো। আঁকা-বাঁকা একটা পার্বত্য-পথ বেয়ে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ে ক্রফ্‌ট ওদের জোর করে ওঠালো। লোকগুলি বুড়ো মানুষের মত ঠক ঠক করে কাঁপছে, ক্লান্তিতে এবং দুর্দশায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে যেখানে ক্রফ্‌ট দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে পেঁছে ওরা সবাই অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল, আর এগোবার শক্তি নেই কারো।

ক্রফ্‌ট তখনও গর্জন করেন, “আমিই এগিয়ে যাবো, তোমরা সবাই অস্ত্র-সাহায্য দিয়ে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।”

ক্রফ্‌ট বুকে হেঁটে—হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন আর মাটিতে কান পেতে শুনছেন। কোনো বাধা নেই, প্রতিরোধের চিহ্ন নেই। গাছগুলির প্রায় প্রান্তে পেঁছে উঠে বসলেন ক্রফ্‌ট, তারপর দলবলকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন।

সেই বিরল নীল আকাশ প্রকম্পিত করে সহসা একটি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বিস্ময় বিমূঢ় ক্রফ্‌ট পিছন দিকে হেলে পড়ে গেলেন। বিভ্রান্ত দলবল হতচকিত হয়ে পড়ল—, কে যেন অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল—‘জ্যাপস্‌’।

গাছের আড়াল থেকে প্রায় পঞ্চাশজন জাপানী রাইফেলধারী সৈন্য এগিয়ে এল, অফিসারের হাতে একটা সামুরাই তরবারি—আর সেনাদল গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। ক্রফ্‌ট রাইফেলটা তুলে ধরতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অফিসার ওর বুকে সেই সামুরাই তরবারি প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

খরগোসের পালের মত প্লেটুনের আর সবাই পালিয়ে গেল।

ওদিকে অপারেশন টেণ্টে জেনারেল কামিংস ওপরওলাদের কাছে আরো নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রার্থনা জানিয়ে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরছিলেন। উপরওলাদের কাছ থেকে তড়পানি খেয়ে তিনি জ্বালায় ছট্‌-ফট্‌ করছিলেন। ওপরওলারা মনে করেন যে, কাজ সফল না হওয়াটা জেনারেলেরই অক্ষমতা। লড়াই যেন খালি হাতে হবে। এমন কি ওঁদের মতে জেনারেল নাকি শত্রুসৈন্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা করে বসে আছেন।

ফিরে এসে জেনারেল দেখেন অপারেশন টেনটে ভীষণ হট্টগোল। টেলিফোন বাজছে, ম্যাপ গড়াগড়ি যাচ্ছে। সব অফিসার মিলে চেঁচামেচি করছেন, হৈ হৈ বেঁধে গেছে। কোন একটা ইডিয়ট চেঁচাচ্ছে—“সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন জাপ হেড কোয়ার্টার্সকে একেবারে পর্যুদস্ত করেছে, ওরা একেবারে বিতাড়িত।”

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ উত্তেজিত কর্নেল ডালেসন তাঁর উপস্থিতি আবিষ্কার করে বলে ওঠেন—“স্যার! আমরা শত্রুদের আক্রমণ করে বিতাড়িত করেছি।”

কামিংস পাথরে গড়া মানুষ, গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন—“তোয়াকুর কি হল? সে বেঁচে আছে?”

“আমাদের একজন জাপানী বন্দী বলছিল তোয়াকু আমেরিক্যান লাইন ভেদ করে পালিয়েছে।”

“নির্জলা মিথ্যা! তোয়াকু নিশ্চয়ই এখনো এই দ্বীপেই লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বার করো। শুনতে পাচ্ছো! কর্নেল, তাকে খুঁজে বার করো। কোনো কথা শুনতে চাই না।”

কর্নেল নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে শুধু বল্লেন—“ইয়েস স্যার।”

সুদীর্ঘ দিনের অবশেষে অবসান ঘটে, সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে এল সেই যেখানে সমুদ্রোপকূলে আক্রমণকারী বোট ভেড়ানো আছে। তিনজন শ্রান্ত মানুষ নীরবে বসে আছে নৌকায় স্ট্রেচারটা ওঠাবে বলে। কোনো রকমে তারা এখনও লেফটেনাণ্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন—

নৌকার চালক মৃদু গলায় বলে—এখন সব নির্ভর করছে তাড়াতাড়ি ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে পেঁছে দেওয়ার ওপর। আমি বরং আরেকটা নৌকার জন্য বেতার মারফৎ খবর দিই, বাকী সবাই তাতে—”

কথাটা আর শেষ করা যায় না। জঙ্গলের ভেতর থেকে সহসা রাইফেলের
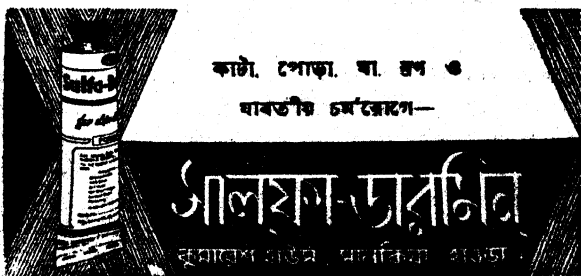
আওয়াজ পাওয়া গেল। নৌকার সবাই সতর্ক হয়ে উঠল। একটি বিপর্যস্ত আকৃতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বালি ভেঙে নামতে লাগল, সে গাল্লাঘর, তার পিছনে দ্রুতগতিতে আসছে মিনেত্তা, ব্রাউন, রেড আর মার্টিনেজ—

ওদের পিছনে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর জোনাকির আলোর মত গুলির চমক দেখা যাচ্ছে। নৌকার অস্ত্রশালা থেকেও বুলেট বর্ষিত হ'তে থাকে। নৌকার মেসিনগান চালক প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। আর বাকী লোকেরা এই শ্রান্ত, আহত, পলাতক মানুষগুলিকে টেনে তুললো নৌকার ওপর।

মার্টিনেজ ওদের নেতৃত্ব করে নিয়ে এসেছে, তাকে সর্বশেষে জল থেকে টেনে তোলা হল। সে নৌকায় উঠে হাঁফাতে শুরু করতেই নৌকা ছেড়ে দেয়।

ডাক্তাররা দেখার পর যে হাসপাতাল শিবিরে হার্ন আহত অবস্থায় শায়িত সেখানে গুজবের আর অন্ত নেই। শিবিরের ছাদের পানে তাকিয়ে চেয়ে আছেন হার্ন, আশ-পাশের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—

"সবাই বলছে আমাদের এই ক্ষুদে টহলদারী বাহিনীর ফলে তোয়াকুকে হঠে যেতে হয়েছে।"

"ওরা বলছে যে, আমরা প্রথম যখন গিরিবর্ত্মে আক্রান্ত হই, তখন ওরা বেতারযোগে সংবাদ পাঠিয়েছে যে অন্ততঃ আধ-ডিভিসন সেনাদল পিছনে আছে। কারণ জাপানীরা দুটি কম্প্যানিকে উঠিয়ে নিয়ে ওপরে পালিয়েছে। ওদের লাইনে মস্ত ফাঁক পড়ে যায়, ফলে সমস্ত অভিযানটাই একেবারে বেলুনের মত ফেঁসে গেছে।"

"মনে হচ্ছে, টহলদারী বাহিনীর বুদ্ধি আছে। তবে ঐ হতভাগ্য ক্রফট—ও অমন ছোটলোক আর দেখা যায় না, যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনই নীচ, কিছুতে ভয় নেই—অঃ—ও—ঐ ক্রফটেই সম্ভব!"

লোকেরা হার্নের পাশে এসে দাঁড়াত, ও'র শরীর সম্পর্কে প্রশ্ন করত। হার্নের তা ভালো লাগত। সবাই বেশ ভালো লোক। হার্ন ভাবেন, যুদ্ধান্তে এদের কি হবে, গাল্লাঘরকে তার শিশুপুত্রে মানুষ করতে হবে, মার্টিনেজ একেবারে জাত সৈনিক, আবার হয়ত সেনাদলে নাম লেখাবে, যতদিন না পেনসন নেওয়ার সময় হয় কাজ করে যাবে। গোল্ডস্টাইন আর রীজেস ওদের খামারের কাজে ফিরে যাবে। রেডটা হালকা চরিত্রের, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিন কাটাবে। আর মিনেত্তা—ওদের অনেক পয়সা—'

ওদের সকলের কথাই মনে মনে ভাবেন হার্ন, আর সকলের কল্যাণ কামনা করেন। ওরা সবাই ভালো।

একদিন সকালে জেনারেল ওর খাটের ধারে এসে দাঁড়ালেন। ভঙ্গীটা একটু অন্যরকম। হার্ন তাঁর পাণ্ডবিক, শীতল দৃষ্টির পানে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন—

জেনারেল কামিংস অবশেষে বললেন—"তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে ভারী আনন্দ হল, রবার্ট। তোমার বাবাকে চিঠি দিয়েছি। তুমি আহত হয়েছ শুনে আমি দুঃখিত।"

—"তা করবেন বৈকি জেনারেল!" কথার সুরে তিক্ততা ঢাকা গেল না। জেনারেল কিন্তু যাওয়ার জন্য অস্বস্তি-ভরে এগিয়ে গেলেন, যেন চলে যাচ্ছেন এই ভঙ্গি।

হার্ন হঠাৎ বলে ওঠেন—"অনেক কথা মনে হচ্ছিল স্যার!" এই কথায় জেনারেল দাঁড়িয়ে পড়লেন। "আপনি যে-সব কথা বলতেন তাই ভাবছিলাম স্যার। ভয়ের শক্তি আর শক্তির ভয়। ভয় দিয়ে মানুষকে জয় করা যায় না জেনারেল। তখন আমি ঠিক বুঝতাম না আপনার ভুল হচ্ছে না আমার, এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি।

কামিংস শুখনো গলায় বললেন—"বলে যাও, কি বুঝেছ বলো শুনি!"

"দুজন মানুষ আমাকে জঙ্গলের ভেতর আঠারো মাইল বয়ে নিয়ে এসেছে জেনারেল, দুজন আশ্চর্য মানুষ। তারা আমাকে ভয়ে ভয়ে আনেনি, ভালোবেসে এনেছে। এই ভালোবাসা ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি নয়, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। ওরা নিজেদের ভালোবাসে, আমাকে যদি হারাতো, নিজেদেরও অনেকখানি যেত ওদের। ওরা আমাকে বাঁচিয়েছে, বরং আরেকটু বেশী করেছে। ওরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে মানুষের অন্তরে এমন এক শক্তি আছে যা সকল ভয়কে জয় করে, সকল দুর্দশা, সকল ক্লেশ।"

"রবার্ট! আমি দানব নই।"

"মানুষ দেবতা হতে পারে না জেনারেল! রাজনীতিবিদ আর জেনারেলদের সেই চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির নামই ভগবান। মানুষই তাই দেবতা। তাই সে অবিনাশী, তার ক্ষয় নেই, ভয় নেই।"

কিছুক্ষণের জন্য সেইখানেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংস দাঁড়িয়ে রইলেন। কথাগুলি তিনি শুনেছেন, হয়ত সত্যই শুনেছেন। তারপর তিনি দ্রুতপদে শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সেই চলে যাওয়ার চেহারাটা দেখলেন হার্ন, কি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল প্রভাবে মানুষটা সহসা কেমন সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র, শীর্ণ হয়ে গেছে।

আর এদিকে—এই যে সব সাধারণ মানুষ, যারা টহলদারী বাহিনীর দলে একত্রিত হয়েছিল, যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অতি আকস্মিক পরিবেশে—তারা কেমন বৃহৎ হয়ে উঠেছে। এই নগ্ন আর মৃত মানুষদের আগে কখনো এত বড়, এত বিরাট মনে হয়নি। আশ্চর্য!

যুগে যুগে যুদ্ধ শিল্পীর কল্পনার খোরাক যুগিয়ে এসেছে। যুদ্ধের দৃশ্যের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিভিন্নমুখী সত্য, শিল্পীর বিচিত্র প্রতিভায় বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছে। কেউ এর মধ্যে দেখেছেন মানুষের আদিম বর্বরতা, কেউ বা দেখেছেন যে কোন বিরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে মানুষের সদাপ্রস্তুত ভাব। আবার কারো কাছে এ কেবল সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য নক্সা তৈরীর অছিলা মাত্র। বিশ্বের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা এই কয়েকটি ছবির মধ্যে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে ফ্লোরেন্স ও পিসার যুদ্ধ তখনকার দুজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে। দুটি যুদ্ধে ফ্লোরেন্স পিসাকে ভীষণভাবে পরাজিত করে। এর মধ্যে আংঘিয়েরীর যুদ্ধের শেষদৃশ্য আঁকেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এবং কাসিনার যুদ্ধে অতর্কিতে আক্রান্ত স্নানরত ফ্লোরেন্টাইন সৈন্যদের ছবি আঁকেন মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)। লিওনার্দো যুদ্ধকে মনে করতেন মানুষের পৈশাচিক উল্লাস। পতাকার চতুর্দিকে উন্মত্ত যোদ্ধাদের ছবিতে হত্যালীলায় ক্রোধান্ধ মানুষের ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মিকে-

আংঘিয়েরীর যুদ্ধ —দা ভিঞ্চি

কাসিনার যুদ্ধ —মিকেলাঞ্জেলো

বাটাভিয়ানদের শপথ গ্রহণ　　　　—রেমব্রাণ্ট
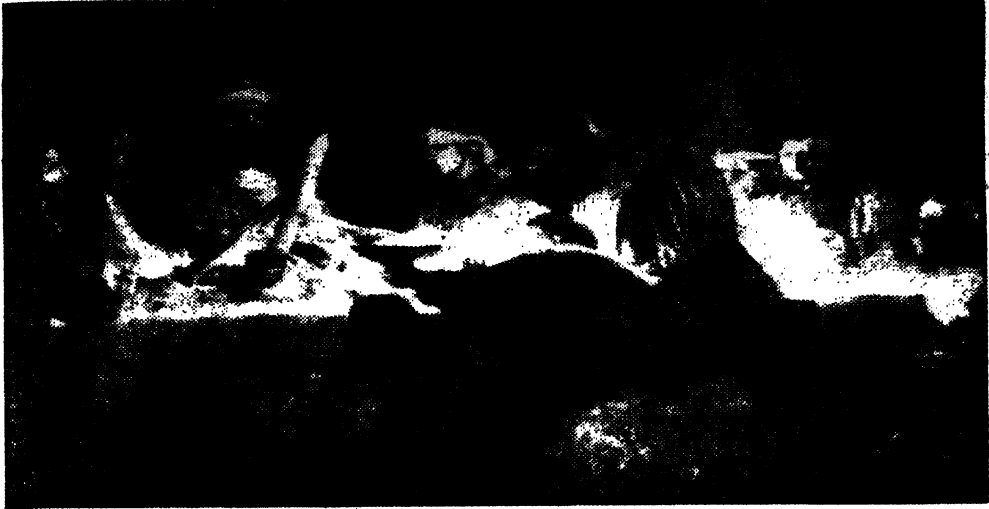
লাপ্তেলোর ছবিতে দেখতে পাই যে-কোন জরুরী অবস্থার জন্যে মানুষের সদা-প্রস্তুতি। স্নানরত সৈনিকরা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও নিজেদের কর্তব্যে এগিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছবি দুটি সমাপ্ত হয়নি। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে এদের কার্টুনগুলি কেবল প্রস্তুত হয়েছিল। বর্তমানে রুবেন্স এবং বাস্টিয়ানোর করা নকল থেকে এগুলির রূপ সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। এই ছবি দুটি ইউরোপীয় শিল্পে দেহাকৃতি অংকনের ধারাই পালটে দিয়েছিল।

●

বাটাভিয়ানরা ছিল এক টিউটনিক উপজাতি। এরা হল্যান্ডে বসবাস শুরু করে। এই সময় ভুবনবিজয়ী রোমানদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এদের দলপতি ক্লডিয়াস সিভিলিস এক ভোজ-সভায় বিভিন্ন গোষ্ঠীপতিদের রোমের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীনতারক্ষার জন্যে শপথ গ্রহণ করান। ১৬৬১ খৃঃ আমস্টার্ডাম টাউন-হলের জন্যে আঁকা এই ছবিটিতে সেই নাটকীয় মুহূর্তের গম্ভীর দৃশ্য অমর করে রেখেছেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী রেমব্রাণ্ট (১৬০৬-১৬৬৯)।

●

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের সময় এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। এর কাহিনী অমর হয়ে আছে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্তর উগোর 'লে মিজেরাবুল'এর কয়েকটি পরিচ্ছেদে। শিল্পের ক্ষেত্রেও তখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-স্ফীত অ্যাকাডেমিক দল এবং তাঁদের বিরোধী রোমাণ্টিক দলের তীব্র বাগবিতণ্ডা চলছিল। প্যারীর পথে পথে যে বিপ্লব তখন চলছিল তারই অনুপ্রেরণায় ফরাসী শিল্পী দেলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩) আঁকলেন ফ্রান্সের অন্তরাত্মা মূর্তিমতী স্বাধীনতা জনসাধারণকে ডাক দিয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অ্যাকাডেমিক শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই বর্ণাঢ্য রোমান্টিক ছবি ছিল দেলাক্রোয়ার একটি চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার আহ্বান　　　　—দেলাক্রোয়া

২রা মে ১৮০৮ —গোয়া

নেপোলিয়ন যখন স্পেন আক্রমণ করেন তখন স্পেনের রাজশক্তি ছিল অপদার্থ। কিন্তু রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহস্র অভিযোগ থাকলেও স্পেনের জনসাধারণ পররাজ্যলোলুপ বিদেশীকে কখনো ক্ষমা করেনি। তাদের ক্রোধের ধূমায়িত বহ্নি ১৮০৮ এর ২রা মে মাদ্রিদের পথে পথে জ্বলে উঠল। জনতা তাদের সাধ্যমত অস্ত্রসংগ্রহ করে সেদিন নেপোলিয়নের মামেলুক অশ্বারোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই গণ-অভ্যুত্থান ৩রা মে নেপোলিয়নের সৈন্যদল অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করে। ঘটনার ছ বছর পরে নিজের স্মৃতিমন্থন করে তখনকার শ্রেষ্ঠ স্পেনীয় শিল্পী গোয়া (১৭৪৬-১৮২৮) সেই বিপ্লব ও তার দমনের দুখানি বিখ্যাত ছবি আঁকেন। এখানে উন্মত্ত জনতার আক্রমণের সামনে সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের পশ্চাদ-পসরণের মুহূর্তের গতিশীল দৃশ্য যেন মুহূর্তের জন্যে দেখা যাচ্ছে।

●

১৪৩২ খৃষ্টাব্দে সান রোমানোর যুদ্ধে ফ্লোরেন্স, সিয়েনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। ইতালীয় শিল্পী পাওলো উচেল্লো (১৩৯৭-১৪৭৫) এই বিজয়ের দৃশ্য আঁকেন ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে। এঁর কাছে যুদ্ধ একটি উপলক্ষ্য মাত্র। সমস্ত ছবিতে শিল্পীর প্রধান চিন্তা পারস্পেকটিভ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিমাত্রিক ভাব কিভাবে আনা যেতে পারে তাই। তাই ছবিতে যুদ্ধের কোন ভীষণতা নেই। সবসুদ্ধ কেমন যেন একটি পর্দায় আঁকা রঙীন নক্সা। —অনেকটা আধুনিক আন্তর্জাতিক শিল্পরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

●

সানরোমানোর যুদ্ধ —উচেল্লো

১৫৬৮ খৃঃ সম্রাট আকবরের রণ-তাম্ভোর বিজয়ের এই দৃশ্যটি তাঁর সমসাময়িক শিল্প মুস্কিন এবং পরস এই শিল্পী দুজনার আঁকা। ছবিটি প্রধানত বর্ণনাত্মক। পার্বত্য গলিপথে গো-শকটে কামান টেনে তোলার দৃশ্যের ব্যস্ততা শিল্পীরা প্রচুর খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে এ'কেছেন।

●

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৭-এর ২৬শে এপ্রিল ফ্রাংকোপক্ষীয় জার্মান বিমানবহর ছোট্ট বাস্ক শহর গুয়েনিকার নিরীহ নাগরিকদের বোমাবর্ষণ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এর কোন সামরিক গুরুত্ব ছিল না। এ হল রণতন্ত্রী জার্মানীর পরীক্ষামূলক কাজ। পরীক্ষা সফল হয়েছিল। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই নিহত হয়। আধুনিক যুগের আর এক শ্রেষ্ঠ স্প্যানিশ শিল্পী পিকাসো (১৮৮১—) সেই বছরেই প্যারিস বিশ্বমেলার জন্যে এই ছবি আঁকেন। আধুনিক সর্বাত্মক যুদ্ধ কিভাবে মানুষের আত্মাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়, অমঙ্গল কিভাবে মঙ্গলের ধ্বংস ঘটায় তার সমস্ত প্রতীক এই ছবিটির মধ্যে পাওয়া যায়। প্যারিস অধিকারের সময় জনৈক জার্মান নাৎসী পিকাসোকে জিজ্ঞাসা করে এ ছবি কি তাঁর করা। শিল্পী জবাব দেন, "না, তোমরা করেছ।"

রণতাম্ভোর বিজয় —মুস্কিন এবং পরস

গুয়েনিকা —পিকাসো

মহাভারতের যুদ্ধনীতি

বিশু মুখোপাধ্যায়

আমাদের একটি চলতি কথা আছে, 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যা আছে, তার সবই আছে মহাভারতে। অথবা যা মহাভারতে নেই, তা ভারতবর্ষেও নেই। কথাটি নিরর্থক তো নয়ই, পরন্তু বিশেষ অর্থপূর্ণ। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এমনকি যুদ্ধনীতিরও বহু কৌশল ও আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় এই মহান গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে।

মহাভারতের ভীষ্ম, দ্রোণ ও শান্তি-পর্ব যাঁরাই মনোযোগসহকারে পাঠ করেছেন, তাঁরাই অবগত আছেন আমাদের দেশের প্রাচীন আর্যগণ সমরবিদ্যায় কি পরিমাণ বিচক্ষণ ও পারদর্শী ছিলেন। বর্তমান কালে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৈন্য-পরিচালনার উপর যুদ্ধের ফলাফল অধিক পরিমাণে নির্ভর করে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যূহ রচনা, দেশরক্ষা ব্যবস্থা, দুর্গ অবরোধ ও চর-নিয়োগ প্রভৃতি রণকৌশলে মহাভারত ও রামায়ণের সমসাময়িক যোদ্ধৃগণও যে অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। ইদানীন্তন কালে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি কয়েক প্রকার ব্যূহ রচনার যে পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি, প্রাচীন আর্যগণের যুদ্ধনীতির মধ্যেও তা সুবিদিত ছিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুদ্ধকৌশলের বহু পরিবর্তন ঘটলেও এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হলেও, উত্তর-মহাভারতীয় যুগের নৃপতিগণও কিভাবে ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের দ্বারগুলি সুরক্ষিত রাখতেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করতেন, তা পড়লে আজও বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এবং তাঁদের রাজনীতি ও সমরনীতির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

'বাঙ্গালীর বল বা বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস' নামক মূল্যবান বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রথমাংশে গ্রন্থকার রাজেন্দ্রলাল আচার্য আমাদের পূর্ব-পুরুষ গৌড়জনের বীরত্ব ও রণকৌশলের যে গৌরবজনক চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। বর্তমানে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'ত। উক্ত গ্রন্থের মধ্যেও গ্রন্থকার একাধিকবার মহাভারতের উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধকালে অথবা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 'স্পাই' বা গুপ্তচরদের একটি বিশেষ মূল্যবান স্থান দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক দেশই এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করে থাকেন। বিপক্ষীয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক গোপন সংবাদসমূহ এই চরেরাই সপক্ষে দিয়ে বিপক্ষকে ঘায়েল করার পথ সুগম করে দেয়। মহাভারতের মধ্যেও এই গুপ্তচরের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

।। গুপ্তচরের প্রয়োজন ।।

চত্বর, তীর্থস্থান এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাসগৃহে গুপ্তচরের গোপন ব্যবস্থা করা রাজার বা রাষ্ট্রপতির অবশ্যকর্তব্য।

দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন স্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতিক সৈন্য সংস্থাপনপূর্বক, অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার-সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গুপ্তচরসমূহ সংগ্রহপূর্বক উঁহাদের সাহায্যে গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত, ভূপতি এবং জনপদবাসীদিগের আচার-ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অন্যতম প্রধান করণীয় কার্য।

শত্রুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে গুপ্তচর প্রেরণ করেছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করার জন্য পানভূমি, মল্লযুদ্ধস্থান, মহাজন-সমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটী, বহির্বাটী, পণ্ডিতগণের সমাগমস্থান, রাজসভা ও ভদ্রলোকদের বৈঠকখানায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারলে রাজ্যের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

।। কূটনীতি ।।

কূটনীতি (Diplomacy) সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তি-পর্বে আমরা দেবগুরু বৃহস্পতির মুখনিঃসৃত বাণীর সাহায্যে জ্ঞাত হই যে, 'রাজ্যলোভেচ্ছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম (তোষণ বা সন্ধি), দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে কার্যসিদ্ধি সম্ভব হলে, কখনো যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হবেন না।

এতদ্ব্যতীত এই পর্বে কূটনীতি সম্বন্ধে আরও উল্লিখিত আছে যে, রাজা বা কোন রাষ্ট্র নিজেকে যখন অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করবেন, তখনই তাঁর অমাত্যগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, বলবান রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনে অগ্রবর্তী হবেন।

।। সাধারণ যুদ্ধনীতি ।।

দুর্বলের রাজা বলবান কর্তৃক জয়ের কৌশল সম্বন্ধেও মহাভারতে উল্লেখ আছে সুন্দরভাবে। প্রসঙ্গক্রমে প্রাধান্য সেটি উল্লেখ করছি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করছেন, "পিতামহ! বলবান ভূপতি, দুর্বল ভূপতিকে পরাজিত

করার ইচ্ছা করলে কি উপায়ে তা সম্পাদন করা সম্ভব?”

উত্তরে ভীষ্ম বললেন, “ধর্মরাজ! বলবান ভূপতি অন্যের রাজ্যে প্রবেশ করে, সেই রাজ্যের প্রজাগণকে সম্বোধন করে বলবেন, ‘আমি তোমাদের অধিপতি হয়ে পরম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করব; তোমরা আমাকে কর প্রদান করবে ও আমার আশ্রয় গ্রহণ করবে।’ বলবান নবাগত ভূপতি এইরূপ বাক্য ব্যবহার করলে, প্রজারা যদি তাঁর বাক্যে সম্মত হয়, তাহলে তিনি কোন বিবাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করেই তাদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তারা যদি তাঁর বাক্যে সম্মত না হয়, তাহলে বলপূর্বক তাদের বশীভূত করবেন।”

।। শত্রু-আক্রান্ত রাজ্যে রাজার কর্তব্য ।।

কোন রাজা বলবান রাজার বল-বীর্যের নিকট পরাভূত হবার উপক্রম হলে, দুর্গে আশ্রয় নিয়ে, মিত্রগণকে সুরক্ষিত করে সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের প্রচেষ্টায় তৎপর হবেন। উক্ত সময় তিনি বনবাসীদের রাজপথে, গ্রামবাসীদের গ্রামান্তর থেকে এনে উপনগরের মধ্যে এবং ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে বারংবার আশ্বাসপ্রদানপূর্বক সুরক্ষিত দুর্গসমূহের মধ্যে সন্নিবেশিত করবেন। রাজ্যের সমুদয় শস্য দুর্গমধ্যে সংস্থাপন করবেন, এবং যদি শস্য সহজভাবে আনয়নে অক্ষম হন, তাহলে অগ্নি-সহযোগে তা অবশ্যই দগ্ধ করে ফেলবেন। নদীর সেতুসমূহ নষ্ট করে ফেলবেন এবং সমূহ প্রণালীর জলবন্ধন মুক্ত করে পথ-প্রান্তর জলপ্লাবিত করবেন। কূপাদির সলিলে বিষপ্রয়োগ করবেন। মিত্রগণের রক্ষাকার্য কর্তব্য হলেও, তা পরিত্যাগ করে, শত্রুর প্রবল বিপক্ষ যে দেশ, সেই দেশের মহীপালের শরণাপন্ন হবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গজাতীয় সেনা-বাহিনীর অবস্থানগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলবেন। সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূলোৎপাটন করবেন এবং বৃহৎ বৃক্ষ-সমূহের শাখা-প্রশাখাগুলি ছেদন করবেন। নিজের সুবিধার জন্য উন্মুক্ত পরিখাগুলি জল ও কণ্টকের দ্বারা অচিরাৎ পূর্ণ করে দেবেন।

।। ভয়াবহ সংগ্রামে সেনাপতির কর্তব্য ।।

ভয়াবহ সংগ্রামের সম্মুখীন হলে সেনাপতি কি রূপ ধারণ করবেন সে সম্বন্ধে মহাভারতে কথিত আছে। সেনা-পতি নিজ সৈন্যগণের সাহস উৎপাদন ও উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য বজ্রনির্ঘোষে বলবেন, “শত্রুপক্ষীয়রা পলায়নরত, ওদের শেষ নিকটস্থ।” তিনি আরো বলবেন, “হে, আমাদের মহাবলশালী বীরগণ! তোমরা নির্ভীক চিত্তে শত্রুকে আক্রমণ করো।” এই সকল বাক্যসহ ঢক্কা, বেণু, শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য-সহযোগে যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে সিংহনাদ সৃষ্টি করবেন।

।। বিপন্ন ও হস্তগত শত্রুর প্রতি ব্যবহার ।।

কোন ব্যক্তি সমরে সক্ষম না হলে তাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। বিপন্ন, ভীত বা বিজিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি অস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নয়। বিষমিশ্রিত শর নিক্ষেপ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য। দুর্বল, চ্যুত অস্ত্র বা হতবাহন শত্রুকে বধ করা অকর্তব্য। শরণাগত, অস্ত্রত্যাগী সৈনিককে কখনও বিজয়ী সেনানীর বিনাশ করা ধর্ম নয়। যে সকল সৈন্য দলচ্যুত বা ছিন্নভিন্ন

ভারত প্রতিরক্ষা

ভারত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বময় কর্তা হচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির এই দায়িত্ব কার্যকরী করবার ভার ভারত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর।

প্রতিরক্ষা সংগঠন

প্রতিরক্ষার সর্বব্যাপী দায়িত্ব ও শাসন তিন ভাগে বিভক্ত—(১) সৈন্য-বিভাগ, (২) নৌ-বিভাগ, (৩) বিমান-বিভাগ। সৈন্যবিভাগের অধিকর্তাকে বলা হয়—Chief of the Army Staff। নৌ-বিভাগের অধিকর্তার নাম— Chief of the Naval Staff। বিমান-বিভাগের অধিকর্তার নাম— Chief of the Air Staff।

সৈন্য-বিভাগ তিন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে বিভক্ত (three Command's)—পশ্চিম, পূর্ব এবং দক্ষিণ নিয়ন্ত্রণ (Command)। এই প্রত্যেক কমান্ড তিনজন বিভিন্ন General Officer Commanding-in-Chief-এর অধীনে। এই সব বিভাগীয় অধিকর্তারা লেফটানেন্ট জেনারেল স্তরের। এই সৈন্যবিভাগের প্রধান দপ্তর দিল্লীতে অবস্থিত।

নৌ-বিভাগের প্রধান দপ্তর দিল্লীতে অবস্থিত। এই বিভাগের কর্তা Chief of the Naval Staff। চারজন প্রধান কর্মচারী Principal Staff Officer's এঁকে সাহায্য করেন।

বিমান-বিভাগের Chief of the Air Staff-কে সাহায্য করেন চারজন প্রধান Staff Officer। এই চারজন বিমান-অধিকর্তা বিমান-বিভাগের চারিটি শাখা শাসন করেন।

সৈন্যদের শিক্ষণ ব্যবস্থা

সাধারণ সৈন্য (Army), নৌ-সৈন্য ও বিমান-সৈন্যদের শিক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল স্থাপন করেছেন। সংক্ষেপে তাদের নাম দেওয়া হোল।

১। জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ (National Defence College)। এই কলেজে তিন শ্রেণীর সৈন্যের officer-দের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

২। জাতীয় প্রতিরক্ষা আকাদমী (National Defence Academy) পুণার নিকট খাডাকভাসলায় অবস্থিত।

৩। Defence Service's Staff College—দক্ষিণ ভারতের ওয়েলিংটন নামক স্থানে অবস্থিত। প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার-দের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৪। Armed Forces Medical College—এই কলেজ পুণায় স্থাপিত। কমিশনপ্রাপ্ত চিকিৎসক-অফিসারদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫। রাষ্ট্রীয় ভারতীয় মিলিটারী কলেজ—দেরাদুনে এই কলেজ স্থাপিত। তিন শ্রেণীর ভবিষ্যৎ অফিসারদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এই কলেজে হয়।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান শিক্ষালয় ছাড়া আরও অনেকগুলি শিক্ষালয় আছে, যেমন,—ভারতীয় মিলিটারী একাডেমী, দেরাডুন, Armoured Corps Centre and School, Ahmednager, মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কিরকী, School of Signals, মাও, School of artillery, দেওলালী ইত্যাদি।

নৌ-শিক্ষা—এই শিক্ষার জন্য কোচিন, বোম্বাই ও বিশাখাপত্তমে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত জাহাজেও নানা প্রকার নৌ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেমন—INS Venduruthy, INS Garuda, INS Shivaji, INS Valsura ইত্যাদি।

বিমান-শিক্ষা—যোধপুরের Air Force Flying College-এ পাইলটদের শিক্ষা দেওয়া হয়; জেটবিমান চালনা শিক্ষা দেওয়া হয় হায়দ্রাবাদে। এছাড়াও অনেক স্কুল আছে।

হয়ে পড়েছে, বিপক্ষীয় বীরগণ কখনও তাদের অনুসরণ করবেন না। দ্রুতবেগে পলায়ন করছে, এরূপ সৈন্যকেও প্রকৃত যোদ্ধা কখনো হত্যা করবেন না।

।। উৎকৃষ্ট সৈনিকের লক্ষণ ।।

উৎকৃষ্ট সৈনিকের লক্ষণ সম্বন্ধেও মহাভারতের শান্তিপর্বে বিশদভাবে লিখিত আছে। সংক্ষিপ্তভাবে এস্থলে তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হ'ল।

মহাভারতে বলা হয়েছে, যাদের কণ্ঠস্বর ও গতি শার্দুলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তারা অনায়াসেই শত্রুসৈন্য নিধনে সক্ষম। যাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের সমতুল্য, তারা অনবহিত, মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হয়ে থাকে। যারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন ও অবলীলাক্রমে বহুদূরে গমন করতে সক্ষম, যাদের নাসাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল, কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশদাম অত্যন্ত বিরল, গাত্রচর্ম অতি সূক্ষ্ম ও মন অতি প্রশস্ত, হনুদেশ (চোয়াল) মাংসশূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, শরীর কৃশ ও শিরাব্যস্ত এবং যারা যুদ্ধকালে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাদের পরাজিত করা দুঃসাধ্য।

।। সৈন্য সমাবেশের স্থান ।।

যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ উচ্চস্থানীয় সেনাপতিগণ মুক্ত স্থান অপেক্ষা অরণ্যের নিকটস্থ নিভৃত স্থানকে সৈন্যসমাবেশের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেন। অতএব সেই স্থানে পদাতিকগণকে গোপনে রেখে, শত্রুগণের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আক্রমণ করা বিচক্ষণ সেনাপতির কর্তব্য। সংগ্রাম-নিপুণ বীরগণ বারি-কর্দম-বিবর্জিত লোষ্ট্র-বিহীন, প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদের; উদকবিহীন, কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদের; ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও মহাকক্ষসঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদের এবং পর্বত, উপবন ও বেণু-বেত্রসমাকুল বহু দুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিকদের সংগ্রামোপযোগী বলে বিবেচনা করবেন। সৈন্যগণের মধ্যে পদাতিক শ্রেণীর সংখ্যা অধিক হলেই তা সুদৃঢ় বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

।। সৈন্য সমাবেশের পদ্ধতি ।।

যুদ্ধকালে খড়্গ ও চর্মধারী পদাতিক সৈন্যগণকে অগ্রভাবে ও শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদভাগে রক্ষাপূর্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে স্থাপন করা কর্তব্য। উক্ত সময় যাঁরা অগ্রবর্তী থাকবেন, তাঁরা শত্রুনিধনের জন্য পদাতিকদের রক্ষা করবেন। বলবান তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎগমন করে তাদের রক্ষাকার্যে যত্নবান হবেন। ভীরুদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য যত্নসহকারে তাদের নিকট অবস্থান করা বীর সৈনিকদের অবশ্য কর্তব্য। সেনাপতি সমরকুশলী অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিস্তার করে যুদ্ধ করবেন।

যুদ্ধগমনকালে সৈন্যদের প্রতি উপদেশ

রাষ্ট্রপতি পর্যায়ক্রমে সমূহ সৈনিকদের আহ্বান করে বলবেন, "এখন আমাদের জয়ের আশায় বুক বেঁধে, সংগ্রামস্থলে গমন করে, পরস্পরকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করব না বলে শপথ গ্রহণ করতে হবে। অতএব আমাদের মধ্যে যারা ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাঁরা অন্যায় আচরণের দ্বারা আত্মপক্ষীয় প্রধান সৈনিকদের ক্ষতিসাধন করবেন, তাঁরা এই সময়েই ক্ষান্ত হোন। তাঁরা যেন সমরাঙ্গনে গমনপূর্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন না করেন। বীর যোদ্ধারা সকল সময়েই আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা ক'রে বিপক্ষগণকে বিনাশ করে থাকেন। রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হয়ে থাকে। আমাদের শত্রুপক্ষীয়রাই যেন আমাদের কর্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নদন্তোষ্ঠ হয়ে ভবলীলা সমাপ্ত করে। যারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্ধক মাত্র। তাদের কোন মঙ্গল হয় না; তারা অপাঙক্তেয় ঘৃণ্য জীব হিসাবে লোকসমাজে বসবাস করে।

বিপক্ষগণ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার শক্তিমত্তার উপর কলঙ্ক আরোপ করে তবে সে দুঃখ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক। একমাত্র জয়লাভই ধর্ম ও সুখের মূলস্বরূপ। ভীরু ব্যক্তি বিপক্ষ কর্তৃক ধৃত বা মৃত্যুগ্রস্ত হতে ভীত হয়, কিন্তু বীর যোদ্ধারা চিরদিন সুস্থচিত্তে বিপক্ষের আঘাত সহ্য ও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে থাকেন। অতএব আমরা সংগ্রামে গমনপূর্বক হয় জয়লাভ, না হয় শত্রুপক্ষের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মরজীবনের চরিতার্থতা প্রমাণ করব।

বর্তমান যুদ্ধে মহাভারতের প্রাচীন যুদ্ধনীতি যে সম্পূর্ণ অচল সকলেই তা স্বীকার করবেন। তবু সে যুগের যুদ্ধে যে সকল রীতি-নীতি ব্যবহৃত হ'ত, এই প্রবন্ধের মধ্যে পাঠক তারই কিছুটা আভাস পাবেন। মহাভারত থেকে সংগৃহীত এই অংশগুলির প্রাচীনত্ব বজায় রাখার জন্য ভাষাকে যথাসম্ভব প্রাচীনই রাখা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের রাজারা শরৎকালে
ুদ্ধযাত্রা করতেন। সাম্রাজ্যলিপ্সার
াড়না ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সেটা ছিল
াঁদের নিরুদ্দেশ্য রণাভিযান, এক ধরনের
রমৃগয়া। শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীর উপর
যথা বলপ্রয়োগের মধ্যে যে হিংস্র
্রাস আছে, তারই খানিকটা উদ্ধত
কাশ।

এ যুগে পররাজ্য আক্রমণ নিছক
ামরিক অভিযান বা শক্তিমত্তার বিলাস
য়। তার পেছনে একটা কোনো রাজ-
ীতিক উদ্দেশ্য থাকে। আক্রান্ত রাজ্যের
বল প্রতিরোধ বা অন্য কারো প্রকাশ্য
স্তক্ষেপ সে উদ্দেশ্যকে মাঝপথে
নচাল করে দিয়েছে, ইতিহাসে সে
ৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু সে
াতীয় বাধা যেখানে কার্যকরী নয়,
সখানেও যদি আক্রমণকারী স্বেচ্ছায়
স্ত্রসংবরণ করে বসে, মানুষের মনে এই
ারণা হওয়াই স্বাভাবিক, যে তার
দ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। চীনের সাম্প্রতিক
ারতাভিযান এবং তার আকস্মিক
বরতি সে বিষয়ে পৃথিবীর সাধারণ
ানুষকে শুধু নয়, চিন্তানায়কদেরও
ধাঁধাগ্রস্ত করে তুলেছে।

'বর্ডার ডিস্‌পিউট্‌' বা সীমান্ত-
বরোধের আবরণ থাকলেও আসলে যে
টা পরিকল্পিত পররাজ্য-আক্রমণ, সে
বষয়ে আর দ্বিমত নেই। সে আক্রমণ
যমন বিপুল, তেমনি ব্যাপক।
হমালয়ের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড
ুড়ে নানা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত লক্ষ
ক্ষ সৈন্য-সমাবেশ একদিনে সম্ভব
য়নি। তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের
স্তুতি। হঠাৎ একদিন তারা পঙ্গ-
ালের মত তড়িৎ-গতিতে ঝাঁপিয়ে
ড়ল অ-প্রস্তুত প্রতিবেশীর উপর।
অপরিমিত লোকক্ষয় অগ্রাহ্য করে কেড়ে
নল একটির পর একটি জনপদ।
দিনের মধ্যে নেফার একটা বৃহৎ অংশ
াবং লাদকের অনেকগুলো ঘাঁটি চলে
গল শত্রু-কবলে। তারপর ওদিকে
সুলের মত অপরিহার্য রক্তকেন্দ্র এবং

এদিকে আসামের সমৃদ্ধ খনিজ ও কৃষি-
অঞ্চল যখন অতিশয় বিপন্ন, অর্থাৎ
বলতে গেলে সহজলভ্য, তখন চীনা-
শিবিরের পিছন দিকে রণ-হুঙ্কারের
বদলে শোনা গেল দুটি অপ্রত্যাশিত
শান্তির বাণী (!)—'সীজ-ফায়ার'।
"তোমরা থাম আর না থাম, আমরা
নিজে থেকেই যুদ্ধ থামিয়ে দিলাম।
শুধু থামা নয়, ছাউনি গুটিয়ে সরে
যাচ্ছি, ১৯৫৯ সালের নবেম্বরে অর্থাৎ
তিন বছর আগে যেখানে ছিলাম, তারও
পেছনে।" সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত
বিভ্রান্ত। কোন কোন দেশ তো বাহবাই
দিয়ে ফেলল। কী উদারতা! কি আশ্চর্য
শান্তিপ্রীতি!

কিন্তু ভারতবর্ষ তো এ উদারতা
চায়নি। বরং বারংবার বলেছে, মরি আর
বাঁচি, আমরা লড়ব। একটা চীনা সৈন্য
যতক্ষণ আমাদের মাটি আঁকড়ে থাকবে,
ততক্ষণ আমরা ক্ষান্ত হব না। আরো
বলেছে, আমরা শান্তিকামী, কিন্তু
বেয়নেট উঁচিয়ে ধরে যে শান্তির
আহ্বান তাতে কখনো সাড়া দেবো না।
তবু কেন এই একতরফা 'সীজ-ফায়ার'?
তবে কি যে উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল
সেটা সফল হয়েছে? তাহলে এত সহজ-
লব্ধ কাম্য বস্তু ফেলে চলে যাবার প্রস্তাব
কেন? বিজিত দেশ স্বেচ্ছায় ছেড়ে যায়
কোন বিজেতা?

কিছুই বোঝা গেল না। এই রাতা-
রাতি যুদ্ধাবসান আমাদের কাছেও একটা
দুর্বোধ্য ধাঁধার মত এসে ঠেকল।

এই ধাঁধার উত্তর অনেকে অনেক
ভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন। কারো
কারো মতে এটা মোটেই ওদের স্বেচ্ছা-
প্রণোদিত সংকল্প নয়। পেছনে রয়েছে
রাশিয়ার প্রবল চাপ। মাও সে তুং যতই
দুর্ধর্ষ জঙ্গীবাদী হউন, তার টিকি
রয়েছে ক্রুশ্চেভের হাতে। শুধু ম্যান-
পাওয়ার বা জনশক্তি দিয়ে তো যুদ্ধ
হয় না, তার সঙ্গে চাই আধুনিক
হাতিয়ার ও উপকরণ। তার জন্যে
পিকিংকে প্রায় একান্তভাবে মস্কোর
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

কেউ কেউ বললেন, রুশ প্রভাব নয়,
এটা একটা ধূর্ত চাল, এশিয়া ও
আফ্রিকার জনমতকে দলে টানবার চেষ্টা।
কারো ধারণা, এটা নতুন প্রস্তুতির জন্যে
কালক্ষেপ। তার উত্তরে বলা হল, কিন্তু
এই কালক্ষেপ যে অপর পক্ষকেও
শক্তিশালী করে তুলবে, তা কি তারা
জানে না? তাছাড়া ওরা কি এতই কাঁচা
যে মাসখানেকের মধ্যেই নতুন প্রস্তুতির
প্রয়োজন দেখা দিল? বরং ঠিক উল্টো।
বহুদিনব্যাপী আয়োজন ছাড়া এত বড়
আক্রমণ শুরু হত না।

আর একটা মতবাদ শোনা গেল—
প্রস্তুতির অভাব নয়, হিসাব বা ক্যাল-
কুলেশনের অভাব। যে-ভারত ক্যাবর
নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করে এসেছে
যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও "সিয়াটো",
"ন্যাটো" বা ঐ জাতীয় কোনো সামরিক
জোটের আওতায় গিয়ে পড়েনি, তার
দরজায় এত দ্রুত এবং এমন বিপুলভাবে
পশ্চিমী সমর-সম্ভার এসে যাবে, চৈনিক
মস্তিষ্ক সেটা ভাবতে পারেনি। তার
সঙ্গে আরো ভুল করেছে ওরা। এখানে
ওদের শিষ্য-সাকরেদ যারা আছে, কথায়
কথায় যারা কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা লাল
ঝাণ্ডা উঁচিয়ে 'আমাদের দাবি মানতে
হবে' বলে রাস্তায়-ঘাটে, কলেজে-স্কুলে,
কল-কারখানায় এমন কি সরকারী
অফিসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে,
তারা যে হঠাৎ রাতারাতি ভোল বদলে
'দেশভক্ত' হয়ে পড়বে, অর্থাৎ প্রভুদের
সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসবে, সে
ধারণাও তারা করতে পারেনি। 'শিষ্য'রা
যদি গুরু-শিবিরে কোনো ইঙ্গিত
পাঠিয়ে থাকে, সেটাও ভুল-হিসাবের
ফল। এ দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের
মধ্যে কলহ দলাদলি যতই করুক, ভিতরে
ভিতরে ন্যাশনালিস্ট। স্বদেশ-প্রীতি বা
দেশহিতৈষণা ভারতবর্ষের মজ্জাগত
মনোবৃত্তি। অন্য সময়ে যাই হোক,
বাইরের আঘাত যখন আসে, তখন আর
সেটা চাপা থাকে না, বিপুল বেগে
বেরিয়ে আসে। এদেশের লাল-পন্থীরা
এটাও বুঝতে পারেনি।

ধাঁধার আর একটা জবাব লক্ষ্য করা
গেল। চীন আশা করেছিল, তাদের
নবলব্ধ সুহৃৎ পাকিস্তান ভারত-দমন
পর্বে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, অর্থাৎ
একই সঙ্গে কাশ্মীর ও আসাম-সীমান্তে
আক্রমণ শুরু করবে। হয়তো করত,
তোড়জোড়ও চলছিল, কিন্তু কেনেডি-
ম্যাকমিলনের ধমক খেয়ে হাত গুটিয়ে
নিয়েছে।

এই জাতীয় বহু উত্তর এসেছে এবং
এখনো আসছে। তার সঙ্গে আর একটা
সম্ভাব্য সমাধান যোগ করতে দোষ কি?

শুধু রহস্য-উদ্‌ঘাটন নয়, এর মধ্যে হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতও মিলতে পারে।

লাল চীনের এই প্রস্তাবিত বিরতি ও অপসারণের মধ্যে খানিকটা মুখরক্ষার চেষ্টা রয়েছে বলে মনে হয়। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

চীনাসৈন্য যে অতিশয় দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ, এই রকম একটা ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে। এবারকার যুদ্ধের গতিই সম্ভবতঃ সে মনোভাবের কারণ। আমরা ক্রমাগত শুনে আসছি, সে কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত, অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু, নৃশংস, বেপরোয়া, ধূর্ত, মৃত্যু-ভয়হীন ইত্যাদি। কিন্তু তারও যে একটা দুর্বল দিক আছে, সে তথ্যটা তেমন প্রচার হয়নি। একথা অবশ্য মানতে হবে যে, ১৯২৭ সালে যখন প্রথম গঠিত হল, চীনসেনা এখন আর সে 'জনতা'র স্তরে নেই। তারপর দীর্ঘদিন তারা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আরো পরে কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। তার চেয়েও অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে কোরিয়া যুদ্ধে। সেখানে যাদের সঙ্গে মুখোমুখী লড়তে হয়েছিল, তারা রীতিমত আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত এবং উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত। এ সবই সত্য। তবু একটা কথা রয়ে গেল। এ সব যুদ্ধ হয়েছিল তার নিজের ঘরের মধ্যে কিংবা তার কাছাকাছি ভূখণ্ডে। বিদেশ-বিভুঁয়ে সেই একই সাফল্য বা কৃতিত্বের পরিচয় দেবে, সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।

আজকের দিনের ব্যাপক যুদ্ধ যে-ব্যবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তার নাম 'সাপ্লাই'—খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্রাদি সমরোপকরণ, ঔষধ পথ্য ইত্যাদি বহু জিনিসের সুষ্ঠু ও নিয়মিত সরবরাহ। চীনাদের এই যোগান-ব্যাপারটা অতি-মাত্রায় সরল এবং অনেকটা অনাধুনিক। সৈন্যদের পোষাক-আষাক অতি দীন। যখন বরফ-বৃষ্টি হচ্ছে, তখনো পশমের বদলে তুলার প্যাডের ব্যবস্থা। তাও একবার চড়ালে, জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বার হুকুম নেই। খাদ্য বলতে ব্যাণ্ডোলিয়রের মত কাঁধে-ঝোলানো এক থলে ভাত। তার সঙ্গে আর কোনো উপকরণ নেই, এবং ফুরিয়ে গেলে নতুন যোগান অনিশ্চিত। অনেক সময় 'মার্চে'র মুখে যা কিছু পাও, ধরো মারো খাও—এছাড়া অন্য উপায় থাকে না। হাসপাতালের বালাই নেই বললেই চলে। যা আছে, আহত সৈন্যরা তার কবলে পড়ার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করে। সকলের হাতে দেবার মত হাতিয়ার নেই। একদল নিরস্ত্র মানুষকেই অস্ত্রের মত ব্যবহার করা হয়। খানিকটা গোলাগুলি চলবার পর যখন বিরাম আসে, সভ্য দেশের সৈন্যরা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে ছোটে আহত বন্ধুদের কুড়িয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার জন্য। ওদের পাঠানো হয় মৃত এবং অশক্ত 'কমরেড'দের হাত থেকে হাতিয়ার কুড়াতে। ওখানে মানুষের জীবনের চেয়ে রাইফেলের মূল্য অনেক বেশী।

অন্য কোনো দেশ হলে এ হেন অবস্থায় সৈন্যবাহিনীতে বিরূপ মনোভাব দেখা দিত, হয়তো তারা বিদ্রোহ করে বসত। ওখানে তার সম্ভাবনা নেই। বিদ্রোহ যে করবে, সেই মন নামক বস্তুটিকে কমিউনে ফেলে অনেক আগেই গলা টিপে মারা হয়ে গেছে। তাছাড়া ওরা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে তো নিত্য-দুর্ভিক্ষের পালা। সেই বুভুক্ষার মুখে ফিরে যেতে কার ইচ্ছা হয়? আর্মিতে তবু দুটো অন্নের মুখ দেখা যায়।

জাপান-যুদ্ধে কিংবা চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে উন্নত ধরনের সাপ্লাই ব্যবস্থা বা সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ততটা বোঝা যায় নি। সে যুদ্ধ চলেছিল দেশের মধ্যে। দেশের লোকেরাই নানাভাবে সাহায্য করেছে। কোরিয়ায় অবশ্য সে সুবিধা ছিল না। কিন্তু সেখানে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বাছাই-করা সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, এবং উপকরণের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। সেটুকু সংগ্রহ করা কঠিন হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার মাইল-ব্যাপী হিমালয়-অভিযানে সংখ্যাকে নির্দিষ্ট রাখা যায়নি। সমর-নায়কদের সে উদ্দেশ্যও বোধহয় ছিল না। লোকক্ষয়কে তারা গুণতির মধ্যে আনেনি বরং সংখ্যার চাপটাকেই কাজে লাগিয়েছে। বরফ-ঢাকা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা পার হয়ে, পথে, বিপথে, বিনা পথে তারা লাল পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। মরেছেও পিঁপড়ার মত। তবু একদল শেষ হতেই এগিয়ে এসেছে আরেক দল। কত, কে তার হিসাব রাখে!

সংখ্যা যতই বিশাল হোক, তার ক্ষেত্র ও কার্যকারিতার সীমা আছে। আধুনিক যুদ্ধে সংখ্যাটাই প্রধান শক্তি নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল, সেই সংখ্যার সুষম গঠন, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যালেন্সড্ ফরমেশন। শুধু সৈন্য দিয়ে সেনা-বাহিনী তৈরী হয় না। আজকের দিনে আর্মি বলতে বোঝায় বহু ধরনের, বিভিন্ন বৃত্তির ও নানা স্তরের লোক। তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। একটির অনুপাতে আর একটি যদি বেড়ে বা কমে যায়, গোটা বাহিনীর কর্মক্ষমতা ব্যাহত হতে বাধ্য। কুশলী কর্মীর সংখ্যা যতই হোক, অকুশলী শ্রমিকের সাহায্য ছাড়া তারা অচল। তার উল্টোটাও ঠিক তেমনি সত্য।

চীন এর আগে যে-সব যুদ্ধ করেছে, যাকে বলে ব্যাপক যুদ্ধ অর্থাৎ ম্যাসিভ ওয়ার-ফেয়ার, সেখানে তার সেনাবাহিনীর গঠন-কৌশল, বহুদূরব্যাপী যোগা-যোগ ব্যবস্থা, সাপ্লাই-সৌকর্য ইত্যাদি দিকগুলো বড়রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। এবারেও যুদ্ধটা যতদিন হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন সংখ্যার জোরই ওদের সাহায্য করেছে। একটা সুবিশাল পদাতিক বাহিনীর পক্ষে ঐ পথঘাটহীন জঙ্গল-পাহাড়-উপত্যকার যেখানে সেখানে অনু-প্রবেশ সহজেই সম্ভব হয়েছিল। তিব্বত জয়ের পর এ বিষয়ে ওরা আরো দক্ষ হয়ে উঠেছে, ওখানকার কঠোর আবহাওয়াও ধাতস্থ হয়ে গেছে। আমাদের সৈন্যরা স্থানীয় অভিজ্ঞতার অভাবে এবং পার্বত্য জলবায়ুতে অভ্যস্ত নয় বলে বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিল। তার ফলে শত্রুসেনা প্রায় অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসতে পেরেছিল।

কিন্তু পার্বত্য ভূভাগ ছেড়ে অপেক্ষা-কৃত সমতল ভূমিতে পৌঁছে চীনারা প্রথম বুঝতে পারল যে সংখ্যার প্রাধান্য আর তেমন কার্যকরী হবে না। এখানে 'মানুষ'-এর চেয়ে যন্ত্রের এলাকা বড়। খচ্চর বা ছাগ-বিচরণের পথ ধরে এক-রকম বিনা বাধায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসা গিয়েছিল। এখানে এই খোলা মাঠে সে গতি পদে পদে প্রতিহত হবে। পাহাড়ের কৌশল সমতল ভূমিতে চলে না। এখানে সামনে দাঁড়িয়ে সারি সারি ভারী এঞ্জিন এবং নানা ধরনের আধুনিক অস্ত্র-সজ্জা। তার চেয়েও বড় কথা, নিজেদের

জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রভাব

ক্ষেত্রনাথ রায়

জীব জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আদিম যুগে বন্য জীবজন্তু এবং মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মানুষ হাজার হাজার বছরের সাধনায় অপরিমেয় দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে এমন কি মৃত্যু বরণ করে তবে এই শ্রেষ্ঠত্বের পদলাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই মানব সভ্যতার ইতিহাস একদিক থেকে সংগ্রামের ইতিহাস এবং মানুষের সেই সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আজও ক্ষান্ত হয়নি। মানুষের আর এক রণাঙ্গণ—রোগ, জরা এবং মৃত্যুর বিপক্ষে। এই দুই রণাঙ্গনের সংগ্রাম মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণার্থে। তাই এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। পৃথিবীতে মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। আর এক যুদ্ধের কথা আমরা জানি। সে যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী—মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে শুধু সংগ্রামে জাগ্রত করেনি। মানুষের স্বভাব-চরিত্রে পরদ্রব্যলোলুপতা, জিঘাংসা, শঠতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলির কারণও প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষের এই হীন মনোবৃত্তিগুলির চরম অভিব্যক্তিই হ'ল পররাজ্য আক্রমণ অর্থাৎ যুদ্ধ। পৃথিবীতে বারম্বার যুদ্ধ এসেছে। পৃথিবীর বহু শান্তিপ্রিয় জাতিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রাণ-পণ করেও শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়েছে। যুদ্ধের বীভৎসতা এবং ক্ষয়-ক্ষতি সাময়িকভাবে মানুষকে শান্ত করেছে মাত্র। মানুষের জীবনে সব থেকে বড় অশান্তি ও অভিশাপ এবং মানব সভ্যতার পক্ষে সব থেকে বড় কলঙ্ক এই যুদ্ধ। তাই কি উপায়ে পররাজ্য আক্রমণ থেকে মানব সমাজকে নিবৃত্ত করা যায় এবং কি উপায়ে পৃথিবীতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তার চিন্তায় পৃথিবীর শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেই সদা উদগ্রীব। কিন্তু যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া যায় তাহলে শান্তি-প্রিয় নাগরিক এবং সমগ্র জাতিরও উচিত হবে পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। সে যুদ্ধ তখন স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, দুই রাষ্ট্রের আদর্শ-গত [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে পরম মিত্র হিসাবে একই শক্তিতে জোট বাঁধে, আবার দুই মিত্র রাষ্ট্রের একজন অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে অপর দেশকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। সুতরাং সাবধানের মার নেই। স্বাধীনতার স্বার্থে দেশকে অস্ত্রবলে বলীয়ান রাখাই সুবুদ্ধির কাজ। ইতিহাস বলে, দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নয়—দেশের জনগণই শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। এবং জনগণ নৈতিক এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই উন্নত হোক না কেন [illegible] যদি দৈহিক [illegible] না থাকে তাহলে জাতির [illegible] সুতরাং [illegible] মানসিক [illegible] খেলাধুলার [illegible] প্রয়োজন।

ছাই তুমি ধন্য!

এই সেই ঐতিহাসিক ভস্মাধার—যার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্যবহৃত উইকেটের চিতাভস্ম। এই চিতাভস্ম উপলক্ষ করেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার জাতীয় সম্মানের লড়াই এবং যে লড়াই দুই দেশের [illegible] জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে [illegible] জাগ্রত করে রেখেছে।

জাতীয় জীবনে খেলাধুলোর প্রভাব বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী। জনসাধারণের দৈহিক এবং মানসিক পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে খেলাধুলোর যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার বহু স্বীকৃতি আছে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান গ্রীক জাতির জাতীয় জীবনে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে গ্রীস জাতিকে বিশ্বের দরবারে সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা—জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং শৌর্যে-বীর্যে যে মর্যাদা দিয়েছিল, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে তার তুলনা নেই এবং আধুনিক সভ্য জগতের মানুষের কাছেও প্রাচীন গ্রীসের সেই সর্বাঙ্গীন সাফল্যের ইতিহাস পরম বিস্ময়ের বস্তু। মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান একটি গৌরবোজ্জ্বল জীবন্ত অধ্যায়। প্রাচীন গ্রীক জাতি তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বিশুদ্ধতার বহু জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ইতিহাসে। এ সম্পর্কে মাত্র একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে—অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হ'ত মাত্র অলিভ পল্লব-রচিত মাল্য দিয়ে।

আজ পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি জাতীয় জীবনে খেলাধুলোকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। খেলাধুলো আজ জাতীয় শিক্ষা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের ধারক ও বাহক।

খেলাধুলো দেহ ও মনকে সতেজ করে; মনে আনন্দ সঞ্চার করে এবং আশাআকাঙ্ক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয় নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য যেসব সদ্‌গুণের একান্ত প্রয়োজন তার অনুশীলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ রচনা করে এই খেলাধুলো। খেলাধুলোর আবেদন যেমন সহজগ্রাহ্য তেমনি স্থায়ী এবং আকর্ষণীয়। খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই জাতীয়তাবোধ, দায়িত্ববোধ, নীতি-বোধ, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্বাস, সহ-যোগিতার মনোভাব, একতা, নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব, আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, নিয়মানু-বর্তিতা প্রভৃতি নৈতিক চরিত্রের বিশেষ সদ্‌গুণগুলি মানব চরিত্রে অতি সহজ-ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সব কারণে বহু দেশের জাতীয় [illegible] খেলাধুলো [illegible] না। জাতীয় প্রতিরক্ষা [illegible] জাতির [illegible] রাখতে [illegible] জনসাধারণকে [illegible]—[illegible]—[illegible] পবিত্র [illegible] এক [illegible]

[illegible] এবং [illegible]

ক্ষেত্রে খেলাধূলোর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। খেলাধূলোর পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্ম-বোধ কিভাবে জাগ্রত হয় তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ঘটনাটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের। ইংল্যাণ্ডের ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া টসে জয়ী হয়ে প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৬৩ রান করে। ইংল্যাণ্ডেরও প্রথম ইনিংসের খেলা খুব সুবিধার হ'ল না, ১০১ রান। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১২২ রানে শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে মাত্র ৮৫ রানের প্রয়োজন হয়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ৫০ রান উঠেছে, দুটো উইকেট পড়ে। সুতরাং আর জয়-লাভের জন্যে ৩৫ রান দরকার, হাতে জমা আছে তাজা ৮টা উইকেট। ভয়ের কোন কারণ নেই দেখে ইংল্যাণ্ডের সুনিশ্চিত জয়লাভের কথা ভাবতে ভাবতে খোশ-মেজাজে মাঠের অনেক দর্শকই বাড়ী ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের খেলায় ভাঙ্গণ ধরলো। দলের ৫৩ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট পড়ে গেল। তখন জয়-লাভের জন্যে ৩২ রান প্রয়োজন, আর ৬টা উইকেট পড়তে বাকি ছিল। ইংল্যাণ্ডের ৬৬ রানের মাথায় যখন পঞ্চম উইকেট পড়লো তখনও ইংরেজ দর্শকদের মনে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পরাজয়ের কোন আশঙ্কাই জাগেনি। হাতে ৫টা উইকেট জমা, জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১৯ রানের প্রয়োজন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বাকি পাঁচজন খেলোয়াড় এই ১৯ রান আর তুলতে পারেননি, মাত্র ১১ রান তুলেছিলেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ার মোট রানের থেকে ইংল্যাণ্ড ৭ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে যায়—অস্ট্রেলিয়াই ৭ রানে জয়লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব দু'জন খেলোয়াড়ের—এফ আর স্পোফোর্থ এবং এইচ এইচ মাসাই। মাসাই দ্বিতীয় ইনিংসে উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন এবং স্পোফোর্থ ৯০ রানে ১৪টা উইকেট (৪৬ রানে ৭ এবং ৪৪ রানে ৭) পান। প্রকৃতপক্ষে এই টেস্ট খেলায় মাসাই এবং স্পোফোর্থ না খেললে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ঐতিহাসিক 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ' কথাটির জন্মই হ'ত না। এই খেলায় ইংল্যাণ্ডের পরাজয় ঘটবে একথা ইংল্যাণ্ডের শত্রুরও মনে উদয় হয়নি। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ সহজভাবে স্বদেশের এই পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সারা দেশ শোক-দিবস পালন করে—এ যেন রাষ্ট্রীয় শোক-দিবস পালনের আহ্বান। জাতীয় ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডেরএই পরাজয় যে কত বেদনাদায়ক এবং শোকাবহ ঘটনা, তা খেলার পরের দিনে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'স্পোর্টিং টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং সংবাদ-পরিবেশনের ধরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। সংবাদটির চারপাশে ছিল শোক-ব্যঞ্জক কালো বর্ডার। পাঠকদের কাছে সেই ঐতিহাসিক সংবাদটি এখানে তুলে দিলাম ঃ

"In affectionate remembrance
of
English cricket
which died at the Oval
on
29th August, 1882.
Deeply lamented by a large circle of sorrowing friends and acquaintances.
R. I. P.
N.B. The body will be cremated and the Ashes taken to Australia".

এই সংবাদটির মধ্যে সারা ইংল্যাণ্ডের শোকার্ত পরিবারের মনের অবস্থা ধরা পড়ে।

পরবর্তী শীতকালের (১৮৮২-৮৩) ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চারটে টেস্ট খেলা হল। প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ২৭ রানে এবং তৃতীয় টেস্টে ৬৯ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ২—১ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পিছনে ফেলে রাখে। বাকি শুধু মেলবোর্নের চতুর্থ টেস্ট খেলা। এই চতুর্থ টেস্ট খেলা ড্র গেলেও অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের হাতে 'রাবার' এসে যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ৪ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেল। ফলে খেলার ফলাফল দাঁড়াল সমান-সমান, উভয় পক্ষেরই জয় দুটো ক'রে খেলায়। কিন্তু ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠের খেলাতে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' লাভ করায় তাদের হাতেই সে সম্মান থেকে গেল। ইংল্যাণ্ড শূন্য হাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরলো না। একদল অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতায় উৎসাহিত হয়ে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক আইভো ব্লিগ-কে একটি ভস্মাধার উপহার দেন। এই মৃৎপাত্রে ছিল তৃতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত ষ্টাম্পের ভস্মাবশেষ। ক্রিকেট খেলার পীঠস্থান ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠের যাদুঘরে এই ভস্মাধারটি দেশ-বিদেশের অগণিত চক্ষুর অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করে।

এই চিতাভস্ম উপলক্ষ্য ক'রেই ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে দুই দেশের জাতীয় সম্মানের লড়াই—এই লড়াইয়ের নাম 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'।

এ যুদ্ধ নিছক খেলায় প্রাধান্য নিয়ে নয়। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়-দের মধ্যে কে কতখানি জনমনে দেশাত্মবোধ এবং হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিতে পারে তাই নিয়ে যুদ্ধ। খেলাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

॥ দুর্বোধ্য অভিলাষ ॥

প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েও বহু লোকক্ষয় করে যে এলাকাটুকু দখল করতে চীনের এক মাস সময় লেগেছিল, সদিচ্ছা থাকলে সে এলাকা ত্যাগ করতে তার এক সপ্তাহও লাগত না। কিন্তু ১লা ডিসেম্বরের পর তিন সপ্তাহ অতিক্রম করে গেলেও চীনা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি। বমডিলা চীনারা ত্যাগ করেছে, কিন্তু তার মাত্র পাঁচ মাইল দূরে তাদের সৈন্য অপেক্ষা করছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ওয়ালঙ তারা এখনও ত্যাগ করেনি এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে লদাকের অধিকৃত এলাকাগুলি ত্যাগ করে তারা এক ইঞ্চিও পেছিয়ে যায়নি। দিনের পর দিন এইভাবে অতিক্রান্ত হওয়া খুবই অস্বস্তিকর, কিন্তু কিভাবে এর প্রতিকার করা হবে বা চীনাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে সমস্যা সমাধানের আশা কবে পরিত্যক্ত হবে সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

কলম্বো প্রস্তাব ভারত ও চীন উভয় দেশের সরকারের কাছেই পৌঁচেছে এবং এ প্রসঙ্গ লেখা পর্যন্ত জানা গেছে যে সে প্রস্তাব উভয় সরকারেরই বিবেচনাধীন। কলম্বো প্রস্তাব যদি সসম্মানে সমস্যা সমাধানের পক্ষে ভারতের সহায়ক হয় তবে সেটা খুবই আনন্দের কথা হবে, কিন্তু যদি তা না হয় তবে বলপ্রয়োগের দ্বারাই চীনা হানাদারদের উৎখাতের কথা চিন্তা করতে হবে। এই কারণেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বোধহয় বারবার করে বলেছেন যে, দেশবাসীকে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বমডিলায় চীনাদের যে নির্লজ্জ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে ঐ লুটেরাদের কাছে সম্মানজনক কোন কিছুই আশা করা যায় না। যেখানে যা ছিল ঐ লুণ্ঠনকারীর দল তা লুঠ করে নিয়ে গেছে। পাওয়ার হাউসের ডায়নেমো থেকে শুরু করে শেষ কণা খাদ্যশস্য পর্যন্ত তাদের নজর এড়ায়নি। আন্তর্জাতিক সম্মানের চিন্তা যে আজ তাদের কাছে কত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র লোভে তাদের দৃষ্টি কতখানি আচ্ছন্ন তা এই

সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কোন মন্ত্রীর

লুঠতরাজ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নিছক শুভবুদ্ধির তাড়নায় চীন কোন ভাল কাজ করবে এ আশার মত দুরাশা আর কিছুই নেই।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষায় দান ॥

ভারতবাসীর স্বেচ্ছাদানে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সংগৃহীত অর্থ কুড়ি কোটির লক্ষ্য অতিক্রম করে গেছে। সর্বশেষ হিসাবে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মোট জমা পড়েছে ২০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও প্রায় ৬৭,২৯৮ তোলা সোনা। আমরা ইতিপূর্বে এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছিলাম যে, চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ভারতবাসীর সক্রিয় সমর্থনের সাক্ষ্যস্বরূপ ৪৪ কোটি নরনারী অধ্যুষিত ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অন্তত ৪৪ কোটি টাকা উঠুক। আমাদের সে আশা হয়ত অচিরেই পূর্ণ হবে।

॥ নেপালে নতুন সংবিধান ॥

রাজা মহেন্দ্র পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নেপালে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রস্তাবিত সংবিধানের সমর্থনে উক্ত রাজ-ঘোষণায় বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নেপাল উপলব্ধি করেছে যে পূর্ব-প্রবর্তিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য-বিরোধী। নেপালের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ও প্রাথমিক শিক্ষার অভাবও সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ নয়। এই কারণেই পঞ্চায়েৎ ভিত্তিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে গোড়া থেকে জনগণের রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে।

নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থাতেও রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে। তবে জনগণ নির্বাচিত জাতীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় তিনি রাজ্য শাসন করবেন। জাতীয় পঞ্চায়েৎ হবে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা। তার ৯০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসবেন আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎসমূহ হতে; ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন বিভিন্ন শ্রেণী-সংগঠন হতে; ৪ জন সদস্য নির্বাচন করবেন স্নাতকরা। রাজা মনোনীত করবেন মোট সদস্যসংখ্যার সর্বাধিক ১৫ শতাংশ সদস্য। এক-কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পঞ্চায়েতের সদস্যগণের মধ্য হতেই রাজা মন্ত্রীদের মনোনীত করবেন এবং সেই মন্ত্রীরা তাঁদের সকল কাজের জন্য রাজা ছাড়াও জাতীয় পঞ্চায়েতের কাছে দায়ী থাকবেন। জাতীয় পঞ্চায়েতের উপস্থিত বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলে সেই মন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হবেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠে মনে হয়, মন্ত্রিসভার কোন যৌথ দায়িত্ব থাকবে না। রাজা মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন কোন মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় থাকবেন না। চেয়ারম্যানকে সকল কাজে সাহায্যের জন্য আইন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও পঞ্চায়েৎ দপ্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কার্যনিয়ামক কমিটি অর্থাৎ 'ক্যাবিনেট' গঠন করা হবে। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন আর সেই সদস্যরাই নির্বাচিত করবেন জাতীয় পঞ্চায়েতের সদস্যদের।

সংসদীয় গণতন্ত্র যে দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে কত দ্রুত ও সফলভাবে জাগরিত করে তা আমরা আমাদের দেশের তিনটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি। একারণে রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত দেশবাসী গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় অসমর্থ এ যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। পরন্তু আমরা মনে করি যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমেই শুধু দেশবাসীর রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করা সম্ভব। গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় জনগণের দোষে নয়, জনগণকে পরিচালনার যাঁরা দায়িত্ব নেন তাঁদের দোষে। সৎ বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ছাড়া গণতন্ত্র কেন কোন তন্ত্রই সফল হতে পারে না। তবে একথাও সত্য যে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু কিছু সংস্কারের কথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। সেদিক থেকে পঞ্চায়েতী নামে নেপালের নতুন গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। আমরা নেপালের এই নতুন গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এই আশা প্রকাশ করছি যে, নেপালের যেসব গণনেতা এখনও কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত অবস্থায় দিনযাপন করছেন তাঁরাও সকলে এবার মুক্ত ও স্বাধীনভাবে দেশগঠনের কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

॥ চীনের সর্বনাশা নীতি ॥

ভারত আক্রমণ করে চীন ভারতের যে ক্ষতি করেছে তার চেয়ে সুহৃদগণ

বেশী ক্ষতি করেছে নিজের। তার এই আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুধু যে গণতান্ত্রিক বিশ্বেই ধিক্কৃত হয়েছে তাই নয় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও একে একে তার জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতেও চীনের নীতি পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। চীনের নেতৃবৃন্দ শুধু যে ঐ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিরই নিন্দা করেছেন তাই নয়, তাদের নেতৃস্থানীয় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকেও এখন তাঁরা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করছেন। শিল্পে অনগ্রসর ও তৈলসম্পদে দীন কমিউনিষ্ট চীনকে আজ তার প্রতি মুহূর্তের কাজের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবুও জঙ্গী চিন্তাধারা তার শুভবুদ্ধিকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, সেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে নামতেও আজ আর তার কোন দ্বিধা নেই। ক্রুশ্চেভের নীতির নিন্দা করে চীনের কমিউনিষ্ট নেতারা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে শান্তি অর্জন করা যায় না, একমাত্র যুদ্ধ দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের সাধ মেটানো সম্ভব। পারমাণবিক যুদ্ধ পরিহারের উদ্দেশ্যে ক্রুশ্চেভ যেভাবে কিউবা ত্যাগ করে এসেছেন সেটা চীনের জঙ্গী নেতাদের একেবারেই মনঃপূত নয়। পূর্ব ইউরোপের সবকটি কমিউনিষ্ট দেশ ও বিশ্বের সকল মানুষ ক্রুশ্চেভের কিউবা নীতির প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানালেও চীনের নেতারা বলেছেন, কাগজের বাঘ দেখে ক্রুশ্চেভ পেছিয়ে এসেছেন। সে কথার যোগ্য উত্তর দিয়ে ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে বলেছেন, বাঘ কাগজের হলেও তার দাঁতগুলি পারমাণবিক অস্ত্রের। সুতরাং সে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে, যার অর্থ হ'ল বিশ্বের সমূহ ধ্বংস।

চীন জানে যে তার একার শক্তিতে সে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারে না। তাই ছলেবলে অথবা কৌশলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে যুদ্ধে জড়িত করাই তার এখন প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য যে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তা সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট ও ইউরোপের সবকটি কমিউনিষ্ট দেশ (অবশ্য আলবানিয়া বাদে) ও কমিউনিষ্ট দল কর্তৃক ক্রুশ্চেভের নীতি সমর্থিত হওয়ার পর স্পষ্ট হয়ে গেছে। চীন আজ যে পথ ধরে এগিয়ে চলেছে সে পথ যদি সে ত্যাগ না করে ও তার বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীসুলভ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ না করে তবে সে অবিলম্বেই দেখতে

পাবে যে তার পথে সঙ্গী কেউ নেই। কমিউনিষ্ট ও গণতন্ত্রী বিশ্বের সকল দেশ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে তার দুষ্ট সংসর্গ।

॥ ফিজি ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বৃটিশ উপনিবেশ ফিজি দ্বীপপুঞ্জ বৃটেনকে এক অস্বাভাবিক সমস্যার সম্মুখীন করেছে। বৃটেনের স্বাধীনতা প্রস্তাবের জবাবে ফিজির আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য জানিয়েছেন যে, ফিজির আদিম অধিবাসীদের সম্মতি ছাড়া বৃটেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করতে পারবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা তাদের কাম্য নয়।

ফিজির বর্তমান অধিবাসীদের পরিচয় ও সেখানকার বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেই অবশ্য এই অস্বাভাবিক দাবীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। ঐ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ। ১৯৬০ সালের হিসাবমতে তার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা ১,৯৮,০০০, আর ঐ দ্বীপের যারা আদিম অধিবাসী সেই ফিজিয়ানদের সংখ্যা ১,৬৭,০০০; অর্থাৎ, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তুলনায় ফিজির আদিম অধিবাসীরা এখন সংখ্যালঘু। এ ছাড়াও সে রাজ্যে আছে দশ হাজার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী। আজ ঐ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভুত্বের আশঙ্কাই ফিজির আদিম অধিবাসী ও শ্বেতাঙ্গদের ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের পক্ষ হতেই ফিজির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাবী জানানো হয়েছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েও ভারতীয়দের তুলনায় সংখ্যালঘু, কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে ফিজির আইন পরিষদে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ ফিজি আইন পরিষদের ৪৫টি আসন ভারতীয়, শ্বেতাঙ্গ ও ফিজিয়ানদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয়রা সংখ্যায় প্রায় দুই লক্ষ হয়েও তাদের আইন পরিষদে প্রতিনিধি ১৫ জন, আর শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যায় মাত্র দশ হাজার হয়েও তাদের আইম পরিষদে প্রতিনিধি আছেন ১৫ জন। আজ ভারতীয় ১৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ ও ফিজিয়ান সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা-বিরোধী দাবী উত্থাপন করেছে। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আইন পরিষদের কয়েকজন মাত্র সদস্যের মতামত অবশ্যই ৭,০৮৩ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট ঐ দ্বীপপুঞ্জটির চার লক্ষ অধিবাসীর মনোভাবের প্রতিফলন নয়।

॥ ঘরে ॥

১৩ই ডিসেম্বর—২৭শে অগ্রহায়ণ ঃ 'আপৎকালীন অবস্থা দীর্ঘকাল চলিলেও দেশে খাদ্য-ঘাটতির আশংকা নাই—সরকারী গুদামে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত আছে'—কলিকাতায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের ঘোষণা।

কেন্দ্র কর্তৃক দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎরাজ কর্মসূচীর ব্যাপক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত —সমগ্র দেশে গ্রামস্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা।

১৪ই ডিসেম্বর—২৮শে অগ্রহায়ণ ঃ কলিকাতার রাজপথে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বিরাট মৌন মিছিল—চীনের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজের প্রবল ধিক্কার—দিল্লীস্থ চীনা দূতাবাসে স্মারকলিপি প্রেরণ।

নেফায় কয়েকটি স্থান হইতে চীনাদের পশ্চাদাসরণের সংবাদ—বমডি-লা, ওয়ালং ও মিচুকা শত্রু-কবলমুক্ত।

ডিব্রুগড়ের (আসাম) নিকট দিয়া চীনা জেট বিমানের আকাশ অতিক্রম (১০ই ডিসেম্বরের ঘটনা)—চীনা সরকারের নিকট ভারতের প্রতিবাদ।

'পিকিং রিভিউ'র আরও দুইটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত—মানচিত্রে কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ ও সমগ্র নেফা চীনের বলিয়া প্রদর্শনের চেষ্টা।

১৫ই ডিসেম্বর—২৯শে অগ্রহায়ণ ঃ বমডি-লায় আবার ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন—চীনা গ্রাস হইতে মুক্তির পর নেফা প্রশাসনের প্রথম পুরোবর্তী দলের বমডি-লা উপস্থিতি।

কলিকাতায় চীনা মালিকদের জুতা তৈয়ারীর ও চামড়া পাকাই-এর কারখানা হঠাৎ বন্ধ।

১৬ই ডিসেম্বর—৩০শে অগ্রহায়ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক বিমানে লডাকের অগ্রবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন।

কলম্বো সম্মেলনের (জোট-বহির্ভূত ছয় জাতির) বার্তা লইয়া সিংহলী বিশেষ দূতের (মিঃ জি এস পিরিস) দিল্লী আগমন।

তিব্বত ও ভারতের মধ্যে পুরাতন সীমারেখা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী—'হিমালয় বাঁচাও' সম্মেলনের (দিল্লী) প্রস্তাব।

১৭ই ডিসেম্বর—১লা পৌষ ঃ দিল্লীতে আগত সিংহলী দূত কর্তৃক শ্রীনেহরুর হস্তে কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব অর্পণ।

'চীন অধিকৃত অঞ্চলগুলি ছাড়িয়া দিলে ভারত আলোচনায় প্রস্তুত'—হো চি মিনের (ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট) পত্রের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর লিপি।

বমডিলায় অসামরিক প্রশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

১৮ই ডিসেম্বর—২রা পৌষ ঃ 'সামরিক সাহায্যের সংগে কাশ্মীর বিরোধের সম্পর্ক নাই'—শ্রীনেহরুর নিকট কেনেডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) পত্র।

যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ এডওয়ার্ড কার্দেলির দিল্লী উপস্থিতি—চীন-ভারত সশস্ত্র সীমান্ত সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ।

'কাশ্মীরের প্রশ্নে পাকিস্তান চাপ দিয়া কাজ আদায়ের চেষ্টা করিতেছে—' কাশ্মীর মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের উক্তি।

১৯শে ডিসেম্বর—৩রা পৌষ ঃ পশ্চিমবংগে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে পৌর নির্বাচনের ব্যবস্থা — বিধান সভায় (পশ্চিমবঙ্গ) সকল দলের সমর্থনে বিল গৃহীত।

'সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দেশরক্ষার সর্বাত্মক প্রস্তুতির অটুট সংকল্প —জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠকে (দিল্লী) শ্রীনেহরুর নেফা ও লডাক সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

বমডি-লা নিঃশেষে লুণ্ঠিত—তথাকথিত চীনা 'মুক্তি ফৌজের' কুকীর্তি।

পাঞ্জিমে (গোয়ার রাজধানী) সাড়ম্বরে গোয়ার প্রথম মুক্তি বার্ষিকী উদ্‌যাপন।

॥ বাইরে ॥

১৩ই ডিসেম্বর—২৭শে অগ্রহায়ণ ঃ সুপ্রীম সোভিয়েটে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ও কিউবা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ সরকারের অনুসৃত কার্যক্রম অনুমোদিত — চীন ও আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তার তীব্র আদর্শগত আক্রমণ।

কলম্বোয় সিংহলী প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক) সহিত ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী আর কে নেহরুর বৈঠক—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা।

ব্রুনির বিপ্লবে সাহায্যার্থ বিপ্লবী 'প্রধানমন্ত্রী' (নেতা) কর্তৃক এশিয়ার দেশগুলির নিকট আবেদন।

১৪ই ডিসেম্বর—২৮শে অগ্রহায়ণ ঃ আমেরিকা কর্তৃক নূতন বার্তাবহ উপগ্রহ ('রিলে') উৎক্ষেপণ। (প্রথম বার্তাবহ 'টেলষ্টার')।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কর্তৃক কেন্দ্রীয় পাক্ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত—অর্থমন্ত্রীর পদে মিঃ মহম্মদ সোয়েব।

শুকতারার দেশ (শুক্রগ্রহ) হইতে পৃথিবীতে প্রথম বার্তা প্রেরণ—মার্কিন মহাকাশ-যানের (ম্যারিনার—২) বিরাট সাফল্য।

১৫ই ডিসেম্বর—২৯শে অগ্রহায়ণ ঃ রাশিয়া ও চীনের সংবাদপত্রে মতবাদগত সংঘর্ষ—'প্রাভদা' (রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখপাত্র) ও 'পিপলস ডেইলী'তে (চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখপাত্র) পরস্পরের প্রতি আক্রমণ।

পর্তুগীজ-শাসিত এলাকাগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার — অবিলম্বে মানিয়া লওয়ার জন্য পর্তুগালের প্রতি সাধারণ পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) আহ্বান।

১৬ই ডিসেম্বর—৩০শে অগ্রহায়ণ ঃ রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নেপালে নূতন শা স ন ত ন্ত্র জারী—পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পরিবর্তে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্তন।

কাশ্মীরের প্রশ্নে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের উক্তি ঃ গণভোটই একমাত্র উত্তম সমাধান।

১৭ই ডিসেম্বর—১লা পৌষ ঃ সৈন্য ও পুলিশ কর্তৃক সেনেগালের জাতীয় পরিষদ দখল।

কঙ্গোয় বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ।

১৮ই ডিসেম্বর—২রা পৌষ ঃ সেনেগালের প্রেসিডেন্ট মিঃ সেনঘোর কর্তৃক পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ—ক্ষমতাদখলের রক্তপাতহীন লড়াই-এ প্রধানমন্ত্রী ডিয়া পরাভূত ও গ্রেপ্তার।

'নিউইয়র্ক চুক্তি (রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত) অমান্য করিলে ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম ইরিয়ান দখল করিবে'—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের সতর্কবাণী।

১৯শে ডিসেম্বর—৩রা পৌষ ঃ বুয়েনেস আয়ার্সের জেলে প্রবল হাঙ্গামা—১৯ জন কয়েদী ও ১৮ জন ওয়ার্ডার নিহত।

বাহামায় মিঃ কেনেডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের আলোচনা শুরু—স্কাইবোল্ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রসঙ্গ আলোচনায় অগ্রাধিকার লাভ।

প্রেক্ষাগৃহ

বাল্মীকি

আজকের কথা

একটি ফুলের জন্ম :

সালটা বোধহয় ১৯৫১। জায়লেসান স্কুলের শরীরচর্চা-শিক্ষিকা (ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টেস) কুমারী আরতি চট্টোপাধ্যায় —বর্তমানে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়—তাঁর বয়সে-বড় ভাইপোকে ডেকে বললেন, "তোমরা ত' তোমাদের স্কাউটে ব্যান্ডের বাজনার সঙ্গে কত রকম ড্রিল করাও, আমার একটা কাজ ক'রে দাও দিকি।" ভাইপো তখন সাউথ ক্যালকাটা বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী এবং ওখানকার স্কাউটের একজন চাঁই। ভাইপো পিসীকে জিজ্ঞেস করলে, "কি কাজ, বল? দেখি, পারি কিনা।" "ইংরিজীতে ছোটদের জন্যে কত রকমের মজাদার ছড়া আছে, যাকে বলে নার্সারী রাইম্‌স্। আমার স্কুলের বাচ্চা মেয়ে-দের জন্যে ঐ ধরণের বাঙলা ছড়া বানিয়ে দিতে পার? আমি তাহ'লে ঐ ছড়াগুলোকে সুরে গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ড্রিল করাই—ছড়া গাইতে গাইতে ড্রিল করতে ওদের খুব মজা লাগবে।" "বাঃ, এতো খুব চমৎকার আইডিয়া! —ভারী চমৎকার!"

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে "ঘুম, সোনমণা, টুং" প্রভৃতি ছড়াও লেখা হ'ল এবং তারই সঙ্গে কল্পনায় জন্ম নিল "শিশু রংমহল" বা "চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার।" নিশ্চয়ই পাঠকদের বলে দিতে হবে না, এই ভাইপোই হলেন "শিশু-রংমহল"-এর জনক, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ—সমর চট্টোপাধ্যায়। ইনি ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের একজন বড়কর্তা; সম্প্রতি এঁর কর্মস্থান বোম্বাই সহর; কিন্তু হলে কি হয়! প্রাণ ওঁর পড়ে থাকে সর্বদাই ২, তিলক রোডের বাড়ীটিতে, যেখানে ১৯৫৭ সাল থেকে রয়েছে ওঁর শিশু ভাইবোনেরা, যাদের কাছে উনি মাত্র "সমর দা"।

ঐ জায়লেসান ও গোখেল স্কুলের ছাত্রীদের নিয়েই ১৯৫১ সালেই "শিশু-রংমহল"-এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে নিজাম প্যালেসে প্রথম উদ্বোধন প্রদর্শনীর সঙ্গে এর পদযাত্রা হয় শুরু। এর পরের সাধারণ প্রদ-র্শনীটি হয় ১১ই মে তারিখে নিউ-এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীটিকেই যথার্থ প্রথমাভিনয় রজনীর গৌরবে আখ্যায়িত করতে চান এবং নিজাম প্যালেসের প্রদর্শনীটিকে প্রাক্-প্রদর্শনীর পর্যায়ে ফেলেন। প্রতি-ষ্ঠানটির রেজেস্ট্রী করা হয় ১৯৫১ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে।

আজ শিশু রংমহল বা সি এল টি একটি বিরাট সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান. সারা ভারতের সংস্কৃতিজগতে আজ সম্ভবতঃ একটিও লোক নেই, যিনি এই প্রতি-ষ্ঠানটির নাম না জানেন। কিন্তু এর প্রথম যুগে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এর অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল, তাঁরা হলেন দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যা-পিকা; এক, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের শ্রীমতী রাণী বসু এবং দুই, জায়লেসান স্কুলের মিস বস। এদের সহায়তায় ঐ দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছোট ছোট ছাত্রীদের নিয়েই তখন শিশু রংমহলের শিল্পিগোষ্ঠী গঠিত হয়। শুধু তাই নয়; মিস বস সেই শিশু প্রতিষ্ঠানের পালনেরও ভার নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর শিশু রংমহলের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ঐ জায়লেসান স্কুলেই; ইস্তক তিন দিন মেয়েরা জমায়েত হয়ে বড়-দাদের সঙ্গে বাজনার তালে তালে হেসে-দুলে-গা-খেলে ছন্দ-হিল্লোল নৃত্যের মহড়া দিত। কিন্তু এরই মধ্যে অপরাপর জায়গা থেকেও বাচ্চারা আসতে শুরু করেছে; তাই নিজেদের একটা ঠাঁই করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৫৪ সালের শেষাশেষি সি-এল-টি ৪, বিপিন পাল রোডে একটি বাড়ীভাড়া নিল। ১৯৫৫-তে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব শিশু-শিল্পীর সংখ্যা ছিল ৩০টি; ক্রমে সেই অঙ্ক বেড়ে আজ এসে দাঁড়িয়েছে ২০০ জনেরও কিছু বেশীতে। এবং ১৯৫৭ সালেই ২, তিলক রোডের প্রশস্ততর স্থানে একে চলে আসতে হয়। তবু মনে হয়, এই বাড়ীতেও শিশুদের এই আনন্দ-নিকেতনের ঠিকমত সঙ্কুলান হচ্ছে না। ওদের জন্যে চাই আরও বৃহত্তর পরিবেশ। অবশ্য তার ব্যবস্থাও খুব শিগ্‌গিরই হচ্ছে। রবীন্দ্র সরোবরের কাছেই সাউথ এণ্ড পার্কে কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে এক বিঘা জমি কেনা হয়েছে ১,৭২,০০০ টাকার বিনিময়ে। এরই ওপর গড়ে উঠবে "অমর মহল"—শিশু রংমহলের নিজস্ব গৃহ।

আজ শিশু রংমহলের আছে (১) নৃত্য, (২) সঙ্গীত, (৩) অঙ্কন এবং (৪) পুতুল-নাচ বা পাপেট বিভাগ। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা সুস্থ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে নাচছে, গাইছে, ছবি আঁকছে, আবার পুতুল-নাচের আধুনিকতম কায়দা শিখছে। পাপেট বিভাগের পরিচালক সুরেশ দত্ত

থিয়েটার সেন্টার-এ "সৈনিক" :

চীনা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ধনঞ্জয় বৈরাগী রচনা করেছেন দেশাত্মমূলক নাটক "সৈনিক"। দেশব্যাপী জনজাগরণের মূর্ত প্রকাশ দেখা যাবে এই নাটকে, এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে। নববর্ষেই মুখোস সম্প্রদায় তরুণ রায়ের পরিচালনায় নাটকখানিকে দক্ষিণ কলকাতার স্থায়ী রঙ্গালয় থিয়েটার সেন্টার-এ মঞ্চস্থ করবেন। মঞ্চ-পরিচালনার দায়িত্বও তরুণ রায়ের। আলোকসম্পাত ও সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন যথাক্রমে মিলন রায় চৌধুরী ও তরুণ প্রসাদ। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, সুষমা ঘোষাল, মিঃ গড়গড়ি, শশাঙ্ক ঠাকুর, প্রণব ঘোষ, তপতী মণ্ডল প্রভৃতি শিল্পীকে।

জাতীয় নাট্যকার পরিষদ :

বাঙলা দেশের বর্তমান যুগের তরুণ নাট্যকারেরা মিলিত হয়ে গ'ড়ে তুলেছেন জাতীয় নাট্যকার পরিষদ। প্রতিষ্ঠানটির কার্যনির্বাহক সমিতিতে রয়েছেন সভাপতি সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সদস্যরূপে যথাক্রমে সর্বশ্রী কিরণ মৈত্র, দেবব্রত সুর চৌধুরী ও বীরু মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত এবং পরেশ ধর, কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত মুখোপাধ্যায় ও প্রীতি রায়। বর্তমান সংকটনক পরিস্থিতিতে এরা যে খালি দেশাত্মবোধক নাটক রচনাতেই মনোনিবেশ করেছেন, তাই নয়; নিজেদের রচিত নাটকগুলিকে নিজেরাই মঞ্চস্থ করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ'রা প্রথমেই অভিনয় করবেন কিরণ মৈত্র রচিত দেশাত্মবোধক রূপক নাটিকা "মৃত্যুর গর্জন"। সুনীল দত্ত রচিত একাঙ্কিকা "সীমান্ত প্রহরী"র সঙ্গে এই নাটিকাটিও পুস্তকাকারে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠী :

হাওড়ার অন্যতম নাট্যসংস্থা বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি দেশাত্মবোধক একাঙ্কিকা হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আসছে রবিবার, ৩০শে ডিসেম্বর রামরাজাতলার বানী নিকেতন হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ'রা রমেন লাহিড়ী রচিত "অমর" ও "জয়ের মন্ত্র" নাটিকা দু'খানি মঞ্চস্থ করবেন।

শিল্পী সংস্থার স্বাক্ষর-এর শুভ-মুহূর্ত :

গেল রবিবার, ২৩শে ডিসেম্বর রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে শিল্পীসংস্থার প্রথম ছবি "স্বাক্ষর"-এর শুভ মুহূর্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে [illegible] প্রসাদ মিত্র পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, এম এল এ। শ্রীমতী শান্তিলতা মণ্ডল এম এল এ, মহরৎ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

জে জে ফিল্মস-এর সুবর্ণ রেখা :

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত এবং ভারতবর্ষ প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত জে, জে, ফিল্ম কর্পোরেশন-এর চিত্র "সুবর্ণরেখা"র মুক্তি আসন্নপ্রায়। রাধেশ্যামরচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে তোলা এই ছবিখানির চিত্রগ্রহণ করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অভি ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, জহর রায়, অশোক ভট্টাচার্য (শিশু অভিনেতা), মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিখানিতে সুরযোজনা করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দীন খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

কলিকাতা

প্রযোজক বিমল ঘোষ তাঁর ছবি 'বধূ'র অসামান্য সাফল্যের পর শৈলেশ দে রচিত নতুন ছবি 'বিজিতা'র পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। আগামী মাস থেকে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ছবির প্রধান অংশগুলিতে অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মণ, অসিতবরণ, অমিত দে, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, সরযূ দেবী, কমল মিত্র, জহর রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও নবাগতা গায়ত্রী চক্রবর্তী।

সংগীত পরিচালনা থেকে ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। এ'র প্রযোজিত প্রথম ছবির নাম রাখা হয়েছে 'অভিজ্ঞান।' কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করবেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্সে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। আলোকচিত্র, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় কাজ করছেন কানাই দে, সুনীল সরকার ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় কৈলাস বাগচী। সংগীত পরিচালনা করবেন প্রযোজক শ্যামল মিত্র।

'নির্জন সৈকত'-এর বহির্দৃশ্য শেষ করে সম্প্রতি ফিরেছেন পরিচালক তপন সিংহ। পুরী, ভুবনেশ্বর, চিল্কা, কোনারক, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে এ ছবির প্রধান দৃশ্যগুলি গ্রহণ

করেন আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়। এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, ছায়াদেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অমর মল্লিক, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ ও রবি ঘোষ। কুশলী বিভাগের অন্যতম, শিল্প-নির্দেশনা, সম্পাদনা ও সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে সুনীতি মিত্র, সুবোধ রায় ও কালীপদ সেন। সরকার প্রোডাকসন্স প্রযোজিত এ ছবির সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

দীপান্বিতা প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'বিনিময়' পরিচালনা করবেন দিলীপ নাগ। ডাঃ বিশ্বনাথ রায় এ ছবির কাহিনীকার। নায়িকা চরিত্রে নবাগতা সুচিতা সিংহ এবং নায়কচরিত্রে খ্যাতিমান অভিনেতা দিলীপ মুখার্জি এ ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করবেন কালীপদ সেন।

বোম্বাই

অভিশপ্ত চম্বল যার নাম সেই ভয়াবহ ডাকাত-দস্যুদের আস্তানায় সম্প্রতি একমাসকালীন 'মুঝে জীনে দো' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করলেন নায়ক-প্রযোজক সুনীল দত্ত। গোয়ালিয়র থেকে প্রায় সত্তর মাইল ভেতরে এই চম্বল উপত্যকায় কলাকুশলী ও শিল্পীদের প্রায় দুশোজনের একটি বিরাট দল নিয়ে শ্রীদত্ত এ ছবির কাজ শেষ করেন। এই দলের সঙ্গে নার্গিস ও সুনীল-পুত্র সঞ্জীব উপস্থিত ছিলেন। ডাকাত-সম্রাট লক্ষ্মণ সিংহের এটি স্বদেশ ভূমি। এ ছবির দৃশ্যগ্রহণ দেখতে ডাকাতদের অনেকেই উপস্থিত ছিল। এই চিত্রগ্রহণের সময় সবদা বিশেষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। পরিচালক মনি ভট্টাচার্যের পরিচালনায় এই বহির্দৃশ্যের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ওয়াহিদা রেহমান, সুনীল দত্ত, নিরুপা রায়, আনোয়ার হোসেন, তরুণ বোস, সিন্ধু, রাজেন্দ্রনাথ, মনোরমা, মধুমতী, কুক্কু, মমতাজ, নাজ, রসিদ খান, দুলারী, মোহন চটী প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ। তিরিশটি তাঁবু বসবাসের জন্য একটি অভিনয়-শহর জেনারেটারের আলোয়-আলোয় গড়ে উঠেছিল। হিন্দী ছবিতে এতবড় ও দুর্গম বহির্দৃশ্য বহুদিন পর এই প্রথম গৃহীত হল।

বিশ্বজিৎ—নন্দা অভিনীত 'ক্যয়সে ক'হু'-র সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী দৃশ্যগ্রহণ শেষ হল। আত্মারামের পরিচালনায় এ ছবির পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীরা হলেন নাজ, রেহমান, ওমপ্রকাশ, দুর্গা খোটে ও অসিত সেন। সংগীত পরিচালক শচীন দেব বর্মণের নির্দেশে এ ছবির প্রথম পর্যায়ের সংগীতগ্রহণ শেষ হয়েছে।

আলোকচিত্রের 'কঁহি দীপ জলে কঁহি দিল'-র সংগীত গ্রহণ করলেন সংগীতপরিচালক জয়দেব। শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওর পরিচালক সুরেশপ্রকাশ এ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শশিকাপুর, নন্দা, ধর্মেন্দর, রসিদ খান, নাসিম বানু ও আগা। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নির্মল সরকার। চিত্রগ্রহণ করছেন তারু দত্ত।

গত সপ্তাহে ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আসলি নকলি' ছবিটি মিনার্ভায় মুক্তি পেয়েছে। এ ছবির প্রধান চরিত্রলিপিদের মধ্যে অভিনয় করেছেন নাজির হোসেন, আনোয়ার হোসেন ও মুকরী প্রভৃতি। সংগীতপরিচালক শংকর জয়কিষণ।

মাদ্রাজ

বিজয়া প্রোডাকসন্সের তামিল ছবি 'গোন্দামা কথা'-র রজত-জয়ন্তী উৎসব পালনের পর এটির হিন্দী চিত্ররূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পরিচালক টি, প্রকাশ রাও।

নায়ক, পরিচালক ও বীন-বাদক এস, বালাচন্দর সম্প্রতি ইউরোপ সফর শেষ করে ফিরেছেন। আমেরিকার শ্রোতৃবর্গ তাঁর বীন বাজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। বিশেষ করে 'কর্ণাটী' সংগীতের রাগরাগিনী জনপ্রিয় হয়।

গত সপ্তাহে কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে চিত্রতারকাদের একটি হকির প্রদর্শনী খেলা সুসম্পন্ন হল জাতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য সংকল্পে। শিবাজী গণেশন, জেমিনী গণেশন, এস, এস, রাজেন্দ্রন এবং জি, সাবিত্রী এই প্রদর্শনী খেলাতে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া আরও একটি প্রদর্শনী খেলা প্রেসিডেন্ট বনাম প্রধানমন্ত্রী একাদশ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেল।

শিবাজী আর্ট থিয়েটার কর্তৃক প্রযোজিত একটি সামাজিক নাটক রাজা আন্নামালাই মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন শিবাজী গণেশন। আসন্ন বম্বের নাটক উৎসবে এই নাটকটিও অভিনীত হবে। —চিত্রদূত
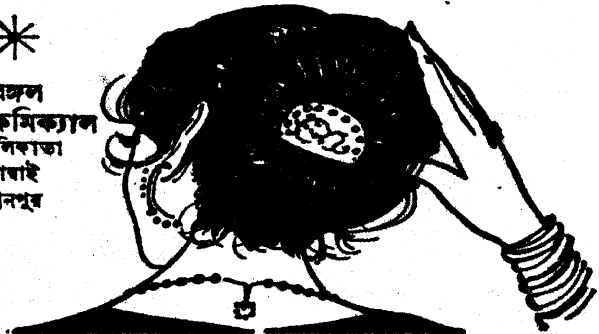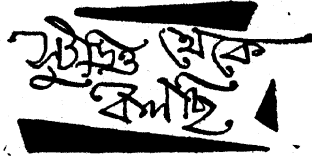
এখানকার জগৎটাই একটু আলাদা-আলাদা। লম্বা দেওয়ালে ঘেরা এই স্টুডিওর ভেতরে মানুষ হাসে আর কাঁদে। অভিনয়-জীবনটা কত রঙ্গে ভরা। বিচিত্র জীবনের এখানে একটিই পরিচয়—Man of a thousand faces। অনেক আশার এই শিল্প-পরিবেশে শিল্পীর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। সুঅভিনয়ে একদিন জনপ্রিয় শিল্পী সাধারণের বিস্ময় আর গর্বের বস্তু হয়ে ওঠেন। শিল্পী তখন সাধনায় মগ্ন।

কিন্তু এই জগতের অন্য মানুষের পরিচয়ও একটা আছে। ঐ যে দ্বার-রক্ষী। স্টুডিওর কুশলী আর কুলী-মিস্ত্রী, যাদের কায়িক পরিশ্রমে শিল্পের প্রথম কাজ এগিয়ে চলে তারাও এক একটি গর্বের স্তম্ভ বলবো। চলচ্চিত্র এমন একটি শিল্প যার সৃষ্টি কোন এক-জনের চেষ্টায় দানা বাঁধে না। দলগত সকলের সাহায্য নিয়েই একটা ছবি তৈরীর কাজ শেষ হয়।

বাইরে থেকে এত সব বোঝা যায় না। কর্মব্যস্ত শহরের জীবনটা কিভাবে চলেছে ভেবে দেখুন না। ট্রাম-বাসের ভীড়, রাস্তায় চলাফেরা এইসবের মধ্যে কত ব্যস্ততা আর ভীড়ের চাপ বেড়েছে। মানুষের কত দাবী, কত অভিযোগের রায় চলেছে এই বাইরের জগৎটায়। অথচ আপনি যেই মুহূর্তে স্টুডিও-ফ্লোরে 'সাইলেন্ট প্লিজ'এর সাবধান সঙ্কেত বোর্ডের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন তখন এখানে কত শান্ত বলে মনে হবে। কত লোক এখানে কাজ করে। কিন্তু ব্যস্ততার গুঞ্জন নেই। নির্বাক মনে হয় এদের জীবনযাত্রা। অভিনয় চলে। বিভিন্ন জীবনের চরিত্র মিছিলের সঙ্গে অভিনেতার জীবন দর্শনের রূপটি এখানে ধরা পড়ে। আলো জ্বলে। পরি-চালক নির্দেশ দেন। আলোক-যন্ত্র এগিয়ে আসে। এরা সকলেই চুপ। শুধু কথা বলেন অভিনেতা আর অভিনেত্রীর দল এক একটি জীবন পরিবেশে। একটা মধ্যবিত্ত সংসার। কত কষ্টে দিন চলছে। সামান্য একচালা ঘর। কাঠের তক্তপোষে বসে সেলাই কাজে ব্যস্ত এ বাড়ীর গৃহ-কর্ত্রী। বড় ছেলে কলেজে পড়ে। অথচ কলেজের মাইনে বাকী পড়েছে। মা নির্মলার একমাত্র ভরসা ঐ আদ্যাশক্তি কালীমূর্তি। বড় ছেলে নবীনের ওপর তার অনেক আশা। ছেলে মাকে বলে—

নবীন—তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে মা, ভেবেচিন্তে রায় দেবে।

নির্মলা—আমি আবার কি রায় দেবো? তুই আমার বিদ্বান-বুদ্ধিমান ছেলে। তুই ভাল বুঝে যা করবি তাতেই আমার মত।

নবীন—কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানো মা! কাজটা পেতে হলে আমাকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে মানে বাইরে চলে যেতে হবে।

নির্মলা—তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর বাবা। তোর মতই আমার মত। ভাল রোজগার হবে। উন্নতি হবে। একথা জেনে তুই যে কাজ করবি নবীন, তাতে আমার প্রাণঢালা আশীর্বাদ থাকবে বাবা, প্রাণভরা আশীর্বাদ থাকবে।

দৃশ্যটি এখানেই শেষ হল।

অভিনয় করলেন সন্ধ্যারাণী আর তরুণকুমার। ছবির নাম 'আকাশ-প্রদীপ।' কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন কনক মুখোপাধ্যায়। 'মায়ার সংসার'-এর সাফল্যের পর বর্তমানে এ ছবির কাজ তিনি শেষ করে চলেছেন ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয়। এঁর সঙ্গে পরি-চালনায় সহযোগিতা করছেন শঙ্কর ও দিলীপ নন্দী। কর্মসচিব পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনায় নির্মল ভদ্র। আলোকচিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন দেওজীভাই ও রবীন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় ভার নিয়েছেন অমিয় মুখো-পাধ্যায় এবং সুনীল সরকার। শিবানী চিত্রমের এই ছবির প্রধান শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, তরুণ-কুমার, অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা সুমিতা সান্যাল।

'আকাশ-প্রদীপ'-এর নির্মলা চরিত্রে সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ও সার্থক বলাবো। এ সপ্তাহে ছবির সঙ্গীত গৃহীত হবে। গান রচনা করেছেন প্রণব রায়।

—চিত্রদূত
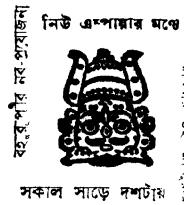
খেলাধুলা

দর্শক

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

ইডেন উদ্যানের এ এক অন্যরূপ। ইডেন উদ্যানের গাছপালা-লতাগুল্ম সকলেরই প্রাণে যেন একটা নতুন চেতনা জেগেছে। শত শত দুর্ঘাস মাথায় নিয়ে ওরা মাতৃভূমিকে আঁকড়ে থাকে, কখনও ত্যাগ করে না। ইডেন উদ্যানের বাতাসেও উত্তাপ অনুভব করলাম। ভারতবর্ষের কোটি কোটি কণ্ঠ বাতাসে ভেসে এসেছে—স্বাধীনতা রক্ষায় দেশবাসীর শপথ-বাণী।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় প্রথম দিনে ত্রিশ হাজার দর্শক সমাবেশ। এ রকম ভাব-গম্ভীর পরিবেশ ইডেন উদ্যানে দেখেছি টেস্ট ক্রিকেট খেলায়—যখনই খেলার গতি ভারতবর্ষের প্রতিকূলে চলে গেছে। আজ তাঁরা এসেছেন দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে। খেলাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

গত বছর এই ইডেন উদ্যানেই লোক-মুখে খেদোক্তি শুনেছিলাম—হায়রে! আগামী শীতে বিদেশ থেকে কোন ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে না।

লোকের হৃদয়ে আজ আর সে শূন্যতা নেই।

এ বছরের শীতের মরসুমে ভারত-বর্ষের কোথাও টেস্ট ক্রিকেট খেলা হচ্ছে না। তার তুলনায় সমগ্র জাতিকে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট খেলায় নামতে হয়েছে—সে খেলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার খেলা।

ক্রিকেট এবং আমরা কি আলাদা? এই দুইয়ের মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্যই নেই। মানব জীবনের সদ্-গুণাবলীর প্রশস্ত অনুশীলন ক্ষেত্র এই ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট তার ধারক এবং বাহক।

॥ স্যার জ্যাক হবস্ ॥

স্যার জন বেরি হবস্ ইংল্যাণ্ডের একজন [illegible] ক্রিকেট খেলোয়াড়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে তাঁর [illegible] নাম-ডাক [illegible]। [illegible] ডিসেম্বর তিনি তাঁর [illegible] জন্ম-দিবস [illegible] পালন করেছেন। ১৮৮২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর [illegible] জন্মগ্রহণ [illegible] দলে ১৯০৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরে (১৯০৮-১৯৩০) মোট ৬১টা টেস্ট ম্যাচ খেলেন—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪১টা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৮টা এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২টো। স্যার জ্যাক হবস্

স্যার জ্যাক হবস্

১৯০৮ সালে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ৮৩ রান করেন। তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১৮৭ রান) করেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কেপটাউনে, ১৯০৯-১০ সালের টেস্ট সিরিজে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৫টা—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২টা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২টো এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টা। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডস মাঠে তিনি যে প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১১ রান করেন, সেই রানই তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান।

স্যার জ্যাক হবসের নামের সঙ্গে আর একটি নাম জড়িত হয়ে আছে, তিনি হার্বার্ট সাটক্লিফ। এঁরা দুজনে খেলায় জুটি—মানিকজোড়। একজনের নাম করলেই অপর জনের নাম এসে যায়। ১৯২৪-২৫ সালের টেস্ট সিরিজে হবস্-সাটক্লিফ জুটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে উপর্যুপরি তিনবার প্রথম উইকেটের জুটিতে দলের শতাধিক রান তুলে দেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ রকম আজও ঘটেনি। মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় তৃতীয় দিনের সকালে তাঁরা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে সারা দিন খেলে অপরাজেয় থাকেন; তাঁদের জুটিতে এই দিন ২৮৩ রান ওঠে। ১৯১১-১২ সালের টেস্ট সিরিজে, মেলবোর্ন মাঠে স্যার জ্যাক হবস্ (১৭৮) এবং ডবলিউ রোডস (১৭৯) প্রথম উইকেটের জুটিতে যে ৩২৩ রান করেন তা আজও ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় উভয় দলের পক্ষে রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

স্যার জ্যাক হবস্ এবং হার্বার্ট সাট-ক্লিফ আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের নিমন্ত্রণে এক সময়ে তাঁরা দুজনে ভারতবর্ষে দীর্ঘ-দিন বসবাস করে ক্রিকেট খেলায় ভারত-বর্ষকে উদ্বুদ্ধ করে যান। বলতে কি, তাঁদেরই ব্যক্তিগত প্রভাবে ভারতবর্ষের জনমনে ক্রিকেট খেলার যথেষ্ট অনুরাগ জন্মায়।

হবসের ক্রিকেট-জীবন

প্রথম শ্রেণীর খেলা (১৯০৫-৩৬): ইনিংস ১৩১৫, মোট রান ৬১২৩৭, নট আউট ১০৬ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩১৬ নট আউট, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৩১।

টেস্ট ক্রিকেট (১৯০৮-৩০): মোট খেলা ৬১, ইনিংস ১০২, নট আউট ৭ বার, মোট রান ৫৪১০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১১, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৫, অর্ধ-সেঞ্চুরী ২৭।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 4th January, 1963.
40 Naya Paise.

আমাদের পঞ্জিকাকারগণ যেভাবে বর্ষারম্ভের পূর্বে আগামী বৎসরের বর্ষফল গণনা ও ঘোষণা করেন, বিদেশী বর্ষপঞ্জীতে সেরূপ গণনা বা ভবিষ্যনির্ণয়ের চেষ্টা সাধারণভাবে করা হয় না। কেননা পাশ্চাত্য জগতে সেরূপ গণনার উপর বিশ্বাস বিশেষ ব্যাপক নয়। তবে "ওল্ডমূর" বা মাদার সিপ্‌টনের অ্যালমানাক এগুলির কিছু নাম আছে এবং অবশ্য এদেশে প্রসিদ্ধ—ও বিদেশে প্রায় অজ্ঞাত—কয়েকটি বিদেশী বর্ষফল-গণনাকার ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-বিশারদের ভবিষ্যনির্ণয় প্রতি বৎসর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

জানিনা ঐ সকল পাশ্চাত্য পুস্তকে ১৯৬২ সালের শেষের ও ১৯৬৩ সালের প্রারম্ভের সময়কালীন ঘটনাবলীর কোনও বিশদ উল্লেখ আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে ব্রিটিশ ও মার্কিন পররাষ্ট্রবিদগণ সে সকল বিষয়ে অবগত আছেন কিনা। তবে চীন-পাকিস্তান মিতালী-চুক্তির কথা একসঙ্গে পিকিং ও রাওয়লপিণ্ডিতে ঘোষিত হইবার পর রাওয়লপিণ্ডিস্থিত মার্কিন রাষ্ট্র-দূতাবাসে ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারের দপ্তরে যে হুলস্থূল পড়ে তাহাতে মনে হয় যে ঐ দুই দেশের পররাষ্ট্র-নীতিবিদগণ তাঁহাদের সিয়াটো এবং সেণ্টো সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ এই মিত্রের বংশ-যবনিকার অন্তরালে গমনাগমন ও বিপক্ষের সহিত সন্ধিসর্তের বিষয়ে কথাবার্তার সম্পর্কে কোনও কানাঘুষাও শোনেন নাই। পিকিং সম্প্রতি জানাইয়াছে যে ১২ই অক্টোবর হইতে এই নেপথ্যে আলাপ ও প্রণয়-বন্ধনের যোগাযোগ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ কিনা একটা বুঝপড়া মোটামুটি হইয়া যাইবার পর চীন ২০শে অক্টোবর নিদ্রামগ্ন ও অশঙ্ক ভারতের উপর প্রচণ্ড ও অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ করে। এই আক্রমণের পরেই ভারত যাহাতে সময়মত বিদেশী অস্ত্রসাহায্য না পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থার ভার নিশ্চয়ই পাকিস্তান লইয়াছিল এবং সেই কারণেই ঐ অস্ত্রসাহায্য রোধ করার জন্য পাকিস্তান এরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে।

সিয়াটো ও সেণ্টো সামরিক জোট দুইটি যে শক্তিজোটের বিরুদ্ধে গঠিত হইয়াছে, রুশ ও চীন তাহার দুই প্রধান। এবং ইহার একটি বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধ করিবার জন্য গঠিত। পাকিস্তান ঐ দুইটি সামরিক জোটের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে যুক্ত এবং সেই কারণে বিপুল পরিমাণে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক এবং সামগ্রিক সাহায্য পাইয়াছে। এই তো সেদিন মাত্র মার্কিন প্রেসিডেণ্ট অতগুলি অভিনবতম অস্ত্রসজ্জিত ও অত্যন্ত দ্রুতগামী জেটফাইটার প্লেন পাকিস্তানকে উপহার দিয়াছেন। এখন এই নূতন প্রণয়বন্ধন গ্রথিত হইবার পর যদি চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে অগ্রসর হয় তবে পাকিস্তান কি তাহা রোধ করিবার জন্য লড়িতে মোটেও রাজী হইবে বা হইতে পারিবে? এই জাতীয় প্রশ্নের এবং ঐ সম্পর্কিত নানা কথার ও তথ্যের হদিশ পাইবার জন্যই রাওয়লপিণ্ডিস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর কাছে ছুটিয়া-ছিলেন এবং সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন, যদিও সেই সাক্ষাৎকারের কোনও পূর্বনির্দিষ্ট সময় বা কোন কথাও ছিল না। এবং ঐ সাক্ষাৎকারের দুই ঘণ্টা পরে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভারত ও পাকি-স্তানের মধ্যে সমস্যাপূরণ বিষয়ে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে এক জরুরী পত্র পাঠাইয়া আলোচনারত ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রিদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠান। আমাদের মন্ত্রী শরণ সিং আয়ুব খাঁর সহিত সাক্ষাতের পর ফিরিতে না ফিরিতেই প্রথমে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও পরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁহার সহিত দেখা করেন। পরে ব্রিটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদ্বয় নিজ নিজ দেশের সাংবাদিকদের ডাকাইয়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহাদের ওয়াকিবহাল করেন, এ-সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর সংবাদ আসে যে আমাদের মন্ত্রী ও তাঁহার উপদেষ্টাবর্গ এবং পাকিস্তানী মন্ত্রী শ্রীভুট্টো ও তাঁহার সহকারি-দিগের মধ্যে আলোচনা এখন ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত হইল এবং পরবর্তী অধিবেশন হইবে দিল্লীতে।

সিয়াটো ও সেণ্টো লইয়া আমাদের মাথাব্যথা নাই। তবে এই ভারত-পাক আলোচনার গতি কি হইবে সেটার চিন্তার কারণ আছে। কেননা, প্রথম পর্যায়ের আলোচনার পর পাকিস্তান মন্ত্রী ভুট্টো বলিয়াছেন যে অবস্থা পূর্বের তুলনায় "আশাপ্রদ"। আমরা আশা করি যে ঐ আশাপ্রদ অবস্থা আমাদের পক্ষে পরে নৈরাশ্য-জনক পরিস্থিতিতে পরিণত হইবে না।

আগামী সংখ্যায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

●

শ্রীজওহরলাল নেহরু

ফুল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিমানীর শ্বেত হাসি কঙ্কাল হাসির মতো
চাপা দিয়ে রক্ত আর মৃতদেহ কত
ধুধু করে।
বোবা এক হাহাকারে
কোটি-কোটি হৃদয়কে নাড়া দেয় গ্রামে ও শহরে।

তবু জানি এই মাটি এই আলো এই যে আকাশ
ভাঙবার নয়,
নতুন শপথে তার ঘটেছে প্রত্যয়।
রাহুমুক্ত সময়ের সংকেত নিশানা
ঘুমে আর জাগরণে দিয়ে যায় হানা
সীমানা, আমার সীমানা!

এক দিন গলবে বরফ আনবে জোয়ার
হাজার ফুলের
প্লাবন ছাপিয়ে যাবে হৃদয় কূলের।

সেখানেতে কোনো বোমা ফাটবে না।
কোনো তরোয়াল সেই ফুল কাটবে না।

হে ভারত, উদ্যান আমার

তরুণ সান্যাল

হে প্রপাত বক্ষে দিয়ো প্রচুর প্লাবন
যেন ক্ষতমুখগুলি ধুয়ে দেওয়া যায়,
প্রলয়মৃত্তিকাতলে বীজধৃত বন
যেন ফেটে ওঠে শষ্প পুষ্পে পতাকায়।
যখন বিশ্বাস শুধু বিশ্বাস ভাঙায়
নিঃশ্বাসের মূল্য নিজ কণ্ঠ চেপে ধরা
হে ফুল, হে উদ্যানের বিকচ রাঙায়
কেমনে জাগিয়েছিলে এড়ায়ে প্রহরা!

পুষ্পিত স্তবকগুলি কেন যে দেখিনি
ভারতবর্ষের কোটি মনের মুকুল
দ্রাবীড় উত্তরাপথে সমবৃন্তে চিনি
আমার ভায়ের মুখ ঃ উর্মিল আকুল।
দক্ষিণ সাগর দেয় তরঙ্গিত জ্বালা
উত্তরের শিলা শৈত্যে রয় প্রতিরোধে
বক্ষে বহে উচ্চারণ নদী জপমালা
পুনশ্চ ঘূর্ণিতে ফেরে বিস্ফারিত ক্রোধে।

কে বানাও হিম ঝড়ে বালুকার বাড়ী
এসো, গেঁথে তুলি কোটি বাহুর পাহারা
যেন দুঃখ ভুল প্লানি মুছে দিতে পারি
এসো স্পর্শ করি পুণ্য জনগঙ্গাধারা॥

হিমালয়

গোপাল ভৌমিক

হিমালয় নাম নয়,
সে আমার সত্তার গভীরে
মিশে-যাওয়া প্রাণমন্ত্র
শত শতাব্দীর ঃ
সে আমার স্থিতি ধৃতি
মৌন প্রেম
তুষার-কিরীট-পরা
আত্মার শরীর।

তার গায়ে হানা দিয়ে
ভুলে গিয়ে ন্যায় নীতিবোধ
প্রেমিকের প্রাণে তুমি
জাগালে যে বিজাতীয় ক্রোধ
তার কোন ক্ষমা নেই,
হয়তো বা নেই কোন শেষ ঃ
যুগজয়ী, কালজয়ী
হিমালয়, আমার স্বদেশ।

হিমালয় শিখরের
জমাট বরফে
কিছুটা লড়াই করে ভাবো তুমি বীর ঃ
দূরে-ফেলে-রাখা ঘৃণা
যাকে তুমি দিয়েছ শরীর
সে যে কত হিমশীত মৃত্যুর তূণীর
পাবে তার ঠিক পরিচয়।

অগ্নিস্রাবী ড্রাগনের
চিতাভস্ম বুকে নিয়ে
হাসবে সেদিন হিমালয়।

পড়াশানার বিষয়ে কথা বলতে ভয় হয়। একে তো নিজে আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই, তার উপর আমাদের সময় থেকে এখন পঠনপাঠনের রীতিনীতি এমন-ভাবেই বদলে গেছে যে, প্ল্যাস্টিক সার্জারীতেও তেমন ঘটে কি-না সন্দেহ। তবু এদিক ওদিকে চোখ মেলে যা দেখতে পাই তা এতই ভয়াবহ এবং করুণ যে নীরবতা অবলম্বন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

একটি ইস্কুলের কথা আমি শুনেছি. পড়াশোনার ব্যাপারে বাইরে তার নাম আছে। প্রতি বছর এই সময়টাতে সেখানে ছাত্রভর্তির এমন হিড়িক চলে যে মেছোহাট বলে ভ্রম হয়। বেশ উচ্চ অঙ্কের মাস-মাইনে দিয়ে অভিভাবকেরা সে ইস্কুলে ছেলে ভর্তি করানোর জন্যে এমন তম্বির-তদারক করেন যা নিজেদের চাকরী জোগাড় করার সময়ও হয়তো তাঁরা করেননি। এই ঝোঁকটাকে আমি ঠাট্টা করতে পারিনে। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে আর কিছু হোক না হোক ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো ফাঁকি দেওয়া চলে না। কাজেই সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে যাঁরা একটা ভালো ইস্কুলে পুত্রকন্যাকে ভর্তি করাতে আসেন তাঁরা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যে আশায় তাঁরা বালক-বালিকাদের হাত ধরে এক ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে টহল দিতে থাকেন সে প্রত্যাশা ফলবতী হয় কিনা তাই আমার সন্দেহের বিষয়।

যে ইস্কুলটার কথা আমি বলছিলাম, শুনেছি সেখানে ফাইনাল পরীক্ষার ফল মোটামুটি মন্দ হয় না। কিন্তু এই ভালো ইস্কুলটিতেও প্রদীপের নিচে যে পরি-মাণ অন্ধকার দেখতে পেয়েছি তাতে সাধারণ ইস্কুলে যে কী দুর্গতি চলছে তা অনুমান করা কঠিন হয়নি।

বলাবাহুল্য, এই ইস্কুলটার বিষয়ে যা কিছু আমি জেনেছি তা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মারফৎ। একটি আত্মীয় বালক পড়ে এই ইস্কুলে। তার কাছ থেকেই নানা সময়ে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে জানতে পেরেছি এইসব তথ্য।

একটা নিদর্শন দিচ্ছি।

একবার ছেলেটির পরীক্ষার পর গিয়ে শুনলাম, অঙ্কে সে খুব ভালো করেছে —একশোতে একশো পাওয়ার আশা রাখে। কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর পর গিয়ে জানলাম, পেয়েছে সাতানব্বই। আরেকজন ফার্স্ট হয়েছে. সে পেয়েছে একশো।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিন নম্বর কাটা গেল কীসে তোর?

ছেলেটি বলল, 'জানিনে তো?'

'কিছু ভুল হয়েছিল তোর?'

'না।'

'তাহলে মাস্টারমশায়কে গিয়ে জিগ্যেস করলি না কেন?'

'করেছি।' ছেলেটি বলল, 'মাস্টারমশায় বললেন, সতীশ (যে ছেলেটি ফার্স্ট হয়েছে) বরাবরই ভালো ছেলে কিনা তাই ওকে একশো দিয়ে আমাকে সাতানব্বুই দিয়েছেন।'

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। কিন্তু এই রহস্যের 'ক্লু' পেলাম আমি কয়েকদিন পর।

একদিন গিয়ে শুনি, আত্মীয়-বালকটিকে একটি কোচিং ক্লাসে ভর্তির আয়োজন চলছে। ছেলেটি ভালো, বাড়িতে সে ভালোই লেখাপড়া করে, তাকে হঠাৎ কোচিং ক্লাসে ভর্তি করার হেতু কী তা আন্দাজ করতে পারলাম না।

'হঠাৎ কোচিং ক্লাস কেন? ব্যাপার কী?' প্রশ্ন করলাম আমি।

ছেলেটির অভিভাবক বললেন, 'অঙ্কে ও একটু উইক আছে তো, তাই।'

'কে বলল অঙ্কে উইক?' আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'পরীক্ষায় তো ও সবগুলিই রাইট করেছে?'

'তা করেছে।' অভিভাবক বললেন, 'কিন্তু ফার্স্ট হতে পারেনি। শুনেছি ওদের অঙ্কের মাস্টার মশায়ের একটা কোচিং ক্লাস আছে। যে ছেলেটি ফার্স্ট হয়েছে সে ওখানে পড়ে। কাজেই ভাবলাম—।'

'ভাবলেন যে এইভাবে যদি কাজ উদ্ধার হয়?' আমি চটে গিয়ে বললাম, 'এ যে একরকম ঘুষ দেওয়া তা আপনি জানেন?'

'জানি। কিন্তু উপায় কী? তাছাড়া মাস্টারমশায়ও নাকি বলেছেন তোমার ভাইপোকে ভর্তি হ'তে। না হলে হয়তো উনি চটে যাবেন!'

'তা বটে।' চট করে কিছু বিপরীত উপদেশ দিতে সাহস হল না। ভর্তি করার সপক্ষেই মত দিলাম আমি।

কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলাম, মাস্টারমশাই এভাবে কোচিং ক্লাসের ব্যবসা চালাচ্ছেন, এতো অন্যায়—সহ-কর্মীরা জানতে পারলে তিনি নিন্দিত হবেন না? অভিভাবকটি অন্যত্র গেলে আমার সেই ভাইপো ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে তোদের অঙ্কের স্যার যে কোচিং ক্লাস খুলেছেন, তা কি অন্য মাস্টারমশায়রা জানেন?'

'জানেন বোধহয়,' সে বলল, 'অনেক স্যারেরই তো কোচিং ক্লাস আছে?'

'কী রকম?'

'দু'তিনজন স্যার মিলে এক-একটা কোচিং ক্লাস খোলেন। আমি, যেটায় ভর্তি হব সেটাতে অঙ্ক আর সায়েন্স

জনি হ্যাজার্ড

আগামী ১৮ই জানুয়ারী প্রকাশিতব্য 'অমৃতে'র ৩৭ সংখ্যা থেকে 'জনি হ্যাজার্ড' নামে একটি চিত্রায়িত রহস্য-কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। কমিক্স নামে পরিচিত এই ধরণের সচিত্রকাহিনীর জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। প্রতি সংখ্যায় দু পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিতব্য এই 'জনি হ্যাজার্ড' কাহিনীটিও আশাকরি আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

সম্পাদক : 'অমৃত'

সাবজেক্টে জোর দেওয়া হয়। আরেকটা আছে, সেখানে বাংলা আর ইংরেজিতে বেশি ঝোঁক। শুনছি, আরও একটা খোলা হবে, সেখানে অঙ্ক ইংরেজি আর স্পোকেন ইংলিশে বেশি জোর দেওয়া হবে।'

'সুন্দর তো ব্যবস্থা!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের হেডমাস্টার-মশাই জানেন এসব?'

'তা জানবেন না কেন? স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস তো তিনিই নেবেন।'

'কিন্তু ও সাবজেক্টে তো পরীক্ষা হবে না?'

আমার অজ্ঞতায় ছেলেটির মুখে হাসির রেখা ফুটল। সে বলল, 'নাই বা হল পরীক্ষা। ইংরেজি বলতে পারলে ইণ্টারভিউ-তে দাঁড়ানোর কত্তো সুবিধে!'

'তা বটে।' এই দ্বিতীয়বার আমাকে হার স্বীকার করতে হল।

কিন্তু মনে মনে আমার আমি ভাবতে লাগলাম, এইসব মাস্টারমশাইরা সবই জানেন, সব সাবজেক্টেই ভালো করে তৈরি করে দিতে পারেন ছাত্রদের, কিন্তু সেটা ইস্কুলে নয়। তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে—হয় কোচিং ক্লাস, না হয় প্রাইভেট টিউটার। ইস্কুলে যে মাইনেটা দেওয়া হয় ছাত্রের জন্যে সেটা একটা অ্যাডমিশান ফি ধরণের ব্যাপার। আসল শিক্ষার আক্কেলসেলামী দিতে হবে অন্যত্র। নাহলে পরীক্ষা নদীর খেয়াপার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

চরম দুঃখে তাই বলতে ইচ্ছে হয়, ইস্কুলগুলো উঠিয়ে দিয়ে কোচিং ক্লাস-গুলোকেই অ্যাফিলিয়েশান দিলে দুর্নীতি বোধহয় একটু কম প্রশ্রয় পেত। অন্তত দুতরফা খরচের জুলুম থেকে রেহাই পেয়ে অভিভাবকেরা একটু স্বস্তি বোধ করতেন।

॥ পর্বতো বহ্নিমান্ ॥

পাহাড়ে আগুন লেগেছে শুনে মনে পড়ল, পাহাড়ে আগুন লেগেছে। আমাদের বাড়ীর সদর দরজায় ঠিক সামনে। গড়পর্বতে। দিনের বেলা বোঝা যায় গরম বাতাস গায়ে লেগে। সন্ধ্যাবেলা চোখে পড়ে রাঙা আলোর লহর পাহাড়ের গলায় এধার থেকে ওধারে। কী তার বাহার! সারা রাত জুড়ে রোশনাই লেগে আছে, আমরা যখন ঘুমিয়ে তখনো সে জেগে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় তপ্ত হাওয়ায়।

আমরাই পালাতে পারিনে। তাহলে ভেবে দেখ পশুপাখী গাছপালার কথা। পশুপাখী পালাবার সময় পায় না, পালাতে গিয়ে দেখে চারদিকে আগুন। গাছপালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলে যায়। যে পাহাড় ছিল প্রাণের আশ্রয়ভূমি সেই হলো মরণের ফাঁদ। সেইসব প্রাণীর জন্যে আমিও কাঁদি। কিন্তু তখনো আমি অসহায় শিশু। আমি নিজেকেই বাঁচাতে পারিনে। ওদের বাঁচাব কী করে।

এমন বছর যায় না যে বছর একটা না একটা পাহাড়ে আগুন লাগে না। গড়পর্বতে নয় তো মেঘা পাহাড়ে, মেঘা পাহাড়ে নয় তো কুটুনিয়া পাহাড়ে। কোরিয়া পাহাড়ে। এগুলো অত কাছে নয় বলে গায়ে আঁচ লাগে না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখি রাঙা আলোর রোশনাই লেগে আছে। নীরো হলে বেহালা বাজিয়ে সঙ্গতি রাখতেন প্রকৃতির ওই পরম রমণীয়তার সঙ্গে।

প্রকৃতির? একটু বড় হয়ে জিজ্ঞাসা জাগল, আগুন কে লাগায়? প্রকৃতি না মানুষ? ওটা কি তুফান ভূমিকম্পের মতো নৈসর্গিক ব্যাপার না আমাদের পাড়ার 'ঘরপুড়ি'র মতো মানবিক? উত্তর পেলুম, কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যায় তারা হয়তো অনবধান হয়ে আধপোড়া বিড়ি বা পিকা বা ধুঁয়াপত্র ফেলে দিয়ে আসে। শুকনো পাতার উপরে। শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে আগুন ধরিয়ে বেড়ায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। একটি বোকা মানুষ এক মুহূর্তের একটা ভুলে আস্ত একটা পাহাড়ের অগণিত পশুপাখী ও গাছপালাকে বিনা নোটিশে পুড়িয়ে মারে। তার পরে মরা হরিণ মরা পাখী নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস।

বড়দের জিজ্ঞাসা করি, আগুন কেন কেউ নেবায় না?

উত্তর পাই, ওটা রাজার পাহাড়। যার পাহাড় সেই নেবাবে। রাজা তো স্বয়ং নেবাতে যাবেন না, হুকুম দেন দেওয়ানকে। দেওয়ান হুকুম দেন ফরেস্ট অফিসারকে। ফরেস্ট অফিসার অবশ্য ঘটনাস্থলে যান, কিন্তু হুকুম দেন রেঞ্জারদের। রেঞ্জাররা ছুটোছুটি করেন, কিন্তু হুকুম দেন ফরেস্ট গার্ডদের। গার্ডরা হৈ চৈ বাধায়, কিন্তু হুকুম দেয় চৌকিদারদের। চৌকিদাররা ধরে নিয়ে আসে গাঁয়ের গরিব লোকদের। তারা রাজার জন্যে বেগার খাটতে বাধ্য। তাদের বলা হয় বেঠিয়া। একটা পয়সাও পাবে

অন্নদাশঙ্কর রায়

না। হরিণটা বনমোরগটা পেলেও উপরওয়ালাদের নৈবেদ্য দিতে হবে। তারা বলে, যাচ্ছি, যাব, হচ্ছে, হবে। আগে তো জল জোগাড় করি, বালি জোগাড় করি। আগুন যত সুলভ জল তত সুলভ নয়। অনেক মেহনৎ করে সারা গাঁয়ের একমাত্র ইঁদারা থেকে জল তুলতে হয়। রাজপুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখেন আর গালমন্দ দেন আর মারধোর করেন, কিন্তু কাজ এগোয় না। আগুন ততক্ষণে মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সে তার খুশিমতো জায়গায় থামবে। দিনকয়েক বাদে আপনা-আপনি নিববে।

ফী বছর আগুন লাগে। তা হলে আগে থেকে ওরা তৈরি হয় না কেন? ফায়ার ব্রিগেড বানায় না কেন? ফায়ার ড্রিল করে না কেন? জিজ্ঞাসা করি আরো বয়স হলে। উত্তর পাই, সবই সম্ভব, অথচ কিছুই সম্ভব নয়। কারণ রাজার আয় মোটে তিন লাখ টাকা। রাজপরিবারকে রাজার হালে রাখতেই খরচ হয় দেড় লাখ। অফিসারদের পুষতে এক লাখ। বাদবাকী যা থাকে তা দিয়ে রাস্তাঘাট, ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুই টিকিয়ে রাখতে হয়। একটা জেলখানাও আছে। কিন্তু কয়েদী বেশী নেই। অতগুলো লোককে খাওয়াবে কে?

একটু একটু করে বড় হই আর একটু একটু করে বুঝি যে, আগুন নেবানো অসম্ভবও নয়, সম্ভবও নয়। তা না হয় হলো, কিন্তু আগুন যে লাগবেই এমন কী কথা আছে? চেষ্টা করলে নিবারণ তো করা যায়। কেউ কেন নিবারণ করে না? এর উত্তর শুনি, পাহাড়ে যদি কেউ না যায় তা হলে আগুন লাগার কোনো হেতু নেই। সব পাহাড়ে লাগে না। কিন্তু কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যাবে তারা কেউ কোনোদিন বিড়ি খাবে না, পিকা টানবে না, ধুঁয়াপত্র সঙ্গে নেবে না এমন ফারমান জারি করাও যা, না করাও তাই। দিনমান যারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে তামাক তাদের কাছে ডালভাতের মতোই দরকারী।

নিবারণ অসম্ভবও নয়, সম্ভবও নয়। আরো বড় হয়ে আরো জিজ্ঞাসা করি। এবার শুধু ঘরের বড়দের নয় বাইরের বড়দেরও। উত্তর পাই, পাহাড়টা রাজার নয় প্রজাদের। তার সংরক্ষণ প্রজাদের প্রত্যেকেরই ভাবনা। সে ভাবনা রাজপুরুষদের উপর ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। যেখানে নিবারণ সম্ভব সেখানে নিবারণ করতে হয়। যেখানে নিবারণ সম্ভব নয়, কিন্তু নির্বাপণ সম্ভব, সেখানে নির্বাপণ করতে হয়। যেখানে পূর্ণ নির্বাপণ সম্ভব নয়, কিন্তু আংশিক নির্বাপণ সম্ভব, সেখানে আংশিক নির্বাপণ করতে হয়। প্রাণপণ চেষ্টায় নারী ও শিশুকে বাঁচানো যায়।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহলকে বেশ খুশী করেছে নিঃসন্দেহে। এর জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

'জানাতে পারেন' বিভাগটিতে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করছি, আশা করি উত্তর পাবো।

(১) কার্তিক মাসে যে শ্যামাপূজা হয় ঠিক সেই সময় আলোর সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্যামা পোকা এসে হাজির হয়। এখন প্রশ্ন, এই শ্যামা পোকা ঠিক এই সময়ই আসে কেন? অন্য সময়েই বা আসে না কেন? তাছাড়া শ্যামা পোকাই বা নাম হ'ল কেন?

(২) মেয়েদের গোঁফ গজায় না কেন?

(৩) আমি লাল, সবুজ এক করে ফেলি। বুঝতে পারি না। কেন এমন হয়? অনেকে বলেন 'কালার ব্লাইন্ড'। কেন? সত্যি সত্যি কি 'কালার ব্লাইন্ড' হয়?

(৪) আট ন'বছরে বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের কিছু কিছু দাঁত পড়ে যায়, কেন? সমস্ত দাঁতই বা পড়ে না কেন?

শ্রীসুশীলকুমার মণ্ডল
৭৯, শ্যামনগর রোড
কলিকাতা—২৮

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগটি অতীব চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক। একটি ছোট প্রশ্নের সঠিক উত্তরের আশায় পাঠাইলাম।

প্রশ্নঃ—ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক পদ্মশ্রী বিজয় হাজারে ওপেনিং ব্যাটসম্যান রূপে খেলিয়াছেন কি? যদি খেলিয়া থাকেন তবে টেস্ট ম্যাচ বা অনুরূপ কোন প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন? সন ও তারিখসহ উত্তর চাই?

শ্রীমহিমারঞ্জন কুণ্ডু
মুস্তাফী লজ
সুনীতি রোড
কোচবিহার।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই নভেম্বরের 'অমৃতে'র 'জানাতে পারেন' বিভাগে লাল রংয়ের বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করে শ্রীকুমকুম দে যে উত্তর দিয়েছেন তা' অত্যন্ত বিতর্কমূলক। তিনি লিখেছেন যে, 'লালের মধ্যে আছে ভয়ংকরের সূচনা', কিন্তু লালে যে রোমাণ্টিকতার চরমতম প্রকাশ তা' তো সকলেরই জানা। এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি শুভকাজে প্রাচীনকাল থেকেই লাল রংকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রমাণ-স্বরূপ বাণভট্টের 'কাদম্বরী' থেকে কটি লাইন তুলে ধরছি ঃ—'একদা তু প্রভাত-সন্ধ্যারাগ লোহিতে গগনতলে কমলিনী মধুররক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধে হংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদ্ অপরজলনিধিতটম্ অবতরতি চন্দ্রমসি'......ইত্যাদি।

তাঁর দ্বিতীয় উক্তি, 'স্বেচ্ছাচার যখন কলঙ্কিত করেছে সমাজের প্রতিটি নারীকে'...ভারত ইতিহাসে ঠিক এরকম অবস্থার নিদর্শন আমরা পাই না। পরন্তু এটাই জানা যায় যে ভারতের বিশেষ করে বাংলার নারী চিরদিনই স্বীয় পবিত্রতার মহিমায় উজ্জ্বল! তাঁর শেষ উক্তি 'রক্তের সঙ্গে লাল রঙের কোথায় যেন সাযুজ্য আছে' একটু বলার অপেক্ষা রাখে। রক্তের লাল হ'বার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রক্তের সঙ্গে লালের কোন 'সাযুজ্য' নেই কারণ রক্তের লাল ও লাল রং উভয়ে লাল হলেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লাল রঙই পরিণামে রক্ত হয় না কাজেই এখানে 'সাযুজ্য' কথাটির ব্যবহার কেমন যেন বেমানান।

যতদূর জানা যায় বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে লাল রঙের ব্যবহার সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে তা' চলে আসছে।

লাল রঙ সকল রঙের মধ্যে সবচেয়ে গাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে তা' মিশে যায় না আর লালের সঙ্গে অন্য কোন রংয়ের মিশ খাওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুণই বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে লাল রংকে ব্যবহার করা যায়।

স্বপন বসু
৪৫এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৯।

বিগত ২৬শে অক্টোবর তারিখের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীমতী অঞ্জনা মিত্রের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ইঁচড় বা এঁচড় বলিতে কাঁচা কাঁঠালকে বুঝাইলেও ইঁচড়ে বা এঁচড়ে পাকা কথাটি, বয়সে অল্প বা অপরিণত অথচ কথায় প্রবীণের মত, এরূপ ছেলে-মেয়ে সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়। বাংলা ভাষায় ইহা একটি বিখ্যাত বাক্‌ধারা। 'জেঠা ছেলে' ও 'জেঠা মেয়ে', ইহারই সমার্থবোধক আর দুইটি বাক্‌ধারা। অকালে পাকা কাঁঠাল যেমন খাইতে ভাল লাগে না, তেমনি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মুখে বয়সের উপযোগী কথা না শুনিয়া, প্রবীণ বা বৃদ্ধলোকের মুখেই শোভা পায়, তেমন কথা বা বাক্য শোনা গেলে তাহাও কাহারও ভাল লাগে না বা লাগিবার কথা নয়। অবশ্য অকালে বা অপরিণত সময়ে পাকা কোন ফলেরই আস্বাদ কালে পাকা ফলের মত ভাল না হইলেও, কথায় কথায় শুধুমাত্র কাঁঠালেরই তুলনা লোকের মুখে কেন আসে, তাহার তাৎপর্য আছে। কাঁঠাল ফলের রাজা। আকারে কাঁঠালের মত বড় আর কোন ফলই হয় না। আমি নিজে ৩৫ সের ওজনের কাঁঠাল দেখিয়াছি ও খাইয়াছি। শোনা যায়, কোন কোন স্থানে কাঁঠালের ওজন ১ মণ ১½ মণ পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সে যাহা হউক, তুলনা দিবার সময় স্বভাবতঃ প্রত্যেক জাতের সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস-টির কথাই লোকের মনে সর্বপ্রথম আসিয়া থাকে। তাই অকালপক্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফলজাতীয় কোন কিছুর তুলনা দিতে গেলে সর্বপ্রথমেই ফলজাতীয় পদার্থের মধ্যে আকারে সর্ববৃহৎ কাঁঠালের কথাই লোকে বলিয়া থাকে। ঠিক তেমনি দেখা যায়, আকার ও শক্তির ক্ষেত্রে তুলনা দিবার সময় মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধ্যমপাণ্ডব ভীম, আর জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হস্তীর কথাই প্রথমে আসিয়া থাকে। যেমন আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি,—হস্তীতুল্য বলশালী, দেখিতে হস্তীতুল্য, ভীমাকৃতি, ভীমতুল্য বল-শালী ইত্যাদি। আবার বিদ্রূপে বা গালা-গালির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মূর্খ বুঝাইতে হস্তীমূর্খও বলিয়া থাকি। অনুরূপ-ভাবেই পরাক্রমের ক্ষেত্রে মানুষের বেলায় প্রথমেই আসেন ভীমসেন, আর জন্তু-জানোয়ারের বেলায় পশুরাজ সিংহ,—যেমন, সিংহবিক্রমে, ভীমবিক্রমে, ভীম-বেগে ইত্যাদি।

এই 'ইঁচড়ে পাকা' কথাটি লোকের মুখে মুখে বহুকাল হইতে ফিরিলেও সম্ভবতঃ প্রাচীন দিনের কবি ও তর্জা-ওয়ালারাই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক প্রতি-পক্ষকে পর্যুদস্ত করিবার সহজ ফন্দী হিসাবেই একটু বেশী করিয়া প্রয়োগ করিতেন। আর করিতেন সম্ভবতঃ পুরা-তন যুগের প্রসিদ্ধ মঙ্গল ও পাঁচালী-কাব্যের রচয়িতারা কাব্যে রস লাগাইবার সহজ কৌশল হিসাবে,—যাহা হইতে আজ এ কথাটির বহুল প্রয়োগ কথায় ও ভাষায় সমভাবেই দেখা যাইতেছে।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
৯৬ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
কলিকাতা—৯।

প্রার্থনা

প্রবোধেন্দু

।। ১৯৫২ ।।

ক্যান্টনের সেই রাত্রিটা আজ মনে পড়ে।
কত মানুষ, কী সমারোহ!
কচি-মুখ কিশোর-কিশোরী হাতে হাত রেখেছে,
অন্য হাতে পুষ্পগুচ্ছ।
এগিয়ে চলি আমরা।
'হোপিন ওয়ান শোয়ে—শান্তি হোক সর্বকালব্যাপী!'
শত কণ্ঠে গান গায়—
'এক হোক পৃথিবীর লোক,
মানুষের হোক জয়—
অগণিত মানুষের একটি হৃদয়।'

এগিয়ে চলেছি।
সপ্তবট-প্যাগোডার ছায়াতুষার থেকে
ঘন্টা-ধ্বনি আসে অবিরাম।
গৈরিকবসন মুণ্ডিতশীর্ষ সহস্র শ্রমণ
বুদ্ধ-নাম জপ করছেন—
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!'
প্যাগোডার সৃজন-কথাও শুনলাম।
ইতিহাসে অশ্রুত তাপস একজন—
কাশ্যিয়ান
হিমগিরি উত্তরণ করে সম্রাট সকাশে উপস্থিত।
'মণিরত্ন কি এনেছ ভারতের উপহার?'
'বুদ্ধ-নাম—রত্ন উত্তমতম তার কাছে—
অহিংসা ও প্রীতির সম্ভার।
আর এই সপ্ত বটশিশু।'
সাত বট সেই হয় বিশাল অটবী
ঘনপত্র-মর্মরে তথাগতের মহাকরুণার বার্তা
আকাশে বাতাসে অহোরাত্রি ঘোষণা করে।
সাতের তলা স্তম্ভ। বিশাল মন্দিরে বিপুলায়তন মহাবুদ্ধ।
ভক্তসম্রাট ওয়াং-মাঙের বিনত-মস্তক তাম্রমূর্তি
দেড় হাজার বছর
মন্দির-চত্বরে প্রহরায় দাঁড়িয়ে।
এই তীর্থভূমিতে নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর হাতে হাত দিয়ে
আমরা চলেছি।
ধরিত্রী কী সুন্দর!
ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কী মধুর তোমার মানুষ!
আকাশে তারকারাজি—
মেঘের মধ্য দিয়ে ঝিকিমিকি বিদ্যুত খেলে গেল।
ঈশ্বরেরই হাসি!
ঝরঝর বৃষ্টি নামল,
ঈশ্বরেরই করুণা ধারা হয়ে শিরে ঝরছে।
আর. বৃষ্টির শব্দ পরাজিত ক'রে
শত কণ্ঠে মন্দ্রিত হচ্ছে—
'শান্তি হোক চিরজীবী। সমুদয় মানুষের একটি হৃদয়!'

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ লাগে অকস্মাৎ।
আকাশের দিকে মুখ তুলে সমস্ত অন্তর দিয়ে
ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা জানাই—
ফুলের মতন বিকশিত হোক এইসব ছেলেমেয়ে,
সুবাস ছড়াক দিগদিগন্তে।
ভুবনের সকল মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে একদিন
এই সমস্ত স্বর্গের দূত।
আমি প্রার্থনা করেছিলাম
দশ বছর আগেকার বৃষ্টি-ঝরা সেই রাত্রে।

।। ১৯৬২ ।।

নিষ্ফল।
সে প্রার্থনা ঈশ্বরের অভিমুখে যায়নি,—
ক্যান্টনের রাজপথের ধূলিতলে লাঞ্ছনায় মুখ থুবড়ে পড়েছে,
পার্ল নদীর স্রোতে ভেসে গেছে।
সেই সব কিশোর দশটা বছর পরে আজ দস্যু।
মানবতার দেবতা বুদ্ধকে তারা ত্যাগ করেছে,
সন্ন্যাসী শ্রমণরা হয়তো বা পলাতক।
হিমগিরি উল্লম্ফন করে
তাপস কাশ্যিয়ানের উপহারের শোধ দিতে
হাজারে হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ল
নিঃশঙ্ক প্রীতিমান প্রতিবেশীর উপর।
দংষ্ট্রায় বিষ,
ক্রোড়ভী রসনায় করাল আগুন লকলক করে।
সুখের ঘর ভাঙল নিরীহ অগণ্য মানুষের।
রক্তের স্রোত বয়ে যায়।

আজ আমার বিপরীত প্রার্থনা—
বজ্রাঘাত হোক দস্যুদলের শিরে।
ঈশ্বরকে ডাকি না—
ঈশ্বরেরও ঘৃণা বর্বরের পানে দৃষ্টি ফেরাতে।
বজ্র আমরাই হানব
আমাদের জওয়ানদের হাত দিয়ে।

বড্ড শীত !
২৮।১২।৬২
কাশ্মীর শাল
রাওলপিণ্ডি
এই মরেছে !
ভারত-পাক বৈঠক
না গো সিরিমা !
তোমার ঐ চীনা মাল
আমার পেটে সইবে না !
কলম্বো প্রস্তাব
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য
সম্মেলন ১৯৬২

আক্রমনকারী চীন ও ভারত

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

লাল চীন রক্তচক্ষু মেলে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে; স্পর্ধিত বিক্রমে ভারতের গণতন্ত্রকে শাসন করতে চায়। তার খেয়াল খুশির খোরাক যোগাড় করে না দিলে সে তার ক্রীতদাসের দল নিয়ে ভারতকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছে। আগ্রাসী চীনের এই স্বেচ্ছাচারমূলক সাম্রাজ্য পরিকল্পনা আজ নূতন নয়, চৈনিক ভূমিতে কমিউনিজমের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক মাও সে তুং সমরবিদ্যায় হাতেখড়ি দেওয়ার পর থেকেই তার এই দানব বাসনায় পরিচয় দিয়ে সমগ্র জগৎকে উৎপীড়িত করে তুলেছে। নিজের দেশের জনগণকে যান্ত্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্মের স্বাধীনতা-হরণ কার্য সমাধা করার পর অনিবার্যভাবেই রাজ্যবৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যলালসায় সে দুর্মদ হয়ে ওঠে। একের পর এক কোরিয়া ও তিব্বতের ঘটনায় তার পরিচয়। দেশের সমগ্র ধন সম্পদ, দেশের কৃষি ও শ্রম, জনগণের ব্যক্তিগত সেবার আদর্শ পরিহার করে, এক অবাস্তব সমরকল্পনার স্রোতে ভেসে চলেছে। মুষ্টিমেয় যুদ্ধোন্মাদের চক্রান্তে এক বিরাট দেশের ততোধিক বিরাট জনগণকে নির্বিচারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে তথাকথিত কমিউনিস্ট চীন এশিয়ায় তার একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শয়তান ড্রাগনের ক্রূর নিঃশ্বাসে মানবসভ্যতা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

ভারত শান্তিকামী; যুদ্ধ সে চায় না। গণতন্ত্রের জয়তিলক তার ললাটে—জনোন্নতি ও জনসেবাই তার আদর্শ। সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার আলোকে তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সে সামগ্রিক উন্নতিবিধানে তৎপর। এই কার্যের সহায়ক শান্তি, যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের আয়োজনে, সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন সম্ভব হয় না—বহু পরিকল্পনাই বিঘ্নিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি, যে পরিস্থিতি সহাবস্থানের সহায়ক, জাগ্রত ভারত সেই সর্বজাতীয় প্রীতির মন্ত্রই উচ্চারণ করেছে। বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীলের প্রস্তাবগ্রহণ তারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাই কোনও সামরিক জোটে সে যোগ দেয়নি—নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে মূলমন্ত্র সে অবিচল হয়ে আছে।

কিন্তু শান্তি চাইলেই লোকে শান্তিতে থাকতে দেবে কেন? পৃথিবীতে দুর্জনের অভাব নেই। প্রতিবেশীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির সংবাদে দুষ্ট প্রতিবেশীর অন্ন রোচে না—ঘুম আসে না। তাই ভারতের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি দানবদের বেসামাল করে তুলেছে—নিজেদের অস্ত্রসম্ভার আর সমরলিপ্সার তাগিদে তারা উন্মত্ত। সর্বপ্রধান প্রত্যক্ষ কারণ লাল চীনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সেখানে নেই কোনও পরিবার পরিকল্পনা, যদৃচ্ছভাবে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যান্ত্রিক উৎপাদনের শক্তিকেও হার মানিয়ে দেয়। মানুষের সত্তাকে তারা স্বীকার করে না—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, স্নেহ প্রেম, চিন্তা ও কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে এক বাস্তব সংস্পর্শহীন সমাজ-ব্যবস্থার কাছে আত্মবলি দিয়েছে। এই সমাজ-ব্যবস্থা আর বিসর্পিত রাষ্ট্রচেতনা অভিন্ন—ফলে এক নীরন্ধ্র অন্ধকারে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন। তাই সেখানে মাঝে মাঝেই অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে—দেখা দেয় কালান্তক আঁধি—দুর্নিবার ঝড়ের বেগে শুধু নিজের দেশেই বিক্ষোভ দেখা দেয় না, দেশের প্রত্যন্ত-ভাগেও তার বেগ গতিশীল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রনায়করা উপায়ান্তরবিহীন হয়ে জনসাধারণকে ঠেলে দেয় সমরাঙ্গনের মৃত্যুগহ্বরে।

কিন্তু কোন প্রতিবেশী যদি দুর্মদ হয়, যদি সে অশান্তিকর কার্যকলাপে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, তখন স্বভাবতই সকল মানুষই একযোগে সেই দুর্বিনীত প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করতে এগিয়ে আসে। তাইতে হামলাকারী লাল চীনের বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রই যে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ভারতের গণদেবতা আজ জাগ্রত। কঠোর সাধনায় সংকল্পবাক্য তার মুখে। দৈত্যদলনী শক্তি তার বাহুতে, বক্ষে তার দুর্জয় সাহস, নবোদিত স্বাধীনতার নূতন কিরণজালে দৃঢ়তার বর্ম ঝলসে উঠছে। এই শক্তি সে কোথায় পেল? এই শক্তি তার আত্মিক শক্তি, তার অন্তর্দেবতার অলংঘ্য নির্দেশ—যুগ-যুগান্তরের সংস্কৃতি ও সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের দেশে বাঁচবার অধিকার সকলেরই আছে—এই মুক্তিপণে আমরা স্বাক্ষর করেছি! এই মন্ত্র আমাদের দেশপ্রেম, আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা, আসমুদ্র হিমাচল চিহ্নিত আমাদের এই ভারতভূমির শত্রুকবল হতে সর্বাঙ্গীন মুক্তি। মেবার-কেশরী রাণা প্রতাপের ন্যায় আমরাও এই কঠিন সংকল্প করেছি—যতদিন না ভারতভূমি চৈনিক রাহুমুক্ত হয়, সমস্ত বিলাস-ব্যসন বর্জন করে শত্রুবিতাড়নে সর্বপ্রকারে আমরা আমাদের গণরাষ্ট্রশক্তিকে অজেয় করে তুলবো।

ভগবানের রাজত্বে কোনও ঘটনাই কার্যকারণবিহীন নয়। লাল চীনের আক্রমণ অনেক কিছুই আমাদের চোখে আঙ্গুল ফুটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা নতুন করে শিখেছি—দুর্জনকে বিশ্বাস করতে নেই। 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই" করে ভাবের আবেগে আমরাই তাদের কোল দিয়েছিলাম—কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা জেনেছি আদর্শের সংঘাতে ও প্রয়োজনের তাগিদে কৃত্রিম বন্ধুত্ব টেঁকে না—সেটা কোনও দিনই দেশের ও দশের পথ্য নয়। ক্ষমা ও তিতিক্ষার মূল্য আছে, যদি সেটা দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সমপ্রাণের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অযৌক্তিক দাবী প্রবলের অবসরটুকু শত্রুকে সুযোগ এনে দেয়—। আফ্রো-এশীয় সম্মেলন বা ভারত-চীনের আলোচনা কোন্ সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করবে, তা' এখনই বলা যায় না—কিন্তু যে সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছি, সেই অনুসারে, আমাদের সংশপ্তক নামে অভিহিত করা যায়—মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন—শত্রুকবলিত ভারতভূমিকে পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হবে না।

উত্তরে ভারতের সীমানা ম্যাকমোহন লাইন—আমরা এটা মেনে নিয়েছি। স্বাধীন তিব্বতের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তারই স্বাক্ষর ম্যাকমোহন লাইনে। তিব্বতকে কুক্ষিগত করার পর লাল চীন তার ড্রাগনের থাবা হিমালয়ের ওপর বসাতে আরম্ভ করে, এবং সুপরিকল্পিতভাবে তার আগ্রাসী সাম্রাজ্য-লোভের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এই কাজে সে

নিজেকে ঢেলে দিয়েছে: নূতন মানচিত্র তৈরী করে সে সমগ্র হিমালয়ের প্রভুত্ব কামনা করে। বর্তমান চৈনিক আক্রমণ যে আরও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই. ফলে, বিপদ শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়াবাসীর এবং সমস্ত পৃথিবীর। লাল চীনের যুক্তিহীন জঙ্গীবাদ যে কোনও আভ্যন্তরিক কারণেই উদ্ভূত হোক না কেন, যে কোনও প্রয়োজনের খাতিরেই অবলম্বিত হোক না কেন, সমগ্র বিশ্বের ভারকেন্দ্রকেই বিচলিত করেছে এবং এই বিবেকহীন পররাজ্যগ্রাসী জিঘাংসাবৃত্তি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছে।

দীর্ঘদিনব্যাপী এই শয়তানি চালিয়ে লাল চীন ভারতের লাদক অঞ্চলে এবং পূর্ব সীমান্তে নেফা অঞ্চলে হাজার হাজার মাইল জমি দখল করেছে এবং সেই জায়গায় তার অধিকার কায়েম করার সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত, পথঘাট নির্মাণ করে মূল চীন ভূভাগের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র রচনা করেছে। পঞ্চশীলের স্বাক্ষরকারী লাল চীন মুখে বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়ায় আর সমরশক্তি বৃদ্ধি করে—"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" এই প্রতিবেশীর হীন চক্রান্তে আমরা প্রতারিত হয়েছি—আমাদের শিয়রের কালান্তক শত্রুকে কোল দিতে চেয়েছি—এই আত্ম-গ্লানির প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে। সংকল্পে আমরা কঠিন হবো—সমরাঙ্গনে আমরা দুর্জয় হব—স্বদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিতেও পরাঙ্মুখ হব না—শত্রুকে বিতাড়িত করতে বজ্রকঠিন পৌরুষের সঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিজয়ী ভারতবর্ষে আমরা বেঁচে থাকতে চাই। যে স্বাধীনতা আমরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করেছি—সেই স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে, ভারতের সার্বভৌম অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের নর-নারী আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই অভ্যুত্থান সাময়িক নয়—সামগ্রিক, উত্তেজনা নয়, উৎসাহের নব উদ্দীপনা, ভাবাবেগ নয়, আমাদের সাধনা।

কাশ্মীর সীমান্তে লদাক অঞ্চলে বারো হাজার বর্গমাইল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আড়াই হাজার বর্গমাইল জমি বলপূর্বক দখল করার পর লাল চীন নিজের গরজে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। এই বিষয়ে তার কতটা কূট ছলনা আছে, দেশের নেতৃবর্গ তা ভাল-ভাবেই বুঝতে পেরেছেন। আফ্রো-এশীয় নিরপেক্ষ শক্তি-জোট সে ছলনার সূত্র আবিষ্কার যদি করতে পারেন, তবেই তাদের এই সীমান্ত নিষ্পত্তির চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্নসূত্রে যে খবর পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় না, লাল চীনের মনে স্বকার্যের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ হয়েছে; বরং কূটনীতির খেল দেখিয়ে কালহরণ ও নিজেকে সমরশাস্ত্রানুযায়ী আরও সংগঠিত করার জন্যই তার এই সদম্ভ প্রয়াস। অপরাধী হয়েও তর্জন গর্জন, সর্ত আরোপ এবং নানাবিধ হুমকী দেখিয়ে সে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চায়। সীমান্ত রেখা নিয়ে বর্তমানে কূটতর্কের যে ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হয়েছে—তার ফলে সম্মুখে যুদ্ধের বিপদ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে বিপদকে বরণ করে নিতেই হবে—নিজের জিনিস রক্ষা করতে যদি আমরা না পারি—তবে ছার আমাদের জীবনধারণ—মিথ্যে আমাদের জাতীয় অনুভূতি—নিষ্ফল আমাদের সভ্যতা-প্রয়াস। এই সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, আমরা প্রস্তুত। ভারতীয় জওয়ানেরা দেখিয়ে দিয়েছে, তারা মরতে জানে, মারতেও জানে—সংকল্পে অবিচল তারা, শির দেব, সম্মান খোয়াবে না—এই তাদের বীজমন্ত্র। যুদ্ধ তাঁদের প্রিয়কার্য নয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে, তারাও যুদ্ধবাজ হতে পারে। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও জানাতে চাই সমগ্র ভারতবাসী আছে তাদের পেছনে—ধনী-দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, চাষী মজুর, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক ও স্থপতিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, বার্তাজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, করণিক, যে যেখানে যেভাবে আছে, যার যেটুকু সহায় সম্বল আছে, যার যতখানি শক্তি আছে, সবদিয়েই সে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সংকল্প ঘোষণা করেছে। জাতীয় জাগরণের নবোদ্ভুদয়ের এই শুভলগ্নটিকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। আজ সমগ্র জাতি এক সুরে কথা বলছে—এই ঐক্যের পথে ভারতের প্রতিরক্ষা যেন সুদৃঢ় হয়। দেশপ্রেমী জনসাধারণের সংগ্রামী সংকল্পকে অটুট রাখার দায়িত্ব সরকারের হাতে। যতদিন না ভারতের সম্পূর্ণ এলাকা তার অধিগত হয়, স্বৈরাচারী কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতের সম্ভাব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বার বার দেখা গিয়েছে চীনাদের যুদ্ধবিরতি, শান্তি প্রস্তাব, আলাপ-আলোচনা নিছক ধোঁকাবাজি—সে ক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রামী জনগণের মনোবল ক্ষুণ্ণ যাতে না হয়, আমাদের সামরিক শক্তি যাতে সর্বপ্রকারে যোগান পেয়ে দুর্দমনীয় অজেয় হয়ে ওঠে, সেই চেষ্টায় আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আজ জেগে উঠেছে—তবু তথাকথিত প্রগতিবাদী আচ্ছন্নবুদ্ধি মুষ্টিমেয় কয়জন যারা আজও ইতস্ততঃ করে, তাদের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃত বিশ্ববোধের সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনও বিরোধ নেই; একটি অপরটির পরিপূরক। নিজের দেশকে যে ভালবাসে না, নিজের জাতিকে যে আপন বলে জানে না—বিশ্ববোধের অধিকার তার নেই। শুধু রাজনীতিক পরাধীনতাই নয়, বিজাতীয়ের চিন্তা ও বাক্যের অধীন হওয়াকেও আমরা ঘৃণা করি। আমার স্বর্গীয় মাতামহ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই মন্ত্রই একদিন আমার কানে ঢেলে দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশে আজ এই কথাই বলতে চাই—

হে মৃত্যুবিজয়ী বীর, তোমাদের নমস্কার করি। তোমাদের শৌর্যে, বীর্যে, ত্যাগে, পরাক্রমে আজ ভারতবর্ষ শত্রু-বিজয়ী হবে। তোমাদেরই শোণিত-সরোবরে ফুটেছে স্বাধীনতার রক্তকমল।

অমৃতপুত্র, রক্ত-তিলক
ঝলকিছে তব ভালে;
জাগো রে নূতন প্রত্যুষে
শুভ প্রত্যুষ কালে।
"মৃত্যু অথবা মুক্তি"—
সকলে শুধু এই কর পণ—
সুচির নিদ্রা অথবা
তোমার অনন্ত জাগরণ।

নেফার মানুষ : দফলা

নলিনীকুমার ভদ্র

উত্তর-পূর্ব আসামের হাবং বা হাবুং রাজ্যের 'কলিতা'-কুলের রাজা রামচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করলেন ১৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে। শাসনভার গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই হতভাগ্য রাজার অদৃষ্টাকাশে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। দুই দিক থেকে আক্রান্ত হল তাঁর রাজধানী। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে চড়াও করলেন আদিবাসী সুতিয়া (চুটিয়া) রাজা বীরভূর ওরফে বিক্রমধ্বজ, আর পশ্চিম দিক থেকে এসে হানা দিলেন বরাহী রাজা বিহপুরীয়া। ইনিও উপজাতীয় নৃপতি। লড়াইয়ে হেরে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেলেন রামচন্দ্র। রাজ্য ছেড়ে যাবার আগে অবশ্য প্রজাদের এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন যে, নববলে বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতে কোনো অনুকূল মুহূর্তে আবার তিনি ফিরে আসবেন তাদের মধ্যে। প্রজারা কিন্তু দিনের পর দিন বৃথাই তাঁর প্রত্যাবর্তন-প্রতীক্ষা করতে লাগল। সেই একান্ত বাঞ্ছিত শুভমুহূর্তটি কিন্তু আর কখনো এল না।

পলাতক রাজা শেষ পর্যন্ত গিয়ে আশ্রয় নিলেন দফলাদের মুল্লুকে। ঐ পাহাড়ী মানুষদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়লেন রাজা রামচন্দ্র এবং তাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। বর্তমান হরমাটি চা-বাগানের আন্দাজ দশ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ের ডগায় দফলাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হল মায়াপুর নামক ইঁটের তৈরি বাড়িঘরওয়ালা রাজধানী। রাজা তো ছেড়ে-আসা রাজ্যের প্রজাদের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দফলাদের নিয়ে মনের আনন্দে দিন গুজরান করতে লাগলেন। রামচন্দ্রের অনুপমা শ্রীময়ী মহিষী—যাঁর রূপের কথা রূপকথার মত আজও দফলাদের মুখে মুখে প্রচলিত, স্বামীর এই আচরণে হলেন মর্মাহত। নিজের দুই শিশুপুত্র মায়ামত্ত আর নাগমত্তকে নিয়ে নেমে এলেন তিনি সমতলে। স্বামীর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কিন্তু সকল প্রয়াসই তাঁর পর্যবসিত হল ব্যর্থতায়। **(The Background of Assamese culture by R. M. Nath)**

ওদিকে দফলাদের সঙ্গে মহরম মহরম করে জীবন কাটিয়ে দিলেন পুত্রকলত্র-বিযুক্ত রাজা রামচন্দ্র। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, সুবর্ণসিরি বিভাগের দইমুখের অনতি-দূরবর্তী ইটা পাহাড়ের উপরকার ভগ্নশেষগুলিই হচ্ছে পলাতক রাজা রামচন্দ্রের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ।

এই সুবর্ণসিরি বিভাগের পশ্চিম অঞ্চলে একদা দুর্ধর্ষ এবং রণদুর্মদ বলে কুখ্যাত দফলাদের বাস। গ্রাহাম বাউয়ার, ফন্ ফুরার হাইমেনডরফ, ইজ্জারড প্রমুখ লেখকদের বইয়ে দুর্দান্ত দফলাদের পৌণঃপুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুনজখম, রাহাজানি, লোকাপহরণ, অপ-

দফলা পুরুষ ও রমণী

রাধীর প্রতি অমানুবিক আচরণ, আবহমান কাল প্রচলিত দাসত্বপ্রথা ইত্যাদির যে-সকল ভয়াবহ বর্ণনা পাওয়া যায় তা পড়ে রীতিমত আতঙ্কিত হতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ হ'ল দফলাদের আগেকার দিনের সমাজজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের চিত্র। এক যুগ আগেও এরা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত আদিম অবস্থায়। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে এদের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। নিজেদের জাতীয় কু-প্রথাসমূহের উপর এরা আজ হয়ে উঠেছে বীতস্পৃহ। বিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রচল (**convention**) কিন্তু আজও অচল, অনড় হয়ে আছে এদের সমাজে। সেগুলি হচ্ছে বহু-বিবাহ, বিমাতৃবিবাহ, পুত্রবধূকে পত্নীরূপে গ্রহণ ইত্যাদি। এদের বিবাহ-বৈচিত্র্যের কথা পরে বলছি। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, এদের সমাজে এমন অনেক ভালো জিনিসও আছে যা রীতিমত প্রশংসার্হ।

সমতলের অধিবাসীদের নিকট দফলারা নিসি অথবা নিসাঙ্ নামে পরিচিত। নিবিড় বন-জঙ্গল এবং পাহাড়-পর্বতে সমাকীর্ণ এদের দেশ। পর্বতের উচ্চতা চার হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত। উত্তরের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা বছরের বেশীর ভাগ সময়ই থাকে তুষারাবৃত।

দফলাদের দেশে সবুজের বিপুল সমারোহ নয়নস্নিগ্ধকর। চার থেকে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে গিরিগাত্র চিরহরিৎ বনানীমণ্ডিত। বন-বনে লতাগুচ্ছ এবং শৈবাল দামে শোভিত দীর্ঘকায় বনস্পতিসমূহের পত্রচ্ছদ ভেদ করে সূর্যের রশ্মিমালা মৃত্তিকা স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে বিছানো থাকে ঝরা এবং মরা পাতার মনোরম গালিচা। বনে ওক, পাইন, চেস্‌নাট, বন্য কদলী এবং 'তাসে' নামক এক প্রকার বুনো পাম গাছের প্রাচুর্য।

লোকালয় থেকে দূরে নিবিড় বনের ভিতরে আর এক জগৎ—সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো শুয়োর প্রভৃতি হিংস্র পশুযূথ। পাহাড়গুলির দইমুখ এবং সাগালির চতুষ্পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল হচ্ছে বন্যহস্তীদের বিহারভূমি। বনের মাটিতে বুকে হাঁটে অজগর, গোখরা এবং আরো নানা জাতের সরীসৃপ।

এই রমণীয় কিন্তু দুরধিগম্য পাহাড়ে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে খানিকটা সাফ-

করা ভূমিখণ্ড। পাহাড়কে পোষ মানিয়ে মানুষ সেখানে করে নিয়েছে বাস এবং চাষবাসের ব্যবস্থা।

দফলারা সুদেহী এবং সুদর্শন। মেয়েদের রূপ-লাবণ্য, দেহ-সৌষ্ঠব, যৌবনশ্রী এবং ভ্রূবিলাসহীন সহজ সরল চাহনি মনকে মুগ্ধ করে, দাঁতগুলি অতি শুভ্র, ঠোঁটে তাদের মন-ভুলানো হাসি লেগেই আছে। বাচ্চাদের গোলাপী গাল-গুলো দেখলে আদর করে টিপে দিতে ইচ্ছা হয়।

এই পরম রমণীয় দেশে এক পাহাড়ের ডগায় উঠে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে অনতিদূরে অন্য পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনের পটভূমিকায় লম্বা কুঁড়েঘর এবং ধূসর ও কালো রঙের চালাবিশিষ্ট গোলা-বাড়ি সম্বলিত গ্রামগুলিকে দেখায় ছবির মতো। খাড়া পাহাড়ের মাথায় ছড়ানো রয়েছে ঘরবাড়িগুলি, দূরে এবং নিকট জঙ্গল-সাফ-করা আবাদী জমি পিছনের গিরিমালার একেবারে শিখরদেশ পর্যন্ত চিরহরিৎ নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন। বহু নিম্নে বয়ে চলেছে একটি নদী অথবা একটি পাহাড়ী 'ছড়া' (অগভীর ছোট নদী)। দুই তীরে বনজ উদ্ভিজ্জের শ্যাম সমারোহ, মাঝে মাঝে আরণ্য-কুসুমের অজস্রতা। সবচেয়ে সুন্দর অবশ্য মেংগো এবং পাজির মত গ্রামগুলি—যারা দাঁড়িয়ে আছে তুষার-কিরীটী নীল শৈলমালার নয়নসুভগ পটভূমিকায়। আকাশের সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে স্তরে স্তরে সাজানো অথবা খণ্ড খণ্ড মেঘ। শাদা তুষারের পুরু চাদরে ঢাকা নীচেকার উপত্যকাভূমি এবং তার কোলাশ্রয়ী গ্রামগুলি।

দফলাদের বাসগৃহ খুঁটির উপর তৈরী এবং খুব লম্বা, চওড়াই কিন্তু খুব কম—মাত্র আঠারো থেকে কুড়ি ফুট পর্যন্ত। পঞ্চাশ গজ লম্বা এমন ঘরও দফলাদের মুল্লুকে বিরল নয় যাতে একসঙ্গে বাস করে দশটিরও অধিক পরিবার।

দফলা পুরুষদের প্রধান পরিধেয় একটি মোটা কটিবাস, গায়ে জড়ানো থাকে একটি চাদর অথবা কম্বল। গলায় পরে তারা সাদা, লাল, নীল, সবুজ, ধূসর ইত্যাদি হরেক রঙের কাচের মালা। এগুলির সঙ্গে গাঁথা থাকে পিতলের চেন, শূয়রের দাঁত, হরিণের শিং ইত্যাদি। ডান কব্জিতে শোভা পায় কতক-গুলি চুড়ি। কোমরের চার পাশে জড়িয়ে রাখে কতকগুলি বেতের আংটা, হাঁটুর নীচে পরে বেত দিয়ে বোনা এক জোড়া পাদচ্ছদ। একটি প্রকাণ্ড দা এবং ছুরি সব সময় থাকবেই দফলা পুরুষদের হাতে। এদের সাজ-সজ্জার মধ্যে দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে শৃঙ্গচঞ্চু পাখীর শাদা এবং কালো রঙের পালকে শোভিত বেতের টুপী। বিচিত্র রকমের সাজ-পোশাকে বলিষ্ঠ, বীর্যবান দফলা পুরুষদের এমন চমৎকার মানায় যে, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে ইচ্ছা হয়।

সাদাসিধে পোশাক-পরা দফলা-সুন্দরীরাও কম মনোমোহিনী নয়। মাথার মাঝখানে তাদের সিঁথি কাটা। দুপাশের অবেণী-সংবদ্ধ কেশপাশ ছড়ানো পিঠের ওপর। পুরুষদের মতো মেয়েরাও গলায় পরে বহুরঙা কাচের কয়েক নর-হার। তার উপর আবার গলা থেকে বুকের উপর ঝুলিয়ে রাখে কতকগুলি ধাতব ঘণ্টা, পিতলের চেন এমনকি চায়ের চামচ পর্যন্ত। কানে পরে প্রকাণ্ড সীসের আঙটি। পরনে তাদের সবুজ পাড়-দেওয়া ডোরাকাটা বস্ত্রখণ্ড। এর উপরে জড়িয়ে রাখে পুরুষদেরই মতো একটি চাদর, আর্তিপিনদ্ধ বক্ষোবাসে স্তনযুগল আবৃত, স্তন-চূড়াগ্র যেন বুকের বসন ভেদ করে ফুটে বেরুতে চায়। মুক্তামসৃণ নিরাবরণ বাহু দুটি নিরাবরণ। নীবিবন্ধ বেতের তৈরী, অনেকগুলি 'হুফি' অর্থাৎ দুই সারি ধাতব গোল চাকতি দ্বারা খচিত। পায়ের গিঁটের উপর খুব আঁট-সাঁট এক রকমের বেতের পাদচ্ছদ পরবার রেওয়াজ আছে দফলা মেয়েদের মধ্যে। এতে চরণযুগলের শোভাবৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, বরং পায়ে ঘা হয়ে যায়।

বহুবিবাহ প্রচলিত দফলাদের সমাজে, কাজেই বহুজনকে নিয়ে এদের পরিবার। পরিবারে আছেন খোদ কর্তা, তাঁর অনেকগুলি স্ত্রী, অনেকগুলি অবি-বাহিত ছেলেমেয়ে, আর শিশুর দল।

বহুপত্নীক পরিবারে শান্তিপূর্ণ সহা-বস্থানের যে দৃষ্টান্ত দেখা যায়, বাস্ত-বিকই তা প্রশংসনীয়।

ছেলেমেয়েদের বিয়ে সাধারণত ঠিক করে তাদের বাপ-মা। এবং কন্যাপণ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি হয় যথেষ্ট। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা প্রচলিত বলে প্রেমঘটিত বিবাহেরও রেওয়াজ আছে এদের মধ্যে। বিয়েতে বাপ-মায়ের সম্মতি না থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে পরিণাম উপেক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয় প্রণয়ী-যুগল। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক অনুরাগ এবং হৃদয়াবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে ইয়ুবা অঞ্চলের একটি আবিয়ু বা প্রণয়-সঙ্গীতে :

দুজনেই পা দিয়েছি যৌবনের প্রথম
ধাপে
এসো পরস্পরের বন্ধু হই আমরা ;
আঁকড়ে ধরে থাকবো আমরা
দুজনে দুজনাকে
একজোড়া কচি কলাপাতার মত।
একসঙ্গে পাহাড়ে চড়াই করব :
তুমি আর আমি
চলার পথে যদি পার হতে হয়
পাহাড়িয়া নদী
একই সঙ্গে হবে আমাদের উত্তরণ।

আরো আছে :

একত্রে জমি চষব আমরা
তারপর একদিন হব বুড়ো,
মাথার চুল আমাদের হবে সাদা
দাঁতগুলি একে একে পড়বে খসি।
তবুও বেঁচে থাকব : তুমি আর আমি।

বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরই দফলা যুবকের মনে যত অধিকসংখ্যক-সম্ভব মেয়েকে বিয়ে করবার উচ্চাশা জাগে। তেজি গ্রামের লিখা দফলা বেশ তেজ দেখিয়ে জাঁক করে বলে, "আমার আটটা বৌ, তাদের নিয়ে নিজের বাড়ীতে বেশ সুখে আছি আমি। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে সব কয়টাকে বিয়ে করেছি। অবশ্য আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই আমার।" লিখার কথা থেকে বোঝা গেল,
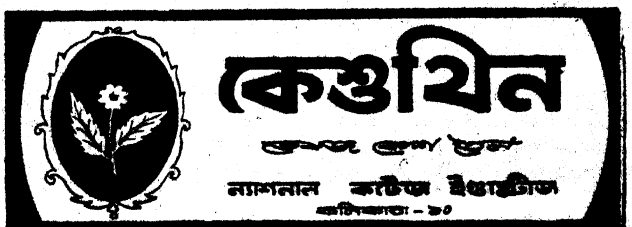
ক্ষেত্রবিশেষে দফলা যুবকের অমতেও অরুচি হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিবাহিত যুবক নিজেই অগ্রণী হয়ে নিজের পাত্রী নির্বাচন করে। আর সেরা পাত্রী হচ্ছে মামাতো বোন। মাংস, কাচের মালা ইত্যাদি ভেটসহ লায়েক ভাগ্নে যখন ঘন ঘন মাতুলালয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকে তখনই বুঝতে হবে মামাতো বোনকে তার মনে ধরেছে। সে তার পাণিপ্রার্থী। আকার-ইঙ্গিতে মাতুলের নিকট সে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করে। বিয়ের পাকা কথা-বার্তা হয় কিন্তু বরের বাপ ও কনের বা পর মধ্যে। কন্যাপণের পরিমাণ সাব্যস্ত হলে পর দিনস্থির করা হয়।

অবধারিত দিবসে বর এবং বরযাত্রী-দল সহ বরের পিতা গিয়ে হাজির হয় কনের পিত্রালয়ে। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কনের পিতা একটি শুকর বধ করে, অনেকগুলি চোঙা মদে ভর্তি করে রাখে এবং অভ্যাগতদের সম্মাননার জন্যে ভোজের আয়োজনে ব্যাপৃত হয়। বরপক্ষ কনের বাড়ীতে থাকে তিন দিন। ঐ দিবস-ত্রয় প্রতি রাত্রে উভয় পক্ষের পুরোহিত-দের কণ্ঠে উদ্গীত হয় 'ইদ' গীতি। এ অনেকটা আমাদের কবির গানের লড়াইয়ের মত। প্রতিপক্ষকে জব্দ করাই এর উদ্দেশ্য। কন্যাপণ দেওয়ার ব্যাপারটা চুকে গেলে পর কনেকে নিয়ে আসা হয় তার স্বামীগৃহে।

আসুর বিবাহেরও রীতি আছে দফলাদের সমাজে। মাঝে মাঝে কুমারী কন্যা পিত্রালয় থেকে (এবং বিবাহিতা বধূ স্বামীগৃহ থেকে) পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় প্রণয়ীর আবাসে। পিতা তখন তৎপর হয়ে ওঠে পলাতকা কন্যার অনুসন্ধানে এবং যদি তার পাত্তা মেলে তাহলে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাধ্য-মত প্রয়াস পায়। ক্ষেত্রবিশেষ বলপ্রয়োগ করাও হয়। প্রণয়ী যদি তার মনোনীতা এবং আশ্রিতার পিতাকে কন্যাপণ দিয়ে দেয় তো সমস্যা চুকে গেল। অন্যথা হলেই সৃষ্টি হয় নানা রকম জটিলতার। যত হাঙ্গামার মূলে এই কন্যাপণ।

গাঙকু গ্রামের মেয়ে ইয়াসাপের বিয়ে হল টোক গাঁয়ের একটি পুরুষের সঙ্গে। ইয়াসাপ ছিল পিতৃহীনা, কাজেই তার দেহের মূল্য পেলে তার ভাই এপা। মেয়েটি স্বামীর ঘর করতে গেল বটে, কিন্তু বরকে তার পছন্দ হল না মোটেই। ফলে স্বামীও তার সঙ্গে শুরু করল দুর্ব্যবহার। একনাগাড়ে চলল মারধোর আর গালিগালাজ, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। স্বৈরিণী ঘরণীকে টিট করার জন্যে স্বামী তখন তার মাথায় চুলগুলি কেটে ফেলে এবং এই বলে শাসায় যে, ফের যদি সে সটকানোর চেষ্টা করে তাহলে তুকতাকের সাহায্যে তাকে সে মেরেই ফেলবে। এই শাসানিতেও কিন্তু সুরাহা হয় না। কৌশলে সকলের চোখ এড়িয়ে একদিন মেয়েটি এসে উপস্থিত হয় তার ভাইয়ের আস্তানায়। এখানেই কিন্তু ইতি হয় না, কয়েক মাসের মধ্যেই

বর্ষাতি গায়ে জনৈক দফলা

ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় রীতিমত ঘোরালো। ইয়াসাপের স্বামী বৌয়ের দেহের মূল্য হিসেবে দেওয়া মিথানগুলি (ষাঁড়) আদায় করতে অপারগ হয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে এপার মিথানগুলি ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে। মেজাজ বিগড়ে যায় এপার, সবটা দোষ চাপায় সে ইয়াসাপের ঘাড়ে। খোলাখুলিভাবে বোনকে সে জানিয়ে দেয় যে, এ বাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না তার। কি করবে ইয়াসাপ। একেবারে ধনুকভাঙা পণ তার, বর্বরের মত যে দিনরাত ঠ্যাঙ্গায় এমন বরের ঘর কিছুতেই করবে না সে। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের বাড়ী ছেড়ে এক প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ইয়াসাপ।

এপার মেজাজ কিন্তু এতেও ঠাণ্ডা হয় না। বোন্‌কে এ পাড়ায় কিছুতেই থাকতে দেবে না এপা। তাকে সে এ মহল্লা ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেতে বলে। বেচারার এতগুলি মিথান হাতছাড়া হয়ে গেল। এ দুঃখ রাখবার কি আর জায়গা আছে! ভাইয়ের চোখ-রাঙানি আর ধমকানির চোটে শেষ পর্যন্ত লুঙবা গ্রামের এমন একটি যুবককে বিয়ে করতে সম্মতি দেয় ইয়াসাপ যে এপাকে তার বোনের দেহের মূল্য অচিরেই দিয়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইয়াসাপ চলে যায় দুই নম্বর স্বামীর ঘর করতে, ভগ্নীপণ কিন্তু এখনো আদায় করতে পারে নি এপা।

দফলা সমাজ-বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির বিধবারা পড়ে তার উত্তরাধিকারী-দের ভাগে। ছেলে মারা গেলে বাপ নিজেই বিধবা পুত্রবধূর ভর্তা হয়ে বসেন। অবশ্য সামাজিক অনুমোদন থাকলেও এ ধরনের ঘটনা যে হামেশাই ঘটছে তেমন নয়।

দফলাদের আত্মীয়াদের মধ্যে যৌন-মিলন নিষিদ্ধ শুধু পিতৃস্বসা, পিসতুত বোন, পিসতুত বোনের মেয়ে, এক কথায় পিসিঠাকরুণের গোষ্ঠীর নারীদের ক্ষেত্রে। তা-ছাড়া বিমাতা বল, খুড়ী, জেঠী, মামী, মাসী বল, খুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত বোন বল, ভ্রাতৃবধূ বল, বিয়ের বাজারে কেউই ফেলনা নয়, এখানে সবাই সমান। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, ছেলে বেঁচে থাকতেই বাপ তার বৌকে জবর-দখল করে নিজের ধর্মসহচরী এবং কর্মসহচরী করে নিয়েছে।

দফলাদের বিবাহ-বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে একথাই কি বলতে ইচ্ছে হয় না যে, সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

এই বিচিত্র দেশের বিবাহ-অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে নাচ। একটা ধাতব পাত্র বাজিয়ে নানা রকম দেহভঙ্গি সহকারে নৃত্য করে নাচিয়েরা। ইয়ুলো পরবে নাচ অপরিহার্য। এতে নৃত্যকারীরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে সোজা ভাবে দাঁড়ায়, শেষে দেহকে অবনমিত করে নৃত্যছন্দে। ফসল কাটা অথবা সফল শিকারের পরও হয় নৃত্যানুষ্ঠান।

আগেকার দিনে দফলারা ছিল ওস্তাদ যোদ্ধা। শত্রুকে নিহত করে হন্তারক যোদ্ধা কেটে নিত তার বাঁ হাতের পাঞ্জা এবং বর্শার ডগায় সেটি ঝুলিয়ে নিজের গাঁয়ের পানে ছুট দিত ঊর্ধ্বশ্বাসে। দলের আর সবাই তার পেছনে পেছনে ছুটত দা ঘোরাতে ঘোরাতে। গ্রামে প্রবেশ করে শত্রুর ছিন্ন হস্ত নিয়ে যাওয়া হত নিলা সেঙ্নে নামে অভিহিত একটি পবিত্র বৃক্ষের নীচে। চেরা বাঁশ দিয়ে তৈরী 'রা' পাতায় শোভিত একটি ক্ষুদ্র আবরণী গাছের গুঁড়ির চারদিকে জড়িয়ে, কাটা পাঞ্জাটিকে লোহার পেরেক মেরে তাতে বসানো হত। অতঃপর একটির পর একটি করে অগণিত তীর ছোঁড়া হত সেই ছিন্ন হস্তের উপর। এমনিভাবে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে সবাই ফিরে আসত যে যার ঘরে। দফলাদের মধ্যে এই কুপ্রথা আজ বিলুপ্ত, কিন্তু সম্প্রতি সংবাদপত্রে কলকাতায় সংঘটিত ছিন্নহস্তের বিবরণ পড়ে মনে হল প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করবার যে সকল বর্বরোচিত আচরণ পাহাড়ী মানুষরা বর্জন করেছে, সেগুলি কি ধীরে ধীরে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজে এসে শিকড় গাড়ছে।

দফলাদের বিশ্বাস যে, এই পৃথিবী অগণিত উইয়ু বা অপদেবতাসমূহে পরিপূর্ণ। উইয়ুদের এরা অত্যন্ত সমীহ করে চলে। এরা মনে করে যে ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ উইয়ুদের অপকর্ম।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'— অর্থাৎ কে চেষ্টা করত, কেই বা বেঁচে থাকত যদি না আকাশে থাকত আনন্দ। আর দফলা ধার্মিক ব্যক্তিরা বলে, "জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ যদি না আকাশ থেকে আলো দিতেন আনে দুইনি অর্থাৎ 'জগন্মাতা' (?) সূর্যদেবতা।

কারো অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলে পর তার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা তার বিছানার চারপাশ ঘিরে বসে এবং ঘন ঘন তার নাড়ী দেখতে থাকে। নাড়ির স্পন্দন যখন থেমে যায় তখন স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে একসঙ্গে কান্না এবং তার-স্বরে বিলাপ জুড়ে দেয়। বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী স্বজনবিয়োগবিধুর দফলাদের এই গগনভেদী রোদনরোল। মৃতদেহকে সমাহিত করা হয় বাড়ীর কাছেই। সংকারভূমিতে বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় একটি ফটক। শবদেহকে মাটিতে গোর দেওয়া হলে পর একটি স্ত্রীলোক সেখানে জল ছিটিয়ে দেয়।

দফলারা গর্বিত, সাহসী এবং পৌরুষসম্পন্ন মানুষ। খুবই দুঃখের কথা যে বহু সদ্‌গুণসত্ত্বেও অতীতে এরা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল লুণ্ঠনকারী এবং বিশ্বাসঘাতকরূপে। পাহাড় অঞ্চলে প্রশাসনের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এরা শান্তিপূর্ণ জীবনধারার অনুবর্তন করে চলেছে এবং যেভাবে ধীরে ধীরে তারা অন্ধকার থেকে এগিয়ে চলেছে আলোর পথে তাতে মনে হয় যে, আগামীদিনের ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক নরগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের জন্যেও নির্দিষ্ট হবে একটি গৌরবের আসন, সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে তাদের সহযোগিতাও গণ্য হবে অপরিহার্য বলে!

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

১৮৯৪ সালে আমাদের কাজ নিয়ে লেখা মোটা মোটা তিনটে পাণ্ডুলিপি খণ্ডের দিকে যখনই তাকাই, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এত রাশি রাশি মূল্যবান উপাদানের মধ্যে থেকে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরব, তা স্থির করা খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে আমার পক্ষে। কেসগুলো শুধু রীতিমত চিত্তাকর্ষক হলেই তো চলবে না, যে সব বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় আমার বন্ধুটির এত নামযশ, তারও চরম প্রকাশ থাকা চাই প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে। পাতা উলটোতে উলটোতে চোখে পড়ছে লাল জোঁকের গা ঘিনঘিনে গল্প আর ব্যাঙ্কার ক্রশবির শোচনীয় মৃত্যু সংক্রান্ত লেখা তথ্য। য়্যাড্‌ল্‌টনের ট্র্যাজেডী আর বৃটেনের সুপ্রাচীন মাটির ঢিবির অত্যাশ্চর্য উপাখ্যানের বিবরণও রয়েছে দেখছি। স্মিথ-মর্টিমারের বিখ্যাত উত্তরাধিকারের মামলাও ঘটেছিল এই সময়েরই মধ্যেই। তাছাড়াও রয়েছে বুলভার-এর গুপ্ত হত্যাকারী হারেটের পশ্চাদপসরণ এবং গ্রেপ্তার সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং অর্ডার অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত চিঠিতে হোম্‌স্‌কে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তার এই কীর্তির জন্যে। প্রতিটি কেস নিয়ে এক একটি কাহিনীর সৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু সব কিছু বিচার করে দেখতে গেলে আমার মতে, ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের উপসংহারের মত কোন কেসটিতেই এতগুলি অসাধারণ পয়েন্টের একত্র সমাবেশ ঘটেনি। এই কেসেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে তরুণ উইলোবি স্মিথ। শুধু তাই নয়, এর পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা থেকেই প্রকাশ পায় খুনের কারণ। সে তথ্য যেমন বিচিত্র, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক।

নভেম্বরের শেষাশেষি সে রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। সন্ধ্যে থেকেই চুপচাপ বসেছিলাম আমি আর হোম্‌স্‌। হোম্‌স্‌ ব্যস্ত ছিল একটা সুপ্রাচীন পার্চমেন্ট কাগজের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। এ জাতীয় পাণ্ডুলিপি-কাগজে প্রথমবারের লেখা তুলে ফেলা হয় দ্বিতীয়বার লেখবার জন্যে। শক্তিশালী একটা লেন্‌স্‌ নিয়ে হোম্‌স্‌ তন্ময় হয়েছিল এই প্রথম সাংকেতিক লিখনেরই মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টায়। আর, আমি নিবিষ্ট হয়ে ছিলাম সার্জারীর একটা সাম্প্রতিক কেতাব নিয়ে। বাইরে বাতাস গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠে

খেয়ে চলেছিল বেকার স্ট্রীট বরাবর। আর, দারুণ বেগে বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছিল জানলার পাল্লার ওপর। শহরের বুকের ওপর প্রকৃতির এই প্রলয়-নাচন ভাবতেও অদ্ভুত লাগে। আমাদের চারদিকে দশ মাইল পর্যন্ত মানুষের হাতেগড়া এই শহর আর তারই ওপর প্রকৃতির এই রুদ্র-লীলা। ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, প্রচণ্ড এই ভৌতিক শক্তিগুলির কাছে প্রান্তরের মাঝে উইয়ের ঢিপির মতই অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছিল সারা লণ্ডন। জানলার সামনে গিয়ে জনহীন রাস্তার পানে তাকালাম আমি। কাদামাখা পথ আর চকচকে ফুটপাতের মাঝে মাঝে দপ দপ করে জ্বলছিল রাস্তার বাতিগুলো। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের প্রান্ত থেকে জল ছিটিয়ে পথ করে নিচ্ছিল একটি মাত্র ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী।

"ভালই হল, ওয়াটসন। আজ রাতে তাহলে আর বেরোতে হচ্ছে না আমাদের।" লেনসটা সরিয়ে রেখে পার্চমেন্ট কাগজের পাণ্ডুলিপিটা পাকাতে পাকাতে বলল হোম্‌স্‌। "একবার বসেই বিস্তর কাজ করে ফেলেছি। চোখ টনটন করছে আমার। খুবদূর বুঝছি, এ ঘটনা ম্যাবি'র চাইতে চাঞ্চল্যকর নয়। কাহিনীর শুরু পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। আরে! আরে! আরে! একি?"

বাতাসের গোঙানির মধ্যে থেকেই ভেসে এল খটাখট খটাখট অশ্বখুরধ্বনি এবং পাথুরে রাস্তার ওপর গড়ানো চাকার একটানা কর্কশ ঘড় ঘড় শব্দ। যে গাড়ীটা আমি দেখেছিলাম দূরে, সেইটাই এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়।

ভেতর থেকে নেমে এল একজন পুরুষ। অবাক হয়ে যাই আমি—"কি চান উনি?"

"চান! উনি চান আমাদের। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আর আমরা চাই ওভার-কোট, গলাবন্ধ, চামড়ার গাম-বুট। এ রকম আবহাওয়ার সংগে লড়াই করার আজ পর্যন্ত মানুষ যা যা উপায় আবিষ্কার করেছে, চাই তাদের প্রত্যেকটি। সবুর, সবুর! ঐ শোন, গাড়ীটা আবার চলে গেল। তাহলে আশা আছে এখনও। আমাদের নিয়ে যাওয়ার বাসনা থাকলে গাড়ীটা রেখে দিতেন ভদ্রলোক। আরে ভায়া, দৌড়োও। চটপট দরজাটা খুলে দাও গিয়ে—লণ্ডনের প্রতিটি সজ্জন ব্যক্তিই অনেকক্ষণ আগেই বিছানায় সেঁধিয়েছে।"

হলঘরের বাতির আলো মধ্যরাতের দর্শনপ্রার্থীর মুখে পড়তেই তাকে চিনতে আর দেরী হল না আমার। লোকটি স্ট্যানলী হপকিন্‌স্‌—তরুণ সরকারী গোয়েন্দা। দিন দিন হপকিন্‌সের সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার ভবিষ্যৎ আছে। অনেকবার তার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে হোম্‌স্‌ এবং হাতেনাতে সাহায্যও করেছে।

"উনি আছেন?" সাগ্রহে শুধোয় হপকিন্‌স্‌।

"চলে এস, মাই ডিয়ার স্যার, 'ওপর থেকে ভেসে আসে হোম্‌সের স্বর। "আশা করি এরকম রাতে আমাদের বাইরে বার করার কোন অভিসন্ধি নিয়ে আস নি তুমি?"

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল গোয়েন্দা-প্রবর। চকচকে বর্ষাতি জ্বলজ্বল করতে লাগল বাতির আলোয়। ভিজে বর্ষাতিটা খুলে ফেলতে সাহায্য করলাম আমি। হোম্‌স চুল্লী খুঁচিয়ে গনগনে করে তুলল আগুনটাকে।

তারপর বললে, "মাই ডিয়ার হপকিন্‌স্‌, এবার জুতোটুতো খুলে ফেলে পায়ের আঙুলগুলো গরম করে নাও। এই নাও একটা সিগার। এরকম রাতে ডাক্তারের একটা প্রেসক্রিপসন আছে—গরম জলের সংগে নেবুর রস। খুবই কাজ দেয় ওষুধটা এ ধরনের আব-হাওয়ায়। এই ঝড়-তুফান মাথায় করে যখন এসেছ, তখন কাজটা দরকারী না হয়ে যায় না, কি বল?"

"বাস্তবিকই তাই, মিঃ হোম্‌স্‌। সারা বিকেলটা দম ফেলবার ফুরসৎ পাইনি। কোন দৈনিকের শেষ সংস্করণে 'ইয়স্কলে' কেস সম্পর্কে কিছু দেখেছেন?"

"পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের কিছুই আজ আমি দেখিনি।"

"খুবই ছোট খবর—একটা মাত্র প্যারা-গ্রাফ। তাও আগাগোড়া ভুল—কাজেই কিছুই চোখ এড়োয়নি আপনার। আমিও উ ঠপড়ে লেগেছি এ ব্যাপার নিয়ে, কাজে ফাঁক রাখিনি কোথাও। ঘটনাটা ঘটেছে কেন্টে, চ্যাথাম থেকে সাত মাইল দূরে আর রেল-স্টেশন থেকে তিন মাইল ভেতরে একটা জায়গায়। সওয়া তিনটের টেলিগ্রাম পাই আমি। পাঁচটায় পৌঁছোই ইয়স্কলে ওল্ড প্লেসে। সরেজমিন তদন্ত শেষ করে শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি চেয়ারিং ক্রশে। সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে সিধে আসছি আপনার কাছে।"

"তার মানে, আমার বিশ্বাস, কেসটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা এখনও পরিষ্কার হয়নি?"

"ব্যাপারটার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি আমি। দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে, এ ধরনের বিদঘুটে জটিল কেস নিয়ে কোনদিনই আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন, প্রথম প্রথম কেসটাকে দারুণ সহজ মনে হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, এত সোজা ব্যাপারে কেউই ভুল করতে পারে না। মিঃ হোম্‌স, মোটিভের নাম-গন্ধ নেই এ কেসে। আমার এত ভাবনা শুধু এই কারণেই—কোনমতেই একটা মোটিভের নাগাল পাচ্ছি না আমি। একটা পুরুষ যে মারা গেছে, তা অস্বীকার করবার জোটি নেই। কিন্তু অনেক ভেবেও তো আমি দিশে পাচ্ছি না যে লোকটার ক্ষতি করবার চেষ্টাই বা কেউ করবে কেন?"

সিগারটা ধরিয়ে নিলে হোম্‌স্‌। তারপর, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, "ব্যাপারটা শোনাও দিকি।"

"জলের মতই পরিষ্কার ঘটনাগুলো," বললে স্ট্যানলী হপকিন্‌স্‌। "এখন শুধু জানতে চাই যে এ সবের আসল মানেটা কি। গল্পটা যতদূর খাড়া করতে পেরেছি, তা এই। কয়েক বছর আগে পল্লীঅঞ্চলের এই বাড়ীটা কেনেন এক ভদ্রলোক। বাড়ীটার নাম ইয়স্কলে ওল্ড প্লেস। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। বাড়ী কেনার সময়ে তাঁর নাম বলেন, প্রফেসর কোরাম। প্রফেসর কোরাম রুগ্ন এবং চলাফেরার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্ধেক সময় পড়ে থাকেন শয্যায়। বাকী সময়টা হয় বাড়ীময় পা টেনে টেনে লাঠি ঠুক ঠুক করে ঘুরে বেড়ান, আর না হয়, বাথ-চেয়ারে বসে হাওয়া খান বাড়ীর সামনের জমিতে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাগানের মালী। প্রতি-বেশীদের কয়েকজন খুবই পছন্দ করত তাঁকে এবং কয়েকবার দেখাও করে গেছিল তাঁর সংগে। মস্ত পণ্ডিত হিসেবে ও অঞ্চলে তাঁর খুব সুনামও আছে। গৃহ-কন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্যে সংসারে আছে মিসেস্‌ মার্কার আর সুসান টার্লটন নামে এক পরিচারিকা। উনি এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকেই এই দুজনে রয়েছে তাঁর সংগে। দুজনেরই স্বভাবচরিত্র অতি চমৎকার।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা গ্রন্থ লিখছেন প্রফেসর। তাই, বছরখানেক আগে তাঁর একজন সেক্রেটারীর দরকার হয়। প্রথম দু'জনকে নিয়ে সুবিধে করে উঠতে পারেন নি প্রফেসর। কিন্তু তৃতীয় জন আসার পর যারপরনাই খুশী হলেন উনি। মিঃ উইলোবি স্মিথ বয়েসে একদম তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিধে আসে প্রফেসরের চাকরীতে। কাজকর্ম দেখিয়ে দু'দিনেই কর্মকর্তার মনোমত হয়ে উঠল সে। সারা সকাল প্রফেসরের ডিকটেশন লিখে নেওয়াই তার কাজ। রেফারেন্স আর উদ্ধৃতির জন্যে কেতাব হাতড়াতেই কেটে যেত সন্ধ্যেটা। পরের দিন সকালে দরকার হ'ত এই সব তথ্য। ছেলেবেলায় আপিংহ্যামে থাকার সময়ে বা যৌবনে কেম্ব্রিজে পড়বার সময়ে কোনদিনই কোন সময়েই প্রফেসর কোরামের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগেনি উইলোবি স্মিথের এবং তাঁর বিরুদ্ধে তার কোন বিদ্বেষও নেই। আমি তার সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম, প্রথম থেকেই ভদ্র, শান্তশিষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে সুনাম কিনেছে সে। কোনরকম দুর্বলতা দেখা যায়নি তার চরিত্রে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আজ সকালে এই ছেলেটিই মারা গেছে প্রফেসরের পড়ার ঘরে—মারা গেছে এমন পরিস্থিতির মধ্যে যে যার ফলে এ মৃত্যুকে খুন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"

গোঁ গোঁ করে গজরে উঠল বাতাস—ককিয়ে কেঁদে উঠল জানলায় জানলায়। আগুনের কাছে সরে বসলাম আমি আর হোমস্। আর, একটির পর একটি পয়েণ্ট তুলে ধরে—ধীরে সুস্থে এই অতি আশ্চর্য কাহিনী বলে চলল তরুণ ইন্সপেক্টর হপকিন্স্।

"সারা ইংল্যাণ্ড তন্নতন্ন করে তল্লাশ করলেও এর চাইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা বাইরের প্রভাব-বিমুক্ত বাড়ী আর পাবেন না আপনি। সারা হপ্তা কেটে গেলেও অতগুলি লোকের মধ্যে একজনও বাগানের ফটক পেরোয় না। প্রফেসর তো নিজের কাজেই ডুবে থাকেন এবং এর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখেন না। প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে আলাপ ছিল না স্মিথ ছেলেটির। কাজেই, প্রফেসরের জীবনই যাপন করতে হ'ত তাকে। কোনমতেই বাড়ীর বাইরে আনা যেত না স্ত্রীলোক দু'জনকে। মালীর নাম মর্টিমার। মর্টিমারই বাথ-চেয়ার ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আগে আর্মিতে ছিল, এখন পেনসন ভোগ করছে। মর্টিমারের বয়স হয়েছে। ক্রিমিয়া তার মাতৃভূমি এবং স্বভাবচরিত্র চমৎকার। বাড়ীর মধ্যে সে থাকে না; থাকে বাগানের একদম শেষে তিন-ঘরওয়ালা একটা কটেজে। ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ বলতে শুধু এই ক'জনকেই আপনি পাবেন। আরও একটা কথা। বাগানের গেট থেকে মাত্র একশো গজ দূরেই আছে লণ্ডন থেকে চ্যাথাম যাওয়ার প্রধান সড়কটা। ছোট হুড়কো দিয়ে আটকানো থাকে ফটকটা। কাজেই, যে কোন বহিরাগতই ভেতরে আসতে পারে বিনা বাধায়।

"এবার শুনুন সুসান টার্লটনের সাক্ষ্য। এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন খবর যদি কেউ দিতে পারে, তবে সে এই সুসান টার্লটন। ঘটনাটা ঘটে দুপুরের আগে, এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। ওপরের তলায় সামনের শোবার ঘরে—কতকগুলো পর্দা টাঙানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুসান। প্রফেসর কোরাম বিছানা ছেড়ে ওঠেননি তখনও। আবহাওয়া খারাপ থাকলে কচিৎ বারোটার আগে শয্যাত্যাগ করেন উনি। বাড়ীর পেছনদিকে কতকগুলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল মিসেস মার্কার। উইলোবি স্মিথ ছিল তার শোবার ঘরে। শোবার ঘরটাই সে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করত। সুসান যে ঘরে ছিল, পড়ার ঘরটা ঠিক তার নীচেই। ঠিক সেই মুহূর্তে সুসান শুনতে পেলে প্যাসেজ বরাবর গিয়ে নীচের পড়ার ঘরে নেমে গেল স্মিথ। স্মিথকে সে দেখেনি বটে, তবে ও রকম চটপটে, জোরালো পায়ে চলার শব্দ শুনে নাকি কিছুতেই ভুল হতে পারে না তার। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দও সে শোনেনি। তবে, মিনিটখানেক পরেই একটা ভয়াবহ চীৎকার ভেসে আসে নীচের ঘর থেকে। ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলায় সে আর্ত-চীৎকার এমনই বিকট, অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক যে চেঁচানিটা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের, তা বোঝা মুস্কিল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় ধপ করে একটা গুরুভার বস্তু পতনের শব্দ—সমস্ত বাড়ী কেঁপে ওঠে তাতে। তারপরেই সব নিস্তব্ধ। মুহূর্তের জন্যে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুসান। পরক্ষণেই, সাহস ফিরে আসে তার। এক দৌড়ে নেমে আসে সে নীচে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল—সুসানই গিয়ে তা খোলে। ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর পড়েছিল তরুণ মিঃ উইলোবি স্মিথের দেহ। প্রথমে সুসান আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। কিন্তু দেহটা তুলতে গিয়েই সে দেখতে পায় ঘাড়ের নীচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দরদর ধারে। সামান্য এতটুকু চোট লাগলেও ক্ষতস্থান খুবই গভীর এবং ঐ এক আঘাতেই দু'টুকরো হয়ে গেছিল ক্যারোটিড ধমনী। যে হাতিয়ারে এ আঘাতের সৃষ্টি, তা পড়েছিল তার পাশেই কার্পেটের ওপর। হাতিয়ারটা গালা সীল-মোহর করার একটা ছোট্ট ছুরি। পুরোনো কায়দায় সাজানো লেখবার টেবিলে এ ধরনের ছুরি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। ছুরির হাতলটা হাতীর দাঁতের এবং ফলাটা বেশ শক্ত। প্রফেসরের নিজের টেবিলেই অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে এ ছুরিটাও ছিল।

"প্রথমে সুসান ভেবেছিল, স্মিথ বুঝি মারা গেছে। কিন্তু কাঁচের জলপাত্র ক্যারাফে থেকে জল নিয়ে কপালে

ছিটিয়ে দিতেই মুহূর্তের জন্যে চোখ খুললে ও। বিড়বিড় করে বললে, "প্রফেসর—সেই মেয়েটা।" সুসান তো দিব্যি করে বলতে রাজী আছে যে ঠিক এই শব্দ ক'টাই উচ্চারণ করেছিল স্মিথ। প্রাণপণে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিল ও—ডান হাতটা শূন্যেও তুলেছিল। তারপরেই, নিস্পন্দ হয়ে যায় তার প্রাণহীন দেহ।

"ইতিমধ্যে মিসেস মার্কারও এসে পৌঁচেছিল ঘরে। কিন্তু একটু দেরী হয়ে যাওয়ায় ছেলেটির অন্তিম কথা আর শুনতে পায়নি। সুসানকে মৃতদেহের পাশে রেখে ও দৌড়ে যায় প্রফেসরের ঘরে। বিছানায় উঠে বসেছিলেন উনি। নিদারুণ আতঙ্ক আর উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। রক্ত-জমানো ঐ চীৎকার শুনেই বোধহয় তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে, ভয়াবহ একটা কিছু ঘটেছে। মিসেস্ মার্কারের বেশ মনে আছে, তখনও রাত্রি-বাস ছিল প্রফেসরের পরনে। বাস্তবিকই, মর্টিমারের সাহায্য ছাড়া তো পোশাক পরিবর্তন করা সম্ভবও নয় তাঁর পক্ষে। মর্টিমারের ওপর আদেশ ছিল দুপুর বারোটায় সময়ে আসার। প্রফেসর বলছেন, দূর থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকার উনি শুনেছেন বটে, কিন্তু তার বেশী আর কিছুই উনি জানেন না। স্মিথ ছেলেটির শেষ কথা-কটিরও কোন অর্থ উনি বলতে পারলেন না। তাঁর মতে 'প্রফেসর—সেই মেয়েটা' কথাটা আসলে নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ও'র বিশ্বাস, দুনিয়ায় কোন শত্রু নেই উইলোবি স্মিথের এবং হত্যার কোন কারণ দর্শানোও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। প্রথমেই উনি মালী মর্টিমারকে পাঠিয়েছিলেন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আনতে। একটু পরেই প্রধান কনস্টেবল খবর পাঠায় আমাকে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসের নড়চড় হয়নি এবং কড়া হুকুম জারী করা ছিল যেন কেউ ফটক থেকে বাড়ীতে আসার পথটার ওপর চলাফেরা না করে। মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌, আপনার থিওরী কাজে লাগার এই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিছুরই অভাব ছিল না অকুস্থানে।"

"কেবল মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌ ছাড়া! তিক্ত হেসে বললে আমার বন্ধুটি। 'যাক, অকুস্থানে পৌঁছে কাজকর্ম কি রকম করলে, তাই এবার শোনা যাক।"

"মিঃ হোম্‌স্‌, প্রথমেই আপনাকে এই নক্সাটা দেখতে বলি। নক্সাটা মোটামুটি হ'লেও প্রফেসরের পড়ার ঘরের অবস্থান এবং এ কেসের অন্যান্য পয়েন্টগুলো সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা আপনি পাবেন এ থেকে। তাতে আমার তদন্ত-ধারা বুঝতে সুবিধে হ'বে আপনার।"

"নক্সাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যে পয়েন্টগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমার কাছে, শুধু সেইগুলোই ধরে রেখেছি নক্সাটায়। বাকী যা কিছু তা নিজের চোখেই পরে দেখবেন'খন। আচ্ছা, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। যদি ধরে নিই হত্যাকারী বাইরে থেকে এসেছিল বাড়ীর মধ্যে, তাহলে প্রশ্ন উঠছে কি ভাবে সে ঢুকল ভেতরে? 'সে' বলতে আমি কিন্তু পুরুষ অথবা নারী উভয়কেই বোঝাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সে ঢুকেছে পেছনকার দরজা আর বাগানের পথ দিয়ে। কেননা, এই দিক দিয়েই সোজাসুজি আসা যায় পড়ার ঘরে। অন্য কোন পথ দিয়ে আসা মানে জটিলতা রীতিমত বৃদ্ধি পাওয়া—কেননা, সেক্ষেত্রে অনেক ঘুরে তবে তাকে আসতে হত। খুনীকে পালাতেও হয়েছে
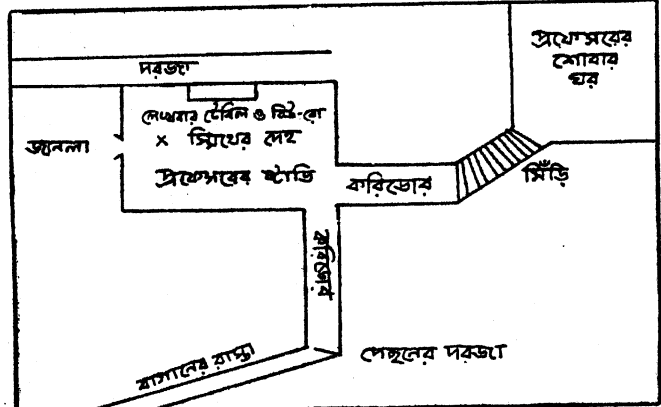
চার্টটা ভাঁজ খুলে মেঝে ধরল হপকিন্‌স্‌। নক্সাটার অবিকল প্রতিলিপি দিলাম ওপরে। হোম্‌সের হাঁটুর ওপর কাগজটা বিছিয়ে দিল হপকিন্‌স্‌। আমি উঠে গিয়ে হোম্‌সের পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ছকটা।

নিশ্চয় ঐ একই পথ দিয়ে। কেননা, ঘর থেকে বেরোবার আর দুটি পথের একটি বন্ধ করেছিল সুসান সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে। আর একটি পথ তো গেছে সিধে প্রফেসরের শোবার ঘরে। কাজে কাজেই সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ আমি বাগানের পথটা নিয়ে পড়লাম। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় জলে প্যাচপেচে হয়েছিল পথটা। সুতরাং সেখানে পায়ের ছাপ থাকা খুবেই স্বাভাবিক।

"পরীক্ষাশেষে দেখলাম, খুব হুঁশিয়ার আর পাকা ক্রিমিন্যালের সঙ্গেই কাজে নামতে হয়েছে আমায়। পথের ওপর কোন রকম পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের বর্ডারের ওপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে, সে বিষয়ে অবশ্য কোনরকম সংশয় আমার নেই। পাছে পায়ের ছাপ থেকে যায়, তাই তার এত সতর্কতা। সুস্পষ্ট ছাপ

বা ঐ জাতীয় কিছুই আমি পাইনি। না পেলেও মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসগুলোর অবস্থা দেখেই বুঝেছিলাম কেউ না কেউ হেঁটে গেছে সেখান দিয়ে। সে-ই যে হত্যাকারী তা বুঝলাম এই কারণে যে, বৃষ্টি হয়েছে রাতে। আর সকালে মালী বা বাড়ীর অন্য কেউই হেঁটে যায়নি ও পথ দিয়ে।"

"এক সেকেন্ড", বলে হোম্‌স্‌। "বাগানের ও পথটা গেছে কোথায়?"

"বড় রাস্তায়।"

"কত লম্বা এই পথটা?"

"শ' খানেক গজের মত।"

"পথটা যেখানে ফটকের মাঝ দিয়ে গেছে, সেখানেই তো পথের ছাপ পেতে?"

"দুর্ভাগ্যবশতঃ পথের ঠিক ঐ জায়গা-টাই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে টালি দিয়ে।"

"বড় রাস্তার?"

"না। জলে-কাদায় জলাভূমি তৈরী হয়ে গেছে যেখানে।"

'কী বিপদ! আচ্ছা, ঘাসের ওপর ছাপটা দেখে কি মনে হ'ল? লোকটা বাড়ীর দিকে আসছিল, না, বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল?"

"তা বলা মুস্কিল। পরিষ্কার ছাপ কোথাও পাইনি।"

"বড় পা না ছোট পা?"

"সে পার্থক্য আপনিও ধরতে পারবেন না।"

অধীরভাবে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল হোম্‌স্‌। "তারপর থেকেই তো মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে আর হ্যারি-কেনের মত তুমুল ঝড় বইতে শুরু হয়েছে। পার্চমেণ্টের ঐ পাণ্ডুলিপির চাইতেও এখন কঠিন হ'বে ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের প্রভেদ বার করা। যাক, যাক, কি আর করা যায়। তারপর, হপ-কিন্‌স্‌, তুমি যে কিছুই করতে পারো নি, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কি করলে শুনি?"

"আমার তো মনে হয় নিশ্চিত-ভাবে অনেক কিছুই আমি করেছি মিঃ হোম্‌স্‌। বাইরে থেকে যে কেউ অতি সাবধানে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে, তা আমি জেনেছি। এরপর, করিডরটা পরীক্ষা করলাম। নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো সেখানে এবং কোন রকম ছাপ তার ওপরে পড়েনি। এখান থেকেই এসে পড়লাম পড়ার ঘরে। অল্প কয়েকটি আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর। প্রধান সামগ্রী হ'ল একটা মস্তবড় লেখবার টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বিউ-রো। বিউ-রো'র দু'পাশে দু'সারি ড্রয়ার—মাঝখানে একটা ছোট্ট কাবোর্ড। ড্রয়ারগুলো খোলা ছিল বটে, কিন্তু তালাচাবী দেওয়া ছিল কাবোর্ডে। দেখে মনে হ'ল, ড্রয়ারগুলো সব সময়েই খোলা থাকে ঐভাবে এবং মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হয় না সেখানে। কাবোর্ডের মধ্যে কতকগুলো দরকারী কাগজপত্র আছে বটে, তবে এমন কোন চিহ্ন দেখলাম না যা-থেকে অনুমান করা যায় যে, কেউ কাবোর্ডটা খোলার চেষ্টা করেছিল। প্রফেসরও জানালেন যে, কিছুই চুরি যায়নি। কাজেই, চুরিচামারি যে একে-বারেই হয়নি, এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত।

"আচ্ছা, এবার আসা যাক ছেলেটির দেহ-প্রসঙ্গে। লাশটা পাওয়া গেছিল বিউ-রো'র কাছেই, একটু বাঁদিকে—চার্টে যেখানে দাগ দিয়েছি, ঠিক ঐ জায়গায়। ছুরি মারা হয়েছে ঘাড়ের ডানদিকে এবং পেছন থেকে সামনের দিকে। কাজেই, সে যে নিজেই নিজেকে ছুরি মারেনি, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকছে না।"

"ছুরি ওপরে তো পড়েও যেতে পারে," বলল হোম্‌স্‌।

"এগ্‌জ্যাক্টলি। এ ধারণা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ছুরিটাকে প'ড়ে থাকতে দেখলাম দেহের কাছ থেকে বেশ কয়েক ফুট দূরে। সুতরাং ও ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তারপরেও ধরুন, ছেলেটির অন্তিম কথাটা। এবং, সব শেষে রয়েছে মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠিতে পাওয়া এই অত্যন্ত দরকারী প্রমাণটা।"

পকেট থেকে একটা কাগজের ছোট প্যাকেট বার করল ষ্ট্যানলী হপকিন্‌স্‌। প্যাকেটটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা সোনার প্যাংসনে চশমা। কালো সিল্কের ছেঁড়া সুতোটা ঝুলছিল চশমার দু'পাশ থেকে। তারপর বললে, "উইলোবি স্মিথের দৃষ্টিশক্তি বরাবরই খুব ভাল। কাজেই এ জিনিসটি যে খুনীর চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।"

চশমাটা নিজের হাতে তুলে নিলে শার্লক হোম্‌স্‌। তারপর অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে তন্ময় হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাকের ওপর লাগিয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করল ও তার-পর উঠে গেল জানলার কাছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। ফিরে এসে বাতির নীচে জোরালো আলোয় উল্টে-পাল্টে অতি সূক্ষ্মভাবে কি যেন দেখল। সবশেষে, নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ে একটা কাগজে খসখস করে কয়েকটা লাইন লিখে টোকা মেরে কাগজটা এগিয়ে দিলে ষ্ট্যানলী হপকিন্‌সের পানে।

বললে, "তোমার জন্যে এর বেশী আর কিছু করতে পারছি না আমি। কাগজটা তোমার কাজে লাগতে পারে।"

কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল গোয়েন্দা-প্রবর। এখন কাগজটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলে। এই কথাগুলো লেখা ছিল কাগজটায় :

"অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের একজন স্ত্রীলোককে আমাদের প্রয়োজন। তার বেশভূষা ভদ্রমহিলার মত, নাক অসাধারণ রকমের মোটা এবং নাকের দু'পাশের দুই চোখ খুবই ঘেঁসাঘেঁসি। তার কপাল কুঁচকোনো, চোখ কুঁচকে তাকানোর অভ্যাস আছে এবং সম্ভবতঃ কাঁধদুটোও গোল। দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক মাসের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দু'বার চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে তাকে যেতে হয়েছে। যেহেতু তার চশমার লেন্‌সের শক্তি খুবই বেশী এবং যেহেতু চক্ষু-পরীক্ষকের সংখ্যা খুব বেশী নেই, সুতরাং তাকে খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন হবে না।"

হপকিন্‌সের অবাক চাহনি দেখে মুচকে হেসে ওঠে হোম্‌স্‌। আমারও চোখে-মুখে নিশ্চয় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা-প্রবরের বিস্ময়।

"আরে, খুবই সোজা আমার অনুমান-সিদ্ধান্ত," বলে হোম্‌স্‌। "চশমা ছাড়া এমন কোন বস্তু নেই যা থেকে এত ভূরি ভূরি অথচ নিখুঁত সিদ্ধান্ত আদায় করা যায়। এরকম কোন বস্তুর নাম করাই কঠিন হবে তোমার পক্ষে। এ চশমাটা তো দেখছি আরও অসাধারণ। প্যাংসনেটা যে স্ত্রীলোকের তা বুঝছি এর হাল্কা আর সূক্ষ্ম গড়ন দেখে এবং বিশেষ করে, মর-বার আগে স্মিথের শেষ ক'টি শব্দ থেকে। তার স্বভাব মার্জিত কিনা এবং বেশভূষা ভদ্রোচিত কিনা, তা বুঝছি সোনার চশমা দেখে। চশমাটা নিরেট সোনায় এবং সুন্দরভাবে বাঁধানো। এমন সুচিসুন্দর প্যাঁসনে যিনি চোখে লাগান,

তিনি যে অন্যান্য দিক দিয়ে অপরিচ্ছন্ন হবেন, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। চশমাটা চোখে লাগালেই দেখবে, ক্লিপটা তোমার নাকের পক্ষে খুবই চওড়া। তার মানে এই—ভদ্রমহিলার নাকটি গোড়ার দিকে খুবই মোটা। এ ধরনের নাক সাধারণতঃ ছোট আর পুরু হয়। কিন্তু এর অনেক ব্যতিক্রম আছে বলেও বর্ণনার মধ্যে এ পয়েন্ট নিয়ে জোর দিইনি অথবা আমার অনুমানই যে নির্ভুল, এমন কথাও বলিনি। আমার নিজের মুখ সরু। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাকের ওপর চশমা লাগালে কিছুতেই দুই চোখের তারাকে কাঁচ-দুটোর মাঝামাঝি বা তার কাছাকাছি আনিতে পারছি না। সুতরাং, ভদ্রমহিলার চোখদুটি যে নাকের একদম গা ঘেঁসে তা বুঝতে দেরী হ'ল না। ওয়াটসন, প্যাংসনে'টা হাতে নিলেই বুঝবে, কাঁচ দুটো কনকেভ অর্থাৎ অবতল এবং তার পাওয়ারও অস্বাভাবিক রকমের বেশী। সারাজীবন ধরে যে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি এতখানি সংকুচিত, তার দেহেতেও যে এমন চাহনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি। কপাল, চোখের পাতা আর কাঁধ—এই তিন জায়গাতেই দেখা যায় চোখ কুঁচকে তাকানোর এই সব চিহ্ন।

আমি বললাম, "তোমার যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম। কিন্তু ভাই, একটা জিনিস তো বুঝলাম না। চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে গত কয়েক মাসের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে দু'বার যেতে হয়েছে—এ তথ্যটি কি করে আবিষ্কার করলে, তা তো বোধগম্য হ'ল না।"

চশমাটা তুলে নিলে হোম্‌স্।

বললে, "হাত দিলেই বুঝবে ক্লিপের ওপর খুদে খুদে সোলার ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকের ওপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে। একটা ফিতের রঙ জ্বলে গেছে। ব্যবহারের ফলে একটু ক্ষয়েও গেছে। কিন্তু অপরটি একদম আনকোরা। কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা ফিতে পড়ে যাওয়ার পর নতুন করে লাগানো হয়েছে এই ফিতেটাকে। পুরোনো সোলটাকে কিন্তু লাগানো হয়েছে মাস কয়েকের মধ্যেই। দুটো ফিতেই দেখতে হুবহু একরকম। তাই বললাম, একই দোকানে দু'দুবার যেতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে।"

"সাবাস! তাক লাগিয়ে দিলেন দেখছি!" প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে হপকিন্‌স্। "ভাবুন তো একবার সব-ক'টা প্রমাণ হাতের মুঠোয় নিয়েও এত খবরের ছিটেফোঁটাও জানতে পারিনি আমি! অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল লণ্ডন শহরের সবগুলো চোখের ডাক্তারখানায় একবার করে ঢুঁ মেরে আসা।"

"তাতো করবেই। ইতিমধ্যে কেসটা সম্পর্কে আমাদের আর কিছু বলার আছে তোমার?"

"আর কিছুই নেই, মিঃ হোম্‌স্। আমার তো মনে হয়, আমি যা জানি, আপনিও তা জানেন—হয়তো বেশীও জানেন। গ্রামের পথে বা রেল-ষ্টেশনে কোন আগন্তুককে দেখা গেছিল কিনা এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম। কাউকে দেখা গেছে বলে কোন খবর এখনও শুনিনি। খুনটার পেছনে কোন রকম উদ্দেশ্যের নামগন্ধ নেই এবং এই না-থাকাটাই বার বার ঘুলিয়ে দিচ্ছে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি। যা হয় একটা মোটিভের ছায়াটুকু পর্যন্ত কেউ ধরে উঠতে পারল না?"

"আ! এ দিক দিয়ে অবশ্য তোমায় সাহায্য করতে পারব না আমি। তুমি কি চাও আমরা কালকে আসি তোমার সঙ্গে?"

পরের দিন যেদম হয়ে থেমে গেল উন্মাদ ঝড়ের নাচন। কিন্তু রাত ফরসা হয়ে যেতে যাত্রাশুরুর সময়ে দেখলাম এক তিক্ত সকালের অপ্রসন্ন মুখ। ম্যাড়-মেড়ে শীতার্ত সূর্য উঠছিল টেম্‌স্ নদীর দীর্ঘ, বিষণ্ণ বিস্তারের আর তার ঘোরমূর্তি জলাভূমির ওপর দিয়ে। এ দৃশ্য দেখলেই মনে পড়ে যায় আমা'দর কর্মজীবনের প্রথম দিকে আন্দামান দ্বীপবাসীর পাছু নেওয়ার ঘটনা। অনেকক্ষণ ধরে বেশ কষ্টকর যাত্রার পর চ্যাথাম থেকে কয়েক মাইল দূরের একটা ছোট্ট ষ্টেশনে নেমে পড়লাম আমরা। গাড়ীতে ঘোড়া জোতার ব্যবস্থা করে সেই অবসরে স্থানীয় সরাইখানায় নাকে-মুখে গুঁজে প্রাতরাশ শেষ করলাম সবাই।
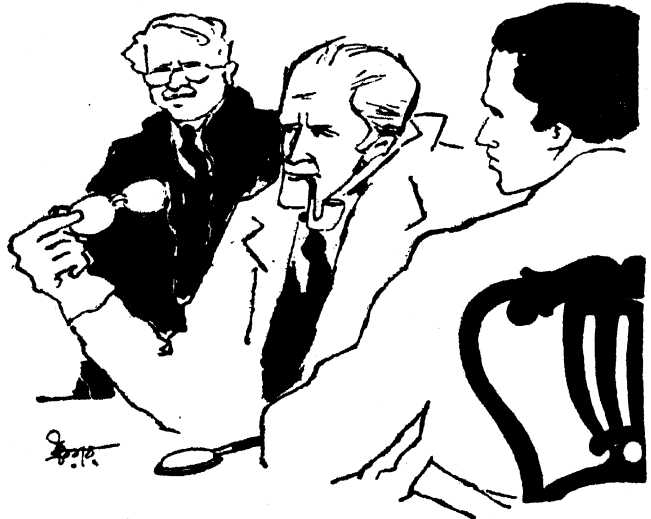
চশমাটা নিজের হাতে তুলে নিলেন শার্লক হোমস্

"চাওয়াটা যদি আমার পক্ষে অতিরিক্ত না হয়, মিঃ হোম্‌স্। তাহলে সত্যিই খুব খুশী হই আপনি এলে। সকাল ছ'টায় চেয়ারিং ক্রশ থেকে চ্যাথামের দিকে একটা ট্রেন আছে। ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে আটটা থেকে ন'টার মধ্যেই পেঁৗছে যাব আমরা।"

"তাহলে ঐ ট্রেনেই রওনা হ'ব আমরা। বাস্তবিকই কেসটায় কতকগুলো দারুণ ইণ্টারেস্টিং বৈশিষ্ট্য আছে। এমন কেসে মাথা ঘামাতে পারলে খুবই খুশী হ'ব আমি। একটা বাজতে চলল। এবার কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। আগুনের সামনে ঐ সোফাটায় নিশ্চয় ম্যানেজ করে নিতে পারবে নিজেকে। বেরোনোর আগে আমার স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালিয়ে তোমাকে এক কাপ কফিও করে দেওয়া যাবে'খন।"

কাজেই, পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে পৌঁছোলাম ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে। বাগানের ফটকে দেখা হ'ল একজন কনস্টেবলের সাথে।

"কিছু খবর আছে উইলসন?"

"না, স্যার, কিছুই নেই।"

"কোন আগন্তুককে দেখা গেছে এ অঞ্চলে?"

"না, স্যার। স্টেশনের কাছে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলছে যে, গতকাল কোনো অচেনা লোকই আসেনি বা যায়নি ও-পথ দিয়ে।"

"সরাইখানা আর হোটেলগুলোয় খোঁজ নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, স্যার। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।"

"এখান থেকে তো হে'টেই যাওয়া যায় চ্যাথাম। যে কোন' লোকের পক্ষেই ওখানে থাকা বা সবার অগোচরে ট্রেনে চড়া সম্ভব। মিঃ হোম্‌স্‌, এই সেই বাগানের পথ। আবার আমি বলছি, গতকাল কোন চিহ্ন এখানে ছিল না।"

"দাগগুলো কোন দিকের ঘাসের ওপর দেখেছিলে?"

"এইদিকে, স্যার। ফুলের ঝোপ আর রাস্তার মাঝে এই সরু ঘাসের বর্ডারের ওপর। দাগগুলো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না বটে। কিন্তু গতকাল বেশ পরিষ্কার ছিল চিহ্নগুলো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখান দিয়ে কেউ না কেউ গেছে। ঘাসের বর্ডারের ওপর ঝু'কে পড়ে বলল হোম্‌স্‌। "খুবই হু'শিয়ার হয়ে পা ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। কেননা, একটু বেসামাল হলেই পায়ের ছাপ থেকে যেত একদিকে রাস্তার ওপর। অপর দিকে পায়ের ছাপ আরও স্পষ্ট-ভাবে ফুটে উঠত ফুলের ঝোপের নরম মাটির ওপর।"

"হ্যাঁ, স্যার, মেয়েটির মাথা খুবই ঠাণ্ডা।"

অভিসন্ধি-লুকোনো চকিত চাহনি ভেসে যেতে দেখলাম হোম্‌সের ওপর দিয়ে।

"ভদ্রমহিলা এই পথ দিয়ে ফিরে এসেছেন বলছিলে না?"

"হ্যাঁ, স্যার। আর কোনও পথ ছিল না।"

"ঘাসের এই বর্ডারটার ওপর দিয়ে?"

"নিশ্চয় তাই, মিঃ হোম্‌স্‌।"

"হুম্! কাজটা খুবই অসাধারণ হে—খুবই অসাধারণ। বেশ, বেশ, আমার তো মনে হয়, পথ দেখা সাঙ্গ হয়েছে। এবার চল, এগিয়ে যাওয়া যাক। বাগানের এই ফটকটা সাধারণতঃ খোলা রাখা হয়, তাই না? তাহলে, গটগট করে ঢুকে পড়া ছাড়া মেয়েটিকে আর কিছুই করতে হয়নি দেখছি। খুন করার অভিপ্রায় তাঁর মনে ছিল না। থাকলে, উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়েই আসতেন তিনি। লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিতেন না নিশ্চয়। এই করিডরটা দিয়ে এগিয়ে গেছেন সম্ভব। মিঃ হোম্‌স্‌, এই সেই বাগানের পথ। আবার আমি বলছি, গতকাল তিনি নারকেল-দড়ির মাদুরের ওপর কোন ছাপই রেখে যাননি। তারপরেই এসে পড়লেন পড়ার ঘরে। এখানে কতক্ষণ ছিলেন তিনি? তা ধরার কোন উপায় আমাদের নেই।"

"এখানে কতক্ষণ ছিলেন তিনি?"

"কয়েক মিনিটের বেশী নয়, স্যার। আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঐ কাণ্ডের একটু আগেই ঘর পরিষ্কার করার জন্যে মিসেস মার্কার এসেছিল এখানে। মিনিট পনেরো ছিল সে এ ঘরে।"

"বেশ তাহলে খানিকটা দিশে পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলা এ ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপর করলেন কি? না, এগিয়ে গেলেন লেখবার টেবিলের কাছে। কি জন্যে? ড্রয়ারে রাখা কিছুর জন্যে নয়। তাঁর নেওয়ার মত যদি কিছু থাকে এঘরে, তবে তা তালাচাবি দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক। না, হে, না, কাঠের ঐ বিউ-রো'টার মধ্যেই ছিল কিছু। হুররে! বিউ-রো'র সামনের দিকে এ আঁচড়টা কিসের হে? দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে ধর তো, ওয়াটশন। এ আঁচড়ের কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন হপকিন্‌স্‌?"

যে দাগ নিয়ে তার এত অভিনিবেশ, তা শুরু হয়েছে চাবির গর্তের ডানদিকে তামার পাতের ওপর। প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা আঁচড়টা—কাঠের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বার্ণিশও তুলে ফেলেছে।

"আমিও ওটা দেখেছি, মিঃ হোম্‌স্‌। কিন্তু চাবির গর্তের আশপাশে এধরনের আঁচড় তো হামেশাই দেখা যায়।"

"কিন্তু এ দাগটা যে আনকোরা—একদম নতুন। দেখছ না, কাটার জায়গায় তামাটা কিরকম চকচক্ করছে। আঁচড়টা পুরোনো হলে সমস্ত তামার পাতটার যা রঙ, আঁচড়টার রঙও হত তাই। আমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখ। পরিখার দু'পাশে যেমন মাটি জমে থাকে উ'চু হয়ে, ঠিক তেমনি বার্ণিশ জমে আছে আঁচড়টার দু'পাশে। মিসেস মার্কার আছে না কি?"

ঘরে ঢুকল একজন বিষণ্ণ-বদন বৃদ্ধা।

"আজ সকালে এই বিউ-রো'র ধুলো ঝেড়েছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এই আঁচড়টা লক্ষ্য করেছিলে?"

"না স্যার, করিনি।"

"আমারও তাই বিশ্বাস, তুমি করোনি। কেননা, ধুলো ঝাড়বার পর বার্ণিশের এই কুচোগুলো নিশ্চয় এখানে থাকত না। এ বিউ-রো'র চাবি কার কাছে থাকে?"

"প্রফেসর তাঁর ঘড়ির চেনের সংগে রাখেন।"

"সাধারণ চাবী?"

"না স্যার। 'চাব' কোম্পানীর চাবি।"

"বেশ, বেশ। মিসেস্ মার্কার, তুমি এবার আসতে পারো। একটু এগোতে পেরেছি আমরা। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, বিউ-রো'র কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর হয় খুলে ফেললেন কাবোর্ডটা, অথবা খোলবার চেষ্টা করলেন। এই নিয়ে যখন ব্যস্ত উনি, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ। তাড়াহুড়ো করে চাবিটা বার করতে গিয়ে পাল্লার খানিকটা আঁচড়ে ফেললেন চাবি দিয়ে। উইলোবি স্মিথ চেপে ধরল তাঁকে। মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যা পেলেন, তাই তুলে নিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, হাতে উঠে এল এই ছুরিটা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাই দিয়ে আঘাত হানলেন তিনি স্মিথের ওপর—উদ্দেশ্য ছিল কোনমতে ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। মারাত্মক সে আঘাত। পড়ে গেল স্মিথ। আর, সটকান দিলেন ভদ্রমহিলা। যা নিতে তাঁর আগমন, যাবার সময়ে তা নিয়েও যেতে পারেন, নাও নিয়ে যেতে পারেন। সুসান আছে নাকি? আচ্ছা, সুসান চীৎকারটা শোনার পর ঐ দরজাটা দিয়ে কারো পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?"

"না স্যার। তা অসম্ভব। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই প্যাসেজে তাহলে কাউকে না কাউকে দেখতে পেতাম আমি। তা ছাড়া, দরজাটা তো একেবারেই খোলেনি। খুললে শব্দ শুনতে পেতাম।"

তাহলে পলায়ন-পথ সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। যে পথে এসেছিলেন ভদ্র-মহিলা, সেই পথেই প্রস্থান করেছেন তিনি। এ সম্বন্ধে তাহলে আর কোন সন্দেহ রইল না। আচ্ছা, এই দ্বিতীয় প্যাসেজটা প্রফেসরের ঘরে গেছে, তাই না? এ দিক দিয়ে বেরোবার পথ আছে না কি?"

"না স্যার।"

"আমরা বরং প্রফেসরের ঘরে গিয়ে আলাপ করে আসি তাঁর সংগে। আরে, আরে, হপকিন্‌স্‌! দারুণ দরকারী, বাস্তবিকই দারুণ দরকারী এই পয়েণ্টটা। প্রফেসরের করিডোরেও দেখছি নারকেল দড়ির মাদুর বিছোনো।"

"কিন্তু স্যার, তাতে হয়েছে কি?"

"কেসটার সংগে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছ না? বেশ বেশ, এর ওপর জোর দিতে চাই না আমি। নিঃসন্দেহে, আমারই ভুল। তবুও কিন্তু পয়েণ্টটা খুবই ইংগিতময়। চলে এস আমার সংগে—আলাপ করিয়ে দাও প্রফেসরের সংগে।"

প্যাসেজ বরাবর এগিয়ে গেলাম আমরা। বাগানের পথের দিকে যে প্যাসেজটা গেছে, তার যা দৈর্ঘ্য, এটারও তাই। করিডোরের প্রান্তে এক সারি সিঁড়ি উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। পথপ্রদর্শক হপকিন্‌স্‌ টোকা দিলে দরজায়। তারপর আমাদের নিয়ে ঢুকল প্রফেসরের শোবার ঘরে।

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অয়স্কান্ত

স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম না, বিজ্ঞানের কল্যাণে তাই আজ চোখের সামনে ঘটল। আমরা যে কী আশ্চর্য জগতে বাস করছি, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। দু-নম্বর ম্যারিনার শুক্রগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৬২ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে।

॥ শুক্রগ্রহ ও ম্যারিনার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি অনন্যসাধারণ গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁদের প্রেরিত দু-নম্বর ম্যারিনার ব্যোমযানটি ১০৯ দিনে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে শুক্রগ্রহকে অতি নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রীনউইচ সময় সন্ধ্যা আটটা এক মিনিটের সময়ে। কলকাতায় তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি তখন আমরা প্রায় সকলেই গাঢ় ঘুমে অচেতন ছিলাম। আর ঠিক সেই সময়েই দু-নম্বর ম্যারিনার শুক্রগ্রহের সবচেয়ে কাছাকাছি (২১,১০০ মাইলের মধ্যে) পৌঁছেছিল। বেয়াল্লিশ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করে-

ছিল চিরকালের রহস্যাবৃত এই গ্রহটিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ গ্রহের অন্ধকার দিককে, তারপরে সূর্যালোকিত দিককে। আর সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল পাঠিয়ে দিয়েছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরের ক্যালিফোর্নিয়ার রিসিভিং স্টেশনে। কিছুকাল আগে আমরা যা

ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব বলা হয়েছে। তা নানা কারণে। আর কখনো শুক্রগ্রহকে এত কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। আর কখনো এতদূর থেকে পৃথিবীতে সাফল্যের সঙ্গে বেতার সংবাদ পাঠানো যায়নি। আর কখনো একটি গ্রহান্তরগামী ব্যোমযানের গতিপথকে পৃথিবী থেকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাই শুক্রগ্রহের উদ্দেশে প্রথম ব্যোমযান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যোমযানের সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ বজায় থাকেনি বলে প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্রহটি শুক্রগ্রহের ৬২,০০০ মাইলের মধ্যে পৌঁছতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে অপর একটি সোভিয়েত ব্যোমযান মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে এবং আগামী ছ-মাসের মধ্যে এই ব্যোমযানটি মঙ্গলগ্রহের খুবই কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে। সেই সময়ে ব্যোমযান থেকে পৃথিবীর ফটো নেওয়া হবে। তারপরে, আঠারো মাস পরে, ব্যোমযান আবার এসে পৌঁছবে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আর তখন ব্যোমযান থেকে ফটোগুলো পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। সত্যিই আমরা এক আশ্চর্য পৃথিবীতে বাস করছি।

॥ শুক্রগ্রহের হদিশ ॥

বলা হয়েছে, শুক্রগ্রহ চিরকালের রহস্যাবৃত। তার কারণ এই যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়েও শুক্রগ্রহের বাইরের ঘন মেঘের আবরণটি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এই কারণে এই গ্রহটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের জল্পনাকল্পনারও শেষ নেই। তাছাড়া সকালের ও সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকালে সূর্য ও চন্দ্রের পরেই আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হচ্ছে এই শুক্রগ্রহ। এই গ্রহটিকেই কখনো আমরা বলি শুকতারা, কখনো সন্ধ্যাতারা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই গ্রহটিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

ম্যারিনারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে যে-যে বিষয়ে খবর সংগ্রহ করা হবে তা এই : জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদান; গ্রহের উপরিতলের তাপাঙ্ক; চৌম্বক ক্ষেত্র; তেজস্ক্রিয়তা; শুক্রগ্রহের আকাশের কস্‌মিক ধুলো। তাছাড়া, মহাকাশ-অভিযানে অভিজ্ঞতা ও যান্ত্রিক কুশলতা অর্জনের দিক থেকে ম্যারিনারের মূল্য খুবই বেশি। এই সাফল্য ভবিষ্যতের বৃহত্তর অভিযানের সূত্রপাত।

॥ শুক্রগ্রহের উপরিতল ॥

ভেনাস বা শুক্রগ্রহকে বলা হয় পৃথিবীর সহযাত্রী। সৌরমণ্ডলের পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ এই শুক্র। ব্যাস ৭৮০০ মাইল (পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল)। বছর ২২৫ দিনে। সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল।

ভর ও মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সবদিক থেকে শুক্রগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর এত মিল যে শুক্রকে পৃথিবীর যমজ বললেও ভুল বলা হয় না।

তবুও এই শুক্রগ্রহ সম্পর্কেই বিজ্ঞানীদের জ্ঞান খুবই কম। কারণ এই গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে ঘন মেঘের আবরণ; গ্রহের উপরিতল সম্পর্কে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা যায়নি। কারও মতে গ্রহটির উপরিতলে রয়েছে শুধু সমুদ্র, কারও মতে শুধু মরুভূমি।

শুক্র সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত খবর সংগ্রহ করা হয়েছে রাডার প্রতিধ্বনির সাহায্যে। মনে রাখা দরকার যে পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব মোটামুটি ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। এই বিপুল দূরত্বের জন্যে কোনো পদ্ধতিতেই এতদিন পর্যন্ত পাকাপাকি রকমের খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সংগৃহীত খবরের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা কোনো সময়েই একমত হতে পারেননি।

মাইক্রোওয়েভ স্ক্যানিং-এ জানা গিয়েছে শুক্রগ্রহের উপরিতলের কাছাকাছি অঞ্চলে তাপাঙ্ক ৬১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। যদি এই তথ্যটি সত্যি হয় তবে পৃথিবীতে যে-ধরনের জীবন রয়েছে সে-ধরনের জীবন শুক্রে থাকা সম্ভব নয়। ইনফ্রারেড মাপে জানা গিয়েছে, শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তাপাঙ্ক শূন্যমানের ৩৮ ডিগ্রি নিচে। বর্ণালী বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, শুক্রের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন, তাছাড়া বৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প। এই তথ্য যদি সত্যি হয় তবে পৃথিবীতে যে-ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে সে-ধরনের উদ্ভিদ শুক্রে থাকা সম্ভব নয়।

শুক্রের মেঘের আবরণটি সম্পর্কেও রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। এই আবরণটির জায়গায় জায়গায় রয়েছে কালো কালো দাগ। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, শুক্রের মেঘের আবরণটি নিশ্ছিদ্র নয়, জায়গায় জায়গায় ফাঁক থেকে গিয়েছে; আর এই ফাঁকগুলো থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় না বলে দূর থেকে কালো দেখায়।

শুক্রের আহ্নিকগতি বা অক্ষ-আবর্তন সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত একমত নন। তবে সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, গোল্ডস্টোন-এর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দু-মাস ধরে পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের নাকি ধারণা হয়েছে যে, শুক্রের অক্ষ-আবর্তন ২২৫ দিনে। আমরা আগেই বলেছি, শুক্রের কক্ষ-আবর্তনও ২২৫ দিনে। তার মানে, বুধগ্রহের মতো শুক্রগ্রহেরও বিশেষ একটি দিক সব সময়ে সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে।

॥ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ॥

ম্যারিনার শুধু শুক্রগ্রহ সম্পর্কেই নয়, শুক্র ও পৃথিবীর মাঝখানের মহাকাশ সম্পর্কেও নানা তথ্য সংগ্রহ করবে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্যে ম্যারিনার-এ যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

॥ মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার ॥

এই যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রগ্রহের উপরিতলের উত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে খবর পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, শুক্রগ্রহের আয়নোস্ফিয়ার পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি ঘন। এই ধারণাটি সঠিক কিনা তা সংগৃহীত খবর থেকে জানা যাবে।

॥ ইনফ্রারেড রেডিওমিটার ॥

এই যন্ত্রটি সন্নিবেশিত হবে মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটারের সঙ্গে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে বিশেষ করে জানা যাবে—শুক্রগ্রহের মেঘাবরণে যে কালো কালো দাগগুলো দেখা যায় সেগুলো সত্যিই মেঘের মধ্যেকার ফাঁক কিনা।

॥ ম্যাগনেটোমিটার ॥

এই যন্ত্রটির সাহায্যে শুক্রগ্রহের চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও বিন্যাস সম্পর্কে খবর পাওয়া যাবে। যদি জানা যায় যে, শুক্রগ্রহে পৃথিবীর মতোই চৌম্বকক্ষেত্র আছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করতে হবে—পৃথিবীর মতো শুক্রেও তেজস্ক্রিয় বলয় আছে, পৃথিবীর মতো শুক্রেও মেরুজ্যোতি দেখা যায় ও চৌম্বক ঝড় ওঠে। এই সিদ্ধান্ত থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই মত পোষণ করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুপিণ্ড তরল অবস্থায় আছে বলেই পৃথিবীর চুম্বকত্ব। শুক্রের যদি চুম্বকত্ব থাকে তাহলে শুক্রের অভ্যন্তরের বস্তুপিণ্ডও রয়েছে তরল অবস্থায় (কিছুকাল আগে সোভিয়েত লুনিকের সাহায্যে জানা গিয়েছিল যে চন্দ্রের চুম্বকত্ব নেই)। মহাকাশগামী ব্যোমযানের গতিবিধি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে মহাকাশের চৌম্বক বিন্যাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। ম্যারিনারের ম্যাগনেটোমিটার এই অপরিহার্য জ্ঞানলাভে অনেকখানি সাহায্য করবে।

॥ আয়োনাইজেশন প্রকোষ্ঠ ॥

এই যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী ও শুক্রের মধ্যবর্তী মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তেজস্ক্রিয় কণিকা সম্পর্কে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাবে। এই কণিকাগুলোর মধ্যে আছে প্রোটোন, আলফা কণিকা, হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের চেয়েও ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন। প্রধানত কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে এই কণিকাগুলো থাকে। ভবিষ্যতের গ্রহান্তরগামী মহাকাশ-যাত্রীর নিরাপত্তার জন্যেই এই তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলো সম্পর্কে খবর জানা দরকার।

॥ সৌর প্লাজমা ডিটেক্টর ॥

সূর্য থেকে সবসময়েই তাড়িতাবিষ্ট কণিকা প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই কণিকাগুলোর মধ্যে আছে প্রধানত হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটন। এই কণিকা-প্রবাহেরই নাম দেওয়া হয়েছে সৌর প্লাজমা বা সৌর বায়ু। আয়োনাইজেশন প্রকোষ্ঠের সাহায্যে এই সৌর প্লাজমা বা সৌর বায়ু সম্পর্কে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাবে।

॥ কসমিক ডাস্ট ডিটেক্টর ॥

গ্রহান্তরবর্তী মহাকাশে ছড়িয়ে আছে আণুবীক্ষণিক ধূলিকণা। এই ধূলিকণার প্রবাহ, গতিবেগ ও পরিমাণ সম্পর্কে এই যন্ত্রটি খবর সংগ্রহ করবে। ইতিপূর্বে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর আকাশের ধূলিকণা সম্পর্কে খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর আকাশ-সীমার বাইরে গ্রহান্তর্বর্তী মহাকাশের ধূলিকণা সম্পর্কে খবর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমরা এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানি না, আমাদের এই সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি কি-ভাবে হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণ্যমান প্রকাণ্ড একটি ধূলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহলে গ্রহান্তর্বর্তী মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধূলিকণা হয়তো এই মেঘেরই অবশিষ্টাংশ। কাজেই, ধূলিকণা সম্পর্কে খবর সংগৃহীত হলে হয়তো সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কেও একটি সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব খাড়া করা চলবে।

॥ ম্যারিনার ব্যোমযান ॥

আকাশে তোলার সময়ে ম্যারিনার ব্যোমযানের ব্যাস ছিল ৫ ফুট (ভূমির দিকে), উচ্চতা ৯ ফুট ১১ ইঞ্চি, ওজন ৪৪৬ পাউন্ড (বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতির ওজন ৪০ পাউন্ড)।

ম্যারিনারের যন্ত্রপাতির জন্যে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা সৌর ব্যাটারির সাহায্যে। এই উদ্দেশ্যে ২৭ বর্গফুট আয়তনের মধ্যে ৯৮০০টি সৌর ব্যাটারি বসানো হয়েছে। এই সৌর ব্যাটারি থেকে সর্বনিম্ন ১৪৮ ও সর্বোচ্চ ২২২ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে পারবে। ব্যাটারির বাড়তি বিদ্যুৎ জমা থাকবে

একটি হাজার ওয়াটের স্টোরেজ ব্যাটারিতে।

ম্যারিনারের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার-যোগাযোগের জন্যে অ্যানটেনা ও অন্যান্য ব্যবস্থা, মাঝপথে ব্যোমযানের গতিমুখ সংশোধন করবার জন্যে ৫০ পাউন্ড ঠেলা তৈরি করবার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি রকেট ও আনুষঙ্গিক ইলেকট্রনিক আয়োজন, ইত্যাদি।

॥ যাত্রা-শুরুর সমস্যা ॥

মনে করা যাক, একটি ঘুরন্ত নাগরদোলায় একটি রাইফেল বাঁধা আছে আর আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটি পাখি। এখন যদি বলা হয় যে এই রাইফেলটা দিয়ে পাখিটাকে তাক্ করতে হবে তাহলে তা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। ছুটন্ত ও ঘুরন্ত পৃথিবী থেকে ছুটন্ত ও ঘুরন্ত শুক্রকে তাক্ করা তার চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে অনেকগুলো ব্যাপারকে একসঙ্গে হিসেবের মধ্যে আনা দরকার—যেমন, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বেগ ও শুক্রের বেগ, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, সূর্যের অয়ন-চলন, সৌরাকর্ষণের চাপ, পৃথিবী-সূর্য-শুক্র-বৃহস্পতির মহাকর্ষ।

সহজেই অনুমান করা চলে, ম্যারিনারকে আকাশে তোলার জন্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঁকজোখের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছিল। আর আকাশে তোলার ব্যাপারটির মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম পর্যায়ের ছুটে ম্যারিনারকে পৃথিবী থেকে ১১৫ মাইল দূরত্বের একটি কক্ষপথে স্থাপিত করা হয়েছিল। তখন তার বেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল। তারপরে এই কক্ষ থেকে ম্যারিনার শুক্রগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে ঘণ্টায় ২৫,৫০০ মাইল বেগে। পৃথিবীর টান থাকার দরুণ এই বেগ কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৬৮৭০ মাইলে। মনে রাখা দরকার এই বেগটি পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক বিচারে। আর ম্যারিনারের ছুট পৃথিবীর বিপরীত দিকে। তার মানে, মহাকাশে ছুটন্ত পৃথিবীর বেগ যদি হয় ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল, তাহলে ম্যারিনারের বেগ হবে তার চেয়েও ৬৮৭০ মাইল কম। এইভাবে বেগ কমে যাওয়ার দরুণ ম্যারিনারের পক্ষে আর পৃথিবীর কক্ষে থাকা সম্ভব হয় না—সূর্যের টানে ভেতরের দিকে (অর্থাৎ সূর্যের দিকে) চলতে শুরু করে। তার মানে ম্যারিনারের কক্ষটি হয় উপবৃত্তাকার। ম্যারিনারের কক্ষ শুক্রগ্রহের কক্ষকে ছেদ করে। আর ম্যারিনারকে আকাশে তোলার সময়ে এমন সূক্ষ্মভাবে আঁকজোখ করা হয়েছে যে ম্যারিনার যখন শুক্রগ্রহের কক্ষে উপস্থিত হয় তখন শুক্রগ্রহটিও সেখানে হাজির থাকে।

ম্যারিনার যখন সূর্যের দিকে আকর্ষিত হচ্ছিল তখন তার বেগও বাড়ছিল। তারপরে যখন ম্যারিনার শুক্রগ্রহের আকর্ষণের এলাকায় এসে পড়ে তখন তার বেগও আরও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন ম্যারিনার শুক্রগ্রহের সূর্যালোকিত দিক দিয়ে পার হয়ে যায় তখন তার বেগ হয় ঘণ্টায় ৯১,০০০ মাইল। এই বেগ শুক্রগ্রহের সূর্য-প্রদক্ষিণের বেগের (ঘণ্টায় ৭৮,৩০০ মাইল) চেয়ে অনেক বেশি।

ম্যারিনারকে ইচ্ছে করেই শুক্রগ্রহের ওপরে আছড়ে ফেলা হয়নি। সেক্ষেত্রে ম্যারিনারের পক্ষে অল্প কয়েকটা মিনিটের জন্যে শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হত। তার চেয়ে ম্যারিনার যদি শুক্রগ্রহকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে তাহলে পর্যবেক্ষণের সময় পাওয়া যায় অনেক বেশি। আর সত্যি সত্যিই তাই হয়েছে। ম্যারিনার শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেছে ৪২ মিনিট ধরে।

অতঃপর দু-নম্বর ম্যারিনার হয়ে উঠবে সূর্যের আরেকটি নতুন গ্রহ। মানুষের কীর্তি ঘোষণা করে ইতিপূর্বে মানুষের তৈরি আরো চারটি গ্রহের স্থান হয়েছে এই সৌরমণ্ডলের মহাকাশে : এক-নম্বর লুনিক, চার ও পাঁচ নম্বর পায়োনিয়র এবং শুক্রগ্রহের উদ্দেশে প্রেরিত সোভিয়েত ব্যোমযান।

মহাকাশের বিপুল বিস্তৃতিতে আরো অনেক অনেক গ্রহের স্থান হতে পারে।

যাই হোক, দু-নম্বর ম্যারিনারের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে শুক্রগ্রহের মাটিতে মানুষের পা দেবার দিনটিও আরো আসন্ন হল।

মহাশূন্যে পরীক্ষা

অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে অসীম শূন্যতা সৃষ্টিরও আদিকাল থেকে বিরাজিত। সভ্যতার যেদিন উন্মেষ হল, যেদিন মানুষের জিজ্ঞাসাবৃত্তি জাগরিত হল যেদিন নীলাভ শূন্যের অন্তরাল হতে অসংখ্য সৌন্দর্যময়ী তারকা হাতছানি দিয়ে ডাকল বর্তমান মানবের আদিমতম পুরুষকে, সেদিন সে আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়নি। অনুসন্ধান আর জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি ঘটেনি আজও। মহাশূন্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে ফিরছে আমাদেরই প্রতিবেশী, একই মাটির মানুষ যারা তার অনন্ত অন্তরীক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসার সমাধান কামনা করছে।

মানুষের মহাশূন্য পরিক্রমায় প্যারাশুটের অবদান কোন অংশে কম নয়। এই একটি 'সৃষ্টি' অসংখ্য জটিলতর প্রশ্নের সমাধান করে আজও কাজ করে চলেছে। ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বতর স্তর থেকে ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষেপের মানুষের প্রচেষ্টা এখনও চলেছে সমানভাবে। গত ১লা নভেম্বর প্যারাশুট লম্ফনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ২৫,৪৫৮ মী, উঁচুতা থেকে এই ঝাঁপ দেওয়া যেমন অভূতপূর্ব তেমনি বিস্ময়কর। স্ট্রেটোসফিয়ার বেলুন 'ভলগা' থেকে পিওতর দলগভ এবং য়েভগেনি আন্দ্রায়েভ-এর এই নিষ্ক্রমণ একটি মর্মান্তিক ও আনন্দদায়ক পরিণতি লাভ করেছে। মর্মান্তিক এই জন্য যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্যারাশুট-জাম্পার পিওতর দলগভ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় পতিত হন। য়েভগেনি আন্দ্রায়েভ নিরাপদে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করেন।

২৫,৪৫৮ মী, যখন তাঁরা গেলেন তখন তাঁদের চারপাশের অনন্তশূন্য সম্পূর্ণ বায়ুহীন। ঐ শূন্যতার মাঝখানে উপযুক্ত পোশাকে আবৃত না থাকলে তার পরিণতি অত্যন্ত বীভৎস এবং করুণ।

পিওতর দলগভের বিগত তের বৎসরের জীবন এক গৌরবজনক অধ্যায়ে সমাদৃত। কোন্ আবহাওয়ায় নিরাপদে উৎক্ষেপণ, কোন আবহাওয়ায় কিভাবে নিজেকে চালিত যানের অভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রমিত করা সম্ভব—এগুলি প্রধানত পূর্বাহ্নে প্যারাশুট সহযোগেই সমাধান করা হয়। দলগভ এ কাজই করে এসেছেন এতকাল। এ কাজে তাঁর সুদক্ষতা প্রশ্নের অতীত। যে সমস্ত মহাকাশযাত্রী নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই দলগভের কাছে কৃতজ্ঞ।

দলগভ এই মহৎ কার্যসাধনের জন্য সরকারী পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৫২ সালে এবং 'অর্ডার লেনিন' খেতাবও লাভ করেন মহাকাশযাত্রার কতকগুলি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ রীতি বা প্রণালী উদ্ভাবনের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ। গত পাঁচ অথবা ছয় বছর ধরে যারা তার সহকর্মী হিসাবে কাজ করে এসেছে তারা দলগভের এই পরিচয়ের সঙ্গে ছিল প্রায় অপরিচিত। এমনকি অনেকেই

মেজর য়েভগেনি আন্দ্রায়েভ

একথা জানে যে তিনি এক সময় সেন্ট্রাল এশিয়ান প্রজাতন্ত্রের এবং বাইলো-রুশিয়ার গ্রীকো-রোমান কুস্তীর চ্যাম্পিয়ান ছিলেন।

বহুবার জাতীয় এবং বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন দলগভ তাঁর জীবনের ১,৪০৯টি লম্ফনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন উচ্চতায় এবং বিভিন্ন-গতিতে তাঁর মত বিশ্বের অপর কোন ব্যক্তি প্যারাশুট উৎক্ষেপে এত কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু বর্তমান উৎক্ষেপে দলগভ যে নতুন প্রচেষ্টার পথে এগিয়েছিলেন তা সার্থকতা লাভ করল না অবশেষে। এই পরিক্রমায় তিনি যে দুটি প্যারাশুট অবলম্বন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা ইতিপূর্বে অন্য কারও দ্বারা অনুসৃত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করে প্যারাশুট দুটি পৃথিবীর মাটিতে বহন করে নিয়ে এল সেই মহান নায়কের প্রাণহীন দেহ।

দলগভের সহযাত্রী আন্দ্রায়েভ নিরাপদে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করলেন। তিনি বিশ্বাস করেন দলগভের মর্মান্তিক পরিণতি এসেছে যে পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্যারাশুট-উৎক্ষেপণে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

'ভলগা' থেকে লাফিয়ে পড়ার সাড়ে চার মিনিট পর আন্দ্রায়েভ পায়ে বাঁধা ব্যারোগ্রাফের সাহায্যে বুঝতে পারলেন যে অবতরণের আর ১,৫০০ মী, বাকি। সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি সেকেন্ড গুনেই তিনি প্যারাশুট খুললেন। সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে কাজ করল। তিনি চারদিক দেখতে পেলেন সুন্দরভাবে। তিন মিনিট বাদে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে ১,৫১০টি লম্ফন শেষ করলেন।

মণিপুরী নৃত্য

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্র অনুযায়ী মণিপুরী নৃত্য ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রাকৃত নৃত্য। ভারতীয় প্রাকৃত নৃত্যকে ভরতাদি মুনিগণ নাট্যম, নৃত্যম্ ও নৃত্তম্ এই তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

নাট্যম্—"নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্বকথাযুতম"।

যা নাট্য তাই নাটক। তা পূজার্হ, প্রাচীন কথাযুক্ত। পুরাণকথার পুজনীয় প্রয়োগ, অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত কাহিনীকে যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ করাই হল নাট্যম্। নাট্যম্ বলিতে আমরা বুঝি কথার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের একাত্মকতা। নাট্য রসাশ্রয়: অতএব নাট্যম্ হল মুদ্রা সমন্বিত ভাব সম্মিলিত ছন্দময় দেহের লীলায়িত ব্যঞ্জনা।

নৃত্যম্—"রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্যতে"।

যে নাট্যকলা ভাব অভিনয় যুক্ত রস-সমৃদ্ধ হয় তাই নৃত্যম্। ধনঞ্জয় ও শারদাতনয়ের মতে নৃত্যম্ ভাবাশ্রয়: যা ভাবাশ্রয় তাই পদার্থাভিনয়াত্মক: এবং মার্গ নামে প্রসিদ্ধ। শার্ঙ্গদেব বলেন, আহার্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনের নাম নৃত্য। "সঙ্গীত দামোদর" রচয়িতা শুভঙ্করের মতে দেবগণের রুচিসম্মত তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

নৃত্তম্—"ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে"।

ভাববিহীন অভিনয়হীন তাল সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ অর্থাৎ শুধুমাত্র লীলায়িত দেহের ছন্দময় প্রকাশকে নৃত্তম্ বলা হয়। ধনঞ্জয় ও শারদাতনয়ের মতে নৃত্তম্ বাক্যার্থাভিনয় প্রধান। তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম দেশী। শার্ঙ্গদেবের মতে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত সাধারণ অঙ্গবিক্ষেপের নামই নৃত্তম্।

এই নাট্যম, নৃত্যম্ ও নৃত্তম্-এর কোনও একটি বাদ গেলে নৃত্য পর্যায়ে পড়বে না অর্থাৎ তা অসম্পূর্ণ। প্রত্যেক প্রাকৃত নৃত্যের মধ্যে এই তিনটি পর্যায় অল্পবিস্তর বিদ্যমান। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে নৃত্যম্ই প্রধান। মণিপুরী নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভাববিভাবের দ্যোতনা। এই নৃত্যে তান্ডব ও লাস্য দুই-ই সমভাবে বর্তমান।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ও আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্য বহুযুগ হতেই শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। মণিপুর অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় জাতি হিসাবেই রয়েছে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রবণতা। সমষ্টিগতভাবে এদের মণিপুরী নর্ত্তন বলা হয়। প্রাগ্ হিন্দুযুগে মণিপুরী নৃত্যে আসুরিক প্রভাব পরিলক্ষিত হত। পরবর্তীকালে শিব ও পার্বতীর পূজা উপলক্ষ্য করে রচিত হয় নৃত্য। সঠিক বলা না গেলেও আনুমানিক পঞ্চদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মণিপুর রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। মণিপুর অধিবাসীদের মধ্যে মৈথৈ ও বিষ্ণুপ্রিয় এই দুটি প্রধান শ্রেণী। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সঙ্গীত ও নৃত্যের বহুল প্রচলন আছে। বহু শতাব্দী পর্যন্ত মণিপুরী নৃত্য কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্যের মধ্যেই। সাম্প্রতিককালে নৃত্যসম্পর্কিত গবেষণা ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধির ফলে এর মূল্য সারা দেশে স্বীকৃতি পায় ও ভারতের অন্যান্য প্রাকৃত নৃত্যের সমমর্যাদা লাভ করে। মণিপুর অধিবাসিগণ সাধারণত অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সরল প্রকৃতিসম্পন্ন। তারা নিজেদের নৃত্যগীত পারদর্শী গন্ধর্বদের বংশধর বলে মনে করে। এবং প্রমাণ-স্বরূপ মহাভারতে কথিত অর্জুন ও গন্ধর্বরাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর উল্লেখ করে। নৃত্য ও সঙ্গীত

রাসলীলা নৃত্যে রাধার প্রধান অভিব্যক্তি

গড়ে উঠেছে তাদের জীবনধারার পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

মণিপুর রাজ্যে বহু প্রাচীন গাথা ও পৌরাণিক উপকথার প্রচলন আছে। সেই সমস্ত কাহিনী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মণিপুর অধিবাসীদের সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। মণিপুর রাজ্য ও তার সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী বহুল প্রচলিত।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন। শিব রাসলীলা দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিযুক্ত করেন রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক। শিব যখন দ্বাররক্ষীরূপে রাসলীলার সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত তখন পার্বতী এসে উপস্থিত। পার্বতী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাসমণ্ডলীর দ্বার খুলে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করেন। এই রাসলীলা দেখবার পর হতেই তিনি শিবের সঙ্গে রাসনৃত্য করবার জন্য অধীর হয়ে শিবকে তাঁদের রাসলীলা করবার উপযোগী একটি স্থান নির্বাচন করতে বলেন। শিব তখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করে অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশে কর্মশৃঙ্গে উপস্থিত হলেন। পর্বতের পাদদেশ জলমগ্ন। শিব এই স্থানকে রাসনৃত্যের উপযুক্ত বিবেচনা করে ত্রিশূলের আঘাতে পর্বতগাত্র হতে জল নিষ্কাশিত করলেন। এখানে সাতদিন সাতরাত্রি ধরে শিব-পার্বতীর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হল। গন্ধর্বগণ ও অন্যান্য দেবতাগণ হলেন সঙ্গীত সহযোগী। পাতালের নাগদেবতা পাখম্বা তাঁর মাথার উজ্জ্বল মণির সাহায্যে স্থানটিকে আলোকিত করলেন। নাগদেবতার মণির আলোকে উজ্জ্বল এই স্থানের নাম হল মণিপুর।

পুরাণ এবং প্রাচীনগাথার কথা বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে মণিপুরের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর অন্যতম কারণ রাজা পামহৈবা যখন (১৭১৪ খৃঃ) বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্বতম সমস্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। ১৫৪ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রফলক মণিপুরের সংস্কৃতির সবথেকে প্রাচীনতম প্রমাণ। ঐ তাম্রফলকে রাজা কোয়াই থম্পককে সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে ব্রহ্মদেশের রাজা খো-লো-ফেং ৭০৭ খৃষ্টাব্দে মণিপুর রাজ্য অধিকার করেন এবং তিনি আসাম ও মণিপুরের নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে একটি শিল্পীদল চীনদেশে পাঠান। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা কয়াম্বার রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের রাজা পং মণিপুর থেকে সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী ও মৃদঙ্গবাদক ব্রহ্মদেশে নিয়ে যান। তার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশীয় ব্রথশিল্পী বাদক মণিপুরে আসে। ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা লয়াম্বা ছিলেন খাম্বা-থৈবীর প্রেমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্যের প্রচলনের বিশেষ উৎসাহী।

অষ্টাদশ শতাব্দী হতে মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসের কিছু কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা পামহৈবা মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করে গোস্বামী শান্তিদাস অধিকারীর প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণবধর্ম ছিল রামানন্দী ভাবাদর্শে প্রভাবিত। বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাবের ফলে মণিপুর রাজ্যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। রাজা পামহৈবা সমস্ত প্রজাদের মধ্যে মৈথৈ রাত্য ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এবং তদনুযায়ী গুরু গোস্বামী শান্তিদাসের নির্দেশে মৈথৈ ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র বিনষ্ট করা হয়। তিনি মৈথৈ দেবদেবীগণের পূজা ও মৈথৈ ভাষা ও বর্ণমালার প্রচলন নিষিদ্ধ করেন। স্বভাবতই তা মৈথৈ শিল্প ও সংস্কৃতির এবং জগোই নৃত্য ও সঙ্গীতধারার উপর বিশেষ আঘাত হানে। এর পর হতেই মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা পামহৈবার পৌত্র জয়সিং কর্তামহারাজা ছিলেন ভাগ্যচন্দ্র নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬৪ খৃঃ থেকে ১৭৮৯ খৃঃ পর্যন্ত। রাজা ভাগ্যচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে আসেন। ফলে ক্রমশঃ রামানন্দী মতের পরিবর্তে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রসার লাভ করে। এবং কালক্রমে মণিপুরী বর্ণমালার পরিবর্তে বাংলা বর্ণমালা মণিপুরে জনপ্রিয় হয়। মণিপুরী সঙ্গীত ও শিল্পকলায়ও ছিল এর প্রবল প্রভাব। ভক্তকবি শ্রীচৈতন্য, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির প্রভাবও দেখা যায়।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র যে কেবলমাত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন

লাইহারাউবা নৃত্যের ভঙ্গী

তাই নয়, তিনি নিজেও ছিলেন একজন গুণজ্ঞানী শিল্পী ও পণ্ডিত। রাজা ভাগ্যচন্দ্র মণিপুরের বিখ্যাত রাসনৃত্যের প্রবর্তক। এই সম্পর্কে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুর রাজ্য ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে বেড়ান। তিনি যখন আসামের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন মণিপুর রাজ্য হতে আসাম অধিপতির নিকট এক রাজকীয় সংবাদ এল যে তিনি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র যদি ভাগ্যচন্দ্রকে হত্যা অথবা রাজ্য হতে বিতাড়িত না করেন তবে তার রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। আসামের রাজা তখন মহাবিপদে পড়লেন। একদিকে তাঁর মান্যবর অতিথি অপরদিকে নিরীহ প্রজার মঙ্গল। রাজা গোপনে মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ভাগ্যচন্দ্রকে ডেকে বললেন যে তাঁর রাজ্যে এক মত্তহস্তী প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করছে। যদি বীরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যচন্দ্র এই হস্তীটিকে বিনাশ করেন তবে রাজা বড়ই বাধিত হবেন। ভাগ্যচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি নিজের বীরত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন না। অবশেষে হস্তী শিকারের দিন সমাগত আর মাত্র একদিন বাকী। ভাগ্যচন্দ্র অহরহ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে আরম্ভ করেন। ঐদিন রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন—"বৎস, তুমি ভয় পেয়ো না। প্রভাতে হস্তীর নিকট যাবার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসী মালা নিয়ে হস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হবে। দেখবে তখন সে আপনা হতে নতমস্তকে অভিবাদন করে তোমাকে নিজস্কন্ধে তুলে নেবে। সেই হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে তুমি মণিপুরে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তা পুনরুদ্ধার করবে। তার পর কেয়াল পর্বতে যে কাঁঠাল বৃক্ষ আছে তার কাণ্ডের দ্বারা আমার মূর্তি নির্মাণ করে মর্তে আমার পূজার প্রচার করবে।"

পরদিন প্রাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুসারে হাতীর সামনে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত তুলসীমালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হাতী তাঁকে দেখবামাত্র শুঁড় নেড়ে অভিবাদন করে নিজস্কন্ধে বসাল। প্রজামণ্ডলী তা দেখে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজা ভাগ্যচন্দ্র হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে মণিপুর রাজ্য উদ্ধার করলেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেয়াল পর্বতের কাঁঠাল বৃক্ষের কাণ্ড আনিয়ে শিল্পীকে মূর্তি নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শিল্পী বললেন, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কিরূপ তা তিনি জানেন না। যদি রাজা ভাগ্যচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনা করেন তা হলে তিনি মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন। তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সুললিত সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ বর্ণনা করলে শিল্পী সেই বর্ণিত-রূপ কাঠের মধ্যে জীবন্ত করে তুললেন।

নাচ্য নৃত্যের ভঙ্গী

মণিপুরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা কিভাবে হবে এই সমস্যা উপস্থিত হল। ঐদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে পুনরায় স্বপ্নাদেশ দিলেন যে রাজার কন্যাকে শ্রীরাধা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গিনীর মতো রেখে রাসনৃত্যের মাধ্যমেই তার পূজা ও প্রচার হবে। শ্রীকৃষ্ণ আরও প্রত্যহ রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে রাসনৃত্য প্রদর্শন করেন এবং পরদিন প্রভাতে রাজা তাঁর কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এইরূপে মণিপুর রাজ্যে রাসনৃত্যের সৃষ্টি ও প্রচার হল। এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোনও সঠিক প্রমাণ নেই। তবে এটা সত্য যে রাজা ভাগ্যচন্দ্রই রাসনৃত্যের প্রবর্তক এবং তাঁর কন্যা আজীবন কৃষ্ণপ্রেমেই নিজেকে উৎসর্গ করেন। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত বহু পুস্তক পাওয়া যায়।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র আসামের সাত্রা নৃত্য, বাঙলার কীর্তন এবং মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সমন্বয় ও সংমিশ্রণে রাসনৃত্য নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করেন এবং রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যানুষ্ঠানের আঙ্গিক, পোশাক, সঙ্গীত ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্রের পর রাজা চন্দ্রকীর্তি সিংও ছিলেন মণিপুরী নৃত্য-গীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। চন্দ্রকীর্তি সিংয়ের পর মণিপুরী নৃত্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রচেষ্টা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এককথায় বলা যেতে পারে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময় হতে চন্দ্রকীর্তি সিংয়ের সময় পর্যন্ত এই একশত বৎসর মণিপুরী নৃত্যগীত ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

মণিপুরী নৃত্যের অপর একটি প্রাচীনতম ধারা লাইহারাউবা। এইটি কেবল মাত্র মৈথৈগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মৈথৈ ভাষায় নৃত্যকে জগোই বলে এবং জগোই নৃত্যের সর্বাপেক্ষা উন্নততম ধারা লাইহারাউবা। লাইহারাউবা ভিন্ন শিব-পার্বতীর সম্মানে ওগ্রিহাংশেল এবং উষাদেবীর সম্মানে খাবলচোংবী, চিংখেরল প্রচলিত ছিল।

লাইহারাউবা শিব-পার্বতীর মহিমা প্রচারের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেমন খাম্বাথৈবী, নংপক নিংথৌ ও পানথৈবী অথবা থানজিং ও লাইরেম্বী প্রভৃতি। মণিপুরী ভাষায় লাই অর্থে দেবতা এবং হারাউবা অর্থে আনন্দনৃত্য বুঝায়। মণিপুরের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে হরপার্বতীর পূজায় ভক্তিভরে নৃত্য করতে পারলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। লাইহারাউবা নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য উভয় শ্রেণীর নৃত্যধারাই বিদ্যমান। লাইহারাউবা মূলতঃ শৈব নৃত্য হলেও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লাইহারাউবার নৃত্য-পদ্ধতিতে রাসনৃত্যের অনুকরণে বৈষ্ণব জীবনধারার প্রভাব পড়ে।

কৃষ্ণের রাসলীলার ভঙ্গী

মণিপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকগাথা খাম্বাথৈবীর কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্য অধিকাংশ সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই কাহিনী মণিপুরের বিখ্যাত মহাকাব্য মৈরাংপর্বেতে লিখিত। অবশ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে লোককবিদের দ্বারা এই কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মণিপুর রাজ্যে খাম্বা ও থৈবীকে শিব-পার্বতীর অংশ বলে মনে করা হয়। খাম্বা ছিলেন মৈরাং গ্রামের এক দরিদ্র ও সাহসী যুবক। থৈবী মৈরাং বংশের রাজ-কন্যা। মৈরাং গ্রাম ইম্ফল শহর হতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজ-কন্যা থৈবী একদা নির্জন লোগতাক্ হ্রদে সহচরীগণের সঙ্গে মৎস্যশিকারে যান। রাজার আদেশে ঐ সময় ঐ স্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কথিত আছে খাম্বা প্রভু থান জিং কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই সময় লোগতাক হ্রদে গমন করেন। খাম্বা ও থৈবী প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হলেন। উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য হল স্বভাবতই তাঁদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়। অবশেষে বহু বিপদ ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে হল তাঁদের মিলন। থৈবীকে লাভ করবার জন্য রাজরোষে খাম্বার বহুবার জীবন সংশয় হয় এবং থৈবীকেও কিছু-কাল ক্রীতদাসীর জীবন স্বীকার করতে হয়। এই সকল ঘটনায় খাম্বাকে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করতে হয় এবং তবেই তিনি তাঁদের বিবাহে সম্মত হন। খাম্বা ও থৈবীর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক। কিন্তু মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। বিবাহের কিছুকাল পরে থৈবীর প্রেমে খাম্বার সংশয় দেখা দেয়। মণিপুর রাজ্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব পরীক্ষা করবার একটি প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। প্রণয়ী পরস্ত্রীর ঘরের মধ্যে তার বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয়, তখন যদি ঐ স্ত্রীলোক বর্শাটি টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দেয় তা হলে বুঝতে হবে যে প্রণয়ীর অসৎ প্ররোচনায় সম্মত হতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোকের তাতে আপত্তি থাকে তা হলে সে বর্শাটি বাইরে নিক্ষেপ করে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। খাম্বা একদিন থৈবীকে বললেন যে তিনি একটি বিশেষ কার্যে গ্রামান্তরে যাবেন এবং পরদিন প্রাতে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন। রাত্রে খাম্বা থৈবীর ঘরে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য নিজের বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। থৈবী তা টেনে নিয়ে সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করে বললেন, "কোন শয়তান আমার মত সতী

মণিপুরী নৃত্য

রাসলীলা নৃত্যে রাধার প্রধান অভিব্যক্তি

নারীকে অসম্মান করতে সাহস করে"। সেই বর্শার আঘাতে বাহিরে খাম্বার দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। খাম্বার আর্তস্বর শুনে থৈবী বাইরে এসে শোকোন্মত্ত হয়ে ঐ বর্শা নিজ বক্ষে বিদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন। সাধারণতঃ লাইহারাউবা নৃত্যের মূল অনুষ্ঠান মৈরাং গ্রামে এপ্রিল অথবা মে মাসে খাম্বা ও থৈবীর অমর প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মণিপুরে রাসনৃত্য মূলত চারি প্রকার (১) মহারাস, (২) বসন্তরাস, (৩) কুঞ্জরাস ও (৪) নিত্যরাস।

মহারাস কার্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। ভঙ্গি পারেং ও বৃন্দাবন ভঙ্গি এর মূল উপাদান।

বসন্তরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। ভঙ্গি পারেং ও গোষ্ঠসন্ধ্যা ভঙ্গি এর মূল উপাদান।

কুঞ্জরাস আশ্বিন পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। খুদুমাক ভঙ্গি পারেংই এর মূল উপাদান।

নিত্যরাস প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন ভঙ্গি পারেং ও ভঙ্গি পারেং এর মূল উপাদান। তাছাড়া বর্তমানে মণিপুরে দিবারাস বলে প্রচলিত আর একটি রাসনৃত্য সাধারণতঃ মধ্যাহ্নকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া খাবা চোংবী, খুবাক্‌ইশেই, মাগা, মন্দিরা, করতাল নৃত্য, করতালি নৃত্য; পুংচোলম মণিপুরে প্রচলিত

আছে। ভঙ্গি পারেং, বৃন্দাবন ভঙ্গি পারেং, গোষ্ট ভঙ্গি পারেং প্রভৃতি পাঁচটি ভঙ্গি সমস্ত মণিপুরী নৃত্যের মূল উপাদান। মণিপুরী নৃত্যগুরুগণ বিভিন্ন তালের ওপর নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী নৃত্য পরিকল্পনা করতে পারেন কিন্তু এই পাঁচটি ভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারেন না। সকল মণিপুরী নৃত্যই কোনও না কোনও ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মণিপুরীগণ নৃত্যকে ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গ মনে করায় নৃত্য অনুষ্ঠানকালে হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত বিধিনিষেধ পালন করে।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত "চারি" নৃত্য মণিপুরে চালি নামে পরিচিত। চালিকে মণিপুরী নৃত্যের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ মনে করা হয় বলে নৃত্যগুরুগণ শিক্ষাদানকালে প্রথমেই চালিনৃত্য শিক্ষা দেন। ঋগবেদে আদিত্যস্তুতিতে বর্ণিত আদিত্য পরিক্রমণের ধারা অনুসরণ করে মণিপুরী নৃত্যে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পরিক্রমণ করা হয়। স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা মণিপুরী নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় এই স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে আমাদের মনে হয় এই নৃত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। মণিপুরী নৃত্যের এই সকল জ্যামিতিক বিন্যাস ও দোলন দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। মণিপুরী নৃত্য প্রধানতঃ ভক্তিরসকে আশ্রয় করে রচিত।

মণিপুরী নৃত্যে শিল্পিগণ কোনও প্রকার অস্বাভাবিক রূপসজ্জা করেন না। স্বাভাবিক রূপকেই সামান্য প্রসাধনে উজ্জ্বল করা হয়। মণিপুরীতে সকল শিল্পিগণই কপালে উর্ধ্বতিলক অঙ্কন করেন এবং পুরুষ শিল্পিগণ শরীরের দ্বাদশ স্থানে চন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদাবলী অঙ্কিত করে।

মণিপুরী নৃত্যে শিল্পিগণ শাস্ত্রসম্মত পোশাক পরিধান করেন। এই বেশভূষা মহাভারতের ক্ষত্রিয়গণের অনুকরণে করা হয়ে থাকে। বেশপরিধানের এই ভঙ্গিকে ত্রিকংস ভঙ্গি বলা হয়। মণিপুরী নৃত্যে মেয়েদের পোশাক সাধারণতঃ দুই প্রকার, 'ফনেক' ও 'কুমিন'। লাইহারাউবা নৃত্যে 'ফনেক' ব্যবহার হয় এবং রাসনৃত্যে 'কুমিন' ব্যবহার হয়। 'ফনেক'এর পাড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনুকরণে পদ্মফুল ও মৌমাছির নক্সা অঙ্কিত থাকে। ফনেকের মধ্যে লাল ও কাল সারি থাকে, এই কাল ও লাল রং যথাক্রমে রাত্রি ও ঊষাকালের প্রতীক। মস্তকের উপর দেবদেবীর অনুকরণে চূড়া বাঁধবার প্রথা প্রচলিত। পুরুষ শিল্পিগণ অধিকাংশ নৃত্যে ধুতি, পাগড়ি, ও উপবীত ব্যবহার করেন। কৃষ্ণের পোশাকের নাম 'কৃষ্ণাগীফিজেং'। নাগনৃত্যে আদিবাসীদের পোশাক প্রচলিত।

মণিপুরী নৃত্যে পুং, পুংজাও, সনন্দা, বাঁশী, মন্দিরা, পেনা, কর্তাল, ঝাল, মাঙ্গাং, মইবুং এবং সাম্প্রতিককালে হারমনিয়াম, সেতার, স্বরোদ, এসরাজ, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।

মণিপুরী নৃত্যের প্রসার, গবেষণা ও অনুশীলন প্রচেষ্টায় গুরু আতম্ব সিং, প্রিয়গোপাল সিং, নদীয়া সিং, গুরু আমুরি সিং প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিককালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মণিপুরী নৃত্য সারা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মণিপুর ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ রাসনৃত্য দ্বারা বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নবকুমার সিংকে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য নিয়ে আসেন। নবকুমার সিংয়ের প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রথম মণিপুরী নৃত্যধারায় 'নটীর পূজা' ও 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলচর থেকে সিনারিক সিং রাজকুমার ও নীলেশ্বর মুখার্জিকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করবার জন্য নিয়ে আসেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের তিনটি নৃত্যনাট্য 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', ও 'চণ্ডালিকা' শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত হয়। পরিশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কবিগুরুর বিশেষ আগ্রহে গুরু আতম্ব সিং শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্য আসেন। তাঁর সময়েই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের ও ভাবের গভীরতার সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতির বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং এই কারণে শান্তিনিকেতনে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের প্রচলনের ও প্রসারের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং পরে সারা ভারতে প্রসারলাভ করে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে সঙ্গীত নৃত্য-নাটক আকাদেমীর মাধ্যমে মণিপুরী নৃত্য অনুশীলন ও গবেষণার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

আলোকচিত্র : শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়দা,

এই তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। আগের প্রত্যেকটি চিঠির মধ্যে প্রত্যাশা লুকানো ছিল, উত্তরের প্রত্যাশা, কিন্তু এ চিঠি সে মোহপাশ থেকে মুক্ত। কাল এ চিঠি যখন তোমার হাতে আসবে তখন আমি বহুদূরে। ঠিকানার সিঁড়ি বেয়ে তুমি আমার নাগাল পাবে না। ভাষাটা কাব্যিক হয়ে যাচ্ছে, তুমি হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছ, যে মহুয়া চিরদিন কাব্যের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে, সভয়ে ছন্দ এড়িয়ে গেছে, আজ চরম বিদায়ের দিনে কেমন করে সে বিচ্যুত হল, ভ্রষ্ট হল তার পথ থেকে।

আমিও ঠিক তাই ভাবছি। মনে আছে তোমার কবিতার খাতাটা আমি চুপিচুপি ড্রয়ার থেকে বের করে নিয়ে তোমাদেরই উঠানের পিছন দিকে পেঁপেগাছটার তলায় রাজ্যের শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। শেষপাতাটি ভস্মীভূত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেখেছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আলমারির তাক থেকে তোমার বাঁশীটা পেড়ে নিয়ে সায়রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। কিছুতে ডোবে না পোড়ার বাঁশী। ঢেউয়ের টানাপোড়েনে কেবল এদিক ওদিক করেছে। শেষকালে ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘায়েল করেছি বাঁশীটা। সেটা বাঁশের টুকরোয় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ইঁট ছোঁড়া থামাইনি। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছিলে, কোথায় গেল তোমার কবিতার খাতা, বাঁশের বাঁশী? আসল কথা লুকাইনি। একটি বর্ণ মিথ্যা বলিনি। বলেছিলাম খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি আর বাঁশী দিয়েছি ভেঙে।

এখনও চোখ বন্ধ করলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তোমার সুগৌর মুখটা মুহূর্তের জন্য আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ। আমি ভেবেছিলাম, তুমি এগিয়ে এসে আঘাত করবে আমাকে। কিন্তু তা তুমি করোনি।

আস্তে আস্তে মুখের রং স্বাভাবিক হয়ে এল। হাতের মুষ্টি শিথিল। গলার স্বরও বেশ নিরুত্তেজ। শুধু বললে, কেন কবিতার খাতা আর বাঁশী কি ক্ষতি তোমার করেছে?

তোমার এই শান্ত, নিরীহ প্রশ্নে আমি অসুবিধায় পড়ে গেলাম। কিন্তু অসুবিধা কাটিয়ে উঠে বললাম, কবিতা আমার ভাল লাগে না। বাঁশীর সুরে আমার কান্না আসে। চোখে জল নয়, বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা কান্নার বেগ।

তুমি চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিলে। হাতলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললে, বেশ, আমি কবিতা শোনাব না তোমাকে। আর বাঁশীও বাজাব না। আমি সারাক্ষণ তোমার চোখের দিকে চোখ রেখেছিলাম। দেখলাম তোমার দুচোখে তোমারই কবিতা পোড়ানোর অগ্নিশিখা, কণ্ঠস্বরে বাঁশীর রেশ। তখন কত আর আমার বয়স। বছর বারো কি তেরো, কিন্তু তখনই এটুকু বুঝেছিলাম, তোমার মনে যে রংয়ের ছোপ লাগতে শুরু করেছে সে রংয়ের উৎস আমি। তখন আমার মন আমের মঞ্জরীর মতন। ফাল্গুনের হাওয়ায় অনবরত দোল খাচ্ছে। কিন্তু মনে হ'ল সে দোলের স্পর্শ তোমাকেও উতলা করেছে।

কবিতার খাতার ভস্ম সারা গায়ে মেখে তুমি বৈরাগী সাজতে চাইলেও, আমি বুঝলাম সে ভস্ম পিনাকীর রোষানলে নিশ্চিহ্ন হওয়া মদনদেবের ছাই। তাতে ত্যাগের কণিকার চেয়ে ভোগের ছিটেই বেশী।

মফস্বল শহর। পাশাপাশি দুটি বাড়ী। মাঝখানে এক চিলতে মেঠো পথ। সে পথ কখনও বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। আমার বাড়ীতে অভিভাবকদের বাঁধন ছিল ঢিলে। সর্বাঙ্গে তখন আমার যৌবনের উদাত্ত ঘোষণা, তবু কেউ আমাকে শাসনের বেড়াজালে বাঁধতে এগিয়ে আসেনি। জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায়নি।

যতটুকু সর্বনাশ করার করেছিলে তুমি। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন সে সর্বনাশের চেহারার মধ্যে কোথায় একটা আকর্ষণ লুকানো ছিল। বহ্নির প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণ। সে আগুনে আমি ইচ্ছা করেই পাখা পুড়িয়ে ছিলাম, যাতে কিছুতেই পাখায় ভর দিয়ে তোমার কাছ থেকে উড়ে না পালাতে পারি।

আজ ভাবছি কোথায় তোমার সেই [illegible] রূপ। কোথায় সর্বনাশী লেলিহান শিখা। সুন্দরে ভয়ঙ্করে মেশানো অনির্বাণ দাহ। এত স্তিমিত তুমি? নতমুখ ভুজঙ্গের চেয়েও নির্বিষ, স্থবির পঙ্গু পশুরাজের চেয়েও নিরীহ।

সেদিনের কথা হয়তো তোমার মনে নেই। আমার আছে। চিরদিন থাকবে।

দুপুরবেলা। বসে বসে তুমি রং আর তুলি দিয়ে ছবি আঁকছিলে। আমি পা টিপে টিপে তোমার ঘরে ঢুকলাম। তুমি এত তন্ময় যে আমার পায়ের একটু শব্দও তোমার কানে গেল না। আমি পিছনে গিয়ে তোমার তুলিটা কেড়ে নিয়ে ছুটে পালালাম। লাল রং ছিল তুলির মুখে। সে রংয়ের ছিটে তোমার খাতায়, তোমার মুখে ছিটকে পড়ল। তুমি ছুটে আমায় ধরতে এলে। আমি আলমারির কোণে আত্মগোপন করলাম জমিয়ে রাখা খবরের কাগজগুলোর পিছনে।

তুমি ঠিক খুঁজে বের করলে। দু'হাতে খবরের কাগজের স্তূপ সরিয়ে আবিষ্কার করলে আমাকে। ঠেলা-ঠেলিতে আলমারি দুলে উঠল। আলমারির মাথায় রাখা খালি বোতল গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তুমি ঠিক সময়ে আমাকে টেনে সরিয়ে না-নিলে, সেই বোতল হয়তো আমারই মাথায় পড়ে চুরমার হ'য়ে যেত।

কিন্তু যে সর্বনাশ হয়েছিল, তার চেয়েও কি বেশী সর্বনাশ হ'ত ওই নীলচে বোতলটা আমার মাথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলে।

হুটোপাটিতে শাড়ী কোমরে এসে ঠেকেছিল। তোমার নিবিড় বাঁধনের মধ্যে উদ্ভিন্নযৌবন দেহটা অপরিসীম এক যন্ত্রণার আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল। এক সময়ে ক্লান্ত গলায় শুধু বলতে পেরেছিলাম, ছাড়ো প্রিয়তম, ছাড়ো। এখনই হয়তো মাসীমা এসে পড়বেন।

মাসীমা আসেননি, কিন্তু একটু পরেই তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে। রংয়ের ছিটে ছাপিয়ে আর এক অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির স্পর্শে তোমার সারা মুখ আরক্তিম হ'য়ে উঠেছিল। তোমার দু'চোখে [illegible] বহ্নি।

আর আমি! আমাকে কে যেন ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়ে তুলল।

তারপর অনেকদিন আর তোমার সামনে আসতে পারিনি। না, ভয় কিংবা লজ্জা নয়, সব মিশিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি।

তুমিই একদিন ডেকে পাঠালে। তোমার ছোট ভাইকে দিয়ে। ঘরের মধ্যে বসে বাবার একটা পুরোনো জামায় তালি দিচ্ছিলাম, তোমার নাম কানে যেতেই আঙুলে ছুঁচটা বিঁধে গেল। বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল শাড়ীতে। আঙুলটা লুকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তোমার ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললাম, বল গিয়ে এখন যেতে পারব না।

মা শুয়েছিলেন ঘরের এক কোণে। জীবনের বেশীর ভাগ সময় শুয়েই কাটিয়েছেন। আলস্যের জন্য নয়, শরীর খারাপ। দাঁড়ালেই চোখে অন্ধকার দেখেন, মাথা ঝিম ঝিম করে। হার্টও দুর্বল।

আমার দিকে ফিরে ক্লান্ত গলায় বললেন, যা না, শুনে আয় না, প্রিয় কেন ডাকছে। কি রাজকার্য করছিস ঘরে বসে।

পঁচাশী টাকা মাইনে পাওয়া বাপের মেয়ে কেউই বাড়ীতে রাজকার্য করে না, কিন্তু গোটা সংসারের ভার সামলাতে হয়। তোমার কাছে আমাকে পাঠাবার এত আগ্রহের কারণটুকু সেই বয়সেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পাত্র ভাল। পাত্র হিসাবে তুমি সর্বাংশে কাম্য। কেবল আমার দরিদ্র বাপের নাগালের পরিধির বাইরে, এই যা।

সেদিন তুমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলে।

কাছে ডেকে এনে, আদর করতে করতে।

কোথাও তো কোন বাধা নেই। সামাজিক কোন অসুবিধা। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো মহুয়া। আমি তোমায় নেব।

আজ ভাবতে হাসি আসে। তোমার বুকে মাথা রেখে সেদিনের প্রত্যেকটি কথা [illegible] বলেছিলে, দু'হাত বাড়িয়ে তুমি আমাকে তুলে নেবে [illegible]

কিন্তু তখন ভাবিনি, ভাবতে [illegible] যে তোমার ভালবাসা [illegible] শুধু আমার যৌবনদীপ্তি [illegible]

ঘিরে। যৌবনের অবসান নেই, কামনার সমাধি।

তারপর বহুবার গেছি তোমার কাছে। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস দিয়ে তুমি আমার অভ্যর্থনা করেছ। আমার দেহে-মনে সঞ্চারিত করেছ তোমার আবেগ।

বছর তিনেক পরে সেই সর্বনাশের রাত্রি এল। বিকেল থেকে আকাশে চাপ চাপ মেঘের ভার। ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। মা হাসপাতালে। বাবার নাইট ডিউটি। ছোট বোনটাকে নিয়ে চুপচাপ শুয়েছিলাম। দরজার শেকলের ঝণাৎকার।

আমি প্রথমে ভাবলাম ঝড়ের শব্দ, কিন্তু বার বার চারবার। ছোট বোনটার গায়ে চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম। অস্পষ্ট একটা মানুষের কাঠামো। অস্পষ্ট অবয়ব বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তোমাকে চিনলাম। কিন্তু সত্যিই কি চিনতে পেরেছিলাম তোমাকে। হিংস্র জন্তুর আচ্ছাদন জড়িয়ে কামনাকলুষ যে সত্তা আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে কি তুমি? বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের সঙ্গে তোমার মনের মিতালী ছিল। সে অন্ধকারের রূপ আমি দেখতে পাইনি, আমি শুধু দেখেছিলাম বিদ্যুতের ইস্পাত-অক্ষর।

তুমি ভোরের দিকে যখন ফিরে গেলে, তখন দরজা বন্ধ করে বিছানার উপুড় হ'য়ে পড়ে আমি অশ্রুর বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। অন্ত-হীন, দুর্বার সে স্রোত। কিন্তু সে বন্যায় আমার পাপ ধুয়ে গেল না। চিত্তশুদ্ধি হয়তো হ'ল, কিন্তু দেহশুদ্ধি নয়।

প্রথমে মায়ের চোখেই পড়ে গেলাম। কুয়োতলায় নীচু হ'য়ে জল তুলছিলাম, মা বসেছিলেন দাওয়ায়। আমার ধারণা ছিল উনি বুঝি চোখ বুজে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন, নিজের রোগজর্জর দেহের কথা, কিন্তু তাঁর কড়া গলা শুনে বুঝতে পারলাম তাঁর দৃষ্টি ছিল আমার দেহের দিকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তাঁর ক্ষীণ, শিরাপ্রকট দুটি হাতে অমিত শক্তির জোয়ার এল। আমাকে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে আমার আবক্ষ [illegible] বিছানার ওপর তারপর শাড়ীর আঁচল মুঠো করে ধরে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, মুখপুড়ী, বল, বল কোথা থেকে এ পাপ [illegible] করলি।

আমি প্রতিবাদ করলাম। মাকে ঠেলে ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করে শুকনো গলায় বললাম, কি যা তা বলছ তুমি?

মা একটি কথাও বললেন না। আমাকে তেমনইভাবে চেপে ধরে পট পট করে একটার পর একটা আমার ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগলেন। কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে মেঝের গড়িয়ে পড়ল। আরো ক্ষিপ্রহাতে অন্তর্বাস ছিঁড়লেন তারপর আবার বললেন, দেখ, দেখ, তুই নিজের চোখে। কার চোখকে তুই ভোলাবি। পরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিজের মনকে পারবি ফাঁকি দিতে।

আর ওঠার চেষ্টা করলাম না। শুয়ে শুয়ে কাঁদলাম। একটু দূরে মেঝের ওপর পড়ে মাও হাঁফাতে লাগলেন। দুহাতে বুক চেপে।

মাকে কোন নাম বলিনি কিন্তু মা বোধ হয় জানতে পেরেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন, কারণ, তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল না। অন্তরঙ্গতাও নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরে বাতি জ্বালানো হয়নি। সেই জমাট অন্ধকারে মার দুটি চোখ জোনাকির মতন জ্বলছিল। সে দুটি দ্যুতি বুঝি সমাজের ভ্রূকুটি, আমারই বিবেকের দাহ।

তুমি ঘরেই ছিলে। সামনে পরীক্ষা তাই একমনে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ছিলে। নিজের ভবিষ্যতজীবনের চিন্তায় ব্যাকুল, আর কারো দলিত-মথিত জীবনের কথা ভাববার অবকাশ ছিল না।

আমাকে দেখে বুঝি ভূত দেখলে।

তারপর আমার প্রত্যেকটি কথা শুনতে শুনতে দেখলাম বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল দুটি ঠোঁট। অনেকটা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বললে, ভয় নেই, সবঠিক হয়ে যাবে। কাল এমনই সময়ে একবার দেখা কর আমার সঙ্গে।

তোমার আশ্বাসবাণীতে কতটা নির্ভর হলাম জানি না, কিন্তু আত্মহত্যা [illegible] নিজের বিশ্বাসঘাতক দেহটা [illegible] বাড়ী ফিরে এলাম।

একেবারে দরজার গোড়ার মা দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, কি বললে? [illegible]

চমকে উঠেছিলাম, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শুধু বললাম, কাল, কাল যেতে বলেছে এমনই সময়ে।

বুঝলাম সারাটা রাত মা জেগে রইলেন। দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে রইলেন আমার ক্লেদাক্ত দেহটা। সারাটা দিন মা চোখের আড়াল করলেন না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই আবার গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার দরজায়। ঘর বন্ধ। ভেতরে কেউ নেই। শাড়ীর খোলসে শরীরটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে মাসীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাসীমা রান্নাঘরে কি একটা করছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কিরে মহুয়া।

বললাম, প্রিয়দা কোথায় মাসীমা?

প্রিয় আজ দুপুরের গাড়ীতে ক'লকাতা চলে গেছে। সামনে পরীক্ষা, এখানে পড়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। হস্টেলে থাকবে। পরীক্ষা শেষ হ'লে বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে যাবে। কেন রে?

না কিছু নয়, এমনি। রান্নাঘরের দরজাটা ধরে টাল সামলালাম। সব অস্পষ্ট, মাসীমার শরীরের পিছনটা, তৈজসপাত্রের রাশ, শিকের টাঙানো হাঁড়ির সার, স্পষ্ট শুধু উনানের চারপাশের লেলিহান নীল শিখা। ঠিক অমনি আগুন জ্বলছে আমার অস্থি-উপাস্থি-স্নায়ু-মজ্জায়। আমার রক্তকোষে।

চলে এলাম। বাড়ীর দিকে নয়। সোজা স্টেশনের পথ ধরে। এমন একটা সম্ভাবনার কথা কেমন করে বুঝি জানতে পেরেছিল অবচেতন মন, তা না হ'লে সারা দুপুর মার বাক্স হাতড়ে নিজের যথাসর্বস্ব খুঁজে খুঁজে তিন-খানা নোট আর কিছু খুচরা পয়সা সংগ্রহ করে কেন বেঁধেছিলাম আঁচলে।

আটটা তেইশের গাড়ীতে উঠে বসে খেয়াল হ'ল, কোথায় চলেছি আমি। যত সহজে বাড়ীর উঠান পার হয়ে এসেছি, তত সহজে কি কোনদিন গিয়ে দাঁড়াতে পারব সে উঠানে।

কিন্তু এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম আমি। আর কোন পথ ছিল আমার। কোন চেতনা ছিল না। অন্য আরোহীরা কি ভাবল, কি বলল, সে বোধ নয়। খেয়াল হ'ল গাড়ী হাওড়া স্টেশনে এসে দাঁড়াতে।

এর পর। কোথায় যাব আমি? কার [illegible]। কার দাক্ষিণ্যের ভিখারী হব

নিজের চরম সর্বনাশের অপেক্ষা করব। তবু মফঃস্বলের নরম মাটির সঙ্গে প্রাণের যোগ ছিল, আত্মীয়তাবোধ, কিন্তু শহরের কঠিন নির্মম অ্যাসফাল্ট উদাসীন, নিস্পৃহ। অপরিচিত এ শহরের রূপ আলাদা, ছন্দ আলাদা। কেউ কারো দিকে ফিরে চায় না। সমবেদনার স্পর্শ নেই, সহানুভূতির প্রলেপ নয়। এ নগরীর ভিন্ন জাত, ভিন্ন ছন্দ।

আঁচলের খুঁটে তোমার কলেজের ঠিকানাটা লেখা ছিল। অনেকবার চিঠি দিয়েছি, উত্তরও পেয়েছি। সবাইকে লুকিয়ে সে চিঠির ভাষা পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। নিজের কাছে নিজে লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছি। যে ঠিকানা আগে ছিল আমার বাসনার কেন্দ্র, সেদিন মনে হ'ল সে ঠিকানা বন্দরের প্রতীক। ঝড়ের ঝাপটায় ভাঙা মাস্তুল জাহাজের সব চেয়ে বড় আশ্রয়।

ঠিকানাটুকুই জানি, ঠিকানায় যাবার পথ নয়। কিন্তু নিরুপায়, এভাবে হাজার মানুষের কুটিল দৃষ্টির সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। সাহস করে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলাম। উঠে বসলাম তার মধ্যে। গাড়োয়ানকে ঠিকানাটা বলে দিলাম।

সন্তাপহারিণী গঙ্গা, কলুষনাশিনী। সব চেয়ে বড় আশ্রয় তো এইখানেই ছিল। আচমকা শুধু নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। হাজার ঢেউয়ের মধ্যে একটি বাড়তি ঢেউ। একটা যন্ত্রণার অবসান, একটা গ্লানির পরিসমাপ্তি।

কিন্তু তা পারিনি। মূর্খ মন চোখের সামনে নানা রংয়ের ফানুস দেখেছিল। জীবনকে রাঙিয়ে তোলার উপাচার। বাঁচবার স্পৃহা সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল, শরীরের পাপের কথা বিস্মৃত হয়ে।

কলেজের গেটে দারোয়ান গাড়ী আটকাল। কলেজ বন্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। এ সময়ে জানালা সওয়ারী নিয়ে কোথায় চলেছে গাড়ী।

ক্লান্ত, নিস্তেজ দেহটা তুলে ধরে বলতে হ'ল। তোমার নাম।

দারোয়ান ভ্রূ কোঁচকাল। এখন কি! এখন তো পরীক্ষার আগে কলেজ বন্ধ। পরীক্ষা শুরু হবে মাস খানেক পর।

নির্বোধের মত প্রশ্ন করলাম, এই সময়ে কোথায় থাকে ছেলেরা।

দারোয়ান প্রায় হতবাক। অনেক কষ্টে বিস্ময় চেপে বলল, কোন জানে মায়ী। কেউ থাকে শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে। কেউ থাকে হস্টেলে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ক্ষীণ রশ্মি। বললাম হস্টেলের ঠিকানাটাই দাও। এবার দারোয়ান বিরক্ত হ'ল। হস্টেল কি একটা যে ঠিকানা দেবে। কোথা থেকে যাউরা আওরত এসে জুটেছে।

ততক্ষণে গাড়োয়ানেরও বিশ্বাস জন্মেছে যে আমি অপ্রকৃতিস্থ, বেসামাল। কলেজ থেকে বেরিয়ে একটু দূরে গিয়েই গাড়োয়ান গাড়ী থামাল। বলল, ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে। উন্মাদিনীকে নিয়ে শহর ঘুরতে সে নারাজ।

ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আশ্রয় নিলাম একটা বাড়ীর দাওয়ায়। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। আতপ্ত দেহ। আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন চারপাশে ছোট খাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে। বাজার-মুখো ছোকরারা দাঁড়িয়ে টিপ্পনী কাটছে। কেউ কেউ স্থূলতের ইঙ্গিতও করছে। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। এতো শুধু শুরু। মরতে না পারার মাশুল। এখন থেকে প্রতি পদে মানুষের ঘৃণা, মানুষের অবজ্ঞা মাথায় নিয়ে চলতে হবে। একটা মানুষের দোষ, তার অবিবেচনা কেউ দেখবে না, ভাববে না, নিন্দার সবটুকু জঞ্জাল আমার মাথায় ঢেলে দিয়েই সবাই নিশ্চিন্ত। কামার্ত পুরুষকে আশ্রয় দেওয়ার সবটুকু অপরাধ আমার। আমি এ দেশের অর্ধশিক্ষিতা এক নারী। পাপকে জয় করার মতন কাঞ্চনকৌলীন্য আমার নেই। সমাজকে মূক করার মতন উঁচুতলার বাসিন্দাও আমি নই।

রূঢ়, কটু মন্তব্যের স্রোতের মধ্যে হঠাৎ একটা মোলায়েম কণ্ঠ শোনা গেল। সহানুভূতিতে তরল।

চোখাচোখি হ'তেই চোখ নামাতে পারলাম না। পাকাচুলে পর্যন্ত পরিমাণ সিঁদুর, লাল পাড় শাড়ী, সুগৌরবর্ণা এক প্রৌঢ়া দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভরাট এক মাতৃমূর্তি।

ভাবতে আশ্চর্য লাগল, যে পৃথিবীতে তুমি আছ, সেই পৃথিবীতে এঁরা থাকেন কি করে! একই আলোর পুষ্ট, একই নিশ্বাসে সঞ্জীবিত ভিন্ন-ধর্মী দুটি প্রাণসত্তা, এ যেন বিশ্বাসেরও অযোগ্য। হয়তো, এঁরা আছেন বলেই, আজো জয়ন্তী এই ধরিত্রী নিজের পাপের ভারে ফেটে চৌচির হয়ে যায়নি। বিষবাষ্পে রুদ্ধশ্বাস-মৃত্যুযোগ ঘটেনি।

এসো মা, ঘরের মধ্যে এসো। আমন্ত্রণ নয়, আবাহন।

শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। হাজার মানুষের কলুষ দৃষ্টি থেকে নিজেকে সংগোপনে সরিয়ে নিতে পেরে যেন নতুন প্রাণ পেলাম। ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা কোণে বসলাম।

প্রৌঢ়া এসে সস্নেহে মাথায় হাত বোলালেন, কোথায় থাক মা। এখানে এলে কি ক'রে?

আশ্চর্য যে কথা হাজার নিপীড়ন আর নিষ্পেষণে কোন দিন কাউকে বলা সম্ভব হ'ত না, স্নেহের মেদুর স্পর্শে সব বাধা, সব সঙ্কোচ ঘুচে গেল। নাম-ধাম গোপন করে সব কিছু বললাম। নাম গোপন করলাম তোমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, সঙ্কোচবশতঃও নয়, তোমার নাম উচ্চারণ করতে ঘৃণা হ'ল তাই।

এই শহরের রাজপথে দাঁড়ানো হাজার মানুষের দুচোখে কামনা আর লালসার যে কুৎসিত দৃষ্টি দেখেছি, সে তো তোমারই চোখের ছায়া। এদের কাছে আমি যেমন দেহসর্বস্ব এক নারী, ভোগের বস্তু, তোমার কাছেও তো তাই। কেবল প্রভেদ এইটুকু তুমি সব কিছুর ওপর ছদ্মপ্রেমের এক চীনাংশুক জড়িয়েছিলে।

সব শুনে প্রৌঢ়া আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, সংসারের পথ বড় পিছল মা, কিন্তু একবার পা পিছলে গেলেই তাকে দূরে দূরে করে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাতে আত্মার অপমান করা হয়, যে আত্মা কখনও অশুচি হয় না। আপত্তি না থাকলে তুমি আমার কাছে থাকো মা। আমরা শুধু বুড়ো-বুড়ী থাকি। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের খুব ক্ষীণ। পড়শীদের সঙ্গে মেলামেশাও কম।

পৌঢ় একটু পরেই এলেন। হৃষ্টপুষ্ট সদা প্রফুল্ল মানুষ। অল্প কথাতেই হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। চীৎকার করে কথা বলেন, নিজে কানে একটু কম শোনেন, সেই জন্যই বোধ হয়।

গৃহিণীর কাছে সব শুনে সরবে হেসে উঠলেন। আমার সামনে এসে

বললেন, নাম-ধামটা বলে ফেল, বেটার কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসি। চালাকি নাকি! সম্ভোগে শ্রীকৃষ্ণ আর দুর্ভোগে আয়ান।

আমার নিজেকে কেঁচোর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হল। কত হীন আমি, কত ঘৃণ্য। নিজের দেহজ কামনাকে সংযত করতে পারিনি, সাপুড়ের সর্বনাশা বাঁশীর তালে তালে ফণা বিস্তার করে নেচেছি। নিজের কথা নিমিষের জন্যও ভাবিনি। অবগাহন করেছি মনের আনন্দে, ভাবিনি, বন্যার জল সরে গেলে পাঁকের ঘূর্ণিপাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হব।

রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেছি, পারিনি। মনে পড়েছে প্রৌঢ় দম্পতির কথা। তাঁদের অনাবিল জীবনযাত্রা। স্বর্গের জ্যোতি বিচ্ছুরিত পবিত্র হৃদয়।

ভেবেছি এই পুষ্পিত, আলোকিত জীবনের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে আমারই চরম ক্ষতি। পৃথিবীর অন্ধকার, ক্লেদাক্ত দিকটাই শুধু দেখে যাব। সুন্দর মহান দিকটা থাকবে অবহেলিত।

শুধু ভেবেছি কোন রকমে যদি দেহজ পাপটা স্থানচ্যুত করা যায়, বিষবৃক্ষের বীজ বিনষ্ট করা যায়, তাহলে নতুন করে জীবনের শুরু সম্ভব। জীবনের নতুন পাঠ।

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেবা-যত্নে, চিকিৎসায় নতুন প্রাণের স্পন্দন স্পষ্টতর। বিসর্জনের রাগিণী রূপান্তরিত হল আগমনীর ভৈরবীতে।

সময়ে নার্স এল। আলাদা ঘর নির্দিষ্ট হ'ল আমার জন্য। স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়লাম।

আমার কামনার ফসল, আমার অন্যায়, আমার ঘৃণা পৃথিবীর আলো দেখল। আশ্চর্য, যতদিন শিশু দেহলগ্ন ছিল, আমার শোণিতসেবী, ততদিন অবজ্ঞা করেছি, মৃত্যুকামনা করেছি কিন্তু যে মুহূর্তে সে ভূমিষ্ঠ হ'ল, রূপ নিল স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে, আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা বেয়ে নামল মাতৃত্বের বন্যা। নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হতেই প্রাণের বন্ধন দৃঢ়তর হ'ল।

নাম অনাথ। একেবারে তোমার চেহারা। সেই সর্বনেশে চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের ভঙ্গী, এমন কি বাঁ-দিকের গালের তিলটি পর্যন্ত। যে তোমাকে প্রাণপণে বিস্মৃত হতে চেয়েছিলাম, ঘৃণার মসীতে চেয়েছিলাম কলঙ্কিত করতে, সেই তুমিই যেন আমার সমস্ত সংসার জুড়ে, দৃষ্টিপথ আবৃত করে রইলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

এর পরের কথাগুলো তোমায় আর লিখব না। পড়তে তোমার ভাল লাগবে না।

কিভাবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে অনাথকে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছিলাম, সে কাহিনী ডানলোপিলো কুশনে বসে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বিলাসের অজস্র উপকরণ জড়ানো জীবনের মাঝখানে থেকে তুমি বুঝতে পারবে না। সে সময়টুকু এভাবে অপব্যয়িত না করে উত্তেজক কোন বিলিতী নভেলের পাতা ওল্টালে তুমি আনন্দ পাবে। সাময়িক তৃপ্তি।

এটুকু শুধু শুনে রাখ। তোমার খোঁজ আমি রেখেছি। তোমার ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার কাহিনী কাগজে পড়েছি আর অভিশাপ দিয়েছি সৃষ্টির দেবতাকে। তোমার ওঠার তালে তালে আমি নীচে নেমেছি। অবিশ্বাসের শেষ স্তরে।

প্রৌঢ় মারা যাবার পর আমি অথৈ জলে পড়েছিলাম। প্রৌঢ়া তার মাস ছয়েক আগেই গিয়েছিলেন। আমি অবশ্য এই দুর্দশার জন্য কিছুটা তৈরীই ছিলাম। খবরের কাগজের ঠোঙা বিক্রি করতাম, বিকেলের দিকে যেতাম নারী সীবনালয়ে। বাড়ীতেও কাজ নিয়ে আসতাম। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কাজ করতাম।

এ সবে আমার এত কষ্ট হয়নি। এত যন্ত্রণা নয়। দুর্বিষহ বেদনায় নিজের সমস্ত শরীর মোচড় দিয়ে উঠত যখন অনাথ ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করত, আমার বাবা কই মা। সকলের কেমন বাবা আছে। আমার বাবা?

অসহ্য দাহে স্নায়ুশিরা পুড়ে গেলেও, সে শিখার ঝিলিক নিজের মুখে ফুটতে দিইনি। অন্য অভাগীদের মতন ছেলেকে বোঝাইনি, বাবা অনেক দূরে গেছে, আবার ফিরে আসবে, কিংবা বাবা ছিল, আর নেই। কোন দিন আসবে না।

অনাথকে বুঝিয়েছি, যে তার বাবা ভীরু, লম্পট, সুবিধাবাদী। প্রয়োজন ফুরাতে পা দিয়ে ভোগের পশরা ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার সাহস তার আর নেই। ছেলের মুখোমুখিও নয়।

যে পুঞ্জীভূত ঘৃণা এতদিন বুকে চেপে অস্বস্তিতে ছটফট করছিলাম, এতদিন পরে তার শরিক পেলাম। ঘৃণার কিছুটা অংশ তুলে দিলাম ছেলের বুকে। দুজনে মিলে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে তোমার সর্বনাশ কামনা করতাম।

ছেলে বড় হ'ল। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকল। পাড়ার স্কুল। কর্তৃপক্ষের হাতে-পায়ে ধরে, নিজের অবস্থা বুঝিয়ে ছেলেকে বিনা বেতনে পড়াতে পেরেছিলাম কিন্তু কলেজে সে সুযোগ হ'ল না। তাছাড়া, আমার সামর্থও নিঃশেষিত। দৈহিক আর্থিক দুই-ই।

বস্তিবাড়ীর এক চালাঘরে আস্তানা পেতেছিলাম। মাস মাস ভাড়া জোগাতে পারতাম না। অনাথ ঘুমালে রাত্রে

তাদের বাড়ীতে গিয়ে কাজ করে দিয়ে আসতাম। বাসনমাজার কাজ। অনাথ বাইরে বেরোলে, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা।

অনাথ গোটা-তিনেক টিউশনি জোগাড় করল। রাই কুড়িয়ে বেল। কিন্তু আমি দেখলাম অনাথ পারছে না। ম্লান হ্যারিকেনের আলোতেও তার ক্লান্ত, নীরক্ত মুখের চেহারা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

বললাম, ছেলে পড়ানো তুই ছেড়ে দে অনাথ।

অনাথ বলল, তারপর।

তারপর!

এই তারপর-এর কথাটা আমিই জানি না। শুধু দারিদ্র্য আর অভাবের মরাল সাপটা দুজনকে পাকে পাকে জড়াচ্ছে। চূর্ণ করছে অস্থি-মজ্জা। কিছু দিন পরে এই পৃথিবীতে আমাদের একটুকরোও অবশিষ্ট থাকবে না।

তারপর লুকোচুরি শুরু হল। মা আর ছেলেতে।

বই হাতে ছেলে বেরোত, ফিরত সন্ধ্যার পর। ক্লান্ত, অবনত মূর্তি।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, কলেজের পরে লাইব্রেরিতে কাটাই মা। আমার তো অনেক বই নেই, কিনতে পারিনি, তাই লাইব্রেরি থেকে কপি করে নিই।

অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার দাঁড়াবার শেষ জায়গাটুকুও অনাথ কেড়ে নিল ছমাস পরে।

বসে বসে ব্লাউজের হাতায় নক্সা তুলছিলাম। সামনের বাড়ীর উকিল-সাহেবের স্ত্রী কতকগুলো কাজ দিয়েছিলেন। সময়ে দিতে পারলে পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু সময়ে দিতে পারব, এমন ভরসা পাচ্ছিলাম না। ক-দিন থেকে মাথাটা ঘুরছে। কিছুক্ষণ বসলেই শিরদাঁড়া টনটন করে। চোখেও ঝাপসা দেখি। বারবার ছুঁচটা হাতে ফুটে যায়। রক্তও পড়ে। এখনও দেহে রক্ত আছে দেখেও আশ্চর্য লাগে।

অনাথ ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসল, একটা কথা বলব মা।

ব্লাউজটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কথা রে?

আমি একটা চাকরি করছি মা। আজ ছ-মাস।

ছ-মাস! টেনে টেনে বললাম।

হ্যাঁ মা। বললেই বোধ হয় কথাটা অনাথের আর পড়ে গেল। বলল, এই ছমাস কিনা কাইরের কাজ করতে হয়েছিল মা। আজ পাকা হয়েছি।

হাত বাড়িয়ে অনাথ আমার দুটো পা ছুঁল। তাকে আশীর্বাদ করতেও ভুলে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাকরি রে? কোন অফিসে?

অনাথ মাথা নীচু করল, ম্যাট্রিক পাস আর কি চাকরি পাবে মা আজ-কাল? বেয়ারার কাজ। তবে বাবুরা বলেছে, দপ্তরীর পোস্ট একটা খালি হবে, তখন আমার কথা ভাববে।

কিন্তু তোর পড়া? অসাবধানে পাশে রাখা ছুঁচটার ওপর হাতটা গিয়ে পড়তেই মুখটা বিকৃত করে হাতটা সরিয়ে নিলাম।

নাইট ক্লাশ করব মা। একটু একটু পয়সাও জমিয়ে নেব এর মধ্যে। বই-পত্র কেনার সুবিধা হবে।

অনাথ বেয়ারা হল। তবে তার উচ্চাশা রইল, একদিন দপ্তরী হবে।

কিন্তু দপ্তরী হবার আগেই আর একটা ঘটনা ঘটল। মাস চারেকের মধ্যেই। আমার মাইনে বেড়েছে মা। অনাথ এক রাজ্যজয় করার কণ্ঠে বলল।

কত টাকা রে? দুঃখের সংসারে জল-মাপার ভঙ্গীতে বললাম। টাকার পরিমাণ কত? কতটা সুরাহা হবে? অর্ধাসনের সঙ্গে সেতুবন্ধন।

টাকার পরিমাণ অনাথ বলল না। চাকরি পাকা হওয়ার এত অল্প দিনের মধ্যে মাইনে বাড়াটা যে কতটা কৃতিত্বের পরিচায়ক সেটারই সবিস্তারে বর্ণনা করল। এ শুধু সম্ভব হয়েছে ছোট-সায়েবের দয়ায়। তিনি ডেকে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনাথকে দেখেছেন।

যে সন্দেহটা মনে শুধু কুয়াশার সৃষ্টি করেছিল, সেটাই স্পষ্ট রূপ নিল কয়েক দিন পরেই।

প্রসারিত বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে দেখলাম। না, কোন ভুল নেই। এত বছরে বিশেষ বদলাওনি তুমি। একটু স্থূল হয়েছ, যে পরিমাণে আমি ক্ষীণ হয়েছি, বোধ হয় সেই পরিমাণেই।

এদিকে অনাথ অনর্গল বলে চলেছে। অফিসের থিয়েটারের প্রোগ্রামটা দেখে হাওয়া খেতে খেতে।

জানো মা, বাবার নামটা শুনেই ছোটসায়েব প্রথমে শুধু কুঁচকে ছিলেন। ও'রও ওই নাম কিনা। তারপর অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কোথায় দেশ। দাদুর কি নাম। এখানে কোথায় থাকি।

মাঝে মাঝে এমন হয়। জলে ডুবে দৃঢ় মুষ্টিতে কে যেন পাতালের রূপে ধরেছে। চোখের সামনে থেকে আলোর শেষ বিন্দুটিও নিভে আসছে। তারপরেই তমিস্রার স্রোত।

অদ্ভুত লোক, মা। এমন মানুষ যে পৃথিবীতে আছে ভাবিনি। আমি সামান্য বেয়ারা, কিন্তু কি ভালবাসেন আমাকে। কত উপদেশ দেন। জীবনে উন্নতি করার কথা বলেন।

ভুল করেছিল অনাথ, তুই বিরাট একটা ভুল করেছিস। সোনার টুকরো হারিয়ে কাঁচের টুকরো কুড়োচ্ছিস দুহাতে। মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে জলাশয়ের রূপ দেখছিস।

কিন্তু এত কথা অনাথকে বলে লাভ নেই। সে বুঝবে না বিশ্বাস করবে না। ভবিষ্যতে দপ্তরীর চাকরি দেবার মালিককে সে কিছুতেই নামাতে পারবে না বুকের বেদী থেকে।

আবার আমি হেরে গেলাম প্রিয়দা। একবার হেরেছিলাম তোমার কামতৃষ্ণাকে স্বর্গীয় প্রেম ভেবে। নির্বিচারে নিজের দেহ তুলে ধরেছিলাম। শুক্তার নির্মাল্যকে কুৎসিত ভোগে পরিণত করেছিলাম।

আবার হারলাম। এতদিন ধরে তোমার বিরুদ্ধে যে ঘৃণার বিষবাষ্প সঞ্চারিত করেছিলাম ছেলের মনে। তোমার লাম্পট্যের, স্বার্থপরতার যে কলুষ ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম, তার অবসান।

জানি না, কি তোমার মনে আছে। কোন দিন অনাথের কাছে তোমার পরিচয় দেবে কি না। হয়তো দেবে, হয়তো দেবে না। যদি দাও, তবে যে ঘৃণার পশরা এতদিন সে বহন করে এসেছে তোমার বিরুদ্ধে, সে ঘৃণা সে দ্বিগুণবেগে আমার ওপর ফিরিয়ে দেবে। ভাববে, এমন দয়ালু, দেবোপম-চরিত্রের পঙ্কিল ছবি যে আঁকতে পারে, আসলে সে নিজে। মূর্তিমতী পাপিষ্ঠা।

তৃতীয়বারের সেই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি নিজেকে নিঃশেষ করলাম। তোমার ঠিকানা আর আমার কাছে দুর্লভ নয়। এ চিঠি তোমার অফিসের ঠিকানায় দিলাম। সম্ভবতঃ কাল পাবে। কিন্তু আমাকে আর কোন দিনও নয়।

এই অন্তিমলগ্নে শেষবারের মত শুধু আমি জানিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে আমি ঘৃণা করি প্রিয়দা। আমার প্রতি রক্তবিন্দু, চৈতন্যের কণা, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে।

ঠিক তোমার মতনই ঘৃণ্য করি, এই পৃথিবীকে, পৃথিবীর এই আশ্চর্য নিয়ম-পদ্ধতিকে, বিচার-বিবেচনাকে, যেখানে তোমার মতন লম্পটেরা উন্নতি করে, জোয়ালের শীর্ষদেশে ওঠে, আর আমার মতন হতভাগিনী, প্রতারিতা, নিষ্পাপ জীবনকে অকালে অন্ধকারে ঝরাতে হয়। ইতি— প্রিয়দা।

প্রথম উপন্যাস রচনায় যাঁরা তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিন তাঁদেরই একজন। সম্প্রতি 'নোভিমির' পত্রিকায় তাঁর 'ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একটি দিন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এইটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। পাণ্ডুলিপি হাতে করে কোন সম্পাদকের দরজায় বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। লেখকও অবশ্য উচ্ছ্বসিত হন রচনা প্রকাশের জন্য। তবু যখন প্রকাশিত হল, তখন আশাতীত সমাদর লাভ করলেন। সাহিত্যের বেত্রদণ্ড হাতে নিয়ে যারা অবিরত সচেতন চক্ষু নিক্ষেপ করে চলেছেন সর্বত্র—তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন এমন উপন্যাস একমাত্র ক্ষমতাশালী লেখকের পক্ষেই রচনা সম্ভব। ফলে বিস্ময়কর প্রতিভা, আন্তরিকতা ও প্রখরতার সঙ্গে লিখিত এই উপন্যাসখানির রচয়িতা সম্পর্কে পাঠকের মনে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হল অস্বাভাবিকভাবে। অথচ তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হল না। কারণ সৃষ্টিকর্তা নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। সমাজের বাইরের লোক তিনি নন। সমাজের সকলের সঙ্গে বাস করলেও কেমন যেন একা একা—কেমন যেন নিঃসঙ্গ।

'নোভিমির' পত্রিকায় তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে সোলঝেনিৎসিন লেখকের ছদ্মনাম। তথ্যটি প্রচারিত হয়ে এমন সত্য বিশ্বাসে পরিণত হল যে, আসল নামটিই যে সকলের সামনে রয়েছে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না। আলেকজান্দার সোল্‌-ঝেনিৎসিন আত্মপরিচয় গোপন না করেই স্বনামে এই উপন্যাস লিখেছেন।

খুব সহজ স্বভাবের একজন ভদ্র মানুষ তিনি—যাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় খুব মৃদু চরিত্রের মানুষ। হাল্কা হলদে রঙ-এর তাঁর মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে। কপালের মাঝখানে ওপর থেকে নীচে গভীর একটা ক্ষতের চিহ্ন। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মানুষের মুখ সাধারণত যেরকম হয়ে থাকে, তাঁর মুখখানাও হুবহু সেই রকম। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে দেখা যায় খুব কমই। এমনকি সাক্ষাৎকার চাইলেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। 'নোভিমির'-এ উপন্যাস প্রকাশকালে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিতে শেষ পর্বের সংশোধন ও অদলবদল করতে। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—

"আমার সম্বন্ধে হৈচৈ সৃষ্টি করার মতো রিপোর্ট প্রকাশের বিরোধী আমি। সেইজন্যেই যেকোনো রকমের সাক্ষাৎ-কারে আমার আপত্তি। আমার যা কিছু বলার আছে, সে সবই আমি বলব আমার গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে।.........সেই সঙ্গে 'মুখোসধারী মানুষ' হিসেবে আমার সম্বন্ধে একটা রূপকথা চালু হোক—এ আমি একেবারেই চাই না। সেইজন্যেই আমার জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য আমি সংবাদপত্রগুলির জন্য দেব। আমার সাহিত্যরুচি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও এই ধরণের অন্যান্য প্রশ্ন করবেন না কারণ এসব প্রশ্নের আমি কোনো জবাব দেবনা।"

হঠাৎ একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসেন, "আপনাকে বন্দী হতে হয়েছিল কেন?"

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সোলঝে-নিৎসিন, 'স্তালিন সম্পর্কে অসাবধান উক্তি করার জন্যে।'

'কি অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল?'

'এটাতো সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রসঙ্গ তুললেন। আমি আবার বলছি, আমার মতে, একজন গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে শুধু তাঁর বই সম্পর্কেই আপনাদের আগ্রহ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নয়।'

সোলঝেনিৎসিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। সমকালীন কোন কোন লেখককে তিনি ক্ষমতাশালী বলে মনে করেন, কোন্ লেখককে সাহিত্যগুরু হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর সাহিত্যের শিকড় নেমেছে কোন্ জমিতে, তাঁর এই লেখার ঝোঁক এবং বাহুল্যবর্জিত ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোধশক্তি এলো কোথা থেকে—এ প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। নিঃসঙ্গ, লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটি কোন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। আপনাকে খোলাখুলি সকলের সামনে তুলে ধরতে চান না।

উপন্যাসটি পড়বার পর সহজেই একটি কথা মনে হবে যে, যিনি এই কাহিনী লিখেছেন, তিনি নিজেও অনেক দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন সয়েছেন। অন্যের মুখে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে ঠিক এইভাবে ইভান দেনিসোভিচ সুখোফ-এর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা যেত কিনা সন্দেহ। সোলঝেনিৎসিনের কাহিনী প্রকৃতই বাস্তবধর্মী। নিজের জীবন থেকে উপলব্ধ সত্যকে শিল্পের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন। এবং প্রকৃত শিল্প-ক্ষমতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সুসামঞ্জস্যেই সম্ভব হয়েছে এই উপন্যাসের জন্ম।

শিল্পের বহিঃপ্রকাশের আগে কোন সৎ শিল্পী জনসমাদৃতির দিকে তত নজর দিতে পারেন না। আবার অনেকে নিজের রচনার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে যেন আগের থেকেই অনুভব করতে পারেন। বইটি লেখার জন্য সোলঝেনিৎসিন যখন কলম ধরেন, তখন এটা ছাপা হবে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন কিনা জানিনা। কিন্তু নিঃসন্দেহে গ্রন্থকার এমন একজন অনন্যসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তি যিনি স্পষ্টদ্রষ্টা ও সুদূরদর্শী।

সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষার ওপর স্পষ্টতই সোলঝেনিৎ-সিনের অসাধারণ দখল। কিন্তু মানুষটি কে—একজন শিক্ষিত চাষী অথবা সাধারণ মানুষদের একেবারে মাঝখানে নেমে আসা একজন বুদ্ধিজীবী?

১৯১৮ সালে এক দপ্তর-কর্মচারীর পরিবারে আলেকজান্দার ইসায়েভিচ সোলঝেনিৎসিনের জন্ম। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগের পর তাঁর মা-ই তাঁকে মানুষ করে তোলেন। আলেকজান্দারের শৈশব ও কৈশোর কাটে ডন নদীর তীরে রোস্তফ শহরে এবং এইখানেই তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিতে স্নাতক হন। কোনো বিশেষ ধরনের সাহিত্য-শিক্ষা পাননি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগের কয়েক বৎসরে তিনি একই সঙ্গে মস্কোর ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য ইনস্টিট্যুটের ভাষা-বিজ্ঞান বিভাগের ডাকযোগে শিক্ষালাভের পাঠ্যক্রম (করেসপণ্ডেন্স কোর্স) অনু-শীলন করেন। ১৯৪১ সালে একজন প্রাইভেট হিসাবে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে তাঁর ডাক আসে। ১৯৪২ সালে গোলন্দাজবাহিনীর কলেজের শিক্ষা শেষ করার পর আলেক-জান্দার এক সৈন্য-ব্যাটারির নায়ক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফ্রন্টে লড়াই করেন। তিনি দুবার রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন।

পূর্ব প্রাশিয়ায় যখন তিনি একজন ক্যাপ্টেন হিসাবে নিযুক্ত তখন সোলঝে-নিৎসিনকে এক রাজনৈতিক অভিযোগে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং আট বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশ শেষ হবার পর তাঁকে নির্বাসনে পাঠান হয়। এর কিছুকাল পরে 'অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি' বলে তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বাসিত করা হয়। বন্দী-শিবির থেকে মুক্তিলাভের পর থেকে আলেকজান্দার একটি বিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন।

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মল্লিকা চলে গেলে আমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে রইলাম। পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে আইলীন যে কী কথা আমাকে বলছিলো, তার অর্ধেকই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। এক সময়ে বললাম, 'আইলীন, এবার তুমি থামো। আমার কয়েকটা কথা আছে তোমাকে বলবার।'

'বেশ বলো।'

'তুমি যে ঠিকানা খুঁজে খবর নিয়ে, অসুস্থ জেনে আমাকে দেখতে এসেছ, তার জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমাকে জানিয়ে দেয়া ভালো, আমার কাছে তুমি আর বিশেষ কিছু আশা কোরো না।'

'কি বললে?'

'আমি তোমাকে এ কথাটা অনেক আগেই বুঝতে দিয়েছিলাম। আমার ব্যবহার, আমার ভঙ্গি, কিছুই আমি ঝাপসা রাখিনি। উচ্চারণ করে না বললেও সে ভঙ্গির অর্থ যে তুমি বোঝোনি তা আমার মনে হয় না। তবু কেন এ রকম করো?'

আইলীন আকাশ থেকে পড়লো, 'এতোকাল ঘুরিয়ে শেষে তুমি আমাকে এই বলে গলাধাক্কা দিচ্ছ?'

'কী আশ্চর্য। আমি কেন ঘুরোবো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তুমি ঘুরিয়েছ, আশা দিয়েছ।'

'কক্ষনো না।'

'এখন অস্বীকার করছো সুযোগ বুঝে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে তুমি প্রতিশ্রুত।

'আইলীন, এটা হাসপাতাল। আমি অসুস্থ। দয়া ক'রে এখানে কোনো দৃশ্যের অবতারণা করো না।'

আইলীন চোখে রুমাল চেপে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলো, 'রাসেল, তুমি এতো নিষ্ঠুর। এতো মিথ্যুক।'

আমার অবস্থা কল্পনা ক'রে দেখুন মিসেস সান্যাল। কী খারাপ লাগছিলো কী বলবো। একটু রেগেই বললাম, 'তুমি বরং এবার যাও।'

তড়িৎতাহতের মতো ছিটকে দাঁড়ালো সে, 'তার মানে আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

'আমি নিরুপায়।'

'এই ইঁদুরের মতো মেয়েটার মধ্যে তুমি কী পাবে বলতে পার?'

'চুপ করো।'

'কেন চুপ করবো, কক্ষণো চুপ করবো না। জানি, শাড়ি দেখলেই তোমরা মুর্ছা যাও। তা ছাড়া আর কালো ভূতটার আছে কী?'

কিছু মনে করবেন না মিসেস সান্যাল, একটি ভারতীয় মেয়েকে আইলীন যে ভাবায় গালাগাল দিচ্ছিলো, সেটা সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত ঈর্ষা-প্রসূত। এমনিতেও সে অত্যন্ত অমার্জিত এবং অশিক্ষিত ছিলো। তার কথা শুনে আপনি আমাদের দেশের অন্য মেয়েকে বিচার করবেন না।

রাসেলের কথা শুনে আমি হেসে বললাম, 'এ নিয়ে তোমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমাদের দেশের কোনো ছেলেও যদি এ রকম তোমাদের দেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইতো অথবা প্রেমে পড়তো, প্রতিযোগী মেয়ে থাকলে সে যা বলতো সেটা তো ধরছিই না, প্রতিবেশীরাও বাক্যবাণে এর চেয়ে একচুল পিছিয়ে দাঁড়াতেন বলে মনে হয় না। এসব ব্যাপারের মধ্যে কোনো দেশ কাল পাত্রের ভেদাভেদ নেই।

রাসেল নিশ্চিন্ত বোধ ক'রে বললো, 'কিন্তু এটা অত্যন্ত অন্যায়।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'আপনিই বলুন তো দেশের তফাতে হৃদয়ের তফাৎ হয় কোথায়? তবু আমরা দেশ-বিদেশ নিয়ে কী কাণ্ড করি, পরস্পরকে কতো দূরে ভাবি। এই বাধা কবে উত্তীর্ণ হবো বলতে পারেন?'

বলতে পারলুম না কাকাবাবু। বলতে পারলুম না, তোমরা আমাদের কী ভাবো জানি না, কিন্তু আমরা ভারতীয়রা আমাদের দেড়শো বছরের অভ্যাসের খোলস ছাড়িয়ে এখনও সহজ হ'য়ে উঠতে পারিনি তোমাদের সঙ্গে। সমকক্ষের মতো মেলামেশা করার চেয়ে তোমাদের আমরা ভক্তিভরে নকল করতেই বেশী উৎসুক। ছেলেমেয়েদের

আমরা তোমাদের স্কুলে পড়িয়ে তোমাদের ধরন-ধারণে পাড় বানাতে পারলেই নিজেদের সফল মনে করি। আমাদের সাবালক পুরুষেরা পোষাকে, আসাকে, সিগারেট ফোঁকায়, মদ খাওয়ায়, মেরুদণ্ড করে খই ফোটা ভুল ইংরিজি বলায় পাড় হবার জন্যে সতত উদগ্রীব। স্বদেশিনী ভগিনীকুলেরা ছাঁটা চুলে, খাটো জামায়, আঁটো ইজেরে শরীর সাজিয়ে রঙিন ঠোঁট গোল ক'রে আধো আধো বাংলা বলে ভারি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। বাচ্চাগুলোকে চার বছর না পুরতেই নৈনিতাল, দেরাদুন, মুসৌরী, কার্সিয়াং, দার্জিলিং ইত্যাদি জায়গায় মিশনারি স্কুলের বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে জগাখিচুরি বানিয়ে তোলেন। আবার এদিকে কখনো কোনো ছেলে যদি মেম বিয়ে ক'রে আনে তখন বলেন, বিলিতি মেয়েগুলোর কি চরিত্র নামে কোনো পদার্থ আছে? এরা হ'লো ছেলে-ধরা ডাইনি। মেয়েরা অবিশ্যি সাহেব বিয়ে করেন না, হয়তো পান না বলেই করেন না, কিন্তু করলে সেই গবুখেকো খোক্কস সাহেবটির চোদ্দোপুরুষ নরকে পাঠাতেও গুরুজনদের দ্বিধা নেই।

আমাকে নিরুত্তর দেখে রাসেল নিজেই আবার বললো, 'এই যে আপনাদের সঙ্গে আমার এতোটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে, ভালোবাসা হ'য়েছে, মাত্র দু'দিনের পরিচয়েই আমরা আপন হ'য়ে উঠেছি এ কি মিথ্যা! এর কি কোনো মূল্য নেই? না কি দেশের ব্যবধানে এতোটুকুও মনের ব্যবধান হ'য়েছে? মনের সঙ্গে মনের সংযোগ এটাই কি সবচেয়ে বড়ো কথা নয়? এ সবের মর্ম আইলীন কী ক'রে বুঝবে? কী ক'রে বুঝবে কেন আমি ঐ ভারতীয় মেয়েটির জন্য আত্মহারা হ'য়েছি? তাই সে আমাকে আঘাত দেবার জন্য বারে বারে মুলিকাকে তার দেশ তুলে গাল দিয়ে নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করছিলো।

আমি উত্তেজিত এবং অস্বস্তি বোধ করলুম। ধমক দিয়ে বললুম, 'তুমি থামবে কিনা।'

সে বললো, 'না।'

আমি বললাম, 'তা হ'লে আমাকে যা খুশি বলো কিন্তু আর একবারও যদি সেই ভারতীয় মেয়েটিকে ইঙ্গিত ক'রে কোনো অশোভন উক্তি করো আমি তৎক্ষণাৎ বেল বাজিয়ে নার্সকে ডেকে তোমাকে বার ক'রে তাড়াবো।

কুৎসিত মুখভঙ্গি ক'রে আইলীন বললো, 'তাই দিও। কেলেঙ্কারী তোমারই হবে, তোমার স্বরূপটাই চিনতে পারবে সবাই। কিন্তু ভূতকে আমি ভূতই বলবো। একশোবার বলবো, ঐ কালো মেয়েটা অত্যন্ত বিশ্রী, আমি তাকে ঘেন্না করি।'

'আইলীন।'

'খুব যে লাগে।'

'হ্যাঁ লাগে। লাগে। তুমি যাও।'

'কেন লাগে শুনি?'

'ভালোবাসি বলে। ভালো বলে।'

'কী! কী বললে? আবার শুনি।'

'শোনো, ভালো ক'রে শুনে নাও। আমি তাকে ভালোবাসি।' বলতে বলতে হঠাৎ সব ভুলে আমার হৃদয় ভ'রে উঠলো। সারা বুক নিংড়ে নিংড়ে আমি বার করলাম সেই শব্দগুলো, আমি কান পেতে শুনলাম। আমি ভেসে গেলাম। আমার চোখে জল এলো। এক ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়লো আমার বুকের তটে।

আইলীন রুদ্ধকণ্ঠে বললো, 'উঃ কী আমার ভালোবাসা! কবে থেকে?'

আমি সুখের ক্লান্তিতে শ্রান্ত হ'য়ে বললাম, 'আইলীন, আর একটা কথাও আমাকে দিয়ে বলিও না।'

তবু আইলীন থামলো না। বললো, 'এককালে তো শুনেছি আমাকেও ভালোবাসতে।'

'না শোনোনি। কক্ষণো শোনোনি।'

'নিশ্চয়ই শুনেছি।'

'না না না, হ'তে পারে না। এই শব্দ এই আমি প্রথম উচ্চারণ করেছি।'

'পাপিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী। বিশ্বাস-ঘাতক।'

'শোনো, আমি প্রেরণায় বিশ্বাসী, সেই প্রেরণা থেকেই আমি আমার তৃতীয় নয়ন দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম এমন কেউ আসবে, যার জন্যেই অর্ঘ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। এই শব্দ আমার সেই অর্ঘ্যের ফুল, এ আমি এই প্রথম উৎসর্গ করলাম। প্রথম আর শেষ। তুমি যাও।'

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। শুয়ে পড়লাম লম্বা হ'য়ে, কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিলাম।

[illegible] কাঁদতে [illegible] আইলীন। [illegible] 'আজ তুমি আমাকে যে অপমান করলে, তা কি আমি ভুলবো? একটা কালো ভূত এসে আমাকে যে [illegible] হটিয়ে দিল সেই অপমান কি আমি সহ্য করবো? না না। তোমাদের এই ভালোবাসার দম্ভে আমি পদাঘাত করি, এই ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ না করতে পারি তা হ'লে আমি আইলীন [illegible] নই।'

আমি চোখে হাত চাপা দিয়ে নিঃশব্দে রইলুম। এক সময় অনুভব করলুম সে চলে গেছে।

কিন্তু ভাগ্যের কি প্রহসন দেখুন। সে গেলো তো খাবার নিয়ে নার্স এসে হাজির। একগাল হেসে বললো, 'এই রাগী গায়েপড়া স্ত্রীলোকটি তোমাকে বড্ড জ্বালিয়ে গেল, না?'

আমি উঠে বসে কোলে ন্যাপকিন বিছালাম।

'একে যে তুমি পছন্দ করবে না, তা কি সে নিজে বোঝে না?'

আমি খাবার মুখে তুললাম।

'এই দ্যাখো, আমার যে এতো অল্প বয়েস, এই রকম সুন্দর ফিগার, তবু আমিই কি কখনো নিজে থেকে কিছু বলেছি তোমাকে? কেন বলবো? যদি চোখে পড়ি তা হ'লে তো তুমি নিজেই ডাক দেবে। তবে হ্যাঁ, ডাকলে যে আমি যাবো সেটা অবিশ্যি জানিয়ে রাখা আমি দোষের মনে করি না। তোমার উপর যে আমার কেমন একটা টান পড়েছে সেটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছ? কী বলো?'

আমি নিঃশব্দে খেতে লাগলুম। অর্ধেক খাওয়া হ'তেই ঠেলে দিলুম বাসন। নার্স হায় হায় করে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার কর্তব্যের অতিরিক্ত সেবা ক'রে ক্লান্ত করতে লাগলো আমাকে। আমি চোখ বুজে রইলুম।

কিন্তু অকৃপণ ঈশ্বর পরের দিন দয়া করলেন আমাকে। আমি জানতাম আজ আর কক্ষণো সে আসবে না, নিশ্চিত নিরাশার অন্ধকারে ডুবে থেকে আমি সেই গীতাঞ্জলির পাতা উল্টিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করছিলাম। আমার সতর্ক শ্রবণ বলে দিল সে এসেছে।

খুব নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে। আমি গভীর দৃষ্টিতে [illegible] তাকিয়ে অনুচ্চারিত শব্দে তাকে আমার কৃতজ্ঞতা

[illegible] সে [illegible] মতোই সহজ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'উনি কেমন আছেন?'

আমি [illegible] মাথায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সে তার দেশের পদ্ধতি অনুসারে আস্তে বললো, 'নমস্কার।'

নিজে থেকেই নির্দিষ্ট আসনে বসলো, হাতের বইখানা আমার টেবিলে রেখে বললো, 'কাল অন্যমনস্ক হ'য়ে আপনার এই বইখানা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। অবিশ্যি আমার তাতে খুব উপকার হয়েছিলো। রাত্তিরে ঘুম এলো না পড়লুম।'

আমি বললুম 'বইয়ের মতো কিছু না।'

সে বললো, 'ভালো বই সবচেয়ে ভালো।'

'অবিশ্যি ওরকম নির্জন সময়ে—' আমি জুড়ে দিলুম কথাটা, 'যখন সব শব্দ থেমে গেছে, পৃথিবী নিথর হ'য়ে ঘুমুচ্ছে, শুধু একজন জাগ্রত মানুষের মন আর একজন দূরের মানুষকে কেন্দ্র ক'রে ঘূরপাক খাচ্ছে, সেই সময়ে তাকে যদি ফোন করা যায়, তার গলা শোনা যায়, সেই শব্দের তরঙ্গে এক ফোঁটা কাছে পাওয়া যায়, তার তুল্য কিছু নয়।'

চুপ ক'রে মল্লিকা বললো, 'আপনার নিশ্চয়ই ভালো ঘুম হয়েছিলো?'

'একটুও না।'

'রাতটা কি তা হ'লে ফোন করেই কাটালেন?'

'সাহসে কুলোলো কই?'

'উনিও করলেন না?'

'কোথায় আর।'

'হয়তো তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

'তিনিও তো শুনলাম ঘুমোননি।' তাকিয়ে হাসলাম আমি, 'সারাটা রাত তো তিনি বই পড়েই কাটালেন, একবারও কি এই অভাগাকে মনে করতে পারলেন না?'

এ কথায় মল্লিকা রঙিন হ'লো।

এর পরে আমার ছাত্রবৃত্তি শুরু হ'লো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আই লভ্' এর বাংলা কী?'

মল্লিকা বললো, 'খুব কঠিন। ওটা কিছুকাল পরে শিখলেও চলবে।'

আমি বললাম, 'তা হ'লে [illegible] দিন [illegible] দিন।' [illegible]

মল্লিকা বললো, '[illegible] দরকার হবে না।'

'তাহলে আমি কী লিখবো?'

'আমি [illegible] হলো। [illegible] কথামতো চলবো—'

'রাত্রিতে ঘুম না হ'লে টেলিফোন করবো—'

'ভুল হ'লো। ওটা আমার নিষেধ শাসনের গণ্ডিতে পড়ে না।'

'তার মানে আপনার আপত্তি নেই?'

'প্রশ্নই ওঠে না। আপনার কাকে ভালো লাগবে, কাকে ভাববেন, কাকে ফোন করবেন সে বিষয়ে আমার কি বলবার থাকতে পারে।'

'জেনে ভালো হ'লো।'

'কিন্তু আপনার বন্ধু আইলীন পলক এলেন না এখনো?'

কথাটা মল্লিকা অত্যন্ত নিরীহ-ভাবেই বলেছিলো, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলুম একটু খোঁচা লেগেছে মনে। সুযোগটিকে ছাড়লাম না। হাতের ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললাম, 'এসে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে।'

'তা হ'লে আমি আজ উঠি।'

সরলভাবে বললাম, 'কেন?'

'আমি থাকলে হয়তো অসুবিধে হবে আপনাদের।'

'অসুবিধে!'

'[illegible] আছি।'

[illegible] শুনলে খুব খুশী হতো। আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ দিয়ে।'

'এটা আপনিও দিতে পারেন। কথাটা তো আপনার পক্ষেও সত্যি।'

'আপনার দেখছি সকলের মনের কথাই জানা আছে।'

'ওটা জানতে আমাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়নি, দু'টো চোখ তো আছে।'

'তা আছে, আর সে চোখের কোনো তুলনাও নেই, তবে দৃষ্টির দিকনির্ণয় শক্তিটা খুব প্রখর বলে মনে হচ্ছে না। সেটা একটু পিছলে গিয়ে দিকভ্রান্ত হচ্ছে।'

'এসব কথা পড়াশুনোর অংশ নয়।'

'ভুল শুধরে দেয়া তার বাইরে নয়।'

'এর নাম ঝগড়া। চুক্তিতে ছিলো ঝগড়া করা নেই।'

'তার জন্য আমার মাস্টারটিই দায়ী।'

'আমি ঝগড়া করেছি?'

'অনবরত।'

'কক্ষণো না।'

'নিশ্চয়ই।'

'এই মুহূর্তে আমি আপনার

শিক্ষক, এ রকম কথার উপর কথা বলা কি উচিত?'

'অতিশয় বেয়াদপি।'

'তবে।'

'ক্ষমা চাইছি, এবার কী পড়াবেন পড়ান, কে এলো গেলো বা আসবে কিনা তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।' এই বলে আমি চোখে চোখ ফেলবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

মৃদুলিকা গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে তার ঝুলি থেকে ভাইয়ের ছেঁড়াপাতা খান দুই বই বার ক'রে মেলে ধরলো, এই দেখুন, এটা হচ্ছে বর্ণপরিচয়, রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর এটা ধারাপাত। অঙ্কের বই। আপনাকে প্রথমে বর্ণগুলো মুখস্ত করতে হবে, তারপর চিনতে হবে, তারপর লিখতে হবে। সেই সঙ্গে এক দুই তিন চার ও শিখে নিতে হবে। মনোযোগ দিয়ে দেখুন—'

এরপরে সত্যি সত্যি বেশ খানিকক্ষণ পড়ালো সে। আমিও মন দিলুম বুঝে নিতে। কয়েকটা শব্দের বাংলা সেদিনই শিখে নিলুম। তার একটা হ'লো 'রোজ আসটে হোবে।'

প্লাস্টার-করা হাত নিয়ে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বললুম, 'বিনিমাইনের মাস্টারমশাইকে কামাই করলে কী শাস্তি দেবো?'

মৃদুলিকা বললো, 'বিনা নোটিশে ছাড়িয়ে দেবেন।'

'তাতে কি তার কিছু এসে যাবে?'

'কে বলতে পারে?'

তখন আমি গম্ভীর গলায় তাকে সদ্যশেখা বাংলা শব্দটি শুনিয়ে দিলুম, 'রোজ আসটে হোবে।'

একটু হেসে নেমে গেল সে।

পুরো দু' মাস আমি হাসপাতালে ছিলুম। হাড় জুড়তে সময় নিচ্ছিলো খুব। হেলথ ইনসিওরেন্স ছিলো বলে খরচ লাগছিলো না কিছু। দিনগুলো অলস মেঘের মতো ভেসে কেটে যাচ্ছিলো।

ইচ্ছে করলে অবিশ্যি চলে যেতে পারতুম বাড়িতে। কিন্তু কী হবে গিয়ে? কার কাছে যাবো? হাতের প্লাস্টার খুলে সম্পূর্ণ সেরে তবে ফিরলাম।

প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাদ দিয়ে বাকি সময়ের মধ্যে মৃদুলিকা আর একদিনও আসতে কামাই করেনি। আমাকে বাংলা শিক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, ততোদিনে আমি শুধু টেগোরের নাম নয়, অনেক বাঙালী আধুনিক লেখকদের নামও শিখে ফেলেছি। তাঁদের দু' একজনকে পড়েও শুনিয়েছে মৃদুলিকা, শুনে শুনে মুখস্ত ক'রে ফেলেছি অনেক লাইন, দরকার মতো জায়গায় লাগাতেও পেরেছি অনেকবার। খুব সুন্দর সে সব লাইন। অতুলনীয়। এই লাইন দুটো তখন তাকে আমি প্রায়ই বলতাম,

'অনেক কথা বলেছিলাম
কবে তোমার কানে কানে
কতো নিশীথ অন্ধকারে
কতো নীরব গানে গানে।

মিসেস সান্যাল, সেই দু' মাসের সুখের স্মৃতি আমার জীবনকে সমস্ত রকমে বদলে দিয়েছিলো তখন। আমি
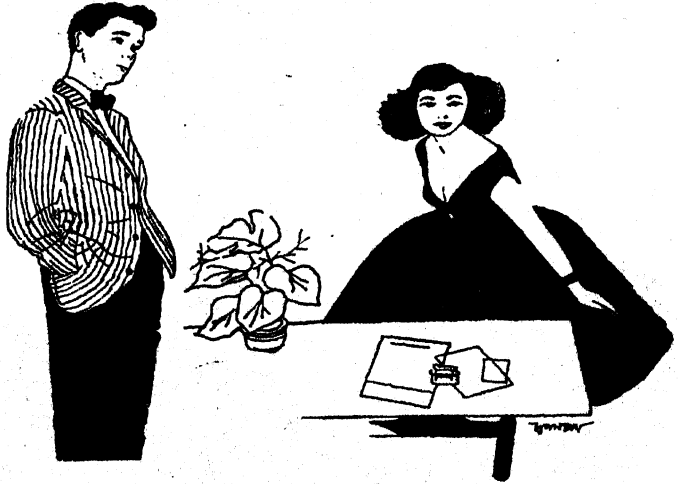
......সেই দু-মাসের সুখের স্মৃতি......

একটা অন্য মানুষ হ'য়ে গেলাম, অন্য জগতের বাসিন্দা হ'লাম।

মাঝে মাঝে অবিশ্যি আইলীন আসতো। কোনো আশা নেই জেনেও শুধু আমাকে অসুখী করতে আসতো, অপমান করতে আসতো মৃদুলিকাকে দেখিয়ে আমার সঙ্গে প্রণয়ের ভঙ্গি করতো, অতীতের কথা বলে কষ্ট দিতে চাইতো, সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগতো সেটা তার নির্লজ্জ আদর।

এসেই চুমু খেতো সে। আমি শক্ত হ'য়ে থাকতুম। মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে আদর করতো, আমি কাঁটা হ'য়ে যেতুম। কিন্তু কী করবো বলুন, আত্ম-সম্মানজ্ঞানহীন ঈর্ষাপরায়ণ স্ত্রীলোক সত্যি বড়ো ভীষণ, তাকে রুখবার মতো শক্তি আমার ছিলো না। বিশেষত একটা হাসপাতালে, যেখানে আরো পাঁচজন লোক আছে, দেখছে। কোন সিদ্ধান্তই সেখানে জোর ক'রে নেবার উপায় নেই। প্রত্যুত্তরে সে যে কী করবে আমার জানা ছিলো না বলেই ভয় করতো। আমি মেনে নিতাম।

দেখা করতে যাতে না আসতে পারে সেই বন্দোবস্তটা অবিশ্যি করা যেতো, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলে। কিন্তু আমার সে সাহসও হ'লো না। মনে মনে ভয় হ'লো রাগের মাথায় সে হয়তো সেখানে চেঁচিয়ে সত্যমিথ্যা মিশিয়ে এমন ঘটনা ঘটাবে, যেটা আমার পক্ষে সম্মানজনক হবে না, হয়তো মৃদুলিকার পক্ষেও খারাপ হ'তে পারে।

আমার সঙ্গে যে তার কতো প্রণয় সেটা দেখাতে চাইতো সে মৃদুলিকাকে। এমন অনেক গল্প বলতো, যার কোনো অস্তিত্ব কখনো ছিলো না। মৃদুলিকা শুনতে শুনতে মাথা নিচু করতো, আরক্ত হ'তো, বিদায় না নিয়ে উঠে যেতো হঠাৎ। আমি রাত্রিবেলা পাগলের মতো ফোন করতাম, বলতাম, 'আপনি কেন

আমার কথা বোঝেন না, কেন মিথ্যাবাদী আইলীনের কথা বিশ্বাস করেন।'

ওপার থেকে মল্লিকার ভাঙাভাঙা গলা শোনা যেতো, 'ঘুমোন, ঘুমিয়ে পড়ুন, অনেক রাত হ'য়েছে।'

'হোক। কেন আপনি ওরকম ক'রে চলে গেলেন সেটা বলতে হবে।'

'বলবার কী আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললো, 'সব সময়ে কি একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে ভালো লাগে কারো?'

এটা তার রাগের কথা। মল্লিকার মন জানবার ঐটাই আমার মস্ত রন্ধ্র। সে যে কেন আমার প্রাক্তন প্রণয়িণীকে (যদিও তা নয়, তবু ধ'রে নেয়া যাক) দেখে আহত হয়, তার স্মৃতি রোমন্থনে ব্যথিত হয়, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে বলতাম, 'স্রোত যদি বাধা না পায় তা হ'লে কি ঢেউ ওঠে জালে?'

একথার জবাব দিত না সে।

আমি অপেক্ষা ক'রে বলতাম, 'কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি কে তা তো বললেন না।'

সে অস্পষ্ট গলায় বলতো, 'জানা নেই?'

'কী ক'রে জানবো?'

'টিউলিপ ফুলের গুচ্ছে কি লেখা নেই সে কথা?'

'টিউলিপ ফুলের গুচ্ছ? সে আবার কী?'

'কবিতাটা যা হোক ভালোই লিখেছিলেন।'

'ও, আপনি সেই কবিতাটার কথা বলছেন? কিন্তু সেটা কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে লেখা বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আইলীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলে দিতে পারতেন।'

'আইলীন তো দাবী করছে যে ওটা নাকি আমি তাকে ভেবেই লিখেছি, ঐ টিউলিপ ফুলটি সে নিজেই হ'তে চায়। সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করলে কি সঠিক জবাব মিলবে?'

'আপনিই কি অস্বীকার করতে পারবেন যে বসন্তের প্রথম টিউলিপটি আপনার জীবনে ঐ মানুষটি ছাড়া আর কেউ নয়।'

'আমি মানুষটা বহুনিন্দিত হ'তে পারি, রুচির নিন্দে কিন্তু কেউ কখনো করেনি।'

'যা সত্য, তা সত্যই, অন্য কথা বলে চাপা দিয়ে লাভ নেই।'

'তার মানে আপনি এখানেও মাস্টারি করতে চান, না?'

'মাস্টারি কেন করবো। যা দেখছি, শুনছি, তাই বলছি।'

'আমার পছন্দের উপর বারবার এ রকম অপমানজনক কথা বললে আমি কিন্তু মানহানির মামলা আনবো।'

'তা বলে কি সত্য কথা বলবো না?'

'সত্য কথাটা হ'লো এই যে, রাত্রিবেলা ঘুম না এলে যাকে ফোন করি সে আইলীন নয়। টিউলিপ যদি কোনোদিন জীবনে ফুটে থাকে।—'

থামিয়ে দিয়ে বলতো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আমার পাচ্ছে না, আমার পক্ষে ছাড়া অসম্ভব।'

'তা আমি কী করবো?'.

'যদি কিছু করবার থাকে সে তো শুধু আপনারই হাতে।'

'সানফ্রানসিসকোর ছেলেদের দেখছি আর কোনো গুণ থাক না থাক, শ্রুতিমধুর কথা বলতে খুব পটু।'

'বাঙলাদেশের মেয়েদের দেখছি আর কোনো গুণ থাক না থাক, একজন অনুগত, বিশ্বস্ত, নিরপরাধ মানুষকে কষ্ট দিতে খুব পটু।'

'অনুগত! বিশ্বস্ত! নিরপরাধ!' 'না?'

'আমি কেমন ক'রে জানবো?'

'ঘুমেরো ঘোনো গোহোনো হ'টে যেমোনো আসে স্বোপ্নো—' 'শোমী শাখার বোক্কো হোটে যেমোনো জেব্বালে অগ্নি—'

মল্লিকা অবাক হ'য়ে যেতো, 'এ গানটা আজ শুনে আজই মুখস্ত হ'য়ে গেছে? কী আশ্চর্য।'

আমি বলতাম, 'যা আপনার মুখ থেকে শুনি তার একটি কথাও যে আমি ফেলতে পারি না। অমনি হৃদয়ে গাঁথা হ'য়ে যায়।

এরপরে অনেকক্ষণ ও পিঠ চুপ ক'রে থেকে বলতো, 'এখন ছাড়ি কেমন?'

'আর একটু।'

'আপনার ঘুম পায়নি?'

'এমন সুন্দর রাত কি ঘুমিয়ে নষ্ট করবার?

'সুন্দর! হাসপাতালের রাত কখনো সুন্দর হয়?'

'হয়। হয়। মিস মল্লিক, ঈশ্বরের দয়ায় সব হয়।'

আবার একটু চুপ। তারপর, 'কিন্তু মানুষের সংসারে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে, অনেক বিঘ্ন আছে। আমি কেটে দিলাম।'

ঠক ক'রে ফোন রেখে দিত মল্লিকা, আমার বুকটাও দপ করে থেমে যেতো সেই সঙ্গে।

এই হাসপাতালে প্রথম এসে আমি ওয়ার্ডে উঠেছিলাম। ইন্সিওরেন্সের বুক্রাশ সময়ে সেইখানেই টাকা জমা দেয়া ছিলো আমার। পরের সপ্তাহে আরো বেশী জমা দিয়ে আমি সেমি প্রাইভেটে এলাম। দুদিন না যেতেই এলাম প্রাইভেটে। সেখানে আমি একা, আমি স্বাধীন। আমার ফোন আমার হাতের কাছে। এ ব্যবস্থার সমস্তটাই আমার মল্লিকার জন্য ছিলো। তা নৈলে আমার কাছে ওয়ার্ড, সেমি প্রাইভেট কিছুরই কোনো তফাৎ ছিলো না। আমার স্বভাবের মধ্যে সহস্র সঙ্গের মধ্যেও একা হ'য়ে যাবার শক্তি ছিলো, আমি অনেক কোলাহলের মধ্যেও নির্জনতার সৃষ্টি করতে পারতাম। সব কিছুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকার অপরিসীম ক্ষমতা ছিলো আমার।

কিন্তু মল্লিকা তা পারতো না। তার মন তার চোখ বারে বারে তাকে ফাঁকি দিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতো। অন্যান্য রোগীরাও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো তাকে। তার প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধা, সঙ্কোচ, লজ্জা, আর শাড়ির অস্ফুট নরম শব্দ, সবাইকে চকিত করতো। আমার একাগ্রতা ভেঙে ভেঙে যেতো।

অবিশ্যি সবচেয়ে বেশী এই ফোনের জন্যই আমার একা ঘরে আসা। একা ঘরে তার সঙ্গে কথা বলছি সে যে কী সাংঘাতিক যন্ত্রণাময় সুখের অনুভূতি তা আমি কাকে বোঝাবো। সেই ফোনেই আমি তাকে সবচেয়ে নিবিড় করে কাছে পেতাম, সে-ও অনেক সহজ হয়ে ধরা দিত আমার কাছে।

মুখোমুখি হলেই সে সচেতন হয়ে পাহারা দিত নিজেকে, আমার অনেক কথার জবাব এড়িয়ে যেতো, চোখ তুলে প্রায় কখনোই সে তাকাতো না আমার দিকে। লজ্জা। লজ্জা। লজ্জা। সেই লজ্জা তাকে সব সময় জড়িয়ে রাখতো, আর আমি সেই নিচু করা মুখে যাত্রা-গেলির ছবি দেখতুম, আমি আত্মহারা হয়ে যেতুম সেই আধখানা মুখের প্রেমে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারার থেকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল সম্পূর্ণ উৎপাটিত করেননি শিল্পী শ্রীফণীভূষণ সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের অন্যতম। আরো আনন্দের কথা যে তিনি প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়ে ধরে বর্তমান শিল্পের কলাকৌশলকে উপেক্ষা করেননি। সর্বদাই নতুন কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটিতে তাঁর একক শিল্প-প্রদর্শনীতে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। তৈলচিত্র, জলরং, ভাস্কর্য এবং গ্রাফিক্‌স নিয়ে সবসুদ্ধ ছেচল্লিশটি শিল্পবস্তুর এই প্রদর্শনী শিল্পীর কর্ম-কুশলতা এবং সজীব দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফণীভূষণ মূলত ডেকরেটিভ শিল্পী। প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্মেই একটি পরিচ্ছন্ন ছন্দবোধ রয়েছে। তৈলচিত্রের মধ্যে হ্যামারড্‌ অয়েলের কাজ 'ক্রাইস্ট' (৪) বাইজান্টাইন মোজাইকের অনুকরণে সুঅঙ্কিত। ভাস্কর্যের মধ্যে 'ক্যাচিং বার্ড' (১০), 'মোর্নিং' (১১), 'মাদার এন্ড চাইল্ড' (১২), 'টোড' (১৬), 'টরসো' (২৩) ইত্যাদি প্রত্যেকটিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে গ্রাফিক্‌সেই মনে হয় শিল্পী নিজের সত্তার পূর্ণবিকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বাটিকের 'রানিং বুল' (২৫) একটি সুন্দর কাজ। তিন-খানি পেপারকাট যে কোন ভাল বিদেশী কাজের সমতুল্য। এছাড়া গ্রাফিকসের একটি নতুন মাধ্যম লুমিপ্রিন্টিং-এ যে তিনখানি শিল্পকর্ম তিনি দেখিয়েছেন (৩৩, ৩৪, ৩৫) সে তিনটিই চমৎকার হয়েছে। প্লাস্টিকের ওপর এচিংএ (৪০, ৪১, ৪২) শিল্পীর সূক্ষ্মকর্মের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীর আর একটি বিশেষ গুণ হল এই দুর্মূল্যের বাজারে যখন কোন জিনিস পাওয়া যায় না তখন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে তিনি করাতের গুঁড়ো, পাটকাঠি ইত্যাদি সহজলভ্য বস্তু দিয়ে মূর্তি নির্মাণে হাত দিয়েছেন। তাঁর এই উদ্ভাবনী শক্তি আশা করি অন্যান্য শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। প্রদর্শনীর আলোর ব্যবস্থা সুন্দর হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল।

শিল্পী : দেবীপ্রসাদ সাহা

শিল্পী : ফণীভূষণ

১৫ই ডিসেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে দেবীপ্রসাদ সাহার একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল ৪৫ খানি তৈলচিত্র নিয়ে। শ্রীসাহা পেইন্টার্স এন্ড স্কাল্পটার্স সংস্থার সভ্য। ইতিপূর্বে তাঁদের সংস্থার প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখা গিয়েছে। শ্রীসাহা বিমূর্ত এবং মূর্তা-ভাসী শিল্প উভয়েরই চর্চা করেন। এ'র বর্ণপ্রয়োগ-রীতি উজ্জ্বল। কখনো কখনো রংয়ের বিভিন্ন প্যাটার্ণের মধ্য দিয়ে ছায়ামূর্তির মত দেহাকৃতি বা মুখাকৃতির আভাস দেখা যায়। এ ধরনের ছবির মধ্যে (১) লাভার্স এন্ড দি মুন, (২) 'দি সান্ডাল্‌স্‌', (৯) 'ভেইল্ড উইমেন', (২০) 'হোলি সেজেস্‌' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিমূর্ত ছবিগুলির মধ্যে স্টাডি ইন কালারস সিরিজের ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। উজ্জ্বল, নীল, সবুজ, হলুদ রংয়ের প্যাটার্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন কোন ছবির মধ্যে বয়সের তারুণ্যের জন্যেই হয়তো কিছু ভাব-প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায়। আশা করা যায় পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী সে দোষ কাটিয়ে উঠবেন।

শিল্পী : ফণীভূষণ

চিত্রকলার ত্রিবেণী-সঙ্গমে

কলারসিক

প্রতি বছর শীতের মরশুমে কলকাতায় অনুষ্ঠিত যে তিনটি সম্মিলিত চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য সর্বস্তরের শিল্পী ও শিল্প-রসিক নর-নারী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, এতদিনে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে সেই তিনটি চিত্র-প্রদর্শনী সাড়ম্বরে শুরু হয়ে গেছে। এর প্রথমটি হল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস কর্তৃক আয়োজিত সর্বভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী। অন্য দুটি হল কলকাতার চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনী তিনটি দেখেই বাংলা তথা সর্বভারতীয় চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

।। অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী ।।

ক্যাথেড্রাল রোডের সুসজ্জিত ভবনেই গত ২২শে ডিসেম্বর অ্যাকাডেমী আয়োজিত ২৭তম সর্বভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্যবারের তুলনায় সর্বভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের এই প্রদর্শনীতে অধিক সংখ্যায় যোগদান এবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এমনকি সুদূর কাশ্মীর থেকেও একজন শিল্পীর চিত্র এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে। আধুনিক চিত্র-শিল্পী-রূপে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে বাংলার শিল্পী অতুল বসু, সতীশ সিংহ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, নীরোদ মজুমদার, সত্যেন ঘোষাল প্রভৃতি যেমন এবার প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছেন, তেমনি দিল্লীর সতীশ গুজরাল, কে. এস. কুলকার্ণি, কনওয়াল কৃষ্ণ, বোম্বের লক্ষ্মণ পাই, ভগবান কাপুর, সুরেশ গান্ধী, হরিশ রাউত, হায়দ্রাবাদের জয়নাব রাজভি, পি টি রেড্ডী, আমেদাবাদের প্রেম রাওয়াল, উড়িষ্যার দীননাথ পাথী, লক্ষ্ণৌ-এর সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতিও তাঁদের চিত্র-কলার নিদর্শন পাঠিয়েছেন এই প্রদর্শনীর জন্য। এরি পাশাপাশি আছে তরুণতর চিত্র-শিল্পী ও ভাস্কর্য-শিল্পীদের নানা মাধ্যমে রচিত প্রায় পৌনে চারশতটি শিল্প-কর্মের নিদর্শন। এইসব শিল্প-কর্মের নিদর্শন দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, বর্তমানে সারা ভারতে একদিকে যেমন প্রথাসিদ্ধ চিত্রকলার চর্চা অব্যাহত রয়েছে, তেমনি বিমূর্ত শিল্পের নামে অতি-আধুনিক এক শিল্পধারাও সবেগে এগিয়ে আসছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ধারাটি বিমূর্ততার নামে উন্মার্গগামিতার পথেও ধাববান। এরি একটি উৎকট উদাহরণ শিল্পী প্রেম রাওয়ালের 'মৃত্যু' (২৭৪) চিত্রটি। মৃত্যুর পর আত্মা কিভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেটি বুঝাতে তিনি ক্যানভাসের উপর রঙ চড়িয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, সাদা আর হলুদ সুতোর মাধ্যমে সেই বিলীন আত্মার যাত্রাপথও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তেমনি শিল্পী সত্যেন ঘোষালের 'পরিপূর্ণতা' (১১৯ক) রঙ-প্রয়োগের অপূর্ব দক্ষতা সত্ত্বেও কোন সাধারণ দর্শকের বোধগম্য হবে বলে মনে হয় না। বোম্বের সুমন্ত শাহর 'স্বপ্ন' (৩৫০) চিত্রখানিও এই ধারারই অনুবর্তী।

কিন্তু অন্যান্য অনেক বছরের তুলনায় এই প্রদর্শনীতে অনেক ভাল চিত্রও এবার স্থান পেয়েছে। তৈলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত বসন্ত আগাসের (ইন্দোর) 'নর্তক' (৪), রবীন্দ্র দলসুখভটের 'গ্রাম্য সৌন্দর্য' (৩৪), পুলকরঞ্জন বিশ্বাসের

শিল্পী : ভোলানাথ কর্মকার

'কম্পোজিশান' (৪২), তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'খেলা', অঞ্জু চৌধুরীর 'নিসর্গ দৃশ্য' (৬৬), সুরেশ গান্ধীর 'জেলেনী' (১১৪), কনওয়াল কৃষ্ণের 'বিচ্ছুরিত আলো', ভগবান কাপুরের 'গোয়ালিনী' (১৬৫), সুধীর খাস্তগীরের 'যুগল নর্তকী' (১৭০), রথীন মৈত্রের 'আক্রমণ' (১৮৮), অরুণ

শিল্পী : গোপাল ঘোষ

মুখোপাধ্যায়ের 'বাঁধের খিলান' (২০৪), লক্ষ্মণ পাইয়ের 'সূর্যাস্ত' (২২৯), দীননাথ পাথের 'ফসলের গান' (২৪১), সুকোমল শাসমলের 'বীরবৃন্দ' (৩২২) এবং বিকাশ ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী রায়-চৌধুরী, সুধীর সেন প্রভৃতি অনেকের চিত্রই কি চিত্র-সংস্থাপনে, কি রঙ-প্রয়োগের দক্ষতায় অনায়াসে দর্শক-মনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র-গুলির মধ্যে মানবেন্দ্র বড়ুয়ার 'নীড়' (২২), প্রদীপকুমার বসুর 'প্রস্ফুটিত' (২৬), নিতাই ঘোষের 'চড়াই-উৎরাই' (১২৮), গণেশ পাইনের 'বিধ্বস্ত' (২৬৪), মনোরঞ্জন সাহার 'কুয়াশার মধ্য দিয়ে' (৩১০) ও মুরলীধর টালির 'শীতের বিকেল' (৩৭০) উচ্চশ্রেণীর শিল্প-সুষমামণ্ডিত কাজ।

এই প্রদর্শনীতে শিল্পী গোপাল ঘোষের প্যাস্টেলের মাধ্যমে অঙ্কিত দুটি চিত্র-নিদর্শন অপূর্ব সুন্দর। চমৎকার রঙে এবং চিত্র-সংস্থাপনের অপূর্ব কৌশলে তাঁর ১২৩ ও ১২৪নং চিত্র দুটিতে গ্রাম-বাঙলার আশ্চর্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। প্যাস্টেলের মাধ্যমে অঙ্কিত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র এই প্রদর্শনীতে নেই। টেম্পেরার কাজের মধ্যে অনেকগুলি ভাল কাজ আছে। গ্রাফিক চিত্রকলার কাজও খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও মন্দ নয়। এর মধ্যে হরেন দাশের এচিং, নিখিলেশ দাসের লিথো এবং ভূপেন্দ্রনাথ সেনের একটি লিনোকাট প্রশংসার যোগ্য। ভাস্কর্য-শিল্পীদের মধ্যে হারান ঘোষের পাথর খোদাই করে সৃষ্ট 'শান্তির প্রতীক' (৯২৫) পায়রা শিল্প-কর্মের একটি সুন্দর নিদর্শন।

এতবড় একটি সর্বভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ যে স্থান নির্দিষ্ট করেছেন এবং যেভাবে ছবি ঝুলিয়েছেন তার প্রশংসা করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। এ-সব সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি দেখে আসার জন্য আমরা শিল্প-রসিক ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাই। প্রদর্শনীটি আগামী ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

।। দুই চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

চৌরঙ্গীর সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় এবং ধর্মতলার বেসরকারী ভারতীয় চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী এক সপ্তাহ আগে-পিছে শুরু হয়েছে। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রদর্শনী বাঙলার শিল্প-কলার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের প্রধান সহায়ক। উদীয়মান শিল্পীদের সঙ্গে এই দুইটি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই সাধারণতঃ আমাদের পরিচয় ঘটে। এই দিক থেকে এই প্রদর্শনী দুটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শিল্পী : তরুণকুমার পাল

যতদূর মনে পড়ে গত বছর আমরা 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় এই প্রদর্শনী দুটির একটি তুলনামূলক আলোচনা করে-ছিলাম। সেই আলোচনায় আমরা স্পষ্ট-ভাবে সরকারী মহাবিদ্যালয় অপেক্ষা বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-কর্মকে তুলনামূলকভাবে উন্নততর বলে ঘোষণা করেছিলাম। এবার কিন্তু অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সরকারী মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রগুলির সামগ্রিক বিচারে সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এবার আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ'দের মধ্যে কৌশিক চক্রবর্তী, আশিস মজুমদার, নিরঞ্জন প্রধান, কুনালকিশোর কর, রাণা সেনগুপ্ত, প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার বসু, অঞ্জু দেব, সেলিম মুন্সী, অপূর্ব পাল, রথীন্দ্র দত্ত, দীপশ্রী গোস্বামী, কুমকুম মুন্সী এবং মধুসূদন কুমারীর কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ও শিল্প-দক্ষতার স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এ'দের মধ্য থেকেই হয়তো কেউ কেউ ভবিষ্যতে শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

ধর্মতলার বে-সরকারী ভারতীয় মহাবিদ্যালয় সামগ্রিক বিচারে তৈল-রঙের মাধ্যমে চিত্র-রচনায় এবার বহুলাংশে ম্লান হলেও এই মহাবিদ্যালয়ের বিকাশ ভট্টাচার্য ও পাঁচু গুপ্ত যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের চিত্র-নিদর্শনে, তা আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার্য। জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র-বিচারে বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি। তেমনি ভাস্কর্য এবং বাণিজ্যিক শিল্পকলার শাখাতেও এ'দের কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নততর। যেমন প্রচ্ছদপট অঙ্কনে ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যত দৃষ্টি দিয়েছেন সরকারী মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিক সেই পরিমাণে দৃষ্টি দিয়েছেন পোস্টার-চিত্র অঙ্কনের দিকে।

এই দুই মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে যথাক্রমে হীরণকুমার মিত্র, তপনকুমার ঘোষ, অঞ্জু চৌধুরী, কমল চৌধুরী, শর্বানী কর, প্রণবকুমার ঘোষ, সুনন্দা গোস্বামী, সুনীল বন্দ্যো-পাধ্যায়, স্বপন দাশ, দীপাঞ্জলি দাশ-গুপ্ত, রজত সাঁতরা, বিকাশ দেবনাথ, মৃণালকান্তি রায়, সিমাদ্রি রায়চৌধুরী, অসীম বসু, বাসুদেব ভট্টাচার্য, নিতাই ঘোষ, বিদ্যাবতী ঘোষ, পূর্ণিমা রায়, হীরক সাহা, কবরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, নিতাই দাশ ও তরুণকুমার পালের শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে সম্ভাবনা-ময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আশা করি এই সব তরুণ শিল্পীরা নিষ্ঠা ও সততা সহকারে তাঁদের ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবনের পথে অগ্রসর হবেন।

শিল্পী : বিকাশ ভট্টাচার্য

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফাল্গুনের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ঐন্দ্রিলার মেজ দেওর শিবু এসে হাজির হল, হাতে একখানা লাল কালীতে লেখা চিঠি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, পাতা কুড়নো শেষ করে সবে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্যামা। শিবু হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। খাটো কাপড় পরনে—তবু তাই-ই টানাটানি করে গুছিয়ে গায়ে দিতে দিতে পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করলেন শ্যামা, 'কী গো, কি মনে করে। বেটার বিয়ে দিচ্ছ নাকি?'

চারদিক ঘোর ঘোর হয়ে এলেও চিঠির লাল কালিটা তাঁর নজর এড়ায়নি।

শিবুও হাসিমুখেই জবাব দিলে, 'বেটার নয়, বেটির।'

'বেটির! তার মানে?'

বেটার বিয়ে হবারও কথা নয়—কারণ শিবুর বড়ছেলের বয়স ন-দশের বেশী হবে না, কিন্তু বেটি আরও অসম্ভব, একেবারেই এই সর্বশেষ সন্তানটি মাত্র, ওর মেয়ে—তার বয়স এক পুরেছে কিনা সন্দেহ। তাই সংশয়ে উদ্বেগে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ। 'ভায়ের মেয়ে আর নিজের মেয়ে কি আলাদা?' শিবু তখনও হাসিমুখেই বলে, 'আপনার সীতারই বিয়ে।'

ততক্ষণে কমক এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়েছে—অভ্যস্ত আতিথেয়তার ন্যায়াকেও বলতে হয় 'বসো বাবা' কিন্তু সেটা সত্যিই যন্ত্রচালিতের মতো বললেন তিনি। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠছে। ঘরে গিয়ে এই খাটো এবং ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসবার কথাও তাঁর মনে পড়ে না। ওর ঐ অতি-সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন তাঁর মনে হয়েছিল যে খবর ভাল নয়, খুব ভাল কোন উদ্দেশ্যে শিবু আসেনি। এখন সেই সংশয়টাই সমর্থিত হয় ওর কথায়।

তিনি তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই পর-পর প্রশ্ন করে যান, 'সীতার বিয়ে? সে কি? কোথায়—কে ঠিক করলে? খোঁদ কোথায়? ছেলে কি করে?'

প্রশ্নগুলোর কোন প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে শিবু ভারিক্কি চালেই বললে, 'যোগাযোগ একটা আপনাদের আশীর্বাদে হয়ে গেল আবুই মা, তাই আর দেরি করলুম না। বিয়ে যেকালে আমাদেরই দিতে হবে, এ দায়ে যখন আর কেউ ঘাড় পাতবে না, সেকালে আমাদেরই ভেবে-চিন্তে ঠিক করা ছাড়া উপায় কি বলুন! ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলুম, মায়ের মত নিলুম—আর বেশী লোককে জানাবার কি খবর দেবার তো সময়ও হল না; এই মাসের শেষ তারিখ পেরিয়ে গেলে এখন দু-মাস আর বিয়ের দিন নেই। সামনে চোত্ত মাস, বোশেখে পড়ছে মলমাস। পাত্র বলছে এই তারিখেই বিয়ে দিতে হবে, আমরা না দিই অপর মেয়ে তার হাতে আছে। সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। ভাল পাত্তর হাত ছাড়া করে এরপর আবার কোথায় খুঁজে বেড়াব বলুন, আমাদের তো আর এথির জোর নেই—কাজেই না বলতে ভরসা হল না। অগত্যা ঐ তারিখেই রাজী হতে হ'ল। তা ধরুন কালকেই বিয়ে।'

'কাল বিয়ে?' সে কি! আর তোমরা আজ আমাদের জানাতে এসেছ? মামা জানল না, দিদিমা জানল না—আমরা এতটুকু মেয়ে থেকে মানুষ করলুম—তার বিয়ে ঠিক করে ফেললে তোমরা আমাদের না জানিয়েই? এ কেমন ধারা কথাবার্তা বাছা, কিছু তো বুঝছি না!'

মনের কুটিল সংশয় আর কণ্ঠে চাপা থাকে না, রাখার চেষ্টাও করেন না শ্যামা।

শিবুরও এবার নিজ মূর্তি প্রকাশ পায়। সে বলে, 'হ্যাঁ, মানুষ আপনারা করেছেন তা ঠিক, তেমনি আবার সব দায়িত্ব চুকিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এটাও তো ঠিক! কৈ, এই তো এতকাল বৌদি পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করছে বলতে গেলে—মেয়ে তো আমাদের ওখানে পড়ে, এই তো ধরুন আধ ঘণ্টার রাস্তা—কৈ মামা দিদিমা একদিনের তরেও খবর নিতে গেছে বলে তো জানিনি!'

'কেন খবর নিতে যাব বাবা। সুখসমন্দা সে আমাদের মা বলে-কয়ে মেয়ে নিয়ে চলে গেছে, আমাদের মত না নিয়েই—আমরা যাব সেধে তার খবর নিতে! আমরা কি যেতে বলেছি—না তাড়িয়ে দিয়েছি?'

'সে স্বেচ্ছায় গেছে!' খুব ভালমানুষের মতোই সায় দেয় শিবু, 'তবেই

দেখুন! এই তো আপনার কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, মেয়ের মা তাহলে চায় না যে মেয়ে আপনাদের দায়িত্বে থাকে। যে-কোন কারণেই হোক, মেয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে সে। এক-আধদিন রাগের মাথায় করার তো কথা নয়—ধরুন হয়েও গেল তো অনেক দিন। এর মধ্যে বহুবার এসেছে গেছে। ইচ্ছে করলেই আবার আপনাদের কাছে রেখে যেতে পারত। আজকালকার যা দিনকাল, পরের ঝক্কি কেউ যেচে স্বেচ্ছাসুখে ঘাড়ে করতে চায় না, এটা তো বোঝেন। বিশেষ বিয়ের ব্যাপার, খরচার কথা। তবে আমাদের ঘাড়ে যেকালে ফেলে দিয়ে গেছে, সে-কালে আমাদেরই যে ভার বইতে হবে, বংশের মেয়ে ফেলে দেওয়া তো চলবে না, দুর্নাম হতে তো আমাদেরই হবে, বলবে অমুকের মেয়ে, অমুকের নাৎনী। তা আমাদের দায় যখন আমাদেরই বইতে হবে, কেউ ভাগ নিতে আসবে না —তখন অপরের মতামত নিতে যাব কেন বলুন, আর এর জন্যে এত কৈফিয়তই বা কিসের?'

বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে শিবু, বোঝা যায় যে সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

বোধহয় এই-ই প্রথম, অপমানিত হয়েও চুপ করে যেতে হল শ্যামাকে, দেবার মতো উত্তর একটাও খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের যুক্তিতেই তাঁকে নিরুত্তর করে দিয়েছে শিবু। যার মেয়ে,—যে তার মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে—কৈফিয়ত চাইতে গেলে সে-ই চাইতে পারে একমাত্র। ও'দের যে অধিকার, অভিভাবকত্বের দাবী, সে তো তা স্বীকার করেনি, তবে কিসের জোর ও'দের?

চুপ ক'রেই রইলেন শ্যামা। শুধু অপমানে আর দুঃসহ ক্রোধে কানের মধ্যেটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

সে ক্রোধ এদের ওপরও ততটা নয়—যতটা তাঁর নিজের মেয়ের ওপর। কী লগ্নেই ঐ মেয়ে জন্মেছিল তাঁর। শুধু জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেল সকলকে। নিজের মন্দভাগ্যের আগুনে শুধু নিজেই জ্বলল না, শুধু তাঁদেরই জ্বালাল না, বোধকরি নিজের সন্তানেরও আজীবন দাহের কারণ হ'ল সে আগুন। কে জানে এদের কী মতলব, বিয়ে একটা সাধারণ ব্যাপার, বরং ঠিক হ'লে আগে তাদেরই জানাবার কথা, খরচের একটা মোটা অংশ দাবী করার কথা। অবস্থা খারাপ নয় এদের এটা ঠিক, তবু এতও ভাল নয় যে একটা মেয়ের বিয়ে টেরও পাবে না। এরাই যে এদের অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী বড়ভাইয়ের চিকিৎসার খরচের বিনিময়ে বিষয়টা লিখিয়ে নিয়েছিল সে কথা তো তিনি ভোলেননি। অথচ—অথচ এক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই তাঁদের। কোন প্রতিকার হাতে নেই। সে সমস্ত পথ সেই হতভাগা নির্বোধ মেয়ে নিজেই ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে।

এর পর আর তাঁর পক্ষে এ প্রসঙ্গ তোলা সম্ভব নয়—অথচ ভেতরে ভেতরে তিনি ছটফট করছেন খবরের জন্য—এ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে প্যারল কনক। সে এবার মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। এর আগে সে কোনদিন শিবুর সঙ্গে কথা বলেনি, তবে সম্পর্কে ছোট ননদের দেওর, কথা কওয়া আটকায়ও না। সে সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'মেজ ঠাকুরঝি কবে এলেন? ভাল আছেন তো তিনি?'

ছোট ও সহজ প্রশ্ন। স্বাভাবিকও। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক ব'লেই বোধ হয়—শিবু যেন বেশ একটু বিরত হয়ে উঠল। তার উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল যে কঠিন কঠিন প্রশ্নের জন্যই তৈরী হয়ে এসেছিল সে—এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘাড় মাথা চুলকে বললে, 'না—ব্যাপারটা কি জানেন বৌদি—মানে এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক হ'ল, বলতে গেলে চার পাঁচ-দিনের মধ্যেই দু-পক্ষের দেখাদেখি দেনা-পাওনা সব কিছুই ঠিক করতে হ'ল কিনা—। কাল পাকা দেখা শেষ ক'রেই বৌদিকে চিঠি দিয়েছি—কাছেই তো—এই বাঁকুরা বিষ্ণুপুর, ক ঘণ্টারই বা পথ, আজই সকালে সে চিঠি পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই, আজ রাত্তিরের ট্রেনে যদি রওনা হয় কাল ভোরেই এসে পেঁছিতে পারবে।'

'অ। ঠাকুরঝি এখনও জানেন না!... তা ছেলেটি কি করে?'

'করে—মানে করবার খুব দরকার হয় না। বিস্তর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি। এই কাছেই ডোমজুড়ে বাড়ি—ধানজমি-টমি নিয়ে যা আছে তাতে একটা বড় গেরস্ত বেশ চলে যায়।'

কনক নাছোড়বান্দা। সে খুব শান্ত সুরেই প্রশ্ন ক'রে যায়—একটার পর একটা : 'তা লেখাপড়াটড়া—মানে এমনিই জিজ্ঞেস করছি, কৈফিয়ৎ চাইছি যেন ভাববেন না—'

'না না, কী আশ্চর্য। কি যে বলেন! তা নয়—তবে কী জানেন, অতটা খোঁজ করিনি। মানে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি—ঠিক প্রথম পক্ষে কাজটা হচ্ছে না। এটি দ্বিতীয়পক্ষ। তা নইলে ঘর থেকে মোটা টাকা ধার ক'রে কাজ করতে পেরে উঠব কেন বলুন? দ্বিতীয়পক্ষ বলেই খরচাপত্র বিশেষ লাগছে না। অথচ অগাধ সম্পত্তি, যা শোনা গেল স্বভাবচরিত্রও ভাল—মানে সব দিক দিয়েই—বুঝলেন না, পাত্রের মতো পাত্র। কেবল ঐটুকু খুঁতের জন্যে কি আর কিছু করা ঠিক হ'ত?'

বলতে বলতে শেষের দিকে বেশ একটু যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে শিবু। বোধ হয় বলার ভঙ্গিতে এবং গলার আওয়াজেই পাত্র সম্বন্ধে এ'দের সমস্ত সংশয় সে দূর করতে চায়।

কিন্তু শ্যামা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পূর্বের অপমান ভুলে গিয়েই আবারও কথা কইতে হ'ল তাঁকে। সীতাকে তিনি সত্যিই ভাল-বাসতেন। যেখানে তার মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্ন, ভবিষ্যতের প্রশ্ন সেখানে মান অপমান অত মনে রাখা সম্ভবও নয়। তিনি আবারও প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'তার মানে মেয়ের মাও জানে না যে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!...... ঐটুকু একরত্তি মেয়েকে একটা দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ, হয়ত বা বুড়োর হ'তে দিচ্ছ কে জানে—তা মেয়ের মার মতটাও কি একবার নেওয়া দরকার ছিল না বাবা?'

'অবিশ্যি। অবিশ্যি। দরকার ছিল বৈ কি!' শিবুর গলা আবার মিষ্ট ও শানিত হয়ে ওঠে, (ওর কথা শুনতে শুনতে কনকের 'মিছরির ছুরি' কথাটা মনে পড়ে যায়) 'তবে কি জানেন, আবুই মা, আমাদের ওপর মেয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত আছে—তখন আমরা মেয়ের শুভাশুভটাই তো আগে ভাবব—তার মায়ের মতামতটা ঢের পরের কথা!'

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ায় সে।

কনক ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি, ও কি—উঠছেন কি, দাঁড়ান, একটু অন্তত মিষ্টি মুখে দিয়ে যান—'

'না বৌদি, ঐটি মাপ করতে হবে। বুঝতেই তো পারছেন, সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আসছি— পেটে আর তিল থোবার জায়গা নেই—'

'তা কি হয়। শুভকর্মে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন—একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে যে মেয়েটার অকল্যাণ হবে ভাই! একটুখানি দাঁড়ান—'

সে ছুটেই ভেতরে চলে যায়। আজ তার বুকে বল আছে অনেকখানি। বড়বাজারের দিকে কী একরকম আকের গুড় উঠেছে—পশ্চিমে নাকি ঐ রকম গুড়ই চলে—বড় বড় ডেলা পাকানো, দামেও নাকি ওরারা—অথচ খেতেও ভাল, সস্তা পেয়ে অনেকখানি কিনে এনেছে হেম গত সপ্তাহে। তাই দেখে শ্যামাও দিলদরিয়া হয়ে দুটো নারকোল বার ক'রে দিয়েছেন, আজ দুপুরে নিজেই নাড়ু পাকিয়ে রেখেছে কনক।

সে ঘরে চলে গেলে হাতের চিঠিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে শ্যামাকে উদ্দেশ ক'রে শিবু বলল, 'কাল আপনারা সবাই

যাবেন দয়া ক'রে—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা উম্ধার করিয়ে দেবেন। মা বলে দিয়েছেন অনেক ক'রে—কোন দোষত্রুটি অপরাধ নেবেন না, মেয়েছেলে সঙ্গে নেই বলে যেন ত্রুটি ধরবেন না। তাঁর তো আসবার উপায় নেই—বাতে পঙ্গু, আমার স্ত্রী সাতমাস অন্তঃস্বত্বা। এক আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী, বৌমা ভরসা—সব কাজ তাকেই করতে হচ্ছে বুঝছেন তো? এইসব বিবেচনা ক'রে ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে নেবেন—যেন অভিমান ক'রে বসবেন না। মা একশ'বার বলে দিয়েছেন!'

'তা তো হয় না বাবা। গায়ে ময়লা মাখলে যমে ছাড়ে না।' শ্যামা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'এ সব সামাজিক কাজ, অপারগ বললে চলে না। বিশেষত পাড়া-পড়শী হলেও না হয় কথা ছিল, এ কুটুম্বস্থল। বৌমার যাওয়ার কথা তো ওঠেই না—তুমি এসেছ যেকালে, হেম কান্তি যেতে পারত। কিন্তু বাবা কাল বিয়ে আজ শুকনো নেমন্তন্ন করতে এসেছ, সে তার বড় মামা, ছ'মাসের মেয়ে এনে সে-ই খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করেছে—সে যে যেতে রাজী হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'দেখুন—সে যা আপনারা ভাল বোঝেন। বাপ-মরা মেয়ে, কাকারা কোন-মতে বিয়ে দিচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করেন তো যাবেন। কী আর বলব। মা যা বলে দিয়েছেন তাও বললুম। এখন আপনাদের অভি-রুচি!'

নিস্পৃহ উদাসীনভাবে বলে শিবু।

ইতিমধ্যে একটা রেকাবীতে চারটে নারকোল নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে সামনে ধরেছে কনক।

'উঁহু উঁহু বৌদি, মাপ করবেন—একটা, একটার বেশী কোনমতেই চলবে না। ভাববেন চাল দেখাচ্ছে তাই, নইলে বলতুম আধখানা। একটা আমার হাতে তুলে দিন।'

'আপনিই নিন না তুলে যা নেবেন।' রেকাবীটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে দেয় সে।

আলগোছে, অতি সন্তর্পণে একটা নাড়ু তুলে মুখে ফেলে হাতটা শুধু ধুয়ে নিলে সে গেলাসের জলে, জল খেল না।

তারপর শ্যামাকে প্রণাম ক'রে কনকের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার ক'রে 'তবে আসি বৌদি' বলে বেরিয়ে গেল।

শ্যামা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভরসন্ধ্যায় সন্ধ্যা জ্বালার আগে কুটুমের ছেলে বাড়ি থেকে যাওয়া উচিত নয়, কনকেরও এই রাক্ষসীবেলায় সন্ধ্যা দেখাবার আগে খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে—এসবই মনে হ'ল তাঁর কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারলেন না।

শুধু দেহ নয়, মনেরও যেন আর কিছু ভাববার বা স্থির করার শক্তি ছিল না।

হেম বাড়ি আসতে কনকই তাকে খবরটা দিল। শ্যামা তখনও গুম্ খেয়ে বসে আছেন। মেয়েটার জন্যে দুশ্চিন্তা তো বটেই—অপমানের জ্বালাটাও ভুলতে পাচ্ছেন না। বার বার অপমান ক'রে গেল বলতে গেলে—অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ভাল রকম একটা জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না!

কনকেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। এ বাড়িতে আসার পর ঐ মেয়েটাই ছিল তার প্রধান অবলম্বন। তার সঙ্গে বকে, তার সঙ্গে গল্প ক'রেই তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচত সে। সীতাকে ওদের বাড়িতে ফেলে রাখাটা কখনই তার পছন্দ হয়নি, অনেকবার সে এখানে আনবার কথা তুলেছেও—কিন্তু এ'রা সেধে আনতে রাজী হননি, ও পক্ষের নরম হয়ে ফিরে আসারই অপেক্ষা করছিলেন। আর আনতেই হ'ল না—একেবারে পরের বাড়িতেই চলে গেল মেয়ে।

তা যাক। নিজের ঘর-বর পাচ্ছে ভালই। কিন্তু কেমন সে ঘর-বর সেই তো দুশ্চিন্তা। ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে না ব'লেই তো এত ভাবনা। দোজবরে বিয়ে এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়, আখাছারই হচ্ছে। অল্পবয়সী দোজবরে হ'লে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ বর কেমন তা কে জানে! কত বয়স, ও পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে কিনা—কিছুই তো জানা গেল না। হয়ত ভাল পাত্রই, মিথ্যেই ওরা ভেবে মরছে, কিন্তু—কনকের মনে বার-বার এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—তা'হলে এত লুকো-ছাপার কী আছে! তাদের না হয় না জানাল, মেয়ের মাকে মাত্র একদিন আগে চিঠি দেওয়া হল কেন? এটাই যে মস্ত গোলমেলে ঠেকছে।
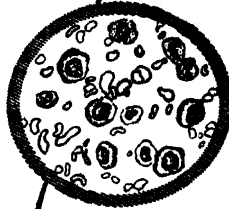
হেমও সমস্ত শুনে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর বললে, 'তা আমি আর কি করব বল! আমার আর কী করবার আছে!'

কনক ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ওমা, তা বলে কিছুই করবে না? একটু খোঁজ-খবরও নেবে না—কী পাত্তর, কী বিত্তান্ত?'

'নিয়ে লাভ? যদিই ধর পাত্র শুনি খুব খারাপ—আমি কি বিয়ে বন্ধ করতে পারব? মিছিমিছি ছুটোছুটি ক'রে লাভ কি?'

'বিয়ে বন্ধ করার কোন উপায় নেই? তুমি তো মামা, তেমন বুঝলেও বিয়ে বন্ধ করতে পারবে না? তাই কখনও হয়!'

'তুমি আইন-কানুন জান না—কী বুঝবে! তুমি গিয়ে বোঝাওগে পুলিশকে। আমি কি করে বিয়ে আটকাব বল! এক থানা-পুলিশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তা তারা যদি বলে মেয়ের মা কোথায়—তার কী মত? তখন? তাঁকে তো চেনো। তিনি যদি এসে বলেন, বেশ করব আমার মেয়ে এই পাত্তরে দেব—তখন? তখন তো সে থানা-পুলিশ তারা করবে আমাদের নামে! মানহানির মামলা ক'রে বসবে তারা। সে আমি পারব না।'

থানা-পুলিশ না-ই করলে। পাড়ার লোকজনকে বলে কিছু করা যায় না?' ভয়ে ভয়ে বলে কনক।

'অত হ্যাঙ্গাম কে করে বল! আত্মীয় কুটুম্বর ব্যাপার। পাড়ার লোক মনে করবে কোন আকচা-আকচির ব্যাপার আছে। তারপর তারা আমাদের চেনে না—ওদের সঙ্গে এতকাল বাস করছে।...... আর আমাদের অত ছিষ্টি করবার দরকারই বা কি? আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে যখন নিয়ে গেছে তখন আমাদের কী দরকার ওর মধ্যে মাথা গলাবার? যাচ্ছিও না—কিছুই না। মিটে গেল! যার মেয়ে, যে সোহাগ ক'রে রেখে গেছে ওখানে, সে বুঝুক!'

অগত্যা কনককে চুপ ক'রে যেতে হয়। সে আর কি বলবে, তার কতটুকু ক্ষমতা, কতটুকু জোর। শুধু সেই নিরুপায় নিরপরাধ মেয়েটার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে চোখ ছলছল করতে থাকে তার।

কনক অনুচ্চ কণ্ঠে বললেও দালানের ভেতর থেকে শ্যামা সবই শুনেছেন, হেমের জবাবও। তিনিও আর কিছু বললেন না, শুধু বেশ শব্দ ক'রেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। এ তাঁরই ভাগ্যের দোষ, যেখানে একটু সম্পর্ক'ও আছে—কেউ সুখী হবে না, কেউ শান্তি পাবে না।

মুখে যা-ই বলুক, শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার পর হেম বেরিয়ে পড়ে একবার। এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তা কনক প্রশ্ন করে না, বুঝতেই পারে সে। নিশ্চয় মহাদেবের বাড়িই যাচ্ছে। ডোমজুড়ে ওদের সব কে চেনা লোক আছে, আত্মীয় কেউ থাকাও বিচিত্র নয়। ওরা হয়ত জানলেও জানতে পারে পাত্রের খবর।......

কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হ'ল না। তারাও কিছু জানে না। সেখানে শিবু গিয়েছিল আরও রাত্রে—আটটা নাগাদ। এখান থেকে সেরে ও-পাড়ায় গিয়েছিল। বোধহয় শ্যামার কথাটা স্মরণ করেই—ওখানে আর মেয়েদের কথা তোলে নি—কিম্বা সেই রকমই কথা ছিল—শুধু পুরুষ কজনকে নিমন্ত্রণ করেছে, তাও কুঁচো-কাঁচা নয়, তিন কর্তা আর বড় চার-পাঁচটি ছেলেকে নাম ক'রে ক'রে বলেছে। মিনিট পাঁচেকের বেশি নাকি থাকেনি, সেজকর্তাই সামনে ছিল, তাকেই বলে চলে এসেছে। তাকেও ছেলের নাম-ধাম কিছু জানায়নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে। অবশ্য তারও অতটা তখন মনে হয়নি, বিয়েটা যে তাড়াতাড়ি সারা হচ্ছে, মামাদের জানানো হয়নি—এ-সব কিছু জানবার কথা নয় তার। মহা সে সময় বাড়ি ছিল না, সে থাকলে হয়ত জোর ক'রে জেনে নিতে পারত। ওর অত মান-অপমানের বালাই নেই, চেঁচিয়ে হাট বাধাত, জামাধরে টেনে বসানোও বিচিত্র নয় তার পক্ষে—কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, আজই সে গিয়েছিল পাড়ার কাদের বাড়ি আনন্দ নাড়ু ভাজতে। ফিরে এসে খবর পেয়ে হায় হায় করছে—কিন্তু এখন আর উপায় কি?

রাত বারোটা নাগাদ হেম ফিরে এসে যখন এই খবর দিল তখনও এ দুটি স্ত্রীলোক জেগে বসে। শ্যামা তখনও জল খাননি, তাঁর আর খাওয়া হবেও না। কনক একবার ভাতের সামনে বসেছিল বটে—কতকটা শ্যামার ভয়েই—কিন্তু কিছুই খেতে পারেনি। খাওয়ার কোন প্রবৃত্তিই ছিল না। সীতাকে যে সে এতটা স্নেহ করে—তা এর আগে সে নিজেও কোন দিন বুঝতে পারেনি।

শ্যামা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। যাবার আগে শুধু কনককে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'তুমি আর মিথ্যে এ নিয়ে মন খারাপ করো না বৌমা, ভাল বিয়ে ওর হবে না, হ'তে পারে না। সে আমি বেশ জানি। আমার ঝাড় যে! যেখানে আমার এক ফোঁটা রক্তও আছে, সেখানে কেউ কোন-দিন সুখী হবে না। মিছিমিছি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

এ সান্ত্বনা যে তিনি কাকে দিয়ে গেলেন—কনককে না নিজেকে—তা বোঝা গেল না, তবে তা বিলাপের মতোই শোনা গেল। তেমনি করুণ তেমনি অসহায়।

(ক্রমশঃ)

আমি কি বিয়ে বন্ধ করতে পারব

যিশুখৃষ্ট কবে জন্মেছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতেরা আজো 'বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল'। পশ্চিম চর্চাগোষ্ঠী পঁচিশে ডিসেম্বরকেই যিশুর আবির্ভাব-দিবস মেনে নিয়েছেন। পরম্পরের পত্রের আবির্ভাবধন্য ২৫এ ডিসেম্বর সত্যিই বড়দিন। যিশু যেন সূর্যের রথে চড়ে পৃথিবীতে এসেছেন তাই তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ অধিকতর আলো পেতে আরম্ভ করে। ক্রিস্টমাসের বড় আকর্ষণ শিশুদের কাছেই সবচেয়ে বেশী। বুড়ো সান্টাক্লজের বল্গা-হরিণের গলায় ঘন্টাধ্বনিতে তারা বড়দিনের পায়ের শব্দ পায়। হিসেব করতে বসে সান্টাক্লজের উপহারের ঝুলি থেকে কি উপহার বেরুবে তার জন্যে।

এ বছর ভারতে বিষণ্ণ বড়দিন। সীমান্তের হানাদার বাহিনী যতদিন না ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন ভারতবর্ষের গলায় ক্যারলগানের সুরে বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোনো আবেগ থাকবে না। আলোর মালায় রূপসী কলকাতা সাজেনি এবছর, নিউ-মার্কেটে বড়দিনের কল্লোলও শোনা যায়নি এ বছর।

রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী

শুধু ভারতবর্ষেই যুদ্ধের দুন্দুভি বড়দিনকে নিষ্প্রভ করেনি। গত মহাযুদ্ধে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই বড়দিন এসেছে পা টিপে টিপে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে। যুদ্ধের পর আঠারো বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিষণ্ণ বড়দিনের ক্ষীণ ছায়া মাড়াতেই হচ্ছে ইউরোপকে।

ইউরোপে গত মহাযুদ্ধে মাতৃপিতৃহারা শিশুরা বড়দিনে ক্রিস্টমাস-ট্রির সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই স্মরণ করবে সেই সুখী গৃহকোণটির কথা যেখানে মার কোলে বসে তারা ক্রিস্টমাস ক্যারলের সুর শুনত। ইউরোপের এই সব যুদ্ধ-শিশুরা এবং পরিত্যক্ত শিশুরা যাতে বিষণ্ণ বড়দিন না কাটায় তার জন্যে ইউরোপের অনেক দেশে শিশুগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রিয়ান হারমান মেইনার নামে জনৈক ভদ্রলোক ১৯৪৯ থেকে শিশুগ্রাম স্থাপনের আন্দোলন আরম্ভ করেন। আজকে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা ইউরোপে প্রায় তেরো লক্ষ। এই সভ্যরা প্রত্যেকে দৈনিক এক ফেনিগ দান করে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন। ছবিতে দৃশ্যমান শিশুরা সকলেই অস্ট্রিয়া এবং জার্মানীর এগারোটি শিশুগ্রামে পুনর্বসতি হয়েছে। এরা সকলেই একই সঙ্গে এ বছর বড়দিনের উৎসব পালন করেছে। যুদ্ধোত্তর নতুন পৃথিবীতে এই সব অনাথ শিশুরা একই পরিবারভুক্ত হয়ে এক কণ্ঠে ক্রিস্টমাস ক্যারল গাইবে।

আজ ভারতবর্ষে যে সব শিশুকে বড়দিনের এই উৎসবের সময় নিরানন্দ প্রহর গুণতে হ'য়েছে তাদের আমরা দুর্ভাগা বলব না। মাতৃভূমির এই দুর্দিনে স্বেচ্ছাতেই তারা উৎসবের প্রলোভন ত্যাগ করেছে। সে জন্যে তারা অবশ্যই দেশমাতৃকার আশীর্বাদ লাভ করবে। একদিন এ দুঃসময় থাকবে না। অন্যায় আক্রমণের প্রতিরোধে সারা দেশ যেভাবে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে হানাদারদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই অনতিদূর বিপদমুক্তির দিনে আজকের শিশুরা গৌরব বোধ করবে এই মনে করে যে, দেশজননীর দুঃখমোচনের দিনে তারাও কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়েছিল অগ্রজদের সঙ্গে। এই বিষণ্ণ বড়দিনের স্মৃতি হবে সেদিন পরম আনন্দের সঞ্চয়।

॥ উল্লেখযোগ্য পশ্চাদপসরণ ॥

ভারতের উত্তর সীমান্তের পূর্ব রণাঙ্গন হ'তে চীনা সৈন্যদের উল্লেখযোগ্য পশ্চাদপসরণের সংবাদ পাওয়া গেছে। বমডিলা হতে চীনা সৈন্য অপসারণের সংবাদ পূর্বেই জানা গিয়েছিল, সম্প্রতি নেফা-বর্মা সীমান্তের ওয়ালং, সিয়াং ডিভিশনের মেচুকা ও সুবর্ণশ্রী ডিভিশনের লাইল কিং অঞ্চল হতেও চীনা সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করেছে বলে জানা গেছে। দারাং জং হতেও চীনা সৈন্যদের অপসারণ প্রস্তুতির সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আসামের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণু সহায় শীঘ্রই বমডিলা পরিদর্শনে যাবেন। বমডিলা প্রত্যাগত নেফা প্রশাসনের কমিশনার কর্ণেল জুথরা তেজপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, বমডিলায় অসামরিক শাসনকার্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক্তাররা ডিসপেন্সারী খুলে বসছেন, ঔষধপত্রাদি পাঠানো আরম্ভ হয়েছে, ডাক-তার বিভাগের কাজকর্মও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আশা করা যেতে পারে যে অবিলম্বে ওয়ালং ও অন্যান্য মুক্ত এলাকাগুলিতেও অনুরূপভাবে শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে ও চীনা হানাদারির ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সেসব স্থানের তা পূরণ হবে।

চীনারা আরও ৩৬৮ জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ও ১১টি জওয়ানের মৃতদেহ ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর দারাং জং নামক স্থানে চীনা রেডক্রশ ভারতীয় রেডক্রশের হাতে ঐ আহত ও মৃত জওয়ানদের অর্পণ করে। এইভাবে তিন কিস্তিতে চীনারা ৬০৭ জন যুদ্ধবন্দী ও ১৩টি ভারতীয় জওয়ানের মৃতদেহ ভারত সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিল। অন্যান্য যুদ্ধ-বন্দীদের একটি নামের তালিকাও চীনা কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ২৮শে ডিসেম্বর জং হতে আরও ১০৬ জন আহত ও পীড়িত জওয়ানদের মুক্তি দেওয়া হবে চীন সরকার জানিয়েছেন।

লাদাক রণাঙ্গন হতেও এতদিন পরে কিছু কিছু পশ্চাদপসরণের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কমিউনিষ্ট চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্থল বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল লো জোই চিং গত ২২শে ডিসেম্বর ঘোষণা করেন, চীনা

বাহিনী লাদাক অঞ্চলের চিপচাপ উপত্যকা ত্যাগ করেছে। ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষও এ সংবাদের সমর্থনে বলেছেন, চীনা সৈন্যরা কারাকোরাম নদীর উৎপত্তি স্থান হতে পশ্চাদপসরণ করেছে এবং তারা হয়ত আপনা হতেই আরও পশ্চাদপসরণ করবে।

এ সময়ের মধ্যে একমাত্র অস্বস্তিকর সংবাদ হল চুম্বী উপত্যকায় চীনাদের নতুন করে সৈন্য সমাবেশ। তবে ব্যাপক অপসারণ প্রস্তুতির সংগে এই নতুন সমাবেশ সংঘাতিসূচক নয় বলে মনে হয়, এই সমাবেশের পিছনে কোন আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য নেই। কিছু কিছু অপসারিত সামগ্রী চীনাদের ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল, সে সম্পর্কেও এই প্রসংগ লেখা পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

॥ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ॥

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের যুদ্ধ চীন সরকারের বিরুদ্ধে, কারণ তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। কিন্তু চীনা জাতির বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। চীন সরকারের কার্যকলাপের জন্য অতীত গৌরবের অধিকারী চীন দেশ বা চীনা জাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা পোষণ করা উচিত নয়।

শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণদানের প্রায় সমসাময়িককালেই রাষ্ট্রপতি আমেদাবাদে এক বক্তৃতায় বলেন, চীন আমাদের প্রতিবেশী দেশ, সুতরাং প্রতিবেশীর সংগে দীর্ঘ বিরোধ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্স ও জার্মানীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ঐ দুই দেশ পরস্পরের শত্রু ছিল কিন্তু আজ তারা মিত্র। ফ্রান্স-জার্মানীর বিরোধের মীমাংসা যখন সম্ভব হয়েছে তখন ভারত-চীন বিরোধের মীমাংসা ও তাদের মৈত্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হবে না।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি প্রমুখ রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ণধাররা এতদিন জাতিকে শুধু দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতেই আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ উভয়ের মুখেই যুগপৎ মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আগ্রহে মনে হয়, চীন সম্পর্কে ভারতের মনোভাব পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। দীর্ঘ কেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে মুহূর্তের বিরোধও অবাঞ্ছিত এবং ভারত কোনদিনই চীনকে তার শত্রুরূপে দেখতে চায়নি। আজ যে বিরোধ ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার জন্যেও ভারত দায়ী নয়। ভারত আজ যা করছে তা নিতান্ত নিরুপায়ের আত্মরক্ষা প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অবস্থায় মাতৃভূমির পূর্ণমুক্তির আগেই শত্রুর প্রশংসা বা তার মৈত্রীর উপর গুরুত্ব আরোপ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদার্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

॥ নেতাজীর স্মরণে ॥

আমেদবাদে সবরমতী নদীর উপর যে দীর্ঘ সেতু নির্মিত হবে নেতাজীর পুণ্যস্মৃতির স্মরণে তার নাম হবে নেতাজী সুভাষ সেতু। সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ জাতির এই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, নেতাজীর দেশপ্রেম শুধু মহাত্মাজীর দেশপ্রেমেরই সমতুল। অন্তর হতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নেতাজী জাতির সম্মুখে যে গৌরবোজ্জ্বল দেশপ্রেমের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন আজ জাতির সংকটক্ষণে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন; নেতাজী এই মহান সত্য আরও একবার জগৎসমক্ষে প্রমাণ করে গেছেন যে, আদর্শের পথে অবিচল থাকতে হলে অনেক সময় একাই চলতে হয়। কিন্তু যে তাতে পেছিয়ে না পড় জগৎ তাকে পরবর্তীকালে অনুসরণ করে।

॥ ঠাণ্ডা লড়াই ॥

কমিউনিষ্ট দুনিয়ায় ইউরোপে আলবানিয়ার যে ভূমিকা, এসিয়ায় বহির্মংগোলিয়ারও সেই একই ভূমিকা। ইউরোপের সবকটি কমিউনিষ্ট দেশ চীনের জংগী মতবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থক হলেও আলবানিয়া তার ব্যতিক্রম। আলবানিয়ার মতে সোভিয়েটের বর্তমান শান্তিনীতি শোধনবাদেরই নামান্তর এবং সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভ শুধু সাম্যবাদেরই পথ ত্যাগ করেননি, তিনি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের দোসর। আলবানিয়ার এ বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে তার বর্তমান অভিন্নহৃদয় বন্ধু জংগীবাদী কমিউনিষ্ট চীনেরই অভিমত। চীনের সমর্থন ছাড়া ক্ষুদ্র আলবানিয়ার এতখানি দম্ভ কখনোই প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

অাবার এসিয়ার কমিউনিষ্ট দেশ ও কমিউনিষ্ট দলগুলি মোটামুটিভাবে

কমিউনিস্ট চীনের সমর্থক হলেও চীনের নিকটতম প্রতিবেশী কমিউনিস্ট শাসনাধীন বহির্মঙ্গোলিয়া তার ব্যতিক্রম। বহির্মঙ্গোলিয়ার বিপ্লবী দলের সেন্ট্রাল কমিটি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মতই ষ্টালিনবাদ বর্জন করেছে ও চীন এবং আলবানিয়ার তত্ত্বগত গোঁড়ামির নিন্দা করেছে। বহির্মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্ট শাসকরা পুরোপুরিভাবেই ক্রুশ্চেভের শান্তিনীতির সমর্থক।

এসিয়ার অন্য বহু দেশের মত বহির্মঙ্গোলিয়াকেও চীন তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে, এবং প্রকৃত পক্ষে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার মত বহির্মঙ্গোলিয়াও একদিন চীনের শাসনাধীন ছিল। ৪১ বছর আগে বহির্মঙ্গোলিয়া চীন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চীন কিন্তু কোনদিনই বহির্মঙ্গোলিয়ার এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেয়নি এবং কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হওয়ার পরেও মাও সে তুঙ বলেছেন, তিব্বতী মঙ্গোলিয় প্রভৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করে চীনের ঐক্য সম্পূর্ণ করাই তাঁদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য। এ কারণে এখনও চীন ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যবর্তী দীর্ঘ সীমান্তকে চীন তার মানচিত্রে সুচিহ্নিত করে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রধানত চীনের আগ্রাসী নীতি হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বহির্মঙ্গোলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শরণাপন্ন হয়েছে। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, চীনের আহ্বানে চীন-মঙ্গোলিয়া সীমান্ত সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে বহির্মঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী উমজাগিন সেদেনবল মধ্যে পিকিঙে এসেছিলেন। সীমান্ত আলোচনার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা ভারতের সঙ্গে চীনের তথাকথিত সীমান্ত-বিরোধের পর কারও বুঝতে বাকি নেই। বহির্মঙ্গোলিয়াকে স্বমতে আনার বা অন্তত নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যেই চীন বহির্মঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে পিকিঙে ডেকেছেন, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক মহলে আজ এই ধারণাই বিশেষ প্রবল হয়েছে। বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর এমন চাপ যদি চীনের পক্ষ হতে সত্যই আসে তবে তা যে চীন-সোভিয়েট বিরোধকে আরও ঘনীভূত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ চীন-মঙ্গোলিয়ার মধ্যবর্তী বর্তমান সীমান্ত-রেখা সোভিয়েট সরকার অনুমোদিত এবং চীন যদি বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর কোন অন্যায় চাপ দেয় সোভিয়েট ইউনিয়ন কখনোই তা মুখ বুজে সহ্য করবে না।

॥ রুশ-যুগোশ্লাভ মৈত্রী ॥

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। রাশিয়ায় তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করেছেন তা প্রায় অভূতপূর্ব। চীন যখন মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে পঞ্চমুখ সেই সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের এই টিটো-প্রীতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যমূলক ও সুদূরপ্রসারী পরিণতির ইঙ্গিতবাহক। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মার্শাল টিটো জানিয়েছেন, মিঃ ক্রুশ্চেভও তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং কয়েকদিন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই তিনি সস্ত্রীক যুগোশ্লাভিয়া সফরে আসবেন।
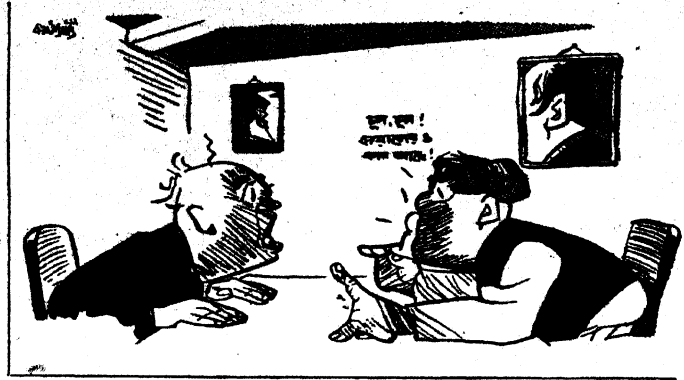
॥ নিয়াসাল্যাণ্ডের মুক্তি ॥

১৯৫৩ সালে মধ্য আফ্রিকার তিনটি উপনিবেশ উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ডের সম্মিলনে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন গঠিত হওয়ার পর থেকেই ডঃ বাণ্ডার নেতৃত্বে নিয়াসাল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ঐ অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্তির দাবী জানিয়ে আসছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে নবগঠিত ফেডারেশনের শ্বেতাঙ্গ শাসকরা যেভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের নিজ বাসভূমে পরবাসী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেটা নিয়াসাল্যাণ্ডের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের কাছে একেবারেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নিয়াসাল্যাণ্ডের দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের সস্তায় খনি-শ্রমিকরূপে পাওয়ার মতলবেই রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসক ও খনি-মালিকরা নিয়াসাল্যাণ্ডকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। নিয়াসাল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তাই প্রথম দিন থেকেই এই অবাঞ্ছিত যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন এবং একারণে নিয়াসাল্যাণ্ডের নেতা ডঃ বাণ্ডা ও তাঁর সহকর্মীদের কারাবাস হতে শুরু করে বহুরকম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্যার রয় উইলিনস্কি এ ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে ফেডারেশন তিনি কিছুতেই ভাঙতে দেবেন না। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে ফেডারেশনের অন্তর্গত তিনটি রাজ্যেই স্যার রয় উইলিনস্কির দল ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টির শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। উত্তর রোডেসিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ডের রাজ্য-সরকার বর্তমানে আফ্রিকানদের দখলে। দক্ষিণ রোডেসিয়ার নির্বাচনেও স্যার রয় উইলিনস্কির দল আরও দক্ষিণপন্থী কৃষ্ণাঙ্গ-বিরোধী দল রোডেসিয়া ফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। রোডেসিয়া ফ্রন্টের নেতা মিঃ উইনস্টন ফিল্ডকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কৃষ্ণাঙ্গ-বিরোধী নেতার পরিষ্কার কথা হল যে, কৃষ্ণাঙ্গদের আর বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় না। তার জন্যে যদি ফেডারেশন ভেঙে যায় যাবে। এর পরেই বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেছেন যে নিয়াসাল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির দাবী মেনে নিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। উত্তর রোডেসিয়াও এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং মধ্য আফ্রিকা ফেডারেল ভেঙে গিয়ে অবিলম্বে আফ্রিকায় আরও তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে। তখন দক্ষিণ রোডেসিয়া তার পরেও বৃটেন তথা সমগ্র বিশ্বের বিশেষ শিরঃপীড়ার কারণ হবে। কারণ ঐ রাজ্যের নবনির্বাচিত শাসকরা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের মতই বর্ণবিদ্বেষী। দক্ষিণ রোডেসিয়ার পঁচিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ। কিন্তু তারাই সে রাজ্যের সব সম্পদের মালিক ও শাসনদায়িত্বের একমাত্র অধিকারী। কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার পর্যন্ত স্বীকৃত নয় সে দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকার পাশেই অবস্থিত এই রাজ্যটির শ্বেতাঙ্গ শাসকরা যখন স্বাধীনভাবে কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের সুযোগ পাবে তখন বর্ণবিদ্বেষের সমস্যাটি নিঃসন্দেহে আরও জটিল ও সংকটজনক হয়ে উঠবে।

॥ ঘরে ॥

২০শে ডিসেম্বর—৪ঠা পৌষ: দেশে সংকটকালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য মজুতের সিদ্ধান্ত—পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে বিরাট গুদামঘর নির্মাণের প্রস্তাব।

২১শে ডিসেম্বর—৫ই পৌষ: 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসমূহের জমি (কয়লা-গর্ভ জমি সমেত) ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করিতে পারেন'—সুপ্রীম কোর্টের রায়—পশ্চিমবঙ্গের মামলা ডিসমিস।

পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষা উদ্যম জোরদার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা আহবান—বিধানসভায় বিতর্কের উত্তরে রাজ্য সরকারের নীতি বিশ্লেষণ—প্রতিরক্ষা ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা।

২২শে ডিসেম্বর—৬ই পৌষ: ভারত কর্তৃক নেফায় চীনাদের ঘাঁটি রাখার প্রস্তাব অগ্রাহ্য—চীনের পত্রের (৮ই ডিসেম্বরের চরমপত্র) উত্তর প্রেরণ।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ইডেন উদ্যানে (কলিকাতা) প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা আরম্ভ—খেলা: প্রধানমন্ত্রী একাদশ বনাম রাজ্যপালের (পশ্চিমবঙ্গ) একাদশ—প্রথম দিনে প্রতিরক্ষা বন্ড ও সার্টিফিকেট বিক্রয় মারফৎ প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

কেন্দ্র কর্তৃক ভারতের এটর্ণি জেনারেলের কার্যভার জরুরী অবস্থায় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের হস্তে অর্পণের সিদ্ধান্ত।

২৩শে ডিসেম্বর—৭ই পৌষ: 'রেল দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক'— কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কুঞ্জরু কমিটির (রেল দুর্ঘটনা নিরোধ সম্পর্কে নিযুক্ত) রিপোর্টের প্রথম অংশ পেশ—কর্মী নির্বাচন, শিক্ষণ ও চাকুরীর অবস্থার উন্নতির সুপারিশ—রেলপথে নাশকতামূলক কার্যই দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মত প্রকাশ।

শিক্ষাখাতে (আগামী বৎসরের) কেন্দ্রীয় ব্যয় শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস—চীনা আক্রমণজনিত জরুরী অবস্থায় সরকারের সিদ্ধান্ত।

২৪শে ডিসেম্বর—৮ই পৌষ: 'মৈত্রীভাবাপন্ন জাতি বা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ নহে—আক্রমণকারী যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ'—বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে শ্রীনেহরুর (আচার্য) ভাষণ—সংকটকালে গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) ও মহাত্মাজীর আদর্শে অবিচল থাকিবার আহবান।

প্রতিরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ হইতে বহু দ্রব্যাদির আমদানী নিষিদ্ধ—ভারত সরকার কর্তৃক ষাণ্মাষিক আমদানী নীতি ঘোষণা—প্রায় দশ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উদ্যোগ।

২৫শে ডিসেম্বর—৯ই পৌষ: 'সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে—দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) দৃপ্ত আহবান—নবগ্রামে (মুর্শিদাবাদ) সর্বোদয় নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের (অসুস্থ) সহিত নেহরুজীর নিভৃত বৈঠক।

গোরক্ষপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৮তম অধিবেশন সুরু—মূল সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

'নেতাজী সুভাষচন্দ্র একজন মহামানব'—সবরমতীতে (আমেদাবাদ) সুভাষ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির (ডঃ রাধাকৃষ্ণন) শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২৬শে ডিসেম্বর—১০ই পৌষ: 'পিকিং সরকারের প্রস্তাবে ইচ্ছা করিয়াই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে: 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা' ও ভারতীয় অঞ্চলে দাবীর মধ্যে সঙ্গতি নাই—চীনের স্মারকলিপির উত্তরে ভারতের চরম জবাব—ভারত সরকার কর্তৃক তথাকথিত অস্ত্র সম্বরণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

'বর্তমান সংকটকালে স্বর্ণ ক্রয় করা 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র সমতুল্য'—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

২০শে ডিসেম্বর—৪ঠা পৌষ: মিঃ ম্যাকমিলান (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) ও মিঃ কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) নিকট পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পত্র—বিষয়বস্তু: কাশ্মীর ও সিন্ধু নদের জলবিরোধ (পাক-ভারত) প্রসঙ্গ।

সাধারণ বাজারের (ইউরোপীয়) সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আফ্রিকার সদ্য মুক্ত দেশগুলির উদ্যোগ—সংশ্লিষ্ট ২৪টি রাষ্ট্র কর্তৃক নূতন সমিতির সনদ অনুমোদন।

২১শে ডিসেম্বর—৫ই পৌষ: 'ভারতে ইঙ্গ-মার্কিণ অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত থাকিবে'—বাহামা বৈঠকান্তে কেনেডি ম্যাকমিলান যৌথ বিবৃতি—স্কাইবোল্ট ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্তে আমেরিকা কর্তৃক বৃটেনকে পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত।

মিসেস সিংহলী দূত মারফৎ জোট বহির্ভূত ছয় জাতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব পিকিং-এ প্রেরণ।

২২শে ডিসেম্বর—৬ই পৌষ: মার্কিণ স্কাইবোল্ট ক্ষেপণাস্ত্র সাফল্যের সহিত উৎক্ষিপ্ত—ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাতেও আমেরিকার সাফল্য।

রাশিয়া কর্তৃক নূতন স্পুটনিক কসমস (কৃত্রিম উপগ্রহ) উৎক্ষেপ—দ্বাদশ 'কসমস'-এর পৃথিবী পরিক্রমা সুরু।

কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব চীনা প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ চৌ) হস্তে অর্পণের সংবাদ।

২৩শে ডিসেম্বর—৭ই পৌষ: 'ইঙ্গ-মার্কিণ 'পোলারিস' চুক্তি সংশ্লিষ্ট দুই দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক'—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের মন্তব্য।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া পরিদর্শনের আমন্ত্রণ (যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট টিটোর অনুরোধ) গ্রহণ।

২৪শে ডিসেম্বর—৮ই পৌষ: এলিজাবেথভিলে কাতাঙ্গা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম কাতাঙ্গী বাহিনীর গুলীতে রাষ্ট্রসংঘের হেলিকপ্টার ভূপাতিত।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পুনরায় পরীক্ষামূলক মেগাটনী বোমা বিস্ফারণ।

ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে আমেরিকার বন্দরগুলিতে ডক শ্রমিকদের (৮১ হাজার) ব্যাপক ধর্মঘট।

২৫শে ডিসেম্বর—৯ই পৌষ: ভারতের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কবাণী: রাষ্ট্র জোটের বাহিরে থাকার নীতি (নিরপেক্ষতা) পরিহার করা সঙ্গত হইবে না।

'কাশ্মীর সমস্যা দীর্ঘকাল মুলতুবী রাখিলে সশস্ত্র যুদ্ধের আশংকা'—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিঃ জাফরুল্লা খানের হুঁসিয়ারী—পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের জরুরী আহবানে করাচী আগমন।

২৬শে ডিসেম্বর—১০ই পৌষ: কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসায় পাক-ভারত মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে যোগদানার্থ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের রাওয়ালপিন্ডি উপস্থিতি—দলীয় নেতা: সর্দার শরণ সিং। বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট পাক প্রতিনিধিদলের নেতা: মিঃ জেড এ ভুট্টো।

চীন বহির্মঙ্গোলিয়া সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চল ও চীনের মধ্যে সীমানা সম্পর্কে চীন-পাকিস্থান যৌথ ঘোষণা।

॥ মাও সংহিতা ॥

প্রতিটি চীনা সৈনিককে ধর্মপরায়ণ খ্রীষ্টানের বাইবেল পাঠের মত এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ দশটি অনুশাসন অবশ্যই পাঠ করতে হয়। সমগ্র রণকৌশলের নির্দেশ আছে মাত্র দশটি অনুশাসনে। মাও সে তুঙ স্বয়ং এই অনুশাসনের রচয়িতা। যাঁরা চীনা কম্যুনিস্টদের কুয়োমিনটাঙ সরকারের সঙ্গে লড়াই বা কোরিয়ার য়ুনাইটেড নেশনস বাহিনীর সঙ্গে লড়াই-এর সংবাদ রাখেন বা অতি সাম্প্রতিককালের নেফার যুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে তাঁরাই স্বীকার করবেন মাও লিখিত এই সুসমাচার আজো চীনা সৈনিকের কাছে ধর্মগ্রন্থের মতো পবিত্র।

মাও-এর রণনীতির গুরুদেবের নাম চু তে, ১৯২৭-এর ১লা আগস্ট নানচাং-এ চৈনিক লাল ফৌজের সূচনাকালে গুরু চু তে শিষ্যকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন গেরিলা যুদ্ধের চূড়ামণি, সহস্র সংঘর্ষের নায়ক, মাও সে তুঙ তা আক্ষরিকভাবে পালন করে চলেছেন।

এই দশটি অনুশাসন মাও লিখিত গ্রন্থ 'The Turning Point in China-তে পাওয়া যায়। তার সংক্ষিপ্ত-সার নীচে দেওয়া গেল ঃ

(১) শত্রুর বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে সর্বাগ্রে আঘাত হানো, পরে শক্তিশালী সেনাগোষ্ঠীকে আক্রমণ করবে।

(২) প্রথমে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সাইজের শহর গ্রহণ করবে, পরে ধরবে বড় বড় শহর।

(৩) প্রথম কর্ম হল শত্রুর আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করা। বিরাট শহর জয় করা বা অধিকারে রাখা নয়।

(৪) প্রতিটি যুদ্ধে একান্তভাবে উত্তম সৈনিক আমদানী করবে, শত্রুর চেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ এমনকি পাঁচ-ছ'গুণ বেশী সৈন্য নিয়ে শত্রুকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে সমূলে বিনাশ করবে। জাল ছিঁড়ে যেন কেউ পালাতে না পারে। শত্রুর কেন্দ্র-মূলে আঘাত করবে, একেবারে নিঃশেষ করার চেষ্টা করবে, তার ফলে আমাদের সেনাদলকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে অন্যত্র শত্রু সেনাকে আক্রমণ করা যাবে। যেখানে লাভের পরিমাণ তেমন বেশী নয় যাতে করে মাত্র ক্ষতি-পূরণ করা যায়, কিংবা কোনো রকমে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, সে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবে।

(৫) তৈরী না হয়ে কোনো যুদ্ধ লড়বে না। যে যুদ্ধে বিজয়

অভয়ঙ্কর

সম্ভাবনা নেই, সেই যুদ্ধ পরিহার করো। প্রতিটি সংঘর্ষেই বিজয়ের জন্য চেষ্টা করবে, তবে শত্রু এবং আমাদের সৈন্যের তুলনামূলক অবস্থাটা সর্বদা বিচার করবে।

(৬) অল্পকালের মধ্যে একই সঙ্গে কয়েকটি বিরামহীন আক্রমণ চালাবে।

(৭) শত্রু যখন চলমান তখনই তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে সেই সঙ্গে আক্রমণকারী সমাবেশ-গুলিকে সুদৃঢ় করবে, আর শত্রুর কাছ থেকে তার সুদৃঢ় ঘাঁটি ও অবস্থান স্থল ছিনিয়ে নেবে।

(৮) প্রথমে নেবে যে সব অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল। এরপর অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য অপেক্ষা করবে তারপর নেবে যে সব অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রবল।

(৯) শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া গোলা-বারুদ দিয়ে নিজেদের অভাব মেটাবে। মানুষ এবং মসলার উৎস হল সংগ্রামস্থল।

(১০) দুটি অভিযানের অন্তর্বর্তীকাল বিশ্রামের জন্য ব্যয় করবে। এই অবসরে পুনর্বিন্যাস এবং সৈনিক শিক্ষণের কাজটা সেরে নেবে। পুনর্বিন্যাস এবং বিশ্রামের কাল যেন সুদীর্ঘ না হয়। যতদূর সম্ভব শত্রুকে এতটুকু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেবে না।

ভারতের বুকে চৈনিক আক্রমণের ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই বুঝবেন মাও লিখিত সুসমাচার অনুসারে চৈনিক আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষতঃ (১), (৩), (৪), (৫), (১০) এই পাঁচটি অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে। এই অভিযানের জন্য প্রস্তুতি হয়েছে অতি প্রবলে। আমাদের সেনা-দলকে চীনারা পাঁচ থেকে ছ' গুণ বেশী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেছে। চলমানতা এবং সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলে ওরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তাওয়াং-এ প্রথম আক্রমণের কাল থেকে বোমডিলায় ও ওয়ালং-এ দ্বিতীয় আক্রমণের অবসরকালটুকু ওরা কৌশল সহকারে কাজে লাগিয়েছে বিশ্রাম ও পুনর্বিন্যাসে। অথচ 'শত্রুকে নিঃশ্বাস

ফেলার অবসর দিও না' এই নির্দেশ আক্ষরিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

মাও সে তুঙ-এর দশটি অনুশাসন, চৈনিক লালফৌজের প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন অভিযানের ইতিহাস, তাদের শক্তিমত্তা ও রণনৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে একখানি মনোরম গ্রন্থ এই ডিসেম্বর মাসে লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'THE RED ARMY OF CHINA', লিখেছেন মেজর এডগার ও' ব্যালান্স।

মেজর ও' ব্যালান্স বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে তথ্য এবং কাহিনীকে পৃথক করেছেন। মাও সে তুঙ-এর সেনাদল সম্পর্কে অনেক রূপকথার কাহিনী গড়ে উঠেছে মাও-এর গুণমুগ্ধ অনুগামীদের মুখে মুখে। সে গৌরবগাথাকে তথ্য থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই মূল্যবান গ্রন্থে পাওয়া যাবে চৈনিক লালফৌজের পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস। এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তারা নিয়তই হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে নয় যুদ্ধ করেছে। তবে মেজর ও' ব্যালান্স বলেছেন যে চীনের ড্রাগনের দ্রংষ্ট্রা করাল দেখে ভীত হওয়ার কিছু নেই, কারণ ড্রাগনের সব নখের তীক্ষ্ণতা সমান নয়, আর দংশন ক্ষমতাও সীমিত। নেতৃত্ব সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

চৈনিক লাল ফৌজ বেড়ে উঠেছে যে ঐতিহ্য নিয়ে, যে সাফল্য তারা লাভ করেছে এতাবৎকাল, তা তাদের গেরিলা রণ-পদ্ধতির জন্য। বহু চৈনিক সমর-নায়ক আজো স্ব স্ব ক্ষেত্রে এবং পদে অধিষ্ঠিত, তার ফলে সামরিক বিচিন্তা একই ধারায় নিয়ন্ত্রিত। একই নেতৃত্ব সেখানে পথনির্দেশ করে। ন্যাশন্যাল পিপ্‌লস কনগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান চু তে, মাও সে তুঙ গোড়া থেকেই সমান আসনে অধিষ্ঠিত। বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের সকলেই প্রায় পুরাতন, মার্শাল চেন ই থার্ড আর্মির কম্যান্ডার, তিনিই এখন সহকারী প্রধান-মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব। প্রতিরক্ষা সচিব লিন পিয়াও ও এমনই আরো অনেকে আছেন।

মেজর ও' ব্যালান্সের মতে এদের চিন্তাধারা তাঁদের গেরিলা অভিজ্ঞতায় সীমিত। তা মোটেই প্রগতিমূলক বলা যায় না। কয়েকখানি পুরাতন রাশিয়ান সমর বিজ্ঞানের গ্রন্থের চীনা অনুবাদ হয়েছে, সেগুলি কিছু পরিমাণে পরিমার্জিত করে প্রশিক্ষণশালায় ব্যবহার করা হয়। রুশ শিক্ষকরা কিছু কিছু রুশ ধারায় শিক্ষা দিয়েছেন, সে কৌশল হল অবস্থানমূলক সংঘর্ষের। কোরিয়ার যুদ্ধে চীনারা সে কৌশলে পরাক্রান্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের সাহায্য করেনি। তাই বুনিয়াদি Wave বা তরঙ্গায়িত কৌশল, বা প্রচণ্ডভাবে পদাতিক বাহিনীর নৈশ আক্রমণ আজো চীনা বাহিনীতে চালু আছে। মাঝে মাঝে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পরাভূত হলেও এই কৌশল ওরা পরিহার করেনি।

গেরিলা পদ্ধতির অর্থ হল চলমানতা এবং গতি। এ বিষয়ে চীনারা অনন্যসাধারণ। এই ধরণের যুদ্ধ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী, এই পরিবেশেই "লাল ফৌজ" বিখ্যাত "Long March" করেছে এবং সাফল্য-লাভ করেছে। সেই কালে মার্শাল চিয়াং কাইসেকের সৈন্যদল দলত্যাগ করেছে, অফিসাররা আপোষে কলহ করেছে, আর লাল ফৌজ জয়যুক্ত হয়েছে। অবস্থান-মূলক সংগ্রাম বা পজিশন্যাল ব্যাট্‌ল-এ কিন্তু লাল ফৌজ এতখানি সাফল্যলাভ করেনি। সমতল ভূমিতে কুয়োমিনটাঙ, জাপ-বাহিনী বা কোরিয়ায় ইউ-এন সেনাদলের কাছে তারা হটে গেছে। পজিশন্যাল ব্যাটল-এ শত্রুর গোলার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে চীনাদের এখনও শক্তির ও রণকৌশলের পরীক্ষা দিতে হবে। মেজর ও' ব্যালান্স বার বার বলেছেন যে চৈনিক পদাতিক বাহিনীর শিক্ষা এখনও মুখ্যতঃ গেরিলা-নীতি অনুসারী। ব্যক্তিগত অস্ত্র ব্যবহারে সে শিক্ষালাভ করেছে। গ্রেনেড প্রক্ষেপন, মাইন সমাবেশ, বা মর্টার নিক্ষেপ করতে সে পারদর্শী। সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার তাকে দিনেরাতে টহলদারী বাহিনীতে দীর্ঘ পাড়ি দিতে হয়। অল্পকালের মধ্যে চৈনিক লাল ফৌজ তাই সহজে চলাচল করতে পারে, অনুপ্রবেশ করতে পারে, দূর অঞ্চল অতিক্রম করতে পারে।

প্রতিটি সেনাবাহিনীর একজন রাজনৈতিক কমিশনার থাকে। প্রতিটি চীনা সৈনিক কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশেষ-ভাবে দীক্ষিত তথাপি রণক্ষেত্রে সে পুত্তলিকা মাত্র। শাসকদের বিশ্বাস করতে, মান্য করতে, তাঁদের প্রদত্ত অনু-শাসন পালন করতে তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিছুতেই তা থেকে সে বিচ্যুত হবে না। নিজের মতে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই। চীনারা যে এক উচ্চ-শ্রেণীর জাতি এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল, বিদেশী বিরোধী মনোভাব তার অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে আছে। যদিচ দেশের প্রতিরক্ষায় চীনা সৈন্য লড়তে পারে, তবু আপৎকালে তার মনোবল বা 'মরেল' এখনও পরীক্ষিত হয়নি। কোরিয়ায় যখন চাপ পড়েছে তখন চীনা সৈনিকের মনোবল ভেঙে পড়েছে। অধিকসংখ্যক চীনা সমরবন্দীই তার প্রমাণ, আর অনেক চীনা সমরবন্দী দেশে ফিরে যেতে চায়নি। মাও-হয়ত একথা ভালোই বোঝেন। ৪ এবং ৫ নম্বর অনুশাসন তার প্রমাণ।

এই গ্রন্থে প্রদত্ত চীনা সৈন্যের সংখ্যা ১৯৬১-র মে মাস পর্যন্ত সাড়ে চার মিলিয়ন, তার মধ্যে আড়াই মিলিয়ন হল কম্বাট্যান্ট বা হাতেকলমে লড়াই করে। মেজর ও' ব্যালান্স বলেছেন যে চীনা সৈন্যরা যে একপুট্‌লী ভাত কাঁধে নিয়ে অনির্দিষ্টকাল যুদ্ধ করতে পারে এ ধারণাও ঠিক নয়। তার সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর সব নির্ভর করে। হয়ত নেফায় চীনাদের অগ্রগমন হঠাৎ বন্ধ হওয়ার এটি অন্যতম কারণ। যোগাযোগরক্ষী বাহিনী তেমন শক্তিশালী নয়। নেফায় সংঘটিত সংঘর্ষের পক্ষে চীনা সৈনিক বেশ পারদর্শী। তাদের হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, সে অস্ত্র এখন চীনে তৈরী হয়। পার্বত্য অস্ত্রাদিও চীনে হয়, তবে ভারী অস্ত্রের জন্য চীন রাশিয়ার মুখাপেক্ষী। চীনা বিমান বাহিনীতে আছে অর্ধ-মিলিয়ন জেট বিমানচালক, আর আছে ৪০০০ হাজার ফাইটার বিমান ও বোম্বার। এগুলি পুরাতন রাশিয়ান ধরণের, বিমানের তৈলের জন্য চীনকে রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, তাই সে রাশিয়ার সঙ্গে একেবারে গাঁটছড়া ছিন্ন করতে পারবে বলে মনে হয় না। চীনা নৌ-সেনা বাহিনীর শক্তি ৭০,০০০ হাজার। সামান্য সাবমেরিন বাহিনী ভিন্ন নৌ-শক্তি অকিঞ্চিৎকর। ২৫০ মিলিয়ন নর-নারীর এক সমর-বাহিনী (আমাদের এন, সি, সি'র মত) আছে, তাদের সকলের অস্ত্র নেই। মাও সব মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে ভরসা পাননি, মেজর ও' ব্যালান্সের এই ধারণা।

THE REDARMY OF CHINA
— By Major Edgar O' Ballance
Publishers — Faber & Faber
— Price — 30 Shillings.

কবি-প্রণাম—বিশু মুখোপাধ্যায়—সম্পাদিত। ইন্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। মূল্য—পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীকে কেন্দ্র ক'রে দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-চর্চার উৎসাহ দেখা গেছে। দেশে-বিদেশে নানা শ্রেণীর মানুষের মত বাংলার কবিকুলও রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মশত বর্ষে নানাভাবে উপলব্ধি ক'রে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। শুধু তাই নয়। বিগত কালের বিভিন্ন পরিবেশে বাংলার নানা কবি কিভাবে রবীন্দ্রচর্চায় উৎসাহী হয়েছিলেন এই শুভলগ্নে তার একটা পরিচয় লাভের

ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং তাঁর প্রতিভার আত্মবিকাশ ঘটেছে বাংলা ভাষায়। তাই বাংলার কবি সমাজের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সে দিক দিয়ে রবীন্দ্র প্রতিভার বিষয়ে রচিত একশ পঞ্চাশজন প্রাচীন ও নবীন কবির একশ ছাব্বিশটি কবিতা ও চব্বিশটি সংগীতের সম্ভারপূর্ণ বিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কবি-প্রণাম' গ্রন্থটি অশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে রবীন্দ্র সম্পর্কিত কবিতাবলীর যে কয়টি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে গুণ-গ্রাহিতা ও পক্ষপাতহীনতার বিচারে 'কবি-প্রণাম' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সংকলনক্ষমতার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থ সংকলন হিসাবে তাঁর খ্যাতিকে প্রসারিত করবে বলে বিশ্বাস।

বর্তমান সংকলনগ্রন্থ 'বন্দনা', 'সংগীত' ও 'বিলাপ' এই তিনটিভাগে বিভক্ত। কবির আবির্ভাব ও প্রতিভাকে উপলক্ষ করে 'বন্দনা' অংশের কবিতাবলী রচিত। 'সংগীত' অংশে কবির সংগীত-ধারার অনুসরণে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ 'বিলাপ' অংশে কবির তিরোধানকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিকে এই তিনটি ভাগে ভাগ করে সংকলক তাঁর রসানুভূতির অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছেন। এই সংকলনের বেশীর ভাগ কবিই আধুনিক। সেই সঙ্গে কিছু-সংখ্যক প্রাচীন ও বিস্মৃতপ্রায় কবির উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের কবিতাও বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। এঁদের মধ্যে বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'জাতি-বিস্ময়' ও মনোজ বসুর 'তুমি আর আমি' রীতিমত ভাল কবিতা। এ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র চিরঞ্জীবেষু', গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মিকী প্রতিভার অভিনয় দর্শনে', অমৃতলাল বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বাল্মিকী-প্রতিভা অভিনয় দর্শনে' প্রভৃতি কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য ও আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থের তিনটি অংশের মধ্যে 'বন্দনা' অংশের কবিতাবলীই কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ। এই অংশের বিশেষ উল্লেখ্য কবিদের মধ্যে আছেন অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সজনী ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। 'সংগীত' অংশ এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্র-প্রভাবিত ও কতকাংশে নিষ্প্রভ। এই অংশের অন্তর্গত অতুলপ্রসাদ সেন ও দিলীপকুমার রায়ের গান দুটি স্মরণীয়। 'বিলাপ' অংশে আছেন যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট কবিবৃন্দ। তিনটি ভাগেই প্রবীন কবিদের রচনার পাশে সুকান্ত ভট্টাচার্য (মৃত) সুশীলকুমার গুপ্ত, দুর্গাদাস সরকার, আনন্দ বাগচি, কল্যাণ-কুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ তরুণ কবিদের সুনির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থে সংকলিত সব কবিতা সমানভাবে উৎকৃষ্ট না হলেও তাদের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সব দিক বিচার করলে বলা যায় যে এই গ্রন্থের মুকুরে বাংলায় রবীন্দ্র-চর্চা ও সেই সঙ্গে বাংলা কাব্য রচনার একটি প্রতি-নিধিস্থানীয় ছবি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে এবং সেইখানেই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতা-বলীর ভিতর দিয়ে সাধারণভাবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও বিবর্তনের একটি উজ্জ্বল রূপরেখাও পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে 'সপ্তপর্ণতরুতলে বন্দনা-রত রবীন্দ্রনাথ' 'সংগীতরত রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ' ও 'সপ্তপর্ণতরুতলের শূন্যবেদিকা' শীর্ষক ছবি তিনটি যথাক্রমে 'বন্দনা', 'সংগীত' ও 'বিলাপ' অংশের প্রারম্ভে স্থাপিত হয়েছে। ছবি তিনটি এই গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ। প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের ছবিটিও সুন্দর।

সংকলকের প্রাক্‌কথনটি সুলিখিত। হুমায়ুন কবিরের মুখবন্ধ এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রত্যেক সাহিত্য-রসিক এই গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। এই গ্রন্থের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও বহুল প্রচার কামনা করি।

হিমাচলম্‌— (ভ্রমণ) শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব-লিশিং কোং (প্রাঃ) লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

লেখক কেদার বদরী তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন, সেই পর্যটনের রিপোর্ট এই 'হিমাচলম্‌'। ভ্রমণকাহিনী রচনার আঙ্গিক লেখকের করায়ত্ত, তাই এমন একটি মনোজ্ঞ রম্যরচনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। হিমালয়ের আরোহণ-অব-রোহণের তালে তালে যে ভক্তি, শক্তি ও মুক্তির স্বাক্ষর মনে রেখে যায়, লেখক তা এই চমকপ্রদ ভ্রমণকাহিনীতে বিধৃত করেছেন। সংবাদ ও তথ্য বাহুল্যে গ্রন্থটিকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করা হয়নি। বাল্যে ভ্রমণকাহিনীর সম্রাট জল-ধর সেন মহাশয়ের একখানি 'হিমালয় ভ্রমণ' লেখকের হাতে আসে, তখন থেকেই হিমালয়ের আকর্ষণ তাঁর মনে। 'চলো মুশাফির বাঁধো গাঁঠোরি', এই মূলমন্ত্র নিয়ে হিমালয়ের গভীরে তিনি ঘুরেছেন। 'অমৃতের' পাঠকবৃন্দ ধীরেন্দ্র-নারায়ণের এই সুন্দর ভ্রমণকাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত, এমন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে লাভ করার সুযোগ হওয়ায় অনেকেই আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য মনোরম।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

বাঙলা ছবির বার্ষিক খতিয়ান ঃ

আমাদের জীবন থেকে ইংরেজী ভাষাকে যেমন আমরা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না, ঠিক সমানভাবেই অপারগ হচ্ছি আমাদের দৈনন্দিন রোজ-নামচা থেকে ইংরেজী তারিখ-মাস-সাল-গুলোকে খারিজ করতে। কাজেই পিছন ফিরে কেবলই মনে হচ্ছে, আর একটি বছর সদ্য সমাপ্ত হ'ল—নতুন আর একটি বছরের জন্ম দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে ইচ্ছে করছে, ১৯৬২ সালে বাঙলা ছবির হালচাল।

হিসেবে দেখছি, ১৯৬২ সালে মোট ৩৩ খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পেয়েছে অর্থাৎ আগের বছর থেকে ১ খানি কম। কিন্তু ১ খানি ছবি কম বা বেশী মুক্তি পেলে বিশেষ কিছু যায় আসে কি? মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যার বিচার ক'রে বাঙলা ছবির রাজ্যের আর্থিক বা ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কতখানি বুঝতে পারা যাবে? সাধারণ কথা এই, একখানি ছবি যত বেশী দিন ধ'রে চলবে অর্থাৎ যত বেশী জনপ্রিয় হবে, তার আর্থিক সাফল্য তত বেশী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটি প্রস্তুত করতে কত খরচ পড়েছে, সে হিসেবটাও রাখতে হবে। ধরুন, গেল বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি দু'খানির কথা। তাঁর "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ইস্টম্যান কালার-এ তোলা বা রঙ্গীন; আর "অভিযাত্রী" ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে বা সাদা-কালোয়। কাজেই বুঝতে কষ্ট হয় না, "অভিযাত্রী" থেকে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" তুলতে খরচ নিশ্চয়ই বেশী পড়েছে। অতএব ছবি দু'খানি যদি সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে সমান টাকা আমদানী করত, তাহ'লেও "কাঞ্চনজঙ্ঘা" থেকে "অভিযাত্রী" ছবির লাভ হ'ত বেশী। অবশ্য কার্যতঃ "অভিযান"ই বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। তবে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র প্রদর্শনীক্ষেত্র 'অভিযান' থেকে ব্যাপক ও বৃহত্তর; কারণ প্রথম ছবিখানির ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি ভারতের বাইরে বহু জায়গাতেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ঐ ব্যাপারে কিছু কিছু চুক্তিও এরই মধ্যে হয়ে গেছে। তবুও তৈরী করবার খরচের কথা ভাবলে "অভিযান"-কেই ব্যবসায়ের দিক থেকে বেশী সফল ছবি বলতে ইচ্ছে করে।

মুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি ছবিই যদি আর্থিক দিক থেকে "অভিযান", "বধূ", "মায়ার সংসার" বা "কাঁচের স্বর্গ"-এর মত সাফল্যমণ্ডিত হ'ত, অর্থাৎ প্রতিটি ছবিই কম ক'রে ১২ থেকে ১৬ হপ্তা তাদের মুক্তিগৃহে স্থায়িত্ব লাভ করত, তাহ'লে একদিকে যেমন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির প্রযোজকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতেন, অপর দিকে তেমনই মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ৩৩ থেকে ক'মে দাঁড়াত ১৬ থেকে বড়জোর ২০; কেননা বাঙলা ছবির মুক্তির জন্যে শহর-কলকাতায় বর্তমানে পাঁচটির বেশী ছটি জোটবদ্ধ চিত্রগৃহ (রিলিজিং চেন) নেই। অতএব চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত এবং আরও আরও সমস্যাসংকুল হ'ত আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র জগৎ।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে যেমনই একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অমনই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্বর চৈনিক আক্রমণে আমাদের

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ও গোল্ডস্টাইন পিকচার্স পরিবেশিত 'ন্যায়দণ্ড' চিত্রে সবিতাব্রত, অসিতবরণ ও তরুণকুমার

দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হ'ল। কাজেই বাঙলা ছবির ব্যবসা কবে যে দৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সে মাত্র ভাবিতব্যই জানেন। এবং তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রযোজনাকে "ব্যবসা" বলার চেয়ে ভাগ্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা বলাই যুক্তিযুক্ত।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, গেল বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ৩৩টি ছবির মধ্যে মাত্র ৭।৮ খানি মোটামুটি আর্থিক সাফল্য লাভ করেছে, খান ৩ ছবি মাঝারি রকম টাকা আমদানী করতে পেরেছে এবং বাকীগুলি সব লোকসানের খাতায়। আরও দেখছি, নতুন নতুন প্রযোজনা-সংস্থা গজিয়ে উঠছে এবং একখানি ছবি তৈরী ক'রেই তাদের প্রত্যেকেরই নাভিশ্বাস উপস্থিত হচ্ছে। একমাত্র জালান প্রোডাকসান্স ছাড়া আর কোনো প্রযোজক-সংস্থাকেই গেল বছরে দু'খানি ছবি প্রস্তুত করতে দেখা যায়নি। নতুন প্রযোজক-সংস্থার সঙ্গে অনেক নতুন পরিচালকের নামও পর্দায় শোভা পেয়েছে। জানি না, এঁদের মধ্যে কতজনের নাম দ্বিতীয়বার দেখবার সৌভাগ্য হবে।

পর্দার ওপর শিল্পী হিসেবে বহু নতুন মুখও দেখতে পাওয়া গেছে; কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি খুব বেশী পেয়েছি ব'লে মনে করতে পারছি না। এখনও উত্তম-সুচিত্রা জুটিই শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকা হয়ে রয়েছেন এবং এঁদের পরেই স্থান ক'রে নিয়েছেন বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায় জুটি।

কিন্তু আর অন্য কথা বলার আগে ক্রম-মুক্তির তারিখ অনুযায়ী প্রযোজক-প্রতিষ্ঠানের নাম সমেত গেল ১৯৬২ সালের ছবিগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল:

দেখা যাচ্ছে, ৩৩খানি ছবির মধ্যে ২১খানি ছবিই উপন্যাসের চিত্ররূপ। এ ছাড়া ১খানি ছবি একটি ইংরেজী কাব্যের ছায়া অবলম্বনে গঠিত এবং আর ১খানি একটি ইংরেজী ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত। ২খানি জীবনী চিত্র, ২খানি পৌরাণিক এবং মাত্র ৬খানি মৌলিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এদের মধ্যে পুরোপুরি হাসির ছবি একখানিও নেই; কিছুটা হাসতে পাওয়া যায় "স্যরি ম্যাডাম" এবং "দাদাঠাকুর"--ছবিতে। জীবনীচিত্র "ভগিনীনিবেদিতা" ১৯৬১ সালের মধ্যেই সেন্সার সার্টিফিকেট পেয়েছিল ব'লে ১৯৬১র শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক পেয়ে বাঙলা ছবির গৌরব বাড়িয়েছে।

৩৩খানি ছবির মধ্যে মাত্র "কাঞ্চন-জঙ্ঘা" হচ্ছে রঙীন ছবি—ইস্টম্যান কালারে তোলা। মাত্র তাই নয়; ছবির ঘটনাগুলি যে-সময়ের মধ্যে ঘটেছে, ঠিক ততটুকু সময় ধরেই ছবিখানি দেখানো

ক্রমিক সংখ্যা	মুক্তির তারিখ	ছবির নাম	প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান	শ্রেণী
১।	১২ই জানুয়ারী	স্যরি ম্যাডাম	বি, আর, সি, সিনে প্রোডাকসন্স	রোমান্টিক
২।	ঐ	মন দিল না বঁধু	এস, কে, প্রোডাকসন্স	রোমান্টিক
৩।	২৬এ জানুয়ারী	বিপাশা	চিত্র-প্রযোজক	রোমান্টিক
৪।	ঐ	ডাকাতের হাতে	লিটল সিনেমা	অ্যাডভেঞ্চার (কিশোর-চিত্র)
৫।	৯ই ফেব্রুয়ারী	কাঁচের স্বর্গ	চিত্রযুগ	সমস্যামূলক
৬।	১৬ই „	ভগিনী নিবেদিতা	অরোরা	জীবনী
৭।	ঐ	সূর্যস্নান	চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা	গার্হস্থ
৮।	২৭এ ফেব্রুয়ারী	সঞ্চারিণী	দে প্রোডাকসন্স	গার্হস্থ
৯।	১৬ই মার্চ	শাস্তি	চিত্রশোভনা	সমস্যামূলক
১০।	২৩এ মার্চ	শিউলিবাড়ী	মুক্তিটক	সমস্যামূলক
১১।	১২ই এপ্রিল	কান্না	ডি-লুক্স	সামাজিক
১২।	১৪ই এপ্রিল	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	জালান প্রোডাকসন্স	সামাজিক
১৩।	১১ই মে	কাঞ্চনজঙ্ঘা	এন, সি, এ, প্রোডাকসন্স	সমস্যামূলক
১৪।	২৫এ মে	অতল জলের আহ্বান	আর, জি, বি, প্রোডাকসন্স	গার্হস্থ
১৫।	১লা জুন	অগ্নিশিখা	শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স	গার্হস্থ
১৬।	ঐ	তরণীসেন বধ	সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান	পৌরাণিক
১৭।	১৫ই জুন	বধূ	বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স	গার্হস্থ
১৮।	ঐ	আগুন	বাদল পিকচার্স	সামাজিক
১৯।	১২ই জুলাই	খনা	এল, বি, প্রোডাকসন্স	পৌরাণিক
২০।	২০এ জুলাই	বন্ধন	সপ্তক	সামাজিক
২১।	১০ই আগস্ট	কাজল	বি, এ, পি, প্রোডাকসন্স	গার্হস্থ
২২।	১৭ই আগস্ট	মায়ার সংসার	শিবাণী ফিল্মস	গার্হস্থ
২৩।	২৪এ আগস্ট	শেষ চিহ্ন	চিত্র সংসার	গার্হস্থ
২৪।	৩১এ আগস্ট	অভিসারিকা	টাস ফিল্মস	গার্হস্থ
২৫।	২১এ সেপ্টেম্বর	বেনারসী	ফিল্ম ক্র্যাফ্ট	সমস্যামূলক
২৬।	২৮এ সেপ্টেম্বর	অভিমান	অভিযাত্রিক	সামাজিক (রোমান্টিক)
২৭।	৪ঠা অক্টোবর	শুভ দৃষ্টি	এস, সি, প্রোডাকসন্স	গার্হস্থ
২৮।	৫ই অক্টোবর	কুমারী মন	ফিল্ম এজ	সমস্যামূলক
২৯।	৯ই নভেম্বর	দাদাঠাকুর	জালান প্রোডাকসন্স	জীবনী
৩০।	ঐ	ঢেউ-এর পরে ঢেউ	রেনেসাঁস ফিল্মস	সামাজিক
৩১।	১৬ই নভেম্বর	রক্তপলাশ	এম কে জি প্রোডাকসন্স	রোমাঞ্চ-রহস্য
৩২।	২৯এ নভেম্বর	নবদিগন্ত	শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স	সমস্যামূলক
৩৩।	১৪ই ডিসেম্বর	ধূপছায়া	এস, এস, চিত্রমন্দির	গার্হস্থ

হয় অর্থাৎ গল্পের সময় (স্টোরি টাইম) এবং চলচ্চিত্রের সময় (সিনেম্যাটিক টাইম) এই ছবিটিতে এক হয়ে গেছে। তার ওপর ছবিটির বিষয়বস্তুতেও অসামান্য নতুনত্ব আছে; কাহিনীমূলক চিত্র হ'লেও এবং একটি পরিবারের কাহিনী হ'লেও ছবিটিতে একটি কাহিনী বিধৃত নয়। তিন-চারটি সমস্যা সহসা বিরাট হ'য়ে উঠে প্রায় দু' ঘণ্টার মধ্যেই তাদের যখন সমাধান ঘটে গেল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে "কাঞ্চনজঙ্ঘা"কেও দেখা গেল, এই দুর্ঘমায়র চমৎকারিত্বে ভরা "কাঞ্চনজঙ্ঘা"ই এ-বছরের সবচেয়ে বিশেষত্ব-পূর্ণ ছবি। এ ছাড়াও যে-ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হচ্ছে সাগাধর্মী 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', জীবনধর্মী 'অভিযান', বিচিত্র সমস্যামূলক 'কাঁচের স্বর্গ", জীবন্ত জীবনীচিত্র 'দাদাঠাকুর' এবং মহৎ জীবনীচিত্র 'নিবেদিতা'।

(১) প্রোফেসার (হিন্দী) : ঈগল ফিল্মস-এর নিবেদন, প্রযোজনা : এফ সি মেহরা, পরিচালনা : লেখ ট্যান্ডন; সংগীত-পরিচালনা : শঙ্কর জয়কিশন; রূপায়ণে : শাম্মী কাপুর, কল্পনা, ললিতা পাওয়ার, প্রবীণ চৌধুরী প্রভৃতি। লেখচুন-এর পরিবেশনায় গেল ২৮এ ডিসেম্বর থেকে রক্সী, প্রিয়া, গ্রেস, গণেশ, চিত্রা, মেনকা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

মনোরম ইস্টম্যান কালারে তোলা এই রঙীন ছবিটি তৈরী করবার সময় প্রযোজক, পরিচালক থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকটি সংগঠনকারীর একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল—দর্শকসাধারণের মনোরঞ্জন করা। এবং সেই উদ্দেশ্য যে তাঁদের পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়েছে, প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের উল্লাস ও উত্তেজনা দেখবার পর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। নাচে, গানে এবং প্রধানতঃ কৌতুকরসে ভরপুর ছবিখানি দেখতে দেখতে কোনো রকম যুক্তি বা সম্ভাব্যতার কথা মনেই আসে না, মন মেতে ওঠে মধুর কৌতুকে, গানের ঝর্ণায় নাচতে নাচতে দর্শক অনায়াসেই ভেসে চলেন গল্পের সঙ্গে সঙ্গে।

ভূপেন রায় পরিচালিত ও অশোক দাশগুপ্ত প্রযোজিত গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্সের 'নিশাচর' চিত্রে মঞ্জু দে

গৃহশিক্ষক হবার প্রধান শর্ত—বয়েস হ'তে হবে পঞ্চাশের ওপর। কাজেই অর্থোপার্জনের তাগিদে প'ড়ে যুবককে ছদ্মবেশ নিতে হ'ল প্রৌঢ়ের এবং দার্জিলিং-এ যে বাড়ীতে সে বহাল হ'ল, সেখানে বিধবা 'আন্টির' দাপটে দু'টি কলেজে-পড়া মেয়ে এবং দু'টি ছোট ছেলে—ওরা চারজন ভাইবোন—একেবারে অস্থির। প্রৌঢ়বেশী প্রোফেসরের ওপর ভার পড়ল ছোট ছেলে দু'টিকে পড়াবার এবং মেয়ে দু'টিকে মাত্র সংস্কৃত ভাষায় দোরস্ত করবার। সংস্কৃত!—আচ্ছা, তাই হবে। দোকান থেকে সংস্কৃত প্রবেশিকা কিনে বেচারা প্রোফেসার নিজে শিখতে চেষ্টা করল তাবাটা। প্রৌঢ়ের কাছে ব'সে সংস্কৃত পড়তে হবে, এই ভয়ে মেয়ে দু'টি—বিশেষ ক'রে বড়োটি—তাকে তাড়াবার ছল খুঁজতে লাগল। এদিকে যুবক তার প্রেমে পড়েছে এবং ক্রমে দু'জনেই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। আবার বিপদের মাত্রা বৃদ্ধি হ'ল, যখন প্রৌঢ়া 'আন্টি'র মনে বসন্ত বইতে শুরু করল প্রৌঢ় প্রোফেসরের সান্নিধ্য লাভের আশায়। এর পর নানা রোমহর্ষক ঘটনার ভিতর দিয়ে আসল যুবক প্রৌঢ়বেশী প্রোফেসরের ভাইপো হিসেবে পরিচিত থেকে কি ক'রে ছদ্মবেশ সরিয়ে নিজের যথার্থ রূপ প্রকাশ করল এবং তার পরেও প্রেমিকার সংগে মিলিত হবার জন্যে 'আন্টি' দ্বারা নির্বাচিত হ'ল, তাই নিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি।

কাহিনীটিকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক কৌতূহল বজায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব জনপ্রিয় অভিনেতা শাম্মী কাপুর নিজেই একক-ভাবে বহন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রৌঢ়ের ছদ্মবেশে এবং যুবক নায়ক রূপে তিনি যে বিপরীতধর্মী বাচন এবং মুখ-অঙ্গ-গতিভঙ্গী দ্বারা তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা' অবিস্মরণীয়। প্রোফেসার ছবিটিকে তাঁরই ছবি বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ ক'রে প্রৌঢ়ের ছদ্মবেশে তাঁর অভিনয় যেমন নূতনত্বপূর্ণ, তেমনই উপভোগ্য। তাঁর পরেই নাম করতে হয় 'আন্টি'র ভূমিকায় ললিতা পাওয়ারের। প্রৌঢ়া আন্টির কঠিন হৃদয়ে প্রেমের দোলা লাগার কৌতুকের সঙ্গে বিষাদের ছোঁয়াচ-লাগা দৃশ্যগুলিতে তিনি তাঁর অভিনয়কলার একটি নতুন দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় কল্পনা চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন, প্রবীণ চৌধুরী এবং সখীদের সঙ্গে তাঁর নৃত্যও দর্শকদের যথেষ্টই আনন্দ দিয়েছে। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

শঙ্কর জয়কিশন এই ছবিতেও বিভিন্ন গানের সুরারোপে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছেন। প্রায় প্রতিটি গানই জনপ্রিয়তার দাবী নিয়ে উপস্থিত। কলাকৌশলের অপরাপর দিক একটি উচ্চ মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। ইস্টম্যান কালারে তোলা দার্জিলিংয়ের বহিদৃশ্যগুলি নয়নাভিরাম।

'প্রোফেসার' ছবি অসাধারণ জন-প্রিয়তা লাভ করবে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

(২) **ইস্পাত-কাহিনী** (ইংরাজী নেপথ্যভাষণ সম্বলিত তথ্যচিত্র) : হরি-সাধন দাশগুপ্ত প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৫,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিত্রনাট্য-তত্ত্বাবধান : সত্যজিৎ রায়; আলোকচিত্র : ক্লড রেনোয়া ও বুলু দাশগুপ্ত, আবহ-সংগীত পরিচালনা : রবিশঙ্কর।

টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীর উদ্যোগে তোলা 'ইস্পাত-কাহিনী' দলিলচিত্রটি গেল শুক্রবার ২৮এ ডিসেম্বর লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে সাংবাদিক ও অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন টাটারই পাবলিক রিলেসন বিভাগ।

ভারতে দেশী প্রথায় কিভাবে ইস্পাত তৈরী হ'ত, তাই প্রথমে দেখানোর সংগে

সংগে কুতুবমিনারের নিকটবর্তী ইস্পাত-স্তম্ভ, কোনারক ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে ইস্পাতের নিদর্শন প্রভৃতি দেখাবার পর গত যুগের শেষে জামশেদজী টাটার ইস্পাতের সন্ধানে ভারতের মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শেষে ভূতত্ত্ববিদ প্রমথ বসুর নির্দেশে সাকচির কাছে ইস্পাতকারখানা স্থাপন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্রের নেতৃত্বে সেই কারখানার ক্রম-সম্প্রসারণ প্রভৃতি অত্যন্ত কৌশলে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ক্রমে ক্রমে দেখানো হয়েছে। এর পরে আকরিক লোহ থেকে ধাপে ধাপে কিভাবে স্টীলের জন্ম হয়, তা বিস্তৃতভাবে দেখানোর শেষে ইস্পাতকারখানার আনুষঙ্গিক আরও যে-সব কারখানা টাটানগরে গড়ে উঠেছে, তারই চিত্র দেওয়া হয়েছে। শেষে ১৯৫৮ সালে টাটা কারখানার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। টাটানগরে কর্মীদের সুখ-সুবিধার জন্যে ডিমনা হ্রদ থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পুষ্পোদ্যান, বিদ্যাভবন, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন এবং হাটবাজার, আদিবাসীদের বিচিত্র বেশভূষা প্রভৃতিও এই দলিলচিত্রটিতে সংগতভাবেই স্থান পেয়েছে।

রবিশঙ্করকৃত আবহসংগীত, যোগ্য ধারাবিবরণী এবং টেকনিকলারের বর্ণ-সুষমা এই 'ইস্পাত-কাহিনী'টিকে অনায়াসেই একটি আন্তর্জাতিক মান-সমন্বিত তথ্যচিত্রের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত আর ডি বি-র 'ছায়াসূর্য' চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

দু'টি দেশাত্মবোধক নাট্যাভিনয়

(১) জাতীয় নাট্যকার পরিষদ-এর 'মৃত্যুর গর্জন' :

বাঙলাদেশের বর্তমানকালের তরুণ নাট্যকারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান জাতীয় নাট্যকার পরিষদ গেল শনিবার ২৯এ ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে কিরণ মৈত্র রচিত দেশাত্মবোধক নাটক 'মৃত্যুর গর্জন' মঞ্চস্থ করেন।

এই রূপক নাটিকাটির প্রযোজনায় যে অনাড়ম্বর দৃশ্য-পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা সাধারণভাবে প্রশংসনীয়, তবে দেওয়াল সংলগ্ন কাগজে অঙ্কিত চিত্রগুলি আরও বর্ধিত আকারে বর্ণোজ্জ্বল ক'রে চিত্রিত হ'লে রূপক রূপারোপে অধিকতর সহায়ক হ'ত ব'লে মনে হয়। অভিনয়ে যুদ্ধরাজবেশী কিরণ মৈত্র এবং শান্তির ভূমিকাভিনেত্রী সোনালী ঘোষ ছাড়া আর কেউই রূপক নাট্যাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীকে আয়ত্ত করতে পারেননি। বিশেষ ক'রে 'পীত সাম্রাজ্যবাদ'-এর ভূমিকায় দেবব্রত সুরচৌধুরী প্রভৃতির একান্ত অভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অস্ত্রশক্তি, দম্ভ, প্রভুত্ব এবং অশান্তির ভূমিকায় যথাক্রমে সুনীত মুখোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী এবং কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে অপ্রস্তুতির ভাব ফুটে না উঠলেও রূপক নাটকের চরিত্রগুলির সংগে একাত্মতার অভাব অনুভব করেছি। সুনীল দত্ত কিন্তু রূপক নাটকের বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রাখতে না পারলেও একটি বিশেষ ভঙ্গিমার সাহায্যে চরিত্রটিতে একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অভিনয় উপভোগ্যও হয়েছিল।

আশা করি, 'জাতীয় নাট্যকার পরিষদ' 'মৃত্যুর গর্জন'-এর পুনরাভিনয়ে অধিকতর প্রস্তুতির সংগে রূপক নাটক-সম্মত অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(২) নাটমহল-এর 'সীমান্তের ডাক' :

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর ৫১ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গেল শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যে সম্বর্ধনা উৎসব হয়ে গেল, তার কার্যসূচীর শেষ বিষয় ছিল নাটমহল কর্তৃক দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'সীমান্তের ডাক' নামে একাঙ্কিকাটির অভিনয়। 'অমৃত'-এ প্রকাশিত এই একাঙ্কিকাটি নিঃসন্দেহে একখানি দেশাত্মবোধক নাটক এবং বর্তমান চীনা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত।

অভিনয়ে শিবনাথ, রাধারাণী, সর্বেশ্বর, প্রভা, বাউল এবং সমীরের ভূমিকায় যথাক্রমে কমল মজুমদার, মায়া ঘোষ, মলয় মহান্ত, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য অসিত মুখোপাধ্যায় এবং সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। অসিত মুখোপাধ্যায়ের সুকণ্ঠনিঃসৃত গানগুলি বারংবার শোনবার মত।

প্রোঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস' :

গেল রবিবার ৩০এ ডিসেম্বর বেলগাছিয়া ট্রামডিপোর সন্নিকটে টালা পার্কে প্রোফেসর সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস'-এর শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, প্রায় অর্ধ-শতাধিক শিল্পীসমন্বিত এই সার্কাসটি প্রায় পুরোপুরি বাঙালীদের দ্বারা গঠিত। বাঙালী ছেলেমেয়েদের রোমহর্ষণ ট্রাপিজের খেলা, বারের খেলা, সাইকেলের খেলা, বহু রকম দেহের কসরৎ যে কোনোও দর্শককে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত করবে। মিঃ ইউনিভার্সরূপে পরিচিত সুগঠিত দেহধারী মনোহর আইচ তাঁর দেহের বিভিন্ন মাংসপেশী সঞ্চালন ক'রে এবং লোহ গোলক তোলা ও স্প্রীং টানায় সমবেত দর্শকদের যেমন বিস্মিত করেন, তেমনই অবাক করেন পুতুল সাহা তাঁর উপর দিয়ে অতিকায় হস্তীকে ধীর পদক্ষেপে যেতে দিয়ে। শৈলেন মল্লিকের রোমান রিং, চন্দ্রকান্তের বালক ছেলেমেয়েদের ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে নানাবিধ কসরৎ প্রদর্শন এবং এস ভি লালের লোহমণ্ডলের মধ্যে মোটর সাইকেল চালনা, হস্তীযূথ ও ব্যাঘ্র-সিংহের বহু রকম খেলা সার্কাস-প্রিয় জনসাধারণের পক্ষে রীতিমত আকর্ষণের বস্তু। আমরা 'ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস'-এর সাফল্য কামনা করি।

* * *

রেলওয়ে ইন্সিওরেন্স কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড-এর সভাপতি শ্রীশান্তি ব্যানার্জি সমিতির পক্ষ থেকে গত ১৪ই ডিসেম্বর ১০০১, টাকার একখানা চেক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করেন। গত ২৪শে নভেম্বর সমিতির সাধারণ সভায় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে উক্ত পরিমাণ টাকা দানের সিদ্ধান্ত করে চীনের নির্লজ্জ আক্রমণের উপর একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।
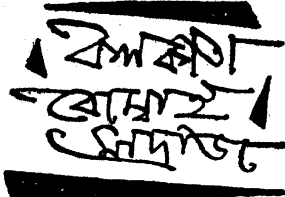
কলিকাতা

রূপনিকেতন প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রয়াস সুবোধ ঘোষের 'শেষ প্রহর।' গত মাসের শেষ সপ্তাহে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় ছবির প্রথম কাজ শুরু করেছেন প্রান্তিক-গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গাঙ্গুলী। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ থেকে এ ছবির কাজ আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হয়েছে। বিস্তারিত খবর ক্রমশঃ জানতে পারবেন। কুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন আলোকচিত্রে সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা, দুলাল দত্ত ও শিল্পনির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত। ব্যবস্থাপনায় মুকুল চৌধুরী রয়েছেন।

সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত একটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা।' জে, জে ফিল্মস কর্পোরেশন-এর হয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন শ্রীঘটক। কাহিনীর বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ ছবির নতুনত্ব রয়েছে যথেষ্ট। বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অভি ভট্টাচার্য, শ্রীমান অশোক, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য জহর রায় ও বিজন ভট্টাচার্য। সংগীত এ ছবির একটি পরীক্ষামূলক সৃষ্টি। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সংগীত পরিচালনায় উচ্চাঙ্গ-সংগীতের খেয়াল ও ধ্রুপদ গানের ওপর কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। নতুন পরিবেশক সংস্থা ভারতবর্ষ এ ছবিটির পরিবেশনাভার গ্রহণ করেছে।

মধু বসু পরিচালিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবির কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে ক্যালকাটা মুভিটোনে। দৃশ্য গ্রহণের আগে এ ছবির কয়েকটি গান গ্রহণ করবেন সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচী। কণ্ঠদান করবেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অমরেশ দাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী।

গত ২০শে ডিসেম্বর রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় শিল্পী সংস্থার প্রথম ছবি 'স্বাক্ষর'-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। 'চিত্রভানু' এই নবগঠিত পরিচালক-সংস্থা এ ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মহরৎ-শিল্পী বাণী গাঙ্গুলীর দৃশ্য গ্রহণে ক্ল্যাপস্টিক দেন বিপিন গুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও প্রধান অতিথি কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। আগামী মাস থেকে ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে।

বোম্বাই

ইন্দো-আমেরিকান কো-প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'দি গাইড' হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হবে আগামী মাস থেকে। নবকেতন ইন্টারন্যাশনালের

তরফ থেকে আংশিক প্রযোজনা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন দেবানন্দ। একটি প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করছেন রিড ডেনিলিউস্কি। আর, কে, নারায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পার্ল বাক।

জে, বি, প্রোডাকসন্সের 'মুঝে প্যায়ার কা নাশা হ্যয়' ছবির কাজ শেষ হতে চলেছে। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করছেন সাহিদ লাতিফ। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে মনোজকুমার ও কল্পনা। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রনাথ, কে, এম, সিং, হেলেন, ললিতা পাওয়ার ও প্রাণ। সঙ্গীত পরিচালক হলেন রবি।

সম্প্রতি রণজিৎ স্টুডিওয় লোটাস প্রোডাকসন্সের 'জুয়ারী' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়েছে। শশি কাপুর ও নন্দা এ ছবির দুটি প্রধান চরিত্র। কাহিনীকার নির্মল সরকার এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন। সুরেশপ্রকাশ এ ছবির পরিচালক। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকুমার, তনুজা, মাধবী, উল্লাস, অচলা সহদেব, মদনপুরি, আসা ও নবাগতা কাবেরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

কাশ্মীরে বহির্দৃশ্য শেষ করে ফিরেছেন রঙিন ছবি 'ফির ওহি দিল লায়া হুঁ'-র প্রযোজক-পরিচালক নাসির হোসেন। আশা পারেখ ও জয় মুখার্জি এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। ও, পি, নায়ার এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

মাদ্রাজ

ভেনাস পিকচার্সের হয়ে পরিচালক টি, প্রকাশ রাও একটি রঙিন হিন্দী ছবির নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত জনপ্রিয় ছবি ছিল 'অমরদীপ' ও 'নজরানা'। সম্প্রতি এই ছবিটির জন্য দুটি প্রধান চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

বহুদিন পর জনপ্রিয় অভিনেত্রী ভানুমতী পুনরায় এ, ভি, মায়াপ্পানের 'আম্মাই' (মা) ছবিতে দর্শনীয় অভিনয় করলেন। ভানুমতী একজন সুদক্ষ শিল্পী। অভিনয় ছাড়াও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তিনি বহু ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি কর্ণাট সঙ্গীতের সঙ্গে জাপানী সঙ্গীতের একটি পরীক্ষামূলক গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছেন। —চিত্রদূত

'আমার জন্ম-কাহিনী নিশ্চয়ই তুমি প্রতাপবাবুর কাছে সব শুনেছো। কিন্তু বিশ্বাস কর আমার পরিচয় আমার নিজের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যেদিন আমি শুনলাম—তুমি যা জানতে সে আমার সত্যিকারের পরিচয় নয়—ভেঙে গেল আমার সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন। হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম—কিন্তু তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হ'ল না কারণ সেদিন আমার কথা তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে না। কিন্তু আজ সমাজে আমার কোথায় ঠাঁই তা আমি জানি। আর এও জানি মাঝখানের এতটা ব্যবধান রেখে তোমার আমার মিলন কোনদিনই সম্ভব নয়—তাই নিজেকে অনেক দূরে নিয়ে চলেছি। তোমার কাছে আমার শুধু একটি মাত্র অনুরোধ—তুমি আমায় ভুল বুঝো না। পর-জন্মে শুধু তোমাকেই কামনা করবো।'

এ চিঠি রেবা লিখেছে অনিমেশকে। অভিজাত ও সুশিক্ষিত অনিমেশ জীবনের পথে চলতে গিয়ে এই প্রথম হোঁচট খেল। ওর নিঃসীম ভালবাসার হৃদয় থেকে এমনিভাবে হঠাৎ রেবা পালিয়ে বাঁচলো। কোথায় এবং কেন সে-কথা জানতে না পেরে অনিমেশ একটু নিষ্ঠুর হ'ল। তার ব্যবসায়ী অংশীদার মিঃ বাসুর দুই কন্যা স্বপ্না আর মনীষার সান্নিধ্যে অনিমেশ উন্মত্ত হয়। একদিন গভীর রাতে মদমত্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে সে রেবার তৈলচিত্রেই গুলী করে। উতলা অনিমেশ। নিজের খেয়াল
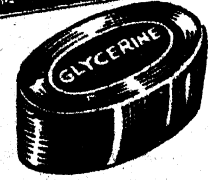
খুশিতে দিন চলছিল। শিল্পী সুব্রত-র সঙ্গে তার পরিচয় হল মিঃ বাসুর বাড়ীতে। স্বপ্নার দুর্বলতা এল সুব্রতর ওপর। অনিমেশ বোঝে। মনীষাও সব জানে। হৃদয়ের সেই না পাওয়ার যন্ত্রণাকে প্রতিশোধ নিতে সে স্বপ্নার অন্তররাজ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে।

প্রতিযোগিতা চলে। অনিমেশের আমন্ত্রণে সুব্রত আসে ওর বাড়ীতে। রেবার সেই ক্ষতবিক্ষত তৈলচিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয় সুব্রত। শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে অপরূপ সৌন্দর্য। তবে অনিমেশের কাছে সে রেবার কিছু পরিচয় জানতে পারে। আর সুব্রত পিছিয়ে আসে স্বপ্নার কাছ থেকে। এই ঘটনার কয়েক দিন পর রেবাকে তার নিজের স্টুডিওয় দেখতে পেয়ে সুব্রত বেশ অবাক হল। রেবা এখন শিল্পকলার ছাত্রী। সুব্রতর কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করতে চায়। রেবার এই নব পরিচয়ে সুব্রত রাজী হয়। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা-দ্বয় একাত্ম হল।

প্রতাপ চৌধুরী খুঁজে পায় না রেবাকে। ওকে দিয়ে তার উপায়ের পথ বন্ধ হল। প্রতাপবাবু এই উদ্দেশ্যেই মাত্র তিন মাসের শিশু রেবাকে পতিতালয় থেকে নিয়ে এসেছিল। রেবার চোখে জল। সুব্রত ছবি আঁকছে। রেবা-সুব্রত শিল্প সাধনায় মগ্ন। অনেকদিনের ব্যবধানে হঠাৎ স্বপ্না এই স্টুডিওয় এসে রেবা-সুব্রতর এই একাত্ম রূপ দেখে নিজের জীবনকে সে বিলিয়ে দিতে চাইলো। জীবনে যেন ওর কিছুই আর পাওয়ার নেই। মিঃ বাসু এই উদাসীনতার প্রস্তাব অনিমেশকে জানায়। সে বিয়ের প্রস্তাব নিজেই আনে স্বপ্নার কাছে। কিন্তু স্বপ্নার যে স্বপ্ন সুব্রত।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় গৃহীত 'মরুতৃষা' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের পূর্বমুহূর্তে পরিচালক সুরেশ রায়, আলোকচিত্রশিল্পী মুরারী ঘোষ ও অভিনেত্রী তপতী ঘোষ

তাইতো আবার ঘটনাচক্রে মনীষার কাছে পাঠানো রেবার তৈলচিত্র দেখে স্বপ্না শেষ বিচারের আশায় সুব্রতর কাছে ছুটে এসে সব জানতে পারে। স্বপ্না অবাক। কিন্তু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শোনে রেবা। তার অভিশপ্ত জীবনের শেষ আশ্রয়টুকু এমনিভাবে সরে যাওয়ায় নিজের জ্ঞান হারিয়ে বসলো। খবর পায় অনিমেশ। ছুটে আসে রেবার কাছে। ওদিকে প্রতাপ চৌধুরীও খবর পেয়েছেন। অনিমেশ এতদিনে মুক্তি পেল প্রতিশোধের একটি মৃত্যু-গুলিতে। রেবা জ্ঞান ফিরে পেয়েও অনিমেশকে ফিরে পেল না। তার শেষ লেখা চিঠির কথাই যেন সত্যি হল।

আজকের সমাজের যারা লাঞ্ছিত তাদের সত্যিকারের পরিচয় এ কাহিনীর মূল বক্তব্য। চিরদিন যারা অন্ধকারে পড়ে রইলো সেই আঁধারের একটি চরিত্র রেবার জীবনকে নিয়ে এ কাহিনী—'মরুতৃষা'। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন সুরেশ রায়। সম্প্রতি রাধা ফিল্ম স্টুডিওয় এ ছবির চিত্র গ্রহণ শেষ করছেন শ্রী রায়। এঁর প্রথম ছবি। পরিবেশক মহাজাতি ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্সের কর্ণধার সুনীলকুমার বাগ ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন, মিঃ বাসু—বিপিন গুপ্ত, অনিমেশ—রবীন মজুমদার, প্রতাপ চৌধুরী—সিতাংশু মুখোপাধ্যায়, [illegible]—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত—অসিতবরণ, স্বপ্না—সবিতা বসু ও মনীষা—তপতী ঘোষ। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন জহর রায়, পদ্মা দেবী, জয়শ্রী সেন, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শচীন চক্রবর্তী, গণেশ রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার ও নমিতা সিংহ ও অমিতা বসু।

কুশলী বিভাগে, চিত্রগ্রহণে—মদুরারী ঘোষ, সম্পাদনা—নিমুর ভট্টাচার্য, শিল্প-নির্দেশনা—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত—কালোবরণ, যন্ত্রস্থাপনা—শঙ্কর নন্দী ও প্রচার সচিব—তপোব্রত মজুমদার। এ-ছবির গান গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কণ্ঠদান করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আল-পনা, গায়ত্রী ও অন্নপূর্ণা। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।   —চিত্রদূত

ইডেনে আর এক প্রতিরোধের দুপুর

(১) ওপরের চিত্রে দুই জনপ্রিয় নায়ক বিশ্বজিৎ ও উত্তমকুমার।

(২) নীচের বাঁদিকের চিত্রে প্রদর্শনী খেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু, অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বি সি রায় ও ১৯৬১ সালে ভারত ও কমন-ওয়েলথ সিলভার জুবিলী ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়-গণের স্বাক্ষরিত ব্যাটখানি নিলাম হলো শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ১৫ হাজার টাকায় কিনে নেন।

(৩) নীচের ডানদিকে ক্রিকেট ব্যাট হাতে বিশ্বজিৎ।

দেশের সংকট মুহূর্তে চিত্রশিল্পীদের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৪৭ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়েছে।
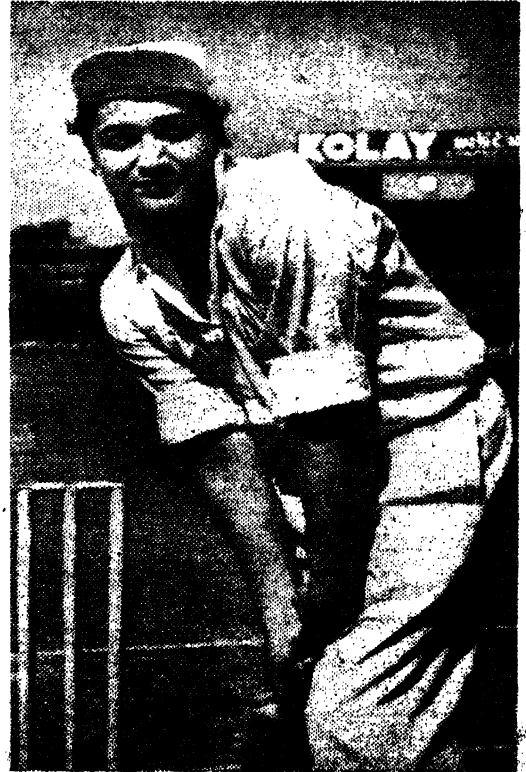
ইডেনে প্রতিরোধের দুপুর

কনাদ চৌধুরী

!! প্রতিরোধ ! প্রতিরোধ ! !!

ইডেন যাঁদের কাছে শীতের দুপুর, আমার পরম দুর্ভাগ্য আমি কখনই তাঁদের মত গণ্যমান্যজন হতে পারিনি। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড-এর দুটো টেস্টেই ইডেন উদ্যান আমার কাছে শুধু শীতের দুপুরই না শীতের দিন রাত্রিও ছিল। এবং 'টেস্ট' কথাটির অর্থ যদি পরীক্ষাই হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান এবং ইংল্যাণ্ড-এর তিনটে টেস্ট খেলাই আমার দর্শক-জীবনে প্রতিরোধের তিনটি অমোঘ পরীক্ষা। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পরীক্ষাটি দিতে হয়েছিল ইডেনে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের খেলায়। 'টিকিট তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাও' এই প্রশ্নে সেদিন সারা কলকাতাই কল্লোলিত। সুতরাং সেই 'জয়সীমা-টেস্টের' মৌসুমী ছাড়পত্রের আশা ত্যাগ করে পাড়ার নারাণদারই শরণাপন্ন হতে হল। খবর পেয়েছিলাম নারাণদা মাঠে একটা খাবারের স্টল দেবেন। নারাণদা একটা ভেণ্ডার কার্ডে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন কথা দিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সর্তও জুড়ে দিলেন।

—দিনের বেলা কিন্তু ঢোকাতে পারবো না তোমাকে! একেই ব্যাটারা ভেণ্ডার কার্ড এবার কম দিয়েছে, আমার দোকানের লোকজনদেরই কুলোবে না! তার ওপর বাড়ির লোকেরাও ত একাধদিন খেলা দেখবে।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি, তোমাকে খেলা আরম্ভ হওয়ার আগের রাত্রে ঢুকতে হবে ভেতরে। আমার দোকানে থাকবে, চা'টা—একবেলার ভাত না হয় আমার দোকানেই খেয়ো। সকালে খেলা দেখবে, বিকেলে একবার বাড়ি গিয়ে রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে আবার রাত্রেই এসে ঢুকবে। এইভাবে পাঁচদিন খেলা যদি দেখতে পারো ন্যাখো, আমার আপত্তি নেই।

আমি তখন ওনিল, নীল হার্ভের নীল নেশায় আচ্ছন্ন, নারাণদার সর্তে রাজী হতে একটুও সময় নেইনি। এবং খেলার আগের রাত্রি মাঠের ভেতরে ঢোকার পর থেকেই শুরু হয়েছিল শীতের বিরুদ্ধে মশার বিরুদ্ধে মাথা-মুড়ি চাদর কম্বলের অনভ্যস্ত প্রতি-রোধ।

দুই অধিনায়ক ঃ আলা আর মুস্তাক

ইডেনকে যাঁরা দুপুরের চশমায় দেখেছেন পৌষরাত্রির নিঃঝুম ইডেন তাঁদের কাছে এক রহস্যময় মায়াকানন। চারদিকে গ্যালারীর শূন্য কংকালের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় কুয়াশার মশারী খাটিয়ে, ধূসর সুজনী পেতে কারা যেন একটা অনির্বচনীয় বিছানা সাজিয়ে চলে গেছে। এবং যাবার সময় প্যাভেলিয়নের দিকের যে আলোকগুলোকে পাহারায় বসিয়ে গেছে, রাত জেগে জেগে আমার মত তাদেরো চোখ লাল।

প্রথম দুরাত্রি পনেরো টাকার গ্যালারীতেই নির্বিঘ্নে কাটিয়েছিলাম, রাত্রির পাহারাওয়ালার সঙ্গে গল্প করে, মশার বিরুদ্ধে হাতের রুগ্ন ব্যাট চালিয়ে এবং ঘুমের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল তৃতীয় রাত্রি থেকে। তখন রাত দশটা হবে। নারাণদার স্টলে বসে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছি। অন্ধকারের মধ্যে অন্যান্য ক্যান্টিনের লোকরা জঞ্জাল জেলে অমৃত শেরগীলের ছবি হয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। দুএকটা স্টলে পরদিনের সিঙ্গাড়ার জন্যে ময়দা মাখাও শুরু হয়েছে। আমাদের স্টলের কারিগররা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবে চট পেতে কম্বল মুড়ি দিয়েছে। ওদের আবার ভোর চারটেয় উঠে চপ কাটলেট ভাজতে হবে। হঠাৎ এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নারাণদা এসে হাজির।

—শোনো এইমাত্র শুনে এলাম সারপ্রাইজ চেক হবে সব দোকানে। কারা যেন কমপ্লেন করেছে যে ভেণ্ডার কার্ডে অনেক বাইরের লোকও ঢুকে আছে ভেতরে। তুমি এক কাজ করো চট্ করে পাখাটা নিয়ে পেছন ফিরে উনুনে হাওয়া দিতে আরম্ভ কর। আমার ভাইপোর বন্ধু এসেছে, আজকে সে ওই কারি-গরদের চট পেতে শুয়ে পড়বে। তারপর ওরা চলে গেলে তুমি আর গ্যালারীর দিকে যেও না, ওখানেও দেখবে ওরা। সোজা স্টেডিয়ামে উঠে যেও। স্কোর-বোর্ডের কোনা দিয়ে। স্টেডিয়ামে কেউ যাবে না!

উনুনে বিনাবাক্যব্যয়ে হাওয়া করতে লাগলাম, ভাইপোর বন্ধু যথানির্দেশ কারিগরদের শয্যায় লীন হল. চেক পার্টি এল টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে,, বিশেষ কিছুই হল না, আমাদের দোকানে এক-বার টর্চ ফেলে ওরা সামনের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল, আমি হাওয়া করা বন্ধ করলাম।

তারপর অন্ধকারে স্কোরবোর্ডের কোনার দিকের বাঁশটা বেয়ে বাঁদরের সেই অঙ্ক কষতে কষতে স্টেডিয়ামে উঠলাম। রাত্রির অন্ধকারে রঞ্জী স্টেডিয়ামকে প্রেতলোকের পরিত্যক্ত এক বিশাল সিংহাসন মনে হচ্ছিল, একটা শূন্য হাহাকার কলমার ধাপে ধাপে, সিঁড়িতে সিঁড়িতে পাথরের ঢেউ হয়ে থেমে আছে। একেবারে ওপরে উঠলে গঙ্গার জল, জাহাজের আলো চোখে পড়ে। এখানে মশা কম হাওয়া বেশী। চারদিকে গঙ্গার ওপর দিয়ে ভেসে আসা হু হু হাওয়ার হৈ-চৈ! ওরি মধ্যে জাহাজের জলদ আওয়াজ দৈববাণীর মত শোনা যায় থেকে থেকে। এখানে সাড়ে এই চারটে পর্যন্তও কমলালেবুর রঙের রোদে কমলালেবুর খোসা ছোড়াছুড়ি

দেখেছি, ব্যারাকিং-এর চাবুক এখান থেকেই সোজা খেলোয়াড়দের পিঠে পড়েছে, দুরন্ত দুপুরের সাদা কড়াইয়ে হাততালির খৈও ভেজেছে রণজী স্টেডিয়াম। কিন্তু এখন শুধু অন্ধকার, শীত ছাড়া মুখোমুখি বসবার আর কেউ নেই—পাহারাওয়ালাও না। রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর সিমেন্টের শ্মশানে শরীরের উইকেটটিকে প্রাণপণে টিকিয়ে রেখেছিলাম দুটো চাদর আর একটা কম্বলে পুঁটলি হয়ে। কিন্তু আমার মুখটুকু খোলা আছে এই খবরটা পাওয়া মাত্রই যেন জিন্ডওয়াল-বিক্রম হাওয়া ক্রমাগত বাম্পার দিয়ে যাচ্ছিল। রণজী স্টেডিয়ামের আমার সেই তেরাত্রি পুইয়েছিল প্রতিরোধের অমানুষিক প্রচেষ্টায়।

পাকিস্তানের খেলা অবশ্য আরেকটু আরামে দেখেছি। এক বন্ধুর সহৃদয়তায় নতুন বেতার-ভবনের ছাদের কার্নিশে হাতদেড়েক জায়গা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও আরেক প্রতিরোধ। কার্নিশটা এত ছোট যে একটু অন্যমনস্ক হলে কিংবা আব্বাস আলীর হুকের তারিফে হাততালি দিতে উদ্যত হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবলীলায় একটি ডলি ক্যাচ লুফে আমার ইহজীবনের উইকেটের পতন ঘটিয়ে দিত। কাজেই সবসময়েই ভয়ে ভয়ে একটা রেনপাইপ ধরে ভূমধ্য-পতনকে প্রতিরোধ করতে করতে খেলা দেখেছিলাম সেবার। বয়সটা ইতিমধ্যে বেড়ে যাবার ফলে ইংল্যান্ড বনাম ভারতের সেই গৌরবময় খেলাটিও কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়েই দেখবার চেষ্টা করেছি। রাত থাকতে দৈনিক টিকিটে লাইন দিয়েও দেখেছি শীতের অধিক 'শত্রু'ও আছে খেলার মাঠে। এই 'শত্রুরা' হলেন প্রেস-ফোটোগ্রাফাররা। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে যে লোকটি অফিসে জানিয়েছে যে নিদারুণ সর্দি-জ্বরে ভুগছে বলে সে উত্থানশক্তি-রহিত, তার ছবি যদি খবরের কাগজে দেখেন বড়বাবু তাহলে টিকিট-কাটার টাকা আসবে কোথেকে? ফলে রাত্রেও আমাকে (এবং আমার মত অনেককেই) কালো চশমা পরে ছবিওয়ালাবাবুদের ক্যামেরাকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে।

কাজেই আমি দেখেছি, আমার দর্শক-জীবনের অভিধানে ক্রিকেট খেলার প্রতিশব্দ 'প্রতিরোধ'। তবে এবারের প্রদর্শনী খেলায় একটি সিজন টিকিট জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির বন্ধুবাৎসল্যে পেয়ে ভেবেছিলাম জীবনে এই প্রথম ইডেনে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শীতের দুপুর দেখবো। কিন্তু দিবাস্বপ্নটি ভাঙলো যখন মৃত জওয়ান-দের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সকালের কুড়ি হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে দুমিনিট নীরবতা পালন করলাম। খেলাটাই যেখানে প্রতিরোধের পবিত্র উদ্দেশ্যে সেখানে আমোদের লেপ টেনে কে মত্ত হবে শীতের বিলাসী দুপুরে। ওই যে প্রধানমন্ত্রীর এবং রাজ্যপালিকার দুটি দল মাথা নামিয়ে চুপ, ও'রা কে কার বিরুদ্ধে জিতলে সুখী হবেন? এই খেলায় কোন ব্যাটসম্যান কোন বোলারের জন্যে রৌদ্রাপ্লুত স্টেডিয়াম থেকে বাবা তারকেশ্বরের নামে সেবা দেয়া হবে! আসলে যে সারা মাঠ জুড়ে একটাই দল, একটাই জাতি এবং একটাই প্রাণ। আমরা সবাই প্রতিরোধের পতাকা নিয়ে মাঠে এসেছি, যতদিন হানাদাররা না বিতাড়িত হচ্ছে ততদিন ইডেনে শীতের দুপুরের ছুটি। ইডেনে এখন প্রতিরোধের দুপুর।

।। চার অঙ্কের সৌখীন নাটক ।।

সৌখীন, কারণ নাটকীয় সংঘর্ষের ক্ষীণ আশা দল গঠনের ভূমিকা-লিপি দেখেই অন্তর্হিত হয়েছিল দর্শকসাধারণের। ভারতীয় সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা যে রাজ্যপালের অনেক ওপরে—এই সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই যেন রাজ্যপালিকার দলটিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করে গঠন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী দলের উমরিগড়-নাদকার্নি-মেহেরা এবং গিলক্রাইস্ট-এর যোগাযোগ যে অপর দলের পক্ষে একটি বিয়োগান্তক নাটকের উপক্রমণিকা প্রথম থেকেই আঁচ করেছিলেন অনেকে। রাজ্যপালিকার দলে আশার সঙ্গতে ছিলেন ক্ষীণকান্তি কেনী, ওয়াদেকার এবং কিং-ওয়াটসন। সকলকেই ভাঙা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেনী খেলার দ্বিতীয় দিন থেকেই বাইরে, আর কিং মন্থর উইকেটে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পংকজের চশমায় সম্ভবতঃ তেমন আলো আসে না, অতএব দাঁড়াবে কে? অতীতযুগের নায়কদের কাছ থেকে কিছু অলৌকিক যারাই শুধু আশা করেছেন দর্শকরা তার বেশী কিছু না। তাঁদের সেই আশার অঞ্জলি মুস্তাক-অমরনাথ-হাজারে নিশ্চয়ই ভরেছেন যথাসাধ্য। বাঙালী ক্রিকেটরসিকদের মনের নিভৃত দেয়ালে কিন্তু চারটি বাঙালী নামের ছবি ছিল। পোদ্দার, ডি এস মুখার্জি, শ্যামসুন্দর মিত্র এবং এম পি বড়ুয়া। এ'দের মধ্যে যদি একজনও অন্ততঃ চমকপ্রদ কিছু দেখাতে পারতেন তাহলে আগামী টেস্টে স্কোরবোর্ডের খড়ির লিখনে একজন বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম উঠত। কিন্তু খেলার শেষে সব

রাজ্যপালের একাদশ ফিল্ডিং করতে নামছেন

দর্শকই একই বিষাদ সংগীতে ভারাক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ঃ "বাংলার ব্যাট, বাংলার বল, শূন্য আজি শূন্য আজি হায় ভগবান।"

।। প্রথম অঙ্ক ।।

ভারতীয় সংবিধানকে তৃণজ্ঞান করে টসের মুদ্রাটি কিন্তু রাজ্যপালিকার দলকেই ব্যাটের অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সম্ভবতঃ 'লেডিজ ফার্স্ট' এই আপ্ত-বাক্যটিকে স্মরণ রেখেই। মুদ্রাদি সংবিধান মানেনি, কিন্তু মুস্তাক মেনেছিলেন। টসে জিতেও প্রধানমন্ত্রীর দলকেই পাঠিয়েছেন হাতে ব্যাটের রাজ-দণ্ড দিয়ে। 'নরম মাটি বেড়ালে আঁচড়ায়' এই বাংলা প্রবাদটির কথাই হয়ত ভেবেছেন মুস্তাক, ব্যাটিং আগে না নিয়ে। সকালের নরম উইকেটে তাঁর বোলাররা ভালভাবেই পীচ আঁচড়াতে এবং সেই সঙ্গে উইকেট আছড়াতে পারবেন এই বিশ্বাসের কিন্তু নাভিশ্বাস উঠল যখন দেখা গেলো সাবিনা পার্কের 'রাজা' লেস্টার কিং-এর বলের- বেগে ব্যাটসম্যানরা একেবারেই নিরুদ্বেগ। নাটকের প্রথম অঙ্কে ইডেনের মঞ্চে জনতা ছাড়া আর কেউ নেই। স্কোর-বোর্ডেই শুধু আপন মনে রাণ উঠছে, ফিল্ডসম্যানরা সকলেই হঠাৎ কবি, বলের সঙ্গে কেমন করে যেন জলের মিল আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ফলে হাতের ফাঁক দিয়ে ঠিক জলের মতই বল গলে যাচ্ছে, যেখানে দু রাণ হবার কথা সেখানে বল সীমান্তে, সীমান্তের চার রাণ কুমারী (মিস) প্লোর মোহিনী মায়ায় পাঁচ হয়ে যাচ্ছে! তার ওপর আবার মেহেরার ১৯৩ মিঃ-এর দুর্বিসহ সেঞ্চুরী। পোদ্দার ত ক্রিকেট খেলতে এসে দেখালেন ঘড়ির খেলা। ৯০ মিনিটে ১৮ রাণ। পোদ্দারকে ঘড়ির বড় কাঁটা ছাড়া তখন আর কিছুই মনে হওয়া সম্ভব না। ঘড়ির বড় কাঁটাটির মতই তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটি করে রাণ সংখ্যার ঘরে অধিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। উমরিগড়ের 'আবির্ভাবে'র আগে মনে হচ্ছিল খেলাটি প্রতিরোধের খেলা বটে, তবে সীমান্তের হানাদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের না, ক্রিকেটের বিরুদ্ধেই যেন প্রতিরোধের ক্রিকেট খেলছেন খেলোয়াড়রা। শীতের দুপুরে এরকম ঠাণ্ডা খেলা দেখতে দেখতে আমার পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ভেপোলিনের বিজ্ঞাপনটার দিকে। দেখলাম লেখা আছে "ভেপোলিন স্টপস কোল্ডস কুইকলি।" —আচ্ছা দাদা, পীচের মধ্যে ভেপোলিন ঘষলে খেলাটা একটু গরম হয় না? পীচে ভেপোলিন ঘষলে ঠাণ্ডা খেলা গরম হয় না, কিন্তু উমরিগড় এসে দাঁড়ালে হয়। ক্রিকেট যে খেলার রাজা বোঝা গেল উমরিগড় মাঠে নামতেই। চা-পানের পর রাণ কুড়োতে আরম্ভ করেছিলেন পালি, খেলার শেষঘণ্টায় উমরিগড়-নাদকার্নি জুটি পোদ্দারের সেই মন্থর ঘড়ির কাঁটাগুলোকেই যেন ভেঙে টুকরো টুকরো করে সীমান্তে পাঠালেন। খেলার শেষ এক ঘণ্টায় রাণ উঠেছিল ৭৩।

।। দ্বিতীয় অঙ্ক ।।

প্রথম দিনের পাষাণভার দ্বিতীয় দিনে ছিল না। দ্বিতীয় দিনে খেলা হল রাণের ছোটাছুটিতে উজ্জ্বল ছুটির ক্রিকেট। খেলা আরম্ভ হওয়ার নব্বই মিনিটের মধ্যে আগের দিনের উমরিগড়-নাদকার্নি জুটি ১২৫ রাণ তুলে নিজেদের সেঞ্চুরী এবং দর্শকদের রোমাঞ্চবাসনা পূর্ণ করলেন। অমর-নাথের জন্যে হা-পিত্যেশীর দল হতাশ হয়ে শুনল অমরনাথ ব্যাট করবেন না, তাঁর জ্বর হয়েছে সামান্য। সেই থেকে সারাটা দিন ধরেই যেন ইডেনে 'হসপিটাল ইনিংস'এর খেলা। স্টেয়ার্স-এর বাম্পারে আহত হলেন কেনী। গিল ক্রাইস্ট-এর অমিত্রোচিত বলে শ্যাম-সুন্দর মিত্র মাঠ ত্যাগ করলেন। ওয়াট-সনেরো যেন আমচকা কোথায় টনটন করে উঠল, তিনিও বিদায় নিলেন। মন্দভাগ্য রাজ্যপালিকা। নইলে একে একে দেউটি নেভে অমন করে? অপরাহ্নের সবটুকু আলো মাথায় সাদা চুলে মেখে সেদিন কিন্তু একজনই খেলেছিলেন। রাণের সিংহাসনে না বসে পঞ্চাশ মিনিট তিনি দাঁড়িয়েছিলেন রোমাঞ্চকর ক্রিকেটের রাজপথে। সেই অবিস্মরণীয় ক্রিকেট-পথিকটি দীর্ঘ

প্যাভেলিয়ান থেকে বেরোলেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। আমরা বাঙালীরা আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ আলিবাবার কাহিনীই বেশী পছন্দ করি। ক্রিকেটেও বাঙালীর পছন্দ আলিবাবারাই। নইলে মুস্তাক আলি, আব্বাস আলি আর টাইগার মনসুর আলি মাঠে নামলেই কেন বাঙালী দর্শকের হৃদয় আকুল হয়। এই কারনেই মুস্তাক তাঁর শেষের কবিতা লিখেছেন, তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট সেঞ্চুরীর সাক্ষী এই ইডেন গার্ডেন। কাজেই মুস্তাক যতক্ষণ ইডেনের মাঝ-ময়দানে ব্যাট হাতে থাকবেন কলকাতার দর্শক ততক্ষণ কিছুতেই সিটে বসে থাকতে পারবেন না। পুরোনো ক্যালেণ্ডারের সব কটা পাতাই উল্টে গেলেন মুস্তাক মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে। তাঁর বিখ্যাত সব কটা মারই মারলেন, গ্ল্যান্স, হুক, কাট, লেগের বল অফে ঘোরানো। আর সেই একই অননুকরণীয় ভঙ্গী! সেই বল ডেলিভারী হবার আগেই উইকেটকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে বলের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। এবং প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সঞ্জীবিত করে। মুস্তাক আসার আগে রায়ের ব্যাটের মুখে রাটি ছিল না, ক্রিজে অনেকক্ষণ মারমুক হয়েছিলেন পঙ্কজ, হাউই মুস্তাকের হঠাৎ হাওয়ার হানায় তিনিও যেন মারমুখো হয়ে উঠলেন। প্রথম দিনে মেহেরা নিরস সেঞ্চুরী করে অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন, আজকে দৌড়ে এসে মিড-অনে একটা ক্যাচ লুফে অনেকের ঘৃণাভাজনও হলেন মনে হল। ক্যাচটি লোফার পর অপরাহ্নের সূর্য পশ্চিম দিকে প্যাভেলিয়নের আকাশে অস্ত গিয়েছিল। পাশের ব্যক্তিটি মেহেরার উদ্দেশ্যে ক্ষেদোক্তি করলেন : "বাবা মেহেরা! আমরা কাল নেহাৎ মেহেরবাণী করেই তোমার অখাদ্য সেঞ্চুরী দেখলুম, আর তুমি বাপু আজকে ক্যাচটা মেহেরবাণী করে ফেলে দিয়ে মুস্তাকের খেলাটা দেখাতে পারলে না?"

।। তৃতীয় অঙ্ক ।।

তৃতীয় দিন সকালে যাঁরা অনেকদিন পরে পঙ্কজের শতরাণের সম্ভাবনায় কাঁসরঘন্টা নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন, তাঁরা অমরনাথের অনবদ্য স্কোইভ কাট এবং হুককে অভিনন্দিত করলেন সেই কাঁসর বাজিয়ে। অমরনাথ বুঝি মাঠে আসতে সময় নিচ্ছিলেন, মুস্তাক মাঠ থেকে ঘাড়ি দেখালেন, দেরী কেন আজকের ইডেন ত তোমার জন্যেই হাত-তালির হাজার হাজার বাঁয়া তবলা নিয়ে অপেক্ষা করছে। নট-আউট ৬৫ করে অমরনাথ ইডেনের লোকনাথ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম ইনিংস-এর কাটা সৈনিক পোদ্দারও যেন এই ইনিংসে উজ্জীবিত হয়ে পূর্বভূমিকার প্রায়শ্চিত্ত করলেন ৪৭ রাণ করে। অতঃপর হে নির্বাচক-মণ্ডের বিধাতাবৃন্দ, অধীন পোদ্দারকে তুমি একটু মনে রেখো। ওয়াদেকারকেও ভুলো না। মনে রেখো কুন্দরামের সেই বিশ্রী নীচু ক্যাচটি বেশ শক্তই ছিল ধরা এবং তার ওপর মেহেরা আর রামচাঁদের উইকেট দুটোও সে পেয়েছে বাঁ হাতের বলে।

।। চতুর্থ অঙ্ক ।।

ওয়াদেকারকে টেস্টে অন্তর্ভুক্ত না করে সত্যি কোনো উপায় নেই নির্বাচকমণ্ডলীর। যেমন ফিল্ডিং, তেমনি বোলিং, চতুর্থ দিনে ৭২ করে ওয়াদেকার দেখালেন ব্যাটিং-এ তিনি কিছু কমতি নন। খেলার চতুর্থ দিন বড়দিন, ক্রাইস্ট-এর দিন। ক্রাইস্ট নামটির মর্যাদা রাখবার জন্যেই যেন গিলক্রাইস্ট সকালে ১২ রাণে তিনটি উইকেট নিয়ে নিলেন। না, অন্যের ওপর এতটুকু নির্ভর করেননি গিল ক্রাইস্ট, সম্পূর্ণ একাই ফিরিয়েছেন তিনজনকে, প্রথম তিনজনই বোল্ড আউট। তাড়াতাড়ি গিল ক্রাইস্টকে সরিয়ে অমরনাথ আপাততঃ অমরত্বের বর দিলেন রাজ্যপালিকার একাদশকে। তা যদি না দিতেন ইডেন উদ্যানে একটি অবিস্মরণীয় ঝড় দেখা থেকে বঞ্চিত হতেন দর্শকরা। ৬৫ মিঃ ৮৪ রাণকে ঝড় ছাড়া আর কি বলা যায়। প্রথম ২৫ রাণের মধ্যে ৬টাই বাউণ্ডারী করেছেন দেশাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর সেই ৮৫ রাণ কলকাতার দর্শকরা দেখতে পাননি, তাঁদের মনোস্কামনা এতদিনে পূর্ণ করলেন রমাকান্ত দেশাই। তাঁর চোদ্দটি বাউণ্ডারী আট-কাবার জন্যে অমরনাথ কম চেষ্টা করেন নি। দেশাই ব্যাট করতে আরম্ভ করলে ফিল্ডিং-এর জালটাকে দূরে ছোঁড়া হচ্ছিল, কিংবা ওয়াটসনের ক্ষেত্রে গোটানো হচ্ছিল জালটা। কিন্তু রমা-কান্ত দেশাই গভীর জলের মাছ। পুল, সুইপ স্কোয়ার কাটে 'জেলেরা' বিষম নাকাল না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তাঁকে প্যাভিলিয়নের ডাঙ্গায় টেনে তোলা যায়নি। দেশাই-এর ৮৪ রাণের জন্যে যদি হাততালি দেয়ার লোক ভাড়া পাওয়া যেত প্রতিটি দর্শকই একশো হাতে তালি দিতেন। যতক্ষণ দেশাই মাঠে ততক্ষণই চারদিকে 'দেশাই দেশাই নন্দির করি মন্দ্রিত সব ভেরী।' চার অঙ্কের নাটক যেভাবে শেষ হয় অন্তিম মঞ্চের নায়ক দেশাই ঠিক সেইভাবেই শেষ করেছেন খেলা ভাঙ্গার খেলা।

।। পরিশিষ্ট ।।

খেলার শেষে যখন শোনা গেল প্রতিরক্ষা ফণ্ড প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে এবং প্রদর্শনী বাবদ সংগৃহীত হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা বড়দিনকে আরো অনেক বড় দিন মনে হল।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

গত বছর এই শীতের সময়—ইডেন উদ্যানের টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিবেশ পরিষ্কার মনে পড়ছে। ৪ঠা জানুয়ারীর অপরাহ্নে সারা ইডেন উদ্যান দর্শক-সাধারণের আনন্দ-উল্লাস এবং জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ১৮৭ রানে জয়। জাতীয় মর্যাদার লড়াইয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের এই দ্বিতীয় জয়। টেস্ট খেলার দরুণ গত শীতের খেলাটির যে গুরুত্ব ছিল, তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব ছিল এবারের শীতের প্রধানমন্ত্রী একাদশ দল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল একাদশ দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার। গতবারের খেলাটি ছিল টেস্ট ক্রিকেট খেলা, যার ফলাফল সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নই বড় ছিল। কিন্তু আলোচ্য প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি ছিল আমাদের কাছে এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে খেলায় হার-জিতের প্রশ্ন গৌণ এবং সে সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন আগ্রহ বা উত্তেজনার বালাই ছিল না, সেখানে খেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে এতদিন আমরা প্রধানতঃ খেলোয়াড়দের উপরই নির্ভর করে এসেছিলাম। কিন্তু এ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিল জন-সাধারণের দেশাত্মবোধের উপর। তাঁরা সে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই খেলার মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে আমাদের দেশাত্মবোধ সদাজাগ্রত এবং ক্রিকেট খেলার জীবনাদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত। এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে আমরা এই চারদিনের খেলায় আমাদের জাতীয় কর্তব্য পালন করেছি।

চীনা হানাদারদের অন্যায়ভাবে ভারতভূমি আক্রমণের ফলে সারা দেশে যে জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটির আয়োজন করা হয়। চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট বিক্রি বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা পড়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল এবং প্রদর্শনী খেলায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নাম স্বাক্ষরিত তিনখানি ক্রিকেট ব্যাট নীলাম ক'রে ১৫,৩০০ টাকা পাওয়া গেছে। চারদিনের খেলায় প্রতিরক্ষা বন্ড এবং সার্টিফিকেট বিক্রী হয়েছে ৪২ লক্ষ টাকার।

লালা অমরনাথ

প্রধানমন্ত্রী একাদশ : ৪২৩ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিজয় মেহরা ১২৬, বাপু নাদকার্ণী ১০৫ এবং পলি উমরীগড় ১০০ নট আউট। ওয়টশন ৫১ রানে ২, কেনী ৪৯ রানে ২ এবং মুস্তাক আলী ১৫ রানে ১ উইকেট)।

ও ২১৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লয়ার্ড। মেহরা ৬৮, অমরনাথ ৬৫ নট আউট। ওয়াদেকার ৩১ রানে ২ উইকেট)।

রাজ্যপাল একাদশ : ২৪২ রান (পঙ্কজ রায় ৫৫ এবং কেনী ৪৮—আহত অবস্থায় অবসর। গিলক্রিস্ট ৩৪ রানে ২ এবং মুখার্জি ৩৭ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৮২ রান (আর বি দেশাই ৮৪ এবং ওয়াদেকার ৭২। গিলক্রিস্ট ১৩ রানে ৩, নাদকার্ণী ৬৪ রানে ৩ এবং পোদ্দার ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

আলোচ্য প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ফলাফল সম্পর্কে দর্শকদের কোন ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ ছিল না। সুতরাং খেলার ফলাফল ছিল গৌণ। অতীত/ এবং বর্তমান সময়ের ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় এবং সেই সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিনজন টেস্ট বোলার খেলার প্রধান আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিলেন। লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, মুস্তাক আলি, মানকাদ, উমরীগড়, পি রায় এবং রামচাঁদ আজ অতীতের গৌরব। এই সাতজন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়ের খেলা যাঁরা বহুবার দেখেছেন এবং যাঁরা সে সৌভাগ্য লাভ করেননি—তাঁদের কাছে সমানভাবেই এই প্রদর্শনী খেলাটির আকর্ষণ খুব বেশী ছিল। মুস্তাক আলী এই সাতজনের মধ্যে ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। মুস্তাক আলীর জনপ্রিয়তা সারা ভারতে। কিন্তু

এস মুস্তাক আলী

তাঁর প্রতি ক'লকাতার ক্রিকেট মহলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার গভীরতা এইভাবে প্রকাশ করা যায়—ক্রিকেট খেলার প্রতি মুস্তাকের ভালবাসা এবং মুস্তাকের প্রতি ক'লকাতার ক্রিকেট মহলের ভাল-বাসা—এই দুইয়ের মধ্যে উনিশ-বিশ পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে তাঁর যে জনপ্রিয়তা, এতখানি জনপ্রিয়তা তিনি ভারতবর্ষের অন্য কোন ক্রিকেট মহলে পাননি। বাংলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা কতখানি, তা অতীতের কলকাতায় 'No Mushtaq, No Test' আন্দোলন থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। সেই মুস্তাক ক'লকাতায় খেলতে এসেছেন প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ইডেন উদ্যানের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডুর কাছে একলক্ষ টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা বণ্ড কিনছেন।

অটোগ্রাফের খাতা তাঁর পাতেই বেশী পড়েছিল।

খেলার প্রথম দিন মাঠ ভর্তি ত্রিশ হাজার দর্শক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল একাদশ দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলি টসে জয়লাভ করলেন। কিন্তু তিনি প্রথম ব্যাট নিলেন না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একাদশ দলকে দান ছেড়ে দিলেন। প্রথম দিনের খেলায় রানের গড় ভালই ছিল—৩ উইকেট পড়ে প্রধানমন্ত্রী একাদশ দলের ২৯৮ রান। কিন্তু খেলায় প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব খুবই বেশী ছিল। এই দিনের খেলায় প্রধান আকর্ষণ ওপনিং ব্যাটসম্যান বিজয় মেহরার সেঞ্চুরী (১২৬ রান)। মেহরা ২২৬ মিনিট খেলে তাঁর ১২৬ রান তুলেন; বাউণ্ডারী করেন ১৬টা। প্রথম দিনের খেলায় অপরাজেয় থাকেন নাদকার্ণী (৬৬) এবং উমরীগড় (৪১)।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ক্রিকেটের জৌলুষ ছিল। নাদকার্ণী (১০৫) এবং উমরীগড় (১০০) সেঞ্চুরী করেন। নাদকার্ণীর শত রান পূর্ণ করতে ১৮৫ মিনিট সময় লাগে। তাঁর এই রানে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল। নাদকার্ণী এবং উমরীগড়ের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৪৩ রান যোগ হয়। নাদকার্ণীর বিদায় নেওয়ার পর উমরীগড়ের জুটি হন রামচাঁদ এবং হাজারে। কিন্তু এ'রা দু'জন বেশীক্ষণ উইকেটে ছিলেন না। উমরীগড়ের শত রান পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একাদশ দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ দলের ৪২৩ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উমরীগড়ের সেঞ্চুরী করতে ১৫৫ মিনিট সময় লেগেছিল। তিনি ৭টা বাউণ্ডারী করেন।

রাজ্যপাল একাদশ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি। লাঞ্চের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে তখনও ১৫ মিনিট বাকি, এদিকে দলের দুটো উইকেট পড়ে গেছে। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় মাত্র ১১, ২'টো উইকেট পড়ে। দলের দুর্ভাগ্য এইখানেই শেষ নয়। স্টেয়ার্সের বলে এস মিত্র এবং গিলক্রিস্টের বলে আর বি কেনী আহত হয়ে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল দলের ৪টে উইকেট পড়ে ২০০ রান। উইকেটে তখন খেলছেন পঙ্কজ রায় (৫৪) এবং মানকদ (২৯)। মুস্তাক আলী তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ খেলায় ২৮ রান ক'রে নাদকার্ণীর বল মেহরার হাতে তুলে দিয়ে আউট হন।

তৃতীয় দিনে রাজ্যপাল একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ২৪২ রানে শেষ হয়। কেনী এবং মিত্র এই দিনও ব্যাট করতে নামেননি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যপাল দলের ২৪২ রানে যে ইনিংস শেষ হয় তা ৮ উইকেটের বিনিময়ে। প্রধানমন্ত্রী একাদশ দল ১৮১ রানের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। রাজ্যপাল দলের আরও একজন অসুস্থ ও আহতদের তালিকায় নাম লেখালেন। উইকেটকীপার ইঞ্জিনিয়ার

ছেলেমেয়েদের অনুরোধ রক্ষা : প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী অটোগ্রাফ অজস্র স্বাক্ষর দিচ্ছেন।

উমরীগড়

নাদকার্ণী

এইদিনের খেলায় যোগদান করতে পারেননি।

খেলা ভাঙগার নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ৫ উইকেট পড়ে প্রধানমন্ত্রী দলের ২৯৩ রান দাঁড়িয়েছে। উইকেটে অপরাজেয় রইলেন লালা অমরনাথ (৬৫ রান) এবং নাদকার্ণী (২৩ রান)। লালা অমরনাথ অসুস্থতার কারণে প্রথম ইনিংসে খেলেননি। অমরনাথের দর্শনীয় খেলা দর্শকসাধারণের মনে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। এইদিনে খেলায় আড়ষ্টতা অনেক কেটে যায়—ক্রিকেটের রমণীয়তায় দর্শকদের মন ভরে যায়। প্রধানমন্ত্রী দল ৪৭৪ রানে এগিয়ে খেলায় দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করে।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনেও যে খেলা এমন উপভোগ্য হবে তা কেউ আশা করেননি। এইদিনে প্রধানমন্ত্রী একাদশ দল আর ব্যাট করতে নামেননি। তৃতীয় দিনের অসমাপ্ত ২৯৩ রানের (৫ উইকেটে) উপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। খেলার এই অবস্থায় রাজ্যপাল দলের পক্ষে ৩০০ মিনিটের খেলায় ৪৭৫ রান তুলে জয়লাভ করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

শেষদিনে চা-পানের বিরতির পর কয়েক মিনিট খেলা চলেছিল। রাজ্যপাল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮২ রানে শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী একাদশ দল ১৯২ রানে জয়লাভ করে। শেষদিনে রামকান্ত দেশাই নির্মমভাবে পিটিয়ে খেলেছিলেন। তিনি মাত্র ৬৫ মিনিটে তাঁর ৮৪ রান তুলেছিলেন। তাঁর এই রানে ছিল বাউন্ডারীর ফুলঝুরি—মোট ১৪টা। দেশাইয়ের বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলাও শেষ হয়ে যায়।

কলকাতায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একাদশ দল বনাম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একাদশ দলের চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে সব অতীত এবং বর্তমানকালের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগদান করেছিলেন তাঁহাদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্যের পরিচয় সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের সে সাফল্যের পরিসংখ্যান (১।১।৬৩ পর্যন্ত সংশোধিত) নীচে দেওয়া হ'ল।

অতীতের টেস্ট খেলোয়াড়

	মোট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	মোট সেঞ্চুরী
উমরীগড়	৫৯	৩৬৩১	২২৩	১২
পি রায়	৪৩	২৪৪১	১৭৩	৫
হাজারে	৩০	২১৯২	১৬৪*	৮
মানকাদ	৪৪	২১০৯	২৩১	৫
রামচাঁদ	৩৩	১১৮০	১০৯	২
অমরনাথ	২৪	৮৭৮	১১৮	১
মুস্তাক	১১	৬১২	১১২	২
বর্তমানের টেস্ট খেলোয়াড়				
নাদকার্ণী	২১	৭৯৪	৭৮*	
দেশাই	২১	৩২৫	৮৫	
ইঞ্জিনিয়ার	৭	২৪৫	৬৫	
কেনী	৫	২৪৫	৬২	
মেহরা	৬	২৪২	৬২	
কুন্দরাম	৮	১৭৮	৭১	

বোলিং

অতীতের টেস্ট খেলোয়াড় : মানকাদ ৫২৩৫ রানে ১৬২; রামচাঁদ ১৯৯০ রানে ৪১; উমরীগড় ১৪৭৫ রানে ৩৫, মুস্তাক আলী ২০২ রানে ৩ এবং অমরনাথ ১৪৮১ রানে ৪৫ উইকেট।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরিত এই তিনখানি ব্যাট ১৫,০০০ টাকায় বিক্রীত হয়।

প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ক্রিকেট ব্যাট নিলাম করতে দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানের টেস্ট খেলোয়াড় : দেশাই ২২২২ রানে ৫৫ এবং নাদকার্ণী ১৩৭১ রানে ৪১ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলোয়াড়

কলকাতার প্রদর্শনী ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনজন বর্তমান সময়ের টেস্ট বোলার—স্টেয়ার্স, ওয়াটসন এবং কিং যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সব থেকে বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ওয়াটসন—৬টা। ওয়াটসন ৬৯৮ রানে ১৮টা, স্টেয়ার্স ৩৬৪ রানে ৯টা এবং কিং ৬৪ রানে ৭টা টেস্ট উইকেট পেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

এম সি সি : ৫৮৬ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কলিন কাউড্রে ৩০৭, টম গ্রেভনী ১২২ নট আউট, ডেভিড শেফার্ড ৮১ এবং কেন ব্যারিংটন ৫২) ও ১৬৭ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ৪৪ রানে ২ উইকেট)।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া : ৪৫০ রান (ফ্যাভেল ১২০, সোবার্স ৮৯, ম্যাকলাচলান ৬২, ডানসী ৬৪। টিটমাস ৮৮ রানে ৩, এ্যালেন ৫৪ রানে ২ এবং ব্যারিংটন ৫৫ রানে ৩ উইকেট) ও ১১৩ (৪ উইকেট। সোবার্স ৭৫ নট আউট)।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এম সি সি দলের এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরের ১৬শ খেলাটি ড্র যায়। বৃষ্টির দরুণ অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এই কারণেই চতুর্থ দিনে খেলা ভাঙগার নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত অনুসারে

খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। খেলার শেষ অর্থাৎ চতুর্থ দিনে এম সি সি দল ১৬৭ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের জয়লাভের জন্যে ৩০৪ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে ৪ ঘণ্টা খেলার সময় ছিল।

এই খেলাতে ব্যক্তিগতভাবে ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন ইংল্যান্ডের সহ-অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স। কাউড্রে তাঁর ৩০তম জন্মদিনে (২৪শে ডিসেম্বর) প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩০৭ রান পূর্ণ করেন। কাউড্রে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। জন্ম স্থান বাঙ্গালোর। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খেলোয়াড়ের জন্ম দিনে এরকম সাফল্যের নজির কোন দেশেই নেই। প্রথম দিনের খেলায় কাউড্রে ২৪৪ রান ক'রে নট আউট ছিলেন। তাছাড়া কাউড্রের এই ৩০৭ রান অস্ট্রেলিয়া সফরে যে কোন দেশের পক্ষেও এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান হিসাবে রেকর্ড-ভুক্ত হ'ল। পূর্বের ৩০৫ রানের রেকর্ড করেছিলেন কেন্ট কাউন্টি দলেরই খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক উলি, আজ থেকে ৫১ বছর আগে (১৯১১—১২) টাসমানিয়া দলের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত তিন শতাধিক রান অনেক দিন চোখে পড়েনি। শেষ ক'রেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান ১৯৩৫—৩৬ সালের ক্রিকেট মরশুমে দু'বার (৩৫৭ রান ও ৩৬৯ রান)। ইংল্যান্ডের পক্ষেও অনেক দিন পর এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত তিনশত রান হ'ল। কাউড্রের ঠিক আগে করেছিলেন রমন সুব্বারাও ১৯৫৮ সালের ইংলিস ক্রিকেট মরসুমে।

আলোচ্য খেলায় দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়, কাউড্রে এবং গ্রেভনীর ৫ম উইকেটের জুটিতে ৩৪৪ রান—এম সি সি দলের পক্ষে এই জুটিতে রেকর্ড রান। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি এই নিয়ে চারবার এক ইনিংসের খেলায় পাঁচ শতের বেশী রান তুললো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের উভয় ইনিংসের খেলায় যথাক্রমে ৮৯ এবং ৭৫ রান (নট আউট)। বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৪বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে ডেভিস কাপ জয়লাভের গুরুত্ব—পুরুষদের দলগত বিভাগে বেসরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব লাভ। যেহেতু পুরুষদের দলগত অথবা

সাঁতারু শ্রীতড়িৎকুমার সাহা (স্কুল ছাত্র) এই বৎসর রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বয়েজ বিভাগে ১০০ মিঃ বুক সাঁতার ও চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার ও একটি ক্ষেত্রে পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করেন। জাতীয় স্কুল সন্তরণে শ্রীমান সাহা বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গ দলে ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমে নিঃ ভাঃ জলক্রীড়ায় শ্রীমান সাহা ফ্রিস্টাইল, বাটারফ্লাই ও রিলে রেসে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ব্যক্তিগত বিভাগে সরকারীভাবে কো অপেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যব আজও হয়নি সেই কারণে ডেভিস কা লন টেনিস প্রতিযোগিতাকে এক রক সরকারীভাবেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশী হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়; এ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ উঠে না।

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ ল টেনিস প্রতিযোগিতা নানা দিক থে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ আমেরিকা তা নিজের জোনের ফাইনালেই উঠ পারেনি। অথচ যুদ্ধোত্তর কালের প্রতি যোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে আমেরি এক টানা ১৪ বার (১৯৪৬-৫৯) থে ৬বার ডেভিস কাপ পেয়েছিল। এ বছ মেক্সিকো চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে উঠেছে শক্তিশালী আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয় সুইডেন এবং ভারতবর্ষকে পরাজি ক'রে। সুতরাং মেক্সিকোর চ্যালে রাউন্ড পর্যন্ত যাওয়া মোটেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। এবারের চ্যালে রাউন্ডের খেলাতে অস্ট্রেলিয়াকে পর জিত করে মেক্সিকো একটা কিছু অ টন ঘটাবে এমন কথা যাঁরা মনে ক ছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের প্রথম দিনে দ্বিতীয় খেলায় রড লেভার মেক্সিকো র‍্যাফেল ওসুনাকে পরাজিত কর অস্ট্রেলিয়া ২—০ খেলায় অগ্রগামী হ। এ বছরই পশ্চিম ইংল্যান্ড টেনিস প্রতি যোগিতার সেমিফাইনালে র‍্যাফেল ওসু বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় র লেভারকে পরাজিত করে আন্তর্জাতি টেনিস মহলকে হতবাক করেছিলেন লেভার সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নে ডেভিস কাপের এই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ডাবলসে খেলায় জয়লাভ করলে তাদের হাতে ডেভিস কাপ থেকে যায়। তখন বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার গুরুত্ব অনে কমে যায়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তৃতী দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলায় কো রকম গা-আলগা দিয়ে খেলেনি বরং ঘামিয়ে খেলে জয়লাভ করে। চ্যালে রাউন্ডের ডাবলসের খেলায় গত তি বছর অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলে এমার্সন এবং ফ্রেজার জুটি। কিন এ বছর এই জুটিতে খেলেছিলেন র লেভার এবং এমার্সন। মেক্সিকো প্যালাফক্সের বিপক্ষে ফ্রেজারে কষ্টার্জিত জয়লাভই এই পরিবর্তনে কারণ। এই নতুন জুটি খেলার সব বিষয়ে মেক্সিকোর ওসুনা - প্যালাফ জুটিকে পরাজিত করে। ডাবলসে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে ৭ মিনিট সময় লেগেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার ২৬শে পৌষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday 11th January, 1963.
40 Naya Paise.

বিগত সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৯৬৩ সাল আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের যে সকল ঘটনাবলীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য ঘটনা কি? —এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর নানাজনের ও নানাশ্রেণীর লোকের মনে নানারূপে উদিত হওয়া সম্ভব, কেননা সকলের দৃষ্টিকোণও এক নয় এবং বিভিন্ন মতিগতির লোকের চিন্তাধারার গতি নানা পথে চলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ চীনা আক্রমণের পর, ভারতকে অস্ত্রসাহায্যদান সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গের চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের যুদ্ধ যে বর্বর ও বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম সে বিষয়ে ও ভারতের স্বপক্ষে চীনের জোটের বাহিরের প্রায় সকল দেশের—এমন কি কমিউনিস্ট দেশগুলিও কয়েকটির—স্পষ্ট অভিমত পাওয়া গিয়াছে। এবং সেই কারণে ভারতের বন্ধু যাঁহারা এরূপ প্রায় সকল দেশনেতা তাঁহাদের দেশের ক্ষমতা-অনুযায়ী ভারতকে অস্ত্র, রসদ ও অন্য সামরিক ও সামগ্রীক সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। কয়েকটি দেশ সাহায্য করিতে না পারিলেও সহানুভূতি জ্ঞাপন বা বিবাদ ও বিরোধের মীমাংসা ও শান্তিস্থাপনের চেষ্টা সক্রিয়ভাবে করিতেছে। ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দুইটি ক্ষেত্রে।

অস্ত্রসাহায্য বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করেন ঘানার প্রেসিডেন্ট এন্‌ক্রুমা এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। পাকিস্তানের এ-বিষয়ে বিরোধিতা ও আপত্তির কারণ আমরা খুব ভাল করিয়াই বুঝি যদিও বর্তমান অবস্থায় সে বিষয়ে বিশদভাবে না লেখার জন্য সরকারি অনুরোধ আমাদের সম্মুখে থাকায় সে বিষয়ের বিশেষ চর্চা করা আমাদের চলে না। এবং সেই কারণে এ দেশের সংবাদপত্রগুলি প্রায় সকলেই এখন এ বিষয়ে বিশেষ সংযম দেখাইতেছে, এবং পাকিস্তানী ও আয়ুবশাহি মনোভাবের যথাযথ বিশ্লেষণ পাক-ভারত আলোচনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে চেষ্টিত হইতেছে।

ভারতীয় নেতৃবর্গের ও ভারতীয় সংবাদপত্রের এইরূপ সংযম প্রদর্শনের অনুরূপ ব্যবহার অবশ্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যাশা করা বৃথা, কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে আমাদের মুখ না-খোলার সুযোগে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ভারতের অনিষ্টজনক মতামত প্রচারে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে আমরা দেখি তিনি পাকিস্তানী নীতি অনুযায়ী কাশ্মীর সম্পর্কে নিজের পাতে ঝোল টানায় সচেষ্ট হইবার পর এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তি সম্পর্কে সাফাই গাহিবার পর ঝাল ঝাড়িয়াছেন ভারতকে অস্ত্রসাহায্য করার উপর এবং অস্ত্রসাহায্য বন্ধ করার জন্য মান-অভিমান ভীতি-প্রদর্শন ইত্যাদিও নাটকীয়ভাবেই করিয়াছেন। লাদাকে ও নেফায় ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঐ সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা পাকিস্তান অধিপতির মতে নাকি অস্ত্রের অভাবে ঘটে নাই। উপরন্তু এই অস্ত্রসাহায্যের ফলে নাকি পাকিস্তান এতই বিপন্ন হইয়া পড়িবে যে তাহাকে সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির জোট হইতে সরিয়া নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতের যে অকর্মণ্য সামরিক সংস্থা ও ব্যবস্থা অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও চীনকে ঠেকাইতে পারে নাই, সেই ভারতের সেই সামরিক সংস্থা ও ব্যবস্থাই আর কিছু অস্ত্র পাইলেই শুধু চীনকে ঠেকাইতে সমর্থ হইবে না অধিকন্তু পাকিস্তানকেও আক্রমণে উদ্যত হইবে! মার্কিন দেশের লোকে এই যুক্তি জট ছাড়াইয়া গিলিতে পারিবে কিনা জানি না—আমরা উহার লেজ ও মুড়ার সন্ধানই পাই নাই।

ঘানা ভারতকে অস্ত্রসাহায্যদানের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত কেন করিয়াছিল তাহা কেহই আদৌ বুঝিতে পারে নাই, এমন কি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীও না!

যাই হোক এখন মূল প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাক। বিগত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ কি?

আমাদের বিবেচনায় সেই সংবাদ দিয়াছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপসিং কাইরন পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা একত্রিশ হইতে নয়জনে সঙ্কুচিত করিয়া। ইতিপূর্বেও তিনি দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন একদিনে ৩ মণ ২৪ সের স্বর্ণদানে, নভেম্বরে প্রতিরক্ষা তহবিলে সারা ভারতের সবচেয়ে অধিক জমা দিয়া (নগদে ও সোনায় ৫ কোটি ৬৭ হাজার টাকা) এবং ২ লক্ষাধিক যুবককে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করাইয়া।

প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বক্তৃতায় অনেকেই পঞ্চমুখ কিন্তু কথা বনাম কাজের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত আসিয়াছে পঞ্চনদের সন্তানদিগের নিকট [illegible] ভারতের অন্য সকল প্রদেশকে বিস্মিত করিয়া।

সংগ্রামরত জোয়ানদের প্রতি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলার সমতল ছেড়ে অনেক দূরে
তুমি এখন হিমালয়ের উচ্চ পাহাড় চড়াই-এ,—
যেখানে তুষার, শুধু শুভ্র তুষার;
কিন্তু তোমার চোখে শ্যেনের দৃষ্টি,
বুকে জ্বলন্ত সাহস,
হাতে উদ্যত রাইফেল;
আর এতে আমার আনন্দ, আমার গর্ব
তুমি আমার সহোদর ভাই, ভারতের সন্তান।

শত্রুর রাইফেল, মর্টার মেসিনগান, কামান
কিছুই দমাতে পারবে না তোমাকে, জানি,
তুমি স্বাধীন ভারতের সৈনিক,
দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়বে
দুর্ধর্ষ বীরের মতো—ভয়ঙ্কর। শত্রুর হাত
থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারের ব্রত তোমার;
আর এতো আমার আনন্দ, আমার গর্ব
তুমি আমার ভাই, মহান ভারতের সন্তান।

সারা দেশ উৎকর্ণ হয়ে আছে তোমাদের
শৌর্যের সংবাদে। শত্রুর কবল থেকে তোমরা
ছিনিয়ে আনবে অপহৃত মাটি, উজ্জ্বল করবে
দেশের মুখ, ফিরিয়ে আনবে শ্রী, সম্মান, গৌরব;
বীর বাঙালীর উত্তরাধিকার তোমাদের রক্তে
তোমরা উদাত্ত ভারতের সাহসী সন্তান।

তুষার-পিছল পথে দৃঢ় পদক্ষেপে সঙিন উঁচিয়ে
তোমরা ছুটবে চীনা ড্র্যাগনকে তাড়া করে,
তোমাদের হেলমেটে ঝরবে তুষার,
লাগবে শত্রুর সঙিনের আঘাত, কামানের গোলা,
কিন্তু তোমরা দুর্ধর্ষ, শেষ শত্রুটিকে দেশের মাটি
থেকে উৎখাৎ না করে বিশ্রাম নেই তোমাদের।
তোমরা দেশের গর্ব, রাখবে জাতির মান।

যারা পবিত্র দেবভূমির শান্তিময় নিস্তব্ধতা ভেঙে
পৈশাচিক উল্লাসে অশান্ত চিৎকার তুলেছে, তাদের
প্রাণপণে হানবে তোমরা প্রচন্ড আঘাত;
তাদের বুঝিয়ে দেবে—ভারতের সদিচ্ছা যতো মহান,
তার শক্তি ততো প্রচন্ড, শত্রুতা তেমনই ভয়ঙ্কর।
ভারতের সন্তান আঘাতের প্রত্যাঘাত হানতে জানে।
মাতৃভূমিকে
নিষ্কলঙ্ক রাখতে পারে। তার পৌরুষ বজ্রহুঙ্কার হানে।
তোমরা দেশের গর্ব। তোমাদের পিছনে
আসমুদ্র হিমাচল দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

তোমরাই শেষ কথা নও

রাম বসু

সেই রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর তুহিন বিস্তার
বরফের কিমাকার মূর্তির পাশে গুলির শব্দ,
আর আমাদের বিক্ষুব্ধ চোখে মানবিক পতন,
টকটকে তাজা রক্তে হিমালয়ের বরফ গলছে।

জীবনের চেয়েও দামী এই হিংসা?
ফুল ও পল্লবের চেয়ে দামী ঘৃণা ও আতঙ্ক
স্বচ্ছ বিশ্বাসের চেয়েও দামী রক্ত ও মরণ?

আমরা হাসি ও মুক্তিকে ভূষিত করেছি বুকের ঝাঁঝরায়
আমাদের মুখে বিকশিত মানবিক বিভূতি,
আমাদের পরিমাপ মৃত্যুর চেয়েও বড়,
এবং বিবেকবান বিক্ষত মানুষ
একটি দর্পিত নগরীর মহিমা,
এক গুচ্ছ গোলাপ ও মানবিক বেদনা; এই ভারতবর্ষ!

বিকার, দুঃস্বপ্ন, কবন্ধ
তোমরাই শেষ কথা নও
আমরা অকলঙ্ক মুখে পুষ্পের কোরকে যাবো।
রৌদ্রদীপ্ত পৌরুষের কেন্দ্র থেকে বলি:
স্বাধীনতা, প্রেম, শস্য ও মানুষ
আমাদের আদি
আমাদের অন্ত।

আমার শাণিত প্রেম

প্রসূন বসু

যে প্রেমে আকাশে মুখ, হৃদয় হাওয়ায়
উড়েছিল এতোকাল
সে প্রেম বিদীর্ণ আজ রক্তাপ্লুত নখে
লজ্জায় ঢেকেছে মুখ পথের ধুলোয়!

স্বপ্নগুলো শব্দ হয়ে, শব্দ হয়ে গান
হাজার বছর ধরে নদীর মতোন
বয়েছিল যেই প্রেম,
সে প্রেম আজকে শুধু ঘৃণার আগুনে
ইতিহাস দগ্ধ করে,
দগ্ধ করে লালিত বিশ্বাস।

আমার শানিত এই প্রেমের জোয়ারে
হিংস্র পশু সরে যাও,
ভাইয়েরা আমার, দাও
বলিষ্ঠ মুঠোর আজ
কোটি কোটি হৃদয়ের দুর্জয় কামান
কণ্ঠ আজ বজ্র হোক, শেষ হোক গান॥

জৈমিনি

কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট পড়ে অনেকেই হয়তো কৌতুক অনুভব করেছিলেন। ব্যাপারটা ছিল এই রকম।—

বছরের শেষদিকে সরকারী কর্মচারীদের নিজেদের এবং তাঁদের পরিবারভুক্ত লোকজনদের মধ্যে অদ্ভুত নানা-রকম অসুখ মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। একটি মাত্র বিভাগে খবর নিয়ে দেখা গিয়েছে করণিকদের সংখ্যা সেখানে ১৭৫ জন, কিন্তু গত মাসের কোনো এক দিনে ঐ বিভাগে ৭১ জনই ছিলেন অনুপস্থিত।

এই ৭১ জনের মধ্যে ২০ জন অনুপস্থিত ছিলেন স্ত্রীর অসুখের জন্যে, ১২ জনের ছিল ছেলের অসুখ, ১০ জনের মেয়ের অসুখ। পাঁচ জনের ছিল গুরুতর মাথাধরা, সাতজনের পেটের গোলযোগ, ছ'জনের সর্দিকাশি, এবং এগারোজন ছুটি নিয়েছেন ধর্মীয় কারণে।

খবরটির একটা মুখবন্ধ আছে। তাতে জানানো হয়েছে যে, কর্মচারীগণ বছরে ১৫ দিন 'ক্যাজুয়াল লীভ' পান; ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সে ছুটিরও যবনিকা-পতন ঘটে।

শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। এই অসুস্থ ব্যক্তিগণ তাহলে জানুয়ারী মাসের প্রথমই স্ব স্ব চেয়ারে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পেরেছেন!

যাই হোক খবরটি পড়ে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার। পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি এখানে।

প্রথম ঘটনা আমাদের বন্ধু বিজনের কাছে শোনা। পাওনা ছুটি তার একদিনও ছিল না। কিন্তু ছুটি নেওয়া যেখানে রেওয়াজ এবং ছুটি পাওয়া সুলভ, সেখানে ছুটি না নিতে পারলে মান থাকে না। কাজেই সে তার স্ত্রীকে একদিন আপিস থেকে ফিরে ভরসা দিয়ে বলল যে, পরদিন সে ছুটি নেবে। পুরো ছুটি নয়, সেভাবে ছুটি নেওয়ার উপায় নেই তার, আপিসে গিয়ে জ্বর হয়েছে বলে চলে আসবে। যাহোক নির্দিষ্ট দিনে আপিস যাওয়ার আগে সে দাড়ি কামালো না, স্নান করল না, বেশ একটা শুকনো মেক-আপ নিয়ে বেরোল বাড়ি থেকে। যাওয়ার আগে আরো একটা কাণ্ড করে বসল সে। স্ত্রীকে বলল যে, আপিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসবে না, মিছি করবে কোনো এক সিনেমা হলের

লাগলো। ঠিক আড়াইটার সময় তার স্ত্রী যেন সেখানে দু'খানা টিকিট কেটে তার জন্যে অপেক্ষা করেন। টিফিনের পরই বিজন ছুটি নিয়ে চলে আসবে নির্ঘাৎ।

আপিসে কাজকর্মে তেমন মন বসলো না। ম্যাটিনি শো'তে যে সিনেমা দেখবে তার মনের অবস্থা সীরিয়াস কাজের অনুকূল না হওয়ারই কথা। এটা ওটা করে কোনোরকমে ঘড়ির কাঁটাকে একটার ঘর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভালো করে খেয়ে নিল। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে উত্তেজনার ফলে ভালো করে খাওয়া হয়নি। সে ঘাটতিটা ভালো মতো পুষিয়ে নেওয়া গেল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে কিছুটা রৌদ্র-সেবন করে দুটো নাগাদ আপিসে ফিরে এল।

বিজনের ওপরওয়ালা ছিলেন একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। বেশ মিশুকে প্রকৃতির মানুষ, সুযোগ পে'লে রসিকতাও করেন তিনি বিজনদের সঙ্গে। কাজেই ছুটি পাওয়ার বিষয়ে বিজন একরকম নিশ্চিতই ছিল।

যথাসময়ে ভদ্রলোকও ফির'লেন লাঞ্চ থেকে। তারপর বিজন মুখ-চোখের ভাব যথাসাধ্য কাতর ও করুণ করে দাঁড়াল গিয়ে তাঁর ঘরে।

'হ্যালো বোস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?' সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'স্যার,' বিজন সবিনয়ে বলল, 'জ্বর হ'য়েছে। বাড়ি যেতে চাই।'

সাহেব এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। বিজন কল্পনা করতে লাগল, তার ১০৫· ডিগ্রি জ্বর হ'য়েছে, মাথায় আইসব্যাগ; এবং মুখখানা সেইরকম রে'পাচ্ছন্ন করতে স'চেষ্ট হল। আধ মিনিট তাকিয়ে দেখে সাহেব ফিক করে একটু হেসে বললে, 'জানো বোস, পাকা খুনীও তার দুষ্কর্মের সবগুলো প্রমাণ লুকিয়ে ফেলতে পারে না!'

'স্যার।?!' বিজনের কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময়, প্রশ্ন ও ভয় ধ্বনিত হ'য়ে উঠল।

সাহেব বললেন, 'জ্বর তোমার হয়নি বোস, এটা তোমার কল্পনা।'

'না স্যার, কাল রাত থেকে স্যার......আজ স্নানও করিনি, খাইওনি, দেখছেন না!'

'দেখছি।' সাহেব বললেন, 'আর আয়না থাকলে তুমিও দেখতে পেতে। ......জ্বর হ'লে সাধারণত মানুষ পান খায় না!'

চমকে উঠল বিজন—সর্বনাশ, টিফিনের সময় গুরু-ভোজনের পর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে কখন করে ফেলেছে এই দুষ্কর্ম—ছি-ছি কী অন্যমনস্ক সে, কী অপদার্থ!

প্রহৃত প্রাণীর মতো মাথা নীচু করে ফিরে এল সে নিজের চেয়ারে। মনে পড়তে লাগল কেবল তার স্ত্রীর কথা। মাসকাবারের মূল্যবান সঞ্চয় দিয়ে টিকিট কিনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সিনেমা-হলের সামনে। না যেতে পারলে আজ হোম-ফ্রন্টে যে কী দুর্গতি ঘটবে তা ভাবতেও তার হাত-পা সব হিম হ'য়ে আসতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলতে লাগল এদিকে। দুটো পনের, কুড়ি, পঁচিশ...... কেন পান খেতে গেল সে? ছি ছি, এত বোকা, এত লোভী...! খুট করে শব্দ হল একটা। বিজন তাকিয়ে দেখল, সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে। সে উঠে দাঁড়াল।

সাহেব টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যালো বোস, মুখ-চোখ শুকনো কেন? কী হ'য়েছে?'—যেন এই প্রথম দেখা হল!

বিজন ঢোক গিলে বলল, 'না স্যার, এই একটু—!'

'কী জ্বর নাকি?' সাহেবের কণ্ঠে যেন উৎকণ্ঠা আর সমবেদনা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল, 'তাহলে বাড়ি চলে যাও না! এক্সপোজার লাগাচ্ছ কেন?' বলে সাহেব সকলের অলক্ষ্যে ছোট্ট করে একটু চোখের কোণা কুঁচকে অন্য দিকে চলে গেলেন।

বিজন মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করে চার্লি চ্যাপলিনের চেয়ে দ্রুততর-গতিতে করিডর দিয়ে ছুটে চলল সিঁড়ির দিকে। চেষ্টা করলে এখনো তিনটের আগে পৌঁছানো যেতে পারে যথাস্থানে!

দ্বিতীয় ঘটনা অন্য জাতের। কোনো আপিসে ঘটেনি ব্যাপারটা, ক্যাজুয়াল লীভের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

ভারতের প্রতিবেশী অন্য একটি রাষ্ট্রে থাকেন আমার আরেক বন্ধু সীতেশের বাবা রমেশবাবু। যাতায়াত করতে হয় পাসপোর্টের সাহায্যে, এবং সে যাতায়াতের বাৎসরিক সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রমেশবাবু প্রতিবছরই একবার করে বেশি আসেন। কীভাবে?

অনেক চিন্তা করে তিনি নাকি একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন। দরখাস্তে কারণ দেখানোর সময় তিনি লেখেন, সেক্রেড থ্রেড সেরিমনি অব মাই সান—অর্থাৎ কিনা ছেলের পৈতে।

ওখানকার কর্তাব্যক্তিরা আর সবই বোঝেন, বোঝেন না শুধু নাকি এই 'সেক্রেড থ্রেডে'র ব্যাপারটা। ফলে রোজ বছর থেকে শুরু করে এই বাইশ বছর পর্যন্ত সীতেশের ছোট ভাই ঋণ্টুর পৈতে হ'য়ে গেছে ছ'বার।

সীতেশ বলল, রমেশবাবু যেখানে থাকেন সেখানকার এক অন্য ধর্মী প্রতিবেশীর খটকা লেগেছিল এবার ব্যাপারটায়। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা কর্তা, আপনার বড় ছেলের তো যতোদূর মনে প'ড়ে পৈতে হ'য়েছিল একবার, ঋণ্টুবাবুর এতবার হচ্ছে কেন?'

'তা হবে না?' রমেশবাবু নাকি জবাব দিয়েছি'লেন, 'অষ্টগ্রহ সম্মেলন হ'য়ে গেল যে গত বছর, পড়েন নি কাগজে! আমাদের বংশে নিয়ম আছে, এ রকম যোগের পর আটবার পৈতে নিতে হয়।'

অর্থাৎ, আরো দুবার বাকী আছে!

'কিন্তু', গল্পটা শুনে আমি সীতেশকে বললাম, 'তার আগে ঋণ্টু বিয়ে করে না বসে!'

'বাবা বোধহয় সেদিকটা ভেবে দেখেন নি!'

খুব একচোট হাসাহাসি হল। হাসতে হাসতেই আমি বললাম, 'তোর এই গোটা গল্পটাই বোগাস—একেবারে আজগুবি!'

'তা বটে। কিন্তু সত্যি হলেও ক্ষতি ছিল না।'

তৃতীয় ঘটনা কোনো ব্যক্তির নয়, বইয়ের। সকলেই জানেন, বিয়ের পর নববিবাহিতা মেয়েকে পিতৃগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুবই একটা আগ্রহ থাকে অভিভাবকদের। এসব ক্ষেত্রে মেয়েও মা-বাবাকে দেখার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে থাকে। আগেকার কালে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নতুন বউকে চট করে আসতে দিতে চাইতেন না বলে, এই আগ্রহটা আরো বেশি হত।

কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মতি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। তার একমাত্র অভিভাবক ছিল তার স্বামী কুমুদ। সে মতিকে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিল। কিন্তু বার সঙ্গে মতির পিত্রালয়ে ফেরার কথা সেই শশী ডাক্তারকে হতভম্ব করে দিয়ে সে ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্তে এমন কাণ্ড করে বসল যাতে তাকে থেকে যেতে হল কুমুদের সঙ্গেই।

কুমুদের প্রতি তার আন্তরিক আকর্ষণের ফলেই ঘটতে পেরেছিল ব্যাপারটা। বাপের বাড়ি যাবার আগ্রহ তার কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে গিয়েছিল।

এবং, চাকরীর কথা দিয়ে শুরু করেছি বলে ফিরে আসছি আবার চাকরীতে—চাকরীর বেলাতেও এই একই কথা সত্য। কাজকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটি নেন না। যে আনন্দ তাঁরা পান আপিসের বাইরে এসে, তার চেয়ে বেশি আনন্দ পান আপিসে। এবং আপিস চলে এ'দের জন্যেই।

স্বামী বিবেকানন্দ

জওহরলাল নেহরু

মর্ত্য-মানুষ, যাঁকে মর্ত্যের কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাঁর পক্ষে ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কিছু বলা সমীচীন কিনা জানি না। তবে মর্ত্য-মানুষেরা সেই সমস্ত ঈশ্বরপ্রেরিতদের বাণী সম্পূর্ণরূপে না বুঝলেও যদি তাঁদের শিষ্যদের রচনা পড়ে প্রভাবিত হয়ে গৌরব-ঘোষণা করে তা'হলে তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হবে না। এই সমস্ত অলৌকিক শক্তিসম্পন্নরা শুধু তাঁদের কালকেই নয়, পরবর্তী কালের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অনেক সময় তাঁরা শক্তিমানদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, তাঁদের জীবনের মূল্যবোধই যায় বদলে। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সাধারণ মানুষ ছিলেন না। মনে হয়, তিনি ভারতের সেই সমস্ত প্রাচীন ঋষিদের অন্যতম যাঁরা যুগে যুগে পরম সত্যের সন্ধান দিতে এসেছিলেন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ভারতবর্ষ কোন সময়ই তার জীবনচর্যায় মর্ত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেনি। জীবনের সত্য যে তার পারমার্থিক মূল্যে একথা বিশ্বাস করেছে এবং তাই সেই সমস্ত সত্য-সন্ধানীদের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিক-কালে সে আগ্রহ আর নেই। দিনে দিনে আমরা কেমন যেন পরমত-অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি, এবং নিজ নিজ সংকীর্ণ মতবাদকেই ধ্রুবসত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভারতীয় ঐতিহ্য এ নয়। ভারতবর্ষ কোনদিনই এভাবে ভাবেনি। ঔদার্যেই তার মহত্ত্ব। সে বিশ্বাস করত সত্যের বহুরূপে। 'সত্য' অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ। সুতরাং একজন মানুষ কি করে বলবে যে, সে 'সত্য'কে পেয়েছে? সত্য-সন্ধানী 'সত্যে'র একটি রূপকে পেতে পারেন। অতএব কি করে তিনি বলবেন যে, তাঁর পথ অনুসরণ না করলে 'সত্য'-কে পাওয়া যাবে না? তাই ভারতবর্ষ চিরকালই এই সত্য-সন্ধান ও তাঁর নৈতিকমূল্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও এটাই বোধহয় ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।
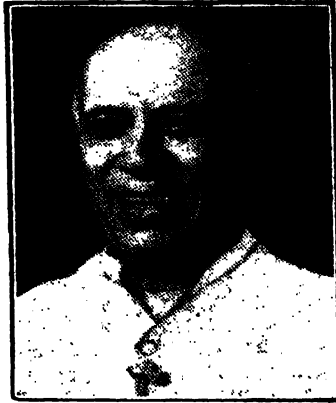
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন, তাঁকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন। কেউ কেউ দূরে থেকে এই অক্ষর-জ্ঞানশূন্য লোকটিকে উপহাস করেছেন, কিন্তু যেইমাত্র তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন অমনি এই ঈশ্বর-প্রেরিত মানুষটির নিকট নতিস্বীকার করে উপহাস করা থেকে বিরত হয়েছেন। এ'দের অনেকেই পরে সাধারণ বৃত্তি ত্যাগ করে শিষ্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এ'রা প্রত্যেকেই মহান। এ'দেরই অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ভারতবর্ষের শুধু নয় সমস্ত বিশ্বেই পরিচিত। জানিনা, এখনকার তরুণেরা ক'জন বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পড়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের সময় অনেকেই তাঁর রচনাবলীর স্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আধুনিক তরুণেরা তাঁর রচনাসমূহ পাঠ করলে অনেক উপকৃত হবে। উপলব্ধি করবে বিবেকানন্দ কোন প্রেরণার স্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ, তিনি যা বলতেন, তা উদ্বুদ্ধ হয়েই বলতেন। তাই তিনি একজন 'বাগ্মী' বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আর এই 'বাগ্মী'-গুণেই তিনি তাঁর পরবর্তী দুই পুরুষকে প্রভাবিত করেছেন বলেই, এদেশে আরও একটি ঘটনা ঘটল। প্রাচীন ঋষিদের ধারা অনুসরণ করে আর একজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হোল, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোড়িত করলেন। ইনি গান্ধীজী।

ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। যার ফলে, আজ আমরা সেই সমস্ত মনীষীদের প্রায় ভুলেই গিয়েছি, যাঁরা সে দুর্দিনে এই ভারতবর্ষকে তার বর্তমান রূপের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। অথচ এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, আজও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী পুরনো হয়নি। কারণ, ছাপান্ন বছর আগে তিনি বিশ্বের যে সমস্ত সমস্যার কথা বলেছিলেন, সে সমস্ত সমস্যা এখনও আছে। তাই আজও আমরা তাঁর রচনাবলীর জন্য গৌরব বোধ করি। তিনি আমাদেরও বাদ দেননি, ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তিনি কিছুই গোপন করতে চাইতেন না, এবং তা করাও উচিত নয়। যেহেতু, ত্রুটিগুলো আমাদের, এবং আমাদেরই তা সংশোধন করা দরকার। এজন্য তিনি কখনও আমাদের রূঢ় আঘাত করেছেন, কখনও বা আমাদের মহত্ত্ব—যে মহত্ত্বের জোরে ভারতের দুঃসময়েও আমরা টিকে থাকতে পেরেছি, তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং, স্বামীজী যা লিখেছেন বা বলেছেন, তা আগ্রহসহ অনুধাবন করা দরকার। তিনি প্রচলিত অর্থে রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু আমি মনে করি, তিনি অন্যতম প্রবর্তক। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা যাঁরা

পরবর্তীকালে সক্রিয়ভাবে এতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। অতএব, বলা যেতে পারে—বর্তমান ভারত গঠনে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছেন। এবং আমি মনে করি যে, আমাদের তরুণেরা স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞান ও প্রাণশক্তির সুযোগ নেবে।

ভারত তথা বিশ্ব আজ বহু কঠিন সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু কি করে তার সমাধান সম্ভব? সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের কথা না তুলেও বলতে পারি, রাজনীতিক বা রাষ্ট্রনেতাদের একটি পথ আছে। কিন্তু তাঁরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনে অনেক সময় এমন কিছু করতে বাধ্য হন যা সবসময় অভিপ্রেত নয়। কিন্তু দৈব-প্রেরিতরা ভিন্ন উপায়ে তার সমাধান করে থাকেন। তাঁরা সমস্ত কিছুর বিনিময়ে 'সত্য'-কে আঁকড়ে ধরে থাকেন। এজন্য কখনো কখনো তাঁদের নানারকম লাঞ্ছনা শুধু নয়, মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে। কারণ, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের 'সত্য'ই একমাত্র ধ্রুবলক্ষ্য। সত্য-নিষ্ঠার জন্য কারও কারও মৃত্যু ঘটলেও সত্য কখনই লোপ পায়নি—যেহেতু, সত্যদ্রষ্টাদের চেয়েও 'সত্য' মহত্তর।

রাজনীতিবিদ্ ও সত্যদ্রষ্টা—এ'দের সবসময়ই সমস্যা-সমাধানের দু'টি ভিন্ন উপায় আছে। একই সঙ্গে সাময়িক প্রয়োজন ও চিরন্তন মূল্যবোধের দাবীর দিক থেকে বিচার করলে এর কোনটিকেই যথাযথ বলবার উপায় নেই। সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, ঋষিদের পথই যথার্থ। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে তা সবসময় হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে, রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা অনেক সময় দেশের জনসাধারণের তাৎকালিক প্রয়োজনে একের পর এক সামঞ্জস্যের পিচ্ছিল পথে চলেন। এ পথে একবার পদার্পণ করলে অনেক সময় বাধ্য হয়ে পরিবেশের তাগিদে 'সত্য' থেকে দূরে সরে আসতে হয়। তখন নেতারা একটা দোটানার মধ্যে পড়ে যান—'সত্য' না 'প্রয়োজন'—এর কোনটিকে আঁকড়ে থাকবেন, ভেবে পান না। এ একটি জটিল সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যায় যদি একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া যায়, তবে সত্য থেকে দূরে সরে আসতে হয়। তাই সব সময় সচেতন থাকতে হয়, সত্যাদর্শ মানুষের মনে কতটা সক্রিয় রয়েছে, সেদিকে। রাজনীতিক যদি সত্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করেন, তবে ঋষিদের উপলব্ধিরও কোন মূল্য থাকে না।

আজ আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতির যুগে বাস করছি। বলতে দ্বিধা নেই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর—সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলতে হয় যে, মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। এটা আশঙ্কার বিষয়। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবক। আণবিক শক্তির মধ্যে আমরা তা দেখেছি। এই আণবিক শক্তি যেমন সাধারণভাবে মানব-হিতে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তেমনি, ভয়াবহ ধ্বংসকার্যেও লিপ্ত হ'তে পারে। বিদ্যা হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে কোন ভাল-মন্দ নেই। তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারকারীরাই ভাল ও মন্দ। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর বস্তু যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের প্রয়োগ করবার পূর্বে নৈতিক ও পারমার্থিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখা উচিত এর দ্বারা কোন্ লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছুতে চান এবং যথার্থ মানবকল্যাণ এর দ্বারা কিভাবে সম্ভব। দেশের সমস্ত ধর্ম-গির্জা-মঠ-মন্দির-মসজিদ-গুলোর দিকে তাকিয়েও একথা বলা যায় যে, আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে এ'রা তেমন-ভাবে জাগাতে পারেননি। এটাই এ যুগের দুর্ভাগ্য। একদিকে যখন আমরা নিজেদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করবার জন্য ছোটখাট বিশ্বাস ও ছোটখাট সংস্কারের জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছি তখন আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সঙ্গত আচরণ কিভাবে করা যায়, তা ভেবে দেখছি না। ফলে, পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীতে দু'ধরণের শক্তি আছে,—ধ্বংসমূলক ও গঠনমূলক। যদি বলি, আমি গঠনমূলক শক্তিতে বিশ্বাস করি তবে তা হৃদয়ে উপলব্ধি করা ছাড়া, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার উপায় নেই। কারণ, এটি তখনই একমাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব যখন জীবনাদর্শের মধ্যে বিশ্বাস করবার মত একটি নৈতিক ভিত্তি থাকে। আর তা' না হলে ধ্বংসকারী শক্তি পথ করে নেবেই।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মনীষীরা পৃথিবীকে মঙ্গলময় করবার মহৎ প্রেরণা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ বিশেষ শিক্ষা শুধু নয়, তাঁদের মহৎ জীবনদৃষ্টি যুগ যুগ ধরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করছে। মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী,—সে অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোন বিষয়েই হোক না কেন—গ্রহণ না করলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর জীবনকে দেখবার যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তার মূল্য অপরিসীম। যদি তা গ্রহণ করা না হয়, তা হ'লে ধ্বংস ও বিপর্যয় অনিবার্য। তাঁর বিশেষ নীতির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর-প্রেরিত ছিলেন, এবং তিনি রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই বলেননি,—তবুও এটি ছিল তাঁরও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী। স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহান্ জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এ ছাড়া আর কিছু বলেননি। তাঁর জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যা আন্তর্জাতিকতারই অংশ বিশেষ। সুতরাং, এই সমস্ত মনীষীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনচর্যায় ব্রতী হওয়া দরকার। আর তা হ'লেই এ'দের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে; দেশের এবং সম্ভবতঃ মনুষ্যত্বের প্রতি কর্তব্য করা হবে। *

অনুবাদক : শ্রীদিলীপকুমার নন্দী।

* ১৯৪৯ সালে প্রদত্ত শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভাষণ। দিল্লীর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এ বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন।

।। বিভূতিভূষণ ।।

মনে পড়ল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা।

বাংলাদেশের যে-সব সাহিত্যিককে আমার দেখবার সৌভাগ্য ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজনই বোধ হয় অজাতশত্রু। একজন কলকাতা থেকে অনেক দূরে নিজের নিরুপদ্রব শান্তি আর চমৎকার ফুলের বাগানটি নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন—আহরণ করে চলেছেন জীবনের কৌতুকরস; আর একজনকে যদিও প্রায়ই কলকাতায় দেখা যেত—শুধু তাঁর মন পড়ে থাকত বনগাঁর মজা পুকুর, আমের বাগান আর ঘাটশীলার পাহাড়-জঙ্গলে।

বিভূতিভূষণ নামেরই গুণ আছে হয়তো। শান্ত, নির্বিরোধ, আত্মতৃপ্ত, আত্মমগ্ন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বলছিলাম। তাঁর, 'অপু'র সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-কোনো তফাৎ ছিল না, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে দু-একদিনের জন্যেও এসেছেন তাঁরাই তা জানেন। বাইরে অন্যের সঙ্গে কথা কইছেন—অথচ অন্যমনস্ক দৃষ্টি তলিয়ে আছে নিজের ভেতরে। আমাদের মাঝখানে বিভূতিভূষণ বসে আছেন—আমরা তর্ক করছি, উত্তেজিত হচ্ছি—কিন্তু বিভূতিভূষণের অন্তর্লোকে তা বিন্দুমাত্র আলোড়ন তুলছে না, সেখানে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেন তুলে রেখেছেন তিনি। ঠিক এই জিনিসটি আর একজনের ভেতরেও চোখে পড়ত, তিনি আমার অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ দাশ।

সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস—কলকাতায় একশো আট ডিগ্রির অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আমার কলেজ বন্ধ, দার্জিলিং-শিলং-এর স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রস্য মনোরথাঃ!" বাইরে যাওয়ার পয়সা নেই, তার ওপর কতগুলো ভয়াবহ পরীক্ষার খাতা দেখতে হচ্ছে। এমনি এক দুপুরে বেলা একটা-দেড়টা নাগাদ আমাদের পটলডাঙার গলির মোড়ে হ্যারিসন রোডে সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলুম। রাস্তার পীচ গলছে বললে কম বলা হয়—টগবগিয়ে ফুটে উঠবার উপক্রম করছে। যেন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা ফার্নেসের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এমনি বাতাসের ছোঁয়া। জানলা বন্ধ করে দিয়ে ফাঁকা ট্রাম-বাস ছুটেছে। সিগারেট কিনে গলিতে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেখি রাস্তার ওপারে—আধখানা ঝাঁপ-নামানো একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে একটি মানুষ চুপ করে দাঁড়িয়ে। একপাশে সরে গেলে একটু ছায়া পেতেন, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর রোদের মধ্যে খাড়া হয়ে নিবিষ্টভাবে কী চিন্তা করছেন তিনি।

লোকটি বিভূতিভূষণ।

রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেলাম। বললাম, দাদা, ব্যাপার কী? রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন?

বিভূতিভূষণ যেন জেগে উঠলেন। বললেন, কী জানো, খুব মুশকিলে পড়ে গেছি। একটু আগেই এসেছি বনগাঁ থেকে। একবার ভাবছি যাই সজনীর ওখানে, আর একবার ভাবছি গজেনের ওখানে গেলে কেমন হয়। কী করব তাই চিন্তা করছিলাম।

চিন্তা করবার জায়গাটি বেছে নিয়েছেন চমৎকার। তাকিয়ে দেখলাম, মোটা মানুষটি যেন নেয়ে উঠেছেন, চশমার ওপর দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়াচ্ছে। বললাম, চিন্তাই যদি করতে হয়, তা হলে আমার বাসাতেই আসুন না। এখানে রোদে পুড়ে কী লাভ?

—তোমার বাসায়? ভুরু কুঁচকে বললেন, না—অসম্ভব।

—অসম্ভব কেন?

—তুমি আমাকে দেরী করিয়ে দেবে। আমি খুব ব্যস্ত—অনেক কাজ আমার, এক্ষুনি যেতে হবে।

অভয় দিয়ে বললাম, এক মিনিট দেরী হবে না—আপনি যখন খুশি উঠে যাবেন। কিন্তু এ-ভাবে রাস্তায় আপনার কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না।

—আচ্ছা, চলো। কিন্তু ঠিক পাঁচ মিনিট বসব।

—তাই হবে, আপনি আসুন।

প্রায় জোর করে ধরে আনতে হল। সেই সাড়ে তিন হাত চওড়া গলির ভেতরে, দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ীর একতলার বসবার ঘরটিতে ঢুকেই বললেন, বাঃ—চমৎকার!

একমাত্র বিভূতিভূষণের পক্ষেই এই চমৎকৃতি সম্ভব। কারণ, তিনি ছাড়া আর যে-কেউ এই ঘরে ঢুকে অস্বস্তি বোধ করে। বেলা দেড়টায় সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার, স্যাঁৎ-সেঁতে দেওয়ালে জলের ছোঁয়া, ফাটলে ফাটলে আরশোলার শুঁড়। একমাত্র গুণ বোধ হয় এই যে, গরম লাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইজিচেয়ারে বসলেন, আমি পাখাটা খুলে দিলাম। মিনিট দুই চুপ করে থেকে বললেন, তোমার এখানে এসে ভালোই করেছি দেখছি। রাস্তায় রোদ্দুরে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

এতক্ষণে সেটা টের পেয়েছেন।

আমার স্ত্রী এসে প্রণাম করলেন। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, বৌমা, ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আমি চলে যাব। তুমি আমার জন্যে এক গ্লাস জল আনো।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, দই আছে দাদা, একটু সরবৎ করে দেব কি?

—সরবৎ? আচ্ছা, চলতে পারে। কিন্তু মনে রেখো, ঠিক পাঁচ মিনিট—তারপরে এক সেকেন্ড দেরী করা চলবে না আমার।

সরবৎ ঠিক পাঁচ মিনিটে এল না, আর একটু দেরী হল। সেই সঙ্গে আমার স্ত্রী একটি অটোগ্রাফের ছোট খাতাও নিয়ে এলেন। তাঁর সম্পত্তি নয়—কে একটি মেয়ে রেখে গেছে তাঁর কাছে।

—একটা অটোগ্রাফ দিন। কিছু লিখেও দিতে হবে।

কলম খুলতে যাচ্ছিলেন, লিখে দিতে হবে শুনেই বন্ধ করলেন। বললেন, বাপরে—লেখার সময় আছে নাকি! আমি ভীষণ ব্যস্ত, এক্ষুনি যেতে হবে, একদম সময় নেই।

সময় সত্যিই ছিল না। সরবৎ খাওয়া হয়ে গেলে ইজিচেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে বসলেন। বললেন, জানো নারায়ণ, একবার চাইবাসায় এমনি গরমের সময়—

চাইবাসা থেকে চলে গেলেন পাহাড়-জঙ্গলে, পূর্ণিমার গ্রামে, যশোরের ছায়া-বীথিতে। তেমনি করে নিজের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে, মন ডুবিয়ে কথা বলে যেতে লাগলেন। ছোট ছোট স্মৃতি, ছোট ছোট আনন্দ-বেদনা, অনেকগুলি সহজ মানুষের কথা। আমাদের দুজনের তখন আর কোনো বক্তব্য ছিল না—নিঃশব্দ শ্রোতার ভূমিকায় বসে রইলাম মুগ্ধ হয়ে।

আমার স্ত্রী পণ্ড করলেন শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ বলে বসলেন, দাদা, তা হলে চা আনি?

—চা! —বিভূতিভূষণ চমকে উঠলেনঃ এই দুপুরে চা?

বললাম, দুপুর নয় দাদা, পাঁচটা প্রায় বাজে।

—পাঁচটা! —বিভূতিভূষণ আর্তনাদ করে উঠলেন : তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে হে! এত দেরী করিয়ে দিলে? আমার অসম্ভব কাজ, আমি দারুণ ব্যস্ত—বলেই উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে।

আমার স্ত্রী অটোগ্রাফের খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, তা হলে অন্তত একটা সই—

—সই, পাগল নাকি? সময় কোথায়? পরে হবে—

দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আমি পেছন পেছন ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু আর একটা কথাও বলতে দিলেন না। তিনি যে অসম্ভব ব্যস্ত সেটা বুঝতে আমারও দেরী হল না। কারণ, যে ট্রামটায় তিনি উঠে পড়লেন, দেখলাম সেটা পার্ক-সার্কাসের, তাতে চড়ে 'মিত্র-ঘোষে' যাওয়া যায় না, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে সজনীকান্তের বাড়ীতেও নয়।

দুঃস্বপ্ন!
সোভিয়েট
তিব্বত
এবারের
বিশ্ব চন্দ্রমল্লিকা
প্রদর্শনী
এ কি,
ভাত
কোথায়?
চীনদেশের
নতুন চপস্টিক!

নেফা দর্শনের ইতিকথা

কৃষ্ণ ধর

আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীরা একটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজী বর্ণমালার সংক্ষিপ্তকরণে এই অঞ্চলটা নেফা নামে লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সংবাদপত্র আর আকাশবাণীর কল্যাণে। এতকাল ঘুমন্ত থাকার পর আমাদের এই সীমান্ত হঠাৎ তার তুষারঘেরা গিরিশিখর আর অজস্র রডোডেনড্রনগুচ্ছের রক্তাভ বর্ণ-ছটায় জেগে উঠেছে। শত্রুর আক্রমণ, তার পশ্চাদপসরণ উভয় কারণেই নেফা আজ রক্তাক্ত, অশ্রুসিক্ত ও লুণ্ঠিত। জনবসতি-বিরল বলেই লদাক নিয়ে এতটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি যতটা দেখা দিয়েছে নেফার বলিষ্ঠ মানুষগুলির জন্য। ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও নেফার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। আদিবাসী-দের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্যই সমগ্র নেফাকে দেওয়া হয়েছিল একটি পৃথক সত্তা। একেই বলা হয়েছে 'ফিলসফি অব নেফা' (Philosophy of NEFA) বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দর্শন।

নেফার দর্শন কী, এ নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। চীনা বাহিনীর আক্রমণের ফলে নেফার কামেং ও লোহিত ডিভিশনের একটা বৃহৎ অংশে থেকে ভারতীয় শাসনের অবলুপ্তি ঘটেছিল। কামেং ডিভিশনের সদর দপ্তর বমডিলা ১৯৬২ সালের ১৯শে নভেম্বর চীনা বাহিনীর দখলে চলে যায়। (সম্প্রতি আবার ফিরে এসেছে আমাদের দখলে।) নেফার উল্লেখযোগ্য মঠনগরী তোয়াং, জনপদ ওয়ালং ও উচ্চতম গিরিবর্ত্ম সেলা শত্রুকবলিত হয়। শত্রুবাহিনীর দুর্বার অভিযানে সীমান্তের সরল মানুষগুলির জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত, তাদের জনপদ, বসতি, ক্ষেতখামার কোনো কিছুই অক্ষুণ্ণ থাকেনি। দখলদারী বাহিনীর কাছ থেকে এর চেয়ে ভিন্নতর কোনো ব্যবহার আশা করা অবশ্য যায় না। সামরিক দিক দিয়ে বিপর্যয় সাময়িক, এর জন্য উচ্চতম মহলে নিশ্চয়ই তদন্ত ও অনুসন্ধান চলবে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে নেফার মানুষের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রায়, তাদের জীবন-দর্শনে। চীনা-দের চাপে নেফার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, কামেং, সুবর্নসিরি, তিরাপ ও লোহিত ডিভিশন থেকে সমতলে, ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত প্রসারিত উপত্যকাভূমিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে অন্তত পনেরো হাজার মানুষ, যাদের আমরা জানি আদিবাসীরূপে। এরমধ্যে রয়েছে প্রায় দশ হাজার মনপা, দুই হাজার শেরডুকপেন, হাজার খানেক আকা উপজাতীয় শ্রেণীর নরনারী। এই বৃহৎ জনসমষ্টিকে আবার ফিরিয়ে নিতে হবে তাদের পাহাড়-ঘেরা ছোট জনপদ-গুলিতে, লোহিত, দিহাং আর নামকা চু নদীর তীরবর্তী পর্বতের সানুদেশে যেখানে মেঘ আর আকাশ, সবুজ মাঠ আর শুভ্র তুষার চিরকালের সঙ্গীর মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে। আজ ছিন্নমূল আদিবাসীদের মনে প্রবেশ করেছে গৃহচ্যুতির মানসিকতা, তাদের বিশ্বাসেও কি সংশয়ের ভ্রূকুঞ্চন দেখা দেয়নি? তাদের কি আমরা ঠিক আগের মতোই নির্লিপ্ত নিরপেক্ষতায় অরণ্যঘেরা উচ্চাবচ সীমান্তভূমিতে বাস করতে দিতে পারবো নিশ্চিন্তে। ঘুমন্ত সীমান্তে যে স্বস্তি নিয়ে ওরা এতদিন বাস করেছে, আজ জাগ্রত রণাঙ্গনে, বারুদের কর্কশ গন্ধ আর মর্টারের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে মুখরিত উপত্যকাভূমিতে কীভাবে রক্ত আর অশ্রুর দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে এই সরল মানুষগুলি বাস করবে? এই সংশয় প্রধানমন্ত্রীর মনেও দেখা দিয়েছে। বম-ডিলা-র পতনের পর তেজপুরে এক জন-সভায় শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'নেফার দর্শন'এর পরিবর্তন প্রয়োজন

নেফা সীমান্তে টহলদারী ভারতীয় জোয়ানগণ।

নেফা সীমান্তে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে টহলদারী ভারতীয় জোয়ানগণ।

হতে পারে। হয়তো বাইরে থেকে কিছু মানুষ নিয়ে গিয়ে এই সীমান্তভূমিতে বসাতে হবে স্থায়ী অধিবাসী রূপে, যাতে নেফার আদিবাসীদের সঙ্গে সমতলের 'সভ্য' মানুষের হৃদয়গত সান্নিধ্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়, সীমান্ত বলতে দূরতম কোনো দুরধিগম্য অঞ্চলের চিত্র সমতলের সুরক্ষিত জনসমাজের মনে ফুটে উঠতে না পারে। নেফার আদিবাসীরা বুঝতে শেখে বৃহৎ ভারতবর্ষ তাদের দেশ, তাদের লোককথায় স্বপ্নেদেখা মাতৃভূমির জাগ্রত, বাস্তব রূপ।

নেফার এই স্বতন্ত্র ফিলসফির স্রষ্টা প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ ভেরিয়ার এলুইন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর আদিবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা তিনি। আদিবাসীদের সম্পর্কে তিনি যে মনোভাব পোষণ করেন, নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে তা ঠিক, কিন্তু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে তার মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, একথা আক্রমণের পর, স্বীকৃত হ'য়েছে। শ্রীনেহরুই এ মতবাদের প্রবক্তা।

আদিবাসীদের সম্পর্কে শ্রীনেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক সহৃদয় মানুষের। এক দশক আগে ১৯৫২ সালে নয়াদিল্লীতে উপজাতি সম্মেলনে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

I have always—long before I became Prime Minister—felt very strongly attracted to the tribal people of this country. This feeling was not the curiosity of an idle observer has for strange customs, nor was it the attraction of the charitably disposed who want to do good to other people. I was attracted to them simply because I felt happy and at home with them...In the tribal people I have found many qualities which I miss in the people of the plains, cities, and other parts of India. It was these qualities that attracted me."

আদিবাসীদের তিনি যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত করতে চাননি। তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে বৃহৎ জনসমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টি করার জন্যই তিনি আগ্রহী ছিলেন। তথাকথিত সভ্য মানুষ শ্রেয়োমন্যতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আদিবাসীদের উদ্ধারকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করবে, এটা তিনি চাননি। ভারতীয় সভ্যতার ব্যর্থ অনুকরণে আদিবাসী সমাজ রাতারাতি ধূতি-পাঞ্জাবি কিংবা কোট-পাৎলুন পরে 'সভ্য' হয়ে উঠবে এটাও নৃতত্ত্ববিদদের কাম্য ছিল না। বৃটিশ আমলেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর জীবনধারার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়নি। বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের এই নির্লিপ্ততার তিনটি কারণের কথা আমাদের মনে হ'তে পারে। তাঁরা মনে করতেন, এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বৃটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। এই কষ্ট স্বীকারে তাদের আপত্তি হতো না। কিন্তু প্রধান কারণ ছিল, ভারতের রাজনৈতিক চেতনা-প্রবাহ থেকে এই সরল আদিবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা। শিক্ষার প্রসার ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা দিলে আদিবাসীদের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংখা দেখা দিতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই নেফাতে বৃটিশরা আইনের শাসন ও সভ্য সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে খুব আগ্রহ দেখায়নি। আরেকটি কারণ থাকতে পারে এই নির্লিপ্ততার। সম্ভবত বৃটিশ অফিসারদের মনেও ধারণা ছিল যে, এই আদিবাসীরা, রুশো, দিদেরো যাদের মনে করতেন 'Noble Savage', প্রকৃতির অনাবিল পরিবেশে সভ্য মানুষদের চেয়ে সুখী। ওদের বিরক্ত করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে আদিবাসীদের সমীকরণের চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্য সমাজের রীতি-নীতি প্রবর্তনের উৎসাহ ও উদ্যমও কম দেখানো হয়নি। খৃষ্টান মিশনারীরা দীর্ঘদিন ধরেই আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করছেন। বহু আদিবাসী সমাজ ধীরে ধীরে

তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে 'সভ্য সমাজের' অনুকরণ করেছে। আদিবাসীদের জীবন-ধারায় যে সৌন্দর্যবোধ তাদের সহজ, সরল ব্যবহারকে সভ্য মানুষের কাছে আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছিল, সঙ্গতি-হীন একাত্মকরণের ফলে তাদের সেই জীবনের সৌন্দর্য যাবে ম্লান হ'য়ে, এমন আশঙ্কা নৃতত্ত্ববিদরা প্রকাশ করেছেন। নেফাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি কাজ করেছে। মনপা, দাফলা, মিশমি, আবোর কিংবা শেরডুকপেনদের যথাসম্ভব নির্বিঘ্নে, প্রশাসনিক কলরব, কোলাহলের বাইরে শান্ত নীরবতায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল 'আভ্যন্তরীণ প্রাচীর' বা Inner line, যে প্রাচীর অতিক্রম করে তথাকথিত সভ্যতার অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রী তাদের রক্ষা করতে চেয়েছেন সভ্যতার কলুষস্পর্শ থেকে। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল বন্ধুর মতো, সহযোগীর মতো আদিবাসীদের কাছে যাওয়া, অভিভাবকের দম্ভ নিয়ে নয়। আদিবাসী-দের সরল জীবন, তাদের শিল্পকলার উৎকর্ষ বাণিজ্যিক সভ্যতার নোংরা হাতের মলিন স্পর্শে বিনষ্ট হোক, এটা ভারতীয় প্রশাসকরা চাননি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

I am alarmed, when I see—not only in this country, but in other great countries, too—how anxious people are to shape others according to their own images or likeness, and to impose on them their particular way of living.

সভ্যতা চাপিয়ে দেবার এই প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাইনি। আমরা সভ্য, আর আদিবাসীরা অসভ্য এই সংকীর্ণ মনোভাবকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রকৃতিকে সভ্য মানুষ জয় করেছে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে তার অবারিত সম্পদকে প্রয়োগ করেছে জীবনে। কোন জীবন শ্রেয়, কোন জীবন কাম্য, এ বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, কোনো কোনো দিক দিয়ে আদিবাসীদের জীবন-যাত্রা উৎকৃষ্টতর। তাদের সংস্কৃতির কত রকম বৈচিত্র্য। প্রকৃতির লীলার মতোই তা অজস্র, অফুরন্ত। সভ্য মানুষের 'সভ্যতা'র চোখে আদিবাসীদের জীবন স্বতন্ত্র হ'তে পারে, কিন্তু তাকে অনুন্নত বা অনগ্রসর বলা চলে কি?

এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীই আদিবাসী মানুষের এই সংস্কৃতিকে সযত্ন পরিচর্যায় চেয়েছিলেন লালন করতে। 'Noble Savage' আখ্যার উৎস-সন্ধানে গেলেও আমরা দেখতে পাবো আদিবাসীদের বলিষ্ঠ, সুকুমার ও অনাবিল জীবনযাত্রার প্রতি শিল্পী ও সংবেদনশীল মানুষ চির-কালই অনুভব করেছে প্রবল আকর্ষণ। শিল্পী গর্গাঁ, সাহিত্যিক স্টিভেনসন, পিয়ের লোটি, হারম্যান মেলভিল থেকে শুরু করে নেহরু কিংবা ভেরিয়ার এলুইন পর্যন্ত অনেকেই আদিবাসীদের এই 'শ্রেষ্ঠত্ব'কে সভ্যতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। আমাদের 'নেফা ফিলসফি'র উৎপত্তিও এই মনোভাব থেকেই। নেহরু এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন, আদিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জমি জায়গা, বনসম্পদের অধিকারী বাইরের কেউ হ'তে পারবে না। এদের ওপর হস্তক্ষেপ করাও চলবে না। আদিবাসীদের মধ্যে যে উচ্চ শৃঙ্খলাবোধ, জীবন উপভোগের ক্ষমতা, নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে সেই জীবনবোধ রক্ষা করার জন্যই আমাদের প্রশাসনিক নীতি হ'বে নিয়ন্ত্রিত, এগুলো ধ্বংস করার জন্য নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও শিক্ষার আশীর্বাদ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হ'বে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমষ্টি কল্যাণের কর্মসূচী থাকবে অব্যাহত। আমরা আদিবাসীদের জীবনের মানোন্নয়নে সাহায্য করবো, তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করে। এটাই ছিল নেফা ফিলসফির মূলতত্ত্ব।

নেফার মানুষগুলি কেমন, তার পরিচয় সম্প্রতি আরও বেশী করে সম-তলের সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আসামের পূর্বপ্রান্তে হিমালয় গিরিভূমির কোলে শায়িত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী। ২৭ হাজার বর্গমাইল আয়তনের এই সীমান্ত অঞ্চলের পাঁচটি ডিভিশন—কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ। এই অঞ্চলের অধি-বাসীরা বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠির, এদের ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার প্রথারও পার্থক্য অনেক। বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন রয়েছে একটা বিরাট জনসংখ্যা। কামেং ডিভি-শনের মনপা ও শেরডুকপেন আদি-বাসীরা ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। চাষবাস ও মেষপালন এদের প্রধান জীবিকা। তোয়াং-এর লামাতন্ত্রের অনুগামী এই গোষ্ঠি। খামতি ও সিংপোরাও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। কামেং-এর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে দাফলা উপজাতি। সিয়াং ডিভিশন নেফার মধ্যে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য। আবোর, অসমীয়া ভাষায় যার অর্থ স্বাধীন, উপ-জাতিদের বাসভূমি এই অঞ্চল। উজ্জ্বল পরিচ্ছদ, নয়নাভিরাম বয়ন, উচ্ছল নৃত্য ও গীত আবোরদের দিয়েছে বৈশিষ্ট্য। তিরাপ ডিভিশনে রয়েছে বলিষ্ঠ ও সুদৃশ্য ওয়াংচু উপজাতি। তাদেরই প্রতিবেশী নোক্‌তে (Noctes) উপজাতি, যারা বৈষ্ণবভাবাপন্ন। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। সে জন্য এদের নিজস্ব সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়েছে। এ রকম আরও বহু উপজাতির বাস উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীতে। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠির রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য।

চীনের অভিযানের ফলে এই আদি-বাসীদের জীবনে এসেছে বিপর্যয়। হানাদার বাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণের পর আমাদের অসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হ'বে তাদের ভয় আর সংশয় ঘোচাতে। প্রধানমন্ত্রী সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন তাঁর তেজপুরের বক্তৃতায়—নেফা ফিলসফির পরিবর্তন করতে হ'বে সীমান্ত প্রতিরক্ষার বৃহত্তর পরি-প্রেক্ষিতে। সরল আদিবাসীদের আর প্রকৃতির অনাবৃত পরিবেশে নিঃসঙ্গ, নির্জনতায় থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না। এরমধ্যেই এমন খবর এসেছে যে, তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করে অনেকদিন থেকেই চীনারা নেফার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে আসছে। তিব্বতী লামাতন্ত্রের প্রভাবকে তারা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে। আমাদের প্রশাসকরা সম্ভবত এই স্বতন্ত্র নেফা দর্শনের জন্যই আদিবাসীদের 'ইনার লাইন' অতিক্রম করতে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। তার ফলে আদিবাসীদের নিজস্বতার প্রতি সহানুভূতি ও মর্যাদা দেখাতে গিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় মানসিকতা থেকে তাদের দূরেই রাখা হয়েছে। আজ প্রয়োজন হয়েছে এই দর্শনের পরিবর্তন। আদি-বাসীরাও ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুদূর কেরল, দূরান্তের পাঞ্জাব থেকে বীর যোদ্ধারা ছুটে গিয়েছিলেন হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে, প্রাণ দিয়েছেন শত্রু-বাহিনীর অভিযানরোধের জন্য, এই মহৎ ভ্রাতৃত্ববোধ সচেতনভাবে জাগানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীতে মাত্র গুটিকয় সরকারী অফিসারই যথেষ্ট নয়, সেখানে সমতলের মানুষের বসতি স্থাপনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথাও প্রশাসনিক কর্তৃ-পক্ষকে চিন্তা করে দেখতে হ'বে। বৃহত্তর ভারতের সমাজ-জীবনের চিন্তা-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নেফাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মাতৃভূমির অঙ্গীভূত হওয়া তার স্বার্থ এবং ভারতের সীমান্ত প্রতিরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজন। তখনই নেফার দর্শন ভারতীয় জাতীয়তার দর্শনের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর জীবনস্রোতে সংস্কৃতির সমুদ্রে গিয়ে মিশতে পারবে।

চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে

ডাঃ অশোক বাগচী

[জানবার আগ্রহ মানুষের সহজাত। কেবল পারিপার্শ্বিক পৃথিবী আর মহাশূন্যের বিষয়েই নয়, রোগ ও মৃত্যুর বশীভূত স্বকীয় শরীরটির সম্পর্কেও তার কৌতূহল প্রায় অপরিসীম। সভ্যতার আদিতম লগ্ন থেকে যুগে যুগে কত অভিনিবেশ সহকারে মানুষ এই রোগ ও মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে চিকিৎসাশাস্ত্রের বুনিয়াদ গ'ড়ে তুলেছে, তারই আশ্চর্য বিবরণ পাওয়া যাবে কৃতী স্নায়ু-শল্য-চিকিৎসক ডাঃ অশোক বাগচীর এই ধারাবাহিক রচনায়।]

চিকিৎসা শাস্ত্র : প্রাচীন ভারতে

॥ ভূমিকা ॥

কোটি কোটি বৎসর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোনও এক আদিম জলাভূমির কাদায় একটি এককোষী প্রাণী অ্যামিবার জন্ম হয়েছিল। এক-কোষীর পর এল বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে পৃথিবীর বুকে আসে বানর-রূপী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে সেই মানুষই আজ পরিণত হয়েছে স্পুটনিক চালনা-কারী সুসভ্য মানুষে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কালক্রমে বর্তমান মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট-দর্শন ও হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হতে তারা আত্মরক্ষা করতে শিখেছিল। কিন্তু বহু অদৃশ্য রোগ-জীবাণু তাদের দেহে প্রবেশ করায় ব্যাপকভাবে মৃত্যুকে স্বীকার করতে তারা বাধ্য হত। তারা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকেই মৃত্যুর কারণ হিসাবে মনে করত। রোগ চিকিৎসার কোনও উপায়ই তারা জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার বলে তারা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর অতি-ক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে এবং সেই রোগানলে আত্মাহুতি দিয়েছে আরও বহু মানুষ। কিন্তু যারা বাঁচল তাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। তাই মনে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল মানুষেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

পৃথিবীর আদিমতম রোগগ্রস্ত প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি অস্থি ক্ষয়রোগগ্রস্থ ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ডিনোসা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে অব-লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার জীবাশ্ম রোগক্লিষ্ট জীবনের এক করুণ ইতি-হাসকেই আজকের সভ্য মানুষের চোখে তুলে ধরে। মানব দেহের প্রাচীনতম রোগগ্রস্থ জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদ্বীপে। ১৮৯১ খৃঃ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খনন কার্যের দ্বারা যবদ্বীপ-মানবের (পিথাকানথ্রোপাস ইরেকটাস) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি স্ফীতি বা টিউমার ছিল।

প্রাচীন মানুষের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট হতেই জানতে পারা যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত 'মমি'র দেহে রয়েছে অস্থি-প্রদাহ, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের পাথুরী, পিত্তা-শয়ের পাথুরী, মেরুদণ্ড ও অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন। প্রাচীন মিশরে দন্তরোগ ও বাত-রোগেরও খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ফরাসী

অরিগনাসিয়ান যুগের ভৌতিক চিকিৎসক

দেশের পিরেনীজ পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে জন্তুর ছাল পরিহিত এক যাদুকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক গুহাবাসী আদিম চিত্রকর। ঐরূপ বিচিত্র বেশধারী চিকিৎসকগণ কিভাবে প্রাচীন মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজও মনে হয় যে, তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধি করতেন।

জীবাশ্মীভূত অস্থির অবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে, প্রাচীন মানব শল্যতন্ত্রে পারদর্শী ছিল। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, পোলাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী ও স্পেনের গুহাভ্যন্তরে প্রাগৈতিহাসিক মানবের বহু সচ্ছিদ্র করোটী পাওয়া গেছে। কিরূপে প্রাচীন মানব করোটীর ন্যায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, প্রাচীন শল্যচিকিৎসকগণ উক্ত শল্যতন্ত্রের দ্বারা রোগীর মস্তকের অভ্যন্তর হতে শিরঃপীড়া, মৃগীরোগ প্রভৃতির কাল্পনিক অপদেবতা বিতাড়ন করতেন। প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা মুখ্যতঃ ছিলেন পুরো-হিত, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা

বিকল্পে অর্থোপার্জন করতেন। এবারস্ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ভূর্জপত্র-লিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি ও ভেষজাদির তালিকা পাওয়া গেছে।

পৃথিবীতে প্রথম কবে মানব-সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল নিরূপণ করা যায় নি। অতিকথায় আটলান্টিস নামে এক বিশাল সভ্যতা-সমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি অতলান্তিক মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। ধ্বংসের প্রাক্কালে কতিপয় আট্‌লান্তিসবাসী আফ্রিকা ও পশ্চিম য়ুরোপের উপকূলে উপস্থিত হয় এবং কালক্রমে মিশর, সুমেরিয়া ও প্রাক্ আর্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন ভারত, সুমেরিয়া ও মিশরে সভ্য মানুষের প্রাচীনতম চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব।

॥ প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র ॥

প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান সুসভ্য আখ্যাধারী য়ুরোপীয়গণ ছিল সভ্যতার অস্তিত্বহীন অন্ধকারে। হরপ্পা, মোহেঞ্জোদারো ও তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে উপরিউক্ত স্থানসমূহে অতি সভ্য মানুষ খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাত হতে নয় হাজার বৎসর পূর্বে বাস করত। উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্নাবশেষ-এর মধ্যে আছে সুনির্মিত বাসগৃহ, স্নানাগার ও বিজ্ঞানসম্মত পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ। সভ্যতা ও সমৃদ্ধির নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রতীচ্যের বহু ঐতিহাসিক য়ুনানী সভ্যতাকে এখনও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরনো বলে অভিহিত করতে সচেষ্ট। ভারত-প্রেমিক সংস্কৃতজ্ঞ জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলের প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক-গণের সমক্ষে প্রাচীন ভারতের উৎকর্ষের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে অপদস্থ হন। আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসক ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, ডেনমার্ক, সুইডেন ও রাশিয়ার বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজক ভারতবিদ্বেষী মত-বাদ পোষণ করতেন না। কৃষ্ণমাচারী তাঁর "Essays of Ancient India" পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন পারসিক, মিশরীয়, য়ুনানী, রোমক, স্কান্ডি-নেভীয়, ফিনীসিয় ও ইংলণ্ডের দ্রুইডগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী এক মহাদেশ হ'তে এসে-ছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত অ্যাজটেক নৃপতি মন্টিজুমাও মনে করতেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণও প্রাচ্যদেশ হতে আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। কয়েকজন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মতে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতাও ভারতীয় সভ্যতাপ্রসূত।

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই যা প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ পৃথিবীর যে কোনও দেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক। চিকিৎসা শাস্ত্রেও প্রাচীন হিন্দুগণ চরম উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-মতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সংকলিতা হলেন ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং। ঋগ্বেদের প্রায় সকল অধ্যায়েই শরীরের রুগ্নাবস্থা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার ব্যবস্থার বর্ণনা আছে। অবশ্য বেদের বহু অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে রোগসমূহ অলৌকিক বা ভৌতিক প্রভাবজাত। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পৃথিবীর সকল দেশকেই সমৃদ্ধ করেছিল। ভারতের উন্নতিতে ঈর্ষা-পরায়ণ বহু প্রতীচ্য ঐতিহাসিক প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে স্বীয় সুবিধার জন্য ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অলৌকিক ভাবাপন্ন অংশই লোকসমক্ষে প্রচার করতেন। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে, প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের জন্যই ভারতের প্রকৃত গৌরব ম্লান হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে এমন বহু নিদর্শন আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন য়ুনানেও ভারতীয়গণ বসতি স্থাপন করেছিল। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসার ধারা য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্রকেও সমৃদ্ধ করেছিল। পিথাগোরাস, টেসিয়াস্ ও আরও বহু য়ুনানী চিকিৎসক জ্ঞান আহরণের জন্য ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। ম্যাক্স-মুলের বলেছেন যে, কালনাস বা কল্যাণ নামক এক ভারতীয় চিকিৎসক গ্রীসে গিয়েছিলেন। ভারত আক্রমণকারী বীর আলেকজান্দারের সঙ্গে ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দে য়ুনানী চিকিৎসক মেগাস্থেনেস ভারত পরিভ্রমণ করেন। ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন শল্য-চিকিৎসক শুশ্রুতের জন্ম হয় খৃষ্টজন্মের প্রায় ছয় শতাব্দী আগে। তাঁর জন্মের প্রায় শতাব্দীকাল পরে বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেসের জন্ম। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, কে প্রকৃত চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক—শুশ্রুত না হিপ্পো-ক্রাতেস? এ থেকে মনে হয় হিপ্পোক্রাতেসও হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক চিকিৎসক জীবক শিক্ষালাভ করেন তক্ষশীলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী। হিপ্পোক্রাতেস ও তাঁর সমসাময়িকগণ শারীরস্থান-শাস্ত্রে (Anatomy) প্রায় অজ্ঞ ছিলেন। শুশ্রুত শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা শারীরস্থানশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের বিষয় লিখে রেখে গেছেন। ভারতীয় ভেষজ-শাস্ত্র হ'তে হিপ্পোক্রাতেস শিক্ষালাভ করেন তিল, জটামাংসি, কুন্দরু, আদা ও মরিচের ব্যবহারপদ্ধতি। প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাপুস্তকসমূহে বহু ভারতীয় ভেষজের বিকৃত সংস্কৃত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পুস্তকের কোথায়ও কোন বিদেশী নামের উল্লেখ নেই।

আরবীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব

আরবীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে য়ুরোপে প্রবেশলাভ করে চিকিৎসাশাস্ত্র। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন যে, অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগের য়ুরোপে প্রাচ্য সভ্যতা ও কৃষ্টি আরবীয়গণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে বর্তমান য়ুরোপের তথাকথিত সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতার গোড়াপত্তন করে। আউনাদিম ওরফে আবুল ফারাজ মোহাম্মেদ বিন্ ইসাক নামক বাগদাদবাসী তাঁর কিতাব অল্ ফিরিস্ত নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, খলিফা হারুন ও মনসুরের রাজত্ব-কালে চরক, শুশ্রুত ও নিদানতত্ত্ব প্রভৃতি হিন্দুগণের রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকসমূহ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। বারজুয়ে নামক চিকিৎসক বহু সংস্কৃত পুস্তক পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন পারস্য-নৃপতি নওশেরওয়ানের (৫৩১—৫৭৯ খৃঃ) রাজত্বকালে। প্রবাদ আছে যে বিখ্যাত পারস্য-নৃপতি বাহ্‌রাম পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে কান্যকুব্জ-রাজ বাসুদেবের সভায় এসেছিলেন (৩০০ খৃঃ)। স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের মতে খলিফা হারুন অল্ রসিদের ব্যক্তিগত ভারতীয় চিকিৎসক মানখ আরবী ভাষায় শুশ্রুত সংহিতার অনুবাদক। বিখ্যাত আরবীয়

চিকিৎসক ইবন্‌সিনা (Avicenna), অল্‌রাসি (Rhazes) ও ইবন্‌ সেরাপিন (Serapin) প্রভৃতির লিখিত পুস্তকে চরকের নাম উল্লিখিত আছে। বিখ্যাত আরবীয় পর্যটক অল্‌ বেরুণী সংস্কৃত ও পহ্লবী ভাষার মাধ্যমে আরবদেশে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বুরমাক্‌ বা পরমক্‌ নামক এক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বৌদ্ধধর্মীয় পুরোহিত হারুনের রাজত্বকালে (৭৮৬-৮০৮ খৃঃ) বহু আরবীয় চিকিৎসকগণকে শিক্ষালাভের জন্য ভারতে প্রেরণ করেছিলেন। অল্‌ মুবাফাক্‌ নামক একজন আরবীয় চিকিৎসক পণ্ডিত বুরমাক্‌ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অল্‌ বেরুণীর পরবর্তীকালে ভারতে আসেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ ছিলেন শল্য চিকিৎসা (Surgery), শারীরবৃত্ত (Physiology), শারীরস্থান (Anatomy) ও ভেষজশাস্ত্রে (Medicine) বিশেষ পারদর্শী। বিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার দ্বারা কর্তিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি "ভারতীয় নাসিকা গঠন শল্যতন্ত্র" বা Indian Rhinoplasty নামে পরিচিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম শরীরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চর্ম স্থানান্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক। ডঃ কীথ ও ম্যাকডোনেল বলেছেন যে, তাঁরা রোগগ্রন্থি অপচ্ছেদন ও রোগগ্রস্থ অক্ষিগোলক উৎপাটন প্রভৃতি শল্যচিকিৎসার পারদর্শী ছিলেন। শুশ্রুত স্বয়ং প্রায় শতাধিক শল্যচিকিৎসাযন্ত্র উদ্ভাবক। 'শুশ্রুত সংহিতা' নামক পুস্তকে শুশ্রুত শল্যচিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান (Pharmacology), নিদানতত্ত্ব (Pathology) শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), জীবতত্ত্ব (Biology), চক্ষুরোগবিজ্ঞান (Ophthalmology) প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রাচীন ভারতীয়গণ বর্তমানকালের ন্যায় শবব্যবচ্ছেদে সুদক্ষ না হলেও তাঁদের ব্যবচ্ছেদপদ্ধতি ছিল অতি অভিনব। শরীরের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম শিরা ও ধমনীসমূহ দেখবার জন্য তাঁরা মৃতদেহ কুশাচ্ছাদিত করে নদীতীরে রেখে দিতেন। তিনদিন পরে শবে পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহের আচ্ছাদন উন্মোচিত করে শারীরস্থান পাঠ করতেন। শুশ্রুত স্বয়ং ছিলেন উক্ত পদ্ধতির উদ্ভাবক। শুশ্রুত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করেছিলেনঃ—১) ছেদন (Amputation), ২) ভেদন (Excision), ৩) লেখন (Scraping), ৪) এস্যন (Probing), ৫) আহরণ (Extraction), ৬) বিস্রবণ (Drainage) ও ৭) সীবন (Suturing)। ভেল নামক ভারতীয় চিকিৎসক বলতেন যে, মানুষের বুদ্ধি সঞ্চিত থাকে মস্তিষ্কে। শৌনকের মতে স্নায়ুগ্রন্থিসমূহ করোটীর অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। স্যার ভগবৎ সিংজী প্রাচীন ভারতের এক শল্যচিকিৎসক কর্তৃক ধর রাজ্যের রাজা ভোজের মস্তিষ্ক চিকিৎসার এক মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজা ভোজ শিরঃপীড়ায় বহুদিন কষ্ট পান। বহু প্রকার ভেষজাদির দ্বারা চিকিৎসা করা সত্বেও তাঁর বেদনার কোন প্রকার উপশম হয় না। সেই সময় দুইজন শল্যচিকিৎসক ভোজ রাজাকে পরীক্ষা করে সাব্যস্ত করেন যে, মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা ব্যতীত উক্ত রোগারোগ্যের অপর উপায় নেই। তারপর তাঁরা সম্মোহিনী নামক ভেষজ দ্বারা রাজাকে অজ্ঞান করে ফেলে এবং তাঁর করোটী ছিদ্র করে মস্তিষ্কের মধ্য থেকে রোগকেন্দ্র অপসারিত করায় পর রাজা রোগমুক্ত হন। রাজার জ্ঞান পুনরুদ্ধার করা হয় সঞ্জীবনী নামক অপর একটি ভেষজ দ্বারা। উক্ত ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকগণ মস্তিষ্ক-শল্যচিকিৎসারও অনুশীলন করতেন।

প্রাচীন ভারতের অপর বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম চরক। তিনি ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। চরক মনে করতেন যে, বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটি তথাকথিত মৌলিক উপাদান দ্বারা দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন যুনানীগণ ছিলেন উক্ত মতের অনুসরণে অনুরূপ বিশ্বাসী। চরক অরণ্যচারী মেষপালকগণের নিকট হতে বিভিন্ন ঔষধিগুণ-বিশিষ্ট লতাগুল্ম সংগ্রহ করে চিকিৎসায় প্রয়োগ করতেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে চরক বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন। ছাত্রকে হতে হবে ধীরচিত্ত। সুরা, নারী, পাশক্রীড়া, মৃগয়া, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে তার শিক্ষায় ব্যাঘাত হবে। 'চরক সংহিতা' বা 'শুশ্রুত সংহিতা'য় কোথাও হাসপাতাল জাতীয় আরোগ্যশালার উল্লেখ নেই। সর্বপ্রথম হাসপাতালের ন্যায় আরোগ্যশালা নির্মিত হয়েছিল সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৭৪ - ২৩৬ খৃঃ পূঃ)।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পূর্ণ অনুশীলন করলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। আর মনে হয় আমাদের লুপ্ত গৌরব কি আবার ফিরে আসবে?

ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা উৎকর্ষের পতন

সভ্যতাসমৃদ্ধ ভারতে বহু বিদেশী জ্ঞান আহরণের জন্য এসেছিলেন। বহু ঐশ্বর্যলোলুপ যাযাবর বারম্বার ভারত আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছেন। ক্রমে ক্রমে ইসলামধর্মী তুর্কী, পাঠান ও মুঘলগণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করেন। আক্রমণকারীদের সঙ্গে আসেন তাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ। মুঘল রাজত্বকালে হেকিম নামধেয় মুসলমান চিকিৎসকগণ ভারতে চিকিৎসা করতেন। মুসলমান মুঘল নৃপতিগণ ছিলেন হিন্দু আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা মুসলমান হেকিমগণের অধিক পৃষ্ঠপোষক। রাজ-অনুগ্রহে হেকিমীশাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অবনতি আরম্ভ হল। ১৪৯৮ খৃঃ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ভারত আগমনের জলপথ আবিষ্কার করলেন। পরবর্তীকালে ভারত লুণ্ঠনে এল ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার এবং সর্বশেষে ইংরাজ-বণিকগণ। তাঁদের সঙ্গে বহু য়ুরোপীয় চিকিৎসকও ভারতে আসেন। কালক্রমে য়ুরোপীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ভারতে প্রবর্তিত হল এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃতের' নিয়মিত পাঠক, বিশেষ করিয়া 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য খুবই আগ্রহশীল। এই বিভাগের জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এই বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্নও পাঠাইলাম।

প্রথম ঃ—রাষ্ট্রপুঞ্জে সমস্ত কিছু কাজকর্মে ইংরেজী বাধ্যতামূলক না অন্য কোন ভাষাও চলে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ইংরেজীতে ভাষণ দিতে হয়, না তাঁহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্র ভাষাতেও দেওয়া চলে।

দ্বিতীয় ঃ—এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে কি, বা রাষ্ট্রপুঞ্জে আছে কি, যাহার দ্বারা কোন দেশের প্রতিনিধি যদি তাঁহার রাষ্ট্রভাষাতে ভাষণ দেন তাহা হইলে সেই ভাষণ অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাঁহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্র-ভাষাতেও শুনিতে পাইবেন ?

শ্রীচণ্ডীচরণ মজুমদার,
৬।২৫ পোদ্দারনগর,
কলিকাতা-৩১।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা অমৃতের আমি একজন নিয়মিত ও আগ্রহশীল পাঠক। আপনার 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমার নিম্ন প্রশ্নটি ঐ বিভাগের জন্য পাঠাইলাম। যুক্তির অবতারণা করিয়া বুঝাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

বাংলাভাষায় আমরা সাধারণত অনেক শব্দের অর্থ না জানিয়া ব্যবহার করি। যদিও এ ধারণা আমার ব্যক্তিগত। সাধারণত আমরা যাহার 'মা' ও 'বাবা' জীবিত নাই তাহাকে বলি "মাতা-পিতা-হীন।" কিন্তু "পিতৃমাতৃহীন' এবং "মাতৃপিতৃহীন" ইহাদের অর্থ কি ? এবং কি রকমভাবে ইহাদের ব্যবহার হইবে।

নমস্কারান্তে

শ্রীরণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৬২।বি, বি, বি, সি, কলোনী,
পোঃ পাণ্ডু, জিলা কামরূপ,
আসাম।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্যে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাইলাম। যদি কোন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর জানেন তবে "জানাতে পারেন" বিভাগের মারফৎ জানাইলে বাধিত হইব।

(১) পলো খেলার আবিষ্কার হয় মণিপুরে না পারস্য দেশে ?

(২) টেবিল টেনিসের আবিষ্কর্তা কোন দেশ ?

(৩) বর্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায় এমন প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো প্রাণী কোনটি ?

(৪) ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর শহর কোনটি ?

ধীরাজচন্দ্র ভট্টাচার্য,
C/o দুর্গাপদ রায়চৌধুরী,
রিহাবাড়ী, গৌহাটি, আসাম।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২১শে সেপ্টেম্বর আপনারা নিম্নলিখিত প্রশ্নটি "জানাতে পারেন" বিভাগে ছাপেন এবং তার এক উত্তরও ছাপেন গত ১৬ই নভেম্বর।

প্রশ্ন—বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রংয়ের ব্যবহার হয় কেন ? বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি এর বিজ্ঞানসম্মত কিছু উত্তর দিচ্ছি।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় সূর্যকে লাল দেখায়। আপনারা জানেন—সূর্য সত্যি-সত্যিই সকাল ও সন্ধ্যায় লাল রং ধারণ করে না। সূর্যরশ্মি ঘন বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে যখন প্রতিফলিত হয় তখন তা সাধারণত, নানা বৈজ্ঞানিক কারণে লাল রং ধারণ করে এবং মানুষও তাকে লাল দেখে। সূর্যের তীব্র জ্যোতি সদা-সর্বদাই সাদা এবং সকল রংয়ের সমন্বয়। কাল রং সাধারণভাবে সকল রংয়ের অভাব। লাল, হলদে ও নীল রং সাধারণভাবে মৌলিক অর্থাৎ এই তিনটি রংয়ের (লাল, হলদে ও নীল) মিশ্রণে যে কোন রং তৈরী করা সম্ভব এবং তাই লাল, হলদে ও নীল রং ছাড়া সকল রংই যৌগিক। এই যৌগিক রংগুলি নানা পরিস্থিতি ও উত্তাপে ভিন্ন রং ধারণ করতে পারে এবং এই রংয়ের রশ্মি মানুষের চোখে নানারূপ যৌগিক এমন কি মৌলিক রংও ধারণ করতে সক্ষম অর্থাৎ চোখ নানা পরিস্থিতিতে যৌগিক রংকে ভিন্ন রং বলে গণ্য করতে পারে। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, ধোঁয়া, উজ্জ্বল আলো ইত্যাদি যে কোন রংয়ের যৌগিক ও মৌলিক আলোর রশ্মিকে রং পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং অস্পষ্টতর করে তোলে, তবে লাল রংয়ের উপর এগুলির ক্রিয়াশক্তি খুবই কম। হলদে রং এবং রশ্মি সাধারণত ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, ধোঁয়া, উজ্জ্বল আলো এবং দূরত্বের মাঝে নিজের সত্তা ও রং প্রায়ই হারিয়ে ফেলে এবং তাকে সাধারণত দেখায় হালকা থেকে গাঢ় কমলা রংয়ের। নীল রংও হলদের মত তার অস্তিত্ব হারায় এবং সাধারণত হালকা থেকে গাঢ় বেগুনী রং ধারণ করে। লাল রং উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তার সত্তা খুব কমই হারায় এবং সাধারণত অধিকতর লাল রং ধারণ করে এবং দূরত্বে নিজেকে হারায় না। এ ছাড়া মানুষ নানা কারণে প্রায় সকল রংই দেখতে ও বুঝতে ভুল করে এবং লাল রং দেখতে ও বুঝতে ভুল করার সম্ভাবনা সাধারণত কম। তাই লাল রংয়ের আলো রাত্রে বিপদের এবং অন্য কোন বিশেষ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের আলো হিসাবে ব্যবহার শুরু হয় এবং পরে লাল রং দিবাভাগেও বিপদজ্ঞাপক রং হিসাবে ব্যবহার চালু হয়। এই ব্যবহারের কোন আইনগত ভিত্তি নেই, প্রচলন প্রথার দ্বারাই আজ এর সর্বদেশে প্রতিষ্ঠা।

রেডক্রশে লাল রংয়ের ব্যবহার সম্পূর্ণ আকস্মিক। ১৮৬৪ সালে আগষ্ট মাসে জেনেভায় সুইজারল্যান্ড-বাসী শ্রীহেনরী ডানান্ট-এর পরামর্শ ও পরিকল্পনা মত ১৬টি রাজ্য এক সম্মেলনে মিলিত হয় একটি বিশ্বসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য। এবং বারটি রাজ্য কৃতজ্ঞতা হিসাবে যুবক ডানান্টের দেশীয় পতাকা এই সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করে। আপনারা নিশ্চয় জানেন সুইজারল্যান্ডের জাতীয় পতাকা হচ্ছে লাল জমির উপর সাদা ক্রশ। যাতে এই সেবা প্রতিষ্ঠানের পতাকার সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের রাজ্য পতাকার গণ্ডগোল না হয় তাই এই সেবা প্রতিষ্ঠানের পতাকা হল সাদা জমির উপর লাল ক্রশ।

হিন্দু রমণীরা চুলের মাঝে যে সিন্দুর এবং পায়ে আলতা ব্যবহার করে তার রং লাল হওয়ার পেছনে যে কারণ আছে তা বোধহয় এইরূপ। ভারতীয়দের গায়ের রং সাধারণত হালকা থেকে গাঢ় বাদামী ও গাঢ় কাল। লাল ছাড়া অন্য যে কোন রং গাঢ় কাল বা গাঢ় বাদামী রংয়ের মাঝে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

পশ্চিম দেশের মেয়েরা গালে ও ঠোঁটে লাল রং ব্যবহার করে কারণ তাদের দেশে সাধারণত গাল ও ঠোঁট হয় ফিকে লাল। কাজেই তাকে অধিকতর লাল করে সৌন্দর্য বাড়ানই উদ্দেশ্য।

ইতি—শ্রীমতী কমলাদেবী সান্যাল,
৪৬নং কসবা রোড,
কলিকাতা—৪২।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘরটা বেজায় বড়। চারিদিকে অগণিত কেতাবের সারি। শেলফ্ উপচে বই'য়ের পাহাড় জমে উঠেছে ঘরের কোণে কোণে এবং আলমারিগুলোর পায়ার কাছে মেঝের ওপর। বিছানাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। চারিদি'কে বালিশ সাজিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে বসেছিলেন বাড়ীর মালিক। এ রকম ধরণের অসাধারণ চেহারার লোক আমি কদাচিৎ দেখেছি। হাড়সর্বস্ব রোগা মুখ, টিয়া পাখীর মত বেঁকানো নাক। গুচ্ছ গুচ্ছ ঝোপের মত ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুরুর নীচে গভীর গহ্বরের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল একজোড়া কুচকুচে কালো চোখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিলেন প্রফেসর। ভদ্রলোকের চুল দাড়ি সবই ধবধবে সাদা। কিন্তু মুখের চারপাশের দাড়িতে হলদে রঙের ছোপ লেগেছিল অদ্ভুতভাবে। সাদা চুলের এই ঝোপের মধ্যে জ্বলছিল একটা সিগারেটের আগুন। বাসি তামাকের ধোঁয়ার দুর্গন্ধ ভাসছিল ঘরের বাতাসে। হোম্‌সের পানে ভদ্রলোককে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখলাম, নিকোটিনের হলদে রঙের ছোপ তাঁর হাতেও লেগেছে।

"ধূমপান করেন, মিঃ হোম্‌স্?" বাছাই করা ইংলিশ বলেন প্রফেসর, কিন্তু উচ্চারণটা অদ্ভুত; কেমন জার্মান কাটাকাটা; অর্ধেক প্রকাশ পায়, অর্ধেক পায় না। 'দয়া করে একটা সিগারেট নিন। আর, স্যার আপনি? এ সিগারেট সুপারিশ করছি এই কারণে যে আলেকজান্দ্রিয়ার আয়োনাইড্‌স্‌কে দিয়ে বিশেষভাবে এগুলো আমি তৈরী করাই। প্রতিবার এক হাজার সিগারেট আমাকে পাঠায় ও। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পনেরো দিন অন্তর তাজা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে। খারাপ স্যার, খুবই খারাপ। কিন্তু জানেন তো, বুড়ো মানুষের কয়েকটি মাত্র সখ, আনন্দ থাকে।

> শার্লক হোমসের পরবর্তী গল্প
>
> **খালি বাড়ি**
>
> প্রকাশিত হবে ৩৮ সংখ্যায়

তামাক আর আমার কাজ—এছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

হোম্‌স্ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মসৃণ দৃষ্টি-শর নিক্ষেপ করে চলেছিল ঘরের সব কিছুর ওপর।

"তামাক আর আমার কাজ, কিন্তু এখন শুধু তামাক", উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ।

পাহাড়ের, এ কি সাংঘাতিক বাধা! কে ভেবেছিল এরকম একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে আমায়? খাসা ছেলেটি! আরে মশায়, আর কয়েক মাস ট্রেনিং দিলেই চমৎকার এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারত সে। কেসটা সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়, মিঃ হোমস্?'

"এখনও মনস্থির করে উঠতে পারি নি।"

"আমরা তো প্রত্যেকেই এখনও অন্ধকারে রয়েছি। এ অন্ধকারের মধ্যে যদি কিছু আলো নিক্ষেপ করতে পারেন, তা হলে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। আমার মত নড়াচড়ায় অক্ষম হতভাগ্য গ্রন্থকীটের ওপর এ আঘাত পক্ষাঘাত এনে দেওয়ার সামিল। চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি কাজের মানুষ—ঘটনার স্রোতে ভেসে যাওয়ায় আপনি অভ্যস্ত। এ তো আপনার প্রতিদিনকার কর্মসূচী। সবরকমের জরুরী পরিস্থিতিতে আপনার সমতা আপনি রক্ষা করতে পারেন। আপনাকে আমাদের পাশে পেয়ে বাস্তবিকই আমরা সৌভাগ্যবান।"

বৃদ্ধ প্রফেসরের কথা শুনতে শুনতে ঘরের একদিকে ক্রমাগত পায়চারি করছিল হোমস্ এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। লক্ষ্য করলাম, অসাধারণ দ্রুতবেগে ধূমপান করে চলেছে ও। দেখেই বোঝা যায়, আলেকজান্দ্রিয়ান সিগারেটের প্রতি গৃহস্বামীর অনুরাগে ভাগ বসাচ্ছে হোমস্ নিজেও।

বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ স্যার, প্রচণ্ড এ আঘাত। দূরের ঐ সাইড টেবিলটায় যে কাগজের স্তূপটা দেখছেন—ঐ হল আমার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম। সিরিয়া আর ঈজিপ্টে, জ্যাকোবাইট সম্প্রদায়ভুক্ত দেশীয় খৃষ্টান কপ্ট্‌দের মঠে যে সব দলিলপত্র পাওয়া গেছে—তারই বিশ্লেষণ আপনি পাবেন ঐ কাগজগুলোয়। প্রকাশ পাওয়া ধর্মের মূলে বুনিয়াদ পর্যন্ত নাড়িয়ে দেবে আমার এই রচনা। এমনিতেই আমি রুগ্ন, স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল, তার ওপর আমার এ্যাসিস্ট্যান্টকেও সরিয়ে নেওয়া হল কাছ থেকে। কাজেই জানি না এ কাজ আমি সমাপ্ত করতে পারবো কিনা। আরে মিঃ হোমস্। আপনি তো দেখছি, আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি ধূমপান করেন।"

মৃদু হাসল হোমস্।

"এ বিষয়ে আমি বিজ্ঞ পরীক্ষক", বলতে বলতে সে আর একটি সিগারেট তুলে নিল বাক্স থেকে—এই তার চতুর্থ—তার সদ্য শেষ হওয়া সিগারেটের অংশ দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে বললে, 'সুদীর্ঘ সওয়াল-জবাবের ঝামেলায় ফেলে আপনাকে আর বিব্রত করব না, প্রফেসর কোরাম। কেননা আমি আগেই শুনেছি, খুনের সময়ে আপনি শয্যায় ছিলেন এবং এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। বেচারা ছেলেটি মরবার সময়ে বলে গেছিল, প্রফেসর—সেই মেয়েটা'—এসম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন কি?"

মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, "সুসান পল্লী-অঞ্চলের মেয়ে। এ শ্রেণীর মেয়েদের অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতার কথা তো আপনার অজানা নয়। আমার মনে হয়, অন্তিমসময়ে বেচারা স্মিথ প্রলাপের ঘোরে বিড়বিড় করে অবোধ্য অস্পষ্ট কিছু বলে গেছে—আর এই মেয়েটা তাকেই গাজিয়ে-গুছিয়ে একটা অর্থহীন খবর তৈরী করে নিয়েছে।"

"বটে। ট্র্যাজেডীটা সম্বন্ধে আপনার নিজের কোন ব্যাখ্যা নেই?"

"খুব সম্ভব দুর্ঘটনা। সম্ভবতঃ—শুধু নিজেদের মধ্যেই বলতে সাহস পাচ্ছি—আত্মহত্যা। অনেকরকম লুকোনো কষ্ট থাকে তো তরুণদের মনে। হৃদয়-সম্পর্কিত অনেক ব্যাপার, কোনদিনই সে-সব আমরা জানতে পারিনি। খুনের চাইতে বরং এ ধারণাটার খানিকটা মানে আছে।"

"কিন্তু প্যাংসনে চশমাটা?"

"আ! নেহাৎই ছাত্র আমি—শুধু স্বপ্নই দেখি। বাস্তব জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা করার মত যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তবুও, মাই ফ্রেন্ড, আমরা জানি, ভালবাসার পরিণতি মাঝে মাঝে বড় বিচিত্র আকার ধারণ করে। সে যাই হোক, আর একটা সিগারেট নিন। এ জিনিস এ রকম সমাদর পাচ্ছে দেখলেও আনন্দ। হাতপাখা, দস্তানা, চশমা—জীবন-দীপ নিভিয়ে দেওয়ার সময়ে প্রতীক হিসেবে বা সম্পদ হিসেবে কে যে কোন জিনিসটা নিয়ে যাবে, তা কি কেউ বলতে পারে? এই ভদ্রলোক ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের কথা বলছিলেন। কিন্তু যাই বলুন, ও বিষয়ে ভুল হওয়াটাই খুব সহজ। আর ছুরিটা? পড়ে যাওয়ার সময়ে অনায়াসেই তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে হতভাগ্য স্মিথ। খুব সম্ভব, ছেলেমানুষের মত কথা বলছি আমি। কিন্তু আমার মতে নিজের হাতেই নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছে উইলোবি স্মিথ।"

থিওরীটা হোমসের মনে ধরেছে মনে হ'ল। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চিন্তামগ্ন মুখে তন্ময় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল ও।

তারপর বললে, "প্রফেসর কোরাম, বিউরো'র মধ্যে কাবোর্ডে কি ছিল বলুন তো?"

"চোরের উপকারে আসার মত কিছু ছিল না। পারিবারিক কাগজপত্র, স্ত্রীর চিঠি, ইউনিভার্সিটির দেওয়া সম্মানপত্র, ডিপ্লোমার গাদা—এই সব। এই নিন চাবি। নিজেই দেখে আসুন।"

চাবিটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে একবার দেখে নিলে হোমস্। তারপরেই ফেরৎ দিয়ে দিলে প্রফেসরের হাতে।

"না। বিউরো ঘেঁটে কিছু কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। আমি বরং বাগানে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে ভেবে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা। আপনার ঐ আত্মহত্যা-থিওরী নিয়ে কিছু বলা দরকার। অনেক উৎপাত করে গেলাম, ক্ষমা করবেন, প্রফেসর কোরাম। লাঞ্চের আগে আর বিরক্ত করব না আপনাকে। ঠিক দুটোর সময়ে আবার আসব আমি। ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটে তো তার রিপোর্ট দিয়ে যাব।"

আশ্চর্যরকম অন্যমনস্ক দেখলাম হোমস্‌কে। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা পায়চারি করতে লাগলাম বাগানের পথের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত।

অবশেষে আমি শুধোই—"সূত্র পেয়েছ নাকি?"

"তা নির্ভর করছে আমি যে সিগারেটগুলো খেয়ে এলাম তার ওপর। এমনও হ'তে পারে যে আগাগোড়াই ভুল করছি আমি। ঐ সিগারেটগুলোই আমায় তা দেখিয়ে দেবে।'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি, "মাই ডিয়ার হোমস্, তুমি জানছ কি করে যে—"

"বেশ, বেশ, নিজের চোখেই দেখবে সব। না হ'লে, কোন ক্ষতি নেই চোখের ডাক্তারের ক্লুতো হাতেই রয়েছে, ফিরে এসে তাই নিয়ে কাজ চালানো যাবেখন।

কিন্তু সোজা পথ যখন দেখতে পেয়েছি, তখন তার সুযোগ আমি নেবই। এই যে, মিসেস মার্কার! চল হে, মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা বলে খবর-টবর কিছু জানা যাক ওর কাছ থেকে।"

এর আগে আমি হয়ত বলে থাকতে পারি যে, ইচ্ছে করলে, আশ্চর্য উপায়ে মেয়েদের চিত্ত জয় করতে পারত হোম্‌স্‌ এবং অনায়াসে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠত সে। এ ক্ষেত্রেও, পাঁচ মিনিট বললেও দেখলাম তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই মিসেস মার্কারের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে ও এবং এমনভাবে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে যেন কত বছর ধরেই তার সংগে পরিচয় হোম্‌সের।

'হ্যাঁ, মিঃ হোম্‌স্‌, আপনি যা বললেন, তা সত্যি। দারুণ সিগারেট খান উনি। সারাদিন তো বটেই। এমনকি কখন কখন রাত্রেও। একদিন সকালে ওঁর ঘরটা আমি দেখেছিলাম, স্যার। কি বলব, দেখলে পরে আপনার মনে হত যেন লন্ডনের কুয়াশা দেখছেন। বেচারী মিঃ স্মিথও সিগারেট খেতেন। তবে প্রফেসরের মত এতটা খারাপ স্মোকার ছিলেন না উনি। ওঁর স্বাস্থ্য—এত সিগারেট খেয়ে জানি না ওঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে।"

"আ!" বলে হোম্‌স্‌। "কিন্তু এতে ক্ষিদে নষ্ট হয়ে যায় যে।"

"তা হবে, আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, স্যার।"

"আমার তো মনে হয়, খাওয়ার সময়ে নামমাত্র খান প্রফেসর, তাই নয় কি?"

"ঠিক নেই, কখনও বেশী, কখনও কম। ওঁর হয়েই বলছি আমি।"

"আমি বাজী ফেলে বলতে পারি, আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাননি উনি! তাছাড়া, যে পরিমাণে সিগারেট খেতে দেখলাম, ওর পরে লাঞ্চও ছোঁবেন না।"

"উঁহু, সবই ভুল বললেন স্যার। আজ সকালেই তো আশ্চর্য রকমের বেশী ব্রেক-ফাস্ট খেয়েছেন উনি। এরকম খাওয়া খেতে এর আগে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লাঞ্চের জন্যে একটা পুরো ডিস ভর্তি কাটলেটের অর্ডারও দিয়েছেন উনি। আমি তো নিজেই অবাক হয়ে গেছি ওঁর খাওয়া দেখে। গতকাল এ ঘরে এসে মেঝের ওপর মিঃ স্মিথের দেহ দেখার পর থেকে খাবারের দিকে তাকাতেও পারছি না আমি। যাকগে, সব রকম মিশিয়েই তো এই সংসার। তাই বুঝি এত কাণ্ডের পরেও ক্ষিদে মরতে দেননি প্রফেসর।"

সারা সকালটা বাগানে হাওয়া খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। স্ট্যানলী হপকিন্‌স্‌ গ্রামে গেছিল। আগের দিন সকালে চ্যাথাম রোডে একজন অজ্ঞাত স্ত্রীলোককে কয়েকজন ছেলেমেয়ে দেখেছিল—এমনি একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় খোঁজ করতে গেছিল ও। আর, আমার বন্ধুটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার প্রকৃতিগত সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাই এক ফুৎকারে মিলিয়েছে শূন্যে। এ রকম ভাবে মনমরা হয়ে কোন কেস নাড়াচাড়া করতে ওকে আমি দেখিনি। এমনকি হপকিন্‌স্‌ এসে যখন খবর দিলে যে, হোম্‌সের বর্ণনার সংগে হুবহু মিলে যায় এমনি একজন চশমাপরা বা প্যাংসনে চোখে স্ত্রীলোককে আগের দিন সকালে বাচ্চারা সত্যি-সত্যিই দেখেছে চ্যাথাম রোডে—তখনও তার মনে কোনরকম নিবিড় আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তার অধিকতর মনোযোগ দেখা গেল সুসানের আনা খবরে। লাঞ্চের সময়ে সুসানই পরি-বেশন করছিল আমাদের। নিজে থেকেই খবরটা দিল সে। গতকাল মিঃ স্মিথ বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। খুন হওয়ার আধ ঘন্টাটাক আগে ফিরে আসে সে। এ খবরের সংগে আসল ঘটনার কি সম্পর্ক, আমি তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বেশ বুঝলুম, আগে থেকেই মস্তিষ্কের মধ্যে গড়ে নেওয়া সাধারণ ছকের মধ্যে এ খবরটাকেও বেমালুম জোড়া লাগিয়ে দিলে হোম্‌স্‌। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে তাকালে ও—"জেন্টেলমেন, দুটো বাজে। এবার ওপরে গিয়ে আমাদের প্রফেসর বন্ধুর সংগে বসে এ ব্যাপারটার ফয়শালা করে ফেলা যাক।"

সবে লাঞ্চ শেষ করেছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। খালি ডিসগুলো দেখেই বুঝলাম, মিসেস মার্কার তাঁর চমৎকার ক্ষুধা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সত্য। ধবধবে সাদা কেশর দুলিয়ে ঝকঝকে চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমাদের ওপর রাখতেই তাঁকে দেখে মনে হল যেন বাস্তবিকই কোন ঐন্দ্রজালিকের মূর্তি দেখছি। চিরন্তন সিগারেটটা তখনও ধূমোদ্গীরণ করছিল তাঁর মুখে। পোষাক পরিবর্তন করে আগুনের পাশে হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসেছিলেন উনি।

"তারপর, মিঃ হোম্‌স্‌, রহস্যের সমাধান করতে পারলেন?" বলে, পাশের টেবিলে রাখা সিগারেটের মস্তবড় টিনটা এগিয়ে দিলেন হোম্‌সের পানে। সংগে সংগে হাত বাড়িয়ে দিলে হোম্‌স্‌ এবং হাতে হাতে ঠোকাঠুকি লেগে টেবিলের কিনারায় উল্টে গেল বাক্সটা। মিনিটখানেক কি দুয়েকের জন্যে প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিতে লাগলাম কার্পেটের ওপর এবং ছড়ানো সিগারেট-গুলো উদ্ধার করে আনতে লাগলাম অসম্ভব সব কোণ থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম চকচক করছে হোম্‌সের দুই চোখ এবং রঙের ছোঁয়া লেগেছে গালে। একমাত্র সংকটকালেই উড়তে দেখেছি লড়াইয়ের এসব নিশানদিহি।

"হ্যাঁ," বললে হোম্‌স্‌। "এ রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করেছি আমি।"

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমি আর ষ্ট্যানলী হপকিন্স। জিঘাংসা-নিষ্ঠুর দাঁতখিঁচুনির মতই একটা ছায়া দুলে উঠল বৃদ্ধ প্রফেসরের রুগ্ন মুখের রেখায় রেখায়।

"সত্যি। বাগানের মধ্যে নাকি?"

"না, এখানে।"

"এখানে! কখন?"

"এই মুহূর্তে।"

"নিশ্চয় তামাসা করছেন, মিঃ শার্লক হোম্স্। বলতে বাধ্য করলেন আমায়—

......উঁহু সবই ভুল বললেন স্যার......

এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এভাবে কথা বলা শোভা পায় না।"

"আমার যুক্তি-শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশ আমি নিজে জোড়া লাগিয়েছি এবং প্রতিটি জোড় আমি পরখ করে দেখেছি। প্রফেসর কোরাম, আমার হিসেব নির্ভুল। আপনার মোটিভ কি, অথবা এই অদ্ভুত ব্যাপারে কি চরিত্র আপনি অভিনয় করছেন, তা এখনও বলতে পারছি না আমি। খুব সম্ভব মিনিট কয়েকের মধ্যে আপনার মুখেই তা শুনতে পাব। ইতিমধ্যে অতীতের ঘটনাগুলোই জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করছি আপনার সামনে এবং করছি আপনারই ভালর জন্যে। সব শোনার পর ধরতে পারবেন কোন্ কোন্ তথ্য-গুলো এখনও আমার দরকার।

"গতকাল আপনার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এক ভদ্রমহিলা। আপনার বিউরোতে রাখা বিশেষ কতকগুলো দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করার অভি-প্রায় নিয়েই এসেছিলেন তিনি। সংগে এনেছিলেন তাঁর নিজের চাবি। আপনার চাবি পরীক্ষা করে দেখলাম পালিশের ওপর আঁচড় কাটায় যে সামান্য বিবর্ণতা ফুটে ওঠা উচিত, আপনার চাবিতে তা নেই। কাজেই, একাজে আপনি কোন সাহায্য করেননি। প্রমাণ যা পাচ্ছি, তা দেখে বুঝছি, উনি এসে-ছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার কোন জিনিস সরিয়ে নিয়ে যেতে।"

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, "ভারী ইণ্টারেষ্টিং আর শিক্ষামূলক তো। আর কিছু বলার নেই আপনার? ভদ্রমহিলার অস্তিত্ব যখন আবিষ্কার করেছেন, তখন তিনি গেলেন কোথায়, তাও নিশ্চয় বলতে পারবেন?"

"চেষ্টা করব। প্রথমেই বলি, আপনার সেক্রেটারী তাঁকে পাকড়াও করে। করতেই উনি তার কবলমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছুরি মারেন তাকে। এ বিপর্যয়কে একটা দুঃখময় দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নই আমি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ রকম মারাত্মক চোট দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে ছুরি চালাননি ভদ্রমহিলা। গুপ্তহত্যা যে করতে আসে, সে কখনও নিরস্ত্র হয়ে আসে না। খুনখারাপী দেখেই দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন উনি। ক্ষিপ্তের মত এই শোচনীয় দৃশ্যস্থল ছেড়ে তীরবেগে বেরিয়ে যান বাইরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঝটাপটি করার সময়ে ও'র প্যাংসনেটা খোয়া যায়। দৃষ্টিশক্তি তাঁর অতি ক্ষীণ এবং দূরের জিনিস একেবারেই দেখতে পান না বললেই চলে। কাজেই চশমা হারিয়ে সত্যি সত্যিই অসহায় হয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা। করিডর দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন উনি। ভেবেছিলেন, এই পথ দিয়েই ঘরে ঢুকে-ছিলেন আসবার সময়ে। একই রকমের দেখতে নারকেলদড়ির মাদুর বিছানো ছিল দুটো করিডরেই। যখন বুঝলেন যে ভুলপথে এসেছেন, তখনই খুবই দেরী হয়ে গেছে এবং পিছিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ। এ রকম পরিস্থিতিতে কি করা উচিত তাঁর? যে পথে এসেছিলেন, সে পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। এগিয়ে যেতে হবে—যাই থাকুক সামনে। এগিয়েই গেলেন উনি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে একটা দরজা ঠেলে খুলে-ফেলতেই এসে পড়লেন আপনার ঘরে।"

হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল-ভাবে হোম্সের পানে তাকিয়েছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। বিস্ময় আর ভয় যেন পাশাপাশি কেটে বসে গেছিল তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের রেখায় রেখায়। হোম্সের কথা ফুরোতেই জোর করে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে কপট হাসিতে ভেঙে পড়লেন উনি।

"চমৎকার, মিঃ হোম্স্, আগাগোড়া সুন্দর বলে গেলেন। কিন্তু আপনার এই অতি আশ্চর্য থিওরীতে ছোট্ট একটা কাঁটা থেকে গেছে। আমি নিজে

হাজির ছিলাম এ ঘরে এবং সারাদিনের মধ্যে একবারও বাইরে যাইনি।"

"আমার তা অজানা নয়, প্রফেসর কোরাম।"

"তাই বুঝি আপনি বলতে চান যে বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘরে একটা স্ত্রীলোক ঢুকেছিল কিনা, তা আমি জানতে পারি নি?"

"আমি কখনও তা বলিনি। আপনি জানতেন, তিনি ঢুকেছেন ঘরে। তাঁর সংগে কথা বলেছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁকে গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিলেন।"

আবার উচ্চ-গ্রামে অট্টহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর। শয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন উনি। অংগারের মত জ্বলছিল তাঁর দুই চোখ।

"আপনি উন্মাদ।" চীৎকার করে উঠেন তিনি "বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মতো কথা বলছেন আপনি। আমি তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছি? কোথায় তিনি?"

"ঐখানে," বলে ঘরের কোণে একটা উঁচু বুককেসের দিকে আঙুল তুলে দেখালে হোম্‌স্।

ভয়াবহ একটা আকুঞ্চন ভেসে গেল প্রফেসরের ভয়ংকর মুখের ওপর দিয়ে। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে ধপ করে উনি বসে পড়লেন চেয়ারে। ঠিক সেই মুহূর্তে, বোঁ করে একটা কব্জার ওপর ঘুরে গেল বুককেসটা এবং তীব্রবেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন একজন স্ত্রীলোক।

"আপনি ঠিক বলেছেন!" অদ্ভুত বিদেশী গলায় চীৎকার করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। "আপনি ঠিক বলেছেন! এই যে আমি।"

ধুলোয় বাদামী হয়ে উঠেছিলেন উনি। গোপনস্থানের দেওয়ালের মাকড়শার জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলেন আপাদমস্তক। কালিঝুলির ছাপ তাঁর মুখেও লেগেছিল। কোনমতেই সুশ্রী বলা চলে না তাঁকে। হোম্‌স্ যে রকমটি বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর চেহারার, হুবহু সেইসব বৈশিষ্ট্য দেখলাম তাঁর দেহে-চোখে-মুখে। বাড়তির মধ্যে ছিল আরও একটি বৈশিষ্ট্য—দীর্ঘ আর জেদী থুৎনি। খানিকটা স্বাভাবিক প্রায়-অন্ধতার জন্যে, আর খানিকটা অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় বেরিয়ে আসার জন্যে, চোখ মিটমিট করে আশপাশে তাকাচ্ছিলেন উনি। দেখতে চেষ্টা করছিলেন, আমরা কে এবং কোথায় রয়েছি। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু একটা বনেদীয়ানার ছাপ ফুটে উঠেছিল ভদ্রমহিলার চেহারায়, উদ্ধত চিবুকের সাহসিকতায় আর উন্নত শিরে। দেখলেই সম্ভ্রমবোধ জাগে। যেন বাধ্য করে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে। স্ট্যানলী হপকিন্‌স্ তাঁর বাহুর ওপর হাত রেখে বন্দী হিসেবে দাবী করল তাঁকে। কিন্তু আলতোভাবে ওকে সরিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক মর্যাদার সংগে সরিয়ে দিলেন যে অবাধ্য হতে সাহস করল না হপকিন্‌স্। চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। দারুণ আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল, আকুঞ্চিত হয়ে উঠছিল তাঁর মুখের প্রতিটি মাংসপেশী। উদ্বিগ্ন চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন উনি ভদ্রমহিলার পানে।

"হ্যাঁ, স্যার, আমি আপনার বন্দী," বললেন ভদ্রমহিলা। "ঘুপসির মধ্যে থেকে সব শুনেছি। আপনারা যা জেনেছেন, তা সত্য। সব স্বীকার করছি আমি। আমিই মেরে ফেলেছি যুবকটিকে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি বললেন, এ হত্যা নিছক দুর্ঘটনা, তাঁর ভুল হয়নি। আমি জানতামও না, যে জিনিসটা বাগিয়ে ধরেছিলাম আমি, তা একটা ছুরি
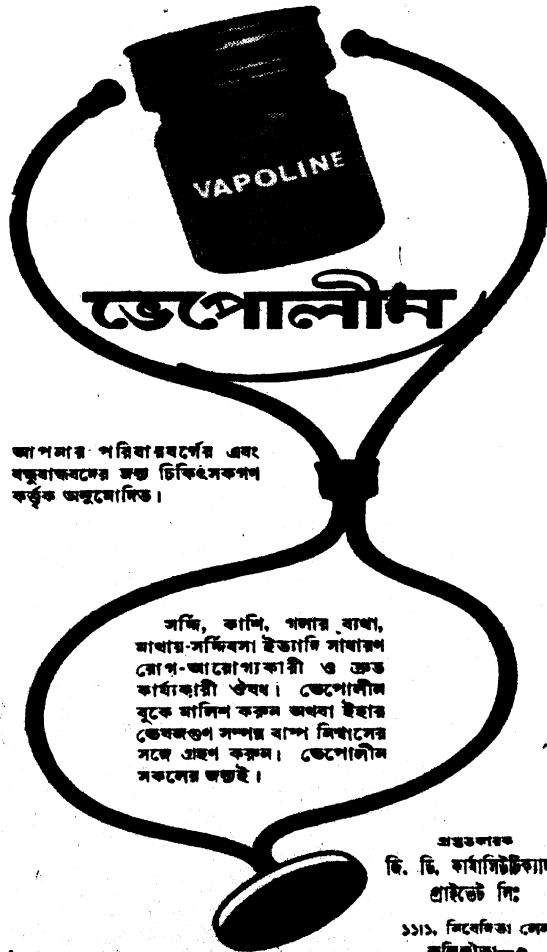
মরিয়া হয়ে টেবিলের ওপর থেকে যা হয় একটা কিছু তুলে নিয়ে ছেলেটিকে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি। যা বললাম, তা সত্যি।"

হোমস বললে, "ম্যাডাম, আমি জানি আপনি সত্যি কথাই বলছেন। আপনাকে কিন্তু মোটেই সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

বীভৎস হয়ে উঠেছিল ভদ্রমহিলার মুখের রঙ। মুখের কালো ধুলোর স্তরের চেয়েও ভয়াবহ সে বর্ণ। শয্যার একপাশে বসে পড়ে বলে চললেন উনি।

"বেশীক্ষণ এখানে আমি থাকছি না। কিন্তু পুরো সত্যটা আপনাদের জানাতে চাই আমি। আমি এই লোকটার স্ত্রী। এ কিন্তু ইংরেজ নয়। রাশিয়ান। ওর নাম আমি বলব না।"

এই প্রথম নড়ে উঠলেন বৃদ্ধ। "ভগবান তোমার ভাল করবেন, অ্যানা! ভগবান তোমার ভাল করবেন!"

দুই চোখে সুগভীর অবজ্ঞা নিয়ে প্রফেসরের পানে তাকালেন ভদ্রমহিলা। "সারজিয়াস, তোমার এই জঘন্য ঘৃণিত জীবনটাকে কেন এমনভাবে আঁকড়ে ধরতে চাও। বল তো [illegible] জীবন ক্ষতি করেছে অনেকের, কিন্তু ভাল করেনি কারোরই—এমন কি তোমার নিজেরও নয়। যাই হোক, বিধাতার নির্ধারিত সময়ের আগে তোমার ঐ অপলকা জীবন-সূত্র ছিঁড়ে দেওয়ার কারণ হতে চাই না আমি। অভিশপ্ত এই বাড়ীর চৌকাঠ পেরোনোর পর থেকে যথেষ্ট নির্যাতন গেছে আমার আত্মার ওপর। কিন্তু তবুও আমায় সব বলতে হবে, তা না হলে দেরী হয়ে যাবে খুবই।

"জেন্টেলমেন, আমি তো বললামই, এ লোকটার স্ত্রী আমি। ওর বয়স তখন পঞ্চাশ। আর আমি ছিলাম কুড়ি বছরের একটা মূর্খ মেয়ে। তখনই বিয়ে হয় আমাদের। রাশিয়ার একটা শহরে, একটা ইউনিভার্সিটিতে—জায়গাটার নাম আমি বলব না।"

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, অ্যানা!" আবার বিড় বিড় করে ওঠেন বৃদ্ধ।

"আমরা ছিলাম সংস্কারক—বিপ্লবী—নিহিলিস্ট। ও ছিল, আমি ছিলাম, আরও অনেকে ছিল। তারপর একটা সময় এল যখন আমরা প্রত্যেকেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। একজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছিল। গ্রেপ্তার হ'ল অনেকে। সাক্ষীসাবুদের দরকার হয়ে পড়ল। তখনই নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে এবং বিস্তর পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী তার নিজের স্ত্রী এবং সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। হ্যাঁ, ওরই স্বীকারোক্তির পর আমরা সবাই গ্রেপ্তার হলাম। কয়েকজন উঠল ফাঁসিকাঠের মঞ্চে, আর কয়েকজন গেল সাইবেরিয়ায়। শেষের দলে আমি ছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবনের মেয়াদ ছিল না আমার। নোংরা পথে পাওয়া সমস্ত অর্থ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে এল আমার স্বামী। সেই থেকেই পরম শান্তিতে এখানে আছে সে। ও অবশ্য ভাল করেই জানে, যেদিন ব্রাদারহুড জানতে পারবে তার ঠিকানা, সেদিন থেকে সাতটা দিনও যাবে না ন্যায়-বিচারের দণ্ড ওর শিরে নেমে আসতে।"

কাঁপা হাত বাড়িয়ে কোনমতে একটা সিগারেট তুলে নিলেন বৃদ্ধ। বললেন, "আমি তোমার হাতের মুঠোয় অ্যানা। আর, চিরকালই আমার ভাল বই খারাপ করোনি তুমি।"

"এখনও কিন্তু ওর শয়তানির চূড়ান্ত দিকটা আপনাদের আমি বলিনি! 'অর্ডারে'র কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। মহান, নিঃস্বার্থ আর প্রেমময় তার চরিত্র—এর কোনটিই কিন্তু আমার স্বামীর নেই। জোর জবর-দস্তি জুলুমবাজিকে ঘৃণা করত সে, ভালবাসত অহিংসাকে। অপরাধী ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই—অবশ্য যদি একে অপরাধ বলা যায়—কিন্তু সে নয়। এপথ থেকে আমাকে ফেরানোর জন্যে চিঠি লিখত সে আমায়। এই চিঠিগুলোই বাঁচাতে পারত ওকে। আর পারত আমার ডায়রীটা। তার প্রতি আমার মনোভাব, আমার আবেগ অনুভূতি প্রতিদিন লিখে রাখতাম এই ডায়রীতে। আর লিখতাম আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত। ডায়রী আর চিঠির তাড়া—দুটোই খুঁজে বার করে নিজের কাছে রেখে দেয় আমার পতিদেবতা। শুধু রেখে দেওয়া নয়, এক-দম লুকিয়ে ফেলে এই দুটি জিনিস এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে ঐ যুবাপুরুষটির জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে। প্রাণে বেঁচে গেলেও মুক্তি পেল না, য়্যালেক্সিস। তাকে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায়। সেইখানেই এখনও, এই মুহূর্তে, সে কাজ করে চলেছে একটা নুনের খনিতে। ভাবো দিকি তার অবস্থাটা, শয়তান কোথাকার, শয়তান কোথাকার! এখন, এই মুহূর্তে—যার নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতাও তোমার নেই, সেই য়্যালেক্সিস ক্রীতদাসের মত গতর খাটিয়ে কোনরকমে রয়েছে বেঁচে। আর তবুও কিনা তোমার জীবন আমার হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তোমায় রেহাই দিচ্ছি আমি!"

সিগারেটে টান মেরে বললেন বৃদ্ধ : "তুমি তো চিরকালই এমনি মহীয়সী, অ্যানা।"

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু পরক্ষণেই যাতনা-করুণ ছোট্ট চীৎকার জেগে ওঠে ওঁর কণ্ঠে—ধপ করে আবার বসে পড়েন শয্যায়।

বলেন, "শেষ আমায় করতেই হবে। আমার মেয়াদ ফুরোলে উঠে পড়ে লাগলাম ডায়রী আর চিঠিগুলো উদ্ধারের কাজে। রাশিয়ান গভর্ণমেন্টের কাছে এদুটি জিনিস পাঠালেই হল, তাহলেই খালাস পাবে আমার বন্ধুটি। আমার স্বামী যে ইংল্যাণ্ডে এসেছে, তা জানতাম। মাসের পর মাস তল্লাসি চালালাম—শেষকালে আবিষ্কার করলাম তার ঠিকানা। ডাইরীটা যে এখনও তার কাছেই আছে, তা জেনেছিলাম সাই-বিরিয়াতে থাকার সময়ে ওর একটা চিঠি পেয়ে। ডায়রীর পাতা থেকে কয়েকটা অংশ তুলে তিরস্কার করে চিঠিটা লিখেছিল আমায়। কিন্তু প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রবৃত্তি যার এতখানি, সে যে নিজে থেকেই সুড়সুড় করে কোনদিনই ডায়রীটা আমার হাতে তুলে দেবে না, তা আমি জানতাম। নিজেকেই তৎপর হয়ে সংগ্রহ করতে হবে তা। এই উদ্দেশ্যেই একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান থেকে একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করলাম এ কাজের জন্যে। সেক্রেটারী হয়ে সে এল আমার স্বামীর বাড়ীতে। সার-জিয়াস, সে হল তোমার দ্বিতীয় সেক্রেটারী। খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিয়েছিল সে। কাগজপত্র যে কাবোর্ডে থাকে এ খবর সে সংগ্রহ করলে এবং চাবিটারও একটা ছাপ এনে দিলে আমায়। এর বেশী এক পা-ও যেতে রাজী হল না সে। বাড়ীর একটা নক্সাও আমায় দিয়েছিল সে। আর বলেছিল, দুপুরের আগে সবসময়ে ফাঁকা থাকে পড়ার ঘরটা। সে সময়ে সেক্রেটারী ব্যস্ত থাকে ওপরে। তাই, শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে নিজেই এসেছিলাম কাগজগুলো উদ্ধার করতে। সফলও হয়েছি, কিন্তু হায়রে, কি চরম মূল্যই দিতে হ'ল তার প্রতিদানে!

"কাগজগুলো সবে নিয়েছি। চাবী ঘুরিয়ে কাবোর্ডটা বন্ধ করছি, এমন

সময়ে ছেলেটি এসে চেপে ধরলে আমায়। সেদিন সকালেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রফেসর কোরাম থাকেন কোথায়। তখন জানতাম না যে এ বাড়ীরই কর্মচারী সে।"

"এগজ্যাক্টলি! এগজ্যাক্টলি!" বলে ওঠে হোমস্। "বাড়ী ফিরে এসে সেক্রেটারী প্রফেসর কোরামকে জানালে রাস্তায় দেখা স্ত্রীলোকটার কথা। তারপর. শেষনিঃশ্বাস ফেলার সময়ে এই খবরটি পাঠাতে চেয়েছিল তাঁকে যে এই সেই মেয়েটি—যে মেয়েটির কথা এইমাত্র সে আলোচনা করে এসেছে তাঁর সঙ্গে।"

"আমাকে কথা বলতে দিন," আদেশের সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ভদ্রমহিলার কণ্ঠে। যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে তাঁর মুখ। "ও পড়ে যেতেই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ভুল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীর ঘরে। ও চেয়েছিল আমাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ও কাজটি করতে যাওয়ার আগে তার মনে রাখা উচিত যে তারও জীবন আমার হাতে। আমাকে আইনের খপ্পরে দিলে, আমিও তাকে সঁপে দেব ব্রাদারহুডের কবলে। আমি যে শুধু আমার জীবনের জন্যেই বাঁচতে চেয়েছিলাম, তা নয়। আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। ও বুঝল, আমার যে কথা, সেই কাজ—বুঝল যে, ওর অদৃষ্টও নির্ভর করছে আমার অদৃষ্টের ওপর। শুধু এই কারণেই আমাকে আড়াল করতে চেয়েছিল ও—আর কোন কারণের জন্যে নয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা লুকানোর জায়গায় আমাকে ও ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। পুরোনো যুগের চিহ্ন এই ঘুপসি জায়গাটার হদিশ জানত শুধু সে নিজে। নিজের ঘরে খাবার আনিয়ে খেত ও। তাই, ওর খাবারের অংশ আমাকেও দিতে পেরেছিল ও। ঠিক ছিল যে পুলিশ বাড়ী ছেড়ে বিদেয় হলে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেব আমি এবং আর কোনোদিন ফিরে আসব না এ অঞ্চলে। কিন্তু কি করে জানি না আমাদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেল আপনার কাছে।" পোষাকের ভেতর থেকে বুকের কাছে লুকোনো ছোট্ট একটা প্যাকেট টেনে বার করলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, "এই আমার শেষ কথা। এই প্যাকেটের বিনিময়ে মুক্তি পাবে অ্যালেক্সিস। ন্যায়বিচারের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আর অনুরাগের বিশ্বাসেই এ জিনিস গচ্ছিত রাখলাম আপনার হাতে। নিন! রাশিয়ান এমব্যাসিতে আপনি পৌঁছে দেবেন এই প্যাকেট। আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। আর—"

"থামাও ওঁকে!" চেঁচিয়ে উঠল হোমস্। ঝড়ের মত ঘরের মাঝ দিয়ে ছুটে গিয়ে ভদ্রমহিলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে ছোট্ট একটা শিশি।

"বড্ড দেরী হয়ে গেছে!" শয্যার ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললেন উনি। "বড় দেরী হয়ে গেছে। গোপন-স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই বিষ খেয়েছি আমি। আমার মাথা ঘুরছে! চললাম! প্যাকেটটার কথা স্মরণ রাখবেন স্যার—এ দায়িত্ব আপনার।"

শহরে ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে বলল হোমস্, "খুবই সোজা কেসটা। কিন্তু কয়েকদিক দিয়ে বেশ শিক্ষামূলক। প্রথম থেকেই পুরোপুরিভাবে কেসটা নির্ভর করছিল ঐ প্যাসনেটার ওপর। কপাল ভাল তাই মরবার আগে চশমাটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল স্মিথ। তা না হলে এ রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন কোনদিন সম্ভব হত বলে মনে হয় না আমার। কাঁচদুটোর শক্তি লক্ষ্য করেই বুঝেছিলাম, এ চশমা যিনি ব্যবহার করেন, তাঁকে প্রায় অন্ধ বললেই চলে এবং চশমা-বিনা তিনি নিতান্তই অসহায়। তাই তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করতে বললে যে আততায়ী সরু একফালি ঘাসের ওপর দিয়ে গেছে, অথচ একবারও ভুল পা ফেলেনি, তোমার মনে থাকতে পারে, তখন আমি বলেছিলাম কাজটা বাস্তবিকই বড় অসাধারণ। মনে মনে আমি কিন্তু নিশ্চিত জানতাম, এ কাজ একেবারেই অসম্ভব। তার আর একটা চশমা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কাজেই, ভদ্রমহিলা যে বাড়ীর মধ্যেই আছেন, এমন একটা প্রকল্প বা hypothesis বেশ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বাধ্য হলাম আমি। দুটো করিডরে একই রকমের দেখতে নারকেলদড়ির মাদুর পাতা দেখে বুঝলাম, পথ ভুল করা খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। সেক্ষেত্রে তিনি যে প্রফেসরের ঘরে ঢুকেছেন, তা আর না বললেও চলে। তাই প্রথম থেকেই রীতিমত সজাগ হয়ে রইলাম। আমার ধারণা যাতে সত্য প্রমাণিত হয়, এমনি কোন কিছু যাতে চোখ না এড়োয়, তাই সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলাম সবকিছু। তন্ন তন্ন করে ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম লুকোবার মত কোন জায়গা দেখার আশায়। কার্পেটটা একটানা পাতা এবং মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটা। তাই, মেঝের ওপর চোরা-দরজার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। বইগুলোর পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থাকতে পারে। জানেই তো, সেকেলে লাইব্রেরীতে এ ধরণের কায়দা হামেশাই দেখা যায়। লক্ষ্য করলাম, মেঝের সর্বত্র পর্বতপ্রমাণ বই, কিন্তু একটা বুককেসের সামনেটা একদম ফাঁকা। গোপনস্থানের দরজা হয়ত এইটাই। কিন্তু আমার সাহায্য হ'তে পারে, এমনি কোন চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না। তবে কার্পেটটার রঙ ম্যাটমেটে ধূসর-বাদামী—এ রকম রঙের কার্পেট পরীক্ষা করা খুব সহজ। তাই, অমন চমৎকার সিগারেটগুলোর অনেকগুলো শেষ করে ফেললাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। আর, ছাই ফেলতে লাগলাম সন্দেহজনক বুককেসটার সামনে সমস্ত জায়গাটার ওপর। কৌশলটা ভারী সহজ, কিন্তু দারুণ কাজে লাগে। তারপর নীচে নেমে গেলাম। ওয়াটসন, তোমার সামনেই তো প্রমাণ করলাম, আমার ধারণা সত্য। প্রমাণ করলাম যে, প্রফেসর কোরামের খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে খাবার সরবরাহ করলেই তাঁর নিজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক—তাই নয় কি? তুমি অবশ্য আমার কথাবার্তায় এলোমেলো ধরণ থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারোনি। আবার গেলাম ওপরতলায়। সিগারেটের বাক্স উল্টে দিয়ে খুব কাছ থেকে ভাল করে দেখে নিলাম মেঝের অবস্থাটা। সিগারেটের ছাইয়ের চিহ্ন থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝলাম, আমাদের অবর্তমানে গোপন-স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। ওহে হপকিনস্, চেয়ারিং ক্রশ তো এসে গেল। কেসটার এরকম সফলতাময় সমাপ্তির জন্যে অভিনন্দন জানাই তোমায়। নিশ্চয় এখন হেড-কোয়ার্টারে চলেছ তুমি। ওয়াটসন, একটা গাড়ী নিয়ে চল তুমি আর আমি যাই রাশিয়ান এমব্যাসিতে।"

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন।

তাই তো সে-বিরহ সহ্য করতে না পেরে সব বিঘ্ন-বাধাকে তুচ্ছ করে রাতের অন্ধকারে নির্জন চার ক্রোশ পথ পার হয়ে সে পালিয়ে এসেছে তার কাছে।

গভীর আবেগে রাধাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, সেখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তা কাউকে দিয়ে খবর পাঠালেই তো পারতে। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতাম। তোমাকে ছেড়ে আমারই কি কম কষ্ট হচ্ছিল। শুধু লোক হাসাহাসির ভয়েতেই কিছু বলতে পারি নি। নাও, এইবার চোখের জল মুছে ফেল। আমার কাছে তো এসেই পড়েছ, আর ভয় কি? নাও, মুখ তোল, দেখি, দেখি—

রাধাকে আরও কাছে আকর্ষণ করে গভীর সোহাগে তাকে চুম্বন করল সুরদাস। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নগুণ ধনুকের মত এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিল রাধা। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, না—না—না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, আমি যে অশুচি।

নেশার ঘোর হঠাৎ কেটে গেল সুরদাসের। আঁৎকে সে বলে উঠল, অশুচি! তুমি কি বলছ রাধা?

—ঠিকই বলছি গো, ঠিকই বলছি। তোমার কাছে কি আমি মিথ্যে বলতে পারি!

হঠাৎ যেন কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল সুরদাসের গলা। রাধার গলা থেকে দুই হাত সরিয়ে নিয়ে সে বলল, থাক, অত ভনিতার দরকার নেই। স্পষ্ট করে বল কি হয়েছে। কেন এমনভাবে এখানে চলে এসেছ?

—বলব, বলব, সব বলব। বলব বলেই তো এতটা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। কিন্তু দোহাই তোমার, তুমিও যেন আমার উপর বিরূপ হয়ো না। তুমি ছাড়া যে আর আমার কোন আশ্রয় নেই।

• • •

একে একে সব কথাই খুলে বলল রাধা। অকপটেই বলল। তর চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে ঘরের মেঝে ভিজিয়ে দিল। কিন্তু সুরদাসের মন তাতে ভিজল না। হায়রে মানুষের মন! সে কি মাটির চেয়েও নীরেট!

রাধার কাহিনী শুনতে শুনতে একটা রুদ্ধ আক্রোশ যেন সুরদাসের বুকের ভিতর দাপাদাপি করতে লাগল। খাঁচার বাঁধা অভুক্ত হিংস্র বাঘ যেমন করে রুদ্ধ আক্রোশে গর্জায়, আর উদ্যত থাবা তুলে অবিরাম আঘাত করে খাঁচার শিকে, ঠিক তেমনি একটা জান্তব আক্রোশ যেন নির্মম থাবা তুলে সুরদাসের বুকের পাঁজরে অবিরাম আঘাত করতে লাগল। মুহূর্তমাত্র আগেকার প্রেম-প্রীতি ভালবাসা সব যেন নিমেষে মিথ্যা হয়ে গেল। খুলে গেল মুখোশ। করাল বীভৎসতায় আত্মপ্রকাশ করল ভিতরের জন্তুর মূর্তি।

তীক্ষ্ণ গর্জনে ফেটে পড়ল সুরদাস, ন্যাকামি! মিথ্যে করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল! না স্বেচ্ছায় তুই গিয়েছিলি অভিসারে! তারপর ধরা পড়ে বাপের বাড়ি

"তুমি আমাকে ছুঁয়োনা, আমি যে......"

মুখ দেখাতে না পেরে নির্লজ্জার মত ছুটে এসেছিস এখানে? নিজের মুখে চুনকালি মেখে আশা মেটেনি, এখন কালি মাখাতে এসেছিস আমার মুখে? তোর এতদূর আস্পর্ধা!

তীব্র আক্রোশে রাধাকে আঘাত করবার জন্যই বুঝি বা হাতটা তুলেছিল সুরদাস। সেদিকে চেয়ে রাধা বলে উঠল, তাই কর গো তাই কর। তুমি আমাকে মার, যত পার মার। শুধু একটু ঠাঁই দিও তোমার পায়ে, দাসী-বাঁদীর মতই একটু ঠাঁই দিও।

—ঠাঁই! কি যেন বলতে যেয়ে আত্মসংবরণ করল সুরদাস। অসহ্য উত্তেজনায় তার বুকের ভিতরটা তখন ধ্বক্ ধ্বক করছে। মুহূর্তমাত্র কি যেন ভেবে সে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, ঠাঁই তো দিতেই হবে। এখানেই থাকবি তুই। তোর ওই পোড়ামুখের আগুনে তুই আমার মুখ পোড়াবি সে হবে না—কিছুতেই হবে না।

সুরদাসের তখনকার সেই রোষকষায়িত ভয়ংকর চেহারা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত রাধা শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের পক্ষসমর্থনে আর একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হল না। সুগভীর অভিমানে সে যেন মূক পাষাণস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে।

ক্ষুধিত হায়েনার মত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল সুরদাস। কখনও কঠিন মুঠিতে আঁকড়ে ধরে নিজের মাথার চুল কখনও বা দুপাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে

নিজেরই অঙ্গুল। একটা কিছু সে করতে চায়। এমন কিছু যাতে মনের এই সহ্যাতীত উত্তেজনার কিছুটা উপশম হয়। কিন্তু কিসে তা হবে? কী সে করবে?

বিদ্যুৎঝলকের মত কী এক নারকীয় ছবি যেন ঝলসে উঠল তার চোখের সামনে। ক্ষুধিত হায়েনার মত একটা বিকৃত চাপা হাসি হেসে উঠল সুরদাস। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর দিক যেমন করে দৃঢ় কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে যায় জল্লাদ ঠিক তেমনিভাবে মেপে মেপে পা ফেলে রাধার কাছে এগিয়ে গেল। তার সেই ভয়ংকর চেহারা দেখে ভয়ে গুড়ি-সুড়ি মেরে কুঁকড়ে একেবারে দেয়ালের সংগে মিশে বসল রাধা। ভয়ার্ত দুটি ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে রইল সুরদাসের দিকে।

বিকৃত গলায় সুরদাস বলতে লাগল, কিন্তু তোকে তো বিশ্বাস নেই। তাই আজ রাতেই তোকে এমন শাস্তি দেব যাতে জীবন থাকতে কোন দিন আর এ রাতের কথা ভুলতে না পারিস।

—তুমি কি বলছ? আমার যে বড় ভয় করছে।

—ভয়! কুলটার আবার ভয়! সাপের হিস্‌হিস্ শব্দের মত চাপা হাসি হাসল সুরদাস।

সুরদাসের পায়ের উপর আছড়ে পড়ল রাধা। বলল, ওগো, তুমি আমাকে মার কাট যা ইচ্ছে কর, কিন্তু অমন করে আমাকে বলো না গো। তোমাকে কেমন করে আমি বোঝাব যে আমি কুলটা নই। কোন অন্যায় আমি স্বেচ্ছায় করি নি। বরং সেই পিশাচটাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় যশোদা-মাসিকেই না হয় শুধিয়ে এস তুমি।

হেসে উঠল সুরদাস, হ্যাঁ, বেছে বেছে সাক্ষী জুটিয়েছিস্ ভাল। চোরের সাক্ষী গাঁট-কাটা। ও-সব সাক্ষী-টাক্ষী চলবে না। আমি যা ঠিক করেছি তা করবই। নইলে আমার বুকের জ্বালা মিটবে না।

কথা শেষ করে হন্যে কুকুরের মত দরজার পাশ থেকে ছাই-চাপা আগুনের মালসাটাকে ঘরের মাঝখানে টেনে আনল সুরদাস। টিনের বেড়ার সংগে ঝোলানো ছিল একটা লোহার বেড়ি। রান্নার বেড়ি একটা। একটানে সেটাকে তুলে নিয়ে আগুনের মালসাটার কাছে ছুটে গেল। লোহার বেড়ি দিয়ে মালসাটার ছাই-গুলোকে উল্টে দিতেই গনগনে আগুন বেরিয়ে পড়ল। সেই আগুনের লালচে আভায় সুরদাসের বিকৃত মুখমণ্ডল যেন দানবীয় জীঘাংসায় জ্বলজ্বল্ করে উঠল।

ডান হাতের এক ধাক্কায় বেড়ির প্রায় অর্ধেকটা আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আড়চোখে একবার রাধার দিকে তাকাল সুরদাস। নির্বিকার ভৌতিক গলায় বলল, এই দেখছিস্ বেড়িটা আগুনে দিলাম। একটু পরেই এটা লাল গন্‌গনে হয়ে উঠবে। তখন এটা তুলে নিয়ে দুটো ছাপ এ'কে দেব কুলটার দুই গালে।

শরবিদ্ধ হরিণীর মত আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল রাধা, না—না—না—

জ্বলন্ত বেড়িটাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সুরদাস বলল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

॥৩॥

অনেক কাল পরে এ সমস্ত কথা আমাকে রাধাই বলেছিল।

রাধা। আমার বাল্যসখী লাবণ্যময়ী শ্যামলা মেয়ে রাধা। একই রাত্রিতে এক লম্পট পুরুষ আর বিকৃত-হৃদয় স্বামীর হাতে উপর্যুপরি নিগৃহীত হয়ে আত্ম-রক্ষার একটা জৈবিক প্রেরণাবশেই সেই যে একদা এই অন্ধকার পৃথিবীর বুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর থেকে রূপসী গাঁয়ে কেউ আর কোনদিন তাকে দেখে নি। কালক্রমে সবাই তার কথা ভুলেও গেল।

আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। সংসারের চাকায় তেল জোগাতেই দিনরাত যাদের ঘাড় গুঁজে মুখ নিচু করে চলতে হয়, অপরের কথা ভাববার, অপরকে মনে রাখবার তাদের সময় কোথায়!

ইতিমধ্যে পদ্মা-মেঘনা-ভাগিরথীর খাত বেয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। দুই ভাগ হয়েছে বাংলাদেশ। উপজীবিকা-ব্যপদেশে র‍্যাডক্লিফ-রেখার এপারে কলকাতা মহানগরেই আস্তানা পেতেছি আমি।

কোন এক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে গিয়েছিলাম পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী একটি ছোট শহরে।

শহর ছোট। সম্মেলনের আয়োজনও ছোটখাট। তবু ভাগ্যবিধাতাকে আজ অনেক ধন্যবাদ জানাই যে, ছোট বলে অবহেলা করে সে সম্মেলনকে পাশ না কাটিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। নইলে জীবনের এতবড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হত।

সন্ধ্যার পরে যথারীতি সম্মেলন শেষ করে মণ্ডপ থেকে উঠব-উঠব করছি, এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক একটি চিরকুট এনে হাতে দিল। এক নজর পড়েই একান্ত নির্বিকারভাবেই চিরকুটখানা পার্শ্বে উপবিষ্ট সম্মেলনের সম্পাদকের হাতে দিলাম। লক্ষ্য করলুম, সেখানা পড়ে সম্পাদক মশায়ের ললাট কেমন যেন কুঞ্চিত হল।

আমাকে কিছু না বলেই পাশের অপর একজন কর্তৃপক্ষস্থানীয়ের হাতে তিনি সেটা পাচার করে দিলেন। তারপর সে হাত থেকে অন্য হাতে।

চিরকুটটি পড়ে সবাই যেন কেমন অপ্রতিভ, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়লেন সহসা। বিস্মিত হলাম। বললাম, ব্যাপার কি? কোন দর্শনপ্রার্থীর আমন্ত্রণ নিশ্চয়ই। তা বেশ তো, অসুবিধা হয় না হয় নাই বা গেলাম। চিঠি নিয়ে যিনি এসেছেন তাকে 'না' বলে দিন।

সম্পাদক মশায় বললেন, হ্যাঁ স্যার, সেই ভাল। ওখানে আপনি নাই গেলেন। তাছাড়া, চিঠিতে নামও তো কারও নেই। শুধু ঠিকানাটাই দেওয়া রয়েছে। তাই বলছিলাম—

প্রথমে অতটা লক্ষ্য করি নি। এবার চিরকুটখানা চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখি, সত্যি তাই। চিঠিতে কারও নাম নেই। শুধু সময়মত একবার দেখা করবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে অত্যন্ত কাঁচা হস্তাক্ষরে।

চিরকুটখানা ভাঁজ করে পকেটে পুরে —বললাম, সিংহসদন নামে বাড়িটা শহরের কোন্ দিকে? আর সেখানে আমার যাওয়া নিয়ে আপনারাই বা এতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন?

—কি জানেন, সিংহসদন শহরের একেবারে পূর্বপ্রান্তে একটা পুরনো বাড়ি। অনেক কাল থেকেই গাছ-গাছালি —জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। দেশ-ভাগের পরে একদল উদ্বাস্তু এসে সেখানে আস্তানা গাড়ে প্রথম। হাত বদলে বদলে এখন সেটা ব্যাড ক্যারেক্টার উইমেনদের একটা ডেন্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছিলাম—

দেশ-ভাগ। উদ্বাস্তু। ব্যাড ক্যারেক্টার উইমেন। কথাগুলো মনের মধ্যে অবিরাম তোলপাড় করতে লাগল। কিসের একটা রহস্য যেন ঘিরে রয়েছে এই ছোট্ট চিরকুটখানাকে।

মাথা চাড়া দিল লেখক-মনের চিরন্তন কৌতূহল। সম্পাদক মশায়কে বললাম, চিঠি নিয়ে যিনি এসেছেন দয়া করে তাকে কাল সকালে একবার আসতে বলুন। আমি যাব।

পরদিন সকালে খবর পেয়ে একেবারে তৈরী হয়ে নিচে নেমে দেখি, একটি প্রৌঢ় ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

থামল একেবারে সিংহসদনের গাড়ি-বারান্দার নিচে। গাড়ি থেকে নেমে প্রৌঢ়ের পিছন পিছন ফাটলধরা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম।

সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল বিগত-যৌবনা একটি স্ত্রীলোক। মিসি-দেওয়া কালো দাঁতে কুৎসিত হাসি ফুটিয়ে সে বলল, আসুন বাবা, এই দিকে আসুন। কাল থেকে মেয়ে আমাদের হা-পিত্যেস করে আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। এই যে, এই ঘর। আপনি ঢুকে যান। সে ভিতরেই আছে।

ভয় হল। এ আবার কোন্ ফাঁদে এসে পা দিলাম! শেষ পর্যন্ত আটকে যাব না তো! কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। একটু ইতস্তত করে ঢুকে পড়লাম ঘরে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এক বারাঙ্গনার বিলাস-কক্ষ। বই-পত্রে যেমনটি পড়া যায় ঠিক তেমনি। একটু গান-বাজনার আয়োজনও রয়েছে।

একখানা সাধারণ আটপৌরে শাড়িতে অঙ্গ ঢেকে ঈষৎ ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে একটিমাত্র নারী। ভয়ংকর রাগ হল এই দেহোপজীবিনী নারীর স্পর্ধা দেখে। আমাকেও সে ভোলাতে চায়? কর্কশ কণ্ঠে বললাম, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি চাই তোমার?

মুখ ফেরাল নারী। ঘোমটা ঈষৎ টেনে দিল।

অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। শুধুই চেয়ে রইলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না!

রাধা। আমার বাল্যসখী। সুন্দরী গাঁয়ের লাবণ্যময়ী শ্যামলা মেয়ে। কিন্তু এ কী পরিণতি তার? কোথায় সদানন্দ-কাকা, কোথায় সুরদাস। আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে রাধা?

একটু পরে ব্যথিত গলায় বললাম, রাধা! তুমি!

আয়ত দুটি চোখ তুলে রাধা বলল, হ্যাঁ, আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—বিশ্বাস না করে আর উপায় কি বল। কিন্তু বিশ্বাস না করতে পারলেই যে ভাল হত।

চুপ করে বসে রইল রাধা। একটু পরে বলল, ও কি, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসতে ঘৃণা হচ্ছে?

রাধার এ প্রগল্ভ রূপ আমার অপরিচিত। একটু বিরক্তি বোধ করলাম। মনে হল বলি, ঘৃণা হওয়া কি অন্যায়। কিন্তু বললাম না। চুপচাপ ফরাসে উঠে বসলাম।

রাধা বলল, বুঝতে পারছি তুমি খুব রাগ করেছ। সত্যি, তোমাকে এখানে ডেকে আনা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু কি জান, কাল শোভাযাত্রায় ফুলের মালা গলায় তোমাকে দেখা অবধি কিছুতেই মনকে আমি ঠেকাতে পারলাম না। কেবলি মনে হতে লাগল, তুমি আজ অনেক উঁচুতে বসে আছ। আমার এ নরকের তাপ তোমার গায়ে তো লাগবে না। তবে আর তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে দোষ কি? কতকাল যে রূপসী গাঁয়ের একটি মানুষও দেখি নি!

বুঝলাম, জীবনের অনেক ঘাটে ঘুরে অনেক কথা বলতে শিখেছে রাধা। রূপের সঙ্গে বাণীও তো তার ব্যবসার অন্যতম মূলধন।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, চিঠিতে তোমার নাম লেখনি কেন বল তো?

হেসে রাধা বলল, নাম লিখিনি ভয়ে।

—কিসের ভয়?

—পাছে নাম দেখে চিনতে পেরে তুমি না আস।

—নাম না শুনেও তো না আসতে পারতাম।

—তা হয়তো পারতে। তবু আমার মন বলেছিল তুমি আসবেই।

কথার শেষে একটুখানি মিষ্টি হাসি খেলে গেল রাধার মুখে। চকিতে

যেন সময়ের যবনিকা একটুখানি সরে গেল। মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম আমার বাল্যসখী রাধার নিটোল মুখখানি।

সেই সময় পাশের ঘর থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রাধা। বলল, তুমি একটু বস। আমি এখুনি আসছি।

চঞ্চল পায়ে রাধা চলে গেল। একা বসে আমি ঘরখানা দেখতে লাগলাম। বাল্যসখীর জীবনের এই শোচনীয় পর্যায়ে বেদনার একটা কাঁটা যেন খচ্‌ খচ্‌ করে মনের মধ্যে বিঁধতে লাগল।

একটু পরেই ফিরে এল রাধা।

কৌতূহল চাপতে না পেরে, প্রশ্ন করলাম, কার অসুখ?

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে রাধা বলল, তোমাদের জামাইবাবুর।

—জামাইবাবু! কণ্ঠে আমার সীমাহীন বিস্ময়।

রাধা বলল, এস আমার সঙ্গে। পাশের ঘরেই সে আছে।

রাধাকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেলাম। ছোট ঘর। কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তক্তপোশে তক্‌তকে বিছানা। কাঁধ পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢেকে চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে একটি পুরুষমানুষ। মুখ দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি রুগ্ন। বোধ হয় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে।

ভাল করে লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলাম, মানুষটি সুরদাস। অথবা তার কঙ্কালমাত্র। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম রাধার মুখের দিকে। সে-মুখে বেদনার বিষণ্ণ ছায়া।

নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাধা। আমিও। পাশের ঘরে ফরাসে গিয়ে বসলাম দুজন।

একে একে সবই শুনলাম। গোড়ার দিককার কিছু কিছু কথা আমি জানতামও।

উত্তপ্ত লোহার বেড়িটাকে সজোরে তার দক্ষিণ গালের উপর চেপে ধরতেই মৃত্যুযন্ত্রণায় একবার চীৎকার করে উঠেছিল রাধা। পরমুহূর্তেই নিজের সমস্ত শক্তিকে এক করে এক ঝটকায় সুরদাসের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সারা রাত একটানা ছুটেছিল উর্ধ্বশ্বাসে। তারপর রাত শেষ হয়ে এক সময় দিনের আলো ফুটে উঠল। আর সেই আলোতেই নিজের কথা ভেবে নতুন করে চোখে অন্ধকার দেখল রাধা। এখন সে কি করবে? একবার ভাবল আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়বে। সে অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন্ পথই বা তার সামনে খোলা ছিল! তবু মরা তার হল না। বেঁচে থেকে বিচিত্র সংসারের অনেক ঘাটেই তো ঘুরে বেড়াল। জীবন-তরঙ্গিনীর কুটীল আবর্তে পাক খেতে খেতে ক্রমাগতই ডুবতে লাগল। ডুবতে ডুবতে একেবারে নরকে পৌঁছল।

আর ঠিক সেই অবস্থায়ই এই সিংহসদনের সামনেই একদিন আবার দেখা হয়ে গেল সুরদাসের সঙ্গে।

সুরদাস তখন অর্ধবিকৃতমস্তিষ্ক। মাঝে মাঝেই অতীতের কথাগুলো তার মনে পড়ে। বুকের ভিতরটা হু-হু করে জ্বলে ওঠে। দুটি কোটরগত চোখ জলে ভরে আসে। পরক্ষণেই সব কেমন ভুল হয়ে যায়। একাকার হয়ে যায় দুঃখ-সুখ আনন্দ-বেদনা। আপন মনেই হাসে। বিড় বিড় করে কথা বলে। পথ চলে ছন্নছাড়ার মত।

ছুটে সুরদাসের কাছে গিয়ে রাধা বলল, ওগো, এ তোমার কি হাল হয়েছে?

অবাক হয়ে রাধার মুখের দিকে চেয়ে রইল সুরদাস। একটা অর্থহীন বোবা চাউনি তার চোখে।

নিজের মুখটাকে সুরদাসের মুখের আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে গালের উপরকার কালো দাগটার উপর তর্জনী রেখে রাধা বলল, এখনও কি চিনতে পারছ না আমাকে—এই দাগ দেখেও?

এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল সুরদাস। সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, সরে যাও—সরে যাও আমার কাছ থেকে—

সে নিষেধ ভ্রূক্ষেপ করল না রাধা। এগিয়ে একটা হাত চেপে ধরল সুরদাসের। সস্নেহে বলল, সরে যাব কেন? এস তুমি আমার সঙ্গে।

বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে যেন সভয়ে কুঁকড়ে সরে গেল সুরদাস। একটা সমূহ বিপদের আশঙ্কায় চীৎকার করে উঠল, না না, তুমি সরে যাও আমার সামনে থেকে। দেখছ না আমার হাতে লোহার বেড়ি আছে। তোমাকে খুন করে ফেলব যে।

বলতে বলতে দুই প্রসারিত হাতের দশটা আঙুলকে সজোরে আকুঞ্চিত করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সুরদাস। আর পরক্ষণেই তার সংজ্ঞাহীন নিস্তেজ দেহটা ঢলে পড়ল মাটিতে। ক্ষিপ্রহাতে তাকে ধরে ফেলল রাধা।

কাহিনীর মাঝখানেই হঠাৎ চুপ করল রাধা। দুটি অশ্রুভরা চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, সেই যে আমার হাতের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল সেই থেকেই একটা অঙ্গ ওর অবশ হয়ে গেল। চলা-ফেরার শক্তি আর ও ফিরে পেল না। বুদ্ধি তো আগেই লোপ পেয়েছিল, এবার শক্তিও গেল।

বলতে বলতে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল রাধা। একটু থেমে আঁচলে চোখ মুছে আবার বলল, সে কী চেহারা হয়েছিল তখন ওর। চোখে দেখলে তোমারও কান্না পেত। চুলে জট বেঁধেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন। নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না।

আমি বললাম, সেই হতে ও তোমার কাছেই আছে বুঝি?

রাধা বলল, তাছাড়া আর যাবে কোথায় বল? খারাপ হই, মন্দ হই, তবু ও তো আমার স্বামী। ফেলতে তো আর পারি না।

সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে রাধার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে তাকালাম আবার। সুরদাসের নিজের হাতে আঁকা তপ্ত লৌহ-বেড়ির পোড়া দাগটা রাধার ডান গালের উপর তখনও জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।
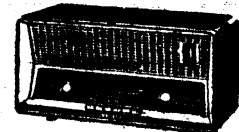
॥ মনের চোখ ॥

॥ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ॥

প্রথম যেদিন চোখ খারাপ হওয়ার পরে মাইনাস ফোর পাওয়ারের চশমাটা প'রে আমার পরিচিত পৃথিবীটাকে নতুনভাবে দেখলাম, তখনকার আনন্দের স্মৃতি আজও মনে আছে। দুটো কাঁচের চশমা সেদিন আমাকে যে আনন্দ দিয়েছিল, সে আনন্দ যেন অচেনাকে চেনার আনন্দ। অস্পষ্টকে স্পষ্ট করে দেখার আনন্দ। কিন্তু দুটো চশমার কাঁচে যে পৃথিবীটাকে আমি অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর দেখলাম, তা ক্রমবর্ধমান চশমার পাওয়ার আটের ঘরে গিয়ে ঠেকলেও পৃথিবীকে নিত্য নূতন ক'রে দেখাতে কই পারল না ত'?

কারণ এ পৃথিবীটাকে নিত্য নব মহিমায় দেখতে হলে যে দেখার চোখ চাই তা কুকসের দামী লেন্সেরও ক্ষমতায় নেই। সেই দেখার চোখই হল আমাদের মনের চোখ। আর এই মনের চোখ থাকলেই তবে স্পর্শ করতে পারি এ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ, বুঝতে পারি নিজের অস্তিত্বের মূল্যটাকে। সোজা কথায় মনের চোখ বলতে পাঠকেরা অন্তর্দৃষ্টি বলতে যে কথাটি শুনে আসছেন, তাই আমি বলতে চাইছি। অবশ্য তার সঙ্গে আমি মনের সংবেদনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকেও বাদ দিচ্ছি না। আপনি আমি প্রত্যেকেই যদি একটি করে মনের চোখের মালিক হতে পারতাম, তবে ক্ষীণদৃষ্টিতে কাঁচের চশমা যে আনন্দ দেয়, তার চেয়েও বৃহৎ আনন্দের অধিকারী হতে পারতাম।

এই অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিক গতিশীলতা খুব সৌভাগ্যবানদেরই ভাগ্যে স্বাভাবিকভাবে জুটে থাকে এবং যাঁদের মনের মধ্যে এই চোখটি বিধাতাপুরুষ বসিয়ে দেন তাঁরা কিন্তু হাত-দেখা জ্যোতিষী হন না, তাঁরা হন দার্শনিক, স্বপ্নদ্রষ্টা, সাহিত্যসাধক। এ'দের দেখেই আমরা বুঝতে পারি, মানুষ যে বেঁচে আছে তা এই একঘেয়ে পরিচিত দুঃখক্লেশ ভরা পৃথিবীর জন্যে নয়, তাঁদের অনুভবে চিন্তায় আর কল্পনায় যে পৃথিবী অলক্ষ্যে জন্ম নিচ্ছে তারই জন্যে।

শোনা যায়, অন্ধরা চক্ষুষ্মানদের চেয়েও ভাল দেখেন। অন্ধদের দেখাটা চাক্ষুষ নয় তবু তাদের অনুভবের ভেতর যে আবেগ আছে, সেই আবেগময় অনুভূতির কাছে চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিশক্তিও বুঝি হার মানে। আসলে মনের গভীরে যেতে না পারলে কোন দেখাই আসল দেখা নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলবার বাসনাটা প্রবলতর হয়ে দেখা দিচ্ছে বলে সেটা এখানে বলেই ফেলি।

একটা স্যানাটোরিয়ামের গল্প। গল্পটা গল্প বলে এখানে বিবৃত করলেও তা সত্যি ঘটনা। এই স্যানাটোরিয়ামের একটি ওয়ার্ডে ঘটনাটা ঘটেছিল। ওয়ার্ডের চার ধারের দেওয়ালে জানলা বলে কিছু ছিল না বললেই চলে। যেদিকেই চাও শুধু শূন্য সাদা দেওয়াল। মাথার ওপর শুধু স্কাইলাইটের বন্দোবস্ত, সেখান দিয়ে আলো আসে শুধু কিন্তু তার মধ্য দিয়ে নীল আকাশই দেখা যায় না, তা বাইরের পৃথিবী।

রোগীরা এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন মৃত্যুপুরীতে হাঁফিয়ে ওঠে। একটি লোক শুধু ব্যতিক্রম। ওরই খাটের সামনের দেওয়ালে শুধু একটি জানালা আছে। কেউ যে বিছানা থেকে উঠতে পারে না, তা না হলে ঘর শুদ্ধ রোগীরা ওই জানালার ধারে হয়ত ভিড় করতে ছুটত।

জানলা দিয়ে দেখে শুধু ভাগ্যবান রোগীটি। কি সে দেখে গল্প করে ওদের সবায়ের কাছে। হ্যাঁ, এই জানালা দিয়ে ও দেখতে পাচ্ছে দূরের বড় একটা বাড়ীর ছাদে ছোট্ট একটি মেয়ে দাঁড়-লাফ খাচ্ছে। কলেজের ছেলেমেয়েরা জানলার সামনে হাসপাতালের মাঠের ঘাস মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে গেটের দিকে।

মেয়েগুলোর হাসিতে ছেলেরা হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ট্রামের ঘন্টির আওয়াজ তোমরা শুনতে পাও, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রাম হাসপাতালের গেটের কাছে থেমে গেল আর একটা সুন্দর দেখতে মেয়ে একহাতে ফলের ঠোঙ্গা আর এক-হাতে লাল টুকটুকে জামা পরা একটা বাচ্চাকে নিয়ে এগিয়ে আসছে। হয়ত ওর স্বামী, বাচ্চার বাবা হাসপাতালে রয়েছে।

এক সময় ওয়ার্ডবয়রা বিকাল হতেই কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে তবু জানলার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান রোগীটির মুখের গল্পের প্রতি মুগ্ধ শ্রোতার মত কান পেতে থাকে সবাই। নাই বা ওরা দেখতে পেল ও যা দেখতে পাচ্ছে, তবু এ সব শুনেই যেন কত আনন্দ।

জানলার অধিকারী রোগীটি মারা গেল একদিন। পাশের লোকটি এল পরের দিন জানলার সামনের বিছানায়। কোনক্রমে বিছানায় ঠেস দিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু একি, জানলার সামনে কোথায় সেই গল্পের পৃথিবী, এ যে সামনে বিরাট এক লাল ইঁট বার-করা দেওয়াল।

গল্পটা পড়ে অন্ততঃ মনের চোখ বলতে আমি যা বলতে চাইছি তা যে শুধুই অন্তর্দৃষ্টি নয় তা খুলে বলবার প্রয়োজন নেই। মনের চোখ বলতে আমি কল্পনা বলে তিন অক্ষরের কথাটারই ওপর জোর দিচ্ছি। দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন বস্তু বা চিন্তার অস্তিত্বকে ধরাই অন্তর্দৃষ্টি, আপাতঅস্তিত্বহীন চিন্তার পেছনে ধাওয়া করাটাই কল্পনা। কল্পনার দৌড়ে দৌড়বীর হতে না পারলে সার্থক ভাবুক হতে পারে না কেউ।

এই প্রসঙ্গে লোকান্তরিত ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শের বিরোধী কোন নেতার শ্রদ্ধা নিবেদনের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে অনেক প্রশস্তি আমরা শুনেছি, কিন্তু স্বর্গতঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হতে পারে না বলেই আমার ধারণা। কর্মযোগী বিধানচন্দ্র, তাঁর এই কর্মযজ্ঞের প্রেরণার মূলে যে কল্পনা নামক বস্তুটিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন এটা সত্যিই লক্ষণীয়। মন যদি না ভাবে, তবে হাত কি কাজ করতে পারে? এবং মনের চোখ থাকলে তবেই ত সে প্রকৃত ভাবনাটা কোন পথে চলেছে তা চিনে নিতে পারে?

দর্শন বলে যে বস্তুটির কল্যাণে আজ মানবজীবন সার্থক থেকে সার্থকতার পথ-সন্ধানে নিয়ত ব্যস্ত, তা ত এমনি কল্পনারই ঘোড়দৌড় খেলার ফল। সব মানুষ যে একদিন সমান কর্মে, ঘর্মে, আনন্দে, স্বাধিকারে একই মর্যাদা পাবে তা ত' কিছু ভাবুকমানুষের পাগলামী চিন্তা থেকেই। সেই সমস্ত চক্ষুষ্মান সত্যদ্রষ্টারা সেদিন মানুষের যে ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন, তা ত' একদিন মানুষের জীবনে ঘটবে এটা আর কল্পনা মাত্র নয়।

কিন্তু কে দেবে আমাদের এই চোখ? কাঁচের চশমা নয় যে পয়সা ফেললে কিনে আনব এটি, কারখানায় এ চোখটি উৎপাদনও হয় না। তবু বিশ্বাস করি আমরা মনুষ্যত্বের সেই স্তরে একদিন না একদিন উঠতে পারবই, যে স্তরে গেলে এ পৃথিবীকে তার যথার্থ মহিমায় আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আজ চোখের ছানির মত নানা দুঃখ-ক্লেশ আমাদের সেই উপলব্ধির রাস্তায় বাধা বিশেষ, তবু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কল্পনায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েই দেখব, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু কল্পনা তা পাগলামী নয়, তা বাস্তবে ধীরে ধীরে ধরা দিচ্ছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত আমরাও আজ বলব, 'What has been achieved in the way of diminishing extreme poverty is a ground for hopes which not long ago, would have seemed utopian. In spite of all that is painful, I find myself still glad to be alive, and wishing to know what will be the next chapter in the book of human destiny'.

এ ভবিষ্যৎ দেখতে হলে আমাদের আজ শুধু যা চাই, তা হল একটি মন, মূলে যার চিন্তা, কল্পনা আর অনুভূতির গভীরে।

ইবন্‌বতুতার বঙ্গদর্শন

শিবদাস চৌধুরী

প্রায় সোয়া ছয়শ' বছর পূর্বে বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তৎকালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ইবন্ বতুতা নামে এক কৃতবিদ্য ভবঘুরে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশে কিছুদিন সরকারী কাজও করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য উপলক্ষে তিনি বহুস্থানে গিয়েছেন। সেই যাত্রাপথে নানা কাজের ভিতরে নিজের স্মৃতির মণিকোঠায় যাহা তিনি দেখিয়াছেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন সময় নোটও নিয়াছিলেন। তবে তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিবাহী রোজনামচা হইতে পরবর্তীকালে তিনি "wove into one of the most remarkable descriptions we possess of any medieval Muslim Court" (H.A.R. Gibb).

তিনি তাঁহার ভ্রমণের ঝুলিতে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ফেজে পৌঁছিয়া সুলতানের আদেশে ইবন্ জুজাইয়ু নিকট বিবৃত করেন। তিনি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করেন—মাঝে মাঝে নিজের বক্তব্যও জুড়িয়া দেন। সেই সংক্ষিপ্ত কাহিনী হইতেই বাঙলা দেশের অংশটুকুর সারমর্ম আমরা এখানে পাঠকের গোচরীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

ইবন্ বতুতার জন্ম হয় তাঞ্জিয়ারে; ২৪শে ফেব্রুয়ারী; ১৩০৪ সালে। পিতা ছিলেন আবদুল্লা ইবন্ মুহম্মদ। এই বংশ হইতে বহু কাজীর জন্ম হইয়াছে। ইবন্ বতুতা লেখাপড়া শেষ করিয়া ২১ বছর বয়সে মক্কা দর্শনে বাহির হন। এই যে ভ্রমণের নেশা তাঁহার লাগিয়া গেল তাহা শেষ হইল এশিয়া ও আফ্রিকার ৭৭,৬৪০ মাইল ভ্রমণের পরে। তিনি ফেজে ৭৪ বৎসর বয়সে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে অধ্যাপক H. A. R. Gibb যাহা বলেন তাহা উল্লেখযোগ্য : "The length and detail of Ibn Battuta's description of India and his activities and travels there bear their witness to the deep impress which they made upon his mind and memory. What he had to say on the court, the administration, the extraordinary personality of Sultan Muhammad and other matters of contemporary history, is generally borne out by the Indian historians, and his observations on social custom supplement them with a mass of vivid and valuable detail".

তিনি পশ্চিম এশিয়ার ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৩৩৩ সনের ২৪ অক্টোবর উঁছে পৌঁছান; সেখান হইতে ৫ নভেম্বর মুলতানে; তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে ১৩৪৬ এর ৯ জুলাই—সাতগাঁও (বা চট্টগ্রাম কাহারো কাহারো মতে); সেখান হইতে ৩০ জুলাই কামরূপ ও ১৪ আগস্ট সোনারগাঁও পৌঁছান। দিল্লীতে পৌঁছাইলে সুলতান তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে ৭ বৎসর ছিলেন। তারপরে রাজসভার চক্রান্তে পড়িয়া কাজে ইস্তফা দেন। ১৩৪২ সালে চীনের মঙ্গোল রাজদরবারে প্রেরিত মিশনের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া তিনি দিল্লী ত্যাগ করেন বিরাট দল সহ। সেই যাত্রাপথেই তিনি বাঙলাদেশে উপস্থিত হন। তাঁহার রোজনামচা তৎকালীন বাঙলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে বিশেষ আলোকসম্পাত করিবে।

ইবন্ বতুতা মালদ্বীপ ভ্রমণ বেশ ভালভাবেই শেষ করিলেন। এইবার চীনে যাইবার পালা। তখন সোনারগাঁও হইতে জাভার জাহাজ চলাচল করিত। সেই সময়ে আবার প্রখ্যাত ফকির শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া সিলেটে বাস করিতেন। তাই চীনে যাইবার মুখে নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে দর্শন করিয়া যাইতে মন স্থির করিলেন। মালদ্বীপ হইতে জলযানে তেতাল্লিশ দিনে সাতগাঁওএ পৌঁছান। সাতগাঁও তৎকালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে হুগলীর মোহনায় এই বিরাট শহরটি ছিল। ইহার নিকট দিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া যমুনার সাথে পথে মিলিত হইয়া সাগরে নিজেদের উজাড় করিয়া দিত। গঙ্গাতে বহু যুদ্ধসাজে সজ্জিত অর্ণবপোত সুলতানের আদেশের অপেক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। বাঙলাদেশে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে ও সাতগাঁও হইতে কামরূপ যাত্রা পথে তিনি পূর্ববঙ্গের বৃহদংশের প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পরিচিত হন। এই পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হন। যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন তাহাই তাঁহার রোজনামচার স্মৃতির মণিকোঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা তৎকালীন বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে বিশেষ আলোকপাত করে।

বাঙলার সুলতান তখন ফকরুদ্দিন। তিনি বহুগুণান্বিত ছিলেন। বিদেশীদের, বিশেষভাবে ফকির ও সুফীদের, বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেন। বাঙলা দেশ তখন ফকীর ও সুফীদের ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র ছিল; তাঁহার রাজত্বে তাঁহারা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করিতেন; বিনাভাড়ায় নৌকায় যাতায়াত ও খেয়া পার হইতেন; ভরণপোষণের খরচ চাহিলেই পাইতেন। শহরে উপস্থিত হইলে অর্ধ দিনার ভিক্ষা পাইতেন। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার এত প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি তাঁহাদের একজনকে সাতগাঁও-এর নায়েবের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নাম ছিল সৈদা। কিছুদিন পরে সুলতান এক শত্রুকে শায়েস্তা করিতে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজধানীর শাসনভার অর্পণ করিয়া যান বিশ্বাসভাজন ফকীর সৈদার উপরে। পৃষ্ঠপোষকের অনুপস্থিতির সুযোগে সৈদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন স্বয়ং ক্ষমতা দখল করিবার জন্য। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সুলতানের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিলেন। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া তড়িৎবেগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সৈদা ও তাঁহার অনুচরেরা ভয়ে পশ্চাদপসরণ করিয়া সোনারগাঁও-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সোনারগাঁও তখন সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত ছিল। সুলতান সোনারগাঁও অবরোধ করিবার জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সোনারগাঁওয়ের অধিবাসীরা প্রমাদ গণিলেন। প্রাণের ভয়ে সৈদা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সুলতানের সৈন্যবাহিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সুলতানকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে বিদ্রোহী-নায়কের শির রাজধানীতে প্রেরণের আদেশ আসিল। সৈদার কর্তিত রক্তাক্ত শির সুলতানের দরবারে প্রেরণ করা হইল। এই উপলক্ষে বহু ফকির সুলতানের রোষে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন।

এখান হইতে ইবন্ বতুতা কামরূপ রওনা হন। কামরূপ এক মাসের রাস্তা। কামরূপের পাহাড়ে কস্তুরী মৃগ পাওয়া যাইত। এই পর্বতের অধিবাসীদের দেখিতে অনেকটা তুর্কীদের মত; তাহারা কষ্টসাধ্য কার্য করিতে পটু ছিলেন; সেখানকার একজন কর্মকার অন্য জায়গার কর্মকারের সমান কর্মদক্ষ; যাদুবিদ্যা ও মন্ত্রতন্ত্রে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই পর্বতের এক গুহাতে তাব্রিজের শেখ জলালুদ্দিন বাস করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার

উদ্দেশ্যেই তিনি কামরূপ আসেন (১৩৪৫ খৃঃ)। এই শেখ মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি বহু প্রকার কেরামতী দেখাইয়া শিষ্য ও অনুরক্ত ও ভক্তদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারিতেন। তিনি বহু মহৎ কাজও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরা বলেন তিনি ১৫০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কামরূপ পর্বতাঞ্চলের বহু অধিবাসী তাঁহার নিকটে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই জন্যই তিনি তাঁহাদের মধ্যে বাস করিতেন। মুসলমানদের সিলেট অধিকার-পর্বে এই শেখ বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান অধিবাসীরা সকলেই তাঁহার আশীর্বাদ নিতে আসিত ও প্রণামী দিয়া যাইত। প্রণামীর প্রাপ্য দ্রব্যাদি দ্বারা শেখের পার্ষদ ফকিরদের ও অভ্যাগতদের ভরণ-পোষণ চলিত। নিজে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন ও দরগায় পালিত গরুর দুগ্ধ দিয়া পারণ করিতেন। শেখের আশ্রয়ে তিন দিন থাকিয়া তিনি বিদায় লইলেন, ইহার পরে হবিগঞ্জের দশ মাইল দক্ষিণে হবঙ্কটীলাতে পৌঁছাইলেন। শহরটি খুব সুন্দর ও প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে মাত্র ইহার ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। কামরূপ পর্বত হইতে যে নদীর উৎপত্তি হইয়াছে উহা এই শহরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নীলাক্ত নদী। তাই নদীর নাম মেঘনা। এই নদীপথেই বাঙলাদেশ ও লখনৌতিতে যাইতে হয়। হবঙ্কের নাগরিকেরা পৌত্তলিক ছিলেন। তাই তাঁহারা যে শস্য উৎপাদন করিতেন তাহার অর্ধেক সুলতানকে খাজনা দিতে হইত; ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্যান্য কাজও করিতে হইত।

ইবন বতুতার রোজনামচা হইতে আরও জানা যায় যে, মুসলমানদের রাজত্বে বাঙলার হিন্দুদের অবস্থা বিশেষ সুখপ্রদ ছিল না। তাঁহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ রাজকোষে জমা দিতে হইত; আবার খাজনাও দিতে হইত।

নৌ-পথে বাণিজ্য ও যাতায়াত বেশীর ভাগ চলিত। অনেক নৌকার কনভয় একযোগে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। ইবন বতুতা নদীর বুকে বহু জাহাজ ও নৌ-যান দেখিতে পান। প্রত্যেক নৌ-যানে একটি করিয়া ড্রাম থাকিত। যখন এক নৌকার সঙ্গে অন্য একটি নৌকার দেখা হইত তখন উভয় পক্ষই ড্রাম বাজাইয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানাইত ও কুশল-বার্তা বিনিময় করিত। ইহা সম্ভবতঃ লুণ্ঠনরাজের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

তিনি পূর্ববঙ্গে শস্যশ্যামল সবুজ নয়নাভিরাম মাঠ দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। সবুজ কচি ধানের শিষ, ঘন সবুজ পত্রবিশিষ্ট জলপাই গাছ। নদীর বাঁকে বাঁকে ছোট ছোট বাড়ী ও বাজার তাঁহার মনকে মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলে। সিলেট হইতে সোনারগাঁও যাত্রাপথে পনের দিনে তিনি যে দৃশ্য দেখেন তাহা তাঁহার মনে চিত্রাঙ্কিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের নৌকা গ্রামের ভিতর ও ফলের বাগানের ভিতর দিয়া যাইত। এই যাত্রাপথের দৃশ্য দেখিয়া নীলনদের তীরের মিশরের ছবি তাঁহার মনে জাগরূক হইত। নদীর তীরে তীরে, ডাইনে-বামে ফলোদ্যান, জলতুলিবার কল ও গ্রাম। কী অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু বাঙলার গ্রীষ্মের ভেপসা গরম মাঝখানে তাঁহার সমস্ত আনন্দ তিক্ত করিয়া তুলিত।

আফ্রিকার এই বিশ্ব-পথিকটি বহু সভ্য ও সমৃদ্ধশালী দেশ দেখিয়াছেন এশিয়া ও আফ্রিকাতে—কায়রো, বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, পেকিং, বুখারা, সমরকন্দ হেরাত—আরও কত জায়গা। কিন্তু কোথায়ও তিনি বাঙলা দেশের মত সস্তা খাদ্যশস্য ও জীবনধারণের অন্যান্য বস্তুর স্বল্পমূল্য দেখেন নাই। ইহা তৎকালীন বাঙলাদেশ যে প্রাচুর্যের স্বর্গ ছিল তাহাই নির্দেশ করে।

বাঙলার ভূভাগ অত্যন্ত বিশাল ছিল। প্রচুর ধান জন্মিত এখানে। বাঙলাদেশ অত্যন্ত কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ছিল। বাঙলার পথে-ঘাটে চাউল প্রতি রৌপ্য দিনারে ২৫ রতল (দিল্লীর ওজন) পাওয়া যাইত। তবু স্থানীয় লোককে বলিতে শুনা যাইত যে, চাউল অত্যন্ত দুর্মূল্য।

তখন জনজোর মুহম্মদ-উল-মসমূদী বাঙলাদেশে বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার বয়সও হইয়াছিল। তাঁহারই কাছে তিনি জানিতে পারেন যে, সস্ত্রীক ও এক ভৃত্যের সংবৎসরের খাদ্যদ্রব্যের জন্য সাত টাকা ব্যয় করিলেই চলিত, কড়ির প্রচলন তখন ছিল। ৮০ রতল ধান হইতে ৫০ রতল চাউল পাওয়া যাইত। তিনটি রৌপ্য দিনারে একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা যাইত। এতদঞ্চলে গরু হইতে মহিষই বেশী দেখা যাইত। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিরও তৎকালীন মূল্যও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

চাউল	প্রা ৮·৯০ মণ	৭·০০
ধান	২৮ মণ	৭·৯১
ঘি	১৪ সের	৩·৫০
তিল তৈল	১৪ ”	১·৭৫
গোলাপজল	১৪ ”	৭·০০
চিনি	১৪ ”	৩·৫০
মুরগী (হৃষ্টপুষ্ট)	৮টি	·৮৭
ভেড়া (”)	১টি	১·৭৫
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	২১·০০
কপোতক	১৫টি	·৮৭

ইহা ছাড়া ১৫ গজ খুব মিহি সুতীর ধুতির দাম ছিল ১৪ টাকা একটি সোনার দিনারে গৃহকর্ত্রী হওয়া যোগ্য খুব সুন্দরী যুবতী ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। এই মূল্যে ইবন বতুতা স্বয়ং অপরূপা এক যুবতী রমণী ক্র[illegible] করেন। নাম আসুরা। তাঁহার সঙ্গী[illegible] একজন কয়েকটি স্বর্ণ দিনার দিয়া সা[illegible] বছর বয়সের একটি বালককে ক্রয় করে[illegible] তাহার নাম ছিল লুলু।

ইবন বতুতার ভ্রমণকাহিনী হই[illegible] আমরা উপরি উল্লিখিত তথ্যগুলি পা[illegible] ইহা হইতে তৎকালীন বাঙলাদে[illegible] রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্[illegible] একটি চিত্র আমরা পাই। এই ধর[illegible] চিত্র সাধারণতঃ অন্য কোন মুসল[illegible] ভ্রমণকারী হইতে আমরা পাই না।

॥ শান্তির দৌত্য ॥

কলম্বো প্রস্তাবের সর্তাবলী এখনও প্রকাশ করা হয়নি। শুধু প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রস্তাবটি অস্পষ্ট। অন্যান্য সূত্রে এ সম্বন্ধে আর যেটুকু জানা গেছে তা হল যে, প্রস্তাবে চীনকে আক্রমণকারী বলে বর্ণনা করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ও চীন সম্পর্কে প্রস্তাব রচনাকারীদের মনোভাব থেকে এটুকু অন্তত আমরা বুঝতে পারছি যে, কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধ মীমাংসার খুব বেশী আশা পোষণ করা বোধহয় সুবিবেচনা-সম্মত হবে না। যদিও একথা স্বীকার্য যে, মধ্যস্থের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম থেকেই সব বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। তবুও সর্বান্তঃকরণে আমরা এই আশাই পোষণ করব যে, এশিয়া ও আফ্রিকার যে ছয়টি রাষ্ট্র আজ বিরোধ মীমাংসায় অগ্রণী হয়েছে তাদের প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হোক এবং সকলের সহায়তায় ও সক্রিয় সমর্থনে ভারতের মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকুক।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী পিকিংএ গিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গ লেখা পর্যন্ত সংবাদ পাওয়া গেছে যে, কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আলোচনাকালে শ্রীমতী বন্দরনায়েককে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও পিকিংএ গেছেন। পিকিংএ আলোচনা শেষ হলে শ্রীমতী বন্দরনায়েক নয়াদিল্লী আসবেন এবং সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনাকালে তাঁকে সাহায্য করবেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক আলি সাব্রী। ১০ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে এসে পৌঁছানোর কথা আছে তাঁর। পিকিংএ ইন্দোনেশিয়া প্রতিনিধি ও নয়াদিল্লীতে মিশরীয় প্রতিনিধির আগমন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে নয়াদিল্লী ও পিকিংএর নির্ভরতা যথাক্রমে মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার উপরেই সবচেয়ে বেশী। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে যদি বর্তমান অবাঞ্ছিত বিরোধের নিষ্পত্তি হয় তবে সেইটাই হবে বিশ্বের কাছে নববর্ষের সবচেয়ে বড় আশা ও আনন্দের সংবাদ।

॥ যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি ॥

চীনের আক্রমণের ফলে ভারতের সামরিক বাহিনীর যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার সর্বশেষ হিসাব সম্প্রতি ভারত সরকারের পক্ষ হতে প্রকাশ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, চূড়ান্ত হিসাব এখনও করা সম্ভব না হলেও মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, চীনাদের আক্রমণে নিহত ভারতীয় সামরিক ব্যক্তির সংখ্যা ২২৪ ও আহত ৪৬৮ জন। নিহতদের মধ্যে ১৮ জন অফিসার শ্রেণীর ও ১৫ জন জে-সি-ও। বাকি ১৯১ জন অন্যান্য

ভারত-পাকিস্থান আলোচনায় যোগদানের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দল গত ২৬শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লী হতে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করেন। পালাম বিমানবন্দরে গৃহীত এই ফটোতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নিম্নোক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখা যাচ্ছে (বাম হতে দক্ষিণে) পররাষ্ট্র দপ্তরের শ্রী বি এল শর্মা, কমনওয়েলথ সেক্রেটারী ওয়াই ডি গুণ্ডেভিয়া, কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং, প্রতিনিধি দলের নেতা ও কাশ্মীর বিষয়ক স্পেশ্যাল সেক্রেটারী শ্রীএ স চোপ্‌রা, পররাষ্ট্র দপ্তরের শ্রীএ এস চিব এবং ব্রিগেডিয়ার ডি কে পালিত।
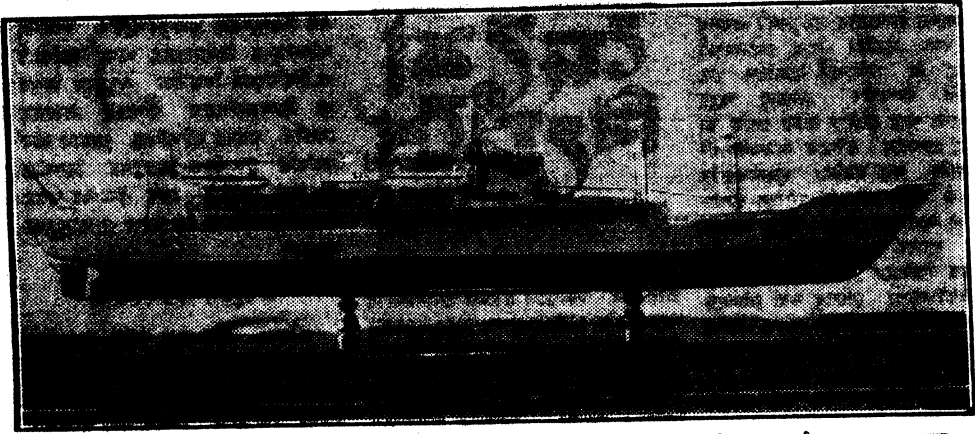
আবহতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য জাপ মন্ত্রিসভা একখানি পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। ৬,৩৫০ টনের এই জাহাজখানি নির্মাণে ৯ বছর সময় লাগবে এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয় হবে। উপরে জাহাজখানির মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে।

শ্রেণীর। এছাড়া চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছিল ৩,৯০৮ জন, যাদের মধ্যে অনেককে ইতিমধ্যে ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে। এই হিসাবের বাইরে ১৬৯৮ জন সৈনিকের এখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। হয়ত তাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক হয়ত পরে ফিরে আসবে।

॥ পারিবারিক কলহ ॥

চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতিগত পার্থক্যের কথা বেশ কিছুদিন ধরে সাড়ম্বরে প্রচার করা হচ্ছিল এবং অনেকের মনেই এ ধারণা জন্মেছিল যে অনতিবিলম্বেই এ বিরোধ প্রকাশ হয়ে পড়বে। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে যেভাবে চীনকে আক্রমণ করা হয় এবং ইতালীর কমিউনিস্ট নেতা তোগ-লিয়াত্তি যেভাবে প্রকাশ্যে চীনের ভারত আক্রমণের নিন্দা করেন তাতে আমাদের মনেও এমন আশা দেখা দিয়েছিল যে, ক্রুশ্চেভও হয়ত অনতিবিলম্বেই চীনকে তার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য নিন্দা করবেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভের নব-বর্ষের বাণীতে সে আশা নির্মূল হয়েছে। তিনি বলেছেন, চীনের সঙ্গে তাঁদের যে মত-বিরোধিতা সেটা পারিবারিক কলহের বেশী কিছু নয়। এবং সাম্রাজ্য-বাদীরা যদি কখনও কোন যুদ্ধের চেষ্টা করে তবে সমগ্র কমিউনিস্ট জগতই ঐক্য-বদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, সোজা কথায়, চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং চীনকে কেউ আক্রমণ করলে সোভি-য়েট ইউনিয়ন তা মুখ বুজে সহ্য করবে না।

ক্রুশ্চেভ এই বলেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, বিগত বর্ষে সমাজবাদ ও শান্তির শিবির আরও শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ, চীন যে ভারত আক্রমণ করে তার কয়েক হাজার মানুষকে নিহত, আহত ও বন্দী করেছে এবং এখনও যে ভারতভূমির উপর তার জবরদখল কায়েম করে রেখেছে, শান্তি-বাদী সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভের মতে সেটা অশান্তি নয় এবং সে সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্যই নেই। ক্রুশ্চেভকে ধন্যবাদ, নববর্ষের প্রারম্ভেই তিনি এদেশের বহু মানুষের একটি বিরাট ভুল নিরসন করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, চীন তাঁদের পরিবারভুক্ত এবং চীন যাই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করবেন না। পরন্তু চীনের আক্রমণাত্মক কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে অন্য কোন দেশ যদি অস্ত্র ধারণ করে তবে সেই "সাম্রাজ্য-বাদী"দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিধাবোধ করবে না।

॥ কাতাঙ্গার যুদ্ধ ॥

এতদিন পরে কাতাঙ্গার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে বলে মনে হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর প্রবল চাপে শোম্বের পরিচালনাধীন ভাড়াটে সৈন্য-বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সঙ্গে আপোষে আসার জন্য কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট শোম্বে এখন খুবই ব্যাকুল। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হতে সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত স্পষ্ট ভাষায় শোম্বেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাঝপথে আর আপোষ বা আলাপ-আলোচনার কোন অবকাশ নেই। সে সুযোগ অনেকদিন আগেই শোম্বে হারিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের একমাত্র কাজ হবে কাতাঙ্গাকে কঙ্গোর অংশী-ভূত করা ও কাতাঙ্গার শাসন ব্যবস্থা কঙ্গোর কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন করা। কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথ-ভিল বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর দখলে, এবং উ থান্ত এ সম্পর্কে শোম্বেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একী-করণের বিষয়ে তাঁর কিছু বলার থাকলে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর প্রহরাধীনে এলিজাবেথভিলে আসতে পারেন। এছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়েই শোম্বের সঙ্গে বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

উ থান্ত ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর এ দৃঢ়তা একটু বিলম্বে প্রকাশিত হলেও তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এবং এই মনোভাব অপরিবর্তিত থাকলে কঙ্গো

সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হতে আর খুব বেশী দিন লাগবে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রসংঘের দুর্বলতার অভাবে পৃথিবীর বহু সমস্যারই দীর্ঘদিন কোন সমাধান সম্ভব হয়নি। অন্তত একটি জায়গাতেও তাদের দৃঢ়তা যদি সাফল্য আনে তবে ভবিষ্যতে বহু সমস্যারই সমাধান ত্বরান্বিত হবে।

॥ কাশ্মীর প্রসঙ্গ ॥

কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাওলপিণ্ডিতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে একদফা আলোচনা হয়েছে এবং সে আলোচনার ফলাফল অসন্তোষজনক নয় বলে আবার জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তাঁরা নয়াদিল্লীতে মিলিত হবেন। যদি তার ফলে কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব হয় তবে তারপর পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব আসবেন নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আলাপ আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে এবং এই পথেই যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বারবার আলোচনা সত্ত্বেও কোন পক্ষ যদি তার মনোভাব অপরিবর্তিতই রাখে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না চায় তবে সেক্ষেত্রে আলোচনাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নেহরু শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর প্রসঙ্গকে 'মৃত' প্রসঙ্গ বলে ও-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা চালাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বর্তমান স্থিতাবস্থাকেই স্থায়ী ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছিলেন। আজ যে আবার কাশ্মীর নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব উঠেছে তাতে কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষ হতে এখনও পর্যন্ত কোন মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়নি। এখনও পর্যন্ত তাদের দাবী, যেহেতু কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক মুসলিম সেই হেতু কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগদানের অধিকারী এবং গণভোটের ব্যবস্থা করে কাশ্মীরের অধিবাসীদের সেই মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। —আমরা পূর্বেই একথা বলেছি
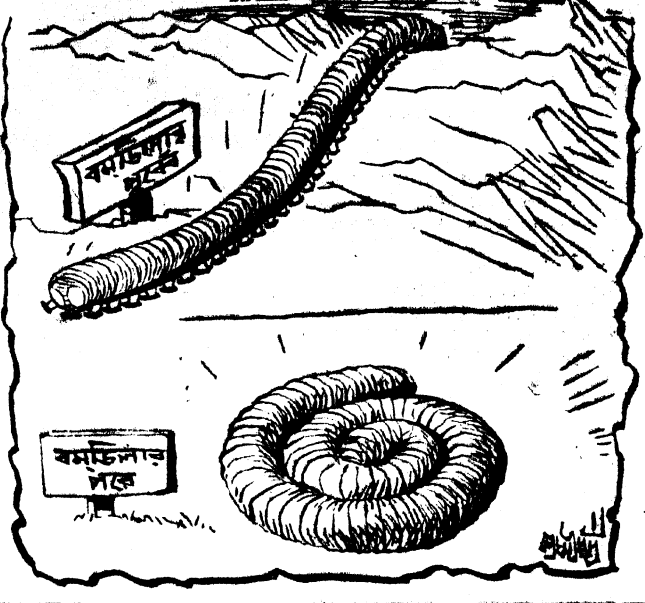
যে, যে পাকিস্থানের শাসকবর্গ নিজের দেশের জনসাধারণকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করে রেখেছে সেই শাসকবর্গের মুখে কোনমতেই গণভোটের কথা শোভা পায় না। আর মুসলিম হলেই তার দেশ পাকিস্থান এমন সর্বনাশা ভয়ঙ্কর যুক্তিও ধর্মনিরপেক্ষ ভারত কখনও মেনে নিতে পারে না। ভারতে বর্তমানে মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা পাকিস্থানের মুসলিম অধিবাসীর প্রায় সমান। তারা যদি ভারতীয় হয়ে থাকে তবে কাশ্মীরের মুসলিমরাও ভারতীয়। সেক্ষেত্রে নতুন করে তাদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্য যাচাই করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণেই লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীচাগলা বলেছেন, কাশ্মীর প্রসঙ্গকে যেভাবে পাকিস্থান উপস্থাপিত করতে চায় সেটা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক মনোভাব-প্রসূত। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত এই সাম্প্রদায়িক দাবী কখনও মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতার পরিণতি যে কতখানি বিষময় তা ভারতের চেয়ে কেউ বেশী জানে না। এ কারণে শ্রীচাগলা বলেছেন, পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উপর চাপ না দিয়ে পাকিস্থানকে প্রকৃত অবস্থা মেনে নিতে বলা।

॥ পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত ॥

চীনা আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা উদ্ভূত হওয়া মাত্র পাঞ্জাবের কংগ্রেসী সদস্যগণ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ব্যয় হ্রাসের দাবী জানান। সেই দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকাইরণ তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে সকল মন্ত্রীই পদত্যাগ করেন। তারপর শ্রীকাইরণ পদত্যাগকারী বিভিন্ন পর্যায়ের সেই একত্রিশ জন মন্ত্রীর মধ্য হতে মাত্র নয়জনকে নিয়ে তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পূর্ব মন্ত্রিসভার সকল রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে বর্তমান মন্ত্রিসভা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন দুইজন মন্ত্রীও নতুন মন্ত্রিসভা হতে বাদ পড়েছেন। সরকারের ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের এই অভিনব উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়।

॥ ঘরে ॥

২৭শে ডিসেম্বর—১১ই পৌষ : 'জোট-বহির্ভূত ছয় জাতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব (চীন-ভারত প্রসঙ্গে) অস্পষ্ট'—দিল্লীতে পি-এস-পি নেতৃবর্গের নিকট শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) মন্তব্য।

আসামের সকল সক্ষম ছাত্রেরই স্বেচ্ছায় এন-সি-সি'তে যোগদানের সংবাদ।

চীনা সৈন্যদের তাওয়াং (নেফা) হইতে ৪০ মাইল দূরে অপসারণের সংবাদ—দিরাং জং-এ অসামরিক প্রশাসন বিভাগের স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ।

২৮শে ডিসেম্বর—১২ই পৌষ : তিব্বতে চীনাদের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির সংবাদ—যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও পূর্ণোদ্যমে সামরিক সমাবেশ।

'চীন বিনা নোটিশেই আবার ভারত আক্রমণ করিতে পারে : সীমান্তে শান্তি অনিশ্চিত' —নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর উক্তি।

২৯শে ডিসেম্বর—১৩ই পৌষ : 'চীনা আক্রমণজনিত জরুরী পরিস্থিতিতে ভারতের বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে'—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধীর ভাষণ।

দেশব্যাপী গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা—সর্বভারতীয় ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি সম্মেলনে (দিল্লী) অনুমোদন।

৩০শে ডিসেম্বর—১৪ই পৌষ : 'সাহসের সহিত চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে'—জাতীয় বিজ্ঞান ভবনের (দিল্লী) বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীনেহরুর দাবী।

হিন্দুমহাসভার ৪৭তম অধিবেশনে (কলিকাতা) যুদ্ধোদ্যমে সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন - অধিবেশনের সভাপতি : অধ্যাপক ভি জি দেশপাণ্ডে।

'চীন না হটিলে (৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী স্থানে) যুদ্ধ অনিবার্য'—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

৩১শে ডিসেম্বর—১৫ই পৌষ : 'চীনাদের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে ভারতের মনোভাব অপরিবর্তিত'—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা : সর্বশেষ চীনা নোট প্রচ্ছন্ন হুমকীতে ভর্তি।

অনতিবিলম্বে সোভিয়েট 'মিগ' বিমান পাওয়া যাইবে বলিয়া শ্রীনেহরুর আশা।

চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া ফেনী নদীর উপর পাকিস্থানের বাঁধ নির্মাণ—ত্রিপুরা শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ।

১লা জানুয়ারী (১৯৬৩)—১৬ই পৌষ : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিবপুর

বোটানিক্যাল গার্ডেনের (প্রাচ্যের বৃহত্তম উদ্ভিদ উদ্যান) পরিচালনভার গ্রহণ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীহুমায়ুন কবীরের (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) হস্তে উদ্যানের চাবি অর্পণ।

জাতীয় জরুরী অবস্থায় পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার আয়তন হ্রাস—৩১ জনের স্থলে ৯ জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত।

কলিকাতায় এয়ার ভাইস-মার্শাল যশবন্ত সিং-এর পরলোকগমন।

'চীনাদের হঠাইবার জন্য সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত : পরিণামে ভারতের জয় অনিবার্য'—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ঘোষণা।

২রা জানুয়ারী—১৭ই পৌষ : 'চীনের আক্রমণ ভারতবাসীর মনে যে ঐক্যবোধ আনিয়াছে, তাহা যেন উবিয়া না যায়'—ভুবনেশ্বরে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের দাবী।

নাগাভূমির উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন কোটি টাকা বরাদ্দ।

॥ বাইরে ॥

২৭শে ডিসেম্বর—১১ই পৌষ : রাওয়ালপিণ্ডিতে (পাকিস্থানের রাজধানী) পাক্-ভারত মন্ত্রি পর্যায়ে বৈঠকের উদ্বোধন—ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং কর্তৃক কাশ্মীরসহ সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আহ্বান।

পিকিং ও দিল্লী মিশনের সাফল্য সম্পর্কে শ্রীমতী বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) দৃঢ় আশা—চীন যাওয়ার পথে কুয়ালালামপুরে মন্তব্য।

এলিজাবেথভিলে (কাতাঙ্গার রাজধানী) রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও কাতাঙ্গী ফৌজের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত।

২৮শে ডিসেম্বর—১২ই পৌষ : কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা প্রচেষ্টায় অগ্রগতির সূচনা—রাওয়ালপিণ্ডিতে নিভৃত বৈঠকের (ভারত-পাক) পর সর্দার শরণ সিং ও মিঃ জেড এ ভুট্টোর (উভয় রাষ্ট্রের নেতৃদ্বয়) বিবৃতি—বর্তমান আলোচনা ১৬ই জানুয়ারী (১৯৬৩) পর্যন্ত মুলতুবী—পরবর্তী বৈঠকের স্থান দিল্লীতে নির্ধারিত।

২৯শে ডিসেম্বর—১৩ই পৌষ : কাতাঙ্গার দুইটি সহরে (রাজধানী এলিজাবেথভিল ও খনি সহর কলওয়েজি) রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর বিমানের গোলাবর্ষণ—কাতাঙ্গার তিনটি বিমান ধ্বংস—প্রেসিডেন্ট শোম্বের পলায়নের সংবাদ।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মৈত্রীর পরিবেশ সৃষ্টির আবেদন—রাওয়ালপিণ্ডি বৈঠকের শেষে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—আলোচনার ধারায় উভয় পক্ষের সন্তোষ প্রকাশ।

৩০শে ডিসেম্বর—১৪ই পৌষ : ভারতের প্রতি চীনের নূতন হুমকী : সীমান্তে একতরফা যুদ্ধবিরতি 'অনিশ্চিত'—আলোচনার পূর্ব সর্ত হিসাবে '৮ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬২) অবস্থা' গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কাতাঙ্গা হইতে প্রেসিডেন্ট শোম্বের রোডেশিয়া পলায়ন—রাজধানী সেলিসবেরীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অবস্থান —রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্তৃক কিপুশি ও কামিনা সহর (কাতাঙ্গা) দখল।

৩১শে ডিসেম্বর—১৫ই পৌষ : শান্তির দৌত্যে শ্রীমতী বন্দরনায়কের পিকিং উপস্থিতি—বিমান ঘাঁটিতে বিপুল সম্বর্ধনা—মিশনের সফলতা সম্বন্ধে মিঃ চৌ এন লাই'র (চীনা প্রধানমন্ত্রী) আশা।

প্রেসিডেন্ট শোম্বের কাতাঙ্গা প্রত্যাবর্তন—রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্তৃক এলিজাবেথভিলে কারফিউ জারী।

পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশীয় পতাকা উত্তোলিত—তিন শতাব্দীর অধিককালব্যাপী ওলন্দাজ শাসনের অবসান।

পক্ষকালের মধ্যে কঙ্গোর ঐক্য বিধানের ব্যবস্থা করার দাবী—প্রেঃ শোম্বের (কাতাঙ্গা) প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের আহ্বান।

আমেরিকা কর্তৃক স্কাইবোল্ট ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী বাতিল।

১লা জানুয়ারী (১৯৬৩)—১৬ই পৌষ : পিকিংএ মিঃ চৌ-এর সহিত শ্রীমতী বন্দরনায়কের দ্বিতীয় দফা বৈঠক—ভারতের বিরুদ্ধে চীনা প্রধানমন্ত্রীর চিরাচরিত দোষারোপ।

চীনা সৈন্যদের সে-লা (নেফা অঞ্চল) ত্যাগ (পিকিং পরিবেশিত সংবাদ)।

আব্দুল গফুর খান ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী—জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রন্টের সভায় (করাচীতে ফ্রন্ট নেতা মিঃ সুরাবর্দীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত) প্রস্তাব গ্রহণ।

২রা জানুয়ারী—১৭ই পৌষ : জাদোৎভিল সহরের (কাতাঙ্গা) দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর অব্যাহত অভিযান—যুদ্ধবিরতির জন্য প্রেঃ শোম্বের অনুরোধ।

পুনরায় শ্রীমতী বন্দরনায়ক-চৌ এন লাই আলোচনা।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

একদা রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আটান্নশ বছর আগে বারাণসীতে প্রবাসী বাঙালীরা একটি সাহিত্য সম্মেলন আহবান করেন। পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বাৎসরিক অধিবেশন বসেছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রথমনাথ তর্কভূষণ, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক্‌পালগণ সভানায়কত্ব করেছেন। ইদানীং এই সম্মেলন সর্বভারতীয় আঙ্গিকে রূপান্তরিত। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কর্ণধার এবং সর্বভারতীয় লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এমন কি সারা বিশ্বের বহু মনীষী বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। শ্রীদেবেশ দাস, ।াই সি এস, এই সম্মেলনের স্থায়ী ার্যকরী সভাপতি।

২৫শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর ৯৬২ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে ানুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী সম্মেলনে বহু ারতীয় লেখক উপস্থিত হয়েছিলেন। ূল সভাপতি ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার ট্টোপাধ্যায়, সম্মেলন উদ্বোধন করেন ীমতী কৃপালিনী। শ্রীযুক্ত মৈথিলিশরণ ুপ্ত, রামধারী সিংহ 'দিনকর', ডঃ ভাকর মাচারে, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভূষণ াশগুপ্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ শচীন সন, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, শ্রীঅক্ষয়কুমার ন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরাম চক্রবর্তী, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ আর্থার আইসেনবার্গ প্রভৃতি বভিন্ন শাখার উদ্বোধক এবং সভাপতি নর্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র াবং দিনেশ দাস কবি সম্মেলনে উপস্থিত ছলেন। সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেও একটি অনুষ্ঠান হয়। সাহিত্য শাখার সভাপতি ডঃ াশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণ-প্রসঙ্গে ালেন—"জনপ্রিয়তা এবং অর্থাগম াহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন প্রেরক হইয়া দখা দিতে পারে তেমনই অন্তরায় ইয়াও দেখা দিতে পারে। যশ এবং অর্থ র্বদাই তপস্যার অন্তরায় বলিয়া গৃহীত, ামরা আমাদের উপন্যাস এবং ছোটাল্পের ক্ষেত্রে একটি আশাপ্রদ এবং লাঘনীয় মন অধিকার করিয়াছি, এই ধিকারের পিছনে আমাদের প্রেরণা, নন, যত্ন এবং শ্রম রহিয়াছে, সাম্প্রতিক ালের অতিসুলভ যশোলাভ এবং র্থাগম-সম্ভাবনা পূর্বোক্ত তপস্যাগুলোর কোনোটাতেই যেন আমাদিগকে শিথিল া করিয়া তোলে। [illegible] উল্লেখ

অভয়ঙ্কর

করিতেছি মনে মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হইয়াছি বলিয়া, সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে পরিমাণ সম্পূর্ণ উপন্যাসের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি উহাতেই আশঙ্কিত হইয়াছি।"

ডঃ দাশগুপ্তের অভিভাষণ নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ভাষণে নূতন চিন্তা এবং সাহসিক সতর্কবাণীর উপস্থিতি প্রশংসনীয়। তবে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেছেন, "আমাদের অনুবাদে কয়েকখানি উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই নাই।"—এই উক্তি ভ্রান্ত, তিনি কয়েকটি প্রকাশকের পুস্তক-তালিকা অনুসন্ধান করলেই দেখতেন সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু দুরূহ বিদেশী গ্রন্থের সার্থক বঙ্গানুবাদ হয়েছে।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্য সমালোচক ডঃ শচীন সেন সংবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন—"কম্যুনিস্ট চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। এই সংঘাতে ভারতবর্ষে এক নতুন মাতন দেখা দিয়েছে। শত্রু আমাদের প্রতারণা করেছে, এতে হয়ত বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু শত্রুর নিকট স্বাধীন ভারত পরাজয় স্বীকার করবে না—এ

প্রতিজ্ঞায় আমরা আজ সবাই আবদ্ধ, তাই ভারত-চীনের সংঘর্ষ, এই তথ্য ভারতের কাছে নতুন সত্য বহন করে এনেছে।" প্রায় সকল সভাপতির ভাষণেই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ধরণের বাণী প্রতিধ্বনিত। জাতীয় জীবনের সংকটে সমগ্র সাহিত্যিক-সমাজ আজ সচেতন. জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সাহিত্যিকের সর্বাধিক।

কবি সম্মেলনের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিরা যোগদান করেন। অধিবেশনের পর প্রতিনিধিবৃন্দ গোরক্ষপুরের দর্শনীয় স্থানসমূহ যথা কবীরের সমাধি মগহর, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণক্ষেত্র কুশীনগর, যোগীগুরু গোরক্ষনাথের মন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

ভারতে শক্তিসাধনা (আ লো চ না)
—অমূল্যনাথ চক্রবর্তী। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শক্তিসাধনার স্থান অত্যন্ত উঁচে। এই শক্তিসাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ভারতীয় সাধনপদ্ধতিতে শক্তিসাধনার ধারা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বৈদিক সভ্যতার সুবর্ণ যুগ থেকে তান্ত্রিক-সংস্কৃতির উন্মেষকাল পর্যন্ত বিস্তৃত সাধনার ধারায় শক্তিসাধনার অসামান্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান গ্রন্থকার শক্তিসাধনার ইতিহাস রচনায় একটি পরিশ্রমসাধ্য মূল্যবান কাজ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে, উপনিষদে, বিভিন্ন পুরাণে; রামায়ণে, মহাভারতে, বৌদ্ধ-হিন্দু-জৈন তন্ত্রশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব মতে শক্তিসাধনার স্থান গ্রন্থকার নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। শক্তিসাধকদের জীবন বৃত্তান্ত, শক্তিসাধনার পদ্ধতি ও নানা রূপ এবং ইতিহাস সযত্নে বর্ণিত। গ্রন্থকার প্রাচীন ও আধুনিক মতকে গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়ে সমগ্র বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রক্ষা করেছেন। লেখকের ভাষা সরল এবং সহজবোধ্য। শক্তিসাধনার ন্যায় একটি দুরূহ বিষয়কে গ্রন্থকার যেরূপ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ্যে বর্ণনা করেছেন তা যেমন সাধারণ পাঠকের উপযোগী তেমনি গ্রন্থকারের বর্তমান বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানই সুপ্রমাণিত করে।

আমার ঘরের আশেপাশে—(প্রবন্ধ) ডঃ তারকমোহন দাস। রূপা। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থের কিছু অংশ যখন 'যুগান্তর' সাময়িকীতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থের আকারে লেখাগুলো হাতে পাবার পরে বোঝা গেল, শুধু এই একটি গ্রন্থের জন্যেই গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে, বাংলাভাষায় এ-ধরনের বিজ্ঞানের বই যতো বেশি প্রকাশিত হবে ততোই আমরা দেশগঠনের দিকে এগিয়ে যাব। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। কারণ এই বইটি পড়ার পরে আমরা আমাদের ঘরের আশেপাশের জগৎকে নিবিড়ভাবে চিনতে পারি ও ভালোবাসতে পারি। এই চেনা ও ভালোবাসা থেকেই তো আরো ভালোভাবে গড়ে তোলার প্রেরণা আসে।

বইয়ের নামপত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি আছে। তার প্রথম লাইনটি এই : "আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল।" এখনকার ব্রস্ত-ব্যস্ত নাগরিক জীবনের দিন-পরিক্রমায় এই বোবা-বন্ধুদের ডাক কিন্তু আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কলকাতার যে-ময়দানের পাশ দিয়ে আমাদের দু-বেলা যাতায়াত, আমরা কি খবর রাখি সেই ময়দানে "বট ও অশ্বত্থের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সবুজ আলোছায়ার কুহেলী রচনা করে আছে এখানে দেবদারু, কনক চাঁপা, শিমুল, শিশু, জংলী বাদাম, নিম, নিশিন্দা, হিজল, তুন, সেগুন, কুসুম, পলাশ, শিরীষ, গুলমোহর, কর্ণিকার, হরীতকী, অর্জুন, বয়ড়া, জিয়ল, আম, নানা জাতের বাবলা, ঘূর্ণিফল, কালকাসুন্দা প্রভৃতি গাছ"? আমরা কি খবর রাখি : "সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্মবীজের আয়ুষ্কাল নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কয়েকজন জাপানী বৈজ্ঞানিক প্রথমে বলেন যে, তাঁরা দেখেছেন প্রায় দশ-বিশ হাজার বছরের পুরানো, মাটির তলায় চাপা-পড়া পদ্মের বীজ আবার জল, বায়ু ও উত্তাপের স্পর্শে অঙ্কুরিত হতে পারে। সেদিন অনেকেই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়া হ্রদের তলা থেকে ৪০—৫০ হাজার বছরের পুরানো কয়েকটি পদ্মবীজ পাওয়া গেছে, বীজের খোসাগুলি ফসিলে পরিণত হয়েছিল। এই ফসিলের বৈশিষ্ট্য ও মাটির তলায় অবস্থানের খুঁটিনাটি বিবরণ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এদের প্রাক্-ঐতিহাসিক বয়স সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে এই বীজগুলি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল পার্কে এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অঙ্কুরিত করবার চেষ্টা হয়। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। প্রায় ৪০—৫০ হাজার বছরের নিদ্রাভঙ্গ করে অবশেষে পদ্মের ভ্রূণ আবার বীজ থেকে বেরিয়ে বিকশিত কিশলয়ে সূর্যের আলো পান করছে। এমনি অজস্র জ্ঞাতব্য তথ্যে বইটি সমৃদ্ধ। এমন কি আমাদের অতি-পরিচিত আম গাছ সম্পর্কেও যে কত খবর জানবার আছে তা এই বইটি পড়ে জানা যায়। বইয়ের সঙ্গে একটি মূল্যবান ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে।

বইটির বহুল প্রচার হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তবে, ১১৪ পৃষ্ঠার বইয়ের মূল্য পাঁচ টাকা ধার্য হবার ফলে বহুল প্রচার কিছুটা বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে হয়। প্রকাশক অনায়াসেই বইয়ের বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠবের (বিশেষ করে বাঁধাইয়ের) খরচ কিছু কমিয়ে বইটির দাম কমাতে পারতেন। সাধারণের জন্য লেখা বিজ্ঞানের বইয়ের দাম যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয় তাহলে বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

চীনের ড্রাগন —(প্রবন্ধ)—ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ। বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো। কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'চীনের ড্রাগনের' লেখক বঙ্গদেশীয় না হলেও বাংলা রচনায় পারদর্শী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 'রোমাঞ্চকর রাশিয়া' লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। আলোচ্য গ্রন্থটি কিছুকাল আগে একটি দৈনিক পত্রের রবিবারের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। লেখক গ্রন্থটির সূচনায় ১৯৫৯-এর ১৪ই নভেম্বর নেহরুর জন্মদিনে চীনারা যে নয়জন মৃত ভারতীয় সৈনিকের দেহ ভেট পাঠিয়েছিল সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ডঃ সিংহ ভারতের উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। চীন-ভারত সমস্যাকে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আলোচনা করা ছাড়া ডঃ সিংহ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছেন। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে 'এশীয় মরুপথের দ্বন্দ্ব' প্রসঙ্গে 'ভারতে সিংকিয়াংয়ের কমিনফর্ম' ও 'সিংকিয়াংয়ে বিদ্রোহ' পরিচ্ছেদ দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ডে 'হিমালয় প্রতিরক্ষা' বিষয়ে আলোচনা আছে। 'হুনজা-গিলগিট গিরিবর্ত্মে', 'ড্রাগনের থাবায় নেপাল', 'ব্রহ্মপুত্রের বাঁকে' প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে অনেক নূতন তথ্য আছে। ডঃ সিংহ বলেছেন—"১৯৫০-এ তিব্বত অভিযানে বেরিয়ে চীনা সৈন্যরা

প্রথম হিমালয়ের চেহারা দেখে। আলো-মুখীন অন্ধকারে পেরোতে প্রতিরোধ-বাহিনীর দ্বারা বাধা হয়। তখন মরীয়া হয়ে চীনারা দক্ষিণের দিকে পথ খোঁজে। বেরিয়ে আসার একটা সহজ পথ ভারতীয় মানচিত্র থেকে তারা খুঁজে পায়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চারটি বিভাগ দখল করে নিতে পারলে ভূটান সীমান্তে পৌঁছাতে পারবে, তারপর তোয়াং দিয়ে তিব্বত এবং লাসায় পৌঁছানো যাবে। এই পথের হদিশই নেফার উপর চীনা-দাবির জন্ম দেয়।"

ডঃ সত্যনারায়ণের সঙ্গে সকলে এক-মত না হলেও তাঁর এই গ্রন্থটির মধ্যে পরিবেশিত প্রচুর তথ্য এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ চিন্তাশীল পাঠককে 'চৈনিক ড্রাগ ন'র নন্দন লালসার একটা সুস্পষ্ট ধারণা নির্ধারণে সাহায্য করবে। বর্তমান কম্যুনিষ্ট নেতাদের 'কম্যুনিজম' মন্ত্রে কিভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা হয়েছে এবং মস্কো কমিনফর্ম এবং পিকিং কমিনফর্মের সংঘাত ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

প্রতীচ্য মধ্যযুগ ও দান্তে অ্যালিগিএরি— চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থকার কর্তৃক ৬৯৮এ, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলিঃ-৩৩ থেকে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

সমকালের পটভূমিকায় এবং ইউ-রোপীয় অন্য মহৎ কবিদের সঙ্গে তুলনায় দান্তে অ্যালিগিএরি-র কাব্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ এপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বেশী হয়নি। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় নিজে কবি এবং কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। পেগ্যানিজম্ থেকে ক্রিশ্চিয়ানিজম্-এর বিবর্তনকালে কবি দান্তের আবির্ভাব, প্রতীচ্যে মধ্য-যুগের সূচনা এবং সেক্সপীয়র, মিল্টন ও গ্যোটের কবিধর্মের সঙ্গে দান্তের কবিপ্রকৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ— এই সমস্তই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চঞ্চলবাবু আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে, মধ্যযুগের ইউ-রোপীয় অগ্রধারাগুলিকে আমরা যেন চলচ্চিত্রের মতই মানসলোকে অবলোকন করি। পৃষ্ঠাসংখ্যা অল্প হলেও তথ্যের দিক থেকে বইটি অত্যন্ত মূ:

এপিডেমিক—(উ প ন্যা স)—সুনীল-কুমার ঘোষ। প্রকাশক—বসু-চৌধুরী। ৬৭-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সুনীলকুমার ঘোষ রচিত কয়েকটি সুন্দর গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর রচনার মধ্যে আছে আকর্ষণ এবং [illegible]। 'এপিডেমিক' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস, প্রথম উপন্যাস 'মারমেরাইট' সমাদৃত হয়েছে। 'এপিডেমিক' উপন্যাসটি নানা কারণে উল্লেখনীয়, যে বিষয়বস্তু এই উপন্যাসের উপজীব্য তা নিয়ে ইতিপূর্বে আর কোনো উপন্যাস রচয়িতা পরীক্ষা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই, অথচ সমাজের বুকে ধর্মের নামে অনেক অবাঞ্ছিত মিশন গড়ে উঠেছে যেখানে ধর্ম ছাড়া আর সবই ঘটে থাকে। সদানন্দ-দেবের আশ্রম আনন্দধামে এলেন রথীন ডাক্তার, আশ্রমে কোয়ার্টার নেই, ডাক্তারখানাও নেই, অথচ দেশ বিদেশের সম্ভ্রান্ত অতিথি অনেকে আসেন, ডাক্তার তাই চাই। সেখানে দেখা পাওয়া গেল শীলার লম্বা দোহারা পরিচ্ছন্ন চেহারা। সে আশ্রমের রাঁধুনী। আনন্দ মহারাজের ট্রাজেডি, তারাদাসের কথায় প্যাঁচ নেই প্যালিস আছে, রজনী কম্পাউণ্ডার, মিঃ তালুকদার ও তাঁর কন্যা সুকন্যা, মহাভারত বিলাসী মিঃ ব্যানার্জি প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং নিখুঁত। মিঃ চৌবেকে আশ্রমকর্তৃপক্ষের সাহায্য করার চেষ্টা, তাঁর তথাকথিত স্ত্রীর সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু সবই আশ্চর্য বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। শীলা চরিত্রটি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে, তাই শেষ পৃষ্ঠায় জীপের দরজা খোলার সঙ্গে যখন শীলার কোমল স্পর্শ রথীনের অঙ্গে লাগে তখন পাঠকও আনন্দিত হয়। সুনীলকুমার ঘোষের কাহিনী পরিবেশনের পদ্ধতিতে মৌলিকত্ব আছে। 'এপিডেমিক' তাই উপন্যাস হিসাবে সার্থক ও সুন্দর হয়েছে।

চীনের নাম বিষ (সংকলন)—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৭৪, লেকভিউ রোড; কলকাতা—৩১। দাম পঁচিশ নয়া পয়সা।

এক জাতি এক প্রাণ (সংকলন)— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। দাম পঁচিশ নয়া পয়সা।

'ফেসিং দি ড্রাগন' (সংকলন)— রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সাম্প্রতিক চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত কবিগণের লিখিত প্রতিরোধাত্মক বা দেশপ্রেমমূলক কবিতার সংকলন। তিনটি পুস্তিকাই সম্পাদনা করেছেন শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙলার কবিগোষ্ঠীর এই অগ্রণী ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। "তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত এই ধিক্কার-ধ্বনি আজ প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি-ধ্বনিত হোক!"

'চীনের নাম বিষ' ও 'একজাতি এক-প্রাণ' সংকলন দুটিতে যাঁদের কবিতা আছে—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অতীন্দ্র মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

'ফেসিং দি ড্রাগন'-এ যাঁদের কবিতা সংকলিত ও অনূদিত হয়েছে—প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, অতীন্দ্র মজুমদার, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিশু রঙমহলে

"পৃথিবীতে স্বর্গ যদি থাকে, তবে তা' এখা নই, এখানেই, এখানেই"—এই কথাটাই ফিরে ফিরে মনে হয়েছে দেশপ্রিয় পার্কে শিশু রংমহলের একাদশ বার্ষিক উৎসব-প্রাঙ্গণে গি.য়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ, তাদের হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি, তাদের নানা রঙের সাজ-পোশাক এবং মঞ্চের ওপর তাদেরই ভাইবোনেদের নাচ-গান-অভিনয় দেখে তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস যতক্ষণ দেখেছি, ততক্ষণ ভুলে থেকেছি এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কঠিন কঠোর বাস্তব জীবনের কথা। এই উৎসব-মেলায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু এই আসরের পুরো-ভাগে যাদের জন্যে প্রশস্ত আসন বিছানো ছিল, তারা হচ্ছে ঐ অনাবিল আনন্দেরই প্রতীক ছেলেমেয়েরা, যাদের

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দেখে নতুন ক'রে মনে পড়ে, "ঈশ্বর তাঁর নিজের ছাঁচেই মানুষকে গড়েছেন।" শিশু রংমহলের উৎসব প্রধানতঃ শিশু-দের জন্যেই, এ-কথাটা উৎসবের বয়স্ক কর্মকর্তারা কোনো দিনই ভোলেন না ব'লেই উৎসব-গৃহের সবচেয়ে ভালো জায়গাটা তাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকে এবং তাদের জন্যে প্রবেশমূল্যও সবথেকে কম।

কিন্তু প্রধানতঃ শিশুদের জন্যে হ'লেও বড়োরা কি এই উৎসবসূচীগুলি থেকে কম আনন্দ পান? 'অবন পটুয়া', 'মিঠুয়া', লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'কাঠ-ঠোকরা', 'লাল্‌চে বুড়ো', 'ভারত-গাথা' প্রভৃতি পালা দেখে কি ভেবে অবাক লাগে না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোন্‌ সোনার কাঠির পরশ পেয়ে এমন নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠেছে? কি অপরূপ তাদের নৃত্যছন্দ, কি বিচিত্র সাজসজ্জা, দৃশ্যপট পরিকল্পনা কি আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচায়ক, আলোর খেলা কি মায়াময় এবং সুর-যোজনা কি অভাবনীয় দক্ষতার নিদর্শন! মিঠুয়া ছিল বা 'ভারত-গাথা'তে ছোট ছোট মেয়েদের যে অনায়াস ভঙ্গিতে কথক বা ভরতনাট্যম্‌ নাচতে দেখেছি, তা অচিন্তনীয়; মনে হয়, বহু প্রাপ্তবয়স্ক শিল্পীও তাদের কাছে হার মেনে যাবে। 'মিঠুয়া' প্রভৃতি পালায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরযোজনা তাঁর অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভার পরিচায়ক। 'ভারত-গাথা'তে (সং অব ইণ্ডিয়াতে) ভারতবর্ষকে যে-মণ্ডলসজ্জার মাধ্যমে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং যে-ভাবে নাগা নৃত্য থেকে শুরু ক'রে মণিপুরী, রাজস্থানী, কথক, সাঁওতালী, ভরতনাট্যম্‌, কথাকলি, গর্বা, বাউল প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন

[illegible]

অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে উপযুক্ত গান ও বাদ্যের সাহায্যে ভারতের জনমানসের সংস্কৃতিকে রূপায়িত করা হয়েছে এবং শেষে সকল রাজ্যকে একাত্ম হ'তে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা' লেখকের সবিশেষ মননশীলতারই পরিচয় বহন করে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সহজ ছন্দ-বোধ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাকেই জাগিয়ে তোলা সম্ভবতঃ শিশু রংমহলে'র প্রধান লক্ষ্য। এবং স্পষ্টই দেখতে পেলুম, সমবেতভাবে গতিভঙ্গি বা গ্রুপ মুভমেণ্ট শেখবার জন্যে ছেলে বা মেয়েদের খুব গুণান্বিত হওয়ার দরকার নেই, সাধারণ পর্যায়ের হ'লেই যথেষ্ট। এমন কি, সি-এল-টি'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায়ের মতে যারা কিছু মাটো ধরনের অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধিতে পিছিয়ে আছে, তাদের উন্নতির জন্যে ছন্দোময় বা রিদ্‌মিক ড্রিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ও'রা দেখেছেন, কিছুদিন রিদ্‌মিক ড্রিল এবং গ্রুপ মুভমেণ্ট শেখাবার পর মাটো, মাঝারি এবং বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।

শিশু রংমহলে ছেলেমেয়েরা খালি যে ছন্দোবন্ধ গতিভঙ্গিই শেখে তা নয়, প্রত্যেকেই নিজের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী নৃত্য, গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, অঙ্কন বা পুতুলনাচ-পদ্ধতি শিখতে পারে।
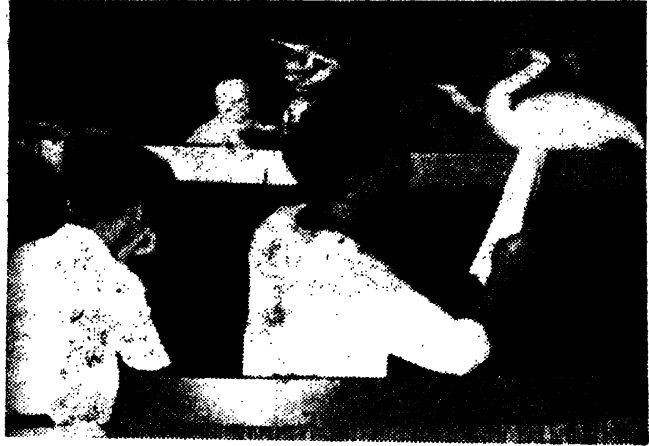
সুরেশ দত্তর কাছে ছেলেরা পাপেট চালনা শিখছে।

ছেলেমেয়েরা যখন একাগ্রচিত্তে তাদের শিক্ষাগুরু সুরেন চক্রবর্তীর নির্দেশে দৃশ্যপটের অংশবিশেষ অঙ্কন করতে মগ্ন বা সুরেশ দত্তর নির্দেশমত পুতুল-খেলার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করতে ব্যস্ত থাকে, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, আনন্দের ভিতর দিয়ে এই যে সুকুমার-কলার শিক্ষা-পদ্ধতি, এই পদ্ধতিকে সারা বাঙলার বিদ্যালয়গুলিতে গ্রহণ করা হয় না কেন? শিশু রংমহলের ছেলে-মেয়েরা এর সঙ্গে আরও যা শিখছে, সে হচ্ছে—নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞানুবর্তিতা এবং সমবেত শৃঙ্খলাবোধ এবং এই শিক্ষার বিস্তার হ'লে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আশান্বিত হ'তে পারব।

শিশু রংমহলের শিল্পীরা উৎসবের জন্য অলঙ্করণের কাজ করছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকার

রঙ্গালয়ের দর্শক :

সময়—১৯১৮ সাল। স্থান—মিনার্ভা থিয়েটার। নাটক—পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'কিন্নরী'। মিনার্ভার বিখ্যাত সখীদল নেচে-গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছে। গ্যালারীর দর্শকরা নাচ-গান দেখতে দেখতে বিড়ি টেনে চলেছেন একাগ্র চিত্তে আর মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে উঠছেন—'বাহবা, খুব্‌রে-ফিরে'। প্রেক্ষাগৃহের এখান-ওখান থেকে আহ্লাদে আটখানা হওয়ার নিদর্শন-স্বরূপ জোর শিটি—মুখের ভিতর দু' আঙুল ঢুকিয়ে তীব্র সুরেলা আওয়াজ—দেওয়াও চলছে। এবং এ ব্যাপারে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু ক'রে সম্ভ্রান্ত দর্শক পর্যন্ত কারুরই কোন আপত্তি দেখা গেল না। উৎপল-মকরী বেশে কাতিবাবু (সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়) ও চারুশীলার শ্বেত নৃত্যগীতের সময় রসালো টীকা-টিপ্পনীও বাদ গেল না। বয়েস তখন অল্পই এবং দু'চারজন দাদা-স্থানীয়দের সঙ্গে আট আনার টিকিটের গ্যালারীতেই বসেছিলুম। বিড়ির ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দূরের রঙ্গমঞ্চের দিক নিরীক্ষণ ক'রে জায়গাটাকে স্বর্গরাজ্য ব'লেই মনে হচ্ছিল। এবং সখিগুলিকে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী পরী ব'লেই ভ্রম হচ্ছিল। পরে ভেবে দেখেছি, ও-যুগে থিয়েটারকে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের আনন্দ-নিকেতন বলেই গণ্য করা হ'ত। কাজেই যত না সামাজিক নাটক অভিনীত হ'ত, তার চেয়ে বেশী অভিনীত হ'ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং গীতি-নাটক বা অপেরা। এ ছাড়া সামাজিক নাটকের পরেও একখানি এক বা দেড় ঘন্টার গীতিনাট্য অভিনয় করার রেওয়াজ ছিল। তাই সে যুগের থিয়েটারের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল সখিসংঘ এবং বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে মিনার্ভা থিয়েটারেরই নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু আজ? বাঙলার থিয়েটার থেকে সখিসংঘ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত। আজ বাঙলা থিয়েটারে অভিনীত হয় সামাজিক নাটক—গার্হস্থ্য নাটকও আমরা সামাজিক নাটকের গোষ্ঠীভুক্ত করি—এবং মাত্র সামাজিক নাটক। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং গীতিনাট্য দেখবার প্রবণতা আজকের নাট্যরসিক দর্শকদের মধ্যে আছে কিনা, তা সহজে বোঝবার উপায় নেই। অবশ্য সময়ে সময়ে সৌখীন বা আধা-সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় নৃত্যনাট্যের আয়োজন করলে সে-আসরে দর্শকদের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাতে মনে হয়, নৃত্যগীতের প্রতি আমাদের অরুচি নেই এবং যদি কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ একখানি অপেরাকে আধুনিক যুগোপযোগী ভাবে মঞ্চস্থ করাতে পারেন, তা'হলে তাঁকে লোকসানের ভাগী হ'তে হবে না।

অবশ্য আজকের দিনে যাঁরা রঙ্গালয়ের দর্শক, সে-যুগের দর্শক থেকে তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে পৃথক শ্রেণীর লোক। সে-যুগের গ্যালারী বা পিটকে (আট আনা এবং এক টাকার আসন) যাঁরা বিড়ি বা হাওয়া-গাড়ী সিগারেটের (এক প্যাকেটের দাম ছিল সম্ভবতঃ এক আনা) গন্ধে আমোদিত রাখতেন, তাঁরা আজ স্থান পরিবর্তন ক'রে হিন্দী ছবির এবং কখনও-সখনও এক আধখানা বাঙলা ছবির দর্শক হয়েছেন। আজ বাঙলা থিয়েটারের দর্শকের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য বললেও চলে এবং মোটা-মুটি শিক্ষা শতকরা অন্ততঃ আশি-জনেরই আছে ব'লে মনে হয়। তাই দর্শকরুচি আজ যথেষ্টই উন্নত। তা নইলে 'ট্রেন-দৃশ্যের' চমক সত্ত্বেও 'সেতু' নাটক খণ্ডিত মাতৃত্বের কাহিনী দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ ক'রে রাখতে পারত না বা খাদের মধ্যে জলোচ্ছ্বাসের ভেল্কী সত্ত্বেও শ্রমিকের বঞ্চনার ইতিহাস-সর্বস্ব 'অঙ্গার' দর্শক আকর্ষণ করতে অসমর্থ হ'ত। দর্শকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রুচিও হয়েছে উন্নত, দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে পরিবর্তিত, নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁরা নাটকই দেখতে চান এবং নাটকের সুষ্ঠু পরিবেশন মারফৎ আনন্দ পেতে চান, নর্তকীদের বিশেষ ভঙ্গী সহকারে নৃত্য-গীত দেখে স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ' হ'তে চান না। আজকের দিনের রঙ্গালয়ের দর্শককে খুশী করা রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই সমস্যার বিষয়।

মুখোশ অভিনীত "সৈনিক" :

গেল রবিবার, ৬ই জানুয়ারী থেকে দক্ষিণ কলিকাতার থিয়েটার সেন্টার-এ মুখোশ সম্প্রদায় ধনঞ্জয় বৈরাগী-রচিত 'সৈনিক' নামে নতুন দেশাত্মবোধক নাটকটির অভিনয় শুরু করেছেন।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত ও বিনু বর্ধন পরিচালিত 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রাবর্মণ।

ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা হামলার ফলে সারা দেশে যে আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই নতুন নাটকখানির মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ শান্তির সময়ে রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া ও লড়াই করি না কেন, আজ হানাদার চীনের মোকাবিলা করবার জন্যে সমস্ত আদর্শের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকেই দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যে তা না করবে, সে হচ্ছে দেশের শত্রু এবং তাকে কোনো অজুহাতেই রক্ষা করা চলবে না। 'সৈনিক' নাটকের নায়ক প্রাক্তন মেজর তাই সকলের যিনি বিচার করেন, সেই বিচারকের উদ্দেশে বলছেন ঃ "আমি অন্যায় করেছি। আমার ছেলে দেশদ্রোহী জেনেও আমি তাকে প্রাণে না মেরে মাত্র তার পায়ে গুলী করেছি। হে বিচারক, আমাকে শাস্তি দাও।"

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বোঝা যায়, মেজরের একমাত্র সন্তান প্রবীর তার ভিন্নাদর্শের বন্ধু অরিন্দম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এও বোঝা কঠিন নয় যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত একদিন উত্তাল হয়ে উঠে একটি চরম নাটকীয় সঙ্কটের সৃষ্টি করবে। যে মেজর প্রথমে উত্তর সীমান্তের ঘটনাকে মাত্র একটি সীমান্ত-সংঘর্ষ মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, তিনি যেদিন শুনলেন শত্রুর গুলীতে তাঁরই বন্ধু মেজর চক্রবর্তী প্রাণত্যাগ করেছেন, সেদিন চীন সাম্রাজ্যবাদীর প্রকৃত স্বরূপ তাঁর চোখের সামনে মুহূর্তেই উদ্ঘাটিত হয়ে গেল এবং তখনই তিনি অবসরপ্রাপ্ত জীবনের সুখশান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় যথাসাধ্য সাহায্য করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। পল্লীর লোক তাঁকে পল্লীর অসামরিক প্রতিরোধ সমিতির নেতা নির্বাচন করল। কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি অন্ধ, তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁরই আদর্শে গড়া প্রবীর অন্য কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত হ'তে পারে। তাঁর বন্ধু রাজবন্দী সুধাকান্ত প্রবীরের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করায় তিনি রীতিমত রুষ্টই হয়ে ওঠেন। কিন্তু একদা নিষ্প্রদীপ রাত্রে বিপদসূচক সাইরেণের শব্দ শুনে যখন অঞ্চলের অধিবাসীদের নিরাপত্তার মহড়া দেবার সময় উপস্থিত হ'ল, তখন পিতা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র তাঁর আদর্শ থেকে বহু দূরে। তখনই তাঁর মনে হ'ল, তাঁর সন্তান প্রবীর দেশের শত্রু।

নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী নাটকের মধ্যে চমক-সৃষ্টিতে যতখানি বিশ্বাসী, ততখানি প্রস্তুতিতে নয়। তাই অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই সদ্য-পিতৃহারা মৃণাল এসে মেজরকে চীনাদের হাতে তাঁর বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে সচকিত করে তোলে এবং নিরাপত্তা সম্পর্কীয় মহড়া দেবার জন্যে নিষ্প্রদীপ রাত্রে বিপদসূচক সাইরেণ ধ্বনির পর পিতা আকস্মিকভাবেই পুত্রের ভিন্নাদর্শের বিষয় আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে
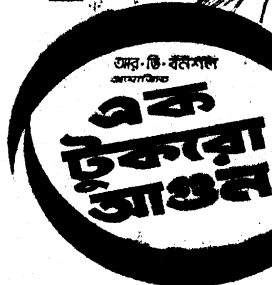
দেশশত্রুজ্ঞানে গুলী দ্বারা আহত করেন। কিন্তু নাটকীয় বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট ও বলিষ্ঠ আকারে প্রকাশের জন্যে পিতাপুত্রের সংঘাতকে আরও দীর্ঘায়িত করবার প্রয়োজন ছিল এবং আরও কিছু ঘটনা, আরও কিছু নাটকীয় উপাদান সৃষ্টি করতে পারলেই তা' সম্ভব হ'ত। নাটকে ঘটনার চেয়ে সংলাপ প্রাধান্য পেয়েছে এবং নাটক স্বচ্ছন্দগতিতে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে না গিয়ে বারংবার মোড় ফিরেছে পথের সন্ধানে।

কিন্তু অভিনন্দন জানাই তরুণ রায় প্রমুখ 'মুখোশ' সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দকে তাঁদের অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে। অনুভূতিপ্রবণ মেজরের ভূমিকায় তরুণ রায় এবং পিতার মৃত্যুতে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত প্রতিভার ভূমিকায় দীপান্বিতা রায়ের অভিনয় 'সৈনিক' নাটকের প্রধান আকর্ষণ। প্রবীরের ভূমিকায় নবাগত সমরেশ চক্রবর্তী এবং মিসেস হালদারের ভূমিকায় নবাগতা সুষমা ঘোষালের অভিনয়ে যে দীপ্তির প্রকাশ দেখলুম, তাতে প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে সুধাকান্ত, অরিন্দম, মৃণাল ও শোভনা রূপে যথাক্রমে শশাঙ্ক ঠাকুর, প্রণত ঘোষ, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী মন্ডলের অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যে সমগ্র নাটকটির ঘটনাসংস্থাপনে তরুণ রায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছেন। সুরযোজনা এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণের কৃতিত্ব যথাক্রমে তরুণ প্রসাদ ও মিলন রায়চৌধুরীর।

বহুরূপী অভিনীত "দশচক্র" :

গেল রবিবার, ৬ই জানুয়ারী সকালে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বহুরূপী সম্প্রদায় হেনরিক ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দি পিপ্‌ল' অবলম্বনে রচিত 'দশচক্র' নাটকটির পুনরাভিনয় করেছিলেন। তথাকথিত সভ্য সমাজব্যবস্থার আবর্তে পড়ে একজন সৎ হিতকামী লোক জনতা দ্বারা কিভাবে নিগৃহীত হয়, তারই বাস্তব আলেখ্য হচ্ছে 'দশচক্র'। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার তখনই সার্থক, যখন সেই প্রাপ্তবয়স্কেরা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত এবং গড্ডালিকার দলভুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা রাখে। তা না হ'লে ডেমোক্রেসি ডেমোনোক্রেসিরই নামান্তর হয়ে ওঠে—গণতন্ত্র পরিণত হয় দানবতন্ত্রে। যে নলচালিত জলসরবরাহের আকর্ষণে একটি বিরাট কলোনী গড়ে উঠেছে, কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় সেই জলে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর আবির্ভাব ঘটেছে এবং সরবরাহ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে কলোনীর জনগণের বিপদ অবশ্যম্ভাবী, এই সত্যটিকে ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না, তাঁরই দাদা সমাজের নেতৃস্থানীয় স্বার্থান্ধ অমলেন্দু গুহের প্রতিকূলতার জন্যে। শুধু তাই নয়, যাদের মঙ্গলের জন্যে তিনি চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে চাইলেন, তারাই তাদের অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাল তাঁকে
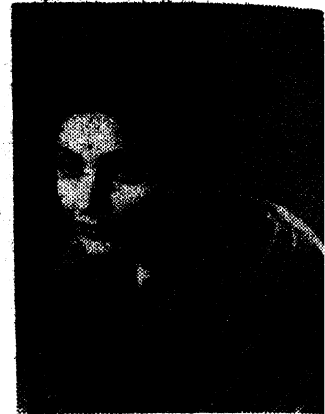
অসীম পাল পরিচালিত 'দুই বাড়ী' চি
তন্দ্রা বর্মন

লাঞ্ছিত, আহত করে। জনগণের মূর্খ
যে চরম ট্রাজেডীর সৃষ্টি করে, তার
প্রকাশে নাটকের সমাপ্তি।

নাটকের বক্তব্য তত্ত্বের ওপর প্রতি
ষ্ঠিত, তথ্যের ওপর নয়। ডাঃ গুহ ক
ছেন, পানীয় জলে অসংখ্য জীবা
ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সেগুলি মনু
দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। ডাঃ গুহে
কথাকে স্বার্থান্বেষীর কথা বলা সহ
হয়েছে স্বার্থান্ধ অপরপক্ষীয়দের
জলপানকারীর শরীরে ক্ষতির দিকে
আদৌ দেখান হয়নি বলে। যদি দে
যেত, ঐ জল পান করার ফলে জ
সাধারণের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়
কারুর কারুর মৃত্যু ঘটছে, এমন
চেয়ারম্যান অমলেন্দু গুহের পরিবারে
মধ্যেও রোগ ঢুকেছে, তাহলে উভ
পক্ষের দ্বন্দ্ব বাস্তব তথ্যের ও
প্রতিষ্ঠিত হত এবং নাটকের আবে
মাত্র মস্তিষ্কগ্রাহ্য না হয়ে সহৃদয় হৃদ
সংবেদনীও হতে পারত। কিন্তু বু
জীবীর নাটকে হৃদয় চিরদিনই উপেক্ষি
হয়ে থাকে এবং বর্তমান ক্ষেত্রেও ত
ব্যতিক্রম হয়নি। তাই অতি সংল
দ্বারা ভারাক্রান্ত নাটকটিকে অত্য
ঊষর ব'লে বোধ হয়েছে গুহ-জায়া হৈ
আকুতি সত্ত্বেও।

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে 'বহুরূ
সম্প্রদায়ের সুনাম বহুবিস্তৃত এ
'দশচক্র' নাটকের মঞ্চোপস্থাপনায়
ক্ষুণ্ন হয়নি। নাটকের অকুস্থল তিনটি
এক, ডাঃ গুহের বাড়ী, দুই, জনবা
প্রেস, তিন, ডাঃ গুহের প্রতি দরদ
ভাবাপন্নের গৃহে সভাস্থল। এই তিন
দৃশ্যকেই অপরূপ নিপুণতার সঙ্গে
একই দৃশ্যের অদলবদলের সাহা
দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া পাত্রপাত্রী
সাজসজ্জা, বিশেষ করে গুহ ভ্রাতৃদ্বয়ে

ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলী ও শম্ভু মিত্রের রূপসজ্জা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়ে সত্যাজরী ডাঃ শুভেন্দু গুহের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রকে রূপামঞ্চে মূর্ত করে তুলেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের আত্মভোলা ভাবের সঙ্গে বিশ্বাসের দৃঢ়-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তাঁর গৃহীত চরিত্রকে অপূর্বভাবে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছিল। দর্শক তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। চেয়ারম্যান অমলেন্দু গুহের ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলী একটি বলিষ্ঠ চরিত্র-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। কালীকিঙ্করের ভূমিকায় সুনীল সরকার অনায়াসেই একটি টাইপ-সৃষ্টি করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু (রাধাকান্ত), কুমার রায় (জনবাণী সম্পাদক করুণাবাবু) লতিকা বসু (হেম) এবং রমলা রায় (মঞ্জু) চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

আবহ-সঙ্গীত এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'আনন্দমঠ' ও 'দেশের ডাক' :

প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্যে এবং দেশের জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা তিন মাসের জন্যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তারই অন্যতম উদ্যম স্বরূপ তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ'-এর একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপ পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করছেন।

দশটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপটিতে নাট্যরূপদাতা শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূল সুরটি বজায় রেখে সে যুগের সন্তান-আন্দোলনের সঙ্গে বর্তমানে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছেন। আনন্দমঠের সন্তানদের শত্রুকে বর্তমানের চীনা শত্রু বলে গণ্য করতে কিছুমাত্র কল্পনার প্রয়োজন ঘটে না। এবং এইটিই নাট্যরূপদাতার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মধ্যে কিছুটা ফাঁক লক্ষ্য হলেও নাটকে রসের অভাব ঘটেনি এবং সমগ্র নাটকটি দর্শক-কৌতূহল বজায় রেখে চরম লক্ষ্যে পৌঁছেচে অনায়াসেই। বর্তমান আপৎকালে এই নাটকের বহুল প্রচার ও অভিনয় জাতির মনোবল রক্ষার জন্যে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

অনাড়ম্বর নাট্যপ্রযোজনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালকরূপে শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দৃশ্যনির্দেশক ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দও গৃহীত ভূমিকাগুলির প্রতি যথাযথ সুবিচার করেছেন। বিশেষ করে মহেন্দ্রের ভূমিকায় সতীশ লাহিড়ীর এবং শান্তির ভূমিকায় কল্পনা দেবীর অভিনয় উচ্চ প্রশংসার দাবী করে। অপরাপর ভূমিকায় শান্তি ভট্টাচার্য (সত্যানন্দ), ষষ্ঠী দে (ভবানন্দ), শচীন ভট্টাচার্য (মহাপুরুষ), নৃপেন মিত্র (জীবানন্দ) এবং সুস্মিতা দাশগুপ্তা (নিমাইমণি) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

'দেশের ডাক' হচ্ছে শিবনাথ মজুমদার রচিত একটি নৃত্য-নাটিকা। গান ও নাচের মাধ্যমে সীমান্ত-রক্ষীদের ওপর চীনা-শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ, তার ফলে দেশের মধ্যে জনজাগরণ এবং
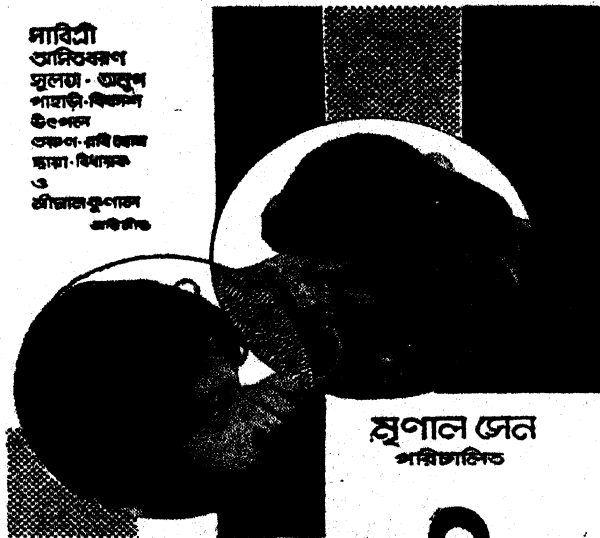
কালোবাজারী ও দেশদ্রোহীদের স্বরূপ-প্রকাশ প্রভৃতিই এই নৃত্যনাটিকার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। অতীনলালের পরিচালনায় শিল্পীরা নৃত্যে যেমন আশানুরূপ পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, কন্ঠসংগীতে—বিশেষ করে সমবেত সংগীতে তেমন দক্ষতা প্রত্যক্ষগোচর হ'ল না। কয়েকজন শিল্পীর মুদ্রাদোষ দৃষ্টিকটু। এবং নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে যে বীররসের অবতারণার প্রয়োজন, তার সমূহ অভাবই লক্ষ্য করলুম।

আজ শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী দু'খানি বাঙলা এবং একখানি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। বাঙলা ছবি দু'খানির মধ্যে একখানি হচ্ছে অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে মৃণাল সেন পরিচালিত এবং সাবিত্রী, সুলতা, অসিতবরণ, অনুপকুমার, পাহাড়ী, বিকাশ, শ্রীমান কুনাল প্রভৃতি অভিনীত অভ্যুদয় ফিল্মস-এর 'অবশেষে'। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর-সমৃদ্ধ এই ছবিখানি স্কাপস ফিল্মস-এর পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। দ্বিতীয় বাঙলা ছবিখানি হচ্ছে আর ডি বনশল প্রযোজিত এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে বিনু বর্ধন দ্বারা পরিচালিত 'এক টুকরো আগুন'। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, পাহাড়ী, তন্দ্রা বর্মণ, অনুভা গুপ্ত, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনীত, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা সুর-সংযোজিত এবং আর ডি [বি] অ্যান্ড কোম্পানী পরিবেশিত এই ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে শ্রী, লোটাস, ইন্দিরা ও অপরাপর ছবিঘরে।

*

যে টেকনিকালার ও স্কোপ পদ্ধতিতে তোলা বিরাট হিন্দী ছবিখানি আ[জ] ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, বীণা, বসুশ্রী, কৃষ্ণা ও অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সেখানি হচ্ছে মেহবুব প্রোডাকসন্স-এর 'সন অব ইণ্ডিয়া'। ছবিখানির পরিচালনা, সংগীত পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে মেহবুব, নৌশাদ এবং ফরদু[ন] ইরাণী।

মেহবুব প্রোডাকশনের 'সন অব্ ইণ্ডিয়া' চিত্রে কুমকুম ও সাজিদ।

রঙমহলে 'কথা কও' :

কাল শনিবার, ১২ই জানুয়ারী র[ঙ]মহলে শান্তিনিকেতনের বিনয় ভব[নের] অধ্যক্ষ সুনীলচন্দ্র সরকার লিখিত ন[তুন] নাটক 'কথা কও'-এর উদ্বোধন-র[জনী।] নাটকটির মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলো-নিয়ন্ত্রণ ও শব্দপ্রক্ষেপণে আছেন যথাক্র[মে] অমলেন্দু সেন, অনিল সাহা ও প্রভ[াত] হাজরা। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্র[হণ] করবেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবর[ণ,] সবিতাব্রত দত্ত, রবীন মজুমদার, হরি[ধন] মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, সত্য বন্দ্যো-পাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, অজিত চট্টো-পাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ[া] চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা [...] এবং সরযূবালা।

জ্যোতি সিনেমায় 'দি অ্যালামো' :

জন ওয়েন প্রযোজিত ও পরিচা[লিত] এবং জন ওয়েন, রিচার্ড উইডমাক, লরেন্স হার্ভে, রিচার্ড বুন এবং [লি]ন্ডা ক্রিস্টাল অভিনীত টড-এও ৭০ মি[লি]মিটারে তোলা ছবি 'দি অ্যালামো' [এই] শুক্রবার ১১ই জানুয়ারী থেকে জো[তি] সিনেমায় মুক্তি পাচ্ছে। ২ ঘণ্টা [...] মিনিট স্থায়ী এই সুদীর্ঘ ওয়ে[স্টার্ন] ছবিখানিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর গো[ড়ার] দিকে মেক্সিকোতে টেক্সাস যু[দ্ধের] সময়ে ১৮৫ জন অসমসাহসিক [...] শিক্ষিত সৈন্য কিভাবে ৭০০০ সৌ[ন্য] বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি [...] মিশনকে রক্ষা করবার জন্যে [...]

চেষ্টা করেছিল, তারই রোমহর্ষক কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

দক্ষিণী'র বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান ঃ

আসচে রবিবার, ২০এ জানুয়ারী সকাল ১০-৩০টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। মণিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম পদ্ধতির বিভিন্ন নৃত্যাংশ ছাড়া নৃত্যের আঙ্গিকে 'ভানু সিংহের পদাবলী' পরিবেশিত হবে। আদিত্যসেনা রাজকুমার ও নন্দিতা রায় নৃত্যাংশ এবং অমল নাগ সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করবেন।
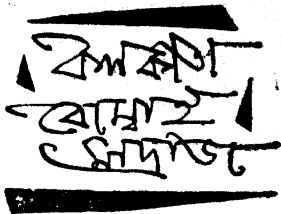
কলকাতা

গত শনিবার টেকনিসিয়ান স্টুডিওর নতুন ফ্লোরে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'মহানগর' ছবির প্রথম কাজ আরম্ভ করলেন। নরেন্দ্র মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্প অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা করছেন শ্রীরায়। সহকারী পরিচালনায় রয়েছেন শৈলেন দত্ত, অমিয় সান্যাল ও গিরীশরঞ্জন। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন সুব্রত মিত্র। সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দুলাল দত্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও দেবেশ ঘোষ। রূপসজ্জায় অনন্ত দাস। ব্যবস্থাপনায় অনিল চৌধুরী ও ভানু ঘোষ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় রয়েছেন আর ডি বনশাল।

সুশীল ঘোষ পরিচালিত স্বস্তিকা ফিল্মসের 'পলাশের রঙ' সমাপ্তির পথে। সম্প্রতি শ্রীঘোষ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর কাহিনীর কয়েকটি প্রধান দৃশ্য গ্রহণ করলেন। শিল্পনির্দেশক গৌর পোদ্দার নির্মিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে আপন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে জন্মদিনের একটি দৃশ্যে আলোকমালায় সজ্জিত নৃত্যমঞ্চ ও কয়েকটি অঙ্কিত ছবি দর্শনীয় হয়েছিল। সেদিনের নৃত্যশিল্পী ছিলেন জহর রায়। রাণী বিশী রচিত এ ছবির প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, বঙ্কিম

ঘোষ, কমল মিত্র, সুতপা মজুমদার, জহর রায়, অঞ্জনা নাগ, আভা মণ্ডল ও চিত্রিতা মণ্ডল। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি বালসারা।

শিল্প ভারতীর 'স্বর্ণচোরা' মুক্তি প্রতীক্ষিত। বনফুল রচিত এটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব শেষ করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এ ছবির জন্য তিন জায়গায় গান করেছেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান-

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্ররূপায়িত ও মৃণাল সেন পরিচালিত, অভ্যুদয় ফিল্মসের 'অবশেষে' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান কুণাল

গুলি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নায়ক-নায়িকার দুটি মধুর চরিত্রে রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায়, গীতা দে, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কুশলী বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, সুবোধ রায় ও প্রসাদ মিত্র। ছবিটি পরিবেশনা করবেন সিনে ফিল্মস।

আলোকচিত্রমের 'দুই বাড়ী' ছবিটিও মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। শৈলেশ দে-র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অসীম পাল। চিত্রগ্রহণ করেছে কানাই দে ও মনীশ দাশগুপ্ত কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছে অনিল চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন, পাহাড় সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রা গীতা দে, অনুপকুমার, মিতা চট্টোপাধ্যা জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলস চক্রবর্তী, জীবেন বসু ও মণি শ্রীমানি সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন।

বোম্বাই

রাওয়াল ফিল্মসের প্রণয়মধুর ছ 'দিল হি তু হায়' দ্রুত সমাপ্তির পা যুগ্মভাবে ছবিটি পরিচালনা করছেন এল সন্তোষী ও সি এল রাওয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন রা কাপুর ও নূতন। পার্শ্বচরিত্রে অভি করছেন প্রাণ, আগা, নাসির হোসে লীলা চিটনীস ও সবিতা চ্যাটার্জি সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রোসন।

সম্প্রতি পুষ্প পিকচার্সের রা ছবি 'তাজমহল'-র বহির্দৃশ্য গৃহীত আগ্রা ও আজমলের বিভিন্ন অংশে। কে নদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত ও এম সা পরিচালিত এ ছবির ভূমিকায় অভি করেছেন বীণা রাই, প্রদীপকুমার, জব রেহমান, বীণা, মিনু মমতাজ ও হেলে সাহির রচিত গানগুলির সুর স করেছেন রোসন।

বিমল রায় পরিচালিত 'ভাইজান' 'বন্দিনী'-র কাজ শেষ হয়েছে। এর তিনি দিলীপকুমারকে নিয়ে 'সর ম্বোলা' করবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। বর্তমানে তিনি স্বামী বিবে নন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে একটি দৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্র পরিচালনা কর

স্বামীজির জীবন অবলম্বনে। এই সংগে তাঁর পরবর্তী ছবি 'মহাভারত' এবং 'সরলা'-র চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করছেন।

মাদ্রাজ

জেমিনীর পরবর্তী ছবি 'গ্রাহস্তি' শীঘ্রই মুক্তি পাবে। এস এস ভাসান প্রযোজিত ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী এটির জেমিনী স্টুডিওর প্রোডাকসন নং ৩৩। শ্রীভাসান তাঁর কুশলীদের চার মাসের বোনাস দেবার মনোস্থির করেছেন।

নায়ক পি এস ভিরাপ্পা প্রযোজক হয়েছেন। 'আলয়ামানি' ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিবাজী-গণেশন, সরোজাদেবী, রাজেন্দ্রনাথ, বিজয়কুমার, এম আর রাধা ও পি এস ভিরাপ্পা স্বয়ং। জি বালাসুব্রামানিয়ম রচিত এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন বিশ্বনাথ রামামূর্তি।

—চিত্রদূত
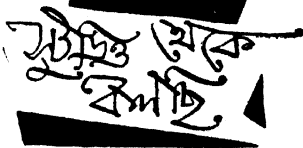
একটা সম্পূর্ণ ছবির শেষ কাজটুকু এডিটিং-টেবিল আর ল্যাবরেটারীর শোধন-ধাপে পরিসমাপ্তি ঘটে। টালি-গঞ্জের নিউথিয়েটার্স স্টুডিওর এক অংশে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী এখন সবচেয়ে ব্যস্ত শোধনাগার। তারপর বেঙ্গল ফিল্ম এবং অন্যান্য। এখানকার সমাপ্তপ্রায় একটি ছবির নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তরায়ণ'। অগ্রদূত পরিচালিত 'নবদিগন্ত'-র পর এ ছবিটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষিত। এ ছবি সম্পর্কে আপনাদের কিছু খবর জানিয়ে রাখি।

ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে পরশমল-দীপচাঁদ নিবেদিত ও অগ্রদূত পরিচালিত 'উত্তরায়ন'-এর কুশলী বিভাগের নাম আগে বলে রাখি। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় অগ্রদূত। চলচ্চিত্রায়নে বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ। শব্দানুলেখনে যতীন দত্ত। গীতিকার শৈলেন রায়। চিত্র-সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশক বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি ও সত্যেন রায়চৌধুরী। সংগীত-পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থা-পনায় নিতাই সিংহ ও রমেশ সেনগুপ্ত।

স্থিরচিত্রগ্রহণে এডনা লরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ। প্রচার পরিচালনায় সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রকাহিনীর সংক্ষিপ্ত গল্পাংশটি বলছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগেকার একটা ঘটনা। আরতির সংগে প্রবীরের পরিচয়টা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত বলা চলে। কলেজের ইউ-নিয়নের এক ইলেকসন ছিল। কলেজ থেকে খেদিয়ে দেওয়া ছেলে সুব্রত অপর দলের পাণ্ডা হয়ে আরতিকে অপমান করে বসে। সেই সময় সুব্রতকে উপ-যুক্ত শিক্ষা দিয়ে আরতিকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করে প্রবীর। সহরের ধনী শিল্পপতি অমৃত সেনের মেয়ে আরতি প্রবীরকে বাড়ীতে এনে বাবার সংগে এর পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিচয়ের সূত্র ধরে আসা-যাওয়ার মাঝখানে আরতি-প্রবীরের ভালবাসা দানা বাঁধে।

এই সময় হঠাৎ জাপানে যুদ্ধ নামলো। মিঃ সেনের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য জাপানে ছিল। হঠাৎ বন্ধ হয়ে সর্বস্বান্ত হন মিঃ সেন। অন্যদিকে লণ্ডনের বিমান-হানায় একমাত্র ছেলে রথীনের মৃত্যু সংবাদে মিঃ সেন শয্যা নিলেন। এই অভাবের দিনে প্রবীর এঁদের জন্য অনেক করলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সাহায্য আর কাজে লাগলো না। সামরিক বিভাগের ডাকে যুদ্ধে যেতে হয় প্রবীরকে। বিদায়ের সেই দিনটি বড়ই মর্মস্পর্শী। অশ্রু-সজল চোখে আরতি প্রতিশ্রুতি দিল প্রবীরকে—'সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকবো তোমার পথ চেয়ে।'
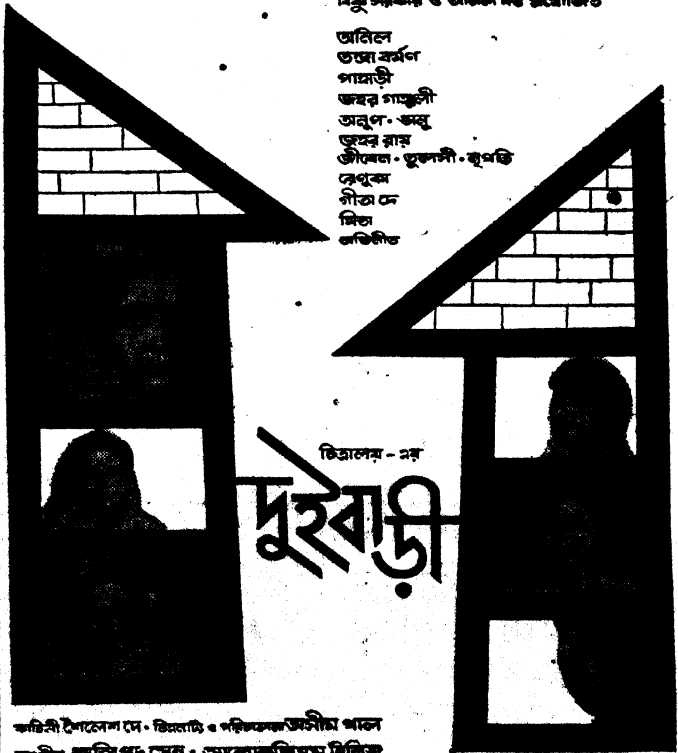
যুদ্ধ এল এগিয়ে। কলকাতার ওপর জাপানী বিমানের আগমনে মিঃ সেন মারা গেলেন আতঙ্কে। আরতির এই আকস্মিক বিপদে অরুণ সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসে। অবশ্য এক সময়ে আরতির সঙ্গে অরুণের বিয়ে দেবার কথা মিঃ সেন ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ সময়ে এ বাসনা তাঁর কার্যকরী হয়নি। সুযোগ পেয়ে আরতির কাছে তার আপন উদ্দেশ্যের কথা জানালে সে অরুণকে ফিরে যেতে আদেশ করে। অরুণ ভুল বুঝতে পেরে চলে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মোটর-মেকানিক রতনের সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় হল। কিন্তু চেহারার মধ্যে দুজনের মিল একদম এক। অবিকল একই চেহারার দুই সত্তা। বন্ধুত্বও এদের মধ্যে নিগূঢ় ছিল। মরবার আগে রতনকে কথা দিয়েছিল প্রবীর যে সে তার অন্ধ মা আর স্ত্রীকে দেখবে।

কলকাতায় তখনও দাঙ্গা চলেছে যুদ্ধ থেকে ফিরে প্রবীর, রতনের অন্ধ মা আর স্ত্রীর খবর নিতে চেহারার ভুলে প্রবীর রতনের স্ত্রীর কাছে আবদ্ধ হল। এই সংসারের পুরুষোত্তম প্রবীর এই দাঙ্গার আহতদের সেবা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে প্রবীর গুণ্ডাদের কবল থেকে আরতিকে আবিষ্কার করলো। আরতির জ্ঞান ফিরতেই সে বলে ওঠে—'প্রবীর......।' প্রবীরের মুখ দিয়ে তখন শুধু একটা কথাই শোনা গেল—'আমার নাম রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য'।'

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর প্রাইং চেম্বারে নেগেটিভ ফিল্ম পরীক্ষা করছেন এই সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ আর বি মেহেতা এবং কর্মী পুষ্কর পুরকায়স্থ।

এ ছবির দুটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান দুটি রচনা করেছেন শৈলেন রায়। প্রথম কয়েকটি পংক্তি—

'মহুয়া মধুর মা জাগে
কোয়েলিয়া মনের লাজারুণ রাগে
রংরে রংরে বন-বীথি রাঙলো।'

দ্বিতীয়টি—

'এক হি সূর্য অজিত তেজ
বিরজে বিপুল মত্তে,
এক হি পুরুষ পরম রতন
আর ব্রজ নারী সবে।।'

রূপায়নের বিভিন্ন প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, শৈলেন মুখার্জি, প্রেমাংশু বসু, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, মিতাজনী, ধীরাজ দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, আশাদেবী ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

উত্তরভাগে উত্তরায়ণ-এর সমস্ত খবর আপনাদের জানিয়ে রাখলাম।

—চিত্রদূত

ভ্রম সংশোধন

২য় বর্ষ, ৩৫ সংখ্যার ৯৮৮ পৃঃ 'ইয়েসে আর এক প্রতিভাধরের দপ্তরে'-এর ওপরের চিত্রটির পরিচিত জনপ্রিয় নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার পড়তে হবে।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ॥

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৬ রান (উইলিয়াম লরী ৫২ এবং কেন ম্যাকে ৪৯। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৮৩ রানে ৩, লেন কোল্ডওয়েল ৫৮ রানে ২ এবং ফ্রেডারিক টিটমাস ৪৩ রানে ৪ উইকেট পান)।

ও ২৪৮ রান (ব্রায়ান চার্লস বুথ ১০৩ এবং উইলিয়াম লরী ৫৭। ট্রুম্যান ৬২ রানে ৫ এবং স্ট্যাথাম ৫২ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩৩১ রান (কলিন কাউড্রে ১১৩ এবং টেড ডেক্সটার ৯৩। এ্যালেন ডেভিডসন ৭৫ রানে ৬, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৯৫ রানে ২ উইকেট পান)

ও ২৩৭ রান (৩ উইকেটে। ডেভিড শেফার্ড ১১৩, কলিন কাউড্রে ৫৮ এবং টেড ডেক্সটার ৫২)

প্রথম দিন (২৯শে ডিসেম্বর) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭ উইকেট পড়ে ২৬৩ রান ওঠে। কেন ম্যাকে (৩৭) এবং রিচি বেনো (২১) নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (৩১শে ডিসেম্বর) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৬ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১০ রান ওঠে ৩ উইকেট পড়ে। কলিন কাউড্রে (৯৪) এবং কেন ব্যারিংটন (১১) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (১লা জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে সমাপ্ত হলে তারা ১৫ রানে অগ্রগামী হয়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এইদিন ৪ উইকেট পড়ে ১০৫ রান ওঠে। উইকেটে অপরাজেয় থাকেন উইলিয়াম লরী (৪১) এবং ব্রায়ান বুথ (১৯)।

ফ্রেডী ট্রুম্যান

চতুর্থ দিন (২রা জানুয়ারী) : অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ২৪৮ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১ উইকেট পড়ে ৯ রান ওঠে।

পঞ্চম দিন (৩রা জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩ উইকেট পড়ে ২৩৭ রান উঠলে ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।
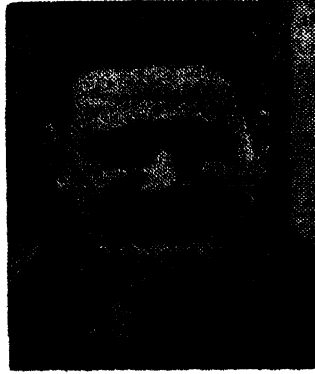
কলিন কাউড্রে

ঐতিহাসিক মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে বর্তমান টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় এগিয়ে গেল। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র গেছে। সুতরাং আর তিনটে টেস্ট খেলা বাকি। মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্টের ফলাফল বর্তমানে দাঁড়াল : খেলা ৩৮, অস্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যান্ডের জয় ১৫ এবং খেলা ড্র ৩। অস্ট্রেলিয়াতে এই নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে ৯৯টা টেস্ট খেলা হল। খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫৩, ইংল্যান্ডের জয় ৩৯ এবং খেলা ড্র ৭। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত মোট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : মোট খেলা ১৮৫, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭৬, ইংল্যান্ডের জয় ৬৪ এবং খেলা ড্র ৪৫। বর্তমান অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া ৭৬—৬৪ টেস্ট খেলায় অগ্রগামী আছে।

টেড ডেক্সটার

মেলবোর্ণে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার আলোচ্য ৪৬তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শুরু হয় গত বছরের ২৯শে ডিসেম্বর। খেলার আগের দিন রাত্রে এবং খেলার দিনেও সকালে বৃষ্টিপাত হয়; তবে বৃষ্টি পীচের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়লাভ করে প্রথমেই ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। খেলা আরম্ভের সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ৫০,০০০ হাজার দর্শক। শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭০,০০০ হাজারে। ১৯৬১ সালে এই মেলবোর্ণ মাঠেই অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে পৃথিবীর রেকর্ড-সংখ্যক দর্শক (৯০,০০০) উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য খেলায় টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া তার কোন সুবিধাই কাজে লাগাতে পারেনি। দলের ৬৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। ঐ একটা উইকেট পড়েই অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়াল ১১১। এর পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ার ভাঙ্গন শুরু হয়। ১১১ রানের মাথায় ২য় এবং ১১২ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। খেলা হল ১৫টা বল আর মাত্র এক রান যোগ হয়ে উইকেট পড়লো ৩টে। ৫ম উইকেটের জুটি পিটার বার্জ এবং ব্রায়ান চার্লস বুথ সাময়িকভাবে দলের এই পতন রোধ করেন। তাঁদের জুটিতে দলের ৪০ রান যোগ হয়। এরপর অস্ট্রেলিয়াকে বিপদমুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন ৭ম উইকেটের জুটি চৌকশ খেলোয়াড় এ্যালেন ডেভিডসন এবং কেন্ ম্যাকে। তাঁদের জুটিতে দলের ৭৩ রান যোগ হয়। ল্যাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৯৩ রান (১ উইকেটে), চা-পানের বিরতির সময় দলের রান ছিল ১৬৪ (৬ উইকেটে)
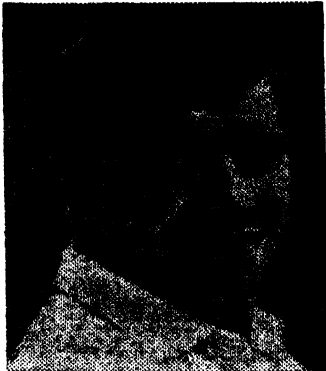
উইকেটে ছিলেন ডেভিডসন (২) এবং ম্যাকে (০)। চা-পানের পরবর্তী খেলায় ৯৯ রান ওঠে, সপ্তম উইকেট পড়ে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ড বড় করুণ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অস্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট পড়ে ২৬৩ রান। ম্যাকে (৩৭) এবং বেনো (২১) অপরাজিত আছেন।

অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় অবস্থার মূলে ছিলেন ইংল্যান্ডের তিনজন বোলার—কোল্ডওয়েল, টিটমাস এবং ট্রুম্যান। দল গঠনে ইংল্যান্ডের ঝুঁকি ব্যর্থ হয়নি।

খেলার দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলা লাঞ্চ সময় পর্যন্ত গড়ায় নি। ৩১৬ রানে শেষ হয়। শেষের তিনটে উইকেটে ৯৭ মিনিটের খেলায় দলের ৫৩ রান যোগ হয়।

লাঞ্চের আগে ইংল্যান্ড মাত্র ১৩ মিনিট ব্যাট করার সময় পেয়েছিল। তার মধ্যেই একজন আউট। খেলার সূচনা করেন ডেভিডসন এবং তাঁর প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই ইংল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান শেফার্ড এল-বি-ডবলিউ হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন—তখন দলের রানের ঘরে শূন্য। চা-পানের সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের দুটো উইকেট পড়ে ১০৭ রান দাঁড়িয়েছে। উইকেটে ডেক্সটার (৫৩) এবং কাউড্রে (৪৩)। লাঞ্চের পরের খেলার ১৫ মিনিটে ডেভিডসন ইংল্যান্ডের ২য় উইকেট পান—পুলার (১১) বোল্ড আউট হন। দলের ১৯৪ রানের মাথায় ডেক্সটার নিজস্ব ৯৩ রান ক'রে বেনোর বল সিম্পসনের হাতে তুলে দিয়ে আউট হন। সাত রান কম পড়ায় তিনি সেঞ্চুরী করার গৌরব পেলেন না। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং কাউড্রে ১৯৮ মিনিট খেলে দলের ১৭৫ রান তুলে দেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় রান দাঁড়ায় ২১০ (৩ উইকেটে)। কাউড্রে (৯৪) এবং ব্যারিংটন (১১) উইকেটে অপরাজেয় থাকেন।

এ্যালেন ডেভিডসন

তৃতীয় উইকেটের জুটি ডেক্সটার এবং কাউড্রে ইংল্যান্ডের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটান।

উইলিয়াম লরী

খেলার তৃতীয় দিন—ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন। ইংল্যান্ডের পক্ষে শুভ। তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে শেষ হলে তারা মাত্র ১৫ রানে এগিয়ে যায়। কলিন কাউড্রে সেঞ্চুরী (১১৩ রান) করেন। ২৭০ মিনিটের খেলায় কাউড্রে ৭টা বাউন্ডারী মারেন। এ নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় কাউড্রের সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ১০টা এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৩টে। ইংল্যান্ডের শেষ ৬টা উইকেটে দলের ৭৭ রান যোগ হয়। ম্যাকেঞ্জি তাঁর সাতটা বলে কাউড্রে এবং ব্যারিংটনকে আউট করেন। তৃতীয় দিনে বোলিংয়ে সাফল্য

ব্রায়ান বুথ

এফ জে টিটমাস

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের বিজয়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দল ও রেক্টর শ্রীত্রিগুণা সেন

লাভ করেন ডেভিডসন—৩৫ রানে ৪টে উইকেট। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে তিনি মোট ৬টা উইকেট পান ৭৫ রানে। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩১৪, ৬টা উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন গ্রেভনী (৪০) এবং স্মিথ (১)। স্মিথ ৬৪ মিনিট খেলে ৬ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। শেষের তিন-জন—ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম এবং কোল্ডওয়েল আধ ঘন্টার মধ্যে ডেভিডসনের বলে আউট হ'ন।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তনও সুবিধার হয়নি। দলের ৬৯ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট পড়ে যায়। ট্রুম্যান তাঁর পর পর বলে অস্ট্রেলিয়ার সিম্পসন এবং ও'নীলকে খেলা থেকে বিদায় করেছেন। তখন রান ৩০। প্রখ্যাত খেলোয়াড় নীল হার্ভে শূন্য উইকেটে খেলতে নামলেন প্রখ্যাত ট্রুম্যানের বলের মুখে। বর্তমান যাঁরা ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট খেলায় প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের মধ্যে ব্যাটস-ম্যান হিসাবে হার্ভের সমকক্ষ কেউ নেই। যখন তিনি এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়ালেন তখন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের সাফল্যের পরিসংখ্যান এই রকম ছিল : খেলা ৭৫, মোট রান ৫৮৫০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৫ এবং সেঞ্চুরী সংখ্যা ২০টা। কিন্তু এই দিনের খেলার এই মুহূর্তে সারা মাঠ হার্ভের কাছে চাইছে—ট্রুম্যানের 'হ্যাট্‌ট্রিক' প্রতিরোধ করা এবং খেলায় এক রান করা। প্রথম ইনিংসে তিনি শূন্য করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় ইনিংসে অন্তত একটা রান না করলে তাঁকে উভয় ইনিংসে শূন্য করার অপবাদ ঘাড় পেতে নিতে হবে। ব্যাটসম্যানের পক্ষে তা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। শেষ পর্যন্ত হার্ভে নিজের এবং দলের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করেন। তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার সময় দর্শকরা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্কোর বোর্ড পড়লো—৪ উই-কেট পড়ে ১০৫ রান। উইকেটে আছেন লরী (৪১) এবং বুথ (১৯)।

তৃতীয় দিনের খেলায় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন কাউড্রে, ডেভিডসন এবং ট্রুম্যান।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার বাকি ৬টা উইকেটে ১৪৩ রান যোগ হল। দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ২৪৮ রানে। অস্ট্রেলিয়া এই দিনে খুবই মন্থরগতিতে রান করে—প্রথম দু' ঘন্টায় ৫৯ রান, পরবর্তী দু'-ঘন্টায় ৫১ রান এবং পরবর্তী এক ঘন্টা ১৫ মিনিটে ৩৬ রান। সাম্প্রতিক টেস্ট খেলার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া এ-রকম শম্বুকগতিতে কখনও উইকেটে হাঁটেনি। ব্রায়ান চার্লস বুথ সেঞ্চুরী (১০৩ রান) করেন। তাঁর এই ১০৩ রান করতে ৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগে। এত বেশী সময় নেওয়ার জন্যে দর্শকে প্রায় ধৈর্য্য হারান না। বরং তাঁকে অনেক ভারী দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে খেলতে হয়ে-ছিল। এই দিনে ট্রুম্যান ২১ রানে ৩টে উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তিনি উইকেট পান মোট ৫টা ৬২ রানে।

ইংল্যান্ড এই দিনে ১টা উইকেট খুইয়ে ৯ রান করে। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে আর ২২৫ রানের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনের লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৯৬, ১টা উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন শেফার্ড (৪৫) এবং ডেক্সটার (৪৪)। ডেক্সটার ৫২ রানে রান-আউট হ'ন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে শেফার্ড এবং ডেক্সটার দলের ১২৪ রান তুলে দেন। লাঞ্চের পরের খেলায় এক সময় দেখা গেল, ইংল্যান্ডের ১৪০ রান ২টো উইকেট পড়ে। তখন জয়লাভের জন্যে আর ৯৪ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট। উইকেটে ছিলেন শেফার্ড (৭৫) এবং কাউড্রে (০) চা-পানের বিরতির সময় রান দাঁড়ায় ১৮৮, ২টো উইকেট পড়ে। উইকেটে তৃতীয় উইকেটের জুটি শেফার্ড (৯৬) এবং কাউড্রে (২৬)। তখন জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ৪৬ রানের।

চা-পানের পরের খেলা—দলের রান ২৩৩, ২টো উইকেট পড়ে। উইকেটে খেলছেন শেফার্ড (১১৩) এবং কাউড্রে (৫৪)। জয়লাভের জন্যে আর মাত্র একটা রান দরকার। এই স্মরণীয় জয়সূচক রানটি করার ভার পড়ে শেফার্ডের ওপর। শেফার্ড ব্যাটে-বলে এক ক'রেই দৌড় দেন। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পোঁছবার আগেই তাঁর উইকেট ভেঙ্গে যায়—তিনি রান আউট হন। শেফার্ড ১১৩ রান করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে শেফার্ড এবং কাউড্রে দলের ১০৪ রান তুলে দেন। শেফার্ডের শূন্য উইকেটে খেলতে নামেন ব্যারিংটন। ব্যারিংটনকে কোন রান করতে হয়নি। ব্রায়ান বুথের বলে কাউড্রে কভার-ড্রাইভ ক'রে বাউ-ন্ডারী করেন। দলের রান দাঁড়ায় ২৩৭—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৩৪ রানের থেকে তিন রান বেশী। কাউড্রে ৫৮ রান করে নট-আউট থেকে যান। কাউড্রে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১৩ রান) করেছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। ইংল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর লেগ-স্পিন যে ভীতির কারণ নয় আলোচ্য টেস্ট খেলায় অন্ততঃ ইংল্যান্ড তা প্রমাণ করেছে। রিচি বেনো যখনই বল দিতে নেমেছেন তখনই ইংল্যান্ডের রান গড়গড় করে বেড়ে গেছে। প্রথম ইনিংসে তাঁরা ৮২ রান দিয়ে মাত্র একটা উইকেট পান; কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রান দিয়ে কোন উইকেটই নিতে পারেন নি। প্রথম ইনিংসে ডেভিডসন ৭৫ রানে ইংল্যান্ডের ৬টা উইকেট পেয়ে-ছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকেও শূন্য থলি নিয়ে ফিরতে হয়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়ে-ছিল। সেই সঙ্গে বলবো ভাগ্যদেবী তাদের উপর বিরূপ ছিলেন। ডেক্সটার, শেফার্ড এবং কাউড্রে শেষ দিনের খেলায় কপাল জোরেই আউট হওয়া থেকে ছাড়ান পান। এই তিনটি সুযোগের অপচয় অস্ট্রেলিয়ার সব থেকে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষতি পূরণের কোন উপায়ই আর ছিল না। খেলার শেষে রিচি বেনো খেদ করে বলেছেন, যে সকল ক্যাচ ধরার উপর খেলার ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছে সেগুলি যদি ফস্কে যায় তা হলে খেলায় জয়লাভের আশা করা যায় না। রিচি বেনো এই সঙ্গে বলেছেন, 'তাছাড়া জয়লাভের জন্যে আমাদের যথেষ্ট খেটে খেলা হয়নি।' ইংল্যান্ড অতীতে অনেক বার তার বোলিং শক্তিতে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে এসেছে। আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের জয়লাভের শক্তি ব্যাটিং এবং উভয় ইনিংসেই ইংল্যান্ড তার প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ব্যাটিংয়ে উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্যের কথা স্বীকার করে নিলেও নিঃসন্দেহে একথাও বলা যায়, ইংল্যান্ডের এই জয়লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার' পর্যায়ে পড়ে না। পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৭৬ মিনিট আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে

যায়। আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় রান আউটের ছড়াছড়ি উল্লেখযোগ্য। এই চারজন রান আউট হয়েছেন—অস্ট্রেলিয়ার হার্ভে (৯০ রান) এবং ইংল্যান্ডের তিনজন খেলোয়াড়—গ্রেভনী (৪১), ডেক্সটার (৫২) এবং শেপার্ড (১১৩)। শেফার্ড প্রথম ইনিংসে শূন্য করেছিলেন। ফলে টেস্ট খেলা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর সেঞ্চুরী (১১৩ রান) এবং দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা তাঁকে পুনরায় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যদের চোখের সামনে এনে দিয়েছে। ইংরেজদের 'তের' সংখ্যা সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে। তের সংখ্যাটা তাদের কাছে খুবই অশুভ সংখ্যা। আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দেখছি, ব্যক্তিগত ১১৩ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের দুজন খেলোয়াড় আউট হয়েছেন—প্রথম ইনিংসে কাউড্রে (১১৩) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে শেফার্ড (১১৩)।

॥ আন্তঃ প্রদেশ ব্যাডমিন্টন ॥

বাঙ্গালোরে সম্প্রতি অষ্টাদশ আন্তঃ প্রদেশ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শেষ হল। পুরুষদের দলগত বিভাগে গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র এবারও রহিমতুল্লা কাপ জয় করেছে।

● সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের দলগত বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৪—১ খেলায় ইউ পি'কে পরাজিত করে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ : রেলওয়ে ২—১ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ : মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় ইউ পি'কে পরাজিত করে।

॥ দলীপ সিংজী ক্রিকেট ॥

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে দলীপসিংজী ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় উত্তরাঞ্চল দল ১০ উইকেটে পূর্বাঞ্চল দলকে পরাজিত করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রখ্যাত বোলার চেস্টার ওয়াটসন এবং কিং যথাক্রমে উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল দলের

সুরেশ গোয়েল

পক্ষে খেলেছিলেন। ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় পূর্বাঞ্চল দল পরিচালনা করেন। অপর দিকে উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক ছিলেন টেস্ট খেলোয়াড় বিজয় মেহরা।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পূর্বাঞ্চল দল : ১৬০ রান (সুধীর দাস ৬১। ওয়াটসন ৪১ রানে ৪ এবং উইলিয়াম ঘোষ ৫৮ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১০৯ রান (পি সি পোদ্দার ৪০। ওয়াটসন ৩০ রানে ২ এবং জি দেব ৩১ রানে ৩ উইকেট)।

উত্তরাঞ্চল দল : ২৬৬ রান (প্রেম ভাটিয়া ১০৭। ডি এস মুখার্জি ৭০ রানে ৩ এবং এস কুণ্ডু ৬৩ রানে ৬টা উইকেট)

ও ০৭ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

॥ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ॥

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বার্ষিক জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাব ১৫—৭, ১৪—১৬ ও ১৫—১০ পয়েন্টে ভারতীয় রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগের ফাইনালে মাদ্রাজ ১৫—৪, ১৫—৪ ও ১৫—০ পয়েন্টে মধ্যপ্রদেশ দলকে পরাজিত করে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে ২৭তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগের সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : সুরেশ গোয়েল (উত্তরপ্রদেশ) ১৫—৭, ১৫—১১ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার বিভাগ (বালক) : গৌতম ঠক্কর (মহারাষ্ট্র) ১৫—৮, ৬—১৫ ও ১৫—১১ পয়েন্টে মেহবুব আলীকে (অন্ধ্র) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার বিভাগ (বালিকা) : মিস বি সুবেদার (ইউ পি) ১১—৩ ও ১১—৪ পয়েন্টে মিস পল্লীকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মিস সরোজিনী আপ্তে এবং মিস সুনীলা আপ্তে (রেলওয়ে) ১৫—৬ ও ১৫—১১ পয়েন্টে মিস এম কেলকার এবং মিস কার্নিককে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস মীনা সাহা (রেলওয়ে) ১১—৩ ও ১১—৬ পয়েন্টে মিস সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিন বছর খেতাব লাভের গৌরব অর্জন করেন।

মিক্সড ডাবলস : সি ডি দেওরাস এবং মিস এম কেলকার (মহারাষ্ট্র) ১৫—১২ ও ১৫—৬ পয়েন্টে ও রমকন এবং মিস সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 18th January, 1963
40 Naya Paise.

এই সপ্তাহে সারা ভারতে এক মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকীর আনন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। আমাদের পুণ্যময় মাতৃভূমিতে যুগে যুগে, প্রতি শতকে, বহু মহামানব ও বহু সাধুসজ্জনের আবির্ভাব ও তিরোধান হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই দেশকে নানা উপদেশ ও নানা আদর্শবাদ দান করিয়া ধর্মের পথ ও মঙ্গলের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ অগণিত মহাত্মা ও আচার্যদিগের স্মৃতিমন্দিরে এই পুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা পুরুষ এক বিশিষ্ট আসন অধিকার ও অলংকৃত করিয়া চিরদিন বিরাজ করিবেন, কেননা ভারতকে চরম নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি হইতে প্রগতির পথে ও উন্নততর জীবনের দিকে চলিতে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেই মহান পথপ্রদর্শকদিগের গণনারম্ভেই তাঁহার নাম পাই। অন্যদিকে দেখি অধ্যাত্মজীবনে নূতন পন্থা নির্দেশকরূপেও তিনি এদেশ ও জাতির দীক্ষাগুরুদিগের মধ্যেও অন্যতম। সেই কারণে আজ "স্বামীজি" বলিতে এদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার মনে একটি নামই জাগে যে নামে সেই মহাপুরুষ বিশ্বজগতে খ্যাত—স্বামী বিবেকানন্দ।

যে যুগল দীপশিখা—মানবত্ব ও সেবাধর্ম—তিনি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেশ ও জাতিকে পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার আধার ছিল দেশাত্মবোধ। স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা কি তীব্র অনুভূতিযুক্ত ছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার নানাস্থানে ও নানাদেশে প্রদত্ত বহু ভাষণের মধ্যে। এইভাবে ১৯০০ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসাডেনা নগরের সেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতায় আমরা দেখি তিনি তৎকালীন ভারতের বর্ণনা এইভাবে করিয়াছেন :—

"উহা এক বিরাট সৌধের ভূপতিত ধ্বংসাবশেষের মত। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হয় প্রায় কোনও আশা নাই। জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত ও শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি স্থিরভাবে অপেক্ষা ও সমীক্ষা করিলে অন্য এক তথ্য পাইবে। সে তথ্য এই যে মানুষ বাহ্যরূপকে যে অন্তর্নিহিত সত্তার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র, সেই সত্তা, সেই আদর্শ যদি ছিন্ন বা বিনষ্ট না হয়, তবে সে মানুষ জীবিত থাকে এবং সে মানুষের জন্য আশা আছে। তোমার জামা যদি বিশবারও চুরি যায় সে কারণে তোমার বিনাশ সম্ভব নয়। তুমি নূতন জামা তৈয়ার করিতে পার। সে জামা (তোমার) মূলসত্তার অঙ্গ নয়..................।

"এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আমরা যদি দেখি—তবে কি দেখি? ভারত রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন; এজাতি দাসত্বপাশবদ্ধ। ভারতীয়গণের কোনও অধিকার নাই তাহাদের নিজ শাসনতন্ত্রে—তাহারা ত্রিশ কোটি ক্রীতদাস মাত্র—অন্য কিছু নয়! ভারতের সাধারণ মানুষের গড়পড়তা মাসিক আয় দুই শিলিং (দেড় টাকা) মাত্র। অতি অল্প আহারে কোনক্রমে বেঁচে থাকাই ঐ বিপুল জনতার অধিকাংশের সাধারণ অবস্থা। সুতরাং আয়ের সামান্য ঘাটতি হইলেই লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পড়ে। অতি অল্পদিনের অনাহারেই মৃত্যু আসে। ভারতের অবস্থার এই দিক দেখিলেও আমার চোখে পড়ে শুধু ধ্বংসরাশি—নৈরাশ্যময় ধ্বংসাবশেষ।"

এই নিরাশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেও তিনি আশা রাখিয়াছিলেন এবং সেই আশার আলোকে পথ দেখাইয়াছিলেন দেশকে ও জাতিকে পুনর্জাগরণের ও পুনর্জীবনের। তিনি দেখিয়াছিলেন যে জাতির আধ্যাত্মজীবনের শিখা একেবারে নির্বাপিত হয় নাই এবং তিনি সেই শিখা হইতে জাতীয় জীবনের পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির যজ্ঞারম্ভের হোমাগ্নি দীপ্ত করিবার শিক্ষাদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

তিনি পৌরুষের ও মনুষ্যত্বের উচ্চ মান ও মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণীতে আমরা পাই :

"হাঁ, আমার বয়স যতই বাড়ছে ততই যেন আমি সকল ব্যাপারেই পৌরুষের প্রাধান্য দেখছি। ইহাই আমার নূতন সুসমাচার। দুষ্কর্ম করিলেও তাহা মরদের মত করিবে! যদি দুষ্কৃতকারী হ'তেই হয় তবে সেটাও বিরাট পরিমাপেই হয়।"

সেবাধর্ম ছিল তাঁহার জীবনবেদের প্রধান অঙ্গ। তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"যদি ঈশ্বরকে পাইতে চাও তবে মানুষের সেবা কর।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন :—

"যতদিন আমার দেশে একটা কুকুর খাদ্যহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে ততদিন আমার ধর্মের পূর্ণরূপ ঐ কুকুরকে খাওয়ানোই থাকুবে।"

আজিকার দিনে কামনা জানাই, যখন জড়ের উপর আসক্তির ফলে এবং আত্মতুষ্টি ও স্বার্থপূর্তির চেষ্টায় দেশের আবার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে তখন এই পবিত্র ও তেজোময় জীবনের পুণ্যস্মৃতি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল কলুষ, সকল গ্লানি মোচনে চিরসহায়ক হউক।

জয়তু স্বামীজি

॥ বিবেকবাণী ॥

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; ভুলিও না— নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

মৃত্যুরূপা মাতা

স্বামী বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জৈমিনি

সম্প্রতি কলকাতা শহরে চোখ মেলে চললে অনেক নতুন ধরণের পোস্টারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। সিনেমা থিয়েটারের বিজ্ঞপ্তি তো আছেই, দেশের জরুরী অবস্থার পটভূমিতে জাতীয় কর্তব্যমূলক পথনির্দেশও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে আরেক রকম প্রচারপত্র—যা থেকে আমাদের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত বেশ নিরাপদেই গ্রহণ করা চলে বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো নিরাপদে গ্রহণ করা যায় বলে, ব্যাপারটাও যে খুব নিরাপদ, তা আমি বলতে পারব না। সিদ্ধান্ত আসে ন্যায়শাস্ত্রের পথে, কিন্তু তার সামাজিক কার্যকারিতাও যে ন্যায়সঙ্গত হবে তার কোনো কথা নেই। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এটা প্রমাণসম্মত সিদ্ধান্ত, কিন্তু তাই বলে আগুনে হাত দেওয়া বা হাত পোড়া এর কোনোটাকেই ঠিক বাঞ্ছনীয় বলে গ্রহণ করা যায় না।

যাই হোক, ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলা যাক।

যে ধরণের পোস্টারের কথা আমি বলছিলাম তা হল 'কে-জি' বা 'প্রিপ্যারেটারী' স্কুলের বিষয়ে। শহরের যে কোনো বড় রাস্তা বা গলি দিয়ে দশ গজ এগোলেই এ ধরণের দু তিনটে বিজ্ঞপ্তি আপনার চোখে পড়বে, এবং বিদ্যাদানের জন্যে দেশব্যাপী এই আলোড়ন দেখে আপনার হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে আপনি যদি শুধু একজন দর্শক না হন, যদি আপনার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকে এবং ইতিমধ্যেই তাদের কোনো ইস্কুলে ভর্তি করে না থাকেন, তা'হলে অচিরাৎ এই বিজ্ঞপ্তিগুলোর পিছনে কী গুপ্ত প্রেরণা কাজ করছে তা আপনার জ্ঞানগোচর হ'তে থাকবে।

শিশুদের বিষয়ে আমরা ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম, তার একটা

লাইনে ছিল—"যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।" তখন লাইনটার যে মানে বুঝেছিলাম তা আক্ষরিক, এখন দেখা যাচ্ছে ওর গভীরতর অর্থ ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। বিদ্যাকে দান করলে যে জিনিসটা বেড়ে যায়, আমরা সহজ বিশ্বাসে তখন ভেবেছিলাম সেটাও বুঝি বিদ্যা। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেটা বিদ্যা নয়, টাকা। এই মানে হৃদয়ে নিয়ে লাইনটা আবার পড়লেই দেখবেন আপনিও সব বুঝতে পারছেন প্রাঞ্জল ভাবে। "যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে"—এটা আসলে কোনো হিতোপদেশ নয়, বিদ্যা-ব্যবসায়ীদের কোড; তাঁদের মতো কেউই এত ভালো করে উপলব্ধি করেন না ঐ লাইনটির নিহিতার্থ।

এখন ব্যাপার হল এই যে, আপনার যদি কোনো প্রথম-শিক্ষার্থী ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে তাদের আপনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে চেষ্টা করবেনই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ভালো ইস্কুলে সীট পাওয়া যাবে না। তখন আপনার মানসপটে কয়েকটি প্রশ্ন এসে আবির্ভূত হবে।

(১) যে কোনো ইস্কুল-মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠানে আপনি ছেলের নাম লিখিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন কিনা?

(২) বাড়িতে টিচার রেখে কালাহরণ করবেন কিনা?

(৩) যদি আপনি ১নং পথে যান তাহলে আপনার ছেলের যে গোড়াতেই বারোটা বেজে যাবে তা আপনি জানেন বলে, আপনি হয়তো ২নং পথে যেতে চাইবেন; কিন্তু যেহেতু আজকাল তিরিশ চল্লিশ টাকার কমে এ বি সি ডি শেখানোরও টিচার পাওয়া যায় না, এবং যেহেতু সে টিচারও দৈনিক দেড় ঘণ্টা কি দু ঘণ্টার বেশি থাকবেন না, সেইহেতু

(৪) কোনো 'কে জি' ইস্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাবেন কিনা? এতে

(৫) টিচারের চেয়ে খরচ কম, ১৫ থেকে ২০ টাকার মধ্যেই হ'য়ে যেতে পারে, এবং

(৬) শিক্ষালাভের সময়ও বেশি; দৈনিক অন্তত তিন ঘণ্টা।

এইসব চিন্তা ক'রে আপনি 'কে-জি' বা প্রিপারেটারী ইস্কুলের সপক্ষেই হয়তো মত দেবেন, এবং একদিন ছেলেকে নিয়ে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি ক'রে দেবেন।

এর মধ্যে আরো একটা কথা আছে, যা আগে উল্লেখ করা হয়নি। সেটা হল ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন। ইদানীং শিক্ষা বলতে অবশ্য ভাষা বা সাহিত্যের বিষয়ে দক্ষতার কথা ভাবা হয় না, আদপ-কায়দাই হল এখন আসল শিক্ষা। একটু আধো আধো ভাবে ইংরেজি বলা এবং ফিটফাট ভাবে ইস্কুলের ইউনিফর্ম পরে যাতায়াত করা, এই দিয়েই হয় সে শিক্ষার গোড়াপত্তন। কাজেই 'কে-জি' যে সে শিক্ষার যোগ্য বাহন তা অস্বীকার করে লাভ কী?

কিন্তু সমস্যা হল, শহরময় গজিয়ে ওঠা এই অজস্র 'কে-জি' থেকে কিছু শিখে এবং না-শিখে একদিন যখন ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন হবে তখন তারা যাবে কোথায়? তখনো তো সেই একই সংকট? দ্বিতীয়ত, অবস্থার চাপে পড়ে এই যে প্রত্যেকটি প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেমেয়ের জন্যেও ১৫।২০ টাকা করে শিক্ষা-খরচ, তা কি কোনো মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য?

এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সকলেরই জানা। এত বেশি জানা যে প্রশ্নগুলো পর্যন্ত আহাম্মকের মতো শোনায়। কাজেই ঘটনাস্রোতকে নিজের পথে চলতে দিয়ে আমরা অর্ধজাগ্রত ভাবে দিন কাটাই।

আর সেই সুযোগে শহরময়, প্রায় কুটিরশিল্পের মতো গজিয়ে ওঠে 'কে-জি', প্রিপারেটারী, নার্সারী। কলকাতার অর্ধেক বাড়ির মোটর-গ্যারাজ যেমন অনিবার্যভাবে হ'য়ে দাঁড়ায় মুদিখানা, তেমনি প্রত্যেক বাড়ির ড্রইং-রুম পরিবর্তিত হচ্ছে 'কে-জি'-তে।

আর সেইজন্যেই পথে পথে এত পোস্টার।

এর পর যদি সার্কাসের তাঁবুর মতো এইসব প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে কর্মকর্তারা 'আইয়ে...আইয়ে' বলে অতর্ক চোঙ লাগিয়ে চেঁচান, তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ডান হাতে সরস্বতীকে অঞ্জলি দিয়ে, বাঁ হাতে এমনভাবে লক্ষ্মীর প্রসাদ কুড়োনোর সুযোগ পেলে কেই বা পিছিয়ে থাকে!

॥ জনি হ্যাজার্ড ॥

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতাব্দী হিসাবে পালিত বর্তমান সপ্তাহে চিত্রায়িত রহস্যকাহিনী 'জনি হ্যাজার্ড' প্রকাশ শুরু না করে আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু করা হবে।

●

'জনি হ্যাজার্ড' প্রথমেই উপস্থিত করেছে প্যারিসের পথে পাইরেট ধরার কাহিনী। সঙ্গে একটি চীনা নারী। কেন এই চক্রান্ত, কোথায় তাদের গন্তব্য কে জানে!

।। পথে চলতে ।।

তুষারকান্তি ঘোষ

মনটা খারাপ হয়ে ছিলো। জরুরী একটা সভায় যোগ দিতে যাচ্ছি অথচ বিশেষ কারণে বারাসাত থেকে বেরোতে একটু দেরী হয়ে গেছলো। গাড়ীতে বসে ভাবছিলুম বারাসাতের "শিশির কুঞ্জে" বাস করবার সুবিধা যেমন অনেক আছে তেমনি অসুবিধাগুলিও তুচ্ছ নয়। এতো দূরে বাড়ী হওয়ার ফলে আমাদের কাজকর্ম, ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজ ইত্যাদির জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় রেখে রওনা না হতে পারলে দেরী হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। বাড়ীতে কোনো নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ থাকলে অতিথি-অভ্যাগতরাও ঠিক সময়ে পোঁছতে পারেন না।

যাই হোক, ভাবলুম পথে যেতে যেতেই একটু কাজ সেরে রাখি। সেদিন-কার জরুরী চিঠিপত্রগুলি খুলে পড়তে আরম্ভ করলুম—তার মধ্যেই দেখি শ্রীমান মণীন্দ্রর পত্র আছে—'অমৃত'র "মনে পড়লো" বিভাগে কোনো স্মৃতির টুকরো পরিবেশন করতে হবে তারই অনুরোধ। পত্রটি পাঠ করে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি রাস্তার ভিড়ের জন্য আমার গাড়ীটি সাময়িকভাবে আটকে পড়েছে। আশ্চর্য! তখনই মনে পড়ে গেল এই তো গঙ্গানগর! ঠিক এই-খানেই একটি ঘটনা ঘটেছিলো, সে আজ থেকে প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর আগেকার কথা।

তখনও বারাসাতে আমরা পাকা-পাকিভাবে বাস করতে আরম্ভ করিনি। তবে বাগান-পুকুর ভালই ছিলো,—তারই আকর্ষণে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ছুটে আসি বারাসাতে, কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে যাই। উন্মুক্ত প্রকৃতির বিচিত্র আকর্ষণ কোনোদিনই এড়াতে পারি না, বাল্যকালে যশোরের অমৃতবাজার গ্রামের ক্রোড়ে কাটানো দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, তাই ওই একটুকরো জমিই আমাকে প্রভূত আনন্দের উপকরণ যোগায়। সেদিনও গেছি সেখানে, সঙ্গে স্ত্রী আছেন, ফিরতে ফিরতে প্রায় বেলা পড়ে এসেছে। আমাদের গাড়ীটা সেদিনও ঠিক এইখান দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলুম পথের একপাশে একটি গাড়ী বনেট-খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ীর চালক খুট্‌খাট করে কিছু মেরামত করছে এবং একজন বয়স্ক আরোহী দরজা খুলে বিরক্তমুখে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি পাশে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "মশাই, ব্যাপার কি?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, গাড়ীটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

আমি সহসা দেখতে পেলুম গাড়ীর মধ্যে চন্দন-পরা একটি যুবক বসে আছে, ব্যস্ত হয়ে বললুম, "ব্যাপার বিশেষ কিছু নয় বলছেন কিন্তু গাড়ীতে বর বসে আছে, বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন, রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়ে তো খুবই বিপদে পড়েছেন দেখছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "ও কিছু নয়, গাড়ী এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি প্রশ্ন করলুম "লগ্ন কখন?"

উত্তর এলো, "গোধূলি লগ্ন।"

আমি তখন প্রস্তাব করলুম যে বরকর্তা বর ও নাপিত-পুরোহিত নিয়ে আমার গাড়ীতে আসুন, তাঁদের গন্তব্য-স্থলে পোঁছিয়ে আমাদের ফিরতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

বরকর্তা কিন্তু প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বসলেন।

তবুও ইতস্ততঃ করে আমি বললুম, "দেখুন, বেলা তো প্রায় পড়ে গেছে, তা আপনাদের যেতে হবে কোথায়?"

উত্তর পেলুম, "বারাসাতে।" আমি আবার সবে আরম্ভ করেছি, "তবে তো কোনো অসুবিধাই......", এমন সময় বরকর্তা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "না মশাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা এই গাড়ী সারিয়ে নিয়েই যাবো, আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দেব না!" বিয়েবাড়ীর অসংখ্য ঝঞ্ঝাট সামলিয়ে বরকে নিয়ে শুভযাত্রা করে বেরিয়ে পথের মাঝখানে এই মোটর-বিভ্রাট ভদ্রলোকের কিছু উষ্মা ও বিরক্তি উৎপাদন করেছে বোঝাই গেল।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে তাঁদের সেই অবস্থায় রেখে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলুম, কিন্তু দমদম পর্যন্ত গিয়ে কেমন যেন বিবেকের তাড়না অনুভব করলুম। মনে হলো, ওঁদের ওইভাবে ছেড়ে আসা কি উচিত হয়েছে? যদিও বরকর্তা আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন তবুও গৃহস্থ বাঙালীর গৃহে বিবাহের মতো শুভকাযে এ'ধরনের বাধা পড়লে যে কি বিপদের সম্ভাবনা হয় তা তো আমি ভালো করেই জানি। শুধু তাই নয়, আমার আরো মনে হলো যে বরকর্তা নিশ্চিন্ত-চিত্তে গাড়ী কতোক্ষণে সারে—তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকলেও কন্যাকর্তার অবস্থা এতোক্ষণে কি হয়েছে তা হয়তো শ্রীভগবানই জানেন। কেবলই এই কথা মনে হতে লাগলো এবং অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলুম। স্ত্রী লক্ষ্য করে বললেন, "তবে আর একবার ফিরেই চলো না?" বলামাত্র আর সংশয় রইলো না, গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আবার সেই স্থানে ফিরে এলুম। এসে দেখি তখনও গাড়ীটি বনেট খোলা অবস্থায় পড়ে আছে এবং খুট্‌খাট করে মেরামতীর কাজও সমান-ভাবেই চলেছে। বরকর্তা আমাদের পুনরাগমনে মনে মনে খুশী হলেন কিনা জানি না, তবে প্রকাশ্যে ভ্রূ দুটি ঈষৎ তুলে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু তখন আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি। বললুম, "মশাই, কখন আপনার গাড়ী ঠিক হবে তার ঠিক নেই, ঠিক হলে আপনি তাতে আসবেন এখন। আপাততঃ, অনুমতি করুন, বর, পুরোহিত ও নাপিত নিয়ে আমি রওনা হয়ে যাই, লগ্ন যে বয়ে যেতে বসেছে।"

বরকর্তা তখনও কিছুক্ষণ বিবেচনা করলেন, তারপর নিরুপায় হয়েই বললেন, "আচ্ছা, তবে এদের নিয়ে যান।"

অতঃপর বর ও পুরোহিত-নাপিতকে নিয়ে যখন আমি বারাসাতের দক্ষিণপাড়ায় বিবাহবাড়ীতে পোঁছলুম তখন দেখি বরের দেরী দেখে উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় কন্যার বাড়ীর মহিলারা পর্যন্ত প্রায় পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে সঙ্গে দেখে কন্যাকর্তা আশ্চর্য হয়ে বললেন,

"একি—আপনি?"

উত্তর দিলুম, "সে সব বৃত্তান্ত পরে শুনবেন, এখন বরকে তো সভাস্থ করুন।"

আজ সেই কথা মনে পড়ে গেল। সেই রাত্রে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়েছিলো, যদিও বরকর্তা বিবাহক্রিয়া আরম্ভ হবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গলদঘর্ম শরীরে উপস্থিত হ'তে পেরে-ছিলেন। যাই হোক সেদিন সেই শুভ-কার্যে সাধ্যমতো সাহায্য করবার সুযোগ পেয়ে অনাবিল আনন্দে মন ভরে গেছলো। শুনেছি সেদিনকার সেই বরটি এখন বর্মার চিকিৎসক। আশা করি সুখেস্বাচ্ছন্দে গৃহিণীকে নিয়ে সে সংসার করছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে বারাসাতে একটি বন্ধুলাভ করেছি, তিনি হলেন কন্যার কাকামহাশয়, বারাসাতের চিকিৎসক ডাক্তার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়।

মহান জীবনের কয়েকটি বিশেষ লগ্ন

১৮৬৩, ১২ই জানুয়ারি, কলিকাতা শিমলার অন্তর্গত গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ পৈতৃক ভবনে জন্ম। পিতা-কায়স্থকুলোদ্ভব বিশ্বনাথ দত্ত, এটর্ণি। মাতা—ভুবনেশ্বরী, বিদুষী ধর্মশীলা রমণী। কাশী বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে জন্ম বলিয়া—ডাকনাম বিলে, পরে নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। ছাত্রজীবন হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ও শারীরিক শক্তিতে অসাধারণ পটুতা লাভ করেন।

১৮৭৯ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংসর্গ। ফলে খ্যাতনামা ব্রাহ্মনেতাদের সহিত পরিচয়।

১৮৮১ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত পরিচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার ভিতর যোগীর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তুমি ধ্যান অভ্যাস কর।' বন্ধুগণের সহিত রামকৃষ্ণদেবকে দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বর গমন (ডিসেম্বর) ও ঠাকুরকে 'মন চল নিজ নিকেতনে' গাহিয়া শ্রবণ করান।

১৮৮৪ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, পিতা বিশ্বনাথের অকাল মৃত্যুতে বিধবা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে লইয়া বিব্রত ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃথা চেষ্টা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ও বিবেকানন্দ সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত।

১৮৮৫ এই সনের মধ্যভাগে ঠাকুরের অসুস্থতার সূত্রপাত। তাঁহাকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরের বাগান বাড়িতে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরন। কতিপয় ভক্তগণ সহিত ঠাকুরের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ (ডিসেম্বর)।

১৮৮৬, ১৬ আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। তৎপূর্বে (জানুয়ারি) স্থায়ীভাবে গৃহত্যাগ উপলক্ষে পরিজনের সহিত মনান্তর। আগষ্ট মাসের শেষভাগে বরাহনগরে মুন্সীবাবুদের ভাড়া বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি-কলসী আনিয়া তাম্রকৌটায় রক্ষিত। বিবেকানন্দ ইহাকে 'আত্মারামের কৌটা' বলিতেন। প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মঠের এভাবেই সূত্রপাত হয়।

১৮৮৭—৮৯ এই সময়ে তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন, শেষে হিমালয় অঞ্চলে তপশ্চর্যায় ব্রতী হন। নানা স্থান পর্যটন করিয়া দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হন। এই শোচনীয় দুর্দশার প্রতিকারে কৃতসংকল্প হন।

১৮৯২ কাশীপুর হইতে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হয়।

১৮৯৩ রাজপুতানা, কাথিয়াবাড়, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া কন্যাকুমারিকায় উপনীত হন। ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বিদেশে প্রচারের জন্য স্থির করেন। মাদ্রাজে কয়েকজন ভক্ত আমেরিকায় আসন্ন চিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব করিতে সংকল্প করিয়া পাথেয় ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন (মার্চ—এপ্রিল)।

মে, বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা। স্বামীজি বলিয়াছিলেন, 'সমগ্র ভারত ঘুরেছি দরিদ্র দেশবাসীদের অজ্ঞতা, নির্যাতন ও দুর্দশা দেখে চোখের জল রোধ করতে পারিনি। তাদের দুঃখমোচন করবার জন্য আমেরিকা যাচ্ছি।'

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর, 'হল অফ কলম্বাস' —নামক সুবৃহৎ হলে বিশ্বধর্মসভার অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় যখন স্বামীজি, 'আমেরিকাবাসী আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,' বলিয়া জনতাকে সম্বোধন

করেন, তখন দুই মিনিটব্যাপী করতালিতে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হয়।

১৮৯৪ তৎপরে আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ এপ্রিল, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে উপনীত। কলিকাতা হইতে স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডন গমন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ লাভ, বন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের সহিত পরিচয় ও সখ্যতা এবং ধর্ম বিষয়ে আলোচনা, পরে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৬ গ্রীষ্মকালে ইউরোপ ভ্রমণ ও সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিষ্যদের জন্য হিমালয় অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠার সংকল্প। তৎপরে পুনরায় ইংলণ্ড গমন ও পূর্বপরিচিত ভক্ত মিস মুলার, মিস নোবল (পরে ভগ্নী নিবেদিতা), মিঃ স্টার্ডি প্রভৃতিকে দীক্ষা দান।

১৮৯৭ জানুয়ারির প্রথম দিকে কলম্বোয় উপনীত, একটি দেশীয় জাহাজে ভারতবর্ষে পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করেন। রামনাদের রাজা জেটি হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজে উপনীত ও ঐ মাসের শেষ দিকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ—বাগবাজারে পশুপতি বসুর ভবনে আতিথ্যসৎকার ও গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলন।

২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অভিনন্দন। পরে স্টার থিয়েটারে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা।

এই বৎসরের মে মাসে বলরাম বসুর বাড়িতে মঠের সন্ন্যাসীদের ও গৃহীভক্তদের লইয়া অধিবেশন ও রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচারে দেশেবিদেশে প্রচারকার্য ও জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণে কর্মভার গ্রহণ।

বিবিধ কর্ম সম্পাদনে ও দুর্ভিক্ষের সেবাকার্যে কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভাঙিয়া পড়ে।

১৮৯৮ কাশ্মীর ভ্রমণ (জুলাই), এই সময়ে অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী তীর্থ দর্শনে যে ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা 'Kali the mother' রচনা করেন।

পাশ্চাত্য শিষ্যদের সহায়তায়, স্বামীজি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেলুড়ে ভূমি ক্রয় করিয়া মঠের নির্মাণকার্য শুরু করেন। ঐ বৎসর ৯ই ডিসেম্বর তিনি বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। তৎপূর্বে কাশীপুর হইতে মঠ স্থানান্তরিত হইয়া নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়িতে চলিয়া আসে। এখান হইতে 'আত্মারামের কৌটা' নবনির্মিত মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯৯ জুন, স্বামীজি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সঙ্গী ছিলেন—ভগিনী নিবেদিতা ও তুরিয়ানন্দ। পরে সেস্থান হইতে আমেরিকায় যাত্রা করেন। অভেদানন্দের প্রচার কার্য দেখিয়া তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় উপনীত হন, সেন্টক্রেয়ারে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০০ জুলাই, প্যারিস ধর্মকংগ্রেসে যোগদান ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৩ই জানুয়ারি ট্রাস্ট-ডিড করিয়া মঠের রেজিস্ট্রী ও গুরুভ্রাতাদিগকে ট্রাস্টীপদে নিযুক্ত করেন। নিজে মঠের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করেন।

১৯০১ মার্চ, মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ ও ঢাকায় নাগ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সেপ্টেম্বর, মহাসমারোহে বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব সমাপন।

১৯০২, ৪ জুলাই, মহাসমাধি প্রাপ্ত, বেলুড় মঠে।

সংকলক : সনৎকুমার গুপ্ত

বাংলার নবজাগৃতি: বিবেকানন্দ

অমিয় দত্ত

।। এক ।।

নবজাগৃতি অর্থাৎ রেনেসাঁস্ জাতির স্থবিরত্ব ঘুচিয়ে তার মধ্যে প্রাণের বেগ আনে, চাঞ্চল্য আনে, আর আনে মুক্তির সংবাদ।

ঊনিশশতকে বাংলার রেনসাঁসের মধ্যে আমরা পেয়েছি,—প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, অর্থাৎ নবতররূপে সংস্কৃতির মর্মোদ্ঘাটন; জীবন সম্পর্কে মানুষের নতুন আশা, উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনা এবং ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন মূল্যবোধ। এই নতুন করে দেখা, শোনা ও উপলব্ধির প্রবৃত্তিই হোল নবজাগৃতির মৌল লক্ষণ। তাই বাংলার নবজাগরণের সুদীর্ঘ একশত বছরেরও অধিক সময়ব্যাপী কালসীমায় যে সমস্ত মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করেছি। তবে সকলের মধ্যে এই প্রবৃত্তির প্রকাশ একইভাবে ঘটেনি; অনেকের মধ্যে ঐ একই প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে ভিন্ন উপায়ে—অন্য পথে। কেউ যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে বস্তুনির্ভর জ্ঞানবাদের ওপর আস্থা স্থাপন করে নবজাগরণের সাধনায় বসেছেন,—কেউ কেবল আবেগ-নির্ভর ভক্তিবাদের ওপর বিশ্বাস রেখে নবজাগৃতির অনুশীলন করেছেন,—আবার কেউ বা জ্ঞান ও ভক্তি, এই উভয়ের সমন্বয়-সম্মিলনের মধ্যদিয়েই রেনেসাঁসকে পূর্ণতর মূর্তিতে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু নবযুগ ও নবজাগরণের প্রবর্তক রামমোহন থেকে শুরু করে নবজাগৃতির ইতিহাসের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতিটি মনীষীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ গুণের সাধারণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হোল: (ক) সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি অনিঃশেষ আগ্রহ, (খ) বিশ্ব-মানবিকতার প্রতি আজীবন আনুগত্য, এবং (গ) মার্জিত জীবনবোধের (Urbanity) প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ। এ ছাড়া ধর্ম, কর্ম, জীবন প্রভৃতির সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এখন বিবেকানন্দের মধ্যে বাংলার নবজাগৃতির পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি কিভাবে কোন্ রূপের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে সেই আলোচনা করতেই সচেষ্ট হচ্ছি।

।। দুই ।।

রামমোহনের অনেক পরে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। রামমোহনের তিরোভাব ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। আর বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালে। তারপরে আরো দুটো দশকেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে 'নরেন্দ্রনাথে'র 'বিবেকানন্দ' ও 'স্বামীজি'তে পরিণত হতে। এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক পুণ্যশ্লোক মনীষীর আগমনবার্তা ধ্বনিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে নতুন ও পুরাতনোদ্ভূত সংশয়, দ্বিধা ও ভাব-ক্লান্তিকে লক্ষ্য করেছি—বিদ্যাসাগরকে দেখেছি লোকহিতৈষী, বীর্যবান প্রেমিক এবং সুদক্ষ ভাষাশিল্পীরূপে। এর পর দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের—ভক্তিবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানবাদের নতুন দিগন্তের আবরণ উন্মোচিত করেছেন। প্রজ্ঞা, প্রত্যয় এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তার ওপর ভর করে এসেছেন ভূদেব ও রাজনারায়ণ। সাহিত্যে নবসৃষ্টির সূচনাকে প্রত্যক্ষ করেছি মধুসূদন, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ও বিহারীলাল প্রভৃতির মধ্যে। আর কেশবচন্দ্রে আত্মিক শক্তি, সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ও সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তারকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছি। কিন্তু এঁদের কারোর আন্দোলনেই রামমোহনের সেই ব্যাপক, বিশাল, দিগন্তপ্রসারী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়নি। একেবারে ঊনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দের মধ্যে এসেই রামমোহনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সংহতি লাভ করেছে,—বিবেকানন্দ হয়েছেন রামমোহনের ভাব-শিষ্য—তাঁর উত্তর-সাধক। এখন ভেবে দেখা যেতে পারে, রামমোহনের মধ্যে আমরা কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করেছি, যার জন্য তাঁকে আমরা 'নবযুগের প্রবর্তক', 'Prophet of New India' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে থাকি। রামমোহনের মধ্যে ছিল উদার ধর্মচেতনা, সমাজ-সংস্কারকের কঠোর দৃষ্টি, স্বাজাত্যবোধের সহনীয় অহমিকা, সাহিত্য-নির্মাণের সাধু প্রচেষ্টা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং মানবিকতার প্রতি গভীর আস্থা। রামমোহন ছিলেন সমন্বয়-সাধক। ধর্মকে এবং সেই একই সঙ্গে বিজ্ঞানকেও স্থান আপন অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। তাই একদিকে যেমন তিনি বেদান্তের নবীন ব্যাখ্যাতা—শাঙ্কর-অদ্বৈতের প্রচারক, অন্যদিকে তেমনি ফরাসী এনসাইক্লোপেডিস্টদের ভাব-শিষ্য। শুধু দান, ধ্যান, দয়াধর্ম ও মানবতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাপোষণ নয়,—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাও তাঁর আত্মার আত্মীয়। এখন ঠিক এই ভাবগুলি, এই গুণগুলি যদি অন্য আর কারো মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখি, তাহলে তাঁকে নিশ্চয় আমরা কেবল সাধারণ অর্থে সাধু-সন্ন্যাসীর পর্যায়ভুক্ত না করে, আমাদের নবজাগৃতি আন্দোলনের সক্ষম কৃতী নেতাদের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দেব। বিবেকানন্দকে আজ ঠিক এইরকমের একজন কর্মযোগী বলে স্বীকার করে নেবার সময় এসেছে। তিনি কেবল রামকৃষ্ণেরই শিষ্য নন, বিশেষ অর্থে তিনি রামমোহনেরও শিষ্য। তিনি কেবল আবেগপ্রবণ ধর্মপ্রচারক নন, তিনি যুক্তিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকও। গেরুয়া বসন ধারণ করেও তিনি বৈরাগী হন নি—ব্যবহারিক জীবনের প্রতিও তাঁর অনীহা নেই। বরং মাটির মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রবলতম আসক্তি ও সহৃদয় সহানুভূতি।

।। তিন ।।

ঊনিশ শতকে বাংলার যে নবজাগরণ, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সমগ্র ভারতবর্ষ অনেক কিছু প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে এর দিকে তাকিয়েছিল। "ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সবক্ষেত্রেই নবীন ভারতে যে রূপান্তর ঘটল তার মূলে এক বড়ো শক্তি-রূপে কাজ করেছে এই রেনেসাঁস্।" (১) সুতরাং রেনেসাঁস্-পর্বে বাংলার যে চিন্তা তা কেবল বাংলার জন্যই নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যও। এই চিন্তার প্রাথমিক রূপ রামমোহনের আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে পরিস্ফুট; আর বিবেকানন্দে এর পূর্ণ পরিণত রূপের অভিব্যক্তি। আশ্চর্যের কথা, বিবেকানন্দ যখনই যা কিছু চিন্তা করেছেন—যা কিছু বলেছেন তা সমস্তই ভারতবর্ষের জন্য,—কেবল বাংলার জন্য নয়। প্রাদেশিক চেতনার সংকীর্ণতাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে। তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র, বক্তৃতামালা ও রচনার মধ্যে "বাংলা" শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত অল্প—নেই বললেই হয়। অথচ "ভারতবর্ষ" শব্দটির ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মত। ভারতের মাটি তাঁর কাছে দেবী অনুপমা,

---

(১) বাংলার জাগরণ—আবদুল ওদুদ।

বেশী পবিত্র। তিনি বলেছেন,—"The soil of India is my highest heaven," কর্মক্ষেত্রে নেমে স্বামীজী শিষ্যদের ডাক দিয়ে তাঁর অন্তরের আশাকে ব্যক্ত করেছেন,—"আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালাতে হবে যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে।" (২) সুতরাং বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় কোন আলোচনার পটভূমি হিসেবে শুধুমাত্র বাংলা দেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষও অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠার অবকাশ থেকে যায়। তা হোল,—বিবেকানন্দ কি উগ্র জাতীয়তাবাদী? আমরা সরবে বলবো,—না। কারণ আমরা জানি, উগ্র জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবিকতার পরিপন্থী। অথচ বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বজাতের সর্বকালের মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ের সর্বাত্মক সহানুভূতিবোধ ও অনির্বাণ প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। মানবতাবাদের মন্ত্র জপে স্বামীজী আমাদের নবজাগরণের অনেকাংশে সফল করে তুলেছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে একটা চিঠিতে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখছেন,—"আমার জাতি বিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতি বিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের।" ৩) ঠিক এর একমাস আগে নিউ ইয়র্ক থেকে মিঃ ই, টি, স্টার্ডিকে লিখেছেন,—"ভারতকে আমি সত্যসত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি?" (৪) সুতরাং এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক। তবে ভারতের সম্পর্কেই তিনি বেশী বলেছেন ও ভেবেছেন। এর পেছনে অন্য কারণ আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নবজাগৃতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতিটি মনীষীর মধ্যেই যে তিনটি সাধারণ গুণের সমুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে সার্বিক মুক্তি-চেতনা ও স্বাধীনতার প্রতি অনিঃশেষ আগ্রহ অন্যতম। এই গুণের অধিকারী বিবেকানন্দের কাছেও তাই পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছিল। কুসংস্কার ও কুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ভারতকে আত্মিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে মুক্তি এবং স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর এত বেশী সচেতনতা;—অন্য আর কোন কারণে নয়।

(২) পত্রাবলী (১ম), পৃঃ ১৬১

(৩) ঐ পৃঃ ৪৪৬

(৪) পত্রাবলী—(১ম) পৃঃ ৩৬১

।। চার ।।

রামমোহনের মত নবজাগরণের সাধনায় ব্রতী বিবেকানন্দও অদ্বৈতবাদের প্রচার করেছেন—বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ও চিন্তায় তথাকথিত অলৌকিকতার মধ্যে বেদান্তের কোন স্থান নেই। স্বামীজীর মতে;—The abstract Advaita must become living—poetic in everyday life." এই অদ্বৈতবাদের প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একই জাতির আভ্যন্তরীণ বিবাদকে মিটিয়ে ফেলে সকলকে একতার সূত্রে দৃঢ়সংবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবু রামমোহনের সময়ে ছিল শুধু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমতের মধ্যে বিবাদ। কিন্তু বিবেকানন্দের আমলে আবার এর সঙ্গে এসে যুক্ত হোল ব্রাহ্মধর্মের ত্রিধারা,—আদি ব্রাহ্মসমাজ, নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সুতরাং ধর্মমতের ক্ষেত্রে রামমোহনের সময় অপেক্ষা বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের অবস্থা জটিলতর। এছাড়া বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন ধর্মের বিবাদ তো ছিলই। রামমোহনের মত স্বামীজীকেও তাই শাঙ্কর-অদ্বৈতের প্রচার করতে হয়েছে অদ্বৈতবাদের ঐক্য-চেতনায় এক সূত্রে শতসহস্রটি মন বাঁধবার জন্য,—এক কর্মে শতসহস্রের প্রাণ সমর্পণে প্রেরণাদানের জন্য।

বিবেকানন্দের ধর্মমত বাস্তব চিন্তা-প্রসূত। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ঐহিকতার দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি আধুনিক সংস্কারমুক্ত, প্রগতিবাদী, মুক্তস্বচ্ছ ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী মন তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের প্রতিটি স্তরে পরিব্যাপ্ত। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসু 'Swami Vivekananda' (Studies in the Bengal Renaissance — Edited by Atul Gupta) নামক প্রবন্ধের মধ্যে এক জায়গায় লিখছেন, "The nation is his God, service to the nation his religion," একথা বিবেকানন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য,—এ সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। স্বামীজী নিজেও স্বীকার করেছেন,—"মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম।" (৫) আর এই 'মুক্তি'ই তো হোল 'Service to the nation'—এর লক্ষ্য! জীবের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও সহানুভূতি হোল বিবেকানন্দের সাধনার পথ, আর ভালোবাসা তাঁর উপাসনা. এই জন্যেই তিনি এমন এক ধর্ম চেয়েছেন, "যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে।" (৬) "আমার অভিযানের পরি-

(৫) পত্রাবলী—পৃঃ ৩৬৪

কল্পনা' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন,—"মানুষ গড়িতে পারে, এমন ধর্ম আমরা চাই।......চারিদিকে মানুষ গড়িতে পারে, এমন শিক্ষা আমরা চাই। মানুষ গড়িতে পারে, এমন তত্ত্ব আমরা চাই।" এই মানুষ গড়ার সাধনাই হোল নবজাগৃতি-পর্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা। আর বিবেকানন্দ এ সাধনায় সিদ্ধকাম। তিনি যথার্থই মানুষ গড়ার সুদক্ষ কারিগর।

বিবেকানন্দ ঈশ্বর-বিশ্বাসী।

কিন্তু সে কোন ঈশ্বর? তাঁর কথাতে বলতে গেলে বলতে হয়, "The only God in whom I believe, is the sum total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races." সর্বজাতীয় (all races) দরিদ্র, বঞ্চিত, উৎপীড়িত ও ব্রাত্য মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তির ব্যাপকতা এবং সর্বাত্মক সহানুভূতিবোধ না থাকলে এমন উক্তি কি কেউ করতে পারে? দুঃস্থ মানুষকে ভালোবাসার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে স্বামীজীর অসংখ্য চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় ও রচনায়। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি।" (৭) অন্যত্র বলছেন,—"পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না তাকি আবার ধর্ম?" আর এক জায়গায় বলছেন, "আমি এক ধর্ম মানি, তার নাম পরোপকার।" সুতরাং এই সমস্ত উক্তি থেকে এ কথাটা সহজেই অনুমেয়, প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও ঈশ্বরকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে সর্বপ্রথমে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষ,—তার পরে ভগবান। স্বর্গের চিরকালীন সুখশান্তির চাইতেও ক্ষুধার অন্নের প্রয়োজন ও মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী। তাই একথাও তাঁকে বলতে শুনি, "I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven." (৮) আমরা এতদিন জানতাম, মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু স্বর্গধাম। আমরা জানতাম শিবের সেবার ভেতরেই মানুষের মহৎ কল্যাণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু জীবপ্রেমিক বিবেকানন্দ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন,

(৬) স্বামী বিবেকানন্দের জীবন', ২য় খণ্ড, ৭৩ পরিচ্ছেদ।

(৭) পত্রাবলী (১ম) পৃঃ ৩৯২।

8. Letters of Vivekananda, Advaita Ashrama, Mayavati, p. 141.

সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ, জীবের সেবাই শিবের সেবা—শিবের সেবা জীবের সেবা নয়। সমষ্টির উন্নতি মানেই ব্যষ্টির উন্নতি—কিন্তু ব্যষ্টির উন্নতি মানে তো আর সমষ্টির উন্নতি নয়! এই-ভাবেই নবজাগৃতি-পর্বে মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ ধর্ম ও ঈশ্বরের নতুন সংজ্ঞা-নির্দেশের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সংকীর্ণ মুক্তিচেতনার ওপর উড়িয়ে দিয়েছিলেন সমষ্টি-চেতনার গৌরব পতাকা।

।। পাঁচ ।।

আলোচনার এই অংশে সমন্বয়সাধক, আধুনিকতার প্রতি আস্থাবান ও ইতিহাস-সচেতন বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমরা কিছু বলবো। কারণ, সমন্বয়চিন্তা, আধুনিকতা ও ইতিহাসসচেতনতা যে-কোনো-দেশের নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছে। সমন্বয়-চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ঐক্য-চেতনা, আধুনিকতা থেকে মিলেছে মুক্তির আশ্বাস, আর ইতিহাস-চেতনা থেকে পাওয়া গেছে আত্মবিচারের প্রবৃত্তি। রামমোহনের মধ্যে এই ভাবগুলি সবই বীজের আকারে ছিল—বিবেকানন্দে এসে এগুলি সবই মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাই রামমোহনের পর প্রথম বিবেকানন্দকেই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হ'তে দেখলাম। দেখলাম, যুক্তি-বাদী ধর্মের ওপর ভর করে তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদ তথা নব-বেদান্তবাদকে গড়ে তুলতে। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্মকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হলেও বিবেকানন্দের মতে এদুটোর লক্ষ্য কিন্তু এক। বিজ্ঞানও ঐক্যের আবিষ্কারে নিয়োজিত—ধর্মও ঐক্যের সন্ধানে উন্মুখ। উভয়েরই ভিত্তি: জ্ঞান বা যুক্তি। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল প্রয়োগ ভিন্ন। "বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে চায়। ধর্ম হইল কেবল অধিকতর পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার আছে (তথাকথিত ধার্মিক হলে কি একথা বলতে পারতেন?) যে, উহা অধিকতর পবিত্র।" (৯) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমন্বয়-সাধনার প্রভাবে বিবেকানন্দ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে জ্ঞান বা যুক্তির ভিত্তিভূমিতে সমন্বিত করেছিলেন,—ভাবদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মধ্যে সার্থক মিলন ঘটিয়েছিলেন।

সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব হোল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সম্মিলন। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। তাই বললেন, "আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।" (১০) একই সঙ্গে মানুষের জীবনে 'ধর্মশিক্ষা' ও 'ঐহিক উন্নতি'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করা কোনো তথকথিত সাধু-সন্ন্যাসীর কাজ নয়,—এ যথার্থ সমন্বয়-বাদে বিশ্বাসী নবজাগরণের একজন ধারক ও বাহকের পক্ষেই সম্ভব। বিবেকানন্দের পূর্বোক্ত উক্তি থেকে এ কথাটা স্পষ্ট যে, তিনি কেবল পাশ্চাত্য থেকে আমাদের গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকতে নির্দেশ দেননি—আমাদের দানও করতে বলেছেন। পাশ্চাত্যকে আমরা দান করতে পারি, একথা 'সংস্কারযুগে' রামমোহন ছাড়া আর কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। সামগ্রিকভাবে না হলেও তাই ব্যাপক-ভাবে রামমোহনের পর থেকেই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের যুগ ব'য়ে গেছে। বিবেকানন্দকে এই যুগের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। আধুনিক মননজাত উপলব্ধির সাহায্যে তিনি আমাদের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত হয়ে তার যা কিছু ভালো সেগুলিকে গ্রহণ করতে বলেছেন,—সবকিছুকে নয়।

বিবেকানন্দ ইতিহাস-বেত্তা। ইতিহাস-চেতনাই তাঁকে অনেকাংশে আধুনিকতার

(৯) সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।

(১০) পত্রাবলী (১ম)—পৃঃ ১৮১।

প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার দৃষ্টি প্রক্ষেপণে সহায়তা করেছে। স্বামীজী অতীতকে জেনে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ছিলেন—আবেগ, বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে বর্তমানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে অগ্রসর হয়েছেন—আর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। যথার্থ ঐতিহাসিকের মন নিয়ে ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,—"প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে।"—আরো বলেছিলেন, "কিন্তু আসবে যে ভারত Future India—Ancient India -র অপেক্ষা অনেক বড় হবে।" এই 'অনেক বড় হবে'র প্রত্যাশা প্রগতিবাদে বিশ্বাসী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন আশাবাদীর।

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে Urbanity বা Decencies of life (কারো কারো মতে) প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমত খুব স্পষ্ট। তিনি বলছেন, "মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহাবীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।" (১১) তিনি চেয়েছেন, প্রতিটি মানুষ আত্মনির্ভরশীল হোক। আত্মনির্ভরহীন মানুষকে তিনি অভিহিত করেছেন নাস্তিক বলে,—

"He who does not believe in himself is an antheist," বলেছেন,—"Believe first in yourself, and then in God." নিঃস্বার্থপরতাই জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বার্থপর মানুষেরা স্বামীজীর মতে 'দেশ-দ্রোহী'। স্বাধীনতা তিনি বরাবর চেয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা গ্রহণ করার মত ক্ষমতাও আমাদের অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের ছিল Possitivism-এ বিশ্বাস। সব কিছুতে নেতিবাচক মনোভাবকে তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। পলায়নপর মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। শিক্ষার প্রসারের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে, পৃথিবীতে থেকেই, সমস্ত কিছুকে জানা-শোনার আগ্রহ নিয়েই, দুঃখকষ্টের হাত এড়াতে তিনি আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। নীচের উধৃতিটি এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত:—"Do not fly away from the wheels of the world machine, but stand inside it and learn the secret of work." (১২)

ঊনিশ শতকীয় নারী আন্দোলন সম্পর্কেও বিবেকানন্দ নীরব ছিলেন না। শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। বিধবা-বিবাহের সমস্যা-সমাধানের ভার বিধবারা শিক্ষিত হলে নিজেদেরই কাঁধে তুলে নিতে পারবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হওয়া স্বামীজীর অনভিপ্রেত ছিল না। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতনভাবে বাধা-বিপত্তির হাত এড়িয়ে অগ্রসর হতে বলেছেন। আজকের দিনে এ কথার গুরুত্ব খুব সহজেই অনুভব করা যায়। শঙ্কর-অদ্বৈতের প্রচারক হলেও বিবেকানন্দ কিন্তু শঙ্করাচার্যের মত নারীকে 'নরকের দ্বার' মনে করেন নি:—বরং শ্রদ্ধা করেছেন, ভক্তি করেছেন, বিশ্বাস করেছেন। Organisation গড়ে তোলার জন্য ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে চিঠিতে লিখছেন,—"হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণমেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।" (১৩) নারী জাতির জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—যে বিদ্যালয়ে কুমারী ও ব্রহ্মচারিণী রমণীগণ আধুনিক সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু এই ইচ্ছার বিরোধিতা করেছে।* ভারতের অস্পৃশ্য, অসহায়, চিরলাঞ্ছিত ও দুর্বল নারী-সমাজের মৃতপ্রায় চিত্তের উদ্বোধন ঘটাতে নিবেদিতাকে ডাক দিয়ে বিবেকানন্দ লিখছেন,—"প্রিয় মিস্ নোবল, ভারতের জন্য বিশেষত নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন।" পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এই রকম 'সিংহিনী' নারীর যে কত প্রয়োজন ছিল, পরের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

॥ ছয় ॥

আলোচনার শেষাংশে বিবেকানন্দের জীবন-সাধনার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করছি। আমরা আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ঊনিশ শতকীয় নবজাগৃতির শেষ দুজন উত্তরাধিকারী। আর এটাও আমরা জানি, ভারতের জাতীয় আন্দোলন বাংলার এই নবজাগরণের পরোক্ষ প্রভাব-জাত (অনেক সময় প্রত্যক্ষও)। সেইজন্য জাতীয় আন্দোলনেও বিবেকানন্দের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর প্রভাব অবিস্মরণীয়। বিবেকানন্দের আবির্ভাব ছাড়া "India would not have been what she is now," (১৪)। কারণ বিশ শতকের প্রথমদিকের প্রতিটি বিপ্লবীই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নিবেদিতা ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তাঁদের জীবনসাধনায় স্বামীজীর আদর্শকেই প্রতিফলিত করেছেন বিভিন্ন উপায়ে।

(১১) পত্রাবলী (১ম) পৃঃ ৪৭৯।

12 Works, Vol. I, P. 113.

(১৩) পত্রাবলী (১ম) পৃঃ ৪৫১।

* 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী'—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

(১৪) 'Swami Vivekananda' — Atindranath Bose.

স্বদেশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

না, না, এতে দোষ নেই, লজ্জা নেই কোনো,
হোক না সে বর্ষিষ্ঠ পুরোনো
জরাজীর্ণ মলিন গরিব,
মাকে ঠিক ডাকা যায় মা-মা বলে উৎকণ্ঠ-উদ্‌গ্রীব—
কখনো তা কানে প্রাণে লাগে না বেসুরো,
মা কখনো হয় না তো বুড়ো
পরিত্যাজ্য পরিহরণীয়,
মাতৃনাম জীবনের বলিষ্ঠ পানীয়।
না, না, এতে ক্লেশ নেই, নেই মাত্র ভাবালু আবেশ,
বলো বলো মা আমার, আমার স্বদেশ ॥

তোমার মানবজন্ম নয় আকস্মিক,
শূন্যোৎপন্ন নও তুমি আকাশস্খলিত,
ঘর আছে, বেড়া আছে, জনক-জননী আছে ঠিক;
তেমনিও নির্দিষ্ট নির্ণীত
দেশ আছে, আছে তার মাটি—
জলোজ্জ্বল নদী আছে
শ্যামোচ্ছল মাঠ আছে
চতুর্দিক রসে-গন্ধে জমাটি-ভরাটি।
আর আছে মধুরের উৎস হতে মুখে ফোটা ভাষা,
স্বভাব-নিসৃত ভালোবাসা।
না, না, এতে দৈন্য নেই
কোনো মতিচ্ছন্ন নেই,
যেখানে তোমার চোখে আলোকের প্রথম উন্মেষ,
তাকে ঠিক বলা যায়, মা আমার, আমার স্বদেশ ॥

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে নীচের প্রশ্ন কয়টির উত্তর পেলে সুখী হব।

(১) গাড়ী চালানো অথবা পথ চলার ব্যাপারে কবে থেকে এবং কেমন ক'রে 'Keep to the left' এই নিয়ম চালু হয়েছে? আমেরিকার 'Keep to the right' বৃটিশদের এই 'leftist' নিয়ম থেকে আলাদাই বা কেন?

(২) Football-এর বল গোল কিন্তু Rugby-র বল নারকেলের মত কেন? নিছক Convention-এর কথা বাদ দিয়ে খেলার দিক থেকে এর কোন যুক্তি আছে কি?

(৩) আমেরিকা এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশে Cricket খেলা চালু হয়নি কেন? সে সব দেশের জনসাধারণের 'Sporting temperament'এর ওপর কোন অদৃশ্য হাত আছে কি?

সুবিমল সিংহ রায়,
২, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, বেহালা,
কলিকাতা-৩৪।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন পাঠক, পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি, আশা করি প্রশ্নগুলির জবাব 'অমৃত' মারফৎ জানতে পারবো।

(ক) আমি একটি Poultry করতে চাই। Poultry সম্বন্ধে, বিশেষ করে মুরগী সম্বন্ধে, কোন বই থাকলে বইটির নাম ও কোন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে?

(খ) মুরগী নাকি গরমের সময় অসুখে মারা যায়। কেন মারা যায়? কি করিলে ইহা প্রতিরোধ করা যায়।

(গ) মুরগীর খাদ্য কি কি?

এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি?

ইতি—নৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী,
পোঃ শিমুরালী, গ্রাম চান্দুরিয়া,
জেলা নদীয়া।

(উত্তর)

বিগত ২রা নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

শিয়াল, মোরগ ও কুরাল পাখী রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরেই ডাকিয়া থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রহর ৩ ঘণ্টা ধরিলে মোটামুটি রাত্রিকালে ৪টি প্রহর হয়। কি করিয়া ইহারা সঠিক সময়টির সন্ধান পায়, ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সর্বদেশের পণ্ডিতগণই মনে করেন যে, ভগবদ্দত্ত বা প্রকৃতিদত্ত সহজাত সংস্কার বা সহজ জ্ঞানের বলেই ইহারা সময়ের সন্ধান পাইয়া থাকে, যেমন পাইয়া থাকে পিপীলিকা আসন্ন বর্ষার পূর্বাভাষ। ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয়। সহজাত শক্তি যা সহজ জ্ঞান প্রাণীজগতের সর্বত্রই কমবেশী দেখা গেলেও রাত্রিকালীন সময়ের প্রায় সঠিক পরিমাপক শক্তি এই তিনটি প্রাণীর মধ্যেই বেশী নির্দিষ্ট। মোরগ গৃহপালিত পাখী, আর বাকী দুইটিও সাধারণতঃ লোকালয়ের নিকটেই বাস করে। ঠিক কি উদ্দেশ্যে ইহারা প্রতি প্রহরে ডাকিয়া থাকে, তাহা বলা কঠিন হইলেও জ্ঞানীগণের বিশ্বাস, মানুষকে নৈশ প্রহরের খবর জানাইবার জন্যই ইহারা স্বীয় স্বভাববশে এরূপ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ইহাদের ডাকে পল্লীগ্রামে বা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মানুষের উপকারই হইয়া থাকে, এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারা যে মানুষের বিনা-পয়সার ঘণ্টাবাদক, একথা অনস্বীকার্য। যে যুগে আধুনিক ঘড়ির ব্যবহার ছিল না, আর জল-ঘড়ি বা বালি-ঘড়ি রাখাও অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইত না, সে যুগে রাত্রিকালীন সময়ের হিসাব সাধারণ মানুষ মোরগ, শেয়াল এবং কুরালের ডাক শুনিয়াই ঠিক করিত। এখনও যাহাদের ঘড়ি কিনিবার সামর্থ্য নাই, বা ঘড়ি দেখিয়া সময় ঠিক করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা সকলেই ইহাদের ডাকের উপর নির্ভর করিয়াই রাত্রিকালীন সময়ের নির্ণয় করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের প্রহরে প্রহরে ডাকে মানুষেরই যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬।১১।৬২ ইং তারিখের অমৃত পত্রিকায় "জানাতে পারেন" বিভাগে রাঁচী থেকে শ্রীসমীরকুমার বিশ্বাস যে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, তার (গ) অংশের উত্তরে জানাচ্ছি :

সাগরের মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাফের কেবল্ পাতার চেষ্টা শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮৫১ সনে ডোভার প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রথম কেবল্ পাতা হয়। আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে কেবল্ পাতার কাজ সাফল্যলাভ করে ১৮৬৬ সনে। গভীর সাগরে যে কেবল্ পাতা হয়েছে তা হচ্ছে এক প্রকারের ইস্পাতের দড়ি। এগুলো এক ইঞ্চি মোটা হয়।

কেবল্ যদি সাগরের তলদেশে ২০০০ ফ্যাদম্ গভীরে অর্থাৎ দুই মাইলেরও অধিক গভীরে পাতা হয় তবে তা এক শতাব্দীরও অধিক কর্মক্ষম থাকে; কারণ সাগরের তলদেশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নরম কর্দমের আস্তরণ পড়ে থাকে সেখানে। কেবল্‌কে সেখানে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। কেবল্ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অগভীর সাগরে খুব তাড়াতাড়ি।

দীর্ঘ কেবল্ জড়ানো অবস্থায় জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয় খুলতে খুলতে এবং সাগরের মধ্যে ফেলতে ফেলতে। কেবল্ যেখান দিয়ে পাতা হয়ে থাকে তার একটা নিখুঁত চার্ট তৈরী করে রাখা হয়। সেই চার্টে প্রতি মাইল কেবল্-এর গতিপথ ও বিভিন্ন স্থানের সাগরের গভীরতা উল্লেখ করা থাকে। এই চার্টের সাহায্যে প্রয়োজন মতো কেবল্-এর সঠিক অবস্থান নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

যদি কোথাও কেবল্ ছিঁড়ে যায় তবে প্রথমে স্থল-দেশে অবস্থিত কেবল্-এর দুই মুখ থেকে ইলেকট্রিক্যাল টেস্ট দ্বারা কেবল্-এর ছিন্ন দুই মুখের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তারপর মেরামতকারী জাহাজ পাঠিয়ে ঐ ছিন্ন দুই মুখ হুকের সহায়তায় তোলা হয়। এই টেনে তোলবার হুকের দড়ি তৈরী হয় ইস্পাতের তার ও শনের সাহায্যে এবং প্রায় ১৮ টন ওজন তোলার ক্ষমতা সম্পন্ন করে এটা তৈরী হয়; কারণ ভারী কেবল্ তুলতে হয় দুই থেকে তিন মাইল গভীর সাগর থেকে। ছিন্ন দুই মুখ টেনে তোলার পর তাদের আবার যথাযথভাবে জুড়ে দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে দেওয়া হয় সাগরের তলদেশে।

কেবল্ লাইন পাতায় ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বার্তা-প্রেরণের কাজ একদিন অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। আজ অবশ্য বেতারের যুগ। বেতার ধীরে ধীরে তারের স্থান গ্রহণ করছে। বেতারের সাহায্যে অনেক সহজতর উপায়ে বার্তা-প্রেরণ আজ সম্ভব হয়েছে। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল্-এর ব্যবহার চালু থাকলেও একদিন হয়তো তার ব্যবহার সম্পূর্ণ উঠে যাবে।

শ্রীসুতপেশ দাস,
ও-সি-এস পোঃ মোহনপুর,
নদীয়া।

লবণ পারাবারের তীরে

মিহির আচার্য

[একটা বয়েস আছে যখন সব শিশুই মেয়েদের কাছে উপযুক্ত সমাদর পেতে চায়। জননীর দাবি তার কাছে আরো বেশি। আমাদের হতভাগ্য নায়ক নিরঞ্জন অতি শৈশবেই তার গৌরাঙ্গী এবং মিশনারী শিক্ষায় লালিত মার কাছ থেকে লজ্জা-করুণ উপেক্ষা পেয়ে এসেছে। নিরঞ্জনের অপরাধ তার গায়ের রঙ মার মতো ফরসা হয়নি। রঙের অভাবে তার শৈশব কেটেছে মাদ্রাজী আয়ার কারাগারে। তারপর একদা তার মার অকালমৃত্যু ঘটেছে। নিরঞ্জন কলেজে-পড়া ত্রিশ বছরের যুবক। বাবার ওয়ালটেয়ারে জাহাজের ঠিকাদারের ব্যবসা। তাই কলেজ-জীবনে ঐশ্বর্যের ছটা ছিল নিরঞ্জনের পোশাক-আশাকে চলায়-ফেরায়। মেয়েরা সতেজ হৃদয় নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু নিরঞ্জন বিজ্ঞানী গবেষকের দৃষ্টিতে মেয়েদের আবিষ্কার করতে চেয়েছে। শৈশবের এক অনুবন্ধ তাকে অস্থির ঘোড়ার মতো ছটফটে করে রেখেছে। সে আবিষ্কার করতে চেয়েছে নারীর সত্তা, সে কি নারীর বুকেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে, আবরণ উন্মোচন করে পাপড়ির মতো খসিয়ে সে গভীরে ডুব দিতে চেয়েছে। উজ্জ্বলা এমনি এক নারী, যে হৃদয়ের সাম্রাজ্য নিয়ে অনেকের চেয়ে কাছে এসেছিল। নিরঞ্জন তাকে গ্রহণ করেনি। আহত উজ্জ্বলা সাব-ডেপুটি তরুণকে বিয়ে করে বসল। বিয়ের পরে নিরঞ্জনের আবার আবির্ভাব। শ্বশুর-শাশুড়ী এমন কি স্বামীকে পর্যন্ত সে বশ করে ফেলল। তারপর নবদম্পতির মধু-চন্দ্রিকার অবকাশযাপন নির্দিষ্ট হল নিরঞ্জনের ওয়ালটেয়ারের বাড়িতে। হাওড়া স্টেশনে যাত্রার সময় উপস্থিত। এমন সময় হঠাৎ কর্মস্থলের জরুরি তার-এ তরুণের যাওয়া স্থগিত করতে হল। তিন-চারদিন পর সে আসছে এ-রকম ঠিক হলে উজ্জ্বলা নিরঞ্জনের সঙ্গেই রওনা হয়ে গেল। ওয়ালটেয়ারে নিরঞ্জন পেল নিঃসঙ্গ উজ্জ্বলাকে। একদিন গভীর রাত্রে নিরঞ্জন প্রবেশ করল উজ্জ্বলার শয়নঘরে, আবিষ্কারের সুতীব্র জ্বালা তার চোখে। উজ্জ্বলার ঘুমন্ত শরীরের দিকে দৃষ্টি স্থির। বিজ্ঞানী তন্ময়তা নেমে এসেছে নিরঞ্জ-নের চোখে। উজ্জ্বলা জেগে উঠে স্থির হয়ে গেল। সেই নিরুত্তাপ সন্ধানী আলোর সামনে উজ্জ্বলার নারীসত্তা যেন লজ্জায় দমবন্ধ হয়ে গেল। তারপর ঘরের ভেতরে একজোড়া পুরুষ-নারী ছুটোছুটি করতে লাগল, পালাতে চায় উজ্জ্বলা, এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট নিয়তির মতো, অমোঘ মৃত্যুর মতো নিরঞ্জন, বিড়-বিড় করে সে কি বলে, দেয়ালে শেষ আশ্রয় নিয়ে পিঠ শক্ত করে দাঁড়াল উজ্জ্বলা। সমস্ত শরীরে ঝেকারের ওঠা-নামা, উত্তেজিত মার্জারের মতো নিশ্বাস ফেলছে, তারপর কাপুরুষতায় কেঁপে উঠল ওর দেহমন, একটা দামাল ভয়, এবং ভয়কে জয় করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উজ্জ্বলা রুটি-কাটা ছুরিটা প্রাণ-পণে বসিয়ে দিল নিরঞ্জনের বুকে। মৃত্যু। লম্পটের হাত থেকে পরিত্রাণের

মানবী আদর্শের বৈজয়ন্তী তুলে কোর্ট থেকে খালাস পেল উজ্জ্বলা।

এবার পড়ুন......]

বাইরে শব্দহীন সন্ধ্যা। সমুদ্র এখন গম্ভীর মৌন। মাঝদরিয়ায় নোঙর-বাঁধা জাহাজটা আলোর দীপ জেলে দিয়েছে।

এই বাড়িতে আজ আলো জ্বলবে না। হয়তো এখনো অন্ধকার হয়নি। লনে বৃত্তাকারে চেয়ারগুলি পাতা। উজ্জ্বলার শ্বশুর-শাশুড়ি, তাঁদের মুখোমুখি ওর বাবা-মা। তরুণ এতক্ষণ চেয়ারের বুকেই স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, এবার ওঁদের দিকে পিছন ফিরে সমুদ্র দেখছে। ওর দিকে এই মুহূর্তে কারুর মনোযোগ নেই।
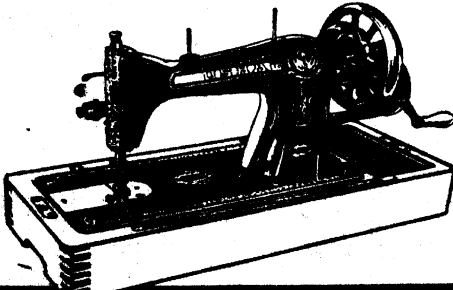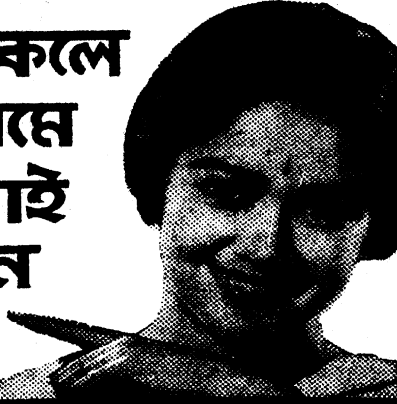
গৃহস্বামী অম্লানবাবু, মৃত নিরঞ্জনের জনক। পেশল বলিষ্ঠ চেহারা, এই বয়েসেও, গৌরবর্ণ। এবং সমগ্র চরিত্রে সৌম্য-ভদ্রতা। কোর্ট থেকে সকলকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। কারণ কাল বিকেলের আগে ট্রেন নেই। প্রথমে তাঁরা আপত্তি করেছিলেন, ইতস্ততও। কিন্তু অম্লানবাবুর আকৃতিতে এমন এক আর্যসুলভ দৃঢ়তা ছিল যে সে-সম্মোহনকে অস্বীকার করা যায়নি। বিচারশালায় উপস্থিত ছিলেন না, বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম আলাপপর্বেই তিনি যে নিরঞ্জনের বাবা, এ-পরিচয় তিনি মুছে দিতে পেরেছিলেন। বদনামী সন্তানের কলঙ্কের আঁচ তাঁর গায়ে লাগেনি। গাড়িতে আসতে-আসতে উনিই বেশি কথা বলেছিলেন। আর, আশ্চর্য হয়ে ও'রা দেখছিলেন এই বিগতদার প্রৌঢ় মানুষটিকে, যাঁর একমাত্র বংশধর এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। নাঃ কোনো শোক নয়, দুঃখ নয়, কিছু ক্লান্তি হয়তো ছিল, ভেঙে-পড়ার বিষাদ নয় একটুও। সন্তানশোকে অবিচলিতচিত্ত এই সৌম্য ভদ্রলোক একসঙ্গে বিস্ময় ও ভীতির কারণ হয়েছিলেন।

উজ্জ্বলাকে তিনিই হাল্কা হাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। উজ্জ্বলা, এখন এই মুহূর্তে পাগলের মতো নিদ্রা দিচ্ছে। ঘরে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন অম্লানবাবু, বাইরে থেকে নিজের হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন।

উজ্জ্বলা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক।

বাইরে লনে সকলে গোল হয়ে বসেছেন। জলধর কফির বাটি পরিবেশন করে গেছে। নৈশ ভোজনের এখনো দেরি আছে।

একমাত্র বক্তা অম্লানবাবু। যেন এ'রা কতকালের পরিচিত আত্মীয়। হয়তো নিরঞ্জনের অকস্মাৎ মৃত্যুই সকলকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। নিরঞ্জনের স্মৃতি নয়, এখন গৃহস্বামীই তাঁর প্রতিটি আচরণ, কথাবার্তা দিয়ে এ'দের চোখের সামনে অভূতপূর্ব

বিস্ময়ের মতো উপস্থিত হয়েছেন। যেন একটা সুপ্রাচীন পাহাড়—বহু ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে প্রকাণ্ড অস্তিত্বের গৌরব ধারণ করে রয়েছেন। এই সুমহান অস্তিত্বের সামনে আশেপাশের মানুষগুলিকে ক্ষুদ্র খর্ব দেখাচ্ছে। যেন সঙ্কোচের ভয়ে তাঁরা মামুলি কোনো শোক-বিজ্ঞাপন বা সে ধরনের কিছু জানিয়ে আর ছোটো হতে চান না। যাঁর শোক নেই দুঃখ নেই, সেই হৃদয়ের আকাশে তাঁরা কি আখর টানবেন। আশ্চর্য, তবে কি তিনি নিঃসম্পর্ক হয়ে পুত্রের দোষকে বিচার করতে পেরেছেন। অপরাধী সন্তানকে ঘৃণা করতে পেরে স্বস্তি লাভ করেছেন। নিরঞ্জন জঘন্য অপরাধী, নিদারুণ পশু এবং পাপের বেতন মৃত্যু। কিন্তু, তবু তো নিরঞ্জন তাঁর সন্তান, তাঁরই শোণিত-প্রবাহ, বংশলতা। এর চেয়ে তিনি যদি পুত্র-শোকে ভেঙে পড়ে শিশুর মতো ক্রন্দন করে উঠতেন। মানুষটাকে বোঝা যেত, বেদনাকে স্পর্শ করা যেত। এই দুর্ঘটনার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই, এই দুর্নিবার নিয়তির জন্যে আমরা অন্তত শোকপ্রকাশ করতে পারতাম। এ যেন আমরা এক পবিত্র গির্জের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে শোক নেই, পরিতাপ নেই, সমস্ত বেদনা স্বর্গীয় রোমাঞ্চ হয়ে ফুটে উঠছে।

'আপনাদের মতো মানী অতিথি-সমাগমে আমার কুটির ধন্য হয়েছে—' অম্লানবাবু আবার বললেনঃ 'কিন্তু এমন একটি ঘটনায় আমাদের সম্মিলন ঘটবে, কে ভেবেছিল।'

সকলে নিঃশব্দ।

সমুদ্র মৌন। আকাশ মৌন। কেবল নোঙর-করা জাহাজটি বন্দরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

'জীবন একটা আশ্চর্য সম্পদ......' শুভ্রকেশে আঙুল ডুবিয়ে বললেন অম্লানবাবু। আশ্চর্য জীবনের সম্পদে অপূর্ব ভাবমুগ্ধ দেখাল তাঁর মুখ। একটু নড়ে বসলেন তিনি। চেয়ার শব্দ করে করুণ আপত্তি জানাল। 'আর-এক দফা কফি হোক কী বলুন?'

কেউ আপত্তি করলেন না। কারণ আপত্তি করলে কথা বলতে হয়।

'নিরুর মা অতি অল্পবয়েসে মারা যান। সেই থেকে ছেলেটা আমার হাতেই মানুষ। আমিই ওর মা-বাবা...' কাশলেন অম্লানবাবু। একটু থেমে আবার স্বগত উচ্চারণ করলেনঃ 'কী আশ্চর্য, আমিই ওকে মানুষ করেছি। ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত শান্ত আর নিরীহ সে। তবে মাঝে-মাঝে ওকে অস্বাভাবিক কাজ করতে দেখতাম। একদিন একটা বেড়াল কোথা থেকে বাড়িতে এসে ঢুকেছিল, সে লাঠি নিয়ে তাড়া করে ওকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছিল। বেড়ালকে সে সহ্য করতে পারত না। সত্যি, কী আশ্চর্য, এখন এসব কথা এক-এক করে মনে পড়ছে। জীবহত্যা পাপ সে জানত না।'

তরুণের মা কাশলেন। ঘোমটার আড়ালে কাশির ধমকে ওঁর সারা শরীর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

অম্লানবাবু ওঁকে সামলাবার সময় দিলেন। চোখ রাখলেন ওদিকে তরুণের উপর। ছেলেটি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে হাত রেখে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁকে এখন কুঁজো দেখাচ্ছে, চুলগুলি উড়ছে, আর দৃষ্টি সুদূরে। তারপর এক সময় হাঁটা থামিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিলেন কথাগুলি। 'আমি বাবা হয়েও সন্তানকে বুঝতে পারিনি। আমাদের সম্পর্কের ভেতরে কোথায় একটা দূরত্ব ছিল। এখন মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করলেও ওর মনের কাছাকাছি আসতে পারিনি।' একটু থেমেঃ 'তাই বোধহয় নিরুর মনে কতগুলো ফাঁক ছিল ফাঁকি ছিল, যেগুলি সে নিজে নিজেই সমাধান করতে চাইত। সমস্যাগুলিও তার নিজেরই বানানো।' তারপর আবার পায়চারি শুরু করলেন। বোধহয় চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার অবকাশ গ্রহণ করলেন। একটু পরে চেয়ার টেনে বসলেন। বললেনঃ 'আমি অবাক হয়ে গেছি এই ধরনের সমস্যাগুলি সে কোথায় পেল। বংশগতিতে আমি বিশ্বাস করি, উত্তরাধিকারসূত্রে কখনো মা কখনো বাবার মানসিক বৈশিষ্ট্য সন্তানের ওপর ভর করে। কাজেই যে মানসিক গঠন নিরু পেয়েছে তাতে আমার বা ওর জননীর প্রচুর দায়িত্ব আছে। সমস্যাগুলি আপাতদৃষ্টিতে ওর বানানো মনে হলেও তার স্মৃতিরেশ ছাপ ফেলেছে তার মনে। ফলে ঝুরিনামা বটগাছের মতো তার ভেতরে একটা ভাবজট ঘন বাসা বেঁধেছে। নিরু অবশ্য তার ডায়েরিতে এই কমপ্লেক্সের একটি কার্যকারণ দাঁড় করিয়েছে। যাকে সে প্রধান অপরাধী করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিজের কাছেই সে পরিষ্কার করতে পারেনি। আমি ভাবছি যার উল্লেখ না থাকলেও নিরু যা হবার তাই হয়েছে, এ-ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না। আপনারা কি বলেন?'

এবারও কোনো উত্তর নয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে পাথর।

জলধর কফি নিয়ে এল। কফির পাত্র সামনে রেখে ওঁরা পান করতে ভুলে গেলেন।

অম্লানবাবু উঠে দাঁড়ালেন। 'এক মিনিট। আসছি।'

সিঁড়ি পার হয়ে ওঁর দীর্ঘদেহ বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অম্লানবাবু উজ্জ্বলার ঘরের চাবি খুললেন। ঠাণ্ডা সবুজ আলোয়

প্রলেপের মতো চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর। খাটের দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি নিদ্রার বন্যায় তলিয়ে। সারা শরীর শয্যার পরে বিতত। মুখে বেদনার শুকনো গোলাপ। চোখের কোলে কালি, আর পাতলা গোলাপী ঠোঁটজোড়া রক্তের কালশিটে জমানো। অম্লানবাবু অকস্মাৎ নিবিড় বেদনা বোধ করলেন মেয়েটির জন্যে। অত্যন্ত ভালোবেসে

মেয়েটি নিদ্রার বন্যায় তলিয়ে ......

ফেলেছেন ওকে। যেন ওর মধ্যে তাঁর মৃত পুত্রের ভাঙাচোরা একটি স্মৃতিস্তম্ভ খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। যেখানে অনেক চোরকাঁটা, বুনো ঘাস, আর নাম-না-জানা ফুলের সমারোহ। এই মেয়েটি —কী নাম ওর—উজ্জ্বলা। ক্লান্ত শ্রান্ত একটি মেয়ে। ওর বাঁ হাতটা খাটের থেকে ঝুলে পড়েছে, অম্লানবাবু অসীম স্নেহে তুলে দিলেন সেটা। করতল উষ্ণ, আঙুলগুলি কৌণিক। তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ও'র শীর্ণ কপালে হাত রাখলেন, শুকনো গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো চোখ থেকে সরিয়ে দিলেন। পলকবিহীন তাকিয়ে রইলেন তিনি। যেন ওটা একটা ভাঙা তৈলচিত্র, নিরঞ্জনেরই তুলির আঁচড়ে গড়ে-ওঠা। অবরুদ্ধ আবেগে বুকের ভেতরে কেমন এক হাঁপ অনুভব করলেন, একটা কণ্ট। পিতৃত্ব। এবং কামিজের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছলেন। কী আশ্চর্য, এই মাত্র অনুভব করলেন তিনি নিরুর কোনো পূর্ণবয়স্ক ছবি এই বাড়িতে নেই। অথচ তার স্মৃতিবহ অনেক চিহ্ন এ বাড়ির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। স্মৃতির একটি অবয়ব দিতে চাইলেন অম্লানবাবু। মুখচোখসহ একটি স্পষ্ট শরীর। যাকে স্পর্শ করবেন, ঘ্রাণ নেবেন, যার উত্তাপ অনুভব করবেন। নিজের রক্তে। এই মেয়েটি, উজ্জ্বলা যার নাম, যেন এমনি একটি শরীর—উত্তাপ-স্পর্শ-স্পন্দন জড়ানো একটি কীর্তি। নিরঞ্জন এই কীর্তির স্থপতি।

বিছানা থেকে সরে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। ডলফিন্‌স নোজের চুড়ো অন্ধকারে অতিকায় জন্তুর মতো দেখাচ্ছে। ঠিক মাথার ওপরে একটি তারা জ্বলছে। অম্লানবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

'আপনাদের কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলাম—' হাসলেন অম্লানবাবু। বসলেন চেয়ার টেনে।

ও'রা কেউ নড়েননি, ওঠেননি চেয়ার থেকে। তেমনি সমাহিত বসে। প্রত্যেকের দিকে একবার চোখ বুলোলেন অম্লানবাবু। দেখলেন পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো তরুণকে। সমুদ্র দেখছে।

'কি যেন বলছিলাম........' অম্লানবাবুকে চিন্তিত দেখাল। তারপর কথার সূত্র খুঁজে পেয়েছেন এইভাবে শুরু করলেন : 'নিরুকে আমি বুঝতে পারিনি, বাবা হয়েও সন্তানকে চিনতে না-পারার ক্ষোভ আমার কোনো দিনও যাবে না। এই আজকের যুবকেরা অন্য-এক যুগে বাস করছে, ওদের কাছে আমাদের যুগ ফুরিয়ে গেছে। আমরাও আমাদের যুগের সমস্যায় পীড়িত ছিলাম। কিন্তু, আমাদের সামনে ছিল বিরাট এক কর্মযজ্ঞ—কাজের প্রবল রথের চাকায় জীবনকে ছুটিয়ে দিয়েই ছিল আনন্দ। কিন্তু, এখনকার যুবকেরা, কাজের চেয়ে চিন্তাকে বড় করে দেখেছে। তারা যত কাজ করেছে তার চেয়ে চিন্তা করেছে বেশি। এই চিন্তাই আজকের যুগের প্রধান লক্ষণ।' একটু থেমে : 'নিরুর কথাই বলছিলাম। সেও এই যুগের দুঃখদায়ক অথচ অবশ্যম্ভাবী শিকার।'

কে কেঁদে উঠলেন চাপা অথচ তীক্ষ্ণস্বরে। উজ্জ্বলার মা।

অম্লানবাবু কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। 'আমি কি এমন কিছু বলেছি......' স্বর জড়িয়ে গেল তাঁর কণ্ঠে।

'না না। আপনার কথায় নয়—' তাড়াতাড়ি বললেন উজ্জ্বলার বাবা।

ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বোধকরি অন্তঃশীল একটা দুঃখ বহুক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল তাঁর হৃদয়কে। অম্লানবাবুর নিরাসক্ত দার্শনিকতা তাঁকে অবিচলিত থাকতে দেয়নি। মহৎ এক বেদনার হিমাচল গাম্ভীর্যের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যে-ভয় যে-

অসহায়ত্ব অনুভব করে সেই উৎস থেকেই এই কান্না উৎসারিত। কিংবা নারীর স্বাভাবিক অধিকারে একটি পুরুষের বাগাড়ম্বরের পেছনে যে মেঘলা স্যাঁত-সেঁতে আকাশ তার পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি।

অম্লানবাবুর এতক্ষণকার সাজানো চিন্তায় কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। একটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর আচরণে, প্রস্তুত চিন্তাগুলি বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মতো এলোমেলো হয়ে গেল।

তবে কি এতক্ষণ অভিনয় করছিলেন নিজের সংগে।

'সব, সব আপনার ভণ্ডামি।'

তৎক্ষণাৎ বাজ পড়লেও কেউ এমন চমকাত না।

সকলের দৃষ্টি তরুণের দিকে। শ্বাপদের মতো জ্বলছে ওর চোখের ভাষা, ঘনঘন বিক্ষুব্ধ হচ্ছে ওর শরীর, থরথরিয়ে উঠছে ঠোঁট।

'চমৎকার নাটক।' বঙ্কিম ঠোঁটের মুদ্রায় আবার বলল তরুণ।

ঘাড় নিচু করে পুঞ্জীভূত স্তব্ধ শোকের মতো নিশ্চুপ বসে রইলেন অম্লানবাবু। নাটক। ভণ্ডামি। ভাবলেন তিনি : সত্যিই কি তিনি নাটকের একটা ভণ্ড পার্ট এতক্ষণ করে গেছেন। নিরঞ্জন তাঁর পুত্র, একমাত্র বংশধর। হঠাৎ রিক্ত শূন্যতায় ভরে উঠল তাঁর হৃদয়।

'ছি তরুণ, সংযত হও।' বললেন ওর বাবা।

'না।' তরুণ সিন্ধুারসের গলায় চিৎকার করে উঠল : ও'র ছেলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনে আমার কী কাজ হবে। আমি কি পাব, কী পেলাম।'

তরুণের মা ছেলেকে কাছে টেনে বসালেন। ওর মাথায় স্নিগ্ধ হাত রাখলেন।

'জীবন একটা আশ্চর্য সম্পদ.........' সম্মোহিত গলায় উচ্চারণ করলেন অম্লানবাবু। 'সত্যিই আমি দুঃখিত। মৃত লোককে এখন এই আসরে টেনে এনে আমি ভুল করেছি। নিরু এখন মিথ্যা, স্মৃতি মাত্র।

'একটি পশু, শয়তান। আপনি এই ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন।' তরুণ তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার করে উঠল।

কঠিন নীরবতা। শব্দহীন সন্ধ্যা। মৌন সমুদ্র।

অম্লানবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আমি এই ছেলেকে জন্ম দিয়েছি। নিরু আমারই ছেলে।'

তরুণ বলল, 'আপনার লজ্জা করে না।'

'না। সত্যিই এখন আর আমার কোনো লজ্জা নেই।' সোজাসুজি ওর দিকে চোখ রাখলেন অম্লানবাবু : 'আমি ওর জন্যে গর্বিত।'

'বা!'

'হ্যাঁ। গর্বিত। বুকে-হাঁটা সরীসৃপ আমি অনেক দেখেছি, দেখছি।' স্থির গলায় বললেন অম্লানবাবু : একটা চমৎকার স্বাস্থ্যবান, অজস্র প্রাণৈশ্বর্য অকুতোভয়......'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! একটা অসভ্য অভদ্র ইতর......'

অম্লানবাবু বললেন, 'ভদ্রতা-সভ্যতা আমি অনেক দেখেছি ইয়ংম্যান। শহরের অজস্র দোকানপত্তরে ভদ্রতা-সভ্যতা খরিদ করা যায়। কী জানো, ওই কথা দুটির কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, অন্য-লোকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তার যাথার্থ্য যাচাই হয়। যেমন........'

'আপনি কি বলতে চান।'

'উত্তেজিত হয়ো না।' বললেন অম্লানবাবু : 'আমার কথা খুব পরিষ্কার। একটুও ধোঁয়া নেই। উজ্জ্বলাই তার জীবন্ত উদাহরণ—'

হঠাৎ চাবুক খেয়ে মারখাওয়া জন্তুর মতো বিবর্ণ মুখ হয়ে গেল তরুণ। জলধর এসে জানাল : টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।

রাত ঘন থেকে ঘনতর হল।

বাইরের শব্দ-সাড়া মুছে গিয়ে এখন সমুদ্রের একঘেয়ে তান। যেন দূরাগত বৃষ্টির শব্দ।

এই বাড়ির সকলে সম্ভবত এখন ঘুমিয়ে। ঘুম না এলেও ঘরের ভেতরে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সাড়া দিয়ে

কেউ অস্তিত্বের স্বাক্ষর জানাতে চান না। কোনো কথা নয়, কথার গুঞ্জন নয়।

উজ্জ্বলা ঘরে একা। ওর মা থাকতে চাইছিলেন। নাঃ, অম্লানবাবু মত দেননি। মেয়েটি একা থাক। একটু সুস্থ হোক। কোনো উত্তেজনা নয়, নিজেকে নিঃসঙ্গ পেয়ে ধীরভাবে এখন নিজের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হোক।

রাত বাড়ে।

অম্লানবাবুর চোখে ঘুম নেই। ঘরে নিঃশব্দ পায়ে কিছুক্ষণ পদচারণা করে এবার তিনি বেরিয়ে এলেন খোলা লনের ধারে। লন পেরিয়ে গেট ছাড়িয়ে নেমে এলেন বিচ্ রোডে। পায়ে পায়ে সমুদ্রের কিনারে। সমুদ্র জ্বলছে, যেন হাত ধরাধরি করে সাদা মশাল হাতে বিদ্রোহীরা ছুটে আসছে, বেলাভূমিতে তরঙ্গ ক্রমাগত আছড়ে মরছে। দূরে জাহাজের বাতি তারার মতো স্থিরবিন্দু। অজস্র বুটিদার তারা কালো আকাশের জমির গায়ে ঝলমল করছে। ডানদিকে লাইট হাউস, তার আলোর দিকে তাকালেন একবার। ডলফিন্‌স নোজের দিকে।

'আশ্চর্য, জীবন এক আশ্চর্য সম্পদ.....' আবার মৌন-বিস্ময়ে আউড়ালেন অম্লানবাবু।

এই রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সমুদ্রের অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যের সামনে অম্লানবাবু নিসর্গিক-সত্তায় অবলুপ্ত হয়ে গেলেন। মনে হল রাত্রির সমুদ্র তার অজস্র বাহু বাড়িয়ে তাঁকে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছে। সামুদ্রিক চেতনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন অম্লানবাবু।

পেছনে হাত রেখে অন্যমনে হেঁটে চললেন তিনি। পায়ের চাপে বালি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে বালি-শয্যা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে একটা কাছিম দৌড়ে জলে নেমে গেল। বিচিত্র পায়ে কাঁকড়াগুলি ছুটোছুটি করে গর্তে ঢুকে পড়ল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন অম্লানবাবু।

'কে? কে ওখানে?' ঢেউয়ের গর্জনে ভেঙেচুরে গেল কণ্ঠস্বর।

নৌকোটা উপুড় করে রাখা; তার গায়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে পালের মতো শাড়ির আঁচল। আর, শাড়ির বন্ধনের তলায় নড়ছে একটা শরীর।

হিমেল ভয়ে অম্লানবাবুর রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাবে। উত্তেজনায় শিরা-প্রশিরা জোঁকের মতো ফুলে উঠছে। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে তাঁর।

তারপর কাছে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

'উজ্জ্বলা।'

নৌকোর পিঠে ঠেস দিয়ে নিশ্চল নিস্পন্দ উজ্জ্বলা। শাড়ির প্রান্ত উড়ছে, খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে চোখে-নাকে। সমুদ্রের দিকে নিমেষহারা দৃষ্টি। স্তব্ধীভূত মূর্তি।

ঘরের দরজা নিজের হাতেই চাবি-বন্ধ করেছেন অম্লানবাবু। রাত্রে ওকে খাওয়াতে পারা যায়নি। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কেউ বিরক্ত করবে না ভেবে অম্লানবাবু কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেননি। তবে কি করে ও বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'উজ্জ্বলা।'

উজ্জ্বলা নীরব। হাওয়া লেগে কেবল কেঁপে যাচ্ছে ওর শাড়িটা। দেহটা একটা শক্ত যষ্টির মতো, ঋজু কঠিন।

'কেমন করে বেরিয়ে এলে তুমি?'

'জানালা দিয়ে।' উজ্জ্বলা শুধু বলতে পারল। ওর চোখ সমুদ্রের দিকে যেখানে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গশীর্ষে ফসফরাস জ্বলছে। সে নিজেও সমুদ্র হয়ে গেছে।

'ফিরে চলো।'

'কোথায়?'

'বাড়ি চলো। এখন অনেক রাত্তির। তুমি অসুস্থ।'

উজ্জ্বলা বলল, 'না।'

অম্লানবাবু বললেন, 'তবে কি করবে এখানে?'

'আমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকব। দেখব সমুদ্রকে।'

'ও'রা তোমাকে কাল নিয়ে যাবেন। তুমি ফিরে যাবে।'

'কোথায় ফিরব। আমার তো কোনো জায়গা নেই।

'আছে।' অম্লানবাবু বললেন : 'এ পৃথিবীতে সকলেরই জায়গা আছে। পৃথিবী অনেক বড়।'

উজ্জ্বলা বলল, 'কত বড়? সমুদ্রের চেয়েও—'

'সমুদ্রের চেয়েও।'

উজ্জ্বলা বলল, 'না।'

অম্লানবাবু বললেন, 'কি না?'

উজ্জ্বলা বলল, 'আমি ফিরতে পারিনে। আমার আর ফেরা হবে না। এমন ভুল করলাম। নিরঞ্জন যতদিন বেঁচেছিল আমি লড়াই করেছি ওর সঙ্গে, হার স্বীকার করিনি। কিন্তু মরে গিয়ে সে আমাকে হারিয়ে গেল। আমি আজ বুঝতে পারছি ও আমার সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ করে মিশে গেছে। এখন নিরঞ্জন আর আমি এক-সত্তায় পরিণত হয়েছি। আমি ইচ্ছে করলেও আর অন্য কিছু হতে পারিনে।'

অম্লানবাবু স্তব্ধ নির্বাক।

রাত্রির মৌনের নিচে এই দুটি মানুষের মূর্তি নিশ্চল নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল প্রশস্ত বক্ষের কুলায় অতীতকাল আগামীকে নির্ভয় আশ্রয় দিচ্ছে।

দূরে বন্দরের প্রতীক্ষারত জাহাজটার স্থির আলো কালোর বন্যার ওপরে সংকেত জেলে অনিমেষ তাকিয়ে রইল।
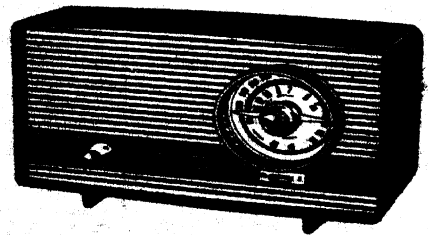
চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত

সন্তোষকুমার দে

একদিন রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভ্রাতা বুলা মহলানবীশের কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, কথাটা সেদিন বুলাবাবুর কাছেই শুনলাম,—কবি সবার জন্য, সকল রসের, সকল অবস্থার উপযোগী গান দিয়ে গেলেন। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মানুষের এমন কোনও অনুভূতি নেই যা কবির গানে ধরা পড়েনি। ভগবৎ অনুভূতির গভীরতম চেতনা হতে শুরু করে প্রেম, বিরহ, ভালোবাসা, সমাদর, সম্বর্ধনা, দেশপ্রেম, আত্মচেতনা জাগ্রত করবার আহ্বান, এমনকি চপল চটুল রইস্যময় ব্যঙ্গমধুর হাসিউচ্ছ্বসিত, সকল বয়সের উপযোগী, সকল অবস্থার ব্যবহারযোগ্য এমন গীতিগুচ্ছ শুধু বাংলায় কেন, পৃথিবীর আর কোন ভাষায় কোনও একজন গীতিকারের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব হয়নি। আনন্দেও লোক রবীন্দ্রসংগীতে নিজের উৎসাহ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, আবার গভীরতম দুঃখের দিনে, প্রচণ্ডতম শোকের আঘাতের মধ্যেও রবীন্দ্রসংগীতেই সান্ত্বনা খুঁজে পায়, জীবন যখন সত্যই শুকিয়ে যায় তখন করুণাধারায় আসে গান—রবীন্দ্রনাথের গান।

জীবনের বিচিত্র লীলার জীবন্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই চলচ্চিত্রে, তাই স্বভাবতঃই রবীন্দ্রসংগীতের অসীম পাথার মন্থন করলে সকল অবস্থার উপযোগী গানই পাওয়া যায়। তবে তার জন্য দরকার উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ডুবুরীর—যে রত্নের সন্ধান করে তুলে আনবে সেই গহন গভীর রত্নভাণ্ডার হতে।

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার তাই অতি সঙ্গত কারণেই বহুল ও ব্যাপক এবং আরও ব্যাপকতর ব্যবহারের ক্ষেত্র এখনও অনাবিষ্কৃত আছে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে 'ঘরোয়া' নামক চিত্রখানির কথা। 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ'—গানটি ঘিরেই গড়ে উঠেছিল একটি চমৎকার আবেগময় কাহিনী যার চিত্ররূপ শুধু সংগীতমুখর নয়, নিতান্ত মর্মস্পর্শী।

অবশ্য সব গল্পই যে কোন একটি গানকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে এমন কথা বলছি না। বরং একথা স্বীকার করতেই হবে—চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার রবীন্দ্রসংগীতকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করেছে। কবি স্বয়ং তাঁর গানের বিষয়ে যে আফসোস করেছিলেন—

"গেলেও বিচিত্র পথে
হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

তার কিছুটা অপনোদন হয়েছে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করবার জন্য। একটি ঘটনার কথা বললে আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের কথা। খুলনা জেলার একটি গ্রামে নদীপথে চলেছি। 'টাবুরে' নৌকার ছইয়ের উপর বসা যায় না, ছইয়ের ভিতরে বসেই যেতে হয়। আমিও তাই চলেছি, ভিতরে বসে, আমার সঙ্গিনী আমার সহধর্মিণীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। সহসা তিনিই আমার কথা বন্ধ করিয়ে দিয়ে বললেন,—শোনতো কে কি গাইছে।

নদীটি ছোট, এঁকেবেঁকে গিয়েছে। আমাদের সুমুখে কিছু দূরেই একটি বাঁক, বাঁকের অপর দিক হতে গানটি ভেসে আসছে :

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা
ঐ ছায়া
ভুলালোরে ভুলালো মোর প্রাণ,
ওপারেতে আঁধার কূলে গহন মূলে
কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজভাঙানো গান ॥

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নদীতীরের তরুশ্রেণী ক্রমে ছায়ার আড়ালে মুখ লুকালো, নীড়েফেরা পাখীর কাকলিস্তিমিত হয়ে এলো—সন্ধ্যা সমাগত। ঠিক এই পরিবেশে ঐ গানটি এমনভাবে জীবনে আর কোনদিন শুনিনি। মনে হল যে গাইছে সে সত্যই কবি, সে সত্যই ভাবুক; সত্যই তার মনের মধ্য দিয়ে গেয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু গায়ককে দেখতে দেরী হল না। একখানি ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকার উপর এক বোঝা জলজ 'বেতি' ঘাস কেটে নিয়ে একটি যুবক চাষী একা বৈঠা বেয়ে চলেছে আর আপন মনে গাইছে—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া।"

সে যদি সারী গান গাইত তাও ভালো লাগত, কিন্তু অবাক হতাম না, সে যদি জারী গান গাইত তা বোধহয় শুনেও শুনতাম না। কিন্তু সে যে গানটি গেয়ে উঠল—তা যে সারী জারীর মতই আমাদের প্রাণের বস্তু হয়েও তারও চেয়ে

অনেক বেশী, যা যে মনের বস্তু, হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত তার মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা বেজে চলেছে, তা যে রবীন্দ্র-সংগীত।

কিন্তু কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হল? গায়ক হয়ত জানেন না, হয়ত কেন নিশ্চয়ই জানে না—সে কার রচনা গাইছে। জিজ্ঞাসা করে তার ভাব নষ্ট করতে ইচ্ছা হল না। আপন মনে গাইতে গাইতে সে আমাদের নৌকার পাশ দিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেল।

কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করতাম তবে কি জবাব পেতাম তা আমি জানি। সে হয় বলত—শুনেছি শহরে 'উত্তরায়ণী' সিনেমায় 'মুক্তি' ছবি দেখে এসেছে—তাতে ঐ গানটি আছে, না হলে বলত—রাজেন দালালের গ্রামোফোনের দোকানে রেকর্ড বাজতে শুনেছে—তাতে ছিল গানটা। এ-গ্রামের কারো বাড়ীতে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া ঐ গানটির রেকর্ড থাকাও অসম্ভব নয়।

অর্থাৎ 'মুক্তি' চিত্রে ঐ গানটি না থাকলে ঐ চাষীটির কাছে 'দিনের শেষে' পৌঁছবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। চলচ্চিত্রের গান খুব সহজে মুখে মুখে ছড়ায়—বিশেষ করে সে গান যদি আবার গ্রামোফোন রেকর্ডেও প্রকাশিত হয়। উন্নাসিকেরা নিশ্চয় বলবেন, চাষীটি কি পঙ্কজ মল্লিকের মত ঠিক সুরটি তুলতে পেরেছিল? উত্তরে বলব—তা ঐ চাষীটি কেন, বহু সংগীতানুরাগীই হয়ত পারবেন না। কিন্তু ঐ চাষীটির আনন্দের ভাগ তাতে বিন্দুমাত্র কম হয়নি এবং তার মূল্য যে কম নয় তাতো কবি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। চলচ্চিত্র কবির বিচিত্রগামী গানকে সর্বত্রগামী করে তুলছে—এ কথা জানলে সবচেয়ে খুশী হতেন কবি স্বয়ং।

প্রসংগক্রমে দু'একটি কথা উল্লেখযোগ্য। নিউ থিয়েটার্স ভারতীয় চলচ্চিত্রে বহু বিষয় প্রবর্তন করেছিলেন—চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার তার মধ্যে একটি। এবং প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি' চিত্রেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করা হয়। কবির অনুমোদন লাভে অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে অতুলনীয় উৎসাহী বন্ধু, মহলানবীশ, গায়ক ও সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং 'মুক্তি' চিত্রের সংগীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। হয়ত লক্ষ্য করেছেন—পঙ্কজকুমার মল্লিককে শুধু গায়ক নয়, সুরকার বলেও উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের গানের একটি বৈশিষ্ট্য, সব গানে তিনি নিজেই সুর দিয়ে গিয়েছেন; তবে "দিনের শেষে"তে সুর দিয়েছিলেন—গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিক। একথাও লিখে রাখা দরকার—কবিকে দীনেশ পঙ্কজবাবু গানটি গেয়ে শোনালে কবি গানটির সুর অনুমোদন করেন। পরে রেকর্ড শোনাতে নিয়ে গেলে কবি পরিহাস করে বলেছিলেন—লোকে হয়ত বলবে রবীন্দ্রনাথ সুর দেননি অতএব এ গান কিছু না। কিন্তু পঙ্কজকে বলেন—'আমি খুশী হয়েছি।' কথাগুলি যাঁর কাছে বলেছিলেন—সেই বন্ধু মহলানবীশ একথা সানন্দে স্বীকার করেছেন।

নিউ থিয়েটার্স শুধু 'মুক্তি' ছবিতে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত-প্রবাহের মুক্তি দিলেন না, 'উদয়ের পথে', 'ডাক্তার', 'অঞ্জনগড়', 'অধিকার', 'অভিজ্ঞান', 'পরিচয়', 'প্রিয়বান্ধবী' প্রভৃতি অনেক ছবিতেই সাগ্রহভাবে কবিগুরুর গান যথোচিত বিচার-বিবেচনা করে যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করেছেন।

প্রসংগক্রমে যে, ১৯৬২ সাল পর্যন্ত যতগুলি বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে পড়ছে তার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দিচ্ছি। যে ছবিগুলি হতে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাদের নামগুলি তো দেওয়াই হল; যে ছবিগুলি হতে রেকর্ড প্রকাশিত হয়নি তার আগে একটি তারা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পর্যায়ে যদি কোন ছবির নাম বাদ পড়ে থাকে সেটা নেহাৎ অনবধানবশত। এ-বিষয়ে আমরা পাঠকসাধারণের নিকট হতে কোন সংবাদ, উপদেশ ও পরামর্শ পেলে কৃতার্থ হব :—

১। অঞ্জনগড়, ২। অধিকার ৩। অনন্যা, ৪। অনির্বাণ, ৫। অপরাধ, ৬। অভিজ্ঞান, ৭। অভিযাত্রী, ৮। আলো-ছায়া, ৯। আহুতি, ১০। উদয়ের পথে, ১১। উত্তরায়ণ, ১২। কালের স্বর্গ, ১৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা*, ১৪। কাবুলিওয়ালা*, ১৫। ক্ষুধিত পাষাণ* ১৬। জয়োয়া, ১৭। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ১৮। জীবনমরণ, ১৯। ডাক্তার, ২০। তথাপি, ২১। দত্তা, ২২। দিক্‌ভ্রান্ত, ২৩। দুরন্ত যাদের জীবন গড়া, ২৪। দৃষ্টিদান, ২৫। নৌকাডুবি, ২৬। পথ বেঁধে দিল, ২৭। পরাজয়, ২৮। পরিচয়, ২৯। প্রতিবাদ, ৩০। প্রিয় বান্ধবী, ৩১। বিষের ধোঁয়া, ৩২। বৌঠাকুরাণীর হাট, ৩৩। ভুলি নাই, ৩৪। মন্ত্রমুগ্ধ, ৩৫। মুক্তি, ৩৬। লুকোচুরি, ৩৭। শান্তি, ৩৮। শেষরক্ষা, ৩৯। শোধবোধ, ৪০। সন্দীপন পাঠশালা, ৪১। সন্ধ্যারাগ, ৪২। সহসা।

ঢোঁড়া সাপ !
১১|১|৬৩
পাকিস্তান
নেপাল
ব্রহ্ম
বহির্মঙ্গোলিয়া
আহা ভারত !
বুঝলি রে ? প্রত্যেককে
আলাদা করে পোষ কর্তে হয় !
সবগুলোকে কি
—একা সামলানো যায় ?
শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তি
ব্যাটা
চৌ-এন লাইকে
যদি একবার পাই !
উঃ, আমার
সোনার গয়না তৈরী
একেবারে
বন্ধ করে দিয়েছে !

চিকিৎসা শাস্ত্র বহির্ভারতে

ডাঃ অশোক কাশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসা শাস্ত্র

সুমেরীয়গণের রাজধানী ছিল ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্তী উর নামক শহর। খৃষ্টজন্মের প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে সুমেরীয় সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতা আসিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জনক। প্রাচীন উর নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় বহু লিখনযুক্ত মৃত্তিকাফলক আবিষ্কৃত হয়। উক্ত ফলক সমূহের কিয়দংশে সুমেরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাম্মুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পূঃ) [illegible]র শাসনকালের চিকিৎসাবিধি [illegible] প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ [illegible]ছিলেন। ধনাঢ্য রোগীর চিকি[illegible]ণা ও দরিদ্রের চিকিৎসার [illegible]মাপ তিনি স্থির করে [illegible] রাজত্বকালে চিকিৎসকের [illegible]য় রোগীর দৈহিক ক্ষতি হলে, [illegible] চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা [illegible] হেরোডোটাস বলেছেন যে, প্রাচীন [illegible]নীয়গণ চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং উৎসুক ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অজ্ঞাত রোগগ্রস্থ রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ স্থানে এমন কি বাজারের মধ্যে এনে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোনও পরিব্রাজক চিকিৎসক হয়ত রোগীকে দেখতে পেয়ে তার রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। একথাও জানা যায় যে, ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও ব্যবসা করতেন।

মিশরীয় চিকিৎসক ইমহোটেপ

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসা শাস্ত্র

প্রাচীন মিশরে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা করতেন। ইমহোটেপ্ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম হয় মিশরে। মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তিকে ভগবৎ জ্ঞানে পূজা করা হ'ত। য়ুনানীগণ দাবী করেন যে, তাঁদের চিকিৎসাদেবতা ইস্কুলাপিউস্ ও ইমহোটেপ্ অভিন্ন ব্যক্তি। ইমহোটেপ্ চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যতীত স্থাপত্যবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সাকারায় বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন।

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোনও এক অদৃশ্য শত্রুর প্রভাবে রোগ মানবশরীরে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মাংস ও মজ্জা ক্ষয় করে রোগীকে হত্যা করে। এডুইন স্মিথ ও এবারস্ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন মিশরীয় ভূর্জপত্র-লিখনে অহিফেন, হেমলক্, তাম্রঘটিত লবণ ও এরণ্ড তৈলের ব্যবহারবিধির উল্লেখ আছে। ৫২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে পারসীকগণ কর্তৃক মিশর অধিকৃত হবার পর দক্ষিণ মিশরের সাইস নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। হেরোডোটাস্ উক্ত বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

পোলিও রোগাক্রান্ত মিশরীয় রোগী

॥ প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ॥

চৈনিকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব হতেই। সেন্ ন্যুং (৩০০০ খৃঃ পূঃ) নামক চৈনিক নৃপতি অবসর বিনোদনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন। "পেন্ সাউ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তিনি বহু ঔষধের ব্যবহারবিধি লিখে গেছেন। খৃঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দে হোয়াং তি নামক অপর এক চৈনিক নৃপতি "নাইচিং" নামক একখানি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র দ্বারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়। চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা-পুস্তক রচনা করেন কিন্ ল্যুং নামক একজন নৃপতি। তিনি বলতেন যে, মানবশরীর মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান দ্বারা গঠিত। সুতরাং বোঝা যায় যে, প্রাচীন চীনে সমাজের অভিজাত ব্যক্তিগণ কেবল মাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন।

॥ প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসা শাস্ত্র ॥

বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে রোগযন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিশাপ। রোগী চিকিৎসার জন্য পুরোহিতগণের স্মরণাপন্ন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলিতেন যে, মুসার নির্দেশ মেনে চললে মানুষ কখনই রোগগ্রস্থ হবে না। মহামারীর চিকিৎসায় পুরোহিতগণ সুদক্ষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই বর্তমান জনস্বাস্থ্য রক্ষাব্যবস্থার জনক। লেভিটিকাস্-এর পুস্তকে দূষিত খাদ্য, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব-ব্যবস্থা, ঋতুস্রাব এবং সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। কেননা শূকরের মাংস হতে অন্ত্রে ক্রিমি রোগ হয় এজন্য উক্ত পুস্তকে শূকরের মাংস গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুষ্ঠ ও অপরাপর সংক্রামক রোগগ্রস্থগণকে জনসাধারণের নিকট হতে দূরে বসবাস করতে বাধ্য করা হত। "তালমুদ" নামক ইহুদি ধর্মপুস্তকেও বহু চিকিৎসাব্যবস্থার উল্লেখ আছে। পৌত্তলিকতার অপবাদে ইহুদি চিকিৎসকগণকে হেয় জ্ঞান করতেন মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়। কিন্তু খৃষ্টান রোগীও গোপনে ইহুদি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতেন। বহু খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিৎসক গোপনে বাস করে ধর্মাধ্যযাজকগণের চিকিৎসা করতেন।

॥ য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র ॥

প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহৃত জ্ঞানের সমন্বয়ে য়ুনানী চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্যাণ্ডিয়াদ্বীপবাসী সুসভ্য মিনোয়ানগণের নিকট হতেও তাঁরা এই বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। মিনোয়ানগণ ছিল সভ্যতাসমৃদ্ধ জাতি। তাঁরা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, জল সরবরাহ, স্নানাগার নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্য রক্ষাব্যবস্থায়ও পারদর্শী ছিলেন।

খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে য়ুনানীগণ মিনোয়ানদের সুরম্য নগরী ট্রয় ধ্বংস করে। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে য়ুনানীগণ শিক্ষালাভ করে বহু নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্র এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী য়ুনানীগণ ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে তাদের চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ করেছিল। প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী। তিনি বিচক্ষণ নরঅশ্ব (Centaur) চিরনকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেন। চিরনের সুযোগ্য শিষ্য ইয়াসন্, এ্যাকিলেস্ ও ইস্কুলাপিউস্। ইস্কুলাপিউস চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা প্লুটো ঈর্ষাবশতঃ তাঁকে হত্যা করেন। য়ুনানীগণ ইস্কুলাপিউসকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত এবং মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থে "আস্কেলোপিয়া" নামক বহু মন্দির নির্মাণ করে। এপিডাউরুস শহরে এখনও একটি আস্কেলোপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

আস্কেলোপিয়াগুলিতে আহার্য, স্নান, অঙ্গ-সঞ্চালন ও শরীর-মর্দন প্রভৃতি সরল প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ পবিত্র হয়ে ইস্কুলাপিউস-এর উদ্দেশ্যে পূজা করত, তারপর চিকিৎসার জন্য নাটমন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর রোগীগণের শরীরের অবস্থা ও চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করা হ'ত। মন্দিরে পালিত বিষহীন সর্পদ্বারা রোগগ্রস্তের চক্ষু লেহন করা হত চক্ষুরোগের

একটি ইস্কুলাপিয়া

চিকিৎসার জন্য। রোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্য নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সিসিলির প্যালের্মো, ইতালীর নেপলস্, সার্দিনিয়া দ্বীপ ও অষ্ট্রিয়ার ষ্টীরিয়া প্রদেশে। মন্দিরগুলি ছিল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবহুল পার্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোনও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক ও মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না। বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, বাদগাস্টাইন ও লুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসেও অনুরূপ বিধি-নিষেধ মেনে চলা হয়। স্বপ্ন-সমীক্ষার দ্বারা মন্দিরে বাসকারী রোগীদেরও চিকিৎসা করা হত সেকালে। পরলোকগত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ইয়ুংগ ও ডঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডও স্বপ্ন-সমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসা করতেন।

প্রাক্ হিপোক্রাতিক বা হোমারীয় যুগের চিকিৎসা

হোমার প্রণীত "ইলিয়াড" কাব্যে ট্রোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে যে, ১৪৭ জন আহত সৈন্যের মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয়। এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগরশ্রেণী হতে উদ্ভূত। সাধারণতঃ পিতা বা পিতৃব্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তারা বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতেন। কিছুকাল বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য। খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত। কিন্তু বিদ্বৎ সমাজে তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। সেকালে ডাক্তার চুরির মত একটা ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক সুনাম অর্জন করলে নিকটস্থ নগরীর বাসিন্দাগণ তাঁকে পারিতোষিক দ্বারা প্রলুব্ধ করে নিজ নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তরফলকের উপর উৎকীর্ণ করে দিত। আথেন্সে স্ত্রীলোক ও বহু লজ্জাশীলা ... গ্রীক নারী, পুরুষ চিকি... চিকিৎসা না করায় অকা... পতিত হতেন। আগ্নোডিস স্ত্রীলোক তাঁদের দুঃখে বিগ... পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশা... করেন। এবং গোপনে স্ত্রীলোক চিকিৎসা করতেন।

॥ য়ুনানের দার্শনিক চিকিৎ... ॥

তিনজন দার্শনিক চিকিৎসা-বিদ্যোৎসাহী ছিলেন পিথাগোরাস, এ্যালকমেওন ও এম্পিডোক্লেস। পিথাগোরাস (৫৮০-৪৯৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। গ্রীসের সামোস শহরে জন্মগ্রহণকারী এই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনবাসী। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য এ্যালেক্মেওন। তিনি বলতেন মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোক্লেস একটি বদ্ধজলাশয়ের জল নিষ্কাসন করে মহামারী রোধ করেন। মনোবিকারগ্রস্ত অবস্থায় এটনা আগ্নেয়গিরি গহ্বরে লম্ফন করে আত্মহত্যা করেন এম্পিডোক্লেস।

॥য়ুনানের সুবর্ণযুগ ॥

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিশ্ববিশ্রুত হিপোক্রাতেস। তাঁকে আজও

প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক মনে করা হয়। তাঁর জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে। চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি আথেন্স, থ্রেস, থেসালী ও মাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কস্ দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলোপিয়ার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষছায়ায় বসে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। উক্ত বৃক্ষের বংশধরগণ আজও বর্তমান। হিপ্পোক্রাতেস লিখিত পুস্তকের শতাধিক অনুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের অলৌকিকতা অগ্রাহ্য করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। রোগীকে বায়ু-পরিবর্তন ও খনিজপদার্থবহুল প্রস্রবণে স্নান করাতে উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে নল-সাহায্যে পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচ্য খাদ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা হয়, হিপ্পোক্রাতেস সেইভাবে রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাদ্য ... করতেন। কিন্তু শারীরস্থান ... প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন তিনি ...

হিপ্পোক্রাতেসের ... গণকে শিক্ষা-সমাপনের ... লিখিত শপথ গ্রহণ করতে ...

... ইঁ... পোলো, ইস্কুলাপিউস, ... থেন্ট ... নগণকে সাক্ষী রেখে গেছে ... যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি একটা ... তে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

শিক্ষাগুরু ও পিতামাতাকে পালন ... তাঁদের ঋণ পরিশোধ করব।

... গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতাজ্ঞানে স্নেহ করব এবং যদি তাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন তা হলে তাঁদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিষ্যগণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

"আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না।

"আমি কাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশ করব না। আমি কোন নারীর গর্ভপাত করাব না।

"আমি সৎপথে চলব ও ধর্মচর্চা করব।

"আমি পাথুরীর জন্য অস্ত্রোপচার করব না। যাঁরা উক্ত চিকিৎসার পারদর্শী ... দের নিকট পাথুরীগ্রস্ত রোগীকে ... করব।

"আমি রোগীর গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট-চিন্তা করব না। রোগী-গৃহের কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না।

"কোন রোগীর গোপনীয় বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করব না।

"যদি আমি শপথবাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তা হলে ঈশ্বর আমার মঙ্গল সাধন করবেন, অন্যথায় আমার সর্বনাশ হউক।"
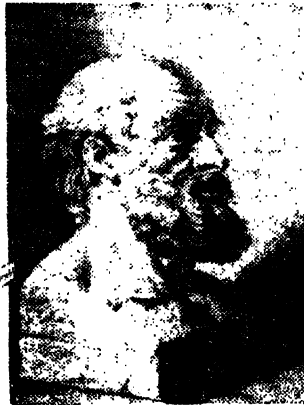
শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিপ্পোক্রাতেস লিখেছেন যে, শল্যচিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহকারী, শল্যযন্ত্রাদি ও উপযুক্ত আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, 'রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা অনুচিত। বৃদ্ধগণ অনশন সহ্য করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন শীত ঋতুতে ফুসফুসের ঝিল্লীপ্রদাহ, সর্দি, গলপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই যক্ষ্মারোগ বেশী হয়।'

হিপ্পোক্রাতেস হেরাক্লিদে

তিনি একটি জ্বরগ্রস্থা রোগিণীর রোগের দৈনিক ধারাবিবরণী রেখে গেছেন। আজ হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানে তা থেকে জানা যায় যে, উক্ত রোগিণী ছিল আন্ত্রিক জ্বরাক্রান্তা।

হিপ্পোক্রাতেসের জীবিতকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর আরিস্টটল-এর (৩৮৪—৩২২ খৃঃ পূঃ) মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল এবং বহু পশুর শব-ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়াকলাপ রক্ত, শ্লেষ্মা, পীতপিত্ত ও কৃষ্ণপিত্ত নামক চারি রসের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দূষিত হলে শরীরে রোগ-লক্ষণ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করতেন।

॥ আলেকজান্দ্রিয়ার চিকিৎসাশাস্ত্র ॥

আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বৎসর। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর আগে নীল নদের উর্বর ব-দ্বীপে তিনি ভবিষ্যৎ আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি সোটের (৩২৩—২৮৫ খৃঃ পূঃ)। টলেমি ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং য়ুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শারীরস্থান শিক্ষক ছিলেন হেরোফিলুস ও এরাসিস্ত্রাতুস। হেরোফিলুস জনসমক্ষে

মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁর মতে মস্তিষ্ক মানবদেহের গতিসঞ্চালন, স্পর্শ-চেতনা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। তিনি মস্তিষ্ককে বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum)—এই দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর আবিষ্কৃত মস্তিষ্কের শিরাচক্র (Torcular herophili) আজও শারীরস্থান শাস্ত্রে সুপরিচিত। এরাসিস্ট্রাতুস ছিলেন মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। তিনি মনে করতেন মানব মস্তিষ্কের গঠন মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন এবং মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের আভ্যন্তরীণ 'মস্তিষ্ক-বারি' (Cerebrospinal fluid) স্নায়ুরজ্জুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পেশী সংকুচিত করে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পর (৫০ খৃঃ পূঃ) উক্ত চিকিৎসাধারার পরিসমাপ্তি ঘটে।

॥ রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র ॥

রোমানরা প্রধানতঃ য়ুনানী ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করতেন না। রোম শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষা-ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের অধিকাংশ স্থানে ছিল সুনির্মিত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য রাজকোষ-নিযুক্ত চিকিৎসক। খৃষ্ট-জন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুসবাসী য়ুনানী চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হয়। গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতীকস্বরূপ একটি পবিত্র সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেন্ট বার্থেলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয় রোমকরা। ঐ দ্বীপে ছিল একটি আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালার [illegible]ষ্ঠিত নগর। পিয়ার রাহেরে নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেন্ট বার্থেলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা করেছিলেন। রোমক সৈন্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহু স্থানে আরোগ্যশালা স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নেপল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী পম্পেই শহরেও আছে অনুরূপ হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ। ডিওস্কোরিডেস নামক এক য়ুনানী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেন। রোমক চিকিৎসা-জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন য়ুনানী বংশোদ্ভব। ক্ষুদ্র এশিয়ার পেরগামোস নামক শহরে তাঁর জন্ম—১৩০ খৃঃ অব্দে। পেরগামোসও স্মির্না শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। ২৮ বৎসর বয়সে এক পেশাদার মল্লযোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসেবে জীবনারম্ভ করেন। কিছুকাল পরে [illegible] রোম শহরে বসবাস আরম্ভ করলে [illegible] দের চক্রান্তে তাঁকে স্বল্পকালের [illegible] রোম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম [illegible] মার্কুস আউরেলিয়ুস তাঁকে সসম্মানে [illegible] পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্যালেন শা[illegible] শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে বহু মৌ[illegible] রচনা করেছিলেন। তাঁর কা[illegible] মানবদেহ ব্যবচ্ছে[illegible] বার্বারী বানর প্রভৃ[illegible] প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ ক[illegible] লাভ করেন। হৃৎপিণ্ডের [illegible] সম্প্রসারণের ফলে শরীরে [illegible] চাপের তারতম্য সৃষ্টি হয় [illegible] তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত হয় বলে [illegible] তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বি[illegible] করতেন যে, রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শ্বাস-যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করায় সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে। তাঁর রচিত ৫০০ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ৮০ খানির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন যে, শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মুখ্য রস দ্বারা পরিচালিত। প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোন শিষ্য গ্রহণ করেননি বা চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অব্দে মহামারী রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত [illegible] জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য [illegible] হয়ে পড়ে। এখনও ইংলণ্ডের [illegible]স্পিয়ারা, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম ও ভিয়েনার নিকটবর্তী কার্নুন্টুম নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা 'ভ্যালেটুডিনারিয়া'এর [illegible] ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

১৯৬২ সালে মহাকাশ-অভিযানে দুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

১৯৬২ সালে 'মহাকাশ-অভিযানে এত ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টা হয়েছে যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ১৯৬২ সালে মহাকাশ-অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কী, তাহলে নিঃসন্দেহেই জবাব দেওয়া চলে যে কৃতিত্ব হচ্ছে দুটি। একটি, সোভিয়েত ভোস্তোকের যুগল নভোচারণা। অপরটি, মার্কিন মেরিনারের শুক্রগ্রহ থেকে বার্তা প্রেরণ।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬২ সালের ১১ই ও ১২ই আগস্ট তারিখে। ১১ই তারিখে মহাকাশে যাত্রা করেছিলেন সোভিয়েত নভোচারী নি[illegible]লায়েভ ও ১২ই তারিখে পোপোভি[illegible] নিকো[illegible]ভের মহাকাশে [illegible]স্থায়ী হয়েছিল ৯৪ ঘন্টা [illegible]নিট। এই সময়ের মধ্যে তিনি [illegible]থিবীকে ৬৪ বার পাক দিয়েছিলেন[illegible] মোট দূরত্ব অতিক্রম [illegible] ২৬,৪০,০০০ কিলোমিটা[illegible]পোভিচের মহাকাশে অবস্থান [illegible] ই[illegible]৭ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে [illegible]থিবীকে ৪৮ বার পাক [illegible]লেন আর মোট দূরত্ব অতিক্রম [illegible]ছলেন ১৯,৮০,০০০ কিলোমিটার।

এই যুগল নভোচারণার সবচেয়ে [illegible]শ্চর্য ফল অবশ্যই যুগল নভোচারণার [illegible]ফল্য। তিন নম্বর ও চার নম্বর [illegible]স্তোকের উপযুক্ততা ও উৎকর্ষ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

এই দীর্ঘকালীন নভোচারণার ফলে যে বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে এই যুগল নভোচারণার দ্বিতীয় লাভ। এই উদ্দেশ্যে প্রচুরসংখ্যক টেপ-রেকর্ডিং ও ফটোগ্রাফও নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় লাভ, ক্যারিয়ার রকেটের সাহায্যে তিন ও চার নম্বর ভোস্তোককে নিখুঁতভাবে কক্ষে স্থাপন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন। তিন ও চার নম্বর ভোস্তোকের অবস্থানের দূরত্ব ছিল মাত্র ৬·৫ কিলোমিটার। মহাকাশে এত কাছাকাছি অবস্থানে দুটি ব্যোমযানকে এত দীর্ঘ সময় ধরে পাক খাওয়ানোর ফলে রকেট-বিজ্ঞানের উৎকর্ষই সূচিত হচ্ছে।

চতুর্থ লাভ, ভোস্তোকের অভ্যন্তরে সমস্ত কলকব্জা নির্ভুলভাবে চালু থাকা।

অয়স্কান্ত

পঞ্চম লাভ, মানুষের শরীর যে দীর্ঘকালীন নভোচারণার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত তার প্রমাণ পাওয়া। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ছিল, দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে নভোচারীদের মানসিক স্থৈর্য বিনষ্ট হতে পারে। নিকোলায়েভ ও পোপোভিচ প্রমাণ দিয়েছেন যে এই আশঙ্কা অমূলক। অতঃপর আরো দীর্ঘকালীন অভিযানের জন্যে—অর্থাৎ চন্দ্রে বা শুক্রগ্রহে অভিযানের জন্যে—প্রস্তুতি চলতে পারে।

মার্কিন শিল্পীর কল্পনায় চন্দ্র অভিযান

ষষ্ঠ লাভ, দুই ভোস্তোকের মধ্যে এবং প্রত্যেকটি ভোস্তোক ও পৃথিবীর মধ্যে বেতার যোগাযোগ বজায় থাকা। মহাকাশে অবস্থান করা সত্ত্বেও যে দুজন নভোচারীর পক্ষে বেতার যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব—তার প্রমাণ এই প্রথম পাওয়া গেল।

ফিরিস্তি অবশ্যই আরো বাড়িয়ে যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু মোটামুটি সবচেয়ে বড়ো বড়ো লাভগুলো উল্লেখ করার পরে এখন শুধু এটুকুই বলার থাকে যে এই সমস্ত লাভের মোট ফল হলো, অদূর ভবিষ্যতে দূর মহাকাশে মানুষের যাত্রা শুরু। তিন ও চার নম্বর ভোস্তোককে যদি অভিনন্দন জানাতে হয় তাহলে এই অভিনন্দনই জানানো উচিত যে এই দুটি ব্যোমযান মানুষের বিশ্বজয়ের প্রতীক। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এরচেয়ে বড়ো সম্মান আর কিছু হতে পারে না।

মার্কিন মেরিনারের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। এই ব্যোমযানটি ১৯৬২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে শুক্রগ্রহের ২১,৫০০ মাইলের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

মেরিনারের বার্তা থেকে জানা গিয়েছে যে শুক্রগ্রহে চুম্বকত্ব নেই বা যদি থেকেও তো খুবই কম। শুক্রগ্রহকে বলা হয় পৃথিবীর দোসর—কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চুম্বকত্বের ব্যাপারে পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রগ্রহের মস্ত অমিল। আর চুম্বকত্ব যদি না থাকে তাহলে তেজস্ক্রিয় বলয়ও না থাকবারই সম্ভাবনা।

পৃথিবীর চুম্বকত্বের উৎপত্তি কি-ভাবে সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে এ-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রয়েছে তরল লোহার পিণ্ড। পৃথিবীর অক্ষআবর্তনের ফলে এই তরল লোহার মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর তারই ফলে পৃথিবীর চুম্বকত্ব।

পৃথিবীর চুম্বকত্বের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে শুক্রগ্রহ সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্ত করা চলে। যেহেতু শুক্রগ্রহের চুম্বকত্ব নেই বা না-থাকার মতো, অতএব শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন খুবই ধীরে ধীরে। তার মানে, শুক্রগ্রহের দিন ও রাত্রি খুবই

দীর্ঘ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শুক্রগ্রহে দিন ও রাত্রি বলে কিছু নেই—একদিকে চির-দিন, অপর দিকে চির-রাত্রি। এমন ব্যাপার তখনই ঘটতে পারে যখন শুক্রগ্রহের ঠিক যতোদিনে একবার কক্ষ-আবর্তন ঠিক ততোদিনেই একবার অক্ষ-আবর্তন। অর্থাৎ, শুক্রগ্রহের বিশেষ একটি দিক সমসময়েই সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে—যেমন থাকে চন্দ্রের পৃথিবীর দিকে। তার মানে, কথাটা দাঁড়ায় এই যে, শুক্রগ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ২২৫ দিন আর এই ২২৫ দিনেই শুক্রগ্রহ একবার নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায়। শুক্রগ্রহ সম্পর্কে এ-খবরটি একেবারেই নতুন। কারণ এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন ১০ দিনে। অর্থাৎ পাঁচ দিনে রাত্রি, পাঁচ দিনে দিন। অন্যান্য ব্যাপারে পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রগ্রহের খুবই মিল। সব মিলিয়ে মানুষের বাসযোগ্য জায়গা হিসেবে শুক্রগ্রহ খুব খারাপ হত না। কিন্তু এখন যা দেখা যাচ্ছে, শুক্রগ্রহের কোথাও চির-দিন, কোথাও চির-রাত্রি, কোথাও চির-প্রদোষ ইত্যাদি, অর্থাৎ কোথাও অসম্ভব উত্তাপ, কোথাও অসম্ভব ঠাণ্ডা, কোথাও মাঝারি অবস্থা ইত্যাদি। এ-অবস্থায় শুক্রগ্রহ মানুষের বসবাসের জায়গা হিসেবে খুব একটা আকর্ষণীয় জায়গা থাকে না।

এখানেই শেষ নয়। শুক্রগ্রহে চুম্বকত্ব না-থাকার ফল অন্য একদিক থেকে কিন্তু আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে সূর্য থেকে অনবরত অজস্র তড়িতাবিষ্ট কণিকা বর্ষিত হচ্ছে। এই কণিকাগুলো পৃথিবীর চৌম্বক এলাকায় এসে চৌম্বক টানের মধ্যে পড়ে যায় এবং সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত আমরা পৃথিবীর বাইরের দিকের সীমানা বলতে বুঝতাম বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার। কিন্তু আয়োনোস্ফিয়ারর বাইরেও তড়িতাবিষ্ট কণিকারা বায়ুমণ্ডল সমেত এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। একটি নয়, দুটি স্তরে। দুই স্তরে বিভক্ত এই তেজস্ক্রিয় বলয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর চুম্বকত্ব থাকার দরুনই তেজস্ক্রিয় কণিকারা পৃথিবীর মাটিতে সরাসরি পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু শুক্রগ্রহের চুম্বকত্ব নেই, অতএব তেজস্ক্রিয় বলয়ও নেই, ফলে তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলো সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে শুক্রগ্রহের মাটিতে। এদিক থেকেও শুক্রগ্রহ মানুষের পক্ষে আদৌ বাসযোগ্য জায়গা নয়।

সোভিয়েত লুনিকের মারফৎ জানা গিয়েছিল যে চন্দ্রেরও চুম্বকত্ব নেই। তার ওপরে, শুক্রগ্রহে যদিও বা বায়ুমণ্ডল আছে চন্দ্রে তারও অভাব। সমুদ্র—না চন্দ্রে না শুক্রগ্রহে। এসব খবর শোনার পরে মনে হতে পারে, সৌরমণ্ডলের মধ্যে একমাত্র এই পৃথিবীটাকেই যেন মানুষের বসবাসের জন্যে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আর সেখানে অতিসুন্দর সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌরমণ্ডলে গ্রহ আছে আরো আটটি কিন্তু পৃথিবীর মতো এমন সুন্দর ও সর্ব আয়োজনে এমন সার্থক গ্রহ আর একটিও নেই।

অথচ ভরের দিক থেকে পৃথিবী ও শুক্রগ্রহ প্রায় সমান সমান। খবরটা আগেও জানা ছিল, ম্যেরিনারের মারফৎ আরো পাকাপাকি জানা গেছে। শুক্রগ্রহের ভর—এগারোর পরে চব্বিশটি শূন্য বসালে যে-সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো পাউণ্ড। অর্থাৎ, পৃথিবীর ভরের ০·৮১৪৮৫ গুণ।

॥ নভোচারণার যুগ ॥

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ ও ব্যোমযান মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে ছিল স্পুৎনিক, লুনিক, ভোস্তোক ইত্যাদি। অন্যদিকে এক্সপ্লোরার, ডিসকভারার, পায়োনীয়র ইত্যাদি। দু-দেশ মিলিয়ে একশোরও বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উঠেছে।

বর্তমানে দু-দেশেই শুরু হয়েছে চাঁদে মানুষ [illegible]ঠাবার তোড়জোড়। মার্কিন [illegible]রা [illegible]ণা করেছেন, ১৯৭০ সালে[illegible] এই উদ্দেশ্যে সমস্ত আয়োজন [illegible] করবেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের [illegible] ঘোষণা আছে যে সোভিয়েত বি[illegible] ৫০তম বার্ষিকী চাঁদের মাটিতে উদযা[illegible]

মার্কিন দেশে চন্দ্রে [illegible] প্রস্তুতির জন্যে বর্তমান বছ[illegible] হবে ৩৭৫ কোটি ডলার, আগা[illegible] বছরে দু-হাজার কোটি ডলার। ম[illegible] বিজ্ঞানীরা আরো ঘোষণা করেছেন ১৯৭০ সালের মধ্যে তাঁরা পারমাণবি[illegible] শক্তিচালিত ব্যোমযানের নির্মাণকা[illegible] সম্পূর্ণ করবেন। সোভিয়েত দেশে[illegible] প্রস্তুতিও এরচেয়ে কোনো অংশে [illegible] হবার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, বিজ্ঞানীরা যখন ঘোষণা করেন যে অমুক সময়ের মধ্যে অমুক ঘটনাটি ঘটবে—বিজ্ঞানের আশ্চর্য অগ্রগতির ফলে বাস্তবে কিন্তু তার অনেক আগেই ঘটনাটি ঘটে যায়। কাজেই আশা করা চলে, ১৯৭০ সালের বা সোভিয়েত বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হবার অনেক আগেই পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে হাজির হতে পারবে। কিংবা হয়তো বা এমন কি শুক্রগ্রহে বা মঙ্গলগ্রহেও। সম্ভবত পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যোমযান ১৯৭০ সালের অনেক আগেই নির্মিত হবে। এমন কি যদি ১৯৬৩ সাল শেষ হবার আগেই এই শুভ খবরটি শোনা যায় তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই। সব মিলিয়ে আমাদের এই ষাটের দশকটি নভোচারণার যুগের দশক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রক [illegible] পর)

সেদিন সারা [illegible] তার গলার সেই রাসেল ডাক [illegible] কে বাতাসের শিসের মধ্যে [illegible] ক'রে ফিরেছিলো। আমার [illegible] ইচ্ছিই ডাক চাঁদের রাতে সমুদ্রের লাগর [illegible] থেন্ট [illegible] মার এনে দিয়েছিলো। আমি [illegible] কান পেতে শুনেছিলাম সেই গেছে এক।

একটা [illegible] পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেও সেই শনিবারেশ জড়িয়ে ছিলো আমাকে। আমার [illegible] বুকটা ভ'রেছিলো। আমি সারাক্ষণ আনমনা হ'য়ে কবিতার লাইন আওড়াচ্ছিলাম। স্কুলে গিয়ে ছেলেদের কবিতাই পড়ালাম শুধু। গল্প বললাম, 'ভারতবর্ষে এক রানী আছে, তার নাম মল্লিকা মল্লিক, তার রং রামধনুর মতো, তার চোখ জলেভরা মেঘ, তার দেহ ধোঁয়ার ওড়নায় ঢাকা—'। তারা হাঁ ক'রে গিললো। তারপর বাড়ি ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। আদর ক'রে কুকুরটাকে তুলে নিলাম বুকের মধ্যে। সে আমার হাত চাটলো, মুখ চাটলো, ল্যাজ নেড়ে অনেক কথা বললো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও-বাড়িতে তোকে সবচেয়ে কে বেশী ভালোবাসত?'

বোবা জন্তু, কথা বলতে পারে না। কিন্তু কুঁই কুঁই করলো, আমি স্পষ্ট শুনলাম সে মল্লিকার নাম বলতে চাইছে।

হাত মুখ ধোয়া, কাপড় ছাড়া, খাওয়া [illegible] আমার পড়ে রইলো, উত্তেজিতভাবে ফোন কানে তুললাম।

'হ্যালো।'

'হ্যালো, কে? আমি মল্লিকাকে চাই।'

'অমিত?'

'হ্যাঁ।'

'কী দরকার?'

'আপনি কি তার মামী?'

'হ্যাঁ।'

'একটু মল্লিকাকে দিন।'

'আমাকে বললে হয় না?'

রেগে গেলাম। বললাম, 'না।'

মামী বললেন, 'কিন্তু সে একটু ব্যস্ত আছে।'

মামীর গলা আমার কাছে কঠিন লাগলো, অভদ্র লাগলো, নিষেধের মতো শোনালো। আমি অপমানিত হ'য়ে বললাম, 'ঠিক আছে।' তারপর খুব জোরে রেখে দিলাম ফোনটা।

সমস্ত শরীর আমার কাঁপছিলো রাগে। আমি তৎক্ষণাৎ মনোস্থির করেছিলাম এদের সঙ্গে আর না। ওয়াশিংটনের নিমন্ত্রণটা কাছে ছিলো, এক মুহূর্ত দেরি করলাম না জবাব দিতে। তারপর চলে গেলাম।

কিন্তু রাগের চেয়ে যেখানে অনুরাগ প্রবল, সেখানে কি তা টেঁকে? দেখতে দেখতে মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, মল্লিকার মামী যাই বলুন, মল্লিকা কী বলে সেটা আমার জানা দরকার। সম্পর্ক আমার তার মামীর সঙ্গে নয়, তার সঙ্গে।

নানা অছিলায় স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আরো কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরে কাটাবার চেষ্টায় ছিলাম, পারলাম না। এক অদৃশ্য আকর্ষণ দুর্জয় টানে আমাকে টেনে আনলো আবার, এসেই আমি তাকে ফোন করলাম। ভিতরে ভিতরে যে একটু ভয় ছিলো না, দ্বিধা ছিলো না এমন নয়। ওর মামী ধরলে কী বলবো তার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মল্লিকাই ধরলো।

তাবলে এই খবর? সে চলে যাবে! মাথায় বজ্রপাত হ'লো আমার। আমার সব সুখ নিমেষে মুছে গেল। আমি আবার অবুঝের মতো বললাম: 'এ'রা যদি যায় যান, তুমি থাকো।'

সে বললো, 'পাগল নাকি।'

মাথা ঝেঁকে বললাম, 'কিছুই পাগলামী করিনি, কিন্তু এইবার হবো।'

'একদিন যে তই হবে তা কি অজানা ছিলো?'

'ছিলো, মল্লিকা, ছিলো। অনেক কিছুই অজানা ছিলো আমার।'

'খাবার দিয়েছে, আসুন, খেয়েনি।'

'শোনো, আমি তোমার মামাকে বলবো তোমাকে রেখে যেতে। তুমি ভর্তি হবে, তুমি পড়বে এখানে। তোমার সমস্ত খরচপত্র দেখাশুনো, সব বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেব।'

'মালপত্র জাহাজে রওনা হ'য়ে গেছে আজ সকালে, আমরা প্লেনে যাচ্ছি, তার টিকিট কাটতে গেছেন মামা, সেইসঙ্গে মামী বাজারে বেরিয়েছেন বাবলুকে নিয়ে। সকলের জন্যই কিছু কিছু উপহার কিনতে কিনতে অনেক দেরি হবে তাঁর। বাড়িতে একা ছিলুম, চলে এসেছি এখানে। এর পরে কি আর থাকার প্রশ্ন ওঠে?'

'কিন্তু আমি—আমি কী করবো?'

'হয়তো কোনো একদিন যাবেন, কোনো একদিন একটা চিঠি পেয়ে, দমদম এয়ার-পোর্টে আনতে ছুটবো—' বিষণ্ণমুখে মল্লিকা হাসলো।

আমি আর একটা কথাও বলতে পারলাম না। অসহ্য বিচ্ছেদের গাঢ় বেদনায় আমার সকল অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো।

আর মাত্র দু'দিন! সে তো একটা পলক।

আমি ওদের সকলকে নিয়ে পরের দিনই বাইরে ডিনার খাওয়ালাম।

তার পরের দিন ও'রাও আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

দু'দিন মল্লিকা এতো নিঃশব্দ হ'য়ে ছিলো যে প্রায় অপরিচিতের মতো লাগছিলো তাকে। আমার দিকে সে মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলে তাকালো না, একা হ'লো না। কাজের অছিলায় শুধু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলো।

বুঝতে পারলাম পাথরে কপাল ঠুকে আর আমার লাভ নেই। আমার কাজ গেল, কর্ম গেল, ইশকুল গেল, খাওয়া-দাওয়া-ঘুম সব চুকে গেল। কখনো ঘরে একা বসে থাকি, কখনো এলো-মেলো ঘুরে বেড়াই। এর মধ্যে একদিন যাবার জন্য ফোন করলেন মল্লিকার মামা, বাজে অজুহাতে কাটিয়ে দিলুম সেটা। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটা রাগ যেন কুরে খেতে লাগলো আমাকে। কেবল মনে হ'তে লাগলো ওরা আমাকে ঠকিয়েছে। ঠকিয়েছে।

যেদিন ও'দের যাবার তারিখ তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নিজেকে আয়ত্তে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো। মনে হচ্ছিলো, একবার, শুধু একবার শেষবারের মতো দেখে আসি ওকে। ফোনের কাছে অন্তত ছুড়িবার এগিয়ে গেলুম, আর ফিরে এলুম। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকলুম মাথায় হাত দিয়ে।

স্যান্ডুইচ চিবিয়েই দিন কাটছিলো, কিন্তু এ্যাবির মাংস সেদ্ধ না হ'লে খাওয়া চলে না। বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে ভাবছিলাম বেরিয়ে গিয়ে কিছু কিনে আনবো কিনা বাইরে থেকে। কষ্ট হচ্ছিলো ওর জন্যে। অবোধ, অসহায়, আমি ওকে খেতে দিলে তবেই ও খাবে, আদর করলে তবেই ওর আদর। নিজের ভাবনায় নিজে যতোই জর্জর থাকি না কেন, ওর সেটা বোঝবার কথা নয়।

আস্তে কলিং বেল বেজে উঠলো। আমি বিরক্ত বোধ করলাম। আমার পাশের ঘরের একটি ছোটো ছেলে সর্বদাই যখন তখন এসে কলিং বেল টিপে আমাকে বিরক্ত করতো। এর আগেও সে দু'বার এসে গেছে।

তার মা কোথাও কাজে কর্মে বেরুলেই সে এরকম চলে আসে আমার ঘরে। আমাকে তার খুব পছন্দ। আমারও তাকে সঙ্গী হিসেবে কখনো কখনো বেশ লাগতো। মোটা-সোটা আট বছরের বুদ্ধিমান ছেলে, কবিতা শুনতে ভালোবাসতো খুব।

কিন্তু সেই সময়ে তার উপস্থিতি আমার পক্ষে পীড়াদায়ক মনে হ'লো।

বকার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রেগে গিয়ে দরজা খুলে দিতে দিতে বললুম, 'শোনো, তুমি যদি আর আমাকে এ রকম বিরক্ত করো, তোমার মাকে আমি বলে দেব, এখন যাও—', ব'লেই ঠাস ক'রে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েছিলুম, হাত তেমনি থেমে গেল। তাকিয়ে দেখলুম, দেয়াল ঘেঁষে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলুম আমরা। অনেক পরে আস্তে বললুম, 'এসো।' ধীর পায়ে ঘরে এলো সে, সে কোনো একটা আসনে বসে পড়লো ক্লান্ত ভঙ্গিতে। আমি একটা অস্থির জানোয়ারের মতো কেবল হাঁটতে লাগলাম ঘরের এ মাথা ও মাথা।

মল্লিকাকে একটি শোকের ছবির মতো দেখাচ্ছিলো। লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, চুপচাপ গালে হাত দিয়ে সে বসেছিলো। তার সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম। তারপর হঠাৎ যেন একটা জানালা খুলে গেল, আলোর ঝলকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমার বেদনা আর মল্লিকার বেদনা আজ ভিন্ন নয়।

আমি তার পায়ের কাছে বসে পড়লুম।

আমি তাকে বললুম, 'যেয়ো না, তুমি যেয়ো না।'

সে চুপ করে থাকলো।

আমি ডাকলুম, 'মল্লিকা। আমার মল্লিকা। মাই হানি। মাই হার্ট।'

সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

আমি তার হাতদুটো টেনে নিয়ে আমার বুকের উপর চেপে ধরলাম। সে মুখ নিচু করলো। তার গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল আমার মাথার চুলে মিশে গেল।

সেই আমাদের শেষ দেখা মিসেস সান্যাল। তারপরে কতোগুলো দিন কেটে গেল, এক বিন্দু ভুলতে পারলাম না তাকে। মিসেস ক্রাউন আমাকে ঠাট্টা করেন বাউ বলে, তিনি জানেন না আমি খাই জীবনধারণের জন্য, পরি লজ্জা নিবারণের জন্য, কাজ করি জীবিকার জন্য। আমার জীবনে সুখ-সাধ নামে কোনো জিনিসের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার দেয়া সেই বইখানাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন গাওয়া প্রত্যেকটা গান—আমি গাইতে পারি, আমি শুনতে পাই কানে। তার হ'য়ে রইলো। বইখানা আমার মুখস্থ, তার হাতের লেখাভরা বাংলা লেখার খাতা-খানা এক মুহূর্ত আমি চোখের আড়াল করতে পারি না। মিসেস সান্যাল, সে আমাকে 'অ্যালফাবেট মি লেটার' বাংলাটা শুধু শিখিয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু 'আই লাভ ইউ' কথাটি শেষদিন পর্যন্ত বলে গেলো না।'

আমি বললাম, 'তার কাছ থেকে শেষ চিঠি তুমি কদ্দিন আগে পেয়েছিলে?'

'এক বছর ছ'মাস আগে। উনিশে মার্চ, রবিবার, বেলা তিনটার সময়।'

'সব মুখস্থ?'

'চিঠিও মুখস্থ।'

'শেষ চিঠিতে কী লেখা ছিলো।'

'তুমি চিঠি লেখো না কেন, আমি ব্যাকুল হ'য়ে থাকি।'

'তুমি চিঠি লিখতে না কেন?'

'লিখতাম না! আমি না লিখে থাকতে পারি?'

'তবে?'

'সে পেতো না।'

'কেন?'

'কারণ জানি না। শেষে আমার চিঠিগুলো ফেরৎ আসতে লাগলো। সবশুদ্ধু সতেরোখানা চিঠি ফিরে এসেছে আমার।'

'আশ্চর্য! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কারো হাত ... ছিলো ...'

'নিশ্চয়ই ...'

'তারপর যে চিঠি তার আর কোনো খোঁজ পাওনি?'

'না।'

'যে ঠিকানায় সে ছিলো, ... ঠিকানাতেই সে আছে কি না জানো না?'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। বললাম '... তুমি ভুলতে চেষ্টা করো র‍্যালেন।'

'অসম্ভব।'

'তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটছো।'

'আলেয়া!'

'তা ছাড়া আর কী।'

র‍্যালেন হাসলো।

'অসম্ভবকে অসম্ভব বলে বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।'

'আমিও তো অসম্ভবই বলছি। যদি তাকেই ভুলে যাই, তা'হলে তো নিজেকেও ভুলে যাবো। আর তার মানে তখন উন্মাদ আশ্রমে যাবো।'

'র‍্যালেন, নিজেকে নষ্ট কোরো না।'

'আমি জানি, আবার আমাদের দেখা হবে।'

'একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রে সুখী হও, সংসারী হও।'

'তাকে ছাড়া সে সুখ, সে সুখ আমি চাই না।'

'তুমি কী করে জানো, এতোদিনেও তার বিয়ে হয়নি, তোমাকে ভুলে যায়নি, সুখী হয়নি।'

'হ'তে পারে না। হ'তে পারে না।'

এরপরে আমি চুপ [illegible]লাম। এই পাগলকে কী বোঝাবো।

সে বললো, 'আপনি ভাববেন না মিসেস সান্যাল, আমি টাকা জমিয়েছি, তিল তিল ক'রে জমিয়েছি, আর দেরি নেই, আমি শীগ্‌গিরই গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছুবো।'

'যাবার খরচ জমে গেছে তোমার?'

'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না একটা ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোট নেই, জুতোটা তালি মারতে মারতে কী চেহারা হ'য়েছে। হাতের প্লাস্টিক দু'টোর চামড়া খুবলে খুবলে গেছে। যা উপার্জন করি তার কতোটুকু খরচ করি আমি? দেখবেন আর ছ'মাসের মধ্যেই আমি রওয়ানা হ'য়ে যাবো ভারতবর্ষের দিকে। শুধু যাবার আগে একটা চাকরী যোগাড় [illegible] হবে ওখানে, এক বন্ধুকে এখন [illegible] লিখে রেখেছি সে কথা।'

[illegible]

সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত [illegible]গেল সে। ছ'মাসের আগেই [illegible] বিদায় নেবার সময় হেসে [illegible] আমার জন্য প্রার্থনা করবেন [illegible] ইণ্ডি[illegible] লাগব[illegible] যথেষ্ট [illegible] চিঠি লিখো।' [illegible] গেছে এক[illegible] একটা [illegible], 'লিখবার মতো হ'লে [illegible] শান্তি[illegible] সংগ্রাম।'

[illegible] তার পিঠে হাত রেখে আদর ক'রে ব[illegible]ম, 'তার চেয়ে ঢের ভালো।'

সেই আমাদের শেষ দেখা মিসেস্ সান্যাল

'তারপর?'

গল্প শুনতে শুনতে একাগ্র হ'য়ে যাওয়া ডাক্তার মৈত্রের ভারি গলা নীলিমার একটানা কণ্ঠস্বরের পরে যেন মেঘের মতো গুমগুম ক'রে উঠলো।

'তারপর?'

গল্প শেষ ক'রে নীলিমা মাথা নিচু ক'রে হাতের বালাটা ঘুরোচ্ছিলো। কাকাবাবুর প্রশ্নে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কথারই পুনরাবৃত্তি করলো। [illegible] থেমে বললো, 'তারপর তো আর [illegible]জানি না কাকাবাবু।'

'জানো না?'

'না।'

'তাহলে রাসেল স্মীথ তোমাকে গিয়ে কোনো চিঠিপত্র লেখেনি?'

'লিখেছিলো। প্রথম চিঠিতে পৌঁছ খবর ছিলো। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলো খুঁজছে। তৃতীয় চিঠি হতাশার ভরা।'

'পুরুষ বয়।'

কৌচের এলানো আরাম থেকে সোজা হ'য়ে বসলেন তিনি। একটু যেন অস্থির মনে হ'লো। খানিকক্ষণ কী ভাবলেন, তারপর ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'ইশ! কতো রাত করিয়ে দিলুম তোমার। যাও, শীগ্‌গির শুয়ে পড়ো গে।'

বলেই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ড্রেসিং টেবিল থেকে ব্রাশটা তুলে নিয়ে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে আরম্ভ করলেন।

নীলিমাও উঠলো। কফির বাসনটা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে গরম জলে ধুয়ে রেখে দিল সাজিয়ে। আলোটা নিবিয়ে দিল। বসার ঘরের এলো-মেলো চেয়ারগুলো হাতের টানে এ-পাশ ও-পাশ ক'রে যথাযথ ক'রে রেখে নিজের ঘরে এসে হাই তুললো। ক্লসেট খুলে রাত্তিরের পোশাকটা হাতে নিয়েছিলো, সেটাকে খাটের উপর ফেলে কী ভেবে কাকাবাবুর ঘরের পর্দার এ-পিঠে এসে দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

ডাক্তার মৈত্র মুখ বার করলেন, "কিছু বলবে?"

'গরম জলের ব্যাগ দেব?'

'পাগল?'

'আর একটা কম্বল দেব?'

'এটাই ব্যবহার করতে পারবো কিনা জানি না, যা গরম ক'রে রাখে এরা ঘরগুলো।'

'তা হ'লে আমি শোবো।'

'নিশ্চয়ই।' আদর ক'রে নীলিমার মাথাটা তিনি নেড়ে দিলেন, 'এ দেখছি একেবারে পাকা গিন্নী হ'য়েছে, এ্যাঁ?'

নীলিমা হেসে এক গ্লাস জল খেয়ে চলে এলো নিজের ঘরে। নরম বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে তার এক মিনিট লাগলো না।

ঘুমোতে ঘুমোতে ভাবলো কালকে কাকাবাবুকে স্টেক ক'রে খাওয়াবে। আর তারপর দিন ভালো থাকলে সারা দুপুর ঘুরে বেড়াবে।

(ক্রমশঃ)

নতুন নির্মল
কাচলে আপনার কাপড়চোপড়
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে

সংগীতবীক্ষা

আনন্দভৈরব

॥ সংগীত-সম্মেলন ॥

পূর্বেকার আলোচনায় সংগীত-সম্মেলন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল। বর্তমান স্থলেও দু-একটি আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। সংগীত-সম্মেলনে সাধারণত গীত-বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি ললিতকলারই পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে গীত তথা কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে খেয়াল গানের পরিবেশনই প্রাধান্য লাভ করে, কেননা ক্ল্যাসিকাল গানের ক্ষেত্রে বর্তমানে খেয়াল গানই অধিকতর অনুশীলিত ও লোকপ্রিয়। খেয়াল গান গাইবার যে ক্রম তার সঙ্গে রসোপলব্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে তৎসম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে আলাপের মাধ্যমে রাগ-রূপায়ণ একটি বড়ো কথা। কারণ আলাপের সাহায্যেই রাগের পূর্ণাঙ্গ ও ঠিক-ঠিক নক্সা শ্রোতার কাছে উপস্থাপিত করা যায়। বর্তমানে সংগীত-সম্মেলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেয়াল গানের পূর্বে মুক্ত-আলাপ সামান্যই করা হয়—বিলম্বিত খেয়ালের সূচনায় তার অন্তর্ভুক্ত করেই আলাপ বা শব্দালাপ পরিবেশিত হয়ে থাকে। যে-ক্ষেত্রে সময় সীমিত এবং যে ক্ষেত্রে গানের পূর্বে ও গানের সঙ্গে পরি-বেশনের দ্বারা আলাপ অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা সে-ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত রীতি সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল এই যে, বিলম্বিত খেয়ালে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী সম্পূর্ণ কথার অংশ পরিবেশন করেন না, যার ফলে শ্রোতার সম্পূর্ণ গানটি শোনা হয় না; হলেও অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণের অস্পষ্টতার জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। 'খেয়াল গানে কথা অকিঞ্চিৎকর'—একথা সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়।

তারপর আসে তান (ও বোলতানের) প্রসঙ্গ। আলাপের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তানের ক্ষেত্রেও তা বিস্মৃত হওয়া ঠিক নয়। খেয়াল গানে তানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাগভিত্তিতে কণ্ঠকৌশল প্রদর্শন করা নয়, লয়বদ্ধ ঘনসন্নিবিষ্ট স্বরবিন্যাস দ্বারা রূপায়ণ অব্যাহত রেখে রাগকে বৈচিত্র্যশীল করাই তানের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাগ-ভেদে তানের প্রকার ও পরিমাণের যে পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন যে রাগের ভাবের উপর নির্ভরশীল এ কথাও স্বীকার্য। পরিবেশনের সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে বলেই এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলন

গত ৫—১২ জানুয়ারী এই আট দিনের আটটি অধিবেশনে মহাজাতি সদনে অষ্টম বার্ষিক মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলন সম্পন্ন হল—প্রথম ও শেষ দিনের অধিবেশন ছিল সারারাত্রি-ব্যাপী। দেশের বর্তমান জটিল পরি-স্থিতিতে যখন এ বছরে আর সংগীত-সম্মেলন হবে কি হবে না বিষয়ে মনে সংশয় ছিল তখন মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলনের আয়োজনে আনন্দবোধ করেছি। বিশেষত জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসাহায্যের উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করে মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীত-সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে প্রথমে যে জিনিসটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল প্রেক্ষাগৃহ, তারপর মঞ্চ, তারপর অনুষ্ঠানাদি। প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে মহাজাতি সদন উত্তম স্থান। আর মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ মঞ্চটি সুসজ্জিত করায় ভালো লেগেছে। তা ছাড়া মঞ্চের সামনের দিকে দুপাশে বোর্ডে অনু-ষ্ঠানের বিবরণাদি লিখিত হওয়ায় দর্শকদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হয়েছে।

আলোচ্য সম্মিলনে গীত-বাদ্য ও নৃত্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ, স্থানীয় ও বহিরাগত বহু শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন, আনন্দ দিয়েছেন। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্যে বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচনা কয়েকটি মাত্র অনুষ্ঠানেই সীমিত হল।

কিরানা ঘরানার প্রখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর মারুবেহাগ রাগে খেয়াল পরিবেশন উপভোগ্য হয়েছে। মারুবেহাগ খুব প্রাচীন না হলেও লোকপ্রিয় রাগ। বেহাগ ও কল্যাণ রাগের ভিত্তি এই রাগের প্রধান উপজীব্য। দুই মধ্যমের কুশলী প্রয়োগে মধুর রসের উপস্থাপনা হৃদয়গ্রাহী। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী সুষ্ঠুভাবে রাগ-রূপায়ণ করলেন। কুশলতার সঙ্গে এক-একটি স্বরের প্রয়োগ ও তাঁর আলাপের ক্রম প্রশংসনীয়। তার ফলে মারুবেহাগ রাগের মধুর রস পরিস্ফুট হয়েছে।

[illegible] কুমারী [illegible] ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত [illegible] শিল্পী। তিনি কেদার রাগে [illegible] পরিবেশন করলেন। তাঁর কণ্ঠ সুরে [illegible] সুখশ্রাব্য। কেদার রাগের পরিবর্তে [illegible] উপযোগী অন্য কোনো রাগ নির্বা[illegible] তাঁর অনুষ্ঠান আরো [illegible] হত। শ্রীমল্লিকার্জুন মনসুরের [illegible] কাফি-কানাড়া রাগে খেয়াল [illegible] উপভোগ্য হয়েছে। রাগমিশ্র[illegible] অনুসারে কাফি ও কানাড়া রাগের উপযোগী এবং প্রকৃতিমধুরও। এই কাফির প্রাধান্য বেশি হলেও [illegible] কোমল গান্ধারের প্রয়োগে ও স্থানবিশেষে কানাড়ার আভাসে যে মিশ্র-রাগটি [illegible] হয়ে ওঠে শিল্পীর পরিবেশনে উপলব্ধি করা গেছে।

এইদিনের (চতুর্থ অধিবেশন) শেষ অনুষ্ঠানে স্বরোদে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর কৌশী-কানাড়ার রাগ-রূপায়ণ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রাগ-রূপায়ণে তাঁর মেজাজ ও তন্ময়তা প্রশংসার দাবি রাখে এইজন্যে আরো যে তার ফল শ্রোতাদের উপরও বর্তে। রাগের ঠিক ভাব-রূপটি উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা, পরিস্ফুট করা ও তাতে তন্ময় হয়ে যাওয়াই শিল্পীর সাধনার বিষয়। যিনি তা পারলেন তিনিই সার্থক শিল্পী। বিশেষ করে সার্থক শিল্পী যখন কোনো রাগ-রূপায়ণ করেন, তখন এই তন্ময় হয়ে যাওয়া বিষয়টি যে কি তা উপলব্ধি করা যায়। সেদিক থেকে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর আলোচ্য অনুষ্ঠানকে প্রশংসা জানাই।

অল্প কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এ স্থলে আলোচনা করা হল। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

একটা ক্ষীণ আশা ... ছিল যে হয়ত পাত্রপক্ষ ...টুকু জানাতে বলতে আসবে। বরের ... —সেটুকে বলতে গেলে মেয়ের ... পরই আমার বাড়ি ধরে— ...। ওদের আগে বলা উচিত ... ইতিমধ্যে খোঁজ করলে কি এরা ... লাগত ... যথেষ্ট। ... সঙ্গে লোকই দেবে গেছে একরকম ... গোপন করার কোন একটা ...। ওদের মতলব তো নিশ্চয়ই ... শনিবারে

বাড়ি কেউই কিছু বলতে এল না। নিয়মমাফিক যেটা বৌভাত—ফুলশয্যের দিন সেটাও কেটে গিয়েও দুদিন চলে গেল। কোন খবরই পাওয়া গেল না মেয়েটার। চারদিনের দিন সন্ধ্যার সময় একেবারে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকল ঐন্দ্রিলা।

'ওগো এ আমার কী হ'ল গো! ওগো তোমরা থাকতে আমার মেয়ের এই সব্বনাশটা হ'ল গো। ওগো তোমরা কেউ একবার গিয়ে দেখলে না!'

শ্যামা তখন সবে স্নান ক'রে এসে ঘরে কাপড় ছাড়ছিলেন, তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন।

'থাম, থাম। চুপ কর। ও কি ...? ভর-সন্ধ্যেবেলা অমন মড়া-... কিসের জন্যে? গেরস্তর অকল্যেণ—সে মেয়েটারও অকল্যেণ।...... চুপ, চুপ।'

কিন্তু মাকে দেখে ঐন্দ্রিলা আরও যেন হাহাকার করে উঠল।

'ও মাগো, এ আমার কী হ'ল মা! আমার যে ঐ একটা মেয়ে মা। আমি যে ওর ওপর ভরসা করেই বুক বেঁধে ছিলুম মা। তোমরা থাকতে আমার এ সব্বনাশ কী ক'রে হ'ল মা।'

'চুপ। চুপ।' একটু ধমকই দিয়ে ওঠেন শ্যামা এবার, 'নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই করেছ মা। মাঝখান থেকে আর এদের মাথাটি খাচ্ছ কেন—এখন এই ভরসন্ধ্যেবেলা কান্নাকাটি ক'রে! এখন বলছ আমরা থাকতে—। আমরা কী করব শুনি! মেয়েকে নড়া ধরে নিয়ে যাবার সময় হুঁশ ছিল না! আমরা কি তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, না নিয়ে যেতে বলেছিলুম? টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে তুলে দিলে কে? তুমিই তো তাদের গার্জেন করে দিয়ে গেছ বাছা। এখন আমাদের কাছে এসে কাঁদলে কী হবে? আমরা কি করব। আমাদের জানিয়েছে তারা, না মত নিয়েছে!'

'ওগো, আমি না হয় চিরদিনের অজ্ঞান, আমি না হয় অন্যায় করেছি—তোমরা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এলে না কেন! তোমরা যদি জোর ক'রে এনে রাখতে তা হ'লে তো আর এ সব্বনাশটি হ'ত না!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়। তারপর তুমি এসে উলটে আমাদের নামে থানা-পুলিশ কর! কার হুকুমে আমার মেয়েকে নিয়ে এলে তোমরা—একথা বললে আমরা কোথায় দাঁড়াতুম? তোমার তো মুখে যাট নেই মা। আসল এ সর্বনাশের জন্যে দায়ী তোমার স্বভাব। তোমার ঐ স্বভাবের জন্যেই চিরকাল জ্বলবে আর জ্বালাবে। তোমার পাপেই তোমার মেয়ের এই হাল হ'ল!'

কনক ততক্ষণে ছুটে এসে ঐন্দ্রিলার হাত ধরে দাওয়ায় বসিয়েছে। ওর এই চিৎকার আর মড়াকান্না শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে—এবার হয়ত ভিড় করে এসে বাড়িতে ঢুকবে। লোক জানাজানি কেলে-ঙ্কারীর আর কিছু বাকী থাকবে না।

সে মিনতি করে বলে, 'চুপ করুন, চুপ করুন ঠাকুরঝি। ছিঃ অমন ক'রে কি কাঁদতে আছে। কী এমন হয়েছে। আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে, সে হওয়া তো আর ফিরবে না। মিছিমিছি মেয়েটার আরও বেশী অকল্যেণ করছেন কেন। স্থির হোন একটু।'

সে ছুটে গিয়ে একটা চুমকি ঘটি ক'রে জল এনে ওর চোখে মুখে দিতে থাকে। মাথাতেও দেয় খানিকটা থাবড়ে থাবড়ে।

'আর কি কল্যেণ হবে ভাই। আর কি বাকী আছে কিছু? ওরা যে আর কোন সব্বনাশটা করতে বাকী রাখেনি তোমাদের সীতার!'

কান্না একেবারে বন্ধ হল না, কিন্তু কনকের সহানুভূতির স্পর্শে হাহাকারটা কমে আসে একটু একটু ক'রে।

একটু একটু করে সব খবরও পাওয়া যায় তার মুখ থেকেই।

চিঠি পেয়েছে ঐন্দ্রিলা বিয়ের পরের দিন। সে বাঁদের কাছে কাজ করে তাঁরা ডাকের মোহর দেখেছেন। বিয়ের দ্বিতীয়

রোহর পড়েছে এখানকার। তার মানে সেইদিনই সকালে ফেলা হয়েছে—যাতে ও বিয়ের দিন না পৌঁছতে পারে।

ওকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক হ'ল তাতেই ওর কেমন কেমন বোধ হয়েছিল। নানারকম সন্দেহ মনে দেখা দিয়েছিল তখনই। তবে এতদূর কল্পনাও করতে পারেনি। ওর দেওররা যে ঠিক এতখানি অমানুষ তা ও জানত না।

এ যে একেবারে ওর ধারণার বাইরে। এক একবার এ-ও ভেবেছে যে—হয়ত বিয়ে-বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি বাধাবে, অশান্তি করবে নানারকম, সেই ভয়েই ওকে দেরি ক'রে খবর দিয়েছে।......

যাই হোক—চিঠি পেয়েই রওনা দিয়েছে ও। সেইদিনই। মনিবরা বারণ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—একা মেয়েছেলে রাত্রের ট্রেনে গিয়ে কাজ নেই।

তারা এড়িয়ে গেছে। শেষে শাশুড়িকে গিয়ে চেপে ধরায় তিনি বলেছেন, 'গায়েহলুদ ফুলশয্যা গায়ে গায়ে কাটান গেছে—ফুলশয্যের তত্ত্ব পাঠানো হবে না।'

খুবেই মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। যতই গায়ে গায়ে কাটান দেওয়া হোক, এমন তো অনেক বিয়ে দেখেছে—নিয়ম-কর্ম যেটুকু, একটু ফুল, দুখানা কাপড়, একটু ক্ষীর মুড়কি—এও যাবে না, সে আবার কী রকম কথা।

তখনই পাড়ায় বেরিয়ে পড়েছে ও—ঘাট থেকে মুখহাত ধুয়ে আসবার অছিলায়। পাড়ায় যাদের বাড়িতেই গেছে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যেন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বিব্রত হয়ে উঠেছে যেন ওকে দেখে। বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। শে[illegible] পর্যন্ত পাড়ার দাশু মজুমদারের গি[illegible]র কাছে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করতে [illegible] বলেছেন, 'বাপু, বুঝতেই তো [illegible] পাড়ায় বাস করি, আর তো[illegible] চি[illegible]ড়ীর যা মুখ, সাধ করে কে ঝগড়া [illegible]নবে বলো ওদের সঙ্গে। দুটি ঠোঁট [illegible]ই বিপদ।...... তাছাড়া পাড়াঘরে [illegible] [illegible]কে বলোনি—আড়াল আবডাল [illegible] ছেলেরা দেখেছে। সেসব ক[illegible]। তা তুই বা এর ওর ক[illegible] মাথা খুঁড়ছিস্ কেন, [illegible]। আপনার চক্ষে সুবর্ণবর্ষে [illegible] দেখে আয়!'

'কিন্তু ঠিকানা জানি না [illegible] কাকী-মা।' ঐন্দ্রিলা বলেছে।

আর একটু ইতস্তত ক'রে তিনি ঠিকানাটাও বলে দিয়েছেন। গ্রামের নাম, পাত্রের নাম শুধু। আর গ্রামটা ডোম-জুড়ের কাছেই—এইটুকু। এরচেয়ে বেশী ঠিকানা নাকি কেউ জানে না। ওরা কাউকেই বলেনি—ওর দেওররা।

তখনই বেরিয়ে পড়েছে ঐন্দ্রিলা। গাড়ির কাপড় ছাড়া হয়নি, মুখে একটু জলও পড়েনি। আঁচলেই টাকা কটা বাঁধা ছিল তাই রক্ষে। বাড়িতে গেলেই ওকে আটকে ফেলবে—এটা ও এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল বেশ।

অজানা অচেনা পথ। [illegible] লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে [illegible] যাওয়া, গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থাও জানা নেই কিছু—তবু হাল ছাড়েনি ও।

'একবার ভেবেছিলুম দিদির বাড়ি গিয়ে বুড়ো কি ন্যাড়া কাউকে সঙ্গে নিই

'নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই করেছ মা—'

মন খারাপ খুবই হয়েছিল। একটা মেয়ে—তার বিয়েটাও চোখে দেখতে পেল না। আবার মনকে বুঝিয়েছে যে ওর যা দুভোগ্যনে বরাত, না দেখেছে ভালই হয়েছে। ওর নজরেই ক্ষতি হ'ত হয়ত। আরও একটা আশ্বাস মনে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যে দাদা আছে মা আছে, তারা নিশ্চয় দেখেশুনেই মত দিয়েছে। মামাদের যে জানানোও হয়নি—

একদিন সবুর করুক বরং—কে চেনা-শুনো লোক কলকাতা যাচ্ছে খোঁজ ক'রে দেখে তার সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তাঁরা। বিয়ে যখন হয়েই গেছে, তখন আর এত তাড়া কি? কিন্তু ঐন্দ্রিলা সেই একদিনও অপেক্ষা করতে পারেনি।

এখানে এসে ওর আরও মন খারাপ হয়ে গেছে—ফুলশয্যার কোন আয়োজন নেই দেখে। দেওরদের জিজ্ঞাসা করেছে,

—আবার ভাবলুম মিছিমিছি আরও দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া তারাও হয়ত পথঘাট চেনে না। দিদি খাওয়ার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে গেলেই, ওখানেই দুপুর গড়িয়ে যাবে, যাওয়াই হবে না শেষ পর্যন্ত। তখন আমার জেদ চেপে গেছে —ওদের ফুলশয্যা বৌভাত কেমন হয় দেখতে হবে। ঘরবরও দেখব নিজের চোখে। তাই অমনিই বেরিয়ে পড়লুম, তখনই। এদেশ ওদেশ ঘুরে পরের বাড়ি চাকরি ক'রে ক'রে আগের চেয়ে সাহস বেড়ে গেছে তো, সেয়নাও হয়েছি অনেকখানি—শেষ পর্যন্ত তাই খুঁজে বারও করলুম! কিন্তু কী দেখতে গেলুম বৌদি, কী দেখলুম গিয়ে। এ দেখতে এত কান্ড ক'রে কেন গেলুম!'

আবারও হুহু করে কেঁদে ওঠে ঐন্দ্রিলা।

কনক তখন একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে আর একহাতে মথায় [illegible] করছে, 'চুপ করুন চুপ করুন [illegible]। স্থির হোন। কেঁদে তো এতটুকু [illegible] ফল হবে না। মিছি মিছি [illegible] বেশী অকল্যাণ করছেন [illegible]

জামাই [illegible] কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছে [illegible] সন্ধ্যার বেশী দেরী [illegible] এসেছে চারদিক। গেছে একসময় [illegible] বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছে একটা [illegible] ম ক'রে সে-ই উত্তর দিয়েছে [illegible] চকি হেসেছ একটু। তবু তখনও ঐন্দ্রিলা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে বিয়ে [illegible] র কথা জিজ্ঞাসা করছে, বিশেষ দোজবরের বিয়ে, তাই ওরা হাসছে। সে হাসির কোন গূঢ় অর্থ আছে তা মনে করেনি একবারও।

বরং অন্য চিন্তাই দেখা দিয়েছে মনে।

বিনা নিমন্ত্রণে কর্মবাড়ি যাওয়া উচিত নয়, জামাইবাড়ি তো এমনিই যাওয়া অনুচিত—এসব কথা এতক্ষণ একবারও মনে হয়নি ঐন্দ্রিলার। একেবারে ওদের পাড়ায় পৌঁছে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। গাড়ির কাপড়, এমনিতেই আধময়লা হয়ে গিয়েছিল, তারওপর সারাদিনের 'রহটে' তো রীতিমতো কালোই দেখাচ্ছে, চাদরটাও ফুটো ফুটো—কবেকার হরিনাথের দরুণ চাদর এটা—তার ওপর ময়লাও হয়েছে যৎপরোনাস্তি। এই অবস্থায় জামাইবাড়ি যাওয়া—ছি! কী মনে করবে ওরা। বেশী নিমন্ত্রিত কেউ না এলেও ঘরের লোকজনও তো আছে।

তাছাড়া জামাই প্রথম দেখবে শাশুড়িকে —কী ভাববে। মেয়েরও একটা লজ্জার কারণ।

ফিরেই আসছিল। দুচারপা এসেও ছিল কিন্তু তাতেও ঠিক মন সরল না। এতদূরে এসে এতকান্ড করে জামাইকে না দেখেই চলে যাবে? যার জন্য আসা। তার চেয়ে বরং একটু আড়াল থেকে ঘরবর দেখে চলে আসবে।

সেই ভেবেই আর একটু এগিয়ে একেবারে ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল সামনের বাগানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, বেশ একটা হৈ-চৈও হচ্ছে। প্রথমটায় একটু আশ্বস্তই হয়েছিল। ভেবেছিল বৌভাতেরই ভিড় এটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য খটকা লাগল। আলো নেই কেন? এত লোক যেখানে নিমন্ত্রিত সেখানে অন্তত দুটো গ্যাসের আলো [illegible] করা হয়নি—এ যেন কেমন ঠেকছে। একটা হ্যারিকেন শুধু দূরে বসানো আছে, যেখানটায় বেশী জটলা, সেখানটায় কিছুই নেই। এ যেন বড় বেশী অস্বাভাবিক মনে হ'ল তার।

তখন আর একটু এগিয়ে গেল। ওরা নিজেদের গোলমালে ব্যস্ত, তাছাড়া বেশ ঘোরঘোরও হয়ে এসেছে, তাকে অত কেউ লক্ষ্য করবে না। কাছে যেতেই বুঝল ব্যাপারটা। উৎসবের আনন্দ কোলাহল নয়—দাঙ্গা, মারপিট। অতি কুৎসিত ইতর কলহ একটা। দুই দলে বিবাদ হচ্ছে, পাড়ার লোক এসেছে মধ্যস্থতা করতে।

সেই গালিগালাজ ও কটূক্তির বিপরীত-মুখী অবিরাম বর্ষণের মধ্যে থেকে আসল ঘটনাটা যখন বুঝতে পারল ঐন্দ্রিলা তখন কিছুকালের জন্য তার হাত-পা পাথর হয়ে গেল। বুকের স্পন্দন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

এইখানে বিয়ে হয়েছে সীতার! এই বিয়ে!

চিনতেও পারল সবাইকে। সীতার বর—আর তার ওপক্ষের ছেলেমেয়ে সকলেই ছিল সেখানে। যে জোয়ান জোয়ান চারজন ছোকরা এদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে—তারা জামাইয়েরই ছেলে। এদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে এদের বড় ভগ্নিপতি এবং তার বড় ছেলে। সেও সতেরো আঠারো বছরের ছোকরা। জামাইয়ের দিকে শুধু আছে আর একটি জামাই। সে কলকাতার লোক, ঝগড়া-বিবাদ পছন্দও করে না—এর মধ্যে থাকতেও চায় না। সে পেরেও উঠছে না তাই এদের সঙ্গে।

আশপাশের দুএকজনকে প্রশ্ন ক'রে এই বিবাদের ইতিকথাও জানতে পারল ঐন্দ্রিলা। এই বিয়ের কথা শুনেই নাকি বুড়োর (তারা সকলেই বুড়ো বলে উল্লেখ করেছে, জামাইয়ের নাম উমেশ সে একজনের মুখেও শুনলে না, ছেলেরাও বাবা বললে না কেউ, তারাও বুড়ো বলতে লাগল) ছেলেরা রুখে উঠেছিল, ভয় দেখিয়েছিল যে এ তারা কখনও সহ্য করবে না—তাদের জাজ্বল্যমান সংসার, তাদের মা মারা গেছে এখনও ছমাস হয়নি— সে জায়গায় এসে বসবে কে এক হাঘরের মেয়ে—হাঘরে ছাড়া বুড়োকে মেয়ে দেবেই বা কে?—এ তারা দেখতে প্রস্তুত নয়। এ বিয়ে তারা বন্ধ করবেই, দরকার হয়তো দাঙ্গাহাঙ্গামা মারপিটেও তারা পিছ-পা হবে না। বুড়োর ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলে রাখা খুবই সোজা—কিন্তু তাও তারা করবে না, বিয়ের আসরে গিয়ে হট্টগোল

বাধিয়ে পাড়ার লোক ডেকে বেইজ্জৎ করবে, খোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে ফিরে আসতে হবে।

বুড়ো সত্যিই ভয় পেয়ে গিছল ওদের এই শাসানিতে। অথচ বিয়েরও এমন লালসা যে কোন অগ্রপশ্চাৎ ভাববারও শক্তি ছিল না। সে ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য ওরা যা বলেছে তাতেই রাজী হয়েছে, বাড়িঘর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি যেখানে যা ছিল সব ঐ ছেলেদের নামে দানপত্র ক'রে রেজেস্ট্রী ক'রে দিয়েছে। তখন ভেবেছিল যে ষোলআনা অধিকার পাবার পর যার সম্পত্তি তাকে আর তার বৌকে একেবারে ফেলবে না, দুটো ভাতকাপড় দেবেই। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও দিতে বাধ্য হবে। তার জীবদ্দশাতে তো কোন ভয়ই নেই—মরার পরও বিধবাটাকে কি আর দুটো ভাত দেবে না? তাছাড়া হয়তো বিধবার প্রশ্ন নিয়ে তখন সে আদৌ মাথাই ঘামায়নি। তার তখনকার প্রয়োজনটাই বড় কথা। সে যখন থাকবে না তখন কার কী হ'ল না হ'ল সে তো আর দেখতে আসবে না। জীব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই সে জীবের আহারেরও একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সব হিসেব কিন্তু বানচাল হয়ে গেল যখন কাল নতুন বৌ এনে দেখলে যে তার নিজের বাড়িতে আর ঢোকবার অধিকার নেই, সে দরজা ওদের মুখের ওপরই বন্ধ হয়ে গেল। তখন গালি-গালাজ শাপশাপান্ত যা করবার বুড়ো যথেষ্টই করেছে কিন্তু ছেলেরা গ্রাহ্যও করেনি। বহু রাত অবধি কনে-বৌকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে অন্ধকারেই। যে বন্ধুকে অভিভাবক বা বরকর্তা মতো ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, সে বেগতিক দেখে আগেই সরে পড়েছে। তখন এক প্রতি-বেশীর হাতে-পায়ে ধরে বাকী রাতটা তার বাড়ির সদর ঘরে কাটিয়েছে। তাদের তখন খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে—তাছাড়া তারা অন্য জাতও বটে—সুতরাং রাত্রের আহারও জোটেনি কারুর।

আজ সকালে উঠে যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে বুড়ো। কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউই গা করেনি; পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা সাফ্ জবাব দিয়ে দিয়েছে। কে এ ঝগড়ায় নাক গলাবে। অভিভাবকদের উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—এত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে যে, সে কী বলে বিষয়সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকে।

ঐ নাতনীর বয়সী মেয়েটার কত বড় সর্বনাশ সে করছে খেয়াল ছিল না?

কারুর কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক একটি কথাও শোনেনি সে। তখন চোখে অন্ধকার দেখেছে। শেষ পর্যন্ত বড় ছেলের শ্বশুর এবং ছোট জামাইয়ের কাছে কান্নাকাটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তাদের টেনে এনেছে মধ্যস্থতা করতে। বুড়ো ভেবেছিল যে নিজের শ্বশুরের কথা বড় ছেলে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। আর সে নরম হ'লে দল ভেঙে যাবে, অন্য ছেলেরাও জুৎ করতে পারবে না তখন।

মধ্যস্থ দুজনকে নিয়ে ঐন্দ্রিলার মেয়ে-জামাই একটু আগেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ছেলেরা কোন কথা এবং কারুর কথা শুনতেই রাজি নয়। শ্বশুর আছে শ্বশুর আছে ঘরে অ... এসব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে কেন! ও বাপকে তারা কিছুতেই এ-বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তারা ওকে বাপ বলে মানতেই রাজি নয়। ও তো বদ্ধ পাগল। মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে ধোঁকাকেশো বুড়োর—নইলে এ কাজ কেউ করে? গঙ্গাপানে পা হয়েছে, ঘাটে উঠলেই হয় এখন—সে কিনা একটা নাতনীর বয়সী কেন—নাতনীর চেয়েও বয়সে ছোট মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল! এখন ওদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া মানেই তো একটা বিধবার আজীবন খোরপোষের ভার ঘাড়ে নেওয়া। সে কাজে যেতে তারা প্রস্তুত নয়। ও উড়ো-আপদ উড়েই চলে যাক, যেদিকে খুশি।

এই নিয়েই এখনও তকরার চলছে। বুড়োর বলতে গেলে দুদিন অনাহার চলছে, তার ওপর সকাল থেকে ছুটো-ছুটি ঘোরাঘুরি—তার আর সত্যিই তখন মাথার ঠিক নেই। নিজের আত্মজদেরই যে কুৎসিত ভাষায় ইতরের মতো গাল দিচ্ছে তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। ছেলেরাও অবশ্য কম যাচ্ছে না। সেদিক দিয়ে অন্তত তারাও যে বাপেরই বেটা তা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

বিবাদ অনেকদূর গড়িয়েছে। আস্তে আস্তে ইতিহাস সংগ্রহ করতে ও বুঝতে ঐন্দ্রিলার সময় লেগেছে বেশ খানিকটা। ইতিমধ্যে কখন যে সে আরও সামনে চলে এসেছে তা নিজেই টের পায়নি। সীতা এতক্ষণ কোনদিকে মুখ তুলে তাকায় নি, ঘাড় হেঁট করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাপের বাড়িতে ছিল সারা-

দিন তারা ভাত খাওয়াতে সাহস করেনি বামুনের মেয়েকে—জলখাবার খাইয়েছিল সামান্য কিছু। খাবার অবস্থাও ছিল না। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তায়, আশাভঙ্গের বেদনায় সে যেন জড় হয়ে গিয়েছিল। জড় হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় রক্ষা, নইলে তার পাগল হয়ে যাবারই কথা। এখনও, এই সমস্ত অপরিচিত লোকের মধ্যে এই অতি-ইতর আবহাওয়ায় সে আরও ভয়েই কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একসময় যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে আটকে যাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠে মুখ তুলতেই মায়ের দিকে চোখ পড়ে গেল তার। সে 'মাগো' বলে চিৎকার ক'রে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ গুঁজে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

ঐন্দ্রিলা প্রথমটা ভেবেছিল সীতা বুঝি ম'রেই গেল। তাছাড়া তারও এত-ক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে ... ...ন কোন মতেই আর আত্ম-সম্বরণ ... সম্ভব নয়। সে মাটিতে আছড়ে ... কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে গালাগাল ... অভিসম্পাত দিয়ে চিৎকার করে এক ... বাধিয়ে তুলল। তাতেই কিন্তু ... গেল শেষ পর্যন্ত। অনে... হ'ল, সত্যিই তো ঐ এ... কী দোষ! অভিভাবকদের ... শাস্তি পায় কেন? সে কে ... করবে? বিশেষ ঐন্দ্রিলার ক... যখন সকলে জানতে পারলে ... মেয়ের মাকে না জানিয়ে, তার মত না ...য়েই, এ বিয়ে দেওয়া হয়েছে—অনাথা আশ্রয়-হীনা বিধবার একমাত্র সন্তানকে ওরা ষড়যন্ত্র ক'রে বিয়ে দিয়েছে—তখন সহানুভূতিটা পুরোপুরি এদের দিকে এসে পড়ল। কে একজন ছুটে গিয়ে ঘটি ক'রে জল এনে সীতার মুখে মাথায় ঝাপ্টা দিতে লাগল। একজন মহিলা এসে ঐন্দ্রিলাকে মাটি থেকে তুলে মুখ চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

এইবার পাড়ার লোকেরা অনেকেই বুড়োর ছেলেদের ওপর রুখে ...। এ কী অন্যায় কথা! যার ধন ত... নয় নেপোই মারে দই!' বুড়ো ... খারাপ কাজ করেছে সত্যি কথা—তবু তারই বিষয় তারই সম্পত্তি—এইভাবে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে সব সম্পত্তি হাতিয়ে এখন তাকেই এমন করে লাঞ্ছনা করা! নিজের

বাড়িতে যে ঢুকতে পারবে না। আর ঐ দুধের মেয়েটা কাল থেকে না খাওয়া না দাওয়া—পরের বাড়ি পড়ে আছে—ওর ওপরই বা অকারণ এ প্রহারী কেন? যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে—এখন এদের বাড়ি ঢুকতে দাও, মেয়েটার একটু শোবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। বুড়ো যদি এ আহাম্মকী না ক'রে পুলিশ ডেকে তোদের তাড়িয়ে দিত—তা হ'লে তো এরই যথাসর্বস্ব। তখন তোরা দাঁড়াতিস কোথায়, খেতিস কি?...এখনও যদি ওদের অল্প চৈতন্য না হয় তো বুড়োকে নিয়ে ওরা থানায় গিয়ে ডায়েরী করিয়ে ছেলেদের নামে মামলা করাবে। ভয় দেখিয়ে যে দানপত্র করা হয়েছে সে দানপত্রের কোন মূল্যই নেই। কোন আদালত তা মানবে না।

এই ওষুধেই ছেলেরা অনেকটা নরম হয়ে এল। এভাবে ঐন্দ্রিলো গিয়ে পড়ে কে'দে জিতবে তা ত... হাতের উদ্যত লাঠি এবার ... সকলকারই। কেবল মেজ ছেলেটুকু মুখ গোঁজ ক'রে বললে, 'জমি—সেটা না হয় লিখে দিলে ... নগদ টাকাগুলো তো ...ন। বুড়ো বাড়ি একটা কিনে দিল ইতিহ... তার ছুকরী মেয়েমানুষকে! লাগত ...থেষ্ট।

গেছে একমুহূর্তেও চারিদিক থেকে সকলে ধমকে একটা ...লে। 'এ কী অভদ্র কথাবার্তা! ব্রাহ্মণের শনিবার ...য়ে, দস্তুর মতো নারায়ণ অগ্নি ...ড়ি সাক্ষী ক'রে বিয়ে ক'রে এনেছেন তোমা-...টু...দের বাবা—তার সম্বন্ধে এ রকম ...অশোভন আচরণ করা অত্যন্ত অন্যায়।'

কিন্তু সে কথা চাপা পড়ে গেল আর একটি সংবাদে। উমেশের যে বন্ধু বরকর্তা সেজেছিলেন এ বিবাহে (সম্ভবত মোটা টাকা খেয়েই) এবং বিয়ে দিইয়ে নিয়ে এসেছিল কাল—আবহাওয়া অনুকূল দেখে সে এবার এগিয়ে এল; 'সে টাকা কি আর আছে বাবাজীবনরা, তার আর একপয়সাও নেই। সে টাকা থাকলে তোমার বাবা এতক্ষণ বাড়ি ঠিক করে বায়না করে ফেলতেন। তিনিও কম জেদী মানুষ নন। নিছক কারে পড়েই তোমাদের কোর্ট ধরেছেন।'

শুধু জীবনধনেরই নয়, উপস্থিত সকলেরই কৌতূহল সরব হয়ে উঠল।

তখন তিনি সবিস্তারে সে ইতি-হাসটুকু বিবৃত করলেন। আর তখনই ঐন্দ্রিলা জানতে পারল যে সীতার ভাগ্যে আশা বা ভরসা বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

সীতার জ্যেঠ কাকা ভোলা নাকি কী ফাটকা খেলতে গিয়ে অফিস থেকে হাজার দুই টাকা ভেঙে বসেছিল। এ কাজ নাকি ইতিপূর্বেও সে অনেকবার করেছে, কোনটায় হেরেছে কোনটায় জিতেছে—অফিসের টাকা যথাসময়ে পুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবার ক্রমান্বয়ে লোকসান হওয়ায় দেনার অঙ্ক বেড়েই গেছে, শোধ দেবার কোন উপায় করতে পারেনি। সামনেই অডিট—কথাটা আর চাপা থাকবে না বুঝে চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু অত টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে—কে তাকে দেবে? এজমালি সম্পত্তি, এখনও বখরা হয়নি, সে সম্পত্তি বাঁধা দিতে বা বিক্রী করতে গেলে অন্য ভাইয়ের সই চাই। ভাই তা দিতে রাজী হয়নি। এই যখন অবস্থা—এক পা বাইরে এক পা জেলে—তখনই কার মুখে শুনল উমেশের কথা। সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছে, বয়স পঞ্চাশের কম নয় এবং তার হাতে অনেক টাকা।

শোনামাত্র সে উমেশের এই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সোজাসুজি প্রস্তাব করে যে তিন হাজার টাকা পেলে এবং ওরা যদি বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে রাজী থাকে তো সে উমেশের সঙ্গে নিজের ভাইঝিরই বিয়ে দিতে পারে। পাছে এতগুলো টাকা খরচা শুনে ও তরফ ভয় পায় সেই জন্য প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে মেয়েটিকে দেখাবারও ব্যবস্থা করে। মায়ের মতো অত রূপসী না হোক—সীতা লাবণ্য-বতী মেয়ে। গৌরাঙ্গী নয়—তেমনি কালোও নয়, মাজা মাজা রঙ। মুখশ্রী পেয়েছে সে বাপের কাছ থেকে—কাটাকাটা মুখ যেন। গঠনও নিখুঁৎ। সর্বোপরি অল্প বয়স, তখন তার প্রথম কৈশোর। এ বয়সে কুৎসিত মেয়েকেও ভাল দেখায়। উমেশের মাথা ঘুরে গেল। সে এই প্রস্তাবেই রাজী হয়ে পড়ল। কথা হ'ল যে পাকা দেখার দিন দু'হাজার এবং বিয়ের দিন এক হাজার টাকা সে ভোলার হাতে দেবে এবং মেয়ের গহনা কাপড় বাসনপত্র ও খাওয়াদাওয়ার যাবতীয় বাজার ক'রে পাঠাবে। গহনা কত দেবে তা ভোলা জিজ্ঞাসা করেনি—তার অত মাথাব্যথাও ছিল না। সেইজন্যই বরং উমেশ কম দিয়েছিল। কারণ অত টাকা তার হাতে সত্যিই ছিল না। সে ভেবেছিল যে তার প্রথমা স্ত্রীর দু'একখানা গহনা ভেঙে নতুন ক'রে গড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাতাসে খবর পেয়েই তার ছেলেরা আগে সে বাক্সটি আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং কয়েকগাছা পাতলা চুড়ি এবং একগাছি সরু হার ছাড়া কোন গহনা সে দিতে পারেনি। বাকী সব খরচটাই কিন্তু ভোলা

আদায় করে নিয়েছে বলতে গেলে ওর কান ম'লে।

এইখানেই ঐন্দ্রিলা উমেশের ঐ বন্ধুর মুখ থেকে প্রথম জানল যে, শিবু আগে এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি—বরং খুবই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। শেষে ভোলা পুরো একটি দিন নিরম্বু পড়ে থেকে মাকে দলে টানতে মা কান্নাকাটি ক'রে সেজছেলের হাতপায়ে ধরে তাকে রাজী করিয়েছিলেন। তাও শেষ পর্যন্ত একটি হাজার—অর্থাৎ- বাড়তি টাকার সবটাই তাকে গুণে দিতে হয়েছিল। জেলটা বাঁচল এবং আপাতত চাকরিটাও রইল—ভোলার এইটুকুই নীট্ লাভ।

এই ইতিহাস শুনে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছু-কাল। এতখানি মূর্খতা ও উন্মত্ততা তাঁদের ধারণার বাইরে। একে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই, নিঃশ্বাসের অপচয়। অতিরিক্ত কামোন্মত্ততায় লোকটা শুধু এই মেয়েটারই সর্বনাশ করেনি, নিজেও সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে। যতকাল বাঁচবে এদের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে—এদের হাত-তোলায় থাকতে হবে। মামলা-মকদ্দমা করে যে নিজের বিষয় ফিরিয়ে নেবে তারও খরচ আছে, সে টাকাটাও হাতে রাখেনি। মেয়েটাকে কী ক'রে পাবে তাই শুধু ভেবেছে—কী ক'রে পালন করবে তা পর্যন্ত চিন্তা করেনি।

কে একজন পিছন থেকে বললেন, 'মেয়েটারই বরাত। নইলে এমন তো কখনও শুনিনি।'

উপস্থিত সকলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই কথাটারই সমর্থন করলেন। কী আর করবেন তাঁরা? কী আর করবার আছে এক্ষেত্রে?

যাইহোক—চারিদিক থেকে উমেশকে লক্ষ্য করেই চাপা এবং স্পষ্ট ধিক্কার উঠলেও—তার ছেলেরা এবার বাড়ির প্রবেশপথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। উমেশ ঘাড় হেঁট করে নববধূকে নিয়ে অবশেষে তার নিজের ঘরে গিয়ে উঠল।

তারপর অবশ্যই কর্তব্যকর্ম কোন ত্রুটি ঘটেনি। উমেশের বড়ছেলের বৌ এসে হাতজোড় ক'রে ভেতরে যেতে বলেছে, 'যা হবার হয়েছে, এখন সন্তান মনে ক'রে মাপ করুন। দয়া ক'রে ভেতরে চলুন। স্নানটান ক'রে একটু কিছু মুখে দিন।'

বলা বাহুল্য ঐন্দ্রিলা ওদের বাড়ি ঢোকেনি। সেও হাতজোড় ক'রে বলেছে, 'তোমরা যেতে বলেছ এই আমার যথেষ্ট হয়েছে ভাই। কিন্তু জামাইবাড়িতে যাওয়া আমাদের বংশের নিয়ম নয়—সে আমি পারব না। এখানে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো রাতটা কাটিয়ে ভোরেই আমি চলে যাব।'

তবুও ওরা অনুনয় বিনয় করেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলা কিছুতেই রাজী হয়নি। উমেশের সেই বন্ধুটি বলেছিল তার বাড়ি যেতে কিন্তু তাকে মুখের ওপরই বলে দিয়েছে সে, 'আপনার বাড়ি যাব? আপনি বলছেন কোন্ মুখে? আপনার সাহস তো কম নয়! আপনি জেনেশুনে ঐ কসাইদের সঙ্গে ষড় ক'রে আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করেছেন—আপনার ভিটেতে পা দিলেও পাপ হবে আমার। ব্রাহ্মণের নিষ্পাপ কুমারী মেয়ে—সাক্ষাৎ ভগবতী—কুমারী পুজো না করলে মার পুজো হয় না। টাকা খেয়ে সেই কুমারী মেয়ের এই সর্বনাশ করলেন আপনি—এর ফল তোলা রইল, মনে থাকে যেন। মা সর্ব-মঙ্গলা এর বিচার ঠিকই করবেন। আমি যাব, হ্যাঁ যাব বৈকি—যদি কোনদিন শুনি আপনার ভিটে থেকে জোড়া মড়া বেরোচ্ছে সেইদিন আনন্দ করতে আপনার বাড়ি যাব। তার আগে নয়!'

এরপর আর ভদ্রলোকের সাহস হয়নি কিছু বলতে। মুখ কালি করে চলে গেছেন। পালিয়ে গেছেন বলাই উচিত বরং।

পাড়ার অপর একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এসে তখন ওর হাত ধরে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে স্নান করেছে, আহ্নিকও করেছে কিন্তু একটু গুড়ের সরবৎ ছাড়া কিছুই খেতে রাজী হয়নি। তাঁদের বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে অনুরোধ করেছিলেন—একটু কিছু খাবার জন্য। কিন্তু ঐন্দ্রিলা এক কথাতে সমস্ত অনুরোধ এড়িয়ে গেছে, 'খাব তো নিশ্চয়, এত খেয়েও যখন পোড়া পেটের খিদে মেটেনি, তখন খেতে তো হবেই। কিন্তু আজ সত্যিই মুখে রুচবে না মা কিছু। আমার বড়সাধের সন্তান, ওর মুখ চেয়েই সব দুঃখ ভুলেছিলুম এতদিন, সেই মেয়ে আজ ঐ হেঁপোরুগী বুড়োর পাশে শুয়ে ফুলশয্যা করছে—তা জেনে আজ আর এ গলা দিয়ে কিছু নামবে না। এ অনুরোধ করবেন না আপনারা।'

অগত্যা তাঁদের চুপ করে যেতে হয়েছে। সারারাত বসে কেঁদেছে ঐন্দ্রিলা সেদিন—দুটি চোখের পাতা বুজতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যেও। শেষ পর্যন্ত সে ভেবেছিল মেয়েকে জোর ক'রে নিয়ে চলে যাবে কিন্তু যে ভদ্রমহিলা ওকে টেনে এনেছিলেন তাঁদের বাড়ির সকলেই বারণ করলেন এ কাজ করতে। গিন্নী বললেন, 'দ্যাখ্ মা—তুই আমার মেয়ের বয়সী, তুই তোকারি করছি কিছু মনে করিসনি। —যা হয়ে গেছে তা আর কিছুতেই ফিরবে না। এ হিঁদুর বিয়ে, এতে তালাক দেওয়া নেই। তবু যতদিন আছে অদৃষ্টে—সোয়ামীর ঘর করে নিক। টেনে নিয়ে গিয়েই বা কী রাজঐশ্বর্য তুই দিতে পারবি মা ওকে? ...আর তা দিলেও—খেতে পরতে না হয় দিলি—ভাতার তো দিতে পারবি না। তার চেয়ে যা হবার হোক, তুই চলে যা। বরাতে থাকলে ঐ ঘরই দীর্ঘদিন করতে পারবে। এই যে [illegible]মার সইয়ের মেয়ে প্রভা, তার [illegible] [illegible]দিনের মধ্যে জামাইয়ের [illegible] পড়ল—তবু প্রভা আমার দশ ব[illegible] ক'রে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়েই চলে [illegible] ড্যাং ড্যাং ক'রে। আর তা যদি নাই [illegible] বরাত যদি না-ই ক'রে থাকে—মেয়েটা [illegible] থাকলে গোবেচারা ভালমানুষ [illegible] দিকে চাইলে ছেলে-বৌগু[illegible] পড়বে। ভবিষ্যতের কথাটা [illegible] আর যতই হোক, এখনও না [illegible] সোমথ হয়নি, দুমাস পরেই হ[illegible] সোয়ামীর ঘর ঘুচিয়ে কোথায় [illegible] বল? কতক্ষণ পাহারা দিবি? [illegible] তো আর চোখে চোখে রাখতে [illegible] নি। শেষে কি একটা কেলেঙ্কার [illegible] বসবি!...... না, না, ওসব মতলব ছাড়। যেমন একা এসেছিস একাই ফিরে যা।'

মায়ের মতো—ওর নিজের মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ভদ্রমহিলার আন্ত-রিকতাপূর্ণ কথা ঐন্দ্রিলার বড় ভাল লাগল। বুঝলও সে। ওদিকে আর যাবার চেষ্টা না ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রে একাই ফিরল।

ওখান থেকে ফিরে সোজা সে ওদের সম্পর্কে এক নন্দায়ের কাছে গিয়েছিল মাকড়দায়। তিনি কিছুই জানতেন না। শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতে চাননি প্রথমটায়। ঐন্দ্রিলা অনেক ক'রে দিব্যি গেলে বলতে তবে [illegible] হ'ল তাঁর।

সে ভদ্রলোক নাকি এক বড় উকীলের মুহুরী। সেইজন্যেই গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে।

কিন্তু তিনি বিশেষ আশাভরসা দিতে পারেননি। বলেছেন ও ধরনের মামলা দাঁড় করানো শক্ত। টাকা খেয়ে কাকারা এ কাজ করেছে তার প্রমাণ কি? কোন লেখাপড়া তো নেই। হিন্দু বিয়ে নাকচ করাতে গেলে ঢের কাঠখড় পোড়াতে হবে। হাইকোর্টের এ ধারে কিছু হবে না। তাও, নাবালক মেয়ে ফুসলে এনে বিয়ে দিয়েছে অভিভাবককে না জানিয়ে, প্রমাণ করতে প্রাণান্ত হবে। কারণ ঐ কাকাদের কাছে দীর্ঘকাল আছে, মাও ওখানে আসাযাওয়া করে—এটা প্রমাণ হয়ে যাবে সহজেই, সুতরাং ফেসলানোর কেস টিকবে না, তাছাড়া লুকিয়েও দেয়নি। পাঁচটা আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণও করেছে। এ কেস হাইকোর্ট পর্যন্ত ঠেলতে অগাধ পয়সা খরচ হবে, তাও ধোপে টিকবে কিনা সন্দেহ। আর—শেষ মোক্ষম কথা একটি বলেছেন তিনি—যদিই বা মামলা করে এবং জেতে—ঐ দাগী মেয়ে এনে আবার বিয়ে দিতে পারবে ঐন্দ্রিলা?

অর্থাৎ সর্বশেষ যেটুকু আশা মনে টিকিয়ে রেখেছিল—সেটুকুও আর রইল না।

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করতে সময় লাগল যথেষ্ট। এর মধ্যেই হেম এসে গেছে একসময়। আজকাল আর সে বড় একটা গোবিন্দদের বাড়িও যায় না—শনিবার ছাড়া। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। আজ বরং একটু বেশী সকাল ক'রেই ফিরেছে। আগের ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছিল। এসে নিঃশব্দেই ওর পিছনে বসে পড়েছে—অনর্থক কথা বলবার চেষ্টা করেনি। কাহিনীর অর্ধেকেরও বেশী শুনেছে সে। বাকীটা অনুমান ক'রে নিতে আটকায়নি।

সে এবার আস্তে আস্তে—এই প্রথম প্রশ্ন করল, 'তোর শ্বশুরবাড়ি আর গেলিনি?' ঐন্দ্রিলা রাগ করে সেবার চলে যাবার পর এই প্রথম কথা কইল সে ওর সঙ্গে।

ঘাড় নাড়ল ঐন্দ্রিলা। গিয়েছিল সে। কাল সেই ননদাইয়ের বাড়ি কাটিয়ে আজ ভোরেই পেঁৗছেছিল ওখানে। ইচ্ছে ক'রেই সে সময় গিয়েছিল। অফিস বেরোবার একটু আগে—যে সময়টা স্নান আহার করবার কথা হিসেব ক'রে ঠিক সেই সময়টারই পেঁৗচেছিল। কিন্তু সম্ভবত দূর থেকে ওকে আসতে দেখেই ভোলা পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শিবু অতটা বুঝতে পারে নি, সে একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বুকের পাটাও বেশী। সে ঝেড়ে জবাব দিয়ে দিয়েছে। 'আমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলে, আমরা যা ভাল বুঝেছি সেই মতো বে দিয়েছি।' টাকার কথাও সোজাসুজি অস্বীকার করেছে সে। বলেছে, 'মিথ্যে কথা। হয় তুমি বানিয়ে বলছ, নয় তো তোমার পাগলামি কাণ্ডকারখানা দেখে তারাই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে আরও ইচ্ছে ক'রে। অত নগদ টাকা তার হাতে থাকলে আর ভাবনা ছিল না। তাছাড়া কী এমন ফেলনা পাত্তর। অত বিষয়সম্পত্তি যার তার কি মেয়ের অভাব হয়। দুপায়ে জড়ো করতে পারত সে। আর তোমার মেয়েই বা কী এমন রূপসী নূরজাহান যে তার জন্যে পয়সা লুটিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ—ঐ বিষয়সম্পত্তি দেখেই দিয়েছিলুম, সত্যি কথা। সে তোমার মেয়েরই জন্যে। সে-ই সুখে থাকবে বলে। তা সে যে সব ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে বসে আছে—কেমন ক'রে জানব বল। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ও সবই আবার তোমার মেয়ের কাছে এসে যাবে। ও যা তোখড় লোক, ঠিক সব বাগিয়ে নেবে আবার। এখন আড়বগ্গার মতো উলটো বুঝছ তা কী হবে!...তোমার তো পয়সার জোর নেই এক কানাকড়িরও, এ বিয়ে না হ'লে কী বিয়ে দিতে তুমি? একটা ডুলি-কাবারি বিড়িওলা দেখে বিয়ে দিতে হ'ত। মাতাল নেশাখোর এই জুটত শেষ পর্যন্ত। এ তো তবু নামকরা ভদ্দরলোক একটা—সাতখানা গাঁয়ের লোক চেনে। মেয়েও তোমার সুখে থাকবে দেখো। বুড়ো বয়সের বৌ, হাতের তেলোয় রাখবে। বলি আট বছরের মেয়ে দুগ্গা—শখ ক'রে বুড়ো শিবকে বিয়ে করেন নি?'

এইসব অবান্তর কথা বলে গেছে এলোপাতাড়ি। মুখ খোলবার অবকাশই পায়নি ঐন্দ্রিলা। অবশ্য তারপর আর দাঁড়াতে পারেনি বেশিক্ষণ। সে যখন মুখ ছুটিয়েছে, শাপশাপান্ত শুরু করেছে—তখন অফিসের নাম ক'রে বেরিয়ে গেছে—ভাতবাড়া ঘরের মধ্যে দেখেছে সে। কিন্তু ভাত খেয়ে যেতেও সাহসে কুলোয়নি শিবুর।

'আর তোর শাশুড়ি মাগী?' হেম জিজ্ঞাসা করলে।

'সে কি আর বেরোল নাকি? আমাকে দেখেই ঘরে খিল দিয়েছিল—সেই খিল দিয়েই বসে রইল। কাটি কাটি ক'রে যা মুখে এল শোনালুম, গাল দিলুম, মণ্যি দিলুম—সব হজম করলে বসে বসে। শেষে শিবুর বৌটা এসে পায়ের ওপর আছাড় পড়ল, বলে, ও দিদি, চুপ কর দিদি, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি ঘাট মানছি—দিদি। পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করি—ওদের মুখের দিকে চাও একটু। ওরা তো কোন অপ-রাধ করে নি!...ওর কান্না দেখেই চুপ করলুম। আর কীই বা করব, গাল দিলে কি আর মেয়ের বে ফিরবে? তা'ছাড়া, পাড়ার অনেকে ছুটে এসেছিল তো চেঁচা-মেচি শুনে, তারাও থামিয়ে দিলে—মজুমদার গিন্নী জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল নিজের বাড়ি। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হ'ল। বুঝতেই তো পারছি, পয়সা খেয়ে ওরা যেকালে এই কসাইয়ের কাজ করেছে সে কালে গাল-মন্দ খাবার জন্য তৈরী হয়েই আছে। ওতে কিছু হবে না। এখন কিসে একটা বিহিত হয় তোমরা যুক্তি পরামর্শ ক'রে সেইটে বল। পুলিশে যাব একবার? ও'দের নামে এই সব কথা যদি লিখিয়ে দিয়ে আসি? পুলিশ কিছু করবে না?'

অনেক আশা, অনেক আগ্রহ নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে ছোট বোন। তাকে নিরুৎসাহ করতে মন চায় না। তবু ঘাড় নাড়তেই হয় হেমকে।

'নাঃ!......ও তোর নন্দাই যা বলেছে তাই ঠিক। আশা কম—আর লড়তে গেলেও বিস্তর টাকার খেলা। অর্থবল লোকবল দুই-ই চাই। আমাদের ও কোনটাই নেই। পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কোন উপায় দেখি না।'

'কোন উপায় নেই? কী বলছ দাদা?' প্রশ্ন নয়—যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে ঐন্দ্রিলা, 'তা'হলে মেয়েটা ঐ ভাবে জ্যান্ত মরা হয়েই থাকবে চিরকাল? কোন বিহিত হবে না?'

চুপ ক'রে থাকে হেম। কী বলবে, কী বোঝাবে ওকে!

প্রাণপণে কটি মুহূর্ত হতাশাকে ঠেকিয়ে রেখে শেষ বিন্দু আশা আঁকড়ে ধরে থাকে ঐন্দ্রিলা উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু দাদার নিরুত্তর স্তব্ধতায় সে আশা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে যায়।

আর একবার হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আর একবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এদের ওপর দোষারোপ করে, ওদের গালাগালি ও অভিসম্পাৎ দিতে থাকে। মেয়ের বৈধব্য কামনা করে। এ বিবাহিত জীবনের চেয়েও সে ভাল। না হয় মা-মেয়ে একসঙ্গেই একাদশী করবে। সে ঢের ঢের ভাল। তারপর এক সময় আবার দৈহিক শ্রান্তিতেই চুপ করে।

শ্রান্তির মতো সান্ত্বনা আর নেই তা বুঝে এরাও চুপ ক'রে থাকে। ওর মিথ্যা অভিযোগেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করে না কেউ।

(ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক ফরাসী চলচ্চিত্র

দিলীপ মালাকার

প্যারিস। সিনেমার জয়জয়কার জগৎ জুড়ে। কারণ জনসাধারণ মাত্রেই সিনেমা দেখে থাকেন। আজকের দিনে সিনেমা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অঙ্গ। আগে যাঁরা যাত্রা দেখতেন নিয়মিত, তারপর ভদ্রলোকেরা দেখতেন থিয়েটার। এখন ছোট-বড় সবাই দেখেন সিনেমা। তাই সিনেমা আজ সার্বজনীন। যেমন সংবাদ-পত্র। সংবাদপত্র মারফৎ যেমন ভাল-মন্দ কথা বলা যায়, সমালোচনা করা যায়, তেমনি সিনেমা মারফৎ ভাল-মন্দ কথা প্রচার করা ছাড়াও আজকের সমাজের প্রত্যক্ষ সমালোচনা করা চলে, দেখান চলে অসাধারণ জীবনযাত্রার দৃশ্য, অতি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ। এখানেই সিনেমার বৈশিষ্ট্য। সব মিলে সিনেমা আজ এমন অংশ গ্রহণ করেছে, যাকে প্রত্যাখান করা মোটেই চলে না।

সিনেমা শুধু আর্ট নয়। টেকনোলজি তো বটেই আবার ইনডাসট্রিও। অর্থাৎ সিনেমায় সমন্বয় ঘটেছে শিল্প-বিজ্ঞান ও ব্যবসার। এই তিন মিলে আজকের ফরাসী সিনেমা।

ফরাসীদের আর্ট ও সাহিত্য চর্চায় বিশ্বজোড়া নাম। তারই ছাপ পাওয়া যাবে সম্প্রতিকালের ফরাসী সিনেমা-শিল্পে। ফরাসীরা যেমন আর্ট ও সাহিত্যে নতুন পথপ্রদর্শক, তেমনি সিনেমায়। ফরাসী সিনেমা শিল্পের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'নুভেল ভাগ' বা নবতরঙ্গ। এই নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে ফরাসী সিনেমা-শিল্পে ১৯৫৫ সালের পর থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত ফরাসীরা সিনেমা শিল্পে একটা বিরাট কিছু দেখাতে পারেনি। ওই সময় চলছিল ইতালিয়ান ও জার্মানদের দিগ্‌বিজয়।

১৯৫৫ সালের পর থেকে ফরাসীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সিনেমা উৎসবে একটার পর একটা পুরস্কার লাভ করে চলেছে।

নতুন একদল তরুণ পরিচালক ফরাসী সিনেমা-শিল্পে এনেছে নতুনের স্বাদ। এদের সাথে এসেছে নতুন-নতুন সিনেমা-শিল্পী, চিত্র-তারকা। এমনকি অনেক অজানা অজ্ঞাতকুলশীলদের ওরা

প্রখ্যাত চিত্রতারকা আন্না কারিনা

যাদুবিদ্যাবলে কিনা জানি না বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে। অধিকাংশ ফিল্ম-পরিচালক গ্রহণ করেছে অজ্ঞাত বা নতুন চিন্তাশীল ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের কাহিনী। এরা এনেছে যেমন ফটোগ্রাফিতে নতুনত্ব তেমনি শব্দধারণে। সবকিছুতেই যেন তারুণ্যের ভাব। এদের আজ বলা হয় 'নুভেল ভাগ্'। ফরাসী 'নুভেল ভাগ্' দলের জয়যাত্রা চলেছে ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে।

'নুভেল ভাগ' সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মঁঃ আল্যাঁ রব্-গ্রিয়ে ইউ[illegible]ময় পরিচিত। আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে শুধু পরিচালক নন তিনি ঔপন্যাসিক। এককালে সাংবাদিক লেখকরূপে ছিলেন পরিচিত। আল্যাঁ রব্-গ্রিয়ের 'লানে দারনিয়ের আ মারিয়েনবাদ' ছবিটি গত বছর দুই-তিন দেশের ফিল্ম ফেস্‌টিভ্যালের প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটি 'নুভেল ভাগ' দলের স্মারক ছবি। ছবিটির আখ্যানবস্তু রহস্যময়। পাঠকের কাছে তাই মনে হবে। নায়ক প্রতি বছর গ্রীষ্মে মারিয়েনবাদে ছুটী কাটাতে যায়। একবার তার সাথে একটি মহিলার আলাপ হল। নায়কের মনে হল সে তাকে এর আগে সেখানেই দেখেছে। কিন্তু আসলে সবটাই যেন হেঁয়ালি। মনে হবে মেয়েটির আত্মা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুজনের প্রেমালাপ শোনা যাবে। কিন্তু সবই মানসিক। দৈহিক নয়। কারণ সেটি আত্মা বা হেঁয়ালি। এমনি এক কাব্যিক পরিবেশে পরিচালক ছবিটিকে খাড়া করেছেন। ছবিটা দেখে মনে হবে প্রতিটি কথা স[illegible] কিন্তু বস্তুজগতের সাথে তার ধরা-ছোঁয়া নেই। এমন ধরণের আরেকটি ছবি তুলেছেন ঔপন্যাসিক-পরিচালক আল্যাঁ রব্-গ্রিয়ে তুর্কিতে। ছবিটির নাম

হাস্যকৌতুকের অভিনেতা ফ্রান্সিস ব্লাঁশ ও দারি কাউলকে 'লাবোমিনাবল ওম দে দয়ান' ছবিতে দেখা যাবে।

'ইমমরতেল'। কিছুদিন আগে আল্যা রব-গ্রিয়ের সাথে প্যারিসের এক কাফেতে আলাপ হল। আল্যা রব-গ্রিয়েকে কেন্দ্র করে আজকাল রেডিও-টেলিভিশনে বহু আলোচনা হচ্ছে। কথায় কথায় মঃ রব-গ্রিয়ে বললেন যে, "আমি সাহিত্যের নীতিনির্ধারক নই। অনেক লেখক একটা দুটো বই লিখেই বাজারে থিওরি চালু করে। আমি তিনটে উপন্যাস লিখে এখনও থিওরি বাংলাতে পারলাম না। পত্রিকাসম্পাদকদের আমন্ত্রণে ছোটখাট উপন্যাস লিখি। তার থেকে দেখি পাঠকদের প্রতিক্রিয়া। আগে আগে লিখতাম নামজাদা পত্র-পত্রিকায় মানবতা-বাদ সম্পর্কে প্রচুর প্রবন্ধ। সেগুলোকে দার্শনিক প্রবন্ধ বলা চলতে পারে। কিন্তু সে সবের খবর কেউ রাখত না। কদর করা দূরের কথা। তাই বাধ্য হয়ে সে পথ ছাড়তে বাধ্য হলাম। উপন্যাস মারফৎ তাই সেসব চালাচ্ছি। চেষ্টা করছি আমার উপন্যাস বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে কিন্তু কৃতকার্য হয়েছি কি?"

'নুভেল ভাগ' দলের একটা ছবি কয়েক সপ্তাহ হল বেশ প্রশংসালাভ করেছে প্যারিসে। ছবিটির পরিচালক মঃ রোজে ভাদিম যেমন নুভেল ভাগ দলের অন্যতম পরিচালক, তেমনি নায়ক রবার হোসেন ও নায়িকা ব্রিজিদ বার্দো। আজকাল কুমারী ব্রিজিদ বার্দোর নামেই ছবি কাটে। বার্দোর ছবির ব্যবসায়িক মূল্য লাখ লাখ টাকা। হয়তো কোটী টাকার। ব্রিজিদ বার্দো এতই জনপ্রিয়। ইনি শুধু ফ্রান্সে নয় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। এর ছবি দেখতে সিনেমা হলের সামনে লম্বা 'কিউ'। এরই অভিনিত নতুন ছবির নাম হল "ল্য রেপো দ্য গেরিয়ের (যোদ্ধার বিশ্রাম)"। ছবিটি রঙ্গীন। ছবির আখ্যানবস্তু একটা মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ। ছবিটিতে নায়ক মঃ রবার হোসেন ও নায়িকা মাদমোয়াজেল বার্দো অভিনয় করেছেন অপূর্ব। আখ্যানবস্তুটি হল এই : নায়ক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেমিক সন্ত্রাস-

সর্বজনপ্রিয় ফারনানদেল

বাদীর কাজ করছে। এখন সে শিল্পি। সংসারে তার কেউ নেই। জীবনে তার বিতৃষ্ণা আসায় সে একদিন এক হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করতে গিয়েও বেঁচে গেল। বাঁচাল তাকে নায়িকা হঠাৎ। তার সাথে কোনোদিন ছিল না পরিচয়। নায়ক ভবঘুরে। নায়িকা বড়ঘরের মেয়ে। কিন্তু তার হঠাৎ মায়া হল, সেইথেকে প্রণয়। কিন্তু নায়ক ভবঘুরে, কোথাও বেশীদিন থাকতে তার ভাল লাগে না। তার শিল্পি বন্ধুরা নায়িকাকে সবকথা বোঝালে। শেষে একদিন তারা চলল ইতালির ভেনিশ নগরীতে বেড়াতে। সেখানে ঘটল অঘটন। নায়ক বাউণ্ডুলে বিপথে পা বাড়িয়েছে। শেষে সে ভুল বুঝতে পেরে এসে নায়িকার কাছে ক্ষমা চায়। ছবিটির সারমর্ম হল এই যে, যারা আজীবন সংগ্রাম করে চলে তাদেরও এমন একটি সময় আসে যখন তারা চায় বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রাম হল কোনো নারীর ভালবাসা। ভালবাসা থেকে বিবাহবন্ধন।

দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়-বস্তু নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ছবি তোলাই হল 'নুভেল ভাগ' গোষ্ঠীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এদেরই এক পরিচালিকা শ্রীমতি আগ্নেস ভার্দার ছবি 'ক্লেও, ৫ থেকে ৭' দর্শকের মনে দাগ কেটেছে। ছবির বিষয়বস্তু বা দৃশ্যাগুলো অসাধারণ নয়। ছবির নায়িকা সিনেমা আর গান গেয়ে প্রচুর পয়সা করেছে। কিন্তু সে অসুখি। ভেতরে ভেতরে সে ভুগছিল ক্যান্সার রোগে। পয়সাই সব নয়। পয়সা আনে না সুখ। তার এক বান্ধবী মডেলের কাজ করে অতি অল্প রোজগার করে

'সাতাম কাদুই ল্য বাল' চিত্রের নায়িকা ক্যাথরিন দানভ

কিন্তু সে সুখি। একদিন প্যারিসের এক পার্কে এক সৈনিকের সাথে হঠাৎ আলাপ হল। সৈনিকটি চলেছে ছুটি শেষ করে কাজে যোগ দিতে। অতি সাধারণ মানুষ সে। তার মধ্যে খুঁজে পেল ক্লেও খনিকের সুখ ও শান্তি। এমনি ধরনের ছবি এবং তার সাধারণ দৃশ্যবস্তু হ'ল 'নুভেল ভাগের' অবদান। 'নুভেল ভাগ' দলের নেতা ও শিল্পিদের নাম দিচ্ছি। এদের অধিকাংশ পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা নাম করেছেন তাঁরা হলেন: আলেকজান্দর আস্ত্রুক, জাক বারাতিয়ের, ফিলিপ দ্য ব্রোকা, মার্সেল কামু, ক্লদ শাব্রল, মিশেল ক্লেম' ফ্রেডারিক রসিফ, জাক্ দোনিওল ভালক্রোজ, মিশেল দ্রাশ, জর্জ ফ্রাঞ্জ, মিশেল গাস্ত, জঁ লুক্ গোদার, লুই মাল্, অবি, ফ্রান্সোয়া, মুখি, জেরার উরি, ফ্রাঁসোয়া রিশেন বাখ, আল্যাঁ রনে, জঁ রুশ্, ফ্রাঁসোয়া রুকো, রজে ভাদিম, আগনেজ ভার্দা। অভিনেতাদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। দু একজন তারচেয়ে বেশী। তাদের নামগুলো দিচ্ছি: পাস্কাল অদ্রে, শার্ল আজনাভুর, জঁ পল বেলমন্দো, জেরার ব্লাঁ, ব্রাজার, ব্রিয়ালি, ফ্রাঁসোয়াজ বির, জঁ ক্লদের ব্রুশোল, জাক্ শারিয়ের, আনোভিয়েভ ক্লুনি, আল্যাঁ দলঁ, শার্ম ফ্রে, রবার ওশেন, লাফোঁ, ব্রিজিদ বার্দো, জুলিয়েৎ মোলি, পাস্কাল বোতি, এমানুয়েলা রিভা, দানি সাভাল, জঁ'র তারজিয়ের, মারিনা ভ্লাদি, দানি কারেল।

বিখ্যাত পরিচালক রাঁনে ক্লেয়ার ও জঁ রনোয়া এখনো মাঝে মাঝে দু একটা

'ল্য রূপো দ্য লেপিয়ের' চিত্রের নায়ক-নায়িকা ব্রিজিদ বার্দো এবং রবার ওসেন

ছবি তোলেন। তবে এরা এখন ক্লাসিক হয়েছেন। অভিনেতাদের মধ্যে বয়সে বুড়িয়ে গেলেও এখনও জনপ্রিয় এবং নতুনত্বের নিদর্শন প্রায়ই দিচ্ছেন কয়েকজন। তাদের মধ্যে হলেন সর্বপ্রথম ফারনানদেল, জঁ গাবাঁ, পেরিয়ের, ফ্রান্সিস ব্লাশ, দারিকাউল এবং মহিলাদের মধ্যে জান্ মরো, মিশেল মরগ ইত্যাদি।

বিগত এক বছরে যে সব ছবি শুধু ফ্রান্সে নয় বাইরে সুনাম করেছে তাদের নামগুলো দিচ্ছি: শাবরোল এর 'ওফেলিয়া', জঁ রনোয়ার 'ল্য কাপোরাল এপেংলে', পার্ভালিয়ের 'ল্য বাত্তো সেমিন', শাবরোল এর 'লে দেজুবোশে কাশিদ্রো', উরির 'লা ব্রিমনপেরিকা', লুইমাল এর 'ভি প্রিভে', শাবরোল এর 'লা দু মালা', আবসিসির 'হোরাস ৬২', আস্ত্রুকের 'লোমুক্রেশিয় সক্রিয়কারী', রুকোর 'আমুর আজ্জাত্তি', দানিওল ভালক্রোজের 'লা দেনোর্সিয়াসিয়ন', দ্য ব্রোকার 'ল্য ফি দালা বশোক', রিভ্ কিয়ারশিলার 'ফিরাদেক্স', মার্সেল কামুর 'লোয়াজ দা পারাদি', শব্রোল্লের 'লে শারিজিয়ান', অ'রি ভারনইল-এর 'এঁা মাঁজ অঁনিহ্বার', দবার 'এ শান্তের কমনুই দা বাল', গ্রানজিয়ের 'লা জেন্টেলম্যান জেবথম' বাউল রোভিয়র 'মার্কোপোলো', বারাতিয়ের 'লা পুসে', লাপ্রার 'তারতারান দা তারাসাক', ফ্রাঞ্জুর 'থেরেস দে কুয়ের', কারাদের 'লা ভেনেদক্ত' ইত্যাদি।

বছর কয়েক আগে ফরাসী সিনেমা-শিল্পে এসেছিল ভাঁটা। তার অবসাদের পথ দুর করে দেখালো 'নুভেল ভাগ' দল। তবে এখন চলছে সিনেমা বাজারের মন্দা। শুধু ফ্রান্সে না সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। আজ অনেক ছবি ফরাসী-ইতালি-জার্মানিরা একত্র হয়ে তুলছে। সেই ছবি পরে তিন ভাষায় ডাবিং করে তিন দেশে বিক্রি হচ্ছে। হয়ত আরেকটি নতুন দল এসে ফরাসী সিনেমাকে তুলে ধরবে ভবিষ্যতে। নইলে বাজারের যা অবস্থা তাতে অনেকের অপমৃত্যু ঘটতে বাধ্য।

প্রার্থনার আকাশ

দিলীপ মিত্র

সারারাত ভালমত ঘুমোতে পারেনি নীলকান্ত মজুমদার।

বারবার বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। অন্ধকার ঘরটা কাঠকয়লার রূপ নিয়ে বোবা হয়ে রয়েছে।

ছোট্ট নাতিটা পাশে ঘুমোচ্ছে। হাত দিয়ে ওর অস্তিত্বকে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। 'মা' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ রাখলেন জানালার দিকে। মজুমদারকে যেন কেউ অন্ধকার সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আলো নেই। শুধু বাতাসের ফিসফিস শব্দ কানে এসে বাজছে একটা আতঙ্কের মত।

সবাই দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কারো যেন কোন দুশ্চিন্তা নেই। বিরক্ত হলেন মজুমদার।

আশ্চর্য!

প্লেনের শব্দ। কান খাড়া করলেন। এ'কদিন ধরে প্লেনগুলো খুব যাওয়া-আসা করছে। কান-কাঁপানো শব্দ। বোধহয় জেট-প্লেন।

লোহার শিকটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তাকিয়ে রইলেন মজুমদার। অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্তেরা যেন বিকট চিৎকার করে হানাহানি করছে।

ছোট নাতিকে আরো বুকের কাছে টেনে নিলেন। ও [illegible] জেগে উঠেছিল।

বলল, দাদু উড়োজাহাজ! বোমা ফেলবে? মা-মণি তাহলে মরে যাবে, না?

দূর বোকা! কেউ মরবে না। তোমার মা-মণি না। তুমি না। আমরা কেউ না। ওতো আমাদের দেশের জাহাজ! পাহারা দিচ্ছে। ভয় কী?

চুপ করে গেল টুকুন। আট বছরের শিশুর মধ্যেও আতঙ্ক জেগে উঠেছে। বুড়ো-দাদাকে পরম নির্ভয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে ছেলেটা।

বাড়ির সবাই আলোচনা করছিল যুদ্ধের খবর নিয়ে। নিজেও লাঠিতে ভর করে এগিয়ে গেছেন পাশের বাড়ির রেডিও শুনতে। এর আগে কোনদিন খবর শোনবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না মজুমদারের। সংসারে কতরকমের ঝামেলা! বড়মেয়ের এখনও বিয়ে দিতে পারেননি। ছোটছেলেটা দণ্ডকারণ্যে চাকরি করছে লেখাপড়া বন্ধ রেখে। আগে তো বাঁচতে হবে। বড়ছেলে নরেন মিলিটারীতে চাকরি নিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ওর এই সখ। সংসারের আঘাতে রিটায়ার্ড দারোগা নীলকান্ত মজুমদার আজ কর্মবিরত। বুড়ো বয়সে এত কষ্ট হবে কে জানত? মাথা গুঁজবার ভালমত আশ্রয়ও নেই। আজ চোখ বুজলে কাল যে এরা কোথায় যাবে, সেকথা ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পায়ের তলায় মাটি নেই যেন। দোষ যে কার? কে যে এরজন্য অপরাধী সেটাও ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন না। হয়ত দোষটা সবই তাঁর নয়।

বুড়ো বয়সেও চাকরি করতে চেয়েছিলেন মজুমদার। দশ-বারোজন খাইয়ে। দু'তিনটে মেয়ে দেখতে দেখতে যেন তাল গাছের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। লজ্জা হয় ওদের দেখলে এখন। সুধাময়ী বলেছে, তিরিশটা টাকা সংসারে এলেই বা কম কি? মজুমদার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাননি। যুবকরা যেখানে চাকরি পেতে হিমসিম খাচ্ছে। সেখানে বুড়োদের কে ডাকবে? তারপর একদিন হঠাৎ পাখি-ওড়া, আলোভরা আকাশটা কেমন যেন দূরের হয়ে যেতে লাগল। মাঠে শুয়ে-থাকা বাছুরটাকে আদর করছিল ওর মা। ওদের যেন কেউ ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে!

চিৎকার করে ডাকলেন, খোকার মা তুমি কোথায়?

সবাই ছুটে এলো কাছে কিন্তু সবাই রয়ে গেল দূরে! কোন একটা জানালাতে ওরা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পর্শ করে অনুভব করতে পারছেন তাদের পৃথক সত্তাকে। কিন্তু চোখের আলোয় চোখের ছায়া আর তো নজর হলে কোথা ছিল না!

সুধাময়ী চিৎকার করে উঠেছিল কান্নায়। বড় ছেলে নরেন ছুটে গিয়েছিল রিকশা ডেকে আনতে।

ছেলেমেয়েদের সে কী কান্না!

রিকশা করে নরেনের পাশে বসে এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে গিয়েছিলেন শহরে। মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছিল রিকশাটা।

কষ্ট হলে বলবেন। চোখে লাগছে খুব? স্নেহের সুর বড় ছেলের। এই রিকশাওয়ালা, একটু আস্তে আস্তে চলো। রাস্তাঘাট যে কবে ভাল হবে! দুনিয়া চোরে ভরে গেছে!

ভাল লেগেছিল মজুমদারের ছেলের কথাবার্তা। এককালে প্রচুর ঘুষ খেয়েছেন। কিন্তু কোথায় গেল সেই টাকা? পাপের ধন বোধহয় প্রায়শ্চিত্তেই যায়!

রোদে খুব কষ্ট হচ্ছে? ছেলের গলার স্বরে যেন চমক ভাঙল!

ভাববেন না, ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় পাবার কিছু নেই!

কিন্তু মজুমদার তো জানেন, ভয় পাবার কারণই রয়েছে! ডাক্তার না জানি কি প্রেসক্রপসন করবে? সে কত টাকার ধাক্কা কে জানে! বাক্স থেকে কুড়িয়ে-সুরিয়ে দশটা টাকা জোগাড় করা গেছে। মাসের শেষ। সবারই তো এক অবস্থা। ধার দেবে কে?
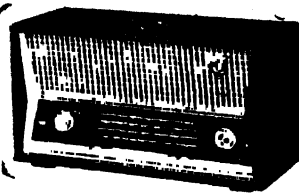
ফিরে যখন এলেন পৃথিবীর চির-সবুজ মূর্তিটায় কেউ যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। পুকুরপাড়ের লাল রঙের শিমুল ফুলের গাছটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী তখন শ্লেটের রঙ নিয়েছে।

রিকশা থেকে ধীরে ধীরে নেমে বিছানায় শুয়ে রইলেন। সামনের জানালাটা দিলেন বন্ধ করে।

পাশের বাড়ির রেডিওর সামনে বসে সবাই। কে যেন কথা বলছিল। সবাই ধমকে দিল ওকে। যেন একটা বিরাট ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই শোনার ওপরে।

ছোট্ট রেডিওর পাশে বিরাট বিরাট সংসারগুলো আজ ভিড় করেছে। দু'এক-জন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। টুকরো টুকরো কথা। এতদিন সব ঘুমিয়ে ছিল! সর্বাঙ্গে সবাই যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করছেন।

তীব্র উত্তেজনায় সমস্ত ঘরটা যেন কাঁপছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়া-শুনা ফেলে এসে যুদ্ধের খবর শুনছে। ওদের মধ্যেও দুশ্চিন্তা ঢুকেছে। কী আছে শেষ পর্যন্ত কে জানে? একটু দূরে বসে আছে পাড়ার দু'একজন মেয়ে-বউ।

...আমাদের জওয়ানরা শত্রুর সঙ্গে নতুন করে মোকাবিলা করবার জন্য খানিকটা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছেন। মরণপণ সংগ্রামের পরে আমাদের জওয়ানরা আরও একটি ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। রণাঙ্গণ থেকে এ পর্যন্ত......। মাপ করবেন, একটু ভুল হয়ে গেছে।......

প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন মজুমদার!

পাশে বসে থাকা সত্য-মাস্টার বকলেন মজুমদারকে। তোমার গলাই শুনব না রেডিওর গলা শুনব? চুপ করে শুনতে দাওতো!

ইস্! কত সৈন্য যে আমাদের গেছে কে জানে? সহানুভূতিতে গলার স্বর কাঁপছে দেবেনবাবুর স্ত্রীর। আমরা এই ঠাণ্ডাতেই কাঁপছি আর আমাদের সৈন্যরা ওই পাহাড়ে ঠাণ্ডায় কিভাবে যুদ্ধ করছে ভাবুন দেখি দিদি!

একটু চুপ করুন না মাসীমা। শুনতে দিন। ব্যাঙ্কের কেরাণী হেমন্তবাবুর ছেলে অমলের গলার স্বর। ......প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আমাদের জওয়ানরা ওয়ালং ত্যাগ করেছেন......।

ঘোষকের বেদনার্ত স্বর। একটা অব-রুদ্ধ কান্না যেন সারা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখে কোন কথা নেই। সবারই চোখের সামনে পাহাড়ঘেরা ওয়ালং এখন অন্য একটা কল্পিত জগতের রূপ নিয়েছে। মাথা হেঁট করে বসে রয়েছে সবাই।

ওবাড়ি থেকে মজুমদার চলে এলেন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। সামনের মিউ মিউ করা বেড়ালটাকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে আঘাত করলেন।

কি শুনলে? সুধাময়ী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে আনাজ-কাটা বঁটিটা।

কি আবার শুনব? একটার পর একটা ফল্ করছে। আমাদের সীমান্তের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ওরা ঢুকে পড়েছে।

তা আমাদের সৈন্যরা কি করছে? সুধাময়ীর অবাককরা কন্ঠস্বর। তখনই বুঝেছি যে ভাবে ঘন ঘন এরোপ্লেন দৌড়চ্ছে! কখন যে টুক করে বোমা ফেলে চলে যাবে কে জানে!

তুমি চুপ করতো মা। যা জানো না তা নিয়ে কথা বলোনা। এখানে এসে বোমা ফেলবে! এতই সোজা? ওতো আমাদের প্লেন। ক্লাশ এইটে-পড়া শ্যামল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তা, ওই আমাদের প্লেনগুলো গিয়ে পারে না ওব্যাটাদের শেষ করে দিতে?

সুধাময়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো। ছোট্ট লণ্ঠনের আলোয় কালি পড়েছে। ফিসফিস সুরে যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছে। এখন যেন ওদের ধমক দিতে পারছেন না মজুমদার। কি-ই বা বয়স ওদের! এই যুদ্ধের আতঙ্কের মধ্যেই ওদের জীবন বড় হয়ে উঠছে। পড়াশুনা হয়ত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কোথায় যাবে কোথায় থাকবে সব তার কি কিছু ঠিক আছে?

দাদু, আমাকে যে রেডিও শুনতে নিয়ে গেলে না। আমি বাবার খবর শুনব না?

নরেনের ছেলে টুকুন অভিমানভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শুনবেই তো! আদর করে বুকে তুলে নিলেন। চুমু খেলেন। আমার প্রাণটা।

স্নেহের সুরে ডাকলেন ক্ষমা, ক্ষমা!

ছেলের বৌ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিষাদমাখানো চোখের দৃষ্টি। কথা নেই।

সকালের ওষুধটা নিয়মমত খাচ্ছো তো?

হ্যাঁ। মৃদু গলায় স্বর ক্ষমার।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মজুমদার। কিছু যেন বলতে হবে ক্ষমাকে। অথচ গুছিয়ে বলতে পারছেন না।

এত চুপচাপ থাক কেন আজকাল। রেবা, রীনা ওদের সঙ্গে একটু বেড়াতে

যাবে। মনটাও ভাল থাকবে। অত মন খারাপ করে থাকলে কি চলে মা?

অন্ধকার চোখ দুটো তুলে ধরলেন সজল হয়ে আসা আলোভরা দুটো চোখের পানে।

আর তাছাড়া এসময় তোমার সাবধানে থাকা উচিত। মনকে আনন্দে রাখবে।

সুধাময়ী কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলের-বৌকে উপদেশ দিচ্ছে।

—যাও, তোমার বাবাকে দুধ এনে দাও।

ক্ষমা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই।

—কোথায় নাকি বহু সৈন্য মারা গেছে শয়তানদের হাতে। পাড়ার সমীর বলছিল। ভেজা-ভেজা গলার স্বর সুধাময়ীর। বহু বাঙালী সৈন্যও নাকি—

চুপ করতো। যতসব গুজবের কথা। সমীর বুঝি রয়টার?

কোনরকমে নিজেকে একটু সামলে নিলেন মজুমদার। মা'র পক্ষে ভয় পাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। সুধাময়ীর চোখের কোল উনি দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু অনুভব করতে পারছেন। আর ছেলে কি সুধাময়ীর একারই! তার কি কিছুই নেই? তবু সংযত রাখতে হয় নিজেকে। উপায় কী?

শান্ত-স্নেহের সুরে মজুমদার বললেন, শুধু আমাদের ছেলেই তো নেই। আরও কত লোকের ছেলে গেছে। যাচ্ছে। যাবেও। অত ভাবনা করলে কি চলে?

ঘরের মধ্যের লন্ঠনের আলোটা চোখে এসে পড়েছে। তার স্পর্শ অনুভব করতে পারছেন মজুমদার।

ডাকলেন, শুনছো?

সুধাময়ী কথা বলে না। সবকিছু বুঝতে পারছেন মজুমদার। নিজের বুকের ভেতরটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন কুচি-কুচি করে কাটছে। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে চোখের অন্ধকার পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে সুধাময়ীর চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দেন।

চিৎকার করে উঠলেন মজুমদার। আবার আরম্ভ করেছো? আমাকে কি পাগল করবে নাকি? একবার বউটার কথা ভাবো তো! এরকম করতে দেখলে ওর কি রকম লাগে?

দাদু-দাদু-কাগজ এসেছে। বাবার ছবি বেরিয়েছে।

ছুটতে ছুটতে এসেছে টুকুন। হাতে খবরের কাগজটা। ও জানে, রোজই ওর বাবার কথা, খবরের কাগজে লেখা থাকে। সৈন্যদের ছবি দেখলে বলে এইতো বাবার ফটো। টুপি পরা। ঘরে নরেনের মিলিটারী ড্রেসপরা ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে এক-সময়।

জানো ছোটকাবু, বাবার ছবি বেরিয়েছে। এই দেখ। কচি আঙুলটা তুলে ধরে খবরের কাগজের ফটোটার ওপরে। বারো বছরের পিন্টুকে সাক্ষী মানে। কে ওকে বলেছে, ওর বাবার ছবি বের হয় না।

মা-মা। মা'র আঁচল ধরে টেনে এনে বসায় টুকুন। তুমি পড়ো, দাদু শুনবে।

মাদুরের ওপর নাতিকে কোলে নিয়ে বসেন মজুমদার। খবরের কাগজটা রোজ ক্ষমাকেই পড়তে হয়। জোরে জোরে পড়ে ক্ষমা।

...আমাদের জওয়ানরা এবার প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে। দু'তিন জায়গায় শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

ভেরী গুড্—ভেরী গুড। হাতের শক্ত মুঠিটা সজোরে মেঝেতে ঠেকাতে থাকেন মজুমদার।

বুঝলে মা, ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্স দুর্ধর্ষ। ওয়ার্লডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খুব বড় বড় করে খবরটা ছেপেছে তো? দেখবে, এবার যুদ্ধের মোড় ফিরে যাবে। প্রথমটায় হঠাৎ আক্রমণে বেসামাল হওয়া স্বাভাবিক। কেন, মনে নেই লাস্ট গ্রেট ওয়ারের কথা? হিটলার তো মস্কোর দুয়ারে এসে পড়েছিল। তারপর? তারপর কি হল? বল?

জয়ের সংবাদটা যেন ক্ষমার মুখ থেকেই শুনতে চান মজুমদার।

নাৎসী-বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। ক্ষমা চোখ রাখল শ্বশুরের দিকে।

তবে? আরে বাবা, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। বিদেশীরা পর্যন্ত আমাদের সৈন্যদের প্রশংসা করেছে। গর্বে বুকটা যেন ভরে উঠেছে মজুমদারের। চোখের সামনে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রটা দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসিমুখে। শত্রুর দেহ পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। বহু শত্রু পালিয়ে গেছে।

আরে শুনছো, এদিকে এসে শোনো। শিগগীর এসো।

ক্ষমা, আরেকবার পড়ো তো মা? আবার পড়ল ক্ষমা।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে ক্ষমাকে জিগগেস করলেন, আমার নরেনের নাম দিয়েছে না?

ছেলে-মেয়েরা হেসে উঠল। মা যে কি বলে! কত সৈন্য রয়েছে। খবরের কাগজে দাদার নাম শুধু দেয় কি করে?

ধমক দিয়ে ওদের হাসিকে থামিয়ে দিলেন মজুমদার।

আজ কত আনন্দের দিন! ওরা কি করে বুঝবে সেসব? নরেনও তো সেখানে রয়েছে। কানের মধ্যে বারবার বেজে উঠছে ক্ষমার গলার স্বর। এক বিরাট শত্রুবাহিনীকে আমাদের জওয়ানরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই জওয়ানদের মধ্যে তাদের নরেনও হয়ত রয়েছে।

উঠি রান্না রয়েছে। সুধাময়ী উঠে চলে যাচ্ছিল।

সব কিছু ভুলে হুতড়ে হাতড়ে বউ-এর হাতটা টেনে ধরলেন মজুমদার। দুটো হাতের মাঝখানে ছেলের বউ-এর

খবরের কাগজ ধরা হাতটার স্পর্শ লাগল!

তুমি শোন। আরও অনেক খবর আছে।

—কিন্তু পরে যে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাব না। কত বেলা হয়েছে।

মা তুমি বোস। আমি গিয়ে ডাল চাপিয়ে দিয়ে আসছি। আমি পারব।

ছুটে চলে যায় রেবা। আজকের জন্য মা'কে ওরা রান্নাঘর থেকে রেহাই দিতে চায়। অবাক হয়ে ভাবছিলেন মজুমদার। কৈ, আগে তো ওরা কখনও এমন ছিল না। সুধাময়ী চিৎকার করেও কাজে লাগাতে পারত না ওদের। কতদিন বলেছে, মেয়েদের যে সব বিবি তৈরী করছ, পার করবে কি করে? কোন নশ-পঞ্চাশ টাকা জমিয়েছ? পরের ঘরে এ'দের খেটে খেতে হবে না!

বেশী হলুদ দিস না কিন্তু—সুধাময়ী রেবাকে বললেন।

তুমি চুপ করে শোন ত। আমাকে কিছু শিখিয়ে দিবে হবে না।

ক্ষমা পড়ছিল।

'...শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও ল্যান্স নায়ক বনবাহাদুর থাপা কয়েকজন আহত সৈনিককে নিরাপদ জায়গায় পেশছে দেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে জীবনপণ সংগ্রাম করে কয়েকজন শত্রুকে হত্যা করে, নিজে পরিখার মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দেন।......'

রক্তগর্ভা মার সন্তান। সুধাময়ী চোখের জল মুছছিল।

মজুমদার ভাবছিলেন, নরেনের নাম যদি একদিন এইভাবে সবার মুখে মুখে ফেরে। তার ছেলেও তো থাপার মত মরতে পারে!

চোখের কোণটা আনন্দে-বেদনায় চিক-চিক করে ওঠে। অনুভব করলেন সামনেই ক্ষমা বসে। সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে শাঁখা। কি সুন্দর দেখতে মজুমদারের ছেলের বউ। লক্ষ্মীশ্রী সর্বাঙ্গ জুড়ে। আজ না হয় দেখতে পান না মজুমদার। কিন্তু বিয়ের সময় তো সব দেখতে পেতেন। কত ভাব স্বামী-স্ত্রীতে। এক-দিনের জন্য রাগারাগি দেখেননি ছেলে-বউ-এর। কত ভালবাসে নরেন ক্ষমাকে। চিঠির পর চিঠি দেয় দূরে গেলে। এখন কিছুদিন চিঠি বন্ধ।

ক্ষমা-ক্ষমা। সোহাগ ঝরা গলায় ডাকলেন মজুমদার।

বাবা, গলার স্বরটা যেন একটু উদাস ক্ষমার।

কি ভাবছ তুমি মা? কোন ভয় নেই? তাহলে একটা গল্প বলি শোন। তখন ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ—আমি। এক পলিটিকাল লীডারকে ধরতে গেছি। পাঁচটা মার্ডার কেস তার বিরুদ্ধে। ধরতে পারলে নির্ঘাত ফাঁসি।

ভোরবেলা যখন এ্যারেস্ট করি বউ এসে চাদরটা দিয়ে গেল। শীতের দিন ছিল। বললে, ঠাণ্ডা লাগবে এটা নিয়ে যাও। চোখে-মুখে যেন আগুন জ্বলছে ভদ্রমহিলার।

ফাঁসি হয়েছিল সেই ভদ্রলোকের। পরে ওঁর স্ত্রীকে একদিন বলেছিলাম, আশ্চর্য লোক তো আপনি! ফাঁসির সময় আপনাদের কারো চোখে এক ফোঁটা জল দেখলাম না।

ভদ্রমহিলা আমাকে কি বলেছিলেন জানো? সব জল শুকিয়ে আগুন হয়ে গেছে। আমার স্বামী তো নীচ কাজ করে ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নেননি। দেশের মঙ্গলের জন্য, স্বাধীনতার জন্যই সে সব কষ্ট স্বীকার করেছে।

জানো, তার কয়েকদিন পরেই ডি, এম এর দেহটা পাওয়া গেল তার বাইরের ঘরে। খুব অত্যাচারী ছিল লোকটা। না, পুলিশ ওকে ধরতে পারেনি। সুইসাইড করে নিজেই মরেছে। চুপ করে রইলেন মজুমদার। সেই ছবিটাকে যেন আরেকবার দেখে নিলেন নিজের মনের মধ্যে।

বাবা আর একটা খবর শুনুন। আমাদের একজন জওয়ান একা আটজন সৈন্যকে মেরে মরেছে।

'...পরিখার মধ্য হইতে গুলীবর্ষণের পর এক সময় সমস্ত গুলী ফুরিয়ে যায়। তখন বেয়নেট নিয়ে শত্রুসৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আটজন শত্রুকে হত্যা করে নিজে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেন......'

ক্ষমার মুখটা বুঝি আনন্দে ভরে গেছে। এসব শুনলেও আনন্দ লাগে মা! মজুমদারের গলার স্বর।

আফিসে যাবার সময় খেতে বসে মেজছেলে রূপেন বলছিল, জানো মা, এ মাসে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছি ডিফেন্স ফাণ্ডে। সবাই দিয়েছে। আমাদের আফিসের সবাই ঠিক করেছি যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন প্রত্যেকে একদিনের করে মাইনে দেব।

ডালে হাতা দিয়ে নাড়তে নাড়তে সুধাময়ী বললে, তোর এ মাসে জামা করলি না? জামাটার অবস্থাটা একবার দেখিস? ভদ্রলোকের মধ্যে বের হস কি করে?

—তোমাদের ওইসব মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারা এখন বাদ দাও। ভদ্রলোক-অভদ্রলোক সব সমান।

—এই আরম্ভ হল রূপেনের লেকচার। ক্ষমা রুটি বেলতে বেলতে হাসছিল। দু'একজন ভাই-বোন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রূপেন হাসিমুখে মা'র দিকে তাকাল। জানো মা, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কি বলেছেন? অপচয় বন্ধ করতে। তোমার সোডা-সাবানের খরচা কমাতে হবে প্রথমে। আচ্ছা মা, তুমি যুদ্ধে যাবে?

—আমাকে নেবে কিসের জন্য? আমি যেতে চাইলেই কি নেবে?

—কেন মা নার্সিং শিখবেন। যুদ্ধে নার্সেরও কত দরকার, কি বলেন মা? ক্ষমা হাসিমুখে শাশুড়ীর দিকে তাকাল।

সুধাময়ী হেসে বললে, তোমরা কি ভাবো আমাকে? এখনও বুড়ো হলে কি হবে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী খাটতে পারবো।

রূপেন তাকায় মা'র দিকে। ছেঁড়া কাপড় কাপড় গিঁট দিয়ে বাধা। বুকের হাড় গোনা যায়। কয়েকদিনে চেহারা আরো খারাপ হয়েছে। দাদার খবর জানা যাচ্ছে না। ও আসামেই ছিল।

—মা তোমার জন্য একটা স্যাণ্ডেল নিয়ে আসবো। ঠাণ্ডার মধ্যে কাজ করতে হয় তোমাকে।

—থাক, তোমাকে আর বাহাদুরি করতে হবে না। এমাসে বলে ডিসেন্স ফান্ডে টাকা দিবি?

মা'র কথায় সবাই হেসে উঠল। ডিসেন্স নয় মা ডিফেন্স। রেবা শুধরে দিল কথাটা।

মা হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের মত এলে-বিলে পাশ করিনি তো? এই ঝগড়াটিটাকে পাঠিয়ে দেনা যুদ্ধে। কয়কটা শত্রু মেরে আসুক।

—নিলে তো এখুনিই যাই। কেন মেয়ে সোলজার নেই? গরিলা বাহিনী? কি খবর জান তুমি?

—আমি এয়ার ফোর্সে যাবই। মজুমদারের ছোটছেলে বীরেনের গলা।

কে বলল কথাটা বীরু না? রাত্রিবেলা পায়খানা যেতে হলে বাচ্চা বুজলাকে আলো ধরতে হয় যার জন্য। সে যাবে যুদ্ধে? মজুমদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন হাসিমুখে।

তোমার মত বীরপুরুষই যাবে যুদ্ধে? তাহলেই হয়েছে। সুধাময়ীর হাসি-হাসি মুখ।

আচ্ছা ক্ষমা. মড়াগুলো আমাদের দেশে মরতে এসেছে কেন? কামান মেরে ওদের শেষ করে দেওয়া যায় না? মর-মর সমূলে ধ্বংস হ তোরা! সুধাময়ী অভিশাপ দিচ্ছিল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মজুমদারের ঘুম আসে না। নিস্তব্ধ। শুধু দু'একটা কুকুর এখানে-ওখানে ডাকছে। প্লেনের শব্দ। সামনে বেলফুলের গাছ থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। চোখে দেখতে পান না মজুমদার কিন্তু সবই অনুভব করতে পারেন।

ওই কোণের দোপাটি ফুলের চারাটা এখনও জেগে রয়েছে। প্রজাপতি ধরবার জন্য কতদিন টুকুন ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। রীনা ভোরবেলা পুজোর ফুল তুলে ডালা ভর্তি করে রাখত। ফুলের বাগানের সখ নিজেরও কি কম ছিল মজুমদারের। চোখ ভাল থাকলে নিজেই বাগানে কাজ করেছেন। এখনও মাঝে মাঝে কাজ করেন। ছোটছেলের পাশে থেকে গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দেন। জল ঢালেন।

নিজে অন্ধ হলেও ছেলে-মেয়ে-বউ-আরও পাঁচজন ফুলের বাগানটা দেখতে পায়। নরেনটা ভালবাসত সাদা গোলাপ, মনে মনে ভাবলেন মজুমদার, কাল বিকেলে সাদা গোলাপ গাছটার গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে।

চোখের সামনে একটা ছবি এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরে এসেছে নরেন। সাদা গোলাপ ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা। হাসি-হাসি মুখ ওদের। নরেন হয়ত বলছে, কি, এবার ছেলে না মেয়ে?

লজ্জায় লাল হয়ে গেছে ক্ষমার মুখটা। মাথা নিচু করে একবার তাকিয়ে আদরকাড়া ভঙ্গীতে বলবে, জানি না যাও।

চিরদিনের জন্য নিজের চোখের আলো হারালেও আর সবার চোখের আলো তো হারিয়ে যায়নি; সবাই প্রাণভরে দেখতে পায় ফুলের বাগানটাকে। অনেক ময়লা, অনেক পচা পাতা, আগাছা, ভাঙা ডাল জমে আছে বাগানটায়। পাশের বড় নিমগাছটার জন্য সাদা গোলাপ গাছটা বাড়তে পারছে না। ওটা ছেলেদের নিয়ে কেটে ফেলতে হবে। ময়লা, আগাছা নিজেরাই পরিষ্কার করবেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। সুধাময়ী বলেছিল একদিন বাইরের লোক রেখে পরিষ্কার করতে হবে বাগানটাকে। এত আগাছা তোমরা পারবে না সাফ করতে।

কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। নিজেরাই সাফ করব ফুলের বাগানটা। বাইরের লোকের কি দরকার? সাদা গোলাপ ফুলের গাছটায় তারার মত কত ফুল ফুটবে একদিন। সবাই প্রাণভরে দেখবে। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলবে, আঃ কি সুন্দর! আকাশের বুকে আবার প্লেনের শব্দ। সব স্বপ্ন যেন কেমন তছনছ হয়ে যায়। হয়ত একদিন কালো হয়ে উঠবে বারুদের ধোঁয়ায় এই নীল আকাশটা। ফুলের বাগানটা যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। পুড়ে পুড়ে কুঁকড়ে যাবে তাজা সদ্য ফোটা ফুলগুলো। প্রজাপতিগুলো ছাই হয়ে যাবে। টুকুনের ভোলা কুকুরটা ইঁটের চাপায় জিভ বার করে পড়ে থাকবে।

সেদিন অন্ধ মজুমদার কি করবে?

আর ভাবতে পারেন না মজুমদার। কালো আকাশে, বিষাক্ত গন্ধে মানুষ চিৎকার করে কাঁদছে। দৈত্যদের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওরা হাসছে বিকট চিৎকার করে।

—ক্ষমা—ক্ষমা। আমাকে একটা রাইফেল দাও। অন্ধ হলেও আমি ঠিক

গুলি করে মারতে পারব ওদের। এনে দাও, শিগগীর এনে দাও। কার হুকুমে ঢুকেছে এ বাগানে।

—কি হয়েছে বাবা? ছুটে এসেছে ক্ষমা, সুধাময়ী, বরেন, ছেলেমেয়েরা সবাই। বাবা, অমন করছিলেন কেন? ক্ষমার মুখটা মজুমদারের মুখের ওপরে।

সুধাময়ী তালুতে হাত রাখলেন। ইস! মাথা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। একটু পুরোনো ঘি মালিশ করে দেই।

দেখেছেন মা চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল।

—ক্ষমা। টুকুন কই? মজুদারের ভেজা ভেজা গলা।

—এই তো দাদু। এই তো আমি। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া গলার স্বর

সেদিন এরা কোথায় থাকবে? তার প্রিয় সবাই?

এক ফোঁটা জল চাইলেও টুকুনটাকে দিতে পারবেন না। তীব্র কান্নায় হয়ত ইঁটের পাজরের মধ্যেই ওই শিশুর পাঁজর মিশে যাবে। নিজের মত ওরাও হয়ত সবাই পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত হবে। গাছের ডালে বসা 'বউ সরষা কোট' পাখিটাকে আর 'পিউ কাঁহা' পাখিগুলোকে ওরা দেখতে পাবে না কোনদিন!

—শুনছো? ক্ষীণ গলায় ডাকলেন মজুমদার।

উঃ—কি? সুধাময়ী যেন একটা অন্য জগৎ থেকে সাড়া দিল। সেই ভয়াবহ দুস্বপ্ন কি ওঁরও চোখের সামনে ভিড় করে রয়েছে!

"ক্ষমা—ক্ষমা। আমাকে একটা রাইফেল এনে দাও।"

টুকুনের। জড়িয়ে ধরেছে দাদুকে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে মজুমদারের।

—একটু খাবার জল দাও তো মা। জল খেলেন। জানো, বড় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছি। যাও ক্ষমা, শুয়ে থাক গিয়ে।—তুমি ঠান্ডার মধ্যে বের হয়েছ কেন?

সবাই চলে গেছে শুতে। শুধু সুধাময়ী মাথায় পুরনো ঘি মালিশ করে দিচ্ছে। পাশে বসে রয়েছে টুকুন। কত কাছে আজ সুধাময়ী বসে আছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাছে এসে কথা বলছে।

কিন্তু সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা যদি অজগরের মত তেড়ে আসে কোনদিন?

—জানো, কালকে ক্ষমা রূপেনের হাত দিয়ে একজোড়া কানের দুল পাঠিয়ে দিয়েছে সেই যুদ্ধের ফান্ডে।

মজুমদার কিছু বললেন না। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন।

—আমিও বালাটা পাঠিয়ে দেব। রূপেন বলছিল, এখন নাকি সোনার খুব প্রয়োজন। অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হবে। কবে যে ও ব্যাটারা খতম হবে? আর কবে যে আমার নরেন ঘরে আসবে? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুধাময়ীর।

ভোরবেলা বাড়িতে শঙ্খ বেজে উঠল।

সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে। সুধাময়ী এসে বলে গেছে। আনন্দে লাঠিতে ভর দিয়ে বারান্দায় এসে

দাঁড়িয়েছেন মজুমদার। মনটা একটু অন্যমনস্ক। সাদা গোলাপ ফুলের গাছটার কথা আবার মনে পড়ল! হয়ত নরেন এ সময় যুদ্ধ করছে। আর ফুটফুটে মেয়েটা...ভাবতে পারছেন না মজুমদার। কান্নায় গলাটা বুজে আসতে চাইছে। ক্ষমার মনের আজ কি অবস্থা। আঁতুড়-ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবে নরেন। ক্ষমা মিষ্টি হেসে বলবে, একেবারে তোমার রঙ পেয়েছে। নরেন বলবে, চোখটা কিন্তু তোমার মতনই। এই বুড়ি। এই! কি? চিনতে পারিস? মেয়েটা হাসি মুখে তাকাবে বাবার দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মজুমদার।

মাদুরটায় আবার এসে বসলেন একদিন। ক্ষমা বসে বসে যুদ্ধের খবর শোনাত! পাশে বসে রয়েছে টুকুন। ওর হাতে একটা পুতুল। ছেলেদের মত হাফপ্যান্ট পরিয়েছে ওকে রেবা।

—দাদু এ কার ছেলে বল তো? পিসী, বলবে না কিন্তু। টুকুন হাসছে।

ডল পুতুলটা বুকের কাছে টেনে নেন মজুমদার। হেসে বলেন, আমার প্রর্থনা মা'র ছেলে। এ পুতুলটা তোর ভাগনে। তুই ওর মামা। মামা ভাগনে যেখানে বিপদ নেই সেখানে। আর তোর রাঙা টুকটুকে বোনের নাম রেখেছি, প্রার্থনা। সকাই ওই নামে ডাকবে। নরেনের মেয়ের নাম প্রার্থনা!

দূরের ফুলের বাগানটা বোধহয় এখন হাসছে। উড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে প্রজাপতিরা। ভোরবেলায় শিউলি ফুল ফুটবে। মালা গাঁথবে ছেলেমেয়েরা।

স্বপ্ন দেখছেন যেন মজুমদার।

হঠাৎ বললেন, আচ্ছা দাদু, তোর বোনকে যদি কেউ অপমান করে তুই কি করবি?

—একেবারে মেরে ফেলে দেব। ভেঙে দেব হাত। টুকুনের গলার স্বর।

হাসি ফুটল মজুদারের মুখে। আদর করে কাছে টেনে নিল টুকুনকে।

তারপর ডল পুতুলটাকে চোখের সামনে এনে বললেন, তোমার মা'কে যদি কেউ অসম্মান করে, তুমি কি করবে? বল?

ডল পুতুল কথা বলতে পারে না। অন্ধ মজুমদার চোখে দেখতে পায় না। তবু যেন মজুমদারের মনে হচ্ছে, উনি চোখের আলো আবার ফিরে পেয়েছেন!

ডল পুতুলটাকে চুমু খেয়ে আদর করে আনন্দে-আবেগে বলছেন, সাবাস, এই তো চাই! ছেলের মত কথা বলেছে ব্যাটা।

মজুমদার স্বপ্ন দেখছিলেন, প্রার্থনার ছেলেকে নিয়ে আগাছা, মরা ডাল, সব কিছু জঞ্জালকে ফুলের বাগান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

সাদা গোলাপ ফুলের গাছটা আবার হাসিমুখে কথা বলছে! প্রজাপতিদের নিয়ে আবার নতুন গল্প সাজাচ্ছে ফুলের বাগানটা।

কলারসিক

একটি বিমূর্ত অন্যটি ভারতীয় শিল্পের প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী চিন্ময় চৌধুরীর একক দ্বিতীয় প্রদর্শনী শেষ হয়েছে এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের স্টুডিও-সভ্যদের একটি সম্মিলিত প্রদর্শনীরও উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে এই দুটি প্রদর্শনী সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্মী। শিল্পী চিন্ময় চৌধুরী বিমূর্ত শিল্প-রীতির উপাসক আর ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা একান্ত-ভাবেই প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় শিল্প-ধারার অনুসারী। আধুনিক বুদ্ধিজীবী দর্শকের কাছে প্রথম প্রদর্শনীর আকর্ষণ যেমন সত্য তেমনি সাধারণ শিল্পরস-পিপাসু মানুষের মনে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর আবেদন অনেক প্রবল বলেই আমার ধারণা। এ-দিক থেকে দুটি প্রদর্শনীই বহু মানুষের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

।। শিল্পী চিন্ময় চৌধুরীর প্রদর্শনী ।।

গত বছর আমরা শিল্পী চৌধুরীর চিত্র-কর্মের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হই। শুনেছি, শিল্পী এই এক বছরের মধ্যে দিল্লী ও বোম্বাই শহরে দুটি একক প্রদর্শনী করে এসেছেন। সেই হিসাবে শিল্পী চৌধুরীর এটি চতুর্থ প্রদর্শনী হলেও কলকাতায় কিন্তু এটি তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী। তাঁর সেই প্রথম প্রদর্শনীর কথা স্মরণে রেখে অনায়াসে বলা যায় শিল্পীর চেতনা ও নৈপুণ্য ক্রমবিকাশের পথে।

ইদানীং লক্ষ্য করেছি যে-সব শিল্পী বিমূর্ত শিল্প-রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তাঁদের কল্পনা যথেষ্ট দরিদ্র। শুধুমাত্র অবয়বের বিকৃতি ও রঙ প্রয়োগ করে তাঁদের চিন্তাকে দর্শক-মনের উপর চাপিয়ে দিতে চান। চিত্রকলা দর্শনের পর দর্শক-মন স্বাভাবিকভাবে সে-সব চিত্রের আবেদনে সাড়া দিতে পারে না। একি শুধু দর্শকের শিক্ষার দৈন্য, না শিল্পীর অক্ষমতা? এই প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিন্ময় চৌধুরীর চিত্র-বিচার করে বলতে পারি শিল্পী তার অন্ততঃ কয়েকখানি চিত্রে দর্শক-মনকে আকর্ষণ করার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত কয়েকটি মুহূর্তকে চমৎকার রঙে এবং রেখায় বিধৃত করতে পেরেছেন। বিশেষ করে 'মোহমুক্তি' (২) ও 'হতচকিতা' (৩) চিত্রে দুই নারীর এমনি চেতনা-প্রবাহকে চিত্রিত করার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যম। 'কৃপণ' (৮) নামে যে চিত্রখানি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল সেটিও নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য। কোনো একটি পত্রিকায় দেখলাম এই চিত্রখানিকে সমালোচক চলতি অর্থে কৃপণের যে অর্থ সেই অর্থে গ্রহণ করেছেন। আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। নীচের করোটি এবং উপরের কঙ্কালের মধ্যদিয়ে শিল্পী এক বিশেষ অর্থে এই নাম সার্থক করেছেন। আত্মার-দৈন্য, জীবনকে উপভোগ করার অক্ষমতাই এখানে প্রবলভাবে উপস্থিত। এই চিত্রে

শিল্পী : গোপেন রায়
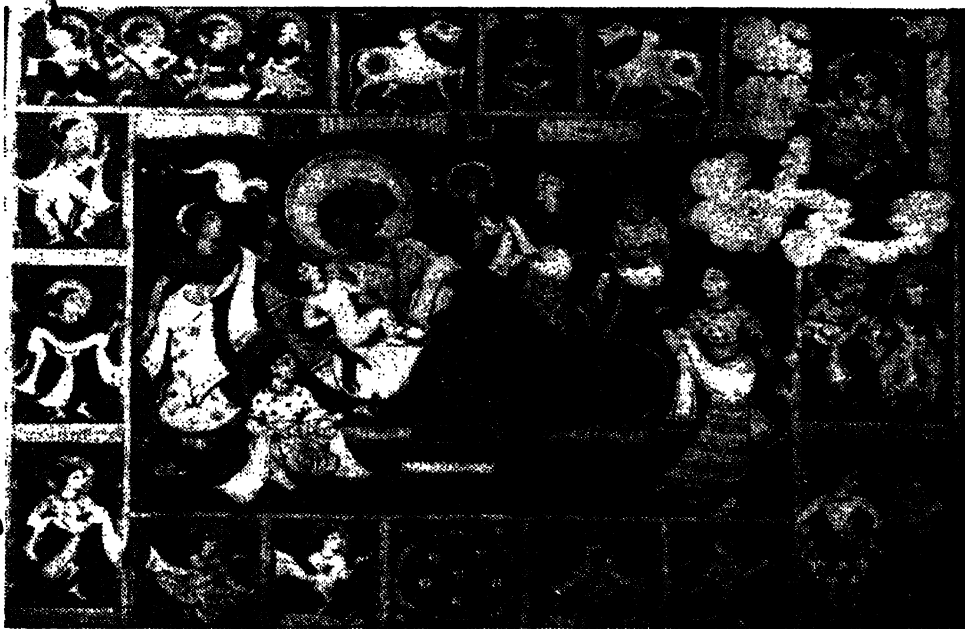
শিল্পী : চিন্ময় চৌধুরী

শিল্পী চৌধুরীর ক্ষমতা সমধিক প্রকাশিত।

কিন্তু এর পাশাপাশি অনেকগুলি স্টান্টধর্মী চিত্রও আছে। বিমূর্ত শিল্প-কলার নামে এগুলিকে প্রশংসা করতে আমরা অক্ষম। তবে একটা কথা স্বীকার্য যে, শিল্পী চিন্ময় চৌধুরী তেল-রঙ ব্যবহারে এবং উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি করার কাজে বেশ পারদর্শী। আশা করি ভবিষ্যতে শিল্পী তাঁর দোষত্রুটি মুক্ত হয়ে আরো সার্থক চিত্র আমাদের উপহার দেবেন। আমরা শিল্পী চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাই।

সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনী

ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি অনেক দিনের বহু-প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান। শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে এই সোসাইটির স্মৃতি বিজড়িত। একদিন বাংলার প্রখ্যাত শিল্পীদের অনেকেই এই সোসাইটির কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আজ এই সোসাইটির সেই সুনাম ও কর্মোদ্দীপনা প্রায় অবলুপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোসাইটির এই সাম্প্রতিক প্রদর্শনী দেখে আমরা উৎসাহ বোধ করছি। ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যের ধারাকে এঁরা যদি আবার পুনরুজ্জীবিত করে নতুন যুগের নতুন চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে নিঃসন্দেহে আমরা খুশি হব।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে ১৫ জন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর ৮১ খানি চিত্র-নিদর্শন স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ চিত্রই জল-রঙ ও টেম্পারার মাধ্যমে অঙ্কিত। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা কম। এদিক থেকে সোসাইটির সভ্যেরা ভারতীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

জল-রঙ ও টেম্পারার সাহায্যে অঙ্কিত যে চিত্রগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অধিকাংশই হল নিসর্গ চিত্র। এগুলির মধ্যে শ্রীমতী বীথি ঘোষের 'কামাক্ষ্যা' (২), 'সমুদ্রের গান' (৫), প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দিগন্তের দিকে' (৯), দেবব্রত ঘোষের 'মাঠের পানে' (৪৪), নীরেন ঘোষের ৫২ ও ৫৩ নং চিত্র এবং গোপেন রায়ের 'প্রভাতসূর্য' (৬৮), 'বিদায়লগ্ন' (৬৯) ও 'অস্তসূর্য' নিঃসন্দেহে সুন্দর। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে শিল্পী মনোরঞ্জন সাহার নিসর্গ চিত্রাবলী (৩২—৩৯)। তাঁর ৮ খানি চিত্রই জল-রঙের চমৎকার প্রয়োগে, চিত্র-সংস্থাপন এবং আলো-ছায়ার প্রাণবন্ত সুষমায় প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিল্পী তুফান রাফাই টেম্পারায় যে দুটি চিত্র এঁকেছেন তাতে তাঁর শক্তির পরিচয় আছে। 'ঘুড়ি ওড়ানো' (৪১) ও 'শোভাযাত্রা' (৪২) নামক চিত্রে মুঘল রীতির প্রভাব থাকলেও শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেও তা সমুজ্জ্বল।

তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র-গুলির মধ্যে শ্রীমতী বীথি ঘোষের 'টপ কর্ণার' (৩), আশীষ প্রধানের ২৭ ও ২৮ নং নিসর্গ দৃশ্য এবং শ্রীমতী করুণা সাহার 'কালিম্পং' সত্যি উচ্চস্তরের কাজ। এই তিনজন শিল্পীর চিত্র-সংস্থাপন, রঙ-প্রয়োগ এবং ঘনত্ব ও দূরত্ব চিত্রে এমন স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট যে তা মনকে আকর্ষণ না করে পারে না। শিল্পী যামিনী রায়ের তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রগুলি মন্দ নয়। এই মাধ্যমের আর একটি স্মরণীয় কাজ শিল্পী মুরলীধর টালির 'আমার মা' (৪০) নামক প্রতিকৃতি-চিত্রটি; শিল্পী টালি যে কত ক্ষমতাবান তা এই চিত্রখানি থেকেই অনুমান করা যায়।

লোক-শিল্প এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত শিল্পী কেশ ভৌমিক, শ্রীমতী মায়া রায়, শ্রীমতী মঞ্জুলিকা কুমার ও অর্ধেন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের চিত্রও অনেকের ভাল লাগতে পারে। আমরা এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্রের বইয়ের জগতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস এবং অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকাদি বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের এক মনোরম সম্ভার। সুপরিচিত লেখকদের সঙ্গে অনেক নতুন নামেরও দেখা মিলবে এবছরে প্রকাশিত সাহিত্যের আসরে।

সংখ্যার দিক থেকেও এবছরে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবছরের প্রথম দশ মাসে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৬,৫০০। অনুমান করা যাচ্ছে যে, সারা বছরে যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার সংখ্যা গত বছরে প্রকাশিত সংখ্যাকেও (১৮,০৬০) ছাড়িয়ে যাবে। যুদ্ধোত্তর যুগে যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র ১৯৫৬ সালেই বই-প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য অবনতি দেখা গিয়েছিল, এ ছাড়া বরাবরই ঊর্ধ্বমুখী গতি অব্যাহত।

সম্ভবতঃ এবছরের সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি হচ্ছে সমালোচনা ও জনপ্রিয়তা উভয় দিক থেকেই একটি উপন্যাস—এক হিসাবে যাকে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যায়। বিগত তিন দশক ধরে যাঁরা আমেরিকার প্রথম সারির সাহিত্যিকরূপে পরিচিত—তাঁদেরই অন্যতমা ক্যাথারিন অ্যানি পোর্টারের রচনা এটি।

১৯৩০ দশকে ক্যাথারিন ছোট গল্প ও ছোট উপন্যাস রচনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গদ্য সাহিত্যিকরূপে খ্যাত হন। তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উপন্যাস "শিপ অব ফুলস্" এক জটিল, বিস্তৃত, পটভূমিকায় রচিত। মেক্সিকো থেকে ১৯৩১এ এক জার্মান জাহাজের সমুদ্রযাত্রার রূপকের মাধ্যমে "একটি অর্ণবপোতের অনন্ত যাত্রা"-এর উপজীব্য বিষয়। উপন্যাসের দুঃখবাদী উপসংহারের সঙ্গে সকল সমালোচক অবশ্য একমত হতে পারেননি, কিন্তু, জাহাজের যাত্রীদের চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহে জীবনের মূল সুরকে উপলব্ধি করবেন।

১৯৬২ সালে উপন্যাস রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন আর একজন গল্প-লেখক। নাম তাঁর ফিলিপ রথ। তিন বছর আগে তিনি "জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার" পেয়েছেন। প্রথম উপন্যাস "লেটিং গো" রচনার জন্য সাহিত্যের আসরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপন্যাস-জগতের অপর দুটি "[illegible]" দুজন নবাগতের রচনা। বই দুটি সমালোচকদের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে। এঁদের একজন হচ্ছেন আইরিজ ডোর্নফেলড। তাঁর রচিত "জিনি রে" বাস্তব ও কল্পনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। গ্রন্থখানি এক বালিকার মর্মস্পর্শী কাহিনী। যে পৃথিবী তাকে মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত বলে মনে করেছিল, সেই পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তার দুঃসাহসিক অভিযান ও অভিনব প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়েছে এতে।

উপন্যাস-জগতে অপর নবাগত রেনল্ডস প্রাইস-এর "এ লং এণ্ড হ্যাপি লাইফ" আসলে একটি শ্লেষাত্মক উপন্যাস। একজন অপদার্থ যুবকের সঙ্গে এক গ্রাম্য বালিকার প্রণয়-কাহিনী মর্মস্পর্শী ও সুললিত ভাষায় বর্ণিত। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কাব্যসুলভ শাশ্বতধর্মী, সুললিত জটিলতাবর্জিত ভাষা এই উপন্যাসের প্রধান গুণ।

প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য-কৃতির মধ্যে কনরাড রিচারের "এ সিম্পল অনারেবল ম্যান" এক বিগত যুগের কাহিনী। ১৯৫১ সালের পুলিৎসার পুরস্কার এবং ১৯৬০ সালের "জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার" প্রাপ্ত মিঃ রিচার অতীত যুগের গণজীবনযাত্রাকে নিপুণ লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন এতে।

এ বছরের অন্যান্য স্মরণীয় রচনার মধ্যে লুই আকিনক্লেসের "পোর্ট্রেট ইন রাউনস্টোন" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে নিউ ইয়র্কের এক ক্ষমতাশালী পরিবারের কাহিনী, তৎকালীন সমাজ-জীবনকে লেখক নতুনভাবে চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া জন অ্যাপডাইকের "পিজিয়ন ফেদারস এণ্ড আদার স্টোরিজ", ভন বেরির "মুনট্র্যাপ" ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে যাযাবর সম্প্রদায় ও নববিস্তারী আধুনিক সভ্যতার মধ্যে সংঘাতের কাহিনী এবং শার্লি জ্যাকসনের "উই হ্যাভ অলওয়েজ লিভড্ ইন দি ক্যাসল" বিশেষভাবে স্মরণীয়। শেষোক্ত উপন্যাসটি অপরাধের কালো ছায়ায় ঢাকা এক পুরানো প্রাসাদের তিনজন বাসিন্দার কাহিনী, ভীতি ও উত্তেজনা সারা কাহিনীটিকে ঘিরে রয়েছে।

উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে আমেরিকার সমাজ-জীবনের [illegible] কয়েকটি গভীর সমীক্ষামূলক রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আগাস্ট হেক্‌সারের লেখা "দি পাবলিক হ্যাপিনেস"। জীবনকে আরও অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে চারুকলার যে বিপুল সম্ভাবনাময় ভূমিকা রয়েছে—তার উপরেই জোর দিয়েছেন লেখক। বইটি নিঃসন্দেহে পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে।

বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ও বিচক্ষণ সমাজদ্রষ্টা ওয়াল্টার কের তাঁর "দি ডিক্লাইন অব প্লেজার"এ দেখিয়েছেন যে, আধুনিক মানুষ জীবনের অবকাশকে যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারে না। এই বইটিতে লেখক জীবনকে সৌন্দর্যে, মহৎ চিন্তায় ও নির্মল আনন্দে ভরিয়ে তোলবার পথ নির্দেশ করেছেন।

বেন লুসিয়েন বুরম্যানের "ইচিং এ বিগ কন্টিনেন্ট" এবং জন স্টাইনবেকের "ট্র্যাভেলস উইথ চার্লি : ইন সার্চ অব আমেরিকা" এ বছরের গ্রন্থ-প্রকাশন তালিকায় স্মরণীয় সংযোজন। স্টাইনবেকের বইটি শুধু যে তাঁর সর্বাধিক বিক্রীত বই, তাই নয় এই বইটি লিখেই তিনি ১৯৬২ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনী ও আত্মচরিত প্রত্যেক বছরেই কিছু কিছু প্রকাশিত হয়। "লেটারস্ অব জেমস এজি টু ফাদার ফ্লাই" লেখকের মৃত্যুর পর তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্থার ও বারবারা গেলব-এর লেখা "ও নীল" বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাট্যকারের জীবন-চরিত, নিখুঁত জীবনীলেখারূপে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। সর্বোপরি, ডোনাল্ডডের লেখা "উইল রজার্স : এ বায়োগ্রাফি" দার্শনিক ও কৌতুকরসিক রজার্সের যথাযথ চরিত্র-চিত্রণ হিসাবে পাঠকদের মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে।

বারবারা ডব্লিউ টাকম্যান রচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ত্রিশদিনের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মর্মস্পর্শী ইতিহাস "দি গানস্ অব আগস্ট", যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল রবার্ট এফ, কেনেডি কর্তৃক বিশ্বপরিক্রমার নিখুঁত বিবরণ-সম্বলিত কাহিনী "জাস্ট ফ্রেণ্ডস এণ্ড ব্রেভ এনিমিজ", প্রবন্ধ-সঙ্কলন "বর্নাড বেরিনসন ট্রেজারি" এবং আমেরিকার বিখ্যাত [illegible] স্ব-নির্বাচিত রচনা-[illegible] [illegible] [illegible] অন হিজ ওয়ার্ক" ১৯৬২ সালের বইয়ের জগতে মূল্যবান অবদান হিসাবে বিপুলভাবে সমাদৃত।

॥ স্বামীজী ॥

আজ এক বিশ্বজয়ী ভারত-পথিকের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙলাদেশের পরম সৌভাগ্য, শতবর্ষ আগে বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বীর যোদ্ধা সন্ন্যাসী, বাঙলা ভাষাতেই সর্বপ্রথম গর্জন করে উঠেছিল তাঁর কম্বুকণ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন জন্মেছিলেন ভারতে সেদিন এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল সর্বাধিক বিপন্ন। কিন্তু প্রকৃত বিপদ তারচেয়েও বড় ছিল এই কারণে যে, ভারতবাসী তার সে সমূহ বিপদ সম্পর্কে এতটুকুও সচেতন ছিল না। স্বামীজীর জন্মেরও প্রায় শতবর্ষ আগে ভারত ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছিল আর সেই পশ্চিমী শাসকদের চোখধাঁধানো আধুনিক সভ্যতা একশ বছরের মধ্যে এমন করে মুগ্ধ করে দিয়েছিল এদেশের শিক্ষিত সমাজকে যে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মত সভ্যতা নেই, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মত শাণিত সমৃদ্ধ চিন্তাধারা জগতে বিরল। আচার আচরণে, চলনে বলনে ইংরেজিয়ানাই ছিল সেদিনের শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের একমাত্র চিন্তা। ভারত ইতিপূর্বে আরও বহুবার বিদেশীর পরাধীন হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক পরাধীনতা কখনও এমন করে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করেনি। সহস্র সহস্র বছর ধরে রাজনৈতিক বিজেতাকে শেষ পর্যন্ত ভারত পরাজিত করেছে তার মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার আলিঙ্গন দিয়ে। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের আমলেই ঘটল তার প্রথম ব্যতিক্রম। শাসক, ইংরেজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার

ক্ষেত্রেও হয়ে উঠল শিক্ষিত ভারতবাসীর আদর্শ।

চিন্তার জগতে শিক্ষিত ভারতবাসীর সেদিনের হীনমন্যতার বিরুদ্ধে সনাতন ও শাশ্বত ভারতের প্রথম মূর্ত ঘোষণা স্বামী বিবেকানন্দ। সে বীর সন্ন্যাসীর সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে ছিল হিমালয়ের দৃঢ়তা, কণ্ঠে ছিল ভারত মহাসাগরের গর্জন, মেধায় ছিল বৈদিক জ্ঞানতাপসের প্রজ্ঞা, অন্তরে ছিল জননী জন্মভূমির সর্বসহা ভালবাসা। মাথায় পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে তিনিই প্রথম আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র আমেরিকা, বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বলে এলেন, ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম, ভারতের ঔদার্য আজও পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজও জগতের শিক্ষাগুরু ভারত, ভবিষ্যতেও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জেলে মানব জাতিকে পথ দেখাবে ভারত। তাঁর ইংরেজী ভাষণে অতলান্তিক মহাসাগরের গর্জন শুনেছিলেন ইংলণ্ডের তৎকালীন রাষ্ট্রনেতা গ্ল্যাডস্টোন। মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, বিবেকানন্দের ইংরেজি ভাষণ শোনার পর বুঝেছেন তিনি যে বিদেশী ভাষা বলে কোন কথা নেই। অথচ অত বড় ইংরেজ বক্তা ইংলণ্ডে দাঁড়িয়েও সেদিন তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের মত একবারের জন্য বলেননি, ইংরেজ-শাসনের কাছে ভারত কোনভাবে ঋণী। স্বদেশে শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কোটি কোটি নিরক্ষর অনাদৃত দেশবাসীর সেদিন যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করাও ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তাই বিদেশে ভারতের মাহাত্ম্য সগর্বে প্রচার করে এলেও ভারতবাসীর ক্ষুদ্রতা দীনতা ও মোহান্ধতাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, সকল মোহমুক্ত হয়ে সদর্পে নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবতে, ভারতের দরিদ্র মূর্খ চণ্ডাল নরনারীকে নিজের রক্ত নিজের ভাই বলে জানতে। ভবিষ্যতেও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা চতুর ইংরেজ শিক্ষার বেড়াজাল দিয়ে সে ব্যবধান ঘটাতে চেয়েছিল মুষ্টিময় শিক্ষিত ও কোটি কোটি দরিদ্র নিরক্ষর ভারতবাসীর মাঝে, তার উপরেই এভাবে সবল আঘাত হানেন ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী নেতা স্বামী বিবেকানন্দ। দেশগতপ্রাণ তরুণ সমাজকে আহ্বান জানিয়ে বললেন তিনি, জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। —সে মন্ত্র শিরোধার্য করে মাত্র এক দশক পরে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়ালেন বাঙলার অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম। শুরু হল ঘরে ঘরে আত্মদানের সাধনা। সেই সাধনারই পূর্ণ ও সফল পরিসমাপ্তি নেতাজীর মহান সংগ্রামে ও জাতির শৃঙ্খলমোচনে। স্বামীজীর ধ্যান ও জীবন-সাধনারই আদর্শ ও অনিন্দ্যসুন্দর পরিণতি নেতাজী।

স্বামীজীর শতবর্ষপূর্তির পুণ্য-দিনটির প্রতি মর্যাদা দিতে ভারত সরকার যে ঐদিন সারা ভারতে ছুটি ঘোষণা করেছেন তাতে ভারত সরকারের বর্তমান নায়কদের ঔদার্য ও মহান ভারতপথিক বিবেকানন্দের প্রতি তাঁদের সম্যক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সারা ভারতের সকল মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে, পবিত্র হৃদয় নিয়ে আজ স্বামীজীকে স্মরণ করুন এই আমাদের একান্ত কামনা।

॥ সতর্কতা চাই ॥

প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলেছেন, যুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেছে বলে কেউ যেন মনে না করেন অনতিবিলম্বেই সব সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সব বিরোধের নিষ্পত্তি হতে হয়ত আরও পাঁচ বছরও সময় লাগতে পারে। অতএব দেশবাসী যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকেন।

চৈনিক শঠতা সঠিক উপলব্ধি করার মত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা বর্তমানে ভারতে কেন সমগ্র বিশ্বরাজনীতিতেও বিশেষ কেউ নেই। সুতরাং চীন আজ আক্রমণ বন্ধ করেছে ও শান্তিস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে অদূর-ভবিষ্যতে আবার চীন ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। যতদিন ভারতের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল থাকবে ততদিনই চীনাদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাবে। কিন্তু এরজন্যে শুধু দেশবাসীরই কি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন? দেশবাসী আক্রান্ত হওয়া মাত্র যেভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং যেভাবে চল্লিশ কোটি মানুষ
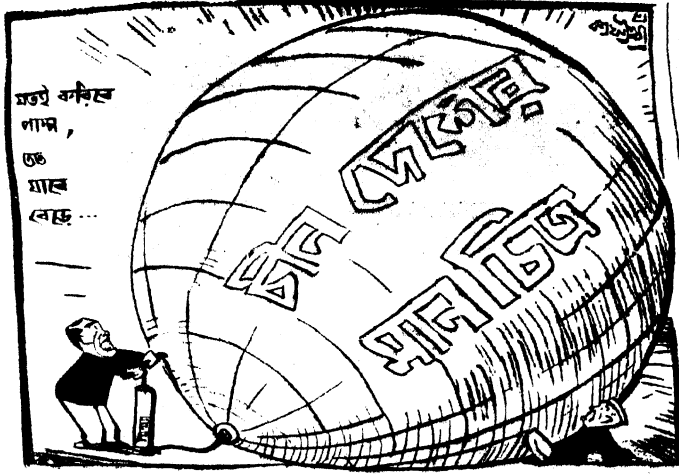
একটি মানুষের মত সংঘবদ্ধ হয়ে প্রধান-মন্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়েছেন তা চীনা আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও প্রায় কল্পনাতীত ছিল। অতি দরিদ্র মানুষও তাঁর সামান্যতম সম্বলটুকু জাতীয় প্রতিরক্ষায় দান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ ও মহান আদর্শবাদের সংগে সমতা রক্ষার জন্য সরকারী কর্মচারীদের ও রাষ্ট্রীয় কর্ম-কর্তাদের যে আচরণ ও নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল তা কি সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে? সম্প্রতি এ ব্যাপারে যে কয়েকটি সংবাদ ও অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে তার সামান্যতম অংশও যদি সত্য হয় তবে জাতীয় জীবনে তার যে বিষময় প্রতিক্রিয়া হবে তা আমরা চিন্তা করতেও ভয় পাই। প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, নেফার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গত কয়েকবছর ধরে রাস্তা নির্মাণের জন্য যে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা সীমান্ত সড়কসংস্থা কর্তৃক সম্পূর্ণ ব্যয় করা হলেও তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় রাস্তা নাকি সবক্ষেত্রে নির্মাণ হয়নি বা হলেও সে রাস্তা যানোপযোগী নয়। এমন কি যুদ্ধের মানচিত্রে যে রাস্তার উল্লেখ আছে, সৈনিকরা মানচিত্র অনুসরণ করে সেখানে এ গাড়ি নিয়ে কোন রাস্তা খুঁজে পায়নি! প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে এ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এতবড় জঘন্য অপরাধে অপরাধী যারা তাদের কি শাস্তি দেবেন তিনি? অপর এক অভি-যোগে প্রকাশ, নেফায় যুদ্ধরত সৈন্যদের খাবার পাঠানোর দায়িত্ব আছে একটি এলাকার [illegible] উপর। কিন্তু তারা সব [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] বাজারে বিক্রয় করে দিয়েছে। এ অভি-যোগও যদি সত্য হয় তবে তার চেয়ে জঘন্য পাপ আর কি হতে পারে?

প্রধানমন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক উক্তিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়েছে। লখনৌতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন, বিমানআক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে বা অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রাদি ক্রয় করে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংগে সংগে সে-উক্তির সত্যতা অস্বীকার করে বলেছেন, রাজ্য সরকার অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র কিনে একটি পয়সাও খরচ করেননি বা এ রাজ্যের এখানে-ওখানে যে দু'চারটি পরিখা খনন করা হয়েছে তারজন্যেও কোন সরকারী অর্থ ব্যয় করা হয়নি। ওগুলি সবই স্থানীয় লোকেদের স্বেচ্ছাশ্রমের সৃষ্টি। তাছাড়া বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য এপর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তা সবই করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে।

॥ শোক সংবাদ ॥

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের সহধর্মিণী ও বর্তমান সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতা সুলেখিকা দেশপ্রাণা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার উনসত্তর বছর বয়সে পরলোকগমণ করেছেন। দেশমাতৃকার শৃংখলমোচনে স্বদেশীযুগে বাঙলাদেশের যে অল্পসংখ্যক নারী আত্মনিয়োগ করেন নির্ঝরিণী দেবী ছিলেন তাঁদেরই অন্যতমা। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি দুবার কারাবরণ করেন ১৯৩০ ও '৩২ সালে। সেদিন ইংরাজ-শাসনের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এই মহীয়সী নারী যে সাহস ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের পরিচয় দেন তা আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। নির্ঝরিণী দেবীর আরও গৌরবময় পরিচয় যে তিনি ছিলেন বিশ্বকবির স্নেহধন্যা। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি পত্র সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রকা-শিত পত্রাবলীতে স্থান পেয়েছে।

পুণ্যপ্রাণা নির্ঝরিণী ছিলেন শ্রীশ্রীসারদামাতার মন্ত্রশিষ্যা। আমরা এই মহীয়সী নারীর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ ঘরে ॥

৩রা জানুয়ারী—১৮ই পৌষ : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের (পশ্চিমবঙ্গ) সহিত রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) ভারতের সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর বৈঠক—বাঙ্গালী রেজিমেন্ট গঠন প্রসঙ্গ সমেত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

জরুরী ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিমানঘাঁটিসমূহের (অসামরিক) উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যম—পূর্ত দপ্তরের অধীনে নূতন বিভাগ চালু।

৪ঠা জানুয়ারী—১৯শে পৌষ : মুঙ্গের জেলার উমেশনগর ষ্টেশনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা—দণ্ডায়মান কাটিহার-বারৌনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের (আপ) সহিত ডাউন অযোধ্যা-ত্রিহুত মেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ—৪২ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত।

'ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্রসাহায্যের সহিত কাশ্মীর বিরোধের সম্পর্ক নাই'—দিল্লীতে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে শ্রীনেহরুর উক্তি—সীমান্তে (নেফা) ত্রুটিপূর্ণ সড়ক নির্মাণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের আশ্বাস।

কাপাংলা গিরিপথে (নেফা সীমান্ত সন্নিহিত) বিপুল চীনা সৈন্য সমাবেশ।

৫ই জানুয়ারী—২০শে পৌষ : 'চীনের শান্তির বাণী সম্পূর্ণ অসার : ঘটনাবলীর বিকৃতিসাধন চীনেরই অপকর্ম'—পিকিং-এর ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রের উত্তরে ভারতের জবাব।

চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য অত্যাবশ্যক কয়েক শ্রেণীর কর্মীকে ট্রেনিং দিয়া প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা—কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির প্রতি জরুরী নির্দেশ।

'চীনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধই ভারতের প্রথম জনযুদ্ধ'—লক্ষ্ণৌ-এ শ্রীনেহরুর ভাষণ—চীন-ভারত যুদ্ধ পাঁচ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাহস সঞ্চয় ও প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব আরোপ—পরিখা খনন ও নিষ্প্রদীপ মহড়ার বিরোধিতা।

৬ই জানুয়ারী—২১শে পৌষ : পশ্চিমবঙ্গের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা—১৯৬১-৭১ সালের মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব—জাতীয় ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিষদের (দিল্লী) অভিমত।

'দেশের মর্যাদার নিকট নতিস্বীকার অসম্ভব'—এলাহাবাদের জনসমাবেশে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—সর্বস্তরে প্রস্তুতির দৃঢ় আহ্বান—সীমান্তে যুদ্ধ আপাতত বন্ধ কিন্তু বিপদ এখনও কাটে নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

ত্রিপুরার সীমান্তে অবিরাম পাকিস্তানী দৌরাত্ম্যের সংবাদ।

৭ই জানুয়ারী—২২শে পৌষ : শ্রীনেহরু কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে রিহান্দ বাঁধের (উত্তর-প্রদেশ) উদ্বোধন—বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নদী উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের সার্থক রূপদান।

"পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা' করার সিদ্ধান্ত অটুট থাকিবে"—রাজ্য বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি—বিধানসভা কর্তৃক বিতর্কমূলক জেলা পরিষদ বিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ।

৮ই জানুয়ারী—২৩শে পৌষ : বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বিলের উপর বিতর্ক শুরু—বিরোধীপক্ষ কর্তৃক বিলের তীব্র সমালোচনা—বিলকে 'অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দান।

সিকিম-তিব্বত সীমান্তে চীনাদের ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচাবনের সহিত কলিকাতায় আগত সামরিক মুখপাত্রের উক্তি।

বিশিষ্ট সমাজ ও সাহিত্যসেবী শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারের (৬৯) জীবনাবসান।

৯ই জানুয়ারী—২৪শে পৌষ : ভারত সরকার কর্তৃক স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি জারী—স্বর্ণালঙ্কার ভিন্ন সমস্ত সোনার হিসাব দাখিলের নির্দেশ—রূপার ফাটকা কারবারও অবিলম্বে বন্ধ।

"চীনের নয়া প্রস্তাব তিনদফা 'শান্তি প্রস্তাব' অপেক্ষাও জঘন্য"—শ্রীনেহরুর মন্তব্য—ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চৌ-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) সর্বশেষ নোট প্রত্যাখ্যাত—৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের দাবী।

॥ বাইরে ॥

৩রা জানুয়ারী—১৮ই পৌষ : রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কর্তৃক কাতাঙ্গার খনি শহর জাদোৎভিল শহর দখল—কলওয়েজিতে শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) সরিয়া পড়ার সংবাদ।

'আণবিক যুদ্ধ বাধিলে সমগ্র বিশ্বই ধ্বংস হইবে—জয়-পরাজয় বলিয়া কিছু থাকিবে না'—পিকিং-এর জনসমাবেশে শ্রীমতী বন্দনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) সতর্কবাণী।

৪ঠা জানুয়ারী—১৯শে পৌষ : জাদোৎভিল হইতে কলওয়েজির মধ্যবর্তী পথে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও কাতাঙ্গী সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ—কলওয়েজিতে কাতাঙ্গার সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণ।

পাক্ সীমান্ত পুলিশ কর্তৃক ভারতীয় পুলিশ দল (১৫ জনের) আটক (২৮শে ডিসেম্বরের ঘটনা)—রাজস্থানের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিতে আলোচনা করিতে যাইয়া ফ্যাসাদ। (বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ)

৫ই জানুয়ারী—২০শে পৌষ : করাচীতে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত—পাক্-চীন মিতালি দৃঢ়তর করার আয়োজন।

চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রীমতী বন্দরনায়কের আশা প্রকাশ—চীনা নেতৃবৃন্দের সহিত পাঁচদিবসব্যাপী আলোচনার পর সিংহলী প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।

৬ই জানুয়ারী—২১শে পৌষ : কাশ্মীর সমস্যার (পাক্-ভারত সংশ্লিষ্ট) মীমাংসা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আয়ুব খানের (পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট) আশা প্রকাশ—রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ বাস্তবসম্মত হইবে না বলিয়া মন্তব্য।

৭ই জানুয়ারী—২২শে পৌষ : কলম্বো সম্মেলনের (জোট নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় ছয় জাতির) প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের অনুকূল মনোভাব—চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ও শ্রীমতী বন্দরনায়কের (মিশনে আগত সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ—বান্দুং সম্মেলনের নীতির ভিত্তিতে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার উপর গুরুত্ব আরোপ।

কঙ্গোর সহিত কাতাঙ্গার পুনরায় সংহতিসাধন প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী আদোলা (কঙ্গো) কর্তৃক ছয় দফা পরিকল্পনা ঘোষণা।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইনের সংশোধন—প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

৮ই জানুয়ারী—২৩শে পৌষ : 'কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণের ফলে ভারতের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে'—প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেঃ আইসেনহাওয়ারের মন্তব্য।

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অভিযানকালে পলায়নকারী কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট মিঃ শোম্বের এলিজাবেথভিল প্রত্যাবর্তন।

৯ই জানুয়ারী—২৪শে পৌষ : চীন সফরান্তে নয়াদিল্লীর পথে শ্রীমতী বন্দরনায়কের হংকং উপস্থিতি।

ভারত ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা—কায়রোর সরকারী নেতৃবৃন্দের সহিত সফররত ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বৈঠক।

॥ নিষিদ্ধ বই ॥

লেডী চ্যাটারলীজ লাভার গ্রন্থটি ইংলন্ডের বিচারকমণ্ডলীর নির্দেশে নির্দোষ স্বীকৃত হলেও, প্রথমে মহাকালে ও পরে অন্যত্র আদালতের নির্দেশে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। চার অক্ষর বিশিষ্ট নিষিদ্ধ শব্দটি কি তা জানার উপায় নেই। তাই বলে, ভারতে যে আর কোনও অশ্লীল গ্রন্থ প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হচ্ছে না তা নয়, এবং মানব সমাজের চরিত্র রাতরাতি শুকদেবের মত অম্লান হয়ে গেছে তাও নয়। তবু, যা নিষিদ্ধ তার প্রতি মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে।

নিষিদ্ধ মানে যে সেই গ্রন্থ অশ্লীল, তা বলা যায় না। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সরকারের মেজাজ এবং মর্জি অনুসারে বহু ক্ল্যাসিক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আগুনে পোড়ানো হয়েছে, তথাপি সেই-সব সৎ এবং অসৎ গ্রন্থ অমরত্ব লাভ করে সজীব হয়ে আছে। এই আলোচনায় কয়েকখানি এই জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করব, আলোচনার স্থান সীমিত, তাই আমার তালিকা স্বাভাবিক কারণেই অসম্পূর্ণ থাকবে, তবে এই গ্রন্থাবলীর নামগুলি লক্ষ্য করলেই বুদ্ধিমান পাঠক নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন নিষিদ্ধ বই নিয়ে হৈ-চৈ করা নিরর্থক।

হোমারের 'ওডিসি' পাঠ করে প্লেটো বললেন, অপরিণত বয়স্ক পাঠকের জন্য এই গ্রন্থের স্থান-বিশেষ বর্জন করা হোক। কালিগুলা এই মহাগ্রন্থ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেন, কারণ, স্বাধীনতা সম্পর্কিত চিন্তাধারা রোমক স্বেচ্ছা-তন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক। ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্লুটার্ক "কমেডিস অফ এরিস্টোফানিস" অশ্লীল বিবেচনা করেছিলেন।

অনেকের হয়ত জানা নেই যে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয় তা উইলিয়াম টিনডেল অনুদিত "দি নিউ টেস্টামেন্ট"। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের যাজকসমাজের তীব্র আন্দোলনের ফলে গ্রন্থটি কলোনে মুদ্রিত হয়। চার্চের পরিধি সুদূরপ্রসারী, প্রকাশক ওরমসে পালিয়ে গিয়ে গোপনে এই গ্রন্থ ছাপেন। ৬০০০ কপি নিউ টেস্টামেন্ট চোরা-চালানীর কৌশলে ইংলণ্ডে আমদানী করা হয়, ইংলণ্ডের গির্জার কর্তৃপক্ষরা কিছু কপি সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে তা পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব করেন। কুইন মেরী ইংলণ্ডে ঘোষণা করেন :

"No manner of persons presume to bring into this realm any manuscripts, books, papers and of any like" books containing false doctrines against the Catholic faith."

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] [illegible]

অভয়ঙ্কর

নিষিদ্ধ করলেন, সবগুলো গ্রন্থ ধর্মাধিকরণে দেওয়া হল সংশোধনের জন্য।

এমন কি ইদানীং কালেও বোকাচিওর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডিক্যামেরন' সাধারণ রুচির পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে ১৯২২এ সিনসিনাটির (যুক্তরাষ্ট্র) ডাকঘর কর্তৃপক্ষের চোখে। তাঁরা এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করেন। ডিস্ট্রিক্ট জাজ গ্রন্থবিক্রেতার ১,০০০ ডলার জরিমানা ধার্য করলেন। ১৯৩৪-এ ডেট্রয়টের পুলিশ বিভাগ এই "Salacious literature" বাজেয়াপ্ত করলেন, আর ইংলণ্ডের এক ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৫৩-তে এই গ্রন্থের সাতশ কপি নষ্ট করার আদেশ দিলেন।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম সেক্সপীয়ার বিপাকে পড়লেন। "রিচার্ড দি সেকেণ্ড" নাটকের মূলগ্রন্থে সম্রাটের মুখ দিয়ে কিঞ্চিৎ স্বীকারোক্তিমূলক এক দৃশ্য ছিল, রাণী এলিজাবেথ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সব কপি থেকে সেই অংশটুকু সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার আদেশ দিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এক সংস্করণে এই দৃশ্য যোগ করা হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে 'কিং লিয়র' ইংলিশ রঙ্গশালা থেকে নিষিদ্ধ হয়, কারণ সম্রাট তৃতীয় জর্জের মানসিক বিকারের কথা সর্বজনপরিচিত,—তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩১-এ "মার্চেন্ট অব ভেনিস" যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো এবং ম্যাঞ্চেস্টার-এর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠসূচী থেকে বাতিল করা হল কারণ এই গ্রন্থ "Fosterd intolerance"।

মলিয়েরের "তারতুফে" চতুর্দশ লুই কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে তিনি চার্চের মুরুব্বীদের সমবেত করে তা উচ্চকণ্ঠে স্বয়ং পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। প্রথম তিনটি অঙ্ক বারবার রাজসভায় অভিনীত হয়েছে,

কিন্তু প্রতিরের প্রকাশ্য অভিনয় প্রদর্শনের অনুমতি লাভ করেনি।

এমনি নেপোলিয়ন হেসিমের 'আমারি' লেনপাঁর করেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পূর্বে গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জিত করা হয়।

ড্যানিয়েল ডিফোর "মোল ফ্লানডার্স" আর "রোকসানা" ১৯৩০ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস বিভাগ নিষিদ্ধ করেন। এই লেখকের 'রবিনসন ক্রুসো' স্পেনে নিষিদ্ধ হয়। চার্লস ল্যাম্ব স্যামুয়েল রিচার্ডসনের "পামেলা" পাঠে উত্তেজিত হয়ে বলেন :

"A young lad will retreat hastily from it with a deep blush".

ভলতেয়ারের 'ক্যানডিডে' সারা পৃথিবীতে বারবার নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯২৯-এ সবচেয়ে মজার কাণ্ড ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রে। বোস্টনের কাস্টমস-কর্তৃপক্ষ এক প্যাকেট 'ক্যানডিডে' অশ্লীল ব'লে বাজেয়াপ্ত করেন, অথচ ঠিক সেই মুহূর্তে মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে এই মহাগ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে পড়ান হচ্ছে। ১৯৪৪-এ নিউ ইয়র্কের কনকর্ড বুকস এক পুস্তক তালিকায় এই গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেন, তখন তাঁদের সরকারি মহল থেকে আদেশ দেওয়া হল :-

"Your list violated the Section relating to the mailing of obscene literature, and that the title must be blocked out before it could re mailed." প্রকাশককে তাই করতে হল।

১৮০৮-এ গ্যেটের 'ফাউস্ত' বার্লিনে মঞ্চস্থ করা গেল না, নির্দেশ দেওয়া হল : "Certain dangerous passages concerning freedom should be deleted". ১৮৪১-তে শেলীর প্রকাশক মোকসোনিকে শেলীর গ্রন্থাবলী প্রকাশের অপরাধে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮১১-তে শেলী এবং তাঁর বন্ধু হগকে অক্সফোর্ড থেকে বহিষ্কৃত করা হয় "দি নেসাসিটি অব এথেসিজ" প্রকাশের অপরাধে।

ভিকটর হুগোর 'নতরদাম' এবং 'লা মিজারেবল' রোমের নিষিদ্ধ তালিকায় ছিল ১৯৫৪ পর্যন্ত। ১৮৫০-এ রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস ভিকটর হুগোর সব গ্রন্থাবলী নিষিদ্ধ করলেন।

ন্যাথানিয়েল হথর্নের বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি স্কারলেট লেটার' ১৮৫২ পর্যন্ত রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি ১৯২৫-এ রেভারেন্ড এ সি কক্স যুক্তরাষ্ট্রে এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বলেন :—

"Let this brokerage of lust be put down at the very beginning."

সেই বছরই এই মহাগ্রন্থের চিত্ররূপের অংশবিশেষ নিষিদ্ধ হয়। এদিকে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি তাঁদের 'হল অব ফেমে' ন্যাথানিয়েল হথর্নের মর্মর মূর্তি স্থাপিত করেন।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের "লীভস অব গ্রাস" ১৮৮১-এ আমেরিকান নৈতিক আদর্শকে আহত করে, সোসাইটি অব সাপ্রেসন অব ভাইসেস কর্তৃক নিষিদ্ধ বিভিন্ন এটর্নি গ্রন্থটি পরিমার্জিত না করলে নিষিদ্ধ করা হবে এই ভীতি প্রদর্শন করলেন। হুইটম্যান গ্রন্থটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। ওয়েন্ডেল ফিলিপস বললেন—

"Here be all Sorts of leaves except fig leaves"

আজ নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির 'হল অব ফেমে' হুইটম্যানের মর্মর মূর্তি শোভাবর্ধন করেছে।

হেনরিক ইবসেনের 'গোস্টস' ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ হয় ও ১৯০৩-এ আমেরিকায় আইনতঃ প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়।

ইউনাইটেড স্টেটসের পোস্ট-অফিস টলস্টয়ের "ক্রুৎজার সোনাটা"র প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। থিওডোর রুজভেল্ট টলস্টয়কে sexual and moral pervert বলতেন এই গ্রন্থের জন্য।

১৯৩১-এ হুনান প্রদেশের গভর্নর 'এলিস ইন দি ওয়ানডার ল্যান্ড' নিষিদ্ধ করেন, পশুতে কেন মানুষের মত কথা বলবে, সে মহাপাপ—

"Animals should not use human language and that it was disastrous to put animals and human beings on the same level".

মার্ক টোয়েনের 'টম সইয়ার' নিউ ইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরী থেকে নিষিদ্ধ হয়, আর 'হাকল বেরী ফিন' নিষিদ্ধ হয়—তার কারণ "trash and suitable only for the Slums."

১৯০৫-এ রাশিয়া এই দুটি গ্রন্থই নিষিদ্ধ করে। ১৯৪৩ থেকে রাশিয়ার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং গ্রন্থ দুটি প্রচুর জনপ্রিয়।

'দি মিকাডো' নামক গিলবার্ট এবং সুলিভ্যানের বিখ্যাত কমেডি ১৯০৫-এ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরকে ভীষণ উৎপীড়িত করেছে। নাটকটি ১৮৮৫ থেকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল, হঠাৎ তাঁদের মনে হল যে হয়ত জাপানী মৈত্রীতে এই নাটক চিড় খাইয়ে দেবে। এদিকে জাপানী জাহাজে 'দি মিকাডো'র গান বাজানো হত।

এইভাবে তালিকা আরো সুদীর্ঘ করা যায়। বহুবিধ উদাহরণ দিয়ে একথাই প্রমাণ করা যায় যে আজ যা নিষিদ্ধ কাল তা নয়, আজকের রুচি, কাল পরিবর্তিত। তাই 'লেডী চ্যাটার্লীর হতভাগ্য লাভরের কপালও তাঁর রাশিচক্র অনুসারে মাঝে মাঝে ভালো এবং মন্দ যাবে। নিষিদ্ধ গ্রন্থ আবার সিদ্ধ হবে। রাজপুরুষের সাহিত্যরুচি কালের নির্দেশে নিয়তই পরিবর্তনশীল।

নতুন বই

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সংকলিত। দি আইডিয়েল এডভার্টাইজিং এজেন্সী। ৫৪, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২।

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তির সার সংকলন। বিবেকানন্দের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই পুস্তিকাটির প্রকাশ সময়োচিত। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কানাগলির মানুষ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বহু সমস্যাভরা সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কানাগলির মানুষ'। সমাজের দুষ্টক্ষত, বাতিল বলে চিহ্নিত কতকগুলো প্রাণের ব্যর্থতার ইতিহাসকে আলোচ্য উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জীবনের আধি ব্যাধি যন্ত্রণার জীবন্ত প্রতীক উপন্যাসের সব ক'টি চরিত্র। তাই ভালো লাগে সোমনাথ, দয়াল ডাক্তার, বৈরাগীদা, বড়বৌ, মল্লিকা, বাবুলাল, শিবেন্দ্রনাথ, মিস্টার সেনের দলকে। এরা সবাই আমাদের নিত্যকালের পরিচিত। 'কানাগলির মানুষ' কানাগলির ইতিহাস নয় বর্তমান কালের যুগযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই শোভন।

সুর্যশিখা (উপন্যাস)—মায়া বসু। প্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

মায়া বসু ইদানীং অনেক ছোট গল্প লিখছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'চেনা-অচেনা'। 'সূর্যশিখা'য় পাওয়া যাবে নন্দিতা দত্তের জীবন দ্বন্দ্বের কাহিনী। পরপর কয়েকটি ঘটনা সমাবেশে তার জীবনে এক নিদারুণ পরিবর্তন এল, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে পরাজিত নন্দিতা এক অমার্জনীয় অপরাধে আদালতে হাজির হয়। স্বামীর একটি চোখ পক্ষাঘাতে অন্ধ, আর একটি চোখে হয় ক্যান্সার ... নন্দিতা ...

দিয়ে সেই চোখ নষ্ট করে দেয়। আদালত বিচার করে তাকে সাধারণ ও সুস্থ চিন্তাশক্তি বিরহিত মানসিক ভারসাম্য-বিহীনা রমণী স্থির করেন। অথচ এই নন্দিতা একদিন সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তার মনে গড়ে ওঠে একটা আবর্ত। লেখিকা অসামান্য লিপিকুশলতায় কাহিনীকে সুন্দর শিল্পসমৃদ্ধ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। যে বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য বাংলা সাহিত্যে তা বিশেষ আলোচিত নয়, সেই কারণে তিনি ধন্যবাদার্হ। গভীর জীবনবোধ ও সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পচেতন মন সংযুক্ত হওয়ায় লেখিকা এই কৃতিত্বের অধি-কারিণী হয়েছেন।

ছাপা এবং প্রচ্ছদপট বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রেমগ্রহ

নান্দীকর

(১) এক টুকরো আগুন (বাঙলা) : ৩৯৩৩ মিটার দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : বিনু বর্ধন; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই; শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়; সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : অনুভা গুপ্ত, অপর্ণা, তন্দ্রা বর্মণ, সুব্রতা সেন, মিতা চট্টোপাধ্যায়, আভা মণ্ডল, রমা ঘোষাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বজিৎ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর, ডি, বি অ্যান্ড কোম্পানীর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী থেকে শ্রী, লোটাস, ইন্দিরা ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "মুক্তি" ছবি থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাঙলা ছবির জগতে স্বামী স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝিকে অবলম্বন ক'রে বহু ছবিই তৈরী হয়েছে। কিন্তু আদর্শগত বিরোধের ফলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলে তারা দু'জনেই দু'জনের সম্বন্ধে কতখানি কঠোর হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মানসিক আবর্তের বহিঃপ্রকাশের ভাষা কতখানি রূঢ় হ'তে পারে, তার সাম্প্রতিক নিদর্শন হচ্ছে "এক টুকরো আগুন"। স্ত্রী স্বামীকে বলে, "আমার দেহের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, মনের সঙ্গে নয়।" এবং স্বামী স্ত্রীকে বলে, "আমার ঘর, আমার বিছানার বাঁধন থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম।"

কিন্তু বিরোধটি আসলে নিতান্তই বাহ্য। তাই দেখি, উভয়ের মনের পার্টিশনের নীচেই বয়ে চলেছে প্রেমের ফল্গুধারা। একই বাড়ীর ভিন্ন তলে দু'জনে পৃথকভাবে বসবাস করলেও স্ত্রীর মাথাধরার সংবাদে স্বামী অস্থির হয়ে চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ওডি-কোলন এবং বিদেশগত স্বামীর সংবাদ না পেয়ে স্ত্রীর চিন্তার অন্ত থাকে না। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামী যখন দেখে স্ত্রীর ঘরে তালা ঝুলছে, তখন তার সন্ধানে সে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ঘুরে বিফল হবার পর ভ্রাতৃকন্যার বিবাহে তাকেই বরবরণ ক'রতে দেখে তার মুখোমুখী হবার জন্যে হেন কাজ নেই, যা করে না এবং শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখে বাড়ী যেতে গিয়ে নিজের মোটরের মধ্যেই তাকে আসীন দেখে অতি-আনন্দে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না, এবং চোখ হয়ে ওঠে সজল। অপর পক্ষেরও অবস্থা যে অন্যরকম কিছু নয়, তা বোধ করি না বললেও চলে। অবশ্য আদর্শের পার্থক্য ছাড়াও স্ত্রী মালতীর মনে স্বামী সুকান্ত সম্বন্ধে মামীঘটিত একটি সন্দেহ চির-জাগ্রত ছিল।

স্বামী-স্ত্রী সংঘাতের এই মূল গল্পের সঙ্গে চলেছে একজোড়া তরুণ-তরুণীর প্রেমের খেলা। এরা দু'জনে একই কলেজে পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দু'টি এদেরই জন্যে সংরক্ষিত। দেখা যাচ্ছে, আজকাল বাঙলা ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা হ'তে গেলে মাত্র সুচেহারা ও সুকণ্ঠের অধিকারী হ'লেই চলবে না, লেখাপড়াতেও সর্বোত্তম হ'তে হবে। মাত্র লেখাপড়া করবার যে বিচিত্র আদর্শ ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, সেইটেই সাংঘাতিক। তরুণীটি আদর্শের বিভ্রাটে বিধ্বস্তপ্রায় সুকান্ত দত্তের (মূল গল্পের স্বামী) আদরের ভাইঝি এবং তরুণটি মূল গল্পের স্ত্রী, মালতীর ঘরের সংগীত আসরের নিমন্ত্রিত গাইয়ে ও পরে তরুণী মিলির সঙ্গে সুকান্তর সম্পর্ক জানবার পর সুকান্ত-মালতীর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করবার জন্য বদ্ধপরিকর। অবশ্য তার চেষ্টার ফলে সুকান্ত-মালতীর মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যে তারা তারই বিবাহ-রজনীতে নতুন ক'রে মিলিত হয়, সেটি সুকান্তর দাদা ও মিলির বাবা নিশিকান্তর অভিজ্ঞ মস্তিষ্কের অবলম্বিত কৌশলের প্রত্যক্ষ ফল।

কাহিনীটির প্রায় সর্বত্রই একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ছোঁয়াচ আছে এবং সেই কারণেই একটি মামুলী প্রেমের গল্পের সঙ্গে একটি দাম্পত্য সংঘাতের কাহিনীকে অনায়াসেই জুড়ে দিতে পারা গেছে এবং কৌতুকরসে সিঞ্চিত হয়ে সমগ্র ছবিটি একটি উপভোগ্য নতুনত্বের আবেদন দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছে। গল্পের মধ্যে [illegible] রূপক বিশিষ্ট চার জোড়া [illegible]

'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আছে। এর ভিতর যে দু'জোড়ার কথা আগেই বলা হয়েছে, তারা ছাড়াও আছে তরুণী নায়িকার মা-বাপ—নিশিকান্ত ও তার স্ত্রী এবং সুকান্তর চাকর শীতল ও মালতীর কি করুণা। দাম্পত্যজীবনের চারটি পৃথক রূপকে অত্যন্ত সুকৌশলে রসোত্তীর্ণভাবে এই কাহিনীতে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং চারটিই চমৎকার উপভোগ্য। সুকান্তকে সিঁড়ির ওপরে এবং মালতীকে কাঠের পার্টিশনের আড়ালে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দু'জনের বারংবার বাদানুবাদ ঘটানোর মধ্যে যে কৌশলী রসিকমনের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকেই আবার ক'রে আবিষ্কার করা যায়, দরজার চৌকাটের বাইরে অপর পক্ষকে রেখে নিশিকান্তর ক্রমাগত দরজার ভিতর দিক থেকে কোনাকুনিভাবে অকুস্থলে প্রবেশ করা এবং চড়া সুরে বক্তব্য পেশ করার পর "আশ্চর্য" হয়ে আবার সেইভাবেই নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ভিতর। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রোমাণ্টিক নায়ক-নায়িকা যেখানে ঘাসের ওপর ব'সে কল-গুঞ্জনে মত্ত, সেখানেও পিছন দিয়ে প্রৌঢ় পথচারীর হাত থেকে ছাতা প'ড়ে যাওয়া এবং তার একবার চ'লে গিয়ে আবার ফিরে আসা ও ছাতা নাচিয়ে চ'লে যাওয়ার ভিতরেও ঐ একই কৌতুকাশ্রয়ী রসিকমনের সন্ধান পাওয়া যায়। ছবিটি উপভোগ্য সংলাপে ভরপুর। কিন্তু আপত্তি জানাই, অকারণে প্রবিষ্ট যৌনবিজ্ঞান পড়ার দৃশ্যটি এবং বন্ধ্যত্বের নামে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে অদৃশ্য আলোচনাটির সম্পর্কে।

পরিচালক বিনু বর্ধন সুধীর মুখোপাধ্যায়ের অধীনে কয়েক বছর আগে 'মহিলা মহল' নামে একখানি ছবির পরিচালনা করেছিলেন; কিন্তু যথার্থ স্বাধীনভাবে চিত্রপরিচালনা করলেন তিনি এই "এক টুকরো আগুন" ছবিতেই। এবং এই প্রথম ছবিতেই তিনি একটি বেশ উপভোগ্য নতুনত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখ, দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতি বিভাগের কলা-কৌশলের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির প্রথমাংশকে আর একটু ঘনসন্নিবিষ্ট করার সুযোগ ছিল এবং তা' করতে পারলেই সম্পাদনার কাজ নিখুঁত হওয়ার সংগে সংগে ছবিটির উপভোগ্যতাও বৃদ্ধি পেত অনেকখানি।

অভিনয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অভিজ্ঞ অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। তাঁর 'আশ্চর্য' উক্তির সংগে আশ্চর্য চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত দর্শকদের আশ্চর্যই করে। সুকান্ত বেশে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে কোথাও কোথাও কিছু মাত্রাতিরিক্ততা দেখা গেলেও চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। প্রেমিক নায়ক হিসেবে বিশ্বজিৎ-এর অভিনয় সহজ সুন্দর। অনুভা গুপ্তার মালতী অভিমানহতা নারীর রূপটিকে অনায়াসেই তুলে ধরতে পেরেছে। নায়িকার ভূমিকায় তন্দ্রা বর্মণ কিছুটা আড়ষ্ট। অপরাপর ভূমিকায় শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষাল, সুব্রতা সেন, আভা মণ্ডল, খগেন পাঠক, শৈলেন প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

প্রথম কৌতুকাশ্রয়ী "এক টুকরো আগুন" একটি নতুনত্বের আস্বাদে ভরা উপভোগ্য চিত্রনিবেদন।

(২) অবশেষে (বাঙলা) : অভ্যুদয় ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৩৪৯১ মিটার দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (স্বভাবের স্বাদ); চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মৃণাল সেন; সংগীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীতরচনা : প্রণব রায়; চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : দেবেশ ঘোষ ও সুশীল ঘোষ; শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : বংশীচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদনা : গদাধর নস্কর; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী, সুব্রতা সেন, অসিতবরণ, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, বিধায়ক ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, শ্রীমান কুণাল প্রভৃতি। স্কাপস্ ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

অভ্যুদয় ফিল্মস্ নিবেদিত এবং মৃণাল সেন পরিচালিত "অবশেষে" চিত্রটির কাহিনীও দাম্পত্যজীবনে সংঘাতের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সংঘাতটি "এক টুকরো আগুন"-এর

মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো আদর্শগত মতানৈক্যের জন্যে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে স্ত্রীর মনে স্বামীর চরিত্রের ওপর সন্দেহের বশে। অথচ মিঃ রায় ও রমা পরস্পরকে ভালোবেসেই অসবর্ণ বিবাহ করেছিল রমার বাপের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু বিয়ের পরেই ওরা আবিষ্কার করেছিল যে, ওদের দু'জনের ইচ্ছা দু'রকমের এবং ওদের ছেলে যখন বছর চার-পাঁচেকের, তখন তার ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে দু'জনের মধ্যে লেগে গেল খিটিমিটি। এবং খিটিমিটি উত্তাল হয়ে উঠল যখন স্বামীর ভাগ্নের বান্ধবী সুমিতার ফোটোটিকে রমা তার স্বামীরই কোনো বান্ধবী ভেবে ভুল ক'রে বসল। প্রতিদিনের ঝগড়া-কোলাহল থেকে দূরে রাখবার জন্যে মিঃ রায় ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিলেন হাজারিবাগের এক মিশনারী স্কুলে আর এদিকে রমা তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের সকল বন্দোবস্তকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠল। দু'পক্ষেই "বিচ্ছেদ ও উচ্ছেদ"-বিশেষজ্ঞ দুই ঝানু উকীলের সংগে শলাপরামর্শ চলতে লাগল। যথাসময়ে আদালতে মামলা দায়ের হ'ল এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে প্রশ্নও উঠল। ছেলের অভিভাবকের নির্দেশমত স্কুলের রেক্টর যখন ছেলের সংগে ছেলের মার দেখাসাক্ষাৎ মঞ্জুর করলেন না, তখন আদালতে আবেদন দেওয়া হ'ল। দুই উকীলের পরামর্শে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রওনা হ'ল ছেলের কাছে পৌঁছোবার জন্যে। কিন্তু দু'জনের বিরুদ্ধে দু'জনের যত অভিযোগ, সমস্ত অন্তর্হিত হ'ল, যখন ছেলে হয়ে দাঁড়াল দু'জনের মধ্যে সেতু।

ডাঃ বিদ্যা' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

এই কাহিনীটিকে চিত্রে রূপায়িত করবার জন্যে একটি বিশেষ কোনো ভংগী গ্রহণ করা হয়নি। প্রথমাংশে চিত্রনাট্যটি "এক টুকরো আগুন"-এরই মতো কিছুটা কৌতুকরসাশ্রয়ী; কিন্তু মাঝের অংশে হাজারিবাগ স্কুলে ছেলের মনে মায়ের জন্যে আকুলতা জাগানোর উদ্দেশ্যে যে-ভাবে এক দীর্ঘকালব্যাপী নৃত্যোনাটিকার অবতারণা করা হ'ল, তাকে যাত্রাধর্মী বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং ছবির শেষ ভাগ মাত্র দুই মোটরের আগে পৌঁছোনোর লড়াইয়ের দৃশ্যটুকু বাদে রীতিমত গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ছবির বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। শেষ পর্যন্ত সন্তানের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন মিলন ঘটলই, তখন সমস্ত জিনিসটাকে চায়ের পেয়ালায় তুফান' জ্ঞান করে রঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে বিবৃত করলে ছবিটি হয়ত উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয়নি।

রমার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়ের অভিনয়ে আতিশয্যের কিছু বাড়াবাড়ি আন্তরিক চরিত্রসৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। বরং স্ত্রীর মনোরঞ্জনে মিঃ রায়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টা যথাযথভাবে রূপ পেয়েছে অসিতবরণের অভিনয়ে। প্রেমিক ভাগ্নের ভূমিকায় অনুপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। একটি মাতালের চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল জীবন্ত অভিনয় করে এক নবতম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন; টাইপ চরিত্র-রূপে এটি স্মরণীয় হয়ে রইল। আর দুই ঝানু উকীলের ভূমিকায় রবি ঘোষ ও বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁরা যে ঝানু চরিত্রাভিনেতা, তারই প্রমাণ দিয়েছেন; বিশেষ করে রবি ঘোষ তাঁর অসাধারণ বাচনভংগী দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে দর্শকদের পুলকিত করেছেন। রমার বাপের ভূমিকায় উৎপল দত্ত একটি টাইপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন; তবে মাঝে মাঝে অত খানি উচ্চগ্রামে কথা না কইলে লোকসানের ক্ষতির চেয়ে লাভই হত বেশী। শান্ত প্রকৃতির মায়ের ভূমিকায় [illegible] অভিনয় অত্যন্ত সংযত ও [illegible]-পূর্ণ। মাস্টার [illegible] [illegible] ও [illegible]।

অপরাপর ভূমিকায় [illegible], [illegible]-কুমার, সুরতা সেন, [illegible] চৌধুরী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ পর্যায়ের।

(৩) সন অব ইণ্ডিয়া (হিন্দী) : মেহবুব প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১৪৬৫ মিটার দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : মেহবুব; কাহিনী : মেহবুব প্রোডাকসন্স; সংলাপ : আর এস চৌধুরী, ডঃ সফদার আহ এবং জালাল মহীলাবাদী; সঙ্গীত-পরিচালনা : নৌশাদ; গীত-রচনা : শকীল বদাউনি; চিত্রগ্রহণ : ফরিদুর ইরাণী; শব্দানুলেখন : এস এম মোদী; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : কৌশিক; শিল্পনির্দেশনা : ভি আর যাদব এবং রাম ইয়েবেকার; সম্পাদনা : সামসুদ্দীন কাদরী; নৃত্যরচনা : গোপীকিষণ ও হীরালাল; রূপায়ণ : সাজিদ, কুমকুম, কমলজিৎ, জয়ন্ত কুমার, কানহাইয়ালাল, সিমি, মুত্তওয়াল প্রভৃতি। মেহবুব প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড (পরিবেশন বিভাগ)-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী থেকে ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, বীণা, বসুশ্রী, কৃষ্ণা, পূর্ণশ্রী ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

অজস্র অর্থব্যয়ে নির্মিত, গেভাকলার নেগেটিভে ও ফিল্মস্কোপে তোলা এবং টেকনিকালারে মুদ্রিত "সন অব ইণ্ডিয়া" ছবিটির যা বক্তব্য, তা মহৎ এবং সময়োপযোগী। "কখনও ভিক্ষা করবে না, কখনও চুরি করবে না, কখনও মিথ্যা বলবে না এবং সব সময়েই ভগবানকে তোমার বন্ধু মনে করবে"—এই চারটি উপদেশ বাল্যকাল থেকে যে মনে রেখে চলতে পারে, কোনো বাধাই তার কাছে বাধা নয়, কোনো বিপদই তাকে কাবু করতে পারে না, সকল প্রলোভনকে সে অনায়াসে জয় করে মনুষ্যত্বের পথে দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে। এবং আমাদের দেশে আজ এই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরই প্রয়োজন সব থেকে বেশী।

চলচ্চিত্র যে শুধু আনন্দের উপাদান নয়, নিছক আনন্দ পরিবেশনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার মাধ্যমে মানুষের পক্ষে প্রজ্ঞাকর, শুভদায়ক বাণী প্রচারেরও যে প্রয়োজন আছে, প্রযোজক-পরিচালক মেহবুব যে সে-বিষয়ে বিলক্ষণ সচেতন, এ-কথা তিনি বারংবার প্রমাণ করেছেন তাঁর "আওরৎ", "আন্দাজ", "ওয়াতন", "মাদার ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি মারফত। কাজেই "সন অব ইণ্ডিয়া" ছবিতেও তিনি যে তাঁর মহান কর্তব্যকে বিস্মৃত হবেন না এবং হননি, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবির প্রথম গান "নন্হা মুন্না রাহী হুঁ, দেশকা সিপাহী হুঁ" গান থেকে শুরু করে তিনি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই মানুষকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করবার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেন নি। মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান, কালোবাজারীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, ভুয়ো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিন্দা—এ-ধরনের বক্তব্য ছবিটির মধ্যে রয়েছে প্রচুর।

কিন্তু এই বাণীগুলি, শিক্ষা বিকীরণের এই চেষ্টা ছবিটির সঙ্গে একান্ত হয়ে উঠতে পারেনি, ছবিটিতে অকারণ নৃত্যগীত এবং অপর্যাপ্ত জাঁক-জমকের বাহুল্যে। অকাতরে প্রচুর অর্থব্যয় করলেই যে ছবি ছবি হয়ে ওঠে না, "সন অব ইণ্ডিয়া" তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ছবির যে বক্তব্য, তার যে আসল গল্প, তাকে সুষ্ঠুভাবে বলবার জন্যে এই জাঁকজমকের, এই অসংখ্য ক্লান্তিকর নৃত্যগীতের অনুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না। দুর্দান্ত জে-বির হাতের ক্রীড়নক এক যুবক এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করল, সেই ধনীর ধনদৌলতের লোভে; কিন্তু মেয়েটির সদগুণ, তার মিষ্টি-স্বভাবে সে মুগ্ধ হয়ে গেল; জে-বির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। জে-বি গেল ক্ষেপে; সে যুবককে শাস্তি দিতে উদ্যত হল। যুবক স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে গা-ঢাকা দিল। ছোট গোপাল মিশনারী স্কুলে ভর্তি হল লেখাপড়া শেখবার জন্যে; কিন্তু তার [illegible] উপলক্ষ্য করে [illegible] তার অসহ্য বোধ হয়। এই সময়ে [illegible] তার মা মৃত্যুপথযাত্রিণী। সে [illegible] মায়ের কাছে। মা একটু সুস্থ হলে তাঁর কাছে সে বাপের খবর জানতে চাইল। মায়ের মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনে সে বেরিয়ে পড়ল তার বাপের সন্ধানে; সঙ্গে তার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান কুকুর। পথে নানা প্রলোভন, নানা বিপদ এড়িয়ে সে শেষ পর্যন্ত তার বাপের সঙ্গে মিলিত হল। —এই হচ্ছে ছবির ঘটনার সারাংশ।

কিন্তু এই ঘটনাকে বিবৃত করতে গিয়ে সকল যুক্তিতর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ছবিটিকে বিরাট, জাঁক-জমকপূর্ণ ও সাধারণ দর্শকের কাছে উপভোগ্য করবার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শ্রীমেহবুব আমাদের যে-বস্তু উপহার দিয়েছেন, তাকে একটি বিরাট ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। অজস্র অর্থের এ-রকম অপব্যয় চিত্রজগতের ইতিহাসে সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। চিত্রগ্রহণে ফরিদুন ইরাণীর অসামান্য কৃতিত্ব, নৌশাদের সুরসৃষ্টি, দৃশ্যপটরচয়িতার পরিশ্রম ও কল্পনা এবং বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয় প্রচেষ্টা—কিছুই ছবিটিকে হৃদয়গ্রাহী সার্থক

শিল্পসৃষ্টি করে তুলতে সাহায্য করেনি। সিমি এবং কুমকুম, কুমার এবং কানাহাইয়ালাল, কমলজিৎ এবং জয়ন্ত এবং সবশেষে নবাগত বালক-অভিনেতা সাজিৎ অভিনয়ে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বালক-অভিনেতাটির মুখাবয়ব চলচ্চিত্রের মারফত সুন্দর না দেখালেও তার স্বচ্ছন্দ অভিনয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু "সন অব ইণ্ডিয়া" আমাদের দর্শকচিত্তে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, তা পূর্ণ হল কি?

(৪) দি দুর্গাপুর স্টোরি (ইংরাজী ধারাবিবরণী সমেত) ঃ ইসকন-এর নিবেদন; ১৩৬২ মিটার দীর্ঘ এবং ৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ মধু বসু প্রোডাকসন্স; পরিচালনা ঃ মধু বসু; চিত্রগ্রহণ ঃ অজয় কর; ধারা বিবরণী লিখন ঃ জন লট; ধারা বিবরণী ভাষণ ঃ পিয়ার্সন সুরিটা; সম্পাদনা ঃ শিবসাধন ভট্টাচার্য; আবহসঙ্গীত ঃ ফ্র্যাঙ্গো পোলো।

কলকাতা থেকে ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একদা বনজঙ্গলপূর্ণ দুর্গাপুরকে ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি যেদিন ১৩টি বৃটিশ কোম্পানীর সমন্বয়ে গঠিত "ইণ্ডিয়ান স্টীল ওয়ার্কস কন্সট্রাকসান কোম্পানী লিমিটেড"-এর বিরাট স্টীল কারখানা স্থাপনের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেদিন কে ভেবেছিল ১,৫০০ একর (২·৪ বর্গ মাইল) জমি নিয়ে এমন একটি বিরাট ইস্পাতনগরী গড়ে উঠবে, যা বছরে অন্ততঃ ১০,০০,০০০ টন স্টীলের পিণ্ড কিংবা বাট নির্মাণ করতে থাকবে।

মাত্র ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে প্রথম কোক-ওভেন ব্যাটারী প্রজ্বলিত করা, ঐ বছরেরই ২৯এ ডিসেম্বর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দিয়ে প্রথম ব্লাস্ট ফার্ণেসের কাজ শুরু করা,

'ছক্কা পান্জা' চিত্রে ছবি বিশ্বাস ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ইস্পাত তৈরী করা এবং মে মাসের মধ্যে রোলিংয়ের কাজ চালু করা যে-কোনো সংস্থার পক্ষে শ্লাঘার কথা।

অভিজ্ঞ পরিচালক মধু বসু নির্মিত "দি দুর্গাপুর স্টোরি" এই কর্মপ্রবাহের একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল। দুর্গাপুরের জঙ্গল পরিষ্কার থেকে শুরু করে কারখানার সকল বিভাগের নির্মাণ এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্মপদ্ধতির প্রতিটি স্তরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে তিনি মাত্র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জন্ম ও প্রসারের ইতিহাসকেই চলচ্চিত্রে ধরে রাখেননি, কিভাবে ইস্পাতের এবং রেলগাড়ীর চাকা, অ্যাক্সেল প্রভৃতি ইস্পাত নির্মিত জিনিসের জন্ম হয়, তারও শিক্ষাপ্রদ বিবরণ দানে চিত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক ১নং ব্লাস্ট ফার্ণেসের উদ্বোধন, প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্তৃক মিডিয়ম সেকশন মিলের উদ্বোধন এবং ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথের দুর্গাপুর দর্শন, ভারতে বৃটিশ হাই-কমিশনার মহামান্য ম্যালকম ম্যাক-ডোনাল্ড-এর দুর্গাপুরে আগমন প্রভৃতি স্মরণী ঘটনাকেও এই ছবির মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ছবিটির জন লট লিখিত ও পিয়ার্সন সুরিটা কথিত ধারা বিবরণী চিত্রে প্রদর্শিত দৃশ্যাগুলিকে সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে চিত্রটির আকর্ষণকে বর্ধিত করেছে। আবহ-সঙ্গীত যেটুকু ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আবহ-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ছবিটির একটি দূরীলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করলে জনসাধারণ "দুর্গাপুর বিবরণ" দেখে আনন্দ লাভ করতে পারেন।

ছক্কাপান্জা ঃ

আজ শুক্রবার, ১৮ই জানুয়ারী থেকে রূপবাণী, অরুণা এবং ভারতীতে দেখানো হবে "ছক্কা পান্জা" নামে একটি অপরাধমূলক কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র। শোনা যাচ্ছে, অধুনালুপ্ত ফিল্ম কর্পোরেশনে তোলা একদা বিখ্যাত "পাপের পথে" ছবিখানিকেই বেশ কিছু অদল-বদল করে এবং নতুন গানে সমৃদ্ধ করে এই "ছক্কা পান্জা" গড়ে উঠেছে। কথাটা সত্যি হলেও বর্তমানের চলচ্চিত্র-রসিকদের পক্ষে [illegible] কথা, কারণ তাঁরা [illegible]

একখানি বিখ্যাত অপরাধমূলক ছবিকে আজকের দিনে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

*

ইসিকা নাম দুনিয়া হ্যায় :

এ সপ্তাহে হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে দুখানি; এক, জে বি প্রোডাকসন-এর "ইসিকা নাম দুনিয়া হ্যায়"। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শক্তি সামন্ত এবং এতে সুর সৃষ্টি করেছেন রবি। অশোককুমার, শ্যামা, সাহিরা, মেহমুদ, কে এন সিং ও হেলেন অভিনীত এই ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে অপেরা, প্রভাত, দর্পণা, গণেশ, রূপালী, ইন্টালী, ভবানী, প্যারামাউন্ট প্রভৃতি চিত্রগৃহে।

*

ডাঃ বিদ্যা :

দ্বিতীয় হিন্দী ছবি হচ্ছে মোহন সায়গল নিবেদিত রাজেন্দ্র ভাটিয়া পরিচালিত এবং এস ডি বর্মন দ্বারা সুরসমৃদ্ধ ডি ল্যুক্স ফিল্ম-এর ডাঃ বিদ্যা। বৈজয়ন্তীমালা, মনোজকুমার এবং হেলেন অভিনীত এই ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে প্যারাডাইস, কৃষ্ণা, খান্না, কালিকা, মেনকা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে।

*

প্রাচী সিনেমার নবরূপ :

সম্প্রতি মধ্য কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ "প্রাচী"-র আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহটির আয়তন বৃদ্ধি, তাকে মনোরমভাবে আলোকিত এবং অলঙ্কৃত করা ছাড়াও রূপালী পর্দা ও তার আবরণটিকেও আধুনিক রুচিসম্মত করে ছবি দেখার আনন্দকে বহুগুণে বর্ধিত করা হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত "প্রাচী"-র আধুনিক রূপ আমাদের চমৎকৃত করেছে।

*

কোটৈশ্বে সিণ্ডিকেট-এর "অপরূপ কথা" :

কিশোর চিত্র "অপরূপ কথা"র কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। গেল ১লা জানুয়ারী টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় কিশোর শিল্পীদের গাওয়া দুখানি গান শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

*

'এরা শিল্পী' সম্প্রদায়-এর 'তাইতো' :

গেল ২৮এ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার সৌখীন মহিলা শিল্পী সম্প্রদায় 'এরা শিল্পী' রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'তাইতো' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। দীননাথের ভূমিকায় বীণা দে, জীবনময়ের ভূমিকায় জ্যোৎস্না নাথ এবং সমীর, সময় ও পরাণের ভূমিকায় যথাক্রমে রীতা বসু, সবিতা ভট্টাচার্য ও সবিতা সমাজদারের অভিনয় [illegible] দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। অপরাপর ভূমিকায় বীণা ঘোষ,

'এরা শিল্পী' অভিনীত 'তাইতো' নাটকের একটি দৃশ্যে বীণা ঘোষ ও সবিতা সমাজদার

মাধবী দাস, ইলা সমাদ্দার, সীতা বসু প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। সৌখীন মহিলাদের দ্বারা এমন নিখুঁত অভিনয় খুব কমই দেখতে পাওয়া গেছে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিলেন বীণা ঘোষ।

'সুরতীর্থে'র দ্বাদশতম সঙ্গীত সম্মেলন

গত ২৯শে ডিসেম্বর ডোভার লেনের সিংহী পার্কে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে 'সুরতীর্থে'র দ্বাদশতম সঙ্গীত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরন্ময়

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

প্রথম দিন নৃত্যানুষ্ঠানে 'সুরতীর্থের' শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কয়েকটি নাচ অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। এইদিন বিশেষত 'কুমার-সম্ভব' নৃত্যনাট্যের অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কুমার কার্তিকেয়-এর জন্ম ও তারকাসুর বধের কাহিনীটি সার্থক প্রতীকের পর্যায়ে উন্নীত। সর্বশ্রী বালকৃষ্ণ মেনন, শান্তি রায় ও মায়া সেনের যথাক্রমে শিব, তারকাসুর ও পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় অসাধারণ। বসন্ত ঋষির কর্তৃক উমার তপোভঙ্গের কৌতুকাবহ দৃশ্যটি নাট্য-প্রযোজকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। শ্রীনীরদ প্রযোজকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। শ্রীনীরদবরণের সঙ্গীত-পরিচালনা ছিল এই নৃত্যনাট্যের প্রাণস্বরূপ। নেপথ্য সঙ্গীতে শ্রীমতী প্রতিভা কাপুরের স্বরগীত ভজন গানটি মনে করে রাখবার মতো।

দ্বিতীয় দিন ৩০শে ডিসেম্বর-এর অনুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীতে মালবিকা কানন পুরিয়া-ধানশ্রী রাগে খেয়াল ও একটি ঠুংরী পরিবেশন করেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, শ্রীনিখিল ব্যানার্জি, ওস্তাদ মহম্মদ সাগিরুদ্দিন,

সুরতীর্থের দ্বাদশতম উৎসবে 'অর্জুন-দ্রৌপদী' নৃত্যে অর্জুনের ভূমিকায় বালকৃষ্ণ মেনন

পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ সম্মেলনে যোগদান করেন।

স্বরোদে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ-র নৈপুণ্য সম্বন্ধে বাগবিস্তার বাহুল্য। তবে, এইদিনের বাজনা বহুদিন শ্রোতাদের স্মরণে থাকবে। তিনি পরপর ইমন-কল্যাণে আলাপ, মিশ্র হিন্দোল-হেম ও পিলু রাগে গৎ বাজিয়ে শোনালেন। কোমল পর্দার আশ্চর্য ব্যবহার ও সূক্ষ্মশ্রুতির নিপুণ কারুকার্যমণ্ডিত দ্রুত গৎ-এর সঙ্গে তবলায় ওস্তাদ কেরামতুল্লার যোগ্য 'সাথ-সঙ্গৎ'-এর তুলনা হয় না।

পরিমিত সময়ের মধ্যে এই সঙ্গীত-সম্মেলনটি যথার্থই সুপরিচালিত।

রূপমের একটি অনুষ্ঠান :

'রূপমের' বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত শুক্রবার ২৮এ ডিসেম্বর শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ধমানের মহারাণী শ্রীমতী রাধারাণী মহাতাব। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রী পি বি মুখার্জি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর।

অভিনয়ে যে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা ও সাফল্যের পরিচয় লক্ষ্য করা গেল তা সাধারণতঃ পেশাদারী বা অপেশাদারী মঞ্চে খুব কমই দেখা যায়।

কলিকাতা—

সঙ্গীত-শিল্পী শ্যামল মিত্রের প্রযোজনায় রূপছায়া চিত্রের নতুন ছবি 'দেয়া নেয়া'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। কলাকুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন আলোকচিত্রে কানাই দে, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও শিল্প-নির্দেশনায় সুনীল সরকার। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার ও জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন প্রযোজক শ্যামল মিত্র।

বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনী হিসেবে অগ্রগামী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিশীথে' একটি দুরূহ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। তাছাড়া এ কাহিনী সম্পর্কে ছোটগল্পের বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের যে সম্পদ পাঠকদের এতদিন ধরে কৌতূহল জাগিয়ে এসেছে তা আজ চলচ্চিত্রায়নে সার্থক হতে চলেছে। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নন্দিতা বসু, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছায়া দেবী, গঙ্গাপদ বসু, শৈলেন গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল ও জীবন কর্মকার। আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথার্থ গুণের পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, কালী রাহা ও সুধীর খান। সঙ্গীত-পরিচালনায় এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবির মধ্যে অন্যতম হরিদাস ভট্টাচার্যের 'শেষ অঙ্ক'। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ... চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল,

কমল মিত্র, তরুণকুমার, দীপক মুখার্জি, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায় ও জীবেন বসু। কল্পনা মুভিজের এ ছবির পরিচালক ও প্রযোজক হরিদাস ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। সংগীত-পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কানাই দে।

অসীম পাল পরিচালিত ও শৈলেশ দে রচিত 'দুই বাড়ী' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। নায়ক-নায়িকার দুটি মধুর চরিত্রে যথার্থ অভিনয় করেছেন অনিল চ্যাটার্জি ও তন্দ্রা বর্মণ। প্রধান চরিত্রের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, গীতা দে, অনুপকুমার, জহর রায় ভানু ব্যানার্জি, জীবেন বসু ও মণি শ্রীমানি অন্যতম। আলোকচিত্র পরিচালনা করেছেন কানাই দে ও মনীশ দাশগুপ্ত। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন।

বোম্বাই—

গত বছরে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মোট সংখ্যা হল ১১৮টি। তার মধ্যে হিন্দী ও উর্দুর সংখ্যা—৮২, মারাঠি—২২, গুজরাঠী—৫, পাঞ্জাবী—৫, ইংরাজী—২, ভোজপুরী—১ ও তামিল মাত্র একটি।

রুহী ফিল্মসের 'জানোয়ার' যন্ত্রস্থ। হরদীপ প্রযোজিত বাপ্পি সোনি পরিচালিত এই রঙিন ছবির দুটি জনপ্রিয় নায়ক নায়িকা শাম্মি কাপুর ও রাজশ্রী। অন্যান্য অংশে অভিনয় করছেন রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, ডেভিড, মাধবী ও পৃথ্বিরাজ কাপুর। মডার্ণ স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। আলোকচিত্রশিল্পী তারু দত্ত। সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ।

এয়ার-ফোর্স অফিসার-র চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ। ছবির নাম 'সানহাই'। এ ছবির প্রযোজক-পরিচালক এস ডি নারাং। নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন রাজশ্রী। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কয়েকটি মনোরম দৃশ্যে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন নিরূপা রায়, লীলা চিটনীস, জনি ওয়াকার, অসিত সেন, তুনতুন ও চাঁদ ওসমানি। এ ছবির সুরকার রবি।

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তীর রঙিন ছবি 'জিদ্দি'-র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়েছে মডার্ণ স্টুডিওয়। প্রধান ভূমিকায় ও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি, আশা পারেখ, শুভা খোটে, মামুদ ও রাজ মেহরা। আলোকচিত্র ও শিল্পনির্দেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, কে, মূর্তি ও শান্তি দাস। সংগীত পরিচালনা করছেন এস, ডি, বর্মণ।

মাদ্রাজ—

শ্রীধর পরিচালিত চিত্রালয়ের 'দিল এক মন্দির'-এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল মাত্র একমাস সময়ে। এত দ্রুত কাজ এর আগে এখানে কোন হিন্দী ছবির হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। একটি হাসপাতালের জীবনকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী, রাজেন্দ্রকুমার, মনমোহন কৃষ্ণ, অচলা সহদেব, সুন্দর, কৃষ্ণকুমারী, মমতাজ বেগম, শুভা খোটে ও মামুদ। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

ভেনাস পিকচার্সের এস, কৃষ্ণমূর্তি এবং পদ্মিনী পিকচার্সের বি, আর, পান্থালু সম্প্রতি যুক্তভাবে ভেনাস-পদ্মিনী পিকচার্স প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করলেন। বিজয়া স্টুডিওর তিনটি ফ্লোরে এই সংস্থা পরিচালিত ছবিগুলির কাজ অতি শীঘ্র আরম্ভ হবে।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
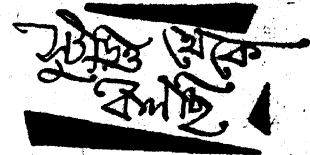
নতুন বছরের নতুন ছবি সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'। 'অভিযান'-এর সার্থক অভিযানপর্ব শেষ করে সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় টেকনিসিয়ান স্টুডিওর আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত এ ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। নরেন্দ্র মিত্র রচিত 'অবতরণিকা' গল্প অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা করছেন শ্রীরায়।

মধ্যবিত্ত জীবনের একটি সংসার। উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দুখানা ঘর। তারই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সুব্রত তার স্ত্রী আরতি আর এক ছোট ছেলে। তাছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা,

আর ছোট বোন। কলকাতার বুকে এই সংসার। নেহাত ছোট নয়।

নিখুঁত এই সংসারটিকে দেখলাম সেদিন নতুন স্টুডিও-ফ্লোরে। সাজিয়েছেন শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। পাশাপাশি দুটি ঘর। সামনের দিকে সুব্রত-আরতির ঘর। খাট, আলনা আর টেবিলে ঠাসা। এই ঘরে দৃশ্যগ্রহণের জন্য আলোর সংযোগ করছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র। মহলা দেবার পর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। অভিনয় করছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, নবাগত জয়া ভাদুড়ী ও শিশুশিল্পী প্রসেনজিৎ।

অবতরণিকা অবলম্বনে 'মহানগর'-এর কাহিনী নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র-নাট্যে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। তবে নরেন্দ্র মিত্রের যে গল্প তা থেকে মোটামুটি কাহিনী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনাদের আগেভাগে জানিয়ে রাখি।

পুত্রবধূ আরতিকে ঘরে আনলেন
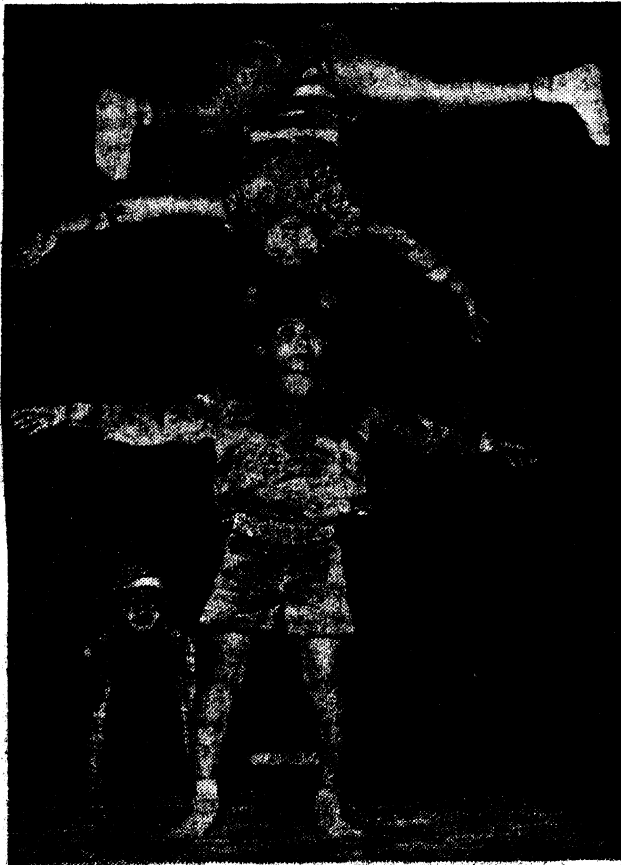
'মহানগর'-এর একটি দৃশ্য গৃহীত হবার পূর্বে নায়ক-নায়িকা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়

[illegible]

প্রিয়গোপালবাবু। একদিন তাঁর জমিদারী সেরেস্তার চাকরী গেল। পাকিস্থান হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্র সুব্রত লিখলো— 'দু' জায়গার খরচ চালাবার আমার সাধ্য নেই। মাকে নিয়ে আপনিও চলে আসুন।' সেই থেকে কলকাতায়।

একা সুব্রতর আয়ে এ সংসার পিছিয়ে পড়ছিল। তাই আরতিকে কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সুব্রতর একান্ত ইচ্ছায় চাকরীক্ষেত্রে পা বাড়াতে হয়। অবশেষে ক্যানিং স্ট্রীটের মুখার্জি এণ্ড মুখার্জি ফার্মে আরতির চাকরী হল। কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। স্টেশনারী স্টোর্স ছাড়াও একটা নতুন ধরনের উলেন মেশিনের এজেন্সী নিয়েছে মুখার্জি এণ্ড মুখার্জি। এই মেশিনের ব্যবহার ক্রেতাদের শেখাতে হবে।

প্রথমে ঘরের বউকে চাকরীতে পাঠানো প্রিয়গোপালবাবুর বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু এত বড় সংসার শুধু সুব্রতর একার আয়ে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তাইতো সকলের অমতে (শুধু সুব্রত ছাড়া) আরতি দশটা-পাঁচটার জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। প্রথম মাসের মাইনের টাকা পেয়ে সে নিজের ছোট ছেলে ও ননদের জন্য লজেন্স আর লেবু, শাশুড়ীর জন্য এক কৌটো ভাল জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য এক ঠোঙা আঙুর, স্বামীর জন্য একটিন ভাল সিগারেট আর নিজের জন্য দুটো ব্লাউজের দু'গজ অর্গাণ্ডি কিনে এনেছিল। আস্তে আস্তে সংসার এমনিভাবে আবার স্বাভাবিক এবং সচ্ছল হল।

অফিসনিষ্ঠ আরতি। সুব্রতকে পর্যন্ত হার মানায়। ভোর থেকেই চলে তার প্রস্তুতি। রান্নার দায়িত্বটা শাশুড়ি নিজেই পালন করেন। তাই তো এক একদিন রাগ করে বলে ফেলেন— 'এসেছিল হেঁসেল ঠেলতে, [illegible] বাই। ছেলের বিয়ে দিয়ে খুব সুখ হল

আমার।' কিন্তু উপায় নেই আরতির। মুখার্জি এণ্ড মুখার্জির অধিকর্তা হিমাংশু মুখার্জি বাস্তবেপী পাংচুয়াল। অফিস শুরু হবার আগে থেকেই তার একচোখ থাকে এ্যাটেনডেন্সের খাতায় আর একচোখ ঘড়ির কাঁটায়।

সবকিছুই ঠিক চলছিল। সংসার সচ্ছলও হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক সুবিধাটাই তো সব নয়। সখ, আহ্লাদ এমনকি ভালবাসা সবই চলে যেতে শুরু করেছে ঐ অফিস-ডিউটি আর মেশিন বিক্রীর কমিশন আদায় করে অসময়ে বাড়ী ফিরতে। স্বামী-স্ত্রীর রোমান্স বুঝি লোপ পেল। বেশ কয়েকমাস সহ্য করে আর সুব্রত চুপ করে থাকতে পারলো না। আরতিকে চাকরী ছাড়তে বলে। কিন্তু আরতি শোনে না। এই কয়েকমাসে চাকরীর অর্থ-রোমান্সে জড়িয়ে পড়েছে। এরমধ্যে কত হিসেব, কত যুক্তি, কত রাগ, কত কাকুতি-মিনতি! চাকরীর মোহ—নিজের হাতে টাকা রোজগারের মোহ তাকে পেয়ে বসেছে। তাই রাত্রে সুব্রতর অত নিষেধ সত্ত্বেও পরদিন অফিস বেরুলে সুব্রত জানতে চায়—

সুব্রত—তুমি আবারও যাচ্ছ!

আরতি স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় তারপর মিষ্টি হেসে বলে—

আরতি—হ্যাঁ যাই, আজ আর অত রাত হবে না। ছ'টার মধ্যেই ফিরবো।

সুব্রত—তবু তুমি যাবেই!

আরতি—না গেলে চলবে কি করে? অফিস তো, একটা নিয়ম-কানুন আছে। নিজেও তো কর। সেসব যে না জানো, তা তো নয়। হুট্ করে কি ছেড়ে দিয়ে আসা যায়?

কথা বন্ধ হল। কিন্তু অফিস যাওয়া বন্ধ হল না আরতির। এভাবে আর চলল না। সুব্রত স্থির করলো, কিছুদিন আলাদা থাকব। শ্বশুরকে জানালো। কিন্তু হঠাৎ রাতারাতি জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে তালা পড়ল। সুব্রতর চাকরী গেল। বাধ্য হয়ে পুরোদমে অফিস করে আরতি। অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রীর কমিশনের জন্য টালা থেকে টালিগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন আর কথা বলে না। সুব্রত পর্যন্ত। কিন্তু ঘটনাচক্রে আরতি চাকরী ছাড়ল। একদিন অফিস কলিগ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডি এডিথকে অসাক্ষাতে মুখার্জি এণ্ড মুখার্জির হিমাংশুবাবু অসম্মানজনক কথা বলেন। নিজের সম্মান বাঁচাতে আরতি চাকরী ছেড়ে আবার সংসারী হল।

সুব্রত এখনও কোন চাকরী পায়নি।

চলচ্চিত্রায়নে এ কাহিনীর কয়েকটি প্রধানচরিত্র অভিনয় করছেন সুব্রত—অনিল চট্টোপাধ্যায়, আরতি—মাধবী মুখোপাধ্যায়, প্রিয়গোপাল—হরেন চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী—শেফালিকা পুতুল। বাণী—জয়া ভাদুড়ী, পিন্টু—প্রসেনজিৎ এবং হিমাংশু মুখার্জি—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর'-চিত্রে কলা-কুশলীদের মধ্যে রয়েছেন সহকারী পরিচালনায় শৈলেন দত্ত, অমিয় সান্যাল ও নিরীশরঞ্জন। আলোকচিত্রে সুব্রত মিত্র। সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও শব্দ-গ্রহণে দুলাল দত্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত ও দেবেশ ঘোষ। রূপনে অনন্ত দাস। কর্ম-পরিচালক অনিল চৌধুরী এবং ব্যবস্থাপনায় ভানু ঘোষ।

●

সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলালের স্মৃতিপূজা:

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'-আয়োজিত সুরেন্দ্রলাল দাসের স্মৃতিপূজা এবং সঙ্ঘের চতুর্বিংশ প্রতিষ্ঠান দিবসের একটি সঙ্গীত সমাবেশে সুরের ঝরণাধারায় অবগাহন করতে করতে বার বার আমার মনে পড়ছিল স্বনামে ধন্য সুরের ঐন্দ্রজালিকদের।

উত্তর কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সংগীত-সংস্থা আওয়ার অর্কেস্ট্রা। সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রলালের আদর্শে পরিচালিত।

সুরেন্দ্রলাল পরিকল্পিত ও সজ্জিত বিভিন্ন রাগরাগিণী আওয়ার অর্কেস্ট্রার সভ্যা ও সভ্যরা কখনও কণ্ঠসঙ্গীতে, কখনও বা যন্ত্রসঙ্গীতে এবং কখনও বা অর্কেস্ট্রায় মূর্ত করে তুলেছিলেন। বহু অপ্রচলিত এবং প্রায়-অবলুপ্ত রাগ-রাগিনী পুনরুদ্ধার করে একদিন সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল সঙ্গীত-পিপাসুদের আনন্দবর্ধন করেছিলেন। বহু রাগরাগিণীর তিনি ছিলেন উদ্ভাবক ও পরিকল্পক। বর্তমান আয়োজনটি সামগ্রিক সম্পূর্ণতায় এবং সুরবৈশিষ্ট্যের অতিদুর্লভ চারুতায় ও বিশুদ্ধ রূপায়ণে সার্থক হয়ে উঠেছিল।
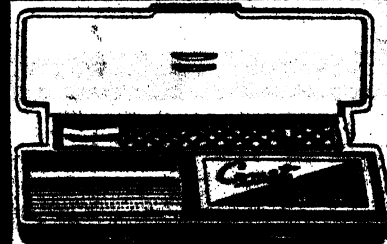
দর্শক

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

এম সি সি : ৩৩১ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; ডেভিড শেফার্ড ৮২, কেন ব্যারিংটন ৭৩, বেরী নাইট ৬৮ এবং রয় ইলিংওয়ার্থ নট আউট ৬৫) ও **১১৬ রাণ** (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। শেফার্ড ৬৭, পারফিট ৩৮ নট আউট)।

সম্মিলিত একাদশ দল : ৭৭ (ও'নীল ২২ রাণ। ফ্রেডী ট্রুম্যান ১৩ রাণে ৪ এবং ডেভিড লার্টার ২৪ রাণে ৪ উইকেট) ও **৫৭ রাণ** (ডেভিড এ্যালেন ১৯ রাণে ৪ এবং রয় ইলিংওয়ার্থ ১১ রাণে ৩ উইকেট)।

মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে পরাজিত ক'রে অস্ট্রেলিয়া সফরের পরবর্তী খেলায় এম সি সি ৩১৩ রাণে সম্মিলিত একাদশ দলকে পরাজিত করেছে। তিন দিনের এই প্রথম শ্রেণীর খেলায় এম সি সি'র জয়লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মিলিত একাদশ দলের তিনজন খেলোয়াড়—বিল লরী, ব্রায়ান বুথ এবং নর্মাণ ওনীল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় খেলেছিলেন এবং এই তিনজন এবং বেরী শেফার্ড তৃতীয় টেস্ট খেলায় নির্বাচিত বারজন খেলোয়াড়ের নামের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। অপরদিকে আলোচ্য খেলায় এম সি সি দলের পাঁচজন খেলোয়াড় ডেক্সটার, শেফার্ড ব্যারিংটন, টিটমাস এবং ট্রুম্যান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বিজয়ী ইংল্যান্ড দলে ছিলেন।

প্রথম দিনের খেলায় এম সি সি ৭ উইকেটে ৩৩১ রাণ তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। রেভারেন্ড ডেভিড শেফার্ড দলের সর্বোচ্চ ৮২ রাণ করেন ১৬৫ মিনিটের খেলায়। একটা ওভার বাউণ্ডারী এবং নটা বাউণ্ডারী করেন। দলের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় শেফার্ড এবং ব্যারিংটন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে শেফার্ড (৮২) এবং ব্যারিংটন (৭৩) দলের ১৪৭ রাণ তুলেন ১৪৯ মিনিটের খেলায়। দলের ২ রাণ এবং ৭ রাণের মাথায় যথাক্রমে ১ম ও ২য় উইকেট পড়ে যায়। এই দিনে কোন উইকেট না হারিয়ে সম্মিলিত একাদশ দল ১৫ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনে সম্মিলিত একাদশ দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৭ রাণে শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ২২ রাণ করেন টেস্ট খেলোয়াড় ও'নীল। চারজন গোল্লা করেন। এই নিয়ে আলোচ্য সফরে এম সি সি দলের বিপক্ষে দ্বিতীয়বার এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রাণ উঠলো। প্রথম বারেও ৭৭ রাণ ওঠে ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে। সম্মিলিত একাদশের এই শোচনীয় ব্যর্থতার মূলে ছিল ট্রুম্যান এবং লার্টারের মারাত্মক বোলিং। ট্রুম্যান ১৩ রাণে ৪ এবং লার্টার ২৪ রাণে ৪টে উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দলের একটা উইকেট পড়ে ১১৬ রাণ দাঁড়ায়। শেফার্ড এবারও অর্ধশত রাণ (৬৭) করলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় এম সি সি দল আর ব্যাট ধরে নি। পূর্ব দিনের ১১৬ রাণের (১ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই খেলাতে এম সি সি মোট ৮টা উইকেট হারিয়ে দুবার ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সম্মিলিত দলের খেলা আরও খারাপ হল—মাত্র ৫৭ রাণে ইনিংস শেষ।

এম সি সি দলের বিপক্ষে এবারের সফরে এই ৫৭ রাণই উপস্থিত এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রাণ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এম সি সি দলের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড আরও কম, মাত্র ১৫ রাণ—মেলবোর্ণ মাঠে ১৯০৩—৪ সালের সফরে ভিক্টোরিয়া দল এই রাণ করে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এম সি সি তথা ইংল্যান্ড দলের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড—৪৫ রাণ (সিডনি, ১৮৮৬—৮৭)।

আলোচ্য খেলায় সম্মিলিত দল দ্বিতীয় ইনিংসে বিপর্যস্ত হয় স্পিন বোলার ডেভিড এ্যালেন এবং রে ইলিংওয়ার্থের বোলিংয়ে। প্রথম ইনিংসে তারা কাত হয়েছিল ফাস্ট বোলার ট্রুম্যান এবং ডেভিড লার্টারের গোলাতে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এ্যালেন ১৯ রাণে ৪টে এবং ইলিংওয়ার্থ ১১ রাণে ৩টে উইকেট পান। বৃষ্টির দরুণ পীচ স্পিন বোলারদের সাহায্য করেছিল। তবে এ রকম বিপর্যয় হবে কেউ ধারণা করেন নি। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে এক ঘন্টা আগেই সম্মিলিত দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। খেলাও এই দিন এক ঘন্টা দেরীতে আরম্ভ হয়েছিল।

টাসমানিয়ার বিপক্ষে এম সি সি দলের দু'দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। টাসমানিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ২০৩ রান ওঠে। দলের সর্বোচ্চ ৮২ রান করেন রে স্টোক্স। ব্যারিংটন ৩৫ রানে ৪টে উইকেট পান। এম সি সি দল প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র দুটো উইকেট খুইয়ে টাসমানিয়া দলের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা (২০৩ রান) ছাড়িয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে এম সি সি দল শেষ পর্যন্ত ৩২৪ রান ক'রে ১২১ রানে অগ্রগামী হয়। পারফিট সেঞ্চুরী (১২১ রান) করেন। টাসমানিয়ার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ও'ব্রিয়েন ৭৩ রানে ৭টা উইকেট পান। এক সময় তাঁর বোলিংয়ের অঙ্ক ছিল ৩১টা বলে ২৩ রান দিয়ে ৬টা উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে টাসমানিয়ার সূচনা খুবই নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। মাত্র ৫৪ রানে ৪টে উইকেট পড়ে যায়। পঞ্চম উইকেটের জুটি রে স্টোক্স এবং বি হেল্যান্ড ৭০ মিনিটের খেলায় ১০০ রান তুলে দিয়ে এম সি সি দলকে জয়লাভের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেন। ন্যাটা খেলোয়াড় স্টোক্স শেষ পর্যন্ত ৭৬ রান ক'রে অপরাজেয় থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই দলকে পরাজয় থেকে রক্ষা করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স

চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত ৩১তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুপরি চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি রাজশেখরণ ১০০ মিটার দৌড় অনুষ্ঠানে (হিটে) ১০·৫ সেকেণ্ডে দূরত্বপথ অতিক্রম ক'রে ভারতীয় রেকর্ড (১০·৬ সেঃ) ভঙ্গ করেন। দশ বছর আগে (১৯৫৩ সাল) বোম্বাইয়ের লেভি পিণ্টো এই রেকর্ড (১০·৬ সেঃ) স্থাপন করেছিলেন। রাজশেখরণ এই সঙ্গে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডও (১০·৭ সেঃ) ভঙ্গ করেছেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। রাজশেখরণ স্বল্পপাল্লায় একজন কুশলী দৌড়বীর। জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত গত জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন এবং জাকার্তার এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজের (১৯৬২-৬৩) আগে পর্যন্ত রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল চারটি দেশের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট সিরিজ খেলে প্রত্যেকটিতে 'রাবার' লাভ করেছে—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দু'বার এবং একবার ক'রে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়াকে আজ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নিঃসন্দেহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলা যায়। সিডনির ওভাল মাঠের এই তৃতীয় টেস্ট খেলাটি রিচি বেনোর ব্যক্তিগত খেলোয়াড় জীবনের ৫৭তম টেস্ট খেলা এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসাবে তাঁর পঞ্চবিংশতি টেস্ট খেলা। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এইরকম ২৫বার দল পরিচালনা করেছেন একমাত্র বিল উডফুল (১৯৩০-৩৪)। রিচি বেনো যদি তাঁর পূর্ব-ঘোষিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করেন তাহলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজই তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের শেষ অধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া প্রতিটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয় করেছে এই অদ্বিতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিতে চান। কিন্তু আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। পাঁচটা টেস্ট খেলার মধ্যে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র গেছে এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড জয়লাভ ক'রে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে আছে। খেলার এই অবস্থায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে সরাসরি 'রাবার' জয় করতে হলে বাকি তিনটে খেলায় অন্ততঃ এই রকম ফলাফল তাদের করতে হবে—জয় ২ এবং খেলা ড্র ১। সমগ্র পৃথিবীর ক্রিকেট অনুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি আজ একজনের উপরই নিবদ্ধ—সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি রিচি বেনো।

॥ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ॥

১৯৬২ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা (সন্তোষ ট্রফি) অনুষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্গালোরে। প্রতিযোগিতায় ১৪টি প্রদেশ নাম দেয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ৯টি প্রদেশ যোগদান করে। প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে সার্ভিসেস, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা। গত বছরের সন্তোষ ট্রফি জয়ী রেলওয়ে এবং রানার্স-আপ মহারাষ্ট্রের প্রথম খেলা দেওয়া হয় কোয়ার্টার ফাইনালে। বাংলা প্রথম রাউন্ডের খেলায় মধ্যপ্রদেশের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার পায়। বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে ৫—০ গোলে কেরালাকে এবং সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে গত বছরের বিজয়ী রেলওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ২—০ গোলে অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে মহীশূরের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়। মহীশূর প্রথম রাউন্ডে ২—১ গোলে রাজস্থানকে এবং কোয়ার্টার-ফাইনালে ২—১ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

ফাইনালে বাংলা ২—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত ক'রে এগারবার সন্তোষ ট্রফি জয়লাভের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলার পক্ষে গোল দেন দীপু দাস এবং সন্তোষ চ্যাটার্জি।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪১ সালে। তিন বছর (১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৮) খেলা হয়নি। এ পর্যন্ত মোট খেলা দাঁড়িয়েছে ১৯ বার। এই ১৯ বার খেলার মধ্যে বাংলা ১৫ বার ফাইনালে খেলে ১১ বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। একটানা ফাইনালে খেলেছে ১০ বার (১৯৪১—৫৩) এবং এই সময়ের মধ্যে জয় সাতবার—একটানা চারবার (১৯৪৭, ১৯৪৯—৫১)। বাংলা ছাড়া আর মাত্র ৬টি দল (দিল্লী, মহীশূর, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে) সন্তোষ ট্রফি জয় করেছে। এই ৬টি দলের মধ্যে মহীশূর এবং হায়দরাবাদ পেয়েছে দু'বার ক'রে।

গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে বাংলা বনাম মহীশূর দলের মধ্যে সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল খেলা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাতে খেলাটি নাটকীয়ভাবে শেষ সময়ে স্থগিত রাখা হয় এবং ঘোষণা করা হয় ১২ই জানুয়ারী খেলা হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে, মাত্র এই অজুহাতে ঐ দিনও খেলা স্থগিত রাখা হয়। খেলার তারিখ আরও দু'দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়—১৪ই জানুয়ারী। এইভাবে খেলার দিন পরিবর্তনের কারণ স্পষ্ট—প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠে দর্শক সমাবেশ কম হবে এবং জলসিক্ত মাঠ মহীশূর দলের খেলার অনুকূল হবে না।

বাংলা বনাম মহীশূর

১৯৪৬ মহীশূর ২ : বাংলা ১
১৯৫২ মহীশূর ২ : বাংলা ১
১৯৫৩ বাংলা ১ : মহীশূর ০
১৯৫৫ বাংলা ১ : মহীশূর ০
১৯৬২ বাংলা ২ : মহীশূর ০

সন্তোষ ট্রফি ফাইনাল

	বিজয়ী	বিজিত	গোল
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	[illegible]—০
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	১—১, ২—১
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	০—০, ১—০
১৯৪৯	বাংলা	হায়দরাবাদ	৫—০
১৯৫০	বাংলা	হায়দরাবাদ	১—০
১৯৫১	বাংলা	বোম্বাই	১—০
১৯৫২	মহীশূর	বাংলা	১—০
১৯৫৩	বাংলা	মহীশূর	০—০, ৩—১
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস	২—১
১৯৫৫	বাংলা	মহীশূর	০—০, ১—০
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	১—১, ৪—১
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০
১৯৫৮	বাংলা	সার্ভিসেস	১—০
১৯৫৯	বাংলা	বোম্বাই	৩—১
১৯৬০	সার্ভিসেস	বাংলা	০—০, ১—০
১৯৬১	রেলওয়ে	মহারাষ্ট্র	৩—০
১৯৬২	বাংলা	মহীশূর	২—০
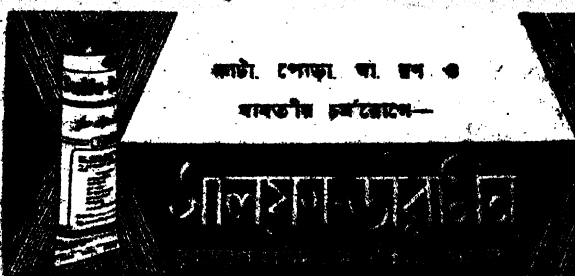
২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 25th January, 1963.
40 Naya Paise.

কলম্বো প্রস্তাবাবলী অর্থাৎ চীন-ভারত সীমান্ত-যুদ্ধ নিরোধের জন্য ছয়টি শক্তিজোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কলম্বোতে সম্মিলিত হইয়া যে প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন ও যুদ্ধরত রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রধানদিগের নিকট প্রেরণ করেন সেই প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পাদকীয় লিখিবার সময় মূল প্রস্তাব এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্তৃক কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় তাহার ব্যাখ্যা ও তাহার সম্পর্কে মন্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধী দলগুলির মতামতও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবের বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই নানা কথাপ্রসঙ্গে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মূল প্রস্তাবগুলি এতদিন গোপন রাখা ছিল। কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের সম্মতিক্রমে সিংহল পররাষ্ট্র দপ্তর বিগত ১৯শে জানুয়ারি উহার প্রকাশ ও প্রচার করেন। প্রস্তাবগুলি এইরূপ ঃ—

প্রস্তাবে ভারত-চীন সীমান্তের পশ্চিমাঞ্চলে চীনাদের সামরিক চৌকি ২০ কিলোমিটার পিছাইয়া লওয়ার এবং ভারতকে বর্তমানে যেখানে তাহার সামরিক চৌকি রহিয়াছে সেইখানেই অবস্থান করার আবেদন জানানো হইয়াছে।

এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, চীনা সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে এই অঞ্চলে যে সৈন্যমুক্ত এলাকা সৃষ্টি হইবে, বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দুইপক্ষের সম্মতিক্রমে অসামরিক কর্তৃপক্ষ তাহার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

পশ্চিম অঞ্চলে চীনা সামরিক চৌকি ২০ কিলোমিটার সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাব চীনা প্রধানমন্ত্রী নিজেই শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত ২১শে ও ২৮শে নভেম্বরের পত্রে করেন।

নেফা অঞ্চল সম্পর্কে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, উভয় সরকার এই অঞ্চলের যে 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন রেখাকে' স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাই যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখারূপে গণ্য হইতে পারে। এই অঞ্চলের অপর এলাকার বিরোধ ভবিষ্যতে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

নেফা সীমান্তের মধ্যাঞ্চল সম্পর্কে কলম্বো সম্মেলন শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করিয়াছেন। এইখানে বলা প্রয়োজন যে এই কলম্বো প্রস্তাবাবলী সীমান্ত-বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সর্ত নহে। প্রস্তাবে যেরূপ ব্যবস্থা করার অনুরোধ দুইপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেরূপ ব্যবস্থা উভয়তঃ স্বীকৃতি পাইলে উহার বলে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি এবং চূড়ান্ত আলোচনা চলিতে পারে কলম্বোয় মিলিত রাষ্ট্রগুলি এইরূপ আশা করেন।

পণ্ডিত নেহরুর মতে কলম্বো সম্মেলনে যোগদান-কারী প্রতিনিধিবর্গ ঐ প্রস্তাবের যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিবেচনা করার পর দেখা যায় যে সীমান্ত সংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভের পূর্বে যাহা ভারতের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় ঐ প্রস্তাব প্রায় তাহার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে।

অন্যদিকে কম্যুনিস্টদল বাদে বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ বিগত রবিবার নয়াদিল্লীতে সম্মিলিত হইয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সালের অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে দাবী ভারতের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে কলম্বো প্রস্তাব তাহার অনুরূপ নহে, অনুকূলও নহে।

এখন এ-বিষয়ে শেষনিষ্পত্তি লোকসভায় হইবে এবং সেখানের আলোচনার প্রশ্নোত্তরে বুঝা যাইবে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারতের মান-ইজ্জত বজায় থাকিবে কিনা।

সমস্যা অত্যন্তই জটিল। কেননা এখানে শুধু বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মান-মর্যাদা নহে, নিরপেক্ষ গোষ্ঠী-বর্গের প্রধানদিগেরও কথা রাখার প্রশ্ন আছে। অন্যদিকে যে সর্তের উপর আলোচনার আরম্ভ, শেষনিষ্পত্তির বেলায় তাহাই আমাদের ক্ষতি না করে তাহাও স্থিরভাবে জানা প্রয়োজন।

জয়তু নেতাজি

"দিল্লী চলো"

"......দূরে, বহুদূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ জলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড়পর্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোন! ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে--আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে। ওঠ, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র হাতে লও। দেখ, তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথ-প্রদর্শকগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার মধ্য দিয়া আমাদের পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিবে, শেষশয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা—একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

॥ সুভাষচন্দ্রের বাণী ॥

আমার সমগ্র জীবনই বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ও আপোষবিহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চিরজীবন ব্যাপিয়া আমি ভারতবর্ষের সেবক। আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষের সেবকই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশে আমি বাস করি না কেন, একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য এবং অনুরাগ আছে এবং চিরকালই থাকিবে।

●

আজাদ হিন্দ! যুদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং শত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাসহকারে তাহা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ন্যায়, সমতা এবং মৈত্রী, এই আভ্যন্তরীণ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্বাধীন ভারতের সমাজ শৃঙ্খলা গঠিত হইবে।

জৈমিনি

সেদিন আমাদের আড্ডায় বহুকাল পরে জীবনবাবুর দেখা পাওয়া গেল। এই সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে আমরা সকলেই খুব পছন্দ করতাম। কাজেই তাঁকে দেখে খুব উৎসাহিত হ'য়ে ওঠা গেল।

কথা হচ্ছিল মদ্যপানের বিষয়ে। আমরা সকলেই প্রায় এ বিষয়ে একমত ছিলাম যে মদ্যপান খুবই অহিতকর। আড্ডাটা সেই জন্যে তেমনভাবে জমে উঠতে পারছিল না। কারণ তর্ক না হলে কোনো আড্ডাই ভালো করে জমে না, আর আমাদের মধ্যে তর্ক করার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা ছিল না।

ক্ষমতা না থাকার একটা কারণ তো আগেই উল্লেখ করেছি—মনে মনে সকলে একমত হলে তর্ক জমে না। দ্বিতীয় কারণ, মেজাজের স্থিতিস্থাপকতার অভাব। প্রাণপণে তর্ক করব অথচ রাগারাগি করব না, এই ব্যবহারিক কৌশলটা আমাদের অনায়ত্ত ছিল। সেইজন্যে চট করে কোনো বিষয়ে বাঁকা কথা বলতে আমরা ইতস্তত করতাম। অল্পস্বল্প রসিকতা, গা-বাঁচানো প্রতিবাদ এবং হাসি, এই দিয়েই আমরা নিরাপদ আড্ডায় সান্ধ্যসুখে তৃপ্ত ছিলাম।

জীবনবাবু আসার ফলে এর গুণগত পরিবর্তন ঘটল।

পরেশ তখন বলছিল, 'মদ্যপান একটা ভাইস্, বসন্তের ভাইরাসের চেয়েও তা মারাত্মক। আমার মনে হয়—।'

জীবনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ভাইটামিন!'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, ভাইটামিন।' জীবনবাবু তাঁর সিগারে টান দিয়ে বললেন, 'সবই আছে, কিন্তু কিছু নেই—হাত পা নড়বড়ে মনটা নিষ্প্রাণ—দাও একটু সোমরস, ব্যস সব চাঙ্গা। মানুষের এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।'

'মোটেই তা নয়,' পরেশ সামলে উঠে দ্বিতীয় আক্রমণ চালাল, 'সংসারের কতো অন্যায়, কতো অশান্তি ঘটিয়েছে

আপনার ঐ সোমরস ভেবে দেখেছেন কখনো?'

'দেখেছি বইকি! জীবনবাবু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'টাকা নিয়েও তো কলহ কিছু কম হয়নি ভায়া, তাই বলে টাকার টান কি উঠে গেছে সংসার থেকে? নাকি সকলেই আমরা লোটাকম্বল নিয়ে বনে চলে গেছি?'

'বাঃ, কীসের সঙ্গে কী? আপনার তর্কের মধ্যে মস্ত বড় একটা ফ্যালাসি আছে জীবনবাবু। টাকা না হলে সংসার চলে না, কিন্তু ড্রিংক্‌স্‌ এত অপরিহার্য নয়।'

'দেখ ভায়া, পরিহার করতে চাইলে অনেক কিছুই হয়তো করা যায়। কিন্তু করব কেন? সভ্যতার ইতিহাসই হল উপকরণ-বৃদ্ধির ইতিহাস। যখন আমরা জঙ্গলে ছিলাম তখন আমাদের অনেক কিছুই ছিল না, এবং এখনো আমরা যতো সামনে এগোব ততোই আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বেড়ে যাবে। এর মধ্যে বাদ দেওয়ার প্রশ্নটা অহেতুক।'

বরেন এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। পরেশকে নীরব দেখে সে এবার বলল, 'কিন্তু জীবনদা, আমাদের এগিয়ে চলার রাস্তার যা কিছু আমরা জোগাড় করেছি সবই আমরা সঙ্গে নিয়ে চলিনি। যেমন

পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে লোহার হাতিয়ার, আবার এখন লোহা ছেড়ে পরমাণু ধরতে যাচ্ছি, তেমনি মনের জগতেও অনেকগুলো সুখের ধারণা হয়তো আমাদের ছেড়ে যাওয়া দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, মদ্যপান যে একটা প্রিমিটিভ ব্যাপার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না।'

'তোমার প্রশ্নটা এবার যেন ময়্যালিটির ধার ঘেঁষে চলছে, বরেন।' জীবনবাবু নিভে-যাওয়া সিগারে অগ্নি-সংযোগ করে বললেন, 'এ বিষয়ে অবশ্য কথা বলার এক্তিয়ার আমার খুবই কম। কিন্তু তোমার লজিক ফলো করেই বলতে পারি, নীতিবোধও তো যুগে যুগে বদলে যায় মানুষের। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য দেখ—মদ্যপান নিয়ে কতো হা-হুতাশ। কারণ তখনকার সমাজে সেটা ছিল দুর্নীতি। মদ্যপান করে সংসার উচ্ছন্নে দিত তখনকার নব্য-শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকেরা। কিন্তু এখন তার মধ্যে মাত্রাবোধ এসেছে। এখন আর কাউকে নেশা করে রাস্তায় গড়াতে দেখা যায় না, নেশার টাকা জোগাতে বাড়িঘরও কেউ নিলামে তোলে না। কাজেই একে এখন ঠিক দুর্নীতি বলা যায় কিনা জানিনে।'

পরেশ এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে বলল, 'মোটেই তা নয়। এখনো একে দুর্নীতি বলা যায়, একটু বেশিই বলা যায়। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মদ্যপান যে কী ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে গেছে, স্ট্যাটিসটিক্‌স্‌ নিলেই তা দেখতে পাবেন। 'বার'-এ যাওয়া আজকাল রীতিমত ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বরেন সায় দিয়ে বলল, 'আর বার-এ যায় না, চোলাই দ্রব্য গলাধঃকরণ ক'রে এমন লোকের সংখ্যাও কিছু কম নয়।'

'তাহলে তোমরা বলছ, মদ্যপান আইনসঙ্গতভাবে বন্ধ করাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য?'

'নিশ্চয়ই!' পরেশ ও বরেন সমস্বরে ঘোষণা করল।

'কিন্তু ভেবে দেখ, আমাদের এই গরিব দেশে কত টাকার রেভিনিউ নষ্ট হবে তার ফলে?'

'উপায় কি?' বরেন বলল, 'জন-সাধারণকে নেশার জোগান দিয়ে রেভিনিউ তুলেই বা লাভ কী? টাকা দিয়ে কার উপকার করবেন আপনি শুনি? সে যে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতো হবে জীবনদা!'

'কথাটা মন্দ নয়', জীবনবাবু বললেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে দেখ। যে রাজ্যে প্রহিবিশান চালানো হচ্ছে, মদ্যপান কি সেখানে সত্যিই ঠেকানো গেছে? নাকি বেআইনী চোলাইয়ের মাত্রাই আরো বেড়ে যাচ্ছে? শুনতে তো পাই, বোম্বাই আর দিল্লির অবস্থা খুবই ভয়াবহ।'

'অতএব, আপনি বলছেন, প্রহি-বিশান তুলে দিতে হবে?' বরেন বলল, 'তাহলে তো ভালো কাজ আর করাই যাবে না কোনোদিন!'

'দেখ ভায়া,' জীবনবাবু সিগারে টান দিতে দিতে চিন্তিতভাবে বললেন, 'ভালো কাজ যে ভালো এ বিষয়ে আর সন্দেহ করছে কে? কিন্তু কথা কি জানো, দু'চারজন লোক ভালো হওয়া এক কথা আর চুয়াল্লিশ কোটি মানুষকে ভালো করা অন্য কথা। দরকার হলে এ-সব ক্ষেত্রে ধীরে সুস্থে এগোনোই সুবুদ্ধির কাজ। নাহলে, দেখতেই তো পাচ্ছ, দুর্নীতি আরো বেড়ে চলে।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'একি, আপনি উঠছেন কেন? কিছুই তো স্থির হল না এখনো?'

'স্থির? কী স্থির হবে?' জীবনবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'আড্ডায় আবার কিছু স্থির হয় নাকি? চলমান এ সংসারে একমাত্র সারবস্তু হল চরৈবেতি—চরৈবেতি। অতএব আমি চললাম।' ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এবং তিনি বেরিয়ে যেতেই পরেশ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'বোগাস! এমন উল্টো-পাল্টা কথা জন্মে শুনিনি।'

আমরা সকলেই তখন পরম বিজ্ঞের মতো হেসে উঠে দ্বিতীয় দফা চায়ের অর্ডার দিলাম।

নেতাজির দৃষ্টিতে স্বামীজি

বনবিহারী মোদক

মহাপুরুষদের বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের মত সাধারণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। এইজন্যেই তাঁদের পুণ্য চরিত-কথা পর্যালোচনা করতে গেলে প্রায়ই আমরা অন্ধ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, প্রগল্‌ভ গুণকীর্তন অচিরেই এক-দেশদর্শী স্তাবকতায় পরিণত হয়।

কিন্তু অন্য একজন মহামানব তাঁর পূর্বসূরীকে কী চোখে দেখেছেন, কী-জন্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সেটা জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেলে তখন আর ভাবাবেগের আতিশয্যজনিত ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে না। যুগস্রষ্টা মহা-মানবদের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক স্বরূপ অনুধাবন করাটাও তাতে সহজ হয়।

বিবেকানন্দের মত ও পথ নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে-ছিল—একথা আমরা সবাই জানি। আত্ম-চরিত 'ভারতপথিক'-এর বিভিন্ন জায়গায় এবং মায়ের কাছে লেখা চিঠিপত্রে অসংখ্যবার সুভাষ, স্বামীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন। নিজের জীবনে সুভাষচন্দ্র স্বামীজির প্রদর্শিত পথে কতদূর এগিয়েছিলেন তার উজ্জ্বল ও অন্তরঙ্গ ছবি রয়েছে হেমন্তকুমার সরকারের 'কৌপিণ থেকে কৃপাণ' এবং দিলীপকুমার রায়ের 'আমার বন্ধু সুভাষ' নামক অনিন্দ্য লেখা দুটিতে। কিন্তু এগুলো সবই তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কথা। পরি-ণত বয়সের বিদগ্ধ মন নিয়ে ভারতের মুক্তিসাধক সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী ভেবেছেন, আমাদের অনেকের কাছেই সেকথা আজও অপরিজ্ঞাত।

আজ থেকে দীর্ঘ একত্রিশ বছর আগে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সুভাষ-চন্দ্রের একটি লেখা পুণার জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত সাময়িকপত্র 'The Marhatta'-য় প্রকাশিত হয়েছিল। সুদূর মধ্যপ্রদেশের সিওনী জেলে রাজ-বন্দী থাকাকালীন ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই অপূর্ব-সুন্দর প্রবন্ধটির প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদে সুভাষচন্দ্র মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু মহাত্মা রামদাস স্বামীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে-ছিলেন। অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটির প্রতিটি পংক্তিতে আমরা পাই স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে নেতাজির চিন্তা ও ধারণার সুস্পষ্ট ও সম্রদ্ধ একটি ছবি।

যতদূর মনে পড়ে, শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত অধুনালুপ্ত ইংরেজী দৈনিক 'The Nation'-এর কোন একটি বিশেষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়ে, প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ সুধি-জনের সপ্রশংস দৃষ্টি ও মনোযোগ আক-র্ষণ করেছিল। স্বামীজির জন্মশত-বার্ষিকীর এই পুণ্য লগ্নে প্রবন্ধটি নতুন প্রেরণায় পাঠকসাধারণকে উদ্দীপিত করবে—এই আশাতেই ওটির বাংলা

তর্জমা করে দিলাম। তবে, সুভাষ-চন্দ্রের মূল ইংরেজী রচনার সমস্ত সৌকর্য অনুবাদের মধ্যেও অটুট রাখতে পারব—এতদূর সাধ্য আমার নেই। সে-অক্ষমতার জন্যে সুধী পাঠক-পাঠিকার কাছে আগেভাগেই তাই মার্জনা চেয়ে রাখছি।

"স্বামী বিবেকানন্দ জনসমাবেশে যেসব অভিভাষণ দিয়েছেন এবং তাঁর লেখা বইগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে, তার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং সাধারণ কথাবার্তার সংকলনগুলো অনেক বেশী আকর্ষণীয় এবং জ্ঞানপ্রদ। স্বামীজি সম্বন্ধে কোন কিছু লিখতে গেলেই অনির্বচনীয় একটি আনন্দে

আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। খুব কম লোকই তাঁকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পেরেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার দুর্লভ সুযোগ যাঁরা লাভ করেছিলেন, তাঁদের সবাইও সেটা পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

"স্বামীজির ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্য-সাধারণ। স্বদেশবাসী জনগণের মনে, বিশেষ করে বাঙালীসমাজের উপর যে বিস্ময়কর প্রভাব তিনি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার মূলে তাঁর শিক্ষাদর্শ ও রচনাবলী তো ছিলই, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ছিল তাঁর ঐ প্রখর ব্যক্তিত্ব। মনুষ্যত্বের এই রকম বীর্যবান ও তেজোময় প্রকাশ বাঙালী জাতির মানসচেতনায় যে রকম আবেদন জাগায়, অন্য আর কোনরকম ব্যক্তিত্বের দ্বারা বোধ হয় ততটা হওয়া সম্ভবই নয়।

"ত্যাগে অকুণ্ঠ, কর্মে অতন্দ্র, প্রেমে অনন্ত, প্রজ্ঞায় অসীম, হৃদয়াবেগে অনন্য, অথচ অন্যায়কে আক্রমণে অবিচল ও নিষ্করুণ—ধূলিমলিন এই পৃথিবীতে এই-ই ছিল তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর স্বরূপ! 'The Master as I saw him' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন—"দেশমাতৃকাই ছিলেন তাঁর আসল আরাধ্যা।" তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে যজন-যাজনকারী গুরু-পুরোহিত, উচ্চবর্ণের মানুষ এবং ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময়ী যে-নিন্দাবাণী তিনি সদাসর্বদা প্রচার করে গিয়েছেন, তা কি শোনেননি আপনারা? এরকম নির্মম সমালোচনা করতে পারলে, চরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীরাও কি গর্বিত বোধ করবেন না?

"আধ্যাত্মিকতার ভড়ং থেকে স্বামীজি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। ওসব ভণ্ডামি

তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। ধর্মের ধ্বজাধারী মিথ্যাচারীদের তিনি বলতেন—"মুক্তি আসবে ফুটবল থেকে; গীতা থেকে নয়।"

"পরমযোগী বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক। তবু, ভগবান বুদ্ধের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। ঐকান্তিক উৎসাহের সঙ্গে একদিন তিনি বুদ্ধ-দেবের মহিমা বর্ণনা করছেন, এমন সময় শ্রোতাদের একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন—"স্বামীজি, আপনি কি বৌদ্ধ?" কথাটি শোনামাত্রই ভাবের আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর কণ্ঠ; অর্ধ-সমাহিত অস্ফুট স্বরে স্বামীজি উত্তর করলেন—"আমি? আমি ভগবান তথাগতের সেবকের সেবকমাত্র।" বিনম্র প্রণতিতে ভগবান বুদ্ধের পদধূলায় লুটিয়ে পড়তেও বোধহয় দ্বিধা করতেন না তিনি। "শঙ্করাচার্যের প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধের করুণাময় হৃদয়,—লক্ষ্য আমাদের এই-ই হওয়া উচিত।" —স্বামীজি প্রায়ই বলতেন একথা।

"ঠিক এইরকম আরেকদিন তিনি যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে ভাষণ দিচ্ছেন, এমন সময় কে-একজন একটা প্রশ্ন করল। স্বামীজি গম্ভীর হয়ে গেলেন, জলদ-মন্দ্রস্বরে উত্তর হল—'আমাদের পাপের জন্যে মানবত্রাতা যীশু যখন চরম যন্ত্রণা বরণ করে নিলেন, আমি যদি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে, শুধু চোখের জলে নয়, বুকের রক্ত দিয়েও আমি ধুইয়ে দিতাম তাঁর চরণদুটি।"

"আর, সমাজের নীচুতলার মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা? তা ছিল মহা-সাগরের মতই অতলস্পর্শী! তাঁর সেই অগ্নিক্ষরা বজ্রগর্ভ বাণী কি স্মরণ নেই আপনাদের? "হে ভারত, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।"

"তেজোদৃপ্ত পৌরুষই ছিল স্বামীজির ব্যক্তিত্বের মূল স্বরূপ। অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত তিনি ছিলেন অন্যায়ের প্রতি সংগ্রামী। বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তির উপাসক। স্বদেশবাসী আপামর জনগণের সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবন এবং অভ্যুদয়ের জন্যে বেদান্তের প্রায়োগিক ও বাস্তবানুগ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন। "শক্তি, উপনিষদসমূহ শক্তির কথাই বলছে।" —একথা তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত। চরিত্রগঠনের উপরেই তিনি সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সম্পর্কে লিখে গেলেও আমি বোধ হয় তাঁর প্রতি সামান্য সুবিচারও করতে পারব না; স্বামীজি ছিলেন এতই বড়, এতই মহান।

"সত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়, বিবেকানন্দ ছিলেন সেই উন্নততম আধ্যাত্মিক স্তরের যোগী। স্বদেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নসাধনের জন্যে সমগ্র জীবনটিই তিনি উৎসর্গ করে-ছিলেন—স্বামীজির মহত্ত্ব ও অবদান বর্ণনা করতে হলে আমি শুধু এই কথাই বলব। স্বামীজি জীবিত থাকলে, অনুগত সেবকের মত তাঁর পদপ্রান্তেই আমি স্থান করে নিতাম। যদি আমি ভুল না করি, তাহলে বলব—আজকের বাংলা তাঁরই সৃষ্টি।

"স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্য সমাজের অনুগামীরা যে-ধরনের সংগঠন-মূলক কাজ করেছেন, বিবেকানন্দ ঠিক সে-রকমটি চাননি; সেদিকে তিনি চেষ্টাও করেননি। এটা তাঁর একটা অসম্পূর্ণতা হতে পারে, কিন্তু নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই বলতেন—"মানুষ তৈরীই আমার ব্রত।" আমাদের স্বদেশজননী যদি প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সংগঠনাদি সুসম্পাদিত হতে দেরী হবে না মোটেই—এটাও তাঁর অজানা ছিল না।

"নিজের শিষ্যদের আধ্যাত্মিক ও কর্মজীবনের বনিয়াদ শক্ত করে গড়ে তুলবার জন্যে কোন শ্রম ও কষ্টবরণেই পিছুপা হতেন না তিনি। তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক চিন্তা খর্ব করার অপচেষ্টাও তিনি কখনও করেননি। ঠিক এই কারণেই, কোন শিষ্যকে তিনি দীর্ঘদিন নিজের কাছে রাখতেন না। একটি বনস্পতির ছায়ায় আরেকটি বড় গাছ বেড়ে উঠতে পারে না—এই-ই ছিল তাঁর মত। সাম্প্রতিককালের অনেক মহাপুরুষ অন্যের স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে পর্যন্ত তাঁদের পায়ে বাঁধা দিয়ে, আমাদের করণীয় চিন্তাটুকুও আমরা তাঁদেরই করতে দেব—এটাই তাঁরা চান। এই রকম সব মহামানবদের সঙ্গে স্বামীজির কি বিস্ময়কর প্রভেদ!"

কর্মযোগী সুভাষচন্দ্র

তুষারকান্তি ঘোষ

গীতার কর্মযোগের দৃষ্টি ও বিচার করলে দেখা যাবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত কর্মযোগী। কর্মই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম। তিনি নিজের মুক্তি চাননি, নিজের সুখের সন্ধান করেননি, তিনি চেয়েছিলেন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। চেয়েছিলেন কোটি কোটি দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ। এই কল্যাণ-কামনাই তাঁকে প্রথম যৌবনের সন্ন্যাস-জীবন থেকে আবার সংসারে ফিরিয়ে এনেছিল। তিনি বুঝেছিলেন সন্ন্যাসীর নিভৃত জীবন তাঁর জন্য নয় তাঁকে আরও বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোটি কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠে মুক্তির ভাষা দেবার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হবে। সুভাষের দৃষ্টিতে মুক্তির অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সে মুক্তির অর্থ আরও ব্যাপক।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যে-ই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সুভাষের কর্মসাধনা শুরু হয়েছিল এই সেবার মধ্য দিয়ে। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই তিনি দুঃস্থ রোগীদের সেবা করতেন।

স্বামীজী বলেছিলেন,—"যে জাত যে শক্তিহীন, সে কোনদিন স্বর্গলাভের ইচ্ছা করতে পারে না।" সুভাষ স্বামীজীর এই নির্দেশকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—যে জাতি শক্তিহীন, বিশ্ব সভায় তার কোন মর্যাদা নেই। আর জাতির শক্তির উৎস হোল তার স্বাধীনতায়—তাই সুভাষ হলেন স্বাধীনতার সাধক।

সুভাষ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাসের ছাত্র। প্রেসিডেন্সীর জাঁদরেল অধ্যাপক ওটেন সাহেব—খাস ইংরেজ। এ হেন ওটেন সাহেব ভারতীয়দের সম্পর্কে অমর্যাদাকর মন্তব্য করায় সুভাষ প্রতিবাদ করলেন—তাঁর বিরুদ্ধে কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট করলেন। ফলে সুভাষের উপর কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হলেন—সুভাষকে কলেজ ছাড়তে হ'লো। পুণ্যশ্লোক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে, দর্শন-শাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এম-এ পড়বার সময়েই তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে যান—সেখান থেকে ফিরে আসেন ১৯২১ সালে।

১৯২১ সাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন—সে ডাক গিয়ে পৌঁছল সুভাষের মনে। তিনি আই-সি-এস-এর লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিলেন।

সুভাষের কর্মসাধনা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সংসদ গঠিত হলে তিনি হলেন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ। পরে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কলকাতার কংগ্রেসের সময় তিনি যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তা থেকে তাঁর বিরাট সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের পদ অলঙ্কৃত
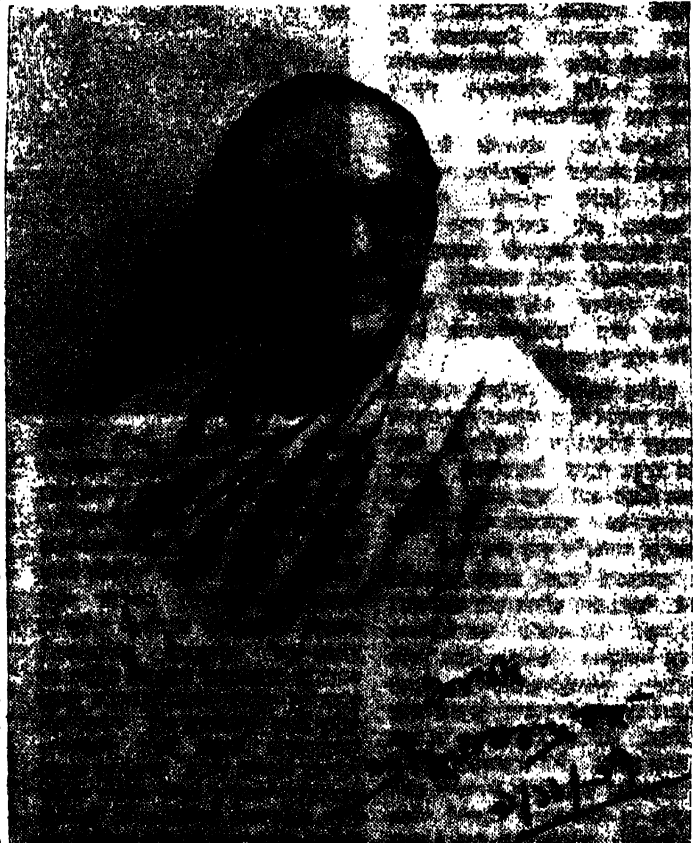
করেন। এর আগে, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই সময়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের বিবিধ উন্নতি সাধন করেন।

সুভাষ আরও কত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে, কতভাবে যে দেশসেবা করেছিলেন, অল্পসময়ের আলোচনায় তা' উল্লেখ করা অসম্ভব। সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত প্রাণ, দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-চিন্তাই ছিল তাঁর কর্মধারার মূল উৎস। দেশ-প্রেমকেই তিনি ঈশ্বরপ্রেমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দেশসেবার কাজে তিনি কখনও কোনও আপোষ করতে স্বীকৃত হননি। ১৯৩৮ সাল সুভাষের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই বছরই হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই সময়েই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে জাতীয় পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

১৯৪০ সালে সুভাষের উদ্যোগে 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বছরেই জুন মাসে তিনি 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ফলে ইংরেজ সরকার ২রা জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখলেন।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করলেন। কারাগারে সুভাষের জীবনদীপ নির্বাপিত হলে সারা ভারত জুড়ে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ উঠবে—এই ভয়ে বাংলা সরকার ৫ই ডিসেম্বর সুভাষকে মুক্তি দিয়ে নিজগৃহে অন্তরীণ করে রাখলেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত সংগ্রামী। রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ জীবন তাঁর জন্য নয়। তাঁর কর্ণে শত কর্মের শত জীবনের অজস্র আহ্বান। ১৯৩৮ সালে তিনি ইয়োরোপ থেকে ফিরেছিলেন। ইয়োরোপের প্রান্তরে যে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছিল, এশিয়ার প্রান্তরেও যে তার প্রতিধ্বনি হবে তা' সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির এই সংকটে ভারতবর্ষকে তার চূড়ান্ত

সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভারতের অভ্যন্তরে থেকে সে সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব নয়। তাই নোতুন যুগের নোতুন শিবাজী—বৃহত্তর ভারত-কারাগার থেকে অন্তর্হিত হলেন। মুক্তির সন্ধানে তিনি গিয়ে উঠলেন জার্মানীতে। সেখানে গঠন করলেন ভারতের জাতীয় বাহিনী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয় দেশভক্তগণ ভারতের মুক্তির যে আয়োজন করেন—সাবমেরিনযোগে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুভাষচন্দ্র এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন—বিস্মিত বিশ্বের কাছে প্রকাশিত হলেন নেতাজী। 'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ' গঠিত হলো, মুক্তিকামী সৈন্যবাহিনীর বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হলো "জয় হিন্দ"। সর্বাধিনায়ক নেতাজী আহ্বান জানালেন, "তোমরা রক্ত দাও! আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।" সে রক্ত ঝরলো কোহিমার প্রান্তরে, আরাকানের অরণ্যে, নাগা পল্লীর পাহাড়ী পথে। কোহিমার ময়দানে উড়লো স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা—কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ইয়োরোপে চক্রশক্তির পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া এশিয়ার প্রান্তরেও দেখা দিল। স্বাধীনতার মুক্তিপতাকা বহন করে যাঁরা ভারতভূমি স্পর্শ করেছিলেন—তাঁদের ফিরে যেতে হলো—ফিরে গেলেন ভারতমাতার প্রিয় দুলাল নেতাজী সুভাষ—অভিমানভরে কোথায় গেলেন সে পথের সন্ধান আজও আমরা পাইনি।

[আকাশবাণীর সৌজন্যে
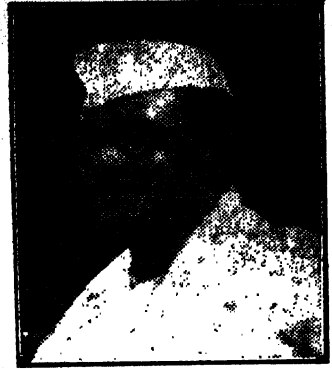
২৬শে জানুয়ারী

"আমরা বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো ভারতীয় জনসাধারণেরও স্বাধীনতা-অর্জন এবং স্বীয় পরিশ্রমের ফললাভ ও জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পূর্ণবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার অধিকার আছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনো সরকার কোনো জাতিকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্যাতন করে, তবে উক্ত সরকারের পরিবর্তন কিংবা অবসান ঘটাইবারও অধিকার আছে সেই জাতির। ব্রিটিশ সরকার যে কেবল ভারতীয় জনসাধারণকে স্বাধীনতা হইতেই বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নহে, জনসাধারণকে শোষণ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে নিজের ভিত্তিভূমি, এবং এইভাবে ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং আত্মিক দিক হইতে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সংশ্রব ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।"

[১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয় কংগ্রেস অধিবেশনে। এবং স্মরণযোগ্য যে ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারীতেই সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে অন্তর্ধানের খবর প্রকাশিত হয়।]

এ এক নূতন খেলা

১৮|১|৬৩ ইং

ক্ষেত্রটা
বড্ড নরম!

মরে যাবো
দাদা!
ইউরোপীয় খোলা বাজার

কথা হচ্ছে,
এই কাশ্মীরী
গালিচাটা
কার?

।। মা আমার ।।

লীলা মজুমদার

মনে পড়ে আমার একটা মা ছিল। সাজত-গুজত না, সাদা একটা জামা গায়ে দিয়ে, লালপেড়ে তাঁতের একটা শাড়ী পরে ঘর আলো করে থাকত। চাকরি-বাকরি করত না, হাটবাজারের আইনকানুন জানত না, বাড়ি থেকে বেরুতে হোলেই সঙ্গী খুঁজত। সভা-সমিতিতে যেত না, বক্তৃতা দিত না, ছাপার অক্ষরে তার নাম কখনো বেরুত না। ইংরিজি জানত, তবু কথাবার্তা সবই বলত বাংলাতে।

মনে পড়ে ঐ মা রাঁধত খাসা। আহা আর অমন খেলাম না কোথাও; অমন করে দিলও না আর কেউ মনের মতন জিনিষটি পাতের ওপর তুলে। কোলে একটা খোকা দেখতাম; হাত দিয়ে যখন তার মাথার চুল সরাত, মনে হোত অমন ছোঁয়া পেলে জীবনটা সার্থক হয়ে যায়।

রাগ করত না; কিন্তু ওর রাগকে ভয় পেতাম দারুণ। সদাই ভাবনা পাছে আমার অন্যায়টা ওর চোখে পড়ে যায়। ধরেও ফেলত ঠিক; তখন কি যে আরাম পেতাম সে আর কি বলব। গলা তুলে কথা বলতে শুনিনি কখনো, কিন্তু এক-বার স্টোভ জ্বলে গিয়ে ছাদ পর্যন্ত আগুন উঠেছিল, অমনি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, নিজের হাতটি আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কল ঘুরিয়ে স্টোভ নিবিয়ে, হাত মুছতে মুছতে শান্ত গলায় বলেছিল, অত পাম্প করতে হয় না। তখন ইচ্ছে করেছিল ওর গোলাপী মতন পা দুখানিকে—কি যে ইচ্ছে করে-ছিল কি করে আর বলি, সে কাছে থাকলে ইচ্ছে-টিচ্ছে সব যে মিটে যেত।

অসুখের সময়ে চোখ খুললেই দেখতাম পাশে বসে আছে। সব সময় লোকের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখত, শুধু ভয়ের সময় এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াত। মিথ্যাকে লোভকে হিংসাকে কি যে ঘেন্না করত। ভেবে-ছিলাম আর বুঝি তাকে দেখতে পাব না; গেল বুঝি আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে, যেগুলো বাকি থেকে গেল আর বুঝি সেগুলো করা হবে না।

হঠাৎ দেখি আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সেই যেখানে ছোটবেলাটি তার কোলের কাছে কেটেছিল, সেখান-কার সরল গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বাতাস বওয়ার শব্দ আবার কানে এল। ঢালুর মধ্যে খোঁদলের ভেতরে সেই যে টিনের চাল দেওয়া বাড়িখানি ছিল, যার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সুখ এঁটে গিয়েও, অনন্ত আকাশের অসীম ফাঁকায় হাত-পা মেলে দেওয়া যেত, তাকে দেখতে পেলাম। যে বিলিতী ফুল-গাছে সে টিনের ঝারি থেকে জল দিত তার একটুখানি গন্ধ আবার আমার নাকে এল।

বাড়ির পেছনে ছোট পাহাড়ে নদী; তার ওপরে পাথর ফেলা, সেই পাথরে পা দিয়ে তার সঙ্গে নদী পার হওয়া যেত। সে নদীর জলে রোদ পড়ে জলের নিচেকার নুড়ি-পাথরকে আবার চিক-মিক করতে দেখলাম। ছোট ছোট মাছ-গুলোকে খেলতে দেখলাম।

সেই যে ঝি-চাকরদের মা বকত না বলে বাড়িতে রাগারাগি হোত,, আস্কারা পেয়ে পেয়ে তারা নাকি ধরাখানাকে সরাখানা মনে করছে, তাদের অবিরাম কাজের শব্দ আবার কানে আসতে লাগল। দেখলাম নাসপাতি গাছগুলো আবার ফুলে ঢেকে গেছে, একটাও পাতা দেখা যাচ্ছে না। কমলাগাছে দেখলাম সেই মৌচাকের মৌমাছিরা তেমনি মধু ভরছে।

পাহাড়ে স্কুলটিও আছে, দলে দলে ছোট ছেলেমেয়ে সেখানে পড়তে যায়, টিফিনের ছুটিতে গাছতলায় বসে খাবার খায়। পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরে। অনেক নিচে ঝরনা থেকে আজও জল ঝরে। সেই জল বেঁধে বিজলি তৈরী হয়, শহরের সেই পথঘাটগুলো তাই আলো হয়।

বুক ভরে উঠ্‌ল। মা আমার, মা আমার, এই তো তুমি আমার বুকের কাছে কাছে রয়েছ, তোমাকে তো আমি হারাই নি। কত বড় হোয়ে গেছ তুমি; আমার পৃথিবী আর আকাশ জুড়ে আছ। এই তো আবার আমাকে সুযোগ দিলে। তোমার কাজ করবার জন্য আমার হাতদুটো কাঁপছে।

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

।। তিন ।।

নবদ্বীপে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ লাভ হইয়াছে। অতঃপর পিতৃকৃত্য সম্পাদনের জন্য শ্রীনিমাই পণ্ডিত গয়াধামে শুভাগমন করিয়াছেন। পথে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জ্বরের উপশম ঘটিয়াছে। গয়াধামে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখাইলেন—সাধুসঙ্গের ফলেই হৃদয়ে নবধা-ভক্তির সঞ্চার হয়। নবধা-ভক্তির প্রথম অঙ্গ শ্রবণ,—কৃষ্ণনাম শ্রবণ। গয়াধামেই প্রথম সেই ভাগ্যোদয় হইল। তিনি শুনিলেন—চতুর্দিকে বিপ্ররূপ ধরিয়া দেবগণ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন।

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।।
বলিশিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।।
তিলার্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলা মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র।।
যোগেশ্বর সভারো দুর্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।।
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস।।
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।।

বিপ্রগণ মুখে চরণের প্রভাব শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দ সুখে নিমগ্ন হইলেন। নবদ্বীপে যাহা হয় নাই, গয়াধামে তাহাই হইল। কমল নয়নে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। দেহে রোমহর্ষ কম্প আদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল। সর্বজগতের শুভাদৃষ্টের সূচনায় প্রভুর প্রেমভক্তি প্রকাশের শুভারম্ভ হইল। ফলে পুনরায় শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর দর্শনপ্রাপ্তি এবং দীক্ষালাভ ঘটিল। সর্বসাধারণের উপযোগী দাস্যভাবেই ইহার প্রথম প্রকাশ।

প্রচলিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কয়েকটি স্থানে পাঠের ভুল আছে। আজ পর্যন্ত কেহ তাহা সংশোধন করেন নাই। আমি যথাস্থানে এই পাঠবিভ্রাট দেখাইয়া দিব। গয়াধামে একদিন নিভৃতে বসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যানানন্দে বাহ্যপ্রকাশ পূর্বক অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা।।

তিনি প্রেম-ভক্তি রসে মগ্ন হইলেন। সকল শ্রী-অঙ্গ ধূলায় ধূসর হইল। তিনি আর্তনাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন—'বাপ কৃষ্ণ আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলে।' শিষ্যগণ অতি যত্নে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, 'আমি আর সংসার মধ্যে ফিরিয়া যাইব না। আমি সেই মথুরায় চলিলাম—আমার বাপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যথায় পাইব। প্রচলিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাঠ আছে—"প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা"। বলা বাহুল্য এই পাঠ ঠিক নহে। এখনো 'প্রাণনাথ' বলিবার সময় হয় নাই। আর ইহার পরেই আছে—প্রভু প্রেমের আবেশে মথুরায় চলিলেন।

কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়।
এই মত বলিয়া চলেন গৌররায়।।

সাধনা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য বাপ মোর এবং প্রাণনাথ একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং আমি যে পাঠ পাইয়াছি, তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে আসিলেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। পাণ্ডিত্যের স্পর্ধা নাই, সে ঔদ্ধত্য নাই। অত্যন্ত বিনীতভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন, কৃষ্ণনাম লইয়া ক্রন্দন করেন। সেই দাস্য ভাবের আর্তি,—"কৃষ্ণরে বাপরে মোর কোন্ দিগে গেলা"। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তদের নিকট গয়াধামের কথা নিবেদন করিতে গিয়াও ঐ একই অবস্থা। যাঁহাকে দেখেন তাঁহাকেই বলেন—ঈশ্বরকে আমি পাইয়া হারাইলাম, তোমরা আমার দুঃখ মোচন কর। নন্দ-গোপ-নন্দনকে আনিয়া দাও।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিমিজায়ন্তসংবাদে যাহা নব যোগীন্দ্রসংবাদ নামে প্রসিদ্ধ—তাহার মধ্যেই মানবের ভগবদনুভূতির প্রথম স্তরের বর্ণনা ঠিক এইরূপ। তিনি পুনঃ পুনঃ গতাগতির বিলোপকারী—পরিভববিধ্বংসী, অভীষ্ট দানকারী, তীর্থাস্পদ, শিব-বিরিঞ্চি-প্রণম্য, শরণ্য, ভৃত্যগণের আর্তি-হর্তা, প্রণত-পালক এবং ভব-সাগরের তরণী—সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অধ্যাপনা করিতে গিয়া ছাত্রগণের নিকটও বলিয়াছেন— জগৎজীবন কৃষ্ণ করুণার সমুদ্র, তিনি সেবকবৎসল, ভাইসব আমি সত্য কথা বলিতেছি শোন, সেই অমূল্য সম্পদ কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম ভজনা কর। লক্ষ্মীদেবী যে চরণ সেবা করেন, ভগবান শঙ্কর যে চরণে শুদ্ধ দাস্য বাঞ্ছা করেন, যে চরণ হইতে শ্রীজাহ্নবী আবির্ভূতা হইয়াছেন, এস আমরা সেই শ্রীপাদ-পদ্মের দাস হই।

আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিলের আদেশে নিমাই পণ্ডিত জননী শচীদেবীর নিকটও এই দাস্য-ভাবের কথাই বলিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্বের নবদ্বীপে— আচার-নিষ্ঠ, বিদ্যামদ-গর্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রধান নবদ্বীপে জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া গয়াধাম প্রত্যাগত নিমাই পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে কৃষ্ণ যদি বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে।।
* * *
শুন শুন মাতা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণ অনুরাগ।।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণ দাস।।
* * *
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্মে তাপ॥
* * *
অনায়াসে মরণ জীবন দেয়া যিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে।।
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বোল হরি॥
ভক্তি হীন কর্মে কোন ফল নাহি পায়
সেই কর্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়।।

নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাম শ্রবণ করেন, বদনেও অবিরাম কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। ছাত্রগণ

জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়" অর্থ কি? নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—"সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ"। সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়-সূত্রটি কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। কাহারো কাহারো মতে সূত্রটি ঐন্দ্র-ব্যাকরণের, ইহার অর্থ বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ। আম্নায় অর্থে বেদ অথবা বেদানুমোদিত শাস্ত্রের উপদেশ। নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণভজনকেই সম্যক আম্নায় বলিয়া'ছেন। পড়ুয়াগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধাতু সংজ্ঞা কার?", পণ্ডিত উত্তর দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার"। যাহা জগতকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই ধাতু। ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে ধাতু বলে। ধাতুর গণ সংখ্যা দশটি। সেই গণ মধ্যে ক্রিয়া-বাচক শব্দই ধাতু।

আয়ুর্বেদে কিন্তু যাহা জীবনের উপাদান তাহাকেই ধাতু বলে। বায়ু পিত্ত কফ ধাতু। জীবনীশক্তির অপর নাম ধাতু, ধাতু না থাকিলে মানুষ বাঁচে না। তাই নিমাই পণ্ডিত বলিয়াছেন—"ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণ শক্তি বল্লভ সভার"। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বোলোঁ কৃষ্ণে দেহ মন।।

অতঃপর তিনি সর্বদাই দেখিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়"

যেন শুনিতে লাগিলেন—

সোনার নূপুরে দুটি বাজে রাঙ্গা পায়।
কটির কিঙ্কনী ধ্বনি মিশিতেছে তায়।।

দেখিতে পাইলেন—

নানা ফুলে গাঁথা মালা দুলিছে হিয়ায়।
মনো বিমোহন চূড়া শোভিছে মাথায়।।

তাঁহার মনে হইল—

হাতছানি দিয়া মোরে ডাকে আয় আয়।
বৃন্দাবন পথ পানে নিয়ে যেতে চায়।।

অতঃপর ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরি নাম-কীর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীল বৃন্দা-বন দাস বলিতেছেন—

এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ।।
চতুর্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কাঁদে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন।।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ এত কাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।।
শিষ্যগণ বোলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে শিক্ষায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া।
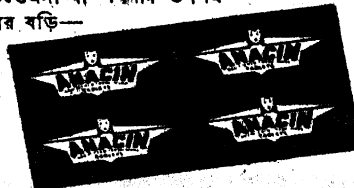
(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(১) বঙ্গ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার নাম কি? কত সনে প্রকাশ হয়েছিল? সম্পাদক কে ছিলেন?

(২) 'অমৃত' কথার প্রকৃত মানে কি? অমৃত পত্রিকার সহিত তার কি সম্বন্ধ?

নমস্কারান্তে,
বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ষ্টাফ কোয়ার্টার,
ব্লক নং ৮, ফ্ল্যাট নং ১০৪,
কলিকাতা-২৯।

—(উত্তর)—

বিগত ২রা নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত শ্রীশান্তিগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

প্রশ্নটি পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক হইলেও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে ইহার আলোচনা চলিতে পারে।

কোন জিনিসের ওজন বলিতে মোটামুটি সেই জিনিসের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান কতখানি, তাহাই বুঝায়। জীবিতাবস্থায় যে লোককে তুলিয়া ধরা বা স্থানান্তরিত করা যে-কোন একজনের পক্ষে সহজসাধ্য, মৃত্যুর পর সেই

লোককেই তুলিয়া ধরিতে বা স্থানান্তরিত করিতে কয়েকজন লোকের প্রয়োজন হয়। ইহাতে মৃত্যুর পর লোকটির ওজন সত্য-সত্যই বাড়িয়া গিয়াছে বা তাহার দেহের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা বুঝায় না। সুস্থ অবস্থায় তাহার শরীরের যে আকার ও আয়তন ছিল মৃত্যু পর্যন্ত তাহা বজায় থাকিলে তাহার দেহের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের কোন তারতম্য হইবার কথা নয়। তবুও মৃত্যুর পর তাহার দেহের ওজন অনেক বেশী মনে হয় কেন? জীবিতাবস্থায় লোকটি এক হাত দিয়া অপরের কাঁধ বা কোমর জড়াইয়া ধরিয়া অপর হাত, পা এবং পিঠের সাহায্যে স্বীয় শক্তির জোরে নিজের দেহকে উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিতে কতকটা সক্ষম থাকে যাহাতে সেই ঊর্ধ্বমুখী ঠেলা বা চাপের ফলে তাহার দেহের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের বেশ কিছুটা পরিমাণ কম হইয়া যায় (Neutralised)। কতকটা অপরের সাহায্যে এবং কতকটা স্বীয় দেহস্থ শক্তিবলে ঊর্ধ্বমুখী চাপের যে পরিমাণ, হইবে, ঠিক সেই পরিমাণেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানও হ্রাস পাইবে। সুতরাং তাহার শরীরের ওজন প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া সাহায্যকারীর বা উত্তোলনকারীর মনে হইবে। পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তির দেহ কাষ্ঠখণ্ড বা লৌহখণ্ডের মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে। সে হাত, পা, পিঠ, কোন কিছুর সাহায্যেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতমুখী কোন চাপের সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং তখন তাহার যাহা ওজন, তাহা তাহার Dead Weight বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পুরাপুরি টানেরই পরিমাণ। আর জীবিত ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভিতরটা বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবার ফলেও স্বাভাবিক কারণেই তাহার দেহের একটা ঊর্ধ্বমুখী গতি কিছুটা হইয়া থাকে, যেমন হয় পাম্প-করা ফুটবলের। আর তাহাতেও তাহার শরীরের উপরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের কিছুটা ক্ষয় হইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার শরীরের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পুরামাত্রায়ই বজায় থাকে। আর ইহাতেই তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভারী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

২৩শে নভেম্বর '৬২-এর 'অমৃত'-এ 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্তর প্রশ্ন (১)-এ কিছু ভুল আছে, জানি না এটা ছাপার ভুল কিনা। রাঁচী শহর থেকে জগন্নাথপুর গ্রাম ১৩।১৪ মাইল নয় ওটা ৭।৮ মাইল এবং এখানে মন্দির বলতে জগন্নাথধামের মন্দিরই বোঝায় যেখানে রথের মেলা বসে প্রতি বছর। শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর আছে এখানে এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই—যতদূর জানি এটা একটা মনগড়া কল্পনা। তবে শ্রীধাম নবদ্বীপে খোঁজ করলে নিশ্চয়ই এ পুঁথি পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

নমস্কারান্তে,
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক—'কাঁচাহাতের কাগজ'
অন্নপূর্ণা হোটেল—রাঁচী।

পেছনে পুরো দলটা ওদের ফেরার পথ চেয়ে বসে রইল।

ওরা তিনজনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। গুড়ো গুড়ো তুষারের কণা জমে শরীর টুকরো হিমবাহ মনে হয়। ওদের গায়ে কেবল একটি করে তুলোর সবুজ বুশ শার্ট। নোংরা ও ছেঁড়া। ভিজে ভিজে মরা জন্তুর পচে ওঠা চামড়ার মতো দুর্গন্ধ আর ভারী। জলে-কাদায় চবচবে পাতলুন। পায়ে হাল্কা অথচ পুরু সোলের ফাটা জুতো। সোলটায় কিছু কাঁটা রয়েছে লোহার—ক্রমাগত পাথরে ঘষা খেয়ে এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। পিঠে গুরুভার ব্যাগ। বুক বরাবর রাইফেল রেখে এগোচ্ছে। ফলে দুটো কনুই পাথরে তুষারে কাদায় ধারাবাহিক আঘাত পেতে পেতে একটি করে চোরা রক্তের রেখা হয়তো বহন করে চলল। দুর্গম চড়াই-এর পথ। এবং পথটা সদ্য যেন ওরা পায়ে পায়ে আবিষ্কার করে নিচ্ছে। কাজেই টুকরো পাথর গাড়িয়ে পড়ার মৃদুতম শব্দ যেন না ফোটে, ওদের চলাটা এই কঠোর সতর্কতায় নিয়ন্ত্রিত। পাহাড় যদিও এখানে খাড়া নয়, কোথাও কোথাও ধ্বস ছেড়ে গভীর গর্ত আর ফাটলের সৃষ্টি করেছে। নিরবচ্ছিন্ন তুষার-পাতে সেগুলো ক্রমে ভরাট হয়ে উঠছে। কোথাও কিছু কাঁটা ঝোপ ও নিষ্পত্র ঘাসের নুয়ে পড়া কংকাল। আর কোন উদ্ভিদ নেই। থাকা উচিতও নয় এত উঁচুতে। তাই ওরা একটু শব্দও টের পেতে দিচ্ছে না এবং পাছে ঈষৎ খাড়া হলে—নিছক ক্লান্তির জন্যেই, একটু দূরে নীচে বাঁপাশের উপত্যকা থেকে কোন শত্রু ওদের অস্তিত্ব জেনে ফেলে, তাই তিনজনে পাহাড়ী অজগরের মতো বুকে হেঁটে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছতে যাচ্ছে।

দিনে দেখেছিল, দেখেছে আরো অনেক উজ্জ্বল সকালে, দুপুরে, বিকেলে, পরিপূর্ণ নন্দনতার অলৌকিকতায় বর্ণময় এই পাহাড়ের চ্যাপ্টা চূড়াটিকে...... আহা, স্মৃতি এখনো এতো তীব্র হয়, মুখর হয়, যখন পায়ে পায়ে নিসর্গ ও মানুষ মৃত্যুর নিরন্তর সাংকেতিকতা উদ্যত রেখেছে! ......ক্যাপ্টেন যাদাও-এর রক্তাক্ত লাসটা বয়ে আনতে আনতে, চার পাশে অবিশ্রান্ত শার্পনেলের বুলেটের ক্ষিপ্ত মৃত্যুধারা, আমার ইচ্ছে করছিল ডানা থাকলে স্বর্ণ ঈগলের মতো উড়ে গিয়ে চূড়টায় বসতুম; কেননা পায়ের নীচে রক্ত ও হিংসার এই লাল রং ওর দৈবী শুভ্রতায় দেখলুম না। নাকি ছিল, থাকে? ওর পূর্বগায়ে চালু চড়াই বেয়ে একদা ইয়েতিদেরও আসতে দেখেছি।...

আঃ আঃ! একজন ককিয়ে উঠেছে।

সুঃ! তার কাঁধে থাবা হানল নরানন্দ সিং। সে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের কাছে

দেখতে পাচ্ছে নয়ান সিং-এর একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ। প্রায় ক্ষুধিত শিকারী নেকড়ের মতো দেখাল। নয়ান সিং তার কাঁধটা ঘুরিয়ে নীচের উপত্যকাটা দেখাচ্ছে। একটি হাউই জ্বলে উঠেছে। আকাশে—এদের সমান্তরালে কেঁপে কেঁপে ভাসছে। নেমে যাচ্ছে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোময়তা আরো নীচে জাপক নদীর হিম জলে, ব্রীজের ওপর, ওপারের ঘন অরণ্যে, নিঃশব্দে। অন্তত ব্রীজের পথটুকু এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবং এখানে বরফের ধূসর আবরণে হাউইটার কিছু ছটা পেঁাছে স্তিমিত জ্যোৎস্নার মুহূর্তস্থায়ী পটভূমি পড়ল। একটু লাল হল। একটু নীল। তারপর আবার ঘন গাঢ় ছায়া। নয়ান সিং অস্ফুট হাসছে যেন। হিস-হিস করে বলল, 'সব বাজে খরচ। ব্রীজ পেরিয়ে কেউ আসবে না এখন।' ওকে কিছু শব্দ বানাতে দেখে এরা দুজনে এতক্ষণে সাহস পাচ্ছে। থেমে বসে গেছে পাথরে হাত রেখে। 'ব্রীজটা সব সময় লক্ষ্য রেখেছে।' ব্রীজের দু পাশে কিছু সমতল জমি, পাথরের টুকরো ছড়ানো, চার পাশে উঁচু ঘাস গজিয়ে রয়েছে—নয়ান সিং অঞ্চলটা মোটামুটি নখদর্পনে রাখে। পুরো দলটা ব্রীজের ওপারের অরণ্যে ব্যাংকারে অপেক্ষা করছে।

'বাঘগুলো এখন জঙ্গলে।' ব্রীজটা উড়িয়ে দিচ্ছে না।' পরস্পর ফিসফিস করল। 'ওদের উদ্দেশ্য কী?' 'চুলোয় যাক্ ওরা।' নয়ান সিং দুহাতে মুখ ঢেকে আচমকা হেঁচে উঠেছে। 'আঃ!' 'আমরা এখন মোটামুটি নিরাপদ।' নয়ান সিং চারপাশে তাকিয়ে বলল। 'আমরা এখন বাঁ দিকে যাবো, তাই না?' 'হ্যাঁ।' বাঁদিকে তাকালে তিনজনে। অনেক দূরে হয়তো নদীর কাছাকাছি কোথাও একটু আলো জ্বলে উঠে তৎক্ষণাৎ নিভে যাচ্ছে। 'ইচাং-এর ক্যাম্প। প্রায় মাইলটাক হয় সোজাসুজি। ওর পশ্চিমে সেই প্রপাতটা। পেরোতে পারেনি বলে অন্য ফন্দি আঁটছে ব্যাটারা। অবশ্যি নদী পেরোনর একটা সহজ পথ আমি চিনি। একদিন চিনেছিলুম আশ্চর্য উপায়ে। বলবো'খন।' নয়ান সিং-এর গল্প শুনবার জন্যে দুজনে হাঁফিয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার চুপ। আবার জাপক ব্রীজের ওপর হাউই জ্বলছে। তারপর বার কয় গুলীর শব্দ। স্যাঁতসেঁতে হাওয়া ঠেলে একটুখানি পেরেক ঠোকার আওয়াজ। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল।" 'কিংবা ভয় দেখাচ্ছে : জেনে রেখো আমরা সব সময় তৈরী।' 'আর কতটা উঠতে হবে?' 'রোসো, একটু দেখে নিই। সেদিন এখানেই কোথায় কাঁটাঝোপে একটা অকেজো রাইফেল পড়ে ছিল। ওপরে লম্বা ছোরার মতো পাথরের চাতাল...ঠিক আছে, বাঁদিকে এগোও।' 'ভুল হচ্ছে না তো?' একজন সন্দিগ্ধ। 'ভুল করো না।' নয়ান সিং ওর হাত ধরে টানল। 'আমার ভুল হয় না বন্ধু!'

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। নীচের দিকে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছে ঠাণ্ডা ভারী হাওয়া। তুষার-গুঁড়ো উড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো-মুঠো। ফলে গুল্মগুলোর ভেজা আচ্ছন্ন ডালপালায় ক্রমাগত শব্দ থিক-থিক সিপ্-সিপ্। আকাশে কোথাও একটি কি দুটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র—পলকে ছুরির পলকে জাগে। বাকী শুধু চাপচাপ তুষার-কুয়াশা, মেঘের মতো সঞ্চরমান।

......কোথায় যেন চলেছি—ইস্পাতের হিম নলের ঠোঁট মৃত্যুর চুমু নিতে অথবা দিতে।

হাতের তেলো চিনচিন করছে। দস্তানাগুলো যা ভারী আর কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল! নদী পেরনোর সময় ছুঁড়ে ফেলেছে।

......আমি জানতুম এমনি করে বুকে ভর দিয়ে একদিন ঐ চূড়ায় উঠতে হবে। চূড়াটা যেন পাহাড়ী সাপের মাথায় একটি দ্যুতিময় মণি। সকালগুলো ওপাশের ঢালু গা বেয়ে দলে দলে ওখানে এসে আলোর পিচকিরীতে রং ছড়ায়। তখন শুধু উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন দিন গেছে। আমরা ছিলুম আরো দশ মাইল পূর্বে। এই পাহাড়ের ঢালু পিঠ বেয়ে ওদিকে এক দৌড়ে ওঠা যায় মনে হতো।......ইয়েতিরা অন্তত উঠেছিল।......অথচ চূড়াটায় অনেক অলৌকিকতা।

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তিনজনেরই।

.........এখনো চূড়াটার কথা ভাবতে পারছি। হয়তো গুলী বিদ্ধ চোখেও ওটা ছবি হবে একদিন।

'আঃ আঃ!' কেউ আবার ককিয়ে উঠল। কেউ কান দেবে না।

......মাঝে মাঝে আমি নিজেই যেন ভারতবর্ষ হয়ে উঠি। অন্তত ভাবতে ইচ্ছে করে নিজেকে। এবং চূড়াটা শুধু ডাক দেয়, ধারাবাহিক তার আহ্বান আমার আক্রান্ত রক্তে ধ্বনিময়।

'আবার হাউই। কী চায় ওরা?' তিনটিতে মুখ ফিরিয়ে ব্রীজের দিকে তাকাল। 'ব্রীজটা পেরনোর হিম্মত কুড়োচ্ছে। এত ভয় পায় আমাদের!' 'জানি।' নয়ান সিং-এর উত্তরটা এদের বিরক্ত করছে। (জানো, সবই জানো তুমি!) নয়ান সিং নিঃশব্দে হাসছে ঠোঁট ফাঁক করে। 'ওদের সঙ্গে আমার বহুবার মোকাবেলা হয়ে গেছে।' এরা উৎকর্ণ। এবং মৃদুভাবে লজ্জিত। নয়ান সিং সবই টের পায়, আশ্চর্য! তাই হয়তো এই নৈশ অভিযানের নেতৃত্ব ওকে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং এরা দুটিতে এবার গর্ব অনুভব করছে। নয়ান সিং দুদিন ধরে বন্দী ছিল শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে। অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে আসে। গল্পটা সারা সীমান্ত ছড়িয়ে গেছে এতদিনে। 'হাঃ-হাঃ-হাঃ, একটি দুনোশুয়ারের রূপকথা।' 'গুলীটা

ভোগে পরলে সত্যি মরণ হতো?' 'নিশ্চয়। সেইজন্যেই ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন জানোয়ার। ফিডের বাড়ির নাড়ী ওদের চোঁ-চোঁ করিনি টানছে—সন্ত্রাসব্যাপী ছবি পৌঁচ্ছে না, আন্দাজ সময় এ্যাভেলেশের রাজটা আমরা উড়িয়ে দিয়ে এসেছিলুম কিনা।' 'ওরা কাঁচা মাংস খেতে থাকল?' 'তোমার দিব্যি।' 'তারপর?' 'যে শাস্ত্রীর হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিয়েছিলুম, হঠাৎ দেখি সে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে কাঁদছে।' 'কাঁদছে?' 'ও সবচেয়ে বেঁটে। ভিড়ের ভেতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে থেকে এন্তার ঘুষি চালাচ্ছে। ভিড়টা ততক্ষণে পাথরের দেয়াল, নড়ে না। ফলে কী আর করা!' 'সেই ফাঁকে তুমি......' 'হ্যাঁ, আমি কাঁটা-খোঁচ ডিঙিয়ে ভোঁ-ভোঁ। আশেপাশে গুলীর শব্দ। রোগা পিলেসার ওদের ক্যাপ্টেনটা তাঁবুর মধ্যিতে ঘুমোচ্ছিল। সব টের পেয়ে থামাকা কটা বুলেট খরচ করে বসল।' 'শুয়ারের দাঁতটাই বোধ করি ওর বরাতে শেষমেশ জুটেছিল?' 'অগত্যা'। 'সাবাস্ জোয়ান!'

কমান্ডার বুম্ বুম্ ধ্বনিপুঞ্জ উপত্যকার চারপাশের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে মিলিয়ে গেল। 'মর্টার!' 'ওরা এত ভয় পায় আমাদের।' 'আমি দেখেছি।' আরো কোন গল্প আছে সম্ভবত। ঘাঁটিতে ফিরে কোন এক সময় শোনা যাবে। 'লীডার!' একজন শ্রদ্ধায় গাঢ় হয়ে ডাকছে। 'উঁহু স্যার বলো, কমরেড বলো।' 'না। লীডার।' নয়ান সিং ওর কাঁধে মৃদু চাপড় দিচ্ছে। ও আবেগে বিহ্বল। 'লীডার, যদি আমি......' স্বরটা কাঁপল। 'যদি তুমি?' 'আমার পকেটে একটা চিঠি রয়েছে।' 'তুমি কি ভয় পাচ্ছো কেবল সিং?' 'না, লীডার।' 'তবে পা বাড়াও। একটু বাঁ-পাশে। নীচে একটা মরা গাছের গুঁড়ি। ওটায় পা রাখতে হবে। একে একে এসো। মধ্যিখানে মস্তো ফাটল রয়েছে, হুঁশিয়ার।' নয়ান সিং আগে নামল। তারপর গুঁড়িটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে বলল, 'পায়ের নীচেই পাথর।' তিনজনে একে একে পাথরটায় পৌঁছল। শুকনো গাছটা ওপরের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এসেছে ভাঙা কড়িকাঠের মতো। 'আবার ওপরে উঠতে হবে একটু পরেই। চূড়োর কাছাকাছি গিয়ে বাঁয়ে নামতে হবে।' দূরে পর্বতের ভাঁজ বেয়ে খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উড়তে হবে। মাথার ওপরে প্লেনের শব্দ। তিনজনে থেমে গেল। ফেনাটা শকুনের মতো ঘুরে নামছে উপত্যকার দিকে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও তুষারের টান সামলাতে পারবে না হয়তো। একটু দূরে নিচেও বিমান ঘাঁটি। তাই ওটা শত্রুপক্ষের—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। 'এখানে হাওয়াটা আরো তীব্র। তাই না?' 'শীত করছে?' 'শীত?' পাহাড় বিকট হেসে উঠত একে একে। 'শীত মরে গেছে। নেই-ই।' 'জায়গাটা একেবারে ফাঁকা কিন্তু। অতো খাড়া হলো না হরকিষণ।' 'আচ্ছা লীডার।' পাথরে বুক ঘষছে এবার। 'আমাদের মতো নিশাচর ওদের পক্ষেও হওয়া সম্ভব। নয় কি?' 'হ্যাঁ, লীডার।' 'তবে আর কোন শব্দ না। যা বলার দরকার হবে, ইশারায় বলবে।' চারপাশে তাকাল তিনজনে। কালো পাথরের ওপর স্তরে স্তরে জমে ওঠা তুষারে ঈষৎ লালচে আভা। ওরা পরস্পর পিঠের ব্যাগটা পরখ করে নিচ্ছে। নয়ান সিং শেষবারের মতো বলল, 'ধরো, আমরা একটি অভিযাত্রী দল। চূড়োটা জয় করবো।' তিনজনে চূড়ার দিকে তাকাচ্ছে। চূড়ার ওপর ম্লান হলুদ একটা ছটা। যেন ঝিপঝিপ বৃষ্টি নেমেছে এতক্ষণে। তুষারপাত ঘন হচ্ছে। কোথাও কোন উষ্ণতা নেই—তবু আকাশে তুষার স্খলিত হতে থাকে। আর পাহাড়ের গায়ে পাথরে পাথরে স্তরীভূত তুষার এবার যেন শাঁখের মতো রং ধরেছে। মনে হয় কাকজ্যোৎস্নার রাত।

......ইচ্ছে ছিল একদিন একা এখানে আসবো। ঈশ্বরসন্ধানীদের মতো। কিছু প্রজ্ঞা নিয়ে ফিরে যাবো প্রান্তরে। এই হিমালয়ে যুগে যুগে ধরে অনেক আলো খুঁজে পাওয়া গেছে। যখন ছোট্টটি ছিলুম হিমালয়ের ছবি দেখতুম মুগ্ধ চোখে। ঋষিদের কথা ভেবেছি। তীর্থযাত্রীদের কথা। একদিন বড়ো হয়ে শুনলুম হিমালয়ে ইয়েতিরা থাকে। কেউ দেখেনি—পরস্পর শুনেছে শুধু। সেই সব ভয়ংকর পদচিহ্ন? তারপর একদিন হিমালয়ে সত্যি আসতে হল। হিমালয়ের ইয়েতিরা দলে দলে বেরিয়ে ছিল। আমার হাতে অস্ত্র দেওয়া হল। অনেক ইয়েতি দেখলুম। মেরেছি অনেক।......তাহলে সত্যি ইয়েতি ছিল, রয়েছে? চম্পাকে লিখেছি, কীভাবে কটা আমার জড়িয়ে ধরেছিল, নখে মাংস খুবলে তুলল, গালে পুরে চিবোতে থাকল। ছ্যাঃ, অতো বেঁটে ছোট্ট কুতকুতে চোখ থ্যাবড়া নাক, অথচ পায়ের চিহ্নগুলো কী করে অতো বড় হয়ে ওঠে? নাকি কিছু চলা-ফেরার কারসাজী? চম্পা লিখেছিল, ওরা কি মানুষ নয়? না চম্পা, মানুষ শুধু জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়। ঠিক তোমার মতো।......একদিন সব বলবো, তোমার পাশে শুয়ে থাকার রাত যদি জীবনে আসে!

......যুদ্ধে কি মানুষ মরে? চম্পা, চম্পাবতী, তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে। তোমার চোখে শুধু ফসলিরা প্রান্তর পেরিয়ে যোজন দূর হিমালয়ের, বর্ণময় উচ্চতার, আকাশের ধারাবাহিক আরাম। তুমি সুখ খোঁজ এই প্রচুর ব্যাপকতার পাখির মতো ফুলের মতো রোদে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে গভীর

অন্তর্বর্তী ধ্বনিপুঞ্জে। অথচ অন্যবিধ ধ্বনি ছিল, ভিন্নতর ব্যাপকতা ছিল হিংসা ও রক্তের। ছিল মৃতদেহ শোক এবং যন্ত্রণা। যারা এই সব উঁচু উঁচু মহিমাকে ধূলিসাৎ করে দিল, তাদের জন্যে তুমি এবার ভাবতে থাকো চম্পা। তুমি ভারত-বর্ষের মেয়ে।

যদি ফিরতে পারে, হাত দুটো টিকে থাকে, ঠিকঠাক এই কথাগুলো লিখে পাঠাবে ভাবছিল।......

নয়ান সিং হাতের তেলো থেকে কাঁটা বের করছে। তাই একটু থামতে হয় সঙ্গীদের। এবং দুজনেই আপন আপন হাত খুঁজছে। সাপের মতো হিস-হিস করে নিশ্বাস পড়ছে। এতখানি পথ প্রচুর ক্লান্তি দিয়েছে। পিঠের বোঝা জ্যান্ত হয়ে কামড়ে ধরে আছে শিরদাঁড়াগুলো। হ্যান্ড-গ্রেনেড, ডিনোমাইটের একটা পিন্ড, ব্যাটারী এবং তারের গোছা খুললে কয়েকশো মিটার লম্বা হবে। হাতুড়ী, আঁকসি, দড়ি, সাঁড়াশী......পাহাড়ী নৈশযুদ্ধের যাবতীয় টুকিটাকি। কোমরে বার ইঞ্চি ফলার ইস্পাতও। মুখোমুখি কিংবা হাতাহাতি যুদ্ধের জন্যে দস্তুর মতো তৈরী ওরা।

এখানে বুঝি এবার নিজেদের নিরাপদ বুঝল নয়ান সিং। শান্ত গলায় বলে উঠল, 'এই পাহাড়টার নাম জানো?' এরা দুটিতে জানে কি জানেনা—সাড়া না দিয়ে নিবিষ্ট মনে কাঁটা খুঁজছে। আসী হিলের একটা ক্যাম্প থেকে সদ্য যে দলটা আমদানি হয়েছে, এরা দুজনে তার মধ্যে বাছাই করা। ওয়েস্ট রীজের দুর্গম অঞ্চলে পাহাড়ী ঘোড়ার মতো ছুটোছুটি করে অনেক কসরত শিখে নিয়েছে। বিশেষ করে গরিলা কায়দায় আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে মোক্ষম আঘাত হানার কৌশলগুলো। ওয়ালং বাঁচানোর জন্যে একে একে সবগুলো রেজিমেন্টের টুকরো টুকরো দল এখানে নীচের গভীর অরণ্যে ইতস্তত জমায়েত হচ্ছিল। ইয়েলো ও গ্রীণ পিম্পলের চূড়ার দিকে লক্ষ্যটা ছিল তীব্র—শত্রুদের মতোই। এখন পাহাড়-গুলোর আশে-পাশে শত্রুরা সতর্ক চোখে মোতায়েন। এরা সব জেনে-শুনেই বেরিয়েছে। এবং নয়ান সিং অবশ্য আরো অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ও ছিল কিবতুর কাছাকাছি ফ্রন্টে একাকায়—যখন শত্রুরা রীমা থেকে কিছুর পথ ধরে ওখানে পৌঁছয়। নটি ব্যাংকার একে একে বিধ্বস্ত হলে ও একা লড়াই দিতে থাকে। তারপর সুযোগ বুঝে জঙ্গলের দিকে কেটে পড়ে। তিনদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে মর-ছিল নয়ান সিং। হয়তো এক সময় তাকেও মৃত্যু বরণ করতে হতো। কিন্তু এক পাহাড়ী মেয়ে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে।

......মেয়েটির পরিচয় নেবার মতো সুস্থতা ছিল না মনে। নৈলে ওর ঠিকানাটা রাখতুম। চম্পাকে লিখেছি সব। চম্পা ওকে 'বহিন' নামে ডেকেছে। বহিন আমায় শত্রুদের গেরিলা যুদ্ধের অনেক পদ্ধতি জানিয়েছিল। যখন সুস্থ হলুম, সেগুলো সব দেখি স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে; অথচ ওর মুখের গড়নটি একেবারে ভুলে গেছি। কোনদিন দেখলেও আর চিনতে পারবো না। ক্যাপ্টেন বাদাও বলেছিলেন, 'যোদ্ধাদের পক্ষে এটুকুই ঘটে থাকে। আমি জানি।' আঃ ক্যাপ্টেনের রক্তগুলো আমার জামা থেকে এখনো মিলিয়ে যায়নি।

'গ্রীন পিম্পল নামটা যে দিয়েছে, তার চোখ আছে বলতে হয়।' উপরে মুখ তুলে রেখে বলল নয়ান সিং। মুখে তুষার আর হাওয়ার ঝাপটানি, তবু অন্ধকারে চেয়ে রয়েছে চূড়াটার দিকে। 'সবুজ স্ফেটিক। হ্যাঁ, দেখায় এই রকম। কিন্তু নাম দেনেওয়ালা লোকটির দিল ছিল না হরকিষণ।' হরকিষণ জবাব দিচ্ছে না। হয়তো এই বেপরোয়ামি হাবভাব তার আদতে সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু সইতে হবে—নয়ান সিং আজ ওদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে গেছে। 'তের হাজার ফিট উঁচু'তে ঐ চূড়াটার জন্যে আমার অনেক ইচ্ছে ছিল: একদিন দেখেছি এর সবুজ গায়ে হাজার হাজার পাখিদের বাসা বাঁধতে। বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে সবগুলো উড়ে পালাল। পাখির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে ওরা আরো বিরক্ত হচ্ছে যেন। নয়ান সিং লোকটা সৈনিক হিসেবে যত ভালো হোক, কোন কোন বিষয়ে বড্ড বোকা: এরা ভাবছে। 'আরো কতখানি উঠতে হবে লীডার?' কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করার ইচ্ছেয় একজন ফিসফিস করে উঠল। 'প্রায় শ'তিনেক ফুট। তারপর একটু ঢালু জায়গা পাবো।' নীচে আর কোন গুলীর শব্দ নেই। কেবল অনেক দূরে বাঁদিকে—হয়তো জাপক নদীর তীর-বর্তী অরণ্যের কোথাও একটা আলো হঠাৎ জ্বলে ডাইনে-বাঁয়ে দুলল। তারপর নিভে গেল। 'এত উঁচুতে বসে দেখতে পাচ্ছি।' নয়ান সিং আলোটা দেখে বলল। 'কোন সিগন্যাল?' 'হ্যাঁ। মেজর কিষণ সিং ওখানে রয়েছেন। আধ ঘন্টা অন্তর আলোটা জ্বলবে।' নদী থেকে পাহাড় অব্দি শত্রুরা কোন সান্ত্রী রাখেনি, আশ্চর্য! তাহলে তো সবই টের পেত!' নয়ান সিং হাসল বোঝা যায়। 'প্রয়োজন মনে করেনি ওরা। এত দুর্গম চড়াই ভেঙে বরফ ঢাকা পাথর পেরিয়ে আমরা ওদের আক্রমণ করতে পারিনে ওরা ভেবে নিয়েছে। ওদের কেমন বিশ্বাস যে আমরা দুটি বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল। এক নম্বর হচ্ছে, আমরা শীত সইতে পারিনে, দু নম্বর: পাহাড়ী যুদ্ধে আমরা অক্ষম।' নয়ান সিং অস্ফুট শব্দ তুলে হাসল।

দূর জাপক রীজে আবার হঠাৎ [illegible]

ব্রীজের পথটা গ্রীন পিম্পলের দক্ষিণ সীমা ঘেঁষে ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের দিকে চলে গেছে। সেই পথে, অনেক দূরে ধাবমান মোটর ট্রাকের আলো দেখা গেল। গাড়ীগুলো পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। নয়ান সিং একটুখানি দেখে নিয়ে বলল, 'দল ভারী করার তালে ওরা। মরুক গে!' জল খাচ্ছে হরকিষণ। এত শীতেও জল তেষ্টা পায়। দেখাদেখি ওরাও কোমর থেকে বোতল খুলে নিচ্ছে।

'এবার দড়ি-আঁকশির দরকার হবে।'

তিনজনে উঠল। এবং একটুখানি এগিয়েই থামল। নয়ান সিং পিঠ থেকে দড়ি আর আঁকশিটা খুলে উপরে ছুঁড়ে দিল। কোথাও আটকাচ্ছে না। ক্রমান্বয়ে কয়েকবার ছোঁড়ার পর শব্দ করে আটকে গেছে এবার। টেনে ঝুলে পড়ে দেখল। 'ঠিক আছে। আগে আমায় উঠতে দাও।' তারপর একে একে।, পরপর তিনটিতে উঠে গেছে উঁচু চওড়া একটা চাতালে। কিছু শ্যাওলা জাতীয় নরম ঘাস। পা
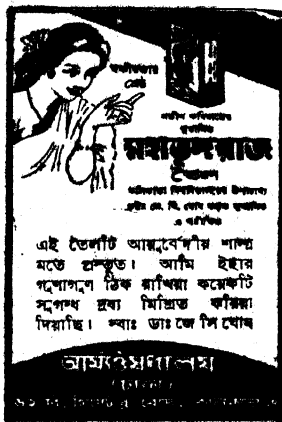
হুমড়ে যায়। পরস্পর জড়াজড়ি করে চলল। কয়েকটি সতর্ক পদক্ষেপ। তারপর চাতালটা শেষ হয়েছে। তুষারের ঝাপটানিতে সোজা দাঁড়ানো মুশকিল। হামাগুড়ি দিয়ে বসে রাইফেলের নল বাড়িয়ে গভীরতাটুকু আন্দাজ করল নয়ান সিং। গর্ত নয়, একটা পাথরের চাঁই বেরিয়ে আছে দেয়াল থেকে। পরস্পর কাঁধে ভর দিয়ে নামল। পা রাখা যায় না—গুরুতর পিছল। এবং আবার ঢালু চড়াই। কিন্তু এবার পাথরের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। চাপচাপ নরম তুষার। হাঁটু অব্দি পুঁতে যাচ্ছে। আঁকসি এবং মাঝে মাঝে গাঁইতি বসিয়ে সাবধানে উঠতে হচ্ছে শরীরের ভারসাম্য রেখে। 'হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার।' নয়ান সিং বিড়বিড় করছে। 'আর মাত্র তিরিশ ফুট। তারপর বাঁদিকে সিঁড়ির মতো ধাপ পাওয়া যাবে।' দুজনে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো হাঁফাচ্ছে। জিভ বেরিয়ে আসছে। 'একটু বসবে লীডার?' 'কষ্ট হচ্ছে?' 'হাঁটু সোজা করা যায় না' 'আর একটুখানি রাস্তার, মাত্র কয়েক ফুট। জিরোবার শেষ জায়গা পাচ্ছি।' নয়ান সিং ওদের কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু কেউ টের পায় না—হাতে ও কাঁধে কোন অনুভূতি নেই।

উজ্জ্বল সাদা জ্যোৎস্নার মতো ঝকঝকে জায়গাটা। জড়োসড়ো হয়ে তিনজনে বসল। দূরে সেই সিগন্যাল আলো উত্তর-পশ্চিম কোণে। আলোটা দুলছে। কিছু বলছে। এরা ওকে সিগন্যালের বাইরে অন্যতর সত্তায় চিহ্নিত করে আরাম খুঁজছে এখন। আহা, আলো নয়, আগুন। একটু আগুন এখন যেন লক্ষ যুগের তপস্যার ফল দিয়ে বদলে নেওয়া যায়। গ্রীণ পিম্পলের চূড়ার অলৌকিকতা স্মৃতিতে ধূসরতর। একজন নিঃশ্বাসে ভেঙে পড়া স্বরগুলো ছাড়ল: 'এ আমরা চাইনি লীডার। আমরা অন্য কিছু চেয়েছিলুম।' নয়ান সিং বিড় বিড় করছে, 'হ্যাঁ, শান্তি আর বন্ধুতা।' 'ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করল।' 'ওরা যে ইয়েতি—মানুষ নয়।'

'হিমালয়ের ইয়েতিগুলো সব একদিন মরে যাবে লীডার।'

এবং ইয়েতিদের অস্তিত্ব, দাঁত, নখ ...রক্তের ঘৃণার হিংসার একটা স্পন্দন তুষার হাওয়ার মৃদু উষ্ণতার মতো কাঁদল, স্নায়ুতে তরঙ্গ তুলল। তিনজন গা ঝেড়ে তুষার ফেলে দিচ্ছে।

ধাপে ধাপে সতর্ক পায়ে ওরা আবার নীচে নামছিল।

কিছু কিছু ঘাসে পা ঠেকছে। ঘাসের ভেতর পা রেখে চলতে হচ্ছে। এত শীতে কোন জানোয়ারের অস্তিত্ব অনুমান করা যাবে না। ময়াল চিতা ভালুক, এরা এখন আরো নীচে নেমে গেছে। অনেক নীচে নামলে হয়তো শোনা যেতে পারে কাকরের ডাক। সজারুর কাঁটার খটখট শব্দ। চিতল হরিণীর ভয়চকিত আর্তনাদ। এখানে তুষারের ঝাপটানি কম। কিন্তু শব্দময়তা ছিল। কাতর এবং ঝুঁকেপড়া বিশীর্ণ গাছ। অবিশ্রান্ত থিপ্ থিপ্ সিপ্ সিপ্ শব্দ। শব্দগুলো বাড়ছিল, যত নীচে নামতে থাকল। গাছপালা ঘন হচ্ছে। ঋজুদেহ ইউক্যালিপটাস, পাইন কি দেবদারু। ওরা তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে।

অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার আর উঁচোনো ভরা পাহাড়ী অরণ্য। ধাপে ধাপে নীচের দিকে বিস্তৃত। গাছের পাতা থেকে তুষারের স্তূপ খসে পড়ার শব্দগুলো শুনে ওরা চমকে উঠছিল। এবং হাওয়া কম, গাছের নীচে চলার সময় মৃদু উষ্ণতা, একটুখানি বসতে ইচ্ছে করে। নয়ান সিং হাত ধরে টেনে তুলছে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে থামল। আর কোন কথা বলা যাবে না, ওরা টের পেয়ে গেছে। নয়ান সিং ইশারায় সমুখে একটা নালার অস্তিত্ব জানাল। দাঁড়ি আর আঁকসি ছুঁড়ে মারল গজ সাতেক চওড়া নালাটার ওপারে। নয়ান সিং জানে নালাটার গভীরতা তিনশো ফুটেরও বেশী। আসলে একটা ফাটল—সোজা পশ্চিমে গিয়ে নদীতে মিশেছে এবং নয়ান সিং যখন দড়ির সাহায্যে বাদুড়ের মতো ঝুলতে ঝুলতে নালাটা পেরোতে থাকল, এরা দুজনে অসহ্য উত্তেজনায় রাইফেলের বাঁটে বিক্ষত হাত চেপে ধরে বসে রয়েছে। এদের সবটুকু রক্ত চোখ-মুখে জমে গেছে। এদের দুজনকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে, লীডার ফিরে আসা অব্দি। এরা রাইফেল দুটো তুলে ধরে চারপাশে তাকাতে থাকল তীক্ষ্ণ চোখে সন্ধানী কানে শিকারী বাঘের মতো।

...আরো একটু উঠলে চূড়ায় পৌঁছতুম। চম্পা, সীমান্তে যদি কোন-দিন শান্তি ফিরে আসে, একবার ওখানে উঠবে। যুগে যুগে হিমালয় তার নীল শরীরের শীর্ষে আচ্ছন্ন শুভ্রতার সঞ্চয় থেকে ধারায় ধারায় নামিয়ে দিয়েছি অনেক আলোর তরলিত আত্মাগুলো। প্রান্তরে কৃষাণ-কৃষাণীর চোখে-বুকে সেই আত্মার সিক্ততা এবং একই সিক্ততা প্রজ্ঞাবিক্ষুদের জন্যেও অনিবার্য ছিল। আমিও তাদের একজন হতে পারতুম। আমারও ইচ্ছে করে গ্রীণ পিম্পলের চূড়ায় উঠে দেখবো, যদি কিছু পেতে পারি, একটি অলৌকিক পাখি কি ফুল জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে রোদে কিছু উজ্জ্বলতা।

...ইচ্ছে ছিল, ওর হিমশুভ্র নগ্নতায় সৈনিক আমায় কী রূপে দেখায়। মাথায় আমার ইন্দ্রধনুর মুকুট, অথচ হাতে বেয়নেট নেই, বুলেট না হ্যান্ডগ্রেনেড, রক্ত না, বোঝাটা নেই, শুধু দুটি খালি হাত, চোখ আর তৃষ্ণা, তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা।

নয়ান সিং পাহাড়ী অজগরের মতো বুকে হেঁটে এগোচ্ছিল। গ্রীণ পিম্পলের

মাঝামাঝি এই ঢাল্‌ অংশটার কোন আশঙ্কার কারণ নেই, শত্রুরা জানে। পূর্বে ও দক্ষিণে দুর্গম চড়াই, পশ্চিমে খরস্রোতা হিম ব্যাপক প্রবাহিনী, নিবিড় অরণ্য—মুখোমুখি ব্যাপক যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। শুধু গেরিলাযুদ্ধ এই পটভূমিকায় কিছু ফল দিতে পারে। শত্রুদের সম্ভবত স্থির বিশ্বাস, গেরিলাযুদ্ধে তাদের দোসর নেই। নয়ান সিং অভিজ্ঞতা থেকে এ বোধটা পেয়েছে। ইচাং প্রপাতের পূর্বতীরে একটা চৌকোণ পাথরের টিলার উত্তরপ্রান্তে ওকে উপস্থিত হতে হবে। তার ওপাশে শ্বেতী নালা। নালাটা অবশ্যি পেরোতে হবে না।

কোথাও খুব কাছেই যেন আবছা কন্ঠস্বর। যেন কে কথা বলল। নয়ান সিং নিস্পন্দ। বুক কাঁপছে। এখানে এতখানি নিশ্চিন্ত ওরা। দলে ভারী হলে এ প্রান্ত থেকেই আক্রমণটা আরম্ভ করা যেত। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বাঁপাশে মোড় নিয়ে নদী লক্ষ্য করে এগোল নয়ান সিং।

ইচাং-এর পূর্বতীর ঘেঁষে একটা কচ্ছপের খোলের মতো টিলা। তার পেছনে পূর্বে দেয়ালের মতো খাড়া উঁচু একটা স্তরীকৃত গ্রানাইট শিলার অনাবৃত পাঁচিল। টিলার ওপর ওদের ব্যাংকারগুলো উঁচু ঘাস আর ঝোপে ঢাকা। প্রাকৃতিক ক্যামাফ্লেজের সুবিধে রয়েছে। মাত্র কদিন আগে নয়ান সিংদের দলটা ওখানে ছিল। গ্রানাইটের দেয়ালের ওপর থেকে হঠাৎ দুপুর রাতে অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয়েছিল। নয়ান সিং একা পালাতে পারে। দলের সকলে ফিরতে পারেনি। কেউ মরেছিল, কেউ সম্ভবত বন্দী হল শত্রুর হাতে।

অতি সন্তর্পণে কোনাকুনি গিয়ে প্রপাতের শব্দ শুনল। শুকনো ঘাসের দাম দুহাতে জড়িয়ে ধরে নীচে নামল। পায়ের নীচে জলেডুবো পাথরগুলো খুঁজছিল নয়ান সিং। কিন্তু হঠাৎ ঘাস ছিঁড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নীচে একটা কাঁটা-ঝোপে আটকে গেছে। নীচের জলে বরফের সর জমেছে। ভাগ্যিস প্রপাতের কল্লোলটা এই আকস্মিক পতনের শব্দকে ঢেকে ফেলল। নয়ান সিং পায়ে হাতড়ে তীরবর্তী ঝোপগুলো ধরে এগোচ্ছে। তারপর পরিচিত ধাপগুলো মিলল। ধাপে ধাপে পাথর উঠে গেছে প্রপাতের কিনারা ঘেষে। টিলাটার উত্তরপ্রান্তে শেষ হয়েছে। একটা গ্রেনেডের টুকরো বের করে হাতে রাখল। রাইফেলটা বাঁহাতে

বুকের আড়াআড়ি ধরে রাখা। যদি কারুর সংগে মোলাকাত হয়ে যায় প্রথমে গ্রেনেড দিয়েই সম্বর্ধনা করবে ভাবল। ফলে অন্যাবিধ ঘটনা শুরু হওয়া সম্ভব। কিন্তু পেছনে ওপারে মেজর কিষণ সিং দুটো প্ল্যাটুনসহ নদী পেরনোর উপযুক্ত সময় খুঁজছেন—উঁচুতে উঠে নয়ান সিং ছোট্ট টর্চটা জেবলে সংকেত জানালেই পরবর্তী কাজ শুরু হবে। আজ সারাটি দিন প্রপাতটা মাঝখানে রেখে উভয়পক্ষ প্রচুর গোলাগুলি ছুঁড়েছিল। হয়তো কেন ফলাই হয়নি। সম্ভবত শত্রুরা দূর দক্ষিণে জাপক ব্রীজ পেরিয়ে আজ শেষ রাত থেকে নতুন আক্রমণ শুরু করবে। এবং প্রপাতের আরো উত্তরে ইয়েলো পিম্পলের নীচে নাব্য নদীপথে ওদের আর একটা দল অরণ্যটা সাঁড়াশির মতো বেড় দিয়ে ধরবে। তার আগেই নয়ান সিং সময়ের চাকা ঘুরিয়ে দিতে চায়। 'ওয়ালং বাঁচাতে হবেই—যে কোন রক্তের মূল্যে।' মেজর কিষণ সিং বলেছিলেন। উনি নিজে রাইফেল ধরেছেন আজ। নয়ান সিং প্রপাতের সমান্তরালে পৌঁছে চারপাশে তাকাল। মাথার ওপর টিলার গায়ে মৃদু যান্ত্রিক শব্দ ঘর্ ঘর্ ঘন্ ঘন্। হয়তো মেসিনগানে কাজ হবে না ভেবে শত্রুরা

দূরপাল্লার কামান বসাচ্ছে। কিছু ব্যস্ততাও অনুভব করা যায় টিলার ওপরে।

ক্যাপটেন বাদাওর রক্তাক্ত মুখটা মনে পড়ল। আর বীর ব্রিগেডিয়ার হোসিয়ার সিং তো দুহাত তুলে আত্মসমর্পণের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন—একটু পরেই মুখ থুবড়ে পড়তেন, গুলী করার দরকার ছিল না; তবু ইয়েতীরা ওঁর ওপর দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ বসাল।

আঃ ঘৃণা, হিংসা, ক্ষোভ! নয়ান সিং-এর হৃদপিন্ড ঘূর্ণমান চাকার মতো এত দ্রুত যে স্থির মনে হয়। টিলার প্রান্ত ঘেষে শ-তিনেক গজ যেতে হবে। তারপর আবার পাথরের উঁচু উঁচু ধাপ। দড়ি-আঁকশির সাহায্যে প্রায় নিঃশব্দে বনবেড়ালের মতো উঠতে থাকল নয়ান সিং। একেবারে গ্রানাইট পাঁচিলের শীর্ষে। ওটার পেছনে একটা গভীর গর্ত রয়েছে দেখেছিল। একজন সৈনিক এখনও ওর মধ্যে রয়ে গেছে। ওর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে মরে গেছে নিশ্চয়। নয়ান সিং এক মুহূর্ত ভাবল। যদি বেঁচে থাকে, ডিনামাইটের পিন্ডটা ও দেখতে পাবে। চেঁচিয়ে উঠবে? কিংবা অন্য কিছু? টর্চ বের করে জবালাল এবং সঙ্কেত দিল। এবং পরমূহূর্তে ধীরে ধীরে ডিনামাইটটা নামিয়ে তারগুলো সন্তর্পণে টেনে আরো দূরে সরে গেল। একটা পাথরের আড়ালে বসল।

এবং দুমিনিট পরেই নির্ধারিত ঘটনার পটভূমি ভয়াবহ গর্জনে বিস্ফোরণে আগুনের প্রচন্ড উত্তাপে অন্ধোর নীচের দিকে বিস্তৃত হতে থাকল। গ্রানাইট পাঁচিলের বড় বড় টুকরো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে রক্তরঙ মৃত্যুর মতো নীচে নেমে গেল। গ্রীন পিম্পলে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। থর থর করে কাঁপছে পাহাড়টা। আর পরক্ষণেই নীচের টিলায় ক্রমাগত বিস্ফোরণের শব্দ। দ্রুত নীচে গড়িয়ে চলেছে নয়ান সিং। একেবারে টিলার ওপর। চারপাশে মর্টারের গম্ভীর নিনাদ। মেসিনগানের ট্রাট ট্রাট। ওপারের বন্ধুরা পৌঁছে গেছে। জঙ্গলটা জবলছে হু হু করে। তুষার এবং শৈত্যকে নিষ্ফল করে ভয়ংকর উজ্জ্বল শার্প নলের ফলা। নয়ান সিং লাফিয়ে ওদের ব্যাংকারের পেছনে নেমে এসেছে। নয়ান সিং বুঝতে পারছে আকস্মিক আক্রমণে শত্রুরা হতচকিত হয়ে ব্যাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রানাইটের শিলার নীচে চকিত আলোয় শত্রুদের পিষ্ট শরীর। ওদের সংখ্যা যা অনুমান করেছিল, তারও বেশী। ওরা পূর্বে চূড়া লক্ষ করে মর্টার ছুঁড়ছে। ওরা ভেবেছে পাহাড়ের ওপর থেকে ভারতীয়রা আক্রমণ করেছে।

কেবল সিং ও হরকিষণের কাছে পেঁাছতে হবে এবার। নয়ান সিং গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ল। শত্রুরা ওকে দেখতে পেয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিস্ফোরণের আলোয় পরস্পরের মুখ দেখল। আবার ইয়েতীদের মুখোমুখি তাহলে। নয়ান সিং-এর রক্তাক্ত শরীরে আর পৃথক অনুভূতি নেই। তাকে নালায় পৌছতে হবে। 'সবুজ স্ফাটকের' বিষ নিষ্কাশিত হতে চলেছে। এখন শুধু রক্তের ক্লেদের ধারা নামল। একদিন আরোগ্য আসবে।

ভোর হচ্ছিল।

গ্রীন পিম্পলের উত্তর প্রান্তের উপত্যকা আস্তে আস্তে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। শত্রুরা আরো পূর্বে পালিয়ে গেছে। দক্ষিণে জাপক ব্রীজেও কোন শব্দ নেই। ভোরের আকাশ স্পষ্টতর হল। পূর্বের দিগন্তে স্বল্পতম দীপ্তি। তুষারপাত কমেছে। কেবল সিং আর হরকিষণ নয়ান সিং-এর রক্তাক্ত দেহটা বয়ে আনছিল। গ্রীন পিম্পলের চূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা জাপক ব্রীজের পথে তাকাল। শত্রুরা দলে দলে মার্চ করে পূর্বে চলে যাচ্ছে। ওরা এদের দেখতে পাচ্ছে, অথচ গুলী ছুঁড়ছে না। এরা অবাক হল। এরা জানত না অকস্মাৎ মধ্যরাত থেকে শত্রুরা সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

'লীডার!'

'ওকে ঘুমোতে দাও হরকিষণ, ও ক্লান্ত।'

'লীডার, কমরেড, মেরি ভাইয়া!'

'ছিঃ হরকিষণ।'

দুজনে পাথরে দেহটা শুইয়ে রাখল। ঝুঁকে পড়ে নয়ান সিং-এর চোখ দুটো দেখল। নয়ান সিং-এর পলক ছাড়া চোখ গ্রীন পিম্পলের চূড়ার দিকে খোলা।

নয়ান সিং হিমালয়ের অলোকিক উজ্জ্বলতা ধারণ করতে চেয়েছিল। হিমালয় ওকে তার সাতটি রঙের মধ্যে বেছে বেছে শুধু লাল রঙটি দিয়েছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যযুগে

ডাঃ অশোক বাগচী

(১০৯৬—১৪৩৮ খৃঃ অঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরবর্তী-কালে সমগ্র য়ুরোপে আরম্ভ হয় বীভৎস অরাজকতা। প্রাচ্য থেকে দলে দলে মধ্য-এশীয় বর্বর যাযাবররা বারম্বার য়ুরোপ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালায়। খৃষ্টীয় যাজকগণ বহু কষ্টে ঐ বর্বরদের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয়দের একতাবদ্ধ করেন। দশম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন যাজকগণ কর্তৃক সংরক্ষিত। খৃষ্টীয় যাজকরা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করে গির্জার সন্নিহিত চিকিৎসালয়ে রোগীর চিকিৎসা করতেন। ১১৩৯ খৃঃ অব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের মনে আশংকা হয় যে, যাজকগণ ধর্মাচরণ অপেক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রেই অধিক মনঃসংযোগ করেছেন। সেজন্য তিনি যাজকগণকে চিকিৎসা ব্যবসায় হতে বিরত হতে আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডার বহু যাজক-চিকিৎসককে ধর্মীয় সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যাজক-চিকিৎসকরা মূর্খ জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে পুনরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলেন। মধ্যযুগের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখা যায় যে, যাজক-চিকিৎসকগণ বলতেন, সেন্ট ব্লেজ কন্ঠনালীর, সেন্ট এ্যাপোলোনীয়া দন্তের, সেন্ট লরেন্স পৃষ্ঠের, সেন্ট বের্নাডিন শ্বাসনালীর ও সেন্ট এরাসমুস উদরের অধিদেবতা। স্বল্প-শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পুজো দিতেন। সেন্ট গল শহরের ব্যারোজিন-গিয়াম মঠে একটি উৎকৃষ্ট আরোগ্যশালা ছিল। দ্বাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তাঁরা খৃষ্টজন্ম-নিরীক্ষণকারী পবিত্র পুরোহিতদের সংগৃহীত করোটী-স্পর্শে রোগ নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে রোগী গির্জায় উপস্থিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজানুগ্রহ লাভের জন্য রাজসমীপে যেত। রোগীর অঙ্গ-স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলেন্ডেশ্বর এডওয়ার্ড দি কনফেসর। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় দুই তিন সহস্র রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী এ্যানও অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন।
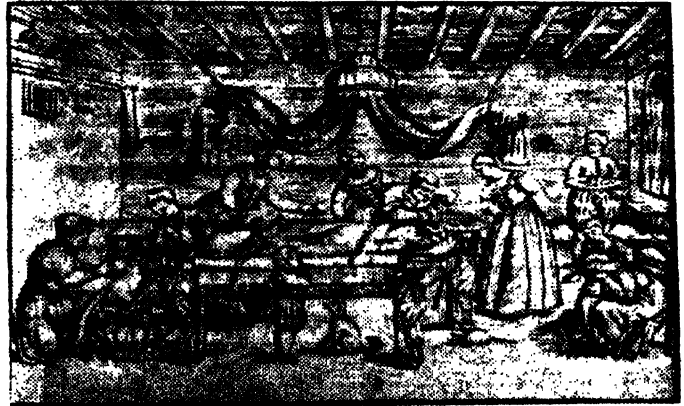
মধ্যযুগে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্শ্বে নির্মাণ করেন 'হস্পিতালিয়া' নামক অতিথিশালা। কালক্রমে অনাথ বালকবালিকা ও কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওয়া হত। পুরাকালে য়ুরোপে কুষ্ঠব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্য দিয়ে য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল ঐ রোগ। য়ুরোপের কুষ্ঠ-রোগীদের শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের য়ুরোপে প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখা দিত। সে সময় প্লেগ-এর নাম ছিল 'কৃষ্ণমৃত্যু'। চতুর্দশ শতকে য়ুরোপের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। য়ুরোপের মূল ভূখন্ডের কনস্তান্তিনোপল্ ও গ্রীস দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা দেয়। অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ করে। যোহানেস্ নোহ্‌ল বলেছেন যে, প্লেগ রোগ সুদূর চীন দেশ থেকে রুশিয়া, পারস্য ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে য়ুরোপে প্রবেশ করে। ফ্রান্সিস্কান যাজক মিখাইল লিখেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারটি জাহাজ-ভর্তি প্লেগাক্রান্ত জেনোয়াবাসী নাবিক সিসিলির মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্র সিসিলিতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। প্লেগ হতে কারও নিস্তার ছিল না। রোগের সূচনায় রোগীর দেহে বিস্ফোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমন করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় ক্ষুব্ধ মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূখন্ডে চলে যায়। উক্ত পলাতক মেসিনাবাসিগণের মাধ্যমে প্লেগ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ প্লেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। গী দ্য শালিয়াক্ বলেছেন যে তাঁরা প্লেগের প্রতিষেধক হিসাবে অধিক জলীয় খাদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করতেন এবং

মধ্যযুগের অস্ত্রোপচার-দৃশ্য

বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সংগে প্লেগ বিস্তৃতি লাভ করে —এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওয়ার আগে মুখোস, আলখাল্লা ও দস্তানা পরিধান করতেন। দূষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য রোগী-গৃহে দুর্গন্ধ-যুক্ত ছাগল রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাদুলী বাঁধা থাকত। ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে ইতালীর রেজ্জিও শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের শাসক ভিস্‌কমতে বের্নারো রোগীদের শহরের বাইরে বহিষ্কৃত করেন এবং শুশ্রূষাকারীগণকে সুস্থ ব্যক্তিগণের সংগে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন।

বাসরার চিকিৎসক

কিন্তু বের্নারোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইদুরের সাহায্যে সংক্রমিত "বাগী প্লেগ" (Bubonic plague)-এর কোনও উপশম হয়নি। সিসিলির রাগুসা বন্দরের নিকট একটি রোগাবাস নির্মিত করা হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী সমস্ত জাহাজ-যাত্রীদের ৩০ হইতে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক বসবাস। ইতালীয় ভাষায় ঐ প্রথাকে বলা হয় 'কোয়ারেন্তা জিওর্নি' অর্থাৎ 'নিরোধক দিবস'। পৃথিবীতে অধুনা সুপ্রচলিত 'কোয়ারেন্টাইন' পদ্ধতি 'কোয়ারেন্টা জিওর্নি'-এর আধুনিক রূপান্তর মাত্র।

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের দেশে ঐ চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভঙ্গকারীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হত। ক্যোনিগস্-বের্গের বারবারা থুটিন নাম্নী এক গৃহ-পরিচারিকা এক প্লেগ রোগীর ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় থুটিন ও তার প্রভু উভয়েই প্লেগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থুটিনের মৃতদেহটি প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেয়।

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বর্ণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের (Four horsemen of the Apocalypse) দ্বারা প্লেগরোগ ব্যাপ্ত হয়। স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-দের সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের এ চরম দুর্দিনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতেন অলীক কল্পনার দ্বারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল [Companies of the Fool] নামক যাজক গোষ্ঠীর সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেন্ট রোখ্‌স নামক এক যুবক নিজে প্লেগাক্রান্ত হয়ে অতি আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্যলাভ করায় পরবর্তীকালে তিনি প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্লেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুসংস্কারাপন্ন জনসাধারণ ইহুদিদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকসমক্ষে জীবন্ত দগ্ধ করে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সম-সাময়িক কালে নেপলস্ শহরের দক্ষিণে ছিল সালের্নো নামক একটি স্বাস্থ্যা-বাস। নবম শতাব্দীতে ঐ স্থানে একটি বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট শার্লেমান ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে ইহুদি এলিনুস্

১৩শ শতকের শবব্যবচ্ছেদ

য়ুনাজী পণ্টুস্, আরবীয় আদ্ আলী ও রোমক সালের্নুস নামক চারজন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞের *সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐটি প্রতিষ্ঠিত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোনও পুরুষ, এমনকি স্ত্রীলোকও ঐ স্থানে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। সালের্নো বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে অবস্থিত ধর্মীয় পুস্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী বহু আহত যোদ্ধা সালের্নোতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর বিজয়ী উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্ট চিকিৎসাব্যপদেশে বহুদিন সালের্নোতে বাস করেন। সেই সুযোগে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হে:সর তাঁর 'লেরবুখ্ দেস গেশিখ্‌তে দের মেদের্ৎসিন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালের্নোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা পাঁচজন স্ত্রী-চিকিৎসকের মধ্যে কনস্তান্তিয়া কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে সাধু রুডলফ্ সালের্নো পরিদর্শনে গিয়ে ট্রটুলা নাম্নী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে একখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সিচেলগার্তা নামক বিষবিজ্ঞানে [Toxicology] পারদর্শিনী মহিলা চিকিৎসক হিংসাপরায়ণা হয়ে তাঁর স্বামী ডিউক রবার্ট গিস্‌কার্দিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয় আজ থেকে দু শতাব্দী আগে থেকে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, সালের্নোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী-প্রগতিপন্থী।

সালের্নোর খ্যাতি ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের দক্ষিণে ম'পেলিয়ের (Montpellier) ও উত্তর-পূর্ব ইতালীর বোলোনা ও পাডুয়া নামক দুটি স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ম'পেলিয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভিলানোভা শহরবাসী আর্নল্ড নামক এক পর্তুগীজ চিকিৎসক। তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সুহৃদ পোপ অষ্টম বনিফেস-এর অনুরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্রাক্ষাসব (alcohol) সাহায্যে ভেষজনির্যাস-প্রস্তুতকারক। পূর্বে উল্লিখিত গী দ্য শালিয়াক্ ম'পেলিয়েরেও বোলোনাতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ ক্লেমেণ্ট্-এর সভা-চিকিৎসক এবং 'চিররুগী ম্যাগনা' নামক একটি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। গিলবার্ট এ্যাংগলিকাস ও গ্রাডেসডেনের জন নামক দুজন ইংরাজ শিক্ষালাভ করেন ম'পেলিয়েরে। জেওফ্রে চসার প্রণীত 'ক্যাণ্টারবারি কাহিনী' পুস্তকে জন-এর নাম উল্লেখ আছে। তিনি দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। 'শারীরের ইতিহাস' নামক পুস্তকে গ্রেণ্ড নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, জন ভেষজ সাহায্যে মূত্রাশয়ের পাথুরী দ্রবীভূত করতেন ও প্রলেপ দ্বারা দাঁতের চিকিৎসা করতেন।

ম'পেলিয়ের খ্যাতি সালের্নো অপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে চিকিৎসা-বিদ্যালাভের জন্য ছাত্রগণ প্যারী ও পাডুয়া যেত। প্যারীবাসী ইংরাজ ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪—১২৯৪) এবং জার্মান ডোমিনিকান যাজক আলবের্টুস মাগনুস (১১৯২—১২৮০) ছিলেন প্যারীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় ধর্মচর্চায় অবহেলা করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত হন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ইসলামী প্রভাব

খৃষ্টীয় নবম শতকে বাগদাদকে কেন্দ্র করে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। প্রাচীন বাগদাদের উন্নতিতে আকৃষ্ট বহু সীরিয়, পারসিক, ইহুদি, তুর্কী, য়ুনানী ও স্পেনীয় বাগদাদে যান জ্ঞান আহরণের জন্য। মুসলমানগণ স্পেনের দক্ষিণতম প্রদেশ কর্ডোবা অধিকার করে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেনে বসবাসকারী মুসলমানগণকে বলা হত মুর। মুর চিকিৎসকগণের মধ্যে আভ্ এন জোয়ার ও আভ রো এজ-এর নাম সুপরিচিত। ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে দেশ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন ইবন অল্ আহির নামক একজন মুর। তিনি দামাস্কাস ও কাহেরা শহরে দুটি বৃহৎ হাসপাতাল দেখতে পান। খলিল নামক অপর এক পর্যটক লিখেছেন যে মক্কা যাত্রার পথে অসুস্থ হওয়ায় তিনি দামাস্কাসের উক্ত হাসপাতালে এক বিচক্ষণ পারসিক চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসিত হয়েছিলেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে কাস্টিলের সেণ্ট ফের্দিনান্দ কর্ডোবা অধিকার করে সমস্ত ইসলামী নথিপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করেন।

মুসলমান চিকিৎসকগণের মধ্যে বাসরার অল্ রাসি (৮৫০—৯৩২ খৃঃ) ও পারসিক ইবন্ সিনা (৯৮০—১০৩৭)-এর নাম আজও বিখ্যাত। অল্ রাসি হাম-জ্বর ও অন্যান্য গুটিকা-জ্বরের (Eruptive fevers) প্রভেদ বিচার করেছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে আছে সর্পদংশন চিকিৎসা, পর্যটকের স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি। ইবন সিনা অল্ রাসির চেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় বোখারা শহরে। অতি শৈশবে তিনি কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পারস্যরাজের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। শহর হতে শহরান্তরে পরিভ্রমণ করতেন এবং শিক্ষা-মানসে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। কবি ওমর খৈয়ামের মতো তিনিও ছিলেন মনোরম কবিতা রচনায় পারদর্শী। ৩৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করবার পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রসেবায় দান করেন।

(ক্রমশঃ)

লণ্ডন থেকে বলছি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

হলিউড-আবিষ্ট আধুনিক পাশ্চাত্য রুচিতে নারীর রূপ নিতান্ত দেহনিকেত, যৌন আবেদনের সংগে অভিন্নার্থ। ইঞ্চির সংখ্যাতত্ত্বে তা নির্দিষ্টপ্রায়। আদ্য ও অন্তে প্রতিসাম্য, —কিঞ্চিদূনে চত্বারিংশৎ, মধ্য অনমতি বিশোর্ধ। অর্থাৎ একই দেহে সংস্কৃত সাহিত্যের পীনপয়োধরা - মন্দোদরী - নিতম্বিনীর সমন্বয়। আরো সংক্ষেপে ওরা তাকে বলে 'আট', আমরা বলতে পারি 'চার' (৪)।

—এই রূপের মাদকতায় ইউরোপ মত্ত। বহুজন-চিত্তবিজয়িনী সপ্তবিংশতি-বর্ষীয়া নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী জয়েস ব্রেয়ার বলেছেন, "একটি রূপবতী তরুণীকে পঞ্চাশটি পাউন্ড দিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিন। কয়েক দিনের মধ্যেই সে যা চায় তাই পেতে পারে।"

রূপ-যৌবনের মন্ত্রশক্তিতে শুধু সে যে ফরাসী রিভিয়েরার কল্পতরুর নত-শাখে সংসক্ত শুক্রশশীকেই করগত করতে পারে তাই নয়, ভাগ্যগুণে অকস্মাৎ তার তারকা-সংযোগ ঘটে যেতে পারে। অমিত যশ ও ঐশ্বর্যের স্বপ্ন-বিলাসিনী মর্তভূমির উর্বশীদের অমরাবতী হলিউড থেকে তার ডাক এসে যেতে পারে। আর প্রায় সংগে সংগে পৃথিবীর দেশে-দেশে চকচকে লোকরঞ্জনী পত্র-পত্রিকায়, দেওয়ালপঞ্জীর মসৃণ অগ্রভাগে, সর্বোপরি অগণ্য প্রেক্ষাগৃহের পর্দায়-পর্দায় তার বিলোল-হিলোল হাস্য-লাস্য, বিচিত্র-সাজসজ্জা কিম্বা কুন্দশুভ্র অসংবৃতা ও অকুণ্ঠিতা অনাবৃত দেহ মূর্ত ও প্রতিফলিত হয়ে উঠবে।

প্রতি বর্ষচক্রে সে এত টাকা অর্জন করবে যা দিয়ে সে প্রতি মাসে নতুন-নতুন রোলস রয়েস কিম্বা ল্যামুনসাই কিনতে পারবে। হীরে-জহরতের অলংকার রাখবার তার স্থানাভাব ঘটবে, মণিবসনের প্রাচুর্যে তার ওয়ালড্রব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। পিকাসোর নতুন ছবি কিনে স্নানাগার সজ্জিত করতে পারবে।

'দি ওয়ার্লড অব সুইজি ওয়াংয়ের' ষড়বিংশতি বর্ষীয়া অভিনেত্রী সাই চিন বলেছেন, "একটি রূপসী রমণীর সম্মুখে প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর, তা সে প্রলোভন—সাফল্য, খ্যাতি, অর্থ কিম্বা পুরুষ যাই হোক না কেন!"

—সেই পথেই লিজ্ টেলার, ব্রিজেট বর্দো, মর্লিন মনরো ও সফিয়া লরেন প্রভৃতি তারকাবৃন্দের চোখ ধাঁধানো উদয়। মদনের কারসাজিতে আলাদীনের প্রদীপের ভেল্কী! কিন্তু তাঁদের অন্ত?

পূর্বোল্লিখিতা শ্রীমতী ব্রেয়ার সখেদে বলেছেন, "কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে না। পরিশেষে সেই সুন্দরীদের যখন আর দেবার কিছুই থাকে না তখন তারা ক্রমশ

জয়েস ব্রেয়ার — মেরিলিন মনরো — জোন কলিন্স্

বুঝতে পারে যে কতবড় বোকামীই না তারা করেছে। তখন তাদের রূপযৌবন চলে যাচ্ছে এবং তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে তারা তাদের স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের সম্ভবনাকে নষ্ট করে ফেলেছে।"

কেন এমন হয়? হলিউডে কালো হরিণ-চোখ বৃটিশ অভিনেত্রী জুন কলিনস তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আপনি যদি অনন্য রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তা সেই রূপ সহজেই আপনার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ মাধুর্য, বুদ্ধি, সপ্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অন্য কোন গুণকেই আপনি পরিণত হবার সুযোগ দেবেন না, বা পাবেন না।"

অভিনেত্রী প্যাট মার্লো বলেছিলেন, "যদি কোন নারী শুধু তার সুন্দর মুখশ্রী ও দেহের গড়নের ওপরই নির্ভর করে তবে যে মুহূর্তে জরার চিহ্ন দেখা দেবে সেই মুহূর্তেই তা হয়ে পড়বে বুমেরাংয়ের মত। কারণ আর কিছুই তার অবশিষ্ট থাকে না।

লিজ্ টেলারকে দেখুন। জগতের কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল ঃ 'সুন্দরী নারী।' সেই কারণেই তিনি আজ [illegible]অত স্বার্থপর, অসামাজিক এবং যথেষ্ট পরিমাণে অসুখী।"

তাই পাশ্চাত্যের লঘু-গুরু যে-কোন পত্র-পত্রিকা খুলুন, দেখবেন, যেখানেই আত্মহত্যা - রাহাজানি, ভয়ঙ্কর মটর দুর্ঘটনা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌন-প্রতিহিংসা, মানহানির মামলা, ঘুম পাড়ানো ও স্নায়ু ঝিমানো ঔষধাসক্তির মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার চাঞ্চল্যকর শিরনামার পতাকা, —তার আড়ালেই আছে এক অনন্য-সাধারণ রূপবতী নারীর জীবনের বিয়োগান্ত নাটক।

মর্লিন মনরো ও ব্রিজেট বর্দো

মর্লিন মনরো ও ব্রিজেট বর্দো, যুদ্ধোত্তর যুগের দুই যৌবন প্রতীক। প্রথমজনের সাম্প্রতিক সকরুণ মৃত্যু ও আরেকজনের জীবনী অবলম্বনে সদ্য মুক্ত চিত্র 'এ ভেরী প্রাইভেট একেয়ার' হচ্ছে পূর্বোক্ত জীবননাট্যের দুই জবানী।

মর্লিন ছিলেন জারজ। তাঁর বাল্য অতীত হয় লসএঞ্জেলেসের এক অনাথ শিশুদের আশ্রমে। কিন্তু তাঁর জীবনীকার মরিস জলাটো লিখেছেন, "তিনি অক্লান্তভাবে আত্মশিক্ষা লাভ করেন কিভাবে যৌনচিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে হয় এবং যৌনআকর্ষণকে অভিব্যক্ত করতে হয়।"

আলোকচিত্রশিল্পী আর্ল থিয়েলসনের একটি উদ্ধৃতি করে জলাটো বলেছেন, "যা কিছু মর্লিন করেন তা হিসেব করে করেন এবং শরীরবিদরা ছাড়া মানবদেহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আর কারো চেয়ে কম নয়।"

প্রযোজক জেরি ওয়াল্ড বলেছেন, "মর্লিন যেন তাঁর দৈহিক আকর্ষণ

ব্রিজিট বার্দো

ক্ষমতাকে একটি বোতলে বন্ধ করে রাখতে পারতেন। কোন এক দৃশ্যে প্রয়োজন মত তিনি যেন তাঁর সেই ক্ষমতা ছিপি খুলে খানিকটা ঢেলে দিতেন তারপর পুনরায় তা প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত ছিপি বন্ধ করে সরিয়ে রাখতেন।"

—এই তাঁর যৌনআবেদন ক্ষমতার জন্যেই চিত্র-জগতে মর্লিনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অত ত্বরিতগতিতে সর্বব্যাপক হয়ে পড়ে। ফলে প্রায় বছর দশেক ধরে মর্লিন বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর দোষই বা কী? চিত্র-পরিচালক জাঁ নিগুলেসকো লেখেন, "ভেবে দেখুন, তাঁর সমস্যা কি ভয়ঙ্করভাবে জটিল। কোন নারী যদি জানে যে দুনিয়ার ১৫০,০০০,০০০ জন পুরুষই তার শয্যাসঙ্গী হতে উদগ্রীব তা হলে তার পক্ষে কি স্বাভাবিক মানুষ থাকা কিম্বা প্রাত্যহিক আটপৌরে কাজ করা সম্ভব?"

মর্লিনের অভিনয়-প্রতিভা ছিল। কয়েকটি ছবিতে তিনি তার পরিচয়ও দিয়ে গেছেন। কিন্তু পরিচালকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্যামেরার নিত্যনতুন কোণ থেকে তাঁর বিশেষ বিশেষ দেহ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন করা। বলাবাহুল্য তাতে বৈচিত্র্যহীনতা আসবেই। তার ওপর মর্লিনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জৌলুস কমে আসতে লাগলো। ফলে কয়েকটি ছবি মার খেল।

আশাভঙ্গে নিরুদ্যম মর্লিন কাজে গাফিলতি করতে লাগলেন। স্টুডিয়োর

ছিলেন। অনেক কন্যাপক্ষই তাঁকে কামনা করেছে। কিন্তু তোমার বাপ অরিন্দম বাগচির ঐ এক গোঁ। কী? না, যে মেয়ের নাক টিপলে দুধ গলে সেই মেয়ের নির্বাচিত পাত্রের আবার মূল্য কী? তা ছাড়া নির্বাচন করবার অধিকারই বা তাকে কে দিল। একে তুমি অহংকার ছাড়া আর কী বলবে, বলো?'

নীলিমা নিঃশ্বাস নিল। এ যে কতো সত্য কথা তা তার চেয়ে বেশী কে জানে। ইঞ্জিনিয়র মানুষ, খেটেপিটে প্রভূত উপার্জন করেছেন, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, এ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে, স্ত্রীর আনুগত্য আছে, সন্তানসংখ্যা কম, সারা-বাড়িতে তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। বাবার নিজের সংসারে বাবাকে যে কেউ অমান্য করতে পারে, তাঁর নির্দেশ ছাড়াও কোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো। আর তার মধ্যে এই বিঘ্ন! তিনি সইতে পারবেন কেন?

মেয়ের বিয়ে দেবেন তিনি নিজে। নিজে দেখে-শুনে পাত্র স্থির করবেন, টাকা খরচ করবেন, বন্ধু-বান্ধবকে ডাকবেন। এ তো তাঁর পক্ষে রীতিমতো অপমান।
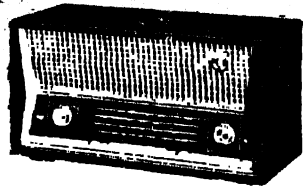
অথচ এমনিতে মানুষটি কী চমৎকার। হাসিখুশী, কর্মঠ। পত্নী-প্রেমিক, সন্তান-বৎসল। কিন্তু কর্তৃত্বের অহংকারে হাত দিলে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে আর একবিন্দু দেরি হবে না। সেখানে তাঁর এক ফোঁটা ক্ষমা নেই। সেটাকে তিনি বেয়াদপি মনে করেন।

কেঁদে কেঁদে নীলিমা মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলো। আর তারপর দৈবের মতো, নিয়তির মতো এই মানুষটি, তার পিতৃবন্ধু এই পিতৃব্যটি যেন স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হলেন। সব শুনে এক হুঙ্কারে দাবিয়ে দিলেন বাবাকে। নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব আরোপ করলেন তিনি বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর অবিবেচক মনের সংস্কারের উপরে। বজ্র কন্ঠে ঘোষণা করলেন, ভালো চাও তো রাজী হও, নৈলে পালিয়ে যাবো মেয়ে নিয়ে, গোত্রান্তর করে পুষ্যি নেবো, বাপ হয়ে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেবো। দেখবো তোমার অহংকারের ঔদ্ধত্যটাই বড়ো কথা, না মেয়ের সুখটাই বেশী জরুরী।

আর তারপর? খুঁতখুঁত করতে করতেও তো মেনে নিতে হলো, মেনে নিয়ে সুখীও হতে হলো। এই জামাইকে নিয়ে কি এখন বাবার কম গৌরব? মার কাছে কি সুব্রত প্রাণাপেক্ষা বেশী নয়?

সে সব দিনের কথা আর সবাই ভুললেও নীলিমা কি ভুলতে পারে? না কি সুব্রত সান্যালই ভুলে গেছেন কিছু?

কিন্তু আজ সে কথা মনে হলো কেন কাকাবাবুর?

২

আস্তে আস্তে বেলা বাড়লো, এক ফাঁকে একটু বাজার করে এলো সে। বেলের মতো মস্ত মস্ত আপেল, নারকোলী কুলের মতো টাটকা কালো কালো আঙ্গুর, আর মেক্সিকোর তরমুজ নিয়ে এলো গিয়ে। এখানকার শাকসবজি ফল মূল সব এতো লোভনীয় যে না কিনে পারে না। কাকাবাবুকে যে কী দিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। দুই চোখে যা দেখছে, সব কিনছে কাল থেকে।

কিন্তু খেতে বসে কাকাবাবুকে দিয়ে খুরে তৃপ্তি হলো না তার। মনে হলো সবই তিনি খাচ্ছেন, নিচ্ছেন, কিন্তু মনোযোগটা নেই। কেমন গম্ভীর আর অনামনস্ক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন তিনি।

নীলিমা কাজ সারতে রান্নাঘরে এলো। বাসন ধুয়ে, মুছে আঁচিয়ে কাকাবাবুর জন্য এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে দেখলো তিনি ক্রমাগত হাতে হাত ঘষছেন (এটা তাঁর উত্তেজিত মুহূর্তের মুদ্রাদোষ), মোটা চুরুটটা কামড়াচ্ছেন দাঁত দিয়ে, (এটাও) তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়ালেন।

নীলিমা হাতের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে, পিছন থেকে তাঁর কায়দা করে ছাঁটা চুলের নিচে ফর্সা বলিষ্ঠ ঘাড়ের দিকে তাকালো। ঘন জমি গাঢ় রং সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা তরঙ্গায়িত হচ্ছিলো। হঠাৎ তার মনে হলো এই মানুষটার বুকের তলায়ও নিশ্চয়ই এমন কোনো জমাট বেদনা লুকোনো আছে যার জন্য এ'র হৃদয় অন্যের প্রতি এতো কোমল এতো সহানুভূতিসম্পন্ন। কাল রাসেল স্মীথের গল্প শুনে থেকেই যে ইনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, ব্যথিত এবং বিচলিত হয়ে আছেন সেটা তাঁর সমস্ত ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কাকাবাবুর এই বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ ভঙ্গি-গুলোর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। রাসেল স্মীথের জীবনের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কোনো মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন কিনা তাই বা কে জানে। কোন অর্বাচীন পিতামাতার শত্রুতায় অন্য কোনো একটি মেয়েও ঠিক তার মতোই কষ্ট পেয়েছিলো কিনা তাও তো জানা সেই নীলিমার। নীলিমার মতো নিশ্চয়ই তার ভাগ্যে কোনো কাকাবাবু এসে উপস্থিত হননি, তাই শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়েছে।

ডাক্তার মৈত্রের খ্যাতি যে শুধু স্বদেশেই সীমিত তা নয়, বিদেশের ডাক্তারকুলেও তিনি নামজাদা। বয়েস পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু সুঠাম দেহে এখনো যৌবনের স্পর্শ জাজ্জ্বল্যমান। মাথার চুল ব্রাউন হয়েছে, কিন্তু পাকে নি। পাৎলা হয়েছে কিন্তু ঢেউ নষ্ট হয়নি। তাঁর প্রশস্ত কপালে যখন কোনো একটি গুচ্ছ এসে লুটিয়ে পড়ে তাকালে নিতান্ত অল্পবয়সী বলে ভুল হয়। গায়ের রং গৌর নয়, চিক্কণ শ্যাম, স্বাস্থ্য ডাক্তার হবার উপযোগী। এখনো যে কোনো একটি মেয়ে—যাদের বয়েস কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে, অনায়াসে তাঁর প্রেমে পড়তে পারে।

কিন্তু তিনি অকৃতদার। কেন?

ডাক্তার মৈত্র যতোক্ষণ পিছন ফিরে তাকিয়ে রাস্তা দেখলেন, ততক্ষণে মনে

মনে এই কথাগুলো ভাবলো নীলিমা। তারপর বললো, 'কাকাবাবু, আপনার কফি।'

'কফি। বাঃ বেশ করেছো। খেয়ে উঠে কফি খাওয়াটা এদেশেরই রীতি, আমার খুব পছন্দ।'

জানালা থেকে সরে এসে বসলেন তিনি, কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন 'সুন্দর হয়েছে দিনটা। কাল রাত্রিবেলা বৃষ্টি হয়েছিলো টের পেয়েছ? আমি তো ভাবলাম সব মাটি।'

ডাক্তার মৈত্রও হাসলেন, চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তা যাই বল, এদের এই গোলাবাড়ির সিঁড়ি, (গোলাবাড়িটা কাকাবাবুর নিজস্ব নাম। তিনি বলেন গোগেনহাইম মিউজিয়ামটির গড়ন আমাদের বাংলাদেশের গোলাবাড়ির মতো) এমন কিছু অভিনব নয়। রোমে তো যাওনি, ভাটিকানের ঢালু সিঁড়ি এর বহুকাল আগে তৈরী হয়েছে। এটা একটু উন্নত সংস্করণ এই যা।'

কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। নিয়ে ওভার কোট আর ছাতা হাতে নেমে এলো নীচে।

'চলুন।'

'চলো।'

সিগারটা নিবিয়ে দিলেন। তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই মত বদলালেন, 'গোগেনহাইম পরে হবে; চলো, আগে হিস্ট্রি মিউজিয়ামটা দেখে নিই। কী বলো?'

'বেশ তো। তাই চলুন।'

"কাকাবাবু, আপনার কফি!"

নীলিমা বললো, 'এখানকার বৃষ্টি তো হাতের মোয়া। লেগেই আছে। তবে বৃষ্টির পরের দিনটা সব সময়েই খুব উজ্জ্বল হয়, সারাদিন রোদ থাকে।'

'তোমার আবার দুপুরে শোয়া অভ্যেস নেই তো?'

'একেবারেই না।'

'তা হলে চল বেরুই, তোমার বিখ্যাত গোগেনহাইম দেখে আসি।'

'তোমার বিখ্যাত গোগেনহাইম' বলাতে হাসলো নীলিমা। কাল সে কাকাবাবুর কাছে গোগেনহাইমের গঠন-শিল্পের একটু বেশী প্রশংসা করে ফেলেছিলো।

কোটটা পরে নিয়ে বললেন 'শোন, আমি নিচে যাচ্ছি, ডেস্কে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবো, তুমি ততক্ষণে তৈরী হয়ে নেমে এসো, আমাকে লবিতে পাবে।'

বেরিয়ে গেলেন তিনি। লম্বা ছিপছিপে দেহ নিয়ে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা অভ্যেস, কাকাবাবুর হাঁটাটাও নীলিমার পছন্দ। তাকিয়ে দেখতে দেখতে আবারো তাঁর মনে হলো, ইনি বিয়ে করেন নি কেন?

৩

তৈরী হ'তে পাঁচ মিনিট লাগলো নীলিমার। টুকটাক একটু কাজ সেরে

নীলিমার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। কাকাবাবুর মন থেকে যে কোনো উপায়ে এই মেয়ের ভারটা সে সরিয়ে দিতে চায়। গল্পটা শুনে উনি যে এমন বিমর্ষ হ'য়ে যাবেন, এমন অভিভূত হবেন, জানলে বলতোই না।

ডাক্তার মৈত্র হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সী থামালেন। একটু প্রতিবাদ করলো নীলিমা, 'আবার ট্যাক্সি কেন? এইটথ এভিনিউতে গিয়ে বাস ধরতে পারতুম। এই তো কাছে—'

'ওঠো, ওঠো। বাস ফাসের ঝামেলায় আর কাজ নেই।'

হাত ধ'রে উঠিয়ে দিলেন তিনি।

নিউ ইয়র্ক শহরে সাত্যি বসন্ত লেগেছে। চারদিকে তাকিয়ে নীলিমাও অবাক হ'য়ে গেল। এ ক'দিন একমাত্র বাজারে ছাড়া বেরোয়নি সে। তার মধ্যেই এই ?

এখানকার বসন্ত বাস্তবিকই এতো আকস্মিক যে যখন আসে যেন বন্যার মতো আসে। এতো হঠাৎ যে মানুষ অবাক না হ'য়ে পারে না। একটা শিশুও বুঝতে পারে সে এসেছে। আনন্দে, করতালি দিয়ে ওঠে। মা-বাবাকে ডেকে এনে আঙ্গুল তুলে দেখায়, 'দ্যাখো, দ্যাখো, খালি ডালে কত পাতা।' নীলিমা মনে মনে ছেলেমানুষের মতো আওড়ালো, 'কাল ছিলো ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে। বল দেখি তুই মালি, হয় সে কেমন ক'রে।'

প্রফেসর সান্যাল গেছেন আজ পাঁচদিন হ'লো, তার দিন তিনেক আগেই তারা দুজনে একটা দুরের পাড়ায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলো, ঐ রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলো, তখনো তো গাছগুলোকে জীর্ণশীর্ণ বুড়ির মতো ক'লো কালো শির বার ক'রে— দুঃখী চেহারায় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেছে, এরমধ্যেই এরা যৌবনের রংয়ে এমন রঙিন হ'য়ে উঠলো ?

গাছে-ছাওয়া সেন্ট্রাল পার্কে যেন সবুজের ঢল নেমেছে, নতুন পাতার উদ্গমে অপরূপ হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

'কী সুন্দর! না?' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো সে।

সেন্ট্রাল পার্কের উল্টোদিকেই এই ন্যাচারেল হিষ্টি মিউজিয়ামের বিশাল প্রাসাদ। ট্যাক্সী থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো তারা। শুকনো বাগানে ফুল ফুটেছে। টিউলিপের পাপড়িতে পাপড়িতে রংয়ের মিছিল। সেই সংগে মানুষের মিছিলও দেখা গেল।

উজ্জ্বল রোদে ঝলসে উঠেছে চারদিক, এমন চমৎকার একটি দিনও বড়ো দেখা যায় না এই শহরে। শীত কমে গেছে, হাল্কা জামা-কাপড় পরতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সবাই। এমন কি স্প্রীং কোটও কেউ আজ ব্যবহার করছে না। নিজের হাতের কোটটা ভার লাগলো নীলিমার কাছে।

সেন্ট্রাল পার্কের গাছের ছায়ায়, ঝুড়ার ফোকরে, লেকের তীরে, ফোয়ারার ধারে, প্রমোদকাননে অজস্র প্রেমিক-প্রেমিকার ভিড়। অজস্র পিরাম্বুলেটার নিয়ে মা-বাবারা শিশুদের রোদ খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বসে আছে বেঞ্চির উপর।

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'সেই ছেলেটি, ধাই বলো বড্ড বেশী ভালোমানুষ। ওর কি উচিত ছিলো না জোর ক'রে মল্লিকাকে আটকে রাখা ?'

কাকাবাবুর চোখ যেখানেই থাক, মন যে কোন রাস্তায় পরিভ্রমণ করছে বুঝতে পারলো নীলিমা। অবাক হয়ে বললো, 'আপনি কি এখনও ওদের কথাই ভাবছেন ?'

'ঠিক ভাবছি না,' মস্ত দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটু দাঁড়ালেন, বললেন, 'মনে পড়ে গেল। আর সেই সংগে এটাই উপলব্ধি করলাম যে যারা ঠকে তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজের বোকামিতেই ঠকে।'

'কিন্তু ওদের মন জানাজানি হ'তে না হ'তেই তো বিচ্ছেদের সময় হ'য়ে গেল।'

'আরে বাবা, একটু ভেয়ারিং হতে তো হয়। তুই একটা সাদা চামড়ার টগবগে যুবক, তোকে কি ঐ সব বৈষ্ণবভঙ্গি মানায় ?'

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে তিনি দ্রুত পা চালালেন, হাত ধ'রে বললেন, 'চলো, চলো, টিকিটটা কেটে আগে প্ল্যানেটোরিয়ামে ঢুকি। ঐ শোনো, এক্ষুণি একটা শো হবে ঘোষণা করছে।'

দৌড়ে গিয়ে টিকিট কাটলেন তিনি।

(ক্রমশঃ)

।। ভবিষ্যতের মোটর গাড়ী ।।
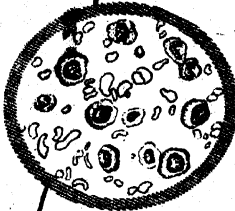
ভবিষ্যতের মোটরগাড়ীতে যোগা-যোগকারী রড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্‌ট ও বেয়ারিং বলতে কিছুই থাকবে না। এর চালককেও ক্লাচ্‌ ব্যবহার করতে হবে না কিংবা গীয়ার পাল্টাতে হবে না। আজকের ইঞ্জিনের তুলনায় এই সম্পূর্ণ নতুন গতিশীলতার গাড়ী চলবে ঢের ভালো। এই নতুন পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বিশদ-ভাবে কাগজে কলমে সাজানো হয়েছে। এতে ইন্‌টার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিনের পিস্টন-স্ট্রোক যোগাযোগকারী রড ও ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের মাধ্যমে আর রোটারী মোশনে পরিবাহিত না হয়ে "হাইড্রো-স্ট্যাটিকাল ইউনিটের" পিস্টন-স্ট্রোক হিসাবে সরাসরি ব্যবহার হবে।

এই বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারটি কোন ওস্তাদ এঞ্জিনীয়ারের মাথা থেকে বেরয়নি। এর পরিকল্পনা করেছেন যে দুটি ছাত্র, তাদের নাম রবার্ট লেহ্‌লে ও হেলমুট কোনেন। কোলোন শহরের ফোর্ড মোটর প্রতিষ্ঠান "আগামীকালের গাড়ী" নামে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় মোট আটানব্বুই জন তরুণ এঞ্জিনীয়ার-প্রতিযোগীদের মধ্যে বিচারকরা ঐ দুজনকেই প্রথম পুরস্কার দেন। প্রতি-যোগিতার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তরুণ এঞ্জিনীয়াররা শিল্পের সঙ্গে সহযোগিতা করার সুযোগ পায়।

ঐ দুজন ছাত্রের গাড়ীর নক্সা করতে সময় লেগেছে তিন বছরেরও বেশী এবং তাদের যুক্ত গবেষণার বিষয়ে তারা প্রবন্ধও দাখিল করেছে। পুরস্কারের ৫০০০ জার্মান মার্ক পেয়ে তারা খুশী হয়েছে। কারণ ঐ টাকা দিয়ে এবার তারা তাদের ধারদেনা শোধ করতে পারবে এবং বাকি টাকা দিয়ে দুজনে দুটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী কিনবে।

।। গাড়ীর তুলনায় পথের অভাব ।।

পশ্চিম জার্মানীর বড় বড় শহরে রাস্তাঘাটের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে গাড়ীর ভিড়ে সেখানে আজকাল অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ বছর আগে স্রেফ মোটরগাড়ী চলার জন্য "অটোবান" নামে যেসব রাস্তা পৃথিবীতে চমক এনেছিল, তাদের অবস্থাও কাহিল। রাস্তাঘাট যদি দ্রুতবেগে আরও বাড়ানও হয়, তাতেও বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না কেননা মোটরগাড়ীর সংখ্যা এত বেড়ে চলেছে যে পথ আর তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

তবু কাজ এগিয়ে চলেছে। যতদূর সম্ভব পথঘাট তৈরি হচ্ছে। বছর বছর ২৫০ কিলোমিটার করে নতুন "অটোবান" জন্ম নিচ্ছে। যুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানীতে যেখানে ২,০০০ কিলোমিটার ব্যবহারযোগ্য অটোবান ছিল ১৯৬২ সালের শেষে সেখানে হয়েছে তিন হাজার কিলোমিটার, ১৯৬৬ সালের শেষে চার হাজার একশো কিলোমিটার এবং ১৯৭০ সালের শেষে পাঁচ হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাবে। আজকাল পথঘাট তৈরি করতে অজস্র অর্থের দরকার যেমন ধরুন এক কিলোমিটার অটোবান তৈরি করতে খরচ পড়ে ৩·৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক। এতো গেল অটোবানের কথা, তাছাড়া বহু দূরপাল্লার রাস্তা ও শাখা-রাস্তা তৈরির পরি-কল্পনাও করা হয়েছে।

এইসব সত্ত্বেও হালে পানি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ গাড়ীর সংখ্যা হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা ৫·৫ মিলিয়ন ও বাস, লরি, মোটরবাইসিকেল ও নানা জাতীয় অন্যান্য মোটরগাড়ীর সংখ্যা আরও চার লক্ষ। এর পরেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরও দশ মিলিয়ন বাড়বে এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে বর্তমান সংখ্যা আরও বিশ মিলিয়ন বেড়ে যাবে অর্থাৎ তখন প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের মোটরগাড়ী থাকবে।

ওপরের হিসেব ধরলে পথের তুলনায় মোটরগাড়ী বাড়বে দ্বিগুণ। এর ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হবে তা দূর করবার জন্য যেমন তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তাঘাট তেমনি পুরনো রাস্তাঘাট যতদূর সম্ভব চওড়া করা হচ্ছে। অটোবানে আগে যেখানে চার সারি গাড়ী চলতো, এখন সেখানে ছ' সারি গাড়ী চলবে। অন্যান্য রাস্তায় দু সারির পরিবর্তে চার সারি গাড়ী চলবে।

এতো গেল সব দূরপাল্লার খোলা রাস্তার কথা। শহরের রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শহরের রাস্তা থেকে গাড়ীর ভীড় কমাতে হলে দুতিন তলা রাস্তা তৈরি করা ছাড়া গতি নেই। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ আজকাল মিউনিখ থেকে জেট বিমানে রোমে যেতে সময় লাগে ৯০ মিনিট অথচ মিউনিখের বিমানবন্দর থেকে মোটরে শহরে আসতে সময় লাগে প্রায় একঘণ্টা।

।। মোটরগাড়ীর সর্বোৎকৃষ্ট রঙ ।।

রাত্রিবেলা, দিনের বেলা কুয়াশার মধ্যে গাড়ীর রঙ ঠিক বোঝা যায় না যেমন তেমনি গাড়ীর ঠিক দূরত্বও ঠাহর হয় না। বেশ কিছুকাল ধরে বিশেষজ্ঞরা একটি যথোপযুক্ত রঙ আবিষ্কার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে আসছেন।

সম্প্রতি আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাময়িক পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, মোটরগাড়ী চালনার নিরাপত্তার দিক থেকে নীল ও হলুদ রঙই সর্বোৎকৃষ্ট।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, মোটরগাড়ী চালকেরা বিপরীত-মুখী অন্য গাড়ী কতদূর রয়েছে তা নিরূপণ করার ব্যাপারে সেই গাড়ীর রঙের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। বিপরীতমুখী অন্য রঙ-এর কোন গাড়ী ২০০ ফুট দূরে থাকলে মনে হবে যেন ৬ ফুট আরও বেশী এগিয়ে রয়েছে। এতে দুর্ঘটনার আশংকা খুবই বেশি থাকে।

নানা রঙ নিয়েই তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, রাত্রি ও দিনের বেলায় কেবল-মাত্র নীল ও হলুদ রঙ-এর গাড়ীর দূরত্বই প্রায় ঠিক মত ঠাহর হয়। ধূসর রঙ-এর গাড়ীসমূহ মনে হয় যেন ঠিক জায়গা থেকে আরও দূরে রয়েছে।

দিনের বেলা ও কুয়াশার সময়ে সবচেয়ে নিরাপদ রঙ হচ্ছে নীল এবং রাত্রিবেলায় হলুদ রঙ।

জনি হ্যাজার্ড
ফ্র্যাঙ্ক রবিনস্

আজ শুরু ফ্লাইং লিজিয়ন
ভোর ৪ টে... সময়টা খারাপ এপাড়ায় গাড়ি পাওয়াও মুশকিল একা ঘোরা ঠিক নয়... বড় রাস্তার দিকে যাওয়াই ভাল ...
ANGE

অল্পালোকিত প্যারিসের রাস্তায় চলতে চলতে ...
'আড্ডা'গুলো খালি হয়ে আসছে। এসব জায়গায় একা চলা ঠিক হচ্ছেনা!
CHAT NOIR

এসো ভা-ই ... বেরিয়ে পড়ি রাত হলো!!

ওঃ হো! মেয়েটা দেখছি টোপ... বোকাটাকে গুণ্ডার পাল্লায় ফেলালো ...
ও ভাই ... পেছনে .....!!

COCHON
LA FA
COC
LE SAME
BAL

এমন বাঁকাচোরা গলির ভেতর ঠিক রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন!

আ-র একটা যায়গা দেখি ট্যা-া-ক্-সি!!!
পাইলট মনে হচ্ছে… ফুর্তি করতে বেরিয়েছে… হল্লা করে সারা শহরের গাড়ি জড়ো করবে দেখছি! দেখি যদি একটা মিলে যায়

কিন্তু হঠাৎ…

ক্রমশঃ

সংগীত বীক্ষা

আনন্দভৈরব

সঙ্গীত সম্মেলন

ভারতীয় রাগসংগীতের ক্ষেত্রে এক-একটি রাগ এক-একটি বিশেষ রস প্রকাশ করে। রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত এই নব রসের (মতান্তরে অষ্ট রস) যে উল্লেখ আছে তার মধ্যে এক-একটি রস এক-একটি রাগ-রূপায়ণে পরিস্ফুট হয়। রাগের রসটি শিল্পী ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করেছেন কিনা এবং উপলব্ধি করে থাকলে পরিবেশনকালে সেই রস সম্যকরূপে অভিব্যক্ত করতে পেরেছেন কিনা সমঝদার শ্রোতা তা বিচার করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিচার্য বিষয় আরো আছে। গৎ বা গানে রাগের স্বর-নক্সা যখন তালে গ্রথিত হয়ে লয়বন্ধ হয় সেই লয়ের তারতম্যের উপরও রসাভিব্যক্তি অনেকখানি নির্ভর করে।

লয় বিষয়টির মধ্যে স্বাভাবিকতা বিদ্যমান। সংগীতের ক্ষেত্রে লয় অর্থে মোটামুটিভাবে গতি বোঝায়। আমরা যে চলাফেরা করি, কাজকর্ম করি তারও লয় আছে। ব্যক্তিভেদে তার তারতম্য ঘটে। রাগ পরিবেশন ব্যাপারে, তা গানের মাধ্যমেই হোক বা গৎ-এর মাধ্যমেই হোক, রসাভি-ব্যক্তি সম্পর্কে লয়ও অবশ্য-বিচার্য বিষয়। স্থূলভাবে, বিলম্বিত লয়ে যেমন শান্ত ভাব দ্রুত লয়ে তেমনি উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য বিলম্বিত মধ্য বা দ্রুত লয়ের তার-তম-ভেদ আছে। সে-সব স্বীকার করেও একটি শান্ত রসের রাগে দ্রুত লয়ের উপস্থাপনা, অথবা একটি রৌদ্র বা বীর রসের রাগে অতি বিলম্বিত লয়ের উপস্থাপনা যুক্তিসঙ্গত কিনা সমঝদার শ্রোতার তাও বিচার্য বিষয়।

মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মিলন

(অনুবৃত্তি)

গত সপ্তাহে এ পত্রিকায় উক্ত সম্মিলনের কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রোফেসর এ. কানন কর্তৃক পরিবেশিত মারবা ও হংসধ্বনি রাগে খেয়াল ও মিশ্র পিলু রাগে ঠুংরি উল্লেখযোগ্য। ঔড়ব জাতির হংসধ্বনি মুখ্যত কর্ণাটিক পদ্ধতির রাগ, এবং সম্ভবত আলোচ্য শিল্পীর প্রিয় রাগ। উত্তর ভারতীয় সংগীতের আসরে এই রাগটির পরিবেশন বৈচিত্র্যের দিক থেকে উপভোগ করা গেছে। সেতারে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়জয়ন্তী রাগের রূপায়ণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। পঞ্চম অধিবেশনের (৯ জানুয়ারি) শেষ অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন করেন কুমারী বেবি নাজ। তাঁর নৃত্যে লালিত্য আছে; তৎসত্ত্বেও বিশেষ পদ্ধতিগত কুশলতার অভাব অনুভূত হয়েছে। একটি ক্ল্যাসিকাল সংগীত-সম্মিলনে এরূপ নৃত্যানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তির সার্থকতা ঠিক বোধগম্য হল না।

ষষ্ঠ অধিবেশনে পূরিয়াকল্যাণ রাগে খেয়াল, পূরিয়া রাগে তারানা ও তারপর ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক। শ্রীমতী পটনায়ক খ্যাতনাম্নী শিল্পী। তাঁর অনুষ্ঠানে সারেঙ্গীর অনুবর্তন না থাকায় পরিবেশনের প্রভাব কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। স্বরোদে ছায়া-হিন্দোল রাগে আলাপ জোড় ঝালা ও গৎ পরিবেশন করেন শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে তবলা-সংগত করেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। এই অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে ছায়া রাগে খেয়ালের সুষ্ঠু পরিবেশন করেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। ছায়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রচলিত রাগ। রাগ স্বল্প-প্রচলিত বা অপ্রচলিত কেন হয়ে যায় তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রুতি-মাধুর্যের কিছুটা অভাব অথবা রাগের দুরধিগম্যতাকে কেউ কেউ দায়ী করেন। কিন্তু এ যুক্তি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ তৎসঙ্গে শিল্পীর পক্ষে রাগের রসোপলব্ধি ও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনের ক্ষমতা ও অধিকারের প্রশ্নটিও সংশ্লিষ্ট।

এই সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বসন্ত রাগে খেয়াল ও অন্যান্য গান পরিবেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কণ্ঠসম্পদ ও সৃজনীশক্তি নিয়ে এই শিল্পী ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার গতি অব্যাহত থাকলে যে উত্তুঙ্গ শিখরে আজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত থাকবার কথা, তাঁর ভাগ্যলিপি তা হতে দেয় নি। তা হলেও সুরসরস্বতীর আশীর্বাদে আজও তাঁর কণ্ঠে যে সম্পদ আছে লোকা-চর তার সন্ধান মেলে না। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি যেভাবে বসন্ত রাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন ও প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃ-বৃন্দকে তদ্‌গত করে নিলেন তা বিস্ময়কর। ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁর সারেঙ্গী-অনুবর্তন ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর তবলা-সংগতের গুণে শ্রীভীষ্মদেবের অনুষ্ঠান আরো সরস হয়েছে। এ স্থলে যে কথাটি বলতে ইচ্ছা হয় • সেটি হল রাগের রূপসৃষ্টি ও ভাবসৃষ্টি সম্পর্কে। এ দুটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বিষয় হলেও খুব কম শিল্পীই দুইয়েরই রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রেই রাগ-রূপের সন্ধান মিললেও রাগ-ভাব অপ্রকাশ্যই থেকে যায়। এই অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে ওস্তাদ ইমরাত হোসেন খাঁর গাওতি রাগে সেতার-বাদন সুখশ্রাব্য হয়েছে।

অষ্টম ও শেষ অধিবেশনটি ছিল সারা রাত্রিব্যাপী। এই অধিবেশনে শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্যামকল্যাণ রাগে খেয়াল ও পরে অন্যান্য গান পরিবেশন করেন। তাঁর অনুষ্ঠান কিছুটা দীর্ঘায়িত অনুভূত হয়েছে। সেতারে খাম্বাজ্রী রাগে আলাপ জোড় ঝালা ও গৎ পরিবেশন করেন শ্রীমণিলাল নাগ। তাঁর হাত বেশ তৈরি। আলাপের মাধ্যমে রাগ-রূপায়ণের অংশ আরো স্থৈর্যের সঙ্গে করলে তাঁর অনুষ্ঠান আরো উপভোগ্য হত। মালকোষ রাগে শ্রীমতী পারভীন সুলতানার খেয়াল পরিবেশন রসোত্তীর্ণ হয়েছে। আলাপ, তান, বোলতান ও সরগমে তিনি মালকোষ রাগের বৈশিষ্ট্য ঠিক-ঠিক পরিস্ফুট করেছেন। দরবারী কানাড়া রাগে পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর খেয়াল পরিবেশন সরস হয়েছে। তাঁর সঙ্গে তবলা-সংগত করেন পণ্ডিত কিষেন মহারাজ। কথক-নৃত্যে শ্রীমতী রোশন-কুমারী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর সঙ্গেও তবলা-সংগত করেন পণ্ডিত কিষেন মহারাজ। খেয়াল গানে ও কথক-নৃত্যে তবলা-সংগতে শৈলী পরি-মিতি ও মেজাজের যে পার্থক্য আছে পণ্ডিত কিষেন মহারাজের পর-পর দুটি অনুষ্ঠানে তবলা-বাদনে তার পরিচয় পেয়ে প্রশংসামুখর হয়েছি। ওস্তাদ আমানত আলি খাঁ ও ওস্তাদ ফতে আলি খাঁর দরবারী টোড়ী রাগের রূপায়ণ ও খেয়াল-পরিবেশন ভালো লেগেছে। এই অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে সেতারে বসন্তকলি রাগে আলাপ জোড় ঝালা ও গৎ পরিবেশন করেন ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁ। তাঁর সঙ্গে তবলা সহ-যোগিতা করেন ওস্তাদ আল্লা রাখা। এই রাগে স্থানে স্থানে রামকেলি রাগের আভাস পাওয়া গেলেও কোমল ঋষভ-কোমল নিষাদ (মন্দ্র) ইত্যাদি স্বরসংগতি রাগ-রূপকে পরিস্ফুট করে তোলে। রাগ-রূপায়ণে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর বেশ দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনুষ্ঠান রসগ্রাহী হয়েছে।

অষ্টম বার্ষিক মধ্য কলিকাতা সংগীত-সম্মেলনে, আলোচিত এই সকল শিল্পী ছাড়াও অনেক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন ও আনন্দ দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

খালি বাড়ী

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

১৮৯৪ সালের বসন্তকাল।

অনারেব্‌ল্‌ রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের হত্যায় দুনিয়ার সমস্ত সৌখীন সমাজে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল, সাড়া পড়ে গেছিল লন্ডনের আপামর জনসাধারণের মধ্যে। যে রকম অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে তিনি খুন হয়েছিলেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। পুলিশী তদন্তের ফলে খুঁটিনাটি অনেক খবরই ইতিমধ্যে জেনে গেছে জনসাধারণ—কিন্তু সমস্ত নয়। বেশীর ভাগ খবরই বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে এই কারণে যে বাদী-পক্ষের কেস এমনই অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী ছিল যে সব খবর আদালতে হাজির করার কোন প্রয়োজন দেখা যায়নি।

দীর্ঘ দশ বছর বাদে আজ আমি অনুমতি পেয়েছি সারি সারি পরম্পরা-নির্ভর আশ্চর্য ঘটনাগুলোর হারিয়ে-যাওয়া অংশগুলো লেখবার। খুনটার এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যে আমার আগ্রহ না জেগে পারেনি। কিন্তু যে অকল্পনীয় উপসংহারে বিপুল বিস্ময় আর বিরাট আঘাতের আকস্মিকতায় আমার এ্যাডভেঞ্চারভরা জীবনের মূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে গেছে—তার কাছে এ আগ্রহ কিছুই নয়। এতদিন বাদে এখনও সে কথা ভাবলে শিউরে উঠি আমি। অনুভব করি আকস্মিক উল্লাস, আনন্দ আর অবিশ্বাসের বন্যা অন্তরের দুকুল ছাপিয়ে।

প্রথমেই সবাইকে জানিয়ে রাখি, দীর্ঘদিন ধরে এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী চেপে রাখার জন্যে আমার কোন দোষ নেই। অতীতে যে অতি আশ্চর্য পুরুষটির অনন্যসাধারণ চিন্তাধারা আর কার্যকলাপের একটু-আধটু খবর জানিয়ে সবার চিত্তবিনোদন করতে সক্ষম হয়ে-ছিলাম, এ কাহিনী না লেখার সুকঠিন

নির্দেশ পেয়েছিলাম তার নিজের মুখ থেকেই। তার নিষেধ না থাকলে বহুদিন আগেই এ কাহিনী তার অনুরাগী জনসাধারণের কাছে হাজির করে আমি আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য পালন করতাম। আজ তা লিখতে বসেছি কেননা গত মাসের তিন তারিখে সে নিজেই এ নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে আমার লেখনীর ওপর থেকে।

শার্লক হোমসের সংস্পর্শে এসে এবং বহুদিন তার একান্ত কাছে থাকার ফলে অপরাধ এবং অপরাধ-সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার নিবিড় আগ্রহ জেগেছিল। তাই তার অন্তর্ধানের পরেও এমন অনেক জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি যা জনসাধারণকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু মাথা ঘামিয়েই ক্ষান্ত হইনি, আত্মতৃপ্তির জন্যে তার তদন্ত-পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করেছি সমস্যার জট ছাড়ানোর—যদিও পুরোপুরি সফল হয়নি কোনক্ষেত্রেই। কিন্তু রোন্যাল্ড এ্যাডেয়ারের ট্রাজেডীতে যতটা চিন্তার খোরাক পেয়েছিলাম, তেমনটি আর কিছুতে আমি পাইনি। মামলার খুঁটিনাটি বিবরণ সবই আমি পড়তাম। এক বা একাধিক অজানা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত খুনের চার্জ গড়ে উঠেছে, তাও জেনেছি। তখনই অন্তরে অন্তরে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি শার্লক হোমসের মৃত্যুতে কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে আমাদের সমাজের। এমন কতকগুলো বিশেষ পয়েন্ট এই অদ্ভুত ব্যাপারে ছিল যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতই। ফলে, পুলিশেরও তদন্তের সুবিধে হত অনেকটা। এমন কি, ইউরোপের সর্বপ্রথম অপরাধ-বিশেষজ্ঞের সাবধানী মন আর অভ্রান্ত চোখে খুনী কে, তাও ধরা যেত পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার অনেক আগেই। রুগী দেখতে যখনই ছুটতাম, তখনই ফাঁক পেলেই গাড়ীতে বসে বসে কেসটার তুচ্ছ পয়েন্টগুলোও মনে মনে তোলাপাড়া করতাম সম্ভাব্য কোনরকম সমাধানের আশায়—কিন্তু কোনবারই এমন কোন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে পারলাম না যাতে আমি খুশী হতে পারি। যে কাহিনী ইতিমধ্যে বহুবার হাজির করা হয়েছে জনসাধারণের সামনে, তার আর পুনরাবৃত্তি না করে, তদন্তের শেষে যে ঘটনাগুলো সবাইকে জানানো হয়েছিল, আমি শুধু সেইগুলিই আর একবার ঝালিয়ে নেব মূল কাহিনীতে আসার আগে।
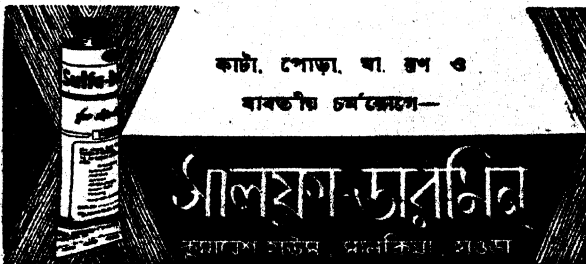
অনারেবল রবার্ট এ্যাডেয়ার আর্ল অফ মেনুথের দ্বিতীয় পুত্র। আর্ল অফ মেনুথ সে সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় একটা কলোনীর গভর্ণর ছিলেন। এ্যাডেয়ারের মা অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে এসেছিলেন চোখের ছানি অপারেশন করতে। ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে ছেলে রবার্ট আর মেয়ে হিল্ডাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। সমাজের সেরা মহলে ঘোরাফেরা করত রবার্ট। এবং যতদূর জানা যায়, তার কোন বিশেষ বদ-অভ্যাস ছিল না, কোন শত্রুও ছিল না। কারস্টেয়ার্সের মিস এডিথ উডলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় মাস কয়েক আগে উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে। এবং এর ফলে রবার্টের মনে যে কোন দাগ পড়েছে তারও কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। সবাই জানত, রবার্ট খুব সীমিত এবং সনাতন পরিধির মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিতে ভালবাসে—কেননা আবেগের কোন বালাই ছিল না তার প্রকৃতিতে। স্বভাবটিও ছিল বেশ শান্ত। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট তরুণ অভিজাতের শিরে নেমে এল মৃত্যুর পরোয়ানা—এল অত্যন্ত আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ১৮৯৪ সালের তিরিশে মার্চ রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে।

তাস খেলতে ভালবাসতেন রোন্যাল্ড এ্যাডেয়ার। একটানা খেলে যেতেন, কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়েও কোনদিন ক্ষুব্ধ হননি। বল্ডউইন, ক্যাভেন্ডিস আর বাগাটেল্লী কার্ড ক্লাবের সভ্য ছিলেন তিনি। জানা গেছে, মৃত্যুর দিন বাগাটেল্লী কার্ড ক্লাবের ডিনারের পর রাবার অফ হুইস্ট খেলেছিলেন রোন্যাল্ড। বিকেলেও তাঁকে খেলতে দেখা গেছে সেখানে। খেলার সাথী ছিলেন মিঃ মারে, স্যার জন হার্ডি এবং কর্ণেল মোরান। এঁদের কথা থেকেই জানা যায় যে হুইস্ট খেলেছিলেন রোন্যাল্ড এবং খেলাতে মোটামুটি সমানভাবে পড়েছিল সবার তাস। এ্যাডেয়ার খুব জোর পাঁচ পাউন্ড হেরে থাকতে পারেন—তার বেশী নয়। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল এবং এ সামান্য ক্ষতিতে মুষড়ে যাবার মত মানুষ তিনি নন। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা ক্লাবে তাস খেলতেন রোন্যাল্ড। কিন্তু এমনই সাবধানী খেলোয়াড় তিনি যে বড়-একটা হারতেন না—পকেট ভারী করে তবে টেবিল ছাড়তেন। আরও জানা গেল যে হপ্তাকয়েক আগে কর্ণেল মোরানকে পার্টনার নিয়ে এক হাত খেলেই গডফ্রে মিলনার এবং লর্ড ব্যালমোরালের কাছ থেকে প্রায় চারশো কুড়ি পাউন্ড জিতেছিলেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলতে তদন্তের ফলে এই সবই জানা গেছিল তাঁর সম্বন্ধে।

খুনের রাতে ক্লাব থেকে ঠিক দশটায় বাড়ী ফিরে আসেন এ্যাডেয়ার। মা আর বোন বেরিয়েছিলেন কোন এক আত্মীয়র সঙ্গে। তিনতলায় সামনের ঘরটা সাধারণতঃ তাঁর বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়—পরিচারিকা এই ঘরেই ঢোকবার শব্দ শুনেছে। আগেই ঘরের চুল্লী জেলে দিয়েছিল সে, ধোঁয়া হচ্ছিল বলে জানলাটাও খুলে এসেছিল। রাত এগারোটা কুড়ি মিনিটে লেডি মেনুথ আর তাঁর মেয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন শব্দ শোনা গেল না ঘর থেকে। শুভরাত্রি জানাবার জন্যে লেডি মেনুথ ছেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়া। চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়েও কোন সাড়াশব্দ যখন পাওয়া গেল না, তখন লোকজন

ডেকে জোর করে খোলা হল দরজা। টেবিলের কাছে পড়েছিলেন হতভাগ্য রোন্যাল্ড। রিভলভারের বুলেট বীভৎস-ভাবে বিকৃত হয়ে গেছিল তাঁর মাথার খুলি। ঘরের মধ্যে কিন্তু ওজাতীয় কোন হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেবিলের ওপর দশ পাউন্ডের দুটো নোট পড়েছিল—আর ছিল ছোট ছোট থাকে সাজানো সোনা-রুপোয় মিশানো সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং। একটা কাগজে কতকগুলো সংখ্যা বসানো ছিল—পাশে পাশে লেখা কয়েকজন ক্লাবের বন্ধুর নাম। কাজেই ধরে নেওয়া হল, মৃত্যুর আগে তাসের জুয়োয় হারজিতের একটা মোটামুটি খসড়া করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

মিনিটখানেক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল কেসটা। প্রথমতঃ, ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব এ কাজ খুনীর। খুনের পর খোলা জানলা দিয়ে উধাও হয়েছে সে দরজার চাবি যেমন ছিল তেমনি রেখে। মাটি থেকে কম করে বিশ ফুট উঁচুতে জানলাটা। অবশ্য জানলার ঠিক নীচেই ফুলে ফুলে ঢাকা ক্রোকাসের একটা ঝোপ ছিল। বিশ ফুট উঁচু থেকে সেখানে কেউ লাফিয়ে পড়ল ফুলটুল ছিঁড়ে ঝোপ তো লন্ডভন্ড হতই, মাটিতেও গভীর পায়ের ছাপ পাওয়া যেত। কিন্তু সে রকম কোন চিহ্নই দেখা গেল না। ঝোপের মধ্যে দিয়ে ইদানীং কেউ হেঁটেছে বলেও মনে হল না। এমন কি, বাড়ী আর রাস্তার মাঝখানকার ফালি ঘাসের জমিটাতেও কেউ হেঁটেছে বলে মনে হল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এ্যাডেয়ার নিজেই দরজায় চাবি দিয়েছিলেন ভেতর থেকে। তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যু এল কোন পথে? কোনরকম চিহ্ন না রেখে কারও পক্ষেই কিছু বেয়ে জানলায় উঠে আসা সম্ভব নয়। ধরা যাক, জানলা দিয়ে কেউ গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর খুলি। তাহলে তো হত্যাকারীর হাতের টিপ অসাধারণ বলতে হবে। কেননা, রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে এরকম মরণ ঘা দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে জনবহুল পার্ক লেনে কেউ না কেউ গুলির আওয়াজ নিশ্চয় শুনতে পেত। বাড়ী থেকে শ'খানেক গজের মধ্যে ভাড়াটে গাড়ীর একটা আড্ডা আছে। সেখান থেকেও কোন ফায়ারের শব্দ শোনা যায়নি। সবই ঠিক। কিন্তু তবুও রিভলবারের বুলেটেই মারা গেছেন এ্যাডেয়ার। মারা গেছেন নিতান্ত আচম্বিতে—ক্ষুদে কালান্তকের চকিত চুম্বন পলকের মধ্যেই অনারেবল্ রোন্যাল্ড এ্যাডেয়ারের দেহ থেকে মুছে নিয়ে গেছে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন।

এই হল পার্ক লেন রহস্য। খুনের পেছনে কোন মোটিভ পাওয়া যায়নি, কেননা আমি আগেই বলেছি রোন্যাল্ডের কোন শত্রু ছিল না। তাছাড়া তাঁর ঘরের টাকা-পয়সা সরানোরও কোন প্রচেষ্টা হয়নি। কাজেই, মোটিভের কোন নামগন্ধ না থাকায় আরও জটিল হয়ে উঠেছে এই আশ্চর্য রহস্য।

সারাদিন ধরে শুধু এই সবই ভাবলাম বার বার। এমন একটা থিওরী বার করার চেষ্টা করলাম যার ভিত্তিতে সবকটা বেয়াড়া বেখাপ্পা ঘটনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা যায়। বন্ধুবর শার্লক হোমস্ প্রায় বলত, যে সূত্র খুঁজতে মোটেই বেগ পেতে হয় না—যে কোন তদন্তের জট ছাড়ানো যায় এই অতি সহজে পাওয়া সূত্রকে অবলম্বন করেই। তার কথা মনে করেই এই 'অতি-সহজে-পাওয়া-সূত্রকে' পেতেও কসুর করলাম না। কিন্তু বৃথাই। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে পরিমাণে মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোকে কষ্ট দিলাম, সে অনুপাতে সমস্যার সুরাহা বলতে গেলে কিছুই হল না।

সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে পার্কের দিকে এসেছিলাম। ছটা নাগাদ এসে পৌঁছোলাম পার্ক লেন আর অক্সফোর্ড স্ট্রীটের মোড়ে। ফুটপাতের ওপর এক দঙ্গল উঞ্ছ প্রকৃতির লোককে দেখলাম ভিড় করে একদৃষ্টে ওপর তলার বিশেষ একটা জানলার পানে তাকিয়ে থাকতে। বুঝলাম যে বাড়ীর সন্ধানে আসা এ সেই বাড়ী। রঙীন চশমা চোখে রোগা লম্বা মত একটা লোক আঙুল নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে বোধ হয় নিজস্ব কোন থিওরী বোঝাচ্ছিল—লোকগুলোও গোল হয়ে তাকে ঘিরে ধরে হাঁ করে গোগ্রাসে গিলছিল তার কথা। আমার তো দেখেই দারুণ সন্দেহ হল যে লম্বা লোকটা সাদা পোষাকপরা গোয়েন্দা না হয়ে যায় না। যতটা পারলাম এগিয়ে গিয়ে কান খাড়া করে রইলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু লোকটার বিদঘুটে কথাবার্তা শুনে এসব বাজে মার্কা লোকের গালগপ্পতে কান দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় মনে করে সরে এলাম বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়ে। পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা লেগে গেল আধবুড়ো এক কুঁজোর সঙ্গে। আমার ঠিক পেছনেই একগাদা বই হাতে দাঁড়িয়েছিল

লোকটা। ধাক্কা লেগে কয়েকখানা বই ছড়াকার হয়ে পড়ল ফুটপাতের ওপর। বইগুলো তাড়াতাড়ি কুড়োতে গিয়ে হাতে আছে একটা বইয়ের নাম দেখলাম 'দি অরিজিন অফ ট্রি ওয়ারশিপ'। নাম দেখে মনে হল লোকটা নিশ্চয় বইয়ের পোকা। হয় ব্যবসার খাতিরে আর না হয় নিছক ছবির তাগিদে এমন সব দুষ্প্রাপ্য বই জোগাড় করে বেড়াচ্ছে, যা পড়ার রেওয়াজ আজকাল আর নেই। লজ্জিত হয়ে দুঃখপ্রকাশ করতে গিয়ে দেখলাম আমার কাছে বইগুলোর যে দামই থাকুক না কেন এবং তাদের সংগে আমি যত খারাপ ব্যবহারই করি না কেন, আধবুড়ো গ্রন্থকীট ভদ্রলোকের কাছে তাদের দাম অপরিসীম। কেননা, আমার কথা শুরু হতে না হ'তেই দাঁত খিঁচিয়ে দারুণ ঘৃণায় এক হুংকার ছেড়ে পিছন ফিরে পা চালালেন ভদ্রলোক ভিড়ের দিকে। পেছন থেকে ভিড়ের মধ্যে আমি শুধু দেখতে পেলাম তাঁর সাদাকালো কোঁকড়ানো জুলপি জোড়া।

পার্ক লেনের ৪২৭ নম্বর বাড়ী দেখে আমার আসল সমস্যার কোন সুরাহাই হল না। রাস্তা আর বাড়ীর মাঝে রেলিং লাগানো একটা নীচু পাঁচিল দেখলাম। তাও সব মিলিয়ে পাঁচ ফুটের উঁচু নয়। কাজেই রেলিং টপকে যে কেউ অনায়াসেই ঢুকতে পারে বাগানে কিন্তু জানলার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কেননা, জলের পাইপ কি ঐ জাতীয় কিছুই দেখতে পেলাম না ধারে-কাছে। আগের চেয়ে আরও বেশী হতভম্ব হয়ে ফিরে এলাম কেনসিংটনে। পাঁচ মিনিটও হয় নি আমার স্টাডিতে বসেছি আমি, এমন সময়ে পরিচারিকা এসে খবর দিলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আমার সংগে।

ঘরে ঢুকলেন যিনি তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পার্ক লেনের সেই অদ্ভুত প্রকৃতির বুড়ো গ্রন্থ-কীট। লম্বা লম্বা পাকা চুলের মাঝে ধারালো কঠিন মুখ। ডান বগলে ডজন খানেক তাঁর সেই মহামূল্যবান কেতাব।

কি রকম যেন অদ্ভুত কর্কশ স্বরে শুধোলেন ভদ্রলোক। "আমাকে দেখে বেজায় অবাক হয়ে গেছেন দেখছি?"

স্বীকার করলাম যে কিছুটা হয়েছি বইকি।

"কিছু মনে করবেন না স্যার, বিবেকের কামড় সইতে না পেরে আসতে হল আমায়। আপনার পিছু পিছু আসছিলাম আমি। আপনাকে এ বাড়ীতে ঢুকে পড়তে দেখে ভাবলাম যাই আমার রূঢ় ব্যবহারের যেন কিছু মনে না করেন। আপনার ওপর মোটেই রাগ করিনি আমি, বরং বইগুলো তুলে দেওয়ার জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞ।"

"আমি আপনার প্রতিবেশী স্যার। চার্চ স্ট্রীটের মোড়ে আমার বইয়ের দোকানটা হয়ত দেখে থাকবেন আপনি। আপনার সংগে আলাপ করে সত্যিই

......পিছন ফিরে পা চালালেন ভদ্রলোক

খুব খুশী হলাম স্যার। আপনারও হয়ত বই কেনার বাতিক থাকতে পারে। এই দেখুন 'বৃটিশ বার্ডস', 'ক্যাটালাস', আর 'হোলি ওয়ার' প্রতিখানা বাড়ীতে রাখার মত বই। পাঁচখানা বই দিয়ে আপনার দ্বিতীয় শেলফের ঐ ফাঁকটা ভরাট করে ফেলতে পারেন। বড় নোংরা লাগছে, কি বলেন স্যার?"

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের ক্যাবিনেটটা দেখে আবার যখন সামনে তাকালাম, দেখলাম, আমার পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে স্টাডি-টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শার্লক হোম্‌স্।

দাঁড়িয়ে উঠে সেকেণ্ড কয়েক রীতি-মত হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। তারপরেই বোধহয় জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ-বারের মত অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। ধোঁয়াটে রঙের খানিকটা কুয়াশা ঘুরপাক খেয়ে উঠল চোখের সামনে। কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখলাম আমার কলারের বোতাম খোলা এবং ঠোঁটের ওপর ব্র্যাণ্ডির চনমনে স্বাদ। ফ্লাস্ক হাতে ঝুঁকে পড়ে আমার চেয়ারে বসেছিল হোম্‌স্।

শুনলাম সেই পরিচিত স্বর যা কোনদিনই ভোলা যায় না—"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আমার ঘাট হয়েছে, ক্ষমা কর আমায়। তুমি যে এরকম শক্ পাবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।"

সজোরে আঁকড়ে ধরলাম তার হাত।

"হোম্‌স্! সত্যিই তুমি তো? বাস্তবিকই কি তুমি বেঁচে আছ? শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর খাদ বেয়ে উঠে আসতে পেরেছিলে তুমি?"

"সবুর! সবুর! এসব কথা আলো-চনা করার মত অবস্থায় আছ তো? আবির্ভাবটা এতটা নাটকীয় করার কোন দরকারই ছিল না। বড় জোরালো শক্ দিয়ে ফেলেছি তোমায়।"

"পীকস্‌ হয়নি আমার। কিন্তু, হোম্‌স্‌, আমি যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না ভাই। গুড হেভেন্‌স্‌, আমি ভাবতেও পারিনি কোনদিন যে তুমি...তুমি আবার এসে দাঁড়াবে আমার স্টাডিতে!" সজোরে আবার তার বাহু আঁকড়ে ধরে মনে পাকানো শিরাবহুল হস্তে হাত বুলিয়ে বললাম, "না, তুমি আর যাই হও, প্রেত নও। বস ভাই, বস, তোমাকে দেখে আমার মনে খুশীর জোয়ার এসেছে, খুশীর চোটে কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। আপাততঃ আদার বসে পড়। তারপর' বল কিভাবে সেই ভয়াবহ খাদের ভেতর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলে।"

আমার উল্টোদিকে বসে হোম্‌স্‌ তার পুরোনো কায়দায় যেন কিছুই হয়নি এমনি উদাসীন ভাবে একটা সিগারেট ধরালে। পরনে তার বইয়ের দোকানীর জীর্ণ ফ্রককোট। বাকিটুকু, অর্থাৎ পাকা চুলের রাশি আর পুরোনো বইয়ের গাদা পড়েছিল টেবিলের ওপর। হোম্‌স্‌কে আগের চাইতেও রোগা এবং সজাগ মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি তার তীক্ষ্ণ নাক, ধারালো চিবুক আর শুকনো মুখে মৃতের মুখের মত পাণ্ডুরপানা রক্তহীনতা লক্ষ্য করে বুঝলাম ইদানীং খুব স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

সিগারেটটা ধরিয়ে বলল হোম্‌স্‌— "গা এলিয়ে বসে বাঁচলাম ওয়াটসন। লম্বা মানুষের পক্ষে পুরো এক ফুট ছেঁটে ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয় করে যাওয়া বড় সোজা কথা নয়। যাক, ভাই, তোমার সাহায্য আমার এখন দরকার। আজ রাত্তেই অত্যন্ত কঠিন আর বিপদজনক অভিযানে তোমাকে পাশে না পেলে আমার চলবে না। কাজটা শেষ হলে 'পর সমস্ত কিছু খুলে বলাই ভাল, কি বল?"

"কৌতূহলের চাপে ফেটে মরে যাবো আমি। যা বলবার এখনই বল।"

"আজ রাতে আমার সঙ্গে আসছ তো?"

"একশোবার। যখনই বলবে, যেখানেই বলবে—আমার অমত নেই।"

"[illegible] পড়েছিলেন দিনগুলো যেন আবার ফিরে এল। তার আগে চটপট হাত চালিয়ে ডিনারটাও খেয়ে নেওয়া দরকার। বেশ তাহলে শুরু করা যাক খাদ-প্রসঙ্গ। খাদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে আমায় খুব বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ওয়াটসন। কারণ আসলে তাতে পড়িনি। খাদের ভেতরে আমি একদিনই পড়িনি।"

"খাদের মধ্যে পড়ইনি?"

"না, ওয়াটসন, কোনদিনই না। তোমাকে যে চিরকুটটা লিখেগেছিলাম, তাতেও কোন মিথ্যা ছিল না। যে সরু পথটা বেয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুনো যায়, ঠিক তার মুখটাকে যখন পরলোক-গত প্রফেসর মরিয়ার্টির শয়তান মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখন অবশ্য আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে আমার লীলাখেলা শেষ হয়ে এসেছে। লোকটার গ্র্যানাইট কঠিন ধূসর চোখে দেখলাম চাপা ফন্দির ঝিলিক। দু'চারটে কথা বলার পর প্রফেসরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছোট্ট চিরকুটটা লিখে ফেললাম—এই চিরকুটটাই তোমার হাতে পৌঁছেছিল। সিগারেটের বাক্স আর বেড়াবার ছড়িসমেত চিরকুটটা রেখে সরু পথ বরাবর এগিয়ে গেলাম— পিছু পিছু এলেন মরিয়ার্টি। পথের শেষে একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে। কোন হাতিয়ার না নিয়ে সিধে আমার দিকে দৌড়ে এসে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে আমায় জাপটে ধরলেন তিনি। তাঁর খেলা যে খতম হয়েছে, তা মরিয়ার্টি ভাল-ভাবেই জানতেন, তাই [illegible] প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। পড়ো পড়ো হয়ে সেই সরু কিনারায় দাঁড়িয়ে কোন রকমে তার ধাক্কা সামলে নিলাম। তুমি তো জানই আমি একটু আধটু বারিৎসু জানি। জাপানী পদ্ধতিতে কুস্তির এই বিদ্যের কায়দা বহুবার আমি কাজে লাগিয়েছি অনেক [illegible] পরিস্থিতিতে। আমাকে জাপটে ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়ো পড়ো হয়েও চট করে পিছলে বেরিয়ে গেলাম তাঁর আলিঙ্গন থেকে। বিকট চীৎকার করে প্রফেসর কয়েক সেকেন্ড পাগলের মত লাথি ছুঁড়লেন, দু'হাতের আঙুল বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরলেন বাতাসকে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও দেহের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তিনি, তলিয়ে গেলেন নীচে। কিনারা থেকে মুখ বাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে পড়তে দেখলাম। তারপর একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে সশব্দে তলিয়ে গেলেন জলের তলায়।

বড় বড় চোখ করে হতবাক হয়ে শুনছিলাম হোম্‌স্‌এর মুখ থেকে জীবন্ত মিথ্যার আমার কাহিনী। সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেছিল সে।

শুনতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কিন্তু পায়ের ছাপ! আমি নিজের চোখে দেখেছি দুজোড়া পায়ের ছাপ কিনারা পর্যন্ত গেছে—কোনটাই কিন্তু ফেরেনি।"

"ফিরেছিল অন্য পথে। প্রফেসর অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতই বুঝলাম দৈবের কৃপায় কি অসাধারণ সুযোগ এসে গেছে আমার হাতের মুঠোয়। আমাকে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখানোর শপথ যে মরিয়ার্টি একা করেননি, তা আমি জানতাম। নেতার মৃত্যুতে অন্ততঃপক্ষে তিনজনের প্রতিশোধ-স্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। তিনজনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির মানুষ। এদের মধ্যে একজন না একজন আমাকে শেষ করবেই। আর যদি উল্টোদিক থেকে ভাবা যায়, অর্থাৎ দুনিয়ার সবাই যদি জানতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে আমিও পরলোকের পথে রওনা হয়েছি, তাহলে এই লোকগুলোও আরও বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করবে। ফলে, একদিন না একদিন আমি তাদের সাবাড় করবই। এবং তিন-জনকে খতম করতে পারলেই দুনিয়াকে আবার জানিয়ে দেওয়া যাবে যে আমি মরিনি, এই সুন্দর ভুবনেই দিব্যি বেঁচে আছি আর পাঁচজনের মত। মস্তিষ্কের কাজ যে কত দ্রুত তা বুঝলাম সেদিন, কেননা আমার বিশ্বাস প্রফেসর মরি-য়ার্টি রাইকেনবাক ফলস'র তলা পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগে এতগুলো জিনিষ ভাবা আমার শেষ হয়ে গেল।

"দাঁড়িয়ে উঠে পেছনের পাথুরে দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখলাম। মাস কয়েক পরে এই দুর্ঘটনার ছবির মত বিবরণ তোমার রচনায় পড়ে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। তুমি লিখেছিলে যে পাথরের দেওয়ালটা খাড়া উঠে গেছে। [illegible] না। কেননা, পা রাখবার ছোট ছোট জায়গা তখন ছিলই, [illegible] তাকের মত খাঁজকাটা [illegible] গেছিলেও এসেছিল। পাহাড়টা এমনই খাড়াই যে আগাগোড়া বেয়ে ওঠা যেমন একেবারেই অসম্ভব, ঠিক তেমনই অসম্ভব ভিজে [illegible] পায়ের ছাপ না রেখে বেরিয়ে পড়া। এরকম [illegible] এর আগে আমি যে [illegible] করেছি, তা অনেক [illegible]।

অর্থাৎ স্রেফ পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু একইদিকে তিনজোড়া পায়ের ছাপ এগিয়ে যাওয়া দেখলেই চালাকী ফাঁশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কাজেই সবদিক ভেবে, পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠাই সবচেয়ে ভাল। ভাই ওয়াটসন, কাজটা খুব মজার নয়। নীচ থেকে জলপ্রপাতের গর্জন এসে আছড়ে পড়ছিল কানের পর্দায়। বাজে কল্পনা আমার মাথায় কোনদিন আসে না, কিন্তু বিশ্বাস কর সেদিন যেন শুনলাম খাদের গহ্বর থেকে আর্তনাদ করে আমায় ডাকছে মরিয়ার্টির কন্ঠ। একটু সামান্য ভুল মানেই মৃত্যু। একাধিকবার ঘাসের চাপড়া উপড়ে এসেছে হাতের মুঠোয় অথবা পাহাড়ের ভিজে খাঁজে হড়কে গেছে বুটের ডগা—প্রতিবারই ভেবেছি এই বুঝি সব শেষ। কিন্তু কিছুতেই না দমে অতিকষ্টে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরে উঠে শেষকালে পেঁছোলাম সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা কয়েক ফুট গভীর একটা পাথরের তাকে। দিব্বি আরামে সবার চোখের আড়ালে থেকে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম এইখানে। মাইডিয়ার ওয়াটসন, এইখানেই শুয়ে শুয়ে দেখলাম কি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অথচ কি বিশ্রী আনাড়িভাবে আমার মৃত্যুর তদন্ত শেষ করলে তুমি।

"অনেকক্ষণ পরে শেষকালে তোমার অকাট্য কিন্তু আগাগোড়া ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলে তুমি। একলা শুয়ে শুয়ে তোমায় যেতে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে। ভেবেছিলাম আমার এ্যাডভেঞ্চারের ইতি বোধহয় এইখানেই। কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে বুঝলাম বিস্ময়ের এখনও অনেক বাকী। ওপর থেকে বিরাট একটা পাথরের চাঁই গড় গড় করে গড়িয়ে এসে সাঁৎ করে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দমাস করে পড়লে নীচের পথে এবং পর মুহূর্তেই ছিটকে গিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। মুহূর্তের জন্য ভাবলাম বুঝি নিছক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওপরে তাকিয়ে দেখলাম কালো হয়ে আসা আকাশের পটে একজন পুরুষের মাথা, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এল আর একটা পাথর, এসে পড়ল যে তাকটায় শুয়েছিলাম ঠিক তার ওপরেই মাথার এক ফুট দূরে। চকিতে বুঝলাম সব। মরিয়ার্টি একা আসেননি। তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল তাঁরই একজন সাঙাৎ। একনজরেই চিনেছিলাম লোকটাকে। কি ভীষণ প্রকৃতির লোক সে, তা ঐ একবার দেখেই বুঝেছিলাম। আমার চোখের আড়ালে থেকে দূরে থেকে সে দেখেছে তার বন্ধুর মৃত্যু এবং আমার পলায়ন। হুট্ করে কিছু না করে অপেক্ষা করেছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। তারপর খাড়াই পাহাড়ের একেবারে ওপরে উঠে কমরেডের অসমাপ্ত কাজটাই সম্পূর্ণ করতে শুরু করেছে।

"ওয়াটসন, এসব কথা ভাবতে আমার বেশী সময় যায়নি। পাহাড়ের চূড়োয় ভয়ংকর মুখটাকে আবার দেখতে পেলাম—বুঝলাম আর একটা পাথর নেমে আসতে আর দেরী নেই। হাঁক পাঁক করে খামচে খামচে নামতে লাগলাম নীচের পথের ওপর। ঠাণ্ডা মাথায় একাজ করতে পারতাম না আমি। ওপরে ওঠার চেয়ে একশোগুণ বেশী কঠিন নীচে নামা। কিন্তু বিপদের কথা ভাববার আর সময় নেই তখন। পাথরের তাক ধরে ঝুলে পড়তেই আর একটা পাথর পাশ দিয়ে গুম করে নেমে গেল নীচে। মাঝামাঝি আসতেই পিছলে গেলাম আমি—হুড়হুড় করে নেমে এলাম নীচে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কাঁটাছেঁড়া রক্তাক্ত দেহে এসে পড়লাম রাস্তার ওপরেই খাদের মধ্যে নয়। নেমেই টেনে দৌড়। অন্ধকারে গা ঢেকে পাহাড়ের সারির মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে গেলাম দশ মাইল। এক হপ্তা পরে পেঁছোলাম ফ্লোরেন্সে। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুনিয়ার কেউই জানেনি আমি কোথায় আছি এবং কিভাবে আছি।

"আমার অজ্ঞাতবাসের খবর জানত শুধু একজনই—আমার ভাই মাইক্রফ্‌ট্। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, জানি না এজন্যে আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবে কিনা। কিন্তু ভাই এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেকেই জানুক এবং বিশ্বাস করুক যে আমি মারা গেছি। এবং এও ঠিক যে আমি মৃত একথা তুমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে কি আমার অক্কালাভের অমন রোমাঞ্চকর বিবরণ লিখতে পারতে? ও লেখা যে পড়েছে, তারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আমি আর নেই। গত তিন বছরে বার কয়েক কলম নিয়ে বসেছিলাম তোমাকে দু'এক লাইন লিখতে, কিন্তু প্রতিবারেই নিজেকে সামলে নিয়েছে আমার প্রতি তোমার গভীর অনুরাগের কথা ভেবে। কেননা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে এমন কিছু অশোভন কাণ্ড করে বসতে যে আমার গোপন রহস্য আর গোপন থাকত না। ঠিক এই কারণেই আজ সন্ধ্যেবেলাতেও যখন আমার বইগুলো রাস্তায় ফেলে দিলে তুমি, আমাকে সরে পড়তে হয়েছে। সে সময়ে খুবই বিপদের মধ্যে ছিলাম আমি। অবাক হয়ে যদি তাকিয়ে থাকতে তুমি অথবা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠতে, তাহলেই ছদ্মবেশ ফুঁড়ে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত সন্ধানীদের চোখে। পরিণাম হত অত্যন্ত শোচনীয় এবং এবার যা হারাতে তা আর ফিরে পেতে না। মাইক্রফটের কাছে আমার গুপ্ত কথা ফাঁস করতে হয়েছে শুধু প্রয়োজনমত টাকা পাওয়ার জন্যে।

"ইতিমধ্যে শুরু হল মরিয়ার্টির মামলা। শেষও হল। কিন্তু ফলাফল খুব সুখের হল না। আশা করেছিলাম অনেক কিছুই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দলের দু'জন সবচেয়ে ভীষণ প্রকৃতির লোকই রইল জেলের বাইরে। আমার ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে এই দু'জনেই মরণপণ করেছিল। দু'জনেই আমার পরম শত্রু।

"কাজেই, দু'বছর ঘুরে বেড়ালাম তিব্বতে লামা দেখে এবং প্রধান লামার কাছে থেকে বেশ কিছুদিন মজায় কাটিয়ে দিলাম। কাগজে নিশ্চয় পড়েছিলে সেই আশ্চর্য অভিযানের চাঞ্চল্যকর বিবরণ। ভেবেছিলে দুঃসাহসী সাইগারসনের জন্ম নরওয়েতে। কোনদিন ভুলেও কি কল্পনা করতে পেরেছিলে তোমার অকৃত্রিম সুহৃদেরই শ্বাসরোধী খবর পড়ছ তুমি? এরপর গেলাম পারস্যে, মক্কা দেখলাম এবং খারটুমে খলিফের সঙ্গে সাক্ষাৎও করলাম। সে ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সবকথা আমি যথাসময়ে ফরেন অফিসে জানিয়ে দিয়েছি। ফ্রান্সে ফিরে এসে আলকাতরা থেকে পাওয়া যৌগিক পদার্থ নিয়ে কয়েক মাস গবেষণা করলাম দক্ষিণ ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ারের একটা ল্যাবোরেটরীতে। ফলাফল হল খুবই সন্তোষজনক। ইতিমধ্যে জানলাম আমার দু'জন শত্রুর মধ্যে বাকী রয়েছে শুধু একজন। কাজেই লণ্ডনে ফিরে আসার আয়োজন করছি, এমন সময়ে শুনলাম পার্ক লেনে রহস্যের চাঞ্চল্যকর খবর। শুনেই আর দেরী করলাম না। কেসটার বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট সম্পর্কে আমার আগ্রহ তো জেগেছিলই, কিন্তু শুধু এই কারণেই অত তাড়াতাড়ি ফিরিনি। খবরটা পড়েই বুঝেছিলাম আবার দৈব আমার সহায়। অদ্ভুত কতকগুলো ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধে হাতের মুঠোয় এসে পড়বে এই সময়ে যদি ফিরে আসতে পারি লণ্ডনে। লণ্ডনে পেঁছেই হাজির হলাম বেকার স্ট্রীটে। মিসেস্ হাডসন তো আমাকে দেখেই আঁৎকে উঠে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন। মাইক্রফট আমার ঘরটা বেশ সযত্নে গুছিয়ে রেখেছিল, যেখানকার কাগজ সেইখানেই ছিল, এতটুকু নড়চড় হয়নি। বেলা দুটোর সময়ে পুরোনো ঘরের পুরোনো আর্মচেয়ারে বসে ভাবলাম পুরোনো দিনের কথা আর পুরোনো বন্ধুর কথা। ভাবলাম আবার কবে দেখতে পাবো আমার ডিয়ার ওয়াটসনকে এ ঘরে। আমার ঠিক উল্টোদিকে তার সবচেয়ে পছন্দসই চেয়ারে বসে আবার কবে শুরু হবে তার অপরাধ আলোচনা।"

এপ্রিলের সেই রাত চিরদিন জ্বলজ্বল করবে আমার স্মরণের ইতিহাসে। অপরিসীম বিস্ময়ে বোবা হয়ে শুনছিলাম এমন এক কাহিনী যা আমি

কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারতাম না কোনদিনই না......যদি না বন্ধুবর শার্লক হোমসকে সশরীরে বসে থাকতে দেখতাম আমার স্টুডিওতে, দেখতাম তার দীর্ঘ শীর্ণ শরীরে আর সজাগ মুখে নিবিড় আগ্রহের চাপা দ্যুতি। কোনদিন কল্পনাই করি নি এ মুখ আবার আমি দেখতে পাব। সে উধাও হওয়ার পর আমি যে কি গভীর শোক পেয়েছিলাম, তা যেভাবেই হোক জানতে পেরেছিল সে, তাই মুখের কথায় যত না হোক মুখের রেখায় ফুটে উঠেছিল আমার প্রতি তার গভীর সমবেদনা।

একটু থেমে আবার বললে হোমস্, "মাই ডিয়ার ওয়াটসন, দুঃখের সবচেয়ে বড় দাওয়াই হল কাজ। আজ রাতের কাজটাও যদি দুজনে মিলে শেষ করতে পারি এবং সফল হতে পারি—তাহলে জানব এ গ্রহে অন্ততঃ একটা পুরুষের বেঁচে থাকার যথেষ্ট অধিকার আছে।"

বৃথাই আমি হাতজোড় করলাম, কাকুতি-মিনতি করলাম আরও কিছু বলার জন্যে। কিন্তু অটলঅনড়ভাবে সে শুধু বললে—"পুরো তিনটে বছর নিয়ে এখনও বকবক করা বাকী আছে। সাড়ে নটা পর্যন্ত তাই চলুক তার বেশী নয়। ঠিক সাড়ে নটার সময়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা, তারপর শুরু হবে খালি বাড়ীতে আমাদের মনে রাখার মত এ্যাডভেঞ্চার।"

ভাড়াটে গাড়ীতে পকেটে রিভলভার নিয়ে ঠিক তার পাশটিতে বসে মনে পড়ে গেল পুরোনোদিনের কথা। দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে নতুন করে অনুভব করলাম এ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ। কঠিন মুখে চুপ করে বসেছিল হোমস্। চোখেমুখে তার উচ্ছ্বাসের বাষ্পও ছিল না। রাস্তার বাতির চকিত আলো এসে পড়ল তার কঠোর ঋজু দেহে। এক ঝলকে দেখলাম, কোঁচকানো কপালে, পাতলা দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁটে গভীর চিন্তার তন্ময়তা। অপরাধী লণ্ডনের অন্ধকার অরণ্যে কোন বুনো জন্তুর সন্ধানে আমাদের শিকার-অভিযান, তা জানতাম না। কিন্তু ওস্তাদ শিকারীর ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম বেশ গুরুতর রকমের এ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়িয়েছি আমরা। মাঝে মাঝে তার তাপসিক গাম্ভীর্য ভেদ করে ফুটে উঠছিল ব্যঙ্গ-বঙ্কিম মৃদু হাসি—তাতে আমার কৌতূহল কমা দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল।

ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রীটে চলেছি, কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ারের কোণে গাড়ী দাঁড় করাল হোমস্। লক্ষ্য করলাম, গাড়ী থেকে নামার সময়ে ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে তন্ন-তন্ন করে সে দেখে নিলে। এবং তারপরেও প্রতিটি রাস্তার মোড়ে নেমে গিয়ে কেউ যে তার পাছু নিচ্ছে না সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কোন উপায়ই বাদ দিলে না। চলেছিলাম আজব রকমের ঘোরালো পথে। লণ্ডনের গলিঘুঁজি হোমসের নখদর্পণে এবং সেদিনও দেখলাম বাস্তবিকই এ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সে। হন্ হন্ করে খাটাল আস্তাবল পেরিয়ে চলেছিল সে, অথচ প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আগে থেকেই হিসেব করা, প্রতিটি মোড় নেওয়া যেন আগে থেকেই প্ল্যান করা। মাকড়শার জালের মত সে সব পথঘাটের সন্ধান হোমস যে কি করে পেল, তা জানি না। অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট একটা রাস্তায় এসে পড়লাম। দুপাশে পুরোনো আমলের নোনাধরা বাড়ীর সারি। সে রাস্তার পর ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রীটে এবং সেখান থেকে পৌঁছোলাম ব্ল্যাণ্ড ফোর্ড স্ট্রীটে। পৌঁছেই বোঁ করে একটা সরু গলিতে ঢুকে গেল হোমস্। ওদিককার কাঠের ফটক পেরিয়ে পৌঁছোলো একটা পরিত্যক্ত চত্বরে। পকেট থেকে চাবি বার করে একটা বাড়ীর পেছনের দরজা খুলে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ভেতরে। ভালমন্দ কিছু ভাবার সময় ছিল না। হোমসের পিছু পিছু আমিও ঢোকামাত্র তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিলে সে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
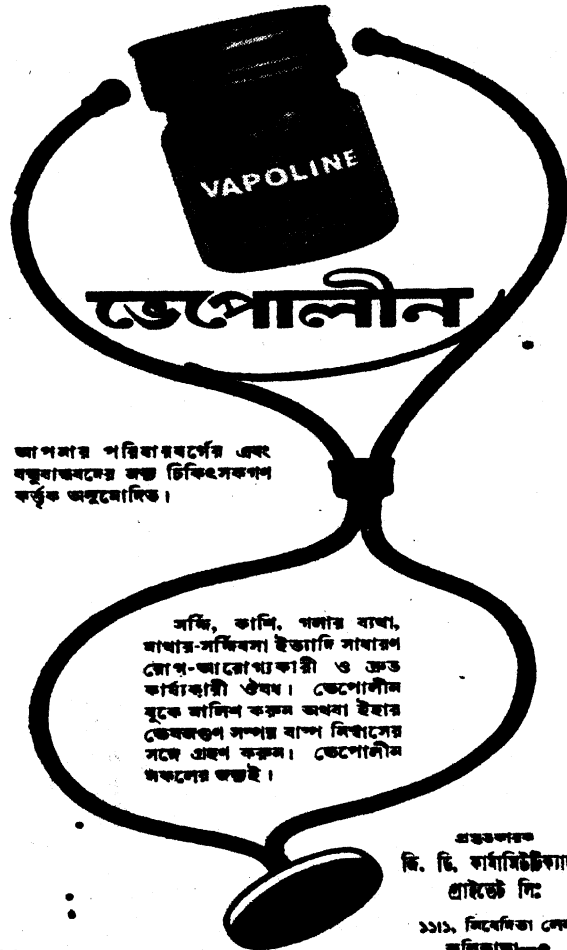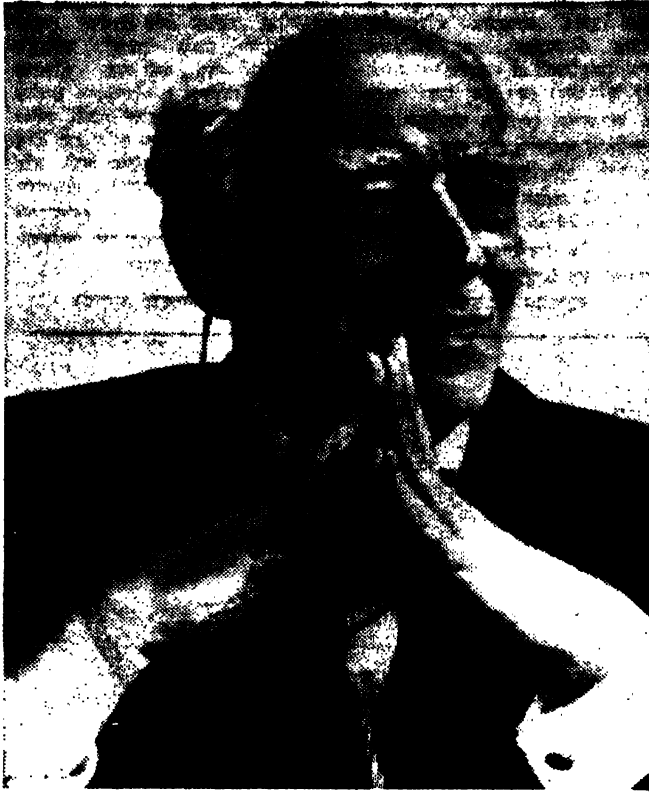
নাটকে নতুন রীতির নায়ক স্টানিসলাভস্কি

কনাদ চৌধুরী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাটমহলে এ-বছরের ১৭ই জানুয়ারী রুশ রঙ্গমঞ্চের চিরকালের নায়ক স্টানিসলাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। রুশ রঙ্গমঞ্চের জনক ছিলেন কনস্টানটিন সারগেয়েভিচ স্টানিসলাভস্কি। রুশ রঙ্গমঞ্চের প্রাক্‌-স্টানিসলাভস্কি যুগ ছিল নাটুকেপনার যুগ। সে যুগে পাদপ্রদীপের আলো সত্যিকারের জীবনকে উদ্‌ভাসিত করত না. তারকাদের মিনে করা মুখেই শুধু নকল উজ্জ্বলতা বিকিরণ করে সেই-সব আলো নিঃশেষে নিভে যেত। মঞ্চেও যাঁদের সাক্ষাৎ পেতেন দর্শকরা তাঁরাও ছিলেন নকল মানুষের দল। চলমান জীবনকে তাঁরা সামান্যই বোঝবার চেষ্টা করতেন। প্রম্পটারের স্বর-কম্পনকে সার করেই মঞ্চের ওপর খানিকক্ষণ কাটিয়ে যেতেন তাঁরা। সেসব দিনের মঞ্চে অট্টহাসি ছাড়া হাসি নেই. চীৎকৃত বিলাপ ছাড়া বিষাদ নেই। স্টানিসলাভস্কি তাঁর আজীবন সাধনায় রাশিয়ার নাটমহল থেকে এইসব নকল মানুষদের নির্বাসিত করেছেন। নাট্য-জগতে অভিনয়ের, মঞ্চসজ্জায় নতুন রীতির প্রবর্তন করে সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনবার কৃতিত্ব তাঁরই।

রুশ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখটিকে লাল অক্ষরে লিখে রাখবে। এই তারিখে স্টানি-সলাভস্কির সঙ্গে দেখা হয় নাট্যকার দানচেংকোর। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ-কারের ফলেই স্থাপিত হয় মস্কো আর্ট থিয়েটার। অনেকদিন ধরেই প্রযোজক-অভিনেতা স্টানিসলাভস্কি নতুন রীতির পরীক্ষার-নিরীক্ষার জন্যে একটি রঙ্গ-মঞ্চ স্থাপনের কথা ভাবছিলেন। দানচেং-কোর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রথম পর্দা তুললেন স্টানিসলাভস্কি। মস্কো আর্ট থিয়ে-টারের প্রতিষ্ঠার ফলে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চের শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি মাত্র ঘটেনি নাট্য-জগতে একটি বিরাট বিপ্লবও সংঘটিত হয়েছিল। আর্ট থিয়েটারের অচেনা নতুন দল গোটা বিশ্বের বিস্মিত চোখের সামনে একটি নবনাট্য রীতির প্রবর্তন করল। এই আর্ট থিয়েটার মারফৎ নবনাট্য রীতি প্রবর্তনা প্রসঙ্গে পরে একদা স্টানিস-লাভস্কি বলেছিলেন :

The programme of our new undertaking was revolutionary. We protested against old manner of playing, against theatricality, false pathos, declamation, show off play-acting, against poor conventions of staging and stage designing, against star system that spoils the company and against the entire presentational style, the paltery repertories of the theatre of those days.

("My life in Art")

নাটক তাঁর কাছে শুধুমাত্র প্রমোদের উপকরণ মাত্র ছিল না। থিয়েটারকে তিনি বই এবং সংবাদপত্রের উপরে স্থান দিতেন। নাটক এবং নাটমঞ্চ তাঁর কাছে সভ্যতার মহত্তম সামগ্রী। তাঁর প্রযোজক এবং অভিনেতা-জীবনের লক্ষ্য ছিল অভিনয়কে সত্য এবং সুন্দরের বাহন করে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা। মঞ্চ

পরিচালনার হাতে-খড়ি হলেও স্টানিসলাভস্কি নাট্যিকদের মৌল দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটার স্থাপন প্রসঙ্গে তাঁর দলের অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন একদা :

কখনো ভুলবে না, যে আমরা দরিদ্র জনসাধারণের নিরানন্দ অন্ধকার জীবনের নদীতে আলোর নৌকো ভাসাবার চেষ্টা করছি, বিষাদমগ্ন মানুষগুলিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যেও আনন্দলোকে নিয়ে যাবো বলেই আমরা একটি সত্যিকারের রঙ্গালয় স্থাপন করতে চাই। এবং এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত জীবন আমরা উৎসর্গ করবো।

বাস্তবিক, রাশিয়ার রঙ্গালয়ের উন্নতির সঙ্গে স্টানিসলাভস্কির সমগ্র জীবনই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। নাট্যকলার শীর্ণ পাদপটিকে নন্দনতত্ত্বের নন্দনকাননে মহীরূহ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। অভিনেতা হিসেবে, নাট্যপরিচালক হিসেবে এবং নাট্য-আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধিজীবীরূপে স্টানিসলাভস্কি যে নাট্যধারার সূচনা করেন রাশিয়ায়, তার প্রভাব থেকে আজকের নাট্যআন্দোলনগুলিও মুক্ত নয়।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর স্টানিসলাভস্কি পুরোনো দিনের ব্যবহৃত নাটকগুলিকে উপেক্ষা করে নতুন শতাব্দীকেই যেন সঞ্চারিত করলেন মঞ্চে। চেখভ, টলস্টয়, সেক্সপীয়ার, হাউপ্টম্যান এবং ইবসেন-এর বিখ্যাত নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে আরম্ভ করলেন। রাশিয়ার প্রগতিশীল জনসাধারণ অভিনন্দিত করলেন স্টানিসলাভস্কির এই মঞ্চ-প্রচেষ্টাকে। ১৯০৬ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণ করার পর সমগ্র ইউরোপেও স্টানিসলাভস্কির নবনাট্যধারা স্বীকৃত হল। তাঁর এই নবনাট্যধারা বিশ্বের নাট্যজগতে "স্টানিসলাভস্কি সিসটেম" নামে আজো পরিচিত। নাটকের চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্যের দিকেই আলো ফেলতেন তিনি। অভিনেতাদের ওপর নির্দেশ থাকত তাঁরা যেন বাইরের মানদণ্ডে তাঁদের অভিনীত চরিত্রগুলির বিচার না করে অন্তরাশ্রয়ী আলোড়নকেই প্রাধান্য দেন। কিন্তু এই মানস সাম্রাজ্যে অভিযান চালানোর জন্য অভিনেতাদের

স্টানিস্লাভস্কি ও বার্ণাড' শ

ওথেলো এবং ইয়াগো : স্টানিস্লাভস্কি ও পেত্রোসিয়ান

চেখভের 'চেরি অরচার্ড' নাটকে স্ট্যানিস্লাভস্কি ও মেরিয়া লিলিনা

কাছ থেকে সর্বস্ব দাবী করতেন স্টানিসলাভস্কি। শারীরিক এবং মানসিক সমস্ত শক্তি নিয়োগের পরই একমাত্র অভিনেতাবৃন্দ চরিত্র সৃষ্টির উপযোগী প্রেরণা লাভ করতে পারেন। স্টানিসলাভস্কির নাট্যসাধনা ছিল এই প্রেরণার মূলকেন্দ্র আবিষ্কারের। কিন্তু এই 'আবিষ্কারের' পথটি সহজ ছিল না। কবি এবং শিল্পীরা যে কোনো মুহূর্তে প্রেরণায় আক্রান্ত হয়ে সৃষ্টিতে ব্রতী হতে পারেন, কিন্তু অভিনেতাদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবার সময় পূর্বনির্দিষ্ট। পাদপ্রদীপের আলো জ্বললে, যবনিকা উঠলে তবেই অভিনেতাদের প্রেরণার ব্রাহ্মমুহূর্তটি আসে। সুতরাং তাঁদের কাজ শিল্পী এবং কবিদের চেয়েও এক-দিক দিয়ে জটিল। প্রেরণাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য না করলে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হবে না। সুতরাং অভিনেতাদের পক্ষে প্রথম শিক্ষা হল ঘড়ির কাঁটায় প্রেরণাকে বিদ্ধ করার শিক্ষা। অনুষ্ঠানসূচীর নির্ঘণ্টের সঙ্গে প্রেরণার সার্থক সাযুজ্য ঘটলে তবেই একজন অভিনেতা চরিত্রসৃষ্টিতে ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারেন। স্টানিসলাভস্কি তাঁর দলের অভিনেতাদের এই সাযুজ্য-সাধনের শিক্ষাই দিতেন অক্লান্তভাবে। মনঃসংযোগের, স্মৃতির, ইচ্ছাশক্তির অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে তাঁর ছাত্ররা অতি সহজেই ভঙ্গি, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। স্টানিসলাভস্কি প্রাক্-অভিনয়-কালীন একটি অভিনয়-পরিমণ্ডল সৃষ্টির ওপর জোর দিতেন। এই পরিমণ্ডলের চাপে অভিনয় স্বতোৎসারিত হত। স্টানিসলাভস্কি মনে করতেন যে অভি-নেতা যত প্রতিভাবান হবেন, তাঁর পক্ষে অনুশীলনের প্রয়োজন ততই অধিক। ছোট পাথরের চেয়ে বড় হীরেকেই যেমন বেশী কাটতে হয় নানাদিক থেকে, প্রতি-শ্রুতিবান অভিনেতারা স্টানিসলাভস্কির কাছে তেমনি বড় হীরেরই মতই অধিক কর্তনসাপেক্ষ।

স্টানিসলাভস্কির 'সিসটেম'-এর মৌল বৈশিষ্ট্য হল সাহজিক সারল্য। মঞ্চের পৌরাণিক চাতুরীকে পুরো-পুরি অতীতের সাজঘরে রেখে মানুষের সরল জীবনকেই মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতাবৃন্দ নকল কণ্ঠস্বরে কখনও কথা বলতেন না মঞ্চে। মঞ্চ এবং দর্শকদের মধ্যে স্বাভাবিকতার সেতু গড়তেন তাঁরা, নাটকের আবেদন এই সেতুবাহিত হয়েই দর্শকবৃন্দের মর্মে গিয়ে পৌঁছত। কিন্তু স্টানিসলাভস্কির অনুকারীবৃন্দ অনেক সময়েই তাঁর সাহজিক সারল্যকে একটা নতুন ক্লিশে হিসেবে প্রয়োগ করেছেন নাট্য প্রযোজনায়। যাবতীয় ক্লিশের তীব্র বিরোধী ছিলেন স্টানিসলাভস্কি। সারল্যের, সত্যের এত-টুকু ছদ্মবেশ তিনি সহ্য করেননি জীবনে। সত্য তাঁর কাছে ছিল সূর্যের মত নগ্ন, আকাশের মত ব্যাপক।

স্টানিসলাভস্কিকে প্রাক্‌বিপ্লব যুগের প্রবক্তা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না এতটুকু। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ হল একটি বিশেষ কাল এবং তার পারিপার্শ্বিকের প্রতিনিধি। তাঁর প্রযো-জিত প্রতিটি নাটকের চরিত্রগুলি তাই সমসাময়িক সমাজমানসকেই প্রতিফলিত করত। এই প্রতিফলন স্টানিসলাভস্কি সিসটেম'-এর 'সুপার-টাস্ক'! এবং এই 'সুপার-টাস্ক'ই প্রকৃত পরিচালকের প্রথম অধিষ্ঠানেই আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এতবড় বাড়িতে বসে পড়বার মতো একটু জায়গা খুঁজে পায় না অরুণ। এটা তার কাছেও সময়ে সময়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু কথাটা তার কাছে অন্তত মর্মান্তিকভাবেই সত্য। শুধু যে এ বাড়িতে কেউ পড়ে না তাই নয়—আর কাউকে পড়বার সুযোগ দিতেও প্রস্তুত নয়। এখানে যেন দিনরাতই হাট বসে আছে। হঠাৎ দূর থেকে এদের বাড়ির দিকে এলে মনে হয় কী কারণে দারুণ একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। এরা সাধারণ কথাও কয় চেঁচিয়ে। কর্তাদের যেমন গলাই শোনা যায় না—সকলেই আস্তে আস্তে কথা বলেন—ছেলেদের তেমনি ঠিক বিপরীত, তারা আস্তে কথা বলতেই পারে না; আর তাদের সঙ্গে চেঁচিয়ে গিন্নীদেরও অভ্যাস হয়ে গেছে সর্বদা চীৎকার করে কথা বলা। তার ওপর এদের আড্ডা যা কিছু বেশির ভাগই বাড়িতে ছাদে ছাদে। পাড়ায় কোথাও এদের আড্ডা জমে না, তার কারণ এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে এমন বেকার খুঁজে পাওয়া কঠিন। লেখাপড়া করুক না করুক—ইস্কুল কলেজে যাওয়ার একটা ঠাট বজায় রাখে অন্য ছেলেরা। এরা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ, তাই অবসরও এদের অখণ্ড।

এ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে। পাড়ার অপর ছেলেরা কথাবার্তা কইলেও এদের একটু হীন চোখে দেখে। অন্তত অরুণের তাই অনুমান। সেটা এরাও খানিকটা বোঝে, সে কারণেও কতকটা আরও গৃহকেন্দ্রিক। আর সেই কারণেই অরুণের ওপরেও এদের একটা আক্রোশ। বোধ হয় মনে করে, শিক্ষানুরাগের এই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওদের নিরন্তর নিঃশব্দে ধিক্কার দিচ্ছে এবং অহরহ ঘরে-বাইরে সকলের কাছে ছোট করে দিচ্ছে। অরুণ যে কখনও এ বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না—এমন কি ইস্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও বাড়ির বাইরে থাকে না—সেটাও ওদের কাছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার বলে বোধ হয়।

সেইজন্যেই অনেক খুঁজে খুঁজে যদি বা একটি নিভৃত কোণ বার করে অরুণ—সেটা বেশীক্ষণ নিভৃত থাকে না। এদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা ওকে অনুসরণ করে, একটু পরেই সেখানে গিয়ে হাজির হ'তেও দেরি হয় না। এক খুব ভোরে উঠে বাগানের কোথাও গিয়ে বসলে খানিকটা সময় পাওয়া যায়—কারণ এদের রাতও হয় যেমন অনেক দেরিতে, তেমনি ভোরও সহজে হতে চায় না। অনাবশ্যক বসে বসে রাত জাগে বলে এধারেও উঠতে দেরি হয়। অরুণও সকাল করে শুতে পারে না এদের অত্যাচারে। তবু ওকে ভোরে উঠতেই হয়। কারণ দিনেরাতে এই যা একটু অবসর, এদের ঘুম ভাঙবার আগে পর্যন্ত। সে ওদের ঘুমের সময়টায় সারারাত জেগেও পড়তে প্রস্তুত ছিল—যদি আলোর একটা ব্যবস্থা থাকত। এ বাড়ির মেজকর্তা অর্থাৎ তার মেসোমশাই এতখানি তেল খরচ বরদাস্ত করবেন না, তা সে জানে।

শুধু যদি চেঁচামেচি হট্টগোল হ'ত তাহলেও অতটা অসুবিধা হ'ত না। কারণ সাধারণ প্রতিকূল পরিবেশেও মন বসবার মতো পাঠে আসক্তি যথেষ্ট ছিল ওর। কিন্তু এদের আক্রমণটা যে শুধু পরোক্ষ নয়—অনেকখানি প্রত্যক্ষও। ওকে পড়তে বসতে দেখলেই এরা নানারকম অত্যাচার শুরু করে দেয়। ঠাট্টা বিদ্রূপ টিটকিরির ঝড় বইতে থাকে। ওর কানের কাছে এসে হয়ত চিৎকার করে বলে ওঠে একজন, 'ওগো তোমরা কেউ এখানে কথা কয়োনি গো, কথা কয়োনি, দুটি ঠোঁট ফাঁক করোনি। বেদব্যাসের ধ্যান ভেঙে যাবে, খুব সাবধান।'

আর একজন হয়ত অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো তোলে, 'চেঁচাস কেন ছোঁড়া—তোর চিচ্‌কারে বিদ্যের জাহাজ ফুটো হয়ে যাবে যে।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে হয়ত একজন বললে, 'দূর—চিচকারে নাকি আবার জাহাজ ফুটো হয়।' আগের লোক আরও চেঁচিয়ে হাত পা নেড়ে জবাব দিলে,—'একি তোর লোহার জাহাজ যে ফুটো করতে কামান বন্দুক চাই—এ বিদ্যের জাহাজ চিচ্‌কারেই ফুটো হয়ে যায়।'

কেউ হয়ত আবার ওর চোখ এবং খোলা বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় জোড়-হস্ত এগিয়ে দিয়ে—যাতে ওর দৃষ্টি-আকর্ষণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে—বলে, 'ওগো বিদ্যেসাগর মশাই, তোমার বিদ্যে থেকে একটু ভাগ দেবে আমাকে? দাও না ভাই, একটা পেয়েক-

টৈয়েক মেরে মগজে ঢুকো—একটুখানি বিদ্যে।’

সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে হয়ত প্রচণ্ড ধমক এসে পড়ে, ‘না না, তোমরা অমন করে ওর পেছনে লেগোনি। মেজকাকা জানতে পারলে দেখো দেবে মজা। ও বলে লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজেস্টার হবে—গোরুর গাড়ি বোঝাই করে ছালাছালা টাকা এনে দেবে মেজকাকাকে—!’ ইত্যাদি ইত্যাদি চারিদিক থেকে চলবে এই সপ্তরথীর আক্রমণ।

প্রথম প্রথম একটু আধটু প্রতিকার বা প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টা করত অরুণ। যুক্তি দিয়ে, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে,—কখনও বা অনুনয় বিনয় করে ওদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করত সে। কিন্তু একেবারেই সে সব চেষ্টা বৃথা দেখে ক্রমশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। এ তার শক্তির বাইরে। জ্ঞান হবার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্ত দুর্দশায় ও পরানুগ্রহে কাটাবার ফলে ওর মনের মেরুদণ্ডই গেছে ভেঙ্গে। কোথাও কোন কারণে সামান্যমাত্র অধিকার কায়েম করা—এমন কি দাবি করারও শক্তি নেই আর। ওদের এইসব টিটকিরির যোগ্য উত্তর মনে এলেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে পারে না। বিনা কারণেই সকলের কাছে সর্বদা যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই এদের এই অর্থহীন আক্রোশ এবং ইতর ব্যবহারের কোন রকম প্রতিরোধ করার কথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, মাটির দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে বসে থাকে শুধু। খুব অসহ্য হলে একবার হয়ত চোখ তুলে অসহায়ভাবে করুণ মিনতির দৃষ্টিতে চায়—কিন্তু সে চাহনির অর্থ অপরে পড়ে আরও নিষ্ঠুর কৌতুকেরই সৃষ্টি করে, ফল কিছু হয় না।

শুধু একটা দিকে কিছু শক্তি তার এখনও প্রকাশ পায়—সেটা আত্মদমনের ক্ষেত্রে। নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই চোখের জলটাকেও সে শাসন করতে পারে এখনও। ক্ষোভে দুঃখে—প্রতিকারহীন অবিচারে যখন তার বুক ভেঙ্গে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় তখন—তার এই অবস্থায় একমাত্র সান্ত্বনা যে অশ্রুকে সে প্রাণপণ চেষ্টায় ফিরিয়েই দেয়—বাইরে তার একটি বিন্দুও প্রকাশ পায় না। এদের অকরুণ বিদ্রূপ-দৃষ্টির সামনে সে জল যে এতটুকু সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারবে না—বরং নবতর অত্যাচারেরই ইন্ধন যোগাবে তা সে জানে।

প্রতিকার যাঁরা করতে পারতেন—কর্তা বা গিন্নীরা-তাঁদের গোচরে এটা-অন্তত এতটা কখনই হয় না। মুখ ফুটে এসব কথা তাঁদের কাছে গিয়ে বলা বা নালিশ করা অরুণের সাধ্যের বাইরে। তাই তাঁরা কেউ জানতেও পারেন না। এক কিছুটা জানে মহাশ্বেতা—তাও সবটা নয়। এতটা জানলে হয়ত সেও প্রতিবাদ করত। তার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ মন এতখানি বরদাস্ত করতে পারত না। সবটা জানে না বলেই বরং মনে মনে সে একটু উৎফুল্ল হয়। কারণ ওরও একটা অব্যক্ত নালিশ আছে অরুণ সম্বন্ধে। ওর ছেলেদের যে আদৌ লেখাপড়া হল না, সেজন্যে বিচিত্র মানসিক কারণে অরুণকেই দায়ী মনে হয় তার। তারও মনে হয়, অরুণের এই বিদ্যানুরাগটা অহরহ তার ছেলেদের মূর্খতাকে ধিক্কার দিচ্ছে আর সকলের কাছে ছোট ক’রে দিচ্ছে তাদের।

অরুণ যদি তার নিজের মাসীকেও এটা জানাতে পারত কি তার কাছে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করত তাহলে কি ফল হ’ত তা বলা কঠিন। কিন্তু একেবারেই চুপ করে থাকার ফলে প্রতিকার কি প্রতিবিধানের কোন আশাই থাকে না। এক এক সময় তার এতদিনের এত ঘা-খাওয়া মনও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। মনে হয় সে বুঝি পৃথিবীতে আসার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে দু-হাত ভরে শুধু অন্ধকারের অভিশাপই চেয়ে এনেছে এ জন্মের পাথেয়—তার জীবনে তাই আলোকের আশীর্বাদ কখনই নামবে না।

তবু, ওর এই বর্তমান জীবনের আদি-অন্তহীন অন্ধকারে একটি স্বর্ণালোক-রেখা ছিল বৈকি।

আলোক রেখা না বলে হয়ত তাকে আলোক দূতী বলাই উচিত। অন্তত অরুণের তাই মনে হয় মাঝে মাঝে। নিঃসীম অন্ধকার সে যেন আলোকশিখা বয়ে এনে হাজির হয়। আর আসে সে আপনা থেকেই, না ডাকতে।

সে হ’ল খুঁচি—মহাশ্বেতার মেয়ে স্বর্ণলতা।

সেই প্রথম দিনটি থেকেই সে ওর সহায়। ওর বন্ধু।

সে-ই মেজকাকীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছে, সেই মেজকাকাকে দিয়ে ওর পড়ার বই আনিয়ে দিয়েছে। দিনকতক তাকেও লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল অরুণ, বই খাতা সুমুখ টেনে বসাত রোজ—কিন্তু বেশীদিন সে চেষ্টা ওর ধাতে সয়নি। দিনকতক পরেই হাঁপিয়ে উঠেছে, বলেছে, ‘না বাপু, রক্ষে করো, এ আমার দ্বারা হবে না। মা সরস্বতী কি সকলের সয়? সয় না। পড়তে গেলেই মাথার মধ্যে সব যেন গুলিয়ে যায়। তারচেয়ে আমার হাঁড়ি-বেড়িই ভাল। তুমি আর ও চেষ্টা করোনি। মিছিমিছি তোমার সময় অপচো। আমাদের বংশে লেখাপড়ার পাট নেই, তুমি চেষ্টা করলে কি হবে বল! বলি, হ’লে তো আমার ভেয়েদেরই আগে হবার কথা গা? ওরা তো বেটাছেলে। তা ওদেরই কি হ’ল?’

সত্যি-সত্যিই, হাঁড়ি-বেড়ি নিয়েই থাকতে ভালবাসে সে। আর সে-ই হয়েছে অরুণের মুস্কিল। রান্নাঘরের বাইরে কোথাও তার টিকি দেখাই যায় না। কদাচিত এঘর-ওঘর আসা-যাওয়ার পথে হঠাৎ যদি নজরে পড়ে যায় তার ভাইদের কাণ্ড—তখনই ছুটে আসে সে। চোখমুখ গরম করে ভুরু কুঁচকে গুরুজনদের মতোই তিরস্কার করে, ‘আবার তোমরা ওর পেছনে লেগেছ? লজ্জা করে না তোমাদের! নিজেদের সবকটি ন্যাজই তো কেটে বসে আছ, এখন ওরটা না কাটতে পারলে, মুখ্যুর খাতায় নামটা না তুলতে

পারলে—দেখি ঘরটার সোয়াস্তি হচ্ছে না। কেন, কী জন্যে এখানে এসেছ তোমরা—কী দরকার? সরে পড়ো, সরে পড়ো বলছি সব—সোজা ঐ গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকো, তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করার মতো ভাম-ভোঁদড় বেস্তর মিলবে!'

রাগ হবারই কথা, হয়ও। যদি কাছাকাছি প্রতিবেশীদের মধ্যে মেজকাকা বা মেজকাকী না থাকে তো সাহস করে কেউ বলেও বসে, 'দ্যাখ, মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি। বেশ করেছি এখানে এয়েছি। আমাদের খুশি এখানে থাকব। কী হয়েছে কি তাতে? হুঁ—উনি লেখা-পড়া করছেন বলে আমরা সবাই দিনরাত মুখে গো দিয়ে থাকব—না? ভারী আমার এলে বিয়ে পাসের পড়া পড়ছেন যে!'

'বলি এলে বিয়ে না হয় না-ই হল—ও যে টুকুন পড়ছে তাও তো তোমাদের

কারুর সাধ্যিতে কুলোল না। লেখাপড়ার মহিমে তোমরা কি বুঝবে—গো মুখ্যুর দল!'

'দ্যাখ্ বুঁচি—' কেউ হয়ত জোর ক'রে একটু ধমকের সুর গলায় আনবার চেষ্টা করত কিন্তু সুচনাতেই তার সে প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটিয়ে হাত-পা নেড়ে চোখমুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বুঁচি উত্তর দিত, 'হ্যাঁ—দেখেছি দেখেছি, খুব দেখেছি। যাও না, মেজকাকাকে গিয়ে বল না যে তোমাদের আমি গোমুখ্যু বলেছি—জবাবটা সে ব্যক্তি কি দেয় শুনে এসো না। যাবে? দ্যাখো—যদি একা যেতে ভরসায় না কুলোয় তো না হয় আমার সঙ্গেই চল, আমি নে যাচ্ছি।'

তারপরই আবার ভ্রূ কুঁচকে দস্তুর-মতো ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে বলত, 'কী তোমরা ভালয় ভালয় যাবে এখান থেকে—না আমিই গিয়ে মেজকাকাকে বলব?'

এর পর আর কারুরই সাহস হ'ত না সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। যেন কিছুই হয়নি, যেন তাদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই, বুঁচির কথাটা তারা কানেও তোলেনি ভাল ক'রে—মুখের ওপর প্রাণ-পণে এমনি একটা নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে করতে একে একে তারা সবাই সরে পড়ত। তারা নিজেদের মর্জী মতোই যাচ্ছে যেন—অপর কারও হুকুমে নয়, এইটেই প্রতি-পন্ন করতে চাইত তারা; কিন্তু পিছনে স্বর্ণের সবিদ্রুপ হাসি তাদের আত্ম-সম্মানের সেই আগ্রয়টুকুও রাখতে দিত না শেষ পর্যন্ত।

আর ওর ঐ আশ্চর্য শক্তি দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকত না অরুণের।

ঐতোটুকু মেয়ে—বয়সের তুলনাতেও অনেক ছোট দেখায় ওকে—কিন্তু কী অনায়াসেই না এদের শাসন করে সে—এই অর্ধ-বর্বর বড় বড় ভাইদের! কোথা থেকে এই শক্তি এই গাম্ভীর্য আসে ওর?

ওরা সবাই চলে গেলে বহুক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে সেই কথাটাই ভাবত সে বসে বসে।

অবশ্য ঠিক তখনই সময় মিলত না কোন কিছু ভাববার।

ওরা চলে গেলে অরুণকে নিয়ে পড়ত স্বর্ণ।

'আচ্ছা, তুমি কী বল তো? বিধাতা কী দিয়ে গড়েছে তোমাকে? এতটুকু হায়াপিত্তি বলে কিছু থাকতে নেই তোমার? ঠায় বসে বসে এই বাঁদরামো সহ্যি কর কি করে? একটু বকতে পার না ওদের, একটু চোখ রাঙাতে পার না?'

ওকে দেখলেই—কে জানে কেন—অরুণ যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠত, তার চিরদিনের বোবামুখেও হাসি ফুটত। হয়ত হেসে বলত, 'চোখ রাঙানো কি সব চোখে মানায়? ওর জন্যে ভগবান আলাদা রকমের চোখ দিয়ে পাঠান যে!'

কপট ক্রোধে চোখ মুখ রাঙা ক'রে উত্তর দিত বুঁচি। 'কেন বল তো যখন-

তখন আমার কটা চোখের খোঁটা দাও! বেশ বেশ! আমার চোখ কটা আছে আমারই আছে—তোমার তাতে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ হয়ে পড়ত অরুণ। সত্যিই বুঁচির যেমন মেমেদের মতো সাদা রঙ, তেমনি তাদেরই মতো চোখ কটা। কিন্তু অত ভেবে কিছু বলেনি অরুণ, কটা চোখের কথা মনেও ছিল না তার। থাকলে কখনই বলত না। আসলে স্বর্ণের চেহারা নিয়ে কোন দিনই মাথা ঘামায়নি সে। ওর মুখচোখ কেমন তা খোঁজহয় খুঁটিয়ে দেখেও নি।

ঘাড় হেঁট ক'রে তাড়াতাড়ি জবাব দিত, 'না না—বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি সে ভাবে কথাটা বলিনি। তুমি কিছু মনে ক'রো না। আর কোন দিন বলব না তোমার চোখের কথা!'

গম্ভীরভাবে বুঁচি বলত, 'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। আর কোনদিন বলোনি।'

তারপরই—অরুণকে চমকিত ও চমৎ-কৃত ক'রে উচ্ছ্বসিত হাসিতে লুটিয়ে পড়ত সে, 'ধন্যি, বাবা ধন্যি। ধন্যি ছেলে বটে তুমি যা হোক! বেটাছেলে মানুষ, একটুতে এমন আউতে পড় কেন? কটা চোখকে কটা বলে ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি? সকলেই তো করে? বেশ করেছি—

একটু বকতে পার না ওদের, একটু চোখ রাঙাতে পার না?...

বলেছি—এ বাক্যি কি তোমার মুখে বেরোয় না?'

সে হাসি সংক্রামক রোগের মতোই অরুণের মনেও সঞ্চারিত হয়। সে-ও হাসে। অল্প-অল্প, অপ্রতিভের হাসি। সুখের হাসিও। স্বর্ণের এ কথা তার মনে কোন বেদনাবোধ জাগায় না, কোন গ্লানি আনে না। বরং একটা আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনার, একটা আশ্বাসের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় যেন ওর মনের সুগভীর ক্ষতগুলোয়। মনে হয়, কোন কঠিন রোগ-ভোগের পর যেন বলকারক পথ্য লাভ

করেছে সে, সঞ্জীবনী সালসা সেবন করেছে।

অবশ্য কথা সে বলতে পারে না কিছু। এসব কথা জানাবার শক্তি বা সাহস তার কাছে কল্পনাতীত। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু স্বর্ণেরই বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা আদায় করার অবসর কই? সে যেমন ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে আসে তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবেই চলে যায়।

আর সে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ভাবে অরুণ, মেয়েটাকে যদি একটু লেখাপড়া শেখানো যেত তো বেশ হত। কত কী জানবার আছে পৃথিবীতে, কত কী দেখবার আছে—তার কোন খবরই রাখল না। শুধু হাঁড়ি-বেড়ি আর সংসারের কাজে কী যে রস পায় ও।

(ক্রমশ)

চারু ও কারুশিল্পের দুটি প্রদর্শনী

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় দুটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। এর একটি শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের চিত্র-প্রদর্শনী, অন্যটি শ্রীযুক্ত আশীষ জানা ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী জানার বৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল মৃৎ-শিল্পের প্রদর্শনী। চিত্র-প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে এবং মৃৎ-শিল্পের প্রদর্শনীটি চলছে আর্টিস্ট্রি হাউসে। জানুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহের প্রথম দিকেই উভয় প্রদর্শনী শেষ হবে।

শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের চিত্র-প্রদর্শনী

আর্টস এণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের একক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ২৬ খানি চিত্র। শিল্পী যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে শিল্প-সাধনায় রত এই প্রদর্শনী দেখে তা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নিখিলবাবুকে বিমূর্তবাদী শিল্পী বলার চেয়ে বাস্তবধর্মী শিল্পী বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, শিল্পীর দৃষ্টিতে সমসাময়িক বাস্তব-জীবনের অনেক ঘটনাই ধরা পড়েছে। কিন্তু নিখিলবাবুর বৈশিষ্ট্য হল চিত্র-রচনার সময় তিনি

কলারসিক

কোন নাটকীয় কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা না করে চিত্র-পটে শিল্প-চেতনার অন্তরের উপলব্ধিকে রঙে আর রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সমস্ত চিত্র জুড়েই এক গতিময় আবেগ বলিষ্ঠ রেখায় বিধৃত। এখানে শিল্পী অন্যান্য অনেক
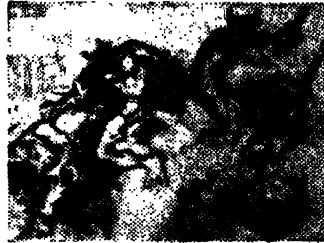
শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

আধুনিক শিল্পীর মত চ্যাপ্টা রঙ ব্যবহার না করে চিত্রের জমিনে রেখার বাঁধনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এবং আমার ধারণা, যে রৈখিক-চেতনা ভারতীয় শিল্পধারার অন্যতম অঙ্গ, শিল্পী বিশ্বাস সেই রৈখিক-চেতনাকে আধুনিক যুগের আধুনিক মনের উপযোগী করে আধুনিক শিল্প-বক্তব্যে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। তাঁর এই প্রয়োগনৈপুণ্য অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে, এ-কথা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীর চিত্র বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণিত হবে। অশ্বের প্রতি শিল্পীর অনুরাগ অন্ততঃ কয়েকখানি চিত্রেই উপস্থিত। এর কারণ অন্য কিছু নয়। অশ্বের গতিময়তা রেখায় বিধৃত করা যাবে বলেই শিল্পীর দৃষ্টি অশ্বের প্রতি নিবদ্ধ। তেমনি 'যুদ্ধ' সিরিজের ১৯ খানি চিত্রাঙ্কনেও শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে সৈনিকের উদ্দাম গতিবেগ, বলিষ্ঠ পেশী আর আবেগময় মুহূর্ত। সুতরাং বলা যায়, শিল্পী বিশ্বাস তাঁর চিত্রে এক গতির আবেগ সৃষ্টি করতেই প্রয়াস পেয়েছেন।

শিল্পীর হাতে রেখার-বিন্যাস কত সুন্দর হতে পারে তার প্রমাণ ৫নং স্কেচ ও 'যুদ্ধ' সিরিজের ১৮নং চিত্র দুখানি। শুধু কালি-কলমে রেখার পরে রেখার জাল বিস্তার করে এক চমৎকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছে এই দুখানি চিত্রে। এ-ছাড়া টেম্পারায় অঙ্কিত 'অশ্ব' (১) 'বল্গাহীন অশ্ব' (১০) ও 'স্থানান্তর'

(১৪) চিত্রের কম্পোজিশান, রঙ ব্যবহার এবং ছন্দিত রেখা নিঃসন্দেহে শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক।* 'খনি শ্রমিক' (৮) নামক চিত্রখানি মাত্র জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত। এখানেও চিত্রের নীল রেখা বেশ বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত।

'যুদ্ধ' সিরিজের একখানি চিত্র বাদে (১৯নং) অন্য দশখানি চিত্রই অয়েল-চারকোলে অঙ্কিত। চীন-ভারত যুদ্ধের অনেক আগেই শিল্পী এগুলির পরিকল্পনা করেন। কারণ সৈনিক-জীবনের উন্দামতা, যুদ্ধের তান্ডব, শিল্পীর রৈখিক-চেতনাকে আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি আমাদের আরো ভাল লেগেছে।

শিল্পী বিশ্বাসের অনেক গুণ। কাউকে অনুকরণ না করে এই অনুসন্ধান সত্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু শিল্পীর কিছু চিত্রের সংস্থাপন, ঘনত্ব ও দূরত্ব-বোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা এখনও বর্তমান। এগুলি বিদূরিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর জন্য আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম।

।। মৃৎশিল্পের প্রদর্শনী ।।

শিল্পী আশীষ জানা এবং শ্রীমতী জানা মৃৎশিল্প নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে বাঙলার গঙ্গামাটি বা লালমাটিকে পুড়িয়ে তাকে রসায়ন প্রয়োগে উজ্জ্বলতা দান—তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম কাজ। আর এ-কাজে যে তাঁরা সার্থক হয়েছেন তার প্রমাণ এবার উপস্থিত করেছেন আর্টিস্ট্রি হাউসের প্রদর্শনীতে।

বেঙ্গল সিরামিক ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই শিল্পীদম্পতি বাঙলার এক লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে নতুন যুগের উপযোগী শিল্প-সুষমায় উদ্ভাসিত করেছেন। মৃৎপাত্র বাঙলার স্মরণাতীত কালের সৃষ্টি। কিন্তু একে চাকচিক্যময় এবং শিল্পসম্মত করার কাজ বেশী দিনের নয়। সিরামিক ইনস্টিটিউট এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ হলেও শ্রী জানা ও শ্রীমতী জানাও তাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। এঁরা মৃৎশিল্পে নানা রঙ প্রয়োগে বিভিন্ন উত্তাপে ভিন্ন ভিন্ন

শিল্পী : আশীষ জানা ও শ্রীমতী জানা

এফেক্ট সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজগুলি দেখলে কিছুতেই মনে হবে না যে এগুলি লালমাটির শিল্পদ্রব্য। তাছাড়া তাঁদের শিল্প-চেতনাও যে বলিষ্ঠ তা এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত নানা মূর্তি এবং পাত্রের গঠনভঙ্গির মধ্যে পরিস্ফুট। বিশেষ করে 'গোপন কথা', ক্ষ্যাপা ষাঁড়, কালো বিড়াল, বংশীধারী, সূর্য-স্নান, বিমর্ষ নারী কিংবা প্রতীক্ষারতা প্রভৃতি মূর্তিতে বিভিন্ন অক্সাইড প্রয়োগে যে ভিন্ন ভিন্ন এফেক্ট সৃষ্টি করা হয়েছে তা মণ্ডন-শিল্পের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। তেমনি মৃৎপাত্রেরও নানা গঠনভঙ্গি ও নানা এফেক্ট অনায়াসে আমাদের মুগ্ধ করতে পারে। দীপাধাররূপে যে 'ইতালীয় বোতল' সৃষ্টি করা হয়েছে তার গায়ে এমন এক আস্তরণ এমন রঙে ফুটে উঠেছে যা দেখলে ঠিক খড়ের মত মনে হবে।

শিল্পী দম্পতির স্টুডিওতে শিক্ষার্থী কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর যে নিদর্শন প্রদর্শনীতে ছিল তাও উপেক্ষা করার মত নয়। এদের মধ্যে শ্রীমতী ইভেলীন বাইভোয়েট, মমতাজ হিরজী নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। আশা করি শিল্পী-দম্পতির এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকবে এবং সরকার এইসব মৃৎশিল্প বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

॥ কলম্বো দৌত্য ॥

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক পিকিং হতে নয়াদিল্লী এসেছিলেন কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত-চীন বিরোধের নিষ্পত্তির উপায় অনুসন্ধানে। পিকিংএ চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে আলোচনাকালে শ্রীমতী বন্দরনায়েককে সাহায্য করতে এসেছিলেন কলম্বো সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও। নয়াদিল্লীতেও শ্রীমতী বন্দরনায়েককে অনুরূপভাবে সাহায্য করতে এসেছিলেন মিশরের প্রধানমন্ত্রী আলি সাবরি ও ঘানার আইনমন্ত্রী ওফরি আট্টা। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে আসার আগে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে যুক্তবিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, চীন সহানুভূতির সঙ্গেই কলম্বো প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। এই উক্তিটুকু ভারতের পক্ষে খুব স্বস্তিকর ছিলনা, কারণ নীতিবোধহীন আক্রমণকারী চীনের পক্ষে যে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য আক্রান্ত ভারতের পক্ষে তা সমভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নয়াদিল্লীর আলোচনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলেই সংবাদ পাওয়া গেছে। বিরোধের সম্মানজনক মীমাংসার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে যেসব রাষ্ট্রনায়করা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই হৃষ্টচিত্তে ও কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে মীমাংসার আশা নিয়ে নয়াদিল্লী ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্মানজনক মীমাংসার উদ্দেশ্যে কলম্বো দৌত্যের প্রয়াসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের প্রস্তাবটি তিনি সংসদের আগামী অধিবেশনের বিবেচনার্থে পেশ করবেন এবং সংসদের অনুমোদন লাভ করলেই তিনি সেইমত অগ্রসর হবেন। ইতিমধ্যে কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী আলোচনা ও ঐসব প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব চূড়ান্তভাবে স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

কলম্বো প্রস্তাবের বিষয়বস্তু এখনও অজ্ঞাত। তবে ভারত সরকারের পক্ষ হতে এটুকু বলা হয়েছে যে, কলম্বো প্রস্তাব ও তার ব্যাখ্যায় এই নীতিই স্থান পেয়েছে যে, চীনারা তাদের সর্বশেষ আক্রমণে ভারতের যেসব ভূমি দখল করেছে তা তাদের মীমাংসা আলোচনা শুরু করার পূর্বে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে যেতে হবে। অর্থাৎ, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের পর হতে অধিকৃত সমগ্র ভারতভূমি চীনারা ত্যাগ করলে তবে ভারত তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে বলে ভারত যে দাবী জানিয়েছিল, কলম্বো প্রস্তাবে মোটামুটিভাবে সেই দাবীকেই ন্যায়সঙ্গত মেনে নেওয়া হয়েছে। একথা যদি সত্য হয় তবে কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পক্ষ হতে চীনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে কোনই অসুবিধা হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে চীনের পক্ষ হতে বিভিন্ন সূত্রে যে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে আবার এ সন্দেহ ঘনীভূত হতে আরম্ভ করেছে যে, কলম্বো প্রস্তাবের প্রতি 'ইতিবাচক' মনোভাব প্রকাশ করে চীন ইতিপূর্বে যেসব কথা বলেছে সেও তার পূর্ববর্তী নীতিবোধহীন চালবাজীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। চীন সরকার এখন এইটাই বোঝাতে চাইছেন যে, কলম্বো প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেননি বলে একথা কেউ যেন মনে না করেন যে ঐ প্রস্তাবটি তাঁরা সর্তহীনভাবে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন।—আসলে ভারতের মনোভাব ঠিকমত না জানা পর্যন্ত নিজেদের মনোভাব প্রকাশে বিরত থেকেছেন। কারণ প্রত্যাখ্যানটা যদি ভারতের পক্ষ হতেই আসে তবে তাঁরা একটা অবাঞ্ছিত কাজ করার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু ভারত যেভাবে প্রস্তাবটির প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখিয়েছে তাতে চীন সরকার বিব্রত না বোধ করে পারেন নি। সে কারণে কলম্বো দৌত্য হৃষ্টচিত্তে নয়াদিল্লী ত্যাগ করার পরেই চীনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে বিষোদ্গার শুরু হয়েছে। এ সম্বন্ধে গত ১৫ই জানুয়ারী চীনা সংবাদপত্র 'তা কুঙ পাও'-এ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে, ভারত যদি মনে করে থাকে যে, একমাত্র ভারতের সর্তেই সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব তবে একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, দিল্লীর সাম্প্রতিক আলোচনার ভিত্তিতে চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসার সম্ভাবনা খুবই কম।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, কলম্বো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রবর্গের অনুমোদন সাপেক্ষে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০শে জানুয়ারী কলম্বো প্রস্তাবাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে চান। মনে হয়, তারপূর্বেই এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও চীনের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে।

॥ অর্থহীন বিরোধ ॥

কমিউনিষ্ট চীনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মনোভাব পূর্ব জার্মানী কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে প্রকাশ্যভাবে চীনকে ভারত আক্রমণের জন্য নিন্দা করা হয়েছিল। এবার একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের নায়ক প্রকাশ্যে চীনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নিন্দা করলেন। পূর্ব জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা হের উলব্রিশ্‌ট পার্টি কংগ্রেসে ভাষণদানকালে সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভের উপস্থিতিতে চীনের সমালোচনা ক'রে বলেছেন, চীন-ভারত বিরোধ সম্পূর্ণ অহেতুক এবং অতি শীঘ্র তার মীমাংসাই পূর্ব জার্মানীর কাম্য। চীন এই বিরোধ শুরু করার আগে কোন কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে পরামর্শ করেননি বা কাউকে এ সম্বন্ধে কিছু জানায়নি। উলব্রিশট্ আরও বলেন, ভারতের সঙ্গে পূর্ব জার্মানীর যে মধুর সম্পর্ক রয়েছে তা পূর্ব জার্মানী অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়।

॥ পারিবারিক কলহ নয় ॥

পূর্ব জার্মানীর কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে চীন-সোভিয়েট বিরোধের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্তরটি দেশ হতে সমাগত প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রতিনিধির সম্মুখে পূর্ব জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা উলব্রিশ্‌ট বলেন, চীন-সোভিয়েট মতবিরোধ মোটেই পারিবারিক কলহ নয়, এটা আদর্শের বিরোধ। চীন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি অনুসরণ করুক এটাই তাঁদের ইচ্ছা, কিন্তু বর্তমান চীনের কমিউনিষ্ট নেতারা সেপথে চলতে রাজী নন।—পরিশেষে জার্মান কমিউনিষ্ট নেতা যখন সোভিয়েট অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান তখন সমবেত সাড়ে চার হাজার প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুশ্চেভের নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

পরদিন সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভ আরও স্পষ্টভাষায় এটা জানিয়ে দেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চলতে হ'লে অ্যালবানিয়া ও তার সমর্থক অর্থাৎ চীনকে বর্তমান নীতি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন কোন নীতি অনুসরণ করবে না যার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ বর্তমানে যুদ্ধ মানেই সর্ববিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধ। ক্রুশ্চেভ যখন চীনাদের 'কাগজের বাঘ' নীতির উল্লেখ করেন তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হাস্যরোলে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। অবশ্য চীনা প্রতিনিধিরা তার ব্যতিক্রম। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা উ-সিউ-চুয়ান, উলব্রিশট বা ক্রুশ্চেভ কারও অভিমতকেই সমর্থন জানাননি। কোন হর্ষধ্বনিতেই তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় মতবাদের লড়াই বর্তমানে যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে তাতে আর খুব বেশী-দিন বর্তমান বাহ্যিক ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

॥ কঙ্গো পরিস্থিতি ॥

এতদিনে সত্যই বোধহয় কঙ্গো সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাকামী নেতা শোম্বে এইবার রাষ্ট্রসংঘবাহিনীর প্রবল চাপ ও রাষ্ট্র-সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের দৃঢ় মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। গত ১৫ই জানুয়ারী কল-ওয়েজি হ'তে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি কঙ্গো হতে কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘোষণা করেছেন। ঐ বিবৃতিতেই তিনি তাঁর অনুগামীদের প্রতি অস্ত্র-সংবরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা অবিলম্বে কাতাঙ্গার রাজধানী এলিজা-বেথভিলে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং কঙ্গো-কাতাঙ্গার পুনঃসংযুক্তিতে উ থান্টের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। কঙ্গো হতে কাতাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার প্রয়াস এত-দিন বৃটেনের বিশেষ সমর্থন লাভ করে আসছিল একারণে কঙ্গো-কাতাঙ্গা মিলনের এই সর্বশেষ অধ্যায় স্থানীয় বৃটিশ দূতাবাসগুলির সম্মুখে কঙ্গোলী ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ তীব্র আকারে প্রকাশ পায়। শোম্বের এতদিনে সত্যই যদি সম্বিৎ ফি'রে থাকে এবং কঙ্গোর কলহ-বিবাদের অবসান হয়ে সত্যই যদি এবার সুসংহত ও সুশৃঙ্খল কঙ্গোর উদ্ভব হয় তবে আফ্রিকার রাজনীতি ও বৈষয়িক উন্নতিতে কঙ্গোর ভূমিকা হবে অদ্বিতীয়। কারণ শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈষয়িক উন্নতিতেও কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকায় কঙ্গোর স্থান সবার উপরে।

॥ টোগোয় অশান্তি ॥

ঠিক যে সময় আফ্রিকা হ'তে দীর্ঘ-স্থায়ী কঙ্গো-বিরোধের নিষ্পত্তির কথা প্রচারিত হল সেই সময়েই পশ্চিম আফ্রিকাস্থ অপর একটি ক্ষুদ্র সদ্যস্বাধীন দেশ টোগো হ'তে নতুন করে অশান্তির কথা প্রচারিত হ'ল। প্রাক্তন জার্মান ও ফরাসী উপনিবেশ টোগো স্বাধীনতা পায় ১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল। অতলা-ন্তিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী এই দেশটির আয়তন কুড়ি হাজার চার শত বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র বারো লক্ষ।

স্বাধীনতার দিন থেকেই টোগোর নেতা ছিলেন সিলভানুস ও লিম্পিও। প্রথমে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, পরে তিনি টোগোর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। টোগোর একটি অংশ ইতিপূর্বে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ঘানার অন্তর্ভুক্ত হয়, একারণে টোগোর অধিবাসীদের একাংশ অনেকদিন থেকেই ইউ ই উপজাতির সম্মিলনের দাবীতে ঘানার ঐ অংশটুকু ফিরে পাওয়ার দাবী জানাচ্ছিল। অপর-পক্ষে ঘানার নেতৃবর্গ টোগো স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব হতেই সমগ্র টোগো ঘানার অংশীভূত করার দাবী জানাচ্ছিলেন। তাই গত ১৩ই জানুয়ারী হঠাৎ টোগোর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় ও অভ্যুত্থান-কারীদের হাতে টোগোর প্রেসিডেন্ট ওলিম্পিও নিহত হওয়ায় অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে, এই সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ঘানার হাত আছে। কিন্তু ঘানার শাসকবর্গ তা বিশেষ জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী দৃষ্টেও মনে হয় যে এব্যাপারে ঘানার কোন হাত নেই। বিদ্রোহীরা টোগোর শাসন ক্ষমতা দখলের পর দুহোমে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছানির্বাসিত নিহত প্রেসিডেন্টের শ্যালক ও টোগোর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকোলাস গ্রানিৎ-সিকিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান ও তিনি সেই মুহূর্তেই সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে টোগোয় ফিরে এসে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর নিহত প্রেসিডেন্ট ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনেন তা সবই ঘরোয়া অভিযোগ, পররাষ্ট্র নীতি পরি-বর্তনের কোন কথা তাতে নেই। অবস্থা পর্যবেক্ষণে মনে হয়, টোগোয় যা ঘটে গেল তা নিছকই ক্ষমতার লড়াই। আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র-গুলিতে সামরিক অভ্যুত্থান এই প্রথম ঘটল। বলা বাহুল্য, এইভাবে অতর্কিতে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস যদি কোন সূত্র হতে উৎসাহিত হয় তবে এশিয়ার মত আফ্রিকাতেও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

॥ ঘরে ॥

১০ই জানুয়ারী—২৫শে পৌষ ঃ পিকিং থেকে ফিরে শেষে কলম্বো সম্মেলনের (আফ্রো-এশীয় ছয় জাতির) প্রস্তাব লইয়া শ্রীমতী বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) দিল্লী উপস্থিতি—পালাম বিমানবন্দরে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত—ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) সহিত শ্রীমতী বন্দরনায়কের আলোচনায় সাহায্যার্থ ঘানার বিচারমন্ত্রী শ্রীকোফি আসান্তে ও করি-আট্টারও দিল্লী আগমন।

সারা ভারতে সোনা-রুপার বাজারে অচলাবস্থা—লেনদেন ও কেনাবেচা বন্ধ—সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশের প্রতিক্রিয়া।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার (২১শে নভেম্বর, ১৯৬২) পরও নেফার বিভিন্ন স্থানে চীনাদের গুলীচালনা—বন্দী করার পর ব্রিগেডিয়ার হোসিয়ার সিংকে হত্যার সংবাদ।

১১ই জানুয়ারী—২৬শে পৌষ ঃ প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে দিল্লীতে শ্রীনেহরু-শ্রীমতী বন্দরনায়ক আলোচনা (কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে) আরম্ভ—প্রথম দিনের আলোচনা শেষে সিংহলী প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ঃ আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী না হইলে সফরে আসিতাম না।

প্রখ্যাত শিল্পপতি লালা শ্রীরামের (৭৮) দিল্লীতে পরলোকগমন।

১২ই জানুয়ারী—২৭শে পৌষ ঃ কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে দিল্লীতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা—সিংহল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতীয় দলের বৈঠক।

দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত সফরাগত আরব প্রজাতন্ত্র নেতা মিঃ আলি সাবরির (আরব প্রজাতন্ত্রের শাসন পরিষদ সভাপতি) পৃথক বৈঠক—শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ।

সোনার বাজারে অচলাবস্থা অব্যাহত—কলিকাতা স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সভায় স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সংশোধনের দাবী।

১৩ই জানুয়ারী—২৮শে পৌষ ঃ শ্রীনেহরুর সহিত কলম্বো সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের (শ্রীমতী বন্দরনায়ক সমেত) দুইদিবসব্যাপী আলোচনার (দিল্লী) পর যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—পার্লামেন্টে আলোচনার পর ভারতের চূড়ান্ত অভিমত (কলম্বো প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কে) জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত।

১৪ই জানুয়ারী—২৯শে পৌষ ঃ মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে দেড় লক্ষ নরনারীর পুণ্যস্নান—লঞ্চ ও নৌকা বিভ্রাটে যাত্রীদের দুরবস্থা—প্রয়াগ সঙ্গমেও (এলাহাবাদ) লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর স্নান।

কলিকাতা মহানগরীতে বসন্ত রোগ মহামারী আকারে দেখা দিবার আশংকা—কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্বেগ।

১৫ই জানুয়ারী—১লা মাঘ ঃ সমগ্র দেশে (ভারত) দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবীর হোমগার্ড বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত—আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সরকারী জরুরী ব্যবস্থা—বিভিন্ন রাজ্যের নিকট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার।

'যুদ্ধ হউক কি না-ই হউক দেশের প্রতিরক্ষায় সর্বক্ষণ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি চাই'—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবনের দৃঢ় ঘোষণা।

আধ্যাত্মিকতা ও স্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিরোভাব স্মৃতি সভার (কলিকাতা) অনুষ্ঠান—বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি—সভাপতি ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক।

১৬ই জানুয়ারী—২রা মাঘ ঃ কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসায় দিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান বৈঠক আরম্ভ—ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং ও পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা ঃ মিঃ জেড এ ভুট্টো।

কঠিন বিতর্কের পর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল রাজ্য বিধানসভায় ভোটাধিক্যে গৃহীত।

॥ বাইরে ॥

১০ই জানুয়ারী—২৫শে পৌষ ঃ কাতাঙ্গার কলওয়েজি ও সাকানিয়া অভিমুখে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর অগ্রগতি—মিঃ শোম্বেকে (কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট) স্বগৃহে অন্তরীণ করার পর মুক্তিদান—যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কাতাঙ্গী সৈন্যদের প্রতি শোম্বের নির্দেশ।

চীনের সিনকিয়াং-এ সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ—চীন-সোভিয়েট সীমান্ত বিরোধের পরিণতি।

১১ই জানুয়ারী—২৬শে পৌষ ঃ পাকিস্তানের মধ্য দিয়া নেপালের বাণিজ্য চালনার উদ্যোগ—কাঠমাণ্ডুতে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত।

এলিজাবেথভিলের (কাতাঙ্গা) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর দ্বিমুখী অভিযান শুরু।

পাকিস্তান কর্তৃক সৌদী আরবকে অস্ত্র সরবরাহ—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক পাক্ সরকারের নিকট প্রতিবাদ।

১২ই জানুয়ারী—২৭শে পৌষ ঃ অব্যাহত অভিযানের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্তৃক সাকানিয়া (কাতাঙ্গা-রোডেশিয়া সীমান্তবর্তী) দখল—লিওপোল্ডভিলে সংবাদ ঘোষণা।

ইয়েমেনী প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধ-প্রস্তুতির আদেশ—প্রেসিডেণ্ট সাল্লাল কর্তৃক সৌদী আরবের রাজা সউদ ও জর্ডানের রাজা হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করার সঙ্কল্প।

১৩ই জানুয়ারী—২৮শে পৌষ ঃ পশ্চিম আফ্রিকার তোগো রাজ্যের (ফরাসী) সামরিক অভ্যুত্থান—মন্ত্রিবৃন্দ গ্রেপ্তার—আততায়ীর হস্তে প্রেসিডেণ্ট ডঃ অলিম্পিও নিহত।

হোটেলের খিড়কী দরজা দিয়া মিঃ শোম্বের (কাতাঙ্গা নেতা) পলায়ন—এনডোলা (উত্তর রোডেশিয়া) হইতে কলওয়েজিতে উপস্থিতি।

রংপুরে (পূর্ব পাকিস্তান) পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত—গভর্ণরের আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে গুরুতর হাঙ্গামা।

১৪ই জানুয়ারী—২৯শে পৌষ ঃ তোগোয় জরুরী অবস্থা ও কারফিউ জারী—বিদেশের সহিত রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

চীনের প্রগল্ভ ভারত আক্রমণে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি মর্মাহত—কংগ্রেসের (মার্কিণ) যুগ্ম অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষণ—কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্পর্কে সতর্কবাণী।

১৫ই জানুয়ারী—১লা মাঘ ঃ অবশেষে মিঃ শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট) মতি পরিবর্তন—কাতাঙ্গার স্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘোষণা—কঙ্গোর পুনঃ সংযুক্তিতে সাহায্য করার আশ্বাস দান।

সাধারণ বাজারের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হওয়ার জন্য বৃটেনের ব্যস্ততা—দ্য গল (ফরাসী প্রেসিডেণ্ট) প্রস্তাবিত সহযোগী সদস্য হইতে আপত্তি।

১৬ই জানুয়ারী—২রা মাঘ ঃ তোগোর বিপ্লব পরিষদ কর্তৃক তোগো রাজ্যে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা।

'কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব চীন পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই'—কায়রো-এ মিঃ আলি সাবরির ঘোষণা।

॥ সাহিত্যিকের সম্মান ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এ বছর কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচককে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্য ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক এবং বিশেষ সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীকে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পুলিনবিহারী সেন ও যোগেশচন্দ্র বাগলকে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ।

পরলোকে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

খ্যাতনামা নাট্য-সমালোচক ও আইন-জীবী ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গত

অজয়শঙ্কর

২০শে জানুয়ারী ৮৪ বৎসর বয়সে পর-লোকগমন করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, আবুল কালাম আজাদ ও সুভাষচন্দ্রের তিনি রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও নাট্যচর্চার প্রতিও তাঁর গভীর যোগ লক্ষ্য করা যায়। দেশ-বন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার নাট্য-সমালোচক ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে রাজ-নীতি হতে তাঁকে সরে আসতে দেখা যায়। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', 'ইন্ডিয়ান স্টেজ' নামক গ্রন্থে তিনি ভারতীয় নাট্য-মঞ্চের ওপর আলোচনা করেছেন এবং রোম থেকে প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ থিয়েটারে' ভারতীয় নাটক সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। তাছাড়া আরও বহু গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আত্মজীবনী রচনা শেষ করে-ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ রাজ্য সরকারের নৃত্য ও সঙ্গীত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের যোগ ছিল আন্তরিক।

আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ ।। (প্রবন্ধ সংগ্রহ) —অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা। কলিকাতা-১২।। দাম সাড়ে চার টাকা।

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার কয়েকখানি বিশিষ্ট প্রবন্ধ-পুস্তকের লেখক এবং খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। এই সংগ্রহে 'আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয়', 'ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস', 'সংস্কৃতি : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য', 'ঐতিহ্য : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য', 'বাংলা, বাঙালী : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' এই কয়েকটি প্রবন্ধ লেখকের বৈদগ্ধ্য এবং লিপিকুশলতার পরিচায়ক। সাহিত্যের ইতিহাসে মানুষের ভূমিকা অভিনব। সে এসেছে মানব-সত্তাকে বিলুপ্ত করে, সেই মানুষের পরিচয় আছে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য উপন্যাসে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসে। যে সব বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের রূপকারের নাম লেখক করেছেন তাঁদের রচনার বাক্যাংশ লেখকের মতে তড়িৎগতি (হয়ত shocking-এর প্রতিশব্দ), পাঠান্তে কিন্তু মানুষের শূন্যতায় পাঠককে সঙ্কু-চিত হতে হয়। অনেক ঔপন্যাসিক সঙ্কীর্ণ সীমায় জীবনকে আবদ্ধ রাখতে চান, আকর্ষণ সেখানে সীমিত। অধি-কাংশ বাংলা উপন্যাসের খণ্ডিত শিল্প-বোধ ও শিল্প-দায়িত্ব লেখককে ব্যথিত করেছে। তিনি তাই প্রকাশকের অনু-যোগ করেছেন যে, সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করছেন, এর জন্য তাঁদের শাস্তিভোগ করতে হবে। লেখকের এই প্রবন্ধটি অতিশয় মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে তিনি যে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন তার বিরাটত্ব বিচার করলে এ আলোচনাকে আংশিক বলা ভিন্ন উপায় নেই। প্রথম প্রশ্নটি নিয়েই একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব, আলোচ্য লেখক সেই ক্ষমতার অধিকারী, তাই তাঁকে এই বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করি। 'ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস' নামক প্রবন্ধটি এক হিসাবে প্রথম প্রবন্ধের পরিপূরক। 'সংস্কৃতি : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত, লেখক এক বিরাট বিষয়বস্তুর অবতারণা করে পরে বলেছেন সোনার ফসল ফলানো আমাদের সকল সাংস্কৃতিক কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তা যে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়জনিত অবস্থার প্রতি-ক্রিয়া এই বিষয়ে লেখক কিছু বলেননি, কিন্তু 'বাংলা, বাঙালী : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে লেখক তাঁর অসামান্য চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি এবং বিশ্লেষণ শুধু তথ্যনির্ভর নয় বাস্তবানুসারী। এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে লেখকের সুগভীর মানব-প্রেম ও মানবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল আশ্বাস আছে।

গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদভূষিত।

ভারত আত্মা রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র-দর্শন)—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ। সাধনা প্রকাশনী। ৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তত্ত্ব-দৃষ্টিকে গ্রহণ করে আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্র-দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা এবং ভারত-চিন্তা লেখককে এই মূল্যবান নিবন্ধ রচনায় উদ্যোগী করেছে। তিনি ভারত-আত্মার মহাপ্রকাশ, রবীন্দ্র কবি-মানসের দিব্যদৃষ্টি, চিন্তা, ঐক্যে শ্রীরাম-কৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, ভারতের আত্মিক সম্বোধি এই কয়টি প্রবন্ধে গভীর চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় দান করেছেন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ কালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এখন সেগুলি সম্পাদন করে সংকলিত করে লেখক রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের ধন্য-বাদার্হ হয়েছেন।

শ্বেত করবী—(গল্প)—রমাপতি বসু। ভারতবর্ষ। ১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, [illegible] টাকা।।

রমাপতি বসু উপন্যাস ও গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের আঙ্গিক ও

বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে, চমক আছে, হৃদয় আছে। সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যার কণ্টক পাঠককে উৎপীড়িত করে না। 'শ্বেত করবী' তাঁর রচিত ছোট গল্পের সাম্প্রতিক সংকলন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র শুচিশুভ্র শ্বেত করবী ক্ষত, বিক্ষত হয়েছে, ঝরে পড়েছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের দৈনন্দিন-জীবনে অতি বিচিত্রভাবে। লেখক অসাধারণ লিপিকুশলতায় অতি সূক্ষ্ম সূত্রে 'শ্বেত করবীর' কাহিনীগুলি বিধৃত করেছেন। গল্পগুলির মধ্যে 'টিপ', 'নতুন মানুষ', 'প্ল্যাটফর্ম' ও 'ইজ্জৎ' যে কোনো ভাষার সাহিত্যের গৌরব। সাময়িক ঘটনার পটভূমিতে রচিত হলেও কাহিনীগুলির আবেদন চিরকালিক। নিতাই দে অঙ্কিত প্রচ্ছদটি মনোরম।

বৈশাখী বসন্ত (উপন্যাস)—সুকন্যা।। প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী। ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।। দাম—পাঁচ টাকা।।

'সুকন্যা' এই ছদ্মনামধারিণী লেখিকার প্রথম উপন্যাস 'খড়ির লিখন' পাঠক এবং সমালোচক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল, সেই কারণে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৈশাখী বসন্ত' একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বলা যায়। লেখিকা এই উপন্যাসটিতে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের একটি ভাগ্যহীনা অশিক্ষিত তরুণীর জীবনের নিদারুণ বিয়োগান্তক কাহিনী বিধৃত করেছেন। এই শান্ত, সুশীলা সুন্দরী মেয়েটির দরিদ্র পরিবারে জন্ম, তার খেসারত দিতে গিয়ে লেখাপড়া হয়নি, বাল্যে বৃদ্ধ এক কাণ্ডজ্ঞানহীনের তৃতীয়া ভার্যার গৌরব অর্জন করে কয়েকমাসের মধ্যে বৈধব্যবরণ করতে হয়। দাদা-বৌদির সংসারে গঞ্জনা তার নিত্য পুরস্কার। জীবনে একদিন বাসন্তী হাওয়া এসে লেগেছিল কিন্তু নিয়তি কেন বাধাতে, রেখার সেজমামা মণিময় বোস আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সুযোগ বাড়ির চক্রান্তে সেদিন গ্রহণ করা যায়নি। তারপর জোয়ারের স্রোতে ভাসতে ভাসতে পল্লীগ্রামে সেবিকা হয়ে গিয়েছিল এই ভাগ্যহীনা, সেখান থেকে এক ধনী পরিবারের সাহায্যে একটা ভদ্রগোছের কাজ অর্থাৎ তাঁদের ছেলে মানুষ করার কাজ পাওয়া গেল। এইখানে থাকার সময় দেখা হল আর এক ভাগ্য-বিড়ম্বিত ধনী বাসুদেবের সঙ্গে। বাসুদেব সকলকে বিস্মিত করে জীবনসঙ্গিনী করল এই সামান্যা রমণীকে। আন্নাকালী ভাগ্যচক্রে অনীতা থেকে এতদিনে এ্যানী হল। কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে, বাসুদেব লোকটি যৌন-ব্যাধিতে জর্জর অতি বিচিত্র বিশ্বাসঘাতক, তথাপি অনীতা বাসুদেবের ব্যবহারে মুগ্ধ। এই ঐশ্বর্যের রাজসূয়ের মধ্যে হঠাৎ উদয় হল সেই পুরাতন প্রেমের নায়ক মণিময় বোস। সে অনীতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখায়, অনীতাও রাজী। জীবনটাকে সে ভোগ করতে চায়, যে জীবন তাকে বঞ্চনা করেছে বারবার, তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে এবার। এমন সময় বাসুদেব অসুস্থ হয়ে পড়ল, আবার বাধা পড়ল মণিময়ের সঙ্গে মিলনের। মেয়েরা আগে ঋণ শোধ করে না ভালোবাসে? লেখিকা এই লাইনটি লিখে উপন্যাস শেষ করেছেন। অনীতা চরিত্রের এই ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বৌদি, বিজলী, নিরঞ্জন, বাসুদেব ও কল্যাণী চরিত্রগুলি উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়। এই প্রতিভাশালিনী লেখিকাকে অভিনন্দন জানাই। মহিলারা বাংলা সাহিত্যে সংখ্যালঘু, তাঁদের মধ্যে একজন শক্তিশালী লেখিকার আবির্ভাব আনন্দ সংবাদ। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

শাশ্বতিক— (নাটক) কমল চট্টোপাধ্যায়।

কে থাকে কে যায়— (নাটক) অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাক প্রহরী—(নাটক) লক্ষণ চট্টোপাধ্যায়। অমর লাইব্রেরী, ৫৪।৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য প্রত্যেকখানি এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শাশ্বতিক একটি একাঙ্ক নাটক। এ নাটকের কাহিনী তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। অধ্যাপক হিমাদ্রিশেখর স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে অবশেষে একদিন যখন কাশীর গঙ্গার ঘাটে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তখনই তিনি শাশ্বতীর দেখা পান। ঘটনাচক্রে এই পিতৃপরিচয়হীনা মেয়েটিও তার একমাত্র অবলম্বন মায়ের মৃত্যুর পর কাশীর গঙ্গায় নিজেকে বিসর্জন দিতে গিয়েছিল। হিমাদ্রিশেখরের সেদিন আর আত্মহত্যা করা হয়নি। তিনি শাশ্বতীকে তাঁর গৃহে আশ্রয় দেন। তাকে অবলম্বন করেই তিনি যেন আবার বেঁচে ওঠেন। কিন্তু অকস্মাৎ হিমাদ্রিশেখরের ছাত্র অরিন্দম এসে এদের দুজনের শান্তির জীবনে আলোড়ন আনে। সে শাশ্বতীকে ভালোবাসে, তাকে বিবাহ করতে চায়। হিমাদ্রিশেখর প্রথমে শাশ্বতীকে হারাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু যৌবনের ধর্মকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। শাশ্বতী-অরিন্দমের মিলিত সংসারে তাঁর স্থানটিও নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ নাটকের কাহিনীতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তবে লেখকের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি নাটকটিকে অনায়াসে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন।

গ্রন্থখানির মূল্য আরও কম হওয়া উচিত।

বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের একাঙ্কের খুবই অভাব। খুব কম নাট্যকারই বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন। যদিও 'কে থাকে কোথায়' একাঙ্কটি নাট্যকারের মৌলিক রচনা নয়, তবুও এই অনতিপরীক্ষিত পথে পদক্ষেপের জন্য আমরা এই নবাগত নাট্যকারকে ধন্যবাদ জানাই। একাঙ্কটি পরশুরামের 'বটেশ্বরের অবদান' নামক রচনা অবলম্বনে লিখিত। এই একাঙ্কটিতে আসলে এক শ্রেণীর লেখকের স্বরূপই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রকেই স্বাভাবিক করে দেখাতে পেরেছেন। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

পরিশেষে, বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক পরশুরামের ছোটগল্পকে নাট্য-রূপায়িত করার জন্য নাট্যকারকে ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির মূল্য আরও কম হওয়া উচিত।

লেখক যদিও 'নির্বাক প্রহরী'কে 'একাঙ্ক হাসির নাটক' বলেছেন কিন্তু আসলে এ নাটকটিতে স্থূল ধরনের হাস্যরসই প্রশ্রয় পেয়েছে। এ নাটকের কাহিনী যত অসম্ভব আর আজগুবি ধরনের ঘটনায় ভরা।

কিছু শক্তিশালী নাট্যকারের ক্ষমতার গুণে বাংলা একাঙ্ক তার বাল্যদশা পার হয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমান নাটকটি পড়ে মনে হয় আমরা এখনও সেই প্রাথমিক স্তরেই আছি। লেখকের সংলাপ দুর্বল। হাস্যরস অনেক জায়গায় ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। একটি

[ল]েখকের মুখে তিনি যে কবিতাটি [শু]নিয়েছেন তা অপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশের আগে তাঁর আরও অনুশীলনের দরকার। গ্রন্থখানির মূল্যও অনেক বেশি মনে [হ]ল।

সরকার প্রসঙ্গে (রাষ্ট্র-বিজ্ঞান) জন সি ক্যালহুন রচিত গ্রন্থের অনিল-রঞ্জন গুহকৃত বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক সমাজ বিদ্যাভবন, ৩।১, নকরকোলে রোড, কলিকাতা-১৫। দাম এক টাকা।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান, সরকারের উৎপত্তি, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়মতান্ত্রিক সরকার, সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সুশাসনের লক্ষ্য, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আলোচিত। ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য এই গ্রন্থটি অনুবাদে অনুবাদক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তবে দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান গ্রন্থের মুদ্রণ মোটেই আশানুরূপ নয়।

নিমডালের ফুল— (কবিতা গ্রন্থ) শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ।। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি, রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা-২৬।

শিউলি ঝরার শব্দে—(কবিতা গ্রন্থ) শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য প্রকাশ, ২৯, রাজপুর বাঁশদ্রোনী। চব্বিশ পরগণা।

কবি শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিমডালের ফুল' এবং শান্তি লাহিড়ী'র 'শিউলি ঝরার শব্দে' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 'আকাশ মাটি' এবং 'কালিঘাটের পট' শান্তি লাহিড়ীর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ। কবি শংকরানন্দেরও কাব্যচর্চা দীর্ঘ সময়ের; 'অজ্ঞাতবাসে'র পর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষণীয়।

কিন্তু 'নিমডালের ফুল' বর্তমান কাব্যধারাকে কোন বিশেষ দিকে অগ্রবর্তী করেছে বলে মনে হয় না; তার চেয়ে বলা যায় প্রেম, শিল্প ও প্রকৃতি সম্পর্কে কবিহৃদয়ের মৌলিক আবেদনকে তা বিশেষভাবে দিক্‌চিহ্নিত করেছে; তাঁর কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ এবং বিষয়নিবিষ্টতায় চরিত্রপ্রধান। তাই বক্তব্যে তাঁর নিজের কণ্ঠই শোনা যায়; আর এই কণ্ঠস্বর কত গভীর, সংহত এবং বিশ্বাস-নির্ভর—

'দরজার চৌকাঠে আমি ছুঁয়ে রাখি
মন্ত্রের বিশ্বাস
যুগ্মতার দৃঢ়তায় এতক্ষণ
উজ্জ্বল আলোক—
কাল বিকেলের আগে মৃত্যু এসে
দাঁড়াবে না ঘরে।'.....

শংকরানন্দের মত শান্তি লাহিড়ীর কবিতাও কলরবহীন; হৃদয়বৃত্তির উত্থান-পতনও দুর্লক্ষ্য। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থেও ছন্দ সম্পর্কে কোন নৈপুণ্যের পরিচয় পাইনি। সব কবিতাগুলি মোটামুটি পয়ার বা প্রবহমান অসম অক্ষরমাত্রিকে লেখা। কবি শান্তি লাহিড়ীর হাত মিষ্টি এবং তিনি পাঠকদের একাধিক স্মরণযোগ্য প্রেমের কবিতা উপহার দিয়েছেন—

আমি হব বিষাদের ঘূর্ণিমাখা
ক্লান্ত জলস্রোত
—এপার ওপার বালি। দেখ ওই
সূর্যের প্রহর
তুমি আমি পাশাপাশি আলোকিত—
স্পষ্ট করে রাখি।

পরিশেষে বলা যায়, উভয় কবিই শব্দ সম্পর্কে যথেষ্ট সংযত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন; বাংলা কাব্যে শব্দ ফুরিয়ে গেছে বলে অশ্লীল শব্দের অকারণ চয়নে কবিতাকে নর্দমা করে তোলেন নি।

॥ ত্রুটি স্বীকার ॥

নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের, গোরক্ষপুর অধিবেশনের সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ পত্রযোগে 'সমকালীন সাহিত্য' বিভাগে প্রকাশিত গোরক্ষপুর অধিবেশন সংক্রান্ত আলোচনার কয়েকটি তথ্যগত ত্রুটী নির্দেশ করেছেন। যথা অধিবেশন ২৫শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অস্বীকৃতি জানান, তাই মূল সভাপতি হয়েছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিহারের মন্ত্রী গোবিন্দ সহায়। অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় হবে। আর মৈথিলিশরণ গুপ্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 'নিমন্ত্রণ স্বীকার' করেননি। আমরা এই ত্রুটীগুলির জন্য দুঃখিত, সম্মেলনে 'অমৃতে'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত তথ্যের উপর নির্ভর করে আলোচনাটি লিখিত হয়েছিল। কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় যদি 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁদের সংবাদাদি পাঠাতেন তাহলে হয়ত এই ত্রুটী নিবারণ করা সম্ভব হত। আমন্ত্রিতগণের সম্মতিলাভের পূর্বেই নাম বিজ্ঞাপিত হলে এই জাতীয় বিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

—অভয়ংকর

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

নবনাট্য আন্দোলনের স্বরূপ ঃ

মোহনবাগান রো থেকে প্রশান্তকুমার সরকার প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "গত কুড়ি বছর ধরে চলছে নবনাট্য আন্দোলন। ...... (এ সম্বন্ধে) যতগুলি লেখা পড়বার এবং বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে থেকে (অক্ষমতা বশতঃ হয়ত) বহু চেষ্টা করেও নবনাট্য আন্দোলনের আসল সংজ্ঞা উদ্ধার করতে পারিনি। ... নবনাট্য আন্দোলনের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?"

"অমৃত"-র ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় (৯ই জুন, ১৯৬১) প্রকাশিত "বর্তমান নাট্য আন্দোলন" শীর্ষক "আজকের কথা" পড়বার সুযোগ সরকার মহাশয়ের হয়েছিল কিনা জানি না। তাই তাঁর প্রশ্ন সম্বন্ধে আবার করে এই বিষয়ে দু'চার কথা বলতে হচ্ছে।

যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারা পৃথিবী কাঁপছে, ১৯৪১ সালে জাপান অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়েই তড়িৎ গতিতে এগিয়ে এসে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরের পতন ঘটিয়ে দিল, তখন ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের কয়েকজন দুশমন মিলে এই দেশে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল, তাতে পথে-ঘাটে কুকুর-বেড়ালের মত লোক মরেছিল অন্ততঃ ৫০ লক্ষ। 'মাগো, একটু ফ্যান দাও', বুভুক্ষুর এই কাতরধ্বনিতে এই সহর কলকাতার আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হাজারে হাজারে, লাখে-লাখে লোক গ্রামের মায়া ত্যাগ করে সহরের পথে পা বাড়িয়েছিল সমস্ত শালীনতা-বোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে। বাংলাদেশের নৈতিক মেরুদণ্ড সেই যে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, আজও তা জোড়া লাগেনি। ইংরাজী ১৯৪৩, বাংলা ১৩৫০ সালে বাংলাদেশে যেন একটা মন্বন্তর ঘটে গেল।

এই ৫০-এর মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখা রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করলেন বিজন ভট্টাচার্য লিখিত "নবান্ন"। যতদূর জানা আছে এর কর্ণধার ছিলেন সুধী প্রধান। শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্যের সহায়তায় তিনি যখন নাটকখানিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন, তখন নাট্যরসিক মহলে পড়ে গেল দারুণ শোরগোল। স্রেফ পাট দিয়ে তৈরী চটকে পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহার করে নেপথ্য থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্রোদ্ভূত আওয়াজের সহায়তায় মঞ্চের ওপর সমবেত অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ দেখিয়ে যে অভাবনীয় নাট্যমুহূর্ত ও রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল এই "নবান্ন" নাটকের অভিনয়ে, তা অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয়।

বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের সুরু এই "নবান্ন" নাট্যাভিনয় থেকেই। অবশ্য এর সুধী প্রধান প্রমুখ কর্মকর্তারা যদিও গণচেতনাকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই তখন অনুমান করতে পারেননি যে, বাংলাদেশে নতুন করে এক নাট্য-আন্দোলনের পূর্বসূরি রূপে তাঁরা চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, আজ কলকাতা সহরের পল্লীতে পল্লীতে, অফিসে-স্কুলে-কলেজে-ক্লাবে এবং মফঃস্বল সহরে, গ্রামে—সর্বত্র যেভাবে নতুন নাটক লেখা ও দল বেঁধে সেই নাটকের অভিনয় করার ধুম পড়ে গেছে, নবান্ন-পূর্ববর্তীকালে তা কেউ কখনো দেখেননি। আজ উত্তর কলকাতার চারটি পেশাদারী রঙ্গালয়ে প্রতি সপ্তাহে তাঁদের নিয়মিত চারটি অভিনয়ের সময়টুকু ছাড়া বাকী সব কটি দিনই সন্ধ্যায় এবং রবিবার সকালে কোনো না কোনো সম্প্রদায় দ্বারা অভিনয় হচ্ছেই এবং হচ্ছেই। এ ছাড়া মহাজাতি সদন, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল, মহারাষ্ট্র নিবাস, আশুতোষ কলেজ হল, রবীন্দ্র সরোবরের ইনডোর স্টেডিয়ম, হিন্দী হাইস্কুল, রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার প্রভৃতি যে-সব জায়গাতেই মঞ্চাভিনয়ের সুবিধা আছে, সেই সব জায়গাতেই বারো মাস, তিরিশ দিন একটা-না-একটা অভিনয় লেগেই আছে। ঠিক এই রকমই চলছে মফস্বলেও। বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, চন্দননগর প্রভৃতি জায়গা থেকে মঞ্চাভিনয়ের সংবাদ হামেশাই এসে পৌঁছোচ্ছে। এই যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই নাট্যচর্চা, এটা নিশ্চয়ই নাট্য আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট রূপ।

এই নাট্যচর্চার আর একটি যে বিশেষত্ব খুব বেশী করে নজরে পড়ে, সেটি হচ্ছে, এই সব অভিনয় মাত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়েই পর্যবসিত না হয়ে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি আঙ্গিকের প্রতিটি দিক দিয়েই একটি অভিনবত্ব প্রকাশে এবং সমস্ত জড়িয়ে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে একটি সম্পূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াসে যত্নবান। যুদ্ধপূর্বকালে সৌখীন, অপেশাদারী নাট্য সংস্থাগুলি নাট্যাভিনয় করতেন, কিন্তু নাট্য প্রযোজনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের অবিদিত ছিল। ●

আজ কলকাতা এবং মফস্বলেও পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার অন্ত নেই। যুদ্ধপূর্বকালে

মুক্তি প্রতীক্ষিত
দুই বাড়ী
চিত্রের
কয়েকটি দৃশ্য

এ বস্তুটির অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

এবং আজ আর শত শত নাট্যসংস্থা পেশাদারী মঞ্চকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে চলেন না; বরং পেশাদারী মঞ্চই তাঁদেরই অনুসরণ করে সময় সময় নিজেদের নতুন করে ঢেলে সাজতে যত্নবান হন।

নতুন নতুন নাটক লেখা, নতুন নতুন আঙ্গিকে অভিনয় ও প্রযোজনা করা, অভিনয়ের ব্যাপারে পেশাদারী মঞ্চকে আদৌ অনুসরণ না করা, ভূরিভূরি নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠা, বছরের ৩৬৫ দিনে কম করে ১০০টি অভিনয় অনুষ্ঠিত হওয়া, বেশ কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা চলা এবং সব শেষে বিভিন্ন প্রকাশক দ্বারা বহু একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হওয়া—এই সমস্ত মিলিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের একটা সংজ্ঞা পাওয়া যায় না কি?

ঘরোয়ার "তাসের দেশ" :

গেল রবিবার, ১৩ই জানুয়ারী রবীন্দ্র ভারতী ভবনে এক আনন্দমুখর পরিবেশে "ঘরোয়া" নামে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ রচিত 'তাসের দেশ' মঞ্চস্থ করেন। আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে এমন একটি প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনবত্বের দাবি রাখে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সকলেই এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। কিন্তু 'তাসের দেশ'-এর মত একখানি নাটককে মঞ্চস্থ করার মধ্যে যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার আবশ্যকতা আছে, এক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র অভাব ঘটেনি। রবীন্দ্রনাটের ব্যাকরণকে ব্যাহত না করে এঁদের এই প্রচেষ্টা মোটের ওপর সার্থকতা লাভ করেছে।

শিল্পভারতীর "বর্ণচোরা" :

বনফুলের একটি উপভোগ্য ব্যঙ্গ-নকসাকে অবলম্বন করে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় একটি রসোজ্জ্বল কৌতুকচিত্র উপহার দিচ্ছেন "বর্ণচোরা"র মাধ্যমে। সামাজিক বিধিনিষেধের অচলায়তনকে লঙ্ঘন করে যে-পুরুষসিংহ তার লক্ষ্যলাভে সাফল্য অর্জন করেছিল, সেই নায়কের ভূমিকাটিতে সার্থক রূপারোপ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। নায়িকারূপিণী সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে আছেন জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, রেণুকা রায়, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিটি পরিবেশনা করছেন সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

যোগেশ দত্ত-র মূকাভিনয় :

ইনস্টিটিউট অব কনটেম্পোরারি আর্টস-এর প্রযোজনায় সম্প্রতি বসুশ্রী সিনেমায় শিল্পী যোগেশ দত্ত এক মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত করেন। বেকার যুবক, অন্ধ ভিক্ষুক, আধুনিকা নারী, দুষ্টু ছেলে প্রভৃতি মোট দশটি নির্বাক আলেখ্য তিনি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। শেষেরটি শ্রীদত্তের ভূমিকালিপিতে নতুন সংযোজন। এই অনুষ্ঠানটিতে একটি বালকের আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে রথীন সরকারের আবহসঙ্গীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"চতুর্মুখ"-এর নতুন প্রয়াস :

কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা "চতুর্মুখ" জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি মহারাষ্ট্রের নাট্যআন্দোলন ও আনুষঙ্গিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে বোম্বাই-এ এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করবেন। ফেরার সময়ে এঁরা মধ্য-ভারতের ভাতখণ্ড নাট্যকলা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্যে রায়পুরে যাবেন। "চতুর্মুখ"-এর এই শিক্ষাসফর ভারত সরকারের সৌজন্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যোৎসব :

গেল রবিবার, ২০এ জানুয়ারী নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে "দক্ষিণী" শিক্ষায়তনের বার্ষিক নৃত্যোৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবের প্রথম ভাগে ছিল সাতখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও দশখানি কথাকলি, মণিপুরী ও ভরতনাট্যম্-এর ঢঙে নাচ এবং দ্বিতীয় ভাগে অভিনীত হয়েছিল "ভানুসিংহের পদাবলী" নৃত্যনাট্য। প্রথমেই প্রায় শিশুদের দ্বারা কথাকলি ভঙ্গীতে "পূজা" নৃত্য অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসবের হয় সূচনা। নৃত্যের মধ্যে বালিকাদের এই সুকুমার শিল্পের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হল এবং একক-নৃত্যে চন্দ্রিকা বসু, নন্দিতা রায় ও স্মিতি গুহঠাকুরতা ও দ্বৈতনৃত্যে মিত্রা গুহঠাকুরতা ও মালশ্রী প্রভৃতি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিও মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছিল। "ভানুসিংহের পদাবলী" নৃত্যনাট্যে দক্ষিণী সংস্থার ছাত্রীরা তাঁদের সুনামকে অক্ষুণ্ণ

রেখেছেন। বিভিন্ন নৃত্যশিল্পীর রূপসজ্জা ও আনুষঙ্গিক মঞ্চসজ্জা প্রশংসনীয়।

।। হাই হিল ।।

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত রাজীব পিকচার্সের অসাধারণ হাসির চিত্র "হাই হিল" সম্প্রতি সেন্সরের সার্টিফিকেট লাভ করেছে। খুব শীঘ্রই "হাই-হিল" শহরের বিশিষ্ট চিত্রগৃহে সমারোহে মুক্তিলাভ করবে। ফণী গাঙ্গুলীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন নবীন পরিচালক দিলীপ মিত্র। জনপ্রিয় সুরকার হেমন্তকুমারের সঙ্গীত পরিচালনায় ৬ খানি নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, ইলা বসু, অমল মুখার্জি ও সুরকার হেমন্ত মুখার্জি স্বয়ং। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শব্দগ্রহণে আছেন যথাক্রমে রঞ্জিত চ্যাটার্জি, অমিয় মুখার্জি ও জে ডি ইরানী। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ছবিটির প্রধান সম্পাদক। চরিত্রচিত্রণে আছেন অনিল চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা রায়, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, অজিত চ্যাটার্জি, শীতল ব্যানার্জি, মিন্টু চক্রবর্তী, তনু দত্ত, সৌরেন ব্যানার্জি, মাঃ দীপক, রেণুকা রায়, কুন্তলা চ্যাটার্জি। এ ছাড়া তিনটি বিশিষ্ট চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন স্বর্গত ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী এবং নবদ্বীপ হালদার। এই ছবিতেই নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস সর্বশেষ সুটিং করেছেন।

।। আগুন নিয়ে খেলা ।।

গত ১০ই জানুয়ারী বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব হলে শ্রীকালিপদ দে রচিত দেশাত্মবোধক নাটক "আগুন নিয়ে খেলা" সুভঙ্গী, বাটানগর লোকরঞ্জনী কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয় নৈপুণ্যে রাণী ব্যানার্জি, মাঃ মানবেন্দ্র, জহর গুহ এবং চিত্ত মুখার্জির অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অনিলকুমার খাঁ যেমন অভিনয়ে তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বরে সকলের মনোরঞ্জন করেছেন।

।। প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যকল্পে ।।

● আগামী ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার, সকাল ৯-৩০ মিঃ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যকল্পে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত রচিত "রক্তের আগে" নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন পঁচিশ সারথীর সজ্যবৃন্দ। নাটক নির্দেশনা করবেন শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (শঙ্কর)।

অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

এস্তোনীয় ভাষায় 'হ্যামলেট' ঃ

বাল্টিক সমুদ্রের তীরে এল্সিনোর-দুর্গপ্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে। এই প্রাসাদে ও তার পটভূমিকায় নির্মিত হবে সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট" নাটকের এস্তোনীয় ভাষায় চলচ্চিত্ররূপ। এস্তোনিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রাসাদ ও দুর্গকেও এজন্য ব্যবহার করা হবে। এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করবেন "সম্মানিত কলা-কর্মী" উপাধি-ভূষিত খ্যাতনামা চলচ্চিত্রস্রষ্টা গ্রিগরি কোজিন্তসেভ; হ্যামলেটের ও পোলোনিয়াস-এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন দুইজন অগ্রগণ্য এস্তোনীয় অভিনেতা ইনোকেন্তি স্মোকতুনোভ্স্কি ও ইউরি তোলুবেইয়েভ।

আস্ত্রাখান রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নাটক ঃ

ভোল্গা যেখানে ক্যাসপিয়ান সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, রুশ ফেডারেশনের দক্ষিণাংশের সেই অঞ্চলে আস্ত্রাখান এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। গত সপ্তাহে এখানকার শিশু-রঙ্গশালায় একটি ভারতীয় রূপকথা অবলম্বনে রচিত "চন্দ্রম কান্ড" নাটকটি নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে। আস্ত্রাখানের জনপ্রিয় নাট্যকার ইলোভাইস্কি এই ভারতীয় রূপকথাটিকে নাটকাকারে রূপায়িত করেছেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার দিন থেকে প্রতিদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা ঃ

ভারতে চীনা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কর-

বার জন্যে গেল নভেম্বর ১৯৬২ থেকে তিন মাসের জন্যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে নাটক, নৃত্য ও তর্জার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে ও মফস্বল শহরে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পর্যায়ের প্রথম নাটক 'আনন্দমঠ'-এর অভিনয় গেল নভেম্বর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ সাব-ডিভিশনে অন্ততঃ ৮বার, ডিসেম্বরে বালুরঘাট, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং চব্বিশ পরগণার অপরাপর অঞ্চলে ৪০ বার অভিনীত হয়েছে। মন্মথ রায় এবং সলিল সেন রচিত আরও দুখানি নাটক অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ'দের নৃত্যনাট্য 'দেশের ডাক'টি গেল ডিসেম্বরে মালদা, চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার কারখানা অঞ্চলে ২০ বার মঞ্চস্থ হয়েছে। তরজার দলটি নভেম্বরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণায় ১২ বার এবং ডিসেম্বরে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হাওড়ার দূর পল্লী অঞ্চলে ২০ বার তাঁদের আসর বসান।

জানুয়ারী মাসে এ'রা উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার স্কুল-কলেজ, চা-বাগান প্রভৃতিতে অনুষ্ঠান করবার জন্যে এ'দের জাতীয়-সঙ্গীত গাইয়ে এবং তরজার দলটিকে পাঠাচ্ছেন এবং তাঁরা কিছু নেপালী সঙ্গীত সমেত অন্ততঃ ৬০।৭০টি আসর বসাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ-ছাড়া 'দেশের ডাক' নৃত্যনাট্যটিকে হিন্দী গানের সহযোগিতায় হাওড়া, হুগলী এবং চব্বিশ পরগণার কলকারখানা অঞ্চলে পরিবেশনের ব্যবস্থাও করেছেন। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিকেরা বেশী পরিশ্রম দিয়ে কারখানায় উৎপাদনের হার বাড়িয়ে তুলবে। এ'দের নাটুকে দলটি বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়াতে অন্ততঃ ৩৫টি অনুষ্ঠান করবেন বলে প্রস্তুত হয়েছেন।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বর্ণচোরা' চিত্রে পিতা-পুত্রীর ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু ও সন্ধ্যা রায়

একটি অভিনয়ঃ

গত ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় শিল্পায়নের (নাট্যকলা কৃষ্টিকেন্দ্র) ওয়াই এম সি এ 'ওভারটুন' হলে সভ্যগণ তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠানে দুটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। তরুণ নাট্যকার শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই নাটক দু'টি রচিত।

'বাস স্টপ' কৌতুক নাটিকাটিতে সঙ্ঘের সভ্যগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। একমাত্র গোবিন্দের চরিত্রে শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও জনৈক বন্ধের (কালা) চরিত্রে শ্রীহীরক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

'অন্যাম্বর' নাটিকাটির অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন সভ্যগণ। বিশেষভাবে নায়িকা সোমার চরিত্রে সুজাতা মুখোপাধ্যায় ও দীপংকরের চরিত্রে শ্রীজয়ন্ত বসুর নিপুণ অভিনয় দর্শকহৃদয় সহজেই জয় করতে সক্ষম হন। শ্রীঅনিল দাস ও শ্রীনিখিল ভট্টাচার্য সুন্দর অভিনয় করেছেন। শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণ দাস, শ্রীমান দেবল ঘোষ ও মাস্টার দীপংকরের অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে শ্রীহীরক

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মণ্টু গুপ্ত, বিনোদ দে, শাশ্বতী ঘোষ, সাথী ঘোষের অভিনয়ও হৃদয়গ্রাহী।

॥ একটি চিঠি ॥

প্রিয় সাম্পাদক মহাশয়,

"অবশেষে" চিত্রটির সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনার রচনায় একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে যা আমাকে বিস্মিত করেছে।

যে নৃত্যনাটিকার অবতারণাকে একটি যাত্রাধর্মী অতি-প্রদর্শন বলে মনে করেছেন আমার ধারণা ওই দৃশ্যটির যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। ছেলেটির মনে যে প্রতিক্রিয়া যা আধুনিক জীবনের বিচ্ছেদের (অবশ্য দাম্পত্য-জীবনের) অবশ্যম্ভাবী ফল তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। হাল্কা ট্রিটমেন্টের স্বচ্ছন্দ গতির একটা ছেদ এবং কাহিনীর মূলমর্ম ঐ নৃত্যদৃশ্যটিতে যথেষ্ট প্রতিফলিত।

সামান্যতম ভুলে কিংবা ভুল বোঝাবুঝি আমাদের জীবনে কতটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে কিংবা দাঁড়াতে চলেছে তার প্রতীক হিসাবে "অবশেষে" চিত্রটির অনবদ্য আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

আপনি চিত্রটি রঙ্গকৌতুক হলে আরো খুশী হতেন বলে আভাষ দিয়েছেন। আপনার সমালোচক মনের এই অভিপ্রায়কে আমি একটি সুস্থ দৃষ্টিকোণ বলে নিতে পারলাম না। চিত্রটির মধ্যে বহু জায়গায় বহু দিন মনে রাখবার মতো জিনিষ আছে যা আপনার কলমে আসে নি। সন্তানকে দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যখন নষ্ট হলো—তারপর রমার বেরিয়ে আসার সময় যে অভিব্যক্তি অনেক বহুখ্যাত চিত্রেও তা হয়তো পাওয়া যাবে না বলে আমার মনে হয়। একটি আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষণের প্রচেষ্টায় মৃণালবাবু যে রত ছিলেন—'অবশেষে' চিত্রে তার যথেষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে।

সাম্প্রতিক অনেক ছবির মধ্যে একটি নতুন দিকের জানালা খুলে দেখার জন্য মৃণালবাবুর "অবশেষে"-কে যে অভিনন্দন আপনার জানানো উচিত ছিল আমার কাছে খুশিতে মনে হয় আপনি তা এড়িয়ে গেছেন।

শেষকালে একটি ছোট্ট কথা : রুদ্রের অভিনয় সম্পর্কে আপনি কোন উল্লেখ করেন নি। দর্শকের ভূমিকাটি ভালো লেগেছে। আশা করি আপনি 'অমৃত' পত্রিকায় আমার মন্তব্য প্রকাশ করবেন।

বিনীত
প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়,
গরিফা।

(উত্তর)

আমার সমালোচনা পত্রলেখককে খুশী করেনি, এর জন্যে দুঃখিত। আমার যেটা ভালো লাগে, সেটা আর একজনেরও যে ভালো লাগবে, এমন আশা আমি কখনই করি না।

ছেলেটির মনে প্রতিক্রিয়া জাগানোর প্রয়োজনকে অস্বীকার করি না; কারণ বরাবরই ছেলেটি বাপকে মায়ের থেকে বড়ো করে দেখেছে। কিন্তু এর যে নৃত্যনাটিকার আয়োজন করা হয়েছে, সেটি এমনই দীর্ঘায়িত ও দর্শক মনকে স্পর্শ করতে অক্ষম যে, প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজনকে নিরর্থক মনে করতে বাধ্য হয়েছি।

না, ছবিটি রঙ্গকৌতুকময় হলেই যে আনন্দ পেতুম, এমন কথা নয়। কিন্তু যখন আরম্ভই করা হয়েছে কৌতুক দিয়ে, তখন সেই ধারাটিই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং তা হয়নি বলেই ছবিটি আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।

হিন্দু সমাজে আজ বিবাহবিচ্ছেদ সরকারের কৃপায় আইনতঃ সচল। তাই "অবশেষে" চিত্রায়িত হতে পেরেছে; নইলে 'নতুন দিকের জানালা' খোলা সম্ভব হ'ত কি?

—সম্পাদক

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

সম্প্রতি চিত্রযুগের 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' ছবির বহির্দৃশ্য মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম, বিমলিপট্টম ও চিন্তাপল্লির অরণ্যগহনে গ্রহণ করে ফিরলেন পরিচালক গুরু বাগচী। রমাপদ চৌধুরী রচিত এ কাহিনীর বহির্দৃশ্যটি সম্পূর্ণ একমাসে শেষ হল। ঋত্বিক ঘটক এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, সিপ্রা মিত্র, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপা চট্টোপাধ্যায়, অমিত দে, বনানী চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি ও দিলীপ রায়। আলোকচিত্র পরিচালনা করেছেন অনিল গুপ্ত। এই বহির্দৃশ্যে ছবির দুটি গান

এইসঙ্গে গৃহীত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন মিতালী ফিল্মস্ সংস্থা।

বিবেকানন্দ জন্মশত বার্ষিকী লগ্নে স্বামীজির বাল্যজীবন-কাহিনী নিয়ে 'বিলে নরেন' ছবিটির পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাউন্ডেশন নামে একটি নবতম সংস্থা। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। ছবিটি পরিচালনা করবেন রবি বসু। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আশীষ খাঁ ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে আর একটি ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'-এর কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক মধু বসু। বর্তমানে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ক্যালকাটা মুভিটোনে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অমরেশ দাস। এ ছাড়া প্রধান চরিত্রে অংশ নিয়েছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী। সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচীর সুর-সংযোজনায় এ ছবির কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে। কন্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জীবন গাঙ্গুলী পরিচালিত 'দুই নারী' চিত্রে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

শীলা পিকচার্সের নতুন ছবি 'ফেলে আসা দিন', পরিচালনা করছেন শ্যামল মুখোপাধ্যায়। শৈলেশ দে রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা রায়, প্রণতি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু ও সুনীতা দত্ত।

বোম্বাই

পরিচালক মোহনকুমার প্রযোজক হয়েছেন। এম. কে. প্রোডাকসন্সের প্রথম

'মহাতীর্থ কালীঘাট' (আংশিক গেভাকলার) চিত্রের একটি দৃশ্যে শম্পা চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য ও নবাগত শংকর নারায়ণ
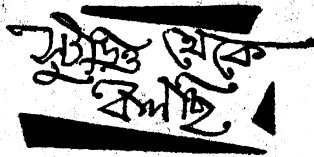
ছবি হবে 'আপ কী পরছাঁইয়া।' আগামী মাস থেকে ছবির কাজ শুরু করবেন পরিচালক, প্রযোজক ও কাহিনীকার মোহনকুমার। প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, ধর্মেন্দ্র, নাজির হুসেন, লীলা চিটনীস ও ওমপ্রকাশ। এই মাসের শেষেই ছবির সংগীত গ্রহণ করবেন সংগীত পরিচালক মদনমোহন। আলোকচিত্র ও শিল্প-নির্দেশনার ভার গ্রহণ করেছেন কে এইচ কাপাডিয়া ও সুধেন্দু রায়।

ইন্ডো-আমেরিকা কো-প্রোডাকসন্সের হিন্দী ও ইংরেজী ছবি; আর, কে, নারায়ণের রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'দি গাইড' আগামী মাস থেকে শুরু হচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে ছবিটি শেষ করবেন পরিচালক ডেনি লিউস্কি। মেহেবুব স্টুডিওয় ছবির চিত্রগ্রহণ গৃহীত হবে। বহির্দৃশ্যের স্থান মনোনীত হয়েছে দক্ষিণ ভারতে। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন দেবানন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান।

একটি মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি—'ইয়ে রাস্তে হ্যাঁয় পেয়ার কী'। ছবিটি পরিচালনা করছেন আর কে নাম্বার। সংগীত পরিচালক রবি। ছবির প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন অশোককুমার, সুনীল দত্ত, লীলা নাইডু, মতিলাল ও রেহমান। গত সপ্তাহে এ ছবির 'সেনসর' হয়েছে।

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওর রঙিন ছবি 'দিল দিয়া দরদ লিয়া'-র সংগীত ও কথক নৃত্যের কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করলেন পরিচালক-প্রযোজক এ আর কারদার। দুটি প্রণয়মধুর চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার ও ওয়াহিদা রেহমান। এ ছবির সংগীত পরিচালক নৌসাদ আলি।

মাদ্রাজ

প্রযোজক এস কৃষ্ণমূর্তি সম্প্রতি জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'স্বয়ংসিদ্ধা'-র হিন্দী চিত্ররূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নায়ক-নায়িকার জন্য মনোনীত হয়েছেন গুরু দত্ত ও মালা সিনহা। শ্রীরামচন্দ্র এ ছবির সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন। মীনা প্রোডাকসন্সের এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইন্দর রাজ আনন্দ।

ভার্টাহিনী স্টুডিওর তিনটি মালয়েলাম ছবির কাজ শেষ হল। ছবির তিনটি নাম—দেবালয়ম, নিনামাণিক্কা কল্পমুগল ও ডকটর।

● অঞ্জলি পিকচার্সের নতুন ছবি 'ফর্লাক সেজ'-র কাজ আরম্ভ হয়েছে গত সপ্তাহে বিজয়া স্টুডিওয়। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তীমালা ও মনোজকুমার। ছবির পরিচালক প্রকাশ রাও।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

শেষপ্রহর। শেষরাতের আকাশে চাঁদ তখনও রয়েছে। শুধু কদমগাছের মাথার ওপরে একটা দাঁড়কাকের ঘুম ভেঙেছে। শহর-কলকাতা কুয়াশা ছড়ানো। এই তো লেভেল ক্রসিং-এর সজাগ ঘণ্টা বাজতে শুরু করলো। একটু বাদেই একটা ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে চলে যাবে।

ভোরের আকাশ ফিকে হতে আরম্ভ করেছে। রাত যাই-যাই করছে। ঐ-তো প্রভাত রায় দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে লাইনের পাশ দিয়ে যেখানে লাইনটা একটুখানি বাঁক নিয়েছে নারকেল সারির গা ঘেঁসে। প্রত্যহের এই এক ছবি প্রভাতের জীবনে। কারণ কারখানার বাঁশি বাজার আগেই তাকে পেঁছতে হবে কর্মস্থলে। তাই আসন্ন-প্রভাতে, প্রভাতের এত ব্যস্ততা। শুধু সঙ্গীমাত্র রোজকার চলে যাওয়া ঐ ট্রেনটা।

শুধু যে অন্ধকার পথ চলতে হয়, তা নয়। কোন কোন দিন আকাশে চাঁদ থাকে। সেই আলোয় আধ-ফোটা শালুক ফুলের রঙটুকু তার চিনতে অসুবিধা হয় না। কলমীদলে ঢাকা পুকুরটার পাশ দিয়ে ঐ হিমে ভেজা সজনে গাছটার কাছে আসতেই প্রভাত একবার থেমে সিগারেট ধরায়। তারপর আবার পথ চল।

সেদিনও এমনি যেতে-যেতে প্রভাত হঠাৎ দেখতে পায় একটা ছায়ামূর্তি মাইল স্টোনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা সে ভেবে পায় না। হিমেভেজা ঘাসের ওপর তার শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। সাহসে বুক বেঁধে সেই-মুহূর্তে প্রভাত ঝাঁপ দিয়ে লাইনের পাশ থেকে এই নারীকে উদ্ধার করলো। পর-মুহূর্তে পরাজয়ের কলঙ্ক ঘোচাতে লম্বা পা ফেলে ট্রেন চলে গেল পাশ দিয়ে।

মুক্তি পেল সেই নারী। ভোরের আলোয় শেষ প্রহরের অস্পষ্টতা স্পষ্ট

'শেষ প্রহর' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ পর্বে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গাঙ্গুলী। সহকারী কলাকুশলী কেনারাম হালদার, পূর্ণেন্দু বসু, নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

হল। অপরিচিতা এই নারীকে প্রভাত চিনতে পারে। তারই বোন হেনার বান্ধবী, প্রীতি সরকার। বাসুদেব সরকারের মেয়ে। প্রভাতের কাছে এই ঘটনা বড় আশ্চর্য বলে মনে হয়। প্রীতির মত মেয়ে কেন আসবে, এই শেষরাতের শেষপ্রহরে, এই নিভৃতে রেললাইনে আত্মহত্যা করার জন্যে? সবটাই রহস্য। তবে হেনার কাছ থেকে কয়েকদিন আগে প্রভাত শুনেছে যে প্রীতির বিয়ের দিন আর দেরি নেই। ঠিক এই সময়ে—!

কদমগাছের মাথায় প্রথম আলো এসে পড়লো। জলভরা প্রীতি সরকারের দুটি বড় বড় চোখ এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। দেখে মনে হয় প্রীতির জীবনের বিদ্রোহ হঠাৎ একজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়েছে। প্রভাত বুঝিয়ে দেয়—'দুঃখ করো না। শুধু বিশ্বাস কর, তুমি ভয়ঙ্কর একটা ভুল করতে চলেছিলে, ভাগ্যি ভাল যে সে ভুল করবার সুযোগ তুমি পেলে না।'

প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে প্রভাত সব জানতে পারলো। আজকের এই শেষ-প্রহরেই নাকি প্রীতির ভালবাসার মানুষটির বিয়ে শেষ হল। নাম তার অতীশ মজুমদার। তিন বছর ধরে প্রীতির ভালবাসাকে উপেক্ষা করে সে তার জীবনের এক বাল্পিতাকে আজ গ্রহণ করবে। তাই এটুকু জীবনের সমস্ত জ্বালা নেভাতে শেষপ্রহরে প্রীতি এসেছিল আত্মহত্যা করতে।

প্রীতির জীবনে প্রভাত যেন শেষ অবলম্বন। ভালবাসার শেষ অঙ্ক। মনের ভাবনায় প্রীতি শেষপ্রহরের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে গুমরে ওঠে। প্রভাতের কথা ভাবে। সে কি আজও সেদিনের মত হঠাৎ রেললাইনের পাশে থামে? থামলেও কি মনে পড়ে তার কথা। মাঝরাতের এই শেষপ্রহরে প্রীতি চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এক-দিন সে নিশির ডাকের আহ্বান শুনে সেই রেললাইনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সজনে গাছের ডালে আবার নতুন ফুল ধরেছে। পুকুরের কলমীদলের ওপর তখন চাঁদের আলো চিকচিক করছে। প্রত্যহের প্রতিনিধি প্রভাত আবার সেই চলে যাওয়া স্মৃতি-দিনটির মত থমকে দাঁড়ায়।

—একি, তুমি আবার এখানে কেন প্রীতি? প্রতিদিন এই পথে যেতে এক-বার তোমার কথা ভেবেছি। শুধু মনে হয়েছে, এতদিনে শান্তি পেয়েছ তুমি, ভাল আছ তুমি। কিন্তু......!

ইঞ্জিনের জ্বলন্ত আলো ফেলে ঐ লম্বা ট্রেনটা চলে গেল প্রীতির মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে। সেই আলোয় প্রভাত দেখে জলভরা চোখ তুলে যেন অন্য এক জগতের সান্ত্বনার দিকে কি যেন আশা করে তাকিয়ে আছে প্রীতি। কেঁপে ওঠে প্রীতির কণ্ঠস্বর—আমাকে ক্ষমা করুন প্রভাতবাবু। দুঃখ করবেন না, আমি মরতে আসিনি।

কদম গাছের মাথার ওপর তখন আলো ছড়িয়ে পড়েছে। প্রীতিকে বাড়ীতে এগিয়ে দিতে সরুপথ ধরে পাশাপাশি চলতে থাকে প্রভাত। বাড়ীর ফটকের সামনে এসে প্রভাত থেমে যায়। বলে—এবার আমি যাই, পাড়ার লোক দেখতে পেলে সন্দেহ করবে। প্রীতি বলে

—করুক সন্দেহ। সকলেই দেখুক, বাবাও দেখুন যে আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন। প্রভাত আবার বলে—সত্যি বলছো?

ঝাপসা চোখের কোণ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে, প্রভাতের মুখের দিকে তাকায় প্রীতি। আর খুব কাছে এসে ধরা গলায় বলে—এসো।

কাহিনী এখানেই শেষ। গল্পের নাম 'শেষপ্রহর'। রচনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। কাহিনীর অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ শুরু করেছেন প্রান্তিকগোষ্ঠী নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। এই সংস্থার অন্যতম পরিচালক হলেন নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গাঙ্গুলী। বিভিন্ন কলাকুশলী বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন আলোকচিত্রে সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্পনির্দেশনা বংশী চন্দ্রগুপ্ত, রূপেন অনন্ত দাস ও ব্যবস্থাপনায় মুকুল চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

চিত্রনাট্যে প্রীতির প্রথম প্রেমিকের চরিত্রে অতীশ মজুমদার একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি। মূল কাহিনীতে এ চরিত্র সম্পর্কে লেখক কোন রেখাপাত করেননি। কিন্তু চিত্রকাহিনীর প্রয়োজনে চিত্রনাট্যে এই চরিত্র সৃষ্টি করে প্রান্তিকগোষ্ঠী বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কোন এক অনুষ্ঠানে প্রীতি জানতে পেরেছিল অতীশ এক ছদ্মবেশী প্রতারক। প্রীতি তাই মুক্তি পেতে শেষপ্রহরে এসেছিল আত্মহত্যা করতে। চিত্রনাট্য শুনে অতীশের এই নতুন চরিত্রের বাঁধুনিটি যুক্তিসঙ্গত মনে হল। পরে অন্য এক সময়ে অতীশের বিচিত্র জীবন-পরিক্রমার কথা আপনাদের বলবো। তার আগে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন তার নাম জানিয়ে রাখি। প্রভাত রায়—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার—শর্মিলা ঠাকুর, অতীশ মজুমদার—দিলীপ মুখার্জি, হেনা—সুব্রতা সেন, বাসুদেব সরকার—পাহাড়ী সান্যাল, প্রভাতের মা—ছায়া দেবী, অতীশের মা—অপর্ণা দেবী এবং প্রভাতের বন্ধু—শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। —চিত্রদূত

প্রবাসী অভিনেত্রী রোমি স্নাইডের

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জার্মান অভিনেত্রী রোমি স্নাইডের জার্মান চিত্রজগতের অদ্বিতীয়া ছিলেন। কমবয়েসী নায়িকার ভূমিকা নির্বাচন করতে গিয়ে প্রযোজকরা রোমির নামটিই আগে ভাবতেন। কিন্তু রোমি বর্তমানে প্যারিসের বাসিন্দা। তাঁর হবু স্বামী আলেইন দিলাঁর দেশকেই স্বদেশ

ক্রিসমাসের মোম ও রোমি স্নাইডার

করেছেন বলতে গেলে। রোমি খ্যাতির শিখরে ওঠেন "সিসি" পর্যায়ের তিনটি জার্মান চিত্রে অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে। ফ্রান্সে এসেও কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা জুড়িয়েছেন রোমি। গত বছর ফরাসী এবং ইটালীর কয়েকটি ছবি ও তাঁর অভিনয় কৃতিত্বে উজ্জ্বল। বর্তমানে আবার রোমি একটি জার্মান ছবিতে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন। ছবিটির নাম "ডি জি গের" ('বিজয়ীরা')। রোমির বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রবার্ট মিচাম।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ॥

ইংল্যান্ড: ২৭৯ রান (কলিন কাউড্রে ৮৫ এবং জিওফ প্লার ৫৩। এ্যালেন ডেভিডসন ৫৪ রানে ৪ এবং সিম্পসন ৫৭ রানে ৫ উইকেট)।

ও ১০৪ রান (পিটার পারফিট ২৮ রান। ডেভিডসন ২৫ রানে ৫ এবং গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ২৬ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া: ৩১৯ রান (ববি সিম্পসন ৯১, নীল হার্ভে ৬৪ এবং বেরী শেফার্ড ৭১ নট আউট। ফ্রেডী টিটমাস ৭৯ রানে ৭ উইকেট)।

ও ৬৭ রান (২ উইকেটে। ববি সিম্পসন ৩৪ নট আউট। ট্রুম্যান ২০ রানে ২ উইকেট)।

প্রথমদিন (১১ই জানুয়ারী): ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭ উইকেট পড়ে ২৫৬ রান ওঠে। টিটমাস (২৮ রান) এবং ট্রুম্যান (১৬ রান) নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১২ই জানুয়ারী): ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানে সমাপ্ত। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেট খুইয়ে ২১২ রান তুলে। বেরী শেফার্ড (১৮ রান) এবং উইকেট-কীপার বি জার্মান (০) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (১৪ই জানুয়ারী): অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩১৯ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬ উইকেট পড়ে ৮৬ রান ওঠে। পিটার পারফিট (২৬ রান) এবং উইকেট-কীপার জে মারে (০) নট আউট থাকেন।

ফ্রেডী টিটমাস

চতুর্থ দিন (১৫ই জানুয়ারী): ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১০৪ রানে সমাপ্ত। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

সিডনির বিখ্যাত ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে বর্তমানে খেলায় ফলাফল সমান (১—১) করেছে। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র যায় এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট

ববি সিম্পসন

খেলায় ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী হয়। আর দুটো টেস্ট খেলা বাকি। অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' সম্মান ফিরিয়ে আনতে হলে ইংল্যান্ডকে বাকি দুটো টেস্ট খেলায় অন্ততঃ একটা খেলায় জয় এবং অপর খেলাটা ড্র করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলায় যদি অনুরূপ ফলাফল হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়া এই রেকর্ড করবে যে, রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে সর্বদাই 'রবার' জয় করেছে।

সিডনির তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের দল গঠনের নীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তাদের পেস বোলাররা প্রায় নিরুদ্দ্ উপোষ দিয়ে-

ডেভিডসন

ছেন। অথচ এ'দের উপরই বেশী নির্ভর ক'রে দল গঠন করা হয়েছিল। বিখ্যাত পেস বোলার ট্রুম্যান প্রথম ইনিংসে ৬৮ রান দিয়ে একটা উইকেটও পাননি। স্ট্যাথাম এবং কোল্ডওয়েল * পেয়েছেন মাত্র একটা ক'রে। অপর দিকে অফ-স্পিন বোলার ফ্রেডী টিটমাস একাই ৭টা উইকেট পান ৭৯ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ট্রুম্যান ২০ রানে ২টো উইকেট পান। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট এবং স্পিন বোলাররা প্রায় সমান-ভাবেই সাফল্য লাভ করেছেন। দুই ইনিংসের খেলায় ফাস্ট বোলার ডেভিডসন ৭৯ রানে ৯টা (৫৪ রানে ৪ ও ২৫ রানে ৫) এবং ম্যাকেঞ্জী ৭৮ রানে ৩টে উইকেট পান (৫২ রানে ০ এবং ২৬ রানে ৩)। প্রথম ইনিংসে স্পিন বোলার ববি সিম্পসন ৫৭ রানে ৫টা এবং বেনো দুই ইনিংসে ৮৯ রানে ২টো উইকেট পান (৬০ রানে ১ ও ২৯ রানে ১)। তৃতীয় টেস্ট খেলায় ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—খেলার এই তিন বিভাগে অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন অস্ট্রেলিয়ার চৌকশ খেলোয়াড় ববি সিম্পসন। সিম্পসন প্রথম ইনিংসে ৯১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট-আউট ৩৪ রান করেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় সিম্পসন ৫৭ রানে ৫টা উইকেট পান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় শেফার্ড (১২), ডেক্সটার (১১) এবং কাউড্রের (৮) ক্যাচ লুফেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি

বেনোর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে সিডনির এই তৃতীয় টেস্ট খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই নিয়ে ২৫ বার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব করে বিল উডফুলের রেকর্ডের সমান করলেন। অপর দিকে তিনি মোট ২২৯টি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক টেস্ট উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছেন। পূর্বে রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার রয় লিন্ডওয়ালের—২২৮ উইকেট। টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান নীল হার্ভের বর্তমানে রান দাঁড়িয়েছে ৫৯৩৯। ছ' হাজার রান পূর্ণ করতে তাঁর আর মাত্র ৬১ রান দরকার। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ৬০০০ হাজার রান পূর্ণ করেছেন মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড়—ইংল্যান্ডের ডবলিউ আর হ্যামন্ড (৭২৪৯ রান), অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান (৬৯৯৬) এবং ইংলন্ডের লেন হাটন (৬৯৭১)। এই তিন জনের

পরই নীল হার্ভের ৫৯৩৯ রান চতুর্থ স্থান পান।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ভাগ্যের খেলায় জয়লাভ করেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে তিনি • এই প্রথম টসে জয়লাভ করলেন। ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। সূচনা ভাল হয় নি। মাত্র ১৮ মিনিট খেলা হয়েছে এবং দলের রান মাত্র ৪—এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট (শেফার্ড) পড়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে পুলার এবং ডেক্সটার ৮২ মিনিট খেলে দলের ৬১ রান যোগ করেন। ডেক্সটার ৩২ রান করে আউট হন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর বলে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বেনোর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৮। ফলে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ফাস্ট বোলার রে লিন্ডওয়াল সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে রেকর্ড (২২৮ উইকেট) করেছিলেন রিচি বেনো সেই রেকর্ডের সমান অংশীদার হন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে পুলার এবং কাউড্রে দলের ৬৭ রান যোগ করেন ১০১ মিনিটের খেলায়। তৃতীয় উইকেট (পুলার) পড়ে দলের ১৩২ রানের মাথায়। ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার ২০৭ মিনিট খেলে তাঁর নিজস্ব ৫৩ রান করেন।

চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৬১, ৩টে উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন কাউড্রে (৫৭) এবং ব্যারিংটন (১৩)। চা-পানের পরই ইংল্যান্ডের খেলায় বিপর্যয় দেখা দেয়। যেখানে স্কোর বোর্ডে এক সময়ে ছিল ৩টে উইকেট পড়ে ২০১ রান সেখানে দেখা গেল ২২১ রানের মাথায় সপ্তম উইকেট পড়ে গেছে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কাউড্রে এবং ব্যারিংটন ৫৬ মিনিটের খেলায় ৬৯ রান করেন। ২২১ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ এবং সপ্তম উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে ঝুলছে ইংল্যান্ডের ২৫৬ রান, ৭টা উইকেট পড়ে। উইকেটে আছেন ট্রুম্যান (১৬) এবং টিটমাস (২৮)। কাউড্রে দলের সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেন ১৫৯ মিনিটের খেলায়।

ইংল্যান্ডের এ কাহিল অবস্থা দাঁড় করান এ্যালেন ডেভিডসন এবং ববি সিম্পসন। ডেভিডসন ৪৮ রানে ৩টে উইকেট পান। ডেভিডসন একই ধরনের পরপর দুটো বল ছেড়ে ইংল্যান্ডের ২২১ রানের মাথায় ব্যারিংটন এবং উইকেট-কীপার মারেকে এল-বি-ডব্লিউ ফাঁদে ফেলে আউট করেন। ডেভিডসন 'হ্যাট-ট্রিক' করবেন, বোলার হয়ে ট্রুম্যান তা কি করে সহ্য করেন! তাই ট্রুম্যান সমস্ত শক্তি দিয়ে ডেভিডসনের 'হ্যাট-ট্রিক' আটকালেন।

ববি সিম্পসন অস্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান। এক সময়ে তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ছিলেন স্টক-বোলার। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের প্রথম দিনে সিম্পসন ৪১ রানে ৩টে উইকেট নেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ হয়। বাকি তিনটে উইকেটে মাত্র ২৩ রান যোগ হয়। প্রচুর রান করার উপযোগী উইকেট পেয়ে এবং টসে জয়লাভ করেও ইংল্যান্ড তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। অষ্টম উইকেটের জুটিতে ট্রুম্যান এবং টিটমাস ৬৬ মিনিটের খেলায় ৫১ রান করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ডেভিডসন ৫৪ রানে ৪টে এবং সিম্পসন ৫৭ রানে ৫টা উইকেট পান। সিম্পসন তাঁর দ্বিতীয় ওভারের শেষ দুই বলে ট্রুম্যান এবং স্ট্যাথামকে আউট করে 'হ্যাট-ট্রিক' করার সুযোগ পান। কিন্তু টিটমাস তাঁর বল ঠেকিয়ে তাঁর সাফল্যের পথে বাধা হন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনাও ভাল হয় নি। দলের ১৪ রানের মাথায় প্রথম উইকেট (লরী) পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে সিম্পসন এবং হার্ভে দলের ভিত অনেকটা সুদৃঢ় করেন—এই জুটিতে ১৬০ রান ওঠে। দলের ১৭৪ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট (হার্ভে) পড়ে টিটমাসের বলে। এই সময় থেকেই অফ-স্পিনার ফ্রেডী টিটমাস বোলিংয়ে মাথা চাড়া দেন। তাঁর বলে পরপর বিদায় নেন হার্ভে (৬৪), সিম্পসন (৯১), ও'নীল (৩) এবং বুথ (১৬)। টিটমাস এই-দিনে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট বল দিয়ে ৪৬ রানে ৪ উইকেট পান। ববি সিম্পসন ২৪২ মিনিট ব্যাট করে নিজস্ব ৯১ রানের মাথায় টিটমাসের বলে বোল্ড আউট হন। সিম্পসনের দুর্ভাগ্য, এই নিয়ে টেস্ট খেলায় তিনি তিনবার নব্বুইয়ের ঘরে পৌঁছেও শতরান করতে পারলেন না। খেলা ভাঙ্গার সময়ে স্কোর বোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার রান জমা পড়লো ২১২ রান, ৫টা উইকেট পড়ে। রাত্রিবাস করতে গেলেন শেফার্ড (১৮) এবং বেরী জার্মান (০)। অস্ট্রেলিয়া স্পিন বোলিংয়ে এইদিন ঘায়েল হয়।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ড খুব কড়া ফিল্ডিং করে। এক ঘণ্টার খেলায় অস্ট্রেলিয়া মাত্র ২৯ রান তুলতে পারে। খেলার ৬ষ্ঠ মিনিটে দলের ২১৬ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (জার্মান) পড়ে যায়। দলের ২৪২ রানের মাথায় ডেভিডসন (১৫) এবং ২৭৪ রানের মাথায় বেনো (১৫) আউট হন। ডেভিডসন তাঁর ১৫ রান তুলেন ৬৩ মিনিটের খেলায় এবং বেনো ২৬ মিনিটে। এক সময়ে বেনো ৬ মিনিটে ১০ রান তুলেছিলেন। ডেভিডসন এবং বেনো দুজনেই অধৈর্য হয়ে আউট হন। দলের ২৭৪ রানের মাথায় যখন ৮ম উইকেট (বেনো) পড়ে যায় তখনও ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রানের নাগাল পেতে অস্ট্রেলিয়ার ৫ রানের প্রয়োজন ছিল। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান গিয়ে দাঁড়ায় ২৯০, ৯টা উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন শেফার্ড (৫১) এবং গেস্ট (২)। এই সময়ে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের থেকে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১১ রানে অগ্রগামী ছিল। দলের শেষ দশম উইকেট পড়ে ৩১৯ রানের মাথায়। শেষ উইকেটের জুটিতে অস্ট্রেলিয়ার দুই নতুন টেস্ট খেলোয়াড় গেস্ট এবং শেফার্ড ৩৯ রান যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৪০ রান অগ্রগামী হয়। অস্ট্রেলিয়ার নতুন টেস্ট খেলোয়াড় বেরী শেফার্ড জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৭১ রান করে নট আউট থাকেন। ২৮৪ মিনিটের খেলায় শেফার্ড একটা ওভার বাউন্ডারী এবং ৮টা বাউন্ডারী করেন। সিম্পসন দলের সর্বোচ্চ ৯১ রান করেন। তাঁর পরই শেফার্ডের এই নট আউট ৭১ রান। শেফার্ড প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দ্বাদশ খেলোয়াড় ছিলেন। ইংল্যান্ডের অফ্-ব্রেক বোলার ফ্রেডী টিটমাসের বোলিং সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় দিনের সকালের দিকের খেলায় টিটমাস ৮ ওভার বল করে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। এই সময়ে তাঁর বোলিংয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৬৪ রানে ৭টা উইকেট। খেলার শেষে দাঁড়ায় ৩৭ ওভার বল এবং ৭৯ রানে ৭টা উইকেট। দশটা উইকেটের মধ্যে টিটমাস কেবল পান নি তিনটে উইকেট—১ম, ৬ষ্ঠ এবং ১০ম উইকেট। ৬ষ্ঠ উইকেট কোন বোলারের ভাগ্যে জুটে নি—সর্ট-লেগ থেকে রেভারেন্ড ডেভিড শেফার্ড অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কীপার বেরী জার্মানকে রান আউট করেন। ১ম এবং ১০ম উইকেট পান যথাক্রমে কোল্ডওয়েল এবং স্ট্যাথাম।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানের (৩১৯) থেকে মাত্র ৪০ রান পিছনে পড়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু এই ৪০ রান উসুল করার আগেই ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে যায়। দলের ৩৭ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার এ্যালেন ডেভিডসনের বল আজ নির্মমভাবে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করে। তাঁর বলে প্রথম তিনটে উইকেট পড়ে—পুলার (০), ডেক্সটার (১১) এবং শেফার্ড (১২)। দলের রান মাত্র

পরবর্তী টেস্ট

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলা ২৫শে জানুয়ারী এডিলেডে এবং পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিডনীতে আরম্ভ হবে।

২৫। আর একটা ওভার খেলার পরই চা-পানের বিরতি। এই শেষ ওভারে বল দিতে এলেন স্বয়ং অধিনায়ক রিচি বেনো এবং তাঁর প্রথম বলেই কাউড্রে ক্যাচ তুলে সিম্পসনের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৭, ৪টে উইকেট পড়ে। পরবর্তী খেলায় আরও দুজন (ব্যারিংটন এবং টিটমাস) আউট হলেন। ৬টা উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের মাত্র ৮৬ রান দাঁড়াল। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ৩১৯ রানের মধ্যে বেঁধে রেখে ইংল্যান্ড খেলায় যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের এই বিপর্যয়ে তা সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মাথায় চড়ে বসে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো খুবই অধীর হয়ে পড়েন। হাতে দুদিন খেলার সময় বাকি কিন্তু তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলাটা শেষ করতে চান। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে কোন সময়ে বৃষ্টি নামবে। অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে ইংল্যান্ডের ছাড়ান পাওয়ার একমাত্র ভরসা এই বৃষ্টি। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার চাতক পাখির মত আকাশের পানে যেন চেয়ে আছেন।

তৃতীয় দিনের অপরাজেয় খেলোয়াড় পারফিট এবং মারে যেন কঠিন প্রতিজ্ঞা করে খেলতে নেমেছেন—সারাদিন মাটি কামড়ে ব্যাট করবেন—তাঁদের রান লক্ষ্য নয়। কুড়ি মিনিট খেলে পারফিট মাত্র ২ রান করলেন। তাঁর জুটি মারের এই সময়ে গতকালের খেলা নিয়ে এক ঘন্টা খেলা হয়েছে কিন্তু রানের ঘর শূন্য। জন মারের ব্যাট থেকে পাঁচ গজ দূরে অস্ট্রেলিয়ার ৯ জন খেলোয়াড় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। শত চেষ্টা করেও পারফিট পরাস্ত হলেন। দলের ৯০ রানের মাথায় ম্যাকেঞ্জির বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন। ১৪৩ মিনিট খেলে ২৮ রান করে তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। মারে ৭৪ মিনিট খেলে প্রথম রান করেন। কিন্তু কিছুতেই ইংল্যান্ড দলের পতন রোধ করতে পারে নি। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১০৪ রানে শেষ হয়। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের বাকি ৪টে উইকেটে পূর্বদিনের ৮৬ রানের সংগে মাত্র ১৮ রান যোগ হয় ৫৬ মিনিটের খেলায়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ডেভিডসন ২৫ রানে ৫টা এবং ম্যাকেঞ্জি ২৬ রানে ৩টে উইকেট পান।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ার পরই বৃষ্টি নামে। পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে ইংল্যান্ডের শেষ ভরসা ছিল এই বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করে ইংল্যান্ড ২৮ মিনিট দেরীতে খেলতে নামে। খেলা আরম্ভের সংগে সংগে আবার বৃষ্টি পড়তে সুরু করে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক খেলা বন্ধের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান সিম্পসনের প্রথম রান করার পরই মেঘের আড়াল থেকে সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করেন এবং বৃষ্টিও বন্ধ হয়।

শেষ পর্যন্ত বরুণদেব ইংল্যান্ডকে মুখচেয়ে দেখলেন না। ইংল্যান্ডের খেলায় কোন আশা-উদ্দীপনা ছিল না। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ২৬, পাঁচ ওভারের খেলায়। প্রথম উইকেটের জুটি লরী (৬) এবং সিম্পসন (১৫) তখনও খেলছেন। লাঞ্চের পরের প্রথম ওভারেই দলের ২৮ রানের মাথায় ট্রুম্যানের বলে লরী বোল্ড আউট হন। তখনও অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্য ৩৭ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের ৫৪ রানের মাথায় দলের দ্বিতীয় উইকেট (হার্ভে) পড়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৬২ মিনিট খেলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনের থেকে ২ রান বেশী অর্থাৎ ৬৭ রান করে ৮ উইকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৩ রানের মাথায় খেলা শেষ হয়ে গেছে এই ভুল ধারনায় শত শত স্কুল-ছাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দনের উদ্দেশ্যে পীচ আক্রমণ করে। এই দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক বয়স্ক লোকও ছিলেন। একজন অতি উৎসাহী দর্শক একটা স্টাম্পই তুলে ফেলেন। এক রকম মল্ল-যুদ্ধ ক'রেই আম্পায়ার মিঃ রোয়ান স্টাম্পটি উদ্ধার করেন। খেলায় জয়-লাভের বাকি দু' রান এবং বাড়তি দু' রান একসংগে আসে বুথের বাউন্ডারী থেকে।

ইংল্যান্ডের এ্যালেক বেডসার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২৩৬টি উইকেট পেয়ে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজ ভাঙ্গার মুখে এসে গেছে। আজ তাঁর নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন এই তিনজন বোলার—স্ট্যাথাম (ইংল্যান্ড), ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড) এবং রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)। সিডনির ইংল্যান্ড - অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার পর এই তিনজনের হাতে উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে —জে বি স্ট্যাথাম ২৩৫টি, রিচি বেনো ২২৯টি এবং ফ্রেডী ট্রুম্যান ২২৯টি। এই তিনজনের হাতে আছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার বাকি দুটো টেস্ট খেলা।

॥ সিডনি মাঠে টেস্ট রেকর্ড ॥

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মোট খেলা ৩৭ ঃ অস্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যান্ডের জয় ১৫ এবং খেলা ড্র ২।

প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ

১৮৮২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

এক ইনিংসে দলগত রান (৫০০ রানের বেশী)

ইংল্যান্ড ঃ ৬৩৬ রান (১৯২৮-২৯); ৫৭৭ রান (১৯০৩-৪); ৫৫১ রান (১৮৯৭-৮); ৫২৪ রান (১৯৩২-৩)।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৬৫৯ রান (৮ উইকেটে, ১৯৪৬-৭); ৫৮৬ রান (১৮৯৪-৫); ৫৮১ রান (১৯২০-১)।

এক ইনিংসের দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড ঃ ৬৩৬ রান (১৯২৮-৯)
অস্ট্রেলিয়া ঃ ৬৫৯ রান (৮ উইঃ ১৯৪৬-৭)

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংল্যান্ড ঃ ৪৫ রান (১৮৮৬-৭)
অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪২ রান (১৮৮৭-৮)

দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০০ রান

ইংল্যান্ডের পক্ষে ঃ ৪১১ (১ম টেস্ট), ১৯২৪-৫।

জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী রান

এই সিডনির ওভাল মাঠে এ পর্যন্ত ৬ জন খেলোয়াড় (ইংল্যান্ডের ৪ ও অস্ট্রেলিয়ার ২ জন) তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সর্বপ্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী রান করেছেন। পরলোকগত পতৌদির নবাব ইফতিকার আলী এম সি সি দলের সংগে ১৯৩২-৩৩ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে সিডনির প্রথম টেস্ট ম্যাচে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী (১০২ রান) করার গৌরব লাভ করেন।

উল্লেখযোগ্য বোলিং সাফল্য

১৫ রানে ৬ উইকেট লাভ—সি টি বি টার্নার (অস্ট্রেলিয়া), ১৮৮৬-৭।

হ্যাট-ট্রিক

ইংল্যান্ডের পক্ষে : জে ব্রিগস (১৮৯১-২)।

একটা খেলায় ৬টা সেঞ্চুরী

প্রথম টেস্ট, ১৯২৪-২৫ সাল

ইংল্যান্ড (৩) : জে হবস (১১৫); এইচ সাটক্লিফ (১১৫), এফ ই উলী (১২৩)।

অস্ট্রেলিয়া (৩) : এইচ কলিন্স (১১৪), ডব্লিউ পোন্সফোর্ড (১১০), জে এম টেলর (১০৮)।

এক ইনিংসে ৩টে সেঞ্চুরী

প্রথম টেস্ট, ১৯৩২-৩৩ সাল

ইংল্যান্ড : এইচ সাটক্লিফ ১৯৪, ডব্লিউ আর হ্যামন্ড ১১২ এবং পতৌদির নবাব ১০২।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ২৮৭ আর ই ফোস্টার, (১৯০৩-৪)

অস্ট্রেলিয়া : ২৩৪ ডি জি ব্র্যাডম্যান
২৩৪ এস বার্নেস
১৯৪৬-৭ সাল

টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড ২৫, অস্ট্রেলিয়া ২৪, মোট ৪৯

রেকর্ড পার্টনারসীপ রান

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১৪৩ রান (৭ম উইঃ) এফ ই উলী এবং জে ভাইন, ১৯১১-২; ১৩০ রান (১০ম উইঃ) আর ই ফোস্টার এবং ডব্লিউ রোডেস, ১৯০৩-৪।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

৪০৫ রান (৫ম উইঃ) ব্র্যাডম্যান এবং এস জি বার্নেস, ১৯৪৬-৭; ১৫৪ রান (৯ম উইঃ) এস গ্রিগরী এবং জে ব্ল্যাকহাম, ১৮৯৪-৫; ১২৭ রান (১০ম উইঃ) জে টেলর এবং এ মেলী, ১৯২৪-৫।

এক ইনিংসে জয়লাভ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : এক ইনিংস ও ১৪৭ রান (১৮৯৪—৫)।

ব্যক্তিগত ডবল সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ২৮৭ আর ফোস্টার (১৯০৩—৪); ২৫১ ডব্লিউ হ্যামণ্ড (১৯২৮—৯); ২৩১ ডব্লিউ হ্যামণ্ড (১৯৩৬-৭)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২৩৪ ডি জি ব্র্যাডম্যান (১৯৪৬-৭); ২৩৪ এস জি বার্নেস (১৯৪৬-৭); ২০১ এস ই গ্রেগোরী (১৮৯৪-৫)।

একটি খেলায় সর্বনিম্ন রান

৩৭৪ রান (ইংল্যান্ড ১১৩ ও ১৩৭; অস্ট্রেলিয়া ৪২ ও ৮২), ১৮৮৭-৮। এই ৩৭৪ রান অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড।

ওভার বাউণ্ডারীর বিশ্ব রেকর্ড

ক্রিকেট খেলায় ওভার বাউণ্ডারী মার ব্যাটসম্যানের দিক থেকে যেমন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় তেমনি বোলারের পক্ষে চরম অসম্মানের কারণ। দর্শকদের কাছে ওভার বাউণ্ডারী মারের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক জন রীড তাঁর নিজস্ব ২৯৬ রানের মধ্যে ১৫টা ওভার বাউণ্ডারী ক'রে প্রথম

জন রীড

শ্রেণীর ক্রিকেটে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ওভার বাউণ্ডারী করার বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। এই রেকর্ড হয়েছে নিউজিল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (প্লাংকেট শীল্ড নদার্ণ ডিস্ট্রিক্ট বনাম ওয়েলিংটন দলের খেলায়। জন রীড খেলেছিলেন ওয়েলিংটন দলের পক্ষে। তাঁর এই ২৯৬ রানের মধ্যে ছিল ১৬টা ওভার বাউণ্ডারী এবং ৩৫টা বাউণ্ডারী এবং এই রান করতে তাঁর সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। জন রীড নিউজিল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবং উইকেট-কীপার। এ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর সাফল্য এই রকম দাঁড়িয়েছে : খেলা ৩৪, মোট রান ১৬৬৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৫, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৩, কট ২৭ এবং স্টাম্পড ১।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ওভার বাউণ্ডারী করার পূর্ব রেকর্ড :

১১টি—সি কে নাইডু (হিন্দু দল), এম সি সি দলের বিপক্ষে, বোম্বাই, ১৯২৬-২৭।

—চার্লি বার্নেট (গ্লাস্টারসায়ার), সামারসেট দলের বিপক্ষে, ১৯৩৪।

—রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া), টি এন পিয়ার্স একাদশ দলের বিপক্ষে, ১৯৫৩।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।